২১শ বর্ষ ১৩৪৯ সালের বৈশাখ হইতে আশ্বিন সংখ্যা পর্য্যন্ত [১ম খণ্ড]

বিষয়ানুক্রমিক সূচী

বিষয়ানুক্রমিক সূচী

কবিতা ঃ—

নক্সা ঃ—

লেখকগণের নামানুক্রমিক রচনা-সূচী

লেখকগণের নামানুক্রমিক রচনা-সূচী

চিত্রসূচী—বিষয়ানুক্রমিক

চিত্রসূচী—বিষয়ানুক্রমিক

চিত্রসূচী—বিষয়ানুক্রমিক

চিত্রসূচী—বিষয়ানুক্রমিক

চিত্র — পত্রাঙ্ক

শিল্প-চিত্র ঃ—

শিল্পিগণের নামানুক্রমিক সূচি

২১শ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড

(১৩৪৯ সাল—কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ,

সম্পাদক

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী বৈদ্যুতিক রোটারী মেসিনে'
শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত

২১শ বর্ষ] ১৩৪৯ সালের কার্ত্তিক হইতে চৈত্র সংখ্যা পর্য্যন্ত [২য় খণ্ড

বিষয়ানুক্রমিক সূচী

বিষয়ানুক্রমিক সূচী

বিষয় পত্রাঙ্ক

সাময়িক প্রসঙ্গ ঃ—(বর্ণানুক্রমিক)

বিষয় লেখকগণের নাম পত্রাঙ্ক

ছোটদের আসর ঃ—

অশ্রু-অর্ঘ্য ঃ—

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য ঃ—

লেখকগণের নামানুক্রমিক রচনা-সূচী

চিত্রসূচী—বিষয়ানুক্রমিক

চিত্রসূচী—বিষয়ানুক্রমিক

চিত্রসূচী—বিষয়ানুক্রমিক

চিত্রসূচী—বিষয়ানুক্রমিক

শিল্পিগণের নামানুক্রমিক সূচি

২১শ বর্ষ] আশ্বিন, ১৩৪৯ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

মৃন্ময়ী—চিন্ময়ী

অখিল-ভূতধাত্রী ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী দেবী বসুন্ধরার স্বর্ণাঞ্চল যথায় আস্তৃত, সেই রত্নপ্রসূ ভূখণ্ডই বরণীয়া শ্রীশ্রীভারত-মাতৃকার অধিষ্ঠান। সমগ্র পৃথিবীর প্রতীক এই ভারতবর্ষ। আবার সারা ভারতের সার—আমাদের স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি —এই সোণার বাঙ্গালা। সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা এই বঙ্গজননীর মৃন্ময়ী মূর্ত্তি ধ্যাননিষ্ঠ ঋষির ক্রান্তদৃষ্টিতে—ভাবমগ্ন কবির রসসৃষ্টিতে—আত্মহারা মাতৃসাধকের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা-শক্তিতে চিন্ময়ীরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। অবশ্য এ তত্ত্ব প্রকৃতির বাহ্যসৌন্দর্য্যের পূজারি প্রাকৃত কবির অনুভূতিগোচর না-ও হইতে পারে। শরতে বঙ্গের সকল সৌন্দর্য্য তিনি কেবল ঝরা শেফালীর মালার মৃদুল গন্ধ, কাশকুসুম-গুচ্ছের পেলব স্পর্শ ও নবীন ধানের মঞ্জরীর সোণালী রূপের মধ্যেই সম্ভৃত দেখিতে পারেন। কিন্তু আনন্দময়ীর আগমনের সূচনায় মৃন্ময়ী-চিন্ময়ীকে বর্ষান্তে আদরিণী কন্যারূপে গৃহে বরণ করিয়া তুলিবার যে অকৃত্রিম আকূতি হিরন্ময়-রবি-করোজ্জ্বল শারদ প্রভাতে আগমনী-গানের ভিতর দিয়া তনয়া-বিচ্ছেদ-বিধুর রোগশোক-অভাব-জর্জ্জর নিরানন্দ বাঙ্গালী গৃহস্বামিগণের গৃহে গৃহে অনাবিল আনন্দের স্রোত বহাইয়া দেয়, তাহার যথার্থ উপলব্ধি করিতে হইলে সূক্ষ্ম সংস্কৃতি অপেক্ষা প্রাণস্পর্শী সহৃদয়তার প্রয়োজনই অধিক বলিয়া মনে হয়।

মৃন্ময়ী দেশমাতৃকার রূপ যে চিন্ময়ী জগজ্জননীরই রূপান্তর মাত্র, চিন্ময়ী ও মৃন্ময়ী যে একান্ত অভিন্ন—এ চিরন্তন শাশ্বত সত্য আর্য্যযুগের আদি-কবি হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালার বর্ত্তমান যুগের অন্যতম প্রবর্ত্তক বাঙ্গালী ঋষিকবির বাণীর মধ্য দিয়া যুগে যুগে নব নব রূপে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। চিরঞ্জীব বঙ্কিমচন্দ্রের অমর মন্ত্র-সঙ্গীত 'বন্দে মাতরম্' এর মধ্যে এই মহাসত্যই অপরূপ বাঙ্ময়ী-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে যে, শস্যশ্যামলা মৃন্ময়ী মাতৃ-ভূমিই চিদানন্দময়ী মহাশক্তিরূপিণী দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী—কমলা কমলদল-বিহারিণী—বাণী বিদ্যাদায়িনী।

ঋষি-প্রণীত পুরাণগুলিতে চিন্ময়ীর মূর্ত্তি-গঠনের উপাদানরূপে মৃত্তিকা-দারু-শৈলখণ্ড-বিবিধ-ধাতু প্রভৃতি দ্রব্যের উল্লেখ থাকিলেও বাঙ্গালী সাধক তাঁহার সাকার উপাসনার প্রতীক প্রতিমার গঠনোপাদান হিসাবে মৃত্তিকাকেই সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার জন্মভূমি মাটির সহিত জগৎপ্রসবিনী মা-টির এরূপ ঐক্য ভারতেরও আর কোন প্রদেশের সাধক হয় ত উপলব্ধি করেন নাই। হয় ত বাঙ্গালী সাধক—বাঙ্গালী শিল্পী ভাবিয়াছিলেন, কোমল মাটি তাঁহার আরাধ্যের রূপ যত সহজে গ্রহণ করিতে পারিবে—এই নমনীয় উপাদানটিকে যেরূপে যেমন ইচ্ছা পরিবর্ত্তিত করা চলিবে, তেমন যথেচ্ছাচরণ কাষ্ঠ-পাষাণ-ধাতু প্রভৃতি উপাদান লইয়া চলিবে না। মৃন্ময়ী মূর্ত্তিতে যেমন বিবিধ সূক্ষ্ম ভাবের অভিব্যক্তি করান

যায়, কাষ্ঠ-পাষাণ-ধাতুময়ী মূর্ত্তিতে তাহা সম্ভব হয় না। মাটির প্রতিমাতে যে কমনীয়তা প্রকাশ পায়, কাষ্ঠাদিময়ী প্রতিমার কোন না কোন স্থানে যেন তাহার একটু না একটু অভাব থাকিয়াই যায়। এই সরসতার রহস্যটুকু বাঙ্গালী-চিত্তের নিকট যতটা ধরা দিয়াছিল, অন্য কোন দেশের জনহৃদয়ে তত দূর পরিস্ফুট হয় নাই। প্রাচীন বাঙ্গালী বুঝিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালীর সহজ ভাবপ্রবণ সরস হৃদয়ের ন্যায়ই বাঙ্গালার স্বভাব-সরস মৃত্তিকা অতি কোমল—কমনীয়—সহজে নমনীয়। বাঙ্গালার মাটির মত সরস-কোমল-শ্যামল মাটিই যে অন্য দেশের বুকে নাই। তাই মাটির প্রতিমার আদরও সে সব দেশে কোন দিন হয় নাই। যে দেশের মৃত্তিকা কঙ্কর-বহুল কঠিন, অথবা যে দেশে হয় ত মাটির সাক্ষাৎ মিলাই কঠিন—চারি দিকে কেবল দীর্ঘ বন্ধুর পর্ব্বতশ্রেণী, আর অধিষ্ঠান-ভূমির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া যে সকল দেশের জনচিত্ত ভাবহীন কঠোর কর্ম্মঠ,—সে সকল দেশে মৃন্ময়ী অপেক্ষা শৈলময়ী মূর্ত্তি যে অধিক সমাদরে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য হইবার কি আছে!

বাঙ্গালীর চিত্ত ইষ্ট-সাধনার সময়েও কোন দিন শ্যামল কোমল বঙ্গভূমির চিরাগত সংস্কার ভুলিতে পারে নাই। তাই স্নিগ্ধ-শ্যামা জন্মস্থলীর রূপ অন্তরের পটভূমিকায় রাখিয়া বাঙ্গালী সাধক তাঁহার ইষ্টদেবতার বাহ্যরূপ কল্পনা করিয়াছেন—শ্যাম। পুরুষরূপে তিনিই শ্যামসুন্দর—প্রকৃতিরূপে তিনিই শ্যামা জন্মহরা। এই দুয়ে এক—একে দুই—এ ছাড়া বাঙ্গালীর ইষ্ট নাই[১]।

বাঙ্গালা দেশে এই মৃন্ময়ী-পূজার ইতিহাস সঙ্কলন করা বর্ত্তমানে বড়ই কঠিন। এ দেশে কবে এই মৃন্ময়ী-পূজার প্রথম প্রবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহার ইতিহাস অতীতের অন্ধকারগর্ভে নিহিত। অবশ্য মৃন্ময়ী-পূজার প্রথম সূচনার পৌরাণিক বিবরণ পাওয়া যায় দেবীমাহাত্ম্য-প্রকাশক শ্রীশ্রী৺মার্কণ্ডেয়-চণ্ডী-সপ্তশতীর মধ্যেই। উহাতে পাই যে, মহারাজ সুরথ ও বৈশ্যবর সমাধি নদীপুলিনে ৺শ্রীশ্রী-জগন্মাতার 'মহীময়ী' মূর্ত্তি গড়িয়া তিন বৎসর ধরিয়া নানা উপচারে উহার অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। অবশ্য অগ্নি-পুরাণাদিতেও দেবতাগণের মৃন্ময়ী-দারুময়ী-লোহময়ী (ধাতুময়ী) রত্নময়ী-শৈলময়ী-গন্ধময়ী-কুসুমময়ী এই সাত প্রকার প্রতিমা-গঠনের নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। মৃন্ময়ী প্রতিমা পূজিত হইলে সদ্যঃ অভীষ্ট ফল দান করে, ইহাও পুরাণাদিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাই বলিয়া মৃন্ময়ীপূজা-পদ্ধতির কোন ধারাবাহিক ইতিহাস এ সকল বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন পৌরাণিক উক্তি হইতে সংগ্রহ করা সম্ভবপর নহে! সুরথ-সমাধির পূজায় একটা কাহিনীর উল্লেখ আছে সত্য; কিন্তু উহাকেও ঐতিহাসিক ঘটনা বলিতে বর্ত্তমানের পণ্ডিতগণ রাজী হন না।

আর সুরথ-সমাধির পূজাও ত বাসন্তী-পূজার বিধি অনুসারে অনুষ্ঠিত—যদিও উহা নিত্যপূজারূপে তিন বৎসর যাবৎ সম্পাদিত হইয়াছিল। ৺চণ্ডীতে অবশ্য "শরৎকালে বার্ষিকী মহাপূজা"রও উল্লেখ আছে। কিন্তু তাহাতে মৃন্ময়ী মূর্ত্তির পূজা করিতে হইবে কি না—তাহার স্পষ্ট কোন উল্লেখ নাই। আর এ সব পৌরাণিক উক্তিতে ইতিহাসের গুরুত্ব আরোপে বর্ত্তমান যুগের গবেষকগণ সম্মত নহেন।

বাঙ্গালার জনসাধারণের অন্তরে বহু দিন হইতে একটা বদ্ধমূল ধারণা আছে যে, বাঙ্গালা দেশে মৃন্ময়ী দুর্গামূর্ত্তি-পূজার প্রথম প্রবর্ত্তক নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র। কিরূপে

---

(১) সুপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালী তান্ত্রিক মহামতি ভাস্কর রায় ৺সপ্তশতী-চণ্ডীর উপর স্বীয় "গুপ্তবতী" টীকার উপোদ্ঘাতে এই কথাই বলিয়াছেন। উপাসকগণের নিকট ব্রহ্মধর্ম্ম বা চিচ্ছক্তির প্রকাশ দুইটি আকারে হইয়া থাকে—পুরুষরূপে ও স্ত্রীরূপে। পুরুষরূপে তিনি মহাবিষ্ণু, আর স্ত্রীরূপেই তিনি দেবী ভবানী। এই পুরুষ-প্রকৃতি-রূপ ধর্ম্ম ব্যতীত ধর্ম্মী এক জন আছেন—তিনি ধর্ম্ম হইতে অভিন্ন; অর্থাৎ—শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ—শক্তিসিদ্ধান্ত। আবার এই ধর্ম্ম-ধর্ম্মী-উভয়াত্মক চিন্মাত্রস্বরূপ ব্রহ্ম। ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী—এই উভয়ভেদই মায়াবশতঃ কল্পিত ("পরব্রহ্মমহিষী শ্রীশ্রীচণ্ডিকা" শীর্ষক মদীয় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য—মাসিক বসুমতী, আশ্বিন, ১৩৪৮)। অপ্পয় (?) দীক্ষিতও তাঁহার "রত্নত্রয়পরীক্ষা" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে এইরূপ কথাই বলিয়াছেন—পরমশিব, মহাবিষ্ণু ও পার্ব্বতী—এই তিন জন দেবতাই 'রত্নত্রয়'। তন্মধ্যে এক পরমশিবেরই দ্বিধা প্রকাশ—বিষ্ণু ও পার্ব্বতী। পরমশিব চিন্মাত্রস্বরূপ। আর বিষ্ণু বা পার্ব্বতী তাঁহার শক্তিস্বরূপ। বিষ্ণু ও পার্ব্বতী অভিন্ন—উভয়েই শিবের শক্তিরূপ—এ-কথাটি আপাততঃ শুনিতে যেন কেমন-কেমন ঠেকিবে। কিন্তু দুইটি অতি সরল ব্যাপার আলোচনা করিলেই সকল সংশয় দূর হইবে। অর্দ্ধনারীশ্বর (হরগৌরী) মূর্ত্তিতে শক্তিমান্ শিবের বামভাগে শক্তিরূপা গৌরী; আবার হরিহর মূর্ত্তিতেও হরের বামাংশে হরি; অর্থাৎ—এক কথায় গৌরী ও হরি উভয়েই হরের বামদেশস্থিত শক্তিরূপ মাত্র। চিন্মাত্রস্বরূপ পরমশিব কেবল জ্ঞেয়স্বরূপ—ধ্যেয় বা উপাস্য হইতেই পারেন না। উপাস্য হইতে পারেন তাঁহার সশক্তিক রূপ। তাই বিষ্ণু ও পার্ব্বতী—এই দুই মূর্ত্তিই—চির উপাস্য। বিষ্ণু ত শ্যামবর্ণই। পার্ব্বতীও শ্যামা। ইহার প্রমাণ চণ্ডীতেই আছে। "...কৃষ্ণাভূৎ সাপি পার্ব্বতী। কালিকেতি সমাখ্যাতা..." ইত্যাদি। টীকাকারগণ ইহার নানারূপ অর্থ করিলেও ইহা বুঝা যায় যে, পার্ব্বতী দেবী প্রথমে কৃষ্ণবর্ণা ছিলেন ও পরে গৌরী হইয়াছিলেন। পুরাণান্তরেও ইহা সমর্থিত হইয়া থাকে।

এই ধারণার উদ্ভব হইল, তাহা বলা যায় না—অথচ এরূপ ধারণার কোনই ভিত্তি নাই। কারণ, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বহু পূর্ব্বকাল হইতেই যে এ দেশে মৃন্ময়ী-পূজা প্রচলিত আছে, সে সম্বন্ধে প্রমাণের অভাব নাই।

নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও বাঙ্গালার বিখ্যাত নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা—উভয়েই এক সময়ের লোক (খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ)। পক্ষান্তরে, সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গীয় স্মার্ত্তকুলচূড়ামণি মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহোদয় শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সমকালবর্ত্তী—কিঞ্চিদধিক সাড়ে চারি শত বৎসর পূর্ব্বে উভয়ে বিদ্যমান ছিলেন[২]। এখন বাঙ্গালা দেশে মৃন্ময়ী শারদীয়া দুর্গাপূজার যে সকল পৌরাণিক পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহাদিগের উল্লেখ স্মার্ত্ত-ভট্টাচার্য্য-প্রণীত 'দুর্গোৎসব-তত্ত্ব' ও 'দুর্গাপূজা তত্ত্ব' নামক গ্রন্থদ্বয়ে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া স্মার্ত্ত-ভট্টাচার্য্য মহোদয় স্বয়ং একখানি দুর্গাপূজা-পদ্ধতি সঙ্কলিত করিয়াছিলেন। উহা স্মার্ত্তমতের পূজা-পদ্ধতি। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বাঙ্গালা দেশে উহার বহুল প্রচার কোন দিনই হয় নাই।

রঘুনন্দন আবার স্বীয় গ্রন্থে স্মার্ত্ত-ধুরন্ধর মৈথিল বাচস্পতি মিশ্রের সুপ্রসিদ্ধ 'কৃত্যচিন্তামণি' গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, বাচস্পতি রঘুনন্দন অপেক্ষা কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন[৩]। তাঁহার কৃত্যচিন্তামণিতে মৃন্ময়ী বাসন্তী-পূজার বিবরণ দৃষ্ট হয়। ইহা ব্যতীত 'দুর্গা' নামটিরও উল্লেখ উক্ত গ্রন্থে আছে।

সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-মহাজন-পদাবলী-রচয়িতা কবিবর শ্রীল বিদ্যাপতি ঠাকুরের 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী'র নাম ইহার পরেই উল্লেখযোগ্য। ইহাতেও মৃন্ময়ী দুর্গামূর্ত্তির পূজাপদ্ধতি সবিস্তরে লিপিবদ্ধ আছে। 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী'র পদ্ধতি আজিও শ্রীহট্ট দেশের বহু শাক্ত-বংশে অনুসৃত হইতে দেখা যায়। বাঙ্গালাদেশে বর্ত্তমানে যে সকল দুর্গাপূজাপদ্ধতি বিশেষ ভাবে প্রচলিত, সেগুলি হইতে বিদ্যাপতি-রচিত পদ্ধতির (দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণীর) স্থানে স্থানে সামান্য সামান্য পার্থক্য আছে। আর এই সকল কারণে রঘুনন্দন বিদ্যাপতির উপর তীব্র কটাক্ষ করিতেও ছাড়েন নাই[৪]।

---

(২) শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মসময় ১৪০৭ শক বা ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দ। রঘুনন্দন মহাপ্রভু অপেক্ষা কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ১৪২১ শক বা ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জ্যোতিস্তত্ত্ব রচিত হয়।

(৩) বাচস্পতি মিশ্র—এই নামের বহু ব্যক্তির সন্ধান মিথিলায় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে দুই জন খুব প্রসিদ্ধ। এক জন প্রাচীন বাচস্পতি মিশ্র—সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র—ষড়্দর্শনের টীকাকার—'ভামতী', 'ব্রহ্মতত্ত্বসমীক্ষা', 'ন্যায়কণিকা', 'ন্যায়সূচীনিবন্ধ', 'তাৎপর্য্যটীকা' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। ইঁহার আবির্ভাব-কাল আনুমানিক খৃঃ নবম শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদ। দ্বিতীয়, অভিনব বাচস্পতি মিশ্র ন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্রের অদ্বিতীয় পণ্ডিত। "খণ্ডনোদ্ধার" (শ্রীহর্ষ-কৃত খণ্ডন-খণ্ডখাদ্য গ্রন্থের খণ্ডন) ও 'চিন্তামণি'-নামক স্মৃতিনিবন্ধসমূহ ইঁহার রচনা। মিথিলার মহারাজাধিরাজ ভৈরব সিংহ (হরিনারায়ণ) ও তৎপুত্র রামভদ্র (রূপনারায়ণ) ইঁহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ইঁহার সময় অনুমান খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষপাদ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ। রঘুনন্দন তাঁহার নানা গ্রন্থে বাচস্পতির নাম শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করিয়াছেন। বাচস্পতি বিদ্যাপতির পরবর্ত্তী; যেহেতু, তিনি কৃত্যচিন্তামণিতে অতি শ্রদ্ধাভরে বিদ্যাপতি-কৃত দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণীর নামোল্লেখ করিয়াছেন—"পূজাবিধানং তু দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণ্যামনুসন্ধাতব্যম্"।

(৪) অধ্যাপক কীথ বিদ্যাপতিকে খৃঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে ফেলিতে চাহেন—A History of Sanskrit Litarature, P. 293. ৺দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থের পঞ্চম সংস্করণে (পৃঃ ২১৪-১৫) পাওয়া যায়—"তাঁহার সর্ব্বশেষ সংস্কৃত গ্রন্থ 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' ভৈরব সিংহ মহারাজের (হরিনারায়ণ) রাজত্ব সময়ে যুবরাজ রামচন্দ্রের (রূপনারায়ণ) উৎসাহে বিরচিত হয়। [পাদটীকা : দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণীর ভূমিকায় 'স্বস্তি' স্থলে 'অস্তি' পাঠ ধরিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন, উক্ত পুস্তক নরসিংহদেবের রাজত্বকালে রচিত হইয়াছিল।] ভৈরবসিংহের রাজত্ব (১৫০৬—১৫২৭ খৃষ্টাব্দ)...আর কাব্যবিশারদ মহাশয়ের মতানুসারে ঐ পুস্তক নরসিংহদেবের রাজত্বকালে লিখিত হইয়াছিল"। বিদ্যাপতির সময় লইয়া বড়ই গোলমাল। তিনি ছিলেন মৈথিল ব্রাহ্মণ। তাঁহার পিতার নাম গণপতি ঠাকুর। তাঁহার অন্যতম খুল্লপিতামহ চণ্ডেশ্বর ঠাকুরের সাতখানি 'রত্নাকর' গ্রন্থ ও আর এক জন দূর সম্পর্কের খুল্লপিতামহ রামদত্ত-কৃত যজুর্ব্বেদীয় দশকর্ম্মপদ্ধতি বিশেষ প্রসিদ্ধ। একটি বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিদ্যাপতি, চণ্ডেশ্বর, রামদত্ত, বাচস্পতি প্রভৃতি মৈথিল পণ্ডিত হইলেও তাঁহাদিগের গ্রন্থ শ্রীহট্টেই বহুল প্রচলিত, অথচ পূর্ব্ব-পশ্চিমবঙ্গে ঐ সকল গ্রন্থের তাদৃশ সমাদর নাই।

একটি ভূমিদান-পত্রে পাওয়া যায়, পঞ্চগৌড়াধিপ শিবসিংহ ভূপ বিদ্যাপতিকে 'বিস্ফী' গ্রাম দান করিয়াছিলেন (ল—সং ২৯৩, হিজরি ৮০০, সংবৎ ১৪৫৫ ?, শক ১৩২১, খৃঃ ১৪০০)। অথচ রাজপঞ্জীতে পাওয়া যায়, শিবসিংহের সিংহাসন-প্রাপ্তির সময় ১৪৪৬ খৃষ্টাব্দ। এ সকল পরস্পর-বিরোধী মতের সমাধান করা কঠিন। গ্রীয়ারসন্ সাহেব ভূমিদানপত্রটিকে জাল বলিয়া প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন। রাজপঞ্জীও কতটা নির্ভরযোগ্য, বলা যায় না। কেন না, বিদ্যাপতির একটি মৈথিলপদে পাওয়া যায়—শিবসিংহের সিংহাসন-প্রাপ্তির সময় ২৯৩ ল-সং (১৪০০ খৃষ্টাব্দ)। দীনেশ বাবুর মতে—খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কবির জন্ম ও পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে তাঁহার মৃত্যু। দীনেশবাবুর উক্তিও বিশেষ নির্ভরযোগ্য নহে। কারণ,

রঘুনন্দনের অধ্যাপক সুবিখ্যাত স্মার্ত্ত-নিবন্ধকার শ্রীনাথ-আচার্য্য-চূড়ামণি-বিরচিত 'দুর্গোৎসব-বিবেক' নামক গ্রন্থে মৃণ্ময়ী দুর্গাপূজার বিশদ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। অথচ বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য স্বয়ং নিজ গ্রন্থের কোন স্থলে স্বীয় অধ্যাপক শ্রীনাথ আচার্য্য-চূড়ামণির নামোল্লেখ করেন নাই।

স্মার্ত্তপ্রবর জীমূতবাহন তাঁহার 'দুর্গোৎসব-নির্ণয়' নামক গ্রন্থে মৃণ্ময়ী দুর্গাপূজার কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই দুর্গোৎসব-নির্ণয় গ্রন্থখানি তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ বৃহত্তর স্মৃতি-নিবন্ধ 'কালবিবেকে'র অন্তর্ভুক্ত। জীমূতবাহন ছিলেন শ্রীনাথ আচার্য্যচূড়ামণির মাতুল। অতএব উঁহাকে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগের লোক বলিয়া ধরিতে পারা যায়[৫]।

তাঁহার তারিখগুলির মধ্যে যথেষ্ট অসামঞ্জস্য আছে। আর একটি কথা। ল-সং বা লক্ষ্মণসংবৎ বা লক্ষ্মণাব্দ ঠিক কোন্ সময় হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা লইয়াও বিস্তর মতভেদ বর্ত্তমান (রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম সং, প্রথম ভাগ, পৃঃ ২৯৯-৩০১)। আবার চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মিলন কাহিনী বা ঈশান-নাগর-কৃত 'অদ্বৈতপ্রকাশে'র বিদ্যাপতি ও অদ্বৈতপ্রভুর সাক্ষাৎকার-বৃত্তান্তও ঐতিহাসিক ভিত্তি-হীন বলিয়া গবেষকগণ মনে করেন। তবে একটা কথা ঠিক যে, বিদ্যাপতির খুল্লপিতামহ চণ্ডেশ্বর মহারাজ হরিসিংহদেবের মহামাত্যসান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন (খৃঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমপাদ)। অতএব, খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কবির জন্ম—এরূপ অনুমান করা বিশেষ অসঙ্গত হইবে না। আর শ্রীমন্মহাপ্রভু জ্ঞানতঃ তাঁহাকে দেখেন নাই—ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। অতএব খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের পূর্ব্বেই তাঁহার দেহত্যাগ ঘটে। শ্রীল বিদ্যাপতির নিজ বাক্যানুসারে শিবসিংহের মৃত্যুর ৩২ বর্ষ পরে (বত্রিশ বরষ পর) আয়ুর্বিহীন হন। শিবসিংহের সিংহাসন-প্রাপ্তি=২৯৩ ল-সং; উহার সাড়ে তিন বৎসর পরে (ল—সং ২৯৭) তাঁহার মৃত্যু। অতএব, বিদ্যাপতির মৃত্যু আন্দাজ—৩২৯ ল-সং। 'কীর্ত্তিলতা' তাঁহার কৈশোরের রচনা (২৫২ ল-সংএর পূর্ব্বে নহে)। তখন তাঁহার বয়স আন্দাজ ২০ বৎসর ধরিলে ২৩২ ল-সংএর পূর্ব্বে তাঁহার জন্ম হইতেই পারে না। আর ২৭৪ ল-সংএর পরেও কীর্ত্তিলতা রচিত হয় নাই। অতএব, তখন কবির বয়স আন্দাজ ২০ বৎসর ধরা হইলে ২৫৪ ল-সংএর পরে তাঁহার জন্ম হইতে পারে না। এরূপ অবস্থায় তিনি পূর্ণ শতায়ুঃ বা তদধিক আয়ুর্বিশিষ্ট না হইলেও দীর্ঘকাল যে জীবিত ছিলেন—ইহাতে সন্দেহের কোন কারণ নাই। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৫ বৎসরের কম বা ৯৬।৯৭ বৎসরের অধিক হয় নাই। তিনি মিথিলায় অন্ততঃ ছয় সাত জন রাজার অধীনে সভাকবিরূপে বাসপূর্ব্বক 'কীর্ত্তিলতা', 'কীর্ত্তিপতাকা', 'ভূপরিক্রমা', 'পুরুষপরীক্ষা', 'বর্ষক্রিয়া', 'শৈবসর্ব্বস্ব-সার', 'গঙ্গাবাক্যাবলী', 'দানবাক্যাবলী', 'লিখনাবলী', 'দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী' ও রাধা-কৃষ্ণ-শিব-শক্তি-গঙ্গা প্রভৃতি নানা দেব-দেবী-বিষয়ক পদাবলী ও অন্যান্য বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। অতএব, তাঁহাকে নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব বলা চলে না। তিনি ছিলেন স্মার্ত্ত—পঞ্চোপাসক। তাঁহার প্রকৃত পরিচয়ের জন্য মিথিলার রাজপঞ্জীর কিঞ্চিৎ জ্ঞান আবশ্যক; উহা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

আলোচ্য দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী গ্রন্থখানি তাঁহার অন্তিম সংস্কৃত গ্রন্থ কি না—নিঃসংশয়ে বলা যায় না। তবে ইহা যে তাঁহার মৃত্যুর কয়েক বৎসর মাত্র পূর্ব্বে রচিত, তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। স্বর্গত পণ্ডিতপ্রবর সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহোদয় রঘুনন্দনের 'দুর্গোৎসব-তত্ত্ব' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়া গিয়াছেন যে, ১৪৭৯ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাপতির দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী রচিত হয়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের বঙ্গদর্শনে ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহাই সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের উপ-জীব্য ছিল। অতএব, উক্ত সিদ্ধান্তের প্রামাণ্য সন্দিগ্ধ। বিদ্যাপতির দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী এতদিন মুদ্রাপিত হয় নাই। সম্প্রতি শ্রীহট্ট হইতে পণ্ডিত শ্রীঈশানচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ নানা মূল্যবান্ তথ্যপূর্ণ ভূমিকাসহ দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণীর একটি সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন। উহাতে পাওয়া যায় যে, শ্রীনরসিংহদেবের পুত্র ও শ্রীভৈরবসিংহদেবের অগ্রজ 'শ্রীরূপনারায়ণপরনামা শ্রীধীরসিংহদেব' যখন মিথিলাধিপতি, তখনই এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল; অর্থাৎ ৩২৫ (বা মতান্তরে ৩২১ ল-সং) হইতে ৩২৯ ল-সং-এর মধ্যে দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী রচিত হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বিবরণ মদীয় 'দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী' শীর্ষক প্রবন্ধ (শারদীয়া বসুমতী, ১৩৪৮) দ্রষ্টব্য।

(৫) জীমূতবাহন হিন্দু আইন সম্বন্ধে বহু প্রামাণিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। 'ধর্ম্মরত্ন' তাঁহার বিখ্যাত স্মৃতিনিবন্ধ। সর্ব্বজন-প্রসিদ্ধ 'দায়ভাগ' গ্রন্থখানি, ইহারই অন্তর্গত। বাঙ্গালা দেশের

শ্রীকর নামে আর এক জন বা দুই জন প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী স্মার্ত্ত ছিলেন। এক জন শ্রীকর শ্রীনাথের পিতা (অতএব জীমূতবাহনের ভগিনীপতি) বলিয়া জনশ্রুতি আছে[৬]। জীমূতবাহন শূলপাণি ও রঘুনন্দন—বঙ্গের এই তিন জন সুপ্রসিদ্ধ স্মৃতিনিবন্ধকারই নিজ নিজ গ্রন্থে অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত শ্রীকরের নাম গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বর্ত্তমানে শ্রীকরের গ্রন্থাদি সকলই বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ায় মৃন্ময়ীপূজা সম্বন্ধে তাঁহার বিশিষ্ট মতামত জানিবার কোন উপায়ই নাই।

শূলপাণি নামে যে সুবিখ্যাত বঙ্গীয় স্মার্ত্তের নাম করা হইল, তিনিও জীমূতবাহনেরই সমকালবর্ত্তী। শুনা যায় যে, তিনি শ্রীনাথের গুরু ও রঘুনন্দনের পরমগুরু ছিলেন। তিনি ছিলেন রাঢ়ীয় শ্রেণীর ভরদ্বাজগোত্রীয় বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ। তাঁহার 'দুর্গোৎসববিবেক' ও 'বাসন্তীবিবেক' নামক গ্রন্থ দুইখানিতে মৃন্ময়ী মূর্ত্তি-পূজার পদ্ধতি বিশেষ বিস্তৃত ভাবে লিপিবদ্ধ আছে।

উল্লিখিত কয় জন বাঙ্গালী স্মার্ত্তই খৃষ্টীয় ষোড়শ, পঞ্চদশ (অথবা, বড় জোর কেহ বা চতুর্দ্দশ) শতাব্দীর লোক। ইঁহারা সকলেই যেরূপ ভাবে মৃন্ময়ী পূজার বিবরণ নিজ নিজ গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যে, ইঁহাদেরও সময়ে বাঙ্গালাদেশে মৃন্ময়ী মূর্ত্তিপূজা ঠিক বর্ত্তমানে প্রচলিত আকারেই অনুষ্ঠিত হইত।

শূলপাণির পুস্তকে জিকন (জীকন)[৭] নামে এক জন অতি প্রাচীন বাঙ্গালী স্মৃতিনিবন্ধকারের নাম দৃষ্ট হয়। এই জীকন সপ্তম্যাদি কল্পের উল্লেখ করিয়াছেন। শূলপাণির গ্রন্থে উদ্ধৃত জিকনের বচনগুলি দেখিলে বেশ মনে হয় যে, তিনি বর্ত্তমান বাঙ্গালাদেশে প্রচলিত মৃন্ময়ীপূজা-পদ্ধতি সবিশেষ অবগত ছিলেন।

শূলপাণি জীকন ব্যতীত আরও এক জন প্রাচীন স্মৃতি-নিবন্ধকারের উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহার নাম বালক। জীমূতবাহনও বালকের মত নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। শূলপাণির গ্রন্থে উদ্ধৃত বালকের বচনগুলি আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, বাঙ্গালাদেশে বর্ত্তমানে প্রচলিত মৃন্ময়ী-পূজাপদ্ধতি তাঁহারও অজ্ঞাত ছিল না।

এই জীকন ও বালক যে খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। কারণ, পরবর্ত্তী কালের কেবল বাঙ্গালী স্মৃতি-নিবন্ধ-রচয়িতৃগণই ইঁহাদিগের দুই জনের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু হেমাদ্রি পরাশর-মাধব নির্ণয়সিন্ধু প্রভৃতি বাঙ্গালার বাহিরে প্রচলিত স্মৃতি-নিবন্ধ-সমূহের লেখকগণের কেহই এই দুই জন প্রাচীন স্মার্ত্তের নামোল্লেখ করেন নাই। ইহা অবাঙ্গালীর দিক্ হইতে বাঙ্গালীর প্রতি স্বাভাবিক বিদ্বেষ পোষণের ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে বলিয়া মনে হয়। বিশিষ্ট প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ সকলেই একমত যে, জিকন ও বালক উভয়েই বাঙ্গালী ছিলেন।

কিন্তু এই দুই প্রাচীন বাঙ্গালী স্মার্ত্তের কালনিরূপণ করা অতি দুরূহ ব্যাপার। জীমূতবাহন তাঁহার দায়ভাগে ও অন্যান্য গ্রন্থে বালক, জীকন ও শ্রীকরের মত সমুদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও ইঁহাদিগের সময় নিরূপণের বিশেষ সুবিধা হয় না।

বর্ত্তমানে যে কয়জন বাঙ্গালী স্মার্ত্তের রচিত প্রামাণিক স্মৃতিনিবন্ধ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ভবদেব-ভট্ট-প্রণীত নিবন্ধগুলিই প্রাচীনতম। এই ভবদেব ভট্ট বাঙ্গালার স্বাধীন রাজা হরিবর্ম্মদেবের সমকালবর্ত্তী ছিলেন। হরিবর্ম্মদেবের

বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহার দায়বিভাগের আইন 'মিতাক্ষরা' অনুসারে রচিত হয় নাই—হইয়াছে 'দায়ভাগ' অনুসারে। তাঁহার আর একখানি গ্রন্থ 'ব্যবহারমাতৃকা' বাঙ্গালার এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে স্বর্গত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রযত্নে সম্পাদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। হিন্দুর ব্যবহারশাস্ত্রে নব্য স্মৃতিনিবন্ধকারগণের মধ্যে জীমূতবাহনের অধিকারই যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতেই পারে না। কেহ কেহ তাঁহাকে বল্লালসেনের সমকালবর্ত্তী বলিতে চাহেন। ইহা নির্ম্মূল। চিন্তামণি কার বাচস্পতি মিশ্র যে জীমূতবাহনের পরবর্ত্তী, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

(৬) শ্রীকর বাস্তবিকই শ্রীনাথের পিতা ছিলেন কি না—সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ যে একেবারেই নাই এমন নহে। কারণ, কেবল জীমূতবাহন, শূলপাণি ও রঘুনন্দন ব্যতীত স্বয়ং ভবদেব ভট্ট পর্য্যন্ত শ্রীকরের নামোল্লেখ করিয়াছেন (ভবদেব-ভট্ট-কৃত প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণ, বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি হইতে প্রকাশিত, পৃঃ ১, ৮২, ১০৫)। ভবদেব যে কোনক্রমেই খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্ত্তী হইতে পারেন না—তাহার প্রমাণ পরে প্রদত্ত হইল। অথবা, শ্রীকর শ্রীনাথের পিতা—এ জনশ্রুতিকে শ্রদ্ধা করিতে হইলে বলিতে হয়—ভবদেবের উল্লিখিত শ্রীকর অন্য ব্যক্তি।

(৭) শূলপাণির গ্রন্থে হ্রস্ব-ইকারান্ত 'জিকন' পাঠ ও ভবদেবের 'প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণে' (পৃঃ ১০২) দীর্ঘ-ঈকারান্ত 'জীকন' পাঠ দৃষ্ট হয়। শূলপাণির 'দুর্গোৎসববিবেক' ও 'বাসন্তীবিবেক', পারিভদ্রীয়োপাধ্যায় জীমূতবাহনের 'দুর্গোৎসব-নির্ণয়' (ধর্ম্মরত্ন-কালবিবেকান্তর্গত), বাচস্পতি মিশ্রের কৃত্যচিন্তামণ্যুক্ত 'দুর্গোৎসব-প্রকরণ', শ্রীনাথ আচার্য্য-চূড়ামণির 'দুর্গোৎসব-বিবেক' ও রঘুনন্দনের 'দুর্গাপূজাতত্ত্ব' সংস্কৃত-সাহিত্যপরিষৎ হইতে পণ্ডিতপ্রবর ৺সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহোদয়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছে।

সময়[৮] এখনও সঠিক নিরূপিত হয় নাই। তবে ইহা কতকটা আন্দাজ করিয়া বলা যায় যে, হরিবর্ম্মদেব খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর তৃতীয় বা চতুর্থ পাদ হইতে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমপাদের কিয়দংশ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন

(৮) খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে গৌড়, বঙ্গ ও মগধ যখন পুনঃ পুনঃ বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হইতেছিল, তখন বঙ্গে বর্ম্মবংশ ও চন্দ্রবংশ নামে দুইটি নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। বর্ম্মবংশেরই অপর নাম যাদববংশ। বর্ম্মবংশের দুইটি বিভিন্ন শাখা—(১) বজ্রবর্ম্মা—জাতবর্ম্মা (+ বীরশ্রী)—শ্যামলবর্ম্মা [(সামল বর্ম্মা) মালব্য + দেবী]—ভোজবর্ম্মা। (২) জ্যোতির্ব্বর্ম্মা—হরিবর্ম্মা। ঢাকা জিলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমায় বেলাবগ্রামে আবিষ্কৃত বজ্র বর্ম্মার প্রপৌত্র ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসনে দৃষ্ট হয় যে, জাতবর্ম্মা ডাহলের কলচুরি বা চেদিবংশোদ্ভব গাঙ্গেয়দেবের পুত্র কর্ণের কন্যা বীরশ্রীকে বিবাহ করেন। কর্ণের আর একটি কন্যা যৌবনশ্রীর সহিত পাল-বংশীয় তৃতীয় বিগ্রহপালের বিবাহ হয়। দ্বিতীয় মহীপাল ও শূরপাল এই যৌবনশ্রীর গর্ভজাত। সন্ধ্যাকর নন্দী-প্রণীত সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক শ্লিষ্ট কাব্য 'রামচরিতের' নায়ক রামপালও এই বিগ্রহ-পালের পুত্র; তবে তাঁহার মাতা ছিলেন মগধের রাষ্ট্রকূট-রাজকন্যা। কর্ণের শাসনকাল অন্ততঃ ১০৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। অতএব, তাঁহার জামাতৃদ্বয় জাতবর্ম্মা ও বিগ্রহপালকে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদেই ফেলিতে হয়। আর জাতবর্ম্মার পৌত্র ভোজবর্ম্মা খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর শেষপাদ হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমপাদ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন—ইহাও বলা চলিতে পারে। জাতবর্ম্মা দিব্য ও গোবর্দ্ধন নামে দুইজন নরপতিকে পরাস্ত করিয়াছিলেন, অঙ্গদেশে সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, ও কামরূপরাজের শ্রীহরণ করিয়াছিলেন। এই দিব্যই রামচরিতের দিব্বোক—বরেন্দ্রী-ভূমিতে কৈবর্ত্তবংশের অভ্যুদয়ের অধিনায়ক। জাতবর্ম্মার পুত্র শ্যামল (বা সামল) বর্ম্মা ও বিগ্রহ-পালের পুত্র রামপাল সমকালবর্ত্তী। আবার শ্যামলবর্ম্মার পুত্র ভোজবর্ম্মা ও রামপালের পুত্র কুমারপাল ও মদনপাল একই সময়ের লোক। রামপাল তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা দ্বিতীয় মহীপাল-কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি যখন কারারুদ্ধ, তখন উত্তরবঙ্গের স্বাধীন কৈবর্ত্তগণ দিব্বোকের নেতৃত্বে মহীপালকে পরাজিত ও নিহত করে। মহীপালের মৃত্যুর পর অল্পদিনের জন্য শূরপাল পালরাজ্যের সিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার পর রামপাল সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। এই সময় দিব্বোকের ভ্রাতা রুদোকের পুত্র ভীম গৌড়-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। রামপালের সহিত যুদ্ধে কৈবর্ত্তনায়ক ভীম জীবিতাবস্থায় হস্তিপৃষ্ঠে ধৃত ও নিহত হন। রামপাল-কর্ত্তৃক ভীমের রাজধানী ডমর-নগর বিধ্বস্ত হয় ও সমগ্র বরেন্দ্রভূমি রামপালের অধিকারে আইসে।

ভোজবর্ম্মার বেলাব তাম্রশাসন হইতে পাওয়া যায় যে, যদুবংশে হরি বহুবার প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইয়াছিলেন। স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার অর্থ করেন—"এই স্থানে প্রশস্তিকার ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন যে, যাদব-বর্ম্মবংশে হরিবর্ম্ম নামে একজন রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন" (বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথমভাগ, পৃঃ ২৭৩)। ভুবনেশ্বরের ভট্ট-ভবদেব-প্রশস্তি শিলালিপি, বিক্রমপুরের তাম্রশাসন ও স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়-কর্ত্তৃক নেপাল হইতে আবিষ্কৃত 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' (হরিবর্ম্মার ১৯শ রাজ্যাঙ্কে লিখিত) তথা 'বিমলপ্রভা' নামক কালচক্রযান-(লঘুকালচক্র)-টীকা (হরিবর্ম্মার ৩৯শ রাজ্যাঙ্কে লিখিত) প্রভৃতি দর্শনে জ্যোতির্ব্বর্ম্মার পুত্র বঙ্গরাজ পরমবৈষ্ণব, পরমেশ্বর, পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ হরিবর্ম্মদেবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। তিনি যে সুচিরকাল (অন্ততঃ ৩৯ বৎসর) রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, সে বিষয়েও আমরা নিঃসংশয়। কিন্তু ইহার অধিক কিছু বলা কঠিন। রামচরিতে দৃষ্ট হয় যে, বর্ম্মবংশীয় পূর্ব্বদেশের জনৈক নৃপতি আত্মত্রাণের জন্য নিজ হস্তিবর ও রাজপথ প্রভৃতি রামপালকে উপহার দিয়া তাঁহার আরাধনা করিয়াছিলেন। রাখাল বাবুর মতে ভোজবর্ম্মা অথবা তাঁহার পুত্র রামপালের শরণাগত হইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, স্বর্গত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় বলেন যে, এই বর্ম্মবংশীয় রাজা হয় হরিবর্ম্মদেব, না হয় তাঁহার পুত্র হওয়াই অধিক সম্ভব [Inscriptions of Bengal, Vol. III, Published by the Varendra Research Society, P. 30]। রামপাল-কর্ত্তৃক বর্ম্মরাজগণের উৎকলাধিকার বিনষ্ট হয়।

ম মঃ ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয়ের মতে একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গৌড়ের উপকূল প্রদেশে এক জন অতিশয় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মনিষ্ঠ বিদ্বৎসেবী বৈষ্ণব নরপতি বর্ত্তমান ছিলেন। ইনিই হরিবর্ম্মদেব। ভুবনেশ্বর হইতে ফরিদপুর পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকারে ছিল। কেবল যে সমুদ্রোপকূলেই তাঁহার রাজ্য ছিল, তাহা নহে। পরন্তু বঙ্গে, রাঢ়ে, এমন কি গৌড়েও কিয়দংশে তাঁহার রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। দার্শনিক-কবি শ্রীহর্ষ ইঁহারই বংশের প্রশংসা করিয়া "গৌড়োর্ব্বীশকুলপ্রশস্তি" লিখিয়াছিলেন। হরিবর্ম্মদেবের রাজ্য-সীমায় সংক্ষুব্ধ পারাবার দর্শন করিয়াই তিনি "অর্ণববর্ণন" লিখেন। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার 'বেণের মেয়ে' নামক উপন্যাসে হরিবর্ম্মার বিজয়কাহিনী সবিস্তরে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার মতে—উদয়নাচার্য্য, শ্রীহীর ও তৎপুত্র শ্রীহর্ষ, ভবদেব ভট্ট, ভবদেবের বন্ধু বাচস্পতি মিশ্র, ন্যায়কন্দলীকার শ্রীধর, রত্নাকরশান্তি, প্রজ্ঞাকরমতি, বজ্রদত্ত, শুভাকরগুপ্ত, প্রকটনিতম্বা, জৈনপণ্ডিত অভয়দেব মলধারী, নাথযোগী চারবীনাথ, সিদ্ধসহজিয়া দাড়িপা, হাড়িপা, লুইসিদ্ধা, উজ্জ্বল-বাচস্পতি প্রথম (?) মহীপাল, দক্ষিণ রাঢ়েশ্বর রণশূর প্রভৃতি সকলেই হরিবর্ম্মার সমকালবর্ত্তী (খৃঃ একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ)।

পক্ষান্তরে, ভুবনেশ্বর-প্রশস্তির অক্ষরগুলির আকৃতিদর্শনে ডক্টর কিলহর্ণ বলিয়াছিলেন যে, অক্ষরের আকৃতি দেখিয়া শিলালিপিখানি ১২০০ খৃষ্টাব্দের বলিয়া অনুমান হয়। রায় বাহাদুর ৺রমাপ্রসাদ চন্দ বলেন—"কিলহর্ণ-কথিত ১২০০ খৃষ্টাব্দ ভবদেব ভট্টের প্রশস্তির কাল না হইলেও, অক্ষরের হিসাবে হরিবর্ম্মার তাম্রশাসন এবং ভট্ট ভবদেবের প্রশস্তি দ্বাদশ শতকের পূর্ব্বে ঠেলিয়া লওয়া যায় না" (গৌড়রাজমালা, পৃঃ ৫৬, পাদটীকা)। স্বর্গত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, ডক্টর শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক, ডক্টর শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী-প্রমুখ পণ্ডিতবর্গের মতে হরিবর্ম্মা ভোজবর্ম্মার পরবর্ত্তী, অর্থাৎ খৃষ্টীয় দ্বাদশ

করিয়াছিলেন। ভবদেব-ভট্ট তাঁহার মন্ত্রী। অতএব তিনিও ঐ সময়ের লোক। ভবদেবের 'প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণে' বালক জীকন ও শ্রীকরের নাম পাওয়া যায়। অতএব বালক, জীকন ও এই শ্রীকরকে অন্ততঃ খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগের লোক বলিয়া ধরিতে হইবে।

বালক ও জীকন যে বর্ত্তমান বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত মৃন্ময়ী দুর্গাপূজাপদ্ধতির বিষয় সবিশেষ অবগত ছিলেন—ইহা শূলপাণির গ্রন্থ হইতে বেশ বুঝা যায়। অতএব আমরা অনায়াসেই অনুমান করিতে পারি যে, নয়শত বা হাজার বৎসর পূর্ব্বেও আমাদের বাঙ্গালা দেশে জগন্মাতার মৃন্ময়ী মূর্ত্তির পূজার প্রথা প্রচলিত ছিল। শুধু তাহাই নহে—তখনকার দিনের মৃন্ময়ী-মূর্ত্তি-পূজা-পদ্ধতির সহিত এখনকার বাঙ্গালাদেশে প্রচলিত মৃন্ময়ীপূজা-পদ্ধতির বিশেষ পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয় না।

বাঙ্গালার মৃন্ময়ীপূজা-পদ্ধতি অন্ততঃ হাজার বৎসরেরও পুরাতন। কিন্তু তাহারও পূর্ব্বে—বাঙ্গালা দেশে বৌদ্ধ-প্রভাব পড়িবার পূর্ব্বেও এদেশে উহার প্রচলন ছিল কি না—তাহা আজিও অনুসন্ধানে পাওয়া যায় নাই।

বাঙ্গালা দেশের এই সহস্র বৎসরের চিরাচরিত সম্প্রদায় বাঙ্গালীর মোহনিদ্রা কি ভাঙ্গাইতে পারিবে না, মা !!

"ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
বন্দে মাতরম্" !!!

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

শতাব্দীর লোক। আর মমঃ ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব ৺নগেন্দ্রনাথ বসু মহোদয়ের মতে তিনি জাতবর্ম্মা, এমন কি, তৎপিতা বজ্রবর্ম্মা হইতেও প্রাচীন, অর্থাৎ—খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের লোক। স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে তিনি রামপাল ও বজ্রবর্ম্মার পূর্ব্ববর্ত্তী। ৺ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের মত অনেকটা রাখাল বাবুর মতের অনুরূপ।

এই সকল পরস্পর-বিরোধী মতের সামঞ্জস্য বা সমন্বয় করা একরূপ অসম্ভব। তবে এটুকু বেশ বুঝা যায় যে, হরিবর্ম্মা রামপাল বা শ্যামলবর্ম্মার পরবর্ত্তী ছিলেন না। তবে তাই বলিয়া তিনি বজ্রবর্ম্মা অপেক্ষাও প্রাচীন ছিলেন কি না—এ সম্বন্ধে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। মমঃ ৺শাস্ত্রী মহাশয় ত স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন যে, শ্যামলবর্ম্মা মহারাজাধিরাজ হরিবর্ম্মার ভায়ের পৌত্র (বেণের মেয়ে—চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ)। অতএব তাঁহার মতে বজ্রবর্ম্মা ও হরিবর্ম্মা—দুই ভ্রাতা। এ সকল দুরূহ সমস্যার সমাধান করিতে যাওয়া বর্ত্তমান অবস্থায় একরূপ অসম্ভব। তাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে উভয় দিক্ রক্ষার খাতিরে হরিবর্ম্মাকে একটা মাঝামাঝি সময়ের লোক (খৃঃ ১১শ শতাব্দীর শেষ) বলিয়া ধরা হইয়াছে। অবশ্য উহার দোষগুণ সুধীগণের বিচার্য্য।

এই হরিবর্ম্মদেবের মন্ত্রী ছিলেন মনীষী ভবদেব ভট। ইঁহার একটি প্রশস্তি পুরী জেলার ভুবনেশ্বর গ্রামে অনন্ত-বাসুদেবের মন্দিরের প্রাচীরগাত্রে উৎকীর্ণ আছে। সাবর্ণমুনির বংশধর শ্রোত্রিয়গণের বাসস্থানসমূহের মধ্যে রাঢ়া বা রাঢ়দেশের অলঙ্কার সিদ্ধলগ্রাম (বর্ত্তমান সিধ্‌লা)। এই গ্রামের এক উত্তম বংশে প্রথম ভবদেব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার অগ্রজ মহাদেব ও অনুজ অট্টহাস। তিনি গৌড়নৃপ হইতে হস্তিনীভিট্টি গ্রাম প্রাপ্ত হন। তাঁহার আট পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ রথাঙ্গ। রথাঙ্গ—অত্যঙ্গ—বুধ (স্মৃতিত)—আদিদেব (বঙ্গরাজের মহামন্ত্রী, মহাপাত্র ও সন্ধিবিগ্রহী) পত্নী দেবকী—গোবর্দ্ধন। গোবর্দ্ধনের দুই পত্নী—সরস্বতী ও বন্দ্যঘটীয় ব্রাহ্মণকন্যা সাঙ্গোকা। এই সাঙ্গোকার পুত্র ভবদেব ভট্ট (দ্বিতীয়)। ইনি হরিবর্ম্মদেব ও তৎপুত্রের মন্ত্রী ছিলেন।

দ্বিতীয় ভবদেব রাঢ়দেশে একটি জলাশয় খনন করান ও ভুবনেশ্বরে নারায়ণ, অনন্ত ও নৃসিংহ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করাইয়া দেন। ভবদেবের পাণ্ডিত্য ছিল অনন্যসাধারণ। ব্রহ্মাদ্বৈতবাদ, মীমাংসাদর্শনে কুমারিল-ভট্টের ভাট্টমতবাদ, বৌদ্ধদর্শন, সিদ্ধান্ত, তন্ত্র, গণিত, ফলসংহিতা, হোরাশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ, অস্ত্রবেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রে তাঁহার অসামান্য অধিকার ছিল। তাই তাঁহার নাম হইয়াছিল "বালবলভীভুজঙ্গ"।

এই 'বালবলভী' কোথায় ছিল, তাহা এক্ষণে বলা কঠিন। রাম-চরিতের টীকায় পাওয়া যায় যে উহা 'দেবগ্রাম-প্রতিবদ্ধ' ছিল। ইহাও অতি অস্পষ্ট আভাস। মমঃ ৺শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, বালবলভী বর্ত্তমানে 'বাগড়ী'। ইহার কোন প্রমাণ নাই। 'দেবগ্রাম' কোথায় তাহাও এখন জানা যায় না। 'হস্তিনীভিট্টি'ও বর্ত্তমানে অজ্ঞাত। কেবল 'সিদ্ধল' সম্বন্ধে কুলপঞ্জিকায় দৃষ্ট হয় যে, রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণকে যে ছাপ্পান্নখানি গ্রাম ('ছাপ্পান্ন গাঁই') প্রদত্ত হইয়াছিল, ইহা তাহাদিগেরই অন্যতম। সাবর্ণ-গোত্রীয় দিজবর বশিষ্ঠ উহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহা বর্ত্তমানে বীরভূম জেলার অন্তর্গত 'সিধ্‌লা' গ্রাম।

এই সিদ্ধলগ্রামীণ বালবলভীভুজঙ্গ দ্বিতীয় ভট্ট ভবদেবের রচিত স্মৃতিপদ্ধতি গ্রন্থ—'কর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতি' বা 'দশকর্ম্ম-পদ্ধতি' ও 'প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণ' খুবই প্রসিদ্ধ। এই দুইখানি পুস্তকই প্রকাশিত হইয়াছে। প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণের (বরেন্দ্র-রিসার্চ সোসাইটি সংস্করণ) ১০২ পৃষ্ঠে জীকনের নাম, ৪২-৪৪-৭৪-৮১-৮৩-১০৯ পৃষ্ঠে বালকের নাম ও ৯-৮২-১০৫ পৃষ্ঠে শ্রীকরের নাম পাওয়া যায়।

৺ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় ভবদেবকে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদেরও কিছু পূর্ব্বে ফেলিতে চাহেন। অতএব, বালক জীকন ও শ্রীকরকে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের লোক বলিয়া অনুমান করা বিশেষ অসঙ্গত হইতে পারে না।

ভবদেবের প্রশস্তি-লেখক দ্বিজাগ্রগণ্য বাচস্পতি কবি তাঁহার প্রিয় সুহৃদ্। মমঃ ৺শাস্ত্রী মহাশয় ইঁহাকে বাচস্পতি মিশ্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু শিলালিপিতে তিনি 'মিশ্র' বলিয়া নিজ পরিচয় প্রদান করেন নাই। তবে ইঁহাকে ভামতী-কার বৃদ্ধ বাচস্পতি মিশ্র বা চিন্তামণিকার অভিনব বাচস্পতি মিশ্রের সহিত অভিন্ন বলিয়া ভ্রম করা উচিত হইবে না।

ত্রয়স্ত্রিংশ তরঙ্গ

হীরার পিন্

রবার্ট ব্লেক যে সময় নিহত ব্যক্তির দেহ পরীক্ষা করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার স্মরণ হইল, ওয়াইল্ড সর্ব্বপ্রথমে সার রডনে ড্রুমণ্ডের অন্যতম শত্রু অসকার মেটল্যাণ্ডের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইবার পর মেটল্যাণ্ড সহসা কি ভাবে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। যদিও পুলিশ সিদ্ধান্ত করিয়াছিল, কোন কারণে মেটল্যাণ্ড আত্মহত্যা করিয়াছিল; কিন্তু ব্লেকের ধারণা হইয়াছিল, তাহার সহযোগিদ্বয় রোর্কি ও কার্ণ বিষ-প্রয়োগে তাহাকে হত্যা করিয়াছিল। তাঁহার এই ধারণা যে সত্য, ইহার কোন প্রমাণ তিনি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। সার রডনের দ্বিতীয় শত্রু রোর্কির মৃত্যু সম্পূর্ণ আকস্মিক, পুষ্করিণীর জলে পড়িয়া তীরে উঠিতে না পারায়, প্রাণভয়ে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া রহিত হওয়াই তাহার মৃত্যুর কারণ, ইহাও ব্লেকের অজ্ঞাত ছিল না; সুতরাং রডনের এই উভয় শত্রুর মৃত্যুর জন্য ওয়াইল্ডকে দায়ী হইতে হয় নাই, অথচ তাহার কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছিল।

সার রডনের তিন জন শত্রুর মধ্যে এখন এক জন মাত্র জীবিত আছে; সে সাইমন কার্ণ। ওয়াইল্ড এবার তাহার বিরুদ্ধে কৌশল জাল প্রসারিত করিয়াছিল; কিন্তু তাহার এই শেষ চেষ্টা সফল হইবার পূর্ব্বেই কার্ণের বাস-ভবনের অদূরে তাহার বজ্রাহত মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইল। সে বজ্রাহত হইবার পূর্ব্বেই কেহ সহসা পশ্চাৎ হইতে তাহার মস্তকে যে আঘাত করিয়াছিল, সেই আঘাতই তাহার মৃত্যুর কারণ—ব্লেক তাহার মস্তকের আঘাত পরীক্ষা করিয়া এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইলেন। গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে রোপার ওয়াইল্ডের সহিত কয়েক বারই তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল; কিন্তু কোন বারই তিনি ওয়াইল্ডের অনুষ্ঠিত কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। সেই সকল সুযোগ তিনি উপেক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু ওয়াইল্ড যে এবার কার্ণকে চূর্ণ করিবারই চেষ্টা করিতেছিল, এ বিষয়ে ব্লেকের সন্দেহ ছিল না।

ব্লেক মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া স্মিথকে বলিলেন, "কিরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল, আমরা তাহা বুঝিবার চেষ্টা করি। অনুমানে নির্ভর করিতে আমি অভ্যস্ত না হইলেও ইহা যে সর্ব্বত্রই উপেক্ষার যোগ্য, এরূপ আমার মনে হয় না। যদি স্বীকার করিতে হয়, ওয়াইল্ড গত রাত্রে ঝড়বৃষ্টির সময় এই স্থানে আসিয়াছিল, তাহা হইলে মনে এই প্রশ্নের উদয় হয় যে, সে কি উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছিল? সে সাইমন কার্ণের বিরুদ্ধাচরণের জন্যই এখানে আসিয়াছিল, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কার্ণের বাসভবন এই স্থানের এত নিকটে অবস্থিত যে, ঐরূপ ধারণা অসঙ্গত নহে।"

স্মিথ তাঁহাকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কি ধারণা, কার্ণই ওয়াইল্ডকে হত্যা করিয়াছে?"

ব্লেক বলিলেন, "আমি আমার ধারণা সম্বন্ধে কোন কথা বলিতেছি না। ঐ অবস্থায় কি সম্ভব, সেই কথারই আমি আলোচনা করিতেছি। তর্কের অনুরোধে আমি একরূপও অনুমান করিতে পারি যে, ওয়াইল্ড রাত্রি-শেষে কার্ণের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিল।"

স্মিথ বলিল, "গত রাত্রে ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে?"

ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, তাহার পূর্ব্বেই; ওয়াইল্ড সম্ভবতঃ কার্ণের অপরাধের প্রমাণ সংগ্রহের জন্য তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিল; সেই সময় কার্ণ তাহার পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিয়া তাহাকে হত্যা করিয়া থাকিলে তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই।"

স্মিথ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "এইরূপই সম্ভব বলিয়া মনে হয় কর্ত্তা! ওয়াইল্ড আত্মরক্ষার সুযোগ পাইলে তাহাকে ঐ ভাবে হত্যা করা সম্ভব হইত না। ওয়াইল্ড সম্মুখ-সংগ্রামে এক ডজন কার্ণকে কেবল পরাস্ত করা নহে, ধরাশায়ী করিয়া প্রহারে গুঁড়া করিয়া ফেলিতে পারিত। এই জন্যই মনে হয়, কুকুরটা তাহাকে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিয়াছিল। আহা, হতভাগ্য বেচারার কি দুর্গতি!"

ব্লেক ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "অত ব্যস্ত হইও না বাপু! আমাদের এই অনুমান অভ্রান্ত, এরূপ নিশ্চিত ধারণার কারণ নাই। কারণ, যদি ওয়াইল্ডের মৃতদেহ সে টানিয়া লইয়া-গিয়া মাঠে ফেলিয়া রাখিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার কোন প্রমাণ আবিষ্কৃত হইতে পারে। সেরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় কি না, তাহার সন্ধান করা আবশ্যক।"

স্মিথ বলিল, "টাইগারের সাহায্যে আমাদের এই চেষ্টা সফল হইতে পারে।"

ব্লেক বলিলেন, "তোমার এ কথা সত্য; কিন্তু আমরা ত তাহাকে এখানে লইয়া আসি নাই। সুতরাং তাহার সাহায্য ব্যতীত আমরা নিজের চেষ্টায় কি করিতে পারি, তাহাই দেখা যাউক; কিন্তু কথা এই যে, কার্ণ কি ঝড়জলের মধ্যেই ওয়াইল্ডকে এখানে আনিয়া ফেলিয়াছিল? সে যাহাই হউক, কার্ণ বা অন্য কেহ ওয়াইল্ডকে মাঠের ভিতর আনিয়া চেষ্টা করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থলে বজ্রাহত করিয়াছিল, ইহা সম্ভব নহে।"

স্মিথ বলিল, "আপনি কি বলিতেছেন—ওয়াইল্ডের দেহ দৈবক্রমে বজ্রাহত হইয়াছিল?"

ব্লেক বলিলেন, "অসম্ভব কি ? কিন্তু আরও কিছু হইতে পারিত ?"

স্মিথ বলিল, "আরও কি হইতে পারিত কর্ত্তা ?"

ব্লেক বলিলেন, "আমার এ কথাও মনে হইতেছিল যে, এই প্রমাণ অমূলক হইতে পারে। ওয়াইল্ডএর দেহ প্রকৃতই বজ্রাহত হইয়াছিল, ইহা সপ্রমাণ করিবার উপায় কি ? উহার দেহের স্থানে স্থানে পুড়িয়া গিয়াছে, এবং পরিচ্ছদও দগ্ধ হইয়াছে; কিন্তু ইহাই কি বজ্রাঘাতের নির্ভরযোগ্য প্রমাণ ? চারি দিকের ঘাসগুলি পুড়িয়া কালো হইয়া গিয়াছে—তাহাও দেখিতে পাইয়াছি; কিন্তু তাহাতে কি প্রতিপন্ন হয় ? চেষ্টা করিয়া এরূপ অবস্থার সৃষ্টি করা অসম্ভব নহে। এরূপও হইতে পারে যে, কার্ণ ওয়াইল্ডের মৃত্যু দৈব ঘটনা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য ঝড়বৃষ্টির সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিল।"

এ কথা শুনিয়া স্মিথ মুখের একটা অদ্ভুত ভঙ্গি করিয়া অস্ফুট শব্দ উচ্চারণ করিল।

ব্লেক বলিলেন, "তুমি স্মরণ রাখিও—আমরা অনুমানে নির্ভর করিয়া একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা করিতেছি মাত্র। ঐ অবস্থায় কি ঘটিতে পারিত—তাহাই বলিতেছি; কিন্তু সত্য সত্য কি ঘটিয়াছিল, তাহা আমাদের অজ্ঞাত। প্রকৃত সত্যে উপনীত হইবার জন্য সতর্ক ভাবে অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন আছে। যদি ধরিয়া লই, ওয়াইল্ড বজ্রাহত না হইয়া নিহত হইয়াছিল—তাহা হইলে কার্ণের বাড়ীর দিকে যাইবার পথে এই মাঠের ভিতর কোন চিহ্ন আবিষ্কৃত হইতে পারে কি না, তাহা পরীক্ষা করা প্রয়োজন।"

স্মিথ বলিল, "আমরা কি এখনই এই পরীক্ষা আরম্ভ করিতে পারি না কর্ত্তা।"

ব্লেক বলিলেন, "তবে তাহারও সময় আছে; এত তাড়াতাড়ি করিবার প্রয়োজন নাই। মাঠে জনমানবের সমাগম নাই, সুতরাং কোন চিহ্ন থাকিলে তাহা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। আমরা যেরূপ অনুমান করিতেছি—কার্ণ যদি সত্যই সেইরূপ করিয়া থাকে, তাহা হইলে স্বভাবতঃই তাহার ধারণা হইবে, মৃতদেহটি লোকের দৃষ্টিগোচর হওয়ায় স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। উহা হত্যাকাণ্ড বলিয়া কেহ সন্দেহ করিবে এরূপ তাহার মনে হয় নাই; সুতরাং কেহ উহার চিহ্ন আবিষ্কারের চেষ্টা করিবে, এ কথা তাহার চিন্তা করিবার কারণ ঘটে নাই। আমরা উহার বাড়ী পর্য্যন্ত স্থানটি পরীক্ষা করিব; কিন্তু তাহার পূর্ব্বে আর একটি বিষয় বিবেচনাযোগ্য বলিয়া আমার মনে হইতেছে। যে স্ত্রীলোকটি টেলিফোনে আমাকে সংবাদ দিয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সকল কথাই জানা আবশ্যক।"

স্মিথ বলিল, "সে আপনার নিকট তাহার পরিচয় গোপন করিয়াছিল; কিন্তু স্ত্রীলোকটি কে, তাহা কি আপনি অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন ?"

ব্লেক বলিলেন, "আমি সে কথা চিন্তা করিয়াছি। আমার মনে হইতেছিল, ওয়াইল্ড যদি কার্ণের বাসগৃহে নিহত হইয়া থাকে, তাহা হইলে কার্ণের গৃহরক্ষিকা বা তাহার পরিচারিকা হয় ত সেই কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিয়াছিল।"

স্মিথ বলিল, "কার্ণের অজ্ঞাতসারে ?"

ব্লেক বলিলেন, "সেইরূপই ত আমার মনে হয়। উহা দেখিয়া সে অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিল। স্ত্রীলোক কি না—কথাটা প্রকাশ করিবার জন্য সে ছটফট্ করিতেছিল; কিন্তু পুলিশের নিকট সে এই সংবাদ জানাইতে সাহস করে নাই, কারণ, তাহার আশঙ্কা ছিল—পুলিশ তাহাকে এই ব্যাপারের সহিত সংসৃষ্ট বলিয়া সন্দেহ করিতে পারে। হত্যাকাণ্ডের সংস্রবে আসিতে সকলেই ভয় পায়। যাহা হউক, কথাটা সে আর চাপিয়া রাখিতে না পারায় টেলিফোনে আমার নিকট উহা প্রকাশ করিয়াছিল; কিন্তু নিজের পরিচয়টা গোপন রাখিয়াছিল।"

স্মিথ সোৎসাহে বলিল, "আপনার অনুমান সত্য বলিয়াই মনে হয়, ইহাই সম্ভব; তবে কথা এই যে, আমরা অনুমানে নির্ভর করিয়াই এই সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা কি, তাহা এখনও জানিতে পারিলাম না!"

ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, তুমি ঠিকই বলিয়াছ; কিন্তু অনুমানে নির্ভর না করিয়া কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া সম্ভব নহে। যাহা হউক, অনুমানে নির্ভর করিয়া আমরা কোথায় গিয়া পৌঁছিব, তাহা জানিতে অধিক বিলম্ব হইবে না।"

স্মিথ বলিল, "উত্তম কথা; যদি ওয়াইল্ডকে লইয়া এ সকল ব্যাপার না ঘটিত, তাহা হইলে ইহার তদন্তে আমি প্রচুর আনন্দলাভ করিতাম; কিন্তু ওয়াইল্ড বেচারার মৃত্যুতে আমি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছি। কার্ণের গলায় যতক্ষণ ফাঁসের দড়ি না উঠিতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা তাহাকে ছাড়িব না।"

ওয়াইল্ড কোন দিন মিঃ ব্লেক বা স্মিথের কোন প্রকার ক্ষতি করে নাই, বরং মুক্তকণ্ঠে তাঁহাদের প্রশংসাই করিত; এই জন্য স্মিথ তাহার পক্ষপাতী হইয়াছিল। ওয়াইল্ডের আকস্মিক অপমৃত্যুতে সে মর্ম্মাহত হইয়াছিল।

স্মিথ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া ব্লেককে বলিল, "কর্ত্তা, ওয়াইল্ডকে হত্যা করিয়া কার্ণ তাহাকে এই মাঠের ভিতর টানিয়া আনিয়াছিল, এই অনুমানে নির্ভর করিয়া যদি আমাদিগকে তদন্ত আরম্ভ করিতে হয়—তাহা হইলে প্রথমে সেই টানিয়া আনিবার চিহ্নই আবিষ্কার করিতে হইবে বলিয়া মনে হয়।—আপনি কি বলেন ?"

ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, তাহাই কর্ত্তব্য বলিয়া আমারও মনে হয়; তবে আমার ইচ্ছা আমরা বিভিন্ন দিক হইতে তদন্ত আরম্ভ করি। আমি মৃতদেহ টানিয়া আনিবার চিহ্ন আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেছি; তুমি লোকালয়ের দিকে যাও। যে পাহারাওয়ালাকে সর্ব্বপ্রথমে দেখিতে পাইবে, তাহাকে এখানে পাঠাইয়া দিবে।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু পুলিশ আসিয়া চারি দিকে ঘুরাফেরা করিলে চিহ্ন আবিষ্কারে বিঘ্ন ঘটিবে না ? পুলিশ আসিয়া আমাদিগকে কি কোনরূপ সাহায্য করিতে পারিবে ? বরং আমাদের উপর সর্দ্দারী করিবারই চেষ্টা করিবে। সাধ করিয়া এ উপসর্গ জুটাইয়া লাভ কি ?"

ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু যদি আমরা স্বেচ্ছায় পুলিশের সংস্রব পরিহার করি—তাহা হইলে অনেক ঝুঁকি আমাদের ঘাড়ে আসিয়া পড়িতে পারে স্মিথ! যে উপায়েই হউক, এই দুর্ঘটনার সংবাদ আমরাই প্রথমে জানিতে পারিয়াছি; এ অবস্থায় পুলিশকে অবিলম্বে সংবাদ দেওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য। তবে আমরা মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি—তাহা আমরা পুলিশের গোচর করিতে বাধ্য নহি। পুলিশও মৃতদেহ পরীক্ষা করিবে। তাহারা

ওয়াইল্ডের মৃত্যু সম্বন্ধে যেরূপ ইচ্ছা সিদ্ধান্ত করিতে পারে, তাহাতে আমাদের কিছুই বলিবার নাই। তাহারা কি সিদ্ধান্ত করিবে— তাহা বুঝিতে পারা আমাদের পক্ষে কঠিন নহে; কিন্তু সে সব কথা থাক; তুমি শীঘ্র যাও, যে কনষ্টেবল প্রথমে তোমার সম্মুখে পড়িবে, তাহাকেই আমার কাছে পাঠাইতে চাও।"

স্মিথ বলিল, "আপনার আদেশ অবশ্যই পালন করিব কর্ত্তা! আমি এখনই যাইতেছি।"

ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু তাহার পর তোমাকে আরও একটি কাজ করিতে হইবে। তুমি একটা টেলিফোন সংগ্রহ করিয়া স্কটল্যাণ্ড-ইয়ার্ডে চীফ ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ডকে এই দুর্ঘটনার সংবাদ জানাইবে। এই মাঠে ওয়াইল্ডের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইয়াছে শুনিলে সে অত্যন্ত বিস্মিত হইবে, এবং আমি তাহাকে এখানে আসিতে বলিয়াছি শুনিলে সে আগ্রহভরেই এখানে আসিবে, এবং ব্যাপার কি জানিবার জন্য তাহার অত্যন্ত কৌতূহল হইবে। যত শীঘ্র সম্ভব সে যেন আসিবার চেষ্টা করে, আমার এই অনুরোধ তাহাকে জানাইবে। ওয়াইল্ডের অপমৃত্যু সম্বন্ধে যতটুকু কথা প্রকাশ করা বলা সঙ্গত মনে করিবে, তাহা তাহাকে বলিতে পার।"

স্মিথ বলিল, "আমার মনে হয়, এ সম্বন্ধে তাঁহাকে অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন হইবে না; কারণ, ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড ওয়াইল্ডকে অসাধারণ লোক মনে করিয়া খাতির করিতেন। তাহার আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ শুনিলেই তিনি আপনার নিকট ছুটিয়া আসিবেন। পুলিশের কে-ই-বা ওয়াইল্ডকে খাতির না করিত?"

ব্লেক গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "লেনার্ড ওয়াইল্ডকে খাতির করুক আর নাই করুক, তাহার মৃত্যুসংবাদে স্বস্তিবোধ করিবে সন্দেহ নাই; কারণ, ওয়াইল্ড স্কটল্যাণ্ড-ইয়ার্ডের কর্ত্তাদের মনে দুশ্চিন্তা, এমন কি, বিভীষিকারই সৃষ্টি করিয়াছিল। উহারা কোন দিন তাহাকে কায়দায় আনিতে পারে নাই, সে উহাদের অনেকেরই সম্ভ্রম ধূলিসাৎ করিয়াছিল, লেনার্ড তাহা জানে: সুতরাং তাহার ক্ষোভের কোন কারণ নাই স্মিথ! আমার বিশ্বাস, তাহার মৃত্যু-সংবাদ প্রকাশিত হইলে স্কটল্যাণ্ড-ইয়ার্ডের অনেকেরই মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইবে।"

ব্লেকের মন্তব্য শুনিয়া স্মিথ অবজ্ঞাভরে বলিল, "পুলিশে চাকরী লইলে মানুষ কি এতই মনুষ্যত্বহীন, নিষ্ঠুর হয়? আপনি না বলিলে ও-কথা আমি বিশ্বাস করিতাম না!"

স্মিথ ব্লেকের নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলে ব্লেক পুনর্ব্বার মৃতদেহ পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। ব্লেক ওয়াইল্ডের মৃত্যু সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় নাই; তাঁহার মনে হইতেছিল—ভিতরে কি একটা গুপ্ত রহস্য আছে, তাহার আবরণ তিনি উদ্ঘাটন করিতে পারিতেছেন না! যে সকল সন্দেহে তাঁহার মন বিচলিত হইয়াছিল, তিনি স্মিথের নিকট তাহা ইচ্ছা করিয়াই প্রকাশ করেন নাই; বিশেষতঃ, একটি সন্দেহ কোনক্রমেই তিনি পরিহার করিতে পারিতেছিলেন না, তাহা পুনঃ পুনঃ তাঁহার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া মানসিক শান্তি নষ্ট করিতেছিল।

ব্লেক নিহত ব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গ সতর্ক ভাবে পুনর্ব্বার পরীক্ষা করিয়া নির্নিমেষ নেত্রে তাহার হাত দুইখানি দেখিতে লাগিলেন। দেহের অন্যান্য অংশ এবং বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে তাহার দুইখানি হাতই অপেক্ষাকৃত অল্প পুড়িয়াছিল। কিন্তু তাহার অল্প দগ্ধ হাত দুইখানি পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়াও তাঁহার মানসিক অশান্তির নিরাকরণ হইল না। তিনি নিহত ব্যক্তির হাতের অঙ্গুলিগুলির দিকে স্থির-দৃষ্টি সন্নিবিষ্ট করিয়া মনে মনে বলিলেন, "এই পরীক্ষায় আমার মনের ধাঁধা দূর হইতেছে না। ওয়াইল্ডের অঙ্গুলি-চিহ্ন দ্বারা তাহাকে সনাক্ত করিতে পারিতেছি কৈ? আঙ্গুলগুলির যে অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে এই চেষ্টা সফল হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি না! হুম্! অত্যন্ত গোলমেলে ব্যাপার বটে!"

বস্তুতঃ, ওয়াইল্ডই যে এই ভাবে নিহত হইয়াছিল, ইহা বিশ্বাস করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইতেছিল না। তাঁহার মনে হইতেছিল, ওয়াইল্ড এই ভাবে মরিতে পারে না। নিহত ব্যক্তিই যে ওয়াইল্ড, ইহার প্রমাণ যতই নিখুঁত হউক, তাহা অকাট্য বলিয়া স্বীকার করা তাঁহার অসাধ্য হইল; মনে হইল, এ প্রমাণ চূড়ান্ত নহে (by no means conclusive)। বিশেষতঃ ওয়াইল্ড কিরূপ রহস্যপ্রিয় ছিল, এবং তাহার অনুষ্ঠিত কৌতুক সময়ে সময়ে কিরূপ দুর্বোধ্য হইয়া উঠিত, তাহার পরিচয় তিনি পূর্ব্বে বহু বারই পাইয়াছিলেন।

যাহা হউক, তিনি মৃতদেহটি অন্য দিকে কাত করিতেই মৃত ব্যক্তির পরিচ্ছদের ভাঁজের ভিতর হইতে কি একটি দ্রব্য পার্শ্বস্থ ঘাসের উপর খসিয়া পড়িল! ব্লেক তৎক্ষণাৎ তাহা তুলিয়া লইয়া দেখিলেন—তাহা হীরক-খচিত 'টাই-পিন।'

ব্লেক পিনটি দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলেন। তিনি কার্ণকে সেই পিন ব্যবহার করিতে দেখিয়াছিলেন। পিনটি স্বর্ণনির্ম্মিত, তাহার মাথায় বহুমূল্য হীরকখণ্ড সন্নিবিষ্ট।

ব্লেক পিনটি হাতে লইয়া বলিলেন, "এ ত কার্ণেরই পিন! এই সূত্র হইতে আমার তদন্তের সুবিধা হইবে। পিনটি আবিষ্কৃত হওয়ায় আমার সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়াই মনে হইতেছে! কার্ণ ওয়াইল্ডকে হত্যা করিয়া এখানে টানিয়া আনিবার সময় তাহার দেহের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল; সেই সময় পিনটি কখন্ তাহার পরিচ্ছদ হইতে খসিয়া-পড়িয়াছিল, কার্ণ তাহা জানিতে পারে নাই। সুতরাং সে সেই সময় ইহার অভাব বুঝিতে না পারায় পিনটির সন্ধান করে নাই। উহা ওয়াইল্ডের পরিচ্ছদে বাধিয়া ছিল, কার্ণ ইহা ধারণা করিতে পারে নাই।"

ওয়াইল্ডের মৃত্যুর সহিত সাইমন কার্ণের সংস্রব ছিল, এ বিষয়ে ব্লেক নিঃসন্দেহ হইলেন। তাঁহার অনুমান এবার সত্যে পরিণত হইল। কার্ণের প্রতিকূলে এই সাক্ষী উপেক্ষার যোগ্য নহে।

অতঃপর ব্লেক পদচিহ্নের সন্ধানে ঘুরিতে ঘুরিতে ঘাসের উপর পদচিহ্ন আবিষ্কার করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু ঘাসের উপর দিয়া ভারী দ্রব্য টানিয়া লইয়া যাইবার চিহ্ন সুস্পষ্টরূপেই দেখিতে পাইলেন; সুতরাং মৃতদেহটি সেই ভাবে টানিয়া-আনা হইয়াছিল, এ বিষয়ে ব্লেকের সন্দেহ রহিল না; কিন্তু তথাপি তাঁহার মনে একটা খট্‌কা বাধিয়া রহিল; তিনি ভাবিতে লাগিলেন, ইহা কি সত্যই ওয়াইল্ডের মৃতদেহ?

চতুস্ত্রিংশ তরঙ্গ

অনুসন্ধান আরম্ভ

স্মিথের প্রথম চেষ্টা সফল হইল না। সে কোন কনষ্টেবলের সন্ধান না পাওয়ায় সেই চেষ্টায় আর সময় নষ্ট না করিয়া টেলিফোনে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে কথা বলিতে আরম্ভ করিল।

চীফ ডিটেক্‌টিভ-ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড শুনিলেন, মিঃ ব্লেকের সহকারী স্মিথ তাঁহার সন্ধান করিতেছে। তিনি টেলিফোনের রিসিভার টানিয়া লইয়া প্রফুল্ল স্বরে বলিলেন, "হালো স্মিথ। তুমি কি তোমার শয়ন-কক্ষ হইতে কথা বলিতেছ?"

স্মিথ বলিল, "আমার—কোথা হইতে?"

লেনার্ড বলিলে, "ওহে ছোকরা! এখন ত বেলা সবে আটটা বাজিতেছে; এ সময় তোমার মত নিষ্কর্ম্মা বালক বিছানা হইতে উঠিয়াছে—এ কথা কি তুমি আমাকে বিশ্বাস করিতে বল? সে কথা থাক; তুমি কি চাও, কি জন্ম আমাকে ডাকাডাকি করিতেছ, তাহাই বল। মিসেস্ বার্ডেল এখনও তোমাকে চা দিতে আসে নাই, তুমি কি ইহার কারণ তদন্তের জন্ম আমার সাহায্য প্রার্থনা করিতেছ?"

স্মিথ হাসিয়া বলিল, "বড় মজা ত! আপনার সম্বন্ধে আমি ঠিক ঐ কথাই ভাবিতেছিলাম; আমার মনে হইতেছিল, টেলিফোনে আপনার বাড়ীর নম্বরটা জানিয়া লইয়া আমিই আপনাকে বিছানা হইতে টানিয়া তুলিব। স্কটল্যাণ্ড-ইয়ার্ডের চীফ-ইন্‌স্পেক্টর এত সকালে শয্যা ত্যাগ করিয়া আফিসে আসিবেন—ইহা আমার স্বপ্নেরও অগোচর! তবে কি আপনি সারা-রাত্রি আফিসেই ছিলেন?—কিন্তু আপনাকে যে চাই।"

লেনার্ড বলিলেন, "কে চায় আমাকে? তুমি?"

স্মিথ বলিল, "না, আপনাকে আমার কোন দরকার নাই; কর্ত্তা আপনাকে ডাকিয়াছেন। কারণটাও আপনাকে বলি। উইম্বল-ডনের মাঠে একটা মৃতদেহ পড়িয়া আছে। কর্ত্তার বিশ্বাস, কোন একটা বিস্ময়কর রহস্য আবির্ভূত হইবার সম্ভাবনা; এই জন্মই তিনি আপনাকে অবিলম্বে তাঁহার কাছে আসিতে অনুরোধ করিলেন।"

লেনার্ড বলিলেন, "কিন্তু আমার যে এখন ওখানে যাইবার উপায় নাই; একটা জরুরি কাজে আমি ভারী ব্যস্ত আছি। এ জন্ম—"

স্মিথ বলিল, "আপনি সে-কাজ অন্ম কাহারও হাতে দিয়া শীঘ্র এখানে চলিয়া আসিলে কর্ত্তা অত্যন্ত বাধিত হইবেন। যাহার মৃত-দেহটি দেখিবার জন্ম কর্ত্তা আপনাকে অনুরোধ করিতেছেন, গত রাত্রে বজ্রাঘাতে তাহার প্রাণবিয়োগ হইলেও কর্ত্তার ধারণা, কেহ তাহাকে হত্যা করিয়া মাঠের ঐ স্থানে ফেলিয়া গিয়াছে। সেই জন্মই কর্ত্তা আপনার সঙ্গে পরামর্শ করিতে উৎসুক।"

লেনার্ড বলিলেন, "তুমি গর্দ্দভ, অনেক কথাই বাড়াইয়া বল। তোমার এ-কথার কতখানি ছুট বাদ দিতে হইবে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না!"

স্মিথ হাসিয়া বলিল, "ইহার ষোল আনাই সত্য! কর্ত্তা আমাকে আপনার নিকট ফোন করিতে পাঠাইয়াছেন, বলিয়া দিয়াছেন, আপনি অবিলম্বে আসিলে তিনি অত্যন্ত অনুগৃহীত হইবেন।"

লেনার্ড বলিলেন, "তোমার কথা সত্য হইলে আমাকে যাইতেই হইবে। বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন ব্লেক আমাকে ঐরূপ অনুরোধ করিতেন না, আমি যত শীঘ্র সম্ভব তাঁহার নিকট উপস্থিত হইব; কিন্তু ঐ স্থানটি ঠিক কোথায়?"

স্মিথ বলিল, "উইম্বলডনের মাঠের শেষ ভাগে।"

লেনার্ড বলিলেন, "আমি সে-মাঠ চিনি; কিন্তু প্রকাণ্ড মাঠ, ব্লেকের সন্ধানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতে অনেক সময় লাগিবে। তুমি কি ঠিক জায়গাটার পরিচয় দিতে পারিবে না?"

স্মিথ যতটুকু পারিল, স্থানটির পরিচয় দিয়া টেলিফোনের রিসিভার নামাইয়া রাখিল। ওয়াইল্ড ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ডের সুপরিচিত হইলেও স্মিথ ইচ্ছা করিয়াই লেনার্ডের নিকট তাহার নাম প্রকাশ করিল না। লেনার্ড ওয়াইল্ডের মৃতদেহ দেখিয়া চিনিতে পারেন কি না, তাহা জানিবার জন্ম তাহার কৌতূহল হইয়াছিল।

স্মিথ ব্লেকের নিকট প্রত্যাগমনের সময় সেই মাঠের অদূরে এক জন কনেষ্টবলের দেখা পাইল। সে কনেষ্টবলকে বলিল, "তুমি আমার সঙ্গে চল? বিশেষ প্রয়োজনেই তোমাকে যাইতে হইবে।"

কনষ্টেবল বলিল, "আমাকে কোথায় যাইতে হইবে? আর প্রয়োজনটাই বা কি?"

স্মিথ বলিল, "ঐ মাঠে; ওখানে একটা মৃতদেহ পড়িয়া আছে।"

কনষ্টেবল সবিস্ময়ে কহিল, "মৃতদেহ! বল কি?"

স্মিথ বলিল, "হাঁ, বজ্রাঘাতে লোকটার মৃত্যু হইয়াছে।"

কনষ্টেবল বলিল, "বজ্রাঘাতে মরিয়াছে? ইহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। কাল রাত্রে কি ভয়ানক মেঘগর্জ্জন হইয়াছিল! এ-রকম ঝড়বৃষ্টি বহু কাল হয় নাই। কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে চালাকি করিতেছ না ত? তোমার কথা সত্য?"

স্মিথ বলিল, "সত্য কি মিথ্যা, আমার সঙ্গে সেখানে যাইলেই জানিতে পারিবে। মিঃ রবার্ট ব্লেকের নাম শুনিয়াছ? তিনিই আমার মনিব। তিনি এখন সেই মৃতদেহের কাছেই আছেন। তাঁহার আদেশে আমি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের চীফ-ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ডকে টেলিফোনে সংবাদ দিয়াছি। তিনি শীঘ্রই আসিতেছেন, তুমিও চল।"

স্মিথের কথা শুনিয়া কনষ্টেবল সোৎসাহে বলিল, "তবে ত আমাকে যাইতেই হইবে। তুমি বলিলে মিঃ ব্লেক তোমার মনিব; তবে কি তুমি মিঃ স্মিথ?"

স্মিথ বলিল, "তোমার অনুমান সত্য, আমারই নাম স্মিথ;—আমি প্যাট্রিক স্মিথ—মিঃ ব্লেকের সহকারী।"

কনষ্টেবল তৎক্ষণাৎ স্মিথের অনুসরণ করিল। সে ব্লেকের নাম শুনিয়াছিল; কিন্তু পূর্ব্বে কোন দিন কোন কার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করিবার সুযোগ পায় নাই। এবার সেইরূপ সুযোগ লাভের আশায় সে অত্যন্ত উৎসাহিত হইল।

স্মিথ যখন সেই কনষ্টেবল সহ ব্লেকের নিকট উপস্থিত হইল, ব্লেক তখনও মৃতদেহের নিকট দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি কনষ্টেবলকে মৃতদেহের পাহারায় থাকিতে আদেশ করিলেন।

ব্লেক কনষ্টেবলকে বলিলেন, "চীফ-ইন্‌সপেক্টর লেনার্ডকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে; তিনি শীঘ্রই এখানে আসিবেন। তিনি আসিয়া তোমাকে যে আদেশ করিবেন, তদনুসারে কাজ করিও। তাহার পূর্ব্বে এখানে যদি বাজে লোকের ভীড় হয়, তাহাদিগকে দূরে সরাইয়া দিবে।"

কনষ্টেবল বলিল, "তাহাই হইবে কর্ত্তা! কোন বাজে লোককে মৃতদেহের নিকট ঘেঁসিতে দিব না; তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিব।"

এবার ব্লেক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া মাঠের উপর দিয়া কার্ণের গৃহাভিমুখে চলিতে লাগিলেন।

স্মিথ ব্লেককে আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি আপনার নিকট হইতে চলিয়া যাইবার পর আর কিছু আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন কর্ত্তা!"

ব্লেক 'টাই-পিন'-আবিষ্কারের সংবাদ জানাইয়া, অদূরে অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া স্মিথকে বলিলেন, "মৃতদেহটি ঘাসের উপর দিয়া কি ভাবে টানিয়া আনা হইয়াছিল—তাহা ঐ চিহ্ন দেখিয়াই বুঝিতে পারিতেছ। আমার মনে হইয়াছিল—কার্ণ ওয়াইল্ডের মৃতদেহ ঐ ভাবে টানিয়া আনিবার পূর্ব্বে, কেহ তাহাকে হত্যাকারী বলিয়া সন্দেহ করিতে না পারে—এই উদ্দেশ্যে যথাযোগ্য সতর্কতা অবলম্বন করিবে; কিন্তু মৃতদেহটি টানিয়া লইয়া যাইবার চিহ্ন সুস্পষ্ট; সুতরাং কার্ণ কি ভাবিয়া যাহাতে সহজে ধরা পড়িতে হয় এমন কাজ করিয়াছে—তাহা এখনও ঠিক বুঝিতে পারা যাইতেছে না!"

স্মিথ সেই চিহ্ন পরীক্ষা করিয়া বলিল, "আপনার কথা সত্য কর্ত্তা! যদি সে যথাযোগ্য সতর্কতা অবলম্বন করিত, তাহা হইলে মৃতদেহটা কি এই ভাবে টানিয়া আনিয়া তাহার অপরাধের সূত্র এমন সুস্পষ্ট ভাবে রাখিয়া দিত? আমার মনে হয়, হত্যাকাণ্ডের পর ভয়েই তাহার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছিল! মৃতদেহটা সে কি করিয়া দূরে ফেলিয়া-আসিয়া নিরাপদ হইবে, এই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়াছিল। কিন্তু এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? সোজা কি তাহার বাড়ীতে গিয়াই উঠিব?"

ব্লেক বলিলেন, "না, ঐ কাজ করা সঙ্গত হইবে না; কারণ, আমাদের নিকট কোন পরোয়ানা নাই। তাহার বাড়ী খানাতল্লাস করিব, সেরূপ কোন সুযোগই আমাদের নাই; সুতরাং আমাদিগকে লেনার্ডের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু ঐ টাই-পিনটা মৃত ব্যক্তির পরিচ্ছদের ভিতর হইতে সংগৃহীত হওয়ায় প্রকৃত ব্যাপার সুস্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারা গিয়াছে। এই হত্যাকাণ্ডের জন্য সে-ই যে দায়ী, এ-বিষয়ে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যদি ওয়াইল্ড-বেচারা দৈবক্রমে বজ্রাঘাতেই নিহত হইত, তাহা হইলে উহার পরিচ্ছদের ভিতর হইতে টাই-পিনটি আবিষ্কৃত হইবার কি কোন সম্ভাবনা ছিল?"

ব্লেক বলিলেন, "এ কথা সম্পূর্ণ সত্য, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে; কিন্তু আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি—তাহাই যে অভ্রান্ত—এ কথাও দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারিতেছি না। এই জন্যই আমি আগ্রহভরে লেনার্ডের প্রতীক্ষা করিতেছি। তিনি আসিলে কার্ণের বাড়ীঘর খানাতল্লাস করিবার একটা ব্যবস্থা হইতে পারে; সর্ব্বাগ্রে তাহাই প্রয়োজন বলিয়া মনে হইতেছে।"

স্মিথের নিকট হইতে টেলিফোনে সংবাদ পাইবার ঠিক কুড়ি মিনিট পরে ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড ব্লেকের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া ব্লেক ব্যগ্র ভাবে কিছু দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন; তাহার পর তাঁহাকে বলিলেন, "লেনার্ড, তুমি এত শীঘ্র আসিতে পারিয়াছ দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। তোমার সাহায্যে শীঘ্রই তদন্ত আরম্ভ করিবার জন্য আমার অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছে।"

লেনার্ড বলিলেন, "শুনিলাম, এখানে কোথায় একটা মৃতদেহ পড়িয়া আছে; লোকটা না কি বজ্রাঘাতে মারা গিয়াছে? মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া কোন বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করিয়াছেন কি? আমার ত মনে হয়, লোকটা বজ্রাঘাতে মরিয়া-থাকিলে আপনি আমার এখানে আসিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করিতেন না।"

স্মিথ এবার বলিল, "লোকটা আপনার পরিচিত ইন্‌স্পেক্টর! মৃত ব্যক্তি ওয়াইল্ড।"

লেনার্ড এ কথা শুনিয়া সবিস্ময়ে ব্লেককে বলিলেন, "ওয়াইল্ড! সে এই ভাবে মারা গেল?"

স্মিথ বলিল, "কর্ত্তার ধারণা, কেহ তাহাকে হত্যা করিয়াছে!"

লেনার্ড ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! আপনার কি এইরূপ ধারণা মিঃ ব্লেক!"—কথাটা হঠাৎ বিশ্বাস করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না; তাঁহার চক্ষুতে অবিশ্বাসের চিহ্ন পরিস্ফুট হইল।

ব্লেক বলিলেন, "তুমি মৃতদেহ একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ।"

লেনার্ড বলিলেন, "ওয়াইল্ডের সহিত যুদ্ধ করিয়া কেহ তাহাকে হত্যা করিতে পারে—ইহা বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়াই মনে করি। লোকটা যে ওয়াইল্ড, অন্য কেহ নহে, এ বিষয়ে কি আপনি নিঃসন্দেহ হইয়াছেন? তাহাকে ঠিক সনাক্ত করিতে পারিয়াছেন কি?"

ব্লেক বলিলেন, "তাহার দেহ পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রমাণ পাইয়াছি, তাহা দেখিয়া সে ওয়াইল্ড ভিন্ন অন্য কোন লোক, ইহা বিশ্বাস করিতে পারি নাই।"

অতঃপর, ব্লেক মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া যাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সেই সকল কথা লেনার্ডের গোচর করিলেন; তাহার পরিচ্ছদের ভিতর যে ভাবে টাই-পিন পাইয়াছিলেন, সে কথাও প্রকাশ করিয়া টাই-পিনটি লেনার্ডের হস্তে প্রদান করিলেন।

লেনার্ড বলিলেন, "তা হইলে বজ্রাঘাতে উহার মৃত্যু হইয়াছে, ইহা আপনি বিশ্বাস করেন নাই?"

ব্লেক বলিলেন, "বজ্রাঘাতে উহার মৃত্যু হইয়া থাকিতে পারে; বজ্রাঘাত হইবার পূর্ব্বেই উহার মৃত্যু হইয়া থাকিলে তাহাতেও বিস্ময়ের কারণ নাই। বিশেষ ভাবে তদন্তের পূর্ব্বে নিঃসংশয়ে কিছুই বলা যায় না।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড অতঃপর মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "লোকটা যে ওয়াইল্ড, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হইয়াছি। আপনি কার্ণ সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন, তাহা সত্য বলিয়াই আমার মনে হইতেছে। আমার মনে হয়, আমাদের অবিলম্বে কার্ণের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তাহাকে আটক করাই উচিত; নতুবা সে আত্মরক্ষার জন্য পলায়ন করিতে পারে। তবে তাহার অপরাধ ধরা পড়িতে পারে, বা কেহ তাহাকে সন্দেহ করিয়াছে, এ ধারণা হয় ত তাহার মনে স্থান পায় নাই।"

ওয়াইল্ড নিহত হইয়াছে, লেনার্ড ইহা বিশ্বাস করিলেও তিনি তাহার এইরূপ মৃত্যুতে খুসী হইলেন না। ওয়াইল্ড অসাধারণ বলবান ও বীরপুরুষ ছিল বলিয়া তিনি তাহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধাই করিতেন।

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড যে সময় ব্লেক ও স্মিথকে সঙ্গে লইয়া কার্ণের বাস ভবনের নিকট উপস্থিত হইলেন, সেই সময় বেলা প্রায় নয়টা। তাহার অল্পকাল পূর্ব্বে গ্রামবাসীরা শয্যাত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্য আরম্ভ করিয়াছিল।

সাইমন কার্ণের বাসভবন প্রাসাদোপম সুবৃহৎ, ও আড়ম্বরপূর্ণ। একটি সুবিস্তীর্ণ আঙ্গিনায় তাহা আধুনিক ভাবে নির্ম্মিত। উহা যে কোন লক্ষপতির বাসভবন, বাড়ীখানির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইত।

ব্লেক ও লেনার্ড ঘাসের উপর দিয়া মৃতদেহ টানিয়া আনিবার যে চিহ্নের অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহা কার্ণের বাসভবন পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। ইনস্পেক্টর লেনার্ড কর্ত্তৃপক্ষের প্রতিনিধিরূপে স্বয়ং সকল দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কার্য্যক্ষেত্রে যাহা কর্ত্তব্য মনে হইবে—তাহাই করিতে তিনি কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

কার্ণের বাড়ীর নিকটে আসিয়া লেনার্ড ব্লেককে বলিলেন, "আমরা উহার বাড়ীর সদর দেউড়ি দিয়াই ভিতরে প্রবেশ করিব; তাহার পর কোন মন্তব্য প্রকাশ না করিয়াই গ্রেপ্তার।"

ব্লেক বলিলেন, "আমারও মনে হয়, এইরূপ করাই সঙ্গত।"

অতঃপর লেনার্ড কার্ণের সদর দরজায় উপস্থিত হইয়া ঘণ্টাধ্বনি করিলে একটি প্রৌঢ়া ভিতর হইতে দ্বার খুলিয়া দিল। দ্বারের বাহিরে তিন জন অপরিচিত ব্যক্তিকে প্রতীক্ষা করিতে দেখিয়া ভয়ে তাহার মুখ বিবর্ণ হইল।

স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কি চান ?"

লেনার্ড তাহার সম্মুখে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "মিঃ কার্ণের সঙ্গে দেখা করিতে চাই।"

স্ত্রীলোকটি উৎকণ্ঠিত ভাবে বলিল, "কর্ত্তার সঙ্গে দেখা করিবেন ? কিন্তু তিনি এখনও উঠেন নাই। তাঁহার নিকট আপনাদের কি প্রয়োজন ? আপনারা কে ? কোথা হইতেই বা আসিতেছেন ?"

লেনার্ড অচঞ্চল স্বরে বলিলেন, "তোমার ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই বাছা! তোমার দুশ্চিন্তারও কোন কারণ নাই। মিঃ কার্ণ যদি এখন পর্য্যন্ত শয্যাত্যাগ না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে বিরক্ত করিব না। আমরা কেবল জানিতে চাই—গত রাত্রে এই বাড়ীতে কোন ফ্যাসাদ ঘটিয়াছিল কি না, কোন গোলমেলে ব্যাপার ?"

এই প্রশ্নে স্ত্রীলোকটি বিব্রত ভাবে বলিল, "আমি—আমি ও-সব কিছুই কিন্তু আমার কিছুই বলিবার নাই; মিঃ কার্ণই আপনার প্রশ্নের উত্তর দিবেন। আমি সত্যই কিছু জানি না।"

লেনার্ড বলিলেন, "কিন্তু তোমার মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিতেছি, তুমি সকল কথাই জান; তবে তাহা আমাদের নিকট প্রকাশ করিতে তোমার সাহস হইতেছে না।"

স্ত্রীলোকটি কোন কথা না বলিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার চক্ষুতে আতঙ্ক পরিস্ফুট!

ইনস্পেক্টর লেনার্ড এবার বলিলেন, "তুমি আমাদের পরিচয় জানিতে চাহিয়াছ; তাহা তোমাকে বলিতে আমার আপত্তি নাই। —আমি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের চীফ-ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড। ও কি! আমার পরিচয় শুনিয়া তোমার যে মূর্চ্ছার উপক্রম হইল! স্থির হও। আমরা তোমার কোন অনিষ্ট করিব না—যদি তুমি—"

তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই স্ত্রীলোকটি ব্যাকুল স্বরে বলিল, "না, না, আমি সত্যই কিছু জানি না মহাশয়! আমি মিঃ কার্ণের গৃহ-রক্ষিকা। আপনারা জোর করিয়া এ ভাবে—"

লেনার্ড বলিলেন, "আমরা ত জোর করিয়া কিছুই করি নাই; তবে ও-কথা বলিবার কারণ কি ? গত রাত্রে এখানে দুই-একটা গোলমেলে কাণ্ড ঘটিয়াছিল, এই জন্যই আমরা তদন্ত করিতে আসিয়াছি। মিঃ কার্ণকে সে জন্য বিরক্ত করা নিষ্প্রয়োজন; তোমার সঙ্গে দুই-একটি কথার আলোচনা করিলেই আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারিব। আমার সঙ্গে যে দুই জন ভদ্রলোক আসিয়াছেন, উঁহারা আমাদেরই লোক; উঁহাদের সাক্ষাতে কোন কথা বলিতে তোমার আপত্তির কোন কারণ নাই।"

ব্লেক তখন পর্য্যন্ত কোন কথাই বলেন নাই; তখন তিনি সাগ্রহে উভয়ের কথাগুলি শুনিতেছিলেন।

অতঃপর তাঁহারা তিন জনে স্ত্রীলোকটির সহিত কার্ণের হলঘরে প্রবেশ করিলে লেনার্ড ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিলেন।

স্ত্রীলোকটি এবার অপেক্ষাকৃত সংযত স্বরে লেনার্ডকে বলিল, এই বাড়ীর দাসদাসীরা প্রায় সকলেই কর্ত্তার হেনলীস্থিত পল্লী-ভবনে চলিয়া গিয়াছে। মিঃ কার্ণেরও সেখানে যাইবার কথা ছিল; কিন্তু লণ্ডনে তাঁহার জরুরী কাজ থাকায় তিনি যাইতে পারেন নাই; সেই কাজ শেষ হইলেই—"

লেনার্ড বলিলেন, "ঐ সকল কথা আমরা শুনিতে আসি নাই মিসেস্—মিসেস্—"

প্রৌঢ়া বলিল, "আমার নাম মিসেস ফিঙ্ক।"

লেনার্ড বলিলেন, "শোন মিসেস্ ফিঙ্ক, গত রাত্রে এই বাড়ীতে কিরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহাই তোমার নিকট জানিতে চাই। আশা করি, তুমি কোন কথাই গোপন না করিয়া সত্য কথা বলিবে। ইহাতে তোমার ভয়ের কোন—"

স্ত্রীলোকটি তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ব্যগ্র ভাবে বলিল, "কিরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা সত্যই আমার জানা নাই মহাশয়! সেই সকল ব্যাপার দুর্ব্বোধ্য রহস্য বলিয়াই আমার মনে হয়। আর মিঃ কার্ণের সম্মুখে যাইতেও আমার সাহস হয় নাই; সকালে তাঁহাকে কেহ বিরক্ত করিলে তাঁহার ক্রোধের সীমা থাকে না। তিনি শয্যা-ত্যাগ করিয়া সাড়া না দিলে আমি তাঁহার ঘরের নিকট ঘেঁসিতেও সাহস করি না।"

লেনার্ড বলিলেন, "তোমার কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম, তোমার মনিবের মেজাজ খুব কড়া; কিন্তু গত রাত্রে এই বাড়ীতে কি গোলমাল ঘটিয়াছিল, তাহাই আমি জানিতে চাই। তুমি সরল ভাবে আমার এই প্রশ্নের উত্তর দাও।"

মিসেস্ ফিঙ্ক বলিল, "আমি ? আমি ও-সকল ব্যাপারের কিছুই জানি না।—কিরূপে আমি জানিব ? আমি সে সময় লাইব্রেরীতে গিয়াছিলাম। তা আপনি যে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ইন্‌স্পেক্টর, ইহা কিরূপে জানিব ? আমার ধারণা ছিল, পুলিশ কাহারও বাড়ীতে জোর করিয়া প্রবেশ করিলে তাহাকে তল্লাসী-পরোয়ানা দেখাইতে হয়। আপনারা যে ভাবে আমাকে বিরক্ত করিতেছেন, তাহাতে মনে হইতেছে, পুলিশের সাহায্য লওয়াই আমার উচিত। আপনি এখানে আসিয়া যাহা খুসী তাহাই বলিয়া আমাকে বিরক্ত করিতেছেন—আমার অপমান করিতেছেন, আমি ইহা অত্যন্ত আপত্তিজনক বলিয়াই মনে করি। এ অবস্থায় আমি—"

লেনার্ড তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "মিসেস্ ফিঙ্ক, এ

তোমার অন্যায় কথা ! আমি তোমাকে এমন কোন কথা বলি নাই, যাহা অপমানজনক বা বিরক্তিকর বলিয়া মনে হইতে পারে। আমি কোন পরোয়ানা আনাও দরকার মনে করি নাই। তুমি স্থির ভাবে আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেই আমি খুসী হইব। যাহা হউক, তুমি যে লাইব্রেরীর কথা বলিলে, তাহা কোন দিকে ? তোমার আপত্তি না থাকিলে আমরা সেই লাইব্রেরীর ভিতর যাইতে চাই।"

হলঘরের এক প্রান্তে একটি কক্ষ ছিল, ইন্‌সপেক্টর লেনার্ডের কথা শুনিয়া স্ত্রীলোকটি সভয়ে সেই কক্ষের দ্বারের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল ; তাহার পর আতঙ্ক-বিহ্বল স্বরে বলিল, "না, না ; আপনারা ওখানে যাইতে পাইবেন না। মিঃ কার্ণ বাহিরে না আসা পর্য্যন্ত আপনাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইবে। তিনি আসিয়া আপনাদের নিকট সকল কথাই—"

লেনার্ড বাধা দিয়া বলিলেন, "তোমার মনিব এখানে আসিলে, তাঁহার সঙ্গে আমরা পরে আলাপ করিব। এখন তুমি আমাদিগকে তাঁহার লাইব্রেরীতে লইয়া চল। আমরা এখনই তাহা পরীক্ষা করিব। ঐ কক্ষটিই লাইব্রেরী নয় কি ? আমরা সেই কক্ষে চলিলাম, তুমি আমাদের সঙ্গে আসিতে পার।"

ইন্‌সপেক্টর লেনার্ড ও মিঃ ব্লেক উভয়েরই ধারণা হইল, লাইব্রেরীর ভিতর গুপ্ত-রহস্যের কোন সূত্র আবিষ্কৃত হইতে পাবে। স্ত্রীলোকটি চীৎকার করিয়া কার্ণকে সতর্ক করিতে না পারে, কিম্বা তাঁহাদের সম্মুখ হইতে সরিয়া-পড়িতে না পারে, সে দিকে তাঁহাদের লক্ষ্য থাকিল। তাঁহাদের মনে হইল, স্ত্রীলোকটি তাড়াতাড়ি দোতলায় উঠিয়া কার্ণকে জাগাইয়া তুলিবে, ও সকল কথাই তাহার নিকট প্রকাশ করিবে।' এই জন্য লেনার্ড স্মিথকে বলিলেন, "স্মিথ, তুমি স্ত্রীলোকটির পাহারায় থাক, ও যেন অন্য কোন দিকে যাইতে না পারে।"

মিসেস্ ফিঞ্চ এ কথা শুনিয়া হতাশ ভাবে একখানা চেয়ারে বসিয়া-পড়িয়া রোদন করিতে লাগিল ; তাহার রোদনের শব্দে সেই কক্ষ প্রতিধ্বনিত হইল।

লেনার্ড ব্লেকের সহিত লাইব্রেরী-কক্ষে প্রবেশ করিয়া কক্ষস্থ সকল দ্রব্যই বিশৃঙ্খল ভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখিলেন ! চেয়ারগুলি উল্টাইয়া পড়িয়াছিল ; মেহগ্নি ডেস্কের উপর যে সকল জিনিস ছিল—তাহাও চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল ; যেন সেই কক্ষে কাহারা ধস্তাধস্তি করিয়াছিল ! একটি বাতায়নের সার্শি চূর্ণ হইয়াছিল ; তাহার পর্দ্দা এক পাশে পড়িয়াছিল। খড়খড়ির পাখীর ভিতর দিয়া বাহিরের আলোক সেই কক্ষে প্রবেশ করিতেছিল।

ব্লেক পদপ্রান্তে দৃষ্টিপাত করিয়া কার্পেটের উপর কৃষ্ণবর্ণ কতকগুলি দাগ দেখিতে পাওয়ায় তাহা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

শরৎরাণী

আজিকে, শিউলি-ছোপা কার রাঙা পায় নূপুর বাজে,
কানে তার, ভুঁইচাঁপা দুল চাঁচর চুলে হিজল রাজে।

কাননের, জংলা-বধূ, কমলা-মধুর পিচকারীতেই,—
ভরি দেয়, মুখখানি কার, চুমকি ঝলে নীল্ সাড়ীতেই।
মেঘেরি, উত্তরী কার হাওয়ায় দোলে দিগ্‌বলয়েই,
প্রভাতের, সূর্য্য শোভে তার সিঁথিতে সিঁদুর হ'য়েই।

শরতের, গৌরী মেয়ে তারেই চেয়ে কুমুদ ফোটে,
খেলিয়া, গেণ্ডুয়া খেল্ ধেনুর রাখাল ধূলায় লোটে।
পরিয়া, 'পায়নাফুলী' রঙীন সাড়ী সুবাস ভরা,
মেয়েরা, গ্রামপথে গায় হর্ষে 'ভাদু-রাণী'র ছড়া।

দেখা যায়, ওই আলিপথ সেথায় কাঁচা সবুজ ধানেই,
ছেয়েছে, মাঠটি-সারা, মুখর সে ঠাঁই বাউল গানেই।
কবি আজ, ভোমরা পাখায় পত্র পাঠায় শরৎরাণি !
আমাদের, দৈন্য ঘুচাও, দাও বরাভয় আশীষ-বাণী !

কাদের নওয়াজ।

শক্তি-মহিমা

(ভক্তি-নিবেদন)

শক্তিই ব্রহ্মরূপিণী। শক্তির লীলাবিলাসেই চরাচর উদ্ভাসিত। তৃণ-তরু-গুল্ম হইতে দেব-দানব-গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সর্ব্বজাতীয় জীব সেই শক্তির করুণাবিন্দু লাভ করিয়া নিজ নিজ রূপে প্রকাশিত। অগণিত গ্রহ-তারকা যেন সেই শক্তির ক্রীড়াকন্দুকরাজি, নীলনভোমণ্ডলরূপী এক বিশাল শ্যামল ক্ষেত্রে ঘুরিতেছে, ছুটিতেছে, আবার স্বস্থানে ফিরিয়া আসিতেছে।

শ্বেতাশ্বতর বলিয়াছেন—'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ'—ইঁহার বিবিধশক্তি এবং তাহা স্বাভাবিক—জ্ঞানশক্তি, বলশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি। যে সমস্ত খণ্ড খণ্ড শক্তি আমাদের নয়নগোচর হইয়া থাকে, তাহার উৎসভূমি সেই মহাশক্তি। জ্ঞানশক্তির পরিচয়ে শ্রুতি বলিয়াছেন,—'এতস্য মহাভূতস্য নিশ্বসিতং যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদঃ' সেই ব্রহ্মময়ীর নিশ্বাস—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ ও সামবেদ ; 'চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ' যিনি চিদ্রূপে সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছেন, ক্রিয়াশক্তি তাঁহার অপূর্ব্ব। দেবীসূক্তে আছে—'অহমেব বাত ইব প্রবাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বাঃ'—আমিই বায়ুর মত প্রবাহিত হইয়া সমস্ত বিশ্ব নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়া থাকি।

> যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ
> যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
> যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি
> তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্ ॥

যেমন উর্ণনাভি (মাকড়সা) নিজ দেহ হইতে জাল সৃষ্টি করে ও তাহাতেই বসিয়া থাকে, যেমন পৃথিবী হইতে ওষধিসমূহ উৎপন্ন হয় এবং যেমন জীবন্ত পুরুষের অঙ্গে কেশলোমাদি বহির্গত হয়, সেইরূপ সেই অক্ষর-ব্রহ্ম হইতে এই বিশ্ব উদ্ভূত হইয়া থাকে।

এই অক্ষরই যে শক্তি, তাহা শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য তাঁহার 'প্রপঞ্চসার' গ্রন্থে স্পষ্টই বলিয়াছেন,—

> 'অক্ষরং নাম কিং নাথ কুতো জাতং কিমাত্মকম্'
>
> * * * *
>
> প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চৈব নিত্যৌ কালশ্চ সত্তম।
> আণোরণীয়সী স্থূলাৎ স্থূলা ব্যাপ্তচরাচরা ॥
>
> * * * *
>
> প্রধানমিতি যামাহুর্যা শক্তিরিতি কথ্যতে।
> যা যুষ্মানপি মাং নিত্যমবষ্টভ্যাতিবর্ত্ততে ॥
>
> * * * *
>
> সৈব স্বং বেত্তি পরমা তস্যা নান্যোঽস্তি বেদিতা ॥
>
> প্রপঞ্চসার, প্রথম পটল।

ব্রহ্মা কোন সময়ে শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে—হে নাথ, অক্ষর কাহার নাম ? তাঁহার স্বরূপই বা কি এবং কেনই বা তিনি প্রকাশিত হইয়াছেন ? তাহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে,—প্রকৃতি ও পুরুষ এবং কাল—এই ত্রিতয়স্বরূপ অক্ষর ! তিনি অণু হইতে সূক্ষ্মতর এবং স্থূল হইতেও স্থূল, এমন কি, চরাচর ব্যাপ্ত হইয়া আছেন।

* * * *

তিনি প্রধান নামে খ্যাত এবং 'শক্তি' বলিয়াও কথিতা হন। যিনি তোমাদিগকে (ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে) এবং আমাকেও নিয়ত ব্যাপিয়া তাহারও অধিক হইয়া আছেন, তাঁহার স্বরূপ তিনি স্বয়ংই জ্ঞাত আছেন, অন্য কেহই তাঁহার স্বরূপ জানে না !

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ব্রহ্মবাদিগণের মধ্যে প্রশ্ন উঠিয়াছিল,—

ব্রহ্মই কি কারণ ? আমরা কোথা হইতে উৎপন্ন হইলাম ? কাহাকে অবলম্বন করিয়া আমরা সুখে দুঃখে অধিষ্ঠিত হইয়া বাঁচিয়া আছি ? ব্রহ্মবাদিগণ ধ্যানযোগে দেখিলেন নিখিল কারণরূপে বিরাজমান—সেই শক্তি ! যিনি স্বগুণনিগূঢ়া ও দেবাত্মরূপিণী। সত্ত্ব, রজঃ ও তম গুণ লইয়াই প্রকৃতি এবং জ্ঞানস্বরূপ আত্মা, চিৎ ও অচিৎ এই উভয়ের এক অপূর্ব্ব সম্মিলন—শক্তিকে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন।

দেবগণের হৃদয়াকাশে একদিন দেখা দিয়াছিলেন এই ব্রহ্মরূপিণী শক্তি—উমামূর্ত্তিরূপে। অগ্নি-পবনাদি দেবগণ আপনাদিগকেই শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর বলিয়া জানিতেন, সেই অভিমান বশে আর কাহাকেও মানিতেন না, তাই উমামূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাদের গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। 'সা ব্রহ্মেতি হোবাচ' (কেন)—সেই উমাই ব্রহ্ম। গুণযোগ ব্যতীত মূর্ত্তি ধারণের সম্ভাবনা কোথায় ? বস্তুতঃ নামরূপে অভিব্যক্ত এই বিশ্ব সংসার, নাম শব্দসমষ্টি ও ভৌতিক প্রকৃতি হইতেই নামরূপের প্রকাশ, এই জন্য প্রকৃতি ও পুরুষ (চৈতন্য) উভয়ের সম্মিলিত স্বরূপই শক্তি।

শক্তিমহিমার অন্ত নাই। বিশ্বের সমস্ত ভাবের উৎপত্তি মহাশক্তি হইতে। এই মহাশক্তির একটি লীলাস্ফুরণ দুর্গামূর্ত্তি। কেহ কেহ তাঁহাকে রণদেবতা বলিয়া তাঁহার স্বরূপসঙ্কোচের চেষ্টা করিয়াছেন এবং মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বের ২৩ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ শত্রুপরাজয়ের জন্য অর্জ্জুনকে দুর্গাস্তোত্রপাঠে নিযুক্ত করিয়াছিলেন—এবং সপ্তশতীতে দৈত্য-দানবদিগের বিনাশের জন্যই সমস্ত দেবগণের 'তেজোরাশি-সমুদ্ভবা' দুর্গামূর্ত্তির আবির্ভাব, সুতরাং তিনি যে রণদেবতারূপে পূর্ব্বে পূজিতা হইতেন, ইহাই প্রমাণিত হয়। ইহার প্রকৃত সিদ্ধান্ত এই যে,—যে যে স্তোত্রে দুর্গার মহিমা বর্ণিত হইয়াছে, সেই সেই স্তোত্রমধ্যে তাঁহার স্বরূপ যে ভাবে উল্লিখিত আছে, তাহার আলোচনামাত্রেই পূর্ব্বোক্ত মতবাদ খণ্ডিত হইয়া যাইবে।

মহাভারতে উল্লিখিত দুর্গাস্তোত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"স্বাহাকারঃ স্বধা চৈব কলা কাষ্ঠা সরস্বতী।
সাবিত্রী বেদমাতা চ তথা বেদান্ত উচ্যতে॥"

'তুমি স্বাহা, স্বধা, কলা, কাষ্ঠা ও সরস্বতী; তুমি বেদমাতা সাবিত্রী এবং বেদান্তরূপিণী।' 'স্বাহা' 'স্বধা' ইহা দ্বারা সমস্ত কর্ম্মময়ী যে তিনি; 'কলা' 'কাষ্ঠা' এই শব্দ দ্বারা তিনি যে সমস্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম কালস্বরূপা; সরস্বতী বেদমাতা সাবিত্রী ইহা দ্বারা সমস্ত বাঙ্ময়-রাজ্যের অধীশ্বরী ও বেদান্তস্বরূপা কথিত হওয়ায় ব্রহ্মবিদ্যাও যে তিনি, ইহা প্রতীয়মান হয়। রণদেবতার উদ্দেশে 'বেদান্ত উচ্যতে' বলিবার কোন সঙ্গতি থাকে না। সপ্তশতীর দেবগণ কর্ত্তৃক যে কয়টি স্তুতি উচ্চারিত হইয়াছে—তাহার প্রত্যেকটিতেই ঠিক ঐরূপ মহিমাই উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে।

স্বাহাসি বৈ পিতৃগণস্য চ তৃপ্তিহেতু-
রুচ্চার্য্যসে ত্বমত এব জনৈঃ স্বধা চ॥

* * * *

মোক্ষার্থিভির্মুনিভিরস্তসমস্তদোষৈ-
র্বিদ্যাসি সা ভগবতী পরমা হি দেবি! (৪।৭,৮)

* * * *

বিদ্যাসু শাস্ত্রেষু বিবেকদীপে-
ষ্বাদ্যেষু বাক্যেষু চ কা ত্বদন্যা॥ (১৩।৩০)

তুমি স্বাহা, এবং পিতৃগণের তৃপ্তিদায়িনী স্বধাও তুমি, তুমি মোক্ষার্থী মুনিগণের সন্নিহিতা এবং তুমি পরমা বিদ্যা। বিবেকোদ্দীপক শাস্ত্রসমূহের এবং কর্ম্মময় বেদবাক্যের স্বরূপ তুমি ব্যতীত আর কেহ নহে।

এই সকল স্তুতিবাক্যে দুর্গার ব্রহ্মস্বরূপতাই প্রদর্শিত হইয়াছে। যাঁহাকে সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী ভোগস্বর্গাপবর্গদা বলা হইয়াছে; তিনি কি ঐহিক জয়ে কি পারত্রিক মঙ্গলে সর্ব্বত্রই প্রেরণাদানে সমর্থা, এজন্য রণাঙ্গনে তিনি বিজয়প্রদা হইবেন, ইহাতে বিস্ময়ের কি আছে ?

সেই শক্তি শিব-দুর্গা, কৃষ্ণ-রাধা প্রভৃতি যুগলরূপে আমাদের নিত্য উপাস্য। শিব বা কৃষ্ণ জ্ঞানের প্রতিমা দুর্গা বা রাধা প্রকৃতির প্রতিচ্ছবি। জ্ঞান হইতে প্রকৃতিকে বিভিন্ন করা যায় না,—ইহাই অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তিতে বা যুগলরূপে প্রতিপাদিত। মানুষ এই উপাসনা-রসে মগ্ন হইয়াও কখনও কখনও শিব ও দুর্গার মধ্যে তারতম্যচিন্তায় বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন। শিব পতিরূপে ও দুর্গা পত্নীরূপে বর্ণিত হওয়ায় শিবের প্রাধান্য ও দুর্গার অপ্রাধান্য স্থির করিয়া বসেন। পুরাণে নানা উপাখ্যানের মধ্য দিয়া এই তারতম্যবুদ্ধি যাহাতে না আসে, তাহার আলোচনা দেখা যায়। বস্তুতঃ চিতিশক্তি প্রকৃতির সহিত মিলিত না হইলে তাহার কার্য্যকারিতা থাকে না, আবার প্রকৃতিও জ্ঞানযুক্তা না হইলে কোন ক্রিয়ায় সমর্থ হয় না। তাহাই আনন্দলহরীতে কথিত হইয়াছে—

"শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুম্" শিব শক্তিযুক্ত হইলে তবে প্রভুত্ব-বিস্তার করিতে পারেন। শক্তিতত্ত্বের ইহাই বৈশিষ্ট্য যে, শিব ও দুর্গা উভয়েরই সমপ্রাধান্য, ইহার মধ্যে ইতর-বিশেষ ভাবনা করিতে নাই। ব্রহ্মপুরাণে একটি উপাখ্যানে ইহা বিশেষ ভাবেই বর্ণিত হইয়াছে।

দক্ষযজ্ঞে সতী নিজ দেহ ত্যাগের পর হিমালয়গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া শিবকে পতিরূপে পাইবার জন্য কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার তপোযোগে সমস্ত লোক পরিতপ্ত হইয়া উঠিল। তখন ব্রহ্মা তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন যে, হে দেবি! এ জগৎ তোমারই সৃষ্টি, তুমি স্বীয় তেজে এই জগৎ ধারণ করিতেছ, তুমি কেন

ইহাকে পরিতপ্ত করিতেছ ? তুমি ইহাকে বিনাশ করিও না। দেবী বলিলেন,—পিতামহ ! আমি যে জন্য তপস্যা করিতেছি, তাহা ত' তোমার অবিদিত নহে। তখন ব্রহ্মা বলিলেন যে, হে শুভে ! যাঁহার জন্য তুমি তপস্যা করিতেছ, তিনি স্বয়ং এখানে আসিয়া তোমায় বরণ করিবেন। সেই দেবদেব স্বয়ম্ভু বিরূপাক্ষ, উদারমূর্ত্তি, তাঁহার তুল্য রূপ কাহারও নাই, তিনি মহেশ্বর, তিনি আদি ও অপ্রমেয়। তৎপরে অন্য দেবগণ আসিয়া সেই তপোনিরতা দেবীকে বলিলেন যে, অচিরকালমধ্যেই ধূর্জ্জটি আপনার ভর্ত্তা হইবেন, আপনি আর তপস্যা করিবেন না। দেবগণ অন্তর্হিত হইলেন, এদিকে তিনি তপোনিবৃত্তা হইয়া একটি অশোকতরু-তলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাদেব চন্দ্রতিলক হইলেও এক বিকৃতরূপ ধারণ করিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বাহু হ্রস্ব, নাসিকা ভগ্ন, কুব্জাকৃতি ; তিনি পিঙ্গলাভ জটা ধারণ করিয়া বিকৃতমুখে বলিলেন,—'দেবি, আমি তোমাকে বরণ করিতেছি।' উমা তাঁহাকে ভাবশুদ্ধ অন্তরে জানিতে পারিয়া পূজা করিলেন এবং বলিলেন,—'ভগবন্ ! আমি স্বাধীনা নহি, আমার পিতা শৈলরাজ, তাঁহার নিকটে গিয়া আপনি প্রার্থনা করুন।' তৎপরে ভগবান্ মহাদেব সেইরূপ বিকৃতবেশে শৈলরাজ হিমালয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—'আপনি আমাকে কন্যাদান করুন।' হিমালয় বলিলেন,—'আমার কন্যার বিবাহ ব্যাপারে এক স্বয়ম্বর-সভা আহূত হইবে, সেই সভায় মদীয় কন্যা স্বয়ং যাঁহাকে বরণ করিবে, তিনিই তাহার ভর্ত্তা হইবেন।' শৈলরাজের এইরূপ কথা শুনিয়া তিনি পুনরায় উমার নিকটে আসিয়া বলিলেন—'শুনিলাম, তোমার পিতা স্বয়ম্বর-সভা আহ্বান করিবেন, এবং সেখানে তুমি যাঁহাকে বরণ করিবে, তিনিই তোমার পতি হইবেন। এই জন্য তোমায় জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, তুমি তখন রূপবান্ বর পরিত্যাগ করিয়া কি এই অযোগ্য বরকে বরণ করিবে?' তখন উমা বলিলেন যে,—'এ বিষয়ে আপনার যদি কোন সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে এখানেই আমি আপনাকে বরণ করিতেছি।' এই বলিয়া একটি অশোকপুষ্পস্তবক গ্রহণ করিয়া শঙ্কর-স্কন্ধে অর্পণ করিয়া বলিলেন যে, 'আমি আপনাকে বরণ করিলাম।' তখন মহাদেব অতীব প্রসন্ন হইলেন এবং অশোকপুষ্প তাঁহার সদাপ্রিয় হইবে—ইহাও জ্ঞাপন করিলেন।

কিছুকাল পরে শৈলসুতার স্বয়ম্বর-সভা বিঘোষিত হইল। হিমাচলপৃষ্ঠ শত শত বিমানে আচ্ছাদিত হইল। যদিও নগরাজ ধ্যানযোগে দেবদেবের সহিত উমার বিবাহ সম্পন্নপ্রায় জানিতে পারিলেন, তথাপি নিজ প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য এই স্বয়ম্বর-সভার অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত হইলেন। স্বয়ম্বর-বার্ত্তা শ্রবণমাত্রে দেবগণ নানাবিধ বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া হিমালয় সন্নিধানে শুভাগমন করিলেন।

এদিকে দেবী উমা হেমময় বিমানপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া পুষ্পময়ী সুগন্ধমালা গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ-পরিবৃত সেই স্বয়ম্বর-সভায় উপনীত হইলেন। দেবাদিদেব শম্ভু তখন তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিবার জন্য একটি পঞ্চশিখাবিশিষ্ট ক্ষুদ্র শিশুরূপে সেই উমার ক্রোড়ে শয়ন করিলেন ও তৎক্ষণাৎ নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। উমাও তাঁহার স্বরূপ জানিতে পারিয়া সাদরে গ্রহণ করিলেন।

তখন দেবগণ দেবীর ক্রোড়ে শিশুকে দর্শন করিয়া বিষম আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শিশুকে আহত করিবার জন্য বজ্রপাণি বজ্র উত্তোলন করিলেন, আদিত্য দীপ্ত আয়ুধ উত্থাপিত করিয়া শিশুকে ছেদন করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু শম্ভু উভয়কেই স্তম্ভিত করিয়া একেবারে শক্তিরহিত করিয়া দিলেন। সমস্ত সুরসমাজ তখন অতীব ক্রুদ্ধ হইলেও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন ব্রহ্মা ধ্যানযোগে সেই শিশুই যে শঙ্কর, ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন এবং স্তব করিতে লাগিলেন। এই স্তববাক্যে শিব ও দুর্গার স্বরূপ কীর্ত্তিত হইয়াছে।

> প্রধানং পুরুষো যস্ত্বং ব্রহ্মধ্যেয়ং তদক্ষরম্।
> অমৃতং পরমাত্মা চ ঈশ্বরঃ কারণং মহৎ ॥
> ইয়ঞ্চ প্রকৃতিদেবী সদা তে সৃষ্টিকারণম্।
> পত্নীরূপং সমাস্থায় জগৎকারণমাগতা ॥

নমস্তুভ্যং মহাদেব দেব্যা বৈ সহিতায় চ ৬॥ (৩য় অঃ)

যিনি প্রকৃতি ও পুরুষ তুমিই সেই অক্ষর ব্রহ্ম, তুমি অমৃত পরমাত্মা, পরম কারণ ঈশ্বরস্বরূপ। এই উমাই প্রকৃতি দেবী—সৃষ্টির হেতু ইনি তোমার পত্নীরূপ গ্রহণ করিয়া জগতের কারণরূপে বিরাজিতা। দেবীর সহিত তোমাকে নমস্কার করি !

এই স্তবে তুষ্ট হইয়া মহাদেব শিশুরূপ ত্যাগ করিয়া বিরূপাক্ষরূপে আবির্ভূত হইলে উমা তাঁহার পাদপদ্মে মাল্য অর্পণ করিবামাত্র দেবগণ সাধুবাদ প্রদান করিলেন ! তৎপরে উভয়ের বিবাহ সুসম্পন্ন হইল !

এই উপাখ্যানে শঙ্করের শিশুরূপে উমাক্রোড়ে আগমন-লীলায় ইহাই প্রকাশিত হইয়াছে যে, উভয়েরই প্রাধান্য সমান। শক্তি ও শিব—উভয়ে সমাংশে মিলিত, দুর্গা

কখনও শিবপত্নী, আবার শিবও কখনও শিশুরূপে দুর্গাক্রোড়ে শয়ান। *

দশমহাবিদ্যার সাধনায় শক্তির প্রাধান্য—শবরূপী বা পর্য্যঙ্কশায়ী মহাদেবের উপরে শক্তিমূর্ত্তি বিরাজিত। প্রকৃতি ও পুরুষের এই যে সংযোগ—শ্রুতি, পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে বহু প্রকারে প্রদর্শিত হইয়াছে; এই সকল তত্ত্ব হইতে শাক্তবাদের যে উপকরণ পাওয়া যায়, তাহাকেই ভিত্তি করিয়া শক্তিভাষ্য লিখিত হইয়াছে।

* মালদহ Museum গৃহে এই শিবের শিশু মূর্ত্তিতে দুর্গাক্রোড়ে অবস্থানের একটি প্রস্তরফলক পাওয়া গিয়াছে।

আজ এই শারদীয়া শুভদিবসে আমরা শক্তিমহিমা উদ্‌ঘোষিত করিয়া ধন্য হই—জগত্তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া জীবন কৃতার্থ করি, আর সেই ব্রহ্মময়ী জগদম্বিকার নিকটে শক্তি প্রার্থনা করিয়া এই রণতাণ্ডবে উন্মত্ত জগতের শান্তি ও স্বকীয় অভ্যুদয় কামনা করি। তিনি রণদেবতারূপে দানবী শক্তি বিলুপ্ত করিয়া সমস্ত বিশ্বে দৈবীশক্তি জাগ্রত করুন। আমরা উচ্চৈঃস্বরে জগদীশ্বরীকে জানাইয়া দিই—

বিশ্বেশ্বরি ত্বং পরিপাসি বিশ্বং
বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্।
বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তি
বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ॥

শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ।

সর্ব্বহারার দল

সভ্য জীবের বসবাস তরে বনজঙ্গল কাটি'
রাজ্য নগর জনপদ যা'রা গড়ে দেহ ক'রে মাটি,—
বুকের রক্ত ঢালিয়া নিত্য প্রবাল-কীটের মত
প্রাসাদ ভবন প্রমোদ কানন রচে যা'রা অবিরত,—
রাজ্যে তাদের নাহি অধিকার, রাজপথ সম্বল;
পাথেয় কিছুই নাই তাহাদের, বসতি বৃক্ষতল!

গ্রীষ্মের রোদে বৃষ্টিবাদলে মৃত্তিকা করি চাষ
বিলাস বস্ত্র রাজভোগ যা'রা যোগাইছে বারো মাস,—
তা'দের ভাগ্যে জুটে না অন্ন, মিটে না ক্ষুধার জ্বালা;
চির-উপবাসী অপরের লাগি' ভরিছে ভোগের ডালা!
যাহারা ফলায় সোনার শস্য দানা তা'রা নাহি পায়;
ধনিকে বণিকে কাঞ্চন লুটে, বঞ্চিত এরা হায়!

লাঞ্ছিত চির-দুর্গত এই সর্ব্বহারার দল,
বক্ষে এদের দুঃখের শিখা, চক্ষে ব্যথার জল।
এরা নিরন্ন সদা বিপন্ন দুর্ভাগা ক্রীতদাস,—
এদের জীবনে নাহি ফুটে ফুল, নাহি আসে মধুমাস।
সভ্যতা-যূপকাষ্ঠে ইহারা নিত্য হ'তেছে বলি;
সভ্য মানব দম্ভে চলেছে এদের চরণে দলি'!

দেবতারে এরা নাহি দেয় দোষ, করে নাক' অভিমান;
যুগ যুগ ধ'রে সহিছে নীরবে অবিচার অপমান।
দধীচির ত্যাগ শিখিয়াছে এই সবহারাদের জাত;
বিশ্বের হিতে নিঃস্ব সাজিয়া করিছে জীবনপাত।
সর্ব্বংসহা ধরণীর মত এরাও সহনশীল,—
এদের ভাগ্যে শান্তি ও সুখ মিলে নাক' এক তিল!

শ্রীনীলরতন দাশ (বি-এ)

'এ-কে-ও-এস্'

[গল্প]
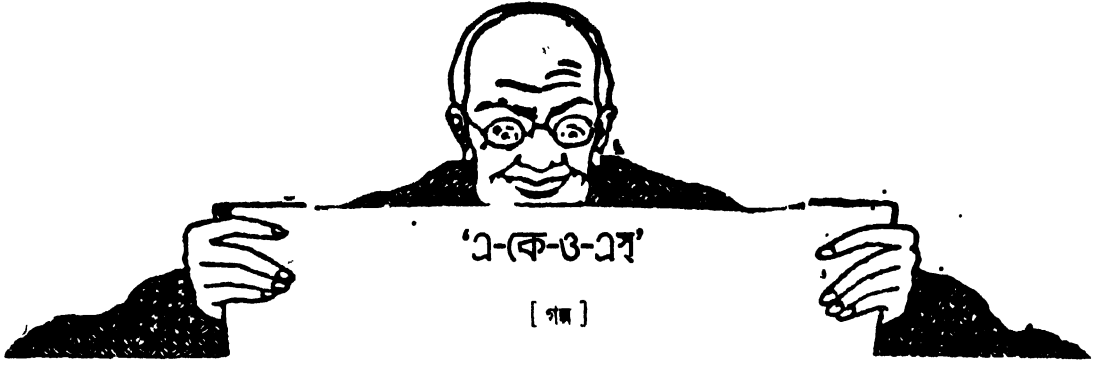
প্রাতঃকাল।

শ্রীযুত রজত রায় বারান্দার আরাম-কেদারায় উপবিষ্ট। পাশের টিপয়ের উপর এক কাপ গরম চা বাষ্পরাশি উদ্গিরণ করিয়া অনাদরে ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছিল। হাতে তাঁহার সেই দিনকার একখানা বাঙ্গালা দৈনিক সংবাদপত্র। চক্ষুর স্থির দৃষ্টি সম্মুখস্থ মেজের উপর নিবদ্ধ, এবং অন্তর অন্তহীন চিন্তায় ভারাক্রান্ত।

স্ত্রী চিত্রা ঘরের ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া কহিল—"এ কি! চা যে জুড়িয়ে বরফ হোয়ে যাচ্ছে! বেহুঁস্ হোয়ে কি ভাবছ বল ত?"

"কাগজওয়ালারা এক কাণ্ড বাঁধিয়ে বসেছে।"

"কিসের?"

"ঐ ছায়ার বিয়ের বিজ্ঞাপনটার! করেছে কি জান? একেবারে 'ম্যাসাকার' (massacre) করেছে! আমি ওদের বিজ্ঞাপনের বিলের একটি পয়সাও দিচ্ছিনে।"

"হোয়েছে কি—আগে তাই শুনি।"

"হোয়েছে? এই—রামের মুণ্ডু শ্যামের ধড়ে, আর শ্যামের মুণ্ডু রামের ঘাড়ে বসিয়ে দিয়েছে! উঃ! 'প্রিণ্টার্স ডেভিল'ই বটে! কেলেঙ্কারী ব্যাপার না ঘটিয়ে আর ছাড়ালে না দেখছি!"

"ব্যাপারটা একটু খুলেই বল না ছাই!"

"ঠিকানা ছাপাতে সাংঘাতিক ভুল করে বসেছে! এই দেখ—" বলিয়া রজত রায় হাতের কাগজখানা চিত্রার হাতে দিলেন।

শ্রীযুত রায়ের একটি পুত্র এবং একটি কন্যা। কন্যাটিই বড়, নাম—কুমারী ছায়ারাণী। ছায়ার বয়স আঠার ছাড়াইয়া গিয়াছে; সে 'ফার্ষ্ট ইয়ারে' পড়ে। শ্রীযুত রায়ের ইচ্ছা, বি-এ পাশ করাইয়া তাহার বিয়ে দেন। কিন্তু চিত্রার ইচ্ছা 'শুভস্য শীঘ্রং' অতএব অবিলম্বে! তাই চিত্রারই পীড়াপীড়িতে রজত বাবু উপযুক্ত পাত্রের জন্য বাঙ্গালা দৈনিকে একটি বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। কিন্তু ছাপাখানার ভুলক্রমে বিজ্ঞাপনের শেষে তাঁর নাম ঠিকানার জায়গায় হরেকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় নামক অপর এক জনের নাম ও তাহারই ঠিকানা ছাপা হইয়াছিল। আর সেই লোকটির মেয়ের বিয়ের বিজ্ঞাপনের শেষে ছাপা হইয়াছিল—রজত রায়ের নাম ও ঠিকানা।—হরেকৃষ্ণ চট্টোর বিজ্ঞাপনটি এই,—

'একটি শ্যামবর্ণা, কৃশাঙ্গী কন্যার জন্য উদার-হৃদয় একটি সৎপাত্রের দরকার; বেরিবেরিতে ভুগিয়া মেয়েটির একটি চক্ষু নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পাত্র পছন্দসই হইলে মেয়ের নামে কলিকাতায় একখানি বাড়ী এবং পাঁচ হাজার এক টাকা যৌতুক দেওয়া হইবে।"

চিত্রা বিজ্ঞাপনটি পড়িয়া কাগজখানি স্বামীর হাতে ফিরাইয়া দিল; কহিল—"তাহোলে আবার বিজ্ঞাপন দাও; আর ওদের ভাল করে বলে এস যে, আর যেন কোন রকম ভুল না হয়।"

"তার জন্যে একটু মিষ্টি মিষ্টি ওষুধের ব্যবস্থাও করতে হবে। ওরে বেহারী! কবিরাজ মশায়কে একবার ডাকতো।"

কবিরাজ মশায়—অর্থাৎ নিশিকান্ত চক্রবর্ত্তী, বয়স সত্তরের কাছাকাছি—এক সময়ে শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। দীর্ঘ, সুগঠিত চেহারা। প্রৌঢ় বয়স পর্য্যন্ত কবিরাজী ব্যবসায় করিতেন। বয়স বেশী হওয়াতে এক্ষণে সে সব ত্যাগ করিয়া, রজত বাবুর পোষ্যভুক্ত হইয়া আছেন। এইখানেই খান দান, থাকেন, কিছু কিছু নগদ হাতখরচাও পান; আর রজত বাবুর সাংসারিক কাজকর্ম্ম দেখা-শুনা করেন, এখানে-সেখানে যান, ফাই-ফরমাস খাটেন।

কবিরাজ মশায় উপরে আসিলে, রজত বাবু তাঁহাকে বিজ্ঞাপনের ভুলের কথা জানাইলেন, এবং বলিলেন—খেয়ে-দেয়ে ওদের আফিসে একবার যাবেন; আর বেশ তুড়ে দু'কথা শুনিয়ে দিয়ে আসবেন।"

কবিরাজ কহিলেন—"ওর ব্যবস্থা আমি করব এখন। বিলের টাকা দেওয়া হবে না। আপনি একবার নীচে চলুন; একটি ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন।"

রজত বাবু বলিলেন—"মিনার্ভা ইন্সিওরেন্স থেকে একটি লোকের আসবার কথা আছে বটে; চলুন যাই।"

নীচে আসিতেই ভদ্রলোকটি নমস্কার করিয়া, চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"আমি আপনার বাড়ীর খুব কাছেই থাকি। বিজ্ঞাপনটা এখনি দেখে এলুম। আমার একটি নাতি, ...অতি চমৎকার ছেলে আই-এ পাশ কোরে..."

"দেখুন, ও বিজ্ঞাপনটা আমার নয়; ঐ কাণা মেয়ের বিজ্ঞাপন ত? কাগজওলাদের ভুলে, নাম-ঠিকানা ওলট-পালট হোয়ে গেছে। আপনি......"

"তাই না কি? ও বিজ্ঞাপন তাহোলে আপনার নয়?"

"না। আপনি ৩০ নং বনমালী ষ্ট্রীটে যান,—যিনি বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, তাঁর নাম—হরেকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।"

ভদ্রলোক নমস্কার করিয়া ঘরের বাহিরের বারান্দা হইতে নীচে না নামিতেই আর এক ভদ্রলোক আসিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইলেন। রজত বাবু ব্যস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কাকে চান? আপনি ঐ বিয়ের এডভারটিজমেণ্ট (advertisement) দেখে আসছেন ত? দেখুন কাগজে 'য়্যাড্রেস্' (address) ভুল কোরে ফেলেছে। আপনি ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে যান; থারটি, বনমালী ষ্ট্রীট। যান, চলে যান ওঁর সঙ্গে,—ঐ যে নেমে যাচ্ছেন—জিনের কোট গায়, মাথায় ছাতা।" তাড়াতাড়ি বৈঠকখানার দরজা বন্ধ করিয়া রজত বাবু অন্দরে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। দু'টি অতিথি বিদায় করিলেন, ত্র্যহস্পর্শের আশঙ্কা ছিল।

বেলা বোধ হয় তিনটা বা সাড়ে তিনটা। বেহারী আসিয়া খবর দিল, পাঁচ-ছয় জন বাবু এসেছেন! রজত বাবুর মাথা ঘুরিয়া উঠিল; একটু ব্যস্ত ভাবে কহিলেন—"কোবরেজ মশায় ফেরেন নি এখনো?"

"আজ্ঞে না।"

অগত্যা রজত বাবু নামিয়া বৈঠকখানায় আসিলেন। একসঙ্গে অনেকগুলি 'সবিনয় নমস্কার' আসিল। আগন্তুকের সংখ্যা অর্দ্ধ ডজন। একটি খর্ব্বাকৃতি মোটা-শোটা ভদ্রলোক মৃদু হাসিতে হাসিতে আসিয়া সামনের চেয়ারখানি অধিকার করিলেন, এবং সেইরূপ সহাস্য মুখে কহিলেন—"দেখুন, ভগবান যাকে ব্যাধি দিয়ে অঙ্গহানি করেন, তাকে আদর করে টেনে নেওয়াই মনুষ্যত্ব; তাই আপনার বিজ্ঞাপনটা পড়েই ··"

দ্বিতীয় ভদ্রলোকটি দূর হইতে কথার পিঠেই বলিলেন,—"দেখুন রজত বাবু, আমারও ওই কথা। অবশ্য ওঁনার সঙ্গে আপনার কথা হোয়ে যাক, তার পর আমি আমার ছেলেটির সম্বন্ধে আপনাকে সব নিবেদন করব। দেখবেন, এ-রকম ছেলে আজকাল আপনি—কি মহৎ আদর্শ! কি উদার——"

রজত বাবু ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া কহিলেন, "দেখুন, আপনারা সব কষ্ট স্বীকার করে এসেছেন বটে, কিন্তু ও মেয়ে আমার নয়। কাগজওলাদের ভুলে নাম-ঠিকানা ওলট-পালট হোয়ে গেছে। সুতরাং—"

"বলেন—কি! ঠিকানাবই ওলট-পালট!"

"আজ্ঞে হাঁ। ওই মেয়ের ঠিকানা ৩০নং বনমালী ষ্ট্রীট্। আপনারা দয়া করে সেখানে যান। বড্ড 'আনূনেসেসারি ট্রাবল্' (unnecessary trouble) পেতে হোল আপনাদের। 'সরি'! (sorry!)" বলিয়া রজত বাবু চেয়ার-ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন! পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া আগন্তুকরাও সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এক জন জিজ্ঞাসা করিলেন, "বনমালী ষ্ট্রীটটা কোথায় বলতে পারেন দয়া করে?"

"শ্যামবাজার কি বেহালার ওই দিকে হবে বোধ হয়; আমি ঠিক জানি নে।"

সকলেই মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া বাহিরে আসিলেন। বিদায়ী নমস্কারের পালাটি উৎসাহ-বিহনে বন্ধ রহিয়া গেল।

পরের দিন।

প্রাতঃকাল।

পূর্ব্বদিনের সেই দ্বিতলের বারান্দা; সেই আরাম-কেদারা; সেই 'টিপয়;' এবং তদুপরি সেই চায়ের কাপ। প্রভেদের মধ্যে গরম চা আজ আর শুধু-শুধু ঠাণ্ডা হইয়া যায় নাই; আজ রজত বাবু নিঃশেষে তাহা পান করিয়া সিগারেটের ধূমপান করিতেছিলেন। সম্মুখে রেলিংয়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া কবিরাজ মহাশয়।

রজত বাবু কহিলেন, "দেখুন, আমি বেরিয়ে যাচ্ছি। আজকেও ঐ 'নন্‌সেন্স্' (nonsence) বিজ্ঞাপনটার জন্যে কেউ কেউ হয় ত এসে জ্বালাতন করতে পারে। থাকুন আপনি বাড়ীতে। পারেন ত, 'আপনার সপ্তক্তিক্তকষায়' সকলকে একটু একটু খাইয়ে পরিপুষ্ট করবেন। আচ্ছা 'বদারেশন্' (botheration) যা' হোক!"

মিনিট পনের পরে রজত বাবু সদর দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিতেই দেখিলেন, দুইটি ভদ্রলোক দরজার ধারে দাঁড়াইয়া কি ভাবিতেছেন! তাঁহাকে দেখিয়া এক জন কহিলেন—"রজত রায়ের বাড়ী কি এটা? তিনি বাড়ী—"

"নেই; এই এঁনার সঙ্গে কথা বলুন"—বলিয়া, পিছনের কবিরাজ মশায়কে দেখাইয়া দিয়াই দ্রুতপদে রজত বাবুর অন্তর্দ্ধান!

বেলা প্রায় সাড়ে বারোটার সময় বাড়ী ফিরিলে, চিত্রা কহিল, "আচ্ছা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলে যা' হোক! কত লোকই যে এসেছিল! আবার তারা সব বিকেলে আসবে বলে শাসিয়ে গেছে!"

চমকাইয়া উঠিয়া রজত বাবু কহিলেন—"বিকেলে আবার আসবে বলে গেছে? কবিরাজ মশায়, কবিরাজ মশায়!—কি ব্যাপার বলুন ত! অনেক লোক না কি এসেছিল?"

"আজ্ঞে, তা হবে বৈ কি; বিশ-পঁচিশ জন ত হবেই।"

"আবার না কি সব আসবে বলে গেছে? কি সর্ব্বনাশ!"

"না না; আমি সব বুঝিয়ে বোলে দিছি; আর তারা আসবে কেন?"

তারা যদিও আর আসিল না বটে, কিন্তু বিকালের দিকে আফিস আদালত বন্ধ হইবার পর—অর্থাৎ সন্ধ্যার আগে, দলে দলে লোক আসিয়া রজত বাবুর বাড়ীর সম্মুখে ভীড় জমাইয়া ফেলিল। আষাঢ় মাসও নয়, রথতলাও নয়, তথাপি যেন রথের ভীড় জমিয়া গেল! রজত বাবু প্রমাদ গণিলেন! তাড়াতাড়ি কবিরাজকে ডাকিয়া বলিলেন, "শীগ্‌গির থানায় যান; পুলিসের 'হেল্প' (help) না নিলে এ সঙ্কটে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে না।"

কবিরাজ মশায় অগত্যা থানায় ছুটিলেন। থানার ইন-চার্জ্জ (Incharge) কহিলেন—"দেখুন, এর আমরা কি করতে পারি! চুরি নয়, ডাকাতি নয়, খুন-খারাপিও নয়···বুঝছেন না? ঠিকানার ভুলে একটা—যাকে বলে 'কমেডি অফ এরারস', সুতরাং এ অবস্থায়···"

সুতরাং কবিরাজ মশায় ফিরিয়া আসিলেন, এবং অতি কষ্টে ভীড় ঠেলিয়া বাড়ী ঢুকিলেন।

তার পর কবিরাজ মশায় এবং রজত বাবু উভয়ে মিলিয়া বহু কষ্টে বহু চেষ্টায় এবং বহু পরিশ্রমে সমাগত ভদ্রলোকগণকে প্রকৃত ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিলেন, এবং কাণা মেয়ের কন্যাকর্ত্তার নাম-ধাম দিয়া হাঁপ ছাড়িয়া ভিতরে আসিলেন।

উদ্বেগ ও পরিশ্রমে রজত বাবু ঘামিয়া গিয়াছিলেন; হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিলেন—"কালই এ বাড়ী ত্যাগ করতে হবে; নইলে ক্রমেই ভয়ানক ব্যাপার দাঁড়াচ্ছে! শেষে হয় ত হার্টফেল হোয়ে মরতে হবে! Horrible! দিনকতকের জন্য এ-বাড়ী না ছাড়লে আর উপায় নেই। ছাড়তেই হবে।"

তখনই রজত বাবু ছড়িগাছটা হাতে করিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন এবং ঘণ্টা দুই পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন—"ও-পাড়ায় পাকড়াশীদের বাড়ীখানা ঠিক করে এলুম। কাল ভোরেই বাড়ীতে তালা বন্ধ করে ওইখানে গিয়ে দিনকতক আশ্রয় নিতে হবে।"

চিত্রা কহিল—"বাড়ী ছেড়ে যাবে? কি যে বলো!"

"তা ছাড়া আর অন্য রেমিডি (remedy) নেই। এ 'বদারেশন্' (botheration) থেকে উদ্ধার পেতে হোলে, দিনকতকের জন্যে এ-বাড়ী ছাড়তেই হবে। উঃ! কাগজওলাদের নামে আমি নালিশ করব,—ঠিকই নালিশ করব!"

"বাড়ী ফেলে পালাতে হবে?"

"Surely। জিনিষ-পত্তর যা আছে সব এমনই থাকবে। রান্নার সরঞ্জাম আর কাপড়-চোপড় নিয়ে শুধু আমরা চলে যাব। কবিরাজ আর রূপনারাণ বাড়ী চৌকি দেবে।"

"কদ্দিন থাকবে?"

"একটা মাস ত বটেই।"

"এই এক মাসের ভাড়া টানতে হবে ত?"

"এক মাসের হোলে ত বাঁচতুম। পাকড়াশীটা ঝোপ বুঝে কোপ মারলে। বলে, তিন মাসের ভাড়া advance না করলে দেবো না।' Can't help! কি করা যায়? তাই দিয়ে এলুম; অর্থাৎ তিন বাট—যার মানে একশো আশীটি টাকা।"

পরদিন প্রত্যুষেই রজত বাবু সপরিবারে পাকড়াশীর বাড়ীতে উঠিয়া গেলেন।

কথায় আছে—'বরাত মন্দ হ'লে, ভাজা মাছটাও পাত থেকে পালিয়ে যায়!'—রজত বাবুর তাহাই হইল। তিনি মনে করিয়াছিলেন, দিন কতক ও-বাড়ীটায় থাকিয়া, কাণা মেয়ের ধাক্কা সামলাইয়া লইয়া এ-বাড়ীতে আসিবেন, এবং ও-বাড়ীটা 'সাব্-লেট্' করিয়া তাহার টাকাটা তুলিয়া লইবেন; কিন্তু বিধি বাম! দিন চার-পাঁচ মধ্যেই সারা দেশে হঠাৎ একটা আতঙ্কের বাতাস বহিল। জাপানীরা সিঙ্গাপুর অধিকার করিয়া রেঙ্গুণে বোমা ফেলিতেই কলিকাতায় ভীষণ আতঙ্কের সঙ্গে বিষম হৈ-চৈ পড়িয়া গেল! লোক যে যেখানে পারিল পলাইতে লাগিল। হপ্তাখানেকের মধ্যে কলিকাতা প্রায় অর্দ্ধেক খালি হইয়া গেল। চিত্রা বলিল—"শীগ্‌গির ভাল জায়গার সন্ধান কর, আমি কিছুতেই আর কোলকাতায় থাকবো না।"

দু'-এক দিনের মধ্যেই ও-পাড়াটাও খালি হইয়া গেল। তখন চিত্রার অনবরত তাগাদায় অগত্যা রজত বাবু, তাঁহার এক বন্ধুর পরামর্শ মত, বারুইপুরের কাছে সোনামুড়ি গ্রামে, তাঁরই বাড়ীর একাংশে গিয়া উঠিলেন। কলিকাতার বাড়ীতে চৌকি দিবার জন্য রহিল শুধু—রূপনারাণ দরোয়ান।

পল্লীগ্রাম। চারি দিকেই মুক্ত প্রকৃতির মনোমুগ্ধকর শোভার বিকাশ। প্রথম দুই-এক মাস রজত বাবুর মনের প্রফুল্লতায় দিন কাটিতে লাগিল। তার পর ক্রমেই একঘেয়ে ভাব বোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কলিকাতায় ফিরিবারও উপায় নাই। কাগজে কাগজে ঘোষণা পাঠ করিলেন, যাহাদের থাকিবার আবশ্যক নাই, তাহারা যেন কলিকাতায় না থাকে। সুতরাং অনিচ্ছা সত্ত্বেও রজত বাবুকে সোনামুড়ি থাকিতে হইল। চিত্রাকে কহিলেন, "Village life মন্দ নয়, কিন্তু বেশী দিন থাকা 'টিডিয়াস্' (tedious)। আচ্ছা, তোমার 'মনোটোনস্' (monotonous) লাগছে না?"

চিত্রা ক'হল—"কি ছাই তুমি বল, ভাল করে বুঝতে পারি নে। জান যে, আমি মোটেই ইংরিজি-টিংরিজি জানি নে, তবু বাংলা বলতে বলতে তার সঙ্গে লম্বা লম্বা ইংরিজি-বুকনি ঝাড়বে! বাংলা মায়ের ছেলে ত? বাংলায় মনের ভাব প্রকাশ করতে পার না?"

"মাঝে মাঝে তুমি বল বটে, কিন্তু আমার ঐ কথাটা মনেই থাকে না। কথার সঙ্গে ইংরিজি বলাটা আমার নেচার (nature) হয়ে গেছে।"

"আবার—'নেচার'!—তাহোলে আমি নাচার! তাহোলে দেখছি, আমাকেই এই বয়সে এ, বি, সি, ডি সুরু করতে হয়। তাই না হয় করব। থাক, তুমি কেরোসিন আর চিনির যোগাড় কর, নইলে মহা মুস্কিল হবে।"

"চিনিটা কিছু কিছু পাওয়া গেলেও যেতে পারে; কিন্তু কেরোসিন সম্বন্ধে আমার 'ডাউট' (doubt)। আচ্ছা, মাসে কতটা 'কোয়ানটিটি' (quantity) আমাদের..."

সহসা চিত্রা উঠিয়া ওদিক্‌কার ঘরের দিকে চলিয়া গেল। রজত বাবু বাহিরের দিকে চাহিয়া নীরবে ব'সিয়া রহিলেন। সামনের নারিকেল গাছের গুঁড়িতে একটা কাঠ্-ঠোকরা, চঞ্চু দ্বারা অনবরত আঘাত করিয়া ঠক্-ঠক্ শব্দ করিতেছিল। পাশের পোড়ো-বাড়ীটার ভাঙ্গা পাঁচিলটার উপর দু'টো কাঠবিড়ালী ছুটাছুটি করিতে লাগিল। দূরের কোন বৃক্ষশাখা বা ঝোপ-ঝাড় হইতে একটা ঘুঘুর ডাক মাঝে মাঝে বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল। ভটচায্যিদের পেয়ারা গাছে দু'টো ছেলে উঠিয়াছে, আর নীচে একদল ছেলে উর্দ্ধদৃষ্টিতে গাছের পানে চাহিয়া থাকিয়া কলরব জুড়িয়া দিয়াছে। সকলে মিলিয়া কাঁচা পেয়ারাগুলা ছিঁড়িয়া নষ্ট করিতে লাগিল।

রজত বাবু উঠিয়া এক-পা এক-পা করিয়া ওদিক্‌কার ঘরে গেলেন। গিয়া দেখিলেন, চিত্রা মেজেয় পাতা মাদুরখানার উপর উপুড় হইয়া শুইয়া Ba—বে, Be—বি, Bi—বাই, Bo—বো পড়িতেছে। রজত বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ কি ব্যাপার?"

"ইংরিজীটা আমার শিখতেই হবে; নইলে তোমার সব কথা বুঝে ওঠা আমার পক্ষে ··

হো-হো করিয়া হাসিয়া-উঠিয়া রজত বাবু কহিলেন—"ওঃ! বুঝিছি। আচ্ছা আর ইংরিজী কথা..."

বেহারী আসিয়া বাহির হইতে কহিল—"ঘটক মশায় এসেছেন!"

ঘটক মশায়—অর্থাৎ গোবিন্দ মুকুজ্যে। এই গ্রামের দক্ষিণপাড়ায় বাড়ী। পেশা যজমানী। যজমানীর ফাঁকে পৈতৃক পেশা ঘটকালীও করিয়া থাকেন। ছায়ার জন্য একটি পাত্রের কথা রজত বাবু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন; যেহেতু আর বিজ্ঞাপন দিতে তিনি ভীত, সন্ত্রস্ত এবং আতঙ্কিত। মুকুজ্যে মশায় কয়েকটি পাত্রের সন্ধান ইতিপূর্ব্বে আনিয়াছিলেন, কিন্তু কোনটিই রজত বাবুর পছন্দসই হয় নাই।

আজ মুকুজ্যে মশায় একটি নূতন সম্বন্ধ আনিয়াছেন; কহিলেন—"এ ছেলেটি হোল 'ফুলপোতা'র রামলাল বোসের নাতি!"

রজত বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"রামলাল বোসটি হলেন কে?"

"মস্ত গেরস্থ। জমি-জমা, বাগান, পুকুর,—সুখের সংসার! সাত শ' বিঘে 'জমার জমি'!—বুঝে দেখুন একবার, কত বড় গেরস্ত! দেশজোড়া নাম এঁদের মশায়!"

"ছেলেটির পড়াশুনা?"

"ওদের পড়াশুনোর দরকার কিঁ? চাকরী-বাকরী ত আর করতে হবে না। তা, শ্যামলাল, আপনার গিয়ে ম্যাট্রিক পাশ করেছে। বিষয়-আশয়, চাষ-বাস সব নিজে দেখাশুনা করে। এমন বুদ্ধিমান, চৌখস্ ছেলে এ তল্লাটে নেই।"

রজত বাবু কহিলেন—"চলবে না, মুকুজ্যে মশায়, ও চলবে না। এ ধরণের ছেলে কিছুতেই চলবে না!" বলিয়া অনবরত ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় নাড়িতে লাগিলেন।—"তাতে আবার ম্যাট্রিক পাশ!

বি-এ.—এম-এ. হলেও না হয়···। যেনো·গেরস্ত-ঘর আর কি! নামের বাহারেই বোঝা গেছে! রামলালের নাতি শ্যামলাল! বাবার নাম বোধ হয় মদনলাল?" বলিয়া রজত বাবু হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

মুকুজ্যে মশায় আর উচ্চ-বাচ্য করিলেন না; নীরবে বসিয়া রহিলেন এবং কিছু পরে ধীরে ধীরে উঠিয়া সরিয়া পড়িলেন।

সন্ধ্যার পর চিত্রা কহিল—"কোথায় যে তোমার পছন্দ হবে জানি না।"

"তা বোলে 'রামলালে'র নাতি 'শ্যামলাল'কে কিছুতেই পছন্দ করতে পারা যায় না। সেকেলে প্যাটার্ণ আর কি! কি ভাগ্যিস, ছিষ্টিধরের নাতি হলধর নয়।"

"দেখ, নাম নিয়ে তুমি এ-রকম কর কেন বল ত? উঃ! আমার নাম নিয়েই কি কাণ্ডটাই না করেছিলে? বাপ-মায়ের দেওয়া চির-কালের নাম ছিল 'মহামায়া'। তাকে কি না করলে 'চিত্রা'! কিন্তু আমি যা ছিলুম, তাই আছি। গোলাপের 'গোলাপ' নাম না হোয়ে যদি 'ভেরেণ্ডা' নাম হ'ত, তাহোলে কি তার আদর কম্‌ত? আর তা ছাড়া, জমা-জমি আছে, পুকুর-বাগান আছে, নাম-করা গেরস্ত—এ ত ভাল পাত্র।"

"তুমি ত সবই বোঝ; চুপ কর।"

সুতরাং চিত্রা এ সম্বন্ধে আর কোন কথা বলিল না; চুপ করিয়াই রহিল।

ফুলপোতা সোনামুড়ি হইতে দুই-তিন ক্রোশ দক্ষিণে; জয়নগরের সন্নিকটে। ফুলপোতার বসুবংশ এ অঞ্চলে বিশেষ বিখ্যাত। তালুক-মুলুক না থাকিলেও, জমি-জমা, বাগান, পুকুর, জলকর ইহাদের যা আছে, তাহাতে হিসাবমত চলিলে, চিরকাল সুখে-স্বচ্ছন্দে সংসার নির্ব্বাহ হইবার পক্ষে যথেষ্ট। বাড়ীতে বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ ছাড়া অতিথ-সেবা ও গৃহদেবতার নিত্যপূজা ত আছেই। বর্ত্তমানে শ্যামলাল ও মিহিরলাল এ বংশের বংশধর! শ্যামলাল বড়, মিহিরলাল ছোট। শ্যামলালের বয়স এখন ২৬, মিহিরের ১৭। মিহির কলিকাতায় মাতুলের বাড়ীতে থাকিয়া পড়ে; এইবার ম্যাট্রিক দিয়াছে। শ্যামলাল বৎসরের বেশীর ভাগ সময়ই জননীকে লইয়া দেশে থাকে; মধ্যে মধ্যে মামার বাড়ী গিয়া মিহিরকে দেখিয়া-শুনিয়া আসে। মামা সত্য বাবু আলিপুর জজকোর্টের এক জন পশারওলা উকিল। কিন্তু বয়স তাঁহার ৩২ অর্থাৎ শ্যামলালের অপেক্ষা কয়েক বৎসরের বড় মাত্র। শ্যামলাল সত্য বাবুকে পিতার মত ভক্তি করে, অথচ তাঁহার সহিত লঘু হাস্য-পরিহাস করিতেও অভ্যস্ত। কিন্তু সে রহস্য-পরিহাসের মধ্যে কোন অভদ্রতা বা আবিলতা থাকে না। সত্য বাবুও খুব পরিহাসরসিক। ভাগনার সহিত এক দিকে তিনি পুত্রের মত, অপর দিকে বয়স্যের মত ব্যবহার করেন।

মুকুজ্যে মশাই রজত বাবুর কাছে শ্যামলালের পরিচয় দিতে গিয়া যে বলিয়াছিলেন, 'অমন বুদ্ধিমান ও চৌখস ছেলে এ-তল্লাটে নেই'—কথাটা খুবই সত্য। শ্যামলাল ম্যাট্রিক পাশ। পিতা জীবিত থাকিলে এবং সংসার-তদারকের ভার তাহার উপর না পড়িলে হয় ত সে গ্রাজুয়েট হইতে পারিত। কিন্তু তাহা না হইলেও গ্রাজুয়েটের মতই তাহার জ্ঞান ও বুদ্ধি। বাড়ীতে সে অনেক পড়িয়াছে, সংসার-বুদ্ধি তাহার যথেষ্ট। অথচ সে অত্যন্ত চালাক-চতুর। এক হিসাবে লোকে যাকে 'ডানপিটে' বলে, শ্যামলালকে সে আখ্যাও দেওয়া যাইতে পারে।

কিছু দিন হইতে শ্যামলালের জননী তাহার জন্য একটি সুন্দরী পাত্রীর সন্ধান করিতেছিলেন। ছায়া বাস্তবিকই সুন্দরী মেয়ে। কিন্তু মুকুজ্যে মশায় আসিয়া যখন রজত বাবুর অপছন্দের কথা জানাইলেন, তখন তিনি এ মেয়ের আশা ত্যাগ করিলেন।

মুকুজ্যে মশায় শুধু যে রজত বাবুর অপছন্দের কথাই জানাইলেন তাহা নয়, এই অপছন্দ-সূত্রে তিনি পাত্র সম্বন্ধে যে বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাহাও হুবহু জানাইলেন। শ্যামলাল শুনিয়া বলিল—"লোকটি বোঝা যাচ্ছে একটু সাহেবী ষ্টাইলের!—আচ্ছা!"

জননী জিজ্ঞাসা করিলেন - "আচ্ছা মানে?"

"মানে, মেয়েটি যদি সুন্দরী হয়, এখানেই ঠিক্‌ঠাক্ করলেই হ'বে।"

"তারা করলে অপছন্দ; তুই ঠিকঠাক্ করবি কি করে?"

—কিন্তু কথাগুলো শ্যামলালের কাণে প্রবেশ করিল না, তৎপূর্ব্বেই সে স্থানত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

ইহারই দিন চার-পাঁচ পরে এক দিন রজত বাবুর সোনামুড়ির বাসার সম্মুখবর্ত্তী পল্লীপথ দিয়া এক জন 'লেস-ফিতা'ওয়ালা হাঁকিয়া যাইতেছিল—"লেস্ লেবে, জরি লেবে, ফিতা লেবে-এ-এ-এ।"

বাড়ীর ভিতরকার একখানি ঘরের মধ্যে মেজেয়-পাতা সতরঞ্চের উপর শুইয়া চিত্রা কি একখানা বাংলা মাসিকপত্রের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে গল্প পড়িতেছিল আর পথের দিকের জানালার ধারে বসিয়া ছায়া একটা ব্লাউজ সেলাই করিতেছিল। ফেরিওয়ালা জানালার ধার দিয়া হাঁকিয়া গেল—"ভাল ভাল লেস্-ফিতা—সেফটি-পি-ই-ই-ইন্।"

চিত্রা জানালার ধারে আসিয়া লেস্-ওয়ালাকে ডাকিল। লেস্-ওয়ালা জানালার নীচে আসিয়া দাঁড়াইল, কহিল—"কি চাই মা ঠাক্‌রোণ?"

"তোমার কাছে খুব ছোট সেফটি-পিন আছে?"

"একেবারে সব ছোট পাবেন না মা! একটা পাতায় ছোট, বড়, মাঝারি মিলিয়ে এক ডজন পাবেন।"

ছায়া কহিল—"কই, দেখাও ত।"

ফেরিওয়ালা তাহার বোঁচকা খুলিল, এবং একপাতা পিন বাহির করিয়া ছায়ার হাতে দিল।

চিত্রা দামের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, ফেরিওয়ালা কহিল—"ছ'পয়সা।"

ছায়া চমকাইয়া উঠিয়া কহিল—"ছ'প-য়-সা।"

"যুদ্ধের বাজারে, দিদিমণি, জানেন ত, এ-সব জিনিষ আর আসে না। আমার আগেকার কেনা ছিল, তাই ছ'পয়সায় দিতে পারব। এ-দামে এখন আর কেউ দিতে পারবে না।"

চিত্রা কহিল—"আচ্ছা, শোন বাছা! পাঁচ পয়সায় দাও।"

"আচ্ছা, নিন মা! পাঁচ পয়সাই আমার কেনা। সারা দুপুর এই রোদে ঘুরে এক পয়সাও আজ আর বিক্রী করতে পারিনি!"

হাত বাড়াইয়া ছায়া সেফটি-পিনের পাতাখানা লইয়া, ফেরিওয়ালাকে পয়সা-পাঁচটা দিয়া দিল।

ফেরীওয়ালা পয়সা লইয়া বরাবর দক্ষিণপাড়া অভিমুখে চলিল, এবং

নতুন পুকুরের ধারে বড় কেয়া-ঝোপটার আড়ালে গিয়া বেশভূষা পরিবর্ত্তন করিয়া মুকুজ্যে মশায়ের বাড়ী প্রবেশ করিল। মুকুজ্যে মশায় কহিলেন—"কি হোল ?"

শ্যামলাল কহিল—"দেখলুম, সুন্দরী বটে।"

কয় মাস পূর্ব্বে যাহারা কলিকাতা ছাড়িয়া বাহিরে গিয়াছিলেন, কয় মাস পরে একে একে প্রায় সকলেই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। বাহিরে নানা অসুবিধা ভোগ করিয়াও কেবল প্রাণের দায়ে এত দিন সকলে ছিলেন, কিন্তু আর থাকিতে পারিলেন না; যেহেতু এই সময়টা বাংলার প্রায় প্রত্যেক পল্লীতেই আমাশয়, টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া প্রভৃতির মরশুম পড়িয়া যায়। সুতরাং রজত বাবুও সোনামুড়ি ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

চিত্রা কহিল—"এইবার উঠে পড়ে ছায়ার বিয়ের যোগাড় কর। ফের ভাল করে কাগজে বিজ্ঞাপন দাও।"

চোখ দু'টো কপালে তুলিয়া রজত বাবু কহিলেন—"বিজ্ঞাপন! বিজ্ঞাপনের দিকে আর যাচ্ছি না; কিছুতেই না।"

"একবার একটা ঠিকানার ভুল হোয়েছে বলে আবার—"

"না—না—না; বিজ্ঞাপন আমি আর কোন মতেই দোব না। আমি তিন-চার জন ভাল ঘটক লাগিয়ে দিচ্ছি।"

তাহাই হইল। রজত বাবু ভাল ঘটকের শরণাপন্ন হইলেন, এবং ভাল রকম বকশিসের আশা তাদের দিলেন। ঘটকেরা নানা স্থান হইতে নানা রকম পাত্রের সন্ধান আনিতে লাগিল।

এক দিন এক জন ঘটক একটি পাত্রের সন্ধান আনিয়া রজত বাবুকে কহিল—"আপনার কন্যার উপযুক্ত সংপাত্র। এ রকম ছেলে হাজারে একটা মেলে কি না সন্দেহ!"

পাত্র সম্বন্ধে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া রজত বাবু মনের মধ্যে সন্তোষলাভ করিলেন। ছেলেটি কনট্রাক্টরী ব্যবসা করে। বিলাতী ডিগ্রী। নিজের বাড়ী, গাড়ী। মাসিক আন্দাজ হাজার টাকা উপায়। কবিরাজ মশায়কে ডাকিয়া রজত বাবু বললেন,—"কাল সকালে চুপি চুপি গিয়ে একবার দেখে আসুন দিকি—বাড়ীখানা কি রকম? আর আশ-পাশ থেকে যদি একটু সুড়ক-সন্ধান নিতে পারেন, ত···

দক্ষিণ কলিকাতার 'সাউদার্ণ এভেনিউ'-এর সংলগ্ন নূতন পল্লীতে পাত্রের বাড়ী। পরদিন সকালের দিকে কবিরাজ মশায় ওই পল্লীতে গিয়া ঘুরিয়া আসিলেন; কহিলেন—"নতুন দোতলা বাড়ী, ঝক্-ঝক্ করছে। ফটকের দু'পাশে দু'খানা পাথরের 'ট্যাবলেট' লাগানো। একখানাতে বাড়ীর নাম লেখা রয়েছে—'ছায়া-বীথি,' অপরখানায় পাত্রের নাম ইংরিজীতে লেখা—'শ্যামল বাবু—A K. O S."

প্রসন্ন চিত্তে রজত বাবু চিত্রার কাছে আসিয়া কহিলেন,—"এই আমার ছায়ার সত্যিকারের বর। বাড়ীখানার নাম কি জান?"

"কি?"

"ছায়া-বীথি! বোঝ একবার! ছায়ার নামেই · আগে থেকেই কি সুন্দর দৈব যোগাযোগের ব্যবস্থা একবার দেখ!···ছেলেটির টাইটেল্ হচ্ছে—A. K. O. S.—কোন বিলিতী টাইটেল্ আর কি! ওঃ! এত দিন পরে···যাক্,—শুভ কাজ সম্পন্ন হলে ঘটককে ভাল করে বকসিস্ করতে হবে। আমার পছন্দসই ছেলে এইবার পেয়েছি।"

সত্যই সত্যই ছেলেটি যে খুবই ভাল, তার আর কোন সন্দেহ নাই। রজত বাবু যেমনটি চাহেন, ঠিক সেইরূপ। আদব কায়দা দোরস্ত, চটপটে; পাড়াগেঁয়ে ভূত নয়—খুব অপ-টু-ডেট। লেখাপড়া জানে। কাজে-কর্ম্মে, চাল-চলনে খুবই হুঁসিয়ার; অত্যন্ত সভ্য—অত্যন্ত ভদ্র। এই অল্প বয়সেই দু'হাতে উপায় করিতেছে। কাজকর্ম্মের তদারকের জন্য নিজের এক মাতুলকে কাছে রাখিতে হইয়াছে। তিনিও খুব শিক্ষিত। বিবাহের ব্যাপারে, ধরিতে গেলে, তিনিই পাত্রের অভিভাবক।

ঘটকের মধ্যস্থতায় উভয় পক্ষের মধ্যে বিবাহের কথাবার্ত্তা খুব দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিল। মামা মেয়ে দেখিতে আসিলেন। মেয়ে দেখিয়া তাঁহার এত পছন্দ হইল যে, তাহা আর বলিবার নয়! তিনি রজত বাবুকে ইংরেজীতে বলিলেন—"মিষ্টার রায়, আমি স্বপ্নে একটি মেয়ে দেখেছিলাম,—সেই মেয়ে এখন দেখছি—আপনারই এই কন্যা।"

রজত বাবুও পরের রবিবার পাত্র দেখিতে গেলেন। বৈঠকখানা ঘরে সাহেবী কায়দায় চেয়ার—টেবিল—সোফা—কোচ ইত্যাদি সাজানো। রজত বাবু একখানি সোফায় বসিতেই শ্রীমান্ শ্যামল তাঁহাকে প্রণাম করিল। শ্যামলের দু'-এক জন কর্ম্মচারী ঘরের বাহিরে তাহার অপেক্ষায় ছিল। শ্যামল ধীর ও বিনীত-ভাবে রজত বাবুকে কহিল,—"আপনি অনুমতি করলে, আমি দু'মিনিট সময় নিয়ে ওদের বিদেয় করে দি।" অতঃপর তাহাদের এক জনকে ডাকিয়া কহিল- "রোববার হলেও আজ যেন কাজ বন্ধ না যায়। 'ফিনুওয়ার্থ কোম্পানী'র বিল আজ তৈরী করাই চাই। ঘুসুটিছানী চা-বাগানের ঐ দু' হাজার "সকেট' (socket) আজ যেন প্যাক হোয়ে থাকে। যান্, আপনি আর দেরী করবেন না; চলে যান।—উপেন বাবু!"

বাহির হইতে উপেন বাবু ঘরের ভিতরে আসিলে, শ্যামল তাহাকে কহিল—"মহারাজার চেকখানা আজ ত আর জমা হবে না; কালকে ওটা জমা করে দেবেন। বারাকপুরে আপনি যেতে সময় পাবেন কি? আচ্ছা, থেয়ে-দেয়ে আমিই যাব এখন। 'সাফারে'র ত জ্বর, আমি না হয় ভাড়াটে ট্যাক্সি করেই যাব এখন।"

উপেন বাবু নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল।

শ্যামল উঠিয়া গিয়া 'ফোন্'টা ধরিল—"পার্ক টু ওয়ান ফাইভ ওয়ান, প্লিজ।···হ্যালো!···আমি শ্যামল।··· না না, মোটেই তা নয়।···সবই আমি জানি।··· সত্যই বলছি···মহারাজার কাজটার জন্য খুব ব্যস্ত আছি।···আচ্ছা আচ্ছা।···হাজার পনর টাকা না হয় আমিই দোব এখন।··· আচ্ছা নমস্কার।"

অতঃপর পাত্র দেখিয়া এবং পাত্রের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া প্রসন্ন মনে রজত বাবু গৃহে ফিরিলেন। চিত্রাকে কহিলেন—"পাকা দেখার বন্দোবস্ত কোরে এলুম। বেশী আর দেরী করা নয়। ২৮শে ভাল দিন আছে; ঐ দিনেই—কি বল?"

বেহারী আসিয়া খবর দিল—একটি ভদ্রলোক এসেছেন। রজত বাবু নীচে নামিয়া আসিয়া ভদ্রলোকটিকে নমস্কার করিয়া কহিলেন—"আপনি কোত্থেকে আসছেন?"

"আইজ্ঞা, বারী আমার ফরিদপুর। অনেক দিন্কার একডা পুরাতোন বিজ্ঞাপন দেইখ্যা আপনার লগে সাইক্ষাৎ করবার্ আসছি। আপনাগোর গোটা কাণা মাইয়ার···"

"ওঃ! এত দিন পরে! সে ত হ'ল গিয়ে…"

"হ্ঃ, অনেক দিনই অইয়া গেল। দোকান থাচি আরাই পোয়া লবণ আনছিলাম টোঙ্গার মইধ্যা। সেই টোঙ্গাটার গায়ে ছিল ঐ বিজ্ঞাপন। তাই পাঠ. করা জানতি পারি। তা, আপনগোর সে মাইয়ার যদ্দপি এখনো বিয়া না হইয়া থাহে, ত…"

রজত বাবু হাসিবেন কি কাঁদিবেন, কিছু ঠিক করিতে পারিলেন না; কহিলেন—"আপনি এখানে থাকেন কোথা?"

"থাহি আমি উল্টাডিঙ্গি; নবীন সোমদ্দাবের আরত জানেন ত? পোলাটিও আমার সাথে থাহে। কি আর কইবো? পোলা মোর এক্কেবাইরা যেন কার্ত্তিক; ম্যাট্রিক পাশ কইর্যা…"

মনে মনে হাসিয়া রজত বাবু কহিলেন—"তাহোলে ছেলে ত আপনার উপযুক্ত পাত্র। তা, আপনি এক কাজ করুন। ৩০ নং বনমালী ষ্ট্রীটে যান; সেইখানে ওঁরা থাকেন"—বলিয়া ব্যাপারটা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন, এবং তাঁহার সহিত আর বেশী বকা-বকি না করিয়া, একটা ছোট নমস্কার জানাইয়া ভিতরে চলিয়া আসিলেন।

সব ঠিক-ঠাক হইয়া গিয়াছে। উভয় পক্ষের দেনা-পাওনার কথা, পাকা-দেখা ইত্যাদি কিছুই আর বাকী নাই। আগামী ২৬শে তারিখে বিবাহ। উভয় বাড়ীতেই ধুমধাম লাগিয়া গিয়াছে। বরপক্ষ নগদ সম্বন্ধে কিছুই পীড়াপীড়ি করেন নাই; কন্যাপক্ষের অভিরুচির উপর নির্ভর করিয়াছেন। কন্যাপক্ষ স্বেচ্ছায় ও সন্তুষ্টচিত্তে দুই হাজার টাকা নগদ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

একটা আনন্দময় আবহাওয়ার মধ্য দিয়া পরের কয়টা দিন কাটিয়া গেল।

২৬শের প্রভাত।

মামা কহিলেন, "হ্যাঁ রে শ্যামা, নতুন বাড়ীখানা আমার ভেঙ্গে-চুরে ত তচ্-নচ্ করলি! তা ঐ দু' হাজার টাকা যা পাবি, আমায় দিবি; বুঝলি?"

"কি তচ্-নচ্টা করলুম, মামা?"

সত্য বাবু কহিলেন—"আমার নামের 'ট্যাবলেট' দু'খানা ফেললি খুলে; খুলতে গিয়ে ত একখানা গেল ভেঙ্গে। ও আবার নতুন করে করাতে হবে। তার পর আবার ট্যাবলেট দু'খানা লাগাতে হবে। তার পর ফটকের পাশে কেমন সব ফুলগাছগুলো ছিল, দিলি সব সাবাড় করে; দিয়ে, তুললি সেখানে এক 'গ্যারেজ'!"

"সে ত ভালই করেছি। মোটরখানা তোমার থাকতো অন্য জায়গায়, এখন বেশ…"

"না; অন্য জায়গাতেই আমার ভাল ছিল। তা যাক্, দু' হাজারের ভেতর হাজারখানেক আমায় দিয়ে দিস্; কি বলিস্?"

হাসিতে হাসিতে শ্যামলাল কহিল—"ভাগনের টাকা, যদি নিতে পার—নিও; আমার কোন আপত্তি নেই।"

"আপত্তি আমারও নেই। 'জন জামাই ভাগনা—তিন নয় আপনা'—সুতরাং পরের টাকা নেওয়াস কোন দোষ নেই। তার পর…"

এমন সময় ঝিহির আসিয়া সত্য বাবুকে কহিল—"মা তোমাকে ডাকছেন, মামা!"

সুতরাং সত্য বাবুর 'তার পর' আর শেষ হইতে পাইল না; উঠিয়া ভিতরে গেলেন। তাঁর 'তার পর'এর জের টানিয়া এ ঘটনারও বিশেষ আর কিছু বলিবার নাই। শুধু এইটুকুমাত্র বলা যায় যে—'তার পর'—শুভলগ্নে শুভক্ষণে, আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে শুভকাজ নির্ব্বাহ হইয়া গেল। বিবাহ হইয়া গেলে বরকন্যা বাসর-ঘরে আসিল। বাসর-ঘরে অনেকেই জমিয়াছিলেন; কিন্তু রাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন সকলে একে একে উঠিয়া গেল, তখন শ্যামলাল তাহার সিল্কের সার্টের পকেট হইতে একটা 'প্যাকেট' বাহির করিয়া ছায়ার কোলের উপর রাখিয়া কহিল—"ছোট সেফটিপিন্ চেয়েছিলে,—এই নাও; কিন্তু পাঁচ পয়সা ডজন এ জিনিষ দিতে পারা যাবে না। জান ত যুদ্ধের বাজার!"

ছায়া কিছু বুঝিতে না পারিয়া ঘোমটা-টা আরো খানিক টানিয়া দিয়া, আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল।

* * * * *

পাঁচ-সাত দিন পরে।

শ্বশুর জামাই মুখো-মুখি বসিয়া।

"হ্যাঁ বাবা, নামটা তোমার গোপন করেছিলে কেন?"

"আজ্ঞে, গোপন করিনি। এক জন জ্যোতিষী বলেছিলেন, দু'টো 'ল' পর-পর থাকা ভাল নয়। তাই মাঝের 'ল'টা তুলে দিয়েছিলুম।"

"ঠাকুরদাদার?"

"ঠাকুর্দ্দার রাশ নামটাই তখন মনে পড়লো, তাই বলেছিলাম—ভবানী বোস।"

"দেশের নাম যখন জিজ্ঞাসা করেছিলুম, 'ফুলপোতা' না বলে 'জয়নগর' বলেছিলে কেন?"

"ফুলপোতা ছোট গ্রাম। ফুলপোতা বললে ত কেউ বুঝবে না। আমাদের ও-অঞ্চলের সব গাঁয়েরই ডাক হল জয়নগর; তাই—"

"আর 'A. K. O. S.'টা?"

"ওটা হোল—'অল্ কাইণ্ডস্ অফ অর্ডার সাপ্লায়ার' (All Kinds of Order Supplier)"

প্রসন্ন হাস্যের সহিত রজত বাবু কহিলেন—"যাই হোক বাবাজি, জিত্ কিন্তু আমারই। ছায়া পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিবলে উপযুক্ত হাতেই পড়েছে। তুমি বাবা রত্ন ছেলে! ১০০ বিঘে ধান-জমির মালিক তুমি, তা'ছাড়া ২২টা মাছভরা পুকুর, বাগান-বাগিচে। অন্ন-লক্ষ্মী তোমার ঘরে বাঁধা। তা'ছাড়া কত বড় বংশের বংশধর তুমি, তা এইবার জানতে পেরেছি। গোড়াতে আমি বিষম ভুল বুঝেছিলুম। আমার পরম ভাগ্য যে তোমার মত সব-দিক্-দিয়ে ভাল ছেলের হাতে আমি মেয়ে দিতে পারলুম। আশীর্ব্বাদ করি বাবা, দু'জনে তোমরা চিরসুখী হও।"

হেঁট হইয়া শ্যামলাল রজত বাবুর পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়।

১
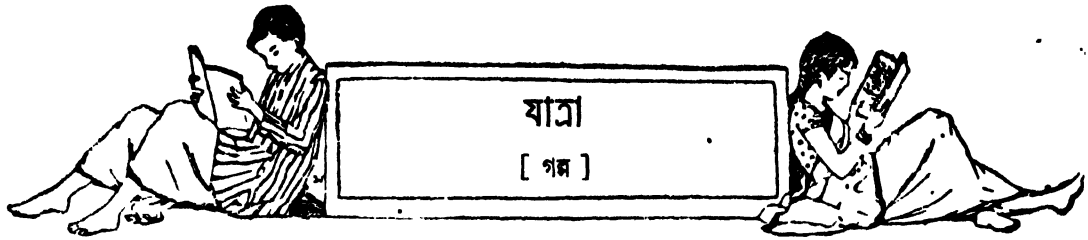
শশাঙ্ক বিবাহ করিবে, এ জন্য নিজেই মেয়ে দেখিতে আসিয়াছে ; দুই-এক কথার পর সে কনেকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি রবীন্দ্রনাথের রচনা সম্বন্ধে মৌলিক কোন কথা বল্‌তে পারেন ? মানে—গাদা গাদা মাসিকপত্রে যে সব মন্তব্য পড়ে পড়ে চোখ শ্রান্ত এবং মন অবসন্ন হ'য়ে পড়েছে, তা' ছাড়া আর কোনও-রকম কিছু ? তা' যদি বল্‌তে পারেন ত' বলুন।"

পাত্রের প্রশ্ন শুনিয়া কনে গভীর বিস্ময়ে তাহার কালো চোখ-দুটি তুলিয়া শশাঙ্কের মুখের দিকে চাহিতেই অন্তরাল হইতে পুর-নারীদের অলঙ্কারশিঞ্জনের সহিত মৃদু হাস্যধ্বনি তাহার কর্ণগোচর হইল। প্রশ্নের উত্তর না পাইলেও সেই কালো চোখের নিবিড় দৃষ্টি দেখিয়া শশাঙ্ক উন্মনা হইয়া উঠিল, এবং আর বিশেষ কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়াই কনে যে তাহার পছন্দ হইয়াছে, ভাবে, ভঙ্গীতে ও ইঙ্গিতে এই মনোভাব প্রকাশ করিল। অন্যান্য সকল বিষয়ই স্থির হইয়াছিল, বাকী ছিল কেবল পাত্রের পছন্দ : সুতরাং উভয় পক্ষই নিশ্চিন্ত হইয়া শুভকার্য্যের আয়োজন আরম্ভ করিলেন।

গভীর রাত্রিতে বাসর-ঘর হইতে অন্য সকলে চলিয়া যাইবার পর অসীমা কোমল কণ্ঠের মধুর স্বর কৌতুক-হাস্যে স্নিগ্ধ করিয়া কহিল, "রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে সেই প্রশ্ন মনে আছে ?"

শশাঙ্ক কহিল, "হাঁ, আজ তার উত্তর চাই, নইলে কিছুতেই ছাড়ব না।"

অসীমার মুখে গভীর শ্রদ্ধার ছায়া প্রতিফলিত হইল ; কিছু কাল নিঃশব্দে থাকিয়া সে কহিল, "এ প্রশ্নের উত্তরে কি আর বলবার আছে ? তাঁর সবই যে মধুর ছিল। সৌন্দর্য্য এবং মাধুর্য্যের প্রতীক ছিলেন তিনি। কিন্তু এ কথাও তো পুরোনো ! তাঁর সম্বন্ধে সারা দেশের লোক এতই ভেবেছে এত কথার আলোচনা করেছে যে, নতুন-কিছু বল্‌তে যাওয়া দুঃসাধ্য বলেই মনে হয়। কেবল এইটুকুই মনে হয় যে, তিনি রূপলোক এবং সুরলোকের অধিষ্ঠাতা দেবতার মতই জ্যোতির্ম্ময় ও সুন্দর। তাঁর জীবনের সবই সুন্দর, তাঁর সৃষ্টির সবই মনোহর। সৌন্দর্য্য তাঁর এতই স্বাভাবিক ও আন্তরিক যে, ইচ্ছে থাক বা না থাক, তাঁর সুন্দর না হয়ে, সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি না করে উপায় নেই। ধরুন, তাঁর চতুরঙ্গের ঐ ননীবালার গল্পটা—

বাসর-কক্ষের অন্তরাল হইতে চাপা হাসির তরল উচ্ছ্বাস এতক্ষণে সুস্পষ্টরূপে তরঙ্গায়িত হইতে লাগিল। অসীমা এতক্ষণ তন্ময় হইয়া, তাহার হৃদয়ের গভীর আবেগপূর্ণ ভাব অভিব্যক্ত করিয়া ভাষায় তাহার রূপ দিবার চেষ্টা করিতেছিল, এবং মনের একাগ্রতা বশতঃ স্থানকালের কথা প্রায় বিস্মৃত হইয়াছিল ! সহসা বাহিরে হাসির গররায় তাহার তন্ময়তা শূন্যে বিলীন হইল ; পারিপার্শ্বিক সকল অবস্থা মনে পড়ায় সে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া উঠিল। জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া একটি তরুণী কহিলেন, "আজ এই প্রথম দিনেই আপনাকে এতটা শস্তা করিস্‌ নে। সেকালে বৌকে বাসর-ঘরে প্রথম কথা বলাতে হ'লে মোহর দিতে হতো ; একালে অত বেশী দাম আদায় করা না হোক, তবু লজ্জার একটু ছিটে-ফোঁটা থাকা ভালো। এই আরম্ভেই মন খুলে অত বেশী গল্প করিস্‌ নে লো !"—অসীমা লজ্জায় মুখ রাঙা করিয়া আড়ষ্ট হইয়া রহিল। ঐ ভাবে আড়ষ্ট হইয়া থাকা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক নহে, এর অযথা লজ্জার ভারে মাথা নত করিয়া মাটির সহিত মিশিয়া যাওয়াও তাহার প্রকৃতিসিদ্ধ নহে ; কিন্তু দ্বারের অন্তরাল হইতে যিনি ঐ কথাগুলি শুনাইয়া দিলেন তাঁহার কথায় যে শ্লেষের তীব্রতা ছিল, তাহারই প্রভাবে তাহার বিকাশোন্মুখ মনটি কিছু কালের জন্য অভিভূত হইয়া গেল। শশাঙ্ক নিজেও অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া অবশিষ্ট রাতটুকু নিঃশব্দেই কাটাইয়া দিল। যে মধুর সুর অল্প একটু ঝঙ্কার তুলিয়াছিল—তাহা আরম্ভেই কাটিয়া গেল।

২

পরদিন সকালে নানাবিধ বাদ্য ও বিপুল সমারোহের সহিত বর নব-পরিণীতা পত্নীসহ গৃহে যাত্রা করিল। শশাঙ্কদের সাবেক আমলের চকমিলান, প্রাসাদতুল্য সুবিস্তীর্ণ ভবন হাতীবাগানে অবস্থিত। সেখানেও আজ সকাল হইতে সুস্বরে রোসনচৌকি বাজিতেছে। বনিয়াদী ঘরের ছেলের বিবাহ ; তার উপর রমানাথ বাবুর এই সর্ব্বশেষ কাজ। এ বাড়ীর ছেলেদের মধ্যে শশাঙ্কই সকলের ছোট। অধিকন্তু সে আধুনিক কালের শিক্ষিত, বিদ্রোহী তরুণ। প্রথমে সে বিবাহ করিতেই রাজী হয় নাই, ধনুর্ভঙ্গ পণ—বিবাহ করিবে না। অতি কষ্টে, অনেক দেবতার দুয়ারে মানতের ফলে শেষে তাহার এই সুমতি ! নানা কারণে হাতীবাগানের সেই সাবেকি বাড়ীতে আজ ধুমধামের সীমা নাই !

শ্বশুরবাড়ীতে আসিয়া অসীমার পদে পদে বিপদ ঘটিতে লাগিল। অবগুণ্ঠন কেন এত অল্প, বাঁ-দিকে কেন বাঁকা-সীঁথি, কেন নতুন বৌ মুখ বুজিয়া বোবার মত বসিয়া থাকে না, কেনই বা সকলের সঙ্গে কথা কহে, সব কথারই তুরুক জবাব দেয় ?—তাহার বিরুদ্ধে এই সকল অভিযোগ লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিল। শশাঙ্ক আদৌ এ সকল খবর রাখে না। এ বাড়ীতে তার নিজস্ব একটি বৈঠকখানা-ঘর আছে। তাহার আগাগোড়াই শশাঙ্কের রুচি অনুযায়ী সজ্জিত। সে ঘরের কাচের আলমারি রুশ দেশের নব-প্রচেষ্টার যত কিছু তথ্য, কাহিনী, এবং ইতিহাস সম্বলিত পুস্তক-রাশিতে পূর্ণ। সে ঘরের দেওয়ালগুলি ফরাসী-বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী, ও স্বাধীনতার উদ্দীপনাপূর্ণ ছবি দ্বারা সুসজ্জিত। মেঝেটি দেশী ধরণের জাজিম, সতরঞ্চ, ধোয়া চাদর, এবং ছোট ছোট তাকিয়া দ্বারা সমাচ্ছন্ন। বন্ধুরা আসিয়া সাবেকি দস্তুরে তাকিয়া ঠেস-দিয়া সেই ফরাসে বিরাজ করিতে লাগিল। সম্মুখে পিতলের

ধূপদানিতে মহীশূরের চন্দন-গন্ধি ধূপশলাকা মৃদু সুগন্ধ বিতরণ করিতেছে। এদেশী শিল্পী নির্ম্মিত, কারুখচিত পিতলের সৌখীন ফুলদানি—রজনীগন্ধা, গোলাপ, বেল, জুঁই, গন্ধরাজের বিকশিত স্তবকে পূর্ণ; তাহাদের মিশ্র গন্ধে সেই কক্ষের বায়ুস্তর সুরভিত। ফাল্গুন-সন্ধ্যার মদির-বিহ্বল সমীর-প্রবাহের সহিত শানাইয়ের মধুর রাগিণী মিশিয়া বসন্তের আবাহন সঙ্গীতে চতুর্দ্দিক্ মুখর করিয়া তুলিয়াছে। শশাঙ্কের মন শানাইয়ের সুরের সঙ্গে কোন্ স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতেছিল; বন্ধুদের আগমনের সঙ্গে তাহার মুখে আনন্দের মধুর হাস্য ফুটিয়া উঠিল। জয়পুরের কারুখচিত পুরোবর্ত্তী ট্রের উপর সংরক্ষিত ফুলের মালার এক-একগাছি সে বন্ধুদের গলায় পরাইয়া দিতে দিতে কহিল, "বসৃতে আজ্ঞা হোক। স্বাগতম্!"

অসিত একটা তাকিয়ায় ঠেস দিয়া কহিল, "তোর সঙ্গে বোঝা-পড়া করব বলেই তো এত সকাল-সকাল এসে পড়লুম। তা এসে দেখছি, ঠকিনি। বাসর সাজিয়ে আমাদের অপেক্ষায় ব'সে আছিস্। আর তা না করেই বা উপায় কি? যা তোদের সাবেক মান্ধাতা আমলের নিয়ম-কানুন! জানি তো, রাত্রি দু'টোর আগে যে নববধূর সঙ্গে চোখোচোখি হবে সে আশা নেই। একটা কিছু উপায় কর না!"

শশাঙ্কের মুখখানি এ কথায় একটু ম্লান হইল; সে কহিল, "কি করবো ভাই, উপায় নেই! আর সবারই উপর জোর খা টাতে পারি, কিন্তু মা বর্ত্তমানে, তাঁর অমতে এ বাড়ীতে কোন কিছুই হবার যো নেই! আর মায়ের কথার উপব কথা বলি সে শক্তিও আমার নেই। ঐ একটি দুর্ব্বলতার হাত থেকে আমার পরিত্রাণ নেই ভাই!"

অবিনাশ বিদ্রূপভরে কহিল, "তাই বুঝি মায়ের খোকা প্রথমটায় বড়-বড় বুলি আওড়ালেও শেষ পর্য্যন্ত সুবোধ গোপালের মত বিয়ে করে ঘর ঢুকলো?"

শশাঙ্ক এ কথায় নিমেষে উদ্দীপ্ত হইয়া কহিল, "কক্ষণো না, আমার আইডিয়াল এবং কল্পনার সঙ্গে না মিললে কখনো বিয়ে করতুম না। তোদের এখনো তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়নি বলেই এমন কথা বলতে পারছিস। একবার দেখলে সমস্তই বুঝতে পারতিস।"

প্রণয়বিমুগ্ধ বন্ধুর এই আত্মবিস্মৃত উক্তিতে যথেষ্ট আমোদ পাইয়া বন্ধুরা একবাক্যে বলিল, "বেশ তো, সেই উপায়ই আবিষ্কার কর না ভাই! আমরা নববধূর সঙ্গে আলাপ করতে চাই যে! আজ তোর কোন আপত্তিই শুনছি নে।"

"—আচ্ছা দেখি"—বলিয়া শশাঙ্ক তাহার মায়ের নিকট দরবার করিবার জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

নিমন্ত্রিতা আত্মীয়া কুটুম্বিনী-পরিবৃতা গৃহকর্ত্রী জয়ন্তী দেবী ভিতরের ঘরে বসিয়া ছিলেন। একটি মেয়ে তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্টা নববধূ অসীমার দীর্ঘ চুলগুলি চিরুণী দিয়া আঁচড়াইয়া খোঁপা বাঁধিতেছিল। সমাগতা মহিলারা নতুন বৌয়ের চুল দেখিয়া ভালো-মন্দ নানা প্রকার সমালোচনা করিতেছিলেন। জয়ন্তী কেশপাশ-রচনানিরতা মেয়েটিকে সম্বোধন করিয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "শুভো, সীঁথেটা বদলে সোজা করে দে।"

শুভা আবদারের স্বরে কহিল, "বাহা রে! তা কি করে হবে মা? বৌদির বাঁ-দিকে সীঁথে করা অভ্যেস; আজ হঠাৎ বদলে দিলে ভালো দেখাবে কেন? কত লোকজন আসবে দেখতে। আজ থাক না; পরে বরঞ্চ আস্তে আস্তে সোজা সীঁথি করে দেব।"

মা একটু দৃঢ়তার সঙ্গেই বলিলেন, "তা হোক, আমাদের এখানে ও-সব চাল চলবে না।"

শুভা কহিল, "তা কেন? আজকাল আর ও-সব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। এই তো ও-মাসে আমার দেওরের বিয়ে হোল, নতুন বৌ এমনই আমাদের বৌদির মত বাঁকা সীঁথে কাটে, কই আমার শাশুড়ী তো কিছুই বলেননি।"

কথোপকথনের এই অংশে শশাঙ্ক "মা, মা" সম্বোধনে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "মা, আমার বন্ধুরা কিছুতেই ছাড়ছে না; তারা বলে, আজকের দিনে নতুন বৌকে তো সবাই দেখে। তাছাড়া বই-টই অনেক কিছু উপহারই মুখ দেখে দেবে বলে তারা আগ্রহ করে এনেছে। কি করে তাদের ফিরাই বলো?"

শুভা কহিল, "দেখবে বই কি; আজ তো সবাই বৌ দেখতে চাইবে। আচ্ছা, আমি বৌদির চুলটা বেঁধে দিয়ে, কাপড় ছাড়িয়ে তৈরী করিয়ে দি ততক্ষণ।"

জয়ন্তী বাধা দিয়া বলিলেন, "এ বাড়ীর বৌ হয়ে যে হট্-হট্ করে বৈঠকখানায় চলে যাবে, সেটি হচ্ছে না।"

শশাঙ্ক চলিয়া যাইতে যাইতে বলিল, "না না, আমাব বন্ধুদেরই ভিতরে নিয়ে আসব একটু পরে।"

জয়ন্তী গম্ভীর অপ্রসন্ন মুখে চুপ করিয়া রহিলেন। বর্ষীয়সী মহিলাদের মধ্যে একটু চোখ-টেপাটেপি ও মুখ-বাঁকানো ভাবের আদান-প্রদান হইল। শশাঙ্ক ঘরে ঢুকিবামাত্র নতুন বৌয়ের মাথায় এক হাত ঘোমটা টানিয়া দিয়া জড়-পুত্তলির মত বসা খুবই উচিত ছিল, কিন্তু তাহা সে করে নাই। তাহার মাথার কাপড় খোলা ছিল, এবং দীর্ঘ কেশরাশি শুভার হাতে পূর্ব্ববৎ ধরাই ছিল। অযথা সন্ত্রস্ত—চকিত হইয়া মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া সে চুল-বাঁধার কার্য্যে কোন বিপর্য্যয়ই ঘটায় নাই।—তাঁহাদের ধারণায় বৌমানুষের এরূপ আচরণ অমার্জ্জনীয়। জয়ন্তী দেবীর গম্ভীর মুখ আরও গম্ভীর হইল। তাঁহার সঙ্গিনীরা—চরম রায় কি দেওয়া যায়, বোধ করি, তাহাই লইয়া গবেষণা করিতে লাগিল।

৩

রাত্রি প্রায় বারোটা বাজিয়াছে, ত্রিতলের ছাদের উপর গালিচা-পাতা, তাহাব উপর স্তবকে স্তবকে ফুলের মালা সাজানো। চাঁদের আলোয় ফুলের সুগন্ধে সেখানে সৌন্দর্য্যের যেন মায়াপুরী রচিত হইয়াছে! শশাঙ্ক অধীর প্রতীক্ষায় একটা বালিসে ঠেস দিয়া এক বার অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় উপবেশন করিতেছিল, এক বার উঠিয়া ছাদে পায়চারি করিতেছিল। তখনও নীচে মেয়েদের সব কাজকর্ম্ম শেষ হয় নাই। খাওয়ানো-দাওয়ানোর কলরবের অস্ফুট শব্দ ছাদে ভাসিয়া আসিতেছিল। নীচের দালানে মহিলারা সকলে এক স্থানেই বসিয়াছেন, নব বধূকেও তাঁহাদের মধ্যে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

জয়ন্তী দেবী রাশভারি কণ্ঠে নূতন বৌকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেখ বাছা! তোমার তপস্যার জোর ছিল তাই এমন ঘরে এমন বংশে পড়েছ; কিন্তু শুধু তাতেই হয় না, তার যোগ্য হওয়া চাই। এমন হাঘরের মত ধরণ-ধারণ যে তোমার হবে, আমার ছেলের বৌ হাতের কব্জিতে ঘড়ি আঁটবে, একঘর বেটাছেলের সামনে ঘোমটা খুলে ফর-ফর করে ইংরিজীতে বুকনি ছাড়বে, দিনের বেলায় সকলের সামনে স্বামীকে দেখেও স্বচ্ছন্দে মাথার কাপড় খুলে বসে থাকবে,—এ আমি স্বপ্নেও

ভাবতে পারিনি ! তা যদি পারতাম, তাহলে মরে গেলেও ওখানে ছেলের বিয়ে দিতাম না।"—জয়ন্তী দেবীর মুখ রাগে, অপমানে লাল হইয়া উঠিল।

অসীমা অবাক হইয়া চাহিয়া ছিল, একটুখানি আগেকার দৃশ্য তাহার মনে পড়িতেছিল। শশাঙ্কের বন্ধুদের অনুমতি পাইতে বিলম্ব সহে নাই, সকলেই এক একটা উপহার দ্রব্য হাতে লইয়া হাস্যোৎফুল্ল মুখে নূতন বৌ দেখিতে আসিয়াছিল। প্রায় সকলেই তাহাকে উপহার দিবার জন্য নানা-রকম বই আনিয়াছে। পুস্তকের রাশি তাহার সম্মুখে রাখা হইলে স্মিত উৎফুল্ল মুখে সে সেগুলি নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতেছিল। এত বই তাহার হইল এবং যখন খুসী সে এ সব পড়িতে পাইবে, মনে করিয়া এখন হইতেই সে আনন্দে অধীর হইয়া উঠিতেছিল। অসীমার আনন্দপূর্ণ, প্রতিভাদীপ্ত উজ্জ্বল মুখ দেখিয়া বন্ধুরা বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া শশাঙ্কের সৌভাগ্যের প্রশংসা করিল। বৌয়ের মুখ দেখিয়াই তাহারা চলিয়া গেল না ; নানা-রূপ গল্প ও হাস্য-কৌতুকের মধ্য দিয়া এই সুন্দরী শিক্ষিতা মধুরভাষিণী ও সপ্রতিভ নববধূর সহিত আলাপ আরও একটু অগ্রসর করিবার জন্য নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করিতেছিল। হিতেশ বলিতেছিল, "এই সেদিন মার্শাল ও মাদাম চিয়াং কাইশেক্ ভারত পরিভ্রমণে আসিয়াছিলেন। মাদাম চিয়াং কাইশেকের কথা যতই পড়ি, শ্রদ্ধাভরে মাথাটা নুয়ে পড়ে। দুঃখে দুর্দ্দিনে, এমন করে দেশের কাজে স্বামীর যথার্থ সহচারিণী হওয়ার যে মহৎ গৌরব, তা যেন জ্যোতির্লেখার মত তাঁকে ঘিরে আছে।"

কিছু দিন আগে অসীমাও মাদাম চিয়াং কাইশেকের কথা অনেক পড়িয়াছিল। সে শ্রদ্ধানত চিত্তে হিতেশের কথা স্বীকার করিয়া লইয়া বলিয়াছিল, "সত্যি, স্বামীর শুধু সেবা করাই নয় তাঁর প্রতি কাজ ও চিন্তার গুরু ভার বহন করে তাঁর প্রকৃত সহচরী হওয়ার মত শিক্ষা আমাদের দেশের মেয়েরা পায় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিত্রাঙ্গদা কাব্যে মহুয়ার কবিতার ছত্রে ছত্রে নারীপ্রেমের যে সর্ব্বাঙ্গীণ রূপ এঁকেছেন, সে আদর্শে পৌঁছে দেবার মত শিক্ষা ক'জন দেয় আমাদের দেশের মেয়েদের ? মাদাম কুরির মত স্বামীর সঙ্গে একত্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করা, ডোরা রাসেলের মত স্ত্রী—যিনি বোট্রাণ্ড রাসেলের মত চিন্তাবীরের সঙ্গে একত্রে বই লিখেছেন, এমন ক'টা দৃষ্টান্ত আমাদের মেয়েদের ভিতর দেখতে পাবেন ?"

হিতেশ, অজিত মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল। বাঙ্গালী-ঘরের নববধূ যে এমন সুন্দর, এমন বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর দিতে পারে—ইহা সে বিস্ময়জনক ঘটনা বলিয়াই মনে করিল। শশাঙ্ক নিজেও আনন্দে এবং গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া প্রীতিমুগ্ধ নেত্রে বারংবার অসীমার দিকে চাহিতেছিল। সেই দৃশ্যের সঙ্গে এই দৃশ্যের কোথাও কোন সঙ্গতি নাই। নব-জীবনের সূচনাতে এই তো অল্প একটুখানি আগে অসীমা আনন্দে উত্তেজনায় নবানুরাগে প্রভাত-কমলের মত বিকচ হইয়া উঠিয়াছিল ! মনে মনে ভাবিতেছিল, বহু ভাগ্যেই সে শিক্ষিত এবং উদার স্বামীর সহিত উদার পরিবেষ্টনীটুকুও লাভ করিয়াছে। এখানে শ্বশুরবাড়ীর বিভীষিকা নাই, আছে শুধু জগতের উচ্চ চিন্তাধারা, আছে সংস্কৃতি, আছে সৌন্দর্য্য।

অসীমা নীরবে নতমুখে বসিয়া আছে, কোন জবাব করে না দেখিয়া ও-পাশ হইতে শশাঙ্কের বড় মামীমা খন-খন করিয়া যেন বাজিয়া উঠিলেন, "কি বৌমা, কথা কও না যে ! শাশুড়ী গুরুজন, এতগুলো যে কথা বল্লেন, তা বুঝি গেরাহ্যির মধ্যেই আনা হ'লো না। না বাপু, লেখাপড়ায় আমাদের কাজ নেই ; আমাদের ছোটখাট একটি মেয়েই ভালো—যার লেখাপড়ার গরব নেই, কিন্তু লজ্জা আছে, হায়া আছে, গুরুজনে ভক্তি আছে।" বক্তৃতাস্রোত ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিল।

শুভা এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া ছিল ; অপ্রীতিকর মন্তব্যের জের যে কোথায় গিয়া থামিবে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া উত্তরোত্তর ভীত হইয়া উঠিতেছিল। কোন মতে অশান্তির সৃষ্টি না করিয়া এই আলোচনা বন্ধ করিবার জন্য সে তাড়াতাড়ি বলিল, "খাওয়া-দাওয়া তো অনেকক্ষণ হয়েছে, শুধু শুধু আর রাত্রি করা কেন ?" ছেলেমানুষ, কষ্ট হচ্ছে, বৌকে আমি ওপরে নিয়ে যাই।"

শশাঙ্কর মেজ মামী পাশেই বসিয়াছিলেন ; তিনিই এবার ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, "থাম বাছা ! অত ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় আমি ভালোবাসিনে ; তোমাদের বৌ আবার ছেলেমানুষ কোনখানটায় শুনি ? সময়ে বে হ'লে—"

"তাঁহার কথা শেষ হইতে না দিয়া শুভা রাগত ভাবে কহিল, "সে যাই হোক, বিয়ে যখন হ'য়ে গেছে, তখন এ-সব কথা নিয়ে বকাবকি করে দাদার মনে একটা অশান্তির সৃষ্টি করতে আমি দেব না। চল বৌ, আমার সঙ্গে উপরে চ'ল।"—এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ অসীমার হাত ধরিয়া তাহাকে একটানে ত্রিতলের ছাদে, যেখানে শশাঙ্ক অধীর উন্মুখ চিত্তে বাসক-সজ্জা করিয়া উৎকণ্ঠিত-ভাবে প্রিয়ার আবির্ভাব কল্পনা করিতেছিল—সেইখানে লইয়া হাজির করিল। তথায় চাঁদের আলোয় লেশমাত্র কৃপণতা ছিল না, এবং পুষ্পসুগন্ধে চারি দিকের বাতাস যেন মাতাল হইয়াছিল। শশাঙ্ক প্রীতিজড়িত কণ্ঠে কহিল, "আমার বন্ধুরা আজ তোমার সঙ্গে আলাপ করে বড়ই সুখী হয়েছে। সেই তারা যখন মাদাম চিয়াং কাইশেকের বিষয় আলোচনা করছিল—"

আবার সেই মাদাম চিয়াং কাইশেক ! আঃ সর্ব্বনাশ ! যেখানে একতলার সহিত তিনতলার এত তফাৎ, সেখানে এ আলোচনা আবার কেন ?

অসীমা স্খলিত কণ্ঠে কহিল, "থাক্ ও-সব কথা। নীচের ঘরে চল না।"

শশাঙ্ক অবাক হইয়া বলিল, "এই এত চাঁদের আলো, এমন বাতাস, এমন খোলা আকাশের নীল চন্দ্রাতপ ছেড়ে নীচে ?"

অসীমা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "হ্যাঁ, নীচেই যাচ্ছি আমি। ঘরের বন্ধ দরজা-জানলাই ভালো। বাঙ্গালী মেয়ের পক্ষে বেশী খোলা আলো-বাতাস ভালো নয়। এ অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। এবার থেকে তাকে জীবনে খাটাব।"

বাঙ্গালীর ছেলের চোখের স্বপ্নঘোর তখনও কাটে নাই। সে একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াই মত দিল, "তোমার যখন ছাদ ভালো লাগছে না, তখন তাই চ'ল।" কিন্তু বাঙ্গালী-মেয়ের চোখে তখন আর স্বপ্নের মধুর রেশ নাই। ফুলের মালা ও ফুলস্তবক সম্পূর্ণ তুচ্ছ করিয়া সে বালিস এবং গালিচা তুলিয়া ভাঁজ করিতে করিতে কহিল, "এগুলো নিয়ে যাই। শিশিরে ভিজে যাবে।"—শশাঙ্ক ফুলের মালাগাছি হাতে লইবার উপক্রম করিতেই সে কহিল, "থাক না, ও-সব রাজ্যের বাজে জিনিষ নিয়ে কি হবে ? তার চেয়ে আমার সঙ্গে এই মাদুর আর বালিসটা নিয়ে এসো। একা এত নিয়ে যেতে কষ্ট হবে।"

—এতক্ষণে স্বাভাবিক গতিপথে বাঙ্গালী-ছেলেমেয়ের যাত্রা সুরু হইল !

শ্রীমতী আশালতা সিংহ।

২২

'যেখানে পথের বাঁকে গেল বধূ নত আঁখে, ভরা ঘট লয়ে কাঁখে তরুণী', সেইখানে আসিয়া আমার পথের শেষ হইল।

যখনই গ্রামে পদার্পণ করি না কেন, পল্লীর স্নিগ্ধ-শ্যাম শোভা আমাকে পুলকিত করে। গ্রীষ্মের শুষ্ক বন-স্থলী, বর্ষার ঘন-নীল মেঘ-মালা, শরতের সোনালী প্রভা, হেমন্তের নির্ম্মল শিশির-কণা, শীতের নিরানন্দ কুহেলিকা, বসন্তের অপরূপ মাধুরী আমার হৃদয়ে সুধা-রস বিকিরণ করে। পর্য্যায়-ক্রমে ছয় ঋতু আসে-যায়, আমি যে কাহাকে বাদ দিয়া কাহাকে হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিতে চাই, বলিতে পারি না!

নদীর উপকূলে আমাদের মাটির কুটীর। বৃষ্টিধৌত সরস বৃক্ষশিরে পড়ন্ত-রৌদ্র ঝিকিমিকি করিতেছিল। সাম্‌নে ভাদ্রের ভরা নদী। ক্ষান্ত-বর্ষণ নীলাকাশ নদীর বুকে মুখ দেখিতেছিল।

বাহিরের বারান্দায় বেতের মোড়ায় বসিয়া বাবা বই পড়িতেছিলেন, আমি যেমন দেখিয়া গিয়াছিলাম, তেমনি প্রসন্ন প্রশান্ত মূর্ত্তি। পরিবর্ত্তনের মধ্যে কিছু কৃশ, দুর্ব্বল বলিয়া মনে হইল।

যাঁহাকে দেখিবার জন্য দূর-দূরান্তর হইতে উদ্বেলিত হৃদয়ে আসিতেছিলাম, তাঁহাকে দেখামাত্র আমার আর তর্ সহিল না। ছোট শিশুর মত উল্লাস-ভরে বাবার কাছে আসিয়া ডাকিলাম, "বাবা আমি এসেছি।"

বাবা চমকিয়া মুখ তুলিলেন। নিমেষে তাঁহার মুখ আনন্দে প্রদীপ্ত হইল।

আমার প্রণত-শিরে দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া মমতায় বিগলিত কণ্ঠে বাবা কহিলেন, "এলি মা! ভালো আছিস? তোদের কলেজে কিসের ছুটি রে? কই, ছুটির কথা তো শুনিনি!"

বলিলাম, "না বাবা, ছুটি নয়। পিসিমার চিঠিতে তোমার অসুখের খবর পেয়ে এসেছি। আজ কেমন আছো বাবা? জ্বর হয়নি তো?"

আমাকে কোলের কাছে বসাইয়া কপালের চুল সরাইয়া দিতে দিতে বাবা বলিলেন, "জ্বর হয়নি মা, আমি ভালো আছি। ক'দিন সামান্য জ্বর হয়েছিল, সে কিছু নয়। বিন্দু আবার তাই লিখে তোকে ব্যস্ত করে এনেছে! বিন্দুর এ বড় অন্যায়!"

"কিসের অন্যায়, বাবা? আমাকে তোমার দেখতে ইচ্ছা না হলেও আমার হতে নেই বুঝি?"

জানি না, কেন আমার চোখ হঠাৎ জলে ভরিয়া গেল। যেখানে অকৃত্রিম ভালোবাসা, সেইখানেই অভিমান অপরিমিত।

ঈষৎ আহত হইয়া বাবা বলিলেন, "কে বলে, দেখতে ইচ্ছা হয় না? তোর ভালোর জন্য, লেখাপড়ার জন্যই না দূরে রেখেছি! তুই ছাড়া আমার কে আছে, করু!"

মুখে কিছু বলিতে পারিলাম না; মনে মনে বলিলাম, আমারো তুমি ভিন্ন কিছু নাই বাবা।

আমার সাড়া পাইয়া পিসিমা বাহির হইয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "ও মা করু এসেছিস! আগে জানলে ষ্টীমার-ঘাটে লোক পাঠাতুম, ভাত রেখে দিতুম। আমার চিঠি পেয়েই বুঝি রওনা হয়েছিস্?"

পিসিমাকে প্রণাম করিয়া উত্তর দিলাম, "হাঁ পিসিমা, সকালে চিঠি পেয়ে রাত্রে রওনা হয়েছি।"

"বেশ করেছিস মা। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে না এলে কি মানায়? গরমের ছুটিতে পাহাড়ে গেলি, আমি বকে

মরি। গাছের যাহোক আম-জাম দু'টো পেড়ে কার হাতে দিই? পাহাড়-পর্ব্বত ভালো হলেও নিজের বাড়ীর চেয়ে ভালো নয়। পথের কষ্টে মুখ তোর শুকিয়ে গেছে করু, আগে হাত-পা ধুয়ে জল খা, আমি ভাত চড়িয়ে দিই।"

"না পিসিমা, তাড়াহুড়ো করে তোমাকে ভাত চড়াতে হবে না। বেলা গেছে, অসময়ে আমি ভাত খেতে পারবো না! রাত্রে বাবার সঙ্গে খাবো। মাসীমা সঙ্গে খাবার দিয়েছিলেন, ষ্টীমারে খেয়ে নিয়েছি। এখন ক্ষিদে নেই। বারে-বারে খেতে পারি না। অভ্যাস নেই।"

"তা থাকবে কেন মা, তোমরা যে সহুরে হয়েছ! না খেয়ে খেয়ে ঢেঙ্গা রোগা লিকলিকে চেহারা করেছো! জোয়ান বয়সের মেয়ে তিন বেলা ঠেসে পেট পুরে ভাত খাবে, দিন-ভোর মুখ নাড়বে, তবে না হবে চেহারার চেক্‌নাই! তা না, ঘড়ি ধরে বাতাস খেয়ে খেয়ে মেয়ের কি ছিরি হয়েছে, দেখেছো দাদা? এর নাম কি পাহাড়ের হাওয়া-খাওয়া দেহ?"

সস্নেহ দৃষ্টিতে বাবা আমার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "সত্যি করু, বিন্দু মিথ্যে বলেনি! সত্যি এত রোগা হয়ে গেছিস কেন? অসুখ করেছিল? না, পড়াশোনার খাটুনি?"

"রোগা কেন হবো বাবা? আগে যেমন ছিলুম, এখনো তেমনি আছি। আমার কিচ্ছু হয়নি। তুমি পিসিমার কথা শোনো কেন?" বলিয়া আমি দিদির প্রদত্ত বেতের বাক্সটা খুলিতে লাগিলাম।

বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত কি এনেছিস করু? রাজ্যের ফল, আচার, মোরব্বা, কিছুই বাকি রাখিসনি যে! তুই বোধ হয় ভেবেছিলি, তোর বাবা মরণ-পথের যাত্রী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে!"

পিসিমা বাবাকে ধমক দিলেন, "আঃ, কি বলছো? মেয়েটা এই মাত্তর এলো, আর তুমি ঐ-সব কথা আরম্ভ করলে! বাপের জন্য মেয়ে জিনিষ আনবে না তো আনবে কে? এখানে এ-সব জিনিষ মেলে না। আচার-বিচার অত-শত আমিও করতে জানি না। করুর বুদ্ধি আছে, তাই এনেছে। আয় মা, ঘরে আয়। দাদাকে ফল ছাড়িয়ে দিই, তুইও নেয়ে নে। এর পর নাইলে চুল শুকোবে না।"

বলিলাম, "যাই পিসিমা। এ-ফলগুলো মিলি বাবাকে খেতে দিয়েছে। আমাদের এক দিদি আছেন, তিনি দিয়েছেন এই সব। তাঁর নিজের তৈরি।"

বাবা বলিলেন, "তোদের দিদি আবার কে, করু? কৈ, এর আগে তো দিদির কথা শুনিনি!"

মিলির বিবাহের আদ্যোপান্ত ইতিহাস বলিয়া কাপড়-জামা লইয়া আমি স্নান করিতে গেলাম।

দরমা-ঘেরা কুয়োতলা হইতে শুনিলাম, পিসিমা গজর-গজর করিতেছেন, "শুনলে দাদা, মিলির বিয়েও ঠিক হলো, তুমি কেবল চুপ করে আছো! মেয়ে ডাগর হলে চার দিকে খোজ-খবর নিতে হয়। ছোট মেয়ের বিয়ে যত সহজ, বড় করে লেখাপড়া শেখালে তত নয়। মেয়ের যোগ্য পাত্র জোটাতে চোখে সরষে-ফুল দেখতে হয়। মিলির মা হুঁসিয়ার, তার অসাধ্য কাজ নেই। মা-মরা বোনের মেয়েটা কাছে থাকে, মিলির চেয়ে বয়সে বড়, আগে তার বিয়ের জোগাড় করতে হয় না? তা না করে নিজেরটিকে নিয়ে মত্ত! ছেলেও ধরেছে ছেলের মত!"

বাবার প্রত্যুত্তর শুনা গেল, "মিলি বেশ ভালো মেয়ে, তার ভালো বিয়ে হচ্ছে জেনে আনন্দ হচ্ছে। মিলির মত মেয়ে আমাদের সমাজে মেলে না।"

পিসিমা ঝাঁজিয়া উঠিলেন, "কত ভালো, আমার জানা আছে! তোমরা ব্যাটা ছেলে, বাইরেটা দেখেই বাহবা দাও। গেল-বছর গঙ্গাচ্চানে গিয়ে ওদের ওখানে ক'দিন থেকে সব দেখে শুনে এসেছি। যেমন মা, তার তেমনি মেয়ে! না আছে নরম-সরম, না আছে মেয়েলি ভাব। মেয়ে নয় তো গোরা-পল্টন, অহঙ্কারে আটখানা, রাগে দিশাহারা! যাকগে, পর-নিন্দা করতে চাইনে। করুর এখন কি করবে, তাই বলো? তুমি গাঁয়ের বাইরে পা না দিলে ভালো পাত্তরের খবর পাবে কি করে? আছে এক জন—তোমারি চোখের সামনে। তোমার তো খেয়াল নেই, মেয়ের বিয়ের কথা মনে করো না, সেই জন্য আমিও কথা কইনে, চুপ করে থাকি। তবে ছেলেটি ভালো হলেও এক দোষ আছে, তাই আমি কিছু বলিনি।"

"কার কথা বলছো বিন্দু? কে ছেলে? কোথায়?"

"বাড়ী হরিপুরে। আমার সেজ ননদের বড় ছেলে। ওই যে চন্দর গো, চন্দ্রচূড়। ছেলে ভালোই। আমেরিকা, না বিলেত কোথা থেকে চাষবাস, না, পাটের চাষ শিখে এসেছে। ভেবেছিলুন, জজ, ম্যাজিষ্টার কি দারোগাগিরি শিখে আসবে, তা না হয়ে এলেন স্বদেশী হয়ে! তাই তো আমি কথা কইনি! নাহলে অবস্থা ভালো, পাকা ঘর। কোন্ কালে বিয়ে দিয়ে দিতুম!"

বাবা বলিলেন, "ও, তুমি চন্দ্রচূড়ের কথা বলছো! আমি আগে বুঝতে পারিনি। চন্দ্রচূড়ের মত ছেলে দুর্লভ, বিন্দু,

তাকে পাওয়া ভাগ্যের কথা। সে কত বড়, তার কাজ কত বড়, তুমি তা বুঝবে না! সে তো, তোমার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে আসে। তার হাতে করুকে দিতে পারলে আমার আনন্দের সীমা থাকবে না। কিন্তু তা কি হবে?"

"হবে না আবার! তুমি যে তাকে এত পছন্দ করো, তা আমি জানতুম না। জানলে কোন্ কালে ঘটিয়ে দিতুম। এখনকার ডাগর ছেলে-মেয়েরা নিজেরা দেখে-শুনে বিয়ের ঠিক করে, মিলিও তাই করছে। করু এসেছে, এই সময় আমিও চন্দরকে একখানা চিঠি লিখে ডেকে পাঠাই। লিখি, 'অনেক দিন দেখি না, শীগ্‌গির এসে দেখা করে যাও!' লিখলেই সে আসবে। সে এসে করুকে দেখুক, করু তাকে দেখুক—তার পরে যা হয় হবে। ছাখো দাদা, আমার সাধ ছিল—করুর একটি টুকটুকে বর হয়, পাঁচ জনকে ডেকে এনে দেখাই। তা চন্দরের রূপে পৃথিবী আলো হয়ে যায়, অমনটি কোথাও পাবে না। দোষের মধ্যে মস্ত দোষ, ছেলে স্বদেশী করে।"

"তা করুক বিন্দু, বললুম তো, সব কাজের বড় কাজ সে। তাতে বাধবে না। আমাকে সকলের আগে নিতে হবে করুর মত। করু বড় হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে, তার অনিচ্ছায় কিছু করবো না। সে যাকে চাইবে, তাকেই আমি এনে দেবো।"

আমি মনে মনে হাসিলাম। বাবা সরল আপনা-ভোলা, সংসারের কুটিল গতি জানেন না! এখানে চাহিলেই কামনার ধন মেলে না। যাহা দুষ্প্রাপ্য, চিরদিন তাহা আয়ত্তের বাহিরে থাকে।

২০

রাত্রে পিসিমার কাছে শয়ন করিলাম। পিসিমা বার-বার মিলির আসন্ন বিবাহের প্রশ্নে আমাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন। তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না। বাড়ীতে বয়স্থা কুমারী মেয়ে থাকিলে অন্য বাড়ীর মেয়ের বিবাহের সংবাদে অনেকে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া ওঠেন!

মানুষ-হিসাবে পিসিমাকে মন্দ বলা যায় না। তবে মাসিমার উপর তাঁহার, নিদারুণ আক্রোশ। পিসিমার সত্যকারের দাবীর স্থান কোথাও নাই। পিতা-মাতা বাল্যে পরলোকগত, ভাই-ভগিনীরা একে একে তাঁহাদের অনুসরণ করিয়াছে। পিতৃকুলে থাকিবার মধ্যে আমার বাবা! শ্বশুরকুল আরও চমৎকার। চরিত্রহীন স্বামী মৃত্যুকালে পিসিমার দাঁড়াইবার ভিটাটুকু পর্য্যন্ত নিঃশেষ করিয়া গিয়াছেন।

পিসে মহাশয়ের মৃত্যুর পরেই আমি মাতৃহীন হই। বাবা নিজে গিয়া অনাথিনী ভগিনীকে আমাদের গৃহে আনিয়া গৃহিণীর আসন দিয়া রাখিয়াছেন। সেই অবধি পিসিমা আমাদের সংসারে আছেন। তাঁহার ননদ, নন্দাই, ভাগ্নে, ভাগ্নীর অভাব ছিল না। বহু বার তাঁহারা তাঁহাকে লইয়া যাইতে চাহিয়াছেন, কিন্তু পিসিমা যাইতে রাজী হন নাই।

বাবার কাছে আসিবার কিছু কাল পরে মাসিমার সঙ্গে পিসিমার দেখা হইয়াছিল। পরাশ্রয়ে, পরান্নে জীবন যাপনের জন্য পিসিমাকে মাসিমা ধিক্কার দিয়াছিলেন। লেখা-পড়া শিখিয়া স্বাধীন উপার্জ্জনের পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। সে হিতোপদেশে পিসিমা কাণ দেন নাই, কিন্তু ধিক্কারটুকু মনে রাখিয়াছেন!

তার পর কত বার দু'জনে সাক্ষাৎ হইয়াছে। একবস্ত্র-পরিহিতা, নিরক্ষরা বিধবাকে খ্যাতিসম্পন্না, শিক্ষাভি-মানিনী মাসিমা প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারেন নাই। পিসিমাকে মাসিমা করিয়াছেন অবজ্ঞা, তাচ্ছল্য; বিনিময়ে পিসিমা করিয়াছেন মাসিমার নিন্দা, কুৎসা, বিদ্বেষ। সেই বিদ্বেষের আগুন অলক্ষ্যে মিলিকেও স্পর্শ করিয়াছে, নহিলে পিসিমার কাছে মিলি কোনো অপরাধ করে নাই। আমার বিবাহের পূর্ব্বে মিলির বিবাহের সম্ভাবনায় পিসিমা নিজেই শুধু জ্বলিতেছিলেন না, আমাকেও জ্বালাইয়া মারিতে উদ্যত হইলেন!

আমি বিরক্ত হইলাম। বলিলাম, "মিলির বিয়ের কথায় আমাদের কাজ কি, পিসিমা? তাদের টাকা আছে, সে নাম-করা মেয়ে, তার সঙ্গে কার তুলনা? যে যেমন, তার উপযুক্ত পাত্র খুঁজে আনতে হয় না! সে আপনি আসে। মিলিকে দেখে জ্যোতি বাবু নিজেই পছন্দ করেছেন, মাসিমা খুঁজে আনেননি।"

পিসিমা অবিশ্বাসের স্বরে তাঁকে কহিলেন, "বয়সে সেয়ানা হলে কি হবে করু, আসলে তুই বোকা। মায়ের ইশারা না থাকলে কি মেয়ে কখনো ছেলে ধরতে পারে? তুই রং-চং না মেখে থাকলেও মিলির চেয়ে অ-সুন্দর নোস্! সে ইলি-বিলি পাশ করেছে, তুইও করেছিস। তার চেয়ে তুই খাটো কিসে? সে পাহাড়ে উঠে বর ধরলো, তুই পারলি নে! পারবি কি করে, তোর পিছনে তোর মা ছিল না তো!"

এত কাল পর মা'র জন্য পিসিমার আক্ষেপে আমারো মা'র অভাব মনে পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল আর-এক জনকে, যাঁহাকে ভুলিবার জন্য আমার

প্রাণ অহরহ ব্যাকুল! আশা করিয়াছিলাম, সে পরিমণ্ডলের বাহিরে আসিলে আমার হৃদয়ের এ-মেঘ কাটিয়া যাইবে, আমি মুক্তি লাভ করিব! কিন্তু ভাগ্যদোষে আমার সে আশা দুরাশায় পরিণত হইল। যে-প্রসঙ্গ এড়াইতে চাহিয়াছিলাম, কুক্ষণে সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া আমি নিজের জালে জড়াইয়া পড়িলাম।

নিশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিলাম। আমার দুঃখ কাহাকে বলিব? কে শুনিবে? সত্যই তো আমার মা নাই! হারানো মায়ের ক্ষীণ-স্মৃতি হাতড়াইতে লাগিলাম। সেখানে কিছুই মিলিল না।

ক্ষণেক পরে পিসিমা ডাকিলেন, "ঘুমুলি না কি রুরু? আহা, ঘুমো! সারা রাত জেগে এসেছিস!"

না ঘুমাইলেও সাহস করিয়া উত্তর দিতে পারিলাম না।

প্রভাতে জাগিয়া দেখি, বেলা অনেক হইয়াছে। পিসিমা বাসি কাজ সারিয়া তরকারী কুটিতেছেন।

আমি কাছে যাইতেই বলিলেন, "মুখ ধুয়ে এসেছিস। আয়, চা-দুধ খা। সাত-তাড়াতাড়ি তোর জন্য আমি বাতাসা দিয়ে দুধ জ্বাল দিলুম। কলকাতায় তোরা তো খাটী দুধ পাস না! যে ক'দিন আছিস, গাইয়ের বাঁটের টাট্‌কা দুধ খেয়ে নে। তোর চা করে উনুনের মুখে বসিয়ে রেখেছি।"

বলিলাম, "চা খাচ্ছি পিসিমা, কিন্তু দুধ এখন খাবো না। বাবা কোথায়?"

"কোথায় আবার! ভোরে উঠে তাঁর যা কাজ, লেগেছেন! বাগানে গেছেন। কিন্তু এখন দুধ খাবো না বললে চলবে না রুরু, আমি কত করে জ্বাল দিলুম! চা খেয়ে দুধটুকু মুখে দে। জুড়িয়ে গেল!"

দুধ জুড়াইবার ভয় না থাকিলেও পিসিমার অনুনয়ের ভয়ে চা-সংযোগে দুগ্ধ পান করিলাম।

পিসিমা প্রসন্ন হইয়া বেড়ার গা হইতে একখানা পোষ্টকার্ড আনিয়া আমার হাতে গুঁজিয়া দিলেন। দিয়া বলিলেন, "আমাকে একখানা পত্তর লিখে দে দিকিনি! নিতাইকে দিয়ে ডাকে পাঠিয়ে দিই। দেরী হলে আজকের ডাকে আবার যাবে না।"

পিসিমা কাহাকে চিঠি দিবেন, কিসের তাড়া, বুঝিতে বাকী ছিল না। ন্যাকা সাজিয়া বলিলাম, "সকালেই কাকে চিঠি দেবার ধুম পড়লো পিসিমা? যাকে দিয়ে তুমি চিঠি লেখাও, তার কাছে যাও না কেন? আমি বাপু, এখন লিখতে পারবো না!"

পিসিমা মিনতি করিতে লাগিলেন, "লক্ষ্মী মা আমার, সোনা মেয়ে, লিখে দে। জিতুর বৌকে দিয়ে আমি চিঠি-পত্তর লেখাই, তা এ সাত-সকালে সে তো সময় পাবে না। দুপুর-বেলা লিখলে আজকের ডাকে যাবে না। দরকারী বলেই তোকে বলছি। চিঠি কাকে আবার লিখবো, আমার ভাগ্নে চন্দ্রচূড়কে। অনেক দিন দেখিনি, মন কেমন করছে। লিখে দে, পত্রপাঠ এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে।"

"আচ্ছা পিসিমা, তোমার তো আরো ভাগ্নে-ভাগ্নী আছে। সবাইকে বাদ দিয়ে চন্দ্রচূড় না চন্দ্রপীড়, চন্দ্রশেখর না চন্দ্রকান্তকে নিয়ে এত টানাটানি কেন? তোমার চন্দ্রকেতু এত দিন কোথায় ছিলেন? কখনো দেখিনি, নামও শুনিনি!"

"মাগো, মেয়ের কথা শুনে আর বাঁচি নে! দেখবি কোথা থেকে বল্! সে কি এ দেশে ছিল? কত বছর ধরে আমেরিকা না বিলেত—সেই দেশে থেকে পরীক্ষার পড়া পড়ছিল। ফিরে এসেই আমার কাছে এসেছিল। তুই তখন এখানে ছিলি না, তাই দেখিসনি। হাঁ, ভাগ্নে-ভাগ্নী আরো আছে মা, কিন্তু চন্দরের মত কেউ আমাকে যত্ন-আত্যি করে না। আমিও তাই তাদের ডাকি না। চন্দর বড় ভালো। বলে, 'মামিমা, চলো, আমার কাছে থাকবে, আমি তোমার ছেলে।' আমি বলি, 'দাদাকে একা ফেলে আমি যেতে পারবো না বাবা, তাতে তুই দুঃখ করিস নে'। যখনি আসে, আমার জন্য নিজের হাতে কাপড় বুনে আনে, টাকা আনে। চন্দর আমার ছেলের মত ছেলে! এক দোষ, শুধু স্বদেশী করে।"

"চন্দ্রচূড় স্বদেশী করুক আর বিদেশীই করুক, তাহার বিশদ-বিবরণ জানিতে আমার লেশমাত্র আগ্রহ ছিল না। আমি বলিলাম, "কি লিখতে হবে বলো, আমি লিখে আনি!"

"আমি আবার কি বলে দেবো? তোরা লিখুনে-পড়ুনে, যা লিখতে হবে জানিস তো! যাতে শীগ্‌গির সে আসে, তাই লিখে দে! দিয়ে ভালো কাপড়-জামা পরে একবার পাড়া থেকে ঘুরে আয়, সকলে তোর কথা জিজ্ঞাসা করে।"

"জিজ্ঞাসা যা করে, তা আমার জানা আছে, পিসিমা। আমার খবর মানে, বিয়ের কথা তো? তা শোনাতে আমি একা যাবো কেন? তোমার সঙ্গে গেলেই হবে।"

[ক্রমশঃ

শ্রীমতী গিরিবালা দেবী

মিলন

১

"তেল—তেলের মশলা—তেলের রং—মাথার ফিতে—নোলক—মাকড়ী—দুল—মুক্তো—ও—ও—"

ফিরিওয়ালার হাঁক শুনিয়াই একটি সাত-আট বৎসরের ফুটফুটে মেয়ে বাড়ীর ভিতর হইতে ছুটিয়া আসিয়া বাহিরের ঘরের জানালায় দাঁড়াইয়া ডাকিল, "ফেরিওলা, ও ফেরিওলা—"

ফেরিওয়ালা মেয়েটির পরিচিত; সে এ-পাড়ায় আসিলেই মেয়েটি তাহার নিকট কিছু-না-কিছু কিনিত। তাই সে বালিকার আহ্বানে জানালার ধারে আসিয়া বলিল, "খুকি! কি চাই আজ তোমার?"

সে তাহার কাঁধের ঝাঁকা বাহিরের রকে নামাইলে, বালিকা এক গজ ফিতে, এক মোড়া তেলের মশলা,—আরও দুই-একটা জিনিস লইয়া বলিল, "পয়সা দিতে হবে কতো?"

ফেরিওয়ালা হিসাব করিয়া বলিল, "ন' পয়সা।"

"তুমি দাঁড়াও, আমি পয়সা আনি।" বলিয়া বালিকাটি ভিতরে চলিয়া গেল; কিন্তু পয়সা আনা সহজ হইল না! মা অন্নপূর্ণা উগ্র স্বরে বলিলেন, "যা ফিরিয়ে দিগে,—পয়সা আমি দিতে পারব না। যা দেখবে, হতভাগা মেয়ে তাই কিনতে বসবে!"

মেয়ে বলিল, "ওকে ফিরিয়ে দেব বলেই আমি কিনলুম কি না! শীগ্‌গীর দাও, মা! লোকটা পয়সার জন্তে বসে আছে।"

"বলছি, ফিরিয়ে দিয়ে আয়! পয়সা পাবি নে।"

মেয়ে চীৎকার করিয়া ডাকিল, "বাবা!"

সাড়া আসিল—"কি রে পাগলী! কি বলছিস?"

"দেখ বাবা, এইগুলো কিনে'ছ, তা মা বলছে পয়সা দেবে না।"

"কি আবার কিনলি?"—বলিয়া পিতা জগদীশ সেখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

"এই দেখ না।—জান বাবা! এই যে মসলাগুলো দেখছ, এতে তেলের কি চমৎকার গন্ধ হবে, তা দেখে নিও। আর এই লাল ফিতে—"

বাধা দিয়া মা বলিলেন, "এক-গাদা ফিতে রয়েছে, আবার এটাও পরবি?"

"মাথায় দেব। দেখ না, কেমন লাল!"—বলিয়া মেয়ে ফিতেটা মাথায় জড়াইতে লাগিল।

মা হাসিয়া বলিলেন, "আ-মরি! যেমন পছন্দ!"

মেয়ে বলিল, "দেখ বাবা, মা ঠাট্টা করছে!"

বাহির হইতে ফেরিওয়ালা হাঁকিল, "আন গো খুকী পয়সা,—দেরী হয়ে যাচ্ছে।"

মেয়ে ব্যস্ত হইয়া বলিল, "দাও না মা, ন'টা পয়সা।"

"বাবাঃ, তোকে কি পারবার যো আছে!"—বলিয়া মা আঁচল হইতে পয়সা খুলিয়া মেয়ের হাতে দিলেন। মেয়ে নাচিতে নাচিতে বাহিরে চলিয়া গেল।

পূজার আর বিলম্ব নাই, তাই ফিরিওয়ালাদের হাঁকাহাঁকিরও বিরাম নাই!—এক জনের পর আর এক জন আসিতেছে। কিছুক্ষণ পরেই আবার শুনা গেল,—"সাবান—তরল আলতা চাই—এসেন্স চাই—পমেড চাই—গন্ধ-তেল চাই—চাই মাথার কাঁটা—আ—আ—"

"ও ফেরিওলা, ফেরিওলা—এই বাড়ীতে!"

বালিকাটি আবার কতকগুলি জিনিস লইয়া বাড়ীতে ঢুকিতেই মা এবার মারমুখী হইয়া উঠিলেন। মেয়ে বেগতিক দেখিয়া, তাহার পিতা যেখানে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে কি লিখিতেছিলেন, সেখানে আসিয়া একেবারে তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "বাবা, মা আমাকে ভারী বকছে!"

পিতা সস্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "কেন, কি করেছিস তুই?"

"কিছু করিনি বাবা! এইগুলো কিনেছি কি না, তাই বকচে।" বলিয়া সে জিনিসগুলি তাঁহাকে দেখাইতে লাগিল।

পিতা বলিলেন, "ইঃ, করেছিস কি? এত সব কিনে কি হবে?"

"দেখো অখন। এখন পয়সা দাও তো।—লোকটা কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে?"

মা সবেগে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "পোড়ামুখী মেয়ে যা দেখবে, তাই কিনবে। জ্বালিয়ে মারলে!"

মেয়ে বাপের আরও কোল ঘেঁসিয়া বসিল। বাপও তাহাকে আরও নিবিড় ভাবে বাহু-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, "আহা! কিছু বলো না গো!"

মা ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, "তুমি আস্কারা দিয়েই তো ওর মাথা খেয়েছ! যা দেখবে—তাই কিনবে। একটু যদি কাণ্ডজ্ঞান থাকে!"

মেয়ে বলিল, "কৈ আর যা-তা কিনলুম? ওই যে জুতো-বুরুস যাচ্ছে আমি কিনেছি? ঐ যে আলু-পটোল বেচতে যাচ্ছে, তা কি কিনেছি? তুমিই তো সে দিন ও-সব কিনলে, তাতে বুঝি দোষ নেই? বা রে!"

তাহার পর সে পিতার দিকে চাহিয়া বলিল, "বাবা, তুমিই পয়সা দাও। মা তো দিচ্ছে না!"

পিতা টেবিলের উপর হইতে 'পার্শ'টা তুলিয়া-লইয়া একটা

টাকা বাহির করিয়া মেয়ের হাতে দিলেন—সে তাহা লইয়া দৌড়াইয়া বাহিরে গেল।

মা মুখ বাঁকাইয়া বলিল, "বাপের আদুরে মেয়ে! আমাকে মানবে কেন? আদর দিয়ে দিয়েই ওর মাথা খেলে।"

হাসিয়া জগদীশ বলিলেন, "না না, ওকে কিছু বলো না। তুমি কি ভুলে গেলে—ও কে?"—তাঁহার কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল।

"জানি; কিন্তু—"

"এতে কিন্তু নেই—ওর আবদার একটু-আধটু সইতেই হবে।"

"সইতে কি কসুর করছি? কিন্তু বড্ড বাড়িয়ে তুলেছে যে! একটু কড়াকড়ি না করলে কি চলে? মেয়ে হয়েই যখন এসেছেন।"

জগদীশের দৃঢ় ধারণা—তাঁহার মা মেয়ে হইয়া তাঁহার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই ধারণার কারণ এই যে, মেয়ের জন্মের কিছু পূর্ব্বে জগদীশ স্বপ্ন দেখেন—তাঁহার মা বলিতেছেন, "জগ, আমি তোর মায়া ছাড়তে না পেরে আবার তোরই কাছে যাচ্ছি।"—তার পরেই এই মেয়েব জন্ম! তাই মেয়েব প্রতি ব্যবহারে তাঁহার একটু দুর্ব্বলতা ছিল।

জগদীশ বলিলেন, "ওর ত কোন ঝক্কিই নেই; কেবল ফেরিওলা দেখলে ওর কিছু না কিছু কেনা চাই। তা শুনেছি, ছেলেবেলায় মারও ঐ রকম অভ্যাস ছিল।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "হাঁ, সেই কথাই শুনেছি বটে!"

"আরো দেখ, ওর দয়া-মায়া কত! সে দিন তোমার অসুখ হলো, ওইটুকু মেয়ে, তোমার কি সেবাটাই করলে! এই যে ওর এত ফেরিওলার উপর ঝোঁক, তাও কি ছিল?"

"তা অবিশ্যি ছিল না। তুমি কি আমাকে বলবে? আমি জানি নে, তাকে আমিই ত পেটে ধরেছি। ওইটুকু মেয়ে, আমার সংসারের কত কাজ করে! না বলতেই সব কাজে ছুটে আসে। আমাকে বাঁধতে দেখে বলে—'মা, তুমি ওঠ, আমি রেঁধে দিই'।"

পরিপূর্ণ তৃপ্তিভরে জগদীশ বলিলেন, "সংসার করবেন বলে আবার এসেছেন মা—মেয়ে হয়ে! অল্প বয়সেই মারা গিয়েছিলেন কি না? সব সাধ ত তাঁর মেটেনি!"

আবার পথে ফেরিওয়ালার ঝঙ্কার উঠিল,—"দো-আনা সব-কই চিজ! দো-আনা—দো-আনা। যা লেবেন তা দো দো-আনা।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "ওই শোন, আর একটা ফেরিওলা হেঁকে যাচ্ছে। তোমার আদুরে মেয়ে ছুটে এল বলে!"

কিন্তু তাঁহার এই অনুমান সত্য হইল না; মেয়ে এবার আর আসিল না; তবে সে ভিতরে না আসিলেও বাহিরে তাহার সাড়া পাওয়া গেল। কয়েক মিনিট পরেই কতকগুলি জিনিস আঁচলে বাঁধিয়া-লইয়া মেয়ে চীৎকার করিতে করিতে তাঁহাদের নিকট উপস্থিত! সে উৎসাহভরে বলিল, "দেখ বাবা! এবার কতো কি কিনেছি। এই পুতুলটা দেখ বাবা, কেমন খাসা দেখতে।"

সে একটা পুতুল আঁচল হইতে বাহির করিয়া পিতার সম্মুখে তুলিয়া ধরিল।

সস্মিত মুখে পিতা বলিলেন, "বাঃ, খুব ভালো পুতুল ত রে!"

"আবার এই দেখ বাবা!" বলিয়া একটা টিনের বাঁশী বাহির করিয়া সে তাহা বাজাইতে বাজাইতে নাচিতে লাগিল।

মেয়ের 'বিক্রম' দেখিয়া মায়ের সর্ব্বাঙ্গে জ্বালা ধরিল; তিনি বলিলেন, "যা, ফিরিয়ে দিয়ে আয়; আর আমি পয়সা দিতে পারব না।"

মায়ের কথায় মেয়ে হাসিয়া বলিল "পয়সা আর তোমাকে দিতে হবে না মা! এর দাম আমি আগেই দিয়ে এসেছি।"

বিস্মিত হইয়া অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "পয়সা কোথায় পেলি যে, দাম দিয়ে এলি?"

"কেন? এই ত একটু আগে বাবা আমাকে একটা টাকা দিলে। ওঃ, বলতে ভুলে গেছি বাবা! তোমার জন্যে এই কলমটা কিনেছি, তুমি লিখো, খাসা কলম। আর মা, এই আরসীখানা তুমি নাও।—পয়সায় কুলোলে তোমার জন্যে চিরুণীখানাও কিনতুম। আমার বড্ড পছন্দ হয়েছিল।"—বলিয়া মেয়ে পাকা গিন্নীর মত জিনিসগুলি বাহির করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে রাখিল।

মেয়ের গিন্নীপণার ঘটা দেখিয়া জগদীশ বাবু হা হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন; কিন্তু মেয়ের ও তাঁহার বাপের আক্কেল দেখিয়া মা অবাক হইয়া গালে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

"বাবা, তিনটে পয়সা বাঁচিয়ে এনেছি।"—বলিয়া মেয়ে বাপের মণিব্যাগটা খুলিয়া পয়সা-তিনটি তাহার ভিতর রাখিয়া দিল। অতটুকু মেয়েব মুরুব্বিয়ানা দেখিয়া জগদীশ বাবুর বিস্ময়ের সীমা রহিল না—যেন সে সত্যই এই নাবালক ছেলেটির মা! কিন্তু ঝঙ্কার দিয়া মা বলিলেন, "একটা টাকা নিয়ে তার প্রায়-সব এখনই উড়িয়ে দিয়ে এলি? এমন হাবাতে মেয়ে ভূ-ভারতে আর দু'টি নেই!"

"করব না? সে দিন নিজে কাঁসারীর কাছে চার টাকার জিনিস কিনলে, তাতে দোষ হয়নি! আমি কি তোমাকে তা কিনতে বারণ করেছিলুম? আর আমাকে কিছু কিনতে দেখলেই তোমার রাগ! আবার আমাকে হাবাতে বলা হচ্ছে!"

"দাঁড়া, তোর সব জিনিস ফেলে দিচ্ছি।"

"ইস্! তা আর দিতে হয় না!"

"তবে দেখ্, আমার কথা সত্যি কি না।"

"দেখ দেখি বাবা! মা সব জিনিস ফেলে দিতে চাচ্ছে। এ-সব জিনিস কিনতে পয়সা লাগেনি বুঝি?"—বলিয়া সে আঁচলে জিনিসগুলি তাড়াতাড়ি তুলিয়া-লইয়া বাপের চেয়ারের পিছনে গিয়া আশ্রয় লইল।

জগদীশ বাবু তাহাকে আড়ালে রাখিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, "আহা, কর কি? দেখছ না, মনের কষ্টে মায়ের আমার মুখখানা শুকিয়ে গেছে!"

মা মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "যা খুশী তাই কর বাছা! ঐ টাকাটা থাকলে কেরোসিন তেলের বাকি দামটা চুকিয়ে দিতুম।"

মেয়ে বলিল, "কেরোসিন তেল কাজেব জিনিস, আর এগুলোর বুঝি দরকার নেই? কি যে তোমার বুদ্ধি!"—মেয়ের কথায় মা না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না।

মাকে হাসিতে দেখিয়া মেয়ে তাহার কাছে আসিয়া উৎসাহভরে বলিল, "তোমার আরশী ভেঙ্গে গিয়েছে, মা, তাই ওটা কিনেছি। এটা ছোট—এখন এতেই মুখ দেখ। আর এক দিন এই এ-তো বড় আরশী তোমায় কিনে দেব। তুমি দুঃখু কোরো না বাছা!"

এই কথা বলিতে বলিতে মেয়ে মায়ের কোলে উঠিয়া দুই হাতে তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিল। মা সস্নেহে তাহাকে বুকে চাপিয়া-ধরিয়া তাহার মুখচুম্বন করিলেন।

* * * * *

আট বৎসর অতীত হইয়াছে। তুলালী এখন ষোড়শী তরুণী—ধনবানের একমাত্র পুত্রের আদরিণী পত্নী।

জগদীশ বাবুর একমাত্র পুত্র হরিশ এম্-এ পাশ করিয়া কোন সরকারী কলেজের অধ্যাপক হইয়াছে। জগদীশ বাবু তাহার বিবাহ দিয়া পুত্রবধূ ঘরে আনিয়াছেন।

২

"গোবিন্দ—গোবিন্দ!" বলিতে বলিতে সন্তোনিদ্রোত্থিত জগদীশ বাবু খোলা জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, পূর্ব্বাকাশ লোহিত অরুণালোকে সুরঞ্জিত হইয়াছে। তিনি একটা তুঃস্বপ্ন দেখিয়াছিলেন; তাই তাঁহার চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু তখনও টল্-টল্ করিতেছিল। তিনি শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। গৃহিণী অন্নপূর্ণা কিছু পূর্ব্বেই শয্যা ত্যাগ করিয়া গৃহকর্ম্মে রত হইয়াছিলেন। জগদীশ বাবু গোবিন্দ-নাম উচ্চারণ করিতে করিতে গৃহদেবতার দ্বারে আসিয়া দেবচরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হে গোবিন্দ, আমার তুঃস্বপ্ন সুস্বপ্ন কর। এ আমাকে কি বিভীষিকা দেখালে গোবিন্দ! আমার মনে শান্তি দান কর,—প্রাণাধিকা তুলালীকে রক্ষা কর দেব!"

অন্নপূর্ণা স্বামীকে সেখানে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "এ কি! তুমি এত সকালেই উঠেছ যে?"

জগদীশ বাবু আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "গিন্নি!—" তাঁহার মুখ দিয়া আর কোন কথা বাহির হইল না।

অন্নপূর্ণা অস্ফুট উষালোকে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া চমকিয়া উঠিলেন; ব্যাকুল স্বরে বলিলেন, "এ কি! তোমার মুখ এ রকম শুকনো দেখাচ্ছে কেন? কি হয়েছে?"

জগদীশ বাবু কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "একটা দারুণ তুঃস্বপ্ন দেখেছি গিন্নি, দেখলুম - যেন তুলালী—ওঃ!"—মুখের কথা তিনি শেষ করিতে পারিলেন না।

"তুলালী কি?"

"সে কথা আমি বলতে পারব না; সে কথা আমার মুখ দিয়ে বেরুবে না!"

ব্যাকুল স্বরে অন্নপূর্ণা বলিলেন, "তুমি এখনি যাও, তার খবর নিয়ে এস। ওগো, তোমার কথা শুনে আমার বুকের ভেতর কি যে করছে!"

"আমি যাচ্ছি।"

"আমি ঠাকুরের তুয়ারে এই বসে রইলুম; তুমি ফিরে না এলে এখান থেকে উঠব না।"

জগদীশ বাবু তখনই বাহির হইয়া পড়িলেন। কলিকাতাতে তাঁহার কন্যার শ্বশুরালয়। তাঁহাদের বাস-গ্রাম হইতে কলিকাতার দূরত্ব প্রায় দশ ক্রোশ—ট্রেণে মাত্র এক ঘণ্টার পথ। তিনি মেয়ের শ্বশুরবাড়ী উপস্থিত হইয়া যাহা শুনিলেন, তাহাতে তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল! কন্যা কঠিন রোগে শয্যাশায়িনী। তিনি কন্যার রোগ-শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আকুল কণ্ঠে ডাকিলেন, "মা তুলালী!"

বাপের কণ্ঠস্বর শুনিয়া মেয়ের ম্লান মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; সে ক্ষীণ স্বরে বলিল, "বাবা, তুমি এসেছ?"

"হ্যাঁ মা! কি হয়েছে তোমার?"

যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখে মেয়ে বলিল, "বড়ই যাতনা, বাবা!"

"কি যাতনা মা?"

"বুকে দারুণ ব্যথা।"

জগদীশের মুখ ভয়ে শুকাইয়া গেল।

এই সময় ডাক্তার আসিলেন; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জামাতা পরেশও সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। ডাক্তার রোগীকে পরীক্ষা করিয়া, ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিয়া, এবং দর্শনীর টাকাগুলি পকেটে ফেলিয়া বিদায় হইলেন। জগদীশ বাবু তাঁহার অনুসরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রোগটা কি ডাক্তার বাবু?"

"জ্বর, সঙ্গে সঙ্গে হৃদ্‌যন্ত্রের দুর্ব্বলতা।"

জগদীশ বাবু স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। ডাক্তার বাবু মোটরে পা দিতেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কি ওকে স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়া যায় না?"

"অসম্ভব; তবে এক সপ্তাহ পরে এ বিষয়ের আলোচনা চলতে পারে—যদি অবস্থার কিছু উন্নতি দেখা যায়।"

জগদীশ বাবু মেয়েকে আবার দেখিয়া এবং তাহাকে আশ্বাস দান করিয়া বাড়ী ফিরিলেন। অন্নপূর্ণা সকল কথা শুনিয়া স্পন্দিত বক্ষে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিলেন।

ইহার পর জগদীশ প্রত্যহ সকালে আহারাদি করিয়া কলিকাতায় গমন করেন এবং সমস্ত দিন মেয়ের কাছে থাকিয়া, তাহার চিকিৎসার তদ্বিরাদি করিয়া সন্ধ্যার পর গৃহে প্রত্যাগমন করেন।—এই ভাবেই তিনি দিনের পর দিন কাটাইতে লাগিলেন।

এক সপ্তাহ পরে ডাক্তার বলিলেন, "এখন ইচ্ছা করলে নিয়ে যেতে পারেন, তবে দেখবেন, বেশী 'জারকিং' না লাগে। শরীরে ত কিছু নেই।"

"আমি মোটরে করে নিয়ে যাব।"

"সেই ভাল। স্থান-পরিবর্ত্তনে রোগীর উপকার হওয়াই সম্ভব।"

ডাক্তারের উপদেশ শুনিয়া জামাতা বা বাড়ীর অন্য কাহারও আপত্তির কোন কারণ ছিল না; বরং বধূর উপকারের সম্ভাবনায় সকলেই এই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

সেই দিনই জগদীশ বাবু ট্যাক্সি করিয়া তুলালীকে স্বগৃহে লইয়া চলিলেন।

তুলালীকে দেখিয়া অন্নপূর্ণা কপালে করাঘাত করিয়া আর্ত্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "মা রে! এ কি চেহারা হয়েছে তোর?"—তাঁহার মুখে আর কোন কথা সরিল না।

জগদীশ বাবু সান্ত্বনার স্বরে বলিলেন, "ভয় কি? সেরে যাবে।" —মুখে তিনি এই কথা বলিলেন বটে, কিন্তু সেই তুঃস্বপ্ন নিরন্তর তাঁহার মন আতঙ্কে অভিভূত করিয়া রাখিল।

স্থান-পরিবর্ত্তনেই হউক, আর ঔষধের গুণেই হউক, তুলালী কয়েক দিন বেশ সুস্থ রহিল—দেহের লাবণ্যও যেন কিছু ফিরিয়া আসিল; কিন্তু পরে হঠাৎ দেখা গেল, আহারে তাহার রুচি নাই! মৌরলা মাছ-ভাজা সে অত্যন্ত ভাল বাসিত, কিন্তু তাহাও সে আর মুখে তুলিতে পারিল না।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভাল লাগে? যা খেতে ইচ্ছা হয় বল, তাই ক'রে দিচ্ছি।"

"কিছুই খেতে পারছি নে মা!"

সেই দিন বিকালে ডাক্তার রোগিনীকে পরীক্ষা করিয়া মুখ বাঁকাইলেন। রোগ ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিল! জগদীশ ও অন্নপূর্ণা কম্পিত হৃদয়ে দিবারাত্রি বিপত্তারণ মধুসূদনকে ডাকিতে লাগিলেন। দুঃস্বপ্নের বিভীষিকায় তাঁহাদের আহার-নিদ্রা ত্যাগ হইল।

এক দিন সন্ধ্যার পর দুলালী ডাকিল, "বাবা!"

"কি, মা!"

"তুমি যে আমাকে দশটা টাকা দেবে বলেছিলে?"

"দেব বৈ কি মা।"

"তবে দাও।"

"এখন টাকা নিয়ে কি করবি মা?"

"রেখে দেব।—তুমি দাও না।"

হাসিয়া জগদীশ বাবু বলিলেন, "পাগলী মেয়ে! আচ্ছা দিচ্ছি, নিয়ে রাখ।"

সাগ্রহে হাত বাড়াইয়া দুলালী পিতার প্রদত্ত নোটখানি গ্রহণ করিল, এবং বিছানার তলা হইতে নিজের 'বাক্স' বাহির করিয়া নোটখানি তাহার ভিতর রাখিয়া দিল; তাহার পর বলিল, "দেখলে বাবা, কেমন পাওনা টাকা আদায় করলুম?"

জগদীশ বাবু চমকাইয়া উঠিলেন। দুলালী বলে কি? পাওনা টাকা আদায় করলুম!—বলিলেন, "আরো ত পাওনা আছে মা।"

হাসিয়া দুলালী বলিল "না, আর কিছু পাওনা নেই, সবই আদায় করেছি বাবা।"

জগদীশ বাবু ব্যাকুল কণ্ঠে বলিলেন, "ছি মা! ও কথা কি বলতে আছে? পাওনার কি শেষ নেই?"

অন্নপূর্ণা সেখানে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দুলালী কি বলছে?"

"বিশেষ কিছু নয়।—বৌমা কোথায়?"

"রান্নাঘরে।"

"হরিশ এসেছে?"

"হ্যাঁ, হাত মুখ ধুচ্ছে।"

"তবে আমি একবার ঘরে আসি।" বলিয়া জগদীশ বাবু বাহিরে চলিলেন।

সে দিন সকাল হইতে দুলালী ভালই ছিল, সহজ ভাবেই আলাপ করিতেছিল, বৌদিদির সহিত ঠাট্টা-তামাসাও করিতেছিল। তাহার পিতামাতা তাহার স্ফূর্ত্তি দেখিয়া কতকটা আশ্বস্ত হইলেন। বেলা ১০টার সময় জগদীশ বাবু বাহিরে যাইবার পর গৃহিণী গৃহকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। হরিশের আজ ছুটী; সে নিজেই ডাক্তারের ঔষধালয়ে ঔষধ আনিতে গেল। বধূ রন্ধনশালার কার্য্যে ব্যস্ত।

দুলালী বিকৃত স্বরে ডাকিল, "মা!"

গৃহিণী তাহার আহ্বান শুনিয়া ব্যগ্র ভাবে বলিল "যাই মা!"—মা তাড়াতাড়ি মেয়ের নিকটে আসিয়া দেখিলেন, দুলালী শয্যায় উঠিয়া বসিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে, আর চোখের ভঙ্গী অস্বাভাবিক! মা ব্যাকুল ভাবে বলিলেন, "কি রকম কষ্ট হচ্ছে মা?"

দুলালী হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "বাবা কোথায় মা?" শঙ্কাকুল চিত্তে মা বলিলেন, "বাইরে গেছেন, এখনি আসবেন।"

সেই ভাবেই দুলালী বলিল, "বাবাকে ডাক শীগ্‌গির!"

জগদীশ বাবুকে ডাকিতে হইল না; তিনি তখনই সেখানে আসিয়া পড়িলেন। দুলালীর অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল! তিনি কম্পিত কণ্ঠে ডাকিলেন, মা দুলালী!"

দুলালী তখনও বসিয়া ছিল; কিন্তু চক্ষুর তারা যেন ক্রমেই উল্টাইয়া আসিতেছিল। কোনও মতে চক্ষু স্থির করিয়া সে বাপের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "বাবা! জল!—বাবা—"

জগদীশ বাবুর সর্ব্বাঙ্গ তখন কাঁপিতেছিল—তিনি তাড়াতাড়ি কম্পিত হস্তে গ্লাস লইয়া তাহার মুখে জল দিলেন। দুলালী বলিল, "আঃ বাবা—"

তাহার মুখ দিয়া আর কোন কথা বাহির হইল না,—সে বিছানায় ঢলিয়া পড়িল! সঙ্গে সঙ্গে জগদীশ বাবু চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "দুলালী—মা!"

তাঁহার সংজ্ঞাহীন দেহ মাটীতে লুটাইয়া পড়িল।

অন্নপূর্ণা এতক্ষণে সবই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। "মা রে, চল আমিও তোর সঙ্গে যাই"—বলিয়া তিনি জলের ঘটাটি তুলিয়া লইয়া সজোরে বক্ষে আঘাত করিলেন, আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই মূর্চ্ছা! সেই মুহূর্ত্তে বধূ সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া পাষাণ-মূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল।

* * * *

শ্মশানের কাজ শেষ হইয়াছে। ঘাট হইতে সকলে ফিরিয়াছে; কিন্তু জগদীশ বাবু সেই যে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন, এখনও তাঁহার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসে নাই। অন্নপূর্ণার জ্ঞান ফিরিয়াছে বটে, কিন্তু আঘাতের জন্য বুকে অসহ্য যন্ত্রণা। ডাক্তার সন্দেহ করিলেন, তাঁহার বুকের অস্থি স্থানচ্যুত হইয়াছে! সুতরাং পরীক্ষার জন্য তাঁহাকে মেডিকেল কলেজে পাঠানই কর্ত্তব্য মনে হইল। অন্নপূর্ণার পিত্রালয় সেই গ্রামেই। তাঁহার এক ভ্রাতা তখনই তাঁহাকে লইয়া কলিকাতায় যাত্রা করিলেন।

হরিশ এই বিপদে মুহ্যমান। সে যে কি করিবে, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। সে পিতার শয্যাপার্শ্বে স্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিল।

ডাক্তার আসিয়া রোগীকে পরীক্ষা করিলেন। হরিশ উৎকণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন দেখলেন ডাক্তার বাবু?"

"ভয় নেই। বোধ হয় এখনি জ্ঞান ফিরে আসবে।"

ডাক্তারের কথা সত্য হইল। জগদীশ বাবু ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন করিয়া ডাকিলেন, "দুলালী!"

তার পর তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিলেন। হরিশ তাঁহাকে উঠিতে দিল না। অবসন্ন ভাবে তিনি ডাকিলেন, "মা দুলালী! কোথায় তুই? ওরে আমার নয়নের মণি! আমি যে—"

ডাক্তার বাধা দিয়া বলিলেন, "আপনি স্থির হোন। আমি ভাল করে একবার দেখি?"

তিনি পুনরায় তাঁহাকে পরীক্ষা করিলেন। হরিশের মনে হইল, ডাক্তারের মুখ যেন মুহূর্ত্তের জন্য বিকৃত হইয়াই আবার স্বাভাবিক হইল। ভয়ে হরিশের মুখ শুকাইয়া গেল।

জগদীশ বাবু আবার ডাকিলেন, "মা!" চারি দিকে চাহিয়া তিনি আবার উঠিবার চেষ্টা করিলেন।

ডাক্তার বলিলেন, "আপনি উঠবেন না।"

"কেন ? আমার কি হয়েছে ? দেখুন, এই আমি উঠে বসছি !"

ডাক্তার আর বাধা না দিয়া তাঁহাকে ধরিয়া শয্যায় বসাইয়া দিলেন। জগদীশ বাবু চারি দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দুলালী কই ?—কোথায় আমার মা ?"

ডাক্তার অম্লান বদনে বলিলেন,—"শ্বশুরবাড়ী গেছে।"

"শ্বশুরবাড়ী ! কখন গেল ? আমাকে ব'লে গেল না ? তার যে বড় অসুখ ?"

"কি ক'রে বলবে। আপনি যে অসুস্থ হ'য়ে পড়ে ছিলেন।"

"আপনি ঠিক বলেছেন ডাক্তার ! দুলালী শ্বশুরবাড়ী গেছে ?"

"এতে ত বেঠিকের কিছুই নেই, জগদীশ বাবু !"

"কিন্তু আমার যেন মনে হচ্ছে—ডাক্তার, ডাক্তার ! সত্য বল, আমি বড়ই ব্যাকুল হয়েছি ; বল – আমার মা কোথায় ?"

স্থির স্বরে ডাক্তার বলিলেন,—"আপনি অকারণ ব্যাকুল হচ্ছেন। আপনাকে স্তোক দিয়ে আমার লাভ কি ? জানেন ত, আমরা ডাক্তার, আমাদের হৃদয় বড় কঠিন।"

সংশয়জড়িত কণ্ঠে জগদীশ বলিলেন, "কিন্তু আমার যেন অস্পষ্ট ভাবে মনে হচ্ছে—অনেক লোক আনাগোনা করছে; অস্ফুট স্বরে তাদের আলোচনা চলছে,—আরও কত কি ?"

ডাক্তার গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ও কিছু নয় ; উহাই আপনার রোগের বৈশিষ্ট্য !"

"কে নিয়ে গেল ?"

"আপনার জামাই। সে আপনার অবস্থা দেখে আর এখানে রাখা সঙ্গত মনে করলে না। আমরাও সেই পরামর্শ দিলুম।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া জগদীশ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "গিন্নী কোথায় ?"

ডাক্তার বলিলেন, "তিনি মেয়ের সঙ্গে গেছেন,—নইলে কে তার সেবা-শুশ্রূষা করবে ? আপনার মেয়ের ত শাশুড়ী নেই।"

"তা বটে ! সে ভালই হয়েছে। আমিও যাই।"

ডাক্তার বাধা দিয়া বলিলেন, "আপনি এখন যাবেন না। সুস্থ হ'ন, তার পর যাবেন। দেখছেন ত, আপনি কত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছেন ?"

"তা হ'লে আমি কবে যেতে পারব ?"

"দেখুন, আপনি বিজ্ঞ। সেখানে একটা অত-বড় রুগী রয়েছে। তার পর আপনি এই অবস্থায় যদি সেখানে যান, তাহলে তাঁরা ভারী ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। বিশেষতঃ, আপনার মেয়ে আপনার এই অবস্থা দেখলে শীগ্‌গির সেরে উঠতে পারবে না। হয়ত তার রোগ ক্রমে বেড়েই উঠবে।"

ডাক্তারের কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "দুলালীর রোগ বেড়ে যাবে ? সম্ভব বটে ! সে যে আমাকে বড়ই ভালবাসে। ডাক্তার, আমি কত দিনে সেরে উঠবো ?"

"আমার ব্যবস্থা-মত চলুন, শীগ্‌গিরই সেরে উঠবেন।"—তার পর হরিশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এস হে হরিশ ! প্রেসকৃপসনখানা লিখে দিয়ে যাই।"

হরিশ এতক্ষণ গভীর বিস্ময়ে ডাক্তারের কথাগুলি শুনিতেছিল। সে ভাবিতেছিল—কোন্‌টা সত্য, ডাক্তারের কথা, না তাহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ? সে ধীরে ধীরে ডাক্তারের সহিত বাহিরে চলিয়া গেল। বধূ আসিয়া শ্বশুরের রোগশয্যা-পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

বাহিরে আসিয়া বিজ্ঞ ডাক্তার গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "দেখ হরিশ, যা বলি মন দিয়ে শোন। তোমার বাবাকে তোমার বোনের মৃত্যু-সংবাদ জানিয়ো না। তা শুনলে হঠাৎ উনি হার্টফেল করতে পারেন। দেখছ না, তোমার বোনের মৃত্যুর ঘটনা উনি ঠিক ধারণা করতে পারছেন না ? সেটা ওঁর ঠিক ধারণা হলে মনে হয় মৃত্যু অনিবার্য্য হ'য়ে উঠবে। তোমার মাকে সকল কথা বুঝিয়ে ব'লে তবে তাঁকে বাড়ীতে আনবে ; আর সকলকেই এ বিষয়ে সতর্ক করে দেবে।"

৩

চার বৎসর চলিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে পরেশ তাহার বৃদ্ধ পিতার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া আবার বিবাহ করিয়াছে। সে ধনবান্ পিতার মাতৃহারা একমাত্র পুত্র। দুলালীকে সে প্রাণের অধিক ভালবাসিত ; এ জন্য পুনরায় বিবাহ করিবার ইচ্ছা না থাকিলেও অবশেষে বৃদ্ধ পিতার কাতরতায় তাহাকে সঙ্কল্পচ্যুত হইতে হয়। সে দুলালীর বাল্যসখী অণিমাকে বিবাহ করিল। অণিমার সহিত দুলালীর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। তাই দুলালীর কথা আলোচনা করিয়া পরেশ ও অণিমা উভয়ের কেহই অশ্রু সম্বরণ করিতে পা'রল না।

জগদীশ বাবু সুস্থ হইয়াছেন বটে, কিন্তু দুলালী যে শ্বশুরবাড়ী আছে এ ধারণা দূর হয় নাই, এবং তাঁহার সেই ধারণা কেহই দূর করিবারও চেষ্টা করেন নাই ; সকলেই ডাক্তারের উপদেশেরই সমর্থন করিয়া আসিতেছে।

আরোগ্যলাভের পরই জগদীশ বাবু বলিলেন, "হরিশ, দুলালীকে এবার দেখে আসি।"

হরিশ পিতার এই প্রস্তাব শুনিবার জন্য প্রস্তুতই ছিল, সে বলিল, "সে ত কলকাতায় এখন নেই বাবা !"

"কলকাতায় নেই ! তবে কোথায় আছে ?"

"সিমলে পাহাড়ে হাওয়া বদলাতে গেছে।"

একটু ভাবিয়া জগদীশ বাবু বলিলেন, "তাকে দেখতে সেখানেই যাব হরিশ !"

"কি করে আপনাকে নিয়ে যাই ? আমার যে ছুটী পাওয়া দুর্ঘট বাবা !"

"তোর যাবার দরকার কি ? গিন্নীকে নিয়ে আমিই যাব।"

"তা কি হয় বাবা ? আপনার এই শরীর ! একলা অত দূর যেতে পারবেন কেন ?"

"খুব পারব, তুই সে জন্যে ভাবিস নে।"

"আপনি হয় ত পারবেন ; কিন্তু আপনাকে এ ভাবে পাঠিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত থাকব কি করে ? তবে না হয় একটা কাজ করি।"

জগদীশ বাবু আগ্রহভরে বলিলেন, "কি কাজ বাবা ?"

"ছুটীর দরখাস্ত করি, চেষ্টা ক'রে দেখি যদি ছুটী পাই। বড় সাহেব অবস্থা বুঝে ছুটী মঞ্জুর করতেও পারেন।"

জগদীশ বাবু খুসী হইয়া বলিলেন, "তাই কর বাবা !"

হরিশ বলিল, কিন্তু সাহেব এখন এখানে নাই— সদরে গিয়েছেন। জন-কতক লোক ছুটীতে আছে, তারা কাজে যোগ দিলেই ছুটী পাওয়া যেতে পারে।" ইত্যাদি নানা কথায় হরিশ তাঁহাকে কোন মতে থামাইয়া রাখিল।

এই ভাবে কিছু দিন কাটিলে জগদীশ বাবু আবার অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন ; অগত্যা হরিশকে বলিতে হইল, "দুলালী শীগ্‌গিরই দেশে আসছে বাবা ! পরেশ চিঠি লিখেছে।"

জগদীশ বাবু ব্যগ্র ভাবে বলিলেন, "কৈ—কৈ, পত্র দেখি।" বলিয়া তিনি হাত বাড়াইলেন। হরিশ পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া পিতার হাতে দিল।—এ পত্র সে পূর্ব্বেই সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল।

জগদীশ বাবুর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল, এ জন্য তিনি চশমা ব্যবহার করিয়াও পত্রখানি সুস্পষ্টরূপে পড়িতে পারিলেন না ; অগত্যা হরিশকেই পড়িতে বলিলেন।

পত্র পাঠ শেষ হইলে জগদীশ বাবু ব্যাকুল ভাবে বলিলেন "সে এলেই আমাকে নিয়ে যাবি ত বাবা ?"

"সে কথা আর কেন বলছেন ?"

আর এক সময় হরিশকে অগত্যা বলিতে হইল, "বাবা, দুলালী যে তোমাকে পত্র লিখেছে।"

"লিখেছে—লিখেছে ? দুলালী মা-আমার আমাকে পত্র লিখেছে ? দাও ত বাবা হরিশ ! সেই পত্র আমাকে দাও। দুলালী পত্র লিখেছে ? ওঃ, কত কাল পরে মা আমাকে পত্র লিখেছে !"

উদ্গত অশ্রু অতি কষ্টে সম্বরণ করিয়া হরিশ একখানি পত্র বৃদ্ধ পিতার কম্পিত হস্তে প্রদান করিল। বৃদ্ধ পত্রখানি সবলে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। তাহার পর হরিশকেই তাহা পড়িয়া তাঁহাকে শুনাইতে বলিলেন।

এই ভাবে সুদীর্ঘ চারি বৎসর কাটিয়াছে ; আর বুঝি চলে না। জগদীশ বাবু বলিয়াছেন, এবার তিনি কোন কথাই শুনিবেন না, যেমন করিয়াই হউক, দুলালীকে দেখিয়া আসিবেন। মধ্যে হরিশ বলিয়াছিল, পরেশ দুলালীকে পাঠাইতে চাহে না, তাই সে তাহার সহিত ঝগড়া করিয়া আসিয়াছে।

এ কথা শুনিয়া জগদীশ বাবু বলিয়াছিলেন, "তোমাদের ঐ বড় দোষ হরিশ ! জামাই মানুষ, তাকে ভগবান্ বিষ্ণুর মত সম্মানের চোখে দেখতে হয়—তা নয়, তার সঙ্গে ঝগড়া ! ছিঃ, কাজটা ভাল হয়নি।"

এই তিরস্কার হরিশকে নতশিরেই সহ্য করিতে হইল।

আবার সম্মুখে পূজা। পথে পথে ফেরিওয়ালার ভীড় ! যত ফেরিওয়ালা আসে জগদীশ বাবু সকলকেই ডাকেন, এবং দুলালী যে সকল জিনিস ভালবাসিত, তিনি সে সবই কিনিয়া স্তূপীকৃত করিতেছেন। গৃহিণী অন্নপূর্ণা অন্তরাল হইতে তাহা দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন না।

৪

"হরিশ !"

"মা !"

"কি হবে বাবা ? এবার বুঝি ওঁকে হারাতে হয় !"—সঙ্গে সঙ্গে মায়ের দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল।

সাহস দিয়া হরিশ বলিল, "তুমি কিছু ভেব না মা ! আমি সব ঠিক করছি।"

আঁচলে চোখের জল মুছিয়া অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিল, "কি করে কি করবি বাবা !"

"পরেশ কাকে বিয়ে করেছে জান মা ?"

"শুনেছি, সে অণিমাকে বিয়ে করেছে।"

"হাঁ, তাই। আমি পরেশের বাড়ীতে গিয়ে অণিমার সঙ্গে দেখা করেছিলুম।"

"দেখা করেছিলি ? সে কি বললে ?"

"কাঁদতে লাগল। বললে, দাদা, তুমি যা বলবে, বাবার জন্যে আমি তাই করব।"

বেঁচে থাক সে, তার হাতের নোয়া-অক্ষয় হোক ; কিন্তু বাবা—"

"তুমি ভেব না কোন ভয় নেই মা !"

"দেখিস বাবা, আমাকে শেষে যেন আত্মঘাতী হ'তে না হয়।"

"তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আজ আবার আমি পরেশের বাড়ী যাব।"

হরিশ পরেশের গৃহে যাত্রা করিল।

বাহিরের ঘরে বসিয়া জগদীশ বাবু নানাবিধ খেলনা, এসেন্স, তেলের মশলা, ফিতা, কাঁটা—প্রভৃতি জিনিস সাজাইয়া-গুছাইয়া রাখিতেছেন ; আর ভাবিয়া দেখিতেছেন, দুলালীর জন্য তাহার প্রিয় কোন জিনিস লইতে ভুল হইয়াছে কি না।

বাহিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া ভিখারী খঞ্জনী বাজাইয়া গাহিতে লাগিল,—

"যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী—"

জগদীশ বাবু বলিয়া উঠিলেন, "যাব, আমি নিশ্চয়ই যাব। আমার মাকে ঘরে নিয়ে আসব। কে ? পরেশ আমার মেয়েকে আটকে রাখবে ? হরিশ—হরিশ ?"

পিতার চীৎকার শুনিয়া হরিশ ত্রস্তপদে তাঁহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল ; গৃহিণীকেও দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইতে হইল।

রুদ্ধ কণ্ঠে জগদীশ বাবু বলিলেন, "হরিশ, সত্য বল, দুলালী কেমন আছে ?"

"ভাল আছে বাবা ! আপনি কেন ব্যস্ত হচ্ছেন ?"

"তবে আমি যাব। আর বাধা দিস নে হরিশ, শেষে কি মারা পড়বো ?"

"আমি ত বলেছি, আপনাকে নিয়ে যাব।"

"তবে আজই চল। ওরে আমার বুক যে ফেটে যাচ্ছে। ওঃ, কত কাল মাকে দেখিনি।"

ভিখারী তখনও গাহিতেছিল—

"অবলা করেছে বিধি—
তাইতে গিরি তোমায় সাধি—"

"ঐ শোন্ হরিশ, গিন্নীর বুকও অমনি ফেটে যাচ্ছে ! ওরে, দুলালী যে তাঁর জীবন। আজ কত দিন আমরা মাকে দেখিনি। ঐ দেখ হরিশ, তোর গর্ভধারিণী কাঁদছে,—চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে।"

হরিশ চাহিয়া দেখিল—তাহার মায়ের উচ্ছ্বসিত অশ্রুধারা আর বাধা মানিতেছে না !"

জগদীশ বাবু কাতর কণ্ঠে বলিলেন, "হরিশ, চ বাবা। আর আমি সইতে পারছি নে।"

"বেশ ত, আজই চলুন।"

"তবে চ।"—বলিয়া জগদীশ বাবু সেই সব জিনিস গুছাইয়া লইয়া উঠিতে উদ্যত হইলেন।

* * * *

ষষ্ঠীর সন্ধ্যা। জগদীশ হরিশের হাত ধরিয়া পরেশের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই সাগ্রহে ডাকিলেন, "দুলালী—মা! মা আমার!"

"এই যে বাবা!" বলিয়া এক তরুণী ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিবার জন্য মাথা নত করিল; কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে জগদীশের ব্যগ্র বাহুর বন্ধনে নিবিড় ভাবে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার বুকে মাথা রাখিয়া সে ডাকিল, "বাবা!"

তাহার মাথাটা বুকে চাপিয়া-ধরিয়া জগদীশ বাবু উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "মা! আঃ, এত দিনে আমার বুক জুড়াল।"

বৃদ্ধের অবারিত অশ্রুধারায় তরুণীর বসন সিক্ত হইতে লাগিল।

সতীপতি বিদ্যাভূষণ।

শেষ প্রশ্ন

হে পৃথিবী আর নয়—
মহিমান্বিত তোমার দানের করিয়াছি অপচয়!
উপল কুড়ায়ে মেটে নাই সাধ লবণাম্বুর তীরে,
ভিক্ষার ঝুলি সম্বল করি তাই আসি ফিরে ফিরে—
আমারে যা কিছু দিয়েছ জননি হিসাব রাখিনি তা'র,
অমা-নিশীথের বক্ষ ভেদিয়া জীবন্ত উল্কার—
বহু-বিকীর্ণ জ্যোতির শিশুকে বিচার করিয়া দেখি
যার লাগি মোর এত আনাগোনা ফিরে আসিয়াছে সে কি?

পাই নাই তার দেখা—
কঙ্কর-পথে পাথেয়-শূন্য আমি চলিয়াছি একা,
মানুষের সাথে মিতালী করিয়া মনের পরশে তার
ঘোচে নাই মোর কলঙ্ক-টীকা, যায় নাই অন্ধকার!
শারদ রাতে রজনীগন্ধা কত বার যায় কেঁদে
তাহাদের লাগি হে আদি-জননি সবুজ আঁচলে বেঁধে
আর রাখিও না, ডেকে লও মোরে কঠিন মাটির তলে
মৃত্যু-তুহিন গর্ভে তোমার নামহারাদের দলে!

শেষ বাঁশরীর সুরে,
মানবাত্মার উষর জমীতে আপনারে ভেঙ্গে-চুরে,
মিশাবার আগে খুঁজিয়া দেখিব আঁধারের বুকে চুপে,
ভাগ্যলক্ষ্মী বন্দিনী কি না কপোলাস্থির স্তুপে!
এত দিনকার দুঃখ-সুখের অযাচিত মালাখানি
সে দিনের মোর পরিচয় দিতে আসিবে না কাজে জানি,
তবু আশা আছে মৌন অতীত আঁধারের কারাগারে
শেষ প্রশ্নের উত্তর লাগি দেখা দিতে হবে তারে!

মুখোমুখি তার চেয়ে—
বলিব বন্ধু, হয়েছ কি সুখী মোর সন্ধান পেয়ে?
মহা নিখিলের হে অভিসারিকা এই ছিল যদি মনে—
কল্পনাতীত মহাসমুদ্র মন্থন করা ধনে
শত শহিদের কবরগুলিরে সাজায়ে রাখার ছলে
রেখে দিয়ে যাবে চিরব্যর্থতা জীবনের শতদলে,
আমাদের কেন ডেকে এনেছিলে ক্ষণিকের বুদ্বুদ,
তৃষ্ণার জল কেড়ে নিয়ে মোর মিটেছে কি তব সুদ?

শ্রীঅমর ভট্ট।

রাজকন্যা অশ্রু

[রূপকথা]

রাজকন্যা অশ্রু। বৃদ্ধ রাজার একমাত্র মেয়ে। ফুলের মত সুন্দর মুখ—আর ফুলের পাঁপড়ির মত কোমল তার হাত-পা। মেয়ে নয় ত যেন স্বর্গের পারিজাত।

রাজকন্যা ভূমিষ্ঠ হ'ল—রাণীও অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। সোণার সংসার ত্যাগ করতে তাঁর মায়া হ'ল, তাই দুই চক্ষুতে দুই বিন্দু অশ্রু টল্ টল্ করতে লাগল। রাণীকে হারিয়ে রাজাও অশ্রু ত্যাগ করলেন; তিনি নিশ্বাস ফেলে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে মেয়ের নাম দিলেন—অশ্রু।

রাজকন্যা অশ্রু শুক্লপক্ষের চাঁদের মত দিন দিন বড় হয়। রাজার নয়নের মণি, রাণীর প্রতিবিম্ব, রাজকন্যা কাঁদলে সমস্ত রাজপুরী চঞ্চল হয়ে ওঠে—হাসলে সকলের মুখে হাসি ফুটে ওঠে।

রাজার পুত্রসন্তান নেই। অশ্রু রাজার একমাত্র উত্তরাধিকারিণী—রাজ্যের ভবিষ্যৎ মহারাণী। রাজা মেয়ের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন। অশ্রু নানা বিদ্যা শিক্ষা করতে লাগল।

২

রাজকন্যা রোজ সকালে বাগানে ঘুরে বেড়ায়। ফুলগুলির সঙ্গে খেলা করে, হাসে, কথা বলে। আনন্দে গাছের শাখা থেকে ফুলগুলি রাজকন্যার মাথায়, গায়ে টুপটাপ ঝ'রে—পড়ে। ফুলগুলি যেন অশ্রুর সখী।

এমনি এক সকালে রাজকন্যা বাগানে বেড়াতে বেড়াতে শুনল, কা'রা যেন রোদন কচ্ছে—অতি করুণ সে রোদন। তাড়াতাড়ি সে বাগানের ধারে গিয়ে দেখে, একটি স্ত্রীলোক; পরিধানের বসনখানি তার মলিন, শতছিন্ন, সঙ্গে তিন-চারিটি উলঙ্গ ছেলে-মেয়ে,—যেন মূর্ত্তিমতী দারিদ্র্য—চীৎকার করে রোদন কচ্ছে।

অশ্রু স্ত্রীলোকটিকে বলল,—কি হয়েছে তোমাদের, অমন করে কাঁদছ কেন?

স্ত্রীলোকটি মুখ তুলে দেখে, সামনে পরীর মত ফুটফুটে পরমা সুন্দরী একটি মেয়ে! সে কেঁদে বলল,—মা, আজ তিন দিন থেকে ভাতের একটি কণাও আমাদের পেটে পড়েনি।

তার দুঃখের কথা শুনে অশ্রু শিউরে উঠলো। ইস্! তিন দিন এরা না খেয়ে আছে! মনে পড়লো, এক দিন ঠাকুরমার উপর রাগ করে সে এক বেলা উপোস করেছিল—উঃ! ক্ষিদের সে কি কষ্ট! আর এরা তিন দিন না খেয়ে আছে? অশ্রুর চোখ দু'টি অশ্রুতে ভ'রে উঠল। সে তাড়াতাড়ি আঙুল থেকে হীরের আংটি খুলে দিয়ে তাকে বলল,—এই আংটিটি নিয়ে যাও—এটা বিক্রি ক'রে যে টাকা পাবে, তাতে অনেক দিন তোমাদের খাওয়া-পরা চলবে।

কত রকম আশীর্ব্বাদ করে স্ত্রীলোকটি চলে গেল। অশ্রু তার বাবাকে এসে বললে,—বাবা, আমাদের রাজত্ব থেকে দারিদ্র্য-দুঃখকে চিরকালের জন্যে বিদায় দেওয়ার ব্যবস্থা কর,—মৃত্যু ছাড়া আর কোন দুঃখ যেন প্রজাদের ভোগ করতে না হয়।

৩

বৃদ্ধ রাজা আর তাঁর প্রধান মন্ত্রী দু'জনেই গভীর চিন্তায় মগ্ন। অনেক চিন্তার পর মন্ত্রী বললেন,—মহারাজ, উপায় একটা পেয়েছি বটে! কিন্তু ভয়ে বলি কি নির্ভয়ে বলি?

—কি উপায় মন্ত্রি, তুমি নির্ভয়ে বল।

—ভেবে দেখলাম, খুব অত্যাচারী কোন রাজপুত্রের সঙ্গে আমাদের রাজকন্যার বিয়ে দিলেই আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হবে।

—তার পর?

—তার পর আবার কি! মহারাজ! আমাদের রাজকন্যা সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা,—আর তাঁর স্বামী হবেন দয়ামায়াহীন, নিষ্ঠুরের অবতার! তাঁদের দু'জনে মিলে যে প্রণালীতে ভবিষ্যতে এই রাজ্য শাসন করবেন, সেই শাসন-প্রণালী হবে আদর্শ রাজ্যশাসন-প্রণালী। একেবারে নির্দ্দোষ, নিখুঁত।

রাজা খুশী হয়ে বললেন, তোমার এই সিদ্ধান্তই ঠিক বলে মনে হচ্ছে মন্ত্রি! অশ্রু বলে,—রাজ্যের সকল প্রজাই রাজার কাছে সমান। এক জন খেতে-পরতে পাবে না, শোবার বিছানা পাবে না, আর এক জন সব রকম উৎকৃষ্ট খাবার খেয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সুকোমল শয্যায় শুয়ে সুখে নিদ্রা যাবে,—এ কখন সঙ্গত হতে পারে না। এ অত্যন্ত অবিচার।—প্রজার জন্যই রাজা। প্রত্যেক প্রজার সুখ-সুবিধার বন্দোবস্ত করবার শক্তি যে-রাজার নেই, তাঁর রাজত্ব ত্যাগ করাই উচিত। কিন্তু অশ্রু বুঝতে পারে না—গরীব চিরকালই রাজ্যে বাস করবে, পৃথিবীতে দরিদ্র ছাড়া কোন রাজ্য নেই, থাকতে পারে না। সংসারে গরীব আছে বলেই ধনীর মর্য্যাদা—ধনীর গৌরব!

তুমি ঠিকই বলেছ, মন্ত্রি! দেশে দেশে, সহরে সহরে ঢোল পিটিয়ে ঘোষণা কর, পৃথিবীর মধ্যে যে রাজপুত্র সবচেয়ে নিষ্ঠুর, যার হৃদয়ে দয়ামায়ার লেশমাত্র নেই, স্নেহ-মমতার সঙ্গে যার পরিচয় নেই, যার হৃদয় পাষাণের মত কঠিন,—সেই রাজপুত্রের সঙ্গেই অশ্রুর বিয়ে দেব।

৪

এক দিন সকালে রাজবাড়ীর খিড়কীর ফুলবাগানে একলা ব'সে রাজকন্যা অশ্রু আপনমনে সোনার সাজি-ভরা ফুটন্ত ফুলের মালা গাঁথছে। ফুলের সৌরভে বাগান আমোদিত হয়েছে! হঠাৎ কে যেন কোথা থেকে ডাকল,—অশ্রু, রাজকন্যা অশ্রু!

অশ্রু মুখ তুলে চারি দিকে চেয়ে দেখল, কিন্তু কৈ, কেউ ত কোন দিকে নেই—তবে তাকে ডাকলে কে! কাউকে দেখতে না পেয়ে রাজকন্যা আবার মাথা নত করে একমনে মালা গাঁথতে লাগল।

কিন্তু আবার সেই কণ্ঠস্বর, অতি কোমল, অতি মধুর। অশ্রু আবার শুনল,—রাজকন্যা অশ্রু! শোন, তোমায় একটা কথা বলব।

এবার অশ্রু চেয়ে দেখতে পেল, একটি কাল ভ্রমর একটা ফুটন্ত গোলাপ ফুলের চারি দিকে ঘুরে ঘুরে উড়ছে, আর অশ্রুর নাম ধরে ডাকছে! অশ্রু অবাক্ হয়ে সেই ভ্রমরটার দিকে চেয়ে রইল।

ভ্রমর তেমনি উড়তে উড়তে বলল,—রাজা তোমার বিয়ে ঠিক করেছে অশ্রু,—পৃথিবীর সব চেয়ে নিষ্ঠুর রাজপুত্রের সঙ্গে। সেই রাজপুত্রের রাজ্যের কোন প্রজা খাজনা না দিলে হাটের মাঝে তার অর্দ্ধেক অঙ্গ পুঁতে, তার উপর কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হয়। আর কুকুর তাকে খণ্ড খণ্ড করে ছিঁড়ে খায়! এতটুকুও দয়ামায়া কাকেও কখনো দেখায় না সেই রাজপুত্র।—সেই নির্ম্মম, নিষ্ঠুর রাজপুত্রের সঙ্গে হবে তোমার বিয়ে! প্রজার প্রতি তোমার এত দয়ামায়া—ছোট-বড় সকল প্রজার প্রতি তোমার সমদৃষ্টি রাজার ভাল লাগে না। তিনি তা চান না, তাই তোমার বাবা—রাজা এই ব্যবস্থা ক'রেছেন।

ভ্রমরের কথা শুনে অশ্রুর বুক কেঁপে উঠল, চোখের সামনে সে সব ঝাপ্‌সা দেখতে লাগল; তার মনে হল, পৃথিবী তার পায়ের তলা থেকে সরে যাচ্ছে; জগৎ শূন্য, অন্ধকারপূর্ণ ব'লে তার মনে হ'ল। মনে হ'ল, পৃথিবী যেন এক বিশাল মরুভূমি, নির্জ্জন, নীরস; মরু-বালুকা চতুর্দ্দিকেই ধূ-ধূ করছে!

আভাসে ইঙ্গিতে অশ্রু পূর্ব্বেই জান্‌তে পেরেছিল—এক নিষ্ঠুর রাজপুত্রের সঙ্গে শীঘ্রই তার বিয়ে হবে; কিন্তু কথাটা তার বিশ্বাস হয়নি। ভ্রমরের কথা শুনে সে ভাবল,—সবই সত্যি তাহ'লে! সে শিক্ষা পেয়েছিল, মানুষের সেবাই ঈশ্বরের সেবা—"সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।" তার এই বিশ্বাস রাজা সত্যই কি ব্যর্থ করবার সঙ্কল্প করেছেন? অশ্রু অবাক্ হ'য়ে ভ্রমরের দিকে চেয়ে রইল।

ভ্রমর অশ্রুর কাতরতা লক্ষ্য করে কোমল স্বরে বলল,—তোমার কোন ভয় নেই রাজকন্যে! আমি তোমাকে বলে দেব—কি উপায়ে তুমি এই বিপদ থেকে উদ্ধার লাভ করবে।

ব্যাকুল কণ্ঠে রাজকন্যা তাকে বলল,—বল ভ্রমর, কি উপায়ে আমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হবে। এ বিপদ থেকে আমি কিরূপে উদ্ধার পাব?

ভ্রমর বলল,—আজ থেকে সাত দিন পরে এই ফুলবাগানে এলে দেখতে পাবে, বাগানের ঠিক উত্তর কোণের ঐ গোলাপ-গাছটিতে একটিমাত্র ফুল ফুটে আছে। সেই ফুলটি তুলে তুমি খোঁপায় গুঁজবে। তাহলে কেউ তোমাকে আর দেখতে পাবে না; অথচ তুমি সবই দেখতে পাবে। তার পর এই রাজ্য ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবে, এক বৎসরের মধ্যে তুমি এ রাজ্যে আর ফিরে আসবে না। যদি এক বৎসরের মধ্যে এ রাজ্যে প্রবেশ কর, তাহ'লেই তোমার সর্ব্বনাশ হবে—তোমার মৃত্যু অনিবার্য্য! এক বৎসর পরে সব আবার ফিরে পাবে। তোমার সাধু সঙ্কল্পে কেউ আর তখন বাধাদান করতে পারবে না। আমি তোমার হিতৈষিণী, আমার এ সব কথা ভুলো না অশ্রু!

গুন্-গুন্ শব্দে ভ্রমর উড়ে গেলো। রাজকন্যা যেন চিন্তার অকূল সাগরে ভেসে চ'লল।

৫

রাজকন্যার বিয়ের সব আয়োজন শেষ। সমস্ত রাজ্য জুড়ে হুলুস্থুল ব্যাপার! কিন্তু রাজকন্যার মনে সুখের লেশমাত্র নেই। বৃদ্ধ পিতার উপর দুরন্ত অভিমান তার বুক জুড়ে বাসা বেঁধেছে। অনেক ভাবনা-চিন্তার পর সে ঠিক করেছে, এক বৎসর অদৃশ্য হয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবে—তবুও নিষ্ঠুর অত্যাচারীর গলায় মালা দিয়ে সেই মহাপাপ তার পিতার রাজ্যে ডেকে আনতে পারবে না। মাত্র ত একটি বৎসর—সে আর কি এমন দীর্ঘকাল? তার পর যদি সব হয়—তার স্বপ্ন সফল হয়—তাহ'লে এক বৎসর কেন, বারো বৎসরও সে বাপের রাজ্য থেকে অদৃশ্য হ'য়ে থাকতে বিন্দুমাত্র কাতর হবে না।

সাত দিন পরে রাজকন্যা ফুলবাগানে এসে সেই গোলাপ ফুলটি দেখতে পেল। সে তখনই তা তুলে নিয়ে খোঁপায় গুঁজতেই আশ্চর্য্য হয়ে দেখল—সে একটি কোকিল হয়ে গেছে! এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তনে মনটা তার ভয়ানক খারাপ হয়ে গেল—কিন্তু সে ক্ষণকালের জন্য; তার পর সে উড়তে উড়তে রাজ্য ছেড়ে চ'লে গেল।

ভ্রমর যখন দেখল, রাজকন্যা কোকিল হ'য়ে উড়ে দেশান্তরে চলে গেল, সে-ও সেই মুহূর্ত্তে রাজকন্যার রূপ ধারণ ক'রে ধীরে ধীরে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ ক'রল—যেন অশ্রুই ফুলবাগান হ'তে ফিরে এল। সুতরাং কেউ কিছুই জানতে পারল না, কারও মনে একটু সন্দেহ পর্য্যন্ত স্থান পেল না।

কিন্তু এই ভ্রমরটা সত্যিই আসল ভ্রমর ছিল না। সে ছিল একটি পরীবালা—নাম ছিল তার সুক্তা। কিছু দিন আগে এক দিন সে অশ্রুদের রাজপ্রাসাদের ছাদের উপর দিয়ে তার চিত্র-বিচিত্র পাখা মেলে উড়ে যেতে যেতে দেখল, একটি পরমা সুন্দরী মেয়ে অন্দরের ফুলবাগানে ফুল নিয়ে মালা গাঁথছে। মানব-নন্দিনীর এত রূপ সেই হিংসুটে পরী সুক্তা সহ্য করতে পারল না। ঈর্ষায় তার সর্ব্বশরীর জ্বালা করতে লাগল। পরী স্বস্থানে না ফিরে—রাজার সেই ফুলবাগানে এসে ভ্রমরের রূপ ধরে বাস করতে লাগল। অনিষ্টকারীর কখন সুযোগের অভাব হয় না। বৃদ্ধ রাজার এই দুর্ব্বলতার সুযোগে সুক্তা নিজের সঙ্কল্পসিদ্ধি করল।

মহা সমারোহে রাজকন্যা অশ্রুর রূপধারিণী পরী সুক্তার সঙ্গে পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম রাজপুত্রের বিয়ে শেষ হয়ে গেল। বৃদ্ধ রাজা মেয়ে-জামাইয়ের হাতে রাজ্যের শাসনভার ছেড়ে দিয়ে রাজকার্য্য হ'তে অবসর নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যে অত্যাচারের আগুন ধূ-ধূ ক'রে জ্বলে উঠল। সেই আগুনে রাজ্যের সুখ-শান্তি, সন্তোষ-আনন্দ সব দগ্ধ হ'য়ে গেল।

আসল রাজকন্যা দিন গণে আর বনে বনে কুহুস্বরে ডেকে ডেকে উড়ে বেড়ায়। তার প্রাণে অশান্তির আগুন জ্বলতে লাগল। কিন্তু উপায় কি?

৬

গভীর রাত্রি। নানা রকম পাখীর সঙ্গে কোকিলরূপিণী রাজকন্যা অশ্রু একটি গাছের ডালে বসে ঘুমের প্রতীক্ষা করছে। মনে তার কত কথা!—"সমস্ত রাজ্যে নিশ্চয়ই হৈ-চৈ পড়ে গেছে। বাবার চোখে আমারই মত হয় ত ঘুম নেই। ভেবে ভেবে তিনি হয় ত শুকিয়ে অর্দ্ধেক হয়ে গেছেন। দিকে দিকে কত লোক হয় ত আমার খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভারি ইচ্ছা করে এক বার দেশ দেখতে, বাবাকে দেখতে, বাড়ীর সকলকে দেখতে; কিন্তু দেশে ফিরলেই যে আমার সর্ব্বনাশ! মৃত্যু অনিবার্য্য!"—মনে মনে এই সব কথা বলে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে অশ্রু আবার ভাবল—"ছ' মাস ত কেটে গেছে, —আর ছ' মাসও দেখতে দেখতে কেটে যাবে। তার পর আবার আমি মানবী হব, নিজের শরীর পাবো,—রাজত্ব ফিরে পাব, বাবাকেও ফিরে পাব, প্রজাদের শাসনভার ফিরে পাব। আমায় ফিরে পেয়ে রাজ্যে আনন্দের স্রোত ব'য়ে যাবে।"—মনের আনন্দে সে কুহুধ্বনি ক'রে ডেকে উঠল।

হঠাৎ তার কানে গেল, এক জোড়া লক্ষ্মী-প্যাঁচার আলাপ! পুরুষ প্যাঁচাটি বলল,—এই মাত্র যে কোকিলটা কু-কু শব্দে ডেকে উঠলো, ওটা আসলে কোকিল নয় প্যাঁচানী! ও হচ্ছে রাজকন্যা অশ্রু।

প্যাঁচার কথা শুনে প্যাঁচানী বলল,—তাই না কি? এ ত ভারী মজার কথা! ও যদি রাজকন্যা অশ্রু, তা'হলে কোকিল হল কি করে?

—প্যাঁচা গম্ভীর হয়ে বলল,—সে অনেক কথা।

—প্যাঁচানী কৌতূহল দমন করতে না পেরে বলল,—তবু শুনি। সব কথা খুলে বল লক্ষ্মীটি!

—লক্ষ্মী-প্যাঁচা প্যাঁচানীকে খুসী করবার জন্য বলল,—সুক্তা পরী হিংসা করে ওকে কোকিল-পক্ষী করে—নিজে রাজকুমারী অশ্রুর বেশ ধ'রে পরম সুখে রাজত্ব করছে। তার নিষ্ঠুর অত্যাচারে প্রজারা জ্বালাতন হ'য়ে উঠেছে।

প্যাঁচানী বলল—বটে। আচ্ছা, আসল রাজকন্যা অশ্রু আর কি কখন মানুষ হতে পারবে না? আহা, বেচারার কি কষ্ট!

প্যাঁচা মাথা নেড়ে বলল,—তা পারবে বটে, কিন্তু সে না পারারই সামিল, কারণ, সে বড্ড কঠিন ব্যাপার! মান্দার দেশের রাজপুত্র আনন্দকে সুক্তা বিয়ে করতে চেয়েছিল; কিন্তু আনন্দ তাঁকে বিয়ে করতে রাজি হয়নি। তাই সুক্তা তাকেও কোকিল ক'রে, কোন্ বনে জানি না,—খাঁচায় বন্দী ক'রে রেখেছে। কোকিল-রূপিণী অশ্রু যদি কোকিলরূপী আনন্দকে খুঁজে বার করতে পারে, তবেই ওরা আবার মানুষ হতে পারবে। নইলে ঐ ভাবেই ওদের জীবন শেষ হবে।

প্যাঁচানী দুঃখিত হয়ে বলল—তাকে খুঁজে যদি বার করতে না পারে, তবে কি ওর দুঃখ কখন ঘুচবে না?

প্যাঁচা উত্তর দিল,—দুঃখ আর ঘুচবে কি করে? ছ'মাস পরেই অশ্রু মারা যাবে, আর আনন্দ মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কোকিল হয়েই থাকবে।

পেচকদম্পতি খাদ্য সংগ্রহ করতে সেই গাছ থেকে উড়ে গেল। কোকিলরূপিণী রাজকন্যা অশ্রু এতক্ষণ মহা বিস্ময়ে তাদের সকল কথাই শুনছিল—এবার তার ছোট্ট হৃৎপিণ্ডটি দুরু-দুরু ক'রে কেঁপে উঠল। ভয়ে, অনুশোচনায় নির্জ্জীবের মত হ'য়ে সে সেই স্থানেই বসে রইল। মনে মনে সে ভাবছিল, "হায়, কি ভুলই আমি করেছি! সুক্তা আমাকে ফাঁকি দিয়ে বিহঙ্গিনী ক'রে নিজে রাণী সেজে বসেছে—প্রজাদের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার করছে—নিজের ভোগবিলাসের জন্য। প্রজাদের উপর এতটুকু মায়া-মমতাও কি হয় না এই সর্ব্বনাশীর। হবেই বা কি ক'রে? ওটা ত আর তার নিজের দেশ নয়।"

কোকিলরূপিণী রাজকন্যা অশ্রুর সর্ব্বাঙ্গ মনের দুঃখে, রাগে জ্বলে উঠল। তার লাল লাল চোখ-দু'টি আরো লাল হ'য়ে উঠল। বিড়-বিড় ক'রে আপন মনেই বলল,—"প্রতিশোধ নিতেই হবে—অত্যাচারের প্রতিশোধ—শঠতার প্রতিশোধ। আনন্দর সঙ্গে মিলে আমার দেশের দুর্গতি দূর করতেই হবে। কিন্তু সময় ত আর বেশী নেই—মাত্র ছ'টি মাস!" তৎক্ষণাৎ সে আনন্দর সন্ধানে উড়ে চলল কোন অজানা দেশে।

৭

গাছ থেকে গাছে—বন থেকে বনে—দেশ থেকে দেশে, অশ্রু আনন্দর সন্ধানে উড়ে বেড়াতে লাগল। এক-একটা দিন যায়—আর উৎকণ্ঠায় তার বুকের রক্ত অনেকখানি শুকিয়ে উঠে। পরদিন নূতন উদ্যমে আবার আনন্দর খোঁজে উড়ে চলে। আনন্দকে যে তার চাই-ই।

কিন্তু কোথায় আনন্দ? উড়ে উড়ে তার ডানায় ব্যথা ধ'রে যায়। রাত্রেও মুহূর্ত্তের জন্য তার ঘুম নেই। কান পেতে সারা রাত্রি জেগে কাটায়—যদি কোন পাখী আনন্দ সম্বন্ধে কোন কথা তার কোন সঙ্গীকে বলে, বা আনন্দর সন্ধান জিজ্ঞাসা করে।

এই ভাবে একে একে পাঁচটি মাস কেটে গেল। শেষ মাসটিও যায় যায়—আর সাত দিন মাত্র বাকি! তার পর তার সব শেষ—চিরদিনের জন্য।

সে দিন ছিল পূর্ণিমা। পৃথিবীটা যেন সোনার জলে ধোয়া এক-খানা থালা—চক্-চক্ করছে। কোকিল-রাজকন্যা নিদ্রাহীন চোখে কান পেতে বসে আছে। শুনল, কে যেন বলছে—যা-ই বল না কেন, সুক্তা কিন্তু ভারী চালাক! কেমন চালাকি করে নিজের কাজ গুছিয়ে নিয়েছে, আর ওকে পায় কে?

সুক্তার নাম শুনতেই অশ্রু সচকিত হয়ে চেয়ে দেখল—সাতটি পরী পাখা মেলে আকাশপথে উড়ে যাচ্ছে। কোকিল-অশ্রুও তাদের পিছনে চুপি চুপি উড়ে চলল—যদি কোন সন্ধান পায়।

একটি পরী বলল,—আর সাত দিন—তার পরেই সুক্তার পথের কাঁটা নির্ম্মূল হবে যাবে; কিন্তু আনন্দ বেচারার জন্য বড্ড দুঃখ হয়। আহা, বেচারা! চিরজীবন তাকে কোকিল হয়েই থাকতে হবে।

তার এক সঙ্গিনী বলল,—আমার কিন্তু সত্যি হিংসা হচ্ছে! সুক্তা আমাদের উপর টেক্কা দিয়ে চিরকাল রাজরাণী হ'য়ে সুখ-ঐশ্বর্য্য ভোগ করবে, আর আমরা কি চিরজীবন একই ভাবে কাটাব?

অন্য একটি পরী বলল,—ঠিক বলেছিল ভাই! আমরা কিসে ওর চেয়ে কম? চ, সকলে মিলে অশ্রুকে খুঁজে বার ক'রে আনন্দর কাছে নিয়ে যাই।

চতুর্থ পরী মাথা নেড়ে বলল,—নিয়ে গেলে কি হবে? ওরা মানুষ-জন্ম ফিরে পাবে বটে, কিন্তু সুক্তার সঙ্গে লড়তে পারবে কি? সুক্তা এখন রাজরাণী—তার কত প্রতাপ-প্রতিপত্তি, কত সৈন্যবল—অর্থবল! লোকে আসল অশ্রুকে চিনতেই চাইবে না—ভাববে, ওটা ডাইনি। হয় ত ধরে ওদের মেরেই ফেলবে। তার চেয়ে যে যা আছে তাই থাক।

প্রথম পরী বলল,—কিন্তু সুক্তার জীবন-কৌটা কোথায় লুকানো আছে, আমি ত তা জানি। সেই কৌটার মধ্যে যে ভ্রমরটি আছে—সেটা যে দিন মুক্তি পাবে, সে দিন সুক্তা ভ্রমর হয়ে যাবে, জীবনেও তার ভ্রমর-দেহ ঘুচবে না। তা না ঘুচুক, তাতে আমাদের কি? চল, অশ্রুকে খুঁজে বার করে সেই কৌটা তার হাতে দিই। তার পর আনন্দ নিজে বীর—তার তলোয়ারের কাছে এগোতে পারে এমন পুরুষ দুনিয়ায় নেই।

সাত জন পরীই আবার ফিরে চলল। সেই সময় কোকিল-রাজকন্যা তাঁদের সম্মুখে এসে বলল,—আমাকে খুঁজতে হবে না; আমি নিজেই আপনাদের পিছন-পিছন আসছি। আপনাদের এ দয়া চিরকাল আমার মনে থাকবে।

আনন্দে পরীরা চঞ্চল হয়ে উঠল। বড় পরী বলল,—চল, রাজপুত্র আনন্দর কাছে তোমাকে নিয়ে যাই। গভীর এক বনে তাকে খাঁচায় পূরে বন্দী করে রেখেছে।

সকলে মিলে সোজা উত্তর দিকে উড়ে চলল। তিন দিন তিন রাত উড়তে উড়তে শেষে যে বনে তারা নামল—সেই বনেই ছিল পিঞ্জরাবদ্ধ রাজপুত্র আনন্দ—কোকিল হয়ে।

অশ্রুর দেহধারিণী-পরী তখন সোনার পালঙ্কে শুয়ে শুয়ে ভাবছে—আর তিনটা দিন কোন রকমে কেটে গেলেই সে বাঁচি!

৮

সেই শেষ তিন দিন কিন্তু আর কাটল না। তৃতীয় দিন ভোরে অশ্রু আনন্দসহ তার পিতার রাজসভায় দেখা দিল। নিষ্ঠুর রাজপুত্র বিস্মিত হয়ে দেখল—ঠিক রাণী অশ্রুর মত আর একটি মেয়ে—বলিষ্ঠ সুন্দর এক রাজপুত্রের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। খবর শুনে বৃদ্ধ রাজা এসে মেয়েটিকে দেখে স্তম্ভিত হলেন; ভাবলেন, "তাই ত, কে আমার আসল মেয়ে?" পরী-অশ্রুর বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল; কিন্তু সে মুখে বলল,—"নিশ্চয় ও ডাইনি—আমার রূপ ধরে ছলনা করতে এসেছে।" অমনি চার দিক্ থেকে রব উঠল,—ডাইনি, ডাইনি, ধর ওদের, পুড়িয়ে মার।

আনন্দ তলোয়ার খুলে বলল,—খবরদার! কাছে এলে কারও রক্ষে নেই।—তার পর বৃদ্ধ রাজাকে লক্ষ্য করে বলল,—শুনুন মহারাজ,—আমি মান্দার দেশের রাজপুত্র আনন্দ, আর ইনি আমার নব-বিবাহিতা পত্নী অশ্রু—এই দেশের আসল রাজকন্যা—আপনার মেয়ে।

তার পর সমস্ত ব্যাপার খুলে বলার পর সে বলল,—মহারাজ, আপনিও কি বুঝতে পারেননি যে, আপনার মেয়ের হৃদয় কখনো এমন কঠোর হতে পারে না?

পরী-অশ্রু বলল,—ওর সব কথাই মিথ্যা! আমার সৈন্য-সামন্তরা কি মরেছে? এই মুহূর্ত্তে এদের বন্দী কর সেনাপতি!

আনন্দ বলল,—সত্য-মিথ্যার প্রমাণ দিচ্ছি। তুমি সুক্তার জীবন-কৌটা খুলে দাও ত অশ্রু!

জীবন-কৌটার নাম শুনেই পরী-অশ্রুর মুখ শুকিয়ে গেল। সে হতাশ ভাবে অশ্রুর পা দু'খানা দুই হাতে জড়িয়ে ধরে বলল,—দোহাই তোমাদের, আমাকে ভ্রমর করে দিও না। এখনই আমি চলে যাচ্ছি—কৌটাটি শুধু আমায় ফেরত দাও।

আনন্দ বলল,—তুমি স্বেচ্ছায় চলে গেলে তোমার কোন অনিষ্ট আমরা করবো না; কিন্তু তোমার জীবন-কৌটা তুমি ফেরত পাবে না,—যাতে ভবিষ্যতে আমাদের আর কোন অনিষ্ট করতে না পার—এই কৌটা আমাদের কাছে তার জামিন থাকবে।

পরী-অশ্রু বলল—শুনুন মহারাজ, তুমিও শোন নিষ্ঠুর রাজপুত্র! আমি রাজকন্যা অশ্রু নই—আমি পরী, সুক্তা আমার নাম। নিজের পরিচয় দিয়েই সে পাখা মেলে আকাশে উড়ে গেল। সভার সকল লোক ভয়ে-বিস্ময়ে স্তম্ভিত হ'য়ে বসে রৈল।

আনন্দ নিষ্ঠুর রাজপুত্রকে বলল,—আর কেন? এবার চটপট্ সরে পড় বাপু। ঢের দিন রাজত্ব করলে—অত্যাচারও অনেক করেছ—এখন প্রজাদের হাড় জুড়োক।

নিষ্ঠুর রাজপুত্র বলল,—বটে! আমার রাজ্য আমাকে ছেড়ে যেতে হুকুম দিচ্ছ! স্পর্দ্ধা ত কম নয়! শাস্তির ব্যবস্থা পরে হচ্ছে; প্রথমে শোন, তোমার পাশে যে রাজকন্যা দাঁড়িয়ে আছে, সে তোমার স্ত্রী নয়—আমার স্ত্রী।—বৃদ্ধ রাজার দিকে চেয়ে সে বলল,—মহারাজ, আপনিই বিচার করুন, সুক্তাকে আমি বিয়ে করেছিলুম আপনারই মেয়ে জেনে; আপনিও ভেবেছিলেন, আপনার মেয়ে অশ্রুকেই আমার হাতে সম্প্রদান করেছেন। এত দিন পরে ফাঁকি ধরা পড়েছে। দোষ আপনারও নয়—আমারও নয়। সুতরাং ন্যায়তঃ অশ্রু আমার স্ত্রী—আনন্দ স্ত্রী বলে ওকে দাবী করতে পারে না।

আনন্দ তলোয়ার খাপে পূরে রেখেছিল; পুনরায় বার ক'রে বলল,—তলোয়ার নিয়ে নেমে এস, ন্যায়-অন্যায়ের বোঝাপড়া এখনই শেষ হয়ে যাক্।

নিষ্ঠুর রাজপুত্র বলল,—বেশ! তাই হোক।—সে তলোয়ার আনতে রাজপুরীর ভিতর প্রবেশ করল।

অনেকক্ষণ কেটে যায়, তাকে রাজসভায় ফিরতে না দেখে রাজপুত্র আনন্দ অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠলো। হঠাৎ দেখা গেল নিষ্ঠুর রাজপুত্র ঘোড়ায় চেপে রাজপুরী থেকে চুপি চুপি পালিয়ে যাচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে প্রজারা সব হেসেই অস্থির! ধর—ধর, ধর—ধর শব্দে জন-কয়েক চীৎকার ক'রে উঠল। রাজপুত্র আনন্দ অশ্রুর হাত ধরে বৃদ্ধ রাজার সামনে এসে তাঁকে প্রণাম ক'রল।

আনন্দে বৃদ্ধের চোখ সজল হ'য়ে উঠল। তিনি কন্যা-জামাতার মাথায় হাত রেখে আশীর্ব্বাদ করলেন—ভগবান্ তোমাদের দীর্ঘজীবী করুন—প্রজাবৎসল হও—দেশে শান্তি ফিরে আসুক।

প্রজারা সমস্বরে হর্ষধ্বনি ক'রে উঠল। তাদের চোখেও জল—আনন্দাশ্রু।

—মবিনউদ্দীন আহমদ।

কুকুরের শিক্ষা

সার্কাসে মানুষের শক্তি-কৌশল দেখিয়া আমরা যেমন বিস্ময় ও আনন্দ পাই, ঠিক তেমনি বিস্ময়-আনন্দ বোধ করি ইতর পশুদের নানা রকমের ক্রীড়া-কৌশল দেখিয়া। বাঘ সিংহ হাতী পোষ মানিয়া বশে থাকিয়া মানুষের সঙ্গে খেলায় যোগ দিতেছে, ইহাতে যে বিস্ময়, তার চেয়ে অনেকখানি বিস্ময় লাগে কুকুরের বুদ্ধিকৌশল দেখিয়া!

এ দেশে কুকুরকে আমরা অস্পৃশ্য বলিয়া অবজ্ঞা করি, অথচ যে-বিড়াল শত রোগের বাহন, সেই বিড়ালকে আমরা ছেলেমেয়ের মতো দুগ্ধ ও আদর দিয়া লালন করি। তোমরা বলিবে, কেন, কুকুরকেও তো যত্ন করিয়া পুষি, আদর করিয়া তাকে নিত্য মাংস খাইতে দি!

এ কথা অস্বীকার করি না, কিন্তু অনেক বাড়ীতে পোষা কুকুরের স্থান শুধু বাহিরের মহলে। অন্দরে গেলে মেয়েরা দূর-দূর করেন! রান্নাঘরের দ্বার মাড়াইলে অনেক বাড়ীতে এমন ঘটে যে বোমা পড়িলেও—ভগবান করুন, বোমা না পড়ুক—তেমন বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটিবে কি না, সন্দেহ।

অথচ বুদ্ধিবৃত্তিতে কুকুর অন্য সব ইতর পশুর উপর টেক্কা দেয়। কুকুরের প্রভু-ভক্তিও অসাধারণ। মানুষ নিত্য বেইমানী করিতেছে,

বন্ধুর নাকাল

বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছে,—কুকুরকে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেহ বেইমানী বা বিশ্বাসঘাতকতা করিতে দেখে নাই। এত বড় সার্টিফিকেট মানুষকেও বোধ হয় দেওয়া যায় না!

কিন্তু সে কথা যাক, কুকুরের বুদ্ধি-বৃত্তির কথা বলিতেছি।

বুদ্ধির পরিচয় পাই—শিক্ষায়। যে-ছেলের বুদ্ধি নাই বা বুদ্ধি মোটা, সে কোনো দিন কোনো-কিছু শিখিতে পারে না। যার বুদ্ধিতে ধার আছে, শিক্ষায়-দীক্ষায় সে-ই শুধু মানুষ হইয়া ওঠে।

কুকুরের বুদ্ধি বেশী বলিয়া কুকুরকে যাহা শিখাইবে, সে তাহাই শিখিবে। যাদের বাড়ীতে কুকুর আছে, তারা দেখিয়াছ, শিক্ষার গুণে কুকুর এমন হয় যে, কখনো ঘর-দ্বার নোংরা করে না। এ শিক্ষা বিড়ালকে দাও, ছাগলকে দাও, গাভীকে দাও—শিক্ষা ব্যর্থ হইবে। শুধু নোংরামি ত্যাগ করার শিক্ষা নয়, কোনো শিক্ষাই কুকুরের কাছে ব্যর্থ হয় না। বানর অনেক-কিছু শেখে, কিন্তু বানরের দুষ্টামি আছে। দুষ্টবুদ্ধি চাপিলে বানর একগুঁয়ে বদ ছেলের মতো দুরন্ত হইয়া ওঠে। কুকুর কিন্তু বর্ব্বরতা বা দুরন্তপনার ধার ধারে না।
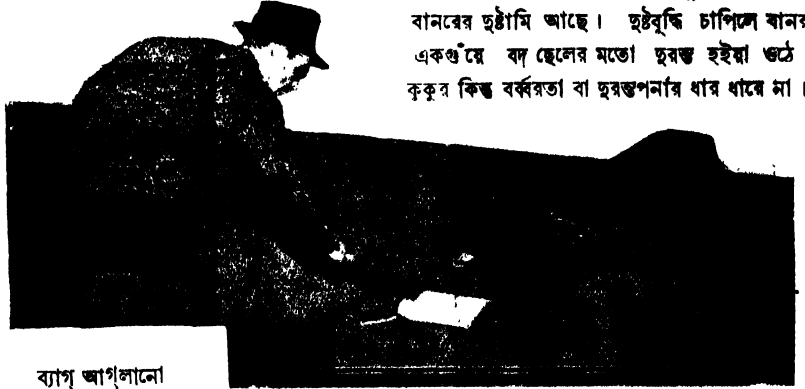
ব্যাগ আগলানো

কয়েকটি শিক্ষার কথা বলিলে কুকুরের বুদ্ধির পরিচয় পাইবে।

যাঁদের বাড়ীতে পোষা কুকুর আছে, তাঁরা একটু চেষ্টা করিলেই শুধু আঙুল নাড়িয়া সেই আঙুলের ইঙ্গিতে কুকুরকে উঠিতে-বসাইতে
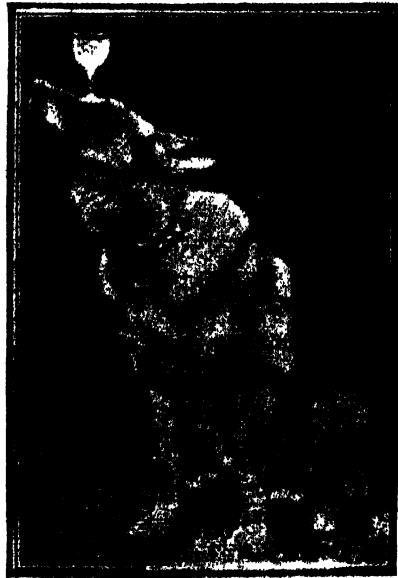
নাকের উপরে গ্লাস

পারিবেন। তাছাড়া কুকুরকে দিয়া বই বহানো, লণ্ঠন বহানো—আমরা তো নিত্য দেখিতেছি।

শিক্ষার সার্থকতা আবার শিক্ষক বা মনিবের বিদ্যা-বুদ্ধি এবং তৎপরতার উপর নির্ভর করে।

যাঁরা প্রাণিতত্ত্ব লইয়া সুগভীর গবেষণা করেন, তাঁরা বলেন, কুকুরের বুদ্ধি দেখিয়া মনে হয়, অন্য ইতর পশুর সঙ্গে একাসনে বসাইলে কুকুরের উপর অবিচার প্রকাশ পাইবে। বুদ্ধির দিক দিয়া মানুষের নীচেই যদি কোনো প্রাণী আসন দাবী করে তো কুকুরের দাবী গ্রাহ্য হইবে।

শিকাগোর মাইকেল ডন্ মোজেক্ নামে এক ভদ্রলোক বহু পশু পালন করেন। তিন পুরুষ ধরিয়া কুকুরের উপর তাঁদের প্রবল মায়া। কুকুরদের তিনি অনেক কিছু শিখাইয়াছেন,—নাট্যাভিনয়, রেডিয়ো-অভিনয়, পুলিশ-পাহারার কাজ; অভিভাবক-গিরি; এবং ছেলে-মেয়েদের সঙ্গী-সহচর হইয়া তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব! এবং সব কাজেই তিনি কুকুরের তৎপরতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন।

মইয়ে ওঠা

তাঁর নানা জাতের কুকুর আছে এবং তিনি বলেন, সব জাতের কুকুরই বুদ্ধিসম্পন্ন।

কুকুরের সবচেয়ে প্রধান গুণ বাধ্যতা। কোনো জীব এমন বাধ্য নয়। এবং এই বাধ্যতার জন্যই কুকুরকে সব কাজ শিখানো চলে।

তাই বলিয়া কুকুর কি লেখাপড়া শিখিবে? তা নয়। লেখাপড়া করার জন্য যে-শক্তির প্রয়োজন,—বাক-শক্তি এবং বোধ-শক্তি—কুকুরকে ভগবান্ সে-শক্তি দেন নাই। তাই কুকুর বেচারা লেখাপড়া শিখিতে পারে না। নহিলে কে জানে, তোমাদের সঙ্গে এক ক্লাশে এ্যানুয়াল-এগজামিনে কুকুর হয়তো ফার্ষ্ট-সেকেণ্ড হইত!

কিন্তু সে কথা যাক্। কুকুরকে যদি তুমি শিক্ষা দিতে চাও, তবে তোমার উপর কুকুরের যাহাতে বিশ্বাস জন্মায়, তোমার এমন হওয়া চাই। কুকুর বুঝিবে, তুমি শুধু তার অন্নদাতা মনিব নও—তোমার দ্বারা তার কোনো অনিষ্ট হইবে না। বেত বা চাবুক কশাইলে কিম্বা ধমক-চমকে কুকুর তোমার প্রভুত্ব মানিবে না, তোমার কথা শুনিবে না। মার-ধর করিলে তোমার উপর তার বিরাগ জন্মিবে। স্নেহ চাই, মেজাজ ভালো রাখা চাই। শিক্ষা দিতে গিয়া যদি ভ্যাখো, কুকুর অমনোযোগী, সরিয়া পড়িতে চায়, তাহা হইলে তাকে প্রহার বা ভর্ৎসনা করিবে না—তখনকার মতো শিক্ষা-দান বন্ধ রাখিয়া কুকুরকে ছুটি দিবে—তার সঙ্গে খেলাধূলা করিবে। খেলার ছলে কুকুর যখন লাফালাফি দৌড়-ঝাঁপ করিবে, তখন ফাঁকে-ফাঁকে তোমার কথা শুনাইতে শিখাও। অমনোযোগী হইলে কুকুরকে আলাদা ছাড়িয়া দিয়ো না—সঙ্গে লইয়া খেলাধূলা করিবে—তাহা হইলে সে তোমাকে দরদী বলিয়া বুঝিবে। এবং একবার যদি তোমাকে সে দরদী বলিয়া বোঝে, তাহা হইলে শিক্ষার দিকে পরে তাকে মনোযোগী করিয়া তোলা কঠিন হইবে না। ভালো মেজাজে তার সঙ্গে খেলাধূলা করিয়া তার মর্জ্জি বুঝিয়া তাকে খুশী রাখিতে হইবে। তবেই সে তোমাকে মানিবে—তোমার কথা শুনিবে।

কুকুরকে কথা শুনাইবার জন্য ইহাই একমাত্র বিধি। এমনি ভাবে আদেশ মানিলে কথা শুনিতে তার অভ্যাস জন্মিবে, এবং অভ্যাসের ফলে
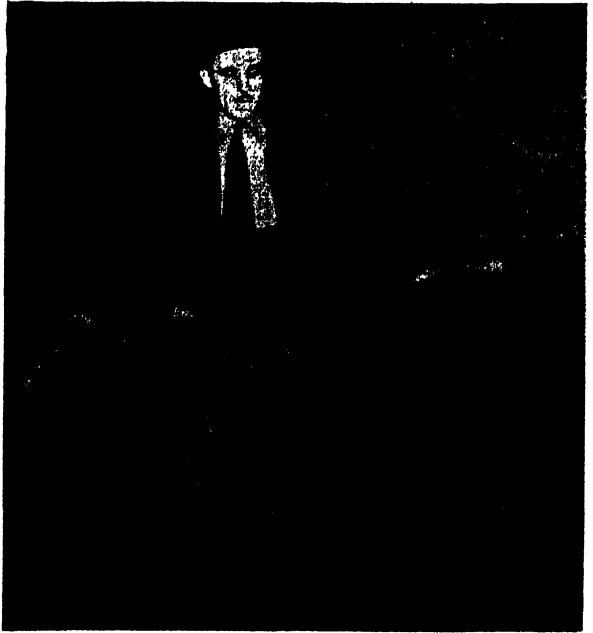
দু'টি রিঙের মধ্য দিয়া

সে অঙ্গুলির সঙ্কেত বুঝিবে, সঙ্কেত বুঝিয়া কাজ করিবে। শেখানোর গোড়া হইতেই অঙ্গুলি-সঙ্কেত ধরিবে। এ সঙ্কেতে যেন সামঞ্জস্য থাকে—অর্থাৎ এক আঙুল নাড়িলে তার অর্থ সে বুঝিবে, বসো; দু' আঙুল নাড়িলে বুঝিবে, এসো। আঙুল-নাড়া দেখিয়া সে বুঝিবে, কোন্ সঙ্কেতে সে দাঁড়াইবে, শুইবে! আঙুল-নাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে মুখে কথা বলিবে—যে-কাজ কুকুরকে দিয়া করাইতে চাও, সেই কাজের কথা বা হুকুম বলা চাই।

কুকুরের শিক্ষায় তোমার বুদ্ধির পরিচয়,—এ-কথা মনে রাখিয়ো। আর একটি কথা, কুকুর শিক্ষা পায় আমাদের কিণ্ডারগার্টেন্ প্রণালীতে,—খেলাধূলার মধ্যে। এবং খেলাধূলার ছলে তাকে নানা কৌশল শিখানো যায়!

সার্কাসে বার-টপকানো, রিঙের মধ্য দিয়া গলিয়া যাওয়া, জ্বলন্ত আগুন ডিঙ্গাইয়া ঝাঁপ খাওয়া, ডাম্বল-মুখে খেলা—এ-সব দেখিয়া অবাক্ হই। কিন্তু এ-সব খেলা কিণ্ডারগার্টেনের ভঙ্গীতে শেখানো সহজ,—হাতে-কলমে শিক্ষা-দান করিলে বুঝিবে!

মোজেক সাহেব তাঁর কুকুরকে শিখাইয়াছেন—ঠ্যালা গাড়ীতে শিশুকে চৌকি দেওয়ার কাজ। এ-কাজে কুকুরের এমন নিষ্ঠা যে, ঠ্যালাগাড়ীর কাছে মোজেক্ সাহেব তাঁহার এক বন্ধুকে পাঠাইবামাত্র কুকুর লাফ দিয়া বন্ধুর ঘাড়ে চাপিল—একেবারে আক্রমণের ভঙ্গীতে।

শিক্ষায় কুকুরকে এমন তৈয়ারী করা যায় যে, সে ইঙ্গিতমাত্র বাক্সের মধ্যে ঢুকিবে। জিনিষ পিঠে লইয়া মই বহিয়া উপরে চড়িবে—মাথায় জল-ভরা গ্লাস রাখিয়া নানা ভঙ্গীতে নড়িবে, গ্লাস পড়িবে না!

বই-খাতা-লাঠি বহানো শিখাইতে চাহিলে প্রথমে তার এ-শিক্ষা সুরু করো তাকে দিয়া খপরের কাগজ বহাইয়া। দু'-চার দিনের
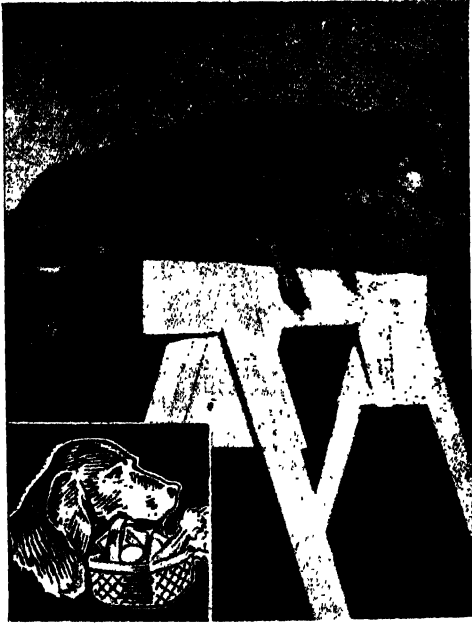
বার্'ডিঙ্গুনো

অভ্যাসে কুকুর জিনিষপত্র বহিবার কায়দা এমন শিখিবে যে, সে-কাজে এতটুকু খুঁৎ থাকিবে না!

সামনে পূজার ছুটী—বাড়ীতে যদি কুকুর থাকে, তাকে নানা খেলার কৌশল শিখাও—বিলক্ষণ আমোদ পাইবে।

—

সাঁতার শেখা

মানুষের মতো মানুষ হতে গেলে লেখাপড়া শেখা যেমন দরকার, লেখাপড়ার সঙ্গে সাঁতার শেখাও তেমনি দরকার। জলপথে কাকে না যাতায়াত করতে হয়! নৌকো যদি ডোবে,—তখন ? সাঁতার জানা না থাকলে নৌকো-ডুবিতে শীসের ডালার মতো জলে ডুবে প্রাণ হারানো—তাতে নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ পাবে।

সাঁতারে কৃতিত্ব দেখিয়ে অনেকে আজ পৃথিবী-ব্যাপী যশ লাভ করেছেন। এই সব সন্তরণকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন স্কান্ডিনেভিয়ার ষ্টকহম্‌বাসী এক ভদ্রলোক। তাঁর নাম আনি বর্জ্জ। বর্জ্জ সাঁতার শিখেছেন ডাঙ্গায় হাত-পা নেড়ে—জলে নয়।

বর্জ্জের বাড়ী সমুদ্র-তীরে। সাগরের ঢেউ দেখে ছেলেবেলাতেই তাঁর দারুণ ইচ্ছা হয়, সাঁতার শিখবেন!

কিন্তু সমুদ্রে সাঁতার শেখা সহজ ব্যাপার নয়। তামাসা করে বর্জ্জকে কে বলেছিল—তুমি ডাঙ্গায় সাঁতার শেখো।

বালক বর্জ্জ এ কথা তামাসা বলে না নিয়ে উপদেশ-স্বরূপ শিরোধার্য্য করেছিলেন, এবং ডাঙ্গাতেই তিনি সাঁতার শিক্ষা করেন। সুদীর্ঘ সাঁতারে তাঁর সমকক্ষ কোনো দেশে আজ কেউ নেই। তিনি জোয়ান পালোয়ান নন্—সাধারণ সুস্থ মানুষের মতো দোহারা গড়ন। তবে তাঁর হাত দু'খানি লম্বা—যাকে বলে, আজানুলম্বিত বাহু। এবং তাঁর দম খুব বেশীক্ষণ থাকে।

তিনি বলেন, সাঁতার ডাঙ্গায় শেখা উচিত। তার কারণ, ডাঙ্গা নিরাপদ, ডোববার ভয় নেই। জলে সাঁতার শিখতে গেলে প্রথম-মুখে জলে দেহ ভাসাবা মাত্র পাছে ডুবে যাই, এই ভয়ে মন এমন ভরে থাকে যে, জলে আমরা অনায়াসে অঙ্গ-পরিচালনা করতে পারি না। অঙ্গ-পরিচালনার দিকে মনোযোগী থাকতে পারি না বলে' সাঁতার শিখলেও আমাদের দম রাখার অভ্যাস ঘটে না এবং জলে দীর্ঘ পথ সাঁতার দিতে আমাদের হাত-পা ঝিমিয়ে অবশ হয়!

ডাঙ্গায় কি করে সাঁতার শিখবো, সে সম্বন্ধে বর্জ্জ বলছেন—

শরীরকে সোজা এবং সুদৃঢ় করে দাঁড়াও। দাঁড়িয়ে সাঁতারের ভঙ্গীতে দু'হাত নাড়তে থাকো—অনেকক্ষণ,—যতক্ষণ না হাঁফ ধরে! হাত-পা নাড়বে বেশ সরল রেখায়! কোমর এতটুকু হেলবে না, দুলবে না, নড়বে না! দু'হাত নেড়ে ঊর্দ্ধে তুলবে সোজা—কাঁধ ছাড়িয়ে—উপর থেকে নীচে হাত নামাবার সময় দুই কনুইয়ের কাছে হাত বাঁকাতে হবে।

তার পর গাড়ীর চাকা যেমন ঘোরে, তেমনি করে' খুব জোরে জোরে এবং দ্রুত ভাবে দু' হাত ঘুরোবে। এতে লাভ হবে এই যে, জলে বহু দীর্ঘ পথ সাঁতারে পাড়ি দেবার সময় হাঁফ ধরবে না, হাতও শ্রান্তিভরে অবশ হবে না।

তার পর পা নাড়া। একখানা চেয়ারে বুক দিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে দেহের ভার রাখো ঐ চেয়ারের উপর। দু' পা শূন্যে ছড়ানো থাকবে। এমনি ভাবে থেকে দু' পা খুব দ্রুত সঞ্চালিত করো। এতে হাঁটুতে বেশ জোর হবে। এ ব্যায়ামে হাতে-পায়ে এমন শক্তি গড়ে উঠবে যে, জলে বহুক্ষণ ধরে সাঁতার কাটবার সময় হাত-পা কখনো ক্লান্ত অবশ হবে না।

জল ছেড়ে ডাঙ্গায় যদি সাঁতার-কাটা শেখো, তাহলে দীর্ঘ-পথ এবং দীর্ঘ-ক্ষণ সাঁতার কাটতে শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে জলে ডোববার ভয় থাকবে না!

গাছে-গাছে দুষ্ট কীট

যাঁর একটু খোলা জায়গা-জমি আছে, তাঁরই আছে গাছপালার সখ। কিন্তু গাছ পুঁতিলেই ফল-ফুলের প্রত্যাশা পরিতৃপ্ত হয় না। গাছপালার

কানন-কুঞ্জে

যত্ন করা চাই, সেবা-পরিচর্য্যা করা চাই! চোখের সামনে বহু-যত্নে পোঁতা এবং লালন-করা গাছপালা যখন নষ্ট হইতে থাকে এবং দুষ্ট কীটের অস্তিত্ব বুঝিলেও চোখ মেলিয়া যখন সে দুষ্ট কীটের অস্তিত্ব ধরিতে পারি না,

ষ্টেথেশকোপ্

তখন দুশ্চিন্তা এবং মনস্তাপের সীমা থাকে না। আমেরিকার প্রাকৃতিক ইতিহাস-বিভাগের মিউজিয়মে ডক্টর ফ্রাঙ্ক লুজ ডাক্তারী-ষ্টেথেশকোপের মতো একটি যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সে যন্ত্রের সাহায্যে পুষ্প-বীথিকাদির কাছে বসিয়া অদৃশ্য দুষ্ট কীট-পতঙ্গের অস্তিত্ব নিখুঁৎ ভাবে উপলব্ধি করা যায়। ডক্টর লুজ বলেন—আলোর সঙ্গে ছায়ার যেমন অচ্ছেদ্য সম্পর্ক, আলো জ্বালিলে তখনি যেমন তার সঙ্গে ছায়াপাত ঘটে, তেমনি গাছ জন্মিলেই জানিবেন, সে গাছে ছায়ার মতো দুষ্ট কীট বিদ্যমান! এই দুষ্ট কীটকে প্রত্যহ বিদূরিত করা চাই। বিদূরিত করার জন্য আরক-ঔষধ আছে। এই যন্ত্র-সাহায্যে অপ্রত্যক্ষ অদৃশ্য কীট-পতঙ্গের অস্তিত্ব জানা যায়—শুধু শব্দে! অতি ক্ষীণ শব্দও
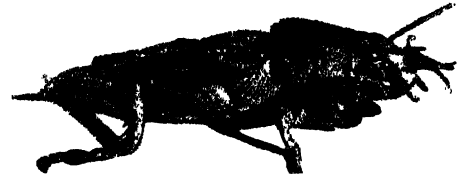
গাছের পোকা। আকারে দশ-বারো গুণ বড় করিয়া দেখানো হইয়াছে।

এ যন্ত্রে ধরা পড়ে। এ যন্ত্রের দৌলতে আমেরিকায় উদ্ভিদ-রাজ্যকে দুষ্ট কীটের নিগ্রহ-পীড়ন হইতে পরিত্রাণ করা আজ সহজ হইয়াছে। তার ফলে প্রকৃতি সেখানে আজ উদ্ভিদ-সম্পদে সুসম্পন্ন হইতেছে।

ছুঁচ-আলপিন্
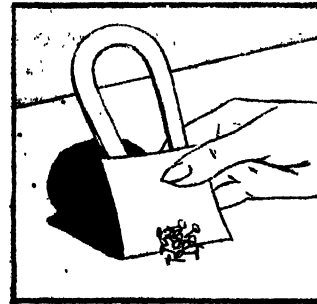
আমাদের ছোটখাট কাজকর্ম্মে নয়—বৃহৎ কর্ম্মে নিত্য যাঁদের ছুঁচ-আলপিন, ট্যাক প্রভৃতি লইয়া কাজ করিতে হয়, অনেক সময় সেগুলা হস্তচ্যুত হইয়া হারায়; চট করিয়া খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই সকল হারা ছুঁচ-আলপিন প্রভৃতি খুঁজিয়া লইবার জন্য চুম্বকের প্রয়োজন। চুম্বক-সাহায্যে ছুঁচ-আলপিন কুড়াইতে গেলে হাতে বিঁধিয়া রক্তপাতের আশঙ্কা আছে! সে আশঙ্কা-মোচনের উপায়—চুম্বকের গায়ে খুব পাৎলা এক-টুকরা কাগজ চাপিয়া ধরিয়া সন্ধান করুন—হারানো ছুঁচ-আলপিন মিলিবে অথচ হাতে আঘাত লাগিবে না।

ফিরে-পাওয়া ছুঁচ-আলপিন্

ছেলেদের নিরাপদ আসন

যে-সব ছেলের প্রাণ আছে, তারা প্রায় দুরন্ত হয়। দুরন্ত ছেলেকে লইয়া মা-বাপ এবং অভিভাবককে হিমসিম খাইতে হয়। তাদের চেয়ারে বসাইয়া রাখা সব-সময়ে নিরাপদ হয় না। চেয়ারে তারা যাহাতে নিরাপদে বসিয়া থাকিতে পারে, অস্থিরতা বা দুরন্তপনা করিলেও পড়িয়া হাত-পা ভাঙ্গিবে না,—এ জন্য চেয়ারে বিচিত্র কৌশলে বেল্ট বা ষ্ট্রাপ আটকাইয়া দিতে পারেন। নীচের

এমনি ভাবে বাধুন

ছবি দেখুন। লম্বা ষ্ট্রাপ লইয়া ছেলের কাঁধ জড়াইয়া বগলের নীচে দিয়া চেয়ারের পিঠ গলাইয়া পায়ার দু'প্রান্ত যদি বাঁধিয়া দেন, তাহা হইলে শত অস্থিরতাতেও ছেলে চেয়ার হইতে পড়িবে না—অথচ তার নড়ন-চড়নে এতটুক অস্বাচ্ছন্দ্য বা অস্বাস্থ্য ঘটিবে না।

ফুটা বাল্‌তি

বাল্‌তি বা ড্রেণ্ড বা তেলের ক্যান যদি ফুটা হয়, তবে সেই ফুটা সারানো চলে। ফুটা ভরাট হয়, এমনি মাপের পেরেক সেই ফুটার মধ্যে

ফুটা সারানো
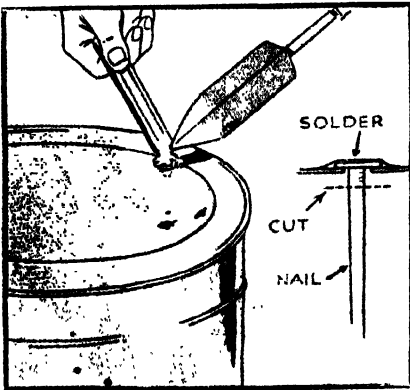
দিয়া লম্বালম্বি ভাবে গুঁজিয়া তার পর কাটিয়া রিপিট্‌ করিয়া পেরেকের মাথার কাছে ঝাল দিয়া লইলে ফুটা বেমালুম জুড়িয়া যাইবে।

সমর-সঙ্কেত

এই যুদ্ধের সময় ছোট-বড় সব রকমের সংবাদ পরিচালনার জন্য সিপাহী-শাস্ত্রীকে যুদ্ধ ছাড়া আরো পাঁচ রকম ডিউটি করিতে হয়। এ সময় দূরে সংবাদ পাঠানো সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের কৌশলে

পোষাকে বেতার-যন্ত্র আঁটা

বেতারের সাহায্যে এ-কাজকে সরল-সহজ করা হইয়াছে। আনাচে-কানাচে রাইফেল-ঘাড়ে সিপাহী-শাস্ত্রী দাঁড়া করাইয়া সংবাদ লওয়া হয় শত্রুর চলাচল-সম্বন্ধে; এবং একটু-কিছু সংবাদ মিলিবামাত্র সে সংবাদ সিপাহী যাহাতে হেড-কোয়ার্টার্সে জানাইতে পারে, তার জন্য এই সিপাহী-শাস্ত্রীর পোষাকের সঙ্গে বেতারের 'ট্রান্স-রিসিভার' যন্ত্র আঁটিয়া দেওয়া হইতেছে। এ-যন্ত্রগুলি আকারে তেরো ইঞ্চি লম্বা, পাঁচ ইঞ্চি চওড়া; ওজনে আড়াই সের। এই যন্ত্রের রিসিভার-মারফৎ সিপাহী-শাস্ত্রী বহু দূরের আস্তানা হইতে আদেশ-নির্দেশ শোনে যেমন, ইহারি মারফৎ দূরের আস্তানায় সংবাদ জানাইতে পারে তেমনি। বেতারের কৌশলে টেলিফোনের ভঙ্গীতে এ-যন্ত্র ক্রিয়া করে। জার্ম্মাণ গুপ্তচরেরা যে বেতার-সাঙ্কেতিক ব্যবহার করে, আকারে তাহা না কি সিগারেট-কেসের মতো ছোট!

বাদল-দিনে

আমাদের এই সভ্য সহর কলিকাতায় বর্ষার দিনে ভিজা জামা-কাপড় ওয়াড়-রুমাল শুকানো এক-রকম অসম্ভব ব্যাপার! আমাদের মধ্যে অনেকেই পায়রার খোপের মত ছোট কামরায় বাস করি—বাস করিতে
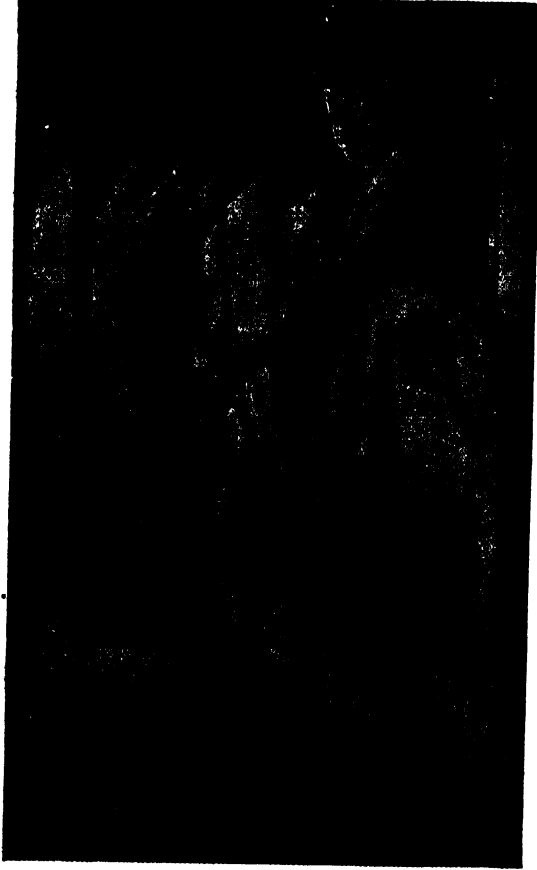
ভিজা জামা-কাপড় শুকানো

এবং জিনিষপত্র রাখিতে জায়গা মিলে না, তা বৃষ্টি-বাদলার দিনে এ সব কামরায় ভিজা জামা-কাপড় শুকাইয়া লইব কি! সুখের মধ্যে
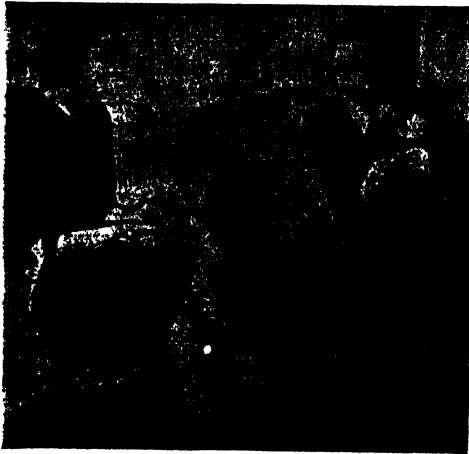
গরম ঘর ঠাণ্ডা করা

সহরের অধিকাংশ গৃহে বাসের যোগ্য জায়গা না মিলিলেও ইলেক্ট্রিসিটির ব্যবস্থা আছে। যদি জানলা খুলিয়া দিয়া সেই জানলার ধারে তার খাটাইয়া ভিজা কাপড় মেলিয়া আর এক-দিকে একখানি টেবল-ফ্যান চালাইয়া দেন, তাহা হইলে খোলা জানলা দিয়া বায়ু-চলাচলের

স্নিগ্ধ-শীতল পবনে

কল্যাণে ভিজা জামা-কাপড় অল্পকাল-মধ্যে শুকাইয়া লইতে পারিবেন। যাঁরা সৌখীন এবং অবস্থাপন্ন, তাঁরা গরম ঘর শীতল করিবার জন্য অনায়াসে টেবল-ফ্যানের সাহায্যে আরামের ব্যবস্থা করিতে পারেন।

লেশ ও টাই কাচা

কালের প্রভাবে অনেক গৃহস্থ আজ টাই ব্যবহার করেন। এই টাই মাঝে-মাঝে কাচিয়া লইতে হয়, নচেৎ ময়লা হয়; ছিঁড়িয়া যায়। লেশ, চুলের ফিতা, টাই—এগুলাও মাঝে মাঝে কাচিয়া সাফ করিয়া লইলে ফিতা প্রভৃতি দীর্ঘ দিন টিঁকিবে। কিন্তু কাচাব ঠিক-প্রণালী না জানিয়া জামা-কাপড়ের মতো কাচিতে গেলে টাই লেশ চুলের ফিতা সম্পূর্ণ অব্যবহার্য্য হইবে। ঘরে কাচিতে হইলে এক কাজ করিবেন। রিঠার জল করিয়া চওড়া-মুখ কাঁচের জারে সেই জল ঢালিয়া টাই লেশ বা ফিতা যা কাচিতে চান, ছাড়িয়া দিন (পাশের ছবি দেখুন)। তার পর বোতলের মুখ আঁটিয়া বোতলটিকে খুব ঝাঁকানি দিন। এই প্রণালীতে কাচার কাজ নিখুঁৎ হইবে! তার পর ইস্ত্রী করুন। রিঠার জল ছাড়া পেট্রোলেও টাই লেশ ফিতা কাচা চলে। কিন্তু পেট্রোল এখন কোথায় পাইবেন!
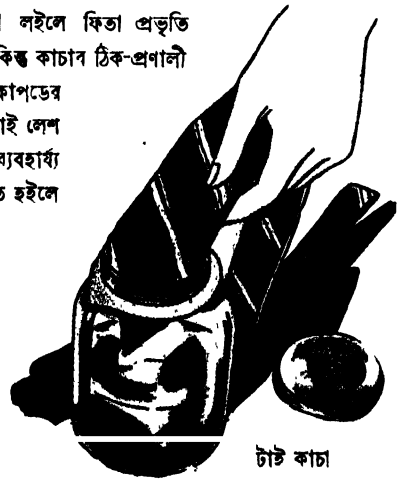
টাই কাচা

অম্বিকা বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষয়িত্রী কুমারী বিজয়াকে মহেশ্বরী কেমন সুনয়নে দেখিয়াছিলেন। যে মেয়ে-ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রীগণ তাঁহার মতে ও ভাষায় 'ঢলানী' ছিল, সেই দলের এবং তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা অল্প-বয়স্কা অষ্টাদশী বিজয়া কি কারণে দিন দিন তাঁহার এত দূর প্রীতির পাত্রী হইয়া কন্যাস্নেহের অধিকারিণী হইয়াছিল, ইহা অন্যের নিকটে যেমন, তাঁহার নিজের নিকটেও সেইরূপ দুর্ব্বোধ্য ও বিস্ময়জনক সমস্যায় পরিণত হইয়াছিল! শীঘ্র যে সেই সমস্যার সমাধান হইবে, তাহারও সম্ভাবনা ছিল না।

পাঁচ জনে এ কথা লইয়া আলোচনা করিতে করিতে বলিত, বিজয়ার আকৃতির সহিত মহেশ্বরীর আকারগত সাদৃশ্য ছিল। মহেশ্বরী কিন্তু সে কথা শুনিয়াও তাহা সত্য বলিয়া মানিতেন না! তিনি বলিতেন, যে বাঁজা, পেটে যাকে কখন একটাও ধরতে হয়নি,—তার চেহারায় অন্যের আকৃতিতে মিল থাকবে কি করে? কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর কেহ দিতে না পারিলেও এই কুঞ্চিত-চর্ম্ম গৌরবর্ণা বৃদ্ধার তরুণী মূর্ত্তিটাই যে অষ্টাদশী বিজয়া, এবং উভয়ের চেহারার সাদৃশ্য কি বিস্ময়কর, তাহা মহেশ্বরীর শয়ন-কক্ষে সংরক্ষিত তৈলচিত্রখানাতে শাশুড়ীর পদপ্রান্তে উপবিষ্টা বধূ মূর্ত্তিটি দেখিলে নিঃসন্দেহেই প্রতীতি হয়।

সে দিন ভাঁড়ারে বসিয়া মহেশ্বরী ভৃত্যদের দ্বারা আতপ চাউলের বস্তাগুলি গুছাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন।

বিজয়া খানিক নামিয়া আসিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ডাকিল, "ঠাকুমা!" ইস্কুলের ছুটী হইলে সময় অসময় গ্রাহ্য না করিয়া বিজয়া এই বৃদ্ধার নিকট আসিয়া দাঁড়াইত।

মহেশ্বরী কহিলেন,—"কে ডাকে,—ক্ষ্যান্ত, দেখ্‌ত!"

ক্ষ্যান্ত ঘরের সম্মুখের দালানে বসিয়া ভাঁড়ারের তৈজসপত্র গুলা ঝাড়িয়া-মুছিয়া গুছাইয়া রাখিতেছিল। সে কহিল,—"কে আবার ডাকবে? ডাকচে ওই মাষ্টারণী গো!"

মহেশ্বরী কহিলেন, "নীচে আস্‌তে বল।" এ কথা বলিয়া তিনি নিজেই ডাকিয়া কহিলেন,—"বিজু, আমি নীচে আছি, এখানেই আয় রে!"

ক্ষ্যান্ত ঝি অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। সে গালে তর্জ্জনী ঠেকাইয়া তাহার বিস্ময় সুস্পষ্ট ভাবেই প্রকাশ করিয়া কহিল,—"বলছ কি আপুনি ঠাকুমা? ওই মাষ্টারণীকে আসতে বললে হেথাকে—এই ভাঁড়ারের মদ্দি?"

ক্ষ্যান্ত তসরের কাপড় পরিয়া শুদ্ধ দেহে মহেশ্বরীর ভাঁড়ারে কাজ করিতেছিল।

মহেশ্বরী কহিলেন,—"আসবে তাতে কি হয়েছে? ও কি আমার ভাঁড়ারে ঢুকছে?"

মহেশ্বরীর এ কথায় তিরস্কারের ঝঙ্কার ছিল। ক্ষ্যান্তর সেটুকু সহ্য হইল না। কারণ, যে মানুষের ছুৎমার্গের আতিশয্যে কেবল দাস-দাসীবর্গই নহে, আত্মীয়-স্বজন পর্য্যন্ত ব্যতিব্যস্ত; আচার-বিচারের নিষ্ঠায় যাঁর কাছে টোলের গোঁড়া অধ্যাপকগণকেও হার মানিতে হয়, সেই মানুষ যে তাঁহার সর্ব্ব প্রকার শুচিতার বাতিককে এক নিঃসম্পর্কীয়া তরুণীর নিকট শিথিল করিবেন, ইহা গাত্রদাহের ন্যায়ই ক্ষ্যান্তর পক্ষে পীড়াদায়ক হইয়া উঠিল। এই জন্য সে ঝাঁঝিয়া বলিয়া উঠিল, "এই দালান তো এক্ষুণি আবার গঙ্গাজল ঢেলে ধুয়ে ফেলতে হবে? তাই—"

কথাটা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই বিজয়া সেখানে আসিয়া পড়িল, এবং সহাস্যে কহিল, "কি ক্ষ্যান্ত, কিসের এত বকাবকি—"

কর্ত্রী ও দাসী উভয়েই বুঝিলেন,—কথাগুলা সমস্তই বিজয়ার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছে; সুতরাং একসঙ্গে উভয়কেই অপ্রতিভ হইতে হইল।

মহেশ্বরী কহিলেন,—"ওর কথায় কান দিস্‌নি মা!—ক্ষ্যান্ত একখানা পিঁড়ে পেতে দে, বিজু বসুক।"

বিজয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল,—সেই হাসি যেন শরতের অম্লান আলোকধারা। আমোদের সুরে সে কহিল,—"তবেই হয়েছে! ঠাকুমা, ক্ষ্যান্ত হয় তো পিঁড়েখানা শেষে পুড়িয়ে শুদ্ধ করবে। থাক, আমি এমনি বসছি,—বেশ তো ঝক্‌ঝকে মেঝে"—বলিয়া মহেশ্বরীকে দ্বিতীয় কথা বলিবার অবসর না দিয়াই সে দালানের এক পাশে ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল।

মহেশ্বরী কহিলেন,—"ওমা, অমন ধপ্‌ধপে কাপড়খানা—"

ক্ষ্যান্ত কহিল,—এ তো জিব দিয়ে চাটা যায় ঠাকুমা! ধুলো আছে না কি?" বলিয়া সে মুখখানার এক রকম অদ্ভুত ভঙ্গী করিল।

মহেশ্বরী কহিলেন,—"তা এত সকালে বিজু—আজ স্কুল নেই?"

—"বাঃ, রবিবারেও ইস্কুলে যাব না কি? বেশ মজা তো! রবিবারে একটা দিনও জিরুতে পাব না ঠাকুমা?"

মহেশ্বরী ঈষৎ হাস্য করিলেন—যেন বর্ষার আকাশে একটুখানি রৌদ্রের ঝলক! হাসিয়া কহিলেন,—"রবিবার, তা কে জানে বাপু!-তবে ভাগবতখানা,—হাঁ বিজু, গেয়ে এসেছিস্?"

"হাঁ ঠাকুমা, খেয়েছি;—কিন্তু আপনার হবিষ্যিটা চড়বে কখন? এতো বেলা অবধি আপনি এই ভাঁড়ারে—"

—"আজ ও বামাই নেই রে!"

—"কেন, আজ খাবে না ?"

কথাটা শুনিয়া ক্ষ্যান্ত সাপের মত ফোঁস করিয়া উঠিল ; বলিল, "বেম্মই হও, আর খিরিষ্টানই হও, আগে তো হিঁদুই ছিলে,—তবু ন্যাকামি ! আজ যে একাদশী—তাও কি জান না ?"

বিজয়া রাগ করিল না ; কহিল,—"না গো, বেম্ম খৃষ্টান কিছুই নই ! ঠাকুমার মত আমিও হিঁদুই—তা হ্যাঁ ঠাকুমা, আজ কি নিরম্বু উপবাস ?"

"দয়াময়ই জানেন। এত দিন ত চালিয়েছি কোন রকমে—"

বিজয়ার প্রফুল্ল মুখখানা একটা আকস্মিক বেদনায় মুহূর্ত্তের জন্য ম্লান হইল ; নির্ব্বাক্ হইয়া সে নিস্পলক নেত্রে মহেশ্বরীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মহেশ্বরী ভৃত্যদের কহিলেন,—"ওরে যদু, বস্তাগুলো তো ঠিক যায়গায় রাখা হোল ?"

একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, বিজয়া কহিল,—"এতো বস্তা বস্তা আতপ চাল কি হবে ঠাকুমা ?"

—"দুর্গাপূজা এসে পড়ল কি না।"

বিজয়া সবিস্ময়ে কহিল,—"এই অ্যা—ক গাড়ী আতপ চাল লাগবে পূজোয় ?"

স্নিগ্ধ হাস্যে মহেশ্বরী কহিলেন,—"এক গাড়ী দেখেই অবাক্ হচ্ছিস ? কিন্তু কি-ই বা আমি করতে পারি,—আর সামর্থ্যই বা কতটুকু ? শ্বশুরবংশের সম্ভ্রম দূরের কথা, নামটুকুও কোন-রকমে বজায় রাখাই কি আমার সাধ্য ? যাদের উপর সে ভার ছিল, তারা যে ছুড়ে ফেললো ! তা না হলে আজ কত গাড়ী চাল আসত, তা তুই কি বুঝবি ? প্রজারা ছেলে-বুড়ো দল বেঁধে খেতে আসবে ; নিমন্ত্রণ-পত্র নিয়ে মহালে মহালে পাইক বরকন্দাজ ছুটছে ; সে কি হৈ হৈ কাণ্ড ! আমার এ কোন রকমে পিত্তিরক্ষে করা বৈ তো নয়।"

কৌতুক-বিস্ফারিত নেত্রে বিজয়া বৃদ্ধার দিকে চাহিয়া কহিল,—"কেন ঠাকুমা—তুমিই আগেকার মত ধুমধাম কর না। তোমার অভাব কি ?"

মহেশ্বরী ক্ষণকাল নীরব রহিলেন। আয়ত্তাতীত একটা গভীর বেদনা সহ্য কষ্টে বুকের ভিতর চাপিয়া বিষণ্ণ স্বরে কহিলেন,—"সে কালের মন কি আর আছে রে। ন'বছর বয়েসে এদের বাড়ী এসেছিলুম আদরের বৌ হয়ে ; আর আঠার বছর বয়সে গিন্নী হতে হয়েছে। সে সব ক্রিয়া-কর্ম্ম পূজা-পার্ব্বণ আজ স্বপ্নের মত. এতে কি আর মন বসে ? আজ এই সত্তর বছর বয়েসেও এমন এক জনকেও তো মায়ের কৃপায় পেলুম না,—যার হাতে সব ধরে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারি।"

ভৃত্যদের চালের বস্তা গুছাইয়া রাখা শেষ হইয়াছিল। যদু কহিল,—"গিন্নীমা, সব দেখে নাও।"

গিন্নীমা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বস্তাগুলার এ-পাশ ও-পাশ দেখিয়া কহিলেন,—"হ্যাঁ, সব ঠিক হয়েছে। কালসোমবার থেকেই ঝাড়া-বাছা সব আরম্ভ করবি।"—কাজ শেষ হইলে তিনি বাহিরে আসিলেন।

ভৃত্যের দল বিদায় লইল। মহেশ্বরী ভাঁড়ারে তালা লাগাইয়া, অঞ্চলবদ্ধ চাবির গোছাটা পিঠে ফেলিয়া বিজয়ার দিকে ফিরিয়া কহিলেন,—"চল বিজু, উপরে যাই।"

* * *

শয়ন-কক্ষে আসিয়া শ্বেত পাথরের মেঝের উপর বসিয়া মহেশ্বরী কহিলেন,—"বিজু, ভাগবতখানা পড়।"

বিজয়া সেলফের উপর হইতে বইখানা লইয়া আসিয়া কহিল,—"ঠাকুমা, আপনাকে শোনাতে গিয়ে আমারও ভাগবত-পাঠ হয়ে গেল। আঃ ! কি সুন্দর এ সব প্রাচীন পুঁথি ! আপনার এখানে এসে, এই দু'মাসে আমার কত গ্রন্থই পড়া হ'ল ! পুরাণই কতগুলি শেষ কর্‌লুম ! কিন্তু আগে এ সব কেতাব স্পর্শ করতেও ভয় হ'ত !"

মহেশ্বরী হাসিলেন ; কহিলেন, "তাই হয় দিদি ! চতুর্মাস উপলক্ষে শ্বশুরের কাছে কত পণ্ডিত, সাধু সন্ন্যাসী আসতেন ; ধর্ম্মালোচনা হতো, গিন্নী চিকের আড়ালে বসে সেই সব শুনতেন।—কর্ত্তারা ভেতরে এলে সেই সব ধর্ম্ম-কথার আলোচনা হতো ; কিন্তু আমাদের বৌয়েদের দলকে যদি কোন দিন শোনবার জন্য ডাকা হতো, তাহলে মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়্‌তো ! পালিয়ে গিয়ে আমরা দশ পঁচিশ খেলতে বস্‌তুম। মনে হতো, এমন আমোদের খেলা ছেড়ে পুরাণ-পাঠ শোনা দারুণ কষ্মভোগ !"

ক্ষ্যান্ত আসিয়া দুয়ারে দাঁড়াইল। মহেশ্বরী কহিলেন, "গেছলি ক্ষ্যান্ত ?"

ক্ষ্যান্ত মুখ ভার করিয়া কহিল, "যাবনি কেন ? আমরা দাসী বাদী বৈ তো নই ? আমাদের আর মান-খাতির কি ? কিন্তু মেজ-বৌ আসতে পারবিনি।"

"কেউ আসতে পারবে না ?"—মহেশ্বরীর স্বরে উদ্বেগের আভাস !

ক্ষ্যান্ত কহিল, "কোথা হতে আসবি ? বোসেদের ছোট খোকার টাইফাইড, তাই বড়-বৌ আসবিনি—ননদ আসবে ! তা কাল হতে তো তেনার জ্বর হয়েছে। মেয়ে আমায় বলে, তা সে কতটুকু সময়, ঘরের কাজ তো সব মিনির উপর পড়েছে।"

মহেশ্বরী কহিলেন,—"দত্তবাড়ী গেছলি ?"

"যাবনি কেন ? ওদের অশৌচ। ন'বৌয়ের খোকা হয়েছে।"

সহর্ষে মহেশ্বরী কহিলেন, "বেশ ! বেশ ! পো-পোয়াতি বেশ ভাল আছে ? ছেলে দেখলি ? আহা, আজ মকর থাকলে কতই আনন্দ করত,—নাতির খোকা হল !" বলিয়া চিন্তিত স্বরে কহিলেন,—"তাই তো, মুস্কিলের কথা !"

বিজয়া উৎসুক চক্ষুতে চাহিয়া ছিল। কৌতূহলী কণ্ঠে কহিল,—"কি হলো ঠাকুমা ! কি হয়েছে ?"

"এই পূজোর সব কাজকর্ম্ম ঝি-বৌয়েরা এসেই করে থাকে ; তাই তাদের বলে পাঠিয়েছিলুম ; তিলের নাড়ু, নারকেল-নাড়ু, চন্দ্রপুলি, ক্ষীরপুলি—কাজ তো আর কম নয় ! চাল-বাছা আলপনা-দেওয়া, বাজে লোকের হাতে তো ও-সব কাজ ভাল উৎরোয় না ! তা মা যা করবেন তাই হবে। আমি অনর্থক ভেবে মরচি !"

মুহূর্ত্ত কাল মৌন থাকিয়া বিজয়া কহিল,—"ঠাকুমা, শুকনো জিনিস-পত্র তো সব মুটের মাথায় আসে—" বিজয়া থামিল।

"—তা তো আসেই ; তা তুই বলছিস্ কি ?"

একটা ঢোক গিলিয়া বিজয়া কহিল, "কোন কাজ কি আমার মত নিষ্কর্ম্মাকে দিয়ে হয় না ঠাকুমা !"

মহেশ্বরী বিজয়ার মুখের পানে তাকাইলেন। দেখিলেন, আয়ত নেত্রের প্রতীক্ষাপূর্ণ দৃষ্টি তাঁহার মুখের উপর স্থাপিত।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি কহিলেন,—"আসিস্ তো কাল।"

প্রথম শরতের সোনালী আলোর ঝলক্ যেন নিমেষে বিজয়ার মুখমণ্ডলে প্রতিফলিত হইল ! আনন্দ-দীপ্ত নেত্রে চাহিয়া সে কহিল,—"বেশ, ঠাকুমা ! আমি কাল সকালেই আসব—স্নান করে।"

-"সেই ভাল,- তাই আসিস্ ; এসে আমার এখানেই খাস। আঃ, তুই যদি —"

- "আমি যদি কি ঠাকুমা !"

- "না, কিছু না। সবই কপাল ! পাব বল্লেই কি পাওয়া যায় ? ওরে, মানুষ অনেক সাধ করে, কিন্তু তা পূর্ণ হয় জন্মান্তরের সুকৃতি-ফলে ! তা না হলে অজয়,—ভাবতেও পারতুম না আমি পেটে ধরিনি —"

বৃদ্ধা হঠাৎ থামিলেন ; কিন্তু স্মৃতির আলোড়নে কোটরগত নয়নের প্রান্ত হইতে কয়েক বিন্দু অশ্রু শীর্ণ পাণ্ডুর গণ্ডে গড়াইয়া পড়িল ।

বিজয়া বৃদ্ধার বেদনাক্লিষ্ট মুখের দিকে চাহিয়া একান্ত মিনতির সুরে কহিল,—"বল না ঠাকুমা ! আমাকে একটুখানি তোমাদের সেকালের কথা।—এই ছ'মাস রয়েছি, এক দিনও তো তোমাদের পুরানো গল্প শুনতে পেলুম না !"

"কি শুনবি রে পাগলী ?"

"ঠাকমা, তুমি আমায় ভালবাস না !"—বিজয়ার সুরে প্রচ্ছন্ন অভিমান।

মহেশ্বরী হাসলেন। যেন এক-পশলা বৃষ্টির পরে নিদাঘাপরাহ্নের রৌদ্র ! সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে কহিলেন, "ছেলেমানুষ তুই ! সে দুঃখের কথা শুনে তোর তো আনন্দ হবে না।"

—"না, ঠাকুমা বল,- আমার বড্ড ইচ্ছা করে তোমাদের কথা শুনতে।"—স্বরে আবদার পরিস্ফুট !

ঠাকুমা আবার হাসিলেন। কহিলেন,—"তবে শোন !—ন'বছর বয়সে বৌ হয়ে এদের বাড়ী এলুম,- আটাশ বছর বয়স হল, তখনও সন্তানের মুখ দেখলুম না ! শ্বশুরের একটিমাত্র বৌ, বংশলোপের আশঙ্কায় কর্ত্তা-গিন্নী দু'জনেই ব্যাকুল !

"শ্বশুর-শাশুড়ী আমায় মেয়ের মত ভাল বাসতেন। তবু বংশ-রক্ষার আশায় তাঁদের 'মা-মণি'র ঘাড়ে সতীন চাপাতে চাইলেন। ধর্ম্ম বড়, না মমতা বড় ? কিন্তু তোর দাদামশায় কোট ধরলেন, আর তিনি বিয়ে করবেন না। স্পষ্ট জবাব দিলেন—যে ধর্ম্ম-কর্ম্মে মন প্রসন্ন হয় না, অন্তর গ্লানি বোধ করে,—আমি কস্মিন্ কালেও তাকে ধর্ম্ম বলে মানতে পারবো না।

"তার পর এই ব্যাপার নিয়ে বাপের সঙ্গে তাঁর প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব ! ছোটর কাছে পরাজয় স্বীকার কর্ত্তে মানুষের মন স্বভাবতঃই বিমুখ হয়। শ্বশুর বল্লেন, বিষয়-সম্পত্তি ছেলেকে দেবেন না ! সব দেবেন দাশরথিকে। দাশরথি তাঁর ভাগনে—সে মামার সংসারের এ সব বাদ-বিসম্বাদের কথা কিছুই জানত না। ছেলে বল্লে, চাই নে বিষয়-সম্পত্তি ! নিঃস্ব ঘরে যারা জন্মায়, তারা চালায় কি করে ?—কিন্তু এই ঝগড়া আর বেশী দূর গড়াতে পেল না ! কারণ ; পনের দিনের জ্বরে বুড়ো বাপের বুকে শেলাঘাত করে মৃত্যু তাঁকে টেনে নিল। আমার মনে ব্যথা লাগবে বলে,—বাপের সঙ্গে তিনি বিরোধ করেছিলেন, কিন্তু আমাকে ফেলে তিনি চলে গেলেন। শ্বশুর অনুক্ষণ বুক চাপড়ে কাঁদতেন, আর বলতেন, যাদু আমার অভিমান করে চলে গেছে ! ওরে, গিন্নী যে অনেক ঠাকুর-দেবতার মাদুলী ধারণ করে তাঁকে বুকে পেয়েছিলেন ; তিনি থাকবেন কেন ? তখন আমিই হলুম শ্বশুরের নয়নমণি ; ছেলের স্থানটা তিনি আমায় দিলেন ! ভাগনে দাশরথি দু'মাসের ছুটী নিয়ে মামার পুত্রশোকে সান্ত্বনা দিতে এল, তার সঙ্গে দেব-শিশুর মত পাঁচ বছরের একটি ছেলে।

"বড্ড ভাল লাগত তাকে। দিনরাতই তাকে নিয়ে থাকতুম। ভাগনে কর্ম্মস্থানে ফিরে যাবার আগে যখন মামাকে নমস্কার কর্ত্তে গেল, শ্বশুর তখন দাশরথির হাত ধরে বল্লেন,—'দাশু, খোকাকে বৌমার কাছে রেখে যাও ! তোমার তো আরও পাঁচটি আছে।'

"খোকার নাম অজু। সে হল এই অন্ধের নয়নমণি ! আমায় মা বলে তাকে ডাকতে শেখালুম। সকলেই বল্লে, দাশরথি মিত্তিরদের এই কুবেরের সম্পত্তির অধিকারী নয়, এর ভবিষ্যৎ মালিক ঐ কুন্দকুসুম ! কিন্তু কি কুগ্রহ তার মাথায় চাপল ! এম, এস-সি পাশ করবার পর, অজু সকলকে লুকিয়ে বিলেতে চলে গেল—ডাক্তারী পড়তে। শ্বশুরের মনে এতে দারুণ আঘাত লাগল। নিজেকে তিনি ভয়ানক অপমানিত মনে করে মর্ম্মাহত হলেন। নিজের ছেলে দু'ঘণ্টার জন্যও কোথাও যেতে হলে বাপের অনুমতি চাইত। আর এই নাতি সাগর-পারে চলে গেল,—একটি বার সে কথা বললে না, এতই তিনি তুচ্ছ ! শ্বশুর খোঁজ নিলেন, খরচা পেলে কোথায় ? জানলেন,—বাপ দিয়েছে। শুধু খরচ দেওয়া নয়, ফিরে এসে এক মস্ত ডাক্তারের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হবে, তাও স্থির হয়ে গেছে ! ঝড় উঠবার পূর্ব্বে প্রকৃতির স্তব্ধতার মত তিনি মৌন হয়ে রইলেন ; এ নিয়ে আর কোন আন্দোলন আলোচনা করলেন না। দাশরথি মামাকে বুঝিয়ে একখানা পত্র লিখেছিল। সেখানা তিনি ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে আমায় বল্লেন,—'বৌমা, ভগবান্ যা দেননি, তার উপর লোভ করো না ! তুমি সকলের মা, তাই তোমার নাম মহেশ্বরী।'- চুপ করে রইলুম ; এ কথার কি উত্তর দেব ? বুকের ভিতর ঝড় বইছিল,—অন্তর কেঁদে কেঁদে লুটিয়ে পড়ছিল ! হোক অপরাধী, হোক দোষী ;- তবু আমি যে পুত্র-স্নেহে তাকে লালন-পালন করেছি ! কিন্তু তাঁর সামনে তখন একটিও শব্দ উচ্চারণ করতে পারলুম না। ছেলের নাম করে তিনি কাঁদতে লাগলেন ! তার পরই তিনি বিছানা নিলেন। অজু বিলেত গিয়ে আমাকেও একখানা চিঠি লিখলে না ! আমি ভাবলুম,—ছেলেমানুষ, ঝোঁকের মাথায় চলে গেছে, তাই লজ্জায় চিঠি লিখতে পাচ্ছে না। আমি মা, আমিই আগে লিখি ; তাই কাগজ-কলম নিয়ে বসতুম ; কিন্তু ভয় হোত, শ্বশুর যদি জানতে পারেন—মনে কি নিদারুণ ব্যথাই পাবেন ! মৃত্যুকালে শ্বশুর উইল করে আমায় তাঁর সর্ব্বস্ব দান-বিক্রির অধিকার দিয়ে গেলেন ; যদি ইচ্ছা করি, দত্তকও নিতে পারি। উইলের কথা রাষ্ট্র হল,—দাশরথি মামার শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ রাখতে এসে বল্লে,—মামাবাবুর আত্মা পরলোকে যেন তৃপ্তি পায় ! রক্তের ধারার মাঝে বিষয়-সম্পত্তি থাকবে বলে, যিনি ছেলের আবার বিয়ে দিতে গেছলেন, রোগে-শোকে তাঁর মতি স্থির ছিল না। তাঁকে এমন করে বুঝিয়ে উইল করালে, এ কি ধর্ম্মে সইবে ?"

এই কটূক্তির কোন উত্তরই দিতে পারলুম না। বলতে পারলুম না—আমার পরামর্শে বা ইচ্ছায় এ উইল হয়নি। নির্ব্বাক্ হয়ে মাটীর দিকে চেয়ে রইলুম। তার পর অজু দেশে ফিরল। ভেবেছিলুম, হয় তো এক দিন এসে মা বলে ডাকবে ; সেই দিন সব কথা

তাকে বুঝিয়ে বলে—তারই হাতে তুলে দেব এই সব সম্পত্তি। কিন্তু বাপ কি বোঝালে জানি না, সে আমার কাছে এলই না! এক এক সময় আমার ইচ্ছা হতো, আমি কঠিন রোগে পড়ে থাকি, তাহলে ডাক্তার সে, তার মাকে একবারও দেখতে আসবে; কিন্তু আশা পূর্ণ হলো না। কি বলব? পরে শুনলুম, অজুর বিয়ে হয়েছে, কিন্তু বউ নিয়ে সে আমাকে দেখাতেও এল না! এক দিন যে ঘর-দোরের দিকে চেয়ে ভাবতুম—অজুর ছেলে-বৌ এসে ভোগ করবে—হায়, আজ তারা কোথায়? একা থাকতে পারতুম না। ভাইপোকে আনালুম,—ছেলের মতই মানুষ করলুম, শেষে বি, এ পাশ করে সে ব্যারিষ্টারী পড়তে বিলেতে যেতে চাইলে। বারণ করলুম না; মত দিলুম, খরচও সব দিলুম। হঠাৎ এক দিন দাশরথির চিঠি পেলুম,—বৌদি, তোমার কোল হতে অজয়কে কেড়ে নিয়েছিলুম,—সেই অপরাধে ভগবান্ আমার কাছ থেকে অজয়কে কেড়ে নিলেন! কোন্ রাজার চিকিৎসা করতে গেছল, শুনলুম, ফেরবার সময় রেলের কলিসনে এই সর্ব্বনাশ! ঠাকুর-ঘরে গিয়ে পড়লুম; কেঁদে বললুম, ঠাকুর, এই অভাগীকে সে মা বলেছিল বলেই কি এমন অসময়ে তাকে পৃথিবী ছেড়ে যেতে হল?—মহেশ্বরী আঁচলে চক্ষু মুছিলেন, ভগ্ন স্বরে কহিলেন, "বিজু, সবাই তাকিয়েছিল এই বুড়ীর পয়সার দিকে, বুড়ীকে কারও দরকার ছিল না, ও-বছর শঙ্কর এসে বললে,—পিসিমা, বিয়ে করব। কার মেয়ে জিজ্ঞেসা করে জানলুম, বিলেত-ফেরত কোন ডাক্তারের পিতৃমাতৃহীনা নাতনী; বি, এ, পাশ করে চতুর্ভুজ হয়েছে! বল্লুম,—তুমি যখন বিয়ে করবেই তখন আমার মতের প্রয়োজন কি? হেসে বল্লে,—'বাবা বলেছেন, আমার মতের কোন মূল্য নেই, তোমার বড় পিসিমা যা বলেন তাই করবে।' মনটা কেমন এক নিমেষে পাথর হয়ে গেল!—বল্লুম, 'আমার মত নেই।' এ কথায় ভাইপোর ভয়ানক রাগ হল। তাই আজ দু' বছরের মধ্যেও সে আমার খোঁজ নিলে না; অথচ এই দুর্গাপূজাতে তারই ছিল সব চেয়ে বেশী আনন্দ—প্রবল উৎসাহ!

অঞ্চলে চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া আত্মসম্বরণের পর মহেশ্বরী কহিলেন, —"আমার কাছে অজুর চেয়ে আর বড় কে? তাকেই যখন ছেড়ে থাকতে হয়েছে, তখন শঙ্কর তো—তবু মনটা এই পূজোর দিন—শঙ্করের জন্যে ব্যাকুল হয় বই কি!"

* * * *

পরদিন প্রভাতেই বিজয়া আসিয়া একেবারে মহেশ্বরীর পূজা-কক্ষের সম্মুখে দাঁড়াইল; কোমল স্বরে ডাকিল, "ঠাকুমা!"

পূজারতা মহেশ্বরী এই আহ্বানে দ্বারের দিকে মুখ ফিরাইলেন। এইমাত্র তিনি অন্নপূর্ণার পটখানাতে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, প্রণামান্তে নত মস্তক তুলিয়াছিলেন; সহসা তাঁহার মনে হইল, সিংহাসনে উপবিষ্টা দেবীই বুঝি পূজায় পরিতুষ্ট হইয়া মানবী-মূর্ত্তিতে কক্ষদ্বারে আসিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন!

বিজয়া স্নান করিয়া আসিয়াছিল। তাহার স্নান-সিক্ত নিবিড় কেশদাম ভিজিয়া যেন আরও বেশী কালো দেখাইতেছিল; তাহা যেমন দীর্ঘ, সেইরূপ মসৃণ। কুঞ্চিত অলকদাম কমনীয় মুখখানির দুই পাশ দিয়া তাহার পিঠ আবৃত করিয়া জানু স্পর্শ করিতেছিল। হাত-কাটা সেমিজে অনাবৃত সুগোল বাহুর লাবণ্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল। লাল ফিতে পেড়ে গরদের শাড়ীখানি দ্বারা আবৃত-দেহ তরুণীর মাধুর্যমাখা মূর্ত্তি প্রভাতের লোহিতালোকে মহেশ্বরীর চক্ষে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিকাশ করিল।

মুগ্ধ নয়নে তিনি ক্ষণকাল বিজয়ার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। সহসা তিনি একটা নিশ্বাস ফেলিলেন। তিনি মনে মনে কহিলেন, 'সত্যই কি আমার মহামায়া এলেন?' কিন্তু প্রকাশ্যে কহিলেন,—"বিজু, এসেছিস? ভেতরে এসে ধূপের মশলাগুলো ঠিক কর।"

বিজয়া হাসিমুখে কহিল,—"একেবারে ঠাকুর-ঘরের কাজ!"

মহেশ্বরীও হাসিয়া কহিলেন,—"তা হোক, তুই তো হিন্দুর ঘরেরই মেয়ে, আয়, উঠে আয়!"

পূর্ব্বদিনে বিজয়া আলতা পরিয়াছিল; মর্ম্মর-মণ্ডিত হর্ম্ম্যতলে তাহার অলক্তরঞ্জিত সুগঠিত চরণযুগল প্রস্ফুটিত পদ্মের মতই সুন্দর দেখাইতে লাগিল। লঘু পদবিক্ষেপে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বিজয়া রজত-সিংহাসনে সংস্থাপিত শালগ্রাম-শিলাকে আভূমি-নত-মস্তকে ভক্তিভরে প্রণাম করিল; প্রণামান্তে বিজয়া মুখ তুলিয়া মহেশ্বরীর মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল। প্রভাতের অম্লান আলোকে তাহার প্রফুল্ল মুখখানি আনন্দ-দীপ্তিতে ঝলমল করিতেছিল: সে কহিল, "ঠাকুমা, কেউ যদি দেখে আমি তোমার ঠাকুর-ঘরে ঢুকেছি, তা হ'লে—"

মহেশ্বরী হাসিয়া কহিলেন, "কে কি করবে? আমার তো আর ছেলে-মেয়ে নেই যে, তাদের সঙ্গে মেয়ের কি ছেলের বিয়ে দেবে না!"

—"তোমার ছেলে-মেয়ে থাকলে তো আমায় দূরে বিদেয় করতে?"

—"না দিদি, তা করতুম না; একটি ছেলে থাকলে তারই সঙ্গে তোর বিয়ে দিয়ে—তোকে ঘরের লক্ষ্মী করতুম; তোর উপরেই আমার লক্ষ্মী-জনার্দ্দনের সেবার সকল ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হতুম।"

বিজয়ার সুগৌর মুখখানার উপর হঠাৎ যেন কৌটা-ভরা সিন্দুর ঢালিয়া পড়িল; আরক্ত মুখে কুণ্ঠিত স্বরে সে কহিল, "ইস্! তখন বলতে, 'দূর হ, বেরিয়ে যা পোড়ামুখী'!"

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মহেশ্বরী কহিলেন,—"জীবনে তো কখন কাউকে বেরিয়ে যা, দূর হ' বলিনি; কিন্তু থাকবে কে? অজুর জন্যে দিনরাত হাঁ করে থাকতুম,—যদি আসে! এই শঙ্কর, সকাল থেকেই ভাবি, এই তো পূজোবাড়ী, পূজো উপলক্ষে যদি সে আসে!

* * * *

স্নেহের গভীরতা কালের গজে মাপা যায় না। যে বিজয়া মহেশ্বরীর কেবলমাত্র ছয় মাসের পরিচিত, মহেশ্বরীর পৌত্রীর স্থান সে অকস্মাৎ এমন ভাবে অধিকার করিয়া বসিল যে, সকলেই তাহা দেখিয়া অবাক্! সপ্তমী পূজার দিন মহেশ্বরী জ্বরে পড়িলেন। পাঁচ জন আহূত অভ্যাগত থাকিলেও তত্ত্বাবধানের সকল ভার তিনি বিজয়ার উপর অর্পণ করিলেন। এ জন্য যাঁহারা ক্ষুব্ধ হইলেন,—তাঁহারা মহেশ্বরীর আপনার জন বলিয়া দাবী করিবার অধিকার রাখেন।

দত্ত-গিন্নী মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন,—"বড়-গিন্নীর সবই বাড়াবাড়ি! একটা ইস্কুলের মাষ্টারণী—শেষকালে সেই হ'ল কি-না মিত্তির-বাড়ীর মাঠাক্'রুণ!"

চাটুয্যে-গিন্নী সহাস্যে কহিলেন,—"ছুঁড়ী বোধ হয় গিন্নীকে গুণ-টুন কিছু করেছে!"

কাজ করিতে করিতে ক্ষ্যান্ত দাসী কহিল,—"আপনারা তো জান না, আমি জানি! সারাক্ষণই মুখের কাছে—ঠাকুমা—ঠাকুমা! যা বলবে উনি! দেওয়ান মশায় তো তাই বলতে লেগেছে—এই যে আসচে উনি!"

বিজয়া সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল। হাতে সোনা-বাঁধান লোহা ও শাঁখা। পুরোহিতকে লক্ষ্য করিয়া কহিল,—"দেবীর সপ্তমী পূজার গয়না।"

সেন-গিন্নী শ্লেষভবে হাসিয়া কহিল,—"তা সন্ধি-পূজোতে কি দিচ্ছ মাকে গিন্নী?"

বিজয়া প্রচ্ছন্ন খোঁচাটা উপেক্ষা করিয়া কহিল,—"নথ দেওয়া হবে।"—এবার সে কাপড়ের হিসাব করিতে বসিল।

নায়েব আসিয়া কহিল,—"মহালের প্রজারা সব এসেছে।"

মুখ তুলিয়া বিজয়া কহিল,—"আপনি আর চণ্ডীবাবু সে দিকে দেখা-শোনা করুন গে;—তাদের যেন কষ্ট না হয়।"

নায়েব অপ্রসন্ন মুখে চলিয়া গেল।

দত্ত-গিন্নী ঘোষ-গিন্নীর গা টিপিলেন। ঘোষ-গিন্নী বিজয়াকে কি বলিতে গেল;—সেই সময় এক জন পরিচারিকা আসিয়া বিজয়াকে কহিল,—"মা-ঠাকরুণ আপনাকে ডাকচে।"

চাটুয্যে-গিন্নী অর্থসূচক দৃষ্টি হানিয়া দত্ত-গিন্নীর পানে চাহিলেন; কহিলেন,—"তা হলে উনিই পূজা-বাড়ীর গিন্নী!"

দত্ত-গিন্নী বক্রহাস্যে কহিলেন,—"হ্যাঁ, কর্ত্রী।"

রায় গিন্নী মহেশ্বরীর গঙ্গাজল। বিজয়ার পানে চাহিয়া কহিলেন, —"তুমি গঙ্গাজলের কে হও বাছা?"

দত্তদের মেজ-বৌ কহিল,—"কে আবার হবে? মেয়ে-ইস্কুলের ও এক জন মাষ্টারনী। আমার সুকুমারী তো ওর কাছেই পড়ে।"

রায়-গিন্নী কহিলেন,—"যাদের মায়া দিলে, তাদের পেলে না। মহামায়ার মায়া কি কেউ কাটতে পারে?"

চাটুয্যে-গিন্নী কহিলেন,—"তা হোক! বড়-গিন্নীর ভীমরতি ধরেছে! তা না হলে—একটা ইস্কুলের মাষ্টারনীকে,—আর তোমাকেও বলি বাছা, তুমিই বা কোন্ আক্কেলে পূজোর জিনিষপত্র ছোঁয়াছুয়ি করছ?—কি জাত তোমার?"

মুখ তুলিয়া সপ্রতিভ স্বরে বিজয়া কহিল,—"আমরা হিঁদুই।"

—"মোচলমান নও—তা আগেই বুঝেছি। বলি, বামন না কায়েত? না—আর কিছু? হিঁদু হ'লে জাত একটা আছে তো? পদবীটা কি?"

—"আমরা বোস।"

—"তা হলে কায়েতই বটে। তা বিধবা, না আইবুড়ো? আজ-কাল তো কিছুই বোঝবার যো নেই।"

—"আমি কুমারী।"

—"মা-বাপ আছে?"

বিজয়ার রাগ ধরিল; সে যেন সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়াছে! শ্রীপদ সরকার উপস্থিত হইতেই বিজয়া কহিল,—"সরকার মশায়, প্রসাদ পাবার ব্যবস্থা করুন। আমি ঠাকুমার ওখানে যাচ্ছি।" —সে উঠিয়া গেল।

চাটুয্যে-গিন্নী কহিলেন,—"দেমাক দেখছিস? 'মহাপ্রসাদকে দেখতে যাব; অমনি বলে আসবো—এমন অনাছিষ্টি কাণ্ড চলবে না বাপু!"

সকলেই কথাটার সমর্থন করিল। দত্তদের মেজ-বৌ কহিল,— "পিসিমা এখন হতে সাবধান হন! আমি উকীলের মেয়ে—বাবার কাছে অমন অনেক মকর্দ্দমার কথা শুনেছি; শেষে টের পাবেন! ছুঁড়ি হয় তো ভুলিয়ে ফুসলে কি সব লিখে নেবে! মিত্তির-জ্যাঠাইমাকেই তো ওঁর শ্বশুর দান-বিক্রীর সব ক্ষমতা দিয়ে গেছেন।"

চাটুয্যে-গিন্নী কহিলেন,—"একেই বলে, 'যার ধন তার ধন নয় নেপোয় মারে দই!' কার সম্পত্তি কে খায়? আমরা তো জানতুম, অজয়ই সব পাবে।"

রায়-গিন্নী কহিলেন,—"পেতও তাই; কেবল বাপের জন্যে হ'ল না। দাশরথিকে তো জানি, সে সোজা ছেলে নয়!—যেমন বুঝলে, বিষয় ছেলে পাবে বাপ কেউ নয়—বাপ যে মুন্সেফ সেই মুন্সেফ! অমনি ছেলেকে ফুসলে বিলেত পাঠালে। আমার বিনোদ তাই বলে,—অজয় বাপের চালবাজি অতটা বুঝতে পারেনি!"

দত্তদের মেজ-বৌ কহিলেন,—"আমরা মনে করতুম, শঙ্করই সব পাবে। বেশ ছেলে ছিল, দেখলে জামাই করতে সাধ হয়! আমি তো ভাবতুম, আমার পুঁটির সঙ্গে—তা জ্যাঠাইমাকে ধরলে 'না' করতে পারত না।"

রায়-গিন্নী কহিলেন,—"তা গঙ্গাজল সে ধাতের মানুষ নয়! 'না' বলতে পারত না; তবে তোমার মেয়ের আবার রাজরাণী হবার বরাত চাই তো! ওই বিয়ে নিয়েই তো শঙ্করের সঙ্গে গঙ্গাজলের বাগাবাগি হয়ে গেল!—আর ওই মাষ্টারণী ছুঁড়ি—কে জানে, গত-জন্মে ওই হয় তো মেয়ে ছিল—চেহারা তো হুবহু গঙ্গাজলের ছোটবেলার চেহারার মত।"

দত্তদের মেজ-বৌ কহিলেন,—"কি যে বলেন, পিসিমা! একটু রূপ দেখে আপনারা অমন করছেন,—শেষে যদি সম্পত্তিটা ওর হাতে যায়?"

"তা বটে—গঙ্গাজলকে বলব এখন। বরাবরই জানি তো, মনটা বড্ড নরম কি না!"

* * * *

দেবায়তনে প্রতিমার সম্মুখে বসিয়া নিমন্ত্রিত, আহূত, পাড়া-প্রতিবেশী রমণীর দল যখন মিত্তিরদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারীর আলোচনায় ব্যাপৃত, সেই সময়ে এক সুদর্শন-মূর্ত্তি সুবেশধারী যুবক এক জন প্রৌঢ় ভদ্রলোককে সঙ্গে লইয়া মহেশ্বরীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া ডাকিল,—"পিসিমা!"

চমকিয়া মহেশ্বরী চক্ষু মেলিলেন; কিন্তু নিজের চক্ষুকে যেন বিশ্বাস করিতে পারিলেন না! বিমূঢ়ের মত বিহ্বল নেত্রে চাহিয়া রহিলেন, মুখ দিয়া বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না!

শঙ্কর মহেশ্বরীর নিকট সরিয়া গেল; কহিল,—"পিসিমা, আমি এসেছি।"

মহেশ্বরীর এতক্ষণে বিশ্বাস হইল—স্বপ্ন নয়, বাস্তব! তিনি ক্ষীণ-স্বরে কহিলেন,—"শঙ্কর, এলি বাবা!"

"হ্যাঁ পিসিমা! তোমার অসুখ শুনে একেবারে কবিরাজ মশায়কে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।—সুবদাস বাচস্পতিকে তো তুমি জান পিসিমা। ইনি—"

শঙ্করের কথা মধ্যপথে থামিয়া গেল; বিজয়া আসিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। মহেশ্বরী তখন কহিতেছেন, "না শঙ্কর, এইবার আমায় যেতে দে বাবা!"

শঙ্কর ব্যগ্র কণ্ঠে কহিল,—"সে কি পিসিমা, আমাদের আশীর্ব্বাদ না করে, আমার বিয়ে না দিয়েই তুমি যাবে কোথায়? এখন তোমার যাওয়া হবে না—হতে পারে না।"

অতি ধীরে ধীরে মহেশ্বরী কহিলেন, "তোর বিয়ে? তোকে আশীর্ব্বাদ—"

"হ্যা পিসিমা, বিজয়াকে যে আমি বিয়ে করব।"

মহেশ্বরী ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের মুখপানে কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়া থাকিয়া চক্ষু মুদিলেন। নিজেরই বোধ হইল, জ্বরের ঘোরে বুঝি কোন অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিতেছেন!

* * * *

ভিসকবৃন্দ বাচস্পতির ভেষজের গুণে দশমীর দিন প্রভাতে মহেশ্বরীর জ্বর ত্যাগ হইল। বুকের সর্দ্দিও কমিল! বুঝা গেল, এবারের মত মৃত্যুর পথ হইতে তাঁহাকে ফিরিতে হইল।

শঙ্করের পানে চাহিয়া মহেশ্বরী স্নিগ্ধ স্বরে কহিলেন, "শঙ্কর, তুই আমায় মরতে দিলি নে।"

শঙ্কর হাসিয়া উঠিল। প্রভাতের নির্ম্মল আলোর মত আনন্দময় হাসি! প্রফুল্ল স্বরে সে কহিল, "নাঃ পিসিমা, মজা মন্দ নয়! তুমি ফাঁকি দিয়ে পালাবে? আর যে বনবাসে নিজেকে নির্ব্বাসিত করে, কঠোর তপে তোমায় তুষ্ট করলে, তাকে তুমি বর না দিয়েই কৈলাসে যেতে চাইছ? তুমি যে মহেশ্বরী।"

রোগ-পাণ্ডুর মুখে আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন,—"বিজয়া! বিজয়া কে?"

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া শঙ্কর কহিল, "বিজয়া কে? আমার কনে এই তো? কিন্তু পিসিমা, তুমি ওকে চিনতে পাচ্ছ না! ও যে তোমার অর্জ্জুনের ছোট মেয়ে। বিয়েতে যখন তুমি কিছুতেই মত দিলে না, ওকে গিয়ে জানালুম, নিরুপায় আমি। পিসিমার আদেশে আমায় হয় তো একটা পাড়া-গেঁয়েকেই নিতে হবে। ও আমায় অভয় দিলে,— একটা বছর সময় চেয়ে নিলে। অম্বিকা বিদ্যালয়ের চাকরীটা অবশ্য আমার কৌশলেই পেয়েছিল! থাক, সেটা আর ফাঁস করব না।"

মহেশ্বরীর পাংশু মুখে শোণিতের উচ্ছ্বাস দেখা গেল। তিনি কহিলেন,—"শঙ্কর, আমার অর্জুনের মেয়ে বিজয়া? তাই ওর মুখখানা দেখলেই আমার কেমন মায়া হয়।"

বিজয়া আসিয়া সেই সময় কক্ষে প্রবেশ করিল। হাতে দেবীর প্রসাদী নির্ম্মাল্য! তাহা মহেশ্বরীর ললাটে ঠেকাইয়া কহিল,—"ভট্টাচায্যি মশায় জানতে চাইছেন, বরণের কি ব্যবস্থা হবে? ও-বাড়ীর জ্যাঠাইমা বলে পাঠিয়েছেন, আসতে পারবেন না।"

বিজয়াকে লইয়াই জ্ঞাতিবর্গ, প্রতিবেশীর দল সকলেই অসন্তুষ্ট, ক্রুদ্ধ, মহেশ্বরীর ইহা অজ্ঞাত নহে। অন্য সময় হইলে হয় তো একটু চিন্তিত হইতেন; কিন্তু এখন তিনি সহজ স্বরেই কহিলেন,—"কেন, তুই করবি!"

এত বড় সম্মানটা অকস্মাৎ বিজয়া যেন আশা করিতে পারে নাই; বিপুল বিস্ময়ে সে কহিল, "আমি? কি বল্লে? আমি করব বরণ?"

দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর হইল—"হাঁ, তুই! তুই যে আমার সর্ব্বেশ্বরী, অর্জুনের মেয়ে, তোরই তো সব! হাঁ বিজয়া! এত দিন সব কথা আমার কাছে লুকিয়েছিলি?"

মহেশ্বরীর চক্ষু দিয়া টপ টপ করিয়া আনন্দাশ্রু ঝরিতে লাগিল।

বিজয়া মহেশ্বরীর পায়ের উপর হাত রাখিয়া কহিল,—"মাফ কর ঠাকুমা! আমি মনে করতুম, বাবার পরিচয় দিলে তুমি হয় তো আমায় তাড়িয়ে দেবে! তার পর যখন জানতে পারলুম, বাবাকে তুমি কত ভালবাস, তখন আর পরিচয় দেবার সুযোগ পাইনি।"

মহেশ্বরী কহিলেন,—"শঙ্কর, আমার বৌমাকে ছেলেমেয়ে নিয়ে আসতে তার করে দে—না, না, বৌমাকে নয়; শুধু অর্জুনের ছেলে-মেয়েরা আসুক। আমি বৌমার বিধবা-মূর্ত্তি দেখতে পারব না।"

বাচস্পতি মশায় আসিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। মহেশ্বরীর কৃশ হাতখানা ধরিয়া নাড়ী দেখিয়া সহাস্যে কহিলেন, "গিন্নীমা, যাওয়া আপনার হ'ল না; গাড়ী ফিরে গেল। শুভ অগ্রহায়ণে শুভকর্ম্মটা সেরে ফেলুন।"

মহেশ্বরী কহিলেন,—সেতেও আমি চাই নে—যতক্ষণ না চার হাত এক হচ্ছে।"

* * * *

বিজয়া-দশমীর দিন দেবী-বরণের নিমিত্ত বহু দিনের অব্যবহৃত মহেশ্বরীর অলঙ্কারগুলা বিজয়ার অঙ্গে উঠিল। শঙ্কর হাসিয়া খুন! এ কি কি বিশ্রী সিঁথি, সাতনরী! সেই সব পরেছ? আঃ, একদম সেকেলে।"

কৃত্রিম কোপ-কটাক্ষে শঙ্করের পানে চাহিয়া বিজয়া কহিল, "মা দুর্গাই কি একেলে,—না শিবশঙ্কর—হালের?"

এয়োতি মেয়েরা দেবীকে সিঁদুর-আলতা সহ বরণের উপচার লইয়া অগসর লইল। দত্তদের মেজ-বৌ কহিল,—"তুমি বরণ করবে?"

রায়-গিন্নী কহিলেন,—"ভাইবুড়ো!"

গম্ভীর কণ্ঠে বিজয়া কহিল,—"ঠাকুমা আমায় ভার দিয়েছেন।"

ক্ষ্যান্ত রায়-গিন্নীর কানে কানে কি কহিতেই, তিনি চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন,- "এ্যাঁ, অজয়ের মেয়ে? বেশ! বেশ! আঃ, গঙ্গাজলের বুকের ভেতরটা যে! হা-হুতু যো-অজু করত। মা দশভুজা এত দিনে মনে শান্তি দিলেন।"

মেজ-বৌয়ের মুখ কালি হইয়া উঠিল; সে কহিল,—"জানি না, পিসিমার অনাছিষ্টি—"

প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া, দেবীর মাথার মুকুট হাতে লইয়া শঙ্কর উল্লাসভরে গৃহে ফিরিল।

মহেশ্বরীর কক্ষের সম্মুখে খোলা ছাতে বিজয়া দাঁড়াইয়াছিল। দশমীর রাত্রি; শরতের কৌমুদী-প্লাবিত বাগানের দিকে নির্নিমেষ নেত্রে সে চাহিয়া ছিল।

শঙ্কর আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিল,—"মাটীর দুর্গাকে জলে দিয়ে এলুম—কিন্তু তাঁর মাথার মুকুট নিয়ে এলুম,—ঘরের দুর্গাকে পরাব বলে।"

হাসিমুখে বিজয়া মাথাটা অবনত করিল।

শঙ্কর সানন্দে বাঞ্ছিতার ললাটে মুকুটটা পরাইয়া দিল।

বিজয়া যাত্রার দলের রাণীর মত মুকুটপরা মাথায় কমনীয় মুখখানি তুলিয়া সহাস্যে কহিল,—"আমি বিজয়া।"

"হাঁ, তুমি বিজয়া, শঙ্কর-মোহিনী" বলিয়া দুই বাহু প্রসারিত করিয়া শঙ্কর বিজয়াকে বক্ষে আবদ্ধ করিল।

—"আঃ, ভারী দুষ্ট তুমি, চল, আগে ঠাকুমাকে প্রণাম করে আসি। দু'জনে একসঙ্গে প্রণাম করব বলে আমি অপেক্ষা কচ্ছি।"

মহেশ্বরীর গৃহ হইতে আহ্বান শোনা গেল, "ও বিজু, মেজ-বৌমা এসেছে— মিষ্টি দিয়ে যা।"

শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী।

মানুষের ভাষায় ইতর প্রাণী

মানুষ জীব-জগতের শ্রেষ্ঠতম প্রাণী ; তাই সে রাজার আসন অধিকার করেছে। সে রাজার জাতির ঔদ্ধত্যকে জীব-জগত হতে স্বতন্ত্র রাখতে চায় ; কিন্তু তার বিশ্ব-প্রেম ইতর জীবের আকৃতি-প্রকৃতিকে ঘর থেকে নির্ব্বাসিত করে হৃদয়ের দ্বার অর্গল-রুদ্ধ করে রাখতে পারেনি। মনুষ্যের গর্ব্ব ভাষা নিয়ে। কিন্তু তার ভাষার সকল ভাবের মধ্যেই জীব-জন্তুর গতি অব্যাহত।

ইতর জীবের উল্লেখ করে মানুষ কেবল ইতর ভাষায় অপরকে গালাগালি দেয় না ; অবশ্য, প্রতিপক্ষের বুদ্ধির অপকর্ষতা সূচিত হয়—গর্দ্দভ, বানর, উল্লুক প্রভৃতি পাশব শব্দে। প্রিয়জনের তুষ্টির জন্যও নব-কোকিলকে বিচরণ করতে হয় পশুশালায়।

প্রাচীন জগতের দেব-বর্গে পশু-পক্ষীর প্রচুর আদর। প্রাচীন আসীরিয় ব্যাবিলনের বহু দেবতা পশু-মুণ্ড। প্রজাপতি দক্ষ ছাগ-মুণ্ড হয়েছিলেন শিবের নিন্দা করে। রোমের জুনো দেবীর হাঁসের পালের ভীতি-কাতর কাকলী একবার শিশু রোমকে বিদেশীর আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছিল। মিশরে আইবিশ-বক ছাগল, বিড়াল, চীল, কুমীর, নকুল, ধর্ম্মের এপিস-ষাঁড়, এমন কি, সারমেয় পর্য্যন্ত পবিত্র বলে সম্মানিত হ'ত।

আমাদের স্বর্গ-বর্গে বহু পশু পক্ষী সম্মানিত। আমাদের দৈনিক কর্ম্মই গো-ব্রাহ্মণহিতের জন্য। দেবাদিদেব সন্ন্যাসী—কিন্তু বৃষভারূঢ়, এবং নাগেন্দ্র তাঁর কণ্ঠভূষণ। তাঁর আদ্যাশক্তি দশভূজা সিংহবাহিনী। কুমার—কার্ত্তিক শিখি-বাহন। গণেশ গজেন্দ্র-বদন, তাঁর বাহন ইঁদুর। কন্যা চঞ্চলার পদতলে অচঞ্চল লক্ষ্মী-পেঁচা। রাজ-হংস বাণীর চরণাশ্রিত। মা দুর্গার পদপ্রান্তে নিপতিত অসুরটি মহিষাসুর।

বিষ্ণুর বাহন অধুনা-লুপ্ত বিহঙ্গরাজ অতিকায় গরুড়। অপর একটি অতিকায় বিহঙ্গম জটায়ু বিষ্ণুর অবতার শ্রীরামচন্দ্রের সহায় হয়েছিল। বালগোপালকে কোলে নিয়ে বসুদেব যখন যমুনার উদ্দামতায় বিব্রত, তখন এক জম্বুক তাঁকে পথ দেখিয়ে যমুনার পরপারে নিয়ে গিয়েছিল। নন্দ-নন্দনের ব্রজলীলায় ধেনু ও বৎসগণের কৃষ্ণ-প্রেম বিশ্ব-বিশ্রুত।

পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা মকরবাহিনী। ব্রহ্মাণী হংসযুক্ত-বিমানারূঢ়া। গর্দ্দভ-পৃষ্ঠে শীতলা দেবীর আসন। বিড়াল মা-ষষ্ঠীর প্রিয় বাহন। দেবরাজ ইন্দ্রের বাহন প্রসিদ্ধ ঐরাবত হস্তী। সাগর-মন্থনোদ্ভূত উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্বও ইন্দ্রের বাহন। নাগরাজ বাসুকির প্রতিষ্ঠা যুগ-যুগান্তরব্যাপী। চীনের ড্রাগন তারই প্রকার-ভেদ।

অনেক প্রাচীন যোদ্ধার ধ্বজাই জন্তু-চিহ্নিত,—যথা কপিধ্বজ, গরুড়ধ্বজ, মকরধ্বজ, মীনকেতন। চীনাদের ড্রাগন-ধ্বজার সম্মানরক্ষার্থ বহু বীর যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করেছেন। এক সময় প্রাচীন ব্রিটেনদের ধ্বজাতেও ড্রাগন বিরাজিত ছিল।

মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ এবং নৃসিংহ হিন্দুদের অবতার হয়ে ইতর প্রাণীর গৌরব বিঘোষিত করেছেন।

দ্বাদশ রাশির মধ্যে ইতর জীবের নামধারী সাতটি—আরাআরির উপর ; মেষ, বৃষ, কর্কট, সিংহ, মকর, বৃশ্চিক এবং মীন। চন্দ্রও শশধর।

পৌরাণিক পরিকল্পনার পশু, পক্ষী, মীন প্রভৃতি ঐতিহাসিক কিম্বা আধ্যাত্মিক সত্যের রূপক—সে কথার আলোচনায় জ্ঞান এবং তর্ক বাড়তে পারে, কিন্তু কাব্য-রস মলিন হয়।

সংসারের নানা কাজে ইতর জীব ভদ্র উপমার উপকরণ। শিশুর মনস্তুষ্টি করতে তার কৃতিত্ব অসাধারণ। "আয় রে আয় টিয়ে, নায়ে ভর দিয়ে, না নিয়ে গেল বোয়াল মাছে, তা দেখে দেখে ভোঁদড় নাচে।"—লেজ-ঝোলার আতঙ্ক অনেক দুষ্ট ছেলেমেয়েকে শান্ত করে ; বুলবুলির ধান খাওয়ার অজুহাতও বহু দুরন্ত খোকা-খুকুর ঘুমের মন্ত্র। আধুনিক ছেলেভুলানো ছড়া—'সিংহ মশায় সিংহ মশায় মাংস যদি চাও, রাজহংস দিব খেতে হিংসা ভুলে যাও'—খোকামণির পূজনীয় জনকজননীরও উপভোগ্য। পশু-পক্ষী ধর্ম্মঘট করলে শিশু-সাহিত্য হয় অচল। 'নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোঁটন বেঁধেছে, ওপারে দুই রুই কাতলা ভেসে উঠেছে' - যেমন শ্রুতিমধুর তেমনি মনোরম। অনুপ্রাসেরও ছটা পাই—টিয়ার মার বিয়েতে। খোকা সুন্দর ছবি দেখে যখন—'খোকা যায় মাছ ধরতে ক্ষীর-নদীর তীরে, মাছ নিয়ে গেল কোলা ব্যাঙে, ছিপ নিয়ে গেল চিলে।'—শিশুর মনে পক্ষি-প্রীতি জাগে, যখন তাকে শেখানো হয়—"পানকৌড়ি পানকৌড়ি ডাঙ্গায় ওঠসে।" সঙ্গে সঙ্গে ভুঁড়ো-শেয়ালীর নাচ এবং ওপারে শেয়ালের কোমরবাঁধার ছড়া শুনে খুকুরাণীর মুখে যে হাসি ফুটে ওঠে, তা সত্যই বড় মধুর।

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথও "জগৎ-পারাবারের তীরে", শিশুর মহামেলায়, ইতর জীবের জগৎ হতে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন শিশুর মনস্তুষ্টির জন্য। যখন,—"কে নিল খোকার ঘুম হরিয়া।"

তখন রোদের বেলা সবাই ছেড়েছে খেলা
ওপারে নীরব চকাচকিরা,
শালিক থেমেছে ঝোপে শুধু পায়রার খোপে
বকাবকি করে সখা-সখীরা।

"সমব্যথী" কবিতায় খোকা যদি খোকা না হয়ে কুকুরছানা কিম্বা টিয়াপাখী হত, তাহলে তার জীবনে কি-সব দুর্ঘটনা ঘটত, তার মজার সমাচার পাই। মাঝি হলে খোকা দেখতে পেত, "গরু মহিষ সাঁতরে-নিয়ে যায় রাখালের ছেলে", "ঝাঁকে ঝাঁকে আসে সেথায় চকা চকি যত", "কাদা-খোঁচা পায়ের চিহ্ন আঁকে পায়ের পর", আর —শুনতে পেত, "শেয়ালগুলোর ডাক বাউ-ভাঙ্গাটার পরে।"

কেবল আমাদের দেশে নয়, বিলাতেও গুজি, গুজি, গ্যাণ্ডার, টেডিবেয়ার প্রভৃতি শিশুদের আদরের প্রাণী।

* দশ অবতারের তিনটি ইতর-প্রাণী, চতুর্থটি অর্দ্ধ-পশু, অর্দ্ধ-নর।

বীর-রসের পরিবেশনে—সিংহ-বিক্রম, হস্তী-পরাক্রম, বৃষস্কন্ধ প্রভৃতি বিশেষণের প্রয়োগ বিরল নহে; নর ব্যাঘ্র, পুরুষ-সিংহ, শিয়াল-কাঁকি প্রভৃতিরও অভাব নাই। কেহ অশ্বের মত দ্রুতগামী, শূয়োরের মত কারও গোঁ, কারও চাতুর্য্য শৃগালের মত, কেহ বা কাকের মত চালাক! কারও স্বর ভালুকের স্বরের সঙ্গে তুলনীয়। অবশ্য গণ্ডারের চামড়া না থাকলে রাজনীতির রণক্ষেত্রে বীরত্ব দেখানো সম্ভব নয়। শ্যেন-চক্ষুই তীক্ষ্ণ দৃষ্টির মর্য্যাদা বৃদ্ধি করে। মাইকেলের বীরাঙ্গনা প্রমীলা— মদ-মাতঙ্গিনী গতি, "সিংহ সহ সিংহী আসি মিলিল বিপিনে।"—

"চিত্রা বাঘিনীরে যথা রোধে কিরাতিনী
মাতে যবে ভয়ঙ্করী—হেরি মৃগপালে।"

রাজারা বসেন সিংহাসনে। "ময়ূর সিংহাসন" শব্দটা সোনার পাথরবাটির মত হলেও, আসনটা ছিল গৌরবময়। চামর—রাজা এমন কি, দেবতার পরিচর্য্যার উপকরণ; কিন্তু উহা চমরী গরুর লেজের লোমগুচ্ছ।

রোমক ও জার্মান ঈগল, বৃটিশসিংহ, বাঙ্গালার বাঘ, অষ্ট্রেলিয়ার ক্যাঙ্গারু, রুশীয় ভল্লুক, কাফ্রী উটপাখী—এ সকল জাতির বীরত্বের নিদর্শন।

ভাষা আদিবসে জীব-জন্তুর জন্য বিশেষ স্থান নির্দ্দিষ্ট করেছে; কারণ, প্রেমের জগতে ওদের খ্যাতি অসাধারণ। কামশাস্ত্র নায়কের শ্রেণী-বিভাগ করেছে পশুর আদর্শে—শশ, মৃগ, বৃষ এবং অশ্ব। কাব্য ও সাহিত্য নায়িকাকে—কোকিলকণ্ঠা, হরিণীপ্রেক্ষণা, মরাল-গামিনী, কম্বুগ্রীবা, সফরীনয়না, মীনাক্ষী ইত্যাদি বিশেষণে অলঙ্কৃত করেছে। অবশ্য, প্রেমিক-প্রেমিকা কপোত-কপোতীর মতই বক্‌বকম্ করে।

রৌদ্র-রসে প্রতি-পক্ষের প্রতি ভর্ৎসনা-বাণ বর্ষণ করতে হলে ইতর প্রাণী দ্বারা তূণ পূর্ণ করতে হয়। পেঁচা-মুখো ছুঁচো-মুখো, বানরমুখো, 'গাড়োল' ছাগল-দাড়ি, বিড়াল-চোখো, ইত্যাদি রূপবর্ণনার অঙ্গ। ভয়ে পিঁপড়ের গর্ত্ত খুঁজতে হয়। তারা কেহ কেঁচোর মত নগণ্য, কেহ বা চিনে জোঁক। রাগ হলে তাদের বলি—হস্তি-মূর্খ, রাসভ-কর্ণ, ফেরু-পাল। তাদের বৈশিষ্ট্য—ক্যাঁকড়ার প্যাঁচ, দাঁড়কাকের চলন, মাছের মত গন্ধ এবং তাদের ব্যবহারে বাঁদরামির পরিচয় পাওয়া যায়। পাঁড়ঘুঘু বা বাস্তু-ঘুঘুর অস্তিত্ব কোথায় নাই?

হাস্য-রস গাঢ় হয় মনুষ্যেতর জীবের সহায়তায়। ট্রামে ও বাসে স্থানাভাব বশতঃ লোকে 'বাদুড় ঝোলে।' তীর্থের কাকের কথা সকলেই জানেন। ভীরু ভয়ে লেজ গুটায়। ভণ্ডামীতে কেহ বক-ধার্ম্মিক। সামর্থ্যের অভাবেও যারা দুঃসাধ্য কাজে হাত দেয়, তাদের সম্বন্ধে বলা হয়, "বাঘ পালালো বিড়াল এলো শীকার করতে হাতী।" আরও শুনতে পাই—"হাতী ঘোড়া গেল তল, ভ্যাড়া বলে কত জল?" "দুর্জ্জন লোকের খুরে নমস্কার" করবারও ব্যবস্থা আছে। পণ্ডিতের দলে মূর্খেরা "হংসমধ্যে বকের মতন।" ক্ষুদ্রত্বে যার সম্পদ গর্ব্ব সে "বন-গাঁয়ের শিয়াল-রাজা।" ইংরেজের ধারণা, যে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে সে কুকুর কামড়ায় কদাচিৎ।

বীভৎস-রসে—ভাল্লুক, উট প্রভৃতি কাজে লাগে।

করুণ-রসে চাতক-প্রতীক্ষা, মণি-হারা ফণী, বৎস-হারা গাভী প্রভৃতির প্রয়োগ অত্যন্ত সাধারণ। বৎস বা বাছা, বাছনী না হলে বাৎসল্য-রস জমে না।

লোকের নামকরণেও সাহেব লোক হামেসা ইতর জীবের অনুকরণ করে। মিঃ ল্যাম্ব, লায়ন, বার্ড, ক্যামেল বড় সাহেব। সেবর্ণ হ ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তা ছিলেন। হনুমান সিংহ, নাগেশ্বর বাগ, হাতী সিংহ পশুপতি হাতী, মহাবীর নাগ, গোষ্ঠ বাবু, মতি বাবু সবাই ভদ্রলোক। নক্ষু অবশ্য খোকা। শ্রীমতী কোয়েলা আধুনিক মহিলা। শ্রীমতী সারিকা এবং কবুতরী বিবি, পায়রা বিবি, মুসম্মত শুকদেই প্রাচীনা। মিস্ নাইটিংগেল কবিত্বপূর্ণ পদবী।

দেশের নামে পশু-পক্ষীর স্মৃতিরক্ষা প্রাচীন। হস্তিনাপুর, সিংহপুর, সিংহল, সিংহভূম সিংহগড় পুরাতন। বাঙ্গালার পল্লীগ্রামের নাম পুঁটীমারি, শেয়ালমারি, খয়রামারি, কাতলমারি কাঁকলেমারি, সোলমারি, ইঁচেখালি। কলিকাতার মুরগীহাটা, মেছোবাজার প্রভৃতির খ্যাতিও অল্প নহে।

কপোতাক্ষ নদ, দুগ্ধস্রোতোরূপী। গাই-বাঁধা যেতে হ'লে শিয়ালদহ, বাঘ-মারী, ঘঘুডাঙ্গা, হাঁসখালি ভেড়ামারা পার হয়ে যেতে হয়। ও-পথে ঘোড়ামারা পড়ে না বটে, কিন্তু গৌহাটি যাওয়া যায়। চীলেখালি দূরে থাকলেও বরাহনগর পাশে পড়ে। হরিণঘাটা, বাঘনাপাড়া, কাক-দ্বীপ প্রভৃতি স্থলে গো-শকটে যেতে হয়। ময়ূর-ভঞ্জের নামকরণ ঐতিহ্য-মূলক।

পোষাক পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেও ইতরের অনধিকার প্রবেশ ভাববার কথা। কিছু কাল আগেও ভদ্রলোক ময়ূরকণ্ঠি র‍্যাপার গায়ে দিত। ব্যবসায়ে লাভবান হলে অনেকে পরিবারকে হাঙ্গর-মুখো বালা, সাপ তাগা, বিছে-হার প্রভৃতি উপহার দিত। ধনি-কন্যা মকর-মুকুট মাথায় দিয়ে বিবাহ-সভায় বসত।

অবশ্য ডাক্-ব্যাগ ওয়াটারপ্রুফ আধুনিক।

সোয়ান পেনসিল, সোয়ান-কালি সাহিত্য-সৃষ্টির উপাদান। বুল ও বেয়াররূপে শেয়ার-বাজারে বহু আমীর ফকীর হয়েছে, আবার বহু ফকরে ফাঁসা আমীর হয়েছে।

কবি একাধারে আকাশ-চাওয়া এবং অন্তর-খোঁজা। তাই বিশ্ব-কবির ব্রহ্মাস্ত্র অনন্ত। হিতোপদেশের বিষ্ণুশর্ম্মা পশুপক্ষী মৎস্য ও সরীসৃপের সহায়তায় হিত-কথা বিলিয়েছেন! কথাসরিৎ-সাগরেরও প্রধান বাসেন্দা ওরাই। ঈশপের গল্পগুচ্ছ সাহিত্যের চিড়িয়াখানা। আমাদের কথামালাও তথৈব চ।

বিশেষ ভাব ও বর্ণনার সঙ্গে কবিরা বিশেষ জীবকে মিশিয়ে রেখেছেন। বর্ষার সঙ্গে আবদ্ধ কেকা-রব এবং ব্যাঙের গ্যাঙোর গ্যাঙ। বিদ্যাপতির—'মত্ত দাদুরী, ডাকিছে ডাহুকী ছাতিয়া ফাটল মোর' বিপ্রলম্ভের ছাতি-ফাটা গান। "কেকা-ধ্বনি" প্রবন্ধে রবীন্দ্র-নাথ এই ছত্রের খুব সুখ্যাতি করেছেন। ফাজিল কবির 'নিশি হল ভোর ডাকিছে ভোঁদর'—ফালতো কবিতা। চণ্ডীদাসের নায়িকার মিলন-নিশার অবসান করেছে—পদউধ, কাক, কোকিলের ডাক। পদউধ—পদায়ুধ অর্থাৎ কুক্কুট বা তাম্রচূড়। খণ্ডিতা এবং বিরহিণীর হৃদয়-জ্বালা জুড়াতে ভোমরা অদ্বিতীয়। মধুকর-নিকর-করম্বিত কোকিল-কূজিত কুঞ্জকুটীরে—প্রেমবৈচিত্র্যের ভীষণ রঙ্গমঞ্চ! মধুসূদন মধুকরী কল্পনাকে আবাহন করেছেন—"কবির চিত্ত-ফুলবন মধু লয়ে রচ

মধুচক্র, গৌড়জন যাতে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।" তাঁর পিক, ময়ূর, শ্যামা পাখী-প্রীতি বাঙলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের প্রেমের বীজ সারা বিশ্বে রোপিত। তার ফসল তিনি মুক্তহস্তে দান করেছেন। ইতর জীবকে তাঁর উদারতা পাংক্তেয় করেছে। "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের" উল্লাসে শুনেছি—"ওরে আজ কী গান গাহিছে পাখি, এসেছে রবির কর।" "কাঠ-বিড়ালীদের পাড়ায়" "পলাশবনে তসরের গুটি ধরেছে, মহিষ চরছে হরতুকী গাছের তলায়।" "ছেলেটা দৌড় দেয় যেথায়"—

মরা নদীর বাঁকে দাম জমেছে বিস্তর
বক দাঁড়িয়ে থাকে চরে
দাঁড়কাক বসেছে বৈচী গাছের ডালে
আকাশে উড়ে বেড়ায় শঙ্খ চিল
বড় বড় বাঁশ পুঁতে জাল পেতেছে জেলে
বাঁশের ডগায় বসে আছে মাছরাঙা
পাতিহাঁস ডুবে ডুবে গুগলি তোলে।

বিশ্বের নিবিড় একত্বের সহজ অনুভূতি মূর্ত্ত হয়ে ওঠে মনের মাঝে।

"কিন্তু গোয়ালার গলিতে", "ঘরে থাকে আরেকটা জীব, এক ভাড়াতেই, সেটা টিকটিকি।"

"প্রাণের ডাকে" রবীন্দ্রনাথ শুনিয়েছেন কিরূপ, যে যাহারে খুসি—ডাক দেয়।

সুদূর আকাশে ওড়ে চিল
বারে বারে ভোরের কোকিল
ঘন দেয় ডাক।
জলাশয় কোন গ্রাম পারে
বক উড়ে যায় তার ধারে
ডাকাডাকি করে শালিকেরে।

অলমতি

দ্বিজেন্দ্রলাল দেশমাতৃকার পূজার বেদীতে যে অর্ঘ্য দিয়েছেন, তাতে বলেছেন—

পুঞ্জে পুঞ্জে ভরা শাখী কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখী
গুঞ্জরিয়া আসে অলি ফুলের মধু খেয়ে
সেথায় পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে উঠি পাখীর ডাকে জেগে।

"বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ"কে তাই কবি আমাদের প্রতিশ্রুতি দিতে বলেছেন—

আমরা মা তোর দুঃখ ঘোচাব,
মানুষ আমরা নহি তো মেষ।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত (এম-এ, বি-এল)

নারী

মন্দিরে অতন্দ্র রহি' যার লাগি করিয়াছ ধ্যান
যৌবন-দেবতা সে তো তোমারেই করিছে সন্ধান।
দুয়ারে দাঁড়ায়ে ঐ, করপুটে অঞ্জলি তোমার
লহ লহ ভার।

যে মালা গেঁথেছ তুমি সঙ্গোপনে মানস-কুসুমে,
যে ডালা সাজালে তুমি গন্ধদীপে অগুরু-কুঙ্কুমে
আনো আনো শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য, খোলো খোলো তব চিত্ত-দ্বার
আনো উপচার।

সুন্দরের ধ্যান ভাঙি' চেয়ে দেখো অন্তর-দেবতা
দয়িতের মূর্ত্তি ধরি' শুনিবারে তব মর্ম্মকথা,
সম্মুখে থামাল রথ, ওড়ে ধ্বজা দিগন্তের ভালে
পত্র-অন্তরালে।

অন্তরের সে বিগ্রহ রূপ নিল মৃন্ময় আলয়ে,
গোপন স্বপনসাধ নারী তুমি কি এনেছ বয়ে?
কিশোরী দিনের স্ম[illegible] [illegible]জড়িত প্রীতি-তন্তুজালে
ভ্রূভঙ্গির [illegible]লে?

নারী নহে শুধু স্বপ্ন অনন্ত [illegible]স্য-প্রহেলিকা
স্বপ্নময় জাগরণে [illegible] নীহারিকা।
অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি তার সুনীল নলিন-নেত্রপাতে
বসন্ত-প্রভাতে।

ধূসর মরুর বুকে নারী আনে প্রেম-মন্দাকিনী,
মধুর আনন্দলোক রচে মৃদু কঙ্কণ-কিঙ্কিণী।
পরম রহস্যময়ী আবির্ভূতা প্রসন্ন প্রভাতে
আলোতে শোভাতে।

নারী নহে শুধু দাসী নর্ম্মসখী খেলার পুতুল,
আদিম বসন্ত-প্রাতে বিকশিত বাসনার ফুল।
নর লবে অশ্ববল্গা নারী হবে সারথি রথের
কঙ্কর-পথের।

সঙ্গে লয়ে চলো তারে দীর্ঘপথ হবে না বন্ধুর,
দুঃখের শিলায়-ঘষা চন্দনের গন্ধ সুমধুর।
সুখদুঃখ বিন্দুমাত্র আবর্ত্তিত ক্ষণ-তরঙ্গের
বিকচ ভঙ্গের।

হেলায় দুর্গম গিরি উত্তরিতে অসীম কৌতুকে,
অপূর্ব্ব রক্তিম ঊষা দীপ্তিমতী নরনারী মুখে।
অসাধ্য-সাধনব্রত সমাধিতে ইহ-নরলোকে
সুখে দুঃখে শোকে,

কুসুম ফোটায় নিত্য পথে পথে নারী যুগে যুগে,
নরের চলার পথে আঘাত যা পাতি লয় বুকে,
নব নব [illegible] আনন্দের গীতি রচি শ্লোকে,
কটাক্ষ-আলোকে।

শ্রী[illegible] বিশ্বাস (এম-এ, বার-এট-ল।)

পূর্ব্বপুরুষের গুপ্তধন

[গল্প]

১
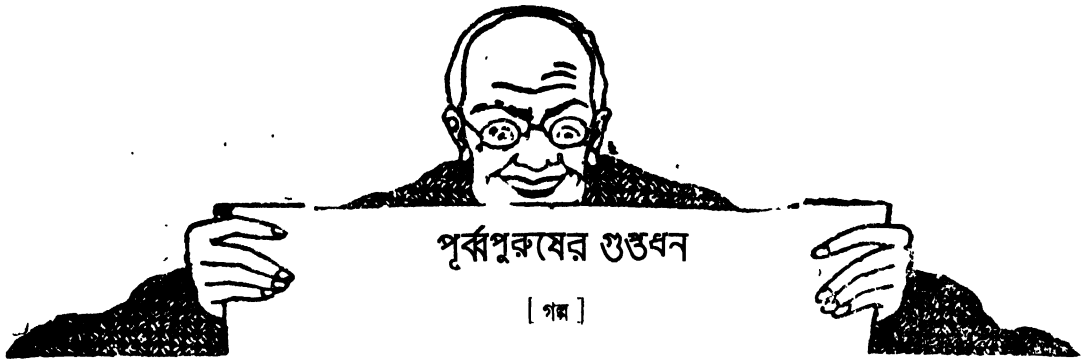
ট্রেণ পাণ্ডবেশ্বর ষ্টেশনে আসিলে যতীশ বাবু পুত্র সতীশকে প্ল্যাটফরমে উপস্থিত দেখিয়া গাড়ী হইতে মুখ বাড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "সতীশ, সতীশ! এই কামরায় আছি।"

পিতার আহ্বানে সতীশ দ্রুতপদে সরিয়া-গিয়া সেই কামরার দ্বার খুলিয়া বলিল, "ট্রেণ এখনও থামেনি, একটু দাঁড়ান বাবা!"

মুহূর্ত্তমধ্যে ট্রেণ থামিয়া গেল। যতীশ বাবুর পত্নী কমলা, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শচীশ ও কন্যা প্রতিভাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া দিলেন; তাহার পর কুলীর সাহায্যে জিনিষপত্রগুলি—একে একে প্ল্যাটফর্ম্মে নামাইয়া দিতে লাগিল। সেই সময়, সাদা ধুতির উপর কাল চাপকান, ও মাথায় এস্-এম্-মার্কা কাল টুপিপরা ষ্টেশন-মাষ্টার হরিশ দত্ত সেখানে আসিয়া যতীশ বাবুকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন; মুখ তুলিয়া বলিলেন,—"সার, আপনি এখানে?"

যতীশ বাবু ষ্টেশন-মাষ্টারের মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন,—"তোমার নামটি যে—"

বাধা দিয়া ষ্টেশন-মাষ্টার বলিলেন,—"হরিশচন্দ্র দত্ত, আমি আপনারই একটি ছাত্র।"

"তা' বুঝতে পেরেছি; কিন্তু নামটা আমার মনে ছিল না। কত ছেলে আমার হাত দিয়ে বেরিয়ে গেছে; সকলের নাম কি মনে থাকে? তা তুমি বুঝি এখানকার ষ্টেশন-মাষ্টার? কত দিন এ চাকরি করছ?"

ষ্টেশন-মাষ্টার বলিলেন, "তা প্রায় বার-তের বৎসর হ'ল। আগে একবার এখানে মাস-খানেকের জন্তে রিলিভিং-এ এসেছিলেম। গত জুলাই মাস থেকে এখানেই পারমানেণ্ট হয়েছি।—আপনি এদিকে কোথায় যাবেন সার?"

যতীশ বাবু বলিলেন, "এখানেই যে আমার বাড়ী;—এখান থেকে মাইল তিনেক দূরে অজয় নদীর ধারে—মলিপুরে।"

অতঃপর যতীশ বাবু বলিলেন, "শচীশ, জিনিস-পত্র সব নামানো হয়েছে ত? একবার দেখে নাও।"

শচীশ সমস্তই নামাইয়াছিল; তবু পিতার কথা শুনিয়া পুনর্ব্বার গাড়ীর ভিতরে উঠিয়া বেঞ্চের নীচে, বাঙ্কের উপরে দৃষ্টিপাত করিল; এবং পিতাকে বলিল, "না, গাড়ীর ভিতর আর কিছু নেই!"

গাড়ী ছাড়িতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া গার্ড ঘন ঘন হুইস্‌ল্ দিতেছিল। শচীশের কথা শুনিয়া ষ্টেশন-মাষ্টার গাড়ী ছাড়িবার সঙ্কেত করিলে গার্ড ট্রেণের 'ষ্টার্ট' দিল। গাড়ী প্ল্যাটফরম ত্যাগ করিলে ষ্টেশন-মাষ্টার বলিলেন, "এইটিই আপনার ছেলে শচীশ? আপনার সঙ্গে এক-এক দিন স্কুলে গিয়ে [illegible] থাকত। তখন ওর বয়স বোধ হয় ন'-দশ বছর হবে। এখন কি করছে? ঐটি বুঝি আপনার ছোট ছেলে? ওকে আমি আগে কখন দেখিনি সার!"

যতীশ বাবু বলিলেন, "হাঁ, ওর নাম সতীশ; আর ঐটি আমার মেয়ে প্রতিভা। শচীশ ল পড়ছে; সতীশকে মেডিকেল কলেজে দিয়েছি! প্রতিভার এ বৎসর ম্যাট্রিক দিবার কথা; কিন্তু কি যে হবে কিছুই জানিনে। বোমার ভয়ে কলকাতা থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়েছি।"

কথা কহিতে কহিতে সকলে ষ্টেশনের বাহিরে, যেখানে পাঁচ-সাত-খানা গরুর গাড়ী যাত্রীদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল, সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সতীশ ষ্টেশনে আসিয়া আগেই দু'খানা গাড়ী ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। শচীশ ও সতীশ জিনিষপত্রগুলি সেই দুইখানি গাড়ীতে তুলিয়া দিলে প্রতিভা মাতার সঙ্গে একখানা গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। সতীশ তাহার দাদাকে বলিল, "তুমি বাবার সঙ্গে এই গাড়ীতে এস! আমি সাইকেল নিয়ে আগেই যাই। জ্যাঠাইমা ডাল-তরকারী রেঁধে বসে আছেন, আমি গিয়ে খবর দিলে ভাত চড়াবেন।"

সতীশ সাইকেলে উঠিয়া চলিয়া গেল।

এবার ষ্টেশন-মাষ্টার যতীশ বাবুকে বলিলেন, "সার, এক দিন মাকে আর প্রতিভা দিদিকে নিয়ে পাণ্ডবেশ্বর দর্শন করতে আসবেন। সেই দিন আমার বাসায় পায়ের ধুলো দিতে হবে। এখন আমি ষ্টেশন ছেড়ে বাসায় যেতে পারব না, এখনই ডাউন ট্রেণ আসবে কি না।"

যতীশ বাবু বলিলেন, "আগে ত গ্রামে গিয়ে সংসার পেতে বসি, তার পর দেখা যাবে।"

ষ্টেশন-মাষ্টার যতীশ বাবুকে প্রণাম করিয়া তাঁহার গুরুপত্নীর গাড়ীর নিকটে গিয়া করযোড়ে বলিলেন, "মা, শচীশ সতীশ যেমন আপনার ছেলে, সেই রকম আমিও আপনার এক ছেলে। এক দিন পাণ্ডবেশ্বর দর্শন করতে এসে আমার বাসায় পায়ের ধুলো দিতে হবে। ছেলের এই আব্দার রাখতেই হবে মা!"

অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা যতীশ বাবুর স্ত্রী মৃদু স্বরে বলিলেন "বাবা! তুমি আমার বড় ছেলে; তোমার বাসায় যাব বৈ কি। কে কে আছেন তোমার বাসায়?"

"আমার মা, স্ত্রী, সাত বছরের একটি ছেলে, আর তিন বছরের মেয়ে।"—[illegible] নি হওয়ায় তিনি বলিলেন, "গাড়ী আসবার সময় হ'ল, এখন যাই মা, প্রণাম!" তিনি সেইখানে দাঁড়াইয়া নতমস্তকে গুরুপত্নীকে প্রণাম করিয়া ষ্টেশনে ফিরিয়া চলিলেন। যতীশ বাবুও জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। গাড়ী 'হটর-হট্' শব্দে চলিতে লাগিল।

২

মলিপুর বা মলয়পুর গ্রাম এক কালে বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল, গ্রামের এখন আর সে অবস্থা নাই। শত বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রামে অন্যূন দুই শত ঘর ব্রাহ্মণের বাস ছিল; এখন ভদ্রলোকসহ মোটের উপর দুই শত ঘর গৃহস্থের বাস আছে কি না সন্দেহ। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, এই গ্রামের প্রাচীন মুখোপাধ্যায়-বংশের আদি-পুরুষ রামজয় মুখোপাধ্যায় নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর প্রিয়পাত্র ছিলেন! নবাব যখন ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থাপন করেন, রামজয়ও সেই সময় পূর্ব্ববঙ্গ হইতে মুর্শিদাবাদে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। তাঁহার পুত্র পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় একবার সরফরাজ খাঁর কোপদৃষ্টিতে পড়ায় মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করিয়া বর্দ্ধমানে পলায়ন করেন, এবং কিছু কাল পরে বর্দ্ধমান জিলার উত্তর প্রান্তে অজয় নদের তীরবর্ত্তী মলয়পুরে প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া বাস করেন। জনশ্রুতিতে ইহাও প্রকাশ যে, তিনি মুর্শিদাবাদ হইতে আসিবার সময় ন্যূনাধিক পঞ্চাশ লক্ষ টাকার সোনা, রূপা ও হীরা জহরৎ প্রভৃতি লইয়া আসিয়াছিলেন।

পঞ্চাননের সময় হইতেই মলয়পুর সমৃদ্ধ গ্রামে পরিণত হয়; কিন্তু গ্রামের এই সমৃদ্ধি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। অজয়ের প্রবল বন্যায় মলয়পুরের সন্নিহিত বহু গ্রাম মধ্যে মধ্যে ভাসিয়া যাইত। মলয়পুর অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্থান বা "ডাঙ্গার" উপর অবস্থিত বলিয়া বন্যাপ্লাবিত হইত না বটে, তবে ঐ গ্রামের আর এক বিপদ ঘটে; বন্যায় অজয় নদের কূল ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে। এইরূপে কয়েক বার প্লাবনের ফলে অজয়ের কূল ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে ভাঙ্গনের তোড় মুখোপাধ্যায় বাড়ীর ভিতের নীচে আসিয়া পড়িল। তখন ঐ বাড়ীতে বাস করা আর নিরাপদ নহে বুঝিয়া পরিবারস্থ অনেকেই গ্রাম ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; কেবল হরনাথ মুখোপাধ্যায় পৈতৃক অট্টালিকার মায়া ত্যাগ করিতে পারিলেন না! কিন্তু পরবৎসর প্লাবনে অন্তঃপুরের অধিকাংশই নদীগর্ভে প্রবেশ করিল। হরনাথ সপরিবারে সদর-বাড়ীতে আশ্রয় লইলেন। সদর-বাড়ীও ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে, এই আশঙ্কায় তিনি গ্রামের পশ্চিম-প্রান্তে একটি অনতিবৃহৎ ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন; কিন্তু সেই নূতন বাড়ীতে উঠিয়া যান নাই। তিনি বলিতেন, যত দিন মাথা গুঁজিবার স্থান থাকিবে, তত দিন তিনি বাস্তুভিটা ত্যাগ করিবেন না।

নূতন বাড়ী নির্ম্মাণের কয়েক বৎসর পরে, হরনাথ একবার বিষয়-কর্ম্ম উপলক্ষে বর্দ্ধমানে গমন করেন, এবং সেই স্থানেই বিসূচিকা রোগে প্রাণত্যাগ করেন। তখন তাঁহার একমাত্র পুত্র নিরঞ্জন অপ্রাপ্তবয়স্ক তরুণ যুবক। স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা পত্নী পুত্রটিকে লইয়া নূতন বাড়ীতে উঠিয়া গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। নিরঞ্জন স্থানীয় চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতেছিলেন। পিতার মৃত্যুতে তিনি চতুষ্পাঠী ত্যাগ করিয়া কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার প্রায় এক শত বিঘা ধানজমী ছিল; সেই জমীর আয় হইতেই তাঁহার সংসার [illegible] গিল।

এদিকে কিছু দিনের মধ্যে তাঁহাদের পুরাতন অট্টালিকা অজয়ের গর্ভে বিলীন হইল; অট্টালিকা-সংলগ্ন প্রায় দশ বিঘা বাগান ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। ধন-কুবের রামজয় মুখোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র নিরঞ্জন মধ্যবিত্ত কৃষিজীবী গৃহস্থে পরিণত হইলেন। এই নিরঞ্জনের পৌত্র যতীশচন্দ্রই সেদিন পাং ষ্টেশনে সপরিবারে ট্রেণ হইতে নামিলেন।

যতীশ বাবু এম-এ পাশ করিয়া কলিকাতার একটা স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি প্রথমে আশী টাকা বেতনে সহকারী হেডমাষ্টার-পদে নিযুক্ত হইলেও কার্য্যদক্ষতাগুণে এখন মাসিক দেড় শত টাকা বেতনে সেই স্কুলের হেডমাষ্টার হইয়াছেন। তিনি কার্য্যানুরোধে কলিকাতা-প্রবাসী হইলেও জন্মভূমি মলিপুরের মায়া ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তিনি যখন চাকরি গ্রহণ করিয়া পত্নী ও শিশুপুত্রদ্বয়কে লইয়া কলিকাতায় যান, তখন দূর-সম্পর্কের এক মামাত ভাইকে গ্রামের বাড়ীতে রাখিয়া যান। তাঁহার সেই ভাই অত্যন্ত দরিদ্র ও নিঃসন্তান ছিলেন। মলিপুরের নিকটবর্ত্তী কোন এক গ্রামে তাঁহার বাস ছিল। এক বৎসর বর্ষার সময় বন্যার প্রাবল্যে তাঁহার পর্ণকুটীর নদীতে ভাসিয়া যাওয়ায় তিনি সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় হইয়া পড়িলেন। যতীশ বাবু তাঁহার এই বিপদের সংবাদ শুনিবামাত্র তাঁহাকে ও তাঁহার স্ত্রীকে নিজের বাড়ীতে আনাইয়া আশ্রয় দান করেন। প্রায় পাঁচ বৎসর হইল, যতীশ বাবুর সেই ভ্রাতার মৃত্যু হইয়াছে; তাঁহার প্রৌঢ়া বিধবা তদবধি যতীশ বাবুর বাড়ীতে থাকিয়াই তাঁহার বাগান, পুকুর প্রভৃতি দেখাশুনা করিতেছেন। যতীশ বাবু যখন কলিকাতা হইতে মলিপুরে যাইতেন, তখন সেই প্রৌঢ়াই যথাসময়ে তাঁহার জন্য রন্ধনাদি করিয়া রাখিতেন।

যতীশ বাবু প্রতি বৎসর পূজার ছুটী, বড়দিনের ছুটী, ও গ্রীষ্মের ছুটী উপলক্ষে সপরিবারে মলিপুরে আসিয়া বাস করিতেন। সেই জন্য তিনি দেশের বাড়ীতেও শীতের ও গ্রীষ্মের উপযোগী দুই প্রস্থ শয্যা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রতিবার যাতায়াতের সময় তাঁহাকে বিছানার মোট বাঁধিতে হইত না, বা হরিকেন লণ্ঠন, বালতী ও বাসনাদিও সঙ্গে লইয়া যাইতে হইত না।

যতীশ বাবু এবার বাড়ী আসিবার সময় অনেক বাক্স তোরঙ্গ আনিয়াছিলেন; কারণ, তিনি বোমার ভয়ে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য পরিবারবর্গকে দেশে রাখিয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শচীশ ও সতীশের কলেজ কামাই করা চলিবে না, তাহারা কলিকাতায় গিয়া কলেজের বোর্ডিংএ থাকিবে; যতীশ বাবু নিজেও একটা মেসে থাকিবেন। ম্যাট্রিক পরীক্ষার কয় দিন প্রতিভা কলিকাতায় গিয়া পিতৃবন্ধু রজনী বাবুর বাড়ীতে থাকিবে। রজনী বাবুর কন্যা মালতী প্রতিভার সহপাঠিনী; সে-ও বর্ত্তমান বৎসরে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবে।

৩

বেলা দুইটার সময় যতীশ বাবুর গাড়ী তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিলে গাড়ী হইতে বাক্স তোরঙ্গ প্রভৃতি ঘরে তুলিয়া গাড়োয়ানদিগকে জলপান ও ভাড়া দিয়া বিদায় করা হইল। তাহারা ঐ গ্রামেরই লোক; এক জন যতীশ বাবুর প্রজা।

প্রথম দর্শনে যথাযোগ্য প্রণাম ও আশীর্ব্বাদ প্রভৃতির পর যতীশ বাবুর ভ্রাতৃজায়া শচীশের জননীকে বলিলেন, "ছোট বউ, তুমি পিতিভাকে নিয়ে চট করে খিড়কীর পুকুর থেকে ছ্যান ক'রে এস। ঠাকুরপো, তুমিও আর দেরী করো না। আর শচীশ কি গরম জলে

ছান করিস ? তুই যে শীতকাতুরে, বোশেখ মাসেও লেপ গায়ে না দিলে তোর ঘুম হয় না !"

শচীশ হাসিয়া বলিল, "আমি আর সে শচীশ নেই, এখন পৌষ মাসের শীতেও ঘরের জানালা খুলে শুই—তবে ঘুম হয় !"

অপরাহ্নকালে গ্রামের কয়েক জন প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ যতীশ বাবুর সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। যতীশ বাবুর গ্রাম-সম্পর্কে খুল্লতাত বৃদ্ধ ভবনাথ ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "বাবাজী, সে দিন খবরের কাগজে দেখলেম, জাপানীরা না কি বাংলায় বোমা ফেলতে আসছে ? তাই কলকাতার সব লোক ভয়ে বাড়ী-ঘর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে ?"

যতীশ বাবু বলিলেন, "জাপানীরা বর্ম্মা পর্য্যন্ত এসেছে বটে, তবে এখনও কলকাতা থেকে অনেক দূরে আছে। দেশ জয় করবার আগে তারা আকাশ থেকে বোমা ফেলে সহরের সব বড় বড় বাড়ী, কেল্লা, কলকারখানা ধ্বংস করে ; পাছে কলকাতায় সেই রকম কিছু হয়, সেই ভয়ে লোকে আগে থেকে সাবধান হচ্ছে। সরকার-পক্ষ হতে বলা হয়েছে, বাড়ীর মেয়েদের আর ছোট ছোট ছেলেদের কলকাতার বাইরে পাঠিয়ে দাও ; যদি কলকাতায় সে রকম কিছু হয়, তাহলে মেয়েছেলে নিয়ে বিপদে পড়বে। আমি সেই জন্যেই আপনার বৌমাকে আর নাৎনীকে রাখতে এসেছি।"

"তুমি আবার কলকাতায় ফিরে যাবে ?"

"যেতে হবে বৈ কি ! না গেলে এখানে খাব কি ? ক' বিঘে ধান জমীর ভরসায় পড়ে থাকলে ত পেট ভরবে না।"

হরিপদ বিশ্বাস বলিলেন, "কলকাতা না কি একদম খালি হয়ে গেছে ?"

যতীশ বাবু বলিলেন, "খালি হবার এখনও অনেক বাকী। কলকাতার বিশ লাখ লোকের মধ্যে বোধ হয় এক লাখ কি দেড় লাখ লোক বাইরে চলে গেছে , এখনও যাচ্ছে। যদি জাপানীরা আরও এগিয়ে আসতে পারে, তাহলে আরও অনেক লোক কলকাতা ছেড়ে পালাবে।"

বৃদ্ধ কৃষক গঙ্গাপদ মণ্ডল গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "তবেই ত মুস্কিলের কথা ! এক লাখ দু লাখ লোক পালিয়েছে ! আচ্ছা, এই যে লোক পালিয়েছে, চৌকীদার জমাদার এদের ধরতে পারেনি ? এক লাখ ! সে ক' কুড়ি, দাদা ঠাকুর ?"

বৃদ্ধের কথা শুনিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "আমাদের এদিকে কোন ভয় আছে না কি ?"

যতীশ বাবু বলিলেন, "কলকাতা থেকে এত দূরে পল্লীগ্রামে জাপানী বোমার ভয় নেই। তারা ত মাঠে ঘাটে বোমা ফেলে না—ফেলে সহরে, কল-কারখানায়, বড় বড় রেল-ষ্টেশনের উপর।"

যখন যতীশ বাবুর বহির্ব্বাটিতে জাপানী-বোমার আকস্মিক আবির্ভাব সম্বন্ধে এইরূপ আলোচনা চলিতেছিল, তখন তাঁহার অন্তঃপুরেও গ্রাম্যমহিলা-বৈঠকে নানা প্রকার আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল। সে বৈঠকে প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল—প্রতিভার এবং শচীশের বিবাহের প্রসঙ্গ। চক্রবর্ত্তী-গৃহিণী শচীশের জননী কমলাকে বলিলেন, "হ্যাঁ ছোট বউ, মেয়ে যে যেটের কোলে ডাগরটি হয়ে উঠল, ওর বিয়ের কি করছ ?"

কমলা বলিলেন, "পনের বছর বয়স হ'ল, ডাগর হবে না ? আমার পনর বছর বয়সে যে শচীশ কোলে এসেছিল। এখন কি আর সেকাল আছে দিদি ? কোম্পানীর আইন—চোদ্দ বছরের কম বয়সে মেয়ের বিয়ে দেওয়া চলবে না।"

"তা পিরতিভার বয়েস চোদ্দ ত পার হয়েছে, এইবার বিয়ে দাও।"

"বিয়ের চেষ্টা হচ্ছে বৈ কি ! যারা দেখতে আসে তারা মেয়ে পছন্দ করে, কিন্তু এত টাকার দাবী করে যে, আমরা আর কথা কইতে পারি নে। কেউ বলে পাঁচ হাজার, কেউ চার-ছ' হাজার ! অত টাকা আমরা কোথায় পাব ? আমরা বড়-জোর দু' হাজার কি আড়াই হাজার পর্য্যন্ত খরচ করতে পারি, তার বেশী আর কোথায় পাব ? একা সতীশকে ডাক্তারি পড়াতেই মাসে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা খরচ হচ্ছে।"

"তুমিও ছেলের বিয়ে দিয়ে টাকা আদায় করে নাও। শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে তোমার দুই ছেলের বিয়েতে তুমিও দশ হাজার টাকা আদায় করতে পারবে।"

কমলা বলিলেন, "ছেলের বিয়েতে আমরা কুটুমের কাছে হাত পাততে যাব না। উনি বলেন, 'মল্লিপুরের মুখুয্যে-বংশ যদি খেতে না পেয়ে শুকিয়ে থাকে, তবু কারও কাছে হাত পাততে পারবে না।"

"তোমার মেয়ের বিয়েতে কেউ কি ছেড়ে কথা কবে যে, তুমি কিছু না-নিয়েই ছেলের বিয়ে দেবে ?"

"যে যা করে করুক, আমাদের তা দেখবার দরকার কি ? সকলের মন ত আর সমান নয়।"

বামা-ঠাকরুণ বলিলেন, "তা সত্যি ভাই ! সে যা হোক, মেয়ের বিয়ের কথাবার্ত্তা কিছু হচ্ছে ? না, মেয়েকে কেবল পড়াতেই থাকবে ?"

কমলা বলিলেন, "হাওড়ার এক জায়গায় কথা হচ্ছে। তাঁরা মেয়ে পছন্দ করেছেন ; তবে তাঁরা পাশ-করা মেয়ে চান। ছেলের বাপ হাকিম, ছেলে চারটে পাশ করে ওকালতির পড়া পড়ছে। ঠিকুজীর মিল হয়েছে। মেয়ে এই বছর পাশের পড়া পড়ছে শুনে তাঁরা বলেছেন, মেয়ে যদি পাশ করে, তাহলে তখন দেনা-পাওনার কথা তুললেই হবে। আমরা যে রকম আঁচ পেয়েছি—তাতে মনে হয়, সাড়ে তিন হাজারের কমে পার পাওয়া যাবে না। তা, আজ-কাল বিয়ের বাজার যে রকম চড়া, সে হিসেবে সাড়ে তিন হাজার টাকা তেমন বেশী বলা যায় না।"

বৃদ্ধা হরমণি বলিলেন, "কি জানি মা ! এখনকার বিয়ের বাজারে ছেলের দামের কথা শুনলে বুকে কাঁপুনী ধরে ! আমার বিয়েতে আমার বাবা বরকে নগদ পঞ্চাশ টাকা, এক বিঘে ভুঁই, আর একটা আংটি দিয়েই কন্যেদায় হ'তে খালাস পেয়েছিলেন।"

কমলা বলিলেন, "তোমাকে গয়না-টয়না কিছু দেননি ?"

"ও মা ! তা' আবার দেননি ? তিন ভরি সোনা, পনর ভরি রূপো দিয়েছিলেন। আবার কি দেবেন ? এই কি কম ?"

কমলা বলিলেন, "ও-সব কথা একালে ভুলে যাও।—সেকালে তোমার বিয়েতে যা খরচ হয়েছিল, এখন শুধু ফুলশয্যার খরচই তার [illegible] !"

[illegible] শুনিয়া বৃদ্ধা বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিলেন ; মুখে আর কথা সরিল না।

বড়দিনের বন্ধের পর ল-কলেজ খুলিলে যতীশ বাবু পুত্রদ্বয়কে লইয়া কলিকাতায় ফিরিলেন।

৪

যতীশ বাবু অনেক দিন হইতেই ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ইংরেজী সাহিত্যের অন্যতম পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইয়া আসিতেছেন ; এ বৎসরেও এই ব্যবস্থার ব্যতিক্রম হয় নাই। সেই জন্য বৈশাখ মাসে তাঁহার স্কুলে গ্রীষ্মাবকাশ আরম্ভ হইলেও পরীক্ষার কাগজ দেখিবার জন্য তাঁহাকে কলিকাতায় থাকিতে হইল। ল' কলেজ ও মেডিক্যাল কলেজ বন্ধ হইলে শচীশ ও সতীশ মলিপুরে জননীর নিকট গমন করিল। চৈত্র মাসে প্রতিভার পরীক্ষা শেষ হইলে সে পিতার সঙ্গে মলিপুরে ফিরিয়া গেল।

যতীশ বাবুর সমস্ত কাগজ দেখা শেষ হইলে তিনি নিশ্চিন্ত চিত্তে দেশের বাড়ীতে আসিয়া সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। সেই সময় এক দিন রূপনারায়ণপুর হইতে তাঁহার দীক্ষাগুরু পণ্ডিত অরবিন্দ ন্যায়ালঙ্কার মলিপুরে পদার্পণ করিলেন। যতীশ বাবু ব্যতীত মলিপুরে ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের আরও দুই-তিন জন শিষ্য ছিলেন। এই সময় তাঁহার বয়স সত্তর বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছিল। তিনি ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন ; কিন্তু সে জন্য তাঁহার আচার-ব্যবহারে বিন্দুমাত্র গোঁড়ামি ছিল না। তিনি বৎসরে একবার করিয়া মলিপুরের শিষ্যালয়ে পদার্পণ করিতেন. সেই সময় যতীশ বাবু গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া পাঁচটি টাকা প্রণামী দিতেন, কমলাও গুরুদেবকে পাঁচ টাকা দিয়া প্রণাম করিতেন। তাঁহাদের এই দশ টাকা "গুরু-প্রণামী" নির্দ্দিষ্ট ছিল। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় মলিপুরে আসিয়া যতীশ বাবুর বাড়ীতেই অবস্থিতি করিতেন।

বর্ত্তমান বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে এক দিন অপরাহ্নে সহসা ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় মলিপুরে পদার্পণ করিলেন। যতীশ বাবুর বাড়ীতে যাইবার পথে তাঁহার অন্যতম শিষ্য বাসুদেব ঘোষালের সহিত সাক্ষাৎ হইলে গুরুদেব বলিলেন, "বাবা বাসুদেব. সন্ধ্যার পর একবার যতীশের বাড়ীতে আসিও ; হরনাথ, নিত্যানন্দ এবং আরও দুই-চারি জন যদি আসেন ত ভাল হয়, আমার কিছু বক্তব্য আছে।" —হরনাথ ও নিত্যানন্দও ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের শিষ্য।

সন্ধ্যার পর বাসুদেব, হরনাথ, নিত্যানন্দ, এবং চাটুয্যে মশায়, মিত্তির মশায়, সরকার মশায় প্রভৃতি চারি-পাঁচ জন প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ ভদ্রলোক যতীশ বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। যতীশ বাবু তাঁহাদিগকে বাহিরের ঘরে বসাইয়া বলিলেন, "গুরুদেব সায়ংসন্ধ্যা করিতেছেন, এখনই আসিবেন।" আগন্তুকগণ সময়ের সদ্ব্যবহারের জন্য ধূমপানে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রায় দশ মিনিট পরে ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় তথায় উপস্থিত হইলে সকলে তাঁহাকে যথাযোগ্য নমস্কার ও প্রণাম করিলেন। তিনি আসনে উপবেশন করিলে অন্য সকলে আসন গ্রহণ করিলেন। কুশল সম্ভাষণাদির পর ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় বলিলেন,—"বাবা যতীশ, আমি আজ বাসুদেবকে দিয়া ইঁহাদিগকে এখানে আসিবার জন্য খবর পাঠাইয়াছিলাম। [illegible] বলিলুম। তুমি বোধ হয় জান যে, দুর্গোৎসবের তিন দিন আমি বাড়ী ছাড়িয়া গ্রামান্তরে যাই না ; ঐ তিন দিন আমি বাড়ীতে থাকিয়া চণ্ডীপাঠ করি। গত ত্রিশ কি চল্লিশ বৎসর যাবৎ আমি এইরূপই করিয়া আসিতেছি ; কিন্তু এ বৎসর ইহার ব্যতিক্রম হইবে।"

বৃদ্ধ বাঁড়ুয্যে মহাশয় বলিলেন, "কেন ? এ বৎসর ব্যতিক্রমের কারণ কি ?"

গুরুদেব বলিলেন, "পরশু শেষ-রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি যে, যতীশের বাড়ীতে এবার দুর্গোৎসব, আর আমি এখানে আসিয়া মা ব্রহ্মময়ীর সম্মুখে চণ্ডীপাঠ করিতেছি। এরূপ স্বপ্ন আমি কখনও দেখি নাই। আমার নিজের বাড়ী ছাড়িয়া শিষ্য-বাড়ীতে আসিয়া চণ্ডীপাঠ করিতেছি, এ স্বপ্ন মা আমাকে কেন দেখাইলেন জানি না।"

চাটুয্যে মহাশয় বলিলেন, "ভোরের স্বপ্ন সফল হয়। এ বৎসর আপনি এখানে আসিয়া চণ্ডীপাঠ করিবেন, ইহাই মা জগদম্বার ইচ্ছা।"

"কিন্তু যতীশ ভায়ার বাড়ীতে দুর্গোৎসব ?"

মিত্র মহাশয় বলিলেন, "নিশ্চয়ই হইবে। যতীশের একার সামর্থ্যে না কুলায় আমরা আছি কি জন্য ? আমরা গাঁয়ের সকলে মিলে চাঁদা তুললেও যতীশের বাড়ীতে দুর্গাপূজার ব্যবস্থা করব।"

যতীশ বাবু বলিলেন, "দুর্গোৎসবে কত খরচ হয়, আমার তা ধারণা নেই। তিন দিন পূজায় মোট কত খরচ হবে, তার আন্দাজ পেলে আমি বুঝতে পারব আপনাদের সাহায্যের প্রয়োজন হবে কি না। অবশ্য, আপনাদের সাহায্য আমাকে নিতেই হবে ; কারণ, আমার লোকবল নাই, আপনারা দশ জনে এসে না-দাঁড়ালে আমি একা কি করতে পারি ?"

চাটুয্যে মহাশয় বলিলেন, "পূজার খরচ তিন দিনে মোটের উপর দেড়শ' থেকে দু'শ টাকার বেশী লাগবে না। তার পর লোকজন খাওয়ান,—সে যে যেমন পারবে, করবে।"

সরকার মহাশয় বলিলেন, "তাতে আর বেশী কি খরচ হবে ? চাল, ডাল, মাছ, তরকারী কিনতে হবে না ; গ্রামস্থ সকলের বাগান থেকে তরকারী পাওয়া যাবে। আমাদের সকলের পুকুরেই মাছ আছে ; মাছেরও অভাব হবে না।"

যতীশ বাবু বলিলেন, "বাবা, আপনার আশীর্ব্বাদে আর এঁদের দশ জনের সাহায্যে আমি এ বৎসর মাকে বাড়ীতে আনব। আমার মেয়ে প্রতিভার জন্মের পর আমি পনের বৎসরের জন্য চার হাজার টাকার জীবন-বীমা করেছিলেম ; আর দু' মাস পরেই সেই টাকাটা আমার হাতে আসবে। সে টাকায় মেয়ের বিবাহ দিব, এইরূপই সঙ্কল্প ছিল। সে টাকা থেকে আমি তিন-চার শ' টাকা মায়ের পূজায় ব্যয় করব। তার পর মেয়ের বিবাহ ? সে মা যা করবেন, তাই হবে।"

ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় বলিলেন, "বাবা, আমার একটা অনুরোধ আছে। লোক-খাওয়ান সম্বন্ধে ইতর-ভদ্রে কোনরূপ তারতম্য করা না হয়। তুমি আমি যে মায়ের সন্তান, দুলে বাগ্দী মালো চাঁড়ালও সেই মায়েরই সন্তান। মায়ের পূজায় যেন তাঁর সকল সন্তানই সমান ভাবে প্রসাদ পায়।"

যতীশ বাবু বলিলেন, "সে আজ্ঞে।"

ন্যায়ালঙ্কার বলিলেন, "বাবা যতীশ, তুমি কিছুমাত্র চিন্তা ক'র না। আমি আশীর্ব্বাদ করছি, নির্ব্বিঘ্নে তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। মা নিজের পূজার ব্যবস্থা নিজেই করে নেবেন। মানুষ কি করতে পারে ? তিনি তোমার বাড়ীতে আসবার ইচ্ছে করেছেন, তুমি এটা পরম সৌভাগ্যের কথাই মনে কোর। ক'জনের অদৃষ্টে এ

সৌভাগ্য ঘটে? তোমার পূর্ব্ব-পুরুষের পুণ্য ফলেই তুমি এ সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছ।"

যতীশ বাবুর বাড়ীতে মহাপূজা হইবে, ইহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইলে চাটুয্যে মহাশয় বলিলেন "যতীশ, তোমার ইষ্টদেব ঠিকই বলেছেন যে, তোমার পূর্ব্ব-পুরুষের সঞ্চিত পুণ্য-ফলেই মহামায়া তোমার বাড়ীতে আসবার ইচ্ছা করেছেন। ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হবে; তোমাকে কোন বিষয়ের জন্যে ভাবতে হবে না।"

আরও কিছু কাল নানা বিষয় সম্বন্ধে কথা-বার্ত্তার পর সভা ভঙ্গ করিয়া সকলে স্ব-স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন।

৫

গ্রীষ্মাবকাশের পর যতীশ বাবু পুত্রদ্বয়কে লইয়া কলিকাতায় গমন করিলেন। দুর্গোৎসবের তখনও প্রায় চার মাস বিলম্ব ছিল; তিনি ধীরে ধীরে পূজার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। শ্রাবণ মাসে তাঁহার জীবন-বীমার টাকাগুলি পাইয়া তাহা ব্যাঙ্কে জমা রাখিলেন। এই টাকাগুলি সময়ে হস্তগত হওয়ায় তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন।

শ্রাবণ মাসের শেষে তিনি সংবাদ-পত্রে পড়িলেন যে, এ বৎসরও অজয় নদে প্রবল বন্যা হইয়াছে, কমলার পত্রেও তিনি বন্যার সংবাদ পাইলেন। কমলা লিখিয়াছেন যে, বন্যা প্রবল হইলেও গ্রামের কোন ক্ষতি হয় নাই; বরং বন্যার জল যদি অধিক দিন স্থায়ী না হয়, তাহা হইলে প্রচুর ফশলই হইবার আশা আছে। বর্ষার প্রারম্ভ-কালে বৃষ্টি না হওয়ায় কৃষকেরা ভয় পাইয়াছিল,—এখন তাহারা কতকটা আশ্বস্ত হইয়াছে।

মহালয়ার পূর্ব্ব-দিন যতীশ বাবু মলিপুরে গমন করিলেন। শচীশ ও সতীশ তাহার দুই দিন পূর্ব্বেই পূজার জন্য ক্রীত দ্রব্যাদি লইয়া কলিকাতা হইতে দেশে গিয়াছিল। যতীশ বাবু বাড়ী আসিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার বাড়ীর সম্মুখে আটচালা বাঁধা হইয়াছে, প্রতিমার নির্ম্মাণও শেষ হইয়াছে; কেবল রং ও সাজ বাকী। কুম্ভকার বলিল, আর তিন-চারি দিনের মধ্যেই প্রতিমা সাজান হইবে। রন্ধনের জন্য প্রচুর পরিমাণ জ্বালানী কাঠ এক স্থানে স্তূপীকৃত হইয়াছে। চাটুয্যে মহাশয় সকল বন্দোবস্তই শেষ করিয়া রাখিয়াছেন। গোয়ালা-পাড়ায় দধি, দুগ্ধ ও ছানার বায়না দেওয়া হইয়াছে। মিষ্টান্ন—সন্দেশ, পান্তুয়া ও বোঁদের জন্য বাড়ীতেই ভিয়েন করা হইবে।

চতুর্থীর দিন অপরাহ্ণে যতীশ বাবু শচীশকে সঙ্গে লইয়া অজয় নদের তীরে, তাঁহার পুরাতন পৈতৃক বাস্তুভিটা-সন্নিহিত জমীতে কিরূপ ধান হইয়াছে—দেখিতে চলিলেন। এই কয় বিঘা জমী তিনি এই বৎসর ভাগে জমা দিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, সমগ্র মাঠই নধর সবুজ ধানের চারায় পরিপূর্ণ; দেখিয়া তাঁহার বড়ই আনন্দ হইল। শরৎকালে ধান্যক্ষেত্রের সবুজ শোভা দেখিয়া পল্লীবাসী কোন্ বাঙ্গালীর হৃদয় আনন্দে পূর্ণ না হয়?

তাঁহাদের প্রজা নিধিরাম দুই ছড়া কাঁচকলা, এবং কুড়ি-পঁচিশটা বেগুন একটা ঝুড়ি করিয়া আনিয়া শচীশের সম্মুখে রাখিয়া বলিল, "বাবা ঠাকুর, কিছু তরকারী তোমাদের জন্যে আনলাম।"

যতীশ বাবু বলিলেন "আজ কেন দিচ্ছ নিধিরাম? বরং কাল দিও, ঠাকুরের ভোগে লাগবে।"

নিধিরাম করযোড়ে বলিল, "সে আপনাকে বলতে হবে না; চাটুয্যে মশায়ের হুকুম হয়েছে—বেগুন, পটোল, ঝিঙ্গে, কুমড়ো, শাগ—সবই আপনার বাড়ীতে পৌঁছে যাবে।"

শচীশ জিজ্ঞাসা করিল, "এ কাঁচকলা আর বেগুনের দাম কত?"

নিধিরাম দন্তে জিহ্বা কাটিয়া করযোড়ে বলিল, "রাধামাধব, রাধা-মাধব! ও-কথা বলতে নেই। জমিদারকে প্রজার বাড়ী থেকে কি শুদু-হাতে ফিরে যেতে আছেন?"

নিধিরামের বাড়ী হইতে যতীশ বাবু অজয় নদের তীরে তীরে কিছু দূর অগ্রসর হইয়া পুত্রকে বলিলেন, "এই আমাদের পৈতৃক ভিটা। এই ভিটায় কত সমারোহেই দুর্গোৎসব হয়েছে! আর আজ আমার বাড়ীতে তালপাতা-ছাওয়া আটচালায় মায়ের পূজার আয়োজন হচ্ছে! একেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস!"

কথা কহিতে কহিতে তাঁহারা অজয়ের জলে অবতরণ করিয়া জলের কিনারা দিয়া চলিতে লাগিলেন; যাইতে যাইতে সহসা এক স্থানে দাঁড়াইয়া যতীশ বাবু বলিলেন, "সরার মত এটা কি মাটীতে পোঁতা রয়েছে?"—সঙ্গে সঙ্গে হস্তস্থিত লাঠি দ্বারা তিনি তাহাতে আঘাত করিলেন; কিন্তু সেটা ভাঙ্গিল না। শচীশ বলিল, "মাটীর সরা নয়, বাবা! বোধ হয়, লোহার ভাঙ্গা কড়া উপুড় হয়ে পড়ে আছে।"

যতীশ বাবু সেটাকে তুলিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তুলিতে পারিলেন না। তখন শচীশ তরকারীপূর্ণ ঝুড়িটা নামাইয়া-রাখিয়া দুই হাতে সেটি টানিয়া-তুলিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু সে চেষ্টাও বিফল হইল। অবশেষে পিতা ও পুত্র উভয়ের চেষ্টায় উহা উত্তোলিত হইলে যতীশ বাবু দেখিলেন– উহা কোন ধাতুনির্ম্মিত কলস! কিন্তু কোন্ ধাতু তাহা বুঝিতে না পারিয়া যতীশ বাবু একখণ্ড ইট দিয়া উহার উপর জোরে আঁচড় কাটিয়া বলিলেন, "এটি দেখছি তামার কলসী, বহু কাল মাটীর ভিতর পোতা থাকায় কালো হয়ে গেছে!"

শচীশ দুই হাতে কলসীটা মাটী হইতে একটু চাগাইয়া তুলিয়া বলিল, "এটার ওজন বোধ হয় আধ মণ কি পঁচিশ সের হবে। এই কলসীতে নিশ্চয়ই গুপ্তধন আছে।"

যতীশ বাবু বলিলেন, "সম্ভব বটে; আমাদেরই পূর্ব্ব-পুরুষের জিনিস! কিন্তু ওটাকে গোপনে বাড়ী নিয়ে যাওয়া যায় কি ক'রে?"

শচীশ একটু ভাবিয়া বলিল, "এইখানে একটু দাঁড়িয়ে থাকুন; আমি বাড়ী থেকে একখানা বড় ঝাড়ন আর আমার সাইকেলখানা নিয়ে আসি।"

"সাইকেলে তুলে নিয়ে কি যেতে পারবি?"

এই তরকারীর ঝুড়িতে রেখে, ঝাড়নে সব বেঁধে নিয়ে যেতে পারব।"—বলিয়া বাড়ী চলিয়া গেল। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে সে বাইসিকেল লইয়া আসিলে শচীশ বাবু বলিলেন, "এত দেরী করলি? সন্ধ্যা হ'ল যে—"

শচীশ বলিল, "ইচ্ছা ক'রেই ত সন্ধ্যা লাগিয়ে এলাম। অন্ধকারে কারও নজরে পড়বে না। পথে আসবার সময় হরকাকার সঙ্গে দেখা; তিনি বল্লেন, 'কোথায় চলেছিস্?' আমি বল্লেম—'নিধিরাম কতকগুলো তরিতরকারি দিয়েছে, তাই বেঁধে আনবার জন্য ঝাড়নখানা নিয়ে যাচ্ছি'।"

"বেশ বলেছিস্। মিথ্যা কথা বলা হয়নি।"—পিতা হাসিয়া এই মন্তব্য করিলেন।

অনন্তর কলসীটা ঝাড়নে বাঁধিয়া উভয়ে ধরাধরি করিয়া নদীগর্ভ হইতে উপরে তুলিলেন। কলসীসহ ঝাড়নটা সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া, তাহার উপর বেগুন ও কাঁচকলার ঝুড়ি বসাইয়া লওয়া হইল।

যতীশ বাবু বলিলেন, "সাইকেলে ওঠ।"

"আমি সাইকেল ঠেলে নিয়ে যাব।"

পল্লীগ্রামের পথে সন্ধ্যার পর তেমন জনসমাগম হয় না। তাঁহারা অন্যের অলক্ষ্যে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলে যতীশ বাবু বলিলেন, "আমি বেগুন ও কাঁচকলা নিয়ে রান্নাঘরে যাই, সকলে এইগুলা নিয়েই ব্যস্ত থাকবে, আর তুই সেই সুযোগে কলসীটা নিয়ে আমার ঘরের এক কোণে রেখে দিস, যেন কেউ দেখতে না পায়।"

৬

রাত্রি নয়টার পর, যতীশ বাবু পুত্র-কন্যা সহ একসঙ্গে আহার করিলেন। আহারান্তে প্রতিভা নিজ শয়নকক্ষে গমন করিল। প্রতিভা মল্লিপুরে আসিলে তাহার জ্যাঠাইমার কক্ষে শয়ন করে। অপর দুইটি কক্ষের একটিতে শচীশ ও সতীশ, এবং তৃতীয় কক্ষে যতীশ বাবু শয়ন করিতেন। রাত্রি দশটার পর কমলা ভোজন শেষ করিলেন। শচীশের জ্যাঠাইমা বিধবা—তিনি রাত্রিকালে যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ ও একটুমাত্র দুগ্ধ পান করিয়া শয়ন করিতেন। তিনি যখন শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন, প্রতিভা তখন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত।

সতীশ ও কমলা এ পর্য্যন্ত তামার সেই কলসীর কথা কিছুই জানিতে পারেন নাই। সতীশ শয়নকক্ষে প্রবেশোদ্যত হইলে যতীশ বাবু বলিলেন, "এখনই ঘুমিয়ো না, আজ তোমাদের সঙ্গে অনেক পরামর্শ আছে।" অগত্যা সতীশ জাগিয়া বসিয়া রহিল।

রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারটার সময়, কমলা রান্নাঘর ও ভাঁড়ার-ঘরের সমস্ত কাজ শেষ করিয়া উপরে শয়ন-কক্ষে গিয়া দেখিলেন, তখনও যতীশ বাবু পুত্রদের সহিত গল্প করিতেছেন। কমলা বলিলেন, "এত রাত্রে আবার কি গল্প জুড়ে দিলে? ছেলেরা ঘুমুবে না? বারোটা বাজে যে!"

যতীশ বাবু বলিলেন, "একটু দরকারি কথা আছে। শচীশ দেখে এস ত, তোমার জ্যাঠাইমা ঘুমিয়েছেন কি না?"

সতীশ বলিল, "জ্যাঠাইমাকে ডেকে আনব?"

শচীশ বলিল, "না, ডাকতে হবে না; আমিই দেখে আসছি।" সে বাহিরে গমন করিল, এবং ক্ষণকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "ঘুমুচ্ছেন; নাক ডাকছে।"

পিতার আদেশে শচীশ সেই কক্ষের দ্বার অর্গলবদ্ধ করিলে যতীশ বাবু মৃদু স্বরে বলিলেন, "আজ আমাদের পুরানো ভিটে থেকে একটা তামার কলসী এনেছি।"

কমলা সবিস্ময়ে বলিলেন, "তামার কলসী? কোথায় ছিল?"

তখন যতীশ বাবু সংক্ষেপে সেই কলসী-আবিষ্কারের বিবরণ বিবৃত করিয়া বলিলেন, "সেটার কি আছে, তা এখনও জানতে পারিনি।"

কমলা বলিলেন, "কলসীটা কোথায়? শেষে আরব্য উপন্যাসের সেই জেলের গল্পের মত কলসীর ভিতর থেকে দৈত্য বেরুবে না ত?"

"এখনই জানতে পারবে।"

পিতার ইঙ্গিতে শচীশ সেই কলসী আনিয়া অতি সন্তর্পণে মাদুরের উপর রাখিয়া দিল, এবং একখানা কাটারির সাহায্যে কলসীর মুখের সুদৃঢ় আবরণটা বহুকষ্টে তুলিয়া ফেলিল। কলসীর মুখ গালা দিয়া বন্ধ করা ছিল। গালার নীচে একটা বাটি উপুড় করা ছিল। সেই বাটির তলায় এক টুকরা বিবর্ণ রেশমী কাপড়ে বাঁধা খুব ছোট একটা পুঁটুলি দেখা গেল। যতীশ বাবু সেই পুঁটুলিটি খুলিয়া দেখিলেন, ভিতরে হলদে তুলোট কাগজে কি লেখা আছে। তিনি চশমার সাহায্যে দেখিলেন, মুক্তার মত হস্তাক্ষরে লেখা আছে,—

"শ্রীশ্রী ৺দুর্গা শরণং,

লিখিতং শ্রীপঞ্চানন দেবশর্ম্মণঃ—

আমাদের বংশে পুরুষানুক্রমে মঙ্গল-ঘটরূপে ব্যবহৃত এই সুপবিত্র তাম্র ঘটে যে ধনরত্ন রক্ষা করিলাম, আমার বংশধরগণের মধ্যে যে কেহ জন্মান্তরের সুকৃতিফলে ইহা পাইবে, কেবল সেই ব্যক্তিই ইহার স্বত্বাধিকারী হইবে। আমার বংশধর ব্যতীত যদিস্যাৎ অপর কেহ এই তাম্রপাত্র প্রাপ্ত হয়, তবে সে অচিরাৎ এই সকল সম্পত্তি ধর্ম্মার্থে ব্যয় করিবে, ইহার অন্যথা করিলে সেই ব্যক্তি ব্রহ্মশাপে অন্ধ এবং নির্ব্বংশ হইবে। এগার শত অষ্টচল্লিশ বঙ্গাব্দে মাহ আশ্বিনে শুভ মহালয়া তিথিতে মহামায়াকে স্মরণ করিয়া এই তাম্রঘট আমি স্বহস্তে ভূমিসাৎ করিলাম। ধর্ম্ম ইত্যাদি।"

পাঠ শেষ করিয়া যতীশ বলিলেন, "কি ধনরত্ন আছে দেখা যাক্।" —এই বলিয়া ঘড়ার ভিতর হইতে আর এক টুকরা জীর্ণ রেশমী কাপড় বাহির করিলেন এবং তাহার পর ঘড়ার ভিতর হইতে বাহির করিলেন —এক মুঠা মোহর, পার্শি হরফ লেখা বাদশাহী মোহর! যতীশ বাবু মুঠা মুঠা মোহর বাহির করিতে লাগিলেন আর কমলা তাহা গণিয়া কুড়িটি করিয়া প্রত্যেক থাকে সাজাইতে লাগিলেন। মোহরগুলি বাহির করা হইলে হিসাব করিয়া দেখা গেল ১৩৪১খানা মোহর।

যতীশ বাবু বলিলেন, "এই মোহর এক একখানার দাম আজকাল চুয়ান্ন টাকার কম নয়, বরং বেশীই হবে। বাদশাহী মোহর—পাকা সোনা; গিনি সোনার চেয়ে দাম বেশী। সতীশ, প্রতি ভরি চুয়ান্ন টাকা হিসাবেই দেখ ত কত টাকা হয়।"

সতীশ পেন্সিল দিয়া এক টুকরা কাগজে হিসাব করিয়া বলিল, "বাহাত্তর হাজার চার শ' চৌদ্দ।"

কমলা বলিলেন, "এ ত গেল মোহর, রত্ন কি আছে?"

যতীশ বাবু পূর্ব্বের মত একখানা রেশমী বস্ত্র ও তাহার পর বিবিধ গঠনের নানা প্রকার স্বর্ণালঙ্কার বাহির করিলেন। প্রত্যেক অলঙ্কারই নিরেট, কিন্তু কয়েক ছড়া হার ব্যতীত আর কোন অলঙ্কারই বর্ত্তমান কালে ব্যবহারযোগ্য নহে। সমস্ত অলঙ্কার একত্র করিয়া যতীশ বাবু বলিলেন, "বোধ হয় আড়াই সের কি তিন সের হবে।"

শচীশ বলিল, "না বাবা, পাঁচ সেরের কম হবে না; বরং বেশীই হবে।"

কমলা বলিলেন, "সে পরে ওজন কল্লেই হবে। আর কিছু আছে?"

সর্ব্বশেষ বাহির হইল—একটা হাতীর দাঁতের ছোট বাক্স। কমলা সেই বাক্সটা লইয়া খুলিবামাত্র সকলে বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন। বাক্সর মধ্যে ত্রিশটা লাল, সাদা, নীল, সবুজ প্রভৃতি নানা

বর্ণের বহুমূল্য জহরত। উহাদের মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা ছোট, সেটিও একটি তেঁতুল-বীজের মত। যতীশ বাবু ইহুগুলি একে একে দেখিয়া বলিলেন, "এই সব জহরতের দাম কত, তা আমি জানি না; তবে মনে হয়, মোটের উপর দশ-পনর হাজার টাকা হবে, হয় ত লক্ষ টাকাও হতে পারে। এখন এ সব রাখা যায় কোথা? ঐ কলসীটা কি কাজে লাগবে মনে হয়?"

কমলা বলিলেন, "এ ঘরে আমার যে বড় ষ্টীল-ট্রাঙ্কটা আছে, তার ভিতর আপাততঃ ও-গুলো থাক। আমার আর প্রতিভার গহনা ওতে আছে, কতকগুলো দলিলপত্রও আছে। ঐ ট্রাঙ্কে ছাড়া আর কোথায় এ সব রাখা যাবে?"

যতীশ বাবু বলিলেন, "আর কলসীটা?"

সতীশ বলিল, "ওটা খিড়কীর পুকুরে ডুবিয়ে রেখে আসি; নদীতে ফেললে হঠাৎ জেলের জালে উঠতে পারে।"

এই প্রস্তাব অন্য সকলে সঙ্গত মনে করিলেও যতীশ বাবু তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন না করিয়া বলিলেন, "আমাদের স্বধর্ম্মনিষ্ঠ পূর্ব্বপুরুষ লিখে গেছেন—এই তাম্রঘট আমাদের বংশে পুরুষানুক্রমে মঙ্গল-ঘটরূপে ব্যবহৃত হতো, এবং তিনিই এই কলসী মহালয়ার দিন মাটীতে পুঁতে রেখেছিলেন। মা দুর্গার কৃপায় এটা আমরা পেয়েছি, সুতরাং মহামায়ার পূজায় এটি ঘটরূপে স্থাপন করলেই এই তাম্র-কলসের যথাযোগ্য ব্যবহার হবে। আমাদের বংশে যত দিন দুর্গোৎসব হবে, তত দিন এটা দুর্গোৎসবে মঙ্গল-ঘটরূপে ব্যবহৃত হবে।"—এই প্রস্তাব সকলেই সঙ্গত মনে করিলেন। কলসীটি একটি সিন্দুকে আবদ্ধ করিয়া যতীশ বাবু বলিলেন, "এইবার শোয়া যাক; রাতও আর বেশী নেই।"

সকলে শয়ন করিলেন বটে, কিন্তু সে রাত্রিতে কাহারও নিদ্রা হইল না। মহামায়ার করুণার কথা স্মরণ করিয়া কমলা কৃতজ্ঞতার অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

* * * *

ষষ্ঠীর দিন বৈকালে যতীশ বাবু আটচালায় প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া চাটুয্যে মহাশয়ের সহিত কথা কহিতেছিলেন, এমন সময় ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র যতীশ বাবু অগ্রসর হইয়া প্রণামান্তে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। ন্যায়ালঙ্কার আশীর্ব্বাদ করিয়া হাসিমুখে বলিলেন, "প্রতিভা দিদি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে শুনে বড়ই আনন্দিত হয়েছি। দেখে দেখি বাবা, জগদম্বার আগমনে বাড়ীর কেমন শোভা হয়েছে। এ বৎসর মা তালপাতার আটচালায় এসেছেন; আমার আশীর্ব্বাদে আগামী বৎসরে তুমি পাকা দালানে মায়ের আবাহন করবে।"

যতীশ বাবু করযোড়ে বলিলেন, "বাবা, আপনি অন্তর্য্যামী। কাল থেকে কেবলই ভাবছি, আসছে বৎসরে মাকে পাকা দালানে এনে চরণে জল-বিল্বদল দিয়ে জীবন সফল করব।"

ন্যায়ালঙ্কার বলিলেন, "আমরা অন্তর্য্যামী কেউ নই বাবা! একা ঐ পাগলীই অন্তর্য্যামিনী। 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।' তোমার ভাবনা সার্থক হবে। তোমার পাকা দালানে, মায়ের পদপ্রান্তে বসে চণ্ডীপাঠ করলে আমার স্বপ্ন সম্পূর্ণ সফল হবে।"

সন্ধ্যার পর ন্যায়ালঙ্কার, দ্বিতলে সিঁড়ির ঘরের পার্শ্বস্থ ঠাকুর-ঘরে সায়ংসন্ধ্যা শেষ করিয়া বসিয়া ছিলেন, এমন সময় যতীশ বাবু ও কমলা গুরুদেবকে প্রণাম করিবার জন্য সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা প্রথমে কুলদেবতা বাসুদেবকে প্রণাম করিলেন; পরে যতীশ বাবু পাঁচখানা এবং কমলা পাঁচখানা মোহর গুরুদেবের পায়ের কাছে রাখিয়া প্রণাম করিলেন।

মোহর দেখিয়া গুরুদেব সবিস্ময়ে বলিলেন, "কি মা! মোহর কেন? এ কোথায় পেলে?"

যতীশ বাবু করযোড়ে বলিলেন, "বাবা, আপনার দয়াতেই পেয়েছি। পরশু সন্ধ্যার সময় আমাদের পুরানো ভিটায়, অজয়ের গর্ভে পূর্ব্বপুরুষের কিছু গুপ্তধন পেয়েছি।"

ন্যায়ালঙ্কার বলিলেন, "বেশ বাবা, শুনে বড় আনন্দ হ'ল। কত পেয়েছ তা আমি শুনতে চাই না। তবে সাবধানে রক্ষা করবে, —লোকে না জানতে পাবে। চোর-ডাকাতেরও ভয় আছে।"

যতীশ বাবু তখন "শ্রীপঞ্চানন দেবশর্ম্মণঃ" লিখিত সেই তুলট কাগজখানা গুরুদেবের হাতে দিয়া বলিলেন, "আপনি আমাকে দুর্গোৎসব করবার বুদ্ধি না দিলে হয় ত এ সম্পত্তি আমি পেতাম না, অজয়ের গর্ভেই থেকে যেত। তাই শাস্ত্রকার বলেছেন—

'আত্মবুদ্ধি শুভকরী গুরুবুদ্ধি বিশেষতঃ।'

বাধা দিয়া গুরুদেব বলিলেন, "না বাবা, বুদ্ধি আমি দিইনি, দিয়েছেন সেই ব্রহ্মময়ী—'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।' তাঁকেই প্রণাম করে বল, 'নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।'"

গুরুদেবের কথা শুনিয়া উভয়ে গলবস্ত্র হইয়া সেই বুদ্ধিরূপিণী জগদম্বাকে প্রণাম করিলেন।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

লক্ষ্মী ও সরস্বতী

দিনে আমি ফসল ফলাই
রাতে ফুটাই ফুল,
ধূলায় ভরা ... [illegible]
সৌরভে আকুল।

লক্ষ্মী আসেন দিনের বেলা
সরস্বতী নামেন রাতের বেলা
স্বপন-পথে।

শ্রীকালিদাস রায়।
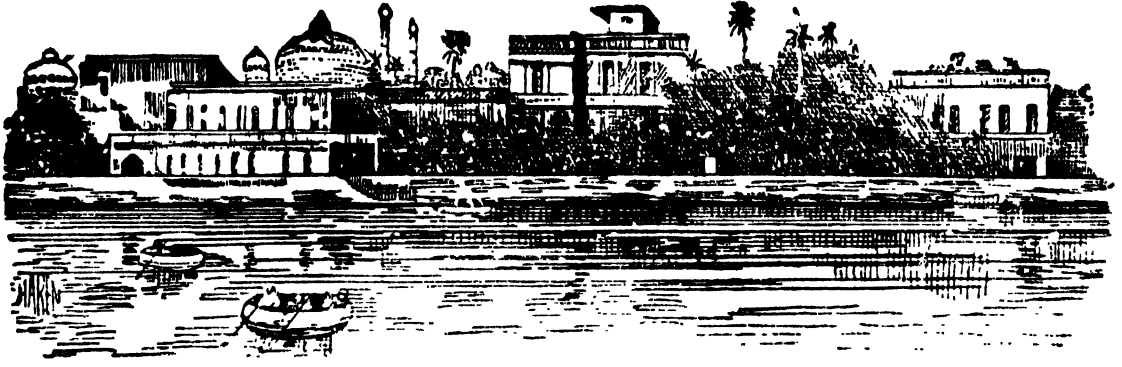
মাডাগাস্কার

ছেলেবেলায় ভূগোলে পড়িয়াছিলাম, আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে ভারত মহাসাগরের বুকে মস্ত দ্বীপ মাডাগাস্কার। পড়িয়াছিলাম, আফ্রিকার দক্ষিণে উত্তমাশা-অন্তরীপ ঘুরিয়া বিদেশীয়েরা পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আসিত এই মাডাগাস্কারের গা ঘেঁষিয়া !

মাডাগাস্কারের নামে কোনো দিন এমন মোহ ছিল না বা মাডাগাস্কারের উপর এমন দরদ জাগে নাই যে, মাডাগাস্কারের বিশদ পরিচয় লইব !

মাডাগাস্কার

আজ কিন্তু এই মহা-সমরের দা[illegible] অজানাকেই ভালো করিয়া জানিতে হইল ! কত পর আজ আমার আপন হইল ! এবং ঠিক এই কারণেই আজ মাডাগাস্কারের দিকে আমাদের দৃষ্টি ও মন একাগ্র হইয়া উঠিয়াছে !

ভারত মহাসাগরের প্রবেশ-পথে মাডাগাস্কার। রেড-সীর পথ বন্ধ হইয়াছে। এখন মাডাগাস্কার যদি বিপক্ষের অধিকার-ভুক্ত হয়, তাহা হইলে উত্তমাশা-অন্তরীপের পথ হইবে বিচ্ছিন্ন—ভারতবর্ষে সামরিক সরঞ্জাম-পত্র পাঠাইবার আশা নির্ম্মূল হইবে—চীনের পক্ষেও প্রচুর অসুবিধা ঘটিবে। তাই মাডাগাস্কার আজ সকলের লক্ষ্যীভূত।

মাডাগাস্কার যদি মিত্র-শক্তির হস্তচ্যুত হয়, তাহা হইলে ডিগো-সুয়ারেজ নৌ-ঘাঁটী হইতে সাবমেরিণের সাহায্যে ভারত-মহাসাগরের প্রবেশ-দ্বার যে জাপান বন্ধ করিয়া দিবে, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না ! জাপানের এই অভিসন্ধি বুঝিয়া মিত্র-শক্তি প্রাণপণে মাডাগাস্কার-রক্ষায় তৎপর !

মাডাগাস্কার আবিষ্কার করেন ভেনিশ-বাসী ভূ-পর্য্যটক মার্কো পোলো। তিনি তখন চীন-ভারতবর্ষ হইতে দেশে ফিরিতেছিলেন,—সিংহলের কাছে বর্ষার মেঘে প্লাবন লাগে, বাতাসের গতি বদলাইয়া যায়। সে বাতাসে মার্কো পোলোর জাহাজ দক্ষিণ-দিকে ভাসিয়া চলে। এবং অকূল সাগরের বুকে ভাসিতে ভাসিতে এক দিন সন্ধ্যার সময় পাল-তোলা একখানি আরব-নৌকার সঙ্গে দেখা। ঝড়-বৃষ্টিতে নৌকা জীর্ণ, পাল ছিন্নবিচ্ছিন্ন, ডেকের উপরে ক্ষুধাতুর মাঝি-মাল্লা ও আরব-সদাগর-যাত্রীদের মূর্ত্তি উন্মাদের মতো ! মার্কো পোলো তাদের আপন-জাহাজে আশ্রয় দিলেন। তারা বলিল,—দক্ষিণে তারা পেম্বায় ও জানজিবারে যাইতেছিল হস্তিদন্ত এবং রজন কিনিতে; কিন্তু ঝড়ের দৌরাত্ম্যে এখন পথ-হারা বিপন্ন ! ক'দিন সকলে অকূল সাগরে দিশাহারা ভাসিতে লাগিলেন— দূর হইতে ছায়ারেখার মতো তীর দেখা যায় ; কিন্তু ঝড় ঠেলিয়া জাহাজ কিছুতেই তীরে লাগে না !

অবশেষে এক দিন ঝিকিমিকি তারার আলোয় ঝড় থামিল ; মার্কো পোলোর জাহাজও তীরে ভিড়িল ! সকলে তীরে নামিলেন, কিন্তু কোথাও জন-মানবের চিহ্ন দেখিলেন না !

দিনের বেলায় সূর্য্যের প্রখর তাপে দেহ তাতিয়া জ্বলিয়া যেন ছাই হইয়া যাইবে,—এমন অবস্থা! ঘোরা অসম্ভব। রাত্রে বনে-বনে হিংস্র পশুর ভীষণ গর্জ্জন। তারার আলোয় জাহাজ হইতে দেখেন, তীরের বন-ভূমিতে অতিকায় বানরের দল, নাম-না-জানা আরো কত রকমের সব অদ্ভুত জীব!

শেষে সাহসে বুক বাঁধিয়া সূর্য্যের প্রখর উত্তাপ সহিয়া সকলকে লইয়া মার্কো পোলো দ্বীপের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। ভিতরে পাহাড় আর পাহাড়, জলা আর জঙ্গল। যত দূর গেলেন, মানুষের মুখ দেখিলেন না।

তবু ক্লান্তি নাই! শেষে এক দিন দেখেন, পাহাড়ের বুকে অদ্ভুত একটা পাখী! হাতীর মতো অতিকায় তার দেহ! এ পাখীর নাম এপিয়র্নিশ। প্রায় মাসখানেক ঘোরা-ঘুরি করিয়া মার্কো পোলো দেশে ফিরিলেন ব্যর্থ-মনোরথে।

তার পর তাঁর মৃত্যুর প্রায় দুই শত বৎসর পরে এক পোর্ত্তুগীজ জাহাজের ক্যাপ্টেন লিশবনে ফিরিয়া এ্যাডমিরাল কুনহাকে এক অত্যাশ্চর্য্য কাহিনী বলিল। সে বলিল—উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া সে ফিরিয়াছে! এ্যাডমিরাল বলিলেন,—তোমার জাহাজ? তোমার সঙ্গীরা?

ভারত মহাসাগর বক্ষে

ক্যাপ্টেন লুরেঙ্কো বলিল—আমরা মোজাম্বিক পর্য্যন্ত নীল আকাশের নীচে নীচে বেশ আসিতে ছিলাম। আমার জাহাজে ছিল পঞ্চাশ জন কাফ্রী দাস—তাদের মারফৎ মাস্কাটে মুক্তার কারবার করিব ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু দু'দিন পরে প্রকাণ্ড ঝড় উঠিল। পাঁচ দিন পাঁচ রাত্রি জাহাজ লইয়া ভয়ে অস্থির। ঝড় আসিয়াছিল উত্তর হইতে,—সে ঝড়ে জাহাজ চলিল দক্ষিণ দিকে—জাহাজ ডুবিল! কত দূর ভাসিয়া গেলাম, জানি না। ছ'দিনের দিন ঝড় থামিল। আমি একা এক অজানা কূলে পৌঁছিলাম। জাহাজ হইতে নামিয়া তীরে দেখি, অদ্ভুত সে-দ্বীপের লোক-জন। তাদের গায়ের রঙ কালো

পথে ভাড়া-গাড়ী ও ট্যাক্সি—টানানারিভ্

—তবে কাফ্রীদের মতো কালো নয়। মুখের ছাঁচ নিগ্রোদের মতো—অথচ হুবহু নিগ্রো নয়। তফাৎ আছে। আমাকে দেখিয়া

তাদের যেমন কৌতূহল, তেমনি সন্দেহ! সে-দ্বীপে কি সব ঘন বন। লোকজন দেখিলাম—বানরের মাংস খায়। বানরও সেখানে নানা জাতের পশু-পক্ষী আছে। নদীতে অসংখ্য কুমীর—আকার জাহাজের মতো বড়।

কুলির কাঁধে 'ফিলান্‌জানা'

জলা-পথে ছ্যাঁচা-বাঁশ ফেলিয়া তার উপ.র মোটরের রাস্তা

এ্যাডমিরাল তখন একখানি মানচিত্র বাহির করিয়া বলিলেন,—ম্যাপ দেখিয়া সে জায়গার সম্বন্ধে কিছু হদিশ দিতে পারো?

লুরেঙ্কো বলিল,—ভারত মহাসাগরের দক্ষিণে সে দ্বীপ। আফ্রিকা হইতে বেশী দূরে নয়। সে দ্বীপ ছাড়িয়া একখানি নৌকায় মোম্বাশা পৌঁছিতে আমার সময় লাগিয়াছিল ঠিক কুড়ি দিন।

তার পর পোর্ত্তুগালের রাজার কাছে এ্যাডমিরাল কুন্‌হা এই অজানা দ্বীপের বিবরণ বলিয়া রাজার কাছে চারখানি জাহাজ, রশদ এবং লোকজন চাহিলেন—এই অজানা দ্বীপ আবিষ্কার করিয়া সেখান হইতে মণি-রত্ন আনিবার জন্য। রাজা জাহাজ দিলেন এবং এ অভিযানে ক্যাপ্টেন লুরেঙ্কোকে পুরোবর্ত্তী করিয়া মাডাগাস্কার আবিষ্কারের প্রয়াস চলিল।

সে প্রয়াস সফল হইল না।

এ ঘটনার আরো শতাধিক বৎসর পরে (১৬৪১ খৃষ্টাব্দ) এক শীতের রাত্রে রাজা ত্রয়োদশ লুইয়ের সঙ্গে কার্ডিনাল রিশ্‌লুর কথা হইতেছিল। কার্ডিনাল রিশ্‌লু এক প্রকাণ্ড মানচিত্র মেলিয়া রাজাকে বলিলেন—এ ম্যাপ আমি পোর্ত্তুগাল হইতে পাইয়াছি। এক শত বৎসর পূর্ব্বে এ্যাডমিরাল কুন্‌হো এ ম্যাপ আঁকাইয়া ছিলেন। ডাচ এবং পোর্ত্তুগীজরা আফ্রিকার সমস্ত উপকূল-ভাগ অধিকার করিয়া বসিয়াছে। কিন্তু ভারত মহাসাগরের দক্ষিণে একটি দ্বীপের সন্ধান মিলিয়াছে, সে দ্বীপটি আজো কেহ অধিকার করে নাই। দ্বীপটির সঠিক অবস্থান এবং আয়তন এখনো জানা যায় নাই। তবে অনুমানে মনে হয়, প্রকাণ্ড দ্বীপ। নাবিকেরা আসিয়া বলে, এ যেন এক মহাদেশ! এবং এ-দ্বীপে সোনা এবং মণি-রত্নাদি আছে একেবারে অজস্র অফুরান। ফ্লাকুর্ত্ত এবং ফ্রাঙ্কো বলেন, ব্যবস্থা হইলে তাঁরা এ দ্বীপ হইতে মণি-রত্ন আনিতে এবং এ দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপনা করিতে পারেন। আমরা মহারাজের সনদ প্রার্থনা করি। সনদ পাইলে ক্যাপ্টেন প্রোনিস এই বৎসরই

প্রচুর। নানা জাতের বানর। এত বানর আর কোথাও দেখি নাই! দ্বীপটি খুব বড় বলিয়া মনে হইল। সে দ্বীপে অজানা

তিনখানি জাহাজ লইয়া যাত্রা করিবেন—সঙ্গে চাই শুধু দুই শত সেনা এবং প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র।

রাজা লুই খুশী-মনে তখনি সনদ দিলেন। দিয়া প্রশ্ন করিলেন—এ অজানা দ্বীপের নাম?

রিকলু বলিলেন—মাডাগাস্কার।

এ ঘটনার আড়াই শত বৎসর পরে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে মাডাগাস্কারের প্রধান সহর আন্তানারিভোর লোক-জন এক দিন প্রাতে দামামা এবং দুন্দুভি-নাদে চমকিত হইয়া দেখে, প্রাসাদের মাথায় নীল-সাদা-লাল রঙের ফরাসী পতাকা উড়িতেছে এবং রাজপথে মার্চ্চ করিয়া চলিয়াছে অগণিত ফরাসী বাহিনী।

তখন মাদাগাস্কারের সিংহাসনে ছিলেন রাণী রাণাভালোনা। ফরাসী সেনাপতি জোসেফ সাইমন গালিয়েনি সৈন্য-সামন্ত লইয়া প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া তূর্য্যধ্বনি-সহকারে ঘোষণা জানাইলেন—রিপাব্লিকের নামে রাণী রাণাভালোনাকে আমি সিংহাসন-চ্যুত করিতেছি। ভবিষ্যতে তাঁর বা তাঁর ওয়ারীশনদেব এ সিংহাসনে কোনো দাবী রহিল না। মাডাগাস্কার আজ হইতে আর স্ব-তন্ত্র রাজ্য নয়—ফ্রেঞ্চ রিপাব্লিকের উপনিবেশ মাত্র। এবং মাডাগাস্কারের সমস্তই আজ রিপাব্লিকের অধীন। রাণাভালোনাকে আদেশ দেওয়া হইতেছে—এখনই তিনি এ দ্বীপ ত্যাগ করিয়া যাইবেন এবং এ দ্বীপে আর পদার্পণ করিবেন না।

সেনাপতির সামনে রাণী মৌন মূক নিশ্চল নিস্পন্দ—যেন পাথরের মূর্ত্তির মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন! তাঁর দু'চোখে অশ্রুর বিগলিত ধারা। তিনি এক পা নড়িতে পারিলেন না।

আয়তনের দিক দিয়া সবচেয়ে বড় দ্বীপ গ্রীনল্যাণ্ড; তার পর নিউগিনি; নিউগিনির পর বোর্ণিয়ো। বোর্ণিয়োর পর মাডাগাস্কারের স্থান। সমগ্র দ্বীপটি আকারে ২২৮৫০০ বর্গ মাইল!

আফ্রিকা হইতে মাত্র আড়াই শত মাইল দূরে অবস্থিত হইলেও আফ্রিকার সঙ্গে মাডাগাস্কারের মিল নাই—না আব-হাওয়ায়, না লোকজনের চেহারায় বা আচারে-ব্যবহারে। এ দ্বীপে প্রায় পঁয়ত্রিশ লক্ষ লোকের বাস। তাদের জাতে বহু পার্থক্য।

অনেকে বলেন—ভারত মহাসাগরের বুকে এক দিন এক বিরাট্ বিশাল মহা-দ্বীপ অবস্থিত ছিল; সাগর-তরঙ্গে তার সব ভাঙ্গিয়া জল-তলে অদৃশ্য হইয়াছে, শুধু এই মাডাগাস্কারটুকু অবশিষ্ট আছে।

আবার বহু বৈজ্ঞানিকের ধারণা, এক দিন মাদাগাস্কার হয়তো অষ্ট্রেলিয়ার সহিত মিলিয়া এক হইয়া ছিল। আবার কেহ বলেন, তা নয়। মাদাগাস্কার ছিল ভারতবর্ষের অংশ।

এ সব অনুমানের যাথার্থ্য সম্বন্ধে কোনো অকাট্য প্রমাণ আজো মেলে নাই।

মাডাগাস্কারের পূর্ব্বাংশে বেৎসীমিশারাকা জাতির বাস। গায়ের বর্ণে, গঠনে, চোখ-মুখের ছাঁদে ইহারা দেখিতে অবিকল যবদ্বীপের

আস্তানদ্রয়-কিশোরী

অধিবাসীদের মতো। এ জন্য এ জাতিকে ইন্দোনেশিয়ান মনে হয়! পশ্চিমের শাকালাভা জাতির সঙ্গে নেগ্রোইড জাতির বহু সাদৃশ্য আছে। ইন্দোনেশিয়ান জাতির মধ্যে যে শিক্ষা-সংস্কৃতি দেখা যায়, এ জাতিতে তার চিহ্নও নাই।

মাডাগাস্কারের সম্বন্ধে সকল রহস্য যতই অপরিজ্ঞাত থাকুক, বিশেষজ্ঞেরা বলেন, এ দ্বীপের অধিবাসীদের সঙ্গে যে কাফ্রী জাতির কোনো সম্পর্ক নাই, তাহা সুনিশ্চিত।

মাডাগাস্কারে আরো কয়েকটি জাতি আছে—আন্তাকরণা, আন্তানদ্রয়, মহালফী। তাদের মধ্যে আরব শিক্ষা-সভ্যতার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

মাডাগাস্কারের ঋতু-বৈচিত্র্যে চমৎকারিত্ব আছে। উত্তর ও পশ্চিমের জল-বাতাস ভারতবর্ষের মতো। দক্ষিণে গ্রীষ্মাধিক্য; বৃষ্টি হয় কম; সে জন্য শুষ্ক রুক্ষতায় এ অঞ্চল ভরিয়া আছে। মরুন্দাবায় গ্রীষ্মের তাপ সব চেয়ে বেশী—সব কয় মাসই তাপের মাত্রা ১২৫ ডিগ্রী! মধ্যবর্তী আন্তসিরাবে প্রচণ্ড শীত—২৬ ডিগ্রী। তামাতাভে বছরে একশো আশী দিন দারুণ বৃষ্টিপাত হয়; অথচ দক্ষিণে ডৌফিন পোর্টে বৃষ্টি হয় বছরে বড় জোর ২৬/২৭ দিন।

মাডাগাস্কারে যে সব গাছপালা দেখা যায়, তার মধ্যে শতকরা আশী জাতের গাছপালা শুধু মাডাগাস্কারের নিজস্ব। "রাভেনালা" বা পান্থ-পাদপ এখানকার গাছ। এ-গাছে পিপাসার জল সঞ্চিত আছে। পিপাসা পাইয়াছে? পান্থ-পাদপের গায়ে খোঁচা মারিলেই ঝর-ঝর ধারে জল ঝরিবে। গাছের খোঁচায়-বেঁধা অঙ্গ নিমেষে জুড়িয়া যায়। এ গাছটি বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি! এখন নানা দেশ হইতে নূতন নূতন গাছপালা আনিয়া বসানো হইয়াছে। এ দ্বীপে ঘর-বাড়ী নানা ছাঁদের; এবং কীট-পতঙ্গ আছে বহু বিচিত্র জাতের।

হিংস্র পশুর তেমন প্রাদুর্ভাব নাই। এখানকার কুমীর ভীষণ দুর্দ্দান্ত। নদীতে কুমীরের সংখ্যা অত্যধিক। এখানে এক-জাতের বানর মেলে—তার নাম লেমুর—আকারে অতি ক্ষুদ্র। এ বানর মাডাগাস্কার ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না।

অতিকায় পক্ষীর কঙ্কাল; পিছনে অষ্ট্রীচের কঙ্কাল

বাণিজ্য-কল্পে এখানে আজ নানা জাতির বাস। চীনা ও আরব জাতির প্রাধান্য সব চেয়ে বেশী। ব্যবসা-বাণিজ্য সব তাদের হাতে। সরকারী কাজের নেতৃত্ব ফরাশীর হাতে—তবে উচ্চ পদগুলিতে আরব জাতির প্রাধান্য।

পল্ আমাশি নামে এক জন মার্কিণ ভদ্রলোক সম্প্রতি মাডাগাস্কার ভ্রমণে গিয়াছিলেন। তিনি লিখিতেছেন—মাজুঙ্গায় কয়েক দিন থাকিয়া আমি আন্তানারিভো (এখনকার নাম টানানারিভ) যাত্রা করিবার উদ্দেশ্যে ট্যাক্সি লইলাম। সরকারী তরফ হইতে টানানারিভ পর্য্যন্ত বাসের ব্যবস্থা আছে। সপ্তাহে দু'দিন বাস চলে। মাজুঙ্গা হইতে তিনশো চল্লিশ মাইল দূরে টানানারিভ। বাসে চড়িয়া দু'দিনে পৌঁছানো যায়। বাসে যাত্রীর এত ভিড় হয় যে, বাসের সব শীট সপ্তাহ-পূর্ব্বে বিক্রয় হইয়া যায়। আমার ভাগ্যে বাস মিলিল না; তাই ভাড়া-ট্যাক্সি লইতে হইল। ভাড়া খুব কম—তিনশো চল্লিশ মাইল পথের জন্য আট ডলার এবং ড্রাইভারকে আলাদা খোরাকী দিতে হইবে! খোরাকী মানে, দু'বেলা দু' বাটি ভাত!

মাজুঙ্গা ছাড়িয়া পথ চক্রাকারে ঘুরিয়া গিয়াছে। পথের দু'ধারে মাটী রৌদ্র-তাপে ফাটিয়া চৌচির। বৃষ্টি এ অঞ্চলে বড় একটা হয় না!

পাহাড়-পথে গাড়ী চলিল। পথে অসংখ্য বাঁক। আর কি প্রচুর ধূলা! স্থানে স্থানে গাড়ী থামাইয়া চাকায় তেল দিতে হয়, নহিলে ধূলার ভারে কলকব্জা বন্ধ হইয়া যায়!

এ পথে পাহাড় আর পাহাড়—দৃশ্যে এতটুকু বৈচিত্র্য নাই।

এক-এক জায়গায় সার-সার চলন্ত গরুর গাড়ী দেখিলাম—এ সব গাড়ীতে করিয়া যাত্রী চলিয়াছে। যাত্রীর দলে দোকানী-পশারী আছে, গৃহস্থ আছে। গাড়ীগুলির মাথায় ছই। গাড়োয়ানের দল গাড়ী চালাইতে চালাইতে মনের আনন্দে গান গাহিতেছে।

পান্থ-পাদপ

লামুর বানর ও মাডাগাস্কারী

সন্ধ্যা সাতটায় মেভাটানানায় পৌঁছলাম। রাত্রে এ পথে গাড়ী চলে না। তার কারণ, গাড়ী যদি পথে বন্ধ হয় তো ঘর-বাড়ী হোটেল-আস্তানা কিছুই মিলিবে না! এতখানি পথের মধ্যে একটিমাত্র হোটেল আছে এই মেভাটানানায়।

হোটেলে গো-মাংস প্রধান খাদ্য। আলু মিলিল দু'চারি টুকরা। শুনিলাম, তরী-তরকারীর খুব চড়া দাম! মাংসর দাম খুব শস্তা—তাই মাংসই এখানকার লোকের প্রধান খাদ্য। চাল মেলে; তবে চালের চেয়ে মাংসের দাম অনেক কম। তাই গরীবের দল মাংসকে

বালির বুকে জলের সন্ধানে

বাঁশের 'গীটার'-যন্ত্র
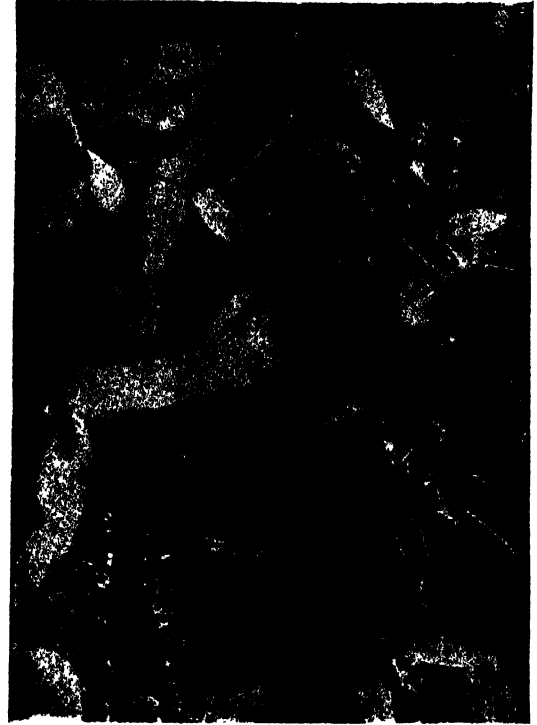
ভ্যানিলা-মঞ্জরী

প্রধান খাদ্য করিয়াছে। দ্বিতীয় দিন প্রত্যুষে যাত্রা সুরু করিয়া দুপুরে গিরি-পথ পাইলাম। এ পথ ৪৫০০ ফুট উর্দ্ধে অবস্থিত। এখান হইতে নীচেকার মালভূমি চমৎকার দেখাইতেছিল। এখানে অপর্য্যাপ্ত ধানের ক্ষেত—জলা, বন, নদী—মাঝে মাঝে পাথরের তৈরী বাড়ী-ঘর—ছেলেদের খেলাঘরের মতো দেখাইতেছিল। এই পার্ব্বত্য অঞ্চলে হোভা জাতির বাস।

আগ্নেয়-গিরির মাথায় ত্রিতুপা হ্রদ—আন্তসিরাব

বেণু-পেটিকা

গরুর শিঙে নক্সার কাজ
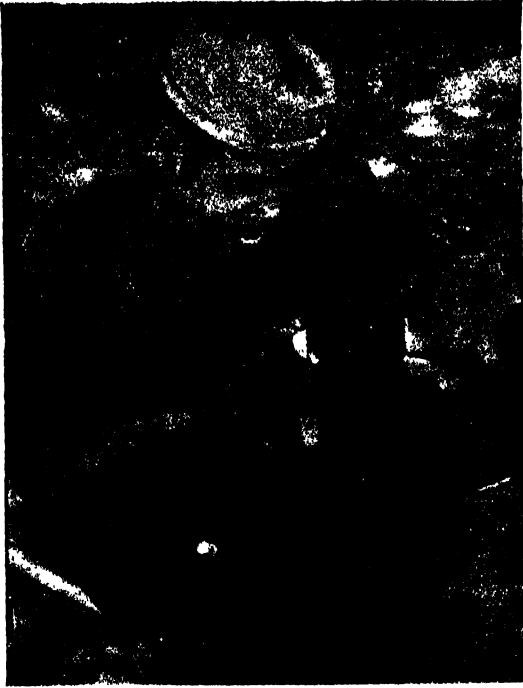
মাডাগাস্কারের ঘর-বাড়ীর চেহারা দেখিয়া যাঁরা এখানকার সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা বলিয়া দিতে পারেন, কোন্ ঘরে কোন্ জাতির লোক

বারা-কুটীর

বাস করে। বাড়ী-ঘরের নির্ম্মাণ-প্রণালী-ভেদে জাতির পার্থক্য বুঝা যায়। তবে পোষাকে-পরিচ্ছদে এক জাতির সঙ্গে অপর জাতির প্রভেদ নাই। সব জাতির স্ত্রী-পুরুষই দীর্ঘ সাদা কাপড় পরে। কাপড়কে ইহারা বলে, লাম্বা। অবস্থাভেদে লাম্বার কোয়ালিটিতেই যা-কিছু পার্থক্য। অবস্থাপন্ন পুরুষরা পরে মশলিনের লাম্বা—ধনী-ঘরের মেয়েরা পরে সিল্কের লাম্বা।

এখানকার আদিম জাতি না কি মলোগাশী। যে-সব এথিয়োপিয়ান এবং আরব এখানে বাস করে, তারাও এ দেশের আচার-রীতি মানিয়া লাম্বা ধরিয়াছে। পরার কায়দা এক-রকমেরই।

আদিম বংশের সর্দ্দার

দীর্ঘ পথ পার হইয়া আমরা এক গ্রামে আসিলাম। এখানে শুধু ধানের ক্ষেত—জলে ডুবিয়া আছে। চাষারা ছোট ছোট সালতি আর ডোঙ্গায় চড়িয়া কাজ করিতেছে। পূর্ব্বে গরুর-গাড়ী ছিল এখানকার

পথে সার সার গরুর গাড়ী

একমাত্র বাহন,—এখন মোটর এবং বাইসিক্‌লের চলন হইয়াছে। টানানারিভ মাডাগাস্কারের রাজধানী। ধানক্ষেতের মধ্য দিয়া পথ—সেই পথে টানানারিভে প্রবেশ করিলাম।

দেখিব, ইহা ছিল আমার স্বপ্ন এবং কল্পনার অতীত! ফরাশী সভ্যতায় এ অঞ্চল প্রদীপ্ত দেখিলাম।

লেখক লিখিতেছেন—গবর্ণর জেনারেলের সহিত দেখা হইয়াছিল।

মালাগাশী-মেয়েদের কাছে ছাতার আদর খুব বেশী

মেয়েদের হাতের শিল্প

পথে এখানে খুব ভিড়—আশে-পাশে বাড়ী-ঘর—কুলীর দল রিক্‌শ গাড়ী লইয়া ছুটিয়াছে। কর্ম্ম-চাঞ্চল্যের তীব্র হল্‌কা!

পাহাড়ের উপর য়ুরোপীয়ের মহল্লা। সিঁড়ি উঠিয়া এ মহল্লায় পৌঁছাইতে হয়। সুদৃশ্য বাড়ী-ঘর, দোকান-হোটেল—টানানারিভ যেন প্যারিসের একটি নব-সংস্করণ! মাডাগাস্কারে এমন সহর

গবর্ণর জেনারেল বলিলেন—মাডাগাস্কার যেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার! খনি হইতে অজস্র সোনা উঠিতেছে, গ্রাফাইট উঠিতেছে। তার উপর পঞ্চাশ রকমের দামী পাথর, লোহা, নিকেল, সীশা, ম্যাঙ্গানীজ এখানে অপর্য্যাপ্ত! ওদিকে ভুট্টা, ভ্যানিলা, ম্যানিয়াক, কফি, কোকো, চিনি, চাল, তামাক, মরীচ, চীনা বাদাম, রাফিয়া এবং সিশালও অজস্র

পরিমাণে মেলে। তবে এ-সবের চাষে বা খনির কাজে লোক পাওয়া যায় না বলিয়া কোনো ব্যবসাকে খুব জমাইয়া তোলা যাইতেছে না। ক্ষেতে এবং খনিতে যত লোক এখন কাজ করিতেছে, তাদের সংখ্যা যদি চার গুণ বাড়ানো যায়, তাহা হইলে খনিজ সম্পদ এবং কফি-চাল, তামাক প্রভৃতি প্রায় পনেরো হইতে কুড়ি গুণ বেশী-মাত্রায় পাইতে পারি!

মাডাগাস্কারে ফরাশীর চেষ্টায় শিক্ষার প্রসার বাড়িয়াছে—লেখাপড়ার দিকে সকলের বেশ অনুরাগ। আর কোনো উপনিবেশে ফরাশী শিক্ষা-সংস্কৃতির এমন প্রসার নাই।

রোগে বোজারা মন্ত্র তন্ত্র পড়ে

এখানকার লোক-জন সরল এবং সাধারণতঃ অলস প্রকৃতির। যেটুকু অর্থ প্রয়োজন—খাওয়া-দাওয়ার খরচ এবং ট্যাক্স দেওয়া—সে-টাকা রোজগার হইলেই খুশী! তার বেশী আর এক-পয়সা রোজগারের দিকে চাড় থাকে না! সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি কাহারো বড় নাই। পাঁচ ছয় ডলার রোজগার হইলেই ব্যস! দু'ডলার লাগিবে ট্যাক্স দিতে—

ডাক-পিয়ন্—দু'-একশো ক্রোশ হাঁটিয়া ডাক বহে

বাকী তিন-চার ডলারে ক' বস্তা চাল এবং একটা সার্ট কিনিতে পারিবে—তার বেশী-পয়সার কি প্রয়োজন?

দু'-এক বার সরকারী তরফ হইতে ট্যাক্সের হার বাড়ানো হইয়াছিল, যদি সে জন্য আলস্য ঘুচাইয়া কর্ম্মানুরাগ বাড়ে! কিন্তু তাহাতে কোনো ফল হয় নাই।
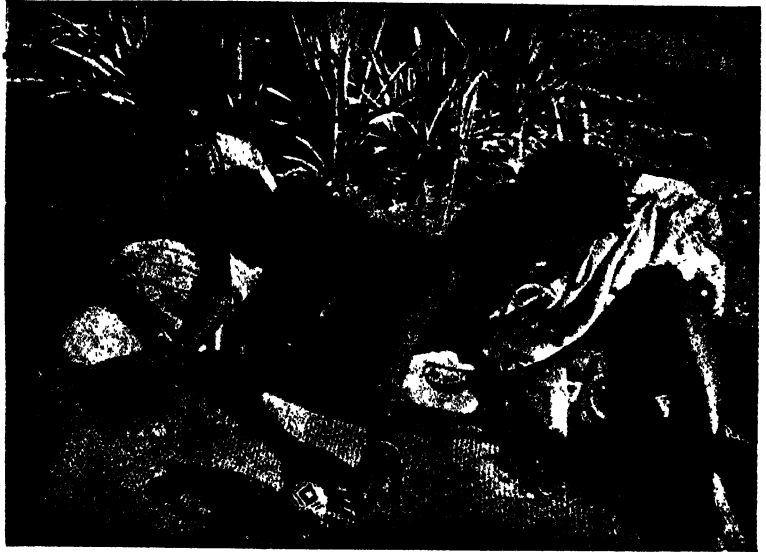
আফ্রিকা হইতে নিগ্রো কুলি আনিয়া কাজে লাগাইবার চেষ্টা চলিয়াছিল—কিন্তু তারা এখানে থাকিতে চায় না।

ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান বা চীনারা এখানকার জল-বাতাসে তেমন কাজ করিতে পারে না। ইন্দো-চীন হইতে আনামাইটদের আনিয়াও এখানে ধরিয়া রাখা যায় নাই।

মাডাগাস্কারের রাজধানীর আধুনিক নাম টানানারিভ; পূর্ব্বে নাম ছিল আন্তানারিভো। আন্তানারিভোর অর্থ—"হাজার গ্রামের সমষ্টি-রচিত নগর।" ফরাশীরা সংক্ষেপে বলে, 'টানা'।

প্রতি-শুক্রবার এখানে হাট বসে। হাটকে ইহারা বলে, 'জোমা'। চারি দিক হইতে চাষী ও পশারীর দল বেচা-কেনা করিতে আসে। এত রকমের জিনিষ হাটে আসে যে, সে-সবের জোড়া পৃথিবীর আর কোনো হাটে-বাজারে দেখা যায় না। গ্রাফাইটের তৈয়ারী ফুলদানী ও তৈজস-পত্রাদি, "রাভেনালা" বা পান্থ-পাদপের ছালের তৈয়ারী বিচিত্র ফার্ণিচার, কাঁচা চিনির ড্যালা, খড়ের রকমারি টুপি, এবং নানা ছাঁদের লাম্বা!

শিল্প-কাজে এখানকার লোক-জনের অসাধারণ নৈপুণ্য। গরুর শিঙে এত-রকমের নক্সা আঁকে যে, উঁচু-দরের আর্টিষ্টকেও তার কলা-কুশলতার তারিফ করিতে হয়। বাঁশের এমন চমৎকার বাঁশী তৈয়ারী করে যে, যে-কোনো ওস্তাদ অর্কেষ্ট্রা-দলও সে বাঁশীকে লুফিয়া লইবে! বাঁশের এ বাঁশীর মাডাগাস্কারী নাম—ভালিহা। তাছাড়া বাঁশ দিয়া অপূর্ব্ব-রকমের পেটিকা তৈয়ারী করে—সে পেটিকায় টাকা-কড়ি, তামাক, দলিল-পত্র রাখে।

গান-বাজনায় মেয়েদের অনুরাগ প্রবল। পর্ব্বে-উৎসবে মেয়েরা বাজনা বাজায়—রীতিমত মেয়ে-অর্কেষ্ট্রার দল আছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বোনার কাজেও মেয়েদের পটুতা অসাধারণ। নক্সাদার

যে-সব লেশ বোনে, তাহা টেবিল-ঢাকা হইতে বিছানা-ঢাকার কাজে ব্যবহার করা চলে। নক্সার কাজ, লেশের বুনন এত চমৎকার যে, সে-লেশের পাশে পাশ্চাত্য বুনন্‌-গরবিনীর "গরব ম্লান হয়ে টুটে" যায়!

টানানারিভে একটি মিউজিয়ম আছে। সে মিউজিয়মে যে সব প্রাচীন কীর্ত্তি-স্মৃতি সংরক্ষিত আছে, তাহা দেখিয়া মাডাগাস্কারের উপর শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম হয়। মার্কো পোলো-বর্ণিত সেই হাতীর মতো পাখী এপিয়োর্নিশের কঙ্কাল এ-মিউজিয়মে আছে।

লেখক লিখিতেছেন—মাডাগাস্কারে এখনো যে সব সাবেক জাতির বাস, ফরাসী শিক্ষা-সংস্কৃতির খবর যারা রাখে না, এমন লোক দেখিতে চাহিলে সকলে বলিলেন—আন্তানদ্রয় ও মালাগাশীদের দেশে যাও। সেখানে যাইতে হইলে ট্রেণে করিয়া আন্তসিরাবে নামিতে হয়। আন্তসিরাব হইতে পাহাড়-পথ ধরিয়া দক্ষিণে গেলে তাদের বড় ছ'টি গ্রাম তুলিয়ার এবং ফোর্ট-ডৌফিনে পৌছানো যায়।

টানানারিভ হইতে যাত্রা করিয়া প্রথমে আসিলাম মানকারায়। পাহাড়ের উপর অবস্থিত। এখানে চারি দিকে ইউকালিপ্‌-টাশের ঘন জঙ্গল। লোক-জনের পরণে শুধু ল্যাম্বা—উপর-অঙ্গে কোনো আচ্ছাদন নাই। স্ত্রীলোকদেরও নয়! মানাকারার উপরে বারা-জাতির বাস। ইহারা পাতার ঘরে বাস করে। ঘরগুলি খুব উঁচু করিয়া তৈয়ারী করে। মই বহিয়া সে ঘরে প্রবেশ করিতে হয়। ঘরের ছাদ খুব নীচু—দাঁড়াইলে মাথায় ঠেকে। এক-তলাতেও ঘর আছে; সে ঘরে ইহারা বাস করে না—এক-তলার ঘরে থাকে গৃহ-পালিত পশু এবং সঞ্চিত ভুট্টার স্তূপ। এমনি ঘরে এবং এমনি ভাবেই তারা সেই মান্ধাতার আমল হইতে বাস করিতেছে! পাহাড়-পথে আর একটি চমৎকার জায়গা ইহশী। ইহশীর পথ কোথাও বেশ খোলা এবং চওড়া,—আবার কোথাও পথের ছ'ধারে মানুষ-ভোর উঁচু ঘাসের জঙ্গল। সে জঙ্গল ঠেলিয়া কোনো দিকে নজর চলে না!

এখানে পথ চলিবার জন্য চেয়ার ভাড়া পাওয়া যায়। ভাড়া-চেয়ারের নাম ফিলান্‌জানা। ছ'টা লম্বা খুঁটার সঙ্গে চেয়ার বাঁধিয়া দেওয়া হয়। সেই চেয়ারে বসুন। বাংলা দেশের মহাপায়ার মতো এ চেয়ার বহিতে চার জন কুলি লাগে। পথ দীর্ঘ হইলে আট জন, বারো জন কুলি লাগে। কুলিরা পালা করিয়া কাঁধ বদল করিয়া লয়। এ অঞ্চলে যখন ঘোড়া ছিল না, গাড়ী ছিল না, তখন এই ফিলান-জানা ছিল একমাত্র বাহন। এখন গাড়ী-ঘোড়ার চলন হইলেও ফিলান্‌জানা লোপ পায় নাই।

আন্তানদ্রয়দের দেশে বৈচিত্র্য দেখিলাম। আন্তানদ্রয়ের অর্থ—কণ্টক-সম্পর্কীয়। এ অঞ্চলকে কাঁটার দেশ বলা চলে। চারি দিকে শুষ্ক মাঠ। সে মাঠে গাছ-পালা বলিতে আছে শুধু কাঁটার ঝোপ আর জঙ্গল। মাঝে মাঝে উচ্চ-শির ঘাসের ঝোপ। বেশীর ভাগ বাড়ী-ঘর এখানে পাতার তৈয়ারী। লোক-জনের গায়ের বর্ণ উজ্জ্বল মসৃণ—যেন এনামেল-করা। বর্ণ কালো নয়, উজ্জ্বল শ্যাম! এ জাতের মেয়ে-পুরুষ কেশের সজ্জা সম্বন্ধে খুব মনোযোগী। মেয়েরা গলায় পরে নানা রঙের পাথর-গাঁথা মালা, মাথায় মুদ্রার মালা বাঁধিয়া কেশ-সজ্জা করে, পায়ে মল পরে।

আন্তানদ্রয়দের দেশ ছাড়িয়া আসিলাম আম্পানিহাই গ্রামে। এ্যাডভেঞ্চারের দেশ! এখানে আইন নাই, কানুন নাই, ভয় নাই, ডর নাই। রাশিয়ার কাছে সাইবেরিয়া যেমন আতঙ্ক-কর, মাডা-গাস্কারের কাছে আম্পানিহাইও ঠিক তাই!

ম্যাডাগাস্কারের সম্বন্ধে বাহিরে কত রকমের গল্প চলিত আছে—

মেয়ে-অর্কেষ্ট্রা

সে সব গল্প শুনিয়া মনে হইত, মাডাগাস্কার যেন বুনোর দেশ! কিন্তু মাডাগাস্কার দেখিলাম, চমৎকার দ্বীপ! এখানকার লোক-জনের মনে বিদেশীর উপর এতটুকু বিদ্বেষ নাই। সাধারণতঃ তাদের প্রকৃতি সরল। মনে দুর্ব্বার লোভ নাই; সম্পদে লালসা নাই—কোনো মতে স্বচ্ছন্দ ভাবে খাওয়া-পরা করিয়া দিন কাটাইতে পারিলেই হইল।

শুনিলাম, মেয়েদের মধ্যে শতকরা ত্রিশ জন বন্ধ্যা। এ বন্ধ্যাত্বের কারণ কোনো বিশেষজ্ঞ আজ পর্য্যন্ত নির্ণয় করিতে পারেন নাই। সে জন্য আদিম অধিবাসীরা সংখ্যায় বাড়িতেছে না। কয়েকটি জাতি বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। নারীর বন্ধ্যাত্বের জন্য বিবাহের প্রথায় বৈচিত্র্য আছে। যে-মেয়ের সন্তান হইয়াছে, তাকে বিবাহ করিবার জন্য পাত্র-মহলে মারামারি কাটাকাটি বাধে! যে-বধূ কাঁখালে যত শিশু লইয়া স্বামীর ঘরে আসে, তার আদর তত বেশী।

মাডাগাস্কারকে অনেকে বলেন রহস্য-পুরী—সে-কথা অর্থহীন নয়!

বেছাঁদ অঙ্গ

অভ্যাসের দোষে এবং ঔদাস্যের জন্য চলা-ফেরায়, বসা দাঁড়ানোয় আমাদের দেশের মেয়েরা তাঁদের দেহের স্বাভাবিক ছাঁদকে দুমড়াইয়া মুচড়াইয়া এমন করিয়া তোলেন যে, সে জন্য শুধু যে রূপ এবং বয়স থাকিতেও তাঁদের বিশ্রী দেখায়, তা নয়—অকালে নানা ব্যাধির ভারে জর্জ্জরিত হইতে হয়। প্রসবের সময় অনেককে যে মরণের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হয়, তার একটি কারণ ঐ বেছাঁদে গড়া দেহ।

লেখা-পড়া এবং গান-বাজনা শেখার দিকে মেয়েদের অনুরাগ খুব প্রবল। তার উপর জাতীয়তার নানা আন্দোলনেও তাঁদের মধ্যে অনেকে বিপুল উৎসাহে যোগ দিতেছেন। ঘরে-বাহিরে আমাদের দেশের মেয়েদের বিরাট কর্ম্ম-উদ্দীপনা দেখিয়া আমাদের যতখানি আনন্দ হয়, তার চেয়ে অনেক বেশী দুঃখ হয় তাঁদের অপুষ্ট রুগ্ন দেহ দেখিয়া! ও-শরীরে কত দিন সামর্থ্য থাকিবে, দশ-দিক-পালিনী দশভুজার মতো কাজ করিবেন!

১। টুলের উপরে বাঁ পা

চলিতে গিয়া কাহাকেও দেখি কোলকুঁজা, কাহারো বা দু'হাঁটুতে ঠোকাঠুকি লাগে, কাহারো পিঠের মেরুদণ্ড বাঁকিয়া গিয়াছে, কাহারো বা গলায় ঝিঁক ওঠা,—এমনি সহস্র বিকৃতিতে তাঁদের দেহ স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবে গড়িয়া ওঠে না। তার কারণ, দেহ-যন্ত্রটাকে সুস্থ এবং স্বচ্ছন্দ রাখিবার উপায় অনেকে জানেন না; আবার যাঁরা জানেন, ও-দিকে মনোযোগ দিবার আবশ্যকতা তাঁরা উপলব্ধি করেন না! আমরা চাই, বাঙলার অন্তঃপুরিকাদের মন যেমন শিক্ষায়-সংস্কৃতিতে প্রদীপ্ত হইতেছে, তেমনি দেহ-ছাঁদও বিকৃতি-মুক্ত হইয়া সুন্দর সুকুমার হোক!

দেহকে সুন্দর সুঠাম সুগঠিত করিবার উপযোগী বিবিধ ব্যায়াম-প্রণালীর কথা আমরা নিত্য আলোচনা করিতেছি। যাঁদের দেহ ঔদাস্যে-অমনোযোগিতায় বেছাঁদ হইয়াছে, চলিতে ফিরিতে যাঁরা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন এবং বেছাঁদ অঙ্গের জন্য যাঁরা অস্বাস্থ্য ভোগ করিতেছেন—কি করিয়া তাঁরা সে-বেছাঁদ ভাঙ্গিয়া দেহকে আবার সুছাঁদে গড়িয়া তুলিতে পারেন, আজ আমরা সেই কথা বলিতেছি।

যাঁদের পিঠ বাঁকিয়া থাকে, কোল-কুঁজো হইয়া চলেন, কিম্বা যাঁদের দেখিলে মনে হয় উপর-পিঠে যেন টোল্ খাইয়াছে, সে-সব বিকৃতি প্রতিকারের জন্য তাঁদের বলি—

১। ছোট এবং নীচু টুলের উপরে এক পা রাখিয়া হেলিয়া দাঁড়ান। যে-পা টুলের উপর থাকিবে,—অর্থাৎ বাঁ পা যদি টুলের উপর রাখিয়া দাঁড়ান, তাহা হইলে দাঁড়াইয়া ১ নং ছবির ভঙ্গীতে বাঁ দিকে মাথা হেলাইয়া দু'-হাত মাথার উপর রাখিয়া মুষ্টিবদ্ধ করুন—এমনি ভাবে থাকিয়া একবার বাঁ দিকে পরক্ষণে ডান দিকে মাথা হেলাইবেন ও দুলাইবেন। বেশ দ্রুত-গতিতে মাথা হেলাইতে দুলাইতে হইবে—প্রায় দু'মিনিট ধরিয়া এ ব্যায়াম করুন। তার পর ডান পা উঁচু টুলে রাখিয়া ডান দিকে হেলিয়া এমনি ভাবে দু'মিনিট মাথা হেলাইবেন-দুলাইবেন।

এ ব্যায়ামে পিঠের টোল সারিবে, কোলকুঁজো ভাব সারিবে।

২। পিঠের নীচের দিকে যদি টোল খাওয়ার মতো দেখায়, তাহা হইলে কাঠের বেঞ্চের উপর ২নং ছবির ভঙ্গীতে বাঁ-কাৎ হইয়া শুইবেন—হাঁটুর নীচে হইতে দুই পা শূন্যে প্রসারিত রাখিবেন।

২। বাঁ-কাতে শুইয়া

তার পর এক পা নীচের দিকে, সেই সঙ্গে অপর পা উপরদিকে তুলিবেন—এই ২ নং ছবির ভঙ্গীতে। এমনি ভাবে থাকিয়া দু'পা ঘন-ঘন নাড়িবেন তিন মিনিট। তার পর ডান্ কাতে শুইয়া এমনি ভাবে বাঁ পা উর্দ্ধে এবং ডান পা নীচের দিকে প্রসারিত করিয়া নাড়া। এ ব্যায়ামে পায়ের গুলি, উরু এবং পিঠের হাড়

সরল হইবে, মজবুত হইবে—পিঠের টোল্‌-খাওয়া ভাব সারিয়া যাইবে।

চলিতে চলিতে অনেকের দুই হাঁটুতে ঘষাঘষি হয়, ঠোকাঠুকি লাগে। হাঁটুর গড়নের দোষে ইহা ঘটে। প্রতিকার না করিলে পা বাঁকিয়া যায়, সে জন্ম রূপসীকে কুশ্রী দেখায়। এ বিকৃতির প্রতিকারের জন্ম—

৩। দু'পা এক করিয়া দাঁড়ান। দু' পা ছোঁয়া-ছুঁয়ি থাকিবে—তার পর সামনের দিকে ঝুঁকুন (৩ নং ছবির ভঙ্গীতে)। তার পর কোমর নোয়াইয়া উপর-দেহ বাঁকান—সঙ্গে সঙ্গে দু' হাঁটু দুমড়ান। হাঁটু দুমড়াইবার সময় দু' হাঁটুর মধ্যে ৩ নং ছবির ভঙ্গীতে দুই হাত রাখুন—রাখিয়া দু' হাঁটু ডাহিনে-বাঁয়ে নাড়ুন। দু' হাঁটু যেন মিলিতে মিশিতে চায় এবং সে-মিলন না ঘটে, দু' হাত মাঝখানে রাখিয়া যেন বাধা দিতেছেন, এমনি ভাবে। এমনি ভাবে হাঁটু নাড়িতে এবং দু' হাঁটুর মধ্যে হাত রাখিতে হইবে। যতক্ষণ না ক্লান্তি বোধ করেন, এ ব্যায়াম করিবেন। হাঁটুর দোষ সারিবে।

হাঁটুতে হাঁটুতে যেমন মেশে, তেমনি আবার অনেকের দু' পায়ে যেন ভীষণ আড়ি! তার ফলে দু' পায়ের মধ্যে অনেকখানি ব্যবধান গড়িয়া ওঠে! অর্থাৎ এ-পা যদি চলে দক্ষিণ দিকে, ও-পা যেন উত্তর দিকে চলিতে চায়! এ বিকৃতিকে বলে bow legs. এ বিকৃতি প্রতিকারের জন্ম—

৩। দু'পায়ে ছোঁয়া-ছুঁয়ি

৪। বাঁ-পায়ে চেয়ারের ভার

৪। সিধা-খাড়া দাঁড়ান। বাঁ পায়ের উপর একখানি চেয়ারের ভার—পায়ের বাহিরের দিকে—(৪ নং ছবি দেখুন) রাখিয়া চেয়ার-সমেত বাঁ পা উপর-দিকে ধীরে ধীরে তুলুন—যতখানি উঁচুতে তুলিতে পারেন, তুলিবেন। তুলিয়া এক দুই. তিন গণিবেন—তার পর ধীরে ধীরে চেয়ারের ভার-সমেত পা নামান। তার পর এক দুই তিন গুণুন। গণার পর আবার এমনি ভাবে পা তুলিবেন ও নামাইবেন। অন্ততঃ-পক্ষে বারো বার এমনি ভাবে বাঁ পা নামাইবেন। তার পর ডান পা লইয়া এমনি তোলা-নামাব ব্যায়াম। অভ্যাস হইলে চেয়ারের চেয়ে ভারী জিনিষ এমনি ভাবে তুলিবেন। ইহাতে পায়ের পেশী সুছাঁদের হইবে, মজবুত হইবে এবং পায়ের গড়ন হইবে সুশ্রী।

অনেকের পায়ের চেটো হয় ফ্ল্যাট—যেন তক্তা! ইহাতে পা কদর্য্য দেখায়। দুর্ব্বল পেশী, রক্তহীনতা, বিশ্রী জুতো ব্যবহার, বেশীক্ষণ দাঁড়াইয়া কাজ করা—এই সব কারণে এ বিকৃতি ঘটে! যাঁদের পায়ের চেটো এমনি ফ্ল্যাট, এ বিকৃতির প্রতিকল্পে তাঁদের বলি—

৫। ৫ নং ছবির ভঙ্গীতে টুলে বসুন। দু' পায়ের চেটো ঐ ছবির মতো ট্যারচা ভাবে রাখিয়া বসিবেন—দু' পায়ের গোড়ালি উঁচু করিয়া রাখিবেন যেন মাটীতে না ঠেকিয়া থাকে! এবার দু' পায়ের পাতায় ভর দিয়া দাঁড়ান—গোড়ালি যেন মাটীতে না ঠেকে! এমনি ভাবে পায়ের পাতার উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া এক হইতে দশ পর্য্যন্ত গুনুন—তার পর গোড়ালি নামাইয়া সহজ ভাবে দাঁড়ান—দাঁড়াইয়া এক হইতে দশ পর্য্যন্ত গুণুন। তার পর পায়ের পাতায় ভর দিয়া গোড়ালি উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া এক হইতে দশ পর্য্যন্ত গোণা—পর্য্যায়ক্রমে এ ব্যায়াম করা চাই বারো বার। তার পর পায়ের পাতায় ভর দিয়া পায়ের গোড়ালি তুলিয়া (পায়ের পাতা মেঝে ছুঁইবে না) উঠিয়া দাঁড়ান। এমনি ভাবে দাঁড়াইয়া হাঁটু মুড়ুন—মুড়িয়া নীচু হোন—যতখানি নীচু হইতে পারেন। এ জন্ম বাঁ হাতে চেয়ার ধরিয়া (৫ নং ছবির ভঙ্গীতে) সেই চেয়ারে দেহের ভর রাখিবেন, নহিলে পড়িয়া যাইবেন। হাঁটু মুড়িয়া তার পর ধীরে ধীরে হাঁটু এবং গোটা দেহকে সবল সিধা করুন। পাঁচ সেকেণ্ড এমনি সিধা থাকার পর আবার হাঁটু মোড়া। এ ব্যায়াম করা চাই আট বার।

৫। দু'পা ট্যারচা ভাবে

এ কয়টি ব্যায়ামে বেছাঁদ সারিয়া দেহ সুছাঁদে গড়িয়া, সুঠাম সুকুমার হইবে।

শেষ ভালো

(গল্প)

১

বর্ষার শেষ ! জ্যাঠাইমা ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইলেন। প্রথম বারের আক্রমণ হইতে মুক্তি পাইয়া তিনি নিশ্বাস ফেলিবারও অবকাশ পাইলেন না, আবার জ্বরে পড়িলেন ! এবার শয্যাগত হইয়া বিছানার সহিত যেন মিশিয়া গেলেন।—দেহ এতই জীর্ণ, অস্থিচর্ম্মসার।

আমি বলিলাম,—চল জ্যাঠাইমা, আমরা দিন-কতকের জন্যে বেরিয়ে পড়ি। তোমার হাওয়া-বদলানোর দরকার !

জ্যাঠাইমা হাসিলেন ; বলিলেন,—কাজ নেই আর হাওয়া-বদলিয়ে শিশির ! যদি মরতেই হয়, তবে এই শ্রীপাটেই মরা ভাল। মহাপ্রভু এখানেই আমায় চরণ-ছায়া দিন।

আমাদের বাড়ী নবদ্বীপ।

আমি বলিলাম,—কিন্তু মরবার কথা কেন বল্‌ছো ? তীর্থে যেতে চাও, বেশ, তাই চল।

তীর্থযাত্রায় জ্যাঠাইমার বিশেষ কোন আপত্তি নাই ; তবে নাবালক বিগ্রহগুলি লইয়াই তাঁহার সমস্যা ! অনেক কষ্টে বুঝাইলাম, নাবালকগুলির সেবার ভার পুরোহিত-গৃহিণীর উপর দেওয়া যাইতে পারে ; কারণ, জ্যাঠাইমা অসুখে পড়ায় প্রায় এক মাসকাল তিনিই এই ভার গ্রহণ করিয়াছেন। উহার পর দ্বিতীয় আপত্তি তুলিলেন, ভাদ্র মাস লক্ষ্মীপূজা আছে ; সে সময় তাঁহার না থাকিলে কি করিয়া চলিবে ? তাহার পর কার্ত্তিক মাসে শ্যামাপূজা আছে ; তাহাতেও তাঁহার থাকা চাই। বুঝাইলাম, ২রা আশ্বিন তীর্থযাত্রা করিয়া শ্যামাপূজার পূর্ব্বেই ফিরিয়া আসিব। জ্যাঠাইমা বিস্তর আপত্তির পর অবশেষে সম্মত হইলেন।

আমি উৎসাহিত হইয়া লোভনীয় তীর্থগুলির নাম করিতে লাগিলাম ;—দ্বারকা, রামেশ্বর, পুরী—ইত্যাদি।

জ্যাঠাইমা চুপ করিয়া সকল কথা শুনিতেছিলেন ; মৃদু নিশ্বাস চাপিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন—যেতেই যদি হয়, তবে চল বাবা বৈদ্যনাথ-দর্শনে দেওঘরে যাই।

বলিলাম,—সে কি জ্যাঠাইমা ! এত তীর্থের নাম করলুম, তাতে তোমার মন উঠল না ; শেষে সেই দেওঘরেই যাবে ?

জ্যাঠাইমার গলার স্বর কাঁপিয়া উঠিল ; বলিলেন,—ওই আমার সব চেয়ে বড় তীর্থ শিশির ! ওখানেই ত তাঁকে রেখে এসেছি বাবা !—তা-ছাড়া ওখানে বাবা বৈদ্যনাথ আছেন।

জ্যাঠাইমার ব্যথা কোথায়, তাহা বুঝিতে পারিলাম ; তাই তাঁহার কথার উপর আর কথা বলিতে পারিলাম না। দেওঘরে আমাদের একখানি বাড়ী আছে ; সেখানেই জ্যাঠামশায়ের মৃত্যু হইয়াছিল।

একটু মৌন থাকিয়া জ্যাঠাইমা বলিলেন,—তাহলে পশুপতিকে একখানা চিঠি লেখ, বাড়ী-ঘর ঝাড়িয়ে-মুছিয়ে কলি ফিরিয়ে রাখবে। এখনও ত সময় আছে ! দশ বছরের মধ্যে আর সেখানে যাওয়া হয়নি ; তার কি আর কিছু ছিরি-ছাঁদ আছে ?

দেওঘরে যাওয়ার ব্যবস্থায় মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহাকে তাহা জানিতে দিলাম না। আমার অনিচ্ছা জানিলে জ্যাঠাইমার মত তখনই বদলাইয়া যাইত ; কিন্তু আমার তাহা প্রার্থনীয় নহে।

জ্যাঠাইমা একটু মৌন থাকিয়া বলিলেন,—গোপেশ্বর বাবুরা রোজই তাগিদ দিচ্ছেন, যাবার আগে মেয়েটি দেখে যাবি নে ?

আমি বলিলাম—তার এত তাড়া কি ? কার্ত্তিক মাসেই তুমি ফিরে আসছ ত ? এসে যা-হয় করা যাবে। আমি তাহলে পশুপতি বাবুকে লিখি।

জ্যাঠাইমা বলিলেন,—তা লেখ ; কিন্তু এদের মেয়েটিকে দেখে গেলে ভাল হ'ত। কথাবার্ত্তাতেও ত কিছু দিন কেটে যাবে।

আমি বলিলাম,—তা হোক। তুমি আগে সুস্থ হয়ে ফিরে এসো। ও-সব হাঙ্গামা এখন থাক।—কথাটা বলিয়াই আমি বই লইয়া উঠিয়া চলিলাম।—এইখানে বলিয়া রাখা ভাল, বিবাহে আমার আপত্তিও ছিল না, আবার সে জন্য ব্যস্ততাও ছিল না। আজ-কাল সাধারণতঃ যে কারণে অধিক বয়সে বিবাহ হইতেছে, অর্থাৎ অন্নচিন্তা, আমার সে চিন্তা ছিল না। জ্যাঠামশায় আমার সংসার-পালনের উপযুক্ত সংস্থান রাখিয়া গিয়াছিলেন। পিতৃমাতৃহীন আমি—নিঃসন্তান জ্যাঠার একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র, তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

২

২রা আশ্বিন যাত্রা করা হইল।

জ্যাঠাইমা প্রথমটা পথের কষ্টে অধিকতর দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেও, আট-দশ দিনের মধ্যেই তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখা গেল।

দেওঘরে আসায় প্রথম হইতেই আমি ক্ষুব্ধ হইয়াছিলাম। প্রতি-দিন যখন নরনারী ও বালক-বালিকার দল বাড়ীর সম্মুখস্থ পথ কলহাস্যে মুখরিত করিয়া চলিয়া যাইত, তখন আমি আরও গভীর মনোযোগের সহিত আমার কৃষিবিজ্ঞানের গ্রন্থগুলি অধ্যয়নে রত হইতাম। গত বৎসর আমি পূষা হইতে কৃষিবিদ্যায় দক্ষতার ছাড় লইয়া বাহির হইয়াছি।

জ্যাঠাইমা ইতিমধ্যে একটু-আধটু বাহির হইতে আরম্ভ করিয়া-ছিলেন। এক দিন আমায় বলিলেন,—পাশের বাড়ীর ভদ্রলোকটির সঙ্গে তোর আলাপ হয়েছে ?

আমি বাড়ীর বাহিরে যাই না. কাহারও সহিত আলাপও করি না ;—বলিলাম,—না।

জ্যাঠাইমা আমাকে বই লইয়া ঘরের কোণে অষ্টপ্রহর বসিয়া থাকিবার জন্ম গুরুগম্ভীর অনুযোগ করিয়া অবশেষে বলিলেন,— আমি আজ ওদের বাড়ী গিয়েছিলুম।

আমি সংক্ষেপে বলিলাম,—খুব ভাল খবর।

জ্যাঠাইমা প্রতিবেশীদের গল্প করিতে লাগিলেন। গৃহকর্ত্রী রুগ্না, এখানে আজ তিন-চার মাস হইল বায়ু-পরিবর্ত্তনে আসিয়াছেন। রোগিণী নিঃসন্তান। বাড়ীতে বিবাহযোগ্যা একটি পিতৃমাতৃহীনা সহোদরা আছে ; মেয়েটি সংসার দেখে, রোগীর পরিচর্য্যাদি সব করে, বড় লক্ষ্মী মেয়ে ইত্যাদি। আমি একটু সতর্ক হইলাম। প্রথমেই শুনিয়াছি স্বজাতি, তাহার পর এই দফাওয়ারি গুণ-বর্ণনা! বোধ হয়, স্বঘরের এমন কোন কুমারীই নাই—যাহার পরিচয় পাইবার পর জ্যাঠাইমা আমার সহিত তাহাকে গাঁথিতে চেষ্টা করেন নাই! কিন্তু অবশেষে তাঁর মনোমত হয় না। কেহ বামনের মত 'বেঁটে', কেহ 'লম্বা তালগাছ,' কেহ 'রং-মাটো', কেহ 'বিড়াল-চোখো'—এইরূপ একটা না একটা খুঁৎ বাহির হয়। জ্যাঠাইমা বোধ হয় ঐ রকমই একটা উদ্দেশ্য লইয়া বিদেশে যাত্রা করিয়াছিলেন।

জ্যাঠাইমা আমাকে নির্ব্বাক্ ও নিস্পৃহ দেখিয়াও নিরুৎসাহ না হইয়া বলিলেন,—মুখখানি বেশ ঢলঢলে, চুলটিও ভাল, তবে রংটি মাটো, আর বড্ড যেন ঢেঙ্গা!

বুঝিলাম, মেয়েটি তাঁহার নিকট রূপের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। হাসি পাইল, ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করি,—তোমার বধূ হইবার জন্য কি তিলোত্তমা স্বয়ং এই বঙ্গভূমিতে অবতীর্ণা হইবেন ?

পরদিন ছাদে উঠিতেই এই 'রংমাটো' মেয়েটিকে অকস্মাৎ দেখিতে পাইলাম। পাশের বাড়ীখানি একতলা ; ছাদে উঠিলে তাহার অনেকটাই দেখা যায়। সামনের খোলা জানলাটার কাছে দাঁড়াইয়া মেয়েটি ছানার পুঁটুলী বাঁধিতেছিল। এইটিই যে জ্যাঠাইমার বর্ণিত মেয়ে, তাহাতে আমার সন্দেহ রহিল না।

হাঁ, জ্যাঠাইমার কথা সত্য, বর্ণ তাহার উজ্জ্বল শ্যাম, যদিও মুখের একপাশ দেখা যাইতেছিল, তাহাই দেখিয়া মনে হইল কুরূপা নয়। সদ্যঃস্নাত ঢেউতোলা চুলগুলিতে পিঠ ঢাকিয়া গিয়াছিল। পরিধানে একখানি বাদামী রংয়ের শাড়ী।

জ্যাঠাইমার ভালো না লাগিলেও আমি মুগ্ধ হইলাম। এই রবিকরোজ্জল শরৎ-প্রাতের মতই তাহার রূপ বেশ স্নিগ্ধ মনে হইল। সরিয়া না গিয়া আমি মুগ্ধচিত্তে সেখানেই দাঁড়াইয়া রহিলাম।

সহসা দেখিলাম, মেয়েটি এক দিকে চাহিয়া চকিত হইয়া উঠিয়াছে। পরক্ষণেই দেখিলাম, সেই দিক্ দিয়া একটি বছর-পঁয়ত্রিশের ভদ্রলোক আসিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইলেন। দেখিয়া চিনিলাম, গৃহস্বামী স্বয়ং। কিন্তু ব্যাপারটা ভাল বুঝিলাম না! জ্যাঠাইমার কথামত মেয়েটি উহারই অনূঢ়া শ্যালিকা।—তবে ?

দেখিলাম, মেয়েটি সরিয়া গিয়া জানালায় ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়াছে। কথা শুনিতে পাইলাম না ; কিন্তু বাক্‌বিতণ্ডা বুঝিতে পারিলাম।

পুরুষটি তাহার একখানি হাত ধরিতে উদ্যত হইতেই আমার দিকে মেয়েটির নজর পড়িল। সে চক্ষুর নিমেষে জানলাটা বন্ধ করিয়া দিল।

ইহার পর কি ঘটিল, চর্ম্মচক্ষে তাহা না দেখিলেও, মনশ্চক্ষে দেখিতে পাইলাম! বুঝিলাম, ভদ্রলোক হিসাবী,—রুগ্না স্ত্রীর মৃত্যু পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে চাহেন না ; তাহার পূর্ব্বেই পাকা বন্দোবস্ত করিয়া রাখিতে চান! মেয়েরা বলেন—লক্ষ্মীর হাঁড়ি কি বাড়ন্ত রাখিতে আছে ?

৩

পরদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাগানে বসিয়া পড়িতেছিলাম। অন্ধকার গাঢ় হইলে যখন আর অক্ষর দেখা গেল না, তখন উঠিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। ঘুরিতে ঘুরিতে অন্যমনস্ক ভাবে প্রতিবেশী ও আমাদের বাগানের বেড়ার ধারে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। সহসা একটা বাতায়নবিচ্ছুরিত আলোক-রেখার প্রতি দৃষ্টি পড়িল। দেখিলাম, সেই মেয়েটি ঘরে দাঁড়াইয়া কি করিতেছে। দুই-এক বার তাহাকে আঁচল তুলিয়া চোখ মুছিতে দেখিলাম ; বুঝিলাম, মেয়েটি কাঁদিতেছে!

বিস্মিত ভাবে চাহিয়া ছিলাম, সহসা দেখিলাম, সেখানে এক পুরুষ-মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। চিনিতে পারিলাম—সকালের সেই তিনি—সেই ভগিনীপতি! মেয়েটি চমকিয়া দুই পা পিছাইয়া গেল। অবশ্য, দূর হইতে আমি তাহাদের মুখভাব দেখিতে পাইলাম না ; কিন্তু আমার দৃঢ় ধারণা হইল, মেয়েটি উৎপীড়িতা।

করুণায় আমার চিত্ত আর্দ্র হইয়া উঠিল। কথাবার্ত্তা বোঝা না গেলেও মনে হইল, মেয়েটি মিনতি করিয়া কিছু বলিতেছে। সহসা সে বসিয়া পড়িল, দুই হাত বাড়াইয়া লোকটার পা জড়াইয়া ধরিল!

চক্ষুর সম্মুখে মূক অভিনয় দেখিতেছি,—কিন্তু মর্ম্মান্তিক অভিনয়। আমার পৌরুষ যেন ক্ষিপ্তপ্রায় হইল ; কিন্তু কি করিতে পারি আমি ? সহসা মেয়েটি উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল। আমিও বাড়ী ফিরিলাম। উৎপীড়িতা মেয়েটির চিন্তা আমায় ব্যাকুল করিয়া তুলিল। রাত্রে অর্দ্ধজাগ্রত ভাবে তাহাকে দেখিতে লাগিলাম। নানারূপ অসংলগ্ন স্বপ্নের মধ্যে রাত্রি কাটিয়া গেল। প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গেই যেন স্বস্তির নিশ্বাস পড়িল ; মনে হইল, সমস্যা সমাধান হইয়া গিয়াছে। মেয়েটিকে সহজেই মুক্তি দেওয়া যায়,—আমি উহাকে বিবাহ করিয়া সেই অভিভাবকবেশী দৈত্যের কবল হইতে উদ্ধার করিতে পারি।

জ্যাঠাইমাকে এক সময় বলিলাম,—পাশের বাড়ীর যে মেয়েটির কথা সে-দিন তুমি বলছিলে, সে কি তোমার পছন্দ নয় ?—নিজের বিবাহের সম্বন্ধে ইহার পূর্ব্বে খোলাখুলি ভাবে কখনও জ্যাঠাইমার সহিত আলোচনা করি নাই, তাই লজ্জা করিতে লাগিল।

জ্যাঠাইমা কিছু বিস্মিত হইয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন; তাহার পর বলিলেন,—তুই চিনুকে দেখেছিস্ তাহলে?

চিনু? কোন্ নামের অপভ্রংশ? মাথা হেঁট করিয়া জানাইলাম,—হাঁ।

জ্যাঠাইমা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন,—তুইও বাপ-মা হারা, চিনুও তাই। কোন পক্ষেরই আদর-যত্নের লোক নেই, তা মনটা খুঁত-খুঁত করছে; তাছাড়া মেয়েটি ফর্সাও ত নয়!

বুঝিলাম, সুরটা বাঁকা! আমি আর কিছু বলিলাম না; ভাবিলাম, আজ এই পর্য্যন্তই থাক্।

পরদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বাগানে বেড়াইতেছিলাম; দেখি, সেই মেয়েটি কতকগুলা বেদানার খোসা লইয়া বাগানের এক পাশে—যেখানে আবর্জ্জনা ফেলা হয়, সেই দিকে যাইতেছে।

আজ দিনের আলোয় মেয়েটিকে ভালো করিয়া দেখিলাম। তাহার অনুপম শ্যামশ্রী সত্যই মনোমুগ্ধকর। আমার দুই চক্ষু যেন জুড়াইয়া গেল! মনে হইল, কাজ নাই আমার শ্বেতা অথবা গৌরীতে; এই নীলোৎপল আমার বক্ষ শোভা করিয়া থাকিলেই আমি পরিতৃপ্ত হইব।

আবার সেই ভগিনীপতির আবির্ভাব! আমি শঙ্কিত দৃষ্টি তাহার উপর নিবদ্ধ করিবার অবসর পাইলাম না। লোকটা বিদ্যুদ্‌গতিতে পিছন হইতে মেয়েটিকে জড়াইয়া ধরিল! চমকিয়া মেয়েটি পিছনে চাহিল, তাহার পর তাহার বাহুবন্ধন হইতে মুক্তি পাইবার বিফল প্রয়াস করিতে লাগিল।

আমি যে কি করিব, তখন ভাবিয়া স্থির করিতে পারি নাই। সহসা আমার দিকে মেয়েটির চোখ পড়িয়া গেল; সে আর্ত্তকণ্ঠে বলিল,—আমায় রক্ষা করুন!

আর্ত্তনারীর কাতর প্রার্থনা! মুহূর্ত্তের মধ্যে আমি পাঁচীল ডিঙ্গাইয়া ছুটিয়া গেলাম, এবং লোকটার নাকের ডগায় বিরাশী সিক্কার এক ঘুসি মারিয়া মেয়েটিকে বলিলাম,—পাঁচীল ডিঙ্গিয়ে আমাদের বাড়ী পালিয়ে যান। সেখানে আমার জ্যাঠাইমা আছেন।

লোকটাকে 'উত্তম-মধ্যম' দিয়া আমিও লাফাইয়া বাগানে আসিলাম। দেখি, মেয়েটি বাড়ী যায় নাই, সেখানেই একটা গাছে ঠেস দিয়া বসিয়া চোখ বুজিয়া হাঁপাইতেছে। আমার পায়ের শব্দে চোখ মেলিয়া চাহিল, কাতর কণ্ঠে বলিল,—এখন আমি কি করব? কোথায় যাব?

আমি দ্বিধা না করিয়া তাহার হাত ধরিয়া তুলিলাম; অভয় দিয়া বলিলাম,—কিছু ভয় নেই। আসুন, আমার জ্যাঠাইমার কাছে নিয়ে যাই।

বাড়ী আসিতেই আমার সহিত চিনুকে দেখিয়া জ্যাঠাইমা এক মুহূর্ত্ত অবাক্ হইয়া আমার দিকে চাহিয়াই সভয়ে বলিলেন,—গায়ে এত রক্ত কেন শিশির?

শোন বলছি।—বলিয়া আমি তাঁহাকে এক দিকে ডাকিয়া-লইয়া দুই-চারি কথায় সমস্তই বুঝাইয়া দিলাম। কথা শেষ করিয়া জ্যাঠাইমার মুখপানে চাহিয়া ভীত হইলাম; বলিলাম,—কি হ'ল তোমার জ্যাঠাইমা! তুমি অমন হয়ে গেলে কেন? তুমি কি আমার ওপর রাগ করলে?

জ্যাঠাইমা অনেক দিন সম্পত্তি পরিচালনা করিয়াছেন,—আইন সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ নহেন। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—তোর ওপর রাগ করবার ত কিছু নেই বাবা! মানুষ হয়ে মানুষের কাজ না করলেই অন্যায়; কিন্তু আমি যে জেলের দরজা খোলা দেখতে পাচ্ছি শিশির! তুমি অনধিকার প্রবেশ করেছ, মারপিট করেছ, আর তার অভিভাবকত্বের গণ্ডীর ভেতর থেকে নাবালক কুমারী মেয়ে বের করে এনেছ!

মনটা দমিয়া গেল, মিনিট-খানেক নীরব থাকিয়া বলিলাম,—যা ভাগ্যে আছে হবে জ্যাঠাইমা! মন খারাপ করে কি হবে? ওকে দেখ।

চিন্ময়ী লজ্জায় অর্দ্ধমৃতার মত একটা থামের আড়ালে দাঁড়াইয়া ছিল। জ্যাঠাইমা আগাইয়া-গিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন,—ভয় কি মা! তুমি আমার কাছে থাক; তোমায় কিছু ভাবতে হবে না। ইস্, হাতখানা যেন বরফ হয়ে গেছে!—বলিয়া জ্যাঠাইমা চিন্ময়ীকে হাত ধরিয়া লইয়া আসিলেন।

৪

পরদিন ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল জ্যাঠাইমার আহ্বানে। চোখ মেলিতেই দেখিলাম,—রোরুদ্যমানা জ্যাঠাইমার পাশে চিনু দাঁড়াইয়া আছে। চোখোচোখি হইতেই সে তাহার সজল দৃষ্টি অবনত করিল।

জ্যাঠাইমা জানাইলেন, পুলিশ আসিয়া আমায় খুঁজিতেছে। চোখের সামনেটা যেন অন্ধকার হইয়া আসিল; কারাগার! প্রারব্ধে কি শেষে এই ছিল? কিন্তু সম্মুখবর্ত্তিনী নারী-দু'টির ভয়কাতর মুখ দেখিয়া মনে দৃঢ়তা সঞ্চয় করিলাম; বলিলাম,—ভয় কি জ্যাঠাইমা, চল, যাচ্ছি।—উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম, যদি জেল হয়ই, তাহলে আর দেশে যেও না। তুমি এখানেই থেক। আর—আর বলিয়া মূর্চ্ছাবসন্না তরুণীর প্রতি চাহিয়া চমকিয়া-উঠিয়া বলিলাম,—ওকে ধর, ধর জ্যাঠাইমা!

জ্যাঠাইমা তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া শোয়াইয়া দিলেন আমার বিছানায়। আমি একবার তাহার মুখপানে চাহিয়া বলিলাম,—যদি ও স্বীকার করে, তবে তোমার কাছেই রেখ। স্বেচ্ছায় ও আমাদের বাড়ী এসেছে, যেন এ বাড়ীতেই থাকে।

বাহির হইতে পুলিশের অসহিষ্ণু আহ্বান আসিতেছিল। আমি বাহিরে আসিতেই পুলিশ ও সেই বর্ব্বরটাকে দেখিতে পাইলাম। লোকটা চীৎকার করিয়া আমায় গালাগালি দিয়া উঠিল। পুলিশ আমার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ, শুনাইয়া আমায় গ্রেপ্তার করিল। সার্চ্চ-ওয়ারেণ্ট ছিল; বলিলাম,—সার্চ্চের আবশ্যক নেই, ওই দেখুন, আমার জ্যাঠাইমার পাশেই মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে।—সকলে সে-দিকে চোখ ফিরাইল। লোকটা পুনরায় চীৎকার করিয়া বলিল, দেখুন, দেখুন, ওই আমার শালী। কিন্তু ওর গায়ের গয়নাগুলা কি হল?

দারোগা তাহার কথায় বিশেষ কান দিল না; চিন্ময়ীকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি আমার কথার উত্তর দিন,—আপনার অভিভাবকের কাছে আপনি ফিরে যেতে চান?

চিন্ময়ী সভয়ে জ্যাঠাইমাকে জড়াইয়া ধরিয়া ভীত স্বরে বলিল,—না না, আমি যাব না!—অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর চিন্ময়ীকে জ্যাঠাই-মার কাছে রাখিয়া দারোগা আমায় লইয়া চলিল।

আমি জ্যাঠাইমার পদধূলি লইয়া বলিলাম,—তুমি কাতর হয়ো না জ্যাঠাইমা, তাহলে আমিও বেশী অস্থির হবো। চিন্ময়ীকে বলিলাম,—জ্যাঠাইমার মনে বড্ড আঘাত লাগবে, আপনি ওঁকে দেখবেন।

চিন্ময়ীর মুখ একেবারে বিবর্ণ—পাংশু হইয়া গিয়াছিল ; সে উত্তর দিল না, শুধু আমার মুখের উপর তাহার ভীত হরিণীর মত ত্রস্ত চক্ষু মুহূর্ত্তের জন্য সন্নিবিষ্ট করিল।

এক মাস হাজত বাস করিয়া অবশেষে মকদ্দমা উঠিল। চিনু সমস্ত কথা বলিল। উহাদের বাড়ীর পুরান ঝি অনেক দিন হইতে বাবুর মতিগতি লক্ষ্য করিতেছিল ; সে-ও চিনুর জবাবের সমর্থন করিল। চিনুর দিদি উঠিতে পারেন না, বাড়ী বসিয়া তাঁহার এজাহার লওয়া হইল। তিনি বলিলেন, আমি হিন্দুর মেয়ে, আসন্ন কালে আর স্বামি নিন্দা আমায় করতে বলবেন না। চিন্ময়ী যে আমার বাড়ী ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছে, এর জন্যে ভগবানকে ধন্যবাদ দিই। শিশির বাবুর কাছে আমি চিরঋণী,—তিনি চিন্ময়ীকে উদ্ধার করেছেন।

চিন্ময়ীর ভগিনীপতির কথার সামঞ্জস্য ছিল না ; কিন্তু আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ ছিল, সে জন্য আইন অনুসারে শাস্তি লইতে আমি বাধ্য। সকল অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বিচারক আমার প্রতি এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন।

৫

জেলের মধ্যে বেশী সময় অসুস্থতাতেই কাটিল। যখন মুক্তি পাইলাম, তখন আমি খুব দুর্ব্বল। নায়েব নবীন আমায় লইতে আসিয়াছিল, আমি জেলে যাওয়া অবধি জ্যাঠাইমা ও চিন্ময়ীর তত্ত্বাবধানের জন্য সে দেওঘরে ছিল ; কিন্তু জ্যাঠাইমা বা চিন্ময়ীকে তাহার সাহত আসিতে না দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইলাম ; বলিলাম,—তাঁরা কেউ আসেননি যে নবীন ?

নবীন বলিল,—মা-ঠাকরুণের পরশু থেকে জ্বর হয়েছে ; দিদি-ঠাকরুণ তাঁকে ফেলে কি করে আসবেন ?

মোটরে উঠিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ী আসিলাম। জ্যাঠাইমার প্রবল জ্বর থাকা সত্ত্বেও নানারূপ মানসিকের পূজার ব্যবস্থা করিয়া বসিয়াছিলেন। আমাকে বুকের ভিতর জড়াইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সেইখানে বসিয়া রহিলাম ; পূজা-পার্ব্বণের পালা চুকিলে আমাকে জল খাওয়াইয়া তবে জ্যাঠাইমা উঠিতে দিলেন।

আমার ঘরে ঢুকিতে যাইব,—দুয়ারের পাশে চিন্ময়ীকে দেখিয়া দাঁড়াইলাম। সে মুখ না তুলিয়াই গলায় অঞ্চল দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া আমায় প্রণাম করিল। জেলের মধ্যেও দেখা হইয়াছে, জ্যাঠাইমায়ের সঙ্গে সে-ও থাকিত, কথা বড় বলি নাই। তাই আজ প্রণতা এই কিশোরীর অভিবাদন কেমন করিয়া প্রত্যর্পণ করিব ভাবিয়া না পাইয়া নীরব রহিলাম। একটুখানি নিস্তব্ধ থাকিয়া সে মৃদুপদ-বিক্ষেপে চলিয়া গেল।

জ্যাঠাইমার অসুখ শীঘ্র সারিল না, তিনি ভুগিতে লাগিলেন। চিন্ময়ী একাই তাঁহার সেবা করিতে লাগিল, আমার সাহায্য প্রত্যাশা করিল না। আমি এক দিন চক্ষুলজ্জার খাতিরে বলিলাম,—একা আপনি আর কত দিন পারবেন ? আমাকেও কতকটা সময় ওঁর কাছে থাকতে দিন।

চিন্ময়ী ক্ষণকাল নতমুখে থাকিয়া বলিল,—আপনি থাকুন না, কিন্তু সেবা করিবার মত শরীর এখন আপনার নয়। দুর্ব্বল শরীরে রোগীর কাছে না থাকাই ভাল।

হঠাৎ এক দিন রাত্রে জ্যাঠাইমায়ের নাড়ীর গতি কেমন খারাপ হইয়া গেল, এবং সর্ব্বাঙ্গ ঘামিতে লাগিল ! চিন্ময়ী ভয় পাইয়া আমাকে ডাকিয়া লইয়া গেল। ডাক্তার আসিয়া ইনজেকশন দিয়া অবস্থা আয়ত্তে আনিলেন বটে, কিন্তু বলিলেন, ছেলেমানুষ মেয়েটির ওপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকবেন না শিশির বাবু, আজ খুব সামলে নেওয়া গেছে ; কিন্তু যদি মেয়েটি ঘুমিয়ে পড়ত, তাহলে কি অবস্থা হোত ভাবুন দেখি ! – ভাবিতেও শিহরিয়া উঠিলাম।

ডাক্তার বলিলেন,—যদি বলেন, নার্স দিতে পারি। বেশি চার্জ্জ নয়, ছয় টাকা রাত্রি। বলিলাম,—টাকার জন্যে নয়, ডাক্তার বাবু ! হিন্দুর ঘরের বিধবা বুঝতেই ত পাচ্ছেন, নার্সের হাতের জল খেতে চাইবেন না ; আর ছোঁয়াছুঁয়ির হাঙ্গামাও বাড়বে। বেশ, আমিই থাকব।

চিন্ময়ী এ প্রস্তাব একেবারে উড়াইয়া দিল, বলিল,—রাত-জাগা আপনার চলবে না। আমার ওপর একেবারে ভরসা না করতে পারেন, পাশের ঘরে—মায়ের দরজা খুলে রেখে শোবেন।

জ্যাঠাইমাও ঘোর আপত্তি করিলেন। অবশেষে জ্যাঠাইমায়ের ঘরেই একপাশে একখানা ক্যাম্প-খাট পাতিয়া চিন্ময়ী আমার শয়নের বন্দোবস্ত করিয়া দিল ; কিন্তু তাহাতে তাহার কাজ বাড়িল ! সবে শীত পড়িয়াছে, প্রথম রাত্রে একখানা র‍্যাপার গায়ে দিলেই যথেষ্ট মনে হয় ; ভোর রাত্রে শীত করে। সকালে উঠিয়া দেখিতাম, চিন্ময়ী আমার গায়ে একখানি কম্বল ঢাকা দিয়া শিয়রের জানলাটা বন্ধ করিয়া গিয়াছে।

এক দিন ভোর-রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে দেখিলাম, চিন্ময়ী জ্যাঠাইমায়ের বিছানায় বসিয়া ঢুলিতেছে। মমতা বোধ হইল। আস্তে আস্তে নিকটে গিয়া মাথায় হাত রাখিতেই সে চমকিয়া তাহার নিদ্রালস চক্ষু তুলিল।

আমি বলিলাম,—আপনি একটু শুয়ে পড়ুন, আমি বসছি। চারটে বেজে গেছে।

চিন্ময়ী ক্লান্ত কণ্ঠে বলিল,—থাকগে, কোথায় আর শোব ? অর্থাৎ জ্যাঠাইমার পাশে যেখানে সে শোয়, সেখানে আমি বসিয়াছিলাম।

আমি বলিলাম,—আমার বিছানাটা খালি রয়েছে।—ইহার পর কথাটা শেষ করিতে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল।

চিন্ময়ী নিরুত্তরে উঠিয়া গেল, এবং আমার গায়ের কম্বলখানা টানিয়া লইয়া শুইয়া পড়িল।

আমি তাহার সুপ্ত মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিলাম।

পাঠক-পাঠিকা যেন ইহার পর একটা নাটকীয় পরিণতির আশা করিবেন না। যেহেতু, আমি পল্লী-অঞ্চলে বর্দ্ধিত হইয়াছি, তথা-কথিত প্রগতির সহিত চাক্ষুষ আলাপ হয় নাই। তা ছাড়া, মুখচোরা বলিয়া বন্ধুমহলে আমার একটু অপবাদও ছিল ; কাজেই নিদ্রিতা চিন্ময়ী বিনা বাধায় ঘুমাইতে লাগিল। আমার উত্তপ্ত নিশ্বাস তাহার ললাট চুম্বন করিয়া তাহাকে সন্ত্রস্ত অথবা পুলকিত কিছুই করিল না ; আমি শুধু তাহার মুখখানির দিকে নিষ্পলক নেত্রে চাহিয়া রহিলাম।

জ্যাঠাইমা ক্রমে সুস্থ হইয়া অন্নপথ্য করিলেন। এই অন্নপথ্য লইয়া আবার একটু গোল বাধিল। জ্যাঠাইমা স্বপাক আহার করিতেন। সমস্যা হইল, কাহার হাতে তিনি খাইবেন ? ডাক্তার

পথ্যের ব্যবস্থা দিলেও দুই দিন এই সমস্যার কিছু মীমাংসা হইল না বলিয়া তিনি পথ্য করিলেন না।

চিন্ময়ী এক সময় আমাকে বলিল,—মা'কে নিয়ে কি করব? তিনি নিজে রেঁধে খেতে গেলে হয় ত অজ্ঞান-হয়ে পড়বেন; অথচ আমায় বলছেন, আমায় ধরাধরি করে বসিয়ে দে, আমি দু'টি ফুটিয়ে নেব।

শিহরিয়া বলিলাম,—সর্ব্বনাশ! না, না, তা কি হয়? আচ্ছা, আমি যাচ্ছি, দেখি কি করতে পারি।

জ্যাঠাইমাকে বলিলাম - আমি স্নান করে শুদ্ধ কাপড় পরে তোমার সামনে বসে রান্না করব, হবে না?

জ্যাঠাইমা হাসিয়া বলিলেন,—যা, যা! তোকে আর জ্যাঠামী করতে হবে না। তোর বাপ-জ্যাঠা কখন হাঁড়ির কানা ছুঁলে না, তুই এসেছিস রেঁধে খাওয়াতে! আগে মরি, তার পর চাল-কলা চটকে খেতে দিস্।

রাগ করিয়া বলিলাম,—বেঁচে থাকতে খেতে পারছো না, কিন্তু মরে খাবার লোভ আছে ত খুব! ও-সব হবে না, আমি রাঁধব।

জ্যাঠাইমা ধমক দিয়া বলিলেন,—জ্বালাসনে শিশির! ব্যাটাছেলে আবার রাঁধবি কি?—চিন্ময়ী বোধ হয় রহস্যচ্ছলেই বলিল,—বেশ ত মা, আমি ত মেয়ে, তবে আমিই রাঁধি?

আশ্চর্য্য! জ্যাঠাইমা রাগিলেন না, হাসিমুখে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, তুই হাড়ি, ডোম, না মুদ্দোফরাস—কার মেয়ে কিছুই জানি নে, তোর হাতে খাব?

চিন্ময়ী বলিল,—আমার বাপের পরিচয়ে কাজ কি মা! এখন ত আমি আপনার মেয়ে: তাই মনে করেই খান। বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

জ্যাঠাইমা হাসিয়া বলিলেন,—তবে তাই দে। ভাল হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে ফেলব। চিন্ময়ীর মুখখানি হর্ষপ্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। বলিল,—তা করবেন তখন, এখন ত খান।

আমি আশ্বস্ত চিত্তে মনে মনে চিন্ময়ীর কর্ম্মকুশলতার সুখ্যাতি করিতে করিতে চলিয়া গেলাম।

এই ভাবে প্রায় মাসখানেক কাটিল, জ্যাঠাইমার শরীর সারিতে অত্যন্ত বিলম্ব হইতে লাগিল। বৃদ্ধ বয়সের পীড়া, তিনি খুবই নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিলেন। চিন্ময়ী তাঁহার সেবাতেই নিমগ্ন থাকিত, অবসর সময়ে আসিয়া আমারও কিছু কিছু তত্ত্বাবধান করিত। সে-ও নীরবে কাজ করিত, আমিও নির্ব্বাক্ থাকিতাম; উপযাচক হইয়া তাহার সহিত কথা কহিতে সাহস হইত না, কি জানি, সে কি ভাবিবে? বালিকা হইলেও তাহার অভিজ্ঞতা বড় তিক্ত। কিছু দিন হইতে তাহাকে বড় শুষ্ক মলিন দেখিতেছিলাম; বুঝিলাম, দীর্ঘ দিন জ্যাঠাইমার সেবা করিতে করিতে সে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিব ভাবিতেছি, সহসা এক দিন চিন্ময়ী নিজেই বলিল,—আপনার সঙ্গে আমার একটু দরকারী কথা আছে, এখন শোনবার সময় হবে কি?

আপ্যায়িত হইয়া বলিলাম,—নিশ্চয়ই। আপনি বলুন না। চেষ্টা করিয়াও তুমি শব্দটা মুখ দিয়া উচ্চারণ করিতে-পারিলাম না।

চিন্ময়ী বসিল না, দাঁড়াইয়া থাকিয়াই মিনিট-খানেক পরে বলিল, —জেলে যাবার আগে আপনি মাকে আমায় দেখতে আদেশ করে গিয়েছিলেন।—চিন্ময়ী আবার একটু থামিল. তাহার পর পূর্ব্বাপেক্ষা মৃদু স্বরে বলিল,—এবার ত আপনি এসেছেন,—আমায় বিদায় নিতে অনুমতি দেবেন কি?

আমি চমকিয়া বলিলাম,—কোথায় যাবে? পাশের বাড়ীটা খালি পড়িয়াছিল, চিন্ময়ীর দিদির মৃত্যু হইয়াছিল, এবং বর্ব্বরটা দেশে ফিরিয়া গিয়াছিল। ঐ এক দিদি ব্যতীত চিন্ময়ীর দ্বিতীয় আশ্রয় ছিল না বলিয়াই জানিতাম।

চিন্ময়ী নতমুখে বলিল,—আমি পাটনায় একটা মেয়ে-স্কুলে শিল্প-কাজ শেখাবার দরখাস্ত করেছিলুম; মঞ্জুর হয়েছে।

আমি এমন হতভম্ব হইয়া গেলাম যে, কিছুই বলিতে পারিলাম না। একটু পরে বলিলাম,—জ্যাঠাইমা কি বলেন?

চিন্ময়ী বলিল, তাঁকে এখনও বলিনি।—অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল,—আপনি কি বলেন?

রাগে, অভিমানে আমার বুকের ভিতর জ্বালা করিতেছিল। যাহার জন্য বিনাপরাধে আমি দীর্ঘকাল জেল-খাটিয়া আসিলাম, সে আমাকে ছাড়িয়া যাইবার জন্য ভিতরে ভিতরে এত কাণ্ড করিতেছিল! কি অকৃতজ্ঞ! চিন্ময়ীর প্রতি বিতৃষ্ণায় মন ভরিয়া উঠিল; ঝাঁঝাল স্বরে বলিলাম,—আমার অনুমতি নিয়ে যখন আবেদন করেননি, তখন আমার মত জিজ্ঞাসার কি কোন প্রয়োজন আছে? আপনি ত আর আমার অধীন নন।

চিন্ময়ী নখে নখ খুঁটিতেছিল; সাত-আট মিনিট নিস্তব্ধ থাকিয়া সে ধীরে ধীরে বলিল,—তাহলে আমি যেতে পারি?

আমি উপেক্ষাভরে রূঢ় স্বরে বলিলাম,—নিশ্চয়ই; স্বচ্ছন্দে পারেন।

আমার রূঢ় কণ্ঠস্বরে বিস্মিত হইয়াই বোধ হয় চিন্ময়ী একবার তাহার ভ্রমর-কৃষ্ণ চক্ষুতারকা আমার মুখের উপর সন্নিবদ্ধ করিল; তাহার পর আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে জ্যাঠাইমা বলিলেন,—হ্যাঁ রে! চিনু যে চলে যেতে চাইছে?

আমি প্রবল উষ্মার সহিত বলিলাম,—তা যান না; চিরজীবনের ভার ত আমরা নিইনি।

জ্যাঠাইমা 'রংমাটোর' দুঃখ ভুলিয়া গিয়াছিলেন; বলিলেন,—এত দিন রয়েছে, মায়া পড়ে গেছে। বড় লক্ষ্মী মেয়ে, ছাড়তে ইচ্ছে কচ্ছে না। হাঁ রে, তখন ত তোর মত ছিল,—

আমি উঠিয়া-দাঁড়াইয়া অত্যন্ত রুষ্ট ভাবে বলিলাম,—হাঁ, তখন ছিল, এখন নেই। তুমি মিছে মায়ার দোহাই দিয়ো না। বাংলা দেশে মেয়ের অভাব নেই।

জ্যাঠাইমা ইঙ্গিতে জানাইলেন, চুপ চুপ, সে নিকটেই কোথাও আছে!

থাকে থাকুক। রাগে আমার আপাদ-মস্তক জ্বলিতেছিল; আমি সেখান হইতে উঠিয়া আসিলাম। ছিঃ, চিন্ময়ী এমন নিষ্ঠুর! এত অকৃতজ্ঞ!

তিন

পরদিন বেড়াইতে বাহির হইয়া পুরাতন বন্ধু শরতের সহিত দেখা হইল, জাপানী বোমার ভয়ে অনেকের মত সপরিবারে কলিকাতা হইতে পলাইয়া আসিয়াছে। কথায় কথায় অনেক বিলম্ব হইয়া গেল; বাড়ী ফিরিতে বেলা পড়িয়া আসিল। বাড়ী ফিরিয়া শুনিলাম,

চিন্ময়ী চলিয়া গিয়াছে। শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম! আমার নিকট বিদায় লইয়া যাইবার পর্য্যন্ত তাহার বিলম্ব সহিল না! বিচিত্র প্রকৃতি বটে! এই অকৃতজ্ঞ, মনুষ্যত্ববর্জ্জিত হৃদয়হীনার জন্ম জেল খাটিয়া আসিলাম—ভাবিয়া দুঃখ হইতে লাগিল। তখন যদি জানিতাম, সে আমার সহানুভূতিরও অযোগ্যা! মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম।—আমি কাঞ্চন ভাবিয়া কাচ বরণ করিতে যাইতে-ছিলাম, সময় থাকিতে তিনি আমার প্রজ্ঞানেত্র ফুটাইয়া দিয়াছেন। আমি মুক্তিলাভ করিয়াছি!

পরদিন ভোরে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে বিছানায় শুইয়া আলস্য ভাঙ্গিতে গিয়া হঠাৎ বালিশের নীচে কি একটা খস-খস শব্দ হইল। বালিশের নিম্নে চাদরের তলায় একখানি খাম পাইলাম। বিস্মিত হইলাম! তবে কি চিন্ময়ী আমায় পত্র দিয়া গিয়াছে? তখনও উষালোক পরিস্ফুট হয় নাই। গায়ের লেপখানা পায়ের নীচে ঠেলিয়া-ফেলিয়া তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিলাম। খামের উপর অপরিচিত অক্ষরে আমার নামটি-মাত্র লেখা! ক্ষিপ্র হস্তে খাম ছিঁড়িয়া পত্রখানা বাহির করিলাম। সম্বোধন দেখিয়া চমকিয়া উঠিলাম। চিন্ময়ীর পত্রই বটে, সে লিখিয়াছে,—

প্রিয়তম! আমি চলিলাম, বাড়ী ফিরিয়া আমাকে না দেখিয়া হয় ত তুমি বিস্মিত হইবে এবং আমাকে অকৃতজ্ঞ ভাবিবে, কিন্তু যে কারণে তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার আশ্রয় ছাড়িয়া যাইতেছি, তাহা অকৃতজ্ঞতা নহে। তোমার নিকট হইতে সহজে এবং শান্ত ভাবে চিরবিদায় লওয়া যে আমার পক্ষে কত কঠিন, তাহা একমাত্র আমার অন্তর্যামীই জানেন;—তাই সেই দায় এড়াইয়াই চলিয়া যাইতেছি।

জেলে যাইবার পূর্ব্বক্ষণে আমার মনে যে আশার বীজ বপন করিয়াছিলে, বুদ্ধিহীনা নারী আমি তাহাতে জলসেক করিয়া তাহাকে পুষ্পিত তরুতে পরিণত করিয়াছি। আমি আমার কল্পনা লইয়া শান্তিতে ছিলাম,—বিরোধ বাধিল—যে দিন বাস্তবের সহিত চাক্ষুষ পরিচয় হইল,—তুমি ফিরিয়া আসিলে!—

তুমি আমার প্রণামের পরিবর্ত্তে আশীর্ব্বাদ করিলে না, মুখের কথায় কুশল প্রশ্নও করিলে না। তাহার পর প্রায় দেড় মাস ধরিয়া একত্র বাসের পরেও আমায় 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন পর্য্যন্ত করিতে পারিলে না! মাকে যাহা বলিয়াছ, তাহাও শুনিয়াছি।

আমি তোমার কাছে চিরঋণী, আমার নারী-জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা নিদারুণ সঙ্কটের দিনে তুমি আমায় উদ্ধার করিয়া আমার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছ,—সে জন্য আমার কৃতজ্ঞ হৃদয় সহস্র বার তোমার পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া প্রণতি জানাইয়াছে। কিন্তু আক্ষেপ বৃথা, সত্যই যদি তোমার পায়ে একবার মাথা ঠেকাইবার সৌভাগ্যও আমার হইত!

আমি ঋণী, সে ঋণ পরিশোধের শক্তি আমার নাই; তাহা লইয়াই আমি চলিলাম। দুঃখ, অভিমান করিবার আমার কিছুই নাই; আমি বন্যার আবর্জ্জনার মত অকস্মাৎ তোমার দ্বারে ভাসিয়া-আসিয়া, আবার তেমনই অবজ্ঞাত ভাবেই ভাসিয়া চলিলাম! আমার অসংখ্য প্রণাম লইও।　　　　—চিন্ময়ী।

পূর্ব্বদিক্ তখন অরুণের রক্তিম আভায় জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু আমার চক্ষুতে যেন অমানিশার নিবিড় অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল! আমি চিঠিখানি মুঠার মধ্যে চাপিয়া-ধরিয়া বালিশে মুখ গুঁজিলাম। আমি তাহাকে এমন ভুল বুঝিলাম! আমার অনাদৃতা উপেক্ষিতা চিন্ময়ী সত্যই কি বন্যার জলে আবর্জ্জনার মত ভাসিয়া গেল?

সকালে বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, জ্যাঠাইমা ভাঁড়ারের সম্মুখে বসিয়া কি কাজে ব্যস্ত আছেন। তাঁহাকে বলিলাম,—জ্যাঠাইমা, তুমি এত সকালে উঠে কি কচ্ছ? তোমার দুর্ব্বল শরীরে ও সব পরিশ্রম সহ্য হবে কেন?

জ্যাঠাইমা উত্তেজিত স্বরে বলিলেন,—করব না ত চলবে কি করে? যেমন বরাত করে এসেছি, তেমনই ত থাকতে হবে। কাজ করে দেবার জন্যে কি আমার পাঁচটা ঝি-বউ বসে আছে?

বুঝিলাম, 'পাঁচটা' নয়, 'একটা'র অভাবেই আজ তিনি ক্ষুব্ধ, এত উগ্র! আমি সেখানেই বসিয়া পড়িলাম; জ্যাঠাইমাকে বলিলাম,—জ্যাঠাইমা, আমি আজই পাটনা যাব, যেখানে পাই, চিনুকে খুঁজে আনব। তোমার ক্ষোভ আমার অসহ্য।

জ্যাঠাইমা তীব্র স্বরে বলিলেন,—কেন বল ত? গোড়া কেটে আগায় জল দিয়ে ফল কি? সে-কি আমার ঘরে ভাঁড়ারী হয়ে থাকতে আসবে? যাকৃগে! সে গেছে, আমি একটা দায় থেকে মুক্তি পেয়েছি। বাপ নেই, মা নেই, দুঃখী মেয়ে; সে খেটে খাবে না ত খাবে কি?

আমার বুকের ভিতরটা রুদ্ধ ক্ষোভে ভরিয়া উঠিয়াছিল; মিনিট-কয়েক কথা বলিতে পারিলাম না। তাহার পর কতকটা সামলাইয়া-লইয়া বলিলাম,—আমার ভুল হয়েছে জ্যাঠাইমা! আমি অন্যায় করেছি। চিনুকে আমি আজই খুঁজতে যাবো।

জ্যাঠাইমা গম্ভীর হইয়া বলিলেন,—যদি তাকে বিয়ে না করাই স্থির করে থাক, তাহলে শুধু শুধু তাকে ঘরে ফিরিয়ে এনে কতকগুলো অপ্রিয় কথার সৃষ্টি কোরো না শিশির! সে গেছে যাক্; পরের মেয়েকে ঘরে স্থান দিয়ে আর অশান্তি কুড়িয়ে কাজ নেই।

একটুখানি মৌন থাকিয়া মৃদু স্বরে বলিলাম,—তোমার ত' অমত নেই, তবে আর বাধা কি? সে তোমার বউই হবে। এর বেশী তুমি আর কি চাও?

*　*　*　*　*

একটা, দুইটা, তিনটা স্কুল খুঁজিলাম। তৃতীয় স্কুলের হেড মিস্ট্রেসের সহিত সাক্ষাৎপ্রার্থী হইলাম। প্রৌঢ়া, বিধবা ভদ্রমহিলা, দেখিয়া শ্রদ্ধা হয়। তিনি বলিলেন,—চিন্ময়ী চৌধুরী? হাঁ, সে কাল এসেছে। কেন বলুন ত? আপনি তার কে?

তাঁহার প্রশ্নে প্রথমে একটু দ্বিধা বোধ করিলাম; তাহার পর সহজ স্বরে বলিলাম,—আমার আত্মীয়া তিনি। বাড়ীতে কিছু না জানিয়েই এই চাকুরী নিয়েছেন।

হেড মিস্ট্রেস বলিলেন,—আমিও মশায়, মেয়েটিকে নিয়ে একটু মুস্কিলে পড়েছি! যে বয়স বলে চাকুরীর জন্য আবেদন করেছিল, দেখলে তার সে বয়স বলে মনে হয় না; মনে হয়, তার বয়স সতের-আঠার বছরের বেশী নয়! স্কুলের মেয়েরা ওকে গ্রাহ্য করবে ভেবেছেন? আপনি তার কে হন বললেন?

আমি একটু ইতস্ততঃ করিতেছি দেখিয়া বলিলেন,—দেখুন, আমি নিজে ভাল করে না জেনে তার সঙ্গে আপনার দেখা হতে দিতে পারিনে। আমার নিজেরও ছেলে-মেয়ে আছে। অত ছেলেমানুষ

মেয়েটিকে নিয়ে আমিই যেন একটা দায়িত্বে পড়ে গেছি! আত্মীয়া বলছেন,—সম্পর্কটা কি শুনি।

বুঝিলাম, গোপন করিতে গেলে উল্টা উৎপত্তি হইবে! তাই সসঙ্কোচে সব কথাই খুলিয়া বলিলাম—কিছুই ঢাকিলাম না।

প্রৌঢ়া এবার একটু হাসিলেন, স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন,—আজকাল মেয়েগুলো বড়ই অবুঝ আর বেয়াড়া হয়েছে দেখছি! বেশ, আমি তাকে ডেকে পাঠাচ্ছি, বুঝিয়ে-সুজিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যান। এখনও ত সে কাজে জয়েন করেনি। ওরে রামদীন্—

ভৃত্য রামদীন সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

হেড্ মিস্ট্রেস বলিলেন,—কাল যে নতুন দিদিমণি এসেছে, চিন্ময়ী চৌধুরী, হিরণের ঘরে আছে, তাকে ডেকে দে। বলিস্, আমি ডাকছি।—আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—এ পাশের বিল্ডিংটা বোর্ডিং, টিচাররা ওখানেই থাকে। থার্ড মিস্ট্রেস হিরন্ময়ী মজুমদার, তার রুমেই ওর থাকবার ব্যবস্থা করেছিলুম।

মিনিট-কয়েক পরেই পর্দার বাহিরে পরিচিত কণ্ঠ শুনিলাম,—ভেতরে আসতে পারি বড়দি!

হেড মিস্ট্রেস উঠিয়া পর্দার কাছে গিয়া মুখ বাহির করিয়া বলিলেন,—হাঁ, ডেকেছিলুম,—ও কি! তোমায় এত শুক্‌নো লাগছে কেন? ঘুম হয়নি? তা আর হবে কি করে?—বলিয়া প্রৌঢ়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—তোমার চাকরী করা হ'ল না, বাড়ী ফিরে যাও। শিশির বাবু এসেছেন, তুমি ওঁর সঙ্গে ফিরে যাও।—এবার তিনি স্বয়ং পর্দার বাহিরে গিয়া চিন্ময়ীকে ভিতরে ঠেলিয়া দিলেন।

* * * *

ট্রেণে বসিয়া চিন্ময়ী বলিল,—ষ্টেশনে কিছু খাবার নিলে হ'ত; কাল রাত্তির থেকে এতটা বেলা পর্য্যন্ত খাওয়া হয়নি বোধ হয়?

ইহাই সেবাপরায়ণা চিন্ময়ীর স্বরূপ! স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলাম; বলিলাম,—হুঁ, খাওয়া! কাল আমার সারাদিনটা যে-ভাবে কেটেছে, তা ভগবানই জানেন!

চিন্ময়ীর মুখে সলজ্জ হাসি দেখা দিল; সে বলিল,—ইস্, ও-একটা কথাই নয়! প্ল্যাটফরমের দিকে চাহিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিল,—ডাকো, ডাকো, ঐ যে খাবারওলা।

তাহাকে ডাকিয়া চিন্ময়ীর নির্দ্দেশমত খাবার কিনিলাম, এবং ব্যাগটি তাহার হাতে দিয়া বলিলাম,—তুমি হিসেব করে ওর পাওনা চুকিয়ে দাও।

দাম মিটাইয়া দিয়া চিন্ময়ী ব্যাগটা ফিরাইয়া দিতেছিল;—বলিলাম,—কি হবে? তোমার কাছেই থাক।

চিন্ময়ী বলিল,—কেন? তুমি নেবে না?

তখন ট্রেণ ছাড়িয়াছে, তাহার ঝাঁকানীতে চিন্ময়ীর গায়ের উপর ঢলিয়া-পড়িয়া বলিলাম,—ব্যাগের মালিকেরও মালিক যে তুমি! ওটা নিয়ে আর কি হবে?

—কিন্তু কামরাখানা ত আমার রিজার্ভ করা নয়, আরও সহযাত্রী আছে;—অতএব এখানেই—

শ্রীমতী মায়াদেবী বসু।

শরৎ-রূপসী এলো দ্বারে

শেফালী শরৎ সাজি শ্যাম বঙ্গে সমাকুল ফেলিছে চরণ,
তৃণে পত্রে সতেজ বরণ ঢালি নব ঘন।
শ্যামরূপে সাজে তরুলতা,
স্বর্ণ-বঙ্গে সজীব বারতা।

মুকুতা-মধুর হয়ে হাসিতেছে শুভ্রচ্ছটা শিশিরের জল;
ঝলমল রৌপ্য-সিক্ততল ভাসে দূর্ব্বাদল।—
পুষ্প-বক্ষে স্ফটিক নির্ঝর
মুগ্ধ করে মধুপ অধর।

পরিস্ফুট রূপ-যৌন মধুগন্ধ শেফালী নিকুঞ্জ-প্রান্ত ঘিরে
স্বর্ণাঞ্চল উড়াইয়া ধীরে দক্ষিণ সমীরে,—
দাঁড়ায়েছে শরতের রাণী,
শিউলী-সুগন্ধ ঘোমটা টানি।

স্বচ্ছ নীল সরোবরে ফুটিয়াছে রক্তবক্ষ কুমুদ কমল;
রূপে রসে পূর্ণ ঢল ঢল যৌবন-বিহ্বল।
কাছে মৃদু ভাষে হংসরাজ,
কুমারী কুমুদ পায় লাজ।

সলাজ সুন্দর তার আননের সমুজ্জ্বল নম্র রশ্মি দিয়া
নীলাম্বর দিয়েছে আঁকিয়া নীলে বিকাশিয়া।
বর্ষা-বৃদ্ধ ধরণীর পর
নেমে এলো নবীন অম্বর।

এলো প্রাণ এলো মুক্তি এলো স্বর্ণ-নভঝরা অরুণকিরণ,
এলো নেমে কনক-বরণ জননী-চরণ।
এলো রে রূপসী লক্ষ্মী দ্বারে,
ঢাল অর্ঘ্য চরণের 'পরে।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল (এম-এ)।

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা

বাঙ্গালায় দুর্গোৎসব আবার আসিয়াছে। নীল অম্বর আবার শারদ-শোভায় হাসিতেছে। শীর্ণা তটিনীও এখন বারিসম্পদে পুষ্টা হইয়া যেন মায়ের চরণকমল ধুইবার জন্য কলকল রবে চলিয়াছে। এই ত মায়ের পূজার সময়। এ পূজা একরূপ বাঙ্গালীরই পূজা। ইহা হিন্দুর পূজা হইলেও এই ভাবে দুর্গাপূজা কেবল বাঙ্গালায়, বেহারে, আসামে এবং অন্য কোন কোন অঞ্চলে প্রচলিত আছে। তবে এই সময়ে অন্যান্য স্থানে যে নবরাত্রির উৎসব হইয়া থাকে,—তাহাও এই উৎসবের প্রকারান্তর। দুর্গাপূজা শক্তির পূজা। শক্তি কে? আমরা কাহাকে পূজা করি? যাঁহার প্রভাবে এই বিশ্বের এবং বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টি, পুষ্টি এবং প্রলয় ঘটিতেছে অর্থাৎ যাঁহার প্রভাবে এই ব্রহ্মাণ্ড এবং তাহার অন্তর্গত সমুদয় বস্তুর উত্থান, অবস্থান এবং পতন ঘটিতেছে,—সেই প্রভাবকে বা পারকতাকে শক্তি বলে। যাঁহার প্রভাবে বায়ু বহিয়া যাইতেছে, সূর্য্য তাপ দিতেছে, মেঘ বর্ষিতেছে, বনে তরুগুলি ফলপুষ্পে শোভিত হইতেছে, গ্রহ-নক্ষত্রগণ উদিত, চালিত এবং অস্তমিত হইতেছে, সেই শক্তি, সেই শক্তিরই আমরা পূজা করি। এই শক্তিই পরম ব্রহ্মের পরা প্রকৃতি। ইহা হইতে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড সমুৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং একমাত্র শক্তিই এই বিশ্বের জননী।

> ত্বং পরাপ্রকৃতিঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
> ত্বত্তো জাতং জগৎ সর্ব্বং ত্বং জগজ্জননী শিবে॥
> মহদাদ্যণুপর্য্যন্তং যদেতৎ সচরাচরম্।
> ত্বয়ৈবোৎপাদিতং ভদ্রে! ত্বদধীনমিদং জগৎ॥

সদাশিব শক্তি বা মহাশক্তির কথা এই ভাবে বলিয়াছেন। পরিচ্ছিন্ন এবং অপরিচ্ছিন্ন এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের স্থাবর এবং জঙ্গম ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ সকল প্রকার বস্তুর প্রসূতিই এই পরা প্রকৃতি বা মূল প্রকৃতি। চণ্ডীতে দেখিতে পাই, ব্রহ্মা যোগনিদ্রার স্তব করিতে করিতে বলিয়াছিলেন :—

> যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্ বস্তু সদসৎ বাখিলাত্মিকে।
> তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা॥ (চণ্ডী ১।৭৩)

হে অখিলস্বরূপে! নিত্য বা অনিত্য যে কোন অবস্থায় যে সকল পদার্থ আছে, আপনি সেই সকল পদার্থের শক্তি। অতএব সর্ব্ব-শক্তিময়ী আপনার স্তব কিরূপে করা সম্ভব হয়! সুতরাং শক্তিই বিশ্বমাতা। সন্তান যেমন মাতাকে পূজা করে, সেইরূপ হিন্দু বিশ্ব-জননীকে পূজা করিয়া থাকে।

ইনি কাহার শক্তি? পরমাত্মার শক্তি। হিন্দুর সৃষ্টিতত্ত্ব অত্যন্ত জটিল। পরমাত্মা বলিতে এখানে তুরীয় ব্রহ্মকে বলা হইয়াছে। তুরীয় ব্রহ্মের সহিত মূল প্রকৃতির সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। এই তুরীয় ব্রহ্ম বাক্য ও মনের অতীত। তিনি নিষ্ক্রিয়। সুতরাং কার্যতঃ মূল প্রকৃতি, নিসর্গ বা আদ্যাশক্তিই সৃষ্টিকর্ত্রী। পরমাত্মা কেবল বিশুদ্ধ আত্মারূপে এবং সকলের সাক্ষিরূপে বিরাজিত। শক্তিই হিন্দুর মতে পরমেশ্বরী। এই মূল প্রকৃতি বা মহাশক্তিই বিশ্বের আদি এবং বিশ্বের বীজ। ইঁহার ন্যায় মহামহিমান্বিত আর কোন কিছুই পৃথিবীতে নাই।

এখন জিজ্ঞাস্য, পূজা শব্দের অর্থ কি?—"গৌরবিত-প্রীতিহেতু ক্রিয়া পূজা।" যিনি গৌরবিত অর্থাৎ মহিমান্বিত, তাঁহাতে প্রীতি জন্মাইবার জন্য যে অনুষ্ঠান করা হয়, তাহার নামই পূজা। ইহার অর্থ গৌরবান্বিত ব্যক্তির বা সত্তার প্রীতির জন্য অনুষ্ঠানই পূজা, ইহা সত্য নহে,—গৌরবিত সত্তার উপর যাহাতে সাধকের মনে প্রীতির উদ্রেক করে, সেইরূপ অনুষ্ঠানকে পূজা বলে। অর্থাৎ দেবতার প্রীতি-লাভের জন্য অনুষ্ঠান পূজা নহে,—সাধকের মনে যে অনুষ্ঠান দ্বারা দেবতার উপর প্রীতি জন্মে, তাহারই নাম পূজা। দেবতা দুটো মিষ্টি কথা শুনিয়া, বা বিবিধ ভোজ্য তাঁহার উদ্দেশে নিবেদিত হইয়াছে দেখিয়া প্রীতিলাভ করেন না,—দেবতার প্রতি সাধক যে সকল বাক্য বলিলে, যে সকল ভোজ্য নিবেদন করিলে সাধকের মনে দেবতার প্রতি প্রীতি জাগে, তদ্বিধ কার্য্য করিলেই দেবতার পূজা করা হয়। এখন এই মহাশক্তির ন্যায় গৌরবান্বিতা সত্তা এই বিশ্বে আর কি আছে? সেই বিশ্বজননী মহাশক্তির উপর যাহাতে আমাদের আসক্তি এবং ভক্তি জন্মে, সেইরূপ অনুষ্ঠান করাকেই আমরা পূজা বলি। এইখানেই হিন্দুর পূজার সহিত অন্যান্য ধর্ম্মের পূজার পার্থক্য বিদ্যমান। অন্য অনেক ধর্ম্মে গৌরবিতের অর্থাৎ ভগবানের মনে সাধকের উপর প্রীতি-সঞ্চারের জন্য পূজা করা হয়। কিন্তু বিষয়াসক্ত মানব-মনকে ভগবানের ভক্তিতে ভোরপূর করিবার জন্যই হিন্দু পূজা করিয়া থাকেন। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা আবশ্যক। পূজা পরম দেবতার মনের উপর প্রভাব-বিস্তার করে না—সাধকের মনকে ভগবানের দিকে আকৃষ্ট করে। কথাটা শ্রীভগবান্ ভগবদ্গীতায় খোলসা করিয়া বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ;—

> সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
> যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥

"আমি সর্ব্বপ্রাণীতে সমদর্শী। আমার কেহ প্রিয় বা কেহ অপ্রিয় নাই। (তবে একটু কথা আছে)। যাহারা দৃঢ়ভক্তি সহকারে আমাকে ভজনা করে, তাহারা আমাতে থাকে, আমিও তাহাতে থাকি।" অর্থাৎ তাহারা আমার সাযুজ্য লাভ করে। সাধক ভক্তির সহিত সাধ্যের সেবা করিলে সাধক নিজ কর্ম্ম দ্বারাই তাহার সাধ্য দেবতার সান্নিধ্য লাভ করে, এবং আরাধ্য দেবতার ঐশীশক্তি নিজ চিত্ত-মুকুরে প্রতিফলিত হয়। ইহার পরের শ্লোকে ঐ কথাটা ভগবান্ আরও পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন যে, "অতি দুরাচার ব্যক্তি যদি অনন্যচিত্ত হইয়া আমাকে ভজনা করে, তাহা হইলেও তাহাকে সাধু বলিয়া মনে করিতে হইবে।" কারণ, সেই ব্যক্তি সম্যক্ অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে ব্যবসিত বা অধ্যবসায়সম্পন্ন। যদি অতি দুরাচার অনন্যচিত্ত হইয়া আমাকে ভজনা করে,—অর্থাৎ সব ছাড়িয়া মদাসক্তচিত্ত

হইয়া আমারই ধ্যান-ধারণা করে, আমার বিষয়ই চিন্তা করে, তাগ হইলে তাহাকে পাপাচরণ ছাড়িতে হয়, সে কার্যতঃ সাধুত্ব লাভ করিয়া থাকে। তাহার ফলে সে ব্যক্তি শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হইয়া থাকে। সুতরাং পূজা প্রধানতঃ সাধকের চিত্তশুদ্ধির জন্য অনুষ্ঠিত হয়।

শাক্তগণ বাক্য এবং মনের অতীত নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মকে তুরীয় ব্রহ্ম বলেন। সেই ব্রহ্ম হইতেই মূল প্রকৃতি আবির্ভূত হইয়াছেন। এই প্রকৃতিই সৃষ্টির আদি-কারণ। মহত্তত্ত্ব অহঙ্কার,—অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূতের পর পর আবির্ভাব ঘটিয়াছে। আমি এ প্রবন্ধে সে সব জটিল কথার অবতারণা করিব না। তবে এইটুকু বলিতে পারি, মহাশক্তিই এই বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্রী। দেবগণও ইঁহারই সৃষ্ট। দুর্গাদেবীরূপে ইনিই আবির্ভূতা হইয়া মহিষাসুরকে তিন বার বধ করিয়াছিলেন। প্রথম, অষ্টাদশভুজা উগ্রচণ্ডারূপে, দ্বিতীয় বারে ষোড়শভুজা ভদ্রকালীরূপে এবং তৃতীয় বারে দশভুজা দুর্গারূপে। দেবীভাগবতে এই মহাশক্তির মূল কোথায়, তাহা ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব তিন জনই চেষ্টা করিয়া জানিতে পারেন নাই। এই বিষয়টি একটি উপাখ্যানে বর্ণিত আছে। উহা দীর্ঘ বলিয়া আমি এ স্থলে বিবৃত করিলাম না।

এই শক্তিপূজা কত কালের? আমার মনে হয়, হিন্দু সমাজের বার্ত্তা যত দিন পর্য্যন্ত জানা যায়, উহা তত কালের। ঋগ্বেদে যে দেবীসূক্ত আছে,—তাহা দেবী দুর্গারই কথা। অম্ভৃণনামক মহর্ষির বাক্‌নাম্নী কন্যারূপে ইনি আবির্ভূতা হয়েন। ইনি বলিতেছেন,—'আমি একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু এবং দ্বাদশ সূর্য্য ও ত্রয়োদশ বিশ্বরূপে বিচরণ করিতেছি, আমিই আত্মরূপে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক মিত্রাবরুণকে ধারণ করিতেছি,—ইন্দ্র এবং অগ্নিকে আমিই ধারণ করি, আমিই অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে তাহাদের কার্য্যকরী শক্তি প্রদান করি। কেন না, আমাতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অধিষ্ঠিত এবং আমার সত্তাই ব্রহ্মাণ্ডের সত্তা। অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকর্ত্রী মায়া আমাতেই অধিষ্ঠিতা রহিয়াছেন' ইত্যাদি। এই দেবীসূক্ত পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, অতি প্রাচীন কাল হইতে হিন্দু জাতি আদ্যাশক্তিকেই ব্রহ্মময়ী বলিয়া পূজা করিয়া আসিতেছেন। কেবল তাহাই নহে। শ্রুতি ইঁহাকে হৈমবতী উমা বলিয়া অভিহিতা করিয়াছেন। কেনোপনিষৎ অতি প্রাচীন। ইহাতে বলা হইয়াছে—

"স তস্মিন্নেবাকাশেস্ত্রিয়মাজগাম বহু শোভমানাং উমাং হৈমবতীং তাং হোবাচ কিমেতৎ যক্ষমিতি"

সঃ অর্থাৎ ইন্দ্র সেই আকাশেই স্ত্রীরূপিণী অতিশয় সৌন্দর্য্যশালিনী হৈমবতী উমাকে আবির্ভূতা দেখিয়া তাঁহার নিকট যাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ঐ পূজনীয় স্বরূপটি কে?

এখানে উমাকে হৈমবতী বলা হইয়াছে। সামশ্রমী মহাশয় ইহার অর্থ করিয়াছেন "হিমবচ্ছিখরপ্রাঙ্গণে প্রাদুর্ভূতাম্‌" অর্থাৎ হিমবানের (হিমালয়ের) শিখর-প্রাঙ্গণে আবির্ভূতা বা হিমালয়নন্দিনী। সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, স্বর্ণালঙ্কারভূষিতা। দুই দিক্ দিয়াই ইহা দুর্গাকে বুঝাইতেছে। এরূপ আরও বহু বৈদিক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু তাহার প্রয়োজন নাই। যাঁহারা নিরপেক্ষ, তাঁহারাই স্বীকার করিবেন যে, দুর্গা বৈদিক দেবতা। তবে নানা কালে নানা দেশে এই দুর্গাপূজা-পদ্ধতি ভিন্নরূপ হইয়া গিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মহাশক্তির ক্রিয়া ভাষায় বলিতে হইলে বলিতে হয়, উহা নানাবিধ। যথা—জ্ঞানশক্তি, দৈহিকশক্তি আর ক্রিয়াশক্তি। জ্ঞানশক্তি চৈতন্যের বা আত্মার দৈহিকশক্তি সজীব পদার্থ কর্ত্তৃক প্রযুক্ত বল এবং ক্রিয়া শক্তি জড়ের শক্তি। কুইনাইনের জ্বরনাশিনী শক্তি জড়ের অন্তর্নিহিত শক্তি। মহাশক্তি আত্মায় জীবে এবং জড়ে থাকিয়া এই ত্রিমূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করেন। আমরা দুর্গাদেবীর যে মূর্ত্তির আরাধনা করি, তাহা তাঁহার পরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তি। অপরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তি আমরা ধারণার মধ্যেই আনিতে পারি না। অথচ "অপরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তি" কাঙ্গালের আমসত্ত্বর ন্যায় অসম্ভব কি না, সে বিচার এখানে করিব না। আমরা যেমন আমাদের এই সীমাবদ্ধ স্থান এবং বিশেষ বিশেষতা দিয়া অসীম বিশ্বের একটা কল্পনা করি, সেইরূপ দুর্গাদেবীর অসীম শক্তি ধারণা করিবার শক্তির অভাবে সসীম দুর্গামূর্ত্তির ধারণা করি।

দুর্গাদেবী দুই বার দেবকার্য্যসাধনার্থ জন্মগ্রহণ করেন। এক বার দক্ষ প্রজাপতির কন্যারূপে আর এক বার নগাধিরাজ-নন্দিনীরূপে। দক্ষতা বলিতে কার্য্যপটুতা বুঝায়। দক্ষের কন্যার নাম হইল সতী। সৎ ও সতীর অর্থ যাহা হয় বা হওয়া উচিত। কর্ম্মপটুতায় মানুষের শক্তি আসে। সেই শক্তি গেল শিবের দিকে—ধর্ম্মের দিকে; শিবই ধর্ম্ম! পরকালে বিশ্বাসই তাহার বনিয়াদ। তাই ইহকাল এবং পরকাল এই উভয়ের সংযোগস্থল শ্মশানই শিবের বাসস্থান। দক্ষ দম্ভভরে শিবকে—ধর্ম্মকে পরলোকে বিশ্বাসকে উপেক্ষা করিয়া সেই সতীকে ধর্ম্ম হইতে মুক্ত বা বিচ্ছিন্ন করিয়া নিজ পার্থিব ক্ষমতা এবং ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিতে চাহে। সে শিবকে বা ধর্ম্মকে আপনার নিকট নতি স্বীকার করাইতে চেষ্টা করিয়াছিল। সে জন্য দম্ভের অবতার দক্ষ শিবহীন যজ্ঞ করে। সতী অযাচিতা হইয়াই দক্ষযজ্ঞে উপস্থিত হন। দক্ষ তাঁহার অবমাননা করেন। সতী দেখিলেন যে, তাঁহার জীবন নিষ্ফল হইল। তিনি দেহত্যাগ করিলেন। শিব বা ধর্ম্ম ক্রুদ্ধ বা বিরূপ হইলেন। তাঁহার জটা হইতে বীরভদ্রের আবির্ভাব হইল। বীরভদ্র অর্থাৎ মঙ্গলকর পুরুষ তিনি দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করিলেন। শিব সতীর দেহ লইয়া বিভ্রান্ত হইয়া নানা স্থানে ঘুরিলেন। শেষে বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন হইয়া সেই সতীদেহ,—সেই দক্ষজাত কল্যাণ নানা স্থানে বিচ্ছিন্ন হইয়া তথায় তীর্থের সৃষ্টি করে।

আমাদের সময়ে আবার দক্ষযজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে। য়ুরোপীয় জাতিরা দক্ষতার দ্বারা যে কৃষ্টির বা সতীর সৃষ্টি করিয়াছে,—সে যদি শিবের বা ধর্ম্মের বা আধ্যাত্মিকতার সহিত মিলিত হইতে পারিত, তাহা হইলে বিশ্বের অশেষ কল্যাণ হইত। দক্ষপ্রজাপতিদুহিতা সতী শিবের সহিত মিলিতা হইয়াছিলেন,—য়ুরোপীয় দক্ষের দুহিতা যান্ত্রিক সভ্যতা শিবের সহিত মিলি মিলি করিয়াও যেন মিলিতা হইতে পারে নাই। এই সভ্যতা ও সার্থকতা লাভ করিতে না পারিয়া বর্ব্বরতায় পরিণত হইতেছে। এ ক্ষেত্রেও শিবাপমানকারী দক্ষতাজনিত সভ্যতা দম্ভের যজ্ঞীয় হোমকুণ্ডে সতী বা কল্যাণ প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছেন,—আর দক্ষের ছাগমুণ্ড বা পশুবুদ্ধিই প্রবল হইতেছে।

আমরা যে দুর্গাদেবীর পূজা করি, তিনি দুর্গতিনাশিনী। জীবের দুর্গতি হরণ করিবার জন্য তিনি প্রতি বৎসর ভক্তের আহ্বানে ভক্তের মণ্ডপে আসিয়া আবির্ভূতা হইয়া থাকেন। তিনি ভবভয়নাশিনী, জীবক্লেশনিবারিণী এবং ভুক্তিমুক্তিবিধানকর্ত্রী। তিনি রক্ষা করিলে কেহই জীবকে মারিতে পারে না,—তিনি মারিলে কেহই

তাঁহাকে রাখিতে সমর্থ হয় না। তাঁহাকে কেবলমাত্র স্তবে তুষ্ট করা যায় না, উপচারে প্রীত করা সম্ভবে না,—সেবায় কৃপাদানে উদ্যত করা কঠিন—তিনি অচিন্ত্য। কিন্তু তাঁহাকে পাইবার একটি উপায় আছে। সেটি ভক্তি। যে-সে ভক্তি নহে,—দৃঢ়াভক্তি। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভগবতীর কেহ প্রিয়ও নাই,—কেহ অপ্রিয়ও নাই। তবে তাঁহার প্রতি যখন পরাভক্তি জন্মে, কর্ণ তাঁহার কথা ভিন্ন আর কোন কথা শুনিতে চাহে না, চক্ষু সর্ব্বদাই তাঁহারই রূপ দেখে, মন সর্ব্বদাই তাঁহার কথা ভাবে এবং তাঁহাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হয়, তখন সাধকের হৃদয়-গগনের কালমেঘ কাটিয়া যায়, মায়ের কৃপারূপ ভাস্বর জ্যোতিঃ সাধকের হৃদয়ে পূর্ণতেজে পতিত হয়,—সাধক তখন বিশেষ শক্তিলাভ করিয়া সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গল নিবারণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। ভাবের ঘরে চুরি করিলে মায়ের এই প্রকার কৃপা পাওয়া যায় না,—মুখে সরল কথা বলিয়া অন্তরে গরল পুষিয়া রাখিলে কস্মিন্ কালেও সে কৃপা পাওয়া সম্ভবে না। কেবল বিষয় ভাবিলে বিষয়ও লাভ হয় না—ভগবতীর কৃপাও মিলে না। বরং পূজা না করাও ভাল, তথাপি ভাবের ঘরে চুরি করিয়া পূজা করা কোনমতেই ভাল নহে।

মা! আমরা ভ্রান্তিবশে বুঝি না যে পাপী, তাপী, সাধু ও ভক্ত সকলেরই উপর তোমার সমান দয়া। তোমার বাতাস সঞ্চরণ সময়ে পাপি পুণ্যাত্মার বিচার করে না,—ভোগী ও ত্যাগীর মধ্যে পার্থক্য করে না,—সকলের উপর সমান মঙ্গল দান করে। সূর্য্য চোরের গৃহে যেরূপ কিরণ বিতরণ করেন, সাধুর গৃহেও সেইরূপ কৃপা করেন। কাহাকেও তিনি অবজ্ঞা করেন না। জলদ সকলকেই সমান ভাবে জল দিয়া যায়। সেইরূপ কৃপাময়ি! তোমার কৃপাও সকলের উপর সমভাবে বর্ষিত হয়। কিন্তু পাপী নিজ পাপ কর্ম্ম দ্বারা নানারূপ বাধা সৃষ্টি করিয়া সেই কৃপা-প্রাপ্তির পথে বাধা ঘটায়। যেমন মানুষ অজ্ঞানের বশে প্রাচীর রচনা করিয়া প্রবহমান সমীর-সঞ্চারে বাধা জন্মায়। মোহ-মূর্চ্ছিত মানবের মন হইতে কু-বাসনা সমুত্থিত ঘন কৃষ্ণমেঘরাশি তোমার কৃপালাভ-পথে তিরস্করিণীরূপে উদিত হইয়া সেই কৃপালাভে বাধা সৃষ্টি করে,—তাই মহাপাপী আমরা ভাবি, আমরা তোমার কৃপালাভে বঞ্চিত। আমাদিগকে সাধন দ্বারা ঐ মেঘাবরণ কাটাইতে হইবে,—কর্ম্ম দ্বারা কৃপালাভের পথ বাধামুক্ত করিতে হইবে। বাধামুক্ত হইলে যে কৃপা পাওয়া যায়, সেই কৃপা মা আমাদিগকে বিতরণ করেন, এই কথাই আমরা বলিয়া থাকি।

আজ আমরা বড়ই দুর্গতিগ্রস্ত। আমাদের অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, অর্থ নাই, সামর্থ্য নাই, ঐক্য নাই, বীর্য্য নাই। আমরা তাই নিশ্চেষ্ট। উচ্ছৃঙ্খল লোকেরা অর্থবলের প্রভাবে নানা অনাচার করিতেছে। কুবুদ্ধির কুহেলিকায় আমাদের দেশের লোকের বুদ্ধিনাশ ঘটিতেছে,—তাই এই আপৎকালে কি করিতে হইবে, তাহা তাহারা বুঝিতে পারিতেছে না। শিক্ষা-বিভ্রাটে পড়িয়াও আমরা অজ্ঞানান্ধকারে দিশাহারা হইয়া ঘুরিয়া মরিতেছি। এদিকে অসুরের দাপটে পৃথিবী টলমল কাঁপিতেছে,—প্রতিদিন সহস্র সহস্র মানব সংগ্রামের অনলশিখায় আত্মাহুতি দিতেছে। কত দেশ শ্মশান হইতেছে, কত লোক নিরাশ্রয় হইতেছে,—কত শিশু অনাথ হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।—শোকের তপ্তশ্বাসে আজ ধরাধর প্রতপ্ত। কাহার ইচ্ছায় এমন হইতেছে? শাস্ত্র বলিবেন,—দুর্গাদেবীর ইচ্ছায় ইহা ঘটিতেছে।

> একৈব শক্তিঃ পরমেশ্বরস্য
> ভিন্না চতুর্দ্ধা বিনিয়োগকালে।
> ভোগে ভবানী পুরুষেষু বিষ্ণুঃ
> কোপেষু কালী সমরেষু দুর্গা॥

অর্থাৎ পরমেশ্বরের একই শক্তি বিনিয়োগকালে চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। যথা ভোগ বিষয়ের অধিষ্ঠাত্রী ভবানী, বিষ্ণু পুরুষ অর্থাৎ পৌরুষের অধিষ্ঠাতা, কালী কোপের অধিষ্ঠাত্রী এবং দুর্গা সমরের অধিষ্ঠাত্রী। মা গো! তুমিই বলিয়াছ—

> ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
> তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥

এই প্রকার যখনই দানবদল-কৃত বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, তখনই আমি অবতীর্ণা হইয়া শত্রুনাশ করিব। তাই কি মা, তুমি এইবার এই সংগ্রামে দানবদল দলন করিবার জন্য রণচণ্ডীরূপে অবতীর্ণা হইয়াছ? মা, তুমি আবার বলিয়াছিলে—

> পুনরপ্যতিরৌদ্রেণ রূপেণ পৃথিবীতলে।
> অবতীর্য্য হনিষ্যামি বৈপ্রচিত্তাংস্তু দানবান্॥
> ভক্ষয়ন্ত্যাশ্চ তানুগ্রান্ বৈপ্রচিত্তান্মহাসুরান্।
> রক্তাদন্তা ভবিষ্যন্তি দাড়িমী কুসুমোপমা॥

"পুনরায় অতি ভীষণরূপে পৃথিবীতলে অবতরণপূর্ব্বক বিপ্রচিত্তিতনয় দানবগণকে সংহার করিব। সেই সকল উগ্র বিপ্রচিত্তিতনয় মহাসুরদিগকে ভক্ষণ করিতে করিতে আমার দন্ত সকল দাড়িমপুষ্পের ন্যায় লোহিতবর্ণ হইয়া যাইবে।" মা গো! এই কি সেই রণ। মা গো! এই দুর্ব্বুদ্ধি দানব কাহারা? কেমনে বুঝিবে মা তোর লীলা! কিন্তু এমন ভীষণ যুদ্ধ আর কখনই হয় নাই, ইহা সত্য। কিন্তু মা গো! শান্তিপ্রিয় আমরা, আমরা ত এ কষ্ট সহ্য করিতে পারিতেছি না। এ যে ভীষণ যন্ত্রণা। মা, তুমিই বলিয়াছ:—

> অহং নারায়ণী গৌরী জগন্মাতা সনাতনী।
> বিভজ্য সংস্থিতো দেবঃ স্বাত্মানং পরমেশ্বরঃ॥
> ন মে বিদুঃ পরং তত্ত্বং দেবাদ্যা ন মহর্ষয়ঃ।
> একোঽহং বেদ বিশ্বাত্মা ভবানী বিষ্ণুরেব চ॥

আমি জগন্মাতা সনাতনী নারায়ণী গৌরী। পরমেশ্বর স্বীয় আত্মা হইতে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। দেবতা এবং মহর্ষিরা আমার এই পরমতত্ত্ব জানেন না। আমি বিশ্বের আত্মা ভবানী এবং বিষ্ণু। মা, তুমিই ত সব। তুমি মুহূর্ত্তে সৃষ্টি, স্থিতি, লয় করিতে পার। তবে তুমি এই দানবদম্ভ চূর্ণ করিয়া বিশ্বে শান্তি স্থাপন করিতেছ না কেন? মা, আমরা বড় কাঙ্গাল। আমাদের বিশ্বাস নাই, বুদ্ধি নাই, ভক্তি নাই, জ্ঞান নাই, সামর্থ্য নাই, সহায় নাই, সম্পদ নাই, সন্ততি নাই, সম্মান নাই, সরলতা নাই, দৃঢ়তা নাই। সর্ব্ববিষয়ে আমরা রিক্ত হইয়া পড়িয়াছি। মা গো! আমাদের মত অসহায় ও পতিত কে আছে? তাই ডাকি এস মা দুর্গতিনাশিনি, ভবভয়-হারিণি, পতিততারিণি দুর্গে! এক বার এসে এই অধম সন্তানগণকে তারণ কর। বিশ্বের সকলে তোমার মহিমা দেখুক। তুমি

দানব-বলের সংহার করিয়া আবার ধরাতলে দেববলের প্রতিষ্ঠা কর। অসুহর অসুরদিগের দর্পদম্ভ চূর্ণ করিয়া স্বার্থহীন শান্তিদাতা সুরবাজ্যের প্রতিষ্ঠা কর মা! মা! তুমি জগতে শোষণের স্থানে তোষণ-নীতি প্রবর্ত্তিত করিয়া ধরাকে নিস্তার কর। মা, তোমাকে তপস্যার দ্বারা জানা যায় না, দানের দ্বারা পাওয়া যায় না, যজ্ঞ দ্বারা লাভ করা যায় না, পাওয়া যায় কেবল উত্তমা ভক্তির দ্বারা। কিন্তু সে ভক্তি পাইব কোথায়? ছিল আমাদের পিতৃপুরুষগণের, এখন কুশিক্ষার প্রভাবে সে শুদ্ধা ভক্তির উৎস শুকাইয়া গিয়াছে। যে ভক্তিতে যশোদা তোমাকে নন্দনরূপে পাইয়াছিল, মেনকা তোমাকে কন্যারূপে লাভ করিয়াছিল, বালক ধ্রুব যে সরল অথচ দৃঢ় ভক্তি প্রভাবে সিংহব্যাঘ্ররূপ শ্বাপদগণকে 'ঐ আমার পদ্মপলাশ-লোচন হরি' বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছিল, প্রহ্লাদ যে ভক্তির জন্য জলে, স্থলে, অনলে, অনিলে সর্ব্বত্রই হরিকে দেখিয়াছিল,—সে ভক্তি কি মা এ যুগে সম্ভব? কুশিক্ষার দোষে কু-বাসনার বাতাসে, কুদৃষ্টির ভ্রান্তিজালে সে ভক্তি আজ তিরোহিত। তবে মা, আমরা তোমাকে পাইব কি করিয়া? মা আমরা প্রত্যেকেই—

কুকর্ম্মী কুসঙ্গী কুবুদ্ধিঃ কুদাসঃ
কুলাচারহীনঃ কদাচারলীনঃ।
কুদৃষ্টিঃ কুবাক্যপ্রবন্ধঃ সদাহং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥

আমরা এখন—

অনাথো দরিদ্রো জরারোগযুক্তো
মহাক্ষীণদীনঃ সদা জাড্যবক্ত্রঃ।
বিপত্তৌ প্রবিষ্টঃ প্রনষ্টঃ সদাহং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥

মা! তুমি বলিয়াছ "ধর্ম্মাৎ সঞ্জায়তে ভক্তির্ভক্ত্যা সম্প্রাপ্যতে পরম্।"—ধর্ম্ম হইতেই ভক্তি উৎপন্ন হয় এবং ভক্তি হইতেই পরমতত্ত্ব তোমাকে পাওয়া যায়। কিন্তু মা! ছিল এক দিন, যে দিন এই বাঙ্গালার আকাশ-বাতাস হইতে ভক্তির প্লাবন বহিয়া সমস্ত ভারত প্লাবিত করিয়াছিল। বাঙ্গালার চৈতন্যদেব ধরায় ভক্তির যে প্লাবন প্রবাহিত করিয়াছিলেন, আর কুত্রাপি সেরূপ ভক্তির প্লাবন কেহ প্রবাহিত করিতে পারিয়াছিল কি না সন্দেহ। বাঙ্গালার জয়দেব, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস ভক্তিভরে তোমায় ডাকিয়া মুক্তি পাইয়াছে। কিন্তু আজ যে মা আমরা কাঙ্গাল। ভক্তির কাঙ্গাল, শ্রদ্ধার কাঙ্গাল, আমাদের উপায় কি হবে শঙ্করি! দাও মা, মা শঙ্করি! সেই ভক্তি, যে ভক্তিভরে তোমারে ডাকিলে আর তুমি স্থির থাকিতে পারিবে না। এই বাঙ্গালায় শ্রীরামকৃষ্ণ, কমলাকান্ত, রামপ্রসাদ যে ভক্তিভরে তোমাকে ডাকিয়াছিল, সেই ভক্তি একবার বাঙ্গালীকে দাও মা! তাহা হইলে তুমি আর স্থির থাকিতে পারিবে না। বাঙ্গালীর দুর্গতির সেই দিনই অবসান হইবে।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

অমিল

হায় কোথা এর মিল?
কত জীবনের স্থির সাধনায় গড়ে প্রেম-মঞ্জিল,
মানুষেরই জাতি; মনের মতন সাজায় হর্ম্ম্যমালা,
মঠ, মন্দির, আরোগ্যধাম, পণ্য-পান্থশালা;
প্রিয়জনে নিয়ে বাস করে সুখে, বান্ধবে ডেকে আনে,
প্রবাসী পান্থে সযতনে তোষে সম্ভ্রমে সম্মানে,
অন্ধ ভিখারী রাজপথ পার করি দেয় হাত ধরি,
আতুর কুকুরে, খঞ্জ অশ্বে, আরোগ্যে সেবা করি।

সেই ত মানুষ! আবার একদা ক্রূর হিংসায় মাতি,
স্নেহ, দয়া, মায়া, প্রেম, সবই ভুলি নাশ করে নরজাতি;
আগুন ছড়ায়, আবাস উড়ায়, প্রাণ-বায়ু ভরে বিষে,
স্থবির ও শিশু, জননীর জাতি যারে পায় মারে পিষে;
হাজার বছর-স্মৃতি দিয়ে পূত লুটে মন্দির-চূড়া,
সারা জীবনের শ্রমের কুটীর, নিমেষেতে হয় গুঁড়া;
অনলে জ্বালিয়া নগর ও গ্রাম আরামে সে ধরে তান,
যার গেল তার কতখানি গেল, কেবা করে পরিমাণ!

'আহা থামো, থামো, রাখো রাখো এই তাণ্ডব-অভিযান,
প্রেমের সৃষ্টি ধ্বংস করো না, ভগবান দেছে প্রাণ,
সুখহীন যদি, স্বল্প যদি বা, ভুঞ্জিতে তাহা দাও,
জাত-অধিকার যে স্বাধীনতার কেন তাহা হরি নাও?'
কেবা দেয় কান? ডাকে মহাপ্রাণ, ক্ষীণ সে কণ্ঠ নিয়া,
বুদ্ধ খ্রীষ্ট কেঁদে ফিরে গেছে, দুনিয়ার দ্বার দিয়া!
লোভ হিংসার দানব হারালো স্নেহ প্রেম অনাবিল।
হায়, কোথা এর মিল?

শ্রীগোপাললাল দে।

গোবর্দ্ধনদা'র বিয়ে

[নক্সা]

১
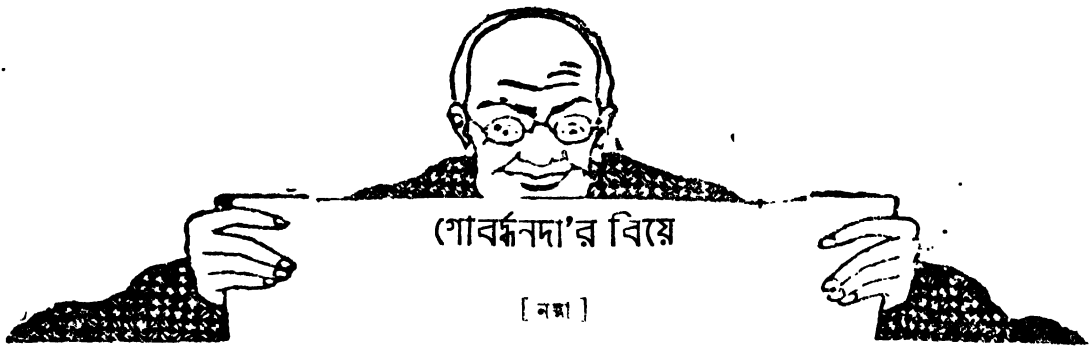
গোবর, গোবরা বা গবুচন্দ্র বললে কেউ তাঁকে চিনবে না; আফিস-শুদ্ধ লোকের 'গোবর্দ্ধনদা', ক্যাস ডিপার্টমেণ্টের কেরাণী। ঘরে বেকার অবস্থায় ব'সে-থেকে চতুর্দ্দিকে সর্ষপ-পুষ্প নিরীক্ষণ করছিলেন; তাই বড়বাবু দয়া করে তাঁকে ডেকে এনে কাজে বসিয়েছেন।

আমাদের আর সকলের তিনি 'গোবর্দ্ধনদা' হ'লেও, বড়বাবুর দু'-একটা মুখরোচক বকুনির সঙ্গে 'গোবর্দ্ধনদা'কে 'গবুচন্দ্র' নামে অভিহিত হ'তে হয়েছে; কিন্তু আমরা সে নাম মঞ্জুর করিনি।

শুনতে পাই, তাঁর চাকরীতে বহাল হওয়ার দিনের একটা ইতিহাস আছে—সেটা স্মরণীয় না হলেও শ্রবণযোগ্য। গোবর্দ্ধনদার গোবর্দ্ধনগিরিতুল্য বিরাট বপু দু' পাশে আয়তনওয়ালা চেয়ারে প্রবেশের সম্ভাবনা না থাকায় বড়বাবুর আদেশে সেই চেয়ারের দুই দিকের হাতা অপসারিত করতে হয়। তা দেখে সামনের আসনে উপবিষ্টা লেডী টাইপিষ্ট তরুণী অনিতাকে উদ্গত হাস্য সম্বরণ করতে না পেরে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে উঠে বাইরে যেতে হ'য়েছিল; তবে এটা অবশ্য জনশ্রুতি।

গোবর্দ্ধনদার বয়স কত, চেহারা দেখে তা নির্ণয় করবার জন্যে যে চশমার প্রয়োজন, তা না কি এখন পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। তবে কাজে অনভিজ্ঞতার ভয়, ও সারল্য-ভরা মুখ নিরীক্ষণ করলে মনে হয়, বয়স তাঁর বড় জোর সাতাশ হতে পারে; কিন্তু সেই মুখে যখন বিপুল গাম্ভীর্য্য সঞ্চিত হয়, তখন মনে হয়, 'নাঃ, বয়স বোধ করি সাঁইত্রিশও পার হয়ে গেছে'। এক দশকের ইতরবিশেষ তেমন মারাত্মক নয়। তবে সন্দিগ্ধচিত্তে তাঁকে সে কথা জিজ্ঞাসা ক'রলে তিনি কতকটা ক্ষাপা হয়েই বল্লেন, 'যে কাজ ক'রতে এসেছ তাই কর—নিজের চরকায় তেল দাও। আমায় ত' আর তোমার বাড়ীর জামাই করছো না যে, বয়স নিয়ে টানাটানি!'—তা যাই হোক, রং শ্যামবর্ণ হলেও দাদার-আমার ফুলো-ফুলো গোলগাল মুখে যে শ্রী আছে, তা অস্বীকার করা যায় না।

লিফ্‌ট চড়ে ওপরে উঠলেও, গোবর্দ্ধনদা চেয়ারে ব'সে অন্ততঃ মিনিট-তিনেক দম নেন—অনেকটা ফুটবলের হাওয়া ছাড়ার মতই!

সুজিৎ ছোকরা বিলক্ষণ রসিক; সে মুখে হাসির বিদ্যুৎ বিকাশ করে জিজ্ঞাসা করে, 'কি হ'ল দাদা?'

গোবর্দ্ধনদা নিশ্বাসত্যাগে ব্যস্ত থাকায় হঠাৎ কিছু ব'লতে পারেন না, কেবল বিরক্তিভরা দৃষ্টিতে অগ্নিবর্ষণ করেন; কিন্তু তাঁর কোপানলে কেউ দগ্ধ হয় না—এটা বিধাতারই বিবেচনার ত্রুটি!

অনিতা মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ করে বলে, 'কি হচ্ছে সুজিৎ বাবু! দাদা একটু মোটাসোটা বই ত নয়?' এ কথা শুনে আড়-চোখে দুই-একবার তাকান বটে, কিন্তু সেটা অস্বাভাবিক নয়।

রেকর্ড-কীপার পঞ্চানন বাবুর একটু বেশী বয়স হয়েছে, তাই তিনি দাদার পর্য্যায় ছাড়িয়ে 'পঞ্চু খুড়ো' খেতাবে প্রমোশন পেয়েছেন। সকলেই 'দাদা' 'দাদা' বলে শুনে, কি একটা উপলক্ষে তিনিও গোবর্দ্ধনদাকে 'দাদা' ব'লে সম্বোধন করেছিলেন। গোবর্দ্ধনদা তাঁর মত প্রবীণ লোকের তখন মুখে কিছু না ব'ললেও আড়ালে বড়বাবুর কাছে প্রায় কাঁদ-কাঁদ হয়ে এই ব'লে অভিযোগ করেন যে দেশে তাঁর বিয়ের কথাবার্ত্তা চ'লছে, কন্যাপক্ষের লোক কোন দিন হয় ত আপিসেই সন্ধান নিতে আসবে; আর ঐ পঞ্চু খুড়ো তাঁকে কি না 'দাদা' সম্বোধন ক'রে তাঁর সর্ব্বনাশ করতে বসেছে! তিনি একটু ছুলকায় বলে কি খুড়োর চেয়েও বুড়ো?

পরদিন আমরা সকলে পঞ্চু খুড়োর কাছে শুনলাম, বড়বাবু তাঁকে ডেকে না কি বলেছেন, 'পঞ্চানন! কেন ওটার সঙ্গে লাগ? ওটা নিতান্ত হাবা-গোবা—নিরীহ বেচারা!'

এ কথা শুনে অনিতা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে খানিকটা তাকিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরালো। আমি যেন তার মনের ভাব বুঝেও বুঝলাম না।

টিফিনের সময় গোবর্দ্ধনদা কারুর সামনে ঐ কার্য্যটি করতেন না। সুজিৎ, অনিতা অনেক দিন তাঁকে জিজ্ঞেসা করেছে, 'দাদা তোমার ঐ কৌটায় কি পদার্থ সঞ্চিত আছে?'

গোবর্দ্ধনদার বোধ হয় ভয়, ওর থেকে কিছু অংশ ওদের ভাগ দিতে হবে। তাই কতকটা সাবধান হয়েই টেবলের তলা থেকে সেটি তুলে নিয়ে নিজের কাছে রেখে দাদা কথাটা হেসে উড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'বিশেষ কিছু নয়, ওতে একটু জলখাবার আছে।'—কিন্তু এই জলখাবারটি যে কি বস্তু,—তা আমরা প্রথম প্রথম অনেক চেষ্টাতেও দেখতে পাইনি।

কিন্তু এক দিন বড়বাবুর কণ্ঠ থেকে 'গবুচন্দ্র' এই আহ্বান আসায় গোবর্দ্ধনদাকে তাড়াতাড়ি উঠে যেতে হ'ল। সুজিৎ এই সুযোগটার সদ্ব্যবহার করতে ছাড়ল না, অর্থাৎ গোবর্দ্ধনদার থিন্ এরারুট বিস্কুটের খালি টিফিন্-বাক্সটি লুকিয়ে রাখলে—একেবারে ল্যাট্রিনের পাশে, একটি খালি অপ্রয়োজনীয় প্যাকিং-বাক্সের ভিতর! কে জানতো যে, এই জন্য বেচারা গোবর্দ্ধনদাকে বড় সাহেবের সম্মুখে হাজির হ'য়ে কৈফিয়ৎ দিতে হবে!

ব্যাপারটা দাঁড়ালো এই রকম! মাঝে মাঝে আফিসের 'ষ্টোর-ডিপার্টমেণ্ট' থেকে নানা রকম জিনিস চুরি যায় শুনে বড় সাহেব তাঁর গুপ্তচরদের দ্বারা কোন কোন দিন আফিসের এ-কোণ থেকে

ও-কোণ পর্য্যন্ত সকল জায়গা 'সার্চ' করাতে আরম্ভ করালেন। পড়বি ত' পড়, গোয়েন্দা অপেক্ষাও ধূর্ত্ত—বড় সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারীর দ্বারা গোবর্দ্ধনদার সেই দুর্লভ টিফিন্-বাক্সটি একেবারে বড় সাহেবের হাতে গিয়ে দাখিল হ'ল! কিছুক্ষণ পরেই বড় সাহেবের বেয়ারা এসে—নিতান্ত গোবেচারা গোবর্দ্ধনদাকে সমনস্বরূপ জানিয়ে গেল 'বড়া সাব বোলাতা!'

গোবর্দ্ধনদা আফিসের কাজে বহাল হওয়ার পর বড় সাহেবের কাছে এই প্রথম তাঁর ডাক পড়লো। দাদা অষ্টমী পূজোর বলির পাঁঠার মতই কাঁপতে কাঁপতে সাহেবের কাছে চললেন। এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপারে আমরাও চকচকিয়ে গেলাম! সবারই ভাবনা, তাই ত' ব্যাপার কি? বড়বাবুও এ সংবাদ জানতে বেশী দেরী হ'ল না। সুইং-ডোরের সামনে দাঁড়িয়ে গোবর্দ্ধনদা আতঙ্ক-বিহ্বল স্বরে নিবেদন করলেন, 'মে আই কাম্ ইন্ সার?'

ভিতর থেকে মেঘমন্দ্র স্বরে উত্তর হ'ল, 'ইয়েস্।'

গোবর্দ্ধনদা ভয়ে ভয়ে সাহেবের সম্মুখে হাজির হয়ে কোন-রকমে যুক্ত-করে সেলাম দিয়ে দাঁড়ালেন।

বড় সাহেব তাঁর দিকে খানিকটা তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করলেন, 'হু ইজ গোবারডান্ ডাট্?'

গোবর্দ্ধনদার ভিতরটা আতঙ্কে শুকিয়ে গিয়েছিল; অতি কষ্টে তিনি উত্তর দিলেন, 'হাম ওই আদমী হোতা-হ্যায় হুজুর?'

বড় সাহেব দাদাকে তাঁর মাতৃভাষায় অনভিজ্ঞ দেখে আরও জোরে বল্লেন, 'ক্যাস্-ডিপার্টমেণ্টমে টোম কাম করটা?'

এবার কিন্তু দাদা আফিসের বাঁধা বুলি আওড়ালেন, 'ইয়েস্ সার!'

ঠিক এই সময় বড়বাবু সেখানে গিয়ে হাজির! অতঃপর বড় সাহেব গোবর্দ্ধনদার টিফিন-বাক্সটি দেখিয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, 'টোম্ লোগ্ আজকাল বহুট চালাগ হোগিয়া,—ট্টোরসে মাল চোরি করকে একদম লাটি্বিন ম ছিপাতা?' তার পর করজোড়ে দণ্ডায়মান বড় বাবুকে সম্বোধন করে বল্লেন, 'ওয়েল বোস্! ইউ এপয়েণ্টেড্ দিজ্ থিফ্?'

বড় বাবু ক্ষীণ স্বরে বল্লেন, 'ইয়েস্ সার!'

গোবর্দ্ধনদা আকাশ থেকে পড়লেন। একটু সাহস সঞ্চয় করে, জড়িত স্বরে বল্লেন, 'উস্‌'ম আমার টিফিন-খানা হ্যায় সাব!'

বড় সাহেব তখন রাগে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য! এত-বড় একটা বিস্কুটের টিন যে অর্দ্ধ ছটাক অন্ন নাকে-মুখে গোঁজা কোনও আফিস্-বাবুর টিফিন-বাক্স হতে পারে, তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি; গোবর্দ্ধনদার হিন্দী-বাংলার খিচুড়ী অগ্রাহ্য করে ধমকে উঠলেন, 'সাট্-আপ্ ইউ মিস্‌চিভাস্ থিফ! তোম লোগকা চালবাজি হাম বহুট সমঝাটা।'

গোবর্দ্ধনদার মাথায় যেন বোমা ফাটলো। তিনি ভয়ে চমকে উঠলেন,—কোনও কথা তাঁর মুখ দিয়ে সরলো না।

কিন্তু বড়বাবু সেই বাক্সটি নিরীক্ষণ করে মুহূর্ত্তেই ব্যাপারটা উপলব্ধি কল্লেন; বল্লেন, 'অল্ রাইট সার, লেট্ আস সি হোয়াট হি হ্যাজ ষ্টোলন্'

বড় সাহেব ক্রোধভরে একবার তাঁর দিকে তাকিয়ে, পাটের দড়ি-বাঁধা বাক্সটি খুলতেই হাতের ঝাঁকানিতে ভিতর থেকে খানিকটা আলুর দম-সাহেবের দেহে ছড়িয়ে-প'ড়ে তাঁর সুটটি ঝোল-মাখা করে দিল! সাহেব তাড়াতাড়ি বাক্সটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বল্লেন, 'ডাটি!'—প্রায় দিস্তাখানেক রুটি ও তরকারী মেঝেয় ছড়িয়ে পড়ল। সাহেবের তখন আর প্রকৃত ব্যাপার বুঝতে বাকী রইল না। তাঁর বৃষভ-কণ্ঠনিঃসৃত বিকট হো-হো হাস্যধ্বনিতে আফিস-ঘর প্রতিধ্বনিত হল। বড় বাবু উপস্থিত বিপদ থেকে মুক্তি লাভ করে খানিক শুষ্ক হাস্যধ্বনি তাতে যোগ করলেন। গোবর্দ্ধনদা লজ্জায় ম্লান হ'য়ে বিক্ষিপ্ত রুটি-তরকারীর দিকে করুণ নেত্রে চেয়ে রইলেন! দাদার বোধ হয় চাকরী গেলেও মনে অতখানি কষ্ট হ'ত না। এতগুলা খাবার 'ন দেবায় ন ধর্ম্মায়' কিছুতেই লাগলো না! কি আফশোস!

গোবর্দ্ধনদার ঐ 'দস্তাখানেক টিফিন-খানা দেখে সকলেই সবিস্ময়ে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। বড় সাহেব কৌতূহল সম্বরণ করতে না পেরে বলে ফেল্লেন, ইস্‌মে টোমারা টিফিন-খানা হ্যায়?'

গোবর্দ্ধনদার জামা তখন ঘামে ভিজে উঠেছে। লজ্জিত ভাবে কোন রকমে ঘাড় নেড়ে উত্তর দিলেন। বড়বাবু দাদাকে রক্ষা করবার আশায় এবার করুণ স্বরে বল্লেন, 'পুয়োর ভিলেজম্যান্ স্যার! ইগনোরাণ্ট এ্যাণ্ড ভেরী সিম্পল।'

এবার বড় সাহেব গোবর্দ্ধনদাকে নিজের কাছে ডেকে তাঁর এই ভুলের জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন, এবং পার্স থেকে একখানি পাঁচ-টাকার নোট বার করে বল্লেন, 'অল রাইট গোবরডান! দিস্ ইজ মাই পেনালটী।' গোবর্দ্ধনদা বড়বাবুর ইঙ্গিতমত তা গ্রহণ ক'রে টিফিন-বাক্সটি তুলে নিলেন, এবং প্রকাণ্ড সেলাম ঠুকে সিংহের বিবর ত্যাগ করলেন। গোবর্দ্ধনদার ভবিষ্যৎ চিন্তায় আফিসের কাজে আমাদের মন লাগছিল না। দেখি, দাদার জামা এবং কাপড়ের অধিকাংশই ভিজে সপ-সপ করছে, কিন্তু লঙ্কাকাণ্ডের বীরটির অনুকরণে বিজয়ীর মত সদর্পে গোবর্দ্ধনদা তাঁর আফিস-ঘরে প্রবেশ করলেন। এত দিন পর দাদার টিফিন-বাক্সের প্রকৃত মহিমা আমাদের উপলব্ধি হল। আরও দেখলাম, তাতে টাইপের অক্ষরে ছাপা একটি লেবেল আঁটা আছে,—"বাবু গোবর্দ্ধন দত্ত, ক্যাস ডিপার্টমেণ্ট।" আলুরদমের তরলাংশের প্রলেপে লেবেলের হরপগুলা প্রায় ঢেকে গেছে! কাজের তাড়ায় তখন আর কোন কথা জিজ্ঞেসা করা হল না।

২

গম্ভীরপ্রকৃতি গোবর্দ্ধনদাকে বিরক্ত করলে তিনি ক্রুদ্ধ হ'য়ে 'ডাম', 'ইডিয়ট' প্রভৃতি পৌরুষজ্ঞাপক শব্দে হুঙ্কার দান করে মানসিক উষ্ণতা হ্রাস করতেন; কিন্তু আমাদের বন্ধুবৎসল অন্তরে তাতে কোন দিন ক্ষোভের রেখাপাত হয়নি। তবে সহকর্ম্মী সুজিতের সঙ্গে গোবর্দ্ধনদার খুঁটি-নাটী সর্ব্বক্ষণই লেগে আছে; কিন্তু এখন আর দাদাকে আগের মত 'সিরিয়স্' দেখা যায় না। তার উপর অনিতার টিপ্পনী ঝালের পর চাটনীর মত মুখরোচক। তাই অনিতার ঠাট্টা বিদ্রূপে গোবর্দ্ধনদা আকর্ণবিস্তৃত বদন উদ্ঘাটিত করে হো হো শব্দে হেসে রসগ্রাহিতার পরিচয় দিয়ে থাকেন; তা দেখে পাশ থেকে পঞ্চু খুড়ো অমনি গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করেন, 'খুব ত' হাসছো গোবর্দ্ধনদা! কিন্তু তোমার খে-থা হ'য়েছ?'

আর যাবে কোথায়? দাদা অমনি ফোঁস্ ক'রে বলেন, আবার দাদা! তা নাই বা হ'ল ও-কর্ম্ম, তাতে আপনার কি?'

অনিতা বিদ্রূপ করলেও তার সুন্দর মুখে ঈষৎ লজ্জার আভা দেখা যায়; আমার পানে সে কতকটা লজ্জা-রঙিন ভাবে তাকায়,—

কিন্তু আমি তার দিকে ফিরে চাইবার পূর্ব্বেই সে তাড়াতাড়ি মেসিনের চাবি টিপে খটাখট্ শব্দ আরম্ভ করে! স্তম্ভিত গোবর্দ্ধনদাকে সঙ্কট থেকে উদ্ধার করবার জন্ত হেসে বলে, 'খুড়ো, আপনি দাদাকে জানেন না, গোবর্দ্ধনদা আমাদের ভীষ্মদেব!' শুনে সকলেরই মুখে হাসি ফোটে; কিন্তু বড়বাবু পাছে দেখতে পান, এই ভয়ে মুখ টিপে চাপা হাসি হাসতে হয়।

এ হেন গোবর্দ্ধনদার হঠাৎ তিন দিন আফিস কামাই! সুতরাং আফিসের কাজে আমাদের মন বসে না। দাদার সেই হাতলহীন চেয়ারখানা খালি—যেন রাজপরিত্যক্ত সিংহাসন! চতুর্থ দিনে দেখি, গোবর্দ্ধনদা শুক্‌নো মুখে আফিসে এসে হাজির। চার দিক্ থেকে প্রশ্নের পর প্রশ্নবাণ বর্ষণ! 'কি হ'য়েছিল, দাদা, এদ্দিন আফিস কামাই যে?'—ইত্যাদি।

সুজিৎ বল্লে, 'কি গোবর্দ্ধনদা! ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা খণ্ডাতে দেশে গেছলেন না কি?'—প্রশ্নজালে বিব্রত না হয়ে তিনি সকলের দিকে একবার স্থিরদৃষ্টিতে তাকালেন মাত্র। কোনও উত্তরই পাওয়া গেল না!

ছুটীর পর অনেক অনুনয়-বিনয় করে অনিতা এই খবরটি আদায় করলে আফিস্-ফেরং গোবর্দ্ধনদা কোন এক দূগ্ নিওয়ালার সঙ্গে বাজী রেখে তার বাক্সের ১৯টি হাঁসের ডিম বিনামূল্যে উদরস্থ করায় তাঁর এই কামাই! শুনলাম, বড় সাহেবও না কি তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন; গোবর্দ্ধনদা তার উত্তরে অনেক ভেবে-চিন্তে সাহস সঞ্চয় করে বলেছিলেন, 'ম্যাঙ্গো-শোপ উইথ বেড ব্লাড সার!' এই অপূর্ব্ব ইংরেজীর অর্থ, রক্ত-আমাশা হওয়ায় তাঁকে কামাই কর্ত্তে হয়েছে।

প্রতি-বছর আমরা জনকয়েক বন্ধু দু'-পাঁচ টাকা চাঁদা তুলে একটা 'ফিষ্ট' করতাম।—তার স্থানটি ছিল আমারই জনমানবহীন বাইরের ঘর। গোবর্দ্ধনদাকে ধরা হল, তাঁকে তিন টাকা চাঁদা দিতে হবে।

দাদা সমস্ত ব্যাপার অবগত হয়ে বোধ হয় মনে মনে হিসাব ক'রে দেখলেন, ঐ তিন টাকায় ছ'টি দিন ঐ রকম খাওয়া চলতে পারে; তাই গম্ভীর হ'য়ে বল্লেন, 'হুঁ!'

সুজিৎ এই সংক্ষিপ্ত মন্তব্য শুনে তাঁকে চেপে ধরে বল্লে, 'দাও না দাদা, টাকা তিনটে; বছরে ঐ একটা দিন বই ত' নয়!' কিন্তু গোবর্দ্ধনদা তাঁর দীর্ঘ দন্তে আধখানি জিহ্বা কর্ত্তন করে অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বল্লেন, 'পাগল হয়েছ ভাই! এই সে দিন অত-বড় সাংঘাতিক রক্ত আমাশায় ভুগে এখন পর্য্যন্ত সুধরে উঠতে পারিনি, আমি গিলবো ঐ সব পোলাও মাংস? আরে, ডাক্তার ত' সতর্ক কর'বার জন্তে বলেই দিয়েছে, গোবর্দ্ধন! গাঁদাল-ঝোল আর পোরের ভাত ছাড়া আর কিছু খেয়েছ কি মরেছ!' অবশ্য, এর পর কারও আর কিছুই বলবার ছিল না। সত্যিই ত', গরীব লোক, যখন খাবেন না—তখন চাঁদাই বা তাঁর কাছে চাওয়া যায় কোন্ যুক্তিতে? কিন্তু বছরের ঐ একটা দিনের উৎসবে গোবর্দ্ধনদা থাকবেন না, এটা যেন আমরা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছি নে।

কাজের চাপে তখনকার মত কথাটা চাপা পড়ে গেল। ছুটীর পর প্রায়ই খেলার মাঠটা বেড়িয়ে যাই। চৌরঙ্গীর মোড় পার হয়ে মাঠের রাস্তা ধরেছি, কপাকপ শব্দ শুনে পিছনে তাকিয়ে দেখি, সশরীরে গোবর্দ্ধনদা পৈতৃক ছাতাটি বগলে নিয়ে উবুড় হয়ে বসে, ফেরিওয়ালার কাছ থেকে জলকচুরী কিনে প্রতি সেকেণ্ডে একটি করে উদর-গহ্বরে নিক্ষেপ করছেন! মিনিট-খানেক অবাক হ'য়ে তাকিয়ে রইলাম,—মনে ভাবলাম, রক্ত-আমাশার উপযুক্ত পথ্যই বটে! শেষের দিকে একখানা শালপাতা ভর্ত্তি ক'রে তেঁতুলের টক-জল খেয়ে গোবর্দ্ধনদা ঝাল-লাগার প্রতিকার করে, পকেট থেকে একটি চকচকে সিকি বার করে—'চার আনা পুরা হুয়া না?' বলে ফেরিওয়ালাকে সেটা দিতেই,—আমি পিছন থেকে তাঁর পিঠে একটা চাপড় মেরে বল্লাম, 'এখানে ও কি হচ্ছে দাদা?'

আমায় দেখে দাদা চমকে উঠে প্রথমটা যেন কিছু অপদস্থ হলেন! তার পর অন্ত দিকে মুখ ফিরিয়ে উপস্থিত লজ্জার ভাবটা কাটিয়ে দিয়ে হাত-মুখ নেড়ে বল্লেন, 'আর ব'ল কেন ভাই। ডাক্তার বলেছে, তেঁতুলের জল বেশ হজমী জিনিস। তাই একটু খেতে হচ্ছে।'

অগত্যা গোবর্দ্ধনদার দেয় ফিষ্টের চাঁদার দরুণ টাকা তিনটে আমাকেই দিতে হ'ল—শুধু সেই উৎসবে দাদাকে পাব বলে। গোবর্দ্ধনদা বাড়ীতে গাঁদাল-ঝোল আর পোরের ভাত খেতেন কি না কে জানে? কিন্তু সে দিনের ফিষ্টে দাদা আমাদের বিস্তর অনুরোধে যখন খেতে বসলেন, তখন ক্ষিদে নেই, এই অজুহাতে দু'খানি কলাপাতা জোড়া দিয়ে বার-ছয়েক মুখরোচক পাঁঠার মাংস চেয়ে নিয়ে অরুচি দূর করেছিলেন! তা দেখে সুজিৎকে বাধ্য হ'য়ে ব'লতে হ'য়েছিল, 'আর দাদা, সবই যে ফুরিয়ে গেছে!' এমনি ভাবে গোবর্দ্ধনদা আমাদের নৈশ ক্লাবে যোগ দিয়ে বেশ জেঁকে বসলেন—শুধু সন্ধ্যার মুখে আমার ওপর দিয়ে চা টোষ্ট চালাবার লোভে!

দাদা তাঁর বেকার অবস্থায় দেশে রাম ঠাকুর্দ্দা, দীনু খুড়ো প্রভৃতি প্রবীণদের দলে ভিড়ে দাবা, পাশায় যে অতখানি পোক্ত হ'য়ে উঠেছিলেন, তা আমরা জানতাম না; কিন্তু সে দিন রাত দু'টো পর্য্যন্ত খেলা করে পঞ্চু খুড়োকে উপরি-উপরি দুই বাজী মাৎ ক'রে দিয়ে সগর্ব্বে বলেছিলেন, 'আরে খুড়ো, আপনি ত' ছেলে মানুষ! দেশে রাম ঠাকুর্দ্দাকে বাজী রেখে গজ-চক্র ক'রে দু'-দু'টো পাঁঠা জিতেছি।' সে দিন বাস্তবিকই আমরা অবাক হয়ে গিছলাম! প্রতি-শনিবারই দাদা দেশে যান, সেই সময় অন্য সকলে আড্ডায় থাকলেও ক্লাব কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকে! কিন্তু শেষে গোবর্দ্ধনদা আড্ডায় এমন জেঁকে বসলেন যে, অনেক শনিবারে তাঁর বাড়ী যাওয়াই ঘটে উঠতো না; গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত খেলায় মসগুল থাকায় কত দিন ঘুম থেকে ঠিক সময়ে উঠতে পারেননি ব'লে আফিসে তাঁকে 'লেট' হতে হয়েছে।

আমি অনুরোধ করতাম, "দাদা, এবার একটা বিয়ে টিয়ে ক'রে ফ্যালো? কারণ, 'গৃহিণী গৃহমুচ্যতে' এটা শাস্ত্রের বিধান।"

গোবর্দ্ধনদা একটু হেসে বলতেন, 'সে জন্তে আর চিন্তা কি?—ওটা করলেই হ'ল।'

অবশেষে এক দিন শুভযোগও উপস্থিত হ'ল। শুনলাম, দাদা এক হপ্তার ছুটী নিয়ে বাড়ী যাচ্ছেন—তাঁর বিয়ে ঠিক হয়েছে। আমরা তাঁকে ছেঁকে ধরলাম,—'কি দাদা! বিয়েতে আমাদের ফাঁকি দেবে? তা হচ্ছে না কিন্তু!'—কিন্তু দাদার মুখ দেখে বুঝলাম, সত্যই তিনি অপারগ, কারণ, কন্যাপক্ষ খুবই গরীব। যাই হোক, 'জয় জয়' ধ্বনিতে আমরা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ক'রে দাদাকে বিদায় দিলাম; তবে এই রকম চুক্তি হ'ল যে, বিয়ের পর নব-দম্পতি বাড়ী এলে এক দিন

সেখানে আমাদের পালা পড়বে। কিন্তু গোবর্দ্ধনদার অনুপস্থিতিতে এই এক সপ্তাহ অফিস আমাদের ডিপার্টমেণ্ট ও নৈশ আড্ডা যেন প্রাণহীন হ'য়ে পড়েছিল।

মাসখানেক পরে দেখা গেল, গোবর্দ্ধনদা তাঁর নববধূকে দেখবার জন্য এক কবিতা লিখে আমাদের নিমন্ত্রণ করেছেন।

তবে সে কবিতা ছাপবার পয়সাটা তিনি বাঁচিয়েছিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিন প্রত্যেকেই চাঁদা দিয়ে একটা বড় গোছের উপহার সংগ্রহ করে দাদার বাড়ীতে আমরা সবশুদ্ধ উপস্থিত হলাম। আহারাদির পর দাদা লজ্জিত ভাবে বল্লেন, 'এস ভাই সব, আসুন অনিতা দেবী!' বৌ দেখবার জন্যে আমরা উঠছি, সেই সময় দাদা সুজিৎকে অনেক অনুনয় করে বল্লেন 'দেখিস্ ভাই, তোর পায়ে পড়ি,—বৌ পাড়াগাঁয়ের মেয়ে কি না—অত-শত বোঝে না ত'; তোরা নিন্দেমন্দ করিস্ নে যেন!'

অনিতা পাশ থেকে বল্ল, 'না দাদা, সে ভয় নেই তোমার।' কিন্তু দাদার ঐ সুজিৎকেই সব চেয়ে বেশী ভয়! বৌ দেখতে সকলে গিয়ে ঘরে ঢুকলাম। দেখলাম, পল্লীগ্রামের একটি বেশ ডাগর মেয়ে—নববধূর সাজে ঘরটিতে একটা মধুর আবেশের সৃষ্টি করেছে; সত্যই, সীমন্তে সিন্দুরবিন্দু-ভূষিতা হিন্দুর ঘরের সলজ্জ নববধূর রূপের একটা বৈশিষ্ট্য আছে।

অনিতা নববধূর হাতে উপহারটি দিয়ে বল্লে, 'আপনার নামটি এখনও জানতে পারিনি বৌদি! দয়া ক'রে বলবেন?'

সলজ্জ মৃদু-মধুর কণ্ঠে বৌ উত্তর দিল—'মাধবী।'

হঠাৎ পাশ থেকে সুজিৎ বলে উঠলো, 'তা বেশ, কিন্তু দাদাকে একটু চালিয়ে নেবেন—বৌদি! দাদা আমাদের ভোলা-মহেশ্বর কি না,—তাই রক্ত-আমাশাটা আরাম হলে পথ্য করেছিলেন পাঁঠার মাংস; হাঁড়িকে হাঁড়ি কাবার করেছিলেন,—একটা আস্তো পাঁঠার প্রায় সের পাঁচেক মাংস!'

আমরা অতিকষ্টে হাস্য সম্বরণ করলাম। হাসি চাপতে গিয়ে কেউ কাসতে লাগলো, কারও বা হাঁচ্চো-হাঁচ্চো শব্দে উৎকট হাঁচি, কেউ বা মুখে রুমাল চাপা দিল। গোবর্দ্ধনদা 'হাঁ-হাঁ ঢের হ'য়েছে থাম'—ব'লে কোনও রকমে গাম্ভীর্য্য বজায় রাখলেন। দাদার অর্দ্ধাঙ্গীটি ত' ছেলেমানুষ নন, রসজ্ঞান হয়েছিল; তিনি স্বামীর অতগুলো বন্ধুর সামনে চোখ-মুখ বুজে কোন রকমে উচ্ছ্বসিত হাসির বেগ দমন করলেন।

শম্ভু খুড়ো বল্লেন, 'যাক্; এত দিনে গোবরার ভীষ্ম নাম ত' ঘুচলো; আর বৌমাটিও হয়েছে যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।'

আমরা একবাক্যে তাঁর এই মন্তব্যের সমর্থন করলাম। রাত্রি-কাল, হ্যারিকেনের স্তিমিত আলোকে ও লোকের ভীড়ে বৌর মুখ বেশ ভাল ক'রে দেখতে না পেলেও—দেখলাম, দাদার গোল-গাল মুখে আনন্দের রক্তিম আভা ফুটে উঠেছে! সুজিৎ বল্লে, 'দেখবেন বৌদি!, দাদাকে একটু ঘুমুতে টুমুতে দেবেন,—দাদা আমাদের বড্ডই ঘুম-কাতুরে কি না। সময় ঘুম না ভাঙ্গায় আফিসে যেন লেট্-ফেট্ না হয়। হাঁ!'—

এ কথায় অনিতা এক বার সলজ্জ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ওদিকে একটু স'রে গেল। গোবর্দ্ধনদা খুসি নীরব আস্ফালনে সুজিৎকে ভয় দেখালেন। সকলে একে একে বললে, 'গুড্ লাক্'; 'হাঁ, মনের মত বৌ পেয়েছ বটে!' ইত্যাদি। সুজিৎ মন্তব্য করলে, 'রয়ে স'য়ে ভোগ কোরো দাদা।' তার পর বন্ধুগণ সকলে বিদায় নিল। শেষে দাদা দরজা পর্য্যন্ত আমাদের এগিয়ে দিতে এসে খুব কুণ্ঠিত ভাবে আমায় জিজ্ঞেসা করলেন, 'রমেশ! সত্যি ক'রে বল্ ভাই, কেমন দেখলি?'

আমি দাদার পিঠ চাপড়ে উৎসাহিত ক'রে বল্লাম, 'সত্যি গোবর্দ্ধনদা, হাজার বছর তপস্যা করে এমন বৌ লোকে হাজারে একটিও পায় কি না সন্দেহ!' দরজায় তখন অন্ধকার, তবু দূরের আলোয় দেখলাম—দাদা সে কথা শুনে আনন্দে চঞ্চল হয়েছেন; তিনি দুই হাতে আমাকে জড়িয়ে ধ'রে আবেগভরে বললেন, 'কি করবো ভাই বল? বাপ-মা কেউই নেই কি না, তাই সে দিন রাত্রে কেঁদে-কেটে বল্লে, আমি যে এত সুখী হ'ব তা স্বপ্নেও ভাবিনি। তা পকেট থেকে প্রায় শ'-তিনেক টাকা খরচ হ'য়ে গেল! কি করি? ঘর-সংসার করতে হ'বে ত'?'

'টাকা ঢের উপার্জ্জন হ'বে দাদা,—কিন্তু অমন লক্ষ্মী বৌ কি আর পেতে?' ব'লে আমি সকলের শেষে বিদায় নিলাম। সঙ্কীর্ণ গলি, তার উপর ব্লাক্ আউট্! অন্ধকারে আশে-পাশে নজর রেখে সাবধানে চলেছি।—মোড়ের মাথায় এসে দেখি—গ্যাস্‌পোষ্টে হাত রেখে অনিতা দাঁড়িয়ে আছে! গ্যাসের আবছা আলোয় অনিতাকে আজ নবরূপে দেখলাম। উজ্জ্বল দিনের আলোয় কর্ম্মনিরতা অনিতার চেহারার সঙ্গে তার এই চেহারার যেন সামঞ্জস্য নেই। দেখলাম—ঘন কুঞ্চিত কেশের কতকগুলো উড়ে-এসে তার চোখে মুখে পড়েছে। যেন তা তার ঢল-ঢল, ভাববিহ্বল, উজ্জ্বল নয়ন-যুগলকে কিছু বলতে দিতে চায় না।

আমি বল্লাম, 'সুজিৎ আপনাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দেয়নি?'

অনিতা অন্য দিকে তাকিয়ে বল্লে, 'না; আমিই তাকে চলে যেতে বলেছি।'

আমি মন সংযত করে মৃদু স্বরে বল্লাম, 'বেশ, তা হ'লে চলুন এগন।' মোড়টা পেরিয়ে আমিই বল্লাম, 'গোবর্দ্ধনদার খাসা বিয়ে হ'ল, কি বলেন?' অনিতা অস্ফুট স্বরে বল্লে, 'হাঁ!'—ঝিরঝিরে নৈশ বাতাসের সঙ্গে তার চাপা নিশ্বাস মিশে গেল। রাস্তায় তখন জনসমাগম নাই;—আমি আর অনিতা পাশাপাশি চলেছি। চলতে চলতে অনিতা বল্লে, 'এই ত' সে দিন চাকরী আরম্ভ করলে, এরই মধ্যে কেমন মনের মত বৌ খুঁজে নিয়ে তাকে বিয়ে ক'রে ফেল্লে!'—শেষের কথাগুলি অপরিস্ফুট হ'য়ে নৈশ নীরবতার সঙ্গে মিশে গেল।

আমি একটু ভেবে নিয়ে বল্লাম, 'হাঁ, সময় হ'য়েছে তাই!'—এ কথায় অনিতা একবার চকিত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাইল, —কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য।

৩

জমাট শীতের পর ঈষদুষ্ণ সুখস্পর্শ বসন্তের সমাগম হয়,—বিয়ের পর গোবর্দ্ধনদারও প্রাণে তার একটু সাড়া মিললো। এটা খুবই স্বাভাবিক; এ হতেই হ'বে—প্রকৃতির নিয়ম কি না!

সেই নীরস নিরেট গোবর্দ্ধনদা,—ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে প্রত্যহ দশটা-পাঁচটা কলম পিষে উদরান্নের সংস্থান করতেন। এখন তাঁর কি ঘোর পরিবর্ত্তন! আধ ময়লা ছিটের সার্টের পরিবর্ত্তে তাঁর বিশাল

বপু টিস্ক্র পাঞ্জাবীতে আবৃত। পায়ের নিউ-কাটটি চকচকে, কদম্ব-কেশরের মত খোঁচা খোঁচা খাড়া চুলের গোছা কপাল থেকে পিছন দিকে ফেরাবার জন্ত অশেষ চেষ্টা! মুখমণ্ডলে ভেজলিং, ক্রীম, পাউডার প্রভৃতির প্রলেপে একটা সমত্ন-রচিত কৃত্রিম শুভ্রতার ছাপ। মুখে কতকটা চেষ্টাসাধ্য সরলভাব হাসি ফুটিয়ে গোবর্দ্ধনদা আফিসে হাজির৷ দেন। 'গুড মর্ণিং এভ্রি বডি' ব'লে, পাখার নীচে বসেন; বিজলি-পাখার বাতাসে অগুরুর সুবাস আফিস-কক্ষের বায়ুস্তর সুরভিত করে।

পঞ্চু খুড়ো সে দিন আর থাকতে না পেরে ফস্ ক'রে ব'লে ফেল্লেন, 'গোবরা কি শ্বশুর বাড়ী যেতে যেতে পথ ভুল এখানে এলি?'

সুজিৎ ও অমিতা তাঁর কথা শুনে হেসে উঠলো; চার দিকে রস ছড়িয়ে পড়লো।

গোবর্দ্ধনদা আড়চোখে পঞ্চু খুড়োর দিকে তাকিয়ে লজ্জিত ভাবে বল্লেন, 'না, এই একটু ইয়ে কি না।' সুজিৎ বল্ল, 'বুঝলেন খুড়ো, ওটা হচ্ছে দশ দিন মহাযুদ্ধের পর ভীষ্মের শরশয্যা।' আমরা আর হাসি চেপে রাখতে পারলাম না। ফিরে চেয়ে দেখি—গোবর্দ্ধনদার পালিশকরা মুখখানির পালিশ অভিমানে ফিকে হয়ে উঠেছে। কিন্তু কাজের চাপে এ সব প্রসঙ্গ চাপা পড়লো।

টিফিনের পর গোবর্দ্ধনদা চুপি চুপি আমায় ডেকে বললেন 'কি করি ভাই বল! তোমাদের বৌদির হুকুম, ফিটফাট থাকা চাই। তার কোন ত্রুটি হলে মুখ অন্ধকার হয়ে যায়। আমি নিরুপায়! সখ করে কে আর বুড়ো বয়সে এ ভাবে সঙ সাজে?'

দাদার অভিমানভরা বাণায় আমার অন্তর বেদনায় টন-টন্ করে ওঠে। তাঁকে শান্ত করে বলি, 'তুমি ওদের কথা শোন কেন?' আমার কথায় গোবর্দ্ধনদা যেন কতকটা শান্তিলাভ করেন। আহা বেচারা, একটু সহানুভূতির কাঙ্গাল!

সারা টিফিনের সময়টাতেই আমাকে গোবর্দ্ধনদার দৈনন্দিন নৈশ অভিযানের কথা শুনতে হয়; ফুলশয্যার রাত্রে গোবর্দ্ধনদার দূর-সম্পর্কের এক ভগিনী খাটের নীচে ওৎ পেতে বসেছিল; মাধু অর্থাৎ দাদার অর্দ্ধাঙ্গিনী কোন কথা না বলে এক-গলা ঘোমটার ভিতর থেকে শুধু অঙ্গুলিসঙ্কেতে দাদাকে সেটা জানিয়ে দিয়েছিল। অতএব তিনি সপ্রমাণ করলেন তাঁর স্ত্রী কি অসাধারণ বুদ্ধিমতী! এই ভাবে গোবর্দ্ধনদা নিত্যই তাঁর পত্নীর নানা গুণের ব্যাখ্যা করতেন। মুখে তাঁর ফুটে উঠতো একটা অবর্ণনীয় আনন্দ।

তার পর টিফিন শেষ হওয়ার সঙ্গে তাঁর কবিত্বের বিরাম হতো। এটা দৈনিক ঘটনা, প্রত্যহই এই ভাবে আমাকে তাঁর প্রেমের গুঞ্জন সহ্য করতে হয়, কিন্তু আমি নিরুপায়!

আজকাল ছুটীর কিছু পূর্ব্ব থেকেই গোবর্দ্ধনদাকে যেন কিঞ্চিৎ চঞ্চল দেখা যায়। যদিও আমি বিবাহিত নহি—তথাপি বুঝতে পারি—এই চঞ্চলতার কারণ কি? কোন্ চঞ্চলার এ আকর্ষণ?

ফাইল-পত্র গুছোতে গুছোতে গোবর্দ্ধনদা ঘন ঘন ঘড়ি দেখেন। পঞ্চু খুড়ো বলেন, 'অত তাড়া কিসের হে গোবর্দ্ধন? দিন-দুপুরে কেউ ত' আর ডাকাতি করতে আসছে না? তবে আর লুঠপাটের ভয় কি?'

গোবর্দ্ধনদা অভিমানের সুরে বলেন, 'যান খুড়ো, আপনার সব তাতেই ঠাট্টা! সময় অসময় জ্ঞান নেই। জানেন, আজকাল আমার কত কাজ?'

পকেট থেকে একখানি বিল বার করে গোবর্দ্ধনদা বল্লেন, 'এখনি কি ফেরবার যো আছে? ধর্ম্মতলা থেকে ফটো নিয়ে যেতে হবে।'

পঞ্চু খুড়ো হেসে বল্লেন, 'আচ্ছা, যা হবে; কিন্তু সন্ধ্যের পর আসছিস ত'? একহাত বসা যাবে, কি বলিস্?'

গোবর্দ্ধনদা অন্যমনস্ক ভাবে 'হ্যাঁ' বলে কোনও রকমে রেহাই পেলেন।

সন্ধ্যার পর সকলেই ক্লাবে উপস্থিত। আমরা ব্রীজে মনঃসংযোগ করলাম। পঞ্চু খুড়ো দাবার ছক পেতে অধীর ভাবে গোবর্দ্ধনদার প্রতীক্ষা করছেন; শেষে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বল্লেন, 'রমেশ! গোবরার আক্কেল দেখছিস্—সাড়ে সাতটা বাজতে চল্লো, এখনও তার দেখা নেই! নাঃ, বিয়ে করলে আজকালকার ছেলেগুলোর কিছু পদার্থ থাকে না। ছোঁড়া দেখছি একেবারে বৌ-মুখো হ'য়ে উঠেছে।' তাঁর মন্তব্য শেষ হওয়ার সঙ্গেই গোবর্দ্ধনদার আবির্ভাব! তিনি কোন কথা না বলে—কাগজে-মোড়া কি একটা জিনিস আমার কোলের উপর ফেলে দিলেন। আমি সোৎসাহে বল্লাম, 'ওঃ—সেই ফটো বুঝি?'

দাদা চোখ টিপে ইসারা ক'রে একটু হাসলেন মাত্র। তার পর সকলেই আগ্রহভরে কলরবের সঙ্গে ছবি দেখলে। আমি বল্লাম, 'বাঃ, খাসা হ'য়েছে!' হঠাৎ সুজিৎ মধ্যে থেকে বল্ল, 'বেশ ব'লে বেশ! ঠিক যেন অশোকবনে সীতা, আর হনুমান তাঁর সম্মুখে!' আশপাশ থেকে দু' এক জন এ কথায় হাসলেও গোবর্দ্ধনদার করুণ মুখের পানে চেয়ে, সুজিতের সেই ব্যঙ্গোক্তিতে আমি হাসতে পারলাম না। পঞ্চু খুড়োর কড়া তাগিদে নীরব অভিমানে গোবর্দ্ধনদাকে দাবা নিয়ে ব'সতে হ'ল। কিন্তু দাদার খেলায় পূর্ব্বের সে কলা-কৌশল, চালের মার-প্যাঁচ আর দেখতে পাই নে! গোবর্দ্ধনদা খেলতে খেলতেও ঘন ঘন ঘড়ি দেখেন, তবু অত্যন্ত পাকা হাত। কোনও রকমে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। পঞ্চু খুড়ো যখন চাল দেন, গোবর্দ্ধনদা তখন একমনে ছবি দেখতে থাকেন। হঠাৎ পঞ্চু খুড়ো 'এবার সামলাও তোমার মন্ত্রী'—বলে নূতন চালের সঙ্গে চীৎকার করে ওঠেন। গোবর্দ্ধনদার চমক ভাঙ্গে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই গোবর্দ্ধনদা মাৎ হয়ে গিয়ে- 'আচ্ছা খুড়ো আজ উঠি'—বলে উঠে দাঁড়ালেন। পঞ্চু খুড়ো গভীর বিস্ময়ে খানিকক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকে বল্লেন, 'সে কি রে, এই ত' সবে আটটা দশ! এর মধ্যেই—'

গোবর্দ্ধনদা বাধা দিয়ে বল্লেন, 'না খুড়ো, তোমার পায়ে পড়ি, বিশেষ কাজ আছে আজ।' তার পর এক রকম জোর করেই পঞ্চু খুড়োর হাত ছাড়িয়ে তক্তাপোষ থেকে নেমে আমায় ডাকলেন, 'রমেশ, শোন!' আমি উঠে গেলাম। বাইরেটা তখন অন্ধকার। দরজার পাশে রোয়াকে দাঁড়িয়ে একটু আশেপাশে তাকিয়ে গোবর্দ্ধনদা ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞেসা করলেন, 'সত্যি করে বল, ছবিখানা কেমন হয়েছে?' তাঁর প্রশ্নে যেন অনেকখানি অনুযোগ মাখানো! ছবি তিনখানি আমার হাতে দিলেন। জানলার খড়খড়ির সেই টুকরো টুকরো আলোতে আর একবার ছবিখানি দেখতে দেখতে বল্লাম 'কি বোলছো দাদা?—ফাইন্!'

গোবর্দ্ধনদা কম্পিত কণ্ঠে বল্লেন, 'তবে সুজিৎটা বলছিল—সীতা হনুমান!'—আমি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বল্লাম, 'আরে দূর! তুমিও যেমন,—তুমি হনুমান হতে যাবে কেন?' খড়খড়ির ভিতর দিয়ে

ছিট্‌কে-পড়া আলোতে দেখলাম, গোবর্দ্ধনদার মুখ থেকে একটা বেদনার ছাপ যেন মুছে গেল। আরক্ত মুখে দাদা বল্লেন, 'আর বলিস্ কেন? তিন কপিতে ছ'টাকা প'চে গে'ছ!' দাদা আমায় এক কাপ দিয়ে বল্লেন, 'এই নে ভাই! পুয়োর ফ্রেণ্ডের একটা স্মৃতি-চিহ্ন তোর কাছে থাকুক।' দাদার গলাটা কেঁপে উঠলো। 'আচ্ছা দাদা, দাও', বলে আমি তা গ্রহণ করলাম। গোবর্দ্ধনদা একটু চাপা কণ্ঠে বল্লেন, 'সকলে হয় ত ভাবে, ত্রিশ টাকার কেরাণীর নবাবী দেখেছো? কিন্তু কি ক'র বল ভাই রমেশ! মাধবী কিছুতেই ছাড়বে না,— বলে কি না, 'তুমি আফিস চলে গেলে সারা দিন আমি কি নিয়ে থাকবো?'—দাদার মুখে একটা প্রচ্ছন্ন আনন্দের আভাস ফুটে উঠলো। যদিও সে সময় আমার হাসা উচিত হয়নি, তবুও আমি প্রসঙ্গটা চাপা দিবার জন্য একটু চাপা-হাসির সঙ্গে জিজ্ঞেসা করলাম, 'তা এর মধ্যে যে চল্লে, গোবর্দ্ধনদা।'

দাদা কুণ্ঠিত ভাবে বল্লেন, 'কি করবো ভাই বল,—আমি না যাওয়া পর্য্যন্ত না খেয়ে বসে থাকবে, সারা রাত কথা কইবে না— আর সত্যি কথা বলতে কি, আমিও না দেখে থাকতে পারি নে। তা তোর কাছে কিছুই লুকোবো না,—মোটা মানুষ, এই গরমের দিনে দোর-টোর বন্ধ করে ঘরে শুতে যে কি কষ্ট হয়! যত বলি, মাথার দিকের জানলাটা খোলা থাক না বাপু! তা লজ্জাবতীর লজ্জার জ্বালায় কি তা খুলবার যো আছে?—গোঁজ হয়ে মাটিতে গিয়ে শোবে!—দেখ না, পিঠটা আমার কি রকম ঘামাচিতে ভরে গেছে'—বলে দাদা আবেগভরে আমার হাতখানা টেনে নিয়ে জামার ভিতর দিয়ে তাঁর থলথলে পিঠে বার-ছয়েক বুলিয়ে দিলেন। সত্যই আমি অনুভব করলাম, মসৃণ পিঠের ওপর ঘামাচিগুলো ঠিক কিরকিরে বালি কাঁকরের মত আমার হাতে ফুটলো! কিন্তু গোবর্দ্ধনদার সেদিকে দৃক্‌পাত নাই, আপন মনেই বল্লেন, 'কি জানিস্ রমেশ, এও সইতে পারি, কিন্তু মাধবীর মুখভার সইতে পারি নে। ক'দিন ধরে ধরেছে, সিনেমা দেখতে যাবে। কিন্তু ভেবে পাচ্ছি নে, কি করে তার ব্যবস্থা হবে?—যা হোক, একটা উপায় করতেই হবে—আচ্ছা, রাত হ'লো, চলি।'—বলে আর কোন কথার জন্য অপেক্ষা না করে দাদা আমার কাছে বিদায় নিলেন। আমি অভিভূতের মত সে দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে মনে-মনেই বল্লাম,—এই সেই গোবর্দ্ধনদা! আজ ন'টা না বাজতেই বলেন— 'রাত হলো'; কিন্তু এমন অনেক রাত গেছে যে, লজ্জা, খাতির ছেড়ে বলতে হয়েছে 'দাদা কাল আফিস আছে।'—কেন এমন হয়? ছবিখানা আর একবার আলোতে ধরলাম। একদৃষ্টে খানিকটা তার দিকে তাকিয়ে থেকে নিজের মনস্তত্ত্বের সঙ্গে যাচাই করলাম; —সত্যই, গোবর্দ্ধনদার চেহারার মধ্যে এমন-কিছু আকর্ষণীয় নাই, এতখানি মোটা নাদুস্-নুদুস্ মানুষ। খানিকটা সাবলো ভরা মুখ, তার পাশে অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা তরুণী—পল্লীর এক ফুটন্ত কুসুম! তার পাশে কি একে মানায়?—অনিতার মধুর কটাক্ষপাতে ও সুজিৎ আদি বন্ধুবর্গের কথাবার্ত্তায় শুনেছি যে, আমার চেহারায় না কি একটা আকর্ষণ-শক্তি আছে। কিন্তু এই গোবর্দ্ধনদা? তবে কি সতী সাবিত্রীর যুগ হ'তে সতী সাধ্বীদের কথা,—হিন্দুর পতিপ্রাণা কুলবধূদের যে কথা চলে আসছে, সে কি কেবল কল্পনা? না, চির সত্য, চির সুন্দর?

ভাবলাম,—না, অনিতাকে কালই সব খুলে লিখে বিয়ের প্রস্তাব করবো।

শ্রীজয়দেব চট্টোপাধ্যায়।

ভারতবর্ষ

ভূমি ও ভূমার মিলন-ক্ষেত্র, হে আদি-জননী ভারতবর্ষ!
কোথা মা তোমার বিগত গরিমা, কোথা মা তোমার বিমল হর্ষ।

শুনেছি তোমার মঠে-মন্দিরে উদ্গীত হ'ত প্রেমের মন্ত্র।
সঙ্ঘারামেতে অযুত 'শ্রমণ' মনন করিত অভেদ তন্ত্র।
এবে ভেদ-নীতি জিনেছে আনন্দে, প্রীতির কুসুমে কীটের বাসা।
ভাইয়ে ভাইয়ে আজ কুরুক্ষেত্র—নয়নে দারুণ সর্ব্বনাশা।
কোথা স্বার্থের সংঘাতে হায়, গ্রাম ও নগরী পুড়িয়া যায়।
কত কীর্ত্তির কৌস্তুভ-মণি বিভূতি-ভূষণে ভূমে লুটায়!
অঙ্গে নাহিক প্রচুর বসন, দারুণ ক্ষুধায় অন্ন নাহি।
কঠোর শাসনে ক্লিষ্ট পরাণ, দুর্গত ডাকে পরিত্রাহি।
পল্বলে আর উঠে না শিহরি কহ্লার মুখে হাসিটি নিয়া।
শাপলা—শালুক শুকায়েছে সব কদমেরে গেছে বিস্মরিয়া।
শুকায়েছে নদী, সলিল-উৎস, গাঙ শালিকেরা করে না মেলা।
সরোবরে আর শোভে না কমল; পানকৌড়িরা ভুলেছে খেলা।
শুধু নোনা জল, কাদা আর পাঁক, কচুরি-পানায় সকলি ভরা।
স্বচ্ছ সলিলে আপনারে আর হেরে না গরবী চন্দ্র, তারা।
শস্য বিহনে ধূ ধূ করে মাঠ মরুভূ বলিয়া ধারণা হয়।
দীপ্ত সূর্য্য লক্ষ ফাটলে ধরার রক্ত শুষিয়া লয়।
শরৎ আনে না সোনার শস্য, আনে ম্যালেরিয়া মরণ-নৃত্য।
মধু বসন্তে 'মারি-বসন্ত' শঙ্কিত করে সবার চিত্ত।
শ্যামল আষাঢ়ে কুঞ্জ কুসুমে অর্ঘ্য রচে না কেহ ত আর।
মেঘ-মল্লার সুরের লহরে কলশ ভরে না বন্ধু তার।
জনপদ-বধূ জলদ নেহারি আঁখি-ইঙ্গিতে কহে না কথা।
দক্ষিণ পথে আসে না মলয়, মৌসুমী বায়ু বাড়ায় ব্যথা।
সুজলা, সুফলা, শস্য শ্যামলা, মলয়-শীতলা ভারতবর্ষ।
কোথা মা তোমার বিগত গরিমা, কোথা মা তোমার বিমল হর্ষ।

বেণু গঙ্গোপাধ্যায় (এম-এ)।

প্রাইস কনট্রোল

[নন্দা]
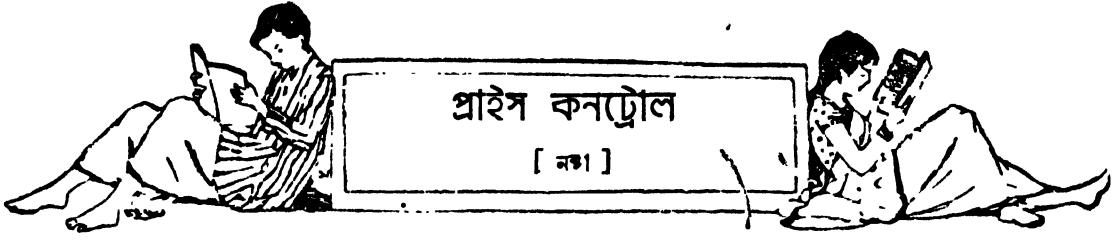
সুচন্দ্র শীল অত্যন্ত খারাপ মেজাজ নিয়ে ঘুম থেকে উঠলেন। উঠলেন বলাটা ঠিক হ'ল না, অসময়ে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হল বলাটাই 'মো'র বিফিটিং।' জু'-গার্ডেনের যত রকম জীবজন্তুর কণ্ঠ-নিনাদ নিঃসারিত হতে পারে যেন তা একত্র সংমিশ্রিত ক'রে তিনি নাসারন্ধ্র থেকে নিঃসারণ করছিলেন, এমন সময় সাতটি পুত্র কন্যার ঐক্যতানের খ্যাচাম্যাচা সুর তাঁর কর্ণবিবরে প্রবেশ করলো। সে সুর যেমন বিকট, তেমনি ভীষণ, তাতে স্বয় কুম্ভকর্ণেরও নিদ্রাভঙ্গ হ'ত। অতএব সুচন্দ্রেরও যে ঘুম ভেঙ্গে যাবে, সেটা আর বিচিত্র কি?

কাঁচা-ঘুম ভাঙ্গার জন্য যেমন মেজাজটা খিঁচড়ে গিছল, একটা মধুর স্বপ্নভঙ্গের জন্য তিনি আরও বেশী ক্ষেপে উঠেছিলেন। স্বপ্ন দেখছিলেন, তাঁর আপিস "বেগ, বরো ওর ষ্টীল অ্যাণ্ড কোম্পানীর" বড় সাহেব "চীট-ক্লেভারলি" সুমিষ্ট পেট্রনাইজিং স্বরে বলছেন—"ওয়েল ছুছ্‌ণ্ডার বাবু, টোমার কাম ডেকিয়া হামি বহুট পিলীট হইলো। বড়াবাবু প্রাণটাগ কড়িলো হামি টোমকো বড়া বাবু বানিয়ে ডেবে।" এ হেন আশাপূর্ণ মনোমুগ্ধকর স্বপ্ন দেখলে কার না মন আনন্দে লম্ফঝম্প করে? কিন্তু সেই সময় যদি ছেলেপিলের চীৎকার ও জগঝম্পে ঘুম ভেঙ্গে যায়, তবে মানুষ যে চটে উঠবে, ক্ষেপে যাবে, টগবগ শব্দে 'বয়েল' করবে—এ যৎপরোনাস্তি স্বাভাবিক।

সুচন্দ্র শীল অতি নিরীহ লোক। কোন রকম গোলমাল পছন্দ করতেন না। আপিসে যাবার সময় ছাড়া বাড়ী থেকে বার হতেন না। ঠিকা ঝিই বাজার করে আনতো। ছেলেদের বাড়ী থেকে বার হতে দিতেন না, পাছে তারা কোন হুজুগে মাতে। এমন কি, নিজে খবরের কাগজ পর্য্যন্ত পড়তেন না, পাছে জাপানী বোমার আবির্ভাব সম্বন্ধে কেউ তাঁকে কোন প্রশ্ন করে! যতখানি সম্ভব, লোকজনকে তিনি এড়িয়ে চলতেন। কে জানে, কখন্ কি কথা মুখ ফস্কে বেরিয়ে যায়! তিনি জানতেন, বোবার শত্রু নেই।

ঘুম ভাঙ্গতেই তিনি চীৎকার করে উঠলেন। অত নিরীহ লোকের ঐ রকম হেঁড়ে-গলা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়! যে কোন নেতা ঐ রকম বাজখাঁই গলা পাবার জন্য দু'-দশ টাকা খরচ করতে কুণ্ঠিত হ'তেন না। চীৎকারে ছেলেরা চুপ না করে গলা আরও চড়িয়ে দিলে। সুর আস্থায়ী থেকে যেন অন্তরায় উঠল! শীল-গিন্নী মোক্ষদা ছুটে এলেন। সকলের গলা ছাপিয়ে তারস্বরে বললেন—"সকালে উঠেই গোলমাল আরম্ভ করেছ?"

সুচন্দ্রের আগুনে মেজাজের ওপর যেন টালার ট্যাঙ্ক ভেঙ্গে জলের বন্যা বইয়ে দিলে। আগুন এমন কি ধোঁয়া পর্য্যন্ত নিমিষে অন্তর্হিত হলো; একেবারে ভিজে বেড়াল বনে গেলেন! আমতা আমতা করে মাথা চুলকে বললেন—"এই বলছিলুম, একটু চা—"

কথা শেষ করতে পারলেন না। মোক্ষদাসুন্দরী গর্জে উঠলেন—ঘুম থেকে উঠেই নবাব হুকুম করলেন—চা! বলি, চা আসে কোত্থেকে! চিনি কই? চালও বাড়ন্ত! একবার গতরটা নেড়ে বাজারে যাও না!"

মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল! বাজারে যাবেন কি করে? রাস্তায় পুলিশ, সার্জেণ্ট ইত্যাদি ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা যদি হঠাৎ তাঁকে সন্দেহ করে অ্যারেষ্ট ক'রে বসে? মানে, কিছু বলা তো যায় না—তখন? সাহেবের আপিসের চাকরী! দোষ থাক আর নাই থাক, চাকরী আর থাকবে না। ভারী মুস্কিলে পড়লেন। ক্ষীণ কণ্ঠে আপত্তি জানালেন—"দেখ, আজ বৃহস্পতিবার, মেল-ডে। একটু তাড়াতাড়ি আছে। তুমি যদি ঝিকে—"

"ঝিকে পাঠিয়ে চিনি পাওয়া যাচ্ছে না। দোকানে নেই। তুমি নিজে একবার—সরকার যে সব নতুন দোকান খুলেছে—"

অগত্যা অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুচন্দ্রকে যেতে হল। বাড়ী থেকে একটু এগিয়ে গিয়ে দেখলেন—সারবন্দী লোক। কি ব্যাপার! খোঁজ করে জানলেন, তারাও তাঁরই মত চিনিপ্রার্থী। কিন্তু দোকান কই? শুনলেন, দোকান সেণ্ট্রাল এভিনিউতে। আর সুচন্দ্র বাবু লাইনে যে স্থানে নিজেকে পুশ-ইন করেছেন সেটা হল মেছুয়া বাজার। একবার ভাবলেন, ফিরে যাই। আপিসের বেলা হয়ে যাবে। কিন্তু সাহসে কুলোল না, ভগ্নদূতের মত শূন্যহস্তে ফিরে গেলে মোক্ষদাসুন্দরীর মুখটা কি রকম হবে—মনশ্চক্ষে নিরীক্ষণ করে শিউরে উঠলেন। যা থাকে বরাতে বলে টিকে রইলেন।

ঘণ্টা খানেক কেটে গেল। লাইনের লোকেদের পা ব্যথা করছে, দর দর করে ঘাম বার হচ্ছে, মাথা ঘুরছে, ধৈর্য্যের বাঁধন ছিঁড়ে পড়ছে। লাইন ক্রমশঃ ভেঙ্গে ভীড়ে পরিণত হতে লাগল। নিরীহ ভালো মানুষ সুচন্দ্র বাবু বেরোতে গিয়ে দেখলেন পথ বন্ধ। যেন কৌরব সৈন্য-বেষ্টিত অভিমন্যু! আগম জানেন, কিন্তু নির্গম জানেন না। চতুর্দ্দিকের ভিড়ের ধাক্কায় প্রাণবিহঙ্গ দেহের মধ্যে ছটফট করছে।

এদিকে দশটা বাজে। দোকান বন্ধ হয়ে যাবে। ধ্বস্তাধ্বস্তি, মারপিট আরম্ভ হয়ে গেল। দোকান বন্ধ হবার আগে কোন রকমে দোকানের সামনে পৌছতে হবে তো। বেচারা সুচন্দ্র! চিরকাল ভীড় গণ্ডগোল এড়িয়ে এসেছেন, আর আজ ভীড়-সমুদ্রে একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছেন! ওদিকে দোকানদার তাড়াতাড়ি দোকান-পাট বন্ধ করে পুলিশে খবর দিয়েছে। দেখতে দেখতে পুলিশ-ভরা একটা লরী এসে উপস্থিত! লাঠি চার্জ্জ, পাঁচ রাউণ্ড গুলী! জনতা ছত্রাকার, পগার পার। ঠেলা, হুড়োহুড়ি সামলাতে না পেরে অনভ্যস্ত নিরীহ সুচন্দ্র কুপোকাৎ। কয়েক জন লোক তাঁকে মাড়িয়ে চলে গেল। হাঁটুতে লেগেছে, হাতটা ভেঙ্গেছে, স্থানে স্থানে ছড়ে গিয়েছে। তিনি পালাতে পারেননি। সুতরাং আগেই তিনি ধরা পড়ে লালবাজারে চালান হলেন। হাঙ্গামা, মারামারি ইত্যাদি অভিযোগ। সেখানে রেডটেপিজ্‌ম্ শেষ হবার পর হাসপাতাল!

তিনি ছাড়া আরও দু'-চার জন লোক ধরা পড়েছিল। কিন্তু

তাদের বন্ধুবান্ধব বাড়ীতে খবর দিয়ে তখুনি তাদের জামীনে খালাস করে নিয়ে গেল। সুচন্দ্র বাবু পারতপক্ষে কারো সঙ্গে মিশতেন না, অতএব বন্ধুবান্ধবের বিলক্ষণ অভাব ছিল; সুতরাং পুলিশের হেপাজতে হাসপাতালেই জমা রইলেন।

ওদিকে যতই বেলা বাড়তে লাগল, সুচন্দ্রগৃহিণী মোক্ষদাসুন্দরীর ততই রাগও বাড়তে লাগল জিওমেট্রিক প্রগ্রেশনে। কিছুক্ষণের মধ্যে বয়েলিং পয়েণ্ট ছাড়িয়ে উঠলো। না হ'ল চা খাওয়া, না হ'ল ভাত রান্না। কিন্তু যখন আপিসের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেল, তখন একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাই ত, লোকটার হ'ল কি? তার পর আবার ভাবলেন, হয় ত কাজের ভয়ে দোকানে না গিয়ে বাজার থেকে খেয়ে সোজা আপিসে চলে গেছেন। যাঁহাতক এই ভাবা, সঙ্গে সঙ্গে আবার তাঁর মনের পারা যতটা নেমেছিল, তার দু'গুণ চড়ে গেল।

আপিসে আজ মেল-ডে। সুচন্দ্র ডেসপ্যাচ ক্লার্ক, অথচ তাঁর দেখা নেই! বড়বাবু চটলেন, সাহেব চটলেন। এ কি! আজকের দিনে দেরী? তার পর যখন দেখলেন যে, সুচন্দ্র মোটে আপিসে এলেনই না, আর লীভ অফ অ্যাবসেন্সের কোন চিঠিও পাঠালেন না, তখন তাঁরা একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে উঠলেন। কাজে এত গাফিলতি! সাহেব হুকুম দিলেন—"বড়বাবু, আজ থেকে ছুচুন্দর বাবুকে আমাদের আপিসে আর দরকার হবে না। সার্ভিস নো লঙ্গার রিকোয়ার্ড।" বেচারা সুচন্দ্রের সকালের মধুর স্বপ্নের এই পরিণতি হ'ল! উন্নতি ত হ'লই না, মাঝ থেকে সোজা বরখাস্ত। অবশ্য, তিনি এ বিষয়ে তখনও কিছু জানতে পারেননি।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে, অথচ এখনও সুচন্দ্র আপিস থেকে ফেরেননি। চিন্তিত হয়ে ঠিকে ঝিকে দিয়ে মোক্ষদাসুন্দরী বাপের বাড়ী খবর পাঠালেন। হন্তদন্ত হয়ে তখুনি তাঁর পিতা গোবর্দ্ধন বাবু এসে হাজির হলেন। সব শুনে মন্তব্য প্রকাশ করলেন—"সুচন্দ্র চিরদিনই বুদ্ধিহীন, অকর্ম্মণ্য। ওকে কাজের ভার দেওয়াই অন্যায় হয়েছে।" মেয়েও চোখে জল ফেলে বললেন—"কি রকম জ্বলে-পুড়ে মরছি, একবার দেখ বাবা।"

বাবা দেখলেন, দুঃখপ্রকাশ করলেন। সান্ত্বনা দেবার জন্য বললেন—"কি আর করবি মা? সকলই আমাদের অদৃষ্ট!"

গোবর্দ্ধন বাবু আপিসে খোঁজ নিয়ে জানলেন, সুচন্দ্র আপিসে যাননি, এবং সেই জন্য চাকরী গেছে। রেগে টং হয়ে গেলেন।

মেয়ে বললেন—"দেখলে বাবা, একটা কাজ জন্মের মধ্যে এই প্রথম বলেছি। তাতে কি কাণ্ডটা করে বস্‌লেন।"

বাবা দেখলেন এবং রাগত স্বরে বললেন "হতভাগা, ইডিয়ট! তোকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলা হয়েছে দেখছি। এখন আর দুঃখ করে কি হবে মা!"

সমস্ত রাত কেটে গেল। সুচন্দ্রের দেখা নেই। সকলেই উদ্বিগ্ন হলেন। বাপ রাগলেন, মেয়ে কাঁদলেন। সকালে পুলিশে খবর দেওয়া হল। তারা সব শুনে জানালে—"কাল চিনির দোকানের সামনে গুণ্ডামি করতে গিয়ে এক জন লোক জখম ও অজ্ঞান হয়ে পড়ায়—হাসপাতালে তাকে রীভুক্ত করা হয়েছে। এখনও বোধ হয় জ্ঞান হয়নি।"

ঠিকানা নিয়ে গোবর্দ্ধন বাবু গিয়ে দেখলেন, তাঁরই জামাতা সুচন্দ্র। তখনও জ্ঞান ফেরেনি। মোক্ষদাকে খবর দেবার জন্য তিনি বাড়ী ছুটলেন। গিয়ে বললেন—"কি আর বলব মা! কাল রাস্তায় গুণ্ডামি মারপিট করার অপরাধে গুণধরের জেল হয়েছে। পুলিশের লাঠি চার্জ্জে অজ্ঞান হয়ে গিছল। এখনও জ্ঞান ফেরেনি। শেষে ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে—ছিঃ!"

* * * *

সুচন্দ্র বাড়ী ফিরেছেন, প্রাণ বেঁচেছে, কিন্তু চাকরী গেছে; গুণ্ডাকে ত আর আপিসে রাখা যায় না! নিজের গৃহে, শ্বশুরালয়ে, এবং পাড়ায় তাঁর পোজিশন মাটীর সঙ্গে মিশে গেছে—আধ সের চিনির জন্য।

শ্রীযামিনীমোহন কর (এম-এ, অধ্যাপক)।

অস্থায়ী

দুর্জ্জেয় কাল, শুনিয়াছি তুমি অশেষ মহামহিম!
মুঠি ভরে' তারে সোণা দাও যেবা করে তব আরাধনা।
বহমান তব স্রোতে যারা নেমে লভিছে আশীস-কণা;
ভীরু ও অলস উর্ম্মির ঘায়ে খায় শুধু হিমশিম।

সত্য বলিয়া যাহা কিছু জানি তুমি কি জননী তা'র?
নরবুদ্ধির শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি প্রকট করেছ তুমি?
নিখিল বিশ্বে যেখানে যা' আছে তোমার বিহার-ভূমি;
রচিয়াছ কোন্ কষ্টিপাথর মিথ্যারে যাচিবার?

এ কথাও জানি চিরচঞ্চল তোমার চপল মতি
পলকে পলকে নব নব রীতে ঘোষিতেছে নির্দ্দেশ;
স্থায়ী শাসনের নাহি আয়োজন, বিচারের নাই শেষ—
তুচ্ছ লভিছে স্বর্ণমুকুট, উচ্চ নিম্নগতি।

ঘূর্ণ্যমান এই চক্রাবর্ত্তে ছোট বড় কোন্ জনা?
স্বর্গের মোহে তবানুসরণ—কেন সে বিড়ম্বনা?

শ্রীরাধারমণ গোস্বামী।

বাঙালীর দিদি

[গল্প]

যৌবনের প্রারম্ভেই শৈলবালার বিবাহ হইয়াছিল দরিদ্রের ঘরে; সে কয়েক বৎসরের মধ্যে সন্তানের জননীও হইয়াছিল।—দরিদ্রের গৃহে তাহার দিন কোন-রকমে চলিয়া যাইতেছিল।

কিন্তু শৈল এক দিন সন্তান ও স্বামীকে হারাইয়া কিছু কাল অতি কষ্টে স্বামিগৃহে বাস করিবার পর আবাল্য-পরিচিত পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিল; দেখিল, পিতৃগৃহের সে শ্রী নাই, সে স্নেহও নাই—কারণ, মা নাই। কোলের একটি শিশু রাখিয়া তিনি শাঁখা শাড়ী সিন্দুর পরিয়াই পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। বিপত্নীক পিতাকে দেখিবার কেহ নাই। এই কারণেই ভারস্বরূপ হইলেও শৈলবালার সেখানে ডাক পড়িল। গৃহহীনা শৈল অসহায় পিতা ও ততোধিক নিরুপায় ভাইটিকে লইয়া পিতৃগৃহে নূতন করিয়া সংসার পাতিয়া বসিল।

আশ্রয়হীন বুভুক্ষু অন্তর তাহার শিশুভ্রাতাকে ঘিরিয়া নিরন্তর আত্ম-প্রসাদ লাভ করিয়াছে, মাতার স্নেহে, ভগিনীর সেবায়, অগ্রজের শাসনে সে ভ্রাতাকে প্রতিপালন করিয়াছে। ভ্রাতা যে দিন ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়া সহর হইতে ফিরিয়া আসিল, এবং বহু যত্নে সঞ্চিত অর্থে বিধবার একমাত্র বিলাস-সামগ্রী একটি গুঁড়ার কৌটা দিদির জন্য কিনিয়া আনিল, সে দিন আনন্দের আতিশয্যে শৈল নীরবে অশ্রু মোচন করিল। আবার তাহার অল্পকাল পরে পিতার পরলোক-গমনে তেমনি করিয়াই নীরব-অশ্রুধারায় শোকতর্পণ শেষ করিল।

যথাসময়ে পরীক্ষায় পাশের সংবাদ আসিল; কিন্তু ভ্রাতা গোপালের আই-এ পড়িবার কিরূপ ব্যবস্থা হইবে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া শৈল ভাবিয়া আকুল হইল। সহরে তাহাদের যে আত্মীয় ছিলেন, তাঁহার বাসায় থাকিয়া পড়িবার সুবিধা হয় কি না, তাহা জানিবার জন্য শৈল যথাসাধ্য চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহার সকল চেষ্টাই বিফল হইল। অবশেষে শৈল ভ্রাতাকে ডাকিয়া কহিল,—যাক্, তুই দিন দেখে যাত্রার আয়োজন কর; আমার যে কয়েকখানা গহনা আছে, তা বিক্রি করে দু'টো বছর কোন রকমে তোর খরচ চালাতে পারব।

গোপাল এই প্রস্তাবে আপত্তি করিল না। সে ভাবিল, কোন দিন সে যদি মানুষ হইতে পারে, তখন তাহার দিদির কোন কষ্টই থাকিবে না।

শৈলর অলঙ্কারগুলি একে একে নিঃশেষিত হইবার সঙ্গেই গোপাল আই-এ পাশ করিল এবং কোন আত্মীয়ের চেষ্টায় আদালতে আমলা-গিরি চাকরী পাইল। শৈল ভাবিল, তাহার জীবনের সমস্ত কর্ত্তব্যই সে সম্পন্ন করিয়াছে, বাকী আছে মাত্র ভ্রাতার বিবাহ। একটি শিক্ষিতা সুন্দরী পাত্রীর সহিত ভ্রাতার বিবাহ দিলেই সে নিশ্চিন্ত। স্ত্রীলোকের সাধ্য যতটুকু—ততখানি চেষ্টা সে করিল; কিন্তু মনের মত পাত্রী সে পাইল না। যাহা হউক, ভ্রাতা নিজেই 'পাশ-করা' একটি কনে স্থির করিয়া দিদিকে সে কথা বলিলে শৈল সন্তুষ্ট চিত্তে সম্মতিদান করিল।

শুভবিবাহও এক দিন যথাসম্ভব আড়ম্বরে সুসম্পন্ন হইল; কিন্তু গৃহস্থালীর কার্য্যে শৈল তাহার মনের মত ভ্রাতৃবধূ পাইল না, তবুও তাহার ভ্রাতা সুখী হইয়াছে ভাবিয়াই সে সান্ত্বনা লাভ করিল।

এক দিন ভ্রাতার ঘরের সম্মুখ দিয়া আসিবার সময় সে লক্ষ্য করিল, কি একটা কথা লইয়া নবদম্পতির পরিহাস চলিতেছে। গোপাল তাহাকে দেখিয়া লজ্জিত হইল, এবং সঙ্কোচ করিয়া একটু আড়ালে চলিয়া গেল; কিন্তু বধূ তাহাকে কোনরূপ সম্মানই দেখাইল না।

ব্যাপারটা সামান্য, কিন্তু এইটুকুই শৈলর বুকে কাঁটার মত নিরন্তর বিঁধিতে লাগিল। একটা শঙ্কা ও অস্বস্তি তাহার অভিমানী অন্তরকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল,—তবে কি এই নূতন সংসার তাহার মত করিয়া সে গড়িয়া তুলিতে পারিবে না?

তাই এক দিন অত্যন্ত সংগোপনে সে নববধূ চিত্রাকে কহিল,—দ্যাখো বউ, তুমি লেখাপড়া শিখেছ, আমার চেয়ে অনেক বেশী জানো শোনো, কিন্তু গ্রামে ত আগে কোনো দিন বাস করোনি, তাই এখানকার চালচলনও জানো না। এখানে একটু লজ্জা দেখাবে, বেশ খানিক ঘোমটা টেনে বেড়াবে, বেশী কথা বলবে না, তবেই লোকে প্রশংসা ক'রবে; আবার সহরে ঐ রকম করলে সহরের লোকে হয় ত গেঁয়ো বলে ঠাট্টা করবে, কেমন এ কথা কি সত্যি নয়?

চিত্রা কথার ইঙ্গিতটা বুঝিয়াছিল, তাই বলিল,—আমি কি বেহায়ার মত কিছু ক'রেছি?

—না না, তা কেন করবে? তবে বলে রাখলাম তোমাকে গাঁয়ের রকম-সকমের কথা। সহরে গেলে সেখানে আমার এ-সব কথা খাটবে না। আমি ত সহুরে মেয়ে নই!

চিত্রা একটু অভিমানের সহিতই কহিল,—আচ্ছা, বেশ!

শৈল চিত্রার মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিল,—হিতে বিপরীত হইয়াছে। তাই সে মনে মনে স্থির করিল, চিত্রাকে কিছু শিখাইতে যাওয়া তাহার পক্ষে সমীচীন হইবে না। মনে মনে সে ক্ষুণ্ণ হইলেও মুখে কহিল,—রাগ করলে না কি বৌ? রাগের কথা নয়, তোমরা হাসি-ঠাট্টা কর দেখলে ত আমার প্রাণ জুড়িয়ে যায়! মা মারা যাওয়ার পরে গোপালকে মানুষ ক'রেছিলাম—তাকে তোমার হাতে সঁপে দিয়েই আমি নিশ্চিন্ত;—নইলে—

শৈলর কথা জড়াইয়া যাইতেছিল, মনের কথা গুছাইয়া বলিতে পারিল না, এবং একটা দুর্দ্দমনীয় ব্যাকুলতায় তাহার চোখ-দুইটি

সজল হইয়া উঠিল। চিত্রা কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া উঠিয়া গেল; শৈল টাকু দিয়া পৈতার সূতা কাটিতে কাটিতে শূন্যদৃষ্টিতে উঠানের দিকে চাহিয়া রহিল। গোপাল যখন প্রথম হাঁটিতে শিখিল—সেই সময়ে একখানা পাটকাটি হাতে লইয়া নিত্য প্রাতে এই উঠানে নূতন উৎসাহে সে টলিতে টলিতে হাঁটিয়া বেড়াইত. পথচারী গৃহবধূগণকে হাতের সেই বিরাট লাঠি দিয়া মারিতে উদ্যত হইয়া আছাড় খাইত ও খিল-খিল করিয়া হাসিত। সেই দিন অন্তরের সমস্ত স্নেহ নিঙড়াইয়া সে তাহাকে টানিয়া বুকে তুলিত; কিন্তু সে দিন আর নাই! শৈল অশ্রু মোচন করিয়া মনে মনে কহিল.—যাক্ গে! আমার পরমায়ু ত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে; ওরা সুখে থাক. এই আমার কামনা।

পরদিন প্রাতে শৈল গোপালের মুখখানা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া তাহার মুখে অপ্রসন্নতার ছায়া দেখিয়া অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিল। হৃদয়ের সমস্ত স্নেহে, দানে, ত্যাগে সে যে গৃহ রচনা করিতে চাহিয়াছিল, সে চেষ্টা কি নিরর্থক হইয়াছে? ভাগ্য তাহাকে আপনার গৃহে বঞ্চিত করিয়াছে. আজ এই গৃহ হইতেও তাহাকে নির্ব্বাসিত করিল? তাই সে নীরবে নিজের মন্দ ভাগ্যকে ধিক্কার দিল মাত্র, কিন্তু কাহারও নিকটে কোন অভিযোগ করিল না। কে আছে যে, তাহার নিকট সে অভিযোগ করিবে? কেনই বা করিবে?

প্রায় এক বছর পরের কথা—

গুডফ্রাইডের বন্ধে গোপাল সহর হইতে বাড়ী আসিল। শনিবারে সে সাধারণতঃই আসিত; তাই শৈল সপ্তাহের যাহা কিছু ভাল তরকারী, খাদ্যবস্তু—গোপাল যাহা কিছু ভালবাসে, সেগুলি সমস্তই গুছাইয়া রাখিত, এবং ছুটির দিনে ভ্রাতাকে কাছে বসাইয়া খাওয়াইত।

সকালে শৈল নানাবিধ তরকারী কুটিয়া ভাগে ভাগে জড়ো করিয়া রাখিতেছিল; গোপাল একখানা পীড়ি টানিয়া লইয়া সেখানে বসিয়া কহিল,—দিদি, বাসা ঠিক করে রেখে এসেছি, কালই সকলকে যেতে হবে; সেখানে পৌছিয়ে একটু গুছিয়ে নেওয়া দরকার।

শৈল বলিল,—সে ত ভালই; হোটেলে খেয়ে তোর শরীরে আর আছে কি? মেয়েরা খাবার গুছিয়ে না দিলে কি ব্যাটা-ছেলের খাওয়া হয়? আচ্ছা, বৌকে সব গুছিয়ে নিতে বল, আমি অন্য সব গুছিয়ে দেব এক সময়।

স্বাভাবিক ভাবে উত্তর দিলেও শৈল অন্তরে অস্বস্তি বোধ করিল। গোপাল এ পর্য্যন্ত তাহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কিছু করে নাই; কিন্তু নূতন বাসার প্রসঙ্গে সে কোন দিন তাহাকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করে নাই!

গোপাল একটু থামিয়া কহিল,—তোমাকেও ত যেতে হবে, নইলে ও কি একা ঘর-গেরস্থালী সামলাতে পারে?

শৈল হাসিয়া কহিল.—আমি যাবো কি রে পাগল! আমি গেলে কি এই ঘর-দোর ধান-টান কিছু থাকবে? আর বৌ ত লক্ষ্মী বৌ, একটা পাশ দিয়েছে; দু'জনের গেরস্থালী ও গুছিয়ে নিতে পারবে না, এ কি একটা কথা? বৌ এ কথা শুনলে রাগ করবে যে!

বধূ চিত্রা যে দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া সব কথাই শুনিতেছিল, উভয়েই তাহা জানিত। গোপাল ভাই কহিল,—দেখছি ত এই এক বছর! আর তা ছাড়া আমি ত সারা দিন থাক্‌বো আফিসেই, সারা দুপুরটা একা ওর কাটবে কি করে?

শৈল এ কথার জবাব খুঁজিয়া পাইল না। কিন্তু তাহার দুঃখকষ্টপূর্ণ জীবনে শুভ দিন, নতুন যুগের সম্ভাবনায় মন বিন্দুমাত্র প্রসন্ন হইল না—বরং একটা অজ্ঞাত অমঙ্গলের আশঙ্কাই তাহার মনে ঘনাইয়া আসিয়াছিল। শৈল কহিল,—কিন্তু, আমি চলে গেলে এ সংসারের কিছু থাক্‌বে কি? ছ'মাস পরে ফিরে এসে দেখ্‌বে, কুটোটি পর্য্যন্ত নেই!

বাদানুবাদে কোন ফল হইল না, শৈলকে গোপালের সঙ্গে যাইতেই হইল; নতুন করিয়া তাহাকে ভ্রাতার সংসার পাতিয়া দিতে হইবে।

বাসায় লোক চারি জন মাত্র। গোপাল, চিত্রা, শৈল ও একটি বালক ভৃত্য। বাসের ঘর দুইখানি; একখানি রান্নাঘর—তাহারই বারান্দায় শৈলর রাঁধিবার স্থান। বাজার হইতে যাহা কিছু আনিবার প্রয়োজন প্রথম কয়েক দিন তাহা শৈলই বলিয়া দিত। গোপাল বাজারের বন্দোবস্ত করিয়া আফিসে চলিয়া যাইত।

সে দিন সকালে নিরামিষ রান্না করিতে করিতে শৈল দেখিল, চিত্রা চাকরকে বাজারের পয়সা দিতেছে। তাহারই প্রতিপালিত গোপালের গৃহে, তাহার গৃহে, তাহার গৃহিণীপণা কেহই অস্বীকার করে নাই। আজ সে একটু আশ্চর্য্য বোধ করিল, কিন্তু মনে মনে একটু হাসিয়া কহিল,—ওদের ঘর-সংসার ওরাই যদি গুছাইয়া লয়, সে ত ভালই, আমি আর কয় দিনই বা আছি?—বাজারের ফর্দ্দটা লক্ষ্য করিয়া শৈল কহিল,—কিছু চিঁড়ে, কলা, আর মিষ্টি আনতে দিও বৌ! বিকেলের জলখাবার ত চাই গোপালের জন্য,—ও দুধ চিঁড়ে খুব ভালবাসে যে!

চিত্রা একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া আর একটা টাকা দিয়া কহিল,—ময়দা আর ঘি নিয়ে আসবি।

শৈল হাসিল, কিন্তু কিছুই বলিল না। চিত্রা আজ ক'দিন এ সংসারে আসিয়াছে? গোপাল যে লুচি-তরকারী ভালবাসে না, বৌ ত তাহা জানে না! গোপাল বাসায় থাকিলে হয় ত ইহাতে আপত্তি করিত।

চাকর বাজার করিয়া যখন ফিরিল, তখন গোপাল বাড়ীতে ছিল। চিত্রা সমস্ত সওদা হিসাব করিয়া লইয়া, নিজের ঘরে তুলিয়া রাখিল। এত দিন গোপাল সংসারের সবই শৈলকে বুঝাইয়া দিত, এবং তাহার আদেশেই সকল কাজ করা হইত। শৈলর মনে একটু অভিমান হইল, স্বামিগৃহে সদ্যবিধবা শৈল যেমন এক দিন অবাঞ্ছনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, আজ ভ্রাতার গৃহেও যেন সে তেমনি অবাঞ্ছনীয়—অনাবশ্যক হইয়া উঠিতেছে! কিন্তু ভাইটিকে যে তাহার সমস্ত প্রাণ দিয়া সে গড়িয়া তুলিয়াছে, তাই অনিবার্য্য বেদনা সে এড়াইতে পারিল না।

বৈকালে সে লক্ষ্য করিল, গোপাল জলখাবার দেখিয়া কোন প্রতিবাদ করিল না। এত দিন সে আফিস হইতে আসিয়া শৈলর নিকটেই খাইতে চাহিত, এবং দেরী হইলে বা পরিমাণে বেশী হইলে রাগ করিত। কিন্তু আজ সে কোন কথাই কহিল না, নিজের ঘরে বসিয়াই খাইল, এবং কোন কথা না বলিয়া বেড়াইতে বাহির হইল।

শৈল নীরবে আপনার কাজ করিয়া যায়।

সে দিন সকালে রাঁধিবার সময় শৈল লক্ষ্য করিল, তরকারী রাঁধিতে হইবে, কিন্তু অল্প কিছু তরকারী ছাড়া অন্য কিছুই নাই! তাই সে কহিল,—এক-তরকারী ভাত কি ও খেতে পারে? আর কিছু থাকে ত দাও।

চিত্রা জবাব দিল, তিন চারটে তরকারী ক'রবার মত খরচ সে পাবে কোথায়? তাকে ত বুঝে চলতে হবে!

কথাটার সবখানিই শৈল বুঝিয়াছিল, কিন্তু রাগ করিল না। সাশ্রুনেত্রে একটু হাসিয়া কহিল,—গোপাল ত মাছ-টাছ ভালবাসে না, বিধবার হাতের রান্না খেয়েই ও মানুষ। একটা তরকারী হ'লে ওর কি খাওয়া হবে? আমার জন্যে কিছুই দরকার নেই বৌ!

চিত্রা কোন কথাই বলিল না; এবং দ্বিতীয় কোন তরকারীরও বন্দোবস্ত করিল না। শৈল বসিয়া বসিয়া অবশেষে রান্না চাপাইয়া দিল। আফিসের তাড়ায় গোপাল তাড়াতাড়ি খাইয়া চলিয়া গেল; এক-তরকারী ভাত হইয়াছে বলিয়া কোন অভিযোগ করিল না।

চিত্রার ব্যবহারে না হইলেও, গোপালের এই পরিবর্তনে শৈল মনে বেদনা পাইল। যে গোপাল বাল্যাবধি খাওয়া লইয়া এত ঝগড়া, এত অভিমান করিয়াছে, আজ সে এমন মন্ত্রমুগ্ধের মত নিঃশব্দে খাইতে লাগিল, এতটুকু অসন্তোষ প্রকাশ করিল না! ইহাতে শৈলর মনে বিস্ময় অপেক্ষা বেদনাই অধিক হইল।

আজ রবিবার। কাল একাদশীর উপবাস গিয়াছে—

সকালে উঠিয়া রান্না করিতে করিতে শৈল প্রতি-মুহূর্তেই প্রতীক্ষা করিতেছিল—চিত্রা তাহার জল-খাওয়ার একটা বন্দোবস্ত করিতেছে, কিন্তু বেলা ১১টায় সমস্ত রান্না হইয়া গেল, অথচ তাহার উপবাস-ভঙ্গের কোন ব্যবস্থাই হইল না! শৈলর চোখ-দুটি বার বার ভিজিয়া উঠিতে লাগিল। গোপালের পড়িবার সময় বহু দ্বাদশীর দিনে সে মুখে দিবার জন্য কিছুই সংগ্রহ করিতে পারে নাই—সে জন্য কোন দৈহিক বা মানসিক কষ্ট সে বোধ করে নাই; কিন্তু আদরিণী বৌয়ের এই উপেক্ষা তাহাকে ব্যথিত করিয়া তুলিল। জীবনের সমস্ত সুখ-কামনা বিসর্জ্জন দিয়া সে যাহাকে অতি কষ্টে মানুষ করিয়াছে, তাহারই গৃহে এই উপেক্ষা তাহাকে অত্যন্ত পীড়া দান করিল!

চিত্রা কিছুই করিল না, কোন কথা জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত করিল না।

কিন্তু গোপাল আসিয়া কহিল,—দিদি, তোমার জলখাওয়া হ'য়েছে?

এই ক্ষুদ্র প্রশ্নটিতে শৈলর সমস্ত বেদনা ও অভিমান যেন কণ্ঠের ভিতর সঞ্চিত হইয়া তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করিয়া দিল। সে সংক্ষেপে কহিল,—হুঁ।

—কি খেয়েছ?' ফলটল কিছু এনেছিলো?

—শৈল একটু হাসবার চেষ্টা করিয়া কহিল,—সে খবরে তোর দরকার কি? আজ নতুন গেরস্থালী আরম্ভ ক'রেছিস্ বুঝি?

হাসিবার চেষ্টা করিলেও শৈলর অবাধ্য চোখ-দু'টি হইতে দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সে আর কিছু না বলিয়া উনুনের তরকারীতে মনোনিবেশ করিল।

গোপাল দাঁড়াইয়াই ছিল—সম্ভবতঃ বিস্মিত হইয়া থাকিবে। চিত্রার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করিল,—জলখাবারের কোন বন্দোবস্ত করা হ'য়েছিল?

চিত্রা অপ্রসন্ন স্বরে উত্তর দিল,—না, এত সব খেয়াল রেখে সংসারের কাজ কি এক জনে করতে পারে? উনিও ত ব'লতে পারতেন যে, কাল একাদশী ছিল।

গোপাল সবই বুঝিয়াছিল, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নিঃশব্দে নিজের ঘরে প্রবেশ করিল! মেয়েরা চাহিয়া-লইয়া নিজের খাওয়ার বন্দোবস্ত করিবে, এ যে কিরূপ অসম্ভব, তাহা সে জানিত।

চিত্রা যেন আর একটা কি অজুহাত খুঁজিতেছিল, কিন্তু কিছু বলিবার পূর্ব্বেই গোপাল চলিয়া গেল। শৈল এতক্ষণে কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া কহিল,—ও-জন্যে এত ব্যস্ত কেন? আমি ত সব দ্বাদশীতে জল খাই নে। ও আমার অভ্যাস আছে, তুই ভাবিস নে।

কয়েক দিন একটা অস্বস্তি সমস্ত বাড়ীখানাতে পরিব্যাপ্ত হইয়া শৈলকে যেন শঙ্কাকুল করিয়া রাখিল। সে বুঝিয়াছিল, স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে প্রচ্ছন্ন কলহ-বহ্নি ধূমায়মান হইয়া উঠিয়াছিল, যে কোন মুহূর্ত্তে তাহা জ্বলিয়া উঠিতে পারে। শৈল মনে মনে ঠাকুর-দেবতার নিকট অনেক প্রার্থনা করিল—যেন তাহার মত অবাঞ্ছনীয় প্রাণীকে লইয়া তাহারা অশান্তি ভোগ না করে। তাহার জন্য গোপালের জীবন অশান্তিপূর্ণ হইবে, ইহা তাহার অসহ্য।

শৈল এক দিন অবসর খুঁজিয়া গোপালকে কহিল,—গোপাল, বাড়ীতে ত কিছুই থাকবে না রে! ঘরের বেড়া পর্য্যন্ত পাড়ার লোকে ভেঙ্গে নিয়ে উনুনে দেবে। বৌ'কে সবই গুছিয়ে দিয়েছি, এখন সে চালিয়ে নিতে পারবে। দু'-চার কাঠা ধান, তাও আমি বাড়ীতে না থাকলে পাওয়া যাবে না।

গোপাল জানিত, শৈল কেন বাড়ীতে যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে, তাই সে কোন কথাই বলিল না।

শৈল পুনরায় বলিল,—দুপুরে ত এ-বাড়ী-ও-বাড়ীর বৌরা বেড়াতে আসে, কাজেই বৌয়ের এখানে একা কোন কষ্ট হবে না। এক জন বাড়ীতে না থাকলে ছুটির সময় বাড়ী গিয়ে উঠবি কোথায়?

চিত্রা কথাটা শুনিয়া মন্তব্য করিল,—ওঁর বোধ হয় সহরে থাকতে ভাল লাগে না।—গ্রামে যাদের বাস, তাদের এ ভাবে আটকা থাকতে খুবই কষ্ট হয়। মনে হয়, জেলখানায় আটক আছেন।

গোপাল তবুও কোন কথা বলিল না। শৈল কহিল,—এবার কোন দিন ছুটি পেলে আমাকে বাড়ীতে রেখে আয়।

গোপাল দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া এবার জবাব দিল,—তোমার কষ্ট হচ্ছে, আর এখানে থাকাও চলবে না তা বুঝেছি। তা বেশ, ছুটি পেলেই রেখে আসবো,—তুমি ব্যস্ত হয়ো না দিদি!

শৈল একটু কুণ্ঠিত হইয়া কহিল,—না না, তোর বাসায় থাকতে আমার কষ্ট কি রে! তবে ওই বৌ যা ব'ললে, গ্রামে প্রতিবেশিনীদের বাড়ী ঘরে বেড়ানো অভ্যাস কি না, এখানে যেন জেলখানায় আছি বলে মনে হয়। কোন দিকে একটু বেরোবার যো নেই!

চিত্রা কহিল,—হ্যাঁ, আটকা থাকা—

চিত্রা মুখের কথা শেষ করিতে পারিল না; গোপালের বেদনা-কাতর মুখের দিকে চাহিয়া সে হঠাৎ থামিয়া গেল।

গোপাল কিছু না বলিয়া ঘর হইতে বাহিরে চলিয়া গেল।

শৈল পৈতৃক বাড়ীতে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে—

পাড়ার কয়েক জন বর্ষীয়সী মহিলা ফিরিবার কারণ অনুসন্ধানের জন্য শৈলকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছে, এবং তাহাদের 'পাশকরা' বৌয়ের প্রতি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতও করিয়াছে; কিন্তু শৈল বার বার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছে—না না, অমন কথা বলবেন না। বৌ আমাদের লক্ষ্মী; পাশ যে করেছে তা কোন রকমেই বুঝতে পারা যায় না! আর আমাকে কত তার যত্ন। কুটো ভেঙ্গে দু'খান করতে দেয়নি, তা সেখানে কি অমন জড়ভরতের মত বসে থাকা যায়?—আটকা থেকে থেকে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠলো! আমরা কি সহর-টহরে থাকতে পারি?—ইত্যাদি।

কেহ বিশ্বাস করিয়াছে, কেহ প্রশ্ন করিয়াছে—অন্য কারণ অনুসন্ধান করিয়া মনে মনে হাসিয়াছে। শৈল বার বার তাহাদিগকে বুঝাইয়াছে যে, তাহার বাড়ীতে ফিরিবার সঙ্গে 'পাশকরা বৌ'এর ব্যবহারের কোন সম্পর্ক নাই।

শৈল একাকী গ্রামের কুটীরখানিতে বাস করে। শীত, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সকল ঋতুতে ভ্রাতার জন্য নানা সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া রাখে। আমতেল, চালতার আচার, কুলের আচার, রাঁধুনি, কালজিরা এমনি কত কি! ঘরের আষ্টে-পৃষ্ঠে নানা রকম হাঁড়ি ও পুঁটুলীতে এই সব মহার্ঘ সামগ্রী অতি যত্নে সে সংগ্রহ করিয়া রাখে এবং যথারীতি রৌদ্রে শুকাইয়া ঝাড়িয়া-মুছিয়া আবার উঠাইয়া রাখে; এবং ভ্রাতা কোন্ দিন আসিবে—এই প্রতীক্ষায় দিন গণিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে।

সে দিন খররৌদ্র-তাপে নিস্তব্ধ দুপুর ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছিল। বাড়ীতে আর কেহ নাই; প্রতিবেশিনীরা সকলেই গৃহের শীতল ছায়ায় আশ্রয় লইয়াছে। শৈল, আমসত্ব আচার প্রভৃতি রৌদ্রে দিয়া ঘরের দাওয়ায় বসিয়া পৈতার সুতা কাটিতেছিল। পাড়ার খুড়িমা ঘাটের রৌদ্রে বাসন মাজিয়া ক্লান্ত হইয়াছিলেন, তাই বাসনের গোছা নামাইয়া রাখিয়া দাওয়ায় উঠিয়া বসিয়া কহিলেন,—একা মানুষ শৈল, তোমার এত কষ্ট করে এই সমস্ত জোগাড় করার আর রোদে দেওয়ার কি দরকার? এত পরিশ্রম ক'রে কি হবে? ছেলেপুলে থাকলে না হয় একটা কথা ছিল।

শৈল বলিল,—বল কি খুড়িমা? ছেলেপুলে নেই, কিন্তু গোপাল ত আছে। সে আচার আমসত্ব, এ সব যে খুব ভালবাসে। সে এসে খাবে, বাসায় নিয়ে যাবে। বৌ কি আর এ সব ক'রতে সময় পায়? তার কত কাজ! গোপাল একটু টক-আচার না হলে খেয়ে আরাম পায় না।

খুড়িমা হাসিয়া কহিলেন,—আজকালকার ছেলেদের কাছে কি আর এ সব ভাল লাগে? বৌরা ত জ্যাম, জেলি কি সব তৈয়েরী করে দেখেছি—তাই তারা চাটে।

শৈল প্রতিবাদ করিল,—গোপাল তেমন নয়। ছোট বেলায় আচার আমতেল চুরি ক'রে খেত বলে কত ব'কেছি! আজ ত এত ক'রেছি, কিন্তু তাকে খাওয়াতে পারি কই? সেই কবে পূজোয় আসবে, তখন ত তার খাওয়ার সময়ই হয় না!

খুড়িমা হাসিয়া বলিলেন,—এই সংসারের জন্যেই ত প্রাণপাত পরিশ্রম ক'রলে সারা জীবন, এখন বুড়ো হয়ে দিন কয়েক না হয় জিরিয়েই নিলে; তা নয় দিবারাত্রি খড়কুটো সংগ্রহ ক'রতে ক'রতে যে আত্মহত্যা করবার দাখিল!

শৈল প্রতিবাদ করিল,—না, খুড়িমা! ওরা ছেলেমানুষ, আমরা ওদিকে না দিলে কোথায় পাবে?—আর সহরে সব জিনিসই ত অগ্নিমূল্য! এক পয়সায় এতটুকু একটু তেঁতুল দেয়, তাতে বাসন মাজাও হয় না। অমন হ'লে কি সংসার চলে?

—তাই ব'লে, তুমি যে আঁকুশী দিয়ে নিজে তেঁতুল পাড়তে গিয়ে, জন্মের মত চোখটাই হারাচ্ছিলে! চক্ষু যদি আজ না থাকে, কি ক'রে খাবে? পথ-চলতেই যে পারবে না। একটা লোক দিয়েও ত পাড়াতে পারতে।

—ছোট গাছ, ওই ক'খানা তেঁতুল। ওর ভাগ দিলে আর কি থাকতো? আর গোপাল ওই গাছের তেঁতুলই সব চেয়ে বেশী ভালবাসে। তেঁতুল-কাসুন্দী খেয়ে কত প্রশংসা করেছে।

খুড়িমা প্রতিবাদ করিলেন না, কিন্তু শৈলর এই মানসিক দুর্ব্বলতার জন্য মনে মনে হাসিলেন। গোপাল না জানিলেও গ্রামের সকলেই এই দুর্ঘটনার কথা জানিত।

বাড়ীর অদূরে পুরাতন ভিটায় একটা ছোট চারা তেঁতুল গাছ আছে, ফাল্গুনের শেষে শৈল নিজেই আঁকুশী দিয়া প্রত্যহ কিছু কিছু তেঁতুল পাড়িয়া আনিত; কিন্তু এক দিন উপরের দিকে চাহিয়া তেঁতুলের গোছায় টান দিতেই তেঁতুলগুলা চোখের উপর আসিয়া পড়ে!—শৈল চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। প্রতিবেশীরা তাহাকে গৃহে লইয়া আসে এবং প্রায় মাসাবধি অশেষ কষ্ট পাইয়া তাহার চক্ষু ভাল হইয়াছে, কিন্তু চোখের সম্পূর্ণ দৃষ্টি ফিরিয়া পায় নাই। তাহার পর রুগ্ন দেহে বৈশাখের খর রৌদ্রে পুড়িয়া সে তেঁতুল-কাসুন্দী তৈয়ারী করিয়া রাখিয়াছে গোপালের জন্যে—পূজার বন্ধে আসিয়া সে খাইয়া হয় ত প্রশংসা করিবে, এবং কিছু বাসাতেও লইয়া যাইবে।

পূজা আগতপ্রায়।

কবে গোপাল আসিয়া পৌছিবে, সে সম্বন্ধে কোন চিঠি-পত্র না পাইয়া শৈল ব্যস্ত হইয়াছিল! পাড়ার শিক্ষিত দুই এক জন লোককে প্রশ্ন করিয়া জানিল যে মহালয়ায় আদালত বন্ধ হইবে, এবং মহালয়ায় দিনই সে বাড়ী আসিয়া পৌছিতে পারে।

মহালয়ায় সমস্ত দিন অধীর আগ্রহে সে ঘাটের দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু গোপাল আসিল না; রাত্রে নৌকার শব্দ পাইলেই ল্যাম্প জ্বালিয়া উঠিয়া আসিল, কিন্তু তবু সে আসিল না বা তাহার কোন পত্রও পাওয়া গেল না; কয়েক দিনে অস্বাভাবিক ব্যাকুলতা ও অস্বস্তিকর প্রতীক্ষায় কাটিয়া গেল—অবশেষে পঞ্চমীতে গোপাল বাড়ী আসিল।

ঘরের গোছানো সমস্ত সামগ্রী দিয়া নানা প্রকার ব্যঞ্জন রাঁধিয়া ভ্রাতাকে খাওয়াইতে খাওয়াইতে প্রশ্ন করিল,—আমি কত ভাবছি, সেই মহালয়া থেকে পথের দিকে চেয়ে আছি! একখানা পত্র ত দিতে পারতিস্।

গোপাল সংক্ষেপে জবাব দিল,—সময় কোথায়? বন্ধ কাজ শেষ করতে হ'ল, তা ত জান না!

—বৌ ত লিখতে পড়তে জানে; সে ত একখানা চিঠি লিখে জানাতে পারে। আজ তিন রাত্রি চোখে ঘুম নেই। ভাত রেঁধে রেঁধে নষ্ট করেছি।

চিত্রা একটু ব্যঙ্গের সহিত হাসিয়া কহিল,—আমারই বা এত সময় কোথায় ? রান্নাঘরেই দিনরাত্রি কেটে যায়। আর ব্যস্ত হবারই বা কি আছে ?

শৈল জবাব দিল না।—এমনি অধীর প্রতীক্ষা, সারা বৎসরের সঞ্চিত আশা—আগ্রহ যাহারা অকিঞ্চিৎকর মনে করে, তাহার ব্যাকুলতার মূল্য তাহারা কি বুঝিবে ? শৈল দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

গোপাল কহিল,—এখন ত আর আমি ছোটটি নই যে, আমার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত হ'তে হবে !

শৈল তবুও কোন কথা বলিল না ; তাহার মনের ভাব বুঝাইবার ভাষা নাই।

পূজার ছুটি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। গোপাল আজ আত্মীয়াদির পরে সস্ত্রীক কার্য্যস্থলে যাত্রা করিবে ; শৈলর বিশ্রাম নাই। নানারূপ পাত্রে নানা রকম আচার প্রভৃতি, হাঁড়িতে খৈএর ধান, মুড়ির চাল, কালজিরা, ধনে প্রভৃতি বাঁধিয়া সে সঙ্গে দিবে। ঘরের নানা স্থানে যে সব পুঁটুলীতে নানা জিনিস সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল, সব খুলিয়া খুঁজিয়া স্বতন্ত্র পোঁটলায় বাঁধিতেছে।

চিত্রা কহিল,—এ সব কি কচ্ছেন ? এত সব নিয়ে গিয়ে কি হবে ?

শৈল মুখ না তুলিয়াই কহিল,—সংসারের কাজে সবই লাগবে বৌ ! সেখানে কড়ি না হ'লে ত ছাইটুকুও মেলে না।—দ্যাখো ত বাঁধুনী কটা বেঁধেছি কি না।

চিত্রা কিছু দেখিল না। এ শ্রম একান্তই অনর্থক এবং দ্রব্যগুলি একেবারে অকিঞ্চিৎকর ভাবিয়া মনে মনে সে হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল ; কিন্তু অকিঞ্চিৎকর এই বস্তুগুলির স্তূপের পিছনে কি বিরাট স্নেহ ত্যাগের মহিমা সমুজ্জ্বল, তাহা সে দেখিতে পাইল না। সে কথা তাহার মনেও স্থান পাইল না !

গোপাল আসিয়া হাসিয়া কহিল,—এই সমস্তই নিয়ে যেতে হবে না কি দিদি !

শৈল হাসিয়া কহিল,—হাঁ, তোর জন্যেই ত ও-সব—তা নইলে আমার নিজের আর এ সব আচার, মসলায় কি দরকার ?

—সব নিয়ে যেতে একখানা নৌকা লাগবে যে !

—না না, এমন বেশী কি দিচ্ছি ?

গোপাল কহিল,—না দিদি, অত সব নিয়ে যাওয়া যাবে না, যা না হ'লে চলে না; তাই দাও।

ঘাটে নৌকা প্রস্তুত।

একে একে সমস্ত জিনিষই উঠিয়াছে, এখন যাত্রীরা উঠিলেই নৌকা ছাড়িবে। গোপাল, চিত্রা ও প্রতিবেশী দুই-এক জন ঘাটে আসিয়া জুটিয়াছে। শৈল কিছু কাল পরে এক হাঁড়ি তেঁতুল লইয়া নৌকার নিকট উপস্থিত হইল।

গোপাল প্রশ্ন করিল—ও আবার কি আনলে টানতে টানতে ?

শৈল সগর্ব্বে কহিল,—ঐ চাবাগাছের তেঁতুল। তোর জন্যে ভাল করে শুকিয়ে রেখেছিলাম ; কিন্তু নানা কাজে আগে সঙ্গে দিতে ভুল হ'য়েছে।

—ও কি করে নেওয়া যাবে ? নৌকো কি রকম বোঝাই হ'য়েছে দেখ্‌ছো ত !

—তা হোক্, তা হোক্, একটা হাঁড়ি কি আর ওতে ধরবে না ?

গোপাল একটু বিরক্ত হইয়াই কহিল,—ও-হাঁড়ি আবার কোথায় রাখবো ? নিজেদেরই ত বসবার জায়গা নেই ! কোন মতে যদি বসে থাকা যায়—

শৈল বলিল,—ওই পাশে রেখে দিবি। এমন তেঁতুল ত আর পয়সা দিয়েও পাবি নে, না হয় নৌকার খোলে—

মাঝিরা আপত্তি করিল ; খোলে আর একবিন্দু স্থান নাই।

—ও থাকগে, রেখে দাও।

বাদানুবাদে বিশেষ কোনই ফল হইল না। যাহা হউক, অবশেষে স্থির হইল, নৌকায় কল আরোহী উঠিবার পরে যদি স্থান থাকে, তবেই তেঁতুলের হাঁড়ি সঙ্গে যাইবে।

চিত্রা ও গোপাল নৌকায় উঠিয়া বসিল ; ছৈএর মাঝে সামান্য একটু স্থান। শৈল কক্ষ হইতে হাঁড়িটি নৌকার আগ মাথায় রাখিয়া কহিল,—ওই কোণে রেখে দে গোপাল !

গোপাল বোধ হয় সেটা লইতে ইচ্ছুক ছিল, কিন্তু চিত্রা অত্যন্ত বিরক্তির সহিত কহিল,—ওটা নিলে ব'সবো কোথায় ? তবে তেঁতুলই যাক, আমি এক দ্বীপে যেতে পারবো না।

গোপাল মাঝিকে আদেশ দিল,—ওটা নীচে নামিয়ে দাও।

মাঝি হাঁড়িটা মাটিতে নামাইয়া রাখিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল।

তীব্র বেদনায় শৈলর বুকের ভিতর মোচড় দিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে চোখ দু'টি জ্বালা করিয়া জলে ভরিয়া গেল।

চোখ দুইটি অঞ্চলে মুছিয়া শৈল যখন চাহিল, তখন নৌকাখানা অদূরে খালের মোড়ে অদৃশ্য হইয়াছে, এবং প্রতিবেশীগণও তাহাকে ফেলিয়া রাখিয়া বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। সে একাকী পুঞ্জীভূত বেদনার মত তেঁতুলের হাঁড়ি সম্মুখে লইয়া স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া আছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া হাঁড়িটি কক্ষে লইয়া শৈল ধীর পদবিক্ষেপে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

সন্ধ্যার পরে গৃহের দাওয়ায় একটা ল্যাম্প জ্বালিয়া বেড়ায় ঠেস দিয়া শৈল হাঁড়িটার পানে চাহিয়া কত কি ভাবিতেছিল ! বিশ্বের সমস্ত ব্যর্থতা সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে কালো হাঁড়িটার ভিতর যেন বাসা বাঁধিয়া জীবনকে একেবারে বিস্বাদ ও নিস্তেজ করিয়া তুলিয়াছে ! সেই নিস্তব্ধ পল্লীর সান্ধ্য অন্ধকারে বারংবার যেন তাহার কর্ণমূলে ধ্বনিত হইতেছে—অলীক এই মোহবন্ধন !

খুড়িমা যাইতেছিলেন, তিনি কহিলেন,—অমন ক'রে বসে কেন ভাসুর-ঝি ? কি হয়েছে তোমার ?

সামান্য সমবেদনায় শৈলের অন্তরের পুঞ্জীভূত বেদনার বাঁধ ভাঙিয়া গেল। সে কহিল,—ওরা তেঁতুল নিল না—কিছুতেই হাঁড়টা নিয়ে গেল না। শৈলের দুই চোখে অশ্রুরাশি উৎসারিত হইল।

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (এম-এ, বি-এল)

হিন্দুর পূজা

বাঙ্গালী হিন্দু আমরা, আমরা মূর্ত্তি-পূজক। একেশ্বরবাদিগণের উপাসনা-প্রণালী হইতে আমাদের উপাসন-প্রণালী একটু পৃথক্ রকমের। একেশ্বরবাদিগণ তাই বলেন, আমরা পুতুলপূজা করি, ইট-কাঠ পাথরের পূজা করি;—আমরা জড়োপাসক,—তাই অবজ্ঞেয়—ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁহাদের মধ্যে ধর্ম্মান্ধ কেহ কেহ আমাদের দেবমন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, আমাদের উপাস্য প্রতিমাসমূহ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া মনে মনে আত্ম-প্রসাদ অনুভব করেন,—মনে করেন, ভারী পুণ্যকার্য্য করিলেন,—করিয়া ভগবানের প্রীতিভাজন হইলেন। ভাবেন, ঐ আঘাতে আমাদের দেবতাগুলি দেবমন্দির সহ নিঃশেষ হইয়া গেল, অধর্ম্ম দেশ হইতে দূর হইল! আমাদের নিজেদের মধ্য হইতে উদ্ভূত ব্রহ্মবাদী বলিয়া পরিচিত এক দল আছেন। মানব সমাজে ধর্ম্মজ্ঞানের আবির্ভাবের বয়সের তুলনায় ইহাদিগকে সদ্যোজাত শিশু বলিলেই হয়,—শৈশব অতিক্রম করিয়া ইহারা কখনও বাল্যে উপনীত হওয়া পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিবে, এমন সম্ভাবনা কিছুমাত্র দেখা যাইতেছে না। তবু ঔদ্ধত্য প্রকাশের মোহ এমনি প্রবল যে, ইহাদেরও কেহ কেহ (সকলে নহে) পর্য্যন্ত বলিতে ছাড়েন না, আমরা পুতুল-পূজকগণের কেহ নহি, পুতুল-পূজকগণকে আমরা ঘৃণা করি, উহাদের পূজাপদ্ধতির সহিত আমাদের কিছু-মাত্র সহানুভূতি নাই! শ্রদ্ধেয় মনীষী ৺বিপিনচন্দ্র পাল এক বার লিখিয়াছিলেন, ভাবের বন্যায় যখন দেশ ভাসিয়া যায়, তখন যে পারে পারুক, আমি শুষ্ক ব্রহ্মডাঙ্গায় বসিয়া থাকিতে পারিব না। কিন্তু বিপিনচন্দ্রের মস্তিষ্ক ও হৃদয় সকলের নাই, উক্ত সমাজে বৃহৎ বালকের অভাব নাই, তাঁহাদের বালকত্ব কোন দিনই ঘুচিবে না! ইঁহাদের উক্তি ও মতামত একান্তই উপেক্ষার যোগ্য। কিন্তু রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রবীণ শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়?—ইঁহাদের নাম করিতেই যে মস্তক শ্রদ্ধায় অবনত হইয়া আসে। ইঁহারাও কি হিন্দুদিগকে পুতুল-পূজক মনে করিয়া গিয়াছেন বা করেন এবং নিজদিগকে হিন্দু হইতে পৃথক্ মনে করেন? সামাজিক ব্যাপারে যাহাই হউক, ধর্ম্মে যে কেশবচন্দ্র নিজেকে হিন্দু হইতে পৃথক্ মনে করিতেন না, ভগবান রামকৃষ্ণ পরমহংসের সহিত তাঁহার সৌহৃদ্য হইতেই তাহা বুঝা যায়। তাঁহার বক্তৃতাবলীর মধ্যে হিন্দু দেবদেবী-মূর্ত্তিকল্পনার এমন চমৎকার ব্যাখ্যা আছে যে, প্রতীকোপাসনার ভক্তগণ তাঁহার অপেক্ষা বেশী অথবা সুন্দরতর, স্পষ্টতর করিয়া কিছুই বলিতে পারিবেন না। হিন্দু দেবদেবীর কল্পনা নিরতিশয় মধুর ও কাব্যগন্ধী। আমাদের অন্তরতম কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ প্রতীকোপাসনায় সেই সরল অনাবিল সৌন্দর্য্যরসে অভিষিক্ত না হইয়া কখনই পারেন নাই। তাঁহার পত্রাবলী হইতে, তাঁহার কবিতাবলী হইতে বহু উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া এই কথা সপ্রমাণ করা যাইতে পারে। তাঁহার সরস আগমনীর গান:—

সারা বরষ দেখি নাই মা তুই মা আমার কেমন ধারা।
নয়নতারা হারিয়ে আমার অন্ধ হল নয়নতারা।
এলি কি পাষাণী ওরে
দেখব তোরে নয়ন ভরে,
কিছুতে মানে না যে মা এ পোড়া নয়নের ধারা।

দাশরথি রায়ের অতুল আগমনী গানসমূহের সহিত গাহিতে গাহিতে কত আগমনী-দিনে আমাদের নয়ন অশ্রুসজল হইয়াছে। তাঁহার নটরাজের নৃত্যের গান, তাঁহার—

যোগী হে, যোগী হে, কে তুমি হৃদি-আসনে।
বিভূতি-ভূষিত শুভ্র দেহ, নাচিছ দিগ্‌বসনে।
মহা আনন্দে পুলককায়
গঙ্গা উছলি উছলি ধায়
ভালে শিশু-শশী হাসিয়ে চায়—জটাজুট-ছায় গগনে।

এমন গান কি প্রতীকোপাসনা-বিদ্বেষীর রচিত হইতে পারে? কিন্তু রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, শিবনাথ, এই সকল মহামনীষী—অতুলনীয় ভগবদ্ভক্তি সম্পদের অধিকারী বঙ্গের এই শ্রেষ্ঠ সন্তানগণ সত্যই কি প্রতীকোপাসনার মত সহজ সরল কাব্যরসপ্লুত ভগবৎপূজাপদ্ধতি বুঝিতে না পারিয়া অনর্থক একটা পৃথক সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন? এ কথা ভাবিতেও যে ব্যথা বোধ হয়। কিন্তু পৃথক্ সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব তো স্বপ্নও নহে, মায়াও নহে। উহা তো সত্যই সৃষ্ট হইয়াছিল, এবং আসন্ন অকাল-মৃত্যুর সমস্ত চিহ্ন অঙ্গে বহন করিয়াও অদ্যাপি উহা বাঁচিয়া আছে। উহার স্বার্থবুদ্ধিসচেতন কেহ কেহ তপশীলভুক্ত বলিয়া পরিচয় দিয়া চাকরীর বাজারে প্রবেশাধিকার অর্জ্জনের চেষ্টায় অদ্যাপি মসগুল! দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নদর্শকগণ আশার স্বপ্নে মুসলমান-খৃষ্টানকে দুর্গামন্দিরে বসিয়া নামাজ-উপাসনায় রত এবং নিষ্ঠাবান্ পণ্ডিতকে মসজিদের অভ্যন্তরে ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন দেখিতে পান। সেই সুস্বপ্ন এক দিন ফলিবেই ফলিবে, কিন্তু কত দিনে ফলিবে, তাহা স্বপ্ন যিনি দেখান, তিনিই বলিতে পারেন। কিন্তু ব্রহ্মমন্দিরে দুর্গাপূজা এবং দুর্গা-মূর্ত্তির পদতলে বসিয়া আদ্যাশক্তি বা পরম ব্রহ্মের উপাসনা সত্যই কেন হইবে না, তাহার কারণ তো খুঁজিয়া পাই না! ভুল বুঝিয়া যে ভ্রাতা মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গিয়াছে, মহা মিলনের এই গুরুতর আবশ্যকতার দিনে সে কেন যে ভাইএর কোলে ফিরিয়া আসিবে না, তাহার হেতু তো বুঝিতে পারি না।

ভয়ানক গোঁড়া মুসলমান, খৃষ্টান বা ব্রাহ্মকে নিজের পিতা, কি মাতার ফটোগ্রাফ একখানা হাতে দিয়া জিজ্ঞাসা করুন, উহাকে তিনি পায়ের নীচে মাড়াইতে পারেন কি না। সম্ভবতঃ এই উত্তরই পাইবেন যে, উক্ত কার্য্য তাহা হইতে অসম্ভব। কেন? ফটোখানা তো একটু

কাগজ ও কয়েকটি রাসায়নিক দ্রব্যের সমবায়ে গঠিত। তবে উহার উপর পা রাখিতে আপত্তি কেন? আপত্তি এই জন্য যে, কাগজ ও রাসায়নিক দ্রব্যের অতিরিক্ত উহাতে একটি জিনিষ আছে, তাহা নিজের নমস্য, পরম শ্রদ্ধেয় নিজের জনকের প্রতিকৃতি। ঐ যে পিতার ভাবটুকু সমগ্র কাগজখানি ব্যাপিয়া বর্ত্তমান, তাহার জন্যই এই নগণ্য কাগজখানির উপর ব্রাহ্ম, খৃষ্টান বা মুসলমানেরও পা রাখা চলে না। হিন্দুর প্রতীকোপাসনা কি ইহা হইতে কিছু ভিন্ন? ভগবান্ বাক্য-মনের অতীত। তিনি নির্গুণ। শাস্ত্রকার সেই নির্গুণের গুণ বর্ণনা এবং বাক্যের অতীতকে বাক্যে প্রকাশের চেষ্টারূপ অপরাধ করিয়া পুনঃ পুনঃ মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু ভগবদ্বিশ্বাসীর এই অপরাধ সর্ব্বদাই করিতে হয়, প্রত্যহ করিতে হয়, প্রতিক্ষণে করিতে হয়। কতকগুলি শব্দ দ্বারা তাঁহাকে বোধগম্য করিতে হয়। তিনি সর্ব্বশক্তিমান, তিনি পরমকারুণিক, সর্ব্বকাল, সমগ্র বিশ্ব, সমগ্র সৌন্দর্য্য, সমগ্র জ্ঞান তাঁহার আয়ত্ত। সমগ্র সৃষ্টি তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া পুষ্পের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভগবদ্ভাব বুঝাইতে মানব জাতির এইরূপ কতকগুলি কথা ছাড়া আর কি সম্বল আছে? এই কথাগুলি দ্বারাই তো তাঁহাকে বুঝিতে বুঝাইতে চেষ্টা করিতে হইবে?

হিন্দুর মন কাব্যরসপূর্ণ, তাঁহার হৃদয় নিজের অনুভূতিকে সুন্দর রূপ, হৃদয়গ্রাহী রূপ দিতে সর্ব্বদাই উন্মুখ। একটি পরম সুন্দর বিরাট্ পুরুষ কল্পনা করিয়া হিন্দু তাঁহার বিবিধ গুণাবলি, তাঁহার শক্তির প্রকারভেদ বুঝাইতে তাঁহার কয়েকখানি হাত কল্পনা করিল। উহাদের এক হাতে চক্র বসাইয়া দিল, এই বুঝাইতে যে অনন্ত অবিশ্রাম ঘূর্ণমান সময়-চক্র [Time] ভগবানের করতলগত। অপর হস্তে শব্দবহ শঙ্খ বসাইয়া বুঝাইল, শব্দবহ অনন্ত আকাশ [Space] তিনিই ধরিয়া আছেন। অনন্ত শক্তির প্রতীক গদা অপর হাতে দিয়া বুঝাইল, সমস্ত শক্তির [Energy] মূলাধার তিনিই। দুষ্কৃতিকারীর প্রতি বিহিতব্য অনিবার্য্য শাসন [Laws of Nature] ও ভগবৎশক্তির অপর এক মহা প্রকাশ। বরযুক্ত সুশোভন পদ্ম অপর হাতে দিয়া বুঝাইল, এই বিশাল সৃষ্টি [Creation] সুন্দর ফুলটির মত তাঁহারই হস্তাবলম্বনে ফুটিয়া আছে এবং অবিশ্রান্ত তাঁহারই করুণা-জলে অভিষিক্ত হইতেছে। মনোগামী গরুড় তাঁহার বাহন, অর্থাৎ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র তিনি আবির্ভূত আছেন। দুই ধারে দুই শক্তি লক্ষ্মী ও সরস্বতী দ্বারা বুঝান হইতেছে যে, জগতের যত সৌন্দর্য্য, যত প্রাচুর্য্য তাঁহার চরণযুগল ঘিরিয়াই বিরাজ করিতেছে। কতকগুলি কথা দ্বারা তাঁহাকে বুঝিতে চেষ্টা করা অপেক্ষা উপরে বর্ণিত কাব্য ও হৃদয়রসে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহাকে বুঝিতে, তাঁহাকে পূজা করিতে চেষ্টা করা যে অবজ্ঞেয় কি করিয়া হয়, তাহা তো আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধির একেবারেই অগোচর!

আমার মত ক্ষুদ্র বুদ্ধির নিকট যাহা এত স্পষ্ট, তাহা যে আমাদের দেশের মহামনীষিগণ বুঝিতে পারিতেন না, এমন অসম্ভব কথা কেমন করিয়া ধরিয়া লইব? কেবলমাত্র পৃথক্ পার্থক্যাভিমানী সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব দেখিয়াই সন্দেহ হয়, কোথায় যেন একটা গলদ রহিয়া গিয়াছে, একটা ভুল হইয়া গিয়াছে। সন্দেহপরায়ণ বলিবেন, কল্পনা তো বেশ করিয়াছ, কিন্তু তদনুসারে প্রতিমা গড়িয়াই তো পুতুল-পূজা আরম্ভ করিয়া দাও,—ঐ ইট-কাঠ-পাথরের পূজা। ইহা অপেক্ষা দারুণ অজ্ঞতা আর কিছুই হইতে পারে না। দেবপ্রতিমা দেবতার ভাব বহন করে বলিয়াই পূজনীয়, ফটো পিতার ভাব বহন করে বলিয়াই শ্রদ্ধেয়। প্রতিমার ইট-কাঠ-পাথর মাটিকে কেহ পূজা করে না,—উহাদের অবলম্বনে যে ভগবৎ-কল্পনা বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, পূজা হয় সেই কল্পনার। ফটোকে যে হিসাবে শ্রদ্ধা করা হয়, ভগবৎ-কল্পনার আধার বলিয়াই প্রতিমাকে তেমনি পবিত্র মনে করা হয়। পূজার প্রায়োজন অতীত হইলেই উহা আবার মৃত্তিকা বা পাষাণে পরিণত হয়, উহা বিসর্জ্জিত হয়। দুর্গাপ্রতিমার বিসর্জ্জন
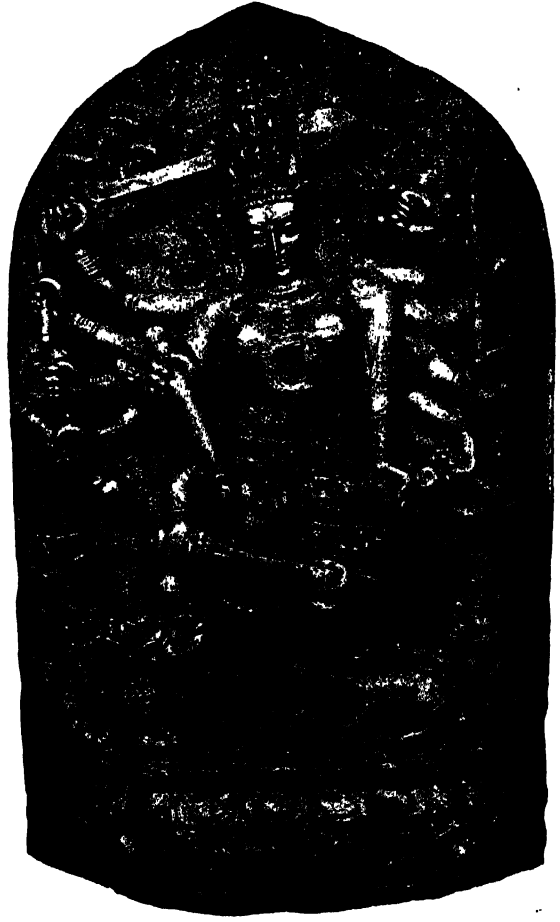
৮ শত বৎসরের পুরাতন দুর্গামূর্ত্তি

কি এই সন্দেহপরায়ণগণ প্রত্যেক বৎসর চোখের সামনে দেখেন না? অজ্ঞতম হিন্দুও জানে, পাথর বা মাটির পূজা হয় না,—পূজা হয়, উহাতে যে দেবতার কল্পনা করিয়া দেবতার আবাহন করা হইয়াছিল, তাঁহারই। কতকগুলি শুষ্ক কথার পরিবর্ত্তে অপূর্ব্ব কাব্যরসসিক্ত কল্পনার অবতারণা করিয়া শ্রেষ্ঠ শিল্পিগণের শিল্পরচনার সাহায্যে কল্পনা ফুটাইয়া তুলিলেই যদি তাহা কাহারও অবোধ্য হইয়া দাঁড়ায়, তবে দুর্ভাগ্য কল্পনাকলারসিকগণের নহে, দুর্ভাগ্য—যিনি তাহা বুঝিলেন না তাঁহারই।

অনন্ত ভগবৎশক্তির বহুবিধ প্রকাশ সৃষ্টির আরম্ভ হইতে মানব-সমাজে দেখা যায়। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানব সমাজে ক্রমশঃ ভগবদ্‌বুদ্ধি—(God-consciousness) জাগিয়াছে। জ্ঞানী ভক্তগণ যোগনেত্রে ভগবৎশক্তির বিবিধ প্রকার বিকাশ লক্ষ্য করিয়া মানস-নয়নে এক এক দেব বা দেবীর মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তত্ত্বজ্ঞ সাধকগণ ভগবদানন্দে বিভোর হইয়া সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্‌কে কি ভাবে বিষ্ণুরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণনা করিয়াছি। মানব-সভ্যতা সমস্ত দিক্ দিয়াই উন্নতির দিকে চলিতেছে। অজ্ঞানের অন্ধকার জ্ঞানের আলোকে ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতেছে। অবোধ্য শব্দরাশি ক্রমশঃ ভাষায় পরিণতি লাভ করিতেছে। এলো-মেলো মধুর ধ্বনিসমূহ ক্রমশঃ সুসম্বদ্ধ সঙ্গীতে পরিণত হইতেছে। মানবের ধ্যান ধারণায় দিন দিন নূতন নূতন সত্য ফুটিয়া উঠিয়া মানব সভ্যতাকে একটি সহস্রদল পদ্মের মত বিকশিত করিয়া তুলিতেছে! সেই শ্বেতশতদলে বসিয়া কলনাদী মনোহংসের উপর রাতুল পা দু'খানি রাখিয়া ধ্যানজ্ঞানময়ী যে জ্যোতিঃপ্রতিমা বীণায় অশ্রান্ত সঙ্গীততরঙ্গ তুলিতেছেন, তাঁহাকে যদি কাহারও মাটির প্রতিমা মৃত্তিকাময়ী বলিয়া বোধ হয় তবে তাহা তাঁহার নিজেরই দুর্ভাগ্য। এই জ্যোতির্ম্ময়ী ভগবৎশক্তির পূজা ছাত্রাবাসে হইতে দিবেন কি দিবেন না, ঠিক্ করিতে আমাদের হতভাগ্য দেশে কর্ত্তৃপক্ষগণকে সময় সময় গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হয়। এই জ্যোতির্ম্ময়ী সর্ব্বশুক্লা কল্পনার নিকট মস্তক অবনত করিতে, তাঁহার প্রসাদ ভিক্ষা করিতে ব্রাহ্ম মুসলমান খৃষ্টান কাহারও আপত্তি হওয়া উচিত নহে।

শারদ পূর্ণিমায় জ্যোৎস্না-জোয়ারে যখন ভুবন ভাসিয়া যায়, যখন খালে বিলে জলাশয়ে সরোবরে কুমুদ কহ্লার শতদলের বক্ষ নিঙাড়িয়া উহাদের সৌন্দর্য্য ও সুবাসের সমস্ত ঐশ্বর্য্য ধূপগন্ধের মত দেবতার আবাস-পানে উঠিতে থাকে,—শেফালীর গন্ধে যখন সন্ধ্যা সুবাসমন্থর হয়, মাঠে মাঠে যখন সুপক্ব ধান্য সারা দেশময় সোণা বিছাইয়া দেয়, তখন সোনার ঝাঁপি হাতে করিয়া প্রাচুর্য্য ও সৌন্দর্য্যের দেবী লক্ষ্মী ঠাকুরাণী সংযতবাক্ গম্ভীর-প্রফুল্ল বদন পেচক-বাহনে যে মর্ত্ত্যে নামিয়া আসেন, তাহা চক্ষুষ্মান্ মাত্রেরই প্রত্যক্ষ সত্য। তখনও যদি কাহাকেও বুঝাইতে হয়, আমরা মাটির ঢেলা পূজা করিতেছি না, এই কল্পলক্ষ্মীরই পূজা করিতেছি, তাঁহারই আগমন বাঞ্ছা করিয়া ঘর-দুয়ার আলিম্পনে আলিম্পনে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিতেছি,—তবে স্থূলবুদ্ধি স্থূলনয়ন সেই বোদ্ধা নিতান্তই হতভাগ্য।

কার্ত্তিকী অমাবস্যা-রাত্রির দ্যুতিমান্ অন্ধকারে নক্ষত্র-তারকা-ঝলমল আকাশের দিকে চাহিয়া কাল-মহাসিন্ধুর ফেনপুঞ্জের উপর শুভ্রকায় মহাকালকে কি শয়ান প্রত্যক্ষ কর না? তাঁহার বুকে জলদবরণী দিগ্‌বসনা মহাকালী শ্যামার নৃত্য দেখিতে পাও না? তাঁহার গলায় নৃমুণ্ডমালা, তাঁহার হস্তে উত্থিত খড়্গ ও লম্বমান রুধিরস্রাবী নরমুণ্ড দেখিতে পাও না? দেখিয়া ভয় পাইও না। ঐ দেখ, মায়ের হাতে বর এবং অভয়ও আছে। সৃষ্টির আদি দিন হইতে মহাকালীর নৃমুণ্ডমালার গঠন চলিতেছে, মৃত্যু সৃষ্টির অমোঘ ও ভয়াবহ সত্য। কিন্তু হননের পরেই বক্ষে গ্রহণ ও নবজীবন দান। অনাদি কাল হইতে এই জীবন-মরণের লীলা মহাকালের বুকে চলিতেছে:—

ডান হাত হতে বাম হাতে লও বাম হাত হতে ডানে।
আপনার ধন আপনি হরিয়া কি যে কর কে বা জানে!

রবীন্দ্রনাথ এই লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াই লিখিয়াছিলেন:—

চিরকাল এ কি লীলা গো
অনন্ত কলরোল!
অশ্রুত কোন গানের ছন্দে
অদ্ভুত এই দোল!

মহাকালের বুকে অনাদি কাল হইতে মহাকালীর এই নৃত্য যুগে যুগে সাধকগণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এই অদ্ভুত মরণ-দোলার দোল দেখিয়াই রামপ্রসাদ বলিয়া উঠিয়াছিলেন—

দোলে দোলে রে আনন্দময়ী করালবদনী।

বলিয়াছিলেন—

যে দেখেছে মায়ের দোল।
সে পেয়েছে মায়ের কোল॥

আর, মহাকালের বুকে মহাকালীর পূজা দেখিয়া অল্পবুদ্ধি অজ্ঞগণ ভাবেন, একটা নেংটা মূর্ত্তি পূজা করিয়া হিন্দুগণ অশ্লীলতার প্রশ্রয় দিতেছে!

এইরূপ আর কত ব্যাখ্যা করিব? সাধকগণ গভীরতম সাধনার বলে সত্যদর্শনের চরম শিখরে উঠিয়া ভগবৎশক্তির যে অপূর্ব্ব রূপ-সমূহ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহার সমস্তগুলি বুঝিবার ক্ষমতাও আমার মত অল্পবুদ্ধির নাই। তবু বড় দুঃখে, বড় ক্ষোভেই আজ এই ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতে বসিয়াছি।

দশমহাবিদ্যার কল্পনায় তান্ত্রিক সাধকগণ মহাশক্তির অদ্ভুত অদ্ভুত রূপসমূহ প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন। ধরুন, যেমন ছিন্নমস্তা! এমন গভীর কবিত্ব ও তত্ত্বময় কল্পনা পৃথিবীর আর কোথাও কেহ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন কি না, আমার জানা নাই। নিম্নে বাহন বদ্ধ রতি-কাম, সৃষ্টি প্রক্রিয়া চলিতেছে। উহার উপর এই বিশাল জগৎ বেগবান উৎসের মত উচ্ছ্রিত হইয়া উঠিয়াছে এবং অন্তিমে সে আপনার মাথা আপনি কাটিয়া নিজেই নিজের রক্তপান করিতেছে! বর্ত্তমানে এই যে ভয়ানক আত্মবিধ্বংসী যুদ্ধে জগন্ময় ছিন্নমস্তা নাচিতেছেন,—ইহারই করাল রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন:—

শ্মশানবিহারবিলাসিনী
ছিন্নমস্তা মুহূর্ত্তেই মানুষের সুখস্বপ্ন জিনি
বক্ষ ভেদি দেখা দিল আত্মহারা
শত স্রোতে নিজ রক্তধারা
নিজে করি পান।

দশ মহাবিদ্যার এক মহাবিদ্যা ধূমাবতীকে প্রকাণ্ড কুলা হস্তে বিশ্ববিধানের সমস্ত দরজায় অতন্দ্র পাহারা দিতে আপনারা কি কেহ প্রত্যক্ষ করেন নাই? মানের দরজায়, যশের দরজায়, সাহিত্যের দরজায়, বাণিজ্যের দরজায়, খ্যাতির দরজায়, বীরত্বের দরজায়? এই লোলচর্ম্মা মূর্ত্তিমতী অভিজ্ঞতা সর্ব্বত্র দাঁড়াইয়া দারুণ কুলার বাতাসে সমস্ত ফাঁকা শস্যকে উড়াইয়া কালের নস্তে পরিণত করিতেছেন। ফাঁকী দিয়া কেহ ঐ সমস্ত দরজায় ঢুকিয়া পড়িবে,

বিশ্ববিধানে এই নিয়ম নাই, ধূমাবতী দেবী এই বিধানের বিধাতা। কবি শশাঙ্কমোহন তাই লিখিয়াছিলেন :—

শক্তি যাদের এসো এসো দলে দলে নাই মানা ;
ধূমাবতী ঐ যে বুড়ী সেই পুরীতে দেয় থানা।
দারুণ বায়ে কাঁকা শস্য
উড়িয়ে করে কালের নস্য
মহাকালের ইচ্ছাপুরী অমর বীজের কারখানা।

মার্কণ্ডেয় পুরাণকারের অতি মধুর—অতি উদ্দেজক কবিত্ব-রসপূর্ণ কল্পনা ভগবতী দুর্গাদেবী। কোন সুদূর অতীতে এই মনোহর কল্পনা কোন মহাকবি মহর্ষির ধ্যাননেত্রে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, আজ আর তাহা ঠিক করিয়া বলিবার উপায় নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সোণার পাতে অঙ্কিত খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দের উমা-মহেশ্বর মূর্ত্তি পাটলীপুত্রের ধ্বংসাবশেষ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। দশভূজা মহিষমর্দ্দিনী দুর্গামূর্ত্তির কল্পনা উহা হইতে নবীনতর সম্ভবতঃ নহে। ৫ম-৬ষ্ঠ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রস্তরনির্ম্মিত দুর্গা-প্রতিমার দেখা মিলিতে থাকে। পাল ও সেনযুগের অসংখ্য প্রস্তরনির্ম্মিত দুর্গা-মূর্ত্তি বাঙ্গালা দেশে পাওয়া গিয়াছে।

বাঙ্গালা দেশের হৃদয়ের ধন এই অপূর্ব্ব কল্পনার ব্যাখ্যা আমি আর কি করিব ? মহামনীষী বঙ্কিমচন্দ্র ভক্তি-গদগদ চিত্তে লিখিয়া গিয়াছেন :—

"সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির উপরে দূর প্রান্তে দেখিলাম, সুবর্ণমণ্ডিতা, এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা। * * * রত্নমণ্ডিত, দশভুজ—দশ দিক্ - দশ দিকে প্রসারিত। তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত ; পদতলে শত্রুবিমর্দ্দিত। পদাশ্রিত বীরজন কেশরী শত্রুনিষ্পীড়নে নিযুক্ত * * * দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞান মূর্ত্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্য-সিদ্ধিরূপী গণেশ,—আমি সেই কালস্রোতোমধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গ-প্রতিমা।"

মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডী নামে পরিচিত মনোহর কাব্যখানিতে এই মহাশক্তির উৎপত্তি ও লীলা বর্ণিত হইয়াছে। হিন্দুগণের এই কাব্য অবশ্যপাঠ্য, অ-হিন্দুগণও এই কাব্যখানি পাঠ করিলে আনন্দই পাইবেন।

প্রায় ৮০০ বছরের পুরাতন দুর্গার একখানি অপূর্ব্ব সুন্দর মূর্ত্তির প্রতিকৃতি এই সঙ্গে মুদ্রিত হইল। ঢাকার দক্ষিণস্থ শাক্তা গ্রামে ঘোষ-পরিবারে এই মূর্ত্তিখানি পূজিত হয়।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী (এম-এ, পি, এইচ, ডি)।

আজি মোর নূতন প্রভাত

প্রভাতে যে ফুল ফোটে—বহু দিন দেখিয়াছি, অনুভব করিয়াছি মনে ;
শুনিয়াছি ঘুম-ভাঙ্গা বিহগের আবাহন হিম-সিক্ত শীতল পবনে ;

ঊষার প্রথম আলোখানি
বহু দিন কাণে-কাণে বলে গেছে দিবসের বাণী :
বিস্তৃত প্রান্তর 'পরে দিগন্তের অস্পষ্ট ইঙ্গিত
বহু দিন চিত্তমাঝে ধ্বনিয়াছে ক্লান্তি-ভরা উদাসীন ভৈরবী সঙ্গীত ;
আজি মোর নূতন প্রভাত,—
নবলব্ধ চেতনায় পরাভূত তারা সরমে মিলালো অকস্মাৎ !
চেয়ে দেখি হাল-কাঁধে কৃষাণেরা আসিয়াছে অর্দ্ধব্যক্ত ঊষার প্রান্তরে
রাতের বিশ্রাম-শেষে নবোদ্যমে নব আশা-ভরে ;
গাভীগুলি পাশে পাশে চ'লিয়াছে অতি অনুগত,
প্রভুর নিকটে যেন চির-জীবনের তরে গ্রহণ করেছে কর্ম্ম-ব্রত।

ও ধারের পোড়ো জমি হ'তে
মাটী-ভরা ঝুড়ি-মাথে মজুরেরা চলে যায় পায়ে-হাঁটা আঁকাবাঁকা পথে,
মাঝি তার নৌকাখানি লয়ে
প্রস্তুত হয়েছে আসি' খেয়া-ঘাটে কর্ম্মের আশয়ে।
জেলেরা ভাসালো ডিঙ্গি নদী-বক্ষে লয়ে দীর্ঘ জাল,
সাদরে আহ্বান করে নিল যেন তাদের সকাল !
প্রকৃতির অংশ ওরা, কর্ম্ম-কামী—ধরণীর আপনার কোলের সন্তান,—
কবির কল্পনা আর ভাবে ভরা প্রভাতেরে ওরাই করেছে সুমহান্ !
কর্ম্মময় ধরণীতে অলস এ দেহমাঝে বহি' শুধু বিলাসের ভার
অনুভব করিলাম মনের গোপনে আজি বারে-বারে সহস্র ধিক্কার !

শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্ত।

(উপন্যাস)

৬

ভোরে পার্ব্বতীপুর ষ্টেশনে ট্রেণ থামিল। বৃষ্টিতে পৃথিবী যেন একেবারে ভাসিয়া যাইবে! সেই বৃষ্টিতে নামা।

সুভাষিণী বলিল—তুমি ভিজো না গো! ওয়েটিং-রুমে গিয়ে বসো। দিলু-নীলুকে নিয়ে কুলিদের দিয়ে আমি মাল-পত্র সব ঠিক করে নামাচ্ছি।

মহেন্দ্র বলিল—পাগল হয়েছো!···সঙ্গে বিছানা-পত্র; তার উপর ব্রেকে একগাদা মাল···

সুভাষিণী বলিল—তা বলে এ বৃষ্টিতে তুমি ভিজবে' একে তোমার অসুখ শরীর!

মৃদু হাস্যে মহেন্দ্র বলিল—অসুখ-শরীর আমার নয়! তাছাড়া কিছু হবে না, তুমি দেখো!

মহেন্দ্র নিষেধ শুনিল না। ছেলেদের সঙ্গে সুভাষিণীকে ওয়েটিং-রুমে বসাইয়া কুলি লইয়া মাল-পত্রের তদ্বির করিতে লাগিল।

এখান হইতে ছোট-লাইন গিয়াছে বাসন্তীতে। সে-লাইন ষ্টেশনের কম্পাউণ্ডের বাহিরে। নীচু প্লাটফর্ম্ম! প্লাটফর্ম্মের ধারে ও-লাইনের ছোট গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। উঠিতে গেলে ভিজিয়া একশা হইতে হইবে। কুলি বলিল—ও-গাড়ী ছাড়তে দেড় ঘণ্টা দেরী আছে বাবু। মাল-পত্র আমি দেড়া-কামরায় ঠিক উঠিয়ে দেবো···লেকেন্ দু'টি টাকা দিবেন!

মহেন্দ্র বলিল—তাই দেবো, বাপু। কিন্তু তুমি একটা ছাতা জোগাড় করতে পারো?···ছেলেদের আর মা-ঠাকরুণকে সেই ছাতার নীচেয় নিয়ে গাড়ীতে বসিয়ে দাও তাহলে!

কুলি বলিল—জী।

তাহাই হইল। ভিজিতে ভিজিতে সকলে গিয়া বাসন্তী-লাইনের ছোট গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। মাল-পত্রও আসিল।

এ-ট্রেণে তেমন ভিড় নাই। গোটা কামরা-খানায় শুধু মহেন্দ্র, সুভাষিণী আর ছেলেরা।

বড় বালতির মধ্য হইতে একখানা গামছা বাহির করিয়া সে-গামছা নিংড়াইয়া সুভাষিণী দিল মহেন্দ্রর হাতে; বলিল—আমি জানলার কাঁচ তুলে দিচ্ছি! তুমি এই গামছা দিয়ে বেশ করে ঘষে-ঘষে গায়ের-মাথার জল মুছে ফ্যালো দিকিনি। ট্রাঙ্ক খুলে আমি শুকনো জামা-কাপড় বার করে দি···একখানা র‍্যাপারও বার করে দি। শুক্‌নো জামা-কাপড় পরে র‍্যাপার গায়ে দিয়ে বসো!

মহেন্দ্র বলিল—এখন থেকেই আমায় তুমি ইনভ্যালিড করে তুললে! কিন্তু ভুলে যাচ্ছো, এখানে আমি হাওয়া বদলাতে আসিনি সুভা, চাকরি করতে এসেছি। এবং জল-ঝড় একটু-আধটু ভোগ করতেই হবে।

কথাটা সুভাষিণীর ভালো লাগিল না। সুভাষিণী বলিল—সে যা হবার হবে'খন! আর কথা নয়, যা বলছি, করো!

মহেন্দ্র গামছা লইল, সুভাষিণী কামরার জানলা-গুলার কাঁচ তুলিয়া দিল।

তার পর মহেন্দ্র ভিজা কাপড়-জামা ছাড়িয়া দিলে জল নিংড়াইয়া সুভাষিণী সেগুলা বড় বালতির মধ্যে গুঁজিয়া রাখিল; রাখিয়া ছেলেদের জামা-কাপড় টিপিয়া-টিপিয়া দেখিতে লাগিল। তাদের জামা-কাপড়ও ভিজিয়া গিয়াছে···সে ভিজা জামা-কাপড় বদলাইয়া তাদেরো শুক্‌নো জামা-কাপড় দিল।

মহেন্দ্র বলিল—তুমিই শুধু রোগ-শোককে জয় করেছো!

—তার মানে ?

—তোমার কাপড়-চোপড় যে আমাদের জামা-কাপড়ের চেয়ে ঢের বেশী ভিজেছে! তোমার বুঝি শুকনো কাপড়ের দরকার নেই ?

সুভাষিণী বলিল—আমাদের ভিজে-কাপড় সয়... অভ্যাস আছে।

মহেন্দ্র বলিল—অভ্যাস চলবে না। এক-যাত্রার পৃথক্ ফল হবে না সুভা।

সুভাষিণী বলিল—বেশ, আমি বাথ-রুমে গিয়ে কাপড়-চোপড় নিংড়ে নিচ্ছি...আমার এখন শুকনো কাপড়-চোপড় বার করা যাবে না। আমার কাপড়-চোপড় যে-ট্রাঙ্কে, সে-ট্রাঙ্ক আছে ব্রেক্-ভ্যানে!

বলিতে বলিতে সুভাষিণী বাথ-রুমে ঢুকিল...

সেমিজ কাপড়ের জল নিংড়াইয়া কামরায় ফিরিলে কুলি আসিল ভাড়ার জন্য। সুভাষিণী বলিল—গরম চা দিয়ে যেতে বলো তো বাবা। বেশ ভালো চা...যা-তা চা যেন না দ্যায়! কেটলি করে সব আনবে। আমার কাছে পেয়ালা আছে।

কুলি গেল চা-ওয়ালাকে খপর দিতে।

সুভাষিণী খাবারের পুঁটলি খুলিল, বলিল—হাত ধো রে সকলে...

দিলু বলিল—বাথ-রুমে গিয়ে ?

—না, না। ও-জলে হাত ধুবি কি! কোথাকার কি নোংরা জল! ঐ জলে হাত ধুয়ে ঐ হাতে খেলে অসুখ করবে! ও-জলে নয়। দাঁড়া, আমি কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে দিচ্ছি...সেই জলে হাত ধুবি!

তাহাই হইল। হাত ধুইয়া সকলে ঠিক হইয়া বসিলে সুভাষিণী কলাপাতায় করিয়া সকলকে দিল বাসি লুচি, বেগুন-ভাজা, আলুর দম আর সন্দেশ। বলিল,—বসে খাও...তার পর চা এলে এক-পেয়ালা করে চা দেবো।

নীলু বলিল—ক'টা ষ্টেশন পরে বাসন্তী ষ্টেশন, বাবা ?

মহেন্দ্র বলিল—পাঁচটার পরে।

—কখন গিয়ে পৌঁছুবো ?

হাসিয়া মহেন্দ্র বলিল—এ-লাইনে ট্রেণের টাইম-টেবল্ থাকলেও সে-টাইম ধরে গাড়ী সব-সময়ে ঠিক যায় না।... আমাদের বরাত যদি ভালো হয়, আর গাড়ী যদি ঠিক চলে, তাহলে আমরা গিয়ে পৌঁছুবো বেলা সাড়ে দশটায়।

নীলু যেন শিহরিয়া উঠিল! বলিল—কত দূর ?

মহেন্দ্র বলিল—বেশী দূর নয়। মোটে সাড়ে সাতাশ মাইল।

নীলু বলিল—কলকাতা থেকে পার্ব্বতীপুর এত দূরে... এত দূর আসতে যে-সময় লাগলো, প্রায় তার সমান ?

দিলু বলিল—এ যে ছোট লাইনের ছোট গাড়ী!

মহেন্দ্র বলিল,—তাছাড়া দিনে চার-পাঁচখানি মাত্র ট্রেণ চলে। সে ট্রেণে প্যাসেঞ্জার যায়, মাল যায়, ডাক যায়, তার উপর গাঁয়ের লোকদের খুঁটিনাটির জন্য ছাড়তে দেরী করে!

হাসিয়া দিলু বলিল—ঘরোয়া গাড়ী! ও-লাইনের মতো নয়! যারা ভাড়া দেয়, তাদের তোয়াক্কা না রেখে তারা উঠলো কি, না উঠলো...না দেখে নিজের দর্প-ভরে চলে না!

ছেলের কথা শুনিয়া মহেন্দ্র হাসিল, বলিল—এই বয়সেই তুই খুব ফিলজফার হয়ে উঠেছিস যে রে!

নীলু বলিল—যে-রকম বৃষ্টি...আচ্ছা বাবা, সেখানে বাড়ী ঠিক আছে তো ? একেবারে সেই বাড়ীতে গিয়ে উঠবো ?

মহেন্দ্র বলিল—না। যে-বাড়ীতে আমার যাবার কথা, সে-বাড়ী না কি ওদের অফিসের অন্য কাজে নিয়েছে। গিয়ে বাড়ী আমাদের দেখে-শুনে নিতে হবে!

নীলু বলিল—তবে যে মা বলছিল, এখানে আমাদের বাড়ী-ভাড়া লাগবে না!

মহেন্দ্র বলিল—আগে এক-পয়সা ভাড়া দিতে হতো না। এখন বাড়ীর জন্য শুনছি, মাহিনার উপর আরো কিছু টাকা দেয়...বাড়ী আমাদের পছন্দ করে নিতে হবে। তবে তার ভাড়া যদি ওদের বরাদ্দ-করা টাকার চেয়ে বেশী হয়, তাহলে বেশী যে-টাকা লাগবে, সে-টাকা ওরা দেবে না, সে-টাকা আমাদের নিজের পকেট থেকে দিতে হবে।

কামরার বন্ধ সার্শির ভিতর দিয়া দিলু চাহিয়াছিল দূর দিগন্তের পানে। বৃষ্টির ঘন ঝালর ভেদ করিয়া দূরে আকাশের গায়ে যেন বিস্তীর্ণ শ্যামল রেখা! সেই রেখার পানে তাকাইয়া তাকাইয়া দিলু বলিল—ওটা পাহাড়, না বাবা ?

মহেন্দ্র লক্ষ্য করিয়া দেখিল, বলিল—হ্যাঁ। শুনেছি, বাসন্তীতে ছোটখাট দু'-একটা পাহাড় আছে! হিমালয়ের কাছে কি না!

নীলু বলিল—সে-পাহাড়ে ঝরণা ঝরে ?

মহেন্দ্র বলিল—না, ঝরণা নেই! তাছাড়া এগুলো আসল-পাহাড় নয় তো! আমরা কলকাতায় থাকি, উঁচু ঢিপি দেখলেই আমরা সে-ঢিপিকে পাহাড় বলি। তবে

এখানে যদি থাকা হয়, তাহলে দেখাবো পাহাড়···ছুটীছাটা হলে দার্জ্জিলিং ঘুরে আসা যাবে একবার···কি বলিস ?

দুই ছেলে সোৎসাহে একবাক্যে বলিল—হ্যাঁ বাবা !

ছোট খোকা ছিল নারাণের মার কোলে। নারাণের মা সঙ্গে আসিয়াছে। বহু দিনের লোক! ভালোবাসে, মায়া-মমতা আছে···তাকে ফেলিয়া আসা হয় নাই।

ছেলেকে বুকে চাপিয়া জল-বৃষ্টি মাথায় করিয়া যে করিয়া নারাণের মা তাকে এ-গাড়ীতে আনিয়া তুলিয়াছে··· পক্ষিমাতার পক্ষপুটে তার শাবকও বুঝি এতখানি নিরাপদ থাকে না!

ছোট ষ্টোভ জ্বালিয়া ফুড তৈয়ারী করিয়া সুভাষিণী বলিল,—এখনো ওটা ঘুমোচ্ছে রে ?

মহেন্দ্র কহিল—এই ঠাণ্ডায় নারাণের মা ওকে গরমে-আরামে রেখেছে···কেন ঘুমোবে না ?

সুভাষিণী বলিল—সেই কত রাত্রে একটু দুধ খেয়েছে ···ওকে এই ফুডটুকু খাইয়ে দে ভাই নারাণের মা।

নারাণের মার হাতে সুভাষিণী ফুডের বাটি দিল, দিয়া বলিল,—ওকে তুলে দে। জেগে উঠে বসুক। শুইয়ে শুইয়ে খাওয়াতে হবে না।

কুলির সঙ্গে চা-ওয়ালা আসিল। তার হাতে চায়ের কেটলি, দুধ ও চিনির পাত্র।

সুভাষিণী বলিল—ও-সব তুমি এখানে রাখো, বুঝলে! আমি চা ঢেলে দুধ-চিনি মিশিয়ে নেবো'খন।···ট্রেণ ছাড়তে আর কত দেরী, জানো ?

চা-ওয়ালা বলিল—আধ ঘণ্টা দেরী আছে, মা-জী !

বাহিরে বৃষ্টির দাপট সমানে চলিয়াছে। ছাতা-টোকা মাথায় দিয়া যাত্রী আসিতেছে। যাদের যাইতেই হইবে, না গেলে চলে না, এমন সব যাত্রী···স্ত্রী-পুরুষ, ছেলেমেয়ে···

সুভাষিণী বলিল—এ-লাইনেও প্যাসেঞ্জার তো বড় কম হয় না!

কুলি বলিল—বাসন্তীতে যারা চাকরি করে, তাদের মধ্যে যারা সেখানে থাকে না,···তাছাড়া আশ-পাশের গাঁ থেকেও অনেকে চাকরি করতে যায়!

সুভাষিণী বলিল—এত ভোরে চাকরি করতে যায় ?

কুলি বলিল—এ ট্রেণে না গেলে ঠিক-সময়ে পৌঁছুবে না, মা!

সুভাষিণী বলিল—ফেরে কখন ?

কুলি বলিল—তা ব্যবস্থা ভালো। যারা দূর থেকে যায়, তারা ছুটী পায় তিনটে বেলায়।

সুভাষিণী বলিল—তাহলেও বাড়ীতে কতটুকুন্ থাকতে পায় ? আহা!

কুলি বলিল—বাড়ী-ঘর রাখবার জন্যই চাকরি। চাকরির জন্য তো বাড়ী-ঘর তুলে দিতে পারে না।

সুভাষিণী বলিল—কাছেই তো···বাড়ীতে থেকে চাকরি করলে এতখানি কষ্ট হয় না! শনিবার-শনিবার বাড়ী আসতে পারে!

কুলি এ-কথার জবাব দিল না। এ-কথার জবাব সে জানে না!···

সকলের খাওয়া চুকিলে মহেন্দ্র বলিল—এবার তুমি কিছু মুখে দাও।

—এ্যাড়া-কাপড়ে কিছু মুখে দিতে আমার রুচি হয় না!

মহেন্দ্র বলিল—অন্য উপায় যখন নেই···বেশ, আর কিছু না খেলেও শুধু একটু চা ? তেষ্টাও তো মানুষের পায়।

সুভাষিণী বলিল—বেশ, এক পেয়ালা চা আমি খাচ্ছি।

তার পর ট্রেণ ছাড়িয়া দিল।

মহেন্দ্র বলিল—ঠিক সময়ে ছেড়েছে। ঘড়ির কাঁটায়-কাঁটায়।

দিলু বলিল—সেখানে নেমে তার পর কোথায় যাবো ?

হাসিয়া মহেন্দ্র বলিল—মাথার উপর আমি যতক্ষণ আছি, ততক্ষণ তোর সে-ভাবনার দরকার কি! ছাখ্ না, এ বেশ লাগছে না ? এই যে কিছু জানি না···এর পর কি···ঠিক যেন তোদের য়্যাডভেঞ্চার-গল্পের মতো!

সস্মিত হাস্যে মহেন্দ্রর পানে চাহিয়া দিলু মাথা নাড়িল।

৭

চলন্ত ট্রেণের কামরায় বসিয়া সুভাষিণীর স্বস্তি নাই! ভাবিতেছে, মা গো, এ বৃষ্টি কি থামিবে না ?

কিন্তু বৃষ্টি থামিল না; সমানে চলিল বাসন্তীর আগেকার ষ্টেশন পর্য্যন্ত। তার পর ঠাকুর সুভাষিণীর মনের কথা শুনিলেন! বৃষ্টি থামিল। তবু আকাশে মেঘের ভার—সূর্য্যের দেখা নাই! চারি দিকে কেমন থম্থমে ভাব!

ট্রেণ আসিয়া বাসন্তী ষ্টেশনে থামিলে নিজেদের নামা,

জিনিষ-পত্র নামানো···তার পরে ট্রেণ চলিয়া গেল। সকলকে লইয়া মহেন্দ্র গিয়া উঠিল ডাক-বাংলায়।

ছোট নদীর ধারে ছোট্ট ডাক-বাংলা। ঘরের ছাদ ফুটো। জল ঝরিয়া চারি দিক জলময়।

গোছগাছ করিয়া কোনো মতে একটু খিচুড়ী করিয়া খাওয়া···তার পর ডাক-বাংলার চাপরাশি একখানা বাইসিক্‌ল্‌-রিকৃশ ডাকিয়া আনিল। সেই রিকৃশয় উঠিয়া মহেন্দ্র বাহির হইল এষ্টেটসের অফিসে।

পাকা রাস্তা। দু'দিকে মাঠ, জলা, বন···জলে ডুবিয়া আছে। মাঝে-মাঝে পাতার ঘর।

খানিক দূর আসিবার পর প্রকাণ্ড ফটকে রিকৃশ ঢুকিল। রিকৃশওয়ালা বলিল—এ-দিকটা হলো কোম্পানির জায়গা!

অফিসে আলাপ-পরিচয় করিয়া বাংলার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া মহেন্দ্র শুনিল, পাঁচ-ছ'খানা বাংলা আছে। ভাড়া ষোল টাকা হইতে পঁয়ত্রিশ টাকার মধ্যে।

মহেন্দ্র বাংলাগুলি দেখিয়া তারি মধ্যে একখানা ঠিক করিল।

দু'খানি শুইবার ঘর, একখানি বসিবার। সদরে-অন্দরে দু'দিকে খানিকটা চওড়া দালান। ঢাকা দালান। তাছাড়া রান্না ঘর, ভাঁড়ার ঘর, জিনিষ-পত্র ডেয়ো-ঢাকনা রাখিবার ঘরও আছে। সে ঘরগুলি ছোট। কুয়ো আছে··· টিউব-ওয়েল আছে। তার উপর স্নানের ঘর। ঘরের ছাদ খড়ে ছাওয়া···একটু কম্পাউণ্ড আছে। এ-বাংলার ভাড়া মাসে পঁচিশ টাকা। মহেন্দ্র এই বাড়ী ঠিক করিল। তার পর অফিসে বলিয়া দিল, দু'জন লোক দিয়া ঘরগুলি সাফ করাইয়া রাখিবার কথা। বৈকালের দিকে সপরিবারে আসিয়া সে গৃহপ্রবেশ করিবে।

ব্যবস্থা পাকা করিয়া মহেন্দ্র যখন ডাক-বাংলায় ফিরিল, বেলা তখন তিনটে বাজিয়া গিয়াছে। ছেলেরা শ্রান্তি-ভরে শুইয়া ঘুমাইতেছে। নারাণের মা বাসন-কোসন মাজিয়া দিয়াছে; সুভাষিণী তাকে লইয়া আর একপ্রস্থ জিনিষ-পত্র গুছাইয়া বাঁধা-ছাঁদা করিতেছে।

মহেন্দ্র আসিয়া বলিল—বাড়ী পেয়েছি গো! পঁচিশ টাকা ভাড়া। বাড়ী ভালো। বাঙলা-বাড়ী।

বাড়ীর ও ঘরের বর্ণনা দিয়া মহেন্দ্র বলিল—ঘরগুলি নেহাৎ ছোট নয়···কলকাতার চেয়ে ভালো। খোলা জায়গা। তার উপর ইলেক্‌ট্রিক লাইটের ব্যবস্থা। তবে রাত এগারোটা বাজলেই কারেণ্ট বন্ধ করে দেয়। তার মধ্যে আলো জ্বালার পাট চুকোতে হবে।

সুভাষিণী কহিল—এগারোটার পরে আলোর দরকার হলে?

মহেন্দ্র বলিল—তেলের আলো জ্বালো। ভাবনা কি, তিন-তিনটে হ্যারিকেন এনেছো তো!

—তা এনেছি। তবু ছেলেপিলের ঘর···বলতে নেই, অসুখ-বিসুখ হলে হ্যারিকেনে অনেক অসুবিধা!

হাসিয়া মহেন্দ্র বলিল—আজ ইলেক্‌ট্রিক আলো পেয়েছো বলে সে-আলো ছাড়া থাকতে অসুবিধা বোধ করো! কিন্তু আগে?···তাছাড়া মন্দটাই বা ভাবো কেন?···কুয়োতলা আছে। সেখানে বাসন-কোসন মাজতে পারো। তাছাড়া টিউব-ওয়েলের জল···স্নানের ঘর একটা আছে। সে-ঘর বাড়ীর সঙ্গে-লাগাও। রাত্রে কিম্বা বর্ষা-বাদলায় বাইরে বেরুতে হবে না।

ডাক-বাংলার লোককে দিয়া একখানা ঠ্যালা গাড়ী আনানো হইল। ঠ্যালা-গাড়ীতে মাল-পত্র তুলিয়া দু'খানা রিকৃশর একখানায় দুই ছেলেকে লইয়া মহেন্দ্র উঠিল··· আর একটায় বসিল সুভাষিণী এবং সুভাষিণীর পাশে ছোট খোকাকে বুকে লইয়া নারাণের মা।

গাড়ী আসিয়া বাংলায় পৌঁছিল।

কালো মেঘের পর্দা ঠেলিয়া সূর্য্য-ঠাকুর কোনো মতে যেন এখন চাকরির কেতাবে হাজিরা সহি করিবার মতলবে পশ্চিম-আকাশে বসিয়া দিগন্তের শেষ-রশ্মিরেখাটুকু নীচে পৃথিবীর বুকে বাড়াইয়া দিয়াছেন!

ঘর দেখিয়া সুভাষিণী বলিল—বেশ বাড়ী। যেখানে থাকবো, সে-জায়গা কেমন লাগবে, ভেবে এতক্ষণ আমার অশান্তির সীমা ছিল না!

হাসিয়া মহেন্দ্র বলিল—স্বস্তি মিললো?

একটা উদ্যত নিশ্বাস চাপিয়া সুভাষিণী বলিল—এখনো মেলেনি। যে জন্য এসেছি, মা-কালী যেন আমার সে-বাসনা পূরণ করেন···ষোড়শোপচারে আমি মার পূজা দেবো।

সুভাষিণী দশভুজা হইয়া ঘর-দ্বার সব এক-রকম গুছাইয়া ফেলিল। নারাণের মাও মানুষটি ভালো···ফাঁকি জানে না! মন দিয়া কাজ করে!

দিলু-নীলুর মনে আনন্দ ধরে না। কলিকাতায় সেই ছোট এতটুকু বাড়ী···এ-বয়সে মন ছুটিতে চায় কল্পনার রথে চড়িয়া দশ দিকে উধাও হইয়া···কলিকাতায় পাঁচ বাড়ীর দেওয়ালে-পাঁচিলে বাধা পাইয়া অগ্রসর হইতে পারিত না।

এখানে চারি দিক খোলা···তার উপর মাথার উপর আকাশের এতখানি প্রসার, গাছপালার অপরূপ শ্যামল শ্রী!

মহেন্দ্র গেল বাহিরে। বলিয়া গেল,—একবার সব দেখাশুনা করে আসি···বিশেষ করে স্কুলের সেক্রেটারি-মশায়···তাঁর সঙ্গে একটু পরিচয় করা দরকার।

সুভাষিণী বলিল—সকাল-সকাল ফিরো। খানকতক লুচি ভেজে দেবো···আর একটা তরকারী করবো···খেয়ে-দেয়ে আজ আর দেরী নয়, শুয়ে পড়া···বুঝলে! দেরী করো না। হ্যাঁ, আর ভালো কথা, দুধের ব্যবস্থা করতে হবে··· আর পারো যদি, একটা চাকর। চাকর দু'-চার মাসের জন্য। তার পর থিতু হলে চাকরের দরকার হবে না। আমি আর নারাণের মা সব দিক দেখে চালাতে পারবো'খন।

৮

সন্ধ্যার আলো জ্বলিতে না জ্বলিতে এক প্রৌঢ়া বিধবা আসিয়া দেখা দিলেন। গৌরী ঠাকরুণ। দু'-চারখানা বাড়ীর পরেই থাকেন। ভাইয়ের সংসার। ভাই সুপ্রসন্ন। ধনী। কাঠের মস্ত কারবার। দূরের পাহাড়-বন ইজারা লইয়াছে। সেই পাহাড় আর বন হইতে কাঠ কাটাইয়া নানা দিকে চালান দেয়।···কিন্তু কারবারে লক্ষ্মীর কৃপা হইলে কি হইবে, সংসারে লক্ষ্মী নাই! ভাজ মারা গিয়াছে আজ পাঁচ বৎসর···একটি মেয়ে রাখিয়া। মেয়ের বয়স···পনেরোয় পড়িয়াছে।···গৌরী ঠাকরুণের কপাল পুড়িতে তিনি গিয়া উঠিয়াছিলেন নবদ্বীপে গুরুর কাছে। ইহলোকের কাজ যদি চুকিল, পরলোকের চিন্তা লইয়া থাকিবেন! কিন্তু এখানে সুপ্রসন্নর সংসার চলে না···মেয়েটাকে কে দেখে? ডাক পড়িল। আসিতে হইল! পায়ের বেড়ি একবার ভাঙ্গিয়া ভগবান্ আবার এ নূতন বেড়ি পায়ে বাঁধিয়া দিবেন, কে জানিত!

সুভাষিণীকে তিনি বলিলেন,—শুনছিলুম, নতুন মাষ্টার মশায় আসছেন। ভাবছিলুম, পাশাপাশি থাকা···বাড়ীর মেয়েরা কি জানি, কেমন হবে! তা দেখে মনটা সুস্থির হলো! এ-বয়সে অনেক দেখেছি শুনেছি। চেহারা দেখলে বুঝতে পারি, কোন্ মানুষ কেমন হবে! তা 'কিন্তু' করো না ভাই, নতুন এসেছো···যা দরকার হবে, আমায় বলো! যতখানি পারি, আমি দেখবো!

এ-কথায় সুভাষিণী গলিয়া গেল! একটু আগে মনে হইতেছিল, মহেন্দ্রর অসুখ-শরীর···ছেলেপিলে লইয়া ঘর··· কাহারো একটু সর্দ্দি হইলে ভয়ে তার প্রাণটার মধ্যে যা হয়! সেখানে পাশে ছিল বিন্দুমতী···বিন্দুর স্বামী কিশোরী বাবু ডাক্তার···বিপদে-আপদে কত বড় সহায় ছিল! এখানে কে আছে!

সুভাষিণী বলিল—আমরা আসতে না আসতে আপনি এসে খোঁজ-খপর নিচ্ছেন···যেন আর-জন্মে আমার দিদি ছিলেন!···আমি আপনাকে 'দিদি' বলবো···আপনার কাছে কোনো বিষয়ে আমি 'কিন্তু' করবো না।

তার পর নাম-ধাম আলাপ-পরিচয়···

শুনিয়া গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন,—এ জায়গা বিশ বছর আগে কি যে ছিল! তখন তো এসেছি এখানে··· সুপ্রসন্ন যখন প্রথম আসে···জন-মানবের বসতি ছিল না, পথ-ঘাট ছিল না···কিছু না! আর এখন···? জানকী বাবুর এই কারবারে মা-লক্ষ্মী তাঁর দোরে যেন হাতী বেঁধে দেছেন! মানুষটি চমৎকার···অমায়িক! লোককে মায়া-দয়া করতে জানেন। তিনি এখানে ঐ টাটার মতো কারগার গড়ে তুলছেন! কত রকমেরই না কাজ হচ্ছে! কাঠ, লোহা-লক্কড়, টিন···মায় চাস-বাস পর্য্যন্ত!··· মায়ের নাম ছিল বাসন্তী দেবী···মায়ের নামে এখানকার নাম দেছেন বাসন্তী।···বন কেটে সহর তৈরী করেছেন ···পথ-ঘাট···এই যে ইলেকট্রিক আলো, টিউব-ওয়েল··· এ সব ওঁর কীর্ত্তি! কুবেরের ঐশ্বর্য্য···তা বড়মানুষী চাল কাকে বলে, জানেন না! ওঁরই কাছে কাজ করছে বিলেত-ফেরৎ জাপান-ফেরৎ কত বাঙালী আর সাহেব। তাদের ফট্‌ফটানি-চাল দেখলে শিউরে উঠতে হয়। কিন্তু জানকী বাবুকে ছাখো, কে চলবে, কোটিপতি মানুষ!···শুনেছি, স্কুলের হেড-মাষ্টার···তার মাইনে ছিল আগে দু'শো টাকা ···ম্যানেজার আছে চাটুয্যে সায়েব···কর্ত্তার উপর কর্ত্তামি করে সে-মাহিনা কমিয়ে একশো করেছে! বলে, একশো টাকাতেই ভালো লোক মেলে যখন, তখন সে জায়গায় দু'শো কেন দেবেন?···তার পর এই যে সব কর্ম্মচারীদের বাড়ী-বাংলা···এ-সবের জন্য কাকেও আগে ভাড়া দিতে হতো না। এ-সবের ভাড়ার ব্যবস্থাও করেছে ঐ ম্যানেজার-সায়েব!···

সুভাষিণীর মনে কৌতূহল···এই চ্যাটার্জী সাহেব? মহেন্দ্রর দিদি সেই জয়া দেবীর স্বামী নয় তো?···কলিকাতায় থাকিতে মহেন্দ্র বলিয়াছিল, জয়া-দির স্বামী এখানকার ভাগ্য-বিধাতা। কিন্তু সে-কথার কি প্রয়োজন? তাঁরা বড়মানুষ আছেন, তাঁরাই আছেন! বড়মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তার খেই ধরিয়া নিজের পরিচয়-প্রতিষ্ঠা···সুভাষিণীর তাহাতে চিরদিন ঘৃণা!···

সুভাষিণী বলিল—আপনাদের বাড়ীর জন্য ভাড়া দিতে হয় ?

গৌরী দেবী দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন—না। ও-বাড়ী-জমি আমার ভাইয়ের নিজের। সে কি আজ এখানে এসে বাস করছে ? হুঁঃ! বলে, জানকী বাবুর সহর গড়ে তোলবার আগে থেকে সুপ্রসন্ন এখানে আছে! জানকী বাবুর মামার বাড়ী এইখানে। উনি তো পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়েছেন সেই ছোটবেলা থেকে··· আজ বোম্বাই, কাল বর্ম্মা, পরশু লঙ্কা, তার পরের দিন বিলেত! মা থাকতো এই মামার বাড়ীতে। মামার বাড়ীতেও তেমনি! মামাদের সব হেজেমজে কোথায় উবে গেল! মা মারা যেতে জানকী বাবু তখন এসে এই গাঁয়ে বসলেন! মামাদের সেই ভাঙ্গা-ঝরা ভিটেটুকু··· তার উপর নিজে মস্ত বাড়ী করেছেন। মায়ের নামে মন্দির। সে-মন্দিরে অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি। মূর্ত্তির নাম দেছেন বাসন্তী দেবী।···আগে সব গোছগাছ করে ঠিক হয়ে বসো, তার পর তোমাকে সব দেখিয়ে নিয়ে আসবো।

সুভাষিণী বলিল—জানকী বাবুর ছেলেমেয়ে ?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—এক ছেলে, আর এক মেয়ে···ছেলেটি চির-রুগ্ন। ছেলেবেলায় ঘোড়ায় চড়া শিখতে গিয়ে পড়ে মাথায় চোট লাগে। অনেক চিকিৎসায় ছেলে বাঁচলো···কিন্তু মাথা কেমন গোলমেলে রয়ে গেল! মাথার জন্য লেখা-পড়া তেমন শেখা হলো না। তা না হলেও ছেলে খুব ভালো। তবে কি না ঐ একটি ছেলে···সে এমন! মনে সুখ নেই! মেয়ের নাম সুরুচি···লক্ষ্মীর প্রতিমা! বড় ভালো মেয়ে! সে আমার এই ভাইঝী কৌমুদী···তার সমবয়সী।···আহা, মা নেই! মা গেছে যখন এই ইন্দ্রপুরী গড়া হচ্ছে, সেই সময়···তা সে-ও প্রায় বারো-তেরো বছর হতে চললো।

—ছেলেটির নাম ?

—ছেলের নাম মণিময়।

—ছেলেই বড় ?

—হ্যাঁ। ছেলের বয়স সতেরো-আঠারো বছর হবে। ভালো কথা, তোমার নাম ? আমি যখন দিদি হলুম, ছোট বোনের নাম জিজ্ঞাসা করবো না ?···

সলজ্জ নম্র কণ্ঠে সুভাষিণী বলিল—আমার নাম সুভাষিণী !

—বেশ নাম! নামের সঙ্গে মানুষটির মিল আছে··· এইটিই বড় দেখতে পাই না···বুঝলে ভাই! তা আজ খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হয়নি তো ? আমি তাই বলতে এসেছিলুম, আমাদের ওখানেই সকলে এ-বেলায় খাবে!

স্নেহের এ-কথায় সুভাষিণী আরো গলিয়া গেল! বলিল—না দিদি, সকলের শরীর আজ যা হয়ে রয়েছে! আমি ময়দা মেখে রেখেছি···ষ্টোভ আছে···উনি এলেই খান-কতক লুচি ভেজে দেবো···খেয়ে সকলে শুয়ে পড়বে ···এই ঠিক করেছি!

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—উনুনও তৈরী নেই তো ? যাক, তার জন্য ভেবো না। কাল হলো সোমবার। উনুন তৈরী করায় নিষেধ নেই। কাল আমি এসে উনুন তৈরী করে দেবো'খন সুভা···তোমাতে-আমাতে মিলে। আর কাল সকালে তোমরা সকলে আমাদের ওখানে খাবে··· বুঝলে ?

সঙ্কোচ-ভরে সুভাষিণী বলিল—কেন কষ্ট করবেন দিদি ? আমাদের কোনো অসুবিধা হবে না। চাল, ডাল, কিছু আনাজ-তরকারী···সব আমি সঙ্গে এনেছি।

—না, না, না···আমার আবার অসুবিধা কি ? বামুন আছে, রাঁধে! তাছাড়া তোমার আবার ঘর-দোর গুছোনো আছে তো। বুঝি ভাই, চার দিকে এমন ছত্রাকার হয়ে থাকলে কিছুতে স্বস্তি মেলে না!···

হঠাৎ বাহিরের দিকে কণ্ঠ শুনা গেল,—পিসিমা···

গৌরী-ঠাকুরাণী বলিলেন—কুমু এসেছে···আমার ভাইঝী। আয় কৌমুদী, ঘরে আয়।

কথার সঙ্গে সঙ্গে এক কিশোরী আসিয়া দেখা দিল। রঙ চাঁপার মতো···ছিপ্‌ছিপে একহারা দেহ···দু'টি চোখে এমন মিষ্ট-মধুর দৃষ্টি যে, দেখিবামাত্র মন একেবারে স্নেহে-মায়ায় ভরিয়া ওঠে!

সুভাষিণী উঠিয়া কৌমুদীর হাত ধরিয়া তাকে প্রায় বুকের উপরে টানিয়া লইল। বলিল,—এসো মা···আমি তোমার আর এক পিসিমা···তোমাদের সঙ্গে এখানে মিলে-মিশে থাকতে এসেছি!

কৌমুদী ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

কৌমুদীর চিবুকে হাত দিয়া চুম্বন লইয়া সুভাষিণী বলিল—তুমি মা ঐ খাটের উপর বিছানায় বসো···মেঝেয় যে-ধুলো···ওখানে বসে না! কাপড় ময়লা হবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি এখন ভল্গার তীরবর্ত্তী ষ্ট্যালিনগ্রাডের প্রতি নিবদ্ধ; এই সহরের উপকণ্ঠে সোভিয়েট বাহিনী যে প্রতিরোধে প্রবৃত্ত, তাহাতে কেবল য়ুরোপের নহে—সম্মিলিত পক্ষের সমগ্র সমর-প্রচেষ্টার আশু ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। ষ্ট্যালিনগ্রাডের যুদ্ধ এখন সমগ্র দক্ষিণ-রুশিয়ার যুদ্ধ; দক্ষিণ-রুশিয়ার যুদ্ধের উপরই মধ্য-প্রাচীর ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে; আর এই অঞ্চলে প্রতীচ্য মিত্রের সাফল্যের জন্যই হয় ত জাপানও প্রাচীতে উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় রহিয়াছে।

ষ্ট্যালিনগ্রাড ও দক্ষিণ-রুশিয়া—

ষ্ট্যালিনগ্রাড দক্ষিণ-রুশিয়ায় সোভিয়েট প্রতিরোধ-বাহিনীর দক্ষিণ পার্শ্ব রক্ষা করিতেছে। এই "প্রহরী" পরাভূত না হওয়া পর্য্যন্ত ট্রান্স-ককেসাসের তৈলকেন্দ্রে জার্ম্মাণ বাহিনীর প্রকৃত অভিযান আরম্ভ হইতে পারে না। ষ্ট্যালিনগ্রাডের এই অসাধারণ সামরিক গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া গত দেড় মাস জার্ম্মাণী প্রায় তাহার সমস্ত শক্তি এই জনপদের প্রতি নিয়োগ করিয়াছে; পক্ষান্তরে, সোভিয়েট সেনাও প্রাণপণ শক্তিতে এই ব্যূহ রক্ষা করিতেছে। ষ্ট্যালিনগ্রাড বিধ্বস্ত হইবামাত্র পশ্চিম দিকে কৃষ্ণ-সাগরের উপকূল এবং পূর্ব্ব দিকে কাস্পিয়ানের তীর ধরিয়া দক্ষিণ অভিমুখে নাৎসীবাহিনীর প্রচণ্ড অভিযান আরম্ভ হইবে। আর আসন্ন শীতকাল পর্য্যন্ত সোভিয়েট নেতার নামাঙ্কিত এই নগর যদি উন্নতশির থাকে, তাহা হইলে ট্রান্স-ককেসাসের তৈলকেন্দ্র আগামী বসন্তকাল পর্য্যন্ত নিরাপদ থাকিতে পারে। ইহার ফলে উত্তর দিক হইতে ইরাণের তৈলকেন্দ্র নিরাপদ হইবে এবং মিশরের দিক হইতে সম্ভাবিত বিপদের জন্য বৃটিশের পশ্চিম-এশিয়ার সমরায়োজন প্রস্তুত থাকিতে পারিবে। আগামী শীতকালে অপেক্ষাকৃত অনুকূল প্রাকৃতিক অবস্থায় আফ্রিকায় মার্শাল রোমেলের তৎপরতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে; বিশেষতঃ ঐ সময়ে রুশিয়ার যুদ্ধ বন্ধ থাকায় তাঁহার বিমানশক্তি বিশেষ বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা। সে যাহা হউক, বর্ত্তমানে ষ্ট্যালিনগ্রাড-রক্ষী সোভিয়েটবাহিনী পরোক্ষে ইরাণও রক্ষা করিতেছে; তাহাদিগের এই প্রতিরোধ যদি সফল হয়, তাহা হইলে জাপানও হয় ত তাহার শীতকালীন সমর-পরিকল্পনা নূতন ভাবে রচনা করিতে বাধ্য হইবে।

বিশ্বের ইতিহাসে ষ্ট্যালিনগ্রাডের প্রতিরোধ-কাহিনী অতুলনীয়।

সোভিয়েট গোলন্দাজ সৈন্য 'পলিটিক্যাল্ কমিশারের' বক্তৃতা শ্রবণ করিতেছে

তিন দিক হইতে নগরটি সম্পূর্ণরূপে পরিবেষ্টিত—শত্রুসৈন্যশ্রেণীর কোন অরক্ষিত রন্ধ্রে পিপীলিকা পর্য্যন্ত প্রবেশের উপায় নাই। উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে শত্রুর বহু সৈন্য ও মারণাস্ত্র নগর মধ্যেও প্রবেশ করিয়াছে। পূর্ব্ব দিকে ভল্গার প্রশস্ত বক্ষে নাৎসী বিমানবাহিনী মুহুর্ম্মুহু অগ্নিবর্ষণ করিতেছে। সামরিক দৃষ্টিতে এইরূপ নৈরাশ্যজনক অবস্থায় কোন নগর রক্ষার জন্য এইরূপ মৃত্যুপণ সঙ্কল্পের দৃষ্টান্ত বিশ্বের ঘটনাপঞ্জীতে অত্যন্ত বিরল। প্রত্যেক গৃহ দুর্গে পরিণত করিয়া এবং প্রত্যেক রাস্তায় পরিখা রচনা করিয়া প্রতি ইঞ্চি ভূমির জন্য অকাতরে প্রাণদানের এই সঙ্কল্প কেবল সু-উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত সৈনিকের পক্ষেই সম্ভব। ছয় বৎসর পূর্ব্বে স্পেনের ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী আদর্শবাদী সৈনিক মাদ্রিদ রক্ষার জন্য এইরূপ চরম দৃঢ়তা অবলম্বন

করিয়াছিল; তখনও ফ্যাসিষ্ট সৈন্য মাদ্রিদের উপকণ্ঠে প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু তাহার পর সুদীর্ঘ আড়াই বৎসরের মধ্যে ফ্যাসিষ্ট সৈন্য স্পেনের রাজধানীতে প্রবেশ করিতে পারে নাই। গত বৎসর নাৎসীবাহিনী যখন লেনিনগ্রাডের নিকটবর্ত্তী হয়, তখন মার্শাল টিমোশেঙ্কোর নেতৃত্বে সোভিয়েট সেনা বক্ষরক্ত ঢালিয়া তাহাদের দীক্ষাগুরুর নামাঙ্কিত নগরটি রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল; কিন্তু নাৎসীবাহিনী লেনিনগ্রাডের বহির্ভাগস্থিত প্রতিরোধ-ব্যূহ ভেদ করিতে অসমর্থ হওয়ায় সোভিয়েট সেনাকে তখন সেই পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতে হয় নাই। এই বৎসর মার্শাল টিমোশেঙ্কোর নেতৃত্বে ষ্ট্যালিনগ্রাডের সোভিয়েট সেনা সেই অগ্নিপরীক্ষায় অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় দিতেছে।

অবশ্য, কেবল মৃত্যুকে উপেক্ষা করিয়াই যুদ্ধে জয়ী হওয়া যায় না; যুদ্ধজয়ের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক সৈন্য ও সমরোপকরণও

জেনারল ঝুকভ্

প্রয়োজন। ষ্ট্যালিনগ্রাডে প্রতিরোধে প্রবৃত্ত সোভিয়েট সেনা অপেক্ষা শত্রুসৈন্যের সংখ্যা বহু গুণ অধিক, শস্ত্রশক্তিতেও তাহারা প্রবল। জার্ম্মাণী এখন সমগ্র য়ুরোপের অধীশ্বর। য়ুরোপের সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রমশিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি জার্ম্মাণীকে শস্ত্রশক্তি যোগাইতেছে; জার্ম্মাণীর তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলি তাহাকে প্রচুর সৈন্য দিয়াও সাহায্য করিতেছে। বস্তুতঃ ষ্ট্যালিনগ্রাডে বহুসংখ্যক রুমানিয়ান্, হাঙ্গেরিয়ান্ ও ইটালীয় সৈন্য নিযুক্ত হইয়াছে। সৈন্যবলে ও শস্ত্র-শক্তিতে অমিত বিক্রম জার্ম্মাণীর আঘাতে ষ্ট্যালিনগ্রাড হয় ত বিধ্বস্ত হইবেই। কিন্তু ভল্গার তীরে এই প্রচণ্ড প্রতিরোধে নাৎসীবাহিনীর উদ্দেশ্যসাধনে যেরূপ বিলম্ব ঘটিল, তাহাতে নাৎসীফ্যাসিষ্ট শক্তির সমগ্র সমর-পরিকল্পনা নূতন ভাবে রচনার প্রয়োজন হইবে।

ককেসাসের পশ্চিম ও পূর্ব্ব অঞ্চলে যুদ্ধের অবস্থা বিশেষ পরিবর্ত্তিত হয় নাই। পশ্চিম অঞ্চলে নভরোসিস্কের নিকটবর্ত্তী স্থানেই যুদ্ধ চলিতেছে; জার্ম্মাণীর পক্ষ হইতে দাবী করা হইয়াছে যে, টুয়াপ্‌সের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, পূর্ব্ব দিকে মজদক্ অঞ্চলেই এখন জার্ম্মাণীর সমর-প্রচেষ্টা নিবদ্ধ। বস্তুতঃ ষ্ট্যালিনগ্রাডের যুদ্ধ অমীমাংসিত থাকাতেই ককেসাসে জার্ম্মাণ সেনার সামরিক তৎপরতা প্রবল হইতে পারিতেছে না।

মধ্য রণাঙ্গনে জেনারল ঝুকভের নেতৃত্বে রেজভ্ অঞ্চলে সোভিয়েট সেনার প্রতি-আক্রমণ চলিতেছে। ভরোনেজ ও লেনিনগ্রাড অঞ্চলেও সোভিয়েট বাহিনী প্রতি-আক্রমণে প্রবৃত্ত।

সোভিয়েট প্রতিরোধ-শক্তির উৎস—

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁহার এক সাম্প্রতিক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—মিঃ চার্চ্চিল প্রভৃতি রাজনীতিকগণ বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, তাঁহারা কেবল প্রচুর ট্যাঙ্ক ও বিমান নির্ম্মাণ করিয়াই ফ্যাসিষ্টশক্তিকে পরাভূত করিবার স্বপ্ন দেখিতেছেন। সংস্কারমুক্ত হইয়া গত তিন বৎসরের যুদ্ধের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে সুস্পষ্ট উপলব্ধি হইবে—ফ্যাসিষ্টশক্তি কেবল সমরোপকরণের প্রাচুর্য্যেই প্রবল হয় নাই এবং তাহাকে পরাভূত করিবার জন্য আবশ্যক সমরোপকরণ অপরিহার্য্য হইলেও কেবল শস্ত্রবলেই তাহাকে পরাভূত করা সম্ভবও নহে; ফ্যাসিষ্টশক্তির পরাজয় সাধনের জন্য শস্ত্রশক্তির প্রাবল্য সর্ব্বপ্রধান প্রয়োজনীয় বস্তুও নহে।

কঠোর স্বৈরশাসনে এবং নির্ম্মম হস্তে স্বাধীন চিন্তা ও আলোচনার নিষ্পেষণে মানুষের বিচার-বুদ্ধিকে পঙ্গু করিয়া মনুষ্য জাতীয় জীবকে জীবন্ত যন্ত্র মাত্রে পরিণত করিবার অসাধারণ কৃতিত্বই ফ্যাসিষ্টশক্তির প্রচণ্ডতার প্রকৃত ভিত্তি; সেই জীবন্ত যন্ত্র এবং উৎকৃষ্ট ও প্রচুর সমরোপকরণের সংযোগে ফ্যাসিষ্টশক্তি দুর্জ্জয় হইয়া উঠিয়াছে। এই দুর্জ্জয় শক্তির সম্মুখীন হইবার যোগ্যতা কেবল তাহাদিগেরই, যাহারা স্বাধীন চিন্তা ও আলোচনায় অর্জ্জিত অধিকারবোধ বাস্তব জীবনে প্রতিফলিত করিবার অথবা প্রতিফলিত রাখিবার সুস্পষ্ট আদর্শ লইয়া ফ্যাসিষ্টদিগের সম্মুখীন হইয়াছে, যাহারা বুঝিয়াছে, সমরক্ষেত্রে ফ্যাসিষ্টশক্তির পরাভবে সংখ্যালঘিষ্ঠ সুবিধাভোগী শ্রেণীর অতিরিক্ত সুবিধা সম্ভোগের পথ নিষ্কণ্টক হইয়া চিরবঞ্চিত সংখ্যাগরিষ্ঠের জন্য পূর্ব্বের ব্যবস্থাই চিরস্থায়ী হইবে না—ফ্যাসিষ্টশক্তির উচ্ছেদে আসিবে রাজনীতি ও অর্থনীতিক্ষেত্রে প্রকৃত সাম্য, অকৃত্রিম মৈত্রী ও অপ্রতিহত স্বাধীনতা। প্রচুর লৌহে ও যন্ত্রসদৃশ মানুষের পেশীতে সৃষ্ট ফ্যাসিষ্ট সমর-চক্রের ভয়াবহ আবর্ত্তন-রোধের পরিপূর্ণ যোগ্যতার জন্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে এই নিশ্চয়তা অপরিহার্য্য। সোভিয়েট বাহিনীর অসাধারণ প্রতিরোধ-শক্তিতে আজ এই সত্যই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ব্যক্তিস্বাধীনতার ফলে লব্ধ অধিকারবোধ বাস্তবে প্রতিফলিত করিবার সকল পথ যাহারা রুদ্ধ দেখিতেছে, তাহাদিগের নিকট ফ্যাসিষ্ট সমর-যন্ত্রের প্রচণ্ড সঙ্ঘাত সহ্য করিবার উপযোগী শক্তি আশা করিলে ভুল হইবে। চিন্তা ও আলোচনার স্বাধীনতা তাহাদিগের চিত্তে প্রশ্ন জানাইবে—সদুত্তর দিবে না, সংশয় আনিবে—বিশ্বাস সৃষ্টি করিবে না। ধনিকপ্রধান গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি চিন্তায় ও বাক্যে যে স্বাধীনতার কথা বলিয়া বাহ্বাস্ফোট করেন, তাহা হইতে উদ্ভূত অধিকারবোধে ও বাস্তব জীবনে যদি অলঙ্ঘ্য পার্থক্য

থাকে, তাহা হইলে আজিকার চরম সন্ধিক্ষণে এই স্বাধীনতা হয় ত দৌর্ব্বল্যেরই কারণ হইবে।

দ্বিতীয় রণক্ষেত্রের দাবী—

সম্মিলিত শক্তি কর্ত্তৃক জার্ম্মাণীকে য়ুরোপের অন্য একটি স্থানে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইবার সম্ভাবনা যেন ক্রমেই সুদূরবর্ত্তী হইতেছে। গত আগষ্ট মাসে মস্কো হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মিঃ চার্চ্চিল বলিয়াছিলেন—রুশদিগের ধারণা এইরূপ যে, তাহারা বৃটেন ও আমেরিকা হইতে প্রচুর সাহায্য পাইতেছে না। সুচতুর মিঃ চার্চ্চিল এই ধারণার প্রকৃত কারণ প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি মিঃ ওয়েণ্ডেল্ উইল্‌কী মস্কোয়ে গমন করিয়া "হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়াছেন"। তিনি বলিয়াছেন—**A second front has become almost a symbol for the Russian people of the kind of aid they feel they are entitled to receive from Britain and America……I was asked about a second front fifty times a day.** তাহার পর, মিঃ উইলকী এই বিষয়ে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—য়ুরোপে "দ্বিতীয় রণক্ষেত্র" সৃষ্টিই রুশিয়াকে সাহায্য করিবার সর্ব্বপ্রধান উপায়; আগামী বৎসর গ্রীষ্মকালের জন্য এই ব্যবস্থা "সিকায় তুলিয়া" রাখিলে হয় ত উহাতে আর লাভ হইবে না। তিনি এমন কথাও বলিয়াছেন যে, এই বিষয়ে জনসাধারণের পক্ষ হইতে "চাপ" দেওয়া প্রয়োজন—**needs some public prodding.**

মিঃ উইল্‌কীর এই সুস্পষ্ট উক্তিতে প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ পাওয়ায় রাজনীতিক চালবাজী আরম্ভ হইয়াছে; বলা হইতেছে—গত মে মাসে ইঙ্গ-সোভিয়েট চুক্তির সময় 'দ্বিতীয় রণাঙ্গন' সৃষ্টি সম্পর্কে যে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল, রুশিয়া তাহার ভুল অর্থ করিয়াছে। কোন দায়িত্বসম্পন্ন রাজনীতিক এইরূপ নির্লজ্জ উক্তি না করিলেও সাংবাদিকদিগের ভাষ্য শ্রবণ করিয়া মনে হয়, এই ভাবেই হয় ত দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা হইবে। বস্তুতঃ ইঙ্গ-সোভিয়েট চুক্তির সময় এই বৎসরই দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট উক্তিই করা হইয়াছিল; সেই উক্তির দ্ব্যর্থ সম্ভব নহে। তবে, আশ্বাসপ্রদানকারীদিগের প্রকৃত মনোভাব বুঝিতে রুশ রাষ্ট্রনীতিকদিগের ভুল হইয়া থাকিবে। উত্তর বা পশ্চিম-য়ুরোপে জার্ম্মাণীকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইবার পথে সামরিক অসুবিধাই একমাত্র বিঘ্ন কি না, তাহা আমরা জানি না। তবে, আমাদিগের আশঙ্কা—রুশদিগের রক্তে ও অশ্রুতে জার্ম্মাণীর শক্তি আরও ক্ষয় হইবার আশায় প্রতীক্ষার ফল বিষময় হইতে পারে; ইতোমধ্যে, সোভিয়েট রুশিয়ার সামরিক শক্তি যদি চূর্ণ হয়, তাহা হইলে তখন বৃটেন ও আমেরিকার সকল সমরায়োজনই হয় ত ব্যর্থ হইবে। আমরা আশা করি—বৃটেন ও আমেরিকার রাজনীতিকদিগের স্কন্ধ হইতে চেম্বারলেনী ভূত সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হইয়াছে; রুশ-জার্ম্মাণ সঙ্ঘর্ষের ফলে কম্যুনিষ্ট রুশিয়া চূর্ণ হইবার পর দুর্ব্বল জার্ম্মাণীকে অনায়াসে পরাভূত করিয়া গণতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের দুইটি শত্রুকে একসঙ্গে ধ্বংস করিবার দুঃস্বপ্ন এখন আর কেহ দেখে না।

উত্তর আফ্রিকায় নাৎসী বিমানের ধ্বংসাবশেষ

মিশর-যুদ্ধ—

মিশর রণক্ষেত্রে কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই; উভয় পক্ষই পরস্পরকে আঘাত করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। এই রণাঙ্গন সম্বন্ধে ইহা হয় ত নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে—দক্ষিণ-রুশিয়ায় জার্ম্মাণী বিশেষ ভাবে বিব্রত থাকিবার সময় বৃটিশ সেনাপতি

জেনারল আলেকজাণ্ডার যদি নাৎসী-ফ্যাসিষ্ট বাহিনীকে প্রত্যাঘাত করিতে না পারেন, তাহা হইলে পরে উহা অনুশোচনার কারণ হইবে। দক্ষিণ-রুশিয়ায় যুদ্ধের সিদ্ধান্ত যদি জার্ম্মানীর অনুকূলে না-ও হয়, তাহা হইলেও শীতকালে ঐ অঞ্চলে যুদ্ধ স্থগিত থাকিবার সময় মিশরে মার্শাল রোমেলের শক্তি বিশেষ বর্দ্ধিত হইবে; তখন তাঁহার প্রচণ্ড আঘাত প্রতিহত করা দুঃসাধ্য হইতে পারে।

ম্যাডাগাস্কারে যুদ্ধ—

ম্যাডাগাস্কারের ফরাসী শাসক মঃ এনেং ১৬ই সেপ্টেম্বর যুদ্ধ-বিরতির অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ-বিরতির সর্ত্ত মনঃপুত

ম্যাডাগাস্কার

না হওয়ায় ম্যাডাগাস্কারের কর্তৃপক্ষ যুদ্ধরত রহিয়াছেন। ইতোমধ্যে ঐ দ্বীপের রাজধানী আণ্টানানারিভো বৃটিশ সৈন্যের অধিকারভুক্ত হইয়াছে; প্রায় সকল বন্দরই তাহারা অধিকার করিয়াছে: মঃ এনেং দক্ষিণ অঞ্চলে ফোর্ট ডফিনে পলায়ন করিয়াছেন।

ম্যাডাগাস্কার সম্পর্কে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ সুকৌশলে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন। ফরাসী সৈন্যের অধিক রক্তপাত ভিসি সরকারের বৃটিশ-বিরোধী প্রচারকার্য্যের উপকরণ হইতে পারে; এই জন্য বৃটিশ কর্তৃপক্ষের উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন অত্যাবশ্যক। ইহা ব্যতীত, প্রচণ্ডবেগে যুদ্ধ না চালাইয়া সামরিক "চাপ" দিয়া ম্যাডাগাস্কারের ফরাসী কর্তৃপক্ষকে যদি ধীরে ধীরে জেনারল দ গলের দলভুক্ত করা সম্ভব হয়, তাহা হইলেই প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে। বস্তুতঃ ম্যাডাগাস্কারের যুদ্ধকে প্রকৃত যুদ্ধ না বলিয়া ঐ দ্বীপের কর্তৃপক্ষকে "স্বাধীন ফ্রান্সের" অনুরক্ত করিবার উদ্দেশ্যে বৃটিশের সামরিক "চাপ" বলাই হয় ত অধিকতর সঙ্গত।

ম্যাডাগাস্কার সম্পর্কে মিত্রশক্তি যেমন সুকৌশলে অগ্রসর হইতেছেন, ভিসি কর্তৃপক্ষও তেমনই গুরুত্বপূর্ণ "কূটনৈতিক খেলা খেলিতেছেন" বলিয়া মনে হয়। গত মে মাসে বৃটিশকে যুদ্ধ-বিরতিতে সম্মত করাইয়া তাঁহারা আলোচনায় কালক্ষেপ করিতে চাহিয়াছিলেন। তাহাদিগের হয় ত আশা ছিল, কিছু কাল এই ভাবে অতিবাহিত হইলে অন্যত্র সামরিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে তাঁহারা সুবিধা লাভ করিতে পারিবেন। সম্প্রতি ম্যাডাগাস্কারের গভর্ণর মঃ এনেং কর্তৃক বৃটিশ সেনাপতি জেনারল প্ল্যাটের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হওয়ায় ভিসি কর্তৃপক্ষের কৌশলে কালক্ষেপণের মনোভাবই যেন স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমানে ম্যাডাগাস্কারে ভিসি ফ্রান্সের সাহায্য পৌঁছিবার কোন সুবিধা নাই। যে অপ্রচুর সৈন্য লইয়া মঃ এনেংএর সেনাপতিগণ বৃটিশবাহিনীর সম্মুখীন হইয়াছেন, তাহাদিগের পক্ষে প্রতিপক্ষকে পরাভূত করা কখনই সম্ভব নহে। কাজেই, অদূর ভবিষ্যতে ম্যাডাগাস্কারের সামরিক অবস্থা ভিসি কর্তৃপক্ষের অনুকূল হইবে না। তবে, ফরাসী সৈন্যরা প্রত্যাবর্ত্তনের সময় সেতু ধ্বংস করিয়া ও রেলপথ বিনষ্ট করিয়া বৃটিশ সৈন্যের অগ্রগতিতে বিলম্ব ঘটাইতে পারে। এবার জেনারল প্ল্যাট যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাতে বোধ হয় আলোচনায় কালক্ষেপণের

ম্যাডাগাস্কারের সর্ব্বপ্রধান নৌ-ঘাঁটী ডীগো-সুয়ারেজ

সুযোগ আর ছিল না—প্রস্তাব গ্রহণ করিলেই মিত্রশক্তি ম্যাডাগাস্কারে পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ পাইত। এই জন্যই হয় ত মঃ এনেং জেনারল প্ল্যাটের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া দীর্ঘসূত্রী সামরিক তৎপরতায় কালক্ষেপণের নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। ভিসি কর্তৃপক্ষ হয় ত আশা করেন—এই ভাবে কালক্ষেপ করিতে পারিলে ফ্যাসিষ্ট আক্রমণ ভারত মহাসাগরের নিকটবর্ত্তী হইবে; মধ্য-প্রাচীতে যুদ্ধের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হওয়ায় ইটালীয় ও ফরাসী নৌবহর লোহিতসাগরে প্রবেশপথ পাইবে।

জাপানের মনোভাব—

জাপানের মনোভাব এখনও রহস্যাবৃত; কোথাও সে তাহার শক্তি প্রয়োগ করে নাই। চীনে তাহার সামরিক তৎপরতা অধিক নহে; অষ্ট্রেলিয়ার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলেও সে তেমন শক্তি প্রয়োগ করে নাই। সলোমন্ পুনরুদ্ধারের জন্য ব্যাপক সামরিক প্রচেষ্টায় জাপান বিরত আছে; নিউ গিনিতে সম্প্রতি জাপানী সৈন্য প্রত্যাবর্ত্তনেও বাধ্য হইয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে পোর্ট মোরস্বী অধিকারের জন্য

জাপানের যে ঐকান্তিকতা প্রকাশ পাইয়াছিল, উহা যেন এখন হ্রাস পাইয়াছে ; অথচ অষ্ট্রেলিয়া সম্বন্ধে জাপানের অভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে পোর্ট মোর্শবী অধিকার করিয়া টরেস্ প্রণালীতে প্রভুত্ব স্থাপন তাহার একান্ত প্রয়োজন। করিতেছে। ভারতের প্রধান সেনাপতি জেনারল্ ওয়াভেল্ তাঁহার সাম্প্রতিক বক্তৃতায় অদূর ভবিষ্যতে ব্রহ্মদেশ আক্রমণের আভাস দিয়াছেন। অষ্ট্রেলিয়াও মার্কিণ সাহায্যে শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে, এমন কি, সে জাপানের অধিকৃত অঞ্চলে প্রত্যাঘাতও করিতেছে।
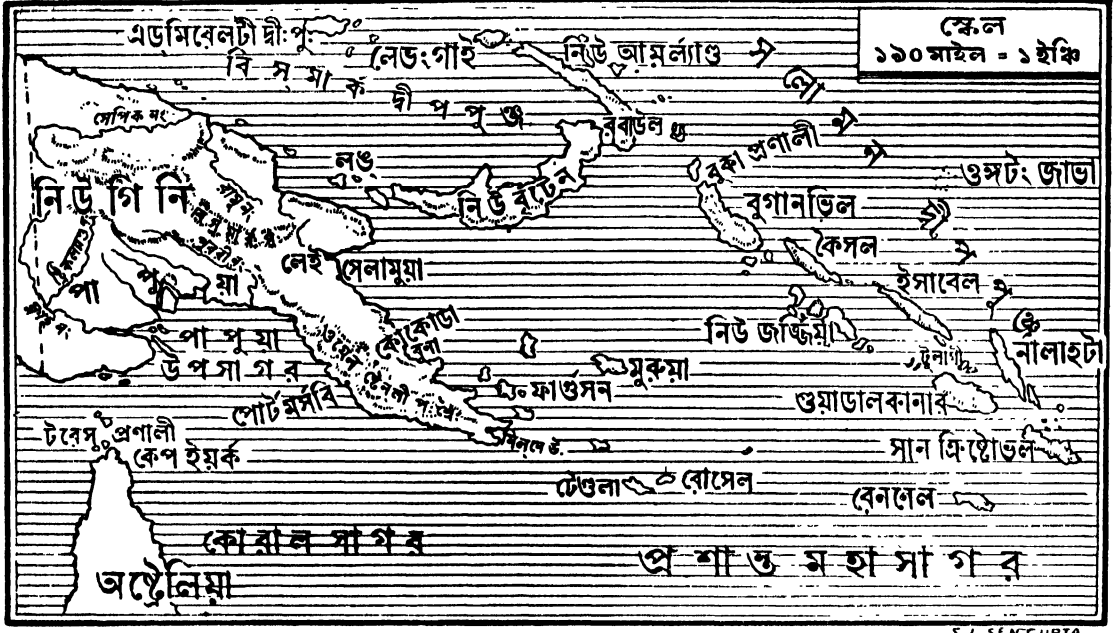
দক্ষিণ-প্রশান্ত মহাসাগরে বর্ত্তমান রণক্ষেত্র

জাপানের এই নিষ্ক্রিয়তা যে "ঝটিকার পূর্ব্বে নিস্তব্ধতা" মাত্র, তাহাতে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ জাপানের প্রধান মন্ত্রী জেনারল টোজো সম্প্রতি ত্রিশক্তির চুক্তির বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে বলিয়াছেন—The real developments of the war will be seen in future.

কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে জাপানের সাইবেরিয়া আক্রমণের সম্ভাবনা নাই ; শীত অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী। এখন জাপান সোভিয়েট রুশিয়াকে উত্ত্যক্ত করিতে পারে না। জেনারল ওয়াভেল্ বলিয়াছেন—এশিয়ায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্ম রুশিয়ার সহিত জাপানের শক্তি পরীক্ষিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন ; চীনের যুদ্ধেরও অবসান ঘটা আবশ্যক। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য যে, এক দিন রুশিয়ার সহিত জাপানকে "হিসাব নিকাশ" করিতেই হইবে। কিন্তু এই বৎসর উত্তর-পূর্ব্ব এশিয়ায় রুশিয়ার সহিত শত্রুতায় প্রবৃত্ত হইবার আর সময় নাই। অবরুদ্ধ চীন সম্বন্ধেও এখন জাপানের উৎকণ্ঠার কারণ কতক পরিমাণে দূরীভূত হইয়াছে। ব্রহ্মদেশ জয় করিয়া জাপান এখন চীন সম্বন্ধে একরূপ নিশ্চিন্ত ; পূর্ব্বাঞ্চলের পরবর্ত্তী ঘাঁটী ভারতবর্ষ যদি চূর্ণ হয়, তাহা হইলে চীন স্বভাবতঃ পঙ্গু হইয়া পড়িবে। বস্তুতঃ অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষ সম্পর্কেই জাপানের উৎকণ্ঠা অধিক ; এই দুইটি অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত মিত্রশক্তির আক্রমণ-ঘাঁটী প্রতিদিন শক্তি সঞ্চয় ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্মদেশ আক্রান্ত হইবে, দক্ষিণ-পূর্ব্ব মহাসাগরে সলোমন নিউ গিনি প্রভৃতি স্থানে জাপানের অধিকৃত অঞ্চলগুলি মিত্রশক্তি ধীরে ধীরে পুনরধিকার করিবেন, আর জাপান তাহাতে উদাসীন থাকিয়া অবরুদ্ধ চীনে সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিবে,

জাপানের বন্দিশিবিরে স্নানরত বৃটিশ সৈন্য

অথবা প্রচণ্ড শীত সম্মুখে লইয়া রুশিয়াকে আঘাত করিবে—এইরূপ অনুমান বাতুলতা। জেনারল ওয়াভেল্ তাঁহার সাম্প্রতিক বক্তৃতায়

বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন—বিমান-শক্তির দৌর্ব্বল্যহেতু জাপানের পক্ষে অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ বা অষ্ট্রেলিয়া আক্রমণের ন্যায় ব্যাপক অভিযানে প্রবৃত্ত হওয়া অসম্ভব। এই উক্তি শ্রবণ করিয়া আশঙ্কা হয়—ইতঃপূর্ব্বে জাপানের সমর-শক্তি সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার ফলে যে সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে, পুনরায় জাপানের শক্তিতে লঘুত্ব আরোপে সেইরূপ সর্ব্বনাশ হয় ত নিকটবর্ত্তী হইবে।

জাপানের প্রকৃত সমর-শক্তির খোঁজ আমরা রাখি না। সে বিষয়ে বিবেচনার ভার জেনারল ওয়াভেল্ প্রভৃতি সমর-বিশেষজ্ঞদিগের

নিউ গিনিতে মার্কিণী সৈন্যের সমাধিক্ষেত্র

উপর ছাড়িয়া দিয়া আমরা বলিব—অতি সত্বর ভারতবর্ষ ও অষ্ট্রেলিয়ার প্রতি অবহিত হওয়া জাপানের একান্ত প্রয়োজন। আক্রমণ পরিচালনের সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করিয়া এবং স্বীয় শক্তির পরিমাণ বুঝিয়া এই দুইটি স্থান আক্রমণের পদ্ধতিতে ও প্রযুক্ত শক্তির পরিমাণে জাপান হয় ত পার্থক্য রাখিতে বাধ্য হইবে। যত দূর মনে হয়, অষ্ট্রেলিয়া অপেক্ষা ভারতবর্ষের প্রতি প্রত্যক্ষ আক্রমণ (enivasion) পরিচালিত হইবার সম্ভাবনা অধিক। সমুদ্রপথে সৈন্য অবতারণ অপেক্ষা স্থলপথে প্রত্যক্ষ অভিযান পরিচালন অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। তাহার পর, সম্প্রতি ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে যে শোচনীয় অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে জাপানের পক্ষে ভারত আক্রমণে প্রলুব্ধ হইবার সম্ভাবনা অধিক। অষ্ট্রেলিয়া সম্পর্কে জাপান হয় ত নিকটবর্ত্তী সামরিক গুরুত্বসম্পন্ন অঞ্চলে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রবল বিমান আক্রমণ চালাইতে সচেষ্ট হইবে। আর, জাপানের সমর-নায়কগণ যদি বুঝেন—একই সময়ে ভারতবর্ষ ও অষ্ট্রেলিয়ায় প্রত্যক্ষ আক্রমণ পরিচালন তাঁহাদিগের পক্ষে অসাধ্য নহে, তাহা হইলে একই সময়ে এই দুই দিকে জাপানী অভিযান আরম্ভ হইতে পারে।

গত আষাঢ় মাসের 'মাসিক বসুমতী'তে বলিয়াছিলাম—বৃটিশ রাজনীতিকদিগের অদূরদর্শিতার ফলে ভারতে যে গণ-বিক্ষোভ আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে জাপান ইন্ধন যোগাইতে প্রয়াসী হইতে পারে। বস্তুতঃ, ভারতে আভ্যন্তরীণ বিপ্লব সৃষ্টিতে জাপানের সক্রিয় সহযোগ স্বাভাবিক ছিল; কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট স্থানে বোমা বর্ষণ করিয়া এবং বিমান হইতে অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া ভারতে প্রচণ্ড গণ-বিপ্লব সৃষ্টির জন্য জাপান উৎসাহিত হইবে বলিয়া তখন সত্যই আশঙ্কা হইয়াছিল। কিন্তু গত দুই মাসে জাপানের এইরূপ তৎপরতা কোথাও আত্মপ্রকাশ করে নাই; সে কেবল বেতারে ভারতবাসীকে "বাহবা" দিয়াছে। মুখে জাপানের এই উৎসাহ প্রদান এবং কার্য্যে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়তা হইতে ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাহার প্রকৃত মনোভাব হয় ত আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। জাপান জানে—ভারতে বৃটিশ-বিরোধী মনোভাব প্রবল হইলেও সেখানে ফ্যাসিষ্টশক্তির প্রতি কোনরূপ সহানুভূতি নাই। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস বৃটিশকে শাসকশক্তিরূপে ভারত-ত্যাগের দাবী জানাইলেও ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারতবর্ষে বৃটিশ ও মার্কিণী সৈন্যের অবস্থানে আপত্তি করে নাই। সেই ভারতীয় কংগ্রেসের পক্ষ হইতেই ভারতবর্ষে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। এই আন্দোলন যদি জাপানের সাহায্যে সফল হয়, তাহা হইলে ফ্যাসিষ্ট বিরোধী শক্তিই প্রবল হইবে; জাপান তাহাতে উপকৃত হইবে না। এই কথা সুস্পষ্ট বুঝিয়াই জাপান নিরপেক্ষ ভাবে ভারতের গণ-আন্দোলনকে সাহায্য করিতে চাহে নাই; সে বেতারে উৎসাহ দিয়া নিরস্ত্র আন্দোলন-কারীদিগকে রাইফেল্ ও মেসিন-গানের সম্মুখে ঠেলিয়া দিয়াছে। সে আশা করে, নিগ্রহের ফলে আন্দোলনকারীরা ক্রমে কংগ্রেস নেতৃবর্গের প্রতি বিশ্বাস হারাইবে; তখন জাপানের তাঁবেদার কোন ভারতীয় যদি ত্রাতারূপে ভারতবর্ষে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সে সহজেই জনসাধারণের সমর্থন লাভ করিবে। বৃটিশ রাজনীতিকদিগের অদূরদর্শিতার ফলে কোন ভারতীয় যদি জাপানকে মুক্তিদাতা বলিয়া বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে জাপানের এই নিষ্ক্রিয়তা হইতে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন।

৪।১০।৪২ শ্রীঅতুল দত্ত।

ফুল ও পল্লব

পল্লব বাড়িয়া যায়
অবিশ্রান্ত রসের যোগানে
কুসুম ফুটে না সেই
ভোগোৎসবে মনের বাগানে।

প্রাচুর্য্যের অবসানে
পত্র-সজ্জা হয় অপচয়,
যে রস সঞ্চিত থাকে
মঞ্জু তাহে তাহে ফুটে ফুল।

শ্রীকালিদাস রায়।

অকস্মাৎ

(গল্প)

চন্দ্রনাথ দত্ত প্রবীণ উকিল। হাইকোর্টে প্রচণ্ড পশার।

পাগলাবাড়ী জমিদারী-এষ্টেটের মস্ত আপীলের মকর্দ্দমায় আট দিন সমানে আর্গুমেণ্ট করিয়াছেন,—প্রতিবাদীর তরফে। পূজার ছুটীতে হাইকোর্ট যে-দিন বন্ধ হইবে, আপীলের রায় বাহির হইল সেই দিন। দেড়শো পাতা রায়। আপীলে দু'জন জজই একযোগে চন্দ্রনাথের কথায় সায় দিয়া তাঁর মক্কেল ভবশঙ্কর চৌধুরীর জিৎ সাব্যস্ত করিয়াছেন!

বখশিস, ভোজ প্রভৃতিতে কোর্টের রাজসূয়-যজ্ঞ শেষ করিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে ভবশঙ্কর মিনতি জানাইলেন—বাড়ী ফেরবার মুখে দয়া করে একবার আমার ওখানে পায়ের ধূলো দিয়ে যেতে হবে।

চন্দ্রনাথের মনে আনন্দের সীমা নাই। মোটা ফীয়ের চেয়ে জিতের আনন্দ কত বেশী—বিশেষ তিন কোর্ট ধরিয়া যে-মামলা সতেজে চলিয়াছে—যাঁরা উকিল, তাঁরা ছাড়া সে-আনন্দ অপরে বুঝিবে না!

সার্কুলার রোডে জমিদার ভবশঙ্করের বাড়ী। চন্দ্রনাথকে আনিয়া ভবশঙ্কর সাদরে বসাইলেন সজ্জিত ড্রয়িং-রুমে। ভবশঙ্করের স্ত্রী রাজেশ্বরী আসিলেন। ছেলে-মেয়েরা আসিল।

স্ত্রী রাজেশ্বরী বলিলেন—শুধু পায়ের ধূলো দিয়ে চলে গেলে চলবে না! একটু কিছু মুখে না দিলে···

চন্দ্রনাথ বলিলেন—না, না, এখন বেশী কিছু চলবে না। শুধু এক পেয়ালা চা···

রাজেশ্বরী বলিলেন—না, শুধু চা নয়। টুনু, কি তুমি তৈরী করেছো আজ বিকেলের জল-খাবার?

টুনু বড় মেয়ে। টুনু বলিল—লুচি, তরকারী, হালুয়া আর বরফী।

চন্দ্রনাথ বলিলেন—তোমার নিজের তৈরী?

রাজেশ্বরী বলিলেন—হ্যাঁ। ওঁর জন্য বিকেলের জলখাবার-তৈরীর ডিউটি ওরা ক'বোনে ভাগ করে নিয়েছে! উনি যা খেতে ভালোবাসেন।

চন্দ্রনাথ বলিলেন—হুঁ! বাপের উপর খুব টান আছে তো!

হাসিয়া ভবশঙ্কর বলিলেন—আমাকে বিপদে পড়তে হয় ওদের জন্য। প্রায় আমাকে ফর্দ্দ দিতে হয়। কি-জিনিষ আমার খেতে ভালো লাগে, কিসে অরুচি! শুধু তাই? সন্ধ্যার সময় ওদের সঙ্গে খানিকটা সময় বসতে হয়। কেউ তখন গান শোনায়, কেউ বাজনা! কেউ বা তার হাতের শিল্প-কাজ এনে দেখায়! কি করবো? সকলের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা চাই, নাহলে ছাড়বে না!

চন্দ্রনাথ শুনিলেন। কথাটা খুব ভালো লাগিল! বাড়ীতে সকলের সঙ্গে সকলের এমন মেলা মেশা···স্নেহ-মমতা ইহাতে কতখানি নিবিড় থাকে! পৃথিবীতে দেনা-পাওনার কারবার তো সর্ব্বত্র! ঘরেও যদি সে-সম্পর্ক গড়িয়া ওঠে ··

নিজের বাড়ীর কথা মনে পড়িল।

তিনি যে এই দিনের পর দিন মকর্দ্দমার নথী-পত্র লইয়া বসিয়া আছেন · বাড়ীতে কোথায় কে কি করিতেছে, জানেন না! হঠাৎ হয়তো এক দিন কাণে শুনিলেন, মেজো ছেলের জ্বর সারিতেছে না—পাড়ার বাঞ্ছনাথ-ডাক্তারের ওযুধে তো কোনো ফল হইল না! একবার রতন ডাক্তারকে খপর দিলে হয় না? কোন্ দিন রাত্রে আহার করিতে বসিতেছেন, হঠাৎ ছোট মেয়ে বিমলা আসিয়া ঢিপ করিয়া প্রণাম করিয়া বসিল! চমকিয়া তিনি বলিলেন—এর মানে? মেয়ে বলিল—বা রে, আজ আমার জন্ম-দিন

অথচ এক দিন এই জন্ম-দিনের সম্ভাবনায় তিন সপ্তাহ আগে হইতে মেয়েদের তাগিদ আর বায়না চলিত,—এবারের জন্ম-দিনে কিন্তু আমার ময়ূরপঙ্খী-রঙের সিল্কের শাড়ী আর ব্লাউশ চাই বাবা।

চন্দ্রনাথ একটা নিশ্বাস ফেলিলেন।

চা আসিল। ভবশঙ্করের মেয়ের তৈরী খাবার আসিল।

চন্দ্রনাথ বলিলেন—পিতৃ-সেবায় আজ বুঝি তোমার ডিউটি?

সলজ্জ হাস্যে মেয়ে মুখ নত করিল।

চন্দ্রনাথ বলিলেন—কি দিয়ে বরফী তৈরী করেছো বলো তো? বেশ নতুন রকম লাগছে!

মেয়ে বলিল—ফুলকপির বরফী।

—হুঁ! ফুলকপির বরফী! আচ্ছা, আর এক-দিন আসবো। আমায় খুব অনেক-অনেক বরফী খাওয়াতে হবে সে-দিন।

খুশী হইয়া মেয়ে বলিল—আজ এসেছেন, আজই অনেক-অনেক খান না!

চন্দ্রনাথ বলিলেন—না। আজ আমার আসবার কথা ছিল না তো! তোমাদের খাবারে ভাগ বসিয়ে গেলুম! তোমাদের ভাগ রেখে আমায় দিয়েছো ছ'-ছ'খানা বরফি! তোমাদের ছ'খানা বরফী কম পড়বে!

রাজেশ্বরী বলিলেন—সত্যি খাবেন?

মেয়েকে তিনি ক'খানা বরফী আনিতে বলিলেন।

মেয়ে বলিল—আনি আমি। বাবা, তুমিও খাবে এখন

ভবশঙ্কর বলিলেন—আনো!

চন্দ্রনাথ বলিলেন—না, না, আর বরফী আমাকে দিতে হবে না। মামলা জিতে তোমার বাবা লাইব্রেরীর জন্ত এক-রাশ খাবার-দাবার আনিয়েছিলেন। দেশী-বিদেশী খাবার। তারো কতক খেয়ে আসছি। আজ আর খাবো না। বললুম তো, নেমন্তন্ন রেখে যাচ্ছি—আর এক দিন আসবো!

তার পর জল খাবারের পালা চুকিলে গান…

আতিথ্যে তৃপ্তি লাভ করিয়া চন্দ্রনাথ আসিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন; এবং গাড়ী আসিয়া বাড়ীর ফটকে ঢুকিল।

বাড়ীতে একেবারে আ৲ার লঙর! হাসি-গান গল্প-কলরবের মস্ত জল্‌সা! চমকিয়া উঠিলেন! ও-বাড়ীর মামলা-জিতের যত আনন্দ কি এ-বাড়ীতে আসিয়া জমিল! ড্রয়িং-রুমে গান হইতেছে। উঁকি মারিয়া দেখিলেন, সোফা-কৌচ জুড়িয়া এক-ঘর লোক। মেয়ে-পুরুষ… নানা বয়সের। তাদের সঙ্গে আছে তাঁর দুই মেয়ে কমলা এবং অমলা…বড় অর্গানের সামনে বসিয়া অপরিচিত এক যুবা গান গাহিতেছে

সাথীহারার গোপন ব্যথা,
বলবো যারে সে-জন কোথা,
পথিকরা যায় আপন মনে,
আমারে যায় পিছে রেখে!

মনে হইল, যেন কোন্ অজানা বাড়ীর ঘর! পা কেমন বাধিয়া গেল,—ঢুকিতে পারিলেন না। নূতন করিয়া এত লোকের সঙ্গে পরিচয়…তার সময় নাই!

তিনি আসিলেন নিজের অফিস-কামরায়।

অন্য দিন তাঁর আসার প্রতীক্ষায় খাশ-বেয়ারা পান্ত থাকে ল্যাণ্ডিংয়ে! আজ তার দেখা নাই! ল্যাণ্ডিংয়ে ছিল না…এখন অফিস-কামরায় আসিয়াছেন…এখানেও না!

ভাবিলেন, ব্যাপার কি? নিজের বাড়ী তো? না, ভুল করিয়া আর কাহারো গৃহে আসিলেন!…

অফিস কামরার বাহিরে ছোট ঘর। এ-ঘরে তিনি পোষাক পরেন। এ-ঘরে ঢুকিয়া নিজের হাতে জুতার ফিতার ফাঁশ খুলিলেন …পোষাক ছাড়িলেন। তার পর ধুতি পরিয়া, গায়ে গেঞ্জি, পায়ে চটি তিনি আবার আসিলেন অফিস কামরায়।

একা…অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। কাহারো দেখা নাই!

বিরক্ত হইলেন।

বাহিরের টানা বারান্দায় আসিলেন। সেখানে দেখা পান্তর সঙ্গে। পান্ত ভিতর-বাড়ীতে চলিয়াছে। তার হাতে খাবারের মস্ত চ্যাঙারি।

ডাকিলেন—পান্ত…

পান্ত জড়োসড়ো মূর্ত্তিতে দাঁড়াইল। চন্দ্রনাথ বলিলেন—ব্যাপার কি? কাজে রিজাইন দেছ না কি? না, প্রোমোশন হয়েছে? নিজের হাতে সব করছি!

কাঁচুমাচু-মুখে পান্ত বলিল—মা দোকানে পাঠালেন…

—বটে! যাও।

পান্ত চলিয়া গেল।

চন্দ্রনাথ আসিলেন ভিতর-বাড়ীতে। গৃহিণী ইন্দ্রাণী ষ্টোভের সামনে বসিয়া পটলের মধ্যে মাছের পুর ঠাশিতেছেন।

চন্দ্রনাথ বলিলেন—ব্যাপার কি? রীতিমত যজ্ঞি! কারো বিয়ে? না, পাকাদেখা আছে না কি?

ইন্দ্রাণী বলিলেন—ওদের সখ হয়েছে, পার্টি করবে।

—ওদের… মানে?

—তোমার ছেলেমেয়ের।

চন্দ্রনাথের ললাট কুঞ্চিত হইল। চন্দ্রনাথ বলিলেন—বাড়ীতে তোমাদের তো দেখি নিত্যই ভোজ লেগে আছে! আজ যেন দক্ষ-যজ্ঞ! লোকজনের কি ভিড় আর হট্টগোল! কোর্ট থেকে ফিরে একটা লোক পাই না যে জুতোর ফিতে খুলে দ্যায়!

ইন্দ্রাণী বলিলেন—কেন? পান্ত?

চন্দ্রনাথ বলিলেন—পান্তকে তো দেখলুম এখন…তোমাদের অর্ডার সাপ্লাই করছেন!

ইন্দ্রাণী এ-কথার জবাব দিলেন না।

চন্দ্রনাথ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সেজো মেয়ে রমলা দ্রুত পায়ে সেখানে আসিল। ডাকিল—মা…

মা বলিলেন—কেন?

রমলা বলিল—হেনার সঙ্গে তার মা মিসেস্ রায়ও এসেছেন!

—বসাও গে। বলো, মা আসছে!

রমলা চলিয়া যাইতেছিল, বাপের দিকে চোখ পড়িল। বলিল—বাবা! তোমার আজ এত দেরী যে কোর্ট থেকে ফিরতে!

বাবা জবাব দিলেন না

রমলা বলিল তুমি শীগগির স্নান করে নাও। তোমার জন্ত যেন সকলকে বসে থাকতে না হয়!

চন্দ্রনাথ নিজেকে স্থির রাখিতে পারিলেন না, বলিলেন—বটে! আমার জন্ত এ-বাড়ীতে কে কবে বসে থেকেছে, শুনি?

কথা শুনিয়া রমলা একেবারে থ! এ-কথা বলার পর চন্দ্রনাথ সেখানে আর এক-মুহূর্ত্ত দাঁড়াইলেন না। চলিয়া আসিলেন।

রমলা আসিল মায়ের কাছে… খুব কাছে। ভয়ে এতটুকু হইয়া বলিল—বাবার কি হয়েছে মা?

মা বলিলেন—কাছারি থেকে ফিরে পান্তকে পাননি। নিজের হাতে জুতো খুলেছেন, পোষাক ছেড়েছেন। কিন্তু জানিস তো, পান্তকে আমি দোকানে যেতে বলেছি কখন! এখন বোধ হয় তাঁর যাবার ফুরসৎ হলো!

পান্ত আসিল। ইন্দ্রাণী ধমক দিলেন—কখন্ তোকে দোকানে পাঠিয়েছি! জানিস, বাবু কাছারি থেকে ফিরবেন! এসে তোকে পাননি—রাগ করেছেন।

পান্ত বলিল—আমার কি দোষ মা! আমি তো তখনি যাচ্ছিলুম, বড়দিদি বললেন, একখানা চিঠি নিয়ে যেতে হবে শান্তি দিদিমণির বাড়ী। সে কি এখানে? সেই চেৎলায়! চেৎলায় চিঠি দিয়ে তবে তো আমি দোকানে গেলুম ফেরবার মুখে।

বড় মেয়েকে উদ্দেশ করিয়া ইন্দ্রাণী ভৎর্সনা করিলেন—কতখানি তার আবিবেচনা বল্ তো রমা! সান্তাায় খাওয়া—কাকে খেতে বলবে, মেয়ের মনে থাকে না! ছুটার সময় চিঠি পাঠিয়ে নেমন্তন্ন করা! অথচ কি কাজে ব্যস্ত আছিস তুই, বল্ তো!

হল-ঘরে বড় টেবিল ঘিরিয়া প্রায় ত্রিশখানা চেয়ার পড়িয়াছে। ইন্দ্রাণী সেই টেবিলের উপর ত্রিশখানা মাটীর রেকাবে খাবার-দাবার সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিতেছেন, বিমলা আসিয়া ডাকিল,—মা!

মা বলিলেন—কেন?

—বাবার চা নিয়ে গিয়েছেলুম। বাবা অফিস-কামরায় চুপ করে বসে আছে। বললে, চা নিয়ে যা—চা আমি খাবো না! চা তাই ফিরিয়ে নিয়ে এসেছি।

ইন্দ্রাণী বলিলেন—থাক। আর একটু পরেই খাবার দিচ্ছি! খাবারের সঙ্গে চা খাবেন'খন। আজ কাজের তাড়া নেই তো! কাছারি বন্ধ হয়েছে।

ইন্দ্রাণী নিজের মনে রেকাবি সাজাইতে লাগিলেন। বিমলা কাঁটা হইয়া নিকটে দাঁড়াইয়া রহিল!

বড় মেয়ে কমলা আসিয়া ডাকিল,—মা!

মা বলিলেন—কেন?

অনুযোগের স্বরে একটু চড়া গলায় কমলা বলিল—সাতটা বাজতে চার মিনিট বাকী! তুমি আর কত দেরী করবে, বলো তো?

মা বলিলেন—একলা মানুষ। চাকর-বাকরদের দিয়ে এ কাজ হয় না তো। তোমরাও দিব্যি নির্লিপ্ত আছো! আমাকে যে একটু সাহায্য করবে, তা নয়!

কমলা বলিল,—বা, আমরা কি করে আসবো? ওখানে সকলে এসেছে। ভূপেন বাবু গান গাইছেন।

মা বলিলেন—তা গাইলেনই বা! তোমাদের এক-জন তো এসে এদিকে হাত লাগাতে পারো। তাহলে আমার সাহায্য হয়।

কমলা এ-কথার জবাব দিল না, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া গোঁ-ভরে চলিয়া গেল।

খাবার সাজানো শেষ হইয়াছে, জগা চায়ের কেটলি আনিয়া দিল। দাসী কালিদাসীর হাতে খাবারের চ্যাঙারি।

ইন্দ্রাণী বলিলেন—চ্যাঙারি রেখে তুই ঠাকুরকে পাঠিয়ে দে কালী। বল্ গিয়ে, মাছের ফ্রাই আর কাটলেট যেন তৈরী রাখে। এরা এসে বসলেই যেন গরম-গরম নিয়ে আসে। বুঝলি?

কালিদাসী কহিল—বুঝেছি মা।

বাহিরে ওদিকে···

চন্দ্রনাথের মনের মধ্যে যে কর্তৃত্ব-ভাব একান্তে পড়িয়া এতকাল আপনা-আপনি ঝিমাইত, অকস্মাৎ সে আজ জাগিয়া দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল!

চন্দ্রনাথ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেখেন, পর্চের নীচে তিন-চার জন লোক···কিশোর, আর কিশোরী। তিনি বলিলেন—কে?

ওরা জবাব দিল না!

চন্দ্রনাথ আসিয়া দাঁড়াইলেন ড্রইং-রুমের সামনে। সেখানে তখন সদ্য কোন্ গল্পে বুঝি হাসির বেলুন ফাটিয়াছে···হাসির চোটে কাণ পাতা দায়!

সে হাসির রোল ঠেলিয়া কাঁপাইয়া চূর্ণ করিয়া চন্দ্রনাথের স্বর জাগিল—কমলা···

কমলা শুনিল, বলিল—বাবা···

—শুনে যাও।

কমলা আসিল চন্দ্রনাথের কাছে।

চন্দ্রনাথ বলিলেন—বাইরে ক'জন লোক দাঁড়িয়ে কিসের চক্রান্ত করছে, দেখলুম। কে ওরা···ওদের চেনো কি না, এসে ভাখো।

কমলা আসিল চন্দ্রনাথের সঙ্গে। পর্চে সে ক'জন কিশোর-কিশোরী তখনো দাঁড়াইয়া আছে—তেমনি ভীত-চকিত ভাব!

কমলা তাদের কাছে গেল। কথা বলিল। তার পর ফিরিয়া আসিয়া বাবাকে বলিল—দাদার বন্ধু। দাদাকে খুঁজছে।

চন্দ্রনাথ বলিলেন, ও! তোমার দাদাকে ডেকে বলো। না, দাদা গবর্ণমেণ্ট-হাউসে ডিনার-পার্টিতে বেরিয়েছেন?

কমলা জবাব দিল না, চলিয়া গেল। চন্দ্রনাথ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

একটু পরে কমলার দাদা হিমাংশু আসিয়া দেখা দিল। চন্দ্রনাথের পানে সে চাহিলও না! সোজা গিয়া পর্চের নীচে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করিল এবং মহা-সমাদরে তাদের লইয়া···

তাদের কথা চন্দ্রনাথের কাণে গেল!

এক জন বন্ধু বলিল,—পাংচুয়ালিটি দেখেছো! ঠিক সাতটায় হাজির।

আর-এক জন বলিল—বড়লোকের বাড়ী, ঢুকতে ভয় হচ্ছিল ভাই হিমাংশু। তাই চুপচাপ গাড়ী-বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলুম।

ছেলে হিমাংশু বলিল—সোজা চলে আসতে হয়। হুঁঃ!

হিমাংশুর সঙ্গে তার বন্ধু-বান্ধবীরা গিয়া ড্রয়িং-রুমে প্রবেশ করিল।

চন্দ্রনাথ চুপ করিয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভাবিতেছিলেন, চমৎকার! আমার বাড়ী! আমার বাড়ীতে লোক-জনের ভিড়—অথচ ইহাদের কাহাকেও আমি চিনি না! ইহারাও আমাকে চেনে না, জানে না! আশ্চর্য্য!

ড্রয়িং-রুমে আবার হাসির অট্টরোল! চন্দ্রনাথের মনে হইল, গিয়া বলেন, এটা হোটেল নয়, সরাইখানা নয় যে আনন্দ এমন বাঁধ ভাঙ্গিয়া তাণ্ডবে মাতন তুলিবে?

কিন্তু বলা হইল না। ধীরে ধীরে তিনি আসিলেন নিজের অফিস-কামরায়।

চেয়ারে বসিলেন। টেবিলের উপরে খবরের কাগজ পড়িয়াছিল; তুলিয়া লইলেন। খবরগুলার উপর চোখ বুলাইতে লাগিলেন। মন কাগজে বসিল না। মনের মধ্যে যেন প্লাবন বহিতেছে!

ও-ঘর হইতে গানের কথা ভাসিয়া আসিতেছিল। গান হইতেছে—

সংসার কঠিন বড়, কারেও সে ডাকে না!
কারেও সে ধরে রাখে না!
হেথা যে যায় সে যায়,
কারো পানে ফিরেও না চায়···

বুকে কে যেন ধাক্কা মারিল! মনে হইল, এ কঠিন পৃথিবীতে তিনি একা! এত হাসি-গান-কলরব···তার সঙ্গে তাঁর কোনো যোগ নাই! এ হাসি-গান তাঁকে চায় না! যেন তাঁর ছায়া এড়াইয়া চলিতে চায়! এত-বড় পৃথিবীতে তাঁর জন্য আছে শুধু এই একটি মাত্র ঘর···আর মামলার নথি-পত্র! সে-সব লইয়া এ ঘরে

তিনি বন্দী! এ ঘরের বাহিরে আর সব-কিছুর সঙ্গে যেন তাঁর কোনো সম্পর্ক নাই!

পাঁচু আসিয়া বলিল—মা বলছেন, খাবার দেওয়া হয়েছে।

চন্দ্রনাথ জবাব দিলেন না।

পাঁচু আবার বলিল—খাবার দেওয়া হয়েছে।

চন্দ্রনাথ বলিলেন—বল গিয়ে, আমি খাবো না।

পাঁচু চলিয়া গেল।

চন্দ্রনাথ তেমনি বসিয়া রহিলেন। মনে পড়িল, ভবশঙ্করের গৃহের দৃশ্য। সেখানে সকলে মিলিয়া কি আরাম-নীড় রচনা করিয়াছে! বাপের জন্য মেয়েদের মধ্যে ডিউটি ভাগ-করা···আমোদ-প্রমোদে তনু-মন-প্রাণ ঢালিয়া দেয় নাই! মেয়েরা—কেহ গান শুনায়···কেহ বাজনা! কে কি শিল্প-কাজ করে, সে-শিল্পও সে আনিয়া দেখায়!···আর তাঁর গৃহে?

ইন্দ্রাণী আসিলেন, বলিলেন—এসো, সকলে বসে আছে তোমার জন্য।

—আমার জন্য বসে আছে?

—হ্যাঁ।

—কারা?

—কমলা-অমলার বন্ধুরা, রমলা-বিমলার বন্ধুরা···সঙ্গে তাদের মা আছেন, ভাই আছেন। অবিনাশ বাবু টীচার; হিমাংশু-সিতাংশুর বন্ধুরা···তার পর মিসেস দে, মিসেস গাঙ্গুলি, মিষ্টার হালদার···

চন্দ্রনাথ বলিলেন—কিন্তু এঁদের তো আমি চিনি না।

ইন্দ্রাণী বলিলেন—চেনো না, চিনতে কতক্ষণ! এসো, চেনাশোনা করো। আমাদের সঙ্গে খুব চেনাশোনা আছে। এঁরা প্রায় আসেন।

—বটে! প্রায় আসেন! অথচ আমি কিছু জানি না!

ইন্দ্রাণী বলিলেন—কি করে জানবে? মেশো কারো সঙ্গে? তুমি তোমার নথী-পত্র নিয়ে দিবা-রাত্র তার মধ্যে নিমগ্ন আছো··· ধ্যানস্থ! সে-ধ্যান ভেঙ্গে কে তোমার মনের দোরে গিয়ে পৌঁছুবে, বলো?

চন্দ্রনাথ নিবিষ্ট চিত্তে শুনিলেন। বলিলেন—বেশ তো, এত দিন যদি আমার মনের দোরে পৌঁছুবার কথা মনে হয়নি, মন ধ্যান-নিমগ্ন থাকায় কারো আমোদ-প্রমোদে তিলমাত্র ব্যাঘাত বা আমোদ-প্রমোদের মাত্রা কারো এক-তিল কম হয় নি, তো আজ হঠাৎ মনের দোর খোলবার কি দরকার হলো যে···

এ-কথার শ্লেষ গায়ে না মাখিয়া ইন্দ্রাণী বলিলেন—মনের দোর খোলার কথা হচ্ছে না! তবে মানুষের বাড়ী মানুষ আসে··· আলাপ-পরিচয় করতে! মানুষের স্বভাব!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া চন্দ্রনাথ বলিলেন,—যে-মানুষদের সঙ্গে তারা আলাপ-পরিচয় করতে চায়, তাদের সঙ্গে পরিচয় হয়ে মানুষরা তো পরমানন্দে আসা-যাওয়া করছে! আমার সঙ্গে পরিচয়ের দরকার এত দিন যাঁরা মনে করেননি, তাঁদের উপর হঠাৎ আজ এ নতুন পরিচয়ের ভার না চাপানোই উচিত! তুমি যাও। আমার যাবার সুবিধা হবে না। কাজ আছে।

ইন্দ্রাণী বলিলেন—কিন্তু সবাই তোমার জন্য···মানে, মিষ্টার হালদার বলছিলেন, ওঁর কাছারি বন্ধ হয়ে গেছে, আজ ওঁকে নিশ্চয় আমাদের দলে পাবে।

—কে এই মিষ্টার হালদার?

—কমলাদের কলেজে ইংলিশের প্রোফেশর।

—তিনিও বুঝি বন্ধু?

—হাঁ, তাঁর মেয়ে প্রীতি এক-ক্লাশে পড়ে কমলার সঙ্গে। দু'জনে খুব ভাব!

—ও! তা, তুমি যাও, ওঁরা বসে আছেন। বলোগে, আমি নথীপত্র নিয়ে মকদ্দমার ধ্যানে নিমগ্ন আছি—সে ধ্যান তুমি ভাঙ্গতে পারলে না! বলো, বাল্মীকি-মুনি যেমন সেই বল্মীকের স্তূপের নীচে ঢাকা পড়েছিলেন, মকদ্দমার নথী-পত্রের নীচে আমিও তেমনি চাপা আছি! এমন চাপা যে, খোঁচা মারলেও এ-বল্মীক ভেঙ্গে আমাকে বার করা যাবে না!

পৌরাণিক উপমার অর্থ না বুঝিয়া ইন্দ্রাণী ক্ষণকাল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; তার পর নিশ্বাস ফেলিয়া প্রস্থান করিলেন।

রাত্রি সাড়ে আটটা।

আহারাদির পর ড্রয়িং-রুমে আবার আসর জমিয়া উঠিয়াছে। গানে-গল্পে যেন নির্ঝর ঝরিতেছে!

পাঁচু আসিয়া ডাকিল,—মা···

ইন্দ্রাণী বলিলেন—কি রে?

—বাবু ডাকছেন।

—আমাকে?

—হ্যাঁ।

—বাবু কোথায়?

—দোতলায় তাঁর ঘরে।

ইন্দ্রাণী দোতলায় উঠিলেন।

চন্দ্রনাথের ঘর। মেঝেয় বারুর একটা বড় স্যুটকেশ। ডালা খোলা, তার মধ্যে রাশীকৃত জামা-কাপড় পাহাড়ের মতো উঁচু হইয়া আছে! হোল্ড-অল খুলিয়া চন্দ্রনাথ তার মধ্যে তোষক চাদর বালিশ গুঁজিতেছেন।

ইন্দ্রাণী আসিয়া বলিলেন—ডাকছো?

—হ্যাঁ।

—কেন?

—তোমার কাপড়-চোপড় দেখে নাও। তুমি অতিথি-সেবায় মত্ত, তাই বিরক্ত না করে তোমাকে না বলে আমি নিজে থেকেই স্যুটকেশের মধ্যে নিয়েছি তোমার খান-আষ্টেক শাড়ী-সেমিজ-ব্লাউশ; গরম সেমিজ আর গরম ব্লাউশ দু'টো করে।

বাধা দিয়া ইন্দ্রাণী বলিলেন—এর মানে?

—মানে, আমার সঙ্গে তুমি বাইরে যাবে আজ। সাড়ে দশটায় ট্রেণ। কাছারির ছুটি হয়ে গেছে। দু'দিন বাইরে যেতে চাই।

ইন্দ্রাণীর চোখের উপরে মেঘের কালো ছায়া! ইন্দ্রাণী বলিলেন, —কিন্তু···

—কোনো কিন্তু নয়। আমি ফোন্ করে বার্থ রিজার্ভ করে ফেলেছি! তোমার কোনো আপত্তি আমি শুনবো না! আমার স্বামিত্ব আর পিতৃত্বের উপর যথেষ্ট পীড়ন-অবহেলা হয়েছে! এত দিন সব সহ্য করেছি, কিন্তু আর করবো না! বুঝছো, the husband rebels!

ইন্দ্রাণী যেন আকাশ হইতে পড়িয়াছেন! তাঁর দৃষ্টিতে এমনি বিস্ময় আর আতঙ্ক! স্বামীর পানে তিনি চাহিয়া রহিলেন নির্ব্বাক্… নিস্পন্দ!

চন্দ্রনাথ বলিলেন—আমার অধিকার আমি ফিরে পেতে চাই! আদরে-প্রশ্রয়ে আমার সব যেতে বসেছে। এ-বাড়ীর আমি কেউ নই, বটে?…আমি যেন ইহলোকের জীব নই! আমি শুধু পয়সা-রোজগার করবার যন্ত্র! তোমাদের পার্টি আর আমোদ-প্রমোদের খরচ জোগাবার মেশিন! আমার নিজের সুখ নেই! দুঃখ নেই! কিছু নেই! Oh no! I have had a revelation! এত দিন অন্ধ ছিলুম! আর অন্ধ নয়! আজ আমি জেগেছি!… চক্রধরপুর যাবো। বুঝলে?

ইন্দ্রাণীর অজ্ঞাতে কণ্ঠে স্বর ফুটিল—চক্রধরপুর!

—হ্যাঁ, চক্রধরপুর! চমৎকার জায়গা! নির্জ্জন। পার্টি-টার্টির ঝামেলা নেই। লোকজনের ভিড় নেই! মন খুব সুস্থ, স্বচ্ছন্দ থাকবে সেখানে!…এখন দেখে নাও, তোমার আর কি-কি চাই? সাবান গামছা, তোয়ালে, তেল, টুথপেষ্ট, টুথব্রাশ…সব নিয়েছি, তবু ছাখো! বাসন-কোশন নেবার দরকার নেই। সেখানে হোটেল আছে। হোটেলে থাকবো। তুমি যাবে, আর আমি যাবো। আর কেউ যাবে না সঙ্গে। চাকর নয়, বামুন নয়, ছেলেমেয়ে নয়! আত্মীয়-বন্ধু কেউ নয়! ছাখো তোমার জিনিষ-পত্তর!

কথার শেষে আদেশের রূঢ় ভঙ্গী!

যন্ত্র-চালিতের মতো ইন্দ্রাণী স্যুটকেশের কাপড়-চোপড় নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিলেন। বুক ঠেলিয়া তাঁর দুই চোখে অজস্র বাষ্প জমিতেছিল!

চন্দ্রনাথ বলিলেন—দুটো মাথার বালিশ, দুখানা গরম র‍্যাগ, দুটো বালিশের ওয়াড়, আর দুখানা সিঙ্গল-বেডের তোষক নিয়েছি। আরো লাগে, হোটেলে পাবো। হ্যাঁ, আর নগদ এই দু'শো টাকা… এ-টাকা তোমার কাছে রাখো! স্যুটকেশেই রাখতে পাবো। তার পর জার্ণির জন্ম যা লাগে, পাশে আমার কাছে রাখছি। আরাম করে আমি বাঁচতে চাই! কেন বাঁচবো না? খেটে এত পয়সা রোজগার করছি, কেন আরাম করবো না?

স্যুটকেশ লইয়া ইন্দ্রাণী হিমসিম খাইতেছেন, তাঁর সঙ্গে চন্দ্রনাথও এটা-ওটা ধরিয়া টানিতেছেন, এমন সময় মেজো মেয়ে অমলা আসিয়া দেখা দিল। বলিল,—মা, তুমি তো বেশ মানুষ! তোমার আর ফেরবার নাম নেই! ওদিকে ব্রজগোস্বামীকে গান গাইতে বললে! ভদ্রলোক গান গাইছেন…

সঙ্গে সঙ্গে দু'চোখ যেন ঠিকরিয়া যাইবে, এমনি তার দৃষ্টি! অমলা বলিল,—দুজনে এ কি করছো! এই একরাশ জামা-কাপড় বিছানা নিয়ে…

চন্দ্রনাথ বলিলেন,—আমরা দু'জনে আজ রাত্রে বাইরে যাচ্ছি।

—বাইরে! আজ রাত্রে!

—হাঁ।

—বাড়ীতে এই সব লোকজন?

—তোমাদের বন্ধু…তোমরা দেখবে! ওদের সঙ্গে তোমার মায়ের বা আমার কি সম্পর্ক!

অমলা ডাকিল—মা…

মা আর পারিলেন না, দু'চোখে জল…সেই জামা কাপড় আর বিছানার মোটের উপর তিনি মাথা গুঁজিলেন।

অমলা চাহিল চন্দ্রনাথের পানে। তার দু'চোখে যেন আগুনের হলকা! বলিল—কি হচ্ছে, বাবা? মার উপর এ পীড়ন করবার মানে?

চন্দ্রনাথ ফোঁশ করিয়া উঠিলেন! বলিলেন,—উনি তোমার মা—তাই ওঁর উপর তোমার এত দরদ! এমন মায়া! আমার উনি কেউ নন্…না? আমাকে তুমি এসেছো তোমার মায়ের ইষ্টানিষ্ট সম্বন্ধে লেকচার দিতে!

অমলা অবাক! বাপ চন্দ্রনাথ সংসারে কাহারো কোনো কথায় থাকেন না…কোনো দিন না! হঠাৎ তাঁর মাথায় আজ ভূত চাপিল না কি?

চন্দ্রনাথ বলিলেন—তোমার মাকে আজ বলছিলুম, লেখাপড়া শিখে সব বুঝেছেন সাম্য আর স্বাধীনতা! স্বাধীনতার মধ্যে কত-খানি অধীনতা, তা বোঝবার সামর্থ্য নেই! সাম্য মানে সব বিষয়ে টক্কর দেওয়া নয়—বড়কে অবজ্ঞা-উপেক্ষা করা নয়! ভাবছো, এ সংসার তোমরা চালাচ্ছো! চালাবার বিদ্যা আর শক্তি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করেছো!…এ ধারণা যা হয়েছে, জানি, তা তোমার মায়ের আদরে আর প্রশ্রয়ে! এমন করে তুলেছো, যেন আমার সঙ্গে তোমার মায়ের সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে!…তাই দেখি, আমার বাড়ীতে আজ দশ-জন অপরিচিত-অনাত্মীয় এসে জটলা করছে! তারাই যেন এ বাড়ীর সব! আর আমি…

আবেগের উত্তেজনায় চন্দ্রনাথের কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন—আমি কেউ নই! সকলের কৃপার পাত্র হয়ে কোনোমতে যেন অন্ন-বস্ত্র আর শুয়ে ঘুমোবার জন্ম রাত্রে বিছানা পেলে কৃতার্থ হবো!

অমলা কাঠ! মুখে কথা নাই!

চন্দ্রনাথ বলিলেন—ছেলেমেয়েকে শাসন…পছন্দ করি না। শাসন করিনি কখনো! বন্ধুর মতো তোমাদের সঙ্গে ব্যবহার করেছি। কিন্তু তোমরা যে ভাবো দুনিয়ায় তোমরাই শুধু মানুষ—তোমরাই শুধু বেঁচে থাকবে…আর আমরা অপদার্থ, আমাদের মরা কর্ত্তব্য…মিথ্যা খানিকটা জায়গা দখল করে আছি,—তোমাদের এ ভুল বিশ্বাস আমি ভেঙ্গে দিতে চাই।…তোমাদের খুশী রাখতে, সুখী করতে, আরাম দিতে, আনন্দ দিতে আমরা নিজেদের মনের পানে, স্বাস্থ্যের পানে, সুখের পানে…কিছুর পানে তাকাইনি! কিন্তু জেনো, বাঁচার মতো বাঁচতে, খুশীতে আমোদে-আনন্দে তোমাদের যেমন অধিকার, আমাদেরো তাতে ঠিক তেমনি অধিকার আছে। তোমরা যা চাও, না চাইতে তোমাদের মন বুঝে আমরা যদি তোমাদের তা দিতে পেরে থাকি, তাহলে তোমরাই বা কেন তা দিতে পারবে না? দেবে না? কেন তোমরা আমাদের তুচ্ছ করবে? উপেক্ষা করবে?

কথা বাধিয়া গেল। চন্দ্রনাথের পানে চাহিয়া কমলা নিস্পন্দ! ইন্দ্রাণীও তেমনি! কাপড়-জামা-বিছানার মোটের উপর মুখ গুঁজিয়া তিনি পড়িয়া আছেন!

চন্দ্রনাথ বলিলেন—বিভীষণ বলেছিল, কলিতে শত পুত্রের

বাপ হওয়া অভিসম্পাত! এ কথা সে বলেছিল ছেলেমেয়েদের এই অবজ্ঞা আর অবহেলা বহনা করে!...তোমার মাকে নিয়ে আজ আমি রাত্রে বাইরে যাচ্ছি। ছুটীর কটা দিন আমরা বাইরে থাকবো। যাই হোক, চালাও তোমরা তোমাদের সংসার, তোমাদের সাম্য আর স্বাধীনতা নিয়ে!

অমলাকে যেন কে মন্ত্র পড়িয়া দিয়াছে... সে যেন পাথরের মূর্ত্তি!

চন্দ্রনাথ বলিলেন,—মায়ের উপর তোমাদের দরদ, সে শুধু উনি নিঃশব্দে তোমাদের শিরোধার্য্য করে চলেন বলে'—তোমাদের দাস্ত করেন বলে'—তোমাদের সুখকে মস্ত বড় করে নিজের পানে চান্ না বলে'! এ-রকম দেনা-পাওনার কারবারের উপর সংসার চলে না! সংসার চালাতে গেলে চাই সত্যিকারের স্নেহ মমতা দরদ সকলকে তুচ্ছ! আর নিজেকে সর্ব্বস্ব করে তুললে সংসার হোটেল হয়!

তার পর ইন্দ্রাণীর পানে চাহিলেন। বলিলেন,—কেঁদো না। ওঠো। যাবো যখন বলেছি, যাবোই!

এক-তলার ড্রয়িং-রুমে তখন সিনেমার দৃশ্য ...

এক-এক জন খাওয়ার মাত্রা এমন করিয়াছে—পরের বাড়ীতে সুপেয় সুভোজ্য পাইলে দেহের শক্তি বা নশ্বরতার কথা ভুলিয়া অনেকে যেমন মরিয়া হইয়া ওঠে...তেমনি!

তাহারি ফলে কেহ কার্পেটের উপর শুইয়া পড়িয়াছে; কেহ বা দু' পা প্রসারিত করিয়া সোফায় পিঠ ঠাশিয়া অচেতন-প্রায়; কেহ গানের ফরমাশ করিতেছে; কেহ-বা সাঙ্গ-সঙ্গিনী লইয়া চক্র রচিয়া গল্প ফাঁদিয়াছে!

এ-সীনে অমলা আসিয়া দাঁড়াইল...কক্ষচ্যুত তারকার মতো!

তাকে দেখিবামাত্র কমলা আসিয়া বলিল—ইহারা বাড়ী যাবে, তাই ইঁহার মা বলছেন, আমাদের গাড়ীখানা করে যদি পৌঁছে দি? ওঁদের বাড়ী হলো পদ্মপুকুরের ওদিকে!

অমলা বলিল—অসম্ভব! গাড়ীতে করে মা আর বাবা এখনি যাবে হাওড়া-ষ্টেশন।

দু' চোখ কপালে তুলিয়া কমলা বলিল—হাওড়া ষ্টেশন!

—ওঁরা বাইরে যাচ্ছেন। চক্রধরপুর।

—চক্রধরপুর!

—হাঁ। চেঞ্জ। বাবার কোর্টের ছুটী হয়ে গেল। বাবা একা যাবে না তো!...মা তাই সঙ্গে যাচ্ছে।

—কিন্তু...বা রে, আমরা যাবো না, বুঝি?

—না!

কমলার চোখের সামনে সব যেন ধোঁয়ায় ভরিয়া গেল।

চন্দ্রনাথের পণ দুর্জ্জয়...টলিল না। সেই দুর্জ্জয় পণের সামনে ছেলে-মেয়েরা ঘেঁষিতে পারিল না। বাবাকে এমন গম্ভীর তারা কখনো দেখে নাই!

রাত্রি দশটায় তিনি ষ্টেশনে বাহির হইলেন, সঙ্গে ইন্দ্রাণী। ইন্দ্রাণীর দু'চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন। চোখের জল যে করিয়া চাপিয়া আছেন। চোখে জল দেখিলে পাছে চাকর-বাকর বা লোকজন মনে করে নাটক করিতেছে, তাই!

তাঁর সেই বাষ্পাচ্ছন্ন চোখের সামনে ছেলেমেয়ে, লোকজন...যেন ব্যারাকপুর-নবাবগঞ্জের ঝুলন-মেলার সেই সব মাটীর পুতুল! তাদের মুখে-চোখে কত রকমের ভঙ্গী! কিন্তু নির্ব্বাক্!

ট্রেণের কামরায় ভিড় নাই। পাশাপাশি দুখানি বার্থে চন্দ্রনাথ আর ইন্দ্রাণী।

চন্দ্রনাথের বার্থে ইন্দ্রাণী বিছানা পাতিয়া দিলেন। চন্দ্রনাথ বলিলেন,—তোমার বিছানা?

ইন্দ্রাণী বলিলেন—আমি শোবো না।

চন্দ্রনাথ বলিলেন—বিলক্ষণ! তা কখনো হয়? সারা রাত ট্রেণে কাটবে! বিছানা করো।

ইন্দ্রাণী বলিলেন,—তুমি তো জানো, ট্রেণে আমার মোটে ঘুম হয় না।

চন্দ্রনাথ মনে-মনে হাসিলেন! বলিলেন,—ঘুম আসে না তোমার ছেলেমেয়ের জন্য! পাছে তাদের কষ্ট হয়, তারা উঠে কে কখন কি চাইবে, এই ভাবনায়! আজ সে-ভাবনা নেই যখন...ওঠো, আমি বিছানা পেতে দি, শুয়ে পড়ো! ঘুম না হয়, চোখ বুজে বিছানায় পড়ে থাকবে। কম্পার্টমেণ্ট আমি লক্ করে দিচ্ছি! কোয়ায়েট্ সেফ্!

চক্রধরপুরের হোটেল।

সন্ধ্যার দিকে খুব খানিকটা ঘুরিয়া চন্দ্রনাথ ফিরিলেন।

খোলা জানলার ধারে ইন্দ্রাণী দাঁড়াইয়া আছেন। বাহিরের দিকে দৃষ্টি! টেবিলের উপর চায়ের পেয়ালায় চা পিরীচ্-ঢাকা, প্লেটে আপেল, নাশপাতি, টোষ্ট-রুটী ...

চন্দ্রনাথ বলিলেন—শুনছো?

ইন্দ্রাণী ফিরিয়া চাহিলেন। চোখের জলে মুখ মলিন!

চন্দ্রনাথ ডাকিলেন—এসো।

ইন্দ্রাণী আসিলেন।

চন্দ্রনাথ বলিলেন—বসো।

ইন্দ্রাণী বসিলেন।

চন্দ্রনাথ বলিলেন,—কাঁদছো! ভাবছো, tyranny করছি? আমি tyrant? কিন্তু আমি tyrant নই! ছেলেমেয়েকে বড্ড ভুল-পথে নিয়ে যাচ্ছি! নিজেদের স্বার্থ, সুখ, হাসি-খুশী আর আমোদ-প্রমোদকেই তারা সার বস্তু বলে বুঝছে! যা চাইছে, তাই দিচ্ছ! বাধা মানে না, 'না' জানে না। এ ঠিক নয়। Life is not so plain and smooth! ঘর ছেড়ে পরকে নিয়ে এমন আত্মহারা হওয়া...এতে ওরা পরে সুখী হবে না।

ইন্দ্রাণী কথা কহিলেন। কাল হইতে অনেক কথা ভাবিয়াছেন? এখনো ভাবিতেছিলেন! বলিলেন—ওরা এখনো জীবনের এত কূট-তত্ত্ব শেখোন! এখনো সব ছেলে-মানুষ!

চন্দ্রনাথ বলিলেন—বেশ, আগে আমাকে ওদের কোনো-কিছুতে ওরা বাদ দিত না! আমার কাছে লক্ষ আব্দার—লক্ষ বায়না করতো!

ইন্দ্রাণী বলিলেন,—তুমি কি এখন ওদের ঘেঁষ দাও? নিজের কাজ-কর্ম্ম নিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা মেতে থাকো!

চন্দ্রনাথ হাসিলেন, বলিলেন—বেশ, তাই যদি, তাহলে আমি

বলবো, ওদের এগজামিনের সময় দ্যাখো তো, পড়ার বই নিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা ওরা কি রকম মেতে থাকে! নাওয়া-খাওয়ার কথা মনে থাকে না! শুয়ে ঘুমোবে, হুঁশ নেই। সুগভীর ধ্যান! সে ধ্যানের মধ্যে ঢুকে ওদের ধ্যান ভাঙ্গিয়ে তুমি ওদের ধরে নাইতে-খেতে পাঠাও··· ধরে-বেঁধে বিছানায় শুইয়ে দাও!···যে-সময়ে যার যা কর্ত্তব্য, সে কর্ত্তব্যে তন্ময়তা চাই! ওদের এগজামিনের তন্ময়তা সাময়িক। কাজে আমার তন্ময়তা···কোনো দিন তা ছেড়ে থাকবার নয়! সংসারে থাকতে হলে যার যাতে দরকার, এ-তন্ময়তা চাই। ওদের তন্ময়তার মধ্যে তুমি গিয়ে যেমন বলতে, নাইতে যা, খেতে আয়, শুয়ে পড়, আমার তন্ময়তার মধ্যেও তেমনি তোমাদের আসা চাই! আমার তন্ময়তা ভেঙ্গে আমাকে তোমরা গল্প বলবে, গান শোনাবে। ছেলেমেয়ে যেমন দরদ প্রত্যাশা করে মা-বাপের কাছে, আমিও তেমনি দরদ প্রত্যাশা করবো না স্ত্রীর কাছে, ছেলে-মেয়ের কাছে?

ইন্দ্রাণীর মাথার মধ্যে যেন একরাশ মৌমাছি ভন্ ভন্ করিতেছে! কি তীব্র সে ভন্ ভনানি-রব!

চন্দ্রনাথ বলিলেন—যে সংসারে একান্ত-আপন-জনের উপর উদাসীন থেকে ছেলেমেয়ে বাইরে থেকে মানুষ ধরে এনে তাদের উপর শুধু দরদ জানায়, সে-সংসার সংসার থাকে না, প্রমোদ নাট্যশালা হয়ে ওঠে। নাট্যশালায় পাঁচ রকমের মানুষ আসে···আমোদ-প্রমোদের প্রত্যাশায়; এবং অতি অল্পক্ষণের জন্য! প্রমোদ-নাট্যশালা তাদের কাছে ক্ষণেকের ছাউনি মাত্র! নাট্যশালার সঙ্গে আমাদের মনের যোগ শাশ্বত নয়! ক্ষণেকের মায়া সে!···তুমি বুঝছো না তোমার সংসার স্নিগ্ধ-গম্ভীর শান্তশ্রী হারিয়ে যেন প্রমোদ-পিয়াসীদের নাট্যশালা হয়ে উঠছে! এ ঠিক নয়। ছেলেমেয়েদের কি বা অভিজ্ঞতা—এ-বয়সে তাদের মন চায় ছুটী আর আমোদ! তাই তাদের বোঝাতে চাই। কর্ত্তব্য।···মলিন মুখে তোমার থাকবার দরকার নেই। ছেলেমেয়ে তোমার একার নয়! আমোদ-প্রমোদ ছেড়ে কাজের ধ্যানে আমি যে নিমগ্ন থাকি, সে তোমার ছেলেমেয়ের সুখের জন্য—আমাদের সকলের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য! কিন্তু না, কাল থেকে কেবলি লম্বা লম্বা লেকচার দিচ্ছি! আর লেকচার নয়। শোনো, অর্জ্জুনকে আমি বলে এসেছি···

অর্জ্জুন অনেক দিনের ক্লার্ক। চমৎকার ভদ্রলোক।

চন্দ্রনাথ বলিলেন—ছেলে-মেয়েদের সে দেখবে। যেদিন সে বুঝবে ওরা আমাদের কাছে আসতে চায়, তখনি নিয়ে আসবে। অর্জ্জুনের কাছে টাকা-কড়ি দিয়ে সে ব্যবস্থা আমি পাকা করে এসেছি! Charity begins at home. তার উপর পুরুষানুক্রম বলে একটা কথা আছে! মা-বাপ যেমন ছেলে-মেয়েকে নিজেদের অংশ বলে' জানবে, ছেলে-মেয়েও তেমনি জানবে মা-বাপ তাদেরই অংশ! গাছ থেকে পাকা ফল ঝরে পড়ে···মানুষের সম্পর্ক··· গাছের সঙ্গে ঝরা ফলের নয়! ঘরকে একেবারে পর করে দিয়ে পরকে নিয়ে ঘর করতে গেলে সে ঘর হয় তাসের ঘর। সে-ঘর ফুঁয়ের ভর সইতে পারবে না!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

ভয়

ভয় আর ভয় শুধু—ভয়েই ম'লাম!
জীবন তো হলো শেষে ভয়েরই গোলাম!
পথে যাই—সেখানেও নাহি নির্ভয়—
কি জানি, যা গাড়ী-ঘোড়া—কখন কি হয়!
অফিসেতে যাই নিয়ে দুরু-দুরু বুক,
না চাই—কাজটি গেলে ঘুচবে যে সুখ!
আলাপ কাহারো সাথে করি, তাও ভয়,
বেফাঁস যদি-ই বলি, ফেরাবার নয়!
আসিলে গভীর রাত—সেও মুস্কিল,
চোর-ডাকাতের ভয়ে দোরে দিই খিল!
ভিড়েতে ঢুকি না পাছে কাটে গো পকেট!
উঁচু শির করি না কো—পাছে হয় হেঁট!
ভোগেতে রোগের ভয়। লোভে যদি খাই,
তখনি ধরিবে রোগে, উদ্ধার নাই।
গুণী সে যদি-ই হই, নিন্দার ভয়!
প্রেমেতে পড়ি না, পাছে বদ্-নাম হয়!
মান সে যদি-ই থাকে, এড়াতে তা চাই!
দৈন্যের ভয়ে প্রাণ ভীত যে সদাই!
কুটুম আসিলে গৃহে—হয় সংশয়,
কি জানি থাকেন যদি—আরো ভয় হয়!
বুকেতে সে লাগে যদি ব্যথা বেদনার—
ভয়ে মরি—'টি-বি' বুঝি বলে ডাক্তার!
রূপ সে যদি-ই বাড়ে, ভয় সে জরার!
সকল ভয়ের চেয়ে ভয় যে মরার!
ভয়ে প্রাণটুকু করি এত সাবধান—
যমের কাছেতে ভাবি, পাবো না কি ত্রাণ?
ভয় আর ভয় শুধু—ভয়ে-ই ম'লাম!
জীবন তো হলো শেষে ভয়ের-ই গোলাম!

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

সাময়িক প্রসঙ্গ

সপ্রু-জয়াকর বিবৃতি

সার তেজবাহাদুর সপ্রু এবং ডক্টর মুকুন্দরাম রাও জয়াকর উভয়েই এ দেশের মধ্যপন্থী রাজনীতিক। উভয়েই প্রগাঢ় পণ্ডিত এবং রাজনীতি-শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ। চরমপন্থীদিগের বা জাতীয়তাবাদীদিগের আবির্ভাবে শঙ্কিত লর্ড মর্লি এক বার ভারতীয় শাসনকর্তাদিগকে বলিয়াছিলেন,---মধ্যপন্থী বা মডারেটদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ কর। কারণ, মধ্যপন্থীরা যতদূর সম্ভব বৃটিশ সরকার এবং তাঁহাদের নীতির সমর্থক। এখন ইঁহাদের দলে লোকসংখ্যা অল্প। ডক্টর জয়াকর এক সময়ে কিছু দিনের জন্য কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছিলেন; কিন্তু মতভেদ হওয়ায় কংগ্রেস পরিত্যাগ করেন। এ দলকেও যদি সরকার অগ্রাহ্য করেন, তাহা হইলে ভারতে প্রকৃত পক্ষে সরকারের পক্ষে কেহই থাকে না। সম্প্রতি মিষ্টার চার্চিচল এবং আমেরীর বক্তৃতায় মর্ম্মাহত হইয়া ইঁহারা উভয়েই এক সম্মিলিত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। বৃটিশ প্রধান সচিবের বক্তৃতা যে মিথ্যা উক্তিতে পরিপূর্ণ, ইঁহারা দুই-জনেই তাহা দেখাইয়াছেন; কিন্তু মিষ্টার চার্চিচল ধরা পড়িয়া লজ্জিত হইবার পাত্র নহেন। সপ্রু এবং জয়াকরের মতে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতার ফলে অবস্থার উন্নতি হইবে না,---অবনতিই ঘটিবে। ইহাতে হয় ত মার্কিণী ও সম্মিলিত পক্ষের অন্যান্য জাতি আশ্বস্ত হইতে পারেন; সম্ভবতঃ তাঁহাদিগকে ঐরূপ আশ্বাস দান করিবার উদ্দেশ্যেই ঐ বক্তৃতার পরিকল্পনা। ইহাতে মনে হয়, বৃটিশ-সচিব সত্য কথার আলোচনা অপেক্ষা স্বদলভুক্ত জাতিদিগকে আশ্বাসদানের জন্যই অধিক আগ্রহবান। কিন্তু কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বা জাতি মিথ্যা বা ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত দ্বারা কাহাকেও চিরদিন আশ্বস্ত করিয়া রাখা সম্ভব বলিয়া মনে করিতে পারেন না।

মিষ্টার চার্চিচল প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন যে, কংগ্রেস এ দেশের অসংখ্য জনগণের প্রতিনিধি নহেন। ডক্টর সপ্রু ও জয়াকর উভয়েই এক বাক্যে বলিয়াছেন, এ ধারণা এত দিন কোথায় ছিল? এই সঙ্কটসঙ্কুল সময়ে তবে হিন্দুসভা ও অন্যান্য দলের সহিত মীমাংসা করিবার কথা বলা হয় নাই কেন? বিলাতের লর্ড প্রিভীসীল তবে কেন দিল্লীতে বলিয়াছিলেন যে, মীমাংসার কথা কংগ্রেসের ও মুশ্লিম লীগের সহিত কহিলেই চলিবে? ইঁহাদের এই উক্তি হইতেই বুঝা যায় যে, চার্চিচলের বক্তৃতায় ইঁহারা---মডারেট দল অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। ইহাতে সুস্পষ্টরূপেই প্রতীতি হইতেছে যে, মিষ্টার চার্চিচলের বচনের ও তাঁহার অবলম্বিত নীতির ফলে ভারতে আর কেহই তাঁহাদের পক্ষাবলম্বী থাকিল না। যে সকল স্বার্থপর লোক হীন স্বার্থ-সাধনের উদ্দেশ্যে তাঁহাদের মনের মত কথা বলিতেছে, তাহাদিগকে কি বিশ্বাস করা যাইতে পারে? সপ্রু এবং জয়াকর উভয়েই এক বাক্যে বলিয়াছেন যে, অবিলম্বে ভারতে জাতীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা করা বিধেয়। কংগ্রেস-নেতৃবর্গের সহিত কারাগারে সাক্ষাৎ করিয়া হিন্দু মহাসভা মুশ্লিম লীগ এবং অন্যান্য রাজনীতিক দলকে ঐ জাতীয় সরকার গঠনের সহায়তা করিতে বলা আবশ্যক। যদি কারাগারে থাকিয়া কংগ্রেস-নেতাদিগের পক্ষে এ বিষয়ে পরামর্শ করা কঠিন হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে মুক্তি দেওয়া উচিত। কংগ্রেসের আইন-অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করা কর্ত্তব্য; কিন্তু কংগ্রেস কর্ত্তৃক ত আইন অমান্য আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হয় নাই। গান্ধীজী উহা প্রবর্ত্তিত করিবেন, এই কথা বলিয়াছিলেন বটে। যাহা হউক, সপ্রু-জয়াকরের সুদীর্ঘ মন্তব্যের আলোচনা করিবার স্থান না থাকিলেও আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, বৃটিশ প্রধান সচিবের উক্তির ও তাঁহার অবলম্বিত নীতির ত্রুটিতেই ভারতে আর কোন বিশিষ্ট রাজনীতিক দলই তাঁহাদের সমর্থক থাকিলেন না।

মুসলমান সমাজের মত

মুসলমান সমাজ কি স্বদেশের স্বাধীনতা চাহেন না? গত ১১শে ভাদ্র ব্যবস্থা-পরিষদে ডক্টর জিয়াউদ্দিন বলিয়াছেন, স্বাধীনতার এবং জাতীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে কংগ্রেসের সহিত মুশ্লিমলীগের মতভেদ নাই। সার আব্দুল হালিম গজনভীকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, কংগ্রেসকে নগণ্য বলা চার্চিচলের পক্ষে সঙ্গত হয় নাই। চার্চিচল বলিয়াছেন, ৯ কোটি মুসলমান মুশ্লিম লীগের সমর্থক, তাঁহার এই উক্তিও সত্য নহে। ভারতের মুসলমানদিগের অনেক বিশিষ্ট দল লীগের সমর্থন করে না। যথা জমিয়াৎ উল উলেমা, মোমিন, অর্হর এবং আজাদ মুসলমান। ইঁহাদের দলের লোকসংখ্যাও বিস্তর, এ কথা পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে। লীগ সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানের সংখ্যা অতি অল্প। কিন্তু সে কথা স্বীকার করিলে উৎকট সাম্রাজ্যবাদী চার্চিচল-আমেরী কোম্পানীর স্বার্থসিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং তাঁহাদিগকে জাগিয়া ঘুমাইতে হইতেছে---ইহা কি তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন না?

বৃটিশ সচিবের নিকট আবেদন

ভারতীয় বর্ত্তমান অচল অবস্থার সমাধান করিবার জন্য ভারতীয় সর্ব্বদলের জননায়ক-স্বাক্ষরিত একখানি আবেদন-পত্র মিষ্টার চার্চিচলের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। যে সকল জননায়ক দিল্লীতে রাজনীতিক বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দ্বারা এই আবেদন-পত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে। মিষ্টার চার্চিচল বক্তৃতা করিবার পূর্ব্বেই ঐ আবেদন-পত্র পাইয়াছিলেন। আবেদন-পত্রে সেই একই প্রার্থনা,---সরকার ভারতবাসীর হাতে অবিলম্বে ক্ষমতা অর্পণ করুন। এই আবেদন-পত্রে ১৫ জন স্বাক্ষরকারীর মধ্যে ৫ জন বিশিষ্ট ও পদস্থ মুসলমান, অবশিষ্ট ১০ জন হিন্দু ও শিখ। কিন্তু মিষ্টার চার্চিচল এই আবেদন-পত্র গ্রাহ্য করেন নাই। এই ব্যবহারে তাঁহার ন্যায় ঝুনা সাম্রাজ্যবাদীর মনোবৃত্তির সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। চার্চিচলপ্রমুখ সাম্রাজ্যবাদীরা দেখিতেছেন যে, ভারতীয় বিভিন্ন সম্প্রদায় ক্রমশঃ একমত হইতেছেন; সেই জন্য তাঁহারা রক্তবস্ত্র দর্শন-চকিত বৃষভের ন্যায় রৌদ্র-তপ্ত হইয়া

প্রচণ্ড বেগে মাথা নাড়িতেছেন। চার্চ্চিলের বক্তৃতাই তাহার প্রমাণ। হিন্দুসভার সভাপতি শ্রীযুত সভারকর কিছুদিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, সর্ব্ব দল একমত হইলেও সাম্রাজ্যবাদীরা ক্ষমতাত্যাগে সম্মত হইবেন না। উহা যে বর্ণে বর্ণে সত্য, তাহা এখন আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই আবেদন-পত্রে বাঙ্গালার প্রধান সচিব মিঃ ফজলুল হকের আজাদ মুসলমানদিগের নেতৃস্থানীয় সিন্ধু-সচিব আল্লাবক্সের, মোমিন সমিতির সভাপতি মহম্মদ জেহিরউদ্দিনের, ঢাকার নবাব মিষ্টার হবিবুল্লার, এবং আজাদ মুসলমান বোর্ডের সেক্রেটারী ডক্টর আন্সারীর স্বাক্ষর আছে; সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে, ইহাতে সর্ব্বদলের বহু লোকেরই সম্মতি আছে। এ অবস্থায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদিগের ক্ষমতা-ত্যাগের অসম্মতির ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট প্রমাণ আর কি হইতে পারে?

যুদ্ধে ভারতীয় খাদ্য

বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে। সেই সময় হইতে গত জুন মাস পর্য্যন্ত অন্নাভাবে নিত্য-প্রপীড়িত ভারতের ৮ লক্ষ ২৭ হাজার ৩ শত ৯৫ টন চাউল বিলাত ও অন্যান্য দেশে রপ্তানী হইয়াছে। এক টনের পরিমাণ সওয়া ২৭ মণ; সুতরাং যুদ্ধের আরম্ভকাল হইতে গত আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত ২ কোটি ২৬ লক্ষ ৬ হাজার ৬ শত ৬১ মণ চাউল ভারত হইতে দেশান্তরে রপ্তানী করা হইয়াছে। গম এবং ময়দা চালান গিয়াছে—২ লক্ষ ৩০ হাজার ৬ শত ৫ টন, প্রায় ১ কোটি ২ লক্ষ ৮৪ হাজার মণ। তদ্ভিন্ন, ২ লক্ষ ৭৮ হাজার ৪ শত ৪৯ টন অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যও বিদেশে প্রেরিত হইয়াছে; কিন্তু ইহা কি কেবল যুদ্ধের প্রয়োজনে, না অন্য কোন প্রয়োজনে? যে প্রয়োজনেই সরকার এই ভাবে পরোপকার করুন, ভারতে খাদ্যশস্যের অভাব ঘটিলে তাঁহারা স্থানান্তর হইতে তাহা আমদানী করিবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন কি? অষ্ট্রেলিয়া হইতে ভারতে ১ লক্ষ টন গোধুম আমদানীর সংবাদ ২১শে আশ্বিনে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা অবশ্যই আশার কথা। ব্রহ্ম প্রভৃতি যে সকল দেশে চাউল উৎপন্ন হয়, জাপান তাহা গ্রাস করিয়া পরম পরিতৃপ্তির সহিত উদ্গার তুলিতেছে; এখন এই অন্নাভাব-কাতর দেশের উপায় কি?

মুসলমানদিগের দাবী

ভারতীয় মুসলমানদিগের মধ্যে মোমিন সম্প্রদায় সংখ্যায় অনেক অধিক। মিষ্টার মহম্মদ জহিরউদ্দিন মোমিন সম্প্রদায়ের বিগত বার্ষিক সভার অধিবেশনে সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবার পর সম্প্রতি ইনি কাণপুরে জনৈক সাংবাদিকের নিকট বলিয়াছেন, "বর্ত্তমান সময়ে ভারতে যে সঙ্কটসঙ্কুল অবস্থা দেখা দিয়াছে, তাহার প্রশমনকল্পে সর্ব্বদলের পক্ষে একমত হইয়া ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য এক সম্মিলিত দাবী উত্থাপন করা কর্ত্তব্য। সকলে একমত হইয়া যে দাবী উপস্থাপিত করিবেন, বৃটিশ সরকারকে সেই দাবী মঞ্জুর করিতেই হইবে।"—ইনি আরও বলিয়াছেন, বিভিন্ন দলের নেতৃবর্গের মধ্যে যেরূপই মতভেদ থাকুক, চেষ্টা করিলে একটা সর্ব্ববাদিসম্মত দাবী উত্থাপন করা যায়। অক্টোবর মাসে দিল্লীতে যে বৈঠক বসিবে, তাহার ফল ভাল হইবে বলিয়াই অনুমান হয়। মোমিন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি মিষ্টার জহিরউদ্দিন নিখিল ভারতের মুসলমানগণের অর্দ্ধাংশের মুখপাত্র; কিন্তু তাঁহার এই উক্তি যতই সঙ্গত হউক, চার্চ্চিল-আমেরী কোম্পানীর 'কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিবে' না। তাঁহারা একমাত্র মিষ্টার মহম্মদ আলি জিন্না ভিন্ন অন্য কাহাকেও মুসলমান সমাজের নেতা বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত নহেন। বিশেষতঃ ভারতবাসীর মনে যাহাতে জাতীয় ভাবের বিকাশ না হয় সে জন্য সরকারকে কতকগুলি ব্যবস্থা করিয়া রাখিতে হইয়াছে। মুস্লিম লীগের সমর্থন, দেশীয় রাজন্যদিগের সহিত সন্ধির সর্ত্তের প্রতি অকস্মাৎ বেমক্কা দরদ, তফশীলভুক্ত জাতিসমূহের জন্য স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনমণ্ডলীর সুব্যবস্থা প্রভৃতি ভারতবাসীকে জাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করিবার পক্ষে ঘোর বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্বতন্ত্র নির্ব্বাচকমণ্ডলী-গঠন সম্বন্ধে অনেক কথাই পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। রাজন্যবর্গের সহিত সরকারের সন্ধিসর্ত্তের প্রতি অযথা দরদ প্রদর্শনের হেতু সম্বন্ধে 'কেম্ব্রিজ হিষ্ট্রী অব ইণ্ডিয়ার' প্রথম খণ্ডের ৫০৭ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে—"ভারতীয় বিবেচনাবুদ্ধিসম্পন্ন সম্প্রদায় কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া সরকার স্বভাবতঃই মিত্র ও সাহায্যকারীর সন্ধান করিতে লাগিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে রাজন্যবর্গ সিপাহী-বিদ্রোহের তরঙ্গ-তাড়না-প্রতিরোধ কার্য্যে সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা রাজনীতিক অশান্তির তরঙ্গাভিঘাত প্রতিহত করিতেও সাহায্য করিতে পারেন; সুতরাং তাঁহাদিগকে দমন না করিয়া তাঁহাদিগের সহিত প্রীতি স্থাপনই করিতে হইবে।" ইহাতেই সরকারী নীতি পরিস্ফুট। দেশের লোক যদি তাহা না বুঝেন, তাহা হইলে সে দোষ কি তাঁহাদেরই বুদ্ধির নহে?

সিন্ধুর প্রধান-সচিবের উপাধি-ত্যাগ

খাঁ বাহাদুর আল্লাবক্স মুসলমান সমাজের গণ্যমান্য নেতা, তিনি বেলুচি, সুমরোবংশ সম্ভূত। খাঁ বাহাদুর নয় বৎসরকাল বোম্বাই ব্যবস্থা-পক সভার সদস্য ছিলেন; পরে সিন্ধু স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হইলে ইনি মুসলমান-প্রধান সিন্ধু প্রদেশে ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়া গোলাম হোসেন হিদায়েৎউল্লার মন্ত্রিমণ্ডলীকে পরাজিত করিয়া স্বয়ং সিন্ধুর মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করিয়াছিলেন। ইনি সম্প্রতি সরকারী নীতির প্রতিবাদস্বরূপ সরকারপ্রদত্ত খাঁ বাহাদুর এবং ও, বি, ই, (অর্ডার অব দি বৃটিশ এম্পায়ার) উপাধি ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি করাচির এক সাংবাদিক-পরিষদে বলিয়াছেন, ভারতবর্ষকে অধীন করিয়া রাখাই বৃটিশ সরকারের নীতি, তাঁহারা ভারতীয় রাজনীতিক এবং সাম্প্রদায়িক মতভেদকে তাঁহাদের প্রচার-কার্য্যে নিয়োগ করিতেছেন, এবং জাতীয় শক্তি চূর্ণ করিয়া স্বকীয় উদ্দেশ্যই সংসাধিত করিতেছেন। বলা বাহুল্য, ইহা কংগ্রেসেরই অভিমত। বেলুচিস্থানের সম্ভ্রান্তবংশ সম্ভূত, এবং সিন্ধু প্রদেশের প্রধান মন্ত্রীর এই স্পষ্ট কথা কি বিস্ময়াবহ নহে? ইঁহাকে পরাভূত করিতে মুস্লিম লীগের নির্ব্বাচিত সদস্যরা চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। সুতরাং বুঝিতে পারা যাইতেছে, সুদূর সিন্ধু প্রদেশেও মুসলমান সমাজের উপর কংগ্রেসের প্রভাব কিরূপ প্রবল। তাহার তুলনায় লীগের প্রভাব—উপেক্ষার যোগ্য। মিঃ আল্লাবক্স

ইহাও বলিয়াছেন যে, অতঃপর তিনি এক দিকে যেমন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে উৎসুক হইয়াছেন,—অন্য দিকে সেইরূপ নাজীবাদ ও ফাসিবাদের বিরুদ্ধেও সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করিবেন। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা তাঁহার জন্মগত অধিকার, আর ভারত আক্রমণকারীদিগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা প্রত্যেক ভারতবাসীর অবশ্যকর্ত্তব্য।—সিন্ধু প্রদেশের বিস্তর অধিবাসীই মিঃ আল্লাবক্সের মতানুবর্ত্তী। তথাপি ভারতবাসীর বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্যে অসমসাহসী চার্চ্চিল-আমেরী কোম্পানী সকল সময়েই মুশ্লিম লীগের দোহাই দিয়া বলেন, মুশ্লিম লীগই ভারতীয় মুসলমানদিগের একমাত্র মুখপাত্র। সাম্রাজ্যবাদীরা 'লজ্জাকে বর্জ্জন করিয়া ত্রিভুবনবিজয়ী' হইতে চাহেন। এ দিকে বোম্বাই প্রদেশের মুসলমানগণ মিঃ জিন্নার নিকট আবেদন করিয়া জানাইয়াছেন, অবিলম্বে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মতের একতা স্থাপন করিয়া অস্থায়ী জাতীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা করা এবং কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকে মুক্তিদান করা হউক। তথাপি চার্চ্চিল-আমেরী মার্কা সাম্রাজ্যবাদীদিগের মুখে সেই একই বচন। যাহারা সত্যই ঘুমায়, তাহাদিগকে জাগাইয়া তোলা যায়, কিন্তু যাহারা নিদ্রার ভাণে চক্ষু মুদিয়া থাকে, কাহার সাধ্য তাহাদিগের ঘুম ভাঙ্গায়?

মিথ্যার প্রচার

সাম্রাজ্যবাদের দুইটি বাহন। একটি পশুবল, দ্বিতীয়টি মিথ্যার প্রচার। পশুবল সম্বল করিয়া দুর্ব্বল জাতির ও দেশ শোষণেই সাম্রাজ্যবাদিগণের প্রবল অনুরাগ লক্ষিত হয়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের নীতি আগাগোড়াই প্রতারণামূলক; সত্য মিথ্যার জাল বুনিয়া লোককে প্রতারিত করিতেই সাম্রাজ্যবাদীদের অসাধারণ নৈপুণ্য লক্ষিত হয়। সত্য কথা তাঁহারা প্রাণ খুলিয়া বলিতে পারেন না।

সম্প্রতি বিলাতে ভারত-কথার আলোচনা-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছিল যে, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সরকার দমননীতির প্রয়োগ করিলেও ভারতের পাঁচটি প্রদেশে দায়িত্বসম্পন্ন মন্ত্রিমণ্ডলীই কাজ করিতেছেন। এই পাঁচ প্রদেশের মন্ত্রিমণ্ডলীই স্ব স্ব পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বৃটিশ সরকারের নীতিরই সমর্থন করিতেছেন; কিন্তু সাম্রাজ্যবাদিগণের মুখে ভিন্ন এ প্রকার নির্লজ্জ মিথ্যা আর কাহার মুখে শোভা পায়? পাঁচটি প্রদেশের মধ্যে বাঙ্গালার প্রধান সচিব মিষ্টার ফজলুল হক তাঁহার সহকারীদিগের সহিত একমত হইয়া ভারতের এই অচল অবস্থার শীঘ্র উপশান্তি করিবার জন্য বড়লাটকে এবং সম্মিলিত শক্তি-বর্গের নেতাদিগকে পত্র লিখিয়াছেন। সিন্ধু প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী সরকারের এই নীতির প্রতিবাদস্বরূপ তাঁহার অর্জ্জিত সরকারী উপাধি পর্য্যন্ত পরিহার করিয়াছেন। সুতরাং এই দুইটি প্রদেশের মন্ত্রিমণ্ডলী ভারত সরকারের এই প্রচণ্ড দমননীতির কতদূর সমর্থন করেন, তাহা বুঝিতে অধিক বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। রোহিণী বাবুর দাবী অগ্রাহ্য করিয়া আসামলাট যে মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন-কার্য্যের সহায়তা করিয়াছেন, তাহার কথা না বলাই শ্রেয়ঃ। অবশিষ্ট দুইটি প্রদেশের একটি পঞ্জাব, অন্যটি উৎকলের নবগঠিত সচিব-সঙ্ঘ। এই প্রদেশদ্বয়ের মন্ত্রিমণ্ডলীর নীতি কিরূপ, তাহা বলা কঠিন। কারণ, তাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে ভারত সরকারের দমন-নীতির সমর্থন করিয়াছেন, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ নাই। মানুষ নানা কারণে মনে মনে কোন নীতির সমর্থন না করিলেও মুখে সে কথা প্রকাশ করে না। এই হেতু তাঁহারা দমননীতির সমর্থক, ইহা ঘোষণা করা সাধুতার নিদর্শন নহে।

আম্বেদকরের তথ্যজ্ঞান

ডক্টর বি, আর, আম্বেদকর সরকারের কৃপায় অস্পৃশ্য জাতির মুরুবিবগিরি করিবার ভার পাইয়াছেন। অস্পৃশ্য জাতিসমূহের প্রতিষ্ঠান-প্রতিষ্ঠায় তাঁহার কৃতিত্ব অসাধারণ। সম্প্রতি তিনি বলিয়াছেন, ভারতবাসীরা সামরিক ব্যাপারে ক্ষমতা লাভের যে দাবী করিতেছেন, এ দাবী বিষম বেমক্কা। কারণ, দেশের লোকের হিত-সাধনে যাঁহারা রত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে এমন লোক একটিও নাই—দেশরক্ষা ব্যাপারে যাঁহার সামরিক খুঁটিনাটি জ্ঞান আছে। সেই ক্ষমতা এ অবস্থায় তাঁহাদিগকে অর্পণ করিলে তাঁহারা ঐ ক্ষমতা-পরিচালনে নামে-মাত্র সমর্থ হইবেন।—যদি তিনি ঐ কথা সত্যই বলিয়া থাকেন—তাহা হইলে তাঁহার জ্ঞানের স্থূলতার বেড় পাওয়া দুরূহ বটে, কিন্তু যিনি তপসীলভুক্ত জাতিসমূহের মুরুব্বি সাজিয়াছেন, তাঁহার নিকট ইহার অধিক আর কি আশা করা যায়? কাজেই তিনি কিরূপে জানিবেন যে, ওলিভার ক্রমওয়েল ৪৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত যুদ্ধ না দেখিলেও তাঁহারই কৃতিত্বে মার্সটন মুর এবং নেস্‌বির যুদ্ধে রাজকীয় সেনা-দলের পরাজয় ঘটিয়াছিল। এখন সমরনীতি অনেকটা জটিল হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া সংগ্রামের খুঁটিনাটি না জানিলেও যে, সমর বিভাগ পরিচালন করা যায় না—এ কথা সত্য নহে। বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধ যিনি পরিচালিত করিয়াছিলেন, সেই মিষ্টার লয়েড জর্জ কস্মিন্‌কালেও সৈনিকের কাজ শিক্ষা করেন নাই। তিনি পেশায় ব্যবহারাজীব—ব্যারিষ্টার। আর আজ যে চার্চ্চিল যুদ্ধের কথায় এত লম্ফঝম্ফ করিতেছেন, তাঁহার সামরিক অভিজ্ঞতা বুয়ার যুদ্ধে শত্রুহস্তে বন্দী হইয়া পরিপাটিরূপে চম্পট দানই সকলেরই সুবিদিত, এবং তাহাই তাঁহার কৃতিত্বের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের সময়ে যে সার এডোয়ার্ড কার্সন নৌ-বিভাগের কর্ত্তা ছিলেন,—তিনি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছিলেন, তিনি যখন নৌ-সেনা বিভাগের পরিচালন সমিতির অধ্যক্ষতা লাভ করেন, তখন ঐ বিভাগের কার্য্য সম্বন্ধে তাঁহার কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না। গ্রেট বৃটেনের বর্ত্তমান নৌ-সেনা সমিতির অধ্যক্ষ এলবার্ট ভি আলেকজাণ্ডার সমার্সেট কাউণ্টি-কাউন্সিলের এক জন কেরাণী ছিলেন। নৌ-বিভাগ পরিচালন-জ্ঞান তখন তাঁহার কিছুই ছিল না; তবে যাঁহারা প্রতিভাবান্ দায়িত্বভার তাঁহাদের ঘাড়ে পড়িলে তাঁহারা নৈপুণ্য সহকারেই কার্য্যসিদ্ধি করেন। কেরাণী ক্লাইভ লেখনী ত্যাগ করিয়া অসিহস্তে কিরূপে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বনিয়াদ গঠন করিয়াছিলেন, আম্বেদকর সে সংবাদও রাখেন না কি?

মার্কিণী প্রেসিডেণ্টের মধ্যস্থতা

মার্কিণে ইণ্ডিয়া-লীগ নামে একটি সমিতি আছে। সর্দ্দার জে, জে, সিং সেই সমিতির সভাপতি। তিনি সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন—মহাত্মা গান্ধী মার্কিণী গ্রন্থকার মিষ্টার লুই ফিসারের মারফত মার্কিণে

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টকে একখানি পত্র দিয়াছেন। ঐ পত্রে মহাত্মাজী মার্কিণী প্রেসিডেণ্টকে ইন্দো-বৃটিশ বিবাদের মীমাংসার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন; অর্থাৎ মধ্যস্থতা দ্বারা তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আদায় করিয়া দিয়া এই অচল অবস্থার অবসান ঘটাইবেন, ইহাই প্রত্যাশা। ইহা ভিন্ন মার্কিণের ৫৭ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি "বর্ত্তমানকালই ভারতের সমস্যা পরিপূরণের উপযুক্ত সময়" শীর্ষক এক প্রবন্ধ বিজ্ঞাপনের স্তম্ভে প্রকাশ করিয়া মার্কিণ প্রেসিডেণ্টকে এবং চিয়াং কাইসেককে ভারতীয় সমস্যার সমাধান করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। মার্কিণের স্বরাষ্ট্র-সচিব কর্ডেল হালও বলিয়াছেন, তাঁহারা বিশেষ মনোযোগ সহকারে ভারতের ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছেন। এ কথা সত্য যে, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট যদি এই সময়ে ভারতবাসীদিগকে স্বাধীনতা দান করিয়া বর্ত্তমান সমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেন, তাহা হইলে বৃটনকে উভয়-সঙ্কটে পড়িতে হয়। কারণ, ইংরেজ প্রাণান্তেও ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে সম্মত নহে, অথচ প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টকে এই সঙ্কটকালে অসন্তুষ্ট করাও তাহাদের আদৌ প্রার্থনীয় নহে। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ভারতের সঙ্কট-সংক্রান্ত অবস্থা হয়ত সম্যক্ অবগত নহেন। বিশেষতঃ, ভারত অপেক্ষা গ্রেট বৃটেনের প্রতিই তাঁহার সহানুভূতি অধিক, এ ধারণা অসঙ্গত নহে, এবং ঐরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। এখন রুজভেল্ট মহাত্মাজীর পত্রের কি উত্তর প্রদান করেন, তাহা জানিবার জন্য সকলেই উদ্গ্রীব আছেন। দ্বিতীয়তঃ, ইংরেজ মার্শাল চিয়াং কাই-শেককে মধ্যস্থ মানিতে সম্মত হইবেন বলিয়া মনে হয় না; সুতরাং মধ্যস্থতার দ্বারা এই সঙ্কট অবস্থার সমাধান সম্ভব হইবে, এমন আশা করা যায় না।

—

অশান্তির আবির্ভাব

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু প্রভৃতি কংগ্রেস-নেতৃবর্গকে গ্রেপ্তার করিয়া সাধারণের অজ্ঞাত স্থানে লইয়া যাইবার পর হইতে ভারতের নানা স্থানে যে ঘোর অশান্তির এবং চাঞ্চল্যের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহাতে বুঝা যায়, দেশের জনসাধারণ এই ব্যাপারে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইয়াছে; কিন্তু এই উন্মত্ত জনতা যে ভাবে হিংসাত্মক কার্য্য সংসাধন করিতেছে, তাহা প্রকৃত ভারতহিতৈষী কর্ত্তৃক সমর্থিত হইবার যোগ্য নহে; বিশেষতঃ ইহা কংগ্রেসের অনুসৃত নীতির প্রতিকূল। অহিংসাই কংগ্রেসের কার্য্যপদ্ধতির মূলনীতি ছিল। যাহারা এই ভাবে শান্তিভঙ্গ করিতেছে, তাহারা সকলেই যে কংগ্রেসপন্থী, এ কথাও সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। আমাদের ন্যায় অনেকেরই বিশ্বাস, আর্থিক কষ্টের সহিত এই রাজনীতিক বিক্ষোভ মিশ্রিত হওয়ায় এই সঙ্কট-জনক অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। তাহার উপর দেশে এখন জনসাধারণের বিশ্বাসভাজন জননায়কের অভাববশতঃ উচ্ছৃঙ্খল লোকসমূহকে সংযত রাখা কঠিন হইয়াছে। সরকারের গুলীবর্ষণে বহু লোক আহত ও নিহত হইতেছে। মিষ্টার উইনষ্টন চার্চ্চিল সে দিন বলিয়াছেন, এত বড় বিশাল দেশে ৫ শত লোকের কম নিহত হইয়াছে। কিন্তু ব্যবস্থা পরিষদে প্রশ্নের উত্তরে সার রেজিন্যাল্ড ম্যাক্সওয়েল বলিয়াছেন, পুলিসের গুলীতে সাড়ে ৩ শত লোক নিহত; এবং সাড়ে ৮ শত লোক আহত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন সৈনিকদিগের গুলীতে ৩ শত ১৮ জন নিহত এবং ১ শত ৫৩ জন আহত হইয়াছে। এই হিসাব সত্য বলিয়া মানিয়া লইলে সর্ব্বসমেত ৬ শত ৫৮ জন নিহত হইয়াছে, ইহাই স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু বৃটেনের প্রধান সচিব সে দেশ হইতে বলিতেছেন, সর্ব্বসমেত ৫ শতের কম লোকই মরিয়াছে।

সার ওসমান বলেন, অত্যন্ত অশান্তিকর অবস্থার উদ্ভব হওয়াতে পুলিসকে বাধ্য হইয়া গুলী চালাইতে হইয়াছে। ইহার ফলে পুলিস কর্ত্তৃক ৩৯০ জন লোক নিহত এবং ১ হাজার ৬০ জন লোক আহত হইয়াছে। ৬০ স্থানে ভারতীয় সৈন্য এবং গোরা সৈন্য নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। তাহারা বাধ্য হইয়া গুলী চালায়, তাহার ফলে ৩৩১ জন নিহত, এবং ১৫৯ জন আহত হয়। সার এম, ওসমানের হিসাবে সর্ব্ব-সমেত ৭ শত ২১ জন ভারতীয় নাগরিক এই ব্যাপারে নিহত হইয়াছে। ব্যবস্থাপক সভায় এ কথাও স্বীকৃত হইয়াছে যে, এখনও সকল স্থানের হিসাব পাওয়া যায় নাই। পাঠক দেখুন, ইঁহাদের প্রদত্ত সংবাদে কিরূপ পার্থক্য! চার্চ্চিলের মতে নিহত লোকের সংখ্যা ৫ শতের কম, ম্যাক্সওয়েলের মত নিহতের সংখ্যা ৬৫৮, আর সার ওসমানের মতে ৭২১ জনের কম নহে। এই হিসাবের কাল পরস্পর দূরবর্ত্তী নহে, তবে এখন হইতে কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী বটে। এখন নিহতের সংখ্যা আরও বাড়িয়াছে। ১৭ই সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বে দুই শত স্থানে পুলিস ও সৈনিকরা গুলী চালায়, এ সংবাদ সরকারী পরীক্ষক কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইয়া সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় সভায় সার এলেন হার্টলী বলিয়াছেন, ৫ বার জঙ্গী বিমান হইতে কলের কামানের গোলা বর্ষিত হইয়াছে। অথচ বহু পূর্ব্বেই, (নেতাদিগের গ্রেপ্তারের পরই) মিষ্টার চার্চ্চিল দম্ভ করিয়া বলেন, অবস্থা সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের ধারণা, দেশের নিম্ন স্তরের লোকরা অভাবের এবং বিক্ষোভের তাড়নায় এই কাজ করিতেছে। ইহা কেবল অসঙ্গতই নহে, এরূপ কার্য্য মহাত্মাজীর অনুসৃত নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী।

—

কংগ্রেস ও সরকার

কংগ্রেসকে বৃটিশ সরকার এবং ভারত সরকার উভয়েই অকারণ অভিযুক্ত করিতেছেন। মিষ্টার চার্চ্চিল বৃটিশ পার্লামেণ্টে—এবং ভারত সরকারের কর্ম্মচারীর দ্বারা ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে ও রাষ্ট্রীয় সভায় কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষকে দোষী প্রতিপন্ন করিবার জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা পাইতেছেন। কংগ্রেস-নেতৃবর্গকে আচম্বিতে গ্রেপ্তার করিবার পর আসমুদ্র-হিমাচল ভারতে একটা নিদারুণ বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে। তাহার ফলে কতকগুলি লোক বিক্ষুব্ধ হইয়া নানা প্রকার উৎপাত করিতেছে। এই ব্যাপারের জন্য সরকার কংগ্রেসকে অভিযুক্ত করিতেছেন। তাঁহারা কংগ্রেসকে আত্মসমর্থনের কোন সুযোগই দেন নাই। কিন্তু প্রত্যেক নিরপেক্ষ ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন যে, এই আইন-অমান্য আন্দোলন কংগ্রেস-প্রবর্ত্তিত নহে। আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে, দিল্লীর অতিরিক্ত জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার এ, ইসাব 'হিন্দুস্থান টাইমসের' মামলা-সম্পর্কে এই কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, গান্ধীজীকে ও কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাকে গ্রেপ্তার করিবার পর যে আন্দোলন ও হাঙ্গামা আরম্ভ হইয়াছে, তাহা এবং নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটী কর্ত্তৃক অনুমোদিত সার্ব্বজনীন আন্দোলন যে এক ও অভিন্ন,

ইহা তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন না। ইনি সকল দিকের প্রমাণাদি দেখিয়া এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। যে সকল রাজপুরুষ কংগ্রেসকে আত্মসমর্থনের সুযোগ না দিয়া অভিযুক্ত করিতেছেন, তাঁহারা একাধারে ফরিয়াদি এবং বিচারক। এরূপ অবস্থায় বিচারফল যেরূপ হইয়া থাকে, সেইরূপই হইতেছে। গান্ধীজী তাঁহার সার্ব্বজনীন অহিংস আন্দোলন প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বেই গ্রেপ্তার হইয়াছেন। কাজেই তাঁহার সঙ্কল্পিত আন্দোলন কিরূপ হইত, তাহা তিনি ভিন্ন অন্য কেহ জানেন বলিয়া মনে হয় না। সাম্রাজ্যবাদীদিগের বিরুদ্ধে যাহারা কথা বলে, তাহাদিগকেই অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। আয়ার্লণ্ডের স্বনামধন্য স্বদেশহিতৈষী পার্ণেলকেও এইরূপ মিথ্যা অভিযোগ সহ্য করিতে হইয়াছিল। এমন কি, তাঁহার বিরুদ্ধে জাল চিঠিও বাহির করা হইয়াছিল; তাহার ফলে বিলাতের "টাইমস"কেও ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ বহু অর্থই দিতে হইয়াছিল। ফিনিক্স পাকের হত্যাকাণ্ডও পার্ণেলের অনুচরবর্গের স্কন্ধে চাপাইবার চেষ্টা হইয়াছিল। এরূপ দৃষ্টান্ত একান্ত বিরল নহে।

পণ্ডিত জওহরলাল কোথায়

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে এবং অন্যান্য কংগ্রেস-নায়ককে সরকার কোথায় রাখিয়াছেন, তাঁহারা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করিতেছেন না। পণ্ডিত জওহরলালের কথা সম্প্রতি পার্লামেণ্টে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল; এক জন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাঁহাকে কি আফ্রিকায় চালান দেওয়া হইয়াছে? মিষ্টার চার্চিল বলিয়াছেন, তাঁহাকে ভারতের ভিতরই রাখা হইয়াছে; কিন্তু কোথায় রাখা হইয়াছে, তাহা তাঁহারা কিছুতেই বলিবেন না। উহা বলিলে কি অসুবিধা হইতে পারে তাহা তাঁহারা প্রকাশ করিতে চাহেন নাই। তাঁহাদের কূটবুদ্ধি প্রহেলিকার ন্যায় দুর্ব্বোধ্য।

—

সংবাদপত্রের মুখবন্ধ

৩১শে ভাদ্র কেন্দ্রী ব্যবস্থাপরিষদে শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী বলিয়াছেন, "এ দেশের সংবাদপত্রের মুখ এমন ভাবে বন্ধ করা হইয়াছে যে, সরকারের অনুমোদিত সংবাদ ভিন্ন অন্য সংবাদ ভারতে বা ভারতের বাহিরে প্রকাশ করিবার উপায় নাই। পূর্ব্বে সংবাদ প্রকাশ সম্বন্ধে সেন্সার পরামর্শ মাত্র দিতেন, এমন বাধ্যতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। সামরিক 'সেন্সারের' অজুহাতে বৃটেন, আমেরিকা এবং চীনের সংবাদপত্রের ভারতের অনুকূল মন্তব্যগুলি হয় প্রকাশ করিতে অমত করা হইতেছে, না হয় একেবারে চাপিয়া রাখা হইতেছে। প্রতিকূল মন্তব্যকে প্রাধান্য দেওয়া হইতেছে। কোন কোন বিদেশী সাংবাদিককে সেন্সরকে এড়াইবার জন্য বিমানযোগে চুংকিঙে যাইতে হইয়াছে।" নিয়োগী মহাশয় অবশ্য বিশেষ করিয়া না জানিয়া এই সকল গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগের উল্লেখ করেন নাই। এ কথা সত্য যে, স্বৈরাচারী শাসক-সম্প্রদায় সংবাদপত্রের স্বাধীন অভিমত বরদাস্ত করিতে পারেন না। সেই জন্যই কি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এই ভাবে রহিত করা হইতেছে? নিয়োগী মহাশয় তাঁহার বক্তৃতায় এ দেশের জনসাধারণের মনে বৃটিশ-বিরোধী ভাব-সঞ্চারের হেতুগুলি বিবৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, যুদ্ধের জন্য স্ব স্ব স্থান পরিত্যাগ করিবার ব্যবস্থার ফলে সহস্র সহস্র দরিদ্র ও অজ্ঞ ব্যক্তির মনে অসন্তোষের সঞ্চার হইয়াছে। তিনি ইহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। কতকগুলি কথা সরকারকে জ্ঞাপন করাও হইয়াছে। গরীব এবং অজ্ঞ লোককে তাহাদের অধিকৃত স্থান ত্যাগ করিতে আদেশ করায় তাহাদের যে কত দূর অসুবিধা ও ক্ষতি হইতেছে, তাহা হয়ত সরকার যথাযোগ্যভাবে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। এ দেশের লোক প্রাণান্তেও তাহাদের বাসস্থান ত্যাগ করিতে চাহে না। তাহাতে তাহাদের অসুবিধা এবং ক্ষতিও যথেষ্ট। অথচ এ সকল কথা সংবাদপত্রেও বিশেষ ভাবে আলোচিত হয় নাই। কিন্তু এই সময়ে দেশের লোকের মনে অসন্তোষের সঞ্চার করা আদৌ সঙ্গত নহে। তথাপি বোধ হয় যুদ্ধের প্রয়োজনেই ঐরূপ কার্য্য করিতে হইতেছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এবং সেনাপতি ওয়াভেল তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, জাপান এখন ভারত আক্রমণ করিবে বলিয়া মনে হয় না; এ অবস্থায় লোককে তাড়াতাড়ি স্থান ত্যাগ করিতে না বলিলে কি কোন ক্ষতি হইত? এ সকল বিষয় সম্বন্ধে সহানুভূতির সহিত সিদ্ধান্ত করাই যে কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্য, ইহার উল্লেখ বাহুল্য মাত্র।

পাটের মূল্য

বর্ত্তমান বৎসরে কি পরিমাণ পাট উৎপন্ন হইবে তাহার শেষ-অনুমান প্রকাশ করা হইয়াছে। এবার ৩৩ লক্ষ একর বা প্রায় এক কোটি বিঘা জমিতে পাট বপন করা হইয়াছে। গত বৎসর কেবলমাত্র সাড়ে ২১ লক্ষ একর বা প্রায় ৬৫ লক্ষ বিঘা জমিতে পাট উৎপন্ন হইয়াছিল। সুতরাং এবার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে পাটের ফলন হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। গত বার ৫৫ লক্ষ গাঁইট পাট উৎপন্ন হইয়াছিল, এবার সরকারী অনুমান ৯০ লক্ষ গাঁইট পাট উৎপন্ন হইবে। এই সরকারী অনুমান কত দূর কার্য্যকরী হইবে, তাহা এখন বলিবার উপায় নাই। অনেকের বিশ্বাস, এবার উৎপন্ন পাটের পরিমাণ এক কোটি গাঁইটেরও অধিক হইবে। কিন্তু পাটের দর এবার অত্যন্ত অল্প। অর্থাৎ প্রতি মণ গড়ে ৫ টাকা। এরূপ অবস্থায় অধিক পাট জন্মিলে মূল্য যথেষ্ট হ্রাস হইবে। সে দিন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন, "এরূপ সঙ্কটসঙ্কুল আর্থিক পরিস্থিতি বাঙ্গালায় আর কখনও উপস্থিত হয় নাই। এক বৎসর পূর্ব্বে চাষীরা ১ মণ পাট বিক্রয় করিয়া দুই মণ চাউল সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইত। এবার তাহারা তিন মণ পাট বিক্রয় করিয়াও এক মণ চাউল কিনিতে পারিবে না।" অন্ততঃ দুই মণ পাট বিক্রয় করিয়া এক মণ চাউল ক্রয় করাও যে চাষীদের পক্ষে অসম্ভব হইয়াছে,—তাহা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। সত্য বটে, পূর্ব্ববর্তী সচিবমণ্ডলী এবার পাটের চাষ অধিক করিতে বলিয়াছিলেন,—কিন্তু বর্ত্তমান সচিবসঙ্ঘ পূর্ব্ব-আদেশ প্রত্যাহার করিতে পারিতেন। পরে জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করায় সবই ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে। এখন প্রাচ্যের অনেক বন্দরই শত্রু-কবলিত, সাগরপথও বিঘ্নসঙ্কুল। কাজেই মার্কিণে পাটের চাহিদা থাকিলেও উহা পাঠাইবার উপায় নাই বলিয়াই মনে হয়। এখন উপায়? ভারত সরকার কি বঙ্গীয় সরকারকে পাট কিনিবার জন্য অর্থ সাহায্য করিবেন? পাটের নিম্নতম দর পাঁচ টাকা মণ বাঁধিয়া দিলেও কোন রকম সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না। ব্যবস্থাপক সভাও সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

শাসন পরিষদের সমর্থন

ভারত সরকার কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যে জেহাদ ঘোষণা করিয়াছেন, তাঁহারা কংগ্রেস-কর্ম্মীদিগকে যে ভাবে বন্দী করিয়াছেন, ভারত সরসরকারের সচিবমণ্ডলীর একাদশ জন সচিবই তাহাতে সম্মতি দিয়াছিলেন, এ কথা চার্চিল-আমেরীর উক্তিতেই স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। ভারত সরকারের এই একাদশ গোপাল বেশ ভাল রকমই জানেন যে, কাহার কৃপায় তাঁহারা ঐ প্রভূত অর্থ ও সেলাম অর্জনের পদ পাইয়াছেন। কাজেই তাঁহারা সে কালের ডেল্‌ফির মন্দিরস্থ দৈববাণী-প্রদাতা দেবতার ন্যায় ফিলিপ যত দিন রাজা থাকিবেন, ততদিন ফিলিপের অনুকূল বাণীই ঘোষণা করিবেন। সরকার এত টাকা ব্যয় করিয়া প্রচার-কার্য্যের সুবিধার জন্যই তাঁহাদিগকে সাজাইয়া গুছাইয়া তক্তনশিন করিয়া রাখিয়াছেন,—ইহা কি অকারণ? নতবা দেখা যাইতেছে যে, যাঁহারা কংগ্রেসের সহিত একমত নহেন,—যাঁহারা কংগ্রেস-প্রবর্ত্তিত আইন-অমান্য আন্দোলনের সমর্থন করেন না,—সেই সপ্রু, জয়াকর, মুঞ্জে, সভারকর, প্রভৃতি এক বাক্যে সরকারের এই কার্য্যের প্রতিবাদ করিলেন কেন? সাম্রাজ্যবাদিগণের কৌশলের কথা কাহার অজ্ঞাত?

—

বাঙ্গালায় দুর্ম্মূল্যতা

কিছুদিন হইতে বাঙ্গালায় ব্যবহার্য্য প্রত্যেক দ্রব্যই যে দুর্ম্মূল্য হইয়াছে, তাহাতে জনসাধারণকে অত্যন্ত শঙ্কিত ও উত্তেজিত দেখা যাইতেছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মফস্বলে মোটা চাউলের মূল্য সাড়ে নয় টাকা দশ টাকা মণ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল,—আজ কাল স্থানে স্থানে কিছু কমিয়াছে; কিন্তু যে হারে কমিয়াছে তাহা যৎসামান্য—মণ করা আট আনা, দশ আনা মাত্র। মিলের ধুতি জোড়া সাত আট টাকা ও এক জোড়া সাড়ী দশ টাকার কমে পাওয়া যাইতেছে না। সরকার যে সস্তায় ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের আশ্বাসবাণী ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহা বিক্রয়ের জন্য বিভিন্ন স্থানে এজেণ্টও স্থির করিতেছিলেন, তাহা কি অবশেষে বিরাট্ ধাপ্পায় পরিণত হইল? ইহাতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর,—যাহাদের আয় অতি অল্প ও পরিমিত, তাহারা দশ দিক্ অন্ধকার দেখিতেছে। কৃষকদিগের, বিশেষতঃ, দরিদ্র চাষীদিগের দুর্দ্দশার সীমা নাই; তবে মফস্বলে তাহাদের ক্ষেতের তরিতরকারী কিছু অধিক মূল্যে বিক্রয় হওয়ায় তাহারা কোন প্রকারে টিকিয়া আছে। কিন্তু এ ভাবে অধিক দিন চলিতে পারে না। সে দিন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাঙ্গালা সরকারের অর্থ-সচিব বলিয়াছেন,—"আমরা এখন রাজনীতিক অশান্তির কথাই আলোচনা করিতেছি; কিন্তু আমরা যদি জনসাধারণের অবশ্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব দূর করিতে না পারি, তাহা হইলে সমস্ত শাসনব্যবস্থা বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে।" কথাগুলি সম্পূর্ণ সত্য। অবশ্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমুদয়ের মধ্যে ভাত-কাপড়ের মত অপরিহার্য্য দ্রব্য আর কি আছে? কিন্তু এই উভয় দ্রব্যই সঙ্গতমূল্যের সীমা এ ভাবে অতিক্রম করিয়াছে যে, তাহা সাধারণের অক্রেয় হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুতঃ, বাঙ্গালার জনসাধারণ অভাবের শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছে। এখন সরকার মূল্যনিয়ন্ত্রণ করিয়া কাহারও বিশেষ কোন উপকারই করিতে পারিতেছেন না। ক্ষুধার তাড়নায় লোক দিগ্বিদিক- জ্ঞানশূন্য হইয়া নিতান্ত নির্ব্বোধের ন্যায় কাজ করিতে থাকে। পৃথিবীতে যত দাঙ্গা, হাঙ্গামা বিপ্লব ও বিদ্রোহ সংঘটিত হইয়াছে, তাহার মূল সাধারণের অন্নবস্ত্রের সমস্যা এবং অসন্তোষ। সরকারের তাহা অজ্ঞাত নহে। সম্প্রতি বাঙ্গালা সরকারের সচিব ডক্টর শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন,—আগামী বারে বাঙ্গালায় ৩ হইতে ৪ লক্ষ টন অধিক চাউল উৎপন্ন হইবে।—এই আশ্বাসে দেশের লোকের অন্ন-বস্ত্রের সমস্যার সমাধান হইবে কি?

—

কিয়া হাত কা তারিফ!

রাণাঘাটের সান্নিধ্যে কতকগুলি শ্রমিক বি, এ, রেলপথে কাজ করিতেছিল, সেই সময় ঊর্দ্ধে বিমান-পথে বিমান কামান লইয়া পর্য্যবেক্ষণে রত ছিল। ঐ সকল বিমান-বীরের ধারণা হয়, কতকগুলি দুর্বৃত্ত একযোগে রেলের পাটি অপসারিত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। তখনই তাহারা ঐ সকল কুলিকে লক্ষ্য করিয়া বন্দের কামান হইতে গোলাবর্ষণ করিল। প্রকাশ, ঐ সকল গোলাবর্ষণে কাহারও মৃত্যু হয় নাই বা কেহ আহতও হয় নাই। বিমানবিহারী বীরগণের হাতের এই তারিপের কে না মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিবে? কিন্তু লোকগুলি প্রকাশ্য দিবালোকে রেলের পাটি উপড়াইতেছিল, বিমানচারী সৈনিকরা কি তাহা ঠিক ভাবে দেখিয়াছিল? আর তাহারা শিক্ষিত হস্তে লক্ষ্য করিয়া কামান হইতে গোলা ছুড়িয়াছিল, তাহাদের নিক্ষিপ্ত গোলাতে এক জনও মরিল না, ইহাও কি অল্প বিস্ময়ের বিষয়? সংবাদটা অদ্ভুত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ সংবাদ বাঙ্গালার প্রধান সচিব মিষ্টার ফজলুল হকই দিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়, সরকারী কর্ম্মচারীরা কিরূপ বেপরোয়া ভাবে লোকের প্রাণ তুচ্ছ বোধে কর্ত্তব্য সম্পাদন করে। বস্তুতঃ, ঐ সকল বিমানবীরের দৃষ্টিশক্তি কি হাত সাফাই অধিক প্রশংসাযোগ্য, তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

—

মার্কিণে জনমত

ইংলণ্ডে এবং মার্কিণ অঞ্চলে জনমতের কিছু পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে। সাম্রাজ্যবাদীদিগের প্রচার সত্ত্বেও তথাকার চিন্তাশীল লোকরা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, সাম্রাজ্যবাদীরা যে ভাবে ভারত শাসন করিতেছেন বলিয়া 'বড়াই' করিয়া থাকেন, সে ভাবে তাঁহারা ভারত শাসন করিতেছেন না। অল্পদিন পূর্ব্বে লর্ড রাসেল (বার্ট্রাণ্ড রাসেল) মার্কিণে থাকিয়া 'এসিয়া' নামক পত্রে ভারতের এই অচল অবস্থার সমাধান করা অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া এক সন্দর্ভ প্রকাশ করিয়াছেন। ইনি এক জন বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ইংরেজ। ইনি বলিয়াছেন যে, "ভারত এবং গ্রেট বৃটেন উভয়েই সামরিক বাস্তবিকতার সম্বন্ধে অন্ধ হইয়া আছেন। আমরা সামরিক বাস্তবিকতা সম্বন্ধে অন্ধ, একথা স্বীকার করি না। সেই জন্য আমরা সম্মিলিত জাতির সহিত নিবিড় ভাবে সংযুক্ত হইয়া থাকিতে চাহি। কিন্তু গ্রেট বৃটেন সামরিক বাস্তবিকতা সম্বন্ধে অন্ধবৎ আচরণ করিতেছেন। বৃটিশ সরকারের মতলব যাহাই হউক, ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, বৃটিশ জাতির এসিয়াস্থিত সাম্রাজ্য লোপ পাইয়াছে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাতে দুঃখিত হইবার কারণ নাই; তবে এই রাজ্য যদি জাপানী সাম্রাজ্যবাদের আয়ত্তে যায়, তাহা হইলে দুঃখিত হইবার কারণ আছে।"—কথা সত্য। পাছে ভারত জাপানী সাম্রাজ্যবাদের আয়ত্তে আসে, সেই জন্য ভারতবাসী প্রাণপণে জাপানকে

বাধা দিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে। তাহারা আত্মরক্ষার জন্য ঐরূপ করিতেছে। ভারতবাসীরা এখন বেশ বুঝে যে, কোন রাষ্ট্রই আর এখন একক থাকিতে পারে না। এখন প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই অন্যের সহিত সম্মিলিত হইয়া থাকিতেই হইবে। ঐ সকল রাজ্যের একই রূপ অধিকার ও কর্ত্তব্য থাকিবে। সেই জন্য ভারতবাসী বৃটিশদিগের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে চাহে না। কংগ্রেস তাহা চাহে না, ভারতের কোন বুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিক ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত ভাবে তাহা চাহেন না। লর্ড রাসেলের কথা অবশ্য ইংরেজের কথা। এদিকে মার্কিণের 'ইকনমিষ্ট' পত্র বলিতেছেন, "মার্কিণের এক সম্প্রদায়ের লোক ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংরেজের কথা শুনিতেই চাহে না।" মার্কিণের মিস্ পার্ল বাক বলিতেছেন যে, "ভারতবর্ষ এখন মিত্রশক্তির ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে,—উহা এখন আর কোন দেশের অধিকারভুক্ত নাই।" সুতরাং মার্কিণী জনমত ক্রমশঃ ঘুরিয়া দাঁড়াইতেছে। তবে ইহার ফল কি হইবে, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন বটে।

পাইকারী জরিমানা

বর্ত্তমান সময়ে ভারতে যে অশান্তি ও বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে, তাহা রহিত করিবার জন্য, বিশেষতঃ, ক্ষতিপূরণের উদ্দেশ্যে সরকার নানা স্থানে পাইকারী জরিমানা আদায় করিতেছেন। কোন স্থানে গৃহদাহ, লুণ্ঠন, রেলওয়ের পাটি উৎপাটন, টেলিগ্রাফের তার ছিন্ন হইলে সেই স্থানের বা তাহার সন্নিহিত অঞ্চলের অধিবাসিগণের কাহারা দোষী এবং কাহারা নির্দ্দোষী, তাহার বিচার না করিয়াই সকলের উপর নির্দ্দিষ্ট হারে যে জরিমানা ধার্য্য করা হয়, তাহাই পাইকারী জরিমানা নামে অভিহিত। ন্যায়ানুসারে এই প্রকার সমবেত অর্থদণ্ডের সমর্থন করা যায় না। কারণ, এই ব্যবস্থায় দোষী ও নির্দ্দোষী সকলকেই শাস্তি পাইতে হয়—বরং নির্দ্দোষীই সাধারণতঃ দণ্ডভোগ করে, দোষী প্রায়ই শাস্তি এড়াইয়া যায়। যাহারা ঐ প্রকার অপকর্ম্ম করে, তাহারা অনেক সময় স্থানীয় লোক না হওয়াই সম্ভব, এবং তাহারা এতই গোপনে ঐ সকল দুষ্কর্ম্ম করে যে, স্থানীয় লোকের তাহা জানিবারও উপায় থাকে না। গভীর রাত্রিতে কেবা কাহারা টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়িল, রেলের পাটি উপড়াইল, বা পোষ্টাফিসে আগুন লাগাইয়া দিল, স্থানীয় লোকের তাহা না জানাই সম্ভব। এই কারণে ন্যায়ানুসারে পাইকারী জরিমানার সমর্থন করা যায় না। আবার অনেক স্থানেই অশান্তির কারণ আদৌ রাজনীতিক নহে, সম্পূর্ণ আর্থিক দুর্গতিই তাহার মূল। সম্প্রতি ময়মনসিংহ জিলার ঈশ্বরগঞ্জের বাজার লুঠ, উচাখিলার হাট লুঠ, এবং মণিরামবাড়ীর ধান লুঠের ব্যাপার আর্থিক দুর্গতির জন্য স্থানীয় লোক কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়াই জানিতে পারা গিয়াছে। যাহারা লুঠ করিয়াছে, তাহারা কৃষক,—চাউলের মণ ১০ টাকা হওয়ায় তাহারা ক্ষুধার তাড়নায় এই অপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ কালনা-কোর্ট ষ্টেশনের ব্যাপার উল্লেখযোগ্য। ঐ ষ্টেশনে কতকগুলি লোক অগ্নিসংযোগ করে। ইহাদের প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারা যায় নাই। ষ্টেশনে অনেক লোক থাকে। আততায়ীরা স্থানীয় লোক হইলে ষ্টেশনের লোকরা তাহাদিগকে নিশ্চিতই চিনিত ও সনাক্ত করিতে পারিত। কিন্তু সেরূপ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। সুতরাং তাহারা যে স্থানীয় লোক নহে, এ কথা নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে। এরূপ অবস্থায় সরকার স্থানীয় লোকদিগকে পাইকারী জরিমানা প্রদানের আদেশ করিয়া কিরূপ ন্যায়নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন? আমরা জিজ্ঞাসা করি, এই ভাবে নির্দ্দোষ লোককে এই দুর্দ্দিনে কঠোর শাস্তি দিলে কি জনসাধারণকে আরও অধিকতর অসন্তুষ্ট করা হইবে না?

নিখোঁজের সংখ্যাধিক্য

বর্ত্তমান যুদ্ধে বিভিন্ন রণক্ষেত্রে ৮৯ হাজার ৮ শত ৮৩ জন ভারতীয় সৈন্য নিরুদ্দেশ হইয়াছে বলিয়া সরকার প্রকাশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে মিশরেই উহাদের সংখ্যা ১২ হাজারের উপর। মালয়ে ৭০ হাজার। ইহারা শত্রুহস্তে বন্দী অথবা নিহত হইয়াছে, এ কথা সরকার বলিতেছেন না। তাহা হইলে ইহারা কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে? দেখা যাইতেছে, মালয়েই এইরূপ নিরুদ্দিষ্ট সৈনিকের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সর্ব্বসমেত প্রায় ৯০ হাজার সৈনিক নিখোঁজ হইয়াছে—ইহা বড়ই বিস্ময়ের বিষয়।

ভারত শাসন আইনের পরিবর্ত্তন

পার্লামেণ্টে ভারতশাসন ও ব্রহ্মশাসন আইনের বিশেষ পরিবর্ত্তন করিবার জন্য এক বিল পেশ করা হইয়াছে। ভারতবর্ষ যে গণতান্ত্রিক-ধারায় শাসিত হইতেছে না, তাহা এই প্রস্তাবেই সুপ্রকাশিত। ইহাতে ভারত এবং ব্রহ্মকে এক সঙ্গে ধরা হইয়াছে। সেনাপতি আলেকজাণ্ডারের ব্রহ্ম হইতে দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মদেশের সহিত বিলাতী পার্লামেণ্টের সকল সম্বন্ধই বিলুপ্ত হইয়াছে। এখন ইংরেজ জাতিকে আবার নূতন করিয়া ব্রহ্ম জয় করিতে হইবে; সুতরাং তাহা সুদূর ভবিষ্যতের কথা। তবে আসল কথা ভারত সম্বন্ধে।

বিলের প্রধান প্রস্তাব এই (১) "ভারতবর্ষে যে সাতটি প্রদেশে পূর্ব্বে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলী ছিল,—সেই সাতটি মন্ত্রিমণ্ডলী পদত্যাগ করায় সরকার আর তথায় মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করিতে পারিতেছেন না। এখন প্রাদেশিক গভর্ণররাই তাঁহাদের মনের মত পরামর্শদাতার সহযোগে ঐ সাতটি প্রদেশ শাসন করিতেছেন। যুদ্ধাবসানের পর আরও দ্বাদশ মাস কাল এই ব্যবস্থাই বহাল থাকিবে। যে সাতটি প্রদেশের মন্ত্রিমণ্ডলী পদত্যাগ করিয়াছেন, সে সাতটি প্রদেশে সরকার গণতান্ত্রিক মতে আবার নির্ব্বাচন করিয়া নূতন ব্যবস্থাপক সভা এবং মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিলেন না কেন? কারণ, তাঁহারা জানেন, নূতন নির্ব্বাচনে কংগ্রেসেরই জয় হইত; সুতরাং ঐ পন্থা অবশ্য-পরিত্যজ্য। অথচ এখন চার্চ্চিল বলিতেছেন, কংগ্রেস অতি অল্প লোকেরই প্রতিনিধি। ইহা কি অপূর্ব্ব সত্যনিষ্ঠা নহে? (২) "যদি জরুরী আদালত কাহাকেও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং সেই দণ্ডাদেশ যদি হাইকোর্টের এক জন মাত্র জজের অনুমোদিত হয়, তাহা হইলে দণ্ডিত ব্যক্তি সেই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে প্রিভী কাউন্সিলে আপীল করিতে পারিবে না।' কিন্তু এইভাবে আপীল করিবার পথ রুদ্ধ করা কি স্বৈরাচারের পরিচায়ক নহে? (৩) "সরকারের বেতনভোগী কোন চাকুরিয়ার আর ব্যবস্থাপক সভাগুলির সদস্য হইবার পক্ষে বাধা ঘটিবে না।' অর্থাৎ সরকার অতঃপর নিজেদের মতানুবর্ত্তী লোক দ্বারা ব্যবস্থা-পরিষদ প্রভৃতি পূর্ণ করিবার সুযোগ গ্রহণ করিবেন। সরকারী

চাকুরিয়ারা নিমকহারামী করিবে না, এই আশাতেই কি সরকার এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতেছেন? সুতরাং এ দেশের শাসকরা কত দূর গণতন্ত্রভক্ত এবং ভারতবাসীকে গণ-শাসনের পথে কতখানি অগ্রসর করিয়াছেন, এই ব্যাপারে তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় কি? বিলখানি ব্যবস্থাপক পরিষদে দ্বিতীয় বার পঠিত হইবার সময় ইহার সম্বন্ধে আলোচনা হইবে। এখনও কি বিলাতের ডেপুটি প্রাইম মিনিষ্টার বলিবেন যে, তাঁহারা ভারতবাসীকে স্বায়ত্ত-শাসনের পথে অনেক দূর অগ্রসর করিয়াছেন? ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট শ্রমিক-দলের ৩ জন সদস্য এই বিলখানি অগ্রাহ্য করিবার প্রস্তাব করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের প্রস্তাব যে বাতিল হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

স্যার লালগোপাল মুখোপাধ্যায়

এলাহাবাদ হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি সার লালগোপাল মুখোপাধ্যায় গত ২৪শে শ্রাবণ, ৬৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম, মুঙ্গেরের পর ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টের স্থায়ী জজের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, ব্যবহারশাস্ত্রে সুনিপুণ এবং সুদক্ষ বিচারক বলিয়া তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। তিনি একাধিক বার অস্থায়িভাবে প্রধান বিচারপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি কিছুকাল কাশ্মীরের বিচার বিভাগের মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন। মাতৃভাষার প্রতি তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল;—প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের তিনি প্রধান উদ্যোগী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, কলিকাতার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। বঙ্গ-সাহিত্যের অলঙ্কারস্বরূপ গ্রন্থরাজি তিনি হিন্দী অক্ষরে মুদ্রণ—প্রচারের সুপরামর্শ দিয়াছিলেন। তিনি তিনি বাঙ্গালী জাতির অলঙ্কার-স্বরূপ ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গ-জননীর যে ক্ষতি হইল, সহজে তাহার পরিপূরণ হইবার আশা নাই।

পরলোকে কুমুদিনীমোহন নিয়োগী

বিশ্ববিখ্যাত সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান রয়টার ও এসোসিয়েটেড প্রেসের কলিকাতা শাখার কার্য্যাধ্যক্ষ কুমুদিনীমোহন নিয়োগী ১২ই আশ্বিন পরলোক-গমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যথিত হইয়াছি। লোক-চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া যে সকল সাংবাদিক পাঠকগণের সংবাদপাঠের আগ্রহ পরিতৃপ্ত—সংবাদপত্র ও সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের উন্নতি-বিধানে আত্মনিয়োগ করেন, তাঁহাদের সাধনার কথা অপ্রচারিত থাকে। কুমুদিনী বাবু ১৮ বৎসর উক্ত প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের সংবাদ সম্পাদন করিয়া যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মধুর ব্যবহারও বিস্মৃত হইবার নহে।

পরলোকে ডাঃ হীরালাল হালদার

৩০শে ভাদ্র স্বনামধন্য অধ্যাপক প্রতিভাবান্ দার্শনিক হীরালাল হালদার মহাশয় ৭৬ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হইয়াছেন। হীরালাল বাবু জ্ঞান ও সংস্কৃতির সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। তাঁহার প্রণীত হেগেল ও তৎপরবর্ত্তী দর্শনশাস্ত্র য়ুরোপে মার্কিণে প্রামাণিক গ্রন্থরূপে সুধীজন-সমাজে সমাদৃত হইয়া, প্রতীচ্য দর্শনে তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভার খ্যাতি বিঘোষিত হইয়াছিল। তিনি প্রথমে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ-কলেজে ও পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় রত থাকিয়া ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কিছু দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট শিক্ষাপরিষদের সভাপতি ছিলেন।

পরলোকে হরদয়াল নাগ

৩রা আশ্বিন চাঁদপুরের প্রবীণতম জননায়ক মুক্তিব্রতী হরদয়াল নাগ মহাশয় ৯০ বৎসর বয়সে পরলোক-গমন করিয়াছেন। কিছু দিন পূর্ব্বে তাঁহার দীর্ঘ জীবনব্যাপী জনকল্যাণ-সাধনার কথা স্মরণে দেশবাসী শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিলেন। ১২৬০ সালে ২৯শে ভাদ্র চাঁদপুর-কাশিমপুরে হরদয়াল নাগ মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৯২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আইন-ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলনের বন্যায় দেশ প্লাবিত হইলে তিনি লাভজনক ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে সেই আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত করেন ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগদানের পর হইতে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বহু বার তিনি সরকারের বিরাগ বরণ করিয়াছিলেন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে যুবকগণকে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত—উদ্বোধিত করিবার জন্য তিনি চাঁদপুরে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন—এই প্রতিষ্ঠান তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে আইন-

হরদয়াল নাগ

অমান্য আন্দোলনে তিনি এক দল কর্ম্মিসহ সর্ব্ব-প্রথম নোয়াখালিতে লবণ-আইন ভঙ্গের অভিযান করেন—এবং বহরম-পুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে তিনি ছয় মাস কারাবরণ করেন। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের সুবর্ণ-জয়ন্তী অনুষ্ঠানের তিনি সভাপতি হইয়াছিলেন। সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আজীবন প্রয়াস পাইয়াছেন,—তাঁহার প্রভাবে চাঁদপুরে এ পর্য্যন্ত হিন্দু-মসলেম বিরোধ হয় নাই। তিনি বলিতেন, "ভারত স্বাধীনতা পাইলে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ তুষারগিরির ন্যায় গলিয়া যাইবে।" তাঁহার ন্যায় একনিষ্ঠ স্বদেশসেবকের সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী মুক্তি-সাধনা কখনই ব্যর্থ হইবার নহে।

হাঙ্গামায় সরকারের বিবৃতি

বৃটিশ পার্লামেণ্টে শ্রমিক দলের জনৈক সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে ভারতসচিব বলেন, ভারতবাসীদিগের মধ্যে যখন আপোষ সম্বন্ধে কোন দল একমত নহে, তখন বৃটিশ সরকারের প্রস্তাব সকল দল প্রত্যাখান করিলেও তাহার কোন অদলবদল করা হইবে না।

পার্লামেণ্টে ভারত-সচিব জানান—১লা আশ্বিন বিহারে একখানি বিমান ভূপতিত হইলে পাইলট নিহত হয়, এবং এক জনতা অপর বৈমানিকগণকে হত্যা করে।

৫ই আশ্বিন রাষ্ট্রীয় পরিষদের অধিবেশনে সরকার হিসাব দেন যে, হিসাব দিবার সময় পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতে হাঙ্গামার ফলে প্রায় ২৫৮টি রেলওয়ে ষ্টেশন ধ্বংস, (ইহার মধ্যে বিহারে ও যুক্তপ্রদেশের পূর্ব্বাঞ্চলে ১৮০টি) ৪০খানি ট্রেণ লাইনচ্যুত। ফলে রেলওয়ে কর্ম্মচারী ১ জন নিহত, ২১ জন আহত, সৈন্য ৩ জন নিহত, ৩০ জন আহত, যাত্রী ২ জন নিহত, ২৩ জন আহত। রেলওয়ে এঞ্জিন, রেলপথ ও গাড়ীর যথেষ্ট ক্ষতি। এ সময় মধ্যে ৫ শত ডাকঘর আক্রান্ত, ৫০টি ভস্মীভূত, ২০০টি বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত, সাড়ে তিন হাজার টেলিগ্রাফের তার কর্ত্তিত, ডাকঘরগুলি হইতে নগদে ও ষ্ট্যাম্পে প্রায় ১ লক্ষ টাকা লুণ্ঠিত, বহু চিঠির বাক্স অপসারিত, পুলিসের ৭০টি থানা, ১৪০টি সরকারী ভবন আক্রান্ত ও অধিকাংশই দগ্ধীভূত। মাত্র রেলওয়ে, ডাকঘর ও টেলিগ্রাফের ক্ষতি ১ কোটি টাকার অধিক। নাগপুর জিলায় ২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ক্ষতি, মধ্যপ্রদেশের এক ট্রেজারী হইতে সাড়ে ৩ লক্ষ টাকা লুণ্ঠিত (ইহার মধ্যে ১ লক্ষ টাকা উদ্ধার)। যুক্তপ্রদেশের এক ডাক্তারখানা লুণ্ঠনে ১০ হাজার টাকা ক্ষতি, দিল্লীতে বিভিন্ন গৃহের ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৮ লক্ষ ৮৭ হাজার ৬০১ টাকা। পুলিসের গুলীবর্ষণে ৩১০ জন নিহত, ১ হাজার ৬০ জন আহত, ৩২ জন পুলিস নিহত ও বহু আহত, ৬০টি স্থানে সৈন্যদলের গুলীবর্ষণে জনসাধারণের ৩৩১ জন নিহত ও ১৫৯ জন আহত, সৈন্যদিগের ১১ জন নিহত ও ৭ জন আহত।

৮ই আশ্বিন রাষ্ট্রীয় পরিষদে ভারত সরকার জানান, ৫ স্থানে জনতার উপর মেশিনগান হইতে গুলীবর্ষণ করা হয়—(১) বিহারে বিহার-শরিফ হইতে প্রায় ১২ মাইল দক্ষিণে পাটনা জিলার গিরিয়াকোর নিকটস্থ রেলপথের উপর। (২) বিহারে ভাগলপুর জিলায় কুরসেলা হইতে ১৫ মাইল দক্ষিণে ভাগলপুর সাহেবগঞ্জ রেলপথের উপর। (৩) বিহারে মুঙ্গের জিলার হাজিপুর-কাটিহার রেলপথের উপর। (৪) বাঙ্গালায় নদীয়া জিলায় রাণাঘাটের নিকট। (৫) উড়িষ্যায় তালচের সহর হইতে ২।৩ মাইল দূরবর্ত্তী এক স্থানে।

৮ই আশ্বিন রাষ্ট্রীয় পরিষদে ভারত সরকার জানান যে, জেলে ভারতের বিক্ষোভ আন্দোলন সম্পর্কে আটক বন্দীদিগকে সিকিউরিটী বন্দী হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিতে হইবে এবং কাহাকেও তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হইবে না। তবে তাঁহারা আপন আপন পরিবারবর্গের নিকট ব্যক্তিগত পত্র লিখিতে পারিবেন।

পাইকারী জরিমানা—

৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতে ৪১ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য্য।

বাঙ্গালা—মালদহ জিলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার অধীন উত্তর হরিশ্চন্দ্রপুর, দক্ষিণ হরিশ্চন্দ্রপুর, পিপলা কাশিমপুর, ভালুকা ও পার ভালুকা মৌজার অধিবাসীদিগের উপর ৫ হাজার টাকা ধার্য্য। ঢাকা জিলার গাওদিয়ায় ৫ হাজার টাকা ধার্য্য। মুর্শিদাবাদ জিলার বেলডাঙ্গায় ৫ হাজার টাকা ধার্য্য। বর্দ্ধমান জিলার কালনা সহরে ৩০ হাজার টাকা ধার্য্য।

আসাম—কামরূপ জিলার ১৪ খানি গ্রামের উপর ৫ হাজার টাকা ধার্য্য। বড়পেটা মহকুমার ৩০খানি গ্রামের উপর ১ লক্ষ টাকা ধার্য্য। শিবসাগর সহরের উপর ৫ হাজার টাকা ধার্য্য।

যুক্তপ্রদেশ—বিজয়পুর, গোরক্ষপুর ও যৌনপুর জিলার কয় স্থানে ৪২ হাজার ৯৮৪ টাকা ॥৴৹ আনা। মথুরা জিলার কয় স্থানের উপর ৩০ হাজার টাকা। মোরাদাবাদ জিলায় ১০ হাজার টাকা। মীরাট জিলার ৩০খানি গ্রামের উপর। আজমগড় জিলায়—২২ হাজার ৬০০ টাকা। এলাহাবাদ সহরের উপর ৫০ হাজার টাকা ধার্য্য হইবার সম্ভাবনা।

বিহার—মজঃফরপুর জিলার ৩ অঞ্চলে ৭৬ হাজার ৫ শত টাকা ধার্য্য, মোকামা অঞ্চলে—১ লক্ষ টাকা ধার্য্য, ২৮শে ভাদ্র পর্য্যন্ত ৩৫ হাজার টাকা আদায়। হাজিপুর সহরের উপর ১০ হাজার টাকা ধার্য্য। ফতোয়া অঞ্চলে—৫০ হাজার টাকা ধার্য্য, ৩০ হাজার টাকা আদায়। সমস্তিপুর মহকুমায় ৩১ হাজার ৪ শত টাকা আদায়। মধুবনী মহকুমায়—(৫০ হাজার টাকার মধ্যে) ৪৯ হাজার ৩০৭ টাকা আদায়। দ্বারভাঙ্গা জিলায়—৩ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা ধার্য্য। মুঙ্গের জিলার ভেগরা অঞ্চলে—২৫ হাজার টাকা ধার্য্য এবং আরও কয়টি গ্রামের উপর ৭৩ হাজার টাকা ধার্য্য। পাটনা জিলার মানের অঞ্চলে—১০ হাজার টাকা এবং ইসলামপুর অঞ্চলে ৯ হাজার টাকা ধার্য্য। পূর্ণিয়ার ৬টি গ্রামের উপর ২৯ হাজার টাকা ধার্য্য।

বোম্বাই—কানাড়া জিলার আনোকোলা তালুকের ১৪খানি গ্রামে—১৫ হাজার টাকা ধার্য্য। বোরসাদ তালুকের ইজলাও গ্রামের ৫ হাজার টাকা ধার্য্য। কানাড়া জিলার দুই গ্রামের উপর ৫ হাজার টাকা ধার্য্য।

মাদ্রাজ—গুণ্টুর জিলার তেনালি সহরের উপর ২ লক্ষ এবং অপর ৭টি গ্রামের উপর ২৭ হাজার ৫ শত টাকা ধার্য্য। রামনাদের দেবকোটাই সহরের উপর দেড় লক্ষ ও পার্শ্ববর্ত্তী ৫০খানি গ্রামের উপর ৫০ হাজার টাকা ধার্য্য।

মুদ্রাযন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিযান—৩১শে ভাদ্র সিন্ধু সরকার বিজ্ঞাপন দেন যে, বর্ত্তমান গণচাঞ্চল্য সম্পর্কে সরকারের অননুমোদিত সংবাদ সিন্ধুর কোন সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে পারিবেন না। ৩রা আশ্বিন পুলিস কর্ত্তৃক আমেদাবাদের নবভারত প্রিণ্টিং প্রেস হইতে 'সহিজ উমাভাই' নামক প্রচারপত্রের হাজার কপি আটক। পাটনার হিন্দী সাপ্তাহিক পত্র যোগীর সহযোগী সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণ মোহন বর্ম্মা ধৃত। ৪ঠা আশ্বিন ভারতরক্ষা বিধির ৪১ ধারা অনুসারে আপত্তিকর প্রচারপত্রের মুদ্রণ রোধ করিবার জন্য এলাহাবাদের ৫।৬টি ছাপাখানা সরকার কর্ত্তৃক ১ মাসের জন্য বন্ধ। ৫ই আশ্বিন ঢাকার একখানি মাসিক পত্রের কার্য্যালয়ে তল্লাসী। ১৪ই আশ্বিন—কলিকাতার 'নবযুগ' দৈনিক পত্রের প্রতি ৩ দিন প্রকাশ বন্ধ রাখিতে

আদেশ। ১৮ই আশ্বিন—বোম্বাই সরকারের আদেশে আমেদাবাদের দৈনিক পত্র 'প্রভাতের' প্রকাশ নিষিদ্ধ। আন্দোলনের সত্য ঘটনা প্রকাশ সম্বন্ধে যে নিষেধাজ্ঞা ৮ই আগষ্ট প্রদান করা হইয়াছিল, তাহা হইতে মাদ্রাজ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বিহার, আসাম, আজমীর, মানগড ও দিল্লীর অব্যাহতি। এক জন য়ুরোপীয়ানকে প্রহার করিবার অভিযোগ হইতে 'সার্চ্চ লাইট' পত্রের সম্পাদক বাবু মুরলী মনোহর প্রসাদের অব্যাহতি লাভ। জানামৎ বাজেয়াপ্তের আদেশের বিরুদ্ধে লাহোরের উর্দ্দু দৈনিক পত্র 'প্রভাতে'র হাইকোর্টে আপীল অগ্রাহ্য। ১৯শে আশ্বিন—কলিকাতার 'আনন্দ বাজার পত্রিকা' ও 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' আফিসে তল্লাসী।

জেল আক্রান্ত—৩১শে ভাদ্র মজঃফরগঞ্জ জেলের কর্ম্মচারীরা আক্রান্ত। বিচারাধীন বন্দী বাবুলাল ও তাহার দলের বন্দীদের জেল হইতে পলায়ন চেষ্টা। ওয়ার্ডারগণকে আক্রমণ করিয়া তাহারা এক জনের বন্দুক ছিনাইয়া লয়, চাবী কাড়িয়া লয় ও ভিতরের গেট খুলিয়া দেয়, জেলের অস্ত্রাগারে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে। পুলিস গুলী চালায়। ৫ জন বন্দী নিহত ও ৩ জন আহত, এক জন ওয়ার্ডারের ছুরিকাতে মৃত্যু। ১২ই আশ্বিন অপরাহ্নে বর্ত্তমান বিক্ষোভাদি সংশ্লিষ্ট দিল্লীর ২০।৩০ জন বিচারাধীন বন্দী কর্ত্তৃক জিলা জেলের সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং অন্যান্য কর্ম্মচারী আক্রান্ত, ৬ জন কর্ম্মচারী বিষম আহত।

লুণ্ঠন—১৮ই আশ্বিনের সংবাদে যে সকল নৌকা ধান ও বিবিধ পণ্য দ্রব্য লইয়া গৌহাটী যাইতেছে, কামরূপ জিলার গ্রাম অঞ্চলে সেগুলির উপর প্রায় আক্রমণ হইতেছে। দিনাজপুরের বালুরঘাট মহকুমার নানা স্থানে ধান্য লুণ্ঠন; ২৮শে ভাদ্র এক জনতার বালুরঘাট (দিনাজপুর) সহরে প্রবেশ। প্রত্যাবর্ত্তন পথে ডাঙ্গিঘাট ও শিমুলতলীর ধানের গুদাম আক্রমণের ফলে বহু পরিমাণ ধান্য লুণ্ঠিত। ৫ই আশ্বিনের সংবাদ—হাওড়া জিলার দেউলী গ্রামের নিকট রূপনারায়ণ নদীতে নৌকা আক্রান্ত। খাদ্য দ্রব্য ও কেরোসিন বোঝাই নৌকা মেদিনীপুরের দিকে যাইতেছিল। সশস্ত্র প্রায় ২০ জন নৌকায় আসিয়া খাদ্যপূর্ণ নৌকা লুণ্ঠন করিয়া তমলুকের দিকে চলিয়া যায়। ৬ই আশ্বিন চাউলের বস্তা বোঝাই কয়খানি গাড়ী কাশপুর থানার (মানভূম) অন্তর্গত এক গ্রামে লুণ্ঠিত। ১৫ই আশ্বিনের সংবাদ—মহিষাদল থানার (মেদিনীপুর) লক্ষ্যা, দেউলপোতা, কালিকাকুণ্ড ও গৌতম চকের ধানের গোলাগুলি লুণ্ঠিত। আঠারবাড়ীর নিকট (ময়মনসিংহ) জনতা কর্ত্তৃক রায়ের বাজারের এক বড় হাট লুণ্ঠিত। শতাধিক লোক গ্রেপ্তার।

ডাক-বিশৃঙ্খলা—ইন্সিওর ও মনি অর্ডারগ্রহণ স্থগিতের আদেশ প্রত্যাহার—২রা আশ্বিন—সিউড়ির অধীন ছত্র রাজগাঁও ব্রাঞ্চ আফিস, ঢাকার তেঁতুলঝোড়া ব্রাঞ্চ আফিস। ৪ঠা আশ্বিন—বালুরঘাট ও হিলি (দিনাজপুর) সাব অফিস, ৫ই আশ্বিন—মালদহের গাজল, হরিশ্চন্দ্রপুর, সামসি ও চাঁচল সাব অফিস।

ইন্সিওর ও মনিঅর্ডার গ্রহণ স্থগিত :—৪ঠা আশ্বিন হইতে—হুগলী জিলার আরামবাগ, বদনগঞ্জ ও তারকেশ্বর সাব পোষ্ট আফিসের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল ব্রাঞ্চ পোষ্ট আফিস, হাওড়া জিলার আমতা বাগনাকুল সাব আফিসের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল ব্রাঞ্চ পোষ্ট আফিস, বাগনান সাব আফিসের সহিত সংশ্লিষ্ট শ্যামপুর ব্রাঞ্চ আফিস এবং নারায়ণগঞ্জ হেড আফিসের অধীন ইছাপুর সাব আফিস ও তাহার ব্রাঞ্চ আফিস ৫ই আশ্বিন—বর্দ্ধমানের জামালপুর সাব আফিস, ঢাকার ভাগ্যকুল সাব আফিস ও তাহার ব্রাঞ্চ আফিসগুলি।

বাঙ্গালা—কলিকাতা—৩১শে ভাদ্র—ডালহৌসী স্কোয়ারে একখানি ট্রামে অগ্নিদান। কলিকাতা জি-পি-ওর এক চিঠির বাক্স ভস্মীভূত। ২রা আশ্বিন—কালীঘাট ডাকঘরের এক ডাক-বাক্সে অগ্নিদান। উত্তর-কলিকাতার ডাক-বাক্স দগ্ধ করিবার জন্য ৩।৪ বার ব্যর্থ চেষ্টা। ৩রা আশ্বিন হাজরা রোড ও হরিশ মুখার্জ্জি রোডের সংযোগ-স্থলে ট্রামের ক্ষতি করিবার চেষ্টা। ১ জন কণ্ডাক্টার আহত। ৬ই আশ্বিন সহরের এক অঞ্চলে টেলিফোনের তার কর্ত্তিত। রাসবিহারী এভিনিউএ একখানি ট্রামে অগ্নিসংযোগ। ১৮ই আশ্বিন গড়পারের এক ডাকঘরে বোমা ও অগ্নি নিক্ষেপ। নগদ টাকা লুণ্ঠন, এক জন আহত, কিছু কাগজপত্র ভস্মীভূত। শ্যামবাজার ও আহিরীটোলায় দুই চিঠির বাক্স পুড়াইবার চেষ্টা। ১৯শে—হাটখোলা পোষ্ট আফিসের চিঠির বাক্সে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা, কিছু চিঠিপত্র ভস্মীভূত। গড়পার ডাকঘরের ঘটনা সম্পর্কে ৪ জন গ্রেপ্তার। বি এণ্ড এ রেলপথে একখানি লোকাল ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর কামরায় অগ্নিসংযোগ। ২০শে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে ডাকঘরের এক চিঠির বাক্সে অগ্নিসংযোগ। কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার শ্রীযুত সুধীরকুমার রায়চৌধুরীকে মুক্তি দিবার সঙ্গে সঙ্গে আটক আদেশ প্রদান। সাংবাদিক অমলেন্দু দাশগুপ্ত গ্রেপ্তার।

গ্রেপ্তার—১লা আশ্বিন রাত্রিতে স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিস ৪ স্থানে তল্লাসী করে। এই দিন অশ্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় ধৃত, ২রা আশ্বিন—নিশীথনাথ কুণ্ডু এম-এল-এ, জগমোহন বসু, ৩রা আশ্বিন—স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিস ৫।৬ স্থানে তল্লাসী করে ও ২ জনকে গ্রেপ্তার করে। ৪ঠা আশ্বিন—প্রভাত সেন, বিজনকুমার দত্ত, শিবব্রত, ৬ই আশ্বিন—গোয়েন্দা পুলিস কর্ত্তৃক ৫ স্থানে তল্লাসী, ৪ জন গ্রেপ্তার। সুরেশ বসু, অজিত সামন্ত গ্রেপ্তার। ৯ই আশ্বিন—৭৮ স্থানে গোয়েন্দা পুলিশের হানা, ৮ জন ধৃত। ১১ই—৮ স্থানে তল্লাসী, ৮৯ জন ধৃত। ১২ই হরলাল বর্দ্ধন, ১৩ই পঞ্চানন সিংহ ধৃত। ১৫ই কর্পোরেশনের কাউন্সিলর শ্রীযুক্ত বিজয়সিংহ নাহার ও ৬ জন গ্রেপ্তার।

ঢাকা—২৯শে ভাদ্র অপরাহ্নে পুলিস কর্ত্তৃক বিক্রমপুরের বিভিন্ন গ্রাম হইতে আগত এক বিরাট জনতার উপর গুলী বর্ষণ। জনতা তাজতলা বাজারে সভা করিতে যাইতেছিল। পরদিন এখানে এক সভা হইলে পুলিশ সভা ভাঙ্গিয়া দেয় এবং ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত, শ্রীআশালতা সেন ও আরও ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করে। এই দিন নবাবগঞ্জেও এক শোভাযাত্রা থানার দিকে অগ্রসর হয়। পুলিশ জনতা ছত্রভঙ্গ করে ও ১৫ জন ধৃত হয়। ৪ঠা আশ্বিন—বিক্রমপুরের কল্মইগু সাব পোষ্ট আফিস ভস্মীভূত। এই সপ্তাহে মুন্সীগঞ্জ মহকুমার ৩টি ডাকঘর ভস্মীভূত, সিগন্যাল যন্ত্রের ক্ষতি। ৫ই আশ্বিন সন্ধ্যায় ঢাকা সহর হইতে প্রায় ১৮ মাইল দূরে নবাবগঞ্জে জনতার উপর গুলীবর্ষণ। ১ জন নিহত বহু আহত। এক জন কনষ্টেবল নিহত। বোমা, বর্শা, লাঠিসজ্জিত ১ হাজার লোক নবাবগঞ্জের

ডাকঘর ও থানা আক্রমণ করিবার জন্য সমবেত। দারোগা কর্ত্তৃক জনতাকে বে-আইনী ঘোষণা। জনতা কর্ত্তৃক পুলিশ দল আক্রান্ত, এক জন কনষ্টেবল বর্শা-বিদ্ধ। পুলিশের গুলী চালনা। বারম্বার জনতা কর্ত্তৃক পুলিশ আক্রান্ত। বহু গ্রেপ্তার। ঢাকা সহরের ছাত্র ধর্ম্মঘট। একটি স্কুলের আফিস ভস্মীভূত। ৭ই আশ্বিন—সিনেমা গৃহগুলি উন্মুক্ত। রাজৈরাইল য়ুনিয়ন বোর্ড আফিস ভস্মীভূত। ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশন রোডে ১১খানি বাড়ীতে তল্লাসী। অধীরকুমার বসু গ্রেপ্তার। ১০ই আশ্বিন—নবাবগঞ্জ থানা আক্রমণের সম্পর্কে গ্রেপ্তার—শঙ্করেশ্বর কবিরাজ (৬৫), জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র কবিরাজ, সুরেন্দ্রনাথ লাহা, ব্রজযোগিনী গ্রামে ৭২ বৎসর বয়স্ক এক বৃদ্ধ। ১৫ই আশ্বিন—মুন্সীগঞ্জ মহকুমায় বন্দুক জমা দিবার আদেশ। ১৮ই আশ্বিন রাত্রিতে ঢাকা সহরে এক সি-আই ডি ইন্সপেক্টারের গৃহে পটকা বিস্ফোরণ। পরদিন ৪ স্থানে তল্লাসী। ১৯শে—ভারতরক্ষা বিধির ১২৯ ধারা অনুসারে এক জন ভূতপূর্ব্ব আটক বন্দী গ্রেপ্তার। ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত, ডাঃ প্রশান্ত সেন, গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়, নিস্তারণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীমতী আশালতা সেন, বীরেন্দ্র গুহ, গঙ্গাচরণ বসুরায়, ভূপেন্দ্র দাস, শান্তিরঞ্জন দাস, শম্ভুনাথ গুপ্ত, শিবেন্দ্র গুপ্ত লক্ষ্মীনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, যতীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী, মদনমোহন গোপ ও সুধীরকুমার দত্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত।

দিনাজপুর—১৮শে ভাদ্র হইতে বালুর ঘাটে দাওয়ানী আদালত বন্ধ। ২৯শে হইতে ৩১শে ভাদ্র মধ্যে ২৫ জনের অধিক গ্রেপ্তার। ৩০শে ভাদ্র মহকুমায় সমস্ত সভা, শোভাযাত্রাদি নিষিদ্ধ। ৫ই আশ্বিন—বালুর ঘাট বৃন্দাবনে সকলকে সাব ট্রেজারীতে বন্দুক জমা দিতে আদেশ। শ্রীসরোজরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের সম্পত্তি দখল। তাঁহাকে গ্রেপ্তারের জন্য পুরস্কার ঘোষণা। ৬ই আশ্বিন পুলিসের মোরা ডাঙ্গা গমন। ৭ই আশ্বিন পুলিস দলের উপর তীরধনুকধারী জনতার আক্রমণ। পুলিসের গুলীবর্ষণ। জনতার আহত ব্যক্তিদিগকে লইয়া প্রস্থান। মোরাডাঙ্গা গ্রামে সাঁওতাল ও রাজবংশীরা পুলিস দলকে আক্রমণ করিয়া বন্দুক ছিনাইয়া লয় ও ধৃত এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করে। দফাদার পলায়ন করিয়া বালুরঘাটের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটকে সংবাদ দেয়। ১২ই আশ্বিন তপন থানার অধীন পরিলাগ্রামে তীর ধনুক ও লাঠি লইয়া ৫০ লোক কর্ত্তৃক সার্কেল ইন্সপেক্টর ও পুলিসদল আক্রান্ত। ১০০ তীর নিক্ষিপ্ত। গুলী চালন, ৩ জন নিহত, বহু আহত ও মৃতদেহের সন্ধান নাই। ১৫ই আশ্বিন বিভিন্ন দলে অস্ত্রসজ্জিত ২ হাজার লোক কর্ত্তৃক বালুরঘাট সহরে প্রবেশ। ফৌজদারী আদালতের সম্মুখে জনতা সমবেত। ১৬ই আশ্বিন পাহাড়পুর এক জন রাজনৈতিক বন্দীর গৃহে তল্লাসী করিয়া বহু অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার।

গ্রেপ্তার—২রা আশ্বিন—অনিলকুমার রায়, অমিয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, সুধীর অধিকারী, অনন্তকুমুদ সরস্বতী, রবীন্দ্র ভট্টাচার্য্য, নরেন্দ্রনাথ দাস, চিত্তরঞ্জন দে, তারাপদ ধর, সত্যেন ঘোষ, মনোরঞ্জন সেন, রণজিৎ বর্দ্ধন, বীরেশ্বর সিং, বালুর ঘাটের ৬ জন। ৪ঠা আশ্বিন—বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কৃপানাথ দে, মুরারী গোস্বামী, আকালুরাম পরি, মহেন্দ্র সরকার। ৬ই আশ্বিন অমলকান্ত মিত্র, যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শশাঙ্কশেখর মজুমদার, করুণাকান্ত রায়, গোপেশ ভট্টাচার্য্য, উপেন্দ্রনাথ দাস, জিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং রমেশচন্দ্র ভৌমিক। ৭ই আশ্বিন উষারঞ্জন মিত্র, মধুসূদন চৌধুরী, বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সত্যরঞ্জন দে এবং অমলকৃষ্ণ ঘোষ। নিমাই সমাদ্দার, ৮ই আশ্বিন—দিনাজপুরের উকীল নরেন্দ্রমোহন সেন, লোকেন্দ্রমোহন সেন, প্রভাতনাথ সেনগুপ্ত। প্রত্যেকে ১ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। ১১ই—সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রদ্যোত মণ্ডল।

মেদিনীপুর—৯ই আশ্বিন—রামনগর থানার বেলবনি গ্রামে জনতার উপর পুলিসের গুলীবর্ষণ। ৩ জন নিহত কয়েক জন আহত। ১২ই আশ্বিন মহিষাদল থানা ভস্মীভূত। পাঁশকুড়া হইতে জিলা বোর্ডের রাস্তায় হাঙ্গামাকারিগণ কর্ত্তৃক পরিখা খনন। মহিষাদলে গুলী চালন। ১৩ই আশ্বিন তমলুক সহরের ৩ স্থানে পুলিসের গুলীবর্ষণ। ৫।৭ জন নিহত, কয়েক জন আহত। তমলুকে ও কুকরাহাটী খাসমহল আফিস, সাব-রেজিষ্ট্রী আফিস, আবগারী দোকান ভস্মীভূত। ৫ হাজার লোকের সুতাহাটা থানা আক্রমণ। দারোগা ও পুলিসের পলায়ন। থানার কাগজপত্র ভস্মীভূত। খাসমহল আফিস ভস্মীভূত, সাব-ম্যানেজার ও তাঁহার বন্দুক নিখোঁজ। মহিষাদল রাজ-কাছারী ভস্মীভূত। নন্দীগাম থানার বহু সরকারী গৃহে অগ্নিদান।

রাজসাহী—৬ই আশ্বিন—পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য ৫ জন ধৃত! প্রতিবাদে স্থানীয় নারীদিগের শোভাযাত্রা, পুলিস বাধা দিতে আসিলে জনৈক স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক এক পুলিস অফিসারের গণ্ডে চপেটাঘাত। ১১ই আশ্বিন জনতার সহিত পুলিস দলের সংঘর্ষ, ৬ জন কনষ্টেবল ও অন্য প্রায় ১২ জন আহত। রাজসাহী কলেজের রাসায়নিক পরীক্ষাগারে অগ্নি সংযোগের চেষ্টা। ৩ জন গ্রেপ্তার।

গ্রেপ্তার—৬ই আশ্বিন সুকুমার ভট্টাচার্য্য, শচীন্দ্রমোহন লাহিড়ী, মৃগাঙ্ক ঘোষ, মানসগোবিন্দ সেন, অপরূপকুমার সরকার। ৯ই—বামাচরণ চক্রবর্ত্তী। ১১ই—শচীন্দ্র চক্রবর্ত্তী, অসীম সেন, প্রিয়তোষ মৈত্র, নারায়ণ ভাওয়াল, মণীন্দ্রনারায়ণ সরকার।

বগুড়া—৬ই আশ্বিন সহরের কয় স্থানে পুলিসের তল্লাসী। ১৯ই আশ্বিন বগুড়া কংগ্রেসের সম্পাদক, অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও কালিদাস সাহা রায় গ্রেপ্তার।

খুলনা—১৯ই আশ্বিন পর্য্যন্ত ৪২ জন গ্রেপ্তার। নিম্নলিখিতগণ ৩ মাস হইতে ১ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত—জ্ঞানেন্দ্র ভৌমিক বীরেন্দ্রনাথ দত্ত, হরিপদ রায়, শৈলেশ ঘোষ, সুধাংশু চক্রবর্ত্তী, সতীশচন্দ্র বর্ম্মণ, সুধাংশু হালদার, শচীন্দ্রনাথ বসু, জহরলাল সেনগুপ্ত, কমল সরকার, সুধাংশু সেনগুপ্ত ও নিতাই মল্লিক। খুলনার এক ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, এক জন ব্যবহারাজীব এবং অপর দুই জন ভারতরক্ষা বিধি অনুসারে ধৃত।

বর্দ্ধমান—৩১শে ভাদ্র—বর্দ্ধমান দাওয়ানী আদালতে, স্কুল-কলেজের উপর কংগ্রেস পতাকা উত্তোলিত। ২রা আশ্বিন জনতা কর্ত্তৃক জামালপুর ডাকঘরে অগ্নিদান করিয়া অর্থ লুণ্ঠন। ৩রা আশ্বিন রাত্রিতে নারঙ্গা ডাকঘরের কাগজপত্র ভস্মীভূত। ৯ই আশ্বিন জনতা কর্ত্তৃক সগরাইএ জিলাবোর্ডে—ডাক বাংলা ও শরণাগতদিগের আশ্রয়কেন্দ্র ভস্মীভূত। ১০ই—রায়না থানার পলাশেম ও সাকনাড়ু

ডাকঘরে অগ্নিদান! গ্রেপ্তার—২৭শে ভাদ্র—পরমানন্দ বিবয়ী, ২রা শ্রাবণ পর্য্যন্ত কালনায় ৫৩ জন গ্রেপ্তার।

বাঁকুড়া—৩১শে ভাদ্র বাঁকুড়ায় ছাত্রদিগের ধর্ম্মঘট। ৮ই আশ্বিন জিলাবোর্ড ও মিউনিসিপ্যাল ভবনে কংগ্রেস পতাকা উত্তোলন। এ সম্পর্কে ৪ জন গ্রেপ্তার। স্থানীয় স্কুলগুলি পিকেটিং হইবার ফলে ছুটি। গ্রেপ্তার—৩০শে ভাদ্র—কমলকৃষ্ণ রায়, উকীল ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

ফরিদপুর—২৮শে ভাদ্র বিনয়কুমার রায়চৌধুরী গ্রেপ্তার। ১লা আশ্বিন হইতে গোপালগঞ্জের ছাত্রদিগের ধর্ম্মঘট। ২রা আশ্বিন ভাঙ্গা কালীবাড়ীর নিকট এক জনতা ছত্রভঙ্গ করিতে গিয়া দারোগা যোগিনীকুমার ঘোষ নিহত ও ২ জন কনষ্টেবল আহত। ১২ই আশ্বিন বসন্তপুর রেলওয়ে ষ্টেশন ভস্মীভূত।

যশোহর—৪ঠা আশ্বিন—জিলা কংগ্রেস কার্য্যালয় পুলিশের দখলে। ৫ই আশ্বিন—যশোহর রেলওয়ে ষ্টেশনের এক কক্ষে কাগজ পত্রে অগ্নিসংযোগ। মোহনলাল চট্টোপাধ্যায় ও তুষারময় রায়চৌধুরী ৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত।

নদীয়া—৫ঠা আশ্বিন রাত্রিতে কৃষ্ণনগর রেলওয়ে ষ্টেশনের সাইডিং-এ ছইখানি লোকাল ট্রেণের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ৪খানি কামরা ভস্মীভূত। ৮ই আশ্বিন—শোভাযাত্রা পরিচালনের অভিযোগে মেহেরপুরে অজিত গঙ্গোপাধ্যায়, ননী সিং ও ভবেন দত্ত সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত।

ময়মনসিংহ—৩০শে ভাদ্র—নেত্রকোণায় ১৪৪ ধারা জারী। অপরাহ্নে শোভাযাত্রা। ২ জন গ্রেপ্তার। ১লা আশ্বিন কিশোরগঞ্জে ছাত্রবিক্ষোভ। পুলিস কর্ত্তৃক ৩ জন গ্রেপ্তার। ১৪৪ ধারা জারী। ৫ই আশ্বিন—ময়মনসিংহ জিলা কংগ্রেস কার্য্যালয় পুলিস হেফাজতে।

গ্রেপ্তার—উকীল শৈলেন্দ্র মজুমদার, অবনীরঞ্জন ঘোষ, সুরেন্দ্র মজুমদার ও ধীরেন্দ্র রায় অবৈধ শোভাযাত্রা করিবার অভিযোগে ধৃত হইয়া জামীনে মুক্ত। ৪ঠা আশ্বিন—শৈলেশচন্দ্র রায়, পরিমল-ইন্দু চক্রবর্ত্তী, বিমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য। ৫ই আশ্বিন নিরঞ্জন সেনগুপ্ত। ৬ই আশ্বিন গোপালচন্দ্র গোস্বামী এবং ১০ই নারায়ণচন্দ্র সাহা গ্রেপ্তার।

আসাম—সমগ্র কামরূপ জিলায় সভাসমিতি ও শোভাযাত্রাদি নিষিদ্ধ। ১লা আশ্বিন শিলচরের ডেপুটী কমিশনার কর্ত্তৃক ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের সশস্ত্র সৈনিকদল সংক্রান্ত অডিন্যান্স অনুসারে এই মর্ম্মে আদেশ জারী করা হইয়াছে যদি কেহ প্রহরী সৈনিকের নিষেধ অগ্রাহ্য করে, কোন সম্পত্তি বিপন্ন করে বা বিপন্ন করিতে পারে বলিয়া মনে হয় বা গ্রেপ্তারে বাধা দেয় বা গ্রেপ্তার এড়ায়, তাহাকে গুলী করিয়া হত্যা করা হইবে। ২রা আশ্বিন শিবসাগরের সিনিয়ার ম্যাজিষ্ট্রেটের বাসভবন সম্পূর্ণ ভস্মীভূত। ম্যাজিষ্ট্রেটের নিস্তার।

৩রা আশ্বিন তেজপুর ধেকিয়াজুলি ও গাহোপুর থানা আক্রান্ত। পুলিসের সহিত জনতার সংঘর্ষ। গুলিবর্ষণে কয়েক জন আহত ও গ্রেপ্তার। ৪ঠা আশ্বিন ধুবড়ীতে তৃতীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাস পুড়াইয়া দিবার চেষ্টা। ৬ই আশ্বিনে প্রাপ্ত সংবাদ—শ্রীহট্ট জিলার কলিড়িয়া কর্ম্মীভবন তল্লাসী, এক জন কর্ম্মী গ্রেপ্তার, মৌলভীবাজারে ২৩ জন যুবক ও ২ জন মহিলা কারাদণ্ডে দণ্ডিত। বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মী কৃপেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ধৃত। হবিগঞ্জের ছাত্র সত্য দত্ত ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। সুনামগঞ্জেও ৮ জন কংগ্রেসকর্ম্মী ৪ হইতে ৬ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত। শিবসাগরে বার দিন পূর্ব্বে জনতার উপর লাঠী চালনা। কয় জন আহত। শিবসাগর কংগ্রেসের সম্পাদক মিঃ পি চেটিয়া ধৃত। কংগ্রেসকর্ম্মী প্রফুল্ল বড়ুয়া ৬ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত। ১ জন গ্রেপ্তার। ১০ই আশ্বিন পর্য্যন্ত দক্ষিণ শ্রীহট্টে ও প্রায় ৮০ জন ধৃত, ইহার মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত এক জন পুলিস ইনস্পেক্টর এবং দুই জন গ্রাজুয়েট মহিলা। ১৬ই আশ্বিন ধুবড়ী ষ্টেশনে অগ্নিদান, তার-প্রেরণ যন্ত্রের ক্ষতি। আসাম পরিষদে কংগ্রেস দলের মোট ৩৩ জন সদস্যের মধ্যে ঐ তারিখ পর্য্যন্ত ১৭ জন ধৃত।

গ্রেপ্তার—২১শে ভাদ্র—শ্রীহট্টের বীরেন্দ্রচন্দ্র সেন শ্রীমঙ্গলে ধৃত, শ্রীহট্টের উকীল সুরেশচন্দ্র মজুমদার, আসাম শান্তি সেনা দলের নেতা ও সহকারী নেতা আটক। গৌহাটী লোকাল বোর্ডে এক জন সদস্য ও অপর ৪ জন ধৃত। নওগাঁয়ে আসাম পরিষদের কংগ্রেস দলের ২ জন সদস্য কারাদণ্ডে ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত। ৩১শে ভাদ্র—শ্রীহট্টে জমিয়ৎ উল-উলেমার ২ জন কর্ম্মী ধৃত। ৩১শে ভাদ্র পিকেটিং করিবার জন্য শ্রীহট্টে ১৩ জন ধৃত। রেল-লাইনে অযথা ঘুরিবার জন্য শ্রীহট্টে ২ জন গ্রেপ্তার। ১লা আশ্বিন—শ্রীহট্টে ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শিবেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস, নবকুমার ভট্টাচার্য্য, জিলা-কংগ্রেসের সভানেত্রী শ্রীমতী সরলাবালা দেব ও অপর ৬ জন মহিলা কারাদণ্ডে দণ্ডিত।

বিহার—২৭শে ভাদ্র দ্বারভাঙ্গা জিলার বিরৌল থানা আক্রান্ত। পুলিশের গুলীবর্ষণ, ১৪ জন ধৃত। ৩১শে ভাদ্র রাত্রিতে মধুবনী সাব জেল হইতে পলাতক বন্দী তেজনারায়ণ সাকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা; "ভালা" নিক্ষেপ করিয়া তেজনারায়ণের দারোগাকে আহত করিবার চেষ্টা ব্যর্থ পিস্তলভাবের গুলীতে তেজনারায়ণ আহত হইলে গ্রেপ্তার। ১লা আশ্বিন—সাহাবাদ জিলার ভাবাকি গ্রামে জনতা সশস্ত্র পুলিশ দলকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর, জনতা ছত্রভঙ্গ। ২রা আশ্বিনের বিহার সরকারের ইস্তাহার—১লা আশ্বিন ভাবরা মহকুমার বন্দ অঞ্চলে গাদা বন্দুকধারী ২ শত লোক পুলিশের এক দারোগা ও ১৭ জন সশস্ত্র কনষ্টেবলকে আক্রমণ করে। জনতার সহিত পুলিশের গুলী বিনিময় হয়। ৬ জন আহত ও ৪ জন গ্রেপ্তার। ২৮শে ভাদ্র এই স্থানে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ জন ও পাটনা কলেজের ১ জন ছাত্র এক থানা আক্রমণকালে ধৃত হয়। সাঁওতাল পরগণায় অনেক সেতুর ক্ষতি করা হয় ও রাজপথে বিভিন্ন স্থানে পরিখা খনন, রেলপথের ক্ষতি করা হয়। সহর থানার অধীন লালাবি গ্রামে ঢাক বাজাইয়া আসিয়া জনতাকর্ত্তৃক পুলিস ও সৈন্যদলকে আক্রমণ, ম্যাজিষ্ট্রেটের গুলীবর্ষণের আদেশ। ১ জন নিহত, ৬ জন আহত। ২রা আশ্বিন—ভাগলপুর জিলা বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব ভাইস চেয়ারম্যান বাবু সীতারাম সিংএর গ্রেপ্তারের জন্য ৫ শত টাকা ও মোক্তার বাবু রঘুনন্দন কুমারের গ্রেপ্তারের জন্য ২ শত টাকা পুরস্কার ঘোষণা। ৩রা আশ্বিন—মজঃফরপুর খাদি ভাণ্ডার পুলিস কর্ত্তৃক তালাবদ্ধ। ভাণ্ডারের ম্যানেজার, গ্রামোত্তক ভাণ্ডারের এক কর্ম্মচারী, মিউনিসিপ্যালিটীর ভূতপূর্ব্ব এক কমিশনার, সদর লোকাল বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান শ্রীরামধারীপ্রসাদ বিশারদ ও অপর এক জন গ্রেপ্তার। জামালপুর মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস

চেয়ারম্যান, দুই জন উকীল ও অপর কয়জন গ্রেপ্তার। ৫ই আশ্বিনের সরকারী ইস্তাহার—মজঃফরপুরে নিমাহিয়া গ্রামের দুই গৃহে বিস্ফোরক প্রস্তুত হইতেছে পুলিস দেখিতে পায়। ৬ই আশ্বিন—নিখিল ভারত কংগ্রেস সমিতির সদস্য বাবু অবধেশপ্রসাদ সিং গ্রেপ্তার। ৯ই আশ্বিন পাটনাসিটি পোষ্টআফিসের এক চিঠির বাক্স ভস্মীভূত। সাঁওতাল-পাহাড়িয়া সেবাসঙ্ঘ বেআইনী-ঘোষণা। ১০ই আশ্বিনের সরকারী বিবৃতি—কয়েকস্থানে রিভলভার, টোট, বর্শা, ছোরা আবিষ্কার। চার জন গ্রেপ্তার। চম্পারণ জিলার জনতার উপর সৈন্য দলের গুলীবর্ষণ। দুই জন নিহত। দ্বারভাঙ্গার এক স্থানে সশস্ত্র জনতার উপর গুলীবর্ষণ, কয় জন আহত, ১৫ জন গ্রেপ্তার। ১৮ই আশ্বিনের সরকারী ইস্তাহারে মুঙ্গের জিলায় ক্ষিপ্ত জনতা আধিপত্য বিস্তার করিয়া জনতা কর্তৃক চুরি অভিযোগে ৫ জনের দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলীগুলি কর্ত্তিত, তিন জনের দক্ষিণ চক্ষু উৎপাটিত, ৫ জনের অঙ্গে তপ্ত লোহার সেকদান। একজন নিহত।

বোম্বাই—৩০শে ভাদ্র নাসিকে জনতা পঞ্চবটী পুলিস চৌকী অবরোধ করিয়া কনষ্টেবলদিগের পোষাকগুলি পুড়াইয়া দেয়। অপর এক জনতা ডাকঘরের আসবাব পত্রে অগ্নিদান করে ও নগদ টাকা ও টিকিটের বাক্স লইয়া যায়। পুনায় একদল তরুণী ইনস্‌পেক্টার জেনারলের আফিস ব্যতীত সকল সরকারী কর্ম্মচারীর নিকট প্রচারপত্র বিলি করে। ৩১শে ভাদ্র রাত্রিতে বোম্বাই-এ এলিস ব্রিজের নিকট যে বোমা বিস্ফোরণ হয় সে সম্পর্কে ৩৯ জন ধৃত। সরকার আমেদাবাদ মিউনিসিপ্যালিটির পরিচালন ভার গ্রহণ করায় কর্ম্মচারীদিগের ধর্ম্মঘট। ৪ জন ভূতপূর্ব্ব কাউন্সিলার ও মিউনিসিপ্যাল-কর্ম্মচারিগণ ধৃত। ধাঙ্গড়গণ জানায় যে গণপ্রতিনিধিদিগের হস্তে মিউনিসিপ্যালিটীর পরিচালনভার না দিলে তাহারা ধর্ম্মঘট করিবে। ৩০শে ভাদ্র—আমেদাবাদ মিউনিসিপ্যালিটীর কার্য্যালয়ের এক বিভাগে অগ্নি সংযোগ। সারঙ্গপুর পুলিস চৌকী ও রায়পুর ডাকঘরে প্রস্তর বর্ষণ। ৯ জন গ্রেপ্তার। সরকার কর্ত্তৃক মিউনিসিপ্যালিটীর পরিচালন ভার গ্রহণে কর্ম্মচারীদিগের অবস্থান ধর্ম্মঘট। মিউনিসিপ্যালিটীর প্রধান এঞ্জিনিয়ারের পদত্যাগ। ৩১শে ভাদ্র—বোম্বাইএ ৫ জন ছাত্র ও পতাকাবাহিনী একজন মহিলা গ্রেপ্তার। লাঠী ও বেত চালাইয়া ৩টি শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ। এলিস ব্রিজ অঞ্চলে বিস্ফোরণ, ৩০ জন গ্রেপ্তার। ২রা আশ্বিন—বোম্বাই সরকার বাছরাজ কোম্পানীর নিকট গচ্ছিত নিখিল ভারত কংগ্রেস সমিতির ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর ব্যক্তিগত টাকাকড়ির হিসাব পরীক্ষা করেন ও টাকার আদান-প্রদান বন্ধ করিতে আদেশ দেন। ৩রা আশ্বিন আমেদাবাদ মিউনিসিপ্যাল আবর্জ্জনা বিভাগের ইনস্‌পেক্টারের আফিস ভাঙ্গিয়া খাতাপত্র টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলা হয়। ৪ঠা আশ্বিন—দাদার ষ্টেশনে রণরাজ সিং, বলবন্ত সিং ঠাকুরের নিকট বোমা তৈয়ারীর জিনিষ প্রাপ্তি। ৫ই আশ্বিন পূর্ব্বাহ্নে বোম্বাই সহরে এক পুলিস ঘাঁটির নিকট খুব উচ্চ হইতে বোমা নিক্ষিপ্ত। ৫ জন পথিক আহত। পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল ঘিরিয়া পুলিশের তল্লাসী। জিজ্ঞাসাবাদ করিবার জন্য ৩৩ জন থানায় আহূত। নদিয়াদে পুলিসের এক গাড়ীর উপর বোমা নিক্ষিপ্ত। ৬ জন কনষ্টেবল ও এক দারোগা আহত। নদিয়াদ জিলায় সভা, শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ। সান্ধ্য আদেশ জারী। ৫ই আশ্বিন—ব্রোচ জিলায় জনতাকর্ত্তৃক বেদাচে থানা আক্রমণ। জনতার গুলীতে এক জন পুলিস আহত। আমেদাবাদ জিলার পণ্ডলা রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট পুলিসের গুলীচালন। ১ জন নিহত। ৬ই আশ্বিন হইতে বোম্বাই সহরে এক মাস কেহ লাঠি, ছড়ি বা কোন অস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবে না এরূপ আদেশ জারী। প্রত্যূষে চার্চ্চগেট ষ্টেশনে একখানি লোকাল ট্রেণের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় বোমা বিস্ফোরণ। ৭ই আশ্বিন সন্ধ্যায় দাদারে এক মিলে বোমা বিস্ফোরণ। শিবাজী পার্কের একটি জনতার উপর পুলিসের গুলী-বর্ষণ। হামাম ষ্ট্রীটে কংগ্রেস প্রচারপত্র মুদ্রণের গুপ্ত ছাপাখানা আবিষ্কার। পুলিশ কর্ত্তৃক ছাপাখানা অধিকার। কীপার, ৩ জন কম্পোজিটর ও দুই জন ভৃত্য, এক জন কাগজ ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার। রুইয়া কলেজের এক অধ্যাপক এবং অপর ৪ জন ধৃত। ছাত্র-ছাত্রী বিক্ষোভ। ৮ই আশ্বিন—দুই বস্ত্র কলের শ্রমিকদিগের ধর্ম্মঘট। বিভিন্ন অঞ্চলে ছাত্রদিগের বিক্ষোভ। রায়পুর অঞ্চলে বোমা বিস্ফোরণের ফলে বোমা বহনকারীর মৃত্যু। রাত্রিতে আদনপুরে পুলিস চৌকীতে বোমা বিস্ফোরণ। দশিরা ষ্ট্রীটে পটকা বিস্ফোরণ। ৮ই আশ্বিন শোলাপুরে তিন স্থানে বোমা বিস্ফোরণ। কয়জন আহত। আমেদাবাদের খদিরাচর পথে শোভাযাত্রাকারীদিগের উপর পুলিসের গুলী বর্ষণ। গুজরাট কলেজের নিকট পুলিসের কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ। পুনার এক গ্রামে অগ্নি সংযোগ। এক গ্রামের তাড়িখানায় অগ্নিদান। শোভাযাত্রায় যোগদান ও যুদ্ধবিরোধী ধ্বনি করিবার অভিযোগে কংগ্রেসকর্ম্মী জগন্নাথ গাইকবাড় ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও আড়াই হাজার টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত। হুবলীতে ৩ জন পুরুষ ও ১ জন মহিলা গ্রেপ্তার, মিঃ এন, এম, যোশী, শ্রীযুত কেশব গোরে, মিঃ এম, সি, লিমায়ে। মিঃ লিমায়েকে ১ মাসের মধ্যে আত্ম-সমর্পণ করিতে ইস্তাহার জারী। ৯ই আশ্বিন রাত্রি বোম্বাই সহরের এক স্থানে ২ শত কনষ্টেবল ও ১০।১২ জন পদস্থ পুলিস কর্ম্মচারী হানা দিয়া প্রায় ১ শত জনকে গ্রেপ্তার। রাত্রিতে মাতুঙ্গায় জি-আই-পি রেলওয়ের ওয়ার্কশপ ইয়ার্ডে অগ্নিকাণ্ড। ১০ই আশ্বিন—আমেদাবাদে ৮ জন কনষ্টেবল জনতা কর্ত্তৃক আক্রান্ত। পটকা ফাটিয়া একজন আহত। শোলাপুরের ১০ স্থানে বোমা বিস্ফোরণ, ১ জন নিহত, ১০ জন আহত। ১১ই আশ্বিন মাতুঙ্গা ডাকঘরের নিকট তাজা বোমা আবিষ্কার। পুনায় ১১ জন যুবক ও ১ জন তরুণী গ্রেপ্তার। বেলগাঁও জিলায় প্রায় ১১২৫টি চন্দন বৃক্ষ কর্ত্তিত। ১২ই আশ্বিন কোলাপুরে ৩ স্থানে বোমা বিস্ফোরণ। বোম্বাইএ সিডেনহাম কলেজের দুই কক্ষে বোমা বিস্ফোরণ। জামালপুর লক্ষীগেরিতে বিস্ফোরণ ফলে ২ জন আহত। বোম্বাইএর দাদার ষ্টেশনে বিস্ফোরণ। পুনায় বোমা বিস্ফোরণে কনষ্টেবল আহত। ১৩ই আশ্বিন আমেদাবাদে বোমা বিস্ফোরণের ফলে ১ জন নিহত, নিহত ব্যক্তির নিকট রিভলভার। আমেদাবাদে জনতার উপর পুলিসের গুলীবর্ষণ। ১৩ জন গ্রেপ্তার। ১৪ই ষ্টক একসচেঞ্জে বিক্ষোভ, এক্সচেঞ্জ বন্ধ। টেলিফোন লাইন মেরামতি করিতে চেষ্টা করিলে দুই জন লাইনস্‌ম্যান ও কুলীগণ আক্রান্ত। বোম্বাইএ ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজের ৩৩টি টেলিফোন লাইনে হস্তক্ষেপ দ্বারা ধ্বংস চেষ্টা, এক জন কর্ম্মচারী ধৃত। পুনায় একটি বোমা আবিষ্কার। বোম্বাই সিডেনহাম কলেজে বিস্ফোরক দ্রব্যপূর্ণ প্যাকেট প্রাপ্তি। ১৫ই আশ্বিন বোম্বাইএ পটাসিয়াম ক্লোরেট বিক্রয় নিষিদ্ধ। ১৭ই আশ্বিন ওয়াদি বন্দরে

বোমা বিস্ফোরণে মারাঠা যুবক নিহত। যুবকের গৃহ তল্লাসী করিয়া ২১টি তাজা বোমা আবিষ্কার। এক বস্ত্র কলে বোমা বিস্ফোরণ। ১৯শে আশ্বিন রাত্রিতে নয়গাঁও পুলিস ফাঁড়ীতে বোমা বিস্ফোরণ, ২ জন কনষ্টবল আহত। ২০শে আশ্বিন ব্রাবোর্ণষ্টেডিয়ামে বোমা প্রাপ্তি। সহরে পুলিসের উপর দুই বার প্রস্তর ও সোডাওয়াটার বোতল নিক্ষেপ।

গ্রেপ্তার—১লা আশ্বিন—আমেদাবাদ বস্ত্রকল সমিতির শ্রীযুত সোমনাথ ধৃত। বেলগাঁওয়ে চারিজন নিরুদ্দিষ্ট কংগ্রেস নেতাকে ১০ই অক্টোবরের মধ্যে আত্মসমর্পণ করিতে বলা হইয়াছে, অন্যথায় তাঁহাদিগের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইবে। ৩রা আশ্বিন—শোভাযাত্রায় যোগদিবার অভিযোগে বোম্বাইএর কোটি শেঠ, অম্বালাল শরা ভাইএর তিন কন্যা, ভারতী বেন, গিয়া বেন ও গীতা বেন অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ডে দণ্ডিতা। অর্থদণ্ড প্রদানে অসম্মত হওয়ায় একখানি মোটর ক্রোক। মাতুঙ্গে এক গৃহ হইতে পুলিস কর্ত্তৃক প্রচারপত্র হস্তগত, এ সম্পর্কে ১ জন মহিলা ও ৭ জন পুরুষ ধৃত। ৪ঠা আশ্বিন—পুণায় শোভাযাত্রা বাহির করিবার জন্য ডাঃ চিতালে, ডাঃ ডিঙ্গাঙ্কর, শ্রীপীতাম্বর মেটা, ডাঃ বাবুরাও মেটা, তুলজারাম মেটা ও তাঁহার পুত্র, ৪ জন মহিলা ও অপর তিন জন গ্রেপ্তার। ৩ জন ভারতরক্ষা বিধি অনুসারে আটক। ৭ জন মহিলার সশ্রম কারাদণ্ড। ডালহা গ্রামে (পুণা) ৩ জন স্বেচ্ছাসেবক ও ৯ জন দেশসেবিকা গ্রেপ্তার। সকলেই দণ্ডিত। ১ই আশ্বিন ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শান্তিলাল সাহা ধৃত।

সিন্ধু—২রা আশ্বিন—করাচি থানার সম্মুখে এক ভীষণ বিস্ফোরণ। কয়েক জন আহত।

যুক্তপ্রদেশ—৩০শে ভাদ্র কয়জন সাইকেল আরোহী কর্ত্তৃক লক্ষ্ণৌর এক ডাকঘর আক্রান্ত, অর্থ লুণ্ঠিত। দুই জন ধৃত। রাত্রিতে এলাহাবাদ ষ্টেশনে সন্দেহজনক এক পার্শ্বেল ধূমায়িত হইতে থাকে। বোমা আছে সন্দেহে পার্শ্বেল জলে নিক্ষেপ করা হয়। ৩১শে ভাদ্র কানপুর জিলার বিলহোয়ার গ্রামে খালের জলের গতিরোধ করিবার অভিযোগে ১১ জন গ্রেপ্তার। অপরাহ্নে এক জনতার আগরার আয়কর আফিসে অগ্নিদান, এলাহাবাদ সহর কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি মৌলানা সহিদ ফকরী ধৃত। পণ্ডিত জওহরলালের জামাতা ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ২ শত টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত। ২রা আশ্বিন শ্রীযুত আর. এস. পণ্ডিত আনন্দভবনে ধৃত। ৭ই আশ্বিন পর্য্যন্ত মীরাটে ৫১১ জন গ্রেপ্তার। বারানসীর এক ডাকঘর লুঠ করিবার অভিযোগে ৪ জন দণ্ডিত। ৮ই আশ্বিন দোকান খুলিতে অস্বীকার করায় কানপুরের ১৩ জন ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার। লাইসেন্সহীন পিস্তল ও আপত্তিকর পুস্তিকা নিকটে রাখিবার জন্য বারানসীর এক কংগ্রেসকর্ম্মী ধৃত। ১৩ই আশ্বিন—যুক্তপ্রাদেশিক কংগ্রেস সম্পাদক পণ্ডিত কেশবদেও মালব্য, শ্রীযুত গণপৎ সাক্সেনা ও শ্রীযুত প্রহ্লাদচন্দ্র কাপুর গ্রেপ্তার।

উড়িষ্যা—৫ই আশ্বিন জানান হয়—উড়িষ্যার ভূতপূর্ব্ব প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুত বিশ্বনাথ দাসকে ৬ সপ্তাহ কারাদণ্ড ভোগের পর ভারতরক্ষা বিধির ২৬ ধারা অনুসারে আটক রাখা হইয়াছে। ৮ই আশ্বিন কুমারী উত্তরা চৌধুরী গ্রেপ্তার। কেন্দ্রী পরিষদের সদস্য শ্রীযুত নীলকণ্ঠ দাসের পুত্র শ্রীঅশোক দাস অভিযোগ হইতে অব্যাহতি পাইলেও পুনরায় ধৃত। ১১ই আশ্বিন ১৮ জন সশস্ত্র পুলিস লইয়া ডেপুটী পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ১ জন পুলিস ইনস্পেক্টার, ১ জন দারোগা এরাম গ্রামে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিতে গেলে জনতা অস্ত্রপূর্ণ থলি-বহনকারী চৌকিদারদিগকে আক্রমণ করিয়া অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লয়। এরাম গ্রামের মধ্যে ৪।৫ হাজার লোক পুলিস দলকে ঘিরিয়া ফেলে। পুলিসের গুলী বর্ষণে ২৫।৩০ জন নিহত ও ৪০।৫০ জন আহত। ১২ই আশ্বিন খয়রা থানার গোলমালের সম্পর্কে এক ফেরারী সন্ধানে ১ গৃহে তল্লাসীকালে কতকগুলি লোক কর্ত্তৃক গৃহে অগ্নি সংযোগ। ৩ শত লোক লাঠী, কাটারী, তীর, ধনুক লইয়া পুলিস দলকে আক্রমণ করিতে উদ্যত। পুলিসের গুলী বর্ষণ! জনতার ২ জন নিহত, ১ জন আহত। ঐ দিন সন্ধ্যায় ধৃত ব্যক্তিদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য জনতা কর্ত্তৃক পুলিস দল ঘেরাও। পুলিসের গুলী বর্ষণ। ১ জন নিহত। ১২ই আশ্বিনের সংবাদ—বালেশ্বর জিলার ধামনগর ও খয়রা থানায় পুনরায় হাঙ্গামা। বালেশ্বর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতের নথিপত্র ছিন্ন। স্থানে স্থানে চৌকিদারগণ প্রহৃত। মুরলীধর পাণ্ডার নেতৃত্বে ৪ হাজার লোক কর্ত্তৃক পুলিস আক্রান্ত। নানা স্থানে জনতা কর্ত্তৃক পুলিসদল আক্রান্ত ও অবরুদ্ধ। খয়রা থানায় গুলী চালন। ১৩ই আশ্বিন পার্ব্বতী দেবী দণ্ডিতা।

দিল্লী—৮ই আশ্বিন ভারত সরকার রাষ্ট্রীয় পরিষদে জানান যে, ঐ তারিখ পর্য্যন্ত দিল্লীতে মোট ৪৫৩ জন ধৃত। ১১ই আশ্বিন শ্রীমতী অরুণা আশফ আলি এবং শ্রীযুত যুগলকিশোর খান্নার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ও তাঁহারা ফেরার বলিয়া ঘোষণা। ১৫ই আশ্বিন ইর্গাটন রোডে জনতার উপর গুলী বর্ষণ, ১ জন নিহত ১ জন আহত।

সামন্তরাজ্য—৪ঠা আশ্বিন হইতে বাঙ্গালোরের তিনটি বস্ত্রকলে ধর্ম্মঘট। ধর্ম্মঘট বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা। ৭ই আশ্বিন হাসান তালুকে জনতার লরী আক্রমণ, পুলিসের গুলী বর্ষণ, কয় জন আহত ও কয় জন গ্রেপ্তার। ৮ই আশ্বিন জনতাকর্ত্তৃক রাজকোট এজেন্সীর দপ্তরখানা অধিকার করিবার নোটিশ দান। জনতার গতিরোধ। লাঠি চালন ও ৩৫ জন গ্রেপ্তার। ৯ই আশ্বিন ধর্ম্মেন্দ্র সিংজী কলেজে পিকেটিংএর জন্য ১৩ জন ছাত্র আটক। পোর বন্দরে জনতাকর্ত্তৃক পুলিসের লোক প্রহৃত ও রেলওয়ে সম্পত্তির ক্ষতি। ১১ই আশ্বিন শিকারপুর তালুকে ১ জন পুলিস ইন্সপেক্টর ১ জন সাব ইন্সপেক্টার, ১ জন দফাদার ও কয় জন কনষ্টেবল জনতা কর্ত্তৃক নৃশংসভাবে আক্রান্ত। দারোগা নিহত। হতাহতদিগের রিভলভার, পোষাক ও দ্রব্যাদি অপহৃত। ত্রিবাঙ্কুরে বে-আইনী সভা করিবার জন্য ৩ জন কংগ্রেসকর্ম্মী ধৃত। ১১শে আশ্বিন শ্রাবণবেলাগোলায় (মহীশূর) উত্তেজিত জনতার উপর গুলী চালন। ৩ জন নিহত। একজন আহত রিজার্ভ কনষ্টেবলের মৃত্যু।

পঞ্জাব—১৬ই আশ্বিন জনতার আক্রমণে কাটরা আলুওয়ালিয়ানে (অমৃতসর) অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট, সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও প্রায় ৩৬ জন কনষ্টেবল আহত।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২১শ বর্ষ] কার্ত্তিক, ১৩৪৯ [১ম সংখ্যা

রস

'প্রবাস'-শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখাইতে গিয়া ভোজদেব বলিয়াছেন—প্র-পূর্ব্বক বস্-ধাতুর উত্তর ঘঞ্-প্রত্যয়ে 'প্রবাস' শব্দ সিদ্ধ হয়। বস্ ধাতুর অর্থ—(১) আচ্ছাদন (যাহা হইতে 'বস্ত্র'-পদ সিদ্ধ হয়), (২) বাস করা, (৩) বাসিত বা প্রভাবিত করা ও (৪) মারণ। 'প্র' উপসর্গের অর্থ প্রতীপ বা বিপরীত। অতএব, প্র-বস্ ধাতুর প্রথম অর্থ ধরিলে দাঁড়ায় আচ্ছাদনের ব্যতিক্রম। যে অবস্থায় অঙ্গনা আত্মদেহ সুবেশে ভূষিত না করেন, তাহাকেই 'প্রবাস' বলে। নায়ক প্রবাসে থাকিলে নায়িকা কখনও নিজ দেহ সজ্জিত করেন না। আবার যুবক নায়ক যখন প্রিয়াসন্নিধানে বাস করেন না, তখনও প্রবাস বুঝিতে হইবে। কারণ, প্রবাসী নায়কের পক্ষে নায়িকার নিকট বাস করা অসম্ভব। যে অবস্থায় নায়ক-নায়িকার চিত্ত উৎকণ্ঠা প্রভৃতির দ্বারা বাসিত হইয়া থাকে, তাহাও প্রবাস। এইরূপে চিত্ত বাসিত হইলে শূন্যদৃষ্টি প্রভৃতি অনুভাবের বাহ্য প্রকাশ দৃষ্ট হয়। বস্-ধাতুর চতুর্থ অর্থ 'প্রমাপণ' বা হিংসন। পুরাপুরি মারণের পরিবর্ত্তে মারণের উপক্রম হইলে তাহাকেও মারণ বলা চলে। প্রবাসী নায়ক ও নায়িকা উভয়েই মৃত্যুতুল্য কষ্ট ভোগ করিয়া থাকেন—ইহা স্বাভাবিক। প্রবাসের পর করুণ। কৃ-ধাতুর উত্তর উণাদি উনন্-প্রত্যয়ে 'করুণ'-পদ সিদ্ধ হয়। কৃ-ধাতুর অর্থ—(১) অবর্ত্তমানের উৎপত্তি, (২) উচ্চারণ, (৩) অবস্থাপন ও (৪) অভ্যঞ্জন। প্রথম অর্থ ধরিলে দাঁড়ায়—যে অবস্থা মূর্চ্ছা প্রভৃতি উৎপাদন করে, তাহাই করুণ-বিপ্রলম্ভ। যে অবস্থায় নায়ক-নায়িকা বিলাপ করিয়া থাকেন, তাহাও করুণ (দ্বিতীয় অর্থ)। যাহার আতিশয্যে সন্তপ্ত নায়ক বা নায়িকা দুঃসাহসিক মরণাদি কার্য্যে মন অবস্থাপিত (অর্থাৎ মনোনিবেশ) করেন, তাহাও করুণ (তৃতীয় অর্থ)। যে অবস্থায় চিত্ত দুঃখ দ্বারা অভ্যক্ত (অর্থাৎ পূর্ণ প্রভাবিত) হয়, তাহাকেও করুণ বলা হয় (চতুর্থ অর্থ)। বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারের বিবিধ অবস্থার নিরুক্তি এই স্থানেই সমাপ্ত হইয়াছে।

বিপ্রলম্ভের পর সম্ভোগ। সম্-পূর্ব্বক ভুজ্-ধাতুর উত্তর ঘঞ্-প্রত্যয়ে সম্ভোগ-পদ সিদ্ধ হয়। ভুজ্-ধাতুর নানা অর্থ—(১) পালন—নবোঢ়া নায়িকা-কর্ত্তৃক অনিচ্ছা-সত্ত্বেও কথঞ্চিৎ নায়কের ইচ্ছানুবৃত্তি প্রভৃতি দ্বারা রতিভাবের পালনে এই অর্থ পরিস্ফুট হয়। প্রথমানুরাগের অনন্তর সম্ভোগে এই অর্থের প্রকাশ। (২) কৌটিল্য (এই অর্থ অবলম্বনে 'ভুজগ'-পদ সিদ্ধ হয়)—পাদপতিত নায়কের প্রতি পাদতাড়ন প্রভৃতি মানিনী নায়িকার যে ব্যবহার, তাহাতে কুটিলতার অভিব্যক্তি। মানানন্তর সম্ভোগে এই কৌটিল্যরূপ অর্থ প্রকাশিত হইয়া থাকে। (৩) অভ্যবহার (বা আহার),

—প্রবাস হইতে প্রত্যাগত নায়কের পক্ষে প্রিয়াসম্ভোগ অনেকটা উপবাসক্লিষ্টের পক্ষে অন্নভোজনের তুল্য। অতএব, প্রবাসানন্তর সম্ভোগেই অভ্যবহার-রূপ অর্থ প্রকাশ পাইয়া থাকে। (৪) অনুভূতি—করুণ-বিপ্রলম্ভের অনন্তর সম্ভোগে এই অর্থটি প্রকাশ পায়। নায়ক-নায়িকার মধ্যে একের মরণানন্তর পুনর্জ্জীবন লাভে উভয়ে যে সুখ অনুভব করেন, তাহা অন্য কোন অবস্থাগত সম্ভোগের সহিত তুলিত হইতে পারে না। এই কারণে করুণানন্তর সম্ভোগে অননুভূতপূর্ব্ব সুখ অনুভূত হইতে থাকে।

আবার যদি ভুজ্-ধাতুর অর্থ ধরা হয় ভোগ, অর্থাৎ নায়ক-নায়িকার পরস্পর মিলন (সম্প্রযোগ), তাহা হইলেও 'সম্'-উপসর্গের সহিত সমাসে চারি প্রকার অর্থ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে—(১) সংক্ষিপ্ত, (২) সঙ্কীর্ণ, (৩) সম্পূর্ণ ও (৪) সম্যক্ ঋদ্ধিমান্। পূর্ব্বরাগানন্তর নবসঙ্গমে যুবক-যুবতী লজ্জা-ভয়াদি বশতঃ প্রায়ই সংক্ষিপ্ত উপচার প্রয়োগ করে, তাই প্রথমানুরাগানন্তর সম্ভোগ 'সংক্ষিপ্ত'। মানানন্তর সম্ভোগে নায়কের শঠতাদির বিষয় স্মরণপথে উদিত হওয়ার নিমিত্ত নায়িকার মনে কিছু রোষের লেশ থাকিয়া যায়। এই রোষমিশ্র সম্ভোগই 'সঙ্কীর্ণ'[১]। প্রবাস হইতে প্রত্যাগমনের পর উৎকণ্ঠাযুক্ত নায়ক-নায়িকার মিলনে অভিলাষের পূর্ণ পরিতৃপ্তি ঘটে বলিয়া এইরূপ ভূয়িষ্ঠ উপভোগ 'সম্পূর্ণ' সম্ভোগ নামে খ্যাত। আর মৃতের জীবন-লাভের পর যে মিলন, তাহাতে নায়ক-নায়িকার যে সুখ উৎপন্ন হয়, তাহার আর সীমা থাকে না। এইরূপ সম্ভোগের নাম 'সমৃদ্ধ' বা 'সমৃদ্ধিমান্'।

প্রথমানুরাগানন্তর যে সম্ভোগ, সেই সম্ভোগের মধ্যে যে অনুরাগের প্রকাশ, তাহার স্বরূপ বর্ণনা করিতে যাইয়া ভোজ বলিয়াছেন—প্রথমানুরাগের 'অনুরাগ'-পদটি রঞ্জ্-ধাতু অথবা রাজ্-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। রঞ্জ্-ধাতুর অর্থ অনুরঞ্জন বা প্রীতি-সম্পাদন। রাজ্-ধাতুর অর্থ শোভা, প্রকাশ বা দীপ্তি। আর 'অনু' এই উপসর্গের অর্থ—(১) সহ, (২) পশ্চাৎ, (৩) অনুরূপ (সদৃশ) ও (৪) অনুগত (যোগ্য)[২]। কখনও কখনও অনুরাগে প্রীতি-সম্পাদন ও শোভা যুগপৎ হইয়া থাকে। আবার এবংবিধ পূর্ব্বানুরাগের পরভাবী সম্ভোগেও এই অনুরঞ্জন ও শোভা অর্থদ্বয় সহভাবেই অন্বিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ—পূর্ব্বানুরাগানন্তর সম্ভোগে কখনও কখনও নায়ক-নায়িকার পরস্পর প্রীতি ও দীপ্তি যুগপৎ প্রকাশ পায়। এরূপ অনুরাগ সহভাবী। এই অনুরাগ পূর্ব্বানুরাগেও যেমন, সম্ভোগেও সেইরূপ অভিব্যক্তি লাভ করে। আবার এই অনুরঞ্জন ক্রিয়াটি পূর্ব্বানুরাগে কখনও পশ্চাৎ উদ্ভূত হইয়া থাকে। অর্থাৎ—পূর্ব্বানুরাগে নায়ক বা নায়িকার মধ্যে একের অনুরাগ দর্শনের পর তাহার প্রতি অপরের অনুরাগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাই পশ্চাদ্ভাবী অনুরাগ। ইহাও পূর্ব্বানুরাগাবস্থা হইতে সম্ভোগে অনুবৃত্ত হইয়া থাকে। তৃতীয়তঃ, কখনও কখনও পূর্ব্বানুরাগে 'শোভা' অর্থটি নায়ক-নায়িকার মধ্যে অনুরূপ-ভাবে প্রকাশ পায়। অর্থাৎ—কোন কোন পূর্ব্বানুরাগের ক্ষেত্রে অনুরাগের বিষয়ভূত নায়িকা বা নায়ক অনুরাগের আশ্রয়ভূত নায়ক বা নায়িকার অনুরূপ (সর্ব্বতোভাবে তুল্য) বলিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকেন। এস্থলে 'অনু' উপসর্গের তৃতীয় অর্থ 'অনুরূপতা' 'রাগ' শব্দের 'শোভা' অর্থের সহিত মিলিত হইয়া অনুরাগ পদটিকে নিষ্পন্ন করে। অনুরাগের এবংবিধ স্বরূপ প্রথমানুরাগ হইতে সম্ভোগেও কখনও অনুবৃত্ত ও অন্বিত হইয়া থাকে। মহাকবি কালিদাস-কৃত রঘুবংশের ইন্দুমতী-স্বয়ংবরের প্রসিদ্ধ শ্লোক ইহার দৃষ্টান্ত—

"শশিনমুপগতেয়ং কৌমুদী মেঘমুক্তং
জলনিধিমনুরূপং জহ্নুকন্যাবতীর্ণা।
ইতি সমগুণযোগপ্রীতয়স্তত্র পৌরাঃ
শ্রবণকটু নৃপাণামেকবাক্যং বিবব্রুঃ"॥

(রঘুঃ ৬।৮৫)

রঘুসুত অজে মিলিতা ইন্দুমতী মেঘমুক্ত শশীর সহিত সঙ্গতা কৌমুদী ও অনুরূপ জলধিতে প্রবিষ্টা জাহ্নবীর ন্যায়ই শোভমানা হইয়াছেন—এই কথা তুল্যগুণসম্পন্না বরবধূর সমাগমে প্রীত পৌরবর্গ একবাক্যে বলিতে লাগিল। কিন্তু ইন্দুমতীর পাণিপ্রার্থী হতাশ রাজগণের কর্ণকুহরে সেই কথাগুলি বিশেষ কটু বলিয়া বোধ হইতেছিল।

আর যথায় নায়িকার পক্ষে উত্তম-নায়ক-কামনা অনিন্দিত (যেমন অপর্ণার শিব-সমাগমের আকাঙ্ক্ষা), তথায় 'অনু' উপসর্গের 'অনুগত (যোগ্য)' অর্থের সহিত রঞ্জনার্থক রাগ-শব্দের অন্বয়ে অনুরাগ-পদের নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। এইরূপ অনুরাগাবস্থা প্রথমানুরাগ হইতে সম্ভোগেও অনুবৃত্ত হইয়া থাকে। এই চারি স্থলেই অনু-উপসর্গ-পূর্ব্বক রঞ্জ্ বা রাজ্ ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে ঘঞ্-প্রত্যয় করিয়া অনুরাগ পদ সিদ্ধ হয়। এই চতুর্ব্বিধ অনুরাগ—কি প্রথমানুরাগে—কি সম্ভোগে—উভয় স্থলেই সমান—ইহাই ভোজের অভিপ্রায়।

---

(১) সঙ্কীর্ণ—মিশ্রিত। 'সঙ্কর' অর্থে 'মিশ্র', যথা—বর্ণসঙ্কর।

(২) ঐ (৮)—মাসিক বসুমতী, ভাদ্র, ১৩৪৯, পৃঃ ৫৫০-৫১ দ্রষ্টব্য।

করণবাচ্যের ব্যুৎপত্তি ব্যতীতও ভাববাচ্যে ঘঞ্ করিয়া অনুরাগ-পদ সাধন করা যায়। সহ-পশ্চাৎ-অনুরূপ-অনুগত এই চারিটি অর্থে প্রযুক্ত 'অনু' উপসর্গের সহিত সংযুক্ত (রঞ্জ্) বা রাজ্ ধাতু হইতে ভাববাচ্যে ঘঞ্-প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন) রাগ-শব্দ রতি বা দীপ্তি অর্থ প্রকাশ করে। পূর্ব্বানুরাগ-গত অনুরাগ-শব্দের নির্ব্বচন প্রসঙ্গে এ কথা বলা হইয়াছে। এইরূপ অনুরাগ বিপ্রলম্ভের পূর্ব্বানুরাগাবস্থা হইতে সম্ভোগ-শৃঙ্গারে পর্য্যন্ত অনুবৃত্ত হইতে পারে। কারণ, সম্ভোগ চতুর্ব্বিধ—বিপ্রলম্ভের চারিটি অবস্থাভেদের প্রত্যেকটির অনন্তর-ভাবী বলিয়াই সম্ভোগও চারি প্রকার। অতএব, বিপ্রলম্ভের প্রথম অবস্থা-ভেদ পূর্ব্বানুরাগে অনুরাগ যদ্রূপ, পূর্ব্বানুরাগানন্তর সম্ভোগেও উহা যে তদ্রূপই হইবে—ইহা স্বাভাবিক।

বিপ্রলম্ভের দ্বিতীয় অবস্থা-ভেদ মান। মান-শব্দ যে মান্-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, তাহার চতুর্ব্বিধ অর্থ—(১) পূজা, (২) প্রিয় মনে করা (প্রিয়ত্বাভিমান), (৩) প্রেম বুঝা (প্রেমাববোধ) ও (৪) প্রেমের প্রমাণ (পরিমাণ) নির্ণয় করা[৩]। ভোজদেব দেখাইয়াছেন যে, মানানন্তর-ভাবী সম্ভোগেও মানাবস্থায় পরিস্ফুট এই চতুর্ব্বিধ অর্থের অনুবৃত্তি হইয়া থাকে।

বিপ্রলম্ভের তৃতীয় অবস্থা-ভেদ প্রবাস যে বস্-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, তাহারও চতুর্ব্বিধ অর্থ—(১) আচ্ছাদন (প্র-উপসর্গের 'প্রতীপ' অর্থাৎ বৈপরীত্য' অর্থ ইহার সহিত সংযুক্ত হইলে আচ্ছাদন বা ভূষণাদির অভাব বুঝায় অর্থাৎ বেশাদির পারিপাট্যের অভাব), (২) বাস করা (প্র-উপসর্গ-যোগে অর্থ দাঁড়াইতেছে—প্রিয়াসন্নিধানে প্রিয়ের বাসের অভাব), (৩) উৎকণ্ঠাদি দ্বারা চিত্ত বাসিত করা, ও (৪) প্রমাপণ (মারণ অর্থাৎ—মৃত্যুতুল্য যন্ত্রণা দান)। প্রবাসানন্তর সম্ভোগের সময়েও প্রবাসাবস্থায় অভিব্যক্ত এই চতুর্ব্বিধ অর্থ অনুবৃত্ত হইয়া থাকে। প্রথম অর্থটির দৃষ্টান্ত মহাকবি কালিদাস-কৃত শকুন্তলার প্রোষিতপতিকা দশা-বর্ণনায় পরিস্ফুট—

"বসনে পরিধূসরে বসানা নিয়মক্ষামতনুঃ কৃতৈকবেণিঃ।
অতিনিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্ত্তি[৪] ॥"
(শকু ৭।২১)

শকুন্তলার প্রোষিতভর্ত্তৃকা অবস্থায় ধূসর বসনযুগল, ক্ষীণ তনু, ম্লান বদন ও এক-বেণী সকলের দৃষ্টিপথে পড়িত। তিনি বেশের পারিপাট্যবিধানে যত্ন লইতেন না। দুষ্মন্তের সহিত পুনর্ম্মিলনকালেও তাঁহার সেইরূপ প্রোষিতভর্ত্তৃকার বেশ ছিল। ভোজ ইহা হইতে অনুমান করিয়াছেন—এ স্থলে প্রবাসানন্তর সম্ভোগেও প্রবাসদশায় অভিব্যক্ত বস্-ধাতুর অর্থ (বেশভূষার অভাব) অনুবৃত্ত হইয়াছে।

বিপ্রলম্ভের চতুর্থ অবস্থাভেদ করুণ-বিপ্রলম্ভ। যে কৃ-ধাতু হইতে করুণ-পদের নিষ্পত্তি, তাহারও চতুর্ব্বিধ অর্থ—(১) অনুৎপন্নের উৎপত্তি, (২) উচ্চারণ, (৩) অবস্থাপন ও (৪) অভ্যঞ্জন। করুণানন্তর সম্ভোগেও এই সকল অর্থের অনুবৃত্তি দৃষ্ট হয়। করুণাবস্থায় দুঃখাতিশয্যে যেরূপ অভূতপূর্ব্ব মূর্চ্ছাদির উৎপত্তি হয়—করুণানন্তর সম্ভোগেও সেইরূপ মৃতের পুনর্জ্জীবন লাভে অপ্রত্যাশিত আনন্দের আতিশয্যে উক্ত মূর্চ্ছাদির আবির্ভাব দেখা যায়। অতএব, উৎপত্তিরূপ অর্থের অনুবৃত্তি এ ক্ষেত্রে ঘটিয়া থাকে। করুণে শোকবশে বিলাপ-শব্দের উচ্চারণ স্বাভাবিক—করুণানন্তর সম্ভোগেও আনন্দের প্রাবল্যে উক্ত শোকজনিত বিলাপ সুখজন্য প্রলাপে পরিণত হয়। অতএব, উচ্চারণরূপ অর্থের অনুবৃত্তি এ ক্ষেত্রেও সুপরিস্ফুট। করুণাবস্থায় শোকবশতঃ দুঃসাহসিক আত্মবিসর্জ্জনাদি কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে দেখা যায়—করুণানন্তর সম্ভোগেও আনন্দাতিরেকবশে মৃতোজ্জীবিত প্রিয় বা প্রিয়ার একান্ত আনুগত্যে মনের অবস্থাপন করিবার প্রয়াস অতি স্বাভাবিক। অতএব, এ ক্ষেত্রেও অবস্থাপনরূপ অর্থের অনুবৃত্তি দৃষ্ট হয়। আর করুণাবস্থায় যে চিত্ত শোক-প্রকর্ষে অভ্যক্ত হইয়া থাকে—করুণানন্তর সম্ভোগে তাহাই পরমানন্দ-দ্বারা অভ্যক্ত হইয়া উঠে। অতএব, এ ক্ষেত্রেও অভ্যঞ্জন-রূপ অর্থের অনুবৃত্তি সহজেই বুঝা যায়[৫]।

---

(৩) মাসিক বসুমতী, ভাদ্র ১৩৪৯, পৃঃ ৫৫১—(রস—৮) দ্রষ্টব্য।

(৪) প্রচলিত পাঠ—
"বসনে পরিধূসরে বসানা নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণিঃ।
অতিনিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্ত্তি"।

(৫) এস্থলে একটি বিষয় খুব সূক্ষ্মদৃষ্টিতে প্রণিধানযোগ্য। পূর্ব্বানুরাগের চতুর্ব্বিধ অর্থ পূর্ব্বানুরাগানন্তর সম্ভোগে যথাযথ ভাবেই অনুবৃত্ত হয়। এ কারণে ভোজমতে 'পূর্ব্বানুরাগানন্তর' এই সমাসবদ্ধ পদে অজহৎস্বার্থা বৃত্তি (অর্থাৎ—এ ক্ষেত্রে স্বকীয় অর্থ মোটেই পরিত্যক্ত হয় নাই)। কিন্তু মানের যে চতুর্ব্বিধ অর্থ (পূজা, প্রিয়ত্বাভিমান প্রভৃতি) তাহা পরিপূর্ণরূপে মানানন্তর সম্ভোগে অনুবৃত্ত হয় না। কারণ, মানকালে পাদপতনাদি দ্বারা যে ভাবে পূজা প্রযুক্ত হইয়া থাকে, মানভঙ্গানন্তর সম্ভোগকালে ঠিক তত দূর পূজাপ্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা থাকে না। অতএব, মানানন্তর সম্ভোগে মানের অর্থ কিঞ্চিৎ মৃদু ভাবে অনুবৃত্ত হয়। ভোজদেব ইহার বর্ণনা করিয়াছেন—ইহা অত্যন্ত অজহৎস্বার্থা বৃত্তির ক্ষেত্র নহে। প্রবাসের চতুর্ব্বিধ অর্থও (বেশভূষার অকরণ প্রভৃতি) সাধারণতঃ অল্প পরিমাণেই প্রবাসানন্তর সম্ভোগে অনুবৃত্ত হয়। শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের বিয়োগানন্তর

এইরূপ নানাবিধ বিশ্লেষণের সাহায্যে ভোজ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে—স্থূলতঃ ইহা বলা চলে—বিপ্রলম্ভের যে ধর্ম্ম সম্ভোগেরও ধর্ম্ম তাহাই—যথাক্রমে বিরহ ও মিলনের মধ্য দিয়া ঐ একই ধর্ম্ম উভয় দশায় অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। তাই বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ—উভয়ই একই শৃঙ্গারের দুইটি রূপ—পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক মাত্র। সম্ভোগ যেমন বিপ্রলম্ভ ব্যতীত পুষ্টিলাভ করে না, বিপ্রলম্ভও সেইরূপ সম্ভোগ ব্যতিরেকে পূর্ণাঙ্গ হয় না। সম্ভোগহীন কেবল বিপ্রলম্ভ—শৃঙ্গারের রূপভেদ হইতে পারে না—উহা মুখ্য করুণরসেরই অন্তর্ভুক্ত।

এইরূপে ভোজ শৃঙ্গার-সম্বন্ধীয় নানাবিধ শব্দের নানারূপ নিরুক্তি প্রদর্শন ও প্রত্যেকটি নির্ব্বচনের অনুকূল যুক্তি ও অনুরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সে সকল পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের সবিস্তর আলোচনা করা অসম্ভব বলিয়া কেবল দিগ্‌দর্শন মাত্র করা হইল।

নিরুক্তির পর 'প্রকীর্ণ' পরিচ্ছেদ। প্রকীর্ণের মধ্যে ভোজ কয়েকটি ব্রত, উৎসব ও ক্রীড়ার নাম দিয়াছেন[৬]—

(১) অষ্টমীচন্দ্রক—ব্রতবিশেষের নাম। চৈত্র মাসের চতুর্থী হইতে যে অষ্টম চতুর্থী, তাহাতে যুবতীগণ চন্দ্রের পূজা করিয়া থাকেন।

(২) কুন্দচতুর্থী—ভোজ বলিয়াছেন, যে তিথিতে যুবতীগণ যবাস্তৃত শয্যায় শয়ন করিয়া এপাশ ওপাশ করিয়া থাকেন, তাহাই কুন্দচতুর্থী[৭]।

(৩) সুবসন্তক—বসন্তঋতুর প্রথমাবির্ভাব-তিথি। কামসূত্রে ইহাকে 'মাহিমানী' ক্রীড়ার অন্তর্গত বলিয়া ধরা হইয়াছে। চৈত্র মাসে (কখনও বা বৈশাখ মাসে) বাসন্তীদুর্গাপূজার যে শুক্লা ত্রয়োদশী পড়ে, সেই চৈত্র শুক্লা ত্রয়োদশীর রাত্রিকে 'সুবসন্তক' বলা হইত। কন্দর্পদেবের পূজা মহোৎসব ও তদুপলক্ষে নানারূপ নৃত্য-গীত-বাদ্য দ্যূতক্রীড়া প্রভৃতিতে এ রাত্রিটি কাটিয়া যাইত। বর্ত্তমানে ইহা 'মদন-ত্রয়োদশী' নামেই অধিক প্রসিদ্ধ।

(৪) আন্দোলনচতুর্থী—যাহাতে যুবতীগণ দোলা-রোহণপূর্ব্বক ক্রীড়া করিতেন[৮]।

(৫) একশাল্মলী—একটি কুসুমশোভিত শাল্মলী-বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া নানারূপ ক্রীড়া। কখন কখন এক জন চোখ বুজিতেন—অপরে লুকাইতেন। পরে তিনি খুঁজিয়া বাহির করিতেন—যাহাকে ছুটিয়া গিয়া ধরিতে পারিতেন সেই হইত চোর। আর কেহ তিনি ধরিবার পূর্ব্বে 'বুড়ি' ছুঁইলে চোর হইতেন না। সম্ভবতঃ শিমুল গাছটিকেই বুড়ি করা হইত। বর্ত্তমানে আমরা যে 'চোর- চোর' খেলা করি, তাহারই অনুরূপ। অথবা, কাহারও চোখ বাঁধিয়া দিয়া 'কানা-মাছি' খেলাও হইত[৯]।

কামসূত্রের 'জয়মঙ্গলা' টীকায় অনুরূপ বিবরণ দৃষ্ট হয়। একটি সুবিশাল পুষ্পিত শাল্মলী তরুর (শিমুল গাছের) চারি দিকে মণ্ডলাকারে নৃত্য-গীত-বাদ্য সহকারে নানারূপ ক্রীড়া। এ খেলায় শিমুল-ফুলের অলঙ্কার তৈয়ারি করিয়া

প্রথম দর্শন-সময়েই শকুন্তলা প্রোষিতভর্তৃকার বেশে ছিলেন। পরেও যে তাঁহার বেশ পরিবর্ত্তন হয় নাই—ইহা ত বলা যায় না। পুনর্দর্শনের ক্ষণে ত বেশ পরিবর্ত্তন সম্ভবই হয় না—কারণ, এ দর্শনই অপ্রত্যাশিত; প্রত্যাশিত হইলে শকুন্তলা নিশ্চয়ই পতির মনোরঞ্জক বেশ ধারণ করিতেন। এই কারণে ভোজমতে প্রবাসানন্তর সম্ভোগে বৃত্তি ঈষৎ অজহৎস্বার্থা। প্রবাসকালীন নিয়মের সংস্কারমাত্র উহাতে কিঞ্চিৎ অনুবৃত্ত হয়। আর করুণের অর্থ করুণানন্তর মোটেই যথাযথ ভাবে অনুবৃত্ত হয় না। আপাতদৃষ্টিতে সমান অর্থের অনুবৃত্তি হইতেছে বোধ হয়। কিন্তু নিপুণ দৃষ্টিতে অনুসন্ধান করিলে বুঝা যায় যে, উহাদিগের মূল কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন (উপরের বিশ্লেষণ পর্য্যালোচনীয়)। অতএব, সুস্পষ্টতঃ করুণানন্তরে বৃত্তি জহৎস্বার্থা (সঃ কঃ ৫।৮৯—৯২)।

(৬) বাৎস্যায়নের কামসূত্রেও এইরূপ কয়েকটি উৎসব ও ক্রীড়ার উল্লেখ আছে। বাৎস্যায়ন ক্রীড়াগুলিকে মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) মাহিমানী ক্রীড়া—যে সকল ক্রীড়ায় মহিমা বা মহত্ত্ব প্রকাশ পাইত—এগুলি ছিল সর্ব্বদেশ-প্রসিদ্ধ ক্রীড়া, (২) দেশ্যা ক্রীড়া—এ খেলাগুলির কোন কোনটি কোন কোন বিশিষ্ট দেশেই প্রচলিত ছিল—এগুলি ছিল প্রাদেশিক ক্রীড়া।

(৭) "যস্যাং যবাস্তরেষ্বেবলা লোলন্তি সা কুন্দচতুর্থী"—(সবস্বতীকণ্ঠাভরণ)। বাৎস্যায়ন দেশ্যা ক্রীড়ার মধ্যে 'যবচতুর্থী' বলিয়া একটি ক্রীড়ার উল্লেখ করিয়াছেন। যবচতুর্থী বৈশাখ শুক্লা চতুর্থী। পরস্পরের গায়ে সুগন্ধি যবচূর্ণ ছড়াইয়া এ খেলা হইত। ইহা অনেকটা হোলির মত ছিল। তবে পার্থক্য এই যে, ইহাতে রঙ্ দেওয়ার প্রথা ছিল না।

(৮) বাৎস্যায়ন দেশ্যা ক্রীড়ার মধ্যে 'আলোলচতুর্থী' বলিয়া একটি ক্রীড়ার উল্লেখ করিয়াছেন। খেলাটির নামের শেষে 'চতুর্থী'-শব্দ আছে বলিয়াই মনে করা উচিত নহে যে, ইহা চতুর্থী তিথিতেই হইত। চার-চার জন মিলিয়া এ খেলা খেলিতেন, তাই ইহার নাম চতুর্থী! তৃতীয়া তিথিতে ইহা হইত। শ্রাবণের শুক্লা তৃতীয়াতে যে হিন্দোল বা ঝুলন হইত, তাহারই নাম ছিল 'আলোলচতুর্থী'। এক এক দোলায় চার-চার জন মিলিয়া খেলিতেন। এক জন দোলায় চাপিতেন, আর তিন জন নানা ছন্দে তাঁহাকে দোল দিতেন। এই ভাবে পালা করিয়া দোলায় চড়া ও দোল খাওয়া ছিল এ খেলার অঙ্গ।

(৯) "একমেব সুকুসুমনির্ভরশাল্মলিবৃক্ষমাশ্রিত্য সুনিমীলিত-কাদিভিঃ খেলতাং ক্রীড়া"—(সঃ কঃ)

পরিবার রীতি ছিল। সে যুগে বিদর্ভদেশে[১০] এই খেলাটির খুব চলন ছিল।

(৬) মদনোৎসব—ত্রয়োদশীতে কামদেব-পূজা। ইহাও বাৎস্যায়নের মতে দেশ্যা ক্রীড়া। বর্ত্তমানে ইহার প্রচলিত নামান্তর 'মদনচতুর্দ্দশী'[১১]। চৈত্র মাসে (কখন বা বৈশাখ মাসে) যে শুক্লা চতুর্দ্দশী পড়ে, সেই চৈত্র-শুক্লা চতুর্দ্দশীতে মদনদেবের প্রতিমা গড়িয়া পূজা করার প্রথা শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। শ্রীহর্ষ-কৃত 'রত্নাবলী'-নাটিকাতেও (খ্রীঃ ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভ) পাওয়া যায়—রাজ্ঞী বাসবদত্তা এই মদনোৎসবে অশোক-তরুতলে মদনের ও তাঁহার স্বামী বৎসরাজ উদয়নের পূজা করিতেন। পূর্ব্বে যে সুবসন্তক বা মদনত্রয়োদশীর উল্লেখ করা হইয়াছে—ঠিক তাহার পরের তিথিতেই ইহার অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। উৎসবও অনেকটা সেইরূপ। তবে সুবসন্তক সর্ব্বদেশপ্রসিদ্ধ মাহিমানী ক্রীড়া, আর মদনোৎসব অপেক্ষাকৃত অল্প-প্রসিদ্ধ প্রাদেশিক বা দেশ্যা ক্রীড়া—ইহাই মাত্র উভয়ের প্রভেদ।

(৭) উদকক্ষ্বেড়িকা—বাঁশের চোঙ্ বা পিচ্‌কারীর মধ্যে গন্ধোদক ভরিয়া পরস্পরের গাত্রে প্রদান—প্রিয়জনকে কর্দ্দমের দ্বারা অভিষেক, ইত্যাদি। ইহা হোলির তুল্য। তবে ইহাতে রঙ্ ব্যবহৃত হইত না—হইত সুগন্ধ জলমাত্র। কামসূত্রে 'হোলাকা' (বা হোলি) একটি পৃথক্ উৎসব। 'ক্ষ্বেড়া' বলিতে বুঝায় 'বংশনাড়ী' বা 'বাঁশের চোঙ্' 'বাঁশের পিচ্‌কারী'। এই খেলায় বাঁশের চোঙে জল ভরিয়া সেই জল ছুড়িয়া অপরের গায়ে দেওয়া হইত। ইহারই অপর নাম 'শৃঙ্গক্রীড়া' বা পিচ্‌কারী-খেলা।

(৮)। অশোকোত্তংসিকা—'উত্তংস' অর্থে শিরোভূষণ বা কর্ণাভরণ অশোকপুষ্পের কিরীট-কুণ্ডল প্রভৃতি নানাবিধ অলঙ্কার-রচনার কৌশল প্রদর্শনই এই খেলার মুখ্য বিষয়। ভোজ বলিয়াছেন—উত্তম নায়িকাগণ পাদাঘাতে অশোক পুষ্প বিকশিত করিয়া সেই ফুলের গহনা নির্ম্মাণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা অঙ্গ শোভিত করিতেন[১২]।

(৯) চূতভঞ্জিকা—যুবতীগণ প্রথমানুরাগবশে আম্র-মুকুল ভাঙ্গিয়া অনঙ্গদেবকে উহা উৎসর্গ করতঃ ভূষণরূপে ধারণ করিতেন[১৩]। কামসূত্রে এতদনুরূপ ক্রীড়ার নামান্তর পরিদৃষ্ট হয়—'চূতলতিকা'। কিন্তু ভোজের 'চূতলতিকা' অন্যরূপ ক্রীড়া।

(১০) পুষ্পাবচায়িকা—যে ক্রীড়ায় যুবতী মদিরাগণ্ডূষ দোহদ দান করিয়া বকুল-পুষ্প বিকাশপূর্ব্বক তাহা চয়ন করিতেন[১৪]। কিন্তু ভোজ 'পুষ্প' বলিতে কেবল বকুল-পুষ্পকেই কেন বুঝিয়াছেন, তাহা দুর্ব্বোধ্য। ফুল-তোলা, ফুল কুড়ান, ফুল ছড়ান, ফুল সাজান প্রভৃতি নানারূপ খেলা পুষ্পাবচায়িকার অন্তর্ভুক্ত—ইহা স্বর্গত তর্করত্ন মহাশয়ের অভিমত। নানা রঙের ও নানা রকমের ফুল তুলিবার পর ফুলগুলি এক সঙ্গে মিশাইয়া চারি দিকে ছড়াইয়া দেওয়া খেলাটির প্রথম ধাপ। দ্বিতীয় ধাপে পরীক্ষা হয়—কে কত শীঘ্র এক এক রকমের ফুল আলাদা করিয়া কুড়াইয়া তুলিতে পারে। তৃতীয় ধাপে—ফুল কুড়াইবার পর নানা আকারে সেগুলি সাজাইতে হইবে। নানারূপ পশু-পক্ষী, লতা-পাতা, গাছ, মানুষ প্রভৃতির ছবি ফুল সাজাইয়া সাজাইয়া আঁকিতে হয়। ইহাতে যাহার যত কৃতিত্ব তাহার তত প্রশংসা।

(১১) চূতলতিকা—যে ক্রীড়ায়—'কোথায় তোমার

---

(১০) বিদর্ভ—বর্ত্তমান বেবার। সেকালের মস্ত বড় একটি রাজ্য—কুন্তল-রাজ্যের উত্তর দিকে অবস্থিত ছিল। কৃষ্ণা হইতে নর্ম্মদা পর্য্যন্ত ছিল উহার বিস্তার। এ কারণে উহাকে 'মহারাষ্ট্র'ও বলা হইত। 'কুণ্ডিনপুর' (বর্ত্তমান Beder) ছিল উহার রাজধানী। বরদা (Warda) নদী রাজ্যটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করায় উত্তরাংশের রাজধানী হয় 'অমরাবতী' ও দক্ষিণাংশের রাজধানী হইয়াছিল 'প্রতিষ্ঠান'।

(১১) কামসূত্রে তিথির উল্লেখ নাই। জয়মঙ্গলা-টীকায় 'সুবসন্তক'-পদের প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে 'বসন্তোৎসব'। পক্ষান্তরে, স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ন মহোদয় তাঁহার কামসূত্রের সংস্করণে স্পষ্ট বলিয়াছেন—সুবসন্তক—মদন-ত্রয়োদশী আর মদনোৎসব মদন-প্রতিমাপূজা, চৈত্র-শুক্ল-চতুর্দ্দশী।

(১২) কবিসময়ে বলা হইয়াছে—উত্তমা যুবতী নায়িকার পাদাঘাতরূপ দোহদ (সাধ) দানে অশোক পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়। ঐরূপ দর্শনও আলিঙ্গনে যথাক্রমে তিলক ও কুরবকের পুষ্পোদ্গম। ঐ ভাবে স্ত্রীগণ-কর্ত্তৃক স্পর্শে প্রিয়ঙ্গু, সীধুগণ্ডূষসেকে বকুল, নর্ম্ম-(শৃঙ্গারভাবপূর্ণ)-বাক্যে মন্দার, মৃদুহাস্যে চম্পক, মুখমারুতে চূত, গীত-দ্বারা নমেরু ও সম্মুখে নর্ত্তন দ্বারা কর্ণিকার পুষ্প বিকশিত হইয়া থাকে—

"পাদাঘাতাদশোকস্তিলককুরবকৌ বীক্ষণালিঙ্গনাভ্যাং
স্ত্রীণাং স্পর্শাৎ প্রিয়ঙ্গুর্বিকসতি বকুলঃ সীধুগণ্ডূষসেকাৎ।
মন্দারো নর্ম্মবাক্যাৎ পটুমৃদুহসনাচ্চম্পকো বক্ত্রবাতা-
চ্চূতো গীতান্নমেরুর্বিকসতি চ পুরো নর্ত্তনাৎ কর্ণিকারঃ"।

"যত্রোত্তমস্ত্রিয়ঃ পদাভিঘাতেনাশোকং বিকাশ্য তৎ কুসুমবতংসয়ন্তি সা অশোকোত্তংসিকা"—(সঃ কঃ)

(১৩) "যত্রাঙ্গনাভিশ্চূতমঞ্জর্য্যোঽবরুহ্যানঙ্গায় বালরাগাদ্ভঞ্জৈব দায়ং দায়মবতংস্যন্তে সা চূতভঞ্জিকা"—(সঃ কঃ)।

(১৪) কবিসময়—"পাদাঘাতাদশোকং বিকসতি বকুলং যোষিতামাস্যমদ্যৈঃ"—সাহিত্যদর্পণ (৭ম পরিচ্ছেদ)। নারীর মুখস্থিত মদ্যগণ্ডূষে বকুলপুষ্প উদ্গত হয়। "যত্র যুবতয়ো মদিরাগণ্ডূষ-দোহদেন বকুলং বিকাশ্য তৎপুষ্পাণ্যবচিন্বন্তি সা পুষ্পাবচায়িকা" (সঃ কঃ)।

প্রিয়তম ?'—এই প্রশ্নকারিগণ-কর্তৃক পলাশাদি নব-লতা-দ্বারা প্রিয়জন আহত হয়, তাহাই চূতলতিকা। কামসূত্র-মতে আমের মুকুল ভাঙ্গিয়া কর্ণাভরণ বা অন্য নানারূপ ভূষণ রচনা ও তাহা পরিয়া ক্রীড়া।

(১২) ভূতমাতৃকা—পঞ্চভূতাত্মক দেহের আনুকূল্য-বিধায়ক ক্রীড়া। ভোজের এই বিবরণটি অস্পষ্ট[১৫]। কামসূত্রে ক্রীড়ার মধ্যে ভূতমাতৃকা ধরা নাই। কিন্তু চতুঃষষ্টি ললিতকলার মধ্যে 'মানসী' নামে একটি কলার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। উক্ত মানসী দ্বিবিধ—(১) দৃষ্টবিষয়া বা দৃশ্যবিষয়া—পদ্মোৎপল প্রভৃতি সঙ্কেত দ্বারা লিখিত শ্লোক দেখিয়া তাহার যথাযথ ভাবে পাঠোদ্ধার, ও (২) অদৃষ্ট-বিষয়া বা অদৃশ্যবিষয়া—ঐ ভাবে লিখিত কবিতা কেহ পাঠ করিতেছে—ইহা শুনামাত্রই তাহার পুনরায় পাঠ—ইহা কেবল শতাবধান বা শ্রুতিধরের পক্ষেই সম্ভব। ইহার অপর নাম 'আকাশ-মানসী' [১৬]।

(১৩) কদম্বযুদ্ধ—বর্ষাকালে কদম্ব-হরিদ্রা-পুষ্প প্রভৃতিকে প্রহরণ-স্বরূপে গ্রহণ-পূর্ব্বক দুইটি দলে বিভক্ত কামিনীগণের মধ্যে কৃত্রিম যুদ্ধরূপ ক্রীড়া[১৭]।

কামসূত্রেও ইহার উল্লেখ আছে। খেলোয়াড়েরা ইহাতে দুইটি দলে বিভক্ত হইয়া দুই দল পরস্পর মুখামুখি হইয়া দাঁড়াইতেন। উভয় দলের প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ের হাতে থাকিত কদমফুল। এই ফুল ছুঁড়িয়া যে আপোষে কৃত্রিম যুদ্ধ হইত, তাহারই নাম ছিল কদম্বযুদ্ধ। এ যুদ্ধের অস্ত্র কদম্বপুষ্প বা ঐ জাতীয় অন্য পুষ্প। অস্ত্র হিসাবে কদম্বফুল লইবার উদ্দেশ্য এই যে, এ কৃত্রিম যুদ্ধের অস্ত্রটি বেশ কুসুম-সুকুমার হওয়া প্রয়োজন; যাহাতে কাহারও অঙ্গে কোন আঘাত না লাগে। অথচ অস্ত্রটি গোলকের মত হওয়া চাই, যাহাতে উহা লইয়া লোফালুফি করা বা গড়াইয়া খেলা করা চলে। কদম ফুলের এই দুইটি গুণই আছে, তাই উহার এত আদর। মাটি, কাঠ বা পাথরের ঢিল বা গোলা লইয়া খেলিলে অঙ্গে আঘাত লাগিয়া আনন্দের পরিবর্ত্তে কষ্ট পাওয়ারই সম্ভাবনা অধিক। সেকালে পৌণ্ড্রদেশে[১৮] এই ক্রীড়াটির বিশেষ প্রচলন ছিল। এ কালের ব্যাড্‌মিণ্টন্, টেনিস্, টেবল্-টেনিস্, রাগ্‌বি, ফুটবল প্রভৃতি গোলক-ক্রীড়ার সহিত এই কৃত্রিম কদম্বযুদ্ধের বেশ তুলনা চলিতে পারে।

(১৪) নবপত্রিকা—প্রথম বর্ষার পর নব তৃণাঙ্কুর গজাইলে বনস্থলীতে নব শাদ্বল অর্চ্চনা-পূর্ব্বক তথায় পান-ভোজন সমাপন করিয়া কৃত্রিম বিবাহাদি ক্রীড়া নবপত্রিকা। এইরূপ ক্রীড়ায় নানারূপ হাস্য-পরিহাস চলিত।

কামসূত্রেও ইহার উল্লেখ আছে। বর্ষার প্রথম বারিপাতের পর গাছে গাছে যখন কচি পাতা দেখা দিত, তখন বনভূমির অধিবাসীদিগের মধ্যে এই খেলাটির ধূম পড়িয়া যাইত। সদ্যো-বর্ষাস্নাত বৃক্ষ-বল্লীর নব কিসলয়োদ্গমে যে অপরূপ শ্যামল শ্রী প্রকাশ পায়, তাহাতে মনে হয় নবপল্লব-শ্যামলা বনস্থলী যেন লাবণ্যময়ী নববধূর বেশে সজ্জিতা হইয়াছেন। এই বর্ষায় নব-পত্রাবলী ছিন্ন করিয়া নানারূপ মণ্ডন-রচনা, আর তাহাতে সজ্জিত হইয়া বনস্থলীতে নানাবিধ ক্রীড়া-কৌতুক ও খেলার শেষে নবশস্য রন্ধন করিয়া বনভোজন, ইহাই ছিল সেকালে এ খেলার অঙ্গ।

(১৫) বিসখাদিকা—নায়ক-নায়িকাগণ সরোবরে গমন-পূর্ব্বক নবোদ্‌ভিন্ন বিসাঙ্কুর গ্রহণ করিয়া যে ক্রীড়া করিতেন, তাহাই বিসখাদিকা।

কামসূত্রে ইহারও উল্লেখ আছে। 'বিস' অর্থে মৃণাল। পদ্মফুলের গাছের যে ডাঁটা, তাহার দুইটি অংশ আছে। যে অংশটির রঙ সবুজ ও যাহাতে কাঁটা আছে, তাহার নাম 'নাল'। এ অংশটি কঠিন, ইহা জলে ডুবিয়া থাকে। আর এই সবুজ ডাঁটার শেষ খানিকটা অংশ প্রায় পাঁকের মধ্যে ডোবা থাকে। ইহার রঙ সাদা ধপ্‌ধপে। ইহা যেমন নরম তেমনই মিষ্ট। এই অংশটুকুই 'বিস' বা 'মৃণাল'। কে কত গভীর জলে যাইয়া এক ডুবে কত বেশী মৃণাল তুলিতে পারে, সেই সব কৌশলের পরীক্ষা এ খেলায় হইত। তার পর সদলে

---

(১৫) "পঞ্চাত্মানুনয়ন্তী ভূতমাতৃকা"—(সঃ কঃ)। পঞ্চাত্ম বা পঞ্চাত্মক বলিতে পঞ্চভূতাত্মক শরীরকেই বুঝায়।

(১৬) "মানসীতি। মনসি ভবা চিন্তা। দৃশ্যাদৃশ্যভেদ-বিষয়া দ্বিধা। তত্র কশ্চিদ্ব্যঞ্জনাক্ষরৈর্যঃ পদ্মোৎপলাদ্যাকৃতির্যথাস্থিতা-নুস্বারবিসর্জ্জনীয়যুতৈঃ শ্লোকমনুক্তার্থং লিখতি। অন্যশ্চ মাত্রাসন্ধি-সংযোগানুযোগচ্ছন্দোবিন্যাসাদিভিরভ্যাসাদতীবাক্ষরং পঠতি। ইতি দৃশ্যবিষয়া। যদা তু তথৈব তানি যথাক্রমমাখ্যাতানি শ্রুত্বা পূর্ব্ববত্তৃতীয় পঠতি, তদা দৃশ্যবিষয়া ন ভবতি। সা চাকাশমানসী-ত্যুচ্যতে" -জয়মঙ্গলা।

(১৭) "বর্ষাসু কদম্বনীপহরিদ্রকাদিকুসুমৈঃ প্রহরণভূতৈর্দ্বিধা বলং বিভজ্য কামিনীনাং ক্রীড়া"—(সঃ কঃ)

(১৮) পৌণ্ড্র—পৌণ্ড্রদিগের বাসভূমি—বর্ত্তমান বাঙ্গালার পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ—সাঁওতাল-পরগণা, বীরভূম ও হাজারিবাগের উত্তরাংশ। 'পুণ্ড্র' নামে একটি পৃথক্ শ্রেণীও ছিল। ইহারা বাস করিত মালদহ, পূর্ণিয়া, দিনাজপুর, রাজসাহী প্রভৃতি অঞ্চলে।

সানন্দে মৃণাল ভোজন। কখন কখন বা পদ্মের পরিবর্ত্তে উৎপলের (সালুকের) ডাঁটাও এই ভাবে তুলিয়া খাওয়া চলিত।

(১৬) শক্রার্চ্চা—শক্রোৎসবদিবস। শক্রোৎসব হইত ভাদ্র মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে। ইহার প্রধান অঙ্গ ছিল ইন্দ্রধ্বজ স্থাপন।

'ভরত-নাট্যশাস্ত্রে' এই শক্রধ্বজ-সম্বন্ধে বেশ একটি কৌতূহল-জনক আখ্যান দৃষ্ট হয়। পুরাকালে শক্রধ্বজোৎসব-কালে ব্রহ্মার নির্দ্দেশে যখন দেব-দৈত্যগণের সম্মুখে মহর্ষি ভরতের নাট্য-সম্প্রদায় অভিনয় দেখাইতেছিল, তখন উক্ত নাট্যাভিনয়ে দেবগণের বিজয় ও অসুরগণের পরাজয় অভিনীত হইতে দেখিয়া দৈত্যগণ ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া মায়া আশ্রয়-পূর্ব্বক নাট্যবিঘ্ন করিতে থাকেন। তাহাতে ইন্দ্র সক্রোধে রঙ্গমঞ্চে উঠিয়া ইন্দ্রধ্বজটির প্রহার-দ্বারা দৈত্য-গণের দেহ জর্জ্জরিত করিয়া দিয়াছিলেন। তদবধি শক্র-ধ্বজের নাম হইয়াছে 'জর্জ্জর'। নাট্যবিঘ্ন দূরীকরণের উদ্দেশ্যে নাট্যাভিনয়ের পূর্ব্বে জর্জ্জর-স্থাপন ও জর্জ্জর-পূজার প্রথা তৎকালে প্রচলিত ছিল[১৯]।

(১৭) কৌমুদী—আশ্বিনের পৌর্ণমাসী। শরৎ-কালের পূর্ণিমা-রজনীতে যে জ্যোৎস্না বা কৌমুদী প্রকাশ পায়, তাহার শোভার তুলনা নাই। তাই ঐ রাত্রিটিরও নাম দেওয়া হইয়াছে 'কৌমুদী'। কামশাস্ত্রে ঐ রাত্রির উৎসবের নাম 'কৌমুদী-জাগর'। ইহা ত্রিবিধ মাহিমানী ক্রীড়ার অন্যতম।

ঐ রাত্রিটি যাঁহারা জাগিয়া কাটাইতে পারেন, মা কমলার কৃপালাভে তাঁহারা ধন্য হন। কিন্তু এক বার ঘুমাইয়া পড়িলে মার কৃপালাভ আর অদৃষ্টে ঘটে না। এ জন্য সারারাত জাগিয়া কাটাইবার ব্যবস্থা। সময় কাটাইবার জন্য দ্যূতক্রীড়ারও ব্যবস্থা এই রাত্রিতে করা হয়। সাধারণতঃ এতদ্দেশে উহা 'কোজাগর-পূর্ণিমা' (৺শারদীয়া দুর্গাপূজার পরের পূর্ণিমা) নামে খ্যাত। কৃপা বিতরণের উদ্দেশ্যে স্বয়ং মা লক্ষ্মী ঐ রজনীতে পৃথিবীর প্রতি ঘরে খোঁজ করিয়া বেড়ান—'কে জাগিয়া আছে (কো জাগর্ত্তি)'? দোলায় চড়িয়া বা পাশা খেলিয়া ঐ রাত্রি জাগিলে ধনবৃদ্ধি হয়—এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে।

(১৮) যক্ষরাত্রি—দীপোৎসব—ভোজমতে। দীপোৎ-সব বলিতে বুঝায় দীপান্বিতা অমাবস্যা—কার্ত্তিকের অমাবস্যা—৺কালীপূজা-লক্ষ্মীপূজার রাত্রি।

কামসূত্রে এই উৎসবটিও ত্রিবিধ মাহিমানী ক্রীড়ার অন্যতম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যক্ষরাত্রি—সুখরাত্রি। এ রজনীতে যক্ষগণ অদৃশ্য ভাবে ধরাবক্ষে বিচরণ করিয়া থাকেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। এ রাত্রিটি দ্যূতক্রীড়াতেই কাটাইবার প্রথা ছিল।

যদিও ভোজ ও কামসূত্রের টীকাকার যক্ষরাত্রিকে দীপান্বিতা অমাবস্যা বলিয়াছেন, তথাপি আমাদিগের মনে হয়—ইহার অন্যরূপ অর্থও করা চলিতে পারে। কার্ত্তিকের অমাবস্যাতে ৺দীপান্বিতা লক্ষ্মীপূজা ও ৺শ্যামাপূজা। উহার পরবর্ত্তী শুক্লা দ্বিতীয়া 'যমদ্বিতীয়া' বা 'ভ্রাতৃদ্বিতীয়া'—ভাই-ফোঁটার দিন। মধ্যে যে শুক্লা প্রতিপৎ, তাহাই যক্ষ-রাত্রি। উহার অপর নাম 'দ্যূতপ্রতিপৎ'—ইহাতে সারা রজনী জাগিয়া দ্যূতক্রীড়া করিতে হয়।

(১৯) অভ্যূষখাদিকা—কাঁচা অবস্থায় শমি-ধান্য শূক-ধান্য আগুনে পোড়াইয়া খাওয়া। কামসূত্রেও ইহার উল্লেখ আছে। 'অভ্যূষ' অর্থে 'আধপোড়া শস্য'। শীত-কালে ক্ষেতে যাইয়া ছোলা-মটর-খেঁসারি প্রভৃতি কড়াইএর আধ-কাঁচা অথচ বেশ সুপুষ্ট শুঁটি গাছশুদ্ধ তুলিয়া কিছুক্ষণ রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হয়। পরে ঐ শুক্‌না গাছে দিতে হয় আগুন। আগুন লাগিবামাত্র শুঁটিগুলি চট্-পট্-শব্দে পুড়িতে থাকে আর সঙ্গে সঙ্গে কড়াইগুলি চারি দিকে ঠিক্‌রিয়া বাহির হইয়া যায়। পাঁচ জনের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করিয়া সেগুলি খুঁটিয়া খাওয়া যেমন কৌশল-সাপেক্ষ, তেমনই আনন্দদায়ক। হিন্দুস্থানীগণ ঠিক এই ভাবেই কচি ভুট্টা গাছশুদ্ধ পুড়াইয়া খাইয়া থাকেন। শুঁটিতে পাক ধরিবার মুখে গাছগুলি আপনা হইতে শুকাইয়া আসিলেই অভ্যূষ অতি সুস্বাদু হয়। নয় ত, শুঁটিগুলি বেশ পুষ্ট হইবার পূর্ব্বে গাছগুলি রৌদ্রে শুকাইয়া পুড়াইলে অভ্যূষ তত সুস্বাদু লাগে না। বাঙ্গালা দেশের কোন কোন অঞ্চলে চলিত ভাষায় এরূপ খেলা ও খাওয়াকে 'হড়া-পোড়া' বলে।

(২০) নবেক্ষুভক্ষিকা—প্রথম ইক্ষুদণ্ড তুলিয়া ভোজন। কামসূত্রে এই খেলাটির নাম 'ইক্ষুভঞ্জিকা'। আখ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া তাহা হইতে নানা ভূষণ-রচনা ও উহা পরিয়া নানারূপ ক্রীড়া-কৌতুক। ইক্ষুদণ্ড হইতে তৎকালে অন্যান্য নানারূপ প্রয়োজনীয় দ্রব্যও নির্ম্মিত হইত। সে কালে ইক্ষুদণ্ড ও গোলকের সাহায্যে 'দণ্ডগোলক' (ডাঙ্-গুলি) ক্রীড়াও চলিত। এই খেলা এ যুগের হকি, ক্রিকেট বা গল্‌ফ খেলার মতই ছিল।

(২১) তোয়ক্রীড়া—গ্রীষ্মকালে জলে অবগাহন-পূর্ব্বক নানারূপ জলকেলি।

---

(১৯) এ সম্বন্ধে ভরত-নাট্যশাস্ত্রের প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(২২) প্রেক্ষা—নাট্যাভিনয় প্রভৃতি দর্শন।

(২৩) দ্যূত—জুয়াখেলা—প্রায়ই পাশার সাহায্যে খেলা হইত। আলিঙ্গনাদি উপচার পণ রাখিয়া পাশার সাহায্যে নায়ক-নায়িকা দ্যূতক্রীড়া করিতেন[২০]।

(২৪) মধুপান—রাগোদ্দীপনের উদ্দেশ্যে মাধ্বীক প্রভৃতি সেবন[২১]।

ভোজ-বর্ণিত প্রকীর্ণ পরিচ্ছেদ এই স্থলেই সমাপ্ত হইয়াছে। এইগুলি সবই শৃঙ্গারের উদ্রেককর বলিয়া শৃঙ্গার-রস-প্রকরণে বিবৃত হইয়াছে। কামসূত্রেও উহাদিগের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে একই উদ্দেশ্যে।

আগামী সংখ্যায় শৃঙ্গার-রস-প্রকরণ সমাপ্ত হইবে।

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

(২০) "আলিঙ্গনাদিগ্লহা দুরোদরাদিক্রীড়া দ্যূতানি"—(সঃ কঃ)

(২১) কামসূত্রে তিনটি মাহিমানী ক্রীড়া—(যক্ষরাত্রি, কৌমুদীজাগর ও সুবসন্তক) ও সতরটি দেশ্যা ক্রীড়া (সহকারভঞ্জিকা, অভ্যূষখাদিকা, বিসখাদিকা, নবপত্রিকা, উদকক্ষ্বেড়িকা, পাঞ্চালানুযান, একশাল্মলী, যবচতুর্থী, আলোলচতুর্থী, মদনোৎসব, মদনভঞ্জী, হোলাকা, অশোকোত্তংসিকা, পুষ্পাবচায়িকা, চূতলতিকা, ইক্ষুভঞ্জিকা ও কদম্বযুদ্ধ) উল্লিখিত হইয়াছে। ভোজ কয়েকটি নূতন ক্রীড়ার নাম করিয়াছেন। আবার সহকারভঞ্জিকা, পাঞ্চালানুযান, মদনভঞ্জী ও হোলাকার নাম করেন নাই।

সহকারভঞ্জিকা—নূতন আমের গুটি বা কচি আম ভাঙ্গিয়া খাওয়া।

পাঞ্চালানুযান—পাঞ্চাল (বর্দ্ধমান বুদাওন-ফরোখাবাদ প্রভৃতি অঞ্চল) দেশের লোকদিগের ভাষা, ভাব-ভঙ্গী প্রভৃতির হুবহু নকল করা। নানা প্রকার পশুপক্ষীর ডাক ও ভাব-ভঙ্গীর নকল করাও এই ক্রীড়ার অন্তর্গত। হরবোলা ও বহুরূপী ইহারই মধ্যে পড়ে।

মদনভঞ্জী বা দমনভঞ্জী—ময়না গাছ বা দমনক (দোনা) গাছের পল্লব ভাঙ্গিয়া মদনদেবের পূজা ও অলঙ্কার নির্ম্মাণ।

হোলাকা—ফাল্গুনী পূর্ণিমার 'হোলি' উৎসব। পরস্পরের গাত্রে আবির-কুঙ্কুমের রঙ্ দেওয়া এ উৎসবের বৈশিষ্ট্য।

সাদা কথা

উপকার করি অপকার যদি পাও
কৃতঘ্নতাকে তবু প্রশ্রয় দাও,
পাবে না জানিয়া ঋণ যদি দিতে পারো,
প্রস্তুত থাকো প্রতারিত হতে আরো,
অবিশ্বাসী ও কুটিলকে ভালোবাসো,
ছলনা এবং চাতুরী দেখিয়া হাসো,
যদি সেজে থাকো অন্ধ বধির বোবা,—
তোফা এ ধরণী, লোকটাও তুমি তোফা!

যদি বলো সব বোকাকে প্রতিভাবান্,
খাঁটি চেয়ে দাও মেকীকেই সম্মান,
হীন নিন্দুকে বলাও স্পষ্টবাদী,
নির্দোষ ভাবো যত দাগী-অপরাধী,
কথা কও নিজ সুযোগ-সুবিধা বুঝি,
ভাণ্ডারে থাকে বহু তোষামোদ পুঁজি,
কুৎসিতকেও ভাবো সে একটা শোভা,—
তোফা এ ধরণী, লোকটাও তুমি তোফা!

যদি তুমি চাও প্রতিশোধ প্রতিদান,
সহানুভূতিতে চঞ্চল হয় প্রাণ,
যদি অবিচার-অন্যায়ে করো ক্রোধ,
ঘুচাতে না পারো আপন বিবেক-বোধ,
মিথ্যাকে যদি ঘৃণা করো ভাবো পাপ,
কমাইতে চাও অত্যাচারীর দাপ,
দেখিবে তোমার বন্ধু অধিক নাই—
এই যে পৃথিবী—বড়ই কঠিন ঠাঁই!

যদি তুমি চলো লয়ে সত্যের আলো
মন্দকে বলো মন্দ, ভালোকে ভালো,
প্রবলের অপযুক্তিতে নাহি ভুলি,
ভাঙ্গাও সে ভ্রম দিয়া চোখে অঙ্গুলি,
বাক্-বিভূতিতে ঢাকা-ছল উদ্ঘাটি
উদ্ধার করো সত্যের রূপ খাঁটি—
দেখিবে তোমার বন্ধু অধিক নাই,—
এই যে ধরণী—বড়ই কঠিন ঠাঁই

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

পঞ্চত্রিংশ তরঙ্গ

প্রমাণ

রবার্ট ব্লেক ও স্মিথকে মুহূর্ত্তের জন্য দৃষ্টি-বিনিময় করিতে দেখিয়া স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড উভয়ের মুখের উপর সগর্ব্ব দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; তাহার পর মিসেস্ ফিঞ্চকে বলিলেন, "কিছুই অস্বাভাবিক নহে, মিসেস্ ফিঞ্চ! আশা করি, তুমি আমাকে এ কথা বলিবে না যে, মিঃ কার্ণের লাইব্রেরী সাধারণতঃ এইরূপ বিশৃঙ্খল ভাবেই পড়িয়া-থাকিতে দেখা যায়!"

মিসেস্ ফিঞ্চ ঈষৎ বিলাপের সুরে বলিল, "আপনারা লাইব্রেরীর এইরূপ অবস্থা দেখিতে পাইবেন ভাবিয়া আমার বড়ই ভয় হইয়াছিল। আমি জানিতাম, এখানে অস্বাভাবিক কিছু ঘটিয়াছে! কিন্তু মনিবকে আমার বড়ই ভয় ছিল। দেখুন, এখন তিনি দোতলায় রহিয়াছেন; অথচ তিনি জানেন না যে—"

ব্লেক তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "তুমি ঠিক জান যে, এখন তিনি দোতলায় আছেন?"

উত্তর হইল, "হাঁ, মহাশয়! এ বিষয়ে আমার ভুল হয় নাই।"

"আজ সকালে তুমি তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিলে?"—ব্লেকের মুখ হইতে এই প্রশ্ন বাহির হইল।

মিসেস্ ফিঞ্চ বলিল, "গত রাত্রে তিনি আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন—সকালে আটটার সময় আমি যেন তাঁহার সঙ্গে দেখা করি, এবং—"

"তুমি কি সকালে আটটার সময় তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়াছিলে?"

"হাঁ, মহাশয়!"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "লাইব্রেরীর এই অবস্থার কথা তাঁহাকে জানাইয়াছিলে কি?"

"না, মহাশয়!"

"জানাইলে না কেন?"

মিসেস্ ফিঞ্চ বলিল, "মনিব মহাশয়ের ঘরের দরজায় আমি ধাক্কা দিয়াছিলাম; তাহার পর কথাটা তাঁহার নিকট বলিতে আরম্ভ করিতেই তিনি আমাকে আর কিছু বলিতে না দিয়া চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইল, তখনও তিনি ঘুমের ঘোর কাটাইতে পারেন নাই; মেজাজ অত্যন্ত চটা বলিয়াই মনে হইল, চক্ষু দুটি ঢুলু ঢুলু করিতেছিল। ঘুম ভাঙ্গিয়া জাগিয়া উঠিলে তাঁহাকে বড়ই ক্ষাপ্পা দেখায়! তথাপি আমি সাহস করিয়া তাঁহাকে আরও দুই-একটি কথা বলিবার চেষ্টা করিলাম; কিন্তু তিনি আমাকে থামাইবার জন্য হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন!"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "বিলক্ষণ আশার কথা বটে! আমার অনুমান, মিঃ কার্ণ বোতল বোতল মদ গিলিয়া বেসামাল হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাহার পর স্বাভাবিক অবস্থা আয়ত্ত করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়াছিল। ইহাই তাঁহার মেজাজ বিগড়াইবার কারণ। আর এক কথা,—তিনি কোন্ ঘরে ঘুমাইয়া থাকেন?"

মিসেস্ ফিঞ্চ বলিল, "দোতলার বারান্দা দিয়া কিছু দূর পশ্চিমে গিয়া ডান পাশে যে শয়ন-কক্ষ আছে—সেই ঘরে।"

লেনার্ড বলিলেন, "উত্তম; কিন্তু কথাগুলা একটু আস্তে বলিতে পারিবে না? আর কাঁদাকাটি করিবারই বা কি প্রয়োজন? কার্ণ তোমার কথাগুলা শুনিতে না পাইলেই আমরা খুসী হইব। তুমি ঐ চেয়ারে বসিয়া থাক; প্রয়োজন হইলে আবার তোমাকে জেরা করিব।"

অতঃপর লেনার্ড স্মিথের মুখের দিকে চাহিয়া ইঙ্গিত করিতেই স্মিথ সরিয়া-গিয়া সেই কক্ষের দ্বারে পৃষ্ঠ সংলগ্ন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সেই কক্ষে অল্প অনুসন্ধান করিতেই একটি মোটা ও ভারী ডাণ্ডা মিলিল; তাহার এক প্রান্ত শোণিত-রঞ্জিত।

লেনার্ড তাহা দেখিয়া বলিলেন, "উহার সাহায্যেই কাজ শেষ করা হইয়াছিল। ব্লেক, আপনি ঠিকই আন্দাজ করিয়াছিলেন। আপনার অনুমানে বাহাদুরী আছে!"

ব্লেক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "ও-কথা আমি নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি না।—এক এক সময় মনে হয়, আমি ভারী নিরেট!"

"নিরেট?"

"একদম!"

"অর্থাৎ?"

ব্লেক বলিলেন, "অর্থাৎটা এখন মুলতুবি থাক। আমার মাথার ভিতরটা কেমন আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে! এখানে সকল ব্যাপারই কেমন গোলমেলে! তবে আর এক বার নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতে হইবে। হুম্! আরও প্রমাণ! দেখ লেনার্ড, এটা তোমার নজরে পড়িয়াছে কি?"—তিনি ডেস্কের উপর অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিলেন।

লেনার্ড ভাঁজ-করা এক টুক্‌রা চিঠির কাগজ হাতে তুলিয়া লইলেন; পত্রখানিতে পূর্ব্বদিন রাত্রি একটার সময় দেখা করিবার নির্দ্দেশ ছিল। উহাতে কর্ণেল ষ্ট্যাম্পসন ওরফে ওয়াইল্ডের স্বাক্ষর ছিল।

পত্রখানি দেখিয়া ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "ওয়াইল্ড কার্ণকে মুঠায় পুরিবার চেষ্টা করিতেছিল, ইহা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন ? এই উদ্দেশ্যেই সে এই পত্র লিখিয়াছিল। সম্ভবতঃ এ জন্য সে কোন রকম পুরস্কারের লোভ দেখাইয়াছিল।"

ব্লেক উৎসাহ প্রকাশ না করিয়া সংক্ষেপে বলিলেন, "হাঁ, সম্ভব বটে।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড ওয়াইল্ডের অভিযানের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন কথাই জানিতেন না ; এই জন্য তাঁহার ধারণা হইল—সে লুণ্ঠনের চেষ্টাতেই ফিরিতেছিল। কিন্তু ব্লেক তাঁহার ভ্রম দূর করিবার জন্য ওয়াইল্ডের নূতন সঙ্কল্প-সংক্রান্ত সকল কথাই তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড ব্লেকের কথা শুনিয়া বলিলেন, "আপনি কি বলিতেছেন ? কিন্তু ব্যাপার যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা কি সুস্পষ্ট নহে ? কার্ণের সন্দেহ হইয়াছিল—ওয়াইল্ড হয় ত কোন রকম চাতুর্য্যের সহায়তা গ্রহণ করিবে। আমার বিশ্বাস, ফিউজ হঠাৎ নির্ব্বাপিত হইলে তাহারা পরস্পরকে আক্রমণ করিয়াছিল ; অন্ততঃ এইরূপই আমার ধারণা। কার্ণ ঐ ডাণ্ডার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিল ; তাহার পর কি ঘটিয়াছিল, এই ঘরের অবস্থা দেখিলেই তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না !"

এ কথা শুনিয়া ব্লেক ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন, কিন্তু কোন কথাই বলিলেন না।

এবার লেনার্ড মিসেস্ ফিঞ্চের নিকটে গমন করিয়া তাহার সম্মুখে বসিয়া পড়িলেন ; তাহার পর গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ওগো লক্ষ্মী ! তোমার সঙ্গে আমার দুই-একটি কথা আছে—তাহা তোমাকে মন দিয়া শুনিতে হইবে। মিঃ কার্ণের সঙ্গে শীঘ্রই আমরা আলাপ করিব ; কিন্তু তাহার পূর্ব্বে তোমাকে কিছু বলিতে চাই।—এই ব্যাপার সম্বন্ধে তুমি কি জান ?"

মিসেস ফিঞ্চ বলিল, "কিন্তু কি কাণ্ড ঘটিয়াছিল, তাহা সত্যই আমার জানা নাই মহাশয় ! আজ সকালেই ও-সম্বন্ধে কিছু কিছু জানিতে পারিয়াছি ; তাহার পূর্ব্বে কিছুই আমার জানা ছিল না ! আমি যথানিয়মে আসিয়া জানালা খুলিতেই ঘরের এই অবস্থা দেখিতে পাইলাম !"

লেনার্ড বলিলেন, "ঘরের জিনিসপত্র এইরূপ লণ্ডভণ্ড হইয়া চারি দিকে ছড়াইয়া আছে দেখিয়া সে কথা কি কাহারও নিকট প্রকাশ করিয়াছিলে ?"

মিসেস্ ফিঞ্চ আগ্রহভরে বলিল, "না মহাশয়, ও-কথা আমি কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই ! আমার সহকারিণী এলেনকেও আমি এ সকল কথার কিছুই বলি নাই। তাহাকে এখানে আসিতেও দিই নাই। আমার মনিবকে এ কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু আমার সেই চেষ্টা সফল হয় নাই ; তিনি আমার কথায় কর্ণপাতও করেন নাই। তাহার পর আমি হলঘরে প্রবেশ করিয়া ব্যাকুল ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম, সেই সময় আপনারা দ্বারে আসিয়া সাড়া দিলেন।"

ব্লেক তাহার সকল কথা শুনিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি টেলিফোনে কাহাকেও কোন কথা বলিয়াছিলে ?"

মিসেস্ ফিঞ্চ বিস্মিত ভাবে বলিল, "কি বলিলেন ? টেলিফোনে ?"

ব্লেক বলিলেন, "হাঁ ; তুমি টেলিফোনে কাহাকেও ডাকিয়াছিলে কি ?"

মিসেস্ ফিঞ্চ মিঃ ব্লেকের মুখের উপর চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "না মহাশয়, পুলিশে ত আমি খবর দিতে পারি নাই, কারণ, আমার ভয় হইয়াছিল। এ সকল কি ব্যাপার, তাহা আমার মনিবকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্যই আমার আগ্রহ হইয়াছিল। আমি—আমি ভাবিয়াছিলাম, ব্যাপারটি এই যে—"

"কি ভাবিয়াছিলে ?"

"দেখুন মহাশয়, আমাদের মনিব আজ-কাল অনিয়মিত ভাবে যখন-তখন বোতল চালাইয়া থাকেন ! এক-এক দিন তিনি যে অবস্থায় বাড়ী ফিরিয়া থাকেন, তাহা দেখিয়া দুঃখই হয়।"—মিসেস্ ফিঞ্চ ক্ষুব্ধ স্বরে এই উত্তর দিল।

"মাতাল হইয়া বাড়ী ফিরিলে তাঁহার মেজাজ কি অত্যন্ত দুর্দ্দমনীয় হইয়া ওঠে ?"

মিসেস্ ফিঞ্চ বলিল, "পূর্ব্বে কখন সেরূপ দেখি নাই মহাশয় ! আমার মনে হইয়াছিল, তিনি বেসামাল হইয়া পড়াতেই, আত্মসম্বরণ করিতে না পাবায় এইরূপ ক্ষতি করিয়াছেন ! আমি ভাবিয়াছিলাম, তিনি নিজেরও ক্ষতি করিয়াছিলেন। মেঝেতে রক্তের এই সকল চিহ্ন দেখিয়া এই ধারণাই আমার মনে বদ্ধমূল হইয়াছে।"

লেনার্ড তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি সেই ডাণ্ডাটা দেখিয়াছ ?"

"কোন্ ডাণ্ডার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন ?"

লেনার্ড বলিলেন, "চুলোয় যাক সেই ডাণ্ডা ! দেখ মিসেস্ ফিঞ্চ, তোমার কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম—তুমি যাহা জান, সে সকল কথাই আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছ ; কিন্তু আমার আশঙ্কা, এই ব্যাপার তুমি যত সহজ মনে করিতেছ তত সহজ নয়। আর কয়েক মিনিটের মধ্যে আমাদিগকে তোমার মনিবের শয়ন-কক্ষে লইয়া যাইতে হইবে। হাঁ, আমরা সেইখানেই গিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব।"

মিসেস্ ফিঞ্চ চঞ্চল স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তাঁহার নীচে নামিয়া-আসা পর্য্যন্ত কি আপনারা বিলম্ব করিতে পারিবেন না ?"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড নীরস স্বরে বলিলেন, "না, সেরূপ মনে হয় না। আমরা তাঁহার সুযোগের উপর নির্ভর করিব না ; এই জন্য তাঁহার শয়ন-কক্ষেই তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে চাই। তিনি সম্ভবতঃ এখনও নেশায় বে-এক্তার হইয়া আছেন ; এই নেশা কাটিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে জেরা করা উচিত মনে হইতেছে।"

এই সময় স্মিথ ব্লেকের সহিত কথা কহিবার একটু সুযোগ পাওয়ায় তাঁহাকে নিম্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কর্ত্তা, আমরা এখানে যেরূপ দেখিবার আশা করিয়াছিলাম—সেইরূপই কি দেখিতে পাইতেছি না ?

ব্লেক বলিলেন, "না, যেরূপ মনে করিয়াছিলাম, তাহার কিছুই এখানে দেখিতে পাইলাম না স্মিথ ! বস্তুতঃ, কার্ণের লাইব্রেরী এরূপ ওলট-পালট দেখিব, ইহা আদৌ মনে হয় নাই। এখানে ধস্তাধস্তির যে সকল প্রমাণ দেখিতেছি, তাহাতে আমি ভীষণ ধাঁধায় পড়িয়াছি !"

স্মিথ বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "ধাঁধায় পড়িয়াছেন ? কিন্তু এ সকল কি অকারণ কর্ত্তা !"

ব্লেক বলিলেন, "এখানে এরূপ দৃশ্য দেখিব—ইহা আমার কল্পনাতেও স্থান পায় নাই স্মিথ ! মাঠে যে প্রমাণ পাইয়াছিলাম,

তাহাতে সুস্পষ্টরূপেই প্রতিপন্ন হইয়াছিল যে, ওয়াইল্ড পশ্চাৎ হইতে আক্রান্ত হইয়া মস্তকে যে আঘাত পাইয়াছিল, তাহাই তাহার মৃত্যুর কারণ।"

স্মিথ বলিল, "হাঁ কর্ত্তা, আমারও সেইরূপই মনে হইয়াছিল।"

ব্লেক বলিলেন, "সেই আকস্মিক আঘাতে যদি তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদের এইরূপ ধস্তাধস্তি করিবার কোন সুযোগ জুটিবার কি কোনও সম্ভাবনা ছিল? আমার বিশ্বাস, এ সমস্তই কৃত্রিম প্রমাণ স্মিথ!"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু প্রথমে এখানে তাহাদের বিবাদে প্রবৃত্ত হইবার কি কোন সম্ভাবনা ছিল না?"

ব্লেক উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "থামো। পাগলের মত কি যে আবোল-তাবোল বকো, তার যদি মাথা-মুণ্ডু কিছু থাকে! কিন্তু আমি ভাবিতেছি, তোমার বুদ্ধি-বিবেচনা-শক্তি হঠাৎ কিরূপে লোপ পাইল? যদি এই কক্ষে সত্যই উহাদের লড়াই হইত, তাহা হইলে কার্ণকে হতবুদ্ধি হইয়া দশ দিক্ অন্ধকার দেখিতে হইত; তাহার চক্ষু হইতে নিদ্রা পলায়ন করিত, ইহা কি বুঝিতে পারিতেছ না?"

স্মিথ বলিল, "তাই ত কর্ত্তা! আপনি ঠিকই বলিয়াছেন। ওয়াইল্ড আক্রান্ত হইয়াছে—ইহা জানিতে পারিলে কার্ণকে সে সহজে ছাড়িত না।"

ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু ওয়াইল্ড পলায়ন করিত না, সাইমন কার্ণই পলায়ন করিত, বুঝিয়াছ? তোমাকে বলিতে বাধা নাই যে, কার্ণ এখন কি অবস্থায় আছে—তাহা জানিবার জন্য আমার এতই কৌতূহল হইয়াছে যে, ইচ্ছা হইতেছে—এই মুহূর্ত্তেই তাহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ কবি।"

তাহাব পর তিনি ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ডের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন তুমি কি করিবে লেন্নু!"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড মৃদু স্বরে বলিলেন, "আমাদের সম্মুখে একটিমাত্র পথ খোলা আছে—তাহা কি বুঝিতে পারিতেছেন না? ওয়াইল্ডের মৃতদেহ মাঠের ভিতর পড়িয়া আছে, তাহার পর ওয়াইল্ডের ঐ চিঠি, আর অন্যান্য প্রমাণও কার্ণের অপরাধেরই অকাট্য প্রমাণ, সুতরাং আমার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে মতান্তর থাকিতে পারে না, আমি তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে দোতলায় চলিলাম।"

ব্লেক বলিলেন, "আমরা যদি তোমার সঙ্গে যাই, তাহাতে তোমার আপত্তি আছে কি?"

লেনার্ড মুখভঙ্গি করিয়া বলিলেন, "আপনার এই কথার কোন অর্থ আছে কি? আপনি কি মনে করেন, পরলোকে আমি ওয়াইল্ডের অনুসরণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছি? কার্ণ এখন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। এ অবস্থায় আপনি ও স্মিথ আমার সঙ্গে থাকিয়া আমাকে সাহায্য করিলে আমি কতকটা নিশ্চিন্ত চিত্তে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারি।"

লেনার্ড উঠিয়া মিসেস্ ফিঞ্চের ঘাড় ধরিয়া অল্প একটু ঝাঁকানি দিলেন। মিসেস্ ফিঞ্চ নতমুখে বসিয়াছিল; অন্য কোন দিকে তাহার দৃষ্টি ছিল না। ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ডের করস্পর্শে সে সচকিত ভাবে আতঙ্কবিহ্বল দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল।

লেনার্ড মৃদু স্বরে বলিলেন, "শোন মিসেস্ ফিঞ্চ! এখন আমরা তোমার মনিবের সঙ্গে কোন কোন বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চাই। তুমি আমাদিগকে তাঁহার শয়ন-কক্ষে লইয়া চল।"

মিসেস্ ফিঞ্চ বিহ্বল স্বরে বলিল, "তিনি শয্যাত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই আপনারা যদি তাঁহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে তিনি ক্ষেপিয়া উঠিবেন, কেহ তাঁহাকে বিরক্ত করিলে তাঁহার ক্রোধের সীমা থাকে না; তাঁহার প্রকৃতি অতি ভীষণ হয়।"

লেনার্ড বলিলেন, "তাঁহার প্রকৃতি ভীষণ হওয়া দুশ্চিন্তার কথা বটে! কিন্তু আমরা সরকারের চাকর, তাঁহার খেয়ালের মর্য্যাদা রক্ষা করা আমাদের অসাধ্য। মিঃ কার্ণের নিকট আমরা প্রকৃত ঘটনার বিবরণ জানিতে চাই; তাঁহাকে চিন্তা করিবার অবসর না দিয়াই উহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিব। মিসেস্ ফিঞ্চ! তুমি উত্তেজিত না হইয়া আমাদিগকে সেখানে লইয়া চল,—ইহাতে তোমার কোনরূপ অনিষ্টের আশঙ্কা নাই।"

মিসেস্ ফিঞ্চ আতঙ্ক-বিহ্বল হইলেও ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ডের আদেশ অগ্রাহ্য করিতে পারিল না। সে তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া সিঁড়ির সাহায্যে দোতলায় উঠিয়া, একটি সুদীর্ঘ বারান্দা অতিক্রম করিয়া একটি কক্ষের দ্বারে উপস্থিত হইল, এবং লেনার্ডকে মৃদু স্বরে বলিল, "ইহাই আমার মনিবের শয়ন-কক্ষ।"

লেনার্ড বলিলেন, "তুমি দরজায় ধাক্কা দাও, তিনি কি বলেন শুনি। তিনি সাড়া দিলে যাহা করিতে হয় আমরাই করিব।"

মিসেস্ ফিঞ্চ রুদ্ধ দ্বারে ধাক্কা দিল; কিন্তু ভিতর হইতে কোন সাড়া পাইল না। পুনর্ব্বার পূর্ব্বাপেক্ষা জোরে ধাক্কা দেওয়া হইল, কিন্তু কক্ষ সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ!

এবার লেনার্ড দ্বারের হাতল ঘুরাইয়া দুই হাতে দ্বার ঠেলিলেন; দ্বার অর্গলরুদ্ধ ছিল না, সবেগে খুলিয়া গেল। লেনার্ড সঙ্গিদ্বয়সহ সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "যা ভাবিয়াছিলাম তাই! পাখী পিঞ্জর হইতে উড়িয়া গিয়াছে!"

তাঁহারা দেখিলেন, শয্যা শূন্য, পরিচ্ছদাধারের দেরাজ খোলা। সেই কক্ষের পার্শ্বস্থ কক্ষদ্বয়ও নির্জ্জন।

সাইমন কার্ণ পলাতক!

ষট্‌ত্রিংশ তরঙ্গ

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়

চীফ ডিটেক্‌টিভ-ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন, "আমি এইরূপই অনুমান করিয়াছিলাম; কিন্তু এ জন্য দুশ্চিন্তার কোন কারণ নাই। আমরা নীচের ঘরগুলিতে উহাকে খুঁজিয়া দেখিব, সেখানে দেখিতে না পাইলে আমি আফিসে ফিরিয়া চারি দিকে সন্ধান লইবারই ব্যবস্থা করিব। কার্ণ যদি আশা করিয়া থাকে, এইরূপ কৌশলে সে আমাদের চোখে ধূলা দিতে পারিবে—তাহা হইলে তাহার সেই আশা পূর্ণ হইবে না। সে আমাদের নিকট যথাযোগ্য শিক্ষা লাভ করিবে।"

মিসেস্ ফিঞ্চ সেই কক্ষের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া ছিল; ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ডের কথা শুনিয়া সে বলিল, "মনিব মহাশয় কি ঘরে নাই? তিনি সকালে উঠিয়াই আমাকে ডাকিয়া থাকেন, এবং আমাকে যাহা

করিতে হইবে—সে সম্বন্ধে আদেশ প্রদান করেন। আমার অজ্ঞাতসারে কোন দিন তিনি শয়ন-কক্ষ ত্যাগ করেন না।"

লেনার্ড বলিলেন, "তোমার মনিব প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পর যে নিয়মে কাজ করেন, আজ তাহার ব্যতিক্রম দেখিয়া তুমি বোধ হয় বিস্মিত হইয়াছ! কিন্তু আমার মনে হয়, মিঃ কার্ণ আজ সকালে ঐ সকল কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মনের স্থিরতা ছিল না। যদি আমরা তোমার মনিবকে এখানে খুঁজিয়া না পাই, তাহা হইলে আমি এখানে এক জন পাহারাওয়ালা মোতায়েন করিব। তাহাকে তোমার ভয় করিবার কোন কারণ নাই; সে তোমার কোন অনিষ্ট করিবে না, মিসেস্ ফিঞ্চ!"

মিসেস্ ফিঞ্চ ভয়কম্পিত স্বরে বলিল, "আপনি পাহারাওয়ালা মোতায়েন করিবেন কি এখানে—এই বাড়ীতে?"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "হাঁ, তাহাই করিব; ইহাতে কি তোমার বিস্ময়ের কোন কারণ আছে? পাহারাওয়ালা নিযুক্ত করিব এক জন নহে, দুই জন। এক জন লাইব্রেরীতে আর এক জন হল-ঘরে পাহারায় থাকিবে। মিসেস্ ফিঞ্চ, তোমাকে বলিতে বাধা নাই যে, তোমার মনিব মিঃ কার্ণ নরহত্যা করিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ হইয়াছে; এই জন্য আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি যে, তুমি সতর্ক ভাবে লোকের সহিত কথা কহিবে, এবং—"

এই সময় স্মিথ লেনার্ডের কথায় বাধা দিয়া ব্যস্ত ভাবে বলিয়া উঠিল, "ও কি! দেখুন, দেখুন!"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড মিসেস্ ফিঞ্চের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার কথা শুনিয়া তাহার মূর্চ্ছার উপক্রম হইয়াছে! কিন্তু তাহাকে ধরিবার প্রয়োজন হইল না; সে নিজের চেষ্টায় সামলাইয়া লইলেও আতঙ্কে তাহার মুখ চা-খড়ির ন্যায় সাদা হইয়া গেল! সে ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ডের মুখের দিকে বিহ্বল নেত্রে চাহিয়া রুদ্ধশ্বাসে বলিল, "কি বলিলেন? নরহত্যা করিয়াছেন—আমার মনিব?"

লেনার্ড দুই-একটি মিষ্ট কথায় তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিয়া স্মিথকে তাহার পাহারায় নিযুক্ত করিলেন; তাহার পর তিনি ব্লেকের সঙ্গে সেই অট্টালিকার বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। একতলায় যে সকল কক্ষ ছিল, তাহাদের অধিকাংশই অব্যবহার্য্য অবস্থায় পড়িয়া ছিল। অবশেষে তাঁহারা একটি ক্ষুদ্র উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন; কার্ণ সেই কক্ষে বসিয়া প্রাতর্ভোজন (breakfast) করিত; কিন্তু সেই কক্ষও খালি!

কার্ণের অন্যতম পরিচারিকা এলেন অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে একতলার বারান্দায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। তাহাকে কার্ণের সংবাদ জিজ্ঞাসা করা হইলে সে বলিল, তাহার মনিব নীচে আসেন নাই; সে খুব সকাল হইতেই হল-ঘরে উপস্থিত ছিল। তাহার মনিব নীচে আসিলে সে তাঁহাকে দেখিতে পাইত। সে তাঁহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল, কিন্তু তাহার আশা পূর্ণ হয় নাই।

ব্লেক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অন্য কোন দিকে দোতলা হইতে নীচে নামিবার সিঁড়ি নাই?"

এলেন বলিল, "আছে বৈ কি মহাশয়! দোতলা হইতে নামিবার-উঠিবার সিঁড়ি পিছন দিকেও আছে; কিন্তু আমাদের মনিব সেই সিঁড়ি ব্যবহার করেন না। আমরা দাস-দাসীরা সেই সিঁড়ি দিয়া উঠা-নামা করি।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বলিলেন, "যে কারণেই হউক, তোমাদের মনিবকে আজ সেই সিঁড়িই ব্যবহার করিতে হইয়াছিল।—ব্লেক, আসুন, চারি দিক্ আমরা সতর্ক ভাবে পরীক্ষা করি। পিছনের সেই সিঁড়িও দেখা দরকার।"

অতঃপর তাঁহারা পরিচারকবর্গের বাস-কক্ষগুলি পরীক্ষা করিয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী সোপানশ্রেণীর নিকট উপস্থিত হইলেন। নীচে যেখানে সিঁড়ির শেষ হইয়াছিল, তাহার অদূরে একটি দ্বার ছিল। সেই দ্বারের মাথা ও চারি ধার কতকগুলি লতায় আচ্ছন্ন ছিল।

সেই দ্বারের বাহিরে একটি ক্ষুদ্র প্রান্তর লক্ষিত হইল; প্রান্তরটির এক প্রান্তে 'টেনিস্-কোর্ট'। এক জন মালি সেই দ্বারের বাহিরে বসিয়া কাজ করিতেছিল।

লেনার্ড তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই—ঠিক উত্তর দাও। তুমি আজ সকালে তোমার মনিব মিঃ কার্ণকে দেখিতে পাইয়াছিলে কি?"

মালি বলিল, "হাঁ মহাশয়, আজ সকালে তাঁহাকে দেখিয়াছি বৈ কি!"

ব্লেক উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "কি বলিলে? আজ তাঁহাকে দেখিয়াছ! কখন দেখিয়াছ!"

মালি বলিল, "হাঁ, প্রায় দশ মিনিট আগে মহাশয়! তিনি ঐ পথ দিয়া আসিয়া বাহিরে গিয়াছেন। আমার বিশ্বাস, বাগানের পিছনের দেউড়ি দিয়াই তিনি চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার হাতে একটা স্যুটকেস ছিল; তাহাও আমার নজরে পড়িয়াছিল।"

এ কথা শুনিয়া লেনার্ড ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমরাও ঐ রকমই মনে করিয়াছিলাম! কার্ণ হয় ত আমাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইয়াছিল; সব কথা সে বুঝিতে না পারিলেও তাহার মনে সন্দেহ হওয়াতেই ধরা পড়িবার ভয়ে এই দিক্ দিয়া লম্বা দিয়াছে!"

ব্লেক কোন মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন; তাহা দেখিয়া লেনার্ড বলিলেন, "আমার কথা শুনিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিবার কারণ?"

ব্লেক অবিশ্বাসভরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "কার্ণকে আজ সকালে এখানে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল, ইহা শুনিয়া বিস্ময় দমন করিতে পারি নাই! আমি ঐরূপ প্রত্যাশা করি নাই।"

অতঃপর তিনি মালির মুখের দিকে চাহিয়া দৃঢ় স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "ঐ পথ দিয়া তুমি যাঁহাকে বাহিরে যাইতে দেখিয়াছ, তিনিই যে তোমার মনিব—এ কথা কি তুমি নিঃসন্দেহে বলিতে পার?"

মালি বলিল, "হাঁ, তিনিই যে আমার মনিব মিঃ কার্ণ—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। অন্য লোক দেখিয়া তাহাকে মিঃ কার্ণ বলিয়া আমার ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই।"

ব্লেক বলিলেন, "তোমার ঐরূপ ধারণা হইতেও পারে; কিন্তু তিনি কি সেই সময় তোমার সঙ্গে কথা কহিয়াছিলেন?"

"না মহাশয়, তিনি কোন কথা বলেন নাই।"

ব্লেক বলিলেন, "তিনি মুখ তুলিয়া তোমার দিকে চাহিয়াছিলেন?"

মালি বলিল, "আপনি এ কথা জিজ্ঞাসা করার এখন মনে হইতেছে, তিনি আমার দিকে ফিরিয়া চাহেন নাই। ইহা একটু অদ্ভুত বলিয়াই মনে হইতেছে! আমার সঙ্গে দেখা হইলে তিনি আমাকে দুই-এক

কথা না বলিয়া মুখ বুজিয়া চলিয়া যান না; তবে তখন তিনি খুব ব্যস্ত ছিলেন বলিয়াই মনে হয়, তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইতেছিলেন।"

ব্লেক আর কোন কথা না বলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ব্লেকের মনের ভাব বুঝিতে না পারায় ইন্স্পেক্টর লেনার্ড কৌতুহল-ভরে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ব্যাপার কি ব্লেক? আপনি কার্ণকে কি তাহার বাড়ীতে দেখিবার আশা করেন নাই? কেন, ইহার কারণ কি?"

ব্লেক লেনার্ডের সহিত বাড়ী ফিরিবার সময় তাঁহাকে বলিলেন, "সে কথা তোমাকে পরে বলিব লেনার্ড! কিন্তু তোমাকে ইঙ্গিতে এইটুকু জানাইয়া রাখিতেছি—তুমি যে ঘটনা সত্য মনে করিয়া তাহাতে হস্তক্ষেপণ করিয়াছ, তাহা সত্য বলিয়া ধারণা করিলে ভুল হইবে। তদন্ত কার্য্যে সত্যই আমি খুশী হইতে পারি নাই—লেনার্ড!"

লেনার্ড সুস্পষ্ট স্বরে বলিলেন, "আপনি বলিতেছেন কি? আপনার মুখের উপর নাকটির অস্তিত্ব যেরূপ সত্য, ইহাও সেইরূপই সত্য। আপনি যাহা বলেন, তাহার অধিকাংশই সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, এবং যাহা আমার দৃষ্টি অতিক্রম করে, আপনি তাহা অনেক সময় সুস্পষ্টরূপেই দেখিতে পান। কিন্তু আমি জোর করিয়া বলিতে পারি—এবার আমারই ধারণা সত্য, আপনিই ভুল করিয়াছেন! আমি এখন ইয়ার্ডে ফিরিয়া যাইতেছি—কার্ণকে ধরিবার জন্য সেখান হইতে জাল-বিস্তার করিব। সেই ফাঁদে তাহাকে ধরা পড়িতেই হইবে। আমি এখান হইতে টেলিফোনে সংবাদ পাঠাইব, এবং আশা করি, অবিলম্বেই তাহাকে ধরিতে পারিব।"

ইহার কুড়ি মিনিট পরে ব্লেক স্মিথসহ তাঁহার মোটর-কার গ্রে-প্যান্থারের দিকে অগ্রসর হইলেন। স্মিথকে তখন অত্যন্ত নিরুৎসাহ দেখাইতে লাগিল।

স্মিথ ব্লেককে বলিল, "কর্ত্তা, আমরা কি আর বেশী কিছুই করিতে পারি না? আমার মনে হইয়াছিল, আপনি কার্ণের অনুসরণ করিতে কৌতুহল বোধ করিবেন।"

ব্লেক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "সে ভার আমরা অনায়াসেই লেনার্ডের হাতে ছাড়িয়া দিতে পারি। কাজের ভিতর সে একেবারে ডুবিয়া গিয়াছে! মৃতদেহটি সে মর্গ-ঘরে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে; এবং স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী আমদানী করিয়া ঐ বাড়ীর পাহারার ভার তাহাদের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছে। তাহার পর সে আরও কত ভাবে উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছে—তাহা নির্ণয় করা কঠিন! আমরা সেই সকল গণ্ডগোলে মিশিতে চাহি না; আমরা তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিয়া আহারটা সকালেই শেষ করিব মনে করিতেছি।"

স্মিথ ব্লেকের মুখের দিকে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "কর্ত্তা, এই ব্যাপার সম্বন্ধে কোন কোন বিষয় আপনি আমার নিকট প্রকাশ করেন নাই; কিন্তু সে সকল বিষয় কি? আপনার কি ধারণা—কার্ণ উহাকে হত্যা করে নাই?"

ব্লেক বলিলেন, "যদি সরল ভাবে তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, তাহা হইলে বলিব—আমার ধারণা ঐরূপই বটে।"

স্মিথ বলিল, "তবে কি আপনি মনে করেন—বজ্রাঘাতেই ওয়াইল্ড নিহত হইয়াছিল?"

ব্লেক সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, উহাও আমি মনে করি না।"

স্মিথ উত্তেজিত স্বরে বলিল, "আপনি ইহাও মনে করেন না, উহাও মনে করেন না; তবে কি মনে করেন কর্ত্তা! ওয়াইল্ড যদি বজ্রাঘাতে না মরিয়া থাকে, এবং কার্ণ কর্ত্তৃকও নিহত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে কিরূপে সে পঞ্চত্ব লাভ করিল?"

ব্লেক বলিলেন, "সে সত্যই পঞ্চত্ব লাভ করিয়াছে কি না, তাহাই ভাবিতেছি স্মিথ!"

স্মিথ সবিস্ময়ে বলিল, "দেখুন কর্ত্তা, যদি সত্যই এরূপ কোন বিষয় থাকে—যাহা—"

ব্লেক স্মিথের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "ও-সব কথা এখন কিছু কালের জন্য মুলতুবি রাখ স্মিথ! আমার বিশ্বাস, এই ব্যাপারে কিছু কিছু বিস্ময়ের অবকাশ আছে।"

স্মিথ বলিল, "কর্ত্তা, আপনার কথা দুর্ব্বোধ্য; আমি রহস্যভেদ করিতে পারিলাম না! আপনি সকল কথা খুলিয়া বলিতে পারিবেন না? ইহার ফল যাহাই হউক, সার রডনে ড্রুমণ্ড এখন নিরাপদ। তাঁহার শত্রুদের মধ্যে শেষ শত্রু কার্ণই এখন অবশিষ্ট আছে; কিন্তু সে এখন এতই বিব্রত যে, সার রডনের প্রতি অত্যাচার করিবে, আপাততঃ সে সুযোগ তাহার নাই।"

ব্লেক বলিলেন, "সার রডনে এখন দেশে নাই; তিনি বায়ু পরিবর্তনের জন্য সুইজার্ল্যাণ্ডের হ্রদ-অঞ্চলে চলিয়া গিয়াছেন। সুখের বিষয় এই যে, তিনি আমার উপদেশ অনুসারে গোপনে দেশত্যাগ করিয়াছেন। আমার মনে হয়, তাঁহার জন্য উৎকণ্ঠার আর কোন কারণ নাই; এখন নিশ্চিন্ত চিত্তে আমরা বিশ্রাম করিতে পারি।"

ব্লেক আর কোন কথা না বলিয়া স্মিথসহ তাঁহার মোটরে বেকার ষ্ট্রীটের বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিলেন। ব্লেক যখন তাঁহার উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন—তখন বেলা এগারটা বাজিয়া গিয়াছিল।

ব্লেক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিতেই টেবলের সম্মুখস্থ আরাম-কেদারা হইতে পরিচিত কণ্ঠে সম্ভাষণ শুনিলেন, "আসুতে আজ্ঞা হোক! আপনার ন্যায় সুহৃদের দর্শন-কামনায় অনেকক্ষণ ধরিয়া বসিয়া আছি।"

ব্লেক কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করিয়া চেয়ারের দিকে চাহিয়া দেখিতে পাইলেন, ওয়াইল্ড তাঁহার চুরুটের বাক্স হইতে একটি চুরুট বাহির করিয়া লইয়া নিশ্চিন্ত ভাবে ধূমপানে রত!

স্মিথ ওয়াইল্ডকে সেই স্থানে সেই ভাবে উপবিষ্ট দেখিয়া এতই বিস্মিত হইল যে, সে দুই হাত দূরে লাফাইয়া পড়িল! তাহার পর উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল, "কি আশ্চর্য্য, ওয়াইল্ড এখানে আসিয়া বসিয়া আছে! কর্ত্তা, আপনি কি উহাকে আপনার প্রতীক্ষায় ঐ ভাবে বসিয়া-থাকিতে দেখিয়া—"

ব্লেক তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "একবিন্দুও বিস্মিত হই নাই স্মিথ! তবে এখন উহাকে এখানে দেখিতে পাইব, এ আশা করি নাই বটে! কিন্তু যাহা আশা করা যায় না, তাহাও অনেক সময় ঘটিতে দেখা যায়।"

ওয়াইল্ড বলিল, "আমার মনে হইয়াছিল, আপনি আমার স্নায়ুর

দৃঢ়তার পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইবেন, কিন্তু আপনার সঙ্গে এ ভাবে আমার দেখা করিতে আসা বিচিত্র ব্যাপার বলিয়া নিশ্চিতই আপনার মনে হয় নাই। আমার আশা ছিল—আমাকে এখানে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আপনি সাদরে আমার অভ্যর্থনা করিবেন।"

স্মিথ কৌতূহলভরে বলিল, "কাহার অভ্যর্থনা করিবেন? যে ব্যক্তি মরিয়া গিয়াছে—তাহারই? তুমি যে যথেষ্ট আয়োজন করিয়া পরম সমারোহে শিঙা ফুঁকিয়াছ—এ বিষয়ে কি বিন্দুমাত্রও সন্দেহ আছে?"

ওয়াইল্ড সংযত স্বরে বলিল, "এখন যে আমি জীবিত দেহে বর্ত্তমান—ইহার অকাট্য প্রমাণ তোমার সম্মুখেই জাজ্বল্যমান! আমার মৃত্যু সম্বন্ধে তোমাকে নিরাশ করিতে হইল স্মিথ!—এ জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত।"

স্মিথ বলিল, "তুমি কি বলিতে চাও—তোমার মৃত্যু-সংবাদে আমি খুসী হইয়াছিলাম? ভুল, প্রকাণ্ড ভুল! তুমি বাঁচিয়া আছ দেখিয়া আমি সত্যই অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি; কিন্তু ব্যাপারটা কি, তাহা আমি আদৌ ধারণা করিতে পারি নাই! তোমাকে সশরীরে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছি—তোমার মৃত্যু হয় নাই; কিন্তু উইম্বলডনের মাঠে যাহার মৃতদেহ দেখিয়া আসিলাম, সে তবে কে? কাহার মৃতদেহ ওখানে দন্তবিকাশ করিয়া পড়িয়া আছে? আমার বিশ্বাস, তুমি কর্ত্তার চোখে ধূলা দেওয়ার জন্য ইচ্ছা করিয়াই কি একটা অদ্ভুত চাল চালিয়াছ!"

ওয়াইল্ড বলিল, "কি বলিলে? আমি উঁহাকে প্রতারিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি? কেহ কি কোন কৌশলে মিঃ ব্লেককে প্রতারিত করিতে পারে? উনি প্রতারিত হইয়াছেন—এরূপ ধারণা উঁহারও হইয়াছে কি?—অসম্ভব!"

ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "আমি স্বীকার করিতেছি—প্রথমটা আমি একটু ধাঁধায় পড়িয়াছিলাম; কিন্তু সেই বিভ্রম দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। কিন্তু তুমি কেন এখানে আসিয়াছ? কার্ণের মৃত্যু দৈবদুর্ঘটনা হইলেও—তোমার নিজের কার্য্যধারা—"

ওয়াইল্ড তাঁহার কথায় বাধা দিয়া সবিস্ময়ে বলিল, "কার্ণের মৃত্যু!—আপনি এ কি কথা বলিতেছেন মিঃ ব্লেক!"

স্মিথ ব্লেকের মুখের দিকে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া বিস্ময়ভরে বলিল, "কি বলিলেন কর্ত্তা! কার্ণ মরিয়াছে?"

ব্লেক স্মিথকে বলিলেন, "সেই মৃতদেহ আমাকে প্রতারিত করিতে পারে নাই; তবে উহা ওয়াইল্ডের মৃতদেহ বলিয়াই প্রথমে আমার ভ্রম হইয়াছিল বটে!"

ওয়াইল্ড বলিল, "আপনার ভ্রম হইয়াছিল! তবে উহা সত্য বলিয়া আপনি বিশ্বাস করেন নাই? আমার পক্ষে ইহা আনন্দের সংবাদ।"

ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু অবশেষে আমার ধারণা হইয়াছিল—এই ব্যাপারে যথেষ্ট চাতুর্য্য প্রদর্শিত হইয়াছে।"—অতঃপর তিনি ওয়াইল্ডের মুখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া অপেক্ষাকৃত কঠোর স্বরে বলিলেন, "দেখ ওয়াইল্ড, অতঃপর কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমি তোমাকে একটা সোজা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই। আশা করি, তুমি সরল ভাবে আমার প্রশ্নের উত্তর দিবে, অর্থাৎ ধাপ্পা দেওয়ার চেষ্টা করিবে না।"

ওয়াইল্ড বলিল, "হাঁ, নিশ্চয়ই ঠিক উত্তর দিব; আপনার কি বলিবার আছে বলুন।"

ব্লেক দৃঢ় স্বরে বলিলেন, "তুমি কি সাইমন কার্ণকে হত্যা করিয়াছ?"

এ কথা শুনিয়া ওয়াইল্ডের মুখ মুহূর্ত্তের মধ্যে একটা অতর্কিত বেদনায় ম্লান হইল; তাহার পর সে ব্যথিত স্বরে বলিল, "দেখুন মিঃ ব্লেক, আমার ধারণা ছিল—আমাকে আপনি অন্য সকলের অপেক্ষা বেশ ভাল করিয়াই জানেন! আপনি কি প্রথম হইতেই জানেন না—নরহত্যায় আমার ঘোর বিতৃষ্ণা, এবং ইহাই আমার অন্তরের খাঁটি কথা?"

ব্লেক বলিলেন, "তবে কি কার্ণের মৃত্যু আকস্মিক?"

ওয়াইল্ড বলিল, "সত্যই কি তাহার মৃত্যু হইয়াছে? আমি তাহা কিরূপে জানিব?"

স্মিথ সবিস্ময়ে বলিল, "কি আশ্চর্য্য! তবে কি মৃত ব্যক্তি সত্যই কার্ণ, অন্য কেহ নহে?"

ব্লেক বলিলেন, "আমার ত সেইরূপই ধারণা।"

অনন্তর তিনি ওয়াইল্ডকে বলিলেন, "ওয়াইল্ড, তুমি গত রাত্রে কার্ণের বাড়ীতে উপস্থিত ছিলে। সেখানে রীতিমত যুদ্ধ হইয়াছিল। তোমার দেহের শক্তি অসাধারণ; সুতরাং সেই যুদ্ধে তুমি যে জয়লাভ করিবে, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। তাহার পর তুমি যে সাজানো প্রমাণ রাখিয়াছিলে, তাহা হইতে সহজেই প্রতিপন্ন হইয়াছিল, তুমি স্বয়ং নিহত হইয়াছিলে, এবং কার্ণ তোমাকে হত্যা করিয়াছিল। তুমি তোমার জোগাড়-যন্ত্র শেষ করিয়া কার্ণের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলে, এবং সম্পূর্ণ প্রশান্তচিত্তেই তাহা দখল করিয়া বসিয়া ছিলে!"

স্মিথ বলিল, "আশ্চর্য্য! এই সহজ ব্যাপারটা আমার মাথায় আসে নাই!"

ওয়াইল্ড হাসিয়া বলিল, "কিরূপে তোমার মাথায় আসিবে? তুমি গোয়েন্দাগিরিতে মিঃ ব্লেকের সাকরেদী করিলেও কোনও দিন কি প্রখর কল্পনা-শক্তির পরিচয় দিতে পারিয়াছ?"

ব্লেক বলিলেন, "এ সকল বিষয় সম্বন্ধে উপর উপর আলোচনা শুনিতে মন্দ নয়; কিন্তু ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ! যাহা হউক, তুমি এখন পর্য্যন্ত আমার প্রশ্নের উত্তর দাও নাই ওয়াইল্ড! যদি আমার প্রশ্নে তুমি মনে আঘাত পাইয়া থাক, তাহা অবশ্যই অত্যন্ত দুঃখের বিষয়,—কিন্তু—"

ওয়াইল্ড তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "আমি কার্ণকে হত্যা করিয়াছি কি না—ইহাই যদি আপনার প্রশ্ন হয়,—তাহা হইলে আমার সুস্পষ্ট উত্তর এই যে,—আমি কার্ণকে হত্যা করি নাই।"

ব্লেক বলিলেন, "তবে কি তোমার সহিত যুদ্ধে সে হঠাৎ নিহত হইয়াছিল?"

ওয়াইল্ড বলিল, "ধীরে, মিঃ ব্লেক, ধীরে! এখানে কিছু বিভ্রাট ঘটিয়াছিল বটে, কিন্তু আপনি যথেষ্ট সতর্ক না হইলে সেই ব্যাপারের সহিত আমাকে জড়াইয়া ফেলিবেন! মিঃ ব্লেক, আপনার কি ধারণা, কার্ণের মৃত্যু হইয়াছে? অথবা তাহার মৃত্যুর সহিত আমার কোন সম্বন্ধ আছে?"

ব্লেক বলিলেন, "আমার ধারণা, তুমি গত রাত্রে কার্ণের বাড়ীতে

গমন করিয়াছিলে, তাহার পর যে কারণেই হউক, তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। তুমি তাহার মৃতদেহ ঐ মাঠে লইয়া-গিয়া এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলে, যেন বজ্রাঘাতেই তাহার মৃত্যু হইয়াছিল—এই ধারণা লোকের মনে বদ্ধমূল হয়! এতদ্ভিন্ন, মৃত ব্যক্তি যে তুমিই, এইরূপ ভ্রম জন্মাইবারও ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলে।"

ওয়াইল্ড বলিল, "আমি যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে মরিতে পারি—এইরূপই আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল।"

ব্লেক বলিলেন, "এক মিনিট অপেক্ষা কর। তোমার কার্য্য-সূচির ঐ পর্য্যন্ত শেষ করিয়া তুমি কার্ণের বাড়ীতে ফিরিয়া গিয়াছিলে এবং তাহার ঘরটি অধিকার করিয়াছিলে। তাহার পর আজ সকালে তুমি বাহিরে চলিয়া গিয়াছিলে। সেই সময় তোমার ব্যবহারে কার্ণের বাগানের মালিকেও প্রতারিত হইতে হইয়াছিল।"

ওয়াইল্ড তাহার মুখের অর্দ্ধদগ্ধ চুরুটটা ফেলিয়া-দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; তাহার পর ব্লেককে বলিল, "দেখুন মিঃ ব্লেক, আমি আপনাকে পরাস্ত করিয়া অহঙ্কার গর্ব্ব প্রকাশ করিতে চাহি না; কিন্তু আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, এই ব্যাপারে আপনাকে বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতে হইয়াছে। এই ব্যাপার সম্বন্ধে আপনি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্তই ভুল করিয়া আসিয়াছেন। আপনার যুক্তি অভ্রান্ত হইলেও কার্য্যতঃ আপনি ভ্রম করিয়াছেন!—কার্ণের সত্যই মৃত্যু হয় নাই।"

ব্লেক বিস্মিত ভাবে বলিলেন, "তাহার মৃত্যু হয় নাই! তুমি বলিতেছ কি?"

ওয়াইল্ড দৃঢ়তার সহিত বলিল, "হাঁ, আমি ঠিকই বলিয়াছি, তাহার মৃত্যু হয় নাই। আজ সকালে তাহার বাড়ীতে কি কাণ্ড ঘটিয়াছিল, তাহা আমি জানিতে পারি নাই; বিশেষতঃ, তাহার বাগানের মালির সহিত এই ব্যাপারের কি সম্বন্ধ, তাহাও আমার অজ্ঞাত। তবে সে যদি বলিয়া থাকে—সেই সময় সে কার্ণকে দেখিতে পাইয়াছিল, তাহা হইলে সে সত্যই তাহাকে দেখিয়াছিল। সে নিশ্চিতই আমাকে দেখিতে পায় নাই, কারণ, সেই সময় আমি কার্ণের বাড়ীর কাছেও ছিলাম না।"

ব্লেক বলিলেন, "তাহা হইলে সেই মৃতদেহটা?"

ওয়াইল্ড মাথা নাড়িয়া বলিল, "সে বেচারাকে আমি চিনি না।"

ব্লেক বলিলেন, "তুমি নিশ্চিতরূপে বলিতে পার—সেই ব্যক্তি সাইমন কার্ণ নহে?"

ওয়াইল্ড বলিল, "হাঁ, ঐ কথা আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি; সে সত্যই সাইমন কার্ণ নহে। আপনার জানিবার আগ্রহ হইলে সকল ব্যাপার আদ্যোপান্ত আপনাকে খুলিয়া বলিতে পারি। আর সত্য কথা বলিতে কি, আপনাকে তাহা বলিবার জন্যই আমাকে এখানে আসিতে হইয়াছে। কিছু কাল পূর্ব্বে আমি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে টেলিফোন করিয়াছিলাম, এবং আমার পক্ষে ধৃষ্টতা হইলেও টেলিফোনে আমি আপনার নাম ব্যবহার করিয়াছিলাম মিঃ ব্লেক! বলা বাহুল্য, টেলিফোনে আমি আপনার কণ্ঠস্বরের অনুকরণ করিয়াছিলাম। আমি ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ডকে ডাকিয়া তাঁহার সাড়া পাইয়াছিলাম। তাহার পর শুনিলাম, কার্ণ পলায়ন করিয়াছে; কিন্তু তাহা আমার ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত, তাই অগত্যা আমাকে এখানে আসিতে হইয়াছে।"

স্মিথ নিস্তব্ধ ভাবে সকল কথা শুনিয়া মাথা চুলকাইয়া বলিল, "ইহা আমারও ধারণার অতীত; আমার মাথা ঘুরিতেছে!"

ব্লেক তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া ওয়াইল্ডকে বলিলেন, "তোমার মতলবটা কি বল—শুনি। আমি তোমাকেই হত্যাকারী বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলাম; এই ভ্রমের জন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু শেষে আমার মনে হইয়াছিল, মৃত্যুটা প্রকৃতপক্ষে আকস্মিক—দৈবাৎ ঘটিয়াছিল। ইহার ফলে আমার নির্ম্মিত তাসের প্রাসাদ চূর্ণ হইয়াছে!"

ওয়াইল্ড বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া বলিল, "সময়ে সময়ে আমাদের সকলেরই ভ্রম হইয়া থাকে; এমন কি, রবার্ট ব্লেকের ন্যায় বহুদর্শী, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিও ভুল করিয়া বসেন! কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। আমি বাজি রাখিয়া বলিতে পারি— আপনি ভ্রমজালে বিজড়িত হইলেও অবশেষে বুদ্ধিমানের মত তাহা চাপা দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।"

ব্লেক ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "সবই শেষে চাপা দিতে পারিলাম কৈ? অনেক ভুলই চাপা দিতে পারি নাই।"

ওয়াইল্ড বলিল, "আপনার শুনিবার ইচ্ছা থাকিলে এই কাহিনীর আগাগোড়া আপনাকে শুনাইতে পারি,—আর সেই জন্যই এখানে আসিয়াছি—এ কথা ত পূর্ব্বেই আপনাকে বলিয়াছি। আমার কথা-গুলি সব শুনিলেই আপনার সকল ভ্রম দূর হইবে; তবে মোটামুটি এই মাত্র বলিতে পারি যে, সাইমন কার্ণকে মুঠায় পুরিব—ইহাই আমার সঙ্কল্প—সেই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করা যতই কঠিন হউক। আমি ভাবিয়াছিলাম, আমি তাহাকে কায়দায় পাইয়াছি; কিন্তু সেই ধূর্ত্তটা আমাকে ফাঁকি দিয়াছিল! আমার ধারণা হইয়াছিল, পুলিশ তাহাকে হাতে পাইবে না। আমাকে হত্যা করিবার অভিযোগে পুলিশ তাহার বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারি করিয়াছে—তাহা কি আপনি জানেন না? কিন্তু সে যাহাই হউক, পুলিশ কখন তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবে না; তবে আমরা যে তাহাকে ধরিতে পারিব—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।"

মিঃ ব্লেক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "এ সম্বন্ধে অন্যান্য কথার আলোচনার পূর্ব্বে তোমার গল্পটার আগাগোড়া শুনিতে চাই। এই ব্যাপারে আমাদের মিশিবার ইচ্ছা নাই।"

স্মিথ বলিল, "মিশিবার কথা কি বলিতেছেন? রহস্য-পাথারে পড়িয়া আমি যে ডুবিয়া মরি! একগাছা দড়ি ফেলিয়া দিন কর্ত্তা! তাহাই ধরিয়া কূলে উঠিবার চেষ্টা করি।"

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

বর্ত্তমান যুদ্ধের আর্থিক বৈশিষ্ট্য

বর্ত্তমান যুগের এই পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হইতেছে; ইহার পূর্ব্বে অন্য কোন যুদ্ধে ঠিক এই শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য দেখা যায় নাই। সকল বৈশিষ্ট্যের বিষয় বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য নহে; এই যুদ্ধে এ দেশের লোকের অর্থকষ্ট কিরূপ দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে, এখানে তাহারই আলোচনা করিব। ঐ কষ্ট ক্রমশঃ চরমে উঠিয়াছে। সর্ব্বপ্রধান কষ্ট এই যে, যে দুইটি দ্রব্য মানুষের পক্ষে অপরিহার্য্য, তাহারই অত্যন্ত অভাব,—অন্ততঃ অনেকের পক্ষে উহাদের অতি উৎকট অভাব অনুভূত হইতেছে। বলা বাহুল্য, সেই দুইটি দ্রব্য—অন্ন ও বস্ত্র। এই দুইটি জিনিসের এমন অভাব—সৃষ্টির আদি-কাল হইতে এ পর্য্যন্ত আর কখনও ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এ দেশে খাদ্যশস্যের কিরূপ অভাব হইয়াছে, পূর্ব্বে বহু বার সে কথা আলোচিত হইয়াছে। কোন কোন জিনিসের প্রকৃত অভাব না হইলেও জনসাধারণ তাহা সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না। বাজারে তাহার আমদানী হইলেও যেন হঠাৎ লোপ পাইতেছে! উদাহরণস্বরূপ চিনির কথা বলা যাইতে পারে। চিনি যাহা আমদানী হইতেছে, তাহা মিলিতেছে না। ক্রেতারা পয়সা হাতে লইয়া, যেন ভিক্ষাপাত্র-ধারী ভিখারীর মত সরবরাহকারী দোকানদারের দোকানের সম্মুখে 'হা প্রত্যাশায়' দাঁড়াইয়া আছে! বালক ও কিশোররা দিন দিন জিনিস না পাইয়া ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া যাইতেছে। পর্দ্দানশীন বিধবা, সামর্থ্যহীন আতুর প্রভৃতির পক্ষে চিনি সংগ্রহ করা ত অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। কেরোসিন তেল সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা যায়; তবে কেরোসিনের সত্যই অভাব হইয়াছে। কেরোসিন তেল এ দেশে আমদানী হইবার পূর্ব্বে লোক প্রদীপে সর্ষপ বা রেড়ির তেল জ্বালাইত; এখন তাহাই বা মিলিতেছে কৈ? বাজারে কোন জিনিস আমদানী হইলেও তাহা মিলিতেছে না!—সেই জন্য এবারকার এই বাজার "আঁধারে বাজার" (Black market) নামে অভিহিত হইয়াছে। যুদ্ধের সুযোগে, খরিদদারের 'গলা-কাটা' ব্যবসায়ীরা বাজারের সমস্ত মালই সাফাই হাতে চাপিয়া রাখিতেছে, বাহির করিতেছে না। উহারা ভবিষ্যতে আরও চড়া-দরে মাল বেচিয়া লক্ষপতি হইবার সুখস্বপ্নে বিভোর! সরকার ইহার প্রতিকারে অকৃতকার্য্য হইয়া অযোগ্যতারই পরিচয় দিতেছেন; কিন্তু এই অব্যবস্থা গরীব গৃহস্থের পক্ষে প্রাণান্তকর।

এই যুদ্ধের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির আর একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, পণ্যের একমাত্র উপাদানের অভাব না হইলেও তাহা হইতে উৎপন্ন পণ্য প্রায় অপ্রাপ্য বা অতিশয় দুষ্প্রাপ্য হইতেছে। দেশের মাটি নিহত বীরপুরুষদের কবর ঢাকিবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত না হইলেও মেটে-হাঁড়ি-কলসীর মূল্য অসঙ্গত ভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছে! অন্য উদাহরণস্বরূপ বস্ত্রের কথাও বলা যাইতে পারে। কার্পাসের দর যদিও চড়ে নাই, তথাপি কাপড়ের দর তিন গুণ বা চতুর্গুণ বাড়িয়াছে। সরকারের কল্পিত 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ' কল্পলোক হইতে এই মর্ত্তধামে আর অবতরণ করিল না। কাপড়ে আছে তুলা আর মজুরী; এই মজুরীর হার অবশ্যই বাড়িয়াছে, কিন্তু এত অধিক বাড়ে নাই—যে, সে জন্য কাপড়ের মূল্য ক্রমশঃ চারি গুণ বাড়িতে পারে। কার্পাসের দর বরং মধ্যে কমিয়াছিল, এখন ত প্রায় সমান আছে। বিশেষজ্ঞদিগের প্রদত্ত হিসাবে দেখা যায় যে, বর্ত্তমান যুদ্ধের ঠিক পূর্ব্বে কার্পাস তুলার দর যাহা ছিল, তাহার শঙ্ক-সংখ্যা (Index number) যদি এক শত ধরা হয়, তাহা হইলে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে উহার পাইকারী দর ৮৮ টাকা হইয়াছিল; অর্থাৎ শতকরা বারো টাকা হারে কার্পাস তুলার দর কমিয়া গিয়াছিল! ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ঐ তুলার দর আরও নামিয়া ৬৭ টাকা দাঁড়ায়; অর্থাৎ শতকরা ৩৩ অংশ কমিয়া গিয়াছিল। বলা বাহুল্য, ইহা কার্পাস তুলার পাইকারী দর। তুলা উৎপাদনকারী কৃষকরা এবং তাহাদের দেশের লোকরা এক দিকে তুলা বিকাইতেছে না বলিয়া কাঁদিয়াছে, আর এক দিকে বস্ত্রাভাবে লজ্জা নিবারণ করা অসম্ভব মনে করিয়াছে! ইহার পর কার্পাস তুলার দর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। গত জুলাই মাসে (আষাঢ় শ্রাবণ মাসে) তুলার শঙ্ক-সংখ্যা ১০৪এর অঙ্কে উঠে; অর্থাৎ যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে তুলার যে দর ছিল প্রায় তাহাই হয়, কেবলমাত্র শতকরা ৪ টাকা-হারে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু কাপড়ের দর ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাইয়া আসিতেছে। কার্পাস-তুলা উৎপাদক চাষীরা যে পরিমাণ কার্পাস-তুলা (পাইকারী দরে) বিক্রয় করিয়া পূর্ব্বে এক জোড়া কাপড় কিনিতে পারিত, এখন তাহার চতুর্গুণ পরিমাণ তুলা বেচিয়াও এক জোড়া কাপড় কিনিতে পারিতেছে না! অবশ্য তাহাকে খুচরা দরেই কাপড় কিনিতে হয়; সুতরাং তাহাদের কষ্ট কিরূপ, তাহা সহজেই অনুমেয়। এখানে এই একটা বিষয় লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, এই দুর্মূল্যের বাজারে সকল জিনিসের মূল্যই বৃদ্ধি পাইয়াছে,—কেবল কার্পাস-তুলা এবং পাটের মূল্য হ্রাস পাইয়াছে। কার্পাস-তুলার মূল্যহ্রাসের প্রধান কারণ, বিদেশে এই পণ্যের রপ্তানীর হ্রাস। এই তিন বৎসরে উহার রপ্তানী কিরূপ হ্রাস হইয়াছে, তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

খৃষ্টাব্দ	রপ্তানীর পরিমাণ
১৯৩৯—৪০	২১,৩৮,০০০, গাঁইট
১৯৪০—৪১	২১,৬৭,০০০ "
১৯৪১—৪২	১৪,১৬,০০০ "

রপ্তানীর অসুবিধা এবং অভাবের জন্য পাটের দরও কমিয়াছে—এ স্থলে সে কথা আলোচ্য নহে।

যুদ্ধের জন্য বিদেশ হইতে এ দেশে বস্ত্র আমদানী হইতেছে না সত্য, কিন্তু দেশীয় কলে অনেক অধিক বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে। ইহারও হিসাব উদ্ধৃত হইল,—

খৃষ্টাব্দ	কত গজ কাপড় বোনা হইয়াছে
১৯৩৯—১৯৪০	৪০১ কোটি ২৪ লক্ষ গজ
১৯৪০—১৯৪১	৪২৬ কোটি ১০ লক্ষ গজ
১৯৪১—১৯৪২	৪৪৫ কোটি ৬২ লক্ষ গজ

যুদ্ধের গত তিন বৎসরের মধ্যে দুই বৎসরে প্রায় সাড়ে ৪৫ কোটি গজ কাপড় ভারতীয় কলে অধিক উৎপন্ন হইয়াছে। কেবল মাত্র বোম্বাইয়ের কলগুলিতেই কত অধিক কাপড় প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা দেখুন।—ঐ সকল কলে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে ১২০ কোটি গজ কাপড় উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহার পর ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে ১৫০ কোটি গজ কাপড় উৎপন্ন হইয়াছে। সূতার উৎপত্তিও বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুরোপীয় যুদ্ধ ঘোষণার কিছুকাল পর হইতে বোম্বাইয়ের কার্পাস-কলে ৩১ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড ওজনের সূতা হইত, জাপানী-যুদ্ধ ঘোষিত হইবার সময় পর্য্যন্ত ৪৫ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড (ওজন) পরিমাণ সূতা প্রস্তুত হইতে থাকে। সুতরাং ভারতীয় কার্পাসকলগুলির ঔদাসীন্য নাই; কিন্তু তাহারা সমস্ত অভাব মোচন করিতে সমর্থ হইতেছে না। তাহার কারণ, ভারতবাসীরা ইদানীং লজ্জা-নিবারণ বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছে। জাপান এবং বিলাত হইতে আনাত বস্ত্র দ্বারাই তাহাদিগকে নগ্নদেহ আবৃত করিতে হইত। এখন বিদেশী বস্ত্রের আমদানী বন্ধ হওয়াতেই আমাদের এই বিভ্রাট ঘটিয়াছে। শুনিতেছি, উড়িষ্যা অঞ্চলে বাঙ্গালা দেশের অনুরূপ বস্ত্রাভাব ঘটে নাই। কারণ, উহার কোন কোন অঞ্চলে এখনও লোক চরকায় সূতা কাটিয়া কাপড় প্রস্তুত করে; কিন্তু বাঙ্গালা এ বিষয়ে একেবারে অসহায় বলিলেও চলে।

চাহিদার টান যে যোগানের মাত্রাকে ছাড়াইয়া যাইবে, তাহা ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগেই কতকটা বুঝা গিয়াছিল। সরকারী কর্ম্মচারীরাও বুঝিয়াছিলেন যে, যেরূপ অবস্থা, তাহাতে এ দেশে বস্ত্রাভাব ঘটিবেই; বস্তুতঃ, বস্ত্রের মূল্য অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে—লোকের নিদারুণ কষ্ট হইবে। সেই জন্য ভারত সরকারের তদানীন্তন বাণিজ্যসচিব সার এ রামস্বামী মুদেলিয়ার ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে এই বিষয়ে বিশেষ অবহিত হন। তিনি বলেন, কাপড়ের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নহে; কারণ, ভারতে প্রায় ৫ শত প্রকার বস্ত্র প্রচলিত আছে, ঐ সমস্ত বস্ত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর নহে। কিন্তু কিছু না করিলে ত চলিতে পারে না। অগত্যা কার্পাস-বয়নসমিতি এবং ভারত সরকারের বাণিজ্য ও সরবরাহ বিভাগের কর্ত্তারা গত ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বাই সহরে এক পরামর্শসমিতি গঠন করিয়া স্থির করিলেন—সমস্ত কার্পাস-কলের কর্ত্তারা সকল প্রদেশের জন্য ঠিক একই প্রকারের কাপড় প্রস্তুত করিবেন, এবং সেই কাপড় সরকারের নির্দ্দিষ্ট দরে সকলকে বাজারে বিক্রয় করিতে হইবে। সার রামস্বামী বলিয়াছিলেন, উহা না করিলে আর রক্ষা নাই! এখন সমস্ত কলওয়ালারা উহাতে সম্মত হইলেই হইল। উহার বণ্টনাদির ব্যবস্থা সমস্তই কলওয়ালাদিগের হাতে থাকিবে। ইহারই নাম হইবে 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ' বা সরকারের বাঁধা নিরিখমত কাপড়, সাধারণের কথায় 'নিরিখী কাপড়'। বোম্বাইয়ের সভার ঠিক এক মাস পরেই দিল্লীতে মূল্য নিয়ন্ত্রণ-পরামর্শ পরিষদের তৃতীয় অধিবেশন হয়। ঐ সভায় কাপড়ের কলওয়ালারাও আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত এস্‌, সি, ঘোষ বঙ্গীয় কার্পাস-কলওয়ালাদিগের পক্ষ হইতে ঐ পরিষদে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ঐ 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড়' একই মূল্যে বিক্রয় করিবার বিরুদ্ধে কতকগুলি যুক্তিযুক্ত কারণ প্রদর্শন করেন। তিনি বলেন, একই নিরিখ-বাঁধা দরে কাপড় বিক্রয় করিতে হইলে সকল কলওয়ালাকে একই দরে কার্পাস তূলা, কলের জন্য আবশ্যক যন্ত্রপাতি—সমস্তই দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যে সকল কলে কেবল কাপড় বুনিবার ব্যবস্থা আছে, তাহাদিগের সকলকে একটা নির্দ্দিষ্ট মূল্যে সূতা দিতে হইবে। বাঙ্গালার কলগুলিতে কেবল মিহি-কাপড় বুনিবারই ব্যবস্থা আছে,—মোটা কাপড় বুনিবার ব্যবস্থা নাই; সুতরাং একটা নির্দ্দিষ্ট দরে ঐ কাপড় বিক্রয় করা সম্ভব হইতে পারে না।

তাহার পর হইতে কাপড়ের মূল্য অতি দ্রুতবেগে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সে সকল কথার আলোচনা করিয়া লাভ নাই। সরকার অবশ্য অল্পমূল্যে বস্ত্র যোগাইবার জন্য মিলওয়ালাদের সহিত পরামর্শ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার ফল কিছুই দেখা যাইতেছে না। বর্ত্তমান সময়ে ভারতীয় কার্পাস-কলের যে অবস্থা, তাহাতে সকলকে বস্ত্র যোগান অসম্ভব। সর্ব্বাগ্রে সাম্রাজ্যের রক্ষাকল্পে সামরিক প্রয়োজনের কাজগুলি করিতে হইবে। এখন সমরাঙ্গনের সৈনিকদিগের অনেক সাজ-পোষাক ভারতীয় কলগুলিতে প্রস্তুত হইতেছে। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর গত জুন মাস পর্য্যন্ত ভারত হইতে সরকার ১ শত ২০ কোটি টাকা মূল্যের কাপড় কিনিয়াছেন, আর বর্ত্তমান বৎসরে তাঁহারা ৭০ কোটি টাকার সামরিক পরিচ্ছদের কাপড়-চোপড় কিনিবেন বলিয়া মনে হইতেছে। প্রতি মাসে ১ কোটি করিয়া পোষাক প্রস্তুত হইতেছে। এখন এক লক্ষ দরজীই পোষাক-সেলাইয়ের কার্য্যে নিযুক্ত আছে। এই সমস্ত কাপড় প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া ভারতীয় কলওয়ালারা আর এত অধিক পণ্য প্রস্তুত করিতে পারিতেছে না,—যাহা হইতে তাহারা ঘরের এবং বাহিরের জন্য সমস্ত চাহিদা মিটাইতে পারে। এ দিকে সমুদ্র-পথ বিঘ্নসঙ্কুল, এবং জাপান যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ায় দক্ষিণ-পশ্চিম এসিয়ায় এবং পূর্ব্ব-আফ্রিকায় ভারতজাত কার্পাস-বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধ আরও কত দিন চলিবে এখন তাহা অনুমান করা কঠিন; তবে আরও এক বৎসর চলিবে, এরূপ মনে করা যাইতে পারে, সুতরাং আর এক বৎসর যে বস্ত্রসমস্যার বিশেষ সমাধান হইবে, এরূপ আশা করা যায় না।

কিন্তু কেবল যোগান (supply) এবং টানের (demand) সামানাশই যে বস্ত্র-বিভ্রাটের একমাত্র হেতু, এরূপ মনে হয় না। তবে উহা যে একটা প্রবল হেতু, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। হেতুর উহা দশ আনা অংশ হইতে পারে; কিন্তু সমস্ত অংশই নহে। কারণ, কেবল কার্পাস তূলা আর পাট ভিন্ন আর সকল পণ্যেরই দাম অতিশয় বাড়িয়া গিয়াছে। মফস্বলে যেখানে তরিতরকারী উৎপন্ন হয়, সেখানে বেগুন, শাকসব্জী প্রভৃতির মূল্য অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্যান্য বৎসর এই সময়ে তথায় বেগুন দুই পয়সা সের বিকাইত; এখন উহা দশ পয়সা, তিন আনা সের বিকাইতেছে! খুব কম হইলেও দুই আনা সেরের নীচে নামিতেছে না। ঝিঙ্গে, ঢেঁড়স, সোলাকচু, এ সব ত আর যুদ্ধে যাইতেছে না; অন্ততঃ আমাদের এখান হইতে

চালান যাইতেছে না,—ইহা সত্য। কিন্তু তথাপি উহা অন্যান্য বৎসরের তুলনায় চতুর্গুণ মূল্যে, কখন বা ছয় গুণ মূল্যে বিকাইতেছে কেন? যুদ্ধই উহার প্রত্যক্ষ কারণ -নহে। মুদ্রামূল্যের হ্রাসই উহার আর একটি প্রবল কারণ। যখন সকল জিনিষেরই দর চড়ে, তখন বুঝিতে হইবে মুদ্রার মূল্য কমিয়া গিয়াছে। এই মুদ্রামূল্য কমিল কেন? যে দিন য়ুরোপে যুদ্ধ বাধে, সেই ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর ভারতে সর্ব্বসাকল্যে ১৮২ কোটি ১০ লক্ষ টাকার নোট প্রচলিত ছিল। ইহার পর দুই বৎসর পরে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসের মাঝামাঝি ৩০২ কোটি টাকার নোট চলিত হইয়াছিল। তাহার পর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্টে প্রকাশ, ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের শেষ তারিখে ৪৬৩ কোটি ২১ লক্ষ টাকার নোট ভারতের বাজারে বাহির করা হইয়াছে। ইহার পরও বাজারে নূতন নূতন নোট বাহির করা হইতেছে। এখন অক্টোবর মাসের শেষে ৫ শত ২৩ কোটি ২৩ লক্ষ টাকার নোট ভারতে চলিতেছে। যুদ্ধের সময় তাহাতে সুবিধা আছে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। ইদানীং খুজরা মুদ্রাও (আধ আনি, এক আনি, দু-আনি) সবই ভড় ধাতুর হইয়াছে। উহার আসল মূল্যের সহিত বাজার-প্রচলিত মূল্যের কোন সম্বন্ধ নাই। উহার আসল মূল্য নাই বলিলেও চলে। সিকি আধুলি ও টাকায় কিছু রূপা আছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা এখন উহাতে রূপার পরিমাণ অল্প দেওয়া হইতেছে। কাজেই ইহারা সবগুলিই ভাক্ত মুদ্রা হইয়া পড়িয়াছে। অত্যধিক নোটের প্রচলন পণ্যমূল্য বৃদ্ধি করে। দুর্ম্মূল্যতার ইহাও একটি প্রবল কারণ। পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পাইলে মজুরীর হার এবং পণ্য প্রস্তুতের উপকরণ এবং যন্ত্রাদির মূল্য বাড়িয়া যায়। বস্ত্র প্রস্তুতের সেই জন্য খরচা বৃদ্ধি পাইয়াছে, বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধির ইহাও অন্যতম কারণ।

বর্ত্তমান সময়ে যুদ্ধে ঠেকিয়া শিখিয়া বার্ত্তাবিশারদরা বার্ত্তাশাস্ত্রের অনেক নূতন নূতন নিয়ম আবিষ্কৃত করিতেছেন। এখন বার্ত্তিকগণ বলিতেছেন যে, যদি টাকার সুদের হার স্বাভাবিক যেরূপ হওয়া উচিত তাহা অপেক্ষা কম করা হয়, তাহা হইলে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। উইকসেল নামক বার্ত্তাবিশারদ এ কথা তাঁহার সন্দর্ভে বিশেষ ভাবে বিবৃত করিয়াছেন! আর যদি টাকার সুদের হার বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে পণ্যমূল্য কমিয়া যায়। বর্ত্তমান যুদ্ধ "থ্রী পারসেণ্ট" যুদ্ধ নামে অভিহিত; কারণ, সরকার এবার টাকার সুদের হার শতকরা তিন টাকার অধিক হইতে দেন নাই। কাজেই পণ্যমূল্য বাড়িয়াছে। বিলাতে টাকার সুদের হার সরকার শতকরা আড়াই টাকা হারে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। যুদ্ধের সময় তথায় ঐ সুদের হার আরও অধিক হওয়া উচিত ছিল। ইহাও মূল্যবৃদ্ধির অন্যতম কারণ। তাহার উপর যুদ্ধের ব্যয় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং সরকারের কল্পলোকের "ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ" বা নিরিখী কাপড় মর্ত্ত্যলোকে আকার লাভ করিয়া উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা অল্প, আর যদিও উহা মূর্ত্তিমান হইয়া আসে, তাহা হইলেও তাহার সেই মূর্ত্তি এবং মূল্য গৌড়বাসীর লোভনীয় হইবে না। গত চৈত্র মাসে ও বৈশাখ মাসে হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছিল যে, অতি মোটা সুতার ১ হাতী ধুতির মূল্য হইবে দুই টাকা পাঁচ আনা আর ৪৪ ইঞ্চি বহর দশ হাতী ধুতির দাম হইবে দুই টাকা সাড়ে চৌদ্দ আনা। এখন শুনিতেছি, ঐ দরে মিলওয়ালারা ঐ কাপড় যোগাইতে পারিবেন না। কারণ, সকল জিনিষের মূল্য দিন দিনই চড়িয়া যাইতেছে। অত মোটা সুতার কাপড় বঙ্গদেশের লোক পরিতে অভ্যস্ত নহে। উড়িষ্যার গ্রাম্যলোকেরা ঐরূপ কাপড় কিছুকাল পূর্ব্বে পরিত, এখন ত তাহা প্রায় পরিতে দেখা যায় না। বাঙ্গালী চাষীরা এখন ভদ্রলোক অপেক্ষা অধিক সৌখীন হইয়াছে। কাজেই এই দরিদ্র দেশের অধিকতর দারিদ্র্যপীড়িত লোক, এই কাপড় বিশেষ পছন্দ করিবে না,—উহার সরবরাহও যে অধিক হইবে, তাহাও মনে হয় না। যাহা হউক, নমুনা স্বরূপ কিছু কাপড় বাহির করিলেও বুঝা যাইত।

এখন কিরূপে এই বস্ত্র-সমস্যার সমাধান হইবে? লোক ত দিগম্বর হইয়া থাকিতে পারে না! বরং এক দিন অনাহারে থাকা চলে, কিন্তু উলঙ্গ অবস্থায় থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব! কলগুলি আর অধিক সুতা কাটিতে বা কাপড় বুনিতে পারিবে না। সরকার যে কোন চেষ্টাই করিতেছেন না, এ কথা বলা যায় না; তবে তাঁহারা সামরিক প্রয়োজনের প্রতি সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি করিতে বাধ্য; অধিক সুতা প্রস্তুত করিতে হইলে মিলওয়ালাদিগকে বিদেশ হইতে কলের টেকো আমদানী করিতে হইবে; কিন্তু সাগরপথ বিঘ্নসঙ্কুল, তাহার উপর পণ্যমূল্য অত্যন্ত অধিক। এতদ্ভিন্ন যানবাহনের অভাবে এবং অসুবিধায় তুলা পাওয়া কঠিন। এই অবস্থায় টেকো ও যন্ত্রপাতি অত্যধিক মূল্যে আমদানী করা কলওয়ালারা সঙ্গত বলিয়া মনে করিতেছে না। বিশেষতঃ, অনেকেরই বিশ্বাস, হয় ত যুদ্ধ শেষ হইলে ঐ সকল টেকো অচল হইয়া পড়িবে। সেই জন্য কলওয়ালাদিগের পক্ষে এদেশী তাঁতিদিগকে অধিক সুতা যোগান দেওয়া সম্ভব হইতেছে না।

এখন একমাত্র উপায় এ দেশের তাঁতি, জোলা প্রভৃতি যদি চরকায় সুতা কাটিয়া সেই সুতায় কাপড় বুনিতে পারে, তাহা হইলেই কতকটা সুবিধা হইতে পারে। কার্পাসের পাইকারী দর গত আগষ্ট মাসেও ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের কার্পাস তুলার দরের সমান ছিল। এখন কিছু বাড়িয়াছে। এখন কাপড়ের মূল্য যেরূপ অধিক, তাহাতে তাঁতিরা চরকা ও তাঁতের সাহায্যে বস্ত্র বয়ন করিয়া লাভবান হইত পারিবে এরূপ আশা করা যায়। তাহাদের যন্ত্রাদি-বাবদ ব্যয় অধিক নহে; উহা দেশেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। তবে সরকারকে কেবল তাহাদিগকে সুলভে তুলা কিনিবার সুবিধা করিয়া দিতে হয়। তুলা না পাইলে তাহারা সুতা কাটিবে কিরূপে? এই সুলভ তুলায় যদি তাহারা ৯ গজ দীর্ঘ ও ৪০ ইঞ্চি বহরের এক জোড়া ধুতি, এবং দশ গজ দীর্ঘ ও ৪২ ইঞ্চি প্রস্থ এক এক জোড়া সাড়ি বয়ন করে, তাহা হইলে খানিক সুবিধা হইতেও পারে। এখন দূরদেশ হইতে তুলার আমদানী করিয়া এ দেশের তাঁতি ও জোলাদিগের পক্ষে কাপড় প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করা অসম্ভব। বাঁকুড়া, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলে তুলা উৎপন্ন করা যে অত্যন্ত আবশ্যক, এ কথা পূর্ব্বে একাধিক বার আলোচিত হইয়াছে; এরূপ করিলে আজ এত অধিক কষ্ট পাইতে হইত না।

এ কথা সত্য যে, কার্পাসজাত পণ্যের মূল্য ইদানীং যত বৃদ্ধি পাইয়াছে, এত আর কোন পণ্যের মূল্যই বৃদ্ধি পায় নাই। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, 'ক্যাপিটালের' প্রদত্ত শঙ্কুসংখ্যার তালিকায় গত মার্চ্চ মাসের পর বস্ত্রের মূল্য কিরূপ আনুপাতিক হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা আর প্রদত্ত হয় নাই। কেবল লেখা হইয়াছে যে, উহার

আনুপাতিক মূল্য জানিতে পারা যাইতেছে না। ইহার কারণ, ঐ মূল্য অত্যন্ত অনিয়ন্ত্রিত ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে; সেই জন্যই সম্ভবতঃ উহা প্রকাশ করা হয় নাই! ধান, চাউল, গম, ময়দা, আটা প্রভৃতির মূল্য প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে; খুচরা কিনিতে গেলে বরং আরও বেশী দিতে হয়। বলিয়াছি, তরিতরকারী প্রভৃতির মূল্য প্রায় তিন গুণ হইয়াছে। চিনির দরও প্রায় তিন গুণ। সুতরাং বর্ত্তমান যুদ্ধে গরিব লোকের জীবনধারণ অত্যন্ত কষ্টকর হইয়াছে। শুধু মূল্য-নিয়ন্ত্রণ দ্বারা এই সমস্যার সমাধান হইবে না; তবে শুনা যাইতেছে যে, গত ১৭ই অক্টোবর অষ্ট্রেলিয়া হইতে ১৫ হাজার টন গম ভারতে আমদানী হইয়াছে। আরও অধিক খাদ্যশস্য আমদানী হইবে। তাহা হইলে খাদ্যাভাবের কষ্ট যে কতকটা দূর হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এই যুদ্ধে দরিদ্র লোকরা অধিকতর নিষ্পিষ্ট হইতেছে। যাহাদের আয় অতি অল্প, যাহারা অল্প পেন্সন পায়, যাহারা সামান্য অর্থানুকূল্যের জন্য পরের উপর নির্ভরশীল, যাহারা অতি অল্প জমিতে চাষ করে, যাহারা দুঃস্থ, বিপন্ন এবং রুগ্ন, যাহারা সাহিত্যসেবী বা বেকার, যাহারা অতি অল্প ভূমির আয়ের উপর নির্ভর করে, যাহারা দাস্যবৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে—তাহাদের দুঃখের সীমা নাই। এক কথায়, এই যুদ্ধের পূর্ব্বে যাহারা কোন প্রকারে দিনপাত করিত, এখন তাহাদিগকে প্রায় প্রতিদিনই 'হরিবাসর' করিতে হইতেছে! যাহাদের কিছু সংস্থান আছে বা কিছু টাকা বাঁচে, তাহারা সরকারী রাজ্যরক্ষা ঋণ-ভাণ্ডারে তাহা ন্যস্ত করিয়া সুদ বাবদ কিছু টাকা পাইবার আশা করিতেছে; কিন্তু সেই সুদের টাকা যোগাইবে কাহারা? সকলকেই তাহা দিতে হইবে, অতি-দরিদ্রও অব্যাহতি পাইবে না। অবশ্য, পরোক্ষ কর-রূপেই তাহা সংগৃহীত হইবে। ফলতঃ, গরিবদিগকেই এই যুদ্ধের তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতে হইবে। অধ্যাপক পিগু সম্প্রতি The Political Economy of War নামক একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাহাতে এই বিষয়ের বিশদ আলোচনা আছে। টাকার বাজারে টানাটানি নাই,—অধিকাংশ ব্যবসায়ে বেশ লাভ হইতেছে। কেবল সারস্বত-বৃত্তিতেই হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। ইহাতে জনসাধারণের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিতেছে।

এই যুদ্ধে গরিব লোকের আর একটি ঘোর অসুবিধা হইয়াছে, উহা পয়সার অভাব। গরিব লোক অনেক জিনিস এক পয়সা মূল্যে ক্রয় করে, যথা—শাক, থোড়, ডুমুর, লবণ, লঙ্কা প্রভৃতি। কিন্তু তাহাদের পক্ষে উহা ক্রয় করা প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে! যাহারা ঐ সকল দ্রব্য আহরণ করিয়া বিক্রয় করে, তাহাদেরও দারুণ অসুবিধা ঘটিয়াছে। তামার পয়সার তিরোধানের সঙ্গে সরকার অন্য কোন ধাতুর এক-পয়সা ও আধ-পয়সা কেন বাহির করিতেছেন না, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না। এই ঘোর দরিদ্র দেশে ক্ষুদ্র মুদ্রার অনাটন হইলে গরিবেরই যে প্রাণান্ত ঘটে, সরকার এখনও কি ইহা বুঝিতে পারিতেছেন না? এই কারণে দরিদ্র লোকের কষ্ট দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে। ফলতঃ, এই যুদ্ধের আর্থিক পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে এ দেশের গরিব লোকের প্রাণান্তকর কষ্ট হইতেছে। তিন পয়সার ডাক-টিকিট কিনিবারও উপায় নাই। মফস্বলে পয়সার অভাবে লোকের যে কিরূপ কষ্ট হইতেছে, তাহা না দেখিলে কেহ বুঝিতে পারিবেন না; কিন্তু এ কষ্ট তাহারা আর কত দিন সহ্য করিবে? এ বিষয়ে সরকারের আর উদাসীন থাকা উচিত নহে।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

স্মৃতি

আশ্বিনে আজ মহামায়ার আগমনীর গানে
বিষাদ-করুণ একটি স্মৃতি জাগছে আমার প্রাণে!

পড়ছে মনে, হাসিমাখা একটি কচি মুখ,
অন্তরে আজ নূতন করে জাগছে যেন দুখ!
একটি ছোট ছেলে হেথায় হারিয়ে গেছে কবে—
হাজার দীপের একটি শিখা, হঠাৎ গেছে নিবে!
সুরে বাঁধা স্বর্ণ-বীণার ছিঁড়েছে হায় তার—
ছিঁড়ে গেছে বিনিসূতার পারিজাতের হার!
এইখানে, এই ছাদের 'পরে তাহার খেলা-ঘর—
পুতুলগুলো ছড়িয়ে আছে ধূলো-মাটির 'পর।

জামা-কাপড় থরে থরে সাজানো রয় সবি—
দেওয়ালে তার হাসি-ভরা কচি-মুখের ছবি!
জুতো জোড়া আজও আছে পায়ের ধূলো মেখে,
সে গিয়েছে; চিহ্ন শত চারি পাশে রেখে!
আসনখানি আজও বহে তারই নামের স্মৃতি,
পোষা পাখী নাম ধরে' তার, আজও ডাকে নিতি!
আজো মা তার ডাক্‌ছে কেঁদে—"খোকন ফিরে আয়!"
কোথায় খোকন? প্রতিধ্বনি শূন্যে কেঁদে যায়!

শ্রীঅমিতা দেবী
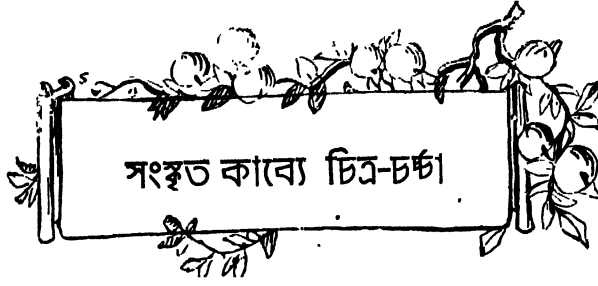
অতীত যুগে সংস্কৃত সাহিত্য-মন্দিরে বাগ্‌দেবীর অর্চ্চনায় যেমন বহুবিধ কাব্যকুসুমের প্রয়োজন অনুভূত হইত, তেমনই বিচিত্র চিত্র-আলিপনার কল্পনাও সমাদৃত ছিল। কাব্য ও চিত্র—কলাশাস্ত্রের দুইটি বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হইয়া চিরদিন সুধীগণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া আসিয়াছে—কিন্তু এরূপও দেখা যায় যে, কখনও উভয়টি একত্র মিলিত হইয়া বাণীপূজার এক অভিনব উপকরণ-মধ্যে গণিত হইয়াছে।

কবি হইলে যে চিত্রবিদ্যায় নৈপুণ্য লাভ করিতে হইবে, এমন কোন নিয়ম দেখা যায় না; অথবা চিত্রকলায় কুশল হইলে যে তাহাকে কাব্য রচনা করিতে হইবে, তাহারও নিয়ম নাই, বরং অকবি—চিত্রকরের এবং চিত্রাঙ্কন বিদ্যায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ কবির সংখ্যাই অধিক। তথাপি উভয়বিধ কলাবিদের চিত্তভূমিগত একটা সৌসাদৃশ্য আছে। বর্ণ ও ছন্দোময় ভাবাভিব্যক্তি হইতেই কাব্যের বিকাশ, রঙ্গ ও রেখাময় ভাবস্ফুরণ হইতে চিত্র-পরিকল্পনা। উভয়েরই উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টি।

চিত্ত-ভূমি হইতে ভাবের বিকাশ হয় বহু মুখে। যেমন স্বরগ্রাম সংযোগে ভাব বিশেষের উদয় হয়—সঙ্গীতকলা হইতে, এবং স্পন্দনময় ভাববিলাস হইতে নৃত্য-কলার উদ্ভব; আবার এই নৃত্য-গীত দৃশ্যকাব্য সহ মিলিত হইলে অধিকতর সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে, তেমনই কাব্যের সহিত চিত্রের, ছন্দোবর্ণময় ভাব বিশেষের সহিত রঙ্গরেখাময় ভাববিলাসের সংমিশ্রণে একটা যে বৈচিত্র্য-সৃষ্টি করে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আলঙ্কারিকগণ বৈচিত্র্যকেই অলঙ্কার বলিয়াছেন, এজন্য সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্য ও চিত্রের মিলনে যে বৈচিত্র্য অনুভূত হয়, তাহাকে 'চিত্র' অলঙ্কার নামে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। চিত্র অলঙ্কারের বিশ্বনাথকৃত লক্ষণ এইরূপ যে, 'পদ্মাদ্যাকারহেতুত্বে বর্ণানাং চিত্রমুচ্যতে,'—কবি যদি বর্ণগুলিকে এমন ভাবে সাজাইতে পারেন, যাহাতে পদ্ম—খড়্গ—মুরজ প্রভৃতির আকার উদ্ভূত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহাকে চিত্র অলঙ্কার বলে। অবশ্য ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, কেবল বর্ণ সাজাইয়া পদ্মাদির আকার নির্ম্মাণ করা যায় না, তাহার উপর রেখা টানিতেই হইবে। এক একটি কল্পিত আকারের (figure) উপযোগী করিয়া সজ্জিত ছন্দোময় বর্ণগুলির সহিত রেখার মিলনে—এক একটি চিত্র নির্ম্মিত হইবে। এরূপ চিত্র বহুবিধ হইতে পারে, তাহার বিভিন্ন নাম বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়। এই চিত্রগুলি বন্ধ নামে বা চিত্রবন্ধ নামেও উল্লিখিত হইয়াছে।

এরূপ বর্ণ ও চিত্রের মিলনের চেষ্টা কত দিন হইতে ভারতে সংস্কৃত সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। তবে, ইহার একটা ইতিহাস সঙ্কলিত হইলে—সংস্কৃত সাহিত্য হইতে একটা মনোবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। কবিতা ও চিত্রবিদ্যার মধ্যে যে একটা মিতালী আছে—বর্ণ, ছন্দঃ ও রেখার মধ্যে যে পরস্পর সঙ্গতি সম্ভবপর হইতে পারে—কবিচিত্তেও যে চিত্রচর্চ্চার আসন প্রতিষ্ঠিত থাকে—এরূপ একটা তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে।

অলঙ্কারশাস্ত্রে দেখা যায় যে, চিত্র নামক অলঙ্কার ব্যতীতও চিত্রকাব্য নামে একটা তৃতীয় শ্রেণীর কাব্যের উল্লেখ আছে। তৃতীয় শ্রেণীর (third class) কাব্য বলিলাম কেন? না—ধ্বনি কাব্য হইল উত্তম কাব্য বা প্রথম শ্রেণীর, আর গুণীভূত ব্যঙ্গ্য হইল মধ্যমকাব্য বা দ্বিতীয় শ্রেণীর, আর চিত্র কাব্য অধমকাব্য বা তৃতীয় শ্রেণীর বলিয়া উল্লিখিত। এই চিত্রকাব্য ও চিত্র অলঙ্কার যে এক নহে, ইহা অনেক আলঙ্কারিকের মত।

আবার কেহ কেহ—চিত্রকাব্য মধ্যেই 'চিত্র' অলঙ্কার পরিগণিত করিয়াছেন। ধ্বনি কাব্যের উৎকর্ষ এই কারণে যে, ইহা পাঠ মাত্রে শব্দসমূহের একটা সাধারণ অর্থ প্রতীত হইবার পর ব্যঞ্জনা শক্তিবলে অন্য একটি সুসঙ্গত সুন্দর অর্থ প্রকাশিত হইয়া পড়ে; যেমন,—কোন উদ্যানে এক সাধু প্রায়ই প্রত্যুষে পুষ্পচয়ন করিত, সেই উদ্যানের এক প্রান্তে একটি দুষ্টা নারী বাস করিত, তাহার গুপ্ত প্রণয়ী ঐ উদ্যান হইতে নির্গত হইত—প্রত্যুষেই, কিন্তু সাধুর আগমনে

—প্রণয়ীর গমনে বাধা হইত, এইজন্য সেই নারী প্রথমে একটা কুকুর রাখিল। সাধুকে দেখিবামাত্র কুকুর চীৎকার করিত, কিন্তু সাধু তাহাতেও ঐ সময়ে পুষ্পচয়ন হইতে নিবৃত্ত হইল না। তখন সেই নারীর ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল—সে একদিন ঐ সাধুকে এই কবিতাটি শুনাইয়া দিল,—

নিশ্চিন্ত হইয়া ভ্রম' উদ্যানমাঝারে
সে কুক্কুর নাই সাধো! মারিয়াছে তারে।
এক তেজী সিংহ; এই গোদাবরী-তটে
গুহায় বসতি করে সে অতি নিকটে॥

কবিতাটি পাঠ করিলে প্রথমে মনে হইবে—সাধুকে উদ্যানে পুষ্পচয়নের জন্য যেন অভ্যর্থনা করা হইতেছে, কিন্তু একটু বিচার করিলেই দেখা যাইবে যে, নিকটস্থিত সিংহের ভয় দেখাইয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিবারই চেষ্টা করা হইতেছে। এই যে দ্বিতীয় অর্থ, ইহাই ধ্বনি; যেখানে এই ধ্বনিই প্রধান—সেই কাব্যের নাম ধ্বনিকাব্য। আবার ধ্বনি গৌণ হইয়া যেখানে বাচ্যার্থ প্রধান হয়, তাহার নাম গুণীভূত ব্যঙ্গ্য; যেমন,—

পল্লীর তরুণ নব অশোক-মঞ্জরী
করে ল'য়ে আসে ঐ তরুণী নেহারি।
থমকি' দাঁড়াল,—তা'র আনন-কমল
মুহূর্ত্তে মলিন কান্তি—হইল শ্যামল।

এই কবিতা শ্রবণে যে সাধারণ অর্থটুকু প্রকাশিত হইতেছে, তাহাতে যে চমৎকারিতা আছে, তদপেক্ষা (ধ্বনি) ব্যঞ্জনালভ্য অর্থ অস্ফুট, কেন না, এখানকার ধ্বনি হইতেছে যে,—উক্ত তরুণ—ঐ তরুণীকে অশোককুঞ্জে যাইবার জন্য সঙ্কেত করিলেও তরুণী যায় নাই, তাহার পর হঠাৎ দেখা, তজ্জন্যই তাহার মুখের মালিন্য; এই অর্থটুকু এই কবিতায় অন্তর্নিহিত থাকিলেও তাহা পরিস্ফুট নহে বলিয়া এই জাতীয় কাব্যকে ধ্বনিকাব্য বলা যায় না, ইহাকে গুণীভূত ব্যঙ্গ্য বলে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—এই দ্বিবিধ কাব্য ব্যতীত আর এক প্রকার কাব্যের উল্লেখ অলঙ্কারশাস্ত্রে দেখা যায়—তাহার নাম চিত্রকাব্য।

কাব্যপ্রকাশকার স্পষ্টই বলিয়াছেন,—
'শব্দচিত্রং বাচ্যচিত্রমব্যঙ্গ্যমবরং স্মৃতম্'।

চিত্রকাব্যও দুই শ্রেণির হইতে পারে—(১) শব্দ-চিত্র (২) অর্থচিত্র, কিন্তু ইহাতে ব্যঞ্জনালভ্য অর্থ থাকে না ও ইহা পরিস্ফুটভাবে অর্থপ্রকাশে অসমর্থ বলিয়া ইহা অধম। শব্দচিত্রের উদাহরণ এইরূপ,—

স্বচ্ছন্দোচ্ছলদচ্ছকচ্ছকুহরচ্ছাতেতরাম্বুচ্ছটা
মূর্চ্ছন্মোহমহর্ষিহর্ষবিহিতস্নানাহ্নিকাহ্নায় বঃ।
ভিদ্যাদুদ্যদুদারদর্দ্দুরদরীদীর্ঘাদরিদ্রদ্রুম-
দ্রোহোদ্রেকমহোর্ম্মিমেদুরমদা মন্দাকিনী মন্দতাম্॥

(অনুবাদ)

স্বচ্ছন্দে উছলি যার স্বচ্ছবারি অনিবার
কচ্ছগর্ত্তে, ছিটাইয়া কণা।
বিনাশে মহর্ষিমোহ স্নানাহ্নিক হর্ষসহ
সমাপিয়া তাঁরা তৃপ্তমনাঃ।
উদার দর্দ্দুর বিলে পশি 'দীর্ঘা হ'য়ে—বলে
দৃঢ়মূল দ্রুম দ্রোহ করি'।
উর্ম্মিমদে মত্তা যিনি তোমাদের মন্দাকিনী
মন্দ ভাব নাশুন সত্বরি॥

এই কবিতায় আছে শুধু শব্দচ্ছটা—অনুপ্রাসের আড়ম্বর, কিন্তু কোন রস বা ভাবের ব্যঞ্জনা নাই—এজন্য এইরূপ কাব্যের স্থান নিম্নতম।

ধ্বনিকার আনন্দবর্দ্ধন বলিয়াছেন যে,—
রসভাবাদিবিষয়বিবক্ষাবিরহে সতি।
অলঙ্কারনিবন্ধো যঃ স চিত্রবিষয়ো মতঃ।

রস বা ভাবাদি বিষয়ে বিবক্ষা না রাখিয়া যে অলঙ্কার রচনা, তাহাই চিত্রকাব্যের বিষয় হইয়া থাকে। সুতরাং শব্দের আড়ম্বর বা অর্থের বৈচিত্র্যবহুল কাব্যে যদি রস বা ভাবের উদ্বোধ না হয়, তাহা হইলেই তাহা চিত্রকাব্য মধ্যে গণিত হইবে। এমন কি, যদি শব্দাড়ম্বর অধিক না থাকে, সাধারণ অনুপ্রাসাদি অলঙ্কার সত্ত্বেও রসের উদ্বোধক না হইলে, তাহাও চিত্র-কাব্য মধ্যে গণ্য হইবে। ইহার উদাহরণ, যথা,—

বিনির্গতং মানদমাত্মমন্দিরাদ্
ভবত্যুপশ্রুত্য যদৃচ্ছয়াপি যম্।
সসম্ভ্রমেন্দ্রদ্রুতপাতিতার্গলা
নিমীলিতাক্ষীব ভিয়ামরাবতী॥

হয়গ্রীববধ নামক নাটকে হয়গ্রীবের নামে স্বর্গপুরীর অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহাই এই কবিতায় বর্ণিত হইয়াছে।

(অনুবাদ)

নিজগৃহ হ'তে হ'য়েছে বাহির
যদৃচ্ছাক্রমে সেই দৈত্য বীর।
শুনি, ইন্দ্র নিজে ত্বরায় অর্গল
রুদ্ধ করে, ভয়ে আমরা বিহ্বল॥

ইহাতে অর্থের বৈচিত্র্য আছে সত্য, কিন্তু দৈত্যের যদৃচ্ছাক্রমে বাহির হওয়া বর্ণিত হওয়ায় ইহাতে তাহার কোন বীরত্ব ব্যঞ্জিত হয় নাই। যে কোন কার্য্যের জন্য হয়গ্রীবের গৃহ হইতে বাহির হওয়ার সহিত যুদ্ধযাত্রার কোন সম্বন্ধ এখানে পাওয়া যায় না, সুতরাং বীররস বা বীররসের স্থায়ী ভাব উৎসাহেরও কোন সূচনা এখানে নাই। একে ত অমরাপুরী অচেতন, তাহার উপর তাহার ভয় বর্ণনা,—তদপেক্ষা দুঃখের বিষয় এই যে, অমরাবতীর ভয় এখানে উৎপ্রেক্ষিত হইলেও শ্রোতৃবৃন্দের তাহা রসবোধের অনুকূল ত' নহেই, প্রত্যুত প্রতিকূল বলিয়াই মনে হয়, অমরাপুরী যে সুখের স্থান বলিয়া সামাজিক শ্রোতৃগণের চিরন্তন সংস্কার বদ্ধমূল আছে, তাহার বিরুদ্ধ এই বর্ণনা শ্রবণে রসবোধ ক্ষুণ্ণ হইয়াই যায়।

নবীন আলঙ্কারিক অপ্পয় দীক্ষিতও তাঁহার চিত্র-মীমাংসা গ্রন্থে কাব্যকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, ধ্বনি, গুণীভূতব্যঙ্গ্য ও চিত্রকাব্য; তন্মধ্যে চিত্রকাব্যের স্বরূপ এই ভাবে বর্ণন করিয়াছেন—

'তদব্যঙ্গ্যমপি চারু তচ্চিত্রম্।'

ব্যঞ্জনাবৃত্তিলভ্য অর্থবিরহিত হইলেও রমণীয় কাব্যই চিত্রকাব্য। তাহাও তিন প্রকার—শব্দচিত্র, অর্থচিত্র ও উভয়চিত্র। শব্দচিত্র বিষয়ে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন যে,—শব্দচিত্র প্রায়শঃ নীরস বলিয়া কবিগণ তাহার তেমন সমাদর করেন না, এবং তদ্বিষয়ে বিচারণীয়ও তেমন কিছু নাই, এজন্য শব্দচিত্র অংশ পরিত্যাগ করিয়া অর্থচিত্র বিষয়ে বিশদ মীমাংসা প্রদর্শন করা যাইতেছে। অতঃপর, উপমা অলঙ্কারকে গ্রহণ করিয়া— সেই উপমাই অন্য বহু অলঙ্কারের মূল—ইহাই প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; ফলতঃ, অর্থচিত্রমধ্যে সমস্ত অলঙ্কারকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া উপমার অপূর্ব্ব মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

তদিদং বিশ্বং চিত্রং ব্রহ্মজ্ঞানাদিবোপমাজ্ঞানাৎ।
জ্ঞাতং ভবতীত্যাদৌ নিরূপ্যতে নিখিলভেদসহিতা সা॥

ব্রহ্মজ্ঞান হইতে যেমন এই বিচিত্র বিশ্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তেমনই এক উপমাজ্ঞান হইতে সমস্ত চিত্রকাব্যের স্বরূপ অবগত হওয়া যায়, এজন্য উপমা ও তাহার সমুদায় অবান্তর ভেদ নিরূপিত হইতেছে। অপ্পয় দীক্ষিতের মতে—প্রধান ও অপ্রধান ভাবে ধ্বনি সম্বন্ধযুক্ত কাব্য ব্যতীত যাবতীয় কবি-রচনা চিত্রকাব্য মধ্যে পরিগণিত। ইহাকে অধম কাব্য বলিয়া তিনি নিন্দা করেন নাই। এ বিষয়ে কাব্যপ্রকাশকারের সিদ্ধান্ত হইতে ইহার মতবাদ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ 'চিত্রমীমাংসা খণ্ডন' নামক গ্রন্থে অপ্পয় দীক্ষিতের মতবাদ ভ্রমপূর্ণ বলিয়া সগর্ব্বে ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু, পণ্ডিতরাজের বিচার হইতে ইহা সুস্পষ্ট হয় নাই যে, চিত্রকাব্যের সীমা বিষয়ে তাঁহার কোন মতভেদ আছে। যে চিত্রের প্রসঙ্গে এই প্রবন্ধের অবতারণা, সেই 'চিত্র' অপ্পয় দীক্ষিতের মতে শব্দচিত্র নামক কাব্যেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু কাব্যপ্রকাশকার চিত্রকাব্য মধ্যে যে শব্দচিত্রকে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা হইতে এই প্রবন্ধের বিষয়ীভূত 'চিত্র'কে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছেন। এবং ইহাকে 'চিত্র' অলঙ্কারমধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন।

'তচ্চিত্রং যত্র বর্ণানাং খড়্গাদ্যাকৃতিহেতুতা'

সন্নিবেশ বিশেষে সজ্জিত বর্ণসমূহ—যেখানে খড়্গ, মুরজ, পদ্ম প্রভৃতির আকারকে উদ্ভাসিত করে, তাহাই চিত্র অলঙ্কার। তবে, এরূপ 'চিত্র'কাব্য কষ্টকল্পিত, এজন্য দিগ্‌দর্শনের জন্য অল্প উদাহরণ দেখান হইয়াছে।

সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ—চিত্রকাব্য নামে কোন তৃতীয় শ্রেণীর কাব্যের ভেদ স্বীকার করেন নাই। তিনি ধ্বনি ও গুণীভূত ব্যঙ্গ্য নামে দ্বিবিধ কাব্য স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু শব্দালঙ্কারমধ্যে 'চিত্র' নামক অলঙ্কারকে গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহার লক্ষণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

কাব্যের এই যে শ্রেণিভেদ বিষয়ে নানা মত দেখা যায়, ইহার হেতু আর কিছুই নহে, সমগ্র ভারতে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভাষার বৈচিত্র্য স্বতঃই উদ্ভূত হইয়াছিল—তাহা কাব্যাদর্শ নামক দণ্ডিকৃত অলঙ্কারগ্রন্থ হইতে বেশ অনুমান করা যায়। দণ্ডী স্বয়ং বিদর্ভদেশোদ্ভব ভাষার পক্ষপাতী ছিলেন—গৌড়দেশের সংস্কৃত ভাষাকে তিনি উপহাস করিয়াছেন। তদানীন্তন কালে (পাণিনি প্রভৃতির অভ্যুদয়ের পর হইতে) সংস্কৃত ভাষার আভিজাত্য লইয়া বেশ একটা দলাদলি ছিল। গৌড়দেশে সমাসবহুল—ওজোবর্ণময় ভাষার সমাদর ছিল, বিদর্ভদেশে বীররস স্থলেও কোমলবর্ণ ও অল্পসমাসযুক্ত ভাষা ব্যবহৃত হইত। দণ্ডী বৈদর্ভী ভাষার প্রতি অত্যধিক অনুরাগবশতঃ গৌড়ী ভাষার বিকৃত রূপ স্বয়ং রচনা করিয়া লোকসমক্ষে ধরিয়াছেন।

দণ্ডীর প্রভাবে পরবর্ত্তী আলঙ্কারিকগণ প্রভাবিত হইলেও বীররসাদি স্থলে গৌড়ী রীতির যে আবশ্যকতা আছে—তাহা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তবে, যেখানে রসাদির অনুকূলতা নাই, অথচ আড়ম্বর আছে—সেরূপ কাব্য শুধু গৌড়ী-ভাষায় কেন বৈদর্ভী ভাষায়ও থাকিতে পারে, এজন্য শব্দচিত্র ও অর্থচিত্র নামক অধম

কাব্যের শ্রেণিভেদ পরবর্ত্তিকালে স্বীকৃত হইয়াছে। সাহিত্য-দর্পণকার যে এরূপ চিত্রকাব্য স্বীকার করেন নাই, তাহার কারণ, তাঁহার মতে রসই হইল কাব্যের আত্মা, যদি রস না থাকে, তাহা হইলে আত্মসম্বন্ধহীন শবদেহের মনুষ্য নামের মত রসহীন শব্দসমষ্টির কাব্য নাম প্রদান করা একান্ত অসঙ্গত। যদি তাহাতে কিঞ্চিৎ রসের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে তাহা একেবারে 'অব্যঙ্গ্য' ব্যঞ্জনারহিত বলা যায় না, সুতরাং দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ গুণীভূত ব্যঙ্গ্য কাব্য মধ্যেই অন্তর্গত হইবে। বিশেষতঃ কবি জয়দেবের সমাস-বহুল গৌড়ী রীতি সংস্কৃতসাহিত্যে যে অমৃতরস সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাতে গৌড়ীভাষার নিন্দা করিতে তৎপরবর্ত্তী কবি বা আলঙ্কারিকগণ পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন। কিন্তু দণ্ডীর সময়েও চিত্রকাব্যের বেশ উন্নতি দেখা যায়, যদিও তিনি 'চিত্র' কাব্য এই নামটি ব্যবহার করেন নাই, কিন্তু শব্দালঙ্কারমধ্যে যমক, গোমূত্রিকাবন্ধ, অর্দ্ধভ্রমক, সর্ব্বতোভদ্র এই কয়টির উল্লেখ ও উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। যমকের বাষট্টি প্রকার ভেদ দেখাইয়াছেন এবং তৎপরে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণগত বৈচিত্র্য লইয়া বহুবিধ উদাহরণ এবং কতিপয় প্রহেলিকা শব্দালঙ্কারমধ্যে প্রদর্শন করিয়াছেন।

তিনি 'চিত্র' অলঙ্কার বলিয়া কোন নাম নির্দ্দেশ না করিলেও—গোমূত্রিকা, অর্দ্ধভ্রমক ও সর্ব্বতোভদ্র এই তিনটিকে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। দণ্ডীর সময়ে পদ্মবন্ধ প্রভৃতির অস্তিত্ব বিষয়ে বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বস্তুতঃ, রেখাচিত্রের প্রাথমিক অবস্থা চিন্তা করিলে এই তিন চার প্রকার চিত্রই প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। এইগুলি সমস্ত সরলরেখার অঙ্কন হইতে উদ্ভূত।

পরবর্ত্তিকালে ক্রমে এই সকল চিত্রবন্ধ পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে এবং সরল, বক্র প্রভৃতি নানাবিধ রেখার আকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাচীন মহাকাব্য—কিরাতার্জ্জুনীয় ও ভারবির অনুকরণকারী শিশুপালবধে—দণ্ডীর নির্দ্দিষ্ট চিত্র কয়টির সন্নিবেশ দেখা যায়, শিশুপালবধে—'মুরজবন্ধ'টি কেবল বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু তাহাও সরলরেখার অঙ্কন বিশেষমাত্র।

সমজাতীয় বর্ণগুলি একত্র সজ্জিত হইলে যেমন বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে, তেমনই মধ্যে মধ্যে রেখার সাহায্য গ্রহণ করিলে যদি সমজাতীয় পদবন্ধ সম্ভবপর হয়, তাহাতেও কবিচিত্ত বৈচিত্র্য অনুভব করিয়াছিলেন। এজন্য বর্ণসজ্জা করিতে করিতেই চিত্রবন্ধ উৎপন্ন হইয়াছে ;—

অনুপ্রাস ও যমকের পরিণতি বিশেষই চিত্রবন্ধ, ইহাই প্রতীত হয়। এই বর্ণের খেলা কতরূপে যে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিয়া 'চিত্র' অলঙ্কারের ক্রমবর্দ্ধমান পরিপুষ্টি প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইব।

শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ (এম-এ)।

এ কি তব লীলাখেলা

তুমি কৃপাময়ী জননী—এ কথা শুনি শিশুকাল হতে !
কিন্তু দেখি যা চক্ষে, সে-কথা মানি আর কোন্ মতে !
চারি দিকে শুধু ধ্বংসের ছবি—প্রাণ নিয়ে হেলাফেলা—
মা বলিয়া ডাকি ! সন্তানে মা'র এতখানি অবহেলা !
শরৎ-প্রভাতে আসিবে জননি, পুলকে ভরিল মন,—
হাস্যময়ীর হাস্য-আভাসে হাসিল কাশের বন !
আসিছে শারদা শুভদা বরদা কণ্ঠে শেফালি-মালা—
আসিলি মা তুই নয়নে ঝটিকা বজ্র-অগ্নি জ্বালা !
কেশপাশে তোর হাজার নাগিনী উদ্যত তার ফণা—
বন্যার ধারা ঝরিল ফণায়,—মরণের ঝঞ্ঝনা !
বন্যায় ধুয়ে মুছে গেল মাঠ, ধুয়ে গেল দেশ-গ্রাম !
জীবন-চিহ্ন মুছে গেল সব, মুছে গেল শত প্রাণ !
কোনো মতে মনে সান্ত্বনা রচি ! হয়েছিল্ল কত দোষ—
নির্ম্মম হাতে দিলি মা শাস্তি,—নিখিল মায়ের রোষ !
অভয়-হস্তে আসিবে অভয়া কল্যাণময়ী কালী—
জবা-বিভূষণা মায়ের হস্তে শান্তি-কুসুম-ডালি !
পূজা-মণ্ডপ সুচারু-সাজেতে সাজায় পুলকে সবে !
কত আনন্দে, কত না ছন্দে মাতে পূজা-উৎসবে—
সহিল না তোর সে-আনন্দ হায়, কোথা দোষ পেলি সে যে—
ত্ব'নয়নে তোর জ্বলিল অনল হিংসা-তীব্র তেজে !
চকিতে ভস্ম করে' দিলি প্রীতি, স্নেহ-মায়া, আশা কত !
ভাগ্যবন্ত হলো গৃহহারা, সম্পদ্ অপগত !
শোণিত-পিপাসা সমরাঙ্গনে—তাতে না তৃপ্তি পেলি !
বন্যার জলে, তীব্র অনলে মৃত্যুর বেশে এলি !
মা যদি হয় নির্ম্মম হেন, বেদনা না বাজে বুকে—
কোথা কল্যাণ ? কোথায় শান্তি ? কার কাছে কবো দুখ এ !
এর পরে বলো আশ্রয় আর মাগিব কাহার কাছে ?
জানি না বাঙ্গলা-মায়ের কপালে আরো কি যে লেখা আছে !

কুমারী ভক্তি মুখোপাধ্যায়

শ্রদ্ধা-নিবেদন

পরলোকে জ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী

হুগলী সিমলাগড়ের প্রসিদ্ধ জমিদার জ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী মহাশয় ৮৫ বৎসর বয়সে ২রা কার্ত্তিক পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি আইন অধ্যয়নের পর কিছু দিন ভারত সরকারে কার্য্য করিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি মহীশূর ও আউধের ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় তাঁহার প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত। 'মরণরহস্য', 'শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তা', 'শ্রীরাধা-চিন্তা', 'পূজনীয় গুরুদাস', 'পঞ্চকণা', 'ধর্ম্মজীবন' প্রভৃতি প্রণয়নে তিনি সাহিত্যানুরাগী সম্প্রদায়ে সমাদর ও প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার শোকসন্তপ্ত স্বজনগণকে আমরা সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র পরলোকে

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র দীর্ঘকাল রোগাক্রান্ত থাকিয়া ১০ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার ৫৪ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু এরূপ অপ্রত্যাশিত যে, এই সংবাদে অনেককেই বিস্মিত হইতে হয়।

তাঁহার পিতা উদয়চন্দ্র মিত্র নোয়াখালি জিলার রাধাপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। সত্যেন্দ্রচন্দ্র কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করিয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সহকর্ম্মিরূপে স্বদেশ-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন; স্বদেশসেবার পুরস্কারস্বরূপ ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে কারাবরণ করিতে হয়। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি মুক্তিলাভ করেন। তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া আইন ব্যবসায় ত্যাগ করেন; অতঃপর স্বদেশসেবাই তিনি জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে নির্ব্বাসিত হইতে হয়; কিন্তু কাউন্সিল-বর্জ্জন নীতি পরিত্যক্ত হইলে তিনি নির্ব্বাসিত অবস্থাতেই কেন্দ্রী ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। কংগ্রেসের নির্দ্দেশ পালন না করায় তাঁহাকে কংগ্রেসের দণ্ডমূলক ব্যবস্থা মানিয়া লইতে হইয়াছিল।

কর্ম্মজীবনে সত্যেন্দ্রচন্দ্রকে বহু দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল, কিন্তু দুঃখ-কষ্টে কোন দিন তাঁহাকে বিচলিত হইতে দেখা যায় নাই। সর্ব্বসাধারণের প্রতি তাঁহার ব্যবহার অমায়িক ও আন্তরিকতাপূর্ণ ছিল। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবার পর তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ব্যবস্থাপক সভার সভাপতিরূপে তিনি সকল দল ও সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বদেশানুরাগ আন্তরিক ছিল এবং কোনরূপ দুঃখ-কষ্টেই কোন দিন তাহা শিথিল হয় নাই। তাঁহার অকাল বিয়োগে আমরা নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়াছি। ভগবান্ তাঁহার আত্মার কল্যাণ করুন।

জ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী

কুমারকৃষ্ণ মিত্র

পরলোকে কুমারকৃষ্ণ মিত্র

গত ২৫শে আশ্বিন প্রত্যূষে কলিকাতা আহিরীটোলা ষ্ট্রীটের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার, ব্যবসায়ী ও জনপ্রিয় সামাজিক কুমারকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় ৬৬ বৎসর বয়সে কর্ম্মময় জীবনের অবসানে লোকান্তরিত হইয়াছেন জানিয়া আমরা হিতৈষী বন্ধুবিয়োগ-বেদনা অনুভব করিয়াছি। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুলাই কুমার বাবুর জন্ম—তাঁহার পিতা ৺ক্ষীরোদগোপাল মিত্র ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থশালী হইয়াছিলেন। কুমার বাবু বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি 'আয়ুর্ব্বেদ-বিস্তার-সমিতি' প্রতিষ্ঠা করিয়া সুলভে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রচারের প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট প্রতিষ্ঠা সূচনায় ইহুদী বণিক্গণ যখন কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলের অট্টালিকা সমূহের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি করিয়া ফাট্কাবাজী করিতেছিলেন, কুমার বাবু সেই সময়ে দিল্লীর প্রসিদ্ধ ধনী সুলতান সিংহের সহায়তায় বহু অট্টালিকা ও জমি ক্রয় করিয়া তাহার উন্নতি-সাধন ও ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। পরে তিনি গিরিডিতে অভ্রের খনি লইয়া অভ্র ব্যবসায়ের ব্যপদেশে দুই বার য়ুরোপ—জার্ম্মাণী—আমেরিকা পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিজ্ঞতা-পূর্ণ ভ্রমণকাহিনীর সচিত্র প্রবন্ধে 'মাসিক বসুমতী' সমৃদ্ধ হইয়াছিল।

কলিকাতা করপোরেশনের পুঞ্জীভূত অনাচার হইতে কলিকাতার করদাতৃগণকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি দেশহিতব্রত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসুর সুপরামর্শে ও সহায়তায় একটি সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়া করপোরেশনের সংস্কার সাধনের জন্য প্রভূত প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ভাস্কর্য্য ও চিত্র সংগ্রহে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন—স্বদেশী মেলা প্রবর্ত্তন—নাট্য-কলার উন্নতি প্রয়াস তাঁহার শিল্পানুরাগের নিদর্শন। বহু দরিদ্র গৃহস্থ বিশেষতঃ বিধবাগণকে তিনি নিয়মিত ভাবে গোপনে অর্থসাহায্য করিতেন। 'বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের' প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল। আমরা তাঁহার স্নেহমধুর ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়া বেদনাতুর হৃদয়ে শ্রদ্ধা-নিবেদন করিতেছি।

চোখের জলে

[গল্প]

বর্ষাকাল। আষাঢ়ের শেষাশেষি ভোরের দিকে এলার্ম-দেওয়া ঘড়িটা বাজিয়া উঠিতেই মধুপের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল! খোলা জানলা দিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া সে দেখিল, সমস্ত আকাশ মেঘে ঢাকিয়া আছে, এখনই বৃষ্টি আসিবে!

মধুপ ভাবিল, আজ টিউশনীতে না গিয়ে বাদলা-বেলাটা গল্প-গুজবে কাটালে মন্দ হয় না। পরক্ষণেই আবার মনে হইল, না, আরামের জন্ম কর্ত্তব্যে অবহেলা উচিত নয়; তাছাড়া গরীবের আবার আরাম কিসের? রোদ-বৃষ্টি-বাদলা গরীবের কাছে সমান।

মধুপ ডাকিল—অঞ্জলি!

—দাদা! বলিয়া দশ-এগারো বছরের মেয়ে অঞ্জলি ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল;

—তাড়াতাড়ি একটু চা করতে পারিস? এখনি বেরুতে হবে। বৃষ্টি এলো বলে।

চা খাইয়া মধুপ যাইবার জন্ম প্রস্তুত হইল। অঞ্জলি বলিল—আজ ফেরবার পথে আমার গল্পের বইটা আনা চাই কিন্তু।

সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া মধুপ দ্রুতপদে পথে বাহির হইয়া পড়িল। টিপ-টিপ করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। মধুপ কালীঘাট ট্রাম-ডিপোয় আসিয়া শেডের নীচে দাঁড়াইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে টালিগঞ্জ হইতে একখানা ট্রাম আসিয়া থামিল। তাড়াতাড়ি ট্রামে উঠিয়া মধুপ সামনের সিটে বসিল।

রিং-রিং শব্দে ডান দিকে চাহিতেই মধুপ দেখিল, সমস্ত কামরা খালি, শুধু লেডিস-সিটে একটি তরুণী। তাহার এলায়িত কেশের গুচ্ছ খোঁপার মত করিয়া জড়াইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু অবাধ্য গুচ্ছ কিছুতেই আয়ত্তে আসিতেছে না! বিব্রত হইয়া তরুণী শেষে চুলগুলি পিঠের উপরে ছড়াইয়া দিল।

তাহার ভাব দেখিয়া মধুপ মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল। শাড়ীর সঙ্গে ম্যাচ-করা তরুণীর পরনে ফিকে আশমানী রংয়ের ব্লাউশ্। পরিপূর্ণ কপোলটির পাশ দিয়া মেঘের মত কাজুরি-কেশগুচ্ছ পিঠে ছড়াইয়া পড়ায় মুখখানিকে পাতা-ঘেরা সদ্যফোটা গোলাপের মত দেখাইতেছিল। ঘনকৃষ্ণ মেঘের বুকে বিজলীর খেলার মত কাণে সোনার দুলদু'টি ভ্রমরকৃষ্ণ চুলের মধ্য হইতে মাঝে মাঝে উঁকি মারিতেছে। তরুণী চুপ করিয়া স্বপ্নাবিষ্ট প্রতিমার মত বসিয়াছিল।

মেঘলা বেলা। মধুপের কবি-হৃদয় ছন্দে ছন্দে নাচিয়া উঠিল। অতৃপ্ত নয়নে তরুণীর পানে সে চাহিয়া রহিল, যেন তাহার কাব্যলক্ষ্মী মূর্ত্তি ধরিয়া সম্মুখে সমাসীন!

—বাবু, টিকিট!

মধুপের চমক ভাঙ্গিল। কণ্ডাক্টরকে মাসকাবারী টিকিটটা দেখাইল। কণ্ডাক্টর তখন তরুণীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

তরুণী ভ্যানিটী-ব্যাগ খুলিয়া তাহার ভিতরে হাত ঢুকাইয়া দিল। ব্যাগটি একটু এদিক্-ওদিক্ করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। পয়সা নাই, আছে শুধু ফাউণ্টেন পেন এবং কয়েক টুকরা কাগজ!

মুহূর্ত্তে তরুণীর মুখ বিবর্ণ হইল। তরুণী বিমূঢ়ের মত বসিয়া রহিল।

ব্যাপার বুঝিয়া মধুপ বলিল,—কিছু যদি মনে না করেন, তাহলে—

কথা শুনিয়া তরুণীর বিবর্ণ মুখে রক্ত আসিয়া জমিল—মুখে কথা ফুটিল না। সে নতমুখে বসিয়া রহিল।

মধুপ বলিল—ভুল এমন অনেক সময় হয়। তার জন্ম ভাববেন না।

মধুপ কণ্ডাক্টরকে কাছে আসিতে ইঙ্গিত করিল। তরুণীকে জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কোথা যাবেন?

লজ্জা-রক্তিম মুখে লজ্জানত দৃষ্টিতে তরুণী মধুপের দিকে চাহিল, তার পর লজ্জা-জড়িত মৃদু কণ্ঠে বলিল—এল্‌গিন্ রোড।

মধুপ চট্ করিয়া মনি-ব্যাগ খুলিয়া কণ্ডাক্টরের হাতে একটা আনি দিল। পয়সা লইয়া তরুণীর হাতে টিকিটটা দিয়া সে দূরে সরিয়া গেল।

তরুণী মৃদু কণ্ঠে বলিল—আজ আপনি আমার মান রক্ষা করেছেন। তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠেই বেরিয়ে পড়েছি কলেজের একটি মেয়ের কাছে যাবো বোলে। কারখানা খোওয়া হচ্ছে, দেরী করলে চলবে না, তাড়াতাড়িতে ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি—পাথেয় আছে কি না, দেখিনি।

মধুপ বলিল—আমাদেরো এমন ভুল হয়।

…কিন্তু আপনি যে উপকার করলেন—আপনার পরিচয়?

হাসিয়া মধুপ বলিল—পরিচয়? গরীব ছাড়া আমার অন্য পরিচয় নেই।

কথাগুলি তরুণীর কাণে বেসুরা বাজিল। সে ভাবিল, এ কি শ্লেষ!

মুখ তুলিতেই মধুপের দীপ্তিপূর্ণ সদা হাস্য মুখ চোখে পড়িল। মুহূর্তে মনের সমস্ত তিক্ততা চলিয়া গেল।

ট্রাম আসিয়া ইতিমধ্যে জগুবাবুর বাজারের সামনে দাঁড়াইয়াছে।

অনুনয়ের সুরে তরুণী বলিল—আমায় এবার নামতে হবে। যদি আপত্তি না থাকে, আপনার ঠিকানা ?

ভ্যানিটী-ব্যাগটি খুলিয়া একখণ্ড কাগজ এবং ফাউনটেন পেন মধুপের দিকে বাড়াইয়া ধরিল। মধুপ নিজের নাম-ঠিকানা লিখিয়া কাগজটি তরুণীর হাতে দিল।

লজ্জাকম্পিত হস্তে ঠিকানাটি লইবার সময় তরুণীর কুসুমপেলব হাত মধুপের হাতে ঠেকিল। এক অনাস্বাদিত পুলকে মধুপের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল।

এল্‌গিন রোডের মোড়। হাসি-মুখে মধুপকে নমস্কার করিয়া তরুণী ট্রাম হইতে নামিয়া পড়িল।

যতক্ষণ দেখা যায়, মধুপ তরুণীর গতি-পথ লক্ষ্য করিয়া ভাবিতে লাগিল, মেয়েটির নাম-ঠিকানা কিছুই জানা হইল না। তার পর ভাবিল, জানিয়া লাভ! মেঘলা-বেলায় আমার কবিত্বের খোরাক জোগাড় হইয়াছে! আর কি চাই ?

দেখিতে দেখিতে ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি নামিল।

এই আবেষ্টনীর মধ্যে তরুণীর কথা ভাবিতে ভাবিতে মধুপ নিজেকে কোন্ কল্পলোকে হারাইয়া ফেলিল!

এল্‌গিন রোডের উপর সুন্দর দ্বিতল বাড়ী। তাহারই রাস্তার দিকে দোতলা ঘরে সিপ্রা বসিয়া পড়াশুনা করে।

আষাঢ়ের ঘনবর্ষণ প্রাতে সিপ্রার মন কিছুতেই পাঠ্যপুস্তকে বসে না। মন কোন্ স্বপ্নলোকের উদ্দেশে ছুটিয়া চলে! টেবিলের উপর বই খোলা। উন্মনা সে জানলা দিয়া বাহিরে বর্ষার দিকে চাহিয়া আছে। মাঝে-মাঝে দমকা হাওয়ায় বৃষ্টির ছাট আসিয়া গায়ে লাগিতেছে।

হঠাৎ কড়া-নাড়ার শব্দে তন্ময়তা ভাঙ্গিয়া গেল। একটু কাণ পাতিয়া শুনিয়া দ্রুত-পদে সে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া আসিল। দরজা খুলিয়া অবাক হইয়া বলিয়া উঠিল—মঞ্জু! তুই! এই বাদলায়! আয় আয়, শীগ্‌গির ভিতরে আয়। ভিজে একেবারে সারা হয়ে গিয়েছিস্ যে! ট্রামে এলি বুঝি! গাড়ী আন্‌লি না ?

—না। সে অনেক কথা, পরে হবে'খন। এখন ওপরে চ, আমার বড্ড শীত করছে।

—চল্। বলিয়া সিপ্রা মঞ্জুরির হাত ধরিয়া উপরে চলিল।

সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে সিপ্রা মঞ্জুরির চিবুকে একটা টোকা দিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল—ভারী চমৎকার দেখতে হয়েছে কিন্তু তোকে! আমি যদি মেয়ে না হয়ে—

—আঃ, কি হচ্ছে, সিপু! আমি শীতে কাঁপছি, আর তুই তামাসা পেলি! না ?

দু'জনে আসিল সিপ্রার পড়ার ঘরে। মঞ্জুরি কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—শীগ্‌গির একখান কাপড় আর তোয়ালে আন্ ভাই! যে শীত করছে!

সিপ্রা দ্রুত ঘরের বাহিরে গেল।

মঞ্জুরি দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছিল। ভিজা শাড়ী-ব্লাউস লীলায়িত দেহলতার সঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। নব-যৌবনের প্রত্যেকটি রেখা নিখুঁত-ভাবে সারা অঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সিপ্রা ফিকে-বেগুনে রঙের একখানা শাড়ী আর ব্লাউস, সায়া, তোয়ালে আনিয়া দিল, বলিল—নে, কাপড় ছাড়্।

—আগে আমার মাথাটা মুছে দে ভাই ভালো করে। তার পর কাপড় ছাড়বো'খন।

সিপ্রা তোয়ালে দিয়া ভিজা চুলগুলি মুছিতে মুছিতে বলিল—বাব্‌বা কি চুল! তোর এই মাথা-ভরা এক-রাশ ঠাস্‌বুনুনী ভ্রমর-কালো চুল আর ঐ চোখ যার নজরে পড়বে, তাকে তুই পাগল না করে ছাড়বি নে!

সিপ্রাকে চিম্‌টি কাটিয়া মঞ্জুরি বলিল—পরের সব-তাতে হিংসে হয়, না রে ? কেন, তোর কোথায় কি কম যে আমায় বল্‌ছিস্!

—হ্যাঁ, হিংসে হয়ই তো! বলিয়া সিপ্রা সশব্দে মঞ্জুরির রক্ত কপোলে একটি চুম্বন অঙ্কিত করিয়া দিল।

—তোর আজ কি হয়েছে বল্ তো ?

নাটকের ভঙ্গীতে সিপ্রা আবৃত্তি করিল—

যৌবন-জল-তরঙ্গ রোধিবে কে
হরে মুরারে হবে মুরারে।

—তাই দেখছি, যৌবন-জল-তরঙ্গ আজ আর কূলে বাঁধা থাকতে পারছে না, উপচে উঠছে। বলি, এই মেঘমেদুর দিনে কোন বিরহী যক্ষ কি বার্ত্তা পাঠালে ?

সিপ্রা ঠোঁট মুচকাইয়া হাসিয়া গাহিতে লাগিল—

উন্মনা মন খুঁজিছে সাথী!

মঞ্জুরি দরজার সামনে দাঁড়াইয়া কাপড় ছাড়িতেছিল, সিপ্রার মাকে সে দিকে আসিতে দেখিয়া বলিল—এই চুপ, মাসিমা আসছেন। তার পর মাসিমাকে শুনাইয়া বলিল—আজ রাস্তায় ভারী বিপদে পড়েছিলুম।

উৎকণ্ঠাপূর্ণ কণ্ঠে মা জিজ্ঞাসা করিলেন—বিপদ! কি বিপদ ?

রাস্তায় কি বিপদ হইয়াছিল, মাসিমাকে বলিতে লজ্জা হইল। আম্‌তা আম্‌তা করিয়া সে বলিল—না, এমন কিছু নয়, ট্রামে এলুম, কিন্তু এই বৃষ্টি!

—সত্যি তো! গাড়ী নিয়ে এলে না! এই বৃষ্টি! সিপ্রাও বলছিল, একেবারে নেয়ে এসেছ। আমি যাই—দু'খানা লুচি ভাজতে বলি ঠাকুরকে। গঙ্গাজল ভালো আছে ?

গঙ্গাজল মঞ্জুরির মা। মঞ্জুরি বলিল—হ্যাঁ।

মা চলিয়া গেলেন। সিপ্রার কাছে আসিয়া মঞ্জুরি বলিল—সত্যি ভাই, যে বিপদে পড়েছিলাম!

কৃত্রিমবিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে সিপ্রা বলিল—কি বিপদ, সখি ?

মুখ নত করিয়া মঞ্জুরি বলিল—এমন ভয়ঙ্কর বিপদ নয়, তবে বিপদ!

দুষ্টামি-ভরা চোখে মঞ্জুরির দিকে চাহিয়া সিপ্রা বলিল—বিপদ, কি বিপদ নয়, সে মীমাংসার ভার আমার উপর ছেড়ে দিয়ে বলে ফেল—কি হয়েছে।

মুখ ভার করিয়া মঞ্জুরি বলিল—কাল রাত্রে মার সঙ্গে একটু কথা-কাটাকাটি হয়ে গেছে।

—কেন ?

স্বরে ঝাঁজ মিশাইয়া মঞ্জুরি বলিল—কিসের জন্য আবার! বিয়ের জন্য। বিয়ে না করলে মার পেটের ভাত হজম হচ্ছে না!

হাসিয়া সিপ্রা বলিল—এতে কথা-কাটাকাটির কি আছে?

তিক্ত কণ্ঠে মঞ্জুরি বলিল—না, কিছু নেই! তুই বিয়ে কর্ না।

—দিলে করি। বলিয়া সিপ্রা তাহার দিকে চাহিল।

—কাকে বিয়ে করবি? বলিয়া মঞ্জুরি সিপ্রার মুখের দিকে চাহিতেই কালো চোখে হাসির বিদ্যুৎ ঠিক্‌রাইয়া সিপ্রা বলিল—তোকে!

—আমাকে বিয়ে করলে দাদার অবস্থা কি হবে? দাদা তোর জন্য পাগল!

সলজ্জ হাসিতে মুখ ভরিয়া সিপ্রা বলিল—পাগলের ওষুধ গারদ। কিন্তু ও কথা থাক, যা বলছিলি, বল্।

মঞ্জুরি বলিল—মা বলেন, পাত্র মজুত। বিলেত-ফেরৎ ডাক্তার, পাত্রের বাপ জমিদার, পাত্র সুদর্শন, আরও কত কি! মা চায়, আজই আমি বিয়ে করি। মা বলেন, এ রকম সুপাত্র না কি বড় একটা মেলে না আজকালকার বাজারে। আমি বলি, এখন নয়, পরে, আই-এ পাশ করার পর। তাছাড়া ডাক্তারদের আমি কেমন দেখতে পারি না।

—কেন, ডাক্তারদের উপর এত বিরাগ কেন? ডাক্তারী তো স্বাধীন ব্যবসা। তাছাড়া পরের উপকার, গরীব-দুঃখীর উপকার করা হয় এতে!

একটু উত্তেজিত স্বরে মঞ্জুরি বলিল—এর মধ্যে সত্যি আছে মানি, কিন্তু রোগের চিন্তা যাদের পেশা, দেশকে নীরোগ দেখলে যাদের মন খারাপ হয়, দেশে রোগের প্রাদুর্ভাব হলে যাদের মন খুশীতে ভরে ওঠে, তাদের উপর আমার স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা। দু' পয়সা পকেটে পড়তে থাকলে দেশের আর দশের কল্যাণ চিন্তা যাদের মনে স্থান পায় না, তাদের প্রশংসায় মঞ্জুরি উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে না। তাছাড়া আজকালকার বাজারে আমরা এতই শস্তা হয়েছি যে, বিলেত-ফেরৎ হলেই ছলে-বলে-কৌশলে তার গলা ধরে ঝুলে পড়ে নিজেদের জীবন সার্থক মনে করতে হবে? কেন, আমরা বানে ভেসে এসেছি না কি যে, আমাদের দাম নেই?

গাম্ভীর্যের ভাণ করিয়া সিপ্রা বলিল—নিশ্চয় আজকালকার বাজারে তোর মত মেয়ের দাম এখনও পড়ে যায়নি, বেশ চড়া দামেই বিকিয়ে যাবি! দেহি পদপল্লবমুদারম্ বলে কত বিলেত-ফেরৎ দোরে এসে ধর্ণা দেবে, ভাবনা কি?

—ঠাট্টা! বলিয়া মঞ্জুরি অভিমানে মুখ ফিরাইল।

সিপ্রার সানুনয় অনুরোধে মঞ্জুরি সকালের বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিল।

শুনিয়া সিপ্রা বলিল—আমার কাছে Weekly Examination-এর task জানতে আসছিস্, এ মিথ্যে বললি কেন?

—বা রে, আমি বুঝি মায়ের সঙ্গে বিয়ের কথা নিয়ে ঝগড়া করে আসছি এইটেই বলবো? তার পর ব্যাগ খুলিয়া ঠিকানা বাহির করিয়া বলিল—এই দেখ তাঁর ঠিকানা বলিয়া কাগজটি সম্মুখে মেলিয়া ধরিল।

সিপ্রা তাহার হাত হইতে কাগজখানা একপ্রকার ছিনাইয়া লইয়া জোরে জোরে পড়িতে লাগিল। নাম পড়িয়া সিপ্রা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—বেশ নামটি! মধুপ মজুমদার! চমৎকার মিল রয়েছে নাম দু'টিতে, মধুপ-মঞ্জুরি! যাত্রা শুভ বলতে হবে। মধুপের সন্ধান মিলেছে, মঞ্জুরি আর রোদে শুকিয়ে মিথ্যা হবে না।

লজ্জায় মঞ্জুরির মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। সলজ্জে হাসিয়া মঞ্জুরি বলিল—তুই আজকাল ভারী দুষ্টু হয়েছিস্ সিপু!

—সত্যি কথা বললেই দুষ্টু হয় মানুষ! বেশ ভাই, বলি, চার চোখের মিলন হয়েছে তো?

ঝাঁজালো স্বরে মঞ্জুরি বলিল—যদি বলি, হয়েছে?

সিপ্রা বলিল—যদি বলি, মরেছো!

মঞ্জুরি বলিল—আমি মরবো কেন? তুই মর্।

—আমি তো মরেই আছি। কিন্তু তোকে যে রোগে ধরেছে!

মা ডাকিলেন,—খাবার হয়েছে, দু'জনে আয় রে!

দু'জনে মায়ের কাছে আসিলে মা বলিলেন—মঞ্জু এ বেলা থাক্, কলেজ যেতে হয় দু'জনে এখান থেকে যেয়ো।

মায়ের কথা শুনিয়া মঞ্জুরি ও সিপ্রার মুখে হাসির রেখা ফুটিল।

কলেজ হইতে ফিরিয়া মঞ্জুরি ও সিপ্রা পড়ার ঘরে বসিয়া কিসের আলোচনা করিতেছিল। হঠাৎ নীচে মোটরের হর্ণ শুনিয়া জানলার কাছে আসিয়া দু'জনে পথের দিকে চাহিল। মঞ্জুরি বলিল—আমাদের গাড়ী, দেখছি! দাদা!

মঞ্জুরির দাদা অলক গাড়ী হইতে নামিল।

চা এবং জলখাবার খাইয়া মঞ্জুরি ও সিপ্রাকে লইয়া অলক যখন লেকের দিকে বেড়াইতে বাহির হইল, তখন সন্ধ্যা হয় হয়। গাড়ী এল্‌গিন রোডের মোড় ফিরিয়া লেকের দিকে বেগে ছুটিয়া চলিল।

তিন-চার দিন পরের কথা।

অনেক ভাবিয়া মঞ্জুরি ঠিক করিয়াছে, মধুপ বাবুর দেওয়া চারটি পয়সা তাঁহাকে ফেরৎ না দিলে নীচ মনোবৃত্তি প্রকাশ পাইবে! আবার দিলে তাঁহার সে উপকারের অসম্মান করা হইবে। তাই তাহা ফেরৎ না দেওয়াই সঙ্গত।

সে-দিন কলেজ হইতে ফিরিয়া মঞ্জুরি দেখিল, অলক ড্রেসিং টেবিলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কেশ বিন্যাস করিতেছে। মঞ্জুরি বলিল—কোথাও যাচ্ছো না কি, দাদা?

—হুঁ। ইউনিভারসিটি ইন্‌সিটিটিউটে আজ একটা ডিবেট আছে। যেতে হবে। বেশী দেরী নেই।

—ও, মহাসমরে ভারতবর্ষের যোগদান করা উচিত কি না—এই নিয়ে তো?

—হুঁ। Subject-matter হচ্ছে "Should India join in the world-war?" যাবি? All-India Inter-versity debate.

—চলো। সিপ্রাকেও নিয়ে যেতে হবে। না হলে সে রাগ করবে!

সাড়ে ছ'টার সময় ডিবেট আরম্ভ হইবে। মঞ্জুরি এবং সিপ্রাকে লইয়া অলক যখন ইনস্‌টিটিউটে পৌঁছিল, তখন ছ'টা বাজে।

সমস্ত হল-ঘরটা ছাত্র-ছাত্রীর কল-কোলাহলে মুখরিত। সম্মুখে মেয়েদের নির্দ্দিষ্ট আসন প্রায় সমস্তই অধিকৃত হইয়া গিয়াছে, কেবল একটা বেঞ্চ খালি ছিল, তাহাও ছাত্রদের ঠিক সম্মুখে। মঞ্জুরি এবং সিপ্রা সেইখানে গিয়া বসিল।

পিছনে ফিরিয়া চাহিতেই অলক দেখে, পিছনের বেঞ্চে কয়েক জন বন্ধু বসিয়া আছে। অলককে তাহারা কোন রকমে নিজেদের মধ্যে বসাইয়া লইল। অলক বলিল—আধ ঘণ্টা আগে এসেও একটু জায়গা পেলাম না। তার পর বলিল—হ্যাঁ রে রজত, মধুপ এসেছে?

—হ্যাঁ। এই একটু আগে দেখা হয়েছিল।

অলক উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল—মধুপ নিশ্চয় ফার্ষ্ট হবে। তোমার কি মনে হয়?

রজত বলিল—নিশ্চয়, ওরই তো ফার্ষ্ট হওয়া উচিত। ওর যুক্তি-তর্কের কাছে কেউ এঁটে উঠতে পারবে না, আমি ভবিষ্যদ্‌-বাণী করছি।

পিছন হইতে তপন বলিল—রজত, পাঞ্জাব-ইউনিভারসিটি থেকে একটি মেয়ে এসেছে। সে না কি খুব ভালো ডিবেট করে। জানো কিছু?

তাচ্ছিল্যের সুরে রজত বলিল—আরে রাখো তোমার দিল্লী, পাঞ্জাব! স্বয়ং সিংহী এলেও বাংলার বাঘের কাছে তার নিস্তার নেই।

অলক বলিল—সত্যি তপন, ওর প্রতিভার কাছে অপরের প্রতিভা ম্লান হয়ে যায়। কখন্ পড়ে, কখন্ টিউশন করে ভেবে পাই না, অথচ বরাবর ফার্ষ্ট হয়ে চলেছে। ইংরেজীতে এম-এ পড়ে, কিন্তু বাংলা-সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, ধন-বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব সব বিষয়েও কি দারুণ ষ্টাডি করে। কবিতায়—কি ইংরেজী কি বাংলা, এরি মধ্যে বেশ নাম করেছে। এমন ছেলে লাখে একটা মেলে কি না সন্দেহ!

রজত বলিল—আমি ভাই ওর কবিতার এক জন একনিষ্ঠ পাঠক। মেয়েদের সঙ্গে ও বড় একটা মেশে না, তবু Love poem আর "My sweet heart" কবিতা দু'টি পড়ে আমি ওকে জিজ্ঞেস করলুম—মধুপ, তুমি তো মেয়েদের সঙ্গে বেশী মেশো-টেশো না! কিন্তু এই সব Love poem লেখবার inspiration পাও কোথা থেকে! হেসে উত্তর দিলে—গাছে ফুল যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ দূর থেকে তাকে দেখতে লাগে অতি চমৎকার, কিন্তু বোঁটা ছিঁড়ে হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করলে তার সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়, তার উপর ফুলের মধ্যের কীট আছে, চোখে পড়তে পারে। দূর থেকে যে ফুল দেখে মন মুগ্ধ হয়ে যেতো, তখন হয়তো তার অতি-কাছে এসে সে-কীট চোখে পড়ায় মন বিতৃষ্ণায় ভরে উঠতে পারে।

মধুপের নাম শুনিয়াই মঞ্জুরি ভাবিয়াছিল, এ মধুপ, সেই মধুপ মজুমদার নয় তো? মধুপের প্রশংসা শুনিয়া মঞ্জুরির কৌতূহল বাড়িয়া গেল। সে অদম্য আগ্রহে উৎকর্ণ হইয়া ছেলেদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে ডিবেট আরম্ভ হইল। মধুপ এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিত্তালয় হইতে আগত ছাত্রীটির যুক্তি-তর্কের সারবত্তায় উপস্থিত সকলে মুগ্ধ হইল। বিচারকেরা মধুপ এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিত্তালয়ের ছাত্রীটিকে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় বলিয়া স্থির করিলেন।

কলিকাতা বিশ্ববিত্তালয়ের জয়ে সমস্ত হল-ঘর আনন্দের আতিশয্যে প্রকম্পিত হইল।

মঞ্জুরির মুখ আনন্দে ভরিয়া উঠিয়াছে। সিপ্রা কৌতুক-দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল,—কি রে, আনন্দ যে ধরে না দেখছি!

মঞ্জুরি বলিল—এই, দাদা আছে সামনে।

অলক বলিল—সিপ্রা, একটু দাঁড়াও, মধুপকে congratulate করে আসি।

অলক চলিয়া গেলে হাসিয়া সিপ্রা বলিল—এই মঞ্জু, অলকদা তো তোর মধুপকে চেনে দেখছি। বোধ হয় একসঙ্গে পড়ে।

মঞ্জুরি বলিল—হবে! দাদাকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারা যাবে।

একটু পরে অলক ফিরিয়া আসিয়া বলিল—সিপ্রা, আমার বন্ধু মধুপ আজ ফার্ষ্ট হলো। ইংরেজীতে এম-এ পড়ে, এটা সিক্সথ ইয়ার, এমন intelligent sweet temperment-এর ছেলে দেখা যায় না! কাল ওকে আমাদের বাড়ীতে invite করেছি, পরিচয় করিয়ে দেবো। দেখবে কি চমৎকার ছেলে!

সিপ্রা মোটরে বসিয়া মঞ্জুরিকে চিম্‌টি কাটিতে লাগিল। অলক মোটরে ষ্টার্ট দিয়া ভিড়ের মধ্য দিয়া আস্তে আস্তে গাড়ী বাহির করিয়া বেগে ছুটাইয়া দিল।

পরের দিন বৈকালে সুসজ্জিত ড্রয়িং-রুমে বসিয়া মঞ্জুরি এবং সিপ্রা আমন্ত্রিত অতিথির জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। গাড়ীর শব্দ শুনিয়া উভয়ে দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। অলক ও মধুপকে গাড়ী হইতে বাহির হইতে দেখিয়া মঞ্জুরি বলিল—এত দেরী হলো যে? তার পর মধুপকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—আসুন মধুপ বাবু।

যেখানে মধুপ পূর্ব্বে কখনও আসে নাই, সেখানে এক অপরিচিত তরুণী তাহাকে মধুপ বাবু বলিয়া সম্ভাষণ করিতে দেখিয়া সে একটু আশ্চর্য্য হইয়া গেল। বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে মঞ্জুরির দিকে চাহিতেই মঞ্জুরি হাসিয়া বলিল—চিনতে পারলেন না? উপকারীর পক্ষে উপকৃতকে মনে রাখার প্রয়োজন না হতে পারে, কিন্তু উপকৃত উপকারীকে ভোলে না।

মধুপকে কৌচে বসাইয়া মঞ্জুরি এবং সিপ্রা আর এক কৌচে বসিল। মধুপ কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় অলক ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া বলিল—আসছি মধুপ, এক মিনিট।

মৃদু হাসিয়া মঞ্জুরি বলিল—আপনার পয়সা চারটে কিন্তু আমি দেবো না।

মধুপ মঞ্জুরিকে চিনিয়াও চিনিতে পারিতেছিল না। মনে হইতেছিল, মুখখানা যেন চেনা-চেনা, কোথায় যেন দেখিয়াছে! কিন্তু এই পয়সার কথায় সে-দিনকার ট্রামের সেই কথা মনে পড়িল। মৃদু হাসিয়া সে বলিল—চারটে পয়সা আমি নেবো না।

সিপ্রা দুষ্টামির হাসি হাসিয়া বলিল—এ তোর ভারী অন্যায়, মঞ্জু! সুদ না দিয়ে শুধু আসলের প্রস্তাবে মহাজন রাজি হবে কেন?

মধুপ মৃদু হাসিয়া মুখ নত করিল। মঞ্জুরি এ প্রসঙ্গ চাপা দিবার জন্য বলিল—আপনাদের আসতে দেরী দেখে আমরা বলাবলি করছিলাম যে, আপনি বুঝি গরীবদের বাড়ীতে আর এলেন না!

ড্রয়িং-রুমের ভিতরটায় একবার চোখ বুলাইয়া মধুপ বলিল—গরীবের নিদর্শনই বটে!

মঞ্জুরি বলিল—গরীব নয় তো কি?

—নিশ্চয়! ঘরে ঢুকে দেখলাম, ঘরের আসবাবগুলোয় নিদারুণ দারিদ্র্যের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে! তাই আপনি যখন পয়সার কথা বললেন, তখন নেবো না ছাড়া আর কিছু বলতে পারলাম না। মানুষের প্রাণ দুঃখে-দারিদ্র্যে দয়ায় বিগলিত হয়ে ওঠে! বলিয়া মধুপ হাসিয়া ফেলিল।

হাসিয়া সিপ্রা বলিল—কিন্তু সাবধান থাকিস মঞ্জু! জানিস তো, মহাজন গরীব প্রজাকে টাকা ধার দেয়, শুধতে দেরী করলে মহাজন প্রথমটা বিশেষ গা করে না। এই গা না করার কারণ দয়া বা করুণা নয়, ভবিষ্যতে একটা বড় দাঁও মারার লোভ! সুদে-আসলে ধার-দেওয়া টাকা ক্রমে এমন সংখ্যায় এসে দাঁড়ায় যে, গরীব প্রজার পক্ষে তা শোধ করা সম্ভব হয় না! তখন তার ভিটে-মাটি চাটি করেও দয়ালু মহাজনের আশা মেটে না, ভিটের মালিককে নিয়েও টানাটানি করেন! তোর অবস্থা যেন—

মঞ্জুরির মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি সিপ্রার মুখে হাত চাপা দিয়া বলিল—তুই আজকাল বড্ড বাজে বকিস্ সিপ্রা!

মধুপ বলিল—অলক পালালো কোথা? তার পর সিপ্রাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—অলককে আর এঁকে দেখলে ভাই-বোন বলে মনে হয়। কিন্তু আপনার পরিচয়?

হাসি-ভরা মুখে মঞ্জুরি বলিল—হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন। আপনার বন্ধু আমার দাদা—আর ওর তিনি অলকদা—বলিয়া সিপ্রার দিকে চাহিল।

মধুপ কি বলিতে যাইতেছিল, হাসিয়া মঞ্জুরি বলিল—বুঝতে পারলেন না? প্রথমে এর পরিচয় আপনাকে দেওয়া হয়নি, ভুল হয়েছে। এর নাম শ্রীমতী সিপ্রা সেন, বেথুন কলেজের কলা-বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী, আমার সহপাঠিনী এবং আরও নিকটতম ও মধুরতম পরিচয় হচ্ছে, উনি আমার ভাবী—ভাবী। অর্থাৎ—

ঠিক এই সময়ে অলক প্রবেশ করিল। তাহার পিছনে বেয়ারা রামজীবন প্রকাণ্ড ট্রেতে করিয়া চা ও খাবার লইয়া ঢুকিল।

সিপ্রার মুখ সিঁদুরে-আমের মত রাঙা হইয়া উঠিল। সে তার শাড়ীর একটা খুঁট লইয়া মুখ নত করিয়া আঙ্গুলে জড়াইতে লাগিল।

মধুপ বলিল—ও-সব কি হবে?

অলক পেটের উপরে একবার তাহার বাম হস্ত বুলাইয়া বলিল—তোমাদের ওখানে মাসিমার হাতের তৈরী খাবারের লোভ সম্বরণ করতে না পেরে বেচারী পেটের উপর যে অত্যাচার করেছি, এখন সোডা খেয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করবো। তার পর বোতল হইতে গ্লাসে সোডা ঢালিতে ঢালিতে বলিল—আমার ভুলটা তোমরা শুধরে নিয়েছ দেখছি।

—কি ভুল? বলিয়া মধুপ তাহার মুখের দিকে চাহিল।

—এই তোমাদের মধ্যে introductionটা—

মৃদু হাসিয়া মধুপ বলিল—আমার কথা ছেড়ে দাও, তবে ওঁদের introduction বেশ ভালো রকম পেয়েছি। মঞ্জুরিকে দেখাইয়া বলিল—উনি শ্রীমানের বন্ধুর অর্থাৎ অলক বাবুর কনিষ্ঠা ভগিনী, আর ইনি শ্রীমানের ভাবী ভাবী।!

সিপ্রা লজ্জায় নুইয়া পড়িল। অলক সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল—ভাবী ভাবী কি আবার?

মধুপ হাসিয়া বলিল—ইংরেজী আর বাঙলা খিঁচুড়ীর মত এটা বাঙলা-হিন্দীর খিচুড়ী—অর্থাৎ ভাবী বৌদি!

হো-হো করিয়া হাসিয়া অলক বলিল—যত নষ্টের গোড়া তুই মঞ্জু, তোর জ্বালায় আর পারা গেল না!

কেটলি হইতে কাপে চায়ের জল ঢালিতে ঢালিতে মঞ্জুরি বলিল—আমি মিথ্যা কথা বলেছি? তুমিই বলো।

সে কথা চাপা দিয়া অলক বলিল—মধুপ, তোমার পরিচয় আর বিশেষ করে ওদের দিতে হবে না। কাল ইনষ্টিটিউটে গিয়ে ওরা সে পরিচয় পেয়ে এসেছে। বাকীটা পথে আসার সময় আমি জানিয়ে দিয়েছি। আমার কর্ত্তব্য অনেকখানি শেষ হয়ে গিয়েছে। বাবা বাড়ীতে নেই। বাকী আছেন মা—বলিয়া দরজার দিকে চাহিতেই আনন্দময়ী ঘরে প্রবেশ করিলেন।

আনন্দময়ী কক্ষে প্রবেশ করিতেই সিপ্রা কৌচ ছাড়িয়া বলিল—আসুন মাসিমা।

সকলকে দাঁড়াইতে দেখিয়া আনন্দময়ী মৃদু হাসিয়া বলিলেন—বোস, বোস তোমরা।

মধুপ আনন্দময়ীকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। আনন্দময়ী সস্নেহে মধুপের চিবুক স্পর্শ করিয়া বলিলেন—থাক্ বাবা, থাক্, বোস। অলকের মুখে তোমার কত প্রশংসাই শুনি!

মধুপ বলিল—ও আমায় খুব ভালবাসে, আমার কথা আপনার কাছে বাড়িয়ে বলবে তো! আপনারা যা মনে করছেন, আমি তেমন নই। তবে অলকের কথায় আমার লাভ হয়েছে, মায়ের কাছে ছেলের প্রশংসা—তাতে ছেলের উপকার হয়।

আনন্দময়ীর মুখ অপরিসীম স্নেহে ভরিয়া উঠিল। এই সুদর্শন বুদ্ধিদীপ্ত অকপট যুবকটি মুহূর্ত্তে তাঁহার সন্তানের স্থান অধিকার করিল।

চা এবং জলখাবার খাওয়া শেষ হইতে আনন্দময়ী বলিলেন—সিপ্রা, একটা গান শুনিয়ে দাও মধুপকে।

সিপ্রা লজ্জানত মুখে বসিয়া রহিল। আনন্দময়ী বলিলেন—গাও মা, গাও। গানে লজ্জা কি?

সিপ্রা এটা-সেটা বাজাইবার পর ধীরে ধীরে গান ধরিল—

"মাধব! কৈছন বচন তুহার!
আজি-কালি করি দিন গোঁয়াইত
জীবন ভেল অতি ভার।"

সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় সমস্ত ঘর ভরিয়া উঠিল। সকলে মুগ্ধ হইয়া তাহার গান শুনিতে লাগিল। অলকের সমাহিত ভাব দেখিয়া আনন্দময়ীর অলক্ষ্যে মধুপের মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটিল।

অলক ভাবিতেছিল, সিপ্রা কি গানের ভিতর দিয়া তাহার প্রাণের কথা আমাকে জানাইতেছে! তাহার সুরের ঝঙ্কার যেন তার প্রাণের গোপনতাকে তাহার কাছে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেছে।

গান শেষ হইলে হাসিয়া মধুপ বলিল—ভারী সুন্দর গলা আপনার! আর এক দিন শোনবার দাবী রইলো!

সন্ধ্যা হয়-হয়।

মধুপ বলিল—আজকে উঠি মাসিমা। আবার আসবো। কিন্তু দেখবেন, এরা ভাই-বোনে যেন আমায় হিংসে না করে। কারণ, ওদের অনেকখানি আমি কেড়ে নিলাম কি না!

—শত পুত্র হলে মায়ের স্নেহের অভাব হয় কি কোন দিন ? তুমি মাঝে-মাঝে আসবে কথা দিয়ে যাও। যেন ডাকতে না হয়।

—হাঁ মাসিমা, নিশ্চয় আসবো, ডাকতে হবে না। আপনার স্নেহের লোভ সম্বরণ করা চলবে না।

অলক বলিল—চলো মধুপ গাড়ী করে একটু বেড়িয়ে আসি, তার পর ঠিক সময়ে তোমাকে টিউশনীর জায়গায় পৌঁছে দিয়ে আমি বাড়ী ফিরবো।

আনন্দময়ীকে প্রণাম এবং মঞ্জুরি ও সিপ্রাকে নমস্কার করিয়া মধুপ গাড়ীতে গিয়া বসিল।

প্রণয়রূপী দেবতা কখন্ কি সূত্রে কাহার ঘাড়ে চাপিয়া বসেন, আগে হইতে বলা শক্ত। মঞ্জুরি এত দিন কত যুবকের সহিত মিশিয়াছে কত টি-পার্টিতে গিয়াছে, পিক্‌নিকে গিয়াছে, কিন্তু কখনো কাহারও উপর একটা স্থায়ী আকর্ষণ অনুভব করে নাই। কিন্তু যে দিন সেই অপ্রীতিকর ঘটনার মধ্য দিয়া ট্রামে মধুপের সহিত পরিচয়, সেই দিন হইতেই তাহার জীবনে পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছিল। সোনার কাঠির স্পর্শে যেমন রাজকুমার ঘুমন্ত রাজকন্যাকে জাগাইয়া তুলিয়াছিল, ট্রামে ঠিকানা লইবার সময় মধুপের মৃদু করস্পর্শ তেমনি মঞ্জুরির সুপ্ত চেতনাকে জাগাইয়া তুলিয়াছে। সে নিজের মধ্যে যেন নূতন কি স্পন্দন অনুভব করে।

এ পরিবর্ত্তন আজ তার নিজের চোখেও ধরা পড়িয়াছে। এই অভূতপূর্ব্ব অনুভূতির কারণ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া সে বারে-বারে লজ্জিত হয়!

সর্ব্ব বিষয়ে যুবক-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইলেও মধুপের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং স্বাতন্ত্র্য যেন এক নিগূঢ় আকর্ষণে মঞ্জুরিকে তাহার প্রতি প্রতিনিয়ত আকর্ষণ করিতেছে।

এক সপ্তাহ পরের কথা।

বাদল মেঘের ধূপ-ছায়ায় গোধূলি মনোরম হইয়া উঠিয়াছে। মধুপ অলকদের ড্রয়িং-রুমে প্রবেশ করিল। ড্রয়িং-রুমের পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষ হইতে এস্রাজের সহিত মঞ্জুরির সুমিষ্ট কণ্ঠের অপূর্ব্ব স্বরলহরী ভাসিয়া আসিল। ড্রয়িং-রুম হইতে পাশের ঘরে যাওয়া যায়। মধুপ ধীর পদবিক্ষেপে দরজার কাছে গিয়া কারুকার্য্যখচিত যবনিকাখানি একটু ফাঁক করিয়া অস্পষ্ট আলোকে মঞ্জুরির ছায়া দেখিতে পাইল। ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিয়া নিঃশব্দে কৌচে বসিল। সমস্ত বাড়ী যেন সুর-লহরীতে কাঁপিয়া উঠিতেছে। মঞ্জুরি গাহিতেছিল—

"যেন একটি গানে
জীবন আমার বাজিতে চায় করুণ তানে তানে।
কোন কথাটি নাহি জানি
এ জীবনে পায় না বাণী
তারি লাগি সুরটি আমার বিরাম নাহি মানে।
যেন কি ফুল হায়
লজ্জায় তনু-মাঝে কাঁদে ফোটার বেদনায়!
যেন গো কোন্ আঁধার টুটে
সোনার আলো পড়বে লুটে
সফল যেমন মালা হয়ে জড়াবে কার প্রাণে।"

গানের শেষে এস্রাজ নামাইয়া রাখিয়া মঞ্জুরি ড্রয়িং-রুমে প্রবেশ করিল। সুইচটা খট্ করিয়া টিপিয়া দিয়া সম্মুখের কৌচে এই অসময়ে মধুপকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বিস্ময় ও হাসিভরা মুখে মঞ্জুরি জিজ্ঞাসা করিল—আপনি! কখন্ এসেছেন?

মধুপ বলিল—খানিকক্ষণ।

—একলা বসে রয়েছেন! আমায় ডাকেননি কেন?

—আপনার গান শোনা হয়তো হবে না, তাই। ভারী মিষ্টি গলা আপনার।

মৃদু হাসিয়া মঞ্জুরি বলিল—মিষ্টি, না, ছাই!

মুহূর্ত্তে হাসির রেখা কোথায় মিলাইয়া গেল। মঞ্জুরির মনে হইল, যেন ধরা পড়িয়া গিয়াছে! গানের ভিতর দিয়া নির্লজ্জের মত অন্তরের সমস্ত কথা যেন প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে! অলক্ষ্যে থাকিয়া মধুপ সব শুনিয়াছে! হয়তো ভাবিতেছে, কি নির্লজ্জ মেয়ে! ছি! ছি!

মঞ্জুরি গম্ভীর হইয়া বলিল—লুকিয়ে পরের গান শোনা ভারী অন্যায়।

মধুপও গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল—লুকিয়ে পরের গান শোনা হয়তো অন্যায়, কিন্তু সব ক্ষেত্রেই কি?

নিমেষে কোথা দিয়া কি হইয়া গেল, মঞ্জুরি বুঝিতে পারিল না। সমস্ত ড্রয়িং-রুম যেন তাহার পায়ের নীচে দুলিয়া উঠিল। সে নিস্পন্দের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া মধুপ কৌচ ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিনয়ের সুরে বলিল—সত্যি, ভারী অন্যায় হয়ে গিয়েছে! সে জন্য মাপ চাইতে লজ্জা পাই না! কারণ, যে মানুষ যে স্তরের, সে যদি হঠাৎ সে স্তর ছেড়ে উঁচু স্তরের মানুষের সঙ্গে মেশে, তাহলে তার ভুলচুক হওয়া স্বাভাবিক!

মঞ্জুরি স্থির থাকিতে পারিল না। দুই হাত দিয়া মধুপের এক হাত সজোরে চাপিয়া ধরিয়া মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিল—ক্ষমা করুন মধুপ বাবু—আমি কি বলতে কি বলে ফেলেছি!

তাহার সমস্ত দেহ থর-থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

ইহার পূর্ব্বে মধুপ কখনও এমন ভাবে নারীর স্পর্শ অনুভব করে নাই। আজ এই গোধূলি-লগ্নে নারীর প্রথম স্পর্শ তাহার কৌমার্য্যের নির্ব্বিকার যোগ-নিদ্রা নিমেষে ভাঙ্গিয়া দিল। রক্তের প্রত্যেকটি বিন্দু চঞ্চল হইয়া শিরা-উপশিরায় ছুটাছুটি করিতে লাগিল। মঞ্জুরির কুসুমপেলব-হস্তে মৃদু চাপ দিয়া স্নিগ্ধ-মধুর কণ্ঠে মধুপ বলিল—তা' আমি জানি, মঞ্জু।

—মঞ্জু, মা একবারটি শুনে যা তো! বলিয়া দোতলা হইতে আনন্দময়ী ডাক দিলেন।

মঞ্জুরির হাত ছাড়িয়া দিয়া মধুপ বলিল—চলুন, মাসীমার সঙ্গে দেখা করে আসি। অলক বুঝি বেড়াতে বেরিয়েছে?

লজ্জারুণ দৃষ্টি মেলিয়া মধুপের দিকে চাহিয়া মঞ্জুরি বলিল—আমায় আবার "চলুন" বলছেন কেন? আমার নাম ধরে ডাকবেন। বলিয়া মায়ের কাছে চলিল। মধুপ তাহার পিছনে পিছনে দোতলায় উঠিল।

অলকদের বাড়ী হইতে বিদায় লইয়া মধুপ যখন পথে নামিল, তখন বৃষ্টি থামিয়া আকাশে চাঁদ আর কালো মেঘে লুকোচুরি খেলা

চলিতেছে। চাঁদের ম্লান কিরণে কলিকাতা সহর যেন স্বপ্নপুরী বলিয়া বোধ হইতেছিল। নির্জ্জন জলসিক্ত পথে চলিতে চলিতে মধুপ আপন-মনের অবস্থা এক বার তলাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ঠিক ধরিতে পারিল না।

বাড়ী ফিরিয়া মাকে বলিল—আজ আর খাবো না! অলকের ওখানে খেয়ে এসেছি।

মেঘ-ছায়াঘন রাত্রে মধুপের চোখে ঘুম আসিল না। জানালাগুলি খুলিয়া দিয়া মেঘ আর চাঁদের খেলা দেখিতে লাগিল। মঞ্জুরির স্নিগ্ধ-মধুর মুখ বারে-বারে মেঘের ফাঁকে চাঁদের উঁকি-মারার মত তাহার হৃদয় আকাশে ফুটিয়া উঠিতেছিল।

মাসখানেক পরে।

মধুপ এ-বাড়ীতে নিত্যকার অতিথি। সে আসিলে আনন্দময়ী অনেকখানি খুশী হন—দু'দিন যদি না আসে, আনন্দময়ী বলেন—মধুপের কি হলো রে, অলক? সে আসে না কেন? মায়ের আগ্রহে মঞ্জুরি খুশী হয়। তবু কৃত্রিম অভিমানের স্বরে বলে—পরকে পেয়ে আমাদের উপর মার স্নেহ কমেছে!

সে-দিন মেঘলা রাত্রি।

স্তব্ধ-গম্ভীর আকাশ জুড়িয়া থম্‌থমে অন্ধকার। মধুপ তাহার পড়ার ঘরে একটি পরিষ্কার খাটের উপর জ্বরে বেহুঁস পড়িয়া আছে। মাথার পাশে বসিয়া মঞ্জুরি মধুপের তপ্ত ললাটে ওডিকোলন মিশ্রিত জলপটি দিতেছে। নীল শেডে ঢাকা ল্যাম্পের মৃদু আলোয় ঘরখানি স্নিগ্ধ ছায়াময় হইয়া উঠিয়াছে। টেবিলের উপর রি-টাইমপীশ, ঘড়ি এক-স্বরে টিক্-টিক্ করিয়া ঘরের গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে।

পাশের ঘরের দেওয়াল-ঘড়িতে টং-টং করিয়া দুইটা বাজিয়া গেল। ধীরে ধীরে ভেজানো দরজা ফাঁক করিয়া উমারাণী উৎকণ্ঠাপূর্ণ মুখে রোগীর ঘরে প্রবেশ করিলেন। মঞ্জুরি জানিতে পারিল না। জলপটিটা মধুপের তপ্ত ললাটে বসাইয়া পাখা লইয়া ধীরে ধীরে বাতাস করিতে লাগিল। অতি মৃদু স্বরে উমারাণী ডাকিলেন—মঞ্জু!

মুখ তুলিয়া মৃদু কণ্ঠে মঞ্জুরি বলিল—মাসিমা!

—রাত দু'টো বেজে গেল যে মা, এবার তুমি একটু শোও। আমি আছি।

শান্তমুখে মঞ্জুরি উত্তর দিল—না মাসিমা, মা আমাকে রেখে গেলেন! ক'রাত জেগে আপনার শরীর যা হয়েছে! মা বললেন, সেবা করা মেয়ে-মানুষের কাজ! তুই আজ রাত্রে থাক্ মঞ্জু! আপনি যান মাসীমা! আপনার বুকের ব্যথা যদি বাড়ে? ডাক্তার আপনাকে বারণ করেছে বেশী নড়া-চড়া করতে। আপনি যান, শুয়ে পড়ুন।

উমারাণী স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—তোমারও তো রাত-জাগা অভ্যাস নেই মা! তাছাড়া এতক্ষণ জেগেছো, এবারে তুমি যাও একটু শুয়ে পড়ো। আমার শরীরে সয় মা।

মঞ্জুরি তেমনি ধীর শান্ত স্বরে বলিল—রাত না জাগলে রাত জাগা অভ্যাস হবে কি করে মাসীমা? আজ আমি রাত জাগি। তা ছাড়া আমি তো ঘুমুতে আসিনি, মা আমাকে রেখে গেলেন সেবা করবার জন্য। জানি, আপনাদের মত সেবা আমাদের দ্বারা হবে না! তবু আপনি ভাববেন না! তাছাড়া ওষুধে বেশ কাজ হচ্ছে মনে হয়। হয়তো সকালের দিকে মাথার যন্ত্রণা আর জ্বর কমে আসবে।

সস্নেহে মঞ্জুরির মাথায় হাত বুলাইয়া উমারাণী বলিলেন—তোমার মত রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করতে আমি আর কাউকে দেখিনি মঞ্জু! ক'দিন দিনের বেলাতেও তো দেখছি, ঘড়ির কাঁটার মত এমন নিয়মিত সেবা আমায় দিয়ে হতো না। কিন্তু আর নয় মা, লক্ষ্মীটি। একটু চোখ বুজে গড়িয়ে নাও গে!

মঞ্জুরিকে রোগীর কাছ হইতে নড়ানো গেল না! তার করুণ মিনতি—না মাসীমা, আমার সুস্থ শরীর। আপনি নিজে অসুস্থ! না মাসীমা!

অগত্যা উমারাণী চলিয়া গেলেন।

চারিটা বাজিয়া গেল, মধুপ একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া ফিরিয়া শুইল। কপাল হইতে জল-পটিটা বিছানায় পড়িয়া গেল। মঞ্জুরি সেটা তুলিয়া লইয়া আবার জলে ভিজাইয়া মধুপের কপালে বসাইয়া দিতেই মধুপ চোখ মেলিয়া চাহিল। জিজ্ঞাসা করিল—ক'টা বাজে?

চারিটা বাজে শুনিয়া বলিল—এখনও তুমি শোওনি মঞ্জু! শরীর খারাপ হবে! শেষে তুমিও অসুখে পড়বে?

—কিছু হবে না আমার।

—ঘুম পাচ্ছে না?

—না। আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন।

করুণ কণ্ঠে মধুপ বলিল—কত আর ঘুমোবো মঞ্জু? ঘুম আসছে না। সর্ব্বাঙ্গে পাকা ফোড়ার মত ব্যথা, দিন-রাত বিছানায় শুয়ে থেকে থেকে।

মঞ্জুরি টেম্পারেচার লইয়া দেখিল, জ্বর একশ'।—একটু বেদানার রস করে দি।

—না, না, এখন কিছু খেতে ইচ্ছে নেই। তুমি একবারটি শোনো।

মঞ্জুরি মাথার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে মধুপ বলিল—ইজিচেয়ারটা টেনে নিয়ে বোসো।

ইজিচেয়ারে বসিয়া মঞ্জুরি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মধুপের রোগ-পাণ্ডুর মুখের দিকে তাকাইল।

মধুপ বলিল—সে-দিন ট্রামে তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়, সে-দিনকার কথা মনে আছে?

—আছে। চিরদিন থাকবে। তার জন্যে আমি চিরকৃতজ্ঞ আপনার কাছে।

ম্লান হাসিয়া মধুপ বলিল—আর তোমার এই বিরাম-বিশ্রামহীন সেবার কাছে আমি?

মঞ্জু বিপন্ন হইয়া পড়িল। কি উত্তর দিবে সে! শেষে বলিল—ডাক্তার বাবু কথা বলতে বারণ করেছেন। আপনি ঘুমোন।

মঞ্জুরির ম্লান হাতখানি নিজের বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া মধুপ বলিল—কি ঠাণ্ডা! তার পর মঞ্জুরির প্রশান্ত মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—এখন বেশ ভাল আছি। আমায় একটু কথা বোলতে দাও মঞ্জু। তুমিও ডাক্তারের মত শাসন করো না। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল—আচ্ছা মঞ্জু, আমার অসুখ যদি ক্রমশঃ খারাপের দিকে যায়, তাহলে?

—কিছু হবে না। আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন।

বিস্ময়ের স্বরে মধুপ বলিল—কারো কিছু হবে না? অঞ্জলির? মার? তোমার?

মঞ্জুরি চমকিয়া উঠিল। কে যেন তাহার বুকে হাতুড়ি পিটিয়া দিল।

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মধুপ বলিল—কথা বলতে বড্ড ভালো লাগছে। বারণ করো, কইবো না। বলিয়া মধুপ চিৎ হইয়া শুইল।

মঞ্জুরি উৎকণ্ঠিত হইল। ভাবাধিক্যে উত্তেজিত হইলে যদি জ্বর এবং অন্য উপসর্গ বাড়িয়া যায়! জলপটিটা বাঁ হাতে তুলিয়া লইয়া ডান হাতে সে কপালের তাপ অনুভব করিল।

মঞ্জুরির হাতের উপর নিজের ডান হাতটি চাপাইয়া দিয়া মধুপ বলিল—জলপটির চেয়ে তোমার হাত অনেক ঠাণ্ডা। একটু হাত বুলিয়ে দেবে?

খুশীতে মঞ্জুরির মুখ ভরিয়া উঠিল। মঞ্জুরি বলিল—নিশ্চয়। আমি হাত বুলিয়ে দি, আপনি ঘুমোন।

—ঘুম আসছে না মঞ্জু!

—লক্ষীটি, চোখ বুজে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো। ঘুম আসবে'খন।

এই মধুর সম্ভাষণে খুসীতে মধুপের মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল।

মঞ্জুরি ধীরে ধীরে মধুপের কপালে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল আর মাঝে মাঝে চুলের ভিতর আঙুল দিয়া বুলাইয়া দিতে লাগিল। মঞ্জুরির হাতের শীতল স্পর্শে মধুপ চক্ষু মুদিল।

ভোরের দিকে উমারাণীর চঞ্চল নিদ্রা কিসের শব্দে ছাঁৎ করিয়া ভাঙ্গিয়া গেল। উঠিয়া তিনি আসিয়া মধুপের ঘরের ভেজানো দরজা অতি ধীরে ধীরে একটু ফাঁক করিয়া দেখিলেন—মধুপ ঘুমাইতেছে, আর শ্রান্ত মঞ্জুরি তাহার মাথার দিকে একটা ইজিচেয়ারে বসিয়া মধুপের বালিসের এক কোণে মাথা রাখিয়া অকাতরে ঘুমাইতেছে। তাহার ডান হাত মধুপের কপালের উপর অবশ ভাবে পড়িয়া আছে। ভাবিলেন, এমন দু'টি না হলে মানায়! যেন দু'টির জন্যে দু'টি জন্মেছে! আনন্দে তাঁহার মুখ প্রদীপ্ত হইল। তিনি ধীরে ধীরে দরজা ভেজাইয়া দিলেন।

মঞ্জুরি মধুপের বালিসের এক কোণে তাহার দিকে মুখ করিয়া অকাতরে ঘুমাইতেছিল। একটু পরে মধুপ তাহার দিকে পাশ ফিরিয়া শুইল। দু'জনে মুখোমুখি ঘুমাইতে লাগিল। মঞ্জুরির ডান হাত মধুপের কপাল হইতে গড়াইয়া তার গলার উপরে আসিয়া পড়িল।

ঠুং শব্দে মঞ্জুরি চোখ মেলিয়া চাহিল। মুখের কাছে মধুপের প্রশান্ত ঘুমন্ত মুখ দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল। লজ্জায় মরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিল। সমস্ত রাগ গিয়া পড়িল ঘুমের উপর। ভাবিল, ছি, ছি! মধুপ বাবু যদি আগে জাগিতেন, কি ভাবিতেন তিনি!

শশব্যস্তে উঠিয়া মুখ ফিরাইতেই দেখিল, অঞ্জলি পিছন ফিরিয়া টেবিলের কাছে দাঁড়াইয়া।

মঞ্জুরি মনে মনে বলিল, পৃথিবী দ্বিধা হও, তোমার কোলে মুখ লুকাই।

অঞ্জলি মেজার-গ্লাস লইয়া ফিরিতেই দেখিল, মঞ্জুদি' জাগিয়াছে। হাসিয়া বলিল—ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলুম, না মঞ্জুদি'?

মঞ্জুরির মুখে যেন কে সিঁদুর লেপিয়া দিয়াছে! সে ঘরের বাহিরে আসিয়া একটু রুক্ষ স্বরে বলিল—এত বেলা হয়ে গিয়েছে, একটু আগে ডাকতে পারলে না?

অঞ্জলি ভয়ে ভয়ে বলিল—আমার কি দোষ মঞ্জুদি'! আমি তো ভোরে উঠেই ইলার কাছে গিয়েছিলুম আমার গল্পের বই আনতে। এনে পড়তে বসেছি, মা বললেন—"মেজার-গ্লাসটা আন্‌তো মধুর ঘর থেকে। দেখিস্, মধুর ঘুম যেন না ভাঙ্গে।"

জিভ কাটিয়া মঞ্জুরি বলিল—ছি! ছি! কি পোড়ার ঘুম পেয়েছিল চোখে! তার পর অঞ্জলিকে বলিল—তুমি ভাই তোমার দাদার কাছে একটু বোসো, আমি চট্ করে চানটা সেরেনি। যদি ঘুম ভেঙ্গে কিছু চান, দিও। আমি এই এলুম বলে। তুমি ঘরে বসে বসে পড়ো, আমাকে দাও মেজার-গ্লাস আমি মাসিমাকে দিয়ে চান্ করতে যাবো —বলিয়া অঞ্জলির হাত হইতে মেজার-গ্লাস লইয়া চলিয়া গেল।

স্নান সারিয়া মঞ্জুরি মধুপের ঘরে ঢুকিল। দেখিয়া মনে হইল যেন, সুরলোক হইতে কোন্ দেবকন্যা শাপভ্রষ্টা হইয়া মর্ত্ত্যে নামিয়া আসিয়াছে!

অঞ্জলি থার্ম্মোমিটার লইয়া জ্বর দেখিতেছিল। মঞ্জুরি জিজ্ঞাসা করিলেন—কত?

হাসিয়া অঞ্জলি বলিল—একেবারে জ্বর নেই মঞ্জুদি'। তার পর খাপের মধ্যে থার্ম্মোমিটার ঢুকাইয়া রাখিতে রাখিতে হাসিয়া বলিল—ভারী চমৎকার দেখতে হয়েছে কিন্তু তোমাকে মঞ্জুদি'।

—চমৎকার, না, আর কিছু!

অঞ্জলি বলিল—আচ্ছা দাদা, তুমি বলো, ভারী সুন্দর মানিয়েছে না মঞ্জুদি'কে?

মধুপ হাসিয়া বলিল—তোর রূপের গরব ভেঙ্গেছে তো?

অঞ্জলি মুখ বাঁকাইয়া বলিল—কবে আবার আমি রূপের গরব করেছিলাম?

রূপের প্রশংসায় মঞ্জুরি কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। মুখ নত করিয়া বলিল—মুখ ধোবার জল দেবো?

—মুখ ধুয়েছি।

—বেদানা ছাড়িয়ে দি?

—দাও।

মঞ্জুরি বেদানা ছাড়াইতে লাগিল। মধুপ মুগ্ধ-দৃষ্টিতে তাহার লজ্জা-রক্তিম মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বৃষ্টির গান বন্ধ করিয়া বর্ষা চলিয়া গেল। শরতের আকাশ-বাতাস দেবীর আবাহন-সঙ্গীত সুরু করিয়াছে। সকলের মুখে হাসি ফুটিয়াছে।

বৈকালে মঞ্জুরি পড়িবার ঘরে একটা বড় আর্সির সামনে দাঁড়াইয়া কেশবিন্যাস করিতেছিল, অস্ত-রবির রক্তকিরণ পশ্চিমের জানালা দিয়া আসিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে লুটাইয়া পড়িয়া তাহাকে

এক অপরূপ-শ্রীতে মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। মুগ্ধ-দৃষ্টিতে নিজের রূপ দেখিয়া নিজেই সে বিভোর হইল।

আনন্দময়ীর সঙ্গে দেখা করিয়া মধুপ মঞ্জুরির উদ্দেশে চলিল। মঞ্জুরির এই তন্ময় ভাব দেখিয়া মধুপ দরজার গোড়ায় চমকিয়া দাঁড়াইল। রূপমুগ্ধা মঞ্জুরি তাহা জানিতে পারিল না।

—মঞ্জু, একবারটি শোনো—বলিয়া আনন্দময়ী ডাক দিলেন। মাতার আহ্বানে কন্যার তন্ময় ভাব কাটিয়া গেল। পাশ ফিরিতেই চৌকাঠের উপর পা দিয়া মধুপকে দাঁড়াইতে দেখিয়া সে লজ্জায় অপ্রতিভ হইয়া পড়িল।

চৌকাঠ পার হইয়া মৃদু হাসিয়া মধুপ বলিল—লুকিয়ে পরের রূপ দেখা অন্যায়? না, লুকিয়ে নিজের রূপ দেখা অন্যায়?

মৃদু হাস্যে সরম-জড়িত কণ্ঠে মঞ্জুরি বলিল—দু'টোই অন্যায়।

—আমি মনে করেছিলাম—

—কি মনে করেছিলেন?

—মনে করেছিলাম, লুকিয়ে পরের গান শোনা যখন দারুণ অন্যায়, তখন লুকিয়ে পরের রূপ দেখা—

মঞ্জুরি গম্ভীর হইয়া বলিল—আবার সেই পুরানো কথা! পরকে আঘাত দিয়ে আপনারা কি সুখ পান, বলুন তো?

মৃদু হাসিয়া মধুপ বলিল—আঘাত না দিলে আঘাত দেবার সুখ জানা যায় না।

—চাই না জানতে! আপনি বসুন, মা ডাকছে, শুনে আসছি। বলিয়া মঞ্জুরি দ্রুতপদে কক্ষ ত্যাগ করিল।

একটু পরে অলক আর বিনয় বাবু ঘরে ঢুকিলেন। মধুপ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দেশ হইতে ফিরিবার পর বিনয় বাবুর সহিত মধুপের বেশ আলাপ হইয়াছে। অল্প দিনের মধ্যেই বিনয় বাবু মধুপের গুণে মুগ্ধ হইয়াছেন। হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কখন এলে?

—এই খানিকক্ষণ! আপনার শরীর ভালো?

—নাঃ। বিশেষ ভালো নয়, আবার বিগ্‌ড়োতে আরম্ভ করেছে। দেশে বেশ ভালো ছিলাম! এখানে যেন কেমন—

—দেশেই থাকুন না কেন! এখন কোথাও বেরিয়েছিলেন?

—হাঁ, অলককে সঙ্গে নিয়ে একবার ডক্টর রায়ের কাছে গিয়েছিলাম। দেখে বললেন, কমপ্লিট রেষ্ট চাই। যাই করি না কেন, বৃদ্ধ বয়সের একটা জরাব্যাধি আছে তো! সোত্তোর বছর বয়সে কি আর সতেরো বছর বয়সের মত সুস্থ-সবল থাকবো? তবে স্থান পরিবর্ত্তনে একটু-আধটু তফাৎ হয়, এই যা।

রামজীবন একটা বড় ট্রেতে করিয়া চা ও খাবার লইয়া প্রবেশ করিল। টিপয়ের উপরে ট্রে নামাইয়া সেলাম করিয়া বাহির হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুরি ঘরে ঢুকিয়া আলো জ্বালিয়া চা প্রস্তুত করিতে লাগিল।

অলক এবং মধুপের সামনে দু' ডিস্ খাবার, দু' কাপ চা বসাইয়া দিতেই বিনয় বাবুকে লক্ষ্য করিয়া মধুপ বলিল—আপনি?

বিনয় বাবু বলিলেন—ডাক্তারে চা খেতে বারণ করেছে। চা খেলে দেখেছি ক্ষিদে হয় না, তাই ওটার মায়া ত্যাগ করেছি। এখন ক্ষিদে মন্দা হয়। ক্রমে শরীরের যন্ত্রগুলোর গতিও মন্দা হয়ে আসবে। তাই ভাবছি, মঞ্জুর বিয়ে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত হতে পারি।

মঞ্জুরি অভিমান-ভরে বলিল—তোমরা আজকাল আর আমাকে ছোটবেলার মত ভালবাসো না। এখন আমায় বিদেয় করতে পারলেই তোমাদের আনন্দ। বলিয়া সে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

মধুপকে লক্ষ্য করিয়া বিনয় বাবু বলিলেন—শুনলে ওর কথা! বলে, আমরা না কি ওকে বিদেয় করে আনন্দ পাবো! আরে, তোকে সুখী করেই যে আমাদের সুখ! মা-বাপ না হলে মা-বাপের অন্তর বুঝবি না।

পিতৃস্নেহে বিনয় বাবুর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি মধুপকে বলিলেন—জয়ন্তর সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়েছে মধুপ?

মধুপ বলিল—তাঁর কথা অনেক শুনেছি বটে, তবে পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়নি।

বিনয় বাবু উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিতে লাগিলেন—খুব ভালো ছেলে!—এই সে-দিন বিলেত থেকে ডাক্তারী পাশ করে দেশে ফিরেছে, ফিরেই মেডিকেল কলেজে প্রোফেসরী পেয়েছে। বেশ মোটা মাইনে পায়। প্রায় চার-পাঁচশো হবে। তারই সঙ্গে মঞ্জুর বিয়ের সম্বন্ধ করেছি। মঞ্জু কিন্তু এখন বিয়ে করতে রাজী নয়। বলে, আই-এ পাশ করবার পর। আমি বলি, শুভ কাজ যত তাড়াতাড়ি হয়, ততই ভালো। তুমি কি বলো?

মধুপ বিপন্ন হইল। ভাবিয়া পাইল না, কি উত্তর দিবে! বিনয় বাবুর কথাগুলি তাহার কাণে যেন গরম সীসা ঢালিয়া দিয়াছে!

অলক বলিল—ও তো এখন পড়ছে। পড়ুক না! জোর করে লাভ কি? পাত্রের কথা বলছেন, জয়ন্ত সুপাত্র, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার চেয়েও যোগ্যতর পাত্র মেলা অসম্ভব নয়।

কথাটা বলিয়া অলক ঘরের বাহির হইয়া গেল।

এই যোগ্যতর পাত্রটি যে মধুপ, তাহা বিনয় বাবু বুঝিতে না পারিলেও অলক মধুপকে উদ্দেশ করিয়াই কথাটা বলিয়াছে, মধুপ তাহা বুঝিল।

চেয়ারটা মধুপের কাছে টানিয়া আনিয়া মৃদু কণ্ঠে বিনয় বাবু বলিলেন—তুমি এক কাজ করতে পারো মধুপ?

মধুপ কুতূহলী দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিতে বিনয় বাবু হাসিয়া বলিলেন—তোমার কথা ও খুব শোনে। তুমি যদি ওকে বলে-কয়ে মতটা করাতে পারো, তা হলে দেশে যাবার আগেই আমি শুভ কাজটা সেরে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি।

কথাগুলি মধুপের বুকে শেলের মত বিঁধিল। ম্লান হাসিতে অন্তরের আলোড়ন ঢাকিয়া মধুপ বলিল—বলে দেখবো। কিন্তু এ বিষয়ে আমার কথা কতখানি শুনবে, বলতে পারি না।

বিনয় বাবু হাসিয়া বলিলেন—তুমি বললে ও না বোলতে পারবে না, এ আমি বলে দিচ্ছি। শুভ কাজ যত তাড়াতাড়ি হয়, ততই মঙ্গল নয় কি?

অন্তর্যামী অলক্ষ্যে বসিয়া হাসিলেন! বৃদ্ধ যাহাকে শুভ কার্য্যে মত করাইবার জন্য দৌত্যে নিযুক্ত করিয়া খুশী হইলেন, তাহারই শুভ দৌত্যগিরি যে তাহারই আশার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া 'শুভস্য শীঘ্রং'-এর পথ অন্য দিক্ দিয়া পরিষ্কার করিয়া দিবে, তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

ছোট্ট প্লেটে করিয়া মঞ্জুরি মশলা লইয়া প্রবেশ করিল। ৮—

বিনয় বাবু বলিলেন—মঞ্জু, মা, বুড়ো ছেলের খাবার কথা একেবারে ভুলে গেলি !

মঞ্জু ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল,—বা রে, কেন ভুলবো ! ঠাকুর লুচি ভাজছে। আমি তো ডাকতে এলাম। গরম-গরম খাবে।

—আচ্ছা মা, যাই। তোমরা বোসো। বলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

মধুপের অন্তরে আজ যে ঝড় উঠিয়াছে, তাহা তাহার অন্তরের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষাকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া বিজয়-গৌরবে বহিয়া চলিল। সে মনে মনে বলিল, ওগো অদৃশ্য দেবতা, তোমার এ কি লীলা ! মুহূর্ত্ত-পূর্ব্বে যে-বুক আশার রঙ্গীন স্বপ্নে বিভোর ছিল, এখন সেখানে এই অসহ্য দাহ ! ওগো হাসি-কান্নার দেবতা, বুকে শক্তি দাও, দুঃখে যেন ভাঙ্গিয়া না পড়ি !

হৃদয়ের সমস্ত ঝড়-ঝঞ্ঝাকে প্রফুল্লতার আবরণে ঢাকিয়া মধুপ বলিল—বোসো মঞ্জু, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

—কি কথা ? বলিয়া মঞ্জু চেয়ার টানিয়া মধুপের কাছে বসিল।

মধুপ বলিল—শুভ কাজ কবে হচ্ছে ? 'শুভস্য শীঘ্রং' ! আমাদের আর সবুর সইছে না। বেশ করে এক-পেট খাওয়া যাবে—কি বলো ?

মঞ্জুরি বুঝিতে পারিল যে, বাবা বিবাহের কথা মধুপ বাবুর কাছে বলিয়াছেন ! তাই মধুপ বাবু এ কথা বলিতেছেন !

হাসিয়া লজ্জা-জড়িত কণ্ঠে সে বলিল—নিশ্চয়, কিন্তু একটা কথা আগে থাকতে বলে রাখা ভালো। বিয়ের দিন বাড়ীতে খাবেন না, আর না ডাকলে খেতে আসবেন না, কেমন ?

মধুপ যতই অন্তরের আগুনকে হাসি এবং রহস্য দিয়া ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছিল, ততই তাহা দ্বিগুণ শক্তিতে তাহাকে দগ্ধ করিতেছিল। সে একটু গম্ভীর ভাবে বলিল—ঠাট্টা নয় মঞ্জু ! জয়ন্ত বাবুর মত সুপাত্র আজকাল বড় একটা পাওয়া যায় না। তুমি এ বিয়েতে সুখী হবে। তোমার বাবাও সুখী হবেন।

মুহূর্ত্তে মঞ্জুরির রহস্যোজ্জ্বল মুখ শ্রাবণের বর্ষণোন্মুখ বজ্রভরা মেঘের মত গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে সজোর কণ্ঠে বলিল—সুখী হবো, কি করে জানলেন ?

—তোমার বাবা তো তাই—

কথার মাঝখানে মঞ্জুরি বলিয়া উঠিল—ও ! তাই বুঝি বাবার হয়ে ওকালতি করতে এসেছেন !

মঞ্জুরির রুক্ষ কণ্ঠ আহত ব্যাঘ্রকে খোঁচাইয়া তুলিল। মধুপ চড়া সুরে জবাব দিল—হ্যাঁ, কতক তাই বটে। তোমার বাবা তোমাকে বলবার জন্য বললেন, তাই বলছি। তুমি না কি আমার কথা শুনবে, অমান্য করতে পারবে না !

—সেই দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে আপনি—মঞ্জুরি আর বলিতে পারিল না, মুখে হাত চাপা দিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ব্যাপার এত দূর গড়াইবে, মধুপ স্বপ্নে ভাবিতে পারে নাই। সে কি করিবে ভাবিয়া পাইল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

মঞ্জুরি ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল। মঞ্জুরির অশ্রু মধুপের মনের সমস্ত তিক্ততা ধুইয়া মুছিয়া দিল। অতি ধীর কণ্ঠে সে ডাকিল, —মঞ্জু !

মঞ্জু সাড়া দিল না। তাহার অশ্রুর উৎস যেন আরও বাড়িল। সে তেমনি ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

মধুপ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে মঞ্জুরির মাথায় হাত বুলাইতে-বুলাইতে ডাকিল—মঞ্জু, লক্ষ্মীটি, কেঁদো না, বাইরে মাসিমারা রয়েছেন, ভুলে যদি কোন অপরাধ করি—

ক্রন্দন-জড়িত কণ্ঠে মঞ্জুরি ধীরে ধীরে বলিল—আঘাত দিয়ে কি সুখ পান, জানি না। আঘাত দেবার ব্যথা কি আপনাদের বুকে বাজে না ? এত দিন কি কিছুই—

মঞ্জুরির একখানা হাত নিজের হাতে লইয়া আবেগ-ভরা কণ্ঠে মধুপ বলিল—আমার কথার উপর বিশ্বাস না করে আমার অন্তরের দিকে একবার চাও মঞ্জু ! যদি দেখাবার হতো, দেখাতে পারতাম, আমার বুকের মধ্যে মধুপ-মঞ্জুরি মিশে এক হয়ে আছে !

মঞ্জুরি চেয়ার ছাড়িয়া মধুপের বুকে নিজের মাথা রাখিয়া বলিল—তবে জেনে-শুনে এ আঘাত কেন দিলে ?

মঞ্জুরির অশ্রুলাঞ্ছিত মুখখানি নিজের বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া মধুপ বলিল—উপায় ছিল না মঞ্জু ! ভগবান যা করেন, মঙ্গলের জন্য। আজ এই চোখের জলেই আমাদের প্রেমের পরীক্ষা। তোমার-আমার মিলনের মধ্যে সমস্ত অন্তরায় আজ এই অশ্রুস্রোতে ভেসে যাক্।

খোলা জানালা দিয়া পাগলা জ্যোৎস্না আসিয়া তাহাদের উপর লুটাইয়া পড়িল। পাশের বাড়ী হইতে শাঁখের শব্দ শোনা যাইতেছিল।

মধুপ বলিল—শুনতে পাচ্ছো মঞ্জু !

—পাচ্ছি ! বলিয়া মঞ্জুরি মধুপকে নিবিড় করিয়া জড়াইয়া ধরিল।

শ্রীসত্যব্রত সরকার (বি-এ)।

মেঘদূত

এ কালের মেঘদূত ও দেশের বার্ত্তা কহে
এ দেশের কানে।
সে কালের মেঘদূত যুগ হ'তে যুগান্তরে
বার্ত্তা বহি আনে।

শ্রীকালিদাশ রায়।

সামুদ্রিক সর্প

(প্রাণীতত্ত্ব)

সামুদ্রিক সর্পের বৈজ্ঞানিক নাম হাইড্রোফাইডি (Hydrophidae) অর্থাৎ 'জলজ ফণী।' এদেশের অনেকেরই জীবন্ত সামুদ্রিক সর্প দেখিবার সুযোগ নাই। বহু বৎসর পূর্ব্বে একবার আলিপুর পশুশালায় সামুদ্রিক সর্প দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। সেই সময় প্রায় পনর-কুড়িটি সামুদ্রিক সর্প পশুশালার সরীসৃপ-কক্ষস্থ আধারে সুরক্ষিত হইয়াছিল। সেই সামুদ্রিক সর্পগুলির দেহ কৃষ্ণ ও পাংশুবর্ণে চিত্রিত ছিল। সর্পগুলিকে অধিক দিন পশুশালায় দেখিতে পাওয়া যায় নাই। প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে পুরীর সমুদ্রতীরে ইহাদিগকে পুনর্ব্বার পর্য্যবেক্ষণের সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম। সেই পর্য্যবেক্ষণের ফলে ইহাদের অজ্ঞাত জীবনের যে সকল গূঢ় তথ্য, এবং পরবর্ত্তী গবেষণার ফলে ইহাদের জীবনধারার যে সকল রহস্য জানিতে পারিয়াছি, তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ হইল।

সামুদ্রিক সর্পের বিষয় আলোচনা করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথমেই ইহাদের পুচ্ছের বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। ইহাদের পুচ্ছ সাধারণ সর্পের পুচ্ছের মত ক্রমশঃ সরু না হইয়া, সন্তরণের সহায়তার নিমিত্ত ইহার প্রান্তভাগ চেপ্টা ও গোলাকার হইয়াছে। নৌকার দাঁড়ের মত চেপ্টা ও গোলাকার পুচ্ছই সামুদ্রিক সর্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য। পুচ্ছের মত ইহাদের শল্কও স্থলচর সর্পের শল্ক হইতে বিভিন্ন। স্থলচর সর্পের শল্কগুলি গোলার ঘরের চালের খোলার মত তাহার দেহে একটির উপর আর একটি করিয়া সজ্জিত থাকে; সামুদ্রিক সর্পের শল্ক সে ভাবে সংরক্ষিত নহে। এই শল্ক ইহার দেহে ঘরের মেঝের উপর প্রসারিত টালির ন্যায় পাশাপাশি সংস্থাপিত; অর্থাৎ একখানি শল্কের উপর অন্য শল্ক উদ্গত না হইয়া ঠিক তাহার পার্শ্বেই অন্য শল্কের অবস্থান লক্ষিত হয়। ইহাদের শল্কের আকার সাধারণতঃ ষটকোণ হইয়া থাকে। স্থলচর সর্পের মত ইহাদের উদরতল বৃহৎ শল্কে আবৃত নহে। স্থলে চলিবার প্রয়োজন হয় না বলিয়া ইহাদের উদরতলে বৃহৎ শল্কের উৎপত্তি হয় না। সমুদ্রে দ্রুত সন্তরণের নিমিত্ত ইহাদের উদরতল সাধারণ সর্পের মত চেপ্টা না হইয়া নৌকার পুরোভাগের মত বা কালাচ সর্পের পৃষ্ঠের মত কোণাকৃতি।

সামুদ্রিক সর্পকে সমুদ্রের সকল অংশে দেখিতে পাওয়া যায় না। গ্রীষ্মমণ্ডলের প্রায় সকল সমুদ্রেই ইহারা বাস করে। পারস্যোপ-সাগরে, আরব সাগরে, বঙ্গোপসাগরে, মালয় উপদ্বীপের সন্নিকটে ও অষ্ট্রেলিয়ার চতুঃপার্শ্বস্থ সমুদ্রে, জাপান সমুদ্রে, এবং প্রশান্ত মহা-সাগরের মধ্যবর্ত্তী কতকগুলি দ্বীপপুঞ্জের সন্নিকটে ইহাদিগকে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহা-সাগরের যে অংশ বিষুব মণ্ডলের বহির্ভাগে অবস্থিত, সেই অংশে ইহারা বাস করে না। মেক্সিকোর পশ্চিম উপকূলের সমুদ্রে, মধ্য-আমেরিকার উত্তর দিকের সমুদ্রেও সামুদ্রিক সর্প দেখিতে পাওয়া যায়। কোষ্টারিকা হইতে সুদূর পানামা উপসাগরে এবং কালিফোর্ণিয়া উপসাগরের নিম্নভাগেও ইহাদিগের অস্তিত্ব লক্ষিত হয়। এক শ্রেণীর সামুদ্রিক সর্পকে আবার লুজন (Luzon) দ্বীপের হ্রদের মধ্যে বাস করিতে দেখা যায়। এই দ্বীপটি ফিলিপাইন্ দ্বীপপুঞ্জের বৃহত্তম দ্বীপ। এই দ্বীপস্থিত হ্রদের জল লবণাক্ত নহে। এইরূপ স্বাদু জলের মধ্যে এক জাতীয় সামুদ্রিক সর্পই বাস করে। এতদ্ব্যতীত সকল হাইড্রোফাইডি সামুদ্রিক জীব।

সামুদ্রিক সর্প সাধারণতঃ ৪।৫ ফুট দীর্ঘ হইয়া থাকে। এক শ্রেণীর সামুদ্রিক সর্প ৮।১০ ফুটও দীর্ঘ হয়। গোক্ষুর এবং কালাচ সর্পের সহিত ইহাদের কতকটা সাদৃশ্য আছে। এই কারণে ইহাদিগকে গোক্ষুর, কালাচের সামুদ্রিক জ্ঞাতি বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। ইহাদের মস্তক ক্ষুদ্র এবং দেহ প্রায়ই স্থূল হইয়া থাকে; কিন্তু এক শ্রেণীর সামুদ্রিক সর্প অত্যন্ত সরু। ইহারা মোটামুটী সাতটি জাতি, এবং আটচল্লিশটি উপজাতি বা শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহাদের কোনটিরও ফণা নাই। ফণাহীন মস্তক এবং চেপ্টা ও গোলাকার পুচ্ছই সামুদ্রিক সর্পের বিশেষ লক্ষণ। এই দুইটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিলেই এই জাতীয় সর্পকে সহজে চিনিতে পারা যায়।

সামুদ্রিক সর্পের চক্ষু অত্যন্ত ক্ষুদ্র। প্রথম দৃষ্টিতে মস্তকের পার্শ্বে অনেক সময়েই ইহা নজরে পড়ে না। ইহাদের চক্ষুর গঠন এরূপ যে, তদ্দ্বারা কেবল মাত্র জলের মধ্যে দর্শনই সম্ভবপর। তরঙ্গের উচ্ছ্বাসে তীরের উপর আসিয়া-পড়িলে সূর্য্যের কিরণে ইহারা একেবারে অন্ধ হইয়া যায় এবং দৃষ্টিহীন হওয়ায় আর সমুদ্রের জলে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে না। মস্তকের উপর মুখের অগ্রভাগে ইহাদের নাসারন্ধ্রদ্বয় অবস্থিত। এই নাসারন্ধ্রও অত্যন্ত ক্ষুদ্র। জলে নিমজ্জিত হইবার সময় নাসারন্ধ্রকে ইহারা কুম্ভীরের মত একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে পারে। অন্যান্য সামুদ্রিক জীব-জন্তুর মত ইহারা ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে, এবং এই উদ্দেশ্যে বারংবার সমুদ্রের উপর ভাসিয়া উঠে। সাধারণ সর্পের মত ইহাদের ওষ্ঠে ফাঁক থাকে না। স্থলচর সর্পের মত স্পর্শবোধের নিমিত্ত ইহারা জিহ্বা বাহির করে না বলিয়াই ইহাদের মুখ একেবারে বন্ধ থাকে। শুধু স্থলের উপর আসিয়া পড়িলে ইহারা স্থলচর সর্পের মত ইহাদের ক্ষুদ্র জিহ্বা বারংবার বাহির করিতে থাকে। ইহাদের জিহ্বা ক্ষুদ্র বলিয়া ইহার অল্পাংশ মাত্র এই সময় বাহির হইতে দেখা যায়। জিহ্বা আকারে যেমন ক্ষুদ্র, ইহার অগ্রভাগও সেইরূপ ঈষৎ বিভক্ত। ইহাদের "চোয়াল" সাধারণ সর্পের চোয়াল অপেক্ষা ক্ষুদ্র। "চোয়ালের" অনুপাতে ইহাদের বিষদন্তের আকারও ক্ষুদ্র।

ইহাদের শল্কের বৈশিষ্ট্যের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কতকগুলি সামুদ্রিক সর্পের উদরতলে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ শল্কের উদ্ভব হইয়া থাকে। এই কারণে জল হইতে তীরে আসিয়া পড়িলে

উহারা জলে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে। তবে স্থলচর সর্পের মত উহারা সহজে স্থলের উপর চলিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। সামুদ্রিক সর্পের মধ্যে "পিলেমিস বাইকলর্' (Pelamis bicolor) সাধারণতঃ অধিক সংখ্যক দৃষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ব্বোল্লিখিত সমুদ্র সমূহের সর্ব্বাংশেই ইহারা বিচরণ করে। ইহাদের পৃষ্ঠের বর্ণ কৃষ্ণ ও উদরতল হরিদ্রাভ বা পাংশুবর্ণ। এই সকল সর্প বহু দূর পর্য্যন্ত ঘুরিয়া বেড়ায়। একবার কোন শ্বেতাঙ্গ তীর হইতে ৫০ ফুট দূরে তটস্থিত বদ্ধ জল হইতে একটি সামুদ্রিক সর্পের সমুদ্রে প্রত্যাবর্ত্তনের চিহ্ন বালুকারাশির উপর দেখিতে পাইয়াছিলেন। সমুদ্র হইতে ইহারা অনেক সময় নদীর খাঁড়িতেও প্রবেশ করে। নদীর মোহনায় যত দূর পর্য্যন্ত লোনা জল থাকে, তত দূর পর্য্যন্ত ইহাদিগকে যাইতে দেখা যায়।

সামুদ্রিক সর্পের বর্ণ নানা প্রকার। বঙ্গোপসাগরে সুদৃশ্য বর্ণের ও নানা আকারের বহু সামুদ্রিক সর্প দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের কতকগুলির দেহ শ্বেত, কৃষ্ণ, রক্ত, পীত, নীল প্রভৃতি বর্ণে অতি সুন্দর ভাবে চিত্রিত। ঝড়-বৃষ্টির পরদিন অতি প্রত্যুষে সমুদ্র-তীরে ভ্রমণ করিলে দুই-চারিটি সামুদ্রিক সর্পকে সমুদ্র-তীরস্থ বেলাভূমিতে নিজ্জীব ভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। উষাকালে সমুদ্রতটে ভ্রমণের সময় আমি ইহাদিগকে সেই স্থানে মৃতবৎ নিশ্চল ভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছি। কিন্তু বেলা একটু অধিক হইলে আর ইহাদিগকে সমুদ্রতটে পড়িয়া-থাকিতে দেখা যায় না। প্রভাতালোকে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত হইলে সামুদ্রিক চীলেরা (Sea-gull) সমুদ্রতটে আসিয়া তীরে নিপতিত এই সকল প্রাণী ভক্ষণ করে। একবার আমি সমুদ্র-স্নানের সময় একটি সামুদ্রিক সর্পকে জল হইতে সমুদ্রতটে উঠিয়া আসিতে দেখিয়া, তাহার দেহ পরীক্ষার জন্য তাহার নিকট যাইতে না যাইতেই একটি সামুদ্রিক চিল আসিয়া তাহাকে মুখে তুলিয়া লইয়া উড়িয়া গেল। এই জন্যই দিবাভাগে সমুদ্রতীরে সামুদ্রিক সর্পকে পড়িয়া থাকিতে দেখা যায় না। রাত্রে সমুদ্রে জাহাজ নঙ্গর করিয়া জাহাজের পার্শ্বে আলো জ্বালিয়া রাখিলে ইহাদিগকে সেই আলোর নীচে আসিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। সেই সময় জাহাজের নিকটস্থ জলে নৌকা আনিয়া নৌকার পার্শ্বে টর্চ্চ-লাইটের আলো রাখিলে ঐ আলোকে আকৃষ্ট হইয়া ইহারা ঝাঁকে ঝাঁকে সেখানে উপস্থিত হয়। সে সময় জাল ফেলিলে ইহাদিগকে অনায়াসেই ধরিতে পারা যায়।

কলিকাতার যাদুঘরে অনেক সামুদ্রিক সর্পের মৃতদেহ আরকে সুরক্ষিত হইয়াছে। আরকে নিমজ্জিত থাকায় উহাদের বর্ণ ও অঙ্গ-শোভা মলিন ও বিবর্ণ হইয়াছে। জীবন্ত সামুদ্রিক সর্পের বর্ণ-সম্পদ ও অঙ্গের চিত্রশোভা যে কিরূপ সুদৃশ্য, তাহা মৃত্তিকা-নির্ম্মিত দুই-একটি 'মডেল' দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। যাদুঘরে ইহাদের অনেকগুলি মডেল আছে। সামুদ্রিক সর্প অপেক্ষা সর্পীর আকার অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, এবং উহাদের বর্ণও অনেক সময়ে সম্পূর্ণ বিভিন্ন দেখা যায়। এক জাতীয় সামুদ্রিক সর্প-মিথুনের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ সর্পের বর্ণ কখন কখন এরূপ বিভিন্ন দেখা যায় যে, উহাদিগকে এক শ্রেণীর সর্প বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না!

ইহাদের ফুসফুসের আকার দেহের ন্যায় দীর্ঘ। এই জন্য ফুস্ফুস্ বায়ুপূর্ণ করিয়া ইহারা জলের উপর অনায়াসে দীর্ঘকাল ভাসিয়া বেড়ায়। কোন কারণে ভয় পাইলে ইহারা অর্দ্ধ ঘণ্টাকালও ডুবিয়া থাকিতে পারে। শত শত সামুদ্রিক সর্প সময়ে সময়ে সমুদ্রের শান্ত বক্ষে ভাসিয়া রৌদ্র সেবন করে, অথবা অন্যান্য সামুদ্রিক জীবের মত ক্রীড়ারত থাকে।

ইহাদের বিষদন্ত ও বিষগ্রন্থির আকার ক্ষুদ্র; এবং উহার গঠন-প্রণালী অনেকটা গোক্ষুরাদি সর্পের বিষদন্ত ও বিষগ্রন্থির অনুরূপ। বিষদন্তের আকার ক্ষুদ্র হইলেও ইহাদের বিষ অত্যন্ত উগ্র ও ভীষণ সাংঘাতিক। সমুদ্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্যই ইহাদের একমাত্র ভক্ষ্য। ইহাদের মুখের ভিতর তীব্র বিষের উৎপত্তি হওয়ায় ইহারা সহজেই এই সকল মৎস্য শিকার করিতে পারে। মৎস্য ধরিয়াই ইহারা তাহার দেহ বিষদন্ত দ্বারা বিদ্ধ করে। বিষ-প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে সর্প-কবলিত মৎস্যের দেহের পেশীগুলি সমস্তই শিথিল হইয়া যায়, এবং তৎক্ষণাৎ উহার মৃত্যু হয়। মৎস্যের পেশীসমূহ শিথিল হওয়ায় উহার দেহও কোমল হইয়া যায়; এই জন্য সর্পের মুখ গহ্বর সঙ্কীর্ণ হইলেও অপেক্ষাকৃত বৃহৎ মৎস্যকেও গলাধঃকরণ করিতে ইহাদের বিশেষ অসুবিধা হয় না।

ইহাদের দংশন-চিহ্ন অনেক সময় নির্ব্বিষ সর্পের দংশন-চিহ্নের অনুরূপ দেখায়। এই দংশন-চিহ্ন মশক-দংশনের চিহ্ন অপেক্ষা বৃহৎ নহে। ইহাদের দংশন বেদনাবিহীন, এবং সামান্য হইলেও তাহা উপেক্ষণীয় নহে। সমুদ্রে নামিয়া স্নান করিবার সময় ভিন্ন অন্য কোন সময়ে ইহাদের দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, এবং সেই সময়েও প্রবল তরঙ্গোচ্ছ্বাসে জলরাশি ক্রমাগত আলোড়িত হইলে কদাচিৎ ইহারা দংশন করিবার সুযোগ পায়। এই জন্যই ইহাদের দংশনের কথা প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় না।

এক বার কোন জাহাজের কাপ্তেন সমুদ্রে তাঁহার জাহাজ নঙ্গর করিয়া জাহাজের অদূরে সন্তরণে রত ছিলেন। সেই সময় সামুদ্রিক সর্প তাঁহার পায়ের গোড়ালির উপর দংশন করে। সর্পটি এতই মৃদু ভাবে দংশন করিয়াছিল যে, কাপ্তেন তখন তাহা বুঝিতেও পারেন নাই! জল হইতে জাহাজে উঠিয়া তিনি গোড়ালীতে ঈষৎ জ্বালা অনুভব করায়, সতর্ক ভাবে পরীক্ষার পর সেই স্থানে মশকের দংশন-চিহ্নের অনুরূপ অতি ক্ষুদ্র দংশন-চিহ্ন দেখিতে পাইলেন; কিন্তু তিনি তাহা উপেক্ষা করায় তাঁহার দেহে ধীরে ধীরে বিষক্রিয়া আরম্ভ হয়; এবং দংশনের পর ৭১ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আর এক সময় একখানি যুদ্ধের জাহাজ গঙ্গার মোহনায় নঙ্গর করিয়া কয়েক দিন সেখানে অবস্থান করিতেছিল। জাহাজের কোন পদস্থ কর্ম্মচারী হঠাৎ একটি সামুদ্রিক সর্পকে নঙ্গরের শিকলের সাহায্যে জাহাজে উঠিবার চেষ্টা করিতে দেখিলেন। তিনি কৌতূহল বশতঃ সাপটিকে ধরিতে উদ্যত হইলে, সে তাঁহার হস্তে দংশন করিল; তাহার বিষ-প্রভাবে অল্পকাল পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

মালয় উপদ্বীপের মৎস্যজীবীরা সমুদ্র হইতে তাহাদের জাল তুলিতে গিয়া অনেক সময় সামুদ্রিক সর্প কর্ত্তৃক দষ্ট হইয়া থাকে। জালে আবদ্ধ হওয়ায় সাপগুলি অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠে; সেই অবস্থায় ইহাদের দংশন প্রায়ই সাংঘাতিক হইয়া থাকে।

সমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছ্বাসে ইহারা তীরে উৎক্ষিপ্ত হইলে ইহাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠে। তখন ইহাদের নড়িবার শক্তি থাকে না। পুরীর সমুদ্রতটে এই অবস্থায় দুইটি সামুদ্রিক সর্পকে

পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম। এরূপ অবস্থায় পতিত কোন সর্পকেই নিরাপদ মনে করা সঙ্গত নহে। এই সময় ইহাদের অতি ক্ষুদ্র চক্ষু দুইটিতে মুক্ত আলোক প্রতিফলিত হওয়ায় ইহারা সম্পূর্ণ অন্ধ হইয়া যায়, এবং দংশন করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে প্রচণ্ড বেগে আস্ফালন করিতে থাকে; এমন কি, এই সময় উত্তেজনা বশতঃ ইহারা নিজের দেহও দংশন করে—এরূপ দৃষ্টান্ত একান্ত বিরল নহে।

সামুদ্রিক সর্পী ডিম পাড়ে না, ইহারা একেবারেই পূর্ণাঙ্গ শাবক প্রসব করে। প্রত্যেক সর্পী ২টি হইতে ১৮টি শাবক প্রসব করে। সমুদ্রতটের যে সকল স্থানে নোনা জল বদ্ধ হইয়া হ্রদের ন্যায় অগভীর পল্বলের সৃষ্টি হয়, পূর্ণগর্ভা সামুদ্রিক সর্পীরা ঐ সকল বদ্ধ জলাশয়ে প্রবেশ করিয়া শাবক প্রসব করে। শাবকগুলি মাতৃগর্ভ হইতে প্রসূত হইয়াই খাদ্যান্বেষণে প্রবৃত্ত হয়, এবং তৎপরে সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া মৎস্যকুলে মহা আতঙ্কের সৃষ্টি করে। সদ্যপ্রসূত গোক্ষুর-ছানার ন্যায় সদ্যপ্রসূত সামুদ্রিক সর্প-শাবকের বিষও এরূপ উগ্র যে, ইহাদের দংশনমাত্র ক্ষুদ্র মৎস্যাদির সমগ্র স্নায়ু ও পেশী পক্ষাঘাতে অসাড় হইয়া যায়, এবং অচিরে তাহাদের প্রাণবিয়োগ হয়।

সাধারণ সর্পেরা যেরূপ সম্পূর্ণ "খোলস" ত্যাগ করে, সামুদ্রিক সর্পগুলি সে ভাবে "খোলস" ত্যাগ করে না। ইহাদের নির্ম্মোক-ত্যাগের প্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। খোলস ত্যাগ করিতে স্থলচর সর্প অপেক্ষা ইহাদের অনেক অধিক সময়ের প্রয়োজন হয়; এবং এই দীর্ঘকালের মধ্যেও ইহারা সম্পূর্ণ খোলস ত্যাগ করিতে পারে না। আংশিক ভাবেই ইহাদের নির্ম্মোক পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। নির্ম্মোক ত্যাগের উপরেই সর্পের স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। সম্পূর্ণ "খোলস" ত্যাগ করিতে না পারিলে সর্পের জীবন অনেক সময়েই বিপন্ন হইয়া থাকে। এ কারণে কৃত্রিম উপায়ে উহাদের খোলস ছাড়াইয়া দিতে হয়। "খোলস" আংশিক ভাবে পরিত্যক্ত হইলেও সামুদ্রিক সর্পের জীবনে কোনও বিভ্রাট ঘটে না।

সুতীব্র বিষের অধিকারী হইলেও সামুদ্রিক সর্পের জীবন সমুদ্রেও সম্পূর্ণ নিরাপদ নহে। ক্ষুদ্র ও মধ্যম আকারের মৎস্যগুলি ইহাদিগকে যেরূপ ভয় করে, ইহারাও সেইরূপ অতি বৃহৎ মৎস্য, হাঙ্গর ও সামুদ্রিক বাজের মত পক্ষীগুলিকে ভয় করে। হাঙ্গর প্রভৃতি জলজন্তু ইহাদিগকে দেখিতে পাইলেই আক্রমণ করিয়া ভক্ষণ করে।

বন্দী অবস্থায় ইহারা অধিক দিন জীবিত থাকে না আলিপুর প্রাণীশালায় ইহাদিগকে অল্প কালের জন্য দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। এক বার ক্যারোলাইন দ্বীপ হইতে দ্বাদশটি সামুদ্রিক সর্প ক্যানেস্তারায় পুরিয়া নিউ ইয়র্কের সরীসৃপাগারে প্রেরিত হইয়াছিল। জাহাজে তুলিয়া লইয়া-আসিবার সময় সেই সর্পগুলি স্বাদু পানীয় জলপূর্ণ আধারে সংরক্ষিত হইয়াছিল; কিন্তু প্রত্যহই উহাদিগকে সমুদ্রের জলে স্নান করাইতে হইত। নিউ ইয়র্কের প্রাণীনিবাসে আনীত হইলে, একটি বৃহৎ চৌবাচ্চা সমুদ্রের জলে পূর্ণ করিয়া তন্মধ্যে উহাদিগকে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। প্রায় ছয় মাস সেখানে জীবিত থাকিবার পর সাপগুলি ক্রমশঃ একটির পর একটি প্রাণত্যাগ করে। বিশেষ যত্ন সত্ত্বেও সেখানে উহাদিগকে দীর্ঘকাল জীবিত রাখা সম্ভব হয় নাই।

শ্রীঅশেষচন্দ্র বসু (বি-এ)

সুইজারল্যাণ্ডে সূর্য্যোদয়

রজতচন্দ্রিকানিভ অভ্রংলিহ গিরিশৃঙ্গ পরিয়াছে তুষার-কিরীট,
সুইস্-পর্ব্বতমালা যেন তুগ্ধধবলিত ভ্রাম্যমান্ অনঘ প্রাবৃট!
স্বপ্নে যেন হেরিলাম উর্ব্বশীর অপরূপ নৃত্যতালে রূপের আরতি,
অরূপের পাদপদ্মে পরিপূর্ণ-চিত্তে সেথা রাখিলাম প্রাণের প্রণতি।

আধতন্দ্রাজাগরণে মোহমুগ্ধ দু'নয়নে হেরিলাম নব সূর্য্যোদয়,
কার্ণেশন্, ড্যাফোডিল, রডোডেনড্রনগুচ্ছ বিদেশীর মাগে পরিচয়।
ফলাক্রান্ত দ্রাক্ষালতা, পুষ্পবীথি, কুঞ্জবন, পাইনের অনন্ত বিস্তার,
বঙ্কিম যৌবনপ্রান্তে সেই শান্ত সূর্য্যোদয়, মনে হয় স্বপ্ন-পারাবার।

ইন্দ্রনীলে-সান্দ্রনীলে হরিতে-পাটলে-স্বর্ণে বর্ণে বর্ণে কি অপূর্ব্ব রূপে,
জ্যোতির হৃদয়পদ্ম খুলিল সহস্রদলে পরিমল বিলাতে মধুপে।
অন্তর্হিত কুজ্ঝটিকা, গলিত রজত দীপ্তি গিরিশৃঙ্গে পড়িল তির্য্যক্,
কলচ্ছন্দে নির্ঝরিণী শৈলগাত্রে নৃত্যরত, স্রস্ত শ্লথ তিমির-নির্ম্মোক্।

কীর্ত্তি যার ইন্দ্রধনু পতঙ্গ-পাখার গায় ক্ষণিকে যা' যায় মিলাইয়া,
তা'রি পরিপূর্ণ রূপে শাশ্বত সৌন্দর্য্য হেরি' রূপমুগ্ধ এ বিদগ্ধ হিয়া।
পুষ্পসম অর্ঘ্য দিনু তনু-মন সেই ক্ষণে জীবনের পরম-প্রভাতে,
হেরিলাম দিনদের লাবণ্যের স্তরে স্তরে ঝলকিছে তুষার-সম্পাতে।

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস (এম-এ, ব্যারিষ্টার-এট-ল)

(উপন্যাস)

২৪

গ্রামে তেমন নিকট-আত্মীয় কেহ না থাকিলেও আমাদের পাতানো ঠাকুরমা, জেঠাইমা, কাকীমার অভাব ছিল না। বাবার সৌজন্যপূর্ণ সরল ব্যবহারে প্রতিবেশীদের সহিত আমাদের আত্মীয়তা-বন্ধন সুদৃঢ় হইয়াছিল। পল্লীগ্রাম হইলেও আমাদের গ্রামখানিকে খাঁটি 'পাড়াগাঁ' বলা যায় না। গ্রামে হাট-বাজার, ডাকঘর, ষ্টেশন, ইংরেজী স্কুল এ সকলই ছিল—কিন্তু এক মিশনারী স্কুল ভিন্ন মেয়েদের জন্য পৃথক কোনও বিদ্যালয় ছিল না। বহুকাল পূর্ব্বে পাটের ব্যবসায়ের জন্য ইংরেজ কুঠিয়ালরা এই গ্রামে আসিয়া 'মিশন' স্থাপন করিয়াছিল। তদবধি গ্রামস্থ বালিকারা 'বাইবেল' গ্রন্থে যীশুখৃষ্টের অপূর্ব্ব ত্যাগের কাহিনী পাঠ করিয়া জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া আসিতেছে। আমার অগ্রবর্ত্তিনীদের শিক্ষা অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। প্রাথমিক শিক্ষা অসম্পূর্ণ রাখিয়াই অধিকাংশ বালিকাকে বিবাহের পর শ্বশুর-বাড়ী যাইতে হইয়াছে। 'মিশনের' একমাত্র পুরাতন ছাত্রী আমিই কলেজে পড়িতেছি। মিশন-স্কুল হইতে সর্ব্ব-প্রথম আমিই 'ম্যাট্রিক' পাশ করায় মিশনের শিক্ষানেত্রী পূতচরিত্রা সিষ্টার 'ডরোথি' আমাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন।

পিসিমার চিঠি শেষ করিয়া আমি বাগানে ঢুকিলাম। পুষ্প ও পুস্তক বাবার অত্যন্ত আদরের জিনিস। প্রভাত ও সন্ধ্যা তিনি বাগানেই অতিবাহিত করিতেন।

নিতাই চাকরের সাহায্যে বাবা স্থলপদ্ম ফুল-গাছের গোড়ার মাটি আলগা করিয়া দিতেছিলেন। ফুল ফুটিবার মরসুম সবে আরম্ভ হইয়াছে। প্রতি-শাখায় অসংখ্য কুঁড়ি। একটি ক্ষুদ্র শাখায় চারিটি স্থলপদ্ম ফুটিয়া যেন একটি সুন্দর তোড়া রচনা করিয়াছে। গন্ধরাজের পাতা দেখা যায় না, ফুলে ফুলে শাখা-পত্র আচ্ছন্ন। সেফালির মৃদু সৌরভে পুষ্পোদ্যান আমোদিত।

আমি মুগ্ধ—পুলকিত চিত্তে কহিলাম, "কি সুন্দর! আগে তো এত গাছ, এত ফুল ছিল না?"

বাবা হাসি-মুখে বলিলেন, "এ-দিকের এ গাছগুলো নতুন লাগিয়েছি; তুই অনেক দিন পরে এসেছিস কি না তাই দেখিসনি। এ লতাটা সিষ্টার 'ডরোথি' আমাকে দিয়েছেন। বড় সুন্দর এই লতার ফুলগুলি।"

বলিলাম, "ঐ স্থলপদ্মের ডালটা ভেঙ্গে তার সঙ্গে অন্য ফুল মিশিয়ে আমায় দাও না বাবা! আমি এক্ষুনি গিয়ে 'সিষ্টারের' সঙ্গে দেখা করে তাঁকে দিয়ে আসি। লতার নতুন ফুলও দু'টো দাও। এত ফুল, কাউকে না দিলে আমার তৃপ্তি হয় না। এখন না তুললে, পরে রোদের তাতে শুকিয়ে ঝ'রে পড়বে।"

—"ঝ'রে পড়লেও আবার ফুটবে, ফুলের অভাব কি? কত ফুল চাস্? সকালে তোর স্নানের অভ্যাস, কর! তা তুই স্নানও করলি নে, কিছু খেলিও না। আজ না হয় থাক, কাল সকালে যাস্?"

—"না, বাবা, এখুনি একবার ঘুরে আসি। বাড়ী এসে ভোরে স্নান করতে ভাল লাগে না। খানিক বেলা হোক, তখন নাইলেই হবে। এই এখুনি তো পিসিমা এক বাটি গরম দুধ খাইয়ে দিলেন। কাল থেকে তো পাড়ায় পাড়ায় নেমন্তণের পালা চলবে, সময় পাবো না। আমার আসার খবর এখনো কেউ পায়নি কি না! খবরটা পেলে বাড়ী এতক্ষণ লোকে ভরে যেতো।"

—"বিন্দু বিধবা, আমিও তার সমান। বাড়ীতে মাছ আসে না বলেই সকলে স্নেহ করে তোকে খেতে বলেন। সকলের স্নেহ-ভালবাসা পাওয়া কম ভাগ্যের কথা নয়,

রুরু! পাড়াগাঁয়ে এখনো এটার অভাব হয়নি; কিন্তু শহরে এর অস্তিত্ব আছে কি না, টের পাবি নে। সবাই ভালবাসে, তাই দেখতে আসে, খেতে বলে: সে জন্যে কি বিরক্ত হ'তে আছে?"

—"না বাবা, বিরক্ত হবো কেন? দেখতে আসেন, খেতে বলেন—সে তো সুখের কথা। কিন্তু ওঁরা এত বাজে বকেন, তা আমার ভাল লাগে না। শহরে ভালবাসাও নেই, বাজে কৌতূহলও নেই। কার ছেলে-মেয়ে বড় হলো, সে জন্যে কারও দুশ্চিন্তা নেই; কারও মাথা-ব্যথাও করে না।"

—"যেখানে মাথাই নেই, সেখানে ব্যথা করবে কি? এদের ছোট গণ্ডী, ছোট কথা; বৃহৎ জগতের সঙ্গে এদের পরিচয় নেই। রান্না, খাওয়া, জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে—এই হলো এখানকার চিন্তার ফিরিস্তী। তোর রাগের কারণ জানি, রাগ করিস নে। যা পল্লীসুলভ তার কোন ব্যতিক্রম দেখলেই প্রশ্ন করা এদের স্বভাব।"—বলিতে বলিতে বাবা ফুলে পাতায় প্রকাণ্ড একটা তোড়া বাঁধিয়া ফেলিলেন।

আমার হাতে তোড়াটা দিয়া তিনি কহিলেন, "সিষ্টারকে এটা দিয়ে আয়। ছোট ফুল-ক'টা তাঁরই দেওয়া লতায় ফুটেছিল—বলিস্। গল্পে মত্ত হ'য়ে দেরী করিস নে। বেশী বেলায় স্নান করলে মাথা ধরবে। নিতাই তোকে রেখে আসুক, কি বলিস্?"

—"নিতাইয়ের দরকার নেই, এইটুকু রাস্তা, আমি একাই যাচ্ছি। নিতাইকে পিসিমা ডাকছেন। তুমি আজ স্কুলে নাই-বা গেলে বাবা! শরীর তোমার ভাল নয়, ক'দিনের ছুটি নাও না। দুপুরে তোমার গল্প শুনবো।"

—"সন্ধ্যাবেলা যত খুসী গল্প শুনো মা! "রুরুর গল্প-পর্ব্ব" নাম দিয়ে এখন ছুটি নেওয়ার সুবিধা হবে না। গেল সপ্তাহে শরীর খারাপ ছিল—দু' দিন ছুটি নিয়েছিলাম। কতখানি সময়ই বা স্কুল! চারটেয় তো ফিরে আসবো। তুমি যাও, রোদ উঠছে।"—বলিয়া বাবা আমার সঙ্গে আসিয়া বাগান পার করিয়া দিলেন।

'মিশন' আমাদের বাড়ী হইতে বেশি দূরে নহে, নদীর ধারে নির্ম্মিত খড়ো-বাংলো। বামে প্রকাণ্ড মাঠ—শ্যামল দুর্ব্বাদলে আচ্ছাদিত; দক্ষিণে পুষ্পোদ্যান। ভরা-নদীর পরপারে শুভ্র কাশগুচ্ছ, তাহার সীমারেখা ঘেঁষিয়া বিস্তীর্ণ বালির চর ধূ-ধূ করিতেছে। বিচরণরত বুনহংসের কল-কাকলি শরৎ-প্রভাতের উদাস বায়ু-প্রবাহে ভাসিয়া আসিতেছে।

'বাংলো'-সংলগ্ন বকুলতলার বাঁধানো বেদীতে বসিয়া সিষ্টার 'ডরোথি' বাইবেল্ পড়িতেছিলেন। তিনি যৌবন-সীমা অতিক্রম করিয়া বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার দীর্ঘ দেহ এখনও অটুট স্বাস্থ্যে সমুজ্জ্বল। প্রশান্ত প্রসন্ন মুখচ্ছবি; শুভ্র বরণে, শুভ্র বসনে চিত্তের শুভ্র নির্ম্মলতা যেন পরিস্ফুট। মাথায় সাদা 'হুড্', বুকে রূপার 'ক্রুশ'।

তোড়াটা তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া হস্ত প্রসারণ করিয়া আমি অভিবাদন করিলাম।

তিনি সাদরে, সস্নেহে আমার করতল স্পর্শ করিয়া প্রস্ফুটিত কুসুমের তোড়াটি তুলিয়া লইলেন, এবং আমাকে তাঁহার পাশে বসাইয়া, ফুলের আঘ্রাণ লইতে লইতে ইংরেজিতে কহিলেন, "রুরু, তুমি আজ প্রভাতেই আমাকে আনন্দ দিলে। প্রথম আনন্দ—তোমার আগমনে, দ্বিতীয় আনন্দ—তোমার প্রদত্ত উপহার লাভে; এর জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ। তুমি কবে এসেছ? আশা করি, ভাল আছ। এবার তুমি 'গ্র্যাজুয়েট্' হবে, আমার 'মিশনে'র বালিকার এই উন্নতিতে আমি গৌরব অনুভব করবো।"

আমি বলিলাম, "আমি বাবাকে দেখতে কাল এসেছি 'সিষ্টার'! এবার পড়া ভাল তৈয়েরী করতে পারিনি। তোমার 'মিশনে'র গৌরব বজায় রাখতে পারবো কি না বলা শক্ত।"

—"নিশ্চয়ই তার মান রাখবে। তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী—প্রভু যীশু তোমার মঙ্গল করবেন। পরীক্ষায় পাশ করে তুমি কি করবে—স্থির করেছ কি?"

কি যে করিব, তাহা নিজেই জানি না; কাজেই চট্ করিয়া উত্তর দিতে পারিলাম না।

'সিষ্টার' ক্ষণেক আমার দিকে চাহিয়া, মাথার হুড ঘোমটার আকারে সম্মুখে টানিয়া সহাস্যে কহিলেন, "তুমি এই করবে রুরু! আমি তা বুঝেছি। সে কে—কোন্ ভাগ্যবান্ ব্যক্তি? বলতে বাধা আছে কি?"

আমি হাসিলাম, "না সিষ্টার, আপনার অনুমান ঠিক হয়নি। বিয়ে করলে তো ঐ ভাবে ঘোমটা দেওয়া; আমি বিয়ে করবো না। আমার ভাগ্যবান্ ব্যক্তি কেউ নেই।"

'ডরোথি' সন্দিগ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিয়ে করে সংসারী হতে তোমার অনিচ্ছা কেন রুরু? আমার সন্দেহ হচ্ছে—তুমি হয়তো কোনো তরুণ শয়তানের প্রলোভনে পড়ে হৃদয়ের শান্তি হারিয়ে বসেছ।"

—"না সিষ্টার, আমার হৃদয়ের শান্তি হারায়নি। তোমার পবিত্র জীবনের দৃষ্টান্তে আমার সাধ হয়—বিয়ে

না ক'রে জগতের কল্যাণে নিজের জীবন উৎসর্গ করি। আমি যতটুকু শিখেছি, যারা তা জানে না, তাদের সেইটুকু শিখাই।"

—"তোমার সাধু-সংকল্পে খুসী হলাম কন্ন! কিন্তু তুমি বালিকা, এ পথ তোমার নয়। আমার বয়স ও অভিজ্ঞতা হতে জেনেছি—এ বড় কঠিন কাজ। তোমার মা নাই, আমি তোমাকে স্নেহ করি। আমার মনে হয়—একটি চরিত্রবান, উদার স্বভাবের ক্ষমাশীল তরুণকে বিয়ে করলে তুমি অনেক ভাল কাজ করতে পারবে। তুমি হিন্দু, শুনেছি, তোমাদের সমাজে চিরকুমারী থাকলে নিন্দা হয়; তাই তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, তুমি হৃদয়কে শান্ত করে বিয়ে করো। যদি নিতান্ত না পার, তাহলে কোথাও যেয়ো না। তুমি 'মিশনের' মেয়ে, মিশনেই তোমার কাজ হবে। আর একটি আমার অন্তরের কথা, তুমি মনো রেখো—তোমার বাবার অমতে কিছু করো না। তিনি অত্যন্ত সাধু-প্রকৃতির লোক। তাঁকে আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি।"

বিদেশিনী 'ডরোথির' স্নেহসিক্ত উপদেশ আমার প্রাণে অমৃত সিঞ্চন করিল। যদি কখনো প্রয়োজন হয়,—উত্তাল তরঙ্গিণী-স্রোতে ক্ষুদ্র তৃণের মত যদি আমাকে ভাসিয়া যাইতেই হয়, তাহা হইলে ইঁহাকেই আশ্রয় করিয়া আমি সেই উদ্দাম স্রোতোবেগ রোধ করিব। সামান্য খড়কুটার মত ভাসিয়া যাইব না, স্রোতে বিলীন হইব না! এই সকল কথা ভাবিয়া এত দিনে আমার হৃদয়ের ভার লাঘব হইল। চিত্তের প্রসন্নতা ফিরিয়া আসিল।

বলিলাম, "তোমার হিতোপদেশ, শুভ ইচ্ছাই আমি গ্রহণ করলাম সিষ্টার! তোমার অকৃত্রিম স্নেহের জন্য ধন্যবাদ! এখনো আমি আমার যাত্রাপথের নিশানা পাই নাই,—না পেলে আর কোথাও যাব না; তোমারই কাছে আসবো। জানি, তুমি আমায় ঠিক রাস্তা দেখিয়ে দিতে পারবে।"

আমার আন্তরিক নির্ভরতায় 'ডরোথির' নীল নয়ন দু'টি সজল হইল। তিনি আমার একখানা হাত হাতে লইয়া প্রার্থনার ভঙ্গিতে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

২৫

'মিশন' হইতে ফিরিয়া দেখি, বাড়ীতে রীতিমত হাট বসিয়াছে! প্রতিবেশিনী ঠাকুরমা, জ্যেঠাইমা, মাসী-পিসির দল আমার আগমন-সংবাদ পাইয়া দেখিতে আসিয়াছেন। বাবা স্নানাহার সারিয়া স্কুলে গিয়াছেন। পুরুষশূন্য গৃহ নারী-কণ্ঠের কল-কল, খল-খল শব্দে মুখরিত হইতেছে!

কুণ্ঠিত ভাবে সকলের পদপ্রান্তে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম। প্রণামের সঙ্গেই 'বড়-ঘরে ছোট-বরে বিয়ে হোক', 'সাত ব্যাটার মা, ভাগ্যবতী হও',—ইত্যাদি মামুলি আশীর্ব্বাদধারা আমার মস্তকে বর্ষিত হইতে লাগিল।

আমি গ্রাম্য নারী-সম্প্রদায়কে অতিশয় 'সমীহ' করিতাম। অশিক্ষিতা পল্লী-রমণীর প্রতি ইহা আমার অবজ্ঞা বা তাচ্ছিল্য নহে। আমার কুণ্ঠিত মন, বেশি আলোচনা-আন্দোলনের মধ্যে থাকিতে পারিত না। জনতা দেখিলে আমার অন্তরাত্মা পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর মত ছটফট্ করিয়া মরিত। আমি নির্জ্জনের প্রয়াসী, নিরালায় স্নেহের মাধুর্য্য অনুভব করিতে ভালবাসি।

গ্রামে আমার বয়সের একটি মেয়েও অবিবাহিতা নাই। বিদ্যাশিক্ষার অনুরোধে আর কেহ এমন বন্ধনহীন জীবন যাপন করিতেছে না। এই কারণে সকলের সহিত আমার ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছিল। সকলের মাঝখানে উপস্থিত হইয়া কুশল প্রশ্নের উত্তরে 'হাঁ, না' ভিন্ন আমার যেন আর কিছুই বলিবার ছিল না।

গ্রাম-সম্পর্কে ঠাকুরমা আমার নতমুখ তুলিয়া ধরিয়া ঝঙ্কার দিলেন, "দেখি লো নাতনী, সোনা-মুখের কেমন ছিরি হলো? কত দিন দেখিনি, প্রাণটা ঝুরে ঝুরে মরে। আকুলি-বিকুলি আমরাই করি, তুই তো দিব্যি সব্বাইকে ভুলে গেছিস্? নইলে আমাদের সঙ্গে দেখা না-করেই ছুটেছিলি—সকলের আগে সেই খৃষ্টান মাগীর আড্ডায়!"

এ আক্রমণ হইতে পিসিমা আমাকে রক্ষা করিলেন; নির্জ্জলা মিছা কথা কহিলেন, "কন্ন কি তোমাদের ভুলতে পারে? বাড়ীতে পা দিয়েই তোমাদের কথা! সকালেই যেতে চেয়েছিল, তা আমি বললাম, 'মেমের' কাছে তোর লেখাপড়ার যা দরকার—সে সব সেরে আয়। মোটে সাত দিন থাকবি; এরা তো তোর আপন-জন, যখন খুসী যাবি-আসবি।—তবে না মেয়ে সেখানে গেল।"

ঠাকুমা প্রীত হইলেন, "তা তো সত্যি, আগের কাজ আগে সারতে হয়। এ-বেলা তুমিই নানানখানা রেঁধেছ—রাতে কিন্তু ও আমার কাছে খাবে। কলকাতায় মাছের যা দশা, তোমাদেরও নিরামিষের ঘাঁটা, বাছা প্রাণ ভরে মাছ খেতে পায় না। মাছে-দুধেই বাঙ্গালীর শরীর; তা পায় না বলেই সোমত্ত বয়েসের মেয়ের ছিরিছটা খোলে নি। যেমন ঢেঙ্গা, তেমনি লিকলিকে গড়ন-পেটন। লেখা-পড়াই শেখো—গান গেয়ে আসরই মাত কর,—আর যেই

যেই নেত্য ক'রে পৃথিবী রসাতলে পাঠাও, তাতে কি বাপু ব্যাটাছেলের মন ভোলে ? সকলের আগে চেহারার চটক দেখানো চাই।"

পিসিমা সায় দিলেন, "যা বলেছ কাকীমা, মিছে নয়। এ কালের ছুঁড়ীগুলো বই নিয়েই মত্ত, শরীরের তোয়াক্কা জানে না। না খেয়ে মেয়ের এমনি ছিরি হয়েছে, তোমরা আদর করে খেতে দাও। সেখানে কে দেবে, কে আছে ? কাল ও তোমার কাছে খাবে কাকীমা, আজ আবার আমি দু'টো পিঠে-পুলি করতে গিয়েছি। চিরকাল কব্রু তোমাদেরি খাচ্ছে, তোমাদের যত্ন-আত্তিতে এত বড়টি হয়েছে।"

পিসিমার আপ্যায়নে সন্তুষ্ট হইয়া সকলে প্রস্থান করিলেন, আমি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

দিনান্তের ম্লানছায়া চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইতে না হইতে বাবা ফিরিয়া আসিলেন। বিশ্রামান্তে জলযোগ করিয়া, আমাকে লইয়া তাঁহার ঘরে বসিলেন।

দেখিতে দেখিতে দিনের আলো নিবিয়া গেল। জানালার নীচের বাগান হইতে ফোটা ফুলের মিশ্র গন্ধ সন্ধ্যার বাতাসে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। আমি ইচ্ছা করিয়াই প্রদীপ জ্বালিলাম না। আমার বলিবার যাহা, দীপালোকে তাহা বাধিয়া যায়। অপার স্নেহ-সমুদ্রের উপকূলে, নিঝুম অন্ধকারে মানুষ যেমন আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে, এমন আর কিছুতেই নহে। চন্দ্রচূড়কে আহ্বান-লিপি প্রেরণ করিবার পর হইতে আমার চিত্তচাঞ্চল্য আরম্ভ হইয়াছিল। পিসিমার মনোভাব সুস্পষ্ট, বাবাও অনুকূল। সাত দিনের ছুটিতে আসিয়াছি, দুই দিন থাকিয়া প্রস্থান করিলেও ইহাদের মত-পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা নাই। আমার যাহা বলিবার, এখন তাহা না বলিলে নিজেই জটিলতার জালে জড়াইয়া পড়িব, ইহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

বাবার মাথার চুলে অঙ্গুলি-চালনা করিতে করিতে আমি বলিলাম, "তখন সিষ্টারের কাছে গিয়েছিলাম বাবা! তিনি বল্লেন, আমি বি-এ পাশ করলে তিনি 'মিশনে' কাজ দেবেন। এখন পারিশ্রমিক দিয়েই ওঁরা লোক রাখেন। তোমাকে অসুখ নিয়েই কাজ করতে হয়; আমি ফিরে এসে তোমাকে নিষ্কৃতি দানের জন্য মিশনে চাকুরী নেব। তোমার কাছে থাকবো—অন্য কোথাও যেতে হবে না।"

আমি যেন শুধু বাবার জন্যই অতিরিক্ত চিন্তার ফলে ব্যাকুল হইয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, এই অনুমানে বাবা স্নেহে আর্দ্রতায় বিগলিত হইয়া বলিলেন, "আমার শরীরের ভাবনায় তুমি এত অস্থির হয়েছ কেন, মা! আমার স্বাস্থ্য সাধারণের স্বাস্থ্যের তুলনায় ভালই বলতে পারি। এ বয়সে এক-আধ দিন সর্দ্দি বা জ্বর হলে তাকে অসুখ বলা চলে কি? তোমার হয়তো বিশ্বাস, আমি কষ্টে পড়ে ছেলে পড়িয়ে খাচ্ছি! কিন্তু সত্যই তা নয়। যাদের আকাঙ্ক্ষা বেশী, অভাব তাদেরই; আমার অভাব নেই। কাজকর্ম্ম নিয়ে আছি, ভালই আছি, আনন্দে আছি। কাজ না থাকলে আমার থাকা না থাকা সমান কব্রু! আর যা বলতে হয় বল; তোমার বুড়ো ছেলেকে কাজ ছাড়তে বলো না মা!"

—"কেন বলবো না, বাবা? আমি যদি তোমার মেয়ে না হয়ে ছেলে হতাম, আর চাকরী নিয়ে ভাল-রকম রোজগার করতাম; তাহলে তখনো কি তুমি চাকরী করতে?"

—"করতাম কি না, তা অন্যের ওপর নির্ভর করে না, সেটা নিজস্ব। অকর্ম্মণ্য অলস জীবন সকলেরই বাঞ্ছনীয় নয়। আর ছেলের কথা বলাই বা কেন? ছেলে মেয়েতে কিছুই প্রভেদ করিনি। তুমি আমার যা করছ, ছেলে থাকলে এর বেশি পারতো না। আমি তোমাকে পেয়ে সব পেয়েছি, কব্রু! আমার ছেলের আক্ষেপ নাই।"

আমার দুই চোখ দিয়া ঝর-ঝর করিয়া জল ঝরিতে লাগিল। আমাকে পাইয়া বাবা সব পাইয়াছেন—এ কত বড় দরাজ মনের কথা! কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, করুণায়, অমৃত-ধারায় অভিষিক্ত হইয়াও আমি সন্তাপে জ্বলিতেছি। বাবার মত আমিও কেন বলিতে পারি না—পিতৃস্নেহের অধিকারিণী হইয়া আমি সবই পাইয়াছি; আমার আর কিছুরই প্রয়োজন নাই?

গলা ধরিয়া আসিয়াছিল, তবু কথা কহিতে হইল; কহিলাম, "তোমার আক্ষেপ নাই বলে আমার কি উচিত অনুচিত বোধ থাকবে না বাবা? তোমার যত-খুসী খাটতে থাকো, আমিও তোমার সঙ্গেই খাটবো। পরীক্ষা শেষ হলেই আমি 'মিশনে' ঢুকবো, আগেই তা বলে রাখছি; তখন কিন্তু তুমি অমত করতে পারবে না।"

বাবা ক্ষণকাল নতমুখে কি চিন্তা করিলেন। তাহার পর গম্ভীর স্বরে কহিলেন, 'মিশনে' চাকরী নেওয়া ছাড়া আর কিছু কি তোমার মনে হচ্ছে না, কব্রু! তুমি জান, উপার্জ্জনের উদ্দেশে পুরুষের সাথে মেয়েদের প্রতিযোগিতা আমি পছন্দ করি নে। দায়ে পড়ে অবশ্য অনেককেই অনেক কিছু করিতে হয়। সে ব্যবস্থা পৃথক্। পয়সার লোভে, ইচ্ছা করে ঘরের লক্ষ্মীদের এই ছেঁড়াছেঁড়ি, কাড়াকাড়ি ব্যাপারের আমি সমর্থন করিনে। আদিম কাল থেকে

ঘরে বাইরের পার্থক্যে যে সুন্দর শান্তির ধারাটা বয়ে যাচ্ছে, তা নষ্ট হতে দেখলে আমি ব্যথা পাই। দাসত্ব করা ছাড়া করবার কাজ ঢের আছে। লোকের উপকার করতে চাও, শিক্ষা দিতে চাও, দাও না কেন? অর্থের বিনিময়ে সৎকাজের দাম কমে যায়, তা মনে রেখো।"

—"তা হলে আমি কি করবো বাবা? তোমার কি ইচ্ছা—আমি এম-এ পড়ি, না বি-টি? যা হোক্-একটা কিছু করতে হবে তো? যদি তোমার মত থাকে, তাহলে না হয় কিছু না নিয়েই 'মিশনে'—"

বাধা দিয়া বাবা বলিলেন, "আমার মত অন্য। তুমি যদি আরো পড়তে চাও, তাতে আমি অমত করবো না। আমার ইচ্ছা, তোমাকে তোমার জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করা। তোমার মা নেই, দুই জনার যা করণীয় কাজ, আমাকেই একা তা সম্পূর্ণ করতে হবে। তোমাকে বড় করেছি, লেখা-পড়া শিখিয়েছি; এখন যোগ্য পাত্রে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত হতে পারি।"

লজ্জায় মস্তক অবনত হইল; কিন্তু এটা আমার লজ্জার সময় নয়—মৃদু স্বরে বলিলাম, "তুমি যা ভেবেছ, তা আমি পারবো না বাবা! আমার প্রবৃত্তি নেই। আর কোন বিষয়েই আমি তোমার অবাধ্য হবো না, কেবল ওইটা বাদ। কেনই বা তোমরা চন্দ্রচূড় বাবুকে আনছ? আমার মা নেই বলে তোমরা আমাকে ভার বলে মনে করছ? কিন্তু মা থাকলে এমন তাড়াতাড়ি বিলিয়ে দিতে চাইতে না।" বলিতে বলিতে আমার এত দিনের সঞ্চিত অশ্রু-ধারা প্রবাহিত হইল। আমি নিজেকে আর সম্বরণ করিতে পারিলাম না, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

বাবা চকিত হইয়া আমাকে কোলে টানিয়া লইলেন। আমার মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিলেন, "সংসারী হতে চাও না—তা বলতে এত কান্না কেন, মা! আমি জানি না, আমায় তো কখনো বলোনি। তোমাকে ভার মনে করে বিলিয়ে দিতে চাচ্ছি, এটা তোমার ভুল ধারণা। তোমাকে সুখী করতেই আমার যত্ন আগ্রহ। তোমার মা থাকলেও এ-ই চাইতেন। তাঁর চাওয়া আমার চাওয়া ভিন্ন হতে পারে না। বিয়েতে তোমার প্রবৃত্তি নেই কেন—সেটা জানতে চাইলে কি তোমাকে পীড়ন করা হবে? আমাকে লজ্জা করো না মা! মনে কর, তোমার মাকে বলছ, মার কোলে রয়েছ। বল—কেন ইচ্ছা নেই, কারণ কি?"

অশ্রুর প্রথম উৎস-ধারা বর্ষণের পর আমার অশান্ত হৃদয় কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়াছিল। বাবার কথায় আমার অবারিত উচ্ছ্বসিত অশ্রুর ধারা সহসা থামিয়া গেল।

আমার দুর্নিবার লজ্জার কাহিনী কেমন করিয়া বলিব? ইহা কি বলিবার কথা? সে নগ্ন কদর্য্যতা বাহিরের নহে, অন্তরের। আমি বাবার কোলে মুখ গুঁজিয়া তেমনি পড়িয়া রহিলাম।

বাবা ধীরে আমার চুলের রাশি গুছাইয়া দিতে লাগিলেন। তাঁহার সুকোমল স্পর্শ আমার গোপন বেদনা যেন প্রকাশ করিতে উদ্যত হইল। আজ নানারূপ প্রসঙ্গে একাধিক বার আমার পূতহৃদয়া স্বর্গগতা মায়ের নাম শুনিয়াছিলাম। কিন্তু তাহা শোনা পর্য্যন্তই! আমি মাতৃস্নেহের আস্বাদ জানি না। মা থাকিলে কি করিতাম বলিতে পারি না; তবে ইহাই বলিতে পারি যে, বাবাকে যাহা লুকাইলাম, জগতে কাহারো কাছে তাহা বলিতাম না। বিশ্বে আমার বাবা অপেক্ষা আর কেহ বড় নাই, থাকিতে পারে না।

অনেক ক্ষণ পর বাবা কহিলেন "তুমি বলতে পারলে না রুরু! আমার কাছেও লজ্জা-সঙ্কোচ? তা না বল্লেও আমি জানি—আমার রুরু-মা লজ্জার কোনও কাজ করতে পারে না।—চন্দ্রচূড় আসবে, তাতে কি? সে বিনুর আপনার জন, আমাদেরও আত্মীয়। আমি কাউকে কথা দেব না, চেষ্টা করবো না।—যখন তোমার ইচ্ছা হবে, সময় আসবে, আমি তার জন্যে অপেক্ষা করবো।"

২৬

সে-দিন দ্বিপ্রহরে পাড়ার নিমন্ত্রণ সারিয়া বাড়ী ফিরিলাম। বাবা স্কুলে, পিসিমা মেঝেয় পাটী পাতিয়া দিবানিদ্রার আয়োজন করিতেছিলেন। আমার সঙ্গী সাথী নাই, গোলমালের মধ্যে আমি থাকিতে পারি না। সাধারণতঃ নিজের নিভৃত নীড়ে থাকিতেই আমার ভাল লাগে। মাসীমার ব্যবস্থায় সেখানেও আমি নিজস্ব একটি ঘর পাইয়াছিলাম; এখানেও বাবা আমার জন্য একখানা পৃথক্ ঘর রাখিয়া দিয়াছেন।

গৃহের সম্পদ্ বেশি কিছু নয়। কাঁটাল-কাঠের একখানি ক্ষুদ্র চৌকী, তাহার উপরে বিছানা। দুইটি কাচের আলমারী-ভরা প্রাচীন গ্রন্থ। একটা 'সেলফে' আধুনিক লেখকদের গুটিকতক বাছা বাছা বই। এক কোণে কাপড় রাখিবার আলনা।

বিছানায় বসিয়াই নদীর তরঙ্গ-ভঙ্গ চোখে পড়ে; পর-পারের মসীবর্ণ গ্রাম যেন হাতছানি দিয়া ডাকে। পশ্চাতের

বাঁশঝাড়ের ভিতর হইতে কত শব্দ বায়ুতরঙ্গে ভাসিয়া আসিয়া মিলাইয়া যায়। প্রকৃতির ঐশ্বর্য্য উপভোগ করিতে আমাকে বন-বনান্তরে খুঁজিতে হয় না, আমার ঘরখানিতেই তাহা যেন লুকানো থাকে। তাই এখানে আসিয়া বেশিক্ষণ বাহিরে থাকিতে পারি না। ঘরে ঢুকিতে যাইতেছিলাম, এমন সময় পিসিমা ডাকিলেন, "করু, খেয়ে এলি? কি দিয়ে খেলি—আয় শুনি। অম্নি একখানা বই নিয়ে আসিস্।"

ইতিপূর্ব্বে ছুটির অবকাশে আসিয়া 'সংস্কৃত' কাব্য হইতে পিসিমাকে একটু-আধটু পড়িয়া শুনাইয়াছিলাম। কাব্যের রসের সহিত যত না হোক, গল্পের সহিত পিসিমার পরিচয় হইয়াছিল।

'রঘুবংশ'-খানা বাহিরেই ছিল; আমি তাহাই লইয়া পিসিমার পাটীতে আশ্রয় লইলাম। সময়টি রঘুবংশ পড়িবার মত; শরতের অলস মধ্যাহ্ন, প্রকৃতি গভীর ধ্যানমগ্না। তাঁহার ধ্যান ভাঙ্গাইতে বাব্‌লা বনে ঘুঘু করুণ কণ্ঠে ডাকিতেছে।

আমি বই খুলিলাম বটে, কিন্তু পিসিমা সে-দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া রান্না-খাওয়ার বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করিতে আগ্রহান্বিত হইলেন। কি মাছ, তরকারী কি, কে রাঁধিয়াছিল? এমনি ধরণের অসংখ্য প্রশ্নে আমার বই-পড়ার নেশা ছুটিয়া গেল। ভয় হইতে লাগিল, রন্ধন-বিশেষে ফোড়নের বিশেষণ হয়তো আরম্ভ হইবে।

সামান্য বিষয়ের চর্চ্চা করিতে মেয়েরা যে এত ভাল-বাসেন, আমি তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। পিসিমার প্রতি আমার মনে কিঞ্চিৎ অনুকম্পারও সঞ্চার হইল। ইঁহারা যেন পিঞ্জরের পোষা পাখী, অসীমের গান ভুলিয়া গুটিকত মামুলি বুলি শিখিয়া রাখিয়াছেন! জগতের সহিত কোন যোগ নাই; অশান্তি-উদ্বেগেরও আশঙ্কা নাই। যাঁহাদের বিচরণ-ক্ষেত্র আলোকে, তাঁহারা এই অন্ধকারের জীবদের কি চোখে দেখেন জানি না। আমার মনে হয়, ক্ষুদ্র জীবনের এই সঙ্কীর্ণ পরিসর মন্দ কি? এ একটানা হৃদয়-নদীতে জোয়ার-ভাঁটা না থাকিলেও শান্তি আছে, নির্ভরতা আছে। হাটের মাঝে বেচা-কেনায় অনেক জ্বালা!

পল্লীর সরলা শিক্ষাহীনাদের আমি ছোট ভাবিতে পারি না। নগরের আবিলতায় ইহারা মনের স্বতঃস্ফূর্ত্ত নির্ম্মলতা হারাইয়া ফেলে নাই। জ্ঞান-বৃক্ষের ফল আস্বাদন করিয়া সন্দেহ-সংশয়কে বরণ করিয়া লয় নাই। ইহাদের প্রকৃতি যেন ছায়াসমাচ্ছন্ন দীঘির শীতল জল—তরঙ্গহীন, স্রোতো-বিহীন।

ইহাদের মধ্যে আমিও প্রথম আঁখি মেলিয়াছিলাম, এখানকার সুস্বাদু নীরে, স্নিগ্ধ সমীরে আমার অস্ফুট জীবন-কলিকা ধীরে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল; কিন্তু এখানে আমার স্থান হইল না। ঝড়ে-ছেঁড়া ফুলের মত শহরের জটিলতার মধ্যে উড়িয়া পড়িলাম। রাশীকৃত বই ঘাঁটিলাম, দেশ-বিদেশের বিচিত্র কাহিনী শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। তাহার ফলে চিত্তের সরলতা, সরসতা হারাইয়া ভ্রান্তির পিছনে ঘুরিয়া মরিতেছি! আমার বাল্যসখীরা আজ এক এক গৃহের গৃহিণী, সন্তানের জননী। তাহাদের শিক্ষা সামান্য, আকাঙ্ক্ষা পরিমিত—যাহার ভাগ্য যাহা ছিল, নির্ব্বিচারে তাহাই মানিয়া লইয়াছে। কাহারো সহিত বিরোধ বা বিদ্রোহ করিবার প্রয়োজন হয় নাই।

পিসিমার টুক্‌রো-টুক্‌রো বাক্যের ভিতর দিয়া কত জনকে আমার মনে পড়িতে লাগিল। আমার সখীরা এখনো দলভ্রষ্ট হয় নাই, দিক্‌ভ্রান্ত হয় নাই; আমিই কেবল অনেক জানিবার ভাণ করিয়া, অনেক শিখিবার ছলনায় সাথীহারা হইয়াছি!

সংক্ষিপ্ত উত্তরে গল্পের আসর জমে না। ঘণ্টাখানেক পিসিমা আপন মনে বকিয়া-বকিয়া অবশেষে শ্রান্ত হইয়া কহিলেন, "বেলা গেল, কখন বই শোনাবি করু? আমায় আবার কাজে লাগতে হবে।"

আমি বই খুলিলাম, কিন্তু পড়া হইল না। হঠাৎ পিসিমা চমকিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনছি! চন্দ্র এলো বুঝি?"—বলিতে বলিতে পিসিমা ভারী ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া তেপান্তরের রাজপুত্রের আবির্ভাব আমি কল্পনা করিতে পারি নাই। সে-দিন বাবার আশ্বাস পাইয়া চন্দ্রচূড়ের আসন্ন-আগমনের ভীতি আমার মন হইতে মুছিয়া গিয়াছিল। সে নামে কেহ যে আছে, আসিতে পারে, তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

পিসিমার ব্যগ্রতায় আমার কৌতূহল প্রবল হইল। আমি বলিলাম, "ধন্য তোমার সাধনা পিসিমা! গাছের পাতাটি নড়লেও কে আসছে, তা বলে দিতে পারো।"

—"পারি বৈ কি? সময় এলে তুইও পারবি। আমি মিছে বলিনি,—চেয়ে দেখ, ওই যে নিমগাছের তলায়।"

পিসিমা বাহিরে চলিয়া গেলেন।

পিসিমার অনুমান-শক্তিতে আমি অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলাম। ঘোড়াটি পক্ষিরাজ নামের যোগ্য না হইলেও, আরোহীকে রাজপুত্র বলিলে অত্যুক্তি হয় না। নামের উপযুক্ত রূপ বটে! দীর্ঘ, বলিষ্ঠ গঠন, বিশাল বক্ষ;

উন্নত নাসিকা ; আয়ত উজ্জ্বল উদাস নয়ন। সর্ব্বোপরি 'রজতগিরিনিভ' বর্ণ। তরুণ বয়সের কোমলতার সহিত পুরুষোচিত উগ্র সৌন্দর্য্যের সংমিশ্রণে চন্দ্রচূড়কে অপরূপ মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছে। মনে মনে স্বীকার করিতে হইল, বাঙ্গালার অভিজাত সমাজেও এমন রূপ দুর্লভ ; পিসিমা সেকেলে হইলেও তাঁহার রুচি প্রশংসার যোগ্য বটে।

নিতাইয়ের হাতে ঘোড়ার ভার দিয়া চন্দ্রচূড় বাবু প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন। রৌদ্রের উত্তাপে পথশ্রমে তাঁহার সুগৌর গণ্ড আরক্তিম, গা বহিয়া ঘাম ঝরিতেছে।

পিসিমা অগ্রসর হইয়া অনুযোগ করিতে লাগিলেন—"ভাদ্দরের কড়া রোদে বের হয়েছিস্ কেন চন্দর! আহা, ঘেমে নেয়ে উঠেছিস্! আয় বাবা, ছায়ায় এসে বোস্।"

পিসিমাকে প্রণাম করিয়া চন্দ্র বাবু উত্তর করিলেন, "রোদে বের না হয়ে কি করি,—তুমি যে ডেকেছ মাসীমা? রোদ-বৃষ্টিকে তোমরা যত ভয় করো, আমরা—চাষাভুষো মানুষ, তত ভয় করি নে। আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। মামা বাবু স্কুলে বুঝি? তা এত তাড়া কিসের?"

"কিসের আবার? অনেক দিন দেখিনি কি না, দেখতে ইচ্ছা হয়েছিল। দাদার সংসার গলায় নিয়ে আমার তো কোথাও পা-বাড়ানোর যো নেই; তবু তুই মাঝে মাঝে আসিস্, তাই তো তোর মুখখানা দেখতে পাই। তোদের খবর সব ভাল তো?—বাবা, মা, ছেলে-মেয়েরা কেমন আছে?" বলিয়া পিসিমা হাঁকিলেন, "রুরু, বারান্দায় একটা মাদুর পেতে দে ; আর একখানা পাখা নিয়ে আয়!"

যাঁহাকে কখনো দেখি নাই, সহসা তাঁহার সম্মুখে যাইতে আমার সঙ্কোচ হইতেছিল ; তবু পিসিমার আদেশ উপেক্ষা করিতে পারিলাম না।

আমি বাহির হইয়া বারান্দায় মাদুর পাতিয়া দিলাম। মাদুরের উপর পাখা রাখিলাম।

পিসিমা আমার পরিচয় দিলেন, "এই আমার ভাইঝি রুরু,—যার কথা তোকে বলেছিলাম। ক'দিন হোল এসেছে—রুরু, এ-দিকে আয় ; চন্দরকে লজ্জা করিস্ নে, পায়ের ধূলো নে।"

পিসিমার 'পায়ের ধূলো নে'র মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত উঁকি-ঝুঁকি দিতেছিল। মানুষের আশা কি ভ্রমপূর্ণ, কল্পনা মরীচিকা ভাবিয়া আমার হাসি আসিল।

আমি চোখ তুলিতেই চন্দ্র বাবু যুক্তকরে আমাকে নমস্কার করিলেন। আমাকেও যুক্ত দুই হাত তুলিতে হইল।

—"আমি এখানে আজ নতুন আসিনি। আমার আসা-যাওয়া আছে। আমাদের মৌখিক পরিচয় না থাকলেও আমরা অপরিচিত নই, আপনি বসুন।"—বলিয়া চন্দ্র বাবু বসিলেন।

পিসিমা পাখায় হাত দেওয়া মাত্রই তিনি আপত্তি করিয়া বলিলেন, "না, না, আর হাওয়া করিতে হবে না। দিব্যি ঝিরঝিরে হাওয়া আসছে—এর কাছে কি তালপাখার বাতাস!"

—"কিছু না হোক বাপু, তুই খা তোর ঝিরঝিরে হাওয়া। আমি একটু সরবত করে আনি।"

বাগানের পাশের নারিকেল গাছে ডাব ঝুলিতেছিল ; চন্দ্র বাবু সেই দিকে অঙ্গুলি তুলিয়া কহিলেন, "মাসীমা, তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? পিপাসা নিবারণের অমন চমৎকার জিনিস থাকতে চিনি-মিছরীর সরবত আমার রুচবে কেন?"

আমি এতক্ষণ নীরবে ছিলাম, ভদ্রতার খাতিরে কিছু বলা দরকার মনে করিয়া বলিলাম, "নিতাই তো নারকেল গাছে উঠতে পারে না। রামচরণকে ডাকুক, সে ডাব পেড়ে দেবে।"

—"আপনাদের নিতাই—রামচরণে দরকার নেই ; আমি নিজেই ও-সব কাজ পারি। আমাকে একগাছা মোটা দড়ি আর একখান কাটারি দাও তো মাসীমা! দেখি তোমাদের কত ডাবের দরকার।"

পিসিমা কাটারি আনিয়া দিলেন ; তাঁহাকে আর কষ্ট করিয়া দড়ি জোগাইতে হইল না, খুঁটার গায়ে একগাছা মোটা দড়ি ঝুলিতেছিল, চন্দ্র বাবু চক্ষুর নিমেষে সেই দড়ি খুলিয়া-লইয়া বাগানের বেড়া পার হইলেন। সেই বেড়ায় গায়ের পাঞ্জাবীটা রাখিয়া, গেঞ্জির নীচে কোমরে কাপড় জড়াইয়া লইলেন।

পিসিমার ভাগিনার কত গুণ, তাহা আমি জানিতাম না। দ্বিপ্রহরের খর-রৌদ্রে ঘোড়ার পিঠে মাইলের পর মাইল অতিক্রম করিয়া কোনও ভদ্রলোক যে বিশ্রামের পূর্ব্বেই গাছে—বিশেষতঃ ডাবগাছে উঠিতে পারে, ইহা আমার কল্পনার অগোচর ছিল।

দেখিতে দেখিতে দড়ির সাহায্যে চন্দ্র বাবু ডাবগাছের মাথায় উঠিয়া বসিলেন। তাহার পর সুরু হইল দুম-দাম শব্দ! পিসিমার চীৎকার,—"ও চন্দর, অতো ডাবে দরকার নেই। ঢের হয়েছে! কে খাবে এত? মিছে-মিছি ডাবগুলো নষ্ট করিস্ নে। আয় বাবা, নেমে আয়!"

গাছের উপর হইতে সরল হাসির সহিত গুরুগম্ভীর স্বর ভাসিয়া আসিল, "ও কটা যে আমারি গলা ভিজোতে লাগবে মাসীমা! তোমাদের জন্যে কি পাড়ছি?"

আমার এ বয়সে কখনো আমি এমন অদ্ভুত লোকের সংস্পর্শে আসি নাই। উনি যেন বিধাতার এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি! যেমন রূপের বৈচিত্র্য, তেমনি স্বভাবের বৈশিষ্ট্য। অমন মানুষের কাছে লজ্জা লজ্জায় সরিয়া যায়, দূরত্বের ব্যবধান থাকে না।

আমি ঊর্দ্ধে চাহিয়া বলিলাম, "আপনি কত খেতে পারেন—দেখা যাবে। এখন নেমে আসুন ; আর দরকার নেই।"

আমার আহ্বান ব্যর্থ হইল না। শাখাবাহী কাঠ-বিড়ালের মত ক্ষিপ্রগতিতে তিনি বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলেন।

নিতাই রাশীকৃত ডাব কুড়াইয়া বারান্দায় রাখিয়া দিল। আমি আনিলাম—পাথরের গেলাস, বাটি।

চন্দ্র বাবু ডাব কাটিতে বসিলেন। প্রথম ডাবটা কাটিয়া, পিসিমার সামনে ধরিয়া আদেশের ভঙ্গীতে কহিলেন, "নাও মাসীমা, চট করে খেয়ে নাও। কাটা ডাব রাখতে নেই ;—'তুই আগে খা' বলো না যেন। আমি আরম্ভ করলে সব কিন্তু এঁটো হয়ে যাবে।"

তাঁহার কণ্ঠস্বরে জোরের আভাস পাইয়া আমি অনুমান করিলাম, উনি যাহাকে যাহা বলেন, তাহা নিছক মুখের কথা নহে, দৃঢ় হৃদয়ের প্রতিধ্বনি ; কেহই তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারে না।

পিসিমা বিপন্ন ভাবে আমার পানে তাকাইলেন। আমি বলিব কি ? তখনই আমার সামনে আর একটা ডাব হাজির হইয়াছে ! সঙ্গে সঙ্গে আদেশ,—"নিন, এটা খেয়ে ফেলুন ; গেলাস লাগবে না। কাটা-জায়গায় মুখ লাগিয়ে এমনি চোঁ চোঁ করে—"

আমি যে ঐ ভাবে খাইতে পারি না, তাহা বলিতে পারিলাম না ; চেষ্টা করিলাম, কিন্তু উদরস্থ হইবার পূর্ব্বেই অর্দ্ধেকের বেশি জল পড়িয়া গেল ! তবে অপর পক্ষ আমার এই অবস্থা টের পাইলেন না। তখন তিনি একটির পর একটি ডাব কাটিয়া ঊর্দ্ধমুখে তৃপ্তির সহিত গলায় ঢালিতেছিলেন।

২৭

ডাবের জলপানের এই সমারোহের মধ্যে বাবা আসিয়া পড়িলেন। চন্দ্র বাবুকে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না ; বলিলেন, "চন্দ্র, কতক্ষণ ? মাঠে তোমার ঘোড়া দেখেই বুঝলাম তুমি এসেছ।"

—"অনেকক্ষণ এসেছি মামা বাবু ! এসেই কাজে লেগে গেছি ; এখনো শেষ করতে পারলুম না।"

—"শুধু ডাবের জলেই পেট ভরাচ্ছ—পাগল ছেলে ! আর কিছু খাও।"

—"সে হবে স্নানের পরে মামা বাবু ! আপনি আর দাঁড়াবেন না, মুখ ধুয়ে আসুন। আমি হাত ধুয়ে আপনার ডাব কাটি।"

বাবা কাপড়-জামা বদলাইতে গেলেন। পিসিমা তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

আমি চন্দ্র বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার কি দুই বেলা স্নানের অভ্যাস ? ক'টায় স্নান করেন ?"

—"ক'টা তা তো বলতে পারবো না। গাছের মাথায় যখন রোদের লেশও থাকবে না, তখুনি আমার স্নানের সময়,—তার আগে নয়।"

—"আপনি রোদ, বৃষ্টি, ছায়া দেখে সময় ঠিক করেন না কি ? ঘড়ির অপরাধ কি ?"

—"অপরাধ কিছু নয়, কিন্তু বাহুল্য। আমার বন্ধুরা ঘড়ির ধার ধারে না, দিনের আলোয়, রাতের তারায় তাদের সময় নির্দ্দেশ হয়, ওদেরই কাছে আমার শেখা। দেখুন, যা অযাচিত, অনাহূত ভাবে পাচ্ছি, তা না-নিয়ে আড়ম্বর করবো কেন ? আমাদের গরীব দেশ, বাইরের চাকচিক্যে মুগ্ধ হলে আরো যে বেশি করে অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়বো। এখন ভাববার সময় এসেছে—দেশের পয়সা কি করে দেশে থাকবে।"

বিলাসিতার প্রতি আমার কোন কালে স্পৃহা ছিল না। সাধারণ বেশভূষাতেই আমি অভ্যস্ত। আজ নিমন্ত্রণ ছিল, এ জন্য আমি স্নানের পরে একখানা বাদামী রংএর 'ভয়েলের' শাড়ী পরিয়াছিলাম। আমি সাদার ভক্ত হইলেও কিছু কাল হইতে আমার ভিতরে রঙের নেশা ধরিয়াছে। দার্জ্জিলিংএ এক মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় মিলির শাসনে এই শাড়ী আমার অঙ্গে উঠিয়াছিল। এক জনের মুখে এই রংএর স্তবগান শুনিয়া বাদামী রং সকল রঙের চেয়ে আমার প্রিয় হইয়াছে। শাড়ীটা দেশী নহে, তাহা আমি জানিতাম। আমার মনে হইল, চন্দ্র বাবু আমার শাড়ী লক্ষ্য করিয়াই দেশের দুর্দ্দশায় বিগলিত হইয়াছেন।

মেয়েরা অনেক সহিতে পারে, সহিতে পারে না কেবল প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত। তর্কাতর্কি যদিও আমার স্বভাববিরুদ্ধ, তবু একটু খোঁচা দিবার লোভ আমি সংবরণ করিতে পারিলাম না ; বলিলাম, "দেশের জিনিসের আদর করা সকলের উচিত ; যা সম্ভব তা করাই দরকার। আগে আর্য্যরা গাছের বাকল পরতেন, আপনারা তা পারেন না বলেই সুতোর কাপড় পরছেন, তাতে খরচ বেড়ে গেছে।

অর্থাৎ গাছের বাকল গাছে অনর্থক নষ্ট হচ্ছে—তার আদর নেই।"

চন্দ্র বাবু সোৎসাহে বলিতে লাগিলেন "ঠিক বলেছেন, আমাদের অক্ষমতায় দেশের কত জিনিস ধ্বংস হচ্ছে, তার সীমা নেই! এ-দিন থাকবে না—আপনি দেখে নেবেন। লুপ্ত যা, ধ্বংস যা, তা আমরা ফিরে পাবো! যত দিন বাকলে কাপড় তৈরির প্রণালী শিখতে না পারবো, তত দিন নিজেদের কাপড়ের সুতো হাতে কেটে, তাঁতে কাপড় বুনে নিতে হবে। ক্ষেতের তুলো, হাতের কাপড়—এ কম তৃপ্তির বিষয় নয়! আমার যা দেখছেন, এ আমি সুতো কেটে তাঁতে বুনে নিই।"

—"ভাল কাজই তো করছেন। তাঁত বোনা, চরকা-কাটা শিখতেই কি আপনি বাইরে গিয়েছিলেন? স্বাধীন দেশের, স্বাধীন জাতের কাছে কি শিখে এলেন? ওদের কাছে না কি ঢের জিনিস আমাদের শিখবার আছে?"

—"থাকতে পারে, আমাদের কাছেও ওদের শিখবার অনেক আছে। তাঁত বোনা, চরকা-কাটা শিখতে কেউ বিদেশে যায় না। আমি গিয়েছিলাম হারানো সম্পদ্ ফিরিয়ে আনতে। রামায়ণে পড়েননি—রাজর্ষি জনক লাঙ্গল চষতে চষতে সীতাদেবীকে পেয়েছিলেন। পুরাকালের হাল-লাঙ্গলের প্রচলন আমরা ভুলে গেছি, আমাদের গৌরবের অনেক জিনিস চুরি হয়েছে। কলের লাঙ্গল আমাদেরি সৃষ্টি, উড়ো জাহাজও আমাদের। কত বলবো? আমার যতটুকু সাধ্য, করে যাই। আশা আছে, আমার চেয়ে শক্তিমান্ যারা পরে আসবে, তারা জঙ্গল কেটে মন্দির গড়বে, পাথর গুঁড়ো-করে সোনা ফলাবে। হারানো জিনিস কড়ায় গণ্ডায়, সুদে আসলে ফিরিয়ে আনবে।"

আশায়, উৎসাহে চন্দ্র বাবুর চক্ষু মধ্যাহ্ন-ভাস্করের মত জ্বলিতে লাগিল। উদীয়মান্ সূর্য্যের মত সেই দীপ্তিশালী পুরুষের দিকে চাহিয়া আমার কণ্ঠ নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল, মুখে ভাষা ফুটিল না।

কিয়ৎকাল পর বাবা আসিয়া মাদুরে বসিলেন; বসিয়া কহিলেন, "আগে তোমার ডাব খাই চন্দর! তুমি স্নান করে এলে একসঙ্গে জল খাব।"

পিসিমা এক বাটি সরিষার তৈল আনিয়া তাড়া দিলেন—"চন্দর যা বাবা, চট করে নেয়ে আয়। বর্ষার নতুন জলে সন্ধ্যা বেলা নাইলে অসুখ বিসুখ হতে পারে।"

—"আমার অসুখ হয় না, মাসীমা, তোমার ভয় নেই।"

আমি বলিলাম, "আপনি তেল মেখে আসুন; আপনার জল, সাবান কুয়োতলায় রাখি গে!"

—"আমি তোলা জলে স্নান করি না। এত কাছে নদী থাকতে 'ঘটীগঙ্গায়' কে স্নান করে? আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমার কিছু লাগবে না। কাপড় গামছা সঙ্গেই আছে; সাবান তো ব্যবহার করি না।"

—"কেন, দেশে কি সাবান তৈয়েরি হয় না?"

—"তা হয়, কিন্তু এক পয়সার বেশমে পাঁচ দিন চললে পাঁচ আনা দামের একখানা সাবান মাখবো কেন? সব চেয়ে খাঁটী সরষের তেলই আমার ভাল।"

বাবা বলিলেন, "তেলে-জলেই বাঙ্গালীর শরীর। তোমার মত এমন মজবুত শরীর ক'জনের আছে? সাবান-ঘষা, পাউডার-মাখা, মেয়েলি ধরণের বাবুর দল তোমার পাশেও দাঁড়াতে পারবে না। শুধু রংএ মানুষকে সুন্দর করতে পারে না, থাকা চাই স্বাস্থ্যসৌষ্ঠব।"

সত্যই বলিষ্ঠ, সুগঠিত দেহ সৌন্দর্য্যের প্রধান উপাদান। চন্দ্র বাবুর অনাবৃত দেহ দেখিয়া আমি বাবার উক্তির সমর্থন করিলাম। সেটা মনে মনে করিলাম; প্রকাশ্যে বলিতে পারিলাম না, সঙ্কোচ হইল। কিন্তু তাঁহার নিঃসঙ্কোচ, সরল ব্যবহারে আমি মুখচোরা—এই দুর্নামের হাত হইতে মুক্তি পাইয়াছি। তাঁহার অনাবৃত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দর্শনীয় বস্তু বটে, কিন্তু প্রশংসমান নেত্রে সে-দিকে চাহিয়া-থাকা আমার পক্ষে নীতিবিরুদ্ধ।

আমি সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া বাগানে প্রবেশ করিলাম। উপরে উন্মুক্ত আকাশ দিনান্তের ম্লান ছায়ায় অবসন্ন, তরুতল ঝরা ফুলের স্নিগ্ধ সৌরভে রোমাঞ্চিত।

টগর গাছের আড়াল হইতে আমি চন্দ্র বাবুর গমনশীল মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। বাগানের সম্মুখ দিয়া নদীর পথ প্রসারিত, তিনি হরিদ্রা রঙ্গের গামছা কাঁধে লইয়া স্নানে যাইতেছেন। কটিদেশ মাত্র আবৃত, অনাবৃত সর্ব্বাঙ্গ হইতে সুগৌর বর্ণচ্ছটা ফুটিয়া বাহির হইতেছে! হাঁ, স্বীকার করি—বিশ্বশিল্পীর রচনার উহা সার্থকতা বটে!

দুঃখ হইতে লাগিল, এই ভীষণ মধুর, রুক্ষ-শীতল চিত্র-পটখানি মিলির চোখের সামনে ধরিতে পারিলাম না! যে মর্ম্মর-ফলকে কখনো কাহারো প্রতিচ্ছবি রেখাঙ্কিত হইতে পারে নাই, সেই মনোমুকুরে এই রূপের প্রতিবিম্ব পড়িত কি না, তাহাই পরীক্ষা করিতাম।

[ক্রমশঃ]

শ্রীমতী গিরিবালা দেবী।

ভাগের মা

দশটা নয়, পাঁচটা নয়, দু'টি মাত্র ছেলে, তাহাদের মধ্যেও যখন মনোমালিন্যের সূত্রপাত হইল, তখন জননী করুণাময়ী আশঙ্কায় ও দুশ্চিন্তায় চারি দিক্ অন্ধকার দেখিলেন।

কত কষ্টে তিনি যে এই ছেলে-দু'টিকে মানুষ করিয়াছেন, লেখা-পড়া শিখাইয়া দশ জনের নিকট পরিচিত হইবার যোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন, একমাত্র অন্তর্যামী ভিন্ন আর কে তাহা জানে? দুই হাতে নিবিড় দুঃখের রাত্রি ঠেলিয়া ফেলিলেও আজ এই সুখের প্রভাতে আবার এ কি দুঃখের সর্ব্বনাশী অন্ধকার তাঁহাকে গ্রাস করিতে আসিল!

রমেশ আট বছরের আর সুরেশ ছয় বছরের; এই দু'টি শিশুর সকল ভার তাঁর মাথায় চাপাইয়া করুণাময়ীর স্বামী যখন তিন দিনের জ্বরেই পৃথিবী হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন, সেই দিনের সুকঠোর মর্ম্মভেদী স্মৃতি কি তিনি ভুলিতে পারিয়াছেন?

নগরের এক প্রান্তে মাথা গুঁজিবার মত একখানা ছোট বাড়ী, ছোট-খাট একটি বাগান, আর স্বামীর জীবন-বীমা হইতে প্রাপ্ত হাজার পাঁচেক টাকা, ইহাই ছিল তাঁহার চরম সম্বল! সেই দুর্দ্দিনে যথাসর্ব্বস্ব হারাইয়া এই দু'টি সন্তানের জন্যই বুক বাঁধিয়া, তাঁহাকে সংসারের কণ্টকাকীর্ণ সঙ্কীর্ণ পথে আবার চলিতে হইয়াছিল।

কিন্তু সেই হৃদয়ভেদী নিদারুণ দুঃখের আভাসও তিনি তাঁহার কোমলমতি সংসারজ্ঞানরহিত ছেলে-দু'টিকে জানিতে দেন নাই; একাকী তাহাদের সকল সুখ-সুবিধার ভার স্কন্ধে লইয়া, পিতার কঠোর কর্ত্তব্য ও মাতার অনুপম স্নেহ দিয়া তাহাদিগকে নিয়ত সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন।

সুরেশ আজ উকীল, রমেশ কোন আফিসে একাউণ্টেণ্টের কাজ পাইয়াছে। মায়ের সুখ-দুঃখ তাহারা আর বোঝে না। তাহার কোন প্রয়োজন আছে কি না, তাহাও বোধ হয় অনুভব করিবার শক্তি তাহাদের নাই!

শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, সারা-রাত্রি ধরিয়া অবিশ্রান্ত বেগে বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইয়াছে। তথাপি তখন পর্য্যন্ত নিবিড় মেঘে সমগ্র আকাশ সমাচ্ছন্ন; বোধ হইতেছে, এখনই আবার প্রবল বেগে বৃষ্টি আসিবে।

সবে মাত্র রাত্রি প্রভাত হইয়াছে; সমস্ত রাত্রি বৃষ্টিতে ভিজিয়া কাকগুলা তখনও গাছের ঘন পাতার অন্তরালে লুকাইয়া আছে। সেই অস্ফুট প্রভাতে করুণাময়ী রান্নাঘরের ভিতর হইতে পূর্ব্ব-রাত্রির রাশীকৃত এঁটো বাসন বাহির করিয়া, ছাই তুলিয়া-ফেলিয়া উনান পরিষ্কার করিতেছিলেন।

বাড়ীর একমাত্র ঝি মঙ্গলার মা কয় দিন হইতে অসুস্থ; এ জন্য কাজে আসিতেছে না। বড়বধূ কচি ছেলের মা, খুব ভোরে উঠিয়া তাহার এই সব কাজ করা কঠিন। ছোট বৌ বড়লোকের মেয়ে, সে কোনও দিন এ সব কাজ করে নাই; কি করিয়া করিতে হয়, তাহাও জানে না। সে জন্য তিনিই একা এই সব বাসি কাজ লইয়া ব্যস্ত ছিলেন।

উনান নিকানো হইয়া গেলে, কয়লা ভাঙ্গিয়া-আনিয়া উনানে আগুন দিয়া বৃষ্টির জলে ভিজিতে ভিজিতেই যখন তিনি কলতলা হইতে বাসনগুলি মাজিয়া-লইয়া ঘরে তুলিলেন, তখন পর্য্যন্ত বধূরা শয্যা-ত্যাগ করে নাই; শুধু বড় ছেলে রমেশ উঠিয়া বকুলের একটা কচি ডাল ভাঙ্গিয়া লইয়া দন্তসংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

মাকে দেখিয়া পুত্র রমেশ বিরক্তির স্বরে কহিল, "মা, আজ রান্নাটা যেন একটু তাড়াতাড়ি হয়। কাল আফিসে যেতে ভয়ানক 'লেট' হয়ে গিয়েছিল! মধ্যে মধ্যে এ রকম হলে কোন্ দিন হয় তো চাকরীটা হাতছাড়া হবে, তখন সারা গোষ্ঠী খাবে কি?"

মা কহিলেন, "সেই জন্যেই তো রাত থাকতে উঠেছি বাবা! যতটুকু পারি আমার এই বুড়া হাড় খাটিয়ে যাতে তোমাদের সুবিধা হয়, সেই চেষ্টাই করি। কাল আফিস থেকে ফিরতে তোমার অন্ধকার হয়ে গেল, তাই বলা হয়নি, রান্নার তেল একটুও নেই। রাত্রিটা কোন রকমে চালিয়ে নিয়েছি। মুগ আর মসুরির ডালও কিছু এনো; সেগুলোও ঘরে বাড়ন্ত।"

রমেশের মুখ বিরক্তির ছায়ায় কালো হইয়া উঠিল। সে উত্তেজিত স্বরে বলিল, "এরই মধ্যে তোমার তেল ফুরিয়ে গেল? আমার মনে হয়, জিনিষপত্র বড্ডই লোকসান হচ্ছে!"

মা বলিলেন, "যতটুকু না হলে নয়, ততটুকু দিয়েই কাজ চালাই বাবা! দু'বার খালি রান্না, আর ছেলেমেয়েরা একটু গায়ে মাখে, একটু প্রদীপে পোড়ে।—জিনিষই বা কতটুকু পাওয়া যায়?"

—"বেশ বেশ, তোমার হিসেব আমি শুনতে চাই নে। হিসেব দিয়ে তো আমায় একেবারে রাজা করে দেবে! এখন তেল আনবার একটা যায়গা দাও, বাজে ভ্যান্‌ভ্যানানি আমার ভাল লাগে না।"

করুণাময়ী তাড়াতাড়ি একটা সদ্য-মাজিত বাটি ছেলের হাতে দিলেন।

পুত্র চটিজোড়া পায়ে দিয়া বাহিরে চলিয়া গেলে, জননী ব্যথিত-চিত্তে আকাশ-প্রান্তে চাহিলেন। শ্রাবণের মেঘে-ঢাকা নিকষ-কৃষ্ণ আকাশের মত তাঁহার হৃদয়ও দুঃখের মেঘে ঢাকিয়া গিয়াছে! ছেলেদের কঠোর ব্যবহারে প্রত্যেক সময় তিনি মর্ম্মাহত; তাহাদের নির্ম্মম বাক্য ও ব্যবহার বজ্রের মতই তাঁর বুকে পড়িয়া বুক ভাঙ্গিয়া দিয়া যায়!

কেন এমন হইল? তাঁহার তো সতাত ছেলে নয়, এ ছেলে দু'টি তাঁরই গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কাহার কাছে তিনি এই দুঃখ জানাইবেন? একমাত্র ভগবান্ ভিন্ন এ দুঃখ বুঝিবে—এমন আর কেহই নাই। গোপনে চোখের জল ফেলিয়া তাঁহার অশ্রু শুকাইয়া গিয়াছে। তাঁহার ব্যথাভরা হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস বাহির হইল। স্নিগ্ধ প্রভাতের প্রথম মুহূর্ত্তেই সংসারে কলহ-বিরোধের আরম্ভ, সমস্ত দিনই তাঁর গৃহে বিরক্তি ও ঈর্ষ্যার কোলাহল!

প্রায় প্রত্যহই এইরূপ ঘটে! তিনি ভাবিলেন, "হায়, সংসার কি আজ নূতন করিতেছি? তোরা যখন ছোট ছিলি, তখন কেমন করে ঐ সামান্য পুঁজিতেই তোদের বড় করে তুললাম, লেখাপড়া শিখালাম। তখন তো এ-সব হিসাব কাহাকেও করতে হয়নি। তোদের উপার্জ্জনের পয়সায় কি আমার দাবী নেই?"

দশটি নয় পাঁচটি নয়, দু'টি মাত্র ছেলে, আজ তাহারা মানুষ হইয়া দশ জনের এক জন হইয়াছে; জননীর মনে কত সুখ-সাধ, কত আশা! তাহাদের লইয়া যাহা পল্লবিত মুকুলিত হইয়া কত কল্পনার মায়া রচনা করিয়াছিল, আজ তাহা অকারণ ঈর্ষ্যা ও স্বার্থের ঘাতে ছিন্নভিন্ন চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে!

জননীর উপরও যেন আর তাদের একটুও ভালবাসা নাই! মায়ের কথা ছেলে দু'টি আর গ্রাহ্যই করে না। কি করিয়া যে তিনি সকল দিক্ বজায় রাখিবেন, ভাবিয়া তাহার যেন আর কূল-কিনারা পাইতেছেন না!

ছোট ছেলে সুরেশ ওকালতি করিতেছে; অল্প দিনের মধ্যেই তার বেশ পশার হইয়াছে। মা মনে ভাবিয়াছিলেন, সুরেশকে এম-এ ও আইন পড়াইতে তাঁর যে সামান্য অলঙ্কার বাঁধা দিয়াছিলেন, সুরেশ উপার্জ্জন করিয়া সেই বন্ধকী গহনা ছাড়াইয়া লইবে; বাড়ীখানাও অনেক দিন মেরামত করা হয় নাই, তাহার সংস্কার করিবেন। তাঁহার স্বামীর ভিটা, তাঁহার পুণ্য তীর্থ, একটু সংস্কার করিয়া লইলেই আবার বহু কাল তাহা বাসের উপযোগী হইবে। ছেলে দু'টি সন্তান-সন্ততিসহ তাঁহার এই সুখের নীড়ে বাস করিবে।

হায় মানুষের মন, শত ঘাত-প্রতিঘাতেও তোমার আশার অবসান হয় না! তাই যে-দিন প্রতিবেশিনীদের মুখে তিনি জানিতে পারিলেন, তাঁহার সুরো বেশ দশ টাকা রোজগার করিতেছে, কিন্তু পাঁচটি টাকাও কোন দিন ইচ্ছা করিয়া তাহাকে তাঁর হাতে দিতে দেখা যায় নাই,—সে-দিন বহু কষ্টে তিনি আত্মসম্বরণ করিয়াছিলেন; পরের নিকট দুঃখ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় নাই।

এইরূপেই দিন কাটিয়া যাইতেছিল। গৃহ-সংলগ্ন ছোট বাগানে গোপালভোগ আমের নূতন কলমের গাছে কয়েক থোকা আম ফলিয়াছিল; ছোট ছেলে সুরেশ এক থোকা আম মাকে আনিয়া দিয়া কহিল, "এই আম-কটা ভাল করে রাখো তো মা! বেশ রং ধরেছে, দুই-এক দিন পরেই খাওয়া চলবে। দেখো, আমরা যেন কিছু খেতে পাই; আদর করে সবগুলোই তোমার নাতি-নাতনীদের দিয়ে সাবাড় করো না।"

মা সভয়ে চারি দিকে চাহিলেন; দেখিলেন, বড়বৌ কিছু দূরে দাঁড়াইয়া আছে; তাহার মুখ অন্ধকার! তিনি বুঝিলেন, কথাটা তাহার কাণে গিয়াছে! ইহার ফল প্রকাশ হইতেও বিলম্ব হইল না। বড়বৌর রাগ খুব বেশী; রাগ হইলে নিরপরাধ ছেলে-মেয়েগুলিকে অকারণে প্রহারে জর্জ্জরিত হইতে হয়। তার পরই একটা কথা সে সাতখানা করিয়া রমেশকে শুনায়। এইরূপেই সে তিলে তিলে তাঁহার ছেলের মন তিক্ত ও বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে।

সুখে-দুঃখে বহু মনঃকষ্টের ভিতর দিয়া বৎসর শেষ হইয়া গিয়াছে। ছোটবৌ প্রভাতী পিত্রালয়ে গিয়াছিল, কয়েক মাসের ছেলে লইয়া ফিরিয়া আসিল। দু'টি সন্তান ও বধূদ্বয়ের কোন কষ্ট বা অসুবিধা না হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখিয়া করুণাময়ী দিবারাত্রি সেই একই ভাবে পরিশ্রম করিয়া সংসার চালাইতেছেন। কিন্তু তাঁহার প্রতি কাহারও দরদ নাই। তিনি নিজের অদৃষ্টের উপর সকল দোষ চাপাইয়া নীরবে সকল কষ্টই সহ্য করেন। পরলোকগত স্বামীর উদ্দেশে বলেন, "কবে তোমার কাছে আমায় ডেকে নেবে গো! আর কত দিন এ ভাবে·········" ইত্যাদি।

প্রত্যহই সেই খাটুনী, সকালে উঠিয়া তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া দুইটি উনান জ্বালিয়া রান্না; নিরামিষ উনানেই সকালবেলা সকলের রান্না একসঙ্গে হয়। রাত্রের মাছের ঝোল, ভাত রাঁধিবার ভার বধূদের উপর; কিন্তু সুরেশকে লইয়াই মা মুস্কিলে পড়িয়াছেন! সে কিছুতেই প্রভাতীকে সংসারের কোন কাজ করিতে দিবে না; কাজ করিলে অযত্ন হইবে বলিয়া সে রাগ করে। রান্নার জন্য একটি পাচক নিযুক্ত করাও ঘটিয়া উঠিতেছে না। সঙ্কীর্ণমনা সুরেশ অন্যের সুবিধা করিতে চাহে না। সে বলে, কেন, বড়বৌএরই তো পাঁচটা ছেলে মেয়ে, তাঁরই বেশী গরজ; রান্না ও সংসার দেখা তাঁরই কর্ত্তব্য। সন্ধ্যা অতীত হয়, সব কাজ বিশৃঙ্খল ভাবে পড়িয়া থাকে দেখিয়া অগত্যা করুণাময়ীকে এ-বেলাও রান্নাঘরে প্রবেশ করিতে হয়। মাছ কুটিয়া, বাটনা বাটিয়া, রান্না করিয়া নাতি-নাতনী, ছেলে ও বৌদের খাইতে দেন। সেই রাত্রে আবার তাঁহাকে স্নান করিতে হয়; নহিলে একটু জল খাওয়াও যে তাঁহার ঘটিয়া উঠে না!

ছোটবৌ প্রভাতীর মন তত হীন ছিল না; কিন্তু সুরেশের জন্যই তাহাকে হীনতা প্রকাশ করিতে হইত। সে বৃদ্ধা শাশুড়ীর সাহায্য করিতে চাহিত; কিন্তু অতিমাত্রায় পত্নী-প্রেমিক সুরেশ প্রভাতীকে সামান্য কোন কাজ করিতে দেখিলে মাকে এমন কঠোর কথা শুনাইত যে, করুণাময়ী অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিতেন না।

পুনরায় কোনও দিন কোনও কাজে সে সাহায্য করিতে আসিলে তিনি সভয়ে ব্যস্ত ভাবে বলিতেন, "থাক্ থাক্, মা! তোমাকে কিছু করতে হবে না। ঘরে যাও মা, সেখানে তোমার অন্য কোন কাজ থাকলে তাই কর গিয়ে।"

প্রভাতী স্বামীকে অনুযোগ করিত, কিন্তু স্বার্থপর সুরেশ সে সব কথায় বিচলিত হইত না। সে বলিত, "এই সারা দিন খেটে-খুটে এলাম প্রভা! একটু কাছে বোস: ভারি তো কাজ, তুমি না করলে কোন ক্ষতি হবে না। এমন সুন্দর নরম হাত দু'খানি কি রান্নাঘরের হলুদ আর কালি-ঝুলি মাখবার জন্যে?" সুরেশের [illegible] প্রতিবাক্য

প্রভাতীর মন্দ লাগিত না; তবুও তাহার মনে কি সঙ্কোচ যেন কাঁটার মত বিঁধিতে থাকিত! সে হাসিয়া বলিত, "তোমার মত স্বার্থপর আমি কোথাও দেখিনি। নিজের মা উদয়াস্ত খাটেন, তা দেখেও তোমার মনে কষ্ট হয় না? আশ্চর্য্য!"

সুরেশ বলিল, "কষ্ট আবার কি? মা তো চিরকালই আমাদের জন্য কাজ করছেন,—ছোট থেকেই দেখে আসছি। তাঁর অভ্যাস আছে। তাই বলে আমার প্রভাবাণীকে ঐ সব বাবুর্চির কাজ করতে দেখলে, আমার কি সহ্য হয়?"

২

শীতের সন্ধ্যা। সন্ধ্যার অন্ধকারে একখানা ছেঁড়া আলোয়ান গায়ে জড়াইয়া করুণাময়ী সায়ং-সন্ধ্যার শেষে হরিনামের মালা জপ করিতেছিলেন। সে-দিন তাঁহার শরীর তেমন ভাল ছিল না।

বড়বৌ শরৎশশী রান্না করিতেছিল। রমেশ আসিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া বলিল, "দেখ মা, ক'দিন থেকে তোমাকে বলব বলব মনে করেও বলা হয়নি। এ সব কথা আমি অনেক ভেবে দেখেছি; কিন্তু এমন করে তো আর চলতে পারে না। সুরেশ সকল বিষয়েই আমার হিংসা করে। সে ওকালতিতে এখন বেশ রোজগার করছে, কিন্তু সংসারে একটা পয়সাও কোন দিন দিয়েছে কি? কৈ, আমার তো তা মনে পড়ে না। আমি চাকরী আরম্ভ করবার সঙ্গে সঙ্গেই সংসারের সকল ভার আমার উপরেই এসে পড়েছে। আমার পাঁচটি ছেলে-মেয়ে; তাদের জন্য এখন থেকেই আমাকে ভাবতে হচ্ছে। আমার বাঁধা মাইনে কি না, তাই বেশী কিছু বাঁচাতে পারি নে। সুরেশের উচিত, এখন সংসারের ভার কিছু কিছু নেওয়া।—তার কাছে তুমি টাকাকড়ি কিছু পাও কি?"

করুণাময়ী জপ করিতেছিলেন; তাই মাথা নাড়িয়া ইসারায় তিনি জানাইলেন—তাহার কাছে কিছুই তিনি পান না।

রমেশ কহিল, "কিছুই দেয় না! দেবার ইচ্ছাও বোধ করি তার নেই। সুরেশের হয় তো ধারণা—বাবার দরুণ যে সামান্য কিছু জমি-জমা আছে, তারই আয়ে আমাদের সংসারের সব খরচই চলে। এই সব বিষয় নিয়ে সে আমার সঙ্গে অনেক কথা-কাটাকাটি করলো। তার পর গৃহস্থালীর কাজ ছোটবৌমাকে কিছুই সে করতে দেয় না; দেখতে পাইতো, শুনতেও কিছু বাকি থাকে না। বড়বৌকে অনেক কাজ করতে হয়; কিন্তু সেও তো ছোট ছেলের মা। এ সবই আমি বুঝতে পারি, তাই আমার পক্ষে সহ্য করা ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠেছে। এই জন্যেই স্থির করেছি, আমরা পৃথক্ হব, সুরেশও তাই চায়; কিন্তু তা হ'লে তোমার কি ব্যবস্থা করব, তা এখনও ঠিক করতে পারিনি। তুমি কার কাছে থাকবে? আমার কাছে, না সুরেশের কাছে? আমার তো মনে হয় তোমার এখন কাশীবাস করাই ভাল।"

করুণাময়ীর মালা-জপ শেষ হইয়া গিয়াছিল; তবুও তিনি কোন উত্তর দিলেন না, স্তব্ধ ভাবেই বসিয়া রহিলেন। আজ আর তাঁর চোখে অশ্রুরেখা দিল না। এত দিন ধরিয়া ইহাই তো তিনি আশঙ্কা করিয়া আসিয়াছেন; শেষে তাহাই ঘটিয়া গেল! দু'টি ভাই—রমেশ ও সুরেশ ছোটবেলা প্রত্যেক বিষয়ে মায়ের আদেশের প্রতীক্ষা করিত; মাকে না বলিয়া, তাহার অনুমতি না লইয়া তাহারা খেলা পর্য্যন্ত করিতে যাইত না! দু'টি স্নেহের মধ্যে কি গভীর ভালবাসা ছিল! সেই ভালবাসা, স্নেহ আজ কাহার—কোন্ মন্ত্রে অদৃশ্য হইল?

ছোটবেলায় সুরেশ এক দিন পড়িয়া-গিয়া কয়েক ঘণ্টা অজ্ঞান হইয়াছিল; এ জন্য রমেশের সে-দিন কি কান্না! সে-দিন সে খাইতে শুইতে পারে নাই। সুরেশও কি তার দাদাকে কম ভালবাসিত! যে ভাল জিনিষটি পাইত, তার দাদাকে না খাওয়াইয়া সে তৃপ্তি পাইত না। তার পর মা। এই মা'র উপরেও ছেলেদের আর কোন টান নাই, ভালবাসা নাই! মা'কে তাহারা যেন সহ্য করিতেও পারিতেছে না, তাঁহাকে দূরে সরাইয়া দিতে চায়! স্ত্রী ও সন্তান লইয়া উহারা একা থাকিতে চায়; কিন্তু মা'র তো আর কেহ নাই। মা'র যে এই ছেলে-দু'টি মাত্রই সম্বল। তাহাদের ছাড়িয়া তিনি কোথায় যাইবেন? মায়ের দুঃখ ছেলেরা বোঝে না। মা এখন নিতান্ত অনাবশ্যক ভারস্বরূপ হইয়াছেন!

রমেশ মায়ের বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিল। তাহার মনে হইল, মায়ের মনে কষ্ট হইয়াছে; তা কষ্ট তো একটু হইবেই। বড়বৌ শরৎশশী রান্নাঘর হইতে তখন হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে স্বামীর কথাগুলি কান পাতিয়া শুনিতেছিল।—হাঁ, এত দিন পরে তার স্বামীর ঘটে শুভ বুদ্ধির উদয় হইয়াছে বটে। কত দিন ধরিয়া তো স্বামীকে প্রতি রাত্রে—যখনই সুযোগ পাইয়াছে তখনই এ কথা বলিয়াছে; এত দিন পরে কি সত্যই ভগবান্ সদয় হইলেন? পূর্ব্ব-দিন রাত্রিতে শাশুড়ী রান্না করিতে আসিয়াছিলেন। অত বড় রুই মাছের মুড়োটা তাঁর ছোট ছেলের পাতেই দেওয়া হইল! কেন, বড় ছেলেকে মুড়োটা খাইতে দিলে কি ভাগবত অশুদ্ধ হইত? এমন একচোখো মা কিন্তু কখন দেখিনি! ছোটবৌ আর ছোট ছেলে যেন ওঁর অন্ধের নয়ন, মাথার মণি! স্বামীর সুমতি এখন স্থির থাকে—তবেই তো!—সে সওয়া-পাঁচ আনার হরির লুঠ মানত করিল। ও-দিকে ছোটবৌ-রাণীর দেহ ননীর মত; এতই কোমল যে, এক দিন আগুনের একটু আঁচ লাগিলেই গলিয়া যায়! এবার পৃথক্ হইলে কি হয় দেখা যাইবে।—সে মনে মনে হাসিল!

* * * *

ইহার পর দুই ভাই পৃথক্ হইল। পৈতৃক ছোট বাড়ীতে ভাগাভাগি করিয়া বাস করা কষ্টকর বলিয়া সুরেশ ভাড়ার বাড়ীতে সংসার পাতিয়া বসিল।

করুণাময়ী নির্ব্বাক্ ভাবে দিনপাত করিতেছিলেন। পাড়াপড়শীরা বলাবলি করিতেছে—"ছেলেদের ব্যবহারে রমেশের মা না পাগল হয়ে যায়! খায় না, ঘুমায় না, কোন মানুষের সঙ্গে একটি কথা পর্য্যন্ত বলে না? বাপ রে! এমন ছেলে, মায়ের দুঃখ ওরা এতটুকু বুঝল না। তোদের পৃথক্ হওয়া কি পালিয়ে যাচ্ছিল? বুড়ো মা আর ক'দিন? তার পর না হয় পৃথক্ হয়ে চতুর্ভুজ হতিস্। তবে আর এটাকে কলিকাল না বলবে কেন?" ইত্যাদি।

করুণাময়ী সত্যই আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছিলেন। নিষ্ঠুর ব্যবহারে তাঁহার বুকটা যেন চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল! তিনি ছেলেদের সুমতির জন্য দেবতার উদ্দেশে নিত্য মাথা কুটিতেন, মাথা কুটিয়া কুটিয়া তাঁর কপালখানা কালো হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহাকে দেখিবার কেহ নাই, তাই পাড়ার শ্যামা-ঠাকুরঝি আসিয়া মাঝে মাঝে তাঁকে টানিয়া লইয়া-গিয়া স্নানাহার করাইত। দু'টি ভাত মুখে—

ধ্যাই তিনি উঠিয়া পড়িতেন ; রাত্রে তাঁহার শয্যা অব্যবহৃত পড়িয়া থাকিত । বিনিদ্র ভাবে তিনি উঠানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন ; প্রহরের পর প্রহর অতিবাহিত হইত ।

সুরেশের পসার বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল। সে তাহার নূতন সংসার মনের মত করিয়া গুছাইয়া লইল। আয়না, সোফা, ছবি ও সৌখীন আসবাবে তাহার বাসগৃহ সুসজ্জিত হইল। রান্নার জন্ম উৎকলবাসী পাচক, গৃহকার্য্যের জন্ম দাসী ও পুত্রের জন্ম বালক-ভৃত্য নিযুক্ত হইল। রমেশের আপত্তি সত্ত্বেও বড়বৌ শরৎশশী গৃহসজ্জার জন্ম আসবাবপত্র কিছু কিছু কিনিল। অনেক দিনের কামনা পূর্ণ হইয়াছে। শুধু মায়ের দিক্‌টাই বিরাট্ শূন্যতায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। মায়ের বজ্রাহত হৃদয়ের সংবাদ কেহই লইল না,—লওয়া কর্ত্তব্য বলিয়াও ছেলেদের মনে হইল না !

সুখের সংসারের ইহাই পরিণাম !

৩

রমেশ আহার করিতে বসিয়া বলিল, "ইস্ ! বড়বৌ আজ যে অনেক রকম রান্না করেছ—দেখছি।"

বড়বৌ মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, "স্বামি-পুত্তুরকে পাঁচ রকম রেঁধে খাওয়াতে কার না ইচ্ছে হয়? এত দিন ওদের জন্মই তো কিছু করতে ইচ্ছে হোত না। তা ছাড়া, তোমার মাও তো কম এক-চোখো ছিলেন না ; ভাল জিনিষ সব খাবে ছোট ছেলে—ছোটবৌ ! ছোট ছেলের উপর অত যে ভালবাসা, কৈ, মাকে এক বার তো একটা কথাও জিজ্ঞাসা করতে দেখলাম না ! মাকে নিয়ে গিয়ে সেও তো কাছে রাখতে পারতো। তা কৈ ? এখন চাকর-বামুন রেখে খাসা সংসার চালাচ্ছে।"

রমেশ কহিল, "মা কোথায় খাচ্ছেন ? সে-দিন তাঁকে বললাম, 'মা, তুমি কাশী যাও।'—তা সে কথার একটা উত্তর পর্য্যন্ত দিলেন না ! আমি আর কি করব ? এত দিন ধরে অনেক রকমই তো করে দেখলাম। চারি দিক্ থেকে সকল লোক আমারই দোষ দিচ্ছে ! শুনছি, মা না কি খান না, ঘুমোন না !"

বড়বৌ মুখ ঘুরাইয়া কহিল, "হ্যাঁ, পাড়ার লোকে তো নানা রকম কথা বলবেই। পরকে উপদেশ দিতে অনেক লোককেই দেখা যায়। তা না খেয়ে না ঘুমিয়ে মানুষ ক'দিন থাকতে পরে ? খুড়িমার বাড়ী শ্যামা পিসির বাড়ী—যে-দিন যার বাড়ী ইচ্ছে সেখানেই থাকছেন। তারাই খাওয়াচ্ছে—এই রকমই তো শুনতে পাচ্ছি। তিনি বাড়ী ছেড়ে যেখানে-সেখানে কেন থাকেন ? আমরা কি তাঁকে আর এক মুঠো ভাত দিতে পারতাম না ? হাজারও হোক, নিজের মা তো বটে !"

রমেশ আনমনা হইয়া কি ভাবিতেছিল, অন্যমনস্ক ভাবেই বলিল, "তুমি মায়ের একটু খবর নিয়ো বড়বৌ ! আমি তাঁকে কোন রকমে কাশী পাঠাবার চেষ্টা করে দেখি। মাসে পাঁচ টাকা করে দিলেই মার কাশীবাসের খরচ চলে যাবে। এক বেলা এক মুঠো খাওয়া তো ? সে জন্তে আর কি শ'শো পঞ্চাশ খরচ ?"

৪

অপরাহ্ণে সুরেশ আদালত হইতে ফিরিয়াছে। চাকর, পাচক-ব্রাহ্মণ থাকিলেও প্রভাতীকে এখন গৃহস্থালীর উপর নজর রাখিতে হয়। নজর না রাখায় চাকর-বামুন কিছু দিন বেশ দু'পয়সা উপরি উপার্জ্জন করিয়াছিল।

যথেষ্ট অর্থব্যয় হয় অথচ কোন সুব্যবস্থাই প্রভাতী করিতে পারে না,—দেখিয়া সুরেশ এক দিন বিরক্ত হইয়া বলিল, "প্রভা, তুমি একটু দেখা-শুনা না করলে তো ভারী মুস্কিল। এ বেটারা চুরি করেই আমাকে ফতুর করবার যোগাড় করেছে। মা কত সুন্দর ব্যবস্থা করে রাখতেন, তুমি সে রকম করতে পার না ? এখন তো গিন্নী হয়েছ, পারা উচিত।"

প্রভাতীর ইচ্ছা হইল, সে বলে, "কখনও কোন কাজে হাত দিতে দিয়েছ কি যে সংসারের কাজকর্ম্ম শিখবো ? এখন আবার সেই কথা বলা হচ্ছে !"

সুরেশকে জলখাবার দিয়া, খোকাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জামা পরাইয়া চাকরটার কোলে দিয়া সে বলিল, "দেখ, আজ রাঙা খুড়িমা এসেছিলেন ; তিনি বললেন, মা না কি খান না, ঘুমান না, আমরা তাঁর কোন খোঁজ খবর নিইনে ! মনের কষ্টে তাঁর মাথা খারাপ হয়ে যাবে—এই রকম না কি তাঁরা ভয় করছেন।"

সুরেশের জলযোগ তখন প্রায় শেষ হইয়াছিল ; সে এক গ্লাস জল পান করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, মা'র একটা ব্যবস্থা করতে হবে ; আমার তো এক দিনও যাবার মত অবসর হয়নি। আচ্ছা, তুমি পকেটটা খালি করে রাখ ; আজ বেশ ভারি আছে ! টাকাগুলো গুণে বাক্সে রেখে দাও।"

প্রভাতী টাকাগুলি গণিয়া বাক্সে রাখিল ; হাসিতে হাসিতে বলিল, "অনেক টাকা পেয়েছ তো আজ !"

উত্তর হইল, "হ্যাঁ, স্বয়ং লক্ষ্মী আমার ঘরে, আমার কি টাকার অভাব হ'তে পারে ? সেই সুন্দর নেকলেস-ছড়াটা এবার তোমায় কিনে দেব মনে করছি। সেই যে—যে নেকলেস তোমার ভারি পছন্দ হয়েছিল।"

প্রভাতীর মনের আনন্দ চোখ-মুখ দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। সে আবার বলিল, "এখন যাও না, মাকে একবার দেখে এস ; প্রায় দু'মাস হয়ে এলো আমরা এখানে এসেছি, এত দিনের মধ্যে মায়ের খবর একবারও তো নেওয়া হয়নি ! আমাদের বাড়ীতে তাঁকে নিয়ে এলেও তো হয় ?"

সুরেশ কহিল, "আমি তো মক্কেল আর আইন-আদালত নিয়েই ব্যস্ত ; অন্য দিকে তাকাবো—তা'র অবসর নেই ! আর যদি সত্যই মায়ের মাথা খারাপ হয়ে থাকে, তাহ'লে তুমি কি তাঁকে সামলাতে পারবে ?"

প্রভাতী কহিল, "আচ্ছা, তুমি এক বার দেখে এসো। একেবারেই তিনি কি পাগল হয়ে গেলেন ? তা তোমাদের ব্যবহারেই যদি ঐ রকম হয়ে থাকে, তবে বড়ই দুঃখের বিষয়, আর লজ্জার কথাও বটে !"

সুরেশ তাচ্ছিল্যভরে উত্তর দিল, "হ্যাঁ, জগতে আমরাই যেন প্রথম পৃথক্ হ'য়েছি ! কিন্তু সকল সংসারেই তো অহরহ এ রকম কাণ্ড ঘটছে। ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধের ফলে পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ-বখরা নিয়ে কোর্টে নিত্য কত মামলা মোকদ্দমা করছি। মা'র [illegible] বুদ্ধি, তাই তিনি ভেবে ভেবে মাথা খারাপ করে বসেছেন ! কি[illegible]তার প্রয়োজন ছিল ? তিনি কাশী চলে গেলেই তো পারতেন, শেষ বয়সে তীর্থ-বাস হতো।"

প্রভাতী কহিল, "সে যা হয় হোক, তুমি এখন এক বার যাও তো ; এক বার তাঁকে দেখে এসো, হাজার হোক মা।"

সুরেশ বলিল, "না, এখন আমার সময় হবে না। আজ সন্ধ্যা সাতটার সময় আমাকে গড়ের মাঠে একটা সভায় 'ভারতমাতার প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা করতে হবে।"

সুরেশ বাহিরে চলিয়া গেল। প্রভাতী একখানা রোমাঞ্চকর নভেলে মনঃসংযোগ করিল। তাহার মনে কর্ত্তব্যের যে ক্ষীণ রশ্মি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, স্বামীর ঔদাসীন্যে ও উপেক্ষায় সেই শুভ বুদ্ধি নিষ্ফল হইল।

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিয়াছে ; আকাশে দুই-একটি নক্ষত্র একে একে ফুটিয়া উঠিয়া শুভ্র জ্যোতি বিকাশ করিতেছে। ইংরেজী মাসের আজ প্রথম দিন। রমেশ তাহার আফিসের একাউন্টেন্ট। আজ সকলের বেতন দেওয়ার দিন ; সেই জন্য কাজ শেষ করিতে অনেকটা বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। পরিশ্রম অধিক হইলেও তাহার মুখ আজ বেশ প্রফুল্ল। বাড়ী ফিরিয়া সে মাহিনার টাকাগুলি পকেট হইতে বাহির করিতে করিতে বলিল, "বড়বৌ, মাইনের টাকাগুলো তুলে রাখো ; আজ একটা ভাল খবর আছে। আফিসে হিসাবের একটা প্রকাণ্ড ভুল ধরায় সাহেব খুসী হয়ে আমাকে উপরের গ্রেডে প্রমোসন দিলেন ; তাতে আমার মাইনে ২০ টাকা বেড়ে গেল। ভুলটা ধরা না পড়লে সরকারের অনেক টাকা ক্ষতি হোত।"

শরৎশশীর মুখ হাসিতে ভরিয়া উঠিয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি রমেশের জন্য চা ও কিছু খাবার আনিতে গেল।

রমেশ মুখ-হাত ধুইয়া একখান চেয়ারে অর্দ্ধশায়িত ভাবে বসিয়া পড়িল। মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার মন ভবিষ্যতের সুখস্বপ্নে নিমগ্ন হইল। সে এবার সাহেবের সুনজরে পড়িয়াছে। তাহার আশা,—ক্রমে ৫০০ টাকার গ্রেডে তাহার উন্নতি হইবে—তাহাতে সন্দেহের কোন কারণ ছিল না।

সেই সময় রমেশের মা আপন মনে অস্ফুট স্বরে কি কথা বলিতে বলিতে পুত্রের গৃহের সম্মুখে আসিয়া তাহাকে কহিলেন, "বাবা রমু, তুই আমায় কাশী পাঠাতে চাস্, তাই সেখানে পাঠিয়ে দে বাবা! আমার সব আশাই তো ছাই হয়ে গিয়েছে ; আর কিছু হোল না, সব ভেঙ্গে গেল—সব ভেঙ্গে গেল! আমার বুকখানাও একবারে ভেঙ্গে-চুরে গেছে!"

জননীর কথাগুলি কানে প্রবেশ করিতেই রমেশের কল্পনার রঙ্গীন চিত্র শূন্যে মিলাইয়া গেল! সে মায়ের দিকে চাহিয়া সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল ; কিন্তু সে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই বড়বৌ কঠোর স্বরে শাশুড়ীকে বলিল, "আচ্ছা মা! সমস্ত দিনই তো তুমি পাড়ায় পাড়ায় আমাদের নিন্দে করে মুখ হাসিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ। সমস্ত দিন পরে মানুষটা খেটে-খুটে বাড়ী এসেছে ; ঠিক খাওয়ার সময়টাতেই এলে বিরক্ত করতে? কি রকম তোমার আক্কেল বল দেখি?"

জননী উদাস দৃষ্টিতে একবার ছেলে ও পুত্রবধূর মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "এখনও কিছু খায়নি রমু! আহা, খেতে দেও বাছাকে, আমি তো জানিনে মা! তা আমি যাচ্ছি—আমি যাচ্ছি। কিছু মনে কোর না তোমরা—আমি চল্লাম মা।"

রমেশের [illegible] দৃষ্টিতে টানিতে টানিতে [illegible] দিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

রমেশ কহিল, "মাকে চলে যেতে দিলে কেন? ওঁর শরীরটা বড় খারাপ হয়ে গিয়েছে বলে মনে হোল।"

বড়বৌ মুখভঙ্গী করিয়া কহিল, "আবার এখনই এলেন বলে! যাবেন আর কোথায়? তোমার খাওয়াটা হয়ে যাক। সর্ব্বদাই তো এ-বাড়ী ও-বাড়ী করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন! পাগলের কি আর দিক্-বিদিক্ জ্ঞান আছে?"

রমেশ আর কিছু বলিল না ; স্ত্রীর সহিত ভবিষ্যৎ সুখের কথা আলোচনা করিতে করিতে আহার শেষ করিল।

সুরেশ প্রায় রাত্রি ১টায় যখন বাড়ী ফিরিতেছিল—দেখিল, পথের মাঝে লোকের ভিড় জমিয়া গিয়াছে।

সে এক জন ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিল, "মশায়, ব্যাপার কি? এখানে লোকের এত ভিড় কেন?"

"যা হয়ে থাকে মশায়, একটি বৃদ্ধা মোটর-চাপা পড়েছে। ড্রাইভারটা এক সেকেণ্ডও দাঁড়ায়নি। গাড়ীখানা আরও জোরে চালিয়ে নিয়ে পালিয়েছে! স্ত্রীলোকটি মারা গিয়েছে বলেই মনে হচ্ছে ; এম্বুলান্স এসে পড়েছে, হাঁসপাতালে নিয়ে গিয়ে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে তো?"

সুরেশ কহিল, "কলকাতা সহরে প্রাণ নিয়ে রাস্তায় চলা দায়!" সে বাড়ী ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। প্রভাতী তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, এখনও আহার হয় নাই। সে আর কোন দিকে না চাহিয়া চলন্ত ট্রামে উঠিয়া বসিল।

৪

প্রভাত হইতেছে ; যামিনীর অন্ধকার-যবনিকা তখনও ধরণীর বুক হইতে সম্পূর্ণ অপসারিত হয় নাই। ইতিমধ্যেই পথের উপর দিয়া সহরের ময়লাবাহী গাড়ীর বিশ্রী কর্কশ শব্দ নগরের স্নিগ্ধ শান্তিটুকু যেন বিতাড়িত করিতেছে।

পাড়ার শ্যামা ঠাকুরাণী আসিয়া রমেশকে ডাকিলেন ; বলিলেন, "রমেশ—ও রমেশ! তোর মা কোথায়? বাড়ীতেই আছে তো?"

ডাকাডাকিতে রমেশের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে বাহিরে আসিয়া কহিল, "কি শ্যামা পিসি! কি জিজ্ঞাসা করলে?"

"এই তোর মার কথা ; বলি রাতে সে বাড়ী ছিল তো? রোজ আমার কাছেই থাকে ; কাল সন্ধ্যা বেলায় বল্লে,—'আজ বাড়ীতেই থাকি গিয়ে, রমুকে বলি গিয়ে, আমায় কাশী পাঠাবে বলছিল, তাই পাঠিয়ে দিক্।' কাল আবার একাদশী ছিল কি না? আমি আর অন্ধকারে এসে খবর নিতে পারলাম না ; বুড়ো বয়েসে উপোস করে শরীরটা ঠিক থাকে না।"

শ্যামা ঠাকুরাণীর কথায় বাধা দিয়া রমেশ কহিল, "শ্যামা পিসি, মা একবার এসেছিলেন বটে, কিন্তু তখনই তো চলে গেলেন। আমার সঙ্গে একটা কথাও হয়নি। আমি তো তার পর আর তাঁকে দেখিনি।"

শ্যামা ঠাকুরাণী চিন্তিত ভাবে কহিলেন, "তবে কি [illegible] গেল? মনের,—মাথার তো ঠিক নেই তার! একবার চল, খবর নিয়ে আসি বাবা! আমি পূজোর ফুল পর্য্যন্ত আজ তুলিনি। মনে হোল, একবার খবরটা নিয়ে আসি, তার পর সব করা যাবে।"

রমেশ ও শ্যামা ঠাকুরাণী খানিকটা পথ ঘুরিয়া যখন সুরেশের গৃহে আসিলেন, সুরেশ তখন কেবল উঠিয়া—পূর্ব্ব-দিনের মিটিংএ দেও

যেমন চমৎকার বক্তৃতা করিয়াছিল, তাহার মুখে ভারতমাতার দুঃখ-দুর্ভাগ্যের কাহিনী শুনিয়া শ্রোতার দল অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে কেমন ধন্য ধন্য করিয়াছিল, সেই গল্পটা সে তখন পত্নীকে সালঙ্কারে শুনাইতেছিল। সেই সময় তাহার দাদার কণ্ঠস্বরে সে বিস্মিত হইয়া বাহিরে আসিল। রমেশ কহিল, "সুরো, মা এখানে কাল এসেছে কি ?"

সুরেশ কহিল, মা তো কোন দিন আমার বাড়ীতে আসে না। আজ প্রায় ছ' মাস এ বাড়ীতে এসেছি ; মা এক দিনও আমার বাড়ী এসেছে বলে মনে পড়ে না। আমিও মনে মনে ঠিক করে রেখেছি, এ বাড়ীতে তাকে আসতে বলব না। মাকে আমি অনেক দিনই দেখিনি।"

শ্যামা ঠাকুরাণী ললাটে করাঘাত করিয়া কহিলেন, "আঃ আমার পোড়া কপাল ! মা'র খোঁজ নিলে তো তাকে দেখতে পাবি ! এই ছ' মাস ধরে আমার কাছেই সে শোয়, থাকে। খাওয়া তো তার নেই বল্লেই হয় ! মুখে আদৌ রুচি নেই। কাল একাদশী ছিল, খাওয়া দাওয়ার কোন হাঙ্গামাই ছিল না। উপোসী মানুষটা কোথায় গেল কেউ জানে না ! তোদের মত এমন ইন্দ্র-চন্দ্র ব্যাটা যার, সেই মানুষটার এত দুঃখ-দুর্দ্দশা ! যা সম্ভব, শেষটা মোটর-চাপা না পড়ে থাকে।"

সুরেশের কণ্ঠ দিয়া একটা আর্ত্তনাদের মত শব্দ বাহির হইল ! সে দ্রুতবেগে সাইকেলে বাহিরে চলিয়া গেল।

তার পর কি হইল, সেটুকুও লিখিতে হইতেছে ! অনেক খোঁজ করিয়া শেষে স্বেচ্ছাসেবকের মুখে শুনিতে পাওয়া গেল—"মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পরীক্ষায় জানা গিয়াছে, আঘাতের সঙ্গেই তাঁর প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছিল ! ব্রেণে আঘাত লাগিয়াছিল ; বুকের পঞ্জরের একখানা অস্থিও ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। কোন লোককে মৃতদেহের ওয়ারিশ বলিয়া জানিতে না পারায়, তাহারা চাঁদা তুলিয়া মৃতদেহের সৎকার করিয়াছে। মৃতদেহ সনাক্ত করিবার মত একটা রুদ্রাক্ষের মালা বুড়ীর গলায় ছিল। এই দেখুন সেই মালা !"

সুরেশ স্বেচ্ছাসেবকের হাত হইতে মালাটি হাতে লইয়াই—"মা ! এই তোমার ভাগ্যে ছিল !"—বলিয়া ধূলায় লুটাইয়া পড়িল।

শ্রীমতী ঊষা দেবী।

নাগেশ্বর

করে না বিচার দেখি বিধাতার দান,
ভরেছে নাগেশ্বরে ভাঙ্গা এ বাগান।
সমীরে সুদূরে ভাসি' যেতেছে পরাগ,
লভে ভাগ পশু পাখী বিপিন তড়াগ,
অনাদরে আছে হেথা নাহি অভিমান।

বিজনে তাহার পূজা চলেছে নীরব—
পরিমেয় প্রান্তর—এই তার সব।
পবন পদবী দিয়ে সিদ্ধেরা যায়
তার মধু-সৌরভে চমকি দাঁড়ায়,
ক্ষণ তরে পায় বুকে মর্ত্তের টান।

গড়েনিক' রাজছাপ মোটে তার গায়
মনীষী নহে সে মহা-মহোপাধ্যায়।
খাঁটি সোনা জহুরীরা চেনে তার দর
ছাপ-মারা আকবরী নহে সে মোহর,
নাম তার টাইটেলে হয় নাই ম্লান।

জনগণ-মনোহারী গোলাপ সে নয়,
ইতিহাসে বড় করে নাহি পরিচয়।
অজয়েতে ঝরে পড়ে ভেসে যায় দল
নিতি করে দূরাগত ভকতে পাগল
স্বরগে মরতে তার আদান-প্রদান।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

নারী-জাগরণ

যুদ্ধ কেবল দুইটি সজ্জিত সেনাদলের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। তাহার বিশাল শর-তাড়নায় মানুষের দৈনন্দিন সাংসারিক জীবনে বিশাল আলোড়ন জাগিয়া উঠে। তাই প্রত্যেক মহাযুদ্ধের সময় ও তাহার পর ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতির উপর দিয়া একটা অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তনের বন্যা আসে। তাহাকে রোধ করিবার মত সৎসাহস বা দুঃসাহস যুদ্ধের অব্যবহিত পরে শান্তি উপভোগের সময়, কাহারও থাকে না। তাহার পর যখন সেই পরিবর্ত্তনটি সমাজ বা রাষ্ট্রের বক্ষের উপর জগদ্দল পাষাণের মত দৃঢ়রূপে স্থায়ী হইয়া বসে, তখন আমরা হতাশ ভাবে চাহিয়া দেখি ও নিরুপায় হইয়া ভাবি, "তাই ত, এ কি হইল !"

গত ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের মহাযুদ্ধের পর সারা বিশ্বে যে নারী-জাগরণ দেখা দিয়াছে, যাহারই ফলে সাধারণ অসাধারণ সকল শ্রেণীর নারীর মন ও শরীরের মধ্যে যে একটা বিরাট্ বিপ্লবের চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে,—তাহা দেখিয়া আমাদিগকে স্তব্ধ ও স্তম্ভিত হইতে হইয়াছে ! কোথায় এবং কি ভাবে এই নারী-জাগরণের সূত্রপাত হইল, তাহা বলা কঠিন। ভূমিকম্পের মত এই বিশ্ব-বিপ্লব ধরণীর কোন্ অন্ধকার-গর্ভে উৎপত্তি লাভ করিয়া সমগ্র জগৎ আজ ওলোট-পালোট করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার সন্ধান পাওয়া প্রায় অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়।

যুদ্ধের পূর্ব্বে বিশ্বের ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে, নারী জাতি পুরুষের মতই কিছু অধিকার লাভের জন্য উন্মুখ হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডের মেয়েদের ভোটের জন্য যুদ্ধ ইহার এক চমৎকার উদাহরণ। পাশ্চাত্য বিবাহিতা নারী স্বতন্ত্র সম্পত্তির অধিকার চাহিতেছিলেন; পুরুষরা যে সকল কার্য্যে নিয়োজিত হয়, সেই সমস্ত কার্য্যেই নারী নিজের দাবী প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য উৎসুক ছিলেন। এমনই সময়ে মহাসমরের রণভেরী নিনাদিত হইল; ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের প্রত্যেক সক্ষম পুরুষই যুদ্ধে যোগদান করিলেন; তাঁহাদের পরিত্যক্ত স্থান অধিকার করিল—দেশের নারী-সমাজ। তাহার ফলে প্রতিপন্ন হইল—পুরুষের অনুষ্ঠিত সকল কর্ম্মেই নারীর পারদর্শিতা পুরুষের অপেক্ষা কোন অংশেই অল্প বা উপেক্ষণীয় নহে।

রাশিয়ায় ও তুরস্কে অভিনব ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে পূর্ব্বতন সমাজ-ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। সেই আবর্ত্তে নারী ও পুরুষের সম্বন্ধেও পরিবর্ত্তন ঘটিল। উক্ত উভয় দেশেরই শাসক সম্প্রদায়ের প্রতি দেশের জনসাধারণের বিরাগ ও অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইতেছিল। কি তুরস্কে, কি রাশিয়ায় ধর্ম্মসম্প্রদায় লোকমতের উপর নির্ভর না করায় শাসক-সম্প্রদায় তাঁহাদের স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যেই ধর্ম্ম বিনিয়োগ করিতেছিলেন। অত্যাচারীরা যতই বাহ্য আড়ম্বরে আপনাদিগকে সজ্জিত করিতেছিল—তাহার অন্তরের ভাণ্ডার ততই শূন্য হইতেছিল। কিন্তু সে কথার আলোচনা আপাততঃ স্থগিত রাখা যাইতে পারে।

যাহা হউক, ঐ ভাবে কতকটা দায়ে পড়িয়াই নারী জাতি যুদ্ধের সময় সর্ব্বপ্রথম নিভৃত অবরোধ পরিহার করিল। তৎপূর্ব্বে অন্তঃপুরই ছিল নারীর সর্ব্বস্ব। সন্তান-প্রসব, তাহাদের পরিচর্য্যা ও লালন-পালন, স্বামীর প্রত্যেক সুবিধা-অসুবিধা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করা, সপ্তাহান্তে এক বার হয় ত মামুলী প্রথায় ভজনালয়ে গমন করিয়া উপাসনায় যোগদান করা,—ইহাই ছিল নারীর ধর্ম্ম ও প্রাত্যহিক কর্ম্ম। সে-কালে পুরুষরা সাধারণতঃ নারী জাতিকে রক্ষাকবচের মত পবিত্র ভাবে ও সংযমের সহিত রক্ষা করিত। ইহাই ছিল তাহাদের পৌরুষের দম্ভ ও গৌরব। পৃথিবীর সর্ব্বত্র লজ্জাই ছিল নারীর ভূষণ। মহিলাদের আসরে রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন নীতির আলোচনা হইত বটে, কিন্তু সে সকল নারীত্বের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল; তাহাতে জাতির ভাব-সম্পদের কোনও ক্ষতি-বৃদ্ধি ছিল না। তখন নারী সাধারণতঃ সরলতা ও অজ্ঞতার আবেষ্টনের মধ্যেই প্রতিপালিত হইত। সেই সময়েই মিসেস প্যাঙ্কহার্ষ্ট, জর্জ্জ এলিয়ট প্রভৃতি মনীষী মহিলাগণের নাম সভ্য জগতে খ্যাতিলাভ করে; কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্ত পরিমিত ছিল। শারীরবিজ্ঞানে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়াই অনেক বালিকা বা যুবতী বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধা হইতেন—যেমন আজিও আমাদের দেশে ঘটিয়া থাকে।

কামানের রসদ যোগাইতে পুরুষ চলিল জল, স্থল ও অন্তরীক্ষের সমর-ক্ষেত্রে, গৃহকোণ পরিত্যাগ করিয়া নারী আসিয়া দাঁড়াইল ধূলি-কঙ্কর-সমাচ্ছন্ন রৌদ্রপ্রতপ্ত রাজপথে,—পুরুষের পরিবর্জ্জিত সাংসারিক কর্ম্ম পরিচালনের উদ্দেশ্যে। শাসক সম্প্রদায়ের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নারী যখন গৃহকোণ পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রের তথাকথিত পঙ্কিলতার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিল, তখন শাসনানুগত ধর্ম্ম বা সমাজ বিধি-নিষেধের কোন আপত্তিই তুলিল না। নারী কর্ম্মক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়া সেই প্রথম উদ্দাম স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করিল। যে অনুভব করিল, সেখানে পিতা বা পতি কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত সংসারে আত্মসম্ভ্রমের হানিকর দাসী-বৃত্তি নাই, মদ্যপায়ী পিতা বা যথেচ্ছাচারী স্বামীর পীড়ন বা অযথা অত্যাচার নাই, মাতার কঠোর অনুশাসন নাই; আর সর্ব্বোপরি নাই অর্থকৃচ্ছ্রতা। সেই সঙ্গে নারী হাতে লইল আশার অতিরিক্ত প্রচুর অর্থ, এবং চারি দিকে আসিয়া জুটিল মনের মত বান্ধব ও বান্ধবীর দল। নারী এই ভাবে স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়া পুরুষ-সমাজের পরুষ দৃষ্টিকে ভ্রূভঙ্গিতে তাচ্ছিল্য করিবার সাহস ও শক্তি সঞ্চয় করিল।

এই সময়ে রাশিয়ায় ও তুরস্কে এবং তাহার অল্প পরেই জার্ম্মাণীতেও স্বার্থান্বেষী ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতি তীব্র কশাঘাত চলিতে লাগিল। রাশিয়াতে কার্ল মার্কস্ বুঝাইতেছিলেন, ধর্ম্ম জাতির জীবনে অহিফেনের সহিত তুলনীয়। তিনি আরও বলিলেন,—ঈশ্বরে বিশ্বাস কল্পনামাত্র; কোনও বাস্তব পদার্থের সহিত তাহার সম্পর্ক নাই। ধর্ম্ম ভিত্তিহীন অনুশাসনবলে মানবের বৃদ্ধি-বৃত্তিকে জড়তায় আচ্ছন্ন করিয়া রাখে; সুচারুরূপে জীবনযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার কোনও অনুপ্রেরণা তাহাতে নাই। ধর্ম্ম বা ঈশ্বর-ভক্তি মানবের ন্যায়বুদ্ধিকে সংযত করিয়া সৎপথে অগ্রসর হইবার প্রেরণা দান করিলেও দুর্ব্বলকে প্রবলের অত্যাচার হইতে মুক্তিদানের জন্য কোনও প্রকার প্রয়াস তাহার নাই। বিজ্ঞান [illegible] অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত করিয়া জনসাধারণ-সমক্ষে তাহার স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিল। লোকে বুঝিল, বিজ্ঞানই ইহ-জগতে একমাত্র ধ্রুব সত্য। লেনিন শিক্ষা দিলেন যে, ত্যাগ ও অনাসক্তিই জীবনের উদ্দেশ্য নয়,—সকলের সহিত সমান ভাবে দেহের উপভোগ ও আনন্দ বিধানই মানব-জীবনের অদ্বিতীয় মহান্ ব্রত ! লেনিন জনসাধারণকে আরও

বুঝাইলেন, যে শাশ্বত খৃষ্টীয় নীতিতে আমাদের আস্থা নাই, তাঁহার মতে একের অন্যের প্রতি অত্যাচার করিবার অক্ষমতাই একমাত্র সনাতন নীতি—স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে তাহা অবশ্য-পালনীয়।

রাশিয়াতে স্ত্রী-পুরুষের সম্ভোগ-ক্ষেত্রে এই নীতি প্রবর্ত্তিত হইল। ইহার ফলে নারীর ইন্দ্রিয়-ভোগের লালসা পুরুষের মতই অনিয়ন্ত্রিত অধিকারে পরিণত হইল। কুমারীর মাতৃত্বে বা বিবাহিতা নারীর কলঙ্কিত জীবনযাপনে নিন্দা বা অপবাদের কোনও কারণ রহিল না। সমাজের ও রাষ্ট্রের নিকট এই প্রকার চরিত্রহীনতা অতঃপর দুর্নীতির কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইল না। রাশিয়াতে নারী আর অবলা—পুরুষ জাতির অধীন রহিল না। এখন পুরুষের সহিত সকল বিষয়েই তাহার সমান অধিকার। তাই আজ রুশ-নারী কর্ম্মক্ষেত্রে পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া, রাষ্ট্র-পরিচালনার কার্য্যে সকল দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করিয়া সুচারুরূপে স্বীয় যোগ্যতা প্রতিপন্ন করিতেছে।

তুরস্কে মুস্তাফা কমাল পাশা চিরপ্রচলিত ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম-মতকে আক্রমণ করিয়া বজ্র-নির্ঘোষে এই নির্দ্দেশ দান করিলেন যে, পঞ্চ শতাব্দ ধরিয়া এক জন আরবদেশীয় শেখের মত ও অনুশাসন, এবং এক জন অলস, অকর্ম্মণ্য ধর্ম্মযাজক কর্ত্তৃক তাহার অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা দ্বারা তুরস্কের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবন পরিচালিত হইতেছে; তাহাদের মত লইয়াই দেশের শাসন-পদ্ধতি গঠিত এবং তাহাদের অনুশাসন দ্বারা প্রত্যেক তুর্কীর সাধারণ জীবন-যাত্রার প্রণালী নিয়ন্ত্রিত। কমাল পাশা বলিলেন, ইস্লাম ধর্ম্ম, মরুচর আরব জাতির উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু ক্রমবিবর্ত্তমান সভ্য জগতে তাহা সম্পূর্ণ অচল। যাহাকে ঈশ্বরের প্রেরণা বলে, সেরূপ কিছুই নাই; ঈশ্বর বলিয়াও কেহ নাই। দুষ্ট শাসক ও ধর্ম্মযাজকদল কল্পনাবলে একটি ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়া তাহারই মোহে জনসাধারণকে অভিভূত করিয়া রাখে। কমাল খলিফার ক্ষমতা অস্বীকার করিয়া, 'শেখ-উল-ইস্লাম' অর্থাৎ ইস্লাম ধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিচালককে স্বদেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া, তাঁহার পশ্চাতে পবিত্র কোরাণ নিক্ষেপ করেন। কমাল পাশা নবীন তুরস্কে অভিনব শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত করিলেন, এবং রাষ্ট্র হইতে প্রচলিত পর্দ্দাপন্থী ধর্ম্মমত সমূলে বিসর্জ্জন করিয়া নারীদলকে বিনা-বাধায় অন্তঃপুরের বাহিরে আনিয়া সকল বিষয়ে পুরুষের সমান অধিকার দান করিলেন।

জার্ম্মাণীতেও নারী-জাগরণের সাড়া পাওয়া গেল। কাইজারী শাসনমুক্ত দুঃস্থ জার্ম্মাণীর ছেলেমেয়েরা পাশাপাশি দাঁড়াইয়া অন্নসংস্থানের চেষ্টা করিতে লাগিল। সহসা ঝঞ্ঝার মত নাৎসীবাদী হিটলার আসিয়া প্রচলিত সমস্ত নীতিবাদকে পদদলিত করিলেন; কিন্তু জার্ম্মাণীতে নারী ইহার অধিক আর কিছুই পাইল না; নাৎসী জার্ম্মাণী নারীকে রন্ধনাগার দেখাইয়া দিয়া বলিল, "ইহাই তোমার ধর্ম্ম।"

তুরস্কের হাওয়া প্রাচ্য-ভূখণ্ডে প্রবেশ করিল। আফগানিস্থানের আমীর আমানুল্লা নারী-জাগরণের সহায়তা করিবার চেষ্টায় কষ্টলব্ধ রাজ্য পর্য্যন্ত হারাইলেন। কাবুলেও সেই সময় বহু নারী পর্দ্দার বাহিরে আসিয়া দিনের আলোকে অভিনন্দন করিলেন।

প্রতীচ্যের এই বিস্ময়কর নারী-জাগরণের তরঙ্গ ভারতের নারী-সমাজকেও আলোড়িত করিল। ভারতের বহু অন্তঃপুরিকা পুরুষদের সহায়তায় অন্তঃপুর ও রন্ধনাগার ত্যাগ করিয়া রাজপথে বাহির হইলেন এবং অনবগুণ্ঠিত শোভাযাত্রার শোভাবর্দ্ধন করিয়া কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিলেন। কত নারী স্বেচ্ছায় সহাস্য বদনে কারাবরণ করিলেন। এখানেও দাবী চলিতেছে,—হিন্দু-নারীর বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার আইন-সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করাইতে হইবে। সব দেশেই নারী আজ মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিতে চায়! বন্ধনকে সে জীবনের লক্ষ্য বলিয়া মানিবে না।

সুদূর আমেরিকাতেও নারী-জাগরণের তরঙ্গ প্রবল বেগেই বহিয়া চলিয়াছে; তথায় নারী জাতি প্রচলিত নীতিবাদকে হীন করিয়া সাহচর্য্য বা সর্ত্ত-বিবাহ প্রচলিত করিয়াছে। আমেরিকার এ আন্দোলন নব সমৃদ্ধ তরুণ এক জাতির স্বাভাবিক জীবন বিকাশ হইতে পারে; তবে মহাযুদ্ধের সহিত ইহার সাক্ষাৎ সংযোগ নাই।

এই যে সারা গোলার্দ্ধব্যাপী নারী-জাগরণ, ইহার মূলে রহিয়াছে রাশিয়ার বিপ্লবী দলের শিক্ষা। প্রকৃত পক্ষে সারা বিশ্বের নারীর দাবী আজ শিক্ষার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। মহাযুদ্ধে নারী বুঝিতে পারিল যে, পুরুষের এত কালের একচেটিয়া কার্য্য তাহারাও যোগ্যতা সহকারে পরিচালনে সমর্থ। পুরুষের চিরাচরিত কর্ম্মে সাফল্যের ফলে নারী দাবী করিতে শিখিল যে, সে-ও পুরুষের সমান অধিকার পাইবার যোগ্যা। নারী দাবী করিল যে, পুরুষ যদি প্রবৃত্তির বশে জীবনে প্রবর্ত্তিত নীতির বিরোধী গর্হিত আচরণ করিয়াও সমাজ ও রাষ্ট্রে স্বীয় প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হয়, তবে অনুরূপ অবস্থায় নারীর সম্বন্ধেই বা স্বতন্ত্র ব্যবস্থা চলিবে কেন? নারী আজকাল নারী-ধর্ম্মনীতির নূতন আদর্শ সৃষ্টি করিয়াছে, সে দৃঢ়তার সহিত জানাইতেছে, ইন্দ্রিয়োপভোগের জন্য নিজের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও বিচার-বুদ্ধিকে প্রতিহত করিবার অধিকার কোন পুরুষ, কোন নারী, সমাজ বা রাষ্ট্রের নাই! বস্তুতঃ, নারীর সতীত্ব বলিয়া যে রক্ষাকবচ যে taboo, তাহার সমস্ত মিথ্যা গৌরব নারীর অধিকারের তাড়নায় আজ বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে! এই বিশাল বিস্ময়কর নারী-জাগরণকে কেবল যৌন-আন্দোলন বলিয়া বর্ণনা করিলে ভুল হইবে; কিন্তু এই ব্যাপক যৌন-জীবনের স্বাধীনতাকেই নারী মুক্তির মাপকাঠি মনে করে!

মানুষ যখন পশুবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণ মানবত্বে উপনীত হইল, এবং যখন বর্ব্বরতার সকল নিদর্শন পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়া একটি একটি করিয়া সভ্যতার সোপানে আরোহণ করিল, তখন মানব জাতির মনে উপজাত হইল প্রেম। নর-নারীর এই পারস্পরিক আকর্ষণ—তাহা মাত্র শারীরিক ব্যাপার নয়; ইহা আত্মায় আত্মায় অথবা হৃদয়ে হৃদয়ে আকর্ষণ না হউক, ইহা যে এক বিরাট্ মানসিক ক্রিয়া, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না।

নারীর আত্ম-প্রকাশের সম্মুখে যে বিরাট্ তোরণ রুদ্ধ ছিল, নারী তাহা ভাঙ্গিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কার্ল মার্কস্ ও লেনিনের সমষ্টিগত জীবনের গণতান্ত্রিকতা ও সাম্যনীতি এবং উন্নত বিজ্ঞানের শিক্ষায় নারীর হৃদয়ের অন্তর্নিহিত কোমলতা—যাহা এত দিন পুরুষের দম্ভের উপকরণ ছিল—তাহা আজ এক অভিনব রূপ লইয়া নারীকে রূপায়িত করিতেছে। তাই আজ নারীর রূপের আদর্শ পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে! গত শতাব্দীতে নারী ছিল পুরুষের প্রকৃতির দাসী মাত্র। তাই তাহার রূপের মাপকাঠি ছিল রূপজ মোহের পরিমাণ। আজ সে-দিন চলিয়া গিয়াছে।

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য (বি-এ)
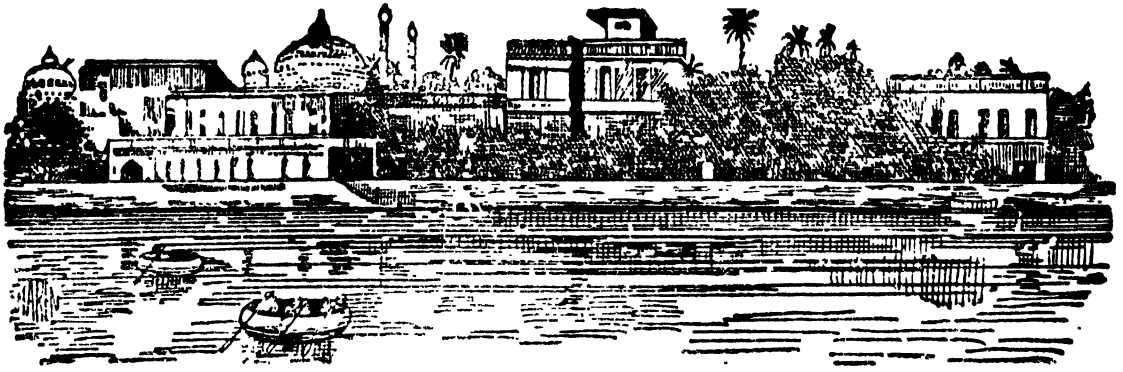
না-জানা জাপান

এক জন মার্কিন লেখক জাপানের সম্বন্ধে সদ্য একটি সন্দর্ভ লিখিয়াছেন। সন্দর্ভটিতে অনেক নূতন কথা আছে। সে-কথায় জাপানের সম্বন্ধে আমরা অনেক নূতন তথ্য জানিতে পারিব।

তিনি লিখিয়াছেন, যুদ্ধে জাপান এ পর্য্যন্ত যেটুকু সুবিধা করিতে পারিয়াছে তার প্রধান কারণ, তারা আমাদের জানে, কিন্তু আমরা জাপানীদের ভালো করিয়া চিনি না, জানি না! যুদ্ধ-শাস্ত্রে গোড়ার কথা হইতেছে, "শত্রুকে ভালো করিয়া চেনা চাই!" (know thy enemy!)

তিনি বলেন, পাশ্চাত্য জগৎকে গুরু মানিয়া জাপান আজিকার এই জাপান হইয়া উঠিয়াছে! পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে পাশ্চাত্য রীতি-নীতিও সে একান্ত ভাবে গ্রহণ করিয়াছে!

১৮৫৩-৫৪ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার সঙ্গে জাপানের সম্পর্ক প্রথম সংস্থাপিত হয়! তার পর আন্তর্জাতিক বিধি-বশে আমেরিকান্ কন্‌শল্ যখন প্রথম জাপানে পদার্পণ করেন, তখন জাপানে আস্তানা পাতিবার পূর্ব্বে তাঁকে বহু আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল। বিদেশীর সঙ্গে জাপানীরা যত অন্তরঙ্গ ভাবেই মিশুক, আজ পর্য্যন্ত তারা কোনো বিদেশীকে গৃহে তেমন অন্তরঙ্গ ভাবে গ্রহণ করে নাই। তাই তাদের পারিবারিক জীবন-সম্বন্ধে বিদেশীরা সঠিক সংবাদ জানে না!

লাফকাডিয়ো হার্ণ এক জন জাপানী মহিলাকে দার করিয়াছিলেন। জাপানী পরিবেশের মধ্যে তিনি বাস করিয়াছিলেন। জাপান ও জাপানীদের সম্বন্ধে বহু মনোজ্ঞ গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনিও তাঁর Japan An Attempt At Interpretation নামক শেষ গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন,—বহু কাল পূর্ব্বে আমার অতি-প্রিয় এক জন জাপানী বন্ধু আমায় বলিয়াছিলেন,—আরো চার-পাঁচ বৎসর পরে তুমি বুঝিবে জাপানীদের তুমি কিছু ই চেনো নাই! তখন যদি তাদের সম্বন্ধে খানিকটা সত্য-পরিচয় তুমি পাও!

জাপানীদের সঠিক পরিচয়-গ্রহণে মস্ত বাধা তাদের ভাষা! পাঁচ বৎসর জাপানে বাস করিয়া আমি ও আমার স্ত্রী কয়েকটি মাত্র জাপানী কথা শিখিয়াছিলাম। কিন্তু জাপানী ভাষায় না পারিতাম একটি কথা লিখিতে বা পড়িতে! শুধু আমাদের কথা নয়! সব বিদেশীর সম্বন্ধেই এ কথা খাটে! জাপানে আসিয়া এখানকার এক কলেজের আমেরিকান
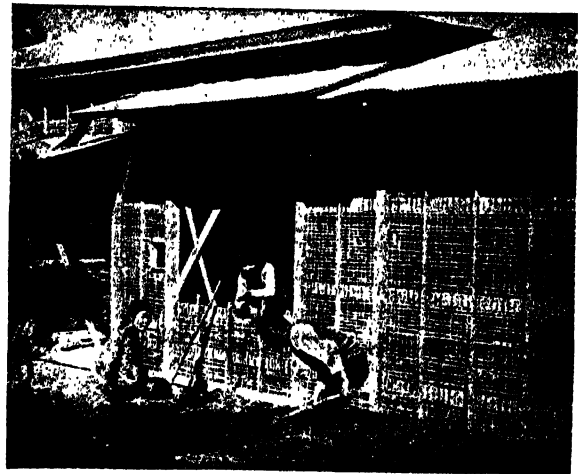
সাধারণ গৃহ

অধ্যক্ষকে (ত্রিশ বৎসর ইনি জাপানে আছেন) বলিয়াছিলাম, আমার জন্য জাপানী ভাষায় কতকগুলা কথা লিখিয়া দিতে। তিনি আমায় বলিয়াছিলেন, আমি জাপানী ভাষার এক বর্ণ পড়িতে পারি না! জাপানী ভাষায় কথা বলি, কিন্তু লিখিতে পারি না!

জাপানীরা কিন্তু ইংরেজী ভাষা ভালো করিয়া শেখে এবং ইংরেজী ভাষা শিখিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতাকে তারা আজ

একেবারে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে। জাপানী ভাষায় তারা বহু ইংরেজী কথাকে 'আপন' করিয়া লইয়াছে। টকি-ছবি জাপানী ভাষায় হইয়াছে 'টোকি'; 'ডিপার্টমেন্ট' হইয়াছে 'ডিপাটো'; 'মডার্ণ গার্ল'—মোগা; 'মডার্ণ বয়' —মোবো। ইংরেজী high collar জাপানীতে হইয়াছে "হাইকারা"; 'ওভারকোট'—ওবা; রুমাল বা হ্যাণ্ডকারচিফ হইয়াছে হাঙ্কেচি; 'কেক্'—কেকি; rice curry রাইস্কারি।

পাশ্চাত্য আচার-রীতি এবং পোষাক-পরিচ্ছদও জাপানীরা সমাদরে গ্রহণ করিয়াছে। জাপানীরা বলে, আড়াইশো বৎসর পূর্ব্বে তারা ছিল কূপমণ্ডুক; জাপান ছাড়া দুনিয়ায় আর কোনো-কিছুর সঙ্গে তাদের পরিচয় ছিল না। এখন সে কূপমণ্ডুকত্ব ঘুচিয়াছে।
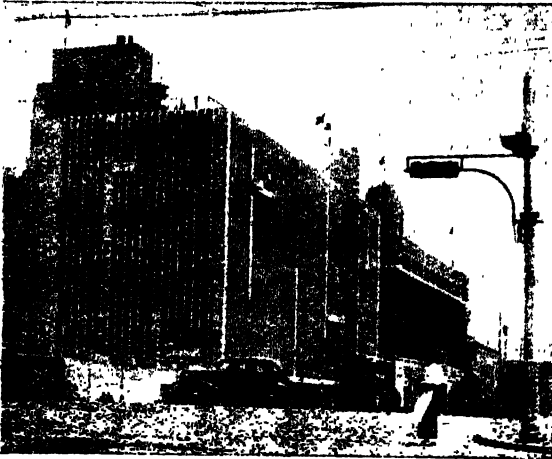
আধুনিক বিপণী (বোমায় ভয় নাই !)—ওশাকা

লেখক বলিতেছেন—জাপানীরা প্রথম যখন পাশ্চাত্য রীতিনীতি, বেশভূষা ও সভ্যতার অনুকরণ সুরু করে, য়ুরোপীয়ান এবং মার্কিণরা তখন অনেকখানি গর্ব্ব ও আত্ম-প্রসাদ বোধ করিয়াছিল। কাচ দেখিয়া জাপানীদের বিস্ময়-চমকের অন্ত ছিল না! টেলিগ্রাফের তারের পানে চাহিয়া অবাক্ হইয়া ভাবিত, ও-তারের মধ্য দিয়া কি করিয়া খবর যায়? কেহ বলিত, ফাঁপা তার—তার মধ্য দিয়া খবর পাঠানো হয়। কেহ-বা বলিত—তার টানিয়া এদিক্কার খবর ওদিক্ হইতে সংগ্রহ করে! অনেকে তার কাটিয়া ছিঁড়িয়া সত্য-নির্দ্ধারণের প্রয়াস পর্য্যন্ত পাইয়াছিল। প্রথম যখন জাপানে টেলিফোন প্রবর্ত্তিত হয়, রাগিয়া অনেকে বলিয়াছিল, বাঃ! বক্তার মুখের কথা বহিয়া কলেরা এবং নানা রোগের ছোঁয়াচ আসিয়া লাগুক! তার পর শুধু আচার-রীতি বেশভূষা নয়, জাপানীরা পাশ্চাত্য যন্ত্রতন্ত্র কল-কব্জার নকল করিতে উদ্যোগী হইল; প্রথমে বহু গলদ ঘটিয়াছিল। ষ্টীমার তৈয়ারী করিয়া জলে দিবামাত্র সে ষ্টীমার উল্টাইয়া গেল! নূতন-তৈয়ারী বয়লার ফাটিয়া লঙ্কাকাণ্ড ঘটিল। তার পর ষ্টীমার-জাহাজ যদি বা ভাসিল তো ক্যাপটেন সে ষ্টীমার-জাহাজ থামাইতে জানে না! ষ্টীমার-জাহাজ তীরে লাগিয়া চূর্ণ হইয়া গেল! তবু উদ্যোগ কমিল না। এবং সে উদ্যোগ ক্রমে সিদ্ধিতে পরিণত হইয়াছে।

ম্যাঞ্চেষ্টারের মিল দেখিয়া জাপানীরা তুলা হইতে সূতা কাটিতে শেখে। তার পর জাপানে তাঁত বসিল, মিল বসিল; এবং জাপানীরা ধুতি-সার্ট তৈয়ারী করিয়া লক্ষ লক্ষ ডজন হিসাবে নানা দেশে সে সার্ট চালান দিতে লাগিল। প্রায় জলের দামে সে সব সার্ট বিক্রয় করিল।

এবং এমনি উদ্যোগ-অধ্যবসায়ের মধ্যে টয়োডা নামে এক জাপানী খুব ভালো তাঁত গড়িয়া তুলিলেন। সে তাঁতে জটিলতা নাই! সে তাঁত চালানো সহজ; এবং তাহাতে খরচ কম। বহু জাপানী স্ত্রী-পুরুষ লাঙ্কাশায়ারে এবং ম্যাঞ্চেষ্টারে গিয়া তাঁতের যন্ত্র দেখিয়া ভালো করিয়া কাজ শিখিয়া দেশে ফিরিল। লাঙ্কাশায়ারের মিলে একটি মেয়ে-শিল্পী যে ক্ষেত্রে আটটা মেশিন পরিচালনা করে, জাপানে এক জন মেয়ে-শিল্পী সে ক্ষেত্রে ষাট্টি মেশিন পরিচালনা করে। জাপানীর কর্ম্মপটুতা এত বেশী! সুতরাং জাপানী মিলে লাঙ্কাশায়ারের চেয়ে কাজও হয় প্রায় আট-গুণ বেশী।

ক' বৎসর পূর্ব্বে জাপানী কাপড়ে পৃথিবীর বাজার ছাইয়া গিয়াছিল। তখন লাঙ্কাশায়ারের বহু মিলওয়ালা জাপানের কর্ম্ম-শক্তির অনুশীলনের জন্য জাপানে গিয়া-ছিলেন; এবং টয়োডা-প্রবর্ত্তিত তাঁতের উৎকর্ষে মুগ্ধ হইয়া জাপানী তাঁত কিনিয়া লাঙ্কাশায়ারের মিলে আনিয়া বসাইয়াছেন।

জাপান কিন্তু টয়োডার তাঁত লইয়া নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকে নাই! সে তাঁতের আরো উৎকর্ষ কি করিয়া হয়, সে সম্বন্ধে সমানে তাদের সাধনা চলিয়াছিল! এবং এ সাধনা ব্যর্থ হয় নাই। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতে তুলা কিনিয়া মাশুল দিয়া সে তুলা জাপানে লইয়া যাইত; তার পর সেই তুলায় কাপড় তৈয়ারী করিয়া ভারত-সরকারকে ডিউটি দিয়া সে-কাপড় ভারতবর্ষে পাঠাইয়া যে-দামে সে সব কাপড় বিক্রয় করিয়াছে,

তাহা দেখিয়া লাঙ্কাশায়ার হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল! জাপানের এ সাফল্যে পৃথিবীর কাপড়ের বাজার দুর্দ্দিনের আশঙ্কায় কম্পান্বিত হইয়াছিল!

রেশমের ব্যবসায়ে জাপানীদের কোনো জাতি পরাভূত করিতে পারে নাই। পৃথিবীতে যত সিল্ক ব্যবহার হয়, তার শতকরা ৭০ ভাগ ছিল্ জাপানী সিল্ক! ইহার কারণ শুধু যে জাপানে প্রচুর গুটি মেলে তা নয়; জাপানীরা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গুটি পালন করিতেছে; জেলায়-জেলায় গুটি পাঠাইয়া গুটির চাষ বাড়াইয়া তুলিয়াছে এবং প্রতি জেলায় তাঁত আর মিল বসাইয়া অজস্র ভাবে সিল্ক তৈয়ারী করিতেছে!

জাপানী সিল্কের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়া পাশ্চাত্য জগৎকে শেষে রেয়ন্ বা নকল সিল্ক তৈয়ারী করিতে

রাজ-প্রাসাদ-সন্নিহিত সেতুকে জাপানী প্রজাদের প্রণতি

হয়। রেয়নের আবিষ্কারে প্রথমে জাপান শঙ্কিত হয়, কিন্তু অনতিকাল মধ্যে জাপানও রেয়ন-রচনায় নৈপুণ্য-লাভ এবং রেয়নের তাঁত-মিল প্রতিষ্ঠা করিয়া পাশ্চাত্য জগৎকে এদিকেও পরাভূত করিয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত জাপান হইতে যত নকল সিল্ক দেশ-বিদেশে চালান যাইতেছিল, আর কোনো দেশ হইতে তত নয়। পাটের চাষেও জাপান আজ বৈজ্ঞানিক কৌশলে সকলের পুরোবর্ত্তী।

শুধু পাট বা সিল্ক কিম্বা সূতির কাপড়ের ব্যবসা নয়, টোকিও হইতে কোবি পর্য্যন্ত বিচরণ করিলে জাপানকে শিল্প-বাণিজ্য-কেন্দ্র ছাড়া আর-কিছু বলিয়া মনে হইবে না! শূন্য-পথ দিয়া যদি কোনো শত্রু কোনো দিন জাপানকে বিপর্য্যস্ত করিতে যায় তো কোবি হইতে টোকিয়ো পর্য্যন্ত শুধু বোমা-নিক্ষেপ! চকিতে জলবিম্বের মতো জাপানের সমৃদ্ধির বিলোপ ঘটিবে! এবং এ প্রলয়-সাধনে সময় লাগিবে তিন ঘণ্টা মাত্র!

কিন্তু শূন্য-পথ হইতে টোকিয়োর উপরে কয়েকটি বোমা ফেলিলেই যে জাপান ভস্মসাৎ হইবে, এ ধারণা ভুল! কারণ, নীচে সারা সহর যেন অসংখ্য চক্র-গণ্ডীতে ভাগ করা। প্রত্যেকটি গণ্ডীর চারি দিকে চওড়া রাস্তা, না হয় নদী বা খালের সীমানা রচিত আছে। বোমা-নিক্ষেপে এক একটা চক্র-গণ্ডী বিপর্য্যস্ত হইলেও অন্যগুলি অক্ষত থাকিবে—চক্র-গণ্ডী-রচনায় জাপানীরা এমন কৌশল করিয়াছে! গত-বারের সেই করাল-রূপী ভূমিকম্পের পর এ-ভাবে চক্র-গণ্ডী রচিত হইয়াছে।

বারুদ-কামান-বন্দুকাদি নির্ম্মাণের জন্য যে সব বিরাট্ অস্ত্রশালা, সেগুলি আছে নাগোয়া, ওশাকা এবং কোবিতে। এ-সব অস্ত্রশালা এবং এখানকার প্রত্যেকটি শিল্প-কেন্দ্র পাশ্চাত্য আদর্শে রচিত হইয়াছে। এই অনু-করণ-পটুতার জন্য একটা কথা প্রবাদ-বাক্যের মত চলিত হইয়াছে—The Japanese copy everything, invent nothing (জাপানীরা সব-কিছুর নকল করে, কোনো কিছু উদ্ভাবনী-কৌশলে আবিষ্কার করিতে জানে না)।

কিন্তু গত দশ-বিশ বৎসরে জাপানীরা এ বাক্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে। জাপানের রাজকীয় পেটেণ্ট-বুরোয় বছরে হাজার-হাজার নব নব আবিষ্কারের বহু পেটেণ্ট রেজিষ্ট্রী হইতেছে। বছরে এই সব নবাবিষ্কৃতের সংখ্যা বিশ হাজারের কম নয়। য়ুরোপ এবং আমেরিকা সাগ্রহে এবং সকৌতূহলে জাপানের এ নবাবিষ্কার লক্ষ্য করিতেছে।

জাপানীরা এক-রকম চুম্বক-ইস্পাত তৈয়ারী করিয়াছে—সে-ইস্পাতে পৃথিবীর বৈদ্যুতিক যন্ত্র-জগতে যুগান্তর ঘটিয়াছে! তাছাড়া যে টাইপ-রাইটার যন্ত্রে ২৬টি মাত্র ইংরেজী অক্ষর,—সেই টাইপ-রাইটারে প্রায় হাজার হাজার বর্ণমালা জুড়িয়া জাপান সারা পৃথিবীকে বিস্ময়-চকিত করিয়া দিয়াছে! তার উপর বাড়ীতে ব্যবহারের জন্য ক্ষুদ্রকায় টকি-প্রোজেক্টর; গৃহের জন্য টেলিভিশন-শেট; চোখ ঝলশানি-নিবারক নূতন বৈদ্যুতিক আলোর বাল্ব; সর্ব্বদিকে-সঞ্চরমান মোটর-গাড়ীর শক্তিমান হেড্ লাইট; ডিম ভালো কি মন্দ পরীক্ষা করিবার যন্ত্র; বাসি ও গলা ভাত হইতে গৃহ-নির্ম্মাণের উপযোগী মশলা; সেকেণ্ডে ৬০০০০ এক্স্পোজার হয় এমন জাতের মুভি-ক্যামেরা; আর অতি-সুলভ মোটর গাড়ী তৈয়ারী করিয়া জাপান অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখাইয়াছে।

টোকিয়োর এঞ্জিনীয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা-বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর কিনোশিটা বলেন—পাশ্চাত্য জগতের কাছ হইতে জাপান অনেক-কিছু শিখিয়াছে ; এবং যে-শিক্ষা পাইয়াছে, তার দাম সুদ-সমেত সে এখন পাশ্চাত্য জগৎকে চুকাইয়া দিতে চায় ! শব্দে ইনি যুগান্তর আনিতেছেন। বহু উর্দ্ধলোকে যে-শব্দের সৃষ্টি, সে-শব্দ আমরা যাহাতে এই মাটির পৃথিবী হইতে শুনিতে পাই, ডক্টর কিনোশিটা বৈজ্ঞানিক আজ এমন রঙ তৈয়ারী করিয়াছেন, যাহা একশো বছরে মলিন হইবে না বা ঝরিয়া-খশিয়া যাইবে না ! এমন সিমেণ্ট তৈয়ারী করিয়াছে, সে-সিমেণ্ট ফাটিতে জানে না ! বৈদ্যুতিক অর্গান তৈয়ারী করিয়াছে, হাতের স্পর্শ না লাগাইয়া শুধু বাতাসে হাত চালাইলে সে পিয়ানোর সুর-ঝঙ্কার তোলে !

জাপানের পূর্ত্ত-বিভাগ এমন বৈজ্ঞানিক কৌশলে

মিলিটারী-সাজে ছেলেদের পার্ব্বণ-প্যারেড

তক্তায় ফেলিয়া কাপড়-ইস্ত্রী ; মেয়ে-খরিদ্দারের পিঠে শিশু

তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন। গুপ্ত-সঙ্কেতের কাজে তাহা হইলে আশ্চর্য্য রকম সুবিধা ঘটিবে ! এই বিশ্ব-বিদ্যালয়টি পৃথিবীতে অভিনব। এ শিক্ষায়তনে কোনো বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় না। এ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একমাত্র কাজ—গবেষণা-অনুশীলন এবং নব নব সৃষ্টি ! এ বিশ্ব-বিদ্যালয় এমন 'বয়া' (buoy) তৈয়ারী করিয়াছে, প্রচলিত এই সব বয়ার সঙ্গে যার তুলনা হয় না ! এই নূতন জাপানী বয়ার জন্য তৈল, গ্যাস বা বৈদ্যুতিক বাতির কোনো প্রয়োজন নাই ; নিয়ন-টিউব হইতে এ বয়ায় যে-আলোক সঞ্চারিত হয়, সে-আলো নিবিড়-ঘন কুয়াশা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া পরিষ্কার প্রতিভাত হইতেছে। তাছাড়া জাপানী জাপানের ঘর-বাড়ী কারখানা প্রভৃতি তৈয়ারী করিতেছে যে ডক্টর কিনোশিটা বলেন, শূন্যপথে শত্রু আসিয়া জাপানকে আক্রমণ করিতে পারে, এজন্য সহরের বাড়ী-ঘর এমন ভাবে তৈয়ারী হইতেছে যে, কোনো বমারের সাধ্য নাই সে বাড়ী-ঘরের এতটুকু অনিষ্ট সাধন করে ! পূর্ত্ত-বিভাগে এই অলৌকিক অঘটন ঘটাইয়াছেন ডক্টর তানিগুচি। প্রবল ভূমিকম্পেও এ সব বাড়ী-ঘর পড়িয়া গুঁড়া হইবে না !

লেখক বলিতেছেন—জাপানের দোকানদার কুলি-মজুর পর্য্যন্ত—দু'টি চোখের একটি চোখের দৃষ্টি রাখিয়াছে ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর, আর এক চোখের দৃষ্টি রাখিয়াছে

আন্তর্জাতিক পলিটিক্সে ! ডক্টর কিনোশিটা বলেন—আমাদের প্রথম পরিচয়,—আমরা জাপানী; তার পর আমরা বৈজ্ঞানিক ! We are scientists second. First we are Japanese.

জাপানী বিজ্ঞানের মস্ত বৈশিষ্ট্য এই যে, জাপানের বিজ্ঞান শুধু জাপানের জন্য—সে বিজ্ঞান পৃথিবীর জন্য নয় ! বিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য, পলিটিক্সের খবর না রাখিয়া মানুষের

তৈয়ারী করিতেছে মাখন-শীমের খোশা হইতে; ফনোগ্রাফের নীড্‌ল্ তৈয়ারী করিতেছে বাঁশ হইতে; লোহের অভাবে কার্ডবোর্ড এবং গাছের ছাল হইতে তৈয়ারী করিতেছে বাইসিক্‌ল্; পেট্রলের অভাবে জাপানে আজ মোটর-গাড়ী চলিতেছে কয়লার জোরে !

জাপান যে নকল মুক্তা তৈয়ারী করিয়াছে, দেখিলে কে বলিবে, এ মুক্তা আসল নয় ! অথচ এই নকল মুক্তার

শিকারী বাজ-পাখী

তরুণ সমর-শিক্ষার্থী—পরীক্ষায় ফেল হইলে 'হারা-কিরি' করিবে

জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করা। জাপান এ কথা মানে না ! জাপানের অতি-বড় বৈজ্ঞানিক যিনি, তিনিও বলেন, সম্রাট্ জন্মিয়াছেন সূর্য্যের অংশে; সম্রাট্ দেবতার অংশ-সম্ভূত; এবং স্বর্গ হইতে তিনি পাইয়াছেন পৃথিবীর শাসন-পালনের ভার !

এ যুদ্ধে জাপানে বৈজ্ঞানিক-আবিষ্কারের মাত্রা বাড়িয়া গিয়াছে ! লৌহ-পিতল ও তামার অভাব—গাছের পাতা-ঘাস প্রভৃতি বাজে জিনিষ হইতে জাপান আজ তৈয়ারী করিতেছে রেডিয়ো-শেট, দরজার হাণ্ডেল, কব্জা, পেরেক প্রভৃতি। চীনা-বাদামের খোশা এবং সামুদ্রিক গুল্ম-লতাদি হইতে তৈয়ারী করিতেছে নকল ফেল্ট; পশম

দাম জাপানে প্রায় এক পয়সার সামিল। এ নকল মুক্তা সৃষ্টি করিয়াছিলেন সিকিমাটো নামে এক জন জাপানী বণিক্। মুক্তা-কীট (oyster) ধরিয়া তার দেহ-মধ্যে মাদার-অফ-পার্ল ভরিয়া অয়েষ্টারকে আবার জলে ফেলিয়া দেওয়া হয়। জীবন্ত অয়েষ্টারের দেহ-রসে নকল মুক্তার গায়ে যে লালা জমে, তাহারি দৌলতে নকল মুক্তা হয় কঠিন এবং তাহাতে শুভ্র-দীপ্তি উজ্জ্বল হইয়া ফোটে ! এ আবিষ্কারে পাশ্চাত্য জগৎ স্তম্ভিত হইয়াছে। জাপানে আজ মহা-সমারোহে এই নকল মুক্তার কারবার চলিতেছে। কারখানায় অজস্র জলাশয় আছে। সেই সব জলাশয়ে মেয়ে-ডুবুরীরা ডুব দিয়া বিশ ফুট নীচে হইতে পালিত অয়েষ্টার তুলিয়া আনে; তার পর

প্রত্যেকটি অয়েষ্টারের দেহে নকল মুক্তা ভরিয়া সে অয়েষ্টারকে আবার জলাশয়ে ফেলা হয়। আট বৎসর পরে নকল মুক্তা আসলের রূপ আর শ্রী লইয়া আসলের আসন-অধিকারের যোগ্যতা লাভ করে।

সমরায়োজনের প্রারম্ভে লেখকের সঙ্গে এক জন জাপানীর যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা বেশ কৌতুকাবহ।

লেখক বলিয়াছিলেন—তোমাদের চেয়ে আমাদের নৌ-বল অনেক বেশী, বিরাট্ এবং শক্তিমান্।

উষ্ণ প্রস্রবণ—বেপু। গরম-জলের তাপে ডিম-সিদ্ধ

বাসে মেয়ে-কণ্ডাক্টর—ব্যবহারে খুব শিষ্ট ও বিনয়ী
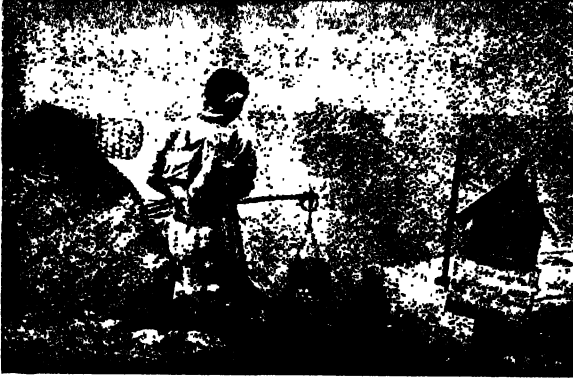
তাছাড়া ওয়াটার-কলার চিত্রাঙ্কনে, ল্যাকারের কাজে, এম্‌ব্রয়ডারির কাজে, বামন-গাছের উদ্ভাবনায়, ট্রের গায়ে নিসর্গ-দৃশ্যাদি অঙ্কনে এবং আরো অনেক ললিত-শিল্পে জাপানী জাতের পটুতার কথা বিশ্ব-প্রসিদ্ধ।

উত্তরে জাপানী বলিয়াছিল—কিন্তু আমাদের একখানা জাহাজে যে কাজ হইবে, সে কাজে তোমাদের ছ'খানা জাহাজ লাগে।

—তার অর্থ ?
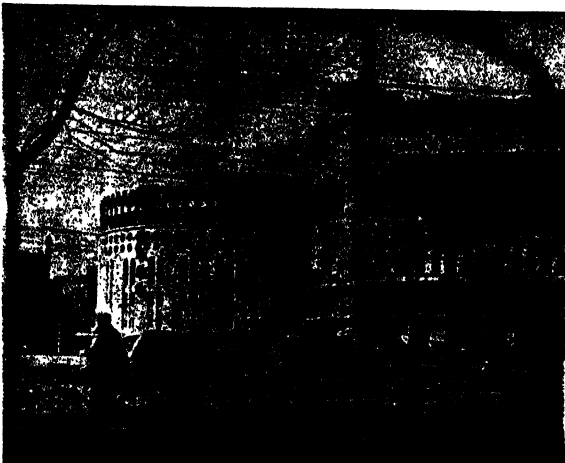
"আসাহি" খবরের কাগজের অফিস—টোকিয়ো। এ কাগজের গ্রাহক-সংখ্যা বিশ লক্ষ

সিনেমা-হাউস—য়োকোহামা

সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতে যে জাতির এমন অসাধারণ শক্তি, সে জাতি আজ অসুরের মন লইয়া বিশ্ব-সংহারে মাতিয়াছে —ইহাতে বিস্ময় এবং পরিতাপের সীমা নাই !

—জাপানীরা আকারে বাঁটুল। ডেকের ছ' দিকে তোমাদের আট ফুট উঁচু জায়গা রাখা চাই—নহিলে দীর্ঘকায় সেনার মাথা ঠুকিয়া যাইবে। আমরা বাঁটুল—ডেক ছ' ফুট উঁচু হইলেই চলিবে। তাহা হইলে একখানি জাহাজে

তোমাদের লোক যে-জায়গা দখল করিবে, সে জায়গায় আমাদের লোক ধরিবে তার দ্বিগুণ।

জার্ম্মাণীর কাছে জাপান বিমান-বিহারী বিদ্যা শিখিয়াছে। জার্ম্মাণীর কাছে শিখিলেও জাপানীর বিদ্যা হইয়াছে গুরু-মারা! জাপানী টর্পেডো-প্লেনের শক্তি পৃথিবীতে না কি অতুলনীয়।

তার উপর জাপানীরা আশ্চর্য্য কষ্ট-সহিষ্ণু। যে ঘরে তারা বাস করে, সেগুলা যেন ইঁদুরের গর্ত্ত। যা-তা খাইয়া তারা বাঁচিতে পারে—সুস্থ থাকে। তারা যে ভাবে বাস ও খাওয়া-দাওয়া করে, পৃথিবীর আর কোনো জাতি বোধ হয় তাহাতে বাঁচিতে পারে না।

বোমা-বারণ বাড়ীর কাঠামো—টোকিয়ো। ডক্টর তানিগুচির আবিষ্কার

• মুক্তা-কীটের দেহে মাদার-অফ-পার্ল ভরা

লেখক বলিতেছেন—জাপানে দেখিয়াছি, বেশীর ভাগ ঘরে ছ্যাচা-কঞ্চির দেওয়াল; সেই ছ্যাচা-কঞ্চির গায়ে পুরু করিয়া মাটির প্রলেপ দেওয়া হয়। মাটি শুকাইলে তার উপর পাৎলা তক্তা আঁটিয়া দেয়। দ্বার-জানলা তৈয়ারী হয় মোটা কাগজ দিয়া। শীতকালে দ্বার-জানলা বন্ধ করিয়া ঘরের মধ্যে পড়িয়া থাকো! গ্রীষ্মের সময় দ্বার-জানলা খুলিয়া দিয়া হাওয়া খাও! শয়ন করো মেঝেয় চ্যাটাই পাতিয়া—ভোজন হাঁটু-ভোর উঁচু টেবিলে ভোজনপাত্র রাখিয়া।

শীতে কম্বল-মুড়ি

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে জাপানে দারুণ ঝড় হয়। সে ঝড়ে এক লক্ষ পাঁচ হাজার ছ'শো সাতান্নখানি ঘর উড়িয়া যায়; সঙ্গে সঙ্গে তিন হাজার লোকের মৃত্যু এবং আট হাজার লোক জখম হয়। তাছাড়া বহু স্কুল-ঘরের অপমৃত্যু, সেতুভঙ্গ ও বন্যা হয়।

একে ঐ-সব ঘরে বাস করায় স্বাচ্ছন্দ্য নাই, তার উপর আছে ইঁদুর আরশুলা এবং মশার প্রবল উৎপাত। কাজেই

মেয়েরা পেট্রোল বেচিতেছে

মানুষ বেশ শক্ত-সমর্থ হইয়া ওঠে, কোনো কষ্টকে কষ্ট বলিয়া মনে করে না! এই কারণে যুদ্ধে বাহির হইয়া জাপানী ফৌজ কোনো-কিছুতে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিয়া কাতর হইতে জানে না—তাদের শক্তিও থাকে অব্যাহত, অটুট!

জাপানীদের মমতা-হীনতার কারণ, জাপানীর কাছে মানুষের প্রাণের কোনো দাম নাই! আমরা দেশের জন্য জীবনকে রক্ষা করিতে চাই। জাপান এ-কথার অর্থ বোঝে না। জাপানীরা দেশের জন্য মরিতে জানে! কাজেই যার কাছে নিজের প্রাণের দাম নাই, অপরের প্রাণের দাম বুঝা তার পক্ষে সঙ্গত নয়। তার উপর ছেলেবেলা হইতে জাপানীরা শিক্ষা পায়, ব্যষ্টিগত জীবনের কোনো দাম নাই; সমষ্টিই সব! ব্যষ্টি ভুয়া!

তাই জাপানীরা যা-কিছু করে, মিলিয়া-মিশিয়া করে। ইংরেজীতে যাকে বলে team work—জাপান সেই টীম-ওয়ার্কে পটু।

জাপানের সম্রাট্ মানুষ নন—ঈশ্বরের অংশ-সম্ভূত—অতএব সম্রাট্ স্বর্গের দেবতা! রাজ্য কিন্তু মন্ত্রী-সেনাপতিরা পরিচালনা করেন। এ-ব্যাপারে কোনো কর্ম্মচারী বা মন্ত্রী যদি বিশিষ্ট শক্তিমান্ হইয়া ওঠেন, তাহা হইলে তাঁর অপঘাত-মৃত্যু অনিবার্য্য।

আত্মহত্যা করিতে জাপানী স্ত্রী-পুরুষ এক-মুহূর্ত্ত দ্বিধা বা কিন্তু-বোধ করে না। যদি মনে হয়, না, কাহারো সঙ্গে খাপ খাইতেছি না, তখনি গিয়া উঠিবে আসামা আগ্নেয়-গিরির মা থা য়—সে খা ন হইতে ঝাঁপ খাইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিবে! তার উপর পরাজয় বা গ্লানি ঘটিলেই আত্মহত্যা—জাপানে নিত্য কত ঘটিতেছে, তার সংখ্যা নাই! যুদ্ধে বন্দী হইলে আত্মীয়-বন্ধুরা লজ্জা পাইবে, এ জন্য বিপদ-কালে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন না করিয়া জাপানী সেনা আত্মহত্যা করে। এ আত্মহত্যার নাম হারা-কিরি!

জাপানীরা প্রাণের দাম বোঝে না—এ সত্য ভীষণ ভাবে প্রতিফলিত দেখা যায় জাপানের কল-কারখানায়। কম মাহিনায় হাড়ভাঙ্গা খাটুনি আদায় করা—জাপানীদের তাহাতে বাধে না।

শিল্প-বিজ্ঞানে জাপানের শ্রীবৃদ্ধি শুধু যে জাপানী শিল্প-পটুতার গুণেই ঘটিয়াছে, তাহা নহে। এত কম মাহিনায় জাপানী শ্রমিকদের কাজ করিতে হয় যে, পারিশ্রমিকের সে-হারের কথা শুনিলে এ যুগে স্তম্ভিত হইবার কথা! তার উপর শ্রমিকদের খাটিতে হয় সপ্তাহে ৪০ বা ৪৮ ঘণ্টার নিয়মে নয়—সপ্তাহে ষাট্ হইতে একশো ঘণ্টা করিয়া
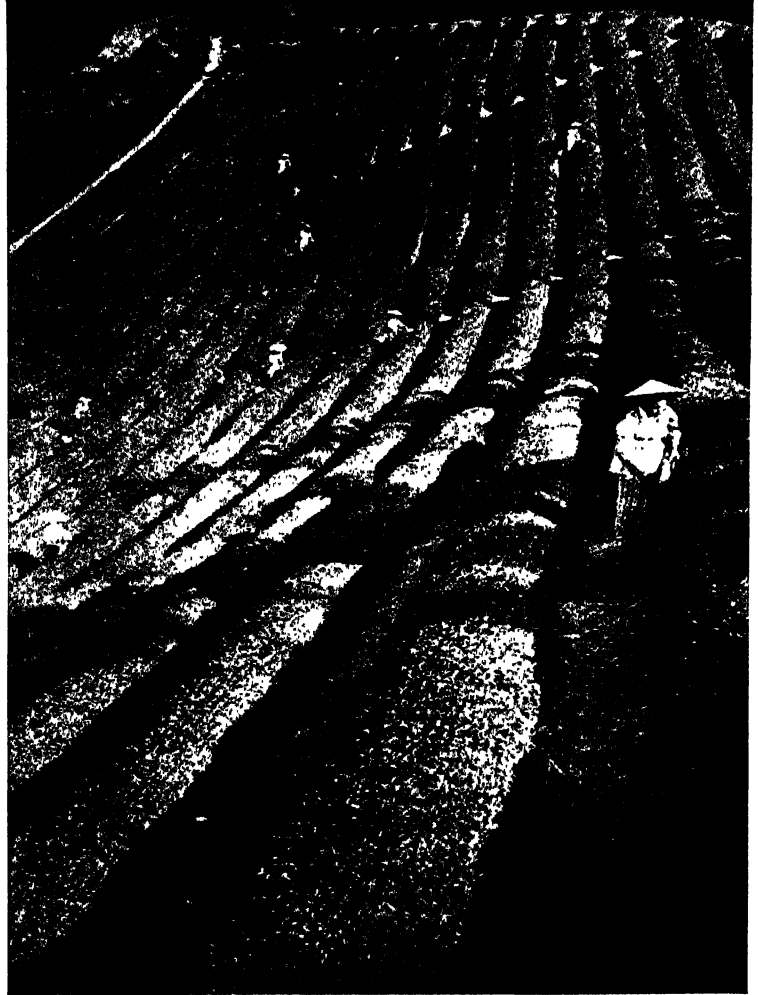
চায়ের ক্ষেত—সিজুয়োকা

তাদের খাটানো হয়। এবং সেই সঙ্গে তাদের উপর ধনিক সম্প্রদায়ের আরো নানা রকমের চাপ ও কষাকষির বাঁধন আছে। এ দুর্গতি মোচনের জন্য শ্রমিকরা এক বার সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছিল; কিন্তু সে সঙ্ঘ-বন্ধন শাসন-যন্ত্রের চাপে নিমেষে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়।

চীনা যুদ্ধের সময় হইতে কল-কারখানার যা-কিছু কাজ

মেয়েরা করিতেছে—পুরুষের দল যুদ্ধে গিয়াছে। কারখানার মালিকের দল জাপানের পল্লীগ্রামগুলি উজাড় করিয়া মেয়ে-কারিগর আনিতেছে।

লেখক লিখিতেছেন, ইবারাতি নামে একখানি গ্রামে গিয়াছিলাম। সে-গ্রামে একটিও তরুণ জোয়ান পুরুষ বা তরুণী দেখি নাই। প্রশ্ন করিয়া জানিলাম, তরুণরা গিয়াছে যুদ্ধে—তরুণীরা গিয়াছে নানা সহরে কারখানায়। গ্রামে-গ্রামে কারখানা-সমূহের এজেন্ট আছে। তাদের লক্ষ্য মেয়েদের দিকে। চৌদ্দ বছর বা তদূর্দ্ধ বয়সের মেয়ে দেখিলেই এজেন্টরা গিয়া মা-বাপ ও অভিভাবকের সঙ্গে দেখা করে; মেয়েদের বেতন ঠিক করে—ঠিক করিয়া মা-বাপের হাতে তিন বৎসরের মাহিনা আগাম চুকাইয়া দেয়। দরিদ্র পরিবারের পক্ষে একসঙ্গে এতগুলি টাকার লোভ সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হয় এবং এজেন্টরাও খুশী-মনে মেয়ে লইয়া সহরের কারখানায় চালান দেয়। মেয়ের হয়তো অনিচ্ছা—তবু উপায় নাই! যে সব কারখানায় কাজ করিতে হয়, সেগুলায় আলো-বাতাসের বালাই নাই! কদর্য্য ভোজন, মেঝেয় শুইয়া রাত্রি-যাপন। তার ফলে শতকরা পঞ্চাশটি মেয়ের শরীর হয় অসুস্থ; কাজে তারা হয় অপটু। কত মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারে এমনি করিয়া যক্ষ্মারোগের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে, তার ইয়ত্তা নাই!

রাজ্য-প্রতিষ্ঠা-পর্ব্বে অফিসারদের সঙ্গে অফিসার-পুত্রদের প্যারেড

ইহার উপর কারখানায় নিত্য এ্যাকসিডেণ্ট ঘটিতেছে! যুদ্ধক্ষেত্রে জাপানী ফৌজ যেমন জানিয়া-শুনিয়া মৃত্যুকে বরণ করিতে যায়, কারখানার শ্রমিকদের সম্বন্ধেও ঠিক ঐ একই বিধি! তবু ধনী মালিকদের ঘাড় ধরিয়া এ সব এ্যাকসিডেণ্ট যাহাতে না ঘটে, সে সম্বন্ধে সতর্ক সচেতন করিবার বিন্দুমাত্র প্রয়াস নাই। এক কারখানার মালিককে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় তিনি জবাব দিলেন—আমাদের শিল্পীরা নিখুঁত ভাবে কাজ করিতে চায়। সে কাজ করিতে যদি প্রাণ যায়, তারা তোয়াক্কা রাখে না!

এই যে মনোভাব, এই মনোভাবের জোরে জাপানীরা বলে—A poor nation can conquer a rich nation—(ধনী-জাতকে যুদ্ধে দরিদ্র জাত পরাস্ত করিতে পারে)। রুশ-যুদ্ধের সময় জাপান ছিল রুশের কাছে ঠিক যেন বলদের শিঙে ক্ষুদ্র মশার মতো! তবু জাপানই তো সে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিল!

জাপানের অর্থ-বল তেমন প্রচুর নয়। লোক-বলের দিক্ দিয়াও মিলিত-শক্তির তুলনায় নগণ্য! ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে

জাপানী-ক্যাবিনেট পণ গ্রহণ করিয়াছে, বিশ বৎসরের মধ্যে এশিয়ায় জাপান স্বপ্রতিষ্ঠ হইবে! জাপানের নারী-জাতিকে এ জন্য অনুজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে—ঘর-সংসার আর নিজের জীবনের দিকে না চাহিয়া শুধু ষ্টেটের প্রসার-কল্পে দাও তোমরা সন্তান—অগণিত সন্তান—Raise up sons for the State. প্রতি পরিবারে পাঁচটি করিয়া সন্তান চাই! যে-পরিবারে পাঁচটি সন্তান মিলিবে, সে-পরিবারকে রাজ-কোষ হইতে বোনাস দেওয়া হইবে!

জাপানী জাতের চক্ষু-লজ্জা নাই। কোনো বিষয়ে তাদের মনে দ্বিধা জাগে না! তারা বলে, জাপানের যাহাতে প্রসার, তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য—তাহাই আমাদের ধর্ম্ম!

স্বজাতির সঙ্গে আচারে-ব্যবহারে জাপানীরা সাধুতা রক্ষা করিয়া চলে। রাত্রে কেহ ঘর-দ্বার বন্ধ করে না—

সিনেমা-হাউস; সঙ্গে রেস্তরাঁ

অথচ দেশে চুরি-চামারির উৎপাত নাই! দোকানে জিনিষ-পত্রের দাম একেবারে নির্দ্ধারিত—এক পয়সা ঠকাইয়া লইবে, এমন প্রবৃত্তি দেখা যায় না। পলিটিক্সে ঘুষ বা গর্হিত উপায়-অবলম্বন অবিদিত। স্বজাতির সম্পর্কে

উষ্ণ-প্রস্রবণের বালুকাময় গরম-কূলে শুইয়া বাত সাবানো

প্রত্যেকে অপরের হক্ মানিয়া চলে। বিদেশীদের জন্য কিন্তু স্বতন্ত্র বিধি।

বিদেশীরা জাপানীকে তাঁদের আবিষ্কারের পেটেণ্ট বেচিতে পারেন—জাপানে গিয়া স্বতন্ত্র পেটেণ্ট রেজিষ্ট্রী করাতেও বাধা নাই! কিন্তু তাঁর নিজের মাল জাপানে লইয়া গিয়া বেচিবেন—সে জো নাই!

এক জন মার্কিন টুপিওয়ালা তাঁর তৈয়ারী টুপি জাপানে গিয়া বেচিবেন বলিয়া বিজ্ঞাপন-প্রচারে সরকারী অনুমতি চাহিয়াছিলেন—কিন্তু সে-অনুমতি তিনি পান নাই। অবশেষে এক জাপানী ফার্ম্মকে সেই টুপি তিনি বেচিতে দেন—তখন সেই জাপানী ফার্ম্মের পক্ষে টুপির বিজ্ঞাপন-প্রচারের অনুমতি-লাভে আপত্তি ওঠে নাই।

বিদেশী জিনিষের ট্রেডমার্ক কিম্বা গ্রন্থের কপি-রাইটের মর্য্যাদা জাপানে নাই! বিখ্যাত ফরাসী পুষ্প-সার আনাইয়া জাপানীরা ফরাসী ফার্ম্মের নাম মুছিয়া বেমালুম নিজেদের নামে তাহা বিক্রয় করিতেছে—তাহাতে বাধা নাই! নিষেধ নাই!

আদি অকৃত্রিম পুরানো "স্কচ্-হুইস্কি" লেবেল মারিয়া জাপানে-তৈয়ারী মদ জাপানের বাজারে বিক্রয় হইতেছে; কোবির তৈয়ারী দেশলাই 'সুইডেনে প্রস্তুত' লেবেল লইয়া বিক্রয় হইতেছে; বিলাতী জ্যামের খালি বোতলে জাপানী জ্যাম ভরিয়া বিলাতী লেবেল আঁটিয়া বিক্রয় চলিতেছে—তাহাতে জাপানী আইনে নিষেধ বা শাসন নাই!

মার্কিন যুক্ত-রাজ্যে তৈয়ারী বহু দ্রব্যের নকল জাপানের একটি পল্লীগ্রামে তৈয়ারী হইতেছে এবং সে সব দ্রব্য "মার্কিন যুক্তরাজ্যে প্রস্তুত"—এই লেবেলে বাজারে চলিতেছে বলিয়া সে পল্লীগ্রামের নূতন নাম হইয়াছে ইউ-এস্-এ (ইউনাইটেড ষ্টেট্স্ অফ আমেরিকা) !

জাপানী ভাষায় অনূদিত বিদেশী বহু গ্রন্থের অব্যাহত প্রচারের বিরুদ্ধে সে-সব গ্রন্থের মালিক কপিরাইট-আইনের আশ্রয় লইয়া জাপানে এক পয়সা খেশারৎ পান নাই !

লেখক অতঃপর জাপ-সম্রাটের প্রসঙ্গে বলিতেছেন—সম্রাটের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ভাবে বলিবার কিছু নাই। হায়ামা গ্রামে সম্রাটের গ্রীষ্মাবাস। আমরা সেই প্রাসাদের খুব কাছে বাস করিতাম। আমাদের বাড়ীর পাশে গ্রামের ছোট পোষ্ট অফিস ! খোলা জানলা দিয়া সেই পোষ্ট অফিসের ও-পাশে দেখিতাম প্রাসাদের উচ্চ পাচীর। প্রাচীরের ধারে সশস্ত্র প্রহরী। প্রাচীরের পরেই রাজ-প্রাসাদের উদ্যান। উদ্যানের তরুশ্রেণী ভেদ করিয়া প্রাসাদের চিহ্নও দেখা যাইত না ! পথে সম্রাট্ বাহির হন না। তাঁকে দেখা যায় শুধু সশস্ত্র বডিগার্ড-বেষ্টিত লিমুশিন-কারে গ্রীষ্ম-আবাস হইতে যখন তিনি টোকিয়োর প্রাসাদে যান, শুধু তখন মাত্র ! পথে একটু বেড়াইবেন বা পাহাড়ে চড়িবেন, নিসর্গ-দৃশ্য উপভোগ করিবেন —সে-অধিকার তাঁর নাই ! তাঁর দশা —মিলিটারী পাহারায় রক্ষিত বেচারী বন্দীর মতো। মিলিটারী-দল দেবতা বানাইয়া তাঁকে প্রাসাদ-কক্ষে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে এবং নিজেদের খেয়াল-বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া জাতির উপর কর্তৃত্ব করিতেছে। এই যে এত বড় সভ্যতা-বিধ্বংসী মহা-মার যুদ্ধ চলিয়াছে, এ যুদ্ধের মূলে আছে মিলিটারী-দলের উৎকট লিপ্সা ! জন-সাধারণের সঙ্গেও মনের দিক দিয়া এ যুদ্ধের যোগ নাই। অষ্ট্রেলিয়া কিম্বা ভারতবর্ষ জাপানীরা পাইল কি না পাইল—সে সম্বন্ধে তাদের এতটুকু মাথা-ব্যথা নাই ! সম্রাটের নামে যুদ্ধ—তাই তারা নিঃশব্দে এ যুদ্ধে যোগ দিয়াছে !

সম্রাট্ মনের কথা বলিবেন, সে উপায় নাই। প্রাসাদে সম্রাটের নিজস্ব টেলিফোন পর্য্যন্ত নাই ! মিলিটারী-দল তাঁকে দিয়া যে-কথা প্রচার করে, কণ্ঠে তিনি শুধু সেই কথাটুকু উচ্চারণ করেন।

জাপানীরা নিয়মের বশ। বিধি-নিয়মের শৃঙ্খল ছাড়িয়া এক পা চলিবার সামর্থ্য তাদের নাই। এ নিয়মানুবর্ত্তিতায় এক দিকে যেমন শক্তি মেলে, তেমনি আবার বিধি-নিয়মের একটু এদিক-ওদিক হইলেই বিপদ !

শিণ্টো-বন্দীদের রথ-যাত্রার পর্ব্ব

জাপানী-জাত আজো প্রাচীন-পন্থী। পাশ্চাত্য জগৎ হইতে শিক্ষা-সভ্যতা পাইলেও জাপানীরা তাদের অতীতকে আঁকড়াইয়া থাকিতে চায়। এ জন্য প্রাচ্য-পাশ্চাত্য আদর্শকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে নাই। শিক্ষায় আজো সেই প্রাচীন feudal (ভৌমিক) নীতি ত্যাগ করিতে পারে নাই; সে জন্য প্রতিহিংসা-স্পৃহা মিটাইতে তাদের নৃশংসতাও অকুণ্ঠ নির্লজ্জতার প্রকাশ পায় !

তার পর বাহিরে বৌদ্ধমতাবলম্বী বলিয়া পরিচয় দিলেও জাপান আজ কোনো ধর্ম্ম মানে না। জাপান আজ ধর্ম্ম-হীন। বুদ্ধদেবের উপর শ্রদ্ধা—সে ঐ পুঁথির

লেখায় আবদ্ধ আছে! নহিলে তাদের পূজ্য শুধু সম্রাট্ এবং পূর্ব্বপুরুষের স্মৃতি! এ পূজায় মানুষ বশ মানিতে পারে—কিন্তু ইহাতে মনুষ্যত্ব রক্ষা পায় না। যে জাতির ধর্ম্ম নাই, সে জাতির বাহুবল যত প্রচণ্ড হোক্, তার শেষ-জয়ের আশা সুদূর-পরাহত!

জাপানীর এই নির্ম্মম হিংসা ও নৃশংসতা তার সমস্ত শক্তিকে খর্ব্ব করিবে, বিচূর্ণ করিবে, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। জাপান আজ সদর্পে ঘোষণা প্রচার করিতেছে—এশিয়াকে করিব শুধু এশিয়াবাসীর স্থান—এশিয়ায় য়ুরোপীয়গণ বা আমেরিকানের স্থান হইবে না! এ-কথা শ্রুতি-মধুর হইলেও জাপানের প্রতি গ্রাম ও নগর হইতে আজ পুরুষ-মানুষের ছায়া মিলাইয়া যাইতেছে! সে জন্য গ্রামে-নগরে প্রতি পরিবারের মনে যে বিক্ষোভ জাগিয়াছে, মনে হয়, ঐ বিক্ষোভের ফলে জাপানের মিলিটারী-দলের দর্প অচিরে চূর্ণ হইবে এবং এই স্বখাত-সলিলে জাপানের সমাধি ঘটিবে!

কাব্য-আলোচনা

জ্যোৎস্না-রাতে বসন্ত-সমীরে
নীল সাগরের কোল-ঘেঁষা
বালুময় তীরে
মুক্ত দেহে নিশ্চিন্ত-শয়ন
আর নিরুদ্দেশ ভ্রমণ;
স্বপ্নময় ফুলেলী বিলাস,
কল্পনার তীব্র অনুপ্রাস;
ব্যর্থপ্রেম, হুতাশ-অনল,
বিরহের দীর্ঘ অশ্রু-জল
ছিল সে-কালের কাব্য-রস!
যদিও সরস
বটে গন্ধময় লাবনিক জল—
সেথা অশ্রু-জল
কাব্য-সহচরী।
তবু হায়, হেরি
অশ্রুজলে লবণের ধৃষ্ট-উপস্থিতি!
(এ কি কাব্য-অধোগতি?)

এ-কালের দূরবীক্ষণ-যন্ত্র
কাব্যের গোপন অস্ত্র
করে বিশ্লেষণ।
এ-কালের কাব্যে চাই কাব্যের প্রমাণ
বস্তু-বাদী কবি গায় গন্ধময় গাথা;
হোক্ কাব্য, তবু চাই
প্রামাণিক সত্য আর পরীক্ষিত কথা।
সে-কালে যারা ছিল কল্পনা-বিলাস—
তারা আজ ব্যর্থ-পরিহাস!
* * * *
কোন্ পথে চলি নাহি জানি।
তবু মানি
উপেক্ষিত, অপেক্ষিতা যারা
পৃথিবীর ইতিহাসে চির-সর্ব্বহারা,
তাদের ব্যথায় আজ শুনি কাব্য-সুর!
ঈডেন উদ্যান কোথা? কোথা ইন্দ্রপুর?

শ্রীনৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

নিমকের মর্য্যাদা

লবণ নহিলে আমাদের দিন চলে না! তরকারী-ব্যঞ্জন লবণ-বিনা মুখে রোচে না—এ কথা আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে জানি! কিন্তু লবণের

ফাটা ডিম সিদ্ধ

আখরোটের খোলা ভাঙ্গা

আরো কত গুণ আছে, সে পরিচয় জানিলে গৃহলক্ষ্মীরা নিমককে আরো মর্য্যাদা দিবেন। প্রথম,—ডিম যদি ফাটিয়া যায়, এবং সেই ফাটা ডিম যদি সিদ্ধ করিতে চান, তাহা হইলে এক কাজ করিবেন; পাত্র ভরিয়া জল লইয়া সে-জলে এক-চামচ (চায়ের চামচ) লবণ মিশাইয়া দিবেন। মিশাইয়া সেই জলে ফাটা-ডিম ছাড়িয়া দিন সিদ্ধ করিতে। লবণ-জলের গুণে ডিমের মধ্য হইতে তরল পদার্থটুকু কিছুতেই নিঃসৃত হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, মশার কামড়ে বা শুঁয়াপোকা কিম্বা বিছুটি লাগিলে যদি কোনো অঙ্গ টাটায় বা ফোলে, তাহা হইলে জলে খানিকটা বাইকার্বনেট অফ সোডা এবং তার সঙ্গে সম-পরিমাণ লবণ মিশাইয়া

কাঠের পিন্

রঙে কাপড় ছোপাইবার আগে

ক্ষত-স্থান সে-জলে সিক্ত রাখুন, তাহা হইলে ব্যথা ও ফুলা সারিবে। তৃতীয়তঃ, বাদাম কিম্বা আখরোট ভাঙ্গিবার পূর্ব্বে লবণ-জলে সারা-রাত্রি ভিজাইয়া রাখিবেন, তাহা হইলে হাতের একটু চাপ দিবা মাত্র দেখিবেন খোলা ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং ভিতরকার শাঁসটুকু গোটা ভাবে সংগ্রহ করিতে পারিবেন। চতুর্থতঃ, লোহার সামগ্রীতে যদি মরিচা ধরে কিম্বা লৌহপাত্র দাগী হয়, তবে সে পাত্রে বা সামগ্রীতে ভিজা

লবণ ছিটাইয়া কাগজের দুটি পাকাইয়া ঘষিবামাত্র দাগ ও মরিচা নিমেষে ঝরিয়া পাত্রটি ঝকঝকে হইয়া উঠিবে। পঞ্চমতঃ, শুকাইতে দিবার সময় কাপড়ে যে কাঠের পিন্ আটকানো হয়, ব্যবহারের পূর্ব্বে সেই পিনগুলি যদি লবণ-জলে চার-পাঁচ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখেন, তাহা হইলে পিন মজবুত হইবে, চট করিয়া ভাঙ্গিয়া কাজের অযোগ্য হইবে না! ষষ্ঠতঃ, রঙে কাপড় ছোপাইবার পূর্ব্বে রঙ-গোলা জলে যদি খানিকটা লবণ মিশাইয়া লন, তাহা হইলে কাপড়ের রঙ পাকা হইবে—সে রঙ ধোপে ফিকা হইবে না বা উঠিয়া যাইবে না।

ট্রাক হইতে স্থল-মাইন ফেলা

রক্ষা-কোমর-বন্ধ

যারা যুদ্ধে নামিতেছে, তাদের পক্ষে জখম লাগা খুব স্বাভাবিক। ছোট-খাট জখম লাগিলে অপরের মুখাপেক্ষী না হইয়া আপনা হইতে যাহাতে সে সব জখমের দাগ্‌রাজি চলে, সে-কারণে প্রত্যেক সেনার জন্য ফার্ষ্ট-এড কোমর-বন্ধ তৈয়ারী হইয়াছে। লম্বা ব্যাগের আকারে এ কোমর-বন্ধ নির্ম্মিত হইয়াছে। ব্যাগের মধ্যে থাকে নানা আকারের নানা ছাঁদের ব্যাণ্ডেজ; আঁটিবার ফিতা (টেপ); কাঁচি; গায়ে চামড়ায় দাগ আঁকিবার উপযোগী পেন্সিল; নোট-পেন্সিল; এবং বিবিধ ঔষধ। এ ব্যাগ কোমর-বন্ধের মতো কোমরে
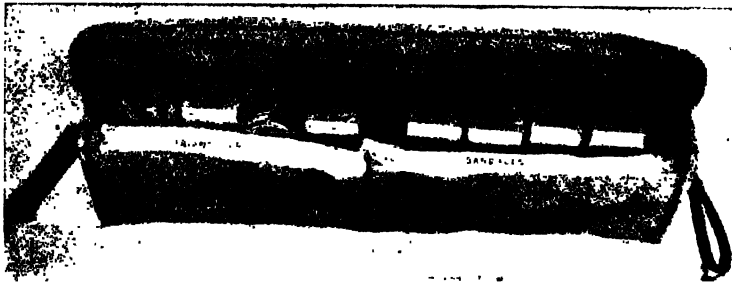
কোমর-বন্ধ

আঁটা থাকে। প্রয়োজন ঘটবামাত্র ক্ষিপ্র হস্তে ব্যাগ খুলিয়া ব্যাণ্ডেজ কিম্বা ঔষধাদি লইয়া জখমী জায়গায় তাহা যথারীতি প্রয়োগ করা চলে।

ট্যাঙ্ক ধরিবার ফাঁদ

শত্রুর ট্যাঙ্ক বা সেনার অগ্র-গতি রোধ এবং তাদের ধ্বংস-সাধনের জন্য যেমন জলের বুকে, তেমনি ডাঙ্গার জন্যও 'মাইন' তৈয়ারী হইয়াছে। মার্কিন যুক্ত-রাজ্যের উদ্ভাবনী-কৌশলে এই স্থল-মাইনের সৃষ্টি। ট্রাকে তুলিয়া এ সব মাইন বহিয়া শত্রুর গতি-পথে অনায়াসে ভূগর্ভে তাহা রক্ষা করা যায়। এ সব মাইন মানুষের বা গাড়ীর ঈষৎ স্পর্শ পাইলেই ফাটিয়া কালান্তক-মূর্ত্তি ধারণ করে! একটির উপর আর-একটি, তার উপর আর-একটি অর্থাৎ তিন-চারিটি করিয়া উপরি-উপরি স্থাপন করা যায়। ভূমির বুকে মাইন রাখিয়া পত্র-পল্লবের আবরণে তাহা আচ্ছাদিত রাখা হয়। এ ফাঁদে পা পড়িলে বিপক্ষের ট্যাঙ্ক বা ফৌজ—কাহারো আর রক্ষা থাকে না!

মেঘনাদী অস্ত্র

এবারকারের এ প্রলয়-যুদ্ধে শূন্য-পথই যুদ্ধ জয়ের আসল পথ! রণ-তরী আজ যেমন মস্ত সহায় নয়, তেমনি অশ্বারোহী বা পদাতিক সেনার জোরও এ-যুদ্ধে তুচ্ছ হইতে চলিয়াছে! আকাশ-পথে উঠিয়া সেখান হইতে শত্রুকে যে মারিতে পারিবে, তার জয় সুনিশ্চিত। মার্কিন যুক্ত-রাজ্য তাই

শত্রুর সন্ধান লইয়া

শত্রুর কামান-গাড়ীতে হানা

মায়া-প্যারাশুটের আবরণে পলায়ন

একসঙ্গে ছ'টি শেল্ ফেলা

মেঘনাদী শক্তিকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে এবং সেই শক্তির উপরই মার্কিন এ মহাযুদ্ধে বিজয়-লাভের আশা রাখে! বিমান-আক্রমণের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাজ্য যে বিপুল আয়োজন করিয়াছে, তাহাতে জয়ের আশার কারণ—স্থলপথে এক-হাজার কামান যে-কাজ করিবে, শূন্যপথ হইতে এই একটি বড়-বমার তার চেয়ে ক্ষিপ্র এবং আরো নিশ্চিত ভাবে সে-কাজ করিতে আজ সমর্থ! বিপক্ষ-দলকে সন্ধান করিয়া অতর্কিত আক্রমণে শত্রু-নিপাত—উড়ো বমারের পক্ষে যেমন সহজ, তেমনি অনায়াসে তাহা সংসাধিত হইবে। তার উপর উড়ো-বমার ভূতলবস্ত বা ভূতলবাহী সশস্ত্র কামান-গাড়ীকে অতর্কিত-আক্রমণে নিমেষে চূর্ণ করিতে পারে; এবং 'শেল' বর্ষণ করিয়া মায়া-প্যারাশুট নামাইয়া অটুট দেহে আত্মরক্ষা করিয়া উড়ো-বমারের পক্ষে পলায়নের পথও সম্পূর্ণ নিরাপদ। তার উপর এক-একটি উড়ো-বমার হইতে এক-এক টন ওজনের ছ'টি করিয়া শেল-বোমা একসঙ্গে নিক্ষেপ করা যায়—এই ছ'টি শেলের ফল ছ'-সাতশো কামানের গোলার মত!

এ বাসে লোক ধরে ১৪১ জন

——

সমর-ট্রেলার

এ যুদ্ধে ফৌজের যেমন প্রয়োজন, এঞ্জিনীয়ার এবং মিস্ত্রী-মজুরের প্রয়োজনও ঠিক তেমনি। যুদ্ধক্ষেত্রে কোথায় কোন্ বিমানপোতের কল বিগড়াইল, কোন্ বিমানপোত ভাঙ্গিল, কিম্বা কামান ও ট্যাঙ্কের কি বৈকল্য ঘটিল, তখনি মেরামত প্রয়োজন। অথচ রণক্ষেত্রে ফৌজের সঙ্গে সঙ্গে মিস্ত্রী-মজুর-এঞ্জিনীয়ারদের বহিয়া বেড়ানো সম্ভব নয়। আবার প্রয়োজন ঘটিলে মিস্ত্রী-মজুর-এঞ্জিনীয়ারও চাই! তাদের বহিবার জন্য অল্প-ব্যয়ে পঁয়তাল্লিশ ফুট লম্বা এবং হালকা-ওজনের নূতন ট্রেলার-বাস তৈয়ারী হইয়াছে। এ বাসের সৃষ্টি করিয়াছে মার্কিন ফৌজ-বিভাগ। এ ট্রেলার-বাসে একশো একচল্লিশ জন লোককে অনায়াসে বহন করা চলে। হালকা বলিয়া এ বাস দ্রুত চলে। এ-বাসের কল্যাণে প্রয়োজনমাত্র রণস্থলে মিস্ত্রী-মজুরদের খুব সহজে এবং অল্পক্ষণে পৌঁছাইয়া দেওয়া চলিবে।
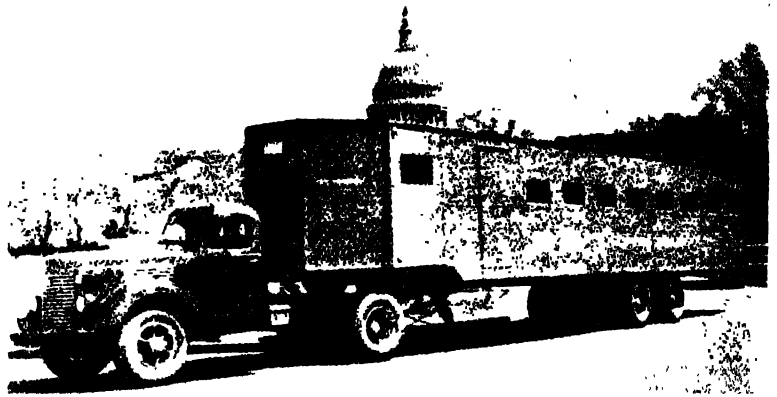
——

নিরাপদ মুখোশ

যুদ্ধের সময় মারণাস্ত্র-নির্মাণে বড় বিপদ! বহু বিষাক্ত উপাদান ঘাঁটাঘাঁটি করিতে হয়; সে জন্য মানুষের নানা ব্যাধি, এমন কি মৃত্যু

পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। নাকে-কাণে তুলা গুঁজিলেই এ ক্ষেত্রে নিরাপদ থাকা যায় না। তাই বৈজ্ঞানিক

নাসা-বন্ধ

গ্যাস-মুখোশ

আগুনের হল্‌কানি চোখে লাগে না

কৌশলে শিরস্ত্রাণ, গ্যাস্-মুখোশ, চোখের ঠুলি, নাসা-বন্ধ, রবারের দস্তানা এবং গ্রীবা-রক্ষকাদি তৈয়ারী হইয়াছে। গ্যাস-মুখোশ আঁটিলে ধাতুচূর্ণ বা বারুদ প্রভৃতির বিষাক্ত বাষ্পের আক্রমণ প্রতিরুদ্ধ হয়; নাসা-বন্ধে বালির অতি-সূক্ষ্ম চূর্ণাদি প্রবেশ করিয়া ফুশফুশ যন্ত্রে বৈকল্য ঘটাইতে পারে না; শিরস্ত্রাণে চোখ এবং ফুশফুশ যন্ত্র নিরাপদ থাকিবে; তার উপর আগুনের হল্‌কা লাগিয়া চোখের দৃষ্টি ব্যাহত হইবে না।
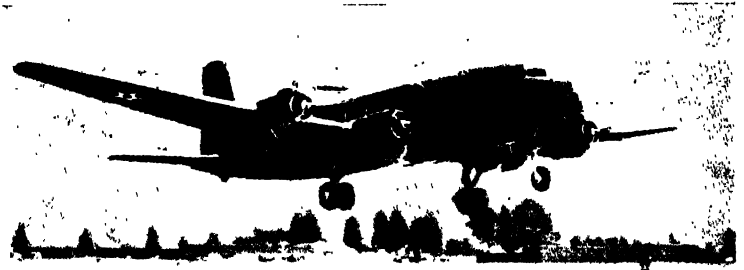
অতিকায় ফৌজ-প্লেন

আমেরিকার ফৌজ-বিভাগ সম্প্রতি এক অতিকায় বিমানপোত নির্ম্মাণ করিয়াছে। এ বিমানপোতে শীতাতপরোধী যে-কামরা আছে, সে কামরায় পঞ্চাশ জন সশস্ত্র সেনা অনায়াসে স্থান পায়—তাহাতে তাহাদের স্বাচ্ছন্দ্য এতটুকু ক্ষুন্ন হইবে না। এ পোতের শক্তি ৩৫ অশ্ব-শক্তির সমান। এ পোত নামাইতে দীর্ঘ প্রসারিত জায়গার যেমন প্রয়োজন নাই, তেমনি ইহার গতি দ্রুত এবং ইহাকে নিরাপদে ভূতলাবতীর্ণ করা যায়। এ পোতের প্রত্যেকটি অংশ স্বতন্ত্র। একটা যদি নষ্ট হয় তো নিমেষে সেটি বদলানো চলে। ফৌজবাহী এত বড় বিমানপোত এই প্রথম নির্ম্মিত হইয়াছে।

এ-প্লেনে পঞ্চাশ-জন সশস্ত্র ফৌজ

বিংশ শতাব্দী

বিংশ শতাব্দীর রক্তিম সূর্য্য
পশ্চিম দিক্‌ভালে অবসাদ-ক্লিষ্ট।
ভাবী-কাল হরষেতে বাজাইছে তূর্য্য,
যান্ত্রিক-সভ্যতা বিদলিত, পিষ্ট।

কে কারে রুখিবে বল, কার বেশী শক্তি?
মেঘে শত মেঘনাদ হানে মরণাস্ত্র!
সবাই মেতেছে রণে, কেবা শোনে যুক্তি।
দীন মোরা নাহি পাই অন্ন ও বস্ত্র।

যে পৃথিবী ছিল কাল আজ তার ধ্বংস।
পড়ে আছে চারিভিতে বিশীর্ণ কঙ্কাল।
লোপ পেল কত রাজা, মানবের বংশ।
তাথিয়া তাথিয়া নাচে তাণ্ডব, মহাকাল।

নাচো তুমি মহাকাল, নাচো মহা রঙ্গে,
বিংশ শতাব্দীর হয়ে যাক অবসান।
শত্রু ভুলুক দ্বেষ শত্রুর সঙ্গে,
উঠুক আকাশ জুড়ি সাম্যের মহাগান।

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়।

ভারতে অর্থনৈতিক নিয়তি

যুদ্ধান্তে জাতীয় তথা আন্তর্জ্জাতীয় অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কিরূপ পরিবর্ত্তন ও পরিণতি ঘটিবে, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই মন তদ্বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বদেশেই যুদ্ধোত্তর-সংগঠন সংকল্পে মহোৎসাহে বিচার-বিতর্ক চলিতেছে! যুদ্ধের ধ্বংসলীলা-প্রসূত পরিস্থিতির ফলে পৃথিবীর উভয় গোলার্দ্ধে, অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তন ও তদনুগামী পরিকল্পনার ঘাত-প্রতিঘাতে অর্থনীতির রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী। এই পরিবর্ত্তনের গতি কোন্ দিকে, এবং তাহার প্রকৃতিই বা কিরূপ, তাহাই বিশেষ বিবেচ্য। সম্প্রতি লণ্ডন নগরে 'বৃটিশ এসোসিয়েসান কনফারেন্সে'র এক অধিবেশনে কমন্স মহাসভার গণনায়ক, ভারতের সুপরিচিত স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপস ইহাই ঘোষণা করিয়াছেন যে, যুদ্ধান্তে আমরা অবশ্যই আমাদের অর্থনৈতিক যুদ্ধ-যন্ত্রকে অর্থনৈতিক কল্যাণ-কলায় পরিবর্ত্তিত করিব। আমরা কিংবা অন্য কোন জাতি, অন্যের পরিশ্রমে এবং অপরের প্রচেষ্টায় নির্ভরশীল সুবিধাভোগী জনসঙ্ঘরূপে আপনাদিগকে দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিব না।

নীতি হিসাবে এই সঙ্কল্প অতি মনোরম, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে ক্রিয়মাণ কার্য্যপ্রকরণ প্রয়োগ-ব্যাপারে ইহার গতি, প্রকৃতি ও পরিণতি কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহাই চিন্তার বিষয়। এই প্রসঙ্গে বর্ত্তমান যুদ্ধ-পরিস্থিতি-সম্ভূত আটলান্টিক সনন্দের (Atlantic Charter) জটিলতা ও উপলক্ষণের বিষয় সর্ব্ব-প্রথমে স্বতঃই মনে উদিত হয়। যুক্তরাজ্যের ভাগ্যের সহিত ভারতের ভবিষ্যৎ ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত, এবং অধুনা যুক্তরাজ্যের অর্থনৈতিক ভিত্তি যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক গতি-প্রকৃতি ও পরিণতির উপর সুদৃঢ়রূপে নির্ভরশীল। যুদ্ধান্তে অত্যাবশ্যক কাঁচা মালের উৎপাদন ও বণ্টনের আন্তর্জ্জাতিক বিধিনির্দ্ধারণই সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। কি ভাবে এই বিধি-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হইবে, সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের ঐকমত্যের উপরেই তাহা নির্ভর করিবে। ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, বর্ত্তমানে যুদ্ধপরিচালনার সৌকর্য্যার্থ সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের মধ্যে কাঁচা মালের ব্যবহার এবং পরিণত দ্রব্য-সামগ্রীর অর্থাৎ পাকা মালের নিয়োগ-নিয়োজন সম্পর্কে যেরূপ প্রগাঢ় সহযোগিতার সৃষ্টি হইয়াছে, জগতের ইতিহাসে তাহা অদৃষ্টপূর্ব্ব। যুদ্ধকালে সর্ব্বজনকাম্য সর্ব্বজাতির শ্রেষ্ঠ স্বার্থ, স্বাধীনতা সংরক্ষণ-সঙ্কল্পে একাভিমুখী ও একাভিসন্ধী হইয়া যেরূপ উপাদান উপকরণের উৎপাদন ও প্রয়োগ-নিয়োগ সম্ভব, শান্তিসমাগমে স্ব স্ব অর্থনৈতিক স্বার্থ-সংরক্ষণে সেরূপ একনিষ্ঠ একতা সম্ভব কি না, তাহার সাক্ষ্য অতীত ইতিহাসে মিলিতে পারে।

যাহা হউক, এখন আমাদিগকে বুঝান হইতেছে যে, আটলান্টিক সনন্দের মূলে এই দৃঢ়বিশ্বাস নিহিত আছে যে, যদি বুদ্ধি-বিবেচনা সহকারে ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে জগতের বর্ত্তমান সম্পদ-সঙ্গতি সুষ্ঠুভাবে সর্ব্বজাতির জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহার্থ সুপ্রচুর, এবং সকলেই তাহাদের উপযুক্ত স্ব স্ব অংশ পাইবার অধিকারী। কেহ কেহ ইহাও স্বীকার করিতেছেন যে, অতীতে আমরা আমাদের অতুল সম্পদের যথোপযুক্ত ব্যবহার সম্বন্ধে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। এই হেতু আটলান্টিক সনন্দের মূলনীতির ন্যায়সঙ্গত প্রয়োগ-কল্পে নূতন উপায় এবং নূতন সংগঠনের প্রয়োজন হইবে। উত্তম উদ্দেশ্য; কিন্তু ইতিমধ্যেই সার্ব্বজনীনতার উন্নত বেদীর পাদমূলে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের সহিত একটি সম্মতিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই ইঙ্গ-মার্কিণ ব্যবসা-চুক্তির (Anglo American Trade Agreement) নিগূঢ় উদ্দেশ্য কি, তাহা এখনও জনসাধারণ-সমক্ষে প্রকাশিত হয় নাই। কিছু দিন পূর্ব্বে মাদ্রাজের কোন সংবাদপত্রে এই গূঢ় চুক্তির যে তথ্য প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার মর্ম্ম এই যে, যুদ্ধান্তে যুক্তরাজ্য শুল্কঘটিত অন্তরায় লঘু করিতে (Reducing tariff barriers), বিভিন্ন দেশের মধ্যে পক্ষপাতসূচক শুল্কপ্রশমন-সুযোগ-সুবিধা তিরোহিত করিতে (Abolishing preferential treatment between one country and another), এবং অবাধ আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য নিরঙ্কুশ করিতে (Ensuring free international trade) সর্ব্বান্তঃকরণে সহযোগিতা করিবেন। এই চুক্তি অবশ্য যুদ্ধান্তে ইজারা ও ঋণ সাহায্য (Lease and Lend aid) পরিশোধ-পরিকল্পে বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

"অবাধ আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য"—ইহা শুনিতে, এবং চিন্তা করিতেও অতি মনোরম। অবাধ-বাণিজ্য নীতি ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের পক্ষে কিরূপ অনিষ্টকর হইয়াছিল, গত চৈত্র-সংখ্যার 'মাসিক বসুমতী'তে "শিল্প ও শুল্ক" প্রবন্ধে তাহার কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত প্রকাশিত হইয়াছে। অবাধ-বাণিজ্যের অভিজ্ঞতা ভারতের পক্ষে আদৌ প্রীতিকর নহে; সুতরাং ভারতের বর্ত্তমান শিল্প-পরিস্থিতিতে অবাধ-বাণিজ্যের পুনঃ-প্রবর্ত্তন-সম্ভাবনা ভারতীয় শিল্পনিষ্ঠ ও শিল্পাশ্রয়ী ব্যক্তিবর্গের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছে। মার্কিণ বিশেষজ্ঞ-দূত-সঙ্ঘের নায়ক ডাঃ গ্রাডী অবশ্য ইহার একটি ভাষ্য দিয়াছেন। তিনি বলেন, মার্কিণের মুখ্য উদ্দেশ্য বাণিজ্যের বদান্যতামূলক প্রসারণ, (Liberalised trade) এবং শুল্কের পরিমাণ হ্রাস,—বহিষ্কার নহে (Lowering down of tariffs, not their elimination)।—এই ভাষ্য ভীতিপ্রদ নহে সত্য; বরং ভারতের পরাধীন অবস্থা বিবেচনায় আশাপ্রদ বলাও চলে। কিন্তু আটলান্টিক সনন্দের—সর্ব্ব-রাষ্ট্রের সমান ভাবে জগতের সমস্ত কাঁচা মাল প্রাপ্তি ও অধিকারের ব্যবস্থা-বিধান (the right to enjoyment by all States of access, on equal terms to the raw materials of the world) এবং মার্কিণের রাষ্ট্রসচিব মিঃ কর্ডেল হালের "পারস্পরিক কল্যাণার্থ ন্যায্য ব্যবহারের" উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক সম্বন্ধে নূতন ও উন্নত প্রণালী প্রবর্ত্তনের উক্তি,—আশঙ্কাবর্জ্জিত নহে। ইহার অর্থ এই যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের দৃষ্টি কোন "ঔপনিবেশিক রীতির" (Colonial system) বহির্ভূত নহে। এই রীতির ব্যবস্থা এই যে, কাঁচা মাল উৎপাদন ও সরবরাহকারী দেশগুলির নিকট

হইতে কাঁচা মাল সংগ্রহ করিয়া তদুৎপন্ন দ্রব্যাদি সেই সেই দেশের বাজারে বিক্রয়,—অর্থাৎ শিল্পক্ষেত্রে, শিল্পে সমৃদ্ধ কয়েকটি মাত্র দেশে শিল্পের একাধিপত্য। এই নিমিত্তই লর্ড সেম্পিল্ সে দিন বিলাতের লর্ডসভায় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, প্রাথমিক উৎপাদক দেশসমূহে, বিশেষতঃ, স্বায়ত্ত-স্বাধীন রাষ্ট্রগুলিতে এবং ভারতবর্ষে, শিল্প-প্রসারণের ফলে পূর্ব্বের ন্যায় উৎপন্ন দ্রব্যের অবাধ আমদানীর অনিচ্ছাই যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক সমস্যার মধ্যে একটি প্রধান ও প্রবলতম প্রশ্ন হইবে।

সম্প্রতি বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ এণ্টনি ইডেন, কমন্স মহাসভার গণনায়ক সার ষ্টাফোড ক্রিপস্, যুদ্ধোত্তর-পুনর্গঠন মন্ত্রী সার উইলিয়াম জোইট, এবং মার্কিণের রাষ্ট্রসচিব মিঃ কর্ডেল হাল্ এই বিষয়ে স্ব স্ব অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। সমাজতান্ত্রিক গণনায়ক ক্রিপসের অভিপ্রায়ের ইঙ্গিত আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি। পররাষ্ট্র-সচিব ইডেনকে পরিত্যাগ করিয়া, আমরা সার উইলিয়াম জোইটের পদমর্য্যাদাসম্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ অভিমতের অনুসরণ ও আলোচনা করিব। সার উইলিয়াম যুদ্ধান্তে যুক্তরাজ্যের তিনটি গুরুতর কর্ত্তব্যের উল্লেখ করিয়াছেন। সর্ব্বপ্রথম—বাণিজ্য-জমা-খরচে সামঞ্জস্যের পুনরুদ্ধার, (Restoration of Trade balance), দ্বিতীয়—অর্থ ও মূল্য-স্ফীতি নিবারণ (Prevention of inflation) এবং তৃতীয়—জাতির অর্থ-সামর্থ্য ও সঙ্গতি-সম্পদের যুদ্ধ প্রয়োজন হইতে শান্তি-কালীন ব্যবহারে নিয়োগ-নিয়োজন (Transfer of British resources from the service of war to the service of peace)। সার উইলিয়াম বলিয়াছেন,—"যদি আমরা রপ্তানী বৃদ্ধি এবং তদ্দারা বাণিজ্য-জমা-খরচের সমতা রক্ষা করিতে না পারি, তাহা হইলে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া অপরিহার্য্য আবশ্যকের অধিক আমদানী বন্ধ করিতে হইবে।"

ইহা অবশ্যই সত্য যে, যুদ্ধান্তে যুক্তরাজ্য যদি রপ্তানী ব্যবসায়ে যুদ্ধ-পূর্ব্ব প্রসার ও প্রতিপত্তি পুনরধিকার করিতে না পারে, তাহা হইলে বাণিজ্য-জমা-খরচে সমতা রক্ষা-হেতু আমদানী ন্যূন করিতে হইবে। তাহাতে যে কেবলমাত্র যুক্তরাজ্যের ক্ষতি হইবে, তাহাই নহে; সমুদ্রপারবর্ত্তী যে সকল উৎপাদক বৃটিশ-বাজারের উপর নির্ভরশীল, তাহাদেরও অসুবিধা ঘটিবে। অধিকন্তু, পাউণ্ড ষ্টার্লিংএর (বৃটিশ স্বর্ণমুদ্রা) অস্থির, অথবা অনিশ্চিত মূল্যমান অবাধ নিখিল জগৎ-বাণিজ্যের পুনঃ-প্রতিষ্ঠার পথে বিষম বিঘ্ন উৎপাদন করিবে। অর্থনৈতিক জগতে পূর্ব্বাধিকার পুনঃ-প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত গ্রেট বৃটেনকে যে রপ্তানী ব্যবসায়ের পুনরুদ্ধার করিতে হইবে, তাহাই নহে; সমুদ্র-পার হইতে লব্ধ যুদ্ধোপকরণের মূল্য দিবার নিমিত্ত, সমুদ্র-পারে ব্যবসা-বাণিজ্যে নিবদ্ধ মূলধনোৎপন্ন আয়ের ক্ষতিও পূরণ করিতে হইবে। অর্থনৈতিক শাসন-বাক্যের বিভ্রম-বিমুক্ত সাধারণ বুদ্ধির নিকট ইহা সুস্পষ্ট যে, যুদ্ধকালে বহু দ্রব্য হইতে বঞ্চিত দেশের পক্ষে যুদ্ধান্তে বহু দ্রব্যের বহুল পরিমাণে আমদানী প্রয়োজন। সুতরাং যুদ্ধান্তে আমদানীর মূল্য প্রদানের নিমিত্ত বহুল পরিমাণে রপ্তানীর উপযুক্ত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা আবশ্যক। তাহাতে যুদ্ধ-প্রত্যাগত এবং যুদ্ধশিল্প-বিমুক্ত বহু নরনারীর কর্ম্ম ও অন্নসংস্থান হইবে। যুদ্ধান্তে যুক্তরাজ্যের এই পরিস্থিতির যথাযোগ্য ব্যবস্থার চিন্তা এখন হইতেই চলিতেছে, এবং সেই ব্যবস্থা কার্য্যকরী করিবার নিমিত্ত যে সকল বিধি-বিধানের আশ্রয় লওয়া হইবে, তাহাদের প্রকোপ ভারতের অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের উপর কিরূপ প্রভাব-বিস্তার করিবে, তাহাই আমাদের আশু বিবেচ্য বিষয়।

যুক্তরাজ্য শিল্পপ্রধান দেশ। শিল্পই তথাকার লোকের প্রধান উপজীব্য। এই শিল্পের পোষণোপযোগী কাঁচা মাল আসে সমুদ্র-পারবর্ত্তী দেশ হইতে, এবং অধিকাংশই ভারতবর্ষ হইতে। ভারত শিল্পে যতই অগ্রবর্ত্তী হইবে, ভারত হইতে কাঁচা মালের প্রাপ্তি ততই কমিয়া যাইবে। এইখানেই বিলাতের সহিত ভারতবর্ষের স্বার্থের সংঘর্ষ। এই স্বার্থ-সংঘর্ষের ফলে প্রাচীন ভারতের বহু বিশিষ্ট শিল্পই লোপ পাইয়াছিল। যুদ্ধান্তে এই সংঘর্ষ প্রবলাকার ধারণ করিবে। এই নিমিত্তই যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ ইতি-মধ্যেই নিখিল জগতের কাঁচা মালের ন্যায়সঙ্গত বণ্টনের ধূয়া তুলিয়াছেন। এই নিমিত্তই যুদ্ধান্তে অবাধ-বাণিজ্যের জয়ধ্বনি। এই নিমিত্তই আটলাণ্টিক সনন্দের এবং বিশেষতঃ ইঙ্গ-মার্কিণ ব্যবসা-চুক্তির উৎপত্তি ও অবাধ-বাণিজ্যের অন্তরায়স্বরূপ রক্ষণ-শুল্কের প্রশমন, এবং কাঁচা মাল বণ্টন ও পাকা মাল, অর্থাৎ পরিণত দ্রব্য উৎপাদনের আন্তর্জ্জাতিক বিধি-বিধানের প্রবল প্রচেষ্টা। এই নিমিত্তই—আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-ক্ষেত্রে মার্কিণ যুক্তরাজ্যের সহযোগিতায় প্রত্যেক প্রকার প্রভেদ পার্থক্যমূলক ব্যবহার এড়াইবার, এবং ঐ একই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত দেশসমূহের সাহচর্য্যে জগতে সাধারণ ভাবে অধিকতর অবাধ-বাণিজ্যের সুযোগ ও সুবিধা-সৃষ্টির চেষ্টা করিবেন। এই ইঙ্গ-মার্কিণ চুক্তির ফলে নিখিল জগতে কিরূপ কল্যাণ সাধিত হইবে, তাহার ইঙ্গিত আমরা মিঃ কর্ডেল হাল-প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের বক্তৃতা ও বিবৃতিতে পাইয়াছি।

যুদ্ধান্তে যুক্তরাজ্যে ও যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কিরূপ পরিবর্ত্তন ও পরিণতি ঘটিতে পারে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ইঙ্গ-মার্কিণ সম্মতিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে। অধিকতর অবাধ-বাণিজ্যের প্রয়োজন; সুতরাং অন্যান্য সমধর্ম্মী ও সম-অবস্থাপন্ন দেশগুলিকেও প্রশ্রয় দেওয়া হইবে! ভেদমূলক শুল্কের নিরাকরণ ও বর্ত্তমান শুল্ক-হারের হ্রাস, এই চুক্তির অন্যতম সর্ত্ত। পক্ষপাতমূলক প্রশ্রয় প্রশমন এবং একাধিপত্য (Preference and monopoly) বিদূরিত করিবার এবং অনুন্নত জাতির জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের উন্নত বিধি-ব্যবস্থা (Higher standard of living) উল্লেখও এই চুক্তিতে আছে। সুতরাং গণতান্ত্রিক জগতের অর্থনৈতিক সুব্যবস্থার মদির-স্বপ্নে এই চুক্তি আটলাণ্টিক সনন্দের আবছায়া হইতে অধিকতর স্বচ্ছ। কিন্তু এই ইঙ্গ-মার্কিণ সন্ধি-সংযোগ দুর্ভাগ্য ভারতের অর্থনৈতিক গতি-প্রকৃতির প্রতি কিরূপ প্রভাব-বিস্তার করিবে, এবং তাহার পরিণাম-পরিণতিই বা কি হইবে, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত হইলেও সহজেই অনুমেয়।

যদিও কংগ্রেসের (মার্কিণ) নিকট তাঁহার পঞ্চম বিবৃতিতে রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট ঘোষণা করিয়াছিলেন—No financial reckoning will take place at the end of the war অর্থাৎ যুদ্ধান্তে আর্থিক পীড়ন ঘটিবে না; তথাপি, ইহা ন্যায়সঙ্গত যে, মার্কিণ তাহার অমিতু ইজারা ঋণ সাহায্যের প্রতিদানে কিছু ফিরিয়া পাইতে চাহে। যুদ্ধান্তে সন্ধি-সর্ত্তে ক্ষতিপূরণের দাবী ও

ব্যবস্থা কিরূপ অনিষ্টকর, তাহার তিক্ত অভিজ্ঞতা সমগ্র জগৎ এবং বিশেষতঃ যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র তীব্র ভাবে অর্জ্জন করিয়াছে। এই নিমিত্ত ইঙ্গ-মার্কিণ চুক্তি, যে সকল বিধি-বিধানের পীড়নে এই ভীষণ যুদ্ধ সমুদ্ভূত হইয়াছে, তাহা বর্জ্জন করিতে সমুৎসুক। ভারতের পক্ষে এই প্রতিবিধানের ফল কি; তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি। এখন এই ইজারা-ঋণ বিধানের সহিত ভারতের সম্বন্ধ-সম্পর্কের একটু আলোচনা করিব। এই ব্যবস্থার ফলে, ভারত বর্ত্তমান বর্ষে, ৪৫ কোটি টাকার দ্রব্যাদি মার্কিণ হইতে পাইবে। যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক মঞ্জুরী-কৃত ইজারা-ঋণের নিমিত্ত ১২০০০ মিলিয়ন ডলার—স্বতন্ত্র নিয়োগ-সমষ্টির তুলনায় যৎসামান্য; তথাপি ইহার পরিশোধ-ব্যবস্থা আমাদের প্রণিধান-যোগ্য। ঋণ-পরিশোধের নিমিত্ত মার্কিণের সহিত ভারতের পৃথক্ হিসাব আছে কি না, তাহা আমাদের অজ্ঞাত। দেশরক্ষা ও জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহার্থ ভারত মার্কিণ হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী পাইতে যেমন উৎসুক, ঋণ-পরিশোধ করিবার নিমিত্তও তদ্রূপ আগ্রহবান্। এইটুকু মাত্র দ্রষ্টব্য যে, এই ঋণ-পরিশোধের প্রকরণ ভারতের পক্ষে অনিষ্টকর না হয়। শেষ হিসাব-নিকাশের সময় সমবেত মিত্রশক্তির সাধারণ সংরক্ষণ-হেতু ভারত কর্ত্তৃক বিনিময়ে প্রদত্ত প্রতিদান-মূলক সেবা ও সাহায্যের, এবং সুযোগ ও সুবিধার বিষয়ও বিবেচ্য। বিলাতে ও ভারতে মার্কিণ সৈন্য-সমাবেশের পর ইজারা-ঋণ এক-তরফা ব্যাপার নহে,—উভয় পক্ষই আদান-প্রদানে নিবদ্ধ হইয়াছে। কংগ্রেসের নিকট তাঁহার পঞ্চম বিবৃতিতেও রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট বলিয়াছিলেন, ইজারা-ঋণ আর "one way traffic" (একমুখী চালান) নহে।

যাহা হউক, এই ইজারা-ঋণ পরিশোধ-প্রতিকল্পে ইঙ্গ-মার্কিণ ব্যবসা-চুক্তিতে উক্ত হইয়াছে যে, যুক্তরাজ্যের সহযোগিতা এবং অন্যান্য সহানুভূতিসম্পন্ন দেশসমূহের সাহচর্য্যে, যুদ্ধান্তে যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য-ক্ষেত্রে প্রভেদ পার্থক্যমূলক নীতির উচ্ছেদসাধন পূর্ব্বক অধিকতর অবাধ বাণিজ্যের পথ মুক্ত করিবেন। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রনীতি-পরিচালক মিঃ কর্ডেল হালও নববিধানের (New and better system of economic relationship established on a basis of fair treatment for mutual benefit) একটি বিবৃতি দিয়াছেন। এই সকলের মূলে রহিয়াছে, —সেই চিরন্তন কাঁচা মাল সংগ্রহ ও সংস্থান-নীতি,—"The right to enjoyment by all States of access on equal terms to the raw materials of the world." পার্থক্যের মধ্যে এই যে, পূর্ব্বে যাহা সার্ব্বভৌম-শক্তির একচেটিয়া ছিল, এখন তাহা "All States"-এর মধ্যে বিতরিত হইবে! কিন্তু এই কাঁচা মাল যোগাইবে কে? ভারতের ন্যায় জগতের মধ্যে আর কোন্ দেশ কাঁচা মালে এত সমৃদ্ধ, এবং কাহার স্বায়ত্ত-শাসন ক্ষমতা সর্ব্বাপেক্ষা লঘু? কাঁচা মালের ন্যায়সঙ্গত বণ্টন এবং আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের প্রসারের অছিলায় সেই সুপ্রাচীন যুদ্ধ-পূর্ব্বে প্রচলিত Coloneal system-এর নবরূপ ও নবসংস্করণ! এই নীতি, অথবা দুর্নীতির বলে, অত্যুন্নত শিল্প-প্রধান দেশসমূহ শিল্পে অনুন্নত কৃষিপ্রধান দেশসমূহ হইতে কাঁচা মাল সংগ্রহ করিয়া পরিণত-দ্রব্যে একাধিপত্য উপভোগ করেন। যে হতভাগ্য দেশ-সমূহ স্বল্পমূল্যে কাঁচা মাল যোগান দেয়, তাহারাই হয়—অতি উচ্চ মূল্যে তদুৎপন্ন পরিণত-পণ্যের শক্তি-সামর্থ্যহীন ক্রেতা! এই ব্যবস্থার ফলে শিল্পে অনুন্নত, অথচ কাঁচা মালে প্রভূত সম্পন্ন দেশ শিল্পোন্নতি ও শিল্প-সম্প্রসারণ দ্বারা তাহার অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি-সাধন করিতে পারে না।

আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য-বিস্তারের উপর যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র উভয়েরই যুদ্ধোত্তর-উন্নতি নির্ভর করিতেছে এবং একমাত্র আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য-প্রসার দ্বারাই যুক্তরাষ্ট্র তাহার ইজারা-ঋণের কিয়দংশ পুনঃপ্রাপ্তির আশা করিতে পারে বটে, কিন্তু অধিকতর অবাধ আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য এবং উৎপাদন ও বণ্টনের আন্তর্জ্জাতিক নিয়ম-নির্দ্ধারণ, শিল্পে অনুন্নত ভারতের পক্ষে পরিপূর্ণরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে না। বর্ত্তমানে ভারত কৃষি-প্রধান সন্দেহ নাই; কিন্তু ইংরেজ-শাসনের পূর্ব্বে ভারত কেবলমাত্র কৃষিপ্রধান নহে, শিল্পপ্রধানও ছিল। ভারতের অত্যুৎকৃষ্ট শিল্পজাত দ্রব্য সম্ভার অর্থগৃধ্নু শ্যেনদৃষ্টি বিদেশী বণিক্‌কে ভারতে আকৃষ্ট করিয়াছিল। কিরূপে ভারতের এই উভয়মুখী সমৃদ্ধি একাভিমুখী হইয়াছিল, তাহার কলঙ্ক-কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠা মসী-মলিন করিয়া রাখিয়াছে; তাহার পুনরুল্লেখ ও পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। এই কৃষিজ, বনজ, ও খনিজ কাঁচা মালে সুপ্রচুর সমৃদ্ধি, এবং শিল্পে, বিশেষতঃ গুরু শিল্পে অসামর্থ্য—ভারতের বর্ত্তমান শোচনীয় অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রধানতম দুর্ব্বলতা। ভারত এই দুর্ব্বলতা পরিহার করিতে কৃতসঙ্কল্প। এই সঙ্কল্পের পরিপন্থী কোন ব্যবস্থাই ভারতের স্পৃহনীয় নহে। যুদ্ধোত্তর-সংগঠনে—কাঁচা মালের ন্যায়-সঙ্গত বণ্টন, উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণ, এবং আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার প্রভৃতি অনুষ্ঠানে ভারতের সহানুভূতি ও সহযোগিতা সুলভ হইবে,—যদি এই নীতিকে কার্য্যকরী করিবার প্রক্রিয়া ও প্রকরণ ভারতের অর্থনৈতিক স্বার্থের পরিপন্থী না হয়। কিন্তু যুদ্ধারম্ভের পর হইতে প্রাচ্যগুচ্ছ বৈঠক এবং বৃটিশ যোগান মন্ত্রিত্ব কর্ত্তৃক প্রেরিত বোজার দূত-সঙ্ঘের আলোচনা ও অনুসন্ধানের এবং প্রাচ্যগুচ্ছ সমিতির কার্য্যপ্রকরণের ফলে ভারতে গুরু ও বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অন্তরায় ঘটিয়াছে; কারণ, দ্রুত যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুতার্থ সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশের মধ্যে যেখানে যে-গুরু ও বৃহৎ শিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত, অন্যান্য স্থান হইতে সেই সেই শিল্পের উপযোগী কাঁচা মাল সেইখানে সরবরাহ করা হইতেছে। ফলে, কাঁচামাল-উৎপাদক-দেশে প্রচুর সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠার প্রতি মনোযোগ দেওয়া হইতেছে না। সুতরাং ভারত নূতন নূতন অত্যাবশ্যকীয় গুরু ও বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠার সুবর্ণ সুযোগ হারাইতেছে। অধুনা আটলাণ্টিক সনন্দ এবং তাহার লেজুড় ইঙ্গ-মার্কিণ বাণিজ্য-চুক্তি কাঁচা মালের তথাকথিত ন্যায়সঙ্গত বণ্টন, উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণ, এবং অধিকতর অবাধ-বাণিজ্যের ব্যবস্থা দ্বারা ভারতের অগ্রগতিকে ব্যাহত করিবারই উপায় নির্দ্ধারণ করিতেছে। বিগত মহাযুদ্ধের পীড়নে, বহু প্রচেষ্টার ফলে, ভারত যে যৎকিঞ্চিৎ শুল্কনির্দ্ধারণ-স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল এবং যাহা এখন নামে-মাত্রে পর্য্যবসিত, তাহারই মূলে কুঠারাঘাত করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। রক্ষণশুল্ক ব্যতীত ভারতের ন্যায় গুরু ও বৃহৎ শিল্পে পশ্চাৎপদ দেশে নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠা এবং পুরাতনের সংরক্ষণ-সম্ভাবনা বিরল।

ভারতের নিজস্ব প্রয়োজন সাধনার্থ ভারতে উৎপন্ন সুপ্রচুর কাঁচা

মালকে ভারতে অতি সুলভ অগণ্য শ্রমিকের আনুকূল্যে যন্ত্রের সাহায্যে নব-নব শিল্প-প্রতিষ্ঠানে পাকা মালে পরিণত করাই ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতির একমাত্র উপায়। এই উপায় দেশরক্ষা ও জীবনরক্ষা উভয় উদ্দেশ্যেই একান্ত প্রয়োজনীয়—অপরিহার্য্য। কৃষিপ্রাধান্যের সহিত শিল্পে প্রাধান্য-অর্জ্জন ও সংরক্ষণ ব্যতীত ভারতের অর্থনৈতিক মুক্তি নাই। উভয় পদে সগৌরবে দণ্ডায়মান হইতে না পারিলে জীবনযুদ্ধে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। সঙ্কীর্ণ অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের কূপমণ্ডূকত্ব যেমন অনিষ্টকর, বদান্য আন্তর্জ্জাতিকতার মরীচিকায় মরু-বিভ্রমও তেমনি অহিতকর। ভারতের ভাবী অর্থনৈতিক গতি-প্রকৃতি ও পরিণাম-পরিণতি যে বন্ধুর পথে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, ভারতের ভবিষ্যতের পক্ষে তাহা আদৌ স্বাস্থ্যপ্রদ নহে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সুদুর্লভ।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

কুন্তীর খেদ

হায় রাজা দুর্য্যোধন, ঘটালে কি অঘটন
ন্যায়-ধর্ম্মে দিয়া জলাঞ্জলি !
রাজ্যলোভে হয়ে অন্ধ বাধাইলে গৃহদ্বন্দ্ব,
সত্যনিষ্ঠা-পুণ্য দিলে বলি।

সত্যব্রত যুধিষ্ঠির ফাল্গুনি ও ভীমবীর
তব ছলে হ'লো দেশান্তরী ;
পুত্র-পুত্রবধূ তরে চক্ষে মোর অশ্রু ঝরে,
কেমনে হৃদয়ে ধৈর্য্য ধরি ?

শকুনি তোমার কাল, ফেলিল বিপদ্‌জাল
কৌরবের ধর্ম্মরাজ্যময় ;
ভাবিয়াছ—পশুবলে নাশিয়া পাণ্ডবদলে
অধর্ম্মের ঘোষিবে বিজয় !

সূচ্যগ্র-সমান ভূমি বিনাযুদ্ধে কভু তুমি
ভ্রাতৃগণে করিলে না দান ;
গদাধর-পদাঘাতে রাজ্য যাবে অধঃপাতে,
তুমিও পাবে না পরিত্রাণ।

অবিচারে অত্যাচারে রাজ্য যায় ছারেখারে,—
চিরদিন দেখেছে সবাই ;
যেথা নির্য্যাতিতা নারী নিত্য ফেলে অশ্রুবারি,
ধ্বংসের বিলম্ব সেথা নাই।

যে রাজত্বে দুঃশাসন প্রজা করে উৎপীড়ন,
রাজনীতি লাঞ্ছিত সেথায় ;
অক্ষৌহিণী সেনাদল, অগণিত অস্ত্রবল
পতন রোধিতে নারে হায় !

তোমার সমাধিক্ষেত্র রচিতেছে কুরুক্ষেত্র,
পাঞ্চজন্য সঘনে ফুকারে ;
কপিধ্বজে নারায়ণ করিছেন আরোহণ—
দিব্যচক্ষে পাই দেখিবারে।

দাম্ভিক দর্পীর গর্ব্ব যুগে যুগে করে খর্ব্ব
দর্পহারী শ্রীমধুসূদন ;
পার্থ-সারথির বেশ ধরেছেন হৃষীকেশ,
সাবধান হও দুর্য্যোধন !

শ্রীনীলরতন দাশ (বি-এ)

এ দেশটাও মন্দ নয়

(নক্সা)
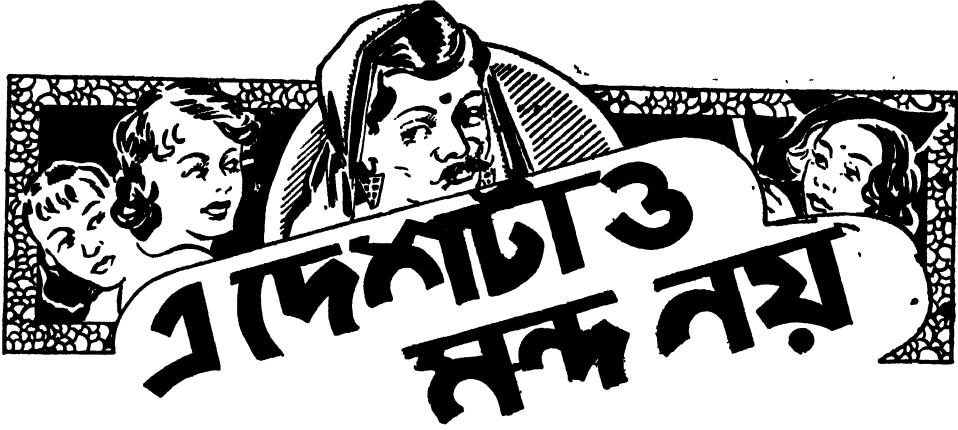
একদা গোবিন্দদাস যে কারণে গৃহত্যাগের পর শ্রীচৈতন্যের আশ্রয়াবলম্বনে অবশিষ্ট জীবন কঠোর সন্ন্যাসে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, আমিও সেই কারণেই গৃহত্যাগ করিলাম। এ রকম কারণ প্রায় সর্ব্বদাই ঘটিতে দেখা যায়—অর্থাৎ স্ত্রীর সহিত মনোমালিন্য; কিন্তু মনে কঠোর আঘাত পাইয়াই গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। ইংরেজী-শিক্ষিত হিন্দু যুবক, সুতরাং মাসিক সাট্ টাকা বেতনের কেরাণীগিরি অতিকষ্টে জুটিলেও—দুর্ভাগ্যক্রমে উচ্চ-শিক্ষিতা অর্থাৎ বি-এ পাশ এক ধনী-কন্যাকে ভবিষ্যৎ সুখের আশায় বিবাহ করিয়াছিলাম। সুতরাং কোনরূপে 'দিনগত পাপক্ষয়' করিতে করিতে এক দিন গৃহিণীর ঝোঁক হইল—তিনি সিনেমায় যাইবেনই; তাহা শুনিয়া আমি বলিলাম, এখন মাসের শেষ কি না—পরের মাসে দেখো।

গৃহিণী কুলাপানা-চক্রের মত মুখভঙ্গি করিয়া বলিলেন, —তোমার গলায় মালা দিয়ে সব সুখ-শান্তি ত বিসর্জ্জন দিয়েছিই—কিন্তু ন'আনার পয়সাও যদি দেওয়ার শক্তি না থাকে, তবে আমাদের মত মেয়ে বিয়ে ক'রেছ কেন? একটা পাড়াগেঁয়ে 'বর্ব্বর' মেয়ে বিয়ে ক'রলেই পারতে—যাদের স্বাধীন সত্তা সম্বন্ধে কোনই ধারণা নেই।

—ওই স্বাধীন সত্তাটা ত্যাগ ক'রলেই ত সব গোলমাল চুকে যায়।—আমার এই সঙ্ক্ষিপ্ত মন্তব্যে গৃহিণী 'তেলে-বেগুনে' জলিয়া-উঠিয়া যা-ইচ্ছা-তাই বলিয়া যাইতে লাগিলেন; আমার দৈন্য, অক্ষমতা, হীন প্রবৃত্তি সম্বন্ধে বহু কটূক্তি করিয়া, আমাকে বিবাহ করিয়াছেন বলিয়া পুনঃ পুনঃ অনুশোচনা করিলেন, এবং তাঁহার বিবেচনার ক্রটি না হইলে এক জন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটকে অনায়াসেই বিবাহ করিয়া কৃতার্থ করিতে পারিতেন, তাহাও জানাইতে কসুর করিলেন না।

আমি ক্রোধে ক্ষোভে অনাহারেই শয্যা গ্রহণ করিলাম, এবং সঙ্কল্প করিলাম, রাত্রিশেষে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত একখানা পত্র লিখিয়া-রাখিয়া গৃহত্যাগ করিব; আর এই অসার সংসারে ফিরিব না। এত লাঞ্ছনা, অপমান—বিশেষতঃ নিজের পত্নীর নিকট—সহ্য করা যায় না!

বান্ধবীসহ গৃহিণীর সিনেমা-দর্শন বন্ধ রহিল না—ইহা বলাই বাহুল্য। ঘরের ভিতর একাকী বসিয়া নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিলাম,—হায়, কেন পুরুষ হইয়া জন্মিয়াছিলাম? এইরূপ বাক্যযন্ত্রণা অপেক্ষা গর্ভযন্ত্রণাও ত অনেক ভাল—যদি স্ত্রীলোক হইয়া জন্মিতাম, তবে এমনি মুখ নাড়িয়া দরিদ্র স্বামীকে দশ কথা শুনাইয়া সিনেমায় চলিয়া যাইতে পারিতাম।—কত পরিশ্রমে কেমন করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে হয়, তাহা ভাবিতে হইত না। ঘরে চাউল না থাকিলেও স্নো-পাউডার কিনিয়া মুখে মাখিতাম —কথায় কথায় মুখ নাড়িয়া, কর্কশ বাক্যে স্বামীর জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতাম। পদতলে পড়িয়া শরাহত শোণিতাপ্লুত ক্লান্ত পাখীর মত পুরুষগুলা ডানা ঝাপ্টাইয়া করুণা ভিক্ষা করিত।

গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়াছি—ক্রমাগত চলিয়াছি। কত দুস্তর মরুকান্তার পার হইয়া কত যুগ-যুগান্ত কাল চলিয়াছি, জানি না। কত দেশ, কত বিচিত্র মানুষের বাসভূমি পার হইয়া বায়ুভরে বায়ুভুকের মত চলিয়াছি। শ্বেত, পীত, লোহিত, ঘোর কৃষ্ণ, বাদামী কত রংএর কত বিচিত্র বেশের মানুষের সঙ্গে মিশিলাম! অবশেষে এক রাজ্যের এক পাশপোর্ট-আফিসের ভাঙ্গা গরাদ দিয়া মাথা-গলাইয়া ঢুকিয়া পড়িলাম —সংগোপনে সিঁদেল চোরের মত।

কিন্তু বেশী দূর যাইতে হইল না, একটু আগাইতেই পুলিশে ধরিয়া হাজতে রাখিয়া দিল।—নানা কথা বুঝাইতে

চাহিলাম, কিন্তু তাহারা কিছুই শুনিল না। ভাবিলাম, হাজতে যখন রাখিবেই, তখন ফল যাহাই হউক একটা আশ্রয়ে অন্ততঃ রাতটা কাটিবে।

এ দেশের পুলিশের বেশ একটু অন্য রকমের। কোমর হইতে পা পর্য্যন্ত লম্বা পায়জামা, উপরে সাদা হাফসার্ট, সকলেই গোঁফদাড়ি-হীন, এবং 'বব' করিয়া চুলকাটা। মাজার নীচে মাংসবহুল স্থানটা ঈষৎ উদার, এবং সম্পূর্ণ বিশালত্ব-বর্জ্জিত নয়, মধ্য ক্ষীণ এবং বক্ষ অস্বাভাবিক উন্নত, সম্ভবতঃ বিপুল মাংসপেশী সমাচ্ছন্ন। বেল্টের সঙ্গে এক দিকে বেটন, অন্য দিকে রিভলভার ঝুলিতেছে।

কিন্তু বেশী দূর যাইতে হইল না, একটু আগাইতেই পুলিশে ধরিল

থানা নানা কর্ম্মকোলাহলে মুখরিত; কিন্তু পরিশ্রান্ত দেহ সমস্ত উপেক্ষা করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। দারোগা বাবু নানারূপ প্রশ্ন করিলেন,—আমি কেবলমাত্র জবাব দিলাম, যাহা বলিতে হয় কোর্টেই বলিব। সকলেই মুখ টিপিয়া হাসিল—কেন বুঝিলাম না!

বেলা ১০টায় আমার সন্ন্যাস-কৃশ দেহের উপরে একটা চাদর জড়াইয়া, যথাসাধ্য আব্রু রক্ষা করিয়া কোর্টে হাজির হইলাম।

ম্যাজিষ্ট্রেট প্রশ্ন করিলেন,—কোন্ দেশ থেকে এসেছ?

প্রশ্ন ইংরেজিতে, ইংরেজিতেই জবাব দিলাম,—কোন্ দেশ তা ব'লবো না, তবে এ দেশে বসবাস ক'রতে দিলে ক'রতে পারি। আর যদি হুজুরের হুকুম হয়, তবে আমাকে নির্ব্বাসিত করুন।

ম্যাজিষ্ট্রেট চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—কন্‌টেমপ্‌ট্ অফ্ কোর্ট!—কিন্তু তিনি হুজুর না হুজুরাণী?

আমি সবিস্ময়ে দেখিলাম,—সকলেই অবাক্ হইয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া আছে। পাশে একটি পুলিশ-প্রহরী দাড়াইয়া ছিল; সে কহিল,—আপনি ত শিক্ষিত? নয় কি?

ম্যাজিষ্ট্রেটা বলিলেন,—বোধ হয় জানো না, এ দেশে পুরুষমানুষকে অন্তঃপুরের বাইরে যেতে দেওয়া হয় না,—সাধারণতঃই তারা মূর্খ, যদিও সরকার লেখাপড়া শিখাবার ব্যবস্থা ক'রেছেন। যা হোক্, তোমার শিক্ষা দেখে আমি খুশী হ'য়েছি; কিন্তু তুমি অনাবৃত বক্ষ, মুখ ও আ-হাঁটু কাপড় পরে ৫ আইন অনুসারে দণ্ডনীয়। এ সম্বন্ধে তোমার কিছু ব'লবার আছে?

—আজ্ঞে হুজুরাণী, কিছুই ব'লবার নেই; তবে আমি কোন নিয়মই জানি না, এতে যদি দণ্ড হ্রাস হয়। বিদেশাগত আমি—পূর্ব্বে বুঝিনি যে পুলিশ, উকিল প্রভৃতি সবই স্ত্রীলোক! আমাকে উপযুক্ত বস্ত্র ও বৃত্তি দিলে আমি এই সুন্দর দেশে বসবাস ক'রতে পারি। যেখানে ছিলাম, সে-দেশে কেবল পুরুষলোকেই এই সমস্ত কাজ ক'রে থাকে।

ম্যাজিষ্ট্রেটা হাসিয়া-উঠিয়া বলিলেন,—পুরুষমানুষে এ সব পারে? হাসির কথা! যাক্, গল্প শুনতে চাই নে। সরকারী পুরুষ-অতিথিশালায় থাকতে পারো, এবং যথাসম্ভব কাপড়-জামা পাবে। কিন্তু সাত দিনের মধ্যে বিয়ে না ক'রলে এ দেশ থেকে চলে যেতে হবে। এ দেশে পুরুষমানুষ কম, তাই এই আইন।

—হুজুরাণী, আমাকে কে বিয়ে ক'রবে?

—ক'রবে, তোমার মত শিক্ষিত পুরুষ এ দেশে বিরল। সরকারের খরচায় কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে। আচ্ছা, জমাদারনি, এই আসামীকে তফাৎ করো।

মেয়ে-দারোগা আমাকে সরকারী অতিথিশালায় লইয়া গেল। উপযুক্ত কাপড়-জামা আসিল—ব্লাউজ, শায়া, শাড়ী, খুরওয়ালা জুতা, ইয়ারিং, চুড়ি, নীবিবন্ধ প্রভৃতি। মেয়ে-দারোগা একটু ঢোক-গিলিয়া, একটু ইতস্ততঃ করিয়া অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে কহিল,—ওগুলো সরকারের দেওয়া,—আর যদি কিছু মনে না করেন, তবে এগুলো উপহার দিতে চাই।

—কি আছে?

—সামান্য উপহার।

—দিয়ে যান।

নারী-দারোগা প্রস্থান করিলে বাক্সটা খুলিয়া দেখিলাম,—তাহাতে ক্ষুর, কাঁচি, পাউডার, এসেন্স, স্নো, গোমেড প্রভৃতি নানা প্রসাধন-সামগ্রী।

৫ আইনে পড়িতে হইবে, এবং কিছু দিনের সন্ন্যাসে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি চুলকাইতেছিল; অতএব তাড়াতাড়ি দাড়ি কামাইয়া, স্নো প্রভৃতির সদ্ব্যবহার করিয়া গোঁফটাকে কায়দা করিয়া ছাঁটিয়া লইলাম; এবং মনের আনন্দে ব্লাউজ প্রভৃতি পরিয়া উল্লাসিত হইয়া বার বার আয়নায় মুখ দেখিতে লাগিলাম। 'গার্ল' আসিয়া পরদিন দৈনিক কাগজ দিয়া গেল;—বুঝিলাম, আমার বিবাহের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত

উল্লাসিত হইয়া বার বার আয়নায় মুখ দেখিতে লাগিলাম

হইয়াছে। গোঁফে তা দিতে দিতে কাগজ পড়িয়া ভাবিলাম—এইবার মুখ-নাড়া দিয়া সিনেমায় যাইবার অপমানের সুদে-আসলে ওয়াশীল করিব;—সেই কুশাসিত রাজ্যে পারি নাই, কিন্তু এই মহিলারাজ্যে আমি সম্মানিত বন্দী; জানি না, কে বলিবে—'এই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর!'

এই রাজ্যের ইতিহাস ক্রমে অবগত হইলাম।

আদিম যুগে এখানে পুরুষমানুষগুলি সর্ব্বপ্রকার কাজ-কর্ম্ম করিত এবং স্ত্রীলোকগুলিকে গৃহে আটক রাখিয়া অশেষ প্রকারে লাঞ্ছিত করিত। তাহারও অনেক পরে রাশিয়া নামক প্রাগৈতিহাসিক রাজ্যে একটা গৃহবিবাদের ফলে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়,—সেই সভ্যতার প্রথম আলোকে—সেই সময় হইতেই বর্ত্তমান সভ্যতার সৃষ্টি।

তার পরে বহু বাক্‌বিতণ্ডা অন্তর্বিপ্লবের ফলে সমগ্র পৃথিবীতে স্ত্রী-পুরুষের একটা বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ হয় এবং তাহাতে হীনবল পুরুষকে পরাজিত করিয়া বিশ্ব-সরকারে (Government of the World Fedaration) স্ত্রীগণের দ্বারা অধিকৃত হয়, এবং তাহারা সমগ্র পৃথিবীকে সুশাসিত করিতে থাকে। পুরুষের বুদ্ধি, শক্তি, স্মৃতি প্রভৃতি কম থাকায় তাহারা গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করে। বর্ত্তমানে বিনা বেতনে সরকার হইতে তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার সুব্যবস্থা হইয়াছে—ইত্যাদি। সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পড়িয়া খুশী হইলাম—বুঝিলাম, নিশ্চিন্ত আলস্যে দিনগুলি চলিয়া যাইবে।

পরদিন সকালে আমার পাণিপ্রার্থিনী কয়েক জন রাজ-কর্ম্মচারী উপস্থিত হইল। আমি একে একে তাহাদিগকে দেখা করিতে আদেশ করিলাম। প্রথম ব্যক্তি আসিল,—এক স্কুলমাষ্টার(ণী)। মৌলিক ভদ্রতা রক্ষা করিয়া বসিতে বলিলাম,—বসুন। কি করেন?

—আজ্ঞে, মাষ্টারী করি, বেতন দেড়শ' টাকা। সরকারের চাকুরী।

মাথার কাপড় টানিয়া গোঁফে তা দিয়া কহিলাম,—মাত্র দেড়শ'! আমি শিক্ষিত পুরুষ, আমার একটু নাচ-গানও জানা আছে, ইজ্জৎ রক্ষার জন্য মোটর রাখা দরকার। আপনি আমার খরচ চালাতে পারবেন কি?

স্কুল-মাষ্টারণী স্মার্ট-কলারের সার্টটার বুকের বোতামটা সম্ভবতঃ ইচ্ছাকৃত ভাবেই খুলিয়া আসিয়াছিল, সেটা আঁটিতে আঁটিতে বলিল,—দেখুন, কেবল টাকাতেই কি সুখ? সত্যিকার শিক্ষিতা মেয়েকে বিয়ে করলেই পুরুষ সুখী হয়। অর্থ না থাকলেও উচ্চাদর্শে অনুপ্রাণিত আমরা উচ্চ মন ও প্রকৃত নারীত্বের গর্ব্ব ক'রতে পারি।

—আমি শিক্ষিত পুরুষ, উদার নারীকে আমি চাইনি; আমি চেয়েছি মোটর, বাড়ী, ফোন, সিনেমা এই সব।—আপনার নাম?

ব্যথিত চিত্তে মাষ্টারণী কহিল,—আমার নাম, ফেলি মুর্সা।

ওঃ, আচ্ছা আসুন।

দ্বিতীয় যিনি আসিলেন, তিনি পুলিস-কর্ম্মচারিণী নাম, বেলি ব্রেনগান।—বসিতে বলিয়া মুখের দিকে চাহিলাম, কালকার সেই দারোগা-বিবি! বলিলাম,

—আপনার উপহারের জন্যে ধন্যবাদ। আজ তবুও একটু পরিষ্কার হওয়া গেছে।

মিস্ ব্রেনগান সম্ভবতঃ একটু আশান্বিত হইয়া কহিল, —আপনার মত শিক্ষিত সুন্দর পুরুষের সঙ্গে আলাপ হই'কাও গৌরবের বিষয়। আমার সামান্য উপহার গ্রহণ সক'রে আমায় কৃতার্থ ক'রেছেন।

নীরে সে জন্যে ধন্যবাদ! কিন্তু দেখুন, আপনার সামান্য বর্ষিইনে, তাতে নির্ভর ক'রে আমাকে বিবাহ ক'রলে আপনার সংসার কেমন ক'রে চ'লবে? আলাপ থাকা, একটু ফ্লার্ট করা, আর বিয়ে করা ত এক কথা নয়।

দারোগা-বিবি মুখখানা একটু কাঁচুমাচু করিয়া কহিল —তবুও—

আপনাদের চাকুরীটা একটু চাষাড়ে-রকমের; তাতে দিবারাত্রি তস্করণী, ডাকাতিনী—এই সব নিয়েই কারবার, কাজেই মনটা একটু কঠোর।

বিশেষ কিছু বলিতে হইল না, মিস্ ব্রেনগান অত্যন্ত নিরাশ হইয়াই চলিয়া গেল, যেমন করিয়া আমাদের পুরাতন দেশে যুবকগণ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া আপনার নিরাশ জীবন লইয়া ফিরে, এবং কেহ বা আত্মহত্যা করে, আবার কেহ বা কবিতা লেখে!

তৃতীয় পাণিপ্রার্থী(নী) আসিলেন—এক জন সামরিক কর্ম্মচারী মিস্ সুরা মেসিনগান। দৈর্ঘ্য প্রায় ছয় ফুট, ওজন অন্যূন সাড়ে তিন মণ, এবং চর্ব্বিসঞ্চয় ব্যতীতও অবলম্বিত অন্য কারণে উদরদেশ অস্বাভাবিকরূপে স্ফীত। দেখিয়া ভীত হইলাম, এবং সসম্ভ্রমে বলিলাম,—বসুন—

গোঁফে চাড়া দিতে সাহস হইল না। একে বিপুল তনু, তাহাতে তন্বীদেহে নানারূপ মারাত্মক আয়ুধ সজ্জিত—এবং নানারূপ সম্মানজনক পদকাদিতে সামরিক বেশ আরও সামরিক হইয়া উঠিয়াছে। হাফপ্যান্ট, বুটজুতা, এবং ষ্টিল হেলমেট বেশ মানাইয়াছে। টুপি নামাইয়া তিনি উদাত্ত কণ্ঠে কহিলেন,—আমি এক জন কর্পোরালা—ত্রিংশ সংখ্যক ব্যাটেলিয়ানের অন্তর্ভুক্তা।

আমি আরও সসম্ভ্রমে কহিলাম,—আজ্ঞে আপনি, আমার মত এক জন নিকৃষ্টা নরকে বিবাহ ক'রবেন—এটা কি ভাল হবে?

—আমার আপত্তি নেই; তবে আপনার শরীর অত্যন্ত কৃশ, স্বাস্থ্য ঠিক সামরিক কর্ম্মচারী-গৃহী হওয়ার যোগ্য নয়।

আমি সভয়ে কহিলাম,—সে একটা বড় দুর্ঘটনা সন্দেহ নেই, কিন্তু সামরিক কর্ম্মচারী দেখলে আমার বুকের ভিতর কেমন ঢিপ্-ঢিপ্ করে, ধড়-ফড় করে, আর বমি আসে,—হিষ্টিরিয়ার মত হয়!

তিনি হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন,—বাইরে ও-রকম কঠোর না থাকলে সৈনিকাগণ মানবে কেন? তা হ'লেও আমাদের ত অন্তর আছে, তাকে উপেক্ষা ক'রতে পারেন না। জানেন ত, সৈনিকাগণ আজকাল কি রকম দুর্দ্ধর্ষ—

আমি নতনেত্রে আঁচলের চাবি ঘুরাইতে ঘুরাইতে কহিলাম,—দেখুন, আপনাদের অন্তরকে উপেক্ষা করা দূরের কথা, খুব শ্রদ্ধা করি, এবং তার চেয়েও বেশী শ্রদ্ধা করি শক্তিশালী তনুকে।—যাকে শ্রদ্ধা করি তাকে দূরে রাখাই ত—

মিস্ মেসিনগান হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—বেশ, বেশ, তাই হোক—

ভারী বুট মেঝেয় ঠুকিয়া সামরিক কায়দায় অভিনন্দন করিয়া সগর্ব্ব পদক্ষেপে তিনি চলিয়া গেলেন,—সমগ্র বাড়ীটা কাঁপিয়া উঠিল; আমার অন্তরাত্মাও কাঁপিয়া কাঁপিয়া শান্ত হইল। যা হোক্! এই সামরিক কর্ম্মচারী যে সহজে মুক্তি দিলেন, সেই ভাগ্য!

পরে যিনি কার্ড পাঠাইলেন, তিনি এক জন সেনা-নায়িকা—মিস্ হায়না হাউইটজার। মেসিনগান দেখিয়াই তটস্থ হইয়াছিলাম; অতএব মিস্ হাউইটজারকে দ্বারপ্রান্ত হইতেই বিদায় দিয়া কহিলাম—নমস্কার, আমায় ক্ষমা ক'রবেন। বর্ত্তমানে একটু হিষ্টিরিয়ার আক্রমণের আশঙ্কা ক'রছি।

কাগজে পড়িতেছিলাম—বিচিত্র দেশের বিচিত্র কত জনরব।

কোনও এক সহরে অবস্থিত এক সৈনিকাদলের কয়েক জন এক জন পুর-নরকে অসম্মান করিয়াছে। কোর্টে তাহাদের বিচার হইয়াছে,—বেত্রাঘাত ও জেল। অন্যের বিবাহিত পতি ফুসলাইয়া লইবার অভিযোগে দণ্ড—পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। কবি-সম্রাজ্ঞী ইলা লীলায়িতার রজত-জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে,—পুরুষ-কবির উল্লেখযোগ্য কবি-প্রতিভা। কোন পত্রিকা-সম্পাদিকার রাজদ্রোহ অপরাধে কারাদণ্ড ভোগ। পুরুষের অপূর্ব্ব কৃতিত্ব, প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ। তাহার ছবিখানিও প্রকাশিত হইয়াছে। অন্তঃপুরচারীর অপূর্ব্ব সাহস—ডাকাতিনীগণের সহিত যুদ্ধ।

আনন্দে সমস্ত দিনটি ধরিয়া কাগজের আপাদ-মস্তক বার বার পড়িলাম। এমন রোমাঞ্চকর সংবাদ পূর্ব্বে কখনও পড়ি নাই।

আজ ষষ্ঠ দিন—কিন্তু উপযুক্ত পাণিপ্রার্থিনী আজও কেহ আসিলেন না; তবে এইটুকু বুঝিয়াছি, বিবাহের বাজারে আমার দর নেহাত মন্দ নয়। ধৈর্য্য ধরিলে ভাল বিবাহ হইতে পারে।

এই কয় দিনে বহু পাণিপ্রার্থিনীকে নিরাশ করিতে বাধ্য হইয়াছি বলিয়া দুঃখিত। কিন্তু আমার বি-এ পাশ করা সাবেক গৃহিণী আমাকে বিবাহ করিয়াছেন বলিয়া অনুশোচনা করিয়াছিলেন, এবং এক জন ম্যাজিষ্ট্রেট বিবাহ করিতে পারিতেন বলিয়া গর্ব্ব বোধ করিয়াছিলেন; অতএব

নমস্কার করিয়া বসিতে বলিলাম

এক জন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে বিবাহ করিতে না পারিলে নিরর্থক এই গৃহত্যাগ!

আজ সকালে এক জন জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটা পাণিপ্রার্থিনী হইয়া আসিলেন। যতগুলি অস্ত্র ছিল, মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিয়া ভাবিলাম, যাহাতে ইনি অন্ততঃ ফস্‌কাইয়া না যান।

নমস্কার করিয়া বসিতে বলিলাম,—বসুন। এবং লজ্জাশীলতা দেখাইবার জন্য অবনত নেত্রে আঙ্গুল খুঁটিতে লাগিলাম।

ম্যাজিষ্ট্রেটা কহিলেন,—দেখুন, আপনি বয়স্থ, এবং শিক্ষিত পুরুষ, আপনাকে বেশী কিছু ব'ল্‌বার নেই; তবে আমার যা আয় ও জীবন প্রণালী সবই জানেন। উচ্চাদর্শ নিয়ে গড়ে উঠেছিলাম, কাজেই শিক্ষিত পুরুষ গৃহে না পেলে সে গৃহ অশান্তিময় হয়ে উঠবে। তার হাতে সমস্ত অর্থ, চিত্ত এবং সেই সঙ্গে আমাকে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে কাজ ক'রতে পারি—

হাতের চুড়ি নাড়িতে নাড়িতে বলিলাম,—আপনার যদি আপত্তি না থাকে, এবং আমাদের মত সোমত্ত শিক্ষিত পুরুষকে—

সাহেবা জিব কাটিয়া কহিলেন,—না না, কিছু মনে ক'রবেন না, বয়স্থ কথাটা দ্বারা কোনরূপ ইঙ্গিত ক'রবার ইচ্ছা আমার ছিল না, নাই-ও; তাই যদি হবে, তবে আপনার পাণিপ্রার্থিনী হ'য়ে আমি কেমন করে আস্‌তে পারি?

—না, তা আমি ব'লতে চাইনি। বলছিলুম, আমাদের মত বয়স্থ পুরুষকে নিয়ে নীড় রচনা ক'রতে যদি আপনার বাধা না থাকে, তবে আমারই বা কি আপত্তি থাকতে পারে? কিন্তু শিক্ষিত পুরুষের যে খরচা বেশী, তা জানেন, তা নিয়ে যদি—

—না না না, কিছু ভাববেন না। আমার সৌভাগ্যকে আজ বিশ্বাস ক'রতে ইচ্ছা হচ্ছে না। তবে শুভদিন কবে?—আজই আমরা ম্যারেজ-রেজিষ্ট্রারের কাছে যেতে পারি?

আমি আঁখি তুলিয়া, কাঁধের কাপড়টাকে ঈষৎ টানিয়া একটু মৃদু হাসিয়া কহিলাম,—আপনার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা।

তিনি হস্ত প্রসারণ করিলেন; আমি সলজ্জ হাতখানি বাড়াইয়া কম্পিত হস্তে করমর্দ্দন করিলাম, এবং গোঁফে তা দিতে দিতে ব্রীড়াভঙ্গি করিয়া কহিলাম,—কখন আস্‌বেন?

—যখন অনুমতি হয়।

—বিকেলে, কি বলেন?

সাহেবা বিদায় লইলেন। মনে মনে ভাবিলাম, এই ম্যাজিষ্ট্রেটা সাহেবাকে যদি নাকানি-চোকানি খাওয়াইতে পারি, তবেই গৃহত্যাগ সার্থক—তবেই সাবেক গৃহিণীর সমুচিত প্রত্যুত্তর দেওয়া হইবে। প্রচুর টাকা খরচ করিবার কি কি ফন্দী আছে, তাহা ঠিক করিয়া রাখিলাম, কেরাণী-জীবনে যাহা করিতে পারি নাই, আজ সেই সমস্ত সাধ পূর্ণ করিয়া লওয়া যাইবে। গাড়ী, বাড়ী, শাড়ী, গহনার কাঁড়ি।

*　　*

শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে।

মফঃস্বলে এক জেলার সহরে বাংলো-বাড়ীতে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবা সম্প্রতি আসিয়াছেন। সঙ্গে বেয়ারা-বরকন্দাজী গাড়ী, গার্ল প্রভৃতি সবই আসিয়াছে। বাংলোর দ্বিতলে পায়চারী করি, সংবাদপত্র পড়ি, গার্ল প্রভৃতিকে

হুকুম করি, ঘুমাই, পথচারিণী নারীগণের প্রতি কখনো দৃষ্টিনিক্ষেপ করি; কুলি-মজুরিণীর প্রতি ঘৃণাভরে চাহিয়া থাকি, তবুও সময় কাটে না! মদীয় পত্নী মাহিনা পাইয়া সমস্তই আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন; কিন্তু কেরাণী-জীবনের সংস্কারবশতঃ কিছুতেই সব টাকা খরচ করিতে পারিতেছি না, তবে না করিলেও যে নয়,—ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবাকে পদানত না করিতে পারিলে এই জীবন ব্যর্থ। এইরূপ চিন্তা করিতেছিলাম।

গাড়ী করিয়া জজপতি, মুনসেফপতি ও এক জন ডিপুটি-পতি বেড়াইতে আসিলেন। জজপতির গোঁফ আছে, মুনসেফপতির নাই—কিন্তু স্বর্ণহার কণ্ঠে ঝিকমিক্ করিতেছে, জজপতি সলজ্জ ভাবে কহিলেন,—আলাপ ক'রতে এলাম, আপনারা শিক্ষিত, আলাপ ক'রতে ভয় ক'রে; কিন্তু সঙ্গী ত চাই।

—না না, এ কি ব'লছেন। অল্প দিনেই হাপিয়ে উঠেছি একেবারে—আপনারা যদি না আসেন টিক্‌বো কি ক'রে?

জজপতি কহিলেন, আমার উনি আবার সকলের সঙ্গে মেশা ভালবাসে না, কাজেই ভয়ে ভয়ে বেরুতে হয়, কিন্তু আশ্চর্য্য! আপনার সঙ্গে আলাপ ক'রে নেবার জন্যে উনিই বললেন।

মুনসেফপতিও একটু কুণ্ঠিত স্বরে কহিলেন,—আমার উনিও ত তাই, আপনার মাঝে কি-ই যে দেখেছেন, সকলেই আলাপ ক'রতে ব্যস্ত; আর আপনি ত আমাদের মত নয় যে, মেয়েমানুষ দেখলে লজ্জায় ভয়ে একেবারে জড়সড় হ'য়ে পড়েন! বাড়ীতেও ত যাবেন?

—যাবো, যদি উনি মত করেন; তা নইলে যাওয়া ত ঠিক নয়।

মুনসেফপতির হারটা লক্ষ্য করি নাই মনে করিয়া তিনি সেটাকে বার-দুই গলার উপর দিয়া ঘুরাইয়া লকেটটাকে ব্যক্ত করিয়া রাখিলেন। এই ক্ষুদ্র ব্যাপারটাতে আমার অশেষ উপকার হইল।

বিকালে আফিস্ হইতে 'উনি' ফিরিতেই, চা প্রভৃতি গার্লের হাতে দিয়া উপস্থিত হইলাম এবং কটাক্ষ শরাঘাতে ও অন্যান্য উপায়ে তাঁহার হৃদয় জর্জ্জরিত করিয়া কহিলাম,—জজপতি ও মুনসেফপতি আজ বেড়াতে এসেছিল যে!

তিনি কহিলেন,—তাঁরা আসবেনই ত;—এ বিষয়ে আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যবতী।

—কিন্তু তারা এসেছিল নতুন কারে চ'ড়ে; আর মুনসেফপতি তার মুক্তার হার সগর্ব্বে দেখিয়ে গেল! নতুন গাড়ী আর হীরার হার না হ'লে ওদের সঙ্গে মিশতে পারবো না। না, সে অপমান আমার সহ্য হবে না। কেন, আমি কম কিসে? আমার মান-সম্ভ্রম নেই?

তিনি হাসিতে চেষ্টা করিয়া কহিলেন,—তা-ত বটেই; কিন্তু ওগুলো ত এক মাসের মাইনেতে হয় না। এ জন্যে অনেক টাকার দরকার।

টাকাখরচের কথায় সাবেক স্ত্রীর সম্মুখে আমার মুখখানা যেমন করিয়া শুকাইয়া যাইত, তাঁহার মুখও তেমনি শুকাইয়া গেল। করুণা বোধ করা উচিত ছিল, কিন্তু—

অভিমানভরে বলিলাম,—তাই বলে এ অপমান আমি সইতে পারবো না; যেখানে হয় চলে যাবো, এত সুখে আমার দরকার নেই।

চোখে আঁচল দিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলাম; কিন্তু পোড়া চক্ষুতে জল নাই—পূর্ব্ব-সংস্কারে শুকাইয়া গিয়াছে। তিনি করুণ বেদনাভরা কণ্ঠে কহিলেন,—না না, তুমি দুঃখ ক'রো না। একটা ব্যবস্থা আমি ক'রবই। কর্জ্জ ক'রে হোক্ বা—

—আমি বুঝি তোমায় কর্জ্জ ক'রতে বলেছি! না হয় অন্য কোথাও পাঠিয়ে দাও।

—তা কি হয়? তোমাকে ছেড়ে আমি বাচবো কি ক'রে?

আনন্দিত হইলাম, কিন্তু চোখ হইতে আঁচল সরাইলাম।

গাড়ী ও হীরার হার আসিল।

মাসের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত যথেষ্ট খরচ করিয়া যখন মাহিয়ানার সব টাকা ফুরাইয়া আসিল, তখন তাঁকে জানাইলাম—টাকা ত আর নেই, সংসার চ'লবে কি ক'রে?

—নেই! মানে অত টাকা খরচ ক'রলে কি ক'রে?

আমি গ্রীবাদেশ স্কন্ধে ঠেকাইয়া বলিলাম,—ও-মা, আমি তোমার টাকা চুরি ক'রেছি না কি? তোমার ঘর-সংসার তুমিই দ্যাখো, আমার দরকার নেই। দিবারাত্রি সমস্ত দেখবো, সংসারের জন্যে খেটে মরবো, আর তার পরে এত অবিশ্বাস! এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না।

—না না না, তা ব'লছি নে; কিন্তু একটু হিসেব ক'রে খরচ ক'রলে—

হিসেব ক'রে খরচ ক'রতে পারে, এমন পুরুষ জুটিয়ে আনলেই ত পারতে। আমাকে বিদায় দাও, যদি এমন অপমান, এত লাঞ্ছনা করবে—

কাঁদিবার চেষ্টা করিতেছিলাম, কিন্তু সে চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হইল না। তিনি ক্ষমা চাহিয়া বলিলেন,—মাফ ক'রো, সত্যিই ত, খরচ হ'লে তুমি কি ক'রবে? যা হয় ব্যবস্থা একটা ক'রবো, তবে—

—তবে টবে নেই। তুমি নিজের মত খরচ ক'রো, আমি চাকর-বাকরের মত থাক্‌বো, সেই ভালো—

উনি নিরুত্তর, বেদনায় চোখ দুইটি অশ্রু-সজল। একটু সহানুভূতি দেখাইতে কহিলাম, তুমি রাগ ক'রলে কি ক'রবো? সম্মানের জন্যে যা দরকার তার বেশী কি খরচ করি? জমাখরচ ত আছে? এক সময় দেখলেই পার।

তিনি হাসিয়া কহিলেন,—আমি কি তোমায় অবিশ্বাস করি যে হিসাব দেখবো?

—করো না?

দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া তিনি বলিলেন, অর্দ্ধেক মানব তুমি, অর্দ্ধেক কল্পনা।

খবরের কাগজে ভয়ঙ্কর সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে—

রাজ্যের সামরিক, বে-সামরিক, রেলওয়ে, পোষ্ট-অফিস প্রভৃতি সমস্ত ডিপার্টমেন্টের কর্ম্মচারিগণ একযোগে ছুটির দরখাস্ত করিয়াছেন। রাজ্যের নিয়মানুসারে তাহাদের ছুটির কারণকে উপেক্ষা করিবার উপায় নাই—প্রত্যেককেই ছয় মাস ছুটি দিতে হইবে। যদি তাহাই হয়, তবে সমস্ত কাজকর্ম্ম, যান-বাহন বন্ধ হইয়া মহা বিশৃঙ্খলা ও অনর্থের সৃষ্টি হইবে।—সরকার এখন নিরুপায়! সকলেই 'মাতৃত্বের কারণে' ছুটি চাহিয়াছেন, সুতরাং আইন অনুসারে সরকার এ ছুটি মঞ্জুর করিতে বাধ্য।

শঙ্কিত হইয়াছিলাম—সমস্তই যদি একযোগে বন্ধ হইয়া যায়, তবে উপায়? সাবেক দেশে ফিরিবারও ত কোন উপায় থাকিবে না!

জনৈক পুরুষ-স্বাধীনতার প্রবর্ত্তক লিখিয়াছেন—তাঁহার কথামত যদি পুরুষকে স্বাধীনতা দান করা হইত, তবে আজ এই বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটিতে পারিত না। আজ একযোগে নমনীয় পুরুষ জাতিকে সরকারের কাজ চালাইবার উপযোগী করা সম্ভব নয়, ইত্যাদি।

জনৈক বৈজ্ঞানিক লিখিয়াছেন—যদি পুরুষদিগকে গর্ভ-ধারণের উপযোগী করিবার জন্যে, গবেষণার জন্যে সরকার যথেষ্ট অর্থসাহায্য করিতেন, তবে এ সমস্যার উদ্ভব হইত না।

আর এক জন প্রতিবাদ করিয়াছেন—তাহা হইলে আদিম যুগে ফিরিয়া যাইতে হইবে। যদি স্ত্রীগণ পুরুষ হন, এবং পুরুষ স্ত্রী হন—তবে এত পরিশ্রমের কি প্রয়োজন? পুরুষই সরকার পরিচালিত করিতে পারে।—শতাধিক বর্ষব্যাপী এই অক্লান্ত সংগ্রাম তাহা হইলে আমরা কেন করিয়াছি? ইত্যাদি নানাবিধ তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ ও সারগর্ভ বাণী প্রকাশিত হইয়াছে। আমার শঙ্কা ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল! —হায়, তবে কি গৃহত্যাগ করিয়া ভাল করি নাই, আর কি ফিরিতে পারিব না? ভাল হোক্, মন্দ হোক্, সেই গৃহিণীর কাছেই ত এত দিন মনটা পড়িয়া আছে—কেবল অভিমান করিয়াই ত চলিয়া আসিয়াছি। বুক চাপড়াইয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইল—কিন্তু নিরুপায়।

আফিস হইতে ফিরিয়া উনি কহিলেন,—ছুটির দরখাস্ত ক'রেছি, আর ত পরিশ্রম ক'রতে পারি নে, শরীর যে ভেঙ্গে পড়েছে—

এত দিন লক্ষ্য করি নাই, আজ ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিলাম,—ছুটি চাহিবার যথেষ্ট কারণই বর্ত্তমান, এবং ছুটির আশু প্রয়োজনকে উপেক্ষা করা যায় না।

—কিন্তু ছুটি কি দেবে? সকলেই যে ছুটি চায়—দারোয়ান, বেয়ারা, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট সব।

বলিলাম,—তাই ত।

মুখ তাঁহার শুষ্ক, বিবর্ণ, রক্তহীন। তাঁহার নিরুপায় অবস্থাই আমাকে যেন নিষ্ঠুর করিয়া তুলিল। আমি উঠিয়া-দাঁড়াইয়া বলিলাম,—আচ্ছা, শুনব এক সময়। ওদের সঙ্গে নিয়ে সিনেমায় যাবার কথা, সময় হ'লো।

—মাসের শেষ, পরের মাসে দেখলে হ'ত না?

আমি সক্রোধে কহিলাম,—তোমার হাতে পড়ে সুখ সুখ-সাধই বিসর্জ্জন দিয়েছি; কিন্তু একটা টাকা যদি না দিতে পারবে তবে বিয়ে ক'রেছিলে কেন—আমাদের মত শিক্ষিত পুরুষকে? একটা গেঁয়ো বর্ব্বর পুরুষকে বিয়ে ক'রলেই হ'ত—যাদের স্বাধীন সত্তা নেই।

—ওই স্বাধীন সত্তা ত্যাগ ক'রলেই ত সব গোল চুকে যায়।

ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলাম,—তোমাকে বিয়ে ক'রে যে কতখানি ঠকেছি, তা' আজ বুঝছি!—ইচ্ছে ক'রলে কোন লাটকে বিয়ে করা আমার পক্ষে কঠিন ছিল না।

ওঁর শরীর ভাল ছিল না, তাই হয় ত রাগিয়া থাকিবেন। সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিলেন,—না, আজ

আমার শরীর ভাল নেই; আজ কিছুতেই যেতে পারব না।

আমি গ্রীবাদেশে তর্জ্জনী সংস্থাপন করিয়া কহিলাম,—বা রে! তোমার জোর?

—হ্যাঁ, তোমার ওপর কি আমার কোন দাবী নেই?

—ছিলো, আজ নেই। তাঁহাকে ঠেলিয়া দিয়া দুম্‌দাম্‌ শব্দে উঁচু-হিল জুতা ঠুকিতে ঠুকিতে বাহির হইয়া পড়িলাম। রুগ্ন শরীর লইয়া তিনি পদপ্রান্তে পড়িয়া গেলে আজ প্রথম লক্ষ্য করিলাম—তাঁর চেহারা ঠিক আমার সাবেক গৃহিণীর মতই,—সার্ট-কোটের অন্তরালে তাহা চাপা ছিল মাত্র।

চোখ মেলিয়া দেখিলাম,—সাবেক প্রিয়া কহিতেছেন,—ও বাবা! রাগ এখনও পড়েনি? সকলকে বলেছিলাম, তাই তো না-গিয়ে পারলাম না; তা তোমার টাকা খরচ করিনি। ওঠো লক্ষ্মী, রাগ ক'রো না, সারারাত্রি না খেয়ে আছ, উঠে তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। না খেয়ে কত কষ্টই পেয়েছ,—ওঠো লক্ষ্মীটি! রাগ ক'রো না।

চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিলাম···

স্বপ্নভঙ্গে উঠিয়া-বসিয়া ভাবিলাম,—এ দেশটাও ত ভবে মন্দ নয়!

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (এম-এ, বি-টি)

শাশ্বত

রাতের আঁধারে নগরীর পথে ঘুরিয়া বেড়ায় যারা
মৃত্যুর বীজ বহন করিয়া চির অধিকার-হারা,
মানুষের ঘৃণা যাহাদের কেশে প্রতিদিন জট বাঁধে
তাহাদের তরে আয়ুর দেবতা সর্পিল পথে কাঁদে!

অর্থবিহীন পথের পাঁচালী সৃজন করার লাগি
ধনীর দুয়ারে বার বার যারা বেড়ায় ভিক্ষা মাগি,
রক্তে তাদের বাসা বাঁধিয়াছে অক্ষমতার ভাণ
পরের অন্নে তাই আজো হয় আত্মার বলিদান!

কত অঙ্কুর জীবন-সূর্য্যে পৃথিবীর ইতিহাস
মহামানবের পথের ধূলায় করে রাখিয়াছে দাস,
গত চেতনার সমাধি-ভূমিতে তাহাদের পাই দেখা
সঙ্গিবিহীন কিসের লাগিয়া আজো ফিরিতেছে একা।

কিছু নাই তবু শাশ্বত যাহা আছে তাহাদের কাছে—
জন্ম-মৃত্যু মিতালি করিয়া ঘুরিতেছে পাছে পাছে,
আর যাহা কিছু মিথ্যা সকলি—সঞ্চয় তার খুলি
দেখিলাম শুধু রাখিয়া গিয়াছে শেষ ভিক্ষার ঝুলি।

বিদ্রূপভরা শেষ দান তার ভিক্ষার ঝুলিখানি
নবাগত কত মানুষের চোখে মাদকতা দেয় আনি,
তমসার ছবি নব-রূপ পায় সৃষ্টির তুলিকায়,
নবীন আশায় আয়ুর দেবতা পিছন ফিরিয়া চায়!

শ্রীঅমর ভট্ট।

ইতিহাসের অনুসরণ

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা কোথায় ছিল এবং কি প্রকারেই বা তাহা বিধ্বস্ত হইয়াছিল,—তাহার নির্ভরযোগ্য কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান কালে ভারতবর্ষের মানচিত্রের যে স্থানটিতে দ্বারকার অবস্থান লক্ষিত হয়, সেই স্থানেই কি শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা প্রতিষ্ঠিত ছিল? না, উহা অন্যত্র ছিল? ইহা ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয় সন্দেহ নাই। পাণ্ডারা এখন যে স্থানটিকে দ্বারাবতী নামে অভিহিত করেন, তাহা যে অত্যন্ত আধুনিক, এ বিষয়ে পুরাতত্ত্বজ্ঞ ও ভূতত্ত্ববিদ্গণ অভিন্নমত। উহা দ্বারকানাথের দ্বারকা নহে—মোক্ষদায়িকা দ্বারাবতীও নহে; অথচ এই দ্বারকাতেই শত শত নিষ্ঠাবান্ হিন্দু পিণ্ডদানাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া শান্তিলাভ করিতেছেন। কিন্তু কালের পবিবর্ত্তনে স্থানেরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে কি না, তাহারও সন্ধান লওয়া প্রয়োজনীয় বটে! কিন্তু নির্ভরযোগ্য সন্ধান কোথায় পাওয়া যাইবে? যাঁহারা পুরাবস্তু লইয়া গবেষণা করেন, তাঁহারা 'পাথুরে'-প্রমাণ ব্যতীত কোন বিষয়েরই অস্তিত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু সকল স্থানের ভূগর্ভ খনন করিয়া পুরাবস্তু বা পুরাতন স্তর আবিষ্কার করা সহজসাধ্য নহে; আর ভূগর্ভ হইতে কোন প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইলেও উহা মহামানব শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী দ্বারাবতী কি না, তাহা নির্দ্ধারণ করিবারই বা উপায় কি? পুরাতত্ত্বের উপর অনুমানের জঞ্জাল এতই পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে যে, গবেষণা দ্বারা প্রকৃত তথ্য নিরূপণ করা অসাধ্য বলিয়াই মনে হয়। এই অবস্থায় মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থে উহার বিবরণ দেখিয়া যদি কোন সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে সেই চেষ্টা সফল হইতেও পারে। দ্বারকার বিবরণ মহাভারতে পাওয়া যায়, এবং উহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ; কারণ, ইহাতে অনেক অলৌকিক কাহিনী থাকিলেও অনেক সত্য ঘটনারও সন্ধান পাওয়া যায়—সুতরাং তাহা হইতে প্রকৃত তথ্যের উদ্ধার-সাধন করা তেমন কঠিন বলিয়া মনে হয় না। মহাভারত হইতেই এই তত্ত্ব জানিতে পারা যায় যে, মগধপতি জরাসন্ধের ভয়েই যাদবগণ মথুরা হইতে দ্বারাবতীতে গমন করিয়া বাস করিতেছিলেন। তাঁহাদের পরামর্শদাতা ছিলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। যাদবদিগের প্রতি জরাসন্ধের অত্যাচার-কাহিনী, এবং মথুরা হইতে যাদবগণের কাথিয়াবাড় বা সৌরাষ্ট্র-অঞ্চলে গমনের বিবরণ শ্রীকৃষ্ণই রাজা যুধিষ্ঠিরের গোচর করিয়াছিলেন। উহাতে দ্বারকার উল্লেখ আছে। শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখেই বলিয়াছেন,—"ঐ জরাসন্ধের ভয়ে আমরা বিপুল ঐশ্বর্য্য পৃথক্ পৃথক্ বিভাগপূর্ব্বক সংক্ষিপ্ত করিয়া লইয়া পুত্র, জ্ঞাতি এবং বান্ধবদিগের সহিত পলায়ন করিলাম। হে নৃপতে! ঐ পশ্চিম অঞ্চলে রৈবতক শৈল দ্বারা পরিশোভিত কুশস্থলী নামক এক পরম-রমণীয় পুরীতে বাস করিলাম এবং তথাকার দুর্গ উত্তম করিয়া সংস্কৃত করিয়া লইলাম। ঐ দুর্গটি দেবতাদিগের অধৃষ্য। তথায় নারীরাও অনায়াসে যুদ্ধ করিতে পারে, বৃষ্ণিবংশীয় মহারথদিগের ত কথাই নাই। আমরা এখন নিঃশঙ্ক হইয়া তথায় বাস করিতেছি। মাধবেরা ঐ সংস্থানাদি বিশেষ বিবেচনা করিয়া এবং মগধরাজ জরাসন্ধের হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া পরম হর্ষপ্রাপ্ত হইয়াছেন। জরাসন্ধের অনিষ্টাচরণের ভয়েই আমরা প্রয়োজন বশতঃ গোমন্ত পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। (১) পরে এই কথার উপসংহারে শ্রীকৃষ্ণ আবার বলিয়াছেন,—আমরাও জরাসন্ধের ভয়ে দ্বারাবতীতে চলিয়া গিয়াছিলাম। (২) ইহাতে দেখা যায় যে, জরাসন্ধভয়ে ভীত যাদবসম্প্রদায় দ্বারাবতী বা কুশস্থলী নামক নগরে পলায়ন করিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন! ঐ দ্বারাবতী বা কুশস্থলী রৈবতক নামক পর্ব্বতের অদূরে অবস্থিত ছিল। উহার দ্বিতীয় নাম কুশস্থলী। এই দ্বারাবতীর সান্নিধ্যে যে সাগর ছিল, শ্রীকৃষ্ণ এ কথা বলেন নাই। পক্ষান্তরে বর্ত্তমান কালে যে স্থান দ্বারকাতীর্থ নামে অভিহিত, তাহা রৈবতক গিরি হইতে প্রায় ৫০ ক্রোশ বা তাহারও অধিক দূরে অবস্থিত। উহার নিকট কোন পাহাড়-পর্ব্বত নাই। এই রৈবতক পাহাড়ের আয়তন তিন যোজন। অবশ্য, এই যোজনের পরিমাণ যে চারি পাঁচ হাজার বৎসর ধরিয়া একরূপই আছে, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া কঠিন বটে! এখন চারি ক্রোশে এক যোজন হয়। তখনও তাহাই হইলেও ক্রোশের দৈর্ঘ্য বোধ হয় অপেক্ষাকৃত অল্প ছিল। সমগ্র সৌরাষ্ট্র প্রদেশে বর্ত্তমান কালে একমাত্র গিরণার পাহাড়েরই পরিসর ১২ বর্গ-মাইল। এত বড় পাহাড় সমগ্র কাথিয়াবাড়ে দ্বিতীয় নাই; সুতরাং গিরণার পাহাড়ের নিম্নে বা অধিত্যকায় কুশস্থলী বা দ্বারাবতী ছিল, এরূপ মনে করা যাইতে পারে; তবে ইহা অনুমান মাত্র।

দ্বিতীয়তঃ, মহাভারতের আদিপর্ব্বের ২১৯ অধ্যায়ে দেখা যায়, অর্জ্জুন নানা তীর্থ পর্য্যটনান্তে প্রভাস-তীর্থে উপনীত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রভাসে গমন করিয়া অর্জ্জুনের সহিত সাক্ষাৎ করেন, এবং তাঁহার সমভিব্যাহারে সোজা রৈবতক পর্ব্বতে উপস্থিত হন। প্রভাস পত্তন কাথিয়াবাড় উপদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম তীরে অবস্থিত। এই স্থান হইতে আধুনিক দ্বারাবতী বহু দূরে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে তৃতীয় পাণ্ডব (অর্জ্জুন)কে রৈবতকে লইয়া গিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে দ্বারকাবাসীরা রৈবতক পর্ব্বত উৎকৃষ্টরূপে সজ্জিত করিয়াছিল। সেই স্থানে কয়েক দিন অবস্থিতির পর তাঁহারা দ্বারকায় গমন করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন দ্বারকায় সুভদ্রাকে দেখিতে পাওয়ায় সুভদ্রাকে হরণ করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরামর্শ করেন। সুভদ্রা রৈবতক-যাত্রার উৎসবে যোগদান করিতে রৈবতক পর্ব্বতে আসিয়াছিলেন। তথায় তিনি পূজার্চ্চনা ও দানাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যখন দ্বারকায় প্রত্যাগমনের জন্য প্রস্তুত, সেই সময় অর্জ্জুন তাঁহাকে হরণ করেন। এই সংবাদ অবিলম্বেই দ্বারকায় পৌঁছিলে অর্জ্জুনের এই কার্য্যে সকলেই ক্রোধ প্রকাশ করেন, কিন্তু

---

(১) মহাভারত সভাপর্ব্ব ১৪ অ, ৪৮—৫৪।

(২) ঐ ঐ ৬৭ শ্লোক।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া ধনঞ্জয়কে দ্বারকায় আনয়ন করেন।—এই বর্ণনাপাঠে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, দ্বারকাপুরী রৈবতক পাহাড়ের পশ্চিম দিকে অবস্থিত পর্ব্বত হইতে অনতিদূরে সংস্থাপিত ছিল, এবং প্রায় এক শত মাইল দূরবর্ত্তী আধুনিক দ্বারকায় উহা প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া ধারণা করা যায় না। প্রভাস বা সোমনাথের দশ ক্রোশ মাত্র পূর্ব্বে একটি স্থানের নাম আছে—মূল-দ্বারকা। শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় অনুসারে পরবর্ত্তী কালে ইহা বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।—কেন, সে কথা পরে আলোচনা করিব।

যে সময়ে অর্জ্জুন তীর্থপর্য্যটন উপলক্ষে প্রভাসতীর্থে (সোমনাথে) গমন করেন, সেই সময়ে মূল-দ্বারকার প্রতিষ্ঠা হয় নাই। কারণ, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে দশ ক্রোশ মাত্র দূরস্থ দ্বারকায় লইয়া যাওয়ার পরিবর্ত্তে কি কারণে একেবারে বহু ক্রোশ দূরবর্ত্তী রৈবতক পর্ব্বতে লইয়া যাইলেন? এবং তথা হইতে আবার ঐ সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া কেনই বা দ্বারকায় আসিবেন? ইহা সঙ্গত বলিয়া ধারণা হয় না। এবং শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় মহামানব—যিনি অবতার বলিয়া নিষ্ঠাবান্ হিন্দু কর্ত্তৃক পূজিত—তাঁহা দ্বারা এই ভাবে শিরোবেষ্টনপূর্ব্বক নাসিকা-প্রদর্শন কদাচ সম্ভব হইতে পারে না। এই জন্যই প্রতীতি হয়, প্রকৃত দ্বারকা বর্ত্তমান গিরণার পাহাড়ের পশ্চিম দিকে কোথাও প্রতিষ্ঠিত ছিল।

যাদবগণ শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ অনুসারে যখন কুশস্থলী বা দ্বারকায় গমন করিয়াছিলেন, তখন তাহা পরিত্যক্ত প্রদেশ মাত্র ছিল। হরিবংশের ১০ম এবং ১১শ সর্গে এই অঞ্চলের পূর্ব্বকথা লিখিত আছে। কিন্তু এ কালের ইতিহাসবেত্তারা হরিবংশের উক্তিতে নির্ভর করিতে প্রস্তুত নহেন; কারণ, উহা অবিমিশ্র ইতিহাস নহে। কিন্তু হরিবংশেও অনেক প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত আছে, ইহা বোধ হয় বহুদর্শী চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত নহেন। এ কথা স্বীকার করিতে হইতেছে যে, আমাদের আলোচ্য বিষয়ের একটা ইঙ্গিত হরিবংশেই পাওয়া যায়। জরাসন্ধের ভয়ে শ্রীকৃষ্ণ মথুরার বাস পরিত্যাগ করিয়া যাদবগণের বসবাসের জন্য গরুড়কে কোন নিরাপদ স্থান খুঁজিতে বলিলে গরুড় অনেক অনুসন্ধানে অবশেষে রৈবতক পর্ব্বতের পশ্চিম পার্শ্বে, সৌরাষ্ট্র বা আনর্ত্ত দেশের (বর্ত্তমান কাথিয়াবাড়) কুশস্থলীতে নগর স্থাপন করিয়া যাদবগণের যোগ্য বাসস্থান বলিয়া বর্ণনা করেন। গরুড় উক্ত প্রদেশ সন্দর্শন করিয়া বলিলেন,—

রৈবতং চ গিরিশ্রেষ্ঠং কুরুদেব! সুরালয়ম্।
নন্দনপ্রতিমং দিব্যং পুরদ্বারস্য ভূষণম্॥
—হরিবংশ ১১২ সর্গ।

হে দেব, আপনি রৈবতককেই সুরালয় (যাদবগণের বাসস্থান রূপে) ঠিক করুন। উহা স্বর্গের ন্যায় দিব্যশোভাসম্পন্ন হইবে, এবং রৈবতক উহার পুরদ্বার হইবে।—গরুড় এই স্থানের যথেষ্ট প্রশংসা করায় শ্রীকৃষ্ণ গরুড়ের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। এখানে দেখা যায় যে, রৈবতককেই উঁহাদের বাসস্থান বলিয়া স্থির করা হয়। স্থানটি যেন যাদবদিগের জন্যই সংরক্ষিত ছিল। হরিবংশের ১০ম এবং ১১শ অধ্যায়ে ঐরূপই বর্ণিত হইয়াছে। বৈবস্বত মনুর বংশোদ্ভূত এক জন রাজার নাম ছিল প্রাংশু। প্রাংশুর পুত্র শর্য্যাতি। শর্য্যাতির পুত্র আনর্ত্ত। এই আনর্ত্তের নামানুসারেই ঐ প্রদেশের নামকরণ হইয়াছিল। আনর্ত্তের পৌত্রের নাম রৈবত। ইঁহারই নাম অনুসারে পাহাড়ের নাম রৈবতক। রৈবত অসাধারণ সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। তিনি পুত্রগণের হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া সঙ্গীত-সম্ভোগমানসে ব্রহ্মলোকে গমন করেন। তাঁহার অনুপস্থিতির সংবাদে সাহস পাইয়া রাক্ষসরা ঐ রাজ্য আক্রমণ করে। তাঁহার পুত্রগণ তাহাদের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া দেশ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে,—প্রজাপুঞ্জও ছত্রভঙ্গ হইয়া নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত ভাবে বাস করিতে থাকে। কিছুকাল পরে রাক্ষসেরা ঐ অঞ্চল হইতে প্রস্থান করিলে কুশস্থলী নগর এবং তৎসন্নিহিত জনপদ পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। অতঃপর যাদবগণ উক্ত প্রদেশে গমন করিয়া কুশস্থলী বা দ্বারাবতীর প্রাচীন দুর্গের সংস্কার-সাধনপূর্ব্বক তথায় বাস করিতে থাকেন।

পরিত্যক্ত নগরের সংস্কার-কার্য্য প্রায় শেষ হইলে শ্রীকৃষ্ণের ধারণা হইল,—তিনি নগর-নির্ম্মাণ কার্য্যে বিশেষজ্ঞ নহেন; সুতরাং এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ শিল্পিশ্রেষ্ঠ বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করাই সঙ্গত। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন,—"স্থানটি সঙ্কীর্ণ, উৎকৃষ্ট নগর নির্ম্মাণ করিতে হইলে একটা ফাঁকা জায়গার প্রয়োজন।" তেমন উন্মুক্ত স্থান কোথায় পাওয়া যায়? বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "সাগরের নিকট হইতে জমি লইয়া নগর নির্ম্মাণ করিতে হইবে।" সুতরাং দক্ষিণ দিকে সাগরতটে বিশ্বকর্ম্মা এক নূতন দ্বারাবতী নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত নূতন দ্বারাবতী শ্রীকৃষ্ণের দ্বারাবতী হইতে অধিক দূরবর্ত্তী ছিল না। কারণ, উহার পূর্ব্ব দিকে ছিল রৈবতক পর্ব্বত। দক্ষিণ দিকে ছিল বনবল্লরী-শোভিত পঞ্চবর্ণ বন। পশ্চিমে ছিল গুল্মাদি-সমন্বিত ইন্দ্রধনুতুল্য নানা বর্ণে সমুজ্জ্বল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাদপপূর্ণ অরণ্যানী। উত্তরে ছিল বেণুমান্ পাহাড়। সমুদ্রের কোন নাম গন্ধও নাই! কেবলমাত্র স্থানটি সমুদ্রের নিকট হইতে গৃহীত বলিয়াই উহা সমুদ্রের সন্নিকটে ছিল, এইরূপ অনুমান হয়।

বিশ্বকর্ম্মা বা পূর্ত্তকার্য্যে বিশেষজ্ঞ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এই নূতন দ্বারকাপুরীও রৈবতকের পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, রৈবতক পর্ব্বত বা গিরণার পাহাড় দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে ১১ বর্গ-মাইল। সুতরাং উভয় স্থানের মধ্যে অধিক ব্যবধান ছিল না। কিন্তু বর্ত্তমান কাথিয়াবাড়ে গিরণার পাহাড়ের নিকট সমুদ্র নাই। যুগান্তপূর্ব্বে হয় ত তাহা ছিল। কাথিয়াবাড়ের উত্তর দিকে কচ্ছ উপসাগর, দক্ষিণে কাম্বে উপসাগর। কিন্তু কচ্ছ উপসাগর আদৌ গভীর না হওয়ায় উহার বহু স্থানেই জল থাকে না, এবং গ্রীষ্মকালে জল প্রায়ই শুকাইয়া যায়। দক্ষিণস্থিত কাম্বে উপসাগর ঐরূপ অগভীর না হইলেও অধিক গভীর নহে। বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত নূতন দ্বারাবতীর দক্ষিণে ছিল বনলতাবেষ্টিত পঞ্চবর্ণ বন। সাগরগর্ভ হইতে নবোত্থিত সিকতাময় স্থানে প্রথমে এইরূপ বন দেখা যায়। বিশেষতঃ, গিরণার পর্ব্বতের পশ্চিম হইতে কয়েক মাইল দক্ষিণে কিছু দূর আসিলে এই অঞ্চলে নিম্নভূমি পাওয়া যায়। ইহাতে মনে হয়, ঐ অঞ্চল হইতে সাগর-জল বিলম্বে সরিয়া গিয়াছিল। ঐ পুরীর পশ্চিমে ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাদপপূর্ণ নানা বর্ণে সুশোভিত অরণ্যানী। এই অরণ্যও নূতন হইতেছিল, এরূপ সন্দেহ হইতে পারে; কিন্তু ওদিকে তখন সাগর ছিল না। কারণ, তাহার পূর্ব্বে

উহার বহু দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রভাসতীর্থ ছিল। উত্তরে ছিল বেণুমান্ পর্ব্বত। বেণুমান্ অর্থে বাঁশবনে সমাচ্ছাদিত। উহা বোধ হয় গিরণারগিরির দুই একটা বহিঃ-প্রসৃত উদগত শৃঙ্গ (spar)। কাথিয়াবাড় উপদ্বীপটি সাগরবক্ষ হইতে অধিক উচ্চ নহে। উহা ভারতীয় মালভূমি হইতে অনেক নিম্ন। সাগরবক্ষ হইতে উচ্চতায় উহা প্রায় বাঙ্গালার সমান। সুতরাং চারি পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে পাণ্ডবদিগের অভ্যুদয় কালে ঐ উপদ্বীপের সকল স্থান হইতে সাগর-জল দূরে অপসারিত হয় নাই। কিন্তু ঠিক কোন্ স্থানে বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক এই নূতন দ্বারকা নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। অবশ্য, শ্রীকৃষ্ণ-নির্ম্মিত আদি দ্বারকা কুশস্থলীতেই ছিল; তবে যাদবগণ কর্ত্তৃক পুরাতন ও পরিত্যক্ত দুর্গটির জীর্ণ সংস্কার সংসাধিত হইয়াছিল। এই পুরাতন দুর্গটি পাওয়ায় যাদবগণ আর কোন নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ করেন নাই। দ্বিতীয় দ্বারাবতী সাগর হইতে অনতিদূরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সুভদ্রা-হরণ প্রভৃতি কার্য্য প্রথম দ্বারাবতীতেই সংঘটিত হইয়াছিল। রাজা রুদ্রদমনের অভ্যুদয়কাল হইতেই এই পর্ব্বতের পার্শ্বেই গিরিনগর নামক পুরী ছিল। উহা হইতে গিরিটির নাম পরে গিরণার হওয়াই সম্ভব। হুয়েন্ সাংয়ের আবির্ভাব কালে পাহাড়টির নাম ছিল উজ্জয়ন্ত। ঐ গিরিটির অতি নিকটেই কাথিয়াবাড়ের রাজধানী ছিল। সুতরাং এই স্থানটি কাথিয়াবাড় অঞ্চলের রাজধানী করিবার উপযুক্ত বলিয়া পূর্ব্বকালে বিবেচিত হইত সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সময়ে জুনাগড় নগরীও গিরণারের পার্শ্বেই অবস্থিত। বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত দ্বারকা সম্ভবতঃ সাগরতীরেই অবস্থিত ছিল। কিন্তু সেই স্থান হইতে সাগর এখন দূরে সরিয়া গিয়াছে কি না, বুঝিবার উপায় নাই। উহার পূর্ব্ব দিকে রৈবতক পর্ব্বত বলাতেই এত গোল বাধিয়াছে! সম্ভবতঃ উহা গিরণার গিরির পশ্চিম-দক্ষিণে অবস্থিত ছিল; ক্রমে সাগরের সহিত পিছাইতে পিছাইতে উহা সাগরতীরস্থ মূল দ্বারকায় পরিণত হইয়াছে। এখন উহা প্রভাস তীর্থ হইতে ১০ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। উহার উত্তরে বেণুমান্ গিরি কোন্ স্থানে তাহা বুঝিলেও স্থান-নির্ণয় করিবার অনেকটা সুবিধা হইতে পারে। ডক্টর ভিনসেন্ট স্মিথ বলিয়াছেন, ভারতের প্রাচীন স্থান-গুলি কোথায় ছিল তাহা এ পর্য্যন্ত যথাযোগ্যরূপে অনুসন্ধান হয় নাই।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, যদুবংশ কিরূপে ধ্বংস হইয়াছিল? মহাভারতের মুষলপর্ব্বে উহার যে রহস্যাবৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে কেহ তাহাতে নির্ভর করিতে পারেন না। সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র ইহাকে অনৈসর্গিক উপন্যাস বলিয়া পরিত্যাগ করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম প্রভৃতির মৃত্যু-কাহিনীর বর্ণনা থাকায় তিনি উহা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ, মৌষলপর্ব্বে কাহিনীটি যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে চেষ্টা করিলে তাহা হইতে প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধার করা যাইতেও পারে।

মহাভারতের কাহিনীটি সংক্ষিপ্ত। উহা এইরূপ। বিশ্বামিত্র, কণ্ব, ও নারদ এই তিন জন ঋষি দ্বারকায় গমন করিলে তাঁহাদিগকে দেখিয়া দ্বারকার কতকগুলি যুবক সাম্বকে গর্ভবতী যুবতী সাজাইয়া ঋষিদিগের সম্মুখে স্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার গর্ভে কি সন্তান হইবে বলুন ত?" ঋষিরা এই বিদ্রূপে কুপিত হইয়া কহিলেন, —"ইহার গর্ভে কুলনাশন মুষল হইবে।" কার্য্যতঃ তাহাই হইল। সাম্বের উদর হইতে যে মুষল বাহির হইল যদু ও বৃষ্ণিবংশীয় যুবকগণ সেই মুষলটি চূর্ণ করিয়া সাগরজলে বিসর্জ্জন করিল। ঐ মুষলের প্রভাবেই যদুবংশ ধ্বংস হইয়াছিল। ইহা অতিপ্রাকৃত ব্যাপার। মানুষের উদর হইতে লোহার মুষল ঋষির শাপেও বাহির হইতে পারে না; তবে এই ব্যাপারের ভিতরে কোন সঙ্গত কাহিনী প্রচ্ছন্ন থাকিতেও পারে।

চপল ও উদ্ধত যুবকরা কণ্বাদি কয়েক জন মুনিকে উপহাস করিয়া অভিশপ্ত হইয়াছিল। তাহার পরই সাম্ব ব্রধ্ন-রোগে আক্রান্ত হওয়ায় লোকে উহার মধ্যে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ আরোপ করিয়াছিল। ব্রধ্ন-রোগের আক্রমণে যে স্ফীতি হয় তাহা অত্যন্ত কঠিন, এবং মুষলের ন্যায় তাহার আকার। সাম্বই এই রোগে প্রথম আক্রান্ত হইয়াছিল। এইরূপ অনুমান করিবার একটা প্রবল কারণেরও অভাব নাই। মুষলপর্ব্বে এইরূপ লিখিত আছে যে, নগরের পথে পথে অসংখ্য মূষিক দেখা যাইত। হাঁড়ি ও জলপাত্র ভাঙ্গাও লক্ষিত হইত। ঐ সকল মূষিক গৃহমধ্যে সুপ্ত ব্যক্তিদিগের কেশ ও নখর খাইতে আরম্ভ করে। উত্তমরূপে প্রস্তুত অন্নও কীটাকুলিত দেখা যাইত। আমরা ইহাও জানি যে, প্লেগের সময় দলে দলে ইন্দুর গর্ত্তের বাহিরে আসে। প্লেগ উহার কারণ বলিয়া অনুমান করা হয়। প্লেগের আক্রমণ হইতে নিস্তার পাইবার প্রধান উপায় স্থান-পরিবর্ত্তন। শ্রীকৃষ্ণ সেই জন্য দ্বারকাবাসীদিগকে প্রভাসতীর্থে গমন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। দ্বারকা হইতে প্রভাসতীর্থের দূরত্ব সম্ভবতঃ ৭০ মাইলের কম নয়। এ কথাও সুবিদিত যে, সূর্য্যের উত্তাপ অত্যন্ত প্রখর হইলে প্লেগের প্রকোপ হ্রাস হয়, এবং সূর্য্যের উত্তাপ হ্রাস হইলে প্লেগের প্রকোপ বর্দ্ধিত হয়। মৌষলপর্ব্বে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, বৃষ্ণি ও অন্ধকদিগের বিনাশের জন্য প্রবল ঝঞ্ঝাবাত উপস্থিত হইয়াছিল, এবং সূর্য্যকিরণ ধূলায় সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল; প্লেগের আক্রমণকালে প্রায়ই ঐরূপ ঘটিয়া থাকে। ঝড় ঝঞ্ঝাবাত হইলে এবং বায়ুমণ্ডল ধূলায় আচ্ছন্ন হইলে সূর্য্যের উত্তাপ হ্রাস হয়। প্লেগের সময় অনেক স্থানে এইরূপ নৈসর্গিক ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়, ইহাও সকলের সুবিদিত।

এইরূপ কথিত আছে যে, ইউফ্রেটিস্ এবং টাইগ্রিস্ নদীর তীরে প্রাচীন কালে বিউবোনিক প্লেগের আক্রমণ হইত। ঐ সময় মেসো-পোটেমিয়া হইতে অনেক বাণিজ্য-জাহাজ ভারতের পশ্চিম উপকূলে উপস্থিত হইত। সেই সূত্রে দ্বারকায় ঐ রোগের প্রাদুর্ভাব অসম্ভব নহে। বস্তুতঃ, দ্বারকা সেই সময় প্লেগাক্রান্ত হইয়াছিল।

যাহা হউক, প্রভাসতীর্থে গমন করিয়াও দ্বারকাবাসীরা ঐ দুরন্ত রোগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। যাদবগণ অগ্নিমুখে ধাবিত পতঙ্গের ন্যায় বিধ্বস্ত হইতে লাগিল। উহা অত্যন্ত সংক্রামক ব্যাধি; এই জন্যই লিখিত হইয়াছে, পিতা সন্তানকে এবং সন্তান পিতাকে বিনাশ করিতে লাগিল, অর্থাৎ পরস্পর বিনাশের কারণস্বরূপ হইল। তাহার পর তাহারা পরস্পর আত্মকলহে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; ইহাও স্বাভাবিক। এই রোগে ৫ লক্ষ বলবান্ যাদব বিধ্বস্ত হইয়াছিল। মহাভারতে স্পষ্টই লিখিত আছে যে, "হতং পঞ্চশতং তেষাং সহস্রং বাহুশালিনাম্" (মৌষল, ৫ম অধ্যায়)। নীলকণ্ঠ তাঁহার টীকায় লিখিয়াছেন, "পঞ্চশত-সহস্রং", "সহস্রগুণিতং পঞ্চশতম্ পঞ্চলক্ষাণি ইত্যর্থঃ"। অনিরুদ্ধের

পুত্র বজ্র কেবল বিশিষ্ট যাদবগণের মধ্যে অবশিষ্ট ছিলেন। তিনি এবং সাত্যকির এক পুত্রও স্থানান্তরে বাস করিয়াছিলেন।

যদুবংশ কেবল মুষল-ব্যাধিতেই বিধ্বস্ত হয় নাই। তাহারা প্রভাসে পরস্পর বিবাদ ও যুদ্ধ করিয়াছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে ও অর্জ্জুনকে যদুবংশের অবশিষ্ট লোকসমূহকে দ্বারকা হইতে লইয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রীগুলিকে ও অবশিষ্ট যাদবগণকে দ্বারকা হইতে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। প্রত্যাগমনকালে অর্জ্জুনকে অত্যন্ত কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল। হস্তিনাপুরে আনীত হইলে শ্রীকৃষ্ণের মহিষী রুক্মিণী, শৈব্যা, গান্ধারী, হৈমবতী ও জাম্ববতী অগ্নিতে দেহ বিসর্জ্জন করেন। সত্যভামা প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য মহিষীগণ অরণ্যে প্রবেশ করিয়া সেখানে কঠোর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

দ্বারকা সম্বন্ধে অতঃপর আর একটা কথাও এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে আলোচ্য। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত যাদবগণকে লইয়া যে সময়ে দ্বারকা ত্যাগ করিতেছিলেন, সেই সময় সমুদ্র আসিয়া দ্বারকা নগরীকে গ্রাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অর্জ্জুন নগরের অবস্থা ও প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন, ঐ নগরের আর রক্ষা নাই। এই জন্যই তিনি ত্বরিতগতিতে যাদবদিগকে নগর ত্যাগ করিতে বলিয়াছিলেন। বসুদেব এই সময়ে দেহত্যাগ করেন। এখন জিজ্ঞাস্য, দ্বারকা সমুদ্র হইতে দূরে অবস্থিত হইলে সমুদ্র উহাকে গ্রাস করিল কিরূপে? ইহার কারণ এই যে, এই অঞ্চলে বাত্যাতাড়িত সমুদ্রজল কখন কখন স্ফীত হইয়া চতুর্দ্দিক্ প্লাবিত করে। উহা Typhoon বা Storm-wave নামে পরিচিত। অনেকেই জানেন, ১২৭১ খৃষ্টাব্দে ২০ আশ্বিন পূজার পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগরে ঐরূপ ঝঞ্ঝাতাড়িত সমুদ্রজল বিপুল বেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া সুন্দরবন ও ডায়মণ্ডহার্ব্বার মহকুমার অন্তর্গত বহু গ্রাম সম্পূর্ণরূপে প্লাবিত করিয়াছিল। সেই জলপ্লাবনে বহু লোকের মৃত্যু হইয়াছিল। আবার ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে বঙ্গোপসাগরের জলরাশি ঐ ভাবেই স্ফীত হইয়া চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, সন্দীপ, হাতিয়া দ্বীপ এবং দৌলতপুর একেবারে পাথারে পরিণত করিয়াছিল। প্রায় লক্ষাধিক নরনারী সেই ঝঞ্ঝায় প্রাণ হারাইয়াছিল, এরূপ নৈসর্গিক উপপ্লব পৃথিবীতে একান্ত বিরল নহে। ইহা অতি-প্রাকৃত ব্যাপার নহে, এবং অবিশ্বাস্যও নহে। তবে ঠিক ঐ ভাবে মহাভারতাদিতে উহা বর্ণিত হয় নাই; কিন্তু যখন ঐ সময়ের কোন বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস নাই, তখন সেই সময়ের ইতিহাস উদ্ধার করিতে হইলে পুরাণই অবলম্বনীয়। উহার অন্য কোন উপায় নাই। সেই সময়ের শিলালিপি বা তাম্রশাসন পাইবার উপায় নাই,—তাহার সম্ভাবনাও নাই। এই জন্যই পুরাণাদিতে লিখিত, কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনীতে সমাচ্ছন্ন নানা বিক্ষিপ্ত বর্ণনা হইতেই ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে।

ঐতিহাসিক যুগের ইতিহাস অনুসন্ধান করা অপেক্ষা প্রাগৈতিহাসিক যুগের ইতিহাসের উদ্ধার-সাধন যে অধিক প্রয়োজনীয়, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে; তাহা না করিলে আমাদের জাতীয় ইতিহাস উদ্ধারের আর উপায় দেখা যায় না। গ্রেটবৃটেনের সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক পরলোকগত ভিন্সেন্ট এ স্মিথ তাঁহার লিখিত Early History of India নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—Very little has been done yet to reveal the secrets of the most ancient sites in India অর্থাৎ ভারতের অতি-প্রাচীন স্থানগুলির গুপ্ত কাহিনী প্রকাশ করিবার জন্য বিশেষ কিছুই করা হয় নাই। অনেক স্থানে অতি-প্রাচীন অক্ষরে যে লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহার পাঠোদ্ধারের কোন চেষ্টাই হয় নাই। জরাসন্ধের রাজধানী গিরিব্রজের 'ভবন গঙ্গায়' যে দুর্ব্বোধ্য লিপি পাওয়া যায়, তাহারও পাঠোদ্ধার হয় নাই! পাঠোদ্ধার হইবে কি না, তাহাও বলা যায় না। কারণ, উহার অক্ষরগুলি বহু পুরাতন ও অতি বিচিত্র, কিন্তু উহার অন্তরালে নিশ্চিতই প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্য প্রচ্ছন্ন আছে।

বৌদ্ধবিপ্লবে ভারতের বহু প্রাচীন তীর্থ লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। উদাহরণস্বরূপ—বৃন্দাবন ও মথুরার কথা বলা যাইতে পারে। এই তীর্থ দুইটি বহু কাল অরণ্যে আবৃত ছিল। উহা যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র, কেহই তাহা জানিত না। অবশেষে রূপ গোস্বামী বহু অনুসন্ধানে উহার আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেইরূপ দ্বারকা সমুদ্রে বিলীন হইবার পর ঐ বিস্তীর্ণ ভূভাগ জনগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিল। স্থানটি নিম্নভূমি ছিল বলিয়া হয়ত তথা হইতে জল নিঃসরণে বিলম্ব হইয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে জানা যায়, আসন্ন দ্বারাবতী রৈবতক পর্ব্বতের নিকটেই ছিল।

আর একটা বিস্ময়ের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান জুনাগড় নগরের যেরূপ গঠন, হরিবংশে বর্ণিত দ্বারাবতী নগরীর গঠন বা আকার অনেকটা সেইরূপ ছিল। 'নাম্না দ্বারাবতী নাম স্বায়তাষ্টাপাশোপমা।' উহার আকার ছিল পাশা খেলার ছকের মত। জুনাগড় নগরীর আকারও অনেকটা ঐরূপ। উহার মধ্যভাগ চতুষ্কোণ, প্রত্যেক দিক্ হইতে পাশা খেলার ছকের মত এক একটা পাদ বা শাখা বাহির হইয়া গিয়াছে। কিন্তু জুনাগড় যে সেই প্রাচীন দ্বারাবতী—একই আকারে ঠিক একই স্থানে বিরাজ করিতেছে, ইহা কল্পনা করাও কঠিন। তবে জুনাগড়ে একটি পুরাতন দুর্গ আছে। তাহা না কি বিশেষজ্ঞদিগের মতে অতি প্রাচীন—গিরিব্রজের সমকালীন। বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন্ সাং সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বভাগে যখন সৌরাষ্ট্র দেশ সন্দর্শনে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি উজ্জয়ন্ত নামক পর্ব্বতের পাদদেশে একটি নগরী দেখিয়াছিলেন। ঐ উজ্জয়ন্ত পর্ব্বতের উপর একটি বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ছিল। ইহাতে মনে হয় যে, এ অঞ্চলেও বৌদ্ধবিপ্লবের তরঙ্গ প্রবলবেগে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। জুনাগড়ের সান্নিধ্যে অশোকের শিলালিপি এবং স্কন্দগুপ্তের লিপিও পাওয়া যায়। বৌদ্ধবিপ্লব যে এই নগরীর সংস্থান-স্থানের বিপর্য্যয় ঘটায় নাই, ইহাই বা বলিবার উপায় কি? তবে সম্ভবতঃ দ্বারাবতী পুরীর অনুকরণে এই অঞ্চলে ঐরূপ নগর-রচনার পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে।

ভূগর্ভ খনন করিয়া হয় ত শ্রীকৃষ্ণের এই নগরীর সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। উহা যে গিরণার পাহাড়ের সান্নিধ্যে ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখন ঐ কার্য্য কে করিবে? শ্রীকৃষ্ণ ভারতের ইতিহাসে কেবল প্রসিদ্ধ নহেন, তিনি স্বয়ং ভগবানের অবতার বলিয়া সমস্ত হিন্দু কর্ত্তৃক পূজিত। তাঁহার নগরীর আবিষ্কারের চেষ্টা করা হিন্দুর অবশ্য-কর্ত্তব্য।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

ম্যালেরিয়ার প্রতিকার ও প্রতিরোধ

ম্যালেরিয়া এ দেশের একটি ব্যাপক ব্যাধি। প্রতি-বৎসর অসংখ্য লোক এ রোগে কালগ্রাসে পতিত হয়; এবং যে সকল লোক এই রোগে আক্রান্ত হইয়া কোনক্রমে বাঁচিয়া উঠে, তাহারা অনেক ক্ষেত্রেই দীর্ঘকাল জীবন্মৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকে; অথবা অন্য কোন রোগে আক্রান্ত হইয়া অবশিষ্ট জীবনের জন্য অকর্মণ্য হইয়া যায়, হয় ত ভুগিয়া ভুগিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কত কাল হইতে এই রোগ ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছে, তাহার সঠিক বিবরণ সংগ্রহ করা দুরূহ হইলেও এই জাতীয় রোগ যে অতি প্রাচীন কাল হইতেই কিছু কিছু চলিয়া আসিয়াছে, তাহার বিবরণ বৈদিক যুগের ইতিহাস হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী যুগের আয়ুর্ব্বেদাদি গ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায়। নব্যবিজ্ঞানের পথি-প্রদর্শক হিপোক্রেটিস্ খৃঃ-পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে যে এই রোগের প্রাদুর্ভাবের উল্লেখ করিয়াছেন, পাশ্চাত্ত্যগণের গ্রন্থে তাহার আভাস পাওয়া যায়। মিশরের এমিন পাশা বহু শতাব্দী পূর্ব্বেই এ রোগের পরিচয় দিয়াছেন; এবং গ্রীস দেশে, মিশরে ও ভারতবর্ষে ইহার প্রাদুর্ভাব ছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই, তবে ভারতে ইহার ব্যাপক প্রাদুর্ভাবের প্রতি গত অর্দ্ধ-শতাব্দী হইতেই বিশেষ ভাবে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকগণের আবিষ্কৃত জীবাণুবিজ্ঞানে এনোফিলিশ জাতীয় মশকই এই রোগের বাহন বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বিশিষ্ট জীবাণু, মশকের মধ্যবর্ত্তিতায় শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হওয়ায় এ রোগের সৃষ্টি, এবং সিঙ্কোনা-বৃক্ষত্বক্‌জাত কুইনাইনই ইহার একমাত্র প্রতিকারক ও প্রতিষেধক ঔষধরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে—যদিও প্রতি বৎসর বর্ষার প্রারম্ভে, মধ্যে, বা অবসানকালে ভারতের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশে বিশেষতঃ, বাংলা ও আসামে ইহার ব্যাপক আক্রমণের পরিচয় পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ বিষমজ্বর নামক এক প্রকার জ্বরকে এই জাতীয় জ্বরের পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া এবং তাহাকে সততক, সন্ততক, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক ও চতুর্থক নামে শ্রেণী-বিভাগ দ্বারা ঐ জাতীয় জ্বরের পরিচয় দিয়াছেন বটে, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদে কথিত এমন কোন বিশিষ্ট, ধারাবাহিক চিকিৎসাপদ্ধতি কেহই এ-কাল পর্য্যন্ত প্রবর্ত্তন করিতে পারেন নাই—যাহা কুইনাইন-প্রয়োগের ন্যায় ফলদায়ক। এ সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদের এই দৈন্যের কথা দীর্ঘকাল পূর্ব্ব হইতে চিন্তা করিয়া আসিতেছিলাম; আমার ব্যবস্থানুযায়ী যথাবিধি ঔষধ ও পথ্যাদি ব্যবহারে ম্যালেরিয়ার ব্যাপক আক্রমণ বহুলাংশে প্রতিরুদ্ধ হইবে বলিয়াই আশা করি। গত দশ মাসে বহুসংখ্যক ম্যালেরিয়া রোগীকে উহা ব্যবহার করাইয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, এখানে তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনায় জনসাধারণের উপকার হইতে পারে।

প্রথমতঃ, এ কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, নব্যবিজ্ঞান—জীবাণুবিজ্ঞান। অণুবীক্ষণের সাহায্যে রোগ নির্ণয় করিয়া চিকিৎসা-বিধানই ইহার মূলতত্ত্ব; কিন্তু আমাদের অবলম্বনীয় আয়ুর্ব্বেদ—ক্ষেত্রবিজ্ঞান। দেহরূপী ক্ষেত্রকে রোগবিকাশের অনুপযোগী করাই আয়ুর্ব্বেদের মূলতত্ত্ব। জগতের যাবতীয় সৃষ্টিপ্রবাহ এই বীজ ও ক্ষেত্রের সমবায়ে সম্ভব হইয়া থাকে; সুতরাং আমার বর্ত্তমান আলোচনা ক্ষেত্রবিজ্ঞানবাদীর দৃষ্টিভঙ্গীতেই করা হইতেছে। সমস্ত জ্বররোগের সাধারণ লক্ষণ কোষ্ঠাগ্নির বহির্নির্গমন। বহিরুত্তাপ এই নির্গমন দ্বারা সম্ভব হয়। আর কোষ্ঠাগ্নি বলিতে—রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, ও শুক্র এই সাতটি ধাতুগত অগ্নিকে বুঝায়। এই সাতটি ধাতুর অগ্নি স্বস্থানে, স্বভাবে ও স্বমানে থাকিলে এই জ্বরের উদ্ভব হয় না। মূল কারণ লক্ষ্য করিলে দেখা যায়—বর্ষার সঙ্গে ইহার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ বিদ্যমান। আয়ুর্ব্বেদে পাঞ্চভৌতিক তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া রোগনির্ণয় ও পথ্যসমস্যার সমাধান হইয়া থাকে; সুতরাং সর্ব্ব-রোগের মূল কারণ—বিকারপ্রাপ্ত মৃত্তিকা, জল, তেজ, ও বাতাস। ব্যোম ইহাদেরই মধ্যবর্ত্তিতায় বিকারপ্রাপ্ত হয়; সুতরাং মৃত্তিকা, জল, তেজ ও বাতাসের যে-কোন একটি বা একাধিক বিকারে ইহার উৎপত্তি ঘটে। বহিঃপ্রকৃতির বিকার জীবপ্রকৃতির বিকারের উপর প্রভাব-বিস্তার করে। বর্ষাকালে মৃত্তিকা ও জল বিকৃত হয়, এবং তাহার ফলে বাতাসও বিকৃত হয়। সূর্য্যতেজও যথোচিত ভাবে তাহার প্রভাব বিস্তার করে না; সুতরাং প্রধানতঃ মৃত্তিকা ও জলগত দোষ আশ্রয় করিয়াই রোগের সৃষ্টি সম্ভব হয়। বর্ষার জলে মৃত্তিকার বিকৃতি ঘটে। জল মৃত্তিকাস্তর ভেদ করিয়া পুষ্করিণী বা নলকূপে সঞ্চিত হয়, এবং আকাশপথে যা পয়ঃপ্রণালীর সাহায্যে গতিবিধির সময় জল নানা প্রকার কীটপতঙ্গ ও লতা-পাতা, উদ্ভিজ্জ বা অন্যান্য ময়লা দ্বারা দূষিত হইয়া নলকূপ, ইঁদারা বা পুষ্করিণীতে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেই দূষিত জল অন্নে, পানে, ও স্নানার্থ ব্যবহারে শরীরে যে বিষক্রিয়া হয়, তাহার ফলে, অথবা দূষিত জলজাত মশকবিশেষের মধ্যবর্ত্তিতায় এই বিষক্রিয়া হয়—তাহার বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া, বিষক্রিয়ার ব্যাপকতাই যে মনুষ্যশরীরে প্রভাব-বিস্তার করে, এবং তাহারই ফলে সপ্তধাতুগত অগ্নি বিকৃত হয়; আর এই বিকৃত অগ্নির বহির্নির্গমনকেই যদি ম্যালেরিয়া নামে অভিহিত করা যায়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য—কোন বিজ্ঞানেরই অমর্য্যাদা হইবার আশঙ্কা নাই। আর এই অগ্নিবিকৃতির ফলে দেহ-শোণিতে বিশিষ্ট জীবাণুর সৃষ্টি হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব; কারণ, ক্ষেত্র জীবাণু-বিকাশের উপযোগী হইলে সেখানে জীবাণুর উৎপত্তি হইবে—তাহাতে সন্দেহ নাই। বহির্জগতের ন্যায় দেহজগতে এ সৃষ্টি চলিতে থাকিবে। বায়ুমণ্ডলে, জলমণ্ডলে ও ক্ষিতি-মণ্ডলে এ সৃষ্টি অহরহই প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। ক্ষেত্র উপযোগী হইলে সৃষ্টি সম্ভব হয়। বীজ হইতে সৃষ্টিপ্রবাহের চিন্তা না করিয়া দেহরূপী ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করিয়া, রোগের কারণ নির্ণয় দ্বারা পাঞ্চ-ভৌতিক তত্ত্বকে ত্রিদোষের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেহকে রোগ-বিকাশের অনুপযোগী করিতে চাওয়াই আয়ুর্ব্বেদের লক্ষ্য। দূষিত জল, বায়ু, তেজ ও মৃত্তিকার যথোপযুক্ত সংস্কার সাধন করিলে এই কার্য্য অনায়াস-সাধ্য হয়। বর্ষাকালে জল অগ্নিতে ফুটাইয়া লইয়া স্নান ও পানার্থ ব্যবহার করিলে জলের সংস্কার সংসাধিত হয়। গৃহের চতুষ্পার্শ্ব যথাসম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিলে বায়ুরও সংস্কার হয়, এবং বর্ষার জলনিকাশের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিলে মৃত্তিকারও সংস্কার হয়। ঘরের ভিতর যথাসম্ভব রৌদ্রপ্রবেশের ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিলে তেজেরও সংস্কার হয়। ইহার মধ্যে জলের সংস্কারই মুখ্য, অন্যান্য সংস্কার গৌণ; কারণ, স্নানান্নপানীয়ের ব্যবস্থায় নিরতই জলের ব্যবহার করিতে হয়। তাহার যথোচিত সংস্কারে অর্থাৎ সুসিদ্ধ করিয়া নিত্য ব্যবহারে এ রোগের আক্রমণ হইতে বহুলাংশে নিষ্কৃতি পাওয়া

যায়। প্রতিষেধের সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা প্রতিকারের ব্যবস্থার কথাও অল্প বিবেচ্য নহে। রোগের সহিত সংগ্রামে অপটু দেহ, এবং যথাবিধি সংস্কার-বিরহিত উপরোক্ত পাঞ্চভৌতিক দ্রব্যের ব্যবহারে অনভ্যস্ত দেহ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইলে কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনীয়, তাহাও জানিয়া রাখা প্রয়োজন। কোষ্ঠাগ্নিকে স্বস্থানে আনয়ন, ইহার মূল তত্ত্ব। যদিও প্রাকৃতিক নিয়মে জ্বরবিরাম সকল জ্বরেরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তথাপি জ্বরের সুপ্তিকাল থাকে। বহিস্তাপ না থাকিলে তখনও অগ্নি স্বস্থানগত হয় না। বিষক্রিয়া নাশপূর্ব্বক সপ্ত ধাতুগত অগ্নিকে স্বস্থানগত করিতে আয়ুর্ব্বেদমতে ৩৫ দিন সময় লাগে; সুতরাং জ্বরবিরামের পর ৩৫ দিন পর্য্যন্ত কোষ্ঠাগ্নির বিষক্রিয়া নাশপূর্ব্বক অনুরূপ পথ্যবিধান এবং কোষ্ঠাগ্নি যাহাতে স্বাভাবিক ভাবে উদ্দীপিত হয় তাহার উপযোগী ঔষধপ্রদানই জ্বরনাশের মূল তত্ত্ব। বিশিষ্ট বিষক্রিয়া অন্নপানাদির মধ্যবর্ত্তিতায়, অথবা জীববিশেষের দংশনবশতঃ যে ভাবেই দেহ-শোণিতে সংক্রামিত হউক,—কোষ্ঠাগ্নি স্বাভাবিক হইলে বিষক্রিয়ার প্রভাব মনুষ্যদেহে আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হইবে না।

এইরূপ বিষক্রিয়ার প্রভাব আয়ুর্ব্বেদে প্রধানতঃ তেজোবিকার বা পিত্তবিকার নামে অভিহিত। এই পিত্তবিকারের আনুষঙ্গিকরূপে কফবিকার (ক্ষিতি ও জলগতবিকার) এবং বায়ুবিকার মানুষের স্ব স্ব ক্ষেত্রপ্রবণতা অনুযায়ী উপস্থিত হইয়া বিশিষ্ট রোগলক্ষণ প্রকাশ করে; সুতরাং সকল জ্বরেই এই পাঞ্চভৌতিক বিকৃতি বা ত্রিদোষবিকৃতি অল্পাধিক ঘটিবেই। বিশিষ্ট ভেষজ ও পথ্যপ্রয়োগে এই বিকৃতিকে স্বভাবগত করাই আয়ুর্ব্বিজ্ঞান বা ক্ষেত্রবিজ্ঞানের মূল কথা। এই প্রবন্ধের উপসংহারে ঔষধ ও পথ্য সম্বন্ধে অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে স্বীয় অভিজ্ঞতাফল বিবৃত করিতেছি।

অতিসার, বা কোষ্ঠবদ্ধতা, বা সাধারণ অগ্নিমান্দ্য এই তিনটির যে-কোন লক্ষণ জ্বররোগীর ক্ষেত্রে প্রকটিত হইবেই। সকল ক্ষেত্রেই অগ্নিমান্দ্যবশতঃ এই সকল বিকার লক্ষিত হয়। এই জন্য জ্বরনাশক অথচ অগ্ন্যুদ্দীপক সাধারণ ও সুলভ ঔষধরূপে নিম্নলিখিত ঔষধটি সকল ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যাইতে পারে। প্রতি মাত্রায়—অতিবিষা তিন রতি হইতে ছয় রতি, ত্রিকটু—শুঁট-পিপুল-মরিচচূর্ণ ৩ রতি, করঞ্জ বীজের শাঁস তিন রতি, শোধিত ধুস্তরাবীজ সিকি রতি, কজ্জলী ১ রতি, শোধিত অমৃতবিষ—১/৮ রতি হইতে ১/৪ রতি—ছাতিম ছাল, কুমুরিয়ামূল, অনন্তমূল, কটকী, নিমছাল, গুলঞ্চ, ও চিরতার ক্বাথে মাড়িয়া একটি বটিকা করিয়া ব্যবহার করা চলে। বিশিষ্ট ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ঔষধ প্রয়োগের প্রয়োজন। কোষ্ঠশুদ্ধি না থাকিলে তেউড়ীমূল চূর্ণ ১ দিন বা দুই দিন অন্তর প্রত্যূষে প্রয়োগ করিতে হইবে। উপরোক্ত ঔষধটি কুইনাইনের ন্যায় শীঘ্র কার্য্যকরী না হইলেও অতি অল্প সময়েই স্থায়ীফল প্রদান করে; তবে পথ্য সম্বন্ধে এবং প্রয়োগ সম্বন্ধে কিছু নিয়ম পালনের প্রয়োজন; কারণ, সেই নিয়মগুলি যথাবিধি প্রতিপালিত হইলে পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না।

জ্বর বিদ্যমানে জ্বরের গতি মন্দীভূত থাকিলে বা ক্রমমন্দীভূত হইবার দিকে অগ্রসর হইলে এই বটী জলসহ প্রত্যূষে এক বার ও সন্ধ্যায় এক বার সেব্য। জ্বরের বেগের প্রাবল্য অত্যন্ত অধিক থাকিলে দিবসে মাত্র এক বটী ব্যবহার করিতে হইবে। জ্বরের গতি হ্রাস হইয়া আসিতে থাকিলে, দুধের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া (প্রত্যহ আধ সের হইতে এক সের পর্য্যন্ত) দিনে তিন-চার বটী পর্য্যন্ত সেবন করান চলে; তবে দ্রুত জ্বরবন্ধের প্রতি লক্ষ্য করিবার ঝোঁক নব্য বিজ্ঞানানুমোদিত হইলেও আয়ুর্ব্বিজ্ঞানসম্মত নহে।

পথ্যস্বরূপে অতিসারাদি লক্ষণে চিঁড়া-ভাজা বা চাউল-ভাজা আড়াই তোলা আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া উহার পানীয়াংশ ব্যবহার্য্য। কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে খই আড়াই তোলা এক সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ সের থাকিতে নামাইয়া তাহা মণ্ডবৎ ছাঁকিয়া ব্যবহার্য্য। পুরাতন আতপ চাউল বা সংবৎসরাধিক কালের মানকচু চূর্ণ, শটীর পালো, পানিফলের পালো, কুট্টিত যব প্রভৃতি ঐরূপ মাত্রায় ব্যবহার্য্য। জ্বর-বিরামে দুধ ঐরূপ মণ্ড সহ মিশাইয়া ব্যবহার করিতে হয়। দ্রববৎ অন্নমণ্ড প্রথম সপ্তাহে অবশ্য ব্যবহার্য্য; তরিতরকারি সম্পূর্ণ বর্জ্জনীয়। মুগ, মশুর ও ছোলার ডালের যূষ ব্যবহার করা চলে; কিন্তু দুষ্পাচ্য দ্রব্য সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। ঔষধ প্রয়োগকালে দুধের ব্যবহার নিত্য প্রয়োজন। দ্বিতীয় সপ্তাহে অন্নস্বরূপে এক ছটাক চাউলের সুসিদ্ধ ভাত গলিতবৎ দ্বিগুণ মাত্রায় অর্থাৎ এক ছটাক মাত্রায় ব্যবহার্য্য। তরিতরকারি যথাসম্ভব অল্প মাত্রায় মণ্ডবৎ সুপিষ্ট অবস্থায় ব্যবহার্য্য। তৃতীয় সপ্তাহে উহার তিনগুণ মাত্রায় অর্থাৎ দেড় ছটাক চাউলের অন্ন ব্যবহার্য্য। চতুর্থ সপ্তাহে উহার চতুর্গুণ অর্থাৎ দুই ছটাক মাত্রায় চাউলের ভাত সেব্য। পঞ্চম সপ্তাহে উহার পাঁচগুণ অর্থাৎ আড়াই ছটাক মাত্রায় সেব্য। ষষ্ঠ সপ্তাহ হইতে স্বাভাবিক মাত্রায় অন্ন পানীয় ব্যবহার করিতে হইবে। প্রত্যহ দুই বারের বেশী এই অন্ন গ্রহণ করা চলিবে না। অন্নের ফেনাংশ বাদ দেওয়া ভাল নহে, কারণ, তাহাতে সংস্কার করা অন্ন ও পানীয় উভয়ই ব্যবহার করা হইবে। যকৃৎকে কোনরূপে ভারাক্রান্ত হইতে না দিলে এই জ্বরের পুনরাবৃত্তি অথবা কালাজ্বর প্রভৃতি দুরন্ত রোগ আসিতে পারে না। প্লীহাযকৃতাদি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে লৌহভস্ম বা পারদঘটিত রসায়ন ঔষধ ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। রোগের সুপ্তিকাল এক মাস। সপ্তাহে এক বার সুসিদ্ধ গরম জলে স্নান ও তাহা সন্তপানার্থ ব্যবহার। ৩৫ দিন এই ঔষধ ও পথ্যাদি ব্যবহারে রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় হয়, তাহার আর পুনরাবৃত্তি হয় না। পূর্ণবয়স্কের মাত্রা এক পোয়া চাউল ধরিয়া মাত্রা নির্ণয় করা হইয়াছে। বালকের পক্ষে মাত্রা তদনুযায়ী অথবা শ্রমজীবীর পক্ষে মাত্রা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এ রোগে অভ্যঙ্গ অর্থাৎ তৈলমর্দ্দন একেবারেই নিষিদ্ধ। রোগের সুপ্তিকালে অর্থাৎ এক মাসের মধ্যে সপ্তাহে এক দিন বা দুই দিন সুসিদ্ধ জলে উষ্ণস্বেদনবৎ স্নানে লোমকূপ পরিষ্কার থাকে। মস্তকে শীতল জল ব্যবহার বিধেয়।

এ রোগে সাগু, বার্লি, হর্লিক্স প্রভৃতি পথ্যরূপে ব্যবহার করা হয়। আজকাল এগুলিও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। স্বরূপতঃ ইহারা লঘুপাক, এই গুণের অতিরিক্ত ইহাদের বিশেষ কোন উপযোগিতা নাই। এগুলির পরিবর্ত্তে আয়ুর্ব্বেদোক্ত রক্তশালি ধান্যজাত চাউল মাত্রাবিচার করিয়া বিভিন্ন আকারে পথ্যরূপে ব্যবহারে পথ্যের অভাব দূর হইবে, এবং দরিদ্রের পক্ষে উহা সহজও হইবে।

শ্রীবিজয়কালী ভট্টাচার্য্য (এম-এ, বেদান্তশাস্ত্রী)।

ময়ূরভঞ্জে পুনর্গঠন

গত চৈত্র মাসে (বঙ্গাব্দ ১৩৪৮) সামন্ত রাজ্য ময়ূরভঞ্জের পুরাতন, বিস্মৃতপ্রায় ও বনাস্তীর্ণ রাজধানী খিচিংএ প্রাচীন মন্দিরের যে পুনর্গঠন-কার্য্য শেষ হইয়াছে, তাহা একাধিক কারণে উল্লেখযোগ্য। ইহাতে কেবল যে এ দেশের রাজনীতিক ও শিল্প-সম্পর্কিত ইতিহাসের নূতন উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাই নহে, পরন্তু যে সকল শিল্পী পুরুষানুক্রমে একইরূপ কার্য্য করায় সেই কার্য্যে অসাধারণ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছে, তাহাদিগের অনাদৃত বংশধরগণ আজও কিরূপ শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারে, তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। পুনর্গঠিত মন্দির যে ভগ্নদশায় পতিত পুরাতন মন্দিরের অবিকল অনুরূপ হইয়াছে, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের অনেক অংশে এখনও গবেষণার আলোকপাত হয় নাই। কি কি কারণে ময়ূরভঞ্জের ভঞ্জ-রাজপরিবার খিচিং ত্যাগ করিয়া নূতন স্থানে রাজধানী-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা এখনও জানা যায় নাই। তবে যে ঐ স্থানে এককালে বর্ত্তমান ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের অর্দ্ধাংশের, কেওঞ্জরের ও কোলহানের রাজধানী ছিল, তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য নহে। এই স্থান নদীর দ্বারা সুরক্ষিত থাকায় শত্রুর আক্রমণ প্রহত করিবার পক্ষে স্বাভাবিক সুবিধা সম্ভোগ করিয়াছিল এবং ইহার স্থাপত্যে বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। বিশ্লেষণ করিলে মনে হয়, যে সকল শিল্পী মন্দির-নির্ম্মাণ-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন বিশেষ যাঁহারা প্রধান মন্দিরের শোভা সম্পাদন করিয়াছিলেন—তাঁহারা উড়িষ্যা হইতে আনীত হইলেও মন্দিরের পরিকল্পনা গৌড়ীয় (বাঙ্গালা ও বিহার) শিল্পে শিক্ষিত শিল্পীর; সেই কারণে এবং এ দেশের শিল্পীদিগের প্রাকৃতিক পরিবেষ্টন হইতে আদর্শলাভের স্বাভাবিক প্রবণতায় খিচিংএর মন্দির-শিল্পে অভিনবত্বের উদ্ভব হইয়াছিল। যিনি এই মন্দিরের কার্য্যে লোকনিয়োগ করিয়াছিলেন, তিনি সম্ভবতঃ উড়িষ্যার বাহিরের কোন সংস্কার-কেন্দ্র হইতে আসিয়াছিলেন। কারণ, তিনি উড়িষ্যার শিল্পীদিগকেই কার্য্যে নিযুক্ত করেন নাই এবং সেই জন্যই খিচিংএর মন্দিরগুলি ভুবনেশ্বরের মন্দিরের অনুরূপই হয় নাই।

উড়িষ্যার মন্দিরগুলি যে বহু দিনের অনুশীলনফল, তাহা বলা বাহুল্য। উড়িষ্যার প্রসিদ্ধ মন্দিরগুলি ৫০০ খৃঃ হইতে ১২০০ খৃঃ—এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে নির্ম্মিত :—

প্রথম—(খৃঃ ৫০০ হইতে খৃঃ ৬০০)
- সিদ্ধেশ্বর
- কেদারেশ্বর
- কপিলেশ্বর

দ্বিতীয়—(খৃঃ ৬০০ হইতে খৃঃ ৭৫০)
- অদন্ত বাসুদেব
- বৃহৎমন্দির
- ভাস্করেশ্বর

তৃতীয়—(খৃঃ ৭৫০ হইতে খৃঃ ৯৫০)
- মুক্তেশ্বর
- কণার্ক
- গৌরীদেবী
- ব্রহ্মেশ্বর
- পরশুরামেশ্বর
- বৈতাল দেউল
- রাজরাণী

চতুর্থ—(খৃঃ ৯৫০ হইতে ১২০০)
- কণার্ক মন্দিরের ভোগমণ্ডপ
- ভুবনেশ্বরের ভোগমণ্ডপ
- ভুবনেশ্বরের নাটমন্দির
- পুরীর মন্দির

উড়িষ্যার মন্দিরসমূহ যে চারিটি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়াছিল, তাহাও ক্রমাভিব্যক্তির ফল। যদি খিচিংএ মন্দিরগুলি উড়িষ্যার মন্দিরসমূহের অনুকরণে গঠিত হইত, তবে আমরা সে সকলে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিতে পারিতাম না।

১৮৭৪-৭৫ ও ১৮৭৫-৭৬ খৃষ্টাব্দে সরকারী প্রত্ন-বিভাগের ডিরেক্টার-জেনারল মেজর-জেনারল কানিংহামের নির্দ্দেশে পরিদর্শনে যাইয়া তাঁহার সহকারী মিষ্টার বেগলার খিচিংএর গুরুত্ব অনুমান করেন। তিনি ঐ বৃহৎ গ্রামে চারি দিকে পুরাকীর্ত্তির চিহ্ন লক্ষ্য করেন। তিনি তৎকালেই অযত্নে ও অনাদরে ভগ্নপ্রায় মন্দিরগুলির উল্লেখ করেন।

তাহার বহু দিন পরে নদীর ভাঙ্গনে কতকগুলি পুরাতন মুদ্রা প্রভৃতি বাহির হইয়া পড়ে এবং খিচিং আবার লোকের

মনোযোগ আকৃষ্ট করে। তখন মহারাজা রামচন্দ্র ভঞ্জদেও মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র পূর্ণচন্দ্র ময়ূরভঞ্জের মহারাজা। তাঁহার বিদ্যানুরাগ অসাধারণ ছিল। তিনি খিচিংএর পুরাতত্ত্ব-সম্বন্ধে অনুসন্ধানতৎপর হইয়া ভারত সরকারের পুরাবস্তু বিভাগে কর্ম্মী চাহিলে তৎকালীন ডিরেক্টার-জেনারলের নির্দ্দেশে রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় তথায় গমন করেন এবং বর্ত্তমান কালোপযোগী ব্যবস্থায় খনন ও অনুসন্ধানকার্য্য আরম্ভ হয়। ময়ূরভঞ্জের প্রত্ন-

কুটাইটুণ্ডী মন্দির—পুনর্গঠিত

বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী শ্রীযুত পরমানন্দ আচার্য্য ও শ্রীযুত শৈলেন্দ্রপ্রসাদ বসু চন্দ মহাশয়কে সর্ব্ববিধ সুবিধা-প্রাপ্তির ব্যবস্থা করিয়া দেন।

যাহাতে স্থানটি খনন করা সম্ভব হয়, সেই জন্য মহারাজার নির্দ্দেশে "ঠাকুরাণী"কে স্থানান্তরিত করিয়া একটি ঘরে রক্ষা করা হয়, এবং তীর্থযাত্রীরা তথায় তাঁহাকে দর্শন করিতে ও পূজা দিতে থাকেন। খিচিং অবজ্ঞাত হইলেও সময় সময় তথায় তীর্থযাত্রীর অভাব হইত না। চন্দ্র-শেখরের ও কুটাইটুণ্ডীর মন্দিরদ্বয় সংস্কৃত হইবার পরে বর্ত্তমান মহারাজা—প্রতাপচন্দ্র খিচিংএর স্থাপত্য-পদ্ধতিতে একটি নূতন মন্দির নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করেন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে "ঠাকুরাণীর" মূর্ত্তি স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯৩৫-৩৬ খৃষ্টাব্দে নূতন মন্দিরের ভিত্তি রচিত হইবার পর মহারাজা অভিমত প্রকাশ করেন, সম্ভব হইলে—পুরাতন ও ইতস্ততঃ পতিত উপকরণে নূতন মন্দির রচনা করা হউক। চন্দ্রশেখরের ও কুটাইটুণ্ডীর মন্দির অধ্যয়ন করিয়া পরমানন্দ বাবু ও শৈলেন্দ্র বাবু তাহা সম্ভব বলিয়া মত
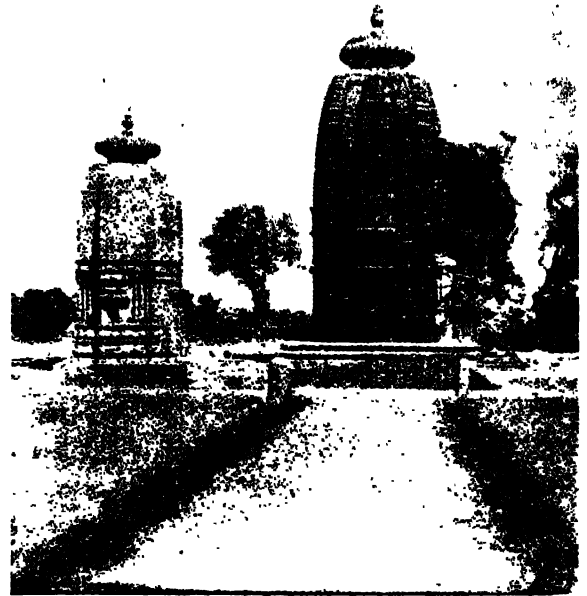
প্রধান মন্দির—পুনর্গঠিত

প্রকাশ করিলে গঠনকার্য্য আরম্ভ হয়। পুরাতন মন্দিরের প্রস্তর যথাসম্ভব ব্যবহৃত হইয়াছে—কেবল যে সকল স্থানে তাহার অভাব ঘটিয়াছে, সেই সকল স্থানেই নূতন প্রস্তরখণ্ড-সমূহ ব্যবহার করা হইয়াছে। কিন্তু সেগুলিতে কোনরূপ ক্ষোদাই করা হয় নাই। প্রায় ৮০ হাজার টাকা ব্যয়ে এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

খিচিংএ দুইটি সুরক্ষিত প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। "ঠাকুরাণী" অর্থাৎ দেবী কিঞ্চকেশ্বরী নামেও অভিহিতা। ইনিই ময়ূরভঞ্জ রাজবংশের কুলদেবী—ইনি চামুণ্ডারূপিণী।

পূর্ব্বে যে মন্দিরে দেবী অধিষ্ঠিতা ছিলেন, তাহারই সম্মুখে "খণ্ডিয়া দেউল" নামে অভিহিত অসম্পূর্ণ মন্দির। মন্দির-প্রাচীর যে পুরাতন ও ভগ্ন মন্দিরের উপকরণ লইয়া

গঠিত হইয়াছিল, তাহা দেখিলেই বুঝা যাইত। বোধ হয়, শিখর সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই, গঠনকার্য্য ত্যক্ত হইয়াছিল।

নিকটে বহু মূর্ত্তি ভগ্ন ও অভগ্ন অবস্থায় পতিত ছিল। ঠাকুরাণীর মন্দির বেষ্টিত করিয়া এক সময়ে ইষ্টকের প্রাচীর ছিল—তাহার ভগ্নাংশ তখনও লক্ষিত হইত।

চন্দ্রশেখরের মন্দির তখনও দণ্ডায়মান ছিল। তাহার কটি (ভিত্তি), প্রাচীর (ভিটি) ও গর্ভগৃহ সম্পূর্ণ ছিল—চূড়ার (শিখর) কেবল শেষাংশ পড়িয়া গিয়াছিল। তবে মন্দিরটি হেলিয়াছিল।

মন্দিরসমূহের মধ্যে নীলকণ্ঠেশ্বরের মন্দিরই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিল। যখন উহা সম্পূর্ণ ছিল, তখন যে উহার অসাধারণ সৌন্দর্য্য লোককে আকৃষ্ট করিত, তাহা বলা বাহুল্য। উহা যে অবস্থায় ছিল, তাহাতে সমগ্র মন্দিরটি প্রস্তরের পর প্রস্তর খুলিয়া লইয়া পুনর্গঠিত করা ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না।

কিরূপ নৈপুণ্যসহকারে প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ড চিহ্নিত করিয়া খুলিয়া লইয়া মন্দির আবার গঠিত করা হইয়াছে, তাহা মনে করিলে এই কার্য্যের জন্য প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

ঠাকুরাণীর মূর্ত্তি অস্থায়ী ঘরে স্থানান্তরিত করার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। যে মন্দির হইতে মূর্ত্তি স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল, তাহা ইষ্টকনির্ম্মিত। ঐ ইষ্টকের মন্দিরটি ভাঙ্গিয়া ফেলিলে দেখা গেল, দেবীমূর্ত্তি যে বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা মৃত্তিকার এবং পুরাতন কোন মন্দিরের ভিত্তির অবশেষের উপরে গঠিত। বোধ হয়, যে মন্দিরে এককালে বৃহৎ শিবমূর্ত্তি ছিল, উহা সেই মন্দির। পুরাতন মন্দিরের ভিত্তি দেখিলে বুঝা গেল, মন্দিরটি প্রায় ৩৫ বর্গফিট ও চতুষ্কোণ। মনে হয়, যখন কোন অজ্ঞাত কারণে এই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মন্দির ভাঙ্গিয়া যায় তখন—তাহারই উপকরণ লইয়া খণ্ডিয়া দেউল গঠন আরম্ভ হয়। তবে উহা পুরাতন মন্দিরের ভিত্তির উপর রচিত হয় নাই—সেই মন্দিরের উপকরণ লইয়া তাহার পশ্চাতে রচিত হয়। পুরাতন মন্দিরের ক্ষোদাই করা পাতরের চৌকাট যে এই মন্দিরে ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অন্য প্রস্তরগুলি ব্যবহারে মন্দির-নির্ম্মাণকারীরা যে ভাবে পুরাতন উপকরণের ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। ঐ সময় বহু মূর্ত্তিও ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

পুনর্গঠনের পূর্ব্বে মন্দিরগুলির অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়াছিল, তাহা কুটাইটুণ্ডী মন্দিরের পুনর্গঠনপূর্ব্ব অবস্থার চিত্র দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। মন্দিরের প্রস্তরগুলি যেন বিচ্ছিন্ন হইয়া পতিত হইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। কোন কোন স্থানে মন্দিরের উপর বৃক্ষ জন্মিয়া প্রস্তর স্থানভ্রষ্ট করিয়াছিল।
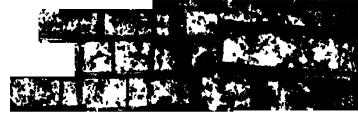
কুটাইটুণ্ডী মন্দির—পুনর্গঠনের পূর্ব্বে

ঐরূপ অবস্থায় পরিণত মন্দিরের প্রস্তরগুলি খুলিয়া লইয়া মন্দিরের পুনর্গঠনকার্য্যে যে অসাধারণ যত্ন, সতর্কতা ও শিল্পনৈপুণ্যের প্রয়োজন, তাহা বিশেষ প্রশংসনীয়।

এই স্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয়, পরমানন্দ বাবু বা শৈলেন্দ্র বাবু কাহারও এ বিষয়ে পূর্ব্বে আবশ্যক শিক্ষা ও

অভিজ্ঞতা ছিল না—তাঁহারা আপনাদিগের কার্য্যে আগ্রহ-হেতু কায এত যত্নসহকারে সম্পন্ন করিয়াছেন যে, মন্দিরের পুনর্গঠনকার্য্য আশাতীতরূপ সুসম্পন্ন হইয়াছে।

যে সকল মূর্ত্তি অযত্নে ইতস্ততঃ পতিত ছিল, সে সকলের কতকগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সকলগুলির সকল অংশ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু কোন কোন স্থলে ভগ্ন অংশগুলি সংগ্রহ করিয়া মূর্ত্তিটির পুনর্গঠন সম্ভব হইয়াছে। একটি হরমূর্ত্তি খণ্ড খণ্ড হইয়া পতিত ছিল এবং মূর্ত্তির বক্ষোদেশের একাংশ খণ্ডিয়া দেউলের প্রাচীরে ব্যবহৃত হইয়াছিল। সন্ধান করিয়া অংশগুলি সংগ্রহ করিয়া মূর্ত্তিটির একটি পদ ব্যতীত আর সবই পুনর্গঠিত করা সম্ভব হইয়াছে।

খিচিংএ যে ভাবে কায হইয়াছে, তাহার সামান্য উল্লেখ আমরা যাহা করিয়াছি, তাহাতে বুঝা যায়—এ দেশের শিল্পীরা এখনও সুযোগলাভ করিলে তাহাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিতে পারে—কেবল সুযোগের অভাবেই তাহা সম্ভব হইতেছে না।

ভারতবর্ষের নানা স্থানে পুরাকীর্ত্তি অনাদৃত অবস্থায় ধ্বংসের প্রতীক্ষা করিতেছে। সে সকলের পরীক্ষা যথা-সম্ভব শীঘ্র হওয়া প্রয়োজন—নহিলে অনেক সুরক্ষিত হইবার উপযুক্ত শিল্পকীর্ত্তি নষ্ট হইয়া যাইবে।

সকল ক্ষেত্রে যে ময়ূরভঞ্জ দরবারের মত অর্থব্যয় বা কর্ম্মচারী-নির্ব্বাচন সম্ভব হইবে তাহা না হইতে পারে; কিন্তু যে স্থানে যেরূপ সম্ভব তাহা করার প্রয়োজন সম্বন্ধে কোন কথা বলা বাহুল্য।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

মরু-মায়া

মরু ওঠে মুঞ্জরি কোন্ মায়াতে—
বুঝি নবীন পরশ পেয়ে শ্যাম কায়াতে!
হেরি রঙীন্ ধূলার শোভা নাহি সেখানে,—
কেন আবীর-গুলাল তবু ছড়ায় প্রাণে!
সেথা' বর্ষার মেঘে নাচে দিগঙ্গনা,
পুনঃ আলোকের ঝল্‌কানি করে বিমনা।
সেথা' কনক-চাঁপার কোনো নাহি ফুলবন,
নাহি বকুল-ছড়ানো বন-বীথি-আবরণ।
তবু অরুণ-কিরণসনে মাধুরী আসে,
মাতে সন্ধ্যা যে নাম-হারা কুসুম-বাসে।

কিছু সঞ্চিত নাহি রয় মরুভূমিতে,—
কোথা' ঝড় আসি বালু-জাল রহে বুনিতে।
হেথা' মহাকাল করে তপ নিত্য জাগি,—
যেন কঠোর সে-ধ্যান মহামায়ার লাগি'!
যবে শান্ত রহেন তিনি স্তব্ধ মরু,
কভু রুদ্র-ডিমি-ডিমি বাজে ডমরু।
হেথা' এমনি খেলাই নিতি খেলে মহাকাল।
বাজে মোহন বাঁশরী কভু বিষাণ ভয়াল!
তবু কা'র কৃপা-ধারা বহে ফল্গু-সমা!
চির মরু-বুকে লুকানো সে মায়া-সুষমা!

বাণীকুমার।
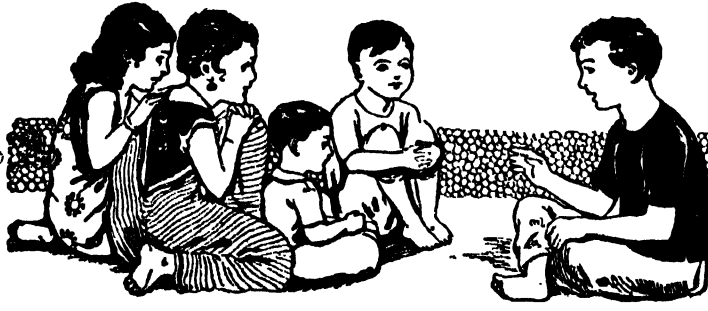
সাবধান

মুখের মধ্যে আলপিন পোরো? খবদ্দার! এমন কাজ করো না! কখন্ শেষে আলপিনটি গিলে ফেলবে! গিলে ফেললে সে-আলপিন তোমার সারা দেহের মধ্যে চলে বেড়াবে—সারা জীবন ধরে; এবং তেমন দুর্ভাগ্য যদি হয়, তাহলে ও-আলপিন এমনি চলতে চলতে কোনো মুহূর্ত্তে যদি ফুশফুশে কিম্বা হার্টে বেঁধে, তাহলে স্বয়ং শিবের সাধ্য থাকবে না যে সে-বিপদে রক্ষা করবেন!

শুধু আলপিন নয়। অনেকের অভ্যাস, সেলাই করতে করতে অনেক সময় ছুঁচটিকে দাঁতে চেপে সেলাই দেখেন, প্যাটার্ণ দেখেন। এ

পাঁজরায় সেফ্‌টি-পিন্

সেই আগুন নিয়ে খেলার মত অন্যায়, তা তাঁরা বোঝেন না! দৈবাৎ ও-ছুঁচটি যদি গিলে ফেলেন, তাহলে সর্ব্বনাশ। ও ছুঁচ সারা দেহ-মধ্যে চলে বেড়াতে পারে। এবং আলপিনের মত যদি ও-ছুঁচ ফুশফুশে কিম্বা হার্টে বেঁধে, তাহলে মৃত্যু সুনিশ্চিত!

আমেরিকায় এক বার এক ভদ্রলোকের খুব বেশী কাশি হয়েছিল। কাশির সঙ্গে জ্বর। বাড়ীর ডাক্তার দেখে বললেন, ব্রঙ্কাইটিশ। ব্রঙ্কাইটিশের চিকিৎসা চললো, কিন্তু রোগীর অবস্থা দিন-দিন কাহিল হতে লাগলো। অবশেষে বড় ডাক্তারের ডাক পড়লো। তিনি এসে বহু ক্ষণ নানা ভাবে রোগীর পরীক্ষা করলেন; করে বললেন, এক্স-রে ফটো নিতে হবে। ঠিক ব্রঙ্কাইটিশ বলে মনে হচ্ছে না। এক্স-রে ফটো নেওয়া হলে বড় ডাক্তার দেখলেন ব্রঙ্কাইটিশ নয়! বুকে বিঁধে আছে একটি সেফ্‌টি-পিন। রোগী বললেন, আশ্চর্য্য! ক' বছর আগে দৈবাৎ একটি সেফ্‌টি-পিন গিলে ফেলেছিলুম! সেটা আর বার করা হয়নি। তখন সার্জ্জন এসে অস্ত্রোপচার করে সে সেফ্‌টি-পিনটিকে বার করে দিলেন—রোগী তখন সেরে ওঠেন।

একটি মহিলার পায়ে কাঁচের টুকরো ফুটেছিল। সেই কাঁচের টুকরো বার করতে গিয়ে তার সঙ্গে বেরুলো এক-টুকরো ঘোড়ার বালামচি! মহিলার চক্ষু-স্থির! তিনি বললেন,—প্রায় দশ বৎসর

ঘোড়ার বালামচি

আগে তিনি ঐ বালামচিটি দৈবাৎ গিলে ফেলেছিলেন! অর্থাৎ যখন তিনি বালিকা ছিলেন, তখন তাঁর খেলার জন্য ছিল একটি কাঠের ঘোড়া—সেই ঘোড়ার বালামচি ওটি!

এ-সব কথা শুনে আশ্চর্য্য লাগছে? কি করে এই ছুঁচ-আলপিন আর বালামচি দেহের মধ্যে এমন চলাচলের পথ পায়? তাছাড়া গিলে ফেলা পিন, ছুঁচ, বালামচি দেহের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যায় কি করে? এ সব ব্যাপারে এমনি নানা প্রশ্ন মনে জাগে।

বিশেষজ্ঞেরা বলেন, এই ছুঁচ-আলপিন আর বালামচি প্রভৃতি ঠিক খাবারের মতো পাকস্থলীতে যায়। তাছাড়া আবার আমাদের দেহের শিরা-উপশিরার মধ্য দিয়ে, আমাদের শ্বাসনলীর মধ্য

দিয়েও চলাচল করতে পারে। বাতাস যে-পথে আমাদের ফুশফুশে যায়, সে-পথও এদের জন্ম মুক্ত থাকে! আধ মিনিটের মধ্যে রক্ত আমাদের দেহের সমস্তটা চক্রাকারে ঘুরে আসতে পারে। হাড়-পাঁজরা ও-সব জিনিষের চলায় বাধা রচনা করতে পারে না। পেশী এবং তন্তুর (tissues) গা পিছলে এ সব সামগ্রীর গতি অব্যাহত থাকে। পেশীর প্রসারে এবং সঙ্কুচনে, হৃদয়ের স্পন্দনে, শ্বাস-প্রশ্বাসে এবং পরিপাক-ব্যাপারে আমাদের অঙ্গের যে নড়াচড়া হয়, সে নড়াচড়ার দোলা পেয়ে এই সব ছুঁচ-আলপিন বা গলাধঃকৃত ছোটখাট সামগ্রী দেহমধ্যে কোথায় গিয়ে আস্তানা নেবে, তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই!

ছুঁচের গতির সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য্য ঘটনার কথা বলছি। এক জন ভদ্র-মহিলা সেলাই করবার সময় ছুঁচটি দাঁতে চেপে সেলাইয়ের ঘর গুণছিলেন, এমন সময় একটি হাঁচি! ব্যস্, যেমন হাঁচা, অমনি ছুঁচটি গেল চলে কণ্ঠ-নলীর মধ্য দিয়ে একেবারে দেহের

ইলেক্‌ট্রিক্-বাল্‌ব গেলা

মধ্যে! ডাক্তার এলেন—কোনো উপায় হলো না! শেষে দশ দিন পরে বুকের নীচে পাঁজরার পাশ দিয়ে চামড়া ফুঁড়ে সে-ছুঁচের মুখ বেরুলো। তখন ছুঁচটির উদ্ধার-সাধনে বেগ পেতে হলো না! কোথা দিয়ে কি করে ছুঁচের মুখ বেরুলো, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের দল তার সে গতি-রহস্য সমাধান করতে পারেননি।

আর একটি ভদ্র-মহিলা এমনি ছুঁচ গিলে ফেলবার পর তাঁর দেহ-মধ্যে সে ছুঁচটি তিন-টুকরো হয়ে ভেঙ্গে গিয়েছিল। ঐ ভাঙ্গা ছুঁচের তিনটি টুকরো পর-পর তিন বারে দেহের তিন জায়গা থেকে বেরিয়ে আসে। প্রথম টুকরোটি বেরোয় এ-দুর্ঘটনার এক মাস পরে—তলপেট থেকে। তার আরো কুড়ি-বাইশ দিন পরে দ্বিতীয় টুকরোটি বেরুলো তলপেটের নীচে থেকে; তার আবার এক মাস পরে তৃতীয় টুকরোটি বেরুলো পাঁজরার পাশ থেকে। এই শেষ-টুকরোটি ছিল ছুঁচের ছুঁচলো মুখ বা ডগা! ডগাটুকু ছুঁচলো হয়েও এত বিলম্বে গায়ের চামড়া ফুঁড়ে বেরুলো কেন, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের দল সে সম্বন্ধে কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি!

এক জন মিস্ত্রীর পায়ে টিনের একটু কুচি বিঁধে ছিল। বহু চেষ্টায় সে সে-টুকরো বার করতে পারেনি। শেষে এক মাস পরে তার হাঁটুতে হলো ফোড়া—সেই ফোড়া ফেটে বেরুলো সেই টিনের কুচি!

কুকুর নিয়ে মার্কিন বিশেষজ্ঞ ডক্টর হারিওয়ার্দেন বহু পরীক্ষা করেছেন—বহু বার বহু কুকুরের শিরার মধ্য দিয়ে তার দেহে লোহা, টিন, এলুমিনিয়ামের টুকরো সাঁধ করিয়ে প্রত্যেক বারই তিনি দেখেছেন, সেগুলো কুকুরদের হার্টে গিয়ে পৌঁছেছিল! বন্দুকের গুলী যদি কারো দেহ থেকে বার করা না যায়, তাহলে সেগুলিও দেহের যে জায়গাতেই বিঁধুক, শেষে তার হার্টে গিয়ে পৌঁছুবে—অবশ্য লোকটি বন্দুকের সে-গুলী খেয়ে বেঁচে থাকলে।

অষ্ট্রেলিয়ায় একটি দশ বৎসর বয়সের ছেলে এক বার একটি পেরেক গিলে ফেলেছিল! পেরেকটি কোনো ডাক্তার বার করতে

পেটের মধ্যে যেন মিউজিয়াম!

পারেননি। ছেলেটির জ্বর হলো। প্রবল জ্বর। সেই সঙ্গে দারুণ কাশি! ছেলেটি কিছু খেতে পারে না—অর্থাৎ যায়-যায় অবস্থা! ছেলেটির বাপ খুব ধনী। তিনি ছেলেকে নিয়ে অষ্ট্রেলিয়া থেকে আমেরিকায় ছুটলেন। হাজার মাইল পথ। আমেরিকায় ছিলেন ডক্টর জ্যাফ। এ সব উপসর্গে তিনি সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি। ডক্টর জ্যাফ ছেলেটির ফুশফুশ থেকে সে পেরেক বার করে দিলেন। এমন অস্ত্রোপচার তিনি করেছিলেন যে ছেলেটির রক্তপাত হয়নি!

এ সব হলো দৈবাতের কথা। কানাডায় এক ভদ্র-মহিলার ভারী বিশ্রী স্বভাব ছিল। তিনি ছুঁচ পিন বোতাম—যা পেতেন, গলাধঃকরণ করতেন। শেষে এক বার পেটের ব্যথায় অস্থির হন। মূর্চ্ছিতাবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালের ডাক্তার এক্স-রে ফটো নিয়ে দেখেন, মহিলার পাকস্থলীটি যেন মিউজিয়াম! অর্থাৎ কি যে সেখানে নেই! অস্ত্রোপচার হলো। এবং অস্ত্র করে' তাঁর পাকস্থলী থেকে পাওয়া গেল প্রায় ২৫৩০টি জিনিষ! জিনিষগুলি? বোতাম, আলপিন, ছুঁচ, মোজার গার্টার-বাঁধা, কাচের একরাশ বীড্, নিব, মায় মাথার কাঁটা পর্য্যন্ত! পাঁচ-সাত বছর ধরে ভদ্র-মহিলা এগুলিকে পাকস্থলীতে পুষে রেখেছিলেন, অথচ তাঁর অস্বস্তি হয়নি এত-কাল!

চিকিৎসকেরা বলেন, বাইরের কোনো জিনিষ পেটে গেলে আমাদের দেহ যদি সে-জিনিষকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে হজম করতে না পারে, তাহলে সে-জিনিষকে যেমন করে হোক ঠাঁই করে দেয়! এল্ পাশো নামে এক জন ম্যাজিসিয়ান্ ম্যাজিক দেখাবার সময় টপটপ করে কাচের মার্বেল, পিত্তল ও লোহার গুলী, মায় বিজলী-বাতির বাল্‌ব গিলে ফেলতেন—যেন বোঁদে, কিম্বা ক্ষীরের গুঁজিয়া, বা রসগোল্লা গিলছেন! সেগুলি তাঁর পেটের মধ্যেই থাকতো। অথচ ভদ্রলোক সে জন্ম শরীরে

এতটুকু গ্লানি বা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেননি ! চিকিৎসকেরা বলেন, তাঁর দেহের ভিতরটা এ-সব সামগ্রীকে জায়গা করে দিয়েছিল !

কলকাতায় এবং বাঙ্‌লা দেশের নানা জেলায় বাঙালী ম্যাজেসিয়ান্ খগানন্দ-মশায় ম্যাজিক দেখাবার সময় আস্ত কাচের গ্লাস চিবিয়ে খেতেন —আমরা স্বচক্ষে এ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছি। তার উপর লোহার পেরেক, আলপিন গিলে ফেলতেন একেবারে অজস্র ভাবে। বহু বৎসর এ ম্যাজিকে তিনি কোন রকম অস্বাচ্ছন্দ্য বা অস্বস্তি বোধ করেননি। কিন্তু ক' বছর আগে হঠাৎ এক বার এমনি ম্যাজিক দেখাবার পর তিনি পেটের যাতনায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েন ; এবং হাসপাতালে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন ! হাসপাতালে তাঁর উদরে অস্ত্রোপচার করা হয়। অস্ত্রোপচারে তাঁর পেট থেকে রাশীকৃত কাচের টুকরো, পেরেক, আলপিন প্রভৃতি পাওয়া গিয়েছিল। অস্ত্রোপচার করেও ভদ্রলোককে কিন্তু বাঁচানো যায়নি ! ঐ দুঃসাহসিকতার ফলে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

এ-কাজে যত বাহাদুরি থাকুক, এমন বাহাদুরির দুর্ম্মতি যেন তোমরা কখনো করো না। এ বদ্ অভ্যাস যদি তোমাদের মধ্যে কারো থাকে, অবিলম্বে তা বর্জ্জন করো। এর ফল সাংঘাতিক, জেনো।

বাঁচার মতো বাঁচা

বাঁচার মতো বাঁচতে কে না চায় ? তোমরাও তা চাইবে, নিশ্চয় ! কিন্তু বাঁচার মতো বাঁচতে হলে শুধু সুস্থ দেহ, লেখাপড়ায় পাশ সেরে বড় চাকরিতে মোটা মাইনে, কিম্বা ওকালতী-ডাক্তারী বা ব্যবসা-বাণিজ্যে বহু টাকা রোজগার করে মোটর-গাড়ী, দাস-দাসী, বড় বাড়ী পাওয়া—এ সব হলেই চলবে না। মনকে উদার করা চাই। পৃথিবীতে প্রতিদিন কোথায় কি ঘটছে, সে সব খবর রাখতে হবে ; কালের অগ্রগতির সঙ্গে মনকে এগিয়ে নিয়ে চলতে হবে। অসংযম নয়, অনাচার নয়, খেয়াল-স্বার্থ নয়, অসাধুতা নয়। এ সব নীচতা-হীনতার সংস্পর্শ বাঁচিয়ে বাস করতে হবে !

তা করতে হলে কি চাই, জানো ?

প্রথমতঃ দেহখানিকে সুস্থ রাখা চাই। তা রাখতে হলে আহারে-বিহারে যেমন সংযত হতে হবে, তেমনি নিত্য একটু-আধটু ব্যায়াম-সাধনা, পায়ে হেঁটে প্রত্যহ সকালে-সন্ধ্যায় নির্ম্মল বাতাসে খোলা জায়গায় খানিকটা বেড়ানো, খেলাধূলায় অনুরাগ—এ সব চাই। খেলাধূলার মানে, বাজি রেখে তাস-পাশা খেলা নয়। সে খেলা কুড়ের খেলা ! বাজি রেখে যে-খেলা, সে-খেলাকে যতই ভদ্র পোষাক পরাও, সে খেলা জুয়া-খেলার সামিল। তাতে নেশা লাগে। সে নেশায় মনের শান্তি যায়, পয়সা-কড়িও নষ্ট হয়। ও খেলায় এ্যারিষ্টোক্রেশির ছাপ যতই লাগাও, ওতে এ্যারিষ্টোক্রেশি নেই—এ কথা ধ্রুব সত্য বলে জেনে রাখো।

লেখাপড়া শেখা চাই, নিশ্চয়। পাশ করতে হবে। কারণ, পাশ না করলে সংসার-অঙ্গনে কায়েমি ভাবে আসন পাতা শক্ত হবে। তবে চাকরি বা পেশার জন্ম যে-লেখাপড়া শেখা, তাকেই যেন শিক্ষার চরম মনে ভেবো না। আমাদের দেশে কত ভালো ভালো 'মাথা' লেখাপড়ার পাশে কৃতিত্ব লাভ করে' পয়সা-রোজগারের জাঁতি-কলের চাপে পড়ে শুধু টাকা-রোজগারের মেশিন বোনে' নিজেদের মাথা খেয়েছেন, তার তালিকা দেখলে শিউরে উঠবে !

যিনি ওকালতিতে খুব পশার করেছেন, তাঁকে দেখবে মক্কেল আর তার মকর্দ্দমার কাগজ-পত্রের মধ্যে ডুবে আছেন। তাঁর চোখের আড়ালে গ্রীষ্ম-বর্ষা শরৎ-হেমন্ত শীত-বসন্ত বিচিত্র মনোহর বেশে যাতায়াত করছে, সে-সবের তিনি খবর রাখেন না ! ছেলেমেয়ে আনন্দ-হিল্লোল তুলে তাঁর চোখের আড়ালে বড় হয়ে উঠছে ! তিনি শুধু তাদের স্কুলের মাইনে, জামা-কাপড়ের দাম আর বই কেনার টাকা জুগিয়ে খালাশ ! জগতে কাছারি-আদালত আর মক্কেলের জন্ম লড়াইয়ের বুলিমাত্র নিয়ে তিনি বাস করছেন ! একে কি জীবন বলে ? এঁরা যতক্ষণ জেগে থাকেন, ততক্ষণ লক্ষ্য শুধু ঐ কি করে' পয়সা রোজগার করবেন ! পশার আর ব্যবসার মধ্যে যাঁরা এমনি ভাবে ডুবে থাকেন, দেখবে, তাঁদের মনে দিবারাত্রি চিন্তা আর চিন্তা ! এ চিন্তায় তাঁরা পাগল হয়ে যেতেন—যদি না ঐ পয়সার মাদুলি হাতে থাকতো !

রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন, "মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।" যে ভুবন এমন সুন্দর, সে-ভুবনের সৌন্দর্য্য যদি মানব-জন্ম পেয়ে উপভোগ না করলে, তাহলে মানুষ হয়ে জন্মাবার কি প্রয়োজন ? আহার আর নিদ্রা—সে তো পশুরাও করে। পশুর সঙ্গে মানুষের প্রভেদ,—মানুষের মন আছে,—জীবন্ত মন ! সে-মন পৃথিবীতে স্বর্গ রচনা করতে পারে।

এ স্বর্গ-রচনার শক্তি মানুষের আছে। এ-শক্তির পরিচয় পাবে যদি চোখ খুলে, মন খুলে পৃথিবীর সঙ্গে মিতালী করতে পারো। এ মিতালী করবার উপায়—লেখাপড়ার বইয়ের বাইরে যে জ্ঞান ও কল্পনার সাগর রয়েছে, সেই সাগরে অবগাহন করা। পড়ো পৃথিবীর যত মনীষীদের লেখা বিজ্ঞান-দর্শন, গল্প-নাটক, উপন্যাস-কাব্য। কাজ-কর্ম্মের মধ্য থেকে খানিকটা সময় করে নাও—এখন, এই বয়স থেকে। এবং সে-সময়টুকুতে পড়ো তোমরা কাব্য-ইতিহাস-দর্শন-সাহিত্য-জীবনী, ভ্রমণ-কাহিনী প্রভৃতি। দেখবে, মনের প্রসার তাতে কতখানি বেড়ে যাবে ! নিত্যদিন রুটিন করে খবরের কাগজ পড়ো। এ পড়ায় দেখবে, চিন্তা করতে শিখবে। সে চিন্তা গদ্যে-পদ্যে লেখবার সামর্থ্য হবে। একটি প্রদীপের শিখার স্পর্শে যেমন আর একটি প্রদীপ জ্বলে, তেমনি পরের লেখা বই পড়ে তাঁর চিন্তার শিখা থেকে তোমার মনের চিন্তা প্রদীপ্ত হবে, জাগ্রত হবে !

রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন, "এই সব মূঢ় ম্লান মূখে দিতে হবে ভাষা !" তোমরা জেনো, দেশের চারি দিকে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি যে সব নিরক্ষর নর-নারী বাস করছে—যারা নিজেদের সুখ-দুঃখের উপলব্ধিও করতে পারে না, তারা তোমাদের মুখ চেয়ে আছে। নিজেদের মনে জ্ঞানের দীপ-শিখা জ্বেলে সে-শিখার স্পর্শে ওদের মনের শিখাকে জ্বেলে দিতে হবে। নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে বাঁচলে চলবে না—সকলকে বাঁচিয়ে বাঁচতে হবে—তাকেই বলে বাঁচার মত বাঁচা ! তোমাদের এমনি বাঁচার মতো বাঁচতে হবে, জেনো !

বিচার

(ঐতিহাসিক গল্প)

রাজপুতানার কথা।

এক পাঠান দস্যুর কাছে যুদ্ধে হেরে টোডার রাজা সুরতান মেবারের এক অংশে বাস করছিলেন। সে রাজ্যের নাম বেদনোর। রাজার এক কন্যা—তারাবাই। কন্যা পরমাসুন্দরী।

মেবারের রাণা রায়মল্ল খুব ধার্ম্মিক এবং ন্যায়পরায়ণ বলে' সবাই তাঁকে দেবতার মত ভক্তি করতো। আর এই বেদনোর রাজ্য ছিল তাঁর আশ্রিত। রায়মল্লের এক ছেলে। তার নাম জয়মল্ল।

এক দিন—তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। মেবারের ছোট একটি পাহাড়ের কোলে বন। বনে পাখীরা কল-গান করছে। লতা-পাতার ফাঁক দিয়ে সান্ধ্য-সূর্য্যের শেষ রশ্মি এসে পড়েছে। বনের একটি সরু পথ ধরে' শিকারীর পোষাকে সুরতানের কন্যা তারাবাই ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছেন। তাঁর বাঁ-হাতে ঘোড়ার রাশ, ডান হাতে বল্লম, পিঠে পূর্ণ তূণীর, কাঁধে স্বর্ণ-শরাসন। তারাবাই পিতৃ-দুর্গে ফিরছিলেন।

ঘটনাক্রমে ঠিক সেই সময়ে পথের আর এক দিক থেকে তেজী লাল ঘোড়ায় চড়ে' রায়মল্লের ছেলে জয়মল্ল এসে সেইখানে উপস্থিত হলেন। গোধূলির সোনালী আলোয় গহন বনে রাজ-কন্যাকে দেখে রায়মল্ল মুগ্ধ হলেন! কিছুক্ষণ তারাবাইয়ের দিকে চেয়ে, ভদ্রভাবে তাঁকে একটি নমস্কার করে' আর এক পথ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে জয়মল্ল চলে গেলেন। রাজকন্যাকে কিন্তু ভুললেন না।

এর কিছু দিন পরে জয়মল্ল এক দিন তার বাবাকে বল্লেন, সুরতানের মেয়েকে তিনি বিয়ে করতে চান। শুনে রায়মল্ল তখনি হাতী সাজিয়ে নিজের এক বন্ধুকে পাঠালেন টোডার রাজার কাছে। বন্ধুর সঙ্গে পাঠালেন খুব দামী হাতীর দাঁতের জিনিষ সুরতানকে নজর দেবার জন্য এবং সেই সঙ্গে সোনার থালায় করে পাঠালেন নারকেল আর একটি ছোরা! রাজকন্যার জন্য পাঠালেন এক ছড়া সাতনরী মুক্তাহার।

বিবাহের প্রস্তাব পাঠাতে হলে রাজপুত রাজাদের মধ্যে প্রথা ছিল, সোনায়-মোড়া নারকেল আর একখানি ছোরা পাঠানো। অপর পক্ষ যদি সে নারকেল গ্রহণ করেন, তা হলে বুঝতে হবে, এ বিবাহে তাঁর মত আছে। নারকেল না নিয়ে যদি কেউ ছোরাখানা তুলে নেয়, তবে বুঝবে যে, তিনি কুটুম্বিতায় রাজী নন।

যথারীতি বন্দনা করে' রায়মল্লের বন্ধু যখন টোডার রাজার সুমুখে সেই থালা ধরলেন, ধরে মেবারের রাণার ইচ্ছা জানালেন, তখন ছোরা বা নারকেল কোনোটি গ্রহণ না করে' সুরতান সবিনয়ে বল্লেন—রাণাকে বলবেন, আমার দুর্ভাগ্য যে, তাঁর মত মহৎ ব্যক্তির প্রস্তাব আমি পাবামাত্রই গ্রহণ করতে পারলাম না। এর কারণ, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, পাঠান-দস্যুর হাত থেকে যিনি আমার নষ্টরাজ্য উদ্ধার করে' দেবেন, তাঁর হাতে আমি কন্যা দেবো। আমার প্রতিজ্ঞা আমি ভাঙ্গতে পারি না। রাণা বিবেচক। তাঁকে এ কথা বলবেন। তিনি বোধ হয় কিছু মনে করবেন না।

হলো তাই! রায়মল্লকে সব কথা জানাতে তিনি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হয়ে ছেলেকে ডেকে বল্লেন, শোনো জয়মল্ল, তারাবাইয়ের পিতা প্রতিজ্ঞা করেছেন, যিনি তাঁর নষ্টরাজ্য পুনরুদ্ধার করে' দিতে পারবেন, তাঁর হাতে তিনি কন্যা দান করবেন। যদি তারাবাইকে তোমার বিবাহ করার ইচ্ছা থাকে, তা হলে যাও, সৈন্য-সামন্ত নিয়ে পাঠান-দস্যুকে যুদ্ধে হারিয়ে টোডা-রাজ্য উদ্ধার করে' সুরতানকে দাও গে।

* * * *

হাতী-ঘোড়া সৈন্য-সামন্ত নিয়ে জয়মল্ল চল্লেন পাঠান-দস্যুকে পরাস্ত করতে। ভীষণ যুদ্ধ হলো। একে একে জয়মল্লের যত সৈন্য ছিল, সব মারা পড়লো। হাতী-ঘোড়া সব নষ্ট হলো। তখন কাপুরুষের মত জয়মল্ল যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে গেলেন।

রায়মল্লের মাথা হেঁট হলো। রাজপুত-কুলে কলঙ্কের কালি পড়লো! এর চেয়ে জয়মল্ল যদি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতেন, তাহলেও ভালো ছিল। রাজপুতের কাছে প্রাণের চেয়ে মানের দাম অনেক বেশী।

কুলাঙ্গার জয়মল্ল কিন্তু শুধু ভীরুর মত পালিয়ে এসেই ক্ষান্ত হলেন না; চুপি চুপি বেদনোরে গিয়ে রাত্রির অন্ধকারে চোরের মত রাজবাড়ীতে ঢুকে তারাবাইকে চুরি করে' আনবার মতলব করলেন। কিন্তু প্রহরীদের হাতে ধরা পড়তে হলো। তারা তাঁকে ধরে' রাত্রির মত একটা গারদ-ঘরে বন্ধ করে' রাখলো।

সকাল বেলায় সুরতান সভায় বসেছেন। তারা জয়মল্লকে নিয়ে রাজসভায় হাজির হলো। জয়মল্ল যুদ্ধে হেরে কাপুরুষের মত পালিয়ে এসেছে, সে-কথা সুরতানের কাণে আগে এসে পৌঁছেছিল। তার পর যখন তিনি তার এই নতুন কীর্ত্তির কথা শুনলেন, তখন লজ্জায়, ক্ষোভে, রাগে অধীর হলেন। বললেন,—রাজপুত-কুলের এমন যে কলঙ্ক, এমন যে নির্লজ্জ নীচ নরাধম, তার মৃত্যুই মঙ্গল। যাও জল্লাদ, ওকে মশানে নিয়ে যাও।

মশানে অসংখ্য রাজপুত-বীরের সুমুখে জয়মল্লর মাথা কেটে ফেলা হলো।

* * * *

এ-কথা মেবারে যে শোনে, সে-ই শিউরে ওঠে! ভাবে, সুরতানের কি সাহস, কি স্পর্দ্ধা! কোথায় মেবারের পরাক্রান্ত পুরুষসিংহ অমিত-তেজা রাণা রায়মল্ল! আর কোথায় লাঞ্ছিত, বিতাড়িত, রাজ্যচ্যুত ক্ষুদ্র টোডার নগণ্য রাজা সুরতান! সেই রায়মল্লের একমাত্র পুত্র জয়মল্ল—তাকে হত্যা!

সকলেই বললে, শনি রন্ধ্রগত হলে মানুষের দুর্ব্বুদ্ধি এমনি হয় বটে। কেউ বললে, সুরতানকে শূলে দেওয়া হবে। কেউ বললে, না, ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়ানো হবে। সবাই ভয়ে-ভয়ে রাজপুত্রের হত্যার কথা নিয়ে কাণাকাণি করে; মুখ ফুটে কেউ কিছু বলতে পারে না!

কিন্তু এ-কথা বেশী দিন চাপা রইলো না। টোডার রাজার এক শত্রু এসে এক দিন খুব আড়ম্বর করে' রায়মল্লকে ব্যাপারটা আগাগোড়া শুনিয়ে দিলে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে জয়মল্লের পলায়নের কথা রাণা গম্ভীর মুখে শুনলেন। তার পর শুনলেন, কি করে' রাত্রিবেলায় চোরের মত সে সুরতানের অন্তঃপুরে ঢুকে তারাবাইকে চুরি করে আনবার চেষ্টা করেছিল!

শুনতে শুনতে তাঁর কপাল কুঁচকে এলো! তার পর সবের শেষে যখন তাঁকে শোনানো হলো যে, সুরতানের হুকুমে তাঁর ছেলের মাথা কেটে ফেলা হয়েছে, তখন হঠাৎ তাঁর মুখ প্রশান্ত হলো, দু'চোখে ফুটলো উজ্জ্বল দীপ্তি। তিনি বললেন,—বাঁচলাম! টোডার রাজা যথার্থই রাজপুত। বিচার কাকে বলে, তিনি জানেন! আজ থেকে তিনি আমার পরম বন্ধু!

কোথায় শূল, কোথায় ডালকুত্তা, আর কোথায় রায়মল্লের মুখে এই কথা! সভাশুদ্ধ লোক বিস্ময়ে স্তব্ধ! দূত গেল টোডার রাজা সুরতানের কাছে রাণার সশ্রদ্ধ নিমন্ত্রণ জানাতে!

শ্রীরামেন্দু দত্ত।

যৌবন-সাধনা

একালের ধনী ও বিলাসী ঘরের মেয়েরা বিদেশী আদর্শে আজ গৃহ-কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়াছেন। সেকালে আমাদের দেশে খুব ধনাঢ্য গৃহের মেয়েরাও গৃহ-কর্ম্মকে হীন বলিয়া ত্যাগ করেন নাই। গৃহ-কর্ম্ম করায় দেহের যে-ব্যায়াম সাধিত হইত, সে-ব্যায়ামের জোরে তাঁদের দেহ স্বাস্থ্যের শ্রী-ছাঁদে যেমন সুগঠিত থাকিত, তেমনি সৌন্দর্য্য-দীপ্তিতে তাঁরা ছিলেন দীপ্তিময়ী। আজ আলস্য-বিলাসে গা ঢালিয়া একালের মেয়েরা স্বাস্থ্য হারাইতেছেন, এবং স্বাস্থ্যহানি-বশতঃ তাঁদের দেহের যে শ্রীছাঁদে তাঁরা যেমন বঞ্চিত, তেমনি রূপ-দীপ্তির অভাবে পরিম্লান! গৃহ-কর্ম্ম যখন করিবেন না, তখন বিদেশী আদর্শে ব্যায়াম-সাধনার প্রয়োজন অন্তঃপুরিকাদের পক্ষে আজ অপরিহার্য্য, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

আমাদের দেশে মেয়েদের স্বাস্থ্যহানি ঘটিবার কারণ একাধিক। নানা দিকে এ দেশের পুরুষের আজ চেতনা জাগিলেও অন্তঃপুরিকাদের দেহ-মনের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তাঁদের উদাস্য এখনো সীমাহীন রহিয়া গিয়াছে! পঁচিশ-ত্রিশ বছর পূর্ব্বে বহু ক্ষেত্রে দেখিয়াছি, অন্দরের সঙ্গে সদরের ছিল শুধু পাওনা আদায়ের সম্পর্ক! মেয়েরা অন্দরের অন্ধকার কোণে বসিয়া পুরুষের সেবার অর্ঘ্য রচনা করিবে, পুরুষের স্বাচ্ছন্দ্য সাধনা করিবে, পুরুষের সুখের জন্য যদি জান্ দিতে হয়, তাও দিবে! মেয়েরা যে জীবন্ত এবং মানুষ, তাদেরো দেহ আছে, মন আছে, সে-মনে সুখ-দুঃখ-বোধ আছে, এ কথা পুরুষ যেন বিশ্বাস করিত না!

সৌভাগ্যক্রমে এখন সে-ভাব অনেকখানি ঘুচিয়াছে। আমরা অন্দরের প্রাচীর ভাঙ্গিয়াছি, জানলা খুলিয়া দিয়াছি। মেয়েরা আজ মাঠে-ঘাটে বাহির হইতেছেন। কিন্তু তাঁদের দেহ-মনের স্বাস্থ্যোন্নতির দিকে লক্ষ্য নাই! ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে, ট্রামে-বাসে, পথে-ঘাটে, সিনেমা-গৃহে হৃষ্টপুষ্ট স্বামি-পুত্র-ভাইয়ের পাশে জায়া-জননী-ভগিনীর কঙ্কালমূর্ত্তি দেখিলে শুধু লজ্জা নয়, আতঙ্ক হয়! ইঁহাদের উদ্দেশেই কি কবি বলিয়াছেন—

তুমি এসো এসো নারি
আনো তব হেম-ঝারি!

কিন্তু কবিত্ব নয়! বাঙলার অন্তঃপুরিকাদের বলিতেছি, আপনারা চাড় করিয়া স্বাস্থ্য-চর্চ্চায় মনোনিবেশ করুন! সিনেমা বিলাস বলুন, বা সজ্জাভূষণের সমারোহ বলুন—দেহকে যদি পরিপুষ্ট স্বাভাবিক ছাঁদে গড়িয়া তুলিতে না পারেন, তাহা হইলে কিসের জোরে বাঁচিবেন! কোনো মতে 'রুগ্ন' দেহ লইয়া বাঁচিলেও মানুষের সমাজে বাহির হইতে হইবে তো! তখন নিজেদের দেহের বিশ্রী ছাঁদের জন্য, অস্বাস্থ্য-জনিত জীর্ণতার জন্য মাথা তুলিতে পারিবেন না যে!

স্বাস্থ্য চর্য্যায় দেহে জরা দেখা দিতে পারে না, এবং পারিবে না—এ কথা খেয়ালী বা বানানো নয়—দেহতত্ত্ববিদ বিশেষজ্ঞদের কথা! মনের যৌবনকে শিক্ষা-সংস্কৃতির জোরে যেমন চিরস্থায়ী রাখা যায়, দেহের যৌবনকেও তেমনি চিরস্থির রাখা যায় ব্যায়ামে! আজ আমরা সেই যৌবন সাধনার কথা বলিতেছি—যে-সাধনায় দেহের শ্রী-সৌন্দর্য্য কোনো দিন ক্ষরিবে না; যৌবন চিরদিন অঙ্গে অঙ্গে লাবণ্য-লীলায় ললিত ছন্দে আবদ্ধ থাকিবে!

আমাদের দেহকে সবল সিধা রাখিতে হইলে ঘাড়কে মজবুত করা চাই। ঘাড়ের জোর বড় জোর। সে জোর এবং তার সঙ্গে ঘাড় ও সমগ্র দেহকে যদি সুছাঁদে রক্ষা করিতে চান, সেই সঙ্গে দু'টি হাতকে কমনীয় শক্তি-সমর্থ ও কোমল-রমণীয় রাখিতে চান, তাহা হইলে পঞ্চ ব্যায়ামের প্রয়োজন।

১। যেন দড়ি ধরিয়া উপরে ২। দু' ফুট দূরে

১। যেন দড়ি ঝুলানো আছে, এবং সেই দড়ি ধরিয়া যেন দেওয়াল বহিয়া উপরে উঠিতে চান, এমনি ভঙ্গীতে দেওয়ালের দিকে সা ম না-সা ম নি দাঁ ড়া ন। দাঁ ড়া ই য়া দু'হাত ঊর্দ্ধে তুলুন। দু'হাতে দেওয়াল স্পর্শ করিয়া দুই হাত ঊর্দ্ধে তুলিবার সময় দুই পায়ের গোড়ালি তুলিয়া শুধু পায়ের আঙ্গুলগুলির উপর ভর রাখিয়া (১নং ছবির মতো) দাঁড়াইবেন। তোলা দু'হাত ঊর্দ্ধে মুষ্টিবদ্ধ থাকিবে—যেন দু'হাতের মুঠায় দড়ি ধরিয়াছেন এমনি ভাবে! তার পর এক বার ডান হাত তুলিবেন বাঁ হাত নামাইবেন, তার পরক্ষণেই বাঁ হাত তুলিবেন, ডান হাত নামাইবেন—যেন দড়ি ধরিয়া উপরে উঠিতেছেন! এ ব্যায়াম করিবেন যতক্ষণ না শ্রান্তিভরে দু'হাত অবশ হয়!

২। এবারে দাঁড়ান (২নং ছবির ভঙ্গীতে)। দেওয়াল হইতে দু'ফুট দূরে দাঁড়াইবেন। এবার দু'হাত প্রসারিত করিয়া দিন, দু'হাতে

দেওয়াল স্পর্শ করা চাই। এবার পা দু'খানিকে সুদৃঢ় রাখিয়া অর্থাৎ না নড়িয়া ঊর্দ্ধ দেহকে সামনে দুলাইবেন। দেহ দুলাইবার সময় এক বার ডান হাত উপরে উঠিবে, বাঁ হাত নীচে নামিবে—পরক্ষণে বাঁ হাত উপরে উঠিবে, ডান হাত নীচে নামাইবেন। এ ব্যায়ামও করা চাই যতক্ষণ না শ্রান্তিবোধ করেন! ব্যায়ামের সময় দু'হাত যেন কোন সময়ে দেওয়ালের স্পর্শ-ছাড়া না হয়। আলতো ভাবে দেওয়াল স্পর্শ করিতে হইবে।

৩। ৩নং ছবির মতো টুলে চেয়ারে বা রোয়াকে বসুন। দুই পা সামনে ঝলাইয়া দিন তার পর দুই হাত তুলিয়া মাথার উপর রাখুন (৩নং ছবি দেখুন)। ডান হাত দিয়া বাঁ হাতের কব্জী এবং বাঁ হাত দিয়া ডান হাতের কব্জী ধরুন। তার পর এমনি ভাবে আবার দুই হাত ধীরে ধীরে নামান—তলপেট পর্য্যন্ত। নামাইয়া তার পরক্ষণে আবার মুখের সামনে দিয়া দুই হাত এমনি আবদ্ধ ভাবে মাথার উপর রাখিবেন। রাখিবার পর এমনি ভাবে আবদ্ধ দুই হাত যতখানি সম্ভব মাথার পিছন দিক্ পর্য্যন্ত যাইবে। বসিবার সময় বাঁ পা থাকিবে ডান পায়ের হাঁটুর উপর (৩নং ছবি দেখুন)। এ ব্যায়াম করিবেন অন্ততঃ পক্ষে পাঁচ বার।

৩। টুলে বসুন

৪। এবার চিৎ হইয়া শুইয়া পড়ুন। দু'পা থাকিবে ৪নং ছবির ভঙ্গীতে! দু'খানি বাঁধানো মোটা বই দু' পাশে রাখিবেন।
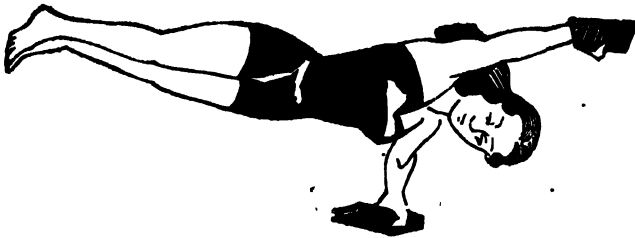
৪। হাতে বইয়ের ভার

শুইয়া বই দু'খানি দু' হাতে নিন (৪নং ছবির ভঙ্গীতে)। এবার বই-সমেত এক হাত তুলুন ঊর্দ্ধে—বই-সমেত অপর হাত এখন থাকিবে মেঝে স্পর্শ করিয়া। এক হাত যখন উঠাইবেন, অপর হাত থাকিবে নীচে,—ঐ ছবির মতো। এ ব্যায়াম করা চাই যতক্ষণ না দুই হাত শ্রান্তিভরে অবশ বোধ হয়।

৫। এবার দেওয়ালের দিকে পিঠ করিয়া দাঁড়ান। দাঁড়াইয়া নৃত্যের ভঙ্গীতে লাফ দিতে দিতে এক বার ডান হাত তুলিয়া পিছন-দিক হইতে আনিয়া ঐ ডান হাতে বাঁ কাঁধ চাপড়ান; তার পরক্ষণেই বাঁ হাত দিয়া এমনি ভাবে ডান কাঁধ চাপড়াইবেন (৫নং ছবির ভঙ্গীতে)। পর-পর এবং দ্রুত-তালে এ ব্যায়াম করিবেন অন্ততঃ পক্ষে দশ বার।

৫। পিঠের দিক দিয়া ডান হাত

এ কয়টি ব্যায়ামের নিত্য সাধনায় হাতের ও কাঁধের গড়ন হইবে সুশ্রী সুছাঁদের, শক্তি-সামর্থ্যও প্রচুর।

অতি-আধুনিকা

একালে মডার্নিজমের নামে আমরা গলা ছেড়ে বলতে সুরু করেছি যে, আমরা পুরুষের দাসী নই, দাস্য আমরা করবো না! না স্বামীর দাস্য, না ভাইয়ের দাস্য, না ছেলেমেয়ের দাস্য! আমবা চাই মুক্তি! আমরা চাই সাম্য! আমরা চাই মৈত্রী!

অর্থাৎ স্বামি-পুত্রের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যেব পায়ে নিজেদের বিকিয়ে নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভুলে আমরা আর নিজেদের অস্তিত্ব হারিয়ে বাস করতে রাজী নই! আমাদের বন্ধু-বান্ধবীদের নিয়ে আমরাও চাই পুরুষের মতো মেলামেশা করতে। আমরা চাই, বান্ধবীর বাড়ীর পার্টিতে যেতে। স্বামী তখন অফিস থেকে বাড়ী ফিরে যদি বলেন, ওগো আমার সঙ্গে চলো একটু সিনেমায়! কিম্বা ছেলে এসে বলে, জামার বোতাম সেলাই করে দাও মা,—তাহলে আমরা স্বামীর কথায় সায় দিয়ে স্বামীর মুখ চেয়ে তাঁকে সঙ্গ-সাহচর্য্যে তৃপ্ত করতে সিনেমায় যাবো না বা ছেলেদের জামায় বোতাম আঁটতে বসবো না! বান্ধবীর পার্টির নিমন্ত্রণ রাখতে বান্ধবীর গৃহে যাবো! আমাদের মুখ না চেয়ে স্বামী, পুত্র, ভাইয়েরা যেমন তাদের সখ-খেয়াল চরিতার্থ করতে ছোটে, আমরাও তাঁদের পথ ধরে সেই রীতি মেনে চলবো!

এতে লাভ? বাড়ীতে পরস্পরের মনে-মনে সহযোগিতার সূত্রটুকু ছিঁড়ে যাবে! বাড়ীর সকলে—কেউ কাকেও পাবে না আর! মানে, স্বামীরা যখন চান, আমরা তাঁদের কাছে একটু বসবো, আমরা তখন এনগেজমেণ্ট রাখতে বাইরে বেরুবো! আমরা যখন চাই স্বামি-পুত্রের কাছে একটু বসবো, তাঁরা তখন কোনো মিটিং এ্যাটেণ্ড করতে বেরুবেন! একেবারে প্রীতি-বাঁধনের সম্পর্ক কেটে সংসার হবে মেসের মত! কোনো পক্ষই অবলম্বন পাবে না! এমন করে পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করায় মানে, আদিম বর্ব্বর যুগে গিয়ে যাওয়া!

সংসারে স্বামী, পুত্র কন্যা, স্ত্রী, ভাই-বোন—সকলকেই সকলের মুখ চেয়ে বাস করতে হয়। তা না করলে কারো স্বাচ্ছন্দ্য থাকে না! এবং পরস্পরকে মেনে বাস করতে হলে কারো পক্ষে অবাধ স্বাধীন বা খেয়ালী হলে চলে না! পরস্পরের জন্য পরস্পরকে খানিকটা ত্যাগ স্বীকার করতেই হবে। স্বামীর অসুখে স্ত্রী আরাম-বিলাস ত্যাগ করে স্বামীর সেবা করেন, স্ত্রীর অসুখে স্বামী যে স্ত্রীর মাথার শিয়রে বসেন,—এতে দু'পক্ষে মনের প্রীতির সম্পর্কযোগে রোগের যাতনা অনেকখানি লঘু হয়—আরোগ্য-লাভে অনেকখানি সহায়তা মেলে! মা-বাপ ত্যাগ স্বীকার করেন বলেই ছেলেমেয়েরা যেমন মানুষ হতে পারে,—তেমনি ছেলেমেয়ে ডাগর হয়ে শুধু যদি নিজেদের সুখ স্বার্থ আর আমোদ আহ্লাদ নিয়ে মত্ত থাকে, মা-বাপের মুখের পানে, তাঁদের সুখ-দুঃখের পানে না চায়, তাহলে সংসার আর সংসার থাকে না! ছোটখাট প্রত্যেক কাজে যেমন ছেলেমেয়ে বাইরে থেকে এসে যেখানে সেখানে জামা-কাপড় ছেড়ে ফেলছে, যখন ইচ্ছা বাড়ী ফিরছে, যখন খুশী বেরিয়ে যাচ্ছে, মা যদি তাদের সেই ছাড়া জামা-কাপড়গুলি যথাস্থানে গুছিয়ে তুলে না রাখেন, ছেলেমেয়ে কখন বাড়ী ফিরবে তাদের জন্য খাবার-দাবার ঠিক করে রাখা, তাদের বিছানা পেতে রাখা, নিজের আরাম ত্যাগ করে এ সব কাজ না করে রাখেন, তাহলে ছেলেমেয়ের সাধ্য থাকতো কি অমন খেয়ালভরে যা-খুশী করে বেড়াবার!

মা-বাপ যে এ কাজগুলো করেন, তা শুধু ছেলেমেয়ের উপর ভালোবাসা আছে বলেই না! যে মা খামখেয়ালী, নিজের আরাম-বিলাস-আমোদ-নিয়ে মত্ত, সে-মা ছেলেমেয়েব উপর দরদ করে ওগুলোর দিকে মন দেন না। তার ফলে দেখি, এ-সব মা ছেলেমেয়ের কাছ থেকে দরদ-মায়া স্নেহ-মমতা পান না! এ জীবন মোটে লোভনীয় নয়। আমার জন্য বাড়ীতে কেউ ভাবছে, আমার আরাম-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করছে, এ সম্বন্ধে গ্যারান্টি না থাকলে জীবনে কোনো আনন্দকেই আনন্দ-হিসাবে উপভোগ করা যায় না! আমার যা-খুশী তাই করবো, তাতে আর কার কোথায় বাধলো বা কারো মুখ চাইবো না—এ মনোভাবে খেয়ালীর খেয়াল খানিকটা নিবৃত্ত হতে পারে, কিন্তু তেমন স্বার্থপরের পক্ষে নির্বান্ধব হয়ে বাস করা ছাড়া অন্য উপায় থাকে না।

ভালোবাসা যেখানে খাঁটি, সেখানে শাসন-বাঁধনের চাপ এতটুকু থাকে না! থাকতে পারে না! ছেলেমেয়ে যা চায়, তাদের সে প্রার্থনা নেহাৎ অসঙ্গত বা অন্যায় না হলে মা-বাপ যে সে-প্রার্থনা-পূরণে অসাধ্য-সাধন করেন, এ অসাধ্য-সাধন করেন ঐ ভালোবাসার জন্য! স্ত্রী যে স্বামীর বিপদে নিজের গায়ের গহনা-পত্র খুলে দেন, সে ঐ ভালোবাসার জন্য। স্বামী যে উদয়াস্ত-কাল খেটে পয়সা উপার্জ্জন করছেন, এ উপার্জ্জনের মূলে স্ত্রীকে ভালোবেসে তিনি চান সকল অভিযোগেব আঘাত থেকে স্ত্রীকে রক্ষা করে তাঁর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করতে। কাজেই এ-সব ক্ষেত্রে দেখি ত্যাগ-স্বীকার। যারা খেয়ালী, স্বাধীনতার বশবর্ত্তী হয়ে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করতে চায়, সকলের দরদ-মায়ায় বঞ্চিত হয়ে তারা কোনো দিন সুখী হতে পারে না!

খেয়াল-ভরে যা-খুশী তাই করার মধ্যে স্বাধীনতা নেই। যে লোক প্রবৃত্তির দাস, তার আবার স্বাধীনতা কোথায়? স্বামি-পুত্রের দাস্য ত্যাগ করে তারা ধরে খেয়ালের দাস্য! আসল যে স্বাধীনতা, সে স্বাধীনতা পেতে হলে গৃহ-সংসারে প্রত্যেকের সঙ্গে মন মিলিয়ে সকলের সুখে নিজের সুখকে গড়ে তুলতে পারলে তবেই শাসন-বাঁধন-হারা মুক্তি মিলবে! এক জন পাশ্চাত্য দার্শনিক বলে গেছেন, A life of self-renouncing love is a life of liberty. এ কথা খুব সত্য। মডার্ণের নামে অনেকে যে অবাধ-স্বাধীনতা চাইছেন, তার মানে, যা-খুশী তাই করবো, কারো মুখ চাইবো না, তা নয়! সে স্বাধীনতায় নিজেকে হারিয়ে নিঃসঙ্গ সর্ব্বহারা হতে হবে, সে কথা ভেবে দেখছেন?

মিলন-সন্ধ্যা

স্বপন-ছায়া আলোর বুকে বুকে
শেষ-বিদায়ের সজল আঁখি-কোণে
দু' ফোটা জল নির্ঝরিণী সম
মরুর বুকে জাগায় ক্ষণে ক্ষণে।
চাঁপার কলি নিবিড় বাহু-ডোরে,
রাখতে তুমি চাইলে মোরে ধ'রে;
আকুল দিঠি চাইলো বারে-বারে
ফুল ফুটালো চুমুর মধু-মাখা।
স্বচ্ছ-শীতল দীঘির কালো জলে
ঢেউয়ের বুকে কমল যেন আঁকা!

বুকের মাণিক হেলায় অনাদরে
দিলাম ঠেলে—এমনি অভিমানী!
পরাণ আমার তাইতো বারে-বারে
বুকের মাঝে চাইছে তোমায় রাণী।
ঝরণা-ধারার ঝর-ঝরানি গানে,
দখিণ হাওয়া কইছে কানে-কানে,
পুলক-মাখা জ্যোৎস্নাধারা সম
হিয়ার মাঝে আসবে তুমি নামি!
স্মৃতির দীপে প্রীতির আলো জ্বালি
দুয়ার খুলে তাই র'য়েছি আমি।

শ্রীনকুলেশ্বর পাল (বি-এল)
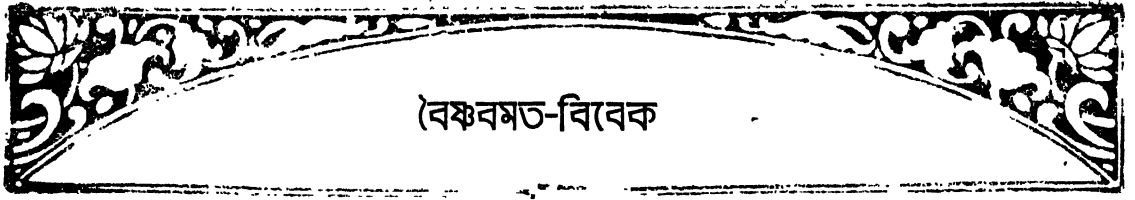
বৈষ্ণবমত-বিবেক

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৩। শ্রীশ্রীমাধবমহোৎসবম্

দার্শনিকশ্রেষ্ঠ শ্রীজীবের বৈয়াকরণিক প্রতিভার পরিচয় যেমন শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে, তেমনই তাঁহার কাব্যকলানৈপুণ্য ও কবিত্বের সর্ব্বপ্রধান নিদর্শন "শ্রীমাধবমহোৎসবম্" নামক কাব্যগ্রন্থে। এই গ্রন্থের শেষে শ্রীজীবের উক্তি—

ইতি রচিতমখণ্ডং কাব্যখণ্ডং রসজ্ঞৈঃ
কথমপি তন্নুরংশঃ স্বদ্যতে যদ্যমুষ্য।
ফলতি মম তদানীমেষ কার্ৎস্ন্যেন যত্নঃ
সকৃদনবিপুলোকালোকিতানামিবাসঃ॥

অর্থাৎ—এই সম্পূর্ণ কাব্যখণ্ড রচিত হইল, রসজ্ঞগণ যদি কোনও রূপে ইহার কিঞ্চিন্মাত্র অংশও আস্বাদন করেন, তাহা হইলে যাবন্মাত্র হরিভক্তের দর্শনকারিগণের যেমন আয়ু সফল হয়, তেমনই আমার এই সমগ্র প্রযত্নও সফল হইবে।

গ্রন্থশেষে মহাকবি শ্রীজীবের এই বিনয়গর্ভ উক্তি পাঠ করিলে পাঠকালে তাঁহার বৈষ্ণবোচিত বিনয় ও দৈন্যের বিশিষ্ট পরিচয়ই পাইবেন। বস্তুতঃ, এই প্রকার বিনয় তাঁহার ন্যায় প্রকৃত বৈষ্ণবের পক্ষেই স্বাভাবিক। কেবল তাহাই নহে, স্বভাবসিদ্ধ দীনতা বশতঃ প্রতিভাবান্ গ্রন্থকার এই শ্লোকে গ্রন্থখানিকে "কাব্যখণ্ড" নামে অভিহিত করিয়াছেন, কিন্তু সাহিত্যদর্পণে মহাকাব্যের যে সকল লক্ষণ প্রকাশিত, তদনুসারে বিচার করিলে শ্রীজীব-রচিত "মাধবমহোৎসব"কে মহাকাব্য নামে অভিহিত করিবার পক্ষে কোন বাধা আছে বলিয়া মনে হয় না। এই গ্রন্থ নয়টি উল্লাসে (সর্গে) বিভক্ত, এবং ইহাতে সর্ব্বসমেত ১১৬৮টি শ্লোক আছে। এই শ্লোকগুলিতে নানারূপ ছন্দোবৈচিত্র্য ও অলঙ্কারবৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথম উল্লাসটিতে প্রধানতঃ ইন্দ্রবংশা বৃত্তি, দ্বিতীয় উল্লাসে ইন্দ্রবজ্রা, তৃতীয়ে বসন্ততিলক, চতুর্থে প্রহর্ষিণী, পঞ্চমে ইন্দ্রবংশা বৃত্তি, ষষ্ঠে দ্রুতবিলম্বিত, সপ্তমে মালিনী, এবং অষ্টমে প্রধানতঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। নবম উল্লাসে—প্রমাণিকা, মৃগেন্দ্রমুখ, স্বাগতা, রথোদ্ধতা, সুন্দরী, দ্রুতবিলম্বিত, প্রভাবতী, উদ্গতা, পুষ্পিতাগ্রা, প্রিয়ংবদা, কলহংস, শুদ্ধবিরাট, ললিতা, অতিজগতী, উপচ্ছন্দসক, আর্য্যা, পজ্ঝটিকা, চারুহাসিনী, গাথা, অনুষ্টুপ্, রথোদ্ধতা বংশস্থবিল, বসন্ততিলক, প্রহর্ষিণী, মালিনী, শালিনী, বাতোর্ম্মি, রুচিরা, সরসী, ইন্দ্রবংশা, মত্তময়ূর, মালতী, পঞ্চচামর, বৈশ্বদেবী, শিখরিণী, মন্দাকিনী, অপরবক্ত্র, আর্য্যাগীতি, চন্দ্রলেখা, ললিত, নারাচ, তূণক, দোলা, নান্দীমুখী, ভুজঙ্গপ্রয়াত, শার্দ্দূলবিক্রীড়িত, মত্তমাতঙ্গলীলাকর, শালিনী, নন্দন, নর্দটক, ফুল্লদাম, স্রগ্বিণী, ইন্দ্রবংশা, ভারাক্রান্তা, বৃত্তি, চিত্র, চণ্ডী, মন্দাক্রান্তা, চিত্রলেখা, মেঘবিস্ফূর্জ্জিতা, কৃতি, শোভা,—এই বহুবিধ ছন্দে বিরচিত শ্লোকমালা স্থান পাইয়াছে; কিন্তু কবির গৌরবের বিষয় এই যে, এই জন্য উল্লাসটির বর্ণনীয় বিষয়ের বৈশিষ্ট্য বা তাহার সাবলীল স্বাভাবিক রসমাধুর্য্য বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। সুদক্ষ যাদুকরের ঐন্দ্রজালিক দণ্ডস্পর্শে যেন সমগ্র বিষয়বস্তু যথাযোগ্যরূপে সুবিন্যস্ত হইয়া শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য ও অপরূপ ভাবগাম্ভীর্য্যের সমাবেশে গ্রন্থখানিকে অতি উচ্চশ্রেণীর মহাকাব্যে পরিণত করিয়াছে। এই গ্রন্থ ১৪৭৭ শকে (সপ্ত সপ্ত মনৌ শাকে) বিরচিত। সেই সময় শ্রীজীবের বয়স প্রায় ৪৫ বৎসর। যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের মিলন-সময়ে যখন কবির যৌবনসুলভ বিশাল সৃজনীশক্তি অক্ষুণ্ণ, অথচ প্রৌঢ়ত্বের ধীরতা ও অচঞ্চল বুদ্ধিবৃত্তি পরিপূর্ণ মাত্রায় পরিস্ফুট, সেই সময় শ্রীজীবের ন্যায় সুপণ্ডিত, এবং প্রতিভাবান্ ও কল্পনাকুশল কবি এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন। আমাদের ন্যায় সাধারণ পাঠকের মনে হয়—এই বহুগুণান্বিত রসমাধুর্য্যমণ্ডিত গ্রন্থখানিই শ্রীজীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য। এই কাব্যের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা করিলে ইহাই উপলব্ধি হয় যে, শ্রীরাধাকৃষ্ণের উজ্জ্বলরসাত্মক লীলার প্রতি যথাযোগ্য মর্য্যাদার অভিব্যক্তিই এই গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য। এই গ্রন্থে বৃন্দাবনের বনরাজ্যে শ্রীরাধিকার অভিষেকের সুন্দর ও সরস বর্ণনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে; মধুমাসে পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীরাধিকার অভিষেক হইয়াছিল বলিয়াই হউক, অথবা উহা স্বয়ং মাধব কর্তৃক অনুষ্ঠিত বলিয়াই হউক, গ্রন্থখানির নাম "শ্রীমাধবমহোৎসব।" এই নাম যে কারণেই প্রদান করা হউক, ইহা যে সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত হইয়াছে—এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

উপরে বলা হইয়াছে, গ্রন্থখানি নয়টি উল্লাসে বিভক্ত; মহোৎসব সংক্রান্ত গ্রন্থ বলিয়া ইহার সর্গগুলি উল্লাস নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহার প্রথম উল্লাসের নাম উৎসুক-বাধিক। এই উল্লাসের প্রথমেই শ্রীরাধিকার অলৌকিক মাধুর্য্য ও রস-নৈপুণ্যের পরিচয়ের সহিত সখীগণের সহযোগে শ্রীরাধিকার পুষ্পচয়ন ও মাল্যগ্রন্থনাদি লীলা বর্ণিত হইয়াছে। সখীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলন ঘটাইতে পারিলেই আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হন। ফলতঃ, পরমানন্দময়ী শক্তি শ্রীভগবানে সংযুক্ত হইলেই অনন্ত কোটি বিশ্ব আনন্দরসে পূর্ণ হয়, আর শ্রীভগবৎপরায়ণ জনগণের চিত্তও আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠে। এই জন্য সখীগণের ইচ্ছাতরঙ্গের অভিঘাতে শ্রীরাধিকার হৃদয়েও এই মিলন-বাঞ্ছা উদিত হইল। অতঃপর তপস্বিনী নান্দীমুখী আসিয়া শ্রীরাধার নিকট শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ ও তিনিও যে শ্রীরাধার সহিত মিলনের জন্য অতীব উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন, ইহা জ্ঞাপন করিলেন। ঐ সময়ে শ্রীললিতাসখী স্বপ্নে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধার অভিষেক দর্শন করিয়াছিলেন; এ জন্য প্রকাশ্যেও শ্রীরাধাকে ঐরূপে অভিষিক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন।

দ্বিতীয় উল্লাসের প্রারম্ভেই শ্রীবৃন্দাবনের অলৌকিক মহিমা ও অপূর্ব্ব শোভা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীবৃন্দাবনের প্রত্যেক শোভাই যে শ্রীকৃষ্ণস্মৃতির উদ্দীপক ও তাঁহার সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষার বর্দ্ধক, ইহা অতি সুকৌশলে প্রদর্শিত হইয়াছে। এতাদৃশ বৃন্দাবনের কুসুমোদ্যানের ও বৃক্ষবাটিকার দুর্দ্দশা দেখিয়া শ্রীরাধিকার চিত্তে নিরতিশয় ক্রোধোদ্রেক

হইল। এই জন্য এই দ্বিতীয় উল্লাসের নাম উন্মুগ্ধরাধিক। ইহার উপর শ্রীরাধিকা যখন শুনিতে পাইলেন যে, চন্দ্রাবলী ও তাঁহার সখীগণই এতাদৃশ বৃন্দাবনের আধিপত্য লাভ করিতে চাহেন, তখন শ্রীকৃষ্ণই যে পরোক্ষ ভাবে ইহার কারণ, এই ধারণার বশবর্ত্তিনী হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দুর্জ্জয় মানে তাঁহার চিত্ত অভিভূত হইল।

তৃতীয় উল্লাসের নাম—উৎফুল্লরাধিক। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবন-রাজ্যের অভিষেক-ব্যাপারে যে উক্তি করিয়াছিলেন, তাহা দ্ব্যর্থ। এই জন্যই চন্দ্রাবলীর পক্ষাবলম্বিনী সখীগণ উহা দ্বারা শ্রীচন্দ্রাবলীরই শ্রীবৃন্দাবনরাজ্যে অভিষেক হইবে, ইহাই স্থির করিয়াছিলেন এবং তদনুসারে প্রচার করিতেছিলেন। শ্রীরাধিকা উহা শ্রবণে মান করিয়া বসিলেন। অতঃপর বৃন্দার চেষ্টায় বিশাখা ও পৌর্ণমাসীর সহায়তায় শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক শ্রীবৃন্দাবন-রাজ্যে শ্রীরাধিকার অভিষেকের কথা, এবং তদ্বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের নিগূঢ় অভিপ্রায় প্রকাশ পাইলে শ্রীরাধিকার মান প্রশমিত হইল; তিনি উৎফুল্ল হইলেন। এই জন্যই এই উল্লাসের নাম উৎফুল্ল-রাধিক।

চতুর্থ উল্লাসে শ্রীকৃষ্ণের আদেশে বৃন্দাদেবী শ্রীরাধিকার অভিষেকের আয়োজন করিতে লাগিলেন। কুন্দবৃন্দাগণ তদ্বিষয়ক আদেশ প্রদান করিলে, শ্রীচন্দ্রাবলীর ও তৎপক্ষীয় সখীগণের দুঃখ প্রকাশ পাইল। অনন্তর, অভিষেকের অধিবাসকৃত্য আরম্ভ হইল। এই উল্লাসের নাম উদ্যোতরাধিক।

পঞ্চম উল্লাসের নাম উদ্দীপ্তরাধিক। এই উল্লাসে শ্রীরাধিকার অভিষেকের আয়োজন পরিপূর্ণ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। স্বর্গের দেবীগণ আসিয়া শ্রীরাধার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহারা গোপীবেশ ধারণ করিয়া শ্রীরাধার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন।

ষষ্ঠ উল্লাসের নাম উন্নতরাধিক। এই উল্লাসের প্রথমেই নিকুঞ্জদ্বারে শ্রীরাধা অভ্যর্থিতা হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অতঃপর এই উল্লাসে শ্রীবৃন্দাবনের কুঞ্জগৃহের বর্ণনাসহ অভিষেকের আসন-সংস্থানাদিও বর্ণিত হইয়াছে। পৌর্ণমাসীর আদেশে দেবীগণও অভিষেকোৎসবে যোগদান করিলেন। অনন্তর অভিষেকের জলানয়নাদি-পর্ব্ব বর্ণিত হইয়াছে। ঐ সময়ে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া নির্জ্জন বনপ্রদেশ হইতে শ্রীরাধিকাকে দর্শন করিয়া যে ভাবে অভিভূত হইলেন, তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর পৌর্ণমাসীদেবী সুকৌশলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলন সংঘটন করিলেন।

সপ্তম উল্লাসের নাম উৎসিক্ত-রাধিক। ইহাতে অভিষেক উপলক্ষে গন্ধর্ব্বকন্যাগণের নৃত্যগীত-বাদ্যাদি ও শ্রীউমাদেবী কর্ত্তৃক অভিষেকের পূজাদি এবং সখীগণ কর্ত্তৃক অষ্টমৃত্তিকাদি দ্বারা স্নান এবং নয় বার অভিষেকের বর্ণনা আছে।

অষ্টম উল্লাসের নাম উজ্জ্বলরাধিক। অভিষেকের পর শ্রীরাধার বেশধারণাদির বিষয় এই উল্লাসে প্রধানতঃ বর্ণিত হইয়াছে। দেবীগণ ও সখীগণ শ্রীরাধিকার বেশ-রচনা সম্পাদিত করিবার পর দেবীগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত মাল্যাদি উপহার আসিল। অতঃপর বন্দিগণ কর্ত্তৃক স্তুতিপাঠ ও তাহাদিগকে পারিতোষিক-দানাদির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

নবম উল্লাসের নাম উন্নদরাধিক। এই উল্লাসে শ্রীকৃষ্ণ-সাক্ষাতে শ্রীরাধিকা শ্রীবৃন্দাবনের রাজসিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক রাজচিহ্নাদি ধারণ করিলেন। বৃন্দাবনরাজ্যে সখীগণেরও কাহার কি অধিকার, তাহাও স্থির হইয়া গেল। অতঃপর শ্রীরাধাকৃত গুরুপূজাদি শেষ হইলে শ্রীরাধার সহিত সম্মিলিত হইবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ উৎকণ্ঠা পরিলক্ষিত হইল। পৌর্ণমাসী দেবীও তখন কৌশলে শ্রীকৃষ্ণকে আনয়ন করিয়া তাঁহার সহিত মিলন সংঘটিত করিলেন, এবং সখীগণ উভয়ের সেবায় নিয়োজিত হইয়া কৃতার্থ হইলেন।

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসেও শ্রীরাধাগোবিন্দের যুগল উপাসনা-ব্যবস্থা প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের এই যুগল-উপাসনার পদ্ধতিই প্রকারান্তরে এই মহাকাব্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অবশ্য, এই গ্রন্থ বিরচিত হইবার পরেই ভক্তগণের অষ্টকালীন স্মরণ-মনন-পদ্ধতিরূপে শ্রীগোবিন্দলীলামৃত শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছিল। কাব্য হিসাবে এই গ্রন্থ যে অতিশ্রেষ্ঠ, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীরাধাগোবিন্দ যুগলের লীলাকাব্য হিসাবেও এই গ্রন্থখানি ভক্তগণের স্মরণ-মননের সহায়ক।

অতঃপর কাব্যগ্রন্থ হিসাবে শ্রীজীব গোস্বামীর শ্রীগোপাল-বিরুদাবলীর আলোচনা করা সঙ্গত।

শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীগোবিন্দ-বিরুদাবলী গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে বিরুদ কাব্যের মধ্যে এই গ্রন্থই সর্ব্বপ্রথমে রচিত হয়। অতঃপর শ্রীরূপ গোস্বামী বিরুদ কাব্যের লক্ষণ নির্দেশ করিবার জন্য "সামান্যবিরুদাবলীলক্ষণ" নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীজীব গোস্বামী এই বিরুদাবলী-লক্ষণের অনুসরণ করিয়াই শ্রীগোপাল বিরুদাবলী গ্রন্থ রচনা করেন।

বিরুদকাব্য সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে এক সাহিত্যদর্পণেই উল্লেখ পাওয়া যায়; বোধ হয়, তাহা যথেষ্ট মনে না হওয়ায় শ্রীরূপ গোস্বামী এই 'সামান্যবিরুদাবলীলক্ষণ' নামক গ্রন্থ রচনা করেন, এবং তাহার উদাহরণস্বরূপ শ্রীগোবিন্দ-বিরুদাবলী রচনা করেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য শ্রীজীব অতঃপর শ্রীগোপাল বিরুদাবলী গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থখানির এত দিন কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে যিনি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী নামে পরিচিত ছিলেন, তিনিই বৈষ্ণব-বেশে শ্রীহরিদাস দাস-বাবাজী নাম ধারণ করিয়া, এই গ্রন্থখানির সন্ধান পাওয়ায় তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। সম্পূর্ণ গ্রন্থখানিই পাওয়া গিয়াছে, কি খণ্ডিত অবস্থায় উহার সন্ধান মিলিয়াছে,—তাহা এখনও নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। কারণ, শ্রীরূপ গোস্বামী বিরুদাবলীর যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তদনুসারে চণ্ডবৃত্তের লক্ষণেই এই গ্রন্থখানি শেষ হইয়াছে। পরন্তু শ্রীজীব গোস্বামী এই গ্রন্থে বিরুদলক্ষণে বর্ণিত দ্বিপাদগণবৃত্ত বা ত্রিভঙ্গীকলিকাদির অনুসারে কোনও শ্লোক রচনা না করিয়া গ্রন্থখানি শেষ করিয়াছেন। সুকবি শ্রীজীবের রচনায় কোথাও কুণ্ঠিত ভাব লক্ষিত হয় না—অথচ তিনি যে এই গ্রন্থখানি শেষ করিলেন না, ইহাতে স্বভাবতঃই সন্দেহের উদয় হয়। যাহা হউক, যদি কখনও এই গ্রন্থের অবশিষ্টাংশ পাওয়া যায়, তবে শ্রীগোপালবিরুদাবলীর সম্পূর্ণ স্বরূপ প্রকাশিত হইবে। অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় এই গ্রন্থখানিতেও শ্রীজীবের রচনানৈপুণ্য ও কবিত্ব-মাধুর্য্য সুপ্রকাশিত। যাঁহারা সংস্কৃত কাব্যে বিশেষ পারদর্শী

তাঁহারাই বিরুদকাব্যের লক্ষণাবলীর বৈশিষ্ট্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ; কারণ, ইহাতে কবিতার রচনা সম্বন্ধে অত্যন্ত বাঁধাবাঁধি নিয়মের অনুসরণ করিয়া চলিতে হয়। এই জন্য এইরূপ কবিতার সৌন্দর্য্য সাধারণ পাঠকবর্গ উপভোগে সমর্থ নহেন। সুতরাং শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীগোবিন্দ-বিরুদাবলী রচনা করিতে যাইয়া বিরুদকাব্যের লক্ষণাবলীর পরিচয় প্রদানের জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী সুপণ্ডিতদিগের গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া স্বতন্ত্র একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। আমাদের মনে হয়—নাটক রচনা বিষয়ে তিনি সাহিত্যদর্পণকারের মত সর্ব্বাংশে গ্রহণ করিতে না পারিয়া তদপেক্ষা প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রকার ভরত মুনির ও রসসুধাকরের অভিমত গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, এবং তাহা দেখাইবার জন্যই নাটকচন্দ্রিকা নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই ক্ষেত্রেই মহাপ্রতিভাশালী শ্রীরূপ সাহিত্যদর্পণকারের অপেক্ষাও প্রাচীন রীতির পক্ষপাতী হইয়া "সামান্য-বিরুদাবলীলক্ষণং" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই বিরুদাবলীলক্ষণের আলোচনা না করিয়া বিরুদাবলী অধ্যয়ন একরূপ নিষ্ফল; অথচ বিরুদাবলীলক্ষণের আলোচনাও সর্ব্বসাধারণের উপভোগ্য নহে। এই জন্যই বর্ত্তমান প্রবন্ধে উহার বিস্তৃত আলোচনায় বিরত রহিলাম। তবে ইহাতে শ্রীজীবের কাব্য-প্রতিভা কিরূপ বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদানের উদ্দেশ্যে আমরা একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া এই গ্রন্থের আলোচনা শেষ করিতেছি;—

"মুহুর্ম্মুহুরপি স্ফুরদ্বিভবমাত্মবেণুক্বণং
বিলক্ষণতয়া দধৎ পরমশিক্ষয়া স্বীয়য়া।
সচেতনমচেতনং বিচলিতং মিথঃ সন্দধে
ভবানিতি পুরা কথং ভবতি যৌবতং বাচিতং॥"

"তুমি নিজে যেমন বিলক্ষণ, তোমার সেই বৈলক্ষণ্য—তুমি তোমার বেণুতে সঞ্চারিত করিয়া তুমি তাহাকে পরম শিক্ষা দ্বারা বারংবারই বেণুর ধ্বনিতে স্বতঃসিদ্ধ বস্তুধর্ম্মপরিবর্ত্তনকারী প্রভাবের দ্বারা সচেতনকে অচেতনে ও অচেতনকে সচেতনে পরিণত করিয়াছ—ইত্যাদি।

৪। শ্রীসঙ্কল্পকল্পবৃক্ষ

ইহা একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ। ইহাতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলার সংক্ষেপে উদ্দেশ প্রদান করিয়া, তাহাতে সাধক কি প্রকারে সখীভাবে সেবার অভিলাষ করিবেন, তাহার ইঙ্গিত প্রকাশিত হইয়াছে। (পরবর্ত্তী কালে মহামহোপাধ্যায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় "শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম" নামে অনুরূপ একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করেন।) শ্রীজীবের এই গ্রন্থে শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া নায়িকা বা পরকীয়া নায়িকারূপে গ্রহণ করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে কোনও স্পষ্ট নির্দ্দেশ না থাকায় বোধ হয় পরবর্ত্তী কালে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই লীলাচিন্তাকালে শ্রীরাধারাণীকে শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া নায়িকারূপে চিন্তা করিতে হইবে, ইহা স্পষ্ট ভাবে দেখাইবার জন্যই "শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম" গ্রন্থ রচনা করেন। বস্তুতঃ, এই বিষয়ে আপাততঃ মতভেদ পরিলক্ষিত হইলেও মূলতত্ত্বে যে কোনও প্রকার প্রভেদ নাই, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি এক বার মাত্র মুদ্রিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু এখন আর তাহা পাওয়া যায় না।

৫। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন ও করচিহ্ন
৬। শ্রীরাধিকার পদচিহ্ন ও করচিহ্ন

"শ্রীরূপচিন্তামণি" নামক গ্রন্থে শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীরাধাকৃষ্ণের শারীরিক লক্ষণাবলীর ও চিহ্নাদির পরিচয় দিয়াছেন; কিন্তু এই দুইখানি গ্রন্থে পদ্মপুরাণ হইতে সুবিস্তৃত ভাবে শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধিকার করচিহ্ন ও পদচিহ্নাদির বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই দুইখানি গ্রন্থ স্বতন্ত্র ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে কি না, তাহা আমরা অবগত নহি: তবে ইহার হস্তলিখিত পুঁথি বহু স্থানেই পাওয়া যায়।

৭। ষট্‌সন্দর্ভ

প্রথম,—তত্ত্বসন্দর্ভ। ইহাতে প্রমাণ কি, তাহা স্থির করিয়া পরে পরতত্ত্ব-স্বরূপ প্রমেয় শাস্ত্র দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

দ্বিতীয়,—শ্রীভগবৎসন্দর্ভ। এই সন্দর্ভে সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত শ্রীভগবানই যে পরতত্ত্বের সম্যগাবির্ভাব এবং শক্তিবর্গের প্রকাশ না থাকায় ব্রহ্ম শ্রীভগবৎ-স্বরূপেরই যে অসম্যগাবির্ভাব, ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। অতঃপর শক্তিবর্গের স্বরূপ ও ভগবদ্বিগ্রহের অপ্রাকৃতত্ব ও বিভুত্ব ইত্যাদি সপ্রমাণ করা হইয়াছে। অতঃপর শ্রীভগবানকে জানিবার উপায়স্বরূপ বেদাদি শাস্ত্রের স্বরূপ আলোচিত হইয়াছে এবং শুদ্ধাভক্তির দ্বারাই যে শ্রীভগবানকে পাওয়া যায়, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

তৃতীয়,—শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ। ইহাতে অবতার-বিচারের দ্বারা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই যে সর্ব্ব-অবতারের অবতারী, তাহা খ্যাপন করিয়া তাঁহার ধামের মধ্যে শ্রীবৃন্দাবনই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ও শক্তিবর্গের মধ্যে ব্রজগোপীগণ ও তন্মধ্যে শ্রীরাধিকাই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে।

চতুর্থ,—শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভ। ইহাতে জীবের স্বরূপ, অহংপ্রত্যয়ের স্বরূপ, জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ, ব্রহ্মের স্বরূপ, ভগবৎস্বরূপ ও পরমাত্মস্বরূপের বৈশিষ্ট্য, জগৎসৃষ্টি ব্যাপারে ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব ও উপাদানত্ব-পরিণামবাদ ও তাহার দ্বারাই যে শ্রুতিসারস্য রক্ষিত হইতে পারে, ইহা দেখাইয়া অচিন্ত্যভেদাভেদবাদখ্যাপন, চতুর্ব্যূহতত্ত্ব ও পাঞ্চরাত্রমতের শাস্ত্রসঙ্গতি প্রদর্শিত হইয়াছে।

পঞ্চম,—ভক্তিসন্দর্ভে ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ ভক্তিযোগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও ভক্তির স্বরূপাদি আলোচনার পর শ্রবণাদি নববিধা ভক্তি ও ভক্তিসাধনার সোপান সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ভক্তিই যে শাস্ত্রের অভিধেয়, এবং প্রেমই যে প্রয়োজন—তাহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

ষষ্ঠ,—শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভ। ইহাতে মুক্তির স্বরূপ ও প্রকার-ভেদের আলোচনা দ্বারা প্রেমই যে পুরুষার্থ-শিরোমণি, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। অনন্তর ভগবৎপ্রীতির স্বরূপ ও তাহার দ্বারা যে সর্ব্ববিধ মুক্তি তিরস্কৃত হয়, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতঃপর ভক্তভেদে প্রীতির তারতম্য ও ক্রমোৎকর্ষ দেখাইয়া শ্রীব্রজগোপীগণে যে প্রীতির চরমোৎকর্ষ, তাহা খ্যাপিত হইয়াছে। ইহার পর শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের স্বরূপ বর্ণনার দ্বারা উজ্জ্বলরসে গ্রন্থসমাপ্তি হইয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই ষষ্ঠ-সন্দর্ভ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি বলিয়া এ স্থলে ইহা অতি সংক্ষেপে আলোচিত হইল। শুনা যায় যে, পণ্ডিত বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই ছয়খানি সন্দর্ভেরই টীকা রচনা

করিয়াছিলেন ; কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার তত্ত্বসন্দর্ভ ব্যতীত অন্য কোনও সন্দর্ভের টীকা পাওয়া যাইতেছে না। সুবিখ্যাত স্মার্ত্ত রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃকও সমগ্র সন্দর্ভ গ্রন্থের টীকা রচিত হইয়াছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহার তত্ত্ব-সন্দর্ভের টীকামাত্রই প্রকাশিত হইয়াছে। ষট্‌সন্দর্ভ, ক্রমসন্দর্ভ ও চারিটি সন্দর্ভের অনুব্যাখ্যার দ্বারাই শ্রীজীব গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের স্বরূপ যে ভাবে বিবৃত করিয়াছেন, তাহাতে এই গ্রন্থাবলী অবলম্বন করিয়াই শ্রীজীবসম্মত ব্রহ্মসূত্রের একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাষ্য বিরচিত হইতে পারে।

৮। সর্ব্বসম্বাদিনী

এই গ্রন্থে শ্রীজীব তত্ত্বসন্দর্ভ, শ্রীভগবৎসন্দর্ভ, শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভ ও শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ— ষট্‌সন্দর্ভের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে—প্রমাণবিচার, শব্দশক্তি-বিচার, শক্তিবাদ, চতুর্ব্ব্যূহবাদ, পরিণামবাদ, অদ্বৈতবাদ, ভেদাভেদবাদ, দ্বৈতবাদ ও অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ ইত্যাদি যাবতীয় বিতর্ক্য বিষয়গুলির শাস্ত্রমূলে মীমাংসা করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই এ সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছি বলিয়া এ স্থানে তাহার উল্লেখ মাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। বস্তুতঃ, সর্ব্বসম্বাদিনীতে শ্রীজীবের সময় পর্য্যন্ত যত দার্শনিক মতবাদ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার অতি সুন্দর ভাবে খণ্ডনমণ্ডনের ব্যবস্থা হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, এই একখানি পুস্তকেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন সম্বন্ধে যাবতীয় স্থূল জ্ঞাতব্য বিষয়ের সন্নিবেশ করা হইয়াছে, এবং ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

৯। ক্রম-সন্দর্ভ

শ্রীজীব সমগ্র ভাগবতের যে দার্শনিক তথ্যপূর্ণ নিখুঁত টীকা রচনা করিয়াছিলেন—তাহাকে তিনি ষট্‌সন্দর্ভের পরিশিষ্ট সপ্তম সন্দর্ভ বা ক্রমসন্দর্ভ নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই টীকার প্রথম শ্লোকেই শ্রীজীব ব্রহ্মসূত্রের চতুঃসূত্রীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ফলতঃ, এক দিকে লীলারহস্যের ব্যাখ্যায় ও অন্য দিকে দার্শনিক তত্ত্বের প্রতিষ্ঠায় এই টীকাখানি অতুলনীয়। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে সমস্ত বেদের সারভাগের যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, শ্রীভগবান্ বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়া তাহাতেই তাহা জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি কলির জীবের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণরূপে তাহারই ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। সুতরাং সমগ্র বেদার্থ এই শ্রীভাগবত মহাপুরাণেই ব্যক্ত হইয়াছে। সেই মহাপুরাণের টীকা করিয়া শ্রীজীব সমগ্র ব্রহ্মসূত্রেরই ভাষ্য রচনা করিয়াছেন—এই জন্যই তিনি আর পৃথক্‌রূপে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নাই। সুতরাং এই ক্রমসন্দর্ভকেই একরূপ শ্রীজীবকৃত বেদান্ত-ভাষ্যরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। যদি কেহ স্বতন্ত্র ভাবে শ্রীজীবকৃত বেদান্তভাষ্য সংগ্রহ করিতে চাহেন, তবে তিনি এই ক্রমসন্দর্ভ হইতেই তাহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপাদান সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেন।

১০। লঘুতোষণী

শ্রীভাগবতের দশম স্কন্ধেই শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত আছে। শ্রীল সনাতন গোস্বামী এই দশম স্কন্ধের যে সুবিস্তৃত টীকা রচনা করেন, তাহাতে শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের উপাস্যতত্ত্বের যাবতীয় লীলারহস্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ১৪৭৬ শকাব্দে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর এই টীকা শেষ হয়। অতঃপর শ্রীল সনাতন গোস্বামীর আদেশে শ্রীজীব গোস্বামী এই টীকা সংক্ষেপ করিয়া যে টীকা রচনা করেন, তাহাই অতঃপর "লঘুতোষণী" নামে প্রচারিত হয়, এবং শ্রীল সনাতন গোস্বামীর টীকা "বৃহত্তোষণী" নামে আখ্যাত হয়। কিন্তু লঘুতোষণী নামে "লঘু" হইলেও, ইহা কোনও কোনও স্থানে "বৃহত্তোষণী" অপেক্ষাও সুবিস্তৃত। শ্রীজীব যেখানে জ্যেষ্ঠতাতের লিখিত কোনও কথার ব্যাখ্যা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, সে স্থানে বৃহত্তোষণী অপেক্ষাও ইহা আকারে বৃহত্তর হইয়াছে ; কিন্তু মূলগ্রন্থে শ্রীপাদ সনাতন যে যে ভাব বিস্তারিত করিয়াছেন, তাহার মর্য্যাদা যথোচিত সাবধানে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই এই "লঘুতোষণী" বিরচিত হইয়াছে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম-এ, বি-এল)

যুগের দাবী

গোলাপের শয়ন তেয়াগি
কর্ম্মের আহ্বানে আজি দিকে দিকে উঠিয়াছে জাগি
লক্ষ লক্ষ বক্ষ আর বাহু।
দুর্ভাগ্যের রাহু
পূর্ণগ্রাসে সমুদ্যত বিরামের চন্দ্রমারে যবে,
তখন কি কবিনামা সবে
বাহির পৃথিবী হ'তে চিত্তলোকে করিবে প্রয়াণ ?
মাটির-পরশ ত্যাজি' 'আকাশ-বিহগ'বৎ ইথরের রাজ্যে লবে স্থান ?
জেগেছে পেশল বাহু—দৃঢ় বাহু কর্ম্মের সন্ধানে,—
তারি মাঝখানে
নবনীত-করলগ্ন সুগোল অঙ্গুলিপ্রান্তে ধরি'
নাই বা জাগালে আর লেখনীতে কবিতা-লহরী।

আজি শোনো কাণ পেতে জাগিতেছে কত শত বাণী।
তব দেহপ্রাণ ঘিরে। হেথা হোথা কত ক্ষীণ প্রাণী
বাণীর পসরা লয়ে আসিতেছে নিতি তব দ্বারে।
তারা অন্ধকারে
পুরাতন সমস্যারে নূতন জটিল করি' তোলে,—
জীবনের প্রয়োজন দিকে দিকে হাসে অট্টরোলে।
"লেখনী থামাও কবি তব"—
কারা যেন ডেকে বলে,—প্রার্থনা তাদের অভিনব।
"বাণী নয়, কর্ম্ম চাই—চাই শক্তি—চাই পরিচয়
বক্ষে ও বাহুতে আজ। বাণীর সঞ্চয়
আর না বাড়ায়ে কবি, কিনে লও কর্ম্মের উদ্যম।"
কবিতার বিনিময়ে অভাব মিটাতে— শ্রান্ত বিশ্ব চাহে দেহশ্রম।

শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্ত।

(উপন্যাস)

৯

মাসখানেক পরের কথা। কৌমুদীর জন্মতিথি।

গৌরী ঠাকুরাণী আসিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন, সুভাষিণীর যাওয়া চাই। কৌমুদী আসিয়া বলিল—কখনো তো আমাদের বাড়ী গেলেন না, আজ কিন্তু সন্ধ্যার সময় না গেলে চলবে না, পিসিমা!

সুভাষিণী বলিল—যাবো বৈ কি মা, নিশ্চয় যাবো।

সন্ধ্যার সময় নিমন্ত্রণ। উৎসবে সমারোহ ছিল। সুপ্রসন্ন ধনী। জানকী বাবুর সঙ্গে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক নয়। এখানকার বড় চাকুরিয়া-ঘরের ঘরণীরা সকলেই আসিয়াছেন, তাঁদের মেয়েরাও বাদ যায় নাই। মেয়ে-যজ্ঞির ব্যাপার। কামাখ্যা চ্যাটার্জীর স্ত্রী জয়া আসিয়াছে, সঙ্গে জয়ার মেয়ে শুক্লা; বাসন্তী ইণ্ডাষ্ট্রীজ-সিণ্ডিকেটের চীফ মেডিকেল অফিসার বিলাত-ফেরত এল, আর, সি, পি, ডাক্তার সামন্তর স্ত্রী মিসেস্ সামন্ত, সামন্তর দুই মেয়ে ললি আর মলি; ইলেকট্রিক এঞ্জিনীয়ারের স্ত্রী মিসেস্ ভট্টচায্যি; এ্যাকাউনটাণ্ট রামহরি সান্যালের স্ত্রী প্রিয়ম্বদা, প্রিয়ম্বদার মেয়ে দিগঙ্গনা প্রভৃতি; এবং জানকী বাবুর মেয়ে সুরুচিও আসিয়াছে।

সুভাষিণীর সঙ্গে গৌরী ঠাকুরাণী সকলের পরিচয় করাইয়া দিলেন। বলিলেন,—নতুন মাষ্টার মশাই এসেছেন মহেন্দ্র বাবু···তাঁর স্ত্রী সুভা। ভারী ভালো মেয়ে। আমার ছোট বোন। সংসারের কাজ-কর্ম্ম করছে, আর ঘর-দোর কি গুছিয়েই রেখেছে!

বড় অফিসারদের গৃহিণীদের মধ্যে কেহ মাথা নাড়িল; কেহ বলিল, ও; কেহ-বা বলিল—আলাপ হলো কৌমুদীর জন্মতিথির দৌলতে! এ-কথা যে বলিল, তা শুধু গৌরী ঠাকুরাণীর খাতিরে। সুপ্রসন্নর অনেক টাকা। আর সুপ্রসন্ন তার এই দিদিকে একেবারে দেবতার মতো শিরোধার্য্য করিয়া রাখিয়াছে। তা ছাড়া গৌরী ঠাকুরাণী কারো টাকার বা পোজিশনের খাতির করেন না! সত্য কথা বলিতে যেমন তাঁর বাধে না, তেমনি মিথ্যা ও কাপট্যকেও কোনো দিন রেহাই দেন না!

পরিচয়ের পালা চুকিলে সামন্তর দুই মেয়েকে লইয়া পীড়াপীড়ি চলিল—গান শোনাও ললি-মলি···ইংরেজী গান! বাংলা গান শুনে শুনে কাণ পচে গেল! তোমাদের মুখে ইংরেজী গান যা লাগে, আঃ!

সামন্ত এ-গ্রামে সবচেয়ে বড় সাহেব। বাড়ীতে দেশী খানার পাট নাই। দুই মেয়ে ললি-মলি পড়ে কলিকাতার লরেটোয়। থাকে সেখানকার বোর্ডিংয়ে। এবং সেখানকার ফিরিঙ্গি-প্র্যাণ্ড কথা হইতে ফ্যাশনের টুকিটাকিগুলাকে আশ্চর্য্য ভাবে রপ্ত করিয়া এখানে আসিয়া সে-সবের জৌলুশে এখানকার বড় অফিসারদের অন্দরকে সচকিত করিয়া তোলে! বাঙলা গান তারা গায় না, বলে—ও আমাদের বিশ্রী লাগে!

ললি বলিল,—এখানে ইংরেজী-গান কি করে হবে? পিয়ানো ব্যাঞ্জো কি ভায়োলিন না হলে গাইবো কি করে?

রামহরি সান্যালের মেয়ে দিগঙ্গনা এই ললি-মলির একবারে গোলাম! ললি-মলি আজ আসিয়াছে শাড়ীকে স্কার্টের মতো খাটো এবং আঁট-সাঁট করিয়া পরিয়া। দিগঙ্গনা সেই শাড়ীর মোহে একেবারে তন্ময়! সে বলিল—সত্যি, পিয়ানো না থাকলে কি ইংরেজী গান হয়! তার পর সে মাকে ডাকিয়া বলিল,—এমনি করে শাড়ী-পরার নতুন ফ্যাশন উঠেছে মা কলকাতায়, আমিও এবার থেকে এমনি করে শাড়ী পরবো! তাতে তোমার খরচ হবে কম··· কম-বহরের সিল্ক লাগবে!

জয়া বলিল,—সত্যি এমনি ফ্যাশন উঠেছে কলকাতায়, হ্যাঁ ললি?

ললি বলিল,—না, না, দু'-তিনটি বিলেত-ফেরতের ঘরে শুধু। আমাদের সঙ্গে পড়ে রাম্নু গুপ্টু, রেভেনিউ-সেক্রেটারি মেঘনাদ গুপ্টুর মেয়ে···তাদের বাড়ীতে দেখেছি এ ফ্যাশন! আর দেখেছি সিভিলিয়ান-জজ স্যর মার্কণ্ড লাহেরির বাড়ীর মেয়েদের এমনি শাড়ী পরতে!

শাড়ী হইতে গড়াইয়া কথা চলিল জুয়েলারিতে, জুয়েলারি হইতে সিনেমা-ষ্টারদের পপুলারিটিতে। বড়-মানুষি জাহির করিবার জন্য পরস্পরে ক্রমে রেশারেশি বাধিয়া গেল।

মিসেস্ সামন্ত বলিলেন,—সে-দিন কলকাতায় যেতে হয়েছিল আমার ভাইয়ের মেয়ের বিয়ে হলো, সেই বিয়েতে! তা ভালো লাগলো না মোটে! এবারে পূজোর সময় কলকাতায় আর যাবো না। ওঁকে বলেছি, পুজোর ছুটীতে বম্বে যাবো। তার পর ইচ্ছা আছে, উনি যদি লম্বা ছুটী পান তো একবার বিলেত ঘুরে আসবো!

এ সব কথার মধ্যে সুভাষিণী চুপ করিয়া বসিয়া আছে ···তার মনে হইতেছিল, ময়ূরের সভায় সে যেন দাঁড়কাকের মতো প্রবেশ করিয়াছে! কি করিয়া এখান হইতে উঠিবে? মনে হইতেছিল, গৌরী ঠাকুরাণী খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করিতেছেন, তাঁর কাছে গেলে বাঁচিয়া যায়! কিন্তু কি করিয়া যায়!

ভগবান্ যেমন এক দিন দ্রৌপদীর মান রাখিয়াছিলেন, তেমনি আজ তিনি সুভাষিণীর মান রাখিলেন। তিনি পাঠাইয়া দিলেন সুরুচিকে। সুরুচি আসিয়া সুভাষিণীর গা ঘেঁষিয়া বসিল। বলিল,—আপনি নতুন এসেছেন! কত দিন ধরে ভাবছি, আপনার ওখানে যাবো, তা হয়ে উঠছিল না! লজ্জা করে। ভাবি, চেনা-শোনা নেই, আপনি কি মনে করবেন! বাবা বলছিল, নতুন হেড-মাষ্টার-মশাই এসেছেন মহেন্দ্র বাবু···চমৎকার লোক রে! ছেলেদের পড়ান্ ভারী সুন্দর! এক-মাসে স্কুলের প্রোগ্রেস হয়েছে চমৎকার!··· যেমন পণ্ডিত লোক, তেমন অমায়িক!

বড়র দলে দু'-এক জনের ললাট কুঞ্চিত হইল! জানকী বাবুর মেয়ে সুরুচি···সকলকে উপেক্ষা করিয়া সে কি না, একশো টাকা মাহিনার এক স্কুল-মাষ্টারের স্ত্রীর সঙ্গে গায়ে পড়িয়া শত-ব্যাখ্যানায় আলাপ করিতে বসিল!

রামহরি সান্যালের স্ত্রী প্রিয়ম্বদা চাহিলেন সুভাষিণীর পানে, বলিলেন,—ভালো কথা, ওঁকে বলছিলুম ছেলেদের জন্য টিউটর রাখতে হবে! মানে, স্কুলে যিনি হেড-মাষ্টার আসেন, তাঁকেই রাখা হয় ছেলেদের জন্য বাড়ীর মাষ্টার। পুরোনো হেড-মাষ্টার চলে গেছে আজ দু'মাস। ছেলেগুলোর মাষ্টার নেই! ওঁকে এত করে বলছি, নতুন হেড-মাষ্টারকে ঠিক করো—তা ওঁর সময় হয় না যে গিয়ে কথা কইবেন! তা আপনার সঙ্গে যখন দেখা হলো, বলবেন আপনি, হেড-মাষ্টার-মশাইকে ওঁর সঙ্গে কাল সকালে এক বার বাড়ীতে এসে দেখা করবেন। মানে, দু'টি ছেলেকে পড়াতে হবে। একটি পড়ে ক্লাশ সিক্স-এ, আর একটি ক্লাশ এইট-এ। সে মাষ্টারকে দিতুম কুড়ি টাকা করে'···তাই দেবো। রেট কমাতে চাই না! রোজ সন্ধ্যার সময় এসে দু'-ঘণ্টা করে পড়াবে!

সুভাষিণী জবাব দিবার পূর্ব্বে সুরুচি জবাব দিল। বলিল,—চমৎকার ব্যবস্থা খুড়িমা! হেড-মাষ্টার মশাই তো ভিখিরী নন যে, তোমার দোরে এসে হাত পেতে দাঁড়াবেন! মানী লোক···তোমাদের দরকার থাকে, তোমরা যাবে তাঁর কাছে।···সত্যি, আমার এ ভারী বিশ্রী লাগে! সে-দিন এক জনদের বাড়ীতে গিয়েছিলুম, গিয়ে দেখি, ছেলেদের মাষ্টার-মশাইকে এমন চোখে দেখে, যেন বাড়ীর বামুন, না, চাকর! কি করে এমন করে সব, বুঝি না। সে-বাড়ীর কর্ত্তাটি আবার···যাকে বলে, গণ্ডমুখ্যু! লেখাপড়া-জানা ভদ্রলোকদের এমন করে অপমান! আমি হলে মাটী কুপিয়ে পয়সা রোজগার করতুম, তবু অমন বাড়ীতে মাষ্টারী করতুম না!

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সুরুচি চাহিল সুভাষিণীর পানে, বলিল,—না, আপনি বলবেন না। তাঁর মান নেই? ইজ্জৎ নেই?

সুরুচি মনিবের মেয়ে···কাজেই এ কথা সহিয়া থাকা ছাড়া উপায় নাই! প্রিয়ম্বদা এ কথায় চুপ করিয়া গেলেন,—সভার মধ্যে তাঁর মুখ একেবারে এতটুকু!

সে-দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া সুরুচি বলিল—বাবার খুব ভালো লেগেছে হেড-মাষ্টার-মশাইকে! বাবা একখানা বই লিখছে। আমাদের দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের কোথায় কি সম্ভাবনা আছে সেই সম্বন্ধে। ইংরেজীতে লিখছে। বাবা বলে, বাবার কলমে বাঙলা-লেখা বেরোয় না—শক্ত ঠেকে! তাই বাবা বলছিল, এক জন সত্যিকারের পণ্ডিত-লোককে কাছে পেয়েছি রে সুরুচি, ওঁকে দিয়ে আমার লেখা ইংরেজীটুকু শুধরে পালিশ করিয়ে নেবো···আমাদের ইংরেজী-লেখা···কোথায় গ্রামারের কি ইডিয়মের কি ভুল হবে, এই ভয়ে সর্ব্বদা হাত কাঁপে, হাতের কলম কাঁপে!

কথার শেষে সুরুচি হাসিল। সে হাসির আলোয় সুভাষিণীর বুকখানা আলোয় আলো হইয়া উঠিল!

স্বামীর কাছেও সুভাষিণী এ-কথা শুনিয়াছে! এ-কথার সঙ্গে মহেন্দ্র বলিয়াছিল—পয়সাওলা লোক, বাঙালীর মধ্যে মস্ত কৃতী পুরুষ···কিন্তু এতটুকু দেমাক নেই···একেবারে বাঙালীর মেজাজ! সাহেবী ঝাঁজ নেই! স্পষ্ট বললেন, আমরা যে ইংরেজী লিখি, সে দোকানদারের ইংরেজী, ব্যবসাদারের ইংরেজী···বইখানা আমি চাই, বুঝলেন কি না, যাঁরা লেখা-পড়া শিখেছেন, তাঁদেরো পড়াতে···তাই আপনাকে দিয়ে এর ইংরেজীটা ঠিক করে নেবো!···আর সে ঋণ বইয়ের গোড়ার পাতায় আমি স্বীকার করবো! ধনী লোক···আশ্রিত ব্যক্তিকে এতখানি সম্মান-মর্য্যাদা ছ্যান্, বাঙলা ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত দেখা যায় না!

সুরুচির কথায় সুভাষিণী হাসিল, বলিল—উনি তোমার বাবার খুব সুখ্যাতি করেন। বলেন, মানুষ বড় হলে তাঁর মন কত বড় হয়, তোমার বাবাকে দেখলে তা বোঝা যায়।···তা তুমি কি পড়াশুনা করছো?

সুরুচি বলিল—আমার এই ক্লাশ সেভ্ন্ চলছে।

সুভাষিণী বলিল—এখানে মেয়ে-ইস্কুল আছে তাহলে?

সুরুচি বলিল,—আছে। সে-স্কুলে মেয়ে-টীচার কিন্তু খুব কম। মোটে চারটি। তাঁরা পড়ান নীচেকার কটা ক্লাশে, বাকী সব পুরুষ-টীচার।

—স্কুলে মেয়ে কত?

—বেশী নয়।···আপনার ছেলে-মেয়ে কটি?

সুভাষিণী বলিল।

সুরুচি বলিল—মেয়ে নেই! ভেবেছিলুম, একটি মেয়ে থাকলে আপনার ওখানে গিয়ে তার সঙ্গে খুব ভাব করবো।

হাসিয়া সুভাষিণী বলিল—আমার সঙ্গে ভাব করো, আমি তোমার মেয়ে হবো।

লজ্জায় সুরুচির মুখ রাঙা হইয়া উঠিল!

সুভাষিণী বলিল—আমার বড় ছেলে তোমার চেয়ে চার বছরের বড়। সে ম্যাট্রিক-ক্লাশে পড়ছে। মেজো তোমার বয়সী—তারো চলছে ক্লাশ-সেভ্ন্!

সুরুচি বলিল,—বেশ! তাহলে দরকার হলে পড়াশুনার সাহায্য পাবো।

এমন সময় কৌমুদী আসিল। সুরুচি বলিল—বা কুমু, তোমার জন্ম-দিন, আর তোমার দেখা নেই!

কৌমুদী বলিল—জানো না, তো, তুমি এখানে এসেছো, আর আমাকে নিয়ে পিসিমা বেরিয়েছিল যে! মন্দিরে গিয়ে আরতি দেখলুম···ঠাকুর নমস্কার করলুম। তার পর গেলুম তোমাদের বাড়ী···জ্যাঠা-মশাইকে নমস্কার করে এলুম। জ্যাঠা-মশায়ের বাত হয়েছে···

সুরুচি বলিল—হ্যাঁ···দশ বছর আগে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েছিলেন···হাঁটুতে লেগেছিল। সেই অবধি হাঁটুটা কম-জুরি হয়ে রইলো। মাঝে-মাঝে হাঁটু ফোলে, হাঁটুতে ব্যথা হয়!

কৌমুদী বলিল—গিয়ে কি লাভ হলো, জানো রুচি! জ্যাঠা-মশাইকে নমস্কার করলুম, জ্যাঠা-মশাই বুকে টেনে নিয়ে আদর করলেন। তার পর কি দিয়েছেন, ছাখো···

বলিয়া কৌমুদী দেখাইল হীরা-চুণী-বসানো একটি ব্রুচ!

বড়র দল ওদিকে নিজেদের বড়মানুষির গল্পে মত্ত ছিলেন ···এ-কথায় তাঁরা একবার ফিরিয়া চাহিলেন। সে ব্রুচ তাঁদের বুকে খোঁচার মতো বিঁধিল!

মনে-মনে জয়া বলিল, আমার মেয়ে কমলার জন্ম-দিনে তাকে দিলেন একখানা মামুলি জর্জ্জেট-সিল্কের শাড়ী আর তার সঙ্গে ম্যাচ করে ব্লাউশ···

মিসেস্ সামন্ত বলিলেন, আমার স্বামী ওঁর তাঁবে চাকরি করেন কি না, তাই আমার দুই মেয়ের বেলায় এক জনকে দিলেন মাদ্রাজী শাড়ী, আর এক জনকে একখানা গুজরাটী! শাড়ী যেন ওরা চোখে ছাখেনি!

রামহরি সান্যালের স্ত্রীর মন বলিল—আমার মেয়ে দিগঙ্গনার জন্মদিনে পঁচিশ টাকার একখানা চেক্!

সকলের এক নালিশ, কৌমুদীর জন্ম-দিনে দামী ব্রুচ! কৌমুদীর বাপ চাকর নয়···সমান-সমান ঘর কি না!

সুভাষিণীকে উদ্দেশ করিয়া কৌমুদী বলিল—তুমি এসো। পিসিমা তোমায় ডাকছে।

সুভাষিণী বলিল—চলো মা···

সুরুচি বলিল—আমিও আপনার সঙ্গে যাবো। আপনি কৌমুদীর পিসিমা হন্···আমিও আপনাকে পিসিমা বলবো।

তিন জনে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

জয়া বলিল—নতুন হেড-মাষ্টারের কি নাম, প্রিয়ম্বদা?

প্রিয়ম্বদা বলিল—মহেন্দ্র চৌধুরী।

বুকে যেন পাথর পড়িল! মহেন্দ্র চৌধুরী!

জয়া বলিল—কোথায় বাড়ী?

প্রিয়ম্বদা বলিল—তা কে জানে! এসেছে মাষ্টারী করতে···তার কুল-কুলুজীর খপর নেবার জন্য কার কি মাথা-ব্যথা পড়েছে!

জয়ার মুখ গম্ভীর!

মিসেস্ সামন্ত এক বার চারি দিকে চাহিলেন, তার পর কণ্ঠ মৃদু করিয়া বলিলেন—মফঃস্বলে এসে মান-ইজ্জৎ আর রইলো না! ঐ স্কুলের মাষ্টার···তার স্ত্রীর সঙ্গে বসে খেতে হবে! কলকাতায় যত দিন ছিলুম, এমনটি কখনো ঘটেনি! সেখানকার সোসাইটিই আলাদা, বুঝলে. জয়া!

গৌরী ঠাকুরাণীর সঙ্গে বসিয়া সুভাষিণী দু'-চারিটা সৌখীন রান্না করিতেছিল···কৌমুদী এবং সুরুচি সেইখানে বসিয়া।

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—তোমরা দু'জনে ওদিকে যাও মা রুচি···ওঁরা যদি কিছু মনে করেন!

সুরুচি বলিল—ওঁদের ও-সব সাজ-ফ্যাশনের কথার মধ্যে আমরা জুজু-বুড়ী হয়ে বসে থাকতে পারি কখনো পিসিমা?

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—কুমুকে তাহলে ছেড়ে দাও, মা···ওর বাড়ীতে কাজ···ও এখানে সরে বসে থাকলে ভালো দেখাবে না।

কৌমুদী বলিল—বা রে, ওখানে ললি-মলির বিলিতি বুকনি! জানো না তো পিসিমা, নরেটোর মেয়েদের কথা কবার ভঙ্গী, তাদের নাচ, তাদের হল্লা আর চালিয়াতীর ইতিহাস শুনতে শুনতে দম বেরিয়ে যায় যেন!

তবু কৌমুদীকে যাইতে হইল। গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—তুমিও যাও রুচি। পৃথিবীতে সব মানুষ কি মনের মতো হয়! তবু সকলকে নিয়ে সকলকে সয়ে আমাদের বাস করতে হয়। এখন থেকে সব-রকমের মানুষকে সহ্য করতে শেখো!

সুরুচি বলিল—তুমি বলছো পিসিমা, যাচ্ছি। কিন্তু আমার সঙ্গে ওরা মিশতে চায় না। বাবার মেয়ে বলে আমি যেন মস্ত অপরাধ করেছি!

১০

জয়া বাড়ী ফিরিল, রাত্রি তখন নটা।

কামাখ্যা সাহেব তখন ছেলেদের লইয়া ডিনারে বসিয়াছে।

জয়াকে দেখিয়া চ্যাটার্জী বলিল—ফিরলে!

গম্ভীর কণ্ঠে জয়া বলিল—হ্যাঁ···

বলিয়া টেবলের সামনে একখানা চেয়ারে বসিল।

কামাখ্যা চাহিল জয়ার পানে, বলিল—মেজাজ গম্ভীর দেখছি যে! মানে? খাতির করেনি ওরা?

জয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল, বলিল—খাতিরের কথা নয়।

—তবে?

জয়া বলিল—বলবো'খন। খেয়ে যেন অফিস-কামরায় চলে যেয়ো না। দরকারী কথা আছে!

এ কথা বলিয়া জয়া চলিয়া গেল বেশ-পরিবর্ত্তন করিতে।

তার পর ভোজন-পর্ব্বের শেষে বারান্দায় দু'জনে কথা হইতেছিল।

কামাখ্যা বলিল—হেড-মাষ্টার মহেন্দ্র চৌধুরী যে তোমার সেই পিসতুতো ভাই মহেন্দ্র···এ কথা তোমায় কে বললে?

জয়া বলিল—মহীনও মাষ্টারী করে। সে ছাড়া ফার্ষ্ট ক্লাশ এম-এ পাশ অন্য মহেন্দ্র চৌধুরী হতে পারে না!

কামাখ্যা চ্যাটার্জী বলিল—এর মধ্যে স্কুল-কমিটির একটি মিটিং হয়ে গেল। তাতে আমি ছিলুম, নতুন হেড-মাষ্টারও প্রেজেণ্ট ছিল···নানা আলোচনা হলো। মহীন্ তো আমাকে চেনে···এ হেড-মাষ্টার তোমার ভাই হলে তুমি ভাবো, আমি না হয় তাকে চিনলুম না, কিন্তু তোমার ভাইও আমাকে চিনতে পারবে না?

জয়া বলিল,—চিনলে কি করতো সে?

—আত্মীয়তার কথা তুলতো! বিশেষ আমি যখন স্কুল-কমিটির প্রেসিডেণ্ট, আমাকে খুশী রাখতে পারলে তার উন্নতির আশা যেখানে, তুমি ভাবো, বাঙালী হয়ে আত্মীয়তার এত-বড় সুযোগ সে নষ্ট করবে? পাঁচ জনের কাছে নিজের মর্য্যাদা বাড়াবার জন্যও তো মানুষ বড়র সঙ্গে আত্মীয়তা জাহির করে বেড়ায়! ছ্যাট্‌স্ হিউম্যান্ সাইকোলজি!

জয়া একাগ্র-মনে কামাখ্যার কথা শুনিল। শুনিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—তুমি জানো না! শুনেছ তো জ্যাঠা বাবুর কাছে, আমার পিসেমশায় মানে, মহীনের বাবা···তিনিও স্কুল-মাষ্টার ছিলেন···তাঁরো ছিল দুর্জ্জয় তেজ। মহীনের অন্য কি গুণ আর আছে না আছে জানি না, তেজ কিন্তু খুব। ভাঙ্গে তো মচকায় না!···জ্যাঠা বাবু অত করে বলেছিলেন, অত ভয় দেখিয়েছিলেন, তবু যা ধরলে, তাই তো করলে! বিষয়-সম্পত্তির লোভ ত্যাগ করে অনায়াসে মাষ্টারী-চাকরি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

সিগারে দীর্ঘ টান দিয়া একরাশ ধোঁয়া ছাড়িয়া কামাখ্যা চ্যাটার্জী বলিলেন,—সে তেজ নিয়ে তোমার ভাই যদি এখানে হেড-মাষ্টারী করে, আমাদের তাতে

কি এসে যাবে শুনি,···যার জন্য তুমি একেবারে মুখখানাকে চক্রাকার করে তুললে!

বিরক্তিতে জয়ার ললাট কুঞ্চিত হইল। জয়া বলিল,—তোমার মতো মানুষ তা কি করে বুঝবে!

এ কথায় একটু চমক।

কুঞ্চিত-ভ্রূ কামাখ্যা চাহিল জয়ার পানে।

জয়া বলিল—মারা যাবার সময় জ্যাঠা-বাবু নতুন উইলের ব্যবস্থা করে গেছলেন,—তুমি তার খশড়াও তৈরী করেছিলে···

কামাখ্যা উচ্চ হাস্য করিল। বলিল—সে কি উইল! হুঁ:!···আমার হাতের লেখা খশড়া! সই হয়নি, কিছু না···সে তো ওয়েষ্ট-পেপার!

জয়া বলিল,—তা হলেও জ্যাঠা বাবুর সে-কথা···

কামাখ্যা বলিল—সে কথা! মারা যাবার সময় তাঁর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সে-অবস্থায় মাথামুণ্ডু যা বলবেন, তাই শিরোধার্য্য করতে হবে? এ-রকম সেন্টিমেণ্টাল হলে পৃথিবীতে বাস করা যায় না! ও-উইলের কোনো দাম নেই···ও-উইল উইলই নয়! তুমি বুঝি তাই ভেবে সারা হচ্ছো!

জয়ার মাথার মধ্যে একরাশ সরীসৃপ কিল্‌বিল্ করিয়া উঠিল! অস্ফুট কণ্ঠে জয়া বলিল—রাজু···

কামাখ্যা বলিল,—রাজু!···হ্যাঁ, বলো, রাজু···কি?

জয়া বলিল—রাজু যদি বেঁচে থাকে···তার সঙ্গে কখনো যদি মহীনের দেখা হয়?

কামাখ্যা বলিল—হয়, হবে! তুমি বলতে চাও, রাজু যদি বলে, তোমার জ্যাঠা বাবু মারা যাবার সময় মুখের কথায় বলেছিলেন, তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তিনি তোমাকে আর তোমার মহীন্-ভাইকে···সমান দু'-ভাগে দু'জনকে দিয়ে গেছেন! এই তো?

জয়া একটা বড় নিশ্বাস ফেলিল; কোনো জবাব দিল না! শুধু ব্যাকুল দৃষ্টিতে স্বামীর পানে চাহিয়া রহিল।

কামাখ্যা বলিল—রাজু যদি বলে, তাতেই অমনি মহীন্ এসে সম্পত্তি ক্লেম করবে!···ক্লেম করলেই সম্পত্তি তার হবে?···পাগল! প্রমাণ কোথায় যে উইল হয়েছিল? রাজু বলবে, তোমার জ্যাঠা বাবুর ছিল এমনি লাষ্ট উইশ! আর তিনি তা লিখিয়েছিলেন আমায় দিয়ে। আমি বলবো, না···এমন উইশের কথা আমি শুনিনি···এমন কথা তিনি আমায় লিখতে বলেননি! ব্যস্! তাছাড়া ওয়ান্ ষ্টেট্‌মেণ্ট এগেনষ্ট এ্যানাদার ষ্টেট্‌মেণ্ট! সাক্ষী কে? কার কথা আদালত বিশ্বাস করবে? আমার? না, রাজু-খানসামার? আমি এক জন বিলিতি-পাশ এঞ্জিনীয়ার holding high office here! আর রাজু? তোমার মহীনের তরফে এ ক্লেম খাড়া করতে চায় মোটা টাকা বখ্‌শিস পাবে, সেই লোভে! কোন্ হাকিম আমায় ছেড়ে তাকে বিশ্বাস করবে? আমি শিক্ষিত ভদ্রলোক···আর সে একটা মিনিয়াল্ চাকর! তাছাড়া কে মরবার আগে কার কাছে তার কি লাষ্ট উইশ ব্যক্ত করে গেছে, সে-জবানির উপর আইন-আদালত নির্ভর করে না! সে লাষ্ট-উইশ কোনো রকম লেখায় ব্যক্ত করে গেলে আর সে-লেখার যোগ্য প্রমাণ পেলে তবেই আইন-আদালত তা নিয়ে মাথা ঘামায়!···তুমি নিশ্চিন্ত থাকো! ···ও-সম্বন্ধে তুমি ভাবো, আমি এমনি চুপচাপ আছি? এ সম্বন্ধে বড়-বড় উকিলের পরামর্শ নিয়েছি, তাঁরা বলেছেন, তুমি নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে ও-সম্পত্তি ভোগ করো গে!

তবু জয়ার মন মানিতে চায় না। জয়া চাহিয়া রহিল উদাস নেত্রে···বাহিরে চন্দ্র-কিরণে দীপ্ত তরুবীথির পানে। ঘন পত্র-পল্লবের গায়ে জ্যোৎস্না পড়িয়াছে, আর সে-জ্যোৎস্নার অন্তরালে অন্ধকারের ছায়া! ও-ছায়ায় যেন অজানা কি নিবিড় রহস্য। সে-রহস্যের পিছনে জ্যাঠা বাবুর দুই চোখের দৃষ্টি যদি···

কামাখ্যা বলিল—উকিলের পরামর্শেই তো তোমার নামে লেটার্স অফ-এডমিনিষ্ট্রেশান নেওয়া হয়েছে! আদালত থেকে প্রমাণ পর্য্যন্ত হয়ে গেছে। তোমার ছেলেরা হলো হিন্দু-আইনে তোমার জ্যাঠা বাবুর সম্পত্তির লিগাল heirs.

জয়া বলিল,—মহীন্?

বিজয়োৎফুল্ল কণ্ঠে কামাখ্যা বলিল,—না! তোমার মহীন হলো তাঁর ভাগনে। আইন বলে, ছেলের অভাবে ভাইপো-ভাইঝী। অবশ্য সে-ভাইঝী যদি হয় married! অর্থাৎ ও সব জটিল ব্যাপার বোঝবার দরকার নেই! তুমি জেনে রাখো, তোমার ছেলেরা উমাপ্রসন্ন রায়ের একমাত্র উত্তরাধিকারী!

জয়া কি ভাবিতেছিল···বোধ হয়, অতীত দিনের কথা! জ্যাঠা বাবুর আশ্রয়ে ঐ মহীনের সঙ্গে এক দিন সে বাড়িয়া উঠিয়াছে! তখন কামাখ্যা ছিল না! দুই ভাই-বোন! মহীন তাকে ভালোবাসিত! জয়ার অপকর্ম্মে জ্যাঠা বাবুর ভর্ৎসনা হইতে জয়াকে বাঁচাইতে মহীন নিজের মাথায় তার দোষ গ্রহণ করিয়াছে! তার পর জ্যাঠা বাবুর সেই বিরাগ মাথায় বহিয়া মহীন যে-দিন বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যায়, সে-দিনও জয়ার হাত ধরিয়া সাশ্রু-নয়নে কম্পিত-কণ্ঠে

বলিয়াছিল, তুমি আমায় ভুলো না জয়া দি, ছোট ভাই বলে মনে রেখো।

সে চোখের জল, সে কণ্ঠ জয়া ভুলিতে পারে নাই! তার পর জ্যাঠা বাবু ডাকিয়া বসাইয়া মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে মহীনকে মার্জ্জনা করিয়া বিষয়-সম্পত্তির সম্বন্ধে যে-কথা বলিয়াছিলেন···

জয়া কি করিবে? মেয়ে-মানুষ! মহীনের সন্ধান কি করিয়া সে পাইবে! স্বামীকে বলিয়াছিল···স্বামী বলিল, খোঁজ পাওয়া যায় নাই। তার পর···

স্বামী কাগজে সহি করাইয়া লইয়াছে, বলিয়াছে, দরকার। সে-ও না দেখিয়া না বুঝিয়া স্বামীর কথায় কাগজে সহি করিয়াছে!

মাথার মধ্যে নিমেষে প্রচণ্ড কলরব জাগিয়া উঠিল! ···কামাখ্যা বলিল,—এর জন্য এত দুর্ভাবনা! আমায় তেমনি কাঁচা ছেলে পেয়েছো! হুঁঃ···

কামাখ্যা উঠিল! বলিল,—কতকগুলো কাগজ পড়ে আছে···সই করতে বাকী···অফিস-কামরায় খাশ-কেরাণী বসে আছে···রাত এদিকে এগারোটা বাজে!

কামাখ্যা আসিল অফিস-কামরায়।

তার পর কাজ সারিয়া আবার যখন ফিরিল, এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে। আসিয়া দেখে, জয়া তেমনি বসিয়া আছে বারান্দায় সেই বেতের চেয়ারে···চিন্তায় একেবারে নিমগ্ন হইয়া!

কামাখ্যা বলিল—এখনো তাই ভাবছো!

জয়া বলিল—তা ভাবিনি!

—তবে?

—অন্য অনেক কথা···

—কি, শুনি?

—ওরা তো এইখানেই রইলো! মহীনের সঙ্গে কখনো আমার দেখা হবে না, ভাবো? তোমার সঙ্গে তো আখ্‌চার দেখা হবে!

কামাখ্যা বলিল—দেখা হলেও ও তুচ্ছ এক জন হেড-মাষ্টার···তাকে আমি recognise করবো, ভাবো? তবে হ্যাঁ, ওরা বলে বেড়াতে পারে আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা! আমার জীবনের গোড়ার দিক্‌কার ইতিহাস জানে তোমার মহীন···সে কথা পাঁচ জনের কাছে বললে আমার পোজিশনে খানিকটা আঘাত লাগতে পারে! তা তার জন্য আমি ভাবছি, একটা-কিছু ছুতো ধরে ওকে এখান থেকে সরানো শক্ত হবে না!

জয়া শিহরিয়া উঠিল! তার মনের গোপন গহনেও বুঝি এমনি আকাঙ্ক্ষা জাগিতেছিল···যদি কোনো দিন জ্যাঠা বাবুর শেষ-দিনের সে মার্জ্জনার কথা শুনিয়া ঐ সুভাষিণী পাঁচ জনের সামনে বলিয়া বসে···

জয়া বলিল—কিন্তু তোমাদের জানকী বাবু মহীনকে খুব ভালো বলে জানেন। মহীনের উপর তাঁর অনেকখানি শ্রদ্ধা। আর সে-শ্রদ্ধা মিথ্যাও নয়! মহীন মানুষ-হিসাবে খুব ভালো···

কামাখ্যা বলিল—Still he is a school-master. স্কুল-মাষ্টাররা অতি নিরীহ জীব। তার পক্ষে goody goody হয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই জয়া! জীবনে ওরা কতটুকু scope পায়! ওদের কাজ আর খ্যাতির গণ্ডী কতখানি লিমিটেড!···তুমি দুশ্চিন্তা ত্যাগ করো। সোশ্যালি ওদের সঙ্গ এড়িয়ে চলো। আমার পক্ষে তার সম্ভাবনা খুব বেশী! কিন্তু তোমরা মেয়েরা···মেলামেশায় বাছ-বিচার করো না···এই না মুস্কিল! তা, তুমি হুঁশিয়ার থেকো! এতটুকু প্রশ্রয় দিয়ো না কোনো দিন!

জয়া বলিল—মহীনের বৌকে দেখে মনে হলো, ভালো মানুষ! গৌরী-ঠাকুরঝি, দেখলুম, ওকে মাথায় তুলেছে ···খুব ভালোবাসে মহীনের বৌকে!

কামাখ্যা বলিল,—তোমার গৌরী-ঠাকুরঝি তাকে মাথাতেই তুলুন আর মন্দিরেই বসান, বিষয়-সম্পত্তিতে মহীন টুঁ মারতে পারবে না! ওদের আত্মীয় বলে স্বীকার করে মেলামেশা করাটুকু বাঁচিয়ে চললে মান-ইজ্জতেও ঘা লাগবে না!

মুখে এতখানি ভরসা দিলেও কামাখ্যার মনের কোণে অস্বস্তির ছায়া লাগে নাই, তা নয়! আরামে বাস করিতেছিল,—কোনো দিকে ছোট একটা কুশাঙ্কুরের মাথা দেখা যায় নাই! আজ হঠাৎ এখানে মহেন্দ্র আসিয়া হাজির! এত-বড় বাঙলা দেশে মাষ্টারী করিবার আর জায়গা ছিল না? তার চাকরির দরখাস্তখানা কামাখ্যার হাত ঘুরিয়াই তো জানকী বাবুর হাতে গিয়া উঠিয়াছিল! কে জানিত, এ মহেন্দ্র···উমাপ্রসন্নর আদরের ভাগিনেয়··· জয়ার ছেলেবেলাকার ভাই! জানিলে···

কিন্তু যা হইয়া গিয়াছে, তা লইয়া এখন মাথা-ঘামানো মূঢ়তা!···তাছাড়া ভয় বা কিসের! জয়ার ভাই মহেন্দ্র এখানে মাষ্টারী করিতে আসিয়াছে, করুক মাষ্টারী! ···কামাখ্যা চ্যাটার্জ্জী-অফিসারকে ভগ্নীপতি বলিয়া সোহাগ জানাইতে আসিবে, এমন স্পর্দ্ধা তার হইতে দিবে না!

কামাখ্যা বলিল,—রাত হয়ে গেছে, শুয়ে পড়ো গে··· এ কথা বলিয়া কামাখ্যা চলিয়া গেল।

জয়া বসিয়া রহিল। মাথার উপর আকাশে এক-রাশ নক্ষত্র! জয়ার মনে হইতেছিল, নক্ষত্রগুলা যেন নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া দেখিতেছে স্নেহ-মমতা ভুলিয়া, বিশ্বাস ভুলিয়া জয়া এ কি করিতেছে!

জ্যাঠা বাবু! যে-কথাটি বলিবার পর তাঁর কণ্ঠে আর দ্বিতীয় কথা সরে নাই...সে-কথার কোনো দাম নাই জয়ার কাছে?

নিশ্বাসে বুক ভরিয়া উঠিল। মনে হইল, নক্ষত্রভরা ঐ আকাশ যেন নীচে নামিয়া আসিতেছে...একেবারে যেন বুকের উপরে! কোনো মতে জয়া উঠিয়া পড়িল! স্বামী...স্বামীর উপর সে নির্ভর করিয়া আছে...

কিন্তু আর পারে না! জ্যাঠা বাবু চলিয়া গিয়াছেন ...তিনি কি জয়ার মন বুঝিবেন না? সে কি করিবে? ওদিকে মহীন...এদিকে স্বামী! স্বামীকে লইয়াই তার সব...স্বামীকে না মানিলে জয়া কোথায় থাকিবে!

আকাশে মেঘ...না? তাই! নক্ষত্রগুলা যেন কাঁপিতেছে!

জয়ার সর্ব্বাঙ্গ আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিল! ত্রস্ত-পায়ে সে গিয়া ঘরে ঢুকিল।

১১

পরের দিন সকালে কৌমুদী আসিয়া সুভাষিণীকে বলিল—রুচি কাল তোমার এখানে বেড়াতে আসবে পিসিমা, বিকেলবেলা।

সুভাষিণী বলিল—বটে! তুমিও এসো তার সঙ্গে... দু'জনে এইখানে জলখাবার খাবে। কেমন?

হাসিয়া কৌমুদী বলিল—আসবো।

—কি খাবে বলো দিকিনি?

হাসিয়া কৌমুদী বলিল—ঐটি আমি বলতে পারবো না পিসিমা। কোনো দিন বলতে পারি না। বাবা আর পিসিমা কাল জিজ্ঞাসা করেছিল, হ্যাঁ রে জন্মতিথিতে কি খাবি, বল্? আমি বলতে পারলুম না।...কক্‌খনো বলতে পারি না! আমি জানি না, কি খেতে চাই, কি খেতে আমার ভালো লাগবে! খেলে তখন বলতে পারি।

সুভাষিণী হাসিল; হাসিয়া বলিল—পাগলা মেয়ে!

মহেন্দ্র বাড়ী ফিরিল। দেখিয়া কৌমুদী বলিল—আমি আসি পিসিমা।

মহেন্দ্র শুনিল, বলিল—আমি এলুম বলে পালাচ্ছো! মাষ্টারকে ভয় করে, বুঝি?

কৌমুদী বলিল—তা নয়! মন্দিরে আজ কথা হবে। পিসিমা যাবে। আমাকে বললে, তুইও যাবি আমার সঙ্গে। পিসিমাকেও নিয়ে যেতুম...তা পিসিমার ঘরকর্ণার কাজ আছে কি না! আসি পিসিমা...

কৌমুদী চলিয়া গেল।

সুভাষিণী তার পানে চাহিয়া ছিল। কৌমুদী চোখের আড়ালে চলিয়া গেলে সস্মিত দৃষ্টিতে মহেন্দ্রর পানে চাহিয়া সুভাষিণী বলিল—চমৎকার মেয়েটি! যেন কত আপনার!

মহেন্দ্র বলিল—একটা সুখপর আছে।

—কি?

—তোমার দুই ছেলেই কোয়ার্টার্লি এগজামিনে ফার্ষ্ট হয়েছে। এত বেশী নম্বর পেয়েছে যে, স্কুলে সকলে বললেন, এত নম্বর কোনো ছেলে পায়নি এর আগে!... কোথায় তারা?

সুভাষিণী বলিল—বেড়াতে বেরিয়েছে।

স্কুলের জামা-কাপড় ছাড়িয়া মুখ-হাত ধুইয়া মহেন্দ্র আসিয়া বসিল বাহিরের বারান্দায়।

সুভাষিণী জলখাবার আনিয়া দিল।

খাইতে খাইতে মহেন্দ্র বলিল—কাল সুপ্রসন্ন বাবুর বাড়ীতে জয়াদির সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল, বললে! তখন ব্যস্ত ছিলুম, সে-কথা শোনা হলো না! তা তোমাকে চিনলে তো?

সুভাষিণী বলিল—দিদি পরিচয় করিয়ে দিলেন সকলের সঙ্গে। এখানকার যত বড়-বড় গিন্নীরা এসে-ছিলেন...মেয়ে নিয়ে। তাঁদের সঙ্গে তোমার জয়াদিও এসেছিলেন...তাঁর মেয়ে কারো সঙ্গে মেশেনি! কথাও কইলে না।

মহেন্দ্র বলিল—জয়াদি তোমার সঙ্গে আলাপ করলে?

—না...

বিস্ময়ে মহেন্দ্রর দুই চোখ বিস্ফারিত হইল। মহেন্দ্র বলিল—সে কি! তোমার সঙ্গে কথা কইলে না?

সুভাষিণী কহিল,—না। ওঁদের সব ফ্যাশনের গল্প চলছিল...আমি একধারে আড়ষ্ট হয়ে বসেছিলুম। ঠিক যেন সেই হংসমধ্যে বকো যথা! এমন সময় জানকী বাবুর মেয়ে সুরুচি এলো। আমার সঙ্গে সে কথা কইতে লাগলো। সুরুচি মেয়েটিও বেশ ভালো।...কাল এ-বাড়ীতে আসবে...কৌমুদীকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছে!

মহেন্দ্র বলিল—বলে পাঠানোর মানে?

সুভাষিণী বলিল,—কাজ-কর্ম্ম করি আমি, জানে।

তাই পাছে আমার কোনো অসুবিধা হয়, আগে থাকতে খবর দেছে! বুদ্ধি-বিবেচনা আছে।

মহেন্দ্রর খাওয়া হইয়া গেল। মুখ-হাত ধুইয়া মহেন্দ্র বলিল—আমায় একটু বেরুতে হবে। যে ওষুধটা কিশোরী বাবু খেতে দিয়েছিলেন, ফুরিয়ে গেছে বলছিলে,—আনা হয়নি। স্কুল থেকে ফেরবার মুখে আনবো, ভেবেছিলুম! হয়নি। এখন বেরুচ্ছি সেই ওষুধের জন্য।

সুভাষিণী বলিল—রাত করো না যেন! ইস্কুলে খাটুনি খুব হচ্ছে। একে ঠাঁইনাড়া—তার বিশ্রাম মেলেনি, তার উপর স্কুলকে ঢেলে সাজছো···

মহেন্দ্র বলিল—গোছগাছ সব করে নিয়ে এসেছি। মানে, নামকা-ওয়াস্তে স্কুল-কমিটির মেম্বার হয়েছেন বাবুরা। স্কুলের ভালো-মন্দ কিসে, সে কথা কেউ ভাবেন না, জানেনও না। মিটিং হচ্ছে, আসছেন, রেজলিউশন হচ্ছে! এ-সব শুধু জানকী বাবুর কাছে টান্ দেখাতে!

মহেন্দ্র বাহির হইয়া গেল।

ফিরিল রাত্রি আটটায়। ছেলেরা বসিয়া লেখাপড়া করিতেছে···সুভাষিণী রান্নাঘরে।

মহেন্দ্র আসিয়া বলিল,—কামাখ্যা বাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল হঠাৎ ডিসপেন্সারিতে। একখানা চেয়ারে বসে আছেন। ডাক্তার সামন্ত ছিলেন ডিস্‌পেন্সারিতে! তাঁর সঙ্গে উনি জানকী বাবুর বাড়ী যাবেন। জানকী বাবুর বাতের ব্যথা বেড়েছে, শুনলুম। জ্বর হয়েছে। ডাক্তার সামন্ত দেখতে যাবেন ডিসপেন্সারির ডিউটি সেরে—কামাখ্যা বাবুও ওঁর সঙ্গে যাবেন জানকী বাবুকে দেখতে।

সুভাষিণী বলিল—কামাখ্যা বাবু বললেন বুঝি? হাজার হোক ভগ্নীপতি তো!

মহেন্দ্র বলিল—কথা কইলেন, তবে সে ভগ্নীপতি হিসাবে নয়। তিনি স্কুলের প্রেসিডেণ্ট, আমি হেড-মাষ্টার এমনি ভঙ্গীতে অর্থাৎ আমি যেন ওঁর আশ্রিত! কৃপাপ্রার্থী! কম-মাইনে কি না।

নিশ্বাস ফেলিয়া সুভাষিণী বলিল—কম-মাইনে পেতে পারো, তা বলে বিদ্যা-বুদ্ধিতে ওঁর নীচে তুমি নও, এ-জ্ঞানটুকু যদি ওঁর না থাকে, তাহলে বলবো, বিলেত গিয়ে মুখ্যু গোঁয়ারের মতো উনি শুধু হাতুড়ি-পেটা শিখে এসেছেন···মনের শিক্ষা যাকে বলে, তা ওঁর নেই!

হাসিয়া মহেন্দ্র বলিল—পতির অমর্য্যাদায় সতীর নয়নে অগ্নি দেখা দেছে! আর নয়! এক দিন সতীর চোখের এ-আগুনে দক্ষ-রাজার যজ্ঞ পণ্ড হয়েছিল! আজ আবার? না সুভা, এর জন্য তুমি দুঃখ করো না। আমরা যে-সুখে আছি, যে আনন্দে···ওঁদের না-মানায় আমাদের কিছু এসে যাবে না! নাই বা ওঁরা মানলেন! বড়লোক বলে যেচে আমরা পায়ে গড়িয়ে পড়বো, তেমন মন ভগবান্ আমাদের ছ্যাননি, এ তাঁর মস্ত অনুগ্রহ! যে যার নিজের কাজ করে যাবো—এতে দুঃখ কোথায়? কিসের দুঃখ?

এ-কথায় সুভাষিণী ঈষৎ অপ্রতিভ হইল, বলিল—তার জন্য আমি দুঃখ করছি না। তোমার কি দাম, তা আমার অজানা নয়। তবে কামাখ্যা বাবু আর তোমার জয়াদি মানুষ তো! তাই ওঁদের কাণ্ড দেখে আমার আশ্চর্য্য লাগে, দুঃখ হয় না!

[ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

প্রেম-লিপি

কাছে কাছে রহি' শুনায়েছি বহু বাণী
বুক দিয়ে তব শুনেছি বুকের ভাষা
চকিতে তা'-সবে স্মৃতি-মাঝে যবে আনি
প্রীতির আশায় কেঁদে মরে ভালোবাসা।
ভালোবাসা মোর ভাষা পেতে মরে কেঁদে—
লিপির মাঝারে আশা-ভরে তাই কাঁদি,
কাছে কাছে রহি যে-কথা বলেছি সেধে
সে-কথা বলিতে আনমনে স্বর সাধি।

মুখে যা' বলেছি লিখে তা' জানাতে পারি!
লিখিতে কি পারি মূক নয়নের বাণী?
সুখ-স্বপনের বেদনা-গলানো বারি,
আঁখিতে এনেছি, লিপিতে কেমনে আনি?
হায় প্রিয়তম, যে-কথা বলিতে চাহি
লিপির ভাষায় কেমনে জানাই তারে?
যাহা লিখি নাই, তারি তলে অবগাহি'
চিনে নিয়ো মোর অকথিত কামনারে।

শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়।

আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি

মিত্রশক্তির আক্রমণাত্মক প্রয়াস—

সভ্যতাভিমানী মনুষ্য-সমাজে বিশ্ব-মানচিত্রের অজ্ঞাত মহাদেশ আফ্রিকার গুরুত্ব অকস্মাৎ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুদীর্ঘ তিন বৎসর পরে এই মহাদেশেই সর্ব্বপ্রথম মিত্রশক্তির ব্যাপক আক্রমণ-প্রচেষ্টা প্রকট হইল। দুই-একটি গুরুত্বহীন রণক্ষেত্রের কথা বাদ দিয়া সাধারণ ভাবে বলা যাইতে পারে—এত কাল ফ্যাসিষ্টশক্তিই ছিল আক্রমণকারী, আর মিত্রশক্তি সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়াছেন মাত্র। অর্থাৎ এত দিন যুদ্ধের গতি নিয়ন্ত্রণে শত্রুপক্ষই নেতৃত্ব করিয়াছে; আর মিত্রশক্তি সেই গতি অনুসরণ করিয়াছেন। আজ আফ্রিকায় বৃটিশ ও মার্কিণের সম্মিলিত সমর-প্রচেষ্টা সেই নেতৃত্ব গ্রহণের ঐকান্তিক প্রয়াস।

অবনত ও বিধ্বস্ত ফ্রান্সের উপনিবেশে যে আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে, তাহার সামরিক সাফল্যে মিত্রশক্তির কোন কৃতিত্ব নাই। বস্তুতঃ এই অঞ্চলের সামরিক সাফল্যের কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতে মিত্রশক্তির ধুরন্ধরদিগের লজ্জানুভব করা উচিত। হয়ত এই জন্যই উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় বৃটিশ ও মার্কিণীর সৈন্যের বীরত্বের কথা তারস্বরে প্রচার না করিয়া প্রতিরোধের স্বল্পতার কথাই বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হইতেছে। উদ্দেশ্য—ভিসি-ফ্রান্সের সেনাবাহিনী যে মিত্রশক্তির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন, এই যুদ্ধে যে তাহাদিগের আগ্রহের নিতান্ত অভাব তাহাই পরোক্ষে প্রকাশ করা। সে যাহা হউক, ফরাসী উত্তর-আফ্রিকা সম্বন্ধে ফ্যাসিষ্টশক্তির কূটনৈতিক পরাজয়ের কথা অস্বীকার করা যায় না। ফরাসী উপনিবেশগুলি ফ্যাসিষ্টশক্তির হস্তে পতিত হইবার নিশ্চিত আশঙ্কা আমরা ইতঃপূর্ব্বে একাধিক বার প্রকাশ করিয়াছি। এই আশঙ্কা আমাদের স্বকপোল-কল্পিত নহে; গত কিছু কালের রাজনৈতিক ঘটনাবলী এই দিকে সুনিশ্চিত ইঙ্গিত করিতেছিল। ইতোমধ্যে ফরাসী উপনিবেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান ফ্যাসিষ্টশক্তির প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইবার কথা একাধিক বার শ্রুত হইয়াছে। ফরাসী উপনিবেশগুলি জার্ম্মাণী ও ইটালীর হস্তে পতিত হইবার আশঙ্কা মিত্রশক্তির রাজনীতিকদিগকে বিশেষ ভাবে উৎকণ্ঠিত করিয়াছিল। কিন্তু কূটনৈতিক চাতুর্য্যের বলে তাঁহাদিগের অভিসন্ধি তাঁহারা গোপন রাখিতে পারিয়াছিলেন; ফ্যাসিষ্টশক্তির আন্তর্জ্জাতিক গুপ্তচর বিভাগের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া ব্যাপক সামরিক আয়োজনও করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ, আকস্মিকতায় ফরাসী উত্তর-আফ্রিকায় এই আক্রমণের সহিত জার্ম্মাণীর নরওয়ে ও রুশিয়া আক্রমণের তুলনা চলিতে পারে। আর, জার্ম্মাণীর ফ্রাঙ্কো-বৃটিশ-বিরোধী সমরতৎপরতায় নরওয়ের ও হল্যাণ্ড-বেলজিয়ামের যুদ্ধের সম্বন্ধ যেরূপ, মিত্রশক্তির জার্ম্মাণ-ইটালী-বিরোধী সমর-প্রচেষ্টায় আফ্রিকার এই যুদ্ধের সম্বন্ধও সেইরূপ; ইহা মূল সমর-প্রচেষ্টার সহিত বিচ্ছিন্ন-সম্বন্ধ গুরুত্বহীন শত্রুতা-সাধন মাত্র নহে।

মিশর হইতে জেনারল আলেক্জাণ্ডারের আক্রমণকে এবং উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় বৃটিশ ও মার্কিণী সৈন্যের এই তৎপরতাকে মিঃ চার্চ্চিল একই সমর-প্রচেষ্টার দুইটি অঙ্গ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আশু সামরিক প্রয়োজনে এই দুই অঞ্চলের সমরতৎপরতার সম্বন্ধ কত দূর ঘনিষ্ঠ, তাহা মানচিত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে। এতদ্ব্যতীত, উত্তর-পূর্ব্ব আফ্রিকার যুদ্ধও যেমন ভূমধ্যসাগরে প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য বিবদমান পক্ষদ্বয়ের শক্তিপরীক্ষা, উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায়ও তেমনই ভূমধ্যসাগরে প্রভুত্ব বিস্তারের উদ্দেশ্যেই যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। বস্তুতঃ এই অঞ্চলে তথা পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে মিত্রশক্তির মুষ্টি শিথিল ছিল বলিয়াই এত দিন লিবিয়ার যুদ্ধে চরম সিদ্ধান্ত হয় নাই; যুধ্যমান পক্ষদ্বয় বিশাল মরুভূমির এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত একাধিক বার ছুটাছুটি করিয়াছেন মাত্র।

ফরাসী উপনিবেশের সামরিক গুরুত্ব—

উত্তর-আফ্রিকায় অ্যালজেরিয়া হইতে দক্ষিণে কঙ্গো পর্য্যন্ত আফ্রিকার মহাদেশের প্রায় অর্দ্ধাংশ জুড়িয়া ফ্রান্সের বিশাল সাম্রাজ্য বিস্তৃত। এই সাম্রাজ্যের উত্তর উপকূল ভূমধ্যসাগর দ্বারা এবং পশ্চিম উপকূল আটলাণ্টিক মহাসাগর দ্বারা বিধৌত। এই সাম্রাজ্যের সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী বিভিন্ন বন্দর ও পোতাশ্রয়ের সামরিক গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স বিধ্বস্ত হইবার পর হইতেই এই সকল সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল এবং ফরাসী নৌবহর ফ্যাসিষ্ট শক্তির প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইবার সম্ভাবনা ঘটে। এই সম্ভাবনা নিবারণের জন্য ফ্রান্স পরাভূত হইবার অব্যবহিত পরেই বৃটিশ নৌবহর উত্তর-আফ্রিকার উপকূলে ফরাসী নৌবহরকে আক্রমণ করিয়াছিল। উহাতে ফরাসী নৌবহর ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও সম্পূর্ণ পঙ্গু হয় নাই। তাহার পর, জেনারল দ গলের সাহায্যে ভিসি সরকারের প্রতি ফরাসী উপনিবেশের আনুগত্য নষ্ট করাইবার চেষ্টা হয়। মধ্য অঞ্চলে দুই-একটি গুরুত্বহীন অঞ্চল ব্যতীত অন্য কোথাও এই প্রয়াস সফল হয় নাই। কাজেই, ফরাসী উপনিবেশ ও ফরাসী নৌবহর ব্যবহারের অধিকার পাইয়া ফ্যাসিষ্টশক্তির ক্ষমতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা দূর হয় না। বিশেষতঃ, গত দুই বৎসরে ভিসি-ফ্রান্সের সহিত জার্ম্মাণীর সম্বন্ধ অধিকতর ঘনিষ্ঠ হইয়াছে; ভিসি-ফ্রান্সের বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী মঃ লাভাল্ স্পষ্টই ঘোষণা করিয়াছেন—তিনি জার্ম্মাণীর বিজয়াকাঙ্ক্ষী।

জার্ম্মাণী ও ইটালীকে যথারীতি ফরাসী উপনিবেশ ব্যবহারের অধিকার প্রদত্ত না হইলেও কোন কোন স্থান তাহাদিগের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইবার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় ডাকারের সামরিক গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক; পূর্ব্ব-গোলার্দ্ধের ডাকারই পশ্চিম-গোলার্দ্ধের নিকটতম বিন্দু। এই স্থানের ঘাঁটী হইতে দক্ষিণ আটলাণ্টিক মহাসাগরের বিশাল অঞ্চলে প্রভুত্ব করা চলে, য়ুরোপের

সহিত দক্ষিণ আমেরিকা ও প্রাচ্য অঞ্চলের সংযোগ বিপন্ন করিতে এই ঘাঁটী বিশেষ সহায়ক। এইরূপ নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, দক্ষিণ আট্‌লান্টিকের জার্ম্মাণ সাবমেরিণবহর এই ডাকার হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছে; ইহা ব্যতীত ক্যাসাব্লাঙ্কা প্রভৃতি উত্তর-পশ্চিম ফরাসী আফ্রিকার অন্যান্য স্থানও জার্ম্মাণ সাবমেরিণবহরকে সাহায্য করিয়াছে। বস্তুতঃ, দক্ষিণ আট্‌লান্টিক মহাসাগরে বিচরণশীল জার্ম্মাণ সাবমেরিণ ফরাসী-আফ্রিকা হইতে জ্বালানি পাইয়া এবং বিমানবাহিনীর সহযোগ লাভ করিয়া মিত্রশক্তির অত্যন্ত ক্ষতি করিতে পারিয়াছে; তৎপরতার ক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে এইরূপ সাহায্যকারী ঘাঁটী না থাকিলে সাবমেরিণগুলির প্রাদুর্ভাব এত দূর বৃদ্ধি পাইতে পারিত না। ইহার পর, সমগ্র উত্তর-পশ্চিম ফরাসী-আফ্রিকায় যদি পরিপূর্ণ জার্ম্মাণ-প্রভুত্ব স্থাপিত হইত, তাহা হইলে দক্ষিণ আট্‌লান্টিকের পথে পিপীলিকাটি পর্য্যন্ত গমনাগমন করিতে পারিত না। শুধু তাহাই নহে, ফরাসী উত্তর-আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল হইতে পশ্চিম গোলার্দ্ধও এক সময় বিপন্ন হইতে পারিত। এই জন্যই কিছু দিন পূর্ব্বে মার্কিণী সৈন্য সাইবেরিয়া অধিকার করিয়াছিল এবং এই জন্যই এখন সমগ্র ফরাসী উত্তর আফ্রিকায় মিত্রশক্তির অধিকার-বিস্তারের এই ব্যাপক প্রয়াস।

মঃ লাভাল

জেনারল ফ্রাঙ্কো

তাহার পর, ভূমধ্যসাগরে অধিকার-বিস্তার সম্পর্কে টিউনিসিয়া, আল্‌জেরিয়া ও মরক্কোর গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। জিব্রল্টরের বিপরীত দিকে অবস্থিত আন্তর্জ্জাতিক নগর ট্যাঞ্জিয়ার ফ্যাসিষ্ট স্পেনের অধিকারভুক্ত হইয়াছে। স্পেনের অন্তর্দ্বন্দ্বের সময় সিউটায় যে সকল জার্ম্মাণ-কামান স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা অপসারিত হইবার কথা শ্রুত হয় নাই। ঐ সময় বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জে ইটালীয় বিমানঘাঁটী স্থাপিত হইয়াছিল; অবস্থার সামান্য পরিবর্ত্তনে জেনারল ফ্রাঙ্কো যে পুনরায় ঐ সকল ঘাঁটী ইটালীকে ব্যবহার করিতে দিবেন, তাহা নিশ্চিত। এইরূপ অবস্থায় পশ্চিম ভূমধ্যসাগরের ওরাণ, আল্‌জিয়ার্স, বিজার্টা প্রভৃতি ফরাসী ঘাঁটীও যদি ফ্যাসিষ্টশক্তির প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইত, তাহা হইলে বৃটিশ নৌবহর ঐ অঞ্চল হইতে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হইত; একমাত্র জিব্রল্টর ঘাঁটীর সাহায্যে পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরে প্রভুত্ব অক্ষুন্ন রাখা সম্ভব হইত না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে একমাত্র জিব্রল্টর ব্যতীত সম্মিলিত পক্ষের অন্য ঘাঁটী না থাকায় ঐ অঞ্চলে বৃটিশ নৌবহরের প্রভাব অল্প; এই জন্যই লিবিয়ায় জার্ম্মাণ-ইটালীয় বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি বন্ধ করা সম্ভব হয় নাই এবং এই জন্যই ফ্যাসিষ্ট বাহিনী একাধিক বার বেন্জাজীর পশ্চিম পর্য্যন্ত বিতাড়িত হইলেও পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করিয়া প্রতি-আক্রমণে প্রবৃত্ত হইতে পারিয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—গত বৎসর লিবিয়ার জার্ম্মাণ-সেনাপতি রোমেলের শক্তি বৃদ্ধির জন্য কয়েকটি ফরাসী ঘাঁটীও ব্যবহার হইয়াছিল।

গত অক্টোবর মাসের শেষভাগে মিশর হইতে জেনারল আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে (৭ই নভেম্বর) ফরাসী উত্তর আফ্রিকায় মিত্রশক্তির ব্যাপক সামরিক তৎপরতা আরম্ভ হইয়াছে। উভয় দিক্ হইতে আক্রমণ প্রসারিত করিয়া ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ তীরে দ্রুত মিত্রশক্তির প্রভাব-বিস্তারই এই দ্বিমুখী অভিযানের উদ্দেশ্য। যেরূপ আকস্মিক ভাবে এই সাঁড়াশী আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে ফ্যাসিষ্টশক্তির পক্ষে জেনারল রোমেলের বাহিনীকে আর রক্ষা করা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না; এমন কি, ডানকার্ক অপসারণের পুনরভিনয়ও হয় ত অসম্ভব হইবে।

মিঃ চার্চ্চিল বলিয়াছেন—উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় এই আক্রমণের দ্বারা তাঁহারা ফ্যাসিষ্টশক্তিকে আঘাতের জন্য একটি সুবিধাজনক ঘাঁটী স্থাপন করিতে চাহিতেছেন। বস্তুতঃ, য়ুরোপে ফ্যাসিষ্ট-শক্তিকে আঘাত করিতে হইলে ভূমধ্যসাগরে মিত্রশক্তির প্রভুত্ব স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন এবং এই প্রভুত্বের জন্য ভূমধ্যসাগরের অন্ততঃ দক্ষিণ উপকূলে তাঁহাদিগের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। ভূমধ্যসাগরে প্রভুত্ব-বিস্তৃতির পর কোন্ দিক্ হইতে ও কি ভাবে ফ্যাসিষ্টশক্তিকে আঘাত করা হইবে, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। তবে, ইহা নিশ্চিত যে, সমগ্র উত্তর আফ্রিকায় মিত্র-শক্তির প্রাধান্য স্থাপিত হইলে ফ্যাসিষ্ট য়ুরোপ একরূপ সম্পূর্ণ ভাবে পরিবেষ্টিত হইবে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যে বৃটেন যে সমরায়োজন হইয়াছে, তাহার জন্য হিটলার পশ্চিম য়ুরোপে ব্যাপক প্রতিরোধ

ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইয়াছেন ; পূর্ব্ব য়ুরোপে দেড় বৎসরের চেষ্টাতেও তিনি রুশিয়ার কামানগুলিকে নীরব করিতে পারেন নাই, রুশ ট্যাঙ্ক ও বিমান এখনও নিশ্চল হয় নাই। ইহার পর, দক্ষিণ অঞ্চলেও যদি ভূমধ্যসাগরের জলরাশি হইতে মিত্রশক্তির হাঙ্গর-গুলি নাসিকা উত্তোলন করিতে থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহা হিটলারকে উৎকণ্ঠিত করিবে। সম্মিলিত পক্ষ এই ভাবে ফ্যাসিষ্ট য়ুরোপকে পরি-বেষ্টিত করিবার
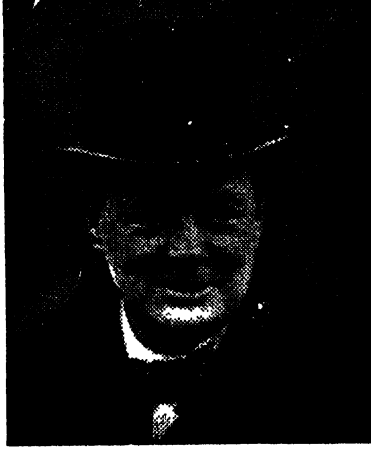
মিঃ চার্চ্চিল

[উ]পর তাহার প্রতিরোধ-ব্যবস্থার দুর্ব্বল স্থানের সন্ধানে প্রবৃত্ত থাকিবেন এবং সুযোগ পাইলেই সেই স্থানে আঘাত করিতে প্রয়াসী হইবেন। এই দিক্ হইতে ফরাসী-আফ্রিকায় মিত্রশক্তির এই সমরতৎপরতাকে তাঁহাদের প্রথম আক্রমণাত্মক প্রয়াস বলা যাইতে পারে।

জার্ম্মাণী ও ফ্রান্সে প্রতিক্রিয়া—

আফ্রিকায় মিত্রশক্তির তৎপরতার সংবাদ পাইবামাত্র হিটলার জার্ম্মাণ বাহিনীকে অনধিকৃত ফ্রান্সে প্রবেশের আদেশ দিয়াছেন ; অজুহাত—মিত্রশক্তি ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই দক্ষিণ ফ্রান্সে আক্রমণ আরম্ভ করিবে বলিয়া না কি সুনির্দ্দিষ্ট আভাস পাওয়া গিয়াছিল। অঞ্চল বিশেষ আক্রমণকালে যে অজুহাত প্রদর্শিত হয়, তাহার গুরুত্ব অধিক নহে ; মিত্রশক্তির যদি দক্ষিণ ফ্রান্স আক্রমণের সাহস ও সামর্থ্য থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই "২৪ ঘণ্টা" বিলম্ব করিয়া তাঁহারা হিটলারকে প্রস্তুত হইতে সময় দিতেন না। যে অজুহাতই প্রদর্শিত হউক না কেন, প্রকৃত কথা এই—হিটলারের পক্ষে অবিলম্বে সমগ্র দক্ষিণ য়ুরোপে প্রতিরোধ-ব্যবস্থা শক্তিশালী করা প্রয়োজন হইয়াছে। তাহার পর জার্ম্মাণ-আনুরক্তি সম্বন্ধে ভিসি-ফ্রান্সে অনৈক্য আছে ; ফরাসী রাষ্ট্রনায়কদিগের এই মতদ্বৈধের রন্ধ্র দিয়া ফরাসী নৌবহর যাহাতে মিত্রশক্তির হস্তে পতিত না হয়, তাহার জন্যও ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। জার্ম্মাণী অবিলম্বে টুলোঁ, মার্শাই প্রভৃতি স্থানের ফরাসী নৌবহর অধিকার করিতে প্রয়াসী হইবে, ফ্রান্সের

হের হিটলার

ভূমধ্যসাগরোপকূলে প্রতিরোধ-ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিবে। তাহার পর, স্বভাবতঃ স্পেন ও পর্ত্তুগালের প্রতি হিটলারের দৃষ্টি পতিত
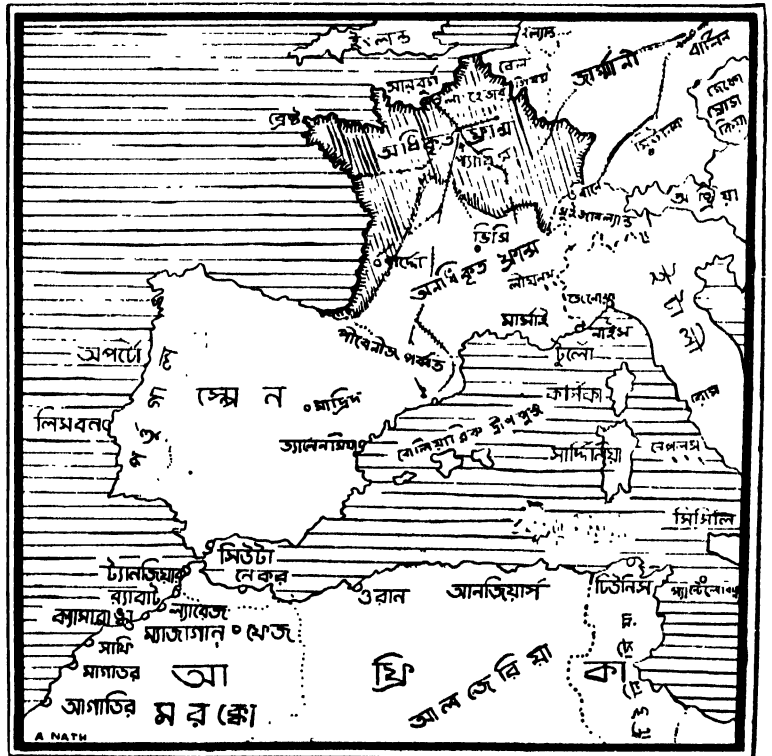
সম্মিলিত পক্ষের তৎপরতার ক্ষেত্র

হইবে; জলে হউক, আর বলেই হউক, আইবেরিয়ান্ উপদ্বীপের (স্পেন-পর্ত্তুগাল) প্রতিরোধ-ব্যবস্থায় তিনি জার্ম্মাণ-নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিবেন। তাহার পর রোমেলের সেনা-বাহিনী; ইতোমধ্যে টিউনিসিয়ায় জার্ম্মাণীর প্রচুর ডাইভ বমার; জঙ্গী বিমান ও কিছু সৈন্য

জেনারল ওয়েগাঁ

মার্শাল পেতাঁ

প্রেরিত হইয়াছে। মিত্রশক্তির সেনাবাহিনীর পূর্ব্বাভিমুখী অগ্রগতি নিবারণের জন্যই এই তৎপরতা। যত দূর মনে হয়, উত্তর আফ্রিকায় মিত্রশক্তির সহিত চরম শক্তি-পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইবার পরিকল্পনা জার্ম্মাণীর নাই; মার্কিণী সৈন্যের পূর্ব্বাভিমুখী অগ্রগতি অন্ততঃ সাময়িক ভাবে রুদ্ধ করিয়া হিটলার রোমেলের সেনাবাহিনীকে অক্ষত অবস্থায় লিবিয়া হইতে অপসারণের উদ্যোগ করিতেছেন। ফ্যাসিষ্ট পক্ষে আজ "দ্বিতীয় ডানকার্ক" সম্ভব হয় কি না, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

ইতোমধ্যে শ্রুত হইয়াছে—টুলোঁ হইতে ফরাসী নৌবহর মিত্র-শক্তির পক্ষে যোগদানের জন্য বহির্গত হইয়াছে। ওদিকে মার্শাল পেতাঁ না কি জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক যুদ্ধ-বিরতি-চুক্তি ভঙ্গ হওয়ায় উষ্মা প্রকাশ করিয়াছেন; তিনি ও জেনারল ওয়েগাঁ কোন অনির্দ্দিষ্ট স্থানে যাত্রা করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে আল্জিয়ার্সে এডমিরাল্ ডার্লাঁ বন্দী হইবার সংবাদ প্রচারিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে আর একটি জনরবে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইতে থাকে যে, ফরাসী উত্তর আফ্রিকার সজ্ঘর্ষ অকস্মাৎ থামিয়া যাইতে পারে। এই সকল সংবাদ হয় ত পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ-বিবর্জ্জিত নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—ভিসি-ফ্রান্সে জার্ম্মাণ-অনুরক্তি সম্বন্ধে তীব্র মতদ্বৈধ আছে, মার্শাল পেতাঁ, জেনারল ওয়েগাঁ প্রভৃতি কোন দিনই সম্পূর্ণরূপে জার্ম্মাণীর পদানত হইতে চাহেন নাই। বস্তুতঃ, মার্শাল পেতাঁর চেষ্টাতেই এত দিন—নামে মাত্র হইলেও—ফ্রান্সের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষিত হইয়াছিল। এই সকল রাষ্ট্রনায়ক এখন সম্পূর্ণরূপে জার্ম্মাণীর পদানত না হইয়া মিত্রশক্তির পক্ষাবলম্বনের সিদ্ধান্ত করিতে পারেন। আর এডমিরাল ডার্লাঁ? গত ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে ফ্রান্সকে যখন জার্ম্মাণীর নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হয়, তখন এডমিরাল ডার্লাঁ ফরাসী নৌ-বাহিনীর উদ্দেশে শেষ আদেশ দিয়াছিলেন—এখন হইতে আমি আর স্বাধীন নহি, অতঃপর আমার আদেশকে আর অধিনায়কের আদেশ মনে করিও না। এই উক্তি হইতেই ঐ সময় তাঁহার মানসিক অবস্থার আভাস পাওয়া যায়। অবশ্য, পরে বৃটিশ নৌবহরের ফরাসী নৌ-বাহিনী আক্রমণে এডমিরাল ডার্লাঁ অত্যন্ত বিরক্ত হন। সে যাহা হউক, ভিসি-ফ্রান্সে জার্ম্মাণ-বিরোধী মনোভাবের কথা বিবেচনা করিলে এবং পেতাঁ, ওয়েগাঁ, ডার্লাঁ প্রভৃতির ব্যক্তিগত মনোভাবের কথা স্মরণ করিলে আলজিয়ার্সে ডার্লাঁ বন্দী হইবার সংবাদ, যুদ্ধবিরতির সম্ভাবনা সম্পর্কিত জনরব পেতাঁ-ওয়েগাঁর নিরুদ্দেশ যাত্রা এবং টুলোঁ হইতে ফরাসী নৌবাহিনীর অন্তর্দ্ধানের কথায় একটি দীর্ঘ যোগসূত্রের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে।

(উদ্ভূত অবস্থা সম্বন্ধে প্রাপ্ত শেষ সংবাদ—জার্ম্মাণী সমগ্র অনধিকৃত ফ্রান্স অধিকার করিয়াছে, কর্সিকা ইটালীয় সৈন্যের অধিকারভুক্ত হইয়াছে; সম্মিলিত পক্ষের নূতন সৈন্য বনে অবতরণ করিয়া বিজার্টা অধিকার করিতে সচেষ্ট হইয়াছে। এ দিকে, ফরাসী-উত্তর আফ্রিকায় ভিসি-ফ্রান্সের সহিত সম্মিলিত পক্ষের যুদ্ধ থামিয়া গিয়াছে; এডমিরাল ডার্লাঁই যুদ্ধবিরতির নির্দ্দেশ দেন। ফরাসী নৌবহর টুলোঁ ত্যাগ করে নাই। পেতাঁ-ওয়েগাঁ কোথায়, তাহা অনিশ্চিত।)

মিশর রণক্ষেত্র ও সোভিয়েট প্রতিরোধ—

গত অক্টোবরের শেষভাগে জেনারল আলেকজাণ্ডারের বাহিনী মিশরের এল্-আলামিন্ রণক্ষেত্রে আক্রমণ আরম্ভ করে। তাহার পর, সমগ্র উত্তর-পশ্চিম মিশর হইতেই জার্ম্মাণ-ইটালীয় বাহিনী বিতাড়িত হইয়াছে। মিশরে মিত্রশক্তির এই সাফল্যের সহিত দক্ষিণ রুশিয়ায় সোভিয়েট বাহিনীর প্রতিরোধের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। গত জুন মাসে জেনারল অচিনলেকের বাহিনী যখন লিবিয়ার পূর্ব্বাঞ্চল হইতে বিতাড়িত হইয়া মিশরে আলেকজেন্দ্রিয়া হইতে ৭০ মাইল দূরবর্ত্তী এল্-আলামিনের স্বল্পপরিসর ক্ষেত্রে আশ্রয় লয়, তখন মিত্রশক্তির বহু ট্যাঙ্ক বিনষ্ট হইলেও বিমান-শক্তিতে তাঁহারা প্রবল থাকে। এল্-আলামিনে আশ্রয় গ্রহণের পর গত ৪ মাস মিত্রশক্তির বিমানবাহিনী শত্রুপক্ষকে অবিরাম আক্রমণ করিয়াছে, জেনারল রোমেলের সাহায্যার্থ সৈন্য ও সমরোপকরণ প্রেরণে বিশেষ বিঘ্ন ঘটাইয়াছে। এ দিকে দক্ষিণ রুশিয়ায় প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হওয়ায় জার্ম্মাণ সৈন্য পরিকল্পিত সময়ের মধ্যে অগ্রসর হইতে পারে না। এই জন্য উত্তর আফ্রিকা হইতে দক্ষিণ রুশিয়ায় বহু বিমান অপসারণের প্রয়োজন হয়; ইহাতে রোমেল্ আরও অসুবিধায় পড়েন। মিত্রশক্তির বিমান আক্রমণে তিনি

প্রয়োজনানুরূপ বাধা দিতে পারেন নাই; ভূমধ্যসাগরের অপর তীর হইতে প্রয়োজনানুরূপ সাহায্য পাইতেও বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। বিমান-শক্তিতে শত্রুপক্ষের এই দৌর্ব্বল্য সাধনে সোভিয়েট প্রতিরোধের পরোক্ষ সহযোগের গুরুত্ব অস্বীকার করা চলে না। তাহার পর, সোভিয়েট বাহিনীর প্রবল প্রতিরোধের ফলেই ইহা সুস্পষ্ট হয় যে,

মিশর রণক্ষেত্র

জার্ম্মাণ-সেনা অবিলম্বে ককেসাস্ ভেদ করিয়া পশ্চিম এশিয়ায় পৌঁছিতে পারিবে না। এই জন্যই পশ্চিম এশিয়া হইতে সৈন্য ও সমরোপকরণ প্রত্যাহার করিয়া মিশরে সম্মিলিত পক্ষের সেনাবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করা সম্ভব হইয়াছিল।

অমীমাংসিত রুশ-যুদ্ধ—

গত এক মাসে ষ্ট্যালিনগ্রাডে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত হয় নাই। নগর হিসাবে ষ্ট্যালিনগ্রাডের অস্তিত্ব এককপ বিলুপ্ত হইলেও সামরিক প্রয়োজনে উহা অধিকার করা জার্ম্মাণীর একান্ত প্রয়োজন ছিল। ষ্ট্যালিন্‌গ্রাড অধিকার করিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে আষ্ট্রাখান পর্য্যন্ত আক্রমণ প্রসারিত করিতে পারিলে সোভিয়েট-প্রতিরোধ-ব্যূহশ্রেণীর দক্ষিণ পার্শ্ব পঙ্গু হইত; সমগ্র ককেশাস্ বিচ্ছিন্ন-সংযোগ হইয়া পড়িত। সুদীর্ঘ ৪ মাস চেষ্টা করিয়াও জার্ম্মাণী ষ্ট্যালিনগ্রাডের প্রতিরোধ চূর্ণ করিতে পারে নাই। বস্তুতঃ, এই সর্ব্বপ্রথম ষ্ট্যালিনগ্রাডেই জার্ম্মাণীর সামরিক মর্য্যাদা আঘাত পাইল। গত বৎসর জার্ম্মাণ সেনা যখন মস্কোর উপকণ্ঠ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তখন শীত নিকটবর্ত্তী। কাজেই, মস্কো অধিকারের ব্যর্থতা সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দেওয়া সম্ভব ছিল; কিন্তু এই বৎসর জার্ম্মাণ সৈন্য ষ্ট্যালিনগ্রাড অধিকারের জন্য সুদীর্ঘ ৪ মাস চেষ্টা করিয়াছে। হিটলার তাঁহার এক সাম্প্রতিক বক্তৃতায় ষ্ট্যালিনগ্রাড অধিকৃত হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। কিন্তু এখন নূতন নূতন অঞ্চল সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি পূরণের প্রয়োজন তাঁহাকে যে ভাবে বিব্রত করিতেছে, তাহাতে ষ্ট্যালিনগ্রাড সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা অতি অল্পই।

ষ্ট্যালিনগ্রাডের যুদ্ধ এইরূপ "ন যযৌ ন তস্থৌ" অবস্থায় রাখিয়া সম্প্রতি জার্ম্মাণ বাহিনী অকস্মাৎ পূর্ব্ব ককেশাসে তৎপর হইয়াছিল। এই অঞ্চলে জার্ম্মাণ সেনা বহু পূর্ব্ব হইতেই মজদক্ হইতে গ্রজনী তৈলকূপে আক্রমণ প্রসারিত করিতে প্রয়াসী হয়। কিন্তু গত অক্টোবর মাসের শেষভাগে নাৎসী-সৈন্য অকস্মাৎ দক্ষিণ-পশ্চিমে নাল্‌চিক আক্রমণ করে। নাল্‌চিক অধিকারের পর উহার দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিক্ হইতে এবং মজদক্ হইতে গ্রজনীর দিকে সাঁড়াশী আক্রমণ প্রসারিত করিতে প্রয়াস পায়। ঐ সময় আশঙ্কা হইয়াছিল—নাৎসী বাহিনী হয় ত সোভিয়েট-প্রতিরোধ ভেদ করিয়া কাস্পিয়ানের তীরে পৌঁছিতে সমর্থ হইবে এবং তথা হইতে দক্ষিণ রুশিয়ায় তাহাদের চরম লক্ষ্যস্থল বাকু তৈলকূপে আক্রমণ চালাইতে পারিবে। কিন্তু নাৎসী বাহিনীর পক্ষে সোভিয়েট-প্রতিরোধ ভেদ করা সম্ভব হয় নাই; মজদকে ও নাল্‌চিকের দক্ষিণ-পূর্ব্ব সোভিয়েট সেনা শত্রুসৈন্যকে সাফল্যের সহিত বাধা দান করিতেছে। পশ্চিম ককেশাসে টুয়াপ্‌সে অধিকারের জন্য জার্ম্মাণীর চেষ্টাও অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। নভরোসিস্কের পর টুয়াপ্‌সে কৃষ্ণসাগরস্থিত সোভিয়েট নৌবহরের প্রধান অবলম্বন। টুয়াপ্‌সে অধিকার করিয়া উপকূলপথে বাতুম্ পর্য্যন্ত নাৎসী বাহিনীর আক্রমণ প্রসারিত হইলে সোভিয়েট নৌবহর নিরবলম্ব হইবে। কাস্পিয়ানের উপকূল ও কৃষ্ণসাগরের উপকূলপথে যদি জার্ম্মাণ-বাহিনী অগ্রসর হইতে পারে, তাহা হইলে সাঁড়াশীর আক্রমণে মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলের সোভিয়েট বাহিনী নিষ্পিষ্ট হইতেও পারে। কিন্তু দুই দিকের আক্রমণই প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হইয়াছে। বিশেষতঃ, ষ্ট্যালিনগ্রাডের প্রতিরোধ চূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত ককেসাস্ অঞ্চল বিচ্ছিন্ন-সংযোগ হইতে পারে না এবং ঐ অঞ্চল যত দিন রুশিয়ার অবশিষ্টাংশ হইতে সামরিক রসদ আহরণ করিতে পারিবে, তত দিন ককেসাসের যুদ্ধে জার্ম্মাণীর অনুকূলে চরম সিদ্ধান্ত হওয়াও সম্ভব নহে।

গত কিছু কাল জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির জন্য প্রবল আন্দোলন চলিতেছিল। অবস্থা এইরূপ হইয়া উঠে যে, মিত্রশক্তির রাষ্ট্রনায়কদিগের পক্ষে এই বিষয়টি আর "চাপা" দেওয়া সম্ভব নহে বলিয়া মনে হইতেছিল। এই জন্যই হয় ত জার্ম্মাণী দক্ষিণ রুশিয়ায় আক্রমণের বেগ শিথিল করিয়া অন্যান্য অঞ্চলের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে বাধ্য হয়। দক্ষিণ রুশিয়ায় জার্ম্মাণীর দ্রুত সাফল্যের পথে ইহা হয় ত বিশেষ অন্তরায় হইয়াছে। তাহার পর, এখন মধ্য-প্রাচীতে যে অবস্থার সৃষ্টি হইল, রুশ রণাঙ্গনে তাহার প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। কাজেই, আগামী শীতকালের পূর্ব্বে দক্ষিণ রুশিয়ার যুদ্ধে চরম সিদ্ধান্তের কোন সম্ভাবনা নাই বলিয়াই মনে হয়।

সুদূর প্রাচী—

দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে সম্মিলিত পক্ষ অষ্ট্রেলিয়ার নিকটবর্ত্তী সামরিক গুরুত্বসম্পন্ন অঞ্চল হইতে জাপানীদিগকে বিতাড়িত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। নিউগিনি ও সলোমান্‌সেই তাঁহাদিগের তৎপরতা অধিক। নিউগিনিতে অষ্ট্রেলিয়ান্ সৈন্য বিশেষ সাফল্য অর্জ্জনও করিয়াছে। সলোমান্‌স্ দ্বীপপুঞ্জে গুয়াডালক্যানারে জাপান সম্মিলিত পক্ষের আক্রমণ-প্রতিরোধের জন্য চেষ্টা করিতেছে।

দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের জলরাশিতে জাপানের প্রাধান্য এখনও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। নিউগিনিতে জাপানের পরাজয় সম্পর্কে সম্মিলিত পক্ষ হইতেই বলা হইয়াছে—এই অঞ্চল হইতে জাপানের সৈন্য প্রত্যাহার ইচ্ছাকৃত বলিয়াই মনে হয়। গুয়াডালক্যানার অঞ্চলে জাপানী নৌ-বহর মধ্যে মধ্যে প্রবল ভাবে আক্রমণ চালাইলেও ঐ অঞ্চল সম্পর্কেও জাপানের চরম প্রয়াস আরম্ভ হয় নাই। বস্তুতঃ, দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর সম্পর্কে জাপানের প্রকৃত অভিসন্ধি এখনও প্রকাশ পায় নাই। ইংরেজিতে সামরিক প্রবাদবাক্য আছে, Attack is the best form of defence—আক্রমণই প্রতিরোধের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। এই প্রবাদবাক্য অনুসারে অষ্ট্রেলিয়ার নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে মিত্রশক্তি পূর্ব্ব হইতেই আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছেন; জাপান এখন সেই আক্রমণ-প্রতিরোধের জন্য প্রয়াসী মাত্র। বস্তুতঃ, দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে যত দিন জাপানী নৌ-বহরের প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ না হইবে, তত দিন অষ্ট্রেলিয়া সম্পূর্ণ নিরাপদ হইবে না; কেবল বিমানবহরের সাহায্যে নৌবাহিনী প্রতিরোধ করা সম্ভব কি না, তাহা সমরবিশেষজ্ঞদিগের আলোচনার বিষয়। বিমান-শক্তির স্বল্পতার জন্য জাপান যদি অষ্ট্রেলিয়ায় সৈন্য অবতরণ করাইতে না-ও পারে, তাহা হইলেও নৌ-বাহিনীর সাহায্যে সে ঐ দ্বৈপায়ন মহাদেশের শক্তি বৃদ্ধিতে বিঘ্ন ঘটাইতে পারিবে। এখন জাপান অষ্ট্রেলিয়ার শক্তি বৃদ্ধিতে বিঘ্ন ঘটাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে, না, সেখানে প্রত্যক্ষ আক্রমণের উদ্যোগ করিবে, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে। আমরা ইতঃপূর্ব্বে একাধিক বার বলিয়াছি—অবিলম্বে জাপানের অষ্ট্রেলিয়া আক্রমণের সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হয় না। আমাদিগের সেই ধারণা পরিবর্ত্তনের কোন কারণ এখনও ঘটে নাই।

জাপানের আক্রমণ-প্রচেষ্টা ও ভারতবর্ষ—

গত অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে জাপানী বিমান চট্টগ্রাম, ডিব্রুগড় এবং আসামের আরও কয়েকটি বিমানঘাঁটিতে বোমাবর্ষণ করিয়াছে। গত ৩০শে অক্টোবর দিল্লীতে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়—জাপানী ও বর্ম্মীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া পূর্ব্ব সীমান্তে বৃটিশ-অধিকৃত অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হইতেছে এবং স্থানীয় অধিবাসীর নিকট হইতে তথ্য সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিতেছে।

বর্ষা অতীত হইয়াছে; শীত আসন্ন। অতি সত্বর পূর্ব্ব-ভারত যুদ্ধপরিচালনের উপযোগী হইবে। কাজেই, এই পূর্ব্ব-ভারতে জাপানের বিমান আক্রমণকে তাহার প্রত্যক্ষ অভিযানের পূর্ব্বাভাস বলিয়াই মনে হওয়া স্বাভাবিক। সীমান্ত অঞ্চলে জাপানী ও বর্ম্মীদিগের তৎপরতা সম্পর্কে মনে হইতে পারে—জাপান পূর্ব্ব ভারতের প্রতিরোধ-ব্যবস্থার দুর্ব্বল স্থান সন্ধান করিতেছে। অবশ্য, ইহাও সম্ভব—ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্মদেশে আক্রমণ পরিচালনের যে আয়োজনের কথা পুনঃ পুনঃ শ্রুত হইতেছে, সেই আয়োজন সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহের জন্য জাপানের এই প্রয়াস।

সম্মিলিত পক্ষের রাজনীতিকগণ আশ্বাস দিয়াছেন—জাপানের ভারত আক্রমণের সম্ভাবনা নাই। ভারতের প্রধান সেনাপতি ওয়াভেল্ ও মার্কিণী সেনাপতি বিজেল্ বলিয়াছেন—জাপানের পক্ষে এখন ব্যাপক আক্রমণে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভব নহে। জাপানের সামরিক শক্তির সন্ধান আমরা রাখি না; সে বিষয়ে মতামত প্রকাশের অধিকারী আমরা নহি। তবে, এই কথা দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে—এই বৎসরের শীতকালই জাপানের শেষ সুযোগ। পরবর্ত্তী বর্ষার পূর্ব্বে জাপান যদি বাঙ্গালা ও আসাম হইতে সম্মিলিত পক্ষের সমরায়োজন বিনষ্ট করিতে অথবা অপসারিত করাইতে না পারে, তাহা হইলে ব্রহ্মদেশ রক্ষা করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইবে। সম্প্রতি জাপান নান্‌কিং সরকারের সহিত সন্ধি করিয়া হাইনান্ দ্বীপের ইজারা লইয়াছে; ইহার ফলে চীনের উপকূলপথে ইন্দো-চীন তথা ব্রহ্মদেশে শক্তি বৃদ্ধির বিশেষ সুযোগ সে লাভ করিয়াছে। অবশ্য সম্প্রতি হংকংএ মার্কিণী বিমানের যে তৎপরতা আরম্ভ হইয়াছে, উহাতে এই সরবরাহ-সূত্র বিপন্ন হইতেছে কি না, তাহা বলা যায় না। সে যাহা হউক, নান্‌কিং সরকারের সহিত সন্ধিতে জাপান মাঞ্চুকো অঞ্চলের এবং চীনে অবস্থিত সমরোপকরণ নান্‌কিং সরকারকে প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছে। ইহাতে এইরূপ সঙ্গত অনুমান করা যাইতে পারে যে, জাপান নান্‌কিংকে দিয়াই চীনের যুদ্ধ চালাইবার মতলব আঁটিতেছে। ইতঃপূর্ব্বে চীনের অন্তর্দ্বন্দ্বের সময় চীনা সমর-নায়কগণ মধ্যে মধ্যে এক পক্ষ ত্যাগ করিয়া অন্য পক্ষে গমন করিয়াছেন। কাজেই, জাপান হয় ত আশা করে—চীনে পুনরায় গৃহযুদ্ধ ঘটাইতে পারিলে সেই পুরাতন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হইবে। ইহা ব্যতীত, জাপানের সহযোগে নান্‌কিংএর ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও সমৃদ্ধি দেখিয়া বহু চীনা ব্যবসায়ীর ও পুঁজিপাতির প্রলুব্ধ হইবার সম্ভাবনা আছে।

কিন্তু চীনের এই গৃহ-দ্বন্দ্বে নান্‌কিংএর জাপানী তাঁবেদারকে সাফল্যমণ্ডিত করাইতে হইলে চুংকিংকে বাহিরের সাহায্যে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন। এই জন্য ব্রহ্মদেশ জাপানের অধিকারভুক্ত থাকা আবশ্যক এবং এই জন্যই ব্রহ্মদেশ আক্রমণের ঘাঁটী পূর্ব্ব ভারতকে নিরস্ত্র করাও জাপানের প্রয়োজন। সম্মিলিত পক্ষ যে ব্রহ্মদেশ আক্রমণের আয়োজন করিতেছেন, তাহার নিশ্চিত আভাস পাওয়া গিয়াছে। জাপান এই আক্রমণ-প্রতিরোধের জন্য আয়োজন করিয়াই বসিয়া থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য, ইহাও সত্য, ব্রহ্মসীমান্তে কোন্ পক্ষের আক্রমণ প্রথমে আরম্ভ হইবে, তাহা লইয়া প্রতিযোগিতা চলিতে পারে।

সম্প্রতি উত্তর আফ্রিকায় ও য়ুরোপে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা ফ্যাসিষ্ট-শক্তির অনুকূল নহে। কাজেই, এই অবস্থার ফলে উৎকণ্ঠিত হইয়া জাপান আরও দ্রুত আক্রমণাত্মক প্রয়াসে প্রবৃত্ত হইতে পারে। উত্তর আফ্রিকায় উদ্ভূত অবস্থা হইতে ইহা নিশ্চিত বলা যায় যে, প্রতীচ্য মিত্রের নিকট হইতে অদূর ভবিষ্যতে পরোক্ষ সহযোগ লাভের আশা জাপানের আর নাই; একই সময়ে মধ্য-প্রাচী ও সুদূর প্রাচীতে "চাপ" দিবার পরিকল্পনা যদি ইতঃপূর্ব্বে রচিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপাততঃ উহা ব্যর্থ হইল। কাজেই, এখন আরও প্রতীক্ষায় জাপানের নিজেরই অসুবিধা বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা।

কেহ কেহ এইরূপ অনুমান করেন—আক্রমণে প্রবৃত্ত না হইয়া প্রতিরোধে প্রবৃত্ত থাকিলে অনেক সময় অল্প ক্ষতিতে শত্রুর অধিক ক্ষতিসাধন সম্ভব হয়। কাজেই জাপান ব্রহ্মসীমান্তের দুর্গম অঞ্চলে প্রতিরোধ-ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিয়া সম্মিলিত পক্ষের আক্রমণের জন্য প্রতীক্ষাও করিতে পারে।

ইহা নিছক সামরিক কৌশল ও সামরিক সুবিধা-অসুবিধা-সম্পর্কিত গবেষণা। তবে, বোধ হয়, ইহা বলা যায়, জাপানী নৌবহরকে প্রশান্ত মহাসাগরে ব্যাপৃত রাখিয়া ব্রহ্মসীমান্তে কেবল শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধে প্রবৃত্ত থাকায় জাপানে সর্ব্বনাশ সাধিত হইতে পারে। যদি নৌ-বাহিনী ও বিমানবাহিনীর সহযোগে ভারতবর্ষ হইতে প্রবল আক্রমণ আরম্ভ হয়, তাহা হইলে জাপানী সমর-নায়কদিগকে অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—জাপান যদি ব্রহ্মসীমান্তে কেবল প্রতিরোধাত্মক
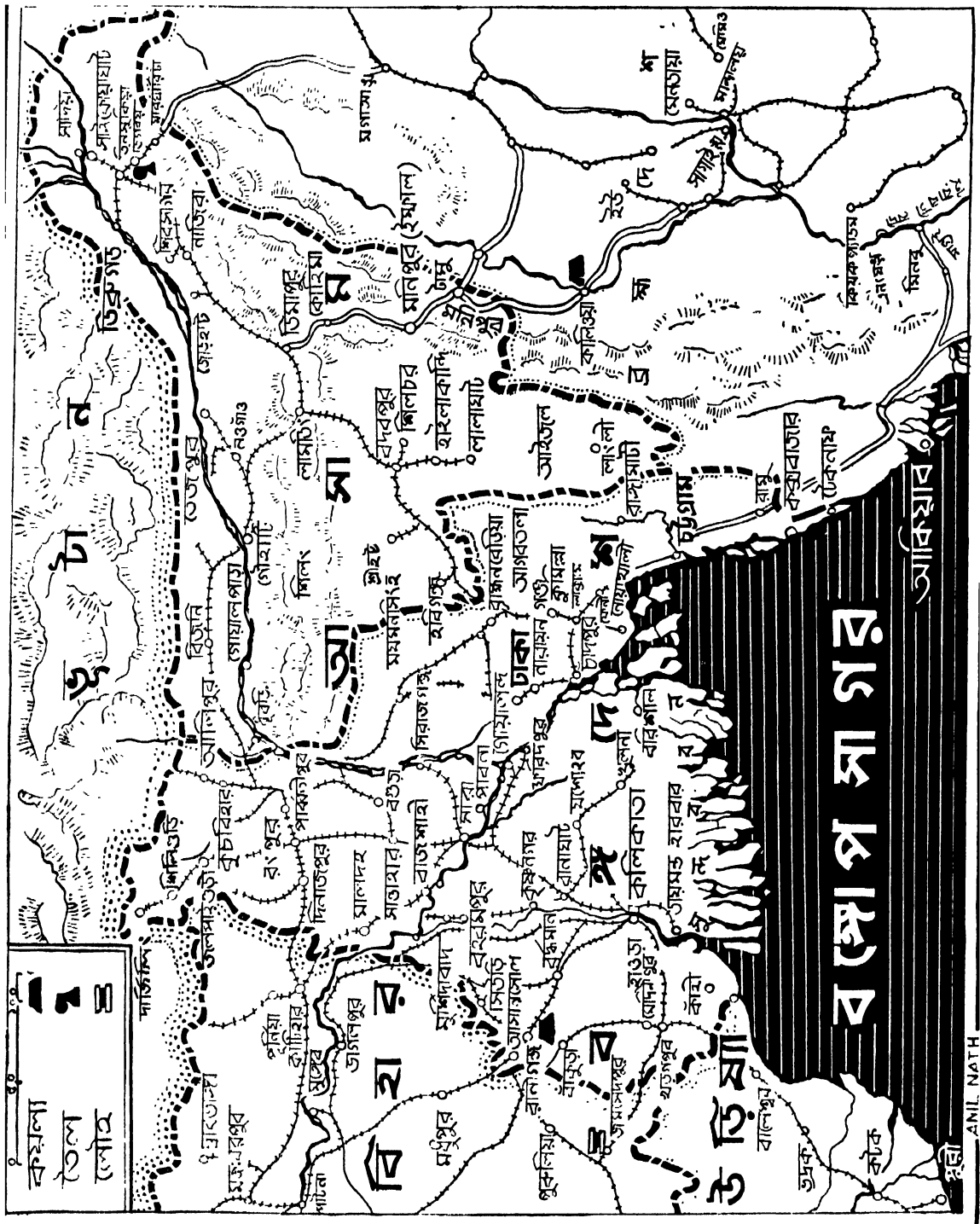
সংগ্রামে প্রবৃত্ত থাকে, তাহা হইলেও সামরিক প্রয়োজনেই পূর্ব্ব-ভারতে তাহার বিমান-আক্রমণ প্রসারিত হইবে।

এবং শত্রুর শ্রমশিল্প-প্রতিষ্ঠানে বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধাত্মক সংযোগ-সূত্রে সংগ্রামেরই অঙ্গ।

১১।১১।৪২

শ্রীঅতুল দত্ত।

মিথ্যার প্রচার

উৎকট সাম্রাজ্যবাদী ভারত-সচিব মিষ্টার আমেরী কিছু দিন পূর্ব্বে বিলাতের ক্যাক্সটন হলে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া এদেশের লোক ভারত-সচিবের প্রগল্‌ভতায় নূতনত্বের পরিচয় না পাইলেও ভারত সম্বন্ধে ও-দেশের লোকের অজ্ঞতাব বহর দেখিয়া তাহাদিগকে নিরতিশয় বিস্মিত হইতে হইয়াছে। বিলাতী শ্রোতার দল এই মিথ্যা কথাগুলি নির্ব্বিকার চিত্তে শ্রবণ করিয়া তাহা কি বিশ্বাস করিতে পারিয়াছেন ? কারণ, কথাগুলি ঐতিহাসিক তথ্য, রাজনৈতিক অভিমত নহে। কথা মিথ্যা হইলেও তিনি লজ্জা-সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া বলিয়াছিলেন, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে ঘোর অরাজকতা বিরাজিত ছিল ; ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বণিক্‌দল সেই সময়ে ঐ দেশ-শাসনেব শক্তি ক্রমশঃ অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু এদেশের ইতিহাসেব পাঠকগণ নিশ্চিতই জানেন—অষ্টাদশ শতাব্দীতে সর্ব্বত্র ঘোর অরাজকতা বিরাজিত ছিল, ইতিহাসে ইহা সত্য বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। সময়ে সময়ে কোন কোন স্থানে অরাজকতা লক্ষিত হইয়াছিল ইহা সত্য বটে, কিন্তু পৃথিবীর সকল দেশেই কোন না কোন সময়ে ঐরূপ অরাজকতাব আবির্ভাব হইয়া থাকে। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, কোন দেশে অরাজকতা স্থায়ী ভাবে বিরাজিত থাকিলে সে দেশের সর্ব্বপ্রকার সমৃদ্ধিই বিলুপ্ত হয়। দারিদ্র্য অরাজকতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। ব্রুকস্ এডামস্ তাঁহার বিরচিত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ The Law of Civilization and Decayতে স্পষ্টাক্ষরেই লিখিয়াছেন যে, পলাশীর যুদ্ধের পর বাঙ্গালার অর্থ বিলাতে নীত হওয়াতেই বিলাতের অধিবাসীরা সমৃদ্ধির পথে ঐ প্রকার অগ্রসর হইতে (অর্থাৎ বিপুল বিত্তের অধিকারী হইতে) পারিয়াছেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধ যেমন শেষ হইল আর সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার টাকা লুণ্ঠিত হইয়া বিলাতে রপ্তানী হইতে থাকিল, আর দেখিতে দেখিতে দড়িটানা মাকু, ধাতু গলাইবার জন্য পাথুরে কয়লার ব্যবহার, ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে হারগ্রীভ্‌সের চরকা (spining jenny), ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে ক্রম্‌টনের সূতা কাটিবার যন্ত্র, ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে আর্কবাটরাইটের যন্ত্র-চালিত তাঁত আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এবং ওয়াটের ষ্টিম-এঞ্জিন প্রভৃতির আবিষ্কারে বুঝিতে পারা যায়, বাঙ্গালার টাকা লইয়াই ইংরেজ-জাতির বুদ্ধি যেন ইন্দ্রজাল-কৌশলে খুলিয়া গিয়াছিল। এ কথা কি সত্য নহে যে, যাহারা বাঙ্গালা হইতে প্রথম যে সকল লুঠের মাল বিলাতে লইয়া গিয়াছিল, তাহাদের সেই দ্রব্য-সম্ভার দেখিয়া বিলাতের জন-সাধারণ বিস্ময়ে যেমন বিহ্বল হইয়াছিল, তেমনি ঐ সকল ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষ্যা, কৌতূহল এবং প্রতিযোগিতা করিবার ভাবে উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছিল ? ক্লাইভকে লোকে মেক্সিকো-বিজয়ী কর্টেজের তুল্য বলিয়া মনে করিয়াছিল। যদি অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালায় বা মাদ্রাজে ঘোর অরাজকতা বিরাজ করিত, তাহা হইলে এদেশে কি তত অধিক ধন-দৌলত থাকিত ? ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যে সকল কর্ম্মচারী এদেশে কেরাণীগিরি করিতে আসিয়াছিল, তাহারা এক-এক জন এক-একটি ক্ষুদ্র নবাব হইয়া উঠিয়াছিল।

বিলাতের লোক এই সকল অভ্রান্ত ঐতিহাসিক তত্ত্ব এত শীঘ্র ভুলিয়া মিষ্টার আমেরীর ঐ ভুল তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা শুনিয়া কিরূপে পরিপাক করিয়াছিলেন, তাহা উপলব্ধি করা কঠিন।

মিষ্টার আমেরীর স্বীকৃতি

ভারত-সচিব মিষ্টার আমেরী এত দিন পরে স্বীকার করিয়াছেন যে, কেবল কংগ্রেসই ভারতের স্বাধীনতা চাহে না, সকল সম্প্রদায়ের এবং সকল শ্রেণীর রাজনীতিকরাই ভারতের স্বাধীনতা-প্রাপ্তির দাবী করিতেছে। কিন্তু তিনি বলিতেছেন যে, সেই দাবী পূরণ করিবার পথে প্রধান বাধা এই যে, সকল সম্প্রদায়ের যাহাতে সুবিধা হয়, কোন সম্প্রদায় অন্য কাহারও প্রতি যাহাতে অত্যাচার করিতে না পারে, সেই প্রকার শাসন-পদ্ধতি উদ্ভাবিত করা যাইতেছে না। সকলেই জানে—"মনের অগোচর পাপ নাই।" এই বাধা কাহারা গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহা কি মিষ্টার আমেরী ও অন্যান্য ইংরেজের অজ্ঞাত ? সাম্রাজ্যবাদী সকল দেশেরই অধিবাসীদের মধ্যে নানা শ্রেণীর নানা সম্প্রদায় বিদ্যমান। মার্কিণে আছে, রুশিয়ায় আছে, কানাডায় আছে, দক্ষিণ-আফ্রিকায় আছে, চীনে আছে, সমগ্র বলকান রাজ্যেও আছে। কিন্তু সে জন্য কোন দেশেই শাসন-পদ্ধতি রচনায় কোন অসুবিধা হয় নাই ! এমন মামুলী আপত্তিও কখন শুনিতে পাওয়া যায় নাই ! বিধাতা কেবল ভারতের স্বায়ত্ত-শাসনের প্রতিকূলেই সমস্ত অসুবিধা ও নানা প্রকার আপত্তি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই বাধা বিঘ্ন সমস্তই কি ভারতকে চির-পরাধীন রাখিবার জন্য গোড়া হইতেই বিলক্ষণ মুন্সীয়ানার সহিত পরিকল্পিত নহে ? অন্ততঃ এ দেশের লোকের এরূপ বিশ্বাস হইয়া থাকিলে তাহাতে বিস্ময়ের কি কারণ থাকিতে পারে ?

সঞ্চয় নিষিদ্ধ

চাঁদপুরে ঢোল-সহরতে এই আদেশ ঘোষণা করা হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তিই অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত তাহার যে পরিমাণ চাউলের প্রয়োজন, তাহার অধিক চাউল সে ঘরে রাখিতে পারিবে না। যদি কেহ তাহা রাখে, তাহা হইলে তাহার অর্থদণ্ড হইবে। যাহাদের অধিক চাউল সঞ্চিত আছে, সে কথা তাহারা সরকারকে জানাইবে। সহজ বুদ্ধিতে এই ঢোলে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় কি ? কেবল চাঁদপুর অঞ্চলেই এই আদেশ প্রচারিত হইবার কারণ কি ? ঐ অতিরিক্ত চাউল জাপানীদের উদর পূর্ণ করিবে, এই ভয় ? কিন্তু এই সঞ্চয়-ভীতি কি চাঁদপুরেরই একচেটে ? চাঁদপুর মেঘনা-তীরবর্ত্তী বাণিজ্য-প্রধান বন্দর। কিন্তু কেবল ব্যবসায়ীই নহে, সর্ব্ব-সাধারণের উপর এই ঘোষণা প্রচার করা হইয়াছে। সুতরাং এ আদেশ হয় সমরনৈতিক

না হয় অর্থনৈতিক। সমরনৈতিক হইলে এ সম্বন্ধে আমরা নির্ব্বাক্; বাঙ্গালায় চট্টগ্রামে এবং আসামের ডিগবয়ে (ডিব্রুগড়ে) জাপানী বোমা দেখা দিয়াছে। কিন্তু কোথাও বিশেষ ক্ষতির সংবাদ পাওয়া যায় নাই। তথাপি কি সরকার জাপানী-আক্রমণ আসন্ন বলিয়া মনে করিয়াছেন? তাই জানিতে ইচ্ছা হয়, এই আদেশ কেবল চাঁদপুরেই জারি করা হইল কেন? এখন যোদ্ধৃবৃন্দের উভয় পক্ষই পরস্পর সন্নিহিত স্থানে কত দূর সুপ্রতিষ্ঠিত এবং তাহাদের বলাবল কত, তাহা নিরূপণের চেষ্টা করিবে। মার্কিণের ১০ম বিমান-বাহিনীর সেনাপতি বিসেল (Bissel) বলিয়াছেন—চীনে সেরা দিবার ব্যবস্থার দিকেই জাপানের এখন অধিক মনোযোগ পড়িয়াছে। ফলতঃ, জাপান এখন ভারত আক্রমণ করিবে না বলিয়াই অনুমান হয়। এ অবস্থায় উক্ত ঘোষণা-প্রচার সামরিক কারণ হইতে উদ্ভূত না হইতেও পারে। আর্থিক কারণে এইরূপ ঘোষণা হইয়া থাকিলে সেই আর্থিক কারণটি কি? আর্থিক কারণেই লোকে নিজ-গৃহে খাদ্য-বস্তু সঞ্চিত রাখে। ইহা এ দেশের সনাতনী নীতি। সে নীতি বিপর্য্যস্ত করিবার এমন কি কারণ ঘটিল, তাহা জানা নিষ্প্রয়োজন নহে।

কিন্তু সরকার অর্থনৈতিক কারণে এই আদেশ প্রচার করিয়া থাকিলে আমরা সরকারকে কয়টি বিষয় বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিতে বলি। প্রথম পৌষ মাসে নূতন চাউল উঠিলে সকলে তাহা পরিপাক করিতে পারে না। এই কারণেই সম্পন্ন গৃহস্থেরা বৈশাখ মাসের পূর্ব্বে নূতন চাউল ব্যবহার করেন না। দ্বিতীয়তঃ আগামী বারে ফসল কিরূপ হইবে, তাহা এখন বুঝিবার উপায় নাই। ঝড়ে-জলে ধানের প্রচুর ক্ষতি হইয়াছে। এই জন্যই ধান-চাউল সঞ্চিত রাখা একান্ত আবশ্যক। এখনই চাউলের যেরূপ মূল্য হইয়াছে, তাহাতে অনেক লোক অর্দ্ধাশনে দিন কাটাইতেছে। সুতরাং এ-অবস্থায় চাউলের মূল্য হ্রাস না হওয়া পর্য্যন্ত এরূপ আদেশ জারি করা সঙ্গত নহে।

মিল এবং গরমিল

নিজের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য বিলাতি সাম্রাজ্যবাদীরা যখন যে কথা বলিলে তাঁহাদের সুবিধা হইবে, তখন সেই কথা বলিতে দ্বিধা বোধ করেন না। উৎকট সাম্রাজ্যবাদীদিগের মুখপাত্র মিষ্টার আমেরী সে-দিন বলিয়াছেন, এইবার চীন জাপান প্রভৃতির সহিত ভারতবাসীদিগের কোন সম্বন্ধ বা সাদৃশ্য (affinity) নাই, বরং ইউরোপীয়ানদের সহিত সম্বন্ধ আছে। এ সম্বন্ধ আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণের সময় হইতে। আবার এই সকল সাম্রাজ্যবাদী দায়ে পড়িয়া সম্পূর্ণ উল্টা কথা বলিয়া থাকেন; বলেন—ভারতবাসীরা এসিয়াবাসী, সুতরাং তাহাদের দেশ স্বায়ত্ত-শাসন গজাইয়া তুলিবার উপযুক্ত নহে। গণতন্ত্রমূলক শাসন বা গণশাসন (Democratic Government) যে আলেকজাণ্ডারের ভারতে আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই এদেশে প্রচলিত ছিল, সুপ্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে তাহার অকাট্য প্রমাণ দেদীপ্যমান। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা নৃতত্ত্বের দিক্ দিয়া সমস্ত ককেসীয় জাতির জ্ঞাতিত্ব বা গোষ্ঠীগত সম্বন্ধ অস্বীকার করি না। আবার ভারতবাসীরা যে এশিয়াবাসী, এশিয়ার জলবায়ু তাহাদের জীবনে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দিয়াছে, তাহাও অস্বীকার করি না, এই য়ুরোপীয় পণ্ডিতরাও বলেন যে, ভারতবাসীর শোণিতে সামান্য পরিমাণ মঙ্গোলীয় শোণিত মিলিয়াছে। যখন চীনের সহিত ভারতীয় সখ্যের কথা উঠে, তখন তাঁহারা এ কথাটা ভুলিয়া যান। গরজ কি নাহি লাজ!

ডক্টর আম্বেদকরের জল্পনা

ডক্টর বি, আর, আম্বেদকর বৃটিশ সরকার কর্ত্তৃক তফশীলভুক্ত অনুন্নত সম্প্রদায়ের এক জন নেতা বলিয়া পরিচিত। বরোদার গায়কবাড়ের সরকার হইতে বৃত্তি পাইয়া তিনি মার্কিণ কলম্বিয়ার ডক্টর ছাপ আঁটিয়া দেশে ফিরিয়াছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত ডক্টরীতে তাঁহার মৌলিকতার কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। অনুন্নত জাতির মুরুব্বি হিসাবে তিনি তাহাদের জন্য কি করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ নাই। তাঁহার অনুন্নত শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান (Depressed Classes Institute) অনুন্নত সম্প্রদায়ের কি উপকার করিয়াছে, তাহাও সাধারণের অজ্ঞাত। জাতি-সম্পর্কিত তাঁহার উক্তি ও সিদ্ধান্তগুলি ভ্রান্ত তথ্যে এবং সিদ্ধান্তে পরিপূর্ণ। কিন্তু প্রত্যেক বিষয়েই মন্তব্য প্রকাশে তাঁহার সখ বিলক্ষণ প্রবল। সম্প্রতি মার্কিণের কতকগুলি লোক ভারত-সম্বন্ধে কিছু কিছু অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ করায় ইনি বলিয়াছেন যে, "যাঁহারা ঐরূপ কথা বলিতেছেন, তাঁহারা ঠিক খবর জানেন না, অর্দ্ধ-সত্য সংবাদ লইয়া মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন। ইহাতে ভারতের উপকার না হইয়া অপকারই হইবে।" এই কণ্ঠস্বর 'হিজ মাষ্টার্স ভয়েস' রেকর্ডের ন্যায় সুস্পষ্ট। ইহার মতে ভারত স্বায়ত্ত-শাসন লাভের অযোগ্য। অর্থাৎ "ভ্যাড়া বলে, কত জল?"

আটলাণ্টিক চার্টার

'আটলাণ্টিক চার্টার' নামক সনদ কাহাদের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইবে, সে বিষয়ে প্রথম হইতেই যথেষ্ট মতভেদ লক্ষিত হইতেছে। মিষ্টার চার্চ্চিল এত দিন ধরিয়া অভিনয়ের ভঙ্গিতে বলিয়া আসিতেছেন, ইহা এশিয়াবাসী বা অন্য কোন বর্ণ-জাতির প্রতি প্রয়োগ করা হইবে না। অথচ মার্কিণের প্রেসিডেণ্ট দলপতি মিষ্টার রুজভেল্ট এই প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ নির্ব্বাক্। হিন্দু মহাসভার সভাপতি মিষ্টার সাভারকর তাঁহার মত জানিবার জন্য তাঁহাকে তার করিলেও তিনি নিরুত্তর। সম্প্রতি প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট মিষ্টার উইলকির বক্তৃতা সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন—'Atlantic Charter applies to all humanity.' অর্থাৎ আটলাণ্টিক চার্টার সমগ্র মানব-জাতির সম্বন্ধেই খাটিবে। কথাটা শুনিয়া অনেকেই সুখ-স্বপ্নে বিভোর হইয়াছেন। কিন্তু মনে হয়, শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া কোন আশা পোষণ করা সঙ্গত নহে। ঘর-পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখিলেও আতঙ্কে অভিভূত হয়! আমাদেরও সেইরূপ অবস্থা! অবশেষে এই Humanity শব্দের অর্থ লইয়া তর্ক আরম্ভ হইবে না ত? পাশ্চাত্য রাজনীতির জটিল তত্ত্ব অনেক সময়েই আমাদের দুর্ব্বোধ্য। Disaffection শব্দের অর্থ লইয়া এক বার বোম্বাইয়ের উচ্চ আদালতে ঘোর বাদানুবাদ চলিয়াছিল। প্রেসিডেণ্ট উইলসনের ১৪

দফার পরিণাম কি হইয়াছিল? এখন আবার Humanity-র কোন্ অর্থ আবিষ্কৃত হয়, তাহা না দেখিয়া এ সম্বন্ধে "মতামত" প্রকাশ করা সঙ্গত হইবে না।

অপবাদের পর শাস্তি

প্রথমে অপবাদ, পরে শাস্তিদান—দুষ্ট লোকের এই কুনীতি চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। সাম্রাজ্যবাদীরা ইহার একটু পরিবর্ত্তন করিয়া স্ব স্ব কর্ম্মনীতি পরিচালিত করেন। তাঁহারা হীন স্বার্থরক্ষার জন্য প্রতিপক্ষের দুর্নাম রটনা করিয়া স্বকার্য্য সাধন করেন। ইহাই প্রাচ্যোচিত কার্য্য। লণ্ডনের 'নিউজ রিভিউ' নামক পত্রিকাখানি সাম্রাজ্যবাদীদিগের সম্পত্তি। গত ২০শে আগষ্ট এই পত্রিকায় অতি অদ্ভুত কথা লেখা হইয়াছে।—"গত সপ্তাহে গান্ধীকে গ্রেপ্তার করা সম্বন্ধে অতিরিক্ত কতকগুলি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। (১) কংগ্রেসী দলের কোন কোন সদস্যের জাপানী এবং জাপানীদিগের অনুকূল পক্ষের সহিত প্রত্যক্ষ সংস্রব আছে; ভারত সরকারের নিকট তাহার প্রমাণ আছে। (২) কতকগুলি ধনী দেশীয় কাপড়ের কলওয়ালাদিগের অর্থেই আইন-অমান্য আন্দোলন চলে। উঁহাদের বিশ্বাস, তীব্র জাতীয়তার ভাব জাগাইতে পারিলে দেশীয় শিল্পাদি সংগঠনের সুবিধা হইবে। এবং (৩) মহাত্মা গান্ধী এবার বড় বুদ্ধিমত্তা দেখাইতে পারেন নাই। ভারতে বৃটিশ শাসন ধ্বংস করিবার কল্পনা তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কাগজে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। কাগজগুলি পুলিশের হাতে পড়িয়াছে।" এই তিন দফা অভিযোগের কোন দফাই কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বিশ্বাস করিতে পারেন না। যাঁহারা অনেক বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীর মতের সমর্থন করেন না, তাঁহারাও এই প্রকার অমূলক অভিযোগ শুনিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন। প্রথম দুই দফা অভিযোগের কথা ভারত সরকার তাঁহাদের বিশ্বস্ত সচিবগণকে বলিয়াছেন কি? উহা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে তাঁহারা এত দিন তাহা প্রকাশ করিতেন। সুতরাং উহা বেবনিয়াদ! আর তৃতীয় অভিযোগটি হাস্যোদ্দীপক। স্বার্থসিদ্ধির জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা কত দূর নামিতে পারেন, ইহা কি তাহারই প্রমাণ নহে?

সিংহলে চাউল রপ্তানী

সিংহলকে ভারত হইতে প্রতি মাসে ২০ হাজার টন অর্থাৎ অন্ততঃ ৪ লক্ষ ৬৫ হাজার মণ চাউল যোগাইতেই হইবে। তাহা ভিন্ন যদি আর কিছু অধিক পাওয়া যায়, তাহাও দিতে হইবে। সিংহলের রাষ্ট্রীয় পরিষদে সিংহলের স্বরাষ্ট্র-সচিব সার ব্যারণ জয়তিলক এই কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু এত চাউল ভারতবাসী কোথায় পাইবে? সিংহলে যখন ধানের চাষ অধিক হইত, তখন ভারতেও ধানের চাষ অধিক হইত। সিংহল যেমন তাহাদের দেশে ব্রহ্মদেশের চাউলের ভরসায় ধানের আবাদ কমাইয়া চা, কোকো, তামাক, রবার, সিঙ্কোনা, লবণ, এলাচ, দারুচিনি, জায়ফল, তৈলবীজ এবং নারিকেলের চাষ করিতেছে, ভারতও তেমনি ঐ ব্রহ্মদেশের ভরসায় বাণিজ্যপণ্য উৎপন্ন করিয়া ধানের চাষ কমাইয়াছে। এই যুদ্ধের পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতে কত চাউল আমদানী করা হইত, তাহা দেখিলেই ইহা প্রতিপন্ন হইবে। ফলে সিংহলেরও যে দশা হইয়াছে, ভারতেরও ঠিক সেইরূপ দুরবস্থা। এই দুই দেশ কি উপায়ে পরস্পরকে সাহায্য করিতে পারে? তবে কি ভারতবাসীরা অনাহারে মরিয়াও সিংহলকে চাউল যোগাইতে বাধ্য হইবে? এরূপ অসঙ্গত আব্দার মানুষ কখনও করিতে পারে কি? ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্যান্য অংশে যেখানে চাউল উৎপন্ন হয়, সেই স্থান হইতে সিংহলবাসীরা চাউল আমদানী করিবার চেষ্টা করেন না কেন? তাহারা সিংহলে ধানের চাষ বৃদ্ধির জন্যও চেষ্টা করিতে পারেন ত! ভারতের লোককে না খাইতে দিয়া সিংহলে চাউল চালান দিতে হইবে, এ বড় অদ্ভুত আবদার! এ দেশে আটা, ময়দা, চাউল প্রভৃতির মূল্য এত অধিক হইয়াছে যে, তাহা ক্রয় করা অনেকের পক্ষেই কঠিন হইতেছে। এ দেশের বহু লোককে অনাহারে দিনপাত করিতে হইতেছে।

চার্চ্চিলের কথা

বিলাতের ম্যান্সন হলে সম্প্রতি সম্রাটের প্রধান-মন্ত্রী মিষ্টার উইনষ্টন চার্চ্চিল যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে আশাবাদী ভারতবাসীদিগের সকল আশা নৈরাশ্যের পারাবারে নিমজ্জিত হইয়াছে। তিনি তাঁহার বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, "আমি বৃটিশ সাম্রাজ্যকে ডুবাইয়া দিবার সভায় সভাপতিত্ব করিবার জন্য সম্রাটের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করি নাই। বৃটিশ-সম্রাটের ছায়াতলে যে স্বাধীন রাজ্যসমষ্টি এবং জাতিসঙ্ঘ গড়িয়া উঠিয়াছে, আমি তাহাতে এক জন বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করি।" সাম্রাজ্যবাদীরা বচনে বৃহস্পতি হইয়া থাকেন! Commonwealth of Nations প্রভৃতি গালভরা নাম দিয়া অধীন রাজ্যগুলিকে অভিহিত করা সাম্রাজ্যবাদীদিগের স্বার্থসাধনের একটা কৌশল। সাম্রাজ্যবাদীদিগের শ্রেষ্ঠ মিষ্টার চার্চ্চিল সে কথার কৌশল খুবই জানেন। কিন্তু ইহা তাঁহাদের বেশ বুঝা উচিত যে, বিধাতার রাজ্যে চিরকালই ভণ্ডামি করিয়া কার্য্যোদ্ধার সম্ভব নহে। তবে আমাদের দেশের লোকের ইহা মনে হইতেছে যে, বৃটিশ জাতি এখন বা অচির-ভবিষ্যতে ভারতবাসীকে স্বায়ত্ত-শাসন দিতে সম্মত নহে। অতএব তাঁহাদের অধীর হওয়া সঙ্গত নহে। বিধাতার কৃপা হইলেই ভারতবাসী স্বায়ত্ত-শাসন পাইবে। আর উহা পাইবার জন্য ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতে হইবে। বিধাতার কৃপা হইলেই বৃটিশ জাতির ভারতকে স্বাধীনতা দিবার আকাঙ্ক্ষা জন্মিবে;—অন্যথা নহে।

সেবা প্রতিষ্ঠান

কল্যাণীয়া সিষ্টার তরু ঘোষ শিক্ষিতা নার্স ও অভিজ্ঞা ধাত্রীগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া ১।১।১ বি, কলেজ স্কোয়ার এবং ১৪২ এফ রসা রোড ভবানীপুরে নার্সেস ইউনিয়ান প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সিষ্টার তরু ঘোষ ও তাঁহার সহকর্ম্মিণীগণের আত্মনিবেদিত সেবা-কার্য্য দেখিয়া আমরা বিশেষ প্রীত হইয়াছি। য়ুরোপীয় নার্সগণের শিক্ষা ও সেবা-নিপুণতার তুলনায় ইঁহাদের অভিজ্ঞতা ও শুশ্রূষানৈপুণ্য কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে—অথচ ব্যয় য়ুরোপীয় নার্সের তুলনায় স্বল্প।

মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ও ধনী-সম্প্রদায় গৃহে রোগ-যন্ত্রণার সময়ে ইঁহাদের সেবা-নিপুণতায় উপকৃত হইতেছেন ; এবং অভাবগ্রস্ত ভদ্র পরিবারের মেয়েরাও এই ভাবে সেবা-ব্রত গ্রহণ করিয়া স্বাবলম্বিনী হইতে পারিতেছেন। আমরা এই প্রতিষ্ঠানের আরও উন্নতি কামনা করি। সিষ্টার তরু ঘোষের সাধনা সার্থক হউক !

টাকা অচল

গত ১৩ই আশ্বিন বুধবার ভারত সরকারের অর্থবিভাগ হইতে এই মর্ম্মে এক ইস্তাহার প্রচারিত হইয়াছে যে, ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ১লা মে (অর্থাৎ বৈশাখ মাসের ১৭ই হইতে) সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ এবং ষষ্ঠ জর্জ্জের নামে প্রচারিত টাকা ও আধুলি বাজারে চলিবে না। তবে ভারতীয় পোষ্টাফিস, ট্রেজারী ও রেল-ষ্টেশনে আগামী বৎসরের কার্ত্তিক মাসের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত (অর্থাৎ ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত) উহা চলিবে ; তাহার পর ঐ সকল স্থানেও আর চলিবে না। তবে তাহার পরেও তাহা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ শাখায় গৃহীত হইবে। সরকার টাকায় অধিক রূপা রাখিতে ইচ্ছা করেন না ; তাই অতঃপর যে টাকা প্রবর্ত্তিত হইবে, তাহার আসল মূল্য অর্থাৎ ধাতব মূল্য অল্পই হইবে। তাহা সুর-মরা বা ক্ষয় হইলে তাহার বিনিময়ে রৌপ্য পাইবার আর আশা থাকিবে না ! ব্যবহারে উহার অক্ষর ঘসিয়া গেলে উহা অচল হইবে এবং সে জন্য সাধারণের ক্ষতিই হইবে। ইহা হইবে পূর্ণমাত্রায় ভাক্ত মুদ্রা (Token Coin)। ইহার ফলে কেবল আন্তর্জ্জাতিক বিনিময়ের অর্থাৎ বাট্টার বাজার বিপর্য্যস্ত হইবে, তাহা নহে,—দেশের মধ্যেও পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পাইবে। আসল মূল্যের ক্ষুদ্র মুদ্রাও ভারতে আর চলিত থাকিল না, দেখিতেছি ! ক্রমশঃ আমরা বিজ্ঞ হইতেছি !

আটলাণ্টিক ম্যাগাজিনের মত

'আটলাণ্টিক ম্যাগাজিন' মার্কিণের একখানি বিশিষ্ট সাময়িক পত্র। উহাতে সম্প্রতি ভারতীয় সমস্যার কথা আলোচিত হইতেছে। উক্ত সংবাদ-পত্রে প্রকাশ যে, "ভারতীয় সমস্যার সমাধান-কল্পে সম্মিলিত জাতিগুলির সম্মিলিত ভাবেই আত্মনিয়োগ করা কর্ত্তব্য।" উহাতে বলা হইয়াছে যে, "কংগ্রেসের সহিত পরামর্শ না করিয়া ভারতীয় সমস্যার সমাধান করা সম্ভবে না। সত্য বটে, কংগ্রেসই ভারত নহে, ইহার সামাজিক কোন কার্য্যসূচি নাই এবং ইহার কোন গণতান্ত্রিক ভিত্তিও নাই। শ্রমশিল্পসেবী ব্যক্তিগণই আংশিক ভাবে ইহার পৃষ্ঠপোষক। তাহা সত্ত্বেও ইহা ভারতের প্রকৃত জাতীয়তাবাদীদিগেরই প্রতিনিধি-সভা। রয়টার সংবাদ দিয়াছেন, এই পত্রিকায় প্রকাশ—কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে বৃটিশ সরকার এবং মার্কিণী সরকার চীনের সানিয়েৎসেনের বিরুদ্ধবাদী উন্নতি-বিরোধী সামরিকদিগেরই সমর্থন করিয়াছিলেন। ইহার ছয় বৎসর পরে তাঁহারাই আবার জাতীয়তাবাদীর সহিত বিবাদ মিটাইয়া চুক্তি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সামরিক দলের সহিত চুক্তি করেন নাই।" "কংগ্রেসের নেতাদিগকে কারারুদ্ধ না করিয়া বরং মুস্লিম-লীগের নেতৃবর্গকে কারারুদ্ধ করিলে অধিক বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ পাইত, চীনের ইতিহাস হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয়।" চিরকালই সকল মানুষের চক্ষুতে ধূলি দিয়া চাতুরী খাটাইয়া রাখা যাইবে—তাহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না ! অন্য মত ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ইহাই বিধাতার বিধান।

ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

কলিকাতা হালসী-বাগানে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। কলিকাতার ইতিহাসে এরূপ অগ্নিকাণ্ডে আর কখনও এত লোক জীবন্ত দগ্ধ হন নাই। কলিকাতা হালসী-বাগান রোডে আনন্দ আশ্রমে কালীপূজার অনুষ্ঠান হয়। ২২শে কার্ত্তিক রবিবার অপরাহ্ণে উক্ত পূজামণ্ডপে বিবিধ ব্যায়াম-ক্রীড়া প্রদর্শিত হইবার সময় সহসা আগুন লাগে। দেখিতে দেখিতে হোগলার বৃহৎ মণ্ডপে অগ্নিরাশি ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। মণ্ডপের চারি দিক্ প্রাচীর-বেষ্টিত। তাহার দুইটি দ্বারের মধ্যে একটি পুরুষের জন্য, আর একটি স্ত্রীলোকদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। স্ত্রীলোকদিগের দ্বারটি চাবি-বন্ধ ছিল এবং চাবি লইয়া কেহই সেখানে উপস্থিত ছিল না ; কাজেই সেই দ্বার দিয়া কেহ বাহির হইতে পারেন নাই। অগ্নি যখন সমস্ত হোগলার মণ্ডপ দগ্ধ করিতে থাকে, সেই সময় স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকারা বাহির হইতে পারে নাই। মণ্ডপের হোগলার আচ্ছাদন বাঁশ-দড়ি সহ জ্বলন্ত অবস্থায় সেই সন্ত্রস্ত ও বিক্ষুব্ধ জনতার উপর ভাঙ্গিয়া পড়ে। সুতরাং স্ত্রীলোক এবং বালক-বালিকাগণ তাহার মধ্যে জীবন্ত দগ্ধ হইতে থাকেন। প্রায় ১৪১ জন নারী ও বালিকা ঐ স্থানে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন। এতদ্ভিন্ন আরও বহু লোক সাংঘাতিক ভাবে দগ্ধ হন। অর্দ্ধমৃত অবস্থায় যাঁহাদিগকে হাসপাতালে পাঠানো হইয়াছিল, তাঁহাদেরও অনেকে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। বস্তুতঃ, দেড় শতের অধিক লোক এই দুর্ঘটনায় অপমৃত্যু বরণ করিয়াছেন। দগ্ধ লোকের সংখ্যাও শতাধিক ছিল। এখন জিজ্ঞাস্য, এইরূপ শোচনীয় ব্যাপার কেন ঘটিল ? অনুষ্ঠাতাদিগের বিষম অযোগ্যতায় এবং অপরিণামদর্শিতার ফলেই যে এই ভীষণ শোচনীয় কাণ্ড ঘটিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হোগলায় সহজে অগ্নি লাগিতে পারে। সেই হোগলার মণ্ডপের চারি দিক্ বন্ধ করিয়া সেখানে এরূপ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা কখনই সঙ্গত হয় নাই। অস্থায়ী বৈদ্যুতিক তারের সংযোগ-দোষে এরূপ অগ্নিকাণ্ড হওয়া বিচিত্র নহে। এই অগ্নিকাণ্ডে একটি স্ত্রীলোকের সাতটি সন্তান জীবন্ত পুড়িয়া মরিয়াছে। আর কত শোচনীয় ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহার সকল বিবরণ কি লোকে জানিতে পারিয়াছে ?

২৫শে কার্ত্তিক কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে পাঁচ জন কাউন্সিলার ও তিন জন বিশিষ্ট নাগরিক লইয়া তদন্ত-কমিটি গঠিত হইয়াছে। প্রস্তাবটি আলোচনা-সময়ে যে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা আলোচিত হইয়াছে, তাহা শোচনীয়। হোগলার মণ্ডপের বাঁশগুলি সন্নিকটবর্ত্তী বাড়ীর সহিত বাঁধা ছিল—অগ্নি-বিস্তারের আশঙ্কায় দড়িগুলি কাটিয়া দেওয়ায় সমগ্র জ্বলন্ত চালটি জনতার উপর অতি-শীঘ্র পতিত হইয়াছিল। দম-কল এবং এ, আর, পির উদ্ধার-কারীদের পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সব শেষ হইয়া গিয়াছিল। উৎসব-মণ্ডপে

এক জনও স্বেচ্ছাসেবক বা এক-বালতী জলেরও ব্যবস্থা ছিল না। বিভিন্ন হাসপাতালে প্রেরিত এতগুলি অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তির এক-সঙ্গে অনুরূপ পরিচর্য্যারও সুবিধা ঘটে নাই এবং তাহা সম্ভব ছিল না! তদন্তের পর যাহাদিগের দোষে এবং অবিমৃষ্যকারিতায় এই কাণ্ড ঘটিয়াছে, তাহাদিগের প্রতি যথাযোগ্য দণ্ডের ব্যবস্থা করা অবশ্য-কর্ত্তব্য। অনিচ্ছাকৃত হইলেও যে ত্রুটির ফলে এইরূপ শোচনীয় জনক্ষয় হয়, তাহা কদাচ মার্জ্জনীয় নহে এবং ভবিষ্যতে যাহাতে এরূপ মূঢ়তা প্রকাশের অবকাশ না ঘটে, এমন ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

পয়সার অভাব

আশ্চর্য্যের বিষয়, লোকের এই ঘোর অর্থাভাবের দিনে বাজার হইতে পয়সা যেন মন্ত্রবলে উড়িয়া গিয়াছে! অতি-দরিদ্র লোকেরই পয়সার প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। গরীব এক পয়সার শাক, লবণ প্রভৃতি কিনিয়া খায়; তাহা কিনিতে পারিতেছে না। অনেক ভদ্রঘরের বিধবা প্রভৃতির আয় মাসিক দশ-বারো টাকার অধিক নহে; তাঁহারা এই বিপদে নিরুপায়। যাহারা শাক, ডুমুর প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া কোনরূপে এক বেলার উদরান্নের সংস্থান করিত, পয়সার অভাবে তাহাদের পণ্যগুলির বিক্রয় বন্ধ। ইহার জন্য কত-লোকের যে ঘোর কষ্ট হইতেছে, তাহা সহরবাসীর অগোচর। তিন পয়সার বা পাঁচ পয়সার জিনিষ কিনিবার উপায় নাই। অনেকে পরদুঃখে কাতর হইয়া একটি পয়সা ভিক্ষা দিয়া থাকেন, পয়সার অভাবে তাঁহাদের দানের প্রবৃত্তি সঙ্কুচিত হইতেছে। বাজার হইতে হঠাৎ পয়সার অদর্শন ঘটিল কেন, তাহা বুঝা যায় না। যুদ্ধের জন্য সরকারের যদি তামার পয়সার দরকার থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা বাজারে অন্য ধাতুর পয়সা চালাইয়া তামার পয়সা প্রত্যাহার করিলেন না কেন? ট্রাম-কোম্পানী খুচরা চেঞ্জ দিবার জন্য এক পয়সা দুই পয়সার কুপন বাহির করিয়াছেন। তামার পয়সার অভাবে বাজারে এমনি কুপন চলিবে কি? এ বিষয়ে বঙ্গীয় সরকারের দৃষ্টি অবিলম্বে আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

বাঙ্গালায় বাত্যা ও বন্যা

গত দুর্গাপূজার সপ্তমীর দিন বাঙ্গালার উপর দিয়া প্রবল ঝড় বহিয়া গিয়াছে। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে যে ঝড় নোয়াখালী ও বাকরগঞ্জের উপর দিয়া প্রবাহিত হয়, তাহাতে যেমন ঝড় ব্যতীত জলোচ্ছ্বাসেও বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল—এ বারও তেমনই ঝড়ে ও জলোচ্ছ্বাসে মেদিনীপুর এবং ২৪ পরগণা জিলাদ্বয়ের কতকাংশে যে-ক্ষতি হইয়াছে, তাহা কখন পূর্ণ করা সম্ভব হইবে কি না, বলা যায় না! ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ঝড়ে ও জলোচ্ছ্বাসে, সরকারী হিসাবে, প্রায় লক্ষ লোকের প্রাণহানি ঘটিয়াছিল। এ বার ক্ষতির পরিমাণ এখনও জানা যায় নাই।

এ বার অবস্থা বিবেচনা করিয়া দুর্ঘটনার পরে প্রায় পক্ষকাল কোন সংবাদ প্রকাশ করিতে নিষেধ ছিল। বাঙ্গালার সচিবদিগের মধ্যে ৩ জন—ডক্টর শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নবাব খাজা হবিবুল্লা বাহাদুর ও শ্রীযুত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিধ্বস্ত অঞ্চলে সফর হইতে ফিরিয়া ২রা নভেম্বর (অর্থাৎ ঘটনার পক্ষ-কাল পরে) ঐ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত এক সরকারী বিবৃতি প্রকাশ করেন। তৎকালে তাঁহারা বলেন—সে পর্য্যন্ত প্রাপ্ত সংবাদে বলা যায়, মেদিনীপুর জিলায় ১০ হাজার এবং ২৪ পরগণা জিলায় ১ হাজার লোক প্রাণ হারাইয়াছে; প্রায় শতকরা ৭৫টি গৃহ-পালিত পশু নষ্ট হইয়াছে; মাটীর বাড়ী প্রায় সবই হয় নষ্ট, নহেত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

সরকারের এই সংক্ষিপ্ত বিবৃতি হইতে ঘটনার গুরুত্ব অনুমান করাও যায় না। তবে সরকারী হিসাবে—যে সংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে,—তাহার পরে জানা গিয়াছে, মৃতের সংখ্যা তদপেক্ষা বহুগুণ অধিক।

তবে ঐ বিবৃতিতেই বলা হইয়াছিল, সরকার সাহায্য-দানের যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিলেও কেবল সরকারের সাহায্যে বিপন্ন ব্যক্তি-দিগের উদ্ধার-সাধন সম্ভব হইবে না। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের প্রাকৃতিক উপদ্রবের ফলে ঐ অঞ্চলে স্থায়ী ক্ষতি হয় নাই—কৃষিকার্য্যের অসুবিধা হয় নাই। এ বার কিরূপ হইবে, তাহা বলা যায় না।

যদি ধরা যায়, শতকরা ৭৫টি গবাদি পশু নষ্ট হইয়াছে, তবে প্রথম জিজ্ঞাস্য—কৃষিকার্য্য কিরূপে নির্ব্বাহিত হইবে?

মোট কত লক্ষ বা কোটি টাকা হইলে সাহায্যদান কার্য্য সম্পূর্ণ করা সম্ভব, তাহার হিসাব এখনও বোধ হয়, হয় নাই।

তমলুক মহকুমার কোন গ্রামের ধ্বংসাবশেষ

ঘটনার পরেও প্রায় পক্ষকাল বাঙ্গালার গভর্ণর সার জন হার্বার্ট শৈলশিরে ছিলেন। তিনি ফিরিয়া ১১ই নভেম্বর এক আবেদন প্রচার করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন:—

"বাঙ্গালায় এ বার যেরূপ ক্ষতিকর ঝড় হইয়াছে, সেরূপ ক্ষতিকর ঝড় অধিক হয় নাই। সরকার যথাসাধ্য লোকের সাহায্যের ব্যবস্থা করিতেছেন; কিন্তু দয়া-দত্ত দানে আরও অনেক কাজের অবকাশ রহিয়াছে।" আর—

"এই অবস্থায় আমি এই আশায় এই আবেদন প্রচার করিতেছি যে, ইহা বাঙ্গালার সকল সম্প্রদায়ের লোকের সাগ্রহ ও উদার সাহায্য-প্রাপ্তির কারণ হইবে। আমি জানি, আরও অনেকে ইতোমধ্যেই এই কার্য্যের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিয়া আবেদন প্রচার করিয়াছেন—তাঁহাদিগের সাহায্য-দানের সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছেন।

"আমি তাঁহাদিগকে আমার সহিত সহযোগ করিতে আহ্বান

করিতেছি যে, আমরা যেন এই দারুণ প্রাকৃতিক উপদ্রবে বিপন্ন ব্যক্তিদিগকে আমাদিগের আন্তরিক সহানুভূতির পরিচয় দিতে পারি।

"এইরূপ অবস্থায় রাজনীতিক বা অন্যবিধ বিচ্ছেদাত্মক ভাব বর্জ্জন করিয়া বিপন্নের সাহায্যের জন্য সমবেত ভাবে চেষ্টা করাই প্রয়োজন।"

এই আবেদন-প্রচারে যে বিলম্ব হইয়াছে, তাহা হয়ত অনিবার্য্য। লর্ড কার্জ্জন এক বার, অন্য প্রসঙ্গে, বলিয়াছিলেন—সরকারের পক্ষে কোন কাজে অবহিত হইতে বিলম্ব হয়। কিন্তু সরকার কোন কাজে অবহিত হইলে যে কর্ত্তব্য-পালনে তৎপরতার পরিচয় প্রদান করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমরা আশা করি, যে সকল প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে সাহায্য-দান কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে কেবল কাজের সুবিধা দেওয়াই হইবে না; পরন্তু তাঁহাদিগের সহিত সরকার আন্তরিকভাবে সহযোগ করিবেন। রামকৃষ্ণ মিশন, হিন্দু মহাসভা, মাড়বারী রিলিফ সোসাইটী প্রভৃতি যে সকল কেন্দ্রে কাজ করিতেছেন বা করিবেন, সে সকল কেন্দ্রে তাঁহাদিগের সহিত সহযোগিতা করিয়া কাজ সুসম্পন্ন করিবার ব্যবস্থা হইবে।

গত ১২ই নভেম্বর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় রাজস্ব-সচিব শ্রীযুত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে যেমন ধ্বংসের পরিমাণ অনুমান করা যায়, তেমনই সরকারের সাহায্যদান-পরিকল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি মেদিনীপুরের অবস্থা সম্বন্ধে বলিয়াছেন:—

মেদিনীপুরের উপকূলবর্ত্তী ৫টি থানাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। প্রায় সমগ্র অঞ্চলেরই সকল ঘর ধ্বংস হইয়াছে এবং শতকরা ৭৫টি গবাদি পশু মারা গিয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা যায় যে, কেবলমাত্র এই অঞ্চলেই ৩ লক্ষ ঘর ও ৬০ হাজার গবাদি পশু ধ্বংস হইয়াছে। তমলুক ও কাঁথি মহকুমার অবশিষ্ট ৭টি থানা এবং সদর ও ঘাটাল মহকুমার ১৩টি থানায় কম পক্ষে ৪ লক্ষ ঘর পড়িয়া গিয়াছে। প্রায় ১৫ হাজার গবাদি পশু মারা গিয়াছে। এইরূপে প্রায় ৭ লক্ষ ঘর ধ্বংস হইয়াছে। ১৫ লক্ষ লোক গৃহহীন হইয়াছে। ৭৫ হাজার গবাদি পশু মারা গিয়াছে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসন প্রভৃতিরও ঐ অনুপাতে ক্ষতি হইয়াছে।

ইহার পর এই কল্পনাতীত ক্ষতিতে সরকার পানীয় জল সরবরাহের ও চিকিৎসার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা ব্যতীত সাধারণ সাহায্যদানের এইরূপ ব্যবস্থার পরিকল্পনা হইয়াছে:—

খাদ্যের জন্য চাউল, ডাইল, লবণ, মণ্ট-দুগ্ধ প্রভৃতির প্রয়োজন। প্রতিদিন প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে (১৪ বৎসরের অধিক) অর্দ্ধ সের এবং অপ্রাপ্ত-বয়স্ক ব্যক্তিকে এক পোয়া চাউল দেওয়া হইবে। ১৪ বৎসরের অধিক বয়স্কগণকে আধ ছটাক ডাইল ও আধ ছটাক লবণ এবং ১৪ বৎসরের অপেক্ষা অল্প বয়স্কগণকে উক্ত পরিমাণের অর্দ্ধেক দেওয়া হইবে। শিশুদিগকে বার্লি, সাগু, মিছরী ও মণ্ট-দুগ্ধ দেওয়া হইবে। এক সপ্তাহের সাহায্য সেই সপ্তাহের নির্দ্দিষ্ট একটি তারিখে কেন্দ্র অনুসারে বিতরণ করা হইবে।

প্রত্যেক পরিবারকে খাদ্য লইবার জন্য একখানি কার্ড দেওয়া হইবে। খাদ্য দেওয়া হইলে কোন্ দিন খাদ্য দেওয়া হইল কার্ডে তাহা লিখা থাকিবে। কোন পরিবারের উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তিদিগকে যখন কোন কার্য্য দেওয়া হইবে, তখন তাহাদিগের সাহায্য দান বন্ধ করা হইবে। ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলের অধিকাংশ লোককেই এখন তাহাদিগের গৃহ পুনরায় নির্ম্মাণ করিতে হইবে। সেই জন্য তাহাদিগকে গৃহনির্ম্মাণ-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হইবে। যাহারা অর্থার্জ্জন করিতে সমর্থ, তাহাদিগকে চারি সপ্তাহের অধিক বিনামূল্যে খাদ্য প্রদান করা হইবে না।

এক স্থানে সমবেত অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয়হীন বিপন্ন নরনারী

গৃহাদি নির্ম্মাণ কার্য্যে সরকার প্রত্যেক পরিবারকে গৃহ-নির্ম্মাণের প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং অর্থ দিয়া সাহায্য করিবেন। একটি পরিবারকে বাসোপযোগী কুটীর নির্ম্মাণের জন্য ৩০ টাকার অধিক এবং রন্ধনগৃহ নির্ম্মাণের জন্য ২০ টাকার অধিক দেওয়া হইবে না। কোন পরিবার যতই বড় হউক না কেন, ৬০ টাকার অধিক কাহাকেও সাহায্য প্রদান করা হইবে না। যে সকল গৃহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সেই সকল ভগ্ন গৃহ হইতে যে সকল দ্রব্য পাওয়া যাইবে, তাহাও গৃহনির্ম্মাণ-কার্য্যে ব্যবহৃত হইবে। যে সকল পরিবারের বস্ত্র, বাসন এবং শয্যাদ্রব্য প্রভৃতি নষ্ট হইয়াছে এবং যাহাদিগের ঐ সকল দ্রব্য ক্রয় করিবার সামর্থ্য নাই,

তাহাদিগকে ঐ সকল দ্রব্য দেওয়া হইতে পারে অথবা অর্থ-সাহায্য করা যাইতে পারে। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক এবং আট বৎসরের অধিক বয়স্ক বালক-বালিকাগণের প্রত্যেককে একখানি করিয়া কাপড় দেওয়া হইবে। আট বৎসরের কম বয়স্ক বালক-বালিকা ও শিশুগণের প্রত্যেকের জন্য একটি শার্ট, পেনি অথবা একটি ফ্রক দেওয়া হইতে পারে। যে পরিবারে পাঁচ জন লোক আছে, সেই পরিবারের জন্য

তমলুক সহরের কয়েকটি বিধ্বস্ত গৃহ

অপর এক স্থানের ধ্বংসাবশেষ

একখানি করিয়া কম্বল দেওয়া হইবে, যে পরিবারের লোকসংখ্যা অধিক, সেই পরিবারের জন্য দুইখানি করিয়া কম্বল দেওয়া হইবে।

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের পূর্ব্বে কৃষিকার্য্যের জন্য গরুর প্রয়োজন হইবে না। দুগ্ধবতী গাভীর আশু প্রয়োজন। যে সংখ্যক গবাদি পশু নিহত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা ৪০ হাজারের কম নহে। যে সংখ্যক গবাদি পশু নিহত হইয়াছে, যদি তাহার শতকরা ২৫টি গবাদি পশুর ব্যবস্থা করিতে হয়, তাহা হইলেও ১০ হাজার গবাদি পশুর প্রয়োজন। ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলের জন্য ইহা সংগ্রহ করিতে হইলে অনেক সময় লাগিবে। দুগ্ধবতী গাভীর প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক। যথা সম্ভব শীঘ্র এই অভাব মিটাইবার চেষ্টা করিতে হইবে।

সাহায্যদান কার্য্য কিরূপ সহানুভূতি সহকারে সম্পন্ন হইবে, কার্য্যফল বহু পরিমাণে তাহার উপর নির্ভর করিবে। এ বার কংগ্রেস নিষিদ্ধ প্রতিষ্ঠান এবং কংগ্রেসের কর্ম্মীরা কারাগারে। এই সময়—বিহারের ভূমিকম্পের পর যেমন বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল—তেমনই বাঙ্গালার কারারুদ্ধ কর্ম্মীদিগকে মুক্তি দিয়া লোকের সেবা-কার্য্যে সহযোগ করিতে বলার যে প্রস্তাব হইয়াছে, আমরা তাহা পূর্ণ সমর্থন করি।

আমরা আরও প্রস্তাব করি—

(১) কোন প্রতিষ্ঠানকে যেন সাহায্যদান জন্য কোন অঞ্চলে যাইতে বাধা প্রদান করা না হয়।

(২) পাইকারী জরিমানা যেন আদায় বন্ধ করা হয়।

(৩) সংবাদপত্রে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশে যেন কোন বাধা না থাকে।

(৪) বিধ্বস্ত অঞ্চলে যেন সহানুভূতিসম্পন্ন রাজ-কর্ম্মচারিগণকেই কার্য্যভার প্রদান করা হয়।

(৫) শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুকে মুক্তি দিয়া এই কার্য্যে নেতৃত্ব করিতে আহ্বান করা হউক।

মেদিনীপুর, কাঁথি ও তমলুকের কল্পনাতীত দুর্দ্দশা

গত ১৬ই অক্টোবর মেদিনীপুর জিলায় কাঁথি ও তমলুক মহকুমার উপর দিয়া যে প্রবল ঝড় ও সমুদ্র-তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, তাহার ক্ষতির পরিমাণ কল্পনাতীত।

কাঁথি মহকুমার সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী গ্রামসমূহের অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়। কে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই—গাছ-গাছড়া বাড়ী-ঘর-দুয়ার ভাঙ্গিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। রাজপথসমূহ বিনষ্ট হইয়াছে—পুষ্করিণী বুঝিবার উপায় নাই। গাছগাছড়ায় এবং জঙ্গল ও আগাছায় সেগুলি পরিপূর্ণ—গো-মহিষাদির গলিত শবে জল পূতিগন্ধময় হইয়াছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরূপে কাঁথি মহকুমার কন্দর্পপুর গ্রামের কৃষক-যুবক রমণীমোহন মাঝীর প্রদত্ত বিবরণ এইরূপ :—

"১৬ই অক্টোবর মহা-সপ্তমীর দিন সকাল হইতে শারদীয়া পূজা উপলক্ষে ঢাক-ঢোলের বাদ্যে গ্রাম-পথ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। গ্রামবাসী বালক-বালিকারা দলে দলে প্রতিমা দর্শন করিতে পূজা-বাড়ীতে যাইতেছিল। যাহারা কৃষক, তাহারা সেই দিনের মত কাজ বন্ধ করিয়াছে; বেলা পড়িয়া আসিলে স্ত্রী-পুত্র সঙ্গে লইয়া পূজা-বাড়ীতে প্রতিমা দর্শন করিতে যাইবে।

"সেই দিন সকাল হইতেই আকাশ সামান্য মেঘাচ্ছন্ন ছিল। আমরা গ্রামের অনেক লোক মিলিয়া বেলা অনুমান ৯টা কি ১০টার সময় বাঁধের নিকট মাছ ধরিতে যাই। পূর্ব্বে অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছিল। কিছুক্ষণ পরে প্রবল বারিবর্ষণ, সঙ্গে সঙ্গে ঝড়! এত প্রবল বারি-বর্ষণ এবং শোঁ শোঁ শব্দ হইতে লাগিল যে, আমরা ভীতি-বিহ্বল হইয়া কি করিব, কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলাম না। এমন সময় এক বিপুল সমুদ্র-তরঙ্গ আসিয়া মুহূর্ত্তে আমাদিগকে ভিজাইয়া দিয়া গেল। পরবর্ত্তী তরঙ্গ আসিতেছে দেখিয়া আমি গ্রামের দিকে দৌড়াইয়া যাইবার সময় পশ্চাতে চাহিয়া দেখি, আমার সঙ্গীরা ভাসিয়া চলিয়াছে! সেই তরঙ্গোচ্ছ্বাসের উচ্চতা প্রায় ২২।২৩ ফিট! প্রাণভয়ে এবং সকলকে সতর্ক করিবার জন্য দৌড়াইতে লাগিলাম। ঝড়ের বেগ বর্দ্ধিত হইতেছিল। গাছ-গাছড়া ও কাঁচা বাড়ী একে একে পড়িয়া যাইতেছিল। আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কায় গ্রামবাসীর ক্রন্দন-রোলে চারি দিক্ প্রতিধ্বনিত। তাহারা তখনও সমুদ্রতরঙ্গের কথা ভাবিতে পারে নাই।

"যাহা হউক, আমি গ্রামের বাড়ী বাড়ী দৌড়াইয়া যাহারা যাইতে পারে তাহাদিগকে সত্বর অন্যত্র যাইতে বলিলাম,—অবশিষ্টদিগকে চালা-ঘরের উপর উঠিতে বলিলাম—ইতোমধ্যে কিন্তু অনেক-চালা-ঘর পড়িয়া গিয়াছে—বহু নর-নারী চালা-ঘরের নিম্নে পড়িয়া কাতর ক্রন্দন করিতেছে।

"সমুদ্র-তরঙ্গ আসিয়া পড়িল। যাহারা চালা ধরিয়া আশ্রয় লইয়াছিল, তাহারা জলস্রোতে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কেহ বড় গাছে গিয়া আটকাইল, কেহ বা চালা ছাড়িয়া দিয়া তাহার অতি প্রিয়জন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গাছের ডাল ধরিয়া রহিল। মাটী হইতে গাছের ডাল অনেক উচ্চে। আমি একটি তেঁতুল গাছে আশ্রয় লইয়াছিলাম। দেখিতে লাগিলাম, বহু নর-নারী, গাছ এবং গবাদি পশু চোখের সম্মুখে ভাসিয়া চলিয়াছে।

"সারা দিন এই ভাবে কাটিল। সন্ধ্যার পর বৃষ্টি একটু কমিল—ঝড়-কমিল না—ধীরে ধীরে জল সরিতে লাগিল। তথাপি রাস্তায় এক-বুক জল। গাছ হইতে নামিলাম। গ্রামের কোন কোন বাড়ীতে গিয়া দেখি—কর্দ্দমাক্ত গৃহপ্রাঙ্গণে শিশুর শব পড়িয়া আছে। মাতার কণ্ঠ নীরব। চালার নিম্ন হইতে মা মৃত শিশুর দিকে তাকাইয়া আছে! পরিধানে বস্ত্র নাই! আমার পরিধানের সিক্ত বসনের কতকটা ছিঁড়িয়া এক জনের নিকট ফেলিয়া দিলাম। কোন বাড়ীর উপর দিয়া যাইতেছি—শুনিতেছি, বাড়ীর চতুর্দ্দিক্ হইতে ক্ষণে-ক্ষণে মনুষ্য-কণ্ঠের করুণ কাতর-ধ্বনি! গাছ পড়িয়া বা টিনের চালা পড়িয়া কাহারও পা ভাঙ্গিয়াছে—কাহারও হাত কাটিয়াছে—গাছের ডাল কাহারও বা চক্ষু ভেদ করিয়া গিয়াছে! দেখি, এক জন বৃদ্ধ মৃত্যুমুখে পতিত, অবশিষ্ট সকলে অর্দ্ধমৃত। চাউল ডাইল সবই ভাসিয়া গিয়াছে। সকাল বেলা বাড়ীতে যে রন্ধন হইয়াছিল, কেহই তাহা খাইতে পায় নাই। জলে ছড়ান অন্ন কুড়াইয়া খাইলাম। তাহার পর কোন দিন খাইয়া কোন দিন না খাইয়া মৃত্যুবিভীষিকায় বিহ্বল হইয়া আছি!

"এক বাড়ীর এক জন লোক ছোট একটি সুটকেস হাতে করিয়া চালা-ঘরের উপর আশ্রয় লইয়াছিল। সেই চালা-ঘরটি ভাঙ্গে নাই—ঝড়ের প্রবল দাপট সহ্য করিয়া টিঁকিয়াছিল। ঝড় ও বৃষ্টি থামিলে সে নীচে নামিয়া আসিল। এই অঞ্চলের কোন কোন কৃষক দুর্দ্দিনের সঞ্চয় চাউল ও ধান আবশ্যকমত মাটীতে পুঁতিয়া রাখে। মাটী খুঁড়িয়া চাউল বাহির করিলাম। কিন্তু রাঁধি কেমন করিয়া? জ্বালানী কাঠ নাই—আগুন গ্রামের কোথাও নাই! ঐ লোকটির সুটকেসের মধ্যে একটি দিয়াশলাই ছিল—তাহারই সাহায্যে অতি কষ্টে জ্বালানী-কাঠ সংগ্রহ করিয়া চাউল সিদ্ধ করিতে লাগিলাম।

তমলুক সহরের তিন মাইল উত্তরে এক ধান্যক্ষেত্রে ১টি স্ত্রীলোক ও ৩টি পুরুষের মৃতদেহ

যেখানে চাউল সিদ্ধ করিতেছি, তাহারই পাশে বহু গরু-বাছুর মরিয়া পড়িয়া আছে,—মনুষ্য-দেহও এখানে-ওখানে পড়িয়া আছে। কোন প্রকারে চাউল অর্দ্ধ-সিদ্ধ করিলাম, এবং ক্ষুধায় কাতর বিপন্ন নর-নারীকে তাহা হইতে কিছু-কিছু দিলাম।

"ক্রমে গ্রামবাসীর আত্মীয়-স্বজন—যাহারা তেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই—তাহারা দূর-দূরান্ত হইতে আসিয়া সেবাকার্য্য করিতে লাগিল। দুই-একখানা চালা উঠিল। শব সৎকার হইল। আত্মীয়-স্বজনদিগের মধ্যে যাহারা একটু বিত্তশালী, তাহারা তাহাদিগকে গ্রামে লইয়া গেল। কিন্তু তাহাদিগের সংখ্যা নগণ্য।

"গ্রামের শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র শাসমল অবস্থাপন্ন এবং দয়ার্দ্র-চিত্ত। তাঁহার বহু ধান ও চাউল এবং অন্যান্য কৃষি-সম্পদ্ বিনষ্ট হইয়াছে। ধানের জমিতে লোণা জল ঢুকিবার ফলে ভবিষ্যতে বহু দিন শস্য উৎপন্ন হওয়ার পথ বন্ধ হইয়াছে। তাঁহার বাড়ীর অধিকাংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। সমুদ্র-তরঙ্গে কে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে, সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তিনি তাঁহার সঞ্চিত চাউল সকল গ্রামের লোককে বণ্টন করিয়া দিয়াছেন। বাড়ীতে পুরাতন ও নূতন

কাপড় যাহা ছিল, তাহাও টুকরা-টুকরা করিয়া লজ্জা-নিবারণের জন্য বিতরণ করিয়াছেন।"

এই ধ্বংসলীলার উল্লেখ করিয়া মেদিনীপুর-প্রবাসী তমলুকের এক জন অতি বৃদ্ধ লোক বলেন, সারা জীবন অতি-কষ্টে যাহা কিছু সঞ্চিত করিয়াছিলাম, মুহূর্ত্তের প্রলয় ঝড়ে সবই বিনষ্ট হইয়াছে। রাজা-প্রজা ধনী-দরিদ্র সকলের আজ এক অবস্থা। এখন আমরা সকলেই পথের ভিখারী।

তমলুক মহকুমার কোন গ্রামের এক-একটি তন্তুবায় বংশ ধরাপৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। কংসবতী নদীর তীরে ঐ তাঁতীদিগের বাস। বহু কাল তাহারা ঐখানে কাটাইয়া দিয়াছে। নারী-শিশু মিলিয়া ১৪ জন তাঁতী এক-বাড়ীতে থাকিত। ঝড়ের দিনেও তাহারা অন্যান্য দিবসের ন্যায় যে যাহার গৃহকার্য্যে রত ছিল। শারদীয়া পূজার প্রথম দিবসে তাঁতের কাজ বন্ধ ছিল। প্রবল বারি-বর্ষণে নদীর জল ফুলিয়া আশ-পাশের সকল বাড়ী ভাসাইয়া দেয়। সমুদ্র-তরঙ্গে ঐ ১৪ জনই ভাসিয়া একটা মাঠের উপর পড়ে—বাড়ীতে একটিও ঘর ছিল না। কয়েক দিন পরে তাঁতীদিগের আত্মীয়-স্বজনগণ অতি-দূর হইতে আসিয়া মৃতদেহগুলি নদীতে ভাসাইয়া দেয়।

অপর এক গ্রামে এক তাঁতী-পরিবারের বাস। তাহারা ঐ বাড়ীতে সবশুদ্ধ ৭ জন ছিল। ৭ জনই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। তাহাদিগের জন্য শোক করিবে, এমন কেহ নাই। যাহারা এখনও বাঁচিয়া আছে, উপযুক্ত সাহায্য ও আহারাদি না পাইলে তাহারাও মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।

মেদিনীপুর এবং মেদিনীপুরের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের অবস্থা কাঁথি-তমলুকের তুলনায় এরূপ শোচনীয় না হইলেও জন-সাধারণের স্থাবর সম্পত্তির অনেক ক্ষতি হইয়াছে। কাঁচা ঘর নাই, পাকা ঘরও অনেক বিনষ্ট হইয়াছে। বড় বড় গাছ পড়িয়া কোনও পাকা বাড়ীর দেওয়াল ধ্বসিয়া গিয়াছে। কোন বাড়ীর চালা বা ছাদ উড়িয়া গিয়াছে! অনেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। রাস্তা-ঘাটে চলাচল প্রায় ৮।১০ দিন একরূপ অসম্ভব ছিল। রাস্তার উপর বড় বড় গাছ পড়িয়া থাকায় লোক এবং যান-চলাচলের বিঘ্নের সীমা ছিল না।

মেদিনীপুরের সন্নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে যকপুর ষ্টেশনের নিকট এক বাড়ীতে বহুকাল হইতে পূজা-পার্ব্বণ বিশেষ আড়ম্বরে হইয়া আসিতেছে। পূজার দিন মন্দিরে বসিয়া পুরোহিত চণ্ডী-পাঠ করিতেছিলেন এবং গৃহস্বামী ভক্তিভরে তাহা শুনিতেছিলেন। এমন সময় ঝড়ের প্রবল ঝাপটায় দেবীমণ্ডপ ভূপাতিত হয়। দেবীর প্রতিমা চাপা পড়িয়া গৃহস্বামী এবং পুরোহিত মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছেন।

বাঙ্গালা সরকার যে সাহায্য করিবেন— পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহা যে যান্ত্রিক ভাব-বর্জ্জিত হইবে না—হইতে পারে না, তাহা আমরা অনায়াসে মনে করিতে পারি। কিন্তু আজ যখন বাঙ্গালার একাংশ মহা শ্মশানে পরিণত হইয়াছে—যখন বিপন্নের আর্ত্তনাদ দিকে দিকে শ্রুত হইতেছে--পিতৃমাতৃহীন শিশুর ও বালকবালিকার—সন্তানহীনা জননীর—সর্ব্বস্বান্ত গৃহস্থের অশ্রু দেশ প্লাবিত করিতেছে—তখন সেই শ্মশানে আবার সংসার-গঠনের, আবার কোলাহল-মুখরিত কর্ম্মক্ষেত্র রচনার জন্য যে সহানুভূতি ও সাহায্যের প্রয়োজন, তাহা বাঙ্গালীকে দিতে হইবে—সে জন্য বাঙ্গালীকে সর্ব্ববিধ ত্যাগ-স্বীকারে প্রস্তুত হইতে হইবে। কাজের গুরুত্ব যেন আমাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধিত করে। আমরা যেন স্মরণ করি— বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী না রাখিলে আর কে রাখিবে? রামকৃষ্ণ মিশন্, হিন্দু মহাসভা, বঙ্গীয় সংবাদ-পত্র-সঙ্ঘ প্রমুখ সেবা-প্রতিষ্ঠানে যাহাতে অর্থের, বস্ত্রের, আহার্য্যের অভাবে সেবাকার্য্য কুণ্ঠিত না হয়, সে ভার বাঙ্গালীকে লইতে হইবে। বিপদে ধৈর্য্য না হারাইয়া—অভিভূত না হইয়া বীরের মত—ত্যাগীর মত কাজ করিতে হইবে।

অপর এক গ্রামের ধ্বংস-দৃশ্য। একটি পশুর মৃতদেহ দেখা যাইতেছে

সাক্ষাতে আপত্তি

হিন্দু মহাসভার পক্ষ হইতে ডাক্তার শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিরা যখন বর্ত্তমান রাজনীতিক সমস্যার সমাধান চেষ্টার জন্য গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন যেমন বড়লাট তাহাতে সম্মত হয়েন নাই, ১২ই নভেম্বর তেমনই তিনি শ্রীযুত রাজাগোপালাচারিয়াকেও সেই অনুমতি দিতে অস্বীকার করিয়াছেন। বড়লাট বলিতেছেন, যখন কংগ্রেসের কারারুদ্ধ নেতারা দেশে কয় মাস যে অবস্থা দেখা যাইতেছে, তাহাতে দুঃখ প্রকাশ করেন নাই, তখন মনে করা যায়—তাঁহাদিগের মতের পরিবর্ত্তন হয় নাই এবং সেই জন্য তিনি গান্ধীজীর সহিত শ্রীযুত রাজাগোপালাচারিয়াকেও সাক্ষাতের অনুমতি দিতে পারেন না। রাজাগোপাল বলিয়াছেন, গান্ধীজী ও কংগ্রেসী নেতারা বর্ত্তমান আন্দোলন প্রবর্ত্তিত করেন নাই এবং জিজ্ঞাসিত না হইলে বন্দিশালার বাহিরে যাহা হইতেছে সে সম্বন্ধে যে গান্ধীজী কোন মত প্রকাশ করিবেন—এমন আশা করাও অসঙ্গত। গান্ধীজীর মত জানাই তাঁহার সাক্ষাৎ প্রার্থনার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, বড়লাটের কার্য্যেই তাহা সিদ্ধ হইতে পারিল না।

বিক্ষোভ, বোমাবিস্ফোরণ ও গুলীবর্ষণ

বাঙ্গালা—পাইকারী জরিমানা—বর্দ্ধমান জিলার কালনা থানার অন্তর্গত বৈদ্যপুর, মীরহাট, চন্দ্রাবাদ ও আকালপৌষ মৌজার অধিবাসীদিগের উপর ১০ হাজার টাকা, মেমারী থানার মণ্ডলগ্রাম ও বামুনিয়া মৌজার অধিবাসীদিগের উপরেও ৫ হাজার টাকা, মঙ্গলেশ্বর থানার ৩ খানি গ্রামের উপর ৫ হাজার টাকা ধার্য্য। দিনাজপুরে বালুরঘাট থানার অধীন দক্ষিণ চক ভবানী, খাদিম ও ডাকরা গ্রাম ও বালুর-ঘাটের অধিবাসীদিগের উপর ৭৫ হাজার টাকা ধার্য্য, ২০শে কার্ত্তিক মধ্যে ৩৩ হাজার টাকা আদায়। ফরিদপুর জিলার ভাঙ্গা সহরের এক অঞ্চলের উপর ১৫ হাজার টাকা ধার্য্য। ঢাকা জিলার সিরাজদীঘি থানার অধীন তালতলা বাজারের অধিবাসীদিগের উপর ৩ হাজার টাকা, অপর এক অঞ্চলের অধিবাসীদিগের উপর ৫ হাজার টাকা ধার্য্য। বাখরগঞ্জ জিলার বাবুগঞ্জ থানার খাপুরা গ্রামের উপর ২ হাজার টাকা ধার্য্য। মালদহে ভালুকার অধিবাসীদিগের নিকট হইতে ২ হাজার টাকা এবং হরিশ্চন্দ্রপুর পিপলার অধিবাসীদিগের নিকট হইতে ৩ হাজার টাকা আদায়।

কলিকাতা—১৫ই আশ্বিন শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা দত্তের গৃহে তল্লাসী। ১৬ই আশ্বিন—৮ স্থানে তল্লাসী। ১৭ই আশ্বিন—গড়পাড়ের এক ডাকঘরে অগ্নিদান ও বোমা নিক্ষেপ—নগদ টাকা লুঠ, এক জন আহত। শ্যামবাজার ও আহিরীটোলা ডাকঘরের সম্মুখস্থ চিঠির বাক্সে অগ্নিদান। বাগবাজারের এক ডাকবাক্সে অগ্নিদান। ১৪ই কার্ত্তিক—উত্তর কলিকাতার ৫।৬টি চিঠির বাক্সে অগ্নিসংযোগ। গোয়েন্দা পুলিশ কর্ত্তৃক ৮ স্থানে ও কয়েকটি ছাপাখানায় তল্লাসী। এক জন যুবক কর্ত্তৃক বহুবাজারের এক মদের দোকান আক্রমণ। ১৫ই—আহিরীটোলার এক ডাকবাক্সে ও উল্টাডাঙ্গা পোষ্ট আফিসে অগ্নিদানের চেষ্টা। ১৬ই—দক্ষিণ কলিকাতার এক স্থানে তল্লাসী, ৪ জন গ্রেপ্তার। জোড়াসাঁকো অঞ্চলের চিঠির বাক্সে অগ্নিদানের চেষ্টা, তিন স্থানে ট্রামে রাসায়নিক দ্রব্য নিক্ষেপ, ৪ জন আহত। ২০শে ও ২১শে বহু স্থানে তল্লাসী, ১ জন গ্রেপ্তার। ১০ই কার্ত্তিক—ওয়েলেসলী ষ্ট্রীটে কামানের ভাঙ্গা শেল বিস্ফোরণ ৮ জন মুসলমান আহত। ২৭শে—দুই স্থানে তল্লাসী। শ্যামপুকুর অঞ্চলে কানাই লাল মিত্র ও অপর ৪ জন গ্রেপ্তার।

ঢাকা—১৭ই আশ্বিন—গেণ্ডারিয়া ষ্টেশনে লুণ্ঠন ও অগ্নিদান সম্পর্কে মোট ২৫ জন গ্রেপ্তার। হাঙ্গামা সম্পর্কে আরও ৩ জন গ্রেপ্তার। মুন্সীগঞ্জ মহকুমার শ্রীনগর থানার প্রায় ৫০ জন হিন্দুর বন্দুকাদি থানায় জমাদান। ২৪শে—মিঃ ওয়াহেদ আলি গ্রেপ্তার। ২রা কার্ত্তিক—সিরাজদীঘি থানার মধ্যপাড়া য়ুনিয়ন বোর্ডের আফিস পুড়াইবার ও লুঠ করিবার অভিযোগে বোর্ডের সভাপতি ও অপর ৬ জন গ্রেপ্তার। ঢাকা সহরের ফরিদাবাদে সার্ব্বজনীন দুর্গাপূজামণ্ডপে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের জন্য ৭ জন ধৃত। ৫ই কার্ত্তিক—কোতোয়ালী থানার নিকট দুই স্থানে বিস্ফোরণ। এ সম্পর্কে পর দিবস ২০ স্থানে তল্লাসী ও ১২ জন থানায় আহূত। ৭ই কার্ত্তিক ১০ই—লালবাগ থানায় বোমাবিস্ফোরণ। ১৪ই—বিশিষ্ট কর্ম্মী হীরালাল দত্তের ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড দণ্ডিত। ১৬ই—সূত্রাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগার গৃহে পটকা নিক্ষেপের চেষ্টা। ১৮ই—পারুলিয়া শক্তিমঠের প্রতিষ্ঠাতাকে গ্রেপ্তার। ২৬শে—মাইসি গ্রামে (মাণিকগঞ্জ) যশোদা গোস্বামী গ্রেপ্তার। মাণিকগঞ্জে এক উকীলের বাড়ী তল্লাসী করিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রী ও অপর ২ জন গ্রেপ্তার।

মেদিনীপুর—১২ই আশ্বিন তমলুকের খাসমহাল আফিস, সাবরেজিষ্ট্রী অফিস, আবগারী দোকান ভস্মীভূত। ৫০০০ লোকের সুতাহাটা থান আক্রমণ ও অগ্নি দান। পুলিসের কোনমতে পলায়ন। খাসমহাল আফিসের ম্যানেজার হরণ, তাহার বন্দুক অপহরণ। মহিষাদল রাজকাছারী ভস্মীভূত, বিভিন্ন গ্রামের ধান্যগোলা লুঠ ও অগ্নিদান। নন্দীগ্রাম থানার সরকারী ভবনগুলির অগ্নিদানের ফলে ক্ষতি। ১৮ই আশ্বিন—মেদিনীপুর জিলার ২৪টি কংগ্রেস সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা। বাঙ্গালা সরকার কর্ত্তৃক ভারতরক্ষা বিধি অনুসারে কাঁথি, তমলুক ও সদর লোকাল বোর্ড নন্দীগ্রাম থানার নরঘাট য়ুনিয়ন বোর্ড, ময়না থানার—ময়না য়ুনিয়ন বোর্ড এবং পাঁশকুড়া থানার কোলা য়ুনিয়ন বোর্ডের কার্য্য ৬ মাসের জন্য স্থগিত।

ত্রিপুরা—২রা কার্ত্তিক—চিত্তরঞ্জন চন্দ গ্রেপ্তার। দুর্গাপুর য়ুনিয়ন বোর্ড (চাঁদপুর) ও ডাকঘর ভস্মীভূত। ৭জন যুবক গ্রেপ্তার ৫ই কার্ত্তিক—কুটি ডাকঘরে অগ্নিদানের চেষ্টা করিবার সময় একজন ধৃত। খেওড়া ডাকঘরের চিঠির বাক্স অপসারিত। ১৩ই কুমিল্লার ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে প্রচারপত্র বিলি করিবার জন্য দুই জন মহিলা ধৃত।

নোয়াখালী—১৭ই আশ্বিন ফেণীর জনৈক ভূতপূর্ব্ব আটক বন্দী ও এক জন কংগ্রেসকর্ম্মীকে সিকিউরিটি বন্দিরূপে আটক। ৭ই কার্ত্তিক—ভারতরক্ষা বিধির ১২৯ ধারা অনুসারে ৭ জন কংগ্রেসকর্ম্মী আটক। ৮ই ফেণীতে জনৈক শিক্ষক গ্রেপ্তার। ৯ই—বাবাইয়ায় (ফেণী) বোমা বিস্ফোরণে দুই জন নিহত ও ২ জন আহত। মুহুরী-গঞ্জে ৩ জন গ্রেপ্তার। বেগমগঞ্জ থানায় দুই গ্রামে স্পেশাল পুলিশ নিযুক্ত।

যশোহর—১৭ই আশ্বিন—বনগাঁ কংগ্রেস সমিতির সভাপতি ও অপর চারি জন ধৃত। বনগাঁ কৃষক সমিতির আফিস তল্লাসী। ৩রা কার্ত্তিক—অমূল্যরতন ধর ও বিজয়চন্দ্র রায় গ্রেপ্তার।

ময়মনসিংহ—১লা কার্ত্তিক—ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ গ্রেপ্তার নেত্রকোণায় কম্যুনিষ্ট কর্ম্মী সিতাংশু দত্তের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত। নেত্রকোণা মহকুমা কংগ্রেসের সভাপতি গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের আদেশ অমান্যে গ্রেপ্তার। এ স্থানে আরও ১ জনকে গ্রেপ্তার। ৪ঠা কার্ত্তিক—মুক্তাগাছার কংগ্রেসকর্ম্মী মনীন্দ্র ভট্টাচার্য্যের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ, ৭ই—শ্যামাদাস চক্রবর্ত্তী ধৃত। ১১ই কার্ত্তিক পর্য্যন্ত মুক্তাগাছায় ২১ জন গ্রেপ্তার। ১২ই—আপত্তিকর কাগজপত্র রাখিবার জন্য ময়মনসিংহে এক জন দণ্ডিত। নেত্রকোণায় এক জন এম-এ ও ল ক্লাশের ছাত্র গ্রেপ্তার।

বাঁকুড়া—১১ই কর্ত্তিক, জিলাবোর্ডের এক জন সদস্য এবং বঙ্গীয় পরিষদের সদস্য শ্রীযুত মণীন্দ্রভূষণ সিংহ গ্রেপ্তার।

বর্দ্ধমান—২৪শে আশ্বিন গুণেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য, বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদ্যোৎকুমার চৌধুরী ও স্বামী নির্ম্মলানন্দ সরস্বতী ধৃত। ১১ই কার্ত্তিক মন্তেশ্বর থানার কুসুম গ্রামের ডাক-বাংলা ভস্মীভূত, ৬ জন গ্রেপ্তার।

চট্টগ্রাম—২৫শে আশ্বিন বাচ্চা মিঞা; ২৬শে আশ্বিন বীরেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য্য; ২৯শে আশ্বিন—ফনী দাস, ৩০শে আসরফ মিঞা, আবদুল কাদের,—১লা কার্ত্তিক এইচ, গত হেভেনষ্টন, ৩রা কার্ত্তিক বরদাপ্রসাদ নন্দী গ্রেপ্তার। ৬ই কার্ত্তিক—শ্রীহট্টের বিদ্যাশ্রমের চট্টগ্রামস্থ কয়েকটি শাখাকেন্দ্র পুলিস কর্ত্তৃক অধিকার। ২রা কার্ত্তিক—যুধিষ্ঠির বড়ুয়া, বঙ্কিম বড়ুয়া, মফজ্জল আহমেদ, হবিবুল্লা, মজফ্‌ফর মিঞা, রমণীমোহন বড়ুয়া ও সুরেন্দ্র লাল বড়ুয়া গ্রেপ্তার। ২১শে কার্ত্তিক—চট্টগ্রাম সদর খাসমহল আফিস ভস্মীভূত।

দিনাজপুর—২৫শে আশ্বিন যোগেন্দ্রনাথ বর্ম্মণ, ২৬শে আশ্বিন রজনীকান্ত সরকার ও অবিনাশচন্দ্র দত্ত এবং ৬ই কার্ত্তিক রামবল্লভ সমাজদার গ্রেপ্তার।

রঙ্গপুর—১৫ই আশ্বিন—কংগ্রেসকর্ম্মী জিতেন্দ্রনাথ সরকার সভা করিবার অভিযোগে দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত। ৩০শে আশ্বিন সরলকুমার গুহ গ্রেপ্তার। ৮ই কার্ত্তিক কালীনারায়ণ সিংহ, অভিরঞ্জন সাহা ও যশোদানন্দন ভট্টাচার্য্য গ্রেপ্তার।

পাবনা—২৯শে আশ্বিন কালাচাঁদ সাহা গ্রেপ্তার। ৮ই কার্ত্তিক—সিরাজগঞ্জের মাগুরা গ্রামে এক গৃহভস্মসাৎ। ১০ই কার্ত্তিক সিরাজগঞ্জ ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা ও অপর একজন অভিযুক্ত; সুবোধ অধিকারী গ্রেপ্তার।

জলপাইগুড়ি—১৭ই আশ্বিন "বলশেভিক" পত্রিকা ও অপর কতকগুলি কাগজপত্র রাখিবার জন্য চারু মজুমদার ৪ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত। ২৫শে আশ্বিন—রবীন্দ্রনাথ শিকদার গ্রেপ্তার।

আসাম—১৫ই আশ্বিন—হবিগঞ্জে স্বগৃহে আটকবন্দী রমেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, পরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য ও অপর ৩ জন শোভাযাত্রায় যোগদান করিবার জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত। হবিগঞ্জ মহকুমায় এ পর্য্যন্ত ৩৭ জন গ্রেপ্তার। এ স্থানের শ্রীযুত যতীন্দ্র চক্রবর্ত্তী অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট পদ ত্যাগ করায় ভারতরক্ষা বিধির ১২৯ ধারা অনুসারে আটক। তেজপুর থানার ১৬ বৎসর হইতে ৫৫ বৎসর বয়স্ক সকল পুরুষকে অঞ্চলের শান্তি ও শৃঙ্খলা এবং সরকারী সম্পত্তি রক্ষা করিবার আদেশ জারী। হবিগঞ্জ জেল হইতে যে ৬৬ জন কয়েদী পলায়ন করে, তন্মধ্যে এ পর্য্যন্ত ২৯ জন ধৃত। ধুবড়ী রেলওয়ে ষ্টেশনে অগ্নি সংযোগ। ১৬ই—এ দিন পর্য্যন্ত আসাম ব্যবস্থা-পরিষদে ৩৩ জন কংগ্রেস সদস্যের মধ্যে ১৭ জন গ্রেপ্তার। ১৭ই—শ্রীহট্ট মহিলাসঙ্ঘের শ্রীমতী স্নেহপ্রভা দেব জজের চেয়ারে বসিবার জন্য ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিতা। অমরেশপুরে অননুমোদিত সভা (বিশ্বনাথ গ্রামে) করিবার জন্য কয়জন ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত। বিশ্বনাথ গ্রামে আর দুই জন কংগ্রেস-কর্ম্মীর প্রত্যেকের ৯ মাস কারাদণ্ড। করিমগঞ্জেও ৮ জনের ৪—৯ মাস কারাদণ্ড। কর্ম্মী মণীন্দ্রমোহন রায় কাছাড় জিলা হইতে বহিষ্কৃত। শিলচর মিউনিসিপ্যালিটীর সদস্য হেমেন্দ্রমোহন দত্তের সদস্যপদ ত্যাগ। (মিউনিসিপ্যালিটীর মোট ২০ জন সদস্যের মধ্যে এ পর্য্যন্ত ৫ জন সদস্যের পদত্যাগ)। ৫ই কার্ত্তিক—কামরূপ জিলার সরুচায়া ও পার্ব্বতীয়া গ্রামের অধিবাসীদিগের সহিত পুলিসদলের সংঘর্ষ, ৫০ জন গ্রেপ্তার। জোরহাট মহকুমায় মোট ৮১ জন গ্রেপ্তার, ১৬ জন দণ্ডিত। ৬ই—আসামপরিষদের সদস্য শ্রীযুত শঙ্করচন্দ্র বড়ুয়া ও শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ নাথের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির। ৮ই মৌলভীবাজার মাদ্রাসার জনৈক শিক্ষক গ্রেপ্তার। গৌহাটী ব্যবহারাজীব সভার ২ জন ব্যারিষ্টার, ২ জন এডভোকেট ও ৭জন উকীল গ্রেপ্তার। লখিমপুরে কয়েকস্থানে ট্রেণ লাইনচ্যুত করিবার চেষ্টা। লখিমপুরে বে-আইনী শোভাযাত্রার উপর লাঠী চার্জ্জ, কয় জন আহত, ৫ জন গ্রেপ্তার। ১০ই—বড়পেটা মহকুমার পাতাচর কুচি অঞ্চল হইতে ১৫ জন ধৃত। ১৩ই—ধুবড়ী কংগ্রেস বে-আইনী ঘোষণা, শ্রীহট্টে বিদ্যাশ্রম অফিস-গুলি পুলিস অধিকারে। রাজনগরে ৩জন যুবক গ্রেপ্তার। ১৫ই—উত্তর লখিমপুরে ৫৬০ মণ ধান্যপূর্ণ নৌকা নিমজ্জিত। শিবসাগরে মার্কিট হাউসে অগ্নিসংযোগ। উত্তর লখিমপুর সহরে রক্ষি-সৈন্যদিগের টহল। ২১শে পাইকারী জরিমানা আদায় করিতে গিয়া গোয়াল-পাড়ার এক গ্রামে বন্দুকের গুলীতে একজন পুলিস ও অপর এক ব্যক্তি নিহত। বে-আইনী শোভাযাত্রা করিবার জন্য হবিগঞ্জের ৫ জন বিশিষ্ট নাগরিক দণ্ডিত।

পাইকারী জরিমানা—কামরূপ জিলার যে সকল গ্রামবাসীর উপর পাইকারী জরিমানা স্থাপন করা হইয়াছে, তাহারা জরিমানা না দেওয়ায় তাহাদিগের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক। ধুবড়ী সহরের হিন্দুদিগের উপর ১৫ হাজার টাকা ধার্য্য। গোয়ালপাড়া সহরে ৩ শত টাকা ধার্য্য।

বোম্বাই—১৬ই আশ্বিন মাঝগাঁও পুলিস আদালতে অগ্নিদান, দুই জন অগ্নিদগ্ধ, কেরাণীদিগের অফিস, রেকর্ড-রুম ও প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাস ভস্মীভূত। বোম্বাইএর ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ বি, জি খেরের পুত্র মিঃ এস, বি, খের ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। হাইকোর্টে পিকেটিং করিবার অভিযোগে উকীল শ্রীযুত হিমৎলাল যোগজীবন ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত। ১৭ই আশ্বিন, ওয়াদি বন্দরে বোমা বিস্ফোরণ। এক গৃহে ২১টি তাজা বোমা প্রাপ্তি। ১৭ই এক কাপড়ের কলে বোমা বিস্ফোরণ; এক জন আহত। ১৮ই গান্ধীজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে শতাধিক মহিলার বারম্বার শোভাযাত্রা; মিঃ কে, এম, মুন্সীর দুই কন্যা ও অপর দুইজন মহিলা গ্রেপ্তার। জনতার উত্তেজনা, প্রস্তর ও সোডাওয়াটার বোতল নিক্ষেপ, ট্রাম থামাইবার চেষ্টা, গুলি। জেলে রাজনৈতিক বন্দীদিগের উপর লাঠী চার্জ্জ, কয়জন বন্দী আহত। ১০ই কার্ত্তিক বোম্বাই তুলার বাজারের নিকট ৩টি বোমা বিস্ফোরণ, ৩ জন পুলিস ও অপর একজন আহত; ৪০ জন গ্রেপ্তার। পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় হাইকোর্টের এক কক্ষে ৩টি বোমা আবিষ্কার। সুরাটে এক মন্দিরে প্রবল বিস্ফোরণ। ১১ই বারদোলীর এক গৃহে বোমা বিস্ফোরণ। ১২ই বোম্বাইএ এক তুলা ব্যবসায়ীর গুদামে বোমা বিস্ফোরণ। টাইমস অব ইণ্ডিয়া পত্রের কাগজের গুদামে অগ্নিকাণ্ডের ফলে ২ লক্ষ টাকা ক্ষতি। ১৪ই এক পুলিস ঘাঁটীতে বোমা বিস্ফোরণ। চলন্ত মোটর গাড়ী হইতে ৫টি বোমা প্রাপ্তি, প্রত্যেকটি বোমার ওজন ৩০ পাউণ্ড, ড্রাইভারের পলায়ন। ২০শে বোম্বাইএ গোখলে রোডে ধাতু আধারে এক বোমা আবিষ্কৃত। ২১শে বোম্বাই সরকার কর্ত্তৃক নিঃ ভাঃ কং কমিটীর ১১ হাজার ৩১৫ টাকা ।৵০ আনা বাজেয়াপ্ত। ২৪শে নাসিক সিটি পুলিস অফিসে বোমা বিস্ফোরণ। ২৬শে উইলসন কলেজ ভবনে বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ড। শেয়ার বাজারে ৫ জন মহিলাকে গ্রেপ্তারের ফলে জনতায় পুলিসের

উপর প্রস্তর ও ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌ব বর্ষণ। ধারওয়ারকর্ণাটক কলেজে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। বার্দ্দৌলীতে বোমা বিস্ফোরণ। ২৭শে বিঠলসদন ও জিন্না হলের আসবাব, দলীল, ২ খানি মোটর গাড়ী ও টাকাকড়ি প্রভৃতি সরকার কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত। কংগ্রেসের বেতার বিস্তার যন্ত্র দখল। ২৮শে সুরাট জিলার বিদ্যালয়গুলি আরও ২ মাসের জন্য বন্ধ। রাজপুতানা শিক্ষা মণ্ডল ও নিখিল ভারত আগর ওয়াল জাতীয় কোরের কার্য্যালয় তল্লাসী।

আমেদাবাদ—১৬ই আশ্বিন বোমা বিস্ফোরণ সম্পর্কে ৬ জন ধৃত। এক কূপ ও পুষ্করিণী হইতে বোমা প্রাপ্তি। সহরে অস্ত্রসহ বাহির হইবার সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞার মিয়াদ বৃদ্ধি, দুই স্থানে শোভা-যাত্রা সম্পর্কে ৬জন গ্রেপ্তার। ১৮ই 'প্রভাত' পত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ। বালক দল কর্ত্তৃক আদালত গৃহ আক্রান্ত। ৬ই কার্ত্তিক ভবনগরে ১০২ জন কংগ্রেসকর্ম্মী ১ মাস হইতে ২ বৎসর কারাদণ্ডে ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত। আমেদাবাদে সান্ধ্য আদেশের মিয়াদ বৃদ্ধি। ১৬ই ভিকটোরিয়া গার্ডেনসে বোমা বিস্ফোরণ। ২০শে আমেদাবাদ সহরে পুলিস চৌকীর নিকটে, এলিস ব্রিজ থানার ওকটন একসচেঞ্জ ভবনে তাজা বোমা প্রাপ্তি। ২৬শে সান্ধ্য আদেশের মিয়াদ বৃদ্ধি, ২৭শে মসকাটি বাজারে জনতার উপর গুলীবর্ষণ, লাঠী চালন ও গ্রেপ্তার।

পুণা—সাতারার সরকারী বিদ্যালয়ে অগ্নিদান, মিঃ ডাবারের গৃহতল্লাসী ও তাঁহাকে গ্রেপ্তার, তামগাঁওএ ২৩ জন গ্রেপ্তার। ১৭ই আশ্বিন পুণার নিকটবর্ত্তী এক সেচ কার্য্যালয়ে অগ্নিদান, ওয়াদিয়া কলেজে এ, আর, পি গুদামে অগ্নিদান। ১০ই কার্ত্তিক বেলগাঁওএ ৩০।৪০ জন বন্দুকধারী ব্যক্তির ডাকগাড়ী লুণ্ঠন। হুবলী-পুণা মেলের এক কামরায় ও শিবাজী মারাঠা স্কুলের প্রাঙ্গণে বোমা বিস্ফোরণ। ১৬ই কার্ত্তিক হুবলী-পুণা শাখার ৩টি রেল ষ্টেশন আক্রমণ ও অগ্নিদান। শোলাপুরে ৩ স্থানে বোমা বিস্ফোরণ। কয়েকজন ছাত্র আহত, ১৭ই, যারবেদা জেলে রাজনৈতিক বন্দীদিগের উপর লাঠী চালন, ৫।৬ জন রাজনৈতিক বন্দী ও জেলের ৪ জন পুলিস আহত, ৪ জন রাজনৈতিক বন্দীর পলায়ন। ২০শে নানাপেটে বহু পুরাতন মোটর টায়ার ভস্মীভূত। ২৬শে অস্ত্রাদিসহ পথ চলিবার নিষেধাজ্ঞার মিয়াদ বৃদ্ধি। শোলাপুর ষ্টেশনে অগ্নিসংযোগ।

সীমান্ত—৪ঠা কার্ত্তিক—ভূতপূর্ব্ব শিক্ষামন্ত্রী কাজী আতাউল্লা, ভূতপূর্ব্ব পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী খান আমির মহম্মদ খান, পরিষদ-সদস্য খান কামদার খান, খান জারিং খান এম-এল-এ, শ্রীযুত জয়া দাস এম-এল-এ, আবদুল আজিজ খান এম-এল-এ গ্রেপ্তার। ৮ই—৪১৬ জন লালকোর্ত্তা স্বেচ্ছাসেবককে মুক্তি দান। ১৩ই—খান খান আবদুল গফুর খান গ্রেপ্তার। এক জন স্বেচ্ছাসেবকের প্লীহা ফাটিয়া মৃত্যু।

সিন্ধু—১০ কার্ত্তিক—নূতন হিন্দু সচিব রায়-সাহেব গোকুল দাসের গৃহে, মিউনিসিপ্যাল উদ্যানে ও সচিব ডাঃ হেমনদাসের গৃহে বোমা বিস্ফোরণ। সচিবের গৃহের পাহারারত পুলিসের প্রতি বোমা নিক্ষেপ। হিন্দু সচিবদিগের গৃহে পিকেটিং করিবার জন্য ২২ জন মহিলা গ্রেপ্তার। পূর্ব্ব দিবস রাত্রিতে সিন্ধু এক্সপ্রেস ট্রেণের এক কক্ষে বোমা আবিষ্কার। ১২ই—সক্করে ১৫০ জন বালক-বালিকা গ্রেপ্তার। ২০শে কার্ত্তিক—ডি-জে, সিন্ধ কলেজে পুলিসদলের নিকট বোমা বিস্ফোরণ।

বিহার—১৫ই আশ্বিন—সারণ জিলার শিষওয়া গ্রামের এক গৃহে কতকগুলি টেলিগ্রাফের তার, রেলওয়ে সম্পত্তি, দুইখানি নূতন ছোরা, শত্রুদেশের কাহিনী সম্বলিত হিন্দী পুস্তিকা আবিষ্কার সম্পর্কে ৭ জন যুবক ধৃত। মানভূম জিলায় জনতা কর্ত্তৃক দুইটি থানা ভস্মীভূত। ১০ই কার্ত্তিক—সরাই থানার এক স্থানে দেশী পিস্তল, রিভলভার ও টোটা প্রাপ্তি। দেওঘরে আয়কর অফিস ভস্মীভূত। ১৮ই—মুঙ্গের সহরতলীর এক জঙ্গল হইতে ২ শত হাত বোমা আবিষ্কার। ২৫শে—হাজারিবাগ সেণ্ট্রাল জেল হইতে শ্রীযুত জয়প্রকাশ নারায়ণ, যোগেন্দ্র শুকুল, রামনন্দন মিশ্র, সূরয় নারায়ণ সিং, গুলাবীসোনার ও শালিগ্রাম সিংএর পলায়ন। তাহাদিগকে গ্রেপ্তারের জন্য ২১ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা। ফতোয়া ষ্টেশনে আর-এ-এফ সামরিক কর্ম্মচারীকে হত্যার সংস্রবে ৫০ জন গ্রেপ্তার। পাটনায় কয়েকটি বেতার লাইসেন্স বাতিল। ২২শে—মজঃফরপুর জেলায় ৭ জনের নির্ব্বাসন ও কারাদণ্ড।

উড়িষ্যা—১৬ই আশ্বিন—গঞ্জাম জিলা কংগ্রেসের ঘনশ্যাম দাস পট্টনায়েক গ্রেপ্তার। ১০ই কার্ত্তিক পর্য্যন্ত মোট ৭৭১ জন ধৃত। ধৃতদিগের মধ্যে ১৫ জন পরিষদ-সদস্য। ১১শে—বালেশ্বর জিলায় হরামে গুলীবর্ষণের ফলে বহু লোক হতাহত।

যুক্তপ্রদেশ—১৪ই আশ্বিন বারাণসীতে মুখোস, ছোরা ইস্‌ক্রুড্রাইভার প্রভৃতিসহ ৪ জন গ্রেপ্তার। পিস্তল ও আপত্তিকর কাগজ পত্র রাখিবার জন্য এক জনের ৬ মাস কারাদণ্ড। ১৫ই আশ্বিন এলাহাবাদ হাইকোর্টের তিন্ জন জজকে কয়েক জন তরুণীর আদালত বর্জ্জন করিতে অনুরোধ। কানপুরে ছাত্রছাত্রীদিগের এক জনতা ছত্রভঙ্গ। ৫৫ জন ছাত্রীর অর্থদণ্ড। ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রশ্নের উত্তরে এক জন ছাত্রী বলেন—আমি মহাত্মা গান্ধীর কন্যা। ১৮ই গোরক্ষ-পুর জিলার বাঁশগাঁও তহশীলের কংগ্রেসকর্ম্মীদিগকে গ্রেপ্তারের ফলে হাঙ্গামা সম্পর্কে কয়েক জন দণ্ডিত। ৭ই কার্ত্তিক মীরাটের এক সিনেমা গৃহে বোমা বিস্ফোরণ। ১৫ই সশস্ত্র ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক এলাহাবাদের আলফ্রেড পার্কে ভিক্টোরিয়ার মর্ম্মরমূর্ত্তি বিকৃত করে। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক গ্রেপ্তার।

মধ্যপ্রদেশ—২৪শে কার্ত্তিক নাগপুর সহরে বোমাসহ দুই জন সাইকেল-আরোহীর মধ্যে বিস্ফোরণ ফলে এক জন আহত। এক গৃহ হইতে ৭টি বোমা, রাসায়নিক পদার্থ, স্বর্ণ ও রৌপ্যা-লঙ্কারাদি আবিষ্কার; ৬ জন গ্রেপ্তার।

সামন্তরাজ্য—৫ই কার্ত্তিক পর্য্যন্ত মহীশূর রাজ্যে ৮১৪ জন গ্রেপ্তার। মহীশূরের ঈশ্বর গ্রামে আমিলদার ও দারোগা গ্রামবাসি-গণ কর্ত্তৃক নিহত ও কয়েকজন সরকারী কর্ম্মচারী আহত। গুলী বর্ষণে দুইজন গ্রামবাসী আহত। গ্রামবাসীদিগের গ্রামত্যাগ। ৭ই কার্ত্তিক নয়াগড় রাজ্যে দুই সহস্র লোকের উপর গুলী চালন, ১ জন নিহত, কয়েক জন আহত। জনতা কর্ত্তৃক কতকগুলি সরকারী ভবন ভস্মীভূত। ১২ই বাঙ্গালোর সিটি ষ্টেশনে বিস্ফোরণ। উড়িষ্যার ঢেঙ্কানাল রাজ্যে আন্দোলন সম্পর্কে ৩ জনের প্রতি প্রাণদণ্ড ও এক জনের প্রতি ৬ বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পৌষ, ১৩৩৮]

"কভু দেখি সেই কন্যা
আঁখির কোণে দিচ্ছে সাক্ষা
ঠিক যেমনটি দেখা যেত কালিদাসের কালে।"—রবীন্দ্রনাথ

[শিল্পী—শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ

২১শ বর্ষ]　　　　পৌষ, ১৩৪৯　　　　[৩য় সংখ্যা

সংস্কৃতকাব্যে চিত্র-চর্চা

দণ্ডী সত্যই বলিয়াছেন,—

> সারা ত্রিভুবন অন্ধসমান রহিত আঁধারে ভরা।
> যদি না উদিত শব্দজ্যোতিঃ সংসার-আলো-করা ॥ (১)

সৌর কিরণ যেমন নৈশ তিমির বিদূরিত করিয়া বহির্জগৎকে উদ্ভাসিত করে, তেমনই শব্দময় জ্যোতিঃ মূকতারূপ তমোনাশ করিয়া অন্তরজগৎকে প্রকাশিত করিয়া থাকে। শব্দসম্পদ হইতেই ভাবরাজ্যের পরিচয়; পরকীয় চিত্তবৃত্তির গূঢ় স্পন্দন শব্দই আমাদের নিকট বহন করিয়া আনে। এই শব্দসমষ্টিই ভাষার রূপকে ফুটাইয়া তুলে।

সংস্কৃত ভাষার শব্দসম্ভার এমনই রমণীয় এবং নমনীয় যে, তাহাকে যে কোন ছন্দে-বন্ধে-ভঙ্গিতে আকর্ষণ বিকর্ষণ করিলেও তাহার সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের হানি হয় না। যদি কোথায়ও মাধুর্য্য ক্ষুণ্ণ হয়, তথাপি ভাষাগত কোন অক্ষমতা দেখা যায় না। শব্দসম্পদের এইরূপ বৈচিত্র্য আছে বলিয়াই সংস্কৃত কাব্যে চিত্র-চর্চ্চার অবকাশ ঘটিয়াছে।

শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হইয়া থাকে, কাব্যে সুপ্রযুক্ত হইলে শব্দের ঝঙ্কার কর্ণগোচর হইবার পর চিত্তে রসবিশেষ জন্মাইয়া দেয়, কিন্তু চিত্রবন্ধে—শব্দরাশি লিপিবিশেষে সজ্জিত হইয়া চক্ষুরিন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করে। কাব্যে সন্নিবিষ্ট এই চিত্র শ্রবণ ও নয়ন উভয়কেই আকর্ষণ করিতে পারে বলিয়া ইহার বৈচিত্র্য কবিগণ সাদরে অঙ্গীকার করিয়া লইয়াছেন। সযত্নে অঙ্কিত চিত্রকরের চিত্র সুদৃশ্য হইলেও তাহা শব্দময়ী ভাষা প্রকাশে অক্ষম হইয়া থাকে, আবার সযত্নে রচিত কাব্য মনস্তুষ্টিপ্রদায়ক হইলেও নয়ন আকর্ষণ করিতে পারে না, এই অসম্ভবকে সম্ভব করিবার জন্য একটা সমাধানের চেষ্টা 'চিত্রবন্ধে' উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু এই সমাধান—সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে নাই। কাব্য ও চিত্রের মিলন করিতে যাইয়া অনেক সময়ে দুরূহ ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। ফলে, অনেক কবি ও আলঙ্কারিক এইরূপ চিত্রচর্চ্চাকে নিরুৎসাহিত করিয়াছেন। কাব্যপ্রকাশে মম্মট ভট মন্তব্য করিয়াছেন যে,—"এতে হি শক্তিমাত্রপ্রকাশকা ন তু কাব্যরূপতাং দধতীতি ন প্রদর্শ্যন্তে"—এই চিত্রবন্ধগুলি কবির শক্তি বা কৌশল মাত্র প্রকাশ করে, কিন্তু কাব্যের স্বরূপতা লাভ করিতে পারে না, এই জন্য এ বিষয়ে অধিক উদাহরণ প্রদর্শিত হইল না। সাহিত্যদর্পণেও বিশ্বনাথ আরও একটু তীব্র মন্তব্য করিয়াছেন (২)। তথাপি সংস্কৃত সাহিত্যে এই চিত্রকাব্যের প্রভাব নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। যদিও আদি-কবি বাল্মীকি বা মহাকবি কালিদাস 'চিত্র' অলঙ্কার সৃষ্টি করেন নাই, কিন্তু বাল্মীকির রামায়ণে স্বাভাবিক কবিত্বগতির মধ্যেও অনুপ্রাসের অভাব নাই (৩) এবং কালিদাসের রঘুবংশে

---

(১) ইদমন্ধন্তমঃ কৃৎস্নং জায়েত ভুবনত্রয়ম্।
যদি শব্দাহ্বয়ং জ্যোতিরাসংসারং ন দীপ্যতে ॥
কাব্যাদর্শ।

(২) কাব্যান্তর্গড়ুভূততয়া তু নেহ প্রপঞ্চ্যতে। ১০ম পরিচ্ছেদ

(৩) চঞ্চচ্চন্দ্রকরস্পর্শহর্ষোন্মীলিত-তারকা।
অহো রাগবতী সন্ধ্যা জহাতি স্বয়মম্বরম্ ॥
রামায়ণ, সুন্দরকাণ্ড।
যমবতামবতাঞ্চ ধুরি স্থিতঃ ইত্যাদি। রঘু, ৯ম সর্গ

অংকেশবচিত যমকাবলীর বিকাশ দেখা যায়। অনুপ্রাস ও যমকের অনুশীলন হইতেই যে পরবর্ত্তিকালে চিত্রবন্ধের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বপ্রবন্ধে বলিয়াছি। বাস্তবিক সংস্কৃত কাব্যে অনুপ্রাস ও যমকের অনুশীলন যে কত বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল—তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয় এবং এইরূপ অনুশীলন করিতে করিতে একটা অভিনব শব্দসজ্জাব আকাঙ্ক্ষা উদিত হওয়ার ফলেই প্রথমে রেখা চিত্রের সহিত বর্ণের মিলন করিবার প্রয়াস ঘটে।

বাঙ্গালা ভাষায় যমকের একটি দৃষ্টান্ত আমাদের বাল্যকালে বড়ই কৌতুক উদ্রেক করিত—

"বকী বলে বকা বোকা, বকা বলে বকী
এইরূপে বকাবকী করে বকাবকি।"

এই কষ্টকল্পিত যমক যে কাব্যরসেব পরিপন্থী, তাহা বলাই বাহুল্য। বাঙ্গালা ভাষায় কিছু কিছু যমকের প্রয়োগ থাকিলেও তেমন প্রভাব-বিস্তাব করিতে পারে নাই (৪) কিন্তু মহারাষ্ট্র ভাষায় মোরপন্তকৃত মহাভারতে কি অপূর্ব্ব যমকেব বিকাশ, তাহা দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। মনে হয়, প্রত্যেক ভাষাব একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে—বাঙ্গালা ভাষার সহিত যমক ও অনুপ্রাসের আধিক্য সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির বাধক, কিন্তু মহারাষ্ট্র ভাষায় সাধক হইয়া থাকে। সংস্কৃত ভাষার সহিত মহারাষ্ট্র ভাষার সম্বন্ধ একাংশে নিকটতর বলিয়া অনেক শ্লোক উভয় ভাষায় একরূপে সমান ছন্দে গ্রথিত হইতে পারে (৫), কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ শ্লোক রচনা কষ্টকর। মদীয় 'সারস্বত-শতকম্' নামক কাব্য হইতে এইরূপ একটি শ্লোক উদাহরণস্বরূপে উদ্ধৃত করিতেছি,—

শুভ্রোজ্জ্বলে শতদলে তব পাদপদ্ম
শোভাধরে মধুরিম ভুবনপ্রকাশে।
উষা যথা কিশলয়ে, তব দেবি! সম্ভো
ভাসে চ'খে শশিকলা বিকলা সকাশে॥

ইহাতে কোনরূপ অনুস্বার বিসর্গ যোগাযোগ না করিলেও এই পদ্যটি হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণসহ বসন্ততিলক ছন্দে পাঠ করিলেই সংস্কৃতভাষায় একটি অর্থবোধ করাইবে, অথচ বাঙ্গলা চতুর্দ্দশপদী ছন্দেও ইহা রচিত। কেবলমাত্র 'চ' 'খে' এইরূপ পৃথক্ পদ হইবে।

যাহা হউক,—খৃষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতে যমকের নানাবিধ ভঙ্গী মহাকাব্য কিরাতার্জ্জুনীয়ম্ ও দণ্ডীর কাব্যাদর্শে বিকশিত হইতে দেখা যায় এবং ইঁহাদেরই প্রদর্শিত সর্ব্বতোভদ্র, অর্দ্ধভ্রমক ও গোমূত্রিকাবন্ধ সংস্কৃত কাব্যে প্রথমে লোকচক্ষুর গোচর হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে,—এই তিনটি চিত্রই সরলরেখার অঙ্কন দ্বারাই নির্ব্বাহিত হয়। সর্ব্বতোভদ্র সম্বন্ধে কাব্যাদর্শে লক্ষণ উক্ত হইয়াছে—'তদিদং সর্ব্বতোভদ্রং ভ্রমণং যদি সর্ব্বতঃ'। বুঝিবার সুবিধার জন্য 'সারস্বতশতকম্' হইতে সর্ব্বতোভদ্রের উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি।

মায়াসাররসায়ামা যা জপাক্ষক্ষপাজয়া।
সা পাশদে দেশপাসা রক্ষ দেবি বিদে ক্ষর।

(অনুবাদ)

মায়া আর শ্রেষ্ঠরসে ব্যাপ্ত যিনি সদা,
অজ্ঞানরজনি জিনি' অজপা বিশদা।
সেই তুমি অধিষ্ঠানে দেশরক্ষা কর,
এস (ভব) পাশচ্ছেদিনি মা, জ্ঞানসুধা ক্ষর॥

মা	য়া	সা	র	র	সা	য়া	মা
যা	জ	পা	ক্ষ	ক্ষ	পা	জ	য়া
সা	পা	শ	দে	দে	শ	পা	সা
র	ক্ষ	দে	বি	বি	দে	ক্ষ	র
র	ক্ষ	দে	বি	বি	দে	ক্ষ	র
সা	পা	শ	দে	দে	শ	পা	সা
যা	জ	পা	ক্ষ	ক্ষ	পা	জ	য়া
মা	য়া	সা	র	র	সা	য়া	মা

এই শ্লোকটির বিশেষত্ব এই যে,—শ্লোকের প্রথম চরণটি এই অঙ্কিত (আটঘরা) চিহ্নের ঊর্দ্ধ, অধঃ, বাম বা দক্ষিণ যে কোন দিক্ হইতে পাঠ করিলে একরূপেই পাওয়া যাইবে। দ্বিতীয় চরণটি সর্ব্বদিকেই দ্বিতীয় স্থানে, এইরূপ তৃতীয় ও চতুর্থ চরণটি—সর্ব্বদিক্ হইতে তৃতীয় ও চতুর্থ পঙ্‌ক্তিতে একরূপেই দেখা যাইবে।

এইরূপ ছন্দের সহিত বিচিত্র বর্ণবিন্যাস আর কোন ভাষায় সম্ভবপর কি না, জানি না, তবে, সর্ব্বতোভদ্রজাতীয় বর্ণবিন্যাস করিবার একটা প্রবৃত্তি দেশান্তরেও দৃষ্ট হয়। *

সর্ব্বতোভদ্রের পরই অর্দ্ধভ্রমকের স্থান। অর্দ্ধভ্রমক এই নামেই

*REMARKABLE INSCRIPTION.

The following singular inscription is to be seen carved on a tomb situated at the entrance of the Church of San Salvador. in the city of Oviedo. The explanation is that the tomb was erected by a King named Silo, and the inscription is so written that it can be read 170 ways by beginning with the large S in the centre. The words are Latin 'Silo princepsfecit.' (The world of wonders—Page 100).

T I C E F S P E C N C E P S F E C I T
I C E F S P E C N I N C E P S F E C I
C E F S P E C N I R I N C E P S F E C
E F S P E C N I R P R I N C E P S F E
F S P E C N I R P O P R I N C E P S F
S P E C N I R P O L O P R I N C E P S
P E C N I R P O L I L O P R I N C E P
E C N I R P O L I **S** I L O P R I N C E
P E C N I R P O L I L O P R I N C E P
S P E C N I R P O L O P R I N C E P S
F S P E C N I R P O P R I N C E P S F
E F S P E C N I R P R I N C E P S F E
C E F S P E C N I R I N C E P S F E C
I C E F S P E C N I N C E P S F E C I
T I C E F S P E C N C E P S F E C I T

(৪) এ বিষয়ে দাশরথি রায়ের পাঁচালী কাব্যে বহুল প্রয়াস দৃষ্ট হয়।

(৫) মহদে সুরসংধম্মে তমবসমাসঙ্গমাগমাহরণে।
হরবহু সরণং তং চিত্তমোহমবসর উমে সহসা॥
দেবীশতকম্ ৭৬ শ্লোক, সাহিত্যদর্পণে উদ্ধৃত।

তাহার স্বরূপের পরিচয়। বর্ণগুলি এমন ভাবে সজ্জিত হয় যে, দুই দিক্ দিয়ে ঘুরিয়া আসে না, একদিক্ মাত্র ভ্রমণ করে। শ্লোকটি এই—

মাতা ন মায়য়া বাধ্যা তারবাদনকায়বা।
ন বা সুধামাত্রকায়া মাদধারাস্তমানয় ॥

(অনুবাদ)

মাতা তুমি বাধ্য নহ মায়ার বন্ধনে,
প্রণবঝঙ্কার তোল' বীণার স্পন্দনে।
চির নবীনতা তব, সুধামাত্র কায়া,
আন' গো আনন্দধারা হইয়া সদয়া ;

শ্লোকটির অঙ্কন এইরূপ,—

মা	তা	ন	মা	য়	য়া	বা	ধ্যা
তা	র	বা	দ	ন	কা	র	বা
ন	বা	সু	ধা	মা	ত্র	কা	য়া
মা	দ	ধা	রা	স্ত	মা	ন	য়
য়	ন	মা	স্ত	রা	ধা	দ	মা
য়া	কা	ত্র	মা	ধা	সু	বা	ন
বা	র	কা	ন	দ	বা	র	তা
ধ্যা	বা	য়া	য়	মা	ন	তা	মা

এই চিত্রে সর্ব্বতোভদ্রের মত সকল দিক হইতে সমানরূপে বর্ণগতি সম্ভবপর হয় না, কেবলমাত্র এক একদিকে অক্ষর ধরিয়া গাইলে—একটি চরণ পাওয়া যাইবে। সর্ব্বতোভদ্রে দুই দিক্ হইতে আট বার ঘুরিবে এবং প্রত্যেক চরণের আট বার আবৃত্তি হইবে। অর্দ্ধ ভ্রমণে এক দিক্ হইতে চার বার মাত্র আবৃত্তি, এ জন্য অর্দ্ধভ্রমক নামটি সার্থক হইয়াছে।

'গোমূত্রিকাবন্ধ'—তির্য্যগগতি সরল রেখার উপর প্রতিষ্ঠিত। গোমূত্র যেমন zigzag গতিতে পতিত হয়, এই বন্ধেও সেইরূপ তির্য্যক্ রেখার অঙ্কন হইবে। সেরূপ অঙ্কন করিতে গেলে সম অক্ষর (even number) বা বিষম অক্ষর (odd number) দুই চরণের পক্ষে সাধারণ (common factor) হওয়া চাই ; যেমন,—

হি
ম তা
স্তো
ম তুঃ
স
মা দা
সো
ম ঢ়
কো
ম কি
লা
পা লা
প
তা চা
প
হা লা

গোমূত্রিকাবন্ধ

হিমস্তোমসমা সোম-কোমলা পাপতাপহা।
হিতা স্তোতুঃ সদা সোঢ়কোকিলালাপচাপলা।

(অনুবাদ)

হিমরাশিমত শুভ্রবরণা কোমলা চন্দ্রসমা
পাপতাপহরা, স্তবকারি-জনে মঙ্গল কর মা!
মধুঋতু যবে নামিছে ধরায়—তখনই তোমার আসা,
সহিছ পিকের চপল আলাপ এত জীবে ভালবাসা।

প্রথম অক্ষরকে লইয়া আরম্ভ হইলে বিষমাক্ষর গোমূত্রিকা বন্ধ এবং দ্বিতীয় অক্ষর হইতে হইলে সমাক্ষর গোমূত্রিকা বন্ধ হইবে। উপরিস্থ চিত্রে বিষমাক্ষর গোমূত্রিকা বন্ধ।
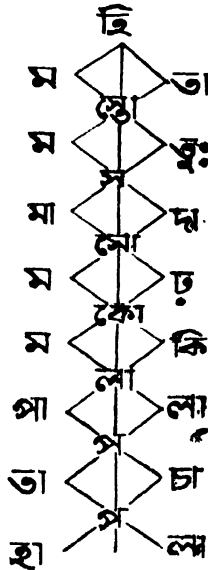
এই তিনটি বন্ধের প্রচলন সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, তৎপরে মুরজ-বন্ধ প্রভৃতির অস্তিত্ব বিকাশলাভ করে। মুরজ শব্দে মৃদঙ্গ, মৃদঙ্গের অঙ্গে বেত্রগুলি যেমন সাজান থাকে, তদনুকরণে মুরজবন্ধের কল্পনা হইয়াছিল—ইহাও সরল রেখার অঙ্কন। যেমন,—

হে ভারতি! সমেহি ত্বং ক্ষ্মাভাবপ্রশমে হিতা।
ত্বদভা রবৌ হিমে হি স্যা শুভা রতিসমেঽহিজিৎ ॥

(অনুবাদ)

ত্বরায় ভারতি! এস হে ধরায়,
ভভাব-ভবণ তোমা হ'তে হয়।
তব ভাতি ফুটে হিমে রবি-গায়
রতিসম শুভে! তম' কর জয় ॥

বন্ধ চিত্রটির বিশেষত্ব এই যে,—প্রথম ও অন্তিম চরণ দুই রূপে দেখা যাইবে। সাধারণ ভাবে শ্লোক যেমন থাকে, তাহা ব্যতীত প্রথম চরণের প্রথম অক্ষর হইতে তির্য্যগ্‌ভাবে নীচের দিকে নামিয়া পুনরায় ঊর্দ্ধে উঠিবে এবং অন্তিম চরণের প্রথম অক্ষর হইতে তির্য্যগ্-গতিতে উপরে উঠিয়া আবার নামিবে ও উভয় স্থলেই শেষ অক্ষরে পুনঃ মিলিত হইবে।
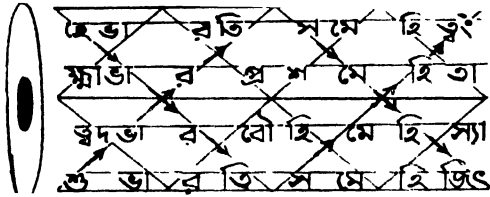
মুরজবন্ধ

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্য (যিনি ধ্বন্যালোক প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা) তাঁহার প্রণীত 'দেবীশতকম্' নামক একখানি ভক্তিরসাত্মক খণ্ডকাব্যে মুরজবন্ধের উদাহরণ দেখাইয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তিকালে বহু কাব্যে মুরজবন্ধের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি 'দেবীশতকে' বহু প্রকারের যমক, অনুপ্রাস, অনুলোমপ্রতিলোমযমক, সর্ব্বতোভদ্র, অর্দ্ধভ্রমক, মুরজবন্ধ এবং গোমূত্রিকাবন্ধের প্রয়োগ দেখাইয়া গিয়াছেন এবং গোমূত্রিকাবন্ধ হইতে দুইটি অবান্তর বন্ধ কিরূপে উৎপন্ন হইতে পারে, তাহাও প্রদর্শন করিয়াছেন, অর্থাৎ গোমূত্রিকাবন্ধ দুইটি পাশাপাশি সংলগ্ন করিয়া রাখিলে জালবন্ধের স্বরূপ হইবে এবং গোমূত্রিকার প্রথম ও শেষ বর্ণ বিভিন্ন রাখিয়া অনুষ্টুপ্ ছন্দের মধ্যবর্ত্তী ছয়টি বর্ণ সমানভাবে সাজাইলে তূণবন্ধ হইবে।* দেবীশতকের কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য অসাধারণ সন্দেহ নাই, কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, খৃষ্টীয় নবমশতকেও কাব্যের

তূণবন্ধের স্বরূপ এই—

* বন্দেবি সারদা ভক্তানন্দে বিশারদা ভব।
নমু জেতৃ দয়া শক্ত্যা তনু জেতৃ দয়া শয়ম্ ॥
সাক্ষ্যতশতকম্।

চিত্রচর্চা সরলরেখার উপরেই প্রধানভাবে চলিয়াছে। ইহাতে একটি মাত্র অষ্টদল পদ্মের উদাহরণ পাওয়া যায়।

অতঃপর ভোজরাজের সরস্বতী-কণ্ঠাভরণ নামক অলঙ্কারগ্রন্থে—বহুবিধ চিত্রের সন্ধান দেওয়া হইয়াছে। এই সময়ে অনুপ্রাস যমক প্রভৃতির গৌরব উচ্চশিখরে আরোহণ করে। তাই ভোজরাজ বলিয়াছেন,—

উপমাদিবিযুক্তাপি রাজতে কাব্যপদ্ধতিঃ।
যত্রানুপ্রাসলেশোঽপি হন্ত তত্র নিবেশ্যতে॥
কুণ্ডলাদিবিযুক্তাপি কান্তা কিমপি শোভতে।
কুঙ্কুমেনাঙ্গরাগশ্চেৎ সর্ব্বাঙ্গীণঃ প্রযুজ্যতে॥

(অনুবাদ)

উপমাদিহীনা হ'লেও ত' দীনা
নহে সে অমর-বাণী।
যদি অনুপ্রাস মধুর বিন্যাস
লেশতঃ করিতে জানি॥
কুণ্ডলাদি নানা আভরণ বিনা
হয় না কি বধূ শোভা ?
কুঙ্কুমরাগে যদি তার জাগে
সকল অঙ্গে আভা ?

ভোজরাজ চিত্র-অলঙ্কারকে ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়া (১) বর্ণচিত্র, (২) (উচ্চারণ) স্থান-চিত্র, (৩) স্বরচিত্র, (৪) আকার-চিত্র, (৫) গতি-চিত্র ও (৬) বন্ধ-চিত্ররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন।

(১) বর্ণচিত্রের বর্ণশব্দের দ্বারা ব্যঞ্জনবর্ণ গ্রহণ করিয়াছেন, কেন না পৃথগ্‌ভাবে স্বরচিত্রের কথা আছে। এই ব্যঞ্জনবর্ণ চিত্র—একটি, দুইটি, তিনটি বা চারিটি মাত্র ব্যঞ্জনবর্ণ ব্যবহারে শ্লোক রচনা সম্ভবপর হইলে তাহা বর্ণ-চিত্র। (২) ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ স্থান অনেক ; কিন্তু তন্মধ্যে তালব্য, মূর্দ্ধন্য বা ওষ্ঠ্যবর্ণ একেবারে বর্জ্জন করিয়া কবিতা রচনার নাম স্থানচিত্র। (৩) একপ্রকার, দ্বিপ্রকার বা তিন প্রকার স্বরমাত্র ব্যবহারে অথবা সর্ব্বপ্রকার স্বরবর্ণের প্রয়োগ দেখাইয়া কবিত্ব-প্রকাশের নাম স্বর-চিত্র। আধুনিক দৃষ্টিতে এই সকল চিত্রের চিত্তাকর্ষকতা স্বীকৃত হয় না। (৪) আকার-চিত্রমধ্যে পদ্মের সন্ধান পাওয়া যায়। 'পদ্মাদ্যাকারহেতুত্বে'—এই যে পরবর্ত্তী আলঙ্কারিকগণের লক্ষণ,—ইহাতে ভোজরাজের আকার-চিত্র স্মরণ করাইয়া দেয়। পদ্মচিত্রের উদাহরণটি দেবীশতক হইতেই সংগৃহীত। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, দেবীশতকের টীকাকার 'কয়্যট' শ্লোকটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু পদ্মচিত্রের সন্ধান দিতে পারেন নাই। এই কয়্যট ৯৭৮ খৃষ্টাব্দের ভীমগুপ্ত নৃপতির সমসাময়িক বলিয়া টীকাশেষে আত্মপরিচয় দিয়াছেন। দশমশতকেও যে পদ্মচিত্রের তেমন প্রচলন হয় নাই, ইহা অনুমান করা যায়। একাদশ শতাব্দীতে সরস্বতীকণ্ঠাভরণে শুধু একটি অষ্টদল পদ্ম নহে, ষোড়শদল, চতুর্দ্দল ও চার প্রকার অষ্টদল পদ্মচিত্র উদাহরণরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। স্বপ্রণীত 'সারস্বত-শতকম্' হইতে অষ্টদল পদ্মের একটিমাত্র উদাহরণ দিতেছি,—

সারদা সারদাধ্যাসা সাধ্যা সাচ্যুতবেধসা।
সাধবে দত্তসাতাস্তু স্তুতা সাস্তু সদারসা॥

(অনুবাদ)

সারদা অধ্যাসীনা সরোজ-উপরে।
(যাঁরে) অচ্যুত বিধি সাধেন সাদরে।
সজ্জনে আজি হউন সুখদা।
তিনি স্তুতিগুণে রসময়ী সদা॥

পদ্মবন্ধ

এই বন্ধের বিশেষত্ব এই যে, প্রথমে পদ্মমধ্যের "সা" হইতে পূর্ব্বদিকের দল ধরিয়া পাঠ করিতে হইবে, তৎপরে দিগ্‌দলগুলিতে যে অক্ষর বসান আছে—তাহা দুই বার বিপরীত ভাবে পড়িতে হইবে, কোণের পদ্মদলের অক্ষর এক বার মাত্র পাঠ করিয়া ঘুরিয়া আবার পদ্মমধ্যে মিলিতে হইবে। সরস্বতীকণ্ঠাভরণের কিছু পূর্ব্ব হইতেই যে চিত্রবন্ধের বিশেষ প্রচার হইয়াছিল, তাহা বেশ অনুমান করা যায়। পদ্ম-চিত্রের দলগুলিতেও মধ্যভাগে অক্ষরসজ্জা তখনও এমন কৌশলে করা হইত যে, কবির নামাক্ষর পর্য্যন্ত তাহাতে স্থান পাইতে বাধা হয় নাই।

(৫) গতি-চিত্রে—অনুলোম গতিতে শ্লোকের এক চরণ কি দুই চরণ রচিত হইয়া পুনরায় সেই বর্ণগুলিই প্রতিলোমগতিতে শ্লোকাংশ পূর্ণ করিবে। যেমন,—

রাধানুরাগিন্নুপসংসরাশু তামাহিতামন্তরভূমকায়া।
ইঁহাকেই বিপরীতভাবে পাঠ করিলে শ্লোকটি পূর্ণ হইবে,—
যা কামভূরন্তমতা হি মাতা শুরাসসম্পন্নু গিরা নু ধারা॥

(অনুবাদ)

ওহে আরাধনা অনুরাগী জন,
সন্নিধানে তাঁর কর প্রসরণ।
সমাগতা সেই অন্তরের ধন
ভূমা তনু যাঁর—কামপ্রস্রবণ।
পরমা জননী তিনি সুখাকারা
না জানি, বাঙ্‌ময়ী কিংবা রসধারা॥

গতপ্রত্যাগত চিত্র বা অনুলোম বিলোম কাব্য বহু ভাবে দেখা

যায়। রামকৃষ্ণবিলোম কাব্য ইহার একটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত। বাম হইতে দক্ষিণ দিকে অক্ষরগুলি পড়িয়া গেলে রামচরিত এবং দক্ষিণ হইতে বামে পাঠ করিলে কৃষ্ণচরিত্র বর্ণিত হইয়াছে।

অতঃপর বন্ধচিত্রের মধ্যে চক্রবন্ধ, শরবন্ধ, ব্যোমবন্ধ, মুরজবন্ধ, গোমূত্রিকাবন্ধ এবং গোমূত্রিকাধেনুবন্ধ প্রভৃতি বহু বন্ধের পরিচয় সরস্বতীকণ্ঠাভরণ হইতে পাওয়া যায়।

এই চিত্রবন্ধের ক্রমবিকাশ চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে—যদিও ধ্বনিকার আনন্দবর্দ্ধন যমকাদি নিবন্ধের তেমন প্রশংসাপরায়ণ ছিলেন না,* তথাপি তিনি নিজেই 'দেবীশতকম্' নামক কাব্য রচনা করিয়া যমক ও চিত্রবন্ধের বহুবিধ সমাবেশ করিলেন কেন? এই প্রশ্ন সকলেরই চিত্তে উদিত হইতে পারে। এই প্রশ্নের সরল উত্তর এই যে,—প্রকৃত রসবিষয়ক রচনায় যমক বা চিত্রবন্ধাদির ব্যবহার না করাই বহু আলঙ্কারিকের অভিপ্রেত এবং রস বলিতে প্রধানভাবে শৃঙ্গার, বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, রৌদ্র ও বীভৎস এই আটটি রসকেই বুঝাইয়া থাকে। শান্তরস বা বাৎসল্যরস সর্ব্ববাদি-সম্মত নহে। এই শান্তরসের সহিত ভক্তির অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এ জন্য ভক্তিরসাত্মক স্তোত্রকাব্য-রচনায় যদি যমক বা চিত্রবন্ধাদির প্রয়োগ করা যায়, তাহা দোষাবহ হইবে না। বিশেষতঃ, অধিকাংশ-স্থলে দেবতার পূজোপচার—অঙ্গভূষণ বা অঙ্গে ধারণীয় অস্ত্রশস্ত্র মধ্যে যে সকল বস্তু পাওয়া যায়, তাহা লইয়াই প্রায় বন্ধচিত্র রচিত হইয়া থাকে, সুতরাং এই সকল চিত্র দেবতাপ্রকরণ সম্বন্ধীয় বলিয়া ভক্তি প্রকাশের সহায়ক হইতে পারে, এবং তাহার ফলে শান্ত নামক নবমরসের উদ্দীপক হিসাবে চিত্রগুলি রসসম্বন্ধহীন বলিয়া উপেক্ষণীয় হয় নাই।

দেবপূজার অঙ্গরূপে শঙ্খ, ঘণ্টা, মুরজাদি বাদ্য আজিও ব্যবহৃত হয়। সারস্বতশতকে ঘণ্টা ও শঙ্খবন্ধ এইভাবেই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে,—

ঘণ্টাবন্ধের শ্লোকটি এই,—

সুহৃৎসদানন্দন-তারদানা-
দ্বিধের্জগৎসৃষ্টিবিধৌ হি দেবি।
বিদে ত্বমেহি স্ফুরদাত্মবীণা-
নাদাবদা নন্দনদাসহৃৎসু॥

(অনুবাদ)

সুহৃৎ সদাই তুমি বিধাতার
সৃষ্টির কাজে বিতর ওঙ্কার।
ঝঙ্কারিয়া বীণা দেবি! জ্ঞান দিতে
এস মা কিঙ্কর তনয়ের চিতে॥

ঘণ্টাবন্ধঃ

এই বন্ধে প্রথম চরণের ঠিক প্রতিলোম বর্ণ সাজাইয়া চতুর্থ চরণটি পাওয়া যাইবে। ঘণ্টার ধরিবার দণ্ড (handle) মধ্যে উপর হইতে শ্লোক আরম্ভ হইয়া বাদ্যভাণ্ডটুকু বেষ্টন করিয়া পুনর্ব্বার ঐ দণ্ড ধরিয়া আরব্ধ স্থানেই শ্লোক সমাপ্ত হইয়াছে।

তঃপর শঙ্খবন্ধটির স্বরূপ নিম্নে দেওয়া হইল—

ভাতু কাপি ললিতাকৃতিঃ সিতা
তাপহা প্রশমদীপিকা তু ভা।
দীর্ঘদর্শিনয়নৈকতারকা
তারকান্ত-কলয়া লয়াদৃতা॥
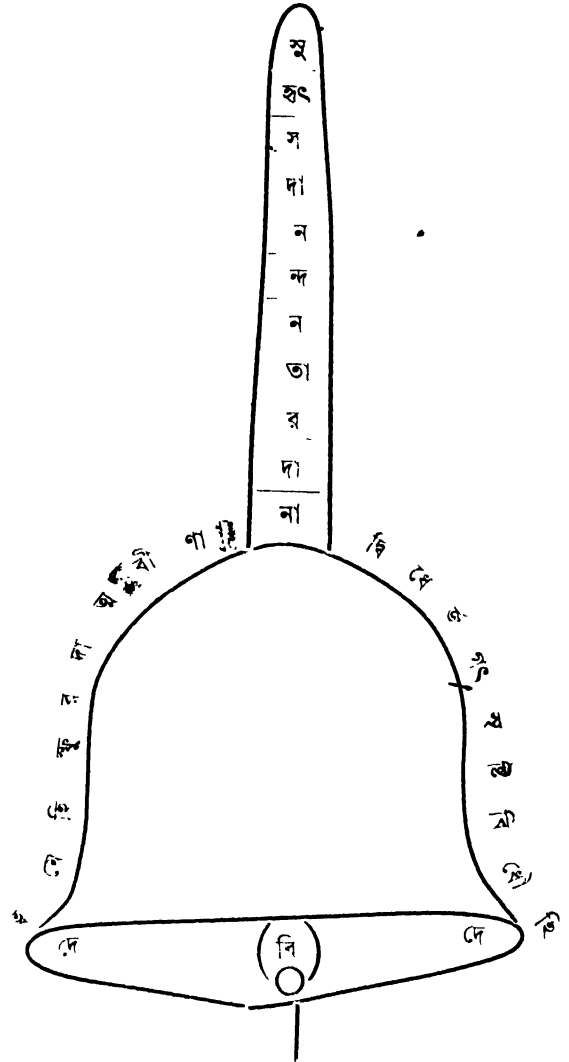
(অনুবাদ)

ভাত গৌর দ্যুতি এক ললিত সুঠাম
শুভ্রা তাপনিবারণী পরশে আরাম।
দীর্ঘদর্শি-নয়নের ধ্রুব তারা মত
শোভে যে রজতকান্তি প্রলয়ে আদৃত॥

শঙ্খবন্ধের বা ঘণ্টাবন্ধের কোন প্রাচীন দৃষ্টান্ত পাই নাই। কাজেই এইরূপ চিত্রে নবকল্পনার আশ্রয় লইতে হইয়াছে। শঙ্খবন্ধের প্রাথমিক চারটি বর্ণ দ্বিতীয় চরণের অন্তিম চারটি বর্ণ প্রতিলোম গতিতে সমান হইয়াছে এবং 'তারকা' ও 'লয়' এই বর্ণগুলি দ্বারা দুইটি যমক সৃষ্টি হওয়ায় নিম্নস্থ দুইটি সারির মিলিত বর্ণসংখ্যা মধ্য-সারির সংখ্যার সহিত সমান করা হইয়াছে।

---

* যমকাদিনিবন্ধেষু পৃথগ্‌যত্নোঽস্য জায়তে।
শক্তস্যাপি রসাঙ্গত্বং তস্মাদেষাং ন বিদ্যতে॥

শঙ্খ বন্ধ

ঘটবন্ধ, পূজাপ্রকরণে ঘটস্থাপনার প্রয়োজন আছে; ঘটে থাকে সিন্দূরের স্বস্তিক চিহ্ন, এই ঘটবন্ধের বিশেষত্ব এই যে, অনুপ্রাস ও যমকের সন্নিবেশেই ইহার রচনা। শ্লোকটি এই,—

স্তন্যস্তন্যরসাসার-রমণী-রমণীয়তা।
তায়তাং জগতো মাত্রা মাত্রাতো যা মিতায়তা।

(অনুবাদ)

স্তন্যরসধারা দানে তনয়ের কল্যাণ সাধন
রমণীর রমণীয় ভাব এই জানে সর্ব্বজন।
জগতের জননি গো! সেই ভাব বিস্তর সংসারে
এই স্নেহমাত্রা হায়! মরতের কে বুঝিতে পারে?

ঘটবন্ধ

এই বন্ধের এবং উপরিস্থ শঙ্খবন্ধের শ্লোক দুইটিতে যেমন সরস্বতীর মহিমা বর্ণিত হইয়াছে, তেমনি শঙ্খ ও ঘটের স্বরূপটিও সঙ্কেতে বলা হইয়াছে। শঙ্খ শুভ্র শীতল, আলয়ে আলয়ে আদরের সামগ্রী ও গৃহিণীদের সর্ব্বদা লক্ষ্যের বস্তু এবং ঘট যে জলের আধার রমণীর কক্ষশোভা, এইরূপ ব্যঞ্জনা দেওয়া হইয়াছে। ধনুর্ব্বাণবন্ধে এই ব্যঞ্জনাকে আরও পরিস্ফুট করা হইয়াছে। ধনুর্ব্বাণবন্ধের শ্লোকটি এই,—

বাণী নমৎ-কোটি গুণানুবন্ধ-
স্কন্তে রুচিং স্যাং কমলে চ বাণী।
কৃশেশয়াস্তঃ ক্ষয়সন্ধতাঞ্চ
প্রবীণতাং পাণিগতাঙ্গগম্যাম্।

(অনুবাদ)

ধনুষ্কোটি নত হ'লে গুণের যোজন
করে সেই বাণধারী বাণী (বাণ+ইন্) যেই জন।
(আর) নম্রজনে কোটিগুণযোগ দেন বাণী
(এমন করুণাময়ী তাঁরে মোরা জানি।)
কমল—হরিণে বাণ বিঁধিবারে রুচি,
(আর) বাণীর প্রভায় হয় অরবিন্দ শুচি।
বাণের সন্ধান হয় সারস নিধনে
বাণীর নিয়ত বাস কমল-কাননে।
বাণ ধরি' প্রবীণতা আসে অঙ্গুলিতে,
বাণী মঞ্জুবীণা করে, গন্ধর্ব্বের হিতে।

ধনুর্ব্বাণবন্ধ

বাণী (বাণধারী বীরপুরুষ) ও বাণী (সরস্বতী) ধনুর্ব্বাণবন্ধের সহিত সরস্বতীর এই শব্দগত সাদৃশ্যকে আপাততঃ গ্রহণ করিয়া সরস্বতীর মহিমা বর্ণনা করা হইয়াছে।

বস্তুতঃ বৈচিত্র্য এই যে, সরস্বতীর সহিত ধনুর্ব্বাণের সম্বন্ধ উপনিষৎ-প্রসিদ্ধ। ব্রহ্ম—লক্ষ্য, জীবাত্মা হইল বাণ, ও প্রণব ধনুঃ এই রূপকের আভাস উপনিষদে উল্লিখিত হইয়াছে, যথা,—

"প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ।"

শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ (এম-এ)।

সুরের আগুন

(গল্প)

ইন্‌স্‌পেক্‌শন সারিয়া মীরপুরে ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। জমিদার-বাবুরা বলিলেন—আমাদের এখানে রাত্রিটা আজ···

নিশীথ রায় বলিলেন—না। আমি ডাক-বাংলাতেই থাকবো। তার পর কাল ঢাকায় ফিরবো।

ডাক-বাংলায় ফিরিয়া দেখিলেন, টেবিলের উপর একখানা চিঠি। ভাবিলেন, নিশ্চয় পার্টির ব্যবস্থা। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মনে-মনে বলিলেন, ক্লান্তির ছলে একটু বিনয়-সহকারে ক্ষমা চাহিব। সারা দিন যে-ধকল গিয়াছে—এখন বিশ্রাম!

খাম ছিঁড়িয়া চিঠি খুলিয়া যা দেখিলেন···চমকিয়া উঠিলেন! মেয়েহাতের লেখা চিঠি। চিঠিতে লেখা আছে:

কি বলে সম্বোধন করবো বুঝতে পারছি না! মহামান্য জজ-সাহেব বাহাদুর? না···

ক্যাম্পবেলের পাশ সামান্য ডাক্তারের স্ত্রী আমি। আর তুমি এ জেলার জজ-সাহেব! যাকে বিশ বছর চোখে ছাখোনি—যার কথা কাণে শোনোনি···

কার চিঠি? কে লিখিয়াছে?

তলায় নাম—জয়ন্তী। মনে পড়িল!

কিন্তু বিশ বছর পরে···হঠাৎ? জয়ন্তী এখানে কোথা হইতে আসিল?

নিশীথ বাবু চিঠি পড়িতে লাগিলেন। চিঠিতে লেখা আছে:

ঢাকা থেকে জজ-সাহেব আসছেন এ-গ্রামে ইন্‌স্‌পেক্‌শনে! জজ-সাহেবের নাম নিশীথ রায় আই-সি-এস্। মনে পড়বে না হয়তো! বিশ বছর পরে হঠাৎ আমার বাড়ীর এত-কাছে এসেছো, আমার মন কেমন আকুল হলো! আসবে, কি আসবে না—এ চিন্তা না করেই চিঠি লেখবার দুঃসাহস করছি! উপায় থাকলে নিজে গিয়ে সেলাম দিয়ে আসতুম হয়তো! কিন্তু আমি গ্রামের কুলবধূ—আমার পক্ষে যাওয়া যখন সম্ভব নয়, তখন আশা করতে পারি, কাজের পর আমার এখানে তুমি আসবে? আমি থাকি সাভারে। মীরপুর থেকে সাভার আট মাইল। ইচ্ছা হলে জজ-সাহেবের পক্ষে বজরা জোগাড় করা মোটেই শক্ত হবে না।

নদীর উপরে আমার বাড়ী-বাগান। বাগানটি মনের মতো তৈরী করেছি। খারাপ লাগবে না। এলে তোমার সঙ্গে বেচারী সুলতার কথা একটু···

অতীতের সব কথা নিশীথের মনে পড়িল। সে-কথায় অনেকখানি ব্যথার স্মৃতি বিজড়িত! সে কথার কি প্রয়োজন আজ!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া নিশীথ আসিয়া বসিলেন ডাক-বাংলার বারান্দায়। আর্দালী আসিয়া টেবিলের উপর চায়ের ট্রে ধরিয়া দিল।

নিশীথের সেদিকে লক্ষ্য নাই। আকাশের দিকে চাহিয়া নিশীথ ভাবিলেন, যে-অতীত পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে, আজ বিশ বছর পরে সে ছাইয়ের স্তূপ ঘাঁটিয়া লাভ? যে ব্যথা ভুলিয়া গিয়াছি, নূতন করিয়া সে-ব্যথা জাগাইয়া তোলা মূঢ়তা!

জয়ন্তী!···এখন প্রৌঢ় বয়স। ক্যাম্পবেলের পাশ ডাক্তার তার স্বামী···নামটা? ব্রজেশ্বর! তাই বটে! মনে পড়িল, সুলতা আর সে···জয়ন্তীকে দু'জনে কত মানা করিয়াছিল, ক্যাম্পবেলের পাশ ডাক্তারকে বিবাহ করিয়ো না! সে-মানা জয়ন্তী শোনে নাই! এক দিন কি নির্ব্বোধই সব ছিল!···সেই সুলতা···সে আজ ইহলোকে নাই!

কিন্তু জয়ন্তী··ভালোই করিয়াছে। বিবাহ করিয়াছে! উচিত কাজ! এখন দেখিতে কেমন আছে? সব দিকে তার সেই তেমনি লক্ষ্য···তেমনি তার ধীর শান্ত প্রকৃতি···তেমনি বুদ্ধি-বিবেচনা?

তার সঙ্গে শেষ দেখা···জয়ন্তীর বয়স তখন কত? বাইশ? চব্বিশ?···চব্বিশ বছরই! গানে তার কি মধুর কণ্ঠ! জয়ন্তী বলিত, বিবাহ করিয়া ঘর-সংসারে তার রুচি নাই···গানে সে বাংলা দেশে কীর্ত্তি রচনা করিবে! তার পর যেদিন বলিল, না, মেয়ে-জন্ম লইয়া তা বরিয়া জীবনকে ব্যর্থ করিবে না···সে বিবাহ করিতেছে ক্যাম্পবেলের পাশ ডাক্তার ব্রজেশ্বরকে, সেদিন সুলতার কি নিষেধ! কত তিরস্কার! কি মিনতি! দিদির এ-কামনায় সুলতার দু'চোখে যেন বন্যা নামিয়াছিল! বলিয়াছিল, তোর অমন গলা দিদি···বিধাতার দান···এ-দান তুই মিথ্যা করিবি? জয়ন্তী সে-কথা মানে নাই!

মনে পড়িল, কলেজে পড়িবার সময় সে থাকিত আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে মামার বাড়ীতে। মামার বাড়ীর সামনে ছিল জয়ন্তীদের বাড়ী। জয়ন্তীর বাপ ক্ষিতীশ বাবু ছিলেন গান-পাগলা ভদ্রলোক। তাঁর বাড়ী ছিল গানের আখড়া! কত ওস্তাদ, কত কালোয়াৎ আসিত। দেশের কত যন্ত্রী! নিশীথ গিয়া জুটিত! নিশীথের বয়সী আরো কত লোক! ক্ষিতীশ বাবুর স্ত্রী ছিলেন না। শুধু দুই মেয়ে···জয়ন্তী আর সুলতা। দেখিতে যেমন সুশ্রী, কণ্ঠও তাদের তেমনি! বিশেষ সুলতার কণ্ঠ! সুলতাকে নিশীথ কি ভালোই বাসিত! সে ভালো-বাসা···সে-ভালোবাসার কথা জানিত শুধু জয়ন্তী!

সে-ভালোবাসা যেন সেই···তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি যুগে-যুগে অনিবার!

তার পর নিশীথ বিলাত গেল···বিলাত হইতে ফিরিল··· ফিরিয়া বিবাহ করিল। স্ত্রী সুনন্দিনী··মস্ত ব্যারিষ্টারের মেয়ে! নিশীথের জীবনে সে আনন্দ···শান্তি···কল্যাণ! কি নয়? দুই ছেলে···ছেলেরা ডাগর হইয়াছে···পড়াশুনা করিতেছে।

সুলতার কথা মনে জাগে! নিশীথ মনে-মনে হাসে! এক দিন ভাবিত, মানুষ এক বারের বেশী দু'বার ভালোবাসিতে পারে না! এখন জীবনের অভিজ্ঞতায় বুঝিয়াছে, ও-কথা ঠিক নয়!

কিন্তু জয়ন্তী?

বিশ বছর পরে জয়ন্তী ডাকিয়াছে! এমন করিয়া নিশীথকে মনে রাখিয়াছে যে একবেলার জন্য নিশীথ এখানে আসিয়াছে, সে খবরটুকুও তার শুধু অজানা নয়! জানিয়া এমন করিয়া ডাকা···

বেয়ারা আসিয়া বলিল—আপনার রাত্রে খানা···

নিশীথ বলিল—না। নেমন্তন্ন আছে। সাভার যাবো। চাপরাশীকে বল, বজরা রেডি করবে। এখনি যাবো।

বেয়ারা বলিল—আমরাও যাবো?

নিশীথ বলিল—না। আমি একা।

বজরায় নিশীথ। মনের পটে অতীতের দিনগুলা যেন ছবির পর ছবি আঁকিয়া চলিয়াছে!

জয়ন্তী আর সুলতা···দু' বোনের স্বভাবে কত তফাৎ! জয়ন্তী বড়। সুলতাকে যেন ডানা দিয়া ঢাকিয়া রাখিত! সুলতার নিত্য নূতন বায়না! ঘরে পয়সার টানাটানি, সুলতার চাই ভালো শাড়ী, ভালো ব্লাউশ, নাচ-গান, পার্টি, হল্লার উল্লাস! ক্ষিতীশ বাবুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীতে ভিড় আরো জমিয়া উঠিল! আজ চ্যারিটি-শো···কাল জলশা···পরশু পিকনিক-পার্টি। সুলতাকে গান গাহিতে হয়! অমনি নয়! টাকা! পিকনিকে তার গানের দাম আসিতে লাগিল!

জয়ন্তী বলিল—টাকা নিবি?

সুলতা বলিল—বা রে, আমি গাইবো, আমার গলার দাম দেবে না?

দামে ক্রমে সুলতার নেশা লাগিল আরো বেশী! টাকার তার অন্ত নাই! যে-রেটে টাকা আসে, তার চেয়ে জোর-রেটে সুলতা টাকা খরচ করে···বেশে-ভূষায় সখে-খেয়ালে! জয়ন্তী ডানা মেলিয়া সুলতার সঙ্গে ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়, তাকে আগলায়। তার নিজের কোনো অস্তিত্ব রহিল না!

জয়ন্তীকে নিশীথ বলিত,—তোমার মতো এমন নিঃস্বার্থ ভালোবাসা আর কোনো বোনের দেখিনি!

জয়ন্তী জবাব দিল—সুলতার কথা বলছো?

—হ্যাঁ।

জয়ন্তী বলিত,—মা ওকে এতটুকুন্ রেখে মারা গেছে। আমিই মানুষ করেছি। আমি ছাড়া কে আর ওর আছে? তুমিও তো ওকে ভালোবাসো নিশীথ···ওর যেন নেশা লেগেছে···ও কিছু দেখতে পাচ্ছে না।

নিশীথ বলিল—কিন্তু আমার এ ভালোবাসা! জানো তো জয়ন্তী, ···এর মানে···

হাসিয়া জয়ন্তী বলিল—জানি, you are not lovers!

নিশীথ বলিল—ওর এ-নেশা ছাড়াতে হবে! না হলে···

না হলে কি, সে-চিন্তায় দু'জনেই শিহরিয়া উঠিত!···নিশীথের কাছে সুলতা ছিল···যেন ফুল! সে ফুল দেখিয়া সুখ! হাতে লইতে ভয় হয়···হাতের মলিন স্পর্শে পাপড়ি যদি ঝরিয়া যায়! যদি ও-ফুল মলিন হয়!

কি ভালোবাসা···এ-বয়সে আজ তা বুঝাইতে পারিবে না। তবে সে ভালোবাসার স্মৃতিতে মনের খানিকটা আজো যেন রাঙা হইয়া আছে! সে-দিক্‌টা...সে যেন সেকালের সেই ঠাকুর-ঘর···বাহিরের কোন-কিছু সেদিকটাকে পাছে স্পর্শ করে, মন তার এখনো সজাগ সতর্ক আছে!

তার পর নিশীথের এগজামিন! ওদিকে সুলতাকে নহিলে সভা-সমিতি জমে না! সুলতার গান!···চ্যারিটি-শো হয়, সুলতার গানের নামে লোক একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে।

তার পর জয়ন্তীর বিবাহ···নিশীথের বিলাত-যাত্রা···ষ্টেশনে তাকে বিদায় দিতে আসিয়াছিল জয়ন্তী আর সুলতা।

বিলাত হইতে নিশীথ ফিরিয়া আসিল। মান-মর্য্যাদা, স্ত্রী, ঘর-সংসার···কোথায় গেল জয়ন্তী কোথায় বা সুলতা···এক কোণে রহিল শুধু তাদের স্মৃতির ক্ষীণ রেখা!

সাভার। ব্রজেশ্বর ডাক্তারের বাড়ী। নিরালা নির্জ্জন গৃহ। আকাশে একরাশ জ্যোৎস্না।

দ্বারে জয়ন্তী। প্রৌঢ় স্থূল দেহ। সমাদরে নিশীথকে আনিয়া সে ঘরে বসাইল।

নিশীথ চমকিয়া উঠিল! সেই জয়ন্তী এমন! চেনা যায় না!

জয়ন্তী বলিল,—এসেছো তাহলে! সত্যি খুব খুশী হয়েছি।

সঙ্গে সঙ্গে একটা নিশ্বাস।

জ্যোৎস্নার আলোয় নিশীথ দেখিল, আগেকার সে জয়ন্তীর থাকিবার মধ্যে আছে শুধু দু'টি চোখ···সেই ডাগর চোখ!

নিশীথ বলিল—খবর ভালো?

জয়ন্তী বলিল,—এমনি চলে যাচ্ছে!

—উনি বেরিয়েছেন। ডিস্‌পেন্‌সারী আছে। ফেরেন রাত আটটা নটায়!···তোমার খপর ভালো?

নিশীথের মুখে কথা নাই!

জয়ন্তী বলিল—যখন শুনলুম জজ-সাহেব আসছেন মীরপুরে··· জানি, তুমি ঢাকায় বদলি হয়ে এসেছো!···তুমি খপর রাখো না, আমি রাখি। ভালো কথা, এখন তাহলে কি বলে ডাকবো, জজ-সাহেব? না, নিশীথ?

নিশীথ বলিল—যদি আগেকার সম্পর্ক ভুলতে পারো, তাহলে জজ-সাহেব বলো। আমাকেও তাহলে আপনি-মশাই বলতে হবে!

জয়ন্তী বলিল—মনে না থাকলে চিঠি লেখবার দুঃসাহস হবে কেন?···বিয়ে করেছো?

নিশীথ বলিল—করেছি কৈ কি! দু'টি ছেলে। তারাও ডাগর হয়ে উঠলো!···তোমার?

একটা নিশ্বাস! জয়ন্তী বলিল,—ছেলেপিলে হয়নি!···সংসারে তুমি সুখেই আছো, নিশ্চয়···মানুষ যেমন থাকে?

নিশীথ বলিল—আমার স্ত্রী···মানে, যাকে আমাদের দেশে বলে, লক্ষ্মী! এমন স্ত্রী·· তার স্বামীর কোনো দুঃখ-দুর্ভাগ্য থাকতে পারে না, জয়ন্তী!

—বুঝেছি, বৌ খুব ভালো!···বিয়ে হয়েছে, তা···প্রায় উনিশ বছর হলো না? হ্যাঁ, উনিশ বছরই। আমার বিয়ে হয়েছে পঁচিশ বছর। বলিয়া সে হাসিল। ম্লান হাসি।

নিশীথ বলিল—সুলতাকে ভালোবাসি···তখন আমার বয়স একুশ বছর। সে ভালোবাসার ঘোর সারা জীবন থাকবে, এ তুমি নিশ্চয় ভাবোনি জয়ন্তী!

জয়ন্তী বলিল—না। অথচ তোমাকে তখন এ-কথা বললে তুমি কি-রকম রাগ করতে! মনে আছে, তুমি বলতে, আমার এ ভালোবাসাকে তুমি জলের লিখন বলতে চাও?

নিশীথ হাসিল। বলিল—সে-বয়সে জীবনের কি বা জানতুম! যখনি আমরা ভালোবাসি, তখনি মনে হয়, সেইটেই পরম সত্য! এ-ভালোবাসা জীবনে মিলিয়ে যাবে না!

একটা নিশ্বাস চাপিয়া জয়ন্তী বলিল—অত ভালোবাসা, পরে তার কিছু মনে থাকে না, এর চেয়ে দুঃখ আর কি থাকতে পারে!

নিশীথ বলিল—তা ঠিক নয়, জয়ন্তী! সুলতাকে ভালোবাসা··· আমার জীবনে সে এক আশ্চর্য্য অনুভূতি···unique! সে ভালোবাসার স্মৃতি ভোলবার নয়···আমি ভুলিনি। তাকে

ভালোবাসার সঙ্গে যত নৈরাশ্য, যত ব্যথা পেয়েছি—সে নৈরাশ্য, সে ব্যথা শুধু মিলিয়ে গেছে···ভালোবাসায় যে-সুখ, যে-আনন্দ ছিল, তা আমার মনে জেগে আছে চিরদিন!

তার পর দু'জনেই নীরব···দু'জনেই ভাবিতেছিল সুলতার কথা!

ভগবান্ সুলতাকে যে-কণ্ঠ দিয়াছিলেন, সে-কণ্ঠ লইয়া কি ভাবেই না নিজেকে সে নষ্ট করিয়া গিয়াছে! মানুষের মন পৃথিবীর মতো চলিয়াছে···শুধু চলিয়াছে! তার এ-চলার বিরাম নাই! নিমেষের জন্ম না!···এক দিন যে-সুলতার গান শুনিবার জন্ম মানুষ আকুল উন্মত্ত হইত, আজ সে-সুলতার নামও তারা করে না! সে সুলতার অভাবে তাদের গানের আসর-জমায় কোনো বিঘ্ন ঘটে না!

গানের আসর ছাড়িয়া সুলতা গিয়া নামিল শেষে ফিল্মের পর্দায়। ছবির যা-কিছু জোর, তা সুলতার গানে! গ্রামোফোনের রেকর্ডে সুলতার গান! ঘরে ঘরে সুলতার গানের রেকর্ড! ঘরে ঘরে ফিল্ম-ষ্টার সুলতার ছবি! সুলতা,—সুলতা,—সুলতা! সুলতা ছাড়া বাঙলা দেশে আর কেহ নাই—কিছু নাই! মা-লক্ষ্মী কোথা হইতে আসিয়া সুলতার মাথায় দু'হাতে টাকা বর্ষণ করিতেছেন—সুলতাও তেমনি সে টাকা খরচ করে! টাকার উপর তার মায়া ছিল না, মমতা ছিল না! দামী শাড়ী-ব্লাউশ···আসবাব মোটর-গাড়ী! ফুলে মধু থাকিলে যেমন মধুকরের ভিড় লাগে, সুলতাকে ঘিরিয়া তেমনি মানুষের ভিড়···কত রকমের মানুষ!

শেষে জয়চাঁদ মাড়োয়ারি···

তার দৌলতে কি না মিলিল! বাড়ী···বাগান! জুয়েলারি! ঐশ্বর্য্য যত বাড়ে, বেপরোয়া সুলতা তত যেন উন্মত্ত হয়!

শেষে হাউইয়ের আগুন যেমন নিবিয়া ঊর্দ্ধ-আকাশ হইতে মাটীতে পড়ে ছাইয়ের রাশি হইয়া···তেমনি এক দিন সুলতারো এ দীপ্তির অবসান হইল পঙ্ক-কদ্দমের স্তূপে! নিজের বাগান-বাড়ীর পুকুরে এক দিন সকালে পাওয়া গেল সুলতার মৃতদেহ···সিল্কের ব্লাউশ ফুঁড়িয়া পিঠে রক্তের জমাট চাপ···ব্লাউশ লালে লাল!

খবরের কাগজে হৈ-হৈ রব উঠিল। তার ছবি ছাপিয়া পিতৃ-পরিচয়ের সঙ্গে গানে তার প্রতিভাব বিকাশ কি করিয়া ঘটিল,—তাহা হইতে সুরু করিয়া জয়চাঁদ মাড়োয়ারি, সমর গুপ্ত, অমর ঘোষ, এ ল্যাহারি···এমনি সত্তেরো নামের মালায় তার স্মৃতির কি লাঞ্ছনাই না-জাহির করিয়াছিল! সুলতার জীবন ঘিরিয়া হায়-হায় বেদনার সঙ্গে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের উৎস!

জয়ন্তী বলিল—বিলেত থেকে ফিরে তার সঙ্গে আর তোমার দেখা হয়নি?

—না। বিলেত থেকে প্রথম প্রথম প্রায় তাকে চিঠি লিখতুম। দু'মাস ছ'মাস অন্তর দু'-চারখানার জবাব দিত। লিখতো, ভারী ব্যস্ত! চিঠির সঙ্গে খপরের কাগজের কাটিং পাঠাতো···কোন্ কাগজ বলেছে নাইটিংগেল···কোন কাগজ লিখেছে সুরের পরী! বছরখানেক এমনি চিঠি লিখেছিল। তার পর তিন-চারখানা চিঠির জবাব দেয়নি। আমিও লেখা ছেড়ে দিয়েছিলুম···তোমার সঙ্গে দেখাশুনা···?

জয়ন্তী বলিল—না। ইদানীং খবর দিত না। খবর রাখতো না আর! কন্ট্রাক্ট নিয়ে বোম্বাই গিয়েছিল। খপরের কাগজে পড়ে যখন জানলুম কলকাতায় ফিরেছে, তখন চিঠি লিখেছিলুম, আমার কাছে একবার আসবার জন্য। তার জবাবও দ্যায়নি! আসেওনি!

নিশীথ বলিল—আমার স্ত্রী ওর গানের সুখ্যাতি করতেন। সুলতার গানের সব রেকর্ড কিনেছেন।

জয়ন্তী বলিল—জানে তোমার সঙ্গে ভাব-সাবের কথা?

নিশীথ বলিল—না। যে সময় এ-সব রেকর্ড কেনা হয়, সুলতা তখন ফিল্মে জয়েন করেছে। পাছে আমার স্ত্রী তার নামের অমর্য্যাদা করেন, তাই বলিনি।

জয়ন্তী বলিল—তার যখন খুব নাম, তুমি তো তখন বিলেত থেকে ফিরেছো, তার গান শুনতে যাবার ইচ্ছা হয়নি? কি কৌতূহল?

—না। তখন ঘর-সংসার পেতে বসেছি।···যা গেছে, তাকে ফের জাগিয়ে তুলে লাভ! তবে আমার কাণে সব খপর পৌঁছুতো। পাঁচ জনে আলোচনা করতো, জয়চাঁদ মাড়োয়ারি তাকে কিনে রেখেছে···তার দৌলতে সুলতার ঐশ্বর্য্যের সীমা নেই! শুনে আমার মনে কষ্ট হতো!···নিঃশব্দে তা সয়েছি!

নিশীথ একটা নিশ্বাস ফেলিল।

জয়ন্তী বলিল,—আমার সম্বন্ধেও কখনো কৌতূহল জাগেনি? হঠাৎ আমি গান ছেড়ে ক্যাম্পবেলের পাশ ডাক্তারকে বিয়ে করলুম··· তার পর কি করছি? কেমন আছি?···এ কৌতূহল? আমার এই গানের গলা নিয়ে আমিও কেন দিগ্বিজয়ে গেলুম না···মনে হতো না?

নিশীথ চাহিল জয়ন্তীর পানে, তার দু'চোখে অনেকখানি কৌতূহল!

জয়ন্তী বলিল—এ খ্যাতির লোভ আমারো ছিল। আমার গান শুনে চারি দিকে জয়ধ্বনি উঠবে, মনে হতো! কিন্তু সুলতাকে দেখে ভয় হলো! সমস্ত পৃথিবীকে যেন সুলতা ত্যাগ করেছে···এমন মত্ততা যে গানের জন্ম যেখানে তাকে ডাকে, সুলতা দ্বিধা না করে চলে যায়! সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলো না! সে বলতো career সেই career-এর নেশা! আমি দিদি··সে-নেশায় আমাকে ভুলে গেল··আমার পানে চাইলো না!

জয়ন্তী চুপ করিল। তার পর একটা নিশ্বাস ফেলিল। আবার বলিল,—লতির চেয়ে আমার মনের জোর অনেক-বেশী···প্রথম প্রথম পাঁচ জনে এসে যখন তার নামে পাঁচ কথা বলতো, আমি অগ্রাহ্য করতুম। ভাবতুম, হিংসায় ওরা ও-সব অপবাদ রটাচ্ছে। লতিকে একবার সে-কথা বলি। তাতে হেসে সে জবাব দেয়, এতে রাগ করো কেন? আমি জিজ্ঞাসা করেছিলুম, এরা যা বলে, তা সত্যি? লতি তাতে জবাব দিয়েছিল, যে যা বলে বলুক গে দিদি, জীবনকে তা বলে উপভোগ করবো না? লোকের কথায় ভয়ে জুজু-বুড়ী হয়ে থাকবো? ···এ কথা শুনে আমি শিউরে উঠেছিলুম। আমার ভয় হলো! ভাবলুম, ভগবান্ মেয়েমানুষকে সত্যিকারের প্রতিভা দিলে কি হবে, সে-প্রতিভার চারি দিকে এত শত্রু এত রকমের ফন্দী আর প্রলোভন নিয়ে ঘুরছে··মেয়েমানুষ এমন অসহায়! মেয়েমানুষের সরল বিশ্বাস ···তার প্রতিভার সম্মান করা দূরের কথা··পুরুষমানুষ সে-প্রতিভাকে হাতের অস্ত্র করে তোলে মেয়েমানুষের সর্ব্বনাশের জন্ম!

কথার শেষের দিকে বাষ্পভারে জয়ন্তীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

নিশীথ নির্ব্বাক্! চাহিয়া রহিল পাশের ঐ মালতী-ঝাড়ের দিকে ···হঠাৎ ব্রজেশ্বরের কণ্ঠ—বাইরে বসে আছো! এমন চুপচাপ!

নিশ্বাস ফেলিয়া জয়ন্তী উঠিয়া দাঁড়াইল। নিশীথের পানে চাহিয়া বলিল—উনি এসেছেন।

নিশীথ ফিরিয়া দেখিল, খাটো-গড়নের মানুষ···গায়ে গলাবন্ধ কোট, হাতে মোটা লাঠি, মুখে একরাশ দাড়ি···ব্রজেশ্বর ডাক্তার।

নিশীথ বলিল—নমস্কার! আসুন।

ব্রজেশ্বর বলিল—ওঁর মুখে আপনার কত কথাই শুনি! চোখে কখনো দেখিনি! দেখবার দুরাশা কোনো দিন মনে জাগেনি। আমরা হলুম চুণোপুঁটি মানুষ, বুঝলেন কি না···আর আপনি হলেন···

বাধা দিয়া জয়ন্তী বলিল—ওকে জজ-সাহেব বলে খাতির করতে হবে না! মিষ্টার টিষ্টার বলবার দরকার নেই··ও হলো নিশীথ ···তোমার সম্বন্ধী।

স্মিত-মুখে ব্রজেশ্বর চাহিল নিশীথের পানে। বলিল—জয়ন্তী বলছে তাই···আমি আপনার আত্মীয়···a very near and dear relation.

ব্রজেশ্বর হাসিল। প্রাণ খুলিয়া খানিকটা উচ্চ হাসি! তার পর বলিল—ভাইকে শুধু বসিয়ে গল্প শোনাচ্ছো! খাবার-দাবার ব্যবস্থা কৈ? আমার কতখানি সৌভাগ্য, আমার কুঁড়েয় উনি পায়ের ধূলো দিয়েছেন!

জয়ন্তী বলিল—তুমি বলবে, তবে সে-ব্যবস্থা করবো?

—না, না, তাই বলছি কি না।

জয়ন্তী বলিল—তুমি মুখ-হাত ধুয়ে নাও। তার পর দু'জনে খেতে বসবে।

নিশীথ বলিল—তুমি?

জয়ন্তী বলিল—তোমাদের হয়ে গেলে তার পর···

নিশীথ বলিল—না, তা হবে না। একসঙ্গে তিন জনে বসে খাবো। এমন সুযোগ জীবনে এই প্রথম!···এবং হয়তো এই শেষ!

—বেশ, তাই হবে!

তার পর আহার চুকিল।

ব্রজেশ্বর বলিল—আমাকে একটু মাপ করতে হবে! বীরেন সাহার বাপ জনার্দন সাহার খুব অসুখ। বুড়ো মানুষ—এ যাত্রা টিঁকবে না! আমাকে তাই যেতে হবে···রাত্রে ওয়াচ্ করবার জন্য··· ঢাকা থেকে সিভিল-সার্জ্জন সাহেব এসেছিলেন বিকেলে···

তার পর নিশীথের পানে চাহিয়া বলিল—বলতে সাহস হয় না, ···দয়া করে যদি পায়ের ধূলো দেছেন, আজ রাত্রে আর নাই বা ফিরলেন!

নিশীথ বলিল—কিন্তু···

ব্রজেশ্বর বাধা দিল, বলিল—কিন্তু কেন! ওঁর গান শুনবেন। সত্যি, এখনো চমৎকার গাইতে পারেন।

দু' চোখে ভর্ৎসনা ভরিয়া নিষেধের স্বরে জয়ন্তী বলিল—আঃ!

নিশীথ হাসিল। হাসিয়া বলিল,—গান তাহলে ছেড়ে দেননি!

ব্রজেশ্বর বলিল—ছাড়বার জো কি! একলাটি থাকতে হয়··· আমার হাসপাতাল আছে···পেসেণ্ট আছে···আমার বাইরে-বাইরে দিন কাটে! ভাগ্যে ওঁর ঐ গান ছিল! ভগবান্ অমন গলা দিয়েছেন···গান গেয়ে কোনো মতে এ নিঃসঙ্গতা সয়ে বাস করছেন! তাছাড়া সকলের সঙ্গে মিশতে পারেন না। ওঁর মনের সঙ্গে পাল্লা দেবে, এমন-মনের মেয়েছেলেও তো আশে-পাশে আর নেই।··· আরো জানেন নিশীথ বাবু, এখন চ্যারিটি শো হলেই ওঁর ডাক পড়ে, গাইতে হবে। মুক্তি নেই! সে বারে অত-বড় বন্যা হয়ে গেল ···গ্রামের পর গ্রাম ভেসে মানুষ সর্ব্বস্বান্ত···এখানে চ্যারিটি শো হলো, তার aid-এ উনি গেয়েছিলেন সে-আসরে পাঁচখানি গান। ওঁর গানের জোরে উঠেছিল···তা দু' হাজার টাকা। ঢাকা থেকে বড় বড় লোক এসেছিলেন ওঁর গান শুনতে।

জয়ন্তী মুখ নত করিল।

নিশীথ বলিল—আমি জানি, চমৎকার গান গাইতে পারেন। তবে ভেবেছিলুম, আপনার সংসারের চাপে সে সব ঝরে গেছে!

ব্রজেশ্বর বলিল—তা কখনো যায় মশায়! গুণীর গুণ কিছুতেই ঝরতে পারে না! ও হলো ভগবানের দান! হা-হা-হা···

ব্রজেশ্বর রোগী ওয়াচ্ করিতে গেল।

জয়ন্তীকে গাহিতে হইল। সেই পুরানো দিনের গান। নিশীথ ছাড়িল না।

তার পর হঠাৎ জয়ন্তী উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—চলো, আমার বাগান দেখবে! জ্যোৎস্না-রাত···তোমার ভালো লাগবে।

বাগানখানি সত্যই চমৎকার। ফুলে ফুলে আলো হইয়া আছে··· তার উপর আকাশ-ভরা জ্যোৎস্না!

জয়ন্তী বলিল,—জানো, মারা যাবার দু'দিন আগে লক্ষ্মি আমায় চিঠি লিখেছিল! সে চিঠি পাবার আগেই খবরের কাগজে আমি শেষ-খবর পেয়েছিলুম···তার চিঠি যখন হাতে এলো, কি যে হলো আমার! একখানি চিঠির জন্য কি-মিনতি না জানিয়েছি, তার লেখবার খেয়াল হয়নি!

নিশীথ বলিল—তোমার ঠিকানা সে জানতো তাহলে?

—না। সে-চিঠি অনেক ঘুরে আমার কাছে এসে পৌঁচেছিল!

—চিঠিতে কি লিখেছিল?

—চিঠিতে শুধু লেখা ছিল—অনেক উঁচুতে উঠেছি! যদি পড়ি, খুব উঁচু থেকেই পড়বো দিদি—মনে কোনো ক্ষোভ থাকবে না!··· শুধু এইটুকু!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া নিশীথ চুপ করিয়া রহিল।

জয়ন্তী বলিল—খ্যাতি যা পেয়েছিল, খুব! রাখতে পারলো না! ···কিন্তু হঠাৎ এত কালের পর আমাকে ও-কথা লেখবার কি দরকার ছিল? এ চিঠি আমি পেলুম সে চলে যাবার পর। চিঠি পেয়ে আমার মনে হলো, সে যেন ও-পার থেকে আমাকে ডেকে এ-কথা বলছে! সে-কথা এখনো যেন কাণে বাজছে!

নিশীথ বলিল—আশ্চর্য্য!

জয়ন্তী বলিল—আমার শুধু এই শান্তি, শেষ-দিন পর্য্যন্ত আমাকে মনে রেখেছিল! ভোলেনি!

নিশীথ কোনো জবাব দিল না।

জয়ন্তী বলিল—হয়তো জেনেছিল, সব তার শেষ হয়ে এসেছে। নিজের জীবনের কথা ভেবে দেখেছিল, হয়তো যত খ্যাতি হয়েছে, যত নাম···যে-জিত, যে-আনন্দ পেয়েছে···আমি ও-পথে যাইনি··· ও-পথে যেতে তাকে মানা করেছিলুম···তাই আমাকে জানিয়ে দিয়ে গেল যে, না, তার মনে কোনো ক্ষোভ নেই···সে তৃপ্তি

পেয়েছে! ভগবানের অমূল্য দান···তা নিয়ে বাণ্ডুনী তাই করে গেছে। সে-দানকে পায়ে ঠেলে আর কোনো-কিছুর প্রত্যাশা বা লোভ সে করেনি।···আমি যেমন সে দানকে হেলায় হারিয়েছি···

নিশীথ বলিল—কিন্তু তা নয় জয়ন্তী!···তুমিও তোমার ও-দানে অনেককে তৃপ্তি দেছ। এই তো শুনলুম, ব্রজেশ্বর বাবুর কাছে, বন্যা-রিলিফে তোমার গানে তুমি দু'হাজার টাকা দান করেছো।

নিশ্বাস ফেলিয়া জয়ন্তী বলিল—সে কি গান! বিধাতার দান নিয়ে ছেলাখেলা করেছি·সে দানের মর্য্যাদা রেখেছি কৈ!··· বিশ বছর আগে আমার গলা কি রকম ছিল···আমার গান তো শুনেছিলে···

নিশীথ বলিল—কিন্তু তোমার তো কোনো দুঃখ নেই সে জন্য। তোমার স্বামী···সংসার···

বড় একটা নিশ্বাস ফেলিয়া জয়ন্তী বলিল—দুঃখ আমার নেই··· আমাকে উনি তুচ্ছ করেন না···আমার উপরই সব ভার। আমি যা করি···যা খরচ করি, কখনো তার কৈফিয়ৎ চাননি··কিন্তু আমি কি পেলুম? স্বামী তাঁর পেসেন্ট নিয়ে মেতে আছেন চব্বিশ-ঘণ্টা··· তাদের রোগ আর ওষুধ এই নিয়েই···আমার পানে ফিরে তাকাবার সময় নেই! কি নিয়ে···কি করে আমার দিন-রাত কেটে চলেছে··· ভাবেন না! আমি যেন মেশিন! আমার সুখ নেই, দুঃখ নেই, আমার আরাম নেই, কিছু নেই। একে বাঁচা বলে না, নিশীথ। মেয়েদের এ দুঃখ তোমরা কখনো দেখলে না। বুঝলে না! জীবনে আমি কি পেয়েছি, বলতে পারো?···ভগবান আমাকে যে-কণ্ঠ দিয়েছিলেন, স্বামী তার পানে কখনো চেয়ে দেখেছেন? কখনো তার দাম বুঝেছেন?···আমার কি মনে হয়, জানো নিশীথ? ভগবান্ আমায় অনেক-কিছু দিয়েছিলেন কিন্তু আমার অযত্নে সে-সব মিথ্যা হয়ে গেল!···কি আমার দাম? স্বামীর বাসনা-কামনার তৃপ্তি জোগাবার জন্যই কি মেয়ে-মানুষের জীবন? তাছাড়া তার আর অস্তিত্ব নেই?

নিশীথ বলিল—এ সব কথা মনে আনতে নেই জয়ন্তী! এই যে সংসার তুমি গড়ে তুলেছো, তাকে লালন করছো···

—আমি তাতে কি পেয়েছি!···তাছাড়া কার সংসার? এ সংসারে আমার স্থান কোথায়? কি দাম?

জয়ন্তীর দু'চোখে অশ্রুর উচ্ছ্বাস···

নিশীথ শুনিল। কি জবাব দিবে? সান্ত্বনা দিবে যে, তুমি তোমার জীবনের পঁচিশটা বৎসর পরের জন্য নিজেকে যে এই চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিয়াছ, এই ত্যাগেই তো নারী-জন্মের সার্থকতা?

এ কথা কতখানি স্বার্থপরের···

জয়ন্তী বলিল—অনেক রাত হয়ে গেল···ডাক-বাংলায় ফিরবে? না, বজরায় থাকবে?

নিশীথ যেন চমকিয়া উঠিল! বলিল—না, ডাক-বাংলাতেই ফিরবো।

জয়ন্তী বলিল,—তাহলে আর দেরী নয়···চলো, তোমাকে বজরায় তুলে দিয়ে আসি।

জয়ন্তীর স্বর বাষ্পার্দ্র। নিশীথ বুঝিল। কোনো কথা বলিল না। জয়ন্তীর মনে যে-বেদনা, মুখের সান্ত্বনা-বাক্যে সে-বেদনা ঘুচিবে না, ঘুচিতে পারে না···তা সে বোঝে।

বজরা চলিয়া গেল।

বজরায় বসিয়া জয়ন্তীর কথা ভাবিতেছিল। জয়ন্তীর ভুল? কী যে নিশীথের অভিজ্ঞতা প্রচুর···পৃথিবীকে স ভালো করিয়াই জানিয়াছে!···নিজের কথা মনে পড়িল। চাকরি করিয়া টাকা রোজগার করিতেছে···পঞ্চাশ দিকে পঞ্চাশ রকমে সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে হয়। সকলকে লইয়া পৃথিবীতে বাস করিতে হয়! নিজের চাওয়া-পাওয়াকেই বড় করিয়া তুলিলে দুঃখ পাইতে হয়!·পৃথিবীতে শুধু দেওয়া-নেওয়ার কারবার! এ বয়সে জয়ন্তী মনের মধ্যে এ কি অতৃপ্তি জাগাইয়া তুলিয়াছে! সংসার স্বামী···ইহাই চলিয়া আসিতেছে চিরকাল। জলশার খ্যাতি। ফিল্মের খ্যাতি···এই খ্যাতিই কি জীবনে সব?···আবার মনে হইল, বঙ্কিম বাবুর চন্দ্রশেখর বলিয়াছিলেন, আমার পুঁথিপত্র গুছাইয়া শৈবলিনীর কি সুখ?···তাই? তাঁর জজীয়তীর গৌরবে তিনিও তো···স্ত্রী রুক্মিণীও সে-গৌরবে এমনি বিভোর? তার নিজের কামনা কিছু নাই? ছিল না?···হয়তো জয়ন্তী যা বলিল···ব্রজেশ্বর তো রোগী দেখিতে চলিয়া গেল। যখন বাহিরে কাজ থাকিবে না, তখন আসিবে ঘরে স্ত্রীর কাছে! স্ত্রী শুধু স্বামীর স্বাচ্ছন্দ্য আরামের কথাই ভাবিবে? স্ত্রীর কথা স্বামী ভাবিবে না?···নাঃ, জটিল সমস্যা! ভাবিতে গেলে কূলকিনারা মেলে না···

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

আল্‌গা ও নিবিড়

আলগা-চুমা ছোঁয়াও খোকার গালে
যেমন ফুলে রবির পরশ জাগে!
অপরাজিতায়, হাস্নুহানার ডালে
পরজাপতির চরণ-ছোঁয়া লাগে।

নিবিড়-চুমা ছোঁয়াও বধূর মুখে
অধীর যেমন ভৃঙ্গ ফাগুন-সাঁঝে,
আলিঙ্গনে জাগুক্ সোহাগ বুকে—
রক্তজবা মুখখানি হোক্ লাজে।

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস (এম-এ, ব্যারিস্টার-এ্যাট-ল)।

শৃঙ্গারের পর হাস্য। মহর্ষি ভরত বলিয়াছেন—হাস্য-রস হাস-স্থায়ি-ভাবাত্মক। ইহা অপরের বিকৃত বেশ, বিকৃত অলঙ্কার, ধৃষ্টতা, লৌল্য কুহক, অসৎপ্রলাপ, অঙ্গহানি প্রভৃতি দর্শন ও দোষকথনাদি বিভাব-দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে ১। ওষ্ঠ-নাসা-কপোল প্রভৃতির স্পন্দন, চক্ষুর ব্যাকোশন ও আকুঞ্চন, স্বেদোদ্গাম, মুখরাগ, পার্শ্বগ্রহণ প্রভৃতি অনুভাব-দ্বারা হাস্য-রসের অভিনয় কর্ত্তব্য ২। অবহিত্থ, আলস্য, তন্দ্রা, নিদ্রা, স্বপ্ন, প্রবোধ, অসূয়া প্রভৃতি হাস্য-রসের ব্যভিচারী ভাব ৩।

হাস্য-রস দ্বিবিধ—(১) আত্মস্থিত ও (২) পরস্থিত। কোন ব্যক্তি যখন স্বয়ং হাস্য করেন, তখন হাস্য-রস তাঁহার 'আত্মস্থ' বা আত্মগত। আর যখন তিনি অপর কোন ব্যক্তি বা বহু ব্যক্তিকে হাস্য করাইয়া থাকেন, তখন হাস্য-রস 'পরস্থ' বা পরগত।

এই প্রসঙ্গে আচার্য্য অভিনবগুপ্ত একটি অতি সুন্দর বিচারের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, মহর্ষি-কর্তৃক কথিত আত্মস্থ-পরস্থ-বিভাগ-দর্শনে আপাততঃ বোধ হইতে পারে যে—বিদূষক বিকৃত-বেশাদি আত্মগত বিভাব-হেতু স্বয়ং যখন হাস্য করেন, তখন ঐ হাস্য-রস তাঁহার 'আত্মস্থ'; আবার যখন প্রধানা রাজমহিষীর হাস্য উৎপাদন করিয়া থাকেন, তখন উহা রাজমহিষীর নিকট 'পরস্থ' (বিদূষক-গত)। কিন্তু ইহা ঠিক নহে; কারণ, এ ক্ষেত্রে কেবল বেশ প্রভৃতি বিভাব বিদূষকে বিদ্যমান—স্থায়ী ভাব (হাস) নহে। এরূপ স্থলে বরং বিভাবের আত্মস্থ-পরস্থ বিভাগ করা চলে। পক্ষান্তরে, কোন স্থলে প্রভু শোকার্ত্ত হইলে তাঁহার অনুজীবিগণও প্রভুর প্রতি সহানুভূতি-বশে শোক করিয়া থাকেন—ইহা সর্ব্বজন-প্রসিদ্ধ। অতএব, উক্ত ন্যায় অনুসারে সর্ব্বরসেই আত্মস্থ পরস্থ-বিভাগ সম্ভব; কিন্তু বস্তুতঃ ইহা ঠিক নহে। এই কারণে আচার্য্য অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন—মহর্ষি-কৃত আত্মস্থ-পরস্থ-বিভাগের উদ্দেশ্য অন্যরূপ। লৌকিক ব্যবহারে কখন কখন এরূপ দেখা যায় যে—কোন লোক হাস্যকর বিভাবাদি স্বয়ং দর্শন করিয়া হাসিতেছেন। অন্য এক জন লোক স্বয়ং ঐ হাস্য-জনক বিভাবাদি দেখিতে না পাইলেও কেবল পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিকে হাসিতে দেখিয়াই হাসিতে আরম্ভ করিলেন। আবার কোন কোন স্থলে এরূপও দেখা যায় যে—কোন ব্যক্তি স্বয়ং হাস্যকর বিভাবাদি দর্শন করিয়াও গাম্ভীর্য্যবশে হাস্য চাপিয়া রাখিলেন—কিন্তু অপরকে হাসিতে দেখিয়া আর হাসি চাপিতে পারিলেন না—হাসিয়া ফেলিলেন। হাস্য স্বভাবতঃ সংক্রামক। অম্লরসের সহিত ইহার অনেকটা তুলনা হইতে পারে। ধরুন, কোন ব্যক্তি অম্ল-আচার প্রভৃতি খাইতেছেন, অপর এক ব্যক্তি উহা খাইতেছেন না—কেবল পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির অম্ল-ভক্ষণ দেখিতেছেন। তথাপি এরূপ স্থলে দ্বিতীয় ব্যক্তির জিহ্বাতে স্বভাবতঃ জল-সঞ্চার হইতে দেখা যায়। যে স্থলে স্বয়ং বিভাব-দর্শনে হাস্যোদ্রেক হয়, তথায় হাস্যরস স্বগত; আর যথায় বিভাবাদির অদর্শন সত্ত্বেও অপরের হাস মাত্র দর্শনে হাস্য জন্মে, তথায় উহা পরগত ৪।

এই প্রসঙ্গে মহর্ষি দুইটি সাম্প্রদায়িক আর্য্যা-শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—

(এ রসে) বিপরীত (অর্থাৎ অস্বাভাবিক) অলঙ্কার, বিকৃত আচার-উক্তি-বেশ ও বিকৃত অঙ্গ-বিকারাদি দর্শনে কোন ব্যক্তি স্বয়ং হাস্য করেন বলিয়াই এ রস 'হাস্য'-রস নামে চিরদিন অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

আবার, (এ রসে) বিকৃত আচার-বাক্য-অঙ্গ-বিকার ও বিকৃত বেশ দ্বারা কেহ অপর ব্যক্তিকে হাসাইয়া থাকেন বলিয়াও ইহার নাম 'হাস্য'।

স্ত্রী ও নীচ-প্রকৃতিক পাত্রে এই হাস্য-রস প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার ছয় প্রকার ভেদ :—

---

(১) বেশ—কেশরচনা প্রভৃতিও বেশের অন্তর্গত। অলঙ্কার—কটক-কেয়ূর-অঙ্গদ প্রভৃতি। বিকৃত বলিতে বুঝায়—দেশ-কাল প্রকৃতি-(স্বভাব)-বয়স্-অবস্থার বিপরীত। দৃষ্টান্ত, যথা—বালকের বেশ বা অলঙ্কার বৃদ্ধ ধারণ করিলে উহা হাস্যোদ্রেক করে। বেশ-অলঙ্কার ব্যতীত গদ্গদ (আধ-আধ কণ্ঠস্বর) প্রভৃতিও হাস্যকর। ধার্ষ্ট্য—ধৃষ্টতা—নির্লজ্জতা। লৌল্য—বিষয়ে অনিয়ত ভাব—চাপল্য। কুহক—কক্ষ-গ্রীবা প্রভৃতি স্পর্শ করিয়া হাস্য উৎপাদন—এইরূপে সাধারণতঃ বালকগণের হাস্যোৎপাদন করা হইয়া থাকে—ইহার চলিত নাম 'কাতু-কুতু' (বা 'কুতু-কুতু') দেওয়া – ইহা অভিনবগুপ্তের মত। ডক্টর সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইহার ইংরেজী প্রতিশব্দ দিয়াছেন—roguery বা দুষ্টামি। অসৎপ্রলাপ—অসৎ-প্রসঙ্গ—হাস্যজনক উক্তি, অথবা অসম্বদ্ধ প্রলাপ—যাহার কোন অর্থ হয় না, এরূপ কথাবার্ত্তা বলা। ডক্টর মুখোপাধ্যায় ইংরেজী করিয়াছেন—senseless drivels, অর্থাৎ বালকের মত বা বাতুলের মত যা-তা আবোল-তাবোল বলা। ব্যঙ্গ—অঙ্গবিগম—অঙ্গহানি। অভিনবগুপ্ত অর্থ দিয়াছেন—'বিখুনাদি'; ইহা অতি অস্পষ্ট। বোধ হয় ইহার অর্থ এইরূপ—অঙ্গহানি-জনিত বিকৃত অঙ্গচেষ্টা। ডক্টর মুখোপাধ্যায়ের ইংরেজী—ridiculing, দোষকথন; 'দোষ' বলিতে বুঝায়—যাহার যাহা স্বভাব নহে, তাহার উপর সেই সেই অস্বাভাবিক ভাবের আরোপ; যথা—বীরের সম্বন্ধে ভয় পাওয়ার উল্লেখ (ভয় পাওয়া বীরের পক্ষে অত্যন্ত অস্বাভাবিক), অথবা ধার্ম্মিকের সম্বন্ধে অকার্য্য-করণাদির উল্লেখ। আবার পূর্ব্বোক্ত বিকৃত-বেশাদিকেও দোষ বলিয়া অভিনবগুপ্ত উল্লেখ করিয়াছেন। দোষকথনাদি—আদি-পদটির দ্বারা সকল্প-স্মৃতি প্রভৃতি বুঝায়।

(২) ব্যাকোশ বা ব্যাকোশন—বিকাস বা উন্মীলন ও নিমীলন—চোখ খোলা ও পলক ফেলা। আকুঞ্চন—ঈষৎ বিকাস ও ঈষৎ নিমীলন, চক্ষু কুঁচ্কান। মুখরাগ—মূলে আছে 'আস্যরাগ'। পার্শ্বগ্রহণ—পার্শ্বদেশ-দ্বয়ের পীড়ন।

(৩) অবহিত্থ—বাহ্য আকারের প্রচ্ছাদন। ডক্টর মুখোপাধ্যায়—dissembling. তন্দ্রা—মোহ (অভিনবগুপ্ত)। প্রবোধ—জাগরণ।

(৪) অভিনবভারতী, ষষ্ঠ অধ্যায়, বরোদা সংস্করণ, পৃঃ ৩১৪—৩১৬

(১) স্মিত, (২) হসিত, (৩) বিহসিত, (৪) উপহসিত (৫) অপহসিত ও (৬) অতিহসিত।

ইহাদিগের দুইটি দুইটি করিয়া ভেদ যথাক্রমে উত্তম-মধ্যম-অধম প্রকৃতির পাত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে। অর্থাৎ—জ্যেষ্ঠ বা উত্তম-প্রকৃতির পাত্রগণ-কর্তৃক স্মিত ও হসিত প্রযুক্ত হয়, মধ্যম-প্রকৃতি-দ্বারা বিহসিত ও উপহসিত, আর অধম-প্রকৃতি-দ্বারা অপহসিত ও অতিহসিতের প্রয়োগ হইয়া থাকে।

যদি গণ্ডদেশ ঈষৎ বিকসিত (অর্থাৎ উৎফুল্ল) হয়, কটাক্ষ বেশ সৌষ্ঠবযুক্ত (অর্থাৎ—অনুগ্র) ভাবে প্রযুক্ত হয়, আর দন্ত লক্ষিত না হয়, তাহা হইলে তাহাকে বলা হয়, উত্তম-প্রকৃতির পাত্র-কর্তৃক প্রযোজ্য ধীর (অর্থাৎ—মন্থর) 'স্মিত'।

যে হাস্যে মুখ ও নয়ন উৎফুল্ল ভাব ধারণ করে, গণ্ডদেশ বিকসিত হয়, আর দন্তপঙ্‌ক্তি ঈষৎ লক্ষিত হয় তাহার নাম 'হসিত'। ইহার প্রয়োগও উত্তম-প্রকৃতির পাত্র-কর্তৃক হইয়া থাকে।

যে হাস্যে অক্ষি ও গণ্ডদেশ আকুঞ্চিত (অর্থাৎ ঈষৎ সঙ্কুচিত) হয়, যাহা মধুর স্বন-যুক্ত ও যাহা স্মিত-হসিতের অনন্তর যথাকালে সমাগত (অর্থাৎ—অভিব্যক্ত) ও যাহাতে মুখরাগ উৎপন্ন হয় (অর্থাৎ—মুখ ঈষৎ রক্তাভ হইয়া থাকে), তাহার নাম 'বিহসিত' ৫।

যে হাস্যে নাসিকা উৎফুল্ল (অর্থাৎ—নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত) হয়, জিহ্মা দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করা হয়, স্কন্ধদেশ ও মস্তক নিকুঞ্চিত হইয়া থাকে (অর্থাৎ—ভিতর দিকে ঢুকিয়া যায়), তাহার নাম 'উপহসিত'। বিহসিত ও উপহসিত মধ্যম পাত্রের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে ৬।

যে হাস্য অস্থানে (অর্থাৎ—অকালে)[৭] প্রযুক্ত হয়, যাহাতে নেত্রে অশ্রু উদ্‌গত হইয়া থাকে, আর যাহাতে স্কন্ধদেশ ও মস্তক উৎকম্পিত হইতে থাকে, তাহার নাম 'অপহসিত' ৭।

যে হাস্যে নেত্র উত্তেজিত ও অশ্রুযুক্ত হয়, স্বর বিকৃষ্ট ও উদ্ধত ভাব ধারণ করে, আর পার্শ্বদেশ হস্ত-দ্বারা চাপিয়া ধরিতে হয়, তাহার নাম 'অতিহসিত'৮। অপহসিত ও অতিহসিত অধম পাত্রের যোগ্য।

বিভিন্ন শ্রেণীর দৃশ্য-কাব্যে নানা কার্য্যবশে উৎপন্ন যে যে হাস্য-স্থান দৃষ্ট হয়, সেই সেই স্থলে উত্তম-মধ্যম-অধম পাত্র অনুসারে এই ছয় প্রকার হাস্যের যথাযথ ভাবে প্রয়োগ কর্ত্তব্য ৯।

মহর্ষি ভরত এই স্থলে স্ব-সমুত্থিত ও পর-সমুত্থ ভেদে দ্বিবিধ, উত্তম-মধ্যম-অধম ভেদে তিন প্রকার প্রকৃতির অনুযায়ী অবস্থাত্রয়-বিশিষ্ট ষড়্‌বিধ হাস্য-রসের বিবরণ সমাপ্ত করিয়াছেন।

বিশ্বনাথ সাহিত্যদর্পণে হাস্য-রসের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা মূলতঃ নাট্যশাস্ত্রের এই বিবৃতির অনুসারী। হাস্য-রসের স্থায়ি-ভাব হাস—উহা বিকৃত আকার-বাক্য-বেশ-চেষ্টা প্রভৃতি হইতে ও কুহক (কাতু-কুতু) হইতে উৎপন্ন—উহার বর্ণ শ্বেত ও দেবতা প্রমথ ১০। যাহার বিকৃত আকার-বাগ্‌-বেশ-চেষ্টা দেখিয়া লোকে হাস্য করে, সেই হাস্য-রসের আলম্বন-বিভাব। তাহার শারীর-চেষ্টা উদ্দীপন-বিভাব। তাহার নেত্র-সঙ্কোচন, বদনের স্মেরভাব প্রভৃতি অনুভাব। আর নিদ্রা-আলস্য-অবহিত্থ প্রভৃতি ব্যভিচারি-ভাব।

হাস্য ষড়্‌বিধ—জ্যেষ্ঠপাত্রের স্মিত ও হসিত, মধ্যম পাত্রের বিহসিত ও অবহসিত, আর অধম পাত্রের অপহসিত ও অতিহসিত ১১।

স্মিত—নয়ন ঈষৎ বিকসিত ও অধর ঈষৎ স্পন্দিত। হসিত—স্মিত-স্থলে দন্তপঙ্‌ক্তি কিঞ্চিৎ লক্ষিত। বিহসিত—মধুর স্বর-যুক্ত হাস্য। অবহসিত—শিরঃকম্পন-সহিত হাস্য। অপহসিত—চক্ষুতে অশ্রুর উদ্গম হয়—এরূপ জোর হাসি। অতিহসিত—অঙ্গবিক্ষেপ সহ বিকট অট্টহাস্য।

বিশ্বনাথ স্বরচিত একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—

"গুরোর্গিরঃ পঞ্চ দিনান্যধীত্য বেদান্তশাস্ত্রাণি দিনত্রয়ঞ্চ।
অমী সমাঘ্রায় চ তর্কবাদান্ সমাগতাঃ কুক্কুটমিশ্রপাদাঃ"।

[কোন পল্লবগ্রাহী পণ্ডিতকে কুক্কুটমিশ্র নামে উপহাস করিয়া বলা হইতেছে—গুরুর বাক্য (অর্থাৎ প্রভাকরের মীমাংসা-মত) দিন পাঁচেক পড়িবার পর, বেদান্ত (অর্থাৎ উপনিষদ্-গীতা-ব্রহ্মসূত্র-শাঙ্করভাষ্যাদি) তিন দিন পড়িয়া, আর তর্ক-শাস্ত্রের বাদ (অর্থাৎ—তত্ত্ব-নির্ণায়ক বিচার-পদ্ধতি) কেবল আঘ্রাণ মাত্র করিয়াই পরম-পূজনীয় কুক্কুটমিশ্র পণ্ডিত মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।]

সাহিত্যদর্পণের হাস্যরস-প্রকরণ এই স্থলেই সমাপ্ত হইয়াছে। অতঃপর হাস্য-রস-সম্বন্ধে শারদাতনয়-রচিত ভাবপ্রকাশনের সিদ্ধান্ত নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে।

---

(৫) কুঞ্চিত অক্ষি—contracted eyes; নাট্যশাস্ত্র-মতে—রস-দৃষ্টি অষ্টবিধ, স্থায়িভাব-দৃষ্টি অষ্টবিধ ও সঞ্চারি-ভাবজ-দৃষ্টি বিংশতি প্রকার। কুঞ্চিতা দৃষ্টি তাহার একটি ভেদ। যে দৃষ্টিতে অক্ষি-পক্ষ্মের অগ্রদেশ ঈষৎ নিকুঞ্চিত, অক্ষিপুট (eye-socket) ঈষৎ কুঞ্চিত ও অক্ষিতারকা সম্যগ্‌রূপে নিকুঞ্চিত, তাহার নাম 'কুঞ্চিত'-দৃষ্টি (নাঃ শাঃ ৮।৭০—কাশী সং; ৮।৭১ বরোদা সং)।

মূলে আছে 'কালাগতং'—অভিনবগুপ্ত অর্থ করিয়াছেন—"স্মিতানন্তরং সঙ্গমনকাল ইত্যর্থঃ" (অভিঃ ভাঃ, পৃঃ ৩১৬)। অভিনব আরও বলিয়াছেন—"স্মিতমেন সংক্রান্তং সদেবংরূপতামেতীত্যর্থঃ" অর্থাৎ—স্মিত অন্য ব্যক্তিতে সংক্রান্ত হইলে বিহসিত হইয়া থাকে।

(৬) জিহ্মদৃষ্টি—যে দৃষ্টিতে অক্ষিপুট লম্বিত ও আকুঞ্চিত (অথবা—যে দৃষ্টি লম্বিতভাবাপন্না ও যাহাতে অক্ষিপুট কুঞ্চিত), যাহাতে নিরীক্ষণ ধীরে ধীরে তির্য্যগ্‌ভাবে (টেরচাভাবে) নিষ্পাদিত হইয়া থাকে, যাহাতে দৃষ্টি নিগূঢ় ও অক্ষিতারকাও গূঢ় (গুপ্ত), তাহার নাম 'জিহ্মা' দৃষ্টি (নাঃ শাঃ, বরোদা সং ৮।৭৩)।

(৭) অস্থানে—অকালে, যথা—শোকাদির ক্ষেত্রে যথায় হাস্য-রসের অবসর নাই।

(৮) বিকৃষ্ট—শ্রবণকটু। উদ্ধত—অত্যুগ্র ও অত্যুচ্চ।

(৯) হাস্যস্থান- occasion for laughter.

(১০) 'কুহক'-শব্দের অর্থ শ্রীরাম তর্কবাগীশ করিয়াছেন—'নর্ত্তকাৎ'। তাঁহার মতে ইহার মর্ম্মার্থ—বিকৃত আকার-বাক্য-বেশ-চেষ্টা প্রভৃতি বিশিষ্ট নর্ত্তক বা নট হইতে হাস্যরসের উৎপত্তি। তিনি আরও বলিয়াছেন—কেবল এইরূপ নর্ত্তক কেন, বিকৃত আকার প্রভৃতির বর্ণনা-যুক্ত শ্রব্যকাব্য হইতেও হাস্য-রসের উৎপত্তি সম্ভব—"এতদুপলক্ষণং বিকৃতাকারাদিবিষয়কশ্রব্যকাব্যাদপি"। তিনি আর একটি পাঠান্তর ধরিয়াছেন—"কৃতকাৎ" ও উহার অর্থ করিয়াছেন—"কৌতুকাৎ"—"বিকৃতাকারাদিজন্যাৎ কৌতুকাৎ"। কিন্তু অভিনবগুপ্ত নাট্যশাস্ত্র-ব্যাখ্যায় 'কুহক'-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—কাতু-কুতু দেওয়া।

(১১) নাট্যশাস্ত্রের 'উপহসিত' সাহিত্যদর্পণে 'অবহসিত' সংজ্ঞায় রূপান্তরিত হইয়াছে।

রসের উপাদান-হেতু স্থায়ি-ভাব। হাস স্থায়ি-ভাব—হাস্যরসের উপাদান-হেতু। যে প্রীতিবিশেষে চিত্তের বিকাশ দৃষ্ট হয়, তাহার নাম 'হাস'। হাস্য রস-রূপে পরিণত হইলে উহার ছয় প্রকার ভেদ হইয়া থাকে।

শৃঙ্গারে বিভাব-সমূহ ললিতভাবাপন্ন। হাস্য-রসের বিভাব ললিত নহে—ললিতাভাস। এই ললিতাভাস হাস্য-বিভাবগুলি যখন স্বীয় উৎকর্ষ-হেতুক যথাযোগ্য অনুভাব-সঞ্চারি-ভাব-সাত্ত্বিক-ভাব ও অনুকূল অভিনয় প্রভৃতি দ্বারা হাস-স্থায়ি-ভাবকে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত করায়, তখন প্রেক্ষকগণের চৈতন্যাশ্রিত অন্তঃকরণ ঈষৎ রজোগুণ-সংস্পৃষ্ট ও তমোগুণ-যুক্ত হইয়া যে বিকার (অর্থাৎ পরিণাম) প্রাপ্ত হয়, তাহাই হাস্য-রস নামে পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। ইহাই শারদাতনয়ের সিদ্ধান্ত।

বিষয়টি আর একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝা প্রয়োজন। প্রত্যেক মনুষ্যের যথার্থ স্বরূপ তাঁহার আত্মা। উহা চৈতন্যমাত্র-স্বরূপ—স্বপ্রকাশ। উহার সংস্পর্শে যাহা আসে তাহাই প্রকাশিত হয়। এই আত্মার সহিত প্রথম সংস্পর্শে আইসে মানুষের মন বা অন্তঃকরণ। অর্থাৎ—জীবের সর্ব্বান্তর-ভূত তত্ত্ব হইতেছে তাঁহারই অন্তরতম অন্তর্যামী আত্মা। উহারই উপর জীবের অন্তঃকরণ (মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহঙ্কার), বহিঃকরণ (বহিরিন্দ্রিয়) দেহ প্রভৃতি আশ্রিত আছে ১২। আত্মা সর্ব্বান্তর—তাহার প্রথম আবরক বুদ্ধি। বুদ্ধি অত্যন্ত স্বচ্ছ—এ-কারণে উহা আত্মচৈতন্যের জ্যোতিতে অবভাসিত হইয়া উজ্জ্বলভাব ধারণ করে ও অপরাপর জড়-পদার্থ-সমূহের প্রকাশে সমর্থ হয়। এইরূপে চৈতন্যাশ্রিত উজ্জ্বল বুদ্ধি প্রকাশ করে মনকে। বুদ্ধির আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া মন প্রকাশ করে ইন্দ্রিয়-সমূহকে। ইন্দ্রিয়গুলি প্রকাশ করে স্থূল দেহ ও বাহ্য বিষয়-সমূহকে, বুদ্ধি মন ও ইন্দ্রিয় সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ বলিয়া আত্মচৈতন্য-জ্যোতির সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ প্রতিফলনে সমর্থ। কিন্তু দেহ ও বাহ্য বিষয়-সমূহ অত্যন্ত স্থূল ও অস্বচ্ছ বলিয়া আর অন্য বিষয় প্রকাশে সমর্থ হয় না। অন্তঃকরণ জড় বস্তু বলিয়া জড়রূপা প্রকৃতির তিনটি গুণের (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ) সমবায়ে গঠিত। সত্ত্ব—প্রকাশ-ধর্ম্মক উজ্জ্বল বৃত্তি—জ্ঞান-বৃত্তি। রজঃ—ক্রিয়া-ধর্ম্মক, অনুরঞ্জক-বৃত্তি—কর্ম্ম-বৃত্তি। তমঃ—মোহ-বাঞ্জক আ...ক-বৃত্তি—অজ্ঞান-বৃত্তি। মন বা অন্তঃকরণ চৈতন্যে সর্ব্বদাই অধিষ্ঠিত বা আশ্রিত। যখন অভিনয়-দর্শন-কালে দর্শকের মন (অর্থাৎ অন্তঃকরণ) ঈষৎ রজোগুণস্পৃষ্ট ও তমোগুণান্বিত হইয়া বিশিষ্ট পরিণাম-ভাব প্রাপ্ত হয়, তখন আলঙ্কারিক পরিভাষায় সেই বিশিষ্ট মনঃপরিণাম বা মনোবৃত্তির নাম হয় হাস্য-রস। এক কথায়—হাস্য-রসে মনের রজোগুণ ঈষৎ অভিব্যক্ত (অর্থাৎ—রজোগুণ মনকে স্পর্শ মাত্র করিয়া বর্ত্তমান), আর তমোগুণ মনের অন্তস্তলে সূক্ষ্মরূপে অন্বিত ১৩।

শারদাতনয় আবার অন্যত্র বাসুকি ও নারদ-কথিত হাস্য-রসোৎপত্তি-প্রক্রিয়ার উল্লেখ করিয়াছেন। এ মতে—অহঙ্কারযুক্ত মন যখন রজোগুণ-হীন ও সত্ত্বগুণ-যুক্ত তখনই হাস্য-রসের উদ্ভব ১৪।

হাস্য-শব্দের নির্ব্বচন করিতে গিয়া শারদাতনয় বলিয়াছেন—হস্-ধাতুর উত্তর অপ্-প্রত্যয় করিলে 'হস'-শব্দ উৎপন্ন হয়। আর হস্-ধাতুর উত্তর ঘঞ্-প্রত্যয়ে 'হাস'-শব্দ সিদ্ধ হয়। "স্বনহসোর্বা" এই সূত্র অনুসারে হস্-ধাতুর উত্তর বিকল্পে অপ্' বা 'ঘঞ্' প্রত্যয় বিহিত আছে। যেহেতু, ইহা-দ্বারা লোকের হাস্য উৎপন্ন হয়, অতএব ইহার নাম 'হাস্য' ১৫।

রসোৎপত্তি-প্রসঙ্গে শারদাতনয় বলিয়াছেন—কোন এক সময়ে সকল লোক দগ্ধ করিবার পর দেবদেব মহেশ্বর নিজ মহিমায় অবস্থান করিতেছিলেন। কিছু কাল পরে আনন্দ-মন্থর নৃত্য করিতে করিতে তিনি নিজ মন হইতেই বিষ্ণু ও ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিলেন। তখন বিভুর বামভাগে মায়াময়ী বৈষ্ণবী শক্তি অম্বিকারূপে অবস্থান করিতে-ছিলেন। দেবাধিদেবের নিয়োগবশতঃ ব্রহ্মা লোকসমূহের সৃষ্টি করিয়া ভাবিলেন—'ঈশ্বরের দিব্য চরিত্র আমি কিরূপে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিব'? ব্রহ্মা এইরূপ ভাবিতে থাকিলে ভগবান নন্দিকেশ্বর তথায় আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে প্রয়োগ বিজ্ঞান সহ নাট্যবেদের অধ্যাপনা করিলেন ও আদেশ দিলেন—'পিতামহ! এই নাট্যবেদোক্ত লক্ষণ অনুসারে এক একখানি রূপক (অর্থাৎ—দৃশ্যকাব্য) রচনা করিয়া আপনি নটগণকে উহাদিগের প্রয়োগ-শিক্ষা দিন। ঐ সকল রূপকের অভিনয় দেখিতে দেখিতে প্রাক্তন কর্ম্মসমূহ আপনার নিকট প্রত্যক্ষবৎ প্রতিভাত হইবে'। এই বলিয়া নন্দী অন্তর্হিত হইলেন। ব্রহ্মাও 'ত্রিপুরদাহ'-নামক একখানি রূপক রচনা করিয়া নটগণকে উহার প্রয়োগ-শিক্ষা দিলেন। পরে উহার অভিনয় দেখিতে দেখিতে তাঁহার চারিটি মুখ হইতে চারিটি বৃত্তি ও তৎসহ চারিটি মুখ্য রসের অভিব্যক্তি হইল। দেবদেব ও দেবীর মিলনাভিনয় দর্শনে ব্রহ্মার পূর্ব্বমুখ হইতে

---

(১২) অন্তঃকরণ—চলিত ভাষায় ইহাকেই 'মন' বলা হয়। বস্তুতঃ, মন অন্তঃকরণের একটি বিশিষ্ট রূপ মাত্র। মন—অন্তঃকরণ যখন দোনা-মনা করে—সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক। বুদ্ধি—নিশ্চয়াত্মিকা—ব্যবসায়াত্মিকা; ব্যবসায়—স্থির নিশ্চয়। চিত্ত—স্মরণাত্মক। অহঙ্কার—গর্ব্বাত্মক। করণ—ইন্দ্রিয়। সাধারণতঃ করণ দ্বিবিধ—(১) অন্তঃকরণ (বর্ত্তমান-প্রসঙ্গে সাধারণভাবে 'মন' নামেই ইহার উল্লেখ করা হইবে) ও (২) বহিঃকরণ। বহিঃকরণ দ্বিবিধ—(১) জ্ঞানেন্দ্রিয়—৫টি—চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, ও (২) কর্ম্মেন্দ্রিয়—৫টি—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ। ইন্দ্রিয়গুলি সূক্ষ্ম—ইন্দ্রিয়-গোচর নহে—অতীন্দ্রিয়। অক্ষিগোলক প্রভৃতি ইন্দ্রিয় নহে—ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান-স্থান দেহাবয়ব মাত্র। আত্মচৈতন্যই সকলের আধার—দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি সবই আত্মাতে আশ্রিত। আবার বাহ্য-বিষয়ও ব্রহ্মচৈতন্যে অধিষ্ঠিত। ব্রহ্ম ও আত্মা একই—ইহাই বেদান্ত-সিদ্ধান্ত।

(১৩) ভাবপ্রকাশন, পৃঃ ৪৪।

(১৪) "তস্মাদেব রজোহীনাৎ সসত্ত্বাদ্ধাস্যসম্ভবঃ",—ভাব-প্রকাশন, দ্বিতীয়াধিকার, পৃঃ ৪৭।

(১৫) "অপ্‌প্রত্যয়ান্তঃ শব্দোঽয়ং হস ইত্যভিধীয়তে।
ঘঞন্তো হাসশব্দস্তু দ্বয়োঃ প্রত্যয়য়োরপি।
অত্র স্বনহসোর্বেতি বিকল্পেন বিধানতঃ।
হাস্যতেঽসাবিতি যতস্তস্মাদ্ধাস্যস্য নির্ব্বচঃ।
বিকৃতাঙ্গবচোবেষব্যাভাবালঙ্কারকর্ম্মভিঃ।
জনান্ হাসয়তীত্যেবং তস্মাদ্ধাস্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ"।—
ভাবপ্রকাশন, পৃঃ ৪৮।

কৈশিকী-বৃত্তি ও তৎসম্ভূত শৃঙ্গার-রসের আবির্ভাব ঘটিল। দেবদেব-কর্তৃক ত্রিপুর-মর্দ্দনের অভিনয়-দর্শনে তাঁহার দক্ষিণ মুখ হইতে সাত্ত্বতী-বৃত্তি ও তদ্ভব বীর-রস জন্মিল। দক্ষযজ্ঞ-বিনাশের অভিনয়-দর্শনে তাঁহার পশ্চিম মুখ হইতে আর পাঁচটি বৃত্তি ও তজ্জনিত রৌদ্র-রসের উৎপত্তি ঘটিল। প্রভুর প্রলয়-কালীন সংহার-কর্ম্ম দর্শনে পিতামহের উত্তর মুখ হইতে ভারতী-বৃত্তি-সঞ্জাত বীভৎস-রসের উদ্রেক হইল। শৃঙ্গার হইতে জন্মিল হাস্য, বীর হইতে অদ্ভুত, রৌদ্র হইতে করুণ ও বীভৎস হইতে ভয়ানক উৎপন্ন হইল ১৬।

যখন জটাজাল-শোভিত-শীর্ষ, অজিন-ধারী, সর্প-ভূষিত অগ্নিময়-নেত্র-বিশিষ্ট, ভস্মাঙ্গরাগ-বিভূষিত-দেহ দেবদেব দেবী পার্ব্বতীর রতি কামনা করিয়াছিলেন, তখন দেবীর ও দেবীর সখীবর্গের প্রচুর হাস্য জন্মিয়াছিল। এই কারণেই বলা হয়, শৃঙ্গার হইতে হাস্যের উদ্ভব ১৭।

হাস্যের বিভাবাদি বর্ণনা করিতে যাইয়া শারদাতনয় বলিয়াছেন —বিকটাকার বেশ, বিকৃত আচরণ ও ক্রিয়া, বিকৃত বাক্য, ধৃষ্টতা, লোভ ও চাপল্য, বিকৃত অভিনয় ও বিকৃত অঙ্গাবলোকন, কুহক, অসৎ-প্রলাপ, দোষ-কথন প্রভৃতি হইতে হাস্য উৎপন্ন হয়—ইহা স্ত্রী ও নীচ-প্রকৃতিতে বহুল ভাবে দৃষ্ট হয়। আশ্রয়ভেদে ইহা দ্বিবিধ—স্বাশ্রয় ও পরাশ্রয়। আবার প্রকৃতি-ভেদে ইহা ষড়্‌বিধ—(ক) বরিষ্ঠ-গণের—(১) স্মিত ও (২) হসিত; (খ) মধ্যমগণের—(১) বিহসিত ও (২) উপহসিত; (গ) নীচগণের—(১) অপহসিত ও (২) অতি-হসিত। স্মিত—ঈষৎ বিকসিত গণ্ডদেশ, সকটাক্ষ নিরীক্ষণ, দন্তজ্যোৎস্না অলক্ষিত। হসিত—সমগ্র গণ্ডমণ্ডল বিকসিত, আনন উৎফুল্ল ও দন্ত লক্ষ্যমাণ। বিহসিত—অক্ষি ও গণ্ডদেশ আকুঞ্চিত, মুখরাগ, মধুর ধ্বনিযুক্ত। উপহসিত—জিহ্মাবলোকনা দৃষ্টি, উৎফুল্ল-নাসিকাযুক্ত মুখ, শিরোদেশ নিকুঞ্চিত ১৮। অপহসিত—অস্থানে উচ্চ হাস্য (অট্টহাস), নয়নে উদ্গতাশ্রু, অঙ্গ-শিরোদেশ-গাত্র কম্পমান। অতিহসিত—বিক্রুষ্ট উত্তেজনাপূর্ণ ধ্বনিযুক্ত, উদ্ধত, নয়নে অশ্রুর উদ্গম, পার্শ্বদেশ কর দ্বারা নিপীড়িত (অত্যধিক হাস্যের বেগে পার্শ্বদেশে বেদনা জন্মে যেন পার্শ্বদেশ ফাটিয়া যাইতেছে, তখন উহা চাপিয়া ধরিতে হয়)। হাস্যে এক প্রলয় (মূর্চ্ছা) ব্যতীত অপর সকল সাত্ত্বিকভাবই প্রযোজ্য। হাস্যের ব্যভিচারি-ভাব—শঙ্কা ত্রপা (লজ্জা), চপলতা, শ্রম, গ্লানি, অপত্রপা (নির্লজ্জতা), হর্ষ, প্রবোধ, অবহিথ, (স্বেদ, অশ্রু, পুলক) প্রভৃতি ১৯।

বাগ্-অঙ্গ-নেপথ্য (বেশ) ভেদে হাস্য আবার ত্রিবিধ ২০। প্রহসন (অর্থাৎ—হাস্যের উৎপাদক) বাক্যকে 'বাচিক হাস্য' বলা হয়। মালা-আভরণ-বস্ত্রাদির বিপর্য্যয়ে নিক্ষেপ—'নৈপথ্যজ হাস্য'। স্বভাববশতঃই হউক, আর কপটতা-পূর্ব্বকই হউক—অঙ্গসমূহের যে বিকট ভাবে অভিনয় (অর্থাৎ—বিকট অঙ্গবিক্ষেপ), উহাই 'আঙ্গিক হাস্য'।

হাসের দেবতা প্রমথবৃন্দ। কারণ, হাস্যের অধিষ্ঠান বা আশ্রয় হইতেছে বিকট অভিনয়। প্রমথগণের মধ্যে উহা অতি স্বাভাবিক। হাস্যের বর্ণ শ্বেত। কারণ, হাস্যকালে শ্বেতবর্ণ দন্তরুচি-কৌমুদীর অভিব্যক্তি হইয়া থাকে।

শারদাতনয়ের বিবৃত হাস্য-রস-প্রকরণ এই স্থলেই সমাপ্ত হইয়াছে।

মম্মটভট্ট কাব্যপ্রকাশে হাস্যরসের স্থায়িভাব হাস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। একটি দৃষ্টান্তও দিয়াছেন; যথা—

"আকুঞ্চ্য পাণিমশুচিং মম মূর্দ্ধ্নি বেশ্যা
মন্ত্রাম্ভসাং প্রতিপদং পৃষতৈঃ পবিত্রে।
তারস্বরং (স্বনং) প্রথিতথূৎকমদাৎ প্রহারং
হা হা হতোঽহমিতি রোদিতি বিষ্ণুশর্ম্মা"।

[অর্থাৎ—'বৈদিক মন্ত্রের প্রত্যেক পদ উচ্চারণে মন্ত্রপূত জল-দ্বারা আমার যে মস্তক পবিত্র হইয়াছে, সেই মস্তকে উচ্ছিষ্টাদি-লিপ্ত অশুচি হস্ত সঙ্কোচ-পূর্ব্বক বেশ্যা প্রহার করিয়াছে ও উচ্চৈঃস্বরে উহাতে থূৎকার প্রদান করিয়াছে—হায়! হায়! আমি মারা গেলাম'!—এই বলিয়া বিষ্ণুশর্ম্মা রোদন করিতেছেন। টীকাকারগণের মতে—এস্থলে বিষ্ণুশর্ম্মা হাস্যের আলম্বন-বিভাব; তাঁহার রোদন উদ্দীপন-বিভাব; রসের আশ্রয়ভূত পুরুষের এই বাক্যটি অনুভাব। চাপল্যাদি ব্যভিচারি-ভাব। এই প্রসঙ্গে একটি বিচারও উঠিয়াছে। এই কাব্যে রতি-ভাবের আশ্রয়ভূত নায়ক-নায়িকার ন্যায় হাসের আশ্রয়ভূত পুরুষের সাক্ষাৎ কোন বর্ণনা নাই—তথাপি এই হাস্য-জনক দৃশ্যের দ্রষ্টা কোন পুরুষ যে বর্ত্তমান থাকিয়া এই বর্ণনা করিতেছেন, তাহা বিভাবাদি হইতে স্পষ্ট অনুমান করা যায়। সাহিত্যদর্পণ-কারও এই কথা বলিয়া গিয়াছেন—যাঁহার হাস (অর্থাৎ যিনি হাসিতেছেন—হাস-স্থায়ি-ভাবের আশ্রয়ভূত হাস্যকর দৃশ্যের দ্রষ্টা পুরুষ), তিনি যদি স্বয়ং সাক্ষাৎভাবে কাব্যে উপনিবদ্ধ নাও হন,

---

(১৬) ভাবপ্রকাশন, তৃতীয়াধিকার, পৃঃ ৫৫-৫৮। ইহা পূর্ব্বেই বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

(১৭) "জটাজিনধরো ভোগিভূষণঃ সাগ্নিলোচনঃ।
ভস্মাঙ্গরাগশ্চ যদা দেব্যা কাময়তে রতিম্।
তদা সখীনাং দেব্যাশ্চ হাসঃ সমুদভূন্মহান্।
তস্মাদ্ধাস্যসমুৎপত্তিঃ শৃঙ্গারাদিতি কথ্যতে"।
—ভাব-প্রঃ, পৃঃ ৫৭।

(১৮) শিরঃকম্প ত্রয়োদশ প্রকার বলিয়া নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে—(১) আকম্পিত (বা অকম্পিত), (২) কম্পিত, (৩) ধুত (বা ধূত), (৪) বিধুত, (৫) পরিবাহিত, (৬) আধূত (বা উদ্বাহিত), (৭) অবধূত, (৮) অঞ্চিত, (৯) নিকুঞ্চিত, (১০) পরাবৃত্ত, (১১) উৎক্ষিপ্ত, (১২) অধোগত ও (১৩) লোলিত (নাঃ শাঃ, কাশী সং ৮।১৭—৩৬, বরোদা সং ৮।১৭—৩৯)। ইহার মধ্যে 'নিকুঞ্চিত শিরঃ' বলিয়া কোন শিরঃকম্পের উল্লেখ নাই।

(১৯) এই পর্য্যন্ত অংশ নাট্যশাস্ত্রেরই অনুবাদ মাত্র। কেবল স্বেদ—অশ্রু—পুলক—এই তিনটিকে ব্যভিচারী না বলিয়া সাত্ত্বিক বলাই সঙ্গত।

(২০) অভিনয় চতুর্ব্বিধ—(১) বাচিক, (২) আঙ্গিক, (৩) আহার্য্য (বা নৈপথ্য) ও (৪) সাত্ত্বিক। আহার্য্য—বেশ-ভূষা প্রভৃতির দ্বারা যে অভিনয় হয়, (make-up, costume)। 'নেপথ্যে' বলিতেও বুঝায় বেশ-ভূষা। সাত্ত্বিক—সত্ত্বসম্ভূত বিকার-দ্বারা অভিনয়; সাত্ত্বিক-ভাব-দ্বারাও অভিনয় প্রদর্শনীয়। সাত্ত্বিক—শারীরিক। সত্ত্ব—শরীর।

ক্ষতি নাই ; বিভাবাদির সামর্থ্যবশে তাঁহার অস্তিত্ব অনুমিত হইয়া থাকে ২১।]

যদিও কাব্যপ্রকাশ-কার এই শ্লোকটিকে হাস্য-রসের উদাহরণ বলিয়াছেন, তথাপি আমাদিগের মনে হয়, ইহাকে হাস্য-রসের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত না বলিয়া অতি নিকৃষ্ট উদাহরণ বলাই অধিকতর সঙ্গত। এমন কি, ইহাকে ব্রীড়া বা জুগুপ্সার ব্যঞ্জক অশ্লীলতা-দোষের উদাহরণ বলিলেও বলা চলে।

রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র-কৃত নাট্যদর্পণে দৃষ্ট হয়—হাস্য-রস বিকৃত আচার-জল্প-অঙ্গ-আকল্প-বিস্মাপন প্রভৃতি হইতে উদ্ভূত ; নাসাস্পন্দ, অশ্রুপাত, জঠরগ্রহণাদি ক্রিয়া দ্বারা ইহার অভিনয় কর্ত্তব্য ২২।

হাস্যের ষড়্‌ভেদ—(ক) জ্যেষ্ঠ-প্রকৃতির (১) স্মিত ও (২) হস (বা হসিত)। (খ) মধ্যপ্রকৃতির (১) বিহাস (বিহসিত) ও (২) উপহাস (উপহসিত)। (গ) নীচ (অধম) প্রকৃতির (১) অপহাস (অপহসিত) ও (২) অতিহাস (অতিহসিত)। স্মিত—অলক্ষিত-দন্ত হাস্য। হসিত—দন্ত কিঞ্চিৎ লক্ষিত। বিহসিত—মধুরস্বর-যুক্ত, আস্যরাগ-বিশিষ্ট ও সময়প্রাপ্ত (যথাকালোপযোগী—অবসর-প্রাপ্ত—যথাস্থানে প্রযুক্ত)। উপহসিত—স্কন্ধ ও শিরোদেশ যে হাস্যে কম্পমান। অপহসিত—অনবসর-প্রাপ্ত (অর্থাৎ হাস্যের অবসর না থাকিলেও যে হাস্য উদ্গত হয়—অস্থানে হাস্যের উদ্গম), অশ্রুপূর্ণ নেত্র, উৎকম্পিত স্কন্ধ ও শিরোদেশ। অতিহসিত—উভয় পার্শ্ব হস্ত-দ্বারা নিপীড়িত, উদ্ধত, বিক্রুষ্ট-স্বর-বিশিষ্ট ২৩।

এই হাস্য-রস প্রায় পামর-প্রকৃতিক ও অধম-প্রকৃতিক পাত্রেই বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। অধম-প্রকৃতি বলিতে নাট্যদর্পণকার-দ্বয় স্ত্রী প্রকৃতি বুঝিয়াছেন। কারণ, তাঁহাদের মতে স্ত্রীগণ পুরুষাপেক্ষা অধম-প্রকৃতিক ২৪।

নাট্যদর্পণের হাস্য-রস-প্রকরণ এই স্থলেই সমাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

(২১) "যস্তু হাসঃ স চেৎ ক্বাপি সাক্ষান্নৈব নিবধ্যতে। তথাপ্যেষ বিভাবাদিসামর্থ্যাদবসীয়তে (ত্বপলভ্যতে)। অভেদেন বিভাবাদিসাধারণ্যাৎ প্রতীয়তে। সামাজিকৈস্ততো হাস্যরসোঽয়মনুভূয়তে"।—"এবমন্যেষ্বপি রসেষু বোদ্ধব্যম্"—(সাঃ দঃ, ৩য় পরিঃ)

(২২) বিকৃত—প্রকৃতি-(স্বভাব)-দেশ-কাল-বয়স্-অবস্থা প্রভৃতির বিপরীত। জল্প—বাক্য, কথোপকথন। বিকৃতাঙ্গ—যথা খঞ্জ প্রভৃতি। আকল্প—বেশ-ভূষাদি। এই প্রসঙ্গে—ধৃষ্টতা, চাপল্য প্রভৃতিরও সংগ্রহ কর্ত্তব্য। বিস্মাপন—কক্ষ-নাসা-বাদন, ভ্রূ-কর্ণ-চূড়া-গ্রীবা-নর্ত্তন, পরভাষার অনুকরণ প্রভৃতি বিটের কার্য্য ; বিট—যাঁহার সকল সম্পত্তি নিঃশেষে নষ্ট হইয়াছে, যাঁহার কলত্রাদি বর্ত্তমান, সেই গুণবান্ শৃঙ্গার-সহায়। হাস্য-রস নাট্যদর্পণ মতেও স্ব-পর-স্থায়ী—দ্বিবিধ। নাসা-স্পন্দন—গণ্ড-স্পন্দন, ওষ্ঠ-স্পন্দন প্রভৃতিও এই প্রসঙ্গে সংগ্রাহ্য। অশ্রুপাত—চক্ষুর আকুঞ্চন-প্রসারণ প্রভৃতি নেত্রবিকারও এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয়। জঠরগ্রহ—পার্শ্বগ্রহণ-করতাড়ন-মুখরাগ প্রভৃতিও এই প্রসঙ্গে গ্রহণীয়।

(২৩) এ-অংশে নাট্যশাস্ত্রের সহিত নাট্যদর্পণের বিশেষ পার্থক্য নাই।

(২৪) "অয়ং চ হাস্যো রসঃ···বাহুল্যেনাধমপ্রকৃতৌ পামরপ্রায়ে ভবতি। স্ববর্গাপেক্ষয়া চ স্ত্রিয়াঃ প্রাধান্যেঽপি পুরুষাপেক্ষয়াধমত্বৈবেতি তত্রাপি"—নাট্যদর্পণ, বরোদা সং, পৃঃ ১৬৭।

সত্য ও জীবন

সত্যের তরে প্রাণ দিলে তাহা
হয় না ক' নিষ্ফল,
সত্য ইহা কি ? হয়ত বা ইহা
কবির বচন-ছল !
ওগো দেশগুরু, এই দ্বিধা শুধু
ক'রে দাও নিরসন,
প্রাণের মমতা রাখিব না আর
করিব মৃত্যুপণ।

শ্রীকালিদাস রায়।

আমি সেই কবি

যুগে যুগে রচি আমি যৌবনের প্রেমের প্রলাপ
বাঁশরীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভরি নিয়া সঙ্গীতের তাপ
আকুল বেদনা-ভরে। মুক্ত-পক্ষ পাখী উদাসান
তুলিয়া মর্ম্মরধ্বনি দিগন্তের সীমান্তে বিলীন
লীলাছন্দে। চোখের আকাশে মোর বিস্মৃত স্বপন
তন্দ্রাচ্ছন্ন দিনান্তের সন্ধ্যাগামী বকের মতন
চেয়ে আছে লায়লীর নিষ্পলক কালো আঁখিতারা,
দুনিয়ার বালুচরে চলি আমি দ্বিধা-দ্বন্দ্বহারা।

শেলী দত্ত।

এই পৃথিবী

[উপন্যাস]

১৫

এক মাসে মহেন্দ্রের অসুখ সারিল না ; আরো ক'টা উপসর্গ লইয়া এমন বাঁকা পথ ধরিল যে, ভয়ে-ভাবনায় সুভাষিণীর অন্তরাত্মা শুকাইয়া উঠিল !

এবং বাড়ীতে এই বিপর্যায়ের মধ্যে দিলুর এগজামিন শেষ হইল।

বাড়ী আসিয়া সে ডাকিল—মা···

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। সুভাষিণী বসিয়া বেদানার রস ছাঁকিতে-ছিল। দিলুর এই আহ্বানের অর্থ সুভাষিণী যা' বুঝিল, তার বুকখানা ধড়াশ্ করিয়া উঠিল ! সে চাহিল দিলুর পানে।

দিলু বলিল—বাবার অসুখ তো কিছুতে সারছে না ! এখানে এসে উপকার হলো কৈ ?

নিশ্বাস ফেলিয়া সুভাষিণী কহিল—কি যে করি ! আমার মাথায় কিছু আসছে না দিলু !

দিলু বলিল—আর কোথাও হাওয়া বদলাবার ব্যবস্থা করলে হয় না ?

সুভাষিণী বলিল—বলেছিলুম, উনি বলেন, তাতে খরচ কত ! তাছাড়া উনি ভারী আকুল হয়ে পড়েছেন। বলেন, এবারে ছুটি নিলে হয়তো অর্দ্ধেক মাইনে দেবে !

চোখের সামনে অকূল সমুদ্র···দিলুর আকুলতা বাড়িল অনেকখানি।

সুভাষিণী বলিল—ও-বাড়ীর দিদি বলছিলেন, সুপ্রসন্ন বাবুর বাড়ী আছে পুরীতে···বলছিলেন, তোমার এগজামিন চুকলে পুরীতে যাবার কথা ! বাড়ী-ভাড়া লাগবে না।

দিলু বলিল—তাহলে দেরী করো না মা ! আমি বলি, পুরীতেই চলো। সেখানকার হাওয়ায় ওজোন আছে। বাবা নিশ্চয় সে-হাওয়ায় সেরে উঠবেন।

সুভাষিণী বলিল—ওঁকে বলি। আজো বিকেলে দিদি এসে বার-বার বললেন, দিলুর এগজামিন শেষ হয়েছে—দেরী করো না বৌ, পুরীতে নিয়ে যাও !

দিলু বলিল—সুপ্রসন্ন বাবু এখানে আছেন ?

সুভাষিণী বলিল—না।

—তবে ?

সুভাষিণী বলিল,—দিদি বললেন, তার জন্য ভাবনা নেই। দিদি যা ঠিক করে দেবেন, সুপ্রসন্ন বাবু তাতে অমত করবেন না··· করবার লোক তিনি নন্।

দিলু বলিল—তাহলে আজই বাবাকে বলে রাজী করাও মা··· কিন্তু টাকার জোগাড় ?

নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—নগদ তেমন নেই। গায়ে গহনা আছে তো আমার !

দিলু কোনো জবাব দিল না···নিরুপায় হতাশ দৃষ্টিতে মায়ের মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

বেদানার রসটুকু মহেন্দ্রকে খাওয়াইয়া সুভাষিণী কথা তুলিল। বলিল—তোমার ছেলে ভারী অস্থির হয়েছে গো···বলছে, পুরীতে যখন বাড়ী পাওয়া যাচ্ছে, দেরী না করে তোমাকে ও সেইখানে নিয়ে যেতে চায় !

মহেন্দ্র বলিল—পাগল হয়েছো ! সে কি সহজ টাকার খেলা, সুভা ! তোমাদের শেষে ধনে-প্রাণে মেরে রেখে যাবো, বলতে চাও ?

সুভাষিণীর বুকে যে-জায়গায় সব চেয়ে বেশী বেদনা, এ-কথা সে বেদনার উপর বড় জোরে আঘাত করিল। সুভাষিণী বলিল—কি যে বলো ! এ কথা বলে বুঝি খুব আনন্দ পাও ?

মহেন্দ্র বলিল—আনন্দ কতখানি, তুমি বুঝবে না সুভা ! আমার জন্য তোমরা যে-উদ্বেগ ভোগ করছো, তোমাদের সে-উদ্বেগের চেয়ে আমার উদ্বেগ কত বেশী···

আবেগে মহেন্দ্রর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

সুভাষিণীর মুখে কথা নাই। মলিন দৃষ্টিতে স্বামীর পানে সে চাহিয়া রহিল···নিঃশব্দে।

মহেন্দ্র বলিল—দেহের কোথায় কল এমন বিগড়ে গেল যে, কিছুতে আর সারতে চায় না ! শুয়ে শুয়ে তাই ভাবছি, কতখানি আশা নিয়ে দেশ ছেড়ে এখানে এলুম—সব মিথ্যা হয়ে যাবে ?

মহেন্দ্রর স্বর গাঢ়। সুভাষিণী শিহরিয়া উঠিল ! বলিল—না, না, কেন মিথ্যা হবে ! ভোগ বলে একটা কথা আছে—গ্রহ খারাপ হলে ভোগান্তির শেষ থাকে না। ও-বাড়ীর দিদি আজ বলছিলেন, তোমার কোষ্ঠী থাকে যদি, ওঁকে দিতে ! ওঁর জানা লোক আছেন, ভালো জ্যোতিষী···সেই জ্যোতিষীকে উনি এক বার দেখাতে চান্ ! কোনো গ্রহ যদি বিরূপ থাকে, তাহলে সে বিরূপতা কাটাবার জন্য শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করবেন উনি।

মহেন্দ্র হাসিল—মলিন হাসি ! বলিল—দিয়ো কোষ্ঠী···ডাক্তারের চিকিৎসায় কিছু হচ্ছে না যখন, ছাখো, তোমার শান্তি-স্বস্ত্যয়নে যদি আমাকে সারাতে পারো !

পরের দিন গৌরী ঠাকুরাণী আসিলেন···বেলা তখন পাঁচটা। বলিলেন,—কাল দোল। ছেলেরা ছ'বেলা আমার ওখানে খাবে—তোমার খাবার পাঠিয়ে দেবো। বাড়ীতে রান্নাবান্না করো না। সন্ধ্যার পর তুমি এক বার গিয়ে ঠাকুর দেখে এসো···

তার পর তিনি মহেন্দ্রকে ধরিয়া বসিলেন—অমত করো না ভাই ···পুরীতে যাবার ব্যবস্থা করো। আমি বুঝি, কোথায় বাধছে। কিন্তু সে-বাধা মানলে তো চলবে না ! এগুলির মুখ চেয়ে সেরে উঠতে হবে···কাজ-কর্ম্ম করে পয়সাও রোজগার করতে হবে। আমার কথা শোনো, এ ঘুসঘুসে জ্বর সমুদ্রের বাতাস গায়ে একবার লাগলেই সেরে যাবে !

মহেন্দ্র বলিল,—ভাবি, কুলি-মজুরের মতো যে-মানুষ দিন আনে দিন খায়, এ-রোগ ভগবান্ তাকে কেন দিলেন !

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—কেন দিলেন, তা যদি আমরা বুঝবো, তাহলে আর ভাবনা কি ছিল ?···পরীক্ষা ! সংসারে থাকতে হলে মানুষকে কত রকমের পরীক্ষা দিতে হয় ! কিন্তু ও-সব কথা নয়।

আমি বলি, দিলুর এগজামিন হয়ে গেল, ভালো দিন দেখে চটপট্ বেরিয়ে পড়ো। পুরীর বাড়ীতে আছে সুবল। বাড়ী-ঘর দেখে। খুব ভালো লোক সে। দেখাশুনা করবে, তোমাদের কোনো কষ্ট হবে না! সাত দিনেই উপকার বোধ করবে! সুপ্রসন্নর একবার হয়েছিল এমনি জ্বর—কিছুতে ছাড়ে না! ডাক্তার-বদ্যি এলে দিয়েছিল! অস্থিসার দেহ! শেষে পুরীতে নিয়ে গেলুম। এক-মাসে অসুখ সেরে গেল,—আর চেহারা যা হলো! আমার ও দেখা, বুঝলে ভাই, আমার কথায় 'না' বলো না।

মহেন্দ্র বলিল—অসম্ভব দিদি! আপনি তো বোঝেন, আবার ছুটী নিলে চাকরি না গেলেও মাইনে কমে যাবে! তাতে···

বাধা দিয়া গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—শরীর যদি না থাকে, চাকরি কে করবে, শুনি? টাকার জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। আমার কাছ থেকে ধার নিয়ো। তার পর সেরে চাকরি করে আস্তে-আস্তে শুধে দিয়ো।

মহেন্দ্র এ-কথার জবাব দিল না; চুপ করিয়া রহিল। মন বলিতেছিল, স্ত্রী-পুত্র···তাদের ভবিষ্যৎ···

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—আমি কোনো আপত্তি শুনবো না। আমায় যদি সত্যি দিদি বলে ভাবো, তাহলে আপত্তি করবে না তুমি! এ শরীরে চাকরি করতে পারবে না,—ছুটী তোমাকে নিতেই হবে। এখানে পড়ে থাকলেও মাইনে কমবে!··· শুয়ে শুয়ে ভুগে এদের সম্বন্ধে কোন সুব্যবস্থাও করতে পারবে না যখন, তখন এ ছাড়া অন্য উপায় কি আছে বলো ভাই!

মহেন্দ্র বলিল—আচ্ছা, আপনার কথাই শুনবো। দেখি, যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ!

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন,—এই তো লক্ষ্মী ভাইয়ের মতো কথা! কালই আমি ভালো দিন দেখিয়ে রাখবো···আর সুবলকে চিঠি লিখে দেবো, পুরীর বাড়ী সাফ্-সুতরো করে রাখবার জন্য।

গৌরী ঠাকুরাণী আসিলেন সুভাষিণীর কাছে! দু'চোখে অধীর প্রশ্ন···সুভাষিণী চাহিল গৌরী ঠাকুরাণীর পানে।

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—বলে এলুম পুরী যাবার কথা! রাজী হয়েছেন। ভালো দিন দেখিয়ে আমিই পাঠাবার ব্যবস্থা করবো। টাকার জন্য ভেবো না। আমি দেবো টাকা।

সুভাষিণীর চোখের দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতা, না, কি···সুভাষিণীর মুখে কথা ফুটিল না!

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—টাকা যদি মানুষের কাজে না লাগলো, তাহলে সে টাকার কি দাম? কাজে লাগবে না, শুধু জমানো থাকবে, এই যদি—তাহলে টাকার বদলে নুড়ি-পাথর জমালেও চলে। দু'য়েরই তুল্য-মূল্য! তাছাড়া নিতে বলছি না তো! তোমার দরকার, ধার নাও। তার পর দিন পেলে শুধে দিয়ো!···ভাবছো কি আমার পানে চেয়ে?

সুভাষিণী বলিল—ভাবছি, আর-জন্মে আপনি সত্যি আমার দিদি ছিলেন!

হাসিয়া গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—ও, এ-জন্মে দিদি নই? বটে!

১৬

পুরী যাওয়ায় বাধা পড়িল। দোলের পর মহেন্দ্রর জ্বর বাড়িল। ডাক্তার বলিলেন—এত-জ্বরে ট্রেণে যাওয়া উচিত হবে না!

মহেন্দ্র বলিল—সত্যি কথা বলবেন ডাক্তার বাবু?

ডাক্তার বলিলেন,—বলুন, কি জিজ্ঞাসা করবেন?

মহেন্দ্র বলিল—যে ভয় করছি, তাই?

—তার মানে?

—সেই পী-এচ-টি-এচ-আই-এস-আই-এস?

নিশ্বাস চাপিয়া ডাক্তার বলিলেন—লাংসে তেমন লক্ষণ তো পাচ্ছি না!

মহেন্দ্র বলিল,—যখন পাবেন, তখন আমার কিছুই আর থাকবে না, বোধ হয়!

ডাক্তার বলিলেন—না, না, সে ভয় করবেন না!

মহেন্দ্র বলিল,—ভরসাও যে এতটুকু পাচ্ছি না। এ ভয় রোগকে নয়, মৃত্যুকে নয়, ডাক্তার বাবু! এ ভয় আমার···আমি চলে গেলে যারা থাকবে, তাদের জন্য। ছেলেদের মানুষ করতে পারলুম না! সংস্থান বলতে কিছুই নেই। এই বিদেশ···

ডাক্তার বলিলেন—শরীরে একটু বল পেলে পুরী পাঠিয়ে দেবো আপনাকে। সেরে উঠবেন নিশ্চয়। এর চেয়েও কত শক্ত কেস্ সারছে···

মহেন্দ্র একটা নিশ্বাস ফেলিল, বলিল—তাই থেকেই বুঝুন আমার দুর্ভাগ্য কত বেশী! মাইনে ওদিকে কমলো! নাম কেটে দায়নি···সইটুকু ছাড়া আর কোনো দিকেই সুরাহা দেখছি না!

এ কথার উত্তর ডাক্তার কি দিবেন? ডাক্তার উত্তর দিলেন না; যথারীতি ব্যবস্থা দিয়া চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার সময় সুভাষিণীর সহিত মহেন্দ্রর কথা হইতেছিল। মহেন্দ্র বলিল—ডাক্তারের কথা মানো সুভা, পুরীতেই নিয়ে চলো। এখানে পড়ে শুধু ভুগছি! এ রোগভোগে আমার মন কি আতঙ্কে ভরে আছে!

সুভাষিণী বলিল—এখানে তবু দু'-এক জন আত্মীয়-বন্ধু আছেন! পুরীতে গিয়ে যদি বাড়ে? তাই ভাবছি···

মহেন্দ্র বলিল—কিন্তু তুমি কি করে এ পরিচর্য্যা চালাবে, ভেবে আমি দিশা পাচ্ছি না! ওঁরা যে-সব ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা করছেন, সে ব্যবস্থা চলে বড় লোকের ঘরে···যার অজস্র টাকা! আমার মতো অবস্থার মানুষ···

সুভাষিণী বলিল—চলছে তো যাহোক করে! তাছাড়া ও সব কথা তুমি কেন ভাবো? মানুষের যা করা কর্ত্তব্য, করতে হবে তো!

মহেন্দ্র বলিল—রোগের জন্য আমার ভাবনা নয়! ভাবনা, আমার এ রোগে তোমার সেবা-পরিচর্য্যার এই বাহুল্য···কি দিয়ে এ-ব্যবস্থা তুমি করছো? তোমাকে এ সম্বন্ধে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করতে আমার ভয় করে কতখানি!

সুভাষিণী এ কথার জবাব দিল না। এ কথার জবাব নাই! মহেন্দ্র আবার কি বলিতে যাইতেছিল, বলা হইল না, দিলু আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল।

মায়ের কাছে আসিয়া মায়ের হাতে পনেরোটি টাকা দিয়া দিলু বলিল—আমার মাইনে।

কথাটা মহেন্দ্র শুনিল, বলিল—মাইনে!

সুভাষিণী বলিল—এক মাস ও ছেলে পড়াচ্ছে। পনেরো টাকা করে তারা দেবে, বলেছে।

মহেন্দ্রর বুকখানা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। মহেন্দ্র বলিল—ভগবান্ কোনো দিকে আর কিছু বাকি রাখলেন না! ছেলের রোজগারও দেখিয়ে দিলেন যাবার আগে!

সুভাষিণী কহিল—এ আবার কি কথা! ছেলে খুশী-মনে রোজগারের টাকা এনে দাঁড়ালো···এ-কথা ওর বুকে পাথরের মতো বাজবে না?

মহেন্দ্র বলিল—আমার বুক এতে পাথর হয়ে গেল যে!

সুভাষিণী বলিল—কি দুঃখে পাথর হবে? সংসারে টাকার দরকার। ছেলের এগজামিন শেষ হয়েছে···এখন পড়াশুনা নেই! তাস-পাশা না খেলে, হুটোপাটি না করে ও যদি দু'টি ছেলে পড়িয়ে টাকা আনে? সংসারের সাশ্রয় করে? তাতে তোমার বুক পাথর হবে কি দুঃখে! না, মন-খারাপ করো না। তোমার মাইনে কমেছে··· ভগবান্ এক দিক্ থেকে যদি খানিকটা সুরাহা করেন, তাঁর সে অনুগ্রহ মাথায় তুলে নাও।

মহেন্দ্র বলিল—তাই নিলুম! তাঁর অনুগ্রহ-নিগ্রহ সবই মাথায় নিয়েছি সুভা···শুধু আজ নয়, চিরদিন!

সুভাষিণী এ-কথার জবাব দিল না, দিলুর পানে চাহিল, বলিল—কাল সকালে ওঁর মিকশ্চারটা আনতে হবে দিলু। এক দাগ বাকী আছে। আজ রাত্রে খাবেন। তার পর কাল সকালে···

দিলু বলিল—কাল সকালে শিশি দিয়ো···ওষুধ নিয়ে আসবো।

সুভাষিণী বলিল—এখন তুমি যাও দিলু, নীলুর কি পড়া বলে দিতে হবে না কি!

—যাই···বলিয়া দিলু চলিয়া গেল।

রাত্রি আটটা। পথ্যের প্লেটে মোজাম্বিক্ দেখিয়া মহেন্দ্র বলিল—ছেলের রোজগারের টাকা ভেঙ্গে আমীরি পথ্য খাওয়াচ্ছ আমাকে···ওদের পেটে কিছু পড়লো না নিশ্চয়!

সুভাষিণী বলিল—তার মানে?

মহেন্দ্র বলিল—মানে, ওর টাকায় আমার জন্য এলো মোজাম্বিক! এদেশে এর দাম কি সামান্য পয়সা! আমাদের মতো গরীব-গৃহস্থের ঘরে ঘোড়া-রোগ এনে দিয়ে ভগবান্ কি তামাসাই না দেখছেন!

সুভাষিণী কহিল—ভয় নেই, এ ফল কেনা হয়নি! যে-বাড়ীতে পড়ায়, তারা দিলুকে খুব ভালোবাসে, যত্ন করে···রোজ ওকে জলখাবার দেয়! কলকাতা থেকে ওঁদের কে কুটুম এসেছেন। তিনি মোজাম্বিক, আপেল, নাশপাতি নিয়ে এসেছেন। দিলুকে তাই খেতে দিয়েছিলেন। ও খায়নি। জোর করে ওর হাতে তাঁরা গুঁজে দিয়েছেন একটি আপেল, দু'টি মোজাম্বিক, চারটে ন্যাশপাতি, কিছু খেজুর আর মেওয়া। দিলু বললে, মোজাম্বিক তোমার পক্ষে খুব উপকারী হবে, তাই···

মহেন্দ্র বলিল—ওদের দেছ?

—দিয়েছি গো!···আধখানা কেটে ওদের তিন ভাইকে দিয়েছি··· আর এই আধখানা এনেছি তোমার জন্ত!

মহেন্দ্রের বুক ঠেলিয়া সঞ্চিত এক-রাশ অশ্রু আসিয়া চোখের পিছনে দাঁড়াইল। রোগশুষ্ক কণ্ঠ সে অশ্রুর বাষ্পে আর্দ্র হইয়া উঠিল। বাষ্পার্দ্র স্বরে মহেন্দ্র কহিল,—ছেলেকে এমন মানুষ করে তুলেছো সুভা! এর চেয়ে বড় সম্পদ্ আর কি আছে! ভগবান তোমাদের মঙ্গল করবেন!

সুভাষিণীর বুক দুলিয়া উঠিল! গ্লানির ভারে মহেন্দ্র এখন যে-সব কথা বলে, সে-কথায় এত ধার যে, বুকখানা তাহাতে ছিঁড়িয়া ক্ষত-বিক্ষত হয়! কোনো মতে আত্মসংবরণ করিয়া সুভাষিণী বলিল,—শুয়ে শুয়ে মন্দটাই যদি তুমি এমন করে ভাবো, তাহলে আমরা দাঁড়াবো কিসের জোরে, বলতে পারো? দিলু···বেচারী! শুকনো মুখ করে আমায় বললে,—উনি যদি এমন হতাশ হয়ে পড়েন···

কথা শেষ হইল না! পাহাড়ের মতো যে বিরাট ভয়-ভাবনা বুকের উপরে খাড়া আছে, সে ভয়-ভাবনা তাকে যেন চাপিয়া ধরিল! সে-চাপে নিশ্বাস বন্ধ হইবার জো!

রাত্রি দশটা। সুভাষিণীকে তাড়া দিয়া মহেন্দ্র খাইতে পাঠাইয়াছে, দিলু আসিয়া বসিল মহেন্দ্রর বিছানায়। সে বাপের পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছিল।

মহেন্দ্র ডাকিল—দিলু···

দিলু বলিল—বাবা···

মহেন্দ্র বলিল—নীলু শুয়েছে?

—হ্যাঁ।

—তুমি?

দিলু বলিল—আপনি ঘুমোলে আমি শুতে যাবো।

—রাত হয়েছে। শোওগে দিলু।

—মা আসুন। আমার ঘুম পায়নি। এগারোটা পর্য্যন্ত আমি পড়ি, তার পর শুতে যাই।

—আজ পড়বে না?

—পড়বো'খন!

মহেন্দ্র আর কোনো কথা বলিল না। দিলু বাপের পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

পাঁচ মিনিট···দশ মিনিট···পনেরো মিনিট কাটিল।

দিলু বলিল—ঘুম পাচ্ছে না?

—না।

দিলু বলিল—নিশ্চয় অনেক কথা ভাবছেন!

মহেন্দ্র বলিল—অনেক কথা নয় দিলু, শুধু একটা কথা ভাবছি! সে কথা তোমাকে বলা দরকার মনে হচ্ছে। তুমি দুঃখ করো না! বয়সে ছেলে-মানুষ হলেও তোমার মন, তোমার বুদ্ধি সাধারণ ছেলেদের মতো ছোট নয়। তাই তোমাকে সে-কথা বলা উচিত মনে করছি!

দিলু কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল। বুঝিল, মহেন্দ্র এমন কথা বলিবে, যে-কথা কাঁটার মতো দিলুর বুকে বাজিবে!

মহেন্দ্র বলিল—তুমি যে এই টুইশনি-চাকরি করছো···আমার এতে খুবই বেজেছে! এ-বয়সে সংসার নিয়ে দুঃখ-দুর্ভাবনা করবার কথা তোমার নয়, দিলু! না, দুঃখ করো না, তোমার বয়সে যে-ছেলেকে সংসারে সাশ্রয় হবে বলে চাকরি করতে বেরুতে হয়, সে ছেলের যে-বাপ, তার দুর্ভাগ্য কতখানি, তা আমি বুঝি, দিলু!···তবু এতে সান্ত্বনাও পাচ্ছি!

এই পর্য্যন্ত বলিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া মহেন্দ্র চুপ করিল। দিলুর মাথার মধ্যে এক-রাশ সরীসৃপ যেন কিলবিল করিতে লাগিল! বাহিরে জমাট স্তব্ধতা! সে স্তব্ধতা চিরিয়া থাকিয়া-থাকিয়া দূরে একটা কুকুর ডাকিতেছে!

মহেন্দ্র আবার বলিল—সব-সময়ে সৎপথে থেকো। যা সত্য আর ন্যায় বলে বুঝবে, তার পক্ষ কখনো ত্যাগ করবে না। ন্যায় আর সত্য রক্ষা করতে যদি গুরুজন বা প্রিয়জনের মনে ব্যথা লাগে, তাতেও কখনো কাতর হয়ো না। পরের অনুগ্রহের উপর কখনো নির্ভর রেখো না। কারো কৃপাপ্রার্থী হয়ো না জীবনে। নিজের শক্তির উপর নির্ভর করবে চিরকাল। ভিক্ষায় বা পরের কৃপায় যে রাজ্য-সম্পদ ভোগ করে, তার চেয়ে যে কুলি নিজের সামর্থ্যে মোট বয়ে দিনাতিপাত করে মানুষ-হিসাবে সে অনেক বড়!

এ কথায় কিসের আভাস, দিলু বুঝিল। ব্যথার নিশ্বাসে দিলুর বুক যেন ফাটিয়া যাইবে! সে বলিল,—এ সব কথা আমাকে বলতে হবে না বাবা। আপনাকে দেখে আমি জেনেছি, মানুষ কাকে বলে···মানুষ হতে হলে···

মহেন্দ্র বলিল—তবু বলে রাখি দিলু। ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার হিসাবই আমরা বুঝে নিতে শিখেছি। কিন্তু পাশ করলেই কেউ মানুষ হয় না! কি করলে মানুষ হয়, ছেলেমেয়েদের তা কখনো আমরা বলে দিই না। তাই···

আঁচলে ভিজা হাত মুছিতে মুছিতে সুভাষিণী আসিল ঘরে। দিলু নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

সুভাষিণী কহিল—কিসের গল্প হচ্ছে তোমাদের?

মহেন্দ্র বলিল—দিলুকে বলছি, কি ভাবে চলবে! মা-বাপ কারো চিরদিন বাঁচেন না তো!

সুভাষিণী রাগ করিল, বলিল—ও সব তত্ত্ব-উপদেশ শোনবার বয়স তোমার ছেলের এখনো হয়নি!···তুই যা দিলু, শুগে যা!

মায়ের কথায় দিলু উঠিয়া গেল। গেল টলিতে টলিতে···কেমন আচ্ছন্নের মতো।

১৭

আরো এক মাস পরের কথা···

মহেন্দ্রর শরীর আরো ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সারা বাড়ী ঘিরিয়া দারুণ অশান্তি-দুশ্চিন্তার ছায়া!

গৌরী ঠাকুরাণী ক'দিন এইখানেই বাস করিতেছেন। সকালে উঠিয়া বাড়ী যান। ছেলেরা তাঁর ওখানে খাওয়া-দাওয়া করিতেছে। সুভাষিণীর জন্ম নিজের হাতে তিনি ভাত বাড়িয়া আনেন। তাঁর মনেও আশার শেষ রশ্মিটুকু নিব-নিব হইতেছে!

সে দিন তিনি আসিয়া ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন—মানুষ, না, পিশাচ! দেখা হয়েছিল তোমাদের ঐ কামিখ্যে-সাহেবের সঙ্গে। বললুম, তোমার না আপন-জন? তার এই অসুখ! বলে, যমে-মানুষে টানাটানি, আর তুমি সাহেবিয়ানা করছো! বললুম, তুমি না যাও, তোমার স্ত্রী···তার তো ভাই হয়! দু'জনে একসঙ্গে মানুষ হয়েছে! তিনি এক বার খোঁজ নিতে পারেন না?

রাগের ঝোঁকে তিনি অনেক কথা বলিলেন। তার পর সে ঝোঁক কমিলে তিনি বসিলেন। বসিয়া বলিলেন—ডাক্তারকেও আজ ডাকিয়ে পাঠিয়েছিলুম। পয়সার চাকর বৈ তো নয়! সুপ্রসন্নর পয়সা আছে··· তার দিদি আমি···ডাকতেই এসেছিল। বললুম, আমরা ডাক্তার নই, আমরা বুঝছি রোগ শক্ত—আর তুমি ডাক্তারী-পাশ করে মাইনে নিয়ে চাকরি করছো—শিসি-শিসি ওষুধই খাওয়াচ্ছো, অসুখ কমছে না, রোগীর দেহ পাত হয়ে যাচ্ছে, তার কোনো ব্যবস্থা নেই? কেউ ওদের দেখবার নেই···কেউ কিছু বলে না, তাই, বটে? তাতে আমতা-আমতা করে বললে, কলকাতার মতো এখানে ব্যবস্থা তো নেই, কাজেই!···আমি ছাড়িনি তবু। বললুম, এখানকার বড় বড় চাকুরে যারা, যাদের হাতে চাকরির কল-কাঠি, তাদের জীবনেরই দাম আছে, ভাবো? আর এ-সব লোকের জীবনের কোনো দাম নেই যে, শুধু ওষুধ দিয়ে দায়ে খালাশ হচ্ছো!

গৌরী ঠাকুরাণী আবার চুপ করিলেন। তার পর দম লইয়া আবার বলিলেন—সুপ্রসন্নকে আমি চিঠি লিখেছি। এক বার আসতে বলেছি! তাকে এখানকার কথা লিখেছি। লিখেছি, আমরা মেয়েমানুষ··· কিছু বুঝতে পারছি না। একবার সে যদি আসে, ভালো রকম বিধি-ব্যবস্থা করি!···এ ডাক্তারের উপর আমার এতটুকু বিশ্বাস নেই। এমন করে রোগীকে ওর হাতে আর ফেলে রাখা চলে না! বড়-চাকুরেদের বাড়ীতে অসুখ হলে পৃথিবী মাথায় করে নাচতে থাকে··· দেখেছি তো! আর এখানে শুধু ঠেকো দিচ্ছেন! মাইনের চাকর এ-সব হতভাগা···মানুষের চামড়াখানাই শুধু যে গায়ে আছে!

ভয়ে-ভাবনায় সুভাষিণীর মন যেন পাথর হইয়া আছে! গৌরী ঠাকুরাণীর এ-কথায় সে-পাথর ফুঁড়িয়া অশ্রু একেবারে উতল হইয়া উঠিল!

নিশ্বাস ফেলিয়া সুভাষিণী বলিল—কি করে আমার দিন কাটছে দিদি, ভগবান্ জানেন! এত দিন তাঁকে যখনি ডেকেছি, তিনি মুখ তুলে চেয়েছেন। এবারে কি এমন অপরাধ করেছি যে, তাঁর দয়া হচ্ছে না!

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—তুমি মন খারাপ করো না বৌ! তোমার মনের জোরের উপরই রোগীর জীবন।···সাবিত্রীর কথা শুনে-ছিলুম···এখানে এক জন কথক এসেছিলেন···তিনি বলেছিলেন, সাবিত্রীর মনের জোরেই সত্যবান্ বেঁচেছিলেন। যমের কাছ থেকে বর পাওয়া···ও সব বানানো গল্প! সত্যবানকে ফিরে পাওয়ার আসল মানে তিনি বেশ মিষ্টি করে বুঝিয়ে বলেছিলেন, সাবিত্রী মনের জোরে সেবা করেছিলেন···মনকে তিনি শক্ত করে বুঝিয়েছিলেন যে, না, সত্যবানের মৃত্যু হতে পারে না! তাঁর সেই মনের জোর আর সেবার জোর···তাতেই সত্যবান্ বেঁচে উঠেছিলেন!

একাগ্র মনে সুভাষিণী এ কথা শুনিল। ভাবিল, তার নিষ্ঠা কি সাবিত্রীর নিষ্ঠার চেয়ে কম? তার ভালোবাসাও সাবিত্রীর ভালোবাসার চেয়ে এক-তিল কম নয়! তবু সুভাষিণী মনে জোর পায় না কেন? মহেন্দ্রর জন্ম সুভাষিণী কি না করিতে পারে? সাবিত্রী ছুটিয়াছিলেন যমকে ভয় না করিয়া যমের পিছনে বৈতরণীর পারে···সুভাষিণী সে-পার ছাড়িয়া দূরে···আরো···আরো···আরো দূরে ছুটিতে পারে, মহেন্দ্র যদি তাহাতে বাঁচিয়া ওঠে!

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন,—আমাদের শিবনাথকে বলেছি, কাল সে পার্ব্বতীপুর গিয়ে সেখান থেকে সিভিল-সার্জ্জনকে একবার নিয়ে আসবে। তুমি ভেবো না বৌ···এক বার দেখি, আমরা যা পারি!

তার পর সুপ্রসন্ন আসুক! বিনা-চিকিৎসায় এভাবে একটা প্রাণ··· যেতে পারে না···যাবে না!

নিশ্বাসের বাষ্পে কথা শেষ হইল না।

তার পর কিছু বাকী রহিল না। পার্ব্বতীপুর হইতে সিভিল-সার্জ্জন আসিলেন। রোগী দেখিয়া রোগ পরীক্ষা করিয়া তিনি যে-কথা বলিলেন, শুনিয়া গৌরী ঠাকুরাণীর হাত-পা অবশ হইয়া গেল! তাই? তাহা হইলে উপায়? সুভাষিণী? ছেলেরা?

রোগী ক্রমে বিছানা হইতে নাড়া অসম্ভব হইল।

পার্ব্বতীপুরের সিভিল-সার্জ্জন ইন্‌জেকশন দিলেন, কত-কি করিলেন। তাঁর হাতে এক দিন একটু ভালো যায়, পরের মন্দ, তার পরের দিন আবার একটু ভালো·

এবং এমনি আশা-নিরাশার তরঙ্গ তুলিতে তুলিতে এক দিন শেষ রাত্রে সংসারটিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া স্ত্রী-পুত্রকে বিদেশে অসহায় রাখিয়া মহেন্দ্র ইহলোক হইতে বিদায় লইয়া গেল!

কান্না নাই···চীৎকার নাই! বাড়ী যেন নিমেষে পাথরের পুরীতে রূপান্তরিত হইল! কি দারুণ নিস্তব্ধতা! দুঃখ-বেদনা-শোকের আঘাতে বাড়ীর লোক-জন যেন সে-পাথর-পুরীর সঙ্গে মিশিয়া পাথর হইয়া গেছে!

ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

ছোটদের আসর

সিনেমার রোমাঞ্চ

আমেরিকান্ ছবির কথা বলিতেছি। ছবির পর্দায় সে ছাখো, মহা-সমুদ্রের বুকের উপর দিয়া জাহাজ চলিয়াছে—হঠাৎ এক অতিকায় তুষার-গিরি ঐ ভাসিয়া আসে—এবার জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা লাগিবে! ভয়ে গায়ে কাঁটা দেয়! তার পর সে তুষার-গিরিতে ধাক্কা লাগিয়া জাহাজ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়!

নকল সাগরে নকল তুষার-গিরি

ছবি দেখিবার সময় তন্ময়তার জন্ত এ ভীষণ দৃশ্যে শিহরিয়া উঠি! কি করিয়া এমন ভাবে মৃত্যুর মুখে মানুষ অগ্রসর হয়, সে চিন্তা তখন মনে জাগে না! তার পর ভাবিয়া আকুল হই, কি করিয়া এমন রোমাঞ্চকর দৃশ্য তোলা হইল!

রহস্ত খুব জটিল নয়। এ দৃশ্যের জন্ত ছোট-খাট মডেলে তৈরী করা হয় জাহাজ এবং তুষার-গিরি। নকল সাগর তৈয়ারী হয় চৌবাচ্ছায় বা ট্যাঙ্কে। তার পর চৌবাচ্ছার জলে ঐ নকল জাহাজ এবং তুষার-গিরি ছাড়িয়া বৈদ্যুতিক যন্ত্রযোগে সাগর-জলে স্রোত সঞ্চালিত এবং নকল সাগরের মাথার উপর যে-আকাশ, সে-আকাশে নকল কুয়াশা সৃষ্টি করা হয়। জল-মধ্যে খাটানো তার টানিয়া তুষার-গিরির সঙ্গে জাহাজের ধাক্কা লাগানো হয়! বাহিরে ক্যামেরা রাখিয়া এ দৃশ্যের ছবি যেমন তোলা হয়, তেমনি অন্ত দিকে জাহাজের আরোহীদের ভীত আর্ত্ত চীৎকারও শব্দযন্ত্রে তোলা হয়; তার পর ছবির দৃশ্যের সঙ্গে এই শব্দ জুড়িতে বেগ পাইতে হয় না!

নকল এঞ্জিন

ছবিতে বড় বড় যুদ্ধের যে সব অগ্নিময় মারাত্মক দৃশ্য দেখানো হয়, সেগুলিও নকল মডেলের সাহায্যে তোলা।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে শিকাগো সহরে দারুণ অগ্ন্যুৎপাত ঘটে। সে অগ্ন্যুৎপাতের ছবি তুলিবার জন্ত ক্যামেরা লইয়া সেখানে কেহ হাজির ছিলেন না! অথচ সিনেমার ছবিতে সে অগ্নিকাণ্ডের দৃশ্য তোলা হয় কি করিয়া, বলি। সত্যকার অগ্নিদাহে চার বর্গ-মাইল-পরিমিত জমিতে যত বাড়ী-ঘর দোকানপাট ছিল, সমস্তই ভস্মসাৎ

হইয়া যায়। সিনেমায় এ দৃশ্য তুলিবার জন্য চার বিঘা-পরিমিত জমির উপর পাংলা কাঠ ও ক্যাম্বিশ দিয়া বহু বাড়ী-ঘরের কাঠামো প্রভৃতি তৈয়ারী করা হয়; সেই সঙ্গে নদী তৈয়ারী হয় দীর্ঘ নালা খুঁড়িয়া। পরে পাইপ-সংযোগে ঐ নদীতে পেট্রোল ঢালিয়া তাহাতে লাগানো হয় আগুন! একেবারে দাউ-দাউ করিয়া আগুন জ্বলে! এই আগুনের ছবি তোলা হয়। এবং অগ্নিকাণ্ডের এ ছবি পদ্দায় প্রতিফলিত হইলে তার ভীষণ বাস্তবতায় দর্শকের দল বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া উঠেন।

তোমাদের মধ্যে অনেকে "কিংকং" ছবি দেখিয়াছ নিশ্চয়! সে ছবিতে অতিকায় দৈত্য কিঙকঙ শেষের দৃশ্যে সহরের আকাশস্পর্শী উচ্চশিখর গৃহের আশ্রয় লইয়াছিল। এ দৃশ্যটি সম্পূর্ণ নকল। কার্ডবোর্ড ও পাংলা কাঠের বাড়ী-ঘরে সহরের যে আভাস তৈয়ারী হয়, ক্যামেরার সাহায্যে তাহাই বাস্তব-রূপে আমাদের নয়নে-মনে এতখানি বিভ্রম জাগাইয়া তুলিয়াছে। আসল বাড়ী-ঘরের আকারের ১৷৪৮তম ছোট-আকারে এই সব নকল ঘর-বাড়ী তৈয়ারী হইয়াছিল।

গৃহচূড়ে কিংকং

নকল বনের নকল গাছ

নকল সমুদ্রে বা নদ-নদীতে জলের গভীরতার আভাস জাগাইতে জলের ট্যাঙ্কে গ্লিসারিণ ঢালা হয়। গ্লিসারিণ গাঢ় বলিয়া ক্যামেরায়-তোলা ছবিতে সে গ্লিসারিণকে দেখায় যেন অথৈ গভীর জলরাশি।

নকল বন-জঙ্গলের বা বাগিচার গাছ-পালা তৈরী করা হয় 'চীজ্-ক্লথ' নামে এক-জাতের কাপড় পাওয়া যায়, সেই কাপড় কিম্বা স্পঞ্জের সাহায্যে।

ট্রেণ-কোলিশন প্রভৃতির যে ছবি আমরা দেখি, সত্যকার ট্রেণে-ট্রেণে কোলিশন ঘটাইয়া তাহা তোলা হয় না। এ ব্যাপারের জন্য ছোট ছোট এঞ্জিন ও ট্রেণের কামরা তৈয়ারী করা হয়। নকল রেল-পথে নকল ট্রেণ চালাইয়া কোলিশন্ লাগাইয়া তার ছবি তোলা হয়। এবং সত্যকার চলন্ত ট্রেণের ছবির সঙ্গে নকল-ট্রেণের কোলিশন্-ছবি জুড়িলেই তাহা আমাদের দৃষ্টি-বিভ্রমে একাকার হইয়া বাস্তবের ভয়ঙ্কর বেশে প্রতিফলিত হয়।
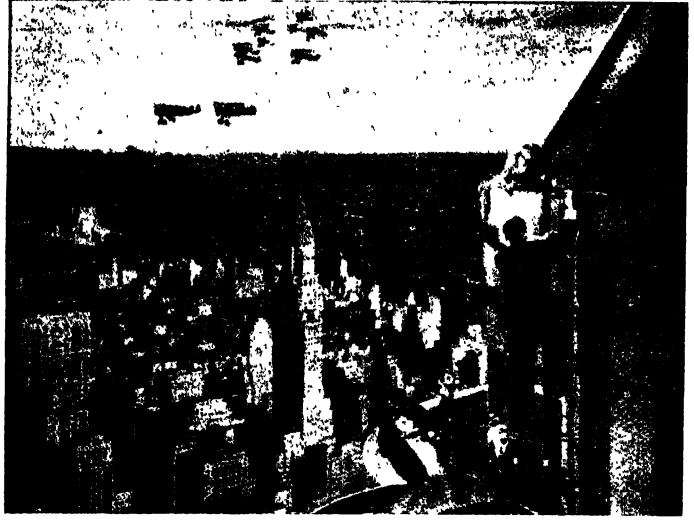
এই সব নকল দৃশ্য তৈয়ারী করিতে যে কল্পনা ও জ্ঞানের প্রয়োজন, তাহাতে অশিক্ষিত-পটুত্বের ছায়া নাই; তাহাতে অনেকখানি মানসিক উৎকর্ষের প্রয়োজন। এবং মনের এ উৎকর্ষ-লাভ সম্ভব হয় শুধু বিজ্ঞান-শিক্ষায়, বিজ্ঞানের অনুশীলনে; এবং কল্পনার জোরে!

আশা ও শক্তি

মার্কাস অরেলিয়াসের লেখা পড়ছিলুম। তিনি ছিলেন প্রাচীন রোমের এক জন বিখ্যাত জ্ঞানী: এবং তিনি যে সব মহাবাণী লিপিবদ্ধ রেখে গেছেন, সে বাণীর মর্ম্ম বুঝে যদি আমরা চলতে পারি, তাহলে জীবনে কোনো দিন দুঃখ-অশান্তি পাবো না!

তাঁর একটি মহাবাণীর কথা আজ বিশেষ ভাবে বলতে চাই। নানা ব্যাপারে আজ আমাদের জীবন এমন সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠেছে যে, আতঙ্কে-দুর্ভাবনায় আমরা যেন দিশেহারা হয়ে পড়েছি! এ মহাবাণীর মর্ম্ম যদি গ্রহণ করতে পারো, তাহলে দুঃখ-দুর্ভাবনা অনেকখানি কমবে।

সে মহাবাণীটি হচ্ছে,—বিধাতা আমাদের এমন ভাবে তৈরী করেছেন যে, পৃথিবীতে সব-কিছুই আমরা সহ্য করতে পারি—যদি অবশ্য সচেতন হয়ে সে-চেষ্টা করি!

আমাদের মহাকবিও বলে গেছেন,—

বিপদে মোরে রক্ষা করো,
এ নহে মোর প্রার্থনা—
বিপদে যেন করিতে পারি জয়!

এ কথা মেনে যদি চলতে পারি, তাহলে বিপদকে ভয় করবার কারণ থাকতে পারে না! এখন মার্কাস অরেলিয়াসের মহাবাণীর আলোচনা করা যাক!

দুঃখ-দুর্দ্দশা ঘটলে যদি চোখ মেলে বাহিরের পানে তাকাও, দেখবে, তোমাদের চেয়ে আরো কত বেশী দুঃখ-দুর্দ্দশা আরো যত লোক সহ্য করছে! আমরা যাদের বলি "দুর্ভাগা" "ভাগ্য-হত", তাদের সংখ্যা সামান্য নয়! এদের এতখানি দুঃখ-দুর্দ্দশার কারণ, এরা নিশ্চেষ্ট ভাবে সে দুঃখ-দুর্দ্দশা ভোগ করে—বিধির দুর্লঙ্ঘ্য বিধান মনে করে! পরাজয়, নৈরাশ্য—এ-সবে যদি মন ভেঙ্গে চুপ করে পড়ে থাকো, তাহলে জয়ের আশা কি করে থাকবে? স্কুলের পরীক্ষার কথা ভাবো! ভালো পড়াশুনা না করলে পরীক্ষায় পাশ করা সম্ভব নয়—ফেল হওয়া অনিবার্য্য! ফেল হয়ে যদি ভাগ্যকে দোষী সাব্যস্ত করে চুপচাপ পড়ে থাকো, তাহলে কি করে পাশ করবে, বলো? ফেল হয়েছো, বেশ, এবার ভালো করে পড়াশুনা করো, ফাঁকি নয়! মনে শক্তি পাবে। সে শক্তির ফলে পড়াশুনায় মন বসবে এবং ভালো করে পড়াশুনা করলে দেখবে, পাশ হবেই! জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রেও এই একই বিধি! আমাদের নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র মশায় বলে গেছেন—

যে মাটীতে পড়ে লোক, ওঠে তাই ধরে'—
বারেক নিরাশ হয়ে কে কোথায় মরে!
তুফানে পড়েছো যদি, ছাড়িয়ো না হাল;
আজিকে না হলো যদি, হতে পারে কাল।

আমি ও-কাজ পারবো না—আমার সাহস নেই—এমন চিন্তা কদাপি মনে এনো না! যে-কাজ আর পাঁচ জনে করেছে, সে-কাজ মানুষ মাত্রেই করতে পারে। তবে তার জন্য চাই মনের জোর, একাগ্রতা আর অধ্যবসায়।

মনের পানে একবার ভালো করে তাকাও দিকিন্। সকলেরি মনে আছে সাহস, শক্তি, দরদ, স্নেহ, মায়া, মমতা! রূঢ়তা, স্বার্থপরতা, হিংসা—এগুলিও মনের মধ্যে আবর্জ্জনার মতো সঞ্চিত হয়। ঘর-দ্বার ব্যবহার করলে যেমন সে ঘর-দ্বারে আবর্জ্জনা জমে, এবং নিত্য দু'বেলা ঝাঁট দিয়ে সে আবর্জ্জনা সাফ করতে হয়, জগতে নানা রকমের লোক-জনের সঙ্গে বাস করতে কাজে-কর্ম্মে আচারে-ব্যবহারে মনের মধ্যেও তেমনি আবর্জ্জনা জমে। এ আবর্জ্জনাও নিত্য দু'বেলা ঝেড়ে বার করে মনকে সাফ করতে হবে। তা না করলে ঘরে আবর্জ্জনা জমলে ঘর যেমন আস্তাকুড় হয়ে ওঠে, মনের আবর্জ্জনা সাফ না করে মনের মধ্যে সেগুলিকে জড়ো করে রাখলে মনও তেমনি নরক হয়ে উঠবে! নরকের সে কলুষিত গন্ধে-বাষ্পে মনের অপমৃত্যু ঘটবে—মানুষ দানব হয়ে উঠবে!

অমুক লোক তোমার উপর অন্যায় করেছে, অবিচার করেছে, অমুক তোমার সঙ্গে অভদ্রতা করেছে, মিথ্যাচরণ করেছে, বেইমানী করেছে? করুক! তুমি সে ব্যথা মনে রেখো না, মনের মধ্যে তার গ্লানি জড়ো করো না। সত্য এবং ন্যায়কে মেনে তুমি চলো তোমার লক্ষ্য ধরে! দেখবে, কারো দেওয়া দুঃখ তোমার মনে বাজবে না—এতটুকু অশান্তি তোমাকে ভোগ করতে হবে না। মাইকেলের কথা—"ভুল দোষ, গুণ ধরো" মেনে চলবার চেষ্টা করো, দেখবে, জীবন হবে স্বচ্ছন্দ, সুখময়—এবং সিদ্ধির বিজয়-মাল্যে তোমার কণ্ঠ বিভূষিত হবেই!

চাঁদের দেশের মেয়ে

(রূপকথা)

সেকালে এক বুড়ো কাঠুরের সংসারে ছিল সে আর তার বৌ। ছেলে-মেয়ে হয়নি, তাই তাদের বড়ই দুঃখ। একটি ছেলের জন্যে তারা কাতর হয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করত। কিছু দিন পরে এক দিন কাঠুরে বনে কাঠ কাটতে গিয়ে দেখলে, গভীর বনের ভেতর থেকে চাঁদের কিরণের মতন কোমল আলো বেরোচ্ছে। কাঠুরে তার কাছে গিয়ে দেখে, ছোট একটি মেয়ে একা শুয়ে হাত-পা নেড়ে খেলা করছে। ফুলের মতন সুন্দর তার মুখ, আর তার গা দিয়ে চাঁদের আলোর মত আলো ফুটে বেরোচ্ছে! মেয়েটি দেখে সে ভারী খুশী হয়ে তাকে কোলে নিয়ে নিজের কুটীরে ফিরে গেল, বউকে ডেকে বললে, "গিন্নি, দেখ, কেমন সুন্দর একটি মেয়ে বনের মধ্যে কুড়িয়ে পেলাম।" মেয়ে দেখে তার বৌয়ের কি আহ্লাদ! মেয়েটিকে কোলে নিয়ে সে কত আদর করলে, কত চুমু খেলে। দু'জনে ভাবলে, ভগবান্ এবার আমাদের দুঃখ দূর করেছেন। তিনি দয়াময়।

মেয়ের গা বেয়ে চাঁদের আলো ঝরতে দেখে—তারা মেয়েটির নাম রাখলে জ্যোছনা। কাঠুরে খুব গরীব ছিল, সব দিন তাদের খাবার জুটতো না; কিন্তু জ্যোছনাকে ঘরে আনবার পর থেকে সংসারে তার আর কোন অভাব রইল না। তারা মনের সুখে ঘরকন্না করতে লাগল, এই ভাবে দিন কাটতে লাগল, জ্যোছনা বেশ বড়-সড় হয়ে উঠলো, তার রূপ আর গুণের খ্যাতি চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ল। দেশ-বিদেশের রাজা-রাজড়ারা তাকে বিয়ে করবার জন্যে কাঠুরের কুটীরে লোক পাঠাতে লাগলেন। জ্যোছনা সে কথা শুনে তাঁদের কাউকেই বিয়ে করতে রাজী হলো না। কাঠুরে আর তার বউ তাকে অনেক রকম বুঝিয়ে বলায় সে বললে, যারা তাকে বিয়ে করতে আসবে, তাদের সে পরীক্ষা করবে। সে পরীক্ষায় যে উত্তীর্ণ হবে, তাকেই সে বিয়ে করবে। তার প্রতিজ্ঞা শুনে রূপনগরের কুমার রূপচাঁদ এলেন, অবন্তী রাজ্যের রাজপুত্র শান্তিকুমার এলেন, সোনাগড়ের স্বর্ণদেব, কাঞ্চীর চঞ্চলকুমার, মায়াপুরের অমিয়কুমার প্রভৃতি আরও কত রাজপুত্র, মন্ত্রিপুত্র সেখানে এসে জুটলেন। ক'নের কাছে পরীক্ষা দিতে হবে শুনে প্রথম পাঁচ জন ছাড়া আর সকলেই সরে পড়লেন। জ্যোছনা রূপচাঁদকে বললে,—"যে পাত্র থেকে সর্ব্বক্ষণ সোনালি আলো ঝরে, আমাকে সেই পাত্র এনে দিন।" শান্তিকুমারকে বললে—"সোনার গাছে রূপোর শিকড়, তার পান্নার পাতা আর তাতে হীরের ফুল ফোটে। আমাকে সেই গাছ, না হয় তার একটা ডাল এনে দিন।" স্বর্ণদেবকে বললে—"আমাকে এমন একটা ঘেরাটোপ এনে দিন—যা জলে ভেজে না, আগুনে পোড়ে না।" চঞ্চলকুমারকে বললে—"বিশাল একটা অজগরের মাথায় সাত-রঙা মাণিক আছে, সেইটে আমায় এনে দিতে হবে।" আর অমিয়কুমারকে বললে—"সাত সমুদ্রের পারে যে টিয়াপাখী আছে, তার গানের এমনই মোহিনী শক্তি যে, সে গান শুনলেই মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে। আমাকে সেই পাখীটা এনে দিন। যিনি প্রথমে তাঁর কাজ শেষ করে ফিরে এসে আমাকে খুশী করতে পারবেন, আমি তাঁর গলায় মালা দেব।"

রূপচাঁদ কোথায় সেই অদ্ভুত পাত্র পাওয়া যায়, তা জানতেন না। দেশে ফিরে গিয়ে তিনি রটিয়ে দিলেন, তিনি সেই পাত্রের সন্ধানে যাচ্ছেন, এবং তাঁর যাত্রার খবরটা তাঁর চেষ্টায় জ্যোছনাও জানতে পারল। তার পর তিনি গোপনে এক যাদুকরের সঙ্গে দেখা করলেন। যাদুকর তাঁর কাছ থেকে অনেক টাকা আদায় করে একটি সুদৃশ্য পাত্রে এমন জিনিসের প্রলেপ লাগিয়ে দিলে যে, সেই পাত্রের গা থেকে ক্রমাগত সোনালি আলো ঝরতে লাগল। রাজপুত্র খুব খুশী হয়ে সেই পাত্রটি এক জন দূতের মারফৎ জ্যোছনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। জ্যোছনা সেই পাত্রটি হাতে নিয়ে জল দিয়ে ভাল করে ধুয়ে ফেলতেই প্রলেপ উঠে গেল, তখন আর তা থেকে আলো বেরুল না। জ্যোছনা দূতকে বললে, "তোমাদের রাজপুত্র আমার সঙ্গে চালাকী করেছেন! সে ধাপ্পাবাজকে আমি বিয়ে করব না।"

অবন্তীর রাজপুত্র শান্তিকুমারও রূপচাঁদের মত সোনার গাছ খুঁজতে যাচ্ছেন, এই সংবাদ প্রচার করে কয়েক জন ওস্তাদ কারিগর দিয়ে খুব গোপনে সোনার একটি বৃক্ষশাখা, পল্লব, পাতা আর তার হীরের ফুল প্রস্তুত করালেন। সেই সব মিস্ত্রীর হাতের কাজ এমন নিখুঁত হ'ল যে, তা দেখে শাখাটি আসল কি নকল, তা কেউ ঠিক করতে পারল না। শান্তিকুমার এক জন দূত মারফৎ সেই অদ্ভুত শাখাটি জ্যোছনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। জ্যোছনা সেই দূতের সামনেই শাখাটি মাটীতে রোপণ করল, কিন্তু শাখাটা বড় গাছে পরিণত হলো না! তা দেখে সে দূতকে বললে—"তুমি তোমার মনিবকে জানাবে, তিনি আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। আমি ডাল আনতে বলেছি। এটা সে আসল ডাল নয়। অতএব তিনি আমাকে বিবাহের আশা ত্যাগ করুন। কোন প্রতারক আমার স্বামী হবার যোগ্য নয়।"

এ কথা শুনে দূত মাথা হেঁট করে চলে গেল।

সোনাগড়ের সুবর্ণদেবও অন্য দুই রাজপুত্রের মত তাঁর বরাতি আলখাল্লা খুঁজতে যাবার মিথ্যে সংবাদ রটিয়ে গোপনে এক দর্জ্জিকে দিয়ে খুব মোটা কাপড়ের এক ঘেরাটোপ তৈয়েরী করালেন। তার ভেতরে দিলেন ভিজে তুলোর অস্তর। তার পর দূতকে দিয়ে সেই ঘেরাটোপ জ্যোছনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। দূতের সামনেই জ্যোছনা সেই ঘেরাটোপ জ্বলন্ত আগুনে ফেলে দিতেই আগুনের তাপে ভিজে তুলো শুকিয়ে যেতেই ঘেরাটোপটা 'দাউ-দাউ' করে জ্বলে উঠল! তা দেখে দূতকে লজ্জায় মাথা হেঁট করে চলে যেতে হলো।

ওদিকে কাঞ্চীর চঞ্চলকুমার ভেবে দেখলেন, আসল অজগরের মাথা থেকে মণি সংগ্রহ করে আনা শুধু যে ভীষণ বিপজ্জনক কাজ তা নয়, সে মণি দুষ্প্রাপ্য। এই জন্যই তিনি মণি খুঁজতে যাচ্ছেন এই মিথ্যা সংবাদ রটিয়ে, নিজের ধনরত্নের সিন্দুক থেকে গোপনে একটি খুব প্রকাণ্ড হীরা বার করে, এক জন সুদক্ষ মণিকারকে ডাকালেন, এবং তাকে দিয়ে হীরাতে অতি নিপুণ ভাবে সাত রকম রং করিয়ে নিলেন; তার পর দূতকে দিয়ে সেই হীরা জ্যোছনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। জ্যোছনা দেখলে, সেই হীরা থেকে সাত রকম রঙের আভা বেরুচ্ছে বটে, কিন্তু আসল মণি থেকে সাত বার সাত রকম রং বেরুবার কথা। তাই সে দূতকে বললে—"এটা সাপের মাথার মণি নয়। এ প্রতারণা। যে প্রতারক, তাকে আমি বিয়ে করতে পারিনে।" দূত ম্লানমুখে নত-মস্তকে প্রস্থান করল।

মায়াপুরের অমিয়কুমার ঐ রকম আজগুবি একটা পাখী আনা পণ্ডশ্রম মনে করলেন; কিন্তু রাজ্যে রটিয়ে দিলেন যে, তিনি পাখীর সন্ধানে যাচ্ছেন! তার পর এক পাখীর ওস্তাদের কাছ থেকে গোপনে খুব ভাল একটা শীষ দেওয়া টিয়া পাখী কিনে এনে দূতের হাতে সেই টিয়া পাখী জ্যোছনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। জ্যোছনা দেখলে, পাখী গানও গায় না, আর তার শীষের ঘুম পাড়াবার শক্তিও নেই। তাই সে দূতকে বললে—"এ পাখীর কথা ত আমি বলিনি, তোমাদের রাজকুমারকে বলো, তিনি আমাকে ঠকাবার চেষ্টা করেছেন, অতএব তাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হতে পারে না।" দূত মুখ চুণ করে ফিরে গেল।

পাঁচ জনেই যখন এই ভাবে প্রত্যাখ্যাত হলেন, তখন তাঁরা সকলে পরামর্শ করলেন যে, জ্যোছনাকে তার গর্ব্বের উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। দল বেঁধে সৈন্যসামন্ত নিয়ে তাঁরা কাঠুরের কুটীরের দিকে অগ্রসর হলেন।

ওদিকে জ্যোছনা—চাঁদের দেশের রাজকন্যা, কোনও একটা ভুলের জন্য তাকে মানবী হয়ে পৃথিবীতে জন্ম নিতে হয়েছিল। সেই সময় বনে পেয়ে কাঠুরে তাকে কুড়িয়ে আনে। অভিশাপ ছিল, তাকে ষোল বছর পৃথিবীতে বাস করতে হবে। যে দিন রাজপুত্রেরা সৈন্যসামন্ত নিয়ে কাঠুরের কুটীরের দিকে অগ্রসর হলো, সেই দিনই অভিশাপের ষোল বছর পূর্ণ হবে। চন্দ্রপুরী থেকে তাকে নেবার জন্য রথ এসেছে। চন্দ্রপুরীর মন্ত্রী জ্যোছনাকে ডেকে বললেন, "চল মা, এইবার তোমার ফিরে যাবার সময় হয়েছে।" মন্ত্রীর কথা শুনে জ্যোছনার যেন চমক ভাঙ্গল। পূর্ব্বস্মৃতি একটু একটু ফিরে আসতে লাগল। সেই সময় মন্ত্রী সুধাভাণ্ড নিয়ে জ্যোছনাকে সুধা পান করতে দিলেন। অমনি সে তার পূর্ব্ব-রূপ ফিরে পেল।

এদিকে পাঁচ রাজপুত্র এসে কুটীর ঘিরে ফেলেছেন। তাই দেখে কাঠুরে আর কাঠুরে-বউ ঘর থেকে বেরিয়ে এল। এসেই দেখে, বিরাট সৈন্যসমুদ্র আর অপূর্ব্ব রথের উপর বসে পরমাসুন্দরী এক কন্যা! কাঠুরে আর তার বউকে দেখেই চন্দ্রপুরীর রাজকন্যা বললে, "তোমরা আমাকে এত দিন যে স্নেহে মানুষ করেছ, তা আমি ভুলতে পারব না। মা-বাপের ঋণ কেউ শোধ দিতে পারে না। আমি বলছি, জীবনে তোমরা কখনও দুঃখ পাবে না।" এই বলে সে তাদের মাথায় সুধাবর্ষণ করলে। সঙ্গে সঙ্গে রথ আকাশে উঠতে আরম্ভ করলে। তাই দেখে পাঁচ রাজপুত্রই সৈন্যদের রথ লক্ষ্য করে তীর ছুড়তে বললে। তারা যেমন ধনুকে বাণ যোজনা করেছে, অমনি চন্দ্রপুরীর মন্ত্রী তাদের উপর হিমবর্ষণ করতে লাগলেন। সৈন্যসামন্ত সবাই হিমে জমে এক বিরাট বরফের পাহাড়ে পরিণত হলো। রথ দেখতে দেখতে শূন্যে অদৃশ্য হ'লো।

আজও সেই রজত-গিরি দেখা যায়! জোরে বাতাস বইলে সেখানে করুণ আর্ত্তনাদ শোনা যায়, রাজপুত্রদের আর সৈন্যদের মরণ-ক্রন্দন!

শ্রীযামিনীমোহন কর (এম-এ, অধ্যাপক)।

"আচার্য্য শঙ্করের জীবন ও ধর্ম্মমত"

অন্যের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। উহা না করিলেই দোষ হয়। এই আত্মরক্ষার অঙ্গ-স্বরূপে কখন কখন অন্যকে আক্রমণ করাও আবশ্যক হয়। কারণ, কেবল আত্মরক্ষাতে পরকর্তৃক আক্রমণের স্থায়িভাবে নিবৃত্তি হয় না, বা পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা দূর হয় না। বহির্জ্জগতে ইহা যেমন নিয়ম, চিন্তারাজ্যেও ইহা তদ্রূপ একটি নিয়ম। এ জন্য দার্শনিক তত্ত্ববিচারে স্বপক্ষ স্থাপন ও পরপক্ষ খণ্ডন, অন্য কথায় খণ্ডন ও মণ্ডনের রীতি প্রচলিত দেখা যায়। এইরূপ আত্মরক্ষার ফলে নিজ নিজ সিদ্ধান্ত দার্শনিকগণের অধিকতর স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হইয়া উঠে, এবং সত্যনির্ণয়ের পথও পরিষ্কৃত হয়।

অতীতের ন্যায় বর্ত্তমানেও আমাদের বৈদিক ধর্ম্ম, সমাজ ও দার্শনিক মতবাদ প্রভৃতির উপর নানা দিক্ হইতে নানারূপ আক্রমণ চলিতেছে। আর সেই আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিবশে বৈদিক সমাজও যথাসম্ভব তাহার প্রতিকার করিয়া আসিতেছে। কিন্তু কিছু দিন হইতে দেখা যাইতেছে, ভারতীয় দর্শনের উপর, বিশেষতঃ বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ এবং সহস্রাধিক বর্ষের প্রাচীন তাহার প্রধান প্রচারক শঙ্করাচার্য্যের উপর এই আক্রমণ কোন কোন দিক্ হইতে যেন আবার একটু নূতন করিয়া আরম্ভ হইয়াছে। এই নূতনত্ব এক্ষণে এক কথায় পাশ্চাত্ত্য মতবাদের প্রভাবের ফল বলিতে পারা যায়। এখন পণ্ডিতসমাজে কেবল মতবাদ খণ্ডন হইতেছে না, কিন্তু মতবাদীর নাম করিয়া তীব্র ভাষায় তাঁহার নিন্দা পর্য্যন্তও আরম্ভ করা হইয়াছে। আবার কোন কোন দিক্ হইতে বৈদিক সমাজের যেন কল্যাণার্থ বৈদিক শাস্ত্রসমূহ অতি যত্নসহকারে প্রকাশিত করিয়া, ভূমিকা, উপসংহার, মন্তব্য বা ব্যাখ্যামধ্যে এমন সব নিরপেক্ষ ও সত্যানুসন্ধিৎসুর কথা বলা হইতেছে যে, সাধারণ পাঠক তাঁহাদের অন্তরের ভাব সম্বন্ধে কোনও-রূপ সন্দেহ করিতে পারেন না। আর ইঁহাদের এই অন্তরের ভাবমধ্যে অনেকরূপ অভিসন্ধিই দৃষ্ট হয়। কোথাও বা বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বিগণের হৃদয়ে তাঁহাদের ধর্ম্মে অশ্রদ্ধা-অবিশ্বাস উৎপাদন করিয়া তাঁহাদের জাতির ধ্বংসসাধনোদ্দেশ্যে আকৃষ্ট করা হয়, কোথাও বা বৈদিক ধর্ম্মের এই ছদ্মবেশী কল্যাণকামিগণের নিজ নিজ ধর্ম্মমতে বৈদিকগণকে আকৃষ্ট করিয়া তাহাদের নিজ নিজ ধর্ম্মমতের পুষ্টিসাধন করা হয়, কোথাও বা কৌশলে তাঁহাদিগকে ক্রীতদাসে পরিণত করিবার প্রয়াস হয়। এই ছদ্মবেশধারী হিতকারিগণের কার্য্যে বৈদিকগণের, বিশেষতঃ তাঁহাদের সন্তানগণের সমূহ বিপদের সম্ভাবনা ঘটিতেছে। এখন প্রায়ই বেদ আর অভ্রান্ত, অনাদি, অপৌরুষেয় বলিয়া বিশ্বাস করা হয় না, গুরুভক্তি অন্তর্হিত হইয়াছে, দেবতা ও ধর্ম্মে বিশ্বাস চলিয়া যাইতেছে, শাস্ত্র ও ঋষিবাক্যে সন্দেহের সঞ্চার হইতেছে, ধর্ম্ম-জীবনের মূল যে শ্রদ্ধা, তাহাই আজ বিলুপ্তপ্রায়। এতদপেক্ষা বিপদ আর কি হইতে পারে? তাহার উপর আজকাল শিক্ষা-পদ্ধতিতে ধর্ম্ম-শিক্ষার বিশেষ কোন ব্যবস্থা নাই; প্রত্যুত, তদ্‌বিপরীত শিক্ষার সহায়তা করা হইতেছে। বিদ্যার্থিগণকে ভাষাবিদ্ বুদ্ধিমান্ ও জড়বিজ্ঞানবিদ্ এবং ইতিহাসজ্ঞ করিয়া জীবিকার্জ্জনের পথ প্রদর্শন করা হয় মাত্র। আর তাহার ফলে তাহারা ইহলোকভোগসর্ব্বস্ব হইয়া উঠিতেছে, ধর্ম্ম এবং নীতি উভয় বিবর্জ্জিত হইতেছে। যে সব তরুণগণ স্বভাববশে স্বধর্ম্মাচরণে অভিলাষী হয়, তাহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া যায়। ইহাই আজ আমাদের ভারতীয় দর্শনের উপর নূতন ধরণের আক্রমণ! এই জাতীয় কৌশলপূর্ণ আক্রমণ পূর্ব্বকালে প্রায় ঘটিত না।

অবশ্য ইহাতে যদিও ভারতীয় দর্শনের কোন বিশেষ স্থায়ী ক্ষতি হইতে পারে না,—কারণ, ভারতীয় দর্শন সত্যে প্রতিষ্ঠিত; সদাচার, সংযম, স্বধর্ম্মনিষ্ঠার উপর প্রতিষ্ঠিত; তথাপি প্রতিবাদের অভাবে যাঁহারা মনে করিতে পারেন,—তবে বুঝি উঁহাদের বলিবার কিছুই নাই, তবে বুঝি প্রতিবাদীর প্রদর্শিত দোষগুলি ইঁহাদেরও স্বীকার্য্য, তবে বুঝি ইঁহারা যাহা বলিতেছেন তাহাই সত্য, তাঁহাদেরই জন্য কিছু বলা আবশ্যক। তাহাদের জন্য প্রতিবাদ আবশ্যক। ইহা না করিলে অন্যায় মানিয়া লইতে হয়। আর আত্মরক্ষা করাও হয় না। এই আত্মরক্ষা করিবার অধিকার সকলেরই আছে। ভবিষ্যদ্ বংশধরদিগের কল্যাণসাধনের প্রবৃত্তি আমাদের স্বাভাবিক। এ জন্য আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিও আমাদের স্বাভাবিক, সুতরাং কর্ত্তব্যই। সত্যনির্ণয়ে সহায়তা করা আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য। এ জন্য আমাদের ভারতীয় ভাবের উপর যেখানে আক্রমণ হয়, যেখানে নিন্দা প্রচার হয়, সেখানে আমাদের সকলেরই তাহার প্রতিবাদ করা একান্ত প্রয়োজন। ইহা না করিলে কর্ত্তব্যের ত্রুটীই হইবে—আমাদের জাতীয় ধ্বংসে সহায়তা করা হইবে।

১৩৪১ কার্ত্তিক সংখ্যার 'প্রবাসী'তে ব্রাহ্ম সমাজের প্রবীণ আচার্য্য মাননীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় "আচার্য্য শঙ্করের জীবন ও ধর্ম্মমত" এই নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয় আজীবন যেরূপ দার্শনিক চিন্তা করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে অনেকেই তাঁহার এই প্রবন্ধের গুরুত্ব উপলব্ধি করিবেন। ইহাতে এ সম্বন্ধে যাঁহারা বিশেষজ্ঞ নহেন, তাঁহাদের মনে শঙ্করাচার্য্য ও অদ্বৈত-বেদান্ত সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণাও হইতে পারে। অদ্বৈত সম্প্রদায়ানুমোদিত পথে যাঁহারা সাধন-ভজন করেন, তাঁহাদেরও শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার হানি হইবার সম্ভাবনা। বেদ ও ঋষিবাক্যে বিশ্বাসী সাধারণ বৈদিকধর্ম্মসেবীরও বিশেষ ক্ষতি হইবার কথা। এই সকল কারণে তাঁহার এই প্রবন্ধের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক। বাল্যকালে সিটি স্কুলে শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের নিকট আমরা ইংরেজী শিক্ষা করিতাম, এজন্য তাঁহার উপর অধ্যাপকোচিত শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়া এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রথম—এই প্রবন্ধটিতে শঙ্করের দার্শনিক মতের অর্থাৎ অদ্বৈতবাদের খণ্ডনপ্রয়াসে ভারতীয় দার্শনিকতার নিন্দা এবং পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকতার প্রশংসা করা হইয়াছে। এজন্য এই প্রবন্ধে শঙ্করাচার্য্যের জীবনের কিছু কিছু পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে মাত্র। আর তজ্জন্য এই প্রবন্ধের নাম "অদ্বৈতমতের খণ্ডন ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের উৎকর্ষ" দিলেই হইত। তাহা হইলে প্রবন্ধের নাম হইতেই প্রবন্ধের তাৎপর্য্য বুঝিবার পক্ষে সহায়তা করা হইত। ইহাকে অদ্বৈতমতখণ্ডন-প্রচারের কৌশলবিশেষ বলা যায় না কি?

ইহাতে শঙ্করাচার্য্যের জীবনকথা অতি সংক্ষেপে আলোচনা-মুখে এক স্থলে বলা হইয়াছে—"শঙ্কর * * * প্রবল স্মৃতি-শক্তিশালী ছিলেন। * * * জর্ম্মাণ দার্শনিক ফিক্‌টে ও ইংরেজ দার্শনিক জন ষ্টুয়ার্ট মিল প্রভৃতির সুপ্রমাণিত স্মৃতিশক্তির দৃষ্টান্ত বর্ত্তমানে, শঙ্করের জীবনের ঐ সকল দৃষ্টান্ত বিশ্বাসের অযোগ্য বোধ হয় না" (১০৩ পৃঃ)। "জর্ম্মাণ দার্শনিক ফিক্‌টে বার বৎসর বয়সে তাঁর গ্রামের গির্জ্জায় প্রসিদ্ধ আচার্য্যের উপদেশ, জার্ম্মাণীর তখনকার শিক্ষা-পরিদর্শকের নিকট কিছু পরে এক সময় আচার্য্যের অঙ্গভঙ্গি উচ্চারণক্রম প্রভৃতির সহিত অবিকল পুনরুক্তি করেন। "Pleasures of Hope"এর প্রসিদ্ধ কবি ক্যাম্বেল কর্ত্তৃক সদ্যোলিখিত একটি দীর্ঘ কবিতা স্যার ওয়ালটার স্কটকে শুনাইলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা আবৃত্তি করিয়াছিলেন। এ সকল স্পষ্ট প্রামাণিক আধুনিক দৃষ্টান্তে শঙ্করের সুতীক্ষ্ণ স্মরণশক্তির বিবরণ প্রমাণিত হচ্চে।" (১০৮ পৃঃ)।

ইহা হইতে মনে হয়, আমাদের দেশীয় প্রাচীন দৃষ্টান্তের প্রামাণিকতার বুঝি অভাব ঘটিয়াছে। পাশ্চাত্ত্যের আধুনিক কথারই প্রামাণ্য আমাদের নিকট অধিক হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রবন্ধেই দেখা যায়, শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয় স্বাধীন চিন্তারই পক্ষপাতী। ইহাকে কি তাঁহার স্বাধীন চিন্তাশীলতার নিদর্শন বলা যায়? এখনও শ্রীযুক্ত সোমেশচন্দ্র বসু জীবিত। তিনি তাঁহার স্মৃতিশক্তি ও মানস-অঙ্ক কষিবার শক্তির দ্বারা পাশ্চাত্ত্য মনীষিবর্গকে মুগ্ধ করিয়া আসিয়াছেন—ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য নহে? কিছু কাল পূর্ব্বে ত্রিবেণীতে পণ্ডিতপ্রবর ৺জগন্নাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় স্নানকালে তীরোপরি দুই জন গোরার কলহ, ইংরেজী না জানিয়াও প্রায় অবিকল আবৃত্তি করিয়া রাজদ্বারে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন—ইহা কি বিশ্বাস করা যায় না? এক বার শুনিয়া আবৃত্তি করার কথা অনেকেই শুনিয়াছেন। এ সব কি সুপ্রমাণিত দৃষ্টান্তের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না? এইরূপ বহু ভারতীয় দৃষ্টান্ত উপেক্ষা করিয়া পাশ্চাত্ত্যের কথা বিশ্বাস করিলে আমাদের যেরূপ মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে তাদৃশ মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির ভারতীয় দার্শনিকতত্ত্ব আলোচনার মূল্য কতটুকু? ভারতীয় স্মৃতিশক্তির কথা হুয়েনসাঙ্গ যেরূপ বলিয়াছেন, তাহাও বিস্ময়কর! শতাবধানীর বাহুল্য মাদ্রাজে এখনও দেখা যায়। এতাদৃশ পাশ্চাত্ত্যপক্ষপাতিত্ব কি সত্যানুসন্ধানের প্রতিবন্ধক হয় না?

দ্বিতীয়—শঙ্কর-রচিত গ্রন্থনির্ণয়ের প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—"তাঁর নামে চলিত গ্রন্থ অনেক, কিন্তু পাশ্চাত্ত্য-গবেষণাকারীদের মতে বৈদান্তিক প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য ছাড়া তিনি অন্য কোনও গ্রন্থ লেখেননি।" (১০৪ পৃঃ)

ইহাতেও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতের কথায় প্রামাণ্যবোধের আতিশয্য প্রমাণিত হইতেছে। ভারতীয় মনীষিবর্গের গবেষণার কথা উল্লেখ করিয়া, অথবা নিজ অনুসন্ধানের ফল বলিয়া কোনরূপ মত প্রকাশিত করিলে আমরা নিশ্চয়ই তাহা সাদরে গ্রহণ করিতাম। আজকাল পাশ্চাত্ত্যের মোহ অনেকেরই অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। এখন এ জাতীয় কথা আর রুচিকর হয় কি? আমরা যথেষ্ট প্রমাণসাহায্যে নিশ্চয় করিয়াছি, পাশ্চাত্ত্যগণের ঐ কথা নিতান্তই ভ্রম। ইহা প্রমাণিত করিবার স্থল ইহা নহে, ইহা প্রসঙ্গান্তর।

তৃতীয়—বলা হইয়াছে—"মূল এবং প্রকৃত বেদান্ত হচ্চে আটখানা উপনিষদ্, যেগুলি বেদের অন্তর্গত—বেদের অন্তভাগ বা বেদের সিদ্ধান্ত। এই আটখানার মধ্যে পাঁচখানা ক্ষুদ্র (minor) উপনিষদ্, যা'তে বেদান্তমত সংক্ষেপে উল্লিখিত হয়েছে মাত্র, ব্যাখ্যাত হয়নি। এই পাঁচখানা হচ্চে ঈশ, কেন, কঠ, তৈত্তিরীয় ও ঐতরেয়। অবশিষ্ট তিনখানা কৌষীতকি, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক হচ্চে (major) বৃহৎ উপনিষদ্, এগুলিতে বেদান্ত-মতের তদপেক্ষা দীর্ঘ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য ও শ্বেতাশ্বতর এই চারখানা minor upanishads বেদে পাওয়া যায় না। যদিও এগুলিকে অথর্ব্ব বেদের উপনিষদ্ বলে ধরা হয়। এগুলিতে এক দিকে বৈদিক ব্রহ্মবাদ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, অপর দিকে বেদবিরুদ্ধ মূর্ত্তিপূজা শিক্ষা দেওয়া হয়নি, সুতরাং প্রকৃতপক্ষে বেদের অন্তর্ভুক্ত না হলেও এগুলিকে আর্ষ অর্থাৎ ঋষি-প্রণীত মনে করে উক্ত আটখানার সঙ্গে প্রকৃত উপনিষদ্ বলে ধরা হয়। এই বারোখানা উপনিষদই আমি প্রকাশ করেছি।" (১০৪।৫ পৃঃ)

মূল এবং প্রকৃত বেদান্ত আটখানা উপনিষদ্, এ কথা আমাদের শাস্ত্রে কোথায়? বেদ অতি প্রাচীন, তাহার কথা বলিতে গেলে প্রাচীনের কথা দ্বারাই বলিতে হইবে। কিন্তু বিনা বিচারে যাহা নিজের বোধ হয়, তাহাই বলিলে কি মান্য হইবে? এই আটখানা বেদের অন্তর্গত এ কথাও সেই কারণে তদ্রূপ অপ্রামাণিক। এই আটখানার পাঁচখানা minor বলায় সেই অন্ধভাবে আবার সেই পাশ্চাত্ত্যের অনুসরণই করা হইল। বেদমত সংক্ষেপে উক্ত হইলে, ব্যাখ্যাত না হইলে কি minor বলা সঙ্গত? অনেকেই জানেন যে, উপনিষদ্ বেদের মন্ত্র বা সংহিতাভাগের শেষে থাকে, অথবা সেই মন্ত্র বা সংহিতাভাগের প্রয়োগ এবং ব্যাখ্যা যাহাতে থাকে, সেই ব্রাহ্মণভাগের শেষে থাকে। ঈশ, শুক্লযজুর্ব্বেদ-সংহিতার ৪০তম অধ্যায়, ইহার ব্যাখ্যা বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, তন্মধ্যে এই উপনিষদ্‌খানি আবার উদ্ধৃত দেখা যায়। সংহিতা বা মন্ত্র স্বভাবতঃই ক্ষুদ্রকায় হয়। সুতরাং তাহাতে ব্যাখ্যা নাই বলিয়া তাহাকে minor উপনিষদ্ বলা অমূলক কল্পনামাত্র। "কেন" ব্রাহ্মণোপনিষৎ, "কঠ" সংহিতোপনিষৎ, "তৈত্তিরীয়" কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় বলিয়া মন্ত্র ও ব্রাহ্মণমিশ্রিত উপনিষৎ। "ঐতরেয়" ব্রাহ্মণোপনিষৎ। এই সব কথায় মনোনিবেশ না করিয়া উক্তরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা হাস্যাস্পদ উক্তি মাত্র। কৌষীতকি, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক major উপনিষদ্, কারণ, তাহাতে ব্যাখ্যা আছে ও আকারে বৃহৎ, এ কথাগুলিও পূর্ব্বোক্তরূপ হাস্যাস্পদ কথা। এ সমস্ত ব্রাহ্মণোপনিষৎ বলিয়াই বৃহদাকার। বলা হইয়াছে—"প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য ও শ্বেতাশ্বতর, এই চারখানি minor upanishad বেদে পাওয়া যায় না।" কিন্তু কেহ কি সমগ্র বেদ দেখিয়াছেন, সংগ্রহ করা ত দূরের কথা! যাঁহারা এই সব উপনিষদের প্রাচীন ব্যাখ্যাতা, তাঁহাদের কথা দ্বারা প্রমাণ দিয়া বলিলে কি ভাল হইত না? বর্ত্তমানে লভ্য প্রাচীনতম শাঙ্করভাষ্যে ত এ সব সন্ধান অনেক প্রদত্ত হইয়াছে। তাহার পর যে বারখানা উপনিষদ্ শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয় বাহির করিয়া লিখিয়াছেন, তাহাতেই আছে যে, শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ শুক্লযজুর্ব্বেদীয়, তাহাকে অথর্ব্ববেদীয় বলা যায় কিরূপে? যিনি বেদেও ভ্রম-প্রমাদ স্ববিরুদ্ধ কথা এবং মতভেদ দেখেন, ঋষিদের বাক্যে প্রমাণাভাস ভ্রম ও মতভেদ দেখেন, বেদের সন্ধান সম্যক্‌রূপে

রাখেন না, যিনি শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎকে অথর্ব্ববেদীয় বলেন, আর প্রথম হইতেই যিনি "যা খোঁজেন তাহা হেগেলের দর্শনে পান, আমাদের দর্শনে পান না" আর এই কথা যিনি বহু বার বলিয়াছেন, তাঁহার বেদ লইয়া এত মাথাব্যথার কি প্রয়োজন, তাহা ত বুঝা যায় না। পরের কথা লইয়া এত ব্যস্ততা কেন ?

বেদে মূর্ত্তিপূজা নাই—এ কথাই বা তিনি বলিলেন কেন ? তিনি ত বেদকে প্রমাণ বলেন না, অতএব এখানেই বা বেদের দোহাই কেন ? খৃষ্টান পাদরীদের কথা আমাদিগকে এখনও অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে—দেখিতেছি। যাঁহারা বেদসেবী ছিলেন, তাঁহারাই ত মূর্ত্তি-পূজক হইয়াছিলেন। বেদে না থাকিলে তাঁহারা তাহা করিলেন কেন ? এবং বেদে বিহিত বলিয়াই বা গ্রহণ করিলেন কেন ? যাহা হইতে যাহা বহির্গত হয়, তাহা তাহাতে থাকে, এই যুক্তিতেও মূর্ত্তিপূজা বৈদিক বলিতে হয়। যে বেদের আজ সহস্র ভাগের এক ভাগ পাওয়া যায়, তাহাতে না পাইয়া "বেদে মূর্ত্তিপূজা নাই" বলা কি শোভন ও সঙ্গত ? পুরাণ ও মহাভারত বেদেরই বিস্তার। বেদে বীজাকারে না থাকিলে তাহা পুরাণাদিতে থাকিতে পারে না। এই জন্ম পুরাণাদি দেখিয়া এবং শিষ্টাচার দেখিয়া বেদ অনুমান করিয়া লইবার রীতি বৈদিক সমাজে প্রচলিত। তাহার পর "প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্গুলি 'ঋষিপ্রণীত' মনে করে উক্ত আটখানির সঙ্গে প্রকৃত উপনিষদ্ বলে ধরা হয়"—ইহা কোন সমাজের কথা ? এ ত বৈদিক সমাজের কথা নহে। তবে কেন এ কথা এরূপ সাধারণ ভাবে বলা হইল ? এরূপ কথায় মনে হয়—এ কথা যেন বৈদিক সমাজও মান্য করে! কিন্তু তাহা ত নহে, এরূপ কথা আমরা এক জন প্রবীণ অধ্যাপকের নিকট হইতে আশা করিতে পারি না।

চতুর্থ—বলা হইয়াছে "যা হোক, শঙ্কর উক্ত ১২খানা উপনিষদের মধ্যে দশখানার ভাষ্য করেছেন—কৌষীতকি ও শ্বেতাশ্বতরের ভাষ্য করেননি। তাঁর অনুশিষ্য শঙ্করানন্দ স্বামী এই দুইখানার ভাষ্য করেছেন।"

শ্বেতাশ্বতরের ভাষ্য শঙ্করানন্দকৃত—এ কথা কি কোথাও প্রাচীন কালের গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায় ? আমরা জানি, এ পর্য্যন্ত এরূপ প্রাচীন কোনও লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। অতএব এটা একটা সন্দিগ্ধ কল্পনামাত্র। সেই কল্পনার হেতুই পরে বলা হইতেছে—"নামের সাদৃশ্যে ভ্রান্ত হয়ে অনেকে এই ভাষ্যদ্বয়কে আচার্য্য শঙ্করের লেখা বলে মনে করেন, যদিও এগুলির ভাষা শঙ্করের ভাষা থেকে খুব ভিন্ন। এইরূপ অন্যান্য অনেক গ্রন্থকেই শঙ্করের বলে ভ্রম করা হয়। শঙ্কর-প্রতিষ্ঠিত চারিটি মঠের অধ্যক্ষেরা সকলেই 'শঙ্করাচার্য্য' উপাধি প্রাপ্ত হন, সুতরাং তাঁহাদের লিখিত উপনিষদ্ভাষ্য বা অন্য কোনও বৈদান্তিক গ্রন্থ আদিম শঙ্করাচার্য্য দ্বারা লিখিত বলে ভ্রম হওয়া কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।" এতদুত্তরে আমরা বলি, ইহাতে কি শ্বেতাশ্বতরের ভাষ্য শঙ্করানন্দলিখিত—এরূপ বলা যায় ? যদি প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিতে উক্ত ভাষ্য কাহার রচিত—এরূপ কথা না থাকিত, অথবা অপর কাহারও রচিত বলিয়া উক্ত হইত, তাহা হইলে এইরূপ "সম্ভব" ন্যায় প্রয়োগ করিতে পারা যাইত। যাবতীয় প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিতে উহা শঙ্করাচার্য্য-কৃত ভাষ্য বলিয়া উক্ত, এস্থলে যদি কোনও একটি পুঁথিতে শঙ্করানন্দ-রচিত বলিয়া উক্ত হইত, তাহা হইলে যে সন্দেহ জন্মিত, সেই সন্দেহ দূর করিবার জন্য ওরূপ যুক্তি কার্য্যকরী হইত। কিন্তু ইহা ত সেরূপ স্থল নহে। অতএব এরূপ কল্পনা নিতান্ত অসঙ্গত।

তাহার পর শঙ্করের প্রধান মঠ শৃঙ্গেরীতে অবিচ্ছিন্ন ধারায় শিষ্যগণ বর্ত্তমান, তাঁহারা তাহা হইলে কি তাহার প্রতিবাদ করিতেন না ? শ্রীরঙ্গমে প্রকাশিত শাঙ্করগ্রন্থাবলী শৃঙ্গেরীমঠের পুঁথি দেখিয়া যে মুদ্রিত করা হইয়াছে, ইহা অনেকেই জানেন। তাহাতেও ত এ কথা নাই। অতএব একপ যুক্তিহীন কথা শোভন হয় নাই।

তাহার পর গ্রন্থের ভাষা দেখিয়া গ্রন্থকার নির্ণয় করিলে তাহা অভ্রান্ত হয় না। এক ব্যক্তি পাঁচ রকম ভাষা লিখিতে পারেন—দেখা যায়। ভাষা দেখিয়া শাঙ্করগ্রন্থের নির্ণয় করিলে সন্দিগ্ধ বিষয়ের দ্বারা অসন্দিগ্ধ বিষয়ের অন্যথা-সাধন করা হয়। এ স্থলে অসন্দিগ্ধ বিষয় প্রাচীন পুঁথিতে রচয়িতার উল্লেখ। এ জন্য সন্দিগ্ধ বিষয়রূপ ভাষা দেখিয়া এই অসন্দিগ্ধ বিষয়ের অন্যথা জ্ঞান করা কোন মতেই সঙ্গত হয় না।

যদি বলা হয়, গ্রন্থান্তর্গত বিষয়, অন্য নিঃসন্দিগ্ধ গ্রন্থের বিষয়ের সহিত বিরুদ্ধ হইলে তাহাকে শঙ্করের নয় বলিব ? সে স্থলেও চিন্তা করিবার অনেক বিষয়ই আছে। কারণ, সে স্থলে যথার্থ বিরোধ আছে কি আমাদের বুঝিবার দোষ হইতেছে, তাহাও বিবেচ্য। যেমন নির্গুণ ব্রহ্মবাদী শঙ্করের কোনও গ্রন্থে সগুণ ব্রহ্মবাদের কথা থাকিলে তাহাকে শঙ্করের নয় বলা সঙ্গত নয়। কারণ, এস্থলে বিরোধ নাই। ইহার কারণ, শঙ্করের মতে সগুণ ব্রহ্মোপাসনা চিত্তশুদ্ধির কারণ হয়। চিত্তশুদ্ধি না হইলে নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞান অসম্ভব—ইহাও শঙ্করের মত। প্রমাণদোষ, প্রমাতৃদোষ ও প্রমেয়দোষ পরিহার করিয়া নির্ণয় করিলে তবে অভ্রান্ত নির্ণয়ের সম্ভাবনা থাকে। এ সম্বন্ধে বহু কথা আছে, তাহার আলোচনার স্থল ইহা নহে। "বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির"-প্রকাশিত শঙ্করাচার্য্য গ্রন্থাবলীর ৩য় খণ্ডের ভূমিকায় এ প্রসঙ্গের আলোচনা করিয়াছি। ফলতঃ, এ বিষয়ে যে যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা আদরণীয় নহে।

তাহার পর ভাষ্য ও টীকার মধ্যে প্রভেদ লক্ষ্য করা হইল না কেন ? শঙ্করানন্দ ১০৮ উপনিষদের উপর দীপিকানাম্নী টীকাই লিখিয়াছেন, তিনি কোনও উপনিষদের ভাষ্য লেখেন নাই। 'অতএব শঙ্করানন্দ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ভাষ্য করিয়াছেন, এ কথা ভ্রম'। এরূপ অসাবধানতাপূর্ণ কথা আমরা শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের নিকট আশা করি না।

পঞ্চম—তাহার পর বলা হইয়াছে—"শঙ্করের ভাষ্যগুলিতে ব্রহ্মোপাসনাই প্রবর্ত্তিত হয়েছে, কোনও দেবতার পূজা শিক্ষা দেওয়া হয়নি। এই জন্যই তিনি রাজা রামমোহন রায়ের গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন। * * * * সুতরাং শঙ্করের নামাঙ্কিত কোনও গ্রন্থে যদি কোন সসীম দেবতা বা গঙ্গাযমুনাদি নদীর স্তব থাকে, তবে নিশ্চিতরূপেই বলা যায় যে, সে গ্রন্থ শঙ্করের লেখা নয়।" (১০৫ পৃঃ)।

এতদুত্তরে বলিব—ব্যক্তিবিশেষের সিদ্ধান্তসম্মত ব্রহ্মোপাসনা শঙ্করের ভাষ্যগুলিতে নাই। যাহা শঙ্করের গ্রন্থে আছে, তাহা বৈদিক মতেরই অথবা শঙ্করমতেরই ব্রহ্মোপাসনা। শঙ্করের ভাষ্যে "কোমল হস্ত রাতুল চরণবিশিষ্ট অসীম ব্রহ্মের" উপাসনা নাই। আর, "কোন

ভাষ্যে দেবতা-পূজার শিক্ষা দেওয়া হয়নি," ইহাও অসঙ্গত কথা। কারণ, ভাষ্যমধ্যে আদিত্যমণ্ডলবর্ত্তী হিরণ্ময় পুরুষের উপাসনার (ব্রঃ সূঃ ১।১।২০) কথা কি নাই? এরূপ স্থল আরও আছে। তিনি কি দেবতা নহেন?

তাহার পর ভাষ্য সর্ব্বদাই মূল গ্রন্থের প্রসঙ্গ অনুসারে হইবার কথা। ভাষ্যকার ত নিজের কথা ভাষ্যে বলিতে পারেন না। অতএব ইহাতে দেবতার উপাসনার কথা নাই বলিয়া "শঙ্কর দেবতা-উপাসনা বলেন নাই"—ইহা কি করিয়া বলা যায়? তাঁহার অন্য গ্রন্থে তাহা যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহা তাঁহারই উপদেশ বলিব। যদি বলা যায়, শঙ্করের নামে প্রচলিত কোনও গ্রন্থে দেবতা-উপাসনা থাকিলে সেই গ্রন্থই শঙ্করের নহে,—যেমন গঙ্গা-যমুনাদির স্তব শঙ্করের নহে বলা হইতেছে—তাহা হইলে বলিব, ভাষ্যগুলি যে শঙ্কররচিত, তাহা কে বলিল? আমি তাহাতেই সন্দেহ করিব! আর যদি ভাষ্যগুলি তাঁহার নামে প্রচলিত বলিয়া তাহা শঙ্করের হয়, তবে অন্য গ্রন্থও তাহাই হইবে না কেন? নচেৎ নিজের মত যেখানে মিলিবে, সেখানে তাহা শঙ্করের বলিব, অন্যথা বলিব না—ইহা কখনই যুক্তিযুক্ত পথ হয় না। যাহার উপর নির্ভর করিয়া একটা কিছু স্থির করা হয়, তদন্তর্গত কোন কথার দ্বারা সেই মূল যুক্তির অন্যথা করা অসঙ্গত। প্রমাণকুশল ব্যক্তির কথা ইহা হইতে পারে না। ইহা, যে শাখায় বসা যায়, সেই শাখা ছেদনের অনুরূপ কার্য্যই হয়। এরূপ যুক্তি আমরা কাহারও নিকট হইতে আশা করিতে পারি না।

তাহার পর "শঙ্করভাষ্যে কোনও দেবতা-পূজা শিক্ষা দেওয়া হয় নাই বলিয়া শঙ্কর রাজা রামমোহন রায়ের গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন"—এই কথাটিও নিতান্ত হাস্যোদ্দীপক কথা। কারণ, রাজা রামমোহন রায় তন্ত্রমতে শক্তিসাহায্যে কারণ পান করিয়া উপাসনা করিতেন, ইহার নিদর্শন পূর্ব্ববঙ্গে এখনও একটি স্মৃতিস্তম্ভ বলা যায়। বস্তুতঃ, শাঙ্করভাষ্যে দেবতা-পূজা নাই বলিয়া শঙ্কর রাজা রামমোহন রায়ের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন—এ কথা আগ্রহাতিশয্যের অসত্য কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। শঙ্করের মহত্ত্বেই তিনি তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছিলেন। অতএব শঙ্করের কতিপয় মাত্র ভাষ্য দেখিয়া শঙ্কর দেবতার উপাসনার কথা বলেন নাই, এই কথা বলা মহা ভ্রম নহে কি? ভাষ্যে দেবতাধিকরণে দেবতার বিগ্রহ এবং শালগ্রামশিলায় বিষ্ণুবুদ্ধির কথা প্রভৃতি কি দৃষ্টিগোচর হইল না? এজন্য ব্রহ্মসূত্র (১।৩।২৬) (৩।৩।১) দ্রষ্টব্য। *

[ক্রমশঃ।

চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী।

* "এতেন প্রতিমাব্রাহ্মণাদিষু বিষ্ণ্বাদিদেবপিত্রাদিবুদ্ধীনাং চ সত্য-বস্তুবিষয়ত্বসিদ্ধেঃ" বৃহদারণ্যকভাষ্য ও ১।৩।১ দ্রষ্টব্য।

কালের রীতি

অমানিশা পরে আসে পূর্ণিমা, দুঃখের শেষে সুখ,
অস্তাচলের চিত্রফলকে শুভ্র তারকা দোলে;
রাত্রি-শেষের ধূসর পথেই শোভে প্রভাতের মুখ,
নব-বসন্তে শীতের বীথিকা অবগুণ্ঠন খোলে।
শীর্ণা তটিনী ফিরে পায় তার দুকূল-ভাসানো গান,
স্বপন-সায়রে স্মৃতির কমল কহে অতীতের কথা;
মরুর জীবন সিন্ধুরে লভি জুড়ায় দগ্ধ প্রাণ,
বেঁচে ওঠে পুনঃ ঝটিকা-ক্ষুব্ধ মৃত্যু-আহত লতা।
বিশ্ব-ভুবনে নিঃস্ব যাহারা হেরিছে অন্ধকার,
একদা আলোকে লভিবে ভাগ্য-দেবীর প্রসাদী ফুল।
ভাগ্য যাদের করেছে বরণ পরায়ে রত্ন-হার;
তাদের ভাঙ্গিবে সাধের প্রাসাদ চিত্ত-নদীর কূল।
সমভাবে কভু যায় না সময়,—জগতের এই রীতি,
সীতার জীবনে হেরিনু কেবল ধরার উল্টা নীতি।

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

আশার বাণী

দূর করি দাও মিথ্যা বাঁধন, দূর করি দাও ভয়
অন্ধকারের বুক ভেদি আসে আলোক জ্যোতির্ম্ময়।
উদয়াচলের দেশে হের ঐ নবীন জ্ঞানের ভাতি।
ওরে ঘর-ছাড়া, ওরে পথ-হারা, কাটিল আঁধার রাতি
পশ্চিমে হের অস্ত-লালিমা, সন্ধ্যা ঘনায়ে আসে,
পূর্ব্বে তরুণ অরুণ উদয়, নবীন প্রভাত হাসে।
সাম-গীতি-ভরা মঞ্জু-বনানী আবার উঠিবে জাগি।
কুটীরে কুটীরে বাজিবে আরতি সায়ংসন্ধ্যা লাগি।
নীবার ধান্য মিটাইবে ক্ষুধা বল্কল দেবে বাস।
মায়ের মতন উদার করুণা বর্ষিবে নীলাকাশ।
সত্য ও ত্যাগে, ক্ষমা-সংযমে উন্মুখ হবে হিয়া।
প্রেমের যমুনা উতলা-আকুল, প্রিয় লাগি কাঁদে প্রিয়া।
পশ্চিমে আজি শশাঙ্ক-লেখা-বিহীনা আসিছে রাতি।
পূর্ব্বে উদিবে গৌরব-রবি দিগন্তে জাগে ভাতি।

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়।

বিমান-বোটে বোম্বেটে

অষ্টত্রিংশ তরঙ্গ

ফাঁদ-পাতা

ডিটেক্‌টিভ-ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ডকে মিঃ ব্লেক টেলিফোনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লেনার্ড, তুমিই কি সাড়া দিলে? বেশ!—কার্ণের কোন সন্ধান পাইলে কি?"

লেনার্ড বলিলেন, "না, তাহার সন্ধান পাই নাই; কিন্তু আমি ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়াছি, সেই ফাঁদে তাহাকে ধরিতে অধিক বিলম্ব হইবে না।"

ব্লেক বলিলেন, "তুমি আমাকে এক ঘণ্টা সময় দিতে পারিবে? তুমি অবিলম্বে বেকার ষ্ট্রীটে আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিবে?"

লেনার্ড বলিলেন, "কিন্তু আমি এখন অন্য কাজে ব্যস্ত আছি যে! এখন আমার অবসর নাই মিঃ ব্লেক!"

ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনেই আমি তোমাকে এখানে আসিতে বলিতেছি। আর ওয়াইল্ডও এখানেই আছে।"

লেনার্ড বলিলেন, "কি বলিলেন? আপনার শেষ কথাটা ঠিক শুনিতে পাই নাই।"

ব্লেক বলিলেন, "ওয়াইল্ড আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে; সে এখানেই আছে।"

লেনার্ড বলিলেন, "ওয়াইল্ড আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে? কোথা হইতে? কথাটা বিশ্বাস করা কঠিন! আপনি পরিহাস করিতেছেন না ত?"

ব্লেক বলিলেন, "পরিহাস? এ কি পরিহাসের বিষয়? ওয়াইল্ড এখনও আমার ঘরে বসিয়া আছে। সে তোমাকে এ কথা বলিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছে। সে বাঁচিয়া আছে লেনার্ড! সত্যই তাহার মৃত্যু হয় নাই।"

লেনার্ড সবিস্ময়ে বলিলেন, "কি বলিলেন? সে জীবিত আছে?"

ব্লেক বলিলেন, "সত্যই তাহার মৃত্যু হয় নাই, সে সেই মৃত-দেহটা দেখাইয়া আমাদিগকে ভুল বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিল।"

লেনার্ড বলিলেন, "বড়ই অদ্ভুত কথা! এদিকে কার্ণকে নরহন্তা মনে করিয়া তাহার গ্রেপ্তারের জন্য আমরা পরোয়ানা বাহির করিয়াছি! এ যে দারুণ গোলমেলে ব্যাপার হইয়া পড়িল ব্লেক!"

ব্লেক বলিলেন, "তুমি শীঘ্র এখানে এস, তাহা হইলে সকল কথাই তুমি শুনিতে পাইবে।"

লেনার্ড বলিলেন, "আমি আর দশ মিনিটের মধ্যেই আপনার সঙ্গে দেখা করিতেছি।"

* * * *

চীফ-ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড যথাসময় মিঃ ব্লেকের উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিলে ওয়াইল্ড তাঁহার সম্মুখে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া উৎসাহভরে বলিল, "নমস্কার ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড; আপনাকে বন্ধুভাবে পাওয়া সত্যই আনন্দের বিষয়। না, আপনার শত্রুতা আমার প্রার্থনীয় নহে।"

লেনার্ড ওয়াইল্ডের করমর্দন করিয়া বলিলেন, "আমি তোমার বন্ধু ব্যক্তি, এ কথা তোমাকে কে বলিল? আমি তোমার ঘাড়টি মুচড়াইয়া ভাঙ্গিতে পারিলেই খুসী হইতাম। তুমি কি মতলবে এই ভাবে আমাদিগকে কষ্ট দিলে, তাহা বলিবে কি? তুমি মরিয়াছ শুনিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম; কিন্তু মরিলে ত আবার বাঁচিয়া উঠিলে কেন?"

ওয়াইল্ড বলিল, "আমি ত মরিয়াই ছিলাম; কিন্তু মিঃ ব্লেক যে আমার মৃত্যু মঞ্জুর করিলেন না! উইম্বলডনের প্রান্তরে আজ আমি মৃত্যুর অভিনয় করিয়াছিলাম—কার্ণকে ফ্যাসাদে ফেলিবার জন্য। কিন্তু সে ধরা পড়িবার পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছে; আপনি শীঘ্রই তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন—এই আশায় আপনাকে সাহায্য করিতে উৎসুক হইয়াছি।"

আরও আধ-ঘণ্টা ধরিয়া অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে তাঁহাদের আলোচনা চলিল। আলোচনা শেষ হইলে ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ডের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি বলিলেন, "কার্ণ সম্বন্ধে আপনারা যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—তাহা কত দূর সঙ্গত হইয়াছে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না! আমার ধারণা, মেটল্যাণ্ড আত্মহত্যা করিয়াছে; কিন্তু তাহা সত্য কি না, নিশ্চিতরূপে বলা কঠিন।"

ব্লেক বলিলেন, "যদি সুযোগ পাই, তাহা হইলে আজ রাত্রেই আমি কার্ণকে একবার কবুল করাইতে বাধ্য করিব; ওয়াইল্ড আমাকে এই পরামর্শ দিয়াছে। আশা করি, ইহাতে সুফল পাওয়া যাইবে।"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড বিস্ময়পূর্ণ নেত্রে ওয়াইল্ডের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি চেষ্টা করিলেই ঐরূপ ঘৃণিত পেশা ত্যাগ করিয়া সাধুভাবে জীবন যাপন করিতে পার; তবে তুমি তাহা করিতে চাহ না কেন? দেখ ওয়াইল্ড, চুরি-ডাকাতি করিয়া কোন লাভ নাই, এরূপ কার্য্যে কেহই সুখী হইতে পারে না; অথচ এ সকল লোককে সকলেই ঘৃণা ও অবিশ্বাস করে। আর তুমিও ত তাহা জান—তবে জানিয়া শুনিয়া তুমি—"

ওয়াইল্ড তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই গম্ভীর ভাবে বলিল, "আপনার কথা সত্য বলিয়াই এক এক সময় আমার মনে হয়; কিন্তু আপনার উপদেশ পালন করা যে কত কঠিন, তাহা আপনি ঠিক বুঝিতে পারিবেন না। যে ব্যক্তি জীবনে আমার মত সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে—সে চেষ্টা করিয়াও তাহার স্বভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। আর সত্য কথা বলিতে কি, আমার মত দস্যু-তস্কর যদি বহু দিনের কু-অভ্যাস ত্যাগ করিয়া সৎপথে চলিতে আরম্ভ করে—তাহা হইলে পুলিশের লোক—আপনারা তাহা বিশ্বাস করেন না, আপনাদের পূর্ব্ব-ধারণার কোন পরিবর্ত্তন হয় না; ইহার ফলে—'জাত যায়, কিন্তু পেট ভরে না'—এই প্রবাদটিই খাটিয়া থাকে!"

ইন্‌স্পেক্টর লেনার্ড কিঞ্চিৎ বিব্রত ভাবে বলিলেন, "তোমার ও কথা সত্য নহে। যখন কোন অসৎ ব্যক্তি সুবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া সৎপথে চলিতে আরম্ভ করে—তখন আমরা তাহার কার্য্যে বাধা দান করি না; কিন্তু আমরা এরূপ শত শত ব্যক্তিকে জানি—যাহারা সৎপথে চলিবার ভাণ করিয়া তাহাদের মন্দ অভ্যাসেরই অনুসরণ করে; প্রকাশ্যে সাধু সাজিয়া গোপনে চুরি-ডাকাতিতে লিপ্ত থাকে। আমরা কিরূপে তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে পারি? তাহাদের

গতি-বিধি লক্ষ্য না করিলে আমাদের কর্ত্তব্য অসম্পন্ন হইয়া যায়। যাহা হউক, তোমার সহিত এখন এ সকল বিষয়ের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। হাঁসের পিঠে জল ঢালিলে যেমন সেই জল তাহার দেহ স্পর্শ করিতে পারে না, আমার কোন উপদেশ সেইরূপ তোমার কর্ণে প্রবেশ করিবে না—ইহা আমার অজ্ঞাত নহে।"

ওয়াইল্ড বলিল, "আপনার এ কথা কত দূর সত্য, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে, ইন্‌স্পেক্টর!

উনচত্বারিংশ তরঙ্গ

সাইমন কার্ণের অনুসন্ধান

সাইমন কার্ণ সহসা সচকিত ভাবে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল; তাহার দৃষ্টিতে আতঙ্ক পরিস্ফুট!

কার্ণ অস্ফুট স্বরে বলিল, "ওটা কি? ইঁদুর হুটপাট্ করিয়া বেড়াইতেছে না কি? কি নোংরা যায়গা! এখানে আসিয়া আমি বড়ই বোকামি করিয়াছি! শেষে কি আমি ক্ষেপিয়া যাইব? আমার মনে হইতেছে, কেহ এখানে দীর্ঘকাল থাকিলে ক্ষেপিয়া যায়!"

কার্ণ তখন সার রডনে ডুমুণ্ডের আরণ্য-ভবনের অন্তর্ব্বর্ত্তী লাইব্রেরীতে বসিয়া ছিল। সে সেই অট্টালিকার সকল অংশই অধিকার করিয়াছিল। তখন রাত্রিকাল। বাহিরে নৈশ সমীরণ প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছিল।

কার্ণের দেহটি প্রকাণ্ড; মুখখানা হাঁড়ির মত গোল, এবং চক্ষু-তারকা নীলাভ। তাহার চক্ষুতে ধূর্ত্ততা ও কপটতা সুপরিস্ফুট।

কার্ণ সার রডনের ব্যবহৃত চেয়ারে বসিয়া ছিল। সেই কক্ষের ডেস্কের উপর একটি তেলের আলো জ্বলিতেছিল, উহা ব্যতীত সেই কক্ষে অন্য কোন আলো ছিল না। গৃহের প্রত্যেক কোণে অন্ধকার পুঞ্জীভূত! সমগ্র স্থানটি বিভীষিকাপূর্ণ, যেন তাহা আতঙ্ক ও নানা প্রকার ষড়যন্ত্রের লীলাস্থল! দিবাভাগে সেই স্থানে বাস করা কষ্টকর না হইলেও রাত্রিকালে কার্ণের ন্যায় সন্দিগ্ধচেতা, অসংযত-চরিত্র ব্যক্তির পক্ষে সেই স্থান বাসের আদৌ উপযোগী নহে।

রবার্ট ব্লেক পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলেন, কার্ণ অন্য কোন স্থানে পলায়ন না করিয়া সার রডনে কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত তাঁহার আরণ্য নিবাসেই আশ্রয় লইয়াছে। তাঁহার এই অনুমান সত্য। কার্ণ পুলিশের কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া নিরাপদ হইয়াছে ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল।

বস্তুতঃ, কার্ণকে কেহই সেই আরণ্য ভবনে আসিতে দেখে নাই, এবং সে সেই স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, এ সন্দেহ অন্য কাহারও মনে স্থান পায় নাই। কার্ণ সার রডনের ভাণ্ডার-ঘর পরীক্ষা করিয়া আশ্বস্ত হইয়াছিল; কারণ, সেই কক্ষে যে সকল খাদ্যসামগ্রী সঞ্চিত ছিল, তাহা আহার করিয়া এক মাসেরও অধিক কাল চালাইবার সম্ভাবনা ছিল। সেই আরণ্য-ভবন যে উচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল, সেই দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া কেহ তাহার সন্ধানে আসিবে, এরূপ আশঙ্কাও তাহার মনে স্থান পায় নাই।

কিন্তু এই স্থানে আশ্রয় গ্রহণের পর তাহার পূর্ব্ব-ধারণা পরিবর্ত্তিত হইল। চারি দিকের অবস্থা দেখিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল—সে স্বেচ্ছায় নির্জ্জন কারাগারে প্রবেশ করিয়াছে।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন মধ্যরাত্রি অতীত হইলেও কার্ণ শয়ন করিতে যায় নাই। সে সেই চেয়ারে বসিয়াই কিছু কাল ঘুমাইয়া শুইয়াছিল। অন্ধকারাচ্ছন্ন পুরাতন হলঘরের ভিতর দিয়া দোতলায় উঠিতে তাহার সাহস হয় নাই। বাহিরে নৈশ সমীরণের শব্দ ভূতের আলাপ বলিয়াই তাহার ধারণা হইয়াছিল! যেন তাহারা দ্বিতলের বারান্দায় অন্ধকারে দাপাদাপি করিতেছিল। সেই নিবিড় অরণ্যে জনমানবের সাড়া-শব্দ ছিল না। বস্তুতঃ, কার্ণ বলবান্ ব্যক্তি, এবং তাহার সাহসের অভাব না থাকিলেও এই স্থানে আসিয়া তাহাকে অভিভূত হইতে হইয়াছিল। স্থান-কালের প্রভাব সে অতিক্রম করিতে পারে নাই। সে সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। সহস্র প্রকার আতঙ্কে তাহার হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়াছিল; অথচ তাহার আতঙ্কের প্রকৃতই কোন কারণ ছিল না! উহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। একটা সামান্য কোন শব্দ হইলেই তাহার বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

কার্ণের ইচ্ছা হইল, সেই কক্ষ আরও কয়েকটি দীপের আলোকে উদ্ভাসিত করে; কিন্তু অন্য আলোক জ্বালিবার উপায় ছিল না। এই স্থানে আসিয়া সে অত্যন্ত অবিবেচনার কার্য্য করিয়াছে ভাবিয়া অনুতপ্ত হইল; কিন্তু স্থানটি তাহার পক্ষে অত্যন্ত নিরাপদ, ইহা বুঝিতে পারিয়া তাহাকে অগত্যা আত্মসংযম করিতে হইল। সে আপনাকে অন্যের আয়ত্তাতীত প্রাচীন দুর্গের অধিকারী মনে করিয়া ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া রহিল।

কিন্তু কার্ণ যে মিথ্যা আশায় প্রলুব্ধ হইয়াছিল, ইহা সে তখনও বুঝিতে পারিল না। উইম্বলডনের প্রান্তরে যে এক ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছিল, এই সংবাদ তাহার অজ্ঞাত ছিল। তাহার লাইব্রেরীর জিনিস-পত্র যে বিশৃঙ্খল ভাবে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহাও সে জানিতে পারে নাই। এতদ্ভিন্ন, হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে তাহার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি হইয়াছিল, ইহাও সে কল্পনা করিতে পারে নাই।

সেই দিন প্রভাতে তাহার গৃহে অপরিচিত লোক-জনের সমাগমের কথা জানিতে পারায়, এবং তাহার গৃহরক্ষিকার ক্রন্দনধ্বনি তাহার কর্ণগোচর হওয়ায় তাহার মন আকস্মিক আতঙ্কে অভিভূত হইয়াছিল, আর এই জন্যই সে গোপনে গৃহত্যাগ করিয়াছিল। তাহার অপরাধী বিবেক তাহাকে নিঃশঙ্ক থাকিতে দেয় নাই; বিশেষতঃ, ওয়াইল্ড তাহাকে টেলিফোনে যে সকল কথা বলিয়াছিল, তাহাও তাহার মনের উপর যথেষ্ট প্রভাব-বিস্তার করিয়াছিল।

অল্প দিন পূর্ব্বে সে পেট্রলের ব্যবসায়ের কতকগুলি 'সেয়ার' সম্বন্ধে প্রতারণা করিয়া কিছু অর্থলাভ করিয়াছিল; এই জন্য তাহার ধারণা হইয়াছিল, পুলিশ তাহার সেই প্রতারণা সম্বন্ধে অভিযোগ পাইয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু সেই ভয় তেমন প্রবল বলিয়া তাহার মনে হয় নাই। সে জানিত, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের শত্রুতাই বিশেষ বিপজ্জনক; কিন্তু তৈলের ব্যবসায়ে সে যে প্রতারণা করিয়াছিল, তাহা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের তদন্তের বিষয় নহে, এ বিষয়ে তাহার কোন সন্দেহ ছিল না।

কার্ণ যদি জানিতে পারিত—কিরূপ অভিযোগে তাহার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইয়াছিল, তাহা হইলে তাহার মন অধিকতর আতঙ্কে পূর্ণ হইত; তাহার দুশ্চিন্তারও সীমা থাকিত না। বস্তুতঃ, লঘু অপরাধে দণ্ডের ভয়ে সে কাতর না হইলেও তাহার

স্নায়বিক অবসাদই তাহার আতঙ্কের প্রধান কারণ। কার্ণ মন স্থির করিবার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। রোর্কি ও মেটল্যাণ্ডের কথাই সে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে লাগিল। তাহাদের অপমৃত্যুর জন্মই তাহার মন দুশ্চিন্তায় অভিভূত হইয়াছিল।

প্রকৃত পক্ষে, কার্ণের হস্তেই মেটল্যাণ্ডের মৃত্যু হইয়াছিল। হুবার্ট রোর্কির এরূপ বুদ্ধি-বিবেচনা ছিল না, যাহা দ্বারা সে কার্ণকে সাহায্য করিতে পারিত; আতঙ্কেই তাহার প্রাণবিয়োগ হইয়াছিল, সুতরাং তৎসম্বন্ধে আলোচনা নিষ্ফল।

কার্ণ তদন্তের রিপোর্ট পাঠ করিয়া অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব করিয়াছিল। পর পর যে সকল অনর্থপাত হইয়াছিল, তাহা অত্যন্ত অস্বাভাবিক বলিয়াই তাহার ধারণা হইয়াছিল। প্রথমতঃ, মেটল্যাণ্ডকে গ্রেপ্তার করা হয়; পরে তাহার কণ্ঠরোধের জন্য সে কার্ণ কর্তৃক নিহত হইয়াছিল। তাহার পর রোর্কিও পরলোকে তাহার অনুসরণ করে। কার্ণ ভাবিল, এবার কি তাহার পালা?

টেলিফোনে কার্ণকে যে কথা বলা হইয়াছিল, তাহা তাহার স্মরণ ছিল। সেই ব্যক্তি সার রডনে ড্রামণ্ডের এজেন্ট, এবং সে কার্ণের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। যে ভাবে সে কার্ণের সহযোগিদ্বয়কে চূর্ণ করিয়াছিল, সেই ভাবে সে কার্ণকেও চূর্ণ করিতে কৃতসঙ্কল্প। কার্ণ বুঝিতে পারিল, তাহারও পাপের প্রায়শ্চিত্তের আর অধিক বিলম্ব নাই; তথাপি মেটল্যাণ্ডের চিন্তাতেই তাহার হৃদয় ব্যাকুল হইল।

সে একটা স্থূল মাংসস্তূপের মত চেয়ারে বসিয়া রহিল। তাহার মানসিক অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়। সে তাহার অতীত অপরাধের কথা চিন্তা করিতে লাগিল। অস্কার মেটল্যাণ্ডকে গ্রেপ্তার করিবার পর জামিনে মুক্তিদান করা হইয়াছিল। কার্ণের আশঙ্কা হইয়াছিল, তাহার এই সহযোগীকে রাজার সাক্ষিরূপে বিচারালয়ে উপস্থিত করা হইবে। এইরূপ অনুমান করিয়াই মেটল্যাণ্ডের মুখ হইতে সত্য কথা প্রকাশের ভয়ে কার্ণ বিষ-প্রয়োগে তাহাকে হত্যা করিয়াছিল।

সকলেরই ধারণা হইয়াছিল, মেটল্যাণ্ড আত্মহত্যা করিয়াছিল; কিন্তু প্রকৃত কথা কার্ণের অজ্ঞাত ছিল না।

এখন সে সেই পুরাতন নিভৃত আরণ্য-ভবনের একটি কক্ষে বসিয়া এই সকল কথা চিন্তা করিতে করিতে দারুণ আতঙ্কে অভিভূত হইয়াছিল, এবং তাহার সকল চিন্তাই মেটল্যাণ্ডের উপর পুঞ্জীভূত হইয়াছিল। সেই সময় যদি সে কোন হোটেলে থাকিত, কিম্বা লণ্ডনের কোন নির্জ্জন বাড়ীতে বাস করিত, তাহা হইলে তাহার চিন্তাস্রোত ভিন্ন পথে প্রধাবিত হইত; কিন্তু এই পরিত্যক্ত ভবনে একাকী বাস করায় নানা দুশ্চিন্তায় সে প্রায় ক্ষেপিয়া উঠিল।

তাহার মনে হইল, তাহার মস্তকের উপর মৃত্যুর কৃষ্ণবর্ণ ছায়া প্রসারিত হইয়াছে; কিন্তু কি ভাবে তাহার জীবনের অবসান হইবে, তাহা নিশ্চিতরূপে বুঝিবার উপায় ছিল না। এই ভাবে লুকাইয়া থাকিয়া কোন লাভ আছে কি না, ইহাও সে বুঝিতে পারিল না। পুলিশ সত্যই তাহার অনুসন্ধান করিতেছিল কি না, তাহাও সে ঠিক জানিতে পারে নাই। তাহার মনে হইল, তাহার এই আশঙ্কা হয় ত অমূলক। আতঙ্কে তাহার স্বাভাবিক বুদ্ধি-বিবেচনা বিলুপ্ত হইয়াছিল।

অবশেষে কার্ণ মনে মনে বলিল, "এই অভিশপ্ত স্থান হইতে কালই আমি সরিয়া পড়িব। হাঁ, রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র আমি এই নির্জ্জন আরণ্য-ভবন ত্যাগ করিব। পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করিবে কি না, তাহা আমার চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। আমার মনে হয়, কারাকক্ষে বাস করা এই দুর্ভোগ সহ্য করা অপেক্ষা অধিক কষ্টকর নহে,—কিন্তু ও কি! কিসের শব্দ?"

কার্ণ চেয়ার হইতে লাফাইয়া-উঠিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল। তাহার মনে হইল, কোন স্থান হইতে শীতল নৈশ বায়ুর একটা প্রবাহ আসিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট করিল। তেলের যে দীপ জ্বলিতেছিল, তাহা হঠাৎ এ ভাবে কাঁপিয়া উঠিল যে, তাহার আশঙ্কা হইল, মুহূর্ত্তমধ্যে তাহা নির্ব্বাপিত হইবে।

কার্ণ সেখানে দাঁড়াইয়া চারি দিকে চাহিতে লাগিল; আতঙ্কে সে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল। যে আরণ্য-ভবনকে সে নিরাপদ আশ্রয় মনে করিয়াছিল, এখন সেই স্থান ত্যাগ করিবার জন্য তাহার ব্যাকুলতার সীমা রহিল না; কিন্তু সেই স্থান হইতে পলায়ন করিতে তাহার সাহস হইল না। রাত্রিকালে সমুচ্চ প্রাচীর-পরিবেষ্টিত অরণ্য অতিক্রম করিতে হইবে ভাবিয়া ভয়ে তাহার বুক কাঁপিতে লাগিল; এই জন্য অবশিষ্ট রাত্রিটুকু সেই স্থানে অতিবাহিত করাই সে সঙ্গত মনে করিল। ইহা ভিন্ন সে অন্য কোন উপায় স্থির করিতে পারিল না।

সে আবার সেই চেয়ারে বসিয়া-পড়িয়া মন স্থির করিবার জন্য একটা চুরুট ধরাইয়া-লইয়া ধূমপান করিতে লাগিল। কিন্তু কয়েক মিনিট পরে সে বিরক্তিভরে অর্দ্ধদগ্ধ চুরুটটা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "না, ধূমপানে আমার স্পৃহা নাই। এখন কি করি? এখন কিছুকাল ঘুমাইতে না পারিলে আমি ক্ষেপিয়া যাইব!"

তাহার সহযোগিদ্বয়ের ন্যায় তাহাকেও নিহত হইতে হইবে, এই ভয়ে তাহার মন পুনর্ব্বার চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, এক সপ্তাহ পূর্ব্বেও তাহারা কত সুখী ছিল, তাহাদের দিনগুলি শান্তিতে ও আনন্দে কাটিতেছিল; কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই তাহার বন্ধুদ্বয় ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের দেহ সমাধি-ক্ষেত্রে চির-বিরাম লাভ করিতেছে। তাহারা যেন তাহাদের অনুসরণ করিবার জন্য তাহাকে ইঙ্গিতে আহ্বান করিতেছে!

তাহার এই দুরবস্থার জন্য সে সার রডনে ড্রামণ্ডকেই দায়ী করিল, এবং শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার সঙ্কল্প করিল। তাহার মনে হইল, সে কি বিষপ্রয়োগে তাঁহাকেও হত্যা করিতে পারিবে না?

বিষপ্রয়োগে তাঁহাকে হত্যা করিবার কথা মনে হইতেই তাহার বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল। সে জানিত, এই ভাবে যে নরহত্যা করে, হত্যাকারিগণের মধ্যে সে সর্ব্বাপেক্ষা হীন-প্রকৃতির নরহন্তা; কিন্তু বিষপ্রয়োগে বিশ্বস্ত সহযোগীকে হত্যা করিয়াও তাহার মনে অনুতাপের সঞ্চার হয় নাই। যে উপায়েই হউক, আত্মরক্ষা করাই সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া তাহার মনে হইয়াছিল; কিন্তু আত্মরক্ষা করাও কি অতঃপর তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে?

কার্ণের মাথা ঘুরিতে লাগিল, তাহার গলা শুকাইয়া গেল, আতঙ্কে তাহার চক্ষু বিস্ফারিত হইল। সে স্থিরদৃষ্টিতে দীপের দিকে চাহিয়া রহিল। দীপালোক সহসা কম্পিত হইল; উহা কি বাতাসে নিবিয়া যাইবে?—এই কথা চিন্তা করিতেই তাহার মনে হইল, কেহ যেন তাহাকে গম্ভীর স্বরে ডাকিল, "কার্ণ!"

এই আহ্বান-ধ্বনিতে বিচলিত হইয়া কার্ণ চেয়ারে সোজা হইয়া বসিল, কিন্তু চারি দিকে চাহিয়া সে কাহাকেও দেখিতে পাইল না। তাহার মনে হইল, বাহিরের নিবিড় অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া এ ধ্বনি তাহার কর্ণগোচর হইয়াছে! সে বিহ্বল দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিতে লাগিল।

সে বুঝিতে পারিল—সে ভিন্ন সেই স্থানে অন্য কোন লোক ছিল না; এমন কি, সেই অরণ্যের বাহিরেও কয়েক মাইলের মধ্যে কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব ছিল না বলিয়াই তাহার ধারণা হইল।

পুনর্ব্বার কে যেন মৃদু স্বরে তাহাকে ডাকিল, "সাইমন কার্ণ!"

এবার কার্ণ ভয়-বিজড়িত স্বরে ব্যাকুল ভাবে বলিয়া উঠিল, "কে আমাকে ডাকিলে? কে কোথায় আছ? কাহার আহ্বান-ধ্বনি শুনিতে পাইলাম? কে তুমি?"

অস্ফুট স্বরে প্রশ্ন হইল, "তুমি কি আমার কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিলে না? এত অল্প দিনেই তুমি অস্কার মেটল্যাণ্ডের কণ্ঠস্বর ভুলিয়া গিয়াছ? ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য?"

এ কথা শুনিয়া কার্ণের কণ্ঠ হইতে অস্ফুট আর্ত্তনাদের মত ধ্বনি নিঃসারিত হইল; সে মাতালের মত টলিতে টলিতে একখানা চেয়ারে ঢলিয়া পড়িল, কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যেই আবার উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং আতঙ্ক-বিস্ফারিত নেত্রে গৃহ-কোণের পুঞ্জীভূত অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিল।

কিন্তু সে আর কাহারও কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল না, চতুর্দ্দিকে গভীর স্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল; বাহিরের উদ্দাম বায়ুপ্রবাহ এক এক বার তাহার শ্রবণ-বিবরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে ব্যাকুল করিতেছিল।

কার্ণ সেই নিবিড় অন্ধকারের দিকে চাহিয়া ভগ্ন স্বরে বলিল, "আমি কি নির্ব্বোধ! আমি কি পাগল হইলাম? আমি বুঝিতে পারিয়াছি, এখানে জন-প্রাণীরও অস্তিত্ব নাই; আমার কল্পনাই আমাকে প্রতারিত করিয়াছে! আমার এরূপ বিহ্বল হইলে চলিবে না, মন সংযত করিতে হইবে। মেটল্যাণ্ডের মৃত্যু হইয়াছে, তাহার কণ্ঠস্বর এখানে শুনিতে পাওয়া কি সম্ভব? হাঁ, আমার সৌভাগ্যক্রমেই সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। তাহার মৃত্যু হইয়াছে—এ জন্য আমি আনন্দিত। তাহাকে আমি সর্ব্বদাই ভয় করিতাম; আমার জীবনে বিন্দুমাত্র শান্তি ছিল না। যে আমার সকল কষ্ট, সকল বিপদের মূল ছিল,—সে মরিয়াছে; আমি তাহাকে হত্যা করিয়া নিষ্কণ্টক হইয়াছি।

কার্ণ ব্যাকুল হৃদয়ে এইরূপ আলোচনা করিতেছিল—সেই সময় সহসা অন্ধকারের ভিতর হইতে সে শুনিতে পাইল, "ওরে নরহন্তা! তোর মনে কি অনুতাপ হয় নাই? তুই যাহাকে হত্যা করিয়াছিস্—তাহার জন্য তোর মনে কি বিন্দুমাত্র করুণার উদ্রেক হয় নাই? তুই কি মনে করিয়াছিস্—আমার প্রেতাত্মাও বিনষ্ট হইয়াছে? না সাইমন কার্ণ, আমি ফিরিয়া আসিয়াছি। হাঁ, আমি তোকে প্রতিফল দিতে ফিরিয়া আসিয়াছি। তুই কি আমার কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিস্ নাই?"

এই সকল কথা শুনিয়া কার্ণ বিহ্বল ভাবে পুনর্ব্বার চেয়ারে বসিয়া পড়িল। তাহার মুখের ভাব অতি ভীষণ হইল। তাহার ধারণা হইল—উহা মেটল্যাণ্ডেরই কণ্ঠস্বর বটে! অস্ফুট নহে, ইহা তাহার সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বর। নৈশ বায়ুপ্রবাহে সেই স্বর ভাসিয়া আসিয়াছিল। মেটল্যাণ্ডের কণ্ঠস্বর তাহার সুপরিচিত, এ বিষয়ে তাহার ভ্রমের সম্ভাবনা ছিল না। কার্ণ চেয়ারে বসিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। তাহার মুখ চা-খড়ির মত শাদা হইয়া গেল। তাহার কম্পিত হস্ত স্থির হইল না।

এবার সে উত্তেজিত স্বরে বলিল, "না না, এ সবই মিথ্যা, আমার কল্পনার বিকার! ইহা মায়ার ছলনা মাত্র! দুশ্চিন্তায় আমি অভিভূত হইয়াছি, ইহা তাহারই প্রমাণ। এখন আমার সুনিদ্রার প্রয়োজন; আলোক, উত্তাপ ও সঙ্গী পাইলেই আমার সকল আতঙ্ক—সকল দুশ্চিন্তা দূর হইবে। এই স্থানে আসিয়া আমার সকল সাহস, মনের বল অন্তর্হিত হইয়াছে। আমি হীন কাপুরুষে পরিণত হইয়াছি! আমি ইহা সহ্য করিতে পারিতেছি না; আমি এখানে আর এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারিব না।"

সহসা কার্ণের সর্ব্বাঙ্গ স্থির হইল। তাহার ধারণা হইল—কল্পনাই তাহাকে প্রতারিত করিয়াছে, এ সকল কথা সত্য নহে। ইহা তাহার উন্মত্ত মস্তিষ্কের ছলনা মাত্র।

কার্ণ ভাবিল, তাহার চক্ষুও কি তাহাকে প্রতারিত করিয়াছে? তাহার মনে হইল, সেই কক্ষের অন্ধকারাচ্ছন্ন কোণে কি নড়িয়া বেড়াইতেছে! ইহা সে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছে বলিয়াই তাহার প্রতীতি হইল!

সেই দিকে যে বাতায়ন ছিল, তাহা পরীক্ষা করিতে কার্ণের সাহস হইল না; যেন তাহা রহস্যজালে সমাচ্ছন্ন! সেখানে যে কাবোর্ড ছিল, কার্ণ তাহার নিকটেও যাইতে পারিল না; অথচ সেই স্থানেই কাহারও মূর্ত্তি ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল!

কিন্তু তাহার আকার কিরূপ, তাহা সে স্থির করিতে পারিল না; এবং তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট আকার ছিল বলিয়াও তাহার মনে হইল না। কার্ণ যেন ভূতের মত কাহারও ছায়াময় দেহ দেখিতে পাইল! কিন্তু অবশেষে ক্রমশঃ তাহা আকারবিশিষ্ট স্থূল দেহ ধারণ করিল,—তাহা মনুষ্যদেহ!

কার্ণ সেই দিকে চাহিয়া নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার দেহের একটি শিরাও স্পন্দিত হইল না। তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন অসাড়! তাহার শ্বাস-প্রশ্বাসেরও শক্তি রহিল না। সে জীবনে কখন ভূত-প্রেতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে নাই, এবং প্রেততত্ত্বকে (Spiritualism) সে অমূলক ও প্রতারণাময় বলিয়াই মনে করিত। ভূত-প্রেতের অস্তিত্বের কথা চিরদিনই সে অবিশ্বাসভরে হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছে!

কিন্তু সেই অন্ধকারের মধ্যে সে যে-মূর্ত্তি দেখিতে পাইল—সেই দিকে চাহিয়া সে ভূতের ভয়ে আতঙ্কাভিভূতা বালিকার ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। তাহার মনে বিন্দুমাত্র সাহস সঞ্চার হইল না। উহা যে ভৌতিক ব্যাপার নহে—এ ধারণাও আর তাহার মনে স্থান পাইল না।

অবশেষে সেই মূর্ত্তি কথা কহিল; কণ্ঠস্বর মৃদু হইলেও সুস্পষ্ট এবং সুতীক্ষ্ণ। কার্ণ শুনিতে পাইল, "সাইমন কার্ণ! আমি এখানে আসিয়াছি। তুমিই আমাকে হত্যা করিয়াছিলে, এ জন্য আমি তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে চাহি। তুমি যে-সকল ঘৃণিত অপরাধ করিয়াছ, ইহলোকে তোমার সেই সকল অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত

নাই ; কিন্তু তুমি বিনাদণ্ডে অব্যাহতি লাভ করিবে, এরূপ আশা করিও না।"

কার্ণ বুঝিতে পারিল—উহা সেই মূর্ত্তিরই কণ্ঠস্বর। কার্ণ এবার আতঙ্ক-বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া সম্মুখে যে মূর্ত্তি দেখিতে পাইল—তাহা অসুকার মেটল্যাণ্ডেরই সজীব মূর্ত্তি! কিন্তু তখনও তাহা অস্ফুট ছায়ার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল ; তথাপি সেই মূর্ত্তি ও কণ্ঠস্বর যে মেটল্যাণ্ডের, এ বিষয়ে কার্ণের কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। তাহার মনে হইল, তবে কি অসুকার মেটল্যাণ্ডের প্রেতাত্মা দেহ ধারণ করিয়া তাহার অপরাধের প্রতিফল দিতে আসিয়াছে ?

কার্ণ আর স্থির থাকিতে পারিল না, ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। তাহার সেই আর্ত্তনাদে যে ভীষণ আতঙ্ক পরিস্ফুট, তাহা যেন অপরাধী আত্মার মর্ম্মভেদী বেদনার অভিব্যক্তি! কিন্তু কার্ণ এবার কথা বলিবার শক্তি লাভ করিল ; সঙ্গে সঙ্গে সে চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং মাতালের মত টলিতে টলিতে কম্পিত পদে অগ্রসর হইয়া মূর্ত্তির সম্মুখে উপস্থিত হইতেই সেই মূর্ত্তি জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি বলিবার আছে কার্ণ। তুমি আমার পান-পাত্রে বিষ প্রদান করিয়াছিলে—এ কথা কি তুমি অস্বীকার কর? হাঁ, তুমি হৃদয়হীন ইতর নরহন্তা ; তুমি কি তোমার অনুষ্ঠিত অপরাধ অস্বীকার করিতে এখনও সাহস করিতেছ ?"

কার্ণ হাঁপাইতে হাঁপাইতে বিকৃত স্বরে বলিল, "হাঁ, উহা মিথ্যা কথা ; আমি তোমাকে হত্যা করি নাই। রোকিই তোমাকে হত্যা করিয়াছিল। রোকিই তোমার পানপাত্রে বিষ দিয়াছিল।"

মূর্ত্তি গর্জ্জন করিয়া বলিল, "মিথ্যাবাদী! তুমি মিথ্যা কথা বলিতেছ।"

কার্ণ পুনর্ব্বার বিচলিত স্বরে বলিল, "না, আমি মিথ্যা কথা বলি নাই। রোকিই তোমার গ্লাসে বিষ দিয়াছিল। আমি তাহাকে থামাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু সে আমার কথা গ্রাহ্য করে নাই। তুমি কেন আমার সম্মুখে আসিয়াছ? তুমি শীঘ্র এই স্থান হইতে চলিয়া যাও ; আমার কাছে আসিও না। আমি সত্য কথাই বলিয়াছি ; রোকিই তোমাকে বিষ পান করাইয়াছিল।"

এবার কার্ণ কাঁপিতে কাঁপিতে সেই স্থান হইতে সরিয়া যাইবার চেষ্টা করিল ; তাহা দেখিয়া সেই মূর্ত্তি দৃঢ়পদে ধীরে ধীরে তাহার দিকে অগ্রসর হইল—যেন কার্ণকে প্রতিফল দানের জন্য সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

কার্ণ ভয় পাইয়া মূর্চ্ছিত হইবে—সেরূপ ভীরুপ্রকৃতির লোক ছিল না। সে নবপশু, তাহার দেহের পেশীসমূহ সুদৃঢ় ছিল, এবং তাহার প্রকৃতিও অত্যন্ত কঠোর ছিল। সে ভয় পাইয়াছিল সত্য, কিন্তু ভয়ে সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয় নাই।

কার্ণ পুনর্ব্বার কম্পিত স্বরে বলিল, "হাঁ, রোকিই তোমার পান-পাত্রে বিষ দিয়াছিল ; তুমি ভুল করিয়া আমার নিকট আসিয়াছ! তুমি ফিরিয়া যাও মেটল্যাণ্ড! তুমি তোমার সমাধিগহ্বরে পুনঃপ্রবেশ করিয়া বিশ্রাম কর।"

মূর্ত্তি বলিল, "আমরা শীঘ্রই ইহার মীমাংসা করিব। তুমি বলিতেছ, রোকিই বিষ দিয়া আমাকে হত্যা করিয়াছিল। তুমি তাহার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করিতেছ—তাহা সত্য কি না, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য আমি তাহাকে এখানে আহ্বান করিতেছি :—হুবার্ট-রোকি। তুমি আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াও।"

কার্ণের এবার মনে হইল, সে সত্যই ক্ষেপিয়া যাইবে। কারণ, মুহূর্ত্ত পরেই সেই অন্ধকারের ভিতর হইতে আর একটি মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল—যেন রোকির প্রেতাত্মা আত্মসমর্থনের জন্য দেহ ধারণ করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল!

সেই মূর্ত্তি জিজ্ঞাসা করিল, "মেটল্যাণ্ড, তুমি আমাকে ডাকিয়াছ?"

সাইমন কার্ণ হতাশ ভাবে বলিল, "রোকি, রোকি! তুমিও এখানে আসিয়াছ?"

কার্ণ বিহ্বল দৃষ্টিতে সেই মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিল। ফাঁদে আবদ্ধ নিরুপায় বন্য-জন্তুর ন্যায় তাহার অবস্থা। সে স্পষ্টই বুঝিতে পারিল, তাহার দুষ্কর্ম্মের সহযোগী হুবার্ট-রোকি মনুষ্যদেহে তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান।

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

বিদ্যাসুন্দর

সৌরভে যেমন পুষ্পের পরিচয়, গ্রন্থে তেমনি গ্রন্থকারের পরিচয়। যুঁই, চামেলী, রজনীগন্ধা, মল্লিকা প্রত্যেকেরই সুগন্ধ আছে, কিন্তু উহাদের প্রত্যেকেরই গন্ধের এমন বৈশিষ্ট্য আছে যে, যুঁইএর গন্ধ চামেলীর গন্ধের মত নয় ; আবার রজনীগন্ধার গন্ধও মল্লিকার গন্ধের অনুরূপ নহে। প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারগণের গ্রন্থ-সমূহেরও সেইরূপ বৈশিষ্ট্য আছে। সেক্সপীয়র, মিল্টন, সেলী বায়রণ, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, টেনিসন প্রভৃতি কবিগণেরও প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য আছে ; সেইরূপ বঙ্গ-সাহিত্যেও চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি লেখকগণের প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য আছে। আবার অনেক সময়ে দেখা যায়—খ্যাতনামা গ্রন্থকার ও তাঁহার প্রসিদ্ধ পুস্তক এই উভয়েরই নাম অভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হয়। যদি বলা যায়—'বাল্মীকিতে মহাভারতের উপাখ্যান-ভাগ বিবৃত না থাকিলেও ব্যাসে রামায়ণের গল্প সংক্ষেপে বর্ণিত আছে', সেই স্থানে 'বাল্মীকি' এবং 'ব্যাস' কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে—তাহা বালকেরও বুঝিতে কষ্ট হয় না। আবার যখন বলা যায়—'কালিদাসে যক্ষের বিরহ-বর্ণনা অতীব করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী', তখন 'কালিদাসে' অর্থাৎ কালিদাসের 'মেঘদূতে'—ইহাও সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

বৈষ্ণবেরা বলেন—নামী হ'তে নাম বড়। এখানেও দেখা যায়—নামের দ্বারাই নামীর পরিচয়। মেঘদূতের কবি বলিলেই কালিদাসকে বুঝায় ; হ্যামলেটএর কবি বলিলেই সেক্সপীয়রকে বুঝায় ; কিন্তু তখনই বিভ্রাটের সম্ভাবনা ঘটে,—যখন একাধিক কবি একই বিষয় অবলম্বনে কোন গ্রন্থ রচনা করেন। ইহারও দৃষ্টান্ত কিন্তু সাহিত্যিক জগতে বিরল নয়। একই রামচরিত অবলম্বনে বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি বহু কবি অনবদ্য কাব্য রচনা

করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গভাষাতেও দেখিতে পাই—বহু কবি রামায়ণ রচনা করিয়া গিয়াছেন; তাঁহাদের মধ্যে অনেকের রচনায় অদ্ভুত কবিত্ব-শক্তি মধুর ছন্দের ঝঙ্কার ও অপূর্ব্ব বর্ণনাবৈচিত্র্যও পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু তথাপি কৃত্তিবাসের রামায়ণই এ দেশে সমধিক আদৃত। আবার দেখিতে পাই—বিদ্যাসুন্দরের সরস উপাখ্যান বর্ণনা করিতে অনেক বাঙ্গালী-কবিই লেখনী ধারণ করিয়াছেন, কিন্তু 'বিদ্যাসুন্দরের কবি' বলিলে আমরা সাধারণতঃ রায় গুণাকরকেই বুঝি। বলা বাহুল্য, এখানেও সেই নামের দ্বারা নামীরই ইঙ্গিত করা হইতেছে। এই বিদ্যাসুন্দর কাব্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনার জন্যই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের মূল নিবন্ধ রচনা সম্বন্ধে বহু মতভেদ আছে। অনেকের মত এই যে—বিদ্যাসুন্দর কোন বঙ্গীয় কবির কল্পনা-প্রসূত কাব্য নহে; কবি বররুচির সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর-কাব্য হইতে মূল উপাখ্যানভাগ গ্রহণ করিয়া বহু কবি তাহা বহু প্রকারে পল্লবিত করিয়া অসামান্য কবি-প্রতিভা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু এই বররুচি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নবরত্নের অন্যতম কবি বররুচি কি না, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে বররুচি-প্রণীত সংস্কৃত প্রাকৃত ব্যাকরণ আছে; কিন্তু তৎপ্রণীত কোন কবিতা বা কাব্যগ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় নাই। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ-লাইব্রেরিতেও বররুচি প্রণীত কোন কাব্য বা কবিতার সন্ধান মিলে নাই।

বাঙ্গালায় রচিত বিদ্যাসুন্দর-কাব্যমধ্যে চোরপঞ্চাশৎ নামে যে পঞ্চাশটি শ্লোক সন্নিবেশিত দেখা যায়, অনেকের মতে সেগুলি কাশ্মীরী পণ্ডিত কবি বিলহন-বিরচিত *। এ বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ দেখা যায় না। তবে, সকল বাঙ্গালা বিদ্যাসুন্দরে চোরপঞ্চাশতের সকল শ্লোক বা তাহার অর্থ দেখিতে পাওয়া যায় না। কাহারও মতে, এই মূল সংস্কৃত খণ্ডকাব্যই কল্পনা-কুশলী নিপুণ কবিগণের দ্বারা বিস্তারিত হইয়া ক্রমে সুন্দর, সুবিপুল বিদ্যাসুন্দর কাব্যের আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু এই চোরপঞ্চাশতের মধ্যে সুড়ঙ্গের কোন উল্লেখ নাই। সুপণ্ডিত রাম তর্কবাগীশ মহাশয় এই চোরপঞ্চাশতের শ্লোকগুলির কালিকাপক্ষে অতি সুন্দর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

এইবার আমরা সংক্ষেপে বঙ্গভাষায় রচিত বিদ্যাসুন্দর কাব্যগুলির আলোচনা করিব। বঙ্গভাষায় কোন্ কবি প্রথম বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন, তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। ডক্টর সুকুমার সেনের মতে বঙ্গভাষায় বিদ্যাসুন্দর প্রথম রচিত হয় ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে বা তাহার দুই-চারি বৎসর পূর্ব্বে। এই কাব্যের কবি শ্রীধরের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন গৌড়ের সুলতান নসিরুদ্দিন নসরৎ সাহের পুত্র যুবরাজ আলাউদ্দিন ফিরোজসাহ। পরে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষ পাদে বা পরবর্ত্তী শতকের প্রথম পাদে ভাগীরথীতীরস্থ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল-বাসিগণের কৃপায় নাগরিক সভ্যতা ও বিলাসিতা দেশময় পরিব্যাপ্ত হইলে, ঐ নিবন্ধ ধর্ম্মের নির্ম্মোকে সংবৃত করা হয়।

(১) রায় বাহাদুর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের মতে বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন—ময়মনসিংহনিবাসী কবি কঙ্ক। কিন্তু কঙ্ক-প্রণীত বিদ্যাসুন্দর অধুনা দুষ্প্রাপ্য।

(২) কবি প্রাণারাম চক্রবর্ত্তী তাঁহার কালিকামঙ্গলে ভণিতামুখে পূর্ববর্ত্তী রচয়িতৃগণের নামের যে তালিকা দিয়াছেন * তদ্‌দৃষ্টে মনে হয়, গৌড়ীয় ভাষায় বিদ্যাসুন্দর প্রথম প্রণয়ন করেন শ্রীকবিবল্লভ। কিন্তু এই বল্লভেরও সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না।

(৩) বঙ্গভাষায় রচিত যে সমুদয় বিদ্যাসুন্দর এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে বোধ হয় কবি কৃষ্ণরাম দাস-রচিত গ্রন্থই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রাচীন। প্রাচীন মঙ্গল-কাব্য-রচয়িতৃগণের মধ্যে কবি কৃষ্ণরামের নাম সুপরিচিত। তাঁহার জন্মমৃত্যুর সন-তারিখ অদ্যাবধি নির্ণীত না হইলেও, কবির কাব্যগুলির মধ্যে নিম্নোদ্ধৃত স্বপরিচয়-জ্ঞাপক ভণিতাগুলি দেখিতে পাওয়া যায়—

সেই গ্রামের মধ্যে বাস নাম ভগবতী দাস
কায়স্থকুলেতে উৎপত্তি।
তাঁহার তনয় হই নিজ পরিচয় কই
বয়ঃক্রম বৎসর বিংশতি॥
শুন সবে এক চিত যেমতে হইল গীত
কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশী তিথি।
প্রথম বৈশাখ মাসে সপনে আপন বাসে
দেখিনু সারদা ভগবতী॥—রায়মঙ্গল।

অন্যত্র— কৃষ্ণরাম বিরচিল রায়ের মঙ্গল।
বসুশূন্য ঋতুচন্দ্র শকের বৎসর॥—রায়মঙ্গল।

আরও—নিমিতে গ্রামেতে বাস নাম ভগবতী দাস
কায়স্থকুলেতে উৎপত্তি।
হইয়ে একচিত রচিলা রায়ের গীত
কৃষ্ণরাম তাঁহার সন্ততি॥—রায়মঙ্গল।

কবির কালিকামঙ্গলের শেষ ভাগে আছে—
ভাগীরথীর পূর্ব্বতীর অপরূপ নাম।
কলিকাতা বন্দিনু নিমিতা জন্মস্থান॥

এই সকল বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায়—কায়স্থ-কুলোদ্ভব কবি কৃষ্ণরাম দাসের পিতার নাম ভগবতী দাস। তাঁহাদের বসতি ছিল

* "Of purely erotic type is the 'Chaurapanchasika,' which is almost certainly by Bilhana author of the 'Vikramadeva-charitam'. There is, of course, no truth in the picturesque tradition which alleges that the poet contracted a secret union with a king's daughter, was captured and condemned to die, but won the heart of the sovereign by the touching verses uttered as he was led to execution in which he recalls the joys of the love that had been. It is highly probable that there is no personal experience at all in the lines whose warmth of feeling undoubtedly degenerates into license."—Classical Sanskrit Literature by A. Berriedale Keith D. C. L., D. Lit, 2nd Edn. p 120.

* ঐ ভণিতা পরে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী নিমিতা গ্রামে। প্রথম বয়সে কবি যখন রায়-মঙ্গল কাব্য রচনা করেন, তখন তাঁহার বয়স কুড়ি বৎসর মাত্র। রায়মঙ্গলের রচনা-কাল ১৬০৮ শক =১৬৮৬ খৃষ্টাব্দ। কবি নিজে কালিকামঙ্গল রচনার সময়-নির্দ্দেশ না করিলেও, ধরা যাইতে পারে যে, খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে এই কাব্য রচিত হওয়াই সম্ভব। ইঁহার কালিকামঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত বিদ্যাসুন্দরে বর্দ্ধমানের নামোল্লেখ নাই।

(৪) বলরাম কবিশেখরের কালিকামঙ্গল; ইহাতে কবির স্বপরিচয়-জ্ঞাপক ভণিতায় দেখিতে পাই—

পিতামহ শ্রীচৈতন্য লোকেতে বলয়ে ধন্য
জনক আচার্য দেবীদাস।
জননী কাঞ্চনী নাম তার সুত বলরাম
কালিকা পূজিল যার আশ॥

ইহা হইতে বুঝা যায়, কবির বংশলতিকা এইরূপ ছিল—

চৈতন্য চক্রবর্ত্তী
|
দেবীদাস চক্রবর্ত্তী =কাঞ্চনী দেবী
|
বলরাম চক্রবর্ত্তী

কবিশেখরোপাধিক বলরাম চক্রবর্ত্তীর বিদ্যাসুন্দর বেশ প্রাঞ্জল ও কবিত্বপূর্ণ, ভারতচন্দ্রের মত আদিরসবহুল নয়।

(৫) কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের বিদ্যাসুন্দর—খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে রচিত। রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর রচনার কাল অদ্যাবধি নিঃসন্দেহে নির্ণীত না হইলেও, খুব সম্ভব, ভারতচন্দ্রের রচনার কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী। রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর কাব্যে নানাবিধ ছন্দের ঝঙ্কার ও মাঝে মাঝে সুমধুর কবিত্ব থাকিলেও তাঁহার ভক্তি-রসাত্মক গানগুলি সমধিক পরিচিত, ও বঙ্গ-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বলিয়া পরিগণিত।

(৬) রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের সুপ্রসিদ্ধ অন্নদামঙ্গল কাব্য। সকলেই জানেন—ভারতচন্দ্র বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ কবি; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার জীবনী বা রচনাবলী সংক্রান্ত অধিক উপাদান অদ্যাবধি সংগৃহীত হয় নাই। খ্যাতনামা কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই প্রথমে বহু চেষ্টায় ভারতচন্দ্রের জীবনী সঙ্কলন করেন। গুপ্ত কবির মতে অনুমান ১১১৯ বঙ্গাব্দে (ইংরেজী ১৭১২ খৃষ্টাব্দে) ভারতচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ভারতচন্দ্র যে সত্যপীরের কথা রচনা করেন, তাহাতে কবির স্বপরিচয়জ্ঞাপক নিম্নোদ্ধৃত পদগুলি দেখিতে পাওয়া যায়—

দেবানন্দপুর গ্রাম দেবের আনন্দ ধাম
হীরারাম রায়ের বাসনা।

অন্যত্র—

ভরদ্বাজ অবতংস ভূপতি রায়ের বংশ
সদা ভাবে হতকংস ভুরসুটে বসতি।
নরেন্দ্র রায়ের সুত ভারত ভারতী-যুত
ফুলের মুখটী খ্যাত দ্বিজ-পদে সুমতি।
দেবের আনন্দ ধাম দেবানন্দপুর নাম
তাহে অধিকারী রাম রামচন্দ্র মুন্সী।
ভারতে নরেন্দ্র রায় দেশে যার যশ গায়
হোয়ে মোবে কৃপাদায় পড়াইল পারসী।
সবে কৈল অনুমতি সংক্ষেপে করিতে পুঁথি
তেমতি করিয়া গতি না করিও দূষণা।
গোষ্ঠীর সহিত তাঁর হরি হোন বরদার
ব্রতকথা সাঙ্গ পায় সনে রুদ্র চৌগুণা।

উল্লিখিত উদ্ধৃতাংশ সমূহ হইতে জানা যায়, কবি ভারতচন্দ্র ছিলেন রায় উপাধিধারী রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র। ভুরসুট পরগণার অধীন আমতার সন্নিহিত পেঁড়ো-বসন্তপুরে ভারতচন্দ্রের জন্ম হয়; পরে ভাগ্যবিড়ম্বনায় সেই স্থান হইতে বিতাড়িত হইয়া কবি সপ্তগ্রামের অদূরবর্ত্তী দেবানন্দপুরের অধিবাসী রামচন্দ্র মুন্সীর নিকট পারসী ভাষা শিক্ষা করেন। অতঃপর হীরারাম রায়ের বাসনানুসারে তিনি সত্যপীরের কথা রচনা করেন—"সনে রুদ্র চৌগুণা," অর্থাৎ ১১৩৪ বঙ্গাব্দে=১৭২৭ খৃষ্টাব্দে। কবির বয়স তখন পঞ্চদশ বৎসর মাত্র।

ভারতের বিদ্যাসুন্দর-উপাখ্যান তাঁহার অন্নদামঙ্গল কাব্যের অন্তর্ভুক্ত। অন্নদামঙ্গলের রচনা-কাল কবি স্বয়ং এই ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা॥

অর্থাৎ ইহার রচনা-কাল ১৬৭৪ শক=১৭৫২ খৃষ্টাব্দ। অতএব দেখা যায় যে, বাঙ্গালার ইতিহাসের যুগান্তকারী যে মহাসমর পলাশী-প্রান্তরে সংঘটিত হয়, এবং যাহার ফলে বাঙ্গালার রাজমুকুট হতভাগ্য সিরাজের মস্তক হইতে স্খলিত হইয়া বণিক্ ইংরেজের মস্তক সমলঙ্কৃত করে, তাহার ন্যূনাধিক পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ভারতচন্দ্রের রসময় কাব্য বিদ্যাসুন্দর রচিত হইয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, রামপ্রসাদ বা ভারতচন্দ্রের রচনার অন্যূন অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে কৃষ্ণরাম কালিকা-মঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলিয়াছেন—কলিকাতার অন্তঃপাতী চড়কডাঙ্গার পশ্চিম হইতে ১৭৫২-৫৩ খৃষ্টাব্দে আত্মারাম ঘোষ নামক জনৈক ব্যক্তি কৃষ্ণরামের কালিকামঙ্গল নকল করেন। তাহা হইলেও ভারতচন্দ্র তাঁহার সুললিত ছন্দোঝঙ্কারপূর্ণ বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনার পূর্ব্বে কৃষ্ণরামের কাব্য দেখিতে পাইয়াছিলেন কি না, তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

কিন্তু ভারতচন্দ্র যেমন মোহিনী তুলিকা-সম্পাতে বর্দ্ধমান নগরকে বিদ্যা ও সুন্দরের বিহারভূমিরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন, কৃষ্ণরাম তাহা করেন নাই। কেহ কেহ বলেন—সুদূর দক্ষিণাপথে বিদ্যাসুন্দরের মিলন সংঘটিত হইয়াছিল। তাঁহাদের মতে বর্দ্ধমানকে বিদ্যাসুন্দরের মিলনস্থলরূপে নির্দ্দেশ—ভারতচন্দ্রের স্বকীয় কল্পনা-প্রসূত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—ভারতচন্দ্রের পিতা রাজা নরেন্দ্রনারায়ণকে ভারতচন্দ্রের শৈশবাবস্থায় ভাগ্যবিড়ম্বনায় জন্মস্থান হইতে বিতাড়িত, অর্থাৎ বর্দ্ধমানের মহারাণীর কোপে পড়িয়া রাজ্যচ্যুত ও গৃহ-বহিষ্কৃত হইতে হইয়াছিল! এ লাঞ্ছনা কবি জীবনের পরবর্ত্তী কালে কোন দিনও ভুলিতে পারেন নাই; এই জন্যই মনে হয়, সম্ভবতঃ আক্রোশ বশতঃ তিনি তাঁহার অমর লেখনীর সাহায্যে সুপ্রসিদ্ধ বর্দ্ধমান রাজপরিবারের ললাটে এই দুরপনেয় কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিয়াছেন। কবির কাব্যমধ্যেই দেখিতে পাই—

সভাসদ্ তাঁহার ভারতচন্দ্র রায়।
ফুলের মুখটী নৃসিংহের অংশ তায় ॥
ভুরস্থটে ভূপতি নরেন্দ্র রায় সুত।
কৃষ্ণচন্দ্র পাশে রবে হয়ে রাজচ্যুত ॥

কিন্তু ভারতচন্দ্র যে লিখিয়াছেন—

রাণী আইল ক্রোধ মনে নূপুরের ঝনঝনে
উঠি বৈসে বীরসিংহ রায়।

অথবা—

কহে বীরসিংহ রায় কহে বীরসিংহ রায়
কাটিতে বাসনা হয় ঠেকেছি মায়ায়।

ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, ভারত তদানীন্তন বৰ্দ্ধমানরাজের নাম বীরসিংহ রায় বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; কিন্তু বৰ্দ্ধমানের কোন রাজার নাম বীরসিংহ ছিল কি না, তাহা জানা যায় না। এই স্থলে আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে হয়। ভারতের অন্নদামঙ্গলে "রাধানাথ" নামক এক ব্যক্তির নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়;

রাধানাথের দুঃখ-ভরা, নাশ গো সত্বরা।
কালের কামিনী কালী করুণাসাগরা গো ॥
* * *
তুমি গো তারিণী-তারা অসার সংসার সারা
নানারূপে চরাচরে চর গো।
রাধানাথ তব দাস পূরাও তাহার আশ
তব ঋণী চক্রে শ্রাণ তব গো ॥

কিন্তু এই রাধানাথ লোকটি কে ছিলেন?

(৭) এইবার বিদ্যাসুন্দর কাব্যের শেষ রচয়িতার কথা বলিব; ইঁহার নাম প্রাণারাম চক্রবর্ত্তী। প্রাণারাম তাঁহার কালিকামঙ্গলে লিখিয়াছেন—

বসুদ্বয় বাণচন্দ্র শক নিরূপণ। (১৫৮৮)
কালিকামঙ্গল গীত হৈল সমাপন ॥
শ্রীকবিবল্লভ দ্বিজ রচিত আছিল।
এই গ্রন্থ রামচন্দ্র প্রকাশ করিল ॥
আছিল অনেক লুপ্ত শব্দ একে আর।
শোধন পূর্ব্বক পুনঃ হইল উদ্ধার ॥
বিদ্যাসুন্দরের এই প্রথম প্রকাশ।
বিরচিলা কৃষ্ণরাম নিমিতা যাহার বাস ॥
তাঁহার রচিত গ্রন্থ আছে ঠাঁই ঠাঁই।
রামপ্রসাদের কৃত আর দেখা নাই ॥
পরেতে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে।
রচিলেন উপন্যাস প্রসঙ্গের ছলে ॥

উদ্ধৃতাংশ হইতে প্রতীতি হয় যে, কবিরঞ্জনের বিদ্যাসুন্দর আশানুরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে নাই,—যদিও তাঁহার রচিত গানসমূহ বঙ্গসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্।

এ কথাও অনেক সময়ে মনে হইয়াছে—যে-নিবন্ধ অবলম্বনে এতগুলি খ্যাতনামা লেখক তাঁহাদের সমগ্র কবিত্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া, সাড়ম্বরে ও সালঙ্কারে প্রত্যেকেই এক একখানি অপূর্ব্ব কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা জনসাধারণের তৃপ্তিবিধানের জন্য নিছক দৈহিক ভোগের কাহিনী হইতেই পারে না। শুধু দৈহিক ভোগের বর্ণনাপূর্ণ কাব্য রচনা দ্বারা বঙ্গবাসীর নিকট হইতে যে স্থায়ী যশঃ অর্জ্জন করিতে * পারা যায় না—ইহা তাঁহারা সকলেই জানিতেন। বাঙ্গালী ভোগবিলাসী জাতি নয়; একমাত্র ত্যাগের মহিমাই বাঙ্গালীর হৃদয় মুগ্ধ করিতে পারে, তাহাই বাঙ্গালীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে। সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর যাঁহাদের আদর্শ দেবতা, সংসার-বিরাগী বুদ্ধ, চৈতন্য যাঁহাদের নিকট ভগবানের অবতার, রামায়ণ যাঁহাদের আদর্শ কাব্যগ্রন্থ,—কলুষময় কামায়ন, যত সুন্দর ভাবেই রচিত বা বর্ণিত হউক না কেন, তাহা যে কোন কালেও সেই বাঙ্গালী জাতির চিত্তে স্থায়ী আসন স্থাপন করিতে পারিবে না, তাহা তাঁহারা প্রত্যেকেই উত্তমরূপে জানিতেন। ভাগবত যদি নিছক ভোগের কাব্য হইত, রাধাকৃষ্ণের বিহার যদি প্রকৃতপক্ষে শুধু দৈহিক ভোগেরই বর্ণনা হইত, তাহা হইলে তাহা কখনও বাঙ্গালীর হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারিত না। এই জন্যই মনে হয়—এই অনবদ্য কালজয়ী বিদ্যাসুন্দর কাব্যমধ্যে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত ইহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা কেবল গ্রহণ করিবার যোগ্যতা ও প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করে। নীলাচলে মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির-গাত্রে যে সমুদয় চিত্র অঙ্কিত আছে, তৎসমুদয়ের যদি অন্তর্নিগূঢ় অর্থ ও উদ্দেশ্য না থাকে, তাহা হইলে সেগুলি লোক-লোচনের সম্মুখে উপস্থাপিত করা নিশ্চিতই অতীব দূষ্য ও গর্হিত। সুতরাং মনে হয়, বিদ্যাসুন্দর কাব্যের অন্তর্নিগূঢ় উদ্দেশ্য ইহাই প্রতিপন্ন করা যে—শ্রেষ্ঠ জ্ঞান (পরা বিদ্যা, যদ্দ্বারা 'বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে') ও আদর্শ সুন্দর (সত্যং শিবং সুন্দরম্)—ইহা প্রকৃত মিলনের পরিপন্থী অনেক; সুড়ঙ্গদ্বার দিয়া (ইড়া পিঙ্গলা প্রভৃতি দ্বার দিয়াই) ঐ মহামিলন সংঘটিত হইতে পারে। 'হংসৈর্যথা ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ' বিদ্যাসুন্দর কাব্যের এই অর্থ গ্রহণ করিতে পারিলে তবেই ইহা পাঠ করা সার্থক, নতুবা বিদ্যাসুন্দর-পাঠ ব্যর্থ, এবং এই প্রবন্ধ-রচনাও নিষ্ফল।

শ্রীজহরলাল বসু।

---

* যদিও এখনকার দিনে তদ্দ্বারা প্রচুর অর্থাগম হইতে পারে বটে। পণ্ডিতেরা বলেন—'কাব্যং যশসেঽর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে।'—লেখক

অপেক্ষা

রাইচরণ লেখে—কবিতা, গান নাটক সবই। মরবার সময় তার বাপ একখান বাড়ী আর কিছু নগদ টাকা রেখে যায়; সুতরাং বাপের এক ছেলে সে, চাকরী-বাকরী না করে মা বীণাপাণির সেবায় আত্মনিয়োগ করলে। অন্দরে স্ত্রীর মুখে স্বামীর রচনার প্রশংসা ধরে না! বাইরে রাইচরণের বৈঠকখানায় বসে বন্ধু-বান্ধবেরা চা আর লুচি-মিষ্টান্নাদি খায় আর তার লেখার বাহবা দেয়। অতএব রাইচরণ নিঃসন্দেহেই কবি এবং লেখক।

রাইচরণ শুধু লেখে, আর কিছু করে না। কাজেই যে পয়সা খরচ হয়, তার পূরণ হয় না। কলসীর জল গড়াতে গড়াতে ফুরিয়ে যায়। রাইচরণের অবস্থাও ক্রমে পড়তে লাগল। বন্ধুরা পরামর্শ দিলে, "কলকাতা যাও। সেখানে তোমার লেখা কাগজে বার করলে কিছু পাবে। তা ছাড়া যদি ষ্টেজে কিম্বা ফিল্মে তোমার বই চলে, তাহলে লাল হয়ে যাবে।"

ক্রমাগত বজ্রপাত হওয়ায় রাইচরণের চেহারা একটু ফ্যাকাশে হয়ে পড়েছিল; সুতরাং লাল হবার আশায় পৈত্রিক ভিটাটুকু বিক্রী করে সস্ত্রীক সে কলকাতায় গিয়ে হাজির হল।

ছোটখাটো একখানি বাড়ী চল্লিশ টাকায় ভাড়া করে রাইচরণ সস্ত্রীক কলকাতায় আস্তানা পাতলে। এক জন দিন-রাতের চাকর রইল, আর একটি ঠিকা ঝি। প্রথম ক'দিন সব দেখা-শুনা করাতেই কেটে গেল। তার পর রচনার বাণ্ডিল বগলে নিয়ে লাল হবার চেষ্টায় রাইচরণ ঘুরে বেড়াতে লাগল।

রাইচরণ ঘুরছে, কেবলই ঘুরছে। কোথাও ঠিক স্থিতি করে উঠতে পারছে না। প্রকাশকরা কেউ বলেন, "পরে এক সময় আসবেন। কেউ তাও বলেন না। দেখব বলে কেউ বা রচনা রেখে দেন; তার পর পুনঃ পুনঃ তাগাদায় বিরক্ত হ'য়ে অপঠিত অবস্থায় তা ফেরৎ দেন। কেউ বা হারিয়ে গেছে বলে ফেরতও দেন না। সম্পাদকরা তো লেখা প্রথমতঃ নিতেই চান না, নিলেও পড়তে চান না। কোনো মতে পড়াতে পারলেও ছাপতে চান না; এবং ক্রমাগত আনাগোনা ধরাধরি করার পর চক্ষুলজ্জার খাতিরে যদিও বা ছাপেন তো দক্ষিণা দিতে চান না। ষ্টেজ আর ফিল্মের কর্তাদের সঙ্গে দেখাই ঘটে না। কোনো মতে যদি বা একে ওকে ধরে তাঁদের দরবারে গিয়ে হাজির হয় তো ক্রমাগত তাঁদের পূজায় পান-সিগারেট ও চা জোগাতেই গাঁটের কড়ি বেরিয়ে যায়! তার পর হয়তো দয়া করে তাঁরা বলেন—"আচ্ছা, রেখে যান, পড়ে দেখব।"

রোজই যায় আসে, পান সিগারেট দেয়, চা খাওয়ায়, পরে বাড়ী ফিরে আসে; উত্তর আর পায় না। মিনতি জানালে তাঁরা বলেন—"বড্ড ব্যস্ত আছি মশায়—পড়বার সময় করে উঠতে পারছিনে কি না।"

এমনি ভাবে আরও কিছু দিন কাটে। গাঁট থেকে আরও কিছু খসে। শেষে ক্রমাগত খোসামোদ করা এবং যাওয়া-আসার ফলে হয়তো খুশী হয়ে তাঁরা বলেন—"বেশ হয়েছে। কিন্তু এখন তো আমাদের হাতে ক'খানা বই রয়েছে। আপনি এখন নিয়ে যান। দরকার হলেই আপনাকে খবর দেব। ফাষ্ট চয়েস্। মধ্যে মধ্যে আসবেন কিন্তু।"—মানে, পান-সিগারেট এবং চা মধ্যে মধ্যে বেখরচায় আসে তো মন্দ কি?

পাঁচ বছর কেটে গেছে। রাইচরণকে দেখলে আর এখন চেনা যায় না; অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। এখন সাত টাকা ভাড়ায় খোলার ঘরে বাস। ঝি নেই, চাকর নেই। স্ত্রী মৃত্যু-শয্যায়। বেশী দিন বাঁচবে—সে আশা নেই। ভাল ওষুধ পথ্য দেবে, সে অর্থও তার নেই। স্ত্রী কোন দিন কোন অভিযোগ জানায়নি; বরং নিরাশায় রাইচরণ যখন ভেঙ্গে পড়েছে, তখন স্ত্রী তাকে সান্ত্বনা দিয়েছে—"নিশ্চয়ই ওরা তোমার লেখা নেবে। আমি জানি, এক দিন না এক দিন তোমার নাম সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে।"

আজ-কাল রোজই সারাদিন ঘুরে বেড়িয়ে বিফল-মনোরথ হয়ে রাইচরণ ঘরে ফেরে। স্ত্রী প্রশ্ন করে—"হ্যাঁ গা, বই ওরা কেউ নিলে?"

রাইচরণ উত্তর দেয়—"হ্যাঁ, এইবার ঠিক হয়ে গেছে। রিহার্সল আরম্ভ হ'ল বলে।"—নির্জলা মিথ্যা কথা এই বলতে রাইচরণের চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে। তবু সে বলে। আনন্দে স্ত্রীর চোখ-দু'টি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। রোগক্লিষ্ট শীর্ণ হাত দু'খানি দিয়ে স্বামীর হাত ধরে উৎফুল্ল ক্ষীণ কণ্ঠে সে বলে—"আমি আগেই তো বলেছিলুম।"

দিন যায়। স্ত্রী প্রশ্ন করে—"হ্যাঁ গা, আর কত দিন দেরী? আমি বেঁচে থাকতে কি শুনে যেতে পারব না—তোমার বই হচ্ছে?"

ধরা-গলায় রাইচরণ বলে—"কি যে বলো! তুমি সেরে উঠবে এবং দেখতে যাবে, প্ল্যাকার্ড বেরিয়ে গেছে। আর-শনিবারে উদ্বোধন-রজনী।"

তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে স্ত্রী উত্তর দেয়—"ভগবান্ এবার বুঝি মুখ তুলে চাইলেন। আমি আগেই ঠিক বলেছিলুম।"

শনিবার এল। উত্তেজনায় স্ত্রী ছট্‌ফট্ করছে। শরীর তার ক্রমেই ভেঙ্গে পড়ছে। জীবন-দীপ নিবে আসছে। রাইচরণ দুপুরবেলা বেরিয়েছে। আজ তার বই-এর প্লে, কত কাজ! রাইচরণ বুঝতে পেরেছে, আজকের দিনটা বোধ হয় কাটবে না। প্রমীলার তখন যায় যায় অবস্থা! মরবার আগে তার এই একমাত্র সাধ যদি কোনো মতে পূর্ণ করা যায়, এই আশায় প্রত্যেক ম্যানেজারের দোরে দোরে সে ঘুরছে। শেষে সন্ধ্যা-নাগাদ সে যেন ভেঙ্গে পড়ল। কলকাতায় একটা নতুন থিয়েটার খুলেছে। ছোকরা ম্যানেজার, বাপের সম্পত্তি পেয়েছে; রাইচরণ তাকেই নিজের সমস্ত কাহিনী অকপটে খুলে বললে; শেষে বললে, "দেখুন, সত্যি করে নয়, যদি মিথ্যা শুধু আপনি এইটুকু মাত্র বলেন যে, আপনারা আমার বই অভিনয় করবেন, আমি গিয়ে সেই সুখবরটুকু আমার স্ত্রীকে দিতে পারব। মৃত্যুর আগে একটা সত্য কথা বলে তাকে সান্ত্বনা দিতে পারলেও আমি অনেকখানি তৃপ্তি পাব, সেও সুখী হবে।"

ম্যানেজার নিজের গাড়ীতেই রাইচরণের বাড়ী গেলেন। তার একখানি বই নিয়ে, তাকে পঞ্চাশ টাকা অগ্রিম দিয়ে 'কাল কথাবার্ত্তা হবে' বলে চলে এলেন। রাইচরণ কিছুই বুঝতে পারলে না। স্ত্রীকে জানাতে সে খুবই আনন্দ প্রকাশ করলে; কিন্তু সেই আনন্দের আতিশয্যে সেই রাত্রেই প্রমীলা মারা গেল। মরবার আগে তার মুখের শেষ কথা—"আমি জানতুম, তোমার বই নেবেই।"

রাইচরণের জীবনের কামনা পূর্ণ হয়েছে। নাট্যকার হিসেবে তার খ্যাতি আজ চারি দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু এ সুখের যাকে ভাগ দেবে, সে আজ আর পৃথিবীতে নেই!

শ্রীযামিনীমোহন কর।

ম্যালেরিয়ায় পথ্য-সমস্যা

আজ কাল কেহ রোগাক্রান্ত হইলে তাঁহার চিকিৎসার জন্য পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ কোন ডাক্তারকে না ডাকিলে যেমন রোগী বা তাঁহার আত্মীয়েরা চিকিৎসায় তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না, সেই-রূপ রোগীর জন্য কৌটা-ভরা বিদেশী বার্লি, হর্লিক্স ফুড, গ্লুকোজ, পার্ল-সাগু, বা ঐ শ্রেণীর বিদেশজাত এবং সুদৃশ্য আধারে সংরক্ষিত মূল্যবান লঘুপাক খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ না করিলে রোগীর জন্য যথাযোগ্য পথ্যের ব্যবস্থা হইয়েছে বলিয়া মনে হয় না। গত ২৫ বৎসরের মধ্যে এ দেশে রোগের ঔষধ ও পথ্য সম্বন্ধে এই প্রকার পরমুখাপেক্ষিতা আমাদের উপর এরূপ উৎকট প্রভাব-বিস্তার করিয়াছে যে, পথ্যের মূলতত্ত্ব পরিহার করিয়া পাশ্চাত্ত্য ব্যবস্থার অনুসরণই একমাত্র অবলম্বনীয় বলিয়া আমাদের ধারণা হইয়াছে।

বাস্তবিক পথ্য বলিলে আমাদের শরীরের অন্তর্নিহিত স্রোতঃ-পথের পক্ষে যাহা কল্যাণপ্রদ, তাহাই বুঝা উচিত। জ্বর, অতিসার, অগ্নিমান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লপিত্ত, ক্ষয়, রক্তদুষ্টি, কুষ্ঠ, শূল, গ্রহণী, আমাশয় প্রভৃতি এরূপ বহু রোগ আছে—সে সকল ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতীয় পথ্যের প্রয়োজন। কোন একটি সুনির্দ্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন না করিয়া বিভিন্ন চিকিৎসক গতানুগতিক প্রথায় ইচ্ছানুযায়ী পথ্যের ব্যবস্থা করেন। এই প্রকার বিনা-বিচারে পথ্য-নির্ব্বাচনে অনেক ক্ষেত্রে রোগীকে বিপন্ন হইতে হয়। হয় একটা বড় বিলাতি পেটেণ্ট ঔষধের ফিরিস্তি অথবা আফগানিস্থানের 'কাবুলি মেওয়া', না হয় এমন-একটা অদ্ভুত-কিছুর ব্যবস্থা করা হয়—মোটের উপর যাহা কখন পুষ্টি-কর, কখন লঘুপাক, কখন বা কোন দিক্‌ দিয়া অসাধারণ হইয়া থাকে; কারণ, রোগীর আত্মতৃপ্তির অনুরূপ ব্যবস্থা না হইলে চিকিৎসার মর্য্যাদাহানিরও সম্ভাবনা ঘটে। বস্তুতঃ, পথ্য-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কয়েকটি সুনির্দ্দিষ্ট ধারা আছে; চিকিৎসকগণ বিবেচনার সহিত তাহা অবলম্বন করিলে তাঁহাদিগকে আর আশ্বস্তচিত্তে প্রতীচীর দিকে চাহিয়া থাকিতে হয় না, কিম্বা পথ্যাদি নির্ব্বাচনের চিন্তায় গলদ্‌ঘর্ম্মও হইতে হয় না।

সকল রোগে ধান্যজাতীয়, দুগ্ধজাতীয়, মূলজাতীয়, ফলজাতীয়, মৎস্য, মাংস এবং তরকারীজাতীয় এক বা একাধিক পথ্যের প্রয়োগ করিতেই হয়। বিশেষতঃ, সকল রোগেই অল্পাধিক পরিমাণে মন্দাগ্নিত্ব থাকে বলিয়া সকল ক্ষেত্রে মাত্রার অল্পতার প্রতি লক্ষ্য রাখিতেই হইবে। মাত্রা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অগ্নিবলানুসারী হইবে। আবার আয়ুর্ব্বেদ মতে ম্যালেরিয়া এক প্রকার বিষম জ্বর—যাহা পরোক্ষ ভাবে মশক-দংশনজনিত বিষ, প্রত্যক্ষ ভাবে জলগত বিষক্রিয়ার ফলে কোষ্ঠাগ্নিকে বিকৃত করে; আর এই কোষ্ঠাগ্নিবিকার বলিতে—রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সাতটি ধাতুর এক বা একাধিক যে কোনটি বুঝায়। এই কোষ্ঠাগ্নি স্বস্থানে, স্বভাবে ও স্বমানে থাকিয়া কার্য্য করিতে বিরত হইলে অন্নরস যথাবিধি রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই ক্রমপরিণতিতে স্ব স্ব কার্য্য নির্ব্বাহ করে না, ফলে ক্ষেত্রবিশেষে রক্তাল্পতা বা যকৃৎ-প্লীহার বৃদ্ধি, আবার কোন ক্ষেত্রে শারীরিক অবসাদ, অগ্নিমান্দ্য, বা কোষ্ঠবদ্ধতার উৎপত্তি হয়; এবং এই সমস্ত ব্যাপার রোগীর অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হওয়ায় রোগী স্বয়ং আদৌ তাহা বুঝিতে পারে না। ফলতঃ, বিকৃত অন্নরসের অনুলোমগতি বা প্রতিলোমগতি হয়। অনুলোমগতির ক্ষেত্রে বিকৃত রস যকৃৎ বা প্লীহাগত হইয়া প্লীহা যকৃৎ বর্দ্ধিত করে, ফলে রক্তের মাংস ইত্যাদি ক্রমপরিণতি সম্ভব হয় না। আবার যে ক্ষেত্রে প্রতিলোমগতি হয়, সে ক্ষেত্রে শরীরের অবসাদ, সাধারণ অগ্নিমান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। মোটের উপর সকল ক্ষেত্রে রক্তাল্পতা থাকিবেই। আর এ রোগের বৈশিষ্ট্য এই যে, বিকৃত রস আমাশয় বা পাকস্থলীগত থাকে না বলিয়া রোগী এক প্রকার কৃত্রিম ক্ষুধা অনুভব করে, এবং রোগীর অগ্নি বিবৃত হইয়াছে, ইহা তাহার উপলব্ধি হয় না। সুতরাং জ্বরবিরামের পরেই যে কৃত্রিম ক্ষুধা অনুভূতি হয়, সেই কৃত্রিম ক্ষুধাই যত অনর্থের মূল। এ জন্য রোগটিকে এক প্রকার মৃদু বিষক্রিয়া বলিয়াই অভিহিত করা যায়। আর এই মৃদু বিষক্রিয়া শোণিত-শোষক বাদুড়ের মত মানুষের তথা জাতির রক্ত তিলে তিলে শোষণ করিয়া তাহাকে মৃত্যুর দ্বারে উপনীত করে। অন্য রোগে দেহ পথ্য গ্রহণ করিতেই চায় না, কিন্তু এ রোগে দেহ পথ্য গ্রহণ করিয়া রোগীর অজ্ঞাতসারে তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করে।

সুতরাং জ্বর থাকিলে দুগ্ধ সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। তরল অন্নমণ্ড, খইএর মণ্ড, যবের মণ্ড, বা চিঁড়াভাজার মণ্ডের যে কোন একটি দুই তোলা মাত্রায় লইয়া আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া এক পোয়া থাকিতে নামাইয়া, ঐ জলীয়াংশ দিনে চারি বার পান করাইলে অগ্নিবল বিকৃত হয় না, অথচ ক্ষুধা বা পিপাসা-বোধ থাকে না। জ্বরবিরামে দুগ্ধসহ এই পথ্য দানে দেহের পোষণ ও বিষক্রিয়ার নাশ হয় এবং অপেক্ষাকৃত গুরু দ্রব্যই প্রদান করা হয়। আবার জ্বরবিরামের তিন দিন পর হইতে এই তরল অন্নমণ্ড কিছু ঘন করিয়া দুগ্ধ বা মাছের ঝোল, বা তরিতরকারীর ঝোলসহ দিলে অন্নগত বিকৃত রস তাহার অনিষ্ট-সাধন করিতে পারে না; অথচ দিনে তিন-চারি বার সেবনে ক্ষুধা ও পিপাসা উভয়েরই নিবৃত্তি হয়। এই জ্বরের সুপ্তিকাল জ্বর-বিরামের পরে এক মাস বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে; যদি সেই সময়-মধ্যে জ্বরের পুনরাক্রমণও হয়, তাহা হইলেও এক মাস কাল এই নিয়মানুসারে চলিলে অনেক ক্ষেত্রে বিনা-ঔষধে অগ্নি স্বস্থান বা স্বভাবগত হইবার সুযোগ পায়, এবং রোগীও ক্রমসুস্থতা অনুভব করে। ফলের রস যাহা সুমিষ্ট অথচ পেটের ভিতর গিয়া অম্ল-বিপাক হয় না, মধুর-বিপাক হয়, সেগুলি রোগীর পক্ষে হিতকর। এ জন্য ডালিম, বেদানা, আঙ্গুর, আমলকী, কচি ডাবের জল প্রভৃতি প্রদানে আপত্তির কারণ নাই। মুখের স্বাদ পরিবর্ত্তন, এবং দেহের পুষ্টি, এ উভয়ই ইহার দ্বারা সাধিত হয়। জ্বরবিরামের পরে তৃতীয় সপ্তাহ হইতে কিছু কিছু স্থূল অথচ সুন্দররূপে সিদ্ধ অন্ন বা তরি-তরকারী পূর্ণমাত্রার অর্দ্ধাংশ, চতুর্থ সপ্তাহে তিন-চতুর্থাংশ, এবং পঞ্চম সপ্তাহে শরীরের স্বাভাবিকত্ব বোধে স্বাভাবিক অন্নে অভ্যস্ততা পথ্য সম্বন্ধে সাধারণ বিধি। ক্ষুদ্র অতৈলাক্ত মাছ বা মাংসের ঝোল তৃতীয় বা চতুর্থ সপ্তাহে ব্যবহারে ক্ষতি নাই; কিন্তু জ্বর হইলেই সাগু, বার্লি, এরারুট, হর্লিক বা গ্লুকোজ প্রভৃতি বিদেশজাত পথ্যাদির প্রয়োজন—এই ভ্রান্ত ধারণা ত্যাগ করিতে হইবে।

শ্রীবিজয়কালী ভট্টাচার্য্য (এম-এ, বেদান্তশাস্ত্রী কবিরাজ)।

অগ্নিশিখা ও পতঙ্গ

করোনার রায় দিলেন—আত্মহত্যা, উপলক্ষ প্রণয়ের ব্যর্থতা; কিন্তু ইহার পূর্ব্বের কিছু ইতিহাস আছে, আমরা এখানে সেই পূর্ব্বকথার আলোচনা করিতেছি।

সে দিন কি একটা ছুটীর বার। 'মনোমোহিনী-মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলে'র হেড-মিস্ট্রেস নীলিমা ব্যানার্জ্জী ঘরে বসিয়া সে দিনের দৈনিক পত্রিকা পাঠ করিতেছিল। পিয়ন দুইখানি পত্র লইয়া আসিল। একখানি পিয়নের হাতে ফিরাইয়া দিয়া নীলিমা বলিল, "মাকে দাও।" মনে মনে বলিল, "দাদার চিঠি।"

পিয়ন চলিয়া গেলে দ্বিতীয় পত্রখানা নীলিমা বুকের উপর চাপিয়া ধরিল; মুদ্রিত নেত্রে ক্ষণকাল স্তব্ধ ভাবে তাহা বুকে চাপিয়া রাখিবার পর সে খামখানার উপর—যেখানে শিরোনামা লেখা ছিল, চুম্বন করিয়া খামখানা ছিঁড়িয়া ফেলিল; কিন্তু তাহার ভিতর হইতে পত্র বাহির করিয়া সে অবাক্ হইয়া গেল! খামের ভিতর তাহারই লিখিত পত্র ফেরত আসিয়াছে কেন? ক্ষিপ্রহস্তে ভাঁজ খুলিতেই ভিতর হইতে অন্য যে পত্রখানা বাহির হইল, তাহাই ভূপতির লিখিত। কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অসীম বিস্ময়ের সহিত নীলিমা ভূপতির পত্রখানা পড়িতে লাগিল। সে লিখিতেছে,—"কল্যাণীয়া নীলিমা, তোমার পত্রখানি এই সঙ্গে ফেরত পাঠাইলাম—দেখিয়া নিশ্চিতই বিস্মিত হইবে। কেন ফেরত পাঠাইতেছি, তাহা পরিষ্কার করিয়াই লিখিতেছি। আমি তোমার কাছে ঋণী,—অসময়ে তুমি আমায় যে কত সাহায্য করিয়াছ—আমি তাহা কোন দিনও ভুলিতে পারিব না। কিন্তু তোমার এ ধরণের চিঠি, অর্থাৎ প্রেমপত্র আমার কাছে আর রাখা উচিত নয় বলিয়া এখানি ফেরত পাঠাই; অবশিষ্টগুলিও একত্র বাণ্ডিল বাঁধিয়া শীঘ্রই পাঠাইয়া দিব।

"তোমাকে বলিতে বাধা নাই যে, আমি বিশ্বস্ত স্বামী হইতে চাই।···কিন্তু এ কথা তোমাকে পূর্ব্বে জানাইবার সুযোগ হয় নাই। সময় অত্যন্ত অল্প; আগামী রবিবার আমার বিবাহ। যাঁহার ডিস্পেন্সারীতে গত মাস হইতে বসিতেছি, তাঁহারই একটি পিতৃহীনা পৌত্রী আছে, তাহারই সহিত আমার বিবাহ স্থির হইয়াছে। পাত্রী তোমার অপরিচিতা নয়। রেণু বলিয়াছে, বিদ্যাসাগর কলেজে সে তোমার সহিত আই-এ পড়িত। রেণু রায়—সম্ভবতঃ তাহাকে চিনিতে পারিবে।

"রেণুকে ভালবাসিয়া বুঝিয়াছি, তোমার সহিত আমার প্রেমের অভিনয়ে যে ছেলেখেলা হইয়াছিল, তাহা একেবারেই ছেলে-মানুষী! আশা করি, তুমিও তাহা ঐ রকম হাল্কা ভাবেই গ্রহণ করিবে; কারণ, উহাতে সারবস্তু কিছু ছিল না—ইহা তুমি অস্বীকার করিতে পারিবে না।

"তুমি টাকা দিয়া অনেক সময় সাহায্য করিয়াছ; আমি উহার হিসাব রাখি নাই। তোমার নিকট যদি তাহা থাকে, অথবা একটা আনুমানিক হিসাব দিতে পার, তবে শীঘ্র তাহা পাঠাইও। আমি পত্র পাঠমাত্র সে টাকা তোমায় পাঠাইয়া দিব। ইতি ভূপতি।"

মন্ত্রচালিতের মত উঠিয়া নীলিমা পত্রখানা টেবিলের উপর রাখিয়া দিল, এবং বিবর্ণ পাংশুমুখে খোলা-জানালার বাহিরে গাঢ় ধূসরবর্ণ বর্ষণরত মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার সমস্ত অন্তর বিরাট্ শূন্যতায় হা হা করিতে লাগিল; তথাপি তাহার মনে হইল—ভূপতি কি তামাসা করিয়াছে?···না, পত্রের প্রত্যেক অক্ষর নির্ম্মম সত্য; তামাসা বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে, এরূপ তরল উক্তি উহার ভিতর একটিও নাই।···ছেলেখেলা! আজ ভূপতি তাহার একনিষ্ঠ প্রেমকে ছেলেখেলা বলিয়া অবজ্ঞাভরে উড়াইয়া দিতে চায়! দীর্ঘ সাত-আট বৎসরের অনাবিল প্রেম ও নিবিড় ঘনিষ্ঠতার ভিতর সারবস্তু কিছুই ছিল না? নীলিমা ইহাকে 'হাল্কা ভাবে' গ্রহণ করিবে?···ভূপতি এ কথা—এই নির্ম্মম উক্তি অতি সহজে, অবলীলাক্রমে লিখিতে পারিল! সে ত উত্তমরূপেই জানে, সে নীলিমার হৃদয়ের ধ্রুবতারা। আর সে-ও যে ভূপতির···না, না, আজ আর ভূপতি তাহার নয়; রেণুকে ভালবাসিয়া সে নীলিমার প্রণয়ের অসারতা উপলব্ধি করিয়াছে!···বিদ্যাসাগর কলেজের সেই রেণু! সুন্দরী রেণু!···নীলিমাকে কালো বলিয়া সে কি অবজ্ঞাই না করিত! লেখাপড়ায় নীলিমার পাদপীঠে বসিবারও যোগ্যতা তাহার ছিল না; সে জন্য সে নীলিমাকে অত্যন্ত ঘৃণা ও হিংসাও করিত।

সেই রেণু—যে সারস্বত-কুঞ্জে কোন দিন নীলিমাকে পরাস্ত করিতে পারে নাই—আজ জীবনের যুদ্ধে সহজেই সে জয়ী হইয়াছে! বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব-টীকা আজ নীলিমার কোন কাজেই আসিল না! ভূপতি ঋণ শোধ করিতে চাহিয়াছে! হাঁ, ঋণ-পরিশোধ সে এখন অনায়াসেই করিতে পারে। রেণু ধনীর দুলালী, বিবাহে ভূপতি প্রচুর টাকা পাইতেছে সন্দেহ নাই; কিন্তু অর্থের ঋণ পরিশোধ করিলেও নীলিমার গভীর প্রেমের ঋণ সে কি দিয়া পরিশোধ করিবে? আজ চারি বৎসর নীলিমা চাকুরী করিতেছে, প্রতি মাসেই সে ভূপতিকে টাকা পাঠাইয়াছে। ইহার মধ্যে কোন বাধ্য-বাধকতা ছিল না, ছিল শুধু অন্তরের আকর্ষণ। কোন দিনও সে একখানি মূল্যবান সাড়ী পরে নাই; নিজের বিলাসিতায় কখন কপর্দ্দক মাত্র ব্যয় করে নাই। কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া সে শুধু ভূপতির উন্নতির পথটি নিষ্কণ্টক—মসৃণ রাখিতে চাহিয়াছে! এ জন্য কতই কঠোর বিদ্রূপ, টিট্‌কারী তাহাকে শুনিতে হইয়াছে, তাহা সে গ্রাহ্য করে নাই। ভূপতি আজ সেই অকিঞ্চিৎকর আর্থিক ঋণ পরিশোধের জন্য ব্যস্ত,—কিন্তু প্রতিদিনের প্রত্যেক কামনা বাসনা সম্বরণের ঋণ সে কি দিয়া পরিশোধ করিবে?—নীলিমার নাসিকা কম্পিত করিয়া একটা জ্বলন্ত নিশ্বাস নিঃসারিত হইয়া শূন্যে বিলীন হইল। হায়! ভারবাহী গর্দ্দভের মত শুধু বোঝা বহিয়াই তাহাকে এত কাল কাটাইতে হইল; ভোগ করিতে পারিল না সে এতটুকু!

ভূপতি! ভূপতি! এই ত তিন মাস পূর্ব্বেও সে নীলিমার সহিত দার্জ্জিলিং বেড়াইতে যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে! তখনও সে নীলিমার প্রেমে পরিতৃপ্ত ছিল; বরং নীলিমা নিজে যদি বলিয়াছে, 'আমার রংটা যদি একটু ফরসা হত; তোমার পাশে আমায় কি বিশ্রীই যে দেখায়!'···তখন ভূপতি আদর করিয়া বলিত, 'তুমি যে আমার ছায়া! ছায়া অন্ধকারই হয়, দেখনি?' অথচ আজ সে রেণুর প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইয়া ঠিক বুঝিয়াছে, তাহার প্রণয়

ছেলেখেলা ছিল, সারবস্তু উহাতে কিছুই ছিল না! ভূপতি কি অর্থের কামনাতেই তাহাকে ঐরূপ চাটুবাক্যে ভুলাইত?

ইহাই ভূপতি ও নীলিমার সব কথা নয়, ইহারও কিছু কিছু পূর্ব্ব-কথা আছে। নীলিমা চাকুরী করিয়া তাহার নিজের ও মা তারই নহে, সমগ্র পরিবারেরই সে অন্নসংস্থান করে বলিলে অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু অত্যধিক বিলাস ও স্বচ্ছলতায় তাহার শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত হইয়াছিল।

নীলিমার দাদা তাহার অপেক্ষা কুড়ি বৎসরের বড়। তিনি জ্যেষ্ঠ, নীলিমা কনিষ্ঠা; মধ্যে আর যে সাত-আটটি ভাই-বোন জন্মিয়াছিল, তাহারা সকলেই গতাসু। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুবিনয় ব্যবসায়ী। নীলিমা শৈশবে পিতৃহীনা হইলেও এই পিতৃতুল্য স্নেহময় ও ধনী সহোদরের স্নেহচ্ছায়ায় প্রতিপালিত হওয়ায় বিপুল প্রাচুর্য্য উপভোগ করিয়াছিল. দাদা সর্ব্বদা তাহার আব্দার রক্ষা করিয়া চলিতেন।

আজ আর সে দিন নাই।

তাহার মসীলিপ্ত মনশ্চক্ষুর সম্মুখে অকস্মাৎ সেই রঙিন্ দিনগুলির সুখস্মৃতি ভাসিয়া উঠিল; কিন্তু আজ তাহার চিন্তাধারা অনন্যমুখী থাকায় ভূপতিই সেখানে আসিয়া জুড়িয়া বসিল।

নীলিমা যখন সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ে, তখন ভূপতি তাহার গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হয়। ভূপতি তখন সবে আই এ পড়িতেছিল; তাহার বয়স তখন উনিশ কি কুড়ি, আর রূপ যেন কন্দর্প তুল্য। নীলিমা কালো হইলেও কৈশোরের লালিত্য তাহার দেহে লাবণ্য বিকাশ করিয়াছিল। কিছু দিন মধ্যে দু'জনেই পরস্পরের প্রণয়াসক্ত হইল। ইহার পর এক দিন মামাত বোনের দ্বারা সে মাকে জানাইল, ভূপতি ভিন্ন অন্য কাহাকেও সে বিবাহ করিবে না। মা নিজেও ব্যাপারটা অনুমান করিয়াছিলেন; এবার কথাটা পুত্রের গোচর করিয়া বলিলেন, "বিনু, নীলাটা নমিকে দিয়ে আমায় কি বলিয়েছে জানিস্? সে বলে, তার মাষ্টার ভিন্ন আর কাউকে সে বিয়ে করবে না।"

সুবিনয় ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "হুঁ, মাকাল ফল দেখেই ভুলে গেছে! ছেলেমানুষ বৈ ত নয়! মা—অন্নদা এমন মন্তব্য শুনিবেন, এরূপ মনে করেন নাই; কারণ, কন্যার নির্ব্বাচন তাঁহার নিজেরও মনোমত হইয়াছিল। রূপের মোহিনী শক্তি আছে,—এই নিরূপম সুন্দর সুকুমার ছেলেটি যখন মা বলিয়া তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইত, তখন তাহার এই সম্বোধনটাকে স্থায়িত্ব দানের জন্য তাঁহার নিজেরও বাসনা প্রবল হইয়া উঠিত।

সুবিনয় মায়ের মুখভাব লক্ষ্য করিয়া তাঁহার মনের গতি বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "তুমি কি বলো মা?—মা তখন কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন, "তাতে দোষ কি বাবা! ছেলেটি ভালো, আর করণীয় ঘরও বটে।"

সুবিনয় হাসিয়া বলিলেলন, "এ রাঙ্গা মূলো দেখে তুমিও ভুললে? কিন্তু ওকে কি দেখে দেব? কি আছে ওর? মোটে ত আই-এ পড়ছে। ওর ভবিষ্যৎ কি, তা ভেবে দেখেছ?"

অন্নদা প্রদীপ্ত মুখে বলিলেন, "ওর কিছু নেই, কিন্তু আমার তুমি আছ! তুমি থাকতে আমি কারুর জন্যে ভাবিনে বাবা!"

সুবিনয় মায়ের মুখপানে চাহিয়া আবার হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "তুমি না হয় ভাব না, কিন্তু আমি থেকে ওর কি করব? বলছ, নীলু আমার কাছেই থাকবে; তার মানে ভূপতিকে তুমি কি ঘরজামাই ক'রে রাখতে চাইছ?"

অন্নদা জিভ কাটিয়া বলিলেন, "দুর্গা, দুর্গা! পরের ছেলে এনে ঘরজামাই করে পোষা সাত-জন্মের পাপ! তা বলবো কেন? তোমার কারবারে কত লোক প্রতিপালন হচ্ছে; তুমি তোমার ভগিনীপতির জন্যে আর কোন-একটা ব্যবস্থা করতে পারবে না? তোমার ত বলে —হাত ঝাড়লেই পর্ব্বত!"

সুবিনয় বলিলেন, "মা, সে কি ভালো? কুটুম্ব কুটুম্বই, সে কর্ম্মচারী হলে কি ভাল দেখায়? আমার ভগিনীপতি আমায় মনিব মনে করে আমার কাছে মাথা হেঁট ক'রে থাকবে? ছি ছি!"

অন্নদা তথাপি নিম্ন স্বরে বলিলেন, "ছেলেটি ভালো, আর—"

সুবিনয় বাধা দিয়া বলিলেন, "কিছুই ভালো নয় মা। তবে ওর চেহারাখানা ভালো বটে! তা ছাড়া, ওর কি আছে? বিষয়-সম্পত্তি, বিদ্যা, বংশমর্য্যাদা কিছুই ওর লোভনীয় নয়। শুধু রূপ দেখে ভুলে গেলে নীলার ভবিষ্যৎ জীবন শান্তিতে কাটবে না।"—অবশেষে তিনি মাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "তুমি কিছু ভেব না মা, এমন জামাই তোমায় এনে দেব যে, দেখে সকলেরই মুখে তার প্রশংসা শুনতে পাবে। তখন দেখো মা—নীলু তার নিজের মস্ত গাড়ী নিয়ে রোজ তোমার দোরে এসে দাঁড়াবে, রোজ চার বার করে তোমায় ফোন করবে। ভগিনীপতি আমার বাড়ী ঢুকবে মাথা উঁচু করে। বিদ্যা-বুদ্ধির দিক্ দিয়ে আমার চেয়ে সে বড় হবে।...সেই ভালো হবে? না, এই চাল-চুলোহীন রূপসর্ব্বস্ব জামাইকে ভালো বলবে?"

ইহার পর অন্নদার আর কিছুই বলিবার রহিল না, বাধ্য হইয়াই তিনি চুপ করিলেন; পুত্রের কথার সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিলেও ভূপতির জন্য তাঁহার মনটা কেমন লোভাতুর হইয়া রহিল।

ইহার পর মাস শেষ হইলে সুবিনয় মাকে বলিলেন, "ভূপতিকে জবাব দিলুম মা! ওকে মাষ্টার রাখাই ভুল হয়েছিল আমার। দেখছি, নীলুর লেখাপড়ায় উন্নতি না হোক, ক্ষতির আশঙ্কাই বেশী!"

সুবিনয় ভূপতিকে নীলিমার সম্মুখ হইতে সরাইবার ব্যবস্থা করিলেও তাহারা পরস্পরকে ছাড়িল না। ম্যাট্রিক পাশ করিয়া নীলিমা বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্ত্তি হইল। এই সময়েই সুবিনয়ের ব্যবসায়ে অকস্মাৎ ভাঙ্গন ধরিল! ঘরের গাড়ী বিক্রয় হইয়া গেল, নীলিমা কলেজের বাসে যাতায়াত করিতে লাগিল; উভয়ের দেখা-সাক্ষাতের কিছু কিছু সুবিধা হইল। ইহার পর সুবিনয়ের বৈষয়িক অবস্থা দিন দিন ক্রমেই শোচনীয় হইতে লাগিল; তখন অগত্যা নীলিমার বিবাহের প্রসঙ্গ চাপা পড়িয়া গেল। নীলিমা নিশ্চিন্ত মনে পড়িতে ও ভূপতির সঙ্গে ঘোরাঘুরি করিতে লাগিল। দাদার তখন আর্থিক ও মানসিক উভয় অবস্থাই শোচনীয়; কাজেই নীলিমা তাঁহাকে আর তেমন আমলে আনিল না।

ভূপতি তখন মেডিক্যাল কলেজে ঢুকিয়াছে। দেশে তাহার যাহা কিছু সম্বল ছিল, মাতৃবিয়োগের পর সমস্ত বিক্রয় করিয়া নগদ টাকা ব্যাঙ্কে রাখিয়া সে ডাক্তারী পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে।

ইহার পর কয়েক বৎসর নীলিমার যে কি করিয়া কাটিয়াছে, তাহা শুধু ভগবানই জানেন!—দিবানিশি অভাবের কষ্ট সহ্য করিয়া কোন মতে সে বি-এ পাশ করিল। সৌভাগ্যক্রমে পাশ করিবার পরই দেড় শত টাকা বেতনের এই চাকুরিটা জুটিয়া গেল। তদ্ভিন্ন, সে

বাসের জন্য বাড়ীও পাইল, এবং কোন জমীদারের কন্যা ও পুত্রবধূকে পড়াইবার কাজ পাওয়ায় তাহাতে তাহার আরও ৩০ টাকা আয় হইল। ভূপতিকে ছাড়িয়া বিদেশে আসিয়া নীলিমার এই কাজ লইবার তেমন ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু ভূপতি নিজের অর্থাভাব জানাইলে নীলিমা বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া এই চাকুরী গ্রহণ করিল। তদবধি মা ও সুবিনয়ের বড় ও মেজ মেয়েকে লইয়া সে এখানেই আছে। দাদাকে প্রতি মাসে ৫০্ টাকা এবং ভূপতিকেও প্রতি মাসে ৩০।৪০ টাকা পাঠায়। প্রয়োজন জানাইলে কোন কোন মাসে তাহাকে ৫০্ টাকাও পাঠায়। এ জন্য তাহাকে কিছু ঋণগ্রস্তও হইতে হইয়াছিল; কিন্তু অত্যন্ত ক্লেশ স্বীকার করিয়া তাহা সে পরিশোধ করিয়াছে। এই সকল অসুবিধার জন্য কোন দিন সে ক্ষুব্ধ হয় নাই।

ইহার পর মাঝে মাঝে দুই-এক বেলার জন্য ভূপতির সহিত নীলিমার সাক্ষাৎ হইয়াছে। পরীক্ষায় পাশ করিয়া গ্রীষ্মের ছুটীর সময় ভূপতি তাহাকে লিখিয়াছিল, "তোমার ত এখন ছুটী; আমার ইচ্ছা দু'জনে দার্জ্জিলিংএ বেড়িয়ে আসি। আজ চার বছর তুমি প্রবাসে কাটালে, দুই-এক ঘণ্টার জন্য তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে, তাতে তৃপ্তি পাইনি।"

নীলিমা উত্তরে লিখিল, "আমি প্রস্তুত, তুমি কবে আস্‌ছো লিখবে।"

তাহার পর আট দিন দার্জ্জিলিংএ থাকিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য নীলিমা তাহার ছয় গাছি চুড়ীর চারি গাছি বিক্রয় করিয়া ফেলিল।

অন্নদা মেয়ের হাতে চুড়ী চারি গাছি দেখিতে না পাওয়ায় তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নীলিমা বলিল, "বিক্রী করে ফেলেছি, বেড়াতে যাবো কি না।"

মা এই সংবাদে রাগ করিয়া বলিলেন, "কি ডোকলা মেয়ে রে তুই! গায়ের গয়না বিক্রী করে বেড়াতে যাবার সখ? ভূপতিও যাবে বুঝি?"

নীলিমাও রাগিয়া উঠিয়া বলিল, "মানুষের সখ—সাধ থাকে না? তোমার ছেলের সংসার আমায় যদি না পুষতে হত, তাহলে কি আমায় গায়ের গয়না বেচতে হয়? যত দিন থেকে চাকরী করছি, কেবল তো ভার বয়েই মরছি।"

এ গঞ্জনা মায়ের পক্ষে মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণাদায়ক; তিনি আর কথা বলিলেন না।

তাহার পর এক দিন সে দার্জ্জিলিং যাত্রা করিল। শিলিগুড়িতে ভূপতির সহিত দেখা হইলে ভূপতি প্রথমেই যাহা বলিয়াছিল, তাহা অত্যন্ত জ্বালার সহিত তাহার মনে পড়িল। ভূপতি বলিয়াছিল, "এঃ, নীলা, তুমি যে ভয়ানক মোটা হয়ে পড়েছ। 'এক্সারসাইজ' করো, 'এক্সারসাইজ' করো!"—নীলিমা সেই হইতে প্রতিনিয়ত ব্যায়াম করিতেছে; কিন্তু ভূপতি তাহার ফলাফল দেখিবার জন্য অপেক্ষা না করিয়াই আজ কৃশাঙ্গী সুন্দরী রেণুর প্রণয় ও রূপে মুগ্ধ!

৩

মায়ের আহ্বানে নীলিমা পিছনে ফিরিল। অন্নদার হাতে একখানি পত্র। দু'জনের কাহারও মানসিক অবস্থা সহজ না থাকায় কেহই অপরের বেদনা-পাণ্ডুর মুখভাব লক্ষ্য করিল না। অন্নদা ভারী-গলায় বলিলেন, "বিনুর চিঠি এসেছে রে!"

নীলিমা নির্ব্বিকার ভাবে মায়ের পানে চাহিয়া রহিল; সহসা দাদার পত্র আসিয়াছে—এ সংবাদে সে সময় তাহার মন বিন্দুমাত্র সাড়া দিল না।

অন্নদা নিজেই বলিলেন, "বৌমার এই ন'মাস পড়ল, এ মাসে কিছু বেশি দিতে পারবি? আঁতুড়-খরচ কিছু তো লাগবে।"

নীলিমা অকস্মাৎ বারুদের স্তূপে অগ্নিস্পর্শের মত জ্বলিয়া উঠিল; কঠোর স্বরে বলিল, "পারব না, আমি কিছুতেই পারব না বলছি, আর একটা কানা-কড়িও আমি দিতে পারব না। বারো মাসই তোমার ছেলে-বৌয়ের রাজ্যের খরচ আমায় যোগাতে হবে, এমন কি কিছু লেখাপড়া আছে?"

অন্নদা সঙ্কোচে এতটুকু হইয়া গেলেন; মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বলিলেন, "অভাব বলেই তো তোকে তা জানিয়েছে—"

নীলিমা বাধা দিয়া উগ্র কণ্ঠে বলিল, "অভাব হয় কেন শুনি? পুরুষমানুষ, হাত পা আছে, সুস্থ শরীর, খেটে রোজগার করে নিজের সংসার প্রতিপালন করতে পারে না? অমন পুরুষের পোড়া কপাল! আমি কিছুই দিতে পারব না। আমায় কি টাকার গাছ পেয়েছো যে, নাড়া দিলেই টাকা ঝ'রে পড়বে?"

অন্নদা আর সহ্য করিতে পারিলেন না, প্রধূমিত ক্রোধ যেন জ্বলিয়া উঠিল; বলিলেন, "নিজের ভাইএর জন্য টাকা বেরোবে কেন? ভূপতিকে ঘুস যোগাবার সময় খুব বেরোয় তো? মনে করিস্ আমি কিছুই টের পাইনে, নয়? মরছিস্ তার পেছনে সর্ব্বস্ব খুইয়ে। মনে করেছিস্, একটু পসার জমাতে পারলে তোকেই পাটরাণী করবে! তার ব'য়ে গেছে! সে ঝানু ছেলে, তোর ঘাড় ভেঙ্গে কাজ বাগিয়ে নিয়েছে, এইবার তোকে কলা দেখাবে। তার দায় পড়েছে তোকে বিয়ে করতে। কোন দিন কি আর্সীতে নিজের মুখখানাও দেখিস্‌নি? ভূপতি আসবে তোর মত মাংসপিণ্ডিকে বিয়ে করতে? হায় রে কপাল!...এই আমি বলে গেলুম দেখিস্—তোর মুখে লাথি মারবে, মেরে সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করে তোর চোখের ওপর সংসার পেতে বসবে। সেই হবে তোর মত নির্ব্বোধের উপযুক্ত শাস্তি! নিমক-হারাম, বেইমান! যে ভাই তোকে বুকে করে মানুষ করলে, তাকে মাসে পঞ্চাশটে টাকা দিস্, তাই জন্যে এতো মুখনাড়া দিচ্ছিস্? তোর তিনটে মাষ্টারের পেছনেই যে সে মাস-মাস পঞ্চাশ টাকা খরচ করেছে। যা যখন আব্দার ধরেছিস্, দ্বিতীয় বার চাইতে হয়নি। আর আজ সেই ভাইয়ের অসময়ে সাহায্য করছিস্ ব'লে তুই যা মুখে আসচে তাই বলছিস্!...বেশ, আমি বিনুকে লিখছি, যদি সে কলকাতার রাস্তায় ছেঁড়া কাগজ কুড়িয়ে বেড়ায় সে-ও ভাল, তবু তোর অশ্রদ্ধার অন্ন যেন মুখে না তোলে—তাকে তার মরা-বাপের দিব্যি দিয়ে লিখ্‌ছি!" কথাগুলা বলিয়া অন্নদা হন্‌-হন্ করিয়া অন্য দিকে চলিয়া গেলেন।

সমুদ্রের উপর দিয়া যেন প্রচণ্ড বেগে তুফান বহিয়া গেল! বিক্ষুব্ধ উত্তাল-তরঙ্গমালার আলোড়ন স্থির হইতেও সময় লাগিল। নীলিমা যখন সমস্ত ঘটনা পুনরায় স্মরণ করিবার ক্ষমতা ফিরিয়া পাইল, তখন তাহার দুই চক্ষু যন্ত্রচালিতের মত ড্রেসিং-টেবিলের দিকে ঘুরিয়া গেল। আয়না দেখিয়া বুঝিল, সে মাংসপিণ্ডই বটে! সে কালো, তাহার উপর শরীর স্থূল হওয়ায় তাহার যৌবনের লাবণ্যটুকুও চলিয়া গিয়াছে। এখন তাহার বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ

বৎসর, কিন্তু মেদবৃদ্ধি বশতঃ তাহাকে স্থূলাঙ্গী গৃহিণীর মত দেখায়। নবোঢ়া বধূ সাজিবার চেহারা সে অনেক দিন পূর্ব্বেই হারাইয়া ফেলিয়াছে। ভূপতির মুখও এই সময় তাহার মনশ্চক্ষে জাগিল। কান্ত মধুর রূপ, সহসা সে রূপের তুলনা মিলে না। আর নীলিমার সর্ব্বাবয়বের কোথাও এমন এক তিলও সৌন্দর্য্য নাই—যাহা ভূপতির বিন্দুমাত্র প্রীতিকর হইতে পারে!

মা জানেন না, কি কঠোর সত্য তিনি দৈববাণীবৎ নিজের অজ্ঞাতসারেই আজ বলিয়া ফেলিলেন। নীলিমার জীবনে তাহাই ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভূপতি আজ অবলীলাক্রমে তাহাকে লিখিতে পারিয়াছে, তাহার সহিত নীলিমার ছেলেখেলা প্রণয় মাত্র। নীলিমা তাহার কষ্টার্জ্জিত অর্থের অধিকাংশই ভূপতির সাফল্য-অর্জ্জনের জন্য ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। আপনাকে প্রতিদিন—প্রতিক্ষণে বঞ্চিত রাখিয়া পতিব্রতা রমণী যেমন একান্ত নিষ্ঠার সহিত স্বামীর জন্য সমস্তই উৎসর্গ করিয়া, তাঁহার কল্যাণ-কামনাকেই একমাত্র কাম্য মনে করিয়া থাকে, তেমনই নীলিমাও সমস্ত বিলাস-বাসনা বর্জ্জন করিয়া ভূপতির সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও উন্নতিকেই একমাত্র কাম্য মনে করিয়াছে; অথচ সে-সকলের মূল্য ভূপতির কাছে যেন কিছুই নয়! নিয়মিত ভাবে অর্থসাহায্যের জন্য অত্যন্ত সাধারণ ভাবে মাঝে মাঝে শুধু কৃতজ্ঞতা স্বীকারেই তাহার কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে। কৃতজ্ঞ! আজ সে শুধু কৃতজ্ঞ! এ কথা মনে করিতে গিয়া সহসা তাহার স্মরণ হইল, ঠিক এই ভাবেই সে নিজেও তো স্নেহের ঋণ অস্বীকার করিয়াছে! দাদা তাহার পিছনে জলের মত অর্থব্যয় করিয়াছেন; স্নেহের তাঁর সীমা-পরিসীমা ছিল না। কোন দিন নিজের ছেলে-মেয়েদেরও তেমন আদর করেন নাই। এই ভূপতিকে শুধু দাদাই রূপ-সর্ব্বস্ব বলিয়া প্রত্যাখান করিয়াছিলেন, এবং কালবিলম্ব না করিয়া তাহার সম্মুখ হইতে তাহাকে অপসারিত করিয়াছিলেন। নীলিমার তাহা মনঃপূত হয় নাই, তাই দাদার সতর্কতাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া দিশাহারা হইয়া সে অন্ধ-আবেগে যে আলেয়ার পশ্চাতে ছুটিয়াছিল, আজ তাহাকে তাহা পঙ্কিল জলাভূমিতে আনিয়া তাহার জীবন ব্যর্থ করিয়া দিল! আজ জীবনের সমাপ্তি! নীলিমা চমকিয়া উঠিল, জীবনের সমাপ্তি! কি শ্রুতিমধুর শব্দ! যেন প্রণয়ীর মৃদু-গুঞ্জন! জীবনের সমাপ্তি! এ অভিশপ্ত ব্যর্থ জীবনের পরিসমাপ্তি! ইহাই কি এখন কাম্য?

এতক্ষণ পরে নীলিমার মন কতকটা স্থির হইল। তাহার দিশাহারা জীবনের ভুল-পথ ছাড়িয়া এই বার সে সত্য পথের সন্ধান পাইয়াছে। আর ভুল নয়, ইতস্ততঃ নয়; সে দৃঢ় অটল পদে অগ্রসর হইবে। দাদার মুখ মনে পড়িল। স্নেহময় পিতৃতুল্য হিতাকাঙ্ক্ষী সহোদর, কতই না সাধ তাঁর ছিল নীলিমাকে লইয়া! ধনী, চরিত্রবান্, বিদ্বান্ পাত্রে তাহার বিবাহ দিবেন,—ঘরে মোটর থাকিবে, ফোন থাকিবে; আভিজাত্যের আধুনিক সকল উপকরণের সে অধিকারিণী হইবে। দাদা বলিতেন, "আমার বোন কালো, আমি সোনা দিয়ে তাকে মুড়িয়ে দেব।"

৪

অনেক দিন হইতে দাদাকে সাহায্য করিতে হয় বলিয়া নীলিমা ভিতরে ভিতরে তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। দাদার কথা মনে হইলে তাহার মন অবজ্ঞায় ভরিয়া উঠিত। আজ সহসা অতীতের কথা স্মরণ করিয়া, মাঝের কয়টা অপ্রিয় বৎসরের স্মৃতি মুছিয়া-ফেলিয়া দাদার প্রতি সহানুভূতি ও মমতায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইল। আপনাকে অত্যন্ত অপরাধী মনে করিয়া সে তখনই কুণ্ঠা ও সঙ্কোচে এতটুকু হইয়া গেল! তাহার মনে হইল, দাদাকে যতটা সাহায্য করা তাহার উচিত ছিল, তাহা না করিয়া সে অন্যায় করিয়াছে। যতটা করিবার ক্ষমতা তাহার ছিল, ততটাও করে নাই! দাদাকে সাহায্য না করিয়া সেই টাকাগুলি ভূপতিকেই দিয়াছে, অথচ তাহা ভস্মে ঘৃতাহুতির মত হইয়াছে। ভূপতি নৌকায় নদী পার হইয়াই পদাঘাতে তাহা উল্টাইয়া-ফেলিয়া তীরে উঠিয়াছে। পুরাতন জীর্ণ কদাকার তরণী আজ তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন!·· যদিও দাদাকে সে যাহা দিত, তাহাতে তাহার অন্তরের তেমন কোন প্রেরণা ছিল না; বরং প্রতি মাসেই দুইখানা মণি-অর্ডার লিখিবার সময় তাহার মনে হইত, দাদার ভার বহিতে না হইলে সে ভূপতিকে আর একটু স্বচ্ছল অবস্থায় রাখিতে পারিত। দাদার নিকট হইতে প্রাপ্তি-স্বীকারের যে পত্র পায়—তাহা আন্তরিক আশীর্ব্বাদ; কত লজ্জা, কত ক্ষোভে পরিপূর্ণ; কিন্তু নীলিমা সে লজ্জা ও ক্ষোভপূর্ণ পত্র পড়িয়া কোন দিন ব্যথিত হয় নাই; ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া খাম খুলিয়াছে, এবং কুঞ্চিত ভ্রূ লইয়াই তাহা নিতান্ত উপেক্ষা-ভরে ফেলিয়া রাখিয়াছে। আজ সহসা সেই সকল বিগত দিনের স্মৃতি মনে করিতেই তাহার মর্ম্মস্থল ক্ষোভ, বেদনা ও আত্মগ্লানিতে ভরিয়া উঠিল। আজ ভূপতির ব্যবহারে সে মর্ম্মাহত হইয়াছে; কিন্তু নিজে সে তাহার অপেক্ষা শতগুণ গর্হিত কাজ করিয়া আসিতেছে। সে ভিখারীকে মুষ্টিভিক্ষা দেওয়ার মনোভাব লইয়া দাদাকে সাহায্য করিয়াছে,—যে দাদা তাহাকে ভালবাসিতেন বক্ষ-শোণিতের তুল্য! এইমাত্র দাদাকে উপলক্ষ করিয়া মা'কে সে যাহা বলিয়াছে, এবং মা-ও যে উত্তর দিয়াছেন, উভয়ই যুগপৎ তাহার মনে পড়িল। নীলিমা ক্ষণকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর কিছু পরে হঠাৎ চমক ভাঙ্গিলে সে সোজা হইয়া বসিয়া প্যাডখানা টানিয়া-লইয়া পত্র লিখিতে বসিল। লিখিল—"ভূপতি বাবু!" আজ আর অন্য দিনের মত তাহার লেখনীমুখে 'আমার চির-সুন্দর' সম্বোধন বাহির হইল না;—লিখিল, "ভূপতি বাবু, আপনার পত্র পাইয়াছি। আমি আপনাকে কত টাকা দিয়াছি তাহার হিসাব রাখি নাই। আনুমানিক হিসাব এই চারি বৎসরে মাসে ত্রিশ টাকা করিয়া ধরিতেছি; তাহাতে প্রায় ১৪৫০৲ টাকা হইতে পারে। আপনি ঐ টাকা দাদাকে তাঁহার নেবুবাগানের বাসায় দিয়া আসিলে উপকৃত হইব। ইতি—

নীলিমা ব্যানার্জ্জী।"

পত্রখানা সে শত বার উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া পড়িল। কে বলিবে, ইহা ভূপতিকে লিখিত নীলিমার পত্র? ইহা যেন পাকা মহাজনের তাগিদ! ইহাতে কুণ্ঠার কোন কারণ ছিল না; ভূপতি তো ইহা ব্যতীত নীলিমার সহিত অন্য সম্পর্ক স্বীকার করে নাই!

কতক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া-থাকিয়া সে আর একখানি পত্র লিখিল,—"দাদা, কয়েক দিন হইল আপনার পত্র পাইয়াছি। একটা সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। ভূপতি বাবুকে আমি প্রায় দেড় হাজার টাকা ঋণ দিয়াছিলাম; অবশ্য, কোন লেখা-পড়া নাই। সেই টাকা

তিনি এখন ফিরাইয়া দিতে চান। আমি আজ তাঁহাকে পত্র লিখিয়া জানাইলাম, আপনার বাড়ী গিয়া টাকাগুলি, তিনি যেন আপনাকে দিয়া আসেন। আপনি ব্যবসায়ে সুদক্ষ,—আশা করি, ঐ কয়টা টাকা লইয়াই আবার বৈষয়িক কাজে নামিয়া পড়িবেন। ভগবান্ এবার আপনার শ্রম সফল করুন। আর এক কথা, ভূপতি বাবুর হাত হইতে টাকা পাইবার পূর্ব্বে কোন পারিবারিক কথার উল্লেখ করিবেন না—তাহা যতই গুরুতর হউক।

স্নেহের নীলিমা।"

পত্রখানা দুই-তিন বার পড়িবার পর সে, সেখানা লইয়া মায়ের কক্ষাভিমুখে চলিল। অকস্মাৎ তাহার মনে হইল, তাহার মাথাটা অত্যন্ত হাল্কা ও দেহটা অতিশয় গুরুভার হইয়া পড়িয়াছে; তাহার প্রতি পদক্ষেপে ধরিত্রী যেন টলমল করিয়া উঠিতেছে।

টলিতে টলিতে সে মায়ের কক্ষদ্বারে গিয়া পৌঁছিল, দেখিল, মা পত্র লিখিতেছেন; তাঁহার গালের উপর দু'টি স্থূল অশ্রুধারা। সুবিনয়ের দুই প্রাপ্তবয়স্কা কন্যা পিতামহীর দুই পাশে বসিয়া পত্রখানি পড়িতেছে; তাহাদেরও চক্ষুদু'টি জলপূর্ণ।

নীলিমা গাঢ় স্বরে ডাকিল, "মা!"

তড়িদ্বেগে অন্নদা মুখ তুলিলেন, মেয়ে দু'টিও চাহিয়া দেখিল। নীলিমা দুয়ারের উপর বসিয়া-পড়িয়া কপাটে মাথা রাখিয়া বলিল, "দাদাকে চিঠি লিখছ মা?"

মা অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সে কথায় তোর দরকার কি?"

নীলিমা মিনিটখানেক মৌন থাকিবার পর বলিল, "ও চিঠি তুমি ছিঁড়ে ফেল। আমি খুব অন্যায় করেছি, কিন্তু তুমি মা হয়ে তা ক্ষমা করবে না?"

অন্নদা রোষরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "না; কারণ, ক্ষমার একটা সীমা আছে।" বলিয়া তিনি পুনরায় কলম তুলিলেন।

নীলিমা ক্লান্ত কণ্ঠে বলিল, "মা, আজ আমায় জীবনের মত ক্ষমা করো মা! আর কখন এমন অন্যায় কথা আমার মুখ থেকে বেরোবে না। আমি কতখানি অন্যায় করেছি, তা হাড়ে হাড়ে বুঝেছি।" ভাইঝি দু'টির দিকে চাহিয়া সমবেদনায় তাহার বুকের যেখানটা একেবারে খাঁ-খাঁ করিতেছিল, সেখানটা অকস্মাৎ ভারী হইয়া উঠিল। মনে হইল, ইহারা কোন দিন তাহাকে পিসিমা ভাবিয়া একটি কথা বলিতে সাহস করে নাই; স্কুলেও যেমন এখানেও তেমনি প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর মর্য্যাদাই দিয়াছে। সেও কোন দিন তাহাদের ডাকিয়া আদর করিয়া কথা বলে নাই; তাহার কারণ, তাহার মন দিক্-দর্শন যন্ত্রের মত সর্ব্বদাই একমুখী থাকিত; তাই একটি পাই-পয়সাও ব্যয় করিতে তাহা তাহাকে কাঁটার মত বিঁধিত। মনে হইত, সমস্তই তাহার অপব্যয় হইতেছে। মা ব্যতীত তাই প্রত্যেকেরই ভার সে অত্যন্ত বিরক্তি ও অনিচ্ছায় বহন করিয়াছে। ইহারা স্নেহ পাইবে কোথা হইতে?

নীলিমা তাহাদের পানে চাহিয়া কোমল স্বরে বলিল, "তোরা কাঁদছিস কেন, মণি, রেবা? আয়, আমার কাছে উঠে আয়, লক্ষ্মী মা আমার!"

পিসিমার মুখ হইতে এই স্নেহমাখা কথা শুনিয়াও মেয়ে দু'টি উঠিয়া-আসা দূরের কথা, দুই হাঁটুর ভিতর মুখ গুঁজিল। নীলিমা হাত বাড়াইয়া মায়ের পায়ে রাখিয়া বলিল, "মা, তোমার পায়ে ধরছি, ও-চিঠি তুমি ছিঁড়ে ফেল। দাদাকে এ সব কথা কিছু লিখ না; আর এই চিঠিখানাও তোমার চিঠির সঙ্গে দাদাকে পাঠিয়ে দিও।"—বলিয়া হস্তস্থিত পত্রখানা মায়ের পায়ের কাছে রাখিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া গেল।

সমস্ত পৃথিবী তখন তাহার চোখে ঘন কালিমায় সমাচ্ছন্ন।

* * * *

খানিকটা পরে মা ক্রোধ সম্বরণ করিয়া নীলিমার পত্র পড়িতে লাগিলেন। পত্রখানা ছোট বটে, কিন্তু পড়িয়া তাঁহার মনে কেমন-একটা ধাঁধা লাগিল। ভূপতি ঋণ লইয়া তাহা ফিরাইয়া দিতেছে কেন? নীলিমার টাকা তো তাহার ঋণ নয়! আর শেষের দিকে একি কথা? কি এমন পারিবারিক গুরুতর কথা হইবে? এ যেন তাঁহার কেমন দুর্ব্বোধ্য হেঁয়ালী বলিয়া মনে হইল।

এতক্ষণের পর অকস্মাৎ মনে পড়িয়া গেল, নীলিমার মুখখানি কেমন যেন বিবর্ণ, প্রাণহীন দেখিয়াছিলেন। এ আবার কি হইল? কি এমন ঘটিল? একবার তাহাকে জিজ্ঞাসা না করিলেই তো নয়! বুকের ভিতরটা তাঁহার ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল; এইমাত্র তাহাকে অভিসম্পাত দিয়া আসিয়াছেন যে!...কিন্তু তিনি তখনই ভগবান্‌কে মনে মনে অসংখ্য প্রণতি জানাইয়া বলিলেন, "ঠাকুর, রাগের ঝোঁকে বলেছি বলে সত্যই তা চাইনি, তুমি তো মায়ের মন বোঝ। ভূপতি যেন ওকে সোনার চোখে দেখে। ও যে পেট ভরে খায়নি, প্রাণ ধরে একখানা ভাল কাপড় পরেনি, শুধু তার উন্নতিই খুঁজেছে।..."

তিনি পত্রখানা সেখানেই রাখিয়া-দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

রেবা বলিল, "কি হ'ল ঠাকুরমা?"

অন্নদার গলার শব্দ অজ্ঞাত বিপদাশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল; তিনি বলিলেন, "কিছু বুঝতে পাচ্ছি না রে! নীলুর কাছে যাচ্ছি। হাঁ রে, ওর মুখ বড় শুক্‌নো দেখাচ্ছিল না? মণি, দেখেছিলি?"

মণি বলিল, "আমারও তাই মনে হচ্ছে ঠাকুরমা! একটা কিছু হয়েছে বোধ হয়—"

চিঠি দুইখানা চাপা দিয়া তিন জনেই উঠিয়া নীলিমার কক্ষাভিমুখে চলিলেন।

নীলিমার কক্ষদ্বার রুদ্ধ। অন্নদার বুক কাঁপিয়া উঠিল। সশব্দে করাঘাত করিয়া ডাকিলেন, "নীলি, নীলু—ও নীলু!" ভিতর হইতে যন্ত্রণা-মথিত শব্দ আসিল, "আমায় ক্ষমা ক'রো মা।" এবং পরক্ষণেই একটা চেয়ার-পড়ার জোর শব্দ হইল। অন্নদা সভয়ে দুয়ারে করাঘাত করিতে করিতে চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "ও নীলু! নীলু রে!"

মণি ও রেবা দৌড়াইয়া জানালার কাছে গেল; খড়খড়ি টানাটানি করিয়া তুলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, "ঠাকুরমা গো! পিসিমা পাখায় কাপড় খাটিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলছে!—মা গো!"

শ্রীমায়াদেবী বসু।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রজার মনোভাব

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

"রাজার জাতি" কর্ত্তৃক হিন্দুর দেববিগ্রহ ভঙ্গ একটি সাধারণ ঘটনা ছিল বলিয়াই মনে হয়। প্রজার প্রতি এই অত্যাচার যে আইন অনুসারে অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত, প্রাচীন সাহিত্যে এমন কোন প্রমাণ পাই নাই। হিন্দুরা এ বিষয়ে রাজার কাছে কখন অভিযোগ উপস্থাপিত করিবার কল্পনাও করিত না; সকলেই সাধ্যানুসারে স্ব স্ব বিগ্রহরক্ষার চেষ্টা করিত। স্বয়ং রাজারাই যে কার্য্যে লিপ্ত থাকিতেন,* সেই কার্য্য রাজার জাতির দ্বারা সম্পন্ন হইলেও তাহাদের অপরাধ হইত না।

"ম্লেচ্ছভয়ে" দেব-বিগ্রহের কি অবস্থা হইত, তাহার একটি দৃষ্টান্ত "অদ্বৈতপ্রকাশে" দেখা যায়। অদ্বৈত ঠাকুর নানা তীর্থ ভ্রমণের পর বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া স্বপ্নাদেশ অনুসারে যমুনাতীরস্থ কোন স্থান হইতে মৃত্তিকাপ্রোথিত মদনমোহন বিগ্রহ উদ্ধার করেন; এবং একটি মন্দিরে বিগ্রহ-স্থাপন করিয়া জনৈক "সদাচারী বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ"কে সেবায় নিযুক্ত করিয়া পরিক্রমায় বাহির হন। এদিকে:—

"দুষ্ট যবনেরা পাঞা ঠাকুরের তত্ত্ব।
ভাবে ঠাকুর ভাঙ্গি হিন্দুর নাশিমু মহত্ত্ব।
যুক্তি করি ম্লেচ্ছগণ হইয়া একত্র।
অদ্বৈত বটেতে আইলা লঞা অস্ত্র শস্ত্র।
মদনমোহন দুষ্ট ম্লেচ্ছ ভয় পাঞা।
পুষ্পতলে লুকাইলা গোপাল হইয়া।
ম্লেচ্ছগণ প্রবেশিয়া শ্রীমন্দির দ্বারে।
ঠাকুর না দেখি গেল দুঃখিত অন্তরে।"

সন্ধ্যাকালে অদ্বৈত ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, ঠাকুর নাই; তিনি রোদন করিতে লাগিলেন। রাত্রিকালে মদনমোহন স্বপ্নে বলিলেন:—

"উঠহ অদ্বৈত মুঞি ম্লেচ্ছগণ ডরে।
গোপাল হইয়া লুকাইল পুষ্পান্তরে।"

তখন ঠাকুরকে তুলিয়া-আনিয়া মন্দিরে স্থাপন করা হইল; কিন্তু দেবতা নিজেই "ম্লেচ্ছভয়ে" উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন, এবং বলবান্ রক্ষকের তত্ত্বাবধানে থাকিতে চাহিলেন। এই উদ্দেশ্যে অদ্বৈতকে স্বপ্নাদেশ দেওয়া হইল:—

"অহে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শুন এক কথা।
মথুরার চৌবে এক আসিবেক হেথা।
ইঁহা দুষ্ট ম্লেচ্ছগণের অত্যাচার হয়।
চৌবে মোরে সমর্পিয়া হও নিঃসংশয়।"

অতএব, চৌবের হস্তে ঠাকুরকে সমর্পণ করা হইল।

"চৈতন্যচরিতামৃতে"ও (মধ্যলীলা) দেবতার ও দেবতার সেবকগণের "ম্লেচ্ছভয়ে" পলায়নের বর্ণনা আছে:—

"অন্নকূট নামে গ্রামে গোপালের স্থিতি।
রাজপুত লোকের সেই গ্রামে বসতি।
একজন আসি রাত্রে গ্রামীকে বলিল।
তোমার গ্রাম মারিতে তুরুকধারী সাজিল।
আজি রাত্রে পলাহ, না রহিহ একজন।
ঠাকুর লঞা ভাগ, আসিবে কালি যবন।
শুনিয়া গ্রামের লোক চিন্তিত হইল।
প্রথমে গোপাল লঞা গাঠোলি গ্রামে থুইল।
বিপ্রগৃহে গোপালের নিভৃতে সেবন।
গ্রাম উজাড় হইল, পলাইল সর্ব্বজন।
ঐছে ম্লেচ্ছভয়ে গোপাল ভাগে বারে বারে।
মন্দির ছাড়ি কুঞ্জে রহে, কিবা গ্রামান্তরে।
* * * *
ম্লেচ্ছভয়ে আইলা গোপাল মথুরা নগরে।
একমাস রহিল বিঠ্ঠলেশ্বর-ঘরে।"

'প্রেমবিলাস' গ্রন্থেও 'অদ্বৈতপ্রকাশের' ঘটনার বর্ণনা আছে।

বৈষ্ণব-সাহিত্য ব্যতীত, মনসা-সাহিত্যেও হিন্দুর দেবপূজা ও দেবস্থানের প্রতি আক্রমণের যে বর্ণনা আছে, তাহাতেও মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, ঐরূপ অত্যাচার হিন্দু জনসাধারণের নিকট বিস্ময়কর বা অপ্রত্যাশিত ছিল না। দ্বিজ বংশীদাসের 'পদ্মপুরাণ' অনুসারে মনসাপূজার স্থানে কাজী "সসৈন্য" উপস্থিত হইলেন।

"কটক সনে হোসেন, করিয়াছেন গমন
লড়ে আসি মিলিলা সত্বরে।
আগে পাইল ব্রাহ্মণ, ধরিয়া ছিঁড়িল নয়ন,
মাথায় মারিল যে পাথরে।
যত পাইল আশপাশ, ধরি কৈল জাতিনাশ,
মারিয়া কাটিল নাক কাণ।
থাইয়া আসার বাড়ি, ব্রাহ্মণে পাড়ে লড়ালড়ি,
হস্তেতে লইয়া পুঁথি খান।
* * * *
আসার বাড়ি মারি ঘট কৈল খান খান।
যার লাগ পায় তার কাটে নাক কাণ।"

এই ঘটনার পূর্ব্বেই হাসান-হোসেনের "দূত" মনসার পূজার ঘট দেখিবামাত্র ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল।

"বিবিধ প্রকারে গোপ পদ্মারে পূজিল।
হেনকালে হাসান-হোসেনের দূত আইল।
আছাড় মারিয়া ঘট ফেলিল ভাঙ্গিয়া।
পূজার যতেক দ্রব্য ফেলে ছড়াইয়া।"

বিজয় গুপ্তের 'মনসামঙ্গলে'ও অনুরূপ বর্ণনা আছে। তকাই মোল্লা রাখালদিগের মনসার ঘট ভাঙ্গিতে গিয়া লাঞ্ছিত হইয়া আসিয়া কাজীকে জানাইল। কাজী সদলে রাখালদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন:—

"সাজ সাজ বলিয়া কটকে পড়ে সাড়া।
ছোট বড় সাজিয়া আসিল হোসেন-পাড়া।

---

* হোসেন শাহ উড়িষ্যা-অভিযানে যাইবার সময় সনাতনকে সঙ্গে লইতে চাহিলে সনাতন বলিয়াছিলেন, "যাবে তুমি দেবতার দুঃখ দিতে" ইত্যাদি (চৈঃ-চরিতামৃত, মধ্যলীলা)।

যতেক যবন আছে হোসেনের পাড়া।
নগর হইতে আসিল পুরুষ মাথামুড়া।"

ইহারা পূজার ঘর, মনসার ঘট ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া ফেলিল :—

"কাজির আজ্ঞায় সৈয়দগণ চলে।
ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলে সমুদ্রের জলে।
কেবা বুঝিতে পারে পদ্মার পরিপাটি।
কোদালে কাটিয়া ফেলে ঘরভিটার মাটি।
*   *   *   *
মাটির গঠন ঘট কনকের চূড়া।
দারুণ যবনে ঘট করিলেক গুঁড়া।"

মনসা-সাহিত্যের অন্যত্রও এরূপ বর্ণনা আছে।

দেবস্থান ও দেবপ্রতিমার প্রতি অত্যাচারের যে বর্ণনাগুলি দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্ধৃত হইল, তৎকালীন শাসকবর্গের ও তাঁহাদিগের স্বধর্ম্মাবলম্বীদিগের হিন্দুধর্ম্ম-বিদ্বেষের উহাই চূড়ান্ত প্রমাণ। তুর্কী-মোগলশাসনযুগের সমসাময়িক বলিয়া—ঐ গ্রন্থগুলির বিবরণের ঐতিহাসিক মূল্য নগণ্য নহে। এ ক্ষেত্রে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, তৎকালীন সাহিত্যকারেরা রাজনৈতিক (অর্থাৎ রাজাদিগের ও তাঁহাদের স্বধর্ম্মীদের সম্পর্কিত) ব্যাপার-সমূহ সাহিত্যে সাবধানে যথাশক্তি এড়াইয়া চলিতেন; নতুবা, আমরা সে কালের ইতিহাসের প্রচুর উপাদান সাহিত্য হইতেই সংগ্রহ করিতে পারিতাম।

৩

"ম্লেচ্ছ"-স্পর্শে ঘৃণা, বেনাপোলের রামচন্দ্র খানের উপর "ম্লেচ্ছ" রাজার দৌরাত্ম্য, "যবনের ভয়," "কাল যবন রাজা"।

প্রাচীন সাহিত্যে "ম্লেচ্ছ"-স্পর্শে হিন্দুর কলুষিত হওয়ার কথা, (বিশেষতঃ, "ম্লেচ্ছের" অন্নজল-গ্রহণে "জাতি-যাওয়ার" কথা) এত অধিক সংখ্যক স্থলে বর্ণিত আছে যে, প্রাচীন সাহিত্যের পাঠক মাত্রেরই তাহা সুবিদিত। এ স্থলে কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল।

'পদ্মপুরাণে' বর্ণিত কাজি-বনাম-রাখাল-সংক্রান্ত ঘটনায় কাজী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, "এড়ারুটি খাওয়াইয়া রাখালদিগের জাতি মারিবেন।"* চৈতন্যসাহিত্যে সুবুদ্ধিরায়ের বৃত্তান্ত সুপরিচিত। হোসেন শাহ "কারোয়ার পানি" (বদনার জল) খাওয়াইয়া সুবুদ্ধির "জাতি" মারিয়াছিলেন। জাতিনাশে, সুবুদ্ধি হিন্দুর দৃষ্টিতে এত কলুষিত হইয়াছিলেন যে, তিনি বারাণসীতে যাইয়া পণ্ডিতদিগের নিকট প্রায়শ্চিত্ত-বিধান চাহিলে, তাঁহাকে বলা হইয়াছিল যে, উত্তপ্ত ঘৃত পানে প্রাণত্যাগ করাই উক্ত পাপের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত! অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্রের 'মানসিংহ' কাব্যে, ভবানন্দকে বন্দী করিবার পর রোহিল্লা প্রভৃতি রক্ষীরা "জাতি মারিবার" ভয় দেখাইয়াছিল —("জাতি লৈতে কেহ চায়")।

রূপ-সনাতন হোসেন শাহের উচ্চপদস্থ বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহারা রাজকার্য্যের জন্য সুলতানের অতি ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সংস্পর্শেই অধিকাংশ সময় থাকিতেন। সুলতান ও তাঁহার স্বধর্ম্মাবলম্বী প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীদিগের ঘনিষ্ঠ সংসর্গে থাকিলেও তাহাদিগের প্রতি রূপ-সনাতনের শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল না, বরং তাঁহাদের উপর তীব্র বিরক্তি ও ঘৃণাই ছিল। 'চৈতন্য-চরিতামৃতে'র মধ্যলীলায় বর্ণিত আছে, চৈতন্য রামকেলী গ্রামে যাইলে রূপ-সনাতন গোপনে, ছদ্মবেশে দেখা করিতে আসিয়া এই ভাবে তাঁহার নিকট দীনতা প্রকাশ করিয়াছিলেন :—

"জগাই মাধাই হৈতে কোটি কোটি গুণ!
অধম পতিত পাপী আছি দুই জন।
ম্লেচ্ছ জাতি, ম্লেচ্ছ সঙ্গী, করি ম্লেচ্ছ-কর্ম্ম।
গো-ব্রাহ্মণ-দ্রোহি-সঙ্গে আমার সঙ্গম।"

'ভক্তিরত্নাকরে' রূপ-সনাতনের মনের অনুশোচনা এই ভাবে বর্ণিত আছে :—

"পিতাপিতামহাদির যৈছে শুদ্ধাচার।
তাহা বিচারিতে মনে মানয়ে ধিক্কার॥
যবন দেখিলে পিতা প্রায়শ্চিত্ত করয়।
হেন যবনের সঙ্গ নিরন্তর হয়।
করি মুখাপেক্ষা যবনের গৃহে যান।
এ হেতু আপনা মানে ম্লেচ্ছের সমান।
*   *   *
দুঃখে মগ্ন হন দৈন্য-সমুদ্র মাঝারে।
ম্লেচ্ছাধিক হৈতে নীচ মানে আপনারে।
নীচ জাতি সঙ্গে সদা নীচ ব্যবহার।
এই হেতু নীচ জাত্যাদিক উক্তি হয়।
বিপ্ররাজ হৈয়া মহা খেদযুক্তান্তরে।
আপনাকে বিপ্রজ্ঞান কভু নাহি করে।"—(১ম তরঙ্গ)

রূপ-সনাতনের পিতা শ্রীকুমার সম্বন্ধে "ভক্তিরত্নাকর" বলেন :—

"যদি অকস্মাৎ কভু দেখয়ে যবন।
করে প্রায়শ্চিত্ত অন্ন না করে গ্রহণ।"—(১ম তরঙ্গ)

"অদ্বৈতপ্রকাশে"র মতে চৈতন্যদেব বারাণসীতে যাইলে মণিকর্ণিকার ঘাটে এক সন্ন্যাসী চৈতন্য সম্বন্ধে এই অভিযোগ করিয়াছিলেন :—

"বেদের বিরুদ্ধে কার্য্য করে সর্ব্বক্ষণ।
যবন সংসর্গে নাহি মানয়ে দূষণ।
ছলেতেও ম্লেচ্ছ যদি করে হরিনাম।
তারে আলিঙ্গিতে নাহি মানে ধর্ম্মজ্ঞান।"—(১৭ অধ্যায়)

"নরোত্তমবিলাসে"র নিম্নলিখিত উক্তিও অর্থপূর্ণ :—

"প্রভুর অদ্ভুত লীলা বুঝে কোন্ জন।
অন্যের কি কথা প্রেমে ভাসয়ে যবন।"—(১ম বিলাস)

অন্যত্র :—

"অতিনীচ যবন বর্ব্বর দুরাচার।
সেহ মত্ত হৈয়া গায় গৌরাঙ্গ বিহার।"

"চৈতন্যভাগবতে" (৫ম অধ্যায়), সপ্তগ্রামে হরিসংকীর্ত্তনের বর্ণনায় :—

"অন্যের কি দায় বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন।
তাহারাও পাদপদ্মে লইল শরণ।
যবনের নয়নে দেখিতে প্রেমধার।
ব্রাহ্মণেও আপনারে জন্ময়ে ধিক্কার।"

---

* ব্রাহ্মণের কাণে কলমা উচ্চারণ,—বলপূর্ব্বক সুন্নত, এবং স্ত্রী লোকের সতীত্বনাশও—"জাতিনাশের" অন্তর্গত।—মনসা-সাহিত্য দ্রষ্টব্য।

"ম্লেচ্ছ" ও "যবনের" প্রতি এই যে দারুণ ঘৃণা, ইহার যে যথেষ্ট কারণ ছিল, তাহা বলা বাহুল্য। ভক্ষ্যাভক্ষ্য, শৌচাশৌচ * ইত্যাদি আচারঘটিত ঘোর পার্থক্য ব্যতীতও, তৎকালে রাজায় প্রজায় বিশেষ ভেদভাবের আর এক কারণ—প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচার। প্রজারা ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী হওয়ায় এবং মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বী তুর্কী-মোগল-শাসন-কর্ত্তাদিগের স্বধর্ম্মাবলম্বীগণ রাজগণের কৃত অত্যাচার-কার্য্যে, সকল সময়ে না হইলেও—অন্ততঃ অনেক সময়ে যোগ দেওয়ায়, সমগ্র "রাজার জাতি"র প্রতিই হিন্দুদিগের আন্তরিক বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল। সম্ভ্রান্ত ও ধনী হিন্দুগণের দ্বারা মুসলমান আদব কায়দা ইত্যাদির অনুকরণ ও ফার্শী ভাষা ব্যবহার, † "রাজার জাতি"র সহিত প্রজাদিগের মনোমালিন্যের অভাব প্রতিপন্ন করে না; বর্ত্তমান ভারতের অসংখ্য শিক্ষিত ভারতবাসী কর্ত্তৃক ইংরেজি ভাষার ব্যবহার, এবং ইংরেজি আচরণ ও ভাবের অনুকরণ অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার হইলেও ইহা দ্বারা প্রমাণ হয় না যে, বর্ত্তমানে রাজার জাতির সহিত শিক্ষিত ভারতীয়গণের মনোমালিন্য নাই।

পুনঃ পুনঃ অত্যাচারের ফলে, হিন্দুদিগের মধ্যে "যবনের ভয়" অর্থাৎ বিশেষ এক প্রকার আতঙ্ক স্থায়ী হইয়া গিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। "প্রেমবিলাসে" সাধুচরিত্র দরিদ্র চৈতন্যদাসের স্ত্রী স্বপ্নে দেখিলেন—কোন মহাপুরুষ তাঁহার গর্ভে আসিয়াছেন। বস্তুতঃ, তাঁহাদিগের দারিদ্র্য ও গ্রামের সকল উপদ্রব—তথা "যবনের ভয়" বিলুপ্ত হইল :—

"লক্ষ্মীপ্রিয়া কহে বড় পাইলাম ধন।
ঘুচিল দারিদ্র্য তোমার সফল জীবন॥
রাজপীড়া ছিল গ্রামে কত উপজাতি।
তাহা শান্তি হৈল রাজা করিল পীরিতি॥
গ্রাম ছাড়ি জমিদার ছিল অন্য গ্রামে।
সেই উপজাতি গেল আসিব নিজস্থানে॥
প্রবেশ করিতে গ্রামে আনন্দ হৃদয়।
অনায়াসে গেল সব যবনের ভয়॥"—(প্রথম বিলাস)

রূপ, সনাতন ও শ্রীবল্লভ, এই তিন ভ্রাতার পূর্ব্ব-পুরুষগণের বিবরণ প্রসঙ্গে দেখা যায়—

"মুকুন্দদেবের পুত্র নাম শ্রীকুমার।
গঙ্গাতীরে নৈহাটিতে ছিল বাসঘর॥
যবনের ভয়ে কুমার নৈহাটি ছাড়িল।
কিছুদিন বঙ্গে চন্দ্রদ্বীপে বাস কৈল॥"—(২৩ বিলাস)

নবদ্বীপে শ্রীবাস স্বগৃহেও সংকীর্ত্তন করিতে যাইয়া উহা "যবনের রাজ্য" মনে করিয়া ভীত হইতেন।

"ম্লেচ্ছদেশ" ও "ম্লেচ্ছরাজ্য" সম্বন্ধে, প্রাচীন সাহিত্যের বহু স্থানে আতঙ্কজনক বর্ণনা আছে। চৈতন্যদেব উড়িষ্যা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে উড়িষ্যা রাজ্যের মেদিনীপুর-সীমা পর্য্যন্ত আসিলে উড়িষ্যা-রাজের কর্ম্মচারী সম্মুখের দিক দেখাইয়া বলিতেছেন :—

"মদ্যপ যবন রাজার আগে অধিকার।
তাঁর ভয়ে পথে কেহ নারে চলিবার॥"
'চৈতন্যচরিতামৃত' (মধ্যলীলা, ১৬ পরিচ্ছেদ)

অন্যত্র—চৈতন্যদেব যখন প্রয়াগের দিকে যাইতে উদ্যত, তখন সার্বভৌমিয়া বিপ্র ও কৃষ্ণদাসকে বিদায় দিতে চাহিলে তাঁহারা বলিলেন :—

"প্রয়াগ পর্য্যন্ত দুঁহে তোমা সঙ্গে যাব।
তোমার চরণ সঙ্গ পুনঃ কাঁহা পাব?॥
ম্লেচ্ছ দেশ, কেহ কাঁহা করয়ে উৎপাত।" ইত্যাদি
(মধ্যলীলা, ১৮ পরিচ্ছেদ)

'চৈতন্য-চরিতামৃতে'র (মধ্যলীলা) আরও একটি বিবরণে "ম্লেচ্ছরাজ্য" বিপদের স্থান বলিয়া বর্ণিত আছে। মাধবেন্দ্রপুরী গোবর্দ্ধনে (বৃন্দাবনে) শ্রীগোপাল-বিগ্রহের সেবায় রত ছিলেন। গোপাল স্বপ্ন দিলেন—"উড়িষ্যার নীলাচল হইতে চন্দন আনিয়া আমার গাত্রে লেপন কর।" মাধবেন্দ্র উড়িস্যায় যাইয়া "মণেক চন্দন, তোলা-বিশেক কর্পূর" সংগ্রহ করিয়া ফিরিবার জন্য যাত্রা করিলেন। রেমুনা গ্রামে আসিলে গোপাল আবার স্বপ্ন দিলেন—"এই গ্রামস্থ গোপীনাথ দেববিগ্রহের গাত্রে চন্দন-লেপনেই আমার দেহ শীতল হইবে।" গোপালের স্বপ্নাদেশ প্রদানের কারণ এই যে, চন্দন লইয়া ফিরিতে হইলে "ম্লেচ্ছদেশের" ভিতর দিয়া যাইতে হইবে, কিন্তু উহা বিপজ্জনক স্থান। ম্লেচ্ছ রাজার প্রহরীরা জাগিয়া পাহারা দেয় ও পথিকের মূল্যবান্ দ্রব্য লুণ্ঠন করে।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক বৈষ্ণবগ্রন্থ 'বৃহৎ সারাবলী'তেও আছে যে, উড়িষ্যা ও বঙ্গদেশের সীমায় উপস্থিত হইলে "উড়্‌দেশ অধিকারী" আসিয়া চৈতন্যকে বলিলেন, সম্মুখে "যবনাধিকার"।

"তবে চলিবারে ইচ্ছা কৈল গৌরহরি।
নরপতি নিবেদয় যোড়হাত করি॥
আগেতে সে গ্রাম হয় যবনাধিকার।
বড়ই নির্দ্দয় রাজা অতি দুরাচার॥
বাটে যেতে নারে কেহ তাহার শাসনে।
দ্বিজ মুনি বৈষ্ণব কাহারে নাহি মানে॥
পিচ্ছিল জলা পর্য্যন্ত তাহার অধিকার।
তার ভয়ে কেহ নারে হ'তে নদী পার॥"

"যবনাধিকার" সম্বন্ধে হিন্দুর মনে ভীতি সঞ্চারের কারণ যে যথেষ্টই ছিল, ইহা পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন। সময় সময় কিরূপ লোমহর্ষণ ভয়াবহ ঘটনা ঘটিত, বেনাপোলের রাজা রামচন্দ্রের ঘটনা তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত। 'চৈতন্যচরিতামৃত' প্রভৃতি বৈষ্ণবগ্রন্থে ইহার বিবরণ আছে। বেনাপোলের (যশোহর জিলার অন্তর্গত) রাজা রামচন্দ্র প্রজার নিকট স্বয়ং কর আদায় করিয়া নবাবকে দিতেন না। শাস্তিস্বরূপ, রামচন্দ্রের স্ত্রী-পুত্রাদিসহ জাতিনাশ ও গ্রাম উজাড় করিয়া দেওয়া হইল। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' বর্ণিত হইয়াছে—

---

* ভারতচন্দ্রকৃত "মানসিংহ" কাব্যে ভবানন্দ-জাহাঙ্গীর সংবাদে ভবানন্দ বলিয়াছিলেন—

"শৌচ আচমন নাহি যাহা পায় খায়।
কেবল ঈশ্বর আছে বলে এই দায়॥"

"বৃহৎ সারাবলী"তে অভিরাম গোস্বামী কাজীকে বলিতেছেন, তোমার আমার ঈশ্বর এক, কিন্তু গোবধাদিজন্যই পার্থক্য।

† ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল" কাব্যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভা-বর্ণনা এবং "বিদ্যাসুন্দর" কাব্যে বর্দ্ধমান রাজসভার বর্ণনা দ্রষ্টব্য।

"দস্যুবৃত্তি করে * রামচন্দ্র রাজারে না দেয় কর।
ক্রুদ্ধ হঞা ম্লেচ্ছ উজির আইল তার ঘর॥
আসি সেই দুর্গামণ্ডপে বাসা কৈল।
অবধ্য বধ করি ঘরে মাংস রাঁধিল॥
স্ত্রীপুত্র সহিত রামচন্দ্রেরে বান্ধিয়া।
তার ঘর গ্রাম লুঠে তিন দিন রহিয়া॥
সেই ঘরে তিন দিন অবধ্য-রন্ধন।
আর দিন সবা লঞা করিল গমন॥
জাতি ধন জন খানের সকল লইল।
বহুদিন পর্য্যন্ত গ্রাম উজাড় রহিল॥"

নীলকণ্ঠের 'ঘটককারিকা'র বর্ণিত 'পীরালী ব্রাহ্মণে'র উৎপত্তিও প্রায় অনুরূপ ঘটনা।

প্রাচীন লেখকরা কখন কখন "যবন" শাসনকর্ত্তাদিগের মুখ দিয়াই উহাদের অনুষ্ঠিত অত্যাচার-কাহিনী বিবৃত করাইতেন। যথা, "চৈতন্যচরিতামৃতে' (মধ্যলীলা, ১৬ পরিচ্ছেদ) উড়িষ্যার সীমাপ্রান্তস্থ বঙ্গদেশের অন্তর্গত "ম্লেচ্ছরাজ্যে"র শাসনকর্ত্তা চৈতন্যের নিকটে আসিয়া দীনতা ও অনুতাপ প্রকাশ করিয়াছিল;—দণ্ডবৎ হইয়া সে বলিতেছে:—

"অধম যবনকুলে কেনে জন্মাইলে।
বিধি মোরে হিন্দুকুলে কেনে না জন্মাইলে॥
হিন্দু হৈলে পাইতাম তোমার চরণ সন্নিধান।
ব্যর্থ মোর এই দেহ যাউক পরাণ॥
*   *   *   *   *
গো ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে হিংসা করাছি অপার।
সেই পাপ হৈতে মোর হউক নিস্তার॥"

'বৃহৎ সারাবলীতে'ও অনুরূপ বর্ণনা আছে।

"যবন রাজা" যে কিরূপ বিভীষিকার কারণ ছিলেন, জয়ানন্দকৃত 'চৈতন্যমঙ্গলে'র একটি বর্ণনায় তাহা বিশদরূপে বুঝা যায়। উৎকলাধিপতি প্রতাপরুদ্রদেবের ইচ্ছা হইল, গৌড়দেশ আক্রমণ করিবেন। এই জন্য প্রতাপরুদ্র চৈতন্যের উপদেশ চাহিলেন। চৈতন্য বলিলেন—"সাবধান, অমন কাজ করিও না। তুমি গৌড়েশ্বরের সহিত যুদ্ধ বাধাইলে, ওড়দেশ উৎসাদিত হইবে, জগন্নাথ পলায়ন করিবেন, দেশে প্রলয় ঘটিবে। তদপেক্ষা বরং তুমি কাঞ্চীরাজা আক্রমণ কর!" কাঞ্চী অবশ্য তখন হিন্দুরাজ্য ছিল। 'চৈতন্যমঙ্গলে'র বিবরণ;—

চৈতন্যদেবে রাজা আজ্ঞা আনিল।
প্রভু বলেন, প্রতাপরুদ্রে কুবুদ্ধি লাগিল॥
কালযবন রাজা পঞ্চ গৌড়েশ্বর।
সিংহ শার্দ্দূল দেখ কতেক অন্তর॥
ওড়্রদেশ উৎসন্ন করিবেক যবনে।
জগন্নাথ নীলাচল ছাড়িব এত দিনে॥
লজ্জা পাবে প্রতাপরুদ্র আমার বাক্য ধর।
গৌড়মুখে শয়ন ভোজন পাছে কর॥
কাঞ্চীদেশ জিনি কর নানা রাজ্য।
গৌড় জিনিবে হেন না দেখি সে কার্য্য॥
গৌড়েশ্বর অবশ্য আসিব নীলাচলে।
তুমি ছাড়িবে প্রলয়* হইব উৎকলে॥"

উপসংহার

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ হইতে ভারতচন্দ্র পর্য্যন্ত প্রাচীন কবিদিগের যে যে গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে এবং আমাদিগের ন্যায় সাধারণ পাঠকের অলভ্য নহে, সেইগুলি অনুসন্ধান করিয়া সেকালের তুর্কী-মোগল জাতীয় রাজগণের সম্বন্ধে প্রজারা (ইঁহারা প্রায় সকলেই হিন্দু ছিলেন) কি মনোভাব পোষণ করিতেন, তাহা প্রদর্শনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলাম। অপ্রকাশিত পুঁথিরও কিছু কিছু সন্ধান করিয়াছি; কিন্তু এ বিষয়ে নূতন তথ্য বিশেষ কিছুই পাই নাই। ভবিষ্যতে যদি কোন অনুসন্ধিৎসু পাঠক প্রাচীন সাহিত্যে এরূপ কোনও নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতে পারেন, যাহাতে এই প্রবন্ধের সিদ্ধান্ত খণ্ডন হইতে পারে, তবে তাহাই তখন সমাদৃত হইবে; কিন্তু যত দিন তাহা না হইতেছে, তত দিন আমাদের অনুসৃত মতে এই সিদ্ধান্তই স্থির থাকিবে যে, তুর্কী-মোগল শাসনের প্রতি আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষরা (হিন্দুরা) সন্তুষ্ট ছিলেন না, এবং শাসনকর্ত্তাদিগকে ও তাঁহাদিগের অত্যাচারের সাহায্যকারী স্বধর্ম্মাবলম্বীদিগকেও শ্রদ্ধা অথবা বিশ্বাস করিতেন না।† বর্ত্তমান যুগে আমরা যদি কাব্য, নাটক, উপন্যাস অথবা "ঐতিহাসিক চিত্র" রচনা করিয়া সে যুগের হিন্দুদিগের মুখ হইতে তুর্কী-মোগল রাজগণের প্রতি অতুলনীয় ভক্তি ও প্রেমের বন্যা বহাই, তাহা হইলে তদ্দারা প্রাচীন ঐতিহাসিক সত্যের বিপরীত মতই প্রচার করা হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্যের, অর্থাৎ তুর্কী-মোগল যুগের সমসাময়িক সাহিত্যের দ্বারা এই মতই সমর্থিত হইবে।‡

রাজা প্রজার এই অসদ্ভাবের বহুবিধ কারণ ছিল। এই প্রবন্ধে উদ্‌ধৃত বহু উক্তি ও ঘটনায় সেই কারণগুলি সুপ্রকাশিত। ধর্ম্মস্থানের পবিত্রতা নাশ, স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার প্রভৃতি ঘটনার সঙ্গে আরও একটি কারণ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। উহা গোহত্যা। ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী শাসক ও শাসিতদিগের মধ্যে পার্থক্য ও অসন্তোষের

* "দস্যুবৃত্তি" সম্বন্ধে চিন্তা করিবার বিষয় এই যে, ইহা সত্য অভিযোগ, না শাক্ত-বৈষ্ণব-বিদ্বেষ-প্রসূত কটূক্তি? রামচন্দ্র খান গোঁড়া শাক্ত ছিলেন এবং হরিদাস ঠাকুর তাঁহার গৃহে অতিথি হইলে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন।

* বঙ্গদেশে এক অনুরূপ "প্রলয়" বা "প্রমাদে"র কথা কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে। কৃত্তিবাসের আত্মচরিতে:—

"বঙ্গদেশে প্রমাদ হৈল সকলে অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইলা গঙ্গাতীর॥"

† অপর পক্ষে, "রাজার জাতি" প্রজাদিগকে (অর্থাৎ হিন্দুদিগকে) কি চক্ষুতে দেখিতেন, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ "রাজার জাতির" লিখিত ইতিহাস। আবুল ফজল ব্যতীত, বোধ হয় প্রত্যেক ইতিহাস-লেখকই "কাফের"দিগকে মহা উৎসাহে ও গর্ব্বভরে বহু প্রকার অপমানসূচক আখ্যা ও বর্ণনা দ্বারা সম্বর্দ্ধিত করিয়াছেন।

‡ বাঙ্গালার তুর্কী-মোগল রাজগণের মধ্যে একমাত্র হোসেন শাহই ৩।৪ জন হিন্দু কবির স্তুতির পাত্র হইয়াছিলেন।

ইহা একটি প্রধান কারণ ছিল বলিয়াই মনে হয়। 'চৈতন্য-চরিতামৃতে' কাজীর সহিত ধর্ম্মালোচনা প্রসঙ্গে মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন :—

"প্রভু কহে—গোদুগ্ধ খাও, গাভী তোমার মাতা।
বৃষ অন্ন উপজায়, তাতে তেঁহো পিতা॥
পিতামাতা মারি খাও—এবা কোন্ ধর্ম্ম।
কোন্ বলে কর তুমি এমত বিকর্ম্ম॥
* * * *
তোমরা জীয়াইতে নার বধমাত্র সার।
নরক হইতে তোমার নাহিক নিস্তার॥
গো-অঙ্গে যত লোম, তত সহস্র বৎসর।
গো-বধে রৌরব মধ্যে পচে নিরন্তর॥"

প্রধানতঃ এই গো-বধের জন্যই রাজায় প্রজায় মিলনে বাধা পড়িয়াছিল, ইহার প্রমাণ অন্যত্রও আছে। 'বৃহৎ সারাবলীতে' অভিরাম গোস্বামী কাজীকে বলিতেছেন :—

"তোমার কোরাণে যারে বলে পরমেশ্বর।
আমার পুরাণে তারে লিখয়ে ঈশ্বর॥
আমার পুরাণ আর তোমার কোরাণ।
এক ব্রহ্ম দুই নহে সেই ভগবান॥
রাম রহিম দোঁহে এক নাম জান।
আমাদের রাম তোমাদের রহিমান॥"

কিন্তু, তথাপি উভয় সম্প্রদায়ে মিলন হয় না কেন?

অভিরাম বলিতেছেন :—

"গরু বধি তোমরা যে নার বাঁচাইতে।
আর তার মাংস বাঁধি ভক্ষ উদরেতে॥
এই সব অনাচার তোমার যাজন।
তে কারণে জাতিভেদ হইল যবন॥
হিন্দুয়ানী নষ্ট কৈল যবন দুরন্ত।
তে কারণে ভগবান হইলা রূপান্ত॥
রাম রহিম হৈলা এই ত কারণে।
নীচ জাতি অনাচারী করিলা যবনে॥
হিন্দু মুসলমান এই বিভেদ হইল।
এক মূলে যেন দুই বৃক্ষ উপজিল॥"

অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভবানীদাস "রামরত্নগীতা" নামক গ্রন্থেও উক্ত ভাবের মহিমা প্রচার করিয়াছেন ;—

"রহিমান নাম বোলাইলা তার তরে।
কোরাণ স্বদিষ্টে তারা গোহত্যাদি করে॥
কৃষ্ণ বলে ধনঞ্জয় শুনহ কারণ।
গোহত্যা পাতকী জীব হয় ত যবন॥
পুনঃ পুনঃ নানা যোনি মধ্যে জন্ম লয়।
কুকর্ম্মাদি পাপকর্ম্ম সতত আচরয়॥" *

গোহত্যা যে শাসক-সম্প্রদায়ের প্রতি হিন্দুদিগের বিরাগ ও অবজ্ঞার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

এই সকল কারণেই ধর্ম্মসমন্বয়ের যে প্রচেষ্টা হিন্দুরাই আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা প্রথমতঃ বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। সত্যপীর সাহিত্যের সর্ব্বত্রই দেখি, ফকির পীরের পূজার প্রস্তাব করিলে হিন্দুরা প্রথমে অস্বীকার করিয়াছিল। রামেশ্বরের পুস্তকে আছে—

"দ্বিজ বলে কহিলেন দেওয়ান মহাশয়।
যবনের কার্য্য সে ত ব্রাহ্মণের নয়॥
ইষ্ট ছাড়ি অনিষ্ট ভজিব কেন অন্য।
ডুবাইব পরকাল ইহকাল জন্য॥"

কবি বল্লভের "সত্যনারায়ণের পুঁথিতে" ফকির বণিক্-রমণীকে পীরের সিন্নি দিতে বলিলে, হিন্দুরমণীদ্বয় ঘৃণাভরে "রাম রাম" বলিয়া উঠিয়াছিল।

"রাম রাম করি দুহে কর্ণে দিল হাত।
তিনবার স্মঙরে ঠাকুর জগন্নাথ॥
কোথাকার ফকির দেখ ছেণ্ডা কাঁথা গায়।
পীরের সিরিণি দিয়া জাতি নিতে চায়॥
কালাম কিতাব কোন কালে নাহি শুনি।
গন্ধবণিক্ হয়্যা হব মুসলমানী॥"

"কঙ্ক ও লীলা" আখ্যায়িকায় (মৈমনসিংহগীতিকা) দেখিতে পাই, কঙ্ক গোপনে পীরের কাছে দীক্ষা লইয়া সত্যপীরের পাঁচালি প্রচলন করিল। ইহাতে তাহার অপযশ ঘটিল :—

"জাতি ধর্ম্ম নাশ হৈল রটিল বদনাম।
পীরের নিকটে কঙ্ক শিখিয়ে কালাম॥
এবং—"হিন্দু যত সবে কঙ্কে মোসলমান বলি।
কেহ ছিঁড়ে কেহ পুড়ে সত্যের পাঁচালী॥
জাতি গেল মোসলমানের পুঁথি নিয়া ঘরে।
যথাবিধি সবে মিলি প্রায়শ্চিত্ত করে॥"

এই প্রকারের ভেদ-ভাব সত্ত্বেও ইহা বলা সঙ্গত হইবে না যে, হিন্দুরা জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে মানুষের মহত্ত্ব মানিতেন না। 'অদ্বৈতপ্রকাশে'র এই শ্লোকটি স্মরণীয় :—

"কেবা ছোট কেবা বড় ঐশ্বর্য্য নাহি জানি।
সাধু আচরণ যার তারে শ্রেষ্ঠ মানি॥"

সর্ব্বশেষে, দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া প্রবন্ধ সমাপ্তির পূর্ব্বে একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করিতেছি। ইংরেজের অধিকারের ফলে, সে কালের শাসকরাও এখন প্রজার স্তরে উপনীত হইয়াছেন। হিন্দু-মুসলমানে শাসক-শাসিত সম্পর্ক দূর হইয়া মিলনের অন্যতম গুরু বাধা অপনীত হইয়াছে। এই দুই সম্প্রদায়ের মিলনের প্রয়োজন ও গুরুত্ব প্রায় সর্ব্বসাধারণেই উপলব্ধি করিয়াছেন। ইহা অতি উত্তম কথা, এবং দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যথেষ্টই আশার কথা। হিন্দু ও মুসলমান প্রত্যেক ভারতবাসীরই সাম্প্রদায়িক ঐক্যসাধনের জন্য সঙ্গত ভাবে যথাসাধ্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য ; কিন্তু এ জন্য ঐতিহাসিক সত্য বিকৃত অথবা গোপন করিবার প্রয়োজন দেখা যায় না। অতীতের ইতিহাস হইতে বর্ত্তমানের শিক্ষা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। রোগের কারণ গোপন করিলে সুচিকিৎসায় বাধা পড়ে। যে একতা বা প্রীতির বন্ধন কোন প্রকার যুক্তিপূর্ণ, সত্য, কিন্তু অপ্রিয় সমালোচনায় নিমেষে ছিন্ন হয়, তাহার মূল্য অধিক নহে।

সর্ব্বোপরি নিবেদন এই যে, সেকালের তুর্কী-মোগল জাতীয় শাসকবর্গের এই সমালোচনা আপনাদিগের গাত্রে মাখিয়া লইবার মত অনাবশ্যক হঠকারিতা প্রদর্শনের জন্য কাহারও যেন আগ্রহ না হয়।

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (অধ্যাপক)।

* ডঃ সুকুমাররঞ্জন সেন-প্রণীত 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' দ্রষ্টব্য।

করবী-মল্লিকা

(উপন্যাস)

৩২

মুক্ত অবাধ নীল আকাশের নীচে সবুজ বন-বনান্তকে দূরে রাখিয়া বন-বিহগী আসিয়া আবার নগরের কোটরে প্রবেশ করিল।

বাবার স্নেহ-সজল মুখ, পিসিমার বিরাম-বিহীন অশ্রু স্মৃতির কোঠায় ভরিয়া আমি ফিরিলাম মাসিমার গৃহে।

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে মিলিরা কেহ বিছানা ছাড়িয়া ওঠে না। আসিবার দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া এখানে কাহাকেও আমি তাহা জানাই নাই, কাজেই কেহ আমার প্রতীক্ষায় ছিল না।

চাকরদের পাশ কাটাইয়া দ্বিতলে উঠিয়া সর্ব্বাগ্রে আমি স্নান করিলাম।

স্নানান্তে চায়ের টেবিলটা ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিতেছি, এমন সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া মিলি আসিল বারান্দায়।

মিলি আমাকে অকৃত্রিম স্নেহ করে, ক'দিনের অদর্শনের পর আমাকে দেখিয়া তাহার স্নেহের সমুদ্র উদ্বেলিত হইল। ব্যগ্র বাহু দিয়া আমার কটি ঘিরিয়া উল্লাসে সে চীৎকার করিয়া উঠিল, "রুরু! কখন এলি? আজ আসবি, তা এক ছত্র লিখেও জানাসনি তো! এসেও একটা ডাক দিসনি! এর মানে? মেসোমশায় কেমন আছেন? ছাখ্, ভারী মজা হয়েছে, এতক্ষণ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তোকেই আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম। আমার ভোরের স্বপ্ন সত্য হলো, সুপ্রভাত বলতে হবে!"

বলিলাম, "সকালে আমার মুখ দেখে উঠ্‌লে কারো সুপ্রভাত হয় না মিলি। 'কু-প্রভাত' বল। ক'দিনের জন্তই বা যাওয়া-আসা, তার আবার লিখবো কি? ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি করে সকলের ঘুম ভাঙ্গানোর দরকার ছিল না বলেই আমি এসে স্নান করে নিয়েছি। বাবা ভালো আছেন। তোরা কেমন ছিলি?"

"এ দিকে মন্দ নয়। শুধু তোর বিরহে যা জ্বর-জ্বর, মর-মর। এতক্ষণে দেহে আমার প্রাণ এলো!"

হাসিয়া উত্তর দিলাম, "এত-ও জানিস্ মিলি! আমার বিরহে কারো এমন শোচনীয় দশা হতে পারে, এ আমার গৌরবের কথা। যাঁর বিরহে হবার সম্ভাবনা, তিনি তো কাছেই ছিলেন। খুব আমোদেই বোধ হয় তোদের এ ক'টা দিন কেটে গেছে? ওঁদের খবর কি? দিদিরা কেমন আছেন?"

"ভালো আছেন। খুব বেশী আনন্দে দিন কাটেনি রে! বাধ্য হয়ে আমাকে এক অপ্রিয় কাজ করতে হয়েছে। যাকে ভালোবাসি, তার ভালোর জন্ম মানুষকে কত কি করতে হয়।"

আমার মনে কাল-বৈশাখীর উদয় হইল। আমার অনুপস্থিতিতে তাঁহাকে না জানি কি আঘাত করিয়াছে! তিনি আমার নন্, মিলির! তবু তাঁর বেদনা যেন আমারই বেদনা!

নিরুত্তরে মিলির মুখের দিকে চাহিলাম।

মিলি বলিল, "অমন করে চাইছিস্ কেন রে? তোর ভয় নেই, জ্যোতি বাবুকে কিছু বলিনি। তুই যাবার পরে একদিন মাত্র মিনিট-পাঁচেকের জন্তে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। আমি বল্‌চি কমলের কথা। বেচারা ছেলেমানুষ, কাণ্ডজ্ঞান নেই। জানার মধ্যে জান্‌তো শুধু বই। আমার মরণ! সেই দুগ্ধপোষ্য বালক শেষে কি না আমার প্রেমে পড়লো!"

প্রেমে পড়ার অপরাধ কি বল্? তোমার পাল্লায় পড়লে পাথরে ঘাস গজায়, মরা নদীতে বান ডাকে। কমলের দোষ কি? অমন করে লেগে থাকলে কার না মতি-ভ্রম হয়?"

মিলি সরোষে গর্জ্জিয়া উঠিল, "তোর যুক্তিতে গা জ্বালা করে রুরু, ভালোবেসে কারো গায়ে হাত দেওয়া, কাউকে আদর করা দোষের? পৃথিবীতে এক ছাড়া আর অন্য কোন সম্বন্ধ থাকতে পারে না? ছেলেয়-ছেলেয় গলা জড়িয়ে এক-বিছানায় শুতে পারে, মেয়েয় মেয়েয় ভালোবেসে একসঙ্গে থাকতে পারে, তাতে দোষ হয় না! যত দোষ, ছেলেতে আর মেয়েতে মুখোমুখী হলে! ভালোবাসার ভিন্ন রূপ যারা জানে না, তাদের উচিত নয়—মেলা-মেশা করা। কমলকে আমি বলে দিয়েছি, একসঙ্গে পড়া সুবিধে হচ্ছে না। তোমার মতন তুমি পড়ো, আমার মত আমি।"

চন্দ্রদাকে আমার মনে পড়িল। এ ভালোবাসার আস্বাদ আমিও সগু পাইয়া আসিয়াছি।

মাসিমার সাড়া পাইয়া তখনকার মত চন্দ্রদার অবতারণা করিতে পারিলাম না।

মাসিমার সঙ্গে আমার বিশেষ কথাবার্ত্তা হইল না। কলেজ কামাই করিয়া আমার বাড়ী যাওয়ার ক্ষোভ এখনো তিনি ভুলিতে পারেন নাই, ছাত্রীর একাগ্রতার বিষয়ে কতকগুলি হিতোপদেশ দিয়া মাসিমা আমার প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ করিলেন। মৃদু কণ্ঠে মিলি বলিল, "এখন মুখ বুজে থাক্ রুরু, কলেজ কামাই হয়েছে বলে মা তোর উপর ভীষণ চটে আছেন। আমাদের দুই মুখের কথা শুন্‌লে আরো চটে যাবেন। দুপুরবেলা আমরা গল্প করবো।"

দ্বিপ্রহরে মিলির সহিত গল্প করিবার আগ্রহ থাকিলেও তাহা কাজে পরিণত হইল না। আহারান্তে বিছানায় যাইতে না যাইতে গত-রজনীর নিদ্রাহারা নয়ন ঘুমে জড়াইয়া আসিল।

মিলির আহ্বানে যখন ঘুম ভাঙ্গিল, বেলা তখন বেশী ছিল না।

মিলি বলিল, "আর ঘুমোয় না। খুব হয়েছে! এখন উঠে তৈরি হয়ে নে। চল, দিদির ওখান থেকে একবার ঘুরে আসি। মা'র হুকুম, কাল থেকে খোপে বন্ধ হয়ে বই মুখস্থ করতে হবে, বেড়ানো চলবে না। এত দিনের ফাঁকির শোধ মা এবার কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নেবেন।"

"বেশ তো, আমার ভালোর জন্তই মাসিমা কড়াকড়ি করছেন। পড়া আমার একেবারেই হয়নি, তা তাঁর জানা আছে। আরো ভালো করে জানা আছে, আমার নিরেট মাথার দৌড়! সকলের স্মরণশক্তি মল্লিকা দেবীর মত নয়। এক বার চোখ বুলোলে মনের মধ্যে অক্ষরগুলো দাগ কেটে বসে না। মল্লিকা কাটেন ধারে, আমরা কাটি ভারে! ভারের ভার নিতে আজ থেকেই আমি প্রস্তুত মিলি। চাই নে কোথাও যেতে। যাবার দরকার কি?"

"দরকার আছে। তোর যাবার দিনে দিদি নিজে এসে কি যত্নে মেসোমশায়ের জন্য কত জিনিষ সাজিয়ে দিয়ে গেলেন, তাঁর

ভাই গাড়ীতে তুলে দিলেন। ফিরে এসে তাঁদের সঙ্গে দেখা না করা খুব অভদ্রতা হবে। চট্ করে ঘুরে আসবো।"

আমার বুক স্পন্দিত হইতে লাগিল। যে মহা-পারাবারের উদ্দেশে আমার হৃদয়-নদী অবিরাম ধাবিত হইতে চায়, আমার দুরদৃষ্ট বশত: আমি তাহার দিকে ছুটিতে পারি না। কি জানি, কোন্ অসতর্ক মুহূর্ত্তে কি করিতে কি করিয়া বসিব! কি বলিতে কি বলিব!

বাহ্যিক দর্শন-স্পর্শনের প্রয়াসী আমি আর নই। বাহিরের যোগসূত্র ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়াই না তাঁহাকে আমার অন্তরের অন্তরতম করিতে চাহিতেছি! ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য জানি না,—জানি, তিনি মিলির। তাঁহার কাছ হইতে দূরে সরিয়া থাকা আমার বিধি-লিপি। প্রলোভনের মরীচিকায় দিশাহারা হইলে আমার চলিবে না। দিদির স্নেহাঞ্চল যে তাঁহারও আনন্দ-নীড়, একের সন্নিধানে দুইয়ের সংঘাত। দিদির অমূল্য স্নেহ অন্তরে অন্তরে আমি উপভোগ করিব, কিন্তু ইচ্ছা করিয়া তাঁহার কাছে যাইতে পারিব না। বিশাল জলধির উপকূলে তৃষিতা চাতকী যেমন ঘুরিয়া মরে, আমিও তাহারই মত। চাতকীর আশা—আকাশের নব-নীল মেঘ-সম্ভার, মেঘের স্নিগ্ধ বারি-ধারা। আমার আশা—মরণের শান্ত-কোমল আশ্রয়!

আমি বলিলাম, "আজ আমি কোথাও যেতে পারবো না মিলি, বড্ড ক্লান্ত বোধ করছি। এর পর একদিন গিয়ে দেখা করে আসবো।"

মিলি রাগ করিয়া উঠিয়া গেল। দূর হইতে তাহার গানের সুর ভাসিয়া আসিল—

'সীমার মাঝে অসীম তুমি, বাজাও আপন সুর,
তোমার মাঝে আমার বিকাশ, তাই এত মধুর।'

৩৩

আলোর সামনে বইয়ের পাতা সবেমাত্র খুলিয়াছি, দিদি আসিয়া ডাকিলেন, "বনফুল! এসেই তোমার শরীর খারাপ হয়েছে না কি? তবে পড়তে বসেছো কেন?"

আমি চমকিত হইলাম। শুধু দিদিই আসেন নাই, তাঁহার পিছনে জ্যোতি বাবু আর মিলি। হৃদয়কে শান্ত করিয়া দিদিকে প্রণাম করিলাম।

জ্যোতি বাবু বলিলেন, "মিলি ফোন্ করেছিলেন, আপনার অসুখ করেছে, বেরুতে পারবেন না। শুনে এখানে আসবার জন্য দিদি একেবারে অস্থির! কারো অসুখ শুনলে দিদির আর জ্ঞান থাকে না! কি হয়েছে আপনার? গাঁয়ের ম্যালেরিয়াকে সঙ্গী করে নিয়ে এলেন না কি? আপনার বাবা কেমন আছেন?"

মিলির দুষ্টবুদ্ধিতে আমার রাগ হইতেছিল। মিলির পানে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া আমি জবাব দিলাম, "বাবা ভালো আছেন। আমার ম্যালেরিয়া নয়, রাত্রে ঘুমুতে পারিনি, তাই বেলা-ভোর শুয়ে ছিলাম। চলুন, ও-ঘরে গিয়ে বসবেন।"

"মাসিমা বাড়ী নেই, তোমার ঘরেই আমাদের কুলিয়ে যাবে বনফুল,—তুমি ব্যস্ত হয়ো না। এখন তো তোমার মাথা-ধরা নেই? একটু ভালো বোধ করছ তো?" বলিয়া দিদি আমার বিছানায় বসিলেন।

চেয়ারখানা জ্যোতি বাবুর দিকে আগাইয়া দিয়া আমি দিদির পাশে বসিলাম।

আমার অসুস্থতার সংবাদ দিয়া মিলি ইঁহাদিগকে ডাকিয়া আনিয়াছে,—কাজেই আমার শরীর লইয়া তাহাকেই জবাবদিহি করিতে হইল। মিলি বলিল, "এখন ওর মাথাধরা নেই দিদি,—সারা দুপুর খুব কষ্ট পেয়েছে। যেমন মাথার যন্ত্রণা, আপনাদের দেখবার জন্য তেম্‌নি ছট্‌ফটানি।"

মিলির কথা আমার অসহ্য বোধ হইতেছিল, এ মিথ্যাজাল হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য আমি কহিলাম, "আপনারা বসুন, আমি চা নিয়ে আসি।"

জ্যোতি বাবু বাধা দিলেন, "চা আমরা খেয়েই আস্‌ছি, আর চাই না। দিদিকে গণ্ডাদশেক পাণ এনে দিন—পাণের জাবর না কাট্‌লে দিদি নিস্তেজ হয়ে পড়েন।"

দিদির চোখে কলহের বাষ্প ঘনাইয়া আসিল। দিদি বলিলেন, —"হ্যাঁ, সব-তাতেই দিদির দোষ! পাণ জুগিয়ে খোঁটা দিলে তবু না হয় মেনে নিতাম, আমি পাণের জাবর কাটি। সিগারেটের জাবর কাটে কে রে? যেমন সিগারেট, তেম্‌নি চা। দুই নেশায় যিনি মশ্‌গুল, তিনি এসেছেন আমার সমালোচনা করতে! দিন-রাত অগ্নিমুখো হয়ে কথা বলতে তোর লজ্জা করে না জ্যোতি?"

"লজ্জা কিসের দিদি? এটা পুরুষের গর্ব্ব, মুখে আগুন ভিতরে উত্তাপ না থাকলে এ-জাত এত দিনে নিবে যেতো, তোমাদের কোন কাজে লাগতো না। পাওয়ার চেয়ে আরো আদায়ের আশাতেই না এমন জায়গায় পাঠিয়েছিল, যেখানে চা-সিগারেটের চেয়েও তেজস্কর জিনিসের আমদানী। ভাগ্যে তার ভক্ত হয়ে ফিরিনি! নিজের ওপর নিজের যে কি অখণ্ড শ্রদ্ধা হয় দিদি, বলবার নয়! রাত্রে শুয়ে কপালে পায়ের ধূলো ছুঁইয়ে নিজেই নিজের স্তব করি। বলি জ্যোতিভূষণ, তুমি অপরূপ, তুমি অসীম, অনেক লোভ জয় করেছো। গেলাসে-গেলাসে অমৃত উপেক্ষা করেছো! তোমার মনের বল অসাধারণ, তোমাকে প্রণাম করি।"

জ্যোতি বাবুর বলিবার ধরণে দিদি হাসিতে লাগিলেন। আমি কোনো মতে হাসি চাপিলাম।

আমাদের হাসিতে যোগ না দিয়া মিলি তীক্ষ্ণ কটাক্ষে জ্যোতি বাবুকে বিদ্ধ করিয়া কহিল, "আপনার মত এত অহঙ্কার এত গর্ব্ব আমি কোথাও দেখিনি। নিজের ওপর এতখানি বিশ্বাস না রেখে চার দিকে ভালো করে চেয়ে দেখুন। যারা বিদেশে যায়, তাদের সবাই কিছু চরিত্র হারিয়ে মাতাল হয়ে ফিরে আসে না!"

"আসে না আবার! তুমি কিছু জানো না মিলি! পরিচিতের এক জন বিলাত-ফেরতের নাম করো,—যার মাতাল নাম রটেনি, চরিত্রহীন নাম রটেনি। ভালো থাকলেও স্থান-মাহাত্ম্যে কেউ তাকে ভালো বলে স্বীকার করে না। যাদের সাথের সাথী নিন্দা-কুৎসা, নিজেদের জয়-ঢাক তাদের আপনাকে বাজাতে হয়। সাধে আমি আমার ভেতরকার জ্যোতিভূষণকে নমস্কার করি!"

জ্যোতি বাবু হা-হা শব্দে হাসিতে লাগিলেন। তাঁহার হাসির বাতাসে মিলির মনের মেঘ কাটিয়া গেল।

দিদি কহিলেন, "আহা, বেচারা জ্যোতিভূষণ সরলতার প্রতিমূর্ত্তি! দিন-রাত কি কষ্টই না সইচে! মিথ্যা অপবাদ, অখ্যাতির বিষ

গিলে নীলকণ্ঠ হয়েছে! সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার থেকে কত নির্মল শুদ্ধ হয়ে ফিরেছে, এ পোড়া দেশের পোড়া লোকগুলো তা বুঝতে পারে না! এদের নামে শুধু শুধু কলঙ্ক দেয়? যা রটে, তা ঠিক না ঘটলেও তিল থাকে! তিল থেকে তাল হয়, আম-কাঁটাল ফলে না জ্যোতি।"

মিলি সায় দিল, সত্যি কথা বলেছেন দিদি, সামান্য কিছু না থাকলে লোকে এমন বলে না। এই তো আমরা দু'টি বোন এক-বাড়ীতে রয়েছি, সামনে না বলুক, আড়ালেও আমার নামে নানা জনে নানা কথা বলে। আমি খুব ভালো নই বলেই বলতে পারে। করুকে তো বলতে পারে না! পারবে কি করে? ও যে সত্যি ভালো।"

আমি মিলিকে থামাইয়া দিলাম, "বাজে বকিস্ নে মিলি, ভালো লোক হলেই প্রশংসা পায় না। অনেকে নিন্দার কাজ ক'রে প্রশংসা পায়, আবার প্রশংসার কাজেও মানুষের নিন্দা হয়। নিন্দা-প্রশংসা আসলে প্রবাদের মত! এবার পিসিমার এক ভাগ্নের সঙ্গে পরিচয় হলো। আমাদের বাড়ীতে তিনি এসেছিলেন। আশ্চর্য্য মানুষ, তিনি! বহু কাল আমেরিকায় থেকেও তিনি সিগারেট দূরের কথা, চা-পর্য্যন্ত অভ্যাস করেননি। তাঁর জীবন-যাত্রার প্রণালী আর্য্য-ঋষিদের মত, তাঁকে দেবতা বললেও বেশী বলা হয় না। তাঁকেও লোকে সন্দেহ করে!"

মিলির চোখে-মুখে বিদ্রূপের হাসি উথলিয়া উঠিল। বাঁকা ঠোঁট আরো একটু বাঁকাইয়া মিলি কহিল, "দেবতা বললেও যাঁকে বেশি বলা হয় না, কৈ, সারাদিনেও তাঁর কথা তো আমায় বলিস্‌নি করু! কোথায় তিনি থাকেন? কি কাজে দেবতার পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, শুনি? কি তাঁর নাম?"

মিলির প্রশ্নে আমার রাগ হইল। তিক্ত স্বরে আমি জবাব দিলাম, "সারা দুপুর ঘুমিয়ে কাটালাম, বলবো কখন? আর তাঁর কথা তোমাদের মত শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত বড়মানুষদের শোনবার যোগ্য নয় মিলি! তাঁর কাজ দীন-দুঃখীদের সুখ-দুঃখ, অভাব-অনাটন নিয়ে,—কি হবে তা শুনে? তোমরা বুঝবে না! তাই তাঁর কথা বলে তোমাদের কাছে তাঁকে হাস্যাস্পদ করতে চাই না।"

মিলি হাসিল, "এরি মধ্যে এমন দরদ! এত টান! অভয় দিচ্ছি, করু, তোর আদর্শ মহাপুরুষকে আমাদের তিন জনের বিরাট্ সভায় হাস্যাস্পদ করবো না। তুই নির্ভয়ে তাঁর নাম বল্, তাঁর কার্য্য-তালিকা দাখিল কর্।"

দিদি সকৌতুকে বলিলেন, "বনফুল আমাদের পাগলি! যিনি বড়, তাঁকে নিয়ে হাসি-তামাসা চলে না বোন। তুমি যাঁকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করো, আমরা কি তাঁকে অসম্মান করতে পারি? কখনো না।"

জ্যোতি বাবু কহিলেন,—"নিশ্চয়। যিনি আপনার প্রীতিভাজন হয়েছেন, আমাদেরো তিনি তাই। আপনি তাঁর নাম বলুন, আমিও পাড়াগেঁয়ে লোক—হয়তো চিনতে পারবো।"

অলক্ষ্যে আশ-পাশের তিনখানা মুখ নিরীক্ষণ করিলাম। কৌতুকে কৌতূহলে তিন-জোড়া চোখে যেন বিদ্যুতের দীপ্তি! আমারই ভুল,—চন্দ্রদার সম্বন্ধে এখনি এতখানি পক্ষপাতিতা-প্রকাশ আমার অন্যায় হইয়াছে। সকলের মনে আশু-সম্ভাবনার আভাস আমিই জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছি।

লজ্জিত হইয়া আমি বলিলাম, "তাঁর নাম চন্দ্রচূড় রায় চৌধুরী। তিনি আমার দাদা হন।"

জ্যোতি বাবু সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন, "চন্দ্রচূড়! চন্দ্র যে আমার বাল্যবন্ধু। গায়ে-গায়ে লাগানো দু'খানা গাঁ হলেও আমরা এক-স্কুলে পড়েছি। একসঙ্গে এক-কলেজে ঢুকেছি, তার পরে হয়েছে আমাদের ছাড়া-ছাড়ি। সে আমার বন্ধু, এ গৌরব আমার সব চেয়ে বড়। আমি হতভাগা, তাই তার পথ ধরতে পারিনি। তার ত্যাগ—তার আদর্শকে মনে-মনে পূজো করেই আসছি শুধু। আপনি তাকে কোথায় দেখলেন? সে কেমন আছে? কত কাল তাকে দেখিনি!"

"চন্দরের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল বনফুল? আমি ভাবছিলাম, না জানি কার নাম করবে। তোমাদের মত আমিও চন্দরের দিদি। তাকে আমি কত ভালোবাসি বলবার নয়। ছেলে, না, হীরার টুকরো! অমন ছেলে আর-একটি আমার চোখে পড়েনি। তুমি আমাদের কথা তাকে বলেছিলে কিছু? বলবেই বা কি করে? তাকে যে জানি আমরা, তা তো কখনো তোমায় বলিনি। চন্দ্র তোমাদের বাড়ীতে কেন এসেছিল?"

দিদি চুপ করিলেন। স্নেহে করুণায় তাঁহার চক্ষু ছলছল্ করিতে লাগিল।

বলিলাম, "তিনি আমার পিসিমার ভাগ্নে। পিসিমা ডেকেছিলেন, তাই দেখা করতে এসেছিলেন। আমি তো জানি না, তাঁর সঙ্গে আপনাদের জানা-শোনা আছে! তাঁকে আমি এই প্রথম দেখলাম। তিনি ভালোই আছেন।"

জ্যোতি বাবু বলিলেন, "আপনি তাকে প্রথম দেখলেন করবী দেবি! দেখাবার মত অমন যে রূপ, তা আপনার পিসিমা এত দিন না দেখিয়ে এবার আপনি বাড়ী যাবা মাত্র চন্দ্রকে ডেকে দেখালেন কেন? আপনার পিসিমা সেকেলে মানুষ, পাকা বুদ্ধি, নিশ্চয় তাঁর কোন উদ্দেশ্য আছে।"

জ্যোতি বাবুর পরিহাসে দিদি খুশী হইলেন, বলিলেন, "ঠিক বলেছিস্ জ্যোতি, আমি যেন কি! এত দিন আর একটা ভাই খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম, চন্দরের কথা আমার মনে এসেও আসেনি। আসেনি বলে মনকে দোষ দেওয়া যায় না,—সাধারণ ভাবে কেউ তাকে চাইতেই পারে না। পুণ্য না থাকলে ওকে পাওয়া যায় না। বনফুল যেমন লক্ষ্মী মেয়ে, চন্দরও তেমনি সাক্ষাৎ চন্দ্রচূড়! দু'টি এক হলে মণিকাঞ্চন যোগ হবে।"

মৌন-মুখে মিলি আমাদের আলাপ-আলোচনা শুনিতেছিল, বলিল, "দিদির অন্য ভাইটি যে 'সন্তান', অনুমানে তা বুঝে নিয়েছি। কিন্তু বিধান্ আর 'সন্তানের' মণিকাঞ্চন সংযোগ, জানতাম না।"

দিদির হইয়া জ্যোতি বাবু জবাব দিলেন, "চন্দ্র যথার্থ সন্তান, তাতে সন্দেহ নেই। তার মত প্রকৃত সন্তান হাজারে একটা মেলে না। জীবানন্দের শান্তি ছিল, চন্দ্রচূড়েরও শান্তির প্রয়োজন আছে। কাল্‌কের ডাকে চন্দ্রকে আমি চিঠি লিখবো। পিসিমার ডাকে তাকে সাড়া দিতে হয়েছে, আমাদের ডাকে তাকে ধরা দিতে হবে। কি বলো দিদি, পারবে না তুমি তাকে বাঁধন পরাতে?"

"পারবো না আবার? আমিও কাল চিঠি লিখবো। বনফুলের মত মেয়ে কটা আছে?"

মিলি বলিল, "বেশি নেই দিদি, কিন্তু আপনার বনফুলের বিয়ের

ঘটকালি সহজ নয়। ও পাহাড়ী নদী, ওর গতি আঁকা-বাঁকা। তবু আপনাদের আদর্শকে এক বার দেখান্, আমরাও চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করি।"

মিলি এ বলে কি! বাক্যে ব্যবহারে আমার মনের ভাব কখনো আমি কাহাকেও জানিতে দিই নাই। ফল্গুর ক্ষীণ ধারা জাগিয়া আমার মনের মধ্যে লুকাইয়া আছে! তাহার কলধ্বনি মিলির জানিবার কথা নয়! আমার পাপের মন,—সামান্য উপহাসকে তাই সহজ ভাবে গ্রহণ করিতে পারি না। কি জানি, কি কথায় মুখরা মিলি কি বলিয়া বসিবে! অথচ দিদির প্রস্তাবকেই বা মাথা পাতিয়া লই কি বলিয়া?

মরিয়া হইয়া আমি কহিলাম, "মিলির কথা শুনো না দিদি, গতি আমার ঠিকই আছে। তবে চন্দ্রদাকে আমি 'দাদা' বলে ডাকি, নিজের দাদার মতই মনে করি। তিনিও আমাকে তাঁর ছোট বোনের মত স্নেহ করেন। পিসিমার নিজের ভাগ্নে,—আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে। আমার অনুরোধ, তাঁর নামের সঙ্গে তোমরা আমার নাম জড়িয়ো না।"

দিদি ক্ষুণ্ণ হইলেন। বলিলেন, "তাই তো, আমার ঘটকালি যে হলো না! মুলুকে এত মানুষ থাকতে চন্দ্রচূড়ের সঙ্গেই বা তোমার ভাই-বোন সম্বন্ধ বেরুলো কেন? এখন আবার কোথায় খুঁজে বেড়াই! খুঁজলে আর যা মিলুক, চন্দ্রচূড় মিলবে না তো!"

"কেন মিলবে না দিদি? আগে হুজুরে হাজির করিয়ে দিন, তার পরে পিসিমার ভাগ্নে, মাসিমার দেওর—আমরা দেখে নেবো। বিয়ের কনেদের দস্তর ওজর-আপত্তি করা, তাতে কাণ দিলে কর্ম্ম-কর্ত্তাদের চলে না!" বলিয়া মিলি আমার দিকে চাহিয়া চোখ টিপিল।

দুই ভাই-বোন প্রসন্ন হইলেন।

আমার মনের মেঘ সরিয়া গেল! আমার অন্তরতম কথা তাহা হইলে এখনো মিলির অগোচর আছে!

৩৪

সেদিন শীতের স্বল্পায়ু অপরাহ্ণে সবে চুল-বাঁধা শেষ করিয়াছি; এমন সময় মিলি আমাকে বসিবার ঘরে ডাকিয়া পাঠাইল!

আজকাল মিলির অকারণ গল্প, ভাগুর আব্দার, মাসিমার ফরমাস প্রায় বন্ধ হইয়াছে। মাসিমার কড়া শাসনে বাড়ীতে হাসি-কলরব থামিয়া গিয়াছে। আমাদের তিন ভাই-বোনের আসন্ন পরীক্ষার চিন্তায় তিনি অস্থির। গৃহে আমাদিগকে আবদ্ধ করিয়া আগন্তুক অভ্যাগতদের অভ্যর্থনার ভার তিনি নিজে লইয়াছেন।

মাসিমা আজ বাড়ী নাই। কি কাজে কোন্ বন্ধুর গৃহে গিয়াছেন, ফিরিতে রাত্রি হইবে। এমন সুযোগে মিলি হয়তো আড্ডা জমাইতে আমাকে ডাকিতেছে জানিয়া আমি হলে প্রবেশ করিলাম।

দেখি, পাশাপাশি দু'খানা সোফায় বসিয়া চন্দ্রদা এবং মিলি।

সবিস্ময়ে আমি বলিলাম, "চন্দ্রদা! আপনি এখানে?"

হাসিয়া চন্দ্রদা বলিলেন, "হাঁ, আমি এখানে,—অবাক হচ্ছ রুরু! ক'মাস আগে তুমিই না আমাকে এখানে আসবার নেমন্তন্ন করে এসেছিলে! তাই এসেছি। আসবার পথে মামা বাবুকে দেখে এসেছি। তিনি ভালো আছেন।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কবে আপনি এসেছেন? মিলির সঙ্গে আপনার পরিচয় হলো কেমন করে?"

"কাল এসেছি। জ্যোতির ওখানে এঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। আমি নিজে এসে তোমাকে চমকে দেবো বলে কাল আমার আসার খবর দিতে এঁকে বারণ করেছিলাম। ক'মাস হলো যেমন জ্যোতির 'এসো-এসো' ডাকাডাকি, দিদিরও তেমনি তাড়া। অবশেষে কাজকর্ম্ম ফেলে আমাকে আসতে হলো। তোমার পরীক্ষাও তো এসে পড়লো, কেমন তৈরি হলো?"

"ভালো না চন্দ্রদা, গোড়ায় না পড়ে শেষকালে আরম্ভ করলে যা হয়! কিছু মনে থাকছে না। ভালোও লাগে না। কত দিন আপনি এখানে থাকবেন?"

"কত দিন আর! এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে এসেছি। তার অর্দ্ধেক কেটে গেল। আছি আর দিন তিন-চার।"

মিলি কহিল, "আপনার আবার ছুটি কিসের? আপনি তো কারো গোলামী করেন না!"

"আমি কাজের গোলাম মল্লিকা দেবি,—কর্ম্মক্ষেত্র থেকে ছুটি নিতে হয়।"

ফুলদানি হইতে একটা পাতা লইয়া মিলি নীরবে ছিঁড়িতে লাগিল।

এতক্ষণ মিলিকে আমি তেমন লক্ষ্য করি নাই। তরুণ বয়স্ক পুরুষের সামনে মিলি চিরকাল রহস্যময়ী, কৌতুকময়ী। তার বাক্-চাতুরী, হাব-ভাব, লীলা-মাধুরী উৎকর্ষ লাভ করে। সর্ব্বোপরি মিলির প্রসাধন—দেখিবার বস্তু। তাহা যেমন রুচিসঙ্গত, তেমনি মোহময়।

সাধারণতঃ মিলি রঙ্ ভালোবাসে। রঙীণ বসন-ভূষণে বিচিত্র বর্ণের প্রজাপতি সাজিয়া সে সকলের চোখ ঝলসাইয়া দিতে ভালোবাসে। আজ মিলি শুভ্রবেশে দেহশ্রী বিকশিত করিয়াছে। জরি-পাড়ের সাদা শাড়ী, হীরার বালা, কুচা হীরার কণ্ঠী, খোঁপায় জড়ানো কুন্দকলির মালা। জ্ঞানে গর্ব্বে সমুজ্জ্বল আয়ত চোখ, প্রীতিপ্রসন্ন-মুখ। কিন্তু এ প্রয়াস কাহার জন্য? নামের মত যিনি নির্লিপ্ত, উদাস, নারীর রূপে—নারীর প্রসাধনে তাঁহাকে কেহ বিচলিত—বিমোহিত করিতে পারে কি?

আমি বলিলাম, "চন্দ্রদা আপনার কর্ম্মক্ষেত্র আর ছুটি—ও-সব জানি না, আমার পরীক্ষার আগে আপনি যেমন এসে পড়েছেন, আপনাকে ক'দিন না খাটিয়ে ছাড়ছি না! সাহায্য করতে হবে। ভাই হওয়া মুখের কথা নয়। বোনের দাবী মেটাতে হয়।"

মিলি প্রশ্ন করিল, "আপনার কি ফিলজফি ছিল?"

চন্দ্রদা বলিলেন, "অতীতে ছিল, সবাই জানে! কিন্তু বর্ত্তমানে আমি সে সব ভুলে গেছি। এখন আমাকে দার্শনিক বললে ভালো লাগে না। চাষা বললে খুশী হই। আমার কাছে পড়া তোমার নিরাপদ নয় রুরু, ফিলজফির বদলে আমি হয়তো তোমাকে কৃষিতত্ত্ব পড়িয়ে তোমার পড়া মাটী করে দেবো। নাহলে বোনের দাবী মেটানো ভাইয়ের কর্ত্তব্য, নিশ্চয়। সত্যি যদি তোমার উপকার হয়, তা হলে বই নিয়ে এসো, উল্টে-পাল্টে দেখি, কিছু মনে আছে কি না?"

"আপনার আবার মনে নেই! খুব আছে। এখনি আমি বই

আনছি। আপনি আগে কিছু খেয়ে নিন চন্দ্রদা! বলুন, কি খাবেন? নিয়ে আসি।"

মিলির পানে চাহিয়া চন্দ্রদা বলিলেন, "এখন আমার পক্ষে খাওয়া কত দূর অসম্ভব, তার সাক্ষী আছেন এই ইনি। এঁর সামনে দিদির আদেশ পালন করে আসছি। আজ আর পারবো না কন্ন,—আছি তো ক'দিন. খেলেই হবে। মল্লিকা দেবি, আপনি 'আমাকে আনতে গিয়ে স্বচক্ষে চাষা-ভূষোর খাওয়ার বহর তো দেখে এলেন!"

মিলি কহিল, "যত বলছেন, তেমন কিছু খাননি! আজ না খেলেন, কাল কিন্তু আমাদের এখানে আপনাকে খেতে হবে। চা খান না, চায়ের নেমন্তন্ন চলবে না। দুপুরবেলা ভাতের নেমন্তন্ন রইলো। মা বাড়ী নেই, মার প্রতিনিধিদের অনুরোধ রাখতে বোধ হয় আপনার আপত্তি হবে না?"

"কি যে বলেন মল্লিকা দেবি! আপত্তি আবার কিসের? আপনি বললেন, এই যথেষ্ট। ভাত-তরকারী বেশি করে রাঁধবেন। বাঙ্গালের খাওয়া, শেষকালে আপনাদের ফাঁকিতে না পড়তে হয়!"

"আমরা ফাঁকিতে পড়ি না, আপনারা যে আমাদের নাম দিয়েছেন অন্নপূর্ণা!" অন্নপূর্ণার অক্ষয় ভাণ্ডার!"

মিলির কথার উত্তর-স্বরূপ চন্দ্রদা একটু হাসিলেন। হাসিয়া আমাকে বলিলেন, "তুমি এখানেই পড়বে? না, তোমার পড়ার ঘরে যাবে? শুধু শুধু সময় নষ্ট করো না।"

মিলি সবিনয়ে বলিল, "সবে তো সন্ধ্যে, এ সময় কন্ন কোন দিন পড়ে না। আজ না হয় পড়ানো থাক্. আপনি তৈরী হয়ে আসেননি!"

"সামান্ত বিষয়ে প্রস্তুত-অপ্রস্তুতের কিছু নেই। দেখুন, আমার একটা বদ অভ্যাস আছে, কোন কাজের কথা উঠলে তা না করা পর্য্যন্ত কেমন সুস্থির হতে পারি না। যা করবো মনে করি, তখনি সেটা করা চাই।" বলিতে বলিতে ব্যস্তসমস্ত ভাবে চন্দ্রদা আসন পরিত্যাগ করিলেন।

মিলি মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল। তাহার চক্ষে যেন প্রদীপ জ্বলিতেছে!

মিলির চোখের এ আলো অভিনব! এ বিমুগ্ধ, বিহ্বল ভাব নূতন। মিলি পুরুষ-বিদ্বেষী, পুরুষের কাজে তাহার চোখে বিদ্রূপের জ্বালাই বিকীর্ণ করে চিরদিন, তাহাতে প্রেম-প্রীতি-শ্রদ্ধার জ্যোতি কখনো দেখি নাই।

সেই মিলির সলজ্জ, শঙ্কিত, আবেশ-ভরা দৃষ্টি দেখিয়া মনে-মনে খুশী হইলাম। হ্যাঁ, বিধাতার রূপ-সৃষ্টি মিথ্যা হয় নাই! যে প্রদীপ এত দিন পতঙ্গের পক্ষচ্ছেদ করিয়া আসিতেছে, এত দিনে ঘন আবরণের অন্তরালে কি তাহার আত্মগোপনের সময় উপস্থিত হইল? চন্দ্রচূড়ের চন্দ্রকান্ত মূর্ত্তি প্রথম-দর্শনেই আমার মনে মিলির কথা জাগিয়াছিল। ভগবানের পরিকল্পনার নিদর্শন এত শীঘ্র মিলিকে দেখাইতে পারিব, ভাবি নাই! কায়মনোবাক্যে আমার কামনা, মিলি জ্যোতি বাবুর হৃদয়কে সরস সজীব করিয়া তাঁহার গৃহ আলো করিয়া রাখুক্ নিজের দর্পতেজ বিসর্জ্জন দিয়া। নারীর এত গর্ব্ব-অহঙ্কার সাজে না! আশ্চর্য্য হইলাম, আমার অগোচরে এত তাড়াতাড়ি মিলি চন্দ্রদার সঙ্গে শুধু আলাপ করে নাই, শ্রদ্ধাও করিয়াছে।

তাহার পর আমরা তিনটি প্রাণী আমার পড়ার ক্ষুদ্র টেবিল ঘিরিয়া বসিলাম। চন্দ্রদা পাঠক, আমরা দুই বোন শ্রোতা। সুরু হইল নীরস দর্শন-শাস্ত্রের সুচারু ব্যাখ্যা, গভীর গবেষণা।

চন্দ্রদা বলিয়াছিলেন, তিনি সব ভুলিয়া গিয়াছেন। ভোলা যদি ইহার নাম, তবে স্মরণ রাখা কাহাকে বলে? মন দিয়া আমি তাঁহার পঠিত বিষয় বুঝিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। মিলি অনিমেষ নয়নে তাঁহার জ্ঞানদীপ্ত, উগ্র সুন্দর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

মিলি ইংরেজী সাহিত্যের অনুরাগিণী, দর্শনে তাহার আগ্রহ নাই। কিন্তু বক্তার প্রকাশ-ভঙ্গিমায় আজ সে যেন তন্ময়!

অনেক রাত্রে চন্দ্রদার বিদায়-কালে মিলি বলিল, "এবার পরীক্ষা হয়ে গেলে আবার আমি ফিলজফি নিয়ে এম-এ পড়বো। তখন কিন্তু দয়া করে আমায় সাহায্য করতে হবে।"

হাসিয়া চন্দ্রদা কহিলেন, "বেশ তো, যখন আমাকে দরকার হবে, ডাকবেন।" [ক্রমশঃ।

শ্রীগিরিবালা দেবী

পৌষের পল্লী

বঙ্গের পল্লী অঞ্চলের সহিত যাঁহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, তাঁহারা জানেন—পল্লীগ্রামের গৃহস্থমাত্রেই পৌষ মাসকে 'লক্ষ্মী মাস' বলেন। পল্লীগ্রামের জনসাধারণের নিকট ধান্তই লক্ষ্মী। এই জন্ত পল্লীগ্রামের সর্ব্ব-শ্রেণীর হিন্দুর গৃহে 'কোজাগর পূর্ণিমায়' যে লক্ষ্মীপূজা হয়, সেই পূজা উপলক্ষে নিষ্কলঙ্ক 'নূতন ধান্তে পূর্ণ লক্ষ্মীর আড়ি' বা বেত্র-নির্ম্মিত 'কাঠা' অনুচ্চ কাষ্ঠাসনে রাখিয়া মালী-বাড়ী হইতে সংগৃহীত সোলা-নির্ম্মিত লক্ষ্মীর মুখ (মুখোস) সেই ধান্তস্তূপের উপর বসাইবার পর লক্ষ্মীরূপে 'লক্ষ্মীর আড়ির' পূজা করা হয়।

বর্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বে বঙ্গের অনেক পল্লীর 'বিলেন' জমিতে বা নদীতীরে 'আশুধান্ত' অর্থাৎ আউশ ধান উৎপন্ন হয়। এই ধান তিন মাসেই পাকিয়া যায় বলিয়া ইহা আশু বা 'আউশ' নামে পরিচিত; কিন্তু তাহার পরিমাণ এতই অল্প যে, তাহাতে দুই-তিন মাস মাত্র পল্লীবাসী গৃহস্থের সাংসারিক অভাব পূরণ হইয়া থাকে। তাহা নিঃশেষিত হইলে শরতের শেষে আমন ধান পাকিয়া উঠে, এবং তাহাতেই গৃহস্থের সম্বৎসরের চাউলের খরচ চলে। পল্লীবাসী গৃহস্থেরা পৌষ মাসেই নূতন আমনের চাউল সংগ্রহ করে; তখন তাহারা আর অভাবের কষ্ট বুঝিতে পারে না। মাঠে মাঠে আমন ধানের কাটাই-মাড়াই চলে, স্বর্ণাভ ধান ঝাড়িয়া বিচালীর যে স্তূপ পাওয়া যায়, তাহাতে গৃহস্থের পালিত গো মহিষাদির ক্ষুধানিবৃত্তি হয়। প্রচুর পরিমাণে খাইতে পাইয়া দুগ্ধবতী গাভী অধিক দুগ্ধ প্রদান করে। এদিকে অগ্রহায়ণের শেষেই মুগ, কলাই, মসুর প্রভৃতি ডালের খন্দ উঠিয়াছে; সুতরাং পৌষ মাসে পল্লীবাসীর সাধারণ আহার্য্য ডাল-ভাতের অভাব দূর হয়। পল্লীবাসীর পক্ষে এরূপ সুখের মাস আর নাই; এই জন্তই তাহারা পৌষ মাসকে 'লক্ষ্মী মাস' নামে অভিহিত করে।

অর্দ্ধ শতাব্দীরও বহু পূর্ব্বে আমাদের পাঠ্য-জীবনে পল্লী-অঞ্চলে পৌষ মাস কি ভাবে অতিবাহিত হইত, আজও তাহা মনে পড়িতেছে।

সেই সুদীর্ঘ ষাট বৎসর পরে—একালে সেই দৃশ্যের প্রচুর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পল্লীর সেই সকল বৈশিষ্ট্য অতীতের তিমিরাচ্ছন্ন গর্ভে চির বিলীন হইয়াছে।

সে কালে এই সময় গ্রামের হাটে বা বাজারে 'রাঢ়' (মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, বীরভূম) অঞ্চল হইতে গাড়ী গাড়ী নূতন চাউল ও মুগ কলাই আমদানী হইত। গ্রামপ্রান্তবাহিনী নদীতে প্রতিদিন নৌকাবোঝাই ধানেরও আমদানী হইত,—সরু, মোটা নানা প্রকার ধান। নানা প্রকার তাহাদের নাম। উহা ক্রয়ের জন্য গ্রামস্থ জনসাধারণের কি আগ্রহ ও উৎসাহ! চেলুকীরা তাহা কিনিয়া চাল প্রস্তুত করিত। গ্রামের নিকট রেলষ্টেশন না থাকিলেও গ্রামবাসীরা এই সকল পণ্যের অভাব অনুভব করিত না। অগ্রহায়ণ হইতে পৌষ পর্য্যন্ত গ্রামপ্রান্তবর্ত্তী বিভিন্ন ধান্যক্ষেত্রে কৃষকদের যেন আনন্দোৎসব চলিত! দীর্ঘকাল রৌদ্রে পুড়িয়া ও সারাদিন বর্ষার জলে ভিজিয়া কঠোর পরিশ্রমে তাহারা যে ধান্য উৎপাদন করিয়াছে, এত দিন পরে মাঠের শোভা ও তাহাদের সম্বৎসরের সম্বল সেই সোনার ফসল পাকিয়াছে; তাহা তাহারা কাটিয়া এক এক স্থানে স্তূপাকারে পালা দিয়া রাখিয়াছিল। এখন ক্ষেতের মধ্যে অনেকখানি স্থান কোদালীর সাহায্যে চাঁচিয়া পরিষ্কৃত করিয়া যে 'খোলা' প্রস্তুত করিয়াছে, সেই স্থানে আট দশটি বলদের সাহায্যে পালার ধান মাড়াইয়া বিচালী হইতে ঝরাইয়া লওয়া হইতেছে। কৃষক বলদগুলিকে পাশাপাশি রজ্জুবদ্ধ এবং তাহাদের প্রত্যেকের মুখে দড়ির জাল আঁটিয়া দিয়া, তাহাদিগকে প্রসারিত ধান্যরাশির উপর পুনঃ পুনঃ ঘুরাইতেছে। অন্য এক জন কৃষক তাহার পশ্চাতে ঘুরিয়া, 'কাঁদাল' দিয়া সেই সকল বিচালী উল্টাইয়া পাল্টাইয়া চারি দিকে সরাইয়া দিতেছে। চার পাঁচ হাত দীর্ঘ বংশদণ্ডের মাথায় লোহার হুক আঁটিয়া এই 'কাঁদাল' নির্ম্মিত হইয়াছে। বিচালী হইতে ধানগুলি নিঃশেষে ঝরিয়া খোলায় পড়িবে—এই উদ্দেশ্যেই কাঁদালের ব্যবহার।

কোন কোন ক্ষেতে ধান-মাড়াই শেষ হইয়াছে। বলদগুলিকে মুক্তিদান করিয়া তাহাদের মুখের জাল খুলিয়া লওয়া হইয়াছে। তাহারা এক এক স্থানে দাঁড়াইয়া নতমুখে বিচালী চর্ব্বণ করিতেছে। দুই-তিন জন কৃষক বিচালীর গাদা এক এক পাশে সরাইয়া রাখিয়া ধানগুলি স্তূপাকারে জড়ো করিতেছে, এবং কেহ কেহ কুলার সাহায্যে সেই ধান ঝাড়িয়া তদ্দারা বস্তাগুলি পূর্ণ করিতেছে। গরুর গাড়ী খোলার মধ্যেই আনিয়া রাখা হইয়াছে।—ধান্যপূর্ণ বস্তাগুলি গাড়ীতে তুলিয়া দেওয়া হইলে, কৃষক যখন ছয়-সাত বস্তা (বার চৌদ্দ মণ) ধানসহ গাড়ী বলদ-জোড়ার সাহায্যে বাড়ী লইয়া যাইতেছে,—তখন দিবা অবসানপ্রায়, সূর্য্য অস্তগমনোন্মুখ। ধূলিধূসরিত নগ্নকায় কৃষক, মাথায় মলিন গামছা জড়াইয়া গাড়ীর সম্মুখে বসিয়া মহানন্দে গাড়ী চালাইয়া লইয়া যাইতেছে। আজ তাহার সকল কষ্ট ও পরিশ্রম সফল!

গ্রামের উত্তরে ও পূর্ব্বে মেঠোপথ প্রসারিত; তাহার দুই পাশে স্থানীয় সমৃদ্ধ গৃহস্থদের আম-কাঁটালের বাগান; তাঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষরা সেকালে এই সকল বাগান প্রস্তুত করিয়া সযত্নে ইহাদের পরিচর্য্যা করিয়া আসিলেও এখন বাগানগুলি অরক্ষিত ও সম্পূর্ণ উপেক্ষিত; নাটা, শিয়াকুল, ময়না, বঁইচি প্রভৃতি কণ্টকপূর্ণ লতা-গুল্মে ঐ সকল স্থান দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে; স্থানে স্থানে জঙ্গল এরূপ নিবিড় যে, বাঘ লুকাইয়া থাকে শুনিয়া দিবাভাগেও কেহ সেই সকল জঙ্গলের দিকে যাইতে সাহস করে না। গ্রীষ্মকালে আম-কাঁটাল সংগ্রহ করিবার জন্য নিকিরীরা এই সকল বাগান যমকর জমা লইয়া ফল পাহারা দেওয়ার জন্য সেখানে 'টোং' পাতে। এই 'টোং'গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর; তাহাদের খড়ের চাল, এবং চ্যাটাই-নির্ম্মিত আবরণ। প্রত্যেক টোং তিন-চারি হাত উচ্চ বংশদণ্ডের উপর স্থাপিত; বাঁশের মৈ (সিঁড়ি) দিয়া টোংএ উঠিতে হয়। এই জন্যই রাত্রিকালে বাগানের প্রহরীকে কোন বন্য জন্তু আক্রমণ করিতে পারে না। বাগানের প্রহরীরা রাত্রিকালে এই সকল টোংএ শয়ন করিয়া টোংএর অদূরে উপবিষ্ট ব্যাঘ্রের গর্জ্জন শুনিতে পায়। তাহাকে দূরে তাড়াইবার জন্য অনেক প্রহরী টোংএর চারি দিকে শুকনো কাঠ, বাঁশ প্রভৃতির সাহায্যে আগুন জ্বালিয়া রাখে। আগুন দেখিলে বাঘ তাহার নিকটে আসে না।

এই সকল পুরাতন বাগানের অদূরে গ্রামের কোন কোন সমৃদ্ধ অধিবাসী আম, লিচু নারিকেলকুল, কামরাঙ্গা, জাম, জামরুল প্রভৃতি ফলের নূতন বাগান করিয়াছেন; সেগুলি সযত্নে রক্ষিত। বাগানের পর সুবিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র। পৌষ মাসে অরহর-ক্ষেত্রে অরহর গাছগুলি পাঁচ-ছয় হাত দীর্ঘ হইয়াছে; তাহাদের শাখাগুলি পরিপুষ্ট ফলভারে অবনত। অদূরে ছোলার ক্ষেতে ছোলা পুষ্ট হওয়ায় অপরাহ্নে গ্রামের ছেলেরা শীতবস্ত্রে মণ্ডিত হইয়া মাঠে বেড়াইতে আসিয়া ছোলার ঝাড় তুলিয়া অঞ্চলে সঞ্চয় করিতেছে; কোন কোন দল মাঠের ভিতর আগুন জ্বালিয়া তাহাতে সেই সকল ছোলার গাছ দগ্ধ করিতেছে; আগুনে গাছের ছোলাগুলি আধ-পোড়া হইলে তাহারা খোসা ছাড়াইয়া সেগুলি মহানন্দে চর্ব্বণ করিতেছে। এই অর্দ্ধদগ্ধ ছোলাকে 'ছোলার হোবা' বলে; পল্লীগ্রামের বালক-বালিকাগণের ইহা অত্যন্ত মুখরোচক খাদ্য।

গ্রামের বিভিন্ন গৃহস্থের বাড়ীতে, পথের ধারে, বাগানের ভিতরে অসংখ্য খর্জ্জুরবৃক্ষ। গ্রামস্থ হাড়ী, বাগ্দী, বাইতি প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর লোক খেজুরে গুড় প্রস্তুতের জন্য এই সকল খেজুর-গাছের 'মাথীর' নিম্নভাগ তীক্ষ্ণ অস্ত্রে চাঁচিয়া, শীতের কয়েক মাস সেখানে মাটীর ঠিলি বাঁধিয়া রস সংগ্রহ করে। ইহাদিগকে কোথাও 'শিউলি', কোথাও বা 'গাছী' নামে অভিহিত করা হয়। অপরাহ্নে গাছীরা মাটীর ঠিলি পশ্চাতে বুলাইয়া, আবদ্ধ আটায় স্থূল রজ্জুর সাহায্যে খেজুর গাছে উঠিতেছে, এবং একটি অনতিদীর্ঘ বংশদণ্ড রজ্জু দ্বারা গাছের সঙ্গে আড়ভাবে বাঁধিয়া, তাহার উভয় প্রান্তে দুই পা রাখিয়া কটিদেশে আবদ্ধ চর্ম্মাবরণের ভিতর হইতে বক্রমুখ তীক্ষ্ণাগ্র হেঁসো বা কাটারী বাহির করিতেছে, এবং তদ্দারা গাছের গলা পুনর্ব্বার চাঁচিয়া রস বাহির হইলে কর্ত্তিত স্থানের নীচে চেরা-কঞ্চির পাঁচ-ছয় আঙ্গুল দীর্ঘ 'নলি' বসাইয়া দিতেছে; তাহার পর সেই নলির অগ্রভাগ ঠিলির মুখে প্রবেশ করাইয়া, ঠিলিটা নলির মুখ হইতে কোন কারণে সরিয়া যাইতে না পারে—এই উদ্দেশ্যে খেজুর-গাছের দুইটি ডেগড়ো দুই দিক্ হইতে টানিয়া-আনিয়া তদ্দারা রজ্জুবদ্ধ ঠিলির গলা আঁটিয়া বাঁধিয়া দিতেছে। সারা রাত্রি ধরিয়া সেই ঠিলিতে খর্জ্জুর-রস সঞ্চিত হইতে থাকে। গ্রামের অনেক দুষ্ট লোক রাত্রিকালে গাছে উঠিয়া ঠিলি হইতে সঞ্চিত রস চুরি করিয়া লইয়া যায়—এই জন্য গাছী মানকচু চাকা-চাকা করিয়া কাটিয়া ঠিলির ভিতর ফেলিয়া রাখে। মানকচুর রস খেজুর-রসের

সহিত মিশিলে সেই রস পানের অযোগ্য হয় ; যদি কেহ না জানিয়া সেই রস পান করে, তাহা হইলে মুখে অসহ্য যন্ত্রণা হয়, এমন কি, মুখ ফুলিয়া উঠে! কোন কোন গাছী ঠিলির ভিতর মানকচুর চাকতি এত অধিক পরিমাণে ফেলিয়া রাখে যে, সেই রস হইতে যে গুড় হয়, সেই গুড় খাইলেও গলা কুট-কুট করে! কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল।

গাছীরা যাহাদের খেজুর গাছ হইতে রস সংগ্রহ করে, তাহাদিগকে প্রত্যেক গাছের জন্য দুই সের গুড় খাজনা দিয়া থাকে ; কিন্তু রস হইতে অধিক গুড় উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে এই খাজনা প্রদান করে না। যাহাদের জমিতে ৫০।৬০টি খেজুর গাছ আছে, তাহারা অভিজ্ঞ শ্রমজীবীর সাহায্যে গাছ 'কাটাইয়া', নিজেরাই বাইন নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে গুড় প্রস্তুত করাইয়া লয়। প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক সতেজ খেজুর গাছ হইতে কার্ত্তিক হইতে ফাল্গুনের শেষ পর্য্যন্ত কয়েক মাসে আড়াই মণেরও অধিক গুড় পাওয়া যায়।

নবীন সর্দ্দার বহু কাল আমাদের গ্রাম্য ডাকঘরে 'ডাক-রনারের' কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। আমাদের গ্রাম হইতে বেঙ্গল আসাম (B. A. Ry.) রেলের ষ্টেশনের দূরত্ব আঠার মাইল। এই দীর্ঘ পথে গাড়ীতে ডাক-বহনের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে নবীন সর্দ্দার সন্ধ্যার সময় বল্লমের অনতিদীর্ঘ দণ্ডবিশিষ্ট গলার ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে তাহাতে আবদ্ধ ডাকের প্রকাণ্ড ব্যাগ পিঠে লইয়া দৌড়াইত। সে তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী আড্ডায় পৌঁছিয়া দ্বিতীয় রনারকে ডাকের ব্যাগ দিয়া সেই রাত্রেই বাড়ী ফিরিয়া আসিত ; আবার প্রত্যূষে সেই আড্ডায় গমন করিয়া রেলষ্টেশন হইতে আনীত ডাক বহন করিয়া স্থানীয় ডাকঘরে পৌঁছাইয়া দিলেই সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাহার ছুটী।

খেজুরে-গুড় প্রস্তুত করিয়া যথেষ্ট লাভ হয় বলিয়া নবীন সর্দ্দার শীতকালের কয়েক মাস ডাক-বহনের কার্য্যে অন্য লোককে 'একটিনী' দিয়া ডাক বিভাগের ইন্‌স্পেক্টরের নিকট ছুটী লইত, কারণ, প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে ও প্রভাতে যখন তাহাকে ডাক বহন করিতে হইত, সেই সময়েই খেজুরের রস সংগ্রহ করিয়া গুড় প্রস্তুত করিবার নিয়ম। নবীন প্রত্যহ বৈকালে তিন-চারিটার সময় হইতে গাছে গাছে উঠিয়া রসের জন্য ঠিলি বাঁধিত, এবং সন্ধ্যার পর কাজ শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিত। যে সকল গাছে উপর্য্যুপরি তিন দিন রস সংগ্রহ করা হইত, সেই সকল গাছকে কয়েক দিন বিশ্রাম দিয়া পুনর্ব্বার তাহার শুষ্ক অংশ চাঁচিয়া তাহাতে ঠিলি বাঁধা হইত ; এই ভাবে সংগৃহীত প্রথম দিনের রসকে 'জিরেন-কাটের' রস বলা হয়। এই রসের পরিমাণ অধিক, এবং স্বাদও উৎকৃষ্ট হয় ; গাছীরা খেজুর-রস বিক্রয় না করিলেও তাহাদের নিকট কেহ রস খাইতে চাহিলে তাহাদের অনেকেই তাহা দানে কার্পণ্য প্রকাশ করে না।

নবীন প্রত্যহ প্রভাতে উষালোক পরিস্ফুট হইবার পূর্ব্বেই রসপূর্ণ ঠিলি খুলিতে যাইত, এবং বাঁশের বাঁকের দুই দিকে সেই সকল রসপূর্ণ ঠিলি একাধিক বারে ঝুলাইয়া-লইয়া সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে বাড়ী ফিরিত।

নবীন তাহার বাড়ীতে মৃৎকুটীরের এক প্রান্তে খানিক যায়গা পরিষ্কার করিয়া সেখানে রস জ্বাল দিবার 'বাইন' করিত। এই বাইনে সে বৃহৎ ও গভীর উনান কাটিত ; তাহার পাশে রসপূর্ণ ঠিলিগুলি সারিবন্দী করিয়া বসাইয়া রাখিত। তাহার পর শুক্‌নো গুল্মরাশির সাহায্যে সেই উনানে আগুন জ্বালিত। নবীন বা অন্য কোন গাছীকে রস জ্বাল দেওয়ার 'খড়ি' কিনিতে হইত না ; তাহারা বিভিন্ন পাড়ার বাগানে বাগানে ঘুরিয়া আস্‌শ্যাওড়া, ভাঁট, কাল্‌কাসিন্দা, ও বাকস প্রভৃতি গুল্ম কাস্তে দিয়া কাটিয়া ফেলিয়া-রাখিয়া আসিত ; কয়েক দিনের মধ্যে সেগুলি শুকাইলে পাতাগুলি ঝরিয়া পড়িত, তখন তাহারা তাহা আঁটি বাঁধিয়া বাড়ীতে আনিয়া বাইনে সঞ্চয় করিত, এবং তদ্দ্বারা উনানে খোলাপূর্ণ রস জ্বাল দিয়া গুড় প্রস্তুত করিত।

নবীন গুড় প্রস্তুত করিয়া তাহার ঠিলিগুলির অধিকাংশ শ্রেণীবদ্ধ করিয়া তাহাদের মুখ কাপড়ে ঢাকিয়া তাহার উপর এক এক হাতা গুড় ঢালিয়া দিত ; সেই গুড় ঠাণ্ডা হইয়া পাটালীর আকার ধারণ করিলে সে সেগুলি কুলা বা ডালায় সাজাইয়া লইয়া বাজারে বিক্রয় করিতে যাইত।

এই সময় পাড়ার ছেলেরা কেহ কচুর পাতা, কেহ কলাপাতা হাতে লইয়া নবীনের 'বাইনে'র কাছে আসিয়া দাঁড়াইত। নবীন তাহার খোলা হইতে সকলকেই এক একটু গুড় খাইতে দিত। সে সরাগুড়গুলি বিক্রয় করিয়া দৈনিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিত। বাজারে যাইবার পূর্ব্বে সে রস-সংগ্রহের ঠিলিগুলি বাইনের উনানের চারি দিকে কাত করিয়া সাজাইয়া রাখিত। তাহার প্রস্তুত সরাগুড়গুলি এমন সুগন্ধ ও ফরসা হইত যে, বাজারে যাইবার পথেই সেগুলি বিক্রয় হইয়া যাইত।

নবীন সর্দ্দার ও গ্রামস্থ অন্যান্য গাছী প্রত্যূষে খেজুর গাছের গলা হইতে রসপূর্ণ ঠিলি খুলিয়া লইয়া যাইবার পর নলির মুখ দিয়া প্রায় সমস্ত দিন টপ্-টপ্ করিয়া রস ঝরিত ; গ্রামের সাধারণ লোকের ছেলেরা প্রশস্ত ফুটা-বিশিষ্ট প্রায় এক হাত দীর্ঘ বাঁশের চোঙার ডগায় ছিদ্র করিয়া দড়ি বাঁধিত, এবং সেই চোঙায় তাহারা সারাদিন ধরিয়া রস সঞ্চয় করিত। এই রসকে তাহারা 'ওলা' বা 'গাঁজলা' রস বলিত। বেলা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাহারা সেই রস খোলায় ঢালিয়া উনানে জ্বাল দিয়া গুড় প্রস্তুত করিত। এই গুড়ের রং কালো, এবং তাহার স্বাদও ভাল হইত না ; একালে গ্রামস্থ বালকরা সময় নষ্ট করিয়া আর এভাবে রস সংগ্রহ করে না।

সেকালে দেখিতাম—পৌষ মাসে দলে দলে পেশোয়ারী শাল, র‍্যাপার, আলোয়ান, জামিয়ার প্রভৃতি শীতবস্ত্রের বড় বড় বাণ্ডিল পিঠে লইয়া পথপ্রান্তবর্ত্তী তেঁতুলতলায়, বা কোন সমৃদ্ধ গৃহস্থের বাড়ীর বাহিরের আঙ্গিনাস্থিত বড় বড় আম, কাঁটাল গাছের ছায়ায় আড্ডা লইত। অনেকে সেখানে বসিয়াই গ্রামবাসীদের নিকট শীতবস্ত্রাদি বিক্রয় করিত। সমগ্র পৌষ মাস এবং মাঘ মাসের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত এই ব্যবসায় চলিত। রাত্রিকালে তাহারা মুক্ত প্রাঙ্গণে অগ্নিকুণ্ডে কাঠের গুঁড়ি জ্বালিয়া তাহার চারি দিকে বসিয়া বসিয়া আরব্যোপন্যাসের গল্পের অনুরূপ অনেক গল্প করিত ; গৃহস্থরাও তাহাদের পাশে বসিয়া সেই সকল সরস উপকথার মাধুর্য্য উপভোগ করিত।

কিন্তু একালে আর পল্লীগ্রামে এই দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। এখনও গ্রামে প্রতি-বৎসর শীতকালে পেশোয়ারীদের সমাগম হয় বটে, কিন্তু তাহাদের পিঠে শীতবস্ত্রের গাঁটরীর পরিবর্ত্তে এখন তাহাদের হাতে খেরো-বাঁধা খাতা ও কাঁধে পাঁচ হাত লম্বা গাঁটবিশিষ্ট পাকা বাঁশের লাঠী সমুদ্যত! তাহারা এখন শীতবস্ত্রের ব্যবসায় ত্যাগ

করিয়া অত্যন্ত অধিক সুদে পল্লীগ্রামের দুঃস্থ গৃহস্থগণকে টাকা ধার দিয়া মহাজনী ব্যবসায় চালাইতেছে।

পৌষ মাসের শেষেই গ্রামস্থ দেশী কুলগাছগুলিতে কুল পাকিয়া উঠে। কোন্ পাড়ায় কাহার বাড়ীর আঙ্গিনায় সুমিষ্ট দেশী কুলের গাছ আছে, গ্রামস্থ বালকগণের তাহা সুবিদিত। পাঠশালার ছুটী হইলে এবং ইংরেজী স্কুলের টিফিনের অবকাশে ছেলেরা দলে দলে সেই সকল কুলগাছের তলায় সমবেত হইয়া এড়ো মারিয়া কুল পাড়ে, এবং পরস্পর হুড়ামুড়ি করিয়া পাকা কুলগুলি কুড়াইয়া-লইয়া কেহ তিন চারিটা এক সঙ্গে মুখে পোরে, কেহ কেহ পরে সদ্ব্যবহার করিবার সঙ্কল্পে তদ্দ্বারা পকেট পূর্ণ করে।

পল্লীগ্রামে পৌষ মাসেও গৃহিণীরা ফুলকপি সংগ্রহ করিতে পারেন না; কারণ, পল্লীগ্রামের ক্ষেতের কপিতে তখনও ফুল দেখিতে পাওয়া যায় না। সহর হইতে যাহা আমদানী হয়, তাহা এরূপ দুর্ম্মূল্য যে, অধিকাংশ গৃহস্থেরই তাহা কিনিবার সামর্থ্য নাই; কিন্তু এই সময় পল্লীগ্রামের অনেক কাঁটাল গাছে যে ইঁচড় পাওয়া যায়, তাহা কপির অভাব পূর্ণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট; এ জন্য তাঁহারা উহাকে 'গাছকপি' নামে অভিহিত করেন। এতদ্ভিন্ন, এই সময় পল্লীগ্রামে প্রচুর মূলো, বেগুন, সুমিষ্ট আলতাপাতি শিম, মেটে আলু, ও কড়াইসুঁটি পাওয়া যায়; তদ্দ্বারা যে ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয়, পল্লীবাসীদের নিকট তাহা ফুলকপির ডালনার মতই মুখরোচক ও আদরণীয়।—এত রকম তরিতরকারী বৎসরের অন্য সময় পাওয়া যায় না; এ জন্যও পৌষ মাস পল্লীবাসীর নিকট সমাদৃত।

পৌষ মাসের আরও গৌরব পোষলার জন্য। পোষলা পল্লীবাসীর আনন্দপ্রদ উৎসব। সাধারণ গ্রামবাসীরা পৌষ মাসের কোন দিন, কখন কখন একাধিক দিন, গ্রামের মাঠে বা গ্রামান্তরে দল বাঁধিয়া গমন করে, এবং সেখানে ভাত বা খিঁচুড়ি ও নানাপ্রকার ব্যঞ্জন, এমন কি, মাছ, মাংস রাঁধিয়াও মহানন্দে বনভোজন করে। পল্লীসমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও পৌষ মাসে পোষলার লোভ সংবরণ করিতে পারেন না। পৌষ মাসে আমরা স্কুলের ছাত্ররা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া পোষলা করিতে যাইতাম। মনে পড়িতেছে, এক বার আমরা আমাদের গ্রামের প্রান্তবাহিনী নদীর অপর পারে অবস্থিত যাদবপুরের মাঠে পোষলা করিতে গিয়াছিলাম। গ্রামের বয়স্ক অধিবাসীরা বা আদালতের আমলা প্রভৃতি পোষলার ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলিয়া থাকেন। যাঁহারা নানাপ্রকার উপচার সংগ্রহ করিয়া মহা সমারোহে পোষলা করেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের চাঁদার পরিমাণ দুই-তিন টাকাও হইয়া থাকে। সেই টাকায় তাঁহারা চাল, ডাল, মুগ, তেল হইতে হাঁড়ি, কাঠ প্রভৃতি ক্রয় করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া যান; কিন্তু আমাদের পোষলার ব্যবস্থা অন্যরূপ ছিল। একালে সেই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে; কারণ, একালের সভ্য ছেলেরা সেইরূপ 'গেঁয়ো' ব্যবস্থার পক্ষপাতী নহে। আমরা যে কয় জন পোষলা করিতে যাইব, তাহা স্থির হইলে আমাদের দলপতি প্রত্যেককে চাল, ডাল ও তরিতরকারী সংগ্রহ করিতে আদেশ করিত; তদনুসারে আমরা থলির অভাবে এক একটা বালিসের ওয়াড় লইয়া তাহার ভিতর বিভিন্ন পুঁটুলীতে চাল, ডাল, আলু, বেগুন, মূলো এবং ঝাল-মসলা, লবণ প্রভৃতি রন্ধনের বিভিন্ন উপকরণ সঞ্চয় করিতাম। সকলের সংগৃহীত সিধা রন্ধনের জন্য ব্যবহৃত হইত; কিন্তু সে সকল দ্রব্য বাড়ী হইতে পোষলার স্থানে লইয়া যাইবার অসুবিধা ছিল, অর্থাৎ জ্বালানী কাঠ, হাঁড়ি, তেল, ঘি, মাছ, দধি, পায়েসের দুগ্ধ, ও সন্দেশ প্রভৃতি নগদ মূল্যে ক্রয় করা হইত। তাহাতে যে অর্থব্যয় হইত, তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য আমাদের প্রত্যেককে ছয় আনা বা আট আনা অতিরিক্ত চাঁদা দিতে হইত।

আমরা সকালে বেলা নয়টার সময় আমাদের সিধার ঝুলি বহন করিয়া সদলে নদীতীরে উপস্থিত হইলাম, এবং নদী পার হইয়া যাদবপুরের প্রান্তবর্ত্তী একটি বাগানের ভিতর সুবৃহৎ আমগাছের ছায়ায় আমাদের সংগৃহীত উপকরণগুলি নামাইয়া রাখিলাম। সেই স্থানে পাশাপাশি দুইটি তেউড়ি খুঁড়িয়া তাহাতে আগুন দেওয়া হইল। আমাদের দলের দুই তিন জন বলিষ্ঠ বালকের রন্ধনবিদ্যায় পারদর্শিতা ছিল; তাহারাই রাঁধিতে আরম্ভ করিল। অল্পক্ষণ পরেই বাজার হইতে মাছ, কপি, চিনি, সন্দেশ, দধি, দুগ্ধ প্রভৃতি আসিয়া পড়িল। মহা আড়ম্বরে রন্ধন আরম্ভ হইলে এক দল ছেলে অদূরবর্ত্তী মাঠে ডাণ্ডাগুলি খেলিতে লাগিল; কয়েক জন তাস লইয়া বসিয়া গেল।

রন্ধন শেষ হইতে বেলা চারিটা বাজিয়া গেল। আমাদের পোষলার সংবাদ পাইয়া এক দল ভিক্ষুক-বালক আহারের লোভে অদূরবর্ত্তী গাছতলায় কলাপাতা বিছাইয়া, কখন রান্না শেষ হয়, সাগ্রহে তাহারই প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। আমাদের সঙ্গে যে মুড়ি ছিল, বহু পূর্ব্বেই তাহা ফাঁকাইয়া শেষ করা হইয়াছিল; সন্ধ্যা হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই, ক্ষুধায় সকলেরই পেট জ্বলিতেছিল। সেই সময় দশ-বারটি ভিক্ষুককে আহারের লোভে সেখানে উপস্থিত দেখিয়া প্রায় সকলেই রাগিয়া উঠিল। চাল, ডাল, মাছ, তরকারী সকলই পরিমিত; এতগুলি ক্ষুধার্ত্ত আগন্তুককে অন্ন-ব্যঞ্জনে পরিতৃপ্ত করা আমাদের অসাধ্য! কেহ বলিল, "দাও বেটাদের গলায় ধাক্কা দিয়ে এখান থেকে তাড়িয়ে।" কেহ বলিল, "আরে, তার দরকার কি? পাত পেতে যেমন বসে আছে থাক্, আমরা পোষলা শেষ করে চলে যাই। আমরা তো আর সদাব্রত করতে এই যাদবপুরের মাঠে আসিনি।"

যাহা হউক, অবশেষে সুবুদ্ধিরই জয় হইল; স্থির হইল, আমরা কিছু কম খাইয়াও উহাদিগকে দুই-এক মুঠা খাইতে দিব।—এই ভাবেই পোষলা শেষ হইল। আমরা কলার পাতায় আহার করিয়াছিলাম; আহার শেষে উঠিতে না উঠিতে ক্ষুধিত ভিক্ষুকরা কুকুরগুলাকে তাড়াইয়া দিয়া যে ভাবে আমাদের উচ্ছিষ্ট পাতা লইয়া কাড়াকাড়ি করিতে লাগিল, তাহা দেখিয়া মনে হইল—এই সকল হতভাগ্য ভিক্ষুক কত দিন হয় ত অনাহারে আছে! একটি দুর্ব্বল বালক একখানা পাতা হইতে একটা রসগোল্লা তুলিয়া-লইয়া মুখে পূরিতেই অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক একটা ভিক্ষুক দুই হাতে তাহার গাল টিপিয়া রসগোল্লাটি বাহির করিয়া লইয়া গ্রাস করিল! মুখের গ্রাসে বঞ্চিত সেই অসহায় বালকের যে হতাশ ভাব লক্ষ্য করিয়াছিলাম—এত কাল পরে আজ এই জীবন-সায়াহ্নেও তাহা ভুলিতে পারি নাই! তথাপি সেই সময় চাউলের মণ আড়াই টাকা, কোন খাদ্যদ্রব্যই দুষ্প্রাপ্য ছিল না; দশ টাকা আয়েই লোক নিরুদ্বেগে সংসার চালাইত। আর আজ? সেই সস্তার দিনেও অস্থিচর্ম্মসার, কোটরগত-চক্ষু ভিক্ষুকগণ অনাহারে শীর্ণ হইত, আর শিকারপুর পাটকেবাড়ী কুঠীর নীলকর সাহেবদের ওয়েলার ঘোড়াগুলা পল্লীবাসী

দরিদ্র কৃষকের ক্ষেত্রোৎপন্ন দানায় পুষ্ট হইত। নীলকরেরা আমাদের সোনার বাঙ্গালায় আসিয়া দেশের লোকের মুখের গ্রাস আত্মসাৎ করিয়া, লক্ষ লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিয়া দেশে ফিরিত।—এ দেশ আমাদের!

পোষলা শেষ করিয়া আমরা খেয়া নৌকায় যখন নদী পার হইলাম, তখন সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়াছিল। খোলা মাঠে পৌষের কনকনে শীতে আমাদের বুক তুরু-তুরু করিয়া কাঁপিতেছিল। আমরা শীতবস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া নদীর এপারে গোপালগঞ্জের ঘাটে নামিয়া বাড়ী ফিরিলাম।

পৌষ মাস একালেও নিয়মিত ভাবে আসিয়া থাকে; কিন্তু একালে আর তাহা পল্লীবাসিগণকে সেকালের মত আনন্দ ও তৃপ্তি দান করিতে পারে না। বোধ হয়, আমাদের রসাস্বাদনের শক্তি হ্রাস হইতেছে, এবং সেকালে পল্লীজীবনের প্রতি আমাদের যে আকর্ষণ ছিল, তাহাও ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতেছে; কিন্তু তথাপি পল্লীরমণীগণ একালেও পৌষ মাসের মায়া কাটাইতে না পারিয়া পৌষ-সংক্রান্তির রাত্রিশেষে শয্যাত্যাগ করিয়া মিলিত কণ্ঠে প্রার্থনা করেন,—

"পৌষ মাস লক্ষ্মী-মাস—যেও না,
ভাতের হাড়িতে থাক পৌষ—যেও না,
লেপ-কাঁথায় থাক পৌষ—যেও না,
পোয়াল-গাদায় থাক পৌষ—যেও না;
পৌষ মাস লক্ষ্মী-মাস—যেও না।"

তাহার পর সমগ্র গ্রাম সুপ্তিক্রোড়ে মগ্ন হয়, এবং পৌষের দীর্ঘরাত্রি সকলের অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে ঊষার হিরণ্ময় অঞ্চলে বিলীন হয়।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

গুজরাতের ভক্ত-কবি নরসিং মেহতা

(১৫০০—১৫৮০)

নরসিং মেহতা গুজরাতের শ্রেষ্ঠ ভক্ত-কবি বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি 'মীরাবাঈ'র সমসাময়িক। তাঁহার সময়ে গুজরাত মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আকবর তখন ভারত-সম্রাট্। কথিত আছে, সম্রাট্ আকবর তানসেনকে লইয়া মীরাবাঈকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। মোগল-রাজত্বে গুজরাতের সমৃদ্ধির খ্যাতি দেশব্যাপী হইয়াছিল। গুজরাতের অন্তর্গত কাম্বে ও সুরাট তখন প্রসিদ্ধ আন্তর্জ্জাতিক বন্দর। য়ুরোপীয় পর্য্যটক বার্থেম (১৫০৩—১৫০৮) এবং ওভিংটন (১৬৯০) তাঁহাদের ভ্রমণ-কাহিনীতে গুজরাতের ঐশ্বর্য্যের বিবরণ মুক্তকণ্ঠে বর্ণনা করিয়াছেন। কাফি খাঁর মতে গুর্জ্জর তখন ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ প্রদেশ। গুজরাতের রাজধানী আমেদাবাদের তিন শত আশীটি (৩৮০) উপকণ্ঠ বা সহরতলী ছিল; এই সকল উপকণ্ঠের প্রত্যেকটিতে রাস্তা, ঘাট, বাজার ও অট্টালিকা এত অধিক ছিল যে, তাহাদের প্রত্যেকটিকে স্বতন্ত্র নগর বলিলে অত্যুক্তি হইত না।

গুজরাতী কবি ভেঙ্কটাধ্বরিন্ (১৬৪০) তাঁহার "বিশ্বগুণাদর্শ" নামক কাব্যে গুর্জ্জরদেশের সম্পদের প্রাচুর্য্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

সকর্পূর-স্বাদু-ক্রমুকনববীটীরসলস-
ন্মুখাঃ সর্ব্বশ্লাঘাপদবিবিধদিব্যাম্বরধরাঃ।
কনদ্রত্নাকল্পাধুমধুমিতদেহাশ্চঘুসৃণৈ-
র্যুবানো মোদন্তে যুবতিভিরমী তুল্যরতিভিঃ ॥১

অনুবাদ:—সর্ব্বসম্পদের আলয় অমর ভূমি এই গুর্জ্জরদেশের যুবকগণের মুখে কর্পূর ও মিষ্ট সুপারি দ্বারা স্বাদু টাট্‌কা পান; তাহাদের গাত্র বিচিত্র শ্লাঘ্য দিব্যবস্ত্র ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উজ্জ্বল রত্নালঙ্কারে শোভিত; সুগন্ধ চন্দনাদি দ্বারা তাহাদের দেহ অনুলিপ্ত, এবং তাহারা রতিতুল্য যুবতীগণের সহিত আহারবিহার করে।

তপ্তস্বর্ণসবর্ণমঙ্গকমিদং তাম্রো মৃদুশ্চাধরঃ
পাণী প্রাগুনবপ্রবালসবর্ণা বাণী সুধাধোরণী।
বক্ত্রং বারিজমিত্রমুৎপলদলশ্রীলুণ্ঠনে লোচনে
কে বা গুর্জ্জরসুভ্রুবামবয়বা যূনাং ন মোহাবহাঃ ॥২

অনুবাদ:—গুর্জ্জরদেশের তরুণীগণের সৌন্দর্য্যও অতুলনীয়। তপ্তস্বর্ণবর্ণ তাহাদের কান্তি; অধর কোমল ও তাম্রবর্ণ; তাহাদের হস্ত নবমৃণালসদৃশ সূক্ষ্ম; মুখের বাক্য সুধাতুল্য; মুখ পদ্মবৎ; নীল পদ্মের আভা তাহাদের চক্ষুতে (প্রতিফলিত); গুর্জ্জরের এই সুন্দরী রামাগণ কাহার মন না মুগ্ধ করে?

দেশে দেশে কিমপি কুতুকাদদ্ভুতং লোকমানাঃ
সম্পাদ্যৈব দ্রবিণমমিতং সদ্য ভূয়োঽপ্যবাপ্য।
সংযুজ্যন্তে সুচিরবিরহোৎকণ্ঠিতাভিঃ সতীভিঃ
সৌখ্যং ধন্যাঃ কিমপি দধতে সর্ব্বসংপৎসমৃদ্ধাঃ ॥৩

অনুবাদ:—গুর্জ্জরবাসিগণ দেশে দেশে পর্য্যটন করিয়া নব নব আচার-ব্যবহার শিক্ষা করে ও প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করে। তাহারা ভ্রমণ ও বাণিজ্য সমাপনান্তে স্বদেশস্থিত গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া দীর্ঘ-বিরহোৎকণ্ঠিতা সতী পত্নীবর্গের সহিত সম্মিলিত হয়। এইরূপে সর্ব্বসম্পদশালী গুজরাতীগণ পরমসুখে কালযাপন করে।

যোড়শ শতাব্দীতে কবি নরসিং গুজরাতে ভক্তি-ভাবের অভিনব স্রোত প্রবাহিত করেন। শ্রীকানাইয়ালাল এম, মুন্সী তাঁহার গ্রন্থে (১) বলেন, "মীরার লালিত্য, সুরদাসের ব্যাকুলতা, এবং তুলসীদাসের গুরুগাম্ভীর্য্য নরসিংহের (রচনায়) না থাকিলেও তাঁহার কবিতায় ও গানে ভাবসম্পদের অভাব নাই। গুজরাতী কবিতার নির্জীব গতানুগতিকতা ভগ্ন করিয়া তিনি ইহাকে প্রাণ ও

১। Guzrat and its Literature K. M. Munshi

প্রেমে পূর্ণ করেন। কবি, ভক্ত, আর্য্য-সংস্কৃতির প্রতিমূর্তি নরসিং অদ্যাপিও গুজরাত ও কাথিয়াবাড়ের সর্ব্বত্র সমাদৃত ও সঙ্গীত। গুজরাতী সাহিত্যে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে। গুজরাতের অমর কবি নরসিংএর নিম্নলিখিত ভজনটি মহাত্মা গান্ধী তাঁহার জীবনসঙ্গীতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন! সবরমতী আশ্রমে এই ভজনটি প্রাতঃকালে গীত হইত।

"বৈষ্ণবজনো তো তেনে কহিয়ে, জে পীড় পরাই জানে রে।
পরদুঃখে উপকার করে তে, মন অভিমান ন জানে রে।
সকল লোকমাঁ সহুনেবন্দে, নিন্দা তে ন করে কেনী রে।
বাচকাছমন নিশ্চল রাখে তো, ধন্য ধন্য জননী তেনী রে।।
সমদৃষ্টি নে তৃষ্ণা ত্যাগী, পরস্ত্রী জেনে মাত রে।
জিহ্বা থকী অসত্য ন বোলে, পরধন নব ঝালে হাত রে।।
মোহমায়া ব্যাপে নহি জেনে, দৃঢ় বৈরাগ্য জেনা মনমাঁ রে।
রামনামসুঁ তালী রে লাগী, সকল তীরথ তেনা তনমাঁ রে।।
বনলোভী নে কপটরহিত ছে, কামক্রোধ নে নিবার্যা রে।
ভণে নরসৈঁয়ো তেনুঁ দরশন করতাঁ, কুল ইকোতের তার্যা রে।।

অনুবাদ :—তিনিই প্রকৃত বৈষ্ণব বা ভক্ত, যিনি অপরের দুঃখকে নিজের দুঃখ বলিয়া অনুভব করেন, যিনি দুর্গতদের সেবা করেন, যাঁহার মনে অভিমান নাই, যিনি সকলকে মান দেন, এবং কাহারও নিন্দা করেন না, ও কায়মনোবাক্যে নিশ্চল। তাঁরই জননী ধন্য। প্রকৃত ভক্ত সমদৃষ্টি ও তৃষ্ণাত্যাগী, তিনি পরস্ত্রীকে মাতৃজ্ঞান করেন, তিনি পরধন স্পর্শ করেন না, তাঁহার জিহ্বা কখনও অসত্য উচ্চারণ করে না, তিনি মায়া মোহে আবদ্ধ নহেন, তাঁহার মনে তীব্র অনাসক্তি, রামনামে (ঈশ্বর নামে) তিনি অশ্রুপাত করেন। তাঁহার শরীরে সর্ব্বতীর্থের সমাগম হয়। তিনি লোভমুক্ত, অকপট, ও কামক্রোধরহিত। নরসিংহ বলে যে, "সেরূপ ভক্তের দর্শনে একাত্তর কুল উদ্ধার হয়।"

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভক্ত-কবি নরসিংএর যশোভাতি ভারতের প্রায় সকল প্রদেশেই পরিব্যাপ্ত হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সময়ে সময়ে যে সাহায্য দান করিয়াছিলেন, সেই সকল অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা বহু প্রদেশে লোকমুখে প্রচারিত হইয়াছিল। গুজরাতী কবি বিশ্বনাথ জানী (১৬৫২)এই সকল ঘটনা অবলম্বনে মনোরম আখ্যায়িকা রচনা করেন।

কাথিয়াবাড়ের অন্তর্গত জুনাগড় সহরের নিকটবর্ত্তী তলাজা-গ্রামে নরসিং মেহতা কোন দরিদ্র-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কৃষ্ণদাস নাগরব্রাহ্মণ ছিলেন। নাগরগণই গুর্জ্জরে কুলীন ব্রাহ্মণ, এবং সমাজের সর্ব্বোচ্চ স্তরে সমাসীন বলিয়া প্রসিদ্ধ। বহু শতাব্দী যাবৎ তাঁহারাই এই প্রদেশে শাস্ত্র ও ধর্ম্মের সংরক্ষক ছিলেন। অল্প বয়সেই নরসিংএর পিতৃবিয়োগ হওয়ায় তাঁহাকে অগত্যা অগ্রজের গলগ্রহ হইতে হয়। বাল্যকাল হইতেই তিনি পরিব্রাজক সাধুদের সংস্পর্শে আসেন, এবং বৃন্দাবনের বৈষ্ণবগণের নিকট ব্রজভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা করেন। 'গোবিন্দদাসের কড়চা'তে লিখিত আছে, শ্রীচৈতন্যদেব ১৫১১ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে জুনাগড়ের রণছোড়জীর মন্দিরে শুভাগমন করেন। নরসিং চৈতন্যদেব এবং মীরাবাঈ'র ন্যায় গোপীভাবের সাধক ছিলেন। গোপীভাবের আবেশে উন্মাদের মত তিনি নৃত্য করিতেন, গান গাহিতেন, এবং 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া আবেগভরে আহ্বান করিতেন। তাঁহার এইরূপ অদ্ভুত আচরণে আত্মীয়-স্বজনগণকে স্তম্ভিত হইতে হয়। এক বার তাঁহারা নরসিংএর বিবাহ-সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। পরে মাণেক-বাঈ নাম্নী ভক্তিমতী মহিলার সহিত নরসিংএর বিবাহ হয়। তাঁহার গর্ভে কিন্নরবাঈ নাম্নী কন্যা ও শ্যামল নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। কপর্দ্দকশূন্য হইলেও নরসিং ও মাণেকবাঈ সময়মত কোন রকমে সেই পুত্র ও কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু অগ্রজ-পত্নীর কর্কশ বাক্যে ও দুর্ব্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হইয়া নরসিংকে গৃহত্যাগ করিতে হয়। অতঃপর তিনি জুনাগড়ের কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী কোন মন্দিরে গোপনাথ মহাদেবের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সাত দিন ও সাত রাত্রি ক্রমাগত অনাহারে ও অনিদ্রায় দেবারাধনার ফলে দেবতা প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে দর্শন দান করেন। এই দেবতাই নরসিংকে দ্বারকাধামে শ্রীকৃষ্ণমন্দিরে লইয়া গিয়া তথায় অদৃশ্য হইয়াছিলেন। নরসিং প্রেম-চক্ষুতে এই মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা সন্দর্শন করেন। এই দর্শনের পরে তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হয়; তিনি দিবারাত্রি ভাব-বিহ্বল চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্ত্তন করিতে থাকেন। অতঃপর জুনাগড়ে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি তাঁহার অগ্রজ-পত্নীকে কটুবাক্য প্রয়োগের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন; কারণ, তাঁহার ধারণা হইয়াছিল—কটুবাক্য শুনিয়া মনঃকষ্টে গৃহত্যাগ না করিলে তাঁহার হয়ত এই অমূল্য ভাব-নিধি লাভ হইত না। কিন্তু নরসিং তাঁহার ভ্রাতার গৃহে পুনঃপ্রবেশ না করিয়া স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সহ একখানি পর্ণকুটীরে বাস করিতে লাগিলেন। কয়েক জন কৃষ্ণভক্ত নরনারীও তাঁহার সঙ্গে আসিয়া জুটিলেন। এই সময় হইতে নরসিং রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক ভজন ও পদাবলী রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। করতাল সহযোগে স্বরচিত ভজনাদি গানেই তাঁহার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত। জনসাধারণেও তাঁহার পদাবলীগুলি ক্রমশঃ গায়িতে লাগিল। এইরূপেই নরসিংএর ভজনাবলী গুজরাত ও কাথিয়াবাড়ের সর্ব্বত্র সমাদৃত ও প্রচারিত হইয়াছিল।

ভক্ত নরসিং সর্ব্বক্ষণ ভাবনিমগ্ন থাকায় নিজের ও পরিবার-বর্গের অন্নবস্ত্রের অভাবের কথা আদৌ চিন্তা করিতেন না। শিশু যেমন জননীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, তিনিও সেইরূপ ভগবানের উপর সর্ব্ববিষয়ে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকিতেন। নগরের ধর্ম্মনিষ্ঠ নরনারীগণই তাঁহার সংসার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বদেশপূজ্য নাগর-ব্রাহ্মণ হইলেও তাঁহার বংশ-গৌরব বা জাতি-গৌরবের বিন্দুমাত্র অহঙ্কার ছিল না। তিনি আপামর সাধারণের সঙ্গে মিলিতেন, এবং জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলকে ভক্তি-রসাস্বাদন করাইতেন। তিনি বলিতেন, যেখানে ভেদাভেদের ভাব, সেখানে পরমেশ্বর নাই। সমদৃষ্টিতে সকলেই সমান। এক বার মেথরাদি অস্পৃশ্য জাতির নিমন্ত্রণে তিনি তাহাদের গৃহে গমন করিয়া নাম-কীর্ত্তনাদিতে সমস্ত রাত্রি যাপন করেন। পরদিন প্রভাতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনকালে জ্ঞাতিবর্গ তাঁহাকে 'পাষণ্ড' 'ভণ্ড' ও 'জাতিভ্রষ্ট' বলিয়া তিরস্কার করিলে তিনি তাহাদিগকে বলেন, "তোমরা সত্যই বলিয়াছ; আমি ভণ্ডই। তোমরা যাহা ইচ্ছা আমাকে বলিতে পার, কিন্তু আমার প্রীতি গভীর। আমি জাতিবিচার করি না, হরিভক্ত-গণই আমার একমাত্র আত্মীয়। যে নিজেকে হরিভক্ত অপেক্ষা

উচ্চজ্ঞান করে, সে পতিত।"—জ্ঞাতিগণ নরসিংকে সমাজচ্যুত করিয়া রাখিল।

নরসিং'এর ৭৪০টি পদাবলী সংগৃহীত হইয়া "শৃঙ্গারমালা" নামক গুজরাতী গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালার কবি যেমন চণ্ডীদাস, সেইরূপ গুর্জ্জরের কবি নরসিং মেহতা। দ্বারকার মন্দিরে তাঁহার যে প্রেমানুভূতি হয়, তাহা তিনি এই ভাবে প্রকাশ করেন—"গোপীনাথ-শ্রীকৃষ্ণের সহিত আমার পরিণয় হয়েছে। আমি আর কিছুই চাই না। আমার পুরুষদেহ নারীদেহে পরিণত হয়েছে। আমি এক জন গোপী। প্রধানা গোপিকা বিরহিণী রাধিকাকে মিষ্ট বাক্যে সান্ত্বনা-দানের সময় দেখিলাম, রাসরাজ কৃষ্ণ আমার হৃদয়বেদীতে সমাসীন।" বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যের ন্যায় গুজরাতী বৈষ্ণব-সাহিত্যেও বিরহ-ভাবই প্রবল। নরসিংএর অধিকাংশ ভজন ও পদাবলী কৃষ্ণ-বিরহ-ভাবে পরিপূর্ণ। নরসিং গাহিতেছেন, "প্রিয়তমের বংশী-ধ্বনি শুনিতেছি। গৃহে আর এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারি না। আমি ব্যাকুল—অস্থির। প্রিয়তমের দর্শনলাভের উপায় কি?" "প্রিয়তমের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার অধরামৃতরস পান করিলাম।" "যমুনায় কি করিয়া জল আনিতে যাই? প্রিয়তমের বাঁশরী আমায় পাগল করিয়াছে।" "তাঁর চক্ষু কি সুন্দর! তিনি আমাকে কামবাণে বিদ্ধ করিয়াছেন—তিনি আমার মন হরণ করিয়াছেন। বিরহের উত্তাপে আমার জ্বরবোধ হইয়াছে। তাঁহার বিরহে আমি মৃতপ্রায়। প্রভু, আমায় দর্শন-স্পর্শন দাও।"—শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সহিত বিহার করিতেছেন, তদ্দর্শনে ভক্ত নরসিং চন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, —"চাঁদ, বাতির মত তুমি চঞ্চল হইও না। তোমার জ্যোতি যেন নিষ্প্রভ না হয়। মুহূর্ত্তের জন্য স্থির হও, আমি আমার প্রিয়তমের মুখপদ্ম সন্দর্শন করি। আজ বড় শুভ রজনী। আমার প্রভু-আমার প্রাণের প্রাণকে আজ আমি লাভ করিয়াছি।"

নরসিং-রচিত "রাসসহস্রপদী" নামক আর একখানি পদাবলী-গ্রন্থ পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাতে বর্ত্তমানে ১২৩টি মাত্র পদ আছে। মূল গ্রন্থখানি বোধ হয় ভাগবতের দশম স্কন্ধের ২৯-৩৩ অধ্যায়ের ভাবাবলম্বনে লিখিত। ইহাতে ভাগবতের বর্ণনা ও ভাষা কিয়ৎ পরিমাণে সংরক্ষিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে প্রত্যেক গোপীর নিকট আবির্ভূত হইয়া তাহাদিগকে আলিঙ্গন ও নৃত্য করিলেন—তাঁহার বংশীর সপ্ত সুরে কিরূপে চতুর্দ্দশ ভুবন উল্লসিত হইল—এই সকল বিষয় নরসিং মধুর ভাবের উচ্ছাসে ও সুললিত ভাষায় বর্ণন করিয়াছেন। গুজরাতী সাহিত্যে ব্রজ-প্রেমের প্রথম ও প্রধান উৎসই নরসিংএর পদাবলী। "বসন্তনাপদো" গ্রন্থে ফাগোৎসব এবং "হিন্দোলানাপদো" গ্রন্থে দোল-উৎসবের বর্ণনায় নরসিংএর অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ও কবিত্ব সুপ্রকাশিত। ভাগবতের ১০ স্কন্ধ অবলম্বনে নরসিং 'কৃষ্ণ-জন্ম', 'বাললীলা', 'নাগ-দমন', 'দানলীলা', 'মানলীলা', 'সুদাম-চরিত্র' ও 'গোবিন্দগমন' নামক সাতটি দীর্ঘ পদাবলী বিভিন্ন বয়সে গুজরাতী ভাষায় রচনা করেন। গ্রন্থগুলি মূলের অনুবাদ নহে। গ্রন্থকার মূলের সহিত উত্তমরূপে পরিচিত ছিলেন। মূল সূত্রকে ভিত্তি করিয়া মৌলিক কল্পনার সাহায্যে তিনি এইগুলিকে অভিনব রূপ দান করিয়াছেন। যাঁহারা মূল ভাগবত পাঠ করেন নাই, এইগুলি কবির মৌলিক রচনা বলিয়াই তাঁহাদের মনে হইবে। নরসিংএর রচিত "সুরতসংগ্রাম" নামক আর একটি মনোজ্ঞ রচনা আছে। ভাব ও ভাষার দিক্ দিয়া এই আখ্যায়িকা অপূর্ব্ব। ইহাতে শ্রীরাধিকাপ্রমুখ দশ জন গোপীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রেমযুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে। এই যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ পরাজিত হইয়া গোপীনাথের হস্তে বন্দী হন। আখ্যানটি সম্ভবতঃ নরসিংএর কোন আধ্যাত্মিক অনুভূতির উজ্জ্বল চিত্র; কারণ, নরসিং সংগ্রামস্থলে 'গীতগোবিন্দ'-প্রণেতা জয়দেব গোস্বামীর সাক্ষাৎলাভ করিয়াছিলেন, এ কথার তিনি উল্লেখ করিয়াছেন।

ভক্তি ও জ্ঞানের তত্ত্ব বর্ণনাতেই নরসিংএর ভাব ও ভাষার চরম পরিণতি। উক্ত কবির চরিত্রের বিভিন্ন দিকের চিত্র ইহাতে পরিস্ফুট। কবি শুধু ভক্ত ছিলেন না—তিনি পরমজ্ঞানী বা বৈদান্তিকও ছিলেন। জ্ঞান-ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি গাহিয়াছেন:—"স্নান, সেবা, পূজায় কি লাভ? গৃহে বসিয়া দানাদিরই বা সার্থকতা কি? ষড়্‌দর্শন পাঠেরই বা কি ফল—যদি জাতিভেদ না যায়। এইগুলি ত জীবিকা-অর্জ্জনের কৌশলমাত্র।" নরসিং বলেন—"তত্ত্বদর্শন ব্যতীত রত্নচিন্তামণিতুল্য অমূল্য জীবন বৃথা হইল।" তাহার বেদান্ত প্রয়োগমূলক। তাঁহার মতে "জীব, ঈশ্বর ও ব্রহ্ম—এই ভেদজ্ঞান দ্বারা সত্যবস্তু লাভ হয় না। 'আমি' 'তুমি' ভেদ ত্যাগ না করিলে গুরুকৃপা হয় না।"—নরসিং তাঁহার পদাবলীতে আধনীতির নির্য্যাস সাধারণের বোধগম্য করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ছিলেন—স্ব-প্রচারিত আদর্শের প্রতিমূর্ত্তি। কর্ম্মজীবনে যাহা তিনি পালন করিয়াছিলেন—তাহাই তিনি ভজনে ও পদাবলীতে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার অনুপ্রেরণা আজও গুজরাতের সর্ব্বত্র অনুভূত হইতেছে—তাঁহার বাণী আজও গুজরাতবাসীর হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

ভাবের সরসতায় এবং ভাষার সৌন্দর্য্যে গুজরাতী ভাষায় এখনও কোন কবি নরসিংকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তিনি সর্ব্বোপরি ছিলেন—পরম কৃষ্ণভক্ত। তাঁহার প্রাণ কৃষ্ণময় ছিল। জাগ্রত অবস্থায় ও স্বপ্নে তাঁহার মন কৃষ্ণচিন্তা করিত। কিন্তু তাঁহার কৃষ্ণ শুধু আকার ও সগুণ মাত্র নহেন, তিনি আবার নির্গুণ ও নিরাকার। সেই কৃষ্ণ সকল নরনারীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। নরসিং পরম জ্ঞানী ছিলেন। তাঁহার জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা নিম্নলিখিত স্বরচিত ভজনে সুপরিস্ফুট:—

"গগনে নিরীক্ষণ কর; দেখ, কে ইহাকে পরিব্যাপ্ত করিয়া 'আমি সেই', 'আমি সেই' এই শব্দ উচ্চারণ করিতেছে। এই বিশ্বব্যাপী শ্যামের চরণে আমি মরিতে চাই; কারণ, ইহলোকে বা পরলোকে কৃষ্ণের তুলনা নাই। অসীম শ্যাম-শোভায় আমি আত্মহারা, অনন্ত উৎসবানন্দে আমার মন চির-নিমগ্ন। জড় ও চৈতন্য এক প্রেমময়েরই প্রকাশ। প্রেমে অনন্ত জীবনকে আশ্রয় কর। শূন্যে দেখ, যেখানে কোটি উদিত রবির জ্বলন্ত জ্যোতিঃ, যেখানে স্বর্ণালোকে ঊর্দ্ধে সপ্তভুবন উজ্জ্বল, সেখানে স্বর্ণময় দোলায় বিরাজিত হইয়া সচ্চিদানন্দ আনন্দ-ক্রীড়া করিতেছেন। তথায় বাতি, তৈল ও সূত্রবিনা চির-প্রদীপ অচল ঝলকে জ্বলিতেছে। এসো, এই নিরাকার পুরুষকে দর্শন করি, কিন্তু এই চর্ম্মচক্ষু দ্বারা নহে। এসো, এই পরমপুরুষের প্রেম-রস পান করি, কিন্তু এই স্থূল জিহ্বায় নহে। এই অজর অবিনাশী পুরুষ অধঃ ও ঊর্দ্ধে ব্যাপ্ত ও বাক্য-মনের অতীত। নরসিংএর প্রভু সর্ব্বব্যাপী। ভক্তগণ প্রেমচক্ষে তাঁহার দর্শন পান—অপরে নহে।"

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ।

পাটের দুর্দ্দশা

বিগত মহাযুদ্ধের সুযোগে পাটের কারবারে অনেক পেটো মহাজন বহু অর্থ লাভ করিয়াছিল। অনেকেরই আশা ছিল, বর্ত্তমান যুদ্ধেও ঐরূপ অর্থাগম হইবে; কিন্তু সে-আশা সফল হয় নাই। বিগত মহাযুদ্ধের তুলনায় বর্ত্তমান যুদ্ধের রীতি-নীতি ও গতি-প্রকৃতি যেরূপ বিভিন্ন, কালের ব্যবধানে ও কলা-কৌশলের ব্যতিক্রমে, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে যুদ্ধ-শিল্প ও যুদ্ধকালীন ব্যবসায়-বাণিজ্যের রীতি-নীতি ও গতি-প্রকৃতিও তেমনি রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধের অভিঘাতে পাটের দুর্দ্দশার কারণ-পরম্পরা ও তাহার প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে আলোচনার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

বাঙ্গালার কৃষি-সম্পদগুলির মধ্যে ঐশ্বর্য্যে পাটই প্রধান। পাট সদ্য অর্থ-প্রাপ্তির ফসল; এই নিমিত্তই বাঙ্গালার অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর পাটের প্রভূত প্রভাব লক্ষিত হয়। পাটের উন্নতিতে বাঙ্গালার যেমন উন্নতি, পাটের অবনতিতে বাঙ্গালার সেইরূপই অবনতি। বঙ্গদেশের প্রধান কৃষিজাত ফসল ধান ও পাট। ধান গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করে; পাট বিলাস-ব্যসনের অর্থ প্রদান করে। পাট বঙ্গদেশের প্রায়-একচেটিয়া উৎপন্ন-দ্রব্য। ইহার সামান্য কিছু বিহার ও আসামে উৎপন্ন হয়। পাটচাষের জন্য প্রচুর বারি ও উত্তাপের প্রয়োজন। মাটির সার ভাগ পাট গাছের পুষ্টির জন্য শীঘ্রই নিঃশেষিত হয়। এই হেতু নদীতীরে—যেখানে প্রতি-বৎসরই নূতন পলিমাটি সঞ্চিত হয়, সেই স্থানেই ইহার চাষ ভাল হয়। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের তীর-ভূমিতেই ইহার আবাদ ভাল হইয়া থাকে। পাটই বাঙ্গালার প্রধান বণিক্ পণ্য। বঙ্গদেশের বাণিজ্য প্রধানতঃ কলিকাতা-বন্দর দিয়া পরিচালিত হয়। এই কলিকাতা-বন্দর হইতে সমগ্র রপ্তানীর খুঁট-অঙ্ক যদি ১০০ ধরা যায়, তাহা হইলে তাহার ৪৬ অংশ কাঁচা পাট রপ্তানীর এবং ১৪ অংশ পাটজাত দ্রব্যাদির। বাঙ্গালা প্রদেশে অন্যূন ৮৪টি পাটের কল আছে। এই পাটের উৎপত্তি কিংবা মূল্য হ্রাস পাইলে বাঙ্গালার কৃষককুলের দুরবস্থা ঘটে। কৃষককুলই বাঙ্গালার অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড, এবং তাহাদের উন্নতির উপর বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেণীর লোকের উন্নতি নির্ভর করে।

গত তিন বৎসর কাল পাটের বিষম দুরবস্থা চলিয়াছে। বর্ত্তমান পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধের উদ্যোগপর্ব্বে, বিশেষতঃ ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের শেষ-পাদে পাটের দর ঊর্দ্ধগতি লাভ করিয়াছিল; কিন্তু এই উন্নতি অল্পকাল স্থায়ী হইয়াছিল। যুদ্ধ-ব্যপদেশে যে পণ্য স্বর্ণ প্রসব করিবে বলিয়াই আশা হইয়াছিল, ঘটনাচক্রে তাহার দুরবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় হইয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ আর্থিক বৎসরের প্রথমার্দ্ধে ফসলের পরিমাণ ৯.৭ মিলিয়ন গাঁইট অনুমিত হইয়াছিল, এবং পাটের কলগুলি সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টা কার্য্য করিতেছিল; সুতরাং কাঁচা পাটের অঙ্কপরিস্থিতি অনুকূল ছিল। এমন কি, ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে যখন সরকার বালির থলির সরবরাহ-কাল ৩০শে এপ্রিল হইতে ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন, তখনও কাঁচা পাটের দরের মন্দা স্বল্পকাল স্থায়ী হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে, বৎসরের অগ্রগতির সহিত বাধা-বিপত্তি উপস্থিত হইতে লাগিল এবং পাটের ব্যবসায় সঙ্কটজনক হইয়া উঠিল। প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপত্তি, মালচালানী জাহাজের অপ্রতুলতা হেতু রপ্তানী-বাণিজ্যের খর্ব্বতা, য়ুরোপের বিপণি রুদ্ধ, এবং দেশাভ্যন্তরে পাটজাত দ্রব্যাদির ক্রমান্বয়ে উৎপাদন-প্রতিরোধহেতু কাঁচা পাটের চাহিদার স্বল্পতা, পাটের ব্যবসায়কে বিপর্য্যস্ত করিয়াছিল। পাট-ব্যবসায় ও পাট-শিল্পের গুরুত্ব এবং উভয়ের অবনতি হেতু সমগ্র প্রদেশের আর্থিক বিশৃঙ্খলার পরিণাম উপলব্ধি করিয়া, বাঙ্গালা সরকার ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে এইরূপ একটি জরুরি আইন (Jute Regulation Ordinance) জারী করেন, যাহাতে পাট-উৎপাদন ক্ষেত্রের পরিমাণ ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দের মরশুমে তৎপূর্ব্ব বৎসরের পরিমাণ অপেক্ষা অধিক না হয়।

ঘটনাক্রমে ঐ সময়ে কাঁচা পাটের ব্যবসায়ে আশু উন্নতির সম্ভাবনা অনুমিত হয়। ক্রেতৃবর্গের সঞ্চিত মজুত মাল ঐ সময়ে প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছিল, এবং লোকের মনে এইরূপ আশার সঞ্চারও হইয়াছিল যে, কাঁচা পাটের পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা অধিকতর উৎপাদন ও সঙ্গত মূল্যে তাহা বিক্রীত হইবে। জনমতের প্রাবল্যে বাঙ্গালা সরকার বাধ্যতামূলক বিধান পরিহার করিয়া, পাট-উৎপাদন-ক্ষেত্রের স্বেচ্ছামূলক সঙ্কোচেরই ব্যবস্থা করেন। এই ব্যবস্থা ফলে ঐ বৎসরের ফসলের পরিমাণ হয় সর্ব্বোচ্চ—১৩.২ মিলিয়ন গাঁইট! ইতিমধ্যে পরিস্থিতির প্রতিকূল পরিবর্ত্তন ঘটে, এবং যখন নূতন ফসল বাজারে আমদানী করা হইল, তখন কাঁচা পাটের মূল্য পূর্ব্বের তুলনায় অর্দ্ধেকে নামিয়া আসিয়াছিল। যে মহাদেশিক য়ুরোপ ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দে সমগ্র রপ্তানী পাটের শতকরা ৫৬ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা তখন নাৎসী-করতলগত! ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে মালচালানী জাহাজের দারুণ অভাবহেতু তখনও উন্মুক্ত বিদেশী-বাজারে মাল পাঠাইবার উপায় ছিল না। রপ্তানী-বাণিজ্যের কিরূপ ক্ষতি হইয়াছিল, অঙ্কের সাহায্যে তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল। ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দের ৬,৯০,০০০ টনের এবং ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দের ৫,৭০,০০০ টনের তুলনায় ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে রপ্তানীর পরিমাণ মাত্র ২,৪৩,০০০ টন। দেশাভ্যন্তরেও চাহিদা কমিয়া যাইতেছিল; কারণ, বৈদেশিক বাজারে উৎপন্ন দ্রব্যের কাটতি-হ্রাস এবং মজুত মালের পরিমাণ-বৃদ্ধি হেতু পাটের কলগুলি কাজ কমাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল। পূর্ব্ব-বৎসরের মরশুমের ১২,৮৮,০০০ টনের তুলনায় ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দের মরশুমে কলগুলি লইয়াছিল মাত্র ৯,৮৯,০০০ টন!

কাঁচা পাটের মূল্য দ্রুতগতিতে নিম্নাভিমুখী হইয়া ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে একপ সঙ্কটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছিল যে, বাঙ্গালা সরকার পাট-ব্যবসায় ও শিল্প-সংসৃষ্ট ব্যক্তিবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া নূতন একটি জরুরি আইন দ্বারা ফাট্কা বাজারে পাটের মূল্য ৬০৲ হইতে ৯০৲, এবং চটের মূল্য ১৩৲ হইতে ২১৲ নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন; কিন্তু বাজারে পাট ও চট নিম্নতম দর অপেক্ষাও অল্প মূল্যে বিক্রীত হইতে লাগিল। ফলে, ফাট্কা বাজারের ব্যবসায় বন্ধ হইয়া গেল। সরকার তখন নিজেই পাট কিনিতে প্রবৃত্ত হইলেন। উহা পুরাতন পাট, এবং বহু পূর্ব্বেই তাহা হস্তান্তরিত হইয়াছিল। সুতরাং কৃষকদের ইহাতে বিন্দুমাত্র সুবিধা হইল না। নূতন পাট

কিনিলে কৃষকদের সুবিধা হইত; কিন্তু নূতন পাটের এক-চতুর্থাংশ মাত্র কিনিতেই বাঙ্গালার এক বৎসরের সমগ্র রাজস্ব অপেক্ষাও অধিক অর্থের প্রয়োজন হইত। পক্ষান্তরে, মজুত মালের সমষ্টিবৃদ্ধিহেতু চটের বাজারেও ঐ সময়ে মন্দার প্রকোপ তীব্র হইল। পরিশেষে সরকার কলওয়ালাদের সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত করিলেন যে, অন্ততঃ ছয় মাসের জন্য তাঁহারা একটি নির্দ্দিষ্ট মূল্যে পাটের ও চটের দর দৃঢ় রাখিবেন; এবং সরকারও ঐ সময়ের মধ্যে কোন আইন জারী করিবেন না। এই বন্দোবস্তের ফলে সঙ্কটের সন্ধিক্ষণ কাটিল বটে, কিন্তু জের মিটিল না।

বিক্রয়ের অভাবে উৎপন্ন মালের মজুত জমা-বৃদ্ধি হেতু কলওয়ালাদের কাঁচা পাটের চাহিদা স্বতঃই হ্রাস পাইল; এবং বৎসরের শেষ পাদে কল-পরিচালনা প্রতি মাসে এক সপ্তাহ বন্ধ রাখিতে হইল। দুর্ভাগ্যবশতঃ নূতন পাটের পরিমাণই যে অপরিমিত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল এরূপই নহে, ইহার অধিকাংশই ছিল নিকৃষ্ট শ্রেণীর। রপ্তানী ও কলের উপযুক্ত উৎকৃষ্ট পাটের পরিমাণ হইয়াছিল অত্যন্ত অল্প। কলওয়ালারা নিকৃষ্ট পাটের নিমিত্ত নূতন চিহ্ন (New Mark) এবং অল্প মূল্যের আবদার জানাইলে সরকার তাহাতে অসম্মত হইলেন। এই বিপত্তিকালে ভারত সরকারের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। নয়া-দিল্লীতে ভারত সরকারের, পাট-উৎপাদক তিনটি প্রদেশের, এবং পাট-কল সমিতির প্রতিনিধিবর্গের একটি বৈঠকে আলোচনার ফলে নূতন চিহ্নের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়; এবং কলওয়ালারা তাঁহাদের প্রস্তাবিত মূল্যে সাড়ে ৩ লক্ষ গাঁইট ব্যবহারযোগ্য পাট কিনিতে স্বীকৃত হন। এই ব্যবস্থায় কিছু সুফল ফলিল বটে; কিন্তু আর্থিক অসুবিধার নিমিত্ত কলওয়ালারা নির্দ্ধারিত সমষ্টির দুই-তৃতীয়াংশের অধিক ক্রয় করিতে সমর্থ হইলেন না। এই দুই তৃতীয়াংশ অবশ্য তাঁহাদের তদানীন্তন প্রয়োজনের অতিরিক্ত হইয়াছিল। কলওয়ালাদের এই অসামর্থ্যের ফলে পাটের বাজারে আবার মন্দা দেখা দিল, কিন্তু অল্প দুই একটি কারণে হতাশা ঘটে নাই। প্রধান কারণ এই—বাঙ্গালা সরকারের বাধ্যতামূলক ভাবে পাটক্ষেত্রের আয়তন কমাইবার ঘোষণা। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের আয়তনের দুই তৃতীয়াংশ ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে বর্জ্জন করিবার ব্যবস্থা হয়। এই ব্যবস্থায় আংশিক ভাবে উদ্বৃত্ত মজুত মালের কিয়দংশ বিক্রীত হইবে আশা হইয়াছিল। পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা ইতিমধ্যেই বর্দ্ধিত হওয়ায় কাঁচা পাটের দর অত্যধিক কমিতে পারে নাই; কিন্তু এই আশা-মরীচিকা অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই; কলওয়ালাদের চুক্তি অসম্পূর্ণ থাকিবার ফলে, উদ্বৃত্ত মজুত মালের সম্পূর্ণ কাটতি ঘটিল না; এবং কাঁচা পাটের দর পুনরায় নিম্নাভিমুখী হইয়া ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের প্রথম পাদের শেষ ভাগে রীতিমত আতঙ্কেরই সৃষ্টি করিল!

সৌভাগ্যক্রমে ১৯৪১-৪২ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে এই পরিস্থিতির কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটে। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর এবং ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী ও মার্চ্চ মাসে পাট-শিল্প বালির থলির সরকারী ক্রয়-চুক্তি লাভ করে। কলওয়ালারা কলের কার্য্যকাল পুনরায় বর্দ্ধিত করেন; তাঁহাদের কাঁচা পাটের প্রয়োজনও বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে, ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের নয়া-দিল্লী বৈঠকের বন্দোবস্ত, চটের মূল্য বৃদ্ধি, এবং বাধ্যতামূলক ভাবে পাটের চাষ-সঙ্কোচনের ফলে পাটের বাজারে আবার উন্নতি লক্ষিত হয়। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের উৎপাদনও যথাসম্ভব অল্প হয়; কিন্তু ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের মরশুমে ভারত সরকারের প্ররোচনায় বাঙ্গালা সরকারকে পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণের কঠোরতা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হয়। ভারত সরকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে প্রচুর পাটের চাহিদা আশা করিয়া বাঙ্গালা সরকারকে আশ্বাস দেন যে, যদি পাট-চাষ বৃদ্ধির ফলে কাঁচা পাটের মূল্য একটি নির্দ্দিষ্ট হারের নিম্নে পতিত হয়, তাহা হইলে ভারত সরকার সাধ্যানুসারে চাষীকে সাহায্য করিবেন। এই আশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, জাপানের যুদ্ধে যোগদান সত্ত্বেও, বাঙ্গালা সরকার ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের এক-তৃতীয়াংশ স্থলে দুই-তৃতীয়াংশ পরিমাণে চাষ-বৃদ্ধির অনুমতি প্রদান করেন। ফলে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমরা সরকারী বিবরণী হইতে বিগত, গতপূর্ব্ব ও বর্ত্তমান বর্ষের উৎপাদন-অঙ্ক নিম্নে উদ্বৃত করিলাম।

১৯৪০—৪১	১৯৪১—৪২	১৯৪২—৪৩
১৩১.৪৬ লক্ষ গাঁইট	৫৪.৭৪ লক্ষ গাঁইট	৯০.১৪ লক্ষ গাঁইট

বে-সরকারী অনুসন্ধানের ফল বিভিন্ন। পাটব্যবসায়ী-মহলের অনুমান, বর্ত্তমান বর্ষের ফসল ১০০ লক্ষ গাঁইটেরও অধিক হইবে। ইহার সহিত গত বৎসরের অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত ৩১ লক্ষ গাঁইট যোগ করিলে পাটের মোট জমা হয় ১৩১ লক্ষ গাঁইট। পক্ষান্তরে, বর্ত্তমান বর্ষের চাহিদার সম্ভাবনা বিবেচনা করিলে, সম্ভাব্য প্রয়োজনের পরিমাণ ৮৫ লক্ষ গাঁইটের অধিক হইবে বলিয়া মনে হয় না। নিম্নে আনুমানিক অঙ্ক দেওয়া গেল।

রপ্তানী	১৫	লক্ষ গাঁইট
চটকলের প্রয়োজন	৬৫	" "
পল্লীগ্রামের ব্যবহার	৫	" "
মোট	৮৫	" "

যুক্তরাষ্ট্রের চাহিদা এবং তথায় মাল-প্রেরণের নিয়মাগতি অক্ষুণ্ণ থাকিবে, এই বিশ্বাসের উপর উক্ত অনুমান নির্ভর করিতেছে। আমরা আরও আশা করিতেছি যে, চটকলগুলি বর্ত্তমানের ন্যায় এক-দশমাংশ তাঁত বন্ধ রাখিয়া ৫৪ ঘণ্টা কার্য্য করিবে। যদি এইরূপ ঘটে, তাহা হইলে বর্ত্তমান বর্ষের উদ্বৃত্তের অঙ্ক ৫৫ লক্ষ গাঁইটে দাঁড়াইবে; এবং তন্মধ্যে ৩৫ লক্ষ গাঁইট হইবে চটকলগুলির নিয়মানুযায়িক মজুত মাল। সুতরাং বর্ত্তমান বর্ষের শেষভাগে পাটের বাজারে অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত থাকিবে ১৫ হইতে ২০ লক্ষ গাঁইট। এই পাটকে বাজার হইতে দূরে নিশ্চল করিয়া রাখিতে না পারিলে যোগান ও চাহিদার মধ্যে সমতা রক্ষা করিয়া মূল্যের দৃঢ়তা সংরক্ষণ অসম্ভব।

বিগত এবং গতপূর্ব্ব বৎসর সরকার চটের ক্রয়-চুক্তি করিয়াছিলেন—মরশুমের শেষভাগে যখন সমস্ত পাট কৃষকদের হস্তচ্যুত হইয়াছিল। ফলে ঐ সকল ক্রয়-চুক্তি হইতে কৃষকেরা কোন উপকারই পায় নাই। যদি বাঙ্গালা সরকার ভারত সরকারের মারফতে মিত্রশক্তি-সমবায়ের প্রয়োজনের পরিমাণানুযায়ী ক্রয়-চুক্তির আদেশ অবিলম্বে সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহা হইলে চাহিদার দৃঢ়তার সহিত মূল্যের স্থৈর্য্য সম্পাদন সম্ভব হয়। বিদেশে রপ্তানী করিবার নিমিত্ত মালচালানী জাহাজে পাটের জন্য যদি আনুপাতিক অংশ (Quota) অপেক্ষা কিঞ্চিদধিক স্থান লাভ করা যায়, তাহা হইলেও অধিকতর

রপ্তানীর দ্বারা চাহিদা ও যোগানের সমতা রক্ষা সম্ভব হয়। এই সমতার উপরেই মূল্যের দৃঢ়তা নির্ভর করে।

সম্প্রতি আরও একটি অসুবিধা ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে, সাধারণ ভাবে মূল্য-হ্রাস ব্যতীত কলিকাতা ও মফস্বলের বাজার-দরের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ঘটিয়াছে। মফস্বল হইতে কলিকাতায় মাল চলাচলের অসুবিধা হেতু কলিকাতায় সরবরাহ কম, এবং মফস্বলে প্রচুর। ফলে, কলিকাতার দর অপেক্ষা মফস্বলে পাটের দর অনেক কম। কলিকাতায় ৬৲৬॥৹ টাকা হারে মণের তুলনায় মফস্বলের দর মণ-প্রতি ২॥৹ হইতে ৩॥৹ টাকা। তিনটি উপায়ে পাট মফস্বল হইতে কলিকাতায় পৌছে। প্রথম রেল, দ্বিতীয় ষ্টীমার, এবং তৃতীয় দেশী নৌকা। সাধারণতঃ এই ত্রিবিধ উপায়ে নিম্নোদ্ধৃত পরিমাণ পাট কলিকাতায় ও চটকল-কেন্দ্রে আনীত হয়,—

	১৯৪০-৪১	১৯৪১-৪২
রেলপথে	৩৮'৬৮ লক্ষ গাঁইট	২৬'৩১ লক্ষ গাঁইট
ষ্টীমারে	৫০'২৭ " "	২৮'৭২ " "
নৌকায়	২'৪০ " "	'৭৯ " "
মোট	৯১'৩৫ " "	৫৫'৮২ " "

সাধারণতঃ রেল এবং ষ্টীমারই অধিকাংশ কাঁচা পাট, বাণিজ্য ও শিল্পকেন্দ্রে বহন করে; কিন্তু যুদ্ধ-পরিস্থিতির অভিঘাতে রেল ও ষ্টীমার পূর্ব্বের ন্যায় কাঁচা পাট বহন করিয়া আনিতে পারিতেছে না। সুতরাং নৌকাযোগে অধিকতর পাটব্যবসায় ও শিল্পকেন্দ্রে আনিবার ব্যবস্থার প্রয়োজন। দেশী নৌকাগুলি যে যথেষ্ট অধিক পরিমাণে পাট বহন করে না, সে দোষ তাহাদের নহে। চটকল ও গাঁইট-বাঁধা কলগুলি নৌকাকে অনুকূল চক্ষুতে দেখে না। পক্ষান্তরে, ষ্টীমার প্রবল প্রতিযোগিতায় তাহাদিগকে কক্ষচ্যুত করিয়াছিল। বর্ত্তমানে যুদ্ধ-পরিস্থিতিহেতু নৌকাগুলির গতিবিধি কঠোররূপে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। পরন্তু, নৌকাগুলি অত্যাবশ্যক প্রয়োজনে পাথর প্রভৃতি অন্যান্য দ্রব্য-বহনে নিযুক্ত আছে। সম্প্রতি রেলে অধিকতর পরিমাণ পাট আসিতেছে বটে, এবং ষ্টীমারেও অধিকতর আমদানী সম্ভবপর হইতে পারে, তথাপি নৌকাযোগে পাট আমদানী করিবার প্রশস্ত ব্যবস্থা ব্যতীত, মফস্বল হইতে বাণিজ্য ও শিল্পকেন্দ্রে প্রচুর পরিমাণে পাট আমদানী সম্ভব নহে। বাঙ্গালার জাতীয় বণিক্-সমিতি (Bengal National Chamber of Commerce) এই প্রসঙ্গে কয়েকটি সমীচীন প্রস্তাব কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করিয়াছেন। (১) নৌকাগুলির নদীপথে নিরাপদে যাতায়াতের ব্যবস্থা, (২) "অস্বীকার নীতি" (Denial policy) ও শত্রুর অত্যাচার হেতু ক্ষতি-পূরণের ব্যবস্থা, (৩) মাঝি-মাল্লাদের নিরাপত্তা এবং যুদ্ধসম্পর্কীয় আপদ-বিপদের দায়িত্বমূলক সাহায্য (War risks injuries benefits) ব্যবস্থা, (৪) সরকারের তত্ত্বাবধানে অধিকতর পরিমাণে মাল বহন করিবার নিমিত্ত, সরকারের সুপারিশে বীমা প্রতিষ্ঠানগুলি কর্ত্তৃক বীমা-হারের লাঘব ব্যবস্থা, এবং (৫) কলিকাতার খাল ও ভাগীরথীর মধ্য দিয়া নৌকা-চলাচলের প্রশস্ততর নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা।

মাল-চলাচলের উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থার সহিত আর্থিক সুবিধার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, যেহেতু, জাহাজে মালপ্রেরকেরা (shippers) বোঝাই মালের হিসাব-পত্রের (Bills of Lading) উপর অগ্রিম টাকা পায়। এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে, যদি সরকার কোন বিশ্বস্ত দেশাভ্যন্তরচারী ষ্টীমার-পরিচালক (Recognised in land-steamer service) কিংবা অন্য যান-বাহনপরিচালক সংগঠন (other transport organisation) প্রতিষ্ঠানকে নৌকাযোগে পাট-চলাচল ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ-ভার লইতে সম্মত করিতে পারেন। বঙ্গীয় জাতীয় বণিক্-সমিতি সন্ধান লইয়াছেন যে, আড়াই হইতে তিন শত গাঁইট বহন করিতে পারে—এমন নৌকা বিহার ও যুক্তপ্রদেশে সহজলভ্য, এবং যদি এইরূপ সহস্র নৌকা পাট বহনের কার্য্যে নিযুক্ত করা যায়, তাহা হইলে বর্ত্তমান মরশুমে ১০ হইতে ১৫ লক্ষ গাঁইট পাট স্থানান্তরিত হইতে পারে; এবং এই কার্য্য যদি রেল ও জলপথের সংযোগস্থলে, রেল-কর্ত্তৃপক্ষের সাহচর্য্যে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে অধিকতর সাফল্যের সম্ভাবনা। খুলনা এবং গোয়ালন্দ এই ব্যবস্থার উপযোগী।

মাল-চলাচলের উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা সাময়িক সুবিধা প্রদান করিবে মাত্র। পাট ব্যবসায়ের স্থায়ী উন্নতিকল্পে অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত মালের সদ্ব্যবহার-ব্যবস্থাই অত্যাবশ্যক। শুধু বর্ত্তমান নহে, ভবিষ্যতের দিকেও দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হইবে। উৎপন্ন উদ্বৃত্ত মজুত কাঁচা পাটের নিঃশেষে ব্যবহারের ব্যবস্থা সম্পাদন হেতু, আগামী বর্ষে যাহাতে মাত্র প্রয়োজনের অতিরিক্ত পাট উৎপাদিত না হয়, তৎপ্রতি কঠোর অনুশাসনের প্রয়োজন। বর্ত্তমান বর্ষে পাটের চাষ অর্দ্ধেক পরিমাণে কমাইয়া দেওয়াও অবশ্য-প্রয়োজন; এবং পাট-মুক্ত জমিতে খাদ্যশস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা প্রধান কর্ত্তব্য। এই সঙ্গে কাঁচা পাটের একটি নিম্নতম মূল্যের হার নির্দ্ধারণ অত্যাবশ্যক। কৃষকদের নিকট হইতে পাট ক্রয়ের একটি বিভিন্ন প্রকারের ব্যবস্থা ব্যতীত মূল্যের নিম্নতম হার দৃঢ় রাখিয়া হতভাগ্য কৃষককুলের দুর্দ্দশা দূর করিবার দ্বিতীয় উপায় নাই।

বর্ত্তমানে মধ্যবিত্ত লোকেরা দীনহীন বুভুক্ষু কৃষকদের দাদন দিয়া অথবা অন্য প্রকারে অতি অল্পমূল্যে কাঁচা পাট ক্রয় করিয়া উচ্চমূল্যে বিক্রয় দ্বারা লাভবান্ হয়। চির-দরিদ্র কৃষকের দারিদ্র্য বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই প্রথার মূলে সবলে কুঠারাঘাত প্রয়োজন। কাঁচা পাট কৃষকের নিকট হইতেই কিনিতে হইবে; কিন্তু কিনিবে কে? সরকারের সরাসরি এই কার্য্যে লিপ্ত হওয়া সঙ্গত নহে; কারণ, তাহাতেও অনাচারের সুযোগ ঘটিতে পারে। ক্রয়ের সহিত বাছাই, শ্রেণীবিভাগ, এবং গুদামজাত করিবার ব্যবস্থার নিকট-সম্বন্ধ। বে-সরকারী ধনী পাটব্যবসায়ীরা ক্ষতির আশঙ্কায় কাঁচা পাট মজুত জমা রাখিতে বিশেষ অনিচ্ছুক হইবেন, তাঁহাদের সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত-বহির্ভূত কারণে ক্ষতি ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। এরূপ ক্ষেত্রে, মনে হয়, সরকার যদি পাট ব্যবসায়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গকে, আবশ্যকমত আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা দ্বারা, তাঁহাদের প্রতিনিধিরূপে বিভিন্ন শ্রেণীর পাট ক্রয় ও গুদামজাত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে নিরন্ন কৃষক-প্রজার অন্নসংস্থানের উপায় হইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে বঙ্গীয় জাতীয় বণিক্-সমিতি একটি সমীচীন প্রস্তাব করিয়াছেন। সরকার প্রতিনিধি দ্বারা মফস্বল হইতে পাট ক্রয়ের ব্যবস্থা করিলেই যে মধ্যবিত্ত লোকেরা অপসৃত হইবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। এই নিমিত্ত সরকার যদি যথার্থ কৃষক-উৎপাদকদিগের মধ্যে প্রথমে পাট-বিক্রয়-অধিকার-পত্র (Jute sale

permits) বিতরণ করেন এবং পরে প্রতিনিধিগণ তাহাদের নিকট হইতেই পাট ক্রয় করে, তাহা হইলে মধ্যবিত্ত লোকেরা দরিদ্র কৃষকের দুর্দ্দশার সুযোগ লইয়া অতি অল্প মূল্যে তাহাদের নিকট হইতে পাট কিনিয়া, নিজেরা লাভবান্ হইতে পারিবেন না। এই বিক্রয়-অধিকার-পত্র, নিয়ন্ত্রণ, অথবা মণ্ডল, কর্ম্মচারী (Jute Regulation or Circle Officers) সাহায্যে বিতরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে, এবং যাহারা এই বিক্রয়-অধিকার পাইবে, তাহারাই সরকারের প্রতিনিধিগণের নিকট পাট বিক্রয় করিতে পারিবে। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সরকার বা তাঁহাদের প্রতিনিধিবর্গকে মফস্বলের উপযুক্ত সংখ্যক ক্রয়কেন্দ্রে গোমস্তা নিযুক্ত করিতে হইবে; যাহাতে সমস্ত পাট-উৎপাদক মোকামে পাটের দর অযথা হ্রাস না পায়।

এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেই যে, সর্ব্বপ্রকার অবিচার হইতে কৃষকসমূহ অব্যাহতি লাভ করিবে, তাহারও নিশ্চয়তা নাই। এই নিমিত্ত এই পাট-বিক্রয়-পরিকল্পনার নিবঙ্কুশ প্রবর্ত্তন ও পরিচালন হেতু বাঙ্গালা সরকার, ভারত সরকার, পাট-কারবারে সংশ্লিষ্ট-সঙ্ঘ-সমূহ, এবং প্রয়োজন বোধ করিলে কেন্দ্রীয় পাট-সমিতির (Indian Central Jute Committee) প্রতিনিধি লইয়া, একটি উপদেশক-মণ্ডলী (Advisory Body) অথবা ক্রয়সঙ্ঘ (Purchasing Commission) সংগঠন করিতে হইবে। এইরূপ একটি সঙ্ঘ, অথবা মণ্ডলী মফস্বলে কাঁচা পাট ক্রয়ের তত্ত্বাবধান, এবং সুচারুরূপে ক্রয়-পরিচালন হেতু সদুপদেশ দান ও কর্ম্মপন্থার যুক্তিসঙ্গত নির্দ্দেশও প্রদান করিতে পারিবেন।

এ সকল ভবিষ্যতের ব্যবস্থা। বর্ত্তমানে পাট কারবারের আশু দুঃখমোচনকল্পে উৎপাদন-উদ্বৃত্তের যাহাতে বাজারে প্রক্ষিপ্ত হইয়া অধিকতর মূল্য-হ্রাসের কারণ না হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। চটকলওয়ালাদের গুদামে মজুত মালের অবশিষ্ট ব্যতীত, ১৫ হইতে ২০ লক্ষ গাঁইট কাঁচা পাট আগামী মরশুমের প্রারম্ভে একটি জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি করিবে;—যদি ইতিমধ্যে এই উদ্বৃত্তকে স্বতন্ত্র ও নিশ্চল করিয়া রাখা না যায়। মণ-প্রতি নিম্নতম মূল্য ৬৲ টাকা ধরিলেও কুড়ি লক্ষ গাঁইট উদ্বৃত্ত পাটকে অন্তরিত ও বহির্ভূত করিয়া রাখিতে, বাঙ্গালা সরকারের প্রায় ছয় কোটি টাকার প্রয়োজন। বাঙ্গালা সরকার, ভারত সরকারের নির্দ্দেশানুসারে গত মরশুমে পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা অধিক পরিমাণে পাট-চাষের অনুমতি দিয়াছিলেন। উহার ফলেই এ বৎসর অত্যধিক পরিমাণে পাট উৎপাদিত হইয়াছে। এই নিমিত্ত পাট ব্যবসায়ের কল্যাণার্থ উদ্বৃত্ত উৎপাদনকে নিশ্চল রাখিবার উদ্দেশ্যে বাঙ্গালা সরকারকে উপযুক্ত অর্থসাহায্য প্রদান করাই ভারত সরকারের কর্ত্তব্য। এ টাকা অপব্যয় হইবার আশঙ্কা নাই, কারণ, আগামী বর্ষে উৎপাদন কম করিতে পারিলে উদ্বৃত্ত মজুত পাটের চাহিদা হইবে, এবং তাহা বিক্রয়লব্ধ অর্থ ব্যয় অপেক্ষা অল্প হইবার সম্ভাবনা নাই।

বর্ত্তমানে কলিকাতায় পাটের অপ্রাচুর্য্যহেতু মূল্যাধিক্য, এবং মফস্বলে তাহার প্রাচুর্য্যহেতু মূল্যহ্রাসজনিত সমস্যার একমাত্র সমাধান মাল-বহনের সুবন্দোবস্ত। এই উদ্দেশ্যে গত অক্টোবর মাসে বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী এবং অর্থসচিব কেন্দ্রীয় সরকারের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। ভারতের বাণিজ্য-সচিব তাঁহাদিগকে মাল-চলাচলের যথাসাধ্য এবং যথাসম্ভব সুযোগ-সুবিধার আশ্বাস দিয়াছেন, এবং কৃষক-প্রজাদিগের অবিক্রীত পাটের উপর যত দিন না বিক্রয় হয়, তত দিনের জন্য ঋণ প্রদানের নিমিত্ত দুই কোটি টাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। বাঙ্গালা সরকারও এই উদ্দেশ্যে আরও অর্দ্ধ কোটি টাকা ব্যয় করিবেন; কিন্তু এই ঋণে কৃষকগণের উপকার অপেক্ষা অপকারই অধিক হইবে বলিয়া মনে হয়। অধিকাংশ পাট যদি তাহারা পেটের দায়ে বিক্রয় না করিয়া থাকে, তাহা হইলে ঋণ এবং সঞ্চিত পাটবিক্রয়-লব্ধ অর্থ এই উভয়ই তাহারা খরচ করিয়া ফেলিবে। তাহাতে তাহাদের ঋণের এবং দুঃখ-দুর্দ্দশার ভার লঘু না হইয়া অধিকতর দুর্ব্বহই হইবে। কৃষক-প্রজাদের যথার্থ কল্যাণ-সাধন করিতে হইলে সরকারকে মফস্বলে গুদাম ভাড়া করিয়া, তাহাতে পাট বন্ধক রাখিয়া ঋণ দান করিতে হইবে। বর্ত্তমান মূল্যের সমানুপাতে এই ঋণ দিয়া যথাসময়ে উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে তাহাদের লভ্যাংশ তাহাদিগকে প্রদান করিলে এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

কিন্তু জানিতে পারা গিয়াছে, বাঙ্গালা সরকার কর্ত্তৃক পাট কিনিবার প্রস্তাব ভারত সরকার প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহারাজাধিরাজ ছত্রশাল রায়

ভারতীয় যে সকল কীর্ত্তিমান্ পুরুষের কীর্ত্তিকলাপ বিস্মৃতির অন্ধকারে বিলুপ্ত হইতেছিল, বুন্দেলার বা বুন্দেলখণ্ডের মহারাজাধিরাজ ছত্রশাল রায় তাঁহাদের অন্যতম। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মিষ্টার কে, পি, যশোয়াল তাঁহার কাহিনী জনসমাজের গোচর করিয়াছেন। যে সময়ে দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ ধর্ম্মান্ধ বাদশাহ ঔরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন, তাহার অল্প দিন পরেই বুন্দেলা-রাজপুতকুলে এই মহাবীর হিন্দু ধর্ম্ম এবং সমাজ-সংরক্ষণের জন্য সুশাণিত কৃপাণ হস্তে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইঁহার বাল্যজীবনের বিবরণ সাধারণের অজ্ঞাত; কেবল জনশ্রুতিতে প্রকাশ, তাঁহার শৈশবকালে কোন জ্যোতিষী তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, এই বালক ভবিষ্যতে রাজ-চক্রবর্ত্তী হইবে, এই ভবিষ্যদ্বাণীতে নির্ভর করিয়া তাঁহার পিতা তাঁহার নাম রাখেন—ছত্রশাল। ছত্রশালের অর্থ ছত্রপতি বা সার্ব্বভৌম সম্রাট্। তাঁহার সমসাময়িক হিন্দী-কবিগণের অনেকে তাঁহার প্রসঙ্গে অনেক কথার উল্লেখ করিলেও কেহই তাঁহার বাল্য-জীবন সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেন নাই। তাঁহার সমসাময়িক অন্যতম হিন্দী কবিভূষণ তাঁহার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "তাঁহার সৈন্য এবং সেনা বিভাগ রাজ্যের চতুর্দ্দিকে ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিয়াছিল, এবং তাঁহার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করে, এরূপ বীরপুরুষ সমগ্র মোগল সাম্রাজ্যে কেহই ছিল না। তিনি যুদ্ধে মোগল-বাহিনীকে বারংবার পরাজিত করিয়াছিলেন।" তাঁহার অশ্বারোহী সৈন্যদল অতীব পরাক্রান্ত ছিল। কিন্তু শিবাজীকে প্রেরণা দানের জন্য রামদাস যেমন তাঁহার গুরু ছিলেন, —মহারাজ ছত্রশালকে প্রেরণা দানের জন্য তাঁহার সেরূপ কোন গুরু ছিলেন কি না, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। তবে তিনি যে স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে ছত্রশাল রায় বুন্দেলার যে রাজপুত-বংশে

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই বংশ অর্চ্ছা নামে অভিহিত হইত। তাঁহার পিতার নাম চম্পৎ রায়। চম্পৎ রায়ের পূর্ব্বপুরুষ মহেবা নামক একটি ক্ষুদ্র জায়গীর লাভ করিয়া তাহারই উপস্বত্বে কোন প্রকারে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন; কারণ, জায়গীরের যে অংশটুকু তিনি লাভ করিয়াছিলেন, তাহার বার্ষিক আয় ছিল—সাড়ে তিন শত টাকা মাত্র। ডামোয়ার বিখ্যাত ঐতিহাসিক রায় বাহাদুর হীরালাল, তাঁহার ডামোয়া-দীপিকায় লিখিয়াছেন, চম্পৎ রায়ের দৈনিক আয় ছিল—পনর আনা মাত্র। এইরূপ দরিদ্র চম্পৎ রায় মহা পরাক্রান্ত বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মের গৌরব রক্ষায় পশ্চাৎপদ হন নাই। ইনি ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়া পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন। তখন মহারাজ ছত্রশাল রায়ের বয়স অত্যন্ত অল্প। চম্পৎ রায় প্রসিদ্ধ যোদ্ধা হইলেও তাঁহার অর্থবল ছিল না। এ জন্য তিনি সৈন্যরক্ষণে অসমর্থ ছিলেন। তবে বুন্দেলার রাজপুতগণ ঔরঙ্গজেবের অত্যাচারে অতিশয় উত্ত্যক্ত হওয়ায় তাঁহাকেই নেতৃপদে বরণ করিয়া সদলে ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রবল-পরাক্রান্ত মোগল-বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়লাভ করা তাঁহাদের সাধ্যাতীত হইয়াছিল। সুতরাং যুদ্ধে চম্পৎ রায় যথেষ্ট বীরত্ব প্রদর্শন করিলেও বুন্দেলার রাজপুতগণকে পরাভূত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা সম্পূর্ণ নির্জ্জীব হইয়া পড়েন নাই। রাজপুতগণের সহিত যুদ্ধে মোগল-সৈন্যেরও যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল।

চম্পৎ রায়ের পুত্র ছত্রশাল রায় শৈশবে পিতৃহীন হইয়া বিধবা জননী কর্ত্তৃক অতি কষ্টে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। নিঃস্ব জায়গীরদারের পুত্রের জীবনকাহিনী কেহ লিপিবদ্ধ না করিলেও ডামোয়া অঞ্চলে এই জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে, ছত্রশাল ভূমিষ্ঠ হইবার পর কোন জ্যোতিষী তাঁহার ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যের কথা গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন—ইহা আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি।

ছত্রশাল অল্পবয়সে পিতৃহীন হইলেও তাঁহার বুদ্ধিমতী জননী তাঁহাকে যথাযোগ্য শিক্ষা দানের ত্রুটি করেন নাই। পারিবারিক গুরুর নিকট ছত্রশাল সাহিত্য ও ধর্ম্মনীতি শিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং জননীর উপদেশে ও দৃষ্টান্তে তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রগাঢ় অনুরক্ত হইয়াছিলেন। এক বার এক ব্যক্তি একটি ব্যঙ্গ কবিতায় তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন, "তুমি ছত্রশাল (চক্রবর্ত্তী মহারাজ) কেবল তোমার মুখের জোরে, কারণ, এক অঙ্গুলি পরিমাণ জমিও তোমার নাই।" সেই কবিতার উত্তরে ছত্রশাল হিন্দী ভাষায় একটি সুললিত কবিতা লিখিয়াছিলেন। উহার মর্ম্ম এই—

"হাঁ মহাশয়, জ্ঞানের শিক্ষক আপনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, অহঙ্কার ঠিক পথ নহে। কিন্তু যে দেবতার বাহন গরুড়, তাঁহার সেবাই ঠিক পথ। তিনিই কেবল নাম প্রদান করেন, এবং তাঁহার ভক্তকে রূপান্তরিত করেন। তিনিই অতি দীন সুদামকে রাজ্যেশ্বর করিয়াছিলেন, বিদুরকে রাজত্ব করিতে দিয়াছিলেন, এবং কুব্জাকে সৌন্দর্য্যদান করিয়াছিলেন। আমি বলি, তিনিই কি দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করেন নাই? না, পাষণ্ড হিরণ্যকশিপুকে সংহার করিয়া ভক্তের প্রতি তাঁহার অঙ্গীকার পালন করেন নাই?" তাঁহার স্বরচিত এই কবিতা যেমন তাঁহার কবিত্ব-শক্তির পরিচায়ক, উহা তেমনই তাঁহার সুদৃঢ় বিষ্ণুভক্তিরও পরিচয় প্রদান করে। তিনি অল্প বয়সেই এই কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন।

বিষ্ণুর প্রতি গভীর ভক্তি—বিষ্ণুই তাঁহার ভক্তদিগকে সর্ব্ব প্রকার আপদ-বিপদে রক্ষা করেন এবং ভগবান্ বিষ্ণুর কৃপা লাভ করিলে তিনি বুন্দেলখণ্ডের সুদাম হইতে পারেন,—এই অবিচলিত বিশ্বাসই তাঁহার উন্নতির মূল। অল্প বয়সে পিতৃহীন হইয়া তিনি কোথায় কিরূপে সামরিক শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও জানিবার উপায় নাই। তিনি একান্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ, রাজনীতিক ও অতিশয় বিষ্ণুভক্ত হইলেও অরিন্দম পুরুষসিংহ ছিলেন, প্রবল পরাক্রান্ত মোগল সম্রাটের সহিত সংগ্রামে জয়লক্ষ্মী একাধিক বার তাঁহার কণ্ঠ জয়মাল্যে সুশোভিত করিয়াছিলেন। ছত্রপতি শিবাজীও এরূপ সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে পারেন নাই। শিবাজীকেও কিছু দিন মোগল বাদশাহের বশ্যতা স্বীকার করিতে হইয়াছিল। কিন্তু মধ্য-ভারতের দুর্গম মরু-কান্তারের এই পুরুষসিংহকে কোন দিনও মোগল বাদশাহের বা অন্য কোন বিধর্ম্মী শাসন-কর্ত্তার বশ্যতা স্বীকার করিতে হয় নাই। ঔরঙ্গজেব যখন স্বীয় ধর্ম্মের প্রতি অতিরিক্ত গোঁড়ামীর জন্য অমুসলমান ব্যক্তিদিগকে বল-পূর্ব্বক মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে মনন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে বুন্দেলার এই পিতৃহীন সহায়-সম্পদ্-বর্জ্জিত রাজপুত বালক স্বদেশের মুষ্টিমেয় দরিদ্র রাজপুতগণকে লইয়া প্রবল পরাক্রান্ত বাদশাহকে বাধা প্রদানে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। বাল্যকালেই তাঁহার প্রতীতি হইয়াছিল—তিনি বিষ্ণুবিদ্বেষী বাদশাহের এই ঘৃণ্য কার্য্যে বাধা প্রদানের জন্যই ভগবান্ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন। রাজা ছত্রশাল সে কার্য্যে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহা য়ুরোপীয় বুধগণও স্বীকার করেন, সেই জন্য Encyclopoedia Britannicaতেও লিখিত হইয়াছে।

Under Champat and his son Chitrashal the Bandalas offered a successful ressitance to the proselytising efforts of Aurangzeb অর্থাৎ বুন্দেলার রাজপুতগণ চম্পৎ রায় এবং তাঁহার পুত্র ছত্রশালের নেতৃত্বে ঔরঙ্গজেবের ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার চেষ্টায় বাধা দিয়া সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর এই স্বয়ংসিদ্ধ রাজপুত বীর কি প্রকার সমরকৌশল শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা জনসাধারণের অজ্ঞাত বলিয়াই এই মহাবীরকে লোকে অষ্টাদশ শতাব্দীর হিন্দু ক্রমওয়েল নামে অভিহিত করে। ইনি ষোল বৎসর বয়স হইতে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া বহু যুদ্ধেই জয়লাভ করিয়াছিলেন।

ইনি কোন্ সময়ে রাজ্যশাসন আরম্ভ করেন, তাহাও জানিতে পারা যায় নাই। পিতার মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পৈতৃক জায়গীরের কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কোন্ সময় 'রাজা' খেতাব লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও অজ্ঞাত। তবে ডামো জিলার সংগ্রামপুরে একটি সোপানযুক্ত ইঁদারা-গাত্রে এইরূপ লিপি উৎকীর্ণ আছে যে, রাজা ছত্রশালের শাসনকালে উহা প্রতিষ্ঠিত। উহার তারিখ ১৭৩৫ সম্বৎ,—অর্থাৎ ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দ। ইহা হইতেই প্রতীয়মান হয়, ত্রিশ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার সময়েই জায়গীরদার ছত্রশাল রায় রাজা উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত ডামো জিলার কুণ্ডলপুর গ্রামস্থ কোন জৈন-মন্দিরে উৎকীর্ণ একটি লিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়,—১৭৫৭ সম্বতে অর্থাৎ ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে রাজা

ছত্রশাল—'মহারাজাধিরাজ ছত্রশাল' এই উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় বাহুবলেই ঐ উপাধি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ধর্ম্মান্ধ মোগল-বাদশাহ ঔরঙ্গজেব অমুসলমান ভারতবাসীদিগকে বলপূর্ব্বক মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ঔরঙ্গজেবের সহিত তাঁহার কত বার যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিত-রূপে জানিবার উপায় নাই। তবে ঐ অঞ্চলে এইরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে, ছয়-সাত বার অপেক্ষা অল্প বার যুদ্ধ হয় নাই, কিন্তু ঐ সকল যুদ্ধে কোনটিতেই মোগল-বাহিনী জয়লাভ করিতে পারে নাই। তবে এ সম্বন্ধে নিশ্চিত বিবরণ জানিতে পারা যায় নাই। তিনি আপনাকে বিষ্ণুর দাস মনে করিতেন বলিয়াই কোথাও জয়স্তম্ভ স্থাপন করেন নাই। বুন্দেলার রাজপুতগণ বিশেষ সুশিক্ষিত ছিলেন না। জাতীয় কীর্ত্তিরক্ষার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা তাঁহারা উপলব্ধি করিতেন না। যাহা হউক, ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে জৈইৎপুর নামক স্থানে মহারাজ ছত্রশালের সহিত দিল্লীর সম্রাট্ মহম্মদ শাহের যে প্রচণ্ড সংগ্রাম হইয়াছিল, সেই যুদ্ধে মহম্মদ শাহ ৮০ লক্ষ অশ্বারোহী এবং বহু লক্ষ পদাতিক সৈন্যসহ গিরধর বাহাদুর ও দয়া বাহাদুর নগর নামক দুই জন হিন্দু সেনাপতিকে ছত্রশালের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই বিপুল মোগল অনীকিনী বীরদর্পে ক্ষুদ্র বুন্দেলা অভিমুখে ধাবিত হইতে দেখিয়া অনেকেরই ধারণা হইয়াছিল, এই যুদ্ধে ক্ষুদ্র বুন্দেলখণ্ড এবং মালোয়ার আর রক্ষা নাই! কিন্তু বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ছত্রশালকে তাহাতে বিন্দুমাত্র ভীত বা কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইতে দেখা যায় নাই। তিনি অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া বাদশাহী সৈন্যচমূকে বাধা দানের জন্য রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া হিন্দী কবিতায় লিখিত একখানি পত্রে মহারাষ্ট্র-নায়ক বাজীরাও পেশোয়াকে তাঁহার সাহায্যার্থ আহ্বান করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ ছত্রশাল ইতোমধ্যে মুসলমান সৈন্যদিগকে বাধাদানে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। অতঃপর পেশোয়া বাজীরাওয়ের সৈন্যমণ্ডলী সহসা তাঁহার সহিত যোগদান করিলে জৈইৎ-পুরের যুদ্ধে তিনি মোগলবাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়াছিলেন। মোগলসৈন্যগণ সুদীর্ঘ ছয় মাসকাল অবরুদ্ধ থাকিবার পর মহারাজা-ধিরাজ ছত্রশালের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। ইহাই মোগলসৈন্যের সহিত ছত্রশাল রায়ের শেষ যুদ্ধ। প্রকাশ, এই জৈইৎপুরের যুদ্ধে মোগল-সৈন্যদিগকে ৮০ টাকা সের মূল্যে আটা কিনিতে হইয়াছিল। ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে মহারাজাধিরাজ ছত্রশালের মৃত্যু হয়। ইনি ন্যূনকল্পে ৫৫ বৎসর রাজত্ব করিয়া বুন্দেলখণ্ডের কীর্ত্তি ও খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

মহারাজাধিরাজ ছত্রশালের কতগুলি কীর্ত্তি এখনও অক্ষুণ্ণ থাকিয়া তাঁহার সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের এবং স্থাপত্য-রুচির পরিচয় বিঘোষিত করিতেছে। রাণী কমলাবতীর স্মৃতি-মন্দির তাহাদের অন্যতম। ইহা অনুমানিক ১৭০০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এরূপ সুদৃশ্য ও সুনি-র্ম্মিত স্মৃতি-মন্দির সমগ্র ভারতে তাজমহল ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। ইহার পার্শ্বেই রাজা ছত্রশালের স্মৃতি-মন্দির। ইহা তিনি স্বয়ং নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন এবং তাঁহার পুত্র ইহার নির্ম্মাণকার্য্য সুসম্পন্ন করেন।

ছত্রশালের মহিষী কমলাবতীর মৃত্যুকাহিনী অতিশয় সকরুণ ও বেদনাপূর্ণ। রাজ্ঞী কমলাবতীর পতিপ্রেম অত্যন্ত প্রবল ছিল। তিনি যেমন সুন্দরী, তেমনই গুণবতী ছিলেন। এখনও যুক্তপ্রদেশ হইতে বিহার পর্য্যন্ত—গোয়ালিয়র হইতে মালোয়া পর্য্যন্ত হিন্দুনারীরা রাণী কমলাপতের (কমলাবতীর অপভ্রংশ) গৌরব কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করে। সেই কবিতার মর্ম্ম এই যে—"রাণী বলিতে রাণীর শ্রেষ্ঠ কমলাপৎ। অবশিষ্ট সকলে কেবল সম্মানের ভারবাহিকা মাত্র। রাজা বলিতে রাজা ছত্রশাল, অন্য সকলে ক্ষুদ্র নরপতি। হ্রদের মধ্যে ভূপালের হ্রদই প্রকৃত হ্রদ, অবশিষ্ট হ্রদ-সমূহ পুষ্করিণী মাত্র।"

বলিয়াছি, রাণী কমলাবতীর মৃত্যু-কাহিনী অতীব সকরুণ। রাজা ছত্রশালের বুদ্ধির দোষেই এই শোচনীয় কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল। ছত্রশাল একদা শিকারে গিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার শোণিতসিক্ত পরিচ্ছদ রাণী কমলাবতীর নিকট এই বলিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন যে, রাজা ছত্রশাল শিকারে গমন করিয়া সিংহ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া-ছেন। সেই রক্তাক্ত বস্ত্র রাজপ্রাসাদে পৌঁছিলে রাণী তাহা দেখিতে পাইলেন। তিনি অনুমৃতা হইবার জন্য তৎক্ষণাৎ চিতা-শয্যার আদেশ করিলেন। কাহারও বাধা মানিলেন না। সংবাদটি সত্য কি না, তাহার অনুসন্ধান পর্য্যন্ত করিলেন না! অবিলম্বেই চিতা সজ্জিত হইল। রাণী চিতাশয্যায় শয়ন করিলেন। অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া সেই অনুপম বরবপু ভস্মে পরিণত করিল। রাজ্ঞীর কোন হস্ত, এমন কি, একটি অঙ্গুলিও কম্পিত হইল না। চিতা যখন নির্ব্বাণ-প্রায়, রাজা ছত্রশাল ঠিক সেই সময় তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন তিনি নিজের অবিমৃষ্যকারিতার জন্য ললাটে পুনঃ পুনঃ করাঘাত করিতে লাগিলেন। তিনি সেই চিতাগ্নিতে লাফাইয়া পড়িবার জন্য উন্মাদের ন্যায় ধাবিত হইলেন। অনেকে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। রাজ্ঞী কমলাবতীর পুণ্য-স্মৃতির সংরক্ষণ-কল্পে তিনি তাঁহার শিকার-স্থলের সান্নিধ্যে একটি হ্রদ এবং সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করাইয়া স্বয়ং সেই হ্রদে কমল রোপণ করিয়াছিলেন। স্থানটি অতি সুন্দর এবং সেই দৃশ্য অতীব প্রীতিকর।

রাজা ছত্রশাল অতীব ন্যায়নিষ্ঠ এবং নিরতিশয় ভক্ত ছিলেন, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। হিন্দী কবি বলভদ্র স্বকীয় চেষ্টায় সাফল্যলাভে সমর্থ ব্যক্তির কতকগুলি দৃষ্টান্ত প্রকাশের পর উপসংহারে তিনি এই উপদেশ দিয়াছেন, "পাঠক, তুমি ছত্রশালের সারা জীবনের ক্রিয়াকলাপ স্বকীয় মানস-ফলকে অঙ্কিত করিয়া রাখ। পিতৃহীন, ভ্রাতৃহীন, বন্ধুহীন, কার্য্যারম্ভ করিবার যোগ্য সম্বলে সম্পূর্ণ বঞ্চিত, সৈন্যহীন, সজ্জাশূন্য, রাজনীতিক্ষেত্রে সহায়হীন হইয়াও কেবলমাত্র সাহসে নির্ভর করিয়া ছত্রশাল তাঁহার রাজ্য এবং গৌরব অর্জ্জন করিয়াছিলেন।" তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিরা তাঁহাকে 'মধ্য-ভারতের শিবাজী' নামে অভিহিত করিতেন। শিবাজী অপেক্ষা তাঁহার বয়স প্রায় ২১ বৎসর কম ছিল।

মহারাজ ছত্রশাল অতিশয় ন্যায়নিষ্ঠ নরপতি ছিলেন। পেশোয়া বাজীরাওকে তিনি 'ধর্ম্মপুত্র' বলিতেন। বাজীরাও তাঁহাকে পিতৃতুল্য শ্রদ্ধা করিতেন। মৃত্যুকালে মহারাজ ছত্রশাল তাঁহার রাজ্যের একাংশ জ্যেষ্ঠ পুত্রের ভাগ হিসাবে পেশোয়াকে দান করিয়াছিলেন, অবশিষ্ট দুই অংশ তাঁহার ঔরসজাত দুই পুত্র পাইয়াছিলেন। বরং বাজীরাও সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হিসাবে কিছু অধিক সম্পত্তিই পাইয়াছিলেন।

রাজা প্রথম জীবনে দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু তাঁহার দারিদ্র্য-কষ্ট নিবারণের জন্যই প্রাচীন পন্নীর নিকট একটি হীরকের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। উহা বিষ্ণুর দান বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইয়াছিল। তাঁহার ন্যায় একাধারে পরমভক্ত এবং শূর সর্ব্বত্রই অতি দুর্ল্লভ।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

প্রশান্ত মহাসাগরের চাবি

ছেলেবেলায় আমরা যে-সব ভূগোল পড়িয়াছি; এবং সে-ভূগোলের বিদ্যাকে সুস্পষ্ট ও ভারী করিয়া তুলিতে দেশী-বিলাতী যে-সব ম্যাপ আমাদের সামনে ধরা হইত, আজ এই যুদ্ধের হাঙ্গামায় বুঝিতেছি,

প্রশান্ত মহাসাগর—পূর্ব্বাংশ

সে ভূগোল এবং সে ম্যাপ কতখানি ফক্কিকারী আর ধাপ্পা চালাইয়াছে! সে-ভূগোল পড়িয়া এবং সে-ম্যাপ দেখিয়া জানিতাম, প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে আছে শুধু জাপান; অষ্ট্রেলিয়া; এবং নিউ-জীলাণ্ড; সুমাত্রা, যব, বোর্ণিয়ো, সেলিবিশ এবং ফিলিপাইনস্; আর আছে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে অথই অসীম জল আর জল! তাই পার্ল-হার্বারে যুদ্ধ; আর নিউ-গিনি, পাপুয়া, ফিলিপাইনস্ এবং অষ্ট্রেলিয়ার উপর জাপানের এতখানি লক্ষ্য দেখিয়া আমরা যেমন দিশাহারা, তেমনি আশ্চর্য্য হইয়াছি! তার পর এখনকার যুদ্ধ-সংস্থান বুঝিতে নূতন ম্যাপে দেখিতেছি, প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ঐ ক'টি দ্বীপই শুধু আছে, তা নয়! ও-বুকে ছোটয়-বড়য় মিলিয়া দ্বীপ আছে প্রায় দু' হাজার! বিভিন্ন দ্বীপ বিভিন্ন জাতির অধিকারে। এই বিভিন্ন জাতির মধ্যে আছে ব্রিটিশ; মার্কিন; ফরাসী; ডাচ; এবং জাপানী।

জাপানীদের অধিকৃত দ্বীপের সংখ্যা ১৪৮৩টি। তার মধ্যে বড় এবং মাঝারি দ্বীপের সংখ্যা ৬২৩; এই ছোটখাট দ্বীপ ৮৬০!

যে দ্বীপগুলি জাপান অধিকার করিয়া আছে, সেগুলির অবস্থান এমন কায়েমি যে, প্রশান্ত মহাসাগরের চাবি-কাঠি জাপানের হাতে, এ-কথা বলিলে এতটুকু অত্যুক্তি হইবে না!

জাপান তার অধিকার-ভুক্ত দ্বীপগুলি হইতেই হাওয়াই, ফিলিপাইনস্, ডাচ-ইণ্ডীজ এবং অষ্ট্রেলিয়া-অধিকৃত দ্বীপগুলিতে হানা দিবার সুযোগ পাইয়াছে চমৎকার! এই সব দ্বীপের দৌলতে জাপান প্রকৃতপক্ষে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে আজ দুর্দ্ধর্ব। কি করিয়া এ সব দ্বীপে জাপান স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত করিল, সে-কাহিনী রোমান্সের মতো বিচিত্র।

তিনিয়ান, পোনাপি, কুশাই এবং মাইক্রোনেশিয়ার বাহিরে ঈষ্টার এবং অন্যান্য বহু ছোট দ্বীপে আজো যে-সব প্রাচীন তৈজস ও আসবাব-পত্র গিরি-শিলা-লিপি এবং গৃহাদির ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, সে-সবের ভাস্কর্য্য ও কারু-কৃতিত্বে প্রাগৈতিহাসিক যুগের শিক্ষা-সংস্কৃতির ছাপ সুস্পষ্ট জাজ্বল্যমান আছে। এ সব কীর্ত্তি কোন্ প্রাচীন জাতির শিক্ষা-সংস্কৃতির পরিচয় বহন করিয়া আজো বহু সহস্র যুগ ধরিয়া বিদ্যমান আছে, ঐতিহাসিক অনুশীলনে তার কোনো সন্ধান মিলে নাই।

সে জাতির পর এ-সব দ্বীপে পলিনেশিয়ান জাতির প্রাদুর্ভাব ঘটে। এখনকার পলিনেশিয়ানরা আদি-পূর্ব্বপুরুষের কোনো সংবাদ জানে না।

ঐতিহাসিক অনুসন্ধান-সমিতিগুলি বহু সন্ধানের পর বলিতেছেন, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রারম্ভে মলয়-দ্বীপপুঞ্জ হইতে পলিনেশিয়ান জাতির বহু স্ত্রী-পুরুষ এই সব বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন দ্বীপে বাস করিতে আসিয়াছিল। এসিয়া হইতে নানা জাতি মলয়-দ্বীপে আসিয়া ভিড় জমায়। তাদের তাড়ায় ইহারা মলয় ত্যাগ করিয়া এই-সব দ্বীপে আসিয়া নিরাপদ আস্তানা পাতিয়াছিল।

প্রশান্ত মহাসাগর—পশ্চিমাংশ

বাহু-বলের সঙ্গে অস্ত্র-বল মিশিয়া মলয়ের আদিম অধিবাসীদের মলয়-ছাড়া করিয়াছিল। মলয়বাসীদের অস্ত্রশস্ত্রাদি ছিল পাথরের তৈয়ারী—এসিয়াবাসী ঔপনিবেশকের দল মলয়ে আনিল নানা ধাতুর অস্ত্রশস্ত্রে

সজ্জিত হইয়া। ধাতুর কাছে পাথরের অস্ত্র পরাভব স্বীকার করিল। এবং মলয়বাসীরা বড় বড় নৌকায় চড়িয়া সাগরের বুক বহিয়া দিক্‌দিগন্তে সরিয়া পড়িল। এমনি করিয়া এ-সব দ্বীপে পলিনেশিয়ান জাতির আবির্ভাব।

তার পর বহু বৎসর ধরিয়া কয়েকটি দ্বীপে পলিনেশিয়ানরা আচারে-ব্যবহারে খাঁটী মলয়ের মতো ছিল; অন্য জাতির সহিত বিবাহ-সূত্রে
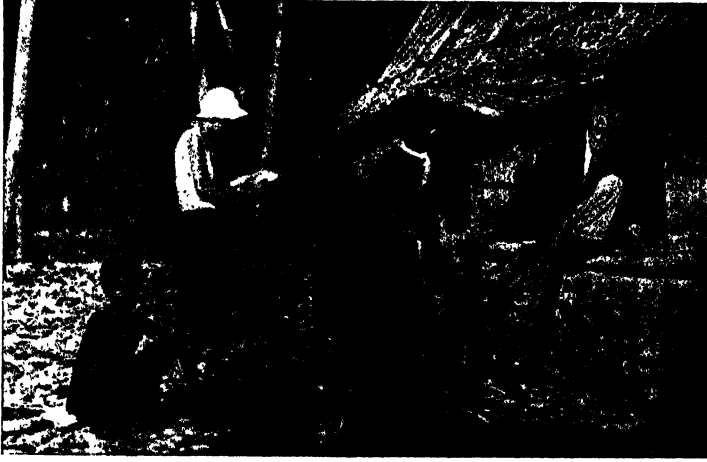
গ্রাম্য ক্লাবগৃহ—ইয়াপ্

নিজেদের আবদ্ধ করে নাই। মাইক্রোনেশিয়ায় কিন্তু এ নিষ্ঠা রক্ষা পায় নাই। তার কারণ, তার অবস্থান। মাইক্রোনেশিয়ার উত্তরে জাপান; পশ্চিমে চীন এবং ফিলিপাইন্‌স্; দক্ষিণ-পশ্চিমে বোর্নিয়ো, সেলিবিশ ও নিউ-গিনির মতো সমৃদ্ধ তিনটি দ্বীপ; সর্ব্ব-দক্ষিণে গোলোকধাঁধার মতো মেলানেশিয়া দ্বীপ; এবং দক্ষিণ-পূর্ব্বে পলিনেশিয়া। এ সব দ্বীপের সঙ্গে মাইক্রোনেশিয়া নিজেকে সম্পর্ক-চ্যুত রাখিতে পারিল না। প্রথমে ব্যবসায়-সূত্র ধরিয়া মেলামেশা; তার পর সেই সূত্র বিবাহ-নিগড়ে মিলিয়া মাইক্রোনেশিয়ানদিগকে সংযোগ-সম্পর্কে নানা রূপে গড়িয়া তোলে। তার ফলে মাইক্রোনেশিয়ায় কোনো জাতি গড়িয়া উঠিল পীতাভ মোঙ্গোলোয়ড ছাঁচে; কোনো জাতি মেলানেশিয়ানের মিষ কালো রঙে হইল কৃষ্ণবর্ণ; কোনো জাতির গঠন হইল চীনা-প্যাটার্ণের; কোনো জাতি হইল জাপানী। সঙ্গে সঙ্গে ভাষাতেও বিপ্লব ঘটিয়া গেল। চীনা, জাপানী-ফিলিপো, মেলিনেশিয়ান, মলয়, এমন কি ভারতের হিন্দুস্থানী ভাষাও এখানে সমান তেজে চলিয়াছে। এই সব ভাষা ধরিয়া মাইক্রোনেশিয়ানদের বংশ-পরিচয় আজ সহজ-লভ্য হইয়াছে।

১৫২১ খৃষ্টাব্দে পাশ্চাত্য-জগৎ হইতে মাগেলান আসেন এ-পথে। তিনি আসিয়া মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করেন। এত কাল এ সব দ্বীপের অস্তিত্ব পাশ্চাত্য জাতির অজ্ঞাত ছিল। মাগেলান আসিয়া এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া এ দ্বীপের নাম দেন লাটান সেইলাশ দ্বীপপুঞ্জ। এখানে গুয়ামা দ্বীপের অধিবাসীরা লুঠপাট করিয়া তাঁর সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লয়। মাগেলান্ কোনো মতে প্রাণ লইয়া পলাইয়া যান; এবং রাগে তিনি তখন লাটান সেইলাশ নাম বদলাইয়া এ-দ্বীপের নাম দেন লাড্রোন্‌স্ (চোরের আড্ডা)।

এ ঘটনার প্রায় এক শত বৎসর পরে স্পেন হইতে এক দল পাদরী আসিয়া এখানে আস্তানা পাতেন। স্পেন-রাজের বিধবা পত্নী মারিয়ানার নামে তাঁরা এ দ্বীপের নাম-করণ করেন।

জেশুইট্ পাদরীদের আগমনের পর হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে দুঃসাহসী বেপরোয়া স্প্যানিশ-পর্য্যটকদের যাতায়াতের মাত্রা বাড়িল। এবং এ সব দ্বীপ হইতে তারা যাহা পাইত, লইয়া গিয়া ব্যবসা বাণিজ্যের পথ-প্রসারণে উদ্যোগী হইল।

তার পর সার জর্জ্জ গ্রে নামে এক জন ইংরেজ রাজনীতিক সঙ্কল্প করেন, এই সব অরাজক বিচ্ছিন্ন দ্বীপগুলিকে কোনো মতে বৃটিশ পতাকা-তলে আনিতে পারিলে প্রচুর সমৃদ্ধি ঘটিবে। কিন্তু তাঁর এ সঙ্কল্প মনে উদয় এবং মনে বিলীন হইল। ইতিমধ্যে জাপানে ঘটিল অভ্যুদয়! জাপান এই সব দ্বীপে অধিকার-স্থাপনে উদ্যোগী হইল।

ইংরেজ এবং মার্কিন জাতি ভাবিল, আলস্য বা অবহেলার সময় আর নাই। এ দুই জাতিও তখন কোমর বাঁধিল, প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ঐ যে সব বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন দ্বীপ—ওগুলিকে লইতে হইবে।

স্পানিশ-আমেরিকান যুদ্ধের সময় মার্কিন যুদ্ধ-জাহাজ চার্লসটন গুয়ামের বন্দরে আসিয়া সেখানকার স্পানিশ-দুর্গের সামনে কামানে তোপ দাগিল। দুর্গটি ছিল প্রাচীন এবং নামেই শুধু দুর্গ। মার্কিনের তোপের উত্তরে স্পানিশ দুর্গ হইতে কামানের সাড়া জাগিল না;

ঘাসের ঘাগ্‌রা—ইয়াপ্

তার পরিবর্ত্তে বড় একখানি নৌকায় চড়িয়া দুর্গ হইতে কয়েক জন স্পানিশ-কর্ম্মচারী আসিয়া ক্ষমা চাহিয়া বলিল, দুর্গে একটিও বন্দুক বা কামান নাই। তারা বলিল, তারা জানে না যে, স্পেনের সহিত আমেরিকার যুদ্ধ বাধিয়াছে। সুতরাং চক্ষের পলকে গুয়াম আসিল আমেরিকার হাতে।

যুদ্ধ-শেষে আমেরিকা কিন্তু সমগ্র স্পানিশ-মাইক্রোনেশিয়া এবং ফিলিপাইন্‌স্ লইয়া দুশ্চিন্তায় পড়িল! এ সব দ্বীপ লইয়া বড় বড় মার্কিনী রাজনীতিকের দল রায় দিলেন, যে-দ্বীপ রক্ষা করিতে যুদ্ধ-জাহাজে অসম্ভব ব্যয়, তাহার উপর মমতা উচিত হইবে না! অথচ পাকা ফলের মতো অনায়াসে এত-বড় দ্বীপ হাতে পাইয়া ছাড়িয়া দেওয়াও মূঢ়তা! তখন রফা হইল—ফিলিপাইন্‌স্ এবং গুয়াম রাখিল আমেরিকা; এবং মাইক্রোনেশিয়ার অবশিষ্ট অংশ স্পেনকে ফিরাইয়া দেওয়া হইল।

ইতিমধ্যে জার্ম্মাণীর সঙ্গে গোপনে স্পেনের ব্যবস্থা পাকা—প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে জার্ম্মাণী খানিকটা স্থান চাহিতেছিল; সেখান হইতে প্রশান্ত মহাসাগরে শক্তি গড়িয়া তুলিবে, সেই জন্য। কাজেই আমেরিকার কাছ হইতে মাইক্রোনেশিয়ার অবশিষ্ট-অংশ ফিরিয়া পাইবা-মাত্র স্পেন এ-সব দ্বীপ পঁয়তাল্লিশ লক্ষ ডলার দামে জার্ম্মাণীকে বেচিয়া দিল।

জার্ম্মাণী তখন চকিতে কেরোলাইন্‌স্ দ্বীপপুঞ্জে কেব্‌ল্-ষ্টেশন গড়িয়া তুলিল—কুশাই দ্বীপের দিকে মার্কিনের গতি রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে।

কিন্তু জার্ম্মাণী টিঁকিল না। জাপান জার্ম্মাণীকে বিতাড়িত করিল। গত বারের মহাযুদ্ধে মিত্র-শক্তির নামে জাপান জার্ম্মাণ-মাইক্রোনেশিয়া আক্রমণ করিল।

সে যুদ্ধের অবসানে যে সন্ধি হইল, সেই সন্ধির সর্ত্তে লীগ-অফ-নেশন্‌স্ জাপানের হাতে মাইক্রোনেশিয়ান্ দ্বীপগুলিকে তুলিয়া দেয়। এমনি করিয়া মার্কিনের মাঝখানে জাপান নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিল।

শাইপানে জাপানী যাত্রী

জাপান হইতে কাঠ চলিয়াছে শাইপানে

মাইক্রোনেশিয়ার অবস্থান যেন কুঠারের মতো! এ কুঠারের ধারালো একটি প্রান্ত আছে হাওয়াইয়ের সামনে, আর এক-প্রান্ত ফিলিপাইন্‌স্, ডাচ-ইণ্ডীজ এবং অষ্ট্রেলেশিয়ার সামনে। এ কুঠারের বাঁট ধরিয়া আছে জাপান!

গত বৎসর ৭ই ডিসেম্বর তারিখে হাওয়াই দ্বীপের গায়ে জাপান এ-কুঠারের আঘাত হানিল। পূর্ব্বদিককার ধারালো প্রান্ত মার্কিন নৌ-শক্তিকে অনেকখানি জখম করিয়াছে। তার পর ও-প্রান্তে আঘাত হানিয়াছে ফিলিপাইন্‌স্ এবং ডাচ্‌-ইণ্ডীজের গায়ে।

জাপান যে এখন আমেরিকার গায়ে কুঠার হানিতে চায়, তার আভাস পাওয়া যাইতেছে। জাপান চায় হাওয়াই ফুঁড়িয়া প্রশান্ত মহাসাগরের কূলে এবং পানামা-খালে কুঠার চালাইতে।

কি করিয়া আভাস মিলে, তাহা বুঝিতে হইলে এ-কুঠারটিকে অনুশীলন করিতে হয়। জাপানের এ-কুঠার বা শক্তির সীমানা দৈর্ঘ্যে ১৮০০ মাইল। এই আঠারো শত মাইলের মধ্যে আছে মারিয়ানা; এবং এ কুঠার সরাসরি উত্তরে একেবারে সেই জাপান পর্য্যন্ত গিয়াছে। এ-লাইনে আছে বোনিন এবং ইজু দ্বীপ।

বোনিনের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক আছে। এ দ্বীপ এক দিন ইংরেজের অধিকারে ছিল; তার পর আমেরিকার হাতে যায়।

১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ ক্যাপটেন ফ্রেডরিক উইলিয়াম বীচ্ এ-দ্বীপটিকে ব্রিটিশ-রাজ তৃতীয় জর্জ্জের নামে অধিকার করিয়া ছিলেন। তবু বহু বৎসর যাবৎ আমেরিকাই ছিল এ দ্বীপের দণ্ডমুণ্ডধর। এ দ্বীপের কর্ত্তৃত্ব ছিল এক জন মার্কিনের হাতে। তাঁর নাম ছিল নাথানিয়েল সাভোরি। হাওয়াই হইতে তিনি এখানে আসেন। তাঁর সঙ্গে আসিয়াছিল এক জন ইংরেজ, এক জন দিনেমার, এক জন জেনোয়ীজ্ এবং পঁচিশ জন হাওয়াইয়ান। সাভোরি এ দ্বীপে রাজ্য পাতিয়া বসিয়াছিলেন।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে এক জন জাপানী আসিয়া এ দ্বীপে নামিল। মার্কিন কুমোডার পেরি তখন বোনিনে ষ্টেশন প্রতিষ্ঠিত করিবার কল্পনা করিয়াছেন। এ দ্বীপে কয়লার আড়ৎ খুলিলে প্রশান্ত মহাসাগর-বাহী জাহাজ-ষ্টীমারের যাতায়াতের পক্ষে বহু সুবিধা হইবে।

বন্দর-রচনা—গুয়াম্

কিন্তু কি করিয়া তা হয়? দ্বীপের মালিক ইংরেজ? না, মার্কিন? পেরির মনে সমস্যা জাগিল। মার্কিন সাভোরি তখন সে দ্বীপে রাজ্য করিতেছেন। দ্বীপের বুকে মার্কিন পতাকা—আইন-কানুনও মার্কিনী। তিনি ওয়াশিংটনে চিঠি লিখিলেন। লিখিলেন, লুচু দ্বীপে মার্কিন শাসন প্রতিষ্ঠিত করা হোক। বোনিনকে করা হোক কোলিং-ষ্টেশন। চিঠিপত্র চলিতেছে, এমন সময় জাপান ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে লুচু এবং ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ফরমোশা অধিকার করিয়া বসিল। অধিকার করিয়া তারা লুচুর নাম দিল রাইয়ুকিউ; ফরমোশার নাম দিল তাইওয়ান্।

তার পর ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বৃটেন এবং আমেরিকাকে জাপান দিল নোটিশ—"বোনিন আমাদের। বোনিন প্রথম আবিষ্কার করে এক জন জাপানী—১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে। তার নাম ছিল ওগাশাওয়ারা সাদাইয়োরি। কাজেই বোনিনের উপর জাপানের দাবী তোমাদের চেয়ে বেশী। ওগাশাওয়ারার পূর্ব্বে বৃটেন বা আমেরিকা বোনিনের নামও শোনে নাই!" এ নোটিশের পর আমেরিকা এবং বৃটেন বোনিন ছাড়িয়া দিল।

শিলা-কারু—মারিয়ানা

ইজু দ্বীপটিও ঐ কুঠারের গায়ে; মারিয়ানাও তাই। বিনা-অনুমতিতে মারিয়ানায় অপর জাতির প্রবেশ নিষেধ।

মাইক্রোনেশিয়ায় বিদেশীদের সকলে সন্দেহের চোখে দেখে। প্রশান্ত মহা-সাগরের এদিকে বিদেশী জাহাজের যাতায়াত বন্ধ। যদি কোনো বিদেশী যাত্রী জাপানী জাহাজে মাইক্রোনেশিয়ার টিকিট কিনিতে চান, তাহা হইলে সর্ব্ব-সময়ে এক উত্তর মিলিবে—জাহাজে জায়গা নাই!

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে মাইক্রোনেশিয়া জাপানের হাতে গিয়াছে, তখন হইতে এ যাবৎ দু'তিন জন মার্কিনী সাংবাদিক ভিন্ন এ-পথে অপর কোনো বিদেশী প্রবেশাধিকার পান নাই। যাঁরা গিয়াছিলেন, ক'-সপ্তাহ মাত্র তাঁদের থাকিতে দেওয়া হইয়াছিল।

এ পথে জাহাজের পাড়ি খুব নিরাপদ নয়। জলের বুকে পাহাড়-পর্ব্বত আছে—ধাক্কা লাগিয়া জাহাজ ভাঙ্গিবে! তার উপর এখানে প্রায় ঝড় ওঠে। সে ঝড়ে জাহাজকে রক্ষা করা কঠিন।

গুয়ামের পূর্ব্বোত্তরে শাইপান। এখানে আখের অনেক ক্ষেত। চিনির বড় বড় কারখানা আছে। দ্বীপটি চিনির মিষ্ট গন্ধে

গুয়ামের পূর্ব্বদিকে গুয়াম হইতে চব্বিশ মাইল দূরে রোটা। রোটার কাছে গায়ে-গায়ে সংলগ্ন বহু ছোট দ্বীপ আছে। সব দ্বীপই উর্ব্বরতা-গুণে সমৃদ্ধ। প্রত্যেকটি দ্বীপ বিচিত্র ফলে-ফুলে ভরা —যেন মায়া-কানন। স্বাস্থ্য এবং আবহাওয়া চমৎকার। এ-সব

স্পানিশ আমলের গৃহ—পোনাপে

দ্বীপে তাল-নারিকেল হইতে সুরু করিয়া প্রাচ্য জগতের কোনো ফলের অভাব নাই! কলা ও পেঁপের প্রাচুর্য্য, আম ও কমলা লেবুর বর্ণোচ্ছ্বাসে দ্বীপগুলিকে মনে হয় প্রকৃতির লীলা-কুঞ্জ! ফুলও তেমনি—বেল জুঁই চাঁপার গন্ধে দিক্ ভরিয়া আছে! ম্যাপের বিষুব-রেখার গা ঘেঁষিয়া দ্বীপগুলির অবস্থান, তবু গ্রীষ্মের

কাণ-কোঁড়ায় অঙ্গ সজ্জা

খর তাপ কোথাও নাই। সারা বছর টেম্পারেচার সমান। ৮০ ডিগ্রীর উপরে যেমন ওঠে না, তেমনি তার নীচেও নামিতে জানে না। সমুদ্রের বাতাসে স্নিগ্ধতা এখানে বারো মাস।

ঋতুর হিসাব এখানে নাই। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা বা বসন্তের বৈচিত্র্য নাই। বারো মাস এখানে বসন্তের রাজ্য। ক্ষেতে বছরের সব সময়ে শস্যের ফলন,—সমুদ্রে মাছের অভাব ঘটে না কোনো কালে। কাজেই অন্নের জন্য কাহাকেও ভাবনা-চিন্তা করিতে হয় না।

ঋতুভেদ না থাকিলেও বাতাসের গতিতে বৈচিত্র্য আছে! ছ' মাস এখানে বায়ু বহে পূর্ব্বৈয়া—বাকী ছ' মাস পশ্চিমী-বাতাস বহে।

ভরিয়া আছে সর্ব্বক্ষণ। সমুদ্রের কূলে নারিকেল গাছের সুদীর্ঘ কেয়ারি। তাছাড়া এখানে আছে কলা, ব্রেড-ফ্রুট, ও ফ্লেম্ গাছের ঘন বন। এখানে নানা জাতের ফার্ণ প্রচুর জন্মায়। শাইপানে পথ-ঘাট ভালো, ঘর-বাড়ী দোকান-পাট অসংখ্য। পথে মোটরের যেমন

গবর্ণমেণ্ট হাউস—পোনাপে

ভিড়, তেমনি ভিড় সাবেকী গরুর গাড়ীর। সভ্যতার সর্ব্ব-সরঞ্জাম-সম্পদে শাইপান সমৃদ্ধ।

শাইপানে স্পানিশ আমোলের শামোরোশ জাতির বাস। এ জাতির উদ্ভব হইয়াছে মাইক্রোনেশিয়ানের সহিত স্পানিশ-জাতির সহযোগ-সম্পর্কে। ইহাদের গায়ের বর্ণ হাল্কা পীতাভ,—ভাষায়
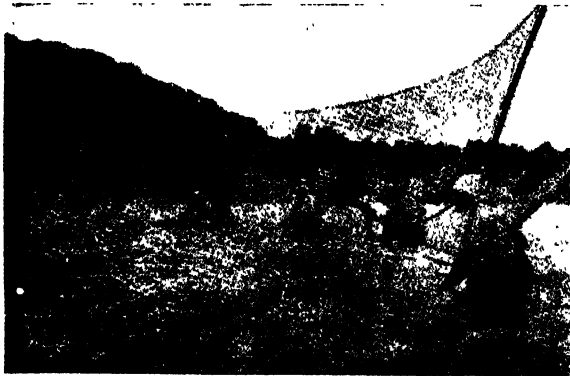
জেলেদের মাছ ধরা—কুশাই দ্বীপ

স্পানিশের আমেজ মিশানো। মেয়েরা স্কার্ট পরে, পুরুষরা সকলেই প্রায় গীটার বাজাইতে ওস্তাদ। নাচ-গান এ জাতির জীবন।

সামরিক-ঘাঁটী হিসাবে শাইপান দুরধিগম্য। মাইক্রোনেশিয়ান্ দ্বীপপুঞ্জ আগাগোড়া বহু কঠিন দুর্ভেদ্য দুর্গে সংরক্ষিত।

শাইপানের পশ্চিমে তিনিয়ান দ্বীপ। এখানেও আখের অজস্র ক্ষেত। এখানে বহু প্রাচীন মন্দিরের যে ভগ্ন-স্তূপ পড়িয়া আছে, তাহা প্রাগৈতিহাসিক জাতির শিক্ষা-সংস্কৃতির পরিচায়ক। বহু জাপানী এখানে এখন বাড়ী-ঘর করিয়াছে। দোকান-সিনেমা-প্রসাধন-বিপণী অসংখ্য—শিন্তো-মন্দিরের অভাব নাই।

বাতাসের গতি ধরিয়া সময় নির্দ্দেশ হয়—'পূব্-বাতাসের বছর'—'পশ্চিমী-বাতাসের বছর'—East-wind year এবং West-wind year.

স্পানিশদের আমোলে বোষ্টন হইতে যে-সব মার্কিনী পাদরী আসিয়া এখানে আস্তানা পাতেন, এখানকার মেয়েদের তাঁরা গাউন পরানো শেখান্। তার ফলে এখানকার মেয়েরা গাউন পরে। এখন বিদেশী পাদরীর নামগন্ধ নাই। বৌদ্ধ, শিন্তো এবং খৃষ্টধর্ম্মী

মজুর—ইয়াপ্। মাথায় চিরুণী আঁটা—স্বাধীন জাতির নিদর্শন

জাপানী-পাদরীর দল আসিয়া বিদেশী পাদরীর আসন অধিকার করিয়াছে।

জাপানী-অধিকারে আসিলেও দ্বীপগুলিতে বিচরণ করিবার সময় লোকজনের আচার-রীতিতে স্পানিশ ও জার্ম্মান্ ছাপ্ লক্ষ্য হয়। বুড়ার দল অভিবাদন জানায় স্পানিশ ভাষায়, "Buenos dias" বলিয়া; মধ্যবয়স্কেরা বলে, "guten morgen"; এবং তরুণরা বলে "ohayo"।

প্রাচীন যুগের বহু আচার-সংস্কার এখনো লোপ পায় নাই। দ্বীপগুলির অভ্যন্তর-প্রদেশে এখনো রণ নৃত্যের রেওয়াজ আছে। জাপানী আদর্শে বাক্সের প্যাটার্ণে বাঁধা ঘরের পরিবর্ত্তে অনেকে এখনো পুরাকালের খড়ে-ছাওয়া ঘরের পক্ষপাতী। কাণ বিঁধিয়া ভারী মোটা কর্ণভূষণ পরা—বিশেষ কাণের ডগা ও ধার কাটিয়া পকেটের মতো ঝুলাইয়া দেওয়া এবং সে-ঝুল অলঙ্কারের ছাঁদে কাণ ঘিরিয়া জড়াইয়া তোলা—এ বিচিত্র সজ্জা-রীতি এখনো আছে।

মাইক্রোনেশিয়ায় বিচিত্র দ্বীপগুলির চারি দিকে অসংখ্য প্রবাল-গিরি আছে। এ সব গিরি আছে সমুদ্র-গর্ভে ২০০ ফুট জলের নীচে।

কেরোলাইন-দ্বীপালীর মধ্যে ত্রুক্ দ্বীপপুঞ্জের বৈচিত্র্য অতুলনীয় এবং এটি প্রবাল-দ্বীপ। চারশ' মাইল চওড়া এক হ্রদকে ঘিরিয়া এ দ্বীপের অবস্থান। হ্রদটির বুকে আছে ২০৫টি ছোট দ্বীপ। হ্রদটি (lagoon) অতলস্পর্শী গভীর। হ্রদের জল খুব স্বচ্ছ। সেই স্বচ্ছ জল-তলে দেখিবেন নানা বর্ণের প্রবাল-পুঞ্জ। যে সব মার্কিনী পর্য্যটক ত্রুক্ দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁরা বলেন,

কাঠের বালিশে মাথা

ত্রুক্কে দেখিয়া স্বর্গের কল্পনা মনে জাগে! ভগবান্ যদি বলেন, স্বর্গে থাকিতে চাও? না, ত্রুকে থাকিতে চাও? আমি জবাব দিব, ত্রুকে (If allowed to choose between Heaven and

সদর-রাস্তা—আধুনিক পাল্লাউ

Truk in what to spend eternity, ne should say Truk)।

ত্রুকের পশ্চিমে পোনাপে দ্বীপ। আকারে এটি বড়—১৩০ বর্গ-মাইল। দ্বীপটি সমুদ্র-গর্ভ হইতে এত ঊর্দ্ধে রহিয়াছে যে, সাগর যদি কোন দিন ধ্বংস-লীলায় ক্ষেপিয়া ওঠে তো পোনাপেকে সে গ্রাস করিতে পারিবে না! এ দ্বীপটির চারিদিকে বিশাল লেগুন-হ্রদ

—তার বুকে আছে পঞ্চাশটি ছোট দ্বীপ! পোনাপেতে ছয়টি উৎকৃষ্ট বন্দর আছে; এবং সমগ্র দ্বীপটিকে রক্ষীর মতো ঘিরিয়া আছে ৮৭৬ ফুট উঁচু জোকাজ দ্বীপ!

মাইক্রোনেশিয়ার ঠিক মাঝখানে পোনাপে। পোনাপে ছিল এ-দিকে স্পানিশদের প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র। প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়া মেলানেশিয়া, পলিনেশিয়া পাপুয়া, জাপান—যেখানেই যান, পোনাপে ঘেঁষিয়া যাইতেই হইবে। এ দ্বীপ হইতে আর সব দ্বীপের নাগাল মেলে সহজে।

পোনাপের বাসিন্দারা খুব জোয়ান। তারা ভয়-ডর জানে না। ছোট ছোট ডিঙ্গি লইয়া সাগরের বুকে অনায়াসে পাড়ি দেয়। তারা এখনো প্রয়োজন ঘটিলে শড়কী হাতে পোনাপেয়ানরা পোনাপেকে কাঁপাইয়া তুলিতে ছাড়ে না! এক গ্রামের এক জন লোক যদি জাপানী-মনিবের উপর রাগে ক্ষেপে তো তার সে রাগের কথা সে শিঙ্গা বাজাইয়া পাড়ায় পাড়ায় রটনা করে। পাড়ার সে-রটনা গিয়া পৌঁছায় গ্রামে-গ্রামে এবং সব গ্রামের লোক শড়কী-হাতে রণমূর্ত্তি ধরিয়া প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে ছুটিয়া আসে!

ইহাদের খেলা রণোন্মাদ-নৃত্য। ঢাক-ঢোল বাজাইয়া এ-খেলায় এমন মাতিয়া ওঠে যে, খেলা অনেক-সময় প্রাণঘাতী হয়। আপাদ-মস্তক তেলে জব্‌জবে করিয়া রণনৃত্যে নামে; নহিলে খেলার লড়াইয়ে ক্ষতবিক্ষত হইবার আশঙ্কা প্রচুর।

চিনির কারখানা—হিনিয়ান্

পোনাপেয়ান্ রূপসীর হাতে বোনিতো মাছ

ভালো কথার বশ। তাদের সঙ্গে মানুষের মতো ব্যবহার করুন, তারা গোলাম বনিবে; কিন্তু রুক্ষ মেজাজ যদি দেখান কিম্বা রূঢ় হন, তারা হিংস্র মূর্ত্তি ধারণ করিবে! জোয়ান পোনাপেয়ান-সমাজে এক আশ্চর্য্য রীতি আছে—হাতে আগুনের ছাঁকা দিয়া নক্সা আঁকে এবং বুকে অস্ত্র বিঁধিয়া গহ্বর-রচনা করে। এ দু'টি ব্যাপারে জানাইতে চায়, তাদের ভয়-ডর নাই! এখনো তারা সাবেকী ধনুঃশর ছাড়িয়া দেয় নাই। এ ধনুঃশরে তারা বনের পশু-পক্ষী শীকার করিতে যেমন পটু, তেমনি পটু সমুদ্রের মাছ ও হাঙ্গর শীকারে। শড়কী অস্ত্রও আছে। জাপান-রাজ তাদের হাতে বন্দুক-পিস্তল দেয় নাই। কারণ, এ-জাত এখনো এমন দুরন্ত যে, পাশ হইতে চুণ খশিলে কি না করিবে, তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নাই!

শুক মাছ মুখে পুরিয়া ইহারা ঠিক গরুর জাবর-কাটার ভঙ্গীতে জাবর কাটিয়া খায়। খেলায়-ধুলায় কাজে-অবসরে মেয়েদের মুখে শুক মাছ আছে সর্ব্বক্ষণ। আমাদের দেশের তাম্বুল-বিলাসীদের মতো ঐ মাছ তারা চিবাইতেছে তো চিবাইতেছেই।

পোনাপেয়ানরা শয়ন করে কাঠের মেঝেয় কাঠের বালিশে মাথা দিয়া। বালিশ মানে, গাছ হইতে কাটিয়া-আনা কাঠের কুঁদা। জাপানীরাও কাঠের বালিশ মাথায় দেয়। সে বালিশে খানিকটা কারিগরি আছে। পোনাপেয়ানরা সে-বালিশ চায় না।

কাজ-কর্ম্ম করে মেয়েরা—পুরুষরা বসিয়া গল্প-গুজব করে, নয় খেলা-ধূলা করিয়া দিন কাটায়।

মন্দ যা-কিছু ঘটে, পোনাপেয়ানরা বলে, মেয়েদের দোষে! মিথ্যা

কথাকে ইহারা বলে, মেয়েলি-স্বভাব! উঁকি-ঝুঁকি মারাকে বলে, মেয়েলি কৌতূহল; চক্রান্তকে বলে, মেয়েলি চুকলি; পক্ষপাতিত্বকে বলে, মেয়েলি সোহাগ; রাগকে বলে, মেয়েলি কণ্ঠ! অথচ যে মেয়ে-জাতকে এত হেনস্থা, সেই মেয়ে-জাত নহিলে কাজ চলে না! বিবাহ হয় বাল্যে এবং তার প্রথা খুব অদ্ভুত। মেয়ে পছন্দ হইলে মেয়ের বাড়ীতে বরের মা আসিয়া মেয়ের পিঠে জ্যাব্‌জেবে করিয়া তেল মাখায়; ইহার নাম 'কন্যা-পছন্দ'। তার পর বরের মা আর এক দিন আসিয়া কন্যার মাথায় মস্ত ফুলের মালা চাপাইয়া দেয়—ব্যস্‌, অমনি বিবাহ-পর্ব্ব চুকিয়া গেল।

এ বিবাহে বরের সঙ্গে সম্পর্ক নাই। বিবাহ যেন বরের মায়ের সঙ্গে! বরের ঘরে আসিয়া বধূ হয় আসলে শাশুড়ীর দাসী। শাশুড়ীর সঙ্গে বধূর বনিবনা না হইলে বিবাহ ভাঙ্গিয়া যায়; বধূ ফিরিয়া যায় তার বাপের বাড়ী! কিম্বা অন্য কোনো ঘরে যদি তার ডাক পড়ে তো সেই ঘরে।

জাপানীদের মতো পোনাপেয়ান-সমাজে পূর্ব্বপুরুষের পূজা প্রচলিত। তাছাড়া ভূত, প্রেত আর দানবের ভয়ে এ জাতি সর্ব্বদা সশঙ্কিত! তাই দেবতা বলিয়া মানে ভূতপ্রেত-পিশাচকে, পাহাড়-বন-জঙ্গল-নদী-সাগরকে। মনে সর্ব্বদা ভয়, অপরাধ হইলে ঘরের দেওয়াল বা ছাদ ফুঁড়িয়া কখন্ কোন্ ভূতপ্রেত-দৈত্য আসিয়া কবিয়া সাজা দিবে! স্বর্গ সম্বন্ধেও অদ্ভুত ধারণা। এ স্বর্গ আছে বড় হ্রদের নীচে যে-সব প্রবালগিরি, সেই গিরির গোপন-গুহার মধ্যে। সেখানে লতায়-পাতায় ফলে-ফুলে অপূর্ব্ব জৌলুশ আর সেখানকার বাতাস ভরিয়া আছে নানা জাতের মাছের তেলের গন্ধে। নরকও এমনি এক প্রবাল-গিরির গুহার মধ্যে। নরকে শুধু কাদা আর পাঁক,—সে কাদায়-পাঁকে হাড়-কনকনানি শীতের চক্র! নরকের দ্বারে আছে দু'জন প্রহরিণী। তাদের এক হাতে জ্বলন্ত মশাল, আর এক হাতে ধারালো খাঁড়া!

চাষ-বাসে ইহাদের অনুরাগ কম। তবু চাষ-বাস করে দায়ে পড়িয়া। সমুদ্রে নামিয়া মাছ-ধরায় আনন্দ পায় সবচেয়ে বেশী। মাছ-ধরায় ইহাদের উৎসাহ তাই সীমাহীন।

মাইক্রোনেশিয়ার সাগরে বেনিতো নামে এক জাতের মাছ মেলে। সে মাছের ব্যবসায় জাপানীরা বহু অর্থ উপার্জ্জন করে। এ মাছ ইহারা রাঁধিয়া খায়; তাছাড়া শুকাইয়া চূর্ণ করিয়া টিনে ভরিয়া রাখে। সে-চূর্ণ স্যুপে মিশাইলে স্যুপের স্বাদ হয় না কি অমৃতের মতো! এই বোনিতোর শুষ্ক-চূর্ণ দেশ-বিদেশে চালান দিয়া জাপানীরা ব্যবসাটিকে বেশ সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে।

সাগরে হাঙ্গর-অক্টোপাশের উৎপাত খুব বেশী। কিন্তু এ সব দ্বীপের লোক হাঙ্গর-অক্টোপাশকে ভয় করে না। হাঙ্গর-অক্টোপাশ ধরে ছিপে টোপ গাঁথিয়া—ছিপ-হাতে মৎস্য-বিলাসীদের মতো অনায়াস ভঙ্গীতে!

মারিয়ানা-যাত্রী নিপ্পনীজের দল
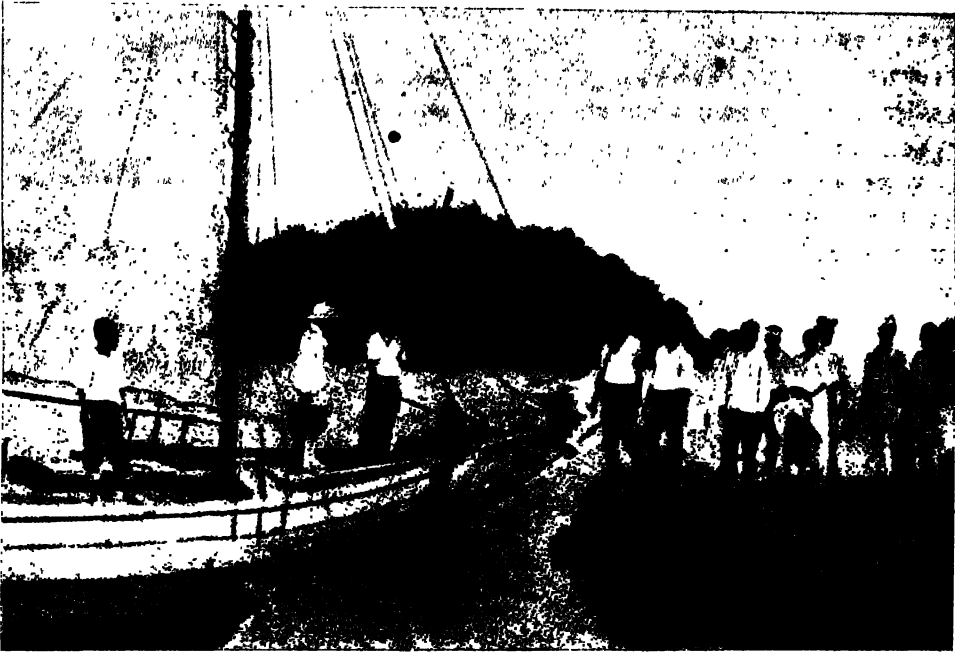
লেগুন-হ্রদের বুকে—ত্রুক্

পোনাপের উত্তরে মার্শাল দ্বীপ। এ-সব দ্বীপ প্রবাল-বৈচিত্র্যে যেমন সুন্দর, তেমনি সমৃদ্ধ। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, এখানে ছিল আগ্নেয়-গিরির সুদীর্ঘ শ্রেণী। সে-সব গিরির অগ্নিস্রাব চিরদিনের জন্ত নিবিয়াছে এবং তাহারি গায়ে প্রবাল-পুঞ্জ গড়িয়া উঠিয়াছে; লেগুনও জন্মিয়াছে অজস্র। এই সব লেগুন আজিকার এ অভিযানে জাপানীদের প্রধান ও প্রবল সহায় হইয়াছে। এই মার্শাল দ্বীপ হইতেই জাপানীরা ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর পার্ল হার্বার বিচূর্ণ করিয়াছে; এবং এ-বৎসর ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী মার্কিন যুদ্ধ-জাহাজ ও বিমান-পোত আসিয়া কাজলিন, উয়োৎজে, মালোই, লাপ এবং জালুইয়তে হানা দিয়া সফলকাম হইয়াছিল। এখান হইতে এক দিকে পানামা-খাল, আর এক দিকে হাওয়াই দ্বীপ নাগালের মধ্যে; তাই এ জায়গাটি হইল জাপান ও মার্কিন যুক্ত-রাজ্যের পক্ষে সঙ্কট-সন্ধিক্ষেত্র।

জাপানী কুঠারের আর-এক দিক গিয়া ঠেকিয়াছে ২৫০০ মাইল দূরে পালাউ দ্বীপে। পালাউ হইতে ফিলিপাইন্‌স্, ডাচ-ইণ্ডীজ এবং অষ্ট্রেলিয়া আক্রমণ জাপানীদের পক্ষে সহজ। জাপানীরা ইতিমধ্যে মানুশ্ দ্বীপের লোরেঙ্গো অধিকার করিয়াছে।

পালাউ জাপানীদের কাছে সিঙ্গাপুরের মতো! পালাউকে অভেদ্য করিয়া রাখিয়াছে এক শত দ্বীপ—কঠিন দুর্গ-প্রাচীরের মতো ঘিরিয়া। পালাউয়ে জাপানীদের বিরাট্ কর্ম্মশালা। সামরিক ও বে-সামরিক অফিসারদিগের ভিড় এবং সর্ব্বপ্রকার সামরিক সজ্জা-সরঞ্জামের মধ্যে যেন মক্ষিকা-প্রবেশের ফাঁক নাই! অসংখ্য অফিস, অসংখ্য কল-কারখানা পালাউকে জমজমাট রাখিয়াছে সর্ব্বক্ষণ! এখানকার বিমান-বন্দর, বাণিজ্য-বন্দর এবং যুদ্ধ-জাহাজের বন্দর যেমন বিরাট্ বিশাল, তেমনি সমৃদ্ধ। পালাউয়ের পূর্ব্বোত্তর কোণে ইয়াপ। ইয়াপের কাছাকাছি অতিক্ষুদ্র ক'টি দ্বীপ আছে—সেগুলি যেন ইন্দ্র-নীল মণির কুচি!

ইয়াপে অদ্ভুত রকমের দাসত্বপ্রথা আছে। দাসেরা নিজ নিজ গ্রামে বাস করে। তাদের লইয়া কেনাবেচার কারবার চলে না; এবং ইহারা কোন বিশেষ-ব্যক্তির দাসত্ব করে না। ইহারা সম্মিলিত সমাজের দাস। রাজার আদেশ ভিন্ন আর-কোন মনিবের আদেশ মানিতে বাধ্য নয়।

ইয়াপ দ্বীপটিতে বারো জন রাজা আছে। রাজারা আদি-বংশীয়। জাপান এ-দ্বীপগুলিতে জাপানী শাসন-প্রথা প্রবর্ত্তিত করে নাই; এই রাজার মারফৎ রাজ্য-শাসন চলে। রাজাদের আসন এবং দাবী বংশগত।

ইয়াপ কথার অর্থ, এখানকার লোক-জন বলে, পৃথিবীর ঠিক মাঝখান। এখানে যে কেব্‌ল্-ষ্টেশন, সেটি জাপানের বার্ত্তাবাহী কাজে সর্ব্বাগ্রণী। তার উপর ইয়াপের "নেভাল্" বন্দর সবল ও সমৃদ্ধ।

এ দ্বীপগুলি এমন যে, মনে হয়, ভগবান্ যেন জাপানের জন্তই এগুলির সৃষ্টি করিয়াছেন! এ দ্বীপগুলি যদি জাপানের হাতে থাকে, তবেই প্রশান্ত মহাসাগর শান্ত থাকিবে, উৎপাতে সে-সাগর অশান্ত হইবে না!

আমেরিকাও এ কথা স্বীকার করিতেছে। বলিতেছে, মাইক্রোনেশিয়ার উপর প্রশান্ত মহাসাগরের শান্তি নির্ভর করিতেছে। এ শান্তির চাবি-কাঠি এই মাইক্রোনেশিয়া! এবং সে-চাবি আজ জাপানীর হাতে আছে, সত্য!

গাছ বাঁচানো

ফুল-ফলের এমন অনেক গাছ আছে—চারা-অবস্থায় শীতের হিমে কিম্বা গ্রীষ্মের রৌদ্রে তাদের বাঁচানো কঠিন। এক মার্কিণ উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদ্ এই সব চারা-গাছের রক্ষা-কবচ বাহির করিয়াছেন। কবচ মানে, এ সব চারা-গাছের গা ঘিরিয়া ঐ চারা জড়াইয়া ঘন করিয়া খড় বাঁধিয়া দিন। গ্রীষ্মকালে সকালে জলধারা-বর্ষণ করিবেন; শীতের দিনে

চারা-গাছে খড়

জল দিবেন না। কদাচ বেশী করিয়া জল দিবেন না; দিলে সে-খড় পচিয়া যাইতে পারে, তাহাতে গাছের ক্ষতির আশঙ্কা আছে। খড় যদি রৌদ্রে শুকাইয়া জীর্ণ হয়, তাহা হইলে তার গায়ে আবার নূতন খড়ের আঁটি বাঁধিয়া দিবেন। এ প্রক্রিয়ায় চারা বাঁচিবে এবং তার বাড়ের অসুবিধা ঘটিবে না।

কামানের শক্তি

যে-জাতির কামান-বারুদ যত বেশী এবং জোরালো, সেই জাতির পক্ষেই শুধু যুদ্ধ-জয়ের সম্ভাবনা। এই কামান-বারুদ এবং অমোঘ অস্ত্রশস্ত্রাদি যত শীঘ্র এবং যত অনায়াসে বিপক্ষ-দলনে পাঠানো যাইবে, জয়ের আশা ততই অধিক হইবে। এ যুগের এ যুদ্ধে অস্ত্র-শস্ত্রাদির ক্ষিপ্র জোগানের উপর যুদ্ধ-রত জাতির আত্মরক্ষা এবং বিজয় নির্ভর করিতেছে। প্রচুর রশদ এবং তার দ্রুত জোগান—এ বিষয়ে মার্কিন জাতি আজ অসাধ্য-সাধন করিতেছে। মার্কিনের অতিকায় কামান আজ এমন শক্তিমান্ যে, তার মুখে রাজ্যপাট নিমেষে জ্বলিয়া ছাই হইয়া যায়! এ কামান যে-গাড়ীতে করিয়া বহা হয়, সে-গাড়ীতে টায়ার আছে দশখানি করিয়া। বেশ ভারী মোটা মজবুত টায়ার। এ-গাড়ী চলে ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে। কামানের সাহায্য ভিন্ন পদাতিক সেনার পক্ষে যুদ্ধে নামা বাতুলতা! প্রত্যেক মার্কিন পদাতিক-দলে থাকে ৩১০খানি করিয়া ট্যাঙ্ক; তার সঙ্গে অতিকায় কামান ৮০; তাছাড়া অসংখ্য কামান-

অতিকায় গাড়ী
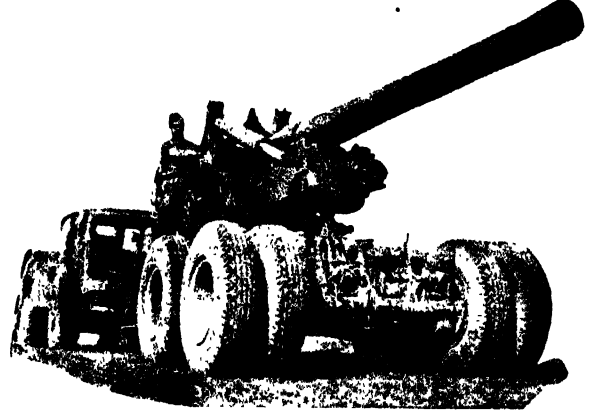
বন্দুক প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র যাহা থাকে, তাহা অমোঘ! ইহার উপর বিমান-পোত এবং বিপক্ষের ট্যাঙ্ক ধ্বংস করিবার জন্য ডেষ্ট্রয়ারও থাকে অসংখ্য! এমন বিরাট্ বাহিনীর কল্পনা মানুষ কখনো করে নাই! এ শক্তির সাফল্য সম্বন্ধে সংশয় থাকিতে পারে কি?

জলমগ্ন শী-প্লেন

যুদ্ধে বহু শী-প্লেন জলমগ্ন হইতেছে। সে জল-সমাধি হইতে সেগুলির উদ্ধার-সাধন ঘটিতেছে এক অভিনব কৌশলে। মজবুত লৌহ দিয়া দীর্ঘ আংটা তৈয়ারী হইয়াছে। সেই আংটা জলগর্ভে ফেলিয়া

আংটা দিয়া তোলা

তাহার সাহায্যে আধ ঘণ্টার মধ্যে জলমগ্ন শী-প্লেনকে টানিয়া উপরে তোলা যায়। এ আংটার কব্জা এমন কৌশলে সন্নিবিষ্ট যে, যে-কোনো দিকে এবং যে-কোনো ভাবে তাহা নিয়ন্ত্রিত করা চলে।

ডাল-ছাঁটা রণপা

গাছপালার স্বাস্থ্যোন্নতি-বিধানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া মার্কিন উদ্ভিদ-তত্ত্বজ্ঞেরা গাছ-পালার অতি-বাড় ছাঁটিয়া, গাছের শুষ্ক বা অপ্রয়োজনীয় ডালপালা কাটিয়া বাদ দিবার পরামর্শ দিতেছেন। যে সব গাছ-পালা খুব দীর্ঘ, সে সব গাছের অপ্রয়োজনীয় ডালপালা
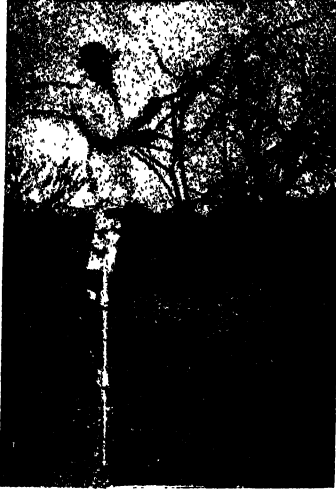
উঁচু ডাল ছাঁটা

কাটিবার জন্য সহজ উপায়ও বাহির হইয়াছে। এলুমিনিয়ামের সুদীর্ঘ রণপা তৈয়ারী করিয়া তাহাতে দাঁড়াইয়া অনায়াসে উঁচু ডালপালা কাটা যায়। যিনি কাটিবেন, এ রণপায় তিনি নিরাপদে দাঁড়াইবেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। রণপায়ে এমন ভাবে থাক্ সংলগ্ন আছে যে, প্রয়োজন বুঝিয়া যে-কোনো ভাবে রণপাকে দীর্ঘ বা খাটো করা চলে। থাকের সঙ্গে যে পা-দানি বা ফুটপ্লেট আছে, জুতা-পায়ে সে পাদানিতে দাঁড়ানো চলে স্বচ্ছন্দ নিরাপদ ভাবে। বড় সাইজের রণপাগুলির ওজন সাড়ে চার সের পাঁচ সের মাত্র।

পঙ্ক-কর্দ্দম-দলনী

আমেরিকার রণ-বিভাগ এক অপূর্ব্ব মোটর-গাড়ী তৈয়ারী করিয়াছে যে সুগভীর পঙ্ক-কর্দ্দমে হাঁস এবং ব্যাঙ্ মাত্র বিচরণ করিতে পারে, এমন

পঙ্ক-পথের গাড়ী

গভীর পঙ্ক-কর্দ্দম কাটিয়া এ গাড়ী অনায়াসে তার পথ-যাত্রা-সম্পাদনে সমর্থ। এ গাড়ীতে চার হইতে দশখানি মোটা টায়ার সংলগ্ন আছে। টায়ারগুলির আয়তন ৩২" ২৪"। অতলস্পর্শী পঙ্ক-কর্দ্দম কাটিয়া পাড়ি-সম্পাদনে এ গাড়ীর এতটুকু বাধে না। এ গাড়ীর গীয়ার এবং এ্যাক্সলও বিশেষ ভাবে নির্ম্মিত বলিয়া ফৌজ এবং তাদের কামান-বন্দুক ও রশদ বহিয়া পঙ্ক-কর্দ্দমে এ গাড়ী অনায়াসে চলিতে পারে!

শক্তিমান্ বমার

এ যুদ্ধে বড় ভারী বমারের চেয়ে ছোট হাল্কা বমারের কার্য্যকারিতা অনেক বেশী। ছোট বমার যেমন দ্রুত-আক্রমণে সমর্থ, তেমনি তাড়া খাইলে চকিতে পলায়ন করিতে পারে। মার্কিন রণবিভাগ এই ছোট হাল্কা বমার তৈয়ারী করিতেছে অজস্র সংখ্যায়। এ-সব বমার বিপক্ষ-গণ্ডীর মধ্যে চকিতে আসিয়া হানা দেয়। এক-একখানি বমারের ওজন সাড়ে ন'টন—দু'টি করিয়া এঞ্জিন সংযুক্ত থাকে। বোমা

প্যারাশুট্ বোমা

ফেলিতে এ বমারের যেমন তৎপরতা, তেমনি শক্তি যুদ্ধ করিতে। এ বমার চলে ঘণ্টায় ৩০০ মাইল বেগে। অনেকগুলি করিয়া বমার অভিযানে বাহির হয় এবং প্রত্যেকটি দলের সঙ্গে থাকে রক্ষি-বিমানপোত। এ বমারের গতি এত ক্ষিপ্র যে, বহু প্রয়াসেও তার ফটো তোলা যায় না। মেশিন-গানের সাধ্য নাই, এ বমারকে আঘাত করিবে! অতি নিঃশব্দে এ বমার আসিয়া হানা দেয়। এক শত গজের মধ্যে আসিবার পূর্ব্বে বিপক্ষ তার সন্ধান পায় না। সন্ধান পাইয়া তার দিকে মেসিন-গান তাগ্ করিতে না করিতে এ সব বমার বোমা ফেলিয়া চলিয়া যায়। এক হাজার গজ পরিমিত স্থান ব্যাপিয়া প্রতি দশ গজ অন্তর একটি করিয়া বোমা নিক্ষেপ করিয়া যায়। তাড়া করিলে প্যারাশুট-বোমা ফেলে। প্যারাশুটের এ সব বোমা একটু বিলম্বে ফাটে। প্যারাশুট ফেলিয়া বমারগুলির অদৃশ্য হইয়া যাওয়ার আধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা, কখনো চব্বিশ ঘণ্টা পরে ফাটে।

জলের বুকে ফাঁদ

শত্রুর আক্রমণ হইতে বন্দরাদি-রক্ষার জন্য মার্কিন রণতরী-বিভাগ ব্যবস্থা করিয়াছেন,—বারোখানি বোট বন্দরের মুখে রাখা হয়। সেই সব বোট হইতে শক্ত ইস্পাতের তারের তৈয়ারী

ফাঁদ-পাতা বোট

মজবুত জাল বন্দরের মুখ হইতে জলের বুকে বহু দূর পর্য্যন্ত নিক্ষিপ্ত হয়। এ জাল ফুঁড়িয়া কাটিয়া অতি-বড় দুর্দ্ধর্ষ জাহাজের পক্ষেও বন্দরে প্রবেশ-লাভ প্রায় অসম্ভব। স্বপক্ষের জাহাজকে বন্দরে আনিবার সময় বোট হইতে পনেরো মিনিট সময়ের মধ্যে ফাঁদ গুটাইয়া লওয়া যায়। বিস্তীর্ণ প্রসারে ফাঁদ ফেলিতেও পনেরো মিনিটের বেশী সময় লাগে না। এ ফাঁদ যেমন জটিল, তেমনি মজবুত; কাজেই এ ফাঁদ লঙ্ঘন করা বেশ কঠিন। এ ফাঁদে পড়িলে সশস্ত্র রণতরী এমন ভাবে বন্দী হয় যে, তার মুক্তির উপায় থাকে না।

এক্স্-রে ছবির যন্ত্র

মার্কিন বিশেষজ্ঞেরা বহু গবেষণায় যে এক্স-রে-যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহাতে এক সেকেণ্ডের শততম সময়ে মানুষের বক্ষ-কন্দরের এক্স-রে ফটো তোলা সম্ভব হইয়াছে। যাঁহার বক্ষ পরীক্ষা করিতে হইবে, তাঁহাকে একটি ফ্রেমে দাঁড় করাইয়া যন্ত্রের বোতাম টিপিয়া দিলেই এক্স-রে টিউব-সংযোগে বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চালিত হয়; সে প্রবাহে যে তাপের সঞ্চার ঘটে, তাহারি ফলে বক্ষের যত-কিছু স্পন্দনের রেখা ক্যামেরার প্লেটে সুস্পষ্ট মুদ্রিত হয়। এই সব রেখা দেখিয়া বক্ষের অতি-সূক্ষ্ম খুঁতটুকুও বিশেষজ্ঞেরা দিব্যদৃষ্টিতে দেখিয়া বুঝিতে পারেন।
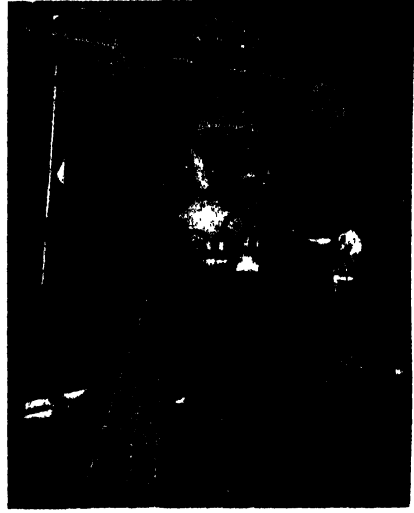
বৈদ্যুতিক টিউবে বুকের ছবি

ফৌজের মুখোশ

মার্কিন নৌ-বিভাগের সৈনিককে বিষাক্ত বাষ্পে মরিতে বা অস্বাস্থ্য ভোগ করিতে না হয়, সে জন্য পশমী ফেল্টের তৈয়ারী

নিরাপদ মুখোশ

মুখোশের ব্যবস্থা হইয়াছে। এ মুখোশে মুখে বা গলায় কিম্বা নাকে এতটুকু চাপ পড়ে না। গ্রীষ্মের তাপ, বৃষ্টি, ঝড়—এ সবের দরুণ এতটুকু অস্বাস্থ্য বা কষ্ট সহিতে হয় না। মুখ-বিবরের কাছে স্বতন্ত্র আবরণ আছে—সে আবরণ খুলিয়া সহজে পান-ভোজন এবং ধূম্রসেবন করা চলে।

হারা ধন

যাহা মোর ছিল না'ক পাই যবে তাই,
আনন্দের তুলি কলরব।
হারাইয়া যাওয়া ধন যবে ফিরে পাই,
কহি তবে মহা মহোৎসব।

শ্রীকালিদাস রায়।

অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-সমস্যা ও বণ্টন-বিভ্রাট

ভারতে খাদ্যসমস্যা সঙ্কট-অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে। সেই জন্য কিছু দিন হইতে সরকার এ দেশে অধিক খাদ্য-শস্য উৎপাদনের জন্য একটি বিভাগ খুলিয়াছেন। ঐ বিভাগের নাম হইয়াছে উৎপাদন বিভাগ।

(১) ভবিষ্যতে কি পরিমাণে খাদ্যশস্যের প্রয়োজন হইবে, তাহার অনুসন্ধান এবং অনুমান। (২) তদনুসারে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া, উহা সঙ্গতরূপে বণ্টন করিবার পরিকল্পনাও এই বিভাগ করিয়া দিবেন।

এই উভয় উদ্দেশ্য হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, একাধারে খাদ্যশস্যের উৎপাদন এবং বণ্টন এই দুইটি কার্য্যই এই বিভাগ দ্বারা সাধিত হইবে। গত অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যভাগ হইতেই এই বিভাগ কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। এইরূপ একটি বিভাগের যে একান্ত প্রয়োজন ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই বিভাগ যদি সুচারুরূপে কার্য্য-পরিচালনা করেন, তাহা হইলে এই সঙ্কট-সময়ে এ দেশের লোকের যে প্রভূত উপকার সাধিত হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। কারণ, কিছু দিন হইতে খাদ্যশস্যের মূল্য যেন আগুন হইয়া উঠিয়াছে! শীঘ্রই ইহার প্রতিকার হওয়া আবশ্যক। কলিকাতা এবং বড় বড় পল্লীগ্রাম ভিন্ন অন্যত্র খাদ্যশস্য অগ্নিমূল্যেও পাওয়া যাইতেছে না। বিভাগটি আজ প্রায় এক-মাস-কাল কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু পণ্যের মূল্যে ইহার কার্য্য-নৈপুণ্য বিশেষ ভাবে লক্ষিত হইতেছে না। ছোট ছোট পল্লীগ্রাম-গুলিতে চাউল, আটা, ময়দা, চিনি প্রভৃতির মূল্যই সমধিক দেখা যাইতেছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, এক দিকে যেমন খাদ্যশস্যের অভাব ঘটিয়াছে,—অন্য দিকে তেমনই ব্যবসায়ীদিগের অত্যাচারে লোক অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। কতকগুলি পল্লীগ্রামে এবং অধিকাংশ ছোট গ্রামে ঐ সকল দ্রব্য অধিক মূল্যে বিকাইতেছে,—কারণ, তথায় পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রিত করিবার কেহই নাই। ফলে তথায় অতিলোভী ব্যবসায়ীমাত্রই নিরঙ্কুশ। সংবাদপত্রে হাটলুঠ—দোকানলুঠের যে সকল সংবাদ মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হইতেছে, তাহা যে এই খাদ্য-সঙ্কটের ফল, এরূপ অনুমান নিশ্চয়ই করা যায়।

এ দেশের অধিকাংশ লোকই অশিক্ষিত। কাজেই বিলাতের ন্যায় যে সকল দেশে শিক্ষিত ব্যক্তির বাস, সেখানে খাদ্যদ্রব্যের অভাব নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সকল কার্য্যপদ্ধতি সফল হইয়াছে,—এ দেশে সেই সকল পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইলে তাহা যে সাফল্য লাভ করিবে, এরূপ আশা করা যায় না। এ-কথা সত্য যে, খাদ্যশস্যের উৎপাদন (production) এবং বণ্টন (consumption) উভয় কার্য্যই বিশেষ বিচার-বুদ্ধি সহকারে নিয়ন্ত্রিত করিলে (rationalize) তদ্দ্বারা বিশেষ সুফল লাভ করা যাইবে। কিন্তু ঐ পদ্ধতি সর্ব্বত্র একই ভাবে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না। দেশ, কাল, এবং পাত্রভেদে তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হয়। দেশের লোকের চিরাচরিত অভ্যাস, তাহাদের মনোবৃত্তি ও জ্ঞান, আর্থিক অবস্থা প্রভৃতির উপরই উহার সাফল্য বিশেষ ভাবে নির্ভর করে। বিলাতে খাদ্য-দ্রব্যের বণ্টন-নিয়ন্ত্রণের জন্য তথাকার সরকার কুপন বা ছাড় বাহির করিয়াছেন, সে জন্য সাধারণের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক খাদ্য প্রাপ্তির সুবিধা হইয়াছে,—কিন্তু আমাদের দেশে উহা প্রবর্ত্তিত করিলে সকল স্থানে সুবিধা না হইতেও পারে। এ দেশের বিভিন্ন সহরে ও পল্লীগ্রামে যদি বহু সরকারী দোকান খোলা হয়, এবং সরকারের লাইসেন্স প্রাপ্ত দোকানের মারফতে খাদ্যদ্রব্য (চাউল, আটা, ময়দা, সর্ষপ তৈল, ঘৃত, চিনি প্রভৃতি) বিক্রয়ের সুব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে হয়ত সুবিধা হইতে পারে।

বাঙ্গালা সরকার সম্প্রতি কলিকাতায় ২১টি বাজারে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে চাউল প্রভৃতি বিক্রয়ের দোকান খুলিয়াছেন বলিয়া ঘোষণা বাহির করিয়াছেন; তৎপূর্ব্বেও বিভিন্ন অঞ্চলে ১৩ পয়সা সের-দরে দুই সের পর্য্যন্ত মোটা চাউল ও ।৶০ সের দরে আধ সের করিয়া চিনি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু সূর্য্যোদয় হইতে বেলা ১১টা এবং বেলা ৩টা হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত দারুণ ভীড়ের ভিতর শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দাঁড়াইয়াও সপ্তাহে দুই দিনের বেশী চাউল বা চিনি সংগ্রহ করা কোন ভাগ্যবানের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। এরূপ বিড়ম্বনা ভোগের পর রিক্তহস্তে ফিরিয়া তাঁহাদের অর্দ্ধাশনের পর অনশনের অভ্যাস করিতে হইয়াছে; নচেৎ 'আঁধার-বাজারের' সহায়তায় ১৪৷১৫৲ মণ দরে মোটা চাউল বা ১৬৲ হইতে ১৮৲ মণ দরে মাঝারি বা আতপ চাউল সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। ইহা কি বাঙ্গালায় আকাল—দুর্ভিক্ষ—মন্বন্তর যে কোন নামে অভিহিত হইবার যোগ্য নহে? কলিকাতা করপোরেশনের ধাঙ্গড় ও শ্রমিকগণ ধর্ম্মঘট করিয়া সম্প্রতি একযোগে যুদ্ধপূর্ব্ব-মূল্যে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের দাবী জানাইয়াছে; কিন্তু ভদ্র গৃহস্থগণের নিশ্চয়ই সেরূপ দাবী করিবার সঙ্গত অধিকার থাকিতে পারে না।

সিঙ্গাপুর-প্রত্যাগত কোন বিশিষ্ট বাঙ্গালীর নিকট সম্প্রতি শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, জাপানী আক্রমণ সময়ে ও তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে সরকারী কর্ম্মচারিগণ সিঙ্গাপুরে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য এরূপ কঠোর ভাবে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন যে, সেখানে তাঁহাদের বিন্দুমাত্র অসুবিধা ভোগ বা কোন খাদ্যদ্রব্যের অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় নাই।

চাউলের মূল্যবৃদ্ধির ফলে এ দেশের লোকের ঘোর কষ্ট হইতেছে। কারণ, চাউলই বাঙ্গালার প্রধান খাদ্য। এক এক স্থানের ব্যবসায়ীরা দলবদ্ধ হইয়া চাউলের মূল্য বৃদ্ধি করিতেছেন। দেশের লোকের ধারণা, দেশে চাউলের অভাব হইয়াছে। কিন্তু সরকার-পক্ষ এবং য়ুরোপীয় সওদাগরদিগের মুখপত্র 'ক্যাপিটাল' বলিতেছেন, দেশে চাউলের অভাব হয় নাই। কিন্তু ব্রহ্মদেশ শত্রুকবলে পতিত হইবার পূর্ব্বে ব্রহ্ম হইতে প্রভূত পরিমাণে চাউল বাঙ্গালায় আমদানী হইত। ঐ চাউল ত এ দেশেই খরচ হইত। এখন সে চাউল আসিতেছে না। সুতরাং সে চাউলের অভাব অবশ্যম্ভাবী। এরূপ অবস্থায় বাজারে বা দেশে যথেষ্ট চাউল আছে, এ কথা বলিলে লোক শুনিবে কেন? তবে কোন কোন মহকুমার সদর সহরে ম্যাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটরা চাউলের মূল্য হ্রাস করিয়া দিতেছেন। 'ক্যাপিটাল' লিখিয়াছেন যে, চাউলের মূল্য মণ-করা ৪ টাকা ৬ আনা সাড়ে চারি পাই হইতে ১০ টাকা পৌণে ৮ আনায় দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু অনেক স্থানে ঐ মূল্যে চাউল পাওয়া যাইতেছে না। কলিকাতায় চাউলের পাইকারী দর শতকরা ১৩৮ টাকা হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে হইতে পারে, কিন্তু মফস্বলে

ঐ দরে পাওয়া সম্ভব নহে। সম্প্রতি কলিকাতায় চাউলের মূল্য কিছু কমিলেও মোটা, মাঝারি ও আতপ এবং ভাল চাউল নিয়ন্ত্রিত মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে বিকাইতেছে।

বাঙ্গালায় প্রতি বৎসরে সমান ধান জন্মে না। প্রতি বৎসর সমপরিমাণ ক্ষেত্রেও ধান উৎপাদন করা হয় না। তবে মোটের উপর যে বার প্রচুর ধান হয়, সে বার বাঙ্গালায় ২০ কোটি ৩০ লক্ষ মণ ধান জন্মে। ইহার এক শত ভাগের অন্ততঃ ১ ভাগ চেলো পোকায় ও অন্যান্য ক্ষুদ্র কীটে নষ্ট করে। ইন্দুরের দৌরাত্ম্যও বড় কম নহে। তাহার পর আর্দ্রতায় বা স্যাঁতায় অনেক চাউল খারাপ হইয়া যায়। এই সকল বাদ দিলে বাঙ্গালায় ২০ কোটি মণের অধিক চাউল মানুষের ভোগে আসে না। কিন্তু বৃটিশ-শাসিত বাঙ্গালায় ৬ কোটি ৩ লক্ষ লোকের বাস। উহারা গড়ে বৎসরে প্রতি জন ৬ মণ করিয়া চাউল খায়, তাহা হইলে বাঙ্গালার প্রয়োজন ৩৬ কোটি মণ চাউলের। বাঙ্গালার চাউলে এই জন্য বাঙ্গালীর অভাব পূর্ণ হইত না বলিয়াই বাঙ্গালীকে ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আমদানী করিতে হইত; তথাপি অনেক লোক অর্দ্ধাশনে দিন কাটাইত। যদি গড়ে প্রত্যেক মানুষের জন্য বার্ষিক ৫ মণ চাউল প্রয়োজন, ইহা ধরা যায়, তাহা হইলেও বাঙ্গালায় বার্ষিক ৩০ কোটি ১৫ লক্ষ মণ চাউলের একান্তই প্রয়োজন। এ বার শুনিতেছি, ভারতে ১০ লক্ষ একর জমিতে ধানের চাষ অল্প হইয়াছে। তন্মধ্যে বাঙ্গালায় ধানের চাষ সর্ব্বাপেক্ষা অল্প জমিতেই হইয়াছে। তাহার উপর ঝড়ে, জলোচ্ছ্বাসে অনেক চাউল ও শস্যক্ষেত্র নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থায় বাঙ্গালায় আগামী বার চাউল অল্প জন্মিবে না, এরূপ আশা সরকার কি করিয়া করিতে পারেন? নূতন আউস চাউলের মূল্যই যখন কলিকাতার সন্নিহিত অঞ্চলে ১১ টাকা, ১২ টাকা মণের কম পাওয়া যাইতেছে না, পুরাতন চাউল ১৪ টাকা হইতে ১৬ টাকা, এমন কি ১৭ টাকা পর্য্যন্ত মণ বিকাইতেছে, তখন চাউলের অভাব নাই কি করিয়া বলা যাইতে পারে? আটা, ময়দা, শুজি, যবের ছাতু প্রভৃতির খুচরা দর কম হইলেও লোক অনশন—অর্দ্ধাশন হইতে রক্ষা পাইতে পারিত।

তাহার পর চিনি। চিনির নিয়ন্ত্রিত মূল্য ১৩ টাকা হইতে ১৪ টাকা মণ। কিন্তু ঐ দরে কুত্রাপি চিনি পাওয়া যায় না। সরকার কলিকাতায় কয়েকটি দোকানে ।৵০ সের দরে আধ সের করিয়া চিনি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন বটে, কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভীড়ে দাঁড়াইয়া বিড়ম্বনা ভোগ করিয়া অবশেষে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসা সম্ভবপর নহে। কাজেই 'আঁধার বাজারের' সাহায্যে অধিক দরে চিনি কিনিয়া সন্তুষ্ট হইতে হয়। গুড়ের দরই মফঃস্বলে মণ-করা ১৫ টাকার অধিক। এরূপ অবস্থায় সরকারের চিনির নির্দ্দিষ্ট মূল্য নিতান্তই হাস্যজনক। ব্যাপার দেখিয়া বঙ্গীয় চিনির কল-সম্মেলন কলিকাতায় সভা করিয়া ইহার প্রতিকার না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা কল বন্ধ রাখিবেন স্থির করিয়াছেন। সরকারের নিয়ন্ত্রিত মূল্যে চিনি বিক্রয় করিতে হইলে গুড়ের মূল্য ১০ টাকা মণের অধিক হওয়া কোন মতেই সঙ্গত হয় না। বিহার প্রদেশে বহু চিনির কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেখান হইতে বাঙ্গালায় যথেষ্ট চিনি আসিবে বলিয়া সরকার আশ্বাস দিয়াছিলেন, কিন্তু মাল-গাড়ীর অভাবে এখন তাহা সম্ভব হইতেছে না।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, Bengal Industrial Servey Committee এ সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার জন্য একটি পরিকল্পনা পাঠাইয়াছেন। তাঁহারা এক প্রাদেশিক শর্করা-সমিতি গঠন করিতে বলিয়াছেন। সম্প্রতি শুনা যাইতেছে যে, ডিরেকটোরেট অফ সিভিল সাপ্লাইস কলিকাতা ও বাঙ্গালার জিলায় জিলায় চিনি সরবরাহের ব্যবস্থা করিতেছেন। চিনি সস্তা হইলেই গুড় সস্তা হইবে। আমাদের বিশ্বাস, বর্ত্তমান সময়ে গুড়ের দর অত্যন্ত অধিক হইয়াছে। গুড়-বিক্রেতারা এই অসময়ে ফাট্‌কাবাজী আরম্ভ করিয়াছে। এখন সরকারের এই ব্যবস্থা কতটা সুফল প্রদান করিবে, তাহা বুঝা যাইতেছে না। এ পর্য্যন্ত সরকার মূল্যনিয়ন্ত্রণের যত ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার একটিও সুফল প্রদান করে নাই; বরং বিপরীত ফলই হইয়াছে। এদিকে দেশের লোকের প্রাণান্ত হইতে বসিয়াছে। পণ্যমূল্যের একটা স্থিরতা নাই। সুবিধা পাইলেই যে যেরূপ ইচ্ছা করিতেছে, সে তাহার পণ্যের সেই মূল্য হাঁকিতেছে।

এই নিদারুণ দুর্গতির দিনে মফঃস্বলবাসীদিগের যে কত দূর কষ্ট হইয়াছে, তাহা সহরের লোকের ধারণার অতীত। ইতিপূর্ব্বে পণ্যের মূল্য কখনই এত বৃদ্ধি পায় নাই। মফঃস্বলেই দরিদ্র লোকের বাস, ইহা সরকার পক্ষের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। কয়লার অভাবে লোকের কষ্টের এক-শেষ হইয়াছে। গাড়ীর অভাবে কয়লা আসিতেছে না। মফঃস্বলে সরিষার তৈল পাঁচ সিকা দেড় টাকা সের হিসাবে বিক্রয় হইতেছে। অথচ কলিকাতায় দেখা যাইতেছে, সরিষার তৈলের পাইকারী দর ৩০৲—৩৫৲ টাকা মণ। ময়দা ২৫৲ মণ ৸০ আনা সের, আটা ২২৲ মণ ৷৵০ সের, কেরসিন ৷৵০–৷০ বোতল, রেড়ীর তেল ১৷০—১৷০ সের, ছাতু ৷৵০ সের, মুড়ি ৸০ সের, একটি দেশলাই ছয় পয়সা! মফঃস্বলে বিক্রেতারা এই হুজুগে দলবদ্ধ হইয়া দর যত ইচ্ছা তত বাড়াইতেছে। ইহার প্রতিকার করা অবিলম্বে কর্ত্তব্য। নতুবা শেষে অবস্থা বড়ই সঙ্কটপূর্ণ হইবে।

আমাদের মনে হয়, সরকার যদি প্রত্যেক থানায়, ফাঁড়িতে, বাজারে ও দোকানে নিত্য-প্রয়োজনীয় খাদ্যের মূল্য-তালিকা মোটা-মোটা অক্ষরে ছাপাইয়া টাঙ্গাইয়া রাখেন, তাহা হইলে ভাল হয়। অথচ সেই দর ন্যায়সঙ্গত হওয়া চাই। গুড়ের দর যখন ১৫—১৬ টাকা, তখন চিনির দর ১৩ টাকা লিখিয়া হাস্যভাজন হইলে চলিবে না। যাহারা খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করে, তাহারা অধিক দর লইবার লোভে বলে, "আমরা আর চাউল প্রভৃতি বিক্রয় করি না,"—কিন্তু অধিক মূল্য দিতে সম্মত হইলে তখন চাউল দিয়া থাকে। ইহারা খরিদ্দারদিগের নিকট হইতে দাম লইয়া রসিদ দেয় না। খরিদ্দারও দোকানদারকে অসন্তুষ্ট করিতে পারে না। জিনিষের স্বচ্ছলতা থাকিলে লোকের এত কষ্ট হইত না।

খাদ্যশস্য ভিন্ন অতি-প্রয়োজনীয় দ্রব্যও নিতান্ত দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে। অন্নের পরই বস্ত্রের প্রয়োজন অসাধারণ। ভারত সরকারের রাজস্ব-সচিবই বলিয়াছেন যে, কয়েক মাসের মধ্যে বস্ত্রোৎপাদনের মূল্য বা খরচা দ্বিগুণ হইয়াছে। Textile Advisory Panel ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় প্রস্তুত করিবার পরিকল্পনার সমর্থন করিয়াছিলেন। যান-বাহনের খরচা-নির্ব্বিশেষে ভারতের সর্ব্বত্রই ইহা একই দরে বিক্রয় করা হইবে বলিয়া আশ্বাসও দিয়াছিলেন। তবে

তিন মাস অন্তর ইহার মূল্য পুনরায় ধার্য্য করা হইবে। তিন প্রকার ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ প্রস্তুত করা হইবে। প্রথম জামার কাপড়, দ্বিতীয় ধুতি এবং তৃতীয় শাড়ী। গরীবদিগের ব্যবহারের জন্যই এই কাপড় প্রস্তুত করা হইতেছে। ইহার মূল্য সাধারণ বস্ত্র প্রস্তুতের খরচা অপেক্ষা শতকরা ৩৫ টাকা হইতে ৪০ টাকা হারে কম হইবে। এই সব সিদ্ধান্ত হইয়া—এজেণ্টগণের নাম শীঘ্রই বিঘোষিত হইবে—পূজার পূর্ব্বেই ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় বাজারে আসিবে বলিয়া প্রচারিত হইয়াছিল; কিন্তু বহু-প্রত্যাশিত ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড়ের দেখা মিলে নাই। এদিকে অর্থাভাবে এবং বস্ত্রাভাবে দেশের গরীব এবং অল্পবিত্ত ভদ্রশ্রেণী প্রায় দিগম্বর হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। পক্ষান্তরে, মিলগুলি সমস্তই সরকারের সামরিক বিভাগের জন্য বস্ত্র প্রস্তুত করিবার জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছে। সামরিক কার্য্যের জন্য মাল সরবরাহ করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন, তাহা আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু দেশের লোক ত আর দিগম্বর হইয়া থাকিতে পারে না! শুনিতে পাইতেছি যে, কেবল মাত্র বিদেশস্থ ভারতীয় সৈন্যদিগের জন্য ভারতীয় কলগুলিতে কাপড় প্রস্তুত হইতেছে না; প্রতি মাসে প্রায় ২০ কোটি টাকার কাপড়ের বায়না দেওয়া হইতেছে। প্রকাশ, ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের জুন মাস পর্য্যন্ত সরকার ভারতীয় কলগুলি হইতে ১২০ কোটি টাকার কাপড় লইয়াছেন এবং আগামী বর্ষে ৭০ কোটি টাকার বস্ত্র লইবেন। বর্ত্তমান সময়ে ভারতে সৈনিক বিভাগের জন্য ১ কোটি পোষাক প্রস্তুত হইতেছে এবং ঐ কার্য্য সম্পাদনের জন্য নানা স্থানে প্রায় এক লক্ষ দর্জ্জী কাজ করিতেছে। ভারতীয় কলগুলিতে এত বস্ত্র উৎপাদনের ব্যবস্থা ছিল না। কাজেই কলওয়ালাদিগকে দিন-রাত কল চালাইয়া এই বস্ত্র প্রস্তুত এবং তিন প্রস্থ শ্রমিক লইয়া কাজ করিতে হইতেছে। অতিরিক্ত অধিক সময় কল চলিতেছে বলিয়া কলের কোন কোন অংশ অবিশ্রান্ত ঘর্ষণ জন্য ক্ষয় পাইতেছে। কিন্তু উহার কতকগুলি অংশ এ দেশে প্রস্তুত হয় না, বিদেশ হইতে আনাইতে হয়। ইহা এখন আনা যায় না, পথ বিঘ্নসঙ্কুল। এক্ষণে যাহা আছে, তাহা অগ্নিমূল্যে বিকাইতেছে। তাহার উপর মজুরীর হার অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। সরকারী কর, অতিরিক্ত লাভ-কর প্রভৃতি দিয়া কলওয়ালারা অধিক লাভ পাইতেছেন না। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহারা ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ প্রস্তুত করিতে এখন সম্মত হইয়াছেন! দেখা যাউক, কি রকম কাপড় হয়—সস্তার দুরবস্থা না হয়!

তাহার পর ঔষধের মূল্য অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। ম্যালেরিয়ার একমাত্র ঔষধ কুইনাইন দুর্ম্মূল্য, অথচ এ বার ম্যালেরিয়া অধিক। টিংচার আয়ডিন, বাই-কার্ব্বনেট অফ সোডা প্রভৃতির দাম অসম্ভব বাড়িয়াছে। অনেকে ঔষধ পাইতেছেন না। অনেক ঔষধ-ব্যবসায়ী অবস্থা বুঝিয়া যদৃচ্ছা ঔষধের দাম চড়াইতেছেন।

বিশ্বপ্রলয়ে কাগজ কেবল অসম্ভব দুর্ম্মূল্য হয় নাই, দুষ্প্রাপ্যও হইয়াছে। ভারতীয় মিলে প্রস্তুত কাগজের শতকরা ৯০ ভাগ সরকারের প্রয়োজনে গৃহীত হইতেছে। কাগজের অভাবের কথা আমরা বহু বার সাময়িক-প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছি। ইদানীং কাগজের অভাব এত অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, সংবাদপত্রের এবং সাময়িক পত্রগুলির সরকারী নিয়ন্ত্রণে মূল্যবৃদ্ধি ও আকার হ্রাস করিয়াও প্রকাশ করা ক্রমে অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। লিখিবার কাগজের মূল্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে! ইহাতে সর্ব্বসাধারণের ঘোর অসুবিধা ঘটিতেছে। ভারতের সাধারণ নাগরিকদিগের জন্য বার্ষিক ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টন কাগজের প্রয়োজন। এখন ভারতীয় কলগুলিতে বৎসরে ১ লক্ষ টন করিয়া কাগজ প্রস্তুত হয়। তন্মধ্যে ভারত সরকার ৯০ হাজার টন কাগজ লইবেন বলাতে দেশে আশঙ্কার চাঞ্চল্য লক্ষিত হইতেছে। বার্ষিক ১০ হাজার টন কাগজে দেশের লোকের কোন প্রয়োজনই মিটিতে পারে না। কাজেই পুস্তক, সংবাদপত্র, মাসিকপত্র প্রভৃতির প্রচার ক্রমে বন্ধ হইবে। হাজার হাজার কম্পোজিটার, লেখক, প্রেসম্যান, দপ্তরী প্রভৃতির কার্য্য বন্ধ হইবার আশঙ্কা জন্মিতেছে। ইতোমধ্যে এই সকল কার্য্য সঙ্কুচিত হওয়াতে বহু সহস্র লোক বৃত্তিহীন হইয়াছে ও হইতেছে। এই উৎকট দুর্ম্মূল্যতার সময় এত অধিক লোক বেকার হইয়া পড়াতে সমাজের আর্থিক অবস্থায় যে ঘোর সঙ্কট উপস্থিত হইতেছে, তাহার প্রতিকারে সরকার মনোযোগী হন নাই। এক জনের অন্ন মারা গেলে তাহার পরিবারস্থ অন্ততঃ ৫-৬ জন যে না খাইয়া মরিবে, ইহা কি সরকার ভাবিয়া দেখিতেছেন? অতএব সরকারের এই সঙ্কল্প অবিলম্বে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। তাহার উপর কাগজের অভাবে শিক্ষার আলোক স্তিমিত হইবে। চীন এত দিন ধরিয়া জাপানের সহিত যুদ্ধ করিতেছে,—কিন্তু তাহার লোক-শিক্ষার কোনরূপ ব্যাঘাত হইতে দেয় নাই। কোন দেশই তাহা দেয় না। এই কার্য্যে ভারত সরকারের নিতান্ত স্বৈরিতার এবং দেশবাসীর কল্যাণসাধনে অনবধানতাই সূচিত হইতেছে। আশা করি, গ্রেট বৃটেন এবং মার্কিণ হইতে কাগজ আনাইবার যথাসম্ভব সত্বর সুব্যবস্থা করিয়া ভারত সরকার এই সঙ্কটসঙ্কুল অবস্থার সমাধান করিবেন।

শিক্ষা-সম্পর্কিত ব্যাপারে সকল দ্রব্যই দুর্ম্মূল্য। কেবল কাগজ নহে, নিব পর্য্যন্ত দুর্ম্মূল্য। এক পয়সার নিব ছয় পয়সায় বিক্রয় হইতেছে। নিবও কি যুদ্ধে যাইতেছে? টিনের অভাবে ভারতে প্রস্তুত নিবও দুর্ম্মূল্য। ইহাতে দরিদ্র লোক কি করিয়া সন্তানদিগকে লেখাপড়া শিখায়? সরকার তাহা বলিয়া দিবেন কি? লোকশিক্ষা যে সরকারের একটা প্রধান কর্ত্তব্য, এ কথা তাঁহারা অস্বীকার করিতে পারেন না। লোক শিক্ষিত না হইলে নানাবিধ কুকর্ম্মে রত হইয়া থাকে। শাসকদিগের পক্ষে তাহা কলঙ্কের কথা! এ সকল বিষয়েও সরকারের বিশেষ ভাবে দৃষ্টিক্ষেপ করা উচিত।

সর্ব্বোপরি তামার পয়সার অন্তর্ধানে—রেজকীর স্বল্পতার জন্য বাজারে টাকার বিনিময়ে সামান্য মূল্যের জিনিস কিনিবার উপায় নাই। কলিকাতার ট্রাম কোম্পানীর অনুকরণে পয়সার পরিবর্ত্তে কুপন দিয়া কি বেসাতি চলিবে? অথচ সরকার বলিতেছেন, তাঁহারা মাসে ৭ কোটি টাকার খুচরা বাজারে ছাড়িতেছেন। সবই কোথায় উড়িয়া যাইতেছে—তাজ্জব প্রহেলিকা বটে! ফলে এই যুদ্ধে আমরা দেখিতেছি যে, এবারকার এই সার্ব্বত্রিক যুদ্ধে ভারতবাসীর পক্ষে অন্নাভাবে জীবন রক্ষা করা, বস্ত্রাভাবে লজ্জা রক্ষা করা, ঔষধাভাবে স্বাস্থ্য রক্ষা করা এবং কাগজ কলম বই প্রভৃতির অভাবে শিক্ষালাভ করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। আবার কি কঞ্চির কলম, খাঁকের কলম, পেন কলম প্রভৃতির যুগে ফিরিয়া যাইতে হইবে? অনেকেই আমাদের স্বাধীনতা প্রদানের লুব্ধ-আশ্বাস দিতেছেন; আমেরিকা—বৃটেন স্বায়ত্ত-শাসন-প্রবর্ত্তনের প্রতিশ্রুতি দিতেছেন—কিন্তু সেই আনন্দসমুজ্জল অনাগত ভবিষ্যতের পূর্ব্বেই কি আমাদের মুক্তিলাভের সম্ভাবনাই প্রবল নহে?

নারী-মন্দির

কাঠে ও কাচে ছবি তোলা

কাঠের গায়ে ; কিম্বা কাচ, পাথর অথবা কাঁশা-পিতলের তৈজসের গায়ে বালি ছিটিয়ে নানা রকমের ছবি তোলা খুব সহজ। এ রীতিতে 'সিলুয়েটের' ধরণে রকমারি প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রতিলিপি খড়খড়ি-জানলার গায়ে, ট্রে বা সাশির গায়ে অনায়াসে তুলতে পারবেন। এ কাজে বড় রকমের শিল্প-শক্তির বা অসাধারণ ধৈর্যের দরকার নেই। যে-কোনো ছাপা বা আঁকা ছবি বা নক্সা থেকে সাদা কাগজে তার প্রতিলিপি তুলে সেই ছবি বা নক্সা আপনারা কাঠ, কাচ, কাঁশা-পিতলের গায়ে অনায়াসে ছকে নিতে পাবেন :

আঁকা বা ছাপা ছবির প্রতিলিপি তুলতে দরকার শুধু পরিষ্কার এক-শীট-কার্বন কাগজ। যে-পেন্সিলের শীস নরম অর্থাৎ যাকে আমরা soft পেন্সিল বলি, সেই পেন্সিল দিয়ে কার্বন-কাগজের সাহায্যে ছবির প্রতিলিপি তুললে সে-প্রতিলিপি বেশ স্পষ্ট হবে। 'হার্ড' বা 'মিডলিং' পেন্সিলে কার্বনের সাহায্যে প্রতিলিপি তেমন স্পষ্ট হবে না।

১নং ছবিখানি দেখুন—কাঠের গায়ে বালি ছিটিয়ে জাহাজের ছবি আঁকা হয়েছে। এ কাজের জন্য যে-কোনো জাতের নরম
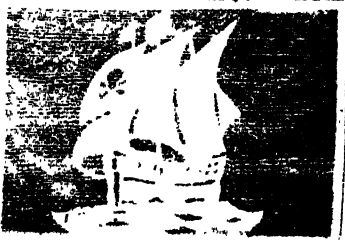
১। জাহাজ

কাঠ নিলে চলবে। প্যাকিং-বাক্সের কাঠ কিম্বা এমনি নরম কাঠ নেবেন। কারণ, নরম কাঠে ছুরি বা নরুণ দিয়ে সহজেই কাট্‌কুট করতে পারবেন।

২নং ছবিখানি দেখুন—এখানি হচ্ছে সাদা কাগজে জাহাজের ছবি। কাগজে ঘর কাটা হয়েছে, তার কারণ, এমনি করে সাদা কাগজে ঘর কেটে ছোট ছবিকে এনলার্জ বা বড করা চলে। যে-কাঠের গায়ে ছবি তুলতে চান, সে-কাঠের গায়ে শিরীষ কাগজ ঘষে প্রথমে সে-কাঠকে বেশ প্লেন করে নিতে হবে। শিরীষ কাগজ মানে মিহি-জাতের শিরীষ কাগজ ঘষবেন। শিরীষ কাগজ ঘষে তার পর কাঠের গায়ে এক-কোট গলা-মোমের (liquid wax) প্রলেপ মাখাবেন।

মাখাবার পর বিশেষ মিক্সচার ঢেলে কাঠের গায়ে জমি তৈরী করা চাই। এ মিক্সচার তৈরী করতে লাগবে খানিকটা শিরীষের টুকরো (Glue)। যে-শিরীষে আঠা. তৈরী হয়, সেই শিরীষ। এই শিরীষের টুকরোর সঙ্গে—যতখানি শিরীষের টুকরো দেবেন, তার চার-ভাগের এক-ভাগ ওজনের জল মেশাবেন। মিশিয়ে ছোট কেরোসিন-ষ্টোভের উপর বসিয়ে কিম্বা নরম আঁচে সেটা চড়িয়ে দেবেন। আগুনের আঁচে যতক্ষণ চড়ানো থাকবে, ততক্ষণ একটা কাঠি দিয়ে সেটা নাড়বেন। তাহলে সমস্ত টুকরোটুকু শীঘ্র গলে যাবে। আঁচে ফুটে এটি যখন ক্ষীরের মত ঘন হবে, তখন একটি পাত্রে ঢেলে রাখুন। তার পর জুড়িয়ে গেলে এতে এক-চামচ (বড় চামচ) গ্লিসিরিণ (অভাবে মিছরীর রস) মিশিয়ে নেবেন। মিশিয়ে তার পর সেটা বেশ মিশ গেলে তাতে দেবেন চায়ের-চামচের এক-চামচ-পরিমাণ জিঙ্ক অক্সাইড। জিঙ্ক-অক্সাইড মেশালে এই মিক্সচারের রং সাদা হবে। এখন মিক্সচার তৈরী হলো।

আচ্ছা, এবার পেষ্টবোর্ড থেকে চারটি টুকরো কেটে নিন; এগুলি চওড়ায় হবে আধ ইঞ্চি করে। কাঠের যে-জায়গায় নক্সা বা ছবি

২। কাগজে আঁকা জাহাজ

তুলবেন, সেই নক্সা-গণ্ডির বাইরে এই চার পীশ্ পেষ্টবোর্ডের টুকরো ধারির মত এঁটে দিন। তার পর ঐ যে মিক্সচার তৈরী হয়েছে, সেই মিক্সচার সাবধানে কাঠের গায়ে ঢালুন। ঢালবার সঙ্গে সঙ্গে তালপাতার চিপ্ দিয়ে সরু-চাকলি তৈরী করবার সময় চাটুতে গোলা ঢেলে যেমন করে খাড়াখাড়ি ভাবে তালপাতা টেনে-টেনে সেই গোলাকে চারিয়ে নেওয়া হয়,—তেমনি ভাবে ঐ মিক্সচার-গোলাটুকুকে চারিয়ে নিতে হবে। তার পর দু'দিন বা আড়াই দিন ওকে রেখে দিন শুকোবার জন্য।

শুকোলে কার্বন-সাহায্যে কাগজের ওপর যে প্রতিলিপি করা আছে, সেটি ঐ জমির ওপরে রেখে ছবির রেখা ধরে ধারালো ছুরির ডগা বুলিয়ে কুঁদে যান। কাঠের গায়ে ছুরির রেখা যেন বেশ সুস্পষ্ট

হয়। ৩নং ছবি দেখলে ছুরি টেনে রেখা তোলার কায়দা বুঝতে পারবেন। তার পর কাঠের গায়ে যে-সব জায়গা খালি অর্থাৎ যেখানে ছবি বা রেখা নেই, সেই সব জায়গায় যদি ঢেউ-খেলানো রেখা টানতে পারেন, তাহলে আকাশ বা জলের ছবি দিব্য বেরুবে।
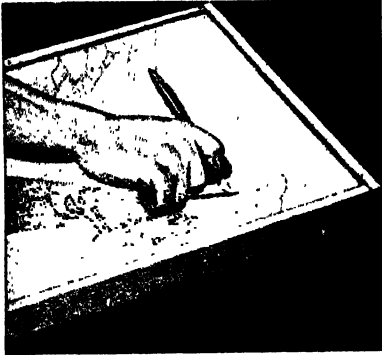
৩। ছুরির রেখা

এইবার বালি ছিটুনোর পালা। বালি বেশ-জোরে ছিটুতে হবে। ছবি আঁকা হয়ে গেলে হাতে বালি নিয়ে ব্লো-পাইপে জোর-ফুঁ দিয়ে বালি ছিটুবেন—অবশ্য ছবি তাগ্‌ করে। বালি ছিটুবার সময় চোখ বুজে বালি ছিটুবেন কিম্বা চোখে নীল চশমা আঁটবেন। না হলে চোখে বালি লাগবে।

এবারে আর-একটু কাজ বাকি। বালি ছিটুনো হয়ে গেলে গরম জলে খানিকটা ন্যাকড়া ভিজিয়ে—সেই ভিজে ন্যাকড়ায় ছবির ঐ কাঠখানিকে চাপা দিয়ে রাখবেন—ন্যাকড়া যেন বেশ ভিজে থাকে। এবং পুরো একটা রাত্রি এমনি চাপা দিয়ে রাখা চাই। পরের দিন সকালে ভোঁতা ছুরি ঘষলে মোম আর নিকশ্চারের প্রলেপটুকু সহজেই চেঁছে ফেলতে পারবেন। প্রলেপ মুছে গেলে কাঠের এই ফাঁকা জায়গায় ছবির রেখা বাঁচিয়ে শিরীষ কাগজ সাবধানে ঘষে নিলে কাঠখানি বেশ প্লেন ও ঝক্‌ঝকে হয়ে উঠবে। এই রীতিতে ৪নং, ৫নং বা যে-কোনো ছবি তুলতে পারবেন।

সার্শির কাচে অবশ্য কোঁদার বালাই নেই। কাচের এক পিঠে এই একই রীতিতে প্রলেপ লাগাবেন, তার পর এমনি ভাবে ছবি আঁকা। শুধু কাচের উল্টো-পিঠে কালো রঙের কাগজ এঁটে নিতে
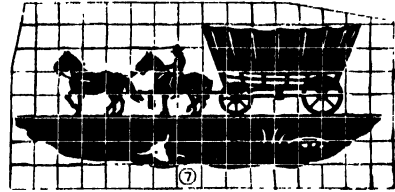
৪। গাড়ীর ছবি

হবে, তাহলেই কালো ব্যাক-গ্রাউণ্ডের জন্য কাচের গায়ে ছবির বাহার খুলবে।
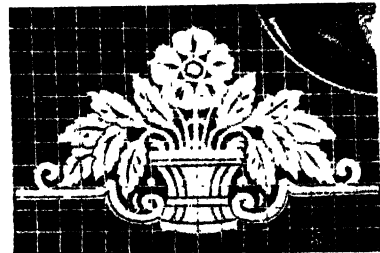
৫। ফুলের তোড়া

কাঁশা-পিতলের পাত্রের গায়ে যদি ছবি আঁকতে চান তো তার রীতিও এই একই রকম!

বালু-চর

স্বপ্নের মায়া নিয়ে চলে যায় মেঘের কুহেলী-রাশি,
রূপালী চাঁদের কল-হাসি জোছনায়,
শরতের বাণী বয়ে নিয়ে ছোটে নীল-সায়রের মাঝে
ভেসে আসে আর ভেসে ভেসে চলে যায়।

সসীম পৃথিবী অসীমের মাঝে একমনে চেয়ে থাকে
ঝরে পড়ে শুধু চন্দ্রের নির্ঝর,
ওই দূরে হাসে শাদা কাশবন মধুর স্বপন-রাতে
চক্‌ চক্‌ চক্‌ জাগিয়াছে বালু-চর।

চক্রবাকের উচ্ছ্বাসভরা অস্ফুট ধ্বনি মাঝে
সাড়া দিয়ে যায় না-বলা প্রাণের কথা—
চাঁদের মায়ায় বালুকার চরে মেদুর প্রেমিক-রাত্তি
বয়ে আনে মনে শাশ্বত আকুলতা।

মহা-বালুচরও হাসে এক দিন কুহক-চাঁদিমা সাথে
চিরন্তনীর বাঁধে শুধু খেলাঘর
তবু শেষ হয় উৎসব-রাতি চন্দ্রমা ডুবে যায়,
ভেঙে ভেঙে যায় প্রেমের বালুকা-চর।

শ্রীজগন্নাথ বিশ্বাস।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

এবার বাঙ্গালা প্রত্যক্ষ ভাবে যুদ্ধের সম্মুখীন ; রণাগ্নির লেলিহান শিখা সত্যই বাঙ্গালীর গৃহ স্পর্শ করিয়াছে। যে বিশ্বব্যাপী ধ্বংসযজ্ঞে সমগ্র জগৎ বিপর্য্যস্ত হইতেছে, এক দিন বাঙ্গালার আকাশে-বাতাসেও যে সেই যজ্ঞের বিষাক্ত ধূম বিচ্ছুরিত হইবে, তাহা বহু পূর্ব্বেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। এত দিনে সকল আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠার অবসান হইল ; বাঙ্গালা আজ সত্যই আক্রান্ত ! তবে, এখনও সে আক্রমণ আকাশপথে। এই আক্রমণ ক্রমে স্থলভাগেও প্রসারিত হইবে কি না, তাহা লইয়া আজ আবার নূতন উৎকণ্ঠা।

বাঙ্গালায় জাপানের বিমান আক্রমণের প্রসার—

ইতঃপূর্ব্বে বাঙ্গালার পূর্ব্বতম প্রান্তে জাপানী বিমান-বাহিনী আঘাত করিয়াছিল। কিন্তু গত ডিসেম্বর মাসে জাপানের এই আক্রমণ প্রসার লাভ করিয়াছে ; পূর্ব্ববঙ্গে কেবল চট্টগ্রাম ও নোয়াখালিতেই নহে—বাঙ্গালার রাজধানী কলিকাতায়ও জাপান এবার নিয়মিত ভাবে আঘাত হানিয়াছে। ইহা জাপানের নিছক শত্রুতা-সাধনের গুরুত্বহীন প্রয়াস নহে—সুনির্দ্দিষ্ট সমর-পরিকল্পনা অনুযায়ীই জাপানের এই আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে। নিছক শত্রুতা-সাধনের জন্য আক্রমণ—অর্থাৎ সম্মিলিত পক্ষ যাহার নাম দিয়াছেন Nuisance Raid—তাহার জন্য জাপানের এত দিন প্রতীক্ষা করিবার প্রয়োজন ছিল না। গত বর্ষাকালে সম্মিলিত পক্ষ যখন ব্রহ্মদেশে পুনঃ পুনঃ বিমান আক্রমণ চালাইতে সমর্থ হইয়াছেন, তখন জাপানের পক্ষে বাঙ্গালার কোন কোন স্থানে কয়েকখানি বিমান প্রেরণ নিশ্চয়ই সাধ্যাতীত ছিল না।

অন্তরীক্ষে জাপানের এই তৎপরতা হয় তাহার স্থলপথে ভারত অভিযানের পূর্ব্বাভাস ; অথবা সে সম্মিলিত পক্ষের ব্রহ্ম-অভিযানের আয়োজন বিনষ্ট করিতে চাহে। এতদুভয়ের মধ্যে যে কোন একটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভারতবর্ষের শ্রমশিল্পের ধ্বংস-সাধন, সংযোগসূত্র বিচ্ছিন্ন করা এবং বেসামরিক জীবনযাত্রায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি তাহার একান্ত প্রয়োজন। সামরিক প্রয়োজনীয়তার দিক্ হইতে জাপানের বিমান আক্রমণ এখন এই প্রথম স্তরে রহিয়াছে। এখন প্রশ্ন—জাপান যেমন অরক্ষিত অবস্থায় পাঁচ-ছয়খানি বোমাবর্ষী বিমান প্রেরণ করিয়া একরূপ লক্ষ্যহীন ভাবেই বোমা ফেলিতেছে, তাহাতে তাহার এই সামরিক উদ্দেশ্য সাধিত হইবে কিরূপে ? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে—কলিকাতা ও তাহার সহরতলীর ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ স্থানে জাপান পাঁচ-ছয়খানি অরক্ষিত বিমান পাঠাইয়া চরম ফললাভের আশা সত্যই করে না ; প্রতিপক্ষের প্রতিরোধ-ব্যবস্থা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই তাহার বোমাবর্ষী বিমান স্থানে স্থানে আঘাত করিয়াছে। গত এক বৎসরে ভারতের প্রতিরোধ-ব্যবস্থার যে উন্নতি হইয়াছে, তাহা জাপানের অজ্ঞাত থাকিবার কথা নহে। কয়েকখানি বিমান নিষ্ক্রিয়ভাবে আকাশে ঘুরিয়া এই সম্পর্কে সকল তথ্য সংগ্রহ করিতে পারে না। কোথায় কি পরিমাণ বিমান-বিধ্বংসী কামান স্থাপিত হইয়াছে, জঙ্গী বিমান-গুলির অবস্থান-ক্ষেত্র কোন্ দিকে, সে বিষয়ে পরিপূর্ণ সংবাদ সংগ্রহের জন্য স্থানে স্থানে আঘাত করা প্রয়োজন। এই সকল অত্যাবশ্যক সংবাদ সংগৃহীত হইবার পর জাপানী বিমানবহর শ্রমশিল্প ও সংযোগ-সূত্র বিনাশ-সাধনের এবং বেসামরিক জীবনযাত্রায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা লইয়া ব্যাপক আক্রমণ আরম্ভ করিবে। তখন বোমাবর্ষী বিমানগুলি প্রচুর জঙ্গী বিমানের রক্ষণাধীনে প্রেরিত হইবে। কত দিনে জাপানের সংবাদ সংগ্রহের কাজ শেষ হইবে এবং তাহার প্রকৃত আক্রমণ আরম্ভ হইবে—তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। তবে, ইহা সত্য, জাপানের প্রাথমিক বিমান আক্রমণের অল্পতা ও বিফলতা লক্ষ্য করিয়া অত্যধিক আশান্বিত হওয়া উচিত নহে ; বস্তুতঃ, ইহা তাহার পর্য্যবেক্ষণ মাত্র—প্রকৃত আক্রমণ নহে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—জাপান কেবল সামরিক লক্ষ্য-বস্তুতে আঘাত করিতে চাহে না—বেসামরিক ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিও তাহার উদ্দেশ্য, ইহা তাহার সামরিক প্রয়োজনেরই অঙ্গ। ইতঃপূর্ব্বে নান্‌কিংএ, ক্যাণ্টনে, রেঙ্গুণে, মান্দালয়ে এবং সিঙ্গাপুরে আমরা

কলিকাতায় বিমান-আক্রমণের সম্ভাবিত ঘাঁটী আকিয়াব

জাপানের এইরূপ প্রয়াস লক্ষ্য করিয়াছি ; প্রত্যেকটি স্থানে সে প্রথমে একরূপ লক্ষ্যহীন ভাবে আক্রমণ চালাইয়া বেসামরিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অচল করিতে সচেষ্ট হইয়াছে। তাহার পর, প্রত্যক্ষ সামরিক লক্ষ্য-বস্তুগুলির প্রতি অবহিত হইয়াছে। বস্তুতঃ, বেসামরিক ব্যবস্থার সহিত সমরায়োজনের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ; বেসামরিক ব্যবস্থায় যদি বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে কেবল সামরিক লক্ষ্য-বস্তুতে আঘাত করিয়া আক্রমণকারীর অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়া সম্ভব নহে। অবশ্য, জাপান ভারতের জনসাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে চাহে। বিশেষতঃ, আমাদের শাসকশক্তির নির্ব্বুদ্ধিতায় জাপান এই বিষয়ে বিশেষ উৎসাহিতও হইয়াছে ; সে জানে—ভারতবর্ষের জাপান-বিরোধী সমর-প্রচেষ্টা সমগ্র ভারতের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা নহে। কাজেই, বিমান-আক্রমণকালে যথাশক্তি বেসামরিক অধিবাসীকে এড়াইয়া চলা জাপানের রাজনীতিক স্বার্থ ; ইহাতে সে ' শ্রেণীর সহানুভূতি পাইবে মনে করিতে পারে। কিন্তু এই রাজনীতিক স্বার্থের জন্য সে আশু সামরিক প্রয়োজন সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে পারে না ; কারণ, সামরিক সাফল্যের উপরই তাহার রাজনীতিক ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। কাজেই, বেসামরিক ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সামরিক

প্রয়োজনে যদি কিছু বেসামরিক অধিবাসী হতাহত হয়, কিছু বেসামরিক সম্পত্তি বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে জাপান নিরুপায়।

জাপান কি ভারত আক্রমণ করিবে ?

এখন প্রশ্ন—জাপান কি সত্বর ভারতবর্ষের উদ্দেশে প্রত্যক্ষ অভিযান আরম্ভ করিবে ? সম্মিলিত পক্ষের সমর-বিশেষজ্ঞগণ বলিয়াছেন—না, জাপানের সেরূপ শক্তি নাই। তাহার পর, দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধে এবং আরাকান প্রদেশে সম্মিলিত পক্ষের সাম্প্রতিক অগ্রগতিতে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া নিয়মিত ভাবে যে প্রচারকার্য্য চলিতেছে, তাহাতে অনেকের মনেই এইরূপ ধারণা হইয়াছে যে, জাপানের পক্ষে এখন ভারত আক্রমণ সম্ভব নহে। কিন্তু আমাদের মনে হয়—জাপানের শক্তি ও অভিসন্ধি সম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে।

দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে সম্মিলিত পক্ষই যে আক্রমণাত্মক সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছেন এবং জাপান সেখানে প্রতিরোধে প্রবৃত্ত, ইহা সত্য। কিন্তু সেখানে জাপানের প্রতিরোধের প্রাবল্যে লঘুত্ব আরোপ করা যায় না। এক নিউ গিনির প্যাপুয়াতেই জাপান ৬ মাস প্রতিরোধে প্রবৃত্ত আছে; বুনা অঞ্চলেই প্রায় দুই মাস যুদ্ধ চলিতেছে। এখনও নিউ গিনির লে ও স্যালামুয়া জাপানের অধিকারভুক্ত। তাহার পর, গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটী রবাউল অবশিষ্ট আছে; সমগ্র নিউ বৃটেন্ ও নিউ আয়র্লণ্ড হইতেও জাপানী সৈন্য বিতাড়িত হওয়া প্রয়োজন। সলোমনসেও সম্মিলিত পক্ষের উল্লেখযোগ্য সাফল্যের কথা আপাততঃ শ্রুত হয় নাই। অবশ্য দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে একাধিক নৌ-যুদ্ধে জাপান ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে; কিন্তু এই ক্ষতিতে জাপানের নৌবহর পঙ্গু হইয়াছে, মনে করা যায় না। তাহার পর, আরাকানে সম্মিলিত পক্ষের অগ্রগতিতেও অধিক গুরুত্ব আরোপ করা চলে না; বুথিডং ও মংডয় জাপানীরা প্রতিরোধ করে নাই—সম্মিলিত পক্ষের সৈন্য নির্বিরোধে ঐ দুইটি স্থানে পৌঁছিয়াছে। ইহার পর আকিয়াবই জাপানের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটী; এই আকিয়াব অধিকৃত না হওয়া পর্য্যন্ত সম্মিলিত পক্ষের সাফল্য উল্লেখযোগ্য নহে—তৎপূর্ব্বে জাপানের প্রকৃত মনোভাবও সুস্পষ্ট হইবে না।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—গত মে মাসের পর হইতে জাপান একরূপ নিষ্ক্রিয়। এই বিষয়ে ইহাই মনে করা যুক্তিসঙ্গত যে, ফ্যাসিষ্ট শক্তির চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী উপযুক্ত প্রাকৃতিক অবস্থায় যুদ্ধ চালাইয়া পরে অধিকৃত অঞ্চলের রস আহরণে স্বীয় শক্তি বৃদ্ধি করিতে জাপান প্রয়াসী হইয়াছে। এই নিষ্ক্রিয়তা তাহার শক্তিহীনতার নিশ্চিত দ্যোতক না হওয়াই সম্ভব।

এখন প্রাকৃতিক অবস্থা পুনরায় যুদ্ধ-পরিচালনের উপযোগী। জাপানের প্রধান মন্ত্রী সে দিন প্রসঙ্গতঃ মন্তব্য করিয়াছেন—এই বার "প্রকৃত সংগ্রাম" আরম্ভ হইবে। তাঁহার এই উক্তি নিছক্ "ফাঁকা আওয়াজ" নহে বলিয়াই মার্কিনী বিশেষজ্ঞদিগের ধারণা। সম্প্রতি ব্রহ্মদেশে জাপানের সমরায়োজন বিশেষ ভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে; এই আয়োজন চীনের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইবার কোন লক্ষণ এখনও দেখা যায় নাই। এই সকল বিষয় উত্তমরূপে চিন্তা করিলে জাপানের ভারত আক্রমণের সম্ভাবনা উপেক্ষা করা চলে না। প্রথমতঃ, জাপানের আক্রমণ-শক্তি এখনও ক্ষুণ্ণ হয় নাই; দ্বিতীয়তঃ, দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে সে এত অধিক বিব্রত নহে যে, অন্যত্র আক্রমণ-পরিচালন তাহার সাধ্যাতীত; তৃতীয়তঃ, ব্রহ্মদেশে জাপানের সমরায়োজন বিশেষ ভাবেই বর্দ্ধিত হইতেছে এবং চতুর্থতঃ, জেনারল তোজোর উক্তি অত্যন্ত অর্থপূর্ণ।

তবে, এই বিষয়ে একটি সন্দেহের কারণ আছে; সেই কারণে জাপানের ভারত আক্রমণের সম্ভাবনায় যেমন সন্দেহের অবকাশ ঘটে, তেমনই মিত্রশক্তির ব্রহ্মদেশ আক্রমণের এবং য়ুরোপে তাঁহাদের "দ্বিতীয় রণাঙ্গন" সৃষ্টির সম্ভাবনায়ও সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। রুশিয়ার যুদ্ধে প্রমাণিত হইয়াছে—যেখানে প্রতিপক্ষের দ্রুত ও নিশ্চিত পরাভবের সম্ভাবনা নাই, সেখানে আক্রমণাত্মক যুদ্ধে প্রবৃত্ত

জাপানের প্রধান মন্ত্রী তোজো

হইলে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমরযন্ত্রও বিকল হইয়া পড়িতে পারে। বিশেষতঃ, প্রতিপক্ষের যদি দীর্ঘকাল গতিশীল যুদ্ধ পরিচালনের উপযোগী বিশাল দেশ থাকে, প্রয়োজন হইলে সে যদি প্রতিরোধকারী সৈন্যদিগকে অপসরণ করিয়া নূতন নূতন ব্যূহে সমাবেশ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার প্রতিরোধ অভেদ্য হইয়া উঠাও সম্ভব। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রতিরোধকারী শক্তি কিছু অঞ্চল ত্যাগে বাধ্য হইলেও প্রকৃতপক্ষে আক্রমণকারীই ক্রমে অন্তঃসারশূন্য হইতে থাকে। ভারতবর্ষে সম্মিলিত পক্ষের সমরায়োজন সম্প্রতি বিশেষ ভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে; বিভিন্ন প্রতিরোধ-ব্যূহে অপসরণ করিয়া দীর্ঘকাল যুদ্ধ-পরিচালনের উপযোগী দেশও এই ভারতবর্ষ। এই দিক্ হইতে বিবেচনা করিলে মনে হইবে—ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন-সংযোগ না করিয়া জাপান একাকী স্থলপথে ভারত আক্রমণে ইতস্ততঃ করিতে পারে। বিশেষতঃ, প্রশান্ত মহাসাগরে প্রতিরোধ

অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সমুদ্রপথে ভারতবর্ষ পরিবেষ্টনের প্রয়াস হয়ত জাপানের পক্ষে অসাধ্য।

কিন্তু অন্য দিক্ হইতে আন্তর্জ্জাতিক অবস্থা জাপানের অনুকূল হইবারও সম্ভাবনা আছে। এইরূপ মনে করিবার সঙ্গত কারণ দেখা যাইতেছে যে, হিট্‌লার অদূর ভবিষ্যতে তুরস্ক আক্রমণ করিয়া পশ্চিম-এশিয়ায় সম্মিলিত পক্ষকে আঘাত করিতে প্রয়াসী হইতে পারেন। এই ভাবে জার্ম্মাণীর আক্রমণে ভারতের পশ্চিম দিকে সম্মিলিত পক্ষ যখন বিব্রত থাকিবেন, সেই সময় জাপান পূর্ব্ব দিকে ভারতবর্ষকে আঘাতের অনুকূল সময় মনে করিতে পারে। হয়ত অক্ষ-শক্তির এইরূপ সমর-পরিকল্পনাই যবনিকার অন্তরালে রচিত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। অক্ষশক্তির পক্ষে সুষ্ঠু সমর-পরিচালনার জন্য তাহাদের প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সমর-যন্ত্রের প্রত্যক্ষ সহযোগ প্রয়োজন। এই দিক্ হইতে মিত্রশক্তির সমর পরিচালন-পদ্ধতি অধিকতর উন্নত; বৃটেন্ ও আমেরিকার সামরিক সহযোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, রুশিয়ার সহিতও সমরোপকরণের আদান-প্রদান চলিতেছে। কিন্তু অক্ষশক্তির প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মিত্র পরস্পরের সহিত সর্ব্ববিষয়ে বিচ্ছিন্ন-সংযোগ। কাজেই, কেবল জাপানের প্রয়োজনে—অর্থাৎ ব্রহ্মদেশরক্ষার্থ তথা চীনের সমস্যার সমাধানের জন্যই যে ভারতবর্ষের প্রতি অক্ষশক্তির প্রভুত্ব স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন, তাহাই নহে—অক্ষশক্তির সুষ্ঠু সমর-পরিচালনের জন্যও দক্ষিণ এশিয়ায় তাহাদের অধিকার-বিস্তৃতির প্রয়োজন স্পষ্ট হইয়াছে।

সর্ব্বোপরি, ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থায় আশান্বিত হইয়া জাপান ভারত আক্রমণে উৎসাহিত হইতে পারে। ভারতে প্রকৃত জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করিয়া সমর-প্রচেষ্টায় সমগ্র জাতির সহযোগ গ্রহণের সুবুদ্ধি আমাদের শাসক-শক্তির হয় নাই। কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ধৃত হইবার পর ভারতে যে গণ-বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়, নির্ম্মম দমননীতির ফলে তাহা শান্ত হইয়াছে বলিয়া শাসক-শক্তি এখন হয়ত আত্মশ্লাঘা বোধ করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নির্ম্মম দমননীতির ফলে জনসাধারণ এখন অধিকতর অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হইয়াছে; তাহাদের বৃটিশ-বিরোধী মনোভাব পূর্ব্বাপেক্ষা বহু গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই দিক্ হইতে গত আগষ্ট মাসের পূর্ব্বে ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থা যেরূপ ছিল, তাহা অপেক্ষা এখন উহা অধিকতর অবনত। এখন ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট জনসাধারণের পক্ষে আক্রমণকারী শক্তির প্রতি আত্মঘাতী সহানুভূতি প্রদর্শনের আশঙ্কা ঘটিয়াছে। জাপান ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং গণ-আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিয়া থাকিবে। কংগ্রেসের জাপ-বিরোধী মনোভাব এবং চীনের প্রতি তাহার সহানুভূতি জাপানের অজ্ঞাত নাই; কংগ্রেসের সর্ব্বশেষ প্রস্তাবে বৃটিশের ভারত-ত্যাগ দাবী করা হইলেও ভারতে বৃটিশ ও মার্কিণী সৈন্যের অবস্থিতিতে আপত্তি করা হয় নাই। সেই কংগ্রেসের নামে যে গণ-বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার ফলে বৃটিশ সরকার কংগ্রেসের দাবী মানিয়া লন—ইহা জাপানের আকাঙ্ক্ষিত নহে; বৃটিশের দমন-নীতিতে ভারতের জনসাধারণ আরও অধিক বৃটিশ-বিরোধী হইয়া উঠুক, ইহাই তাহার কাম্য। সে জানে—এই বিদ্বেষ চরমে উঠিলে ভারতীয় জনসাধারণ দিশাহারা হইবে এবং তখনই তাহাদিগকে স্বাধীনতার আশা দিয়া "হাত" করিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইবে। এখন জাপান মনে করিতে পারে—সেই উপযুক্ত সময় আসিয়াছে। তাহার পর, জাপান দেখিয়াছে—চীনে ও রুশিয়ায় কেবল রাজ্যগত বিশালতাই অক্ষশক্তির বিজয়ের পথে অলঙ্ঘ্য বিঘ্ন সৃষ্টি করে নাই; ঐ সকল দেশের বেসামরিক জনসাধারণের সহিংস অসহযোগ সশস্ত্র প্রতিরোধ অপেক্ষাও ভয়াবহ। ভারতীয় জনসাধারণকে এই সহিংস অসহযোগে উদ্বুদ্ধ করিতে বৃটিশ সরকারের সামর্থ্যে জাপানের সন্দেহ সঙ্গত।

উত্তর আফ্রিকার রণক্ষেত্র ও জার্ম্মাণীর অভিসন্ধি—

লিবিয়ায় জেনারল রোমেলের সেনাবাহিনী আরও পশ্চাদপসরণ করিয়াছে। টিউনিসিয়ার রণক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই। তবে, টিউনিসিয়া ও লিবিয়ার সীমান্তের দিকে সম্মিলিত পক্ষের সেনাবাহিনী আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছে।

ফ্যাসিষ্ট স্পেনের ফ্যাসিষ্ট নেতা জেনারল ফ্রাঙ্কো

জেনারল রোমেল এল-আঘেলিয়ায় প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হইতে পারেন বলিয়া মনে করা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি তাহা করেন না ইহা—তিনি ক্রমেই পশ্চিমাভিমুখে অপসরণ করিতেছেন। আমরা বহু পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলাম যে, রোমেল লিবিয়ায় প্রতিরোধে প্রবৃত্ত না হইয়া টিউনিসিয়ায় সহযোদ্ধগণের সহিত সম্মিলিত হইবেন। আমাদের সেই অনুমান এখন যেন সত্যে পরিণত হইতেছে; লিবিয়ায় প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছা রোমেলের আর নাই বলিয়াই মনে হয়। জেনারল নেহরিং-এর সহিত মিলিত হইয়া তিনি যেন উত্তর আফ্রিকায় শেষ প্রতিরোধের আয়োজন করিবেন।

এই প্রসঙ্গে মনে হয়—হিটলার হয়ত টিউনিসিয়ার স্বল্প-পরিসর রণাঙ্গনে অসাধ্য-সাধনের দুরাশা পোষণ করেন না; তিনি কেবল টিউনিসিয়ায় একটি সুদৃঢ় "কীলক" প্রতিষ্ঠ করাইয়া রাখিতেছেন। টিউনিসিয়ার এবং তাহার উত্তরে সমুদ্রাংশের ও দ্বীপগুলির সামরিক গুরুত্ব সম্বন্ধে আমরা ইতঃপূর্ব্বে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। জেনারল এসেন্‌হাওয়ারের পক্ষে এই স্থানে জার্ম্মাণীর সুদৃঢ় "কীলক" অপসারণ করা সহজসাধ্য হইবে না।

সে যাহা হউক, হিটলার এই "কীলকের" দ্বারাই সমগ্র উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধে পরিবর্ত্তন-সাধনের পরিকল্পনা করেন নাই বলিয়া মনে হয়; অতি সত্বর দুই পার্শ্ব হইতে সম্মিলিত পক্ষকে আঘাত করিয়া তিনি উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধে আমূল পরিবর্ত্তন-সাধনে প্রয়াসী হইতে পারেন। এক দিকে তুরস্ক এবং অন্য দিকে স্পেনে তাঁহার আঘাত পতিত হইবার সম্ভাবনা। স্পেন ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্র; জার্ম্মাণীর স্বগোত্র। কাজেই, সে যে সম্পূর্ণ নির্ব্বিরোধেই জার্ম্মাণীর দাবী মানিয়া লইবে, ইহা মনে করা যুক্তিসঙ্গত। স্পেনের মনোভাব সম্বন্ধে সময় সময় স্বকপোলকল্পিত কাহিনী প্রচারিত হইয়া থাকে। সম্প্রতি জেনারল ফ্রাঙ্কো উদারনীতিকতার বিরুদ্ধে শত্রুতা ঘোষণা করিয়া এবং হিটলার ও মুসোলিনির জয়-গান গাহিয়া তাঁহার তথা ফ্যাসিষ্ট-স্পেনের প্রকৃত মনোভাব জ্ঞাপন করিয়াছেন। বস্তুতঃ, স্পেন এত দিন জার্ম্মাণীর ইঙ্গিতে নিরপেক্ষ আছে মনে করাই সঙ্গত। জার্ম্মাণী যে দিন তাহাকে নিরপেক্ষ রাখা অপেক্ষা যুদ্ধে লিপ্ত করান অধিকতর সুবিধাজনক মনে করিবে, সেই দিনই স্পেন তাহার নিরপেক্ষতা-মুখোস ত্যাগ করিবে। অদূর ভবিষ্যতে জার্ম্মাণী স্পেন অধিকার করিয়া উত্তর আফ্রিকায় সম্মিলিত পক্ষের পশ্চাদ্ভাগে আঘাত করিতে পারে; মিত্রশক্তির অজ্ঞাতসারে দ্রুত স্পেনের সামরিক লক্ষ্যবস্তুগুলি হস্তগত করিবার জন্যই জার্ম্মাণী হয়ত এখন ওঁৎ পাতিয়া আছে।

তবে, তুরস্কে জার্ম্মাণী প্রতিরোধের সম্মুখীন হইবে। কিন্তু স্পেনে কোনরূপ প্রতিরোধের সম্ভাবনা না থাকায় এবং টিউনিসিয়ায় ব্যাপক রণক্ষেত্র সৃষ্ট না হওয়ায় জার্ম্মাণী তুরস্কের প্রতি প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগ করিতেও পারিবে। হয়ত পশ্চিম-এশিয়ায় এই আসন্ন অভিযানের প্রয়োজনেই জার্ম্মাণী উত্তর আফ্রিকার রণক্ষেত্র ইচ্ছা করিয়া সঙ্কীর্ণ করিতেছে। তুরস্কের মধ্য দিয়া জার্ম্মাণীর এই সম্ভাবিত অভিযান যদি সাফল্যের সহিত অগ্রসর হয়, তাহা হইলে দক্ষিণ রুশিয়ায় উহার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পতিত হইবে, ভারতবর্ষ ইহাতে বিপন্ন হইবে, সুয়েজের পক্ষে নূতন বিপদের সৃষ্টি হইবে। কাজেই, এই নূতন অভিযানের জন্য জার্ম্মাণীর ব্যাপক আয়োজন স্বাভাবিক এবং সে জন্য অন্যান্য রণক্ষেত্রে তাহার তৎপরতা সাময়িক মন্দীভূত হওয়াও সম্ভব।

এডমিরাল্ দার্লাঁ নিহত—

গত ডিসেম্বর মাসে এডমিরাল দার্লাঁ গুপ্ত-ঘাতকের হস্তে নিহত হইয়াছেন। এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে ব্যাপক ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত হয় নাই। ফ্যাসিষ্ট-অনুরক্তি, না দার্লাঁর ন্যায় সুবিধাবাদীর প্রভাব হইতে ফ্রান্সকে মুক্ত করা এই হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য, তাহা এখনও সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে জানা যায় নাই। যে কারণেই এডমিরাল্ দার্লাঁকে হত্যা করা হউক না কেন, তাঁহার মৃত্যুতে এক অপ্রীতিকর বিতর্কের অবসান হইয়াছে।

দার্লাঁর জীবনে কোন সুস্পষ্ট রাজনীতিক আদর্শ ছিল না; তাই, সুবিধাবাদীর স্বাভাবিক ধর্ম্মরূপে রাষ্ট্রীয় জীবনে তিনি একাধিক বার রূপ-পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স যখন আত্মসমর্পণ করে, তখন তিনি অত্যন্ত আক্ষেপ করিয়াছিলেন; ফ্রান্সের নৌ-সচিবরূপে তিনি বৃটিশ নৌ-সচিবকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাব উত্থাপিত হইবার পূর্ব্বে ফরাসী নৌবহর বৃটিশ নৌ-ঘাঁটাতে প্রেরিত হইবে। কিন্তু পরে তিনি ফ্রান্সের সকল সম্পদ্ জার্ম্মাণীর পদে অর্পণ করিয়া তাহার কৃপাপ্রার্থী হন। তাহার পর, ফ্রাঙ্কো-জার্ম্মাণ সহযোগিতার কালে তিনি জার্ম্মাণীর উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। আবার উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় সম্মিলিত পক্ষের অভিযান আরম্ভ হইবামাত্র এডমিরাল্ দার্লাঁ ফ্রান্সকে জার্ম্মাণীর প্রভাব হইতে মুক্ত করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যান!

জেনারল দ্য গলে সম্মিলিত পক্ষের চরম নৈরাশ্যজনক অবস্থাতেও জার্ম্মাণীর বিরোধিতায় বিরত হন নাই। সেই দ্য গলেকে উপেক্ষা করিয়া বহুরূপী দার্লাঁর সহিত "দহরম মহরম" করায় সম্মিলিত পক্ষ তীব্র প্রতিকূল সমালোচনার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। অবশ্য দার্লাঁর সহিত মিত্রতার সামরিক কারণ ছিল। তাঁহার সহযোগিতায় উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় সম্মিলিত পক্ষ অতি দ্রুত প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছেন; মার্কিণী সমর-সচিব মিঃ ষ্টিম্‌সনের ভাষায় তাঁহাদের ২ মাস সময় বাঁচিয়া গিয়াছে এবং ১৬ হাজার সৈন্যের প্রাণ রক্ষা পাইয়াছে। এই সামরিক প্রয়োজন ব্যতীত রাজনীতিক কারণেও তাঁহারা দার্লাঁকে "হাতে রাখিতেছিলেন" বলিয়া মনে হয়।

সম্মিলিত পক্ষ এখন য়ুরোপে প্রত্যক্ষ অভিযান-পরিচালনের কথা চিন্তা করিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা এক দুরূহ রাজনীতিক সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন। জার্ম্মাণীর প্রভাবাধীন য়ুরোপে যাহারা এখন চরম নির্য্যাতন সহিয়া বিজয়ী শক্তির প্রতিরোধে প্রবৃত্ত আছে, তাহারা উগ্র বিপ্লববাদী। সম্মিলিত পক্ষ কখনও য়ুরোপে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা চাহিতে পারেন না। হল্যাণ্ড, নরওয়ে, পোল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, যুগোশ্লোভিয়া, গ্রীস্ প্রভৃতি রাজ্যগুলির তথাকথিত সরকার লণ্ডনের "পিঁজরাপোলে" সংরক্ষিত আছে। সম্মিলিত পক্ষ আশা করেন—য়ুরোপের যুদ্ধোত্তর ব্যবস্থায় তাঁহারা প্রাক্তন শাসনতন্ত্রের এই সকল কঙ্কালকে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারিবেন। কিন্তু ফ্রান্সের কি হইবে? ফ্রান্সের শাসনতন্ত্রের কঙ্কাল ত কোন পুরাতত্ত্বশালায় রক্ষিত নাই! এই জন্য যুদ্ধোত্তর ব্যবস্থায় ফ্রান্সে সকল শ্রেণীর ফরাসীদিগের সহযোগিতায় এক সম্মিলিত সরকার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা হয়ত সম্মিলিত পক্ষের বিবেচনাধীন আছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ীই হয়ত তাঁহারা এডমিরাল দার্লাঁর সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—ফ্রান্সের আত্মসমর্পণের পূর্ব্বে এবং ফ্রাঙ্কো-জার্ম্মাণ সহযোগিতার কালে এডমিরাল দার্লাঁ ফ্রান্সে অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন।

সোভিয়েট বাহিনীর সাফল্য—

রুশ-সৈন্য সম্প্রতি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে। মধ্য-রণাঙ্গনে ভেলিকাই-লুকি অধিকার করিয়া তাহারা জার্ম্মাণীর একটি প্রধান সরবরাহ-সূত্র বিপন্ন করিয়াছে; ইহার পর নভো-সকোল্‌নিকি যদি তাহাদিগের অধিকারভুক্ত হয়, তাহা হইলে লেনিনগ্রাড্ অঞ্চলের সহিত জার্ম্মাণীর মধ্য-রণাঙ্গনের সংযোগ ছিন্ন হইবে। ভেলিকাই-লুকির পূর্ব্বদিকে রেজভেও জার্ম্মাণ-বাহিনী পরিবেষ্টিত হইয়াছে। ঐ স্থানটির পতন হইলে ভিয়াস্‌মা পর্য্যন্ত রেলপথ মুক্ত হইবে এবং স্মলেন্স্কের পতনও আসন্ন হইয়া উঠিবে। দক্ষিণ রণাঙ্গনে কোটেল্‌নিকভো পুনরধিকার সোভিয়েট বাহিনীর উল্লেখযোগ্য সাফল্য। তাহাদিগের পরবর্ত্তী

দক্ষিণ রুশিয়ার রণক্ষেত্র

লক্ষ্য স্যাল্স্ক ; এই স্যালস্ক হইতেই রষ্টভ যাইবার ব্র্যাঞ্চ লাইন। রষ্টভ দক্ষিণ রুশিয়ায় জার্ম্মাণ সেনাবাহিনীর সর্ব্বপ্রধান সরবরাহ-ঘাঁটা। মধ্য-ককেসাসে মজদক্, নাল্চিক ও প্রখ্লাদনায়া পুনরধিকার করিয়া সোভিয়েট-বাহিনী গ্রজ্নী তৈলকূপকে সম্পূর্ণরূপে বিঘ্নমুক্ত করিয়াছে। বস্তুতঃ, সমগ্র পূর্ব্ব-য়ুরোপে যুদ্ধের অবস্থা এখন সোভিয়েট রুশিয়ার অত্যন্ত অনুকূল। আশা করা যায়, আগামী বসন্তকালের পূর্ব্বে ঐ অঞ্চলের অবস্থা আরও উন্নত হইবে; ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে গ্রীষ্মকালে জার্ম্মাণী পূর্ব্ব-রণাঙ্গনে যাহা লাভ করিয়াছে, এই বৎসর শীতকালে সে তদপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে।

রুশ-বাহিনীর এই শীতকালীন প্রতি-আক্রমণের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা ইতঃপূর্ব্বে যে মন্তব্য করিয়াছি, এখনও তাহারই পুনরাবৃত্তি সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। সম্মিলিত পক্ষ যদি অদূর ভবিষ্যতে য়ুরোপে জার্ম্মাণীকে আঘাত করিতে না পারেন, তাহা হইলে সোভিয়েট-বাহিনীর এই শীতকালীন সাফল্যের গতি আগামী বসন্তকালে অব্যাহত থাকিবে না। যত দিন জার্ম্মাণী নিশ্চিন্তে সমগ্র য়ুরোপখণ্ডের রস শোষণ করিয়া পূর্ব্ব-য়ুরোপে অখণ্ড মনোযোগ প্রদান করিতে পারিবে, তত দিন তাহার পক্ষে শীতকালীন প্রতিকূলতা সহ্য করিয়া বসন্তকালে পুনরায় নূতন বিক্রমে আক্রমণ-পরিচালন সম্ভব হইবে।

৮।১।৪৩

শ্রীঅতুল দত্ত।

কণ্ঠ ও চিবুক

পনেরো-ষোল বৎসর বয়সেই মেয়েদের মধ্যে অনেকের চিবুকের নীচের দিকটা দু'-ভাঁজ হইয়া পড়ে, তার ফলে কণ্ঠের শ্রী ও শোভা নষ্ট হয়। চিবুক এমনি দু'-ভাঁজ হওয়ার ইংরেজী-নাম—ডবল্-চিন্ (double chin)। দু'-ভাঁজ চিবুকে মুখের কমনীয়তা থাকে না।

চিবুক এমন দু'-ভাঁজ হয় শয়নের দোষে, চলা-ফেরা করার দোষে। এদিকে যদি গোড়ায় মনোযোগী হন, তাহা হইলে অভ্যাসে শুইতে বসিতে চলিতে ফিরিতে স্বাচ্ছন্দ্য যেমন নষ্ট হইবে না, চিবুকের এবং কণ্ঠের গড়নেও তেমনি এতটুকু বৈকল্য ঘটিবে না।

কি করিয়া চলিবেন, কি করিয়া বসিবেন, দাঁড়াইবেন, জানেন ? বুক সিধা রাখিয়া চিতাইয়া—যেন বুক দিয়া ঢেউ ঠেলিয়া চলিতেছেন ! বসা, দাঁড়ানো কিম্বা চলা-ফেরা—সব সময়ে মাথা রাখিবেন সিধা ! মাথা যদি একান্ত হেলে তো পিছন-দিকে। সামনের দিকে মাথা কখনো যেন না ঝোঁকে—এতটুকু না ! এবং চিবুকও যেন কখনো সামনের দিকে হেলিয়া না থাকে ! শুইবার সময়েও সতর্ক থাকিতে হইবে। উঁচু বা শক্ত বালিশ মাথায় দিয়া শুইলে পিঠের মেরুদণ্ডের সঙ্গে মাথা সমান-রেখায় রাখা যায় না—ঘাড় একটু বাঁকিয়া থাকে ; তার ফলে মুখে নানা দাগ (wrinkles) এবং চিবুকে ভাঁজ পড়ে। চিবুক হয়—যাকে বলে, ডবল্ চিন !

১নং ছবিতে দেখুন উঁচু বালিশে মাথা দিয়া শুইবার ফলে ঘাড় বাঁকিয়া আছে ; চিবুকের প্রান্ত ঝুঁকিয়া আছে ! ইহাতে মুখের শ্রী ও গড়ন বিকৃত হয়। অতএব বালিশ মাথায় দিতে হইলে নরম

১। শক্ত উঁচু বালিশে মাথা

এবং নীচু বা পাতলা বালিশ মাথায় দিবেন। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, মাথায় যদি বালিশ আদৌ না দেন, তাহা হইলে ঘাড় গলা বা চিবুকের গড়ন কোনো কালে বিকৃত হইবে না এবং মুখে একটিও রেখা বা দাগ পড়িবে না।

২। মাথা ঝুলাইয়া

যাঁদের চিবুক দো-ভাঁজ এবং গলা বিশ্রী—যেন গন্ড-গণ্ডে আক্রান্ত,—ব্যায়ামে তাঁরা সে বিকৃতি মোচন করিতে পারেন। সে জন্য ব্যায়ামের বিধি—

১। কৌচে বা খাটে শুইয়া মাথা রাখুন ২নং ছবির ভঙ্গীতে ঘাড়ের কাছ হইতে ঝুলাইয়া। তার পর ধীরে ধীরে মাথাসমেত ঘাড় সামনে-পিছনে তোলা-নামা করুন —যতখানি সম্ভব অর্থাৎ পারেন। এমন ভাবে সামনের দিকে মাথা তুলিবেন, চিবুকের প্রান্তভাগ যেন কণ্ঠ-বিবর স্পর্শ করে ! তার পর আবার পিছন-দিকে মাথা নামান্। দু'চোখ খুলিয়া রাখিবেন (২নং ছবি দেখুন)। তোলা-নামা করিবেন খুব মৃদু ভাবে—তবে এমন ভাবে যে ঘাড়ে ও গলায় যেন চাড় পড়ে ! পাঁচ মিনিট ধরিয়া এ ব্যায়াম করিবেন।

তার পর সিধা খাড়া হইয়া বসুন। এমন ভাবে বসিবেন, তল-পেটের পেশীগুলিতে যেন টান পড়ে এবং চেয়ারের পিঠে যেন মেরুদণ্ডের ভর থাকে ! দুই হাত রাখুন কোলে। এবার মাথা দিন পিছন দিকে হেলাইয়া ৩নং ছবির মতো—যতখানি হেলাইতে পারেন। মুখ খুলিয়া রাখুন। তার পর সামনের দিকে বেশ জোর দিয়া মাথা হেলান—সঙ্গে সঙ্গে মুখ বুজিবেন। তখনি আবার পিছন দিকে মাথা হেলান—পিছন দিকে মাথা হেলাইবার সময় মুখ খুলিবেন। তার পর সামনের

দিকে মাথা হেলানো এবং সঙ্গে সঙ্গে মুখ বোজা। ইহাতে গলায় ও গালের পেশীতে চাড় পড়িবে। এ ব্যায়াম করিবেন পাঁচ মিনিট।

পিছনে মাথা হেলাইয়া

৪। ঘাড় ফিরান্

এবার ৩ নম্বরের ব্যায়াম। উঠিয়া দাঁড়ান—পায়ে-পায়ে ঠেকিয়া থাকিবে না—দু' পা একটু ফাঁক করিয়া দাঁড়াইবেন—দু' হাত রাখুন কোমরের উপর। ঘাড় সিধা রাখিবেন। এবার ডান দিকে যতখানি পারেন, ঘাড় ফিরান—চিবুক যেন ঠিক ডান-কাঁধের উপর পর্য্যন্ত আসে। তার পর বাঁ দিকে ঘাড় ফিরান—এবার চিবুক আসিবে বাঁ কাঁধের উপর পর্য্যন্ত (৪ নং ছবি দেখুন)। এমনি ভাবে এক বার ডান দিকে, পরক্ষণে বাঁ দিকে ঘাড় ফিরাইবেন—খুব জোরে নয় এবং খুব আস্তেও নয়। এ ব্যায়াম করা চাই অন্ততঃ পক্ষে পাঁচ মিনিট।

যাঁদের চিবুক দো-ভাঁজ এবং কণ্ঠ হইয়াছে গণ্ডমালা-ব্যাধিগ্রস্তার মতো, এ ব্যায়ামে তাঁদের চিবুকের ও গলার ভাঁজ সারিবে, গলা হইবে সুন্দর সুশ্রী। এবং যাঁদের এ বিকৃতি ঘটে নাই, এ বিকৃতির আশঙ্কাও তাঁদের থাকিবে না।

শাশুড়ী-বৌ

রসরাজ অমৃতলাল তাঁর "গ্রাম্য-বিভ্রাটে" এক-দল শাশুড়ীর অবতারণা করে তাদের মুখ দিয়ে "বৌ এসে ছেলে পর করে দেওয়া"র রকমারি কৌতুক-দিকটাই দেখিয়েছিলেন। শাশুড়ী যেখানে বৌয়ের উপর পীড়ন করে, সেখানে হাসি-তামাসা মিললেও বহু সংসারে এমন ঘটে যেখানে প্রাণের অজস্র স্নেহ-মমতা দিয়েও শাশুড়ী বৌমার মন পান না! মন পাওয়া দূরের কথা, শাশুড়ীকে বৌমা দেখেন বিষ-নয়নে। বিদুষী বৌমার দলকেও যখন দেখি এ-অভিযোগ থেকে মুক্ত নন্, তখন শিক্ষার উপর ঘৃণা জন্মায়! তবু জিজ্ঞাসা করি, যাঁরা এ অভিযোগ তোলেন, বৌমা পরের ঘরের মেয়ে বলে তাঁরা শুধু তাঁর দোষ দেন কেন? পেটের ছেলে যদি ঠিক থাকে, তাহলে পরের মেয়ে বৌমার সাধ্য কি, শাশুড়ীকে অমান্য বা তুচ্ছ-তাচ্ছল্য করে!

ছেলের বিয়ে দিয়ে ছেলের মা যদি ভাবেন, তাঁর ছেলেটি এখনো বাছা-গোপালের মতো তাঁর আঁচল ধরে নেচে বেড়াবে—এবং তাই ভেবে তিনি যদি ছেলে-বৌয়ের মধ্যে এসে দাঁড়ান, তাহলে তাঁর পক্ষে সেটা খুব অন্যায় হবে। ছেলের বিয়ের পরেও যে-মা ছেলেকে এমনি পুতু-পুতু করেন, বৌকে যেমন তিনি কখনো আপনার করে নিতে পারেন না, তেমনি পেটের ছেলেকেও হারিয়ে বসেন। এই সব শাশুড়ীকে বলি—ছেলে-বৌয়ের বয়সের কথা ভাবুন! নূতন দাম্পত্য-জীবনে তাদের মনে কত সাধ, কত কল্পনা, কত আকাঙ্ক্ষা—দিন্ তাদের সে সাধ-আশা সফল করতে! তাদের নিজস্ব আনন্দের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে যাবেন না! তাদের ছেড়ে দিন—তারা আমোদ-আহ্লাদ করুক!

আর এমন দুঃখিনী শাশুড়ীর ছেলেকে বলি—তুমি কেমন ছেলে বাপু? তোমার স্ত্রী তোমাকে ভালোবাসবেন, আর তোমার মাকে তিনি ভালোবাসবেন না? বৌ চায়, তুমি বৌমার মাকে মাথায় করে রাখবে, তাঁকে মান্য করবে, শ্রদ্ধা করবে—আর তোমার মার বেলায় তিনি সে-মান্য দিতে পারবেন না! এ কেমন কথা! ইংরেজীতে একটা কথা আছে—love me, love my dog—আমায় যদি ভালোবাসো, আমার কুকুরকেও ভালোবাসতে হবে! আর বৌয়ের বেলায়—তিনি স্বামীকে ভালোবাসবেন! আর স্বামীর যিনি মা—কুকুর-বেড়াল নন—তিনি মা! সেই মাকে বৌ ভালোবাসবে না!

বৌয়ের কথায় যে-ছেলে মাকে তুচ্ছ করতে পারে, সে-ছেলেকে তার বৌও দু'দিন পরে তুচ্ছ করবে—সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কারণ, স্ত্রী-জাতি শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে এমন পুরুষকে—যে-পুরুষের মন সবল, সুদৃঢ়! আজ যৌবনের মোহে স্বামীর উপর স্ত্রীর এত প্রগাঢ় ভালোবাসা—এ প্রথম-মোহ কাটলে স্বামীকে সে জানবে দুর্ব্বল-মন অপদার্থ!

শাশুড়ী-বৌয়ে মনের অমিল ঘটছে দেখবামাত্র যে-পুরুষ সচেতন মনে এ মেঘ-মোচনে চেষ্টা করে, তার সংসারে অশান্তি ঘটবে না! উচিত—দু'দিক্ বিচার করে যে-পক্ষের ভুল বা দোষ, সে-পক্ষকে শান্ত ভাবে সুযুক্তি দিয়ে—কোনো দিকে পক্ষপাতিত্ব না করে বোঝানো! তা করতে পারলেই মঙ্গল এবং তাই করা উচিত। কারণ, স্ত্রীকে যেমন ফেলতে পারা যাবে না, মাও তেমনি পরিত্যজ্যা নন্!

মাকে যে-লোক সহ্য করতে পারে না,—দুনিয়ার তার মতো দুর্ভাগা আর কেউ নেই!

শ্রীইন্দিরা দেবী।

সাময়িক প্রসঙ্গ

লর্ড লিন্‌লিথগোর বক্তৃতা

১লা পৌষ লর্ড লিন্‌লিথগো রয়েল এক্সচেঞ্জ ভবনে য়ুরোপীয় বণিক্-সভায় এসোসিয়েটেড চেম্বার অফ কমার্সের বার্ষিক অধিবেশনে এক বক্তৃতা করিয়া গিয়াছেন। এই বক্তৃতায় বর্ত্তমান রাজনীতিক অবস্থার আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি স্বীকার করিয়াছেন, ভারতবর্ষ একটি অখণ্ড দেশ। ইহাকে দুই বা ততোধিক ভাগে বিভক্ত করা সঙ্গত হইবে না। তাঁহার কথা ইহার একতা সম্পাদন করাই ভারত সরকারের অভিপ্রেত। ইহার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি ভারত সরকারের উদ্দেশ্য নহে। এ কথা বৃটিশ রাজনীতিকগণ বরাবরই বলিয়া আসিতেছেন, কিন্তু তাঁহারা যেরূপ সাম্প্রদায়িক নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে এ দেশের শিক্ষিত জনসাধারণের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়াছে যে, তাঁহাদেরই নীতি এবং কার্য্যফলেই ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মনে ভেদ বুদ্ধি গজাইয়া উঠিয়াছে। মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্টে এবং সাইমন কমিশন রিপোর্টে স্বীকৃত হইয়াছে যে, সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন-ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মনে তীব্র ভেদবুদ্ধি গজাইয়া উঠিতেছে। কিন্তু এই সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচক-মণ্ডলী ক্রমশঃ বৃদ্ধি করা হইতেছে। ইহাতে লোকে কি মনে করিতে পারে? এ বিষয়ে প্রকৃত পক্ষে কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তিরই ভিন্নমত হইবার সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা অন্যের প্ররোচনায় ভিন্নমত অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন এবং বিভাগের সমর্থক, তাঁহারা বোধ হয় বুঝেন যে, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি তীব্র হইলে দেশের আর্থিক, সামাজিক, শৈল্পিক, শুল্কনীতি এবং দেশরক্ষা সম্বন্ধে ভিন্নমত আত্মপ্রকাশ করা অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং দেশের মঙ্গল বিনষ্ট হইবেই হইবে। সেই জন্য তিনি কিছু ত্যাগ-স্বীকার করিয়া একতা প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু যে ব্যবস্থার ফলে এই ভেদবুদ্ধি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা তিরোহিত না করিলে কিছুতেই ইহা প্রশমিত হইবে না। তিনিও স্বীকার করিয়াছেন, যে জাতি বিভক্ত, সে জাতি তাহার আবশ্যক কাজ করিতে পারে না। তিনি মুখে একতা প্রতিষ্ঠার কথা বলিয়াছেন, কিন্তু কার্য্যে তাহার পথ সুপ্রশস্ত করা হইতেছে কি? তাহা করিতে হইলে জাতিধর্ম্ম এবং বর্ণ-নির্ব্বিশেষে যোগ্যতারই সমাদর করিতে হয়। বড়লাট তাহা করিতে প্রস্তুত আছেন কি?

লর্ড লিন্‌লিথগো বলিয়াছেন যে, বৃটিশ সরকার যে ক্ষমতা ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন, এ কথা সত্য নহে। ক্ষমতা ত্যাগ করিবার মত অবস্থার সৃষ্টি হইলে তাঁহারা ক্ষমতা ত্যাগ করিতে এখনই প্রস্তুত আছেন। সকল সম্প্রদায়ের ঐকমত্যই সেই অবস্থা। এ ক্ষেত্রে বড়লাট কূট সাম্রাজ্যবাদীদিগের কথারই উদ্গার করিয়াছেন। যেখানে ভিতর হইতে উৎসাহ দিবার জন্য স্বার্থপর ব্যক্তিরা আছেন, সেখানে কল্পান্ত পর্য্যন্ত চেষ্টা করিলেও ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার আশা থাকে না। অগ্রে ক্ষমতা ত্যাগ করিলে পরে একতা প্রতিষ্ঠা সম্ভবে। কানাডার ফরাসী এবং ইংরেজ-বংশধর ঔপনিবেশিকদিগের মধ্যে বিশেষ বিবাদ ছিল। কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর তাহাদের মধ্যে ধীরে ধীরে একতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও হইতেছে। মিশর যত দিন বৃটিশ প্রোটেক্টোরেট ছিল, তত দিন কেবল তথাকার কৈলাহীন এবং একেস্তীর বিবাদ প্রবল হইয়াছিল। তাহা কিছুতেই প্রশমিত হয় নাই। শেষে যখন ১৯২২ খৃষ্টাব্দে মিশরের স্বাধীনতা ঘোষিত হইল এবং জগলুল পাশা জাতীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা করিলেন, তখনই উহা প্রশমিত হইয়াছিল এবং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একতার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তাহার পর সিদ্দিকী পাশার সময় আবার উহা জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা হয়। কিন্তু সে চেষ্টা তেমন সফল হয় নাই। এই উপলক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়র ও ইংরেজদিগের পরস্পর মনোভাব পরিবর্ত্তনও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পণ্যমূল্য যাহাতে আর বৃদ্ধি না পায়, এরূপ কোন ব্যবস্থা করিবার কোন কথাই বড়লাট বলেন নাই। যুদ্ধের সময় অনেক শিল্পজ পণ্য প্রস্তুত হইতেছে, এবং তাহাতে দেশের লোকের ধনাগম হইতেছে; সুতরাং তাহাদের অধিক মূল্য দিয়া জিনিষ কিনিবার শক্তিও জন্মিতেছে, এই কথা বলিয়াই তিনি বিষয়টির আলোচনা শেষ করিয়াছেন। সাময়িক পণ্য উৎপাদনের ফলে কতকগুলি কলওয়ালা এবং কয়েক লক্ষ শ্রমিকের হাতে অধিক অর্থ আসিতেছে সত্য, এবং শ্রমশিল্পপ্রধান স্থানে কিছু অধিক অর্থ অল্প জন কয়েক মাত্র পাইতেছে, কিন্তু এই দুর্দিনে যাহারা বেকার হইয়া পড়িয়াছে, কাগজের অভাবে যে সকল লোকের কর্ম্ম গিয়াছে, যাহাদের আয় অতি অল্প, যাঁহারা পেন্সনভোগী, এরূপ লক্ষ লক্ষ লোকের ক্রয়শক্তি বাড়িয়াছে কি? বরং পণ্যমূল্যের স্ফীতিসাধন (Inflation) ফলে ইহাদের প্রকৃত আয় অনেক হ্রাস পাইয়াছে। আয় বৃদ্ধি অপেক্ষা পণ্যমূল্য বৃদ্ধি যে অধিক হইয়াছে, এ কথা অনেক বিশেষজ্ঞই স্বীকার করিতেছেন। এই দারুণ অন্নকষ্টের দিনে ভারতের বড়লাটের মুখে দরিদ্র লোকরা একটিও আশার বাণী শুনিতে পায় নাই। তিনি পল্লবগ্রাহীর মত কেবল ভাসা-ভাসা কয়েকটি কথা বলিয়াছেন। ঝড়ে, জলোচ্ছাসে যাহারা বিপন্ন হইয়াছে, তাহাদের জন্য তাঁহার মুখ হইতে একটিও সমবেদনার বাণী বাহির হয় নাই। দেশের লোকের উপর সাম্রাজ্যবাদীদিগের সহানুভূতির ইহাই নমুনা!

পণ্যমূল্য বৃদ্ধির প্রসঙ্গ তুলিয়া বড়লাট বলিয়াছেন যে, ইহার জন্য দায়িত্ব দেশের লোকেরও যেমন অধিক, সরকারেরও তেমনই অধিক। দেশের জন কয়েক অদূরদর্শী এবং অশিক্ষিত লোক যাহা করে, তজ্জন্য সমস্ত দেশের লোককে দায়ী করা অসঙ্গত। সত্য বটে, কতকগুলি সঙ্কীর্ণচিত্ত, স্বার্থপর লোক গোপনে অতিরিক্ত পণ্য সঞ্চয় করিতেছে, ফাটকাবাজীর দ্বারা অধিক লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছে, মাল বাঁধি করিতেছে, ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের রৌপ্যমুদ্রা গোপন করিয়াছে,—তাম্রমুদ্রার অদর্শন ঘটাইয়াছে, কিন্তু সাধারণের সেই অসুবিধা ঘটানর জন্য ইহাদিগকে ধরিয়া শাস্তি দেওয়া সরকারের অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। এরূপ সামাজিক অপরাধের শাস্তি সকল দেশেরই সরকার দিয়া থাকেন। বড়লাটের বক্তৃতায় কোন সমস্যারই সন্তোষজনক সমাধান সম্ভব হয় নাই। উহা নৈরাশ্য ও অসন্তোষজনক।

চীন রাষ্ট্রনায়কের দান

চীনদেশের রাষ্ট্রনায়ক চিয়াং কাইসেক এবং তাঁহার পত্নী উভয়ে বাঙ্গালার ঝটিকা-বিধ্বস্ত এবং বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলের বিপন্ন লোকদিগের সাহায্য করিবার জন্য বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তার সাহায্য-ভাণ্ডারে ৫০ হাজার টাকা পাঠাইয়া ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। চীনের সহিত বাঙ্গালার সংযোগ নূতন নহে। ইহা বহু কালের। কিন্তু মধ্যে সেই ঘনিষ্ঠতা হ্রাস পাইয়াছিল। আজ চীন দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। এ সময়ে সপত্নীক চিয়াং কাইসেকের ঐ দান এ দেশের লোককে নিশ্চয়ই চীনের সহিত নিবিড় প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ দেশের শাসকদিগের মধ্যে অনেকে কাজে কিছু করা দূরে থাকুক, মুখে সহানুভূতির একটি বাণীও উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য মনে করেন নাই। বরং বাত্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে অবস্থিত য়ুরোপীয় সৈনিকরা সেই দুরবস্থায় পতিত লোকদিগকে সময়োচিত সাহায্য করিয়াছিল, সে জন্য তাহারা দেশবাসীর ধন্যবাদের পাত্র।

'ডেলী হেরাল্ডে'র মিথ্যাপ্রচার

বিলাতের 'ডেলী হেরাল্ড' সম্প্রতি অতি-ভীষণ মিথ্যার প্রচার করিয়াছেন। ঐ পত্রখানিতে লিখিত হইয়াছে যে, বর্ত্তমান যুদ্ধে জাপান যদি জয়ী হয়, তাহা হইলে কংগ্রেসকে তাহারা ভারত সরকার করিবে অর্থাৎ কংগ্রেসকেই তাহারা ভারতের শাসনযন্ত্র পরিচালনা করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিবে। কোন ইংরেজ সম্পাদক যে এত বড় মিথ্যার প্রচার করিতে পারেন, এ ধারণা এ দেশের লোকের কস্মিনকালেও ছিল না! সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবে কতকগুলি বৃটেনবাসী কিরূপ অসত্য প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন—ইহা তাহার একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। কংগ্রেসের নেতারা স্বৈর-শাসনের আদৌ সমর্থন করেন না। তাঁহারা কোন বিদেশীর অধীন থাকিতেও ইচ্ছা করেন না। মহাত্মা গান্ধীর প্রথম কথা, এক জাতির জন্য জাতিকে শাসন করিবার কোন ন্যায়সঙ্গত বা ধর্ম্মগত অধিকার নাই। সেই জন্য ভারতবাসীরা চীনাদিগের অনুরাগী—জাপানের নহে।

পাইকারী জরিমানায় অবিচার

বিখ্যাত ব্যবহারাজীব ডাক্তার মুকুন্দরাম রাও জয়াকর ব্যবহারশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন। ইনি গোল-টেবিল বৈঠকের, ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটীর সদস্য এবং ফেডারেল কোর্টের এক জন বিচারপতি হইয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, কেবল একটি মাত্র সম্প্রদায়ের উপর পাইকারী জরিমানা আদায় করা আইনসঙ্গত নহে। ইউনাইটেড প্রেস শুনিয়াছেন যে, ঐ ব্যবস্থা আইনসঙ্গত কি না, এলাহাবাদের হাইকোর্টে তাহা পরীক্ষা করিবার আয়োজন হইতেছে। শুনা যাইতেছে, ভারতরক্ষা আইনের নিয়মানুসারে ঐ কার্য্য সমর্থন করা যায় না। বিষয়টা ব্যবহারশাস্ত্র-সম্পর্কিত; সুতরাং ব্যবহারশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিরাই ইহার মীমাংসা করিতে পারেন। আমাদের ধারণা, ইহা দল বা সম্প্রদায়বিশেষকে নির্যাতন করিবার একটি প্রকৃষ্ট উপায়। রাজনীতির আলোচনা হিন্দুদিগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। সকল সম্প্রদায়ের লোকই ইহা করিয়া থাকেন। পাইকারী জরিমানা দোষী-নির্দ্দোষী-নির্বিচারে সকলের উপর ধার্য্য হইয়া থাকে। সে হিসাবে উহা ধর্ম্মনীতির বিরোধী। কোন অপরাধের অনুষ্ঠানই সম্প্রদায়বিশেষের এক-চেটিয়া নহে। জন মর্লি যথার্থই বলিয়াছিলেন যে, কঠোর শাস্তি শান্তি-স্থাপনের পথ নহে,—উহা বোমার পথ। সাম্রাজ্যবাদীরা এই ভ্রান্ত পথ ধরিয়া ভারতে তীব্র অশান্তির পথ প্রশস্ত করিতেছেন।

দল-নিরপেক্ষ সম্প্রদায়ের বিবৃতি

ভারতের দল-নিরপেক্ষ রাজনীতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক বিশিষ্ট রাজনীতিক আছেন। যাহা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে হয়, ইঁহারা তাহাই বলিয়া থাকেন। বৃটিশ জাতির সহিত সৌহার্দ্য অক্ষুন্ন রাখিয়া ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জন ইঁহাদের প্রধান কাম্য। গত ২৬শে হইতে ২৮শে অগ্রহায়ণ এলাহাবাদে ইঁহাদের মধ্যে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি সম্মিলিত হইয়া ভারতের এই অচল অবস্থার সমাধান করিবার কথা আলোচনা করিয়াছেন। এই উপলক্ষে তাঁহারা যে বিবৃতি দিয়াছেন, কেবলমাত্র স্বার্থান্ধ সাম্রাজ্যবাদিগণ ব্যতীত পৃথিবীর আর সকল নিরপেক্ষ ব্যক্তিই তাহার সারবত্তা স্বীকার করিবেন। সত্য বটে, ভারত সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নয়নে ধূলি নিক্ষেপ করিবার জন্য সরকার বিভিন্ন প্রদেশের তথাকথিত মন্ত্রিসভায় অধিকাংশ ভারতীয় সদস্য নিযুক্ত করিয়াছেন,—কিন্তু তাহাতে অবস্থার বিন্দুমাত্রও উন্নতি ঘটে নাই, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা শাসন-ব্যবস্থায় ঘোর অবনতিই ঘটিয়াছে। মন্ত্রিসভার সদস্যগণ সরকারেরই মনোনীত। সরকারই তাঁহাদিগকে অপ্রত্যাশিত ভাবে অধিক বেতন দিতেছেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহারা সরকারের মনের মত কথা বলিবেন, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় আর কি আছে? উর্দ্দী পরিয়া সভাশোভন হইয়া বসা ভিন্ন তাঁহাদের জন্য কোন কাজ আছে কি না, আমরা তাহা জানি না। হয়ত কিছু আছে। কিন্তু আসল কাজ এবং শাসন-নীতির পরিচালন যে সিভিলিয়ানরাই করিতেছেন, তাহা কাহারও বুঝিতে বাকি থাকে না। দল-নিরপেক্ষ রাজনীতিক পরিষদের কার্য্যকরী সমিতিও বলিয়াছেন যে, "এই যুদ্ধের সময় আইনের শাসনের পরিবর্ত্তে খেয়ালখেয়ালী হুকুম-নামার (ordinance) রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।" উক্ত সমিতি আরও বলিয়াছেন যে, "প্রায় শত বর্ষ পূর্ব্বে যখন বৃটিশ-সম্রাজ্ঞী ভারত-শাসনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন,—তখনকার তুলনায় এখনকার অবস্থা বরং কোন কোন বিষয়ে অধিকতর মন্দ হইয়াছে।" "ভারতরক্ষা আইন ভারতরক্ষা ব্যাপারের সহিত প্রত্যক্ষ সম্পর্কশূন্য ব্যাপারেও প্রযুক্ত হইতেছে। সাধারণ মামলার বিচারও সাধারণ আদালতের বহির্ভূত করা হইতেছে। অর্ডিনান্সগুলি ব্যবস্থা পরিষদের অনুমোদিত ত নহেই, অধিকন্তু, সেগুলি শাসন-পরিষদের অনুমোদনেরও অপেক্ষা করে না।" ফলে দল-নিরপেক্ষ পরিষদের কার্য্যকরী সমিতি ভারতের বর্ত্তমান অবস্থার দোষের কথা স্পষ্ট ভাবেই বিবৃত করিয়াছেন। লর্ড লিনলিথগো এই দলের কোন ব্যক্তিকে বন্দী কংগ্রেস-নেতৃগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি দেন নাই,—বা কোন বন্দী কংগ্রেস-নেতাকে এই সমিতিতে উপস্থিত হইবার অনুমতি দেন নাই।

ইহাতে স্বতঃই মনে হয়,—এই অচল অবস্থার সমাধান করা যেন সরকারের অভিপ্রেত নহে। জিন্না আমন্ত্রিত হইয়াও আসেন নাই। সকলে ত সরকারের ক্রোধ বা অসন্তোষ উপেক্ষা করিয়া কাজ করা সঙ্গত মনে করেন না। হিন্দুসভার এক জন বিশিষ্ট সদস্য এই সমিতির প্রথম দিনের অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন,—কিন্তু পরে যোগ দেন নাই। ভারতের তথাকথিত ছয়টি স্বায়ত্ত-শাসিত প্রদেশের গবর্ণরই সিভিলিয়ানদিগের সাহায্যে স্বৈর-শাসন চালাইতেছেন। সাম্রাজ্যবাদীরা তাহার উত্তরে বলেন যে, ঐ অঞ্চলের নির্ব্বাচিত সদস্যগণ কাজ ছাড়িয়া দিয়াছেন বলিয়াই ত? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, স্বাধীন ভাবে সাধারণের হিতসাধন-কল্পেই দেশের এবং দশের কাজ করিবার জন্য ত ব্যবস্থা-পরিষদে যাওয়া? না, কেবল 'যে-আজ্ঞার' ঝুড়ি লইয়া সভাসীন হওয়া সঙ্গত? বৃটিশ সরকার প্রথম হইতেই এক বুলি ধরিয়াছেন যে, ভারতবাসীর মধ্যে সর্ব্ব সম্প্রদায়ের মতের একতা হইলেই তাঁহারা ভারতবাসীর হস্তে ক্ষমতা ছাড়িয়া দিতে পারেন; অন্যথা নহে। কংগ্রেস বলিতেছেন যে, বৃটিশ সরকার ক্ষমতা ছাড়িয়া না দিলে সর্ব্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা সম্পাদন সম্ভব হইবে না। কংগ্রেসের এই কথাই আমাদের সমীচীন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বৃটিশ সরকার সে কথা মোটেই শুনিতেছেন না। সেই জন্য ভারতের দল-নিরপেক্ষ ধীরপন্থী রাজনীতিকরা একবাক্যে বলিতেছেন যে, যাহাতে মীমাংসা করিবার সুবিধা ঘটে, সরকার সেরূপ উপায় অবলম্বন করিতে সম্মত হইতেছেন না। তাঁহারা এখনও স্পষ্ট ভাষায় এমন কথা বলিতেছেন না যে, যদি মীমাংসা হয়, তাহা হইলে ক্ষমতা ত্যাগ করিবেন এবং ভারতবাসীকে অষ্ট্রেলিয়ার ন্যায় স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার দিবেন। কংগ্রেসের মতই যে অভ্রান্ত, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

বিডন ষ্ট্রীট পোষ্টাফিসে ডাকাতি

গত ২৮শে অগ্রহায়ণ সোমবার বেলা আড়াইটার সময় বিডন ষ্ট্রীট পোষ্টাফিসে ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ১২ জন যুবক পোষ্টাফিস-গৃহের ভিতর আচম্বিতে যাইয়া বোমাবর্ষণ করিতে থাকে। পাঁচটি বোমা ফাটিয়া পোষ্টাফিসের ছয় জন কর্ম্মচারীকে অল্লাধিক আহত করে। পোষ্টাফিসের কাঠের রেলিংএ আগুন ধরাইয়া দিয়াছিল, কিন্তু উহা শীঘ্রই নিবাইয়া ফেলা হয়। চারিটি বোমা ফাটে নাই। সহরের কর্ম্মকেন্দ্রের মধ্যস্থলে দিবালোকে এরূপ দুঃসাহসিক দস্যুতা আর কখনও অনুষ্ঠিত হয় নাই। দস্যুরা প্রায় দেড় হাজার টাকার খুচরা নোট লইয়া চম্পট দিয়াছে। ইহারা দুই-তিন মিনিটের মধ্যে কাজ সারিয়া চলিয়া যায়। কাহারা এই দস্যুতা করিল, তাহা কিছুই জানিতে পারা যায় নাই। ইহাদের এই কার্য্যের কারণ রাজনৈতিক, কি অর্থনৈতিক, তাহাও বুঝা যাইতেছে না।

মূল্যনিয়ন্ত্রণ কি জন্য?

সরকার কি দেশের লোকের জন্য মূল্যনিয়ন্ত্রণ করিতেছেন? যদি তাঁহারা তাহা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সে চেষ্টা যে সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। গত ২১শে অগ্রহায়ণ দিল্লীতে ভারত সরকারের এড্‌ভাইসরী পেনেল অব একাউণ্টসের অধিবেশনে ভারত সরকারের রাজস্ব-সচিব সার জেরেমি রেইসম্যান্ বলিয়াছেন—"ভারত সরকার প্রধানতঃ সামরিক প্রয়োজনে মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। দেশের লোকের জন্য উহা করা গৌণ উদ্দেশ্য হইতে পারে।" * * "হংকং, মালয় এবং প্রাচ্যখণ্ডের দেশগুলি হস্তচ্যুত হইবার পর হইতে স্পষ্ট বুঝা গিয়াছে যে, ভারতকে সম্মিলিত শক্তিবর্গের অস্ত্র-নির্ম্মাণের স্থান এবং অস্ত্রাগার করিতে হইবে এবং বিভিন্ন রণক্ষেত্রে যে সমস্ত বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বস্তু সরবরাহ করা হইতেছে, তাহা নির্ম্মাণের স্থানে পরিণত করিতে হইবে। ফলে দিন দিন ঐ নানাবিধ জিনিষের চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে, যোগান অপেক্ষা টান ক্রমশঃ অত্যন্ত বাড়িয়া যাইতেছে! আরও একটি কঠিন সমস্যা কম জটিল নহে। সামরিক ঠিকা লাভ করিয়া ঠিকাদারেরা যাহাতে অধিক লাভ করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা-সম্পাদন। এই ক্ষেত্রে যাহাতে আমরা ন্যায্য এবং সঙ্গত মূল্যে জিনিষ পাইতে পারি, তাহার একটা উপায় বাহির করিয়াছি, কিন্তু সে বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করিতে না পারিলেও কতকটা অগ্রসর হইয়াছি। এই সম্বন্ধে পণ্যের যে মূল্য ধার্য্য হইয়াছে, তাহা ঠিক হইল কি না, ঠিকাদারদিগের হিসাব দেখিয়া এবং কারবারে যে অর্থ নিয়োগ করা হইয়াছে, তাহার উপর সঙ্গত লাভের কথাও বিবেচিত হইতেছে। এই সম্পর্কে শেষ উপায় হইতেছে যে, সরকার আইন অনুসারে যে ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহারা সরকারের ধার্য্য মূল্যে পণ্য প্রস্তুত করিতে কারবারীদিগকে বাধ্য করিতে পারেন, তবে যে ক্ষেত্রে তাহারা নিতান্তই ঐ মূল্যে পণ্য যোগাইতে নারাজ হইবে, সেই ক্ষেত্রেই সরকার ঐ ক্ষমতার প্রয়োগ করিবেন।" এ কথাগুলি ভারত সরকারের রাজস্ব-সচিবের উক্তি। সুতরাং নিশ্চয়ই সত্য। কতকগুলি পণ্যের মূল্য কেন অত্যধিক বৃদ্ধি পাইতেছে, রাজস্ব-সচিবের কথায় তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। সমরক্ষেত্রে প্রায় সকল রকম জিনিষের প্রয়োজন হয়। এই বিশ্বজোড়া সংগ্রামের বিশাল ক্ষেত্রে ভারতীয় পণ্য যথাসম্ভব প্রেরিত হইতেছে। কাজেই ভারতীয় নাগরিকদিগের জন্য পণ্যের অভাব লক্ষিত হইতেছে। সরকার সকল শ্রমশিল্পজ পণ্যই নিজ হাতে রাখিতেছেন, অথচ রাজপুরুষগণ hoarding hoarding বলিয়া চীৎকার করিতেছেন,—কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্! ইহাতে একটা কথা বেশ বুঝা গেল। সরকার তাঁহাদের নিয়ন্ত্রিত মূল্যেই কন্‌ট্রাক্টরদিগের নিকট হইতে পণ্য লইবেন; সাধারণে সে মূল্যে পণ্য পাইবেন কি না, তাহার দায়িত্ব সরকারের নহে!

ব্রহ্মদেশ পুনরধিকার

ব্রহ্মদেশ পুনরধিকৃত করিবার জন্য বৃটিশ সরকারের চেষ্টার আর অন্ত নাই। কিন্তু জাপানীরা যে উহা সহজে ছাড়িবে, তাহার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। অচির ভবিষ্যতে ব্রহ্মদেশ লইয়া তুমুল যুদ্ধ হইবে এবং ইহার জন্য ব্যয়-বাহুল্যের সীমা থাকিবে না! এ ব্যয়ভার বহন করিবে কে? 'ট্রিবিউন' পত্রিকার বোম্বাইস্থিত বিশেষ সংবাদদাতা সংবাদ দিয়াছেন যে, ব্রহ্মদেশ যখন ভারতের সীমান্ত, তখন

ব্রহ্মদেশ পুনরধিকারের ব্যয় ভারত সরকারের তহবিল হইতে দিতে হইবে। বর্ত্তমান যুদ্ধের ব্যয় বাবদ কত অংশ বৃটিশ সরকার দিবেন আর কত অংশ ভারত সরকারকে দিতে হইবে, সেই সম্বন্ধে ভারত সরকারের সহিত বৃটিশ সরকারের কথা হইতেছে শুনিয়াছি; এই জন্যই না কি ভারত সরকারের রাজস্ব-সচিব সার জেরেমি রেইসম্যানকে বিলাত যাইয়া আসিতে হইয়াছিল। এখন শুনা যাইতেছে, ব্রহ্মদেশ পুনরধিকারের সমস্ত ব্যয়ভার আর্থিক মেরুদণ্ডহীন ভারতকেই বহিতে হইবে। এই সংবাদে বোম্বাই প্রদেশে লোকের মনে চাঞ্চল্য জন্মিয়াছে। সংবাদটি সম্পূর্ণ সত্য না হইতেও পারে,—তবে ব্যয়ের একটা মোটা অংশ ভারতকে দিতে হইবে বলিয়াই মনে হয়। ব্রহ্মকে যখন ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত করা হইয়াছিল, তখন উহা পুনরধিকারের ব্যয় ভারতকে দিতে হইবে কেন, এই যুক্তিমূলক প্রতিবাদ কেহ শুনিবে না। সংবাদ কত দূর সত্য, তাহা আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে বাজেটের সময়েই পাকাপাকি ভাবে জানা যাইবে।

বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অধিবেশন

১৭ই হইতে ১৯শে পৌষ বিজ্ঞান-কংগ্রেসের ৩০তম অধিবেশন কলিকাতা সায়েন্স কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। অধিবেশনের প্রারম্ভে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং পরে অধ্যাপক ওয়াদিয়া তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। এক জন যুবক প্রথমে মঞ্চোপরি উঠিয়া পূর্ব্ব-নির্ব্বাচিত সভাপতি পণ্ডিত জওহরলালজীর অভিভাষণ পাঠের দাবী জানাইলে ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায় বলেন, পণ্ডিতজীর অভিভাষণ তাঁহাদের হস্তগত হয় নাই। উহা পাইবার জন্য কোন চেষ্টা করা হইয়াছিল কি না, প্রশ্ন করিলে ডাক্তার শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহা বলেন যে, এই সভায় বোধ হয় আমা অপেক্ষা পণ্ডিতজীকে কেহ ভাল জানেন না। ডাক্তার শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মিত্র তখন সেই যুবককে তাঁহার উক্তি প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করেন। যুবক সেই প্রস্তাবে অসম্মত হন। কিছুক্ষণ কথা-কাটাকাটির পর যুবক বলেন যে, যদি সরকার পণ্ডিতজীর অভিভাষণ পাঠ করিতে নিষেধ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সরকারের নীতির নিন্দা করিয়া এই কংগ্রেস প্রস্তাব গ্রহণ করুন। ডাক্তার রায় বলেন, এই কথা বলিবার কোন কারণ নাই। যুবকটি অতঃপর বলেন যে, যেখানে এইরূপ অবস্থা, সেখানে পণ্ডিত নেহরুর প্রতিকৃতি পুষ্পশোভিত করিয়া রাখা সঙ্গত নহে। উহা তাঁহার প্রতি অসম্মানজনক; এই বলিয়া তিনি নেহরুর প্রতিকৃতিটি লইয়া ঐ স্থান হইতে চলিয়া যান। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বহু যুবক ঐ সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহাতে অনুমান হইতেছে যে, বিজ্ঞান-কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষ পণ্ডিত নেহরুর অভিভাষণ পাইবার চেষ্টা করিয়াও তাহা পান নাই। পণ্ডিতজীকে সরকার রাজনীতিক অপরাধী বলিয়া মনে করিয়া তাঁহার রাজনীতিক কার্য্য বন্ধ করিবার জন্য তাঁহাকে আটক রাখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বৈজ্ঞানিক আলোচনায় বাধা দিবার সঙ্গত কারণ নাই। রাজনীতিক কারণে বিজ্ঞান-আলোচনার বাধা হওয়া সঙ্গত নহে। অধিবেশন সমাপ্তির সময় নিখিল ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষ আগামী বর্ষেও পণ্ডিতজীকে ঐ কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়া ভালই করিয়াছেন। আশা করি, সরকার আগামী বার পণ্ডিতজীকে বিজ্ঞান-কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করিতে দিবেন। বিজ্ঞান-কংগ্রেসের সাধারণ কমিটী জানাইয়াছেন যে, সরকারের মনোভাব বুঝিবার জন্য তাঁহারা আগামী জুন মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবেন। আশা করি, তৎপূর্ব্বে সরকারের সুবুদ্ধির উদয় হইবে।

বিজ্ঞান-কংগ্রেসে সভাপতির অভিভাষণে মিষ্টার ওয়াদিয়া পৃথিবীর খনিজ-সম্পদের বিষয় বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, ভারতে খনিজ-সম্পদের অভাব নাই। কিন্তু ভারতবর্ষ স্বায়ত্ত-শাসনশীল নহে বলিয়া তাহার খনিজ-সম্পদের যেরূপ সদ্ব্যবহার হওয়া সঙ্গত, সেরূপ হইতেছে না। ফলে, ভবিষ্যতে ভারতে তাহার প্রয়োজনীয় খনিজ-সম্পদেরও অভাব হইতে পারে। আজ আমরা যে পয়সার অভাব অনুভব করিতেছি, তাহাতেই বর্ত্তমান যুগের যুদ্ধে খনিজ-সম্পদের প্রয়োজন উপলব্ধি হয়। এক জন বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কারফলে বিহারে লৌহ উত্তোলিত হইতেছে। এই বিষয়ে বিহারের বিশেষ সুবিধাও আছে। কারণ, বিহারে লৌহ ও কয়লা উভয়ই সহজপ্রাপ্য। টাটার বিরাট্ কারখানার জন্য যে লৌহ উত্তোলিত হইতেছে, তাহার তুল্য লৌহ যে ভারতের অন্য স্থানেও নাই, এমন বলা যায় না।

খনিজ-সম্পদ্ উত্তোলিত করিবার অধিকার বিদেশীরা পাইয়াছে। যেমন ব্রহ্মে পেট্রল কোম্পানী, ইরাণে অ্যাংলো-পার্শিয়ান অয়েল কোম্পানী। বিদেশী কোম্পানী ঐ কাজে কোটি কোটি টাকা লাভ করিয়াছেন। এই সকল বিদেশী প্রতিষ্ঠান যে টাকা উপার্জ্জন করিয়াছে, সে টাকা যদি দেশে থাকিত, তবে তাহাতে কৃষিপ্রধান দেশ শিল্পপ্রধান হইতে পারিত। আমরা যে ব্রহ্মের কথা বলিতেছি, তাহার কারণ, যে সময় ঐ বিদেশী প্রতিষ্ঠান ব্রহ্মে পেট্রল উত্তোলনের অধিকার লাভ করেন, তখন ব্রহ্ম ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ দেশে কয়লার খনির অনেকগুলি বিদেশীদিগের অধিকৃত।

পৃথিবীতে ধাতুর ব্যবহার কিরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা মিষ্টার ওয়াদিয়া দেখাইয়াছেন—দুইটি জার্ম্মাণ-যুদ্ধের মধ্যবর্ত্তী কালে মানুষ যে পরিমাণ ধাতব পদার্থ ব্যবহার করিয়াছে, আর কখনও সে পরিমাণ ব্যবহার করে নাই। আমরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধেই অধিক অবহিত। এ দেশের খনিজ সম্পদ্ বিদেশের প্রয়োজনে ব্যয়িত হইয়া আমরা নিঃস্ব না হই, সে দিকে লক্ষ্য রাখা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। পশুবধ ও কৃষিকার্য্যে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে করিতে মানুষ যে বর্ত্তমান যুগের মানবে পরিণত হইতে পারিয়াছে—ধাতু ও অন্যান্য খনিজ-দ্রব্য লাভই তাহার প্রধান কারণ। কিন্তু এই উন্নতির জন্য পৃথিবীর খনিজ-সম্পদ্ ভাণ্ডার ব্যবহার করিবার চেষ্টায় মানুষ সেই ভাণ্ডারের সঞ্চয় বহু পরিমাণে নষ্ট করিয়াছে।

ভারতবর্ষে যে লৌহ পরিষ্কৃত করিবার শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহার অনুসন্ধানও প্রয়োজন; এবং সেই অনুসন্ধান-কার্য্য সফল হইলে পৃথিবীর উপকার হইতে পারে। দিল্লীর প্রসিদ্ধ লৌহ-স্তম্ভের লৌহ যাহারা পরিষ্কৃত করিয়াছিল, তাহারা হিন্দু। তাহার পর যে তরবারি—ডামাস্কসের বলিয়া পৃথিবীতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, তাহা যে ভারতে প্রস্তুত হইত, তাহারও ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই বিশাল দেশের খনিজসম্পদ্

সম্পর্কে এখনও আবশ্যক অনুসন্ধান হয় নাই। আসামে যে পেট্রল পাওয়া যায়, তাহা জানা গিয়াছে। এখন সে বিষয়ে ভারতবর্ষকে স্বাবলম্বী করিবার কোন উপায় হইতে পাবে না কি?

মিষ্টার ওয়াদিয়া তাঁহার অভিভাষণে আটলান্টিক চার্টারের একটি দফা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—উহাতে বলা হইয়াছে, পৃথিবীর সকল দেশের উপকরণে সকল রাষ্ট্রের তুল্যাধিকার থাকিবে। কিন্তু সে কল্পনা যে পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রে শান্তির ও সম্প্রীতির সময়ের, তাহা বলা বাহুল্য। যে দেশের কোন খনিজ-সম্পদ অধিক, সেইরূপ অবস্থা ব্যতীত কখনও সে অন্য রাষ্ট্র হইতে অন্য খনিজ-সম্পদ আনিয়া—বিনিময়ে আপনার অভাব পূর্ণ করিতে পারে না। ভারতে টিন, টাংশষ্টেন, গ্রাফাইট, দস্তা প্রভৃতির যেমন অভাব, তেমনই লৌহ, ম্যাঙ্গানীজ, ক্রোমিয়াম প্রভৃতির প্রাচুর্য্য আছে। সুতরাং সুব্যবস্থার বিনিময়ে ভারতবর্ষ তাহার অভাব পূরণ করিতে পারে। কিন্তু যুদ্ধের সময়েও দেখা গিয়াছে, পূর্ব্ব-শিক্ষার অভাব থাকিলেও এ দেশে নানারূপ সমর-সরঞ্জাম প্রস্তুত করা সম্ভব হইয়াছে। তাহাতে বুঝা যায়—আবশ্যক ব্যবস্থা হইলে এ দেশ নানা বিষয়ে অনায়াসে—স্বল্পায়াসে স্বাবলম্বী হইতে পাবে।

কিন্তু সে ব্যবস্থা কে করিবে?

দেখা গিয়াছে, ভারতের বিদেশী সরকার সে ব্যবস্থা করেন নাই।

অশোভন ঘটনা

১১শে পৌষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-গৃহে ষ্ট্যাটিসটিক্যাল কনফারেন্স আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে এক অপ্রীতিকর কাণ্ড ঘটিয়াছিল। ডাঃ শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায় সম্মেলনের উদ্বোধন করিবেন এবং শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার উহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। বিধান বাবু গাড়ী হইতে নামিলে জন কয়েক যুবক একটা পটকা নিক্ষেপ করে ও তাঁহাকে আক্রমণ করে। বিধান বাবুর মোটর-চালক বাধা দিতে যাইয়া আহত হয়। তাহারা নলিনী বাবুর গাড়ীতেও উঠে, কিন্তু কোনও ক্ষতি করিতে পারে না। বিধান বাবু পরে বলিয়াছেন, ঐরূপ ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয়-গৃহে ঘটিয়াছে ইহা পরিতাপের বিষয়। আমি আশা করি, আক্রমণকারীরা কেহই বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কিত লোক নহেন।" বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে এরূপ ব্যাপার নিশ্চয়ই লজ্জাজনক। হয়ত ইহা বিজ্ঞান-কংগ্রেসের ব্যাপারের উপসংহার।

সভাপতি তাঁহার বক্তৃতায় বলেন—"রাজনীতিক স্বাধীনতার অভাবে এ পর্য্যন্ত আমাদিগের জাতিগঠনমূলক কার্য্যাবলী ব্যাহত হইয়াছে। কিন্তু আমি আমাদিগের রাজনীতিক অবস্থার বিশেষ উন্নতির লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি। এই উন্নত অবস্থায় আমরা স্বাধীন ভাবে যুদ্ধের পর আমাদিগের অর্থনীতিক ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিব। উন্নতির চেষ্টায় আমাদিগের সুচিন্তিত পরিকল্পনা থাকা দরকার। এ জন্য সামাজিক ও অর্থনীতিক জীবনের বহু বিষয়ের সংখ্যাতত্ত্ব একান্ত প্রয়োজন। সংখ্যাতত্ত্ব পরিকল্পনার ভিত্তি-স্বরূপ।"

ভারতীয় অচল অবস্থা সম্বন্ধে খৃষ্টানদিগের মত

লণ্ডনস্থ খৃষ্টান বান্ধব-সমিতি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, "ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা সম্পাদনের উপায় না করিয়া কেবল তাহাদের মধ্যে মতের একতা স্থাপন করিতে বলা বাজে কথা মাত্র। এই প্রকারে মিটমাটের উপায় বন্ধ করিয়া দেওয়াতে খৃষ্টান মিশন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। সেই জন্য আমরা আটক নেতাদিগের সহিত তৃতীয় দলের কথাবার্ত্তা কহিবার পথে বাধা অপসারিত করিবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেছি। মিটমাট করিবার পথ এরূপ ভাবে অবরুদ্ধ করা যে খৃষ্টানদিগের জনমতের প্রতিকূল, সে কথা সরকারকে বুঝাইয়া দিবার জন্য আমরা আমাদের খৃষ্টান ভ্রাতাদিগের সহযোগিতা লাভ একান্ত প্রার্থনা করি।" কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী লর্ড লিন্‌লিথগোই রাজাগোপাল আচারিয়া ও সার তেজবাহাদুরের সহিত গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতাদের সাক্ষাৎ করিতে না দিয়া মীমাংসার অন্তরায় হইয়াছেন। জাতীয় শান্তি সমিতির কর্ম্মচারীরাও ঐরূপ অনুরোধ করিয়া বড়লাটকে তার করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন অনুরোধে কোন ফল হয় নাই—হইবেও না।

লোকের কলিকাতা ত্যাগ কি সত্য?

বড়লাটের শাসন-পরিষদের বেসামরিক দেশরক্ষা বিভাগের সদস্য স্যার জে, পি, শ্রীবাস্তব দিল্লী হইতে ঘোষণা করেন, "কলিকাতা ছাড়িয়া লোক যে রেলপথে এবং পদব্রজে চলিয়া যাইতেছে, ইহা জনরবমাত্র, সত্য নহে—একেবারেই মিথ্যা।" বড়লাটের শাসন-পরিষদের অপর সদস্য শ্রীযুক্ত মাধব শ্রীহরি এনি ১৮ই পৌষ মাদ্রাজে পৌছিয়াই কিন্তু বলেন, "লোকজন যে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যাইতেছে না এ কথা ঠিক নহে। কতক লোক চলিয়া যাইতেছে, তবে মোটের উপর কলিকাতার নাগরিকগণ যথেষ্ট সাহসেরও পরিচয় দিয়াছেন।" কলিকাতায় জাপ-আক্রমণের সময় উড়িষ্যার প্রধান-সচিব এবং তাঁহার দুই জন সহ-সচিব কলিকাতায় ছিলেন। প্রধান-সচিব পারলাকিমেদির মহারাজা ২০শে পৌষ কটকে ফিরিয়া এক বক্তৃতায় কলিকাতাবাসীকে ব্যঙ্গ করিয়া বলেন, গোটা-দুই বোমা পড়িতেই দলে দলে লোক কলিকাতা ছাড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া তিনি লজ্জায় মরিয়া গিয়াছেন! তিনি সিদ্ধান্ত করেন, "নগর হইতে এই প্রকার পলায়ন যে পঞ্চমবাহিনীর কারসাজি, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পঞ্চমবাহিনীই লোকের উৎসাহ নষ্ট করিয়া দিয়াছে।" ইহার যোগ্য উত্তরে 'ষ্টেটসম্যান' বলিয়াছেন, "পর্য্যাপ্ত অন্ন এবং সুখ-সুবিধার পর্য্যাপ্ত সুব্যবস্থার উপর জনসাধারণের উৎসাহ নির্ভর করে। যে দেশের জনসাধারণ যুদ্ধের হেতু এবং শান্তির উদ্দেশ্যের কথা বেশী জানে, তাহাদের পক্ষেও এ কথা সত্য। এ যুদ্ধ সম্বন্ধে যে দেশবাসীর নির্দ্দিষ্ট কোন সুদৃঢ় সঙ্কল্প নাই, পূর্ব্ব অভিজ্ঞতায় অনভিজ্ঞ সে দেশবাসীকে মাতৃভূমি প্রভৃতির দোহাই দিয়া কষ্ট এবং বিপদ বরণ করিতে যেখানে বলা হয়, সেখানে এ কথা আরও সত্য।"

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গোলযোগ

এবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন-সভায় মুসলমান ছাত্রগণের ব্যবহারে ছাত্রসমাজ লজ্জিত ও বিক্ষুব্ধ হইয়াছেন। সার ইস্‌মাইল মির্জ্জাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষই সমাবর্ত্তন-সভায় উপদেশ

দানের জন্য আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন। সে হিসাবে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং বঙ্গবাসীর অতিথি। মুসলমানগণ অতিথির সহিত কখনই অসদ্ব্যবহার করেন না।

কিন্তু ঢাকার মুসলমান ছাত্রগণ তাঁহাদের সেই সর্ব্বজন-প্রশংসিত কৃষ্টি বর্জ্জন করিয়াছেন দেখিয়া আমরা দুঃখিত। ইহার পূর্ব্বে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন-সভায় বক্তৃতায় সার ইস্মাইল মির্জ্জা দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিলেন যে, ভারতবাসী সকলেই এক জাতি। মিষ্টার জিন্না এবং তাঁহার চেলা-চামুণ্ডারা যে হিন্দু এবং মুসলমান, এই দুই বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীকে দুইটি বিভিন্ন জাতি মনে করেন,—ইহা তাঁহাদের ভুল। সে ভুল লজ্জাজনক। ঢাকাতে সার মির্জ্জা সেই কথা বলিবেন বুঝিয়া, মিষ্টার জিন্নার মতাবলম্বী কতিপয় মুসলমান ছাত্র তাঁহার বক্তৃতাস্থল কার্জ্জন হলে কোন মুসলমানকে প্রবেশ করিতে দেন নাই। কয়েক জন মাত্র অতি কষ্টে ঠেলাঠেলি করিয়া তথায় উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন। ঢাকা অঞ্চলের এই সকল মুসলমান ছাত্র কি স্বাধীনতা চাহেন না? তাঁহারা স্বাধীন ভাবে কাহাকেও ব্যক্তিগত মতামত ব্যক্ত করিবার অধিকার প্রদানেও নারাজ? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডক্টর এম, হাসান এবং রেজিষ্ট্রার খাঁ বাহাদুর নসিরুদ্দীন আমেদ অতিকষ্টে কোনরূপে ঐ সমাবর্ত্তন-সভায় উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন। মুসলমান ছাত্রগণের এই আচরণে ব্যথিত হইয়া সার আবদুল হালিম গজনভী এবং খাঁ বাহাদুর এস, এম, জান বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। সার মির্জ্জা ঢাকা সমাবর্ত্তন-সভায় বলিয়াছেন, একতার উপরই ভারতের ভাগ্য নির্ভর করিতেছে। যুদ্ধের সময় ভারতের শিক্ষা ব্যাহত করা সঙ্গত নহে। তাঁহার কথাগুলি সারগর্ভ এবং প্রণিধানযোগ্য। কিন্তু ইহা মিষ্টার জিন্নার অসহ্য!

—

বাঙ্গালায় জাপানের বিমান আক্রমণ

অনেক দিন হইতে লোক যাহার আশঙ্কা করিতেছিল, তাহা সহসা সত্যে পরিণত হইয়াছে। ৪ঠা, ৫ই ও ৬ই পৌষ জ্যোৎস্না-রাত্রিতে জাপানীরা বিমানপথে কলিকাতা অঞ্চল আক্রমণ করে। ৬ই পৌষ ভারতের যৌথ সামরিক ইস্তাহারে প্রকাশ, কোন আক্রমণই প্রবল হয় নাই। হতাহতের সংখ্যা অল্প। আক্রমণের সময় কলিকাতায় সতর্ক হইবার জন্য সঙ্কেতধ্বনি করা হইয়াছিল এবং জঙ্গী বিমানগুলি উপরে উঠিয়াছিল। ৮ই পৌষ মধ্যরাত্রিতে জাপানী বিমান দুই দলে বিভক্ত হইয়া আবার কলিকাতা অঞ্চলে কতকগুলি বোমা ফেলিয়াছিল। সামান্য কয়েক জন হতাহত হইয়াছিল। বিমান-বিধ্বংসী কামানগুলি হইতে শত্রু-বিমানের উপর গুলী বর্ষিত হয়। বৃটিশ পক্ষের লড়াইয়ে বিমান শত্রু-বিমানগুলিকে বাধা দিবার জন্য আকাশে উঠিয়াছিল। একখানি জাপানী বিমান জ্বলন্ত অবস্থায় ভূপতিত হয় এবং কয়েকখানি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঐ রাত্রিতে কলিকাতা সহরে শত্রুবিমান চতুর্থ বার বোমাবর্ষণ করে এবং আক্রমণ-সঙ্কেত দীর্ঘ সময়ব্যাপী হইয়াছিল। উহারা অত্যন্ত উর্দ্ধ আকাশপথে আসিয়াছিল। একটি গির্জ্জার প্রাঙ্গণে একটা বোমা পড়িয়াছিল। কোন বাড়ীর বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। ঐ দিনের আক্রমণে এন্টি-পার্শন্যাল বোমা বর্ষিত হয়। এই বোমা কেবলমাত্র খোলা জায়গায় অবস্থিত লোকদিগের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয়। ইহাতে বুঝা যায়, লোকের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করাই শত্রুপক্ষের প্রধান উদ্দেশ্য। ১১ই পৌষ জাপানীরা পুনরায় কলিকাতা অঞ্চলে বোমাবর্ষণ করে। এ পর্য্যন্ত কলিকাতা অঞ্চলে ৫ বার জাপানী বিমান আক্রমণ হইয়াছে। ঐ সম্বন্ধে সরকারী সংবাদ প্রচারে অসঙ্গত বিলম্ব ঘটিয়াছে। ইহাতে ইংরেজ-সম্পাদিত 'ষ্টেটস্‌ম্যান' পর্য্যন্ত অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং সরকারী ইস্তাহারের সঠিকত্বের (precision) অভাব দেখিয়া সরকারের ঐ নীতির নিন্দা করিয়াছেন। ২৭শে ডিসেম্বর আবার উক্ত পত্র লিখিয়াছেন, বড়দিনের পূর্ব্বরাত্রিতে কলিকাতাতে যে বিমান আক্রমণ হইয়াছিল, তাহার সরকারী ইস্তাহার ১২ ঘণ্টা পরেও কোন সংবাদপত্র-আফিসে পৌঁছে নাই। তাহার পর যাহা পৌঁছিয়াছিল, তাহা অতি সামান্য—কেবলমাত্র চল্লিশটি শব্দে সমাপ্ত। ইহাতে অত্যন্ত অতিরঞ্জিত কথা দায়িত্বহীন লোকের মুখে প্রচারিত হয় এবং সকলে তাহা বিশ্বাস করে। কলিকাতায় দ্বিতীয় বিমানাক্রমণের পর-দিবস, ৭ই পৌষ, পূর্ব্ববঙ্গেও দুই স্থানে আক্রমণ হয়। ঐ দিন অপরাহ্নে ফেণী অঞ্চল এবং রাত্রিতে চট্টগ্রাম অঞ্চল আক্রান্ত হয়। ফেণী অঞ্চলের উপর বৃটিশ বিমান-বাহিনীর সহিত জাপ বিমানের লড়াই হয়। প্রকাশ, অন্ততঃ পক্ষে একখানি জাপ বিমান ধ্বংস এবং কয়েকখানি জাপ বিমানের ক্ষতি হইয়াছে। চট্টগ্রামে হতাহতের সংখ্যা ও ক্ষতির পরিমাণ অধিক হয় নাই বলিয়া সামরিক কর্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন।

—

ভারতে মার্কিণী রাষ্ট্রদূত

মার্কিণ যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেন্ট মিষ্টার রুজভেল্ট ভারতের প্রকৃত আর্থিক এবং রাজনীতিক অবস্থা জানিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইয়াছেন। সেই জন্য তিনি বার বার নূতন প্রতিনিধিকে ভারতে পাঠাইতেছেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি মিষ্টার জনসন্ এবং মিষ্টার ফিসারকে তাঁহার প্রতিনিধি করিয়া ভারতে পাঠাইয়াছিলেন। এবার আবার তিনি মিষ্টার উইলিয়ম ফিলিপসকে ভারতের বার্ত্তা লইবার জন্য এ দেশে পাঠাইয়াছেন। ইহাতে মনে হয় যে, তিনি যেন ঠিক অবস্থা জানিতে পারিতেছেন না বলিয়া তাঁহার সংশয় হইয়াছে। মিষ্টার ফিলিপস দিল্লীতে ভারতীয় সাংবাদিকদিগের সম্মেলনে বলিয়াছেন যে, তিনি ভারতের কথা জানিতে আসিয়াছেন। বড়লাট, পঞ্জাব, বোম্বায়ের লাট প্রভৃতির সহিত তিনি আলাপ করিয়াছেন। দিল্লীতে থাকিয়া আমলাতান্ত্রিক ভারতের আমলাদিগের সহিত তিনি কথাবার্ত্তা অনেক করিয়াছেন। উহা অবশ্য এক পক্ষের কথা। অপর পক্ষের কথা যাঁহারা বলিতে পারেন, সরকার তাঁহাদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের সহিত মিষ্টার ফিলিপস কারাগারে দেখা করিবেন কি না, তাহা তিনি স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। ভারত সরকার তাঁহাকে সে সুযোগ দিবেন কি না, বলা কঠিন। এরূপ অবস্থায় ভবিষ্যতে ভারতের রাজনীতিক ব্যবস্থা কি করা হইবে, তাহা তিনি বুঝিবেন কি করিয়া? বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের পর ভার্সাইয়ের সন্ধির সময় মার্কিণের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্ট উইলসনের যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল, এবার এই সার্ব্বত্রিক যুদ্ধের পর সন্ধির সময় হয়ত প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের অবস্থা সেরূপ না হইতে পারে,—কিন্তু তিনি সাম্রাজ্যবাদের মদিরায় মত্ত হইবেন কি না, কে বলিতে পারে?

—

ভারত সরকারের অসাফল্য

ভারত সরকার এই যুদ্ধের সময় পণ্য-মূল্য—বিশেষতঃ সাধারণের অবশ্য-ব্যবহার্য্য পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রিত করিতে যাইয়া যেরূপ অসাধারণ অক্ষমতা প্রকটিত করিয়া বসিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। একটা বিস্তীর্ণ দেশের সরকার যে এই কার্য্য করিতে অক্ষম হইবেন,—ইহা কখনই পূর্ব্বে কেহ বিশ্বাস করিতে পারিত না। যাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া রৌদ্রে পুড়িয়া, জলে ভিজিয়া,—ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া ফসল উৎপাদন করিয়াছে, তাহাদের এবং তাহাদের দেশের লোকের জন্য পর্য্যাপ্ত ফসল না রাখিয়া বৃটিশ জাতির খাস উপনিবেশ সিংহলে চাউল চালান দেওয়া যে কোন্ নীতির অনুমোদিত হইল, তাহা বুঝা যায় না। তাহার পর নয়া দিল্লীতে ভারত সরকারের রাজস্ব-সচিব সার জেরেমী রেইস্‌ম্যান্ যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছে, ভারতবর্ষ হইতে সমস্ত রণক্ষেত্রের জন্য রসদ সরবরাহ করিতে হইতেছে বলিয়া সরকারকে নিজ প্রয়োজনে ভারতে যন্ত্রশিল্পজ পণ্য অধিক পরিমাণে রাখিতে হইতেছে। সে জন্য সাধারণ নাগরিক-দিগের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্যের বিশেষ অভাব ঘটিয়াছে। কিন্তু ভারত হইতে কেবল যন্ত্রশিল্পজ পণ্যই রণক্ষেত্রে যাইতেছে না; খাদ্যদ্রব্যও অনেক চালান যাইতেছে। সে জন্যও খাদ্যশস্যের অনাটন ঘটিবার সম্ভাবনা। এরূপ অবস্থায় দেশের লোককে বঞ্চিত করিয়া সিংহলে বা অন্য কোন দেশে অসামরিক প্রয়োজনে খাদ্যশস্য চালান দেওয়া কি উচিত? চীন দেশেও আজ পাঁচ বৎসর যুদ্ধ চলিতেছে। সে দেশেও সরকার অতিরিক্ত নোট প্রচলিত করিয়াছেন। সে দেশের লোকেরা খাদ্যশস্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছে। সে দেশেও খাদ্যশস্যের অভাব লক্ষিত হইয়াছে! কিন্তু তাহা হইলেও তথাকার সরকার কেমন সুন্দর ভাবে পণ্য-মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন, তাহা অবশ্যই সরকার জানেন! চীন সরকার যেরূপ বিবেচনার সহিত এই কার্য্য পরিচালিত করিতেছেন,—ভারত সরকারের তাহা বিশেষ করিয়া প্রণিধান করা কর্ত্তব্য। চীন সরকার ৪৫ কোটি চীনা-ডলার মূলধন করিয়া মূল্য-নিয়ন্ত্রণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, আর এখানে ভারত সরকারের এ বিষয়ে কোন সুচিন্তিত পরিকল্পনাই নাই। উভয় দেশের মধ্যে এরূপ পার্থক্য হয় কেন?

ভারত সরকারের উপেক্ষা

ভারত সরকার এই যুদ্ধের সময় লোকমত কিরূপ উপেক্ষা করিতেছেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়! আজ প্রায় ছয় মাস কাল ভারতের বাজারে তামার পয়সার দেখা নাই, সে জন্য সাধারণের যে ঘোর কষ্ট হইতেছে, তাহা সকলেই জানেন। উহার প্রতিকার করিবার জন্য সরকারকে বার বার অনুরোধ করা হইলেও সরকার তাহার প্রতিকার করেন নাই। ক্রমশঃ দেখা যাইতেছে যে, আধ-আনি, আনি, দু-আনি, সিকি, আধুলিও অন্তর্হিত হইয়া প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ অসম্ভব করিয়াছে। সরকার বলিতেছেন, তাঁহারা প্রতিমাসে ৭ কোটি টাকার খুচরা বাজারে ছাড়িতেছেন, লোকে উহা সঞ্চয় করিতেছে। সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে যে, ভারত সরকার ভারতীয় টাকশালে অষ্ট্রেলিয়ার জন্য তামার পয়সা প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেছেন। বঙ্গীয় জাতীয় বণিক্-সভা সরকারের ঐ কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। উহাতে কোন ফল হইবে বলিয়া মনে হইতেছে না। সরকারের উদ্দেশ্য কি, তাহা আমরা জানি না! তাঁহাদের এই আচরণে আমরা স্তম্ভিত! যদি তাঁহাদের কোন উদ্দেশ্য থাকে, তাহা কখনই সুফল প্রদান করিবে না।

সিকান্দার হাইয়াৎ খাঁ পরলোকে

পঞ্চনদ প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা সার সিকান্দার হাইয়াৎ খাঁ ৫১ বৎসর বয়সে ১১ই পৌষ পরলোক গমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে তাঁহার জন্ম। নবাব সার লিয়াকৎ হায়াৎ খাঁ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি প্রথমে আলিগড়ের কলেজে, পরে লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি ১৯২১ খৃষ্টাব্দ হইতে পঞ্জাবের ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য ছিলেন।

সিকান্দার হাইয়াৎ খাঁ

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি পঞ্চনদ গবর্ণরের শাসন-পরিষদের সদস্য মনোনীত হন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি পঞ্জাব সরকারের রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রীর কার্য্য প্রাপ্ত হন। ১৯৩২ এবং ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে তিনি পঞ্চনদ প্রদেশের অস্থায়ী গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং কিছু দিনের জন্য নিখিল ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডেপুটি গবর্ণরও হইয়াছিলেন। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি পঞ্চনদ প্রদেশের প্রধান-মন্ত্রীর পদ লাভ করিয়াছিলেন। সামরিক ব্যাপারেও তাঁহার অনেকটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। মন্ত্রিত্ব করিবার সময় তিনি দূরদর্শিতার পরিচয় এবং সাম্প্রদায়িক ঐক্য-প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হইতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেল-কর্ত্তৃপক্ষের অনুষ্ঠিত সামাজিক সম্মেলনে তিনি বলিয়াছিলেন—রেলওয়ে বিভাগের পদস্থ কর্ম্মচারিগণ যদি তাঁহাদের

নিজ নিজ বিভাগে সাম্প্রদায়িক ভাব বর্জন করিয়া সার্ব্বজনীন মঙ্গলের এবং সমদর্শিতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করেন, তাহা হইলে সত্বরই এই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হইবে।

বিজয়চন্দ্র মজুমদার পরলোকে

সুচিন্তাশীল সাহিত্যিক—সন্ধ-প্রতিষ্ঠ কবি—শিক্ষাব্রতে আত্মনিবেদিত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় ৮২ বৎসর বয়সে ১৫ই পৌষ সুদীর্ঘ কালের সাহিত্য-সাধনা সমাপন করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। যৌবনে তিনি কবি বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি উকিল ও কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্যের পরামর্শদাতা ছিলেন। পরিণত বয়সে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরূপে এবং অধুনালুপ্ত 'বঙ্গবাণী' মাসিকপত্র-সম্পাদনে প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। জীবনের শেষে ২৫ বৎসর তিনি দৃষ্টিশক্তি হারাইলেও তাঁহার সাহিত্য-সাধনা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তাঁহার রচিত 'যজ্ঞভস্ম' শ্রীজয়দেব-বিরচিত গীতগোবিন্দ ও বৌদ্ধগাথার সুমধুর পদ্যানুবাদ তাঁহার কবিকীর্ত্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। 'প্রাচীন সভ্যতা' গ্রন্থে তিনি ভারত—মিশর—আরব—চীন প্রভৃতি সুপ্রাচীন দেশের গৌরব-সমুজ্জ্বল সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় প্রদান করিয়া—প্রাচীন অধিবাসিবৃন্দ যে আর্য্য-জাতির সন্তান, তাহা সুপ্রমাণিত করিয়াছিলেন। ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, সমাজ বিজ্ঞান, ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার বহু প্রবন্ধ বিভিন্ন মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। হিন্দু আইন সম্বন্ধে এবং ঐতিহাসিক গবেষণাপূর্ণ তাঁহার কয়েকখানি ইংরেজী গ্রন্থও বিশেষ সমাদৃত। তিনি কবিবর দ্বিজেন্দ্রলালের সুহৃদ ও কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের বন্ধু ছিলেন। তাঁহার সুচিন্তিত প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন মাসিকপত্র হইতে সঙ্কলিত—প্রকাশিত হইলে বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হইবে।

হিন্দু মহাসভার অধিবেশন

১৩ই হইতে ১৫ই পৌষ কাণপুরে হিন্দু মহাসভার ২৪তম অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুত বিনায়ক দামোদর সাভারকর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। অভিভাষণ-সূচনায় বীর সাভারকর মসলেম লীগের পাকিস্থানের দাবীর বিরোধিতা করিতে হিন্দু মহাসভার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করিয়া বলেন, "হিন্দুস্থানের অখণ্ডতা ক্ষুণ্ণ হইলে তাহার স্বাধীনতার কোন অর্থই থাকে না। বৃটিশ শাসনের মত পাকিস্থানও যদি আমাদের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলেও আমরা স্বাধীনতা-সংগ্রামের অধিকারে বঞ্চিত হইব না। মুসলমান-প্রধান উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মুসলমানদিগকে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিতে দিলে বিশেষ ক্ষতি হইবে না বলিয়া যাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহারা এই পরিকল্পনার সামরিক তাৎপর্য্য যেন উপলব্ধি করেন, ইহা আত্মঘাতী নীতি মাত্র। পাকিস্থানের পর পাঠানিস্থানের দাবীও সম্ভব হইতে পারে। ইহা নিশ্চয়ই ভ্রান্ত ধারণা যে, সম্মিলিত দাবী হস্তগত হইবামাত্র ইংলণ্ড ভারত ত্যাগ করিবে। কংগ্রেস, মসলেম লীগ, হিন্দু মহাসভা সকলের সম্মিলিত দাবী যে বৃটেন পূর্ণ করিবে, এমন আশা নাই। ভারতে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ বলিয়া জাতি;—মুসলমানগণ সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় মাত্র। মুসলমানরা পাকিস্থানের জিদ ধরিয়া বিরোধিতা করিলে তাঁহাদের সহযোগিতার প্রত্যাশা না করিয়া হিন্দুরা ভারতের অখণ্ডতা রক্ষার সংগ্রাম চালাইয়া যাইবেন। আমারা সকল জাতির সমান অধিকারের স্বরাজ চাই।"

এই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য (১) সমর-বিভাগে হিন্দু সংখ্যাধিক্য বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা শতগুণ বৰ্দ্ধিত করিতে হইবে। (২) বড়লাটের শাসন-পরিষদ, আইনসভা, দেশরক্ষা সমিতি, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি রাজনৈতিক ও প্রজাধিকার কেন্দ্রগুলি অধিকার করিতে হইবে। (৩) হিন্দুর প্রজাধিকার-পরিপন্থী সকল চেষ্টার বিরুদ্ধাচরণ করিতে হইবে। (৪) মহাসভার সদস্য-সংখ্যা শতগুণ বৃদ্ধি করিতে হইবে। (৫) ৫ বৎসরের মধ্যে দেশ হইতে অস্পৃশ্যতা সম্পূর্ণ দূর করিতে হইবে।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুত লক্ষ্মীপৎ সিংহানিয়া তাঁহার ভাষণে বলিয়াছেন,—মুসলমানদিগকে সর্ব্বদা সুবিধা দিয়া আপোষের চেষ্টা হইয়াছিল বলিয়া কংগ্রেসকে দোষী করা ঠিক হইবে না। সর্ব্বপ্রকার অজুহাত ও অতীতের ভুল-ভ্রান্তির কথা বিবেচনা করিয়া অধিকতর উদারনীতি অবলম্বন করাই হিন্দু মহাসভার কর্ত্তব্য।

১৫ই পৌষ ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্থানের অখণ্ডতা রক্ষা সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া বলেন যে, "বর্ত্তমান সময়ে ভারতে যে অচল অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার জন্য বৃটিশ সরকারই দায়ী। তাঁহারা নানা ওজর-আপত্তি করিয়া ভারতের এই ন্যায়সঙ্গত দাবী অস্বীকার করিয়া আসিতেছেন। যখন সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ এবং ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত-শাসন-আইন ভারতের অমতে ভারতের স্কন্ধে চাপান হইয়াছিল, তখন ঐ সকল অজুহাতের কথা উঠে নাই। ভারতবাসীরা কোন বৈদেশিক শাসনেরই পক্ষপাতী নহেন। তাঁহারা ভারতবাসী কর্ত্তৃকই ভারত-শাসন চাহেন। বৃটিশ সরকার ভারতবাসীর হস্তে ক্ষমতা দিতে সম্মত, এ কথা মিথ্যা। যে ব্যবস্থায় ভারতের অখণ্ডতা বিসর্জ্জন দিতে হইবে, হিন্দু মহাসভা তাহা গ্রহণ করিতে পারেন না। পাকিস্থানের প্রস্তাব গৃহীত হইলে ভারতের স্বাধীনতা-প্রাপ্তির আশা চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইবে।" কথা সত্য। হিন্দুসভা সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার্থ তাঁহাদের সহিত সহযোগিতা করিয়া সর্ব্ববিধ যুক্তিযুক্ত ব্যবস্থা করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত—এ জন্য তাঁহারা একটি কমিটী নিয়োগ করিয়াছেন। মহাসভা কোন সম্প্রদায়েরই কোনরূপ ন্যায়সঙ্গত এবং যুক্তিসঙ্গত অধিকারই ক্ষুণ্ণ করিতে চাহেন না। পাকিস্থান প্রস্তাব পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদিগের উদ্ভাবিত। তাঁহাদেরই স্বার্থ-সাধনের একটা হেয় কল্পনা! উহা ভারতবর্ষকে চিরদাসত্বে বন্ধন করিবার কূট কৌশল। স্থূলবুদ্ধি সাধারণ লোকও তাহা বুঝে। তবে পাকিস্থানপন্থী জন কয়েক মুসলমান যে কেন তাহা বুঝেন না, তাহা বলা কঠিন। বৃটিশ সরকার যে পাকিস্থান প্রস্তাবের সহায়তা করিতেছেন, তাহা ক্রীপস্ প্রস্তাবেই সুপ্রকাশ। হিন্দুস্থানের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য হিন্দু মহাসভা এক সক্রিয় আন্দোলন উপস্থিত করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন। এই আন্দোলন-সম্পর্কে মহাসভার সাধারণ সম্পাদক ডাঃ বি, এস, মুঞ্জে বলিয়াছেন যে, "প্রত্যেক প্রদেশে ১ লক্ষ "রামসেনা" গঠন করিতে হইবে। সৈন্যবিভাগে যোগদান ও শিল্পের প্রসার সম্পর্কে মহাসভার নীতির কোন পরিবর্ত্তন হইবে না।" তাঁহারা কেবলমাত্র হিন্দুদিগের উপরই পাইকারী জরিমানা আদায়ের ব্যবস্থার জন্য কেন্দ্রী ও প্রাদেশিক সরকারের নিন্দা করিয়াছেন। আগামী বারে পঞ্চনদ প্রদেশের অমৃতসর সহরে হিন্দুসভার বার্ষিক অধিবেশন হইবে।

বিক্ষোভ, বোমাবিস্ফোরণ ও গুলীবর্ষণ

সংবাদপত্র—২৮শে—বিহারের 'সার্চ লাইট' পত্রের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য বিহার সাংবাদিক-সঙ্ঘের দাবী। হবিগঞ্জে (আসাম) 'পল্লীবাসী' পত্রের সম্পাদক শ্রীযুত সুবোধকুমার রায়ের ৩ মাস কারাদণ্ড। ২৯শে—ঝাঁসীর 'হিন্দুকেশরী' পত্রের সম্পাদক মিঃ মহম্মদ শের খাঁ গ্রেপ্তার। তেজপুরে 'আসামসেবক' পত্র আফিস তল্লাস। ৩০শে—পুণার দৈনিক সংবাদপত্র 'লোক-শক্তির' জামানত বাজেয়াপ্ত, প্রেস ক্রোক। ১লা পৌষ—লাহোরের 'প্রতাপ' পত্রের মালিক ও তাঁহার পুত্রের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত। ২রা পৌষ—বোম্বাইএর ২৪খানি, সুরাটের ৩খানি এবং আমেদাবাদের সমস্ত সংবাদপত্রের প্রকাশ বন্ধ। ১৬ই, দিল্লীর 'হিন্দুস্থান টাইমসের' সম্পাদক শ্রীযুত দেবদাস গান্ধী এবং 'হিন্দুস্থান' পত্রের সম্পাদক শ্রীযুত মুক্তিবিহারী বর্ম্মের প্রতি নির্দেশ যে, জনবিক্ষোভ সংক্রান্ত সকল সংবাদ সহকারী প্রেস-এডভাইসারের মঞ্জুরী লইয়া প্রকাশ করিতে হইবে। দিল্লীর উর্দ্দু দৈনিক পত্র 'ডেলি তেজের' যুগ্ম সম্পাদক-মুদ্রাকর ও প্রকাশক গ্রেপ্তার। ২১শে, নিখিল ভারত সম্পাদক সম্মিলনের নির্দ্দেশে এবং সংবাদ প্রকাশ সম্বন্ধে সরকারী নিয়ন্ত্রণের প্রতিবাদস্বরূপ 'ষ্টেটসম্যান' ও 'নবযুগ' ব্যতীত ভারতের সর্ব্বত্র জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র সমূহের এক দিনের জন্য হরতাল। ২৩শে, বোম্বাইএর মারাঠী দৈনিক সংবাদপত্র 'নবকালের' সম্পাদক মিঃ জিঃ, ডি, মহাশব্দে গ্রেপ্তার। বোম্বাইএর 'জন্মভূমি' প্রেসের জামানতের কিয়দংশ বাজেয়াপ্ত। ২৪শে, আপত্তিকর সংবাদ প্রকাশের অভিযোগে মিঃ এম, জে, রামলিঙ্গম্ দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত।

লুণ্ঠনাদি—২৯শে অগ্রহায়ণ—বোম্বাইএ জনতা কর্ত্তৃক এক খাদ্যশস্য-ভাণ্ডার লুণ্ঠন, ৮০ জন গ্রেপ্তার। ৩০শে—মধ্য-প্রদেশের রামটেক ট্রেজারি তহশীল আফিস লুণ্ঠনাদির অভিযোগে ৮৮ জন অভিযুক্ত। কাটোয়ায় বেঙ্গল ব্যাঙ্কের গুদাম ও কাটোয়া গৌরাঙ্গপাড়ায় ৪।৫ শত লোক কর্ত্তৃক এক আড়তের প্রায় ৪০০ বস্তা ধান্য ও চাউল লুণ্ঠন। ১লা পৌষ—বোম্বাই প্রদেশের নাগেশ-কুলকরণী গ্রামের প্রায় ২০ একর জমির ফসল লুণ্ঠন। বেলগাঁওএ এক স্থানে মেল-ব্যাগ লুণ্ঠন। চিখালীর (সুরাট) জীবনজী লালভাইএর গৃহে ১ শত জনের হানা, ৫ হাজার টাকার সম্পত্তি লুণ্ঠন। ৩রা—ঢাকায় এক মদ ও মনোহারী ব্যবসায়ীর দোকানে লুণ্ঠনের চেষ্টা। ৫ই—জনতা কর্ত্তৃক সিরাজগঞ্জের তালগাছী হাট লুঠ, প্রায় ২৫ হাজার টাকার ক্ষতি। ৫ই, সরিষাবাড়ীর (ময়মনসিংহ) নিকটবর্ত্তী রামনগর হাটে কাপড়ের দোকান লুঠ। খুলনা জিলার বরাতিয়া গ্রামাঞ্চলের বহু জমি হইতে পাকা ধান চুরি। ৬ই—পাবনার বাজারে দোকান লুঠের চেষ্টা। ১১ই—থানা জিলার (বোম্বাই) খেতিবাড়ী গ্রামের বাজার হইতে খাদ্যদ্রব্য লুণ্ঠিত, ৩৭ জন গ্রেপ্তার। ১৪ই, আমেদাবাদের গোধরা তালুকে সরকারী পণ্য-ভাণ্ডার ভস্মীভূত। রাজস্ব-আদায়কারীকে প্রহার করিয়া অর্থাদি লুণ্ঠিত। পাতদী রাজ্যের এক ব্যবসায়ীর মজুত ছোলা ও বিবিধ শস্য ভস্মীভূত। ১৩ই, হুগলী জিলায় চাঁপাডাঙ্গায় এক হাট লুঠ, পুলিসের গুলীবর্ষণ, ১ জন নিহত, ১০।১২ জন আহত। ১৫ই, ভুধরগড় তালুকের ট্রেজারী লুঠের চেষ্টার অভিযোগে ৪০ জন গ্রেপ্তার। নওগাঁ সহরে (রাজসাহী) জনৈক ব্যবসায়ীর নৌকা হইতে ধান লুঠ, ইহার পক্ষকাল পূর্ব্বে আসানগঞ্জ হাট লুঠের চেষ্টা নিষ্ফল। ১৬ই, দিনাজপুর জিলার কাহারোল হাটে যাইবার পথে সশস্ত্র এক দল লোক কর্ত্তৃক বস্ত্রাদিপূর্ণ ৭খানি গরুর গাড়ী লুণ্ঠিত।

বাঙ্গালা—কলিকাতা—২৮শে অগ্রহায়ণ বিডন ষ্ট্রীট ডাকঘর হইতে ১ হাজার টাকা লুণ্ঠিত, ৪ জন সরকারী কর্ম্মচারী আহত। ৩০শে—৩ স্থানে তল্লাসী। ১লা পৌষ—১২ স্থানে তল্লাসী। আপত্তি-কর পত্রাদি রাখিবার জন্য ৪ জন দণ্ডিত। ২রা—১০।১২ স্থানে তল্লাসী। ৩রা—সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী রোড ও চৌরঙ্গী রোডের মোড়ের নিকট প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। ৪ঠা—ল্যান্সডাউন রোড ও রাসবিহারী এভিনিউর সংযোগস্থলে ট্রামগাড়ী আক্রান্ত, ড্রাইভার আহত। কোন ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারী ভারতরক্ষা বিধির ১২৯ ধারা অনুসারে ধৃত, জনৈক উকীল ও ছাত্রের গৃহে তল্লাসী। ৬ই—ডালহৌসী স্কোয়ারের নিকট লায়ন্সরেঞ্জে দুইটি বোমা বিস্ফোরণ। টালীগঞ্জে প্রতাপাদিত্য রোড ও রসারোডের মোড় এবং বালীগঞ্জের ট্রাম-ডিপোয় ট্রাম আক্রান্ত, রাসবিহারী এভিনিউর এক বিলাতী মদের দোকানে কয়েকটি বোমা নিক্ষেপ। ৭ই—কলিকাতা ও সহর-তলীতে প্রকাশ্যে তরবারি, ছোরা, বর্শা, লাঠী, বন্দুক বা কোন অস্ত্রশস্ত্র লইয়া চলাফেরা নিষিদ্ধ। ৮ই—লোয়ার সার্কুলার রোডে এক সামরিক কর্ম্মচারীর গৃহ হইতে ৪টি বিভলভার ও ১৪৬২ টাকা অপহৃত। ১৭ই,—মধ্য-কলিকাতার ৩ স্থানে তল্লাসী, ৫ জন গ্রেপ্তার। ১৯শে—দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংসের প্রবেশ পথে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং সংখ্যাবিজ্ঞান সম্মিলনের সভাপতি শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকারের প্রতি পটকা নিক্ষেপ, যুবক দল কর্ত্তৃক ডাঃ রায় আক্রান্ত, নলিনী বাবুকে আক্রমণের চেষ্টা। ২২শে, ৫।৬ স্থানে তল্লাসী। ২৪শে, নানা স্থানে তল্লাসী, ৯ জন গ্রেপ্তার।

ঢাকা—২৮শে অগ্রহায়ণ—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্র ভারতরক্ষা বিধি অনুসারে গ্রেপ্তার, ঢাকার প্রসিদ্ধ ব্যায়ামবিদ্ শ্রীযুত নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ঢাকা সহরে আটক। ৭ই পৌষ, নরিন্দা থানায় বোমা নিক্ষেপ। কোপুনগর য়ুনিয়নের চৌকীদারী ট্যাক্স আদায় করিতে গিয়া সরকারী কর্ম্মচারী প্রহৃত, কয় জন গ্রামবাসী অভিযুক্ত। ৯ই, ঢাকা সহরের জনসন রোডে এক রেস্তোরায় দুইটি বোমা নিক্ষেপ। ১৩ই—ঢাকা সহরের নবাবপুর রোডে এক দল যুবক কর্ত্তৃক আবগারী দোকান আক্রমণ, ৩ জন গ্রেপ্তার। ব্রাহ্মণকিতা গ্রামে শ্রীমনো-রঞ্জন রায় ভারতরক্ষা বিধি অনুসারে গ্রেপ্তার। ২২শে—এক সিনেমা-গৃহের সম্মুখে বিস্ফোরণ, ৫ জন আহত।

ময়মনসিংহ—২রা পৌষ—হিজলী বন্দিনিবাস হইতে পলাতক কম্যুনিষ্ট কর্ম্মী পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী গৌরীপুরে গ্রেপ্তার। ১৩ই—মুক্তাগাছার এক হাঙ্গামা সম্পর্কে স্কুলের ছাত্র উপেন্দ্রমোহন সাহা ও চিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্য্য প্রত্যেকে দেড় বৎসর এবং ননীগোপাল সান্যাল ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। ১৬ই—টাঙ্গাইলে এক বৎসর সভা ও শোভাযাত্রাদি নিষিদ্ধ।

দার্জ্জিলিং—শিলিগুড়ির কংগ্রেসকর্ম্মী প্রতুলকুমার মৈত্রেয়, ডাঃ বরদাকান্ত ভট্টাচার্য্য এবং অপর এক জন কর্ম্মীর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।

মুর্শিদাবাদ—৩০শে অগ্রহায়ণ, কমরেড গৌর বাগচী গ্রেপ্তার। কমরেড নির্ম্মলেন্দু বাগচী ও ছাত্রকর্ম্মী শৈলেন বিশ্বাসের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ।

নোয়াখালি—১লা পৌষ ট্রেণে পুলিশের হেপাজত হইতে বিচারাধীন বন্দী নবগোপাল ভৌমিকের পলায়ন। ৫ই, সেনবাগ থানায় দুইটি লাইসেন্সবিহীন দেশী বন্দুক প্রাপ্তি, এক জন গ্রেপ্তার। ২৩শে—বিমানঘাঁটার কার্য্যে বাধাদানের জন্য পূর্ত্তবিভাগের কুলীদিগকে আক্রমণ, মোটর গাড়ীগুলির ক্ষতি এবং ৫০ জন কুলীকে আহত করিবার অভিযোগে তিন জন মুসলমান দণ্ডিত।

খুলনা—৫ই পৌষ, খুলনা কালেক্টরীর ইংলিস অফিসের রেকর্ডে অগ্নিসংযোগ।

নদীয়া—৩রা পৌষ, মেহেরপুরের ফরওয়ার্ড ব্লকের সম্পাদক রমেশ গোস্বামীর গ্রেপ্তারের জন্য ৫০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা। ৮ই, মুড়াগাছার রেলওয়ে সম্পত্তি নষ্ট করিবার অভিযোগে গোপেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও অপর কয় জন গ্রেপ্তার, নবদ্বীপের বিশিষ্ট কর্ম্মী শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য গ্রেপ্তার।

যশোহর—২৭শে অগ্রহায়ণ—বিশিষ্টা কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীমতী মনোরমা বসু ৬ মাসের জন্য যশোহর সহরে আটক। ৫ই পৌষ—ট্রেণে অগ্নিদানের সম্পর্কে এক জন গ্রেপ্তার। ৮ই, ঝিনাইদহ থানার নগেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত।

ফরিদপুর—২৭শে অগ্রহায়ণ—জিলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক এবং অপর ৪ জন আটক। গোয়ালন্দ মহকুমা কংগ্রেসের কর্ম্মী হরেন্দ্রনাথ ঘোষ গ্রেপ্তার। মাদারীপুরের খালিয়া য়ুনিয়নের প্রেসিডেণ্ট দ্বিবিকানাথ বড়োরী গ্রেপ্তার। ১লা পৌষ—ভাঙ্গা থানা এলাকার ৮ জন হিন্দু ভদ্রলোকের বন্দুকের লাইসেন্স নাকচ।

পাইকারী জরিমানা—ফরিদপুর জিলার গোঁসাইঘাট থানার অধীন কয়েক স্থানের অধিবাসীদিগের উপর এক হাজার টাকা, দার্জ্জিলিং ও ময়মনসিংহ জিলার আংশিক শাসন-সংস্কার বহির্ভূত অঞ্চলের উপরেও পাইকারী জরিমানা, অর্ডিন্যান্স প্রয়োগ, ঢাকার ৮টি মৌজায় ২০ হাজার টাকা ধার্য্য। পুনরায় বেলডাঙ্গার অধিবাসীদিগের উপর ২ হাজার টাকা পাইকারী ট্যাক্স ধার্য্য, ইহার মধ্যে শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষের প্রতি ১ হাজার টাকা দিবার আদেশ। ঢাকা জিলার তালতলা বাজারের অধিবাসীদিগের উপর ধার্য্য ৩০০০৲ টাকার মধ্যে ২১৮২।০ আদায়।

বোম্বাই—২৮শে অগ্রহায়ণ—কাফি ক্লাবে বোমা বিস্ফোরণ, কয় জন সৈনিক আহত, অপরাধীদিগকে গ্রেপ্তারের জন্য ৫ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা। এক দল পুলিশের উপর বোমা নিক্ষেপ, ৩ জন গ্রেপ্তার। ২৯শে—গিরগাঁওএর এক ডাকঘরের নিকট বোমা বিস্ফোরণ, ১ জন আহত, ৪ জন গ্রেপ্তার। ঐ স্থানে একটি তাজা বোমা প্রাপ্তি। বোম্বাই সহরের উত্তরাংশের এক কারখানায় বোমা বিস্ফোরণ, বোমা প্রস্তুতের এক বড়যন্ত্র আবিষ্কার, এক লৌহ কারখানার মালিক ও অপর ৩ জন গ্রেপ্তার। সিরওয়ারে রেলওয়ে ষ্টেশন আক্রমণ, জনতা কর্ত্তৃক প্রহরীদিগের নিকট হইতে বন্দুকাদি সংগ্রহ। ষ্টেশনে অগ্নিদান। ৩০শে—পাঁচ স্থানে পুলিশের গুলীবর্ষণ, ১ জন আহত, ১২ জন গ্রেপ্তার। স্বাস্থ্য বিভাগের এসিষ্টাণ্ট ডিরেক্টারের আফিসের দ্রব্যাদি ও কাপড়ের বাজারে কাপড়ের গাঁইটে অগ্নিসংযোগ। বেলগাঁওএ ১৮খানি গ্রামের দপ্তর ভস্মীভূত। ১লা পৌষ—আমেদাবাদে ৫ স্থানে বিস্ফোরণ। এক স্থানে দুইটি বালিকা আহত। দুইটি চৌরা ভস্মীভূত। কয়রা জিলার চারিখানি গ্রামের কয়েক জন লাইসেন্সধারীর বন্দুকগুলি অপহৃত। ধুলিয়া সহরের তিন স্থানে বিস্ফোরণ, কয় জন গ্রেপ্তার। ৩রা—প্রায় ১ শত লোক কর্ত্তৃক সাকন থানা আক্রান্ত। গুলীর আঘাতে এক কনষ্টেবল ও দুই জন আহত। বাবদৌলীতে শ্রীযুত নগিনভাই দেশাইএর গৃহ হইতে বন্দুক চুরি। ৪ঠা—আমেদাবাদে জনতার উপর পুলিশের ৫ বার গুলীবর্ষণ, ২ জন কনষ্টেবল আহত, ১ জন গ্রেপ্তার, মিউনিসিপ্যাল কনজারভেন্সী আফিসের আসবাবপত্র ও রেকর্ড ভস্মীভূত। বোম্বাইএ এক মিল-এলাকায় অবিস্ফোরিত বোমা প্রাপ্তি। ৫ই—সুরাটে ১২টি বোমা আবিষ্কার, ৫ জন গ্রেপ্তার। ৭ই—আমেদাবাদে তিন স্থানে গুলীবর্ষণ, ৪ জন কনষ্টেবল ও এক জন দারোগা আহত, ৩ জন গ্রেপ্তার। রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট বোমা বিস্ফোরণ। বাদ্দোলীতে এক বিদ্যালয়ে বোমা বিস্ফোরণ। ৮ই—ওয়ার্লী পুলিশ চৌকীর নিকট অবিস্ফোরিত বোমা প্রাপ্তি। ১০ই, আমেদাবাদে বালক-দলের উপর পুলিশের গুলীবর্ষণ, ১ জন আহত। বোম্বাইএ ফিরোজশা মেটা রোডের নিকট এক রেস্তোরায় বোমা নিক্ষেপ। এক মোটর গাড়ী হইতে দশ হাজার কংগ্রেস ইস্তাহার প্রাপ্তি। ১১ই, আমেদাবাদে পুলিশের গুলীচালন, এক সিনেমাগৃহে বোমা বিস্ফোরণ, পাটন হাইস্কুল ভস্মীভূত। কয়রা জেলার এক গ্রামে পুলিশ চৌকীর নিকট বিস্ফোরণ, ১ জন পুলিশ আহত, ৮ জন গ্রেপ্তার। পুনা সহরের দুই স্থানে বোমা বিস্ফোরণ, ২ জন আহত। বোম্বাইএর ফোর্ট এলাকায় একটি বোমা আবিষ্কার। ১২ই, ধারওয়ার মিশন স্কুলে টাইম-বোমা নিক্ষেপ। ১৩ই আমেদনগরে এক সিনেমাগৃহে বোমা বিস্ফোরণ, ১ জন নিহত, কয় জন আহত। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আফিসে বোমা বিস্ফোরণ। ওরলী বন্দিশালায় ১ শত রাজনৈতিক বন্দীর উপর লাঠি চালন। ১৪ই, পাঁচমহল জিলার হালোল নামক স্থানে, আমেদাবাদের ওল্ড কমার্শিয়াল মিল ও মহেশ্বরী মিলে বোমা বিস্ফোরণ। আমেদাবাদের পাতসা ষ্ট্রীট ও লুনসাওয়াদায় পুলিসের গুলী চালন। সুরাট জিলায় জালালপুর ও চিকলি তালুকের কয়েক স্থানে অগ্নিদান। আমেদাবাদের পাতাসা ষ্ট্রীটে পুলিসের দ্বিতীয় বার গুলীবর্ষণ। পুনা সার্ভে অফিসের নথিপত্র আংশিক ভস্মীভূত। ১৫ই—বোম্বাই হর্ণবী রোডের এম্পায়ার রেস্তোরায় বোমা বিস্ফোরণ। কলবাদেবী অঞ্চলে এক বদ্ধ ঘর হইতে প্রায় ১ শত বোমা ও বোমা তৈয়ারীর উপকরণ আবিষ্কার, ৮ জন গ্রেপ্তার। মধ্য-রাত্রিতে আদালত অঞ্চলে টর্চ্চ লাইট সহ মিছিলের উপর পুলিসের গুলী বর্ষণ, ১ জন আহত, ৪ জন গ্রেপ্তার। আমেদাবাদে আসারুয়া মিলে বোমা বিস্ফোরণ। ১৬ই—নদিয়াদে মুখোসধারী ৪৫ জন যুবক কর্ত্তৃক আয়কর অফিস আক্রমণ ও অগ্নিদান। আমেদাবাদে সরিবাপুর অঞ্চলে বিস্ফোরণ, সান্ধ্য আদেশের মেয়াদ ১ সপ্তাহ বৃদ্ধি। থানার কারজাত অঞ্চলে এক খাড়া পাহাড়ের চূড়া হইতে সশস্ত্র পুলিস-দলের উপর গুলী বর্ষণ। উভয় পক্ষে বন্দুক-যুদ্ধ। ১ জন নিহত, ২ জন আহত, ৪ জন গ্রেপ্তার; বহু বোমা, রাইফেল, বিস্ফোরক পদার্থ এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি উদ্ধার। ১৭ই—বোম্বাই সহরের বড়ীবন্দর এলাকায় বোমা বিস্ফোরণ, ৭ জন আহত। লেডী জামসেদজী রোডে ডাকঘর আক্রমণ, ২০ জন গ্রেপ্তার। কয়রা জিলার লিম্বাসী ডাকঘরে অগ্নিসংযোগ, বাগাদ রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট বোমা

বিস্ফোরণ। ১৮ই—হাঁসালে (সুরাট) মামলতদারের আদালতে এক বোমা বিস্ফোরণ। কয়রা জিলার দুই জনের ব্যাটারী রেডিও হস্তগত। ১৯শে—বোম্বাই আদালত অঞ্চলে পুলিশ-অফিসের সম্মুখে বোমা বিস্ফোরণ। আমেদাবাদে মনোগ্রাম মিলের নিকট তাজা বোমা। খাদিয়া পুলিশের চৌকীতে বোমা নিক্ষেপ। ২২শে, এক গৃহে সুটকেশে ৩টি বোমা প্রাপ্তি ২ জন গ্রেপ্তার। ২৩শে—আমেদাবাদ সি, আই, ডি, আর অফিসে তিনটি তাজা বোমা প্রাপ্তি, একটি বোমা বিস্ফোরণে অগ্নিকাণ্ড। সুরাটের এক গ্রামে পুলিসের সহিত জনতার সংঘর্ষ। শ্রমিকনেতা মিঃ গোগলেকার ও ডাক্তার শিরোদশর গ্রেপ্তার ২৪শে আমেদাবাদে ১২ বার পুলিশের গুলীবর্ষণ, ১ জন আহত, ১ জন গ্রেপ্তার। সুরাট "বরো" মিউনিসিপ্যালিটির প্রেসিডেণ্টের গৃহের বারান্দায় বোমা বিস্ফোরণ। ২৫শে, আমেদাবাদের বেদিয়াচর রাস্তায় পুলিশের গুলীবর্ষণ, এক জন নিহত। শ্রমিকমঙ্গল কেন্দ্রে বোমা বিস্ফোরণের ফলে অগ্নিকাণ্ড।

সিন্ধু—১৫ই পৌষ সিন্ধু প্রাদেশিক ফরওয়ার্ড ব্লকের সভাপতি মিঃ এ, টি, গিদওয়ানী গ্রেপ্তার।

মধ্যপ্রদেশ—১৫ই পৌষ—মধ্যপ্রাদেশিক পরিষদের সদস্য শ্রীযুত কুশলচাঁদ খাজাঞ্চীর রেডিও যন্ত্র পুলিসের হস্তগত। শেঠ যমুনালাল বাজাজের পুত্রবধূ শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী বাজাজের রেডিও লাইসেন্স বাতিল। ২৭শে—অধ্যাপক ভানশালীর প্রায় ৫০ দিন পর অনশন ভঙ্গ. মধ্যপ্রাদেশিক সরকার ও অধ্যাপকের মধ্যে মীমাংসা। অধ্যাপক ভানশালী সম্পর্কিত সংবাদ প্রকাশ নিষিদ্ধ করিয়া ভারতরক্ষা বিধির আদেশ প্রত্যাহার। মীমাংসার সর্ত্ত অপ্রকাশ।

আসাম—১৫ই পৌষ পর্য্যন্ত আসামে মোট ৬০০ জন দণ্ডিত। ২৬শে অগ্রহায়ণ—নলবাড়ী ষ্টেশনে বোমা বিস্ফোরণ। ২৭শে—মৌলভী বাজারের অবসরপ্রাপ্ত সাব-এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন ডাঃ সরোজকুমার ঘোষ ও অপর ৮ জন স্পেশাল কনষ্টেবল নিযুক্ত। ৩০শে—কম্যুনিষ্ট দলের আসাম শাখার সম্পাদক জগৎ ভট্টাচার্য্য গ্রেপ্তার। গৌহাটীর রঘুনাথ ভট্টাচার্য্যের ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড। ৩০শে—নওগাঁওএর কংগ্রেসকর্ম্মী মহেন্দ্রনাথ হাজারিকা ও লক্ষ্মীপ্রসাদ গোস্বামীকে গ্রেপ্তারের জন্য পুরস্কার ঘোষণা। তেজপুরের রেভিনিউ সার্কেল আফিস, বিলুগুড়ি মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয় ভবন ও তিনটি সেনানিবাস এবং হাজোর ফরেষ্ট বিট হাউস ভস্মীভূত। ১লা পৌষ—বড়পেটার এক ডাকঘর, থানা ও স্কুল অগ্নিদানে ধ্বংস ও লুণ্ঠনের অভিযোগে ৭ জন অভিযুক্ত। শ্রীহট্ট জিলা-জজের আদালতে "ভারত হইতে দূর হও" ধ্বনি করায় আসাম প্রাদেশিক জমিয়ৎ উল উলেমার নেতা মৌলানা জামালউদ্দীন আহম্মদ ও অপর ৪ জন মুসলমান কর্ম্মীর কারাদণ্ড। ২রা—ফেরার আটকবন্দী শ্রীযুত কিরীটী-ভূষণ চৌধুরী শ্রীহট্ট উপকণ্ঠে গ্রেপ্তার। ৫ই—কয়েকটি ইনস্পেকসন বাংলা, হাইস্কুল, কমলাবাড়ী ডাকঘর ভস্মীভূত। ১৮ই, নওগাঁ জিলার কয়েকটি বিদ্যালয়ে অগ্নিসংযোগ। ১০ই, নওগাঁ জিলার ভেরভেরী এলাকা হইতে ১৮ জন গ্রেপ্তার, এক বাড়ী হইতে ৩টি তাজা কার্ত্তুজ প্রাপ্তি। ১৩ই—নওগাঁ জিলার লাহোরিঘাট থানার এলাকা হইতে ৫টি বন্দুক অপসৃত। বহু গৃহে তল্লাসী। তিন জন যুবক গ্রেপ্তার।

পাইকারী জরিমানা—১৫ই পৌষ পর্য্যন্ত মোট ৩ লক্ষ ৮৫ হাজার এগার টাকা জরিমানা ধার্য্য। তেজপুর থানার এলাকাধীন সাজগাঁও গ্রামের অধিবাসীদিগের উপর ৮০০৲ টাকা ধার্য্য। শিবসাগর জিলায় মোট ৩৭ হাজার টাকা ধার্য্য।

বিহার—২০শে মিনাপুর থানার দারোগাকে জীবন্ত দগ্ধ করিয়া হত্যা করিবার অভিযোগে ১ জনের মৃত্যুদণ্ড ও ৫ জনের যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন-দণ্ড। ৫ই পৌষ—পাটনায় কানাডীয় বৈমানিক হত্যা-মামলার পলাতক আসামী চন্দ্রদ্বীপ শর্ম্মা গ্রেপ্তার।

পাইকারী জরিমানা—ভাগলপুর জিলার মোকাশিল থানার ১৯খানি গ্রামের উপর ২০ হাজার টাকা ধার্য্য।

সীমান্তপ্রদেশ—১লা পৌষ—পেশাওয়ার দায়রা জজের এজলাসে হানা দিবার জন্য এক দল লালকোর্ত্তা গ্রেপ্তার।

যুক্তপ্রদেশ—২রা পৌষ, শ্রীযুত সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী এবং তাঁহার ভগিনী শ্রীমতী হাতিসিং এবং তাঁহাদিগের গৃহের জনৈক ভৃত্য কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত। ৭ই, এলাহাবাদে বহু স্থানে তল্লাসী, দুইটি রিভলভার ও একটি পিস্তল আবিষ্কার। ঝাঁসিতে এক কর্ম্মকারের গৃহ হইতে কতিপয় শূন্য বোমার খোল ও বিস্ফোরক পদার্থ আবিষ্কার, ৩ জন গ্রেপ্তার। মজঃফরপুরে এক জনের নিকট ১৪৬২৷৷০ আনার পয়সা ও খুচরা ভাঙ্গানী আবিষ্কার, লোকটি গ্রেপ্তার। ২৫শে, মোরাদাবাদে ৮টি বেতার যন্ত্র বাজেয়াপ্ত। বেরিলীতে দুইটি বন্দুক ও পিস্তল বাজেয়াপ্ত।

মাদ্রাজ—মুকুন্দাপুরমের এক গৃহে দুইটি বোমা ও কার্ত্তুজ আবিষ্কার। ১১ই পৌষ—রামনাদ জিলার এক থানা ও সাব-ট্রেজারী লুণ্ঠন মামলার ফেরারী আসামী এক জনের নিকট পুলিসের গুলীতে নিহত। ২৪শে পৌষ, কেন্দ্রী ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য অধ্যাপক রঙ্গ ও তাঁহার ভ্রাতা অন্ধ্র কিষাণ সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি মিঃ জি, এল, নারায়ণের ধান্য ক্রোক।

সামন্তরাজ্য—৩রা পৌষ বরোদার স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেটের গৃহে একটি এবং মেসানা নামক স্থানে ২টি বোমা বিস্ফোরণ। ৭ই, রাজকোটে ভারমন্দ্রসিংজি কলেজে ও উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ে ৩টি বোমা বিস্ফোরণ। ১০ই, বরোদা কলাভবন কারখানায় বিস্ফোরণ, এক গ্রামের পুলিশ-চৌকীতে বোমা বিস্ফোরণ। ১৪ই, কোলাপুরের পুরাতন কারাগৃহে অগ্নিদান। শিবাজীপেট চৌকীতে অবিস্ফোরিত বোমা প্রাপ্তি। প্রজা-পরিষদের কয়েক জন সদস্য গ্রেপ্তার। ১৬ই, কোলাপুরে ট্রেজারী-প্রাঙ্গণে বিস্ফোরণ সম্পর্কে বহু লোক গ্রেপ্তার।' বরোদা রাজ্যের এক হাইস্কুল হইতে এক অবিস্ফোরিত বোমা অপসারণ। ১৮ই বরোদার বরুণতীর্থ মিউজিয়ামে, জেল-প্রাঙ্গণে ও একটি ব্যাঙ্কের নিকট বোমা বিস্ফোরণ। ২২শে, বরোদার কলেজের গুদামঘরে বোমা নিক্ষেপ। ভবনগরের এক মেল ট্রেণের তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় বোমা বিস্ফোরণ। ২৪শে, বরোদা রাজ্যের মেহসেনার বাজারে বিস্ফোরণ, ২ জন গ্রেপ্তার।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ফুলধনুর জয়যাত্রা

[শিল্পী—শ্রীচারুচন্দ্র সেনগুপ্ত

২১শ বর্ষ] ফাল্গুন, ১৩৪৯ [৫ম সংখ্যা

রস

১৩

মহর্ষি রৌদ্র-রস সম্বন্ধে একটি বিচারের অবতারণা করিয়াছেন। পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে—রাক্ষস-দানব প্রভৃতির রৌদ্র-রস—এ সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে। রৌদ্র-রস কি কেবল ইহাদেরই একচেটিয়া, অন্যের পক্ষে রৌদ্র-রস থাকা কি সম্ভবই নহে? ইহার উত্তরে মহর্ষি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—অন্যেরও রৌদ্র-রস সম্ভব; তবে রাক্ষস-দানবাদির রৌদ্র-রস থাকিবেই থাকিবে—ইহাই মাত্র বিশেষ। রাক্ষসাদিতেই রৌদ্র-রসের যথার্থ অধিকার; কারণ, তাহারা স্বভাবতঃই রৌদ্র-প্রকৃতিক (১)। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে—রাক্ষসাদিও ত নিজ পরিজনবর্গের প্রতি সর্ব্বদা ক্রুদ্ধভাব প্রদর্শন করে না, তাহা হইলে আর তাহাদিগকে স্বভাবতঃ রৌদ্র-প্রকৃতিক বলা যায় কিরূপে? ইহার উত্তরে মহর্ষি বলিয়াছেন—ইহারা বহু-বাহুবিশিষ্ট, বহু-মুখ, উন্নত-বিকীর্ণ-পিঙ্গল-কেশধারী, বৃত্তাকারে ঘূর্ণ্যমান রক্তনেত্র-যুক্ত, ভীমাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ; অর্থাৎ—সাধারণ জনগণের আকৃতির বিপরীত আকৃতি তাহাদিগের। তাহার উপর পর-বিনাশের অভিসন্ধি-জনিত উগ্র তপশ্চর্য্যা অথবা অন্য নানারূপ দুষ্ট কর্ম্মেও তাহাদিগকে ব্যাপৃত দেখিতে পাওয়া যায়। যখন ঐ সকল উগ্র ক্রিয়ার অভিব্যক্তি দৃষ্ট হয় না, তখনও কিন্তু কেবলই অনুমান-বশতঃ মনে হইতে থাকে যে, ইহাদিগের অন্তরে ঐ সকল উগ্র ক্রোধাত্মক অভিসন্ধি রহিয়াছে। তবে তখন উহার অভিব্যক্তি দৃষ্ট না হওয়ায় সামাজিকগণের রৌদ্র-রসাস্বাদ হয় না। অতএব ক্রোধকালে ইহাদিগের যে রৌদ্র-ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা ইহাদিগের মধ্যে সতত বিদ্যমান বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ ইহাদিগের যেন ক্রোধের প্রতিই অনুরাগ—ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইয়া থাকে। কেবল কি আকৃতিই ইহাদিগের এইরূপ রৌদ্রস্বভাবের অনুকূল? ইহাদিগের বাগঙ্গ-চেষ্টাও যাহা যাহা দেখা যায়—সে সকলই রৌদ্র-রসের আস্বাদজনক। অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে যে সকল বাচিক বা কায়িক ব্যাপার ইহারা আরম্ভ করে—সে সকলই রৌদ্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এমন কি দেখা যায়—যখন তাহাদিগের অন্তরে রৌদ্র-ভাব জন্মে নাই, তখনও তাহারা যে সকল বাচিক বা কায়িক ব্যাপারের অনুষ্ঠান করে, সেগুলির মধ্যেও তাড়নাদি ক্রিয়ার প্রাধান্য রহিয়াছে। কাব্যে তাহার বর্ণনা অথবা নাট্যে সেই ব্যাপারগুলির প্রয়োগ রৌদ্র-রস আস্বাদনের হেতু হইয়া উঠে (২)।

(১) স্বভাবতঃই রৌদ্র-প্রকৃতিক, 'স্বভাবতঃ রৌদ্র' প্রভৃতি বাক্যাংশ হইতে বুঝিতে হইবে যে—রাক্ষসাদিকে দেখিলে স্বতঃই তাহাদিগের রৌদ্র-ভাবের কথা মনে উঠিয়া থাকে। অভিনব গুপ্ত বলিয়াছেন, এই কারণেই মহর্ষি তাহাদিগের অঙ্গাদিতেও (আকৃতিতেও) রৌদ্রের সন্নিবেশ করিয়াছেন। অন্যথা তাহাদিগের রৌদ্র স্বভাবটি কেবল রক্তনয়নাদির বর্ণনা-দ্বারাই পরিস্ফুট হইতে পারিত—সে উদ্দেশ্য-সিদ্ধিহেতু বহু বাহু-মুখ প্রভৃতি বিকট আকৃতির বর্ণনা দেওয়ার প্রয়োজন হইত না। এই বিকট আকারের বর্ণনা মহর্ষি দিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় যে, যখন তাহাদিগের অন্তরে রৌদ্রভাবের প্রকাশ থাকে না, তখনও তাহাদিগের আকৃতি হইতে তাহাদিগকে রৌদ্র বলিয়াই মনে হয়।

(২) এ স্থলে অভিনব গুপ্ত কেবল বাচিক ও কায়িক ব্যাপারেরই উল্লেখ করিয়াছেন—মানস চেষ্টার কোন উল্লেখই করেন নাই। তাহার কারণ—মানস চেষ্টা অপ্রত্যক্ষ। উহা যখন দর্শনগোচর হইতে পারে না, তখন উহা রৌদ্র-ভাবাপন্ন কি না, বুঝিবার উপায় নাই। কেবল

মহর্ষি আরও বলিয়াছেন—এই সকল রাক্ষসাদি প্রায়ই বলপূর্ব্বক অতি ক্রুরভাবে শৃঙ্গার-সেবা করিয়া থাকে। অভিনব বলিয়াছেন—'শৃঙ্গার' বলিতে এ ক্ষেত্রে 'শৃঙ্গারের বিভাব' বুঝাইতেছে। শৃঙ্গার-রসের ত আর ক্রুরভাবে আস্বাদন সম্ভব হয় না। অতএব, শৃঙ্গারের আলম্বন প্রমদা বা উদ্দীপন উদ্যানাদি তাহারা বলপূর্ব্বক উপভোগ করে—ইহাই অভিনবের উক্তির তাৎপর্য্য। তবে ইহা প্রায়িক। এ কারণে ক্বচিৎ কদাচিৎ তাহাদিগের অনুনয়পূর্ব্বক শৃঙ্গারাস্বাদও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে; অর্থাৎ—কখনও কখনও তাহারা বলপূর্ব্বক উপভোগের পরিবর্ত্তে প্রার্থিরূপেও উপভোগ করিয়া থাকে।

পক্ষান্তরে, যাহারা রাক্ষসাদির অনুগামী বা অনুকারী, তাহাদিগের ক্ষেত্রে সংগ্রাম-সম্প্রহারাদি-জনিত রৌদ্র-রস বর্ত্তমান—ইহা অনুমান-দ্বারা বুঝিতে হইবে। যাহারা উদ্ধত-প্রকৃতির মনুষ্য—তাহাদিগের ক্ষেত্রে রৌদ্র-রস কিরূপে সম্ভব? কারণ, তাহারা ত আর রাক্ষসাদির ন্যায় বহু বাহু প্রভৃতি বিকট অঙ্গবিশিষ্ট নহে। ইহার উত্তরে মহর্ষি বলিয়াছেন—এই প্রকৃতির মনুষ্যগণ রাক্ষসাদির অনুকারী। তাহারা তামস-প্রকৃতিক, অতএব রাক্ষসাদির সদৃশ—অনুগামী—ইহা বুঝিতে হইবে। যদিও তাহাদিগের উর্দ্ধ-বিক্ষিপ্ত পিঙ্গল কেশরাজি, বহু বাহু প্রভৃতি নাই, তথাপি তাহারা সংগ্রাম সম্প্রহার-তাড়ন-পাটনাদি যে সকল কার্য্যে অধিকাংশ সময় লিপ্ত থাকে, সেই সকল ক্রোধোচিত বাচিক ও আঙ্গিক চেষ্টা দর্শনে তাহাদিগকে রৌদ্র-প্রকৃতিক বলিয়া বুঝা যায়। পক্ষান্তরে, যাঁহারা বীর-রস-প্রধান (যথা, অশ্বত্থামা, পরশুরাম প্রভৃতি), তাঁহাদিগেরও ক্রোধ কারণের গুরুত্ব বশতঃ রৌদ্ররস-রূপে আস্বাদনযোগ্য হইয়া থাকে। অর্থাৎ—এই সকল বীর-প্রধান ব্যক্তির আকৃতি বা প্রকৃতিতে রৌদ্র-ভাব স্বভাবতঃ বর্ত্তমান না থাকিলেও গুরুতর কারণে ইঁহারা কখনও কখনও এরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন যে, সেই ক্রোধ স্থায়িভাব রৌদ্র-রসে পর্য্যবসিত হয়। ইঁহারা স্বভাবতঃ বীর-প্রকৃতিক—কিন্তু বিশেষ কারণে রৌদ্র-রসের আলম্বন হইয়া উঠেন—ইহাই তাৎপর্য্য। আবার দেখা যায় যে, যথাযোগ্য কারণ-বশে রাক্ষসাদিরও হাস-শোকাদি স্থায়িভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে ও তাহার ফলে তাহাদিগের চিত্তগত স্বভাবসিদ্ধ ক্রোধ-ভাব এই সকল হাস-শোকাদি ভাব-দ্বারা অভিভূত হইয়া যায়; অর্থাৎ—স্বভাবতঃ রৌদ্র-প্রকৃতিক রাক্ষসাদিকেও বিশেষ বিশেষ কারণে সময়ে সময়ে হাস্য-করুণাদি রসের আলম্বন হইতে দেখা যায়। অতএব, রাক্ষসাদির যে কেবল রৌদ্ররসই—অন্য রস সম্ভব নহে—ইহা মহর্ষির অভিমত নহে।

এখন আর একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে। রাক্ষসাদি বা উদ্ধত-প্রকৃতিক মনুষ্যাদির না হয় রৌদ্ররস সম্ভব হইল, কিন্তু সামাজিক-গণের কিরূপে রৌদ্র-রসাস্বাদ হওয়া সম্ভব? রৌদ্র-রসের আস্বাদন ক্রোধাত্মক। রাক্ষসাদি স্বভাব-রৌদ্র। তাহাদিগের পক্ষে ক্রোধাত্মক আস্বাদ স্বাভাবিক। কিন্তু রাক্ষসাদিগত ক্রোধের অভিব্যক্তি দর্শনে সহৃদয় দর্শক-সামাজিকগণের অন্তরেও যে ক্রোধাত্মক আস্বাদ জন্মিবে, তাহার নিশ্চিত হেতু কি? সাধারণতঃ সামাজিকগণ ত আর রৌদ্র-প্রকৃতিক হইতে পারেন না। অতএব, অপরের ক্রোধদর্শনে তাঁহাদিগের চিত্তে ক্রোধের উদয় হইবে কেন? ইহার উত্তরে অভিনব গুপ্ত বলিয়াছেন—'আস্বাদ' বলিতে বুঝায় হৃদয়ের একতানতা বা হৃদয়-সংবাদ। দর্শক সাধারণতঃ নানা প্রকৃতির হইয়া থাকেন। কেহ উত্তম সাত্ত্বিক-প্রকৃতিক, কেহ মধ্যম রাজস-প্রকৃতিক, আর কেহ বা অধম তামস-প্রকৃতিক। যাঁহারা সম-প্রকৃতিক, তাঁহাদিগের পরস্পর হৃদগত ভাবের ঐক্য বা হৃদয়-সংবাদ দেখা যায়। ক্রোধে এই প্রকার হৃদয়-সংবাদ কেবল তামস-প্রকৃতিক সামাজিকগণের সহিত রাক্ষসাদির (বা তদনুকরণশীল নটাদির) হইয়া থাকে। কারণ, তামস-প্রকৃতিক দর্শকগণ দানবাদি-সদৃশ। এই হেতু তাঁহারা রাক্ষসাদির ক্রোধাভিব্যক্তি দেখিতে দেখিতে হৃদয়-সংবাদ-বশতঃ তন্ময় হইয়া ঐ সকল অন্যায়কারী রৌদ্র-প্রকৃতিক রাক্ষসাদি কর্ত্তৃক প্রদর্শিত ক্রোধ-ভাব আস্বাদন করিয়া থাকেন। এইরূপে রৌদ্র-রস-নিষ্পত্তি ঘটে (৩)।

এই প্রসঙ্গে মহর্ষি দুইটি আর্য্যাশ্লোক উদ্ধৃত করিয়া রৌদ্র-রসের স্বরূপটি পরিষ্কার ভাবে বুঝাইয়াছেন—

যুদ্ধ, প্রহার, ঘাতন, বিকৃত-চ্ছেদন, বিদারণ, সংগ্রাম-নিমিত্ত সম্ভ্রম প্রভৃতি হইতে রৌদ্ররস সঞ্জাত হইয়া থাকে (৪); অর্থাৎ—এইগুলি রৌদ্র-রসের উদ্দীপন-বিভাব (৫)।

নানা-প্রহরণ-নিক্ষেপ, শিরোদেশ-কবন্ধ-ভুজ-কর্ত্তন প্রভৃতি ব্যাপার-বিশেষ-দ্বারা এই রৌদ্র-রসের অভিনয় কর্ত্তব্য; অর্থাৎ—এইগুলি রৌদ্র-রসের অনুভাব (৬)।

বাচিক ও কায়িক চেষ্টাতেই রৌদ্রের আভাস পাওয়া যায়—"চিত্তস্যাবিকারেঽপি যচ্চেষ্টিতং বাচিকং কায়িকং বা তদেবাং তাড়নাদি-প্রধানমিতি দৃশ্যমানং কাব্যে প্রয়োগে চ রৌদ্রাস্বাদহেতু···মানসস্ত চেষ্টিতমপ্রত্যক্ষত্বান্নোক্তম্"—অভিনবভারতী, বরোদা সংস্করণ নাট্য-শাস্ত্র, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩২৩।

(৩) "ননু সামাজিকানাং তথাভূতরাক্ষসাদিদর্শনে কথং ক্রোধাত্মক আস্বাদঃ? উচ্যতে—হৃদয়সংবাদ আস্বাদঃ। ক্রোধে চ হৃদয়সংবাদস্তামসপ্রকৃতীনামেব সামাজিকানামিতি দানবাদিসদৃশাস্তন্ময়ী-ভূতা এবান্যায়কারিবিষয়ং ক্রোধমাস্বাদয়ন্তীতি ন কিঞ্চিদবদ্যম্"—অভিনবভারতী, পৃঃ ৩২৪।

(৪) প্রহার—আঘাত করা, মারা; "fighting"—Dr. Mukherjee. ঘাতন—মারিয়া ফেলা; "beating"—Dr. Mukherjee. বিকৃতচ্ছেদন—যে ভাবে কাটিলে অঙ্গ-বিকৃতি হইয়া থাকে; "deforming cuts"—Dr. Mukherjee. "বিকৃতং যচ্ছেদনং ব্যঙ্গাদিকরণং"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩২৪। মূলে আছে—"সংগ্রামসম্ভ্রমাদ্যৈঃ"। অভিনব গুপ্ত অর্থ করিয়াছেন—"সংগ্রামায় সম্ভ্রমঃ শস্ত্রাহরণে ত্বরা"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩২৪; অর্থাৎ—সংগ্রামের নিমিত্ত যে সম্ভ্রম—অস্ত্র-শস্ত্রাদি আনয়নে যে ত্বরা। Dr Mukherjee অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন—'সংগ্রাম, সম্ভ্রম প্রভৃতি হইতে'—"from wars, from confusions, etc."

(৫) অভিনব বলিয়াছেন—এই সকল যুদ্ধাদি কার্য্য হইতে অনুমিত পর-চিত্ত-গত যে ক্রোধ, তাহাই এস্থলে বিভাব—অর্থাৎ উদ্দীপন বিভাব—"যুদ্ধাদ্যনুমিতস্য পরক্রোধাদের্বিভাবত্বমুক্তম্"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩২৪।

(৬) কবন্ধ—মুণ্ডহীন দেহ; "trunk"—Dr. Mukherjee. এই সকল কার্য্যে মারণের প্রাধান্য আছে বলিয়াই ক্রোধের আতিশয্য

আদি-রস

করুণ-রস

হাস্য-রস

রৌদ্র-রস

[রাজা সার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বহুব্যয়ে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে অঙ্কিত দুষ্প্রাপ্য-চিত্রের প্রতিচ্ছবি।

ইহার পর স্বরচিত একটি শ্লোক-দ্বারা ভরতমুনি রৌদ্র-রস-প্রকরণের উপসংহার করিয়াছেন—(৭)

দেখা যায়—রৌদ্র-রস রৌদ্র-ভাবাপন্ন বাগঙ্গ-চেষ্টা-সংযুক্ত, শস্ত্র-প্রহার-ভূয়িষ্ঠ ও উগ্রকর্ম্ম-ক্রিয়াত্মক (৮)।

নাট্যশাস্ত্রের রৌদ্র-রস প্রকরণ এই স্থলেই সমাপ্ত হইয়াছে।

সাহিত্যদর্পণ-কার বলিয়াছেন—রৌদ্র-রসের স্থায়িভাব ক্রোধ, বর্ণ রক্ত, দেবতা রুদ্র, আলম্বন অরি, তাহার চেষ্টা উদ্দীপন। এই চেষ্টা কিরূপ, তাহার ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—মুষ্টি-প্রহার, পতন, বিকৃতাচরণ (বিকৃত), (খড়্গাদি দ্বারা) ছেদন, (শূলাদি দ্বারা) অবদারণ (বিদারণ), সংগ্রাম-সম্ভ্রম প্রভৃতি দ্বারা রৌদ্র-রসের পূর্ণ দীপ্তি হইয়া থাকে। ভ্রূ-বিভঙ্গ, ওষ্ঠনির্দংশ, বাহুস্ফোটন, তর্জ্জন, আত্মাবদান-কথন, আয়ুধোৎক্ষেপণ, উগ্রতা, আবেগ, রোমাঞ্চ, স্বেদ, বেপথু, মদ, আক্ষেপ, ক্রূরসন্দর্শনাদি ইহার অনুভাব (৯)। আর মোহ, অমর্ষ প্রভৃতি ইহার ব্যভিচারি-ভাব।

শ্রীভট্টনারায়ণ-রচিত 'বেণীসংহার' নাটকের অশ্বত্থামার উক্তি একটি শ্লোক রৌদ্র-রসের উদাহরণরূপে দর্পণ-কার উদ্ধৃত করিয়াছেন। এস্থলে অর্জ্জুনাদি শত্রুপক্ষগণ অশ্বত্থামার ক্রোধের আলম্বন-বিভাব, অর্জ্জুনাদি-কৃত দ্রোণ-বধ-রূপ অকার্য্য উদ্দীপন-বিভাব, অশ্বত্থামার গর্জ্জনাদি অনুভাব ও গর্জ্জন হইতে অভিব্যক্ত গর্ব্ব ও অমর্ষ (ক্রোধ—অসহনশীলতা) ব্যভিচারী। এইরূপে অশ্বত্থামার ক্রোধ সামাজিকগণ-কর্ত্তৃক আস্বাদ্যমান হইয়া রৌদ্ররসের জনক হইতেছে (১০)।

দর্পণ-কার যুদ্ধবীর হইতে রৌদ্র-রসের ভেদ দেখাইয়াছেন—রৌদ্র-রসে মুখ ও নেত্রের রক্তবর্ণতা যুদ্ধবীর হইতে ইহাকে পৃথক্ করিয়া থাকে। রৌদ্র-রসে যেরূপ, যুদ্ধ-বীরেও সেইরূপ—রিপুই আলম্বনবিভাব। অতএব, এরূপ আশঙ্কা ত হইতে পারে যে, রৌদ্র-রসে ও যুদ্ধ-বীরে বিশেষ কোন ভেদ নাই। দর্পণ-কার বলিয়াছেন—রৌদ্র-রসে মুখ-নেত্রাদি রক্তবর্ণ ধারণ করে, যুদ্ধ-বীরে তাহা করে না—ইহাই উভয়ের পার্থক্য। ইহার তাৎপর্য্য এই যে—রক্তবর্ণ মুখ-নেত্রাদি হইতে অভিব্যক্ত ক্রোধই উভয়ের পার্থক্য সূচনা করে; অর্থাৎ—রৌদ্র-রস ও যুদ্ধ-বীর উভয় স্থলেই যদিও রিপুই আলম্বন-বিভাব, তথাপি যে ক্ষেত্রে ক্রোধের আবির্ভাব হয়, তথায় রৌদ্র-রস ও যথায় উৎসাহের আবির্ভাব, তথায় যুদ্ধ-বীর নিষ্পন্ন হইয়া থাকে (১১)।

সাহিত্য-দর্পণের রৌদ্ররস-প্রকরণ এই স্থলেই সমাপ্ত হইয়াছে। অতঃপর এ সম্বন্ধে শারদাতনয়-কথিত ভাবপ্রকাশনের সিদ্ধান্ত উল্লিখিত হইতেছে।

রৌদ্রের বিভাব 'খর'। রৌদ্রের আলম্বন—বহু-বাহু, বহু-মুখ, ভীমদংষ্ট্র, সিতাঙ্গ—ক্রূর, উদ্‌বৃত্ত, শঠ প্রভৃতি (১২)।

ক্রোধ-স্থায়িভাব রৌদ্র-রসের উপাদান-হেতু। ক্রোধ তেজের জনক। ইহার ত্রিবিধ ভেদ—(১) ক্রোধ, (২) কোপ ও (৩) রোষ।

হর্ষ-আবেগ-উগ্রতা-উন্মাদ-মদ-গর্ব্ব-চাপল-ঈর্ষ্যা-অসূয়া-শ্রম-অমর্ষ-অবহিত্থ-অপত্রপা-নিশ্বাস-স্তম্ভ-রোমাঞ্চ-স্বেদ—এই ভাবগুলি রৌদ্র-রসের অনুকূল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, রৌদ্র-রসের বিভাবসমূহ খর-ভাবাপন্ন। যখন এই খর বিভাবগুলি স্বানুকূল অন্য যথাযোগ্য ভাবান্তর-সমূহের সহিত নাট্যাভিনয়-দশায় সমাশ্রিত হইয়া নিজ স্থায়িভাবের (ক্রোধের) অনুগামী হয়, তখন প্রেক্ষকগণের মন অহঙ্কারযুক্ত ও রজস্তমোম্বিত হইয়া থাকে। ঐরূপ দশাপন্ন মনের যে বিকার উৎপন্ন হয়, তাহারই নাম রৌদ্র-রস (১৩)।

বাসুকি-মতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে রসোৎপত্তি বর্ণনার পর শারদাতনয় নারদ-মতেও রসোৎপত্তি-প্রকার বিবৃত করিয়াছেন। এ মতে—বাহ্য-বিষয়াশ্রিত রজ-স্তমোহঙ্কার-যুক্ত মনের যে বিকার, তাহাই

সূচিত হইতেছে। অন্য প্রকার বীর-রসের কথা দূরে থাকুক, যুদ্ধ-বীরেও এইরূপ মারণ-প্রাধান্য বা ক্রোধাতিশয্য থাকে না। এইখানেই বীর হইতে রৌদ্রের ভেদ—"মারণপ্রাধান্যং নানাপ্রহরণেন দর্শয়তি···ক্রোধাতিশয়ং সূচয়ন্ বীরাদ্ভেদমাহ। যুদ্ধবীরেঽপি হি তন্নাস্তি"—অঃ ভাঃ পৃঃ ৩২৪—২৫।

(৭) "ভরতমুনিস্বেকেন শ্লোকেনোপসংহরতি"—অঃ ভাঃ পৃঃ ৩২৬।

(৮) উগ্রকর্ম্মক্রিয়াত্মক—উগ্র অর্থাৎ উগ্র-ভাব-প্রধান যে সকল কর্ম্ম—শিরশ্ছেদ প্রভৃতি, তাহাদিগের যে ক্রিয়া অর্থাৎ অভিনয়, তাহাই যাহার আত্মা অর্থাৎ তাহাই যাহাতে প্রধান—এইরূপ অর্থ অভিনব করিয়াছেন।

(৯) ওষ্ঠনির্দংশ—নির্দ্দয়ভাবে ওষ্ঠদংশন; ৺চণ্ডীতে মহাসুরগণের বর্ণনায় আছে—"সন্দষ্টৌষ্ঠপুটাঃ"; এই সকল অসুরই রৌদ্র-রসের প্রতীক। বাহুস্ফোটন বাহ্বাস্ফোট। আত্মাবদান-কথন—'অবদান' অর্থে কর্ম্ম; ইহার তাৎপর্য্য আত্মশ্লাঘা-করণ। উগ্রতা-আবেগ-মদ—ব্যভিচারীর মধ্যে গণিত হইলেও এস্থলে অনুভাবরূপে কথিত হইয়াছে. রোমাঞ্চ-স্বেদ-বেপথু—সাত্ত্বিক-মধ্যে গণ্য হইলেও এ ক্ষেত্রে অনুভাব-তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

(১০) "অত্রাশ্বত্থাম্নঃ ক্রোধস্তার্জ্জুনাদিবালম্বনং তদকার্য্যমুদ্দীপনং তাদৃশগর্জ্জনমনুভাবঃ গর্জ্জনব্যঙ্গ্যো গর্ব্বোঽমর্ষশ্চ ব্যভিচারী ক্রোধস্তু সামাজিকরসোৎপত্তেঃ"—রামতর্কবাগীশ-কৃত-দর্পণ-টীকা।

(১১) "রক্তাস্যনেত্রতা চাত্র ভেদিনী যুদ্ধবীরতঃ"—সাঃ দঃ ৩য় পরিচ্ছেদ। "ননু রৌদ্রযুদ্ধবীরয়োঃ রিপুরালম্বনবিভাব ইত্যনয়োরভেদ এবাপতিত ইত্যনয়োর্ভেদং দর্শয়িতুমাহ···রক্তাস্যনেত্রতাব্যঙ্গঃ ক্রোধ এব ভেদঃ। তথা চোভয়ত্র রিপোরালম্বনত্বেঽপি ক্রোধাবির্ভাবে রৌদ্রঃ, উৎসাহাবির্ভাবে বীর ইত্যনয়োর্ভেদ ইতি ভাবঃ"—রামতর্কবাগীশ-টীকা।

(১২) যে সকল ভাব গ্রহণমাত্রেই মনের কাতরতা উৎপাদনে সমর্থ, সেইগুলি 'খর' ভাব; উহারা রৌদ্রের পরিপোষক—"গৃহীতমাত্রা মনসঃ কাতরোৎপাদনক্ষমাঃ। যে ভাবাস্তে খরাঃ খ্যাতা রৌদ্রোৎকর্ষবিবর্দ্ধনাঃ"।—ভাবপ্রকাশন, প্রথমাধিকার, পৃঃ ৫। "বহুবাহা বহুমুখা ভীমদংষ্ট্রাঃ সিতাঙ্গকাঃ। রৌদ্রস্যালম্বনা ভাবাঃ ক্রূরোদ্‌বৃত্তশঠাদয়ঃ"—ভাব-প্রঃ, পৃঃ ৬। সিতাঙ্গ—শ্বেতাঙ্গ। উদ্‌বৃত্ত—দুর্ব্বৃত্ত।

(১৩) এ বিষয়ের সুবিস্তৃত বিবরণ পৌষের মাসিক বসুমতীতে (রস-১১) দ্রষ্টব্য। মূলে আছে—"খরা বিভাবাস্তু যদা স্বানুকূলৈঃ সহেতরৈঃ। স্থায়িনি স্বে প্রবর্ত্তন্তে স্বীয়াভিনয়সংশ্রয়াঃ। তদা মনঃ প্রেক্ষকাণাং রজসা তমসান্বিতম্। সাহঙ্কারঞ্চ তত্রত্যো বিকারো যঃ প্রবর্ত্ততে। স রৌদ্ররসনামা স্যাদ্রস্যতে চ স তৈরপি"।—ভাবপ্রকাশন, দ্বিতীয় অধিকার, পৃঃ ৪৪।

রৌদ্র বলিয়া কথিত হয় (১৪)। অতএব, রৌদ্র-রসের উৎপত্তি সম্বন্ধে নারদ-মত ও বাল্মীকি-মত অভিন্ন।

রৌদ্র-শব্দের নির্ব্বচন-প্রসঙ্গে শারদাতনয় বলিয়াছেন—রুদ্র হাত দিয়া থাকেন বলিয়া রৌদ্র-শব্দের নিরুক্তি; অর্থাৎ রুদ্র যে কাজে হাত দেন, তাহাই রৌদ্র-কর্ম্ম। সেই রৌদ্র-কর্ম্মের কর্ত্তৃত্বের হেতু যাহা, তাহাই রৌদ্র। অথবা যে কর্ম্ম অপরকে রোদন করায়, তাহাই রৌদ্র (১৫)।

রৌদ্র-রসোৎপত্তির ইতিহাস-বর্ণনা-প্রসঙ্গে শারদাতনয় বলিয়াছেন—ব্রহ্ম সভায় ভাবাভিনয়-কোবিদ দিব্য-নটগণ-কর্ত্তৃক প্রযুক্ত 'ত্রিপুর-দাহ' নামক রূপকের অভিনয় দর্শন-কালে পিতামহ ব্রহ্মার চারিটি মুখ হইতে চারিটি বৃত্তির সহিত চারিটি মুখ্য রসের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। ঐ রূপকান্তর্গত দক্ষযজ্ঞ বিনাশের দৃশ্য যখন অভিনীত হইতেছিল, তখন তদ্দর্শনে ব্রহ্মার পশ্চিম মুখ হইতে আরভটী বৃত্তি জন্মে। আরভটী হইতেই রৌদ্র-রসের উদ্ভব (১৬)।

যখন রুদ্র-স্বভাব বীরভদ্র দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংস করেন, তখন তিনি দেবগণকে নানা প্রহরণের আঘাতে পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে দণ্ডদান করিয়াছিলেন। সেই সকল ছিন্ন-কর্ণ, ছিন্ন-নাসিক, স্ফুটিত-নয়ন দীন-ভাবাপন্ন দেবগণের এই বিলাপ-মুখর অবস্থা দর্শনে বীরভদ্রের রৌদ্ররস অনুমিত হইয়া থাকে (১৭)।

রৌদ্রের বিভাবাদি বর্ণন-প্রসঙ্গে শারদাতনয় বলিয়াছেন—ইহা রাক্ষস-উদ্ধত-দৈত্য-ক্রূরাদি-প্রকৃতি-গত হইয়া থাকে। অনৃত বাক্য, অবজ্ঞাসূচক বা পরুষ উক্তি, অপরকে বধের ও অন্যের স্ত্রী-হরণের প্রতিজ্ঞা, রাষ্ট্রভেদ, গৃহ-ক্ষেত্র-দার প্রভৃতির বলপূর্ব্বক গ্রহণ, মাৎসর্য্য, দেশ-জাতি-কুল-আচার-বিদ্যা-শৌর্য্য প্রভৃতির নিন্দা, আক্রোশ-কলহ-আক্ষেপবাক্য-আজ্ঞাভঙ্গ (ভর্ৎসনা) প্রভৃতি ইহার (উদ্দীপন) বিভাব। ভ্রুকুটি, মুহুর্মুহুঃ গণ্ডদেশের স্ফুরণ, দন্তৌষ্ঠ-পীড়ন, হস্ত-নিষ্পেষণ, রক্তনেত্রতা, শস্ত্রাস্ত্র-গ্রহণ, ছেদন, করতল-দ্বারা তাড়ন, মোটন, রুধিরাদি-পান, অস্ত্রাদি-দ্বারা অলঙ্করণ, অবিচারে যুদ্ধে পাত, পুনঃ পুনঃ গর্জ্জন, ভর্ৎসন ও রোমাঞ্চ, স্বেদ, কম্প প্রভৃতি—ইহার অনুভাব। উগ্রতা, মদ, অমর্ষ, মূর্চ্ছা, অসূয়া, অবহিত্থ, স্মৃতি, চাপল্য, বোধ, ধৈর্য্য, উৎসাহ প্রভৃতি ব্যভিচারী (১৮)।

অঙ্গ-নেপথ্য-বাগ্‌-ভেদে রৌদ্র ত্রিবিধ। বহু স্থূল শিরঃ, ঊর্দ্ধ-বিক্ষিপ্ত পিঙ্গল কেশরাজি, অতিদীর্ঘ বা অতিহ্রস্ব বহু-শস্ত্রাস্ত্রধারী বাহুসমূহ, উদ্‌বৃত্ত (ঠেলিয়া বাহির হইতেছে এরূপ) রক্ত নেত্র, বিরাট্ দেহ ও কৃষ্ণ বর্ণ—এগুলি আঙ্গিক রৌদ্রের পরিপোষক। কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ বসন, কৃষ্ণ-রক্ত গন্ধানুলেপন, কৃষ্ণ রক্ত মাল্য, কৃষ্ণ-রক্ত ভূষণ—নৈপথ্যজ রৌদ্র। 'ছেদন কর, ভেদ কর, বন্ধন কর, খাও, মার, তাড়ন কর, আজ তোমার রক্তপান করিব, পেষণ কর', ইত্যাদি—বাচিক রৌদ্রের দৃষ্টান্ত (১৯)।

রৌদ্রের অধিদেবতা রুদ্র। কারণ, রৌদ্র-রসের যাহা কর্ম্ম—রোগাদি, রুদ্র তাহা দিয়া থাকেন। এ হেতু রুদ্রই রৌদ্রের অধিপতি দেবতা।

রৌদ্রের বর্ণ রক্ত। কারণ, অন্তরে ক্রোধ-স্থায়িভাবের প্রকাশ হইলে মুখ-নেত্রাদি আরক্ত ভাব ধারণ করে—ইহা অতি প্রসিদ্ধ কথা।

শারদাতনয়ের রৌদ্র-রস-প্রকরণ এই স্থলেই সমাপ্ত হইয়াছে।

কাব্যপ্রকাশে মম্মটভট্ট ক্রোধ-স্থায়িভাব হইতে কিরূপে রৌদ্র-রসের উৎপত্তি হয়, তাহা একটি শ্লোক উদ্ধার-পূর্ব্বক দেখাইয়াছেন। বেণীসংহারের এই শ্লোকটিই রৌদ্র-রসের দৃষ্টান্তরূপে সাহিত্যদর্পণেও উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রদীপ-কার গোবিন্দ ঠক্কুর ক্রোধের লক্ষণ করিয়াছেন—প্রতিকূল ব্যক্তিগণের প্রতি তীক্ষ্ণভাবের উদ্বোধন-'ক্রোধ'। রৌদ্র তৎপ্রকৃতিক (২০)। বেণীসংহারের এই শ্লোকটিতে রৌদ্র-রসের অভিব্যক্তি হইলেও রৌদ্র-রস-ব্যঞ্জন-ক্ষমা আরভটী বৃত্তি নাই। ইহা কবির অশক্তির পরিচায়ক—ইহা নাগোজী ভট্ট উদ্দ্যোতে স্পষ্ট বলিয়াছেন (২১)। এ ক্ষেত্রে অপকারী অর্জ্জুনাদি আলম্বন, পিতৃহন্তৃত্ব, অস্ত্রাদির উদ্যমন প্রভৃতি উদ্দীপন। অশ্বত্থামার প্রতিজ্ঞা অনুভাব। অশ্বত্থামা যে বলিয়াছেন—একাই তিনি সকলকে ধ্বংস করিবেন—এই উক্তি-গম্য গর্ব্বই সঞ্চারী ভাব (২২)।

---

(১৪) "রজস্তমোঽহঙ্কৃতিভির্যুতাদাত্মার্থসংশ্রয়াৎ। মনসো যো বিকারস্তু স রৌদ্র ইতি কথ্যতে"।—ভাবপ্রকাশন, দ্বিতীয় অধিকার, পৃঃ ৪৭।

(১৫) "রুদ্রো হস্তং দদাতীতি রৌদ্রশব্দো নিরুচ্যতে॥ তৎ-কর্ম্মকর্ত্তৃতাহেতুর্যঃ স রৌদ্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। যৎ কর্ম্ম রোদয়ত্যন্যান্ স রৌদ্র ইতি বা ভবেৎ"।—ভাব-প্রঃ দ্বিতীয় অধিঃ, পৃঃ ৪৯।

(১৬) "তস্মিংস্ত্রিপুরদাহাখ্যে কদাচিদ্‌ব্রহ্মসংসদি। প্রযুজ্যমানে ভরতৈর্ভাবাভিনয়কোবিদৈঃ॥ তদেতৎ প্রেক্ষমাণস্য মুখেভ্যো ব্রহ্মণঃ ক্রমাৎ। বৃত্তিভিঃ সহ চত্বারঃ শৃঙ্গারাদ্যা বিনিঃসৃতাঃ"। "যদা দক্ষাধ্বর-ধ্বংসোঽভিনীতো ভরতৈর্দৃঢম্॥ অভূদারভটীবৃত্তে রৌদ্রঃ পশ্চিম-বক্ত্রতঃ"।—ভাব-প্রঃ, তৃতীয় অধিকার, পৃঃ ৫৬—৫৭।

(১৭) "রুদ্রেণ বীরভদ্রেণ দক্ষস্য ধ্বংসিতে মখে। দণ্ডিতেষু চ দেবেষু নানাপ্রহরণৈঃ পৃথক্। বিলোক্য তান্ প্রলপতশ্ছিন্ন-কর্ণাক্ষিনাসিকান্। দীনান্"—ভাব-প্রঃ ৩য় অধিঃ, পৃ ৫৮।

(১৮) মোটন—নিষ্পেষণ, পেষণপূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া ফেলা। রুধির পান ও অস্ত্রাদি-দ্বারা শরীরের অলঙ্করণ এই দুইটিকে রৌদ্র-রসের অনুভাব না বলিয়া বীভৎস-রসের অনুভাব বলিলেই ভাল হইত। রোমাঞ্চ-স্বেদ-কম্প—এগুলি বস্তুতঃ সাত্ত্বিক ভাব হইলেও অনুভাব-মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

(১৯) পূর্ব্বে বহু বার বলা হইয়াছে—অভিনয় চতুর্ব্বিধ—আঙ্গিক-বাচিক-আহার্য্য-সাত্ত্বিক। আঙ্গিক—যেরূপ অঙ্গ বা অঙ্গ-বিকার-দ্বারা অভিনয়ে রৌদ্র-রসের অভিব্যক্তি হয়, তাহাই আঙ্গিক রৌদ্র। নৈপথ্যজ—'নেপথ্য' অর্থে বেশভূষা, সাজ-পোষাক-অঙ্গরাগ প্রভৃতি। নৈপথ্যজ রৌদ্র বলিতে বুঝাইতেছে, যেরূপ আহার্য্য অভিনয়-দ্বারা রৌদ্রের অভিনয় হইতে পারে। আহার্য্যাভিনয়—নেপথ্যাভিনয়।

(২০) "প্রতিকূলেষু তৈক্ষ্ণ্যস্য প্রবোধঃ ক্রোধ উচ্যতে। তৎপ্রকৃতিকো রৌদ্রঃ"—প্রদীপ।

(২১) "অত্র পদ্যে (কৃতমনুমতমিত্যত্র) রৌদ্ররসব্যঞ্জনক্ষমা বৃত্তির্নাস্তীতি কবেরশক্তির্বোধ্যা"—উদ্দ্যোত।

(২২) "অত্রাপকারিণোঽর্জ্জুনাদয় আলম্বনম্। পিতৃহন্তৃত্বমস্ত্রা-দ্যুদ্যমনমুদ্দীপনম্। প্রতিজ্ঞানুভাবঃ। অন্যনৈরপেক্ষ্যগম্যগর্ব্বঃ সঞ্চারী"—উদ্দ্যোত।

রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র-কৃত নাট্যদর্পণে বলা হইয়াছে—প্রহার-অসত্য-মাৎসর্য্য-দ্রোহ-আধর্ষ-অপনীতি প্রভৃতি হইতে সমুৎপন্ন রৌদ্র-রস। ঘাত-দন্তৌষ্ঠপীড়নাদি দ্বারা উহার অভিনয় কর্ত্তব্য (২৩)।

সাগরনন্দীর নাটকলক্ষণরত্নকোষে নাট্যশাস্ত্রের অনুরূপ আলোচনা প্রদত্ত হইয়াছে। শস্ত্রাঘাত ও উদ্ধত বাগঙ্গ-চেষ্টা প্রভৃতি দ্বারা উগ্রকর্ম্মের অভিনয়াত্মক, সমুদ্ধত-নব-প্রকৃতিক, সংগ্রাম-হেতুক রৌদ্র-রস উৎপন্ন হইয়া থাকে। সকলের অধিক্ষেপ (অবমাননা), মাৎসর্য্য, ধর্ষণ, উপঘাত, অনৃতালাপ, বাক্-পারুষ্য প্রভৃতি ইহার বিভাব। দন্তৌষ্ঠসন্দংশন, ভুজাস্ফোটন, পাটন (দ্বিধাকরণ), শস্ত্রঘাত, শিরো-বাহু-কবন্ধ-স্কন্ধ-তাড়ন (কর্ত্তন), পীড়ন, ছেদন, ভেদন, শোণিতাকর্ষণ, ভ্রুকুটী, হস্ত-নিষ্পেষণ প্রভৃতি দ্বারা ইহার অভিনয় কর্ত্তব্য ; অর্থাৎ—এইগুলি ইহার অনুভাব। উগ্রতা, অমর্ষ, রোমাঞ্চ, বেপথু, স্বেদ, চাপল, মোহ, বেগ (আবেগ) ইহাতে ব্যভিচারী।

শিঙ্গভূপালের রসার্ণব-সুধাকরে রৌদ্র-রসের বিবরণ অতি সংক্ষিপ্ত। স্বোচিত বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারিভাবাদি দ্বারা ক্রোধ-স্থায়ী দর্শক-(সদস্য)গণের রস্য (অর্থাৎ আস্বাদন-যোগ্য) হইলেই রৌদ্র বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। আবেগ-গর্ব্ব-ঔগ্র্য-অমর্ষ-মোহাদি ইহার ব্যভিচারী। প্রস্বেদ, ভ্রুকুটী, নেত্রের রক্তিমা প্রভৃতি ইহার বিকার অর্থাৎ অনুভাব।

রৌদ্র-রস-প্রকরণ এই স্থলেই সমাপ্ত হইল।

রৌদ্রের পর বীর-রস। কেন রৌদ্রের পর বীর-রসের উপাদান, আচার্য্য অভিনব গুপ্ত তাহার কারণ দেখাইয়াছেন। বীরের অন্যতম ভেদ যুদ্ধ-বীরে সংগ্রাম-সম্প্রহার প্রভৃতির যোগ দৃষ্ট হয়। রৌদ্রেও উহা বর্ত্তমান। রৌদ্রের যে জিঘাংসা-ভাব, তাহা বীরেও বর্ত্তমান—এই কারণে রৌদ্রের পর বীরের স্থান (২৪)। আবার দেখা যায় যে, শৃঙ্গার কাম-প্রধান। কাম সকলের নিকট সুলভ—সকলের অত্যন্ত পরিচিত, সকলের নিকট অতিশয় হৃদ্য। তাই সর্ব্বাগ্রে কামের ও তদভিব্যঞ্জক শৃঙ্গারের স্থান। তাহার পর শৃঙ্গারানুগামী হাস্য। নিরপেক্ষ-স্বভাব ও হাস্য-বিপরীত বলিয়া হাস্যের পর করুণ। তাহার পর করুণের নিমিত্ত রৌদ্র ; উহা অর্থ-প্রধান। কাম ও অর্থ ধর্ম্মমূলক বলিয়া তদনন্তর ধর্ম্ম-প্রধান বীর-রস (২৫)।

এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা পরবর্ত্তী সংখ্যায় করা যাইবে।

[ক্রমশঃ

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী।

---

(২৩) প্রহার—পরকে যাহা বিদীর্ণ করে অথবা না করিতেও পারে, এরূপভাবে শস্ত্রব্যাপারের নাম 'প্রহার' ; গৃহাদি ভঙ্গ করা, ভৃত্যাদির উপমর্দ্দন প্রভৃতি ইহার অন্তর্ভুক্ত। অসত্য—বধ-বন্ধন প্রভৃতির বাচক বাক্-পারুষ্যও ইহার অন্তর্গম্য। মাৎসর্য্য—গুণে অসূয়া। দ্রোহ—জিঘাংসা। আধর্ষ—পত্নীধর্ষণ, বিদ্যা-কর্ম্ম-দেশ-জাতি প্রভৃতির নিন্দা, রাজ্য-সর্ব্বস্ব-গ্রহণ ইত্যাদি। অপনীতি—অন্যায়। ইহা হইতে ঔদ্ধত্যও সূচিত হইতেছে।—এইগুলি উদ্দীপন বিভাব। ঘাত—ইহা হইতে ছেদন-ভেদন-রুধিরাকর্ষণ প্রভৃতি অনুভাবও সংগ্রহ করিতে হইবে। দন্তৌষ্ঠপীড়ন—ইহা দ্বারা গণ্ডৌষ্ঠস্ফুরণ-হস্তাগ্র-নিষ্পেষণাদি অনুভাব-সমূহেরও সংগ্রহ কর্ত্তব্য। ইহার ব্যভিচারী—মোহ-উৎসাহ-আবেগ-অমর্ষ-চাপল্য-উগ্রতা-স্বেদ-বেপথু-রোমাঞ্চ প্রভৃতি। উৎসাহ প্রভৃতি যদিও স্থায়িভাবমধ্যে গণ্য (বীর-রসের স্থায়ী উৎসাহ), তথাপি এক রসের স্থায়ী অন্য রসে ব্যভিচারী হইতে পারে)। স্তম্ভ-স্বেদ প্রভৃতি রসের কার্য্য নহে—স্থায়িভাবের কার্য্য—ব্যভিচারী বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

(২৪) "যুদ্ধবীরে হি সংগ্রামসম্প্রহারযোগো রৌদ্রেঽপীতি বীরে জিঘাংসেত্যানন্তর্য্যমথশব্দেনাহ"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩২৫।

(২৫) "তত্র কামস্য সকল জাতিসুলভতয়াত্যন্তপরিচিতত্বেন সর্ব্বান্ প্রতি হৃদ্যতেতি পূর্ব্বং শৃঙ্গারঃ। তদনুগামী চ হাস্যঃ। নিরপেক্ষস্বভাবত্বাৎ তদ্বিপরীতস্ততঃ করুণঃ। ততস্তন্নিমিত্তং রৌদ্রঃ, স চার্থপ্রধানঃ। ততঃ কামার্থয়োর্ধর্ম্মমূলত্বাদ্বীরঃ, স হি ধর্ম্মপ্রধানঃ"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ২৬১।

কৃষ্ণ-ভ্রমর

ভ্রমর কহিল, "রক্ত-কমল খোলো খোলো তব দল,
আমি যে ভক্ত ভৃঙ্গ তোমার যাচি মৃদু পরিমল।
আলোতে এ কালো পক্ষ মেলিয়া ভাসিয়া সমীর-ভরে,
দূর হতে এসে দেখিব কি দ্বার রুদ্ধ কঠিন-করে ?
কণ্টকে-ঘেরা পত্র-আড়ালে গভীর পঙ্ক-নীরে
ভুবনমোহন মূর্ত্তি ধরিয়া খোলো দল ধীরে ধীরে।
কনককিরণে নাচিছে সলিল, বহিছে গন্ধবহ—
মিনতি আমার রাখো পঙ্কজ অঙ্গে বরিয়া লহ।
চপল-ভ্রমর দুয়ারে তোমার কমল-নয়ন তোলো,
পীন-উন্নত বিকচোন্মুখ বক্ষ-আগল খোলো।"
গুঞ্জরি' ফেরে রক্তকমল-দুয়ারে কৃষ্ণ-অলি
মধুলোভে তার রসনা লোলুপ কত কথা যায় বলি'!

প্রথম-প্রণয়মুগ্ধা তরুণী লজ্জায় নত আঁখি,
গোপন তাহার মনের কামনা—কিছু না রহিল বাকি।
চপল ভ্রমর কেমনে জানিল গূঢ় সে মনের কথা,
লঘু-ডানা দু'টি আলোতে মেলিয়া প্রচারিল যথা-তথা।
পদ্মপাতায় ঝলকে শিশির ক্ষেতে-ক্ষেতে লাগে দোল,—
হাসিয়া তপন জাগিল গগনে দিকে-দিকে কলরোল।
রক্তকমলে কৃষ্ণ-ভ্রমর উড়িয়া উড়িয়া বসে,
দলে-দলে তার নগ্ন-বক্ষ খুলিল রভস-রসে।
যুগে-যুগে হায়, এমনি লীলায় মাতিছে চিত্তরাধা,
শ্যামের মোহন বেণুটি ভুবনে আজো রাধা-নামে সাধা!

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস (এম-এ, বার-এট-ল)

ভূমধ্য-সাগর

ভূমধ্য-সাগর যেন পশ্চিমে আজ রণ-কপালিনীর লীলা-শ্মশান! এই ভূমধ্য-সাগরে কত জাতি, কত রাজ্যের ধ্বংস সাধিত ঘটিয়াছে, তার আর সংখ্যা নাই! এবং এই ভূমধ্য-সাগর-তীরবর্ত্তী উনিশটি রাজ্য আজিকার এ-মহাযুদ্ধে প্রাণাহুতি দিতে দাঁড়াইয়াছে!

জার্ম্মান-বাহিনী এই ভূমধ্য-সাগর বহিয়া গিয়া আথেন্স, হায়ফা, আলেকজান্দ্রিয়া এবং মাল্টা আক্রমণ করিয়াছে! এবং এই ভূমধ্য-সাগর বহিয়াই বৃটিশ-জাতি মার্কিনকে সহায় করিয়া মার্কিন ফৌজ, মার্কিন শিল্পী, মার্কিনী প্লেন, ট্যাঙ্ক ও কামানের শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া মিশরে গিয়া জার্ম্মান-শত্রুকে বিধ্বস্ত করিতেছে।

যে-লিবিয়ার আকাশ-বাতাস এক দিন গ্রীস ও রোমের যুদ্ধরথ-চক্রের নির্ঘোষে পরিপূর্ণ থাকিত, আজ সে-লিবিয়ার আকাশ-বাতাস তেমনি

পূর্ব্ব ভূমধ্য-সাগর

পশ্চিম ভূমধ্য-সাগর

মিত্র-পক্ষের ও এক্সিসের ট্রাক্, প্লেন এবং ট্যাঙ্কের বজ্র-হুঙ্কারে সমাচ্ছন্ন! ক্রীটে এক দিন দস্যুরা বহিয়া শত্রু আসিয়া হানা দিত! এবারেও ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের মে মাসে (২১ ও ২২ তারিখে) প্লেনে চড়িয়া জার্ম্মান-বাহিনী আসিয়া ক্রীটে আস্তানা পাতিয়া বসে এবং সেখান হইতে মাল্টা এবং আলেকজান্দ্রিয়া আক্রমণ করে। জার্ম্মানির পাশবিকতার এখানে সীমা ছিল না! প্যারাশুট-যোগে অসংখ্য বাহিনী ক্রীটে নামিয়া বোমার আগুনে গ্রাম-নগর জ্বালাইয়া দেয়; টর্পেডো দিয়া বড় বড় অসংখ্য জাহাজ ধ্বংস করে। সে-কালে বর্ব্বর বোম্বেটের দল যেমন নিষ্ঠুর ভাবে ধ্বংস সাধন করিত, এ-কালের সভ্য জাতিও তেমনি ভাবে শিক্ষা-সংস্কৃতি-সভ্যতা-ধ্বংসে এতটুকু লজ্জা বোধ করে নাই!

মিশরের সভ্যতা এক দিন এই ভূমধ্য-সাগর বহিয়া পালেস্তাইনে গিয়া সে-প্রদেশকে সুসংস্কৃত করে। এই ভূমধ্য-সাগর পার হইয়াই ব্যাবিলনীয়

সভ্যতা-সংস্কৃতি এক দিন গ্রীসে, রোমে, ফ্রান্সে, ইংলণ্ডে এবং আমেরিকায় গিয়া আসন পাতে।

ভূমধ্য-সাগরের বুকে ছোট-বড় দ্বীপ আছে প্রায় লক্ষাধিক—তাছাড়া উপসাগর-অন্তরীপাদিরও সংখ্যা নাই! ইজিয়ান সাগর, কৃষ্ণ-সাগর প্রভৃতির মারফৎ ভূমধ্য-সাগর এশিয়ার সহিত য়ুরোপের যে যোগ-সূত্র রচনা করিয়াছে, তাহার প্রভাব সামান্য নয়।

আকার-আয়তনের দিক্ দিয়া যেম ইতিহাসের দিক্ দিয়াও তেমনি ভূমধ্য-সাগরে সহিত অপর কোনো সাগরের তুলনা হ না!

কৃষ্ণ-সাগরকে ভূমধ্য-সাগরের অংশ বলি যদি ধরা হয়, তাহা হইলে কৃষ্ণ-উপসাগরে পশ্চিম-প্রান্তবর্ত্তী বাটুম্ হইতে মরক্কোর উত্ত ট্যাঞ্জিয়ার্স পর্য্যন্ত পূর্ব্ব-পশ্চিমে ভূমধ -স্যাগরের দৈর্ঘ্য হয় ২৮০০ মাইল।

পশ্চিম দিক্ দিয়া ভূমধ্য-সাগরে প্রবে করিতে হইলে জিব্রাণ্টারের সঙ্কীর্ণ পথ ছা আর অন্য পথ নাই। জিব্রাণ্টারে ব্রিটিশে সুরক্ষিত দুর্গ আছে। ভূমধ্য সাগর উত্তীর্ণ হই প্রাচ্যে ভারত-মহাসাগরে যাইতে হইে পূর্ব্ব-সীমান্তে আছে সুয়েজ খাল। এ সুয়েজ খাল পার হইয়া লোহিত-সাগর দি ভারত-মহাসাগরে আসিতে হয়। জিব্রা-টা হইতে সুয়েজ খাল পর্য্যন্ত ভূমধ্য-সাগরে টানা দৈর্ঘ্য ১২০০ মাইলেরও বেশী।

জিব্রাণ্টার হইতে পূর্ব্ব-সীমানায় যাইতে ভূমধ্য-সাগরের উভয় তীরে আছে স্পেন ফ্রান্স, মোনাকো, ইতালী, যুগোশ্লাভিয়া, আল বানিয়া, গ্রীস এবং তুরস্ক; তার পর পূর্বে দার্দ্দানালেশ, মর্মরা ও বশফরাস ভে করিয়া যে-পথ, সে-পথে যাওয়া যা বুল্গেরিয়া, রোমানিয়া, বেশারেবিয়া, রুশ উক্রেন, ক্রিমিয়া, জর্জ্জিয়া এবং উত্তর-তুরস্কে। দক্ষিণ-তুরস্কের দিকে ভূমধ্য-সাগরের তীরে আছে সিরিয়া, পালেস্তাইন এবং মিশর আবার পশ্চিমে আটলাণ্টিকের দিবে আসিতে লিবিয়া (সাইরেনায়কা এবং ত্রিপোলিতানিয়া); তুনিশিয়া, আল-জিরিয়া এবং মরক্কো।

ভূমধ্য-সাগরের বুকে এবং নানা জাতির অভ্যুদয় ও পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভূমধ্য-সাগরের তীরবর্ত্তী সমস্ত রাজ্য-জনপদের ভাগ্যে কত ভাঙ্গা-গড়া হইয়াছে, তাহারো সীমা নাই!

আজ এ-যুগের তিনটি প্রধানতম জাতির বিরাট্ স্বার্থও এই সাগরের সঙ্গে বিজড়িত।

রোমের সে বিরাট রাজ্য-সম্পদের প্রসার আজ নাই। ক্ষুদ

লিবিয়ায় মার্কিন প্লেন ও ট্যাঙ্ক

সুতরাং ভূমধ্য-সাগরের দুই তীরে কত বিভিন্ন জাতি, ধর্ম্ম, ভাষা এবং সভ্যতা-সংস্কৃতি বিরাজ করিতেছে, ভাবিলে চমক লাগে! তার উপর এই সব বিভিন্ন জাতির প্রধান তীর্থগুলিতে যাইতে হইলেও ভূমধ্য-সাগরই একমাত্র পথ। এই ভূমধ্য-সাগরের বুকে কত যুগের কত রাজা-বাদশা, কত সম্রাট্-সুলতান, কত ডিউক-ডিকটেটর শক্তির জন্য সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন! রোমের ও তুরস্কের বিজয়-অভ্যুত্থান এবং গৌরব-নাশ—তাহাও ঘটিয়াছে এই

ইতালীটুকু লইয়াই আজ রোমের যা-কিছু গর্ব্ব-গৌরব। কত ক্ষুদ্র ইতালীতে সমস্ত ইতালীয়ান জাতের স্থান সঙ্কুলান হয় না। তাই বহু ইতালীয়ান প্রবাসে গিয়া আস্তানা পাতিয়াছেন। কতক গিয়াছেন মার্কিন যুক্তরাজ্যে; কতক আমেরিকায়; কতক ফ্রান্সে; এবং কতক আফ্রিকায়। নিরুপায়ে তাঁদের যাইতে হইয়াছে। শুধু স্থানাভাবই কারণ নয়; ইতালীতে খাদ্য এমন প্রচুর নয় যে, সকলের তাহাতে ভরণ-পোষণ হইতে পারে।

যুদ্ধে নামিবার ন'মাস পূর্ব্ব হইতে ইতালীকে দায়ে পড়িয়া খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে হইয়াছিল। নিয়ন্ত্রণের বিধি এখন আরো কঠিন। বস্ত্রাদি এবং কয়লার অভাব ইতালীতে নিদারুণ। জার্ম্মানির

আকাশে বৃটিশ প্লেন—যুদ্ধ-জাহাজের শত্রু। জলের বুকে বৃটিশ নৌ-শক্তি।

বৃটিশ সেনার স্নান। এ ট্যাঙ্কের জলে রোগের ভয় নাই!

সঙ্গে ইতালীর যে কন্‌ট্রাক্ট, তার সর্ত্ত-মতো ইতালীকে জার্ম্মানির জোগাইতে হয় মাসে দশ লক্ষ টন কয়লা! এ কয়লার জোগান পূর্ব্বে হইত ট্রেণে। ৬০ গাড়ী করিয়া কয়লা প্রত্যহ ইতালীতে পাঠানো হইত। পরে ফৌজ-যাতায়াত বাড়িবার দরুণ কয়লার গাড়ী নিয়মিত আসে না; এবং গাড়ীর সংখ্যাও কমিয়াছে। তাছাড়া ইতালীতে কাঁচা মাল তেমন বেশী জন্মায় না, কাজেই ইতালীতে যে-মাল মিলিতেছে, তার দাম খুব চড়া। এ জন্য অভাব বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ইতালীর ঋণ-ভার বাড়িয়া পাহাড়ের মতো বিপুল হইতেছে।

আমদানি দ্রব্যাদির শতকরা ১৪ ভাগ বৃটেন পায় সুয়েজ-খালের মারফৎ। এ জন্য ভূমধ্য-সাগর ও সুয়েজ—বৃটেনের 'জীবন-রেখা' নামে খ্যাত! আজ সব দিকে বিপর্য্যয় ঘটিলেও উত্তমাশা অন্তরীপের পথ বৃটেনের পক্ষে মুক্ত আছে। সে জন্য তার মাল-আমদানি মাত্রায় কিছু কমিলেও সেখানে তেমন অভাব-অনাটন ঘটিতেছে না। ভূমধ্য-সাগরের উপর আজ বৃটেনের সতর্ক পাহারাদারী চলিয়াছে। বিপক্ষ-দল যদি একবার এ পথে প্রবেশ করিতে পারে, তাহা হইলে নানা বিপর্য্যয় ঘটাইবে।

এ যুদ্ধে মিশরের সঙ্গে কাহারো বিরোধ নাই। তবু মিশর নির্লিপ্ত থাকিতে পারিল না! জার্ম্মানির এবং ইতালীর সর্ব্বগ্রাসী বাসনাকে চূর্ণ করিবার জন্য মিশরকে রক্ষা করিতে বৃটেন আজ কোমর বাঁধিয়াছে। এক্সিস-শক্তি যেন আস্তানা পাতিবার জন্য মিশরে সূচ্যগ্র-পরিমিত ভূমি না পায়!

আফ্রিকার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত বৃটিশ-অধিকৃত প্রদেশগুলিতে যাইতে হইলে মিশর দিয়া যাইতে হয়। সে পথ রুদ্ধ রাখা চাই! তাই সে-পথে প্রহরীর মতো বৃটেন আজ অষ্টবজ্র সম্মিলন ঘটাইয়াছে!* মিশরে যদি এক্সিস-শক্তি আস্তানা পাতিবার সুযোগ পায়, তাহা হইলে বৃটিশ-অধিকৃত কেনিয়া, ফরাসী-অধিকৃত আফ্রিকার সকল অংশ, বেলজিয়ান্‌-অধিকৃত কঙ্গো এবং প্রাচ্য ভূখণ্ড সমধিক বিপন্ন হইবে। অথচ এখানে ইংরেজ আস্তানা পাতিলে সুয়েজ-খালে বৃটেন একাধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে—সিরিয়া, প্যালেস্তাইন, ত্রিপোলি এবং সেই সঙ্গে কায়রো পর্য্যন্ত ইরাক-তৈল রক্ষা করিতেও সমর্থ হইবে। তার উপর ভারতবর্ষ এবং অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত—শূন্য এবং জলপথ বৃটেনের পক্ষে নিরাপদ এবং অবাধিত থাকিবে। সুয়েজের দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত এরিত্রিয়ায় সামরিক ঘাঁটী স্থাপনা করিয়া তুর্কির পথে অথবা কৃষ্ণ উপসাগরের দিকে এক্সিস-শক্তিকে মিত্র-শক্তি দাবে রাখিতে পারিবে।

স্পেনের দিক দিয়া এক্সিস-শক্তি যদি আক্রমণের উদ্যোগ করে, তাহা হইলে ভূমধ্য-সাগরের জন্যই তার সে উদ্যোগ ব্যর্থ হইবার আশা অনেক বেশী।

ভূমধ্য-সাগরের পশ্চিম প্রান্তে জিব্রাল্টার এবং পূর্ব্ব প্রান্তে সুয়েজ। এ দু'টি ঘাঁটী সুরক্ষিত থাকিলে এ যুদ্ধে বৃটেন এবং আমেরিকার পক্ষে জাহাজ, অস্ত্রশস্ত্র এবং রশদের জোগানে কোনো দিন অসুবিধা ঘটিবে বলিয়া মনে হয় না।

---

* মিশর সম্বন্ধে সচিত্র বিবরণ মাঘ-সংখ্যা 'মাসিক বসুমতী'তে বিস্তারিত ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

হায়ফা—এ যুগের সমৃদ্ধতম বন্দর

বসফরাশ—এই নদী পার হইয়া য়ুরোপ ও এশিয়া পরস্পরে এক দিন শত-শত যুদ্ধ করিয়াছিল !
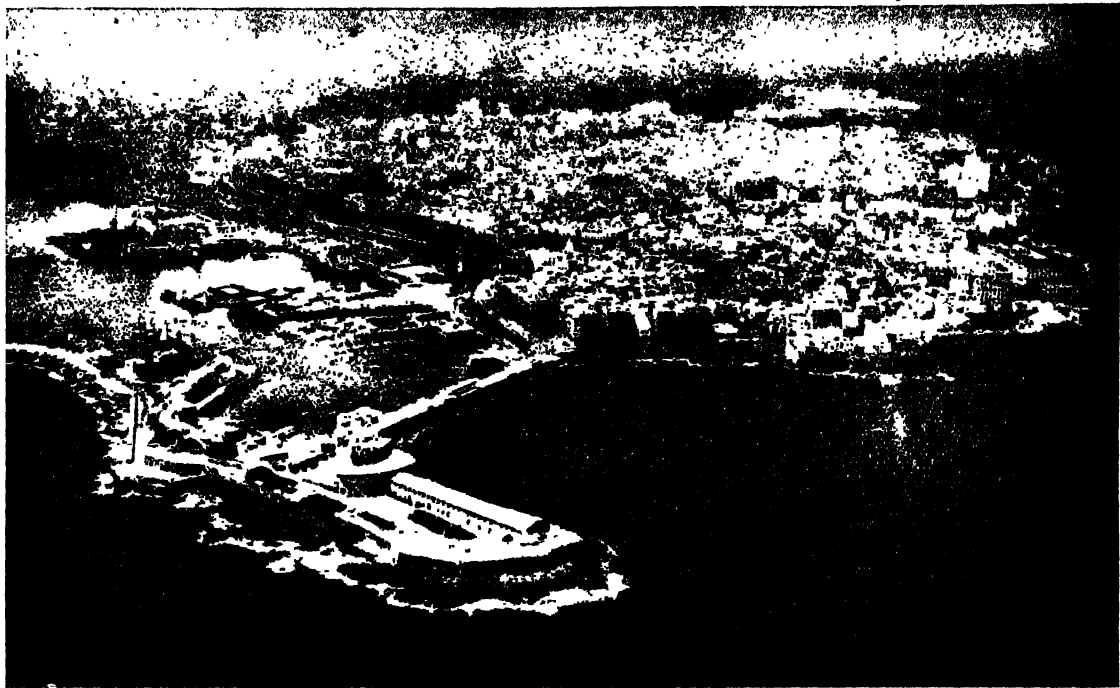
আলজিয়ার্স—আলজিরিয়ার প্রধান সহর। পুরাকালে বোম্বেটের আস্তানা ছিল!

মেশিনো বন্দর—ও-পারে ইতালী
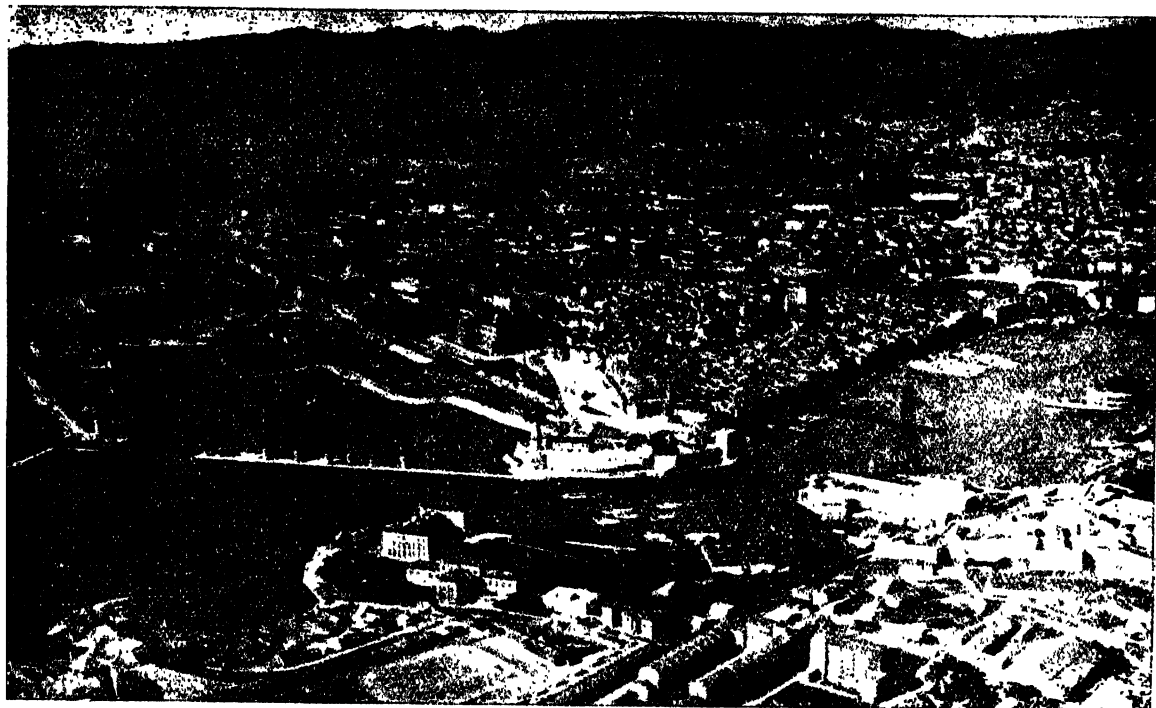
মার্শেল (ফ্রান্স) : মধ্যে শাঁতে জীন্ দুর্গ ; এ-পারে রাণী ইউজিনির প্রাসাদ—এখন চিকিৎসা-বিজ্ঞান-মন্দিব

মাল্টার পাহাবাদার বৃটিশ রণ-তরী "কুইন এলিজাবেথ"

ধূ-ধূ মরুভূমির বুকে সুয়েজের শীর্ণ জলরেখা—সুয়েজের বুকে জাহাজ চলিয়াছে

জিব্রাল্টারে ভূমধ্য-সাগর চওড়া মোটে সাত মাইল। এ সাত মাইলের পাড়িতে য়ুরোপ হইতে আফ্রিকা পৌঁছতে সময় লাগে খুব অল্প। হানিবল এই পথে আফ্রিকায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার পরে মুর-জাতিও এই পথে সাগর পার হইয়া আফ্রিকায় আসিয়াছিল।

মরক্কোর কিউটা সহর স্পানিশের অধিকার-ভুক্ত। তারি নিকটে টাঞ্জিয়ার—খুব সমৃদ্ধ-বন্দর। টাঞ্জিয়ারে ৬০ হাজার লোকের বাস। ঘর-বাড়ী, সিনেমা, নৃত্যশালা, হোটেল, অয়েল-ট্যাঙ্ক, মোটর-গাড়ীর কারখানা ও এজেন্সির প্রাচুর্য্যে টাঞ্জিয়ারের গৌরব-মহিমা আজ সমুজ্জ্বল।

টাঞ্জিয়ারের অপর তীরে জিব্রাল্টার। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে স্পেনের করচ্যুত হইয়া জিব্রাল্টার গিয়াছে বৃটেনের হাতে। জিব্রাল্টারে গত বৎসর জার্ম্মানি প্রচুর বোমা বর্ষণ করিয়াছিল—কিন্তু জিব্রাল্টারের দুর্ভেদ্যতা-নাশে জার্ম্মানি সমর্থ হয় নাই। ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক দিয়া জিব্রাল্টারের কোনো মূল্য নাই। এখানে এমন

কোনো দ্রব্য উৎপন্ন হয় না, যাহা বিদেশে চালান দিয়া অর্থ আসিবে। বাহির হইতে মাল আমদানি করিয়া জিব্রাল্টারের দিনাতিপাত হয়। জিব্রাল্টারের বুকে শুধু উষর পাহাড়। আকাশে-বাতাসে অতীতের শত কাহিনী ভাসিয়া বেড়াইতেছে! ফল-ফুলের প্রাচুর্য্য এখানে খুব বেশী। পূর্ব্বে এডেন, মাঝখানে মাল্টা এবং পশ্চিমে জিব্রাল্টার; ভূমধ্য-সাগরের বুকে এই তিন জায়গায় তিনটি দুর্ভেদ্য দুর্গ—ভূমধ্য-সাগর সুয়েজ এবং লোহিত-সাগর মারফৎ বৃটেনের বাণিজ্য-লক্ষ্মীর পথকে নিরাপদ রাখিয়াছে চিরদিন।

অতীত যুগে যখন বিমানপোতের কথা স্বপ্নের অগোচর ছিল, জাহাজ ও রেলপথ ছিল সংখ্যায় মুষ্টিমেয়, তখন আরব এবং ভারতবর্ষ গিয়াছে। এখন টায়ারের হাটে নূতন যে-সব দ্রব্যের আমদানি হইতেছে, তার মধ্যে আছে সেলাইয়ের কল, রেডিয়ো-শেট, ক্যামেরা প্রভৃতি। সুয়েজ-খাল সে-কালেও ছিল; এবং সে খাল প্রথম তৈয়ারী হইয়াছিল খৃষ্ট-জন্মের প্রায় ১৯০০ বৎসর পূর্ব্বে।

খৃষ্ট-জন্মের ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে পাঁচখানি জাহাজ ভরিয়া চন্দন কাঠ, হাতীর দাঁত, সোনা, দারুচিনি, মৃগনাভি, সুর্ম্মা এবং বহু বান্দা-বাঁদী লইয়া মিশরের রাণী হাতশেপসুৎ এই লোহিত সাগরের বুকের উপর দিয়া আরবে আসিয়াছিলেন বাণিজ্য করিতে, ইতিহাসে এ কথাও লিখিত আছে; এবং সুয়েজ খালে বাণিজ্য-তরী যাতায়াত করিত খৃষ্ট-জন্মের ১৯০০ হইতে ৭৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

নেপল্‌স্ বন্দরে সূর্য্যোদয়। ডাহিনে বিসুবিয়াস; গায়ে-গায়ে সান্ জিয়োভানি, রেজিনা গ্রাম; পম্পিয়াই এবং হার্কিউলেনিয়ামের স্মৃতিস্তূপ।

হইতে রেশম, হস্তিদন্ত, আতর, মরীচ এবং মণি-প্রস্তরাদি লইয়া ব্যবসায়ীর দল উটের পিঠে চড়িয়া ভূমধ্য-সাগরবর্ত্তী জনপদে বাণিজ্য করিতে আসিতেন। সেই ব্যবসায়ের প্রসার-কল্পে সুয়েজ খাল খোঁড়ার প্রেরণা জাগে। ফলে এশিয়ার সঙ্গে আফ্রিকার বাণিজ্যের সম্পর্ক সহজ ও সুদৃঢ় হয়।

খৃষ্ট-জন্মের ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে এ অঞ্চলের বাণিজ্য-সম্পর্কে প্রাচীন ঐতিহাসিক এজকিল যে প্রত্যক্ষ বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়, পালেস্তাইনের উত্তরে টায়ার সহরের বাজারে ভারতবর্ষ আর মিশর হইতে বহু পণ্য আমদানি হইত। ফিনিশিয়ানরা এ বাজারে প্রচুর টিন আনাইত; সেই টিন হইতে তারা তৈয়ারী করিত ব্রোঞ্জ-ধাতু। এখনো নানা পণ্য লইয়া টায়ারে বাজার বসে, তবে টায়ারের চেহারা সব দিক দিয়া বদলাইয়া এই ঐতিহাসিক প্রমাণ হইতে জানিতে পারি, সুয়েজ খাল এ যুগের সৃষ্টি নয়! ভাস্কো ডি গামা ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন আফ্রিকার সর্ব্বদক্ষিণে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া—সে শুধু সুয়েজের পথ তিনি ভুল করিয়াছিলেন বলিয়া! ভারতবর্ষে আসিবার জন্য সুয়েজ খালকেই তিনি পথ-স্বরূপ অবলম্বন করিবেন, স্থির ছিল। কিন্তু সে পথ ভুল করিয়া তিনি গিয়া পড়িয়াছিলেন উত্তমাশা অন্তরীপে।

এখন যুদ্ধের এই বিপর্য্যয় দুর্য্যোগে জাহাজের জন্য ভূমধ্য সাগর মুক্ত বা অবারিত নাই, উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া জাহাজ যাতায়াত করিতেছে। তবে ভূমধ্য-সাগরের পথ রুদ্ধ হইলেও সুয়েজের পথ রুদ্ধ হয় নাই। উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া বহু বৃটিশ ও মার্কিন বাণিজ্য-জাহাজ সুয়েজের মধ্য দিয়া সৈয়দ বন্দরে ও আলেকজান্দ্রিয়ায়

এল জেম্ গ্রাম (টিউনিশিয়া)—প্রাচীন থিশড্রাস্ ; পিছনে রোমান্ এ্যাম্ফি-থিয়েটার

উপর দিয়া জার্ম্মান প্লেন আফ্রিকায় যাতায়াত করিতেছে! বৃটিশ প্লেন চলিয়াছে ফৌজ এবং অস্ত্র-শস্ত্র বহিয়া!

মিশরের সঙ্গে আমেরিকার আজ যে যোগাযোগ, তাহা আছে শুধু ঐ আকাশ-পথ দিয়া। ব্রেজিল হইতে বিমান-পোত আজ আফ্রিকায় আসিতেছে কায়রো পর্য্যন্ত। সেখানে বৃটিশ বিমান-বন্দর আছে।

ভূমধ্য-সাগরে একাধিপত্য লাভের জন্য ফ্রান্সের প্রথম চেষ্টা জাগে নেপোলিয়নের সময়। ভূমধ্য-সাগর বহিয়া নেপোলিয়ন গিয়া মিশর আক্রমণ করেন; এবং তাঁর সে আক্রমণ সার্থক হয়। কিন্তু এ সৌভাগ্য সহিল না! অচির-কালের মধ্যে নীল-নদের যুদ্ধে নেপোলিয়নের ভীষণ পরাজয় হয়, তখন তিনি সিরিয়ায় গিয়া বৃটিশের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। সে যুদ্ধেও তাঁর জয় হয় নাই, পতনের সূচনা ঘটে।

তার পর ইতালী এবং ইংলণ্ডের সহিত একযোগে এই ভূমধ্য-সাগর পার হইয়া আফ্রিকায় আসিয়া ফ্রান্স এখানে বহু প্রদেশ লাভ করে। ভূমধ্য-সাগরবর্ত্তী আলজিরিয়া, টিউনিসিয়া এবং মরক্কো আজ ফ্রান্সের অধিকারে। বহু ফরাশী নর-নারী আসিয়া এ-সব জায়গায় বসবাস করিতেছেন। এক আলজিরিয়াতেই ফরাশী অধিবাসীর সংখ্যা সাত-আট লক্ষ। মরক্কো আলজিরিয়া প্রভৃতির অধিবাসীদের লইয়া এখানকার ফরাশী সৈন্য সংগঠিত হইয়াছিল। তাদের মাথায় ফেজ, পরণে জমকালো লুঙ্গী এবং গায়ের উজ্জ্বল কালো বর্ণ য়ুরোপে এক-দিন প্রচুর বিস্ময় চমক জাগাইয়াছিল!

ভূমধ্য-সাগরে যে-সব দ্বীপ আছে, সে সব দ্বীপে ছয়টি বিভিন্ন জাতি ভাগ-দখল করিয়া লইয়াছে।* মালটা এবং সাইপ্রাস—বৃটিশ

এমন কি জায়ফা-হায়ফাতেও আসিতেছে। তবে বেশীর ভাগ মাল-পত্র সুয়েজে নামানো হইতেছে।

যখন যুদ্ধ-বিগ্রহ ছিল না, তখন বছরে ৬০০০ জাহাজ সুয়েজ খাল মারফৎ এশিয়া-য়ুরোপে যাতায়াত করিত। এ সব জাহাজের মধ্যে শতকরা ৬০খানি ছিল বৃটিশ।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বৃটেন হলাণ্ড জার্ম্মাণ ফ্রান্স স্কানডিনেভিয়া—সকলের বাণিজ্য-জাহাজ চলিত এই সুয়েজ খাল দিয়া ভারতবর্ষের সহিত ব্যবসাদারী করিতে। এই ভূমধ্য-সাগর বহিয়াই আমেরিকা, ফ্রান্স, সুইজার্লাণ্ড, বেলজিয়াম প্রাচ্য ভূখণ্ডের সহিত ব্যবসায়-সম্পর্ক নিবিড় ও অব্যাহত রাখিয়াছিল। তার উপর ভূমধ্য-সাগরে দরিদ্র মৎস্য-জীবীদের জেলে-নৌকা চলিত অসংখ্য। আজ যুদ্ধের দারুণ বিভীষিকা সত্বেও দরিদ্র ব্যবসায়ীরা মাছ ধরিতে ভূমধ্য-সাগরে বোট লইয়া বাহির হয়। তবে বাণিজ্যের দিক দিয়া ভূমধ্য-সাগর আজ ডেড-সীতে পরিণত হইয়াছে! তার ধূ-ধূ বিরাট্ বক্ষে বাণিজ্য-জাহাজের চিহ্ন দেখা যায় না! আকাশ-পথে দেখা যায় শুধু ভূমধ্য-সাগরের

* 'মাল্টার' সচিত্র বিশদ বিবরণ ১৩৪৮ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'মাসিক বসুমতীতে' প্রকাশিত হইয়াছে।

জাতির, ফরাসীর কর্শিকা; স্পেনের বালিয়ারিক্‌স্—বিমান এবং নৌবন্দর; ইতালীর সার্দিনিয়া, রোডস্‌, ইজিয়ান * দ্বীপপুঞ্জ, পান্তেলেরিয়া এবং সিসিলি। এ-সব দ্বীপ পূর্ব্বে জার্মানির ছিল; এখন ইতালী ভোগ করিতেছে। গ্রীসের ছিল ক্রীট এবং কয়রা। এ দু'টি দ্বীপ এখন এক্সিস-শক্তির অধিকারে। তুর্কির আছে দার্দ্দানেলেশের মুখে ইমব্রশ এবং টেনিড্‌শ।

এক্সিস-শক্তির ঘাঁটী সিসিলি হইতে দক্ষিণে ৬০ মাইল দূরে মাল্‌টা। দু'টি দ্বীপে নিয়ম করিয়া বোমায় আলাপ চলে! মাল্‌টার একদিকে সিসিলি, আর এক দিকে আফ্রিকা। কাজেই কুকুরের মুখে মাংসর টুকরার মতো এ দ্বীপটিকে লইবার জন্য বহু জাতির মধ্যে "খেয়োখেয়ি" চলিয়াছে বহু বার। মাল্‌টা প্রথমে ছিল ফিনিশিয়ানদের হাতে; তার পর কার্থেজিয়ান, রোমান এবং গ্রীকদের হাত হইতে নর্মান এবং আরাগনীজের হাত ঘুরিয়া ইংরেজের হাতে আসিয়াছে।

সাইপ্রাস—লাইমেলিয়া বন্দর

ভূমধ্য-সাগরের বুকে বৃটেনের দ্বিতীয় দ্বীপ সাইপ্রাস। এটিও দুর্ভেদ্য দুর্গ-প্রাকারাদিতে সুগঠিত। পালেস্তাইনের হায়ফা হইতে উত্তরে ১৬০ মাইল দূরে সাইপ্রাস অবস্থিত। সাইপ্রাস প্রায় তিনশো বৎসর যাবৎ তুর্কির অধীনে ছিল। গত মহাযুদ্ধের অবসানে সাইপ্রাস আসিয়াছে বৃটেনের হাতে। এ দ্বীপের উপর জার্ম্মানি এবং ইতালীর আক্রমণের আজ বিরাম নাই!

তার পর দার্দ্দানেলেশ, মর্ম্মরা এবং বসফরাশ—ভূমধ্য-সাগর হইতে কৃষ্ণ-সাগরে যাইতে নাতিপ্রসার তিনটি জল-প্রণালী। ভূমধ্য-সাগর হইতে কৃষ্ণ-সাগরের তীরে রাশিয়ার দু'টি বন্দর ওডেশা এবং বাটুম। এ দু'টি বন্দরে যাইতে এই দার্দ্দানেলেশই একমাত্র পথ। রাজনীতিকগণের কাছে দার্দ্দানেলেশের মূল্য জিব্রাল্টার এবং সুয়েজের অনুরূপ। সে জন্য দার্দ্দানেলেশ লইয়া বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ হইয়া গিয়াছে। এটি যদি রাশিয়ার করচ্যুত হয়, তাহা হইলে রাশিয়ার নৌ-শক্তি একেবারে ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িবে।

খৃষ্ট-জন্মের ৭০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে ক্রিমীয়ার গম, ককেশাসের কাঠ এবং চামড়া চালান দিবার জন্য এই দার্দ্দানেলেশই ছিল রাশিয়ার একমাত্র গতি। এ যুগেও নানা খনিজ সামগ্রী এবং বাটুম্‌ ও বাকু হইতে পাইপযোগে রাশিয়া যে-পেট্রোল আনিতেছে, তাহাও এই দার্দ্দানেলেশের কল্যাণে।

এশিয়া-তুর্কির সহিত দক্ষিণ-পূর্ব্ব য়ুরোপের মিলন সংঘটিত হইয়াছে দার্দ্দানেলেশের ক্ষীণ জলরেখা-সংযোগে। য়ুরোপের বহু প্রদেশের মধ্য দিয়া প্যারিস হইতে যে সুদীর্ঘ রেল-পথ, সে পথ আসিয়াছে দার্দ্দানেলেশের উত্তর গা ঘেঁষিয়া একেবারে ইস্তাম্বুল পর্য্যন্ত। শান্তির দিনে নির্ব্বিবাদে এ পথে ট্রেণ যাতায়াত করিত। এখন অবশ্য ট্রেণ-চলাচল বন্ধ আছে। ট্রেণ হইতে এখানে নামিয়া যাত্রীরা বসফরাশ পার হইয়া আবার বাগদাদী-রেলে চড়িতেন। এ ট্রেণে চড়িয়া আঙ্কারা, এলেপো, মশুল, বাসরা পৌঁছানো যায়। পারস্য-উপসাগরের তীরে এই বাসরাতেই ইরাকী পেট্রোলের বিরাট্‌ বিপুল খনি-সম্পদ অবস্থিত।

প্রাচীন গ্রীকরা দার্দ্দানেলেশকে হেলেনোপন্ত নামে অভিহিত করিতেন। প্রাচীন যুগে লিয়াণ্ডার এবং এ যুগে লর্ড বায়রন সাঁতার দিয়া দার্দ্দানেলেশ পার হইয়াছিলেন। এখন কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সাঁতার কাটিয়া দার্দ্দানেলেশ পার—নিত্য-খেলার ব্যাপারে দাড়াইয়াছে।

দার্দ্দানেলেশ পার হইয়া কিম্বা কৃষ্ণ-উপসাগর উত্তীর্ণ হইয়া জার্ম্মানি চায় প্রাচ্য ভূখণ্ড আক্রমণ করিতে। সেই জন্যই রাশিয়ার সঙ্গে তার জীবন-পণ যুদ্ধ চলিয়াছে।

---

* ইজিয়ান দ্বীপপুঞ্জের সচিত্র বিশদ বিবরণ ১৩৪৮ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'মাসিক বসুমতীতে' প্রকাশিত হইয়াছে।

দার্দানেলেশের উভয় তীর তুর্কির অধীনে। এ দুই তীর তুর্কি দুর্গ-প্রাকারে সুরক্ষিত করিয়াছে। দার্দানেলেশে বহু জাতির স্বার্থ আছে। দার্দানেলেশে যদি এক্সিস-শক্তি প্রবেশাধিকার পায়, তাহা হইলে এদিককার পথে তার আক্রমণ দুর্দ্ধর্ষ হইবে!

দার্দানেলেশের কল্যাণে আজ আমেরিকা পাইতেছে তামাক। এই তামাকের দৌলতে তারা ধূমপানের আরাম উপভোগ করিতেছে। দার্দানেলেশের দৌলতে দেশ-বিদেশে ভারে ভারে চলিয়াছে অলিভ তৈল, ফিগ্, পেস্তা, বাদাম, খেজুর, চীজ, মিশরী তুলা, রকমারি সুরা।

ক্রীট্—প্যারাশুটে এখানে নামিয়া জার্ম্মানরা এ-দ্বীপকে করিয়াছিল আক্রমণের ঘাঁটী (মে ১৯৪১)

আজ মহাযুদ্ধের এই পৈশাচিক লীলার ভারে ভূমধ্য-সাগর স্থির নিষ্কম্প পড়িয়া আছে! তার বুকে বাণিজ্য-সম্ভারবাহী জাহাজের চিহ্ন নাই! যাত্রীদের সে কল-হাস্য নাই! চালানীর কাজ একেবারে বন্ধ। তার ফলে সাগরের উভয়-তীরবর্ত্তী জনপদে খাদ্যের প্রচণ্ড অভাব! কোথাও আনন্দ নাই! জীবনের স্পন্দন ক্ষীণ! এই ভূমধ্য-সাগর এক দিন গ্রীস হইতে ভারতবর্ষ হইতে মিশর হইতে জ্ঞান-সম্ভার বহন করিয়া সারা পৃথিবীতে তাহা বিতরণ করিয়াছে! এই ভূমধ্য-সাগর বহিয়া বিজ্ঞান-দর্শন ললিত কলা-শিল্প ইতিহাস ভূগোল রাজনীতি সভ্যতা সংস্কৃতি পৃথিবীর দিগ্‌দিগন্তে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে! বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির মিলন সংঘটিত হইয়াছিল এই ভূমধ্য-সাগরকে অবলম্বন করিয়া! সেই ভূমধ্য-সাগরের আজিকার এ মলিন মূর্ত্তি দেখিয়া মনে হয়, যে-মানুষকে জ্ঞান-বিভূষণে সে সভ্য ভদ্র দরদী করিয়াছে, সেই মানুষ এমন পশুর মত হিংস্র হইয়া বিরাট্ ধ্বংসে উন্মত্ত—তাহা দেখিয়াই সে যেন আজ শিহরিয়া এমন নিস্পন্দ নিথর রহিয়াছে!

বাঙ্গালার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

বাঙ্গালায় এবং বর্ত্তমান বিহারের কোন কোন অংশে লর্ড কর্ণওয়ালিস-প্রবর্ত্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত আছে। অনেকে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের প্রথম আপত্তি, ইহা ভূস্বামী বা জমিদারদিগকে বিনা পরিশ্রমে বহু টাকার অধিকার দেয়। তাঁহারা সেই টাকায় বিলাসে গা ভাসাইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। দ্বিতীয় আপত্তি, যে টাকাটা জমিদারদিগের আয় হয়, সেই টাকাটা সরকারের আয় হইলে তাহাতে সমাজের বিশেষ উপকার সাধিত হইতে পারিত। উভয় আপত্তিই আপাতদৃষ্টিতে ভাল বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহার একটিও বিচারসহ নহে। প্রথমতঃ, অর্থ নিয়োগ করিলেই লোক শ্রম না করিয়াই অর্থের বা আয়ের অধিকারী হইয়া থাকে। ঋণ দাম করিলে যে সুদ পাওয়া যায়, তাহা বিনা শ্রমে আয়েরই সৃষ্টি করে। ডিবেঞ্চার, জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানীর অংশ প্রভৃতি খরিদ করিতে পারিলেই উহা লোককে অনর্জ্জিত আয়ের (unearned income) অধিকারী করে। কিন্তু ঐরূপ আয়ের বিরুদ্ধে ত' কেহ কোন কথা বলেন না। কারণ, উহা বন্ধ করিলে সর্ব্ববিধ আয়ের উপায় বন্ধ হইয়া যায়। তবে রাশি রাশি অর্থ দিয়া যাঁহারা ভূসম্পত্তি খরিদ করেন, তাঁহারা সে আয়ের অধিকারী না হইবেন কেন? ইহার কোন সন্তোষজনক উত্তর ইঁহারা দিতে পারেন না। সুতরাং এ আপত্তি বিচারসহ নহে। দ্বিতীয় আপত্তি, যে টাকাটা জমিদারদিগের আয় হয়, সে টাকাটা যদি সরকারের আয় হয়, তাহা হইলে তদ্দারা সমাজের অনেক উপকার হইতে পারে। কিন্তু সকল সময় বা সকল অবস্থায় তাহা হয় না। সরকার যদি স্বদেশী—স্বদেশপ্রাণ হয় এবং যদি সেই সরকারের কার্য্য স্বদেশ-হিতৈষণার দ্বারা চালিত হয়, তাহা হইলে তাহা হইতে পারে। কিন্তু

তাহা প্রায় হয় না। বিশেষতঃ, পরাধীন রাজ্যে তাহা হইতেই পারে না। কারণ, বিদেশী রাজার বা সরকারের পক্ষে প্রজার নিকট হইতে টাকা আদায় করা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য হইয়া থাকে। উহাতে অনেক টাকা খরচা পড়িয়া যায়। বিদেশী ব্যুরোক্রেসীর বেতন বাবদ ব্যয় অত্যন্ত অধিক। সাধারণের মধ্যে তাঁহাদের মানসম্ভ্রম বজায় রাখিবার ব্যয় বেশী পড়ে। সুতরাং কার্য্যতঃ ঐ টাকা দেশের হিতার্থে ব্যয় হয় না,—হয় বিদেশী ব্যুরোক্রেসী-পোষণে। এরূপ অবস্থায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে উভয় আপত্তির মধ্যে কোন আপত্তিই সমর্থিত হইতে পারে না।

এ দেশে ভূসম্পত্তি চিরকালই ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। ইহা এ দেশের চিরাচরিত প্রথা। ভারতীয় রাজন্যবর্গ ব্যক্তিবিশেষকে ভূমিদান করিতেন। সেই দত্ত ভূসম্পত্তিতে সেই দানগ্রহীতারই নির্ব্যূঢ় স্বত্ব। রাজা দত্তাপহারী হইতেন না। এ দেশের ইতিহাসের উষাকালেই, দেখা যায় যে, বামন বলি রাজার নিকট ত্রিপদ ভূমি মাত্র ভিক্ষা করিয়াছিলেন। পিতৃ-মাতৃ শ্রাদ্ধে ভূমিদানের ব্যবস্থা আছে। হিন্দু সমাজে ভূমি চিরকালই ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। সুবিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে, এ দেশের জমিদাররা কেবলমাত্র খাজনা-আদায়কারী ছিলেন না, তাঁহারা প্রকৃতই দেশের শাসক ছিলেন। লর্ড কার্জ্জন, রমেশ বাবুর এই উক্তিতে আপত্তি করিয়াছিলেন। তিনি এই কথার খণ্ডন করিবার প্রয়াস পাইয়াও খণ্ডন করিতে পারেন নাই। ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট বঙ্গীয় সরকার যে রিপোর্ট ১৯০১ খৃষ্টাব্দে পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে স্পষ্টই স্বীকৃত হইয়াছে যে, কতক জমিদার মধ্যবর্ত্তী সম্প্রদায় হইতেই হইত, আর কতক জমিদার পুরুষানুক্রমে জমিদার ছিলেন। ইহাতে রমেশ বাবুর উক্তি খণ্ডিত হয় নাই। অভাবগ্রস্ত জমিদার অভাবে পড়িয়া তাঁহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিক্রয় করিলেই উহা অন্য লোকের হাতে যাইয়া পড়ে এবং ক্রেতা পূর্ব্বস্বামীর স্বত্বেরই অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এরূপ অবস্থায় কতক ভূ-সম্পত্তি যে অন্য ধনী লোকের হাতে পড়িবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? উহাতে বরং জমিতে প্রাচীন ভূ-স্বামীর নির্ব্যূঢ় অধিকার সূচিত হয়। তবে মুসলমান নবাবগণ খাজনার দায়ে জমিদারের ভূসম্পত্তি কাড়িয়া লইতেন না বা ন্যায়তঃ পারিতেন না। ইহার প্রমাণের অভাব নাই। নলডাঙ্গার রাজাদের ইতিহাসে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। নলডাঙ্গার জমিদার রাজা রামদেব দেবরায় কয়েক বৎসর নবাব-সরকারে তাঁহার দেয় রাজস্ব দিতে পারেন নাই। সে সময় মুর্শিদকুলী খাঁ বাঙ্গালার নবাব। তিনি অত্যন্ত কঠোরতার সহিত জমিদারদিগের নিকট হইতে সরকারী রাজস্ব আদায় করিতেন। যে জমিদার রাজস্ব কয়েক বৎসর দিতে পারিতেন না,—তাঁহাকে তিনি কোমরে দড়া বাঁধিয়া পুরীষপূর্ণ এক হ্রদে ফেলিয়া যন্ত্রণা দিতেন। রাজা রামদেব সরকারী রাজস্ব দিতে পারেন নাই বলিয়া নবাব তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন। শেষে তিনি স্বয়ং নবাবের নিকট হাজির হইয়া প্রস্তাব করিলেন যে, তিনি স্বেচ্ছায় সুস্থ শরীরে এবং বহাল তবিয়তে জমিদারী ইস্তফা করিতে সম্মত আছেন। নবাব তাহাতে রাজী হইলেন। রামদেব জমিদারী ইস্তফা করিয়া এক দলিল লিখিয়া নবাবকে দিলেন। রামদেব "বৈকুণ্ঠের" যাতনা হইতে রেহাই পাইলেন। কিন্তু নবাব-সরকারে রামদেবের এক জন আম-মোক্তার ছিলেন। তাঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণ দাস। তিনি সেই কথা পরদিন শুনিয়া নবাবের নিকট হইতে ইস্তফা-পত্রখানি দেখিবার জন্য চাহিয়া লয়েন এবং পরে উহা গালে পুরিয়া গিলিয়া ফেলেন। এই ব্যাপারে নবাব ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ দাসকে বেদম প্রহার করাইয়া তাঁহাকে গঙ্গায় ফেলিয়া দিবার আদেশ দেন। ভাগ্যক্রমে তিনি জীবিত ছিলেন। এখন জিজ্ঞাস্য, জমিদার যদি কেবলমাত্র নবাব-সরকারের আদায়কারী কর্ম্মচারী হইতেন, তাহা হইলে নরক-যন্ত্রণা হইতে নিস্তার পাইবার জন্য তাঁহাকে জমিদারী স্বেচ্ছায় ইস্তফা করিতে হইবে কেন? নবাব ত' ইচ্ছা করিলেই তাহা কাড়িয়া লইতে পারিতেন। রাজস্ব আদায়ের জন্য বৈকুণ্ঠ নামক নরকের সৃষ্টি করিতে হইত না! আর ইস্তফা-পত্রখানি নষ্ট হইল বলিয়া রাজা রামদেবের জমিদারী রক্ষা পাইল, ইহাই বা কেন হয়? পরে রাজা রামদেব কয়েক কিস্তীতে নবাব-সরকারের প্রাপ্য টাকা শোধ করিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুতি তাঁহাকে দিতে হইয়াছিল। সুতরাং জমিদার কেবল আদায়কারী কর্ম্মচারী ছিলেন না। আবার নবাব সুজাউদ্দীনের আমলে নলডাঙ্গার রাজা রঘুদেব দেবরায় নবাবের আদেশ অমান্য করায় সুজাউদ্দীন রঘুদেবের জমিদারী নাটোরের রাজাকে পাওনা আদায়ের জন্য দিয়াছিলেন। তিন বৎসরে প্রাপ্য টাকা আদায় করিয়া নবাব সুজাউদ্দীন রাজা রঘুদেবকে তাঁহার জমিদারী ফিরাইয়া দেন। জমিদারী জমিদারদিগের সম্পত্তি, এরূপ মনে না করিলে ন্যায়নিষ্ঠ সুজাউদ্দীন কখনই উহা রাজা রঘুদেবকে তিন বৎসর পরে ফিরাইয়া দিতেন না। এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে। সুতরাং বঙ্গীয় সরকার যে লর্ড কার্জ্জনের আমলে তাঁহাদের রিপোর্টে বলিয়াছিলেন,—জমিদারীতে সকল জমিদারেরই মালেকান স্বত্ব ছিল, তাহার প্রমাণ তাঁহারা পান নাই—সে কথা সত্য নহে। মালেকান স্বত্ব না থাকিলে জমিদাররা জমিদারী করিতেন কোন্ অধিকারে? তবে অনেক জমিদার ঋণের দায়ে তাঁহাদের জমিদারী বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন বলিয়া অনেক ধনাঢ্য ব্যবসায়ী জমিদারী কিনিতেন,—সে জন্য উহা অন্য সম্প্রদায়ের হাতে গিয়া পড়িত। জমিদাররা ব্রাহ্মণদিগকে ভূমিদান করিতেন, তাহার ভূরি দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। জমিতে যদি জমিদারের মালেকান স্বত্ব না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা কখনই চিরদিনের জন্য কাহাকেও জমি দান করিতে পারিতেন না। ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে, স্বর্গীয় রমেশ বাবু যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই সত্য। জমিদাররাই জমির মালেক ছিলেন।

যাঁহারা পুরুষানুক্রমে জমির মালেক বলিয়া উহা ভোগ করিয়া আসিতেছেন,—এবং যাঁহারা জমিদারী স্বত্ব টাকা দিয়া কিনিয়াছেন; তাঁহাদের সেই সম্পত্তি ন্যায্য মূল্য দিয়াই খরিদ করা উচিত। অন্যথা তাহা নিতান্তই জুলুম বা লুণ্ঠনের কার্য্য হয়। এরূপ প্রস্তাব কোন ন্যায়নিষ্ঠ সরকারেরই কর্ত্তব্য নহে। পৃথিবীর কোন দেশেই তাহা করা হয় না। ফ্রান্সে কৃষক-ভূস্বামী সৃষ্টি করিবার সময় কৃষকদিগকে ন্যায্য মূল্য দিয়াই জমি লইতে হইয়াছিল,—তথাকার সরকার সে বিষয়ে কৃষকদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন, কিন্তু জমির মালিকদিগের জমির মূল্য কম দেন নাই। য়ুরোপের অন্যান্য স্থানে, যেখানে কৃষক-ভূস্বামী সৃষ্টি করিবার হুজুক উঠিয়াছিল, সেইখানেই কৃষকদিগকে ন্যায্য মূল্য দিয়া জমি খরিদ করিতে হইয়াছে। ষ্টেট বা সরকার কৃষকদিগকে সেই মূল্য প্রদানের সহায়তা করিয়াছেন,—রামের ধন শ্যামকে দিয়া বাহাদুরী করেন নাই।

কোন্ ব্যবস্থা ভাল কি মন্দ, তাহার ফল দেশের লোকের পক্ষে মঙ্গলজনক কি অমঙ্গলজনক, নিরপেক্ষ ভাবে তাহার বিচার করিয়া দেখিতে হয়। যে সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এ দেশের রাজা হইয়াছিলেন, সেই সময়ে ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ খাজনা দিতে অক্ষম জমিদারদিগের অনেক জমিদারী সুদখোর মহাজনদিগের নিকট বিক্রয় করেন। তাহার ফল যে ভাল হয় নাই, তাহা বিদিত ভুবনে।

সেই জন্য লর্ড কর্ণওয়ালিস এ দেশীয় প্রথা অনুসারে জমি যাহাতে প্রাচীন জমিদারদিগের হস্তে থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে পরীক্ষার্থ দশ বৎসরের জন্য ভূমির নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু উহার ফল এতই ভাল হইয়াছিল যে, দশ বৎসর অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বেই কর্ণওয়ালিস ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে সেই ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী করিয়া দিয়াছিলেন। সার ফিলিপ ফ্রান্সিস এবং সার জন শোর (পরে লর্ড টেনমাউথ) উভয়েই ভূমির রাজস্ব স্থায়িভাবে নির্দ্দিষ্ট করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। ইহার ফলে বাঙ্গালার অভিজাতবর্গ প্রাধান্য লাভ এবং বুদ্ধিমান্ সম্প্রদায় বিশেষ সমৃদ্ধি অর্জ্জন করেন। বাঙ্গালা প্রদেশে যে অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা প্রথমেই শিক্ষা-বিস্তার হইয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বাঙ্গালার জমিদারেরা প্রায় প্রত্যেকেই তাঁহাদের এলাকামধ্যে জনসাধারণের শিক্ষার জন্য এক বা ততোধিক উচ্চ এবং মধ্যম শ্রেণীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেই জন্য বাঙ্গালায় প্রথমে অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা অধিক হইয়াছিল।

অনেকে মনে করেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে প্রজার কোন উপকার হয় নাই। ঘটনা-পরম্পরা হইতে তাহা কোন ক্রমেই মনে করিতে পারা যায় না। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য যে, বাঙ্গালায় প্রজাদিগের অবস্থা অন্যান্য প্রদেশের প্রজা-সাধারণের তুলনায় বিশেষ মন্দ নহে। ছিয়াত্তুরে মন্বন্তরের ১৩ বৎসর পরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার পর বাঙ্গালা দেশে আর কখনই তেমন প্রবল দুর্ভিক্ষ হয় নাই। তখন একটু সম্পন্ন বা সঙ্গতিশালী ব্যক্তিদিগের ঘরে কিছু না কিছু খাদ্যশস্য সঞ্চিত থাকিতই। এই তথ্য হইতেই বুঝা যায় যে, বাঙ্গালার কৃষীবল অন্যান্য প্রদেশের কৃষীবল অপেক্ষা দরিদ্র ছিল না। এক বৎসর অনাবৃষ্টি হইলে তাহারা অনাহারে মরিয়া উজাড় হইয়া যাইত না,—এখনও যায় না। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে উত্তর-ভারতে যে ব্যাপক ভাবে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল, তাহাতে বহু লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। এই সকল দুর্ভিক্ষের কারণ অনাবৃষ্টি—ইহাই সরকারী রিপোর্ট। কিন্তু স্বয়ং ওয়ারেণ হেষ্টিংস বিহারে এই দুর্ভিক্ষের বহর দেখিয়া মন্তব্য লিখিয়াছিলেন—"আমার ইহা শঙ্কা করিবার কারণ আছে যে, এই দুর্ভিক্ষের কারণ যদি কলুষিত এবং অত্যাচারপূর্ণ শাসন না-ও হয়, তাহা হইলেও উহা শাসন-ব্যবস্থার দোষে ঘটিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।" স্বয়ং ওয়ারেণ হেষ্টিংস যখন উহা কলুষিত এবং অত্যাচারপূর্ণ শাসনের ফল বলিয়া অনুমান করিয়াছেন, তখন অন্যে কি বলিবে? কিন্তু বাঙ্গালায় ঐ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় নাই। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে বিহার অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল, পণ্যের মূল্য অতিশয় বাড়িয়া গিয়াছিল,—কিন্তু এ অঞ্চলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল বলিয়া অনাহারে মৃত ব্যক্তির সংখ্যা অধিক হয় নাই।

যাঁহারা বলেন যে, জমিদারগণ নানা বাবদ প্রজাদিগের অর্থ শোষণ করিয়া থাকেন, তাহার ফলে প্রজারা নিঃস্ব হইয়া পড়ে,—তাঁহারা তাহার প্রমাণ কিছুই দিতে পারেন না: বাঙ্গালার প্রজাগণ যদি অত্যন্ত রিক্ত অবস্থায় পতিত হইত, তাহা হইলে এ দেশে অনাবৃষ্টি এবং অজন্মার ফলে অন্যান্য প্রদেশের প্রজার ন্যায় দলে দলে অসহায় ভাবে অনাহারে মরিত। কিন্তু তাহা মরে নাই। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে উত্তর-ভারতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। সেই দুর্ভিক্ষে ১২ লক্ষ লোক মরিয়াছিল। এই দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানের বিস্তার অধিক ছিল না। কেবল শ্রমিক বা শিল্পী ইহাতে মরে নাই, সঙ্গে সঙ্গে অনেক কৃষীবলও মরিয়াছিল। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জ্জনের আমলে ভারতে যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল,—তাহাতে গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলে কৃষীবল অনেক মরিয়াছিল, মরুতুল্য বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্র মানুষ এবং গরুর কঙ্কালে বীভৎস মূর্ত্তি ধরিয়াছিল, কিন্তু বাঙ্গালায় সেরূপ হয় নাই। বাঙ্গালায় অজন্মা হইয়াছিল,—কিন্তু মানুষ বা কৃষির পশু অধিক মরে নাই। ইহাতে বাঙ্গালী কৃষকদিগের অবস্থা অন্যান্য প্রদেশের কৃষকদিগের অবস্থা অপেক্ষা অনেক ভাল,—তাহারা অজন্মার তাড়না অনেকটা সহ্য করিতে পারে এবং পূর্ব্বে আরও পারিত; তাহা অস্বীকার করা যায় না। ইহাতে জমিদার কর্ত্তৃক প্রজা-শোষণের বৈপরীত্যই প্রকাশ পায়। ইহা সত্য সত্যই প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

বাঙ্গালার কৃষীবলের অবস্থা কখনই ভাল বলা যাইতে পারে না। কিন্তু তাহার কারণ জমিদারী প্রথা বা চিরস্থায়ী ব্যবস্থা নহে, তাহার কারণ—কৃষকের জোতের জমির অল্পতা এবং অত্যন্ত অধিক লোকের মধ্যে বিভাগ। বাঙ্গালার শ্রমশিল্পের তিরোধানে লোক জীবনরক্ষার জন্য কৃষি অবলম্বন করিয়াছে। লোক জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য অন্য উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া উদরান্নের সম্পূর্ণ সঙ্কুলান না হইলেও জমিতে কিছু স্বত্ব রাখিতেছে। কাজেই কৃষকের জোতের জমি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া 'চটকন্ড মাংসে' পরিণত হইতেছে। জমিদারকে খাজানা দিয়া যে জমিতে কিছু লাভ থাকে, সে জমি পত্তনী, দরপত্তনী, ছে-পত্তনী, হাওলা, নিমহাওলা প্রভৃতি স্বত্বের সৃষ্টি করিতেছে। কিন্তু সে দোষ ত' জমিদারী ব্যবস্থার বা জমিদারের নহে। সে দোষ ত' সম্পূর্ণ প্রজার। প্রজারা গরজে পড়িয়া অনেক মধ্যস্বত্বের সৃষ্টি করিয়াছে। বাঙ্গালায় শতকরা যত লোক কৃষিসেবী, ভারতের অন্য প্রদেশে এত লোক কৃষিসেবী নহে। সেই জন্য হলকর্ষী চাষীদের বিশেষ কিছু লাভ থাকে না। কৃষকরা সেই জন্য কৃষির দ্বারা উদরান্নের সংস্থান করিতে পারে না। ইহার জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে দোষ দেওয়া সঙ্গত নহে। দেশের সমস্ত লোক বা অধিকাংশ লোক যদি কৃষির উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে তাহাদের দারিদ্র্য কখনই ঘুচিবে না। যেখানে কৃষক-প্রজার জমিতে নির্ব্যূঢ় স্বত্ব আছে, সেখানেও এই দোষ দেখা যায়। ফ্রান্সে অনেক প্রজার কৃষিক্ষেত্রে স্বামিত্ব আছে। কিন্তু সেখানেও কৃষির জমি অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া যাইতেছে। অষ্ট্রীয়ায় এবং হাঙ্গেরীতে এই দোষ পরিস্ফুট। তথাপি ঐ সকল দেশের কৃষকদিগের জোতের জমি এ দেশের কৃষীবলের জোতের জমির তুলনায় অনেক অধিক। এই দেশের প্রতি-কৃষকের জমি গড়ে ৬—৭ বিঘার অধিক হইবে না। কিন্তু ফ্রান্সে কৃষকদিগের জোতে ৩৭ বিঘার কম জমি অতি অল্পই আছে। অধিকাংশ ক্ষুদ্র কৃষকের জমিতে অন্ততঃ ২৫ একর বা ৭৫ বিঘা জমি আছে। অষ্ট্রীয়ায় এবং হাঙ্গেরীতে ক্ষুদ্র কৃষকের জমিতে ৭ একর বা ২১ বিঘার কম জমি প্রায় নাই। অধিকাংশ কৃষকের জোতে ৬৫ বিঘা জমি আছে। আর আমাদের দেশের অধিকাংশ চাষী প্রজার জোতে ৫ বিঘা জমিরও কম আছে। এরূপ অবস্থায় এ দেশের কৃষক যদি অতি দরিদ্র হয়, সে জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে দায়ী করা যাইতে পারে না।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিবর্ত্তে দুইটি প্রস্তাব করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, কৃষীবল প্রজাকে তাহার জমিতে মালেকান স্বত্ব প্রদান; দ্বিতীয়তঃ, সমস্ত জমি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি করা। কিন্তু ইহার কোন ব্যবস্থাই আমাদের দেশের উপযোগী হইবে না। এ দেশের কৃষকগণ সাধারণতঃ একেবারে অশিক্ষিত। তাহারা অনেক সময় স্বীয় অবস্থা বুঝিয়া চলিতে অসমর্থ। মতের হিসাবে, কাগজে-কলমে এ ব্যবস্থা ভাল বলিয়া মনে হইলেও কার্য্যক্ষেত্রে ইহার ফল কোন দেশেই ভাল হয় নাই। ইংলণ্ডের ন্যায় ধনিকের দেশে—যেখানে প্রত্যেক

কৃষকের জোতের জমি শত বিঘারও অধিক, সেখানেও উহা নিষ্ফল প্রতিপন্ন হইয়াছে। তথাকার কৃষীবল শিক্ষিত হইলেও তথায় যদি উহা নিষ্ফল হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের দেশে কি হইবে! বেয়ার বলিয়াছেন যে, কৃষকের ভূস্বামিত্ব ইংলণ্ডেও সুফলপ্রদ হয় নাই। কেবল মতের হিসাব করিলে চলিবে না, যাহারা কর্ম্মী, তাহাদের প্রকৃতি ও বিচার-বুদ্ধির উপর সকল ব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে। ফ্রান্সে, অষ্ট্রীয়ায়, হাঙ্গেরীতে, এমন কি, মার্কিণেও ইহা বিশেষ হিতকর হয় নাই। এরূপ অবস্থায় জমিদারী বন্দোবস্ত উচ্ছিন্ন করিয়া কৃষকদিগকে ভূস্বামী করিলে এই অজ্ঞতা-প্লাবিত দেশে তাহার ফল কখনই ভাল হইবে না। উহাতে কৃষকদিগেরই সর্ব্বনাশ হইবে। সুতরাং অগ্র-পশ্চাৎ না ভাবিয়া হঠাৎ আপাত-দৃষ্টিতে সুবিধাজনক মনে হইলেই এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য ব্যাকুল হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নহে।

দ্বিতীয় ব্যবস্থা—দেশের সমস্ত ভূসম্পত্তিতে সরকারের বা রাষ্ট্রের নির্ব্যূঢ় অধিকার স্থাপন। এ ব্যবস্থা এ পর্য্যন্ত অন্য কোন দেশে হয় নাই। এখন রুশিয়ায় ইহা হইতেছে। প্রাচীন কালে ভারতে কতকটা এই ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু এখন রুশিয়ায় উহা যে ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সে ভাবে প্রাচীন কালে ভারতে উহা ছিল বলিয়া মনে হয় না। সকল দেশেই ভূসম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং রুশিয়াতে সে অধিকার এখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। লেনিন প্রথমে রুশ-কৃষীবলকে ভূমির স্বত্বাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন,—কিন্তু পরে নানা দিক্ দিয়া উহার অপকারিতা উপলব্ধি করিয়া অত্যন্ত নির্ম্মম এবং কঠোর হস্তে উহা দমন করেন। অনেক ডিগবাজী খাইয়া লেনিন, ট্রোটস্কি এবং ষ্ট্যালিন কার্ল মার্ক্স-অনুমোদিত রুশিয়ায় প্রায় সমস্ত ভূসম্পত্তিতে রাষ্ট্রের অধিকার প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। কিন্তু এখনও উহা সম্পূর্ণ সুসিদ্ধ হয় নাই। কতক জমি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইয়াছে। উহার প্রজারা সকলেই মজুর মাত্র। উহারা সরকারের নিকট হইতে মাপা সমস্ত আবশ্যক পণ্য পায়। আর সমস্ত ফসলাদি সরকার লইয়া থাকেন। আর কতকটা জমি আছে, উহা অত্যন্ত দরিদ্র চাষী প্রজাদিগকে সম্মিলিত ভাবে দেওয়া হইয়াছে। উহাতে যে ফসল জন্মে, তাহা হইতে সরকার তাঁহাদের নিজ ভাগ লইয়া যান। অবশিষ্ট যাহা থাকে, তাহা সকলে সমান ভাগে বণ্টন করিয়া লইয়া থাকেন। এখন রুশিয়ায় যত কৃষক বিদ্যমান,—তাহার শতকরা ৬০ ভাগ সরকারী খামারে মজুরী করে অথবা সম্মিলিত খামারে (collective farms) কাজ করে। আর অবশিষ্ট যে ৪০ ভাগ কৃষক নিজ খামারে কাজ করে, তাহারা দূর মফঃস্বলে বাস করে। তাহাদের জোতেও অধিক জমি আছে বলিয়া মনে হয় না।

তাহা হইলেও রুশিয়ার জনসাধারণ এখন জার-শাসিত রুশিয়া অপেক্ষা অনেকটা সমৃদ্ধ হইয়াছে। কারণ, রুশিয়া এখন কৃষিমাত্র সম্বল নহে। লেনিন এবং ষ্ট্যালিন ঐ দেশকে শ্রমশিল্পে অগ্রসর করিবার জন্য নানা মতে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। প্রথম প্রথম তথায় শ্রমশিল্প পণ্য ভাল প্রস্তুত হইত না। এখন হইতেছে। শ্রমশিল্পের কার্য্যে অধিক লোক আকৃষ্ট হওয়াতে জমির উপর লোকের চাপ অনেক কমিয়া গিয়াছে। কাজেই রুশিয়ায় লোকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইয়াছে।

রুশিয়ায় ভূমি-সম্পত্তি সরকারী সম্পত্তিতে পরিণত করিবার সঙ্গে সঙ্গে তথায় বিশেষ আগ্রহের সহিত শ্রমশিল্পের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। শ্রমশিল্পের প্রতিষ্ঠানগুলি সমস্তই প্রথমে সরকারী সম্পত্তি করা হইয়াছিল। এখন কিছু কিছু ক্ষুদ্র শিল্পপ্রতিষ্ঠান ব্যক্তিগত সম্পত্তি করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। সরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিতে দেশীয় কর্ম্মীরা মজুর এবং সরকার মনিব।

আমি এ স্থলে রুশিয়ার কথা অতি সংক্ষেপে বলিলাম। এখন জিজ্ঞাস্য, যাঁহারা বাঙ্গালার ভূসম্পত্তিকে রাষ্ট্রীয় বা সরকারী সম্পত্তি করিতে চাহিতেছেন, তাঁহারা কি বাঙ্গালাকে ঐরূপ শ্রমশিল্পের প্রগতির পথে প্রধাবিত করিতে সম্মত আছেন? না, তাঁহারা উহা করিতে পারিবেন? যাঁহারা সরকারকে সমস্ত উৎপন্ন শস্যের ষষ্ঠ ভাগের এক ভাগ খাজনা দিয়া পাকা বন্দোবস্ত করিতে চাহিতেছেন, সরকারই তাহাতে চিরকাল সন্তুষ্ট থাকিবেন, এরূপ কথা তাঁহারা বলিতে পারেন কি? চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যদি উচ্ছিন্ন হয়, তাহা হইলে সবই উচ্ছিন্ন হইতে পারে; দেশে এখনও যেমন অবুঝ লোকের অভাব নাই,—পরেও সেরূপ থাকিবে না। গরজে পড়িলে সকল শক্তিশালী সরকার সবই করিতে পারেন। স্বাধীন দেশেও তাহা হইয়া থাকে। উৎকট সাম্যবাদী রুশিয়াতেও প্রজাকে জমিতে মালেকান স্বত্ব দিয়া তাহা কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল।

গ্রেট বৃটেন ধনিকের দেশ। উহা শিল্পপ্রধান। ঐ দেশে জমিদারী ব্যবস্থা প্রচলিত। তথাকার ভূস্বামীরাই জমির মালেক, তাঁহারাই জমিতে প্রজাবিলি করিয়া থাকেন। প্রজা খাজনা দিয়া অথবা মজুরী করিয়া মনিবের খামারে শস্য উৎপাদন করে। তথায় ভাগ-চাষের ব্যবস্থা যে একেবারেই নাই, তাহা নহে। তবে এ কথা সত্য যে, বিলাতী কৃষীবলের অবস্থা অন্য দেশের কৃষক ভূস্বামীদিগের অবস্থা হইতে অনেক উন্নত। ইংলণ্ডের সহিত এ দেশের নানা কারণে তুলনা হইতে পারে না। ইংরেজ জাতি স্বদেশের কৃষিজাত পণ্যের উপর নির্ভর করে না।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য—অনেক বিশিষ্ট ইংরেজই জমিদারী প্রথার সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। বিশপ হেয়ার, সার উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক, মার্কুইস অব ওয়েলেসলি, লর্ড মিণ্টো, মার্কুইস অব হেষ্টিংস, লর্ড ক্যানিং, সার চার্লস উড (ভারত-সচিব), সার জন লরেন্স (লর্ড লরেন্স), সার ষ্ট্যাফোর্ড নর্থকোট (ভারত-সচিব) প্রভৃতি যে প্রথাকে মোটের উপর ভাল বলিয়াছেন, সে দিনও মিষ্টার সি ডবলিউ গার্ণার যে ব্যবস্থাকে মোটের উপর সন্তোষজনক বলিয়াছেন, তাহাকে কি অকস্মাৎ হঠকারিতার সহিত অনিষ্টকর বলা অসঙ্গত নহে? পৃথিবীতে কোন ভূমি-সম্পর্কিত ব্যবস্থাই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই, জমিদারী প্রথাও নহে। তাই বলিয়া উহার বিলোপসাধনে যে দেশ সমৃদ্ধ হইবে, এমন মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

ভারতীয় বাজেটের সমস্যা সঙ্কট

১৫ই ফাল্গুনে প্রকাশিত, ভারতের চতুর্থ যুদ্ধ-বাজেট অর্থাৎ যুদ্ধারম্ভের চতুর্থ বৎসরের অগ্রিম আয়-ব্যয় হিসাব-বিবরণী আতঙ্কের যৎকিঞ্চিৎ প্রশমন করিয়াছে বটে; কিন্তু আশঙ্কা নিরাকরণ করিতে পারে নাই। প্রতি বৎসর বাজেট প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে আয়-ব্যয়ের আনুমানিক আপেক্ষিক গুরুত্ব অথবা লঘুত্ব এবং তদনুযায়ী কর-বৃদ্ধির সম্ভাবনা, আর্থিক ও বণিক্-ব্যবসায়ী জগতে, বিশেষতঃ শিল্পী ও সাধারণ প্রজাসম্প্রদায়ে সুগভীর আতঙ্কের সৃষ্টি করে। এ বৎসরের প্রধান আতঙ্ক ছিল, বৃটিশ সরকারের সহিত ভারত সরকারের যুদ্ধ-জনিত ব্যয়ের বাটোয়ারা বন্দোবস্তের অহেতুক পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা। দ্বিতীয় আতঙ্ক ছিল, আমাদের ষ্টার্লিং-সংস্থিতি হইতে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধনানন্তর অবশিষ্ট উদ্বৃত্তের ভবিষ্যৎ নিয়োগ সম্বন্ধে। তৃতীয় আতঙ্ক ছিল, মুদ্রা-বৃদ্ধি ও মূল্য-স্ফীতি হেতু অন্ন-বস্ত্রের নিদারুণ অভাব-অনাটনজনিত যে সুকঠোর পরিস্থিতির উৎপত্তি ঘটিয়াছে, তাহার আশু এবং অনতিদূরবর্ত্তী জটিল ও কুটিল পরিণাম সম্পর্কে। চতুর্থ আতঙ্ক ছিল, ক্রমবর্দ্ধমান যুদ্ধব্যয়ের সরবরাহ নিমিত্ত অতিরিক্ত করবৃদ্ধির অবশ্যম্ভাবী এবং অপরিহার্য্য ঘাত-প্রতিঘাত এবং দুর্ব্বহ কর ও ঋণ-ভারের দুর্ব্বিসহ প্রতিক্রিয়া বিষয়ে।

যুদ্ধ ঘোর বিপ্লব। যুদ্ধের ব্যয় ক্রমবর্দ্ধনশীল এবং তাহার অকুণ্ঠিত সরবরাহ প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই সাধারণ ও স্বাভাবিক আয়-ব্যয়ের আয়ত্তের বাহিরে। করবৃদ্ধি এবং ঋণ ব্যতীত তাহার নিয়মিত যোগান সম্ভবপর নহে। ঋণ উত্তমর্ণের প্রয়োজনাতিরিক্ত উদ্বৃত্ত অঙ্ক হইতে সংগৃহীত হয়; কিন্তু করবৃদ্ধি, অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিঃস্ব ও দরিদ্র প্রজাসাধারণের ক্লেশকর হয়। অপরিহার্য্য অধিকতর কৃচ্ছ্র-সাধন দ্বারা চিরন্তন অভাবের মাত্রা বাড়ানো ছাড়া তাহার দ্বিতীয় উপায় থাকে না। এই নিমিত্ত যুদ্ধ-ব্যয় নির্ব্বাহার্থ যুদ্ধ-প্রয়োজন-জনিত আয়ের প্রতি প্রধান লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। কিন্তু যুদ্ধের ক্রমবর্দ্ধমান প্রয়োজনের তাগিদে, উদ্বৃত্ত সঞ্চয় হইতে লব্ধ ঋণ এবং সমর্থ স্বচ্ছল ব্যক্তির স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অথবা বাধ্যতামূলক দান ও সাহায্য ব্যতীত অধিকতর অর্থের প্রয়োজন হয়।

যুদ্ধের পশ্চাদাগত সুফল অথবা কুফল সর্ব্বজনভোগ্য; সুতরাং যুদ্ধের দায়ও সর্ব্বসাধারণের। এই নিমিত্ত ন্যায় ও নীতির নিয়মানুযায়ী প্রজাসাধারণেরও যথাশক্তি অর্থ ও সামর্থ্য প্রদান করিতে হয়। কিন্তু দরিদ্রের অর্থই বা কোথায়, এবং তাহার সামর্থ্যই বা কতটুকু! বিশেষতঃ, ভারতের সাধারণ প্রজাবৃন্দ চির-দরিদ্র। দুই বেলা পেট ভরিয়া আহার তাহাদের কদাচিৎ জোটে। প্রচুর মুদ্রা-বৃদ্ধি সত্ত্বেও তাহাদের অর্থের একান্ত অভাব। যুদ্ধকালে স্বভাবতঃই অপ্রচুর খাদ্যের দুর্ম্মূল্যতা হেতু তাহাদের ভাগ্যে অর্দ্ধাশন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনশনই ব্যবস্থা। অর্থশাস্ত্রের মৌলিক নীতি অনুযায়ী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর-নির্দ্ধারণের ব্যবস্থা আছে; কিন্তু বিপ্লবের সময়, নিদারুণ যুদ্ধের নিষ্ঠুর প্রয়োজনের তাগিদে নিয়ম ও নীতির মর্য্যাদা সংরক্ষণ অসম্ভব। যুদ্ধ ভারতের নিকট হইতে নিকটতর হইয়া আজ দুর্দ্ধর্ষ শত্রু আমাদের দ্বারে হানা দিয়াছে। সুতরাং ভারতের সংরক্ষণ-ব্যয় যে বর্ত্তমান বর্ষে তুঙ্গশীর্ষ অধিকার করিবে, তাহা সকলেরই বোধগম্য হইয়াছিল। এই নিমিত্ত অন্যান্য বৎসরের তুলনায় বাজেটের অব্যবহিত পূর্ব্বে শেয়ার-বাজার প্রভৃতিতে বিভ্রমের পরিবর্ত্তে যথাসম্ভব সাম্যাবস্থা প্রবল ছিল। অর্থনীতিবিদ মহলেও বাজেটের রীতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট পূর্ব্বাভাস অনুমিত হইয়াছিল। কিন্তু অপ্রত্যাশিতের ন্যায় প্রত্যাশিত করভারও সর্ব্বত্র—সর্ব্বক্ষেত্রে—বিশেষতঃ, চির-দরিদ্রের প্রতি ক্লেশদায়ক। সেই ক্লেশের মূল যুদ্ধের ত্বরিত শান্তির নিমিত্ত সকলেই সমুৎসুক; শান্তির আকাঙ্ক্ষায় রাজা-প্রজা সকলেই অশেষ ক্লেশস্বীকারও সহ্য করিতেছে। কোথাও ক্লেশের তীব্রতা অধিক, কোথাও অপেক্ষাকৃত কম, এইমাত্র প্রভেদ। দরিদ্রের ক্লেশ সমধিক।

বাজেটের আর্থিক হিসাব-নিকাশের অঙ্ক দৈনিক সংবাদপত্রাদিতে বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে; এই নিমিত্ত পাঠকের সুবিধার্থ তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া তৎসংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক তত্ত্বের বিশ্লেষণে আমরা মনোনিবেশ করিব। প্রতি বৎসর অতীত বৎসরের শেষ-সঙ্কলিত হিসাবনিকাশ, গমনোন্মুখ বর্ত্তমানের সংশোধিত আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং প্রবর্ত্তনোন্মুখ আগামী সরকারী বৎসরের আয়-ব্যয়ের অগ্রিম বিবরণী বাজেটের অঙ্গীভূত হয়। ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ আরম্ভ হয়; সুতরাং ১৯৪০-৪১ পূর্ব্বাব্দে ভারতের প্রথম যুদ্ধ বাজেট সঙ্কলিত হয়। ১৯৪০-৪১ হইতে ১৯৪২-৪৩ পর্য্যন্ত যুদ্ধপূর্ব্ব সামরিক বাজেটের তুলনায় ভারতের নিজস্ব সংরক্ষণ-ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে ১৫০ কোটি টাকা এবং মোটের উপর গত তিন বৎসরে রাজস্বের ঘাটতির অঙ্ক নির্দ্ধারিত হইয়াছিল প্রায় ৫০ কোটি টাকা। বর্ত্তমান বাজেটে প্রকাশ, গত অর্থাৎ ১৯৪১-৪২ খৃষ্টাব্দে রাজস্বের উন্নতি হেতু ঘাটতির পরিমাণ ১৭'২৭ কোটি হইতে ১২'৬৯ কোটিতে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল; কিন্তু বর্ত্তমান অর্থাৎ ১৯৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দে ঘাটতির পরিমাণ ৩৫'৭৩ কোটি হইতে ৯৪'৬৬ কোটিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই অঙ্কের চরম পরিণতি আগামী বর্ষের বাজেটে প্রকটিত হইবে। ১৯৪০-৪১ হইতে ১৯৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দ সংরক্ষণ-ব্যয়ের দ্রুত বৃদ্ধি নিম্নলিখিত অঙ্ক-তালিকায় প্রকটিত—

	স্বাভাবিক (ক্রোর টাকা)	অতিরিক্ত (ক্রোর টাকা)	মোট (ক্রোর টাকা)
১৯৪০-৪১	৩৬'৭৭	৩৬'৫৪	৭৩'৩১
১৯৪১-৪২	"	৬৫'৬৮	১০২'৪৫
১৯৪২-৪৩	"	২০২'১২	২৩৮'৮৯
১৯৪৩-৪৪	"	১৬২'৮৯	১৯৯'৬৬

বর্ত্তমান ও আগামী বর্ষের সংরক্ষণ-ব্যয়কে নূতন প্রণালীতে দ্বিধা বিভক্ত করা হইয়াছে—রাজস্ব-মূলক ও মূলধন-মূলক অংশে; যথা,—

	রাজস্ব-মূলক (ক্রোর টাকা)	মূলধন-মূলক (ক্রোর টাকা)	মোট (ক্রোর টাকা)
১৯৪২-৪৩	১৮৯'৭৫	৪৯'১৪	২৩৮'৮৯
১৯৪৩-৪৪	১৮২'৪১	১৬'৮৫	১৯৯'২৬

এই দ্বিধা-বিভাগের অন্তরালে যে বিভ্রম প্রচ্ছন্ন, তাহা শুধু অর্থ-নীতিকের বোধগম্য। পৃথিবীর পূর্ব্ব-গোলার্দ্ধে যুদ্ধের প্রচণ্ডতা এবং দুর্দ্ধর্ষ শত্রুর ভারতের সীমান্ত পর্য্যন্ত দ্রুত অগ্রগতি ও আক্রমণের ফলে বর্ত্তমান সরকারী বৎসরে আমাদের যোদ্ধৃসংখ্যা ও যুদ্ধ-সরঞ্জাম প্রভৃতি প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া দেশকে সর্ব্বপ্রকারে সংরক্ষিত করিবার সুবন্দোবস্ত করিতে হইয়াছে। আগামী বর্ষে আমাদের সর্ব্বপ্রকার

সংরক্ষণ-ব্যবস্থা সর্ব্ববিধ বিপদের উপযোগী ও উপযুক্ত হইবে, অর্থ-সচিব এই আশা দিয়াছেন।

ভারতে বিপুল ব্যয়ে যে সংরক্ষণনীতি অবলম্বিত হইতেছে, তাহা কেবল ভারতের আত্মরক্ষার জন্য নহে; ইহাতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থও ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত। এই ভারতের হিসাবের সংরক্ষণ-ব্যয়ের একটি প্রকৃষ্ট অংশ বৃটিশ সরকার বহন করেন। কিছু দিন পূর্ব্বে অর্থ-সচিব এই অংশবণ্টনের ন্যায় ও যুক্তিসিদ্ধ মীমাংসার নিমিত্ত বিলাতে গিয়াছিলেন। বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ বর্ত্তমান বিধি-ব্যবস্থার সংশোধন হেতু কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। যখন বর্ত্তমান বন্দোবস্ত অনুসৃত হয়, তখন জল, স্থল ও বিমান শক্তির কোন গুরু প্রসারণ ঘটে নাই। যখন যুদ্ধের কুটিল পরিস্থিতি হেতু ত্রিবিধ বাহিনীর প্রসার ঘটিল, তখন স্থলবাহিনীর দায়িত্ব সাম্রাজ্যের সহিত যৌথ-ভাবে দৃঢ়বদ্ধ। সুতরাং স্থির হয় যে, (১) ভারতের অর্থ ও শক্তি-সম্পদ হইতে গঠিত শিক্ষিত এবং সজ্জিত সমস্ত স্থলবাহিনীর ভারতে অবস্থিতি কালীন সমগ্র ব্যয়ভার ভারত বহন করিবে। সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে সমুদ্রপারে প্রেরিত হইলে তাহাদের ব্যয়ভার বৃটিশ সরকারের এবং (২) ভারতে গঠিত শিক্ষিত এবং সজ্জিত স্থলবাহিনীর প্রসার হেতু ভারতের বহির্ভাগ হইতে যে সকল সাজ-সরঞ্জাম এবং উপকরণসম্ভার আনীত হইবে, তাহার মাত্র কয়েকটি ব্যতীত সমগ্র ব্যয়ভার বৃটিশ সরকার বহন করিবেন। রাজকীয় ভারতীয় নৌ-বাহিনীর প্রসারকল্পে কোন জটিলতার সৃষ্টি ঘটে নাই। স্থলবাহিনীর ন্যায় বিমান-বাহিনীর গুরু প্রসারণব্যয়ও সম্মিলিত দায়িত্বে নির্দ্ধারিত হয়, সংরক্ষণ-ব্যয়ের অন্তিম আপাত (Incidence) সংঘাত, যোগান বিভাগের কর্ম্মবিস্তার এবং ভারতে অবস্থিত মার্কিণ সৈন্যের নিমিত্ত আদান-প্রদানমূলক ইজারা-ঋণ সাহায্য—এই তিনটি বিষয়ে কিছু জটিলতার সৃষ্টি ঘটিয়াছিল। প্রথমোক্তটির সম্পর্কে মৌলিক (Capital) ব্যয় বৃটিশ সরকার বহন করিতেছেন। কিন্তু যোগান বিভাগের ক্রমবর্দ্ধমান কর্ম্মতৎপরতার ফলে ভারতে বহু শিল্পে স্থায়ী উন্নতি সাধিত হইতেছে, এই অজুহাতে বৃটিশ সরকার উভয় পক্ষের অন্যোন্যসাপেক্ষ (Mutual) স্বার্থের অনুকূলে কিঞ্চিৎ মৌলিক ব্যয় ভারতের অংশে বণ্টন করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, এই প্রস্তাব ভারতের ওয়াকিবহাল মহলে আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছিল। কাগজে-কলমে ব্যয়-বণ্টন ব্যবস্থা যেরূপ সমঞ্জস ও সমীচীন অনুভূত হয়, কার্য্যক্ষেত্রে প্রবল ও দুর্ব্বল স্বার্থের সংঘর্ষে তাহার প্রচুর ব্যতিক্রম ঘটে। সেই ব্যতিক্রম স্বেচ্ছাকৃত কিংবা ঘটনামূলক, সে আলোচনা নিষ্ফল। যাহা হউক, সৌভাগ্যক্রমে বৃটিশ সরকার বর্ত্তমান ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন-প্রচেষ্টা পরিবর্জ্জন করিয়াছেন।

বিমান-বাহিনীর সম্বন্ধে স্থির হইয়াছে যে, ভারতের স্থায়ী স্বার্থের অনুকূলে ভারতের অভ্যন্তরে বিমান-ক্ষেত্র প্রভৃতি নির্ম্মাণ হেতু মৌলিক, এবং ভারতে অবস্থানকালীন বিমান-চমূগুলির পৌনঃপুনিক ব্যয় ভারত সরকারকে বহন করিতে হইবে। সরবরাহ-প্রচেষ্টার নিমিত্ত মৌলিক ব্যয়ের অর্দ্ধাংশ ভারত বহন করিবে এবং ভারতে সৃষ্ট সম্পদ-সম্পত্তির অধিকারী হইবে। ইজারা-ঋণ সম্পর্কে মার্কিণের সহিত ভারতের সরাসরি অন্যোন্যসাপেক্ষ একটি বন্দোবস্তের আলোচনা চলিতেছে। ইতিমধ্যে আদান-প্রদানমূলক ইজারা-ঋণ সম্পর্কিত ব্যয় ভারতের সংরক্ষণ-হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। তবে যেখানে জনসাধারণের কিংবা প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র, রেলপথ এবং কারবার-হিসাবে-পরিচালিত সরকারী বিভাগের নিমিত্ত ইজারা-ঋণের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইয়াছে, সেখানে উপযুক্ত মূল্য সরকারী তহবিলের আমলে লওয়া হইয়াছে। মার্কিণের সহিত আদান-প্রদানমূলক ব্যয়ের তালিকা-নির্দ্ধারণ দুরূহ; তথাপি ১৯৪২-৪৩ অর্থাৎ বর্ত্তমান সরকারী বৎসরে ইহার পরিমাণ ১৬'৭০ কোটি এবং আগামী বৎসরে ৮'০৪ কোটি টাকা হইবে।

যুদ্ধ-বাজেটে যুদ্ধ-সম্পর্কিত ব্যয়ের বিস্তৃত আলোচনা এবং তদানুষঙ্গিক সমস্যা সমূহের বিশ্লেষণ অপরিহার্য্য। তথাপি আগামী বৎসরের মোট আয়-ব্যয়ের অতি সংক্ষিপ্ত একটি তালিকা দিয়া আমরা নব-নির্দ্ধারিত কর সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। যুদ্ধ-সম্পর্কিত ব্যয়-বৃদ্ধির প্রচণ্ডতা হেতু বর্ত্তমান সরকারী বৎসরে রাজস্বের ঘাটতির পরিমাণ ঘটিয়াছে ৯৪'৬৬ কোটি টাকা, এবং আগামী বৎসরের ঘাটতির অঙ্ক ৬০'২৮ কোটি। এই অঙ্ক অবশ্য বর্ত্তমানে প্রচলিত কর সমূহের অক্ষুণ্ণতার উপর প্রতিষ্ঠিত। আগামী সরকারী বৎসরের আয়-ব্যয়ের জায় এইরূপ :—

	ক্রোর টাকা
বে-সামরিক ব্যয়	৭৬'৭৮
সংরক্ষণ "	১৮২'৮১
মোট "	২৫৯'৫৯
বর্ত্তমান নিরিখ অনুযায়ী—	
মোট রাজস্ব	১৯৯'৩০
মোট ঘাটতি	৬০'২৯

এই ঘাটতির এক-তৃতীয়াংশ নূতন কর এবং দুই-তৃতীয়াংশ ঋণ গ্রহণ দ্বারা পূরণ করা হইবে।

শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা ও দেশরক্ষা হেতু সংরক্ষণ-ব্যয় অপরিহার্য্য। এই ব্যয় সাধারণ ও স্বাভাবিক মাত্রাতিরিক্ত এবং ক্রমবর্দ্ধনশীল। নূতন কর এবং ঋণ ব্যতীত এই ব্যয়-সঙ্কুলান সম্ভবপর নহে। নূতন কর যে আকার-প্রকারেই আসুক না কেন, তাহার প্রকোপ ক্রমনিম্নগামী হইয়া সর্ব্বোচ্চ হইতে সর্ব্বনিম্ন স্তর পর্য্যন্ত প্রতি-প্রসারিত হয়। ভারতের সর্ব্বজনীন দারিদ্র্যের সমানুপাতে, অন্যান্য সমৃদ্ধ দেশের তুলনায়, প্রচলিত করভার জনসাধারণের স্বল্প অর্থ, বিত্ত ও সামর্থ্যের অতিরিক্ত। অপেক্ষাকৃত উত্তম অবস্থাপন্ন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের প্রতি প্রযুক্ত করের প্রভাব নিঃস্ব ও দরিদ্রকেও নিষ্কৃতি দেয় না। কিন্তু ইংরেজীতে একটি কথা আছে, —necessary evil, অর্থাৎ অপরিহার্য্য বৈগুণ্য। সংরক্ষণ-ব্যয় সঙ্কুলানার্থ নূতন কর অনিবার্য্য হইতে পারে, সন্দেহ নাই; তবে সঙ্কট এই যে, এই করনির্দ্ধারণে সাধারণ প্রজাবৃন্দের বিশ্বস্ত প্রতিনিধিগণ যেরূপ বিচক্ষণতার ও সহৃদয়তার সহিত প্রতি নূতন করের অন্তিম-দায়ীর দুঃখ-দুর্দ্দশার বিষয় বিবেচনা করিতে পারেন, আমলাতান্ত্রিক শাসন-প্রণালীর পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে। শাসক ও শাসিতের স্বার্থও স্বতন্ত্র; এবং যেখানে শাসক বিদেশী, সেখানে অনাচার অথবা অবিচারের আশঙ্কা অমূলক নহে। আমলাতন্ত্রকে সর্ব্বদা সমুদ্রপারে কর্ত্তৃপক্ষের অভিমত-অনুমতির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হয়। ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে বিচার-বিভ্রাট অসম্ভব নহে। অত্যাচার না হউক, অনাচার ঘটিতে পারে।

কিন্তু ঋণ সম্বন্ধে ব্যবস্থা ভিন্ন। ঋণ উদ্বৃত্ত অর্থের অধিকারীই দিতে পারে। এ ক্ষেত্রেও ভারতের ভাগ্যে বিভ্রাট কম ছিল না। বহু দিন স্বদেশী হইতে বৈদেশিক ঋণভারই ভারতের পক্ষে প্রবল ছিল। কালক্রমে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে বর্ত্তমানে এই পরিস্থিতির প্রচুর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। দরিদ্রের দেশ হইলেও কৃষিজ, বনজ, খনিজ এবং শিল্পজ সম্পদে ভারত চিরদিন সমৃদ্ধ। বিগত এবং বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের প্রয়োজনসাধনার্থ বহুবিধ যুদ্ধাস্ত্র, সাজ-সরঞ্জাম এবং রসদ উপকরণ সরবরাহ করিয়া ভারতবাসী যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছে। যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র-গৃহীত দ্রব্যাদির মূল্য ভারত সরকারকে টাকায় পরিশোধ করিতে হয়। বৃটিশ সরকার তদ্বিনিময়ে ষ্টার্লিং জমা দেন ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডে। এই ষ্টার্লিং এবং নানা কারণে যুদ্ধ পরিস্থিতিহেতু ভারতের আমদানী হ্রাস এবং রপ্তানী-বৃদ্ধির ফলে আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্য-জমা-খরচে উদ্বৃত্ত জমার অন্তর্ভুক্ত ষ্টার্লিং একত্রিত হইয়া, যুদ্ধারম্ভ কাল হইতে আমাদের ষ্টার্লিং-সংস্থিতি ৬৫ কোটি হইতে ৮৪৪ কোটিতে উন্নীত হইয়াছিল। এই সংস্থান হইতে আমরা ৪০০ কোটি টাকা ষ্টার্লিং, অর্থাৎ বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করিয়াছি। গত ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ দিনে এই সংস্থিতির পরিমাণ ছিল ৪৪৪ কোটি টাকা। প্রতি মাসে এই সংস্থিতি ২০ কোটি টাকা হিসাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। যত দিন যুদ্ধ স্থায়ী হইবে, তত দিন এই সংস্থিতি বৃদ্ধি পাইবে। এই সংস্থিতিই আন্তর্জাতিক আর্থিক জগতে ভারতকে অধমর্ণের পর্য্যায় হইতে উত্তমর্ণের পদবীতে আরূঢ় করিয়াছে।

এখন প্রশ্ন, কিরূপে এই সংস্থিতির ন্যায় ও নীতি-সঙ্গত সদ্ব্যবহার হইবে। অর্থ-সচিব প্রস্তাব করিয়াছেন যে, এই সংস্থিতি হইতে ষ্টার্লিং অর্থাৎ বৈদেশিক অবসর-বৃত্তি, পারিবারিক-বৃত্তি এবং সংস্থান-ভাণ্ডার-সংশ্লিষ্ট দায় হেতু বৃটিশ সরকারকে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ প্রদান করিয়া বক্রী অর্থে যুদ্ধান্তে যুদ্ধোত্তর-সংগঠন এবং বিবিধ শিল্পের পুষ্টি ও প্রসার হেতু একটি পুনর্গঠন-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইবে; এবং সেই ভাণ্ডারের অর্থে বিলাত হইতে কল-কব্জা, যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম এবং এ দেশে দুষ্প্রাপ্য উপায়-উপকরণ ক্রীত হইবে। কিন্তু এই পুনর্গঠনের ব্যয় সাধারণ সরকারী তহবিল হইতে নির্ব্বাহ হওয়া সমীচীন। এই বিশেষ ও বিরল সংস্থিতি দ্বারা আমরা সর্ব্বপ্রকার বৈদেশিক মূলধনের মূল উচ্ছেদ করিয়া আর্থিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে প্রয়াসী। যুদ্ধান্তে বৈদেশিক পণ্যও আমরা সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ বিপণিতে ক্রয় করিতে ইচ্ছুক। কোন দেশবিশেষ হইতে উচ্চমূল্যে দ্রব্যাদি আহরণ করিলে তাহা অর্থ-শাস্ত্রের নীতি উল্লঙ্ঘন করিবে। বৃটিশ মূলধনে পরিচালিত সর্ব্ব-প্রকার প্রতিষ্ঠান আয়ত্ত করিয়া, সামান্য কিছু ষ্টার্লিং-সংস্থান ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের নিমিত্ত রাখিয়া, একটি ডলার-সংস্থিতি সংগঠন উপযোগী হইবে। কারণ, আদান-প্রদানমূলক ইজারা-ঋণ কারবারের নিমিত্ত শীঘ্রই আমাদের মার্কিনের সহিত একটি বিশিষ্ট চুক্তি বিধিবদ্ধ হইবে। বলা বাহুল্য, এই সংস্থিতির সহিত ভারতের সংরক্ষণ-ব্যয়ের কোন সাক্ষাৎ সম্পর্ক নাই। বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করিয়া ভারত সরকার ভারতে ঋণ গ্রহণ করিতেছেন। ইহার কল্যাণপ্রদ ফল এই যে, আমরা বৈদেশিক ঋণের সুদস্বরূপ যে মোটা টাকা বিদেশে পাঠাইতাম, তাহা স্বদেশেই থাকিবে। অধিকন্তু, বৈদেশিক মূলধনকেও যদি আমরা স্বদেশী মূলধনে পরিণত করিতে পারি, তাহা হইলে এখন যে প্রচুর লভ্যাংশ বিদেশে যায়, তাহাও আমরা স্বদেশে স্বদেশবাসীর কল্যাণে নিয়োগ করিতে পারিব। ষ্টার্লিংএর যুদ্ধোত্তর দৃঢ়তা সম্বন্ধেও অনিশ্চয়তার প্রচুর আশঙ্কা আছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আগামী সরকারী বৎসরের ঘাটতির এক-তৃতীয়াংশ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর হইতে পূরণ হইবে এবং অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশ ঋণ দ্বারা সরবরাহ করা হইবে। যুদ্ধপূর্ব্বে ভারতের বৈদেশিক এবং ভারতীয় ঋণের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব।

		ভারতীয় (ক্রোর টাকা)	বৈদেশিক (ক্রোর টাকা)	মোট (ক্রোর টাকা)
মার্চ,	১৯৩৯	৭০৯.৯৬	৪৬৯.১০	১১৭৯.০৬
"	১৯৪২	৯৪২.২৯	১৮০.০০	১১২২.২৯

যুদ্ধপূর্ব্বে সুদের দায়ে ভারত সরকারের ঋণসমষ্টি ছিল ১১৮৫ কোটি টাকা। পুরাতন মেয়াদী ঋণ পরিশোধ এবং নূতন ঋণ গ্রহণ প্রভৃতি প্রক্রিয়া সাধনানন্তর, বর্ত্তমান সরকারী বৎসরের শেষে ঋণ-সমষ্টি দাঁড়াইবে ১২৭৩ কোটিতে এবং আগামী বৎসরের শেষে ১৩৩১ কোটিতে। ইহার প্রায় সমগ্র অংশই ভারতীয় ঋণ। রাজস্বের ঘাটতি এবং সংরক্ষণ হেতু মৌলিক ব্যয়ই এই বৃদ্ধির হেতু। রেল, ডাক ও তার বিভাগের মূলধন, সরকার কর্ত্তৃক প্রদত্ত কিছু ঋণ ও দাদন, কিছু প্রযুক্ত অর্থ (Investments) এবং নগদ তহবিল বাদ দিলে, ১৯৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দের শেষে সরকারের দুর্ব্বহ ঋণভার দাঁড়াইবে ৩১৭ কোটি। অবশ্য সরকারের কিছু সম্পত্তি এবং অর্থকরী সম্পদ আছে এবং এই ঋণের সুদনির্ব্বাহার্থ কয়েকটি নূতন রাজস্বের উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। কিন্তু ভারতের দুঃস্থ জনপ্রতি এই ঋণের পরিমাণ ও প্রকোপ কিরূপ প্রবল, তাহা সহজেই অনুমেয়।

সাম্রাজ্য-সংরক্ষণার্থ যুদ্ধোপকরণ এবং ভারতের সংরক্ষণ-সঙ্কল্পে উপায়, উপাদান এবং উপকরণ প্রভৃতির ব্যয়নির্ব্বাহার্থ ভারতে চলতি মুদ্রার প্রভূত প্রসার সাধন করিতে হইয়াছে। যুদ্ধপূর্ব্বে কারেন্সি নোটের প্রচলন ছিল ১৭২ কোটি টাকা। ধীরে ধীরে সেই অঙ্ক আজ ৬২৬ কোটিতে উন্নীত হইয়াছে। কিন্তু অর্থবৃদ্ধির সমানুপাতে প্রজাসাধারণের আহার্য্য ও নিত্য নৈমিত্তিক ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি পায় নাই;—যুদ্ধ-প্রয়োজনে পাওয়াও সম্ভবপর নহে। সুতরাং স্বল্প-পরিমিত আহার্য-ব্যবহার্য্যের নিমিত্ত অত্যধিক পরিমিত অর্থ প্রাপণীয় হওয়াতে দ্রব্য-মূল্য অযথা অসীম পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। পক্ষান্তরে কর্ম্মজীবীর পারিশ্রমিক অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায় নাই। ফলে, জীবন-যাত্রার ধারা নিম্নাভিমুখী হইয়াছে। এই নিমিত্ত চিন্তাশীল অর্থ-শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মুদ্রা পরিচালন-যন্ত্র সাহায্যে বৃটিশ সরকার ও মিত্র রাষ্ট্রগুলির তরফে টাকা খরচকে (Rupee disbursements) দায়ী করিয়াছেন। এই প্রক্রিয়ার ফলেই যে অর্থ-স্ফীতি (Inflation of Currency) এবং তাহারই অবশ্য-ম্ভাবী প্রতিক্রিয়ারূপে মূল্য-স্ফীতি (Inflation of Prices) ঘটিয়াছে, ভারতের অর্থ-সচিব তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি এ বিষয়ে বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত যে যুক্তিজালের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার ন্যায় সরকারী আমলার পক্ষে সমঞ্জস হইলেও বিশেষজ্ঞের পক্ষে সমীচীন নহে। ভারতের অর্থ-সচিব মনে করেন,

কার্য্য-কারণ এবং পরিণাম-পরিণতি (Cause and effect) বিষয়ে মতিভ্রমই এই প্রতিকূল দৃষ্টিভঙ্গীর হেতু। ভারতের যুদ্ধ-প্রচেষ্টা এখনও ভারতের জন-শক্তি ও সম্পদ্-সামর্থ্যের বৃহত্তম অংশ আয়ত্ত করে নাই; সরবরাহ, সংগ্রহ এবং সংগঠন-কার্য্য এখনও প্রবল; সর্ব্বসাধারণ-যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় (Common war effect) দ্রব্যসামগ্রী এবং চাকুরি-নক্রি দ্বারা আন্তর্জ্জাতিক ঋণ-সমস্যার মীমাংসা হেতু প্রচলিত স্বাভাবিক উপায় ও বিধান প্রাপণীয় নহে এবং আমদানী বৃদ্ধি দ্বারা, কিংবা বিনিময়-হারের উর্দ্ধগতি দ্বারা, বাণিজ্য-জমা-খরচের সামঞ্জস্য সংসাধন দ্বারা আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য-সম্পর্কের সঙ্গতি-সাধন সম্ভবপর নহে; এবং যেহেতু ভারতীয় প্রচলিত মুদ্রা সাহায্যেই ব্যয় সম্পাদন করিতে হইবে, সেই হেতু কিরূপে যুদ্ধ-ব্যয়ের বিলি-বিভাগ নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহার সহিত অর্থ-স্ফীতি প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক; যদিও চরম নিষ্পত্তির পক্ষে ইহার গুরুত্ব প্রচুর। সুতরাং কর-নির্দ্ধারণ এবং ঋণ-গ্রহণ সাধ্য হইলে, ভারতের অনুকূলে ষ্টার্লিং-সংস্থিতির বৃদ্ধির সহিত আভ্যন্তরীণ সমস্যার সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ নাই। ভারতের অর্থ-সচিবের বিশ্বাস, যুদ্ধে জয়লাভের সহিত যুক্তরাজ্য এবং ভারত সরকার উৎকৃষ্ট আর্থিক নীতি অনুসরণ পূর্ব্বক বিগত মহা-যুদ্ধের অবসানে কোন কোন বিজিত দেশে অনুভূত অর্থাতিশয্যের কুফল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিবেন। ক্রমবর্দ্ধমান ষ্টার্লিং-সংস্থিতি এবং অত্যধিক অর্থ-স্ফীতি, এই যমজ সমস্যার (Twin problem) গুরুত্বের অপলাপ না করিয়া, অর্থ-সচিবের বিশ্বাস যে, প্রকৃত বাজার-সম্ভ্রম বৃদ্ধি (Pure credit inflation) এবং স্থিতিশীল কিংবা ক্ষয়িষ্ণু ভোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর প্রতি বর্দ্ধিষ্ণু ক্রয়শক্তির সংঘাত, এই দুই-এর মধ্যে পার্থক্যের ভ্রান্ত ধারণা হইতে প্রতিপক্ষের আশঙ্কার উৎপত্তি।

ভারতের অর্থ-সচিব "বিশুদ্ধ বিবেকের" সহিত ঘোষণা করিয়াছেন যে, কোন সময়েই ভারত সরকার বাজার-সম্ভ্রম-স্ফীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। বাজেটে রাজস্বের ঘাটতি-পূরণের কিংবা ব্যয়নির্ব্বাহার্থ সরকারী তহবিল-বৃদ্ধির নিমিত্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ গ্রহণের সুবিধা লয়েন নাই। উদ্দেশ্যবিশেষের জন্য ট্রেজারি বিল (Ad hoc Treasury Bills) দ্বারা ষ্টার্লিং-ঋণের আংশিক পরিশোধ বাজার-সম্ভ্রম-স্ফীতি পর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে না। এই ঋণ-পরিশোধ প্রকল্পে কোন অবস্থাতেই "এড হক্ ট্রেজারি বিলের" বিরুদ্ধে "কারেন্সির" বিস্তার সাধন করা হয় নাই। "ট্রেজারি বিল"গুলি মাত্র সেই ষ্টার্লিংএর স্থান গ্রহণ করে—যাহার বিরুদ্ধে অগ্রেই কারেন্সির বিস্তার সাধিত হইয়াছে—নিয়মানুগ ভাবে, বৈধ দাবীর রোক-শোধ (cash payment) হেতু এবং এই পরিবর্ত্তন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রচলন বিভাগের (Issue department) সম্পদের (assets) সামঞ্জস্য সাধনের জন্য মাত্র। ইহা জাতির ব্যবহারের নিমিত্ত অর্জ্জিত নিবদ্ধ অর্থসমষ্টি (Block of investment) মাত্র। অর্থ-সচিবের আরও একটি যুক্তি এই যে, সরকারের যুদ্ধ-প্রচেষ্টার বিস্তৃতি ও দ্রুততার সহিত শ্রম, কাঁচা মাল এবং বিবিধ কর্ম্মের জন্য ক্রমবর্দ্ধমান পাওনাদারগণকে নগদ মূল্য দিতে হয়। যুদ্ধ-পরিস্থিতিপ্রসূত আশঙ্কা নিবারণ হেতু যে সকল ক্ষেত্রে শান্তিকালে চেক্ চলে, সে সকল স্থলেও নগদ-বিদায়ের ব্যবস্থা করিতে হয়। সুতরাং বিশাল এবং বিস্তারশীল জনসংখ্যার নিমিত্ত প্রভূত নগদ মুদ্রার প্রয়োজন। সে প্রয়োজন সিদ্ধ না হইলে যুদ্ধপ্রচেষ্টা ব্যাহত হয়। অধিকন্তু, সরকারের সর্ব্ববিধ যুদ্ধ-ব্যয় দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির সহায়ক নহে, যদিও সরকারের যুদ্ধ-প্রচেষ্টা হেতু অসামরিক দ্রব্যসম্ভারের উৎপাদন এবং আমদানী কিয়দংশে ব্যাহত হয়। বিশেষতঃ, যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে দ্রব্যমূল্য উচ্চস্তরে নহে—নিম্নস্তরে অবস্থিত ছিল, এবং তাহাদিগকে উর্দ্ধাভিমুখী করিবার প্রয়োজনও ছিল।

যুক্তি বটে! কিন্তু এই যুক্তিজালের অযৌক্তিকতা দুরবগাহ নহে। যে ৪০০ কোটি টাকা ঋণ-পরিশোধার্থ সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে ১৬০ কোটি টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রদান করিয়াছে। কিন্তু গত দুই বৎসরের রাজস্ব-ঘাটতির গুরু অঙ্ক ১০৮ কোটি টাকা যে এই টাকার অন্তর্ভুক্ত নহে, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত সরকারের যেরূপ নিকট এবং নিগূঢ় সম্পর্ক, তাহাতে ভারত সরকারের ক্রমাগত ঋণগ্রহণ-প্রতিক্রিয়ার অন্তরালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কাগজের নোট ছাপিয়া সরকারের বাজার-সম্ভ্রম বৃদ্ধি করেন নাই, তাহাই বা কি প্রকারে বলা যায়! অর্থ লইয়াই যাহাদের কারবার, অর্থাৎ শিল্পী, বণিক্ ও বৃত্তি-ব্যবসায়ী প্রভৃতির বৈধ-প্রয়োজনে প্রচলিত মুদ্রাবৃদ্ধি মুদ্রা-স্ফীতি (Inflation) নহে, এবং তাহার বৈধ মুক্তি-পন্থা কারবারী হুণ্ডি (Trade bills)। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের "বিল" তহবিলের নিরন্তর হ্রাস-লাঘবতার সহিত কারেন্সি নোটের সংখ্যা-বৃদ্ধি অসমঞ্জস পরিস্থিতির নির্দ্দেশ দেয়। দ্বিতীয় কথা, সামরিক উপাদান-উপকরণের ক্রমবর্দ্ধমান উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে অসামরিক আহার্য্য-ব্যবহার্য্যের উৎপাদন হ্রাস পায়। তখন যুদ্ধ-প্রয়োজনে ক্রমাগত অর্থবৃদ্ধি হইলে স্বল্প-পরিমিত ক্ষয়িষ্ণু দ্রব্য-সামগ্রীর উপর ক্রম-বিস্তৃত অর্থবৃদ্ধির অবশ্যম্ভাবী ফল,—দ্রব্যমূল্যের অযথা অপরিসীম বৃদ্ধি। এ দায়িত্ব কাহার?

খাদ্য-দ্রব্যের স্বল্পতা, মূল্য-শাসনের ব্যর্থতা, মাল-চলাচলের দুর্গমতা, গরিষ্ঠ শিল্পের অপ্রতিষ্ঠা, যথা-সময়ে উপযুক্ত ও উপযোগী প্রতিকার-ব্যবস্থার অভাব,—এ সকলের জন্য দায়ী কে? আমদানী-প্রতিরোধই কি খাদ্যদ্রব্যের স্বল্পতার একমাত্র কারণ? খাদ্যদ্রব্যের স্বল্পতা সত্ত্বেও তাহার রপ্তানি কি অর্থশাস্ত্রের অনুমোদিত? সামরিক প্রয়োজনে সরকারের ক্রয়-নীতির সহিত খাদ্যদ্রব্যের মূল্য-বৃদ্ধির কি কোন সম্পর্ক নাই? বিগত মহাযুদ্ধের অবসানের অব্যবহিত পরেই যদি এ দেশে এঞ্জিন ও মাল-গাড়ী প্রস্তুতকার্য্য আরব্ধ হইত, তাহা হইলে এখন মাল-চলাচলের এই বিষম ব্যাঘাত ঘটিত না। পক্ষান্তরে, ভারতের বাহিরেও রেলগাড়ী পাঠাইতে হইয়াছে! এ ত্রুটি কাহার?

তৃতীয় কথা, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি দ্বারা নিরন্ন কৃষককুলের ঋণভার লাঘব হইয়াছে কি? তাহাদের অন্ন-বস্ত্রের অভাব প্রশমিত হইয়াছে কি? চোরা বাজারের সৃষ্টি ও অত্যাচারের মূল উৎস কোথায়? যুদ্ধ-প্রয়োজনে করবৃদ্ধি অপরিহার্য্য। কিন্তু যে প্রকারেই করবৃদ্ধি হউক না কেন, তাহার ক্রম-অধঃ-প্রসারিত অন্তিম অভিঘাত কি দরিদ্রের উপর আপতিত হয় না? তামাক ও বনস্পতি ঘৃতের উপর কর নিতান্তই দরিদ্রের প্রতি প্রযুক্ত নহে কি? কেন্দ্রীয় অতিরিক্ত বাড়্‌তি কর, এবং ডাক ও আইনগঠিত সমিতি (Corporation) কর কি শিল্প, বাণিজ্য ও বৃত্তি-ব্যবসায়কে খর্ব্ব করিবে না? এবং জরুরী (emergency) কর কি অবশেষে স্থায়ী করে পর্য্যবসিত হয় না?

যুদ্ধে ব্যয়-বণ্টন-ব্যবস্থা, ষ্টার্লিং-সংস্থিতির উদ্‌বৃত্তের শেষ পরিণাম, মুদ্রা-বিভ্রাট ও দুর্ম্মূল্য অন্ন-বস্ত্র-সমস্যা আমাদের আতঙ্ক প্রবর্দ্ধিত না করিলেও আশঙ্কা নিবৃত্তি করে নাই। আমাদের ভবিষ্যৎ অনুজ্জ্বল—ঘনঘটা না হউক, গাঢ় কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন। কর ও ঋণ,—ঋণ ও কর, উভয়ই দরিদ্রের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের নিদারুণ অভিসম্পাত, কিন্তু রাষ্ট্র ও পৌর বাজেটের তাহা প্রধান উপজীব্য।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

করবী-মল্লিকা

(উপন্যাস)

৩৮

বেলা পড়িয়া আসিয়াছে, বিছানায় শুইয়া মাসিক-পত্রের ছবি দেখিতেছি, মিলি আসিয়া আপন-মনে আরম্ভ করিল,—

"বাজুক মুরলী সমীরে আকুলি কোমলে মিলায় মধুর তান,
এক-সুরে বাঁধা এক-মন্ত্রে সাধা বাজিয়া উঠেছে যুগল প্রাণ!
হৃদয়ের ভাষা হিয়ার পিয়াসা, শুনিতে বুঝিতে পারে কি পরে!
কি জানি কি কয় নীরবে মলয় যূথিকা-কলিকে গুঞ্জন-ভরে!
সে অস্ফুট কথা, নীরব ব্যথা জানে শুধু ওই কুহকী বাঁশী—
বাঁশীর সুস্বরে ভাসি ওঠে ধীরে, কত আঁখি-ধারা হাসির রাশি।"

ছবি রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ও আবার কি মিলি? সারা দুপুর ওই কাজ হয়েছে না কি? আমার হাতে কাগজখানা দে তো, পড়ে দেখি।"

উত্তর না দিয়া মিলি তেমনি নত-নেত্রে পড়িতে লাগিল,—

"বাজুক মুরলী সমীরে আকুলি কোমলে মিলায় মধুর তান,
ও অধীর ধ্বনি শুধু প্রতিধ্বনি, তরুণ প্রাণের করুণ গান।
ডাকিছে বাঁশরী, আয় কুলনারী, উছলে দু'হৃদি উথলে কূল,
আয় রে যতনে দু'কূল বাঁধনে বেধে দিতে দু'টি প্রাণের মূল।
থেকো নিরমল দুইটি কমল, পবিত্র প্রেমের হারেতে গাঁথা,
বাঁশীর নিক্কণে দুইটি পরাণে উঠুক সুচির প্রণয়-গাথা।"

বিছানা ছাড়িয়া মিলির হাত হইতে খাতার পাতাখানা কাড়িয়া লইলাম।

হাতের লেখা মিলির নয়। বলিলাম, "এ তো তোর লেখা নয়! কার লেখা? কোথা থেকে আনলি?"

মিলি কহিল, "আমার মাষ্টার-মশায় ললিত বাবু এসেছিলেন; তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নিলাম। উনি স্বভাব-কবি, ভেবে-চিন্তে উনি লেখেন না। কলম নিয়ে বসলেই হলো! বললাম, করুর বিয়েতে জরির সুতো দিয়ে মখমলের ওপর আমি একটা স্মরণ-চিহ্ন সেলাই করে দিতে চাই। বলবা মাত্র কল্পতরু মাষ্টার-মশায়ের কলমের ডগা থেকে খস্-খস্ করে এটা বেরিয়ে এলো। হাতে সময় রেখে সেলাই করতে হয়। চার-দিকে লতার বর্ডার দিয়ে মাঝখানে এতগুলি অক্ষর লিখতে সময় বড় কম লাগবে না! এটিতে সুর দিয়ে গাইবো, ইচ্ছা আছে। ভাবছি, তুই কীর্ত্তন ভালোবাসিস্, কীর্ত্তনের সুরই দেবো। ভালোবাসিস্ বলেই না আজ-কাল তোকে আমি কীর্ত্তন শোনাই। এর কথাগুলিতে বেশ কীর্ত্তনের টান রয়েছে,—

"বাজুক মুরলী সমীরে আকুলি, কোমলে মিলায় মধুর তান।"

মিলির পাগলামিতে রাগ করিব, কি হাসিব, ভাবিয়া পাইলাম না। সময়-সময় ও যেন সত্যই প্রহেলিকা হইয়া ওঠে! মিলিকে জানিবার শক্তি আমি হারাইয়া ফেলি! আজ যেন মিলি আমাকে জ্বালাতন করিবার সংকল্প লইয়া আসরে অবতীর্ণ হইয়াছে। প্রভাতে যাহার সূচনা হইয়াছিল, অপরাহ্ণেও তাহার নিবৃত্তির আশা নাই বুঝিয়া বিরক্ত হইয়া আমি কহিলাম, "মাপ কর মিলি, আর আমায় ত্যক্ত করিস্ নে। মন দিয়ে শুনে রাখ্, বিয়ে আমি কখ্খনো করবো না। আমার মিলন-বাসরে কাকেও মিলন-গীত গাইতে হবে না! যদি মরণ বাসরে কিছু দেবার থাকে, তাহলে বরং দিস্। এ জন্মের মত আমার মিলন শেষ। এক আশা, তোদের মিলনে গান গাইবো, তোরা সুখী হলেই আমি সুখী হবো। এ ছাড়া আমার অন্য কামনা নেই।"

"তোর কামনা নেই, আর আমারি আছে করু? তোর ছল-ছল চোখের আমি ধার ধারিনে আর। এত দিন চুপ করেই ছিলাম, আজ আমার বলবার দিন এসেছে। তুই কি জানিস্ না, বর্ণচোরা আমের উপরে রং না ধরলেও ভিতরের রংএ খবর কারো অজানা থাকে না। তোকে যে সব চেয়ে বেশি ভালোবাসে, তার সঙ্গেও ছলনা! ছি করু, ভুলেও তুই আমাকে আপনার ভাবতে পারলি নে!"

মুহূর্ত্তে আমি বিচলিত হইলাম। এই তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিশালিনী প্রতিভাময়ী তরুণীর কাছে ধরা পড়িবার ভয়ে আমি বিহ্বল হইলাম। অশান্ত হৃদয়কে শান্ত করিতে আমার খানিকটা সময় লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে কহিলাম, "তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে মিলি? কি তোকে গোপন করলাম? কিসেরই বা ছলনা? তুই যা-তা বলিস, আমি বারণ করি বলেই না এত কথার সৃষ্টি! আর বারণ করবো না, তোর যা খুশী তুই বল—হলো তো? এদিকে বাজে বকছিস্, ওদিকে বেলা যে গেল, সে-জ্ঞান আছে? নেমন্তন্ন যেতে হবে না? মাসিমা এখনি তাড়া দেবেন, তোর আবার তৈরি হতে দেরী হয়।"

"দেরীর ভয় নেই! তুই যা চাপা দিতে চাইছিস্, আমি তা চেপে গেলাম। শোন্ করু, আজ আমার একটা কথা তোকে রাখতে হবে। চিরকাল তোর পছন্দ-মত তুই সাজ করিস্, আজ কিন্তু আমি তোকে সাজিয়ে দেবো। নিজের রুচিতে খাওয়া, পরের রুচিতে পরা, —এক দিনের জন্য শুধু এ নীতি মেনে নে!"

নিষ্কৃতির সহজ উপায় বুঝিয়া আমার বুকের পাথর যেন নামিয়া গেল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া আমি কহিলাম, "এ নীতি মেনে নিলাম মিলি, তবে আমার মিনতি, বাড়াবাড়ি করিস্ নে। বেশী সেজে বেরুতে আমার লজ্জা করে। আমার সাজের আছেই বা কি? আমার মতে পরের হাতে মানুষের সাজের দিন জীবনে দু'টো,—এক বিয়েয়, আর শেষের দিন।"

"বেশ, আমি কথা দিলাম, তোর বিয়ের দিনে আমি সাজিয়ে দেবো আর তুই আমাকে সাজিয়ে দিবি মরণের পর শ্মশান-যাত্রার সাজে।"

ব্যথিত হইয়া আমি ডাকিলাম,—"মিলি!"

মিলি হাসিল, "এতে চোখ-রাঙ্গানোর কিছু নেই করু। জন্ম যখন নিয়েছি, তখন এক দিন না এক দিন সে-দিন আসবে। চল, কাপড় ছাড়বার ঘরে যাই। বড্ড দেরী হয়ে যাচ্ছে, মা রাগ করবেন।"

নির্ব্বিবাদে মিলির হাতে নিজেকে আমি সমর্পণ করিলাম।

নানা উপকরণে মিলি আমার অঙ্গ সুশোভিত করিতে লাগিল। তাহার হীরা-মুক্তার বাছা কয়েকটি গহনায় তাহারই গৈরিক রঙের 'বিষ্ণুপুরী' শাড়ীতে আমার দেহশ্রী বিলুপ্ত হইল কি বর্দ্ধিত হইল, তাহা সে বলিতে পারে! তাহার একাগ্রতায় নিপুণতায় আমার খোঁপায় মালা পর্য্যন্ত বাদ রহিল না।

এমন করিয়া কেহ কখনো আমাকে সাজায় নাই, আমিও সাজি নাই। অনভ্যস্ত বেশভূষায় আমার লজ্জার সীমা রহিল না। প্রতিবাদ করিতে সাহস হইল না। এত দিন মিলিকে শুধু ভালোই বাসিতাম, সে ভালোবাসায় ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে। মিলি আমাকে যেন জানে,—আমার যাহা গোপনীয়, ও যেন তাহার সন্ধান পাইয়াছে! অনায়াসে মিলি আজ আমার বিচারকের আসনে বসিতে পারে! লুকানো বস্তু প্রকাশ্য দিবালোকে পরিব্যাপ্ত করিতে পারে! মিলিকে জানিবার অহঙ্কার আমার চূর্ণ হইয়াছে। তাহাকে কেহ জানিতে পারে না, দূর হইতে সে দূরতম, সীমার উর্দ্ধে সে! আমাদের ক্ষুদ্র মাপ-কাঠিতে তাহাকে মাপা যায় না, আমাদের মনের সূক্ষ্ম সূতায় সে বাঁধা পড়ে না।

আমার সজ্জা-পর্ব্ব সম্পূর্ণ হইল। প্রতিমার অঙ্গরাগ করিয়া মালাকর যেমন নির্নিমেষে সে প্রতিমার পানে তাকাইয়া থাকে, মিলিও তেমনি মুগ্ধনেত্রে আমাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

আমার প্রতি অঙ্গে দৃষ্টি বুলাইয়া মিলি কহিল, "সত্যি, কি সুন্দর দেখাচ্ছে! একটু এমন-তেমন করলে তোকে এত ভালো দেখায়, তা জানতাম না! কে বলে, তুই দেখতে ভালো নোস্? অনেকের চেয়ে, আমার চেয়ে ঢের ভালো। সবাই যে আমাকে সুন্দর বলে, তা শুধু তোর চেয়ে ফর্সা রংএর জন্য নয়, রাত-দিন আমি সেজে থাকি, তাই। তোর মুখের কাছে আমার মুখ? আয়নায় ভাখ, কি সুন্দর তোকে দেখাচ্ছে!"

আমার হাত ধরিয়া মিলি আমাকে বড় আয়নার সামনে দাঁড় করাইয়া দিল।

চোখ তুলিয়া আমি লজ্জিত হইলাম। মিলি এ কি করিয়াছে? আমি যাহা নই, তাহাই যে প্রতিপন্ন হইতেছে! নয়নের কাজল-রেখায়, অধরের রক্তিম আভায়, চিবুকের কৃষ্ণ তিলের তলে আমি যেন হারাইয়া গিয়াছি! কিন্তু এমন বেশে কেমন করিয়া আমি তাঁহার কাছে যাইব? তিনি কি ভাবিবেন? লজ্জায়, কুণ্ঠায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম। আমার নব সজ্জা আমাকে আশ্বাস দিতে লাগিল, ভয় কি ভীরু! তোর ভয় নেই, মিলির দীপ্ত সৌন্দর্য্যের অন্তরালে তোর এ সজ্জার আড়ালে তুই অনায়াসে লুকাইয়া থাকিতে পারিবি! কে তোকে লক্ষ্য করিবে? তোকে কার বা প্রয়োজন? এ জীবনের মত তোর বিবাহের বেশ তোলা রহিল, এক দিনের এ প্রসাধন অপরাধের নয়!

সরিয়া আসিয়া মিলিকে কহিলাম, "এখন তুই তৈরি হয়ে নে, তোর দেরী হয়ে যাচ্ছে। তোর মত আমি অত-শত জানি না, তবু আয়, চুলটা বেঁধে দি, জামা-কাপড় বের করে দি!"

"আমার জামা-কাপড়ের আজ দরকার নেই রুরু, আমি নেমন্তন্ন যাবো না।"

আমি চমকিয়া উঠিলাম! "যাবি না? তাঁরা অত করে বলে গেলেন! তুই না গেলে দিদি দুঃখিত হবেন, জ্যোতি বাবু আঘাত পাবেন। তোর না যাবার কারণ কি, শুনি? তুই না গেলে আমিও যাবো না,—যেতে আমি পারবো না।"

"আমি না যেতে পারলে তোর যাবার মানা কিসের? ভানু যাবে, মা যাবেন, তাতে হবে না? আমার শরীরটা আজ ভালো নেই, তাই যাবো না। এ কথা তাঁদের লিখে জানিয়েছি, তাঁরা দুঃখিত হবেন না, আঘাতও পাবেন না। তুই চলে যাবি, আমি তো এইখানেই থাকবো. আমার আর-একদিন গেলেই হবে!"

"তা হয় না মিলি। তুই না গেলে আমি কখখনো যাবো না। বেশ তো, ভানুকে নিয়ে মাসিমা নেমন্তন্ন রক্ষা করে আসুন, তোতে-আমাতে বাড়াতে থাকি। কিন্তু না, তোর শরীর আবার খারাপ কোথায়? মিছে ছুতো করছিস তুই!"

"ছুতো নয় রুরু, সত্যি যেতে ইচ্ছা করছে না। তুই থাকবি না বলেই ওঁরা যেতে বলেছেন, তোর জন্যই আজকের খাওয়া-দাওয়া, আমার জন্য নয়। আমি না গেলে পারলে বিশেষ দোষ হবে না। কত জায়গায় তো আমি গিয়েছি, তুই যাসনি, তুই গেছিস, আমি যাইনি! তাতে কি হয়েছে! আজ তোকে কিন্তু যেতেই হবে, রুরু।"

"যেতে হবে তা যেন মেনে নিলাম, কিন্তু আমরা সবাই একত্র হবো, তাই আগে ওঁরা বলেছেন। আমি চলে গেলেও আবার আসতে পাবি! চন্দ্রদাকে আবার কত দিনে পাওয়া যাবে! তুই না গেলে তিনিই বা ভাববেন কি?"

"তাঁর বাড়ী নয়, তাঁর নেমন্তন্ন নয়, তিনি আবার কি ভাববেন?"

৩৯

অনেক দিনের পর আবার সেই বাড়ী, সেই পুষ্পোদ্যান। আমরা গাড়ী হইতে নামিবা মাত্র মা আমাকে সাদরে আহ্বান করিলেন, "এসো মা-লক্ষ্মি, ঘরে এসো!"

দিদি বলিলেন, "মাসিমাকে নিয়ে বসাওগে মা, আমি এদের বাগানে নিয়ে যাচ্ছি।"

ভানুকে প্রবীরের দলে ভিড়াইয়া দিদি আমাকে বাগানে লইয়া চলিলেন।

বাগানে বেতের চেয়ারে বসিয়া চন্দ্রদা ও জ্যোতি বাবু গল্প করিতেছিলেন। জ্যোতি বাবুর পাশের শূন্য আসনে আমাকে বসাইয়া দিদি সহসা অদৃশ্য হইয়া গেলেন। বসন্তের রূপে, রসে, গন্ধে ধরণী রোমাঞ্চিত, বায়ু সুরভিময়। লেকে পর-পারের ঘনসন্নিবেশিত বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য হইতে থাকিয়া থাকিয়া কোকিল ডাকিতেছিল।

চন্দ্রদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুনলাম, মল্লিকা দেবীর অসুখ করেছে! কি অসুখ রুরু?"

উত্তর দিলাম, "তেমন কিছু নয়, শরীরটা ভালো বোধ করছে না, তাই এলো না।"

"তাঁর যদি এখানে আসতে ভালো না লাগে, তাতে দুঃখের কি আছে চন্দ্র? আমি জানি, অসুখ তাঁর দেহের নয় মনের। তোমার না ডাক্তারী-বিদ্যায় এত খ্যাতি, —দাও না মল্লিকা দেবীর মনের অসুখ সারিয়ে! এত কাল কেবল শারীরিক ব্যাধির চিকিৎসাই করেছো, এবার মানসিক রোগের চিকিৎসা ধরো।"

ক্ষণেক চিন্তা করিয়া চন্দ্রদা কহিলেন, "মানসিক রোগের ওষুধ আমি তো জানি না জ্যোতি,—ডাক্তারী বইয়ে লেখা থাকলে খুঁজে বের করবো।"

"খুঁজতে হবে না,—ভাবলেই পাবে, ভাই। এত দেশ-বিদেশ ঘুরে পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করে তবু এমন নিকৃষ্ট হয়ে রইলে! অন্য বিষয় না হয় ছেড়ে দিলাম, কিন্তু বয়সের অভিজ্ঞতা সকলেরই থাকে! তোমার—"

কথাটা জ্যোতি বাবু শেষ করিতে পারিলেন না। ব্যস্তসমস্ত ভাবে দিদি আসিয়া কোন কাজের জন্য যেন চন্দ্রদাকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন।

সেই নির্জ্জন লতা-বিতানে, সন্ধ্যার তরল অন্ধকারে জ্যোতি বাবুর পাশে আমি! কেহ কোথাও নাই। মাথার উপর অবারিত অনন্ত আকাশ, চারি দিকে ফুলের সমারোহ। এ মায়া-বিভ্রমের মধ্যে কেহ কাহাকেও ভালোবাসিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারে না! আমিও পারিলাম না,—অস্থির চিত্তে উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

সবিস্ময়ে জ্যোতি বাবু বলিলেন, "এ কি, আপনিও চললেন যে! ভিতরে যাবার আগে আমার ঘরে আপনাকে একবার যেতে হবে। মিলি আজ আমাকে একখানা চিঠি লিখেছে—সেটা আপনার দেখা দরকার। এখানে আলো নেই, আলোয় যেতে হবে।"

মৃদু কণ্ঠে বলিলাম, "চলুন।"

আবার সেই গৃহ—যেখানে এক দিন অভিসারে আসিয়া আমার আকুল চুম্বন রাখিয়া গিয়াছি! যেখানে যে-জিনিষ সে-দিন দেখিয়াছিলাম, আজও সে-সব তেমনি আছে! সেই নিভৃত নিলয়, সেই ঘন-নীল রঙের যবনিকা। সাদা পাথরের 'টিপয়ের' উপর তেমনি পুষ্পগুচ্ছ। আজ রজনীগন্ধা নয়, কুন্দ এবং শ্বেত করবীর তোড়া।

আমার দিকে চেয়ার সরাইয়া দিয়া জ্যোতি বাবু আমার সামনে বিছানায় বসিলেন।

মন্ত্রমুগ্ধের মত দুরু-দুরু কম্পিত বুকে তাঁহার হাত হইতে আমি চিঠি লইলাম,—কিন্তু কোন শব্দের ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। অক্ষরের পর অক্ষরের মালার পানে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলাম।

জ্যোতি বাবু বলিলেন, "এ কি, আপনার হাত এত কাঁপছে কেন? ভয় কি! মিলি ভয়ের কোন কথা লেখেনি। শান্ত হয়ে পড়ুন। জল খাবেন? বলুন? জল দেবো? না, দিদিকে ডাকবো?"

কি লজ্জা, কি ঘৃণা! এই কি আমার সংযম-শিক্ষা! নিজেকে সুদৃঢ় করিয়া জবাব দিলাম, "না, জল চাই নে, দিদিকেও ডাকতে হবে না।"

এবার মিলির লেখা আর ঝাপসা অস্পষ্ট রহিল না। মিলি লিখিয়াছে,—

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আজ আপনাদের উৎসবে যোগ দিতে পারবো না বলেই এ চিঠির অবতারণা। সামনা-সামনি বলতে গেলে যে কথা বাধে, লেখায় তার বালাই থাকে না।

আমি যা বলতে চাই, তা জেনে অপরে আশ্চর্য্য হলেও আপনি হবেন না, এ আমি জানি! তবু আপনার আর আমার মধ্যে সব পরিষ্কার হওয়া উচিত।

এক দিন দ্বিধা-সংশয়ের মাঝে যে-সম্মতি দিয়েছিলাম, এত কাল মনে-মনে তার আলোচনা করে বুঝতে পেরেছি, সে সম্মতির কোনো দাম নেই। সময় চেয়েছিলাম শুধু নিজেকে জানবার জন্য। পরীক্ষা একটা ছুতো মাত্র।

আশা ছিল, আমার মন ক্রমে আপনার প্রতি আকৃষ্ট হবে, জগতে সব চেয়ে প্রিয়-জ্ঞানে আপনাকে আমার বলে মনে করবো! প্রেমশূন্য বিয়ে যে বিয়ে নয়, এটা আর-সকলের মত আমিও জানি। কিন্তু পারলাম না,—আপনি আমাকে মাপ করবেন।

আমি ভালো না হতে পারি, কিন্তু ছলনার ছদ্মবেশে আপনাকে আর ভুলিয়ে রাখতে চাই না। বিয়ে আমার মত মেয়ের জন্য নয়!

প্রথমে আপনি হয়তো অনেক আশা করে আমার সামনে আপনার মনের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন, আমি সেখানে প্রবেশ করতে পারিনি। এগিয়ে যাবার প্রেরণা না পেলে জোর করে কিছু করা যায় না। আমি আপনার অন্তরে না গেলেও আর এক জনের যে সেখানে আবির্ভাব হয়েছিল, তা আপনার অগোচর নেই। গোঁজামিল দিয়ে আপনি তার নাম দিয়েছিলেন, 'শ্রদ্ধা'! আন্তরিক শ্রদ্ধাই যে প্রেমের গতি-পথ, তা কি আপনি জানেন না?

শ্রদ্ধা আপনি আমাকে কখনো দেননি—ধারণা করেছিলেন, ভালোবেসেছেন! আমি জানি, সে ভালোবাসা নয়, মোহ! কালে আপনার মোহ কি পরিণতি লাভ করতো, তা উপভোগ করবার অবকাশ আমার হলো না। কারণ, আমি চাই না আপনার মোহ-বিজড়িত দুর্ব্বল ভালোবাসা। আপনাকে বিবাহ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

যার ভালোবাসা, আত্মত্যাগ, নিষ্ঠা অতুলনীয়, সে আজ আপনার কাছে যাচ্ছে। তাকে পাওয়া আপনার কেন, অনেকের পক্ষেই সৌভাগ্য। আপনার মা এবং দিদি তাকেই একান্তে চেয়েছেন। আপনার গুপ্ত বাসনাও তাঁদের সঙ্গে বিজড়িত রয়েছে!

ভ্রমেও আপনি ভাববেন না, রুরু আপনাকে অত্যন্ত ভালোবাসে জেনে আমি তার পথ থেকে স'রে যাচ্ছি! রুরুকে যতই ভালোবাসি, তবু এত উদার আমি নই।

আপনার আর আমার মধ্যে রুরুর পক্ষে আপত্তিকর কিছুই ঘটেনি। আত্মীয়-স্বজন যে-মিথ্যাকে গড়ে তুলতে গিয়েছিলেন, তা ভাঙ্গতে পেরে আমি আনন্দ বোধ করছি।

আপনার আংটিটা এই লোকের হাতে ফেরত দিলাম। যে এর প্রকৃত অধিকারিণী, এটি তাকে দেবেন।

বিনীতা
শ্রীমল্লিকা দেবী।

৪০

হৃদয় যতই কঠিন, সংযত করিয়া মিলির চিঠি পড়ি না কেন, চিঠির শেষ অংশ আমাকে বিচলিত করিল। অবশেষে মিলি আমাকে ধরিয়া ফেলিল? শুধু ধরা নয়, ধরাইয়া দিল! এ লজ্জা কোথায় রাখিব? আমার কাম্য যে কিছুই ছিল না! দানের সংকল্প লইয়া আমি বাঁচিয়াছিলাম। আমার গোপন দুর্গ ভাঙ্গিয়া গেল! নগ্ন পৃথিবীর বুকে শত কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে বিচরণ করিবার শক্তি আমার কোথায়? ভীরু মন কাঁপিয়া মরে,—সঙ্কোচে চোখের পাতা বুজিয়া আসে!

দেহ ঝিম্-ঝিম করিতে লাগিল,—চেয়ারের হাতলে আমি মাথা রাখিলাম।

ব্যগ্র ব্যাকুল হইয়া জ্যোতি বাবু প্রশ্ন করিলেন, "অসুখ বোধ হচ্ছে? বিছানায় শোবেন কি?"

কথার উত্তর না দিয়া আমি ঘাড় নাড়িলাম।

নীরবে কিছুক্ষণ কাটিল। সে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া জ্যোতি বাবু বলিতে লাগিলেন, "যা আমার আনন্দের, সুখের, তা জেনেছি বলে তোমার লজ্জা কিসের, করু? তুমি তো লজ্জার কিছু করোনি! আমি অন্ধ ছিলাম—ভুল আমারি। দিদিকে মিলির চিঠি দেখাতে তিনি আমার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন!"

সর্ব্বনাশ! আমার কথা দিদিও তাহা হইলে জানিয়াছেন! মা জানিয়াছেন! এতক্ষণ মাসিমারও জানিতে বাকী নাই। তাই মা আমাকে ডাকিয়াছিলেন, "এসো মা, ঘরে এসো।" তাই আমাদিগকে সুযোগ দিতে ভানু ও চন্দ্রদাকে দিদি সরাইয়া লইয়াছিলেন? মিলি, তুই এ কি করিলি? আমি কোথায় যাইব? কোথায় আমার স্থান?

লুকাইবার অবলম্বন না পাইয়া দুই হাতে আমি মুখ ঢাকিলাম।

তিনি বলিলেন, "মুখ ঢাকলে কেন, করবী? শোনো, আমার সব কথা তোমাকে শুনতে হবে। আমার যা বলার, মিলির চিঠিতে তা সহজ হয়েছে। মিলি লিখেছে, মোহ! আমি তা অস্বীকার করি না। কিন্তু মোহ হলেও মিলিকে এক দিন আমি ভালোবেসেছিলাম।"

হাত নামাইয়া কাঁপা গলায় কোনরূপে বলিলাম, "তাতে কি হয়েছে? মিলিকে সবাই ভালোবাসে, আমিও বাসি। দেখুন, আমার মনে হয়, মিলি আমার জন্যেই এ-সব লিখেছে। দূরে না ঠেলে, আপনার ভালোবাসার জোরে তাকে কাছে নিয়ে আসুন।"

আমাকেই তিনি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। আমার কথায় তাঁহার মুখ লাল হইল। তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "আমাকে এতখানি কাপুরুষ ভাববার তোমার কোন কারণ হয়নি, করু! যে আমাকে চায় না, অপরকে ভালোবাসে, জোর করে তার প্রাণহীন দেহ দখল করবার কল্পনা—আমার পৌরুষে বাধে। ভালোবাসাই ভালোবাসাকে টেনে আনে! অপর-পক্ষ যোগ না দিলে আদান প্রদান চলে না, আপনা-আপনি তার গতিবেগ থেমে যায়। আমার মনের ঘোর কেটে গেছে। তুমি মনেও ভেবো না, মিলি তোমার জন্য এই সব করেছে! সে কাকে চায়, তা আমার জানা হয়ে গেছে।"

"কাকে সে চায়?"

"জানো না? নিজে গোপনে ভালোবাসতে শিখেছো, আর-এক জনের লুকানো কথা টের পাও না? তোমার মল্লিকা পাখী চন্দ্রচূড়ের শরজালে ধরা পড়েছেন।"

আমি চমকিত হইলাম! সামনের কালো পর্দ্দা সরিয়া গেল। প্রতি দিনের প্রতি ঘটনা যেন আমি প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম!

মিলির জন্য আমার হৃদয় বেদনায় বিগলিত হইল। চন্দ্রদা যে বিবাহ-বিমুখ! তিনি বিবাহ না করিলে, মিলির প্রেমের প্রতিদান না দিলে মিলি কি করিবে? কি করিয়া হৃদয়-ভার বহন করিবে? এ মর্ম্মান্তিক জ্বালার পরিচয় যে আমি জানি!

বলিলাম, "কিন্তু চন্দ্রদা বিয়ে করতে চান না যে! মিলির কি হবে?"

"শুনেছি, তুমিও বিয়ে করতে চাওনি! তোমার চন্দ্রদাও চায় না। তার চাওয়া-না-চাওয়ার ভার আমি নিলাম। ভয় নেই করু, তোমার ভগিনী-প্রেমের, সখী-প্রীতির অনেক পরিচয় পেয়েছি। কথা দিচ্ছি, মল্লিকা দেবীর জীবন মিথ্যা হবে না, যে যুগ মানুষকে বাইরে থেকে বিচার করে, চন্দ্র সে যুগের নয়। চন্দ্র মিলিকে ঠিক চিনতে পারবে। মিলির মত সহজ সাবলীল মন মেয়েদের মধ্যে কেন, ছেলেদের মধ্যেও দুর্লভ! মিলিকে তুমি সাধে ভালোবাসো? এক কালে আমিও বেসেছিলাম,—কিন্তু তাতে ভয় পেয়ো না। আমিই তার যোগ্য নয়। অমন বেগবতী নদীকে ধারণ করবার ক্ষমতা আমার নাই। ও নদীকে বাঁধতে পারে শুধু ঐ চন্দ্রচূড়।"

মিলির মৃগয়ার শর এত দিনে লক্ষ্য পাইল? শিকারী আজ নিজেই আহত, তাহার লক্ষ্য কিন্তু ব্যর্থ নয়। সারা জীবন প্রেমের ছায়ার পিছনে ঘুরিয়া, এত দিনে মিলি প্রেমের দেখা পাইয়াছে। তাহাকে তরল-চিত্ত ভাবিয়া তাহার উপর করুণাও করিয়াছি, তাহাকে চিনিতে পারি নাই। তাহাকে চিনিয়াছিল পুরুষ,—যে-পুরুষ চিরকাল এই ছলনাময়ী, শক্তিময়ী নারীর কাছে আত্মদান করিয়াছে। মিলির কৃত্রিম বেশভূষা, নির্লজ্জ প্রেমলীলা—সমস্তই তাহার অশান্ত চিত্তকে ভুলাইবার জন্য! বেশ-ভূষার হৃদয়হীন উপহাসের অন্তরালে এত কাল সে আপনার নীড় খুঁজিয়া ফিরিয়াছে!

"এত ভাবনা কিসের, করু? আমি তোমার মনের ইচ্ছা বুঝতে পেরেছি। মিলিকে রেখে তুমি এগিয়ে যেতে চাও না! সে ব্যবস্থা পঞ্জিকার পাতায় আছে। এক দিনে দু'টো লগ্ন,—কেমন? মুখ অত নামিয়ো না, চোখ তোলো। আমার ভারী মুস্কিল হয়েছে, একটা বোঝা সারা দিন বয়ে বেড়াচ্ছি—তাকে রাখবার জায়গা পাচ্ছি না।"

বলিতে বলিতে জ্যোতি বাবু পাঞ্জাবীর বুক-পকেট হইতে মিলির প্রত্যাখাত হীরক-অঙ্গুরী বাহির করিলেন। বিজলী-আলোর প্রভায় হীরক হাসিতে লাগিল!

সেই হীরকের মত উজ্জ্বল হাসি-মুখে আমার আরো কাছে আসিয়া তিনি বলিলেন, "মিলি লিখেছে, 'যে প্রকৃত অধিকারিণী, তাকে দেবেন'। অধিকারিণীকে আমি পেয়েছি, কিন্তু তিনি অধিকার নেবেন কি না, তা এখনো জানা হয়নি!"

নীরবে আমি হাত বাড়াইয়া দিলাম। মিলির কর-ভ্রষ্ট হীরা আমার বাম-অনামিকায় জ্বলিতে লাগিল! ভ্রষ্ট-তারা এত দিনে যেন তার স্থান খুঁজিয়া পাইল!

শ্রীগিরিবালা দেবী।

শেষ

বিবাহের পরে

(গল্প)

অধ্যাপক বিনয় সেন শেষ পর্য্যন্ত ইন্দ্রাণী রায়কেই বিয়ে করলেন। বিনয় বাবুকে আপনারা নিশ্চয় চেনেন। আমাদের কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক। ইন্দ্রাণী আমাদের সঙ্গে পড়তো। ইংরেজীতে অনার্স। মেয়েটি সুন্দরী এবং বড়লোকের মেয়ে। ঘরের মোটারে করে কলেজে আসতো যেতো। পরীক্ষায় আমাদের চেয়ে বেশী নম্বর পেতো। অতি চালিয়াত—গায়ে-পড়ে আমরা আলাপ করতে গেলুম, সে আমাদের সঙ্গে কথাই কইলো না। তাই আমরা যখন জানতে পারলুম, বিনয় বাবু তাকে বাড়ীতে পড়ান, তখন তা নিয়ে আমরা খুব খানিকটা কাণাঘুষো হৈ-চৈ আরম্ভ করলুম। দেখতে দেখতে কলেজে এবং বাহিরে একটা কথা ছড়িয়ে পড়লো যে, অধ্যাপক বিনয় সেন তাঁর ছাত্রী ইন্দ্রাণী রায়ের প্রেমে পড়েছেন। ডালপালা নিয়ে সে কথা শেষে এমন রূপ ধারণ করলে যে, কলেজের অধ্যক্ষ এক দিন বিনয় বাবুকে ডেকে পাঠালেন। দু'জনে কি কথা হয়েছিল জানি না, তবে ক'দিন পরেই মহা সমারোহে অধ্যাপক বিনয় সেনের সঙ্গে ইন্দ্রাণীর বিবাহ হয়ে গেল। আমরা তাদের জব্দ করতে গিয়ে নিজেরাই বোকা ব'নে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ চুষতে লাগলুম। অবশ্য অনার্স-ক্লাসের ছেলেদের তিনি নিমন্ত্রণ করেছিলেন এবং যে মহিলাটিকে নিয়ে আমরা রঙ্গ করতুম, গুরু-পত্নী বলে পায়ে হাত দিয়ে তাঁকেই প্রণাম করতেও হয়েছিল! তবে ভোজটা হয়েছিল খুব জবর রকমের—এই যা সান্ত্বনা।

গরমের ছুটীতে অধ্যাপক আর মিসেস্ সেন কালিংপঙ্ বেড়াতে গেলেন। দার্জ্জিলিং না গিয়ে কালিংপঙ্ যাওয়ার কারণ—সেখানে ভিড় কম।

বিনয় বাবুর বয়স বত্রিশের কাছাকাছি, ইন্দ্রাণীর বাইশ-তেইশ।

ইন্দ্রাণী পথে অধ্যাপককে বললেন,—"ভাখো, নতুন বিয়ে হয়েছে শুনলে লোকে বড় ঠাট্টা করে। কেউ জিগ্‌গ্যেস করলে আমরা বলব, সাত-আট বছর বিয়ে হয়েছে। তুমি কিন্তু সেখানে অধ্যাপক বলে পরিচয় দিয়ো না।"

বিনয় বাবু কবি লোক। স্ত্রীর আইডিয়ার নূতনত্বে তিনি খুব খুশী হলেন। বললেন,—"মজা মন্দ হবে না। সব সময় যদি লোক জন এসে আমাদের সঙ্গে ঠাট্টাই করে, তাহলে কলকাতা ছেড়ে তোমাকে নিয়ে কালিংপঙ্ যাচ্ছি কি করতে।"

"যাও, তুমি ভারী দুষ্টু"—বলে হেসে ইন্দ্রাণী জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বাহিরের শোভা দেখতে লাগলেন।

ট্রেণ থেকে নামবার সময় ইন্দ্রাণী বললেন, "যা বলেছি মনে আছে?"

বিনয় বাবু বললেন, "খুব। তবে চেনা-শুনা কোন লোকের সঙ্গে দেখা হলেই মুস্কিল!"

ইন্দ্রাণী বললেন, "সে তখন দেখা যাবে। আমার ভয় তোমাকে নিয়ে। যা তোমার ভুলো মন, কোন্ দিন ফস্ করে কি বলে সব ফাঁস করে দেবে!"

বিনয় বাবু হেসে, বল্লেন, "বটে, আমি না তোমার অধ্যাপক। গুরুনিন্দা করতে নেই।"

কৃত্রিম কোপে ইন্দ্রাণী বললেন, "আবার!"

অধ্যাপক এবং মিসেস সেন প্রভাবেষ্ট হোটেলে রুম নাম্বার টেন অধিকার করলেন। হোটেলের কোন অধিবাসীই তাঁদের পরিচিত নয় দেখে দু'জনে আরামের নিশ্বাস ফেললেন। বিনয় সেন কবি, ইন্দ্রাণী সুন্দরী এবং সুগায়িকা, কাজেই দু'-চার দিনের মধ্যে হোটেলের সকলের সঙ্গেই তাঁদের ঘনিষ্ঠতা ঘটলো। দুপুরে ব্রীজ এবং সন্ধ্যায় গান-বাজনায় হোটেলে যেন আনন্দের স্রোত বইতে লাগলো।

ক'দিন পরের ঘটনা। এক নম্বর রুমের বিন্দুবাসিনী রাত্রে তার স্বামী জলধর বাবুকে বললেন, "ইন্দ্রাণী মেয়েটি বেশ।"

জলধর বাবু তখন সিগার-মুখে একখানা ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়ছিলেন। মুখ না তুলেই তিনি বললেন, "হুঁ, বিনয় বাবুও লোকটি খুব ভালো।"

"আচ্ছা ইন্দ্রাণী বলছিল, ওদের সাত বছর বিয়ে হয়েছে—এ কথা তোমার বিশ্বাস হয়?"

বই থেকে মুখ তুলে জলধর বাবু বললেন,—"না; না, তুমি ভুল করেছ, সাত নয়—আট বছর।"

বিন্দুবাসিনী বললেন—"আমাকে ইন্দ্রাণী নিজে বলেছে সাত বছর।"

জলধর বাবু উত্তর দিলেন,—"তুমি বোধ হয় ভুল শুনেছো! মিষ্টার সেন নিজে আমাকে বলেছেন আট বছর।"

কুপিত স্বরে বিন্দুবাসিনী বললেন,—"না, আমি ভুল শুনিনি, তুমি ভুল শুনেছ। সব-তাতেই আমার কথার উপর কথা কওয়া তোমার কেমন অভ্যেস। তাছাড়া পুরুষমানুষের কথার দামই বা কি! তারা বিয়ের তারিখ পর্য্যন্ত ভুলে যায়, তা বছর। পুরুষ-জাতটাই এমনি।"

অগত্যা জলধর বাবুকে চুপ করতে হলো।

দু'নম্বর রুমের প্রীতিলতা তাঁর স্বামী নবীনচন্দ্রকে বললেন,—"হ্যাঁ গা, ইন্দ্রাণী যে বলে, সাত বছর ওর বিয়ে হয়েছে, তোমার বিশ্বাস হয়?"

নবীনচন্দ্র তখন একমনে বসে পেসেন্স খেলছিলেন। মুখ না তুলেই তিনি বললেন—"এতে অবিশ্বাসের কি আছে, এই তো আমাদের চোদ্দ বছরের উপর বিয়ে হয়েছে।"

ভ্রূভঙ্গী সহকারে প্রীতিলতা বললেন,—"চোখের মাথা খেয়েছ!"

অপ্রস্তুত হয়ে নবীনচন্দ্র বললেন,—"তাই তো, পঞ্জাটা যে ছক্কার তলায় বসবে, তা এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি।"

রেগে তাসগুলোকে ঘরময় ছত্রাকারে ছড়িয়ে প্রীতিহীন স্বরে প্রীতিলতা বললেন,—"চব্বিশ ঘণ্টা তাস আর তাস। আমি হয়েছি তোমার চক্ষুশূল।"

ভীত ভাবে নবীনচন্দ্র বললেন,—"কেন, কি আবার হলো?"

"হবে আবার কি! আমার কথার জবাব দাও।"

"তোমার কোন্ কথা?"

"এতক্ষণ আমার একটা কথাও কাণে যায়নি বুঝি, এত তাচ্ছিল্য! আমি জিগ্‌গ্যেস করলুম, ওদের সাত বছর বিয়ে হয়েছে, তুমি তা বিশ্বাস করো?"

"করি, তবে তুমি যদি আপত্তি করো, তাহলে বেশ, অবিশ্বাস করবো।"

"তোমার কথা শুনলে আমার গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছা করে। চোদ্দ বছরে যখন এতখানি তাচ্ছিল্য, তখন সাত বছরে কিছু তো হবে। অথচ ওদের মধ্যে যে-রকম ভাব দেখি, আমার বিশ্বাস হয় না।"

একটু হেসে নবীনচন্দ্র বললেন,—"তোমার সঙ্গে কিছু দিন মিশলেই তোমার ভাব পাবেন'খন।

বারুদে যেন অগ্নিসংযোগ হলো। তীব্র স্বরে প্রীতিলতা বললেন, "আমার তো সবই খারাপ, বেশ তো। পছন্দ না হয়, আর-একটা দেখে-শুনে ঘরে আনো না—কে বারণ করছে।"

"আহা হা, তুমি আমার কথাটা বুঝতে পারলে না গো! আমি বলছিলুম—"

"থাক্, কিছু বলে দরকার নেই! ঢের হয়েছে!"—বলে প্রীতিলতা পান সাজায় মনোনিবেশ করলেন; কিন্তু মহিলাদের স্বভাবই এমন যে, নিজের বক্তব্য সম্পূর্ণ না বলতে পারলে পেট ফোলে! অম্ল, অজীর্ণ, পেট-কাঁপা, বুক-ধড়ফড়, এমন কি, হিষ্টিরিয়া পর্য্যন্ত হ'তে পারে। তাই তিনি বিশ্রামযোগে পান মুখে পুরে আবার আরম্ভ করলেন—"তুমি লক্ষ্য করেছে, বেড়াতে বেড়িয়ে বিনয় বাবু তাঁর স্ত্রীর ওভার-কোট বয়ে নিয়ে যান!"

রসিকতা করে স্বামী বললেন—"ইংরেজীতে একটা কথা আছে, বিবাহের পূর্ব্বে পুরুষ নারীর পিছনে-পিছনে চলে। বিবাহের পর কয় মাস চলে পাশে পাশে। তার পর স্বামী এগিয়ে চলেন আর স্ত্রী ছোটেন তাঁর পিছনে-পিছনে।"

স্ত্রী বললেন—"সেই কথাই আমি বলছিলুম। স্ত্রীর উপর যখন ওঁর এত টান, তখন আমার মনে হয়, সাত বছর নয় আরো কম। সে দিন দ্যাখোনি, এক সঙ্গে আমরা বেড়াতে গেছলুম—ইন্দ্রাণীর হাত থেকে রুমাল পড়ে যেতে বিনয় বাবু তখনি সে রুমাল কুড়িয়ে ঝেড়ে তুলে দিলেন। তুমি কখনো দিয়েছ? বিয়ের বেশী দিন পরে কোন্ স্বামী তা দেয়?"

নবীনচন্দ্র চুপ করে রইলেন। এর পর কি-বা বলবেন!

তিননম্বর ঘরের শান্তিসুধা তাঁর স্বামী বিজয় বাবুকে বলছিলেন—"হ্যাগা, ইন্দ্রাণী বললে, তাদের সাত বছর বিয়ে হয়েছে। এক ছেলে, এক মেয়ে। আর বাপের বাড়ীতে তাদের রেখে এসেছে। তোমার বিশ্বাস হয় এ কথা?"

বিজয় বাবুর বদ অভ্যাস, আহারের পরেই ঘুম পায়। তন্দ্রাজড়িত স্বরে লেপের মধ্য থেকে তিনি বললেন—"কেন, এতে অবিশ্বাসের কি আছে? সকলেরই তো আর আমাদের মত ভাগ্য নয় যে, দশ বছরের উপর বিয়ে হলো, এখনও একটি সন্তানের মুখ দেখলুম না!"

অভিমান-হত স্বরে স্ত্রী বললেন—"এটা নিয়ে খোঁটা দেবার কি আছে! আমার বরাত! তোমার ইচ্ছা হলে আবার বিয়ে করতে পার। আমি তাতে আপত্তি করছি না তো"—বলতে বলতে ঝর-ঝর ধারে তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো।

বিজয় বাবুর তন্দ্রা তখনই গেল ছুটে। লজ্জিত ভাবে উঠে বসে ব্যথিত কণ্ঠে তিনি বললেন—"আমায় ক্ষমা করো শান্তি, তোমাকে ব্যথা দেওয়া আমার উদ্দেশ্য ছিল না।"

মান-অভিমানের পালা সাঙ্গ হলে পর শান্তিসুধা আবার কথার ছিন্নসূত্র জোড়া দিয়ে বললেন,—"তোমার বিশ্বাস হয়, ওদের এক ছেলে, আর এক মেয়ে?"

বিজয় বাবু বললেন,—"এক ছেলে, আর দুই মেয়ে। তোমার শুনতে ভুল হয়েছে বোধ হয়!"

দৃঢ় স্বরে শান্তিসুধা বললেন—"ভুল হবে কেন? ইন্দ্রাণী নিজে আমাকে বলেছে, এক ছেলে, আর এক মেয়ে। ছেলের নাম সুনীল, মেয়ের নাম অলকা।"

বিজয় বাবু উত্তর দিলেন,—"উঁহু, তোমার ভুল হচ্ছে! বিনয় বাবু নিজে আমাকে বলেছেন, ওদের একটি ছেলে, আর দু'টি মেয়ে। ছেলের নাম হিরণ, মেয়েদের নাম অণিমা, আর নীলিমা। তারা মামার বাড়ীতে নয়, ঠাকুরমার কাছে আছে।"

শান্তিসুধা তীব্র ভাবে বললেন—"আমার সব কথাতেই তুমি তর্ক করো। লোকে কথায় বলে, যাকে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা। হয় তোমার শুনতে ভুল, নয় সব গুলিয়ে ফেলেছো। মা'র কখন ভুল হতে পারে না!"

"বাপেরই বা ভুল হবে কেন?"

"খুব ভুল হতে পারে। পুরুষদের পক্ষে সব সম্ভব!"

অগত্যা রণে ভঙ্গ দিয়ে বিজয়কুমার আবার লেপের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

আর এক দিনের ঘটনা! বন্ধুদের সঙ্গে বিনয় সেন বেড়াতে বেরিয়েছেন। হঠাৎ টাইগার-হিল থেকে সূর্য্যোদয় দেখার কথা উঠলো। সকলে স্ব স্ব অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করলেন। বিনয় বাবু বললেন—"আমি লাষ্ট ইয়ারে সূর্য্যোদয় দেখতে গেছলুম। ডিভাইন! সাব্লাইম! সে দৃশ্য ভোলবার নয়! এখনও যেন চোখে লেগে রয়েছে! মাত্র একবার দেখে আশ মেটে না!"

দিলীপ বাবু প্রশ্ন করলেন,—একা গেছলেন? না, সস্ত্রীক?"

বিনয় সেন ঠিক জানতেন না, ইন্দ্রাণী টাইগার-হিলে কখনও গেছেন কি না? শেষে বেকুব না বনতে হয়! তাই তিনি বললেন—"আমি একাই গিছলুম। উনি তখন বাপের বাড়ীতে ছিলেন। সেই বছরই আমাদের ছোট মেয়ে—"

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে নরহরি বাবু বললেন—"তাই তো! এমন একটা দৃশ্য মিসেস্ সেন দেখতে পেলেন না! উনিও দেখেননি। চলুন না, এক দিন সকলে দল বেঁধে যাই। কি বলেন?"

সকলে সানন্দে এ প্রস্তাবের সমর্থন করলেন!

হোটেল-সংলগ্ন উদ্যানে চা-পর্ব্ব শেষ করে মহিলারা গল্প করছেন। কথায় কথায় সুপ্রভা বললেন—"পাহাড়ে ভোর আর সন্ধ্যাই সব চেয়ে দেখতে ভালো।"

জয়ন্তী বললেন,—"সূর্য্যোদয় আর সূর্য্যাস্ত?"

ইলা বললেন—"সূর্য্যোদয় দেখতে হলে টাইগার-হিল। হ্যাঁ ভাই ইন্দ্রাণী, তুমি টাইগার-হিল থেকে সূর্য্যোদয় দেখেছ কখনো?"

ইন্দ্রাণী হেসে উত্তর দিলেন—"হ্যাঁ, বছর-দুই আগে দার্জ্জিলিং গেছলুম—সে বার দেখেছি।"

অর্থপূর্ণ হাস্যসহ সুপ্রভা প্রশ্ন করলেন—"একা, না জোড়ে ?"

ইন্দ্রাণী কি উত্তর দেবেন, ঠিক করতে না পেরে চুপ করে রইলেন। জয়ন্তী হেসে বললেন—"চুপ করে থাকার মানেই জোড়ে। কি বলো ?"

ইন্দ্রাণী শুধু নতমুখে ফিক ফিক করে একটু হাসলেন।

সেই দিনই রাত্রের কথা। চার নম্বর ঘরের সুপ্রভা তাঁর স্বামী দিলীপ বাবুকে বললেন—"ভ্যাখো, সকলে টাইগার-হিল থেকে সূর্য্যোদয় দেখেছে, কিন্তু আমি দেখিনি—এতে আমার ভারী লজ্জা করে। দেখিনি, এ কথা স্বীকারও করতে পারি না, দেখেছি, তাও বলতে পারি না। আমাকে এক দিন সূর্য্যোদয় দেখাতে নিয়ে চলো।"

দিলীপ বাবু বললেন—"বেশ। এক দিন যাওয়া যাবে। আজ সকালেই আমাদের টাইগার-হিল যাবার পরামর্শ হচ্ছিল। বিনয় বাবুর ইচ্ছা, শীঘ্র এক দিন যেতে হবে। ওঁর স্ত্রী আর-বছর বাপের বাড়ীতে ছিলেন। সে সময় উনি গিয়েছিলেন। এবার সস্ত্রীক যাবার ইচ্ছা আছে। উনি বলছিলেন, ওঁর স্ত্রী কখনও টাইগার-হিল থেকে সূর্য্যোদয় দেখেননি!"

বাধা দিয়ে সুপ্রভা বললেন—"তুমি নিশ্চয় ভুল শুনেছ। আজ সকালেই ইন্দ্রাণীর সঙ্গে এ সম্বন্ধে আমাদের কথা হচ্ছিল। সে নিজে বলেছে, বছর-দুই আগে ওরা জোড়ে টাইগার-হিল থেকে সূর্য্যোদয় দেখতে গিছল। আর তুমি বলছো, ইন্দ্রাণী দেখেনি!"

দিলীপ বাবু উত্তর দিলেন,—"কিন্তু আজ সকালেই যে বিনয় বাবু নিজে বললেন—"

উত্তপ্ত কণ্ঠে সুপ্রভা বললেন,—"আজ সকালে ইন্দ্রাণী নিজে আমাদের বলেছে। তুমি নিশ্চয় শুনতে ভুল করেছ! কিম্বা কে ও-কথা বলেছে, তা তোমার মনে নেই।"

দিলীপ বাবু বললেন—"আশ্চর্য্য!" আমার বেশ মনে আছে—"

তীব্র কণ্ঠে সুপ্রভা উত্তর দিলেন,—"ঐ তোমার কেমন স্বভাব! আমি যা বলবো, তা নিয়ে তর্ক করা চাই-ই! আমি হয়েছি তোমার চোখের বালি!"—সঙ্গে সঙ্গে চোখে তিনি আঁচল চাপা দিলেন।

ব্যস্তসমস্ত হয়ে দিলীপ বাবু বললেন—"ঠিকই তো। আমারই ভুল হয়েছে। বয়স হয়েছে, সব কথা কেমন মনে রাখতে পারি না! হ্যাগা, রাগ করলে ?"

মুখ থেকে আঁচল সরিয়ে সুপ্রভা মধুর স্বরে উত্তর দিলেন,—"পাগল! রাগ করবো কেন ?"

তার পর, থাক সে কথা।

কিছু দিন থেকে সকলের মনে কেমন একটা সন্দেহ উঁকি দিচ্ছে। ইন্দ্রাণী আর বিনয় বাবুর কথায় মিল নেই। ছেলেমেয়েদের নাম এবং নম্বর পর্য্যন্ত ভুল! আর দু'জনের মধ্যে যে রকম ভাব, স্বামি স্ত্রীর মধ্যে তা দেখা যায় না। বিশেষ করে সাত-আট বছর এক সঙ্গে থাকবার পর! কত দিন বিবাহ হয়েছে, সে সম্বন্ধে দু'জনের দু'রকম কথা—সন্দেহের অপরাধ কি!

হোটেলের মেয়ে-পুরুষ, স্বামি-স্ত্রী, বন্ধু-বান্ধব সকলের মুখে এই এক কথা! এরা কি তবে সত্যই স্বামি-স্ত্রী নয়! অথচ মেয়েটার মাথায় সিঁদূর!

হোটেলের ম্যানেজার প্রাণকেষ্ট বাবুর স্ত্রী নবতারা তাঁর স্বামীকে বললেন—"ভ্যাখো, মেয়েরা ভারী গোল করছিলেন, ঐ বিনয় বাবু আর ইন্দ্রাণীকে নিয়ে—"

প্রাণকেষ্ট বাবু বললেন—"পুরুষরাও আমাকে বলেছেন। এমন কি, ওদের না তাড়ালে এঁরা চলে যাবেন, এমন কথাও বলেছেন। তাই ভাবছি—"

ঝঙ্কার দিয়ে ম্যানেজার-পত্নী বললেন—"এতে ভাববার কি আছে ? এক জনদের জন্য এতগুলো লোক চলে যাবে ? কালই ওদের তুমি দূর করে দাও।"

চিন্তিত ভাবে প্রাণকেষ্ট বাবু বললেন—"দূর করে দাও বললেই কি দেওয়া যায়! ওঁরা এক মাসের ভাড়া আগাম দেছেন। হঠাৎ কি করে চলে যেতে বলি! একটা কারণ দেখাতে হবে তো!"

উত্তপ্ত কণ্ঠে নবতারা বললেন,—"কারণ ? এর চেয়ে বেশী কারণ আর কি থাকতে পারে! তুমি পরিষ্কার বলে দেবে—ও-রকম লোকদের জন্য এ হোটেলে জায়গা হবে না। এখানে ভদ্রলোকরা থাকেন!"

মাথা চুলকে প্রাণকেষ্ট বাবু বললেন—"কিন্তু ভালো রকম সন্ধান না নিয়ে এত বড় কথাটা বলা উচিত হবে ? তাছাড়া ওঁর স্ত্রীর সাঁথিতে সিঁদূর রয়েছে। বিয়ে না হলে কি সাঁথিতে সিঁদূর পরতে পারতেন!"

চোখ ঘুরিয়ে মুখের সামনে হাত নেড়ে নবতারা বললেন—"যার বুদ্ধি নেই, তার আবার সব কথায় তর্ক করা কেন ? ও তো অন্য লোকের স্ত্রীও হতে পারে। তোমাদের বিনয় বাবু হয়তো নিয়ে এসেছে! আজ-কাল কি না হচ্ছে, সিঁদূর থাকলেই যে স্বামি স্ত্রী হতে হবে, তার কি মানে আছে ?"

আম্‌তা আম্‌তা করে প্রাণকেষ্ট বাবু বললেন,—"তা বটে, তা বটে!"

পরের দিন সকালে চা-পান শেষ হবার পর সকলে হোটেল-সংলগ্ন বাগানে বেড়াচ্ছেন, এমন সময় প্রাণকেষ্ট বাবু সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। নিম্ন স্বরে ক'জনের সঙ্গে কি যেন পরামর্শ করলেন। একটু পরে বিনয় বাবু এসে সে-দলে যোগ দিলেন। এ কথা সে-কথার পর ম্যানেজার বাবু বললেন,—"আচ্ছা বিনয় বাবু, আপনি কি কাজকর্ম্ম করেন ?"

আশ্চর্য্য হয়ে বিনয় বাবু বললেন,—"কেন, বলুন তো ? হঠাৎ আজ এ প্রশ্ন ?"

দু'বার ঢোক গিলে প্রাণকেষ্ট বললেন,—"না, এমনি জিজ্ঞাসা করছিলুম। আপনি বলেছিলেন কবিতা লেখেন! কিন্তু কবিতা লিখে বাঙ্গালা দেশে কি কিছু হয়, মশাই ?"

হেসে বিনয় বাবু উত্তর দিলেন,—"না, তা হয় না। তবে আমার পৈত্রিক কিছু বিষয়-সম্পত্তি আছে, আর নিজেও একটা চাকরি করি। কিন্তু এ-সব প্রশ্নের তাৎপর্য্য ঠিক বুঝতে পারলুম না! আপনার প্রাপ্য কিছু বাকী আছে বলে তো মনে হচ্ছে না!"

অপ্রতিভ ভাবে প্রাণকেষ্ট বাবু বললেন,—"না, মানে সে কথা নয়। আচ্ছা বিনয় বাবু, আপনার বিবাহ হয়েছে কত দিন ?"

অবিরাম প্রশ্নের চোটে বিনয় বাবুর মেজাজ খারাপ হয়ে উঠেছিল। শ্লেষ-সহ তিনি বললেন,—"হোটেলে থাকতে হলে বিবাহের তারিখ বলবার দরকার হয়, তা জানতুম না।"

এ কথার প্রাণকেষ্ট বাবু কি উত্তর দেবেন, ভেবে না পেয়ে মরিয়া হয়ে উঠলেন! বললেন—"আপনার আর আপনার স্ত্রীর কথাবার্ত্তায় অত্যন্ত অসামঞ্জস্য রয়েছে। আমার প্রশ্ন হলো—যে মহিলাটিকে আপনি স্ত্রী বলে চালাচ্ছেন, তিনি সত্যই আপনার স্ত্রী?"

বিনয় বাবু অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটু হাসিও পেলো। তাঁর আর ইন্দ্রাণীর কথায় অমিল থাকা মোটেই আশ্চর্য্য নয়। কারণ, দু'জনেই মিথ্যা কথা বলছিলেন,—এবং পরামর্শ করে নয়, স্বতন্ত্র ভাবে। তাই জিনিসটাকে তামাসার হাওয়ায় উড়িয়ে দেবার জন্য দু'চোখ বিস্ফারিত করে বললেন,—"আপনি জানতে চাইছেন, আমার স্ত্রী আমার সত্যকারের স্ত্রী কি না? তার উত্তরে আপনাকে জানাচ্ছি, আমার স্ত্রী, আমারই স্ত্রী।"

ম্যানেজার বলে উঠলেন,—"প্রমাণ?"

উদ্যত ক্রোধ দমন করে বিদ্রূপপূর্ণ স্বরে বিনয় বাবু বললেন,—"ওঃ! আচ্ছা, আপনার স্ত্রী যে আপনার স্ত্রী, তার প্রমাণ? কোনো ভদ্রলোকই বোধ হয় এমন প্রশ্নের উত্তরে বিবাহের প্রমাণ দিতে পারেন না? সে যাই হোক, আমার বিল দিয়ে দেনা-পাওনা চুকিয়ে নিন। এমন অভদ্র অপমানের পর এখানে থাকা আমাদের পোষাবে না!"

এই বলে উত্তরের অপেক্ষা না করে হন্-হন্ করে বিনয় বাবু সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন।

ওদিকে মেয়ে-মহলে ইন্দ্রাণীকে নিয়ে তীব্র আলোচনা চলছে। সকলেই একমত, ইন্দ্রাণী নিশ্চয়ই বিনয় বাবুর স্ত্রী নয়, সুতরাং এই মুহূর্তে তাকে হোটেল থেকে বার করে দেওয়া উচিত।

বিন্দুবাসিনী বিশেষ লেখাপড়া জানতেন না, সুযোগ পেলেই তাই তিনি লেখা-পড়া-জানা মেয়েদের বিদ্রূপ করতেন। তিনি বললেন,—"লেখা-পড়া শিখলেই মেয়েরা ধিঙ্গী হয়ে ওঠে। লজ্জা-সরমের মাথা খায়। এই জন্যই দেশটা উৎসন্ন যেতে বসেছে!"

শান্তিসুধা কলেজে-পড়া মেয়ে। তখনই প্রতিবাদ করলেন,—"এ আপনার অন্যায় কথা! লেখা-পড়ার সঙ্গে এ সব ব্যাপারের কোন সম্পর্ক নাই। যারা উৎসন্ন যায়, তারা লেখা-পড়া না শিখলেও যায়। বরং মুখ্যুরাই বেশী—"

কথা শেষ হ'ল না। যাকে নিয়ে এ বাক্-বিতণ্ডা, সেই ইন্দ্রাণী ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হলেন।

হেসে ইন্দ্রাণী প্রশ্ন করলেন—"এত তর্ক কিসের?"

সুপ্রভা বললেন—"আমাদের তর্ক হচ্ছে—মেয়েদের লেখা-পড়া শেখা উচিত কি না, এই নিয়ে!"

সবল কণ্ঠে ইন্দ্রাণী উত্তর দিলেন—"খুব উচিত, একশো বার উচিত। এতে কোন ভুল আছে না কি?"

সুপ্রভা বললেন—"কিন্তু ইনি বলছিলেন, লেখা-পড়া শিখলে মেয়েরা অধঃপাতে যায়।"—এই কথা বলে তিনি বিন্দুবাসিনীকে দেখিয়ে দিলেন।

বক্তব্য প্রতিপন্ন করবার জন্য বিন্দুবাসিনী বললেন—"নিশ্চয়। আচ্ছা ইন্দ্রাণী দেবি, একটা কথার উত্তর দেবেন?"

"কি কথা, বলুন?" ইন্দ্রাণী জিগগেস করলেন।

বিন্দুবাসিনী বললেন,—"বিনয় বাবু আপনার স্বামী?"

এ অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে ইন্দ্রাণী যেন বজ্রাহত হয়ে গেলেন। ক্রোধে তাঁর মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠলো। কঠোর স্বরে তিনি বললেন—"আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে আমার ঘৃণা হয়।"—এ কথা বলে তিনি দ্রুতপদে তখনি সে স্থান ত্যাগ করলেন। পিছন থেকে চাপা হাসির একটা আওয়াজ তাঁর কাণে গেল।

কিছুক্ষণ পরে যাবার জন্য তৈরী হয়ে মিষ্টার বিনয় সেন এবং ইন্দ্রাণী হোটেল-প্রাঙ্গণে এসে অপেক্ষা করছেন, কুলীরা মোট-ঘাট এনে জড়ো করছে, এমন সময় হোটেলে এক নতুন ভদ্রলোক এসে উপস্থিত হলেন। যে কলেজে বিনয় বাবু অধ্যাপনা করেন, ইনি সেই কলেজের অধ্যক্ষ। প্রায় প্রতি বছর ইনি ক্যালিংপঙে আসেন এবং এসে এই হোটেলে থাকেন। বিনয় বাবুকে দেখে তিনি বললেন—"কি বিনয় বাবু, চলে যাচ্ছেন। আর কিছু দিন থাকুন, এই তো সীজন আরম্ভ হলো। তার পর ইন্দ্রাণী, ভালো আছো মা?"

ইন্দ্রাণী ঐ কলেজেরই ছাত্রী ছিলেন। দু'জনেই অধ্যক্ষ রবি বাবুকে প্রণাম করলেন।

ইতিমধ্যে হোটেলের ম্যানেজার প্রাণকেষ্ট বাবু এসে হাজির। রবি বাবুকে নমস্কার করে কুশলাদি প্রশ্নের পর তিনি জিগ্গেস করলেন—"বিনয় বাবুকে আপনি চেনেন বুঝি?"

হো হো করে হেসে রবি বাবু বললেন,—"চিনবো না! আজ সাত বছরের উপর উনি আমাদের কলেজে প্রোফেসরি করছেন! আর ওঁর স্ত্রী ইন্দ্রাণী—উনি আমাদেরই কলেজের ছাত্রী ছিলেন। ওঁদের দু'জনকেই আমি খুব ভালো রকম চিনি। এই ক'মাস হলো, ওঁদের বিবাহ হয়েছে। দু'বাড়ীতেই যে-খাওয়া খেয়েছি, এখনো তা ভুলতে পারিনি।"

প্রাণকেষ্ট বাবু এবং হোটেলের অন্যান্য যে সব ভদ্রলোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন, সকলেই অপ্রতিভ হয়ে মুখ-চাওয়াচায়ি করতে লাগলেন।

তার পর রবি বাবুর মধ্যস্থতায় সকল পক্ষের মনের কালি দূর হয়ে গেল।

সকলে

বছর বিবা

পক্ষেই হা

পরের

বিরাট দে

আনিয়ে ন

তন্ত্রে ভাবত্রয়

ভারতে জাতীয়তা-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনা আজ আর কুসংস্কারমূলক বলিয়া বিবেচিত হয় না। ইংরেজী সভ্যতার প্রবর্ত্তনের পর ভারতীয় চিত্তে যে হীন দাস-মনোভাবের বীজ উপ্ত হয়—যাহার ফলে আর্য্যকৃষ্টির (Culture) প্রতি সকলে বীতরাগ ও সন্দিহান হইয়া পড়েন; সুখের বিষয়, সেই দাস-মনোভাবের ক্রমিক উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খল আর্য্যচিত্তে সেই সনাতন আর্য্যকৃষ্টির প্রতি আবার শ্রদ্ধা ফিরিয়া আসিয়াছে—বিশ্বাস ফিরিয়া আসিয়াছে; আর সেই সঙ্গে জাগিয়াছে সংযমবোধ। ইহা জাতীয়তার নিদর্শন, সন্দেহ নাই। ইহার ফলে রসিক বাঙ্গালী-চিত্ত বৈষ্ণবের রস-সাধনায় আকৃষ্ট হইয়াছে। এত দিন ইংরেজী শিক্ষায় যে উদ্‌ভ্রান্ত বাঙ্গালী-চিত্ত বৈষ্ণবসাধনাকে ভোগমূলক ও অশ্লীল বলিয়া ভাবিয়াছিল, আজ তাহাই এই জাতীয়তা-প্রতিষ্ঠার দিনে এক নবীন অধ্যাত্ম-প্রেরণার বলে বৈষ্ণবের অতীন্দ্রিয় রস-সাধনার বাণী হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে। বাস্তবিক গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত ও প্রচারিত যে বৈষ্ণবধর্ম্ম—যাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে, তাহার একটা World message আছে,—বিশিষ্ট মৌলিক রূপ আছে। বাঙ্গালী সহজিয়া-সাধক কিশোরী লইয়া যে রস-সাধন করিয়াছিল, তাহাও তাহার মৌলিক সাধনা। বড়ই সুখের বিষয়, বর্ত্তমানে বাঙ্গালা-চিত্ত বৈষ্ণব-সাধনায় সুমাকৃষ্ট। কিন্তু বাঙ্গালী-প্রতিভার অপর একটি দিক্ আছে। সেটি হইতেছে তন্ত্র। প্রবাদ-বাক্য এ ক্ষেত্রে বাঙ্গালারই জয়গান গাহে। যথা—"গৌড়ে প্রকাশিতা বিদ্যা মৈথিলে প্রকটীকৃতা। ক্বচিৎ ক্বচিন্মহারাষ্ট্রে গুর্জ্জরে প্রলয়ং গতা।" তন্ত্র বাঙ্গালী-প্রতিভার সম্যক্ দান না হইতে পারে, সমগ্র ভারতেই ইহার প্রতিষ্ঠা আছে, তবু তন্ত্র-ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর যে সাধনা, যে দান, তাহা আপন বৈশিষ্ট্যে মহিমান্বিত ও মৌলিক।

বাঙ্গালী কোমল ধাতের মানুষ। কেবল পদাবলী-সাহিত্যের মধ্য দিয়া বাঙ্গালীর প্রাণের খবর লইতে গেলে তাহার প্রকৃত সন্ধান মিলিবে না। বাঙ্গালার চিত্ত শুধু মধুর রস-ঘন-পদাবলী-সাহিত্য ও বৈষ্ণব-রসাস্বাদেই সমর্থ, এ কথা ভাবিলে ভুল হইবে। বাঙ্গালী যেমন আদি-রস-যাজনায় সিদ্ধকাম হইতে পারিয়াছিল, তেমনি সে আবার ভয়ানক-রসের সাধনাতেও সমাহিত হইয়াছিল। ভগবান্ রসস্বরূপ। রস বলিতে তো তিনি মধুর-রসের বিগ্রহস্বরূপ, ইহাই বুঝায় না। তিনি মধুর; তিনি ভয়ানক। বাঙ্গালী শুধু Worship of the Beautiful—সুন্দরের পূজায় পৌরোহিত্য করে নাই। ভারতের এক গৌরবময় দিবসে সে Worship of the Terrible—রুদ্রের পূজায়, ভীষণতার সাধনায় মাতিয়া উঠিয়াছিল। ইহাই তাহার তন্ত্র-সাধনা। তন্ত্রের প্রতি তরুণ বাঙ্গালী তেমন আকৃষ্ট হয় নাই। ইহা লজ্জার কথা। আজিকার জাতীয়তা-প্রতিষ্ঠার দিনে তন্ত্রালোচনায় যথেষ্ট লাভ আছে। তরুণ বাঙ্গালী জানুন যে, সর্ব্বপ্রকার ভীতিবিমুক্ত এক অখণ্ড অমোঘ জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা তন্ত্রের সাধনায় সম্ভব। সে কথা আজ লিখিব না। তন্ত্রে যে পশুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাব,—এই ভাবত্রয়ের কথা আছে, তাহারই সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই-এক কথা বলিব।

তন্ত্রের প্রতি অনেকেই শ্রদ্ধাশীল নহেন। ইহার কারণ, তন্ত্রোক্ত পঞ্চ-মকার-সাধনা অর্থাৎ মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন—ইহা লইয়া পঞ্চ মকার-সাধন। এই সাধন-সামগ্রীগুলিই শ্রদ্ধাহীনতার কারণ। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, এই সাধনের পশ্চাতে একটা তত্ত্ব বা Philosophy আছে—তাহা জানিলে শ্রদ্ধাহীনতার কারণ থাকিবে না। জগতে কোন বস্তুই হেয় নহে, ব্যবহার করিতে পারিলে বাস্তবতঃ হেয় বস্তুও শ্রদ্ধেয় বস্তুতে পরিণত হয়। কারলাইলের Sartor Resartus বাহ্যতঃ একটা Philosophy of clothes; কিন্তু ইহা কি তাহাই? আর যদি বলি, তন্ত্রোক্ত পঞ্চ-মকারসাধনা Philosophy of wine, Philosophy of meat ভিন্ন আর কিছু নয়, তাহা হইলে শিক্ষিত যুবকগণ বোধ করি, এই বিচিত্র রহস্য-নিবিড় তন্ত্রসাধনা সম্বন্ধে মনে আর ঘৃণার ভাব পোষণ করিবেন না।

যাক্, এক্ষণে ভাবত্রয় সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক্। প্রথমেই পশুভাব। তাহার পর একটা transitionএর কাল—সেটি বীরভাবে উন্নতি—তাহার পর আবার transition বা দিব্যভাবে উন্নতি। এই ভাবত্রয়ের কথা বলিতে গেলে তন্ত্রোক্ত সপ্তাচারের উল্লেখ করিতে হয়। এই সপ্তাচার লইয়াই উক্ত ত্রিবিধ সাধনা অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। যথা—বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার, কৌলাচার। প্রথমে বেদাচার ও সর্ব্বশেষে কৌলাচার। প্রথমটির পর দ্বিতীয়টি, পরে তৃতীয়টি এবং শেষে কৌলাচার। সাধকের চরম আদর্শ এই কৌলাচার। সাধনার ক্রমাভিব্যক্তি অনুসারে এই সপ্তাচারের বিন্যাস। প্রথমাচারে অর্থাৎ বেদাচারে সাধক বেদ এবং বেদমূলক স্মৃতি-পুরাণাদি-সম্মত আচার অবলম্বন করিয়া সকাম ভাবে উপাস্য দেবতার উপাসনা করেন। মাংসাদি ভক্ষণ করেন না। বেদ ও স্মৃতির বিধানগুলি যথাভাবে পালন করেন। দ্বিতীয়, বৈষ্ণবাচার—এই আচারে সাধক বেদাচারোক্ত নিয়মগুলি পালন করেন, তদুপরি এই আচারে তাঁহাকে আরও কিছু অগ্রসর হইতে হয়, যথা—তাঁহাকে অষ্টাঙ্গ মৈথুন পরিত্যাগ করিতে হয়। বেদাচারে বৈধ মৈথুন নিষিদ্ধ ছিল না এবং সাধক সকাম ছিলেন। বৈষ্ণবাচারে তিনি নিষ্কাম হইবেন এবং সর্ব্ব প্রকারে হিংসা বর্জ্জন করিবেন। তৃতীয়—শৈবাচারে তিনি আরও অগ্রসর হইবেন। এবার তিনি বৈধ হিংসা করিতে পারিবেন অর্থাৎ সাধনার্থ পশুবধ করিতে পারিবেন এবং অষ্টাঙ্গ যোগাশ্রয় করিয়া আরাধনা করিবেন। চতুর্থ, দক্ষিণাচার—এ আচারেও বেদাচার গ্রহণীয়। এ আচারেও স্ব স্ব বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন করিয়া "দেবী ভূত্বা দেবীং যজেৎ।" পঞ্চম, বামাচার—সাধককে এই আচারে দিবাভাগে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া রাত্রিতে পঞ্চ-মকারের দ্বারা দেবীপূজা করিতে হয়। এই আচারে বৈদিক ক্রিয়া পরিত্যাগ করিতে হয়—এই আচারই আপাততঃ বিদ্রোহমূলক—এই আচারে সাধকের অভিনব জীবন আরম্ভ হয়। ষষ্ঠ, সিদ্ধান্তাচার—এই আচারে সাধক বামাচারোক্ত সমস্ত ক্রিয়াই করিবেন। তবে ইহাতে অন্তর্যাগের মাত্রা বাড়াইতে হয়—তত্ত্বের দিকে অগ্রসর হইতে হয়। সর্ব্বশেষে কৌলাচার।

কুল শব্দ ব্রহ্মবাচক—"কুলং ব্রহ্ম সনাতনম্।" এই শৈবাচারে সাধক ব্রহ্মসদৃশ হয়েন। ভাবচূড়ামণি তন্ত্র বলিয়াছেন—এই অবস্থায় সাধক—"কৰ্দ্দমে চন্দনেঽভিন্নঃ পুত্রে শত্রৌ তথাপ্রিয়ে। শ্মশানে ভবনে দেবি! তথৈব কাঞ্চনে তৃণে।" এই আচারে ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ণ স্ফূর্ত্তি—সোঽহং-তত্ত্বের বা অদ্বৈত তত্ত্বের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। আচার প্রকৃত পক্ষে দ্বিবিধ, যথা—দক্ষিণাচার ও বামাচার। দক্ষিণাচারের অন্তর্গত বেদাচার, শৈবাচার, বৈষ্ণবাচার ও দক্ষিণাচার; এবং বামাচারের অন্তর্গত বামাচার, সিদ্ধান্তাচার ও কৌলাচার। বিশ্বসারতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"বৈদিকং বৈষ্ণবং শৈবং দক্ষিণং পাশবং স্মৃতং। সিদ্ধান্তবামে বীরে তু দিব্যং যং কৌলমুচ্যতে।" ভাবত্রয়ের মধ্যে বৈদিক, বৈষ্ণব, শৈব ও দক্ষিণাচার পশুভাবের অন্তর্গত; সিদ্ধান্ত ও বামাচার বীরভাবের অন্তর্গত এবং কৌলাচার দিব্যভাবের অন্তর্গত।

বীরভাব প্রসঙ্গে অগ্রে পশুভাবের আলোচনা আবশ্যক। এই পশুভাব হইতেছে বিধিমার্গ এবং বীরভাব বিধিপরিত্যাগের মার্গ। বৈষ্ণব যাহাকে রাগমার্গ বলিয়াছেন, ইহা কতকটা সেইরূপ। বিধিমার্গের যাজন না করিলে রাগমার্গের অবসর নাই। বিধিমার্গের যাজনে চিত্তশুদ্ধি জন্মে, সত্ত্বভাবপুষ্টির যোগ্যতা আইসে। তখন বিধিমার্গ পরিত্যাগের অবসর আইসে। মহাপ্রভু যখন রসিকশিরোমণি রায় রামানন্দকে সাধ্য-সাধন জিজ্ঞাসা করেন, তখন রায় মহাশয় স্বধর্ম্মপালনই ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত করেন। মহাপ্রভু ইহা বাহ্য বলিয়া গূঢ়তম ধর্ম্মরহস্য জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় রায় মহাশয় স্বধর্ম্মপালন কিরূপে রাগমার্গের প্রবর্ত্তক হয়, তাহার ক্রমাভিব্যক্তি প্রণালী বর্ণনা করেন। পশুভাব বলিতে এই 'স্বধর্ম্মপালন' বুঝাইয়া থাকে। আর শ্রুতি ও স্মৃতিসম্মত কর্ত্তব্যসম্পাদনই স্বধর্ম্মপালন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্মের যথারীতি সম্পাদনে সকাম ও নিষ্কাম ভাবের সাধনায়, অহিংসা ও ব্রহ্মচর্য্যের সাধনে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়, প্রসন্ন হয়। এইরূপে বিশুদ্ধচিত্তের উদ্ভব হইলে বীরভাবের অনুশীলন করিতে হয় এবং পশুভাব ত্যাগ করিতে হয়। তাই রুদ্রযামল তন্ত্র বলিয়াছেন—"আদৌ ভাবং পশোঃ কৃত্বা পশ্চাৎ কুর্য্যাদবশ্যকম্। বীরভাবং মহাভাবং সর্ব্বভাবোত্তমোত্তমং। তৎপশ্চাদতিসৌন্দর্য্যং দিব্যভাবং মহাফলম্।"

বাস্তবিক ভারতীয় সাধনার বিশেষত্ব এই যে, ভারতীয় সাধক এই বিষয়-জগতের সম্পূর্ণ ব্যবহার করিয়া ইহাকে সে দূরে পরিত্যাগ করিতে চাহে। সংযম-মূলক ভোগাবসানে ইন্দ্রিয়জগৎ ত্যাগ করিয়া অতীন্দ্রিয় সত্তার সমাধিতে নিমগ্ন হইতে চাহে। এই অতীন্দ্রিয় সত্তার সমাধি অর্থে পরিপূর্ণ অদ্বৈত-জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা বুঝিতে হইবে। সে অবস্থায় ঈশ্বর জীবে, ধ্যাতা ও ধ্যেয় বস্তুতে আর সীমারেখা থাকে না—সব এক হইয়া যায়। বিধি-নিষেধাত্মক বিষয়-জগৎই এই পশুভাবের ক্ষেত্র। এই বিধি-নিষেধাত্মক পশুভাব বর্জ্জন করিয়া অগ্রসরকামী যোগ্য সাধককে অতীন্দ্রিয় সাধনার ক্ষেত্রে সমাসীন হইতে হয়। বীরভাবেই এই অতীন্দ্রিয় অদ্বৈত-জ্ঞানের আরম্ভ বা 'প্রবর্ত্তদশা'। পরিপক্ব সাধন-দশাতেই অতি সুন্দর মহাফল দিব্যভাব বা কৌলাচার।

এইবার বীরভাব সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। অবশ্য এই বীরভাবে একটা বিদ্রোহের ভাব রহিয়াছে—যাহা বাহ্যদৃষ্টিতে সমাজবুদ্ধির প্রতিকূল ও পরিপন্থী বলিয়া মনে হইবে। মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন—ইহা লইয়াই বীরাচারীর সাধন। ভীষণ কথা! কিন্তু স্থিরবুদ্ধি হইয়া এ সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখিলে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। ইহা শরীরপালন বিদ্যা (Hygiene) এবং পরমার্থ-তত্ত্ববিদ্যার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। তন্ত্র বলিয়াছেন—ইহা অতি কঠিন দুশ্চর ব্রত। পরমানন্দতন্ত্র বলিয়াছেন—"অয়ন্তু পরমঃ কৌলমার্গঃ সম্যঙ্ মহেশ্বরি। অসিধারাব্রতসমো মনোনিগ্রহহেতুকঃ॥" ইত্যাদি। এই দুশ্চর ব্রতের অধিকারী কে? ত্রিপুরার্ণবতন্ত্র বলিয়াছেন—"অয়ং সর্ব্বোত্তমো ধর্ম্মঃ শিবোক্তঃ সুখসিদ্ধিদঃ। জিতেন্দ্রিয়স্য সুলভো নান্যস্যানন্তজন্মভিঃ॥" জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই এই মার্গের অধিকারী। বাহ্যেন্দ্রিয় সংযত করিয়া এই মার্গে প্রবেশ করিতে হয়।

বীরভাব সাধনায় মদ্য-সাধন সম্বন্ধে কিছু বলিবার আগে 'বীর' কে, তাহা জানা প্রয়োজন। তন্ত্র বলিয়াছেন, "অহনি প্রলয়ং কুর্ব্বন্ ইদমঃ প্রতিযোগিনঃ। স বীর ইতি বিজ্ঞেয়ঃ স্বাত্মানন্দনিমগ্নধীঃ।" যিনি প্রতিযোগী, ইদংপদার্থকে অর্থাৎ বিষয় জগৎকে অহংপদার্থে লীন করিতে পারেন, তিনিই বীর। সমগ্র বিষয়-জগৎ অহংপদার্থে লীন হইলে দ্বৈতজ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়। তখন কেবল অহং জাগিয়া থাকে, আর এই অহংই ব্রহ্ম; শাস্ত্রের ভাষায় "অহং ব্রহ্মাঽস্মি" ইহাই অদ্বৈতজ্ঞান। যাঁহার এই অদ্বৈতজ্ঞান জন্মিয়াছে, অথচ এ জ্ঞান সুদৃঢ় হয় নাই, এমন ব্যক্তিকেই বীর বলিয়া বুঝিতে হইবে। শাক্তানন্দতরঙ্গিণী বলিয়াছেন—"বীরস্তু তত্ত্বজ্ঞানী স ন বাহ্যান্তরক্রিয়াবান্ ঊর্দ্ধ্বমানসত্বাৎ সর্ব্বং গ্রাহ্যং।" বীরাচারীর জন্মে শুদ্ধ-সত্ত্ব-ভাব একটা higher mental status—ইহাই তন্ত্রোক্ত 'ঊর্দ্ধমানসত্ব'। এই 'ঊর্দ্ধমানসত্বে'র সাহায্যে বীরাচারী প্রকৃত বীরের ন্যায় অসম্ভব সম্ভব করেন, মদ্যাদি-সাধনারূপ অসিধারাব্রতের উদ্‌যাপন করিয়া থাকেন।

উপরে যাহা বলিলাম, তাহার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, উন্নত মন লইয়া এই সাধনায় রত হইতে হয়। আগে এই উন্নত মনের 'ঊর্দ্ধমানসত্বের' আবাদ করিতে হয়। এই ভাবে দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, মদ্যসাধন নীতিবিরুদ্ধ ব্যাপার নয়। আর বাস্তবিক তত্ত্বের কথা ছাড়িয়া দিয়া বস্তু হিসাবে দেখিলেও মদ্য খারাপ বস্তু নহে। আয়ুর্ব্বেদ পুনঃ পুনঃ ইহার স্বাস্থ্যগত উপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন: যথা—"মাংসং বাতহরং সর্ব্বং বৃংহণং বলপুষ্টিকৃৎ। প্রীণনং গুরু হৃদ্যঞ্চ মধুরং রসপাকয়োঃ।" এত বড় পুষ্টিবিধায়ক খাদ্যকে আমরা অযথা ব্যবহার করিয়া দুঃখভোগ করি। প্রকৃত ভাবে ব্যবহার করিতে পারিলে ইহা দ্বারা শারীরিক পুষ্টিবিধানই হইয়া থাকে—আমাদের physiological gain হয়। আমাদের দেশে এবং সর্ব্ব দেশে সুরা ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; বীরাচারী তান্ত্রিক সুরার প্রকৃত মর্ম্ম অবগত ছিলেন। মানবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি-রহস্য তান্ত্রিক বুঝিয়াছিলেন। তাই তিনি প্রবৃত্তির পথ ধরিয়া এক অভিনব কলা-কৌশল আশ্রয় করিয়া মানবকে নিবৃত্তির পথে দাঁড় করাইবার বিচিত্র ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অন্যান্য ধর্ম্ম-বিধান মানুষকে শিক্ষা দেয়—জোর করিয়া প্রথম হইতেই তাহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলিকে নষ্ট করিতে। ইহা প্রকৃত মনোবিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা নহে। মনোবিজ্ঞান-দক্ষ তন্ত্রের ব্যবস্থা তাই অন্যরূপ। বীরাচারীর ব্যবস্থায় কি অপরূপ কৌশলে প্রবৃত্তি নিবৃত্তিতে পরিণত হয়! ভোগ যোগে রূপান্তরিত হয়। তাই সুরা লইয়া আরম্ভ। এ সম্বন্ধে বহুবিধ নিয়ম

আছে। অতি সামান্য মাত্রায় ইহা গ্রহণ করিতে হয়। আবার কোন কোন তন্ত্র বলিয়াছেন, মন যাবৎ অস্থির না হয়, তাবৎ কাল পর্য্যন্ত। এইরূপ পরিমিত পানে "মনো নিশ্চলতাং যাতি চিত্তঞ্চাপি প্রসন্নতাম্।" তাহার পর "ততো ধ্যায়েৎ পরং জ্যোতিরাত্ম-জ্যোতিঃ সনাতনম্।" ধ্যানের জন্য, বিক্ষিপ্ত চিত্ত স্থির করিবার জন্যই সাধক সমাধির অনুকূল এই বাহ্য দ্রব্যের সাহায্য সাধনের "প্রবর্ত্তদশায়" লইয়া থাকেন। পরে দিব্যভাবে আর কোনরূপ বাহ্যবস্তুর সাহায্য লইতে হয় না। বীরাচারীর অদ্বৈতজ্ঞান সুস্থির থাকে না। যে অবস্থায় অদ্বৈতজ্ঞান কিছু ভাসা-ভাসা ভাবে থাকে, সেরূপ মানসিক অবস্থার নামই বীরভাব। এই ভাসা-ভাসা ভাব দূর করিবার জন্যই দ্বৈতবুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করিয়া অদ্বৈতজ্ঞান সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই বীরাচারী সাধক বাহ্যবস্তুর সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। তন্ত্র বলিয়াছেন—"মন্ত্রজ্ঞানস্ফুরণায় ব্রহ্মজ্ঞানস্থিরায় চ। অলিপানং প্রকর্ত্তব্যং, লোলুপো নরকং ব্রজেৎ।" কারণ, বীরাচার হইতেছে অদ্বৈতজ্ঞান-সাধনের প্রবর্ত্তদশা মাত্র। দিব্যভাবে "সিদ্ধদশায়" ইহার পূর্ণ পরিণতি, ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে। তন্ত্র মদ্যকে সংস্কৃত বা শোধিত করিতে বলিয়াছেন। তাহার অনেক নিয়মানুষ্ঠান আছে। সে সব আলোচনার স্থান ইহা নহে। তবে মোটের উপর আমাদিগকে জানিতে হইবে, সুরাসংস্কার অর্থে ইহাই বুঝায় যে, একটা 'উর্দ্ধমানসত্ব' লইয়া, সত্ত্বভাব-পরিমার্জ্জিত বুদ্ধি লইয়া সুরাপান করিতে হয়। আমাদিগকে শ্রুতিবচন স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আনন্দই ব্রহ্ম। এই আনন্দ-ব্রহ্মকে realise করাই কৌল-সাধনা। এই আনন্দ-ব্রহ্ম একটা abstract idea —চিন্ময় তত্ত্ববস্তু। এরূপ abstract বস্তুকে concretise করিতে না পারিলে উপাসনা অসম্ভব হইয়া উঠে, অতীন্দ্রিয় বস্তুকে ঐন্দ্রিয়িক বস্তুর সংযোগাশ্রয় ব্যতিরেকে realise করা দুষ্কর হয়। তাই হিন্দুর সাধনা একটা জড়বস্তুর আশ্রয়ে করিতে হয়। ইহারই নাম প্রতীক-উপাসনা। জড়বস্তুর সাহায্যে একটা তত্ত্ববস্তুকে বুঝিতে যাওয়ার নামই প্রতীক-উপাসনা। হিন্দুর সর্ববিধ সাধনার মূলে এই তত্ত্ব নিহিত আছে। মদ্যাদি সেই আনন্দ-ব্রহ্মেরই যেন স্বরূপ, অভিব্যঞ্জনা মাত্র। সাধক মদ্যপানের মধ্য দিয়া পানকালে সেই অখণ্ডানন্দের পূর্ণ স্ফূর্ত্তি অনুভব করেন। কারণ, তন্ত্রও বলিয়াছেন—"আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ দেহে ব্যবস্থিতং। তস্যাভিব্যঞ্জকাঃ পঞ্চমকারাঃ।" ইত্যাদি। সাধারণ পাঠকের অবগতির জন্য একটি মন্ত্র উদ্ধৃত করিতেছি। পানকালে এই ভাব স্মরণ করিতে হয়, যথা "আর্দ্রং জ্বলতি জ্যোতিরহমস্মি জ্যোতির্জ্বলতি ব্রহ্মাহমস্মি যোঽহমস্মি অহমেবাহং মাং জুহোমি স্বাহা"—আমি জ্যোতিঃস্বরূপ, ব্রহ্মস্বরূপ। এই ভাবে পান করিলে তন্ত্রোক্ত 'উর্দ্ধমানসত্বে'র' জন্ম হয়, এই ভাবে 'উর্দ্ধমানসত্ব' লইয়া পান করিলে তাহা প্রকৃত পান—হোমবুদ্ধিতে পান। অন্য ভাবে পানের নাম পশুপান। পাঠক স্মরণ রাখিবেন, এই সব ক্রিয়া অনেকটা অনুভবসিদ্ধ, তর্কসিদ্ধ নহে।

মাংস-সাধনা সম্বন্ধে কিছু বলিবার আগে মদ্যপান সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত কুৎসিত ধারণা সাধারণের মধ্যে আছে—তাহার সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। সেটি হইতেছে সপ্তবিধ উল্লাসের কথা। আরম্ভ, তরুণ, যৌবন, প্রৌঢ়, তদন্ত, উন্মন ও অনবস্থ—এই সপ্তবিধ উল্লাস। সাধারণের ধারণা—অত্যধিক মদ্যপানে এই সপ্তবিধ বিকৃত অবস্থা ঘটে। অত্যধিক মদ্যপানে ভূমিতে গড়াগড়ি দেওয়ার নামই বুঝি অনবস্থ উল্লাস। ইহা অতি ভ্রমাত্মক ধারণা। ইহা সাত প্রকার মানসিক অবস্থা—সমাধির পূর্ব্বে সাত প্রকার স্তরভেদ। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে এই অবস্থাসমূহকে সপ্তজ্ঞানভূমিকা বলা হইয়াছে। যথা—শুভেচ্ছা, বিচারণা, তনুমানসা সত্ত্বাপত্তি, অসংসক্তি, পদার্থাভাবিনী ও তুর্য্যগা। এক এক অবস্থায় এক এক রূপ পাত্র। মন্ত্র-সিদ্ধি হইলে অধিক পানও সম্ভব।

সাধক যে অবস্থায় পানে সবেমাত্র দীক্ষিত হয়, তাহারই নাম আরম্ভোল্লাস। ঈষৎ জ্ঞানের উদয় হইলে তরুণোল্লাস। যে অবস্থায় ব্রহ্মে লীন মনকে যত্ন করিয়া সঞ্চালিত করিতে হয়, তাহার নাম উন্মনোল্লাস। আর যে অবস্থায় মনকে কোনরূপে চালিত করা যায় না, তাহারই নাম অনবস্থোল্লাস। ইহাই সমাধি।

এইবার আমরা দ্বিতীয় মকার মাংস ও তৃতীয় মকার মৎস্য-সাধন সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। পৃথিবীর সর্ব্বত্র মাংস ও মৎস্য উত্তম খাদ্য বলিয়া স্বীকৃত ও গৃহীত হইয়া আসিতেছে। তন্ত্রও এই মৎস্য ও মাংস পরিত্যাগ করিতে বলেন নাই। তবে তন্ত্র এই সুন্দর পুষ্টিবিধায়ক বস্তুকে প্রত্যক্ষ ভাবে আহার্য্যরূপে গ্রহণ করিতে চাহেন নাই। প্রকারান্তরে, এই দুই সাধনে সাধকের শারীরিক-শক্তি বিকশিত হয়। প্রত্যক্ষ ভাবে সাধনার দিক্ হইতেই ইহা গ্রহণ করিতে হয়। যে ভাব ও যে মনোবৃত্তি লইয়া মদ্যপান করিতে হয়, ইহাও সেই ভাবে সেই উদ্দেশ্যহেতু সাধন করিতে হয়। কারণ, পঞ্চ-মকার সাধনের উদ্দেশ্য একই সেই "ব্রহ্মজ্ঞানস্থিরায় চ—" ইত্যাদি। মৎস্য সম্বন্ধে তন্ত্র বহুপ্রকার মৎস্যের আলোচনা করিয়াছেন। এমন কি, রন্ধনের প্রণালী সম্বন্ধেও উপদেশ করিয়াছেন। সে সব আলোচনার স্থান এই প্রবন্ধে নহে। তন্ত্রে পাঠক তাহা দেখিয়া লইবেন। চতুর্থ মকার মুদ্রাও বলকারক খাদ্য-বিশেষ। সাধারণ ভাষায় যাহাকে "চাট" বলে, তাহারই নাম মুদ্রা। পরিমিত মদ্যের সাহায্যে পরিমিত পরিমাণ মৎস্য, মাংস ও মুদ্রা গ্রহণ করিলে অন্নময়-দেহের পরিপুষ্টি হয় এবং তন্ত্রের দিক্ হইতে গ্রহণ করিলে পারমার্থিক কল্যাণ সাধিত হয়। ইহা আমরা মদ্যসাধনের কালে বলিয়াছি। এই ক্ষেত্রে যুক্তির অবতারণা করিতে যাওয়া পুনরুল্লেখ মাত্র। মদ্য ও মৈথুন সম্বন্ধে সাধারণের সন্দেহ করিবার কারণ থাকায় এই দুইটি আলোচনার যোগ্য। তবে মাংস ও মৎস্য সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে যে আপত্তি হইয়া থাকে, সেই সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিয়া আমরা মৈথুন সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করিব।

অনেকের ধারণা—মাংস-সাধনের ব্যবস্থায় তন্ত্র হিংসাবৃত্তি জাগরণের প্রশ্রয় দেন। ইহা ভ্রমাত্মক ধারণা। সাধনার ক্ষেত্র ব্যতীত পশুবধ নিষেধ। তন্ত্র অন্যত্র পশুবধের পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছেন। সাধনার ক্ষেত্রে এইরূপ পশুবধ-ব্যবস্থা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। তন্ত্র বলিতেছেন,—যিনি পূর্ব্বে অহিংসার যাজন করিয়াছেন, তিনিই পশুহননে অধিকারী। পশুভাবে যিনি বৈষ্ণবাচার যাজনপূর্ব্বক কায়, মন ও বাক্যে অহিংসা সাধন করিয়াছেন, তিনিই বীরাচারে কেবল সাধনার ক্ষেত্রে পশুবধের অধিকারী। তিনি শাক্তানন্দতরঙ্গিণী-কথিত এক 'উর্দ্ধমানসত্বে'র মধ্য দিয়া, এক অপূর্ব্ব প্রেম-পরিমার্জ্জিত মন-বুদ্ধি লইয়া, সত্ত্বময় নিষ্কাম ভাব লইয়া বাহ্যতঃ

বধের অভিনয় করেন মাত্র, ছল করেন মাত্র, বস্তুতঃ, ইহা বধ নহে—একটা মস্ত বড় তত্ত্বের সাধন মাত্র। ইহাতে তাঁহার চিত্তের অশুদ্ধি জন্মে না, পারমার্থিক কল্যাণই হইয়া থাকে। বঙ্কিম বাবুর "দেবীচৌধুরাণী"র শিক্ষাপ্রণালী স্মরণ করিলে আমাদের বক্তব্য বুঝিতে পারিবেন। এই তত্ত্ব-বস্তু বাদ দিয়া বহির্মুখী হইয়া উদরতৃপ্তির জন্য পশুবধ করিলে তাহাই বধ বা হিংসার অনুশীলন বলিয়া বুঝিতে হইবে। তত্ত্বতঃ এই জগতে কে কাহাকে বধ করে, কে কাহাকে হনন করে। তত্ত্বতঃ এই বধ বা হনন সম্পূর্ণ মিথ্যা। সবই তো আত্মার বিকাশ। অতএব চাই একটা দিব্য-দৃষ্টি একটা view point অদ্বৈতজ্ঞান-ভূমি হইতে দেখিলে বধ প্রকৃত বধ নহে—বাহ্য বধ বা বধের অভিনয় মাত্র। এমন কি, বৈষ্ণব-পুরাণ শ্রীমদ্ ভাগবত পর্য্যন্ত এইরূপ বধ, বধ বলিয়া স্বীকার করেন নাই, যথা—

"যদ্ ঘ্রাণভক্ষো বিহিতঃ সুরায়া-
স্তথা পশোরালভনং ন হিংসা।
এবং ব্যবায়ঃ প্রজয়া ন রত্যৈ
ইমং বিশুদ্ধং ন বিদুঃ স্বধর্ম্মম্।"

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীধরস্বামী স্বীকার করিয়াছেন—"যদ্ যস্মাৎ সুরায়াঃ ঘ্রাণভক্ষঃ অবঘ্রাণং স এব বিহিতো, ন পানম্। তথা পশোরপি আলভনমেব বিহিতং ন তু হিংসা" ইত্যাদি।

এইবার আমরা পঞ্চম তত্ত্ব বা মৈথুন সম্বন্ধে যৎসামান্য আলোচনা করিব। যৎসামান্য কেন না, ইহা অতি গূঢ় ব্যাপার, গোপন বস্তু। তন্ত্র ইহা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এই তত্ত্বের সাধনেই দেশে ব্যভিচার ঘটে। সহজিয়া বৈষ্ণবদের কিশোরীভজনও এইরূপ ভয়াবহ সাধন। রমণী লইয়া তান্ত্রিক ও বৈষ্ণবের ভজনের উদ্দেশ্য এক না হইলেও সাধনপ্রণালী অনেকটা একরূপ বলিয়া বোধ হয়। কবি চণ্ডীদাস বলিয়াছেন, মাকড়সার জালে যিনি হাতী বাঁধিতে পারেন, সাপের মুখে যিনি ভেক নাচাইতে জানেন, তিনিই কিশোরী-ভজনের অধিকারী। তান্ত্রিকের পক্ষেও একই কথা। মৈথুন তিন প্রকার, তন্মধ্যে প্রথম দূতীযাগ। ইহা পরকীয়া রমণী লইয়া সাধিতে হয়। ইহার অধিকারী-বিচারে পরমানন্দতন্ত্র বলিয়াছেন—"অদ্বৈতজ্ঞাননিষ্ঠো যো যোঽসৌ সংসারপারগঃ। স এব যজনে দূত্যা অধিকারী তু নাপরঃ॥" কলিকালে পরকীয়া রমণী লইয়া এই দূতীযাগ সাধন তন্ত্রে নিষিদ্ধই হইয়াছে। স্বকীয়া লইয়াই এ কালে পঞ্চমতত্ত্বের সাধন করিতে হয়। যিনি অদ্বৈতজ্ঞাননিষ্ঠ, সর্ব্বপ্রকারে জিতেন্দ্রিয়, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞান সুস্থির করিবার জন্য এই মৈথুন-সাধন করিয়া থাকেন।

কিরূপে ইহা সম্ভব? অতি সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিব। এই ভাবের যাজন করিতে হইলে হৃদয়ে সর্ব্বদাই মাতৃভাবের স্ফুরণ করিতে হয়। এই মাতৃভাবের বিকাশে কামের প্রভাব নষ্ট হয়। সকল তরুণী রমণীকে জগদম্বার অংশ বলিয়া ভাবনা করিতে হয়। তাহা হইলে রমণীর রমণীভাব নষ্ট হয়, রমণী জননীতে পরিণত হয়। পরে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বাহ্যেন্দ্রিয় সংযত করিতে হয়। মাতৃভাবে পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ হৃদয়-মন লইয়া অদ্বৈতজ্ঞাননিষ্ঠ ব্রহ্মচারী সাধক মৈথুনতত্ত্বের যাজন করিয়া থাকেন। পূর্ব্ব হইতে well equipped না হইয়া এ ক্ষেত্রে নামিলে সাধন ব্যর্থ হয়।

এই যে মৈথুনতত্ত্ব—ইহাও একটা মস্ত প্রতীক উপাসনার রূপ। সাধক যে রমণীকে লইয়া সাধন আরম্ভ করিতে চান, সেই রমণী গৌরী বা শক্তির স্বরূপ বা প্রতীক এবং সাধক শিবের প্রতীক বা শক্তিমান্। এই শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদ বস্তু, যথা—"শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ" অগ্নি যেমন দাহিকা শক্তি হইতে অভিন্ন, সেইরূপ শক্তি ও শক্তিমানেও ভেদ নাই। এই শক্তি ও শক্তিমানে অভেদজ্ঞান জন্মিলে সোঽহং তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হয়—জীব ও শিব এক হইয়া যায়, সাধক মুক্ত হইয়া তাঁহার original ব্রহ্মস্বভাব প্রাপ্ত হয়েন। পুংদেহ হয় শক্তিমানের স্বরূপ এবং স্ত্রীদেহ শক্তির স্বরূপ; সুতরাং এই উভয়ের মিলনে এই অদ্বয়ভাব—এই অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞান সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, সমাধির অনুকূল ভাব সৃষ্ট হয়—যাহা পূর্ব্বে একটা abstract ভাবমাত্র ছিল, তাহাই নর-নারীর মিলনের মধ্য দিয়া দৃঢ়ীভূত হয়, impressive হইয়া চিত্রপটে অঙ্কিত (stamped) হইয়া যায়। নরনারীর মৈথুনকালে উভয়েরই বিক্ষিপ্ত চিত্তবৃত্তিসমূহ কেন্দ্রীভূত হয়—চিত্তের অপরাপর বৃত্তির যেন বতকটা নিরোধ হইয়া যায় এবং একমুখী হয়। সেই সৃষ্টির পরমক্ষণে চিত্তের কেন্দ্রীভূত অবস্থায় মনে যে ভাবের ছাপ পড়ে, তাহা যেন উহাতে লাগিয়া যায়; সুতরাং অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞান অনেকটা স্থির হইয়া যায়। ইহাই মৈথুনতত্ত্বের পরম পারমার্থিক লাভ। অপর লাভও আছে। এই সাধনের জন্য অনেক প্রকার প্রক্রিয়া আছে। এইগুলির উদ্দেশ্য এক ভাগবত-দেহের সৃষ্টি। সাধক ও সাধিকার জড়দেহকে জড়ভাব হইতে মুক্ত করিয়া উহাতে দেবভাবের প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। তবেই তাহা সাধনদেহ বা ভাগবত-দেহ হয়। অতি সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে দুই-এক কথা বলিতেছি। সকল পূজার ন্যায় অঙ্গন্যাসাদি করিয়া অদ্বৈতজ্ঞানসম্পন্না সাত্ত্বিকী ভক্তিসংযুক্তা নারীর কুলাঙ্গে মাতৃকান্যাসাদি সম্পাদন করতঃ শ্রেষ্ঠ অঙ্গে পরমেশ্বরীর পূজা করিতে হয়। শক্তির সমগ্র অঙ্গে অপরাপর দেবতার পূজা করিতে হয়। এই ভাবে সমগ্র দেহকে ভাগবতদেহে পরিণত করিতে হয়। সাধকের দেহকেও শিবরূপে পূজা করিতে হয়। উভয় দেহে এই ভাবে চিন্ময়ভাবের প্রাদুর্ভাব হইলে মৈথুনারম্ভ। মৈথুনকালেও বহু জপ করিতে হয়—"প্রজপেৎ ক্ষোভরহিত-শ্চাষ্টোত্তরসহস্রকম্" এই ভাবে অষ্টোত্তরসহস্র জপ করিলে মনের ঊর্দ্ধগতি জন্মে—ইন্দ্রিয়ক্ষোভ নষ্ট হইয়া যায়। মন ঊর্দ্ধগতিসম্পন্ন হইলে এক উন্নত statusএ পৌঁছিলে, আমরা যাহাকে মৈথুন বলি, সে মৈথুন আর থাকে না, ইহার রূপ বদলাইয়া যায়,—স্বভাব বদলাইয়া যায়। সুতরাং ইহা মৈথুনের অভিনয় হয় মাত্র। তন্ত্র বলিয়াছেন, সঙ্গমান্তে আমিই ব্রহ্ম বা শিবস্বরূপ, এইরূপ ভাবিতে হয়—'সঙ্গমান্তে শিবোঽহং ইতি ভাবয়ন্ উভয়োঃ সঙ্গমং কৃত্বা পূর্ব্ব-বর্জ্জপাদিকং কুর্য্যাৎ'—ইহাই অদ্বৈততত্ত্বের প্রতিষ্ঠা।

তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, এই বাহ্য মৈথুনের মধ্য দিয়া এক বিরাট্ তত্ত্বের সাধনা—কাম এই ভাবে অকাম অবস্থায় পৌঁছিয়া যায়। কিশোরী-ভজন বুঝাইবার কালে কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন, "কামের অকাম নিত্যস্বরূপ আশ্রয়। তবে সেই নিত্যবস্তু কামেতে উদয়॥" কামেরও একটা অকাম নিত্যস্বরূপ আছে। সাধনা দ্বারা কাম এই স্বভাব প্রাপ্ত হয়। তবে তজ্জন্য সাধকগণ অন্যান্য যৌগিক উপায়ও গ্রহণ করিয়া থাকেন। এখানে সামান্য

একটু আভাস দিই। আমাদের জানা উচিত যে, পুরুষের শুক্রসমূহ ইড়া নাড়ীর অন্তর্গত জ্ঞানাত্মক স্নায়ুসমূহ কর্ত্তৃক উর্দ্ধে বাহিত হইয়া মস্তিষ্কে নীত হয়। পিঙ্গলা নাড়ীর অন্তর্গত কর্ম্মাত্মক স্নায়ুসকল মস্তিষ্ক-সঞ্চিত শুক্রকণাকে অধোগামী করিয়া সুষুম্না-মুখে সঞ্চিত করে। পরে তত্রত্য কামবায়ুর প্রতিকূলতায় উহা মূত্রনালীপথে বহির্গত হইয়া যায়। ইড়া নাড়ীতে শ্বাসবহমানকালে প্রাণায়ামাদি যৌগিক-প্রক্রিয়া অবলম্বন দ্বারা সাধক সুষুম্নামুখ-সঞ্চিত শুক্ররাশিকে উর্দ্ধগ করিয়া মস্তিষ্কে নীত করিতে পারেন। সেখানে উহা 'অটল' এবং সাধন-পক্ক হয়। পরে সাধক সেই অটল শুক্ররাশিকে অধোগামী করিতে পারেন। শুক্রোপরি সাধকের কর্ত্তৃত্ব স্থাপিত হয়—সাধক কামজয় করিতে পারেন। সাধনার এই অবস্থাগুলিকে কারুণ্যামৃত, তারুণ্যামৃত ও লাবণ্যামৃত-স্নান বলে। এই সকল অতি গূঢ় বিষয়—তন্ত্রে এ-সব প্রকাশে নিষেধ আছে।

মোট কথা, এই সব প্রক্রিয়ায় মৈথুনতত্ত্ব সাধিত হইলে নরনারী রিপুর উত্তেজনা হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে। তন্ত্রসাধনে এই সকল কল্যাণের বিষয় আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি, ইহা কত বড় বৈজ্ঞানিক-সাধন এবং তন্ত্রশাস্ত্র কিরূপ বিজ্ঞানের উপর স্থাপিত। তন্ত্র ইহাই ঘোষণা করেন যে, সংসারে কাম-রিপুর আকর্ষণ ভীষণ,—রমণীর নিকট হইতে ভীরুর মত দূরে পলাইয়াও ইহার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না; বরং রমণী-দেহকে স্বীকার করিয়াই ইহার প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়া যায়। রমণী ও পুরুষের মধ্যে যে বিভিন্নধর্ম্মী বিদ্যুৎ-প্রবাহ প্রবাহিত থাকে—যৎকর্ত্তৃক যৌন-চৈতন্য অতিমাত্রায় সজাগ রহে,—তাহা পরস্পরের সান্নিধ্য দ্বারা অনেকখানি ব্যর্থ হয়। বৈজ্ঞানিকগণ এ কথা একটু ভাবিয়া দেখিবেন।

তন্ত্র জানেন, মানুষ স্বভাবতঃ প্রবৃত্তি-সম্পন্ন জীব। ত্যাগের দ্বারা এই প্রবৃত্তির উচ্ছেদ সুকঠিন। তন্ত্রে তাই প্রবৃত্তি লইয়াই আরম্ভ। প্রক্রিয়া-বলে প্রবৃত্তিকে ভোগের মধ্য দিয়া নিবৃত্তি অবস্থায় আনা যায়—তমকে শুদ্ধ সত্ত্বে পরিণত করা যায়। বীরাচারীর ইহাই পরম সাধনা ও চরম বিজয়। তাই তন্ত্র বলিয়াছেন, এই সাধনায় "ভোগো যোগায়তে সাক্ষাৎ দুষ্কৃতিঃ সুকৃতায়তে। মোক্ষায়তে তথা হিংসা কুলধর্ম্মে মহেশ্বরি।"

বাস্তবিক বীরভাব হইতেছে দিব্যভাবের অনেকটা যেন experimental অবস্থা। আমরা দেখাইলাম, বাহ্যবস্তুর সহায়তায় এই ভাবকে realise করিতে হয়। চিত্তে অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞান অনেকটা স্থির হইলে মদ্যাদি বাহ্যবস্তুর আর আবশ্যক হয় না। তখন চিত্তে আপনা হইতেই ভাবস্ফূর্ত্তি ঘটে। মনের এই অবস্থার নাম দিব্যভাব। শাক্তানন্দতরঙ্গিণী বলিয়াছেন—"দিব্যস্তু তত্ত্বজ্ঞানী সন্মানসক্রিয়াবান্" ইত্যাদি। দিব্যভাবে সাধক কেবল মানসক্রিয়াবান্। এক্ষণে তিনি মনে মনে ভাবযাজন করেন। বাহ্যদ্রব্যের সহায়তা লয়েন না। ক্রমে তিনি সমাধিযোগ অবলম্বন করেন। সহস্রারপদ্মে চন্দ্রমণ্ডলক্ষরিত সুধাই তাঁহার মদ্য; যথা—"সোমধারা ক্ষরেদ্ যা তু ব্রহ্মরন্ধ্রাদ্ বরাননে। পীত্বানন্দময়স্তাং যঃ স এব মদ্যসাধকঃ।" এক্ষণে সাধক রসনার দ্বারা উচ্চারিত বাক্যকে ভক্ষণ করিতে অর্থাৎ বাক্‌সংযম করত মাংসসাধক হয়েন, ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীতে শ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ করিয়া মন নিশ্চল করত মৎস্য-সাধক এবং সহস্রদল কমলকর্ণিকাগত পরমাত্মার স্বরূপ অবগত হইয়া মুদ্রা-সাধক হইয়া থাকেন। সর্ব্বশেষে সাধক জীবাত্মাকে পরমাত্মায় লীন করিয়া মৈথুন-সাধক হয়েন। ইহা পূর্ণ যোগের অবস্থা। এই অবস্থায় সাধক সর্ব্বভূতে সমদর্শন হন, শত্রু ও মিত্রে, বিষ্ঠা ও চন্দনে সমদৃষ্টি হন। ইহারই শাস্ত্রীয় নাম জীবন্মুক্তি। এইরূপ সমাধিযুক্ত সাধক পরমহংস নামে খ্যাত হইয়া থাকেন।

অতি সংক্ষেপে আমরা তন্ত্রোক্ত ভাবত্রয়ের আলোচনা করিলাম। তন্ত্র আর্য্যপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ অবদান। তন্ত্র-জগৎ বিশাল—ইহা আমাদিগকে স্মৃতি, বিধি-ব্যবস্থা, আইন, চিকিৎসাপ্রণালী, ঐহিক ও পারমার্থিক বহুবিধ কল্যাণের উপায় নির্দ্দেশ দিয়াছেন। বৈষ্ণবের বাঁশী তরুণ বাঙ্গালীর চিত্ত মুগ্ধ করিয়াছে। উহা তাহার নবীন যাত্রাপথের মঙ্গলগীতি হউক, কম্পক্রান্ত তরুণ বাঙ্গালীর শ্রবণ-পথে বাঙ্গালী-কবির প্রেমের গান মধু-ধারা বর্ষণ করুক! কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, বাঙ্গালী আজ যে রুদ্রের সাধনায় সমাহিত, যে পিনাক-পাণির প্রলয় গর্জ্জনে সে মাতিয়া উঠিতে চায়, তন্ত্র-সাধনায় তাহার পাওনা হইবে এক দিকে ত্যাগ, সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি, ভাগবতশক্তি, অপর দিকে শ্রী, অমোঘ বীর্য্য এবং অমোঘ ভীতিশূন্যতা।

একটি মাত্র ধ্যানের কথা বলি—সেটি দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত ছিন্নমস্তা দেবীর ধ্যান। কি উৎকট সংহার-উন্মাদনার প্রেরণায় দেবী আপনার শির আপনি ছেদন করিয়া স্বীয় রক্ত-পানানন্দে বিভোর! নিজের মস্তক কাটিয়া গিয়াছে, আবার সেই নির্ম্মস্তক বিগ্রহের রক্তপান! কি বিপরীত ভাবের পরিকল্পনা! কোমল-চিত্ত বাঙ্গালী সাধক এই মূর্ত্তির ধ্যান করুন।

শ্রীনিত্যধন ভট্টাচার্য্য।

বাউল

নীল আকাশের স্বপন-বুকে পাখীর পাখায় পাল তুলে
একতারাটি বাজাও বাউল কোন্ কূলে?

ভোরের আলোর ঝরণা-ধারা, আন্‌লো বয়ে কোন্ বাণী?
নাম-হারা সেই সব-হারানো অবুঝ তোমার গানখানি।
ডুবিয়ে দিল আলোর বানে—ডুবিয়ে দিল কূল-হারা—
এই ধরণীর শ্যামল বুকে সুর-ধারা।
বনের ছায়ে ফাগুন-বায়ে গানখানি তার যায় লুটে;
অশোক-শাখায় রক্ত কলি রয় ফুটে।

হাওয়ার বুকে ঘুমিয়ে থাকা আন্‌মনা গো সেই সুরে
নদীর বাঁকে, বালুর চরে কাশের বনে, কোন্ দূরে
বাজাও বাউল পাগল তোমার একতারা!
ও পারের ঐ সুরের নেশায় এ-পারেতে রয় যারা
তোমার গানে তারাও যে হায় রয় ভুলে;
সব হারায়ে আঁধার মায়ার কোন কূলে?

শ্রীনকুলেশ্বর পাল (বি-এল্)।

জীবন রঙ্গ

[গল্প]

ভোরে ঘুম ভাঙ্গিলে কমলা মুখ-হাত ধুইয়া ঢাকা বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। বড় আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া স্বামী নীতীন দাড়ি কামাইতেছে।

বেশ একটু কঠিন স্বরেই কমলা বলিল—তোমার ঘুম ভাঙ্গলো, আমাকে যে বড় ডেকে দাওনি!

মুখ না ফিরাইয়াই নীতীন বলিল—তোমার নাক ডাকছিল··· বুঝলুম, আরামে ঘুমোচ্ছ!···তাই মায়া হলো!

ভ্রূকুটি করিয়া কমলা বলিল—সকালেই এমন মিথ্যা কথাটা না-ই বলতে!

—মিথ্যা কথা! কোন্‌টা মিথ্যা হলো? তোমার ঘুম?

কমলা বলিল—ঘুম নয়। নাক-ডাকা। তোমার মতো আমার বাঁশী-নাক নয় তো যে ডাকবে!

নীতীন বলিল—আমার নাক ডাকে, এ অপবাদ শুনি শুধু তোমার মুখে!···আমি নিজে তার বিন্দুবিসর্গ টের পেলুম না কখনো! আমার নাকে বেদনা হলে আমি জানতে পারি, আর সে-নাক ডাকলে আমি টের পাবো না, ভাবো?

কমলা বলিল—নাক যার ডাকে, সে টের পায় না!

হাসিয়া নীতীন বলিল—তাহলে স্বীকার করছো তোমার নাক যদি ডেকে থাকে, তাহলে তোমার তা টের পাবার কথা নয়!

অন্য সময় হইলে কমলা হয়তো খানিকটা তর্ক করিত, কিন্তু এখন তর্ক বা কথা-কাটাকাটি করিবার মতো মেজাজ তার নয়। সে বলিল,—আজ তাহলে তুমি বাড়ী যাবেই?

বাড়ী মানে, হালিসহরে নীতীনের পল্লী-গৃহ। দাড়ি কামানো শেষ হইয়াছিল, ব্লেড রাখিয়া নীতীন বলিল—দু' হপ্তা যাইনি! মা সেখানে একলাটি···

কমলা বলিল—এই তো পরশু তাঁর চিঠি পেয়েছো! লিখেছেন, ভালো আছেন!

নীতীন বলিল—তা আছেন। তবু মায়ের মন! তুমিও তো বোঝো তোমার নিজের ছেলেমেয়ে নিয়ে! তাছাড়া আমি ছেলে··· আমার কর্তব্য!

কমলা ভ্রূকুঞ্চিত করিল, বলিল—এখানকার এ-কাজও তোমার কর্তব্য ছিল। সংসারে বাস করতে হলে আত্মীয়-বন্ধুদের ছেঁটে ফেলা··· কর্তব্য নয়!···আমার বোন্‌পোর ভাত···আমার দিদির নেমন্তন্ন!··· তবে আমি কোন্ বাঁদীর বাঁদী···আমাকেই মানো না··· তা আমার দিদি!

কথাটা বলিয়া কমলা সেখান হইতে চলিয়া গেল।

চোখে খানিকটা কৌতুক, খানিকটা অস্বস্তি···নীতীন শুধু চাহিয়া দেখিল···মুখে কোনো কথা বলিল না।

স্নান করিয়া ঘরে আসিল। টেবিলের উপর টোষ্ট-রুটি, মাখন, ওমলেট্। পেয়ালায় চা কমলা ঢালিয়া দিল।

নীতীন বলিল—টুনু-বুলু ওঠেনি?

টুনু মেয়ে—বয়স দশ বছর; বুলু ছেলে—সাত বছরের।

কমলা বলিল—এত সকালে আর কবে ওরা ওঠে!

কমলার মুখ গম্ভীর।

নীতীন দেখিল, দুর্জ্জয় অভিমান! ছেলেমেয়ের দিক দিয়াও এ অভিমান টলিবার নয়! সে বলিল—তোমার চা?

কমলা বলিল—আমি এখন খাবো না।

নীতীন কথা বাড়াইল না···চায়ের পেয়ালা মুখে তুলিল।

কমলা বলিল—যাক্, আমার বোনের নেমন্তন্ন রক্ষা না করো, ক্ষতি নেই, তাতে তারা বুক ফেটে মরে যাবে না! কিন্তু আমায় যেতে হবে তো! তোমার বাঁদীগিরি করছি বলে নিজের বোন-বোনপোকে অগ্রাহ্য করতে পারি না। আর যেতে যখন হবে, তখন দিদি আর রায়-মশাই যে-কথা বলেছিলেন, তার একটা জবাব তাঁরা নিশ্চয় চাইবেন। তা কি বলবো তাঁদের?

রুটিতে মাখন মাখাইতে মাখাইতে নীতীন বলিল—কিসের কি বলবে?

কমলা বলিল—কিসের! তার মানে? বিস্ময়ে তার দুই চোখ একেবারে জ্বল্-জ্বল্ করিয়া উঠিল!

নীতীন বলিল—মনে নেই, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

মুখে নিরুপায় হতাশার ভাব···কমলা বলিল—ওঁদের বাড়ীর কাছে ভালো বাড়ী আছে, তুমিই দেখতে বলেছিলে! বলেছিলে, এ বাড়ীতে অসুবিধা হচ্ছে, বড় বাড়ীতে গেলে ভালো হয়! তাছাড়া আপনা-আপনি কাছাকাছি থাকা!···ভাড়া এখানে যা দিচ্ছ, তার চেয়ে ওখানে শুধু পনেরোটা টাকা বেশী!

নীতীন বলিল—মাসে পনেরো টাকা করে বাড়লে বছরে হবে বারো ইনটু পনেরো—যার নাম একশো আশী টাকা! প্রায় দু'শো টাকাই ধরো! না কমল, খরচ এমনিতেই চার দিকে বেড়ে চলেছে। কাজেই বাড়ী-ভাড়া-বাবদ আর এক পয়সা আমি বাড়াতে চাই না! বিশেষ এ বাজারে!

কমলার মন একেই অস্বস্তিতে ভরিয়া আছে! সে অস্বস্তির উপর আবার এই জবাব! যেন বারুদে আগুন পড়িল! কমলা বলিল,—এ বাড়ীতে অসুবিধার সীমা নেই, তাই আমার বলা! তোমার কি! বাড়ীতে কতক্ষণ থাকো! তোমার শোয়া-বসার তো অসুবিধা হয় না···ভাবো, এরাও এমনি দিব্যি আরামে আছে!···একটা লক্ষ্মীছাড়া বাড়ী! আশেপাশে মানুষের মতো এমন মানুষ নেই যে, দু'দণ্ড কথা কয়ে হাঁফ ফেলতে পারি!

নীতীন বলিল—কিছু মনে করো না কমল, তোমার হাঁফ ফেলবার সুবিধার জন্য অত টাকা দামের রেডিও-সেট কিনে দিলুম সে-দিন···কাজকর্ম চুকলে চুপচাপ বসে রেডিও শুনবে!

কমলা বলিল—রেডিও-সেট আমার সখে কেনোনি! যখন কোনো কথা বলবে, নিজের বুকে হাত দিয়ে বলো! তুমিই বলেছিলে, সব বাড়ীতে রেডিও আছে···এ-কালে ও-একটা ফ্যাশন···রেডিও না থাকলে পাঁচ জনে হাসবে! এই কথা বলে তুমিই ছুটেছিলে রেডিও কিনতে! আমার কথায় নয়!

নীতীন এ-কথার জবাব দিল না···নিঃশব্দে খাইতে লাগিল।

কমলা বলিল—বেশ, আমার দিদির বাড়ীর কাছে ও-বাড়ী নাই নিলে! বালিগঞ্জের দিকে নতুন বাড়ী ঢের পাওয়া যায়···ভালো ভালো বাড়ী···সেইখানেই না হয় চলো।

নীতীন বলিল—বাড়ীর জন্য যে-ভাড়া দিচ্ছি, তার উপর ভাড়া আমি আর এক পয়সা বাড়াতে পারবো না!···আচ্ছা, এ-কথা কেন বোঝো না কমল···খরচ বাড়িয়ে লাভ নেই? ছেলে-মেয়েকে মানুষ করা আছে! তার উপর মেয়ের বিয়ে দিতে হবে আর চার-পাঁচ বছর পরে! সে খরচ কি সহজ, ভাবো! বাজে-খরচ করতে তোমার বুক কাঁপে না?

কমলা কোনো জবাব দিল না। দু'চোখে আগুন জ্বালিয়া আকাশের পানে চাহিয়া রহিল।

নীতীনের খাওয়া শেষ হইল। ডাকিল—শম্ভু···

শম্ভু ভৃত্য। বাবুর ডাকে শম্ভু আসিয়া দেখা দিল।

নীতীন বলিল—ড্রাইভার গাড়ী বার করেছে?

শম্ভু বলিল—কৈ, না!

—বল্, বল্, তাড়া দে। সাড়ে সাতটায় আমার ট্রেণ। ওদিকে সাতটা বাজে।

শম্ভু গেল ড্রাইভারকে তাড়া দিতে; নীতীন ঢুকিল ঘরে সাজ-সজ্জা করিতে।

ছেলে-মেয়ের ঘুম ভাঙ্গিল। মেয়ে টুনু আসিয়া বলিল—হালিসহরে যাচ্ছো বাবা?

নীতীন বলিল—হ্যাঁ।

বুলু বলিল—বা রে, আমাদের নিয়ে যাবে না? বলেছিলে, এবার যখন ঠাকুমার কাছে যাবে, আমাদের নিয়ে যাবে!

নীতীন বলিল—আজ যে মাসিমার বাড়ী তোমাদের নেমন্তন্ন··· ছোট খোকার ভাত।

বুলু বলিল—না, আমি মাসিমার বাড়ী যাবো না। আমি ঠাকুমার কাছে যাবো।

ঝাঁজিয়া কমলা ধমক দিল, বলিল—তাই যা! মাসিমা 'বুলু' বলতে অজ্ঞান, মাসিমার কাছে যাবি কেন?···সে যে পরের জন্য ···আমার মা-বোনকে মানলে মহাপাতক হবে!

নীতীন ফিরিয়া তাকাইল কমলার পানে···বলিল—ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কি হচ্ছে ও!

মার ধমকে বুলু চুপ করিয়া গেল···কিন্তু মুখ হইল হাঁড়ির মতো!

টুনু বলিল,—আমার বেহালা কবে কিনে দেবে বাবা? আমি বুঝি বেহালা শিখবো না? মিহির বাবু সে-দিনও এসে বলে গিয়েছেন, এখনও বেহালা কেনোনি!

নীতীন বলিল—দেবো রে, এইবার কিনে দেবো। বড্ড খরচপত্র চলেছে···একটু সামলে উঠি···সামলে উঠলেই তোর বেহালা কিনে দেবো।

শম্ভু আসিয়া খবর দিল, ড্রাইভার গাড়ী বাহির করিয়াছে।

নীতীন গমনোদ্যত হইল···টুলু-বুলুর দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, —ঠাকুমাকে তোদের কিছু বলবার আছে?

টুনু বলিল—ঠাকুমাকে বলো আমায় চিঠি দিতে।

বুলু বলিল—ঠাকুমার কাছ থেকে আমার জন্য সেই সোনালী রঙের পুরু আমসত্ত চেয়ে এনো বাবা! বলো, বুলু চেয়েছে।

টুনু বলিল—আর আমার চাই সেই বড়ির গহনা···বেশ মুচ্‌মুচে খেতে!

নীতীন বলিল—বলবো।

নীতীন আসিল বারান্দায়। কমলা বলিল—একটা কথা ছিল। ভয় নেই, পেছু ডাকিনি।

—বলো···

কমলা বলিল—বোনপোর ভাত···শুধু হাতে তো যেতে পারি না। কিছু দিতে হয়···তোমার মান রাখতে। তাই মানে···দু'টো জিনিষ বাক্সে তোমায় দেখিয়েছিলুম। একটা ঐ মিনের কাজ-করা ঝুমঝুমি, আর একজোড়া সেই সোনার বালা। তার কোন্‌টা দেবো?

নীতীন বলিল—এর মানে? যা তুমি ভালো বুঝবে, দেবে। ও-সম্বন্ধে মতামত দিয়ে কখনো আমি অনধিকার-চর্চ্চা করেছি যে, আজ আমাকে জিজ্ঞাসা করছো!

কমলা বলিল,—না···মানে, বাজে খরচ নিয়ে অত কথা বললে কি না। সোনার বালাজোড়ার দাম পড়বে প্রায় বাহাত্তর টাকা··· আর ঝুমঝুমির দর বলেছে, কুড়ি টাকা।

নীতীন বলিল—পঞ্চাশ টাকার তফাৎ বলে' দুশ্চিন্তা হয়েছে···না?

নীতীনের চোখের দৃষ্টিতে একটু কৌতুকের হাসি! তার পর বলিল—বালাজোড়াই দিয়ো!

কমলা তাহাতে ভুলিল না। বলিল—বালার কথা মনেও আনতুম না···অত দাম! তবে এ-সব কাজে তোমার হাত দরাজ হয় দেখছি কি না। তবু অসৈরণ সইতে পারি না, তাই না বলেও থাকতে পারি না···এই যে একটু স্বচ্ছন্দ ভাবে বাস করবার মতো বাড়ী··সে-বাড়ীর ভাড়ার জন্য বছরে একশো-আশী টাকা দিতে তোমার গায়ে লাগে, অথচ সে-দিন তোমার মা ব্রত করলেন, তার জন্য দু-তিন শো টাকা খরচ করতে তো তোমার বাধেনি! বেশ হাসি-মুখে খুশী-মনে সে-টাকা খরচ করতে পেরেছিলে!

এ কথার পিছনে কী··বুঝিয়া নীতীনের মন কালো হইয়া উঠিল! সে ডাকিল—কমলা···

তখনি নিজেকে সংযত করিল। কহিয়া চলিয়া যাইতেছিল··· যাওয়া হইল না কমলার কথায়!

কমলা বলিল—এর মধ্যে আবার কমলা কি! আমি বললেই তুমি খরচের খোঁটা দাও কি না, তাই। কি বাজে খরচটা আমি করছি, জানতে চাই। এখন বেরুচ্ছো, এখন থাক্! ফিরে এসে আমার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ো, আমি তোমার পায়ের জুতো মাথায় বইবো!···তুমি বলবে, দাসী রেখেছো, চাকর রেখেছো, বামুন রেখেছো! সে আমার জন্য রাখোনি! রেখেছো তোমারি ইজ্জতের জন্য! নাহলে যে-দিন তোমাদের বাড়ী বৌ হয়ে এসেছি, তার দু'দিন পর থেকেই হেঁসেলে ঢুকেছি! বামুন-চাকর রাখার জন্য যদি মনে করে থাকো বাজে খরচ হচ্ছে, দাও তাদের ছাড়িয়ে··· হেঁসেলে ঢুকে হাতা-বেড়ী ধরতে আমি ভয় পাই না, ঘর ঝাঁট দেবার জন্য ঝাঁটা ধরতেও কোনো দিন মূর্চ্ছা যাবো না!

নীতীন ফিরিল। বলিল—আমার দুঃখ হয় এই জন্য যে, তুমি-আমি আলাদা নই, পর নই···আমার আয়-ব্যয়ের দিকে আমার যেমন লক্ষ্য থাকা উচিত, তোমার কেন হবে না! খরচপত্র করবার সময়

তোমাকে আমি ছেঁটে চলি না।···আচ্ছা, বেশ, বলো, কি করতে হবে? ন্যায্য কথা আমি চিরদিন শিরোধার্য্য করে চলি!

কমলা বলিয়া উঠিল—আমার এত বড় আস্পর্দ্ধা, আমি দেবো তোমায় উপদেশ! সে-উপদেশ মানলে বুঝতুম, আমাকে মানুষ বলে' মানো! খরচ বেশী হচ্ছে বলে এই যে মেজাজ খারাপ করো··· আচ্ছা, বলতে পারো···কেন, দেশে আর একটা সংসার রাখবার কি দরকার? মা বিধবা মানুষ···এখানে এসে একসঙ্গে থাকতে পারেন অনায়াসে! ছেলে-বৌ, নাতি-নাতনী···তা নয়···

নীতীন দাঁড়াইল না! এ কথা সে শুনিয়াছে অনেক বার···ভালো লাগে না! মা···তার মা···যে-মা এক দিন কি দুঃখ-কষ্ট সহিয়াই না তাকে মানুষ করিয়াছেন!

মা বলিলেন—বড্ড রোগা দেখছি কেন রে এবার! মুখখানা শুকনো···চোখের কোণে কালি! অসুখ-বিসুখ করেছিল?

নীতীন বলিল—না!

—খুব খাটুনি চলেছে বুঝি?

নিশ্বাস ফেলিয়া নীতীন বলিল—ব্যবসা মন্দা যাচ্ছে, মা। মাথার উপর ঝক্কি। সে জন্য সর্ব্বক্ষণ দুশ্চিন্তা।

মা বলিলেন—বড্ড খরচ করিস্ যে তোরা। এত আমি বলি, এখনো দু'-দু'টো চাকর, তার সঙ্গে একটা ঝী,···কেন? কি দরকার? ভগবানের আশীর্ব্বাদে ছেলেমেয়ে ডাগর হয়েছে···তাদের যে চাকর, সেটাকে না হয় ছাড়িয়ে দে। তার মাইনে, খাওয়া-পরার খরচ··· তাতে কম পয়সা বাঁচবে না তো!

নীতীনের মনেও এ চিন্তা হয়। ভাবে, লক্ষ্মণকে অনায়াসে ছাড়াইয়া দেওয়া চলে। কিন্তু···

মনে পড়িল, ছাড়াইবার কথা তুলিয়াছিল, কমলা তাহাতে জবাব দিয়াছিল, শম্ভু তোমার কাজ করে! যতক্ষণ তুমি বাড়ীতে থাকো, তোমার মুখে-মুখে থাকে! তার পর সে বিছানা করে, ঘর-দোর সাফ রাখে,···কাপড় কাচা, কাপড় কুঁচানো, ছোটখাট ফাই-ফরমাস খাটা, স্কুলে ছেলেমেয়েদের জল-খাবার লইয়া যায়! খানসামা চাকর··· পাঁচ জন ভদ্রলোক আসেন, তাঁদের সঙ্গে কথা-বার্ত্তা কওয়া···তাঁদের আদর-আপ্যায়ন···পুরানো লোক!···লক্ষ্মণ বাসন-কোসন মাজে, বাজার করে। তাকে দিয়া শম্ভুর কাজ চলে না, চলিতে পারে না!

নীতীন বলিল—না মা, কাজ ঢের বেড়ে গেছে। দু'জন চাকর না হলে চলে না।

—ঝী কি করে তবে?

—ঝী আছে···মানে, ওদের কাপড় কাচে। ওদের তেল-মাখানো, গা-হাত টেপা···তাছাড়া ঝী! এটা-সেটা করে··রান্নাঘরের কাজ··· ভাঁড়ার···

মা বলিলেন—বাড়ীর ভাড়া তো এখনো দিচ্ছিস্ সেই একশো টাকা করে?

—তা দিচ্ছি বৈ কি।

—ওর চেয়ে কম-ভাড়ার বাড়ী মেলে না? এই তো শুনতে পাই, কলকাতায় অনেক ফ্ল্যাট-বাড়ী হয়েছে, তার ভাড়া না কি অনেক কম!

নীতীন বলিল—ফ্ল্যাট-বাড়ীতে থাকা চলে না, মা। বাজারে মান-ইজ্জৎ আছে। তা ছাড়া ফ্ল্যাট-বাড়ী নিলে গেরাজের জন্য আলাদা ভাড়া দিতে হবে।

মা বলিলেন—কিন্তু বাবা, দিন-কাল ক্রমেই তো খারাপ হচ্ছে, দেখছি। আগে যে-মানুষ মাসে পঞ্চাশ টাকা রোজগার করতো, সে-ও দেখেছি দোল-দুর্গোৎসব করে' মেয়ের বিয়ে দিয়ে দশ-বারো হাজার টাকা রেখে যেতো। আর তুই এত টাকা রোজগার করিস, কি বাঁচে তোর, শুনি? সত্যি, কিছু জমালি?

নীতীন বলিল—কৈ আর জমে! সম্বলের মধ্যে দু'টো লাইফ-ইনসিওর করিয়েছি···একটা পাঁচ হাজার টাকার, আর-একটা দশ হাজার!

মা'র ললাটে চিন্তার রেখা। মা বলিলেন—তবে? মেয়ের বিয়ে দিতে হবে···ছেলেকে মানুষ করতে হবে!

নীতীনের বুকের উপর যেন পাহাড় জমিয়া উঠিল! এ কথা যখনি মনে উদয় হয়, সঙ্গে সঙ্গে বুকের উপর পাহাড় জমিয়া ওঠে। সে-পাহাড়কে ঠেলিয়া ফেলিবার উপায় খুঁজিয়া পায় না! সে জন্য এ কথা সে মনে আনে না! এখন মা'র কথায় আবার সেই পাহাড়ের ভার! না, এ ভার জমিতে দেওয়া ঠিক নয়।

হাসিয়া নীতীন বলিল—আমাকে তুমি মানুষ করেছো···বিধবা মেয়ে-মানুষ! আর আমি পুরুষ মানুষ হয়ে ছেলেকে মানুষ করতে পারবো না? তুমি আশীর্ব্বাদ করো, মা!

—সে-আশীর্ব্বাদ সব সময়ে করছি, বাবা! দিবারাত্রি আমার শুধু ঐ এক চিন্তা! দূরে থাকি···কিন্তু আমার মন বাস করছে তোমাদের সঙ্গে সেই সহর-কলকাতায়!

নীতীন খাইতে বসিয়াছে। মা সামনে বসিয়া খাওয়াইতেছেন। নিজের হাতে পাঁচ ব্যঞ্জন তৈয়ারী করিয়াছেন। শুক্তো, সোনা-মুগের ডাল, বড়ি ভাজা, আলু-বেগুন ভাজা, মোচার ঘণ্ট, বড় বড় মৌরলা মাছের ঝাল। ছেলে চিরদিন মৌরলা মাছের ভক্ত। ঘোষালদের পুকুরের পোনা মাছ···সেই পোনা মাছের ঝোল, করমচার অম্বল! ছেলে এক দিন এই করমচার নামে গলিয়া পড়িত!

খাইতে বসিয়া নীতীনের মনে অতীতের ছবি জাগিতেছিল। মনে হইতেছিল, মা···আমার মা! এই মায়ের স্নেহ যার আছে, তার কিসের দুশ্চিন্তা! মা বসিয়া ভাবিতেছিলেন, আমার ছেলে, কি দুঃখ-কষ্ট সহিয়াছি এই ছেলের মুখ চাহিয়া! ছেলে আজ মায়ের মুখ রক্ষা করিয়াছে! সে আজ পাঁচ জনের এক জন! সহরে তার কত মান, কতখানি ইজ্জৎ!

আহারাদির পর মা বলিলেন—আজ থাকবি না কি রে নীতু?

—না মা। বিকেলের ট্রেণেই যেতে হবে। সন্ধ্যায় কাজ আছে। রবিবার ছাড়া আর কোনো দিন তো অন্য দিকে চাইবার ফুরশৎ থাকে না।

মা বলিলেন—ওদের কথা বল্ রে, শুনি। বৌমার বুদ্ধিশুদ্ধি হলো একটু? না, এখনো তেমনি খেয়ালী-বুদ্ধি আছে? একটু মোটা-সোটা হয়েছে? হ্যাঁ, তোকে যে বলেছিলুম, সেকেলে সেই রতনচুর আছে আমার দরুণ, সেটা ভেঙ্গে বৌমার জন্য একেলে কিছু গড়িয়ে দিতে···দিয়েছিস্ গড়িয়ে? তার পর বৌমার সে-অসুখে

সে-বারে মানত করেছিলুম, মা-কালীর ওখানে পূজো দেবো। সে পূজো দিয়েছিস তো? দেখিস বাবা, ঠাকুর-দেবতার কাছে মানত··· ফেলে রাখিসনে! বুলু কোন্ ক্লাশে পড়ছে? টুনুর কাশী হয়েছিল, সে বারে বলে গেছলি, সেরেছে বেশ? না সেরে থাকে, আমি বাগশের ছাল আর পাতা দেবো, অল্প-জলে সিদ্ধ করে সন্ধ্যার পর খাইয়ে দিস দিকিন্···ছ'দিনে সেরে যাবে।···ব্রাহ্মী-শাকও ছ'টি দেবো'খন। আগুনে সেঁকে তার সত্ত বার করে খাইয়ে দিস্! ব্রাহ্মী-শাক একেবারে ধন্বন্তরি!

নীতীন বলিল—হ্যা, ভালো কথা, তোমার নাতি-নাতনির ফরমাশ আছে, মা। বলে দেছে। টুনুর চাই সেই বড়ির গহনা আর বুলু চেয়েছে তোমার কাছে সোনালী রঙের পুরু আমসত্ত!

হাসিয়া মা বলিলেন—নিয়ে যাস্। বড়ি করে রেখেছি···আমসত্তও রেখেছি। আর বৌমা আচার-কাসুন্দি ভালোবাসে, আচার-কাসুন্দিও করে রেখেছি।

বাহির হইতে কে ডাকিল—মা···

মা বলিলেন—কে? বিমলা?

—হঁ্যা।

—কেন রে?

বিমলা বলিল—সদাকে বলে এসেছি, সে এক-বাজরা তরী-তরকারী নিয়ে এখনি আসবে। কচি শসা, বেগুন, পটল, আর ডেঁয়ো-ডাঁটা।

নীতীন বলিল—তরী-তরকারী কি হবে মা?

—তোর সঙ্গে দেবো।

নীতীন বলিল—পাগল হয়েছো তুমি! অত মোট নিয়ে আমি যাবো কি?

মা বলিলেন—বাগানের জিনিষ···টাটকা সব্জী···নিয়ে যাবিনে?

—না, মা। তারা সহুরে লোক···তারা শুকনো বীট-কপি খায়। সে-ই তাদের ভালো। এখান থেকে ও-সব নিয়ে গেলে বলবে, জঙ্গল নিয়ে গেছি।

হাসিয়া মা বলিলেন—না, না, নিয়ে যাবি বৈ কি। নিজেদের জমির ফশল। তোর ভাবনা নেই রে! সদা ইষ্টিশানে নিয়ে গিয়ে গাড়ীতে ঠিক তুলে দেবে'খন। সেখানে একটা কুলি ডেকে নামিয়ে নেওয়া শুধু।

কথায়-কথায় নীতীন বলিল—একটা কথা বলবো মা?

—বল!

—আমি বলি, তুমি এখানে একলাটি থাকো···ম্যালেরিয়ার আড্ড···সে জন্য সব সময়ে আমরা কি-দুর্ভাবনায় কাঁটা হয়ে যে বাস করি! চলো না মা, আমাদের ওখানে···বেশ একসঙ্গে সব থাকবো। তোমার নাতি-নাতনিরা তোমাকে পেয়ে বর্তে যাবে, আমরাও নিশ্চিন্ত থাকবো।

মা নিশ্বাস ফেলিলেন, বলিলেন—মন আমার সেইখানেই···তবু সেখানে আমার যাওয়া হয় না, বাবা। এখানে সাত-পুরুষের ভিটে···সাঁঝে পিদীম জ্বলবে না, তা কি হয়!

নীতীন বলিল—আমাদের সঙ্গে তুমি থাকবে, সে ইচ্ছা করে না, মা?

মা নিশ্বাস ফেলিলেন, বলিলেন—করে কি না, অন্তর্যামী জানেন, বাবা!

তার পর ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া মা বলিলেন—তুমি মানুষ হয়েছো···আমার ইহকালের কর্তব্য শেষ হয়েছে, বাবা!

নীতীন বলিল—আমাদের কর্তব্য আছে তো···তোমায় দেখবো, তোমার সেবা করবো।

মা বলিলেন—সে কর্তব্য তুমি তো করছো বাবা। কর্তব্যে তোমার ত্রুটি নেই! আমার ব্রত করার সাধ ছিল, করালে। সে-বারে বড্ড মন হয়েছিল, অর্দ্ধোদয়ে পৈরাগে যাবো, বুকে করে আমাকে নিয়ে গিয়ে তুমি চান্ করিয়ে আন্‌লে। সে জন্য আমার বুক ভরে' আছে, বাবা! এমন সুছেলে আমার!

নীতীন বলিল—আমার মন কিন্তু সর্ব্বদা হা-হা করে মা তোমার জন্য। কি তোমার আপত্তি এখান ছেড়ে আমাদের সঙ্গে কলকাতায় গিয়ে থাকতে?

মা বলিল—এ বাড়ী ছেড়ে আমায় যেতে বলিসনে বাবা। এ বাড়ী ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারবো না। এ বাড়ীতে তিনি দেহ রেখে গেছেন! এ বাড়ীতে আমি যেন দেহ রেখে যেতে পারি, তোমায় মানুষ করার পর এই একটি মাত্র প্রার্থনা শুধু জানাই আমি আমার ইষ্টদেবতাকে।···এ বাড়ী থেকে আমায় টেনে নিয়ে যাসনে।

নীতীন চুপ করিয়া এ কথা শুনিল। শুনিয়া গুম্ হইয়া রহিল। তার পর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—না মা, আর আমি কখনো তোমায় এ বাড়ী ছেড়ে আমাদের কাছে যাবার কথা বলবো না।

বিদায়-বেলা। মায়ের পায়ে প্রণাম করিয়া নীতীন বলিল—আসি মা। আবার আসছে রবিবারের পরের রবিবার···

ছেলের চিবুকে হাত দিয়া চুম্বন করিয়া মা বলিলেন—খরচ-পত্র একটু বুঝে করিস নীতু। টাকা-কড়ির জন্য সব সময়ে কেন এত দুশ্চিন্তা করিস রে! শরীর ওতে থাকবে কেন? শরীর থাকলে তবেই পয়সা। বৌমা ছেলেমানুষ···এ বয়সে পাঁচটা সখ হয়, আবদার করে, বুঝি। কিন্তু তুমি তো জানো বাবা, টাকার অভাবে কি দুঃখ পেতে হয় মানুষকে! যখন ছোট ছিলে, আমার মনে কত সাধ হতো, ছেলেকে এটা খাওয়াবো, ওটা পরাবো! উপায় ছিল না বলে মনটার মধ্যে যা করতো···

মায়ের কণ্ঠ গাঢ় হইল, কথা শেষ হইল না।

নীতীন বলিল—না মা, বাজে খরচের সম্বন্ধে আমি খুব হুঁশিয়ার হবো।

মা বলিলেন—বাড়ী করতে চাস কলকাতায়, কারণ···একটা আশ্রয়। ছেলেমেয়েরা কি আর এ পাড়াগাঁয়ে থাকবে? থাকতে পারবে না। না হলে বলতুম, যে-পয়সা অপব্যয়ে যায়, অপব্যয় বাঁচিয়ে সে-পয়সা দিয়ে এ-বাড়ীকে সারিয়ে মজবুত করতে। কিন্তু তা আর হয় না বাবা! না যায়, তা আর ফেরে না। তাছাড়া দিন-কাল যা হচ্ছে···

নীতীন বলিল—তুমি কিন্তু সাবধানে থেকো মা। একটু অসুখ বোধ করলেই যেমন করে পারো, তখনি আমাদের কাছে খবর পাঠাবে।

ছেলের এ উদ্বেগ লক্ষ্য করিয়া মায়ের মন খুশী হইল। হাসিয়া মা বলিলেন—পাঠাবো খপর। আমার জন্ম কিছু ভাবিসনে নীতু। এত দিন যখন রয়ে গেছি, দেখিস, টুলুর-বুলুর বিয়ে না দেখে তোর মা মরবে না।

শেয়ালদা ষ্টেশন। বাড়ীর মোটর আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কুলির মাথায় তরী-তরকারীর বাজরা···তার সঙ্গে মায়ের দেওয়া ব্রাহ্মী শাক, বাথশের পাতা আর ছাল, টুলুর জন্ম বড়ি, বুলুব জন্ম আমসত্ত, বৌমার জন্ম আচার-কাসুন্দির হাঁড়ি···

নীতীন বলিল—মা-জী কোথায়?

ড্রাইভার বলিল—মাসিমার কোঠি···বাগবাজার।

নীতীন বলিল—মালপত্র নিয়ে বাড়ী যাও। মালপত্র নামিয়ে বাগবাজার যাবে। আমি যাবো ট্যাক্সি করে অন্য জায়গায়। কাজ আছে।

নীতীনের ট্যাক্সি আসিয়া থামিল ভবানীপুরে একটা গলির মুখে। ট্যাক্সি হইতে নামিয়া ভাড়া চুকাইয়া নীতীন গলিতে ঢুকিল।

চার-পাঁচখানা বাড়ীর পর দোতলা বাড়ী। নীতীন আসিয়া সেই বাড়ীর দোতলার ঘরে ঢুকিল।

সোফা-কৌচ-আয়নায় সজ্জিত ঘর। আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া এক তরুণী···মাথায় পিন আঁটিতেছে···কণ্ঠে গানের কলি,

ও কেন গেল চলে
কথাটি নাহি বলে
মলিনমুখী আঁখি ভরিয়া নীরে!

নীতীন বলিল—গুড্ ইভনিং পুষ্প!

তরুণী ফিরিল। মুখে-চোখে হাসির বিদ্যুৎ···বলিল—এ কি বেশ!

নীতীন বলিল—বহু দূরে গিয়েছিলুম। ষ্টেশন থেকে আর বাড়ী ফিরিনি···একেবারে এখানে আসছি।

বলিয়া গায়ের চাদরখানা শোফায় ফেলিল।

তরুণী বলিল—সন্ধ্যা হয়ে গেল, তবু তোমার দেখা নেই! আমি ভাবছিলুম, বুঝি, কাজের ঝঞ্ঝাটে আসতে ভুলে গেলে!

নীতীন বলিল—ভুলবো? কি যে তুমি বলো, পুষ্প!···তা আজ ষ্টুডিয়োয় যাওনি?

পুষ্প বলিল—না। ছুটী নিয়েছি। বলেছি, কাজ আছে, শুটিংয়ে আসতে পারবো না।

—বার্থডের কথা বলেছো?

—না। তাহলে তাদের ক'জনকে নেমন্তন্ন করতে হতো না মশাই? আজকের উৎসবে শুধু তুমি আমার গেষ্ট! তবে পরে ওদের বলতে হবে এক দিন, প্রেজেন্টগুলো ফাঁক যাবে কেন!

নীতীন বলিল—আমার প্রেজেন্ট পছন্দ হয়েছে?

পুষ্পর গলায় ছিল জুয়েলড় নেকলেশ। নেকলেশ দেখাইয়া পুষ্প বলিল—হুঁ!

—মার্কেট থেকে ফুল পাঠিয়েছে? আমি অর্ডার দিয়ে গিয়েছিলুম।

—ফুল পেয়েছি। মাই বেষ্ট থ্যাঙ্কস, ডার্লিং।

আবেশের বিহ্বলতায় পুষ্প দুই হাত প্রসারিত করিয়া দিল।

নীতীন বলিল—মুখ-হাত ধুয়ে আসি। ধুলো আর কয়লা যা মেখেছি, ওঃ!

স্নান সারিয়া ধোপদোস্ত কাপড় পরিয়া নীতীন আসিয়া সোফায় বসিল।

পুষ্প বলিল—খাবার দিতে বলি?

নীতীন বলিল—শুধু এক পেয়ালা চা।

পুষ্প কহিল—দু'খানা স্যাণ্ডুইচ আর ফল দিক।

—বেশ, দাও।

চা খাইতে খাইতে নীতীন বলিল—তোমার এ ছবি শেষ হবে কদ্দিনে?

—বড় জোর আর এক মাস! আচ্ছা, তার পর ভাবছি···

এই পর্য্যন্ত বলিয়া চোখে কটাক্ষ ভরিয়া কণ্ঠে আব্দারের সুর তুলিয়া পুষ্প বলিল,—আমার একটা কথা রাখবে? গুড-ফ্রাইডের সময় নিজেকে ফ্রী রেখো···পাঁচ-সাত দিন। একটু ঘুরে আসবো, ভাবছি···দু'জনে···সুন্দরবন সার্ভিশে!

নীতীন ভ্রূ-কুঞ্চিত করিল, বলিল—কিন্তু এ-বছর ব্যবসা ভারী ডাল্ যাচ্ছে, পুষ্প···মানে, একটু টানাটানি!

পুষ্পর মুখে মেঘের মলিন ছায়া! মুখ ভার করিয়া পুষ্প বলিল—সব সময়ে তোমার টাকার খাঁকতি! দু'বছর কোথাও বেরুইনি··· কলকাতার এই বদ্ধ বাতাসে পড়ে আছি। চারখানা ছবিতে কাজ করেছি। ষ্টুডিয়োর ঐ গরম বাতাসে কি কষ্ট, তুমি তার কি বুঝবে!

পুষ্প উঠিয়া খোলা খড়খড়ির ধারে গেল। গিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

নীতীন চাহিয়া রহিল পুষ্পর পানে···

মনে চিন্তার প্রবাহ।

বেচারী! সিনেমা-আর্টিষ্ট বেলা, চামেলী, প্রতিভা, চম্পকলতা ···যেন বাজ-পাখী! শিকার ছাড়া কিছু জানে না। আর পুষ্প?··· নীতীনের বয়স পঁয়তাল্লিশ। পুষ্পর বয়স চব্বিশ-পঁচিশ! চব্বিশ বছর বয়সে পুষ্পর মনে কত সাধ, কত আশা···পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে নীতীন তার সে সাধ-বাসনার কোন্‌টা পূরণ করিয়াছে? অথচ পুষ্প কথায় গানে, হাস্যে-লাস্যে নীতীনের ক্লান্তি হরণ করে! কি শান্তিই তাকে দেয়! নহিলে ঘরে কমলার ঐ মেজাজ···

নীতীন ডাকিল—শোনো পুষ্প···

পুষ্প সাড়া দিল না, ফিরিয়া চাহিল না।

নীতীন গিয়া তার হাত ধরিল, বলিল—শোনো, এপ্রিল-মাসে মস্ত একটা 'ডিউ' মীটু করতে হবে···তার পর মানে, যা ভাবছি, তা যদি হয়, তাহলে নেক্সট পূজার সময়···পাঁচ-সাত দিন কেন, পনেরো দিনের জন্য···তুমি যেখানে যেতে বলবে, যাবো!

পুষ্প নিশ্বাস ফেলিল। বড় নিশ্বাস। বলিল—তখন কে যাবে! নতুন ছবি সুরু হবে! তাছাড়া এখন আমার সখ হয়েছিল! গুড্-ফ্রাইডেতে অম্বালিকা যাচ্ছে বোম্বাই···অতসী দার্জ্জিলিং··· লালিমা কাশ্মীর···আমি তা যেতে চাইনি···সাত দিনের জন্য শুধু এই কাছে···সুন্দরবন-ট্রিপ!

নীতীন বলিল—কিন্তু আমি ছলনা করছি না পুষ্প, মিথ্যা কথাও বলিনি!

পুষ্প বলিল—তোমার যা ভালোবাসা···থাক্!

সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘনিশ্বাস···মলিন মুখ আনত করিয়া পুষ্প বসিয়া রহিল।

নীতীনের মনে সারা দিনের ঘটনাগুলা যেন গোরার মত প্যারেড করিয়া বেড়াইতে লাগিল। পৃথিবীতে নিজের দিক্‌টাই সকলে বড় করিয়া দেখে! স্ত্রী কমলা···সে চায় নিজের স্বাচ্ছন্দ্য-আরাম সবার আগে! বড় বাড়ী···যে-বাড়ীতে গেলে নিজের মর্য্যাদা আরো বাড়াইয়া তুলিতে পারিবে! মা এখানে আসিতে চাহিলেন না···দেশের বাড়ী ছাড়িয়া! তাঁর সেন্‌টিমেণ্ট! ছেলের উপর স্নেহ···সে-স্নেহের চেয়েও দেশের বাড়ীর উপর মায়ের স্নেহ-মায়া অনেক বেশী! কোথাকার কে এই পুষ্প···মোহের আবেশে নিজের তৃপ্তির জন্য তাকে আশ্রয় করিয়াছে নীতীন! সে চায় ট্রিপ! নীতীনের টাকায় টান পড়িয়াছে···পুষ্প মুখ ভার করিল!

সত্যই তো, যে-টাকা সে রোজগার করিতেছে, সে-টাকা দিয়া নীতীন কি পায়? সে-টাকার উপর চারি দিক্‌কার কত দাবী···সে-দাবী না মিটাইলে সকলের মুখ-ভার! তার মুখের পানে কে চায়?

অথচ এই টাকা যখন ছিল না, অভাবের চাপে দেহ-মন যখন টনটন্ করিত, যখন টাকার সে স্বপ্ন দেখিত, তখন নিজের অভাব-অভিযোগ স্মরণ করিয়া কত বার ভাবিয়াছে, টাকা যদি কখনো পায়, ···অনেক···অনেক টাকা···সে টাকায় ছোট ছোট অভাবের জ্বালায় যারা মাথা তুলিতে পারে না, তাদের পানে এক বার ভালো করিয়া চাহিবে!

মন কেমন বা-রী করিয়া উঠিল! বয়স হইয়াছে! এ বয়সে এই পুষ্পর বয়সী একটা মেয়ের কাছে এমন ভিখারীর মতো···

নীতীন উঠিল। বলিল—তোমার মেজাজ ভালো নয়, দেখছি। আমিও ক্লান্ত বোধ করছি। ভেবো না। দেখবো, গুড্-ফ্রাইডের সময় তোমার টিপের ব্যবস্থা যেমন করে পারি, করবো! তবে আমি যেতে পারবো কি না···

পুষ্প এ কথার জবাব দিল না। নীতীন ডাকিল,—পুষ্প···

পুষ্প সাড়া দিল না।

এখনো অভিমান!

নীতীন উঠিল···নীচে নামিয়া আসিল···একেবারে বাহিরে পথে।

পথে গাড়ী নাই। পাশে কোন্ বাড়ীতে গ্রামোফোনে অর্কেষ্ট্রা বাজিতেছিল।

শুনিতে শুনিতে নীতীন গলি পার হইয়া বড় রাস্তায় আসিল।

একখানা চলন্ত ট্রাম। ট্রামে উঠিয়া বসিল। লাষ্ট ট্রাম। এস্‌প্ল্যানেড চলিয়াছে। নীতীনের বাসা পদ্ম-পুকুরে।

বাড়ী আসিয়া দেখে, বাহিরের রোয়াকে বসিয়া আছে সত্যসিন্ধু অফিসের কেরাণী।

ছেলেটি ভালো। কাজে ফাঁকি দেয় না। নীতীনের সঙ্গে সঙ্গে থাকে ছায়ার মতো।

নীতীন বলিল—খপর কি, সত্য?

সত্যসিন্ধু বলিল—বড্ড বিপদে পড়েছি স্যর।

—বিপদ! এত রাত্রে! কি হয়েছে?

সত্যসিন্ধু বলিল—বাড়ী থেকে চিঠি এসেছে···বাবার দেনা ছিল···সে দেনার দায়ে ভিটে ক্রোক্···সাত দিন পরে নিলামে উঠবে! ভিটে গেলে মা, বুড়ো বাপ, ছোট ভাইবোন···কারো আর মাথা গোঁজবার আশ্রয় থাকবে না স্যর।

কথার শেষে সত্যসিন্ধুর দু' চোখে জল!

নীতীনের বুকখানা ধ্বক্ করিয়া উঠিল! পুষ্পলতার জন্মদিনে দেড়শো টাকা দামের নেকলেশ দিয়াছে নীতীন···বাগবাজারে···

নীতীন বলিল,—কত টাকার দরকার?

—আজ্ঞে, দেড়শো।

—দেড়শো টাকা দিলে বাকী থাকবে কত?

সত্যসিন্ধু বলিল,—দেড়শো দিলেই দেনা চোকে। মানে, তিনশো পঁচিশ টাকা দেওয়া হয়েছে, স্যর, বাড়ীর সোনা-রূপো সব বেচে। এখন আর এমন কিছু নেই, যা থেকে আর একটি পয়সার জোগাড় হতে পারে!

সত্যসিন্ধু কাঁদিতে লাগিল।···নীতীন নির্ব্বাক্।

সত্যসিন্ধু বলিল,—মাইনে-বাবদ আমাকে এ্যাডভান্স দিয়েছিলেন, তার এখনো বাইশ টাকা বাকী। আপনাকে বলবার মুখ নেই, স্যর! কিন্তু আপনি ছাড়া এ বিপদে কার পানে চাইবো, এমন আমাদের কেউ নেই!

নীতীন বলিল—কেঁদো না, এসো!

সত্যসিন্ধুকে সঙ্গে করিয়া নীতীন আসিল বসিবার ঘরে। টেব্‌লের ড্রয়ার খুলিয়া চেকের বই লইয়া চেক লিখিয়া দিল সত্যসিন্ধুর নামে। দেড়শো টাকার চেক।

সে চেক সত্যসিন্ধুর হাতে দিয়া নীতীন বলিল—এই নাও। মাসে মাসে তোমার মাহিনা থেকে যেমন ভাবে পারো, শোধ দিয়ো। তোমায় আমি বিশ্বাস করি। আশা করি, সে বিশ্বাস তুমি নষ্ট করবে না।

কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হইয়া সত্যসিন্ধু একেবারে নীতীনের পায়ে লুটাইয়া পড়িল।

পা সরাইয়া লইয়া নীতীন বলিল—পা ছাড়ো। কৃতজ্ঞতা যদি বোধ করো, আচরণে জানিয়ো। কথায় নয়। কথায় যে-কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়, তার কোনো দাম নেই, সত্য। এখন যাও। কাল চেক্ ক্যাশ্ করে নগদ টাকা নিয়ে তোমার বাবার হাতে দাও গে। তার পর ফিরে এসে আমায় জানিয়ো, সম্পত্তি রক্ষা হলো কি না!

সত্যসিন্ধু চলিয়া গেল। নীতীনের মনের ভার যেন কিছু হালকা হইল। সকাল হইতে যা-যা ঘটিয়াছে···শেষে ঐ পুষ্পর নেকলেশ! এ বয়সে এমন তার নির্লজ্জতা! পয়সা দিয়া তরুণীর সোহাগ কিনিতে যাওয়া···ছি!

সত্যসিন্ধুকে চেক দিবার পর নেকলেশের সে-গ্লানি যেন মন হইতে মুছিয়া গেল!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

ইতিহাসের অনুসরণ

লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসন

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

প্রথম প্রস্তাবেই দেখাইয়াছি, তাম্রশাসনখানিতে প্রদত্ত ভূমির বিস্তৃত বর্ণনা আছে। এই তাম্রশাসনখানি দ্বারা দুইটি গ্রামাংশ এবং পৃথক্ পৃথক্ চারি খণ্ড ভূমি ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত হইয়াছে। প্রদত্ত প্রত্যেক ভূমিরই চৌহদ্দির উল্লেখ আছে। সৌভাগ্যক্রমে এক ভূমির উত্তর সীমানায় বানহার নদের উল্লেখ আছে। এই নামটি পাঠ করিয়াই চিনিতে পারা গেল, ইহা তাম্রশাসনের প্রাপ্তিস্থান রাজাবাড়ী গ্রাম হইতে প্রায় তিন মাইল পূর্ব্বে, কাপাসিয়া নামক সুপরিচিত গ্রামের প্রান্তবাহী বানার নদ। বুঝা গেল, তাম্রশাসন প্রাপ্তি-স্থানের অদূরে বানার নদের পারেই উৎসৃষ্ট ভূমি অবস্থিত ছিল।

বর্ত্তমানে সমগ্র ভাওয়াল অঞ্চল গজারি বা শালবনে সমাচ্ছন্ন। গজারি গড়ের আয়ই ভাওয়াল জমীদারীর প্রধান আয়। ঢাকা হইতে ময়মনসিংহ পর্য্যন্ত রেলরাস্তার জয়দেবপুর হইতে ফাওরাইদ পর্য্যন্ত অংশ এই গজারি গড়ের ভিতর দিয়া গিয়াছে। রেলযাত্রিগণ গাড়ীতে বসিয়াই ছোট ছোট টিলার উপরে অবস্থিত বহুবিস্তৃত এই গজারি গড়ের শোভা দেখিতে পান। এই যে ভূমি, কবি গোবিন্দ দাসের জন্মভূমি,—যথায়, তাঁহারই ভাষায়,—

"টিলায় টিলায় ভুল হয়ে যায় মৈনাক শত শত।"

যথায় :— চিলাইর নীল চেলি তরঙ্গে তরঙ্গে ঠেলি
ছুটিয়া যাইতে লয় লুটিয়া পবন।

তাহা আজ শালবনাচ্ছন্ন হইলেও, ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে উহা পলি-মাটি গঠিত বাঙ্গালা দেশের মধ্যে প্রাচীনতম ভূমি এবং নিম্নবঙ্গে আর্য্য উপনিবেশের প্রাচীনতম স্থল। প্রাচীনতম ঐতিহাসিক যুগের বহুবিধ চিহ্ন ও স্মৃতি এই পুণ্যভূমির বুকে ছড়াইয়া আছে। ভূতাত্ত্বিকগণ এই ভূমির উপযুক্ত মর্য্যাদা দিয়াছেন। প্রত্নতাত্ত্বিকের দৃষ্টি এই দিকে উপযুক্তরূপে আকৃষ্ট হয় নাই।

ভূতাত্ত্বিকগণ এই সমগ্র রক্তমৃত্তিক টিলা-ভূমিকেই 'মধুপুর জঙ্গল' এই সাধারণ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃত মধুপুর জঙ্গল ময়মনসিংহ জেলায় অবস্থিত। বিশালকায় ব্রহ্মপুত্রের বন্যা বা বানের অতিরিক্ত জল পূরণ করিয়া নাতিক্ষীণকায় যে নদটি মধুপুর জঙ্গলের পশ্চিম প্রান্ত ঘেঁষিয়া প্রবাহিত, তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি কোন পণ্ডিত ব্যক্তি সুদূর অতীতে তাহারই সার্থক নাম রাখিয়াছিলেন বানহার বা বানার। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ময়মনসিংহ জেলার সরকারী গেজেটিয়ারে এই সুপ্রাচীন নদটির উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই। সার্ভে বিভাগের প্রচারিত ১″=১ মাইল মানচিত্রে দেখা যায়, মুক্তাগাছা থানার মধ্য দিয়া অনুসরণ করিয়া জামালপুর থানার ডেঙ্গারগড় গ্রাম পর্য্যন্ত, (ব্রহ্মপুত্র নদের ১ মাইল দক্ষিণস্থ) নদটিকে মানচিত্রে দেখান হইয়াছে। ডেঙ্গারগড়ের অব্যবহিত উত্তরেই এই নদটি ব্রহ্মপুত্র হইতে বাহির হইয়াছে। এই স্থানটি জামালপুরের ৫ মাইল নীচে অর্থাৎ অনুলোমে। এই স্থান হইতে আরব্ধ হইয়া সোজা দক্ষিণে চলিয়া নদটি মধুপুর জঙ্গলের পশ্চিম প্রান্ত ঘেঁষিয়া বাহিয়া ময়মনসিংহ জেলার দক্ষিণ সীমায় উপস্থিত হইয়াছে। এই স্থান হইতে সোজা পূর্ব্বদিকে চলিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত ইহা ঢাকা-ময়মনসিংহ জেলার সীমানারূপে পরিণত হইয়াছে। ঢাকা-ময়মনসিংহ রেললাইনটি ফাওরাইদ ষ্টেশনের পরেই নাতিবৃহৎ সেতুর দ্বারা এই নদটি পার হইয়াছে। ফাওরাইদের প্রায় চারি মাইল পূর্ব্ব-দক্ষিণে ত্রিমোহিনী নামক স্থানে ইহা লক্ষ্যা নদীতে মিশিয়াছে। লক্ষ্যা নদীও ইহার অল্প পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র হইতে উত্থিত হইয়াছে, এবং লাখপুর নামক স্থানে পুনরায় ব্রহ্মপুত্র-সঙ্গত হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্র নদের এই কন্যাসঙ্গম অপবাদে উহা অপবিত্র বলিয়া গণ্য, ইহা হিন্দুশাস্ত্রে সুবিদিত। বৎসরে শুধু এক দিন, অর্থাৎ অশোকাষ্টমীর দিন উহাতে সমস্ত তীর্থ সমবেত হয়। তখন লাঙ্গলবন্ধ তীর্থে ব্রহ্মপুত্র তীরে ব্রহ্মপুত্র স্নানের জন্য লক্ষ লক্ষ যাত্রী সমবেত হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, লাখপুর হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত লক্ষ্যার প্রবাহ নিজ নাম হারাইয়া বর্ত্তমানে বানার নামেই পরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। এই বিচিত্র ভুলের ফল সার্ভে বিভাগের পক্ষে বড় মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পুরানা ব্রহ্মপুত্রের খাত অধুনা ব্রহ্মপুত্রতীরস্থ আড়ালিয়া নামক স্থান হইতে লাখপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। লাখপুরে কন্যাসঙ্গত হইয়া, পুনরায় উহাকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইতে দিয়া, ব্রহ্মপুত্র নিজে মহেশ্বরদি ও সুবর্ণগ্রাম পরগণার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া, প্রাচীন সুবর্ণগ্রাম নগরের বিপরীত দিকে লাঙ্গলবন্ধ তীর্থের জন্মদান করিয়া বিক্রমপুরে ইছামতীর সহিত সঙ্গত হইয়া সেই সঙ্গমস্থলে যোগিনীঘাট তীর্থ সৃষ্টি করিয়া এবং সঙ্গমস্থানের অদূরে শ্রীবিক্রমপুর নগরের জন্মদান করিয়া, বিক্রমপুরের দক্ষিণে উহা মেঘনাদের সহিত মিলিত হইয়াছে। লাখপুর হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত লক্ষ্যার প্রবাহ বানারের অভ্যাগমে নিজের নাম হারাইয়া বানার নামে পরিচিত হওয়ায় সার্ভে বিভাগের কর্ত্তাগণ লাখপুর হইতে আড়ালিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন খাতের অংশকে সরকারী মানচিত্রে লক্ষ্যার প্রাচীন খাত বলিয়া অভিহিত করিয়া বসিলেন। ১৮৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত মেইন্ সার্কিট্ ম্যাপগুলিতেও এই ভুল দেখা যায়। কাজেই এই ভুলের জন্ম ইহার পূর্ব্বে হইয়াছিল। বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত সরকারী ম্যাপে এই ভুল চলিয়া আসিতেছে। বহু লেখক বার বার এই ভুল দেখাইয়া দিয়াছেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে মিঃ সাক্‌চির সম্পাদনে সরকার কর্ত্তৃকই প্রকাশিত ময়মনসিংহ গেজেটিয়ার ৭ পৃষ্ঠায় এই ভুল দেখান আছে। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ঢাকা জেলার সেটেলমেণ্ট অফিসার মিঃ এস্কলিকে আমি বিশেষ ভাবে এই ভুল দেখাইয়া দিই। কিন্তু তথাপি অদ্যাপি এই ভুল সরকারী মানচিত্রগুলিকে বিকৃত করিতেছে।

পূর্ব্বের বর্ণনা হইতেই বুঝা যাইবে যে, রক্তমৃত্তিক কঙ্কর-পরিপূর্ণ মধুপুর—ভাওয়ালের সমস্তটাই ভূতাত্ত্বিকগণের নিকট শুধু মধুপুর জঙ্গল বলিয়া পরিচিত হইলেও, স্থানীয় জনসমূহের নিকট উহার মধুপুর ও ভাওয়াল অংশ পৃথক্‌রূপে সুপরিচিত। এই উভয় স্থানের মধ্যে প্রশস্ত বালুকাময় নিম্নভূমির ব্যবধান আছে এবং তাহারই উপর দিয়া বানার নদ বহিয়া ঢাকা-ময়মনসিংহের সীমানা সৃষ্টি করিয়াছে। অধুনা বানার নামেই পরিচিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লক্ষ্যা নদীর ত্রিমোহিনী লাখপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত অংশ ভাওয়ালের টিলাময় উচ্চ ভূখণ্ডকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রবাহিত। এই উভয় বিভাগই প্রচুর বনসমাকীর্ণ এবং ছোট-বড় বহু টিলার সমবায়ে

গঠিত। কোন কোন টিলা বেশ উঁচু এবং এই ভাওয়াল অঞ্চলে কয়েকটি স্থানে বল্মীক-স্তূপের আকৃতি লৌহময় মৃত্তিকা ভেদ করিয়া প্রকাশিত হইয়া নিম্নে লৌহখনির অস্তিত্বও সপ্রমাণ করিতেছে। এই অংশের বানার বা লক্ষ্যার উপর অনেক স্থানেই টিলাসমূহ আসিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। নদ বা নদীটি স্থানে স্থানে বেশ গভীর এবং জলপৃষ্ঠ হইতে তীরস্থ টিলার মাথা কোন কোন স্থানে ৭০ ফিট্ উঁচু। নদীর গভীরতাও এক এক স্থানে ৪০ ফিটের কম নহে।

এই বানার-লক্ষ্যা দ্বারা দ্বিধা-বিভক্ত ভাওয়ালের দুই ভাগেই বহু নদ-নদীর খাত বিদ্যমান। পূর্ব্ববিভাগের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য খাত প্রাচীন ব্রহ্মপুত্রের খাত ব্রহ্মপুত্র-তীরস্থ আড়ালিয়া হইতে লাখপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। অদ্যাপি অশোকাষ্টমীর দিনে এই শুষ্ক খাতেই স্বল্পাবশিষ্ট জলে তীর্থযাত্রিগণ স্নান করিয়া থাকেন। বহু দূর হইতে আনিয়া মৃতদেহসমূহ এই খাতের তীরেই পোড়ান হইয়া থাকে। ব্রহ্মপুত্র সুপ্রাচীন কালে এই খাত পরিত্যাগ করিয়া আড়ালিয়া হইতে পূর্ব্বদিকে বহিয়া ভৈরববাজারে মেঘনার সহিত মিলিত হইয়াছিল। কিন্তু আড়ালিয়া-ভৈরববাজার অংশ অদ্যাপি স্থানীয় লোকগণের নিকট আড়িয়ল খাঁ বলিয়া পরিচিত এবং এই অংশকে আদৌ পবিত্র বলিয়া বিবেচনা করা হয় না। অশোকাষ্টমীতে এই অংশের জলে স্নান হয় না,—হয় আড়ালিয়া-লাখপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত শুষ্ক খাতে। ব্রহ্মপুত্রের বর্ত্তমান প্রবাহ যমুনা বা যমুনা,—যাহা বর্ত্তমানে ময়মনসিংহ ও পাবনা জেলার সীমানারূপে প্রবাহিত, তাহাকেও পবিত্র বলিয়া বিবেচনা করা হয় না।

এই পূর্ব্বাংশের আরও দুইটি নদ-নদীর উল্লেখ করা আবশ্যক। প্রাচীন ব্রহ্মপুত্রের আড়ালিয়া-লাখপুর খাতের পূর্ব্বে এই পাহাড় অঞ্চল ভেদ করিয়া একটি জলধারা প্রবাহিত। স্থানীয় লোক ইহাকে পাহাড়িয়া নদী বলে। তাহারও পূর্ব্বে টেঙ্গর অঞ্চলের পূর্ব্ব-সীমান্তে আর একটি নদী ব্রহ্মপুত্র হইতে বাহির হইয়া দক্ষিণে বহিয়া মেঘনায় যাইয়া মিশিয়াছে। ইহার নাম আড়িয়ল খাঁ নদী।

লক্ষ্যানদীর ত্রিমোহিনী-লাখপুর অংশ অতি প্রাচীন কাল হইতেই বানার নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। কারণ, বর্ত্তমান তাম্রশাসন-খানি দ্বারা এই প্রবাহের তীরেই জমী দেওয়া হইয়াছে এবং এই তাম্রশাসনেও নদের এই অংশ বানহার বা বানার নামেই উল্লিখিত। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, বানারের পূর্ব্ব ও পশ্চিম পারে বিস্তৃত ভাওয়াল অঞ্চল ভূতাত্ত্বিকগণের মতে নিম্নবঙ্গের প্রাচীনতম স্থল। এই ভূমি বর্ত্তমানে জঙ্গলে আচ্ছন্ন এবং বিরলবসতি বটে। কিন্তু প্রাচীন ঐতিহাসিক যুগে ইহা যে বহুজনাকীর্ণ সমৃদ্ধ স্থান ছিল, তাহার নানা প্রমাণ বিদ্যমান।

প্রথম প্রমাণ—নদ-নদী ও গ্রামের নামসমূহে। শ্রী-অন্ত গ্রামের নাম এই অঞ্চলে অনেক পাওয়া যায়। বর্ত্তমান তাম্রশাসনে বস্তশ্রী গ্রামের নাম আছে। ত্রিমোহিনীর সংলগ্ন পূর্ব্বে সিংহশ্রী গ্রাম। এই স্থানে এক বটবৃক্ষ-মূলে এক মুসলমান কৃষক সুলতানী আমলের বহু রৌপ্যমুদ্রা পাইয়াছিল। উহাদের মধ্যে দনুজমর্দ্দন ও মহেন্দ্রদেবের (অর্থাৎ রাজা গণেশ ও তাঁহার পুত্র যদুর) অন্ততঃ ১৫টি টাকা পাওয়া যায়। এই মুদ্রাগুলি ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ঢাকা বিভাগের ভূতপূর্ব্ব স্কুল-পরিদর্শক মিষ্টার ষ্টেপলটনের হস্তগত হয়। তিনি ১৯২২ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় ৪০৭ পৃষ্ঠায় এই সিংহশ্রীতে প্রাপ্ত মুদ্রা-সমূহের উল্লেখ করিয়াছেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে পত্রিকার ৫ পৃষ্ঠায় সিংহশ্রীতে প্রাপ্ত দনুজমর্দ্দন ও মহেন্দ্রদেবের মুদ্রাগুলির সচিত্র বর্ণনা দিয়াছেন। নদের নাম বানহার এবং নদীর নাম শীতললক্ষ্যা। সুপণ্ডিত হৃদয়বান্ ব্যক্তিগণ সুপ্রাচীন কালে এই নামকরণ করিয়াছিলেন। বানহার নামটি লক্ষ্মণসেনের তাম্র-শাসনেই (১২০৪ খৃষ্টাব্দ) পাওয়া যাইতেছে। ঐতিহাসিক যুগের আদিকালে যখন সংস্কৃত-ভাষাজ্ঞান-সম্পন্ন সুসভ্য আর্য্যগণ এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই জন্যই বোধ হয়, নামে এইরূপ কাব্যগন্ধ।

দ্বিতীয় প্রমাণ, এই অঞ্চল হইতে সুপ্রাচীন গুপ্তধন ও তাম্র-শাসনাদি আবিষ্কার। সিংহশ্রীতে আবিষ্কৃত সুলতানী আমলের মুদ্রা পাওয়ার বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আড়িয়ল খাঁ নদীর পারে মরজাল নামক গ্রামে বহু রৌপ্যময় প্রাচীন কার্ষাপণ মুদ্রা পাওয়া যায়। মুদ্রাতত্ত্ববিদ্‌গণ এই মুদ্রাগুলিকে পাঞ্চ্‌মার্ক্‌ অর্থাৎ বিবিধ ছাপ-সম্বলিত মুদ্রা বলিয়া থাকেন। নারায়ণগঞ্জের সেই সময়ের সাবডেপুটী খাঁ সাহেব সৈয়দ এ-এস্-এম্ তৈফুর সাহায্যে আমি ঐ মুদ্রার প্রায় ৯০টি টাকা মিউজিয়মের জন্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। মুদ্রাতত্ত্ববিদ্‌গণের মতানুসারে এই মুদ্রাগুলি মৌর্য্য ও প্রাগ্‌মৌর্য্য আমলের। আড়িয়ল খাঁ নদীর তীরবর্ত্তী মরজাল গ্রাম হইতে মৌর্য্য ও প্রাগ্‌মৌর্য্য যুগের এই মুদ্রার আবিষ্কার হইতে এই অঞ্চলে লোক-বসতির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়া যায়। যে আশরফপুর গ্রামে মহারাজ দেবখড়্গের দুইখানি তাম্রশাসন এবং কয়েকটি ধাতুময় বৌদ্ধ-চৈত্য পাওয়া যায়, তাহাও প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র ও পাহাড়িয়া নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী এবং লাখপুর হইতে ৬ মাইল পূর্ব্ববর্ত্তী। লাখপুর হইতে ১০ মাইল দক্ষিণে বেলাব গ্রামে ভোজবর্ম্মের তাম্রশাসন পাওয়া যায়। আর লাখপুরের কয়েক মাইল উত্তর-পশ্চিমে বানারের পশ্চিম তীরবর্ত্তী স্থানে লক্ষ্মণসেনের আলোচ্য শাসনখানি পাওয়া যায়।

তৃতীয় প্রমাণস্বরূপ এই অঞ্চলবর্ত্তী বানার নদের দুই পারের প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষগুলির উল্লেখ করিতে চাহি।

প্রথম প্রস্তাবেই উল্লেখ করিয়াছি, আলোচ্য তাম্রশাসনখানির প্রাপ্তি-স্থানের মাইলখানেক দক্ষিণ-পশ্চিমে রাজাবাড়ী নামক গ্রামে একটি প্রাচীন রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান। বাড়ীটি গড়খাই ঘেরা। গড়খাইর আয়তন ৭০৪ × ৪৪০ গজ। এই গড়খাইর মধ্যে চারিটি বড় বড় দীঘি আছে; গড়খাইর বাহিরে উত্তর-পশ্চিম কোণে আরও একটি বড় দীঘি আছে। কিন্তু এই স্থানের মাইলখানেক উত্তর-পূর্ব্বে যে মগ্‌গির দীঘির পাড়ে আলোচ্য তাম্র-শাসনখানি পাওয়া যায়, এই অঞ্চলের দীঘিগুলির মধ্যে আয়তনে উহাই সকলের অপেক্ষা বড়। মগ্‌গির দীঘির আয়তন ৩৪০ × ১০০ গজ।

ভাওয়াল অঞ্চলে রাজবাড়ীটি "চাঁড়াল রাজার গড়" বলিয়া বিখ্যাত। চণ্ডালজাতীয় প্রতাপ ও প্রসন্ন নামক দুই ভাই না কি এই অঞ্চলে যুক্তভাবে রাজত্ব করিতেন এবং এই রাজবাড়ী না কি তাঁহাদেরই রাজবাড়ী ছিল। প্রতাপ ও প্রসন্নের ভগিনীর নাম ছিল মগ্‌গি। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ঢাকা বিভাগের ভূতপূর্ব্ব কমিশনার মিঃ রেঙ্কিন আমাকে লইয়া মগ্‌গির দীঘি ও মঠ পরিদর্শন করিতে যান। মগ্‌গির মঠ

তখনও দণ্ডায়মান ছিল—এখন না কি উহার উপরে জাত বট-অশ্বত্থ গাছের ভারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে। মঠ দেখিয়া উহা বেশী দিনের পুরাতন বলিয়া আমার ধারণা জন্মে নাই মোগল ও প্রাগ্‌মোগল যুগের যে সমস্ত প্রধান কার্ণিশযুক্ত এক-কক্ষ মন্দির বিষ্ণুপুর ইত্যাদি স্থানে অদ্যাপি বর্ত্তমান, মঠটি সেই ধরণের ছিল। মঠটি দেখিয়া মনে হইল, প্রতাপ প্রসন্ন এবং মগ্‌গি যদি সত্যই কোন কালে বর্ত্তমান থাকিয়া থাকেন, তবে সেই কাল মোগল-যুগের বড় বেশী আগে হইবে না। ভাওয়ালে প্রাগ্‌মোগল যুগে গাজীবংশীয় জমীদারগণের উত্থানের ফলে প্রতাপ ও প্রসন্ন রাজ্যচ্যুত হইয়া থাকিবেন। অদ্যাপি ভাওয়াল অঞ্চলে প্রবাদ আছে, "চাঁড়ালের রাজত্ব আড়াই দিন।"

কিন্তু মগ্‌গির মঠের নিকটস্থ স্থান হইতে আলোচ্য তাম্রশাসনখানির আবিষ্কারে ব্যাপারটা একটু সন্দেহ-সমাকুল হইয়া উঠিয়াছে। রাজাবাড়ীর রাজবাড়ী প্রতাপ ও প্রসন্ন নামক অতি ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারীর কৃত কি না, সেই বিষয়ে স্বতঃই সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। এই তাম্রশাসনখানি দ্বারা বানার নদের তীরে ব্রাহ্মণকে ভূমিদান দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যায়, বর্ত্তমানে এই অঞ্চল যে প্রকার বিরল-বসতি ও জঙ্গলময়, সেন-আমলে সেই রকম ছিল না। আলোচ্য তাম্রশাসনের ত্রয়োদশ শ্লোকে দেখা যায়, রাজা ধার্য্যগ্রাম রাজধানীর নিকটেই যেন এই রকম বহু গ্রাম ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় তাম্রশাসন-প্রাপ্তি স্থানের অদূরে স্থিত রাজবাড়ীটি লক্ষ্মণসেনের ধার্য্যগ্রাম রাজধানীর রাজবাড়ী হওয়া অসম্ভব নহে। সেন-বংশের পতনের পর বিক্রমপুরস্থ রাজধানী ও রাজবাড়ী যে প্রকার পতিত অবস্থায় পড়িয়াছিল, এই ধার্য্যগ্রাম রাজধানীর রাজবাড়ীও হয় ত সেই অবস্থায়ই ছিল। প্রতাপ ও প্রসন্ন অভ্যুদিত হইয়া ঐ পরিত্যক্ত রাজবাড়ীই আত্মসাৎ করিয়া থাকিবেন। লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের ৬ষ্ঠ বর্ষ পর্য্যন্ত দেখা যায়, তাম্রশাসনগুলি বিক্রমপুর রাজধানী হইতে প্রচারিত হইতেছে। লক্ষ্মণসেনের তপনদীঘি, আনুলিয়া, বকুলতলা, গোবিন্দপুর এবং শক্তিপুর শাসন এইরূপে বিক্রমপুর রাজধানী হইতে প্রচারিত। কিন্তু রাজত্বের শেষ ভাগে পঞ্চবিংশ সম্বৎসরে মাধাইনগর এবং সপ্তবিংশ সম্বৎসরে বর্ত্তমান শাসনখানি যখন প্রচারিত হয়, তখন আর বিক্রমপুর রাজধানীর নাম পাই না,—পাই নূতন এক রাজধানী ধার্য্যগ্রামের নাম। ১২০২ খৃষ্টাব্দে ইখতিয়ারুদ্দিনের আক্রমণে পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গ মুসলমানের হাতে ছাড়িয়া দিয়া লক্ষ্মণসেন যখন পূর্ব্ববঙ্গে চলিয়া আসিতে বাধ্য হন, তখন হয় ত প্রাচীন রাজধানী আর নিরাপদ বিবেচিত হইতে পারে নাই। বানার-তীরে বনময় প্রদেশে, প্রয়োজন হইলেই তৎকাল পর্য্যন্ত মুসলমান-অনধিকৃত কামরূপ প্রদেশে সরিয়া যাইবার প্রশস্ত জলপথের উপরে এই রাজাবাড়ী নামে পরিচিত স্থানটিতে রাজধানী ধার্য্য হইয়া ধার্য্যগ্রাম নামে পরিচিত হইয়া উঠিয়া থাকিবে। বলা বাহুল্য যে, অধিকতর নির্ভরযোগ্য প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত ভাওয়ালের রাজাবাড়ীই রাজধানী ধার্য্যগ্রাম কি না, সেই বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যাইবে না। এই ধার্য্যগ্রামে সেন-রাজধানী বেশী দিন ছিল না। কারণ, লক্ষ্মণসেনের পুত্র কেশব ও বিশ্বরূপ সেনের শাসন দুইখানি ফল্গু-গ্রাম নামক নূতন রাজধানী হইতে প্রদত্ত। বিক্রমপুরের অন্যতম প্রধান জলপ্রণালী তালতলার খালের পাড়ে, পরস্পরের অদূরে অবস্থিত ধাইরপাড়া এবং ফেগুনাসার নামে দুইটি গ্রাম আছে। উহাই ধার্য্যগ্রাম এবং ফল্গুগ্রাম কি না, তাহাও বিবেচ্য।

যাহা হউক, রাজাবাড়ী ধার্য্যগ্রাম হউক আর না হউক, বানারের দুই তীর যে প্রাগ্‌মুসলমান যুগে এবং সুলতানী আমলে রাজধানী সুবর্ণগ্রামের যুগে বহুল জনবসতিপূর্ণ এবং মন্দির-দুর্গাদিপূর্ণ ছিল, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই শীতলক্ষ্যা বানারের জলপথ, সেই আমলে বাঙ্গালা দেশ হইতে আসাম অঞ্চলে যাইবার প্রধান ও প্রশস্ত জলপথ ছিল। কাজেই আসামের দিক্ হইতে শত্রুর আক্রমণ রোধ করিবার জন্য এই পথটি দুর্গাদি দ্বারা সুরক্ষিত করিতে হইয়াছিল। কাপাসিয়ার ৬ মাইল উত্তরে বানারের পূর্ব্বতীরে রাণীর ফোর্ট বা শাহবিদ্যার ফোর্ট বা দুরদুরিয়ার ফোর্ট নামে পরিচিত একটি বিস্তৃত দুর্গের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দেখা যায়। মিঃ রেস্কিনের সাহচর্য্যে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে যখন এই স্থান পরিদর্শন করি, তখন এক জন মুসলমান কৃষক বলিল, কয়েক বছর আগে মাটি খুঁড়িতে একখানি অক্ষর-খোদিত তামার পাত এই দুর্গাভ্যন্তরে আবিষ্কৃত হয়। আবিষ্কারকারী ভয় পাইয়া এই যাদুমন্ত্র-সম্বলিত তামার পাতখানি বানার নদে ফেলিয়া দেয়। এই তাম্রশাসনের আবিষ্কার হইতে বুঝা যায়, দুর্গটি প্রাগ্‌মুসলমান যুগের। দুর্গেরও শুধু চিহ্নটিই আছে, আর কিছুই নাই। মোগল আমলের কয়েকটি দুর্গ এই অঞ্চলে অদ্যাপি দেয়াল ইত্যাদি সহ প্রায় অভগ্ন দণ্ডায়মান। উহাদের অপেক্ষা এই চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট দুর্গটি যে কয়েক শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। দুর্গের বিপরীত পারের গ্রামটির নাম গোশিঙ্গা। এই স্থানে বানার গোশৃঙ্গের আকৃতিতে এমন চমৎকার ঢাকিয়া গিয়াছে যে, গ্রামটির এই নাম যিনি রাখিয়াছিলেন, তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টির প্রশংসা করিতে হয়। ডক্টর টেইলার-প্রণীত Topography of Dacca নামক বিখ্যাত পুস্তকের ১১২—১১৩ পৃষ্ঠায় রাণীর ফোর্টের বর্ণনা আছে। "গোশিঙ্গায় প্রাচীন কালে যে একটি সহর বর্ত্তমান ছিল, তাহার নানা চিহ্ন বিদ্যমান। গোশিঙ্গার কিঞ্চিৎ পশ্চিমে দুইটি বিশাল দীঘি বর্ত্তমান, বৃহত্তরটির আয়তন $\frac{3}{4} \times \frac{1}{4}$ মাইল। ডক্টর টেইলার লিখিয়াছেন :—(১১৪ পৃঃ) "গোশিঙ্গা হইতে প্রায় দুই মাইল পশ্চিমে দুইটি চমৎকার বিশালায়তন দীঘি বিদ্যমান। লোকে বলে, উহা ভূঞা রাজাদের খনিত। দুটি দীঘিই বেশ গভীর এবং সম্ভবতঃ ভূগর্ভস্থ নির্ঝরের সহিত যুক্ত।"

এই অঞ্চলের আর দুইটি প্রাচীন কীর্ত্তি উল্লেখযোগ্য। শীতলক্ষ্যা যে স্থান হইতে ব্রহ্মপুত্র হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে, তাহার সংলগ্ন গ্রাম টোকনগর সুপরিচিত স্থান। এই স্থানে ব্রহ্মপুত্র ভাওয়ালের দৃঢ়মৃত্তিক টিলাময় প্রদেশে প্রতিহত হইয়া হঠাৎ প্রায় সমকোণে দক্ষিণ হইতে পূর্ব্বাভিমুখী হইয়াছে। এই স্থানে টোকের বিপরীত পারে এগার-সিন্ধু (কেহ কেহ বার-সিন্ধুও বলে) নামক স্থানে একটি বেশ বড় আয়তনের দুর্গ প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। স্থানীয় প্রবাদ, দুর্গটি ঈশা খাঁ মসনদ্-ই-আলির প্রতিষ্ঠিত। আকবরের রাজত্বকালে ইনি ঢাকা, ময়মনসিংহ এবং ত্রিপুরা জেলার বিস্তৃত প্রকাণ্ড রাজ্যখণ্ড স্বাধীন ভূপতির মত শাসন করিয়া গিয়াছেন. ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে আমি স্বয়ং এগার-সিন্ধুর দুর্গ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া

দখিয়াছি। রাণীর ফোটের মত ইহারও চিহ্নমাত্রই অবশিষ্ট আছে, যদিও পূর্ব্বে ইহা বেশ বড় দুর্গ ছিল। রাণীর ফোটের মত এই দুর্গটিও হিন্দু আমলের বলিয়াই আমার মনে হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ঈশা খাঁ শেষ ইহার সংস্কার ও ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ। ইহার সহিত ঈশা খাঁর নাম যুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। দুর্গের বয়স যাহাই হউক, এগার-সিন্ধু নামটি যে অতি প্রাচীন, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এগারটি নদী এই স্থানে ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিয়াছে বলিয়া এই স্থানের নাম হইয়াছে এগার-সিন্ধু। সিন্ধু শব্দটির নদী অর্থে ব্যবহার সুপ্রাচীন কালের, সন্দেহ নাই। এগার-সিন্ধুর বিশ মাইল দক্ষিণে আড়িয়ল খাঁ নদীতীরে জনসমূহ যে আমলে পুরাণ বা কার্ষাপণ ব্যবহার করিত, সেই মৌর্য্য বা প্রাগমৌর্য্য আমলেই এই স্থানটি এগার-সিন্ধু নাম পাইয়া থাকিবে।

দ্বিতীয় প্রাচীন কীর্ত্তি, টোকের প্রায় চারি মাইল দক্ষিণস্থ কপাল সহর বা কপালেশ্বর নামক স্থানের মন্দিরাবলির ধ্বংসাবশেষ। রাজসাহীর ৮ মাইল উত্তর-পশ্চিমস্থ বিজয়সেন প্রতিষ্ঠিত প্রদ্যুম্নেশ্বর শিবের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ যেমন অধুনা পদুম সহর নামে পরিচিত, কপাল সহরও তেমনি কপালেশ্বর নামেরই বিকৃতি বলিয়া বোধ হয়। আমি ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে এই স্থানটি পর্য্যবেক্ষণ করি। ইহার বর্ণনা 'ঢাকা রিভিউ' পত্রিকার সপ্তম খণ্ডে ১৯১৭—১৮ খৃষ্টাব্দে ১২ ও পরবর্ত্তী পৃষ্ঠাসমূহে মদীয়—**Notes on Antiquarian Remains on the Lakshya and the Brahmaputra** নামক প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ প্রবন্ধ হইতে কপালেশ্বরের বর্ণনা অনূদিত করিয়া নিম্নে দিলাম।

"কপালেশ্বরের ধ্বংসাবশেষ টোকের পশ্চিমস্থ উলুসরা নামক গ্রামের ঠিক ৪ মাইল দক্ষিণে। নামটি শুনিয়াই বুঝা যায়, উহা একটি শিবের মন্দির ছিল এবং উহা প্রাক্-মুসলমান যুগের। চারিটি বেশ বড় বড় পুষ্করিণী এক লাইনে খুঁড়িয়া উহাদের তীরে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দুইটি দীঘিতে এখনও গভীর জল থাকে। সকলের উত্তরের দীঘিটিই সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণযোগ্য। দুর্গের প্রাকারের মত উহার পাড়গুলি উচ্চ। দীঘিটির পশ্চিম তীরে একটি বৃহৎ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। মন্দিরের দেয়ালগুলি ভাঙ্গা-চূরা ইটের বেশ মোটা রকমের সারি দ্বারা অদ্যাপি চেনা যায়। নানা স্থানে বেশ বড় বড় পাথরের খণ্ডসমূহ পড়িয়া আছে। স্থানীয় লোকে বলিল, তাহারা ছেলেবেলায় আরও অনেক পাথর দেখিয়াছে, সেগুলি মাটিতে ঢাকিয়া গিয়াছে। দিনাজপুর জেলায় দেবকোট বা বাণগড়ের ধ্বংসাবশেষ ভিন্ন ভগ্ন ইষ্টকখণ্ডের এত ছড়াছড়ি আমি আর কোথাও দেখি নাই। এই জনবিরল স্থানে পুরুষানুক্রমে অধিবাসী বড় নাই,—যে কয় ঘর আছে, সকলেই আগন্তুক। এক জন বুড়া বলিল, সে ছেলেবেলায় মুরব্বীদের মুখে শুনিয়াছে, এই সমস্ত মন্দির বল্লালসেন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।"

লক্ষ্মণসেনের রাজাবাড়ী শাসনের প্রদত্ত ভূমির সংস্থান এবং এই কপালেশ্বরের ধ্বংসাবশেষের সহিত বল্লালসেনের নাম বিজড়িত থাকা দেখিয়া মনে হয়, সেন-আমলে এই অঞ্চল এমন বিরলবসতি ছিল না এবং রাজাবাড়ী গ্রামের রাজবাড়ীটি লক্ষ্মণসেনের ধার্য্যগ্রাম রাজধানীর রাজবাড়ী হওয়া অসম্ভব নহে।

তাম্রশাসন দ্বারা দান করা গ্রামগুলির বর্ত্তমান অবস্থান-নির্ণয় সহজসাধ্য নহে। বল্লালসেনের কাটোয়া-শাসন দ্বারা প্রদত্ত গ্রামটি এবং চৌহদ্দিতে উল্লিখিত গ্রামগুলি অদ্যাপি অবিকৃত নামসহ বিদ্যমান। লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর-শাসনে যে বেতড় গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়, অদ্যাপি তাহা হাওড়া-শিবপুরের মধ্যবর্ত্তী সুপরিচিত স্থান। কিন্তু অধিকাংশ তাম্রশাসনে উল্লিখিত গ্রামই খুঁজিয়া খুঁজিয়া হয়রাণ হইতে হয়, তাহাদের কোন উদ্দেশই মিলে না। আলোচ্য শাসন-খানিতে তাম্রশাসনের প্রাপ্তিস্থানের অদূরে প্রদত্ত ভূমির সীমায় উল্লিখিত বানার নদের অস্তিত্ব অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকায় প্রদত্ত ভূমির সংস্থান-নির্ণয় করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইয়াছে। বানার নদটি প্রদত্ত ভূমির এক খণ্ডের উত্তর সীমা ছিল। বানার নদ কিন্তু এই স্থানে উত্তর-পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব-দক্ষিণে প্রবাহিত। কাজেই কোন ভূমির উত্তর সীমানারূপে উহাকে পাওয়া কঠিন,—যখন উহা বাঁকিয়া সোজা পূর্ব্ব দিকে প্রবাহিত হইয়াছে, তখনই উহাকে উত্তর সীমানা-রূপে পাওয়া সম্ভব হইয়াছে। তাম্রশাসনের প্রাপ্তিস্থান রাজাবাড়ী গ্রামের তিন মাইল পূর্ব্বস্থ কাপাসিয়া গ্রামের নিকট ঠিক তাহাই হইয়াছে, পূর্ব্বাভিমুখী এক প্রকাণ্ড বাঁকে নদটি বাঁকিয়া গিয়াছে। এই বাঁকের অভ্যন্তরস্থ গ্রামের নাম মানচিত্রে দেখা যায় সাফাইশ্রী। প্রথম প্রস্তাবে উল্লেখ করিয়াছি, বাগুন, আবৃত্তি এবং বস্তুশ্রী নামক চতুরকের অন্তর্গত মাদিসাহংস এবং বস্তমণ্ডল নামক গ্রাম এবং বানারের দক্ষিণস্থ আরও চারিটি খণ্ডক্ষেত্র আলোচ্য শাসনখানি দ্বারা ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত হইয়াছিল। বাগুন অধুনা বাড়ুন নামে পরিচিত, সাফাইশ্রী গ্রামের ঠিক তিন মাইল দক্ষিণস্থ। সাফাইশ্রী প্রাচীন বস্তুশ্রী নামের পরিবর্ত্তিত রূপ হওয়া অসম্ভব নহে। বস্তমণ্ডলই সম্ভবতঃ বর্ত্তমানে মান্দা নামে পরিচিত। মান্দা অথবা রায়মান্দা সাফাইশ্রী ও বাড়ুনের মধ্যবর্ত্তী।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী (এম-এ, পি-এইচ-ডি)।

পূর্ব্ববঙ্গে বর্ম্মণরাজগণ

পূর্ব্ববঙ্গে যে বর্ম্মণবংশীয় রাজগণ কিছুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা ঘটনা-পরম্পরায় নানা রটিকাবর্ত্তে লোকের স্মৃতি হইতে প্রায় মুছিয়া যাইবার মত হইয়াছিল। সাধারণে তাঁহাদের কথা মনে রাখে নাই, বিশেষজ্ঞেরাও তাঁহাদের কথা বিশেষ জানিতেন না। যে সকল জনশ্রুতি বিশেষজ্ঞেরা অলীক বলিয়া উপেক্ষা করিতেন, তাহা যে অলীক নহে, বেলাবে প্রাপ্ত একখানি তাম্রশাসন তাহা তার-স্বরে ঘোষণা করিয়াছে। এই বর্ম্মণবংশীয় রাজগণ কি প্রকারে পূর্ব্ব-বঙ্গে অর্থাৎ বঙ্গদেশে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা এ পর্য্যন্ত নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে জানিতে পারা যায় নাই। ইঁহারা যাদব-বংশীয়, সুতরাং ক্ষত্রিয়। ইঁহাদের আদি স্থান বা রাজধানী ছিল সিংহপুর। কেহ কেহ বলেন, এই স্থানটি ছিল আর্য্যাবর্ত্তের পশ্চিম সীমায় পঞ্চনদ প্রদেশের অন্তর্গত। বিখ্যাত চীন পরিব্রাজক হুয়েন্থ-সাং খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে সিংহপুরে গিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যে যদুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা সেই যদু বা যাদববংশ বলিয়া অনুমিত হয়। হিমালয় পর্ব্বতের অন্তঃপাতী লাক্ষামণ্ডল নামক স্থানে একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে জানা যায়, বর্ম্মণবংশের বার জন রাজা খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ

পর্য্যন্ত সিংহপুরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। যদুবংশ বা যাদব ক্ষত্রিয়গণ শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানের পর ভারতের নানা স্থানে বিভিন্ন দলে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে একদল যাদব হয়ত পঞ্চনদের সিংহপুরে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার সুদৃঢ় কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ঘটনাচক্রে কোন দিক্ দিয়া কে কোথায় পড়িয়াছিল, তাহা অনুমান করা কঠিন। এই বর্ম্মণ-রাজগণের মধ্যে যাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁহারা পঞ্চনদের প্রান্ত হইতে একেবারে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন, না, অন্য স্থান হইতে আসিয়াছিলেন, তাহা সঠিক নির্ণীত হয় নাই। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, রাজেন্দ্র চোল, দ্বিতীয় জয়সিংহ অথবা গাঙ্গেয়দেবের সহিত এই যাদববংশজাত বজ্রবর্ম্মা নামক জনৈক সেনাপতি উত্তরাপথের পশ্চিমার্দ্ধ হইতে পূর্ব্বাঞ্চে আসিয়া একটি নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ঢাকা জেলায় বেলাব গ্রামে আবিষ্কৃত বজ্রবর্ম্মার প্রপৌত্র ভোজবর্ম্ম দেবের তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, যাদবসেনার সমর-বিজয়-যাত্রাকালে বজ্রবর্ম্মা মঙ্গলস্বরূপ গণ্য হইতেন। রাখাল বাবুর এই সিদ্ধান্ত অনেকটা অনুমানমূলক। সিংহপুর কোথায়, সে সম্বন্ধে রাখাল বাবু দুইটি অনুমান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, হয় উহা হুয়েন্থ-সাং বর্ণিত সিংহপুরো অথবা উহা মালব রাজ্যের অন্তঃপাতী সীহোর। আবার রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় অনুমান করিয়াছেন যে, উহা লালবস্তু অর্থাৎ রাঢ়দেশের মধ্যে অবস্থিত মহাবংশে উল্লিখিত যে সিংহপুর আছে, ইহা সেই সিংহপুর। আবার জনৈক ঐতিহাসিক বলিয়াছেন যে, কলিঙ্গ দেশে সিংহপুর নামক একটি স্থান আছে। সিংহলের রাজা সাহসমল্ল (১২০০ খৃষ্টাব্দে) এই সিংহপুরে জন্মগ্রহণ করেন। অধ্যাপক হুলচ (Hultzsch) বলেন যে, বর্ত্তমান সময়ে চিকাকোল এবং নরসন্নাপেটার মাঝখানে যে সিংহপুরম্ আছে,—উহা সেই সিংহপুরম্। উহা বহু কলিঙ্গ-রাজগণের রাজধানী ছিল। এই সকল রাজার নামের শেষে পূর্ব্ববঙ্গের বর্ম্মণ-রাজাদিগের নামের সহিত "বর্ম্মণ" এই শব্দ দেখা যায়। যথা—

(১) চণ্ডবর্ম্মণ
(২) বিজয়নন্দী বর্ম্মণ
(৩) নন্দপ্রভঞ্জন বর্ম্মণ
(৪) উমাবর্ম্মণ

বংশধারা ক্রমে এই বর্ম্মণ রাজগণ কলিঙ্গের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তন্মধ্যে চণ্ডবর্ম্মণ এবং উমাবর্ম্মণের অনুশাসন (inscription) পাওয়া গিয়াছে। ইঁহাদের প্রদত্ত অনুশাসন বা প্রশস্তিতে কোন প্রাচীন বংশ হইতে উদ্ভূত, এ কথার উল্লেখ নাই। ইহাতে কোন সময়ের নির্দ্দেশ নাই। অর্থাৎ কোন্ সময় ঐ সকল শিলালিপি এবং তাম্রানুশাসন প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ নাই। তাহা হইলেও প্রত্নলিপির বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করিয়া বিশেষজ্ঞগণ স্থির করিয়াছেন যে, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে ঐ অনুশাসনগুলি লিখিত। সুতরাং ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বেই কলিঙ্গ দেশে এই বর্ম্মণ বা বর্ম্মা উপাধিযুক্ত রাজগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন, ইহা বুঝা যাইতেছে। কলিঙ্গ দেশ হইতে বর্ম্মণ-রাজগণের পক্ষে পূর্ব্ববঙ্গে আসা অসম্ভব ছিল না। সেন-রাজগণের আদিপুরুষ যখন কর্ণাট দেশ হইতে বাঙ্গালায় আসিয়া রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন, তখন বর্ম্মণ-রাজগণের পক্ষে কলিঙ্গ দেশ হইতে আসিয়া পূর্ব্ববঙ্গ জয় করা কখনই অসম্ভব হইতে পারে না। বেলাবে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে যে, সিংহপুর নগরে এক গৌরবযুক্ত রাজবংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল,—ইঁহারা বর্ম্মণ নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। এই রাজবংশেই বজ্রবর্ম্মণ জন্মিয়াছিলেন; মহাবাহু চণ্ডবর্ম্মণ এবং তাঁহার বংশধরগণ সকলেই বর্ম্মণ এই অভিখ্যা ধারণ করিতেন। সে জন্য অনুমান হয়, "বর্ম্মণ" ইঁহাদের বংশগত উপাধি ছিল। বজ্রবর্ম্মা সেই রাজকুলেই জন্মিয়াছিলেন। এই বজ্রবর্ম্মা যে এক জন বিখ্যাত বীর ছিলেন, তাহা ভোজবর্ম্ম দেবের তাম্রশাসন হইতেই জানা যায়; যথা—

> অভবদথ কদাচিদ্ যাদবানাং চমূনাং
> সমরবিজয়যাত্রামঙ্গলং বজ্রবর্ম্মা।
> শমন ইব রিপূণাং সোমবদ্বান্ধবানাং
> কবিরপি চ কবীনাং পণ্ডিতঃ পণ্ডিতানাম্॥

অর্থাৎ যাদবসেনার সমরবিজয়যাত্রার মঙ্গলস্বরূপ বজ্রবর্ম্মা জন্মিয়াছিলেন। ইনি শত্রুদিগের কাছে ছিলেন শমনের ন্যায় এবং বান্ধবদিগের নিকট সোম বা চন্দ্রের ন্যায়; কবিগণের মধ্যে বড় কবি এবং পণ্ডিতদিগের মধ্যে বড় পণ্ডিত। ইনি কোন সূত্রে আসিয়া পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। বহু ঐতিহাসিকই মনে করেন, ইনি রাজেন্দ্র চোলের সঙ্গেই তাঁহার সেনাপতিরূপে বাঙ্গালা দেশে আসিয়াছিলেন। রাখাল বাবু বলিয়াছেন যে, "বজ্রবর্ম্মা বোধ হয় কেবল হরিকেল বা চন্দ্রদ্বীপ অধিকার করিয়া নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তৎপূর্ব্বে জাতবর্ম্মা বঙ্গে যাদবপ্রতিভার পতাকা প্রতিষ্ঠিত।" এখন প্রশ্ন এই—হরিকেল কোথায়? রাখাল বাবু বলিয়াছেন, চন্দ্রদ্বীপ। এই হরিকেল যে ঠিক কোথায়, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। হরিকেলে অনেক হিন্দু এবং বৌদ্ধ-কীর্ত্তি ছিল। চন্দ্রদ্বীপের পশ্চিম দিকে হরিকেল নামক একটি স্থান ছিল, সেই জন্য সম্ভবতঃ সমস্ত চন্দ্রদ্বীপই হরিকেল নামে অভিহিত হইত। ইৎসিং বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের পূর্ব্ব-সীমায় হরিকেল নামে একটি বদ্বীপ ছিল। ইৎসিং হয়ত ঐ বদ্বীপকেই ভারতবর্ষের পূর্ব্ব-সীমা মনে করিয়া থাকিবেন। সেই সময় ঐ বদ্বীপের বা চন্দ্রদ্বীপের সহিত বঙ্গদেশ সমুদ্র দ্বারা বিচ্ছিন্ন ছিল। ইৎসিং বলিয়াছেন যে, ঐ স্থানে বহু বৌদ্ধ-কীর্ত্তি দেখা যাইত। শ্রীযুত বিনোদবিহারী রায় বেদরত্ন মহাশয় অনুমান করিয়াছেন যে, "যশোরই প্রাচীন হরিকেল।" তাঁহার ঐরূপ অনুমান করিবার বিশিষ্ট কারণ তিনি প্রদর্শন করেন নাই। কেবল এইমাত্র বলিয়াছেন, "এখানকার মৃত্তিকা খনন করিলে অনেক হিন্দু ও বৌদ্ধ-মূর্ত্তি পাওয়া যায়। এ অনুমান দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত নহে। হরিকেল ঠিক কোথায় ছিল, তাহা এখন বুঝা না; গেলেও উহা যে মোটামুটি চন্দ্রদ্বীপ, তাহা মনে করিলে ভুল হইবে না বলা যাইতে পারে।

বজ্রবর্ম্মা কোন্ সূত্রে বা কি উপলক্ষে পূর্ব্ববঙ্গে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় আজিও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। বেলাবের তাম্রশাসন পাঠ করিলে মনে হয়, তিনি যেন সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গকে আয়ত্তাধীন করিয়াছিলেন। সামরিক শক্তিতে তিনি এ কার্য্য সাধন

করিয়াছিলেন। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিকের অনুমান, বজ্রবর্ম্মা রাজেন্দ্র চোলের সঙ্গে এক জন বিশিষ্ট সেনাপতিরূপে আসিয়াছিলেন। এই অনুমান একেবারে অস্বীকার করিবারও কোন কারণ দেখা যায় না।

বজ্রবর্ম্মার পুত্র জাতবর্ম্মাও বিশেষ শৌর্য্যসম্পদের অধিকারী হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে সংশয় নাই। পিতার বিজিত রাজ্যকে তিনি সুদৃঢ় বনিয়াদের উপর স্থাপিত করিয়াছিলেন।

এই যদুবংশ যে একটি প্রসিদ্ধ বংশ, তাহা অস্বীকার করা যায় না। ইঁহারা যে শ্রীকৃষ্ণের যদুবংশ বা যাদববংশ-জাত, কোন তাম্রশাসনে এমন কথার উল্লেখ নাই, সম্ভবতঃ যদুবংশের প্রসিদ্ধি এত অধিক যে, তাহা বলিবার প্রয়োজন হয় নাই। ইঁহারা উচ্চবংশোদ্ভব না হইলে কলচুরি বা চেদিবংশীয় আভিজাত্য-গৌরবগর্ব্বিত কর্ণদেব জাতবর্ম্মাকে কখনও কন্যাদান করিতেন না। কর্ণদেব তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা বীরশ্রীকে জাতবর্ম্মার হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা যৌবনশ্রীর বিবাহ দিয়াছিলেন তৃতীয় বিগ্রহপালের সহিত। সুতরাং জাতবর্ম্মার সহিত তৃতীয় বিগ্রহপালের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। ইহা হইতে বুঝা যায়, বজ্রবর্ম্মা যখন পূর্ব্ববঙ্গ জয় করেন, রাজা মহীপাল (১ম) তখন গৌড়বঙ্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। মহীপাল খৃষ্টীয় ৯৭৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার পুত্র নয়পাল খৃষ্টীয় ১০২৬ অব্দ হইতে ১০৪২ অব্দ পর্য্যন্ত এবং তাঁহার পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপাল ১০৪২ হইতে ১০৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। বিগ্রহ পাল এবং জাতবর্ম্মা সমসাময়িক ছিলেন। ত্রিপুরীর কলচুরি-বংশীয় কর্ণদেবও ১০৪২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০৭২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

দিব্য এবং গোবর্দ্ধন নামক নরপতিদ্বয়কে সংগ্রামে পরাস্ত করিয়া জাতবর্ম্মা অঙ্গদেশে অধিকার-বিস্তার এবং কামরূপ জয় করিয়াছিলেন। ইঁহার সময়ে বরেন্দ্রভূমিতে কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল। ইনি গৌড়দেশ জয় করিয়া পরে হয়ত বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। সে সময়ে বঙ্গাধিপ জাতবর্ম্মা দিব্বোককেও পরাজিত করিয়াছিলেন। জাতবর্ম্মা অঙ্গদেশ বিজয় করিয়াছিলেন। রাখাল বাবু অনুমান করিয়াছেন, কর্ণদেব কিম্বা চালুক্যবংশীয় কুমার বিক্রমাদিত্যের সহিত তৃতীয় বিগ্রহপাল দেবের যে সময় যুদ্ধ হইয়াছিল, সে সময় বঙ্গেশ্বর গৌড়পতির পক্ষ অবলম্বন করেন। কৌশম্বীর অধিপতি গোপবর্দ্ধনকে জাতবর্ম্মা পরাজিত করিয়াছিলেন (রামচরিতে তাহা লিখিত আছে)। কামরূপের যে রাজাকে জাতবর্ম্মা সংগ্রামে পরাজিত করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম আজ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই।

জাতবর্ম্মার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শ্যামলবর্ম্মা বঙ্গদেশের সিংহাসন লাভ করেন। ইঁহার রাজত্বকালে বিশেষ কি ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। শ্যামলবর্ম্মা জগদ্বিজয় মল্লের মালব্য দেবী নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে বিশেষ কোন স্মরণীয় ঘটনা সংঘটিত হইলে তাঁহার পুত্র ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসনে নিশ্চয় তাহার উল্লেখ থাকিত। শ্যামলবর্ম্মার পুত্র ভোজবর্ম্মা সিংহাসন লাভের পাঁচ বৎসর পরে পৌণ্ড্রভুক্তির অন্তর্গত অধঃপত্তন মণ্ডলে কৌশম্বী এবং উপ্যালিকা গ্রাম রামদেব শর্ম্মা নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করেন। কৌশম্বীর নাম এখন কুশম্বা—ইহা রাজসাহী জিলায় অবস্থিত। "সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত পাঠে জানা যায়, পূর্ব্বদেশের বর্ম্মবংশীয় এক জন রাজা আত্মরক্ষার জন্ম আপনার হস্তী, অশ্ব এবং রথ রামপালকে দিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন। কি কারণে তিনি রামপাল দেবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা ঠিক জানা যায় না। দ্বিতীয় সেনবংশীয় সামন্তসেন বঙ্গদেশ অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গ অধিকার করিয়াছিলেন। খুব সম্ভব, সেই সময়ে বর্ম্মবংশীয় রাজা রামপালের শরণ লইয়াছিলেন।

ভোজবর্ম্ম দেবের বেলাব তাম্রশাসনে দেখা যায়, হরিবর্ম্ম নামধেয় যাদব বর্ম্মবংশে এক জন রাজা আবির্ভূত হন। কোন্ সময়ে ইনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা বলা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু ইঁহার সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত বহু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। "একখানি শিলালিপি, একখানি তাম্রশাসন এবং দুইখানি হস্তলিখিত গ্রন্থ হইতে হরিবর্ম্মা দেবের অস্তিত্ব-কথা জানা যায়।" এই শিলালিপিখানি উড়িষ্যার পুরী জেলায় ভুবনেশ্বর মন্দিরের প্রাঙ্গণে পাওয়া গিয়াছিল। ইহা এখন অনন্ত বাসুদেব প্রাচীরগাত্রে সংলগ্ন আছে। হরিবর্ম্ম দেবের মন্ত্রী ছিলেন ভবদেব ভট্ট। ইনি হরিবর্ম্ম দেবের পুত্রেরও পরামর্শদাতা ছিলেন। দ্বিতীয় ভবদেব ভট্ট রাঢ়দেশে একটি জলাশয় খনন করিয়াছিলেন এবং ভুবনেশ্বরে নারায়ণ অনন্ত এবং নরসিংহ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করাইয়াছিলেন। এই শিলালিপির অক্ষর সম্বন্ধে নানা পণ্ডিত নানা মতই প্রকাশ করিয়াছেন। ডক্টর ফিল হর্ণের মতে এই শিলালিপি অক্ষরের আকার দেখিয়া উহা খৃষ্টীয় ১২০০ অব্দের অক্ষর বলিয়া মনে হয়। স্বর্গীয় রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় ডক্টর ফিল হর্ণের মতই গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু লিপিবিদ্যা-বিশারদদিগের মধ্যে এ বিষয়ে গভীর মতভেদ দেখা যায়। এ সম্বন্ধে লিপিবিদ্যাবিশারদ ঐতিহাসিক স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন :—"বিগত চতুর্দ্দশ বর্ষের মধ্যে আর্য্যাবর্ত্তের উত্তর-পূর্ব্বার্দ্ধে বহু নূতন ক্ষোদিত লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, বহু রাজবংশের কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং ইতিহাসের বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের অক্ষরতত্ত্বের আলোচনা কালে এখন আর বুলার বা ফিল হর্ণের নাম গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের অতি প্রাচীন সিদ্ধান্তগুলি প্রমাণরূপে গ্রাহ্য করা চলিবে না। শিলালিপির সহিত শিলালিপির এবং তাম্রশাসনের সহিত তাম্রশাসনের তুলনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, বিহারে আবিষ্কৃত রামপালের দ্বিতীয় এবং দ্বিচত্বারিংশ রাজ্যাঙ্কের শিলালিপি অপেক্ষা ভট্ট ভবদেবের প্রশস্তি প্রাচীন এবং কমৌলিতে আবিষ্কৃত বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন অপেক্ষা হরিবর্ম্ম দেবের তাম্রশাসনের অক্ষর প্রাচীন।"—(বাঙ্গালার ইতিহাস প্রথম খণ্ড ৩০৩—৩০৪ পৃষ্ঠা)।

এই হরিবর্ম্ম দেব কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদিগের মধ্যেও মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। শেষে রাখাল বাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—"তবে ইহা স্থির যে, হরিবর্ম্ম দেব শ্যামলবর্ম্মা অথবা ভোজবর্ম্মার পরবর্ত্তী কালে আবির্ভূত হন নাই এবং বজ্রবর্ম্মার পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক ও শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মতে হরিবর্ম্মা ভোজবর্ম্মার পরবর্ত্তী; শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বসুর মতে তিনি বজ্রবর্ম্মারও পূর্ব্ববর্ত্তী"—এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত করা কঠিন। সে-জন্য আমি ইহার কাল-নির্ণয় বিষয়ে বিশেষ কোন মত প্রকাশ করিলাম না।

বর্ম্মণ উপাধি যে কেবল পূর্ব্ববঙ্গের এই যাদববংশেরই রাজগণের ছিল, তাহা নহে। নিধানপুরে কামরূপরাজ ভাস্করবর্ম্মার এক তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাতে কামরূপের ভগদত্তবংশীয় রাজগণের পরিচয় পাওয়া যায়। ইঁহারা ভগদত্তবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। মৌখরী রাজবংশের অনেকগুলি রাজার বর্ম্মা উপাধি ছিল। যথা হরিবর্ম্মা, আদিত্যবর্ম্মা, যজ্ঞবর্ম্মা, শার্দ্দূলবর্ম্মা ইত্যাদি। কামরূপের ভাস্কর বর্ম্মার বংশ যাদববংশ নহে,—কারণ, ভগদত্ত যাদববংশীয় ছিলেন না। বর্ম্মা উপাধি ক্ষত্রিয়মাত্রেই গ্রহণ করিতে পারেন। যেমন "শর্ম্মা" উপাধি ব্রাহ্মণমাত্রেই গ্রহণ করিয়া থাকেন। হরিবর্ম্মার বংশধরগণই যে কেবল বর্ম্মা উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, ইহা মনে করা ভুল। ইঁহারা কলিঙ্গদেশের সিংহপুর হইতে রাজা রাজেন্দ্র চোলের আমলে বঙ্গদেশ বা পূর্ব্ববঙ্গে অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন;—ইহাই অধিকাংশ ঐতিহাসিকের অনুমান।

ইহা অনেকটা সম্ভব বলিয়া মনে হয়। এই রাজবংশের অনেক কাহিনী লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অনুসন্ধানের ফলে যদি তাহার পুনরুদ্ধার হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালা দেশের ইতিহাস সম্পূর্ণ জানা যাইবে। কলিঙ্গদেশের সিংহপুরের যাদববংশীয় রাজারা বর্ম্মণ উপাধিতে আত্মপরিচয় দিতেন,—এবং পূর্ব্ববঙ্গের বর্ম্মবংশীয় রাজগণ যাদববংশীয় এবং বর্ম্মণবংশীয় বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেন। ইহা হইতেই অনুমিত হইতেছে যে, ইঁহারা কলিঙ্গদেশের রাজগণেরই শাখা। ইঁহাদের আমলে পূর্ব্ববঙ্গের বিশেষ কোন উন্নতি সাধিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। ইঁহাদের কীর্ত্তিও খুব অধিক নাই। ইঁহাদের আদিস্থান সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কিন্তু অনেকের মতে ইঁহারা কলিঙ্গ হইতে আগত। এ সম্বন্ধে আর অধিক বলা অনাবশ্যক। কাহারও কাহারও মতে ইঁহারা পঞ্জাব অথবা মালবের সিংহপুর হইতে আগত,—কিন্তু সে কথা বিচারসহ নহে।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

নদী এলো বান

[চীনা গল্প]

[এ গল্পটি লিখিয়াছেন চীনের মহিলা লেখিকা কিঙ-লিঙ্। কিঙ্-লিঙের লেখার আদর চীনে যেমন, বিদেশেও তেমনি। হুনানের চাংতে গ্রামে দরিদ্র-পরিবারে তাঁর জন্ম। বহু-কষ্টে তিনি লেখাপড়া শিখিয়াছেন। পাঠ্যাবস্থায় চীনের বিদ্রোহ-আন্দোলনে তিনি যোগ দেন; এবং বিদ্রোহ-সম্পর্কে বহু গল্প লেখেন। বিদ্রোহী দলের অন্যতম অধিনায়ক হু-ইয়ে-জিনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। স্বামীর এবং স্বামীর সহযোগী শোঙ্-শুঙ-ওয়েনের সঙ্গে দীর্ঘ কাল তিনি সাংহাইয়ে ছিলেন। তাঁদের বন্ধুত্ব এবং সহযোগিতা চীনের নব-জাগরণের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। কম্যুনিষ্ট-নিগ্রহের সময় হু-ইয়ে-জিন নিহত হন; এবং কিঙ্-লিঙ্ বন্দী হন। এখনো তিনি নান্‌কিঙে বন্দিনী।

কিঙ্-লিঙ্ বহু গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তার মধ্যে ওয়েই হু; আত্মঘাতীর ডায়েরি; পুরুষের জন্ম-তিথি; এবং শা-ফেইয়ের দিন-নাম্‌চা—এ বই ক'খানি পৃথিবীর নানা ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে।

এ গল্পটি চীনার ইংরেজী-অনুবাদ হইতে সঙ্কলিত]

আশ-পাশের গাঁ থেকে আত্মীয়-কুটুম্বের দল সবাই এসেছে। ঘরে বসে সকলে কথা হচ্ছিল।

অন্ধকার ঘর। খড়ে-ছাওয়া। খোলা দ্বার দিয়ে মলিন চাঁদের ফিকা-নীল জ্যোৎস্না এসে ঘরে পড়েছে।

লাঙ্-ইয়াঙয়ের বয়স পাঁচ বছর। মাথাটি সদ্য কামানো। মা'র কোলে মাথা রেখে চুপ করে সে শুয়ে আছে—দু' কাণ খাড়া—কি কথা হচ্ছে, তার সব সে শুনতে চায়, এমনি তার ভাব! সব কথা সে বোঝে না, এ-সব কথা শোনবার দরকারও তার নেই, তবু শুনছে!

দূরে একটা কুকুর থেকে-থেকে ডেকে উঠছে—যেন ভয়ের আর্ত্ত রব! হঠাৎ জাগলো জলো বাতাসে দম্‌কা বেগ! সে বেগে যেন আক্রোশের রেশ!

—শুনছিস সকলে? ঐ···কান্নার শব্দ, দূরে কে কাঁদছে!

—কৈ, না!

—চুপ কর্ দিকিনি, এখনি শুনতে পাবি!

পাঁচ জনে কথা হচ্ছিল। তাদের কাছাকাছি বসে আছে গাঁয়ের দিহু। এ সব কথা দিহুর কাণে যাচ্ছে না···আপন-মনে দিহু বলছে,—কি যে তোমার মনে আছে, কি যে করবে ঠাকুর! গণকে বলেছে, এ-বছরটা আমার খুব খারাপ! ও-পাশের গাঁ বানে ডুবেছে···শুনে আমি শিউরে উঠেছি। ও বান আমাদের গাঁয়ে আসবে না কি? এত সব বিপদ-আপদ···আমার এটা-ওটা সব নিয়ে যাচ্ছে···আমায় ছুঁতে জানে না! আরো কত কাল বাঁচবো? মরণকে আমি ভয় করি না! এত ঝড়-জল সয়েও বেঁচে আছি, আশ্চয্যি! আবার কোন্‌টা কোন্ দিক্ থেকে সরে যাবে, এই ভয়ে কাঁটা হয়ে আছি।

পাড়ার ফুঙ্-গিন্নী বললে—ছেলে বলো, নাতি-নাতবৌ বলো, অদেষ্ট বাছ-বিচার করে না, পিসি! যাকে খুশী, আর যখন খুশী, টেনে নিয়ে যায়!

দিহু বলে উঠলো—চুপ, চুপ! ওরে, এরা ছেলেপুলে নিয়ে বাস করে। এদের ভয় হবে তোর কথা শুনে!

একটি মেয়ে বললে—রাত হয়েছে। দিহুকে শুইয়ে দে, হাই।

হাই বললে—চলো দিহু, শোবে। অনেক রাত হয়েছে।

দিহু বললে—না, আমি শোবো না। ওরা এখনো ঘরে ফিরলো না! ওরা আসুক। কতক্ষণে যে ফিরবে, কে জানে! কোথায় সব আছে, তাও কেউ জানে না! কারো সাড়া-শব্দ পাচ্ছি কি যে জানতে পারবো?

—তোমার কি মনে হয় দিহু, আজ রাত্রে আমাদের গাঁয়ে বান আসতে পারে?

—কি করে বলবো, বল্? বুদ্ধ-ঠাকুর কি তা বলে দেবেন? এত তাঁকে ডাকছি!

এক জন কিশোরী চড়া-গলায় বলে উঠলো—রাখো দিদু তোমার বুদ্ধ-ঠাকুর! আমাদের ডাক তোমার ঠাকুর কবে শুনেছে, বলতে পারো? বান এসে নিত্যি সকলের ক্ষেত-খামার ঘর-বাড়ী ধুয়ে নিয়ে যাচ্ছে—এত তাকে ডাকছি, শুনেছে কখনো? বছর-বছর বাঁধ বাঁধতে সকলের জান বেরিয়ে যাচ্ছে···বুদ্ধ-ঠাকুর চুপ করে আছে! কোনো বছর এ বান বন্ধ করলো না তোমার ঠাকুর! আমি বলি, দাও তোমার ও মরা-ঠাকুরকে জলে ভাসিয়ে।

জিভ কেটে দিদু বললে—ও-সব কথা বলতে নেই রে তা-ফু! যে ঠাকুর চোখে দেখতে পায় না, আমাদের হাতে পড়ে আছে, তাকে জলে দেবার কথা বলতে নেই!

তা-ফু বললে—আমি বলছি দেখে নিয়ো দিদু, এত তো তোমার ঠাকুরকে তুমি ডাকছো, এবারও তোমার ঠাকুর হেলবে না, বান এসে সব ধুয়ে মুছে দেবে!

দিদু জবাব দিলে না! ঘরে কারো মুখে আর কথা নেই। সকলে চুপ করে আছে। কে যেন আসছে তার সর্ব্বগ্রাসী হাত তুলে··· সে যেন কাকেও ছাড়বে না! সেই ভয়ে সকলে একেবারে কেঁচো!

নিশ্বাস ফেলে দিদু বলতে লাগলো,—সে কত বছর আগে মনে পড়ে না—আমি তখন কত বড়? ঐ লুঙ-এর···ওর বয়সী। জানিস, এমন দিন এলো যে, সকলে মাটী আর গাছের ছাল খেয়ে দিন কাটিয়েছে···মুখে দিতে আর-কিছু জোটেনি! আমাদের অত বড় সংসার···দেখতে-দেখতে সব যেন ছায়ায় মিলিয়ে গেল! আমি একা রইনু! কি করে যে সব গেল!···মড়কে পট-পট করে সব মরতে লাগলো···যেন ঝড়ের ঝাপ্টায় গাছ থেকে ফুল-পাতা ঝরে পড়ছে! ···কে কাকে বার করে নিয়ে যায়, লোক মেলে না! আমার মাসী আর খুড়ো শিয়েন···তারাও রইলো না, চলে গেল! আমার বয়স তখন সাত বছর! সেই সাত বছর বয়স থেকে আজ আমার বয়স হলো সাতষট্টি! এ ষাট্ বছর কি করে যে কেটেছে! লোকের বাড়ী দাসীবৃত্তি করেছি, বুঝলি, সেই একটুখানি বয়স থেকে! একটু এদিক্-ওদিক্ হয়েছে, ধরে কি মারটাই না মেরেছে! তার পর···

দিদুর কণ্ঠ মৃদু হয়ে এলো এবং সে মৃদু কণ্ঠ বয়ে দীর্ঘ ষাট বৎসরের যত ব্যথা, যত বেদনা, যত আশা, যত নৈরাশ্য ভেসে চললো!

তার পর কণ্ঠ আবার যেন সতেজ! দিদু বলতে লাগলো,—বিয়ে হলো! স্বামী ভালোই ছিল! কথার মানুষ! ছেলেও ছিল তার বাপের মতো তেমনি। তারাও চলে গেল এই চোখের উপর দিয়ে! দাঁড়িয়ে আমি দেখলুম···বুঝলি ইউয়েন···আমার জন্য নয়—এ কথা বলছি তোরা বুঝবি,···তোদের মনে আজ কত সাধ, কত আশা! ও-বয়সে আমার মনেও কম সাধ, কম আশা ছিল?··· রোজ রাত্রে শুতে যাবার সময় ভেবেছি, কাল উঠে দেখবো পৃথিবীর রঙ বদলেছে···এমনি একটানা দুঃখ মানুষ পায় কখনো?··· আশা নয়, সে স্বপ্ন! স্বপ্ন যেমন মিলিয়ে যায়, আমার নিত্য-রাতের আশা পরের দিন মিলিয়ে যেতো! আবার আশা করতুম···সে আশাও মিলতো! বুঝলি মিঙ, পৃথিবীতে ভালোর মানে বোকা! এর পর আমি চলে যাবো···তবু যেমন পৃথিবী, ঠিক তেমনি থাকবে··· এমনি দুঃখ, দুর্দ্দশা! এ-সব আর কোনো দিন ঘুচবে না!

জোর-গলায় মিঙ্ বলে উঠলো—এমনি থাকবে কি, দিদু···পৃথিবী এর চেয়েও বিশ্রী হবে, নোংরা হবে। ইচ্ছেও তাই! ভালো কোন্‌খানটা?

বাইরে একটা কুকুর ঘেউ-ঘেউ করে ডেকে উঠলো···দিদু বললে —কে এলো রে?

কথার সঙ্গে ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো জোয়ান এক জন পুরুষ। পুরুষ বললে—কি হচ্ছে সব বসে?

এ কথার জবাব কেউ দিলে না। দিদু বললে,—শান-ইয়ে এলি! কি খপর তোদের? বাঁধ সব ঠিক আছে তো? নদীর জল?

শান্-ইয়ে বললে—অন্ধকারে সব ঘরে বসে আছো···ভূতের মতো! পিদীম নেই? অন্ধকার ঘর! সব ভেবেছো কি যে, মেঘলা আকাশ-খানা মাথায় ভেঙ্গে পড়বে?

দিদু বললে—ঘরে তেল বাড়ন্ত রে! দু'টো বাতি আছে ঘরে··· ঠাকুর-ঘরে আলো দিতে হবে তো···ঠাকুরের পূজো আছে!

মিঙ্ বললে—কারো সাড়া-শব্দ পাচ্ছি না মোটে! জলের খপর কি?

শান্-ইয়ে বললে—পাশেই তাঙ্ গাঁ···সে গাঁ ভেসেছে! গাঁয়ের বাঁধ ছিল পল্‌কা···সময় থাকতে কেউ নজর দ্যায়নি···দেখতে-দেখতে গাঁ একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে! যে-তোড়ে জল ঢুকছে···সাবাড় হয়ে গেল বলে!

হাই বললে—এখানকার খপর কি?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনি! আমার শুয়োরগুলো না তুলে চলে এসেছি।

শান্-ইয়ে বললে—বলা শক্ত। তাঙ্ গাঁ ভাসিয়ে জল যদি ওর উপর দিয়ে পূব-দিকে চলে যায়, তাহলে আমাদের ভয় নেই! কিন্তু জলের বেগ···বলা যায় না তো!···ওরে তা-চু,—ও এর-ফু··· তোরা এখানে! আয়, আয়, তোদের চার-চারটে হাত···তাতেও ঢের কাজ পাবো! আরো লোক চাই। আয়, আয়···বাঁধে যদি একটু ফাট ধরে, তা হলে আর কোনো আশা থাকবে না, সব যাবে!

শান-ইয়ে চললো। তা-ফু, এর-ফু তারাও ঘর থেকে বেরুলো।

মেয়েদের কণ্ঠে আর্ত্ত নিবেদনের একটা মিশ্র ঝঙ্কার···

সে ঝঙ্কার শুনে শান-ইয়ে বললে—এখন থেকে কান্নাকাটি শুরু করো কেন? ঐ তো মেয়েদের দোষ!···তা-ফাও, তুমিও এসো। আর এর-শান্, তুমিও! ছোট হলেও ওদের চোখে-কাণে তেজ আছে···তোমরা যেমন দেখবে-শুনবে, আমরা কি তেমন পারবো! লাও-ইয়াঙ্···না, তুই থাক···তোর অসুখ শরীর। তোর আর গিয়ে কাজ নেই। তুই ঘরে থাক্!

চকিতে ক' জনে চলে গেল। ঘরে জমাট-স্তব্ধতা।

শান্-ইয়ের বৌ তা-ফু! সে বলে উঠলো,—আমিও যাবো··· শান-মু, তুই থাক···ফু-ফু নেহাৎ কচি! ওকে তুই দেখবি···লুঙ-এর ···তুইও থাক্ মা···

বাইরে জলো বাতাস···সে বাতাসে দুরন্ত বেগ। ঘরের মধ্যে সকলে নিস্পন্দ নিথর!

দিদু বললে—আমি জানি, এই বিপদে আমরাই মরবো। যাদের টাকা আছে, তাদের আবার বিপদ কিসের? চিরদিনই দেখছি, যাদের টাকা-পয়সা আছে, তারা এ বানকে ভয় করে না। বানের জলে আমাদের সব যায়, আর তারা দেখে তামাসা! এক বার বুঝলি, সে অনেক দিনের কথা···খুব বান এলো···আমি তখন পণ্ডদের বাড়ী কাজ করি। ওঃ, সব খুইয়ে কাতারে-কাতারে লোক এসে দাঁড়ালো পণ্ডদের দোরে···ভাত চাই, কাপড় চাই! আহা, বেচারা সব ভিখিরীর মতো! পণ্ডের ছেলেমেয়েরা বাগান-বাড়ীতে গেল···সে বাড়ীর ছাদ থেকে বানের জল দেখতে। যত ফশল পণ্ড সাহেব নিজের খামারে টেনে টেনে জড়ো করলে। তার পর সেই ফশল পাঁচ-গুণ সাত-গুণ বেশী দামে বেচে লাখো টাকা ঘরে তুললে। যার অনেক আছে, ঠাকুর তাকেই আরো বেশী-বেশী ঢেলে দেন! তেলা মাথায় তেল দেওয়া ঠাকুর-দেবতাদেরও স্বভাব! আমরা দুঃখী-কাঙাল গরীব···কিছু নেই, তবু আমাদের নিয়ে তাঁর টানাটানি চলেছে পৃথিবীর সেই গোড়ার দিন থেকে!···এত বয়স হলো, বরাবর দেখছি, যারা ধনী, তাদের ধন বেড়েই চলেছে! আর যাদের নেই, তাদের অভাব আর কোনো দিন ঘুচলো না!

হঠাৎ বাইরে অস্ফুট আর্ত্ত চীৎকার,—জল—জল!···সামাল, সামাল ভাই সব!···

বাতাসের বেগ বাড়লো···

ঘরের মধ্যে দারুণ চাঞ্চল্য!

সকলে চীৎকার করে উঠলো,—ওরা যদি যায়, আমরা কার মুখ চেয়ে বসে থাকবো? আমরাও যাবো···যতক্ষণ তবু পারি···

বাহিরে ঝড়ের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে সকলে ছুটলো, ঝড়ের মতো অস্থির উদ্দাম গতি!

পথের কোথায় ক'টা কুকুর ছিল, কি তাদের হলো, আর্ত্ত-রবে দিগন্ত মুখরিত করে তুললো! তাদের সে আর্ত্ত-রবে ভয় পেয়ে ছেলে-মেয়েরা উঠলো কেঁদে! মেয়ের দল জলস্রোতের মতো পথ বয়ে চলেছে···ওদিকে পুরুষদের কণ্ঠে যেন বজ্রনাদ উঠেছে!

—বাঁধ···বাঁধ···মাটী···মাটী নিয়ে এসো!

—শীগগির···শীগগির!

—ঐ ধসেছে ওদিক্···পশ্চিম···পশ্চিম দিক্!

—আলো···আলো···আলো! মশাল জ্বালো···মশাল!

পিঁপড়ের মতো মানুষের সার! জ্বলজ্বলে মশালের আলোয় দেখাচ্ছে যেন ওখানে কি মরণ-যজ্ঞ চলেছে! ঝড়ের বেগ আরো···আরো তীব্র! গাছপালা ভেঙ্গে পড়ছে মাটীর বুকে! আর দিগন্তব্যাপী কালোর পাথারের বুকে ঢেউয়ের উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল অট্টহাসির সাদা ফেনা! ভীম ভয়ঙ্কর-নাদে প্রলয়-হুঙ্কার তুলে ছুটেছে জল···তার গতি উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল!

যেন মরণের দামামা বাজছে! লোকজনের মুখে চীৎকার—গেল···গেল···গেল···গেল···

—জল···জল···জল···

—পালা···পালা···শেঙ্-ফু···লু-ফু···

জলের সে বেগ রুখে দাঁড়ানো যায় না! বাঁধের মাটী খুলে ঝরে ধুয়ে-মুছে কোথায় সরে চলেছে···জল-তরঙ্গ সে-মাটীকে নিমেষে চূর্ণ করে গিলে গ্রাস করছে যেন!

মাথার উপর আকাশের বুকে মেঘের ছুটোছুটি! তারা যেন নীচে এই মরণ-নৃত্য দেখে নিজেদের আর ধরে রাখতে পারছে না!

তারাও সুরু করেছে আকাশের বুকে এমনি উদ্দাম নৃত্য! ভয়ে চাঁদ মেঘের আড়ালে লুকিয়েছে···নক্ষত্রগুলো জ্বলতে-জ্বলতে প্রদীপের শিখার মতো দপ্ করে ঐ নিবে গেল!

আকাশ আর পৃথিবী জুড়ে অন্ধকার···মিষ-কালো জমাট অন্ধকার! সে অন্ধকারের বুকে জল-তরঙ্গ···অট্টহাসির বিপর্য্যয় সাদা রেখা···প্রলয়-ছন্দে পৃথিবী দুলছে!

পরের দিন সকাল বেলা!

ঝড় থেমে গেছে। বানের জল গেছে নেমে। আকাশে চিরদিনের সেই সূর্য্য! নীচে পৃথিবীর বুকে শুধু ধূ-ধূ কাদা-মাটী···সে মাটীর বুকে গাছ নেই, পাতা নেই, ক্ষেত নেই, খামার নেই, কিছু নেই! দূরে উঁচু পাড়ের উপর একখানি পাতার কুঁড়ে···যেন কোন্ অতীত যুগের পৃথিবীর শেষ-স্মৃতির চিহ্ন! সে কুঁড়ের নিরালা ঘরে বসে বুড়ী দিদু···একা···বিড়-বিড় করে বকছে,—এ প্রাণ কে চেয়েছিল, ঠাকুর! বারে-বারে এসে সকলকে নিয়ে যাচ্ছো, আমায় শুধু ফেলে রাখছো···কেন? কেন? কেন?

শ্রীবৈকুণ্ঠ শর্ম্মা

কিন্তু

সব আয়োজন হয়েছে পূর্ণ, সামান্য কিছু বাকি।
সুরে-বাঁধা বীণা কোথায় যেন সে একটু বেসুরো বাজে,
রজনীগন্ধা ফুটেও ফোটে না তিমির-কোমল সাঁঝে;
'কিন্তু' কথারে সৃজিল কোনও দীর্ঘসূত্রী না কি!

আবেগ-উৎস রুধিল কত যে কিন্তু-পাষাণ-ভার।
দার্শনিকের চিন্তার পথে গড়েছে পুরু দেয়াল,
পূর্ণচন্দ্র ঢেকেছে হঠাৎ রাহুর ছায়া করাল;
করমের মাঝে চমকি' সাধক গুটায়েছে হাত তার।

ছিন্নতন্ত্রী সঙ্গীত কত হয়েছে কুক্ষিগত।
প্রীতির প্রেরণা, নব প্রেমধারা শুকায় তীব্র তাপে,
ফুল্লজীবনে ঝরিয়াছে ফুল আচম্বিত অভিশাপে;
মদির আবেশ-পূরিত বক্ষ সহসা মরণাহত।

ঘেরি' চারি পাশ প্রতি পলে পলে নাগপাশে বেড়ী দিয়া
জীবনবৃত্ত ক্ষুদ্র চিত্ত আনিছে সঙ্কুচিয়া।

শ্রীরাধারমণ গোস্বামী

স্বপ্ন-দর্শন

ডক্টর ফ্রয়েড বলেন, আমাদের সব স্বপ্নই বাসনা-মূলক (**Every dream is the fulfilment of a desire**)। আজ তাঁহার সেই কথাটুকু বুঝিবার চেষ্টা করিব।

মানুষের বাসনার সীমা নাই। এই সকল বাসনাকে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারি। (১) জ্ঞাত বাসনা; (২) অজ্ঞাত বাসনা। ইংরেজীতে যাহাকে **Unconscious desire** বলে, আমরা তাহাকে অজ্ঞাত বাসনা বলিতেছি। আমার অর্থ-লাভ হোক, আমি পরীক্ষার পাশ করি—এগুলি আমার জ্ঞাত বাসনা। যে-বাসনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা সচেতন—তাহাকে বলিব জ্ঞাত বাসনা। একটি ছেলে অসুস্থ। তার আম খাইবার ইচ্ছা হইল। অসুখ বাড়িবে ভাবিয়া মা তাহাকে আম খাইতে দিলেন না। রাত্রে ছেলে স্বপ্ন দেখিল, আম-বাগানে গিয়া পেট ভরিয়া সে আম খাইতেছে। এ স্বপ্নে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। ছেলেটি নিজেও বিস্মিত হইবে না। দিনের বেলায় যে-জিনিষ পাইবার জন্য সে বাসনা করিয়াছিল, রাত্রে তাহারই স্বপ্ন দেখিল।

কিন্তু এমন অনেক স্বপ্ন আমরা দেখি, যে-স্বপ্নে আমাদের বিস্ময়ের অন্ত থাকে না।

ধরুন, এক জন লোক স্বপ্ন দেখিল, বন্ধু-পত্নীর সহিত সে নিবিড় আলাপে মগ্ন। হঠাৎ জাগিয়া সে বিচার করিতে বসিল, এ কি? বন্ধুপত্নীর সম্বন্ধে এমন চিন্তা আমি কখনও মনে আনি নাই, তবে এমন স্বপ্ন কেন দেখিলাম?

আমাদেরও প্রশ্ন, কেন এমন হইল? আমাদের প্রত্যেকটি স্বপ্ন যদি কোন-না-কোন বাসনার প্রতিবিম্ব বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে স্বপ্নে এমন ব্যাপার আমরা কেন দেখি—জাগ্রত অবস্থায় যাহার সম্বন্ধে চিন্তাও করি নাই? এ-লোকটিও জাগ্রত অবস্থায় বন্ধু-পত্নীর সম্বন্ধে কোন কামনাই মনে স্থান দেয় নাই, তবু সে এমন স্বপ্ন কেন দেখিল?

এ প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর—অজ্ঞাত বাসনা। এই অজ্ঞাত বাসনার অর্থ,—এমন অনেক বাসনা আমাদের মনে উদয় হয়—এত গোপনে, এমন ভীত-কুণ্ঠিত ভাবে যে সে-বাসনার কথা খুব অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছেও প্রকাশ করিয়া বলিতে আমাদের লজ্জা হয়! এমন কি, নিজের কাছেও এই সব বাসনার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে আমরা কুণ্ঠিত! আমাদের জন্মগত শিক্ষা, চরিত্র ও জীবনের আদর্শ হইতে এ-সব বাসনা এত বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ যে, এমন কোন বাসনা ঘৃণাক্ষরে মনে জাগিলে সাধারণতঃ আমরা সে-দিকে লক্ষ্য দিই না; বরং যত শীঘ্র পারি এমন বাসনাকে সমূলে চাপিয়া চিন্তাস্রোত ভিন্ন দিকে ফিরাই। এই সব বাসনার চিন্তায় আমরা বিরত হই! কাজেই এ-সব বাসনা আমাদের মনে বেশীক্ষণ থিতাইতে পারে না। তাই ইহাদের অস্তিত্বও আমরা অতি শীঘ্র ভুলিয়া যাই। এ-সব বাসনাকে আমরা অজ্ঞাত বাসনা বলিব। ইহাদের অস্তিত্ব আমরা মনের কোণেও রাখি না। এমন বাসনা কখনো করিয়াছি কিম্বা এমন বাসনা কখনো মনে উদিত হইয়াছিল কি না, তাহাও আমাদের স্মরণে থাকে না। ইহাদের পূর্ব্ব-অস্তিত্ব আমরা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যাই। সে-জন্য স্বপ্নাবস্থায় এরূপ কোনো বাসনার উদয় হইলে আমরা আশ্চর্য্য হই। মনে করি, ডক্টর ফ্রয়েড যা বলেন, প্রত্যেক স্বপ্নই বাসনার প্রতিবিম্বমাত্র—তা তবে ভুল!

পূর্ব্বোক্ত লোকটি ডাক্তার ফ্রয়েডের কাছে গিয়া স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলিয়াছিল। ডাক্তার ফ্রয়েড তখন সে স্বপ্ন-সম্বন্ধে তাহাকে বহু প্রশ্ন করেন; লোকটিও সে-প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেয়। প্রশ্নোত্তরে জানা যায় যে, এই লোকটি এক দিন তাহার বন্ধুর গৃহে গিয়াছিল; সেখানে বন্ধু-পত্নীকে দেখিয়া তাহার মনে এমনি চিন্তা বিদ্যুতের শিখার ন্যায় ক্ষণিকের জন্য খেলিয়া গিয়াছিল, পর-মুহূর্ত্তেই মন হইতে এ চিন্তা নিষ্কাশিত করিয়া দেয়। এবং ইহার সম্বন্ধে সে আর কখনো কোনো চিন্তা করে নাই। বিজলী-চমকের ন্যায় ঐ ক্ষণস্থায়ী চিন্তার অস্তিত্বও সে ভুলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে ভুলিলেও সে-বাসনা বা চিন্তা তাহাকে ভোলে নাই! একবার যে-বাসনা আমাদের মনে উদিত হয়, তাহা আমাদিগকে একেবারে পাইয়া বসে—ছাড়ে না! অজ্ঞাত বাসনার নিয়মই তাই। আমরা ছাড়িয়া দিতে চাহিলেও বাসনা আমাদের ছাড়ে না। দিনে নানা কাজে, জাগ্রত-চেতনায় নানা বিষয়ে যখন ব্যস্ত থাকি, তখন সে-বাসনা এতটুকু সুবিধা করিয়া মাথা তুলিতে পারে না! কিন্তু রাত্রে স্বপ্নাবস্থায় আমাদের মনে উদিত হইয়া নৃত্য সুরু করিয়া দেয়! তখন আমরা আশ্চর্য্য হই; কিন্তু ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই! কারণ, আমরা আমাদের সে ক্ষণিক বাসনাকে ভুলিয়া গেলেও সে-বাসনা আমাদের ভোলে না!

এই যে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বাসনা—এই দুই প্রকার বাসনাই আমাদের স্বপ্নে উদিত হইতে পারে। সাধারণতঃ দেখা যায়, ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের স্বপ্নে জ্ঞাত বাসনা এবং বয়স্কদের স্বপ্নে অজ্ঞাত বাসনাই বহুল পরিমাণে দেখা দেয়। ইহার কারণ, ছোট-ছোট ছেলেমেয়ের মানসিক জীবন খুব সরল। তাহাদের জীবনে অজ্ঞাত বাসনা নাই বলিলেও চলে। তাহারা যে-কামনা করে, তাহার সম্বন্ধে তাহারা খুবই সচেতন—অপরেও তাহা জানিতে না পারে, এমন নয়! তাহাদের কথায় এবং কাজেও তাহা বেশ প্রকাশ পায়। একটি ছোট ছেলে এক দিন প্রতিবেশীর বাড়ীতে গিয়া দেখে যে, একটি ছোট মেয়ে তাহার ভাইকে কোলে করিয়া বসিয়া আছে। ফুলের পাপড়ির মতন নরম তুলতুলে খোকাকে কোলে লইবার জন্য ছেলেটির প্রবল ইচ্ছা হইল। খোকাকে তাহার কোলে দিতে বলিল। মেয়েটি গম্ভীর ভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—"না, তুই নিজেই ছোট! তুই কি কোলে নিতে জানিস্! তোর কোল থেকে খোকা পড়ে যাবে।" এ-অপমান ছেলেটির বুকে কাঁটার মত বিঁধিল! সে বলিয়া উঠিল, "তুই খুব বড়? আর আমি ছোট? তুই কোলে নিতে জানিস, আর আমি জানি না? দিচ্ছি তোকে ঠিক করে।" বলা বাহুল্য, দিনের বেলায় সে তাহাকে "ঠিক" করিয়া দিতে পারে নাই। কিন্তু স্বপ্নে এই মেয়েটির হাত সে এত জোরে কামড়াইয়া দিয়াছিল যে, মেয়েটিকে কাঁদিতে দেখিয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতেও সে দ্বিধা করে নাই। ইহা হইতে বুঝিতে পারি, স্বপ্ন ও কামনার মধ্যে বিশেষ ব্যবধান নাই। স্বপ্নের মধ্যে কামনার অস্তিত্ব ও স্বরূপ সুন্দর ভাবে প্রকটিত আছে।

বয়স্কদের স্বপ্নে বাসনার অস্তিত্ব খুঁজিয়া বাহির করা সহজ নয়। কারণ, সাধারণতঃ তাহাদের স্বপ্ন জ্ঞাত বাসনামূলক নয়, অর্থাৎ জ্ঞাত বাসনার প্রতিচ্ছবি নয়। তাহাদের স্বপ্নে অনেক অজ্ঞাত বাসনা লুকাইয়া আছে। ইহার কারণ, বয়স্কদিগের মানসিক জীবন ছোট-ছোট ছেলেমেয়ের মানসিক জীবনের ন্যায় সরল নয়; জটিল। তাহাদের নানা রকমের সাধ আছে, ইচ্ছা আছে, আশা আছে। বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ভাবে তাহারা জগৎ-সংসারকে দেখিতেছে। নানা প্রকারের অসংখ্য ধারণা তাহাদের মনে নিত্য-নিয়ত আসা-যাওয়া করিতেছে! কিন্তু সব ধারণাকেই সমাদরে গ্রহণ করা চলে না, সব ধারণাকেই আমরা আমাদের মনের কুটীরেও প্রকাশ্য ভাবে স্থান দিতে পারি না! সমাজের শাসন, নীতির শাসন, ধর্ম্মের শাসন, রাজার শাসন প্রভৃতি বহু শাসন মানিয়া আমাদের চলিতে হয়। সেই জন্য যে সব ধারণা আমাদের ধর্ম্ম, নীতি বা জন্মগত শিক্ষা এবং সংস্কারের বিরুদ্ধাচরণ করিতে যায়, জোর করিয়া সেই সকল ধারণাকে আমরা চাপিয়া রাখি। মৃত্যু-শয্যাশায়ী বৃদ্ধ পীড়িত পিতার সেবা করা প্রত্যেক পুত্রের প্রধান কর্ত্তব্য। সমাজ, ধর্ম্ম, নীতি এই উপদেশই দেয় এবং আমরাও সাধারণতঃ এই উপদেশ অনুসারে কাজ করি। কিন্তু পৃথিবীর সব লোক সমান নয়। বৃদ্ধ পিতার সেবা করিতে করিতে কোন পুত্রের মনে হয়তো হঠাৎ এমন ভাব জাগিল, যত শীঘ্র পিতার মৃত্যু হয়, ততই ভালো! তিনিও রক্ষা পান, আমিও শান্তি পাই! এমন ভাব মনে জাগা অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের জন্মগত শিক্ষা ও সংস্কার কিছুতেই এমন ভাবের অনুমোদন করিবে না। তার উপর সামাজিক নিন্দা এবং নিজেদের বিবেকের তাড়নাও আছে। তাই আমরা এরূপ চিন্তা-প্রবাহকে এতটুকু উৎসাহ বা প্রশ্রয় না দিয়া যত শীঘ্র পারি তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দিই! এই প্রকারে ইহাকে দাবিয়া রাখিতে পারি বটে এবং পরেও হয়তো ইহার অস্তিত্ব ভুলিয়া যাইতে পারি—কিন্তু প্রাকৃতিক জগতে যেমন Conservation of Energy (শক্তি-সংরক্ষণ) বলিয়া বিধি আছে, মানসিক জগতেও তেমনি Conservation of Ideas (ধারণা-সংরক্ষণ) বলিয়া কঠোর বিধি বিদ্যমান আছে। কামনার নাশ নাই! আজ মাটি দিয়া ঢাকিয়া তাহাকে দৃষ্টির বাহিরে রাখিলাম সত্য, কিন্তু কাল মাটি ভেদ করিয়া আবার সে মাথা তুলিয়া বাহির হইবে! দিনের বেলায় জাগ্রত অবস্থায় অনেক বাসনাকেই আমরা জোর করিয়া দাবিয়া ঢাকিয়া তাহা ভুলিতে পারি, কিন্তু রাত্রে নিদ্রিত অবস্থায় তাহারা অনায়াসে আমাদের স্বপ্নে সমুদিত হইতে পারে।

একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, আমাদের স্বপ্নের অধিকাংশ অজ্ঞাত বাসনাই কাম-মূলক (Sexual)। সাধারণতঃ প্রত্যেক নর-নারীর জীবনে কাম-প্রবৃত্তি প্রবল। আমাদের জীবনে, বিশেষতঃ যৌবনে অসংখ্য যৌন বাসনা আমাদের মনে উদিত হয়; শুধু শিক্ষার গুণে এবং সমাজের শাসনে মুখে আমরা তাহা বলিতে বা প্রকাশ করিতে পারি না। রাজনৈতিক বাসনার উপর কেবল রাজার শাসন বর্ত্তমান,—অধম-বাসনার উপর ধর্ম্মের শাসন। কিন্তু আমাদের যৌন বাসনার উপর ধর্ম্ম, নীতি, শিক্ষা, রাজা ও সমাজ—সকলের শাসনই বিদ্যমান রহিয়াছে। সকল শাসনই আমাদের যৌন বাসনাসমূহকে সবলে দাবিয়া রাখিবার জন্য সতর্ক। উগ্র ব্যাধিতে উগ্র ঔষধ। পাশবিক শক্তিতে যৌন বাসনাই সর্ব্বাপেক্ষা বলীয়ান্,—তাই তাহার উপর শাসনও সবচেয়ে কঠোর। তাহা না হইলে এ সব বাসনা মানব-জীবনে হয়তো ভীষণ প্রলয়ের সৃষ্টি করিত! এই সব কঠোর শাসনের ভয়ে আমরা আমাদের যৌন বাসনাসমূহ দাবিয়া রাখিবার চেষ্টা করি। তাহার ফলে এই সব যৌন বাসনা মনের নিম্ন-স্তরে পড়িয়া থাকে। ইহাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত আমরা ভুলিয়া যাইতে চেষ্টা করি; এবং শিক্ষার প্রভাবে সত্যই তাহা ভুলিয়া যাই। এই সব "চাপিয়া-রাখা" "ভুলিয়া-যাওয়া" বাসনাই অজ্ঞাত বাসনারূপে পরিণত হয়। আমরা তাহাদের ভুলিয়াছি সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের অস্তিত্ব লোপ পায় নাই! মনের নিম্নস্তরে নিতান্ত নির্জীবের মত তাহারা পড়িয়া আছে বটে, তাই বলিয়া তাহারা একেবারে শুকিয়া মরিয়া যায় নাই! একটু সুবিধা পাইলেই মনের নিম্নস্তর হইতে উচ্চস্তরে ভাসিয়া ওঠে! তখন অজ্ঞাত সীমা পরিত্যাগ করিয়া আবার জ্ঞাত রাজ্যে প্রবেশ করে। আমাদের জাগ্রত অবস্থায় সকল শাসন যখন সজাগ, তখন এই সব বাসনাও নির্জীবের মত নিম্নে পড়িয়া থাকে; কিন্তু নিদ্রিত অবস্থায় এ সব শাসন শিথিল; কাজেই সেই সুযোগে এ সব বাসনা উপরে উঠিয়া নৃত্য সুরু করে। তখন আমরা স্বপ্ন দেখি।

২

বয়স্কলোকের অধিকাংশ স্বপ্নই অজ্ঞাত বাসনামূলক; আর তাহাদের অধিকাংশ অজ্ঞাত বাসনাই যৌন বাসনা-মূলক। বাসনা স্ব-রূপে স্বপ্নে আবির্ভূত হয়। বাসনা ও স্বপ্নের মধ্যে এতটুকু দূরত্ব থাকে না, ইহা আমরা বুঝিয়াছি। অজ্ঞাত বাসনা-মূলক স্বপ্নে বাসনাকে খুঁজিয়া বাহির করা তত সহজ নয়। কারণ, প্রথমতঃ, বাসনা ঠিক কি, সহজে তাহা ধরা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, এই অজ্ঞাত বাসনা স্বপ্নে কি রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহা অনুমান করা কঠিন। মোট কথা, এই প্রকার স্বপ্নে অজ্ঞাত বাসনা তাহার নিজের স্ব-রূপ গোপন করিয়া অন্য রূপে দেখা দেয়। স্বপ্নে যে অজ্ঞাত বাসনা বিদ্যমান আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সে বাসনা ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া আছে; তাহাকে অনায়াসে খুঁজিয়া বাহির করা যায় না।

উদাহরণ দিয়া এই কথাটি বুঝিবার চেষ্টা করি। এক বয়স্কা কুমারী স্বপ্ন দেখিয়াছিল, তাহার ভগিনীর ছোট ছেলেটি মারা গিয়াছে; ছেলেটির মৃতদেহ ছোট "কফিনে" রাখা হইয়াছে; কফিন লইয়া সকলে গোরস্থানে আসিয়াছে; পাদরী-সাহেব প্রার্থনা করিতেছেন; শিশুর মাতা এবং কুমারী নিজে মলিন মুখে বিষণ্ণ চোখে দাঁড়াইয়া আছে; তাহাদের অনেক বন্ধু-বান্ধবও সহানুভূতি জানাইবার জন্য সেখানে আসিয়াছে!

এ স্বপ্ন দেখিয়া কুমারী অত্যন্ত বিস্মিতা হইয়াছিল। ভগিনীর ছেলেটিকে সত্যই সে খুব স্নেহ করিত; ছেলেটিরও কোন রোগ ছিল না। সুস্থ সুন্দর ছেলে! অথচ কিশোরী স্বপ্ন দেখিল, এই ছেলেটির মৃত্যু হইয়াছে। কুমারীর অত্যন্ত দুঃখ হইল। কেন এমন দুঃস্বপ্ন দেখিল! ডক্টর ফ্রয়েডের নিকটে গিয়া কিশোরী এ স্বপ্নের বিবরণ দিয়া বলিল,—"ডাক্তার, আপনি বলেন স্বপ্নমাত্রই বাসনার প্রতিচ্ছবি, কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন, আমি সত্য বলিতেছি,

আমার মনে কখনও এমন নিষ্ঠুর বাসনা জাগে নাই। ছেলেটিকে আমি অত্যন্ত ভালোবাসি। তাহার মৃত্যু দূরের কথা, তাহার সামান্য একটু পীড়া হইলেই আমি অস্থির হইয়া উঠি। অথচ কেমন করিয়া আমি এমন নিষ্ঠুর স্বপ্ন দেখিলাম?" ডাক্তার বলিলেন, "ছেলেটির মৃত্যু হয়—মনে এমন ইচ্ছার স্থান হয়তো তুমি কখনো দাও নাই। কিন্তু তোমার এই স্বপ্ন যে মৃত্যু-কামনার প্রতিচ্ছবি, তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। ইহার মধ্যে হয়তো অন্য-কোন গূঢ় তত্ত্ব নিহিত আছে। হয়তো অন্য কোন অজ্ঞাত বাসনা এইরূপ ছদ্মবেশ ধরিয়া সমুদিত হইয়াছে।" ডাক্তার তখন কুমারীকে অনেক প্রশ্ন করিলেন। প্রশ্নোত্তরে নিম্নলিখিত ব্যাপার জানা গেল।

এক যুবকের সঙ্গে কুমারীর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। পরস্পরকে তাহারা খুবই ভালোবাসিত এবং একপ্রকার স্থির ছিল, শীঘ্রই তাহাদের বিবাহ হইবে। কিন্তু কতকগুলি সামাজিক ও পারিবারিক কারণে বিবাহ হইল না। বিবাহের সম্ভাবনাও রহিল না। দু'জনের দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ হইয়া আসিল। দু'জনেই ভিয়েনা সহরে থাকিত, কিন্তু মিলনের কোন উপায় ছিল না। কুমারী কিন্তু সে-যুবককে ভুলিতে পারে নাই—তাহার চিন্তায় অনেক সময় সে বিহ্বল থাকিত। এই-রূপে প্রায় এক বৎসর কাটিল। তখনও কুমারী পূর্ব্বের মত যুবককে ভালোবাসে; তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনেক সময় কুমারীর ইচ্ছা হইত প্রবল; কিন্তু দেখা করিবার কোন কারণ খুঁজিয়া পাইত না। এক দিন এক ব্যাপার ঘটিল। কুমারীর ভগিনীর বড় ছেলেটার মৃত্যু হইল; ছোট একটি কফিনে তাহার মৃতদেহ রাখা হইয়াছিল; সেই কফিন লইয়া সকলে গোরস্থানে গিয়াছিল; বন্ধু-বান্ধব সকলেই সেখানে আসিয়াছিল; এমন ব্যাপারে অনুপস্থিত থাকা শিষ্টাচারবিরুদ্ধ, তাই কুমারীর সেই যুবক বন্ধুও সে-দিন সেখানে আসিয়াছিল; এবং সেখানে যুবকের সহিত কুমারীর সাক্ষাৎ ও আলাপ হইয়াছিল।

এ ব্যাপার জানিতে পারিলেই কুমারীর স্বপ্নের গূঢ় অর্থ বুঝিতে পারিব। কুমারীর মনে গূঢ় বাসনা নিহিত ছিল—কি করিয়া যুবকটির সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ হইতে পারে! এই অজ্ঞাত বাসনাই তাহার স্বপ্নে প্রকটিত হইয়াছে! এ স্বপ্নে মৃত্যু-বাসনার নির্দ্দেশ নাই—মিলন-বাসনাই এ স্বপ্নের মূল কারণ। কিন্তু এই মিলন-বাসনা স্পষ্টরূপে বাহিরে আসিতে সাহস করিতেছে না! পূর্ব্ব ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত জানাইতেছে যে, সে-দিন যেমন ঘটনাচক্রে দেখা হইয়াছিল, আবার যদি তেমন ঘটনা ঘটে!

এ দৃষ্টান্তে বাসনার ছদ্মবেশ-গ্রহণের কথা ভালো করিয়া বুঝিতে পারি। বাসনা যেমন, স্বপ্ন যে তাহারি অনুরূপ হইবে—তাহা বলা যায় না। সাধারণতঃ স্বপ্নে বাসনা বরং ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া আবির্ভূত হয়। আমাদের বাসনাটি ঠিক কি—স্বপ্ন স্পষ্ট তাহা না বলিয়া ইঙ্গিতে জানাইবার চেষ্টা করে। স্বপ্ন—বাসনার অবিকল প্রতিবিম্ব নয়, ইঙ্গিত মাত্র। এই ইঙ্গিতের যথার্থ অর্থ যে বুঝিতে পারে, এ বাসনার স্বরূপও সে জানিতে পারিবে। এই ইঙ্গিতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া স্বপ্নের মধ্যে বাসনার অনুধাবন করিতে হয়। ইংরেজীতে ইহাকে বলে Psycho-analysis (বা মানস পৃথক-করণ)। স্বপ্নের মধ্যে যে গূঢ় বাসনা আছে, তাহা নিশ্চিত; কিন্তু সেই বাসনাকে অনুসন্ধানে বাহির করা সহজ নয়, স্বপ্ন-রূপ ইঙ্গিতের নির্দ্দেশ-প্রমাণে চলিয়া তবে ইহাকে বাহির করিতে হয়। ডক্টর ফ্রয়েড তাই তাঁহার গ্রন্থের নাম রাখিয়াছেন "Interpretation of Dreams"। তিনি বলিতে চান, স্বপ্নই স্বপ্নের লক্ষ্য নয়; স্বপ্ন একটি ইঙ্গিত মাত্র; ইঙ্গিতে কোন এক গুপ্ত বাসনার সে নির্দ্দেশ করে। স্বপ্নের যথার্থ অর্থ (Interpretation) বুঝিলে এই গুপ্ত বাসনাও ধরা পড়িবে।

উদাহরণে এ কথাটি সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিব। বিপ্লবীরা অনেক সময় এক প্রকার সঙ্কেত-ভাষা (Code language) ব্যবহার করে। এক দিন হয়তো তাহাদের একটা টেলিগ্রাম আসিল, "Marriage Settled. Send money." পোষ্ট-মাষ্টার তারের সরল সহজ (superficial) অর্থই বুঝিলেন, তাই তিনি ইহাতে কোন দোষ দেখিলেন না। কিন্তু তিনি যদি ইহার সঙ্কেত-অর্থ বুঝিতেন, তবে টেলিগ্রামটি সটান্ তিনি পুলিশের নিকট পাঠাইতেন। সঙ্কেত-অর্থ হয়তো এইরূপ যে, "ষড়যন্ত্রের সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক। এখন মাল-মশলা পাঠাও।" আমাদের স্বপ্নও এমনি Code language. স্বপ্নে যাহা যে-রূপে দেখা দেয়, তাহা যে সত্যই তার রূপ—তা নয়। "Marriage Settled. Send money." পোষ্ট-মাষ্টার এই তারের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা যথার্থ অর্থ নয় এই তারের যেমন এক নিগূঢ় অর্থ ছিল, আমাদের স্বপ্নেরও সেইরূপ নিগূঢ় অর্থ আছে এবং এই নিগূঢ় অর্থই তাহার যথার্থ অর্থ।

আর একটি উদাহরণ দিই—এক দিন রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখিলাম, সেতার বাজাইতেছি। কিন্তু কি জানি কেন, আমার আঙুল চলিতেছে না। বহু চেষ্টা করিয়াও আমি বাজাইতে পারিতেছিলাম না। হয়, আঙুল চলে না, না হয় সব তারগুলিতে আঙুল লাগিয়া সেতার ঝন্‌ঝন করিয়া ওঠে! কিছুক্ষণ পরে আমার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। ভাবিতে লাগিলাম, এ আবার কি! আমার আঙুলের তো কিছু হয় নাই! তবে কি সত্যই বাজাইতে ভুলিয়া গেলাম? শুইয়া থাকিতে পারিলাম না। উঠিয়া সেতার লইয়া বাজাইতে বসিলাম। কোন কষ্ট হইল না! বেশ বাজাইলাম, আঙুলও ঠিক চলিতেছে! তখন নিশ্চিন্ত হইয়া আসিয়া বিছানায় শুইলাম। শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিলাম, আমার এ স্বপ্নের অর্থ কি?

ভাসা-ভাসা ভাবে দেখিলে মনে হয়, স্বপ্নটি নিতান্ত নির্দ্দোষ! কিন্তু "appearances are deceptive" এইরূপ বিচার করিতে করিতে আমি আবার ঘুমাইয়া পড়িলাম। এবার যে-স্বপ্ন দেখিলাম, তাহার সাহায্যে আমার পূর্ব্ব-স্বপ্নের অর্থ বাহির করা সহজ হইল। এবার স্বপ্ন দেখিলাম, সেতার বাজাইতেছি, কিন্তু কেমন করিয়া জানি না, সেতারটি ধীরে ধীরে তাহার কাষ্ঠ-মূর্ত্তি ত্যাগ করিল। দেখি, কাষ্ঠ-মূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া সেতার এক সুন্দরী তরুণীতে পরিণত হইয়াছে! তরুণীর দিকে ভালো করিয়া তাকাইতেই আমার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল! এ দু'টি স্বপ্নে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিলাম। আরও বুঝিলাম, প্রথম স্বপ্নটি যেমন নির্দ্দোষ বলিয়া মনে হইয়াছিল, সেটি প্রকৃত-পক্ষে তা নয়। এক অজ্ঞাত বাসনা তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট আছে এবং সে অজ্ঞাত বাসনা যে কাম-মূলক, তাহাও সুনিশ্চিত। ভাবিতে ভাবিতে মনে পড়িল, দিনের বেলায় হ্যাভেলক এলিস প্রণীত Studies in the Psychology

of Sex পড়িতেছিলাম। তাহাতে এক জায়গায় ফরাসী ঔপন্যাসিক Balzac-এর একটি কথা উদ্‌ধৃত আছে। সে-কথা আমার খুব ভালো লাগিয়াছিল। Balzac বলেন, "বেহালা বাজাইতে যেমন শিক্ষার প্রয়োজন, স্ত্রীলোকের সহিত আচার-ব্যবহার করিতে জানাও তেমনি শিক্ষা-সাপেক্ষ। বেহালার সহিত মহিলার তুলনা করা যাইতে পারে। বেহালার ন্যায় মহিলাও delicate যন্ত্র-বিশেষ। যাহার শিক্ষা আছে, তাহার স্পর্শে দু'টিই মধুর ঝঙ্কারে বাজিয়া ওঠে। কিন্তু অসভ্য ওরাং-উটাঙের হাতে বেহালা যেমন বাজে না, অশিক্ষিত পুরুষের হাতেও মহিলা-বীণা তেমনি মধুর ঝঙ্কার তোলে না!" Balzac-এর এ উপমাটি সুন্দর! এবং এই সুন্দর উপমাটি মূর্ত্তিমতী হইয়া আমার স্বপ্নে প্রকট হইয়াছিল। স্বপ্নে আমি ওরাং-উটাঙের স্থান অধিকার করিয়া বেহালার বদলে সেতার বাজাইবার বৃথা প্রযত্ন করিতেছিলাম!

এখন দেখিলাম, বাসনাকে মনের নিম্নস্তর হইতে উচ্চস্তরে উঠাইয়া আনাই স্বপ্নের প্রধান কাজ। মনের কোন্ অজ্ঞাত অন্ধকার কুটারে যে সব বাসনা গুমরিয়া মরিতেছে, তাহাদিগকে স্বপ্নাকারে প্রকাশ করার নাম স্বপ্ন-ক্রিয়া (Dream-work)। কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে বাসনা তাহার স্বকীয় যথার্থ-রূপে প্রকাশ পায় না! স্বপ্নে সে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া অন্য-রূপে আবির্ভূত হয়। বাসনাকে এইরূপে ছদ্মবেশে সাজাইয়া দেওয়া স্বপ্নের দ্বিতীয় কাজ। সংক্ষেপে স্বপ্ন (১) বাসনাকে উপরে লইয়া আসিতেছে; (২) আনিয়া ছদ্মবেশে তাহাকে প্রকাশ করিতেছে!

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, স্বপ্ন-ক্রিয়া বাসনাকে ছদ্মবেশে সাজাইতেছে কেন? বাসনা যেরূপ, স্বপ্নও তদ্রূপ হয় না কেন? বাসনা গুপ্ত বা ছদ্মবেশ ধারণ করে কেন? ইহার উত্তরে বলা যায়, জাগ্রত অবস্থাতেও আমাদের অনেক বাসনা অন্য-রূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকে। অবিবাহিত বহু স্ত্রী-পুরুষ কুকুর-বিড়াল পালন করে; অনেকে আবার গান-বাজনায় মগ্ন থাকে; সেতার-দিলরুবা তাহাদের প্রাণ-স্বরূপ হয়। এ ক্ষেত্রে অনায়াসে বুঝা যায় যে, কুকুর-বিড়াল ও সেতার-এস্রাজের উপর তাহাদের যে অনুরাগ, তাহা শুধু কাম-বাসনার রূপান্তর মাত্র! বয়স্কা কুমারী ও বিধবাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম অনেক সময়ে তাঁহাদের কাম-বাসনার প্রতিক্রিয়া মাত্র। জেলের নির্জ্জন কুটারে আবদ্ধ থাকিয়া কর্ম্মপ্রাণ বাঙালী বিপ্লবীদের সকল বাসনা যখন অতৃপ্ত থাকিত, তখন তাঁহারা যেমন ঈশ্বরচিন্তায় কিঞ্চিৎ তৃপ্তি পাইতেন, তেমনি বয়স্কা কুমারী এবং বিধবারাও ঘরের কোণে বদ্ধ থাকিয়া তাঁহাদের বহু অতৃপ্ত বাসনাকে ধর্ম্ম-ক্রিয়ায় পরিণত করিয়া তৃপ্তি লাভ করেন। বাসনার রূপান্তর গ্রহণ সম্বন্ধে বহু উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে,—স্ত্রীর হঠাৎ পিতৃগৃহে যাইবার বাসনা যে অভিমানের রূপান্তর মাত্র, অনেকেই তাহা জানেন।

সমাজের শাসনের ভয়ে এবং শিক্ষার ও সভ্যতার খাতিরে আমরা অনেক সময়ে কিছু-কিছু ভণ্ডামি করিয়া থাকি। মনে রাগ, তবু মুখে হাসি ফুটাইয়া কথা বলিতে হয়। একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য হয়তো খুব ইচ্ছা; কিন্তু সমাজের খাতিরে মুখে উদাসীন ভাব দেখাই—যেন মনে কোন বাসনাই নাই!

কেবল স্বপ্নাবস্থায় নয়, জাগ্রত অবস্থাতেও আমরা আমাদের বাসনা স্বপ্ন-রূপে প্রকাশ না করিয়া গুপ্ত-ভাবে বা ছদ্মরূপে প্রকাশ করি—ইহার কারণ কি? উপমার ভাষায় বলিতে গেলে বলা যায়, আমাদের মনের মধ্যে সর্ব্বদাই এক জন শাসক (censor) বিরাজমান আছে। বাসনাগুলিকে শাসন করাই তাহার কাজ। চিঠি গন্তব্য স্থানে যাইতে হইলে আগে censor-এর কাছে আসে। আমাদের বাসনাও তেমনি প্রকাশের অনুমতির জন্য প্রথমে এই মানসিক শাসকের নিকটে যায়। তিনি যাহাকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বলিয়া মনে করেন, তাহার উপর কোন প্রকার অস্ত্রোপচার না করিয়া তাহাকে তাহার স্বকীয় মূর্ত্তিতে বাহিরে আসিতে অনুমতি দেন। তখন আমরা যে-স্বপ্ন দেখি, তাহা বাসনার অবিকল প্রতিচ্ছবি—যেমন ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের স্বপ্ন! কিন্তু যে-বাসনায় কোন গলদ থাকে, শাসক তাহাকে তাহার স্ব-মূর্ত্তিতে বাহিরে আসিতে দেয় না! তাহাকে কাটিয়া-ছাঁটিয়া, তাহার বিষ-দাঁত ভাঙ্গিয়া, তাহার নানা স্থানে অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া একেবারে নির্দ্দোষ গোবেচারা বানাইয়া তবে তাহাকে উপরে আসিতে দেয়! তখন আমরা যে-স্বপ্ন দেখি, তাহা বাসনার নিছক প্রতিচ্ছবি নয়! এ স্থলে বাসনা এমন নিরীহ ও বেচারার রূপ ধরিয়া উদিত হয় যে, তাহার আসল রূপ খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন হইয়া পড়ে—যেমন বয়স্কদিগের স্বপ্নে ঘটিয়া থাকে।

শ্রীইন্দুভূষণ মজুমদার

বসন্ত

শীতের হিমের বাঁধন কাটিয়া ধরণীতে এলো বসন্ত।
অন্ধ মদন ফুলধনু হাতে খেলিছে খেলা দুরন্ত।
কানন ভরেছে আজি রূপ-রস-গন্ধে,
জগৎ জেগেছে নব মধু-সুর-ছন্দে,
প্রকৃতি সেজেছে নূতন ভূষণে উজলিয়া দিক্-দিগন্ত।
দখিণ হাওয়ায় মন-পরাণ মাতায়,
রঙের নাচন আজি পাতায় পাতায়,
যৌবন-উচ্ছল বনানীর দেহে, উৎসবে মাতে অনন্ত॥

শ্রীযামিনীমোহন কর।

পরিচয়

বিরহ আর মিলন নিয়ে
এই জীবনের কান্না-হাসির মেলা!
কেউ প্রিয়ারে বক্ষে বাঁধে
সঙ্গিবিহীন কেউ বা কাটায় বেলা!
হিংসাতে কেউ জ্বলেই মরে
কেউ বা প্রেমে আপন-ভোলা হয়!
অশ্রু-হাসির আলিঙ্গনে
এই জীবনের সত্য পরিচয়।

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়।

"আচার্য্য শঙ্করের জীবন ও ধর্ম্মমত"

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর) *

দশম—ইহার পর বলা হইয়াছে—"এই পরীক্ষার দ্বারা দেখা যায় যে, অভিজ্ঞতার ভিতরে যে পাঁচ প্রকার উপাদান আছে, সেগুলি স্বতন্ত্র নয়, পরস্পরের সহিত অচ্ছেদ্য। এই উপাদানগুলি হ'চ্চে (১) আত্মজ্ঞান (২) ইন্দ্রিয়বোধ, (৩) ইন্দ্রিয়বোধের আকার দেশ ও কাল (৪) ইন্দ্রিয়বোধের গুণ, পরিমাণ ও সম্বন্ধ বিষয়ে আত্মার বিবিধ ধারণা (conception of categories) (৫) জগৎ, জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই তিনটি মূল বস্তুধারণা (Three ideas of reason) ইত্যাদি।"

এ কথায় বলিতে ইচ্ছা হয়, যাঁহারা ন্যায়ের ভাষ্য গ্রন্থ পূর্ব্বসংগত পড়িয়াছেন, বেদান্তের পরিভাষা গ্রন্থ পড়িয়াছেন, তাঁহাদের নিকট এই জাতীয় কথা অতি পুরাতন কথা। যাঁহারা মীমাংসা ও ন্যায়ের পদার্থতত্ত্ব বুঝেন, কেন পদার্থ সাতটি, আটটি হইল না কেন ?—ইত্যাদি বুঝেন, যাঁহারা ন্যায়ের বা বেদান্তের বা অন্য দর্শনের জ্ঞানোৎপত্তি-প্রক্রিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের নিকট ইহার কোনই নূতনত্ব নাই। দেশ ও কালের সিদ্ধি ও তাহাদের খণ্ডনে যে সব কথা আছে, তাহাতে বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ই আছে। 'জগৎ, জীবাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ এবং সম্বন্ধ' বিচারপ্রসঙ্গে যে সব কথা আছে, ইহাদিগকে সিদ্ধ বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে গেলে, কোন একটা মতবাদ-বিশেষেই প্রবিষ্ট হইতে হয়, নূতন কিছু বলা একটা অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার। ভারতীয় দর্শন যাঁহারা আলোচনা করেন, তাঁহাদের নিকট ক্যাণ্টের এই সব আবিষ্কারের কথা বলা বৃথা শ্রম মাত্র। সংস্কৃতশাস্ত্রের পণ্ডিতগণের ইংরেজী না জানাতেই পাশ্চাত্ত্যভাবাপন্ন মহাত্মগণের এই জাতীয় মন্তব্য বহু স্থলেই দেখা যায়। ইহাই আমাদের অদৃষ্টের পরিহাস।

একাদশ—অতঃপর বলা হইতেছে—"ক্যাণ্টীয় দর্শন আয়ত্ত করলে দেখা যায়, লৌকিক ও চলিত নৈয়ায়িক চিন্তা যে প্রত্যক্ষ (perception) ও অনুমান (inference)কে দুই স্বতন্ত্র প্রমাণ বলে মনে করে, এতেই মস্ত ভুল রহিয়াছে, ফলতঃ, প্রত্যক্ষ ছাড়া পরোক্ষ নেই, পরোক্ষ ছাড়াও প্রত্যক্ষ নেই। জ্ঞান হ'চ্চে বহু উপাদানযুক্ত একটি অখণ্ড ক্রিয়া, এবং এই অখণ্ড ক্রিয়ার বিষয় হ'চ্চে জগৎ ও জীববিশিষ্ট এক অখণ্ড পরমাত্মা।"

এই কথাটিতেও বহু অসঙ্গতি দেখা যাইতেছে। প্রথম, প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে স্বতন্ত্র প্রমাণ না বলিলে ব্যবহারের অনুপপত্তি হয়। কেহই প্রত্যক্ষকে অনুমান বলে না, এবং অনুমানকেও প্রত্যক্ষ বলে না। প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে প্রমাণ না বলিয়া প্রমা অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান বলিলে জ্ঞানত্ব-ধর্ম্ম-পুরস্কারে তাহারা অভিন্ন হয় বটে, কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞান কখনই অনুমিতিরূপ জ্ঞান হয় না। তাহার পর প্রত্যক্ষ ছাড়া পরোক্ষ নাই, আর পরোক্ষ ছাড়া প্রত্যক্ষ নাই বলিয়া ইহাদিগকে স্বতন্ত্র নহে অর্থাৎ অভিন্ন বলা সঙ্গত হয় না। যাহারা ছাড়াছাড়ি থাকে না, তাহারা কি অভিন্ন হয় ? অংশ অংশীকে ছাড়া থাকে না, গুণ দ্রব্য ছাড়া থাকে না, তাহারা কি অভিন্ন নহে বলিব ? অনুমান করিতে গেলে প্রত্যক্ষ আবশ্যক হয়, প্রত্যক্ষ করিতে গেলে কি অনুমানের আবশ্যকতা আছে ? আত্ম-মন-ইন্দ্রিয় বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হইলেই প্রত্যক্ষ হয়, তাহাতে অনুমান কোথায় ?

যদি বলা যায়, ঘটজ্ঞান কালে ঘটের একদেশই আমাদের চক্ষুর সহিত সন্নিকৃষ্ট হয়, ঘটের সর্ব্বদেশে চক্ষুঃসংযোগ হয় না। যে দেশে চক্ষুঃসংযোগ হয়, সেই দেশেরই প্রত্যক্ষ হয়, যে দেশে চক্ষু সংযুক্ত হয় না, সে দেশের প্রত্যক্ষ হয় না, তাহাই অনুমানগম্য। অতএব ঘটের প্রত্যক্ষজ্ঞানে প্রত্যক্ষ ও অনুমান উভয়ই থাকিল ! অতএব প্রত্যক্ষ ও অনুমান পৃথক্ জ্ঞান নহে ?

কিন্তু তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ, ঘটজ্ঞানে প্রত্যক্ষ ও অনুমান উভয় থাকিলেও ঘটপ্রত্যক্ষকেও ঘটের অনুমান বলা হইল না। ঘটজ্ঞান ও ঘটপ্রত্যক্ষজ্ঞান ত অভিন্ন পদার্থ নহে। প্রত্যক্ষ, জ্ঞানের একটা প্রকার মাত্র। জ্ঞান একটি সামান্য নাম। প্রত্যক্ষ তাহার বিশেষ নাম—এইমাত্র প্রভেদ।

যদি বলা হয়, ঘট-প্রত্যক্ষমধ্যেও ঘটানুমান থাকায় উহারা অভিন্ন বলিব ? যেহেতু, ইন্দ্রিয়সহ একদেশসন্নিকৃষ্ট ঘট হইলেও সমগ্র ঘটের প্রত্যক্ষ হইল, এইরূপ ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ইহাও অসঙ্গত। কারণ, এস্থলে অনুমানের সামগ্রী "ব্যাপ্তিজ্ঞান" অনুভূত হয় না। আর সকল দ্রব্যপ্রত্যক্ষই এইরূপ হয় বলিয়া এবং গুণাদি প্রত্যক্ষে এই দেশভেদ থাকে না বলিয়া প্রত্যক্ষমধ্যে অনুমানের স্থান নাই।

যদি বলা যায়, ঘটকে ঘট বলিতে গেলে পূর্ব্বদৃষ্ট ঘটাকার বলিয়া "ইহা ঘট" এইরূপ জ্ঞান হয়, আর তজ্জন্য উহার মধ্যেও অনুমান থাকিয়া যায় ? কিন্তু ঘটের সামান্যজ্ঞানে অনুমান কোথায় ? তাহাতে ঘটকে "ইহা" বলিয়া একটা জ্ঞানই হয়। ঘটের বিশেষজ্ঞানও ন্যায়মতে ঘটত্ব জাতির দ্বারা সিদ্ধ হয়, বেদান্তমতে একটি ঘটপ্রত্যক্ষে যাবৎ ঘটের প্রত্যক্ষ কালে তাহাতে অনুমান থাকে বলা হয় বটে, কিন্তু এ সম্বন্ধে আরও এত কথা আছে যে, ক্যাণ্টের এই কথা তাহার তুলনায় বিশেষ কিছুই নহে বলিতে পারা যায়। আর যদিও তিনি অন্যত্র অনেক কথাই বলিয়া থাকেন, তাহা হইলেও ভারতীয় দার্শনিকগণের নিকট তাঁহাকে ইহার আবিষ্কারকর্ত্তা বলা বৃথা।

তাহার পর "জ্ঞান হ'চ্চে বহু উপাদানযুক্ত একটি অখণ্ড ক্রিয়া" এ কথাও অসঙ্গত। কারণ, জ্ঞান বহু উপাদান বা সামগ্রী হইতে জন্মে বটে, কিন্তু সেই জ্ঞানে কি সেই উপাদানগুলি থাকে যে, তাহাকে "উপাদানযুক্ত" বলা যায়। জ্ঞানসামগ্রীগুলি জ্ঞানের নিমিত্তকারণ, তাহা কার্য্যের সহিত একত্র থাকে না। উহার উপাদান-কারণ অর্থাৎ সমবায়ী কারণ আত্মা, তাহা বহু নহে। বেদান্তমতে এই জ্ঞান নিত্য, উহাই আত্মার স্বরূপ। অন্তঃকরণবৃত্তি সাহায্যে বিভিন্ন বিষয়াকারগ্রাহী

* ১৩৪১ কার্ত্তিক সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের "আচার্য্য শঙ্করের জীবন ও ধর্ম্মমত" প্রবন্ধের প্রতিবাদের অনুবৃত্তি।

হইয়া বিভিন্নরূপে অভিব্যক্ত হয় মাত্র। এইরূপ বহু মতই আমাদের দর্শনে আছে। সকল মতই অতি গম্ভীর।

তাহার পর জ্ঞানকে ক্রিয়া বলাও ভ্রম। ন্যায়মতে তাহা গুণ, বেদান্তমতে তাহা গুণাশ্রয় দ্রব্যবিশেষ। ক্রিয়া দ্রব্যের সহিত দ্রব্যের সংযোগ-বিভাগ হইতে উৎপন্ন হয় এবং পঞ্চমক্ষণ পরে তাহা নষ্ট হইয়া যায়। গুণের ন্যায় ইহাও দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে। এ সম্বন্ধেও ভারতীয় দর্শনে বহু মতভেদ আছে। সে সব শুনিয়া ক্যাণ্টের কথায় নূতনত্ব অনুভূত হইতে পারে বলিয়া বোধ হয় না।

তাহার পর এই জ্ঞান নামক ক্রিয়ার আবার অখণ্ডত্ব কি? ক্রিয়ার উৎপত্তি-নাশ আছে, অখণ্ডেরও কি তাহাই আছে? আর যদি অখণ্ড অর্থ একটামাত্র হয়, তবে বহু উপাদানযুক্ত বস্তু আবার অখণ্ড হয় কিরূপে? বহু উপাদানজাত বস্তু একটি বস্তুবিশেষ হইলে তাহাকে অখণ্ড যদি বলা যায়, তাহাও যথার্থ অখণ্ড নহে। কারণ অখণ্ড বস্তুর ভিতর-বাহির থাকে না। থাকিলে আর তাহা অখণ্ড ঠিক ঠিক হয় না। শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের এই সব কথা সঙ্গত বলিয়া বুঝা যায় না।

তাহার পর বলা হইয়াছে—অখণ্ড ক্রিয়ারূপ জ্ঞানের বিষয় জগৎ-জীববিশিষ্ট এক অখণ্ড পরমাত্মা। এ কথার সার্থকতা কি? যাহাই জানা যায়, তাহাই জ্ঞানের বিষয় হয়। সবিষয় জ্ঞানকেই বৃত্তিজ্ঞান বলা হয়, বৃত্তিশূন্য জ্ঞান নির্বিষয় হয়। উহাই আত্মা বা ব্রহ্মবস্তু বলা হয়। এই বৃত্তিজ্ঞানের বিষয়কে জীব-জগৎ ও অখণ্ড পরমাত্মা বলিবার উদ্দেশ্য কি? যদি ইহার উদ্দেশ্য হয়—বিষয়কে জড় ও চেতনে বিভক্ত করা, তাহা হইলে জড় ব্যতীত জীবকে কোথায় দেখিয়াছে? আর জীব ব্যতীতই বা জড় কোথায় কে দেখিয়াছে? চেতন ব্যতীত জড় কোথায়? জীবমধ্যে জড় ও চেতন উভয়ই দৃষ্ট হয়। আর জীবও কি জগতের মধ্যে নয়? অতএব এই বিভাগ যথার্থ বিভাগ-পদবাচ্য নহে। ব্যবহার সম্পাদনার্থ এই বিভাগ। ব্যবহার ভ্রমজ্ঞান দ্বারাও হয়, প্রমাজ্ঞান দ্বারাও হয়।

তাহার পর অখণ্ড পরমাত্মাই বা জ্ঞানের বিষয় হয় কি করিয়া? জ্ঞান ও তাহার বিষয় পরমাত্মা স্বীকার করায় জ্ঞানসত্তা দ্বারা পরমাত্মা আর অখণ্ড হইতে পারে না। দেশ, কাল ও বস্তু দ্বারা পরিচ্ছেদশূন্য বস্তুই অখণ্ড হয়। অখণ্ড বস্তুর সঙ্গে বা তাহার মধ্যে অন্য বস্তু স্বীকার করিতে পারা যায় না। অতএব অখণ্ড পরমাত্মাকে জ্ঞানের বিষয় বলা ভ্রম ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? সাধারণতঃ আমাদের অদ্বৈত দর্শনে যে এই বিভাগ দেখা যায়, তাহা অজ্ঞের স্বীকৃত বিষয়ের দ্বারা উপদেশ করিবার জন্য।

তাহার পর বিষয়ের সত্তা জ্ঞানের সত্তার অধীন, জ্ঞান না থাকিলে বিষয় থাকে কি করিয়া? যাহা আছে, অথচ জানি না বলা হয়, তাহার সত্তাও জ্ঞানাধীন সত্তা। সেখানে অজ্ঞানকে দ্বারস্বরূপ করিয়া তাহার সত্তা সিদ্ধ হয়। যাহাই কোন না কোনওরূপে বিষয় হয়, জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারে হউক, তাহারই সত্তা জ্ঞানাধীন। যাবদ্ বস্তুই জ্ঞানের আকার, এজন্য বিষয় মাত্রই জ্ঞানাধীন-সত্তাক। জ্ঞান হইতে তাহার পৃথক্ সত্তা স্বীকার ব্যবহারসম্পাদনার্থ মাত্র। জ্ঞানাকার বিষয়ের সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায় না, এজন্য জ্ঞানের এই আকারকে অনির্ব্বচনীয় বলা ছাড়া উপায় নাই। কিন্তু কয়েক পংক্তি পরেই বলা হইয়াছে "অনাত্মা জড় বলে কোনও বস্তু নাই।" অথচ অনাত্মা না থাকিলে জ্ঞানের আকার আসে কোথা হইতে? আকার ও জ্ঞান ত অভিন্ন বস্তু নহে। অতএব জ্ঞানের বিষয় জীব, জগৎ ও পরমাত্মা বলাই ভ্রম! জ্ঞান ও তাহার আকার অভিন্ন বলাও ভ্রম, ভিন্ন বলাও ভ্রম, আর ভিন্নাভিন্ন বলাও ভ্রম। অভিন্ন হইলে জ্ঞানের আকার—এরূপ বলা হইত না, ভিন্ন বলিলে জ্ঞান ভিন্ন অন্যত্রও আকার থাকিত। ভিন্নাভিন্ন বলিলে বিরুদ্ধ কথা বলা হয়। এ জন্য এই আকারের স্বরূপ নির্ণয় হয় না।

যদি বলা হয়, ঘটের আকার যেমন মৃত্তিকাতে থাকে, তদ্রূপ জ্ঞানেও থাকে; ঘটের আকার সুবর্ণ-ঘটে ও মৃণ্ময়-ঘটে – উভয় স্থলেই থাকে? অতএব আকার অন্যত্র থাকিল, বলিব না কেন? ইহাও অসঙ্গত? কারণ, জ্ঞানের আকার জ্ঞান ভিন্ন কোথায় থাকে, মৃত্তিকার আকার মৃত্তিকা ভিন্ন কোথায় থাকে? সুবর্ণঘটের আকার ও মৃণ্ময়ঘটের আকার ঘটেই থাকে, সুবর্ণ বা মৃত্তিকাতে থাকে না। আকার যদি আকারী ভিন্ন কোথাও থাকিত, তাহা হইলে আকারের পৃথক্ সত্তা সিদ্ধ হইত, আর তখন তাহার নির্ব্বচনও সম্ভবপর হইত। কিন্তু তাহা হয় না বলিয়া আকারকে অনির্ব্বচনীয়ই বলিতে হয়। আর অনির্ব্বচন হইলে আমরা নির্ব্বচন করিতে পারিলাম না, সুতরাং আমাদের বুদ্ধির দুর্ব্বলতাই বুঝাইল, ইহাও বলা যায় না। কারণ, নির্ব্বচন না হইলেও তাহা থাকে, এ কথা বলা যায় কি করিয়া? যাহা থাকে তাহারই নির্ব্বচন হয়, যাহা থাকে না অথচ প্রতীত হয়, তাহারই কেবল নির্ব্বচন হয় না। "আকার" ঠিক এইরূপ বস্তু, এজন্য তাহা অনির্ব্বচনীয়। এই জন্যই দৃশ্য বা জ্ঞেয়মাত্রেরই আকার থাকে। আর তাদৃশ সাকার দৃশ্যমাত্রই অনির্ব্বচনীয় বলা হয়।

যদি বলা হয়, এই আকার বাদ দিলে কিছুই থাকে না—বলিব? তাহা বলা যায় না। কারণ, সাকার সকল বস্তুরই আকার পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়। আর এই আকার একেবারে বাদ দিলে নিরাকার নির্গুণ এক অদ্বৈত সৎ ও জ্ঞানস্বরূপ একটি বস্তু থাকিয়া যায়। তাহা আছে, কিন্তু কিরূপ, কি প্রকার, কিমাকার কিছু বলা যায় না। ইহাই অদ্বৈতবাদীর সত্তাসামান্য বা জ্ঞানসামান্য ব্রহ্ম বা আত্মা। আকার বাদ দিলে ইহাই থাকে। এইরূপ একমাত্র অদ্বৈত বেদান্ত-সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে। এই সিদ্ধান্ত বিরোধের নিয়ম স্বীকার করিয়াই লভ্য হয়, বিরোধের নিয়ম অমান্য করিয়া ভেদাভেদবাদ দ্বারা কোনও সৎসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। ইহা আমরা এখনই দেখাইতেছি। সুতরাং জ্ঞানের বিষয় অখণ্ড পরমাত্মা হয় না, ইহাই এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে প্রদর্শিত হইল।

দ্বাদশ—এইবার ক্যাণ্টেরও ভ্রম দেখাইতে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয় বলিতেছেন—"যা হোক ক্যাণ্ট জ্ঞানের এই অখণ্ডত্ব দেখিয়েছেন বটে, কিন্তু তাহা দৃঢ়রূপে ধরতে পারেননি। জ্ঞানের বাহিরে একটি স্বাধীন বস্তু (thing in itself) আছে, যা থেকে আমাদের ইন্দ্রিয়বোধ আসছে। এই ধারণা তাঁহার সমস্ত দর্শনের বিরুদ্ধ হলেও তিনি তা পরিত্যাগ করতে পারেননি। * * * সর্ব্বাধার ব্রহ্মের ধারণাটাকে তিনি একটা ধারণামাত্র বলেই ব্যাখ্যা করেছেন, ব্রহ্মজ্ঞান যে আমাদের আত্মজ্ঞানের সঙ্গে এক, সসীম জীব যে মূলে অসীমের সঙ্গে এক, তা বুঝতে পারেননি।"

এতৎপ্রসঙ্গে বলিতে হয়—ক্যাণ্ট জ্ঞানের অখণ্ডত্ব দেখাইয়াছেন, ইহার উদ্দেশ্য কি ক্যাণ্টের আগে কেহ ইহা দেখান নাই? লেখার সুর হইতে ত তাহাই বুঝায়। এজন্য বলিব—যিনি পঞ্চদশী গ্রন্থ পড়িয়াছেন, তিনি প্রথমেই ইহা দেখিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয় পঞ্চদশী গ্রন্থ পড়িয়াও কেন ওরূপ কথা বলিলেন, বুঝা গেল না। তাহার পর এই কথাটা "ক্যাণ্ট দৃঢ়রূপে ধরতে পারেননি" ইহার কারণ কি এই যে, ক্যাণ্ট, "জ্ঞানের বাহিরে একটা স্বাধীন বস্তু (thing in itself) আছে, যা থেকে আমাদের ইন্দ্রিয়বোধ আসছে"—এই কথা বলিয়াছেন? কিন্তু ক্যাণ্টের এই জ্ঞানকে বৃত্তিজ্ঞান বলিয়া বুঝিলে ত তাঁহার (ক্যাণ্টের) কথার কোনও অসঙ্গতি দেখা যায় না। বৃত্তিজ্ঞানের বাহিরে জ্ঞানের আকার সমর্পকরূপে বিষয় থাকে, কিন্তু জ্ঞানস্বরূপ বস্তুর বাহিরে কিছুই নাই, ইহা খুবই সঙ্গত কথা। "এই ধারণা তাঁহার সমস্ত দর্শনের বিরুদ্ধ হলেও তিনি তা পরিত্যাগ করতে পারেননি"—এইরূপ মন্তব্য ক্যাণ্ট সম্বন্ধে প্রকাশ করা যেন একটু ব্যগ্রতার পরিচয় নহে কি? ক্যাণ্টের মত ব্যক্তি সহজে স্ববিরুদ্ধ কথা বলিবেন, সংস্কারের বশীভূত হইয়া একটা কথা বলিবেন—ইহা সহজে বিশ্বাস হয় না। আমাদের মনে হয়, আমরাই তাঁহার কথা বুঝিতে পারি নাই। বস্তুতঃ, পাশ্চাত্ত্য দেশেই ক্যাণ্টের মত বুঝা সম্বন্ধে অনেক বাদবিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে শুনা যায়। তাহার পর "সর্ব্বাধার ব্রহ্মের ধারণাকে ক্যাণ্ট একটা ধারণামাত্র বলেই ব্যাখ্যা করেছেন" এ কথাতেও অসঙ্গতি কোথায়? কারণ, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মজ্ঞান ত আমরা অভিন্ন বলিয়া বুঝি। ধারণা ত জ্ঞানই। অতএব ইহাতেও ত ক্যাণ্টের দোষ দেখা যায় না। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মজ্ঞান যে অভিন্ন, তাহা যুক্তি ও শ্রুতিসিদ্ধ। এস্থলে সে কথা প্রমাণের চেষ্টা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া পরিত্যক্ত হইল। ক্যাণ্টের এ কথায় শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয় যে দোষ দেখিলেন, তাহার কারণ তিনি বলিতেছেন, "ব্রহ্মজ্ঞান যে আমাদের আত্মজ্ঞানের সঙ্গে এক, সসীম জীব যে মূলে অসীমের সঙ্গে এক, তা (ক্যাণ্ট) বুঝতে পারেননি।" কিন্তু এই কথায় যে কত দোষ হইল, তাহা একবার দেখা যাউক—

আচ্ছা, যদি ব্রহ্মজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান এক হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয় যে ব্রহ্ম, তাহা আত্মজ্ঞানের বিষয় যে আত্মা তাহা অভিন্নই হয়। অর্থাৎ উক্ত জ্ঞান দুইটি এক হওয়ায় তাহাদের বিষয় ব্রহ্ম ও আত্মা অভিন্নই হয়। কিন্তু তাহা হইলে "সসীম জীব যে মূলে অসীমের সঙ্গে এক" এ কথা সঙ্গত হয় কি করিয়া? মূলে এক বলায় সকল অবস্থায় এক নহে, ইহা কি বলা হইল না? মূল শব্দের প্রয়োগ যখন করা হইয়াছে, তখন সসীম জীবের সহিত অসীম পরমাত্মার কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ বলাই হইতেছে, কারণ, মূল শব্দের অর্থই কারণ। এখন তাহা হইলে সসীম জীবটি কার্য্য এবং অসীম পরমাত্মাটি কারণপদবাচ্য হইল। জীব পরমাত্মার কার্য্য হওয়ায় সমগ্র পরমাত্মারই বিকার হয়, ইহা স্বীকার্য্য হইল। আর যদি পরমাত্মার একদেশ বিকৃত হইয়া জীব-কার্য্যের উৎপত্তি হয়—বলা হয়, কিন্তু ইহা বলিলেও পরমাত্মারই বিকার স্বীকার্য্য হইল। কারণ, অংশকে অংশীর নামে অভিহিত করা হয়। কারণ, উপাদান দৃষ্টিতে অংশ ও অংশী এক বলা হয়। যেমন ঘট ও শরাব মৃত্তিকা-দৃষ্টিতে এক বলা হয়। আর অংশকে অংশীর নামে অভিহিত করা ভ্রম বলিলে অংশ ও অংশী দুইটি ভিন্ন বস্তু কেন বলা হইবে না? এতদ্ব্যতীত পরমাত্মার অংশ স্বীকার করায় পরমাত্মা আর অখণ্ড হইলেন না। যাহার খণ্ড আছে তাহা সাবয়ব। যাহা সাবয়ব তাহা বিনাশী, অতএব পরমাত্মা অনিত্য বস্তু হইলেন। আর সমগ্র পরমাত্মার বিকার হইলে পরমাত্মা আর নাই; এবং তাঁহার এই কার্য্যাবস্থা ইহাও আর বলা যায় না। সমগ্র দুগ্ধ দধি হইলে যেরূপ দুগ্ধ আর থাকে না, তদ্রূপ পরমাত্মা আর নাই।

যদি বলা যায়, পরমাত্মার শক্তির বিকার হইয়াছে, পরমাত্মার বিকার হয় নাই, তাহাও বলা সঙ্গত হইবে না। কারণ, শক্তি কখনও শক্তিমান্ ছাড়িয়া থাকে না। সুতরাং শক্তির বিকার হইলে শক্তিমানের বিকারই হইয়াছে বলিতে হইবে। এইরূপে জীব-ব্রহ্মের কার্য্যকারণ সম্বন্ধ স্বীকার করিলে দোষের হাত হইতে নিষ্কৃতি নাই।

যদি বলা হয়, জীব ও পরমাত্মার সহিত অংশাংশিসম্বন্ধ, অর্থাৎ পরমাত্মার এক অংশ জীব, সুতরাং পরমাত্মার এক অংশের বিকার হইল, অন্য অংশের বিকার হইল না। এজন্য উভয়-অংশ-সাধারণ যে পরমাত্মবস্তু, তাহা বিকারীও বটে, অবিকারীও বটে। অতএব "সসীম জীব মূলে অসীমের সঙ্গে এক" এ কথার অসঙ্গতি থাকিল না। কিন্তু এ কথাও সঙ্গত নহে। কারণ, পরমাত্মার জীবরূপ বিকারী অংশ এবং পরমাত্মার জীবভিন্নরূপ অবিকারী অংশের সাধারণ নাম পরমাত্মা বলিলে ভ্রমই হইবে। কারণ, পরমাত্মার যে অংশ বিকারী, সেই অংশ আর অবিকারী পরমাত্মা হইল না। বিকারী অবিকারী এই অংশদ্বয়-সাধারণ পরমাত্মা বলাই ভ্রম। কারণ, পরস্পর বিরুদ্ধের মধ্যে সাধারণ অংশই থাকে না। থাকিলে আর তাহারা বিরুদ্ধই হয় না।

আর যদি বলা হয়, পরস্পর-বিরুদ্ধ অংশ-দ্বয়কেই পরমাত্মা বলি, তাহা হইলে উক্ত পরমাত্মা উক্ত অংশদ্বয় হইতে অভিন্ন বস্তুই হইল। আর তাহা হইলে পরমাত্মা আর উভয় হইতে transcend করিলেন না। ধর্ম্ম, সম্বন্ধ ও অবচ্ছেদ-পুরস্কারে বিরুদ্ধদ্বয়ের মধ্যে এই যে সাধারণ অংশ, ইহা তখন মিথ্যা বা কল্পিত সাধারণ অংশ হইল। বিরুদ্ধ অংশদ্বয়ের যদি সাধারণ অংশ থাকে, তাহা হইলে তাহার সেই পরস্পর-বিরুদ্ধ অংশদ্বয়ের সহিত কোনই সম্বন্ধ থাকিল না। বিকারী ও অবিকারীর সাধারণ অংশ কতকটা বিকারী ভিন্ন এবং কতকটা অবিকারী ভিন্নই হইবে, সুতরাং অবিকারী পরমাত্মাংশ নিজে নিজ হইতে ভিন্ন হইল। ইহা নিতান্তই অসঙ্গত কথা। আর বিকারী পরমাত্মাংশ কতকটা অবিকারী হইলে, সেই বিকারী অংশকেই পরমাত্মার অংশ বলা যায় না। অতএব জীবের সহিত অংশী পরমাত্মার ভিন্নাভিন্ন সম্বন্ধ সম্ভবপর হইল না। সুতরাং মূলে এক বলায় পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন জীব ইহাও বলা যায় না। অথবা পরমাত্মার অংশ জীব বলিয়া পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন জীব, এরূপ কথা বলা যায় না। আর যদি "পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন জীব" ইহার অর্থ বিবর্ত্তবাদ অনুসারে করা যায়, তাহা হইলে অদ্বৈত-সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হইল। সুতরাং "সসীম জীব যে মূলে অসীমের সঙ্গে এক"—এই কথা নিতান্ত অসঙ্গত হইয়া পড়ে। ক্যাণ্ট ইহা না বুঝিতে পারিয়া আমাদের মনে হয় ভালই করিয়াছেন। অসীম বস্তু কি কাহারও মূল হয়। অসীম হইলেই অখণ্ড অদ্বৈত ও নিষ্ক্রিয় বস্তুই হয়।

ত্রয়োদশ—তাহার পর বলা হইতেছে—"আমাদের ধারণাগুলি শ্রেণীবদ্ধ করতে গিয়ে তিনি (ক্যাণ্ট) বুঝেছেন যে, প্রত্যেক ধারণারই বিপরীত ধারণা আছে বটে, কিন্তু এই দুই ধারণার ভেদের ভিতরে অভেদও আছে। এই যে প্রত্যেক বস্তুতে ভেদাভেদদর্শন, একেই বলে Dialectic method। ক্যাণ্টের অব্যবহিত পরবর্ত্তী জার্ম্মাণ দার্শনিক ফিকটে শেলিং হেগেল, বিশেষরূপে হেগেল, ক্যাণ্টের ভুল দেখাতে গিয়ে এই Dialectic methodএ ভেদাভেদ-ন্যায়ে উপনীত হলেন। হেগেল ও তাঁর ইংরেজ অনুবর্ত্তিগণ এই ন্যায়ের উপরই তাঁদের আত্মবাদ বা ব্রহ্মবাদ দর্শন স্থাপন করেছেন। আমি এই দর্শনে প্রবেশ করে দেখলাম যে, এই দর্শনের মূল সিদ্ধান্ত উপনিষদ-ব্রহ্মবাদের সহিত অভিন্ন।"

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, "প্রত্যেক ধারণারই বিপরীত ধারণা আছে"—ইহার অর্থ—সকল ধারণার অর্থাৎ সকল জ্ঞানের একটা বিপরীত ধারণা আছে অর্থাৎ একটা বিপরীত জ্ঞান আছে, ধারণা অর্থ—জ্ঞান। যেহেতু, ঘট এই জ্ঞানে ঘট-জ্ঞান যেমন আছে, তদ্রূপ ঘটাভাব এই জ্ঞানও আছে। ইহা না থাকিলে ঘটজ্ঞানটি পূর্ণ নয়। আর তজ্জন্য ঘটজ্ঞানের বিষয় যেমন ঘট আছে, তদ্রূপ ঘটাভাব-জ্ঞানের বিষয় ঘটাভাবও আছে। এই ঘটাভাব থাকে ঘটভিন্ন পটাদিতে। তদ্রূপ পটাভাব থাকে পটভিন্ন ঘটাদিতে। ঘটধারণার বিপরীত ধারণা পটধারণা বলিলে ঠিক বিপরীত ধারণা বুঝায় না। উহা ঘটধারণার বিপরীত পটমঠাদি অসংখ্য ধারণার মধ্যে একটি ধারণাই হয়। এজন্য ঘটধারণার বিপরীত ধারণা ঘটাভাবের ধারণা। শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের মতে ক্যাণ্ট ইহা বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু ঘটধারণা ও ঘটাভাবধারণার মধ্যে যে অভেদ আছে,—তাহা তিনি বুঝেন নাই! আমাদের মনে হয়, ক্যাণ্ট ইহাতে ভালই করিয়াছেন।

কারণ, ঘটজ্ঞান ও ঘটাভাবের জ্ঞানের মধ্যে অভেদ কোথায়? ঘটজ্ঞানের বিষয় ঘটকে বাদ দিলে যে জ্ঞান থাকে এবং ঘটাভাবের জ্ঞানের বিষয় ঘটাভাবকে বাদ দিলে যে জ্ঞান থাকে, তাহারা অভিন্ন হয় বটে, অর্থাৎ সেই জ্ঞানদ্বয়ে অভেদ থাকে বটে, কিন্তু বিষয় দুইটি বাদ না দিলে কি বিশিষ্ট জ্ঞানদ্বয়ে অভেদ থাকে বলা যায়? কখনই নহে। বলিলে বিরুদ্ধ কথা বলা হয়। কারণ, বিষয়শূন্য জ্ঞান ত স্বীকার্য্য নহে। আর ঘট-শরাবমধ্যে মৃত্তিকা অংশে অভেদ আছে বটে, ধনুকের বা একটি বক্ররেখার ন্যুব্জ কুব্জ ধর্ম্ম মধ্যে ধনুক অংশে বা রেখা অংশে অভেদ আছে বটে, ঘটজ্ঞান ও ঘটাভাবজ্ঞানে রিরোধিতা অংশে অভেদ আছে বটে, কিন্তু যে অংশে ভেদ, সেই অংশে কি অভেদ থাকে? ঘট-শরাবে ঘটত্ব ও শরাবত্ব অংশে ভেদই থাকে, অভেদ ত থাকে না। মৃত্তিকা অংশেই অভেদ থাকে। এইরূপ অন্য দুইটি স্থলেও ধর্ম্মভেদে অভেদ থাকে বুঝিতে হইবে। অতএব এমন কোনও দৃষ্টান্ত নাই, যেখানে যে ধর্ম্মে ভেদ, সেই ধর্ম্মে অভেদও আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয়। ইহা বিরুদ্ধ কথা। ইহা কেহই বুঝিতে পারে না। আর যদি দুইটি বিষয়ের একটি ধর্ম্মে ভেদ, এবং অন্য ধর্ম্মে অভেদ হয়, তাহা হইলে সেই দুই বিষয়ে ভেদই থাকিল, ভেদাভেদ আর থাকিল না। একই ধর্ম্মে ভেদ এবং সেই একই ধর্ম্মে অভেদ থাকিলে ভেদাভেদ বলার সার্থকতা হয়, নচেৎ ভেদাভেদ বলা ব্যর্থ। কারণ, সব "ভিন্ন" পদার্থেই এইরূপ ভেদাভেদ দেখাইতে পারা যায়। এইরূপ "সম্বন্ধ" ও "অবচ্ছেদ" লইয়াও ভেদাভেদের বিচার আছে। যেমন সংযোগ সম্বন্ধে ঘট, যে ভূতলে, যে কালে থাকে, সেই ভূতলে সেই কালে সংযোগ সম্বন্ধে ঘটাভাব আর থাকে না; এবং বৃক্ষের যে অবচ্ছেদে অর্থাৎ যে অংশে পক্ষী যে কালে বসে, বৃক্ষের সেই অবচ্ছেদে অর্থাৎ সেই অংশে পক্ষী সেই কালে থাকে না—ইহা বলা যায় না। এই কারণে, ধর্ম্ম, সম্বন্ধ ও অবচ্ছেদ এই তিনটি লইয়াই বিরোধের পরিচয় দেওয়া হয়। যেমন যে বস্তু, যে ধর্ম্মে যে সম্বন্ধে যে অবচ্ছেদে সেখানে থাকে, সেই ধর্ম্মে সেই সম্বন্ধে সেই অবচ্ছেদে সে বস্তু সেখানে নাই—ইহা বলা যায় না। বলিলে বিরুদ্ধ কথা হয়। ভেদ ভিন্ন অভেদ হওয়ায় অর্থাৎ ভেদ ও অভেদের মধ্যে এইরূপ বিরোধ থাকায় ইহারা একত্র থাকিতেই পারে না। আর যদি ধর্ম্ম সম্বন্ধ অবচ্ছেদের একটি অবিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে আর ভেদের মধ্যে অভেদ থাকিল না। তাহাদের মধ্যে তখন ভেদই থাকিল। এই ভেদাভেদবাদ ভেদবাদেরই নামান্তর। কারণ, ভেদবাদীরা এই কথাই বলেন।

যদি বলা হয়, যখনই যাহার জ্ঞান হয়, তখনই তদ্‌ভিন্নেরও জ্ঞান হয়, তদ্‌ভিন্নের জ্ঞান ব্যতীত তাহার জ্ঞান পূর্ণ হয় না, অতএব সকল বস্তুই ভেদাভেদাত্মক। এজন্য ভেদের মধ্যে অভেদ থাকিবে না কেন? কিন্তু এ কথাও সঙ্গত নহে। কারণ, যখনই যাহার জ্ঞান হয়, তখনই তদ্‌ভিন্ন সমুদায়েরই জ্ঞান হয় না। যেমন পুস্তকের জ্ঞান কালে পুস্তকভিন্ন পুস্তকাধার লেখনী প্রভৃতি কতিপয় বস্তুর জ্ঞান আবশ্যক হইলেও তদ্‌ভিন্ন গ্রহনক্ষত্রাদির জ্ঞান ত হয় না। অতএব তদ্‌ভিন্নের পূর্ণ জ্ঞানই হয় না। এজন্য তদ্‌বস্তুর জ্ঞানের জন্য তদ্‌ভিন্নের জ্ঞান আবশ্যক হয় না বলা যায়।

যদি বলা যায়, তদ্‌বস্তুজ্ঞানের জন্য তদ্‌ভিন্নসমুদায়ের জ্ঞান আবশ্যক না হইলেও জ্ঞাত তদ্‌ভিন্ন সমুদায়ের জ্ঞান আবশ্যক হয়, অজ্ঞাত তদ্‌ভিন্ন সমুদায়ের জ্ঞান অনাবশ্যক হয় হউক, তদ্‌ভিন্ন কতকগুলি বস্তুর ত জ্ঞান আবশ্যকই হয়। পুস্তকজ্ঞানে গ্রহনক্ষত্রাদির জ্ঞান অনাবশ্যক হইলেও পুস্তকাধার প্রভৃতি তদ্‌ভিন্নের জ্ঞান ত আবশ্যকই হইবে। নচেৎ ব্যবহার অচল হইবে? তাহা হইলে বলিব, সে স্থলেও যাবদ্ জ্ঞাত বস্তুরও জ্ঞান অনাবশ্যক, কতকগুলি জ্ঞাততদ্ভিন্নেরই জ্ঞান আবশ্যক হয়। এজন্য তদ্‌ভিন্নজ্ঞানের আবশ্যকতা বলা অযুক্ত। এরূপ বলিলে অংশীর কার্য্য অংশের দ্বারা সিদ্ধ করা হয়। ইহাও অযুক্ত। ব্যবহারেও ইহা বাধিত হয়। এজন্য নৈয়ায়িক প্রভৃতি অনেক ভারতীয় দার্শনিক, তদ্‌বস্তুর জাতি বা অনুগত ধর্ম্ম দ্বারা তদ্‌বস্তুর জ্ঞানের পূর্ণতা হয়, স্বীকার করেন। বস্তুতঃ দেখাই যায়—একরূপ কতকগুলি বস্তুর মধ্যে কোন একটি নির্দ্দিষ্ট বস্তুকে বাছিয়া লওয়া হইতেছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে কি ভেদ, তাহা নির্ব্বাচন-কর্ত্তা বুঝাইয়া উঠিতে পারে না। সেখানে সেই বস্তুর জাতি বা আকার-বিশেষই সেই নির্ব্বাচনের হেতু হয়। অতএব তদ্‌বস্তুর জ্ঞানের জন্য তদ্‌ভিন্নবস্তুর জ্ঞান আবশ্যক, ইহা অসঙ্গত কথা। জাতি বা অনুগত ধর্ম্ম দ্বারা তদ্‌বস্তুর জ্ঞানেরও পূর্ণতা এবং ব্যবহারও সম্পাদিত হয়। বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন, গুড় ও ইক্ষুর মিষ্টতা শব্দ দ্বারা সরস্বতীও বুঝাইতে পারেন না।

যদি বলা যায়, জাতিও তদ্‌জাতিমদ্‌ভিন্নের ধর্ম্মের অভাবস্বরূপই বস্তু। অতএব জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তির জ্ঞান পূর্ণ হয়, ইহা না বলিয়া তদ্‌জাতিমদ্‌ভিন্নের ধর্ম্মের অভাব দ্বারাই যে কোন বস্তুর জ্ঞানের পূর্ণতা হয় ইহা বলাই সঙ্গত। অতএব কোন বস্তুর জ্ঞানকালে তদ্‌ভিন্নবস্তুর

জ্ঞান অনাবশ্যক, ইহা বলা সঙ্গত হয় না। সুতরাং সকল বস্তুই ভেদাভেদাত্মক বলা অসঙ্গত কেন হইবে? কিন্তু ইহাও সঙ্গত নহে। কারণ, জাতির জ্ঞানে ভাব পদার্থেরই জ্ঞান ভাসমান হয়, জাতিকে অভাবরূপে আমরা বুঝি না। ঘটে ঘটত্বই জাতি, কম্বুগ্রীবাদিমত্বই অনুগত ধর্ম্ম, তাহারই ভান ঘটজ্ঞানে হয়, তাহা পটমঠাদিভিন্ন এ ভাবে ঘটের জ্ঞান হয় না। ব্যবহারকালে তাহার আবশ্যকতা হইলেও জ্ঞানকালে তাহার আবশ্যকতা নাই।

যদি বলা যায়, যে বস্তুরই জ্ঞান হয়, তাহাতে সেই বস্তুকে "সেই বস্তু" বলিয়া যে জ্ঞান হয়, তাহা নিজে নিজের ভেদের অভাবের জ্ঞান অর্থাৎ অভেদের জ্ঞান, এবং তদ্‌ভিন্নের ভেদের যে জ্ঞান হয়, তাহা ভেদের জ্ঞান—এইরূপে সকল বস্তুর জ্ঞানে ভেদ ও অভেদের জ্ঞান হয়। ইহা না হইলে কোন জ্ঞানই হয় না। অতএব সকল বস্তুই ভেদাভেদাত্মক? কিন্তু এ কথাও সঙ্গত নহে, কারণ, সেই বস্তুতে যে সেই বস্তুর জ্ঞান, তাহা প্রকারান্তরে নিজে নিজের অভাবরূপের জ্ঞান হইলেও তাহা সেই বস্তুর ভাবরূপের জ্ঞান বলিয়া প্রতিভাত হয়, অভাবরূপে প্রতিভাত হয় না। তাহা একটা কিছুর জ্ঞান বলিয়া তাহা ভাবরূপেরই জ্ঞান। অতএব সেই বস্তুতে সেই বস্তুর জ্ঞান, প্রকারান্তরে অভেদের অর্থাৎ ভেদের অভাবের জ্ঞান হইলেও তাহা একটা ভাবরূপেরই জ্ঞান হয়। তাহাতে অভাবের জ্ঞান অগ্রে হয় না, অগ্রে ভাবেরই জ্ঞান হয়, পরে কল্পনার সাহায্যে তাহাকে অভাবের অভাব বলা হয়। আবার সেই বস্তুতে তদ্ভিন্নের যে ভেদ-জ্ঞান হয়, তাহা ভেদের জ্ঞান নয়, কিন্তু ভেদ-বিশিষ্টের অর্থাৎ ভিন্নের জ্ঞান হয়। যেহেতু, ঘটভিন্ন যে পটাদি, সেই পটাদিভিন্নই ঘট হয়। পটাদির ভেদ পটাদি নহে। ঘটাদিতে সেই ভেদ থাকে, সেই ভেদ ঘটাদি হয় না। আধার কখনও আধেয় হয় না। আধার আধেয় ভিন্নই হয়। অতএব সকল জ্ঞানই ভেদা-ভেদাত্মকের জ্ঞান—ইহা বলা সঙ্গত হয় না। ভেদবিশিষ্টের অর্থাৎ ভিন্নের জ্ঞানে ভেদ হয় বিশেষণ, এবং যাহাতে সেই ভেদ থাকে, তাহা হয় বিশেষ্য। বিশেষণ অপেক্ষা বিশেষ্যেরই প্রাধান্যই হয়।

যদি বলা হয়, সকল বস্তুতে তাহার ভাবরূপের জ্ঞান হইলেও তাহা যে ভাবাভাবাত্মক হয়, অর্থাৎ ভেদাভেদাত্মক হয়, তাহা ত অস্বীকার করা যায় না। জ্ঞান হয় না বলিয়া জ্ঞেয় বস্তুর ত অন্যথা হয় না। অতএব সকল বস্তুই ভেদাভেদাত্মক বলিতে পারা যায়। কিন্তু এ কথাও সঙ্গত নহে। যাহা কল্পিত হয়, তাহার সত্তাও সিদ্ধ হয় না। নিজে নিজের ভেদের অভাবের জ্ঞান, ইহা কল্পনা করিয়া বুঝিতে হয়, এজন্য এই অভেদ কল্পিত পদার্থ। আর জাতির দ্বারা যখন তদ্ভিন্নের ভেদজ্ঞানের কার্য্য সিদ্ধ হয়, তখন তাহার স্বীকার নিষ্প্রয়োজন। অতএব কল্পিতের সত্তার দ্বারা অকল্পিতের স্বরূপ সিদ্ধ করা ব্যর্থ হয়! এ কারণ, বেদান্তিগণ ব্যবহারক্ষেত্রে ভেদাভেদ স্বীকার করিলেও ভেদ মিথ্যা এবং অভেদ সত্য, এই ভাবে ভেদাভেদ স্বীকার করেন। মীমাংসকগণ এই ভেদাভেদবাদী, তবে তন্মতে উভয়ই সত্য বলা হয়। ইহা ক্যাণ্ট হেগেলের বহু বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। অতএব হেগেল ইহার আবিষ্কারকর্ত্তা ইহা বলা সঙ্গত হয় না। আর এইরূপ নানা কারণে উক্ত Dialectic method একটি শব্দাড়ম্বর মাত্র। ইহা ব্রহ্মবিচারের পথই নহে। যে পথে বিরোধ অমান্য করা হয়, সেই পথ পথই নহে। বিরোধ অমান্য করিলে বক্তাকে লোকে বাতুলই বলে।

তাহার পর "ভেদের মধ্যে অভেদ দর্শন" এই কথাটির অর্থও বুঝিতে হইবে। এই নামকরণেও বাহাদুরী আছে! ভেদের মধ্যে অভেদ দেখাকে যদি ভেদ নামক অভাব বস্তুকে অভেদ অর্থাৎ ভেদা-ভাবরূপ একটি ভাববস্তু বলিয়া দেখা—ইহা বলা যায়, তবে অভাবকে ভাব বলিয়া দেখায় তাহা অপ্রমা অর্থাৎ ভ্রমপদবাচ্য হইল। যদি ভেদে অভেদ অর্থাৎ ভেদাভাবরূপ অভাব দেখা হয়, তাহা হইলেও ভ্রম হয়।

যদি বলা যায়, ভেদে অভেদ দর্শন—ইহার অর্থ; ভেদবিশিষ্ট যে ভিন্ন নামধেয় বস্তু, সেই ভিন্নে অভেদ, অর্থাৎ ভেদাভাব দর্শন, তাহা হইলে তাহাও ভ্রম হয়, কারণ, যাহা ভিন্নপদবাচ্য হয়, তাহা ভাব-বস্তুও হয়, অভাব বস্তুও হয়। অতএব ভিন্ন নামক ভাববস্তুতে অভাব দর্শন হইলে তাহা ভ্রমই হয়। এখানে অভাবে অভাবদর্শন সম্ভবপর নহে, কারণ, এখানে ভাববস্তুরই কথা হইতেছে। অতএব "ভিন্নে অভাবদর্শন" ভ্রমই হয়। আর তজ্জন্য "ভেদের মধ্যে অভেদদর্শন" বাক্যের অর্থ এরূপও হইতে পারে না।

যদি বলা যায়, ভেদের মধ্যে অভেদদর্শন—ইহার অর্থ—ভিন্নে অভিন্নদর্শন বলিব, তাহা হইলেও বিরোধ হয়, আর তজ্জন্য তাহাও ভ্রমপদবাচ্য হয়। অতএব ইহার অর্থ, এক ধর্ম্মে ভিন্নদর্শন এবং অন্য ধর্ম্মে অভিন্নদর্শন—এইরূপ করিলে "ভিন্নে অভিন্নদর্শন" কথাটা সঙ্গত হয়। আর তাহা হইলে ভেদের মধ্যে অভেদদর্শনের অর্থ ধর্ম্মভেদে ভিন্নে অভিন্নের দর্শন বলিলে বক্তব্য সঙ্গত হয়। ইহার দৃষ্টান্ত যেমন, ঘট ও শরাবে ঘট ও শরাব দর্শন—"ভিন্নে ভিন্নদর্শন" হয়, এবং ঘট ও শরাবে মৃত্তিকাদর্শন ভিন্নে অভিন্নের দর্শন হয়। অর্থাৎ ভাব ও অভাবের মধ্যে ধর্ম্ম, সম্বন্ধ এবং অবচ্ছেদের মধ্যে কোন একটির অন্যথা বলিয়া যে দর্শন, তাহাতে বিরোধ থাকে না বলিয়া তাহাই ভেদের মধ্যে অভেদদর্শন পদবাচ্য হয়। ইহা কিন্তু ভেদাভেদ-দর্শন হয় না, ইহা বস্তুতঃ ভেদদর্শনই হয়। এজন্য ইহাকে ভেদাভেদ-বাদ বলাও সঙ্গত হয় না। ভেদের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ যে অভেদ, তাহাদের যদি একত্র অবস্থান হয়, তাহা হইলেই ভেদাভেদ বলার সার্থকতা হয়। নচেৎ তাহা ভেদবাদেরই নামান্তর হয়। এজন্য এতাদৃশ ভেদাভেদ-বাদ শব্দাড়ম্বর মাত্র বলা হয়।

যদি বলা হয়, অবয়ব সকল হইতে অবয়বী, যেমন অবয়ব সকলে থাকিয়াও একটা অতিরিক্ত বস্তু হয় অর্থাৎ পৃথক্ বস্তু হয়, সমষ্টি যেমন ব্যষ্টিতে থাকিয়াও ব্যষ্টি হইতে অতিরিক্ত হয়, অর্থাৎ পৃথক্ হয়, তদ্রূপ ভাব (thesis) এবং অভাব (antithesis) এই উভয়ের মধ্যে থাকিয়াও একটা যে অতিরিক্ত বস্তু (synthesis) স্বীকার করা হয়, তাহাই জগৎকারণ মূল বস্তু, তাহাই ব্রহ্মবস্তু। এই অতিরিক্ত বস্তুটি, ভাব ও অভাবে সর্ব্বতোভাবে অনুস্যুত বা অনুপ্রবিষ্ট থাকে, অথচ তদতিরিক্ত বস্তুও হয়। অর্থাৎ, ইহা ভাববস্তুও হয়, এবং ভাবভিন্ন বস্তুও হয় এবং অভাববস্তুও হয় এবং অভাবভিন্ন বস্তুও হয়, ইহাই ভেদাভেদবাদ। বাম হস্ত ও দক্ষিণ হস্তের সহিত দেহের যেরূপ সম্বন্ধ, এই ভাব ও অভাবের সহিত সেই অতিরিক্ত বস্তুরও সেইরূপ সম্বন্ধ। বাম হস্তের সহিত দক্ষিণ হস্তের ভেদ আছে, কিন্তু দেহের সহিত তাহাদের ভেদ নাই। দেহরূপে বাম ও দক্ষিণ হস্ত অভিন্ন, কিন্তু হস্তরূপে তাহারা ভিন্ন। ইহাকে অদ্বৈত বস্তুর স্বগতভেদ বলা যায়, অংশাংশী সম্বন্ধও বলা যায়।

হস্তদ্বয়ই দেহ হইতে অতিরিক্ত নহে, 'কিন্তু দেহ হস্তদ্বয় হইতে অতিরিক্ত। তদ্রূপ জীব ও জগৎ ব্রহ্ম মধ্যে আছে, সুতরাং ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন অর্থাৎ অনতিরিক্ত, ব্রহ্ম কিন্তু জীব-জগৎ হইতে অতিরিক্ত, অর্থাৎ ভিন্নও বটে। এজন্য জীব ও জগৎ এবং তাহাদের যে অভাব—এই ভাব ও অভাব উভয়ের স্বরূপ ব্রহ্ম হইয়াও ব্রহ্ম তদতিরিক্তও বটে। সমষ্টি-ব্যষ্টির সম্বন্ধ, অবয়ব-অবয়বীর সম্বন্ধ, অংশ ও অংশীর সম্বন্ধ, আলোচনা করিলে এই তত্ত্বটি বেশ বুঝা যায়। সকল জ্ঞানে এই ভেদাভেদ ভাব বর্ত্তমান, সকল বিষয়েও এই ভেদাভেদ বর্ত্তমান। ইহাই ভেদাভেদবাদ। এই ভেদাভেদবাদ দ্বারা শ্রুতির সকল বিরুদ্ধ কথার মীমাংসা হয়, এজন্য ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্য, ইত্যাদি।

কিন্তু এ কথাও সঙ্গত নহে। কারণ, ইহাতে বিরোধের অমান্য করা হয়। যেহেতু, যাহা যদতিরিক্ত হয়, তাহা তদভিন্ন হয়। যাহা যদভিন্ন, তাহা তাহা হইতে পারে না। হইতে পারে বলিলে বিরোধ হয়। এ স্থলে ভাব ও অভাব হইতে অতিরিক্ত বস্তুটি অতিরিক্ত বলিয়া একবার ভাব হইতেও ভিন্ন হয় এবং অভাব হইতেও ভিন্ন হয়, অন্যবার তাহা ভাবস্বরূপ হয়, এবং অভাবস্বরূপও হয়। নচেৎ অতিরিক্ত বলাই বৃথা হয়। ইহাই ত বিরুদ্ধ কথা। ভাবকে ভাবভিন্ন বলা ভ্রম, তদ্রূপ অভাবকে অভাবভিন্ন বলাও ভ্রম। যেহেতু, ভাবভিন্নই অভাব, এবং অভাবভিন্নই ভাব। যে অতিরিক্ত বস্তু একই দেশকালে একবার ভাব এবং অন্যবার অভাব হয়, তাহাই ত অনির্ব্বচনীয় হয়, তাহাকে আছে বলা যায় না, নাই বলাও যায় না, এবং আছে-নাই উভয়ও বলা যায় না। এজন্য তাহাকে সদসদ্‌ভিন্ন বলা যায়। ইহাকেই অনির্ব্বচনীয় বা মিথ্যা বলা হয়। ইহাকে ব্রহ্মবাদ বলা অসঙ্গত। ইহাকে প্রকৃতিবাদ বা মায়াবাদ বলা যাইতে পারে। বেদান্তের ব্রহ্মবস্তুটি সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ একটি অখণ্ড নির্ব্বিশেষ বস্তু। তাহা ভেদাভেদাত্মক নহে। আর প্রদর্শিত ভেদাভেদবাদ অবয়বি-অবয়বের ন্যায় নহে, অথবা সমষ্টিব্যষ্টির ন্যায়ও নহে। কারণ, ইহারা সকলেই ভাববস্তু। কিন্তু এই ভেদাভেদবাদ ভাব ও অভাব বস্তুকে লইয়া কল্পনা করা হইয়াছে। সুতরাং অবয়ব-অবয়বি মধ্যে বা সমষ্টিব্যষ্টি মধ্যে যেমন অভেদ থাকিতে পারে, এই ভাব অভাবের মধ্যে সেরূপ অভেদ থাকিতে পারে না। অবয়ব-অবয়বি মধ্যে বিরোধ নাই, সমষ্টিব্যষ্টিতে বিরোধ নাই, কিন্তু ভেদ ও অভেদে বিরোধ বিদ্যমান। এই জন্য এই মতবাদটি শব্দাড়ম্বর মাত্র।

বিরোধ না মানিয়া যাহা বুঝা যায়, তাহা ভ্রম হয়, আর যাহা করা যায়, তাহা অন্যায় হয়। বিরোধ-অমান্যকারীর অসাধ্য কিছুই নাই। এমতে উন্নতি, প্রাকৃতিক নিয়মে অনিবার্য্য। এই মতেই পাপ পুণ্য যে যাহাই করুক না কেন, প্রাকৃতিক নিয়মে তাহার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। এই মতেই অনন্ত উন্নতিবাদ, ক্রমোন্নতিবাদ, অভিব্যক্তিবাদ প্রভৃতির আবির্ভাব হইয়াছে। এই মতে ভোগত্যাগ সন্ন্যাস প্রভৃতি অনাবশ্যক, এই মতেই সাধনার জন্য শক্তিদেবী আবশ্যক, এই মতে সংযমও সুতরাং নিষ্প্রয়োজন, এই মতেই বলা হয়, বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়, এই মতেই বলা হয়, অনন্ত বন্ধন মাঝে লভিব মুক্তির স্বাদ। এই মতের ফলে আজ পাশ্চাত্ত্যের মহাসমর চলিয়াছে। এই মতে বলা হয়, জীবন ধন্য হয়, এই মতেই ভাগবতী নিত্যতনু লাভ হয় বলা হয়। এই মতেই কেহ জন্মান্তর স্বীকার করিয়া অনন্ত উন্নতি বলেন, আবার কেহ বা এই জীবনেই, এই দেহেই অনন্ত উন্নতি বলেন। এই দেহই ক্রমে দিব্য দেহে পরিণত হইবে, এই মতেই বলা হয়, একই কালে একই ব্যক্তিতে ভোগ ও ত্যাগের সামঞ্জস্য হয়। এই মতবাদের বীজ পাশ্চাত্ত্য হইতে আসিয়া ভারতভূমিতে রোপিত এক অতি অদ্ভুত পাপ-পাদপে পরিণত হইয়াছে। এ দেশের ভেদাভেদবাদে ভগবানে ভক্তি শ্রদ্ধা ধর্ম্ম কর্ম্ম ও উপাসনার স্থান ছিল, পাশ্চাত্ত্য ভেদাভেদবাদের সহিত মিশ্রিত হইয়া ইহাতে আর সে ধর্ম্ম কর্ম্ম ভক্তি শ্রদ্ধা ও উপাসনার স্থান নাই, তৎপরিবর্ত্তে যে কোন উপায়ে ভোগনিষ্পত্তির প্রবৃত্তির একাধিপত্য হইয়াছে। আর তাহার ফলে কপটতা কুটিলতা প্রভৃতি বিবিধ পাপের প্রভাব বৃদ্ধি পাইতেছে।

যদি বলা যায়, এরূপ জ্ঞান ভ্রম হইলেও এই জ্ঞানের বিষয়বস্তু ভেদাভেদাত্মক হইতে বাধা কি? ইহার উত্তর পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। যাহা কোনও কালে জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না, তাহার সত্তা স্বীকার করা যায় না, উহা কল্পিত পদার্থ হয়। এই ভেদাভেদে বিরোধ স্বীকার করা হয় না বলিয়া ইহা উপেক্ষার যোগ্য।

তাহার পর সকল ধারণারই যদি বিপরীত ধারণা থাকে, তবে সেই অতিরিক্ত বস্তুরই বিপরীত কিছু থাকিবে না কেন? এবং তদুভয়েরও আবার অতিরিক্ত বস্তু থাকিবে, আবার তাহারও বিপরীত কিছু থাকিবে। এইরূপে কোনও অতিরিক্ত বস্তুতে বিশ্রান্তি ঘটিতে পারিবে না। এজন্য সকল ধারণার বিপরীত ধারণা থাকে, এই কথাই সঙ্গত নহে। আর বিপরীত ধারণা না থাকায় সেই ধারণার বিষয়ও বিপরীতভাবাপন্ন অর্থাৎ ভেদাভেদাত্মক হয় না।

তাহার পর ভাবাভাবাবগাহী যে অতিরিক্ত বস্তুটি হয়, তাহার জ্ঞানকালে তাহার অঙ্গীভূত ভাব ও অভাবের জ্ঞান হয় না, সেই অতিরিক্ত বস্তুর জ্ঞানটি, একটি বস্তুরই জ্ঞান হয়। যেমন ঘটরূপ অবয়বীর জ্ঞানে ঘটাবয়ব কপালের জ্ঞান হয় না, অথবা বৃক্ষের সমষ্টি বনের জ্ঞানকালে ব্যষ্টি বৃক্ষ সকলের জ্ঞান হয় না, কিন্তু ঘট-জ্ঞান কালে একটি ঘটবস্তুরই জ্ঞান হয়, এবং বনজ্ঞান কালে একটি বনবস্তুরই জ্ঞান হয়। ঘটমধ্যে ঘটাবয়ব থাকিলেও সেই অবয়বের জ্ঞান হয় না, বনমধ্যে বৃক্ষ থাকিলেও বৃক্ষের জ্ঞান হয় না। অতএব ভাব ও অভাবের অতিরিক্ত বস্তু জ্ঞানকালে সেই পরস্পর বিপরীত ভাব ও অভাবের ভান হয় না। তদ্রূপ জগৎকারণ ব্রহ্মের জ্ঞান-কালে ব্রহ্মেরই জ্ঞান হয়, জগৎ এবং তাহার অভাবের জ্ঞান হয় না। এই কারণে জ্ঞানও ভেদাভেদাত্মক নহে, জ্ঞানের বিষয়ও ভেদাভেদাত্মক হয় না; সুতরাং ব্রহ্মও ভেদাভেদাত্মক নহে।

এই ভেদাভেদবাদের রহস্য এই যে, এই ভেদাভেদবাদের ভেদ ও অভেদ উভয়ই যদি সমান সত্য হয়, যদি একই দৃষ্টিতে ভেদ এবং অভেদ হয়, অর্থাৎ যদি একই ধর্ম্ম, সম্বন্ধ, অবচ্ছেদে যদি ভেদ ও অভেদ হয়, তাহা হইলে এই ভেদাভেদ পরস্পরবিরুদ্ধ হয়, এবং তখন ইহা অনির্ব্বচনীয় বস্তু হইয়া যায়। তখন ইহা বেদান্তের সম্মতও হয়; কারণ, বেদান্তমতে ব্রহ্ম ভিন্ন সকলই অনির্ব্বচনীয় বলা হয় এবং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ এক অখণ্ড অদ্বয় বস্তু। আর যদি এক দৃষ্টিতে ভেদ এবং অন্য দৃষ্টিতে অভেদ হয়, এবং ইহারা সমান সত্য বলা হয়, তখন ইহাকে ভেদবাদের মধ্যে গণ্য করা হয়, অর্থাৎ তখন ইহাকে ভেদবাদী নৈয়ায়িক প্রভৃতির মতবাদমধ্যে গণ্য করা

হয়। এই মত দ্বারা ব্যবহার সুসম্পন্ন হয়, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বিশেষ সহায়তা হয়, জাগতিক উন্নতির বিশেষ অনুকূলতা হয়; যেহেতু, ঘটশরাবাদির মধ্যে মৃত্তিকা দর্শনের ন্যায়, যাবদ দৃশ্য পদার্থের মধ্যে একটি সাধারণ বস্তুর অন্বেষণে সুবিধা হয়। ফলে জড়ের উপর আধিপত্য বৃদ্ধি পায়। ইহার শেষ প্রকৃতি পর্য্যন্ত। এই মতে উপাসকের গতি জগৎকারণ প্রকৃতিতে লয় পর্য্যন্ত। আর প্রকৃতি নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া এই গতিতে জন্ম-মরণের হাত হইতে নিষ্কৃতি নাই। জন্ম-মরণের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হইলে অপরিবর্ত্তনীয় বস্তু হইতে হইবে। আর যদি ভেদ মিথ্যা এবং অভেদ সত্য—ইহাই ভেদাভেদবাদ হয়, তাহা হইলেও ইহা প্রথম কল্পের ন্যায় বেদান্ত সিদ্ধান্তই হয়, কারণ, ব্রহ্ম এক অভিন্ন বস্তু, ইহাই সত্য এবং ব্রহ্ম ভিন্ন বস্তু বিভিন্নস্বভাব বস্তু, উহা মিথ্যা অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয়, অর্থাৎ দেখা যায় কিন্তু নাই। ইহাতে মুক্তির সাধন বৈরাগ্য জন্মিয়া থাকে।

এখন "হেগেল ও তাঁহার ইংরেজ অনুবর্ত্তিগণ এই ন্যায়ের উপরই তাঁহাদের আত্মবাদ বা ব্রহ্মবাদ-দর্শন স্থাপন করেছেন"—এই কথায় মনে হয়, বেদান্তের আত্মবাদ বা ব্রহ্মবাদ দর্শনটি পাশ্চাত্য দার্শনিকের স্কন্ধে চাপান হইতেছে মাত্র। পাশ্চাত্যের প্রতি অনুরাগবশতঃ চারি দিকে পাশ্চাত্য হেগেলীয় দর্শন দেখা হইতেছে মাত্র। "আত্মবাদ ব্রহ্মবাদ" শব্দ বৈদিক শব্দ, ইহা বৈদিক সম্প্রদায়ের কথা। হেগেল প্রভৃতি দার্শনিকগণ এই শব্দ নিজ নিজ দর্শনে প্রয়োগ করেন নাই। সিদ্ধান্তের কথঞ্চিৎ সাম্য দেখিয়া এক্ষণে তাঁহাদের দর্শনের এইরূপ নামকরণ করা হইতেছে মাত্র। ব্রহ্মবাদের বা আত্মবাদের ব্রহ্ম বা আত্মা যে লক্ষণাক্রান্ত, তাহা স্বাধীন যুক্তি ও অনুভবের দ্বারা জানিতে পারা যায় না। বেদ হইতে তাহার সন্ধান পাইয়া যুক্তি ও অনুভবের দ্বারা তাহার সম্ভাবনা সিদ্ধ করা হয় মাত্র, তাহার বিরুদ্ধ যুক্তির খণ্ডন করা হয় মাত্র। বৈদিক ব্রহ্মবাদের নাম পাশ্চাত্য জগৎকারণবাদে প্রয়োগ করিয়া বৈদিক ব্রহ্মবাদীকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবার সুযোগ প্রদান করা হইল মাত্র। যেহেতু, একটু পরেই বলা হইয়াছে—"আমি এই দর্শনে প্রবেশ করে দেখলাম যে, এই দর্শনের মূল সিদ্ধান্ত উপনিষদ ব্রহ্মবাদের সহিত অভিন্ন।" অগত্যা ভারতীয় দর্শনের স্কন্ধে পাশ্চাত্য দর্শনের সিদ্ধান্ত চাপান দেওয়া হইল বলিতে পারা যায়। যিনি ভারতীয় দর্শনে স্বসম্মত ব্রহ্ম না পাইয়া পাশ্চাত্য দর্শন পড়িলেন এবং পাশ্চাত্য দর্শন পড়িয়া বুঝিলেন ভারতীয় দর্শনেও এই ব্রহ্মবাদ রহিয়াছে, তাঁহার কি ভারতীয় দর্শন পড়িবার অগ্রেই ব্রহ্ম সম্বন্ধে একটা দৃঢ় সংস্কার জন্মে নাই। তাহা না হইলে কি করিয়া বলা যায় "দেশীয় দর্শনে অসন্তুষ্ট হয়েই আমি পাশ্চাত্য দর্শনাধ্যয়নে নিবিষ্টচিত্ত হলাম এবং দীর্ঘ অধ্যয়নের পর তাহাই পেলাম, যা খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম।" ইত্যাদি। কিন্তু ইহাই কি সত্যানুসন্ধানের রীতি? ইহাতে কি ন্যায় মীমাংসা প্রভৃতি গ্রন্থ যথাবিধি যোগ্য অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন না করিয়া বেদান্তের কয়েকখানি পুস্তক নিজে নিজে অধ্যয়ন করিয়া স্থির করা হইল না যে, ইহাতে সত্য নাই! ইহাতে কি এইরূপ কথাই বলা হইল না?

তাহার পর আবার যখন বলা হইল, "ভারতীয় দর্শনাধ্যয়নে ফিরে গিয়ে উপনিষদ্ ও তন্মূলক প্রধান প্রধান গ্রন্থ বিশেষ মনোযোগের সহিত পড়লাম। পড়ে দেখলাম যে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ব্রহ্মবাদ পরস্পর সদৃশ বটে, কিন্তু প্রতীচ্য ব্রহ্মবাদের পশ্চাতে রয়েছে উক্ত স্পষ্ট ও গভীর dialectic method, পরন্তু ভারতীয় দর্শনের পশ্চাতে রয়েছে কেবল শ্রুতির দোহাই, আর সেই লৌকিক দ্বৈতবাদী ন্যায়,—যদ্দ্বারা কখনও ব্রহ্মবাদ প্রমাণিত হতে পারে না।" (১০৬ পৃঃ) ইত্যাদি।

এই কথায় মনে হইতেছে, প্রথমে প্রাচ্য দর্শন পড়িয়া পাশ্চাত্য দর্শন পড়িবার ফলে উভয় দর্শনকে "অভিন্ন" বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তৎপরে পাশ্চাত্য দর্শন পড়িয়া দ্বিতীয় বার প্রাচ্য দর্শন পড়িবার ফলে বোধ হইল "প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ব্রহ্মবাদ পরস্পর সদৃশ"। অর্থাৎ শেষকালে "উভয় দর্শনের মূল সিদ্ধান্ত" আর অভিন্ন বোধ হইল না। সাদৃশ্য ও অভেদ এক বস্তু নহে। আচ্ছা, তাহা হইলে পুনর্ব্বার উভয় দর্শন পড়িলে কি আর সাদৃশ্যও থাকিবে না—ইহা আশা করা ভ্রম হইবে? নিজ বুদ্ধির উপর নির্ভর করিলে অলৌকিক বিষয় সম্বন্ধে আমাদের এই দশাই উপস্থিত হয়—বলা যায় না কি?

অতঃপর বলা হইল—"প্রতীচ্য ব্রহ্মবাদের পশ্চাতে রয়েছে উক্ত স্পষ্ট ও গম্ভীর Dialectic methcd, পরন্তু ভারতীয় দর্শনের পশ্চাতে রয়েছে কেবল শ্রুতির দোহাই, আর সেই লৌকিক দ্বৈতবাদী ন্যায়,—যদ্দ্বারা কখনও ব্রহ্মবাদ প্রমাণিত হতে পারে না।" ইহা কি সঙ্গত কথা? কারণকূট পৃথক্ হইলে কি কার্য্যও বিভিন্ন হয় না? পাশ্চাত্য ব্রহ্মবাদের কারণ উক্ত Dialectic method, আর প্রাচ্য ব্রহ্মবাদের কারণ শ্রুতির দোহাই। এইরূপ বিভিন্ন কারণ হইতে কি করিয়া একই ব্রহ্মবাদ লব্ধ হয়? ইহা নিতান্ত বিরুদ্ধ কথা নহে কি?

যদি বলা যায়, প্রথমে "অভিন্ন" বলা হইয়াছিল, পরে কিন্তু "সদৃশ" বলা হইয়াছে, অতএব বিরুদ্ধ কথা হয় নাই? কিন্তু তাহা হইলেও সদৃশ বলার সার্থকতা কি? সদৃশ বলায় ত ভেদ কিঞ্চিৎ স্বীকার করা হইল। কিন্তু সদৃশের মধ্যে অভেদের ভাগই অধিক থাকে—"তদ্ভিন্নত্বে সতি তদ্গতভূয়োধর্ম্মবত্ত্ব"কে সাদৃশ্য বলা হয়। সুতরাং Dialectic methcd-এর দ্বারা যাহা লভ্য, তাহার সদৃশ বস্তুও শ্রুতির দোহাই বা লৌকিক দ্বৈতবাদী ন্যায়ের দ্বারা লভ্যই নহে। অভিন্ন বলায় যে দোষ হইতেছিল, তাহার মাত্রা কিছু কমিল বটে, কিন্তু নির্দ্দোষ হইল না।

তাহার পর যে লৌকিক দ্বৈতবাদী ন্যায়ের দ্বারা যাহা প্রাপ্যই নহে, তাহার দ্বারা সেই ব্রহ্মবাদ লব্ধ হইল কিরূপে? এটা যে অত্যন্ত অসঙ্গত কথাই হইয়া পড়িল। আর লৌকিক দ্বৈতবাদী ন্যায় বলায় যে অলৌকিক দ্বৈতবাদী ন্যায়ের সত্তা স্বীকার করা হইল, তাহার দ্বারা লোকে সেই ব্রহ্মবাদ কি করিয়া বুঝিবে? লোকে যাহা বুঝে, তাহাই ত লৌকিক, আর যাহা লোকে বুঝে না, তাহাই ত অলৌকিক। ইহাকেই কি transcendal logic বলা হইয়া থাকে? এখন যদি অলৌকিক ন্যায় দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝা হইল, তবে পিতৃপিতামহগণ কর্ত্তৃক অবলম্বিত অলৌকিক শ্রুতিবাক্য মানিতে কি দোষ হইল? অলৌকিক ন্যায় অপেক্ষা অলৌকিক শ্রুতিরই প্রাবল্য অধিক হওয়া উচিত। কারণ, শ্রুতির পশ্চাতে একটা ঈশ্বর কর্ত্তৃক দানের প্রবাদ আছে, অলৌকিক যুক্তিতে সেরূপ কিছু নাই। শ্রুতির প্রতিপাদ্য বিষয়, অন্য প্রমাণগম্য হইলে শ্রুতি অনুবাদ হয়। অনুবাদের প্রামাণ্য নাই, কারণ, যাহার অনুবাদ তাহারই প্রামাণ্য

হয়। যে বস্তু চক্ষু দ্বারা দেখা যায়, তাহার জন্য শুনা কথাকে কে শুনিতে চায়? প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয় প্রত্যক্ষ না করিয়া কে শুনিয়া সন্তুষ্ট হয়। এই কারণে অনুবাদের প্রামাণ্য নাই বলা হয়। অতএব অলৌকিক ন্যায় কথাগুলি নিতান্ত অসঙ্গত কথা। এজন্য Dialec.ic method দ্বারা প্রাপ্য ব্রহ্মবাদ শ্রৌত ব্রহ্মবাদই নহে বা শ্রৌত ব্রহ্মবাদের সদৃশও নহে। শ্রৌত ব্রহ্মবাদ অসঙ্গ অবিকারী ব্রহ্মবাদ। অলৌকিক ন্যায়লভ্য ব্রহ্মবাদ অথবা পাশ্চাত্ত্য ব্রহ্মবাদ বিকারী সাপেক্ষ ব্রহ্মবাদ। উহা স্বগতভেদবিশিষ্ট ব্রহ্মবাদ, আর স্বগতভেদবিশিষ্ট ব্রহ্ম স্বীকারে তাহা বিজাতীয় ভেদবিশিষ্ট হয়। বৃক্ষের সহিত শাখাপল্লবের স্বগতভেদ থাকায় বিজাতীয় আকাশের সত্তা স্বীকার্য্য হয়, তজ্জন্য বিজাতীয় ভেদও স্বগতভেদে স্বীকার্য্য হয়। আর বিজাতীয় ভেদবিশিষ্ট বস্তু সাবয়ব হয়, আর সাবয়ব হওয়ায় তাহা বিনশ্বর হয়, নিত্যবস্তু হয় না। পাশ্চাত্ত্য ব্রহ্মবাদের সহিত শ্রৌত ব্রহ্মবাদের একবার সাদৃশ্য দেখিয়া অন্যবার মূলতঃ অভিন্ন দেখাই ভ্রম, অথবা স্বমতানুরাগাধিক্যবশতঃ ত্বরাগ্রস্ত অথবা উহা বিশ্বপ্রেমের নামান্তর, নিজের যাহা ভাল লাগে, তাহা অপরকে দিবার প্রবৃত্তিবিশেষ। আর লৌকিক দ্বৈতবাদী ন্যায়ের অপ্রাপ্য বলায় অলৌকিক দ্বৈতবাদী ন্যায়ের প্রাপ্য বলা হইল না কি? আর তাহাতে যে নিজ বাক্যেই ভেদাভেদবাদকে ভেদবাদ বলিয়া স্বীকার বলা হইল। সত্য এই ভাবেই প্রকাশ পায়। এই জন্যই আমরা ভেদাত্মক-বাদকে ভেদাভেদবাদ বা দ্বৈতবাদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি।

এস্থলে পাশ্চাত্ত্য ব্রহ্মবাদের একটু আলোচনা করিলে বিষয়টা আরও স্পষ্ট হয়। বলা হইতেছে—"ব্রহ্মবাদের ভিত্তি হচ্ছে আত্ম-বাদ, সবই আত্মিক, অনাত্ম জড় বলে কোনও বস্তু নেই, এই মত।" (১০৬ পৃঃ)

"আচ্ছা সবই আত্মিক হইলে অনাত্মা জড় বলিয়া কিছু থাকে না" কি করিয়া? আত্মিক শব্দের অর্থ আত্মসম্বন্ধীয় অর্থাৎ আত্ম-ভিন্ন সবই আত্মার বিকার বিবর্ত্ত বা বিলাস অথবা কোনওরূপ রূপান্তর। অগত্যা আত্মভিন্ন কিছু না থাকিলে আত্মসম্বন্ধীয়তা সিদ্ধ হয় কি করিয়া? আত্মা ও আত্মিকের কিছু ভেদ না থাকিলে আত্মিক বলার সার্থকতা কোথায়? এখন যাহার সহিত আত্মার সম্বন্ধ থাকে, তাহা আত্মভিন্ন না হইলে সম্বন্ধ হয় কি করিয়া? সম্বন্ধ মাত্রই দ্বিনিষ্ঠ হয়, নচেৎ সম্বন্ধই হয় না। এখন আত্মভিন্নেরই ত' নাম অনাত্মা, আত্মা চেতন বস্তু বলিয়া এই অনাত্ম জড়ই হয়। অতএব "সবই আত্মিক, অনাত্মা জড় বলে কোনও বস্তু নেই" এই কথাটি শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের কি করিয়া সঙ্গত হয়? অবশ্য বিরোধ অমান্যকারী অলৌকিক ন্যায়ে ইহার সঙ্গতি করিতে পারা যায়। এজন্য মনে হয়, উপনিষদাদি বেদান্তের প্রস্থানত্রয়ের সংস্কৃত, ইংরেজী ও বাংলায় ব্যাখ্যা প্রভৃতির রচনা, অপরকে হেগেলিয়ান মতে লইয়া যাইবার চেষ্টা, এবং তাহা শ্রৌতগণের অবলম্বিত প্রমাণাদির বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া কৌশলে তাহাদিগকে বিপথে লইয়া যাইবার প্রয়াস মাত্র বলা যাইতে পারে না কি? দেখা যায়, স্বর্গীয় বৈদিক পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের দ্বারা নিজ লেখা সংশোধন করাইয়া লইয়া যে কয়েকখানি উপনিষদের সংস্কৃত প্রতিশব্দ-সমন্বিত শঙ্কররূপা নাম্নী টীকা ও তাহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহাতে কৌশলক্রমে পাশ্চাত্ত্য ভেদাভেদবাদ প্রবিষ্ট করা হইয়াছে, এবং ভূমিকা ও মন্তব্য লিখিয়া শঙ্করব্যাখ্যার উপর অশ্রদ্ধা আনয়নের চেষ্টা করা হইয়াছে। যাঁহারা উপনিষদ প্রথম পড়িতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের পক্ষে এই কৌশল আবিষ্কার করা অসম্ভব, এজন্য বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বীর পক্ষে এই সব গ্রন্থ মহা অনিষ্ট সাধন করিবে সন্দেহ নাই। একটি দৃষ্টান্ত দিলে এস্থলে মন্দ হয় না। ঈশোপনিষদের ১১ মন্ত্রের ব্যাখ্যাকালে "অমৃতম্" "অশ্নুতে" পদের অর্থ করা হইল—'আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করেন' শঙ্কর অর্থ করিয়াছেন "দেবতাত্মভাব" অর্থাৎ দেবতাস্বরূপতা লাভ করেন। মহাভারতে অমৃত শব্দের অর্থ প্রলয় পর্য্যন্ত স্থিতি, যথা "আভূতসংপ্লবং স্থানমমৃতত্বং হি ভাষ্যতে।" কিন্তু "শঙ্কররূপা" নাম্নী টীকা, যাহা ৺সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় সংশোধন করিয়াছিলেন, তাহাতে অমৃত শব্দের অর্থ "অধ্যাত্ম জীবন" বলিলেন না। অতএব বুঝা যায়, অমৃত শব্দের অর্থ "আধ্যাত্মিক জীবন" ৺সামশ্রমী মহাশয়ের অভিপ্রেত নহে। পুস্তকের মুখপত্রেই আছে "শ্রীমদ্‌বেদাচার্য্যেণ স্বর্গগতেন সত্যব্রতসামশ্রমিণা সংশোধিতা"। এই আধ্যাত্মিক জীবনটা আজকালকার অনন্ত জীবনবাদীর বা ভাগবত জীবনবাদীর কথা। এই মতে অনন্ত উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। মানব পাপ-পুণ্য যাহাই করুক না কেন, উন্নতি অনিবার্য্য। এই মতে কেহ কেহ বলেন, এই দেহেই অক্ষয় জীবন লাভ হইবার সম্ভাবনাও আছে, ইত্যাদি। ইহা বস্তুতঃ বেদ-বিরুদ্ধ কথা। তত্ত্বভূষণ মহাশয়-কৃত ঈশ উপনিষদের বঙ্গানুবাদে "অমৃত" পদের অর্থ "আধ্যাত্মিক জীবন" করায় উক্ত স্বাভিমত মতবাদটি কৌশলে পাঠককে শিক্ষা দেওয়া হইল না কি? ইহাকে স্বমতান্ধতা বলিব না আর কিছু বলিব?

[ক্রমশঃ।

চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী।

শেষ বাসনা

মৃত্যু দাঁড়াইয়া দ্বারে
বলিল সে "হতভাগ্য নর
যাহা বলিবার আছে
লও তাহা বলিয়া সত্বর।"
কত কথা বলিবার
কি বলিবে, বলিবে না আর,
স্থির না করিতে পারি
দিশেহারা অন্তর তাহার।
কণ্ঠ রুদ্ধ বাষ্পভারে,
এক কথা আসে রসনায়
"যারা মোরে ভালবাসো
তারা যেন ভুলো না আমায়।"

শ্রীকালিদাস রায়।

বিজ্ঞান-জগৎ

দৃষ্টিলাভ

চোখের বৈকল্য-হেতু যাঁদের দৃষ্টি-বিভ্রম বা দৃষ্টি-বিকার ঘটিয়াছে, সরাসরি চশমা না লইয়া তাঁরা যদি চোখের পেশীগুলির ব্যায়াম-কল্পে বিশেষ ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে নষ্ট বা ক্ষুণ্ণ দৃষ্টিকে আবার নিখুঁৎ করিয়া লইতে পারিবেন।

১। ঘোরা চাকতির গায়ে কালির ফোঁটা

এ জন্য এক জন ইংরেজ বিশেষজ্ঞ দু' রকম যন্ত্র নিশ্মাণ করিয়াছেন। প্রথম যন্ত্রটি ১নং ছবির মত (horizontal) সমতল একটি রড,—এ রডের প্রান্তে রেকাবির ছাঁদে গড়া একখানি চাকতি সংলগ্ন আছে! চাকতির ফ্রেমের উপর এক-জায়গায় আছে কালির একটি ফোঁটা। চাকতিখানি ঘুরানো যায়। ১নং ছবির মত চাকতি ঘুরাইতে হইবে, চাকতি ঘুরিবে; এবং চোখের পেশীর যিনি ব্যায়াম-সাধন করিতে চান, তিনি ঐ ঘোরা-চাকতির ফ্রেমের গায়ে দু'চোখের দৃষ্টি সুদৃঢ় ভাবে
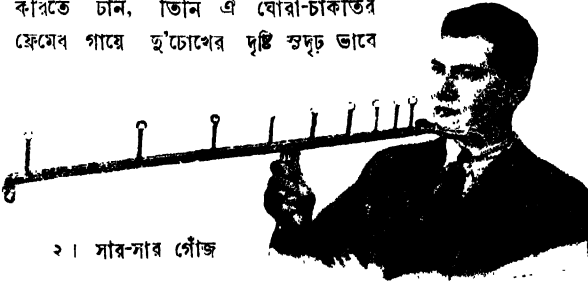
২। সার-সার গোঁজ

নিবদ্ধ রাখিবেন—চোখ চাহিয়া তিনি শুধু দেখিবেন চাকতির গায়ে ঐ কালির ফোঁটা! আর একটি যন্ত্র—২নং ছবিতে সে-যন্ত্রের পরিচয় পাইবেন। একটি দীর্ঘ রডের মাথার উপর নয়টি কাঠি বা গোঁজ্—গোঁজগুলির মাথা গোল, (knob) "নবে"র' মত। রডের এক প্রান্তে যে আংটা, ঐ আংটা গলায় লাগাইয়া রডটি সরল রেখায় সিধা করিয়া ধরিতে হইবে। ধরিয়া একটির পর আর-একটি গোলকের উপর দিয়া বার-বার দৃষ্টি বুলানো চাই। এক বার ওদিক হইতে এদিক পর্য্যন্ত, তার পর এদিক হইতে ওদিক পর্য্যন্ত। দশ-বারো বার করিয়া এ ব্যায়ামটুকু করা চাই। রডটি যেন এতটুকু না নড়ে! এ দুইটি যন্ত্র-সাহায্যে চোখের পেশীসমূহের যে ব্যায়াম হইবে, তাহার ফলে দৃষ্টি চোখের দৃষ্টি সরল হইবে এবং সেই সঙ্গে চোখের বৈ[illegible] পারিবে।

মরণ-পিচকারী

ফাল্গুনে হোলি-উৎসব! পিচকারীতে আবীর-বর্ষণ! কবি গাহিয়া গিয়াছেন—"এমন দিনে আপন-জনে ফাগ মাখাতে হয়!" আর যারা

গোলার পিচকারী

আপন-জন নয়, দুষমণ? তাদের সঙ্গে ফাল্গুনে হোলি-খেলা খেলিতে ব্রিটিশ রণ-তরী-বিভাগ পিচকারী-মেশিন-গানের সৃষ্টি করিয়াছে। যুদ্ধ-জাহাজগুলিতে সার সার কামান সাজানো হইয়াছে,—এক-একটি কামানের সঙ্গে চার-চারটি করিয়া মেশিন-গান সংলগ্ন আছে; প্রত্যেকটি মেশিন-গান হইতে মিনিটে-মিনিটে অজস্র গোলা-বর্ষণ হয়। শত্রুর বিমান-পোতকে ধ্বংস করিবার জন্যই এ পিচকারী-মেশিন-গানের সৃষ্টি। প্রত্যেকটি কামানের সঙ্গে লক্ষ্য-সন্ধানী যন্ত্র আছে—সে-যন্ত্রের সাহায্যে শত্রুর বিমানপোত লক্ষ্য করিয়া এক জন মাত্র গোলন্দাজ এ মেশিন-গানে ঝলকে-ঝলকে ঊর্দ্ধ আকাশ-পথে অজস্র গোলা-বর্ষণ করিতে পারেন।

গ্লাসের শুচিতা

অফিসে ও স্কুল-কলেজে জল-পানের জন্য কাচের গ্লাসের ব্যবস্থা আজ সুপ্রচলিত। কুঁজোর মুখে, মেঝেয়, ধুলায় অথবা ঘরের কোণে কোনো টেবিলের উপরে গ্লাস রাখা হয়; জল-পানের সময় গ্লাসে একটু জল ঢালিয়া গ্লাস ধুইয়া তাহাতে জল ভরিয়া আমরা জল পান করি! ইহাতে বহু রোগের উৎপত্তি হইতে পারে। ধূলা-ময়লায় লক্ষ লক্ষ রোগ-বীজাণুর বাস। ও-রকম ধোয়ায় গ্লাসও সাফ হয় না। এ জন্য মার্কিন বিশেষজ্ঞেরা বলিতেছেন, পাৎলা কাগজে আপাদ-মস্তক জড়াইয়া ঢাকিয়া গ্লাস রাখিবেন, পানের সময় গ্লাসে পরিপূর্ণ ভাবে জল ভরিয়া গ্লাস ধুইয়া তবে তাহা হইতে

জল পান করিবেন। চাকর-বাকরে হাতে করিয়া গ্লাস আনিয়া দেয়, তাদের হাতের ছোঁয়ায় রোগ-বীজাণুর ভয় আছে। তাছাড়া কুঁজোর মুখে, মেঝেয় বা টেবিলে না ঢাকা দিয়া গ্লাস রাখা নিরাপদ

কাগজে মুড়িয়া গ্লাস রাখুন

নয়। জল-পান করিতে চাহিলে জল-ভরা গ্লাসের মাথা ধরিয়া গ্লাস আনিয়া দেওয়া কদভ্যাস—সে কদভ্যাস বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য।

অক্সিজেন-দান

রোগীকে সুস্থ-স্বচ্ছন্দ করিতে অনেক সময় যন্ত্রযোগে তাঁকে অক্সিজেন-বাষ্প দিতে হয়। এ অক্সিজেন-বাষ্প দিতে যে সিলিণ্ডারের ব্যবহার
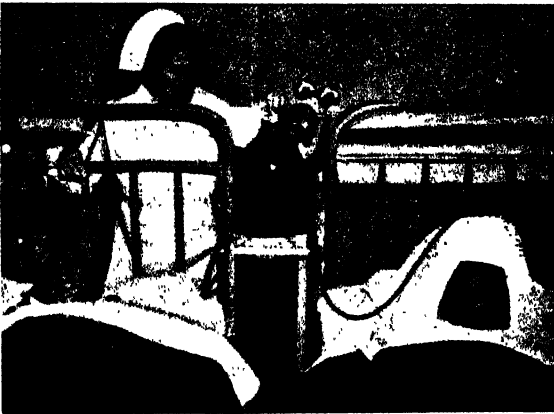
অক্সিজেন দেওয়া

প্রচলিত আছে, তাহাতে অনেক অসুবিধা। এ অক্সিজেন যিনি দেন, তাঁকেও অস্বাচ্ছন্দ্য সহিতে হয়, তাছাড়া অক্সিজেনের অপব্যয় হয় অনেকখানি। অক্সিজেন-বাষ্প দিবার জন্য এক জন ইংরেজ বিশেষজ্ঞ বিশেষ রকমের একটি সিলিণ্ডার তৈয়ারী করিয়াছেন। শয্যা-শায়িত রোগীর নাকের উপরে ঘ্রাণ লইবার উপযোগী স্বচ্ছ সেলুলোজের তৈয়ারী হালকা মুখোস লাগাইয়া নল দিয়া অক্সিজেন-ট্যাঙ্ক হইতে অক্সিজেন বাষ্প প্রয়োগ করা হয়। রোগীর যেমন তাহাতে এতটুকু অস্বাচ্ছন্দ্য ঘটে না, তেমনি এ-বাষ্প যিনি দেন, তাঁর পরিশ্রমও অনেকখানি কমে—সঙ্গে সঙ্গে অক্সিজেনের ব্যয় হয় খুব অল্প। তার উপর এক জন ব্যক্তি এই যন্ত্র-সাহায্যে দু'জন রোগীকে একসঙ্গে অক্সিজেন দিতে পারেন।

হাত ধুইবার জল

স্কুল-কলেজে জল ছোঁয়াছুঁয়ির জন্য অনেক সময় সংক্রামক বহু রোগের প্রসার বাড়ে। ছবির অনুরূপ হাত ধুইবার "ওয়াশ-বেশিনে"

পা দিয়া তলা চাপিলে জল মেলে

ছোঁয়াচের ভয় নাই। জলের ট্যাপে হাত দিতে হয় না; পা দিয়া তলার 'পেডাল' চাপিলেই জল মিলিবে।

স্বর-?

সিনেমা দেখিতে গিয়া অনেক সময় শুনি, নট-নটীর কণ্ঠস্বর তেমন স্পষ্ট নয়, সে-স্বর কর্কশ! অথচ সাধারণ ভাবে কথা কহিলে তাঁদের স্বরে কোনরূপ বৈকল্য হয়তো উপলব্ধি হইবে না! শব্দ-যন্ত্রে কণ্ঠস্বরের যে ছাপ ওঠে, যন্ত্রের সূক্ষ্মতায় স্বরের অতি-ক্ষুদ্র খুঁৎটুকুও সে ছাপে বড় করিয়া মুদ্রিত হয়। তার ফলে যাঁদের স্বর ভালো, মাইকের মারফৎ শুনি গানে তাঁর গলা ফাটা! এ জন্য সিনেমার অভিনয়ে নামাইবার পূর্ব্বে নট-নটীদের স্বর-পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। স্বর-যন্ত্রের সাহায্যে স্বরের পরীক্ষা চলে। এ যন্ত্রের সঙ্গে যে চোঙ লাগানো থাকে, সেই চোঙের সামনে মুখ আনিয়া কথা কহিতে বা গান গাহিতে হয়; যন্ত্রের রেকর্ডিং-অংশে স্বরের ছাপ পড়ে।

সেই রেকর্ড-করা কণ্ঠস্বর হইতে বুঝা যায়, স্বর স্পষ্ট, না, জড়ানো ! ফাটা, না, নিখুঁৎ ! অর্থাৎ কণ্ঠের অতি-ছোট খুঁৎটুকুও ধরা পড়ে। যাঁদের স্বর নিখুঁৎ হয়, মার্কিন সিনেমায় অভিনয়ের জন্য তাঁহাদিগকেই বাছিয়া লওয়া হয়।

কণ্ঠ কেমন

শিল্পীর দস্তানা

মার্কিন বিশেষজ্ঞেরা বলিতেছেন, যাঁরা পিয়ানো বাজান, শুধু-হাতে না বাজাইয়া পশমের দস্তানা হাতে আঁটিয়া যদি বাজান, তাহা হইলে পিয়ানো বাজিবে ভালো। এ দস্তানা হাতে আঁটিয়া ভালো পিয়ানিষ্টরা ছ'-সেকণ্ডে পিয়ানোয় ২৭৮টি নোট বাজাইতে সমর্থ হইতেছেন। তার উপর বিশেষজ্ঞেরা বলেন, শুধু-হাতে পিয়ানোয় যে সুর-ঝঙ্কার পাওয়া যায়, পশমী হাতের আঘাতে ঝঙ্কার হইবে তার চেয়ে আরো দশ গুণ মিষ্ট-মধুর। টাইপ-রাইটার লইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া যাঁদের টাইপের কাজ করিতে হয়, এ দস্তানায় তাঁদের কাজ হইবে অনেক বেশী ক্ষিপ্র ; এবং আঙুল কোনো কালে দুর্ব্বল হইয়া অস্বাচ্ছন্দ্য বা ক্লান্তির সৃষ্টি করিবে না।

দস্তানা-হাতে পিয়ানো

খবরাখবর

কামান-বন্দুক লইয়া কোন্ অনির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে ফৌজ চলিল যুদ্ধ করিতে—হেড-কোয়াটার্স বা প্রধান আস্তানার সঙ্গে খবরাখবর চলিবে কি করিয়া ? খবরের আদান-প্রদান সহজ ও সুনিশ্চিত করিতে টেলিগ্রাফের তার খাটানোর এক অভিনব উপায় বাহির করিয়াছে ব্রিটিশ সমর-বিভাগের সাঙ্কেতিক দল। কামানে গোলার মত সুদীর্ঘ তার ভরিয়া তাহা ঠিক ঐ কামান-ছোড়ার রীতিতে ছোড়া হয়। সে-ছোড়ায় জলা-জঙ্গল নদী-নালা পাহাড়-পর্ব্বত পার হইয়া টেলিগ্রাফের তার বহু দূরে গিয়া পড়ে—এদিককার প্রান্ত অবশ্য গোলন্দাজের হাতে থাকে। তার পর সেই তার লক্ষ্য করিয়া সাঙ্কেতিক-বিভাগের কর্ম্মচারীরা অগ্রসর হইয়া যান। এমনি ভাবে বহু দূর ব্যাপিয়া টেলিগ্রাফের তার খাটানো হয়। তার পর সেই তার-মারফৎ সুদূরবর্ত্তী আস্তানার সঙ্গে খবরের আদান-প্রদানে কোনো অসুবিধা থাকে না !

তার খাটানো

কেশ-পরিচর্য্যা

সুকেশিনী না হইলে কাহাকেও সুন্দরী বলা চলে না। কেশেই নারীর সুষমা-সৌন্দর্য্য। মাথায় যাঁর রেশমের মতো কোমল মসৃণ প্রচুর কেশ, তাঁর মুখের মাধুর্য্যের তুলনা মেলে না!

এ কেশ উঠিয়া যায়, অকালে পাকিয়া সাদা হয়। তখন বিজ্ঞাপন দেখিয়া কত রকমের তৈল আনিয়া মাথায় মাখেন! তবু যে-কেশ গিয়াছে, সে-কেশকে আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না! এমন দুর্ভাগ্য যাঁর ঘটিয়াছে, তিনি যেন মরমে মরিয়া আছেন!

কেশের এ দুর্দশা হয়, শুধু সময় থাকিতে কেশের আমরা যত্ন লই না—কেশের পরিচর্য্যা করি না, বলিয়া।

এক দিন আমাদের দেশে বিধি-মানার মত কেশ-পরিচর্য্যার বিধি মেয়েরা পালন করিতেন। স্নানের সময় মাথায় ঘষিয়া ঘষিয়া তেল মাখা—স্নানের পর গামছা দিয়া ঝাড়িয়া-ঝাড়িয়া কত কৌশলে মাথার জল মোছা—সর্ব্ব-কাজের মধ্যে সময় করিয়া মাথার ভিজা চুল শুকানো; তার পর সন্ধ্যার পূর্ব্বে রীতিমত আয়না পাড়িয়া, ফিতা-চিরুণী লইয়া চুল বাঁধা! নিয়মিত এ-পরিচর্য্যায় মাজিয়া-ঘষিয়া নিজেকে শুধু পরিপাটী করিয়া সাজাইয়া তোলা হইত, তা নয়—ইহাতে কেশের স্বাস্থ্য ভালো থাকিত। একালে লেখাপড়ার চাপ আছে, নাচ-গান-বাজনা-শেখার ধূম আছে,—এ-সবের মাঝে কেশ-পরিচর্য্যার অবসর কোথায়? তার উপর মাথায় ঘষিয়া ঘষিয়া সে তেল-মাখা নাই! মেম সাহেবদের নকলে এই গরম-দেশে অনেকে আবার মাথায় তেল মাখার পাট ছাড়িয়া দিয়াছেন! স্নানের পর তেমন করিয়া ঘষিয়া মাথার জল মোছার কোনো নিয়ম নাই,—মাথা শুকাইবার বা বাঁধিবারও সময় মেলে না! ফ্যাশনের খাতিরে ফিরিঙ্গি-প্যাটার্ণে মাথার চুলে একটা 'নট্', তার সঙ্গে দু'-চারিটা ক্লিপ গোঁজা,—ব্যস্! ফল যা চোখে দেখিতেছি, বলিবার নয়!

কিন্তু না, এ ঔদাস্য চলিবে না! স্নো-রুজ-পাউডার ঘষিবার জন্য যদি সময় পান, তবে কেশ-পরিচর্য্যার জন্যই বা সময় পাওয়া যাইবে না কেন? বাঙলার ঘরের মেয়েদের তাই বলি, কেশের সম্বন্ধে বৈরাগ্য, ঔদাস্য ছাড়িয়া সযত্নে কেশ-পরিচর্য্যা করুন। কেশের সাজে দেহের শ্রী, মুখের মাধুরী বাড়িবে কতখানি,—সে-ফল হাতে হাতে পাইবেন!

এ সম্বন্ধে এক জন মার্কিন মহিলা বহু অনুশীলন করিয়া উপদেশ-ছলে বলিয়াছেন—**You can't neglect your hair and get away with it—it won't be cheated without paying you back and in a very thorough fashion.**

কথাটা খুব সত্য। নাক যদি কাহারো খাঁদা হয় বা কাহারো যদি খড়্গ নাক থাকে তো বিধাতার দেওয়া সে বিকৃতি সহিয়া থাকা ভিন্ন উপায় নাই! কারণ, খোদার উপর খোদ্‌কারি চলে না! কিন্তু কেশের সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কথা। মাথায় যাঁর কেশ অল্প কিম্বা কেশে বহু খুঁৎ, পরিচর্য্যার গুণে তাঁরো কেশ দীর্ঘ হইবে, কোমল মসৃণ সুন্দর হইবে, তাহাতে এতটুকু সংশয় নাই। মাথায় যে মরা-মাস হয়, কিম্বা ঐ যে চুল উঠিয়া যায় বা চুলে পাক ধরে—ইহার কারণ বুঝিবেন, কেশ বিদ্রোহী হইয়াছে!

কেশের 'শাম্পু' প্রয়োজন—সপ্তাহে অন্ততঃ এক দিন করিয়া। শাম্পুর জন্য অন্য কোনো উপকরণ না পান, ব্যাশম্ আছে,—মাথায় বেশ করিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া ব্যাশম মাখুন। চুলে ব্যাশম মাখাইয়া চুল ভালো করিয়া ধুইয়া ফেলুন। এক বার দু'বার তিন বার করিয়া ব্যাশম মাখিয়া শাম্পু করুন! মাথা ধোওয়ার পর মাথায় বেশ করিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া তেল মাখিবেন। এ-ঘষায় মাথার ব্যায়াম হইবে, রক্ত-চলাচল স্বচ্ছন্দ হইবে। তার ফলে কেশের মূল হইবে শক্ত মজবুত। চুল উঠিয়া যাইবে না বা চুলে পাক ধরিবে না।

আমাদের মাথার কেশ আর গাছ-পালা,—দুইই এক নীতি মানিয়া চলে। অর্থাৎ গাছপালা যেমন মূলের সাহায্যে মাটী হইতে

১। দু'হাতের আঙুল দিয়া চক্র-রচনা

রস টানিয়া বাড়ে সুস্থ ভাবে বাঁচিয়া থাকে, কেশও তেমনি মূল-দেশ দিয়া মাথার খুলি (scalp) হইতে প্রাণ-রস লইয়া সুস্থ স্বচ্ছন্দ ভাবে বাড়ে। এ জন্য মাথা ঘষিয়া নিত্য তেল-মাখায় কেশ পায় শক্তির জোগান—তার গোড়ায় থাকে জোর, তেজ। তাই চুল পাকিতে পারে না বা উঠিয়া যায় না।

সেই সঙ্গে চাই কেশের ব্যায়াম-সাধনা।

প্রথমে ব্রাশ লইয়া মাথা আঁচড়ান,—সীঁথি ধরিয়া চিরুণীর সাহায্যে কেশ চিরিয়া দু' ভাগ করুন; করিয়া ব্রাশে আঁচড়ান। তার পর

১। উঁচু টেবিলের উপর দুই কনুইয়ের ভর রাখুন—কনুই হইতে আঙুল পর্য্যন্ত সামনের হাত উঁচু করিয়া তুলুন। এবার দুই কাণের পিছন হইতে সুরু করিয়া দু' হাতের মধ্যমাঙ্গুলি

দিয়' মাথার পরিচর্য্যা। সারা মাথায় চালিয়া-চালিয়া চক্রাকারে দু' আঙুল ঘষুন। ১নং ছবির মতো এমনি করিয়া সমস্ত মাথায় দুটি আঙুল চাপিয়া চক্রাকারে ঘষুন।

২। এবার ২নং ছবির ভঙ্গীতে পিঠের দিকে মাথা হেলাইয়া ডাহিনে-বাঁয়ে দু'দিকে মাথা নাড়ুন প্রায় পাঁচ মিনিট।

২। মাথা হেলাইয়া নাড়া

৩। তার পর টেবিলের উপর দুই কনুইয়ের ভর রাখিয়া দু' হাতের আঙুল দিয়া ৩নং ছবির ভঙ্গীতে মাথা ঘষুন। মাথার

৩। মাথা ঘষুন

সমস্তটুকু এমনি ভাবে. পর-পর ঘষিবেন—দু' হাতের আঙুলে এক ইঞ্চিটাক যেন ফাঁক থাকে।

৪। এবার ৪নং ছবির মত ডান হাতের আঙুল দিয়া চুলের একটি করিয়া গুছি ধরিয়া জোরে জোরে টানুন। হ্যাচকা-টানে

৪। গুছি ধরিয়া হ্যাচকা টান

টানিতে হইবে। মাথার সব চুল এমনি গুছি করিয়া পর্য্যায়ক্রমে টানা চাই।

৫। তার পর ৫নং ছবির ভঙ্গীতে এক-গুছি করিয়া চুল বাঁ হাতে টানিয়া দীর্ঘ ভাবে ধরুন—ধরিয়া ডান হাতে সে-গুছির

৫। একটি একটি গুছি ধরিয়া ব্রাশ করা

উপর মাথার দিক হইতে উর্দ্ধ দিকে জোরে-জোরে আট-দশ বার করিয়া কড়া ব্রাশ চালান। সব চুলগুলির উপর এমনি ভাবে ব্রাশ চালানো চাই।

এ কয়টি বিধি যদি নিয়ম করিয়া নিত্য-দিন সযত্নে পালন করেন, তাহা হইলে কেশের বাড় হইবে এবং কেশ হইবে কোমল, মসৃণ, বরণীয়। কোনো দিন কেশের দুর্দ্দশা ঘটিবে না।

মা-বাপের কথা

ছেলেমেয়েকে মানুষ করার দায়িত্ব মা-বাপের কম সামান্য নয়। তাদের ভালো খাওয়া ভালো পরার ব্যবস্থা করে দিলেই মা-বাপের দায়িত্ব চোকে না। ছেলেমেয়ে বদ হলে অবাধ্য হলে বাপের দল বলেন—কি করবো! ওঁর দোষেই ছেলেমেয়ে এমন হচ্ছে!

যে-সব মা ছেলেমেয়েকে খুব হুঁশিয়ার ভাবে লালন করেন, তাঁদেরো এমন অনুযোগ-অভিযোগ শুনতে হয়।

সাধারণতঃ বাপেদের বিশ্বাস, তাঁদের সামনে ছেলেরা যত শান্ত শিষ্ট বিনয়ী মূর্ত্তিতে উদয় হোক, তাদের শয়তানী আছে বিলক্ষণ এবং সে-শয়তানীর প্রশ্রয় তারা পায় মায়েদের কাছে! প্রশ্রয় না পেলেও ছেলেমেয়েদের শয়তানী কতখানি, মায়েরা তা জানেন, এবং জেনে তাঁদের কাছ থেকে সে-শয়তানীর বৃত্তান্ত গোপন রাখেন! বাপেরা বলেন,—মায়েরা ভাবেন, তাঁদের ছেলেমেয়ে খুব ভালো, যাকে বলে perfect! ছেলেমেয়ে যে-আব্দার করে, সেই আব্দারই মায়েরা রক্ষা করেন; তাদের প্রশ্রয় দেন; আলস্য এবং অপব্যয়কে স্নেহের চোখে দেখেন; ছেলেমেয়ে দোষ করলে বাপ যখন তাড়া দেন, মা তখন তাদের পক্ষ সমর্থন করেই প্রাণপণে লড়েন।

এ অপবাদ যাঁরা দেন তাঁদের জানা উচিত, ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে মায়ের এবং বাপের কর্ত্তব্য এক নয়। ছেলেরাও তা জানে। মায়ের কাছে ছেলেমেয়েরা আজে-বাজে আব্দার তোলে না। সখের আব্দার নিয়ে ছেলেমেয়েরা ভুলেও কখনো বাপের কাছে যায় না। "মা সার্কাশ দেখতে যাবো—মা সিনেমায় যাবো—মা ভালো বুট চাই—সিল্কের গেঞ্জি চাই—" এ সব আব্দার ছেলেরা তোলে মায়ের কাছে, বাপের কাছে নয়!

অনেক বাপের কাছে ছেলেমেয়েদের আসল পরিচয় অপরিজ্ঞাত থাকে। তার খাবার রুচি, পরবার রুচি বাপ জানেন না; কিন্তু মা জানেন। ছেলেমেয়ের সখের আর্জী মায়েরা যখন কর্ত্তার কাছে পেশ করেন, তখন অনেক ক্ষেত্রে বাপ তা নামঞ্জুর করতে উদ্যত হন। যদি তা পূরণ করেন তো মায়ের চেষ্টায়, মায়ের ওকালতিতে তা ঘটে।

নিজের ছেলেবেলাকার কথা বাপ ভুলে যান, মা ভোলেন না।

জন্ম থেকে মা ছেলেমেয়েকে দেখে আসছেন প্রতিদিন, প্রতি দণ্ড, প্রতি পল। মায়ের কাছে ছেলেমেয়ের বড় হওয়ার প্রত্যেকটি ক্ষণ যেমন ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে, তেমনি তার পর্য্যায়ের এতটুকুও মায়ের মন থেকে মুছে যায় না বা সে-পর্য্যায় এতটুকু অস্পষ্ট হয় না।

আদর করে' ছেলেমেয়ে মার হাতে এনে দিলে একটি শুকনো ফুল, একটি মার্ব্বেল, একটি ভাঙ্গা পুতুল! আনন্দে মায়ের প্রাণ তাতে ভরে ওঠে। তুচ্ছ খেলায়-ধূলায় ছেলেমেয়ে মাকে পায়! ছেলেমেয়ের ডাকে সে-খেলায় মাকে যোগ দিতে হয়। মা কখনো "যাঃ" বলে সরিয়ে দেন না। বাপের কাছে ছেলেমেয়ের খেলা তুচ্ছ—নগণ্য! কোনো কাজে যদি ছেলেমেয়ের পারদর্শিতা হলো, চারি দিকে তাদের নামে জয়ধ্বনি জাগলো তো বাপ তখন এসে ছেলেমেয়ের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সে-গৌরবে গর্ব্ব বোধ করেন। ছেলে যদি পরীক্ষায় ফেল হয়, বাপের পিতৃগৌরব ক্ষুণ্ণ হলো বলে' বাপ ওঠেন চটে! ছেলেকে তিনি বকেন! তার ঐ অকৃতকার্য্যতায় বাপের দিক্ থেকে মায়া-মমতা-দরদ জাগে না! তাঁর মাথা হেঁট হলো—এইতেই তাঁর বিরক্তি! কিন্তু মা? গৌরবে-লজ্জায়, সম্পদে-বিপদে ছেলেমেয়ের সঙ্গে মায়ের যেন নাড়ীর সংযোগ! মায়ের স্নেহের কোনো সীমা নেই! সে-স্নেহে স্বার্থের লেশ নেই। বাপের স্নেহে তাঁর স্বার্থ বিজড়িত থাকে! তুমি যদি বাবা বলে' মানো, তবেই আমি তোমাকে মানবো ছেলে বলে'! মা কিন্তু এমন কথা মনে আনেন না। এ চিন্তা মায়ের কল্পনাতীত। ছেলেকে 'ত্যাজ্যপুত্র' করেন বাপেরা। কোনো মা ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করেছেন, এমন কথা বাঙলা দেশে শোনা যায়নি! বৌমার কথায় যে-ছেলে ওঠ্-বোস্ করে, তেমন ছেলের পীড়ন-দুর্ব্যবহার সয়েও মা বলেন, "বৌটার জন্ম! লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে কি না!" বৌয়ের তিনি দোষ দেখেন,—ছেলেকে কখনো দোষী বলেন না। অসুখ-বিসুখে মায়ের বিরামহীন সেবা—ছেলেমেয়েদের অসুখ-বিসুখে বাপ তার কিছুই পারেন না! মায়ের এই তুলনাহীন স্নেহের জন্যই বুঝি আমাদের দেশের শাস্ত্রকারেরা বাপের সম্বন্ধে বলেছেন, "পিতা স্বর্গ"! কিন্তু মাকে বলে গেছেন সে-স্বর্গের চেয়েও বড়—স্বর্গাদপি গরীয়সী! আমরাও যত দূর দেখছি, শাস্ত্রকারদের এ কথাকে অত্যুক্তি বলে মনে হয় না!

বন্দী

বন্দী যে আসি বর্ত্তমানের ভঙ্গুর কারাগারে—
বন্দী আমার অভিযাত্রিক প্রাণ!

লক্ষ আশার বক্ষ কাঁড়িয়া নিরুদ্ধ হাহাকারে
জাগিছে আঁধারে মৃত্যুর কল-তান!
কাব্যে ও গানে আমাদের প্রাণে নিখিলের পরিচয়,
স্পন্দন আনে—দেখিয়াছি তবু বিপন্ন বিস্ময়
কত অসীমের ছায়া-পথ ঘুরি তাহারে আনিছে ডাকি
জাগর-জীবনে চিতার ভস্মে যাহারে এসেছি রাখি!

বন্দীর চির-ভীরুতা লইয়া প্রশ্ন করেছি আমি,—
অবিনশ্বর হে মহা প্রহরী ভবিষ্যতের স্বামি,
যুগ-যুগান্তে জানিতে চেয়েছি বলে যাও আজ মোরে
দু'জনে আমরা পথ চলেছিনু দু'জনের হাত ধরে,—

আমারে বন্ধু বন্দী করিয়া নিজে হলে তার দ্বারী;
আবার দু'জনে কারাগার ছাড়ি কবে হবো পথচারী?
উত্তর মোর আজিও মেলেনি। প্রহরী নিরুত্তর!
শৃঙ্খল শুধু জানায়ে দিয়াছে আমি হেথা নশ্বর!

আমারি মতন অতীতের কত বন্দীর আঁখিজল
বর্ত্তমানের ব্যথার পঙ্কে হয়ে আছে শতদল!
আগামী কালের তরুণ উষায় চিনিবে না কেহ তারে,
বন্ধন-হীন বিগত পথিক শুধু জানি বারে-বারে
পৃথিবীর বুকে দেখা দিয়ে যাবে ভুলের পদ্ম লাগি—
কালের প্রহরী তাহাদের তরে প্রতিদিন আছে জাগি!

শ্রীঅমর ভট্ট।

মানুষের বন্ধু কুকুর

মানুষের আশ্রয়ে থাকিয়া পোষ মানিয়া কুকুর শুধু খাওয়া-দাওয়া-আরাম লইয়া নিশ্চিন্ত বিলাস-সুখ উপভোগ করে না! যে মানুষের খায়, তার হিত-সাধনে কুকুরের যত্নের সীমা দেখি না! সাধারণ-কুকুর পুষিয়াও তাদের যে-পরিচয় আমরা পাই, তাহাতে

তুষারের বুকে আশ্রম

প্রভু-ভক্তি বা কৃতজ্ঞতার দিক দিয়া কুকুরকে বহু কাপুরুষের উপরে আসন দিলে অন্যায় হইবে না!

ছেলেবেলায় দেখিয়াছি, এক জন ভিখারী আমাদের পাড়ায় ভিক্ষা করিত। তার সঙ্গে আসিত একটা কুকুর। খুব সাধারণ কুকুর। পথে-ঘাটে যে-সব কুকুর দেখা যায়, তাদেরি শ্রেণীভুক্ত—অর্থাৎ যে কুকুরকে আমরা বলি, "নেড়ি-কুত্তা!" এক দিন পাড়ায় একটা বিবাহ-উৎসবে ভিখারী দান পাইয়াছিল একখানা নূতন কাপড়। দান লইয়া খুশী-মনে সে গৃহে চলিয়াছে, এক জন জুয়ান বদমায়েস তার কাছ হইতে সে কাপড় কাড়িয়া লয়। ভিখারী ছাড়িবে কেন? বদমায়েসটাকে ধরিয়া কাপড় উদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে সে টানাটানি জুড়িয়া দিল। বদমায়েসটা শেষে ভিখারীকে প্রহার করিয়া ফেলিয়া দিয়া কাপড় লইয়া পলায়নোদ্যত! ভিখারীর কুকুর লাফ দিয়া তার ঘাড়ে কামড় দিয়া ঝুলিতে থাকে,—কিছুতে তাকে ছাড়িবে না! কামড়ের জ্বালায় বদমায়েসটা কাপড় ফেলিয়া দিল, কুকুরও তাকে দিল মুক্তি!

নানা ব্যাপারে কুকুরের প্রভু-ভক্তির যেমন পরিচয় পাই, তেমনি বুঝিতে পারি, ইতর-জীব হইলেও তার বোধ-শক্তি সামান্য নয়। যাদের বাড়ীতে পোষা কুকুর আছে, সে সব কুকুরের বুদ্ধির বহু পরিচয় তারা পাইয়াছে নিশ্চয়।

সে কুকুর নয়! আজ তোমাদের কাছে বরফ-দেশের সেণ্ট-বার্ণার্ড কুকুরের কথা বলি।

সুইজারল্যাণ্ডের শিয়রে সমুদ্র হইতে আট হাজার ফুট উর্দ্ধে আল্পস পর্ব্বত। হিমের আবাস-ভূমি! বছরে ন'-দশ মাস এ পাহাড় বরফে ঢাকিয়া থাকে। এই বরফের গায়ে আছে দোতলা বাড়ী। সেখানে থাকেন ব্রতচারী সাধু-সন্ন্যাসীর দল। হিমের দৌরাত্ম্যে তাঁরা বিচলিত হন না! তাঁদের সঙ্গে বন্ধুর মত বাস করে সেণ্ট-বার্ণার্ড জাতের কুকুর। বরফে ঢাকা থাকিলেও এ-পাহাড়ে চড়িয়া পাহাড় দেখিবার উদ্দেশ্যে নানা দেশ হইতে এখানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। সে-সব যাত্রীর মধ্যে কত জন যে হিমের কবর হইতে রক্ষা পাইয়াছেন শুধু এই সেণ্ট-বার্ণার্ড কুকুরের দয়ায়, তার সংখ্যা নাই!

পাহাড়ের নীচে একটি ষ্টেশন আছে। যে-সব যাত্রী পাহাড়ে চড়েন, এখানে তাঁদের নাম-ধাম লিখিয়া রাখা হয়। যদি কেহ নিরুদ্দেশ হন, তাঁর সন্ধান চলে। পাহাড়ের মাথায় সাধু-সন্ন্যাসীদের যে আশ্রম, সেই আশ্রমের সঙ্গে নীচেকার ষ্টেশনের যোগ আছে টেলিফোন-সূত্রে। কোনো যাত্রীর সম্বন্ধে সংশয় জাগিলে টেলিফোন-যোগে আশ্রমে খবর দেওয়া হয়, অমুক যাত্রীর সন্ধান নাই! তখন আশ্রমের সাধুরা এই সেণ্ট-বার্ণার্ড কুকুরদের লইয়া নিরুদ্দেশ-যাত্রীদের সন্ধানে বাহির হন।

ক' বছর পূর্ব্বে এক দুর্য্যোগের রাত্রে আশ্রমে খবর আসিল,—এক দল ইতালীয়ান যাত্রী,—সঙ্গে একটি মহিলা—পাহাড়ে উঠিয়াছিলেন। মহিলাটি বরফের খদে পড়িয়া গিয়াছেন—তাঁর সন্ধান মিলিতেছে না!

সেণ্ট-বার্ণার্ড কুকুর

সাধুরা বলিলেন—কুকুর লইয়া এখনি আমরা সন্ধানে বাহির হইতেছি।

এক দল কুকুর লইয়া তাঁরা বাহির হইলেন। অন্ধকারে দিক্ আচ্ছন্ন। ঝড়ো বাতাসে বরফের কুচি আসিয়া গায়ে লাগে। সাধুদের হাতে লণ্ঠন—স্কী-যোগে তাঁরা চলিয়াছেন! কুকুরগুলি দিকে-দিকে ছুটিয়া গেল। সাধুর দল লণ্ঠন হাতে ইতস্ততঃ সন্ধানে রত, হঠাৎ একটি কুকুর ছুটিয়া আসিয়া সাধুর পরিচ্ছদ ধরিয়া টানে। এ-সঙ্কেত সাধু বুঝিলেন। কুকুরের সঙ্গে তিনি চলিলেন। এক জায়গায় আসিয়া দেখেন, আরো পাঁচটি কুকুর তুষারের আবরণ সরাইয়া মহিলাকে বাহির করিয়াছে। মহিলাকে তাঁরা আশ্রমে আনিলেন এবং পরিচর্য্যার গুণে মহিলা সুস্থ হইলেন।

এ আশ্রমটি বহু শত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে। গিরি-যাত্রীদের উদ্ধার ও রক্ষা-কল্পেই এ আশ্রমের প্রতিষ্ঠা। জার্ম্মানি

স্কী-যোগে সাধু—সঙ্গে কুকুর

হইতে রোম যাতায়াত করিতে সেকালে অনেকে এই পাহাড়-পথ অবলম্বন করিতেন। আশ্রমে তাঁরা আশ্রয় লইতেন। আজো যাত্রীর দল এ আশ্রমে আশ্রয় পান। বাসের ও খাদ্যের জন্য কাহাকেও মূল্য দিতে হয় না।

আশ্রমটি বেশ বড়। এখানে এক শত শয্যা এবং তিন শত যাত্রীর বাসের উপযোগী ব্যবস্থা আছে। আশ্রমে বহু সেণ্ট-বার্ণার্ড কুকুর প্রতিপালিত হয়। তারা শুধু পথহারাদের পথ নির্দ্দেশ করে না, বিপদে উদ্ধার-সাধন এবং গাইডের কাজেও এ-সব কুকুরের তৎপরতার সীমা নাই। এ-সব কুকুরের বংশ-মর্য্যাদা আছে—পাঁচশো বৎসর ধরিয়া এই তুষার-পাহাড়েই এ-কুকুরের বাস।

ঝড় বা দুর্য্যোগের লক্ষণ বুঝিবামাত্র সাধুরা এ-সব কুকুরকে ছাড়িয়া দেন। তারা দল বাঁধিয়া নানা দিকে ঘোরে। যদি আর্ত্ত বিপন্ন যাত্রীর সন্ধান পায়, উদ্ধার-সাধন করে। এ-কাজে কখনও তাদের অসাফল্য ঘটিয়াছে, এমন কথা জানা যায় নাই!

এ কুকুর আকারে হয় ৩০ ইঞ্চি উঁচু। দেহের ওজন এক মণ পনেরো সের। জোয়ান মোটা একটি মানুষকে এ-কুকুর অনায়াসে ঘাড়ে তুলিয়া লইয়া যাইতে পারে। আশ্রমের কুকুরকে যখন নিরুদ্দিষ্ট যাত্রীর সন্ধানে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তখন তাদের গলার কলারে ব্র্যাণ্ডির বোতল বাঁধিয়া দেওয়া হয়। তার পর তাদের যা শিক্ষা দেওয়া হয়, সে শিক্ষার গুণে এক জন তরুণ স্কাউটের কাজ ইহারা অনায়াসে সাধন করিতে পারে। পথে বিপন্ন যাত্রী পাইলে চীৎকারে কুকুর সঙ্কেত জানায়—আশ্রমে আসিয়া সাধুদের সে সঙ্কেতে সচকিত করে। তখন বিপন্ন যাত্রীর উদ্ধার-সাধনে আশ্রম হইতে সর্ব্ব-সহায়তা-দানে এতটুকু বিলম্ব বা ত্রুটি ঘটে না।

ব্যারি নামে একটি কুকুর প্রায় চল্লিশ জন যাত্রীর উদ্ধার সাধন করিয়াছিল। এক বার এক জন তরুণ সেনা বরফে চাপা পড়ে। দু'দিন তার কোনো সন্ধান মেলে নাই। তৃতীয় দিনে ব্যারি তাকে খুঁজিয়া বাহির করে। সৈনিক মূর্চ্ছাতুর হইয়া পড়িয়া ছিল। জিভ্ দিয়া চাটিয়া ব্যারি সৈনিকের চেতনা সঞ্চারিত করে। চেতনা-লাভে ব্যারিকে নেকড়ে-বাঘ ভাবিয়া সৈনিক ব্যারির অঙ্গে বেয়নেট্ বিঁধিয়া দেয়। সে আঘাতে বেচারা ব্যারির মৃত্যু ঘটে।

ব্যারির কবরের উপর তার কীর্ত্তি খুদিয়া স্মৃতি-স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। পিতৃ-গৌরবের স্মৃতি-রক্ষা-কল্পে ব্যারির জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম বদল করিয়া সাধুরা তার নাম দিয়াছেন, ব্যারি!

চিন্তা-শক্তি

চিন্তা করার একটা প্রণালী আছে। সকলে চিন্তা করতে পারে না। চর্চ্চায় চিন্তা-শক্তি বাড়ে।

ছেলেমেয়েদের আমরা "চলি-চলি-পা-পা" করে হাঁটতে শেখাই,—তাদের বর্ণমালা শেখাই,—গান-বাজনা শেখাই। কিন্তু কি করে চিন্তা করতে হয়, চিন্তা-শক্তি কিসে বাড়ে, সে সম্বন্ধে কাকেও মাথা ঘামাতে দেখি না!

চিন্তা করবার শক্তি যাদের আছে, তারাই শুধু বিপদ-আপদে আকু-পাকু করে মরে না—বিপদ থেকে পরিত্রাণের উপায় বার করে' নিস্তার পায়।

চোখের দেখায় বাহিরের কত বস্তুর সঙ্গে নিত্য আমাদের পরিচয় হচ্ছে,—কাণে শুনে আমরা কত কি শিখছি। তার পর ঘ্রাণ, স্পর্শ, স্বাদ—এ-সবের জোরেও আমাদের অভিজ্ঞতা দিনে দিনে বেড়ে চলেছে।

কিন্তু দৃষ্টি, শ্রুতি, ঘ্রাণ—এ-সবের গণ্ডী ছোট। এ-সবের সাহায্যে আমরা যে অভিজ্ঞতা লাভ করি অর্থাৎ যা শিখি, তার সীমা সঙ্কীর্ণ। তবে দৃষ্টি, শ্রুতি প্রভৃতির সাহায্যে যে জ্ঞান, যে অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করি, সেই জ্ঞানের সঙ্গে যদি আমরা আমাদের চিন্তাকে মিলিয়ে নিতে পারি, তাহলে জ্ঞানের প্রসার অনেকখানি বেড়ে ওঠে!

ছোট একটা দৃষ্টান্ত দিই।

এক জন বন্ধুর বাড়ী গেলুম,—সন্ধ্যার আগে। সদরে ঢুকে বাড়ীর ডান দিকে বসবার ঘর। দেখলুম, ঘরের একটি জানলা দিয়ে অস্ত-সূর্য্যের কিরণ এসে অপর দিকের দেওয়ালে পড়েছে। এখন কেউ যদি জিজ্ঞাসা করেন, কোন্ দিকে,—অর্থাৎ পূব, পশ্চিম, না, উত্তর, দক্ষিণ দিকে মুখ করে এ বাড়ীতে ঢুকেছি তো কি জবাব দেবো?

অভিজ্ঞতার জোরে আমরা জানি, সূর্য্য অস্ত যায় পশ্চিম দিকে—সুতরাং ঘরের দেওয়ালে যে রৌদ্র এসে পড়েছে, ও রৌদ্র অস্ত-সূর্য্যের, পশ্চিম দিক্ থেকে এসেছে! এই অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানের সঙ্গে চিন্তা করে সহজেই আমরা বলতে পারবো বাড়ীর সদর কোন্-মুখী!

স্কুলে এসেছি। স্কুলে আসবার সময় বাড়ী থেকে মা বলে দেছেন—ওরে, ছুটীর পর তোর বোনের জন্য একখানা ফার্ষ্ট বুক কিনে আনবি; তবে গিয়ে তোর মেসোমশায়ের অসুখ, তাঁর ওখানে গিয়ে তাঁকে দেখে আসবি,—বাড়ীতে কাল সত্য-নারায়ণের পূজা হবে ঠিক করেছি, ভট্‌চায্যি মশাইয়ের সঙ্গে দেখা করে অমনি বলে আসবি, তিনি যেন কাল সন্ধ্যার সময় আসেন—তার উপর আছে খোকার ফরমাশ, তার চাই লজেঞ্জস! বন্ধু নন্দ পয়সা দিয়ে বলে দেছে, তার চাই একটা লাটাই—তাও কিনে নিয়ে যেতে হবে!

এই যে এত কাজের ভার রয়েছে—আগে থেকে যদি চিন্তা করে নি,—স্কুল থেকে বেরিয়ে কার বাড়ী, কোন্ দোকান আগে পড়ে,—তাহলে আগে-পরে ঠিক করে' নিয়ে সব কাজগুলি পর-পর এবং শীঘ্র সারতে পারবো, এবং কোনোটা বাদ থাকবে না!

এখানে চিন্তা না করতে পারলে এটা করতে ওটা যাবো ভুলে! না হয় স্কুলের কাছের দোকান থেকে বই না কিনে হয়তো বহু দূরে চলে গেলুম মেসোমশায়ের বাড়ী! তার পর মনে পড়লো ফার্ষ্ট বুকের কথা! আবার এলুম স্কুলের কাছে বই কিনতে; তার পর বাজারে গেলুম উল্টো পথে নন্দর জন্য লাটাই কিনতে—তার পর আবার ঘুরে এলুম লজেঞ্জস কিনতে! ঘোরাঘুরি কষ্টের আর অন্ত থাকবে না! এ জন্য চাই, ছোট বয়স থেকেই ভাবতে শেখা; ভেবে ছোট-খাট সমস্যার সমাধান করা চাই। ভাবতে ভাবতে আমাদের বুদ্ধিতে 'শাণ' পড়ে—বুদ্ধিতে মরচে ধরে না, বুদ্ধি হয় ধারালো; এবং বুদ্ধি ধারালো হলে লেখাপড়া বলো, লেখাপড়া সাঙ্গ হবার পর সংসার-ক্ষেত্রে বলো—কোথাও কোনো ব্যাপারে দিশাহারা হতে হবে না। জীবনে যত বড় কঠিন বিপদ বা সমস্যা আসুক, চিন্তার শক্তিতে সে-বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাবার, সে সমস্যা সমাধানের উপায় সহজেই মিলবে!

আমাদের মনের শক্তি চিন্তার ধারায় বাড়ে। চিন্তা-শক্তিকে বাড়িয়ে তোলবার পক্ষে—ক্রশ-ওয়ার্ড-পাজলের সমাধান, ধাঁধা-হেঁয়ালির জবাব বার করা, অঙ্ক কষা, প্রবন্ধ লেখা—এগুলিতে খুব সাহায্য হয়।

চিন্তা-শক্তিকে জাগ্রত করে, শাণিয়ে ধারালো করে মানুষ জগতে কি অসাধ্য না সাধন করেছেন! সিনেমা, রেডিও, এরোপ্লেন, যন্ত্র-পাতির আবিষ্কার এবং নির্ম্মাণ—গল্প মহাকাব্য নাটক উপন্যাস সৃষ্টি—যে-মানুষের চিন্তাশক্তি আছে, সে-মানুষ ছাড়া এ-সব রচনা করবার ক্ষমতা অপরের থাকতে পারে না। তাই তোমাদের উচিত, ভাবতে শেখা। "ওরে বাবা, ভাববো কি"—বলে' চিন্তার পাশ কাটিয়ে 'নন্দ-দুলাল' হয়ে থাকলে কোনো দিন মানুষ হতে পারবে না!

"স্যর এতগুলি অঙ্ক দেছেন, কবে নিয়ে যেতে হবে, দু' পেজ ট্রানস্লেশন করে নিয়ে যেতে হবে, তার উপর কাল আছে আবার হিষ্ট্রীর এগজামিনেশন!" এ কথা মনে করে যে চুপচাপ বসে থাকে, ভাবনা-চিন্তা করে কাজে লেগে যায় না, তাকে চিরজন্ম দুঃখ পেতেই হবে। "আয়েসী" মানুষ জীবনে কোনো দিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না—তার কারণ, সে ভাবতে চায় না! 'আয়েসী' হয়ো না, ভাবতে শেখো। তাহলে জীবনযুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হবে না, পরাজিত হবে না—সিদ্ধিলাভ করবে, সুনিশ্চিত!

বিদেশী চোর

[রূপকথা]

বহু দিন আগেকার কথা। চন্দনপুরে নৃপেনাদিত্য নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি যেমন সাহসী, তেমনি দয়ালু। তাঁর রাজ্যে প্রজারা পরম সুখে বাস করত। চুরি ডাকাতি এ-সব তাঁর রাজত্বে কখনও হ'ত না। প্রতিদিন সকালে রাজ্যের গরীব-দুঃখীদের রাজা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে খাবার-দাবার কাপড়-জামা, যার যা দরকার দান করতেন! লোকে কথায় বলত—"আমরা রাম-রাজত্বে বাস করছি।" বলতে গেলে কোন অভাব-অভিযোগ তাঁর রাজ্যে ছিল না।

এক দিন রাজা নৃপেনাদিত্যের কাণে এল, কে এক জন বিদেশী চোর তাঁর রাজ্যে এসে বাস করছে এবং তার অত্যাচারে প্রজারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তখনি ডাক পড়ল মন্ত্রীর। বৃদ্ধ মন্ত্রী বিমলদেব এসে হাজির হলেন। মহারাজ প্রশ্ন করলেন—"মন্ত্রিবর, শুনেছেন কি, আমার রাজত্বে এক বিদেশী চোর এসে উপদ্রব করছে!" মন্ত্রী মহাশয় বলির পাঁটার মত কাঁপতে কাঁপতে বললেন—"হাঁ মহারাজ, আজ সকালে এই দুঃসংবাদ আমার কাণে এসেছে! আমি কোটাল চন্দ্রপীড়কে চোর ধরবার আদেশ দিয়েছি।" মহারাজ নৃপেনাদিত্য গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—"উত্তম। আজ থেকে সাত দিনের মধ্যে সেই চোরকে জীবিত অথবা মৃত আমার সম্মুখে উপস্থিত করা চাই। আপনি আর চন্দ্রপীড় থাকতে এ-রকম অভিযোগ আমার কাণে আসে, এ ভয়ানক দুঃখের কথা!"

"আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য" বলে মন্ত্রী মহাশয় মহারাজকে অভিবাদন করে বিদায় গ্রহণ করলেন।

গুপ্তচর-মুখে চন্দ্রপীড় সংবাদ পেলেন, কাছেই এক গ্রামে চুরি হয়েছে। অদ্ভুত চুরি! দিনের আলোয় চোর বাড়ীর মধ্যে জামাইয়ের ছদ্মবেশে ঢুকে বাড়ীর মেয়ের গহনার বাক্স নিয়ে চলে গেছে। চন্দ্রপীড় দলবল নিয়ে তখনই সেই গ্রামে যাঁর গৃহে চুরি হয়েছে, সেই বাড়ীতে উপস্থিত হলেন। গৃহস্বামী তাঁকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। চন্দ্রপীড় আশ্বাস দিয়ে বললেন—"কোন চিন্তা করবেন না। শীঘ্রই আমি চোর এবং চোরাই মাল খুঁজে বার করে দেব!" সে-দিনের মত চন্দ্রপীড় দল-বল সমেত তাঁর বাড়ীতে আশ্রয় নিলেন। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, এমন সময় চন্দ্রপীড় এবং তাঁর সঙ্গীদের জন্য এক জন চাকর কিছু মিষ্টান্ন ও সরবৎ নিয়ে এল। তাঁরা বেশ পরিতৃপ্তি-ভরে খাওয়া-দাওয়া করলেন; তার পর কিছুক্ষণের মধ্যেই সকলে নিদ্রিত হলেন।

ঘণ্টা-দুই পরে গৃহস্বামী তাঁদের খাবার জন্য ডাকতে এসে দেখেন, সকলে ঘুমুচ্ছেন। ভাবলেন—'আহা, এরা পথশ্রমে ক্লান্ত। যাক, ঘুমুচ্ছেন ঘুমুন, একটু পরে এসে আবার ডাকব।' ঘণ্টা-খানেক পরে আবার এসে দেখল, সকলে তখনো সেই রকম গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। রাত্রি অনেক হয়ে যাচ্ছে দেখে তিনি তাঁদের ডাকলেন, কিন্তু কারো ঘুম ভাঙ্গলো না। তখন তিনি চন্দ্রপীড়কে নাড়া দিতে লাগলেন।

অনেকক্ষণ ডাকাডাকি নাড়ানাড়ির পর চন্দ্রপীড়ের ঘুম ভাঙ্গল। লজ্জিত হয়ে বললেন—"তাই তো, আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।" গৃহস্বামী বললেন—"তাতে কি হয়েছে, পথশ্রমে ক্লান্ত ছিলেন—" কথা কিন্তু শেষ করতে পারলেন না। চমকিত ভাবে চন্দ্রপীড় বলে উঠলেন—"অ্যাঁ, এ কি?"

"কেন কি হ'ল?"

"আমার গলার হার, আঙ্গুলের আংটি—কিছুই দেখছি না।"

"বলেন কি?"

চন্দ্রপীড় চিন্তিত ভাবে বললেন—"কিছু তো বুঝতে পারছি না।"

তার পর অঙ্গরাখার জেবে হাত দিয়ে বললেন—"এটা কি?" সঙ্গে সঙ্গে একটা চিঠি বার করলেন। চিঠিতে লেখা ছিল—

"কোটাল চন্দ্রপীড় সমীপেষু,

সবিনয় নিবেদন,

আমায় ধরা আপনার কর্ম্ম নয়। মহারাজকে বলবেন, আরও যোগ্যতর লোক পাঠাতে। গৃহস্বামী নির্দ্দোষ। তাকে নিয়ে টানাটানি করবেন না যেন। কন্যার গহনার শোকে তিনি পীড়িত। আমি চাকর সেজে গাঁঠের পয়সা খরচ করে যখন মিষ্টান্ন আর সরবৎ দিয়ে আপনাদের সম্বর্দ্ধনা করেছিলুম, অতিথি-সৎকারের জন্য তখন তিনি জেলে দিয়ে পুকুরে মাছ ধরাচ্ছিলেন। বলা বাহুল্য, মিষ্টান্নে আর সরবতে ঘুমোবার ওষুধ মেশানো ছিল। আপনার স্নেহের দানের কথা চিরকাল মনে থাকবে। আপনার হার আমার গলায় এবং আপনার আংটি আমার আঙ্গুলে শোভাবর্দ্ধন করছে। নমস্কার।

বিনীত
বিদেশী চোর।"

লজ্জিত ভাবে রাজধানীতে ফিরে মহারাজকে চন্দ্রপীড় সকল কথা নিবেদন করলেন। মন্ত্রী আর মহারাজ দু'জনেই চিন্তিত হলেন। চন্দ্রপীড়কে বিশেষ দোষ দিতে পারলেন না। এমন ক্ষেত্রে সন্দেহই বা হয় কি করে! তিন জনে গভীর ভাবে পরামর্শ করতে লাগলেন, কি করা যায়, কাকে এ কাজের ভার দেওয়া যায়!

শেষে মন্ত্রী বিমলদেব বললেন, "মহারাজ, যদি অনুমতি দেন তো আমি একবার চেষ্টা করে দেখি।" মহারাজ বললেন, "বেশ, আপনিও একবার দেখুন, যদি কিছু করতে পারেন।"

পরদিন গুপ্তচরেরা সংবাদ দিলে, রাজধানীর কাছে স্বর্ণধারা নদীর তীরে সদর নায়েব মলয়ানিলের বাড়ীতে গতরাত্রে চুরি হয়েছে। চুরিটা বিস্ময়কর! সদর নায়েব মহালের আদায়পত্র হিসেব করছিলেন, এমন সময় বাড়ীর ভেতর থেকে তীব্র আর্ত্তনাদ শুনে ছুটে তিনি ভিতরে গেলেন। ভিতরে গিয়ে শুনলেন, সকলের মুখে এক কথা—"কে চীৎকার করলে?" চারি ধারে খুঁজে তার কোনও সন্ধান না পেয়ে বিরক্ত হয়ে তিনি নিজের ঘরে এসে দেখেন, বাক্স ভাঙ্গা, টাকাকড়ি সমস্ত চুরি গেছে, একটি পয়সাও নেই!

মন্ত্রী মহাশয় দু'জন অনুচর নিয়ে অনতিবিলম্বে মলয়ানিলের গৃহে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁর মুখ থেকে সমস্ত ব্যাপার বিশদ ভাবে শুনে মন্ত্রী বললেন,—"এ নিশ্চয় সেই বিদেশী চোরের কাজ! আপনি ভাববেন না—আমি শীঘ্রই এর ব্যবস্থা করব।"

মন্ত্রী বৃদ্ধ, এবং ঠাকুরদেবতার উপর খুব ভক্তি। পরদিন সকালে স্নান সেরে স্বর্ণধারা নদীর তীরে রাধাকৃষ্ণজীউর মন্দিরে গেলেন। সঙ্গে দু'জন অনুচর। মন্দিরে পূজাদি শেষ হবার পর সেখানকার পুরোহিত তাঁকে চরণামৃত খেতে দিলেন। হঠাৎ মন্ত্রী মশাইয়ের শরীর অত্যন্ত আনচান্ করতে লাগল। মন্দির-সংলগ্ন একটি ঘরে তাঁকে শুইয়ে পুরোহিত অনুচর দু'জনকে বাড়ীতে খবর দিতে আর কবিরাজ ডাকতে পরামর্শ দিলেন। তারা তখনি ব্যস্ত হয়ে চলে গেল।

কবিরাজ আর নায়েব মশায়কে নিয়ে অনুচররা যখন মন্দিরে ফিরল, তখন সেখানে হৈ-চৈ পড়ে গেছে। এসে তাঁরা শুনলেন, সত্যকারের পুরোহিতকে মন্দিরের পিছনে মুখ আর হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পাওয়া গেছে। ভিতরে গিয়ে তাঁরা দেখেন, মন্ত্রী মহাশয় তখনো অচেতন অবস্থায় পড়ে আছেন। কিছুক্ষণ শুশ্রূষা করবার পর তাঁর জ্ঞান ফিরে এল। প্রশ্ন করতে তিনি বললেন—"জানি না, হঠাৎ শরীরটা কেন যে অমন করে উঠল! অ্যাঁ, এ কি!"

"কেন? কি হয়েছে?"

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে মন্ত্রী বলে উঠলেন—"আমার গলার হার, আঙ্গুলের আংটী?"

অনুচরেরা তখনি চারি ধারে খুঁজতে আরম্ভ করল। হার-আংটী পাওয়া গেল না, মিলল একটি চিঠি। মন্ত্রী মহাশয় দেখলেন, তাতে লেখা আছে—

"মন্ত্রী বিমলদেব সমীপেষু

সবিনয় নিবেদন,

আপনি বৃদ্ধ লোক। অনর্থক আমাকে ধরবার জন্য কেন কষ্ট করছেন! ধর্ম্মে আপনার মতি আছে। আমি জানতুম, আপনি এতখানি পথ যখন এসেছেন, তখন নিশ্চয় রাধাকৃষ্ণজীউর মন্দির দর্শন করবেন। তাই আপনাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলুম। চরণামৃত ঘুমোবার ওষুধ ছিল। আপনার হার এবং আংটী আমিই ধারণ করেছি। নমস্কার।

বিনীত
বিদেশী চোর।"

* * * *

ক্ষুণ্ন মনে রাজধানীতে ফিরে মহারাজাকে মন্ত্রী সব কথা নিবেদন করলেন। অনেকক্ষণ পরামর্শের পর ঠিক হলো, মহারাজ ঘোষণা প্রচার করবেন, চোর যদি স্বয়ং মহারাজের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে নিজের চুরির কেরামতি দেখিয়ে তাঁকে খুশী করতে পারে, তাহলে মহারাজ তার সব অপরাধ ক্ষমা করবেন! নগরে নগরে ঢ্যাঁটরা দিয়ে ঘোষণা প্রচার করবার দু'-এক দিন পরেই এক যুবক রাজ-দরবারে এসে উপস্থিত হলো। উজ্জ্বলকান্তি, সৌম্যদর্শন, বলিষ্ঠ চেহারা, মুখে-চোখে বুদ্ধির দীপ্তি। সভার সকলে তার দিকে প্রশংসা-বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। যুবক মহারাজকে অভিবাদন করে বললে—"আমি ঘোষণা-অনুযায়ী মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

মহারাজ আশ্চর্য্য হয়ে প্রশ্ন করলেন—"যুবক, তুমি কে?" যুবক মৃদু হাস্যে উত্তর দিলে—"আপনি আমায় চেনেন না, কিন্তু আপনার কোটাল আর মন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার ঘটেছে। আমি সেই বিদেশী চোর।" সভায় সেই মুহূর্ত্তে বজ্রপাত হলেও লোকে এত চমকিত হতো না। মহারাজ বললেন—

"তোমার আগমনে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি, কিন্তু আমার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হতে পারলে তোমার কঠোর সাজা হবে।" অভিবাদন করে যুবক উত্তর দিলে—"তা জেনেই আমি এসেছি মহারাজ!"

সে-দিনকার মত সভা ভঙ্গ হলো।

পরদিন মহারাজ চোরকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন। দূরে এক কৃষক গরু দিয়ে লাঙ্গল চালাচ্ছিল। মহারাজ বললেন—"শুনছো, "ঐ যে কৃষক লাঙ্গল চালাচ্ছে, ওর গরু আর লাঙ্গল চুরি করতে হবে, কিন্তু ও তা বুঝতে পাবে না। কেমন পারবে?" চোর বললে—"আপনার আশীর্ব্বাদে পারব বৈ কি। আপনি একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করুন।"—এই কথা বলে চোর সেইখান থেকে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, এক জন লোক একটি পুঁটলি কাঁধে কি যেন খেতে খেতে কৃষকের কাছে গিয়ে হাজির হলো। কৃষক তাকে প্রশ্ন করলে, "কি খাচ্ছ?"

সে উত্তর দিলে, "কাছে ঐ বনের মধ্যে খুব মিষ্টি কুলের গাছ আছে, সেখান থেকে কুল এনে খাচ্ছি।" কৃষকের কুল খাওয়ার লোভ হলো। লোকটিকে সে বললে, "তুমি যদি ভাই আমার গরু দু'টোকে একটু দেখ, আমি তাহলে গোটাকতক কুল নিয়ে আসি।" আগন্তুক বললে—"বেশ তো, স্বচ্ছন্দে যেতে পার।" লোকটির জিম্মায় গরু রেখে কৃষক চলে গেল। তখন লোকটি ঝুলির মধ্য থেকে গরুর ল্যাজের ডগা আর শিঙ্ বার করে মাটীতে পুঁতে দিলে, তার পর লাঙ্গলশুদ্ধ গরুকে নিয়ে রাজার কাছে ফিরে হাজির হয়ে সেখানে রেখে আবার পূর্ব্ব-স্থানে ফিরে এসে হেট-হেট করতে লাগল! ততক্ষণে কৃষক এসে পড়ল। লোকটি মুখ কাঁচু-মাচু করে বললে—"ভাই, মাটীটা বড় নরম ছিল। গরু-লাঙ্গল সব-শুদ্ধ মাটীর ভেতর ঢুকে গ্যাছে।" মহারাজ ততক্ষণে সেখানে এসে পড়েছেন। হেসে তিনি বাঁচেন না! বলা বাহুল্য, এই ব্যক্তিই সেই বিদেশী চোর! অবশ্য কৃষককে তখুনি সে গরু আর লাঙ্গল ফেরৎ দেওয়া হলো। প্রথম পরীক্ষায় বিদেশী চোর উত্তীর্ণ হলো।

পরের দিন চোরকে মহারাজ বললেন—"আমার ঘোড়া অশ্বরক্ষকের সামনে থেকে চুরি করতে হবে, অথচ সে সন্দেহ করবে না। পারবে?" হেসে মহারাজের পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে যুবক বললে—"আপনার আশীর্ব্বাদে পারব বৈ কি।" মহারাজ বললেন—"বেশ, কিন্তু অশ্বরক্ষকের যেন সন্দেহ না হয় তুমি চুরি করছ! সাবধান!" কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, এক জন বৃদ্ধ অশ্বশালে উপস্থিত হয়েছেন। অশ্ব-রক্ষককে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "আমাকে মহারাজ পাঠিয়েছেন ঘোড়ার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে।" বছরে দু'-চার বার এ রকম স্বাস্থ্য-পরীক্ষক পাঠানো হয়। তখনি চিকিৎসককে সঙ্গে করে অশ্বরক্ষক তাঁকে অশ্বশালে নিয়ে গেল। তিনি ঘোড়াদের দাঁত, পা, ঘাড় ইত্যাদি পরীক্ষা করতে লাগলেন। রাজার খাস-ঘোড়া কোন্‌টা, জিজ্ঞেস করতে অশ্বরক্ষক দেখিয়ে দিয়ে বললে—"এই কুড়িটা ঘোড়া তাঁর নিজের ব্যবহারের জন্য। তার মধ্যে এটি তাঁর সব চেয়ে আদরের।" বৃদ্ধ অনেকক্ষণ ধরে ঘোড়াটিকে পরীক্ষা করলেন, করে বললেন—"ঘোড়াটির আর সবই ভালো, তবে পায়ে যেন একটা বাতের মত মনে হচ্ছে। আচ্ছা দাঁড়াও, আমি একে একটু ছুটিয়ে দেখি।" অশ্বরক্ষক বললে—"বেশ।" তখনি বৃদ্ধ রাজার প্রিয় অশ্বের পিঠে চড়ে সেখান থেকে বেরিয়ে মহারাজের কাছে উপস্থিত হলো, এবং মহারাজকে সব কথা খুলে বলল। এই বৃদ্ধ চিকিৎসকই সেই বিদেশী চোর।

দু'-চার দিন পরে মহারাজ চোরকে বললেন—"আজকে সন্ধ্যের পর মহারাণীর গলার হার চুরি করতে হবে। ঘরে ঢোকবার পথ আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। ধরা পড়ে গেলে কিন্তু প্রাণদণ্ড হবে।"—এই বলে মহারাণীর মহলে ঢোকবার পথ চোরকে দেখিয়ে দিলেন। সন্ধ্যার পর রাণীর মহলে প্রবেশের পথে সশস্ত্র প্রহরী দাঁড় করিয়ে দিলেন এবং স্বয়ং মহারাণীর ঘরে পাহারা দিতে লাগলেন। সন্ধ্যার কিছু পরে এক মনুষ্যমূর্ত্তি মহারাণীর মহলের প্রবেশ-পথে দেখা দিল, অমনি আড়াল থেকে প্রহরী সে মূর্ত্তিকে বর্শা-বিদ্ধ করলে। নীচে প্রাঙ্গণে ধপ করে মনুষ্যদেহ-পতনের শব্দ হলো! মহারাজ রাণীকে পূর্ব্বেই এই চোরের কথা সব বলেছিলেন। পতনের শব্দ শুনে বললেন,—"এবার লোকটার উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে। একে বর্শার আঘাত—তার পর এত উঁচু থেকে পতন! নিশ্চয় সে বেঁচে নেই। যাই, দেখে আসি।"—এই কথা বলে তিনি মহল ত্যাগ করে, নীচে নেমে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে এক জন প্রহরী মহারাণীর কাছে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বললে,—"মহারাণি! বিদেশী চোরের অন্তিমকাল উপস্থিত। শেষ প্রার্থনা-হিসেবে সে, যে-জিনিষের জন্য প্রাণ হারাতে বসেছে, সেই হারটি একবার দেখতে চায়। মহারাজ তাই আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।" মহারাণী তখনি প্রহরীর হাতে নিজের গলার হার খুলে দিলেন।

নীচে মৃতদেহ ঘিরে মহারাজ আর প্রহরীরা দাঁড়িয়ে, এমন সময় পিছন থেকে কে যেন বলে উঠল,—"মহারাজ, এই নিন রাণীমার গলার হার।" রাজা বিস্মিত ভাবে মুখ ফিরিয়ে দেখলেন, বক্তা সেই বিদেশী চোর! প্রহরীদের বিদায় দিয়ে মহারাজ চোরকে জিগ্‌গেস করলেন—"কি করে কি হলো, সব খুলে বল তো। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।" চোর বললে—"আপনার কথায় আমার সন্দেহ হয়েছিল, আমাকে ধরবার জন্য কোনও ফাঁদ পেতেছেন, তাই আগে আমি একটি মৃতদেহ জোগাড় করে তাকে দ্বারপথে এগিয়ে দিয়েছিলুম। প্রহরীদের আঘাতে সেই মৃতদেহই নীচে পড়ে গিছল। আমি এক-ধারে লুকিয়ে ছিলুম, আপনারা নীচে নেমে যেতেই আমি মহারাণীর মহলে প্রবেশ করলুম।" তার পর কি করে মহারাণীর কাছ থেকে হার নিয়ে এল, সে কথাও বললে।

পরদিন মহারাজ মন্ত্রী ও কোটালকে সব কথা খুলে বললেন। মন্ত্রী পরামর্শ দিলেন—"এ চোরকে শাস্তি না দিয়ে রাজকার্য্যে ব্যবহার করলে প্রভূত উপকার হতে পারে। চোরের বুদ্ধি যে তীক্ষ্ণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।" কোটাল প্রশ্ন করলে,—"কিন্তু কি ভাবে তা করা সম্ভব?" মন্ত্রী উত্তর দিলেন,—"যদি রাজকন্যার সঙ্গে তার বিবাহ দেওয়া যায়, তাহলে সে আর রাজ্যের কোনও ক্ষতি তো করবেই না, বরং তার বুদ্ধির বলে রাজ্যের অনেক উন্নতি হবে।" রাজা বললেন—"কথাটা মন্দ বলোনি, তবে রাজকন্যার মতামত জানা প্রয়োজন।" মন্ত্রী বললেন—"আজ্ঞে হ্যাঁ, সে তো বটেই।"

সে-দিনকার মত সভা ভঙ্গ হলো।

সুদর্শন যুবকটিকে দেখে আর তার বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে রাজার মন তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। তাই মন্ত্রীর পরামর্শ তাঁর খুব ভালই

লাগল। তিনি তখনই অন্তঃপুরে গিয়ে রাণী ও রাজকন্যাকে সব কথা খুলে বললেন। রাণী আপত্তি করলেন—"কিন্তু এক চোরের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে!" রাজা হেসে বললেন—"শোনাচ্ছে খুব খারাপ, কিন্তু ওর বুদ্ধি বিপথে চলেছে। ও-বুদ্ধি যদি ঠিক পথে আসে, তাহলে সে আর চোর থাকবে না। দস্যু রত্নাকরও পরে মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি হয়েছিলেন। ওর বুদ্ধির প্রাচুর্য্য অস্বীকার করবার উপায় নেই এবং আমার বিশ্বাস, তাকে সুপথে চালিত করা যাবে।"

রাজকন্যা বললেন—"কিন্তু আমি তার বুদ্ধির কোন পরিচয় পাইনি। যদি সে আমার কাছে বসে এমন কোন সত্য গল্প শোনাতে পারে যা সত্যই বিস্ময়কর, তবেই আমি তাকে বিবাহ করব, এই কথা তুমি তাকে বলে দাও। যখন সে গল্প বলবে, সেই সময় আমি তাকে ধরে ফেলব। যদি সে আমার হাত থেকে ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারে, তবেই বুঝব সে প্রকৃত বুদ্ধিমান্। আর যদি সে অকৃতকার্য্য হয়, তবে তাকে সাধারণ চোরের মত শাস্তি ভোগ করতে হবে। অবশ্য এ কথা আর কাউকে বোলো না।"

মহারাজ কন্যার বুদ্ধির প্রশংসা করে বললেন—"মন্দ যুক্তি নয়।"

সে-দিন সন্ধ্যার সময় চোর রাজকন্যার সামনে বসে তাঁকে গল্প শোনাচ্ছে—"এক রাজা। তিনি তার পাশের রাজার রাজত্ব আক্রমণ করেন এমন সময়, সে দেশের রাজা যখন পীড়িত এবং তাঁর একমাত্র সন্তান নাবালক। রাজা হেরে গেলেন এবং নাবালক পুত্রকে নিয়ে রাজ্য ছেড়ে চলে গেলেন। তার পর রাজা মারা গেলেন,—আর তাঁর পুত্র বড় হয়ে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু তার না ছিল সৈন্য, না ছিল অর্থ! তাই সে একাই রাজার বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে লাগল। রাজা বিপদে পড়লেন—" গল্প জমে এসেছে, এমন সময় রাজকন্যা চোরের হাত দু'হাতে চেপে ধরে "চোর ধরেছি" বলে চীৎকার করলেন। চোর অমনি ঘরের জ্বলন্ত প্রদীপটি ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিল। আলো নিয়ে লোক-জন এবং রাজা ঘরে ঢুকলেন—তখনও রাজকন্যা চোরের হাত ধরে আছে—কিন্তু চোর কই? যে হাত রাজকন্যা ধরে আছেন, সে হাত মোমের তৈরী এবং তার আঙ্গুলের ফাঁকে একটা চিরকুট আটকানো! লোকজনকে বিদায় দিয়ে রাজকন্যা পড়ে দেখেন, চিরকুটে লেখা আছে—"আমিই সেই হতভাগ্য বিতাড়িত রাজার পুত্র, আর আপনার পিতাই আমাদের রাজ্য-সম্পদ্ কেড়ে নিয়েছিলেন।" রাজকন্যা পিতাকে প্রশ্ন করতে তিনি সবই স্বীকার করলেন। রাজকন্যাও চোরের বুদ্ধির প্রশংসা না করে থাকতে পারলেন না।

তার পর? তার পর রাজকন্যার সঙ্গে চোর-রাজপুত্রের খুব ধুম-ধাম করে বিয়ে হলো এবং কালে এই রাজপুত্রই রাজা হলেন। তাঁর রাজ্যে কখন কোন উপদ্রব বা চুরি-ডাকাতি হবার উপায় ছিল না। কারণ, তিনি নিজেই ছিলেন চোরের রাজা! তাঁকে ফাঁকি দেওয়া অসম্ভব।

শ্রীযামিনীমোহন কর (এম-এ, অধ্যাপক)।

বৈষ্ণবমত-বিবেক

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী

প্রথম পরিচ্ছেদ

জন্মস্থান ও পিতৃপরিচয়

প্রাচীন সপ্তগ্রাম সহর হুগলী নগরের বায়ু-কোণে সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। যমুনা, গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলে ইহার অনতিদূরেই মুক্ত ত্রিবেণী। পুরাণে এই সপ্তগ্রাম একটি সুপবিত্র তীর্থস্থানরূপে পরিগণিত হইত। এই সুপবিত্র নগর পূর্ব্বদিকে ভাগীরথী ও উত্তরে সরস্বতী নদীর উপর অবস্থিত হওয়ায় ইহা একটি সুসমৃদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়। প্রিয়ব্রত-পুত্র সাত জন তপস্বীর তপস্যার স্থান বলিয়া ইহা সপ্তগ্রাম নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, এইরূপ প্রবাদ থাকিলেও প্রাচীন সপ্তগ্রাম খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতেও একটি সুবৃহৎ সহর ছিল। বর্ত্তমান কলিকাতার আদিম অধিবাসিরূপে যে সকল শেঠ, বসাক ও সুবর্ণ-বণিক্‌গণকে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদের অনেকেরই পূর্ব্বনিবাস সপ্তগ্রাম। পাঠান-শাসন কালে সপ্তগ্রাম দক্ষিণ-বঙ্গের রাজধানী ছিল। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 'ইবন্ বতুতা' নামক মিশরদেশীয় পর্য্যটক সপ্তগ্রামে আসিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি সপ্তগ্রামকে "সোদকাওয়ান" বা "সাদগাঁওন" নামে অভিহিত করিয়াছেন। সুবিখ্যাত পর্ত্তুগীজ পর্য্যটক ডি ব্যারোজও (De Barros) তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে সাতগাঁর বা সপ্তগ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন। ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে ফ্রেডারিক নামক এক জন ইংরেজ পর্য্যটক বঙ্গদেশে ভ্রমণ করিতে আসেন। তখন পর্য্যন্তও সপ্তগ্রামের বাণিজ্য-সমৃদ্ধি সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু সরস্বতীর মূল স্রোত তখন ভাগীরথীর দিকে প্রবাহিত হওয়ায় সুবৃহৎ অর্ণবপোতগুলি সপ্তগ্রামে না আসিয়া "বাওর" নামক স্থান পর্য্যন্ত আসিত, ইহা ফ্রেডারিকের প্রদত্ত বিবরণ হইতে জানা যায়। পাঠান-শাসন কালে সপ্তগ্রামের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। উহা লক্ষ্য করিয়াই কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে লিখিত হইয়াছে—

"সপ্তগ্রামের বেণে সব কোথাও না যায়।
ঘরে বসি সুখ মোক্ষ নানা ধন পায়।"

পাঠান-শাসন কালে অধিকাংশ শাসনকর্ত্তারই সপ্তগ্রামে টাকশাল ছিল। বোধ হয়, দক্ষিণ-বঙ্গের সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ বাণিজ্যপ্রধান স্থান বলিয়া এই স্থানে মুদ্রার প্রয়োজন বিশেষরূপে অনুভূত হইত।*

* "সাজাহাননামা" হইতে জানা যায় যে, পরবর্ত্তী কালে পর্ত্তুগীজগণ হুগলীতে বাস করিয়া ঐ স্থানে দুর্গাদি নির্ম্মাণ করায় এবং কারখানা

কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, ঐ সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে সপ্তগ্রাম একটি "মুলুক" ছিল। অনেকগুলি পরগণা লইয়া একটি মুলুক গঠিত হইত। স্বাধীন পাঠান বাদশাহ-দিগের আমলে সপ্তগ্রামের রাজনৈতিক অবস্থাও বিশেষ উন্নত ছিল। যখন সমগ্র বঙ্গদেশ এক-শাসনাধীনে আসিয়াছিল, তখনও গৌড়ে মূল রাজধানী থাকিলেও সপ্তগ্রাম দ্বিতীয় রাজধানীরূপে পরিগণিত হইত। এখানেও বাঙ্গালার শাসনকর্তৃগণ সময়ে সময়ে অবস্থান করিতেন। ফলতঃ, এই মুলুকের শাসনকেন্দ্ররূপে পরিগণিত হওয়ায় এখানেও এক জন ফৌজদার ও কাজি থাকিতেন এবং এখানেও অপরাধীদিগকে দণ্ডদানের ব্যবস্থা ছিল।

এই মুলুকের রাজস্ব আদায়ের ভার যাঁহারা লইতেন, তাঁহাদিগকে মুলুকের অধিকারী বা মজুমদার বলা হইত। তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে বার্ষিক রাজস্ব আদায় করিয়া দিবার সর্ত্তে মুলুক ইজারা লইতেন। এই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব সরকারে জমা দিয়া ইহার অধিক যে পরিমাণ রাজস্ব তাঁহারা আদায় করিতে পারিতেন বা অন্য কোনও প্রকারে প্রজাদিগের নিকট হইতে যে অর্থ অধিকারী আদায় করিতেন, তাহার দ্বারা সরঞ্জামি ব্যয় প্রভৃতি নির্ব্বাহ করিয়া উদ্বৃত্ত অংশ নিজেরা লইতেন। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে হিরণ্য দাস ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোবর্দ্ধন দাস সপ্তগ্রামের রাজস্ব আদায়ের অধিকারী ছিলেন বলিয়া তাঁহারা হিরণ্য মজুমদার ও গোবর্দ্ধন মজুমদার নামে অভিহিত হইতেন। গৌড় তখন স্বাধীন পাঠান রাজগণের রাজধানী। মুলুকপতি মজুমদারগণকে তখন গৌড়ের সরকারে এক জন উকীল বা আরিন্দা রাখিতে হইত। ইঁহাদের মারফতে রাজস্ব সরবরাহ করা হইত এবং ইঁহারাই মজুমদারের মধ্যে ও রাজ-সরকারের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করিতেন। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন মজুমদার ভ্রাতৃদ্বয়ের পক্ষ হইতে গোপাল চক্রবর্ত্তী নামক এক জন ব্রাহ্মণ গৌড়ের রাজ-সরকারের "আরিন্দা" ছিলেন। ইনি মজুমদার ভ্রাতৃদ্বয়ের অঙ্গীকৃত রাজস্ব ১২ লক্ষ টাকা প্রতি বৎসরে গৌড়ের রাজ-সরকারে জমা দিতেন। মজুমদার ভ্রাতৃদ্বয়ের শুদ্ধ রাজস্বের খাতে ২০ লক্ষ টাকা বার্ষিক আদায় হইত, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ঐ সময়ে সপ্তগ্রাম একটি সমৃদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল, ঐ জন্য তাঁহারা বার্ষিক ৪।৫ লক্ষ টাকা শুল্ক হিসাবেও আদায় করিতেন। এইরূপে রাজস্ব হিসাবে ১২ লক্ষ টাকা রাজ-সরকারে দিয়াও ইঁহাদের প্রায় ১২।১৩ লক্ষ টাকা থাকিত।

সপ্তগ্রাম হইতে প্রায় এক মাইল দূরে কৃষ্ণপুর নামে একটি পল্লীতে মজুমদার ভ্রাতৃদ্বয়ের রাজপ্রাসাদতুল্য আবাস-গৃহ ছিল। এই স্থানটি সরস্বতী নদীর তীরে, এখনও এই স্থানের কিঞ্চিৎ নিম্নেই সরস্বতীর খাদ দেখিতে পাওয়া যায়। এখন এই স্থানে এই সুবিশাল প্রাসাদের কোনও চিহ্ন আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এখন এই স্থান আর লোকের সুপরিচিত নহে; জঙ্গলের মধ্যে ছুলেপাড়ার সন্নিকটে জনবিরল স্থানে "রঘুনাথ দাসের পাটবাড়ী"রূপে এই স্থানটির এখনও সন্ধান পাওয়া যায়। এখানে একটি আধুনিক ইষ্টকনির্ম্মিত সামান্য গৃহে শ্রীরাধাগোবিন্দের বিগ্রহ জনৈক ভেকধারী বৈষ্ণব কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া থাকে। এই স্থান হইতে সরস্বতীর খাদে নামিবার জন্য ইষ্টকনির্ম্মিত সোপান আছে।

এই কৃষ্ণপুর গ্রাম যখন সপ্তগ্রামের সহরতলীরূপে সপ্তগ্রামের অংশ বলিয়া পরিগণিত হইত, তখন হিরণ্য দাস ও গোবর্দ্ধন দাস নামক উক্ত দুই জন কায়স্থ ভ্রাতা এই স্থানে বাস করিতেন। কায়স্থ-সমাজে ইঁহারা যে বিশেষ সম্ভ্রান্ত ছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ইঁহাদিগকে "সৎকুলীন" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। * শ্রীল সনাতন গোস্বামীও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে "কায়স্থকুল-ভাস্কর" নামে অভিহিত করিয়াছেন। † সম্ভবতঃ, ইঁহারা উত্তররাঢ়ী কায়স্থ ছিলেন; কারণ, দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থগণের মধ্যে "দাস" উপাধিধারী কেহ কোনও দিন কুলীন বলিয়া গৃহীত হন নাই। নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণগণ প্রায় সকলেই এই দাস-ভ্রাতৃদ্বয়ের দানগ্রহণ করিতেন। বিশেষতঃ, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকুল-সম্ভূত নরসিংহ নাড়িয়ালের বংশের শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য প্রভু ও শ্রীচৈতন্যদেবের পিতৃদেব শ্রীল জগন্নাথ মিশ্র ইঁহার দান গ্রহণ করিতেন, এ কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতেই জানা যায়। সুতরাং এই মজুমদার-বংশ যে বিশেষ সম্ভ্রান্ত বংশ ছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তদ্ব্যতীত এই ভ্রাতৃদ্বয় সদাচারী ও ধার্ম্মিক ছিলেন। এই জন্য ইঁহারা সর্ব্বত্র সমাদৃত হইতেন।

কিন্তু এই বিশাল সমৃদ্ধির মধ্যেও ইঁহাদের অন্তরে সুখ ছিল না। ইঁহাদের পুত্র-সন্তান ছিল না। হিরণ্য দাসের কোনই সন্তান হয় নাই; দীর্ঘকাল পরে বোধ হয়, প্রৌঢ় বয়সে গোবর্দ্ধনের একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ইনিই রঘুনাথ দাস। সম্ভবতঃ ১৪১৬ শকে বা ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণপুরে তিনি ভূমিষ্ঠ হন। শ্রীরূপ, সনাতন, শ্রীজীব, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট ও রঘুনাথ দাস ইঁহারাই উত্তরকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মূল আচার্য্যরূপে পরিগণিত হইয়াছেন। ইঁহাদের কাহারও জন্মসময়, জন্মতিথি নিদ্দিষ্টরূপে জানিবার উপায় নাই। যে বিনয়ে আদর্শ-চরিত্র ভক্ত "তৃণাদপি সুনীচ" হইয়া যান, ইঁহারা সেই বিনয়ের মূর্ত্তিমান্ অবতার। ইঁহাদের নিজ নিজ জীবন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে কিছুই প্রকাশযোগ্য মনে করেন নাই। শ্রীবৃন্দাবনের এই ছয় গোস্বামীর মধ্যে পাঁচ জনই ব্রাহ্মণ, মাত্র শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী কায়স্থ। হিরণ্য দাস ও গোবর্দ্ধন দাস রাম-লক্ষ্মণের মত অভিন্নহৃদয় ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কনিষ্ঠ গোবর্দ্ধনের পুত্ররূপে রঘুনাথ দাস জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মে মজুমদার ভ্রাতৃদ্বয়ের স্থাপন করায় সপ্তগ্রামের বাণিজ্যসমৃদ্ধি হুগলীতে স্থানান্তরিত হয়। হুগলীর সম্মুখের খাল সংস্কৃত করিয়া দেওয়ায় নদীর মূল স্রোত তাহাতে প্রবাহিত হওয়ায় সপ্তগ্রামের সম্মুখস্থ নদীস্রোত রুদ্ধ হইয়া যাওয়াতে সপ্তগ্রামের বাণিজ্যের ধ্বংস সাধিত হয়।

* মহৈশ্বর্য্যযুক্ত দোঁহে বদান্য ব্রহ্মণ্য।
সদাচার সৎকুলীন ধার্ম্মিক অগ্রগণ্য॥
নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্য প্রায়।
অর্থ ভূমি গ্রাম দিয়া করেন সহায়॥
—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ১৬শ পরিচ্ছেদ।

† শ্রীল সনাতন গোস্বামী শ্রীল হরিভক্তিবিলাসে স্বকৃত টীকা দিগ্দর্শনীর প্রারম্ভেই শ্রীল রঘুনাথ দাসের পরিচয় দিতে যাইয়া তাঁহাকে "কায়স্থকুল-ভাস্কর" বলিয়াছেন। সনাতন গৌড়ের বাদশাহ হুসেন শাহের প্রধান মন্ত্রী হওয়ায় এ সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল।

হৃদয় যে আনন্দের প্রবাহে পরিষিক্ত হইয়াছিল, ইহা বলাই বাহুল্য। রঘুনাথের জন্মে উভয় ভ্রাতাই আপনাদিগকে "পুত্রবান্" বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। রঘুনাথের যেমন রূপ, তেমনই গুণ। উভয় ভ্রাতাই তাঁহাকে প্রাণের সমান ভালবাসিতেন।

শিক্ষা ও সাধুসঙ্গ

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন উভয়েই নিষ্ঠাবান্ হিন্দু এবং ধার্ম্মিকের অগ্রগণ্য। পুত্রের শৈশব অতিক্রান্ত হইলেই তাঁহারা তাহার বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। শান্ত সৌম্যদর্শন রঘুনাথের বাল্যকাল হইতেই বিদ্যাশিক্ষার প্রতি অপরিসীম অনুরাগ পরিদৃষ্ট হইত। ধার্ম্মিক দাস-ভ্রাতৃদ্বয়—সে কালের প্রচলিত রীতি অনুসারে রঘুনাথের সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা করাই সঙ্গত মনে করিলেন। গুরুগৃহে থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষাতেই স্বভাব পরিমার্জ্জিত হয় এবং সদাচার অভ্যস্ত হয়। কৃষ্ণপুরের অনতিদূরে চাঁদপুরে বলরাম আচার্য্য নামক এক জন সুপণ্ডিত ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ইঁহাকেই দাস-ভ্রাতৃগণ পুরোহিত পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইঁহাকে সর্ব্বাংশে অনিন্দনীয় ও আদর্শ-চরিত্র জানিয়া রঘুনাথের পিতৃব্য ও পিতা তাঁহাকে চাঁদপুরে বলরাম আচার্য্যের বাটীতে রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন। শুভক্ষণে রঘুনাথ আচার্য্যগৃহে প্রেরিত হইলেন।

জীবের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কারবশেই শৈশব হইতেই তাঁহার মনের গতি নিয়ন্ত্রিত হয়। সুকৃতী রঘুনাথ "বাল্যকাল হইতেই বিষয়ে উদাসীন"। বলরাম আচার্য্য একে সুপণ্ডিত, তাহাতে ভগবদ্ভক্ত। রঘুনাথ তাঁহার গৃহে আসিয়া অতীব ঔৎসুক্য সহকারে বিদ্যাশিক্ষায় নিরত হইলেন। তাঁহার মধুর চরিত্র-গুণে তিনি অচিরেই বলরাম আচার্য্যের স্নেহলাভ করিলেন। রঘুনাথের পিতা ও পিতৃব্য উভয়েই সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন—বলরাম আচার্য্যের সুনিপুণ অধ্যাপনায় রঘুনাথও সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য ও অলঙ্কারে কি প্রকার সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন, তাঁহার দানকেলি-চিন্তামণি, মুক্তাচরিত ইত্যাদি গ্রন্থে এবং সুমধুর কবিত্বপূর্ণ পুস্তকাবলীতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাতে আবার বলরাম হরিভক্তের শিরোমণি, বৈষ্ণবসেবায় তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ। তিনি ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবের জাতিকুল বিচার করিতেন না। শ্রীচৈতন্যদেব যে সর্ব্বলোকসুলভ সাধনপদ্ধতি জগৎকে দান করিয়াছেন—শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনই তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। যাঁহারা ঐকান্তিক অনুরাগে এই নামসঙ্কীর্ত্তনকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, হরিদাস ঠাকুর তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য। ইনি প্রতিদিন তিন লক্ষ করিয়া হরিনাম গ্রহণ করিতেন। ইনি যবন হইলেও হরিনামে ইঁহার নিষ্ঠার ফলে ইনি "হরিদাস ঠাকুর" নামে সর্ব্বত্র সুপরিচিত। ইঁহার আদর্শ চরিত্র এবং হরিনামে ইঁহার নিষ্ঠা ও অনুরাগের জন্য ইনি উত্তরকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণবজগতে সকলেরই পরম শ্রদ্ধাপাত্র হইয়াছিলেন। বেণাপোলে একটি নির্জ্জন স্থানে ইনি অবস্থান করিয়া প্রতিদিন তিন লক্ষ করিয়া হরিনাম গ্রহণ করিতেন। হরিনামে ইঁহার এই অনুরাগের কথা শুনিয়া ঐ স্থানের জমিদার রামচন্দ্র খাঁন অসূয়াবশে ইঁহার নিকট একটি সুন্দরী বেশ্যাকে প্রেরণ করিয়া ইঁহার ধর্ম্মনাশের চেষ্টা করেন। কিন্তু এই বেশ্যা হরিদাস ঠাকুরের প্রভাবে—

"প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হইল পরম মহান্তী।
বড় বড় বৈষ্ণব তাঁর দরশনে যান্তি॥"

হরিদাস ঠাকুর বেণাপোলে তাঁহার সাধন-কুটীর এই বেশ্যাকে দিয়া বেণাপোল ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন। বৈষ্ণবে অসামান্য প্রীতিশীল বলরাম আচার্য্য তাঁহাকে চাঁদপুরে নিজ গৃহে রাখিয়া তাঁহাকে নির্জ্জনে নামকীর্ত্তনের জন্য একখানি ভজনকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ইনি সেখানে থাকিয়া নাম জপ করিতেন এবং বলরাম আচার্য্যের গৃহে "ভিক্ষা" গ্রহণ করিতেন। এই সৌম্যমূর্ত্তি নাম-সংকীর্ত্তনপর সাধুকে দেখিয়া রঘুনাথের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। এই দশ বৎসর বয়স্ক বালক এই সাধুর প্রতি এক অপূর্ব্ব আকর্ষণ অনুভব করিলেন। হরিদাস ঠাকুর শিশুগণকে পবিত্র দেবপূজার ফুলের ন্যায় জ্ঞান করিতেন। ইনি শিশুদিগকে মিষ্টান্ন প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের মুখে হরিনাম শুনিয়া আনন্দে আত্মহারা হইতেন। কথিত আছে, বঙ্গদেশে বর্ত্তমানে যে "হরির লুট" দেখা যায়, ইনিই এইরূপে তাহার প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার প্রতি রঘুনাথের শ্রদ্ধা দেখিয়া তিনিও এই শান্ত, স্নিগ্ধ ও সুশীল বালককে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং তাহাকে হরিনাম করিতে উপদেশ দিলেন। বালক রঘুনাথও এই অবধি নিষ্ঠাসহকারে তাঁহার জন্মান্তরীণ সাধনের সহায়ক হরিনাম, যত অল্প সময়ের জন্যই হউক, নিয়ম পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

দৈববশে এই সময়ে একটি অচিন্ত্যপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, গোপাল চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্রাহ্মণ হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনের বেতন ভোগ করিয়া তাঁহার পক্ষ হইতে গৌড় সরকারে রাজস্ব জমা দিতেন এবং রাজ-সরকারের সহিত মজুমদার-ভ্রাতৃগণের যোগ রক্ষা করিতেন অর্থাৎ মজুমদারের পক্ষ হইতে যাবতীয় ব্যাপার রাজ-সরকারে জানাইতেন এবং রাজ-সরকারের যাবতীয় ব্যাপার মজুমদার-ভ্রাতৃদ্বয়ের গোচরে আনয়ন করিতেন। এইরূপ কর্ম্মচারীকে আরিন্দা নামে অভিহিত করা হইত। এই গোপাল চক্রবর্ত্তীর আকৃতি পরম সুন্দর ছিল। এক দিন মজুমদার-ভ্রাতৃদ্বয়ের আগ্রহে বলরাম আচার্য্য হরিদাস ঠাকুরকে তাঁহাদের সভায় লইয়া গেলেন। ঠাকুরকে দেখিয়া দুই ভাই পরম সমাদরে প্রত্যুত্থান করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। সভায় বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও শাস্ত্রদর্শী সজ্জন উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত সকলেই হরিদাস ঠাকুর যে তিন লক্ষ নাম কীর্ত্তন করেন, তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এই প্রসঙ্গে পণ্ডিতগণ সকলেই নামের মহিমা আলোচনা করিতে লাগিলেন। কেহ বলিতে লাগিলেন—নাম হইতে সমস্ত পাপ ক্ষয় হইয়া যায়। অন্য কেহ বলিতে লাগিলেন—নামের ফলে জীবের মোক্ষলাভ হয়। হরিদাস ঠাকুর এই সকল আলোচনা শ্রবণ করিয়া বলিলেন—"হরিনামের এই ফল পর্য্যাপ্ত নহে, হরিনামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উৎপন্ন হয়। সূর্য্য উদিত হইবার পূর্ব্বেই যেমন অন্ধকার বিনষ্ট হয়, পরে সূর্য্য উদিত হইলেই ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও মঙ্গলের প্রকাশ হয়; সেইরূপ নামরূপ সূর্য্য উদিত হইলে কৃষ্ণপদে ভক্তিরূপ মুখ্য ফল জন্মে এবং তাহার আনুষঙ্গিক ফলরূপে মুক্তি ও পাপ নাশ হইয়া থাকে। সুতরাং নামাভাস হইতেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।"

এই কথা গোপাল চক্রবর্ত্তীর সহ্য হইল না, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—

"ভাবুকের সিদ্ধান্ত শুন পণ্ডিতের গণ!
কোটিজন্মে ব্রহ্মজ্ঞানে যেই মুক্তি নয়।
এই কহে—নামাভাসে সেই মুক্তি হয়॥"
হরিদাস কহে—"কেনে করহ সংশয়?
শাস্ত্রে কহে—নামাভাসমাত্রে মুক্তি হয়॥
ভক্তিসুখ—আগে মুক্তি অতি তুচ্ছ হয়।
অতএব ভক্তগণ মুক্তি নাহি লয়॥"

উদ্ধত যুবক গোপাল চক্রবর্ত্তী বলিয়া বসিল—"যদি নামাভাসে মুক্তি না হয়, তবে তোমার নাসিকা ছেদন করিব।" হরিদাস ঠাকুর তাহাই স্বীকার করিলেন। সভাস্থ সকল লোক হরিদাস ঠাকুরের এই অপমানে হাহাকার করিয়া উঠিলেন। হিরণ্য মজুমদার গোপাল চক্রবর্ত্তীকে ত্যাগ করিলেন। মহান্তের অপমানের যে সর্ব্বনাশ ফল, অবশেষে তাহাই ফলিল।

"তিন দিন ভিতরে সেই বিপ্রের কুষ্ঠ হৈল।
অতি উচ্চ নাসা তার গলিয়া পড়িল॥
চম্পককলিকা সম হাত পায়ের অঙ্গুলী।
কোঁকর হইল সব কুষ্ঠে গেল গলি॥
দেখিয়া সকল লোকের হৈল চমৎকার।
হরিদাসে প্রশংসে লোক করি নমস্কার॥
যদ্যপি হরিদাস বিপ্রের দোষ না লইল।
তথাপি ঈশ্বর তারে ফল ভুঞ্জাইল॥
ভক্তের স্বভাব—অজ্ঞের দোষ ক্ষমা করে।
কৃষ্ণের স্বভাব—ভক্তনিন্দা সহিতে না পারে॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত; অন্ত্য; ৩য় পরিচ্ছেদ।

এই ঘটনার পরে হরিদাস ঠাকুর চান্দপুর ত্যাগ করিয়া শান্তিপুরে আসিলেন—শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্য প্রভু গঙ্গাতীরে একখানি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া হরিদাস ঠাকুরকে পরম সমাদরে তথায় রাখিলেন।

এই ঘটনার ফলে সপ্তগ্রামে নাম-মহিমার প্রতি লোকের অতিশয় শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইল এবং বালক রঘুনাথের ও হরিদাস ঠাকুরের নাম-মহিমার প্রতি শ্রদ্ধা দৃঢ় হইল। রঘুনাথ দাসের সৌভাগ্যোদয়ের ইহাই প্রথম সোপান। হরিদাসের এই কৃপা হইতেই তাঁহার হরিনামে নিষ্ঠা হইল এবং কিছু দিন পরেই তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের কথা শুনিয়া তাঁহার পাদপদ্মলাভকেই জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়া স্থির করিলেন। সামান্যমাত্র সাধুসঙ্গেরও ফল কিরূপ সর্ব্বার্থসাধক, রঘুনাথের উত্তর-জীবনে তাহা প্রমাণিত হইল। [ক্রমশঃ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম-এ, বি-এল)।

সুধা-হরণ

[নক্সা]

মুর্শিদাবাদ জেলার মধুনগর গ্রামের ভূম্যধিকারিণী শ্রীমতী রমা বসু উচ্চশিক্ষিত ও প্রতাপান্বিত। গ্রামের পূর্ব্বপার্শ্বে তাঁহার প্রকাণ্ড অট্টালিকা দূর হইতে পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মধুনগরের নিকটবর্ত্তী রেল-ষ্টেশন প্রায় এক মাইল দূরে। গ্রাম হইতে ষ্টেশন পর্য্যন্ত একটি পাকা রাস্তা আছে।

জমিদার-বাটীর সদরের বৈঠকখানায় জমিদারণী রমা বসু একটা মোটা তাকিয়ায় হেলান দিয়া আলবোলায় ধূমপান করিতে করিতে সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন। তাঁহার সুন্দর গৌরবর্ণ, স্থূলদেহ এবং গম্ভীর মুখ দেখিলে দর্শকের মনে স্বভাবতঃই শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। যৌবনে তিনি যে অসামান্যা রূপবতী ছিলেন, তাহার লক্ষণ এখনও তাঁহার শরীরে বিদ্যমান। এখন তাঁহার বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর, কিন্তু দেখিলে মনে হয়, চল্লিশ পার হয় নাই। দুই রগের পাশে কিছু শুক্লকেশ থাকিলেও দূর হইতে তাহা লক্ষ্য হয় না। যৌবনে তিনি যেমন রূপবতী ছিলেন, সেইরূপ বলবতীও ছিলেন। কলিকাতায় থাকিয়া যখন কলেজে পড়িতেন, তখন Long jump high jump, প্রভৃতিতে অনেক বার প্রথম পুরস্কার পাইয়াছিলেন। বাল্যকালে পিতা-মাতার মৃত্যু হইলেও তাঁহাদের প্রবীণা ম্যানেজার মৃণালিনী মজুমদারের তত্ত্বাবধানে তাঁহার শরীরচর্চ্চা ও বিদ্যাচর্চ্চায় কোন ত্রুটি হয় নাই, ম্যানেজারের নিকট তিনি জমিদারীর কাজ কর্ম্মও রীতিমত শিক্ষা করিয়াছিলেন। কলিকাতায় অবস্থান কালে বান্ধবীদের সংসর্গে পড়িয়া না কি তাঁহার চরিত্রস্খলনের উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু সে কথা মৃণালিনী দেবীর কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি যুবতী মনিবকে দেশে আনাইয়া তাঁহার মতি-গতির প্রতি লক্ষ্য রাখিলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই মধুনগরের সন্নিহিত আনন্দপুরের জমিদারের একমাত্র পুত্র হিমাংশুকুমারের সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। ম্যানেজার দেবীকে তিনি "মাসীমা" বলিয়া ডাকিতেন এবং তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন, মাসীমার প্রস্তাবে আপত্তি করিতে তাঁহার সাহস ছিল না। ম্যানেজার দেবী বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলে রমা বলিয়াছিলেন—"আমার ইচ্ছা, এম-এটা আর একবার চেষ্টা করে দেখি, এম-এ পাশ করে তার পর বিবাহ করলে হয় না?"

এ কথায় ম্যানেজার দেবী বলিয়াছিলেন, নাই বা পাশ করলে মা, তোমাকে ত চাকরি করতে হবে না যে, পাশ করলে চাকরির সুবিধা হবে! তোমার বার্ষিক আয় বিশ হাজার টাকার উপর; কাজেই সংসারের ভাবনা ভাবতে হবে না। তোমার লেখাপড়া শেখার উদ্দেশ্য জ্ঞান-লাভ, বাড়ী বসেই তা হতে পারে। আমার ইচ্ছা, তুমি বাড়ীতে বসে বিষয়-কর্ম্ম দেখ আর পড়াশুনা কর। আমি আর কত দিন?"

মাসীমার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইল। রমার বিবাহ হইল। বিবাহের সময় রমার বয়স চব্বিশ বৎসর, হিমাংশুর বয়স উনিশ। বাড়ীতে বসিয়া রমার বিষয়-চর্চ্চা ও বিদ্যা-চর্চ্চা চলিতে লাগিল

কিন্তু বলচর্চ্চা বন্ধ হইল। ফলে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরীরে মেদবৃদ্ধি হইতে লাগিল, চল্লিশ বৎসর বয়সে তিনি রীতিমত স্থুলাঙ্গী হইয়া উঠিলেন। কলিকাতায় অবস্থান কালে সহপাঠিনীদের সঙ্গে তিনি কুস্তি লড়িতেন, তাহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দৌড়-ঝাঁপ করিতেন, কিন্তু দেশে আসিয়া সে চর্চ্চা বন্ধ করিতে হইল; কারণ, তিনি জমিদারণী। জমিদারণী হইয়া প্রজাদের সম্মুখে দৌড়া-দৌড়ি করিলে মান থাকিবে না! প্রজার কাছে তিনি যে রাণী-মা।

জমিদারণী যখন সংবাদ-পত্র পাঠ করিতেছিলেন, সেই সময় বাইশ-তেইশ বৎসর বয়স্ক এক ভৃত্য, বৈঠকখানার অন্তঃপুরের দিকের দ্বারের পর্দ্দা সরাইয়া একবার উঁকি মারিয়াই অদৃশ্য হইল এবং পর-মুহূর্ত্তে সেই দ্বার দিয়া প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়স্ক এক সুশ্রী, সুবেশ পুরুষ অতি সন্তর্পণে প্রবেশপূর্ব্বক কর্ত্রীর হাত হইতে খবরের কাগজখানা সহসা টানিয়া লইলেন। রমা দেবী একটু চমকিত হইয়া আগন্তুকের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সহাস্যে বলিলেন, "হিমা, অসময়ে এখানে কি মনে করে?"

পত্নীর পার্শ্বে বসিয়া হিমাংশুকুমার বলিলেন, "সময়ে ত তোমার দেখা পাবার উপায় নাই, তাই অসময়ে আসতে হয়। বেলা বারোটার সময় কাছারীতে গিয়ে প্রজাদের আবেদন-নিবেদন নিয়ে ব্যস্ত থাকো সেই সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, আর সন্ধ্যার পর থেকে রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত ইয়ার-বন্ধুদের নিয়ে দাবা, তাস, পাশা, তার পর ভিতরে গিয়ে খেয়ে-দেয়ে শুতে রাত একটা-দেড়টা বেজে যায়, পরের দিন বেলা দশটার আগে ঘুম ভাঙ্গে না! ঘুম ভাঙ্গলে স্নানাহার করতেই আবার বারোটা বাজে। এই ত তোমার ডেলি রুটিন্, কাজেই তোমার সঙ্গে কথা কইতে হলে অসময়ে আসতে হয় বৈ কি!"

কর্ত্রী বলিলেন, "কি করি বলো? কাছারীতে বসে জমিদারীর কাজ না দেখলে চলে না, আর সন্ধ্যায় পাড়ার পাঁচ জন ভদ্রমহিলা এসে বসেন, তাঁদের ত তাড়িয়ে দিতে পারি না, কাজেই খেতে-শুতে একটু রাত হয়ে যায়।"

হিমাংশু বলিলেন, "আমি ত ভদ্রমহিলাদের তাড়াতে বলছি না, জমিদারীর কাজ দেখতেও বারণ করছি না! এ দু'টো ছাড়া তোমার দেখবার কি আর কোন কাজ নেই? সুধা যে শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বাইশ উৎরে যেটের তেইশে পা দিয়েছে, সে খবর রাখো? তার বিয়ে দিতে হবে না? আমার উনিশ বছরে বিয়ে হয়েছিল, একুশ বছরে সেই মেয়েটা হয়ে আঁতুড়ে নষ্ট হলো, তার পর তেইশ বছর বয়সে সুধাকে কোলে পেলেম। তেইশ বছর বয়সে আমি দু' সন্তানের বাপ, আর তেইশ বছরে সুধা এখনও আইবুড়া, কি বলবো বলো?"

"সুধার বিয়ের কথা বলবার জন্যে বুঝি অন্দর ছেড়ে সদরে এসে আমাকে পাকড়াও করেছ? তা আমি ত নবাবপুরের জমিদারণী চন্দ্রমুখী মিত্তিরের ছেলেকে কথা দিয়েছি যে, তাঁর সঙ্গেই সুধার বিবাহ হবে, পাত্রী ঠিক করাই আছে, আমি যদি কাল বলি ত কালই বিয়ে হয়—"

বাধা দিয়া হিমাংশু বলিলেন, "পোড়া কপাল অমন পাত্রীর! তার গুণের কথা আমি ঢের শুনেছি, যেমন বওয়াটে, তেমনি নেশাখোর, মদে দিন-রাত মত্ত হয়ে আছে! তার জ্বালায় নবাবপুরের সোমত্ত ছেলেদের গাঁয়ে বাস করা দায় হয়েছে, তার হাতে দেওয়ার চেয়ে ছেলেকে বিষ খাইয়ে মারা ভালো!"

রমা দেবী বলিলেন, "জমিদারের ঘরে ও-রকম একটু-আধটু দোষ কোথায় নেই? ছেলে মানুষ, বয়স হলে কি আর ও-সব দোষ থাকবে?—"

ছেলে মানুষ কাকে বলো? ত্রিশ বছরের ধুমশো মাগী ছেলে মানুষ! না, কচি খুকী! তুমি যাই বলো না কেন, সে বওয়াটে হতভাগীর সঙ্গে কিছুতেই আমি সুধার বিয়ে দেবো না।"

কর্ত্রী ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন, "তবে কোথায় দেবে, শুনি? নবাব-পুরের মিত্তিররা বনেদি ঘর। চন্দ্রমুখী দেবীর বছরে প্রায় আঠারো হাজার টাকা আয়,—ঐ একটি মাত্র মেয়ে"—

বাধা দিয়া হিমাংশু বলিলেন, "ছেলের ভালো-মন্দ, সুখ-শান্তি দেখবে না? খালি টাকা আর জমিদারী দেখবে? আমার মায়েরও ত পনেরো হাজার টাকা আয়ের জমিদারী আছে, সে এর পর সুধাই পাবে, আমার ত আর বোন নেই যে জমিদারী ভাগাভাগি হবে? নবাবপুরের সেই বাঁদরীর গলায় আমি কিছুতেই এই মুক্তোর মালা দিতে দেবো না; তা' বলে রাখছি—"

এমন সময় রমা দেবীর খানসামা গোলাপী আসিয়া বলিল, "বহরমপুরের উকীল সরোজিনী দেবী এসেছেন।"

রমা দেবী বলিলেন, "তাঁকে উপরের বৈঠকখানাতে বসিয়ে তামাক দিগে যা, আমি এখনি যাচ্ছি।" এই কথা বলিয়া তিনি পতিকে বলিলেন, "আমি এখন উপরে চল্লুম, তুমি ভিতরে গিয়ে একটু মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবে দেখগে। একমাত্র ছেলে, তাকে হাভাতে লক্ষ্মীছাড়ার হাতে দিতে পারি না—চারি দিক্ দেখে শুনে তবে"—

বাধা দিয়া হিমাংশু বলিলেন, "চারি দিক্ দেখেছি, শুনেছি, জেনেছি বলেই আমি নবাবপুরের সঙ্গে কিছুতেই কুটুম্বিতা করব না, তা বলে রাখছি।"

২

রমা দেবীর স্বামী হিমাংশু বাবু পত্নীকে যথেষ্ট ভক্তি-শ্রদ্ধা করিলেও নিজের বিবেক-বুদ্ধিকে অন্ধ পত্নী-ভক্তিতে আচ্ছন্ন হইতে দেন নাই, যাহা ভালো ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন, তাহা সম্পন্ন করিতে তিনি পশ্চাৎপদ হইতেন না। তিনিও অশিক্ষিত নন, বি-এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন। তাহার উপর তিনি দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পুত্র নন, তাঁহার মাতাও এক জন সম্ভ্রান্তা ভূম্যধিকারিণী ছিলেন। সেই জন্য স্বামীকে রমা দেবী একটু শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। পুত্র সুধাংশু বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে রমা দেবী পুত্রকে কলিকাতার কোন কলেজে পড়াইবার প্রস্তাব করাতে হিমাংশু বাবু আপত্তি তুলিয়া বলিয়াছিলেন, "বাড়ীর কাছে বহরমপুরে এমন ভালো কলেজ থাকতে ছেলে কলকাতায় পাঠাবার কি দরকার? আমি শুনেছি, মফস্বলের অনেক ছেলে-মেয়ে কলকাতায় পড়তে গিয়ে কুসংসর্গে মিশে নিজেদের নষ্ট করেছে। সুধাংশুর কলকাতায় পড়তে যাওয়া হবে না, ও বহরমপুরেই পড়ুক।"

রমা দেবী ইহাতে আর দ্বিরুক্তি করেন নাই। সুধাংশু বহরমপুর কলেজেই প্রবিষ্ট হইল; কিন্তু বেশী দিন তাহাকে কলেজে পড়িতে হইল না, আই-এ পাশ করিবার পর চোখের অসুখের জন্য তাহাকে চশমা লইতে এবং অবশেষে চিকিৎসকের পরামর্শে লেখা-পড়া বন্ধ করিতে হইল।

সুধাংশু যখন কলেজিয়েট স্কুলে পড়িত, তখন কলেজে এক জন ছাত্রী ছিল—সুলোচনা সরকার। সুলোচনা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের কন্যা। মফস্বলের কোন স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া জলপানি পাইয়া বহরমপুর কলেজে সে পড়িতে আসে। অসামান্য রূপবতী না হইলেও দেখিতে সে মন্দ ছিল না। যেমন বুদ্ধিমতী, তেমনি স্বাস্থ্যবতী, কলেজের কোন ছাত্র-ছাত্রীই শরীর-চর্চায় তাহার সমকক্ষ ছিল না। ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, মুষ্টিযুদ্ধ, লাঠিখেলা প্রভৃতি বীরত্বব্যঞ্জক সকল প্রকার ক্রীড়ায় সে ছিল অদ্বিতীয়। স্কুল বিভাগের ছেলে-মেয়েরা সুলোচনা দিদিকে সকল বিষয়েই আদর্শ মনে করিত। সুলোচনা যদি কোন বালকের সহিত হাসিয়া কথা কহিত, তাহা হইলে সেই বালক আপনাকে ধন্য মনে করিত।

সুধাংশু যে বৎসর স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিল, সুলোচনা সেই বৎসর আই-এস-সি পাশ করিয়া বি-এস সি থার্ড ইয়ার ক্লাসে গেল। সুধাংশু দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিয়া তাহার জননীকে এক দিন বলিল, "মা, আগামী বৎসর আমাব প্রবেশিকা পবীক্ষা, এ দু'টো বৎসর বাড়ীতে এক জন মাষ্টার রাখলে ভালো হয়।"

রমা দেবী বলিলেন, "আমিও সে কথা ভেবেছি। তোমাদের স্কুলেব হেড-মাষ্টারের সঙ্গে পরামর্শ করে তোমার প্রাইভেট টিউটারের ব্যবস্থা করা যাবে।"

স্কুলের হেড-মাষ্টার অর্থাৎ হেড-মিষ্ট্রেস্ কলেজ-বোর্ডিংএর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন, সেই জন্য বোর্ডিংএ যে সকল ছাত্র-ছাত্রী ছিল, তাহাদের সকলকেই জানিতেন। তাঁহাব পরামর্শে রমা দেবী সুলোচনাকে সুধাংশুর প্রাইভেট টিউটর মনোনীত করিলেন। বহরমপুরে রমা দেবীর একটা বাড়ী ছিল, মামলা মোকর্দ্দমার জন্য সর্ব্বদা তাঁহাকে সহরে যাইতে এবং মধ্যে মধ্যে সেখানে বাস করিতে হইত বলিয়া সেখানে বারো মাসই এক জন পাচিকা, ভৃত্য ও দাসী থাকিত। সুধাংশু বহরমপুরের বাড়ীতে থাকিয়া স্কুলে পড়িত, প্রতি শনিবারে সে মধুনগরে যাইত এবং সোমবারে আবার বহরমপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিত। যে সুলোচনাকে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা আদর্শ বলিয়া মনে করিত, সেই সুলোচনা যখন সুধাংশুর প্রাইভেট টিউটর নিযুক্ত হইল, তখন সুধাংশু অত্যন্ত আনন্দিত হইল। সুধাংশুর বয়স তখন চৌদ্দ বৎসর, সুলোচনার বয়স আঠারো।

দু'বৎসর পরে সুধাংশু প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইল, সুলোচনাও বি-এস-সি পাশ করিয়া বৃত্তি পাইল এবং এম-এস-সি পড়িতে কলিকাতায় গেল। বলা বাহুল্য, দু'বৎসরেব ঘনিষ্ঠতায় ছাত্র ও শিক্ষয়িত্রী উভয়ের মনেই পরস্পরের প্রতি অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছিল। বহরমপুর ত্যাগের পূর্ব্বদিন সুলোচনা বিরলে সুধাংশুকে বলিল :—"সুধা, কাল আমি চলে যাচ্ছি। আমি চোখের আড়াল হলে বোধ হয় আমাকে ভুলে যাবে ? জান ত, out of sight, out of mind."

সুধাংশু বলিল, "সে আপনাদের মেয়েমানুষের পক্ষে, আমরা ব্যাটা ছেলে—ও-কথা আমাদের সম্বন্ধে খাটে না। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আপনাকে ভোলবার আগে যেন আমার মৃত্যু হয়।"

"তোমার মা যদি জোর করে তোমার বিবাহ দেন ?"

"বিয়ে দিলেই আমি বিয়ে করছি আর কি !"

"তোমার মা বনিয়াদি জমিদার ছাড়া কারও সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবেন না। তিনি কথায় কথায় আমাকে বলেছিলেন যে, সমান অবস্থার লোক না হলে কুটুম্বিতা করে সুখ হয় না। তোমার অবস্থা আর আমার অবস্থা—দু'য়ে আকাশ-পাতাল তফাৎ। তবে এ কথা আমি তোমাকে বলতে পারি যে, তুমি ছাড়া আর কাউকে আমি বিয়ে করবো না। তোমাকে না পাই, চিরকাল আইবুড়ো থাকব।"

সুধাংশু বলিল, "আমারও সেই কথা। আপনি কলকাতা থেকে আমাকে চিঠি দেবেন ত ?"

"দেব, কিন্তু তোমার মা আপত্তি করবেন না ?"

"মা জানতে পারলে ত ? আমার চিঠি আপনি আমার বন্ধু অমিয়র নামে পাঠাবেন। খামের উপর এক কোণে "S" লিখে অমিয়র নাম-ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবেন।"

"অমিয়র মা কি বাবা যদি জানতে পারেন ?"

"অমিয়র বাবা ইংরেজী জানেন না, মা কলকাতায় চাকরি করেন, মাসে একবার করে বাড়ীতে আসেন। তিনি কি করে জানতে পারবেন ?"

পত্র-ব্যবহার সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা করিয়া সুলোচনা চোখের জল মুছিয়া সুধাংশুকে চোখের জলে ভাসাইয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

৩

সুলোচনা কলিকাতায় গেলে সুধাংশুর মন অত্যন্ত খারাপ হইল। গ্রীষ্মের ছুটীর পর কলেজ খুলিলে সে কলেজে ভর্ত্তি হইল বটে—কিন্তু প্রথম দু'তিন মাস পড়াশুনায় আদৌ মন বসিল না, মন রহিল সুলোচনার কাছে।

পূর্ব্ব-বন্দোবস্ত মত সুলোচনা কলিকাতা হইতে প্রতি সপ্তাহেই অমিয়র নামে সুধাংশুকে পত্র দিতে লাগিল এবং সুধাংশুও নিয়মিতরূপে সে সব পত্রের উত্তর দিত। নূতন বিরহের তীব্রতা কালে কিছু হ্রাস পাইলে সুধাংশু আবার পড়াশুনায় মন দিল এবং যথাসময়ে দ্বিতীয় বিভাগে আই-এ পাশ করিল। ওদিকে সুলোচনাও যথাসময়ে এম-এস-সি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিল।

এম-এস-সি পাশ হইবার কয়েক মাস পরে সুলোচনা সুধাংশুকে জানাইল যে, সে কোন বান্ধবীর সাহায্যে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ইউরোপে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছে। সুলোচনার বান্ধবী তাহাকে এই সর্ত্তে টাকা দিবে যে, সুলোচনা যদি বিদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের উচ্চতর পরীক্ষায় পাশ হয়, তাহা হইলে উপার্জ্জনশীল হইয়া দু'টি শিক্ষার্থীকে সে শিক্ষার্থে বিদেশে পাঠাইয়া দিবে ; কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে, তাহার জন্য যত টাকা ব্যয় হইবে, সে টাকা মায় সুদ পরিশোধ করিতে হইবে। সুলোচনা এই সর্ত্তে সম্মত হইয়া সর্ত্তনামায় স্বাক্ষর করিয়াছে, আর কুড়ি-পঁচিশ দিনের মধ্যেই তাহাকে ইউরোপে যাত্রা করিতে হইবে।

এ পত্র পাইয়া সুধাংশু অত্যন্ত বিমর্ষ হইল। ইউরোপে কত দিন থাকিতে হইবে, কত দিন পরে আবার দেখা হইবে, ইউরোপে অবস্থান কালে হয় ত কোন শ্বেতকায় যুবকের প্রেমে পড়িয়া তাহাকে বিবাহ করিয়া দেশে ফিরিবে, এমনি কত দুশ্চিন্তাই না তাহাকে বিপন্ন করিয়া তুলিল। ফলে তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। স্কুলে পড়িবার সময় তাহার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হওয়াতে চিকিৎসক

তাহাকে চশমা ব্যবহার করিতে বলিয়াছিলেন, সেই সময় হইতে সুধাংশু চশমা ব্যবহার করিত। এখন মানসিক দুশ্চিন্তায় তাহার শিরঃপীড়ার সূত্রপাত হওয়াতে চিকিৎসকের পরামর্শে তাহাকে লেখাপড়া বন্ধ করিতে হইল। শিরঃপীড়ার চিকিৎসার জন্য সুধাংশু জননীর সঙ্গে কলিকাতায় গেল, সেখানে তিন-চার জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বলিলেন, লেখাপড়া বন্ধ করিতেই হইবে, —অন্ততঃ চার-পাঁচ বৎসর কলেজে পড়া স্থগিত রাখিতে হইবে। সুতরাং সুধাংশুর বি-এ পরীক্ষা দেওয়া আর হইল না, উনিশ বৎসর বয়সে তাহাকে সরস্বতীর মন্দির হইতে বিদায় লইতে হইল।

সুধাংশুর কলেজ ছাড়িবার পর আরও চার বৎসর অতীত হইয়াছে। এই চার বৎসরে সুলোচনার নিকট প্রতি মেলেই সে পত্র পাইয়াছে। সুলোচনা কলিকাতায় অবস্থান-কালে যন্ত্র-বিজ্ঞান সম্বন্ধে উচ্চতর বিষয় শিক্ষা করিবার জন্য ফরাসী পড়িতে আরম্ভ করে। দু'বৎসরের চেষ্টায় সে মোটামুটি ফরাসী বলিতে ও বুঝিতে শিখিয়াছিল। ইউরোপে গিয়া সুলোচনা ফ্রান্সে মোটর গাড়ীর ও বিমানপোতের এঞ্জিন নির্ম্মাণ-কৌশল আয়ত্ত করিবার জন্য একটা মোটরের কারখানায় শিক্ষানবীশরূপে প্রবেশ করে। এক বৎসরে মোটর গাড়ীর নির্ম্মাণ-কৌশল শিখিয়া সে প্রায় ছয় মাস জার্ম্মানি, রুশিয়া, ইটালী, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ ঘুরিয়া এরোপ্লেন-নির্ম্মাণ শিক্ষা করিবার জন্য আমেরিকায় যায়।

দু'বৎসর আমেরিকায় থাকিয়া সুলোচনা বিমান-নির্ম্মাণে অনেক নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবন করিল এবং বিমান সম্বন্ধে এক জন বিশেষজ্ঞ বলিয়া পাশ্চাত্য দেশে তাহার খ্যাতি রটিল। আমেরিকায় তৃতীয় বৎসরের শেষে সুধাংশুকে সে পত্রে লিখিয়া জানাইল যে, সে এক প্রকার এরোপ্লেন নির্ম্মাণ করিয়াছে, সে এরোপ্লেন খুব ছোট ও হাল্কা। তার বিশেষত্ব এই যে, ঠিক সোজা ভাবে উপরে উঠিতে ও নীচে নামিতে পারে। সে প্লেন যেমন আকাশপথে ছুটিতে পারে, তেমনি আবার মাটিতেও মোটর গাড়ীর মত ছুটিতে পারে এবং মাটিতে ছুটিবার সময় যে-কোন মুহূর্ত্তে তাহাকে আকাশে চালনা করা যায়। আমেরিকার খুব বড় এক মোটর কোম্পানি ঐ বিমানের একমাত্র নির্ম্মাতা হইবার জন্য সুলোচনাকে এক লক্ষ ডলার বা প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা দিবার প্রস্তাব করিয়াছে, কিন্তু সুলোচনা এখনও তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত হয় নাই।

এ সংবাদে সুধাংশুর যেমন আনন্দ হইল, তেমনি ভাবনাও হইল। আনন্দের কারণ, তাহার সুলোচনাদি'র বিদেশে এই অসামান্য সাফল্য ও সৌভাগ্যের সূত্রপাত! আর ভাবনার কারণ, প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যে তাহাকে কাঁদাইয়া ইউরোপে গিয়াছে, সে কি করিয়া আসিয়া সুধাংশুকে অর্দ্ধাঙ্গরূপে গ্রহণ করিবে? প্রবাসযাত্রার পূর্ব্বে সুধাংশুকে সে যে-দৃষ্টিতে দেখিত, এত দিন পরে দেশে ফিরিয়া কি আর ঠিক সেই দৃষ্টিতে দেখিবে? সে যে দেশে ফিরিবে, তাহারই বা ঠিক কি?

যে পত্রে সুধাংশুকে সুলোচনা নূতন প্রকার বিমানের সংবাদ দিয়াছিল, তাহার পরবর্ত্তী পত্রে সুধাংশুর দুশ্চিন্তার কতকটা নিরসন করিল। শেষ পত্রে সুলোচনা লিখিল, দু'তিন মাসের মধ্যেই সে দেশে ফিরিবে, কারণ, সে ভারত গভর্ণমেণ্টের বিমান-নির্ম্মাণ বিভাগে বেশ উচ্চ বেতনে চাকরি পাইয়াছে। যে মার্কিন কোম্পানি তাহাকে এক লক্ষ ডলার দিয়া তাহার নবোদ্ভাবিত বিমানের একমাত্র নির্ম্মাতা হইতে চাহিয়াছিল, সেই কোম্পানি অবশেষে নগদ দেড় লক্ষ ডলার এবং প্রত্যেক বিমানের জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট কমিশন দিতে সম্মত হইয়াছে। এই ব্যাপারের শেষ নিষ্পত্তি হইলেই সুলোচনা ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক নূতন কার্য্যে যোগদান করিবে।

ইহার দু'মাস পরে সুধাংশু দিল্লী হইতে সুলোচনার এক পত্র পাইল। সুলোচনা লিখিয়াছে—"* * * আমি দিল্লীতে আসিয়া নূতন কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছি। দিল্লীতেই আমাকে বছরে সাত-আট মাস থাকিতে হইবে। এখানে বেশ সুন্দর কোয়ার্টার্স পাইয়াছি। * * * তোমার পত্রে জানিলাম যে, তোমার মা নবাবপুরের চন্দ্রমুখী মিত্রের মেয়ে অপর্ণার সঙ্গে তোমার বিবাহের সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। অপর্ণাকে আমি জানি, তাহার অনেক গুণের কথা আমি শুনিয়াছি। তোমার বাবার এ বিবাহে মত নাই; লিখিয়াছ। তাঁহার মত না থাকিবারই কথা; তুমি এক কাজ করিতে পারিবে? তোমার মাকে কোনরূপে জানাইয়া দিও যে, অপর্ণাকে বিবাহ করিতে তোমার আপত্তি নাই। তোমার মঙ্গলের জন্যই তোমাকে এ কার্য্য করিতে বলিতেছি। তুমি আমার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাক। অপর্ণার সঙ্গে বিবাহের কথা হইলে কোন্ তারিখে এবং কোন্ লগ্নে বিবাহ হইবে, তাহা আমাকে জানাইতে অন্যথা করিও না। কেন এ অনুরোধ করিতেছি, পরে জানিতে পারিবে। জননীর অবাধ্য হইয়া এ বিবাহে আপত্তি করিও না। ইহাই আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ।"

এ পত্র পড়িয়া সুধাংশু হতবুদ্ধি হইয়া গেল। সুলোচনাদি'র এ কি অদ্ভুত অনুরোধ! সে কিছু স্থির করিতে না পারিয়া বন্ধু অমিয়ের শরণাপন্ন হইল। অমিয়ও সুলোচনার পত্রের উদ্দেশ্য আবিষ্কার করিতে না পারিয়া বলিল, "আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না ভাই। যা হোক, তিনি যখন তাঁর উপর নির্ভর করে তোমাকে নিশ্চিন্ত হতে বলেছেন, তখন তুমি তাই করো। আমার মনে হয়, যেমন করেই হোক, তিনি শেষ রক্ষা করবেন।"

অগত্যা সুধাংশু সুলোচনার অনুরোধ পালন করিবার সঙ্কল্প করিল।

৪

নবাবপুরের জমিদারণী চন্দ্রমুখী মিত্রের একমাত্র কন্যা অপর্ণার গুণের পরিচয় হিমাংশু বাবুর মুখে যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা তাহার প্রকৃত গুণের শত ভাগের এক ভাগও নয়। চন্দ্রমুখী কন্যাকে 'মানুষ' করিয়া তুলিবার জন্য যথোচিত চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। অপর্ণার লেখাপড়া প্রবেশিকা পর্য্যন্ত, দু'বার প্রবেশিকা পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া সে স্কুল ছাড়িয়া দিয়াছে। জননী অনেক ভর্ৎসনা করিয়াও কন্যাকে স্কুলে পাঠাইতে পারিলেন না। তখন তিনি হতাশ হইয়া অপর্ণাকে জমিদারীর কাজকর্ম্ম শিক্ষা দিবার সঙ্কল্প করিলেন, কিন্তু তাহাতেও তাঁহাকে ব্যর্থমনোরথ হইতে হইল। মাতার আদেশে অপর্ণা

দু'-চার দিন কাছারীতে গিয়া বসিল, কিন্তু কাজ-কর্মে তাহার মনোযোগ ছিল না—তাহার আকর্ষণ ছিল অন্য দিকে। প্রজাদের মধ্যে কাহার সুশ্রী যুবা পুত্র আছে, গোমস্তাদের দ্বারা সে সন্ধান লইতে আরম্ভ করিল। তখন তাহার বয়স কুড়ি-একুশ বৎসর। স্বভাব-চরিত্র মন্দ হইতে দেখিয়া মা তাহার হাত-খরচ বন্ধ করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন, অপর্ণাও হ্যাণ্ডনোটে টাকা ধার করিতে আরম্ভ করিল।

অপর্ণার বয়স যখন ছাব্বিশ বৎসর, তখন চন্দ্রমুখী পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী হইলেন। চিকিৎসার ত্রুটি হইল না, কিন্তু চিকিৎসায় কোন উপকার হইল না, প্রায় এক বৎসর শয্যাগত থাকিয়া তিনি লোকান্তর প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার অন্তরঙ্গ বান্ধবীরা বলেন, কন্যার দুর্ব্ব্যবহার-জনিত মনঃপীড়াই তাঁহার মৃত্যুর কারণ।

জননীর মৃত্যুতে অপর্ণা স্বাধীন হইল। অন্তঃপুরে অপর্ণার পিতা ছিলেন, কিন্তু অপর্ণা তাঁহাকে গ্রাহ্য করিত না। চন্দ্রমুখীর আত্মীয়-স্বজন বলাবলি করিতেন, পিতার অতিরিক্ত আদর ও প্রশ্রয়ই অপর্ণার অধঃপাতের কারণ।

মাতার মৃত্যুতে অপর্ণা জমিদারীর কর্ত্রী হইয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করিতে লাগিল। পিতা মধ্যে মধ্যে সদুপদেশ দিতেন বলিয়া অপর্ণার যত আক্রোশ গিয়া পড়িল পিতার উপর। বিনা কারণে বা অতি সামান্য কারণে পিতাকে যৎপরোনাস্তি অপমান লাঞ্ছনা করিতে লাগিল। অবশেষে কন্যার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া পত্নীবিয়োগ-বিধুর মিত্রকর্ত্তা কাশীবাসী হইলেন, অপর্ণাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

জননীর মৃত্যুর পর, এক বৎসর অতীত হইতে না হইতেই অপর্ণার জমিদারীর একটার পর একটা মহল বাঁধা পড়িতে লাগিল। এ সময় বান্ধবীরা তাহাকে পরামর্শ দিল, "যদি মধুনগরের রমা বসুর ছেলেকে বিবাহ করতে পারো, তাহলে সোনায় সোহাগা হয়। রমা বসুর ঐ একমাত্র ছেলে, তাঁর প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা আয়ের জমিদারী, তার উপর সে ছেলের পৈতৃক জমিদারীর আয়ও পনেরো হাজার টাকার উপর। যদি রমা বসুর ছেলেকে বিয়ে করতে পারো, তাহলে আর তোমাকে পায় কে? আর সে ছেলে রূপে একেবারে কার্ত্তিক!"

বান্ধবীদের কথায় অপর্ণারও ঝোঁক হইল—রমা বসুর ছেলেকে বিবাহ করিতেই হইবে। পরদিনই মধুনগরে বিবাহের প্রস্তাব লইয়া এক জন লোক গেল। দু'দিন পরে সে লোক আসিয়া সংবাদ দিল, অপর্ণার হাতে পুত্র সম্প্রদান করিতে রমা বসুর আপত্তি নাই, তবে তাঁহার পুত্রের শরীর এখন ভালো নয়, পুত্রের শরীর একটু সারিলে এ বিষয়ে তিনি বিবেচনা করিবেন।

ইহার পর সুধাংশুর স্বাস্থ্যের সংবাদ লইবার জন্য অপর্ণা আরও দু'-তিন বার লোক পাঠাইয়াছিল। অপর্ণার এই আগ্রহ দেখিয়াই রমা বসু হিমাংশু বাবুকে বলিয়াছিলেন, "পাত্রী ঠিক করাই আছে, আমি যদি কাল বলি ত কালই সুধার বিয়ে হয়।"

অপর্ণার সহিত পুত্রের বিবাহ দিতে হিমাংশু বাবুর ঘোর আপত্তি থাকিলেও তাঁহার পত্নী অপর্ণাকেই পুত্রবধূ করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। বলা বাহুল্য, এ বিবাহে সুধাংশুর আদৌ মত ছিল না। বন্ধু অমিয়র দ্বারা সে তাহার অভিমত পিতাকে জানাইয়াছিল। উত্তরে হিমাংশু বাবু বলিলেন, "আমারও ত মত নাই, কিন্তু উনি যে যুক্তি-তর্ক কিছুই শুনবেন না। তাঁর এক কথা—'যখন কথা দিয়েছি, তখন কিছুতেই তার অন্যথা হবে না'।"

ইহার পর সুলোচনার পত্র পাইয়া সুধাংশুর মতের পরিবর্ত্তন হইল, সে সুলোচনার উপর একান্ত নির্ভর করিয়া অপর্ণার সহিত বিবাহে আর আপত্তি করিল না। অমিয় হিমাংশু বাবুকে বলিল, "কাকাবাবু, আপনি অপর্ণার সঙ্গে সুধার বিবাহে আর আপত্তি করবেন না। সুধার ইচ্ছা নয় যে, তার বিবাহের কথা নিয়ে কাকীমার সঙ্গে আপনার কলহ-বিবাদ হয়। আপনি কাকীমাকে বলুন, অপর্ণা দেবীর সঙ্গে বিবাহে সুধার কোন আপত্তি নেই।"

অমিয়র কথা শুনিয়া হিমাংশু বাবু যার পর নাই বিস্মিত হইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন না, পুত্রের সহসা এ মত-পরিবর্ত্তনের কারণ কি? তিনি পত্নীকে এই সংবাদ প্রদান করিলে কর্ত্রী বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং পুরোহিত ঠাকুরাণীকে ডাকাইয়া বিবাহের জন্য দিন স্থির করিতে বলিলেন। পুরোহিত ঠাকুরাণী পঞ্জিকা দেখিয়া বলিলেন, "আগামী ১১শে ফাল্গুন রবিবার বেশ ভালো দিন আছে, রাত্রি ১১টা ২৩ মিনিটের পর ১টা ৩২ মিনিটের মধ্যে। আর একটা লগ্ন আছে, রাত্রি ৩টা ৪০ মিনিট হইতে ৫টা ১৭ মিনিটের মধ্যে।"

রমা দেবী বলিলেন, "ঐ ১১শেই হবে। এখন থেকে আয়োজন করা যাক্।"

বলা নিষ্প্রয়োজন, সুলোচনাকে বিবাহের তারিখ ও সময় অবিলম্বে জানানো হইল।

৫

আজ ১১শে ফাল্গুন, রবিবার সুধাংশুর বিবাহ। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, মধুনগরের জমিদার-বাড়ী লোকে লোকারণ্য। বরাসনে অপর্ণা মিত্র বারাণসী শাড়ী পরিয়া বান্ধবী-পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছে। তাহার সহিত প্রায় দেড় শত কন্যাযাত্রিনী আসিয়াছে। কন্যাযাত্রিনীদিগের মধ্যে অধিকাংশই যুবতী—প্রবীণা মহিলা নাই বলিলেই হয়! অপর্ণার যে সব বান্ধবী আসিয়াছে, তাহাদের অনেকের মুখেই তীব্র সুরার গন্ধ!

রাত্রি ১১টার পর বিবাহের লগ্ন, তাহার পূর্ব্বেই সমস্ত মহিলা ও পুরুষদিগকে খাওয়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। নিমন্ত্রিতের সংখ্যা প্রায় দু'হাজার হইবে। বহির্ব্বাটীতে মহিলাদের ও অন্তঃপুরে পুরুষদের খাওয়ানো হইতেছে। সকলেই মহাব্যস্ত, সকলেই ডাকাডাকি হাঁকা-হাঁকি করিতেছে।

রাত্রি ১১টার মধ্যে নিমন্ত্রিতা ও নিমন্ত্রিতদের অধিকাংশেরই খাওয়া শেষ হইয়াছে, এখনও ভিতরে বাহিরে প্রায় তিন শত লোক ভোজন করিতেছে। সেই সময় একটি হৃষ্ট-পুষ্ট যুবতী একখানা লাল শাল গায়ে দিয়া অন্তঃপুরের প্রবেশ-পথে দু'-চার পা অগ্রসর হইয়া এক জন ভৃত্যকে বলিল, "তুমি অমিয় বাবুকে একবার ডেকে দিতে পারো? তাঁর সঙ্গে একটা জরুরি কথা আছে।"

ভৃত্য বলিল, কোন্ অমিয় বাবু? অমিয় দত্ত, না অমিয় ঘোষাল?

"অমিয় ঘোষাল।"

"আচ্ছা, তুমি এখানে একটু দাঁড়াও, আমি ডেকে দিচ্ছি?" এই বলিয়া সে ভিতরে চলিয়া গেল। প্রায় পাঁচ মিনিট পরে, গেঞ্জি-গায়ে, কোমরে গামছা-বাঁধা অমিয় বাবু আসিয়া উপস্থিত হইল। অপরিচিত যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি আমাকে ডাকছিলেন?"

"আপনি সুধাংশু বাবুর বন্ধু অমিয় বাবু ?"

"হাঁ, আপনার নাম ?"

যুবতী বলিল, "আমার নাম সুলোচনা সরকার। আমি এখনই একবার সুধার সঙ্গে দেখা করতে চাই, আর আধ ঘণ্টা পরেই বিবাহের লগ্ন।"

সুলোচনার নাম শুনিবামাত্র অমিয় সসম্ভ্রমে নমস্কার করিয়া বলিল, "আপনিই সুলোচনা দেবী ? আজ আমার সুপ্রভাত ! আমি এখনই সুধাকে নিয়ে আসছি; আপনি একটু অপেক্ষা করুন।" এই বলিয়া অমিয় বাটীর ভিতর চলিয়া গেল এবং দু'-তিন মিনিটের মধ্যে সুধাংশুকে লইয়া ফিরিয়া আসিল। সুধাংশু সুলোচনাকে দেখিবা-মাত্র তাহাকে জড়াইয়া ধরিল এবং "দিদি, আমাকে রক্ষা করুন" বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

সুলোচনা বলিল, "তোমাকে রক্ষা করবো বলেই এসেছি। তুমি এই মুহূর্ত্তে আমার সঙ্গে মধুনগর ছেড়ে যেতে পারবে ?"

"ও কথা আবার জিজ্ঞাসা করছেন ? চলুন, কোথায় নিয়ে যাবেন।"

সুলোচনা বলিল, "চলো, তোমার কনের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আসি।"

বলিয়া সুধাংশুর হাত ধরিয়া গম্ভীর পদবিক্ষেপে বরাসনের নিকটে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে সুলোচনা বলিল, "অপর্ণা দেবি, আমি আপনার বর সুধাংশু বাবুকে নিয়ে একটু বেড়াতে যাচ্ছি ?"—বলিতে বলিতে সে সভামণ্ডপ ত্যাগ করিয়া পথে বাহির হইয়া গেল।

সুলোচনার কথা শুনিয়া অপর্ণা ও তাহার বান্ধবীরা বিস্ময়ে দু'-তিন মিনিট কাল নির্ব্বাক্, হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। তাহার পর "ধরো—ধরো" "পাকড়ো—পাকড়ো" বলিতে বলিতে পথের দিকে ধাবমান হইল। রমা দেবী গোলমাল শুনিয়া দ্রুতপদে সেইখানে আসিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "ব্যাপার কি ? কি হয়েছে ?"

অপর্ণা বলিল, "কে একটা মাগী এসে বরকে ধরে নিয়ে গেল।"

"সুধাকে ধরে নিয়ে গেল ? কে ?"

অপর্ণা কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার মুখে কথা বাহির হইবার পূর্ব্বেই বহরমপুরের পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট প্রভা মুখার্জ্জি দৃঢ়মুষ্টিতে অপর্ণার হাত ধরিয়া বলিলেন, "অপর্ণা মিত্র, কলকাতা থেকে আপনার নামে গ্রেপ্তারি ওয়ারেণ্ট এসেছে। সেই ওয়ারেণ্টের বলে আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করছি।"

প্রভা মুখার্জ্জির কথা শুনিয়া রমা দেবী বিস্ময়-বিভ্রান্ত চিত্তে বলিয়া উঠিলেন, "গ্রেপ্তার ? অপর্ণাকে ? অপর্ণার অপরাধ ?"

"অপর্ণা দেবীর বিরুদ্ধে অভিযোগ—জাল চেকে ব্যাঙ্ককে ঠকিয়ে তেইশ হাজার টাকা আত্মসাৎ !"

যে সকল স্ত্রীলোক সুলোচনাকে ধরিবার জন্য "ধরো—ধরো" বলিতে বলিতে পথে দৌড়িয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একটি যুবতী এই সময়ে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া রমা দেবীকে বলিল, "কাকীমা, সেই মেয়েছেলেটা সুধা দাদাকে নিয়ে পথে একখানা মোটর গাড়ীতে চড়ে পালাচ্ছিল, আমরাও আপনার মোটর নিয়ে তাকে ধ'রতে যাচ্ছিলাম। খানিক দূর গিয়ে তাদের মোটর হঠাৎ পাখীর ডানার মত দু'খানা ডানা ছড়িয়ে আকাশে উঠে গেল। দেখে আমরা অবাক্ ! যেন ভৌতিক কাণ্ড !"

প্রভা মুখার্জ্জি এক জন কনষ্টেবলকে ডাকিয়া বলিলেন, "প্রেমকুমারী, আসামীকো হাতকড়া লাগায়কে গাড়ি পর উঠাও। রমা দেবি, যে গুণবতীর হাতে আপনার পুত্রকে সম্প্রদান করতে যাচ্ছিলেন, তার চেয়ে একটা প্রেতিনীর হাতে পড়াও ঢের ভালো। আমি এখন চল্লেম। গুড নাইট্।"—এই কথা বলিয়া তিনি রমা দেবীর করমর্দ্দন পূর্ব্বক অপর্ণাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

* * * *

২২শে ফাল্গুন বুধবার, রমা দেবী মেদিনীপুর হইতে একখানা পত্র পাইলেন। পত্রে লেখা ছিল :—

"মা, আমি আপনার অপরিচিতা নই, সুধা যখন বহরমপুরে পড়িত, তখন দু'বৎসর আমি তাহার প্রাইভেট টিউটার ছিলাম। সে সময়ে আমাদের মধ্যে ভালোবাসার সঞ্চার হয়। তাহার পর সুধার সহিত আমার নিয়মিত পত্র-ব্যবহার হইত। আমি সুধার পত্রে জানিতে পারি যে, আপনি জমিদারণী ব্যতীত অন্য কাহারও সহিত সুধার বিবাহ দিবেন না।

কলিকাতা হইতে এম-এস্-সি পাশ করিয়া আমি প্রথমে ফ্রান্সে ও পরে ইউরোপের নানা দেশ ঘুরিয়া আমেরিকাতে বিমান-নির্ম্মাণ শিখিতে যাই। সেখানে আমি এক নূতন ধরণের বিমান-নির্ম্মাণ করিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করি। সেখানকার এক মার্কিন কোম্পানি আমাকে নগদ দেড় লক্ষ ডলার দিয়া আমার বিমান-নির্ম্মাণ ও বিক্রয়ের এজেণ্ট হইয়াছে। তাহাদের নিকট হইতেও আমি বাৎসরিক সত্তর-আশী হাজার ডলার কমিশন পাই।

জমিদার ব্যতীত আপনি অন্য কাহাকেও পুত্রবধূ করিবেন না জানিয়া আমি কলিকাতায় আমার বান্ধবী হেমাঙ্গিনী রায় এটর্ণীকে আমার জন্য একটা জমিদারী কিনিতে অনুরোধ করি। বিধাতার ইচ্ছায় তিনি আমার জন্য নবাবপুরের চন্দ্রমুখী মিত্রের কন্যা অপর্ণার জমিদারী এক লক্ষ সত্তর হাজার টাকায় কিনিয়াছেন, সুতরাং আমিই এখন নবাবপুরের জমিদারণী।

সুধাকে লইয়া আমি আমার বিমানযোগে রাত্রি ১২টার সময় মেদিনীপুরে আমার এক আত্মীয়ার বাটীতে আসি এবং সেই লগ্নেই সুধাকে যথাশাস্ত্র বিবাহ করি। আমার আত্মীয়া আমার কথামত বিবাহের আয়োজন করিয়া আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। নির্ব্বিঘ্নে শুভকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

আপনি অপর্ণা মিত্রের সহিত সুধার বিবাহ স্থির করিতেছিলেন, সুধার পত্রে এই সংবাদ পাইয়া আমি অপর্ণার স্বভাব-চরিত্রের সম্বন্ধে গোপনে অনুসন্ধান করি ; ফলে জানিতে পারি যে, প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব্বে বর্দ্ধমানের এক ভদ্রলোকের কুড়ি বৎসর বয়স্ক একটি নাবালক ছেলেকে বাহির করিয়া লইয়া যায়, পরে ধরা পড়িয়া ছ'মাস জেল খাটে ; আজ খবরের কাগজে দেখিলাম, একটা চেক জাল করিবার অভিযোগে পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

মা, আপনাকে সব কথা জানাইলাম। আশা করি, এখন আমাকে পুত্রবধূর প্রাপ্য স্নেহদানে কুণ্ঠিতা হইবেন না। আপনি ও বাবা আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন, নিবেদন ইতি।

কৃপা-প্রার্থিনী—সুলোচনা সরকার।"

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

এই পৃথিবী

[উপন্যাস]

৪

ইস্কুলে সেদিন হেডপণ্ডিত মশায় আসেন নাই। সেকণ্ড আওয়ারে পণ্ডিত মশায়ের ফার্ষ্ট ক্লাশ লইবার কথা। ছেলেরা জানে, পণ্ডিত মশায় আসেন নাই! একদল ছেলে ছিল ক্লাশে—বাপের বড় চাকরি এবং পয়সার জোরে বেপরোয়া···কাহাকেও তারা গ্রাহ্য করে না। সে দলের চার-পাঁচ জন ছেলে তুমুল কলরব তুলিয়া বায়না ধরিল—মাছ ধরতে যাই, চলো। স্কুলের কাছে যদু দাসের পুকুরে অনেক মাছ···

এ ক্লাশে নীলু পড়ে। ক্লাশের সে ফার্ষ্ট বয়। তাকেও তারা ছাড়িল না। নীলু বলিল—না, আমি যাবো না।

তার উপর টিটকারী চলিতেছে, এমন সময় সেকণ্ড পণ্ডিত মহাশয় আসিয়া ফার্ষ্ট ক্লাশে ঢুকিলেন।

কামাখ্যার মেজো ছেলে দেবকী এ ক্লাশের চাঁই। বাপ কামাখ্যা চাটুয্যে এ তল্লাটে সর্ব্বময় কর্ত্তা, কাজেই দেবকীর দাপট খুব বেশী। শুধু যে সৌখীন, তা নয়! নানা উপঢৌকন দিয়া, বাপের গাড়ীতে চড়াইয়া বেচারী-ছেলেদের সে তার বশীভূত করিয়াছে।

সেকণ্ড পণ্ডিত মশায়কে দেখিয়া দেবকী কোঁশ করিয়া উঠিল। পণ্ডিত মশায়ের মুখের উপরে বলিয়া বসিল—আমরা ঠিক করেছি, এ আওয়ারে মাছ ধরতে যাবো···আর আপনি এসে ক্লাশে ঢুকলেন শনি-ঠাকুরের মতো!···

সেকণ্ড পণ্ডিত মশায় দেবকীকে ভালো করিয়াই জানেন। নীচে-কার ক্লাশে একবার তাকে শাসন করিবার ফলে স্কুল হইতে বাড়ী ফিরিবার সময় পিছন হইতে মাথার উপর গোময়-বৃষ্টি হইয়াছিল। স্কুলের হেড-মাষ্টার ছিলেন তখন সাত্যকি ত্রিবেদী। ত্রিবেদীর কাছে গিয়া নালিশ করিলে তিনি পণ্ডিত মশায়কে চুপি চুপি উপদেশ দিয়াছিলেন, ওটি হলো কামাখ্যা বাবুর ছেলে। ও ছেলের সঙ্গে লড়াই করিতে গেলে এ স্কুলে চাকরি রাখা কঠিন হইবে! সেকণ্ড পণ্ডিত মশায় এ কথায় চমকিয়া সে-অপমান নিঃশব্দে সহিয়াছিলেন। চাকরিও বুঝি তাই আজো বজায় রহিয়াছে!

সেই দেবকী! ক'বছরে তার মুখ-চোখ আরো খুলিয়াছে!

সে বলিল—এ আওয়ারে ক্লাশ বসবে না পণ্ডিত মশায়, আপনি ···

সেকণ্ড পণ্ডিত মশায় বলিলেন—কিন্তু হেড-মাষ্টার মশায় আমাকে পাঠিয়েছেন এ ক্লাশ নিতে। বেশ, পড়াবো না। আমি essay লিখতে দেবো'খন। যা পারো, লিখো!

—না, না, না···দেবকী একেবারে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। এবং একদল ছেলেকে হিঁচড়াইয়া ক্লাশ হইতে টানিয়া সে বাহির হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে দারুণ হট্টগোল···অপর ক্লাশে টীচার এবং ছাত্রের দল স্তম্ভিত!···স্কুলে ডাকাত পড়িল, না, কি?

ফার্ষ্ট ক্লাশে রহিল শুধু নীলু।

হেড-মাষ্টার আসিলেন। বলিলেন—ব্যাপার কি?

সেকণ্ড পণ্ডিত মশায়ের দু'চোখ ভয়ে বাষ্পাকুল···কোনো মতে তিনি ব্যাপার খুলিয়া বলিলেন।

হেড-মাষ্টার গম্ভীর হইয়া রহিলেন, তার পর বলিলেন—এ ভালো কথা নয়! Such lack of discipline···তার পর সেকণ্ড পণ্ডিত মশায়ের পানে চাহিয়া তিনি মন্তব্য করিলেন,—আপনি ক্লাশ ম্যানেজ করতে পারেন না···এ ব্যাপার কমিটি শুনলে আপনি কি-জবাব দেবেন?

সেকণ্ড পণ্ডিত মশায় বলিলেন—আমি শিকল বেঁধে ওদের আটকে রাখবো, এমন সাধ্য আমার···

—হুঁ! বলিয়া হেড-মাষ্টার বলিলেন—এ ব্যাপার রিপোর্ট করতে হবে আমাকে। যে সব ছেলে ক্লাশ ছেড়ে চলে গেছে, তাদের জরিমানা করা দরকার। না হলে এ ব্যাপার যদি সেনেটে রিপোর্ট হয়, ভাবনার বিষয়!

গম্ভীর মূর্ত্তিতে হেড-মাষ্টার চলিয়া গেলেন···সেকণ্ড পণ্ডিত মশায়ের মুখ বিবর্ণ!

পাঁচ মিনিট···দশ মিনিট···পনেরো মিনিট কাটিয়া গেল। অন্য-সব ক্লাশে আবার পড়ার মিশ্র গুঞ্জন-রব উঠিল। সে-রবে সারা স্কুল গম্-গম্ করিতেছে।

পণ্ডিত মশায় ডাকিলেন—নীলায়ু···

নীলুর ভালো নাম নীলায়ু।

পণ্ডিত মশায়ের আহ্বানে নীলু চাহিল পণ্ডিত মশায়ের পানে।

পণ্ডিত মশায় বলিলেন—তুমি তো দেখলে বাবা, ছেলেদের কাণ্ড··· বিশেষ ঐ দেবকীকুমার।

নীলু কোনো কথা কহিল না।

পণ্ডিত মশায় বলিলেন—আমি কি করে ম্যানেজ করবো, বলো? ড্যাঙ্গাড়িয়ে বেরিয়ে গেল! হেড-মাষ্টার মশায় যদি রিপোর্ট করেন? জানো তো বাবা, স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যদু বাবু ঐ দেবকীর বাবার পিছনে ঘোরেন ছায়ার মতো! হয়তো আমার চাকরি নিয়ে টান পড়বে! এ বয়সে চাকরি গেলে···

পণ্ডিত মশায়ের চোখের সামনে জাগিল সংসারের ছবি! দু'টি বিধবা বোন···তাদের চারটি ছেলেমেয়ে···নিজের চারটি! তাঁর দুই চোখ বাষ্পভারে আচ্ছন্ন হইল···সে বাষ্পভার কণ্ঠে জমিয়া তাঁর কণ্ঠরোধ করিয়া দিল···পণ্ডিত মশায়ের কথা শেষ হইল না।

নীলুর মন দুলিল। গরীব···তাই গরীবের দুঃখ সে বুঝিতে পারে।

পণ্ডিত মশায়ের দুঃখ সে বুঝিল। বলিল—এত অবিচার তা বলে হতে পারে না, পণ্ডিত মশায়। হেড-মাষ্টার মশায় যদি রিপোর্ট করেন, আপনি সব কথা খুলে বলবেন। তাছাড়া হেড-মাষ্টার মশায় পণ্ডিত লোক···উনি এ বিষয়ে প্রশ্রয় দেবেন কেন? স্কুলের ডিসিপ্লিন্ উনি দেখবেন না?

নিশ্বাস ফেলিয়া পণ্ডিত মশায় বলিলেন—প্রাইভেট স্কুলে মাষ্টারী করতে এলে বিদ্যা-বুদ্ধি সব শিকেয় তুলে রাখতে হয়, বাবা! এ স্কুলে তোমার বাবা হেড-মাষ্টার! আজ তিনি বেঁচে থাকলে এতটুকু অবিচারের ভয় করতুম না আমি!

স্বর্গীয় পিতার উপর এতখানি বিশ্বাস শ্রদ্ধা···নীলুর চোখে জল আসিল। সে বলিল—ভয় করবেন না, পণ্ডিত মশায়··· আমার বাবা বলতেন, সত্য আর ন্যায়কে অবলম্বন করলে কোনো দিন দুঃখ পেতে হয় না!

পণ্ডিত মশায় নিশ্বাস ফেলিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন···

নীলু লক্ষ্য করিল, আতঙ্কে পণ্ডিত মশায়ের মন একেবারে ভরিয়া রহিয়াছে। তাঁর মনকে কতকটা হাল্‌কা করিয়া দিতে পারে যদি, ভাবিয়া নীলু বলিল—আমার এই সংস্কৃত-ট্রান্‌স্লেসনগুলো যদি দেখে দেন পণ্ডিত মশায়, ঠিক হয়েছে কি-না! হেড-পণ্ডিত মশায় আজকের জন্য টাস্ক দিয়েছিলেন!

বলিয়া জোর করিয়া সেকণ্ড পণ্ডিত মশায়ের মনে নীলু হোম্-টাস্কের খাতাখানা গুঁজিয়া দিল!

ওদিকে কারখানায় টিফিনের ছুটী হইয়াছে। কারখানা ছাড়িয়া কেহ গিয়াছে খাইতে, কেহ বা গাছতলার সভায় জুটিয়া জটলা করিতেছে। এ দুই দলের কোনো দলের সঙ্গে দিলুর সংযোগ নাই! এ সময়টায় বই লইয়া সে একান্তে গিয়া বসে। ইণ্টার-মিডিয়েটের বই। মনে বাসনা আছে, কাজ করিতে করিতে যদি পারে নন-কলেজিয়েট হইয়া কোনো মতে ইউনিভার্সিটির এগজামিন দিয়া পাশ করিতে···

একান্তে বসিয়া সে পড়িতেছিল মিল্টনের প্যারাডাইস লষ্ট। হঠাৎ শুনিল জানকী বাবুর কণ্ঠস্বর—মুরারি···মুরারি···

মুরারি অফিসে জানকী বাবুর খাশ-খানসামা। বই হইতে মুখ তুলিয়া দিলু উৎকর্ণ হইয়া রহিল! মুরারির সাড়া না পাইয়া জানকী বাবু এবারে ডাকিলেন—সুরেশ···সুরেশ···

সুরেশ তাঁর অফিসের তরুণ কেরাণী।

দিলু উঠিল···উঠিয়া জানকী বাবুর সামনে গিয়া দাঁড়াইল! বলিল,—মুরারিকে ডেকে দেবো?

জানকী বাবু বলিলেন—হাঁ···ভাখো তো···মুরারি, না হয় সুরেশ···দু'জনের এক জনকে আমার চাই। খুব দরকার।

দিলু ছুটিল মুরারি আর সুরেশের সন্ধানে। প্রায় পনেরো মিনিট কারখানা আর অফিসের সর্ব্বত্র সন্ধান করিল—কোথাও তাদের দেখা পাইল না!

ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, দেখা পাইল না।

জানকী বাবুর ললাট কুঞ্চিত হইল। তিনি বলিলেন—টিফিনের ছুটী···ভাবলো, এ সময়ে পাছে কিছু করতে হয়, তাই এমন ছুট দেছে যে কেউ না নাগাল পায়!

অপ্রসন্নতার কালো ছায়া জানকী বাবুর মুখে···

দিলু সে ছায়া লক্ষ্য করিল। বলিল—আমাকে দিয়ে সে কাজ হবে···যে জন্য ওদের খুঁজছিলেন?

জানকী বাবু বলিলেন—একখানা চিঠি ছিল। জরুরি। এখানা এখনি পোষ্ট-অফিসে গিয়ে দিয়ে আসতে হবে···পোষ্ট-অফিসের লেটার-বক্সে। না হলে···

দিলু বলিল—আমি দিয়ে আসবো?

জানকী বাবু বলিলেন—যাবে?···তোমার আবার কারখানার হাজ্‌রে কটায়?

দিলু বলিল—দু'টোয়।

—দু'টো! এখন একটা-পঁয়ত্রিশ···বেশ, তা হলে যাও।

জানকী বাবু চিঠি দিলেন দিলুর হাতে। চিঠি লইয়া দিলু ছুটিল পোষ্ট-অফিসের দিকে।

পোষ্ট-অফিসের পথ স্কুলের সামনে দিয়া। স্কুলের কাছাকাছি আসিয়াছে, দেখে, একটি ছেলের ঘাড়ে পড়িয়াছে চার-পাঁচ জন ছেলে···পড়িয়া তার উপর পীড়ন করিতেছে!

দিলু আসিল তাদের মাঝখানে। আসিয়া সে দেখে, যার উপর পীড়ন চলিয়াছে, সে নীলু! এবং পীড়ন করিতেছে দেবকী এবং দেবকীর অনুচরবৃন্দ।

দিলু বলিল—তোমাদের লজ্জা করে না···ক'জনে মিলে এক জনকে মারছো!

দেবকী বলিল—ও! দাদাগিরি ফলাতে এসেছেন! ওরে, নীলু হচ্ছে এই মিস্ত্রীর ভাই!

সকলে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। এক জন বলিল,—মিস্ত্রীর ভাই মিস্ত্রীর ভাইয়ের মতো থাকে না কেন? সাধু সেজে পণ্ডিতের 'সো' হবার সখ! করবি তো শেষে মিস্ত্রীগিরি!

দিলু বলিল—মিস্ত্রীগিরি করলেও তোমাদের মতো বাঁদরামি করবে না কখনো!

—কি! এত বড় কথা! আমাদের বাঁদর বলা! একটা মিস্ত্রী! এখনি জুতো মেরে মুখ ছিঁড়ে দেবো, জানিস্!

বলিয়া দেবকী একেবারে মার-মূর্ত্তি ধরিয়া আস্তিন গুটাইয়া দিলুর সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

দিলু বলিল—পা থেকে জুতো খুলে একবার ভাখো···মুখ ছেঁড়া কতখানি সহজ!··ছোটলোকের মতো গালাগাল দিতেই পারো! মারতে হলে কোমরে জোর চাই! সে জোর বাবুয়ানা করে মেলে না, দেবকীকুমার!···এসো, ক'জনে মিলে আমার সঙ্গে লেগে ভাখো··· এক জোড়া কেন, চার জনের চার জোড়া জুতো নিয়ে চেষ্টা করো, আমার মুখ কতখানি ছিঁড়তে পারো!

এ কথায় দেবকী ভড়কাইয়া গেল! হাজার হোক, দিলু আজ মিস্ত্রীগিরি করিলেও ক্লাশে সে ছিল সবার সেরা ছেলে! পাশ করিয়া স্কলারশিপ পাইয়াছে! সাধারণ মিস্ত্রী সে নয়···কাজেই মুখ-সাপাটি করিয়া বলিল—চলে আয় রে···রাম নয়···সুগ্রীব দোশর এসেছে! তা ছাড়া মিস্ত্রী-মজুরের সঙ্গে হাতাহাতি করলে ইজ্জৎ থাকবে না।

এ কথা বলিয়া দ্রুত-চম্পট-দানে সকলে ইজ্জৎ রক্ষা করিল।

নীলুর পায়ে বেশ চোট্···উঠিতে পারে না। পথের প্রান্তে বসিয়া-ছিল দু'হাঁটু এক করিয়া···দিলু আসিয়া বলিল—উঠতে পারবি নে?

—খোয়া লেগে দু'টো হাঁটু খুব কেটে গেছে।

—ইস্, তাই তো! এ যে রক্ত-গঙ্গা! আয়, দেখি!

বলিয়া নীলুর হাত ধরিয়া দিলু কোনো মতে তাকে লইয়া অদূরে একটা ডিস্‌পেনসারিতে আসিল এবং সেখান হইতে জল চাহিয়া লইয়া সেই জলে কাটা ঘা ধোয়াইয়া দিল। কমপাউণ্ডার আয়োডিনে তুলা ভিজাইয়া দিল। কাটা ঘায়ে তুলা চাপা দিয়া দিলু বলিল—আমার কাঁধে ভর দিয়ে চ···তোকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি।

চলিতে চলিতে দিলু বলিল—হঠাৎ তোর উপরে পড়লো?

নীলু বলিল সেকণ্ড আওয়ারের বিবরণ···তার পর বলিল—

আজ হাফ-হলিডে হলো। আসছি, হঠাৎ ওরা এসে টিট্‌কিরি সুরু করলে! বললে, আমাদের সঙ্গে আসা হলো না! ট্রেটর... কাওয়ার্ড...ডেজার্টার...এমনি সব গালাগাল! আমি শুধু বলেছিলুম—Mind your own machine. অমনি ক'জনে মিলে ধাক্কা দিয়ে ফেলে মারতে লাগলো...

নীলুকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া দিলুর মনে পড়িল জানকী বাবুর চিঠির কথা। এতক্ষণ এ গোলমালে ভুলিয়া গিয়াছিল। মনে পড়িবামাত্র সে এক-মুহূর্ত্ত দাঁড়াইল না...পোষ্ট-অফিসের দিকে ছুটিল।

লেটার-বক্সে চিঠি দিয়া পোষ্ট-অফিসে একটি বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল,—ডাক কখন যাবে?

বাবু বলিলেন—পনেরো মিনিট আগে রাণার ডাক নিয়ে চলে গেছে। আজ আর যাবে না। এ চিঠি যাবে কাল বেলা দু'টোয়।

ঘড়ির দিকে চাহিয়া দিলু দেখে, দু'টো বাজিয়া আঠারো মিনিট।

সে ছুটিল কারখানায়।

কাজে সুখ নাই। মনের মধ্যে কে যেন অজস্র ছুঁচ ফুটাইতেছে!

জানকী বাবুর চিঠি ডাকে দিবার ভার লইয়াছিল...জানকী বাবু বলিয়াছেন, জরুরি চিঠি! সে-চিঠি যথাসময়ে সে ডাক-বাক্সে দিতে পারিল না!...ইহার কি কৈফিয়ৎ দিবে?

জানকী বাবুকে যদি না বলে? তিনি জানিসেন, চিঠি যথাসময়ে ডাক-বাক্সে গিয়াছে...তার পর...

চিঠির ডেলিভারিতে দেরী তো অমন হয়...

কিন্তু না, না! বিশ্বাস করিয়া তিনি কাজের ভার দিয়াছেন... তাঁর সে বিশ্বাস...

বুকের মধ্যে ছুঁচ-কোঁটার যাতনা অসহ্য হইল!

ছুটী হইলে অপরাধীর মতো দিলু গিয়া দাঁড়াইল জানকী বাবুর অফিস-ঘরের সামনে।

জানকী বাবু বাহির হইলেই আর্ত্ত করুণ কণ্ঠে বলিল—স্যর...

জানকী বাবু বলিলেন—ও তুমি! চিঠি ডাকে দেছ?

কুণ্ঠিত স্বরে বলিল,—কিন্তু আমার দেরী হয়েছিল বলে আজকের ডাকে চিঠি যাবে না।

জানকী বাবু বলিলেন—সে কি! প্রচুর সময় ছিল...আজকের ডাকে যাবার জন্য! সেই জন্যই পোষ্ট-অফিসের লেটার-বক্স...

কুণ্ঠিত স্বরে দিলু সব কথা খুলিয়া বলিল। জানকী বাবু একাগ্র মনে শুনিলেন। শুনিয়া তিনি বলিলেন,—একটু অসুবিধে হবে এক দিনের দেরীর জন্য! যাক্, তুমি যে এ-কথা গোপন না রেখে আমার কাছে এসে অপরাধ স্বীকার করে বলেছো, এতে আমি খুশী হয়েছি।...এ স্বভাব চিরদিন যেন থাকে! তবে ভবিষ্যতে সতর্ক হয়ো, যে-কাজের ভার নেবে, সে-কাজ যথাসময়ে করা চাই। অন্য কোনো দিকে মন দিলে যদি সে-কাজ যথাসময়ে করতে না পারো, তাহলে জীবনে কোনো কাজ ঠিক সময়ে করতে পারবে না। অভ্যাস আর স্বভাব দুই খারাপ হয়ে যাবে।

মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া দিলু বলিল,—এ কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে, স্যর।

৫

রাত্রি প্রায় আটটা। কামাখ্যা চ্যাটার্জ্জী সাহেবের গৃহ। কামাখ্যা বসিয়া অফিস-ঘরে একটা এষ্টিমেটের খশড়া দেখিতেছে, কম্পিত পায়ে অন্নদাচরণ আসিয়া তটস্থ হইয়া এক-পাশে দাঁড়াইল।

তাকে দেখিয়া কামাখ্যা সাহেব বলিল—অন্নদা! কি চাই?

বিনয়ে একেবারে আভূমি আনত হইয়া অন্নদাচরণ বলিল—আজ্ঞে, পিনাকী বাবুর কাছে এসেছিলুম।

—পিনাকী!...পিনাকীর সঙ্গে তোমার কিসের দরকার?... কোনো রেকমেণ্ডেশন্ না কি?...পিনাকী এমন মুরুব্বি হয়ে উঠেছে? হুঁ!

কথাটা বলিয়া উত্তরের অপেক্ষামাত্র না করিয়া কামাখ্যা সাহেব আবার হিসাবের কাগজে মনোনিবেশ করিল।

অন্নদা কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বাহিরে আর পাঁচ জনের কাছে এ বাড়ীর দর্পে গল্প খুব জাহির করিলেও আসল গৃহস্বামীর কাছে সে কেঁচো! কামাখ্যা সাহেবের কথার উত্তরে একটি কথাও বলিতে পারিল না, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কামাখ্যা সাহেব দেখিল, অন্নদা নড়িবার নাম করে না! বলিল —তা এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে তো তোমার পিনাকী বাবুর দেখা পাবে না। তাঁর বৈঠকখানায় গিয়ে খপর নাও...তিনি মস্ত লায়েক হয়েছেন...তাঁর আলাদা বসবার ঘর আছে...হাওয়া খেতে বেরোন্!

এ কথার পর অন্নদাচরণ এ ঘরে দাঁড়াইয়া থাকিতে সাহস পাইল না...চোরের মতো নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

গিয়া সে দাদাবাবুর খাশ ভৃত্য বনোয়ারীর শরণ লইল। বনোয়ারীকে বলিল—তোমার বড় দাদাবাবু কোথায় বনোয়ারী?

বনোয়ারী মাদুর পাতিয়া সে-মাদুরে বসিয়া কাপড় কোঁচাইতে-ছিল। বলিল—বড় দাদাবাবু কি এখন বাড়ীতে থাকেন?

—কখন আসবেন?

বনোয়ারী বলিল—তা তো আমাকে বলে যান্ নি।

অন্নদাচরণ বিরক্ত হইল। চাকরের মুখে কথা কি...যেন গায়ে জল-বিছুটীর আছড়া মারিতেছে!

অন্নদাচরণ বলিল—আমাকে আসতে বলেছিলেন কি না...তাই। মানে...

বনোয়ারী বলিল—তাহলে ও-ঘরে গিয়ে বসো। এলে দেখা হবে।

ওদিকে কর্ত্তার কাছে তাড়া, এদিকে খানশামা বনোয়ারীর এই ভঙ্গী...অন্নদাচরণের বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ি পিটিতে লাগিল। মনে হইল, যে জন্য আসিয়াছে, সে কাজ হইলে হয়...

অথচ মাথার উপর পাহাড়ের ভার! এ ভার নামাইতে না পারিলে এই পাহাড়ের তলায় প্রাণটা বুঝি চূর্ণ হইয়া যাইবে!

ভগবান্ তার ব্যথা বুঝিলেন, অচিরে বড় দাদাবাবুর আবির্ভাব ঘটিল।

অন্নদাচরণ বলিল—এই যে পিনাকী...একটু দায়ে পড়ে তোমাকে এ সময়ে জ্বালাতন করতে এলুম, বাবা!

কি দায়, অন্নদাচরণকে দেখিয়াই পিনাকীর বুঝিতে বিলম্ব হইল না! দায়ের কথা বনোয়ারীর সামনে পাছে প্রকাশ করিয়া ফেলে, এ জন্য পিনাকী বলিল—আমার ঘরে আসুন। শুনি, আপনার কি দায়!

এই কথা বলিয়া অন্নদাচরণকে লইয়া পিনাকী আসিল তার বসিবার ঘরে। সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিল। তার পর একটা সিগারেট ধরাইয়া সোফায় বসিয়া সামনের চেয়ারে দু'পা তুলিয়া

সিগারেটে দু'টা টান দিয়া বলিল—বুঝেছি···সেই টাকা···? পাঁচটা তো টাকা! তার জন্য ঘুম হচ্ছে না!

কাঁচুমাচু মুখে অন্নদাচরণ বলিল—জানো তো বাবা, সামান্ত মাইনে···ওই থেকে প্রিমিয়াম দিতে হয় মাসে বারোটা টাকা।

পিনাকী বলিল—আমাকে আপনি বিশ্বাস করতে বলেন, ত্রিশ টাকা থেকে প্রিমিয়াম বারো টাকা দিয়ে বাকী আঠারো টাকার উপর নির্ভর করে' আপনার সংসার চলে? বিশেষ আপনার অমন সৌখীন সংসার! সরোর সেন্ট-পাউডারেই তো মাসে আপনার কম্-সে-কম্ তিন-চার টাকা খরচ, তার উপর আছে ভালো শাড়ী, ভালো ব্লাউশ···

কথাগুলা জুতার মতো অন্নদাচরণের মাথায় পড়িল! অন্নদাচরণ বলিল—আজ প্রিমিয়াম দেবার লাষ্ট দিন ছিল। এখানকার ঐ লোকাল অফিসে কাল ফার্ষ্ট আওয়ারে অফিস-খোলার সঙ্গে সঙ্গে টাকাটা না দিলে নয়! সত্যি, সাতটি টাকা ছাড়া আমার আর এমন কিছু সম্বল নেই, যা থেকে প্রিমিয়াম দেবো। তাই, মানে, সামান্ত পাঁচটি টাকা নির্লজ্জের মতো চাইতে এসেছি!···তোমার অভাব নেই, বাবা···

পিনাকী ভ্রূ কুঞ্চিত করিল। বলিল—আমার বড্ড টানাটানি পড়েছিল বলেই সামান্ত ক'টা টাকা সরোর কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলুম। মাসের আর চারটে দিন গেলেই মাস-কাবার। পয়লা তারিখে বাবার কাছ থেকে হাত-খরচের টাকা পাবো, পেলেই আপনার টাকা ক'টা ফেলে দেবো'খন। যান, পাঁচ টাকার জন্ম সুদ দেবো না হয় পাঁচ আনা!

অন্নদাচরণ হতভম্বের মতো দাঁড়াইয়া এ-কথা শুনিল। পিনাকী বলিল—আজ বাড়ী যান্···পয়লা তারিখে সন্ধ্যার সময় আসবেন, এসে পাঁচ টাকা পাঁচ আনা নিয়ে যাবেন।

বলিয়া পিনাকী উঠিতেছিল, অন্নদাচরণ বলিল—কিন্তু তুমি, রাগ করছো বাবা···নেহাৎ দায়ে পড়েই শুধু···

পিনাকী চটিল। রূঢ়-স্বরে বলিল—ত্রিশ টাকা মাইনের উপর নির্ভর করে অমন ষ্টাইলে বাস করা যায় না অন্নদা বাবু, এ জ্ঞান আমার আছে। কেন মিছে বকছেন! যে-ডিপার্টমেণ্টে কাজ করেন, ও-ডিপার্টমেণ্টে পয়সা একেবারে ছড়ানো আছে! দায় হয়ে থাকে, কারো কাছ থেকে দু'-চার দিনের জন্ম পাঁচটা টাকা ধার নিয়ে কাজ সারুন। তার পর বলেছি তো, পয়লা তারিখে সন্ধ্যার সময়···

অন্নদাচরণ কিছু বলিল না···পায়ের নীচে মাটী যেন দুলিতেছে··· চোখের সামনে অন্ধকার!

পিনাকী বলিল—জানেন, সেদিন সরোর জন্মদিনে তাকে যে টয়লেট-শেটটা প্রেজেণ্ট দিয়েছি, তার দাম কত? পনেরো টাকা। তার পরে সিনেমার-খরচ! আমি কচি ছেলে নই অন্নদা বাবু, কেন আপনার এত দায় হলো, আমি বুঝি! দিগঙ্গনাকে নিয়ে সিনেমায় গিয়েছিলুম, সরোকে নিয়ে যাই নি, সেই হিংসেয় সরো ক্ষেপে উঠেছে, আর তাই আপনি এসেছেন সামান্ত পাঁচটা টাকার তাগাদা করতে!

এ কথার ভিতরে কতখানি শ্লেষ, কি নিদারুণ অপমান, অন্নদাচরণ মর্ম্মে-মর্ম্মে তাহা বুঝিল! কিন্তু সে সরোর বাপ···তাই কেঁচো খুঁড়িতে তার আর ভরসা হইল না! কম্পিত পায়ে নিঃশব্দে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

এক ঘণ্টা পরে।

সকলে আহার করিতে বসিয়াছে।

কামাখ্যা সাহেব ডাকিল—দেবকী···

দেবকী বলিল,—বাবা···

কামাখ্যা সাহেব বলিল—যদু দাসের বাগানে ঢুকে তার কলমের আম-গাছ উপড়ে দেছ···তার একটা গরুকে মেরে জখম করে এসেছো···কেন?

অবিচল কণ্ঠে দেবকী বলিল—না বাবা, মিথ্যা কথা!

কামাখ্যা সাহেব বলিল—অফিস থেকে বাড়ী ঢুকছি, দেখি, সদরে যদু দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে কেঁদে আমার কাছে নালিশ জানিয়েছে···ওপ্‌ড়ানো গাছ এনে দেখিয়েছে। মিথ্যা তার এ নালিশ করবার মানে?

দেবকী বলিল—তার গরু ঐ শিবুদের বাগানে ঢুকে ভালো ভালো ফুলের চারা মুড়িয়ে খাচ্ছিল, তাই আমরা সে গরুকে নিয়ে থানায় দিতে যাচ্ছিলুম···যদু এসে গরু কেড়ে নিয়ে যায়। শিবু বলেছিল, থানায় গিয়ে সে নালিশ লেখাবে···এই তো জানি, ব্যাপার।

কামাখ্যা সাহেব বলিল,—হুঁ! বেশ, যদুকে আমি কাল সকালে ডাকিয়ে পাঠাবো। তার সামনে তোমার এ-কথা বলো···আমি বিচার করবো।

দেবকী কথা কহিল না।

কামাখ্যা সাহেব চাহিল জয়ার পানে। বলিল—ছেলেগুলিকে যা তৈরী করছো···এর পরে আমি মরে গেলে ওদের দশা কি হবে, তা কখনো ভেবেছো?

জয়া বলিল—আমার তো দেখবার কথা নয়! তুমি দেখে বুঝে যা উচিত বোধ করবে, করো।

কামাখ্যা সাহেব বলিল—আমি ঠিক করেছি, সামনের মাস থেকে ওদের মাসকাবারী হাত-খরচের টাকা বন্ধ করে দেবো।

জয়া বলিল,—তাই যদি উচিত মনে করো, করো···

কামাখ্যা সাহেব বলিল—তুমি নাই দিয়েই ওদের সর্ব্বনাশ করলে!

তার পর নিস্তব্ধতা। সকলে বুঝিল, কামাখ্যা সাহেব রাগ করিয়াছে। রাগের সময় কোন কথা বলিলে অগ্নিকাণ্ড ঘটিতে পারে! এ সময়টায় চুপচাপ থাকিলে ও-রাগ পড়িয়া জল হইতে দের সহে না। এত দিনকার অভিজ্ঞতায় এ কথা সকলে ভালো করিয়াই জানে।

অন্নদা গিয়া বাড়ীতে মার-মূর্ত্তিতে প্রবেশ করিল, স্ত্রীকে ডাকিল,—শুনে যাও···

মহামায়া আসিল। কহিল,—কি বলছো?

অন্নদাচরণ বলিল—তোমার মেয়েকে বলো যেখান থেকে পারে, পাঁচটা টাকা এনে দিতে। ঐ উড়নচণ্ডীকে টাকা ধার দেওয়া···ছুঃ!

মহামায়া বলিল—যে করে আমার কাছে মিনতি জানিয়ে চাইলে, বললে, একটা দিনের জন্ম মাসিমা! কাল আমি টাকা দিয়ে যাবো!

অন্নদাচরণ বলিল—অত বড় লোকের ছেলে—সে পাঁচ টাকা ধার চাইছে! এ থেকে বুঝতে পারো না, ওর খরচের কি অন্ত আছে!

মহামায়া বলিল—পাঁচটা মাত্র টাকা! এটা-ওটা···কি না এনে দিচ্ছে, বলো তো! সিনেমা দেখানো···

অন্নদাচরণ খিঁচাইয়া উঠিল। বলিল—এ দানের মানে বোঝো ?··· ঐ তোমার সরো, ও যদি পুচকে বাচ্ছা মেয়ে হতো···কিম্বা মেয়ে না হয়ে ছেলে হতো, তাহলে 'মাসিমা' বলে পিনাকী তোমার পায়ে অমন লুটিয়ে পড়তো, ভাবো ?

মহামায়া এ কথার অর্থ বুঝিল। মায়ের প্রাণ! সহ্য করিতে পারিল না। বলিল,—চুপ করো, সরো তোমার মেয়ে! মেয়ের সম্বন্ধে এমন কথা বলতে লজ্জা হলো না তোমার ?

অন্নদাচরণ বলিল,—সত্য কথা বলবো, তাতে লজ্জা কিসের !··· ও ছেলে ছুঁচ হয়ে ঘরে ঢুকেছে···ফাল হয়ে বেরুবে শেষে···সাবধান থেকো !

—আচ্ছা, আচ্ছা···এখন কি হলো, তাই বলো ?···টাকা দিলে না ?

অন্নদাচরণ বলিল—ক্ষেপেছো! কোথা থেকে দেবে ? তুমি যেমন মাসিমা, এমন অনেক মাসিমা ওর আছে অনেক বাড়ীতে! মুখের উপর সে যে কথা বলেছে আজ···কি বলবো, নেহাৎ তোমাদের মুখ চেয়ে চাকরির মায়া! না হলে···

মহামায়া বুঝিল, এ-পথে গেলে রাগ বাড়িবে, তাই কথার মোড় ফিরাইবার উদ্দেশ্যে সে বলিল—তুমি যে বলেছিলে, ২০ তারিখে ষাট টাকা পাবার কথা। হানিফ মিস্ত্রীর সাড়ে তিন শো টাকার বিল কাটকুট না করে পাশ করে দিয়েছো···সে বলেছিল, ষাট টাকা তোমাকে দেবে !

জ্বলন্ত আগুনে যেন ঘী পড়িল !

রূঢ়-স্বরে অন্নদাচরণ বলিল—হ্যাঁ! দেছে কি না! ব্যাটা ভয়ঙ্কর শয়তান! শুধু বিল পাশ করা! বিল পাশ করে রামহরি বাবুকে ধরে টাকাগুলো সদ্য সদ্য পাইয়ে দিলুম···ইশারা করে আপিসে বলে গেল, সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে এসে টাকা ক'টা দিয়ে যাবে! আজ মাসের সাতাশ তারিখ···ব্যাটা এ পথ মাড়ালো না একবার !

—বোধ হয়, অসুখ-বিসুখ করেছে।···না হলে তোমার সঙ্গে বেইমানী করতে পারে ? এ এষ্টেটে কাজ করে খেতে হবে তো তাকে···বিলও পাশ করাতে হবে !

অন্নদাচরণ কোন জবাব দিল না···নিরুপায় আক্রোশে সাপের মতো গজ্‌রাইতে লাগিল।

এমন সময় সরস্বতীর প্রবেশ। সে গিয়াছিল সতু বাবুর বাড়ী··· সতু বাবুর নবোঢ়া দ্বিতীয়-পক্ষ তার গান শুনিতে চাহিয়াছিল, তাই !

সরস্বতী বলিল,—টাকা পেলে বাবা ?

—হ্যাঁ···টাকার ছালা বয়ে নিয়ে আসছে তার পাইক।

বিস্ময়ে দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া সরস্বতী বলিল—ও মা··· দিলে না ? কি মিথ্যুক গো !

অন্নদাচরণ বলিল—শোনো সরো, ওটার সঙ্গে আর কখনো মিশবে না। ডাগর হয়েছো···ও হলো একের নম্বরের ছুঁচো !··· না হলে ইজ্জৎ থাকবে না! তার পর মহামায়ার পানে চাহিয়া বলিল,—মাসিমা বলে ফের যদি এ বাড়ীতে ঢোকে, খবদ্দার, আর প্রশ্রয় দিয়ো না ওকে···বুঝলে !

এ কথায় কতখানি গ্লানি, সকলে বুঝিল। কথা বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই অন্নদা আবার বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

সকালে কামাখ্যা সাহেব বনোয়ারীকে দিয়া যদুকে ডাকাইয়া আনিল। যদু আসিলে কামাখ্যা সাহেব ডাকিল দেবকীকে।

বনোয়ারী আসিয়া খবর দিল, দেবকী বাড়ী নাই।

কামাখ্যা সাহেব বলিল—তোমার কত লোকসান হয়েছে যদু ?

যদু বলিল,—প্রায় সাত-আট টাকা।

যদুর হাতে আটটা টাকা দিয়া কামাখ্যা সাহেব বলিল— এই নাও আট টাকা···খুশী হয়েছো ?

কামাখ্যা সাহেবকে সেলাম করিয়া যদু বলিল,—আপনি বলছেন, বাবু! কিন্তু একটু বলে দেবেন, আমার পিছনে না লাগে! ছাপোষা গরীব মানুষ···পুকুরের মাছ, গরুর দুধ, ফল-মূল···ঐ বেচে আমার দিন চলে।

কামাখ্যা সাহেব বলিল,—বলে দেবো যদু···তোমার দিক মাড়াবে না আর! যদি কিছু করে, এসে আমাকে জানিয়ো।

যদু চলিয়া গেল।

খোলা খড়খড়ির মধ্য দিয়া কামাখ্যা সাহেব বাহিরের পানে তাকাইয়া রহিল। মনে হইতেছিল, আমি তো এক রকম করিয়া দিন কাটাইয়া চলিলাম! কিন্তু ছেলে-মেয়েরা ?

জানকী বাবু কথায় কথায় বলিয়াছিলেন, বড় ছেলেটিকে মানুষ করিয়া তুলুন কামাখ্যা বাবু! এক দিন এ এষ্টেটের ভার হয়তো তার হাতেই পড়িবে !

এ কথার অর্থ কামাখ্যা সাহেবই নয়—আরো পাঁচ জনে যা বুঝিয়াছিল···তার চেয়ে বড় কামনা কামাখ্যা সাহেবের আর নাই ! জানকী বাবুর ছেলে মণিময়···তার রুগ্ন শরীর···তার উপর জানকী বাবু আশা-ভরসা রাখেন না। তাঁর আশা-ভরসা ঐ মেয়ে সুরুচির উপর! হয়তো তাঁর ইচ্ছা আছে, পিনাকীর সঙ্গে সুরুচির বিবাহ···

কিন্তু ছেলে তার কি যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছে? কামাখ্যা সাহেবই বা ছেলেদের সম্বন্ধে কি করিয়াছে? নিজের অর্থ আর স্বার্থ লইয়াই···

এ চিন্তার মাঝখানে বনোয়ারী আসিয়া দেখা দিল। তার হাতে একখানা কার্ড। কার্ড লইয়া কামাখ্যা সাহেব নাম পড়িল, ইংরেজী হরফে ছাপা—

ভিখামল রণছোড়দাশ
সিল্ক এণ্ড ক্লথ মার্চ্চেন্টস্
রিপ্রেজেন্টেড্ বাই···বিক্রমদাস

কে ?

কামাখ্যা সাহেব বলিল—পাঠিয়ে দে···

বনোয়ারী চলিয়া গেল এবং পরক্ষণে ঘরে ঢুকিল ঢিলা পায়জামা পরা, গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবীর উপর জওহরলাল-ভেষ্ট, মাথায় গান্ধী টুপি···এক ভদ্রলোক।

কামাখ্যা সাহেব বলিল—ইয়েস···

বিক্রমদাস একখানা চেক বাহির করিয়া কাম্যাখ্যা সাহেবের হাতে দিল।

চেক দেখিয়া কামাখ্যা সাহেব স্তম্ভিত! চেক কাটিয়াছে পিনাকীলাল চ্যাটার্জী···এবং কাটিয়াছে প্রায় দেড় মাস আগে !

বিক্রমদাস বলিল, ছোট সাহেব একখানা গুজরাটী শাড়ী লইয়া তারি দাম দিয়াছিলেন পঁচিশ টাকার এই চেকে! তিন বার এ চেক ব্যাঙ্কে পাঠানো হইয়াছিল, তিন বারই ফেরত আসিয়াছে। ছোট সাহেবকে রেজিষ্ট্রী-চিঠি দেওয়া হইয়াছে, উকিলের চিঠি দেওয়া

হইয়াছে। ছোট সাহেব সে-চিঠির উত্তর দিয়াছেন সময় চাহিয়া··· এই সে চিঠি।

কামাখ্যা সাহেব চিঠি দেখিল। তার পর ক্ষণেক নির্ব্বাক্ থাকিয়া ডাকিল—বনোয়ারী···

বনোয়ারী আসিল। কামাখ্যা সাহেব বলিল—তোর বড় দাদাবাবু···

ডাকিবার জন্য দূরে যাইতে হইল না, পিনাকী আসিতেছিল বাপের কাছে। ভিখামল উকিলের চিঠি দিয়াছে নালিশের ভয় দেখাইয়া···ফৌজদারী মকদ্দমার ভয়; তাই কোনো ছুতায় টাকার ব্যবস্থা করিতে বাপের কাছে আসিতেছিল। মায়ের হাতে টাকা নাই। মা সাফ নোটিশ দিয়াছে,—তোদের জন্য আমার কাছ থেকে টাকা-কড়ি সব কেড়ে নিয়ে উনি ব্যাঙ্কে জমা দেছেন!

সামনে বিক্রমদাসকে দেখিয়া পিনাকীর চক্ষু-স্থির!

কামাখ্যা সাহেব বলিল—কার জন্য এ শাড়ীর প্রয়োজন হলো পিনাকী বাবু?

পিনাকীর বুদ্ধি···যাকে বলে, রীতিমত শাণ দেওয়া! কাল অন্নদাচরণ আসিয়াছিল! ধাঁ করিয়া সে বলিল—তোমার অফিসের ঐ অন্নদা বাবু আমাকে ধরেছিল গোটা পঁচিশেক টাকার জন্য···কি না কি শাড়ী কিনেছে···তার দাম। বলেছিল, এ মাসে মাইনে পেলে টাকা দিয়ে দেবে। তাই আমি চেক দিয়েছিলুম। কিন্তু ব্যাঙ্কে টাকা পাঠাবার কথা মনে ছিল না।

কামাখ্যা সাহেব একাগ্র মনোযোগে কথাগুলা শুনিল। শুনিয়া বলিল—তোমার বন্ধু হয়েছেন অন্নদা বাবু? হুঁ! কাল সন্ধ্যার পর তোমার কাছে এসেছিলেন!···তা, অন্নদা বাবু মাইনে পান কত জানো?

—শুনেছি, ত্রিশ টাকা।

—ত্রিশ টাকা যে মাইনে পায়, সে কিনেছে পঁচিশ টাকার শাড়ী ···তাও তোমার কাছ থেকে চেক নিয়ে! এ কথা আমাকে বিশ্বাস করতে হবে?

পিনাকী বলিল—ত্রিশ টাকা মাইনে পেলেও উপরি-রোজগার আছে তো!

—ও! উপরি···তাও জানো!

এইটুকু বলিয়া কামাখ্যা সাহেব তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে ছেলের পানে চাহিয়া রহিল···ক্ষণ-কাল···তার পর বুকের মধ্যে কেমন ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল! একখানা পঁচিশ টাকার চেক লিখিয়া বিক্রমদাসের হাতে দিয়া কামাখ্যা সাহেব বলিল—এ বাবুকে আর কখনো শাড়ী দেবে না···দিলে তার দাম আমার কাছ থেকে পাবে না।

চেক লইয়া বিক্রমদাস চলিয়া গেল। পিনাকী চলিয়া যাইতেছিল, কামাখ্যা সাহেব বলিল—দাঁড়াও পিনাকী···

পিনাকী দাঁড়াইল। কামাখ্যা সাহেব বলিল—সামনের মাসে তোমার হাত-খরচার পঞ্চাশ টাকা থেকে এ পঁচিশ টাকা আমি কেটে নেবো। পঁচিশ টাকার বেশী তুমি পাবে না।

পিনাকী গোঁ-ভরে যাইতে উদ্যত হইল···কামাখ্যা সাহেব বলিল—বুকের পাটা বড্ড বাড়ছে পিনাকী বাবু···হুঁশিয়ার! না হলে বুক ফেটে এক দিন হাহাকার সার হবে, মনে রেখো! [ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

এত দিন জাপানের প্রকৃত মনোভাব যে রহস্যের যবনিকায় আবৃত ছিল, তাহা এখন ক্রমে উত্তোলিত হইতেছে। গত বৎসর মে মাসে ব্রহ্ম-অভিযান শেষ হইবার পর এত দিন কোথাও জাপানের আক্রমণাত্মক প্রচেষ্টা দেখা যায় নাই; অথচ প্রত্যেকটি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে তাহার আয়োজনের কথা শ্রুত হইতেছে। মাঞ্চুকো-সীমান্তে জাপানের ব্যাপক সমরায়োজন দেখিয়া চীনের পক্ষ হইতে একাধিক বার প্রচারিত হইয়াছে—রুশ-জাপান সজ্ঘর্ষ আসন্ন। ব্রহ্মদেশেও জাপানের সমরায়োজন কম হয় নাই; এখানে জাপানের আড়াই লক্ষ সৈন্য এবং প্রয়োজনানুরূপ সমরোপকরণ সন্নিবেশের কথা শ্রুত হইয়াছে। দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে সম্মিলিত পক্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাফল্য সম্পর্কে প্রচারের আতিশয্য যতই প্রবল হউক, তাহাতে ঐ অঞ্চলে জাপানের সমরায়োজনের কথা সম্পূর্ণ চাপা পড়ে নাই। বস্তুতঃ, এত দিন বিভিন্ন অঞ্চলে জাপানের নীরব সমরায়োজন, রণক্ষেত্রে তাহার একরূপ নিষ্ক্রিয়তা অথবা সামান্য প্রতিরোধাত্মক তৎপরতা এবং সর্ব্বোপরি স্থানে স্থানে বিফলতা তাহার প্রকৃত মনোভাব অত্যন্ত রহস্যাবৃত করিয়াছিল। এই সময়ে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত প্রচারকার্য্যের দ্বারা এইরূপ ধারণা সঞ্চারের চেষ্টা হইয়াছে যে, জাপান অত্যন্ত শক্তিহীন; সে যে বিশাল অঞ্চল গলাধঃকরণ করিয়াছে, তাহা পরিপাক করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য, অন্যত্র আক্রমণাত্মক প্রয়াসে প্রবৃত্ত হইবার কথা সে এখন ভাবিতেই পারে না। এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত প্রচারকার্য্য বাস্তবতার সহিত কিরূপ সঙ্গতিহীন, গত মাঘ মাসের 'মাসিক বসুমতী'তে তাহার বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছিল।

জাপানের আক্রমণাত্মক আয়োজন—

গত ১লা মার্চ্চ অকস্মাৎ সম্মিলিত পক্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত প্রধান কেন্দ্র হইতে ঘোষিত হয়,—"জাপানীরা অষ্ট্রেলিয়ার উত্তরে সৈন্য-সমাবেশ করিতেছে। গত কয়েক সপ্তাহের বিমান পর্য্যবেক্ষণে জানা গিয়াছে—যে দ্বীপমালার দ্বারা উত্তর-অষ্ট্রেলিয়া পরিবেষ্টিত, তাহাতে জাপানের সমর-শক্তির প্রত্যেকটি অংশ বিশেষ ভাবে বর্দ্ধিত হইতেছে।" এই সরকারী বিজ্ঞপ্তির সমালোচনা কালে রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা অতীতের সকল প্রচারকার্য্য মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এত দিন আমরা শুনিতেছিলাম—জাপানের অন্তিমকাল নিকটবর্ত্তী। তাহার জাহাজ নাই; সুতরাং সে তাহার বিচ্ছিন্ন সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে না। তাহার বিমান নাই; কাজেই আধুনিক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু এখন অষ্ট্রেলিয়া আক্রান্ত হইবার আশঙ্কায় সম্পূর্ণ নূতন কথা শুনা যাইতেছে। রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা

জানাইয়াছেন—"জাহাজ-সন্নিবেশের প্রধান পোতাশ্রয়গুলিতে অসংখ্য বিমান আক্রমণ সত্ত্বেও জাপানের এখনও প্রচুর জাহাজ আছে। কোরাল্ সাগরে জাপানের যত জাহাজ বিনষ্ট হইয়াছিল, তদপেক্ষা অধিক জাহাজ সে অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে নিয়োগ করিতে পারিবে। ইহাও কাহারও অবিদিত নাই যে, দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের দুর্জ্জয় বিমান-শক্তি আছে। সম্মিলিত পক্ষের বিমান-সংখ্যা অপেক্ষা জাপানের বিমান-সংখ্যা বহু পরিমাণে অধিক।"

এই সংবাদ ও সমালোচনা পরিবেশিত হইবার অব্যবহিত পরেই বিস্‌মার্ক সাগরে জাপান বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এই সাগরপথে জাপানের কতকগুলি সৈন্যবাহী জাহাজ নিউ গিনির উত্তর উপকূলে যাইতেছিল। সম্মিলিত পক্ষের প্রচণ্ড বিমান-আক্রমণে এই সকল জাহাজের ২২খানি নিমজ্জিত হইয়াছে, ১৫ হাজার জাপানী সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছে, সৈন্যবাহী জাহাজ-দলের রক্ষায় নিযুক্ত ৫৭খানি বিমানও ধ্বংস হইয়াছে। বিস্‌মার্ক সাগরের যুদ্ধ-সম্পর্কিত সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র চতুর্দ্দিকে অত্যন্ত আশা ও উল্লাসের সঞ্চার হইয়াছিল। বিলাতের সাংবাদিকগণ অত্যন্ত "ফলাও করিয়া" এই সংবাদের শিরোনামা দিয়াছিলেন এবং এই সম্পর্কে সুদীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধও লিখিয়াছিলেন। কেহ কেহ এরূপ উক্তিও করেন যে, অষ্ট্রেলিয়ার বিপদ এখন দূরীভূত হইয়াছে। কিন্তু নিউ গিনিতে সম্মিলিত পক্ষের অগ্রবর্ত্তী ঘাঁটী হইতে রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা পুনরায় নৈরাশ্যজনক উক্তি করিয়াছেন। ইংরেজিতে যাহাকে "শীতল জল প্রক্ষেপ" বলে, এই সংবাদদাতা যেন বিলাতের উৎসাহী সাংবাদিকদিগের উদ্দেশে তাহাই করিলেন। তিনি বলেন—"বিস্‌মার্ক সাগরের যুদ্ধের ফলে অষ্ট্রেলিয়ার বিপদ দূরীভূত হয় নাই। এই সাফল্যের দ্বারা নিউ গিনিতে সম্মিলিত পক্ষ কোন অঞ্চল অধিকারে সমর্থ হন নাই; ঐ অঞ্চলে জাপানের বহু সৈন্য মজুত আছে। রবাউলে তাহার বহুসংখ্যক জাহাজ সন্নিবিষ্ট। বিস্‌মার্ক সাগরের যুদ্ধে জাপানের বিমান-শক্তির এক নগণ্য ভগ্নাংশ মাত্র বিনষ্ট হইয়াছে। সম্মিলিত পক্ষ অন্তরীক্ষে আধিপত্য লাভ করিয়াছেন—ইহা মনে করা অন্যায়। শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক, শত্রু পুনরায় অধিকতর বিমান-শক্তি লইয়া অগ্রসর হইতে পারে।" এই উক্তির পর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

আমরা ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি—আপাততঃ রুশিয়ার দিকে জাপান হস্ত প্রসারিত করিবে না; সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন-সংযোগ চীনের সম্বন্ধেও সে অধিক উৎকণ্ঠিত নহে। অদূর ভবিষ্যতে অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষ—এই দুইটির যে কোন একটির উদ্দেশে জাপানের আক্রমণ আরম্ভ হওয়া সম্ভব। ইহার কারণ—জাপানের অধিকৃত অঞ্চলকে নিরাপদ করিবার জন্য এই দুইটি অঞ্চলের প্রতি তাহার মনোযোগ একান্ত প্রয়োজন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমাদের এই কথাই মনে হইয়াছে যে, রুশ-যুদ্ধের অভিজ্ঞতার পর জাপানের পক্ষে একাকী এইরূপ বিশাল দেশ আক্রমণে উদ্যত হওয়া স্বাভাবিক নহে; পশ্চিম দিক্ হইতে তাহার ফ্যাসিষ্ট মিত্রের পরোক্ষ সহযোগে সে ভারত আক্রমণে প্রবৃত্ত হইতে পারে। বস্তুতঃ, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ফ্যাসিষ্ট শক্তির মধ্যে সামরিক ও অর্থনীতিক বিষয়ে প্রত্যক্ষ সংযোগের জন্য দক্ষিণ এশিয়ায় অক্ষশক্তির প্রভুত্ববিস্তৃতির প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু য়ুরোপে ফ্যাসিষ্ট শক্তি এখন যে ভাবে বিব্রত, তাহাতে জাপানের পক্ষে এই মিত্রের সহযোগিতা লাভের আশা আপাততঃ নাই; গত শীতকালে রুশ-রণাঙ্গনে জার্ম্মাণীর বিপর্যয় তাহার নিজের পক্ষে যেমন, তাহার মিত্রদিগের পক্ষেও তেমনই কল্পনাতীত ছিল। যদি প্রতীচ্য-মিত্রের সহযোগে ভারত আক্রমণের পরিকল্পনা জাপানের থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে রুশিয়ায় জার্ম্মাণীর অপ্রত্যাশিত পরাজয় তাহাকে নিরাশ করিয়াছে। এই দিক্ হইতে বিবেচনা করিলে রুশ-সেনার বিক্রমেই ভারতবর্ষ আপাততঃ পরিত্রাণ পাইল বলা যাইতে পারে।

সামরিক দিক্ হইতে জাপানের অষ্ট্রেলিয়া আক্রমণ একান্ত প্রয়োজন। অষ্ট্রেলিয়া ও তাহার নিকটবর্ত্তী অবশিষ্ট দ্বীপগুলি যদি সম্মিলিত পক্ষের হস্তচ্যুত হয়, তাহা হইলে পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের বক্ষে তাঁহাদের আর কোন নৌঘাঁটী থাকিবে না অথচ, রুশিয়ার ও চীনের পূর্ব্বাঞ্চলের কথা বাদ দিলে জাপানকে আঘাত করিবার জন্য প্রশান্ত মহাসাগরে সম্মিলিত পক্ষের প্রাধান্য একান্ত প্রয়োজন। উপযুক্ত নৌঘাঁটী ব্যতীত এই প্রাধান্য লাভ সম্ভব নহে; রণপোতগুলি নিরবলম্ব অবস্থায় সমুদ্রবক্ষে ভাসিতে পারে না।

গত মহাযুদ্ধের পর প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যস্থলে অবস্থিত দ্বীপ-সমষ্টিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জাপান ঐ অঞ্চলের জলরাশির প্রকৃত "চাবিকাঠি" হস্তগত করিয়াছিল। এই দ্বীপসমষ্টি হইতেই গত বৎসর সে অতি সহজে পশ্চিম দিকে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে এবং পূর্ব্ব দিকে হাওইতে আঘাত করিতে পারিয়াছিল। তাহার পর, গত বৎসর সিঙ্গাপুর এবং ওলন্দাজ পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ঘাঁটীগুলি অধিকার করিয়া জাপান পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে অত্যন্ত শক্তি-শালী হইয়াছে। এখনও অষ্ট্রেলিয়া ও তাহার নিকটবর্ত্তী যে অঞ্চল সম্মিলিত পক্ষের অধিকারভুক্ত আছে, তিন দিক্ হইতে জাপানী-দানবের সুতীক্ষ্ণ নখর তাহার প্রতি উদ্যত। এই জন্যই অষ্ট্রেলিয়ার বিপদ অত্যন্ত অধিক; এই জন্যই অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী মিঃ কার্টিন্ মধ্যে মধ্যে এইরূপ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, জাপান যদি এখন সত্যই অষ্ট্রেলিয়া অঞ্চলে সকল মনোযোগ প্রদানের সিদ্ধান্ত করিয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ অঞ্চলে সম্মিলিত পক্ষের ঘোর বিপদ উপস্থিত!

তাহার পর, জাপান এখন নিরুৎকণ্ঠায় অষ্ট্রেলিয়ার দিকে অগ্রসর হইতেছে; ব্রহ্মদেশ সম্বন্ধে তাহার অধিক দুশ্চিন্তার কারণ নাই। সম্মিলিত পক্ষের ব্রহ্ম-অভিযানের "শুভ বাসনা" বহু বার শ্রুত হইয়াছে; কিন্তু কার্য্যতঃ আজ প্রায় তিন মাস রথেডংএর বৈচিত্র্যহীন প্রহসনই চলিতেছে। প্রাচ্য অঞ্চলে সামরিক তৎপরতার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সময় শীত এখন অতিবাহিত, বর্ষা আসিতে আর বিলম্ব নাই; বর্ষাকালে ব্রহ্মদেশে অভিযান চলে না। কাজেই জাপান সঙ্গত ভাবেই মনে করিতে পারে—সম্মিলিত পক্ষের ব্রহ্ম-অভিযানের বাসনা আপাততঃ বাসনা মাত্রেই পর্য্যবসিত হইল। পূর্ব্বের চমক-প্রদ সাফল্যে গর্ব্বস্ফীত জাপান আশা করিতে পারে যে, ব্রহ্ম-অভি-যানের উপযোগী পরবর্ত্তী ঋতু আসিবার পূর্ব্বেই সে অষ্ট্রেলিয়ার সমর-শক্তি চূর্ণ করিয়া ব্রহ্মদেশে অখণ্ড মনোযোগ প্রদান করিতে পারে। ইতোমধ্যে ব্রহ্মদেশে জাপান প্রয়োজনানুরূপ প্রতিরোধ-ব্যবস্থাও করিয়াছে। ইহা ব্যতীত, জাপান জানে,—ব্রহ্মদেশে সম্মিলিত পক্ষের অভিযান পরিচালিত হইবার উপযোগী রাজনীতিক অবস্থা

এখনও সৃষ্ট হয় নাই ; ব্রহ্মবাসীর হৃদয় জয় করিবার মত কোন রাজনীতিক প্রতিশ্রুতি বৃটেন এখনও দেয় নাই। ভারতভূমি হইতে ব্যাপক অভিযানে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ভারতের যে রাজনীতিক অচল অবস্থার সমাধান হওয়া উচিত ছিল, বৃটিশ রাজনীতিকদিগের অদূরদর্শিতার ফলে তাহা সম্ভব হয় নাই। জাপান হয় ত আশা করে—চীনে গণ-শক্তির সহিংস প্রতিকূলতার জন্য সে যেরূপ বিব্রত হইয়াছে, সম্মিলিত পক্ষও ব্রহ্মদেশে অভিযানে প্রবৃত্ত হইলে বর্ম্মী জনসাধারণের প্রবল প্রতিকূলতায় সেইরূপ বিব্রত হইবেন। ভারতবর্ষের শোচনীয় রাজনীতিক অবস্থার জন্যও তাঁহারা সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত থাকিবেন।

এডমিরাল্ নিমিৎসের আশ্বাস—

ঠিক এই সময়ে প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত মার্কিণী নৌবহরের অধিনায়ক এডমিরাল নিমিৎস্ বলিয়াছেন—"প্রশান্ত মহাসাগরের মার্কিণী নৌশক্তি এইরূপ কতকগুলি স্থান অধিকারের জন্য প্রস্তুত হইতেছে, যেখান হইতে জাপানের শ্রম-শিল্পকেন্দ্রে প্রত্যক্ষ ভাবে ধ্বংসমূলক আক্রমণ-পরিচালন সম্ভব। প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধে আমরা এখন সন্ধিক্ষণে উপনীত হইয়াছি।"

এডমিরাল্ নিমিৎসের শেষের উক্তিতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই ; প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধ এখন সত্যই সন্ধিক্ষণে উপনীত। কিন্তু সম্মিলিত পক্ষের আক্রমণাত্মক আয়োজনের আভাস পাইবার পূর্ব্বে এডমিরাল্ নিমিৎসের উক্তিতে অধিক উৎসাহিত হওয়া যায় না। তিনি জাপানী দ্বীপপুঞ্জে বিমান-আক্রমণ বা জাহাজ হইতে গোলাবর্ষণের কথা বলেন নাই—জাপানের শ্রমশিল্পকেন্দ্রে প্রত্যক্ষ আঘাতের উপযোগী স্থান অধিকারের আশ্বাস শুনাইয়াছেন।

রুশিয়ার পূর্ব্বতম অঞ্চলের কথা বাদ দিলে জাপানী দ্বীপপুঞ্জে প্রত্যক্ষ আঘাতের একমাত্র উপযুক্ত ঘাঁটী চীনের পূর্ব্বাঞ্চল। রুশিয়ার কোন স্থান আপাততঃ জাপানের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হইবার সম্ভাবনা নাই। কাজেই, জাপানকে প্রত্যক্ষ ভাবে আঘাত করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে চীনের শক্তি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। কিন্তু ব্রহ্ম-চীন পথ যদি উন্মুক্ত না হয়, তাহা হইলে চীনের শক্তি কখনই আশানুরূপ বর্দ্ধিত হইতে পারে না। তাই, জাপানকে প্রত্যক্ষ আঘাতের পরিকল্পনার সহিত সম্মিলিত পক্ষের ব্রহ্ম-অভিযানের সম্বন্ধ অপরিহার্য্য। অথচ, সামরিক অথবা রাজনীতিক—যে কারণেই হউক, সম্মিলিত পক্ষের দ্বিধা ও সঙ্কোচে ব্রহ্ম-অভিযানের উপযুক্ত সময় আজ অতিবাহিত।

আরাকানের উপকূলে গত কয়েক মাস যে গুরুত্বহীন সামরিক তৎপরতা চলিতেছে, সময় সময় উহাকে ব্রহ্ম-অভিযান বলিয়া চিত্রিত করিবার প্রয়াস হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখন ব্রহ্মদেশের যে অঞ্চলে সম্মিলিত পক্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সজ্ঘর্ষে প্রবৃত্ত, উহা "বে-ওয়ারিশ" অঞ্চল মাত্র। পূর্ব্ব দিকে ভারতের রাজনীতিক সীমান্ত যেখানে শেষ হইয়াছে, তাহার কিয়দ্দূরে চিন্দুইন্ নদী ও আরাকান্ য়োমা পর্ব্বতশ্রেণীকে জাপান ব্রহ্মদেশের স্বাভাবিক পশ্চিম সীমান্ত বলিয়া মনে করে। এই সীমান্তরেখার পূর্ব্ব দিকেই জাপানের প্রকৃত সমরায়োজন। এই আয়োজন যে অত্যন্ত ব্যাপক ও শক্তিশালী, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ—গত আট মাস ব্রহ্মদেশে সম্মিলিত পক্ষের উচ্চ-বিঘোষিত বিমান-আক্রমণ সত্ত্বেও জাপান আজ নিশ্চিন্ত মনে অষ্ট্রেলিয়ার দিকে অগ্রসর হইতেছে। স্বভাবতঃই মনে করা যাইতে পারে, জাপানের বিশ্বাস,—সম্মিলিত পক্ষের ব্রহ্ম-অভিযানের সম্ভাবনা যেমন আপাততঃ নাই, তেমনই তাঁহাদিগের বিমান আক্রমণেও জাপানের সুদৃঢ় প্রতিরোধ ব্যবস্থা ক্ষুণ্ণ হইবে না। সে যাহা হউক, চিন্দুইন্ নদী ও আরাকান্ য়োমা পর্ব্বতশ্রেণীর পূর্ব্ব দিকে জাপানের সমরায়োজনে আঘাত করিবার পূর্ব্বে প্রকৃত ব্রহ্ম-অভিযান আরম্ভ হইয়াছে বলা হাস্যোদ্দীপক। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ব্রহ্মদেশের পশ্চিম সীমান্তবর্ত্তী "বে-ওয়ারিশ" অঞ্চলে জাপান না কি তাহার একটিও নিজের সৈন্য নিয়োগ করে নাই ; মালয়ে ও সিঙ্গাপুরে যে সকল ভারতীয় সৈন্য বন্দী হইয়াছিল, তাহাদিগের দ্বারা গঠিত সেনাবাহিনীই এই অঞ্চলে নিয়োজিত। আর সম্মিলিত পক্ষেও না কি সীমান্ত অঞ্চলের উপজাতিরা এই অঞ্চলে যুদ্ধ করিতেছে।

রুশ-রণাঙ্গন—

ষ্ট্যালিনগ্রাডে জার্ম্মাণীর পরাজয় সম্পর্কে বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ ইডেন্ বলিয়াছেন—Hitler has been out-generalled, out-manœuvred and out-fought. বস্তুতঃ, ষ্ট্যালিনগ্রাডে জার্ম্মাণ বাহিনীর পরাজয় বিশ্বের সামরিক ইতিহাসে অতুলনীয়। একটি রণক্ষেত্রে আড়াই লক্ষ সৈন্য বিনষ্ট হইবার কাহিনী ইতঃপূর্ব্বে কোন ঐতিহাসিক লিপিবদ্ধ করেন নাই। আর এই শোচনীয় পরাজয়ের জন্য সর্ব্বপ্রধান সৈন্যাধ্যক্ষরূপে হিটলারই ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী। ষ্ট্যালিনগ্রাডের সাফল্যই সোভিয়েট বাহিনীর শীতকালীন বিজয়ের মূল উৎস। এই উৎস হইতে তাহারা যে সামরিক সুবিধা ও নৈতিক বল লাভ করিয়াছিল, তাহার সম্মুখে শত্রু তিষ্ঠিতে পারে নাই।

গত ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সোভিয়েট বাহিনী দক্ষিণ-রুশিয়ায় বিস্ময়কর সাফল্য লাভ করে। ১ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১৬ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে রুশ-সেনা কর্ত্তৃক রেলওয়ে এঞ্জিন নির্ম্মাণের প্রধানকেন্দ্র ভরোশিলভগ্রাড, গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে ষ্টেশন বীয়েলগোরড্ ও লজোভায়া, ডনের রাজধানী রষ্টভ, কুবানের রাজধানী ক্রাসনোডর এবং সর্ব্বোপরি ইউক্রেণের পুরাতন রাজধানী ও হিটলারের সর্ব্বপ্রধান ঘাঁটী খারকভ পুনরধিকার নাৎসী বাহিনীর তিন বৎসরের ব্লিৎস্‌ক্রিগকেও ম্লান করিয়াছিল। কিন্তু তাহার পর, দক্ষিণ অঞ্চলে অসময়ে বরফ গলিতে আরম্ভ হওয়ায় এবং জার্ম্মাণ-সেনার প্রতিরোধ প্রাবল্য লাভ করায় সোভিয়েট বাহিনীর অগ্রগতি মন্থর হইয়াছে। ইহার পর বিভিন্ন রণক্ষেত্রে রুশ সেনা কিছু অগ্রসর হইলেও খারকভের উত্তরে সুমী এবং কুরস্কের পশ্চিমে লগভ্ রেলষ্টেশন পুনরধিকারই তাহাদিগের একমাত্র উল্লেখযোগ্য সাফল্য।

ইতোমধ্যে মধ্য-রণাঙ্গনে সোভিয়েট বাহিনী তৎপর হইয়াছে। মার্শাল টিমোশেঙ্কো পুনরায় এই অঞ্চলে সৈন্য-পরিচালনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে গুরুত্বপূর্ণ জার্ম্মাণ ঘাঁটী রেজভ্ পুনরধিকারই সোভিয়েট বাহিনীর উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক সাফল্য। গত ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে জার্ম্মাণী এই স্থানটি অধিকার করে এবং ইহার রক্ষার জন্য সুদৃঢ় ব্যূহশ্রেণী রচনা করে। গত বৎসর আগষ্ট মাসে জেনারল ঝুকভ্ রেজভ্ আক্রমণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু সে আক্রমণ ব্যর্থ হয়। তাহার পর, শীতকালে সোভিয়েট বাহিনী রেজভ্‌কে পশ্চাতে রাখিয়া উহার পশ্চিমে গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে জংসন

ভেলিকাই-লুকি. অধিকার করে। কিন্তু পশ্চাতে রেজভ্ অনধিকৃত থাকায় ভেলিকাই-লুকি সম্পূর্ণ নিরাপদ হয় না। এখন মস্কোর পশ্চিমে লাটভিয়ার ১০ মাইল পূর্ব্বে ভেলিকাই-লুকি পর্য্যন্ত অঞ্চলে রুশ সেনা সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। ইতোমধ্যে তাহারা রেজভের দক্ষিণে ঘ্যাটস্ক অধিকার করিয়া ভিয়াস্‌মা বিপন্ন করিয়াছে। ভিয়াস্‌মার পতন হইলে মধ্য-রণাঙ্গনে জার্ম্মাণীর সর্ব্বপ্রধান ঘাঁটী স্মলেন্‌স্ক বিপন্ন হইবে। ভেলিকাই-লুকি হইতে স্মলেন্‌স্কের ৭০ মাইলের দূরেও রুশ সেনা অগ্রসর হইয়াছে।

গত ১৯শে নভেম্বর সোভিয়েট বাহিনীর শীতকালীন অভিযান আরম্ভ হইবার পর গত সাড়ে তিন মাসে রুশ সেনা যে সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে, তাহা কল্পনাতীত। কিন্তু পূর্ব্ব-য়ুরোপে জার্ম্মাণীর চরম পরাজয় এখনও আসন্ন নহে। সোভিয়েট দূত মঃ মেইস্কি সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন—"নাৎসী জার্ম্মাণীকে ধ্বংসোন্মুখ মনে করিলে ভুল হইবে।" মঃ ষ্টালিনও পুনরায় অনুযোগ করিয়াছেন—"য়ুরোপে "দ্বিতীয় রণাঙ্গণ" না থাকায় সোভিয়েট বাহিনী একাকী সকল আঘাত সহ্য করিতেছে।" লর্ড বীভারব্রুকের সতর্কবাণী—"সোভিয়েট বাহিনীর আক্রমণের ফল কল্পনাতীত হইলেও অত্যধিক আশা পোষণ করা উচিত নহে; জুন মাসে পুনরায় জার্ম্মাণীর আক্রমণ আরম্ভ হইতে পারে।"

বলা বাহুল্য, নাৎসী জার্ম্মাণী যখন বর্ত্তমানে পূর্ব্ব য়ুরোপে বিশেষ ভাবে বিপন্ন, সেই সময় তাহাকে পশ্চিম দিক্ হইতে সজোর আঘাত করিতে পারিলে তাহার বিশাল সামরিক যন্ত্র এই বৎসরই সম্পূর্ণরূপে অচল হইতে পারে। তাই, মঃ মেইস্কির সঙ্গত আবেদন —"আসুন, আমরা ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দকে নাৎসী জার্ম্মাণীর ও তাঁহার তাঁবেদারদিগের চরম পরাজয়ের বৎসর করিয়া তুলি।" বস্তুতঃ, এই বৎসরের সুবর্ণ সুযোগ যদি চলিয়া যায়, তাহা হইলে আগামী বৎসর অপ্রত্যাশিত নূতন সমস্যার উদ্ভব হইতে পারে।

রুশ সেনার শীতকালীন সাফল্যের গুরুত্ব যতই অধিক হউক না কেন, আগামী গ্রীষ্মকালে জার্ম্মাণ সেনাপতিরা যদি যুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তনে সমর্থ হন, তাহা হইলে তখন সোভিয়েট বাহিনী নূতন সামরিক সমস্যার সম্মুখীন হইবে। শীতকালে রুশ সেনা যে বিশাল অঞ্চল পুনরধিকার করিয়াছে, যুধ্যমান উভয় পক্ষের ধ্বংসাত্মক কার্য্যের ফলে উহা এখন শ্মশানক্ষেত্র মাত্র। গত বৎসর সোভিয়েট সেনা এই অঞ্চল ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে কারখানাগুলি যথাসম্ভব উরল অঞ্চলে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। তাহার পর, সুপরিকল্পিত বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই স্থানে ধ্বংসাত্মক কার্য্য চলে। গত এক বৎসরে ইউক্রেণ প্রদেশে যদি জার্ম্মাণীর কোন গঠনমূলক কার্য্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই বৎসর নাৎসী বাহিনী প্রত্যাবর্ত্তনের সময় নিশ্চয়ই তাহা অক্ষত রাখিয়া যায় নাই। কাজেই, আগামী গ্রীষ্মকালে সোভিয়েট সেনাকে যদি পুনরায় নাৎসী-আক্রমণের সম্মুখীন হইতে হয়, তাহা হইলে তখন তাহারা ডোনেৎস অববাহিকার শ্রমশিল্পকেন্দ্রের এবং কুবানের কৃষিসম্পদের (কৃশিয়ায় আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকার্য্য চলে) দ্বারা উপকৃত হইবে না। ইউক্রেণ-কৃষিক্ষেত্রের দগ্ধ মৃত্তিকার তাপও তখন জুড়াইবে না। এমন কি, ভল্‌গার তীরবর্ত্তী শ্রমশিল্পকেন্দ্র তখনও পরিপূর্ণরূপে কার্য্যোপযোগী হইবে না। আমরা এখন জার্ম্মাণ-সেনার পশ্চাদপসরণের সঙ্গে সঙ্গে রুশ সেনার পুনরধিকৃত অঞ্চলে গঠনমূলক কার্য্যের কথা শ্রবণ করিতেছি। কিন্তু এই গঠনমূলক কার্য্য নিশ্চয়ই 'রাতারাতি' শেষ হইতে পারে না। কাজেই, আগামী দুই-তিন মাসের মধ্যেই যদি জার্ম্মাণীর প্রতি-আক্রমণ আরম্ভ হয়, তাহা হইলে তখন রুশ সেনা নিকটবর্ত্তী অঞ্চল হইতে সরবরাহের সুবিধায় বঞ্চিত হইবে; সেতু ও রেল-ষ্টেশন ধ্বংস হওয়ায় উরল অঞ্চল হইতে দ্রব্যাদির দ্রুত সরবরাহেও অসুবিধা ঘটিতে পারে। পক্ষান্তরে, জার্ম্মাণীর সরবরাহ-সূত্র সংক্ষিপ্ত হওয়ায় সে অধিকতর সুবিধা পাইবে। তাহার এই সরবরাহ-সূত্র বৎসরাধিক কালের চেষ্টায় পরিপূর্ণরূপে কার্য্যোপযোগীও হইয়াছে।

আগামী গ্রীষ্মকালে জার্ম্মাণীর প্রতি-আক্রমণের সময় রুশ সেনার এই সম্ভাবিত অসুবিধার কথা স্মরণ করিলে রুশিয়ার সাম্প্রতিক সাফল্যে অধিক উৎসাহিত হওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা যাইতে পারে—আগামী গ্রীষ্মকালে জার্ম্মাণীর প্রতি-আক্রমণ সম্ভাব্যতার গণ্ডীতে আবদ্ধ নহে; অনতিবিলম্বে যদি তাহাকে য়ুরোপের অন্য কোন স্থানে যুদ্ধে ব্যাপৃত করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে আগামী গ্রীষ্মকালে পূর্ব্ব-য়ুরোপে তাহার আক্রমণ প্রবলতর—হয় ত ব্যাপকতরও হইবে। আমরা জানি, জার্ম্মাণী তাহার অবশিষ্ট শক্তি সর্ব্বতোভাবে যুদ্ধে নিয়োগের জন্য প্রস্তুত হইতেছে; টিউনিসিয়ার রণক্ষেত্রে তাহার শক্তির এক নগণ্য ভগ্নাংশ নিয়োজিত মাত্র।

টিউনিসিয়ার রণক্ষেত্র—

টিউনিসিয়ায় চরম শক্তি-পরীক্ষা এখনও আরম্ভ হয় নাই। ইতোমধ্যে মধ্য-টিউনিসিয়ায় সম্মিলিত পক্ষ বিশেষ ভাবে পরাজিত হইয়া কতকগুলি স্থান ত্যাগে বাধ্য হইয়াছিলেন; পুনরায় উঁহারা সে সকল স্থান অধিকার করিয়াছেন। দক্ষিণ দিকে জেনারল মণ্টগোমারী ম্যারেথ লাইনে আঘাত করিতেছেন; তবে, উহা চূর্ণ হইবার কোন লক্ষণ এখনও দেখা যায় নাই। উত্তর-টিউনিসিয়ায় জার্ম্মাণীর সামান্য তৎপরতা লক্ষিত হইতেছে। বস্তুতঃ, টিউনিসিয়ার সকল রণক্ষেত্রেই এখন যে সামান্য সঙ্ঘর্ষ চলিতেছে, উহা স্থানীয় সঙ্ঘর্ষ মাত্র। তবে, ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যভাগে মধ্য-টিউনিসিয়ায় সম্মিলিত পক্ষ যখন পশ্চাদপসরণে বাধ্য হন, তখন সে যুদ্ধে তাঁহাদিগের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। সম্মিলিত পক্ষ পরে যখন মধ্য-টিউনিসিয়ায় সাফল্য অর্জ্জন করেন, তখন শত্রুর অধিক ক্ষতিসাধন সম্ভব হয় নাই; শত্রুসৈন্য প্রায় সর্ব্বত্র বিনা যুদ্ধে পশ্চাদপসরণ করিয়াছে।

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী বৃটিশ কমন্স সভায় সমর-সমালোচনা কালে মিঃ চার্চ্চিল বলেন—যদিও পূর্ব্বাহ্নে অতিরিক্ত আশা প্রকাশ তাঁহার স্বভাব নহে, তবুও তিনি এই কথা বলিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না যে, ষ্ট্যালিনগ্রাডে যেরূপ দক্ষ রণকৌশলের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল, টিউনিসিয়ায়ও সেইরূপ রণকৌশলের পরিচয় পাওয়া যাইবে। কিন্তু সেই পরিচয় কবে ও কি ভাবে প্রকট হইবে, তাহা এখনও দুর্ব্বোধ্য। অবশ্য, মিঃ চার্চ্চিল আগামী ৯ মাসের মধ্যে আফ্রিকায় তাঁহাদের সমরায়োজনের ফল পাইবার কথা বলিয়াছেন। তিনি কি মনে করিয়া ৯ মাস—অর্থাৎ আগামী নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু টিউনিসিয়ার স্বল্প-পরিসর রণাঙ্গনে সম্মিলিত পক্ষকে আটক রাখিয়া জার্ম্মাণী যদি আর একটি গ্রীষ্মকালীন অভিযান পরিচালিত করিতে পারে, তাহা হইলে উহার ফল শুভ হইবে না। জার্ম্মাণী এখন তাহার আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন; সে নিশ্চয়ই এই গ্রীষ্মকালে যুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তনের জন্য প্রাণপণ শক্তিতে চেষ্টা করিবে। এই সময় কেবল পূর্ব্ব-য়ুরোপে নহে—অন্যত্রও তাহার সমর-প্রচেষ্টা প্রসারিত হইবার সম্ভাবনা আছে। জার্ম্মাণী টিউনিসিয়ার রণক্ষেত্রে বিলম্বই চাহিতেছে; সম্মিলিত পক্ষ যদি তাহার এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে বাধ্য হন, তাহা হইলে উহা হয় ত অত্যন্ত আশঙ্কার কারণ হইবে।

৮।৩।৪৩ শ্রীঅতুল দত্ত।

সাময়িক প্রসঙ্গ

বাঙ্গালায় খাদ্য-সঙ্কট

বাঙ্গালায় যে দারুণ খাদ্যাভাব ঘটিয়াছে, তাহা কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। নানা স্থান হইতে যেরূপ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহা হইতে বুঝা যায়, বাঙ্গালায় সর্ব্বত্রই যেন দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া প্রসারিত। মোটা চাউলের মূল্য কোথাও পনর কুড়ি টাকা মণের কম নহে। এ দরও ক্রমবর্দ্ধমান। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সরকার শুধু চোরা বাজারের দোহাই দিয়াই সকল দায়িত্ব এড়াইবার প্রয়াস পাইতেছেন। ১৪ই ফাল্গুন বঙ্গীয় সরকারের প্রধান-সচিব নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে এইরূপ সঙ্কটকালে চোরা বাজার সর্ব্বত্রই দেখা দিয়া থাকে। অনেক স্থানে ধান্য প্রভৃতি লুণ্ঠিত হইতেছে। রাজসাহী—বরিশাল—পটুয়াখালি প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে নৌকা-বোঝাই চাউল লুণ্ঠিত হইয়াছে। পূর্ব্ব-বঙ্গে মুন্সিগঞ্জের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের বাঙ্গলায় যাইয়া প্রায় এক সহস্র বুভুক্ষু লোক খাদ্যের প্রার্থনা করিয়াছিল। তন্মধ্যে শিশুসন্তানসহ জননীও অনেক ছিল। সর্ব্বত্রই চুরি, ডাকাতি এবং রাহাজানি অতিশয় বৃদ্ধি পাইতেছে। ২০শে ফাল্গুন রাত্রিতে রাজসাহী জিলার বীরকুৎসা গ্রামে জমিদার শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে কাবুলীবেশধারী ৫০।৬০ জন ডাকাত বহু টাকা মূল্যের অলঙ্কারাদি লুণ্ঠন করিয়াছে। সরকার ক্রমাগতই বলিতেছেন যে, চোরা বাজারে সব মাল গোপন করা হইতেছে। ইহার প্রতিকার কি সরকারের পক্ষে কঠিন? সরকার কি করিয়া বলিলেন যে, চোরা বাজারই সব মাল গিলিয়া ফেলিতেছে? তাঁহাদের বল, বুদ্ধি, ভরসা ত' কেবল কৃষিবিভাগের হিসাব। সে দিন মিষ্টার লসন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বলিয়াছেন যে, কৃষি বিভাগের হিসাব আন্দাজী। আমরাও সে কথা অনেকবার বলিয়াছি; কিন্তু সরকার তাহারই উপর নির্ভর করিয়া দেশের লোকের কথা উপেক্ষা করিতেছেন, ইহাই বিচিত্র। বাঙ্গালায় ধান্যাদির মূল্য দিন দিন অসম্ভব বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া মনে হয়, হয় ত' চাষীরা ঐ সকল পণ্য বিক্রয়ার্থ সম্পূর্ণভাবে বাজারে উপস্থিত করিতেছে না; ইহা সম্ভব, কিন্তু বাজারে তাহা যে প্রয়োজনানুরূপ পাওয়া যাইতেছে না, তাহা সত্য। যদি বাজারে ক্রমাগতই খাদ্যশস্যের মূল্য বাড়িয়াই যাইতে থাকে, তাহা হইলে সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া সরকারের খাদ্যশস্যের উচ্চতম মূল্য ধার্য্য করিয়া দেওয়াই অবশ্য কর্ত্তব্য। মার্কিণের ন্যায় ধনাঢ্য দেশে খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইলে বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু ভারতের ন্যায় অতি দরিদ্র দেশে ইহার ফল সাংঘাতিক। ২০শে ফাল্গুনের দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, অষ্ট্রেলিয়া হইতে লক্ষাধিক মণ গম আমদানী হইয়াছে—কলিকাতা—বোম্বাই মাদ্রাজ প্রদেশ প্রচুর গম পাইয়াছে: কিন্তু তাহা কি সামরিক বিভাগের প্রয়োজনেই নিঃশেষিত হইয়া গেল? বাজারে আটা-ময়দার চিহ্নও ত' আমরা দেখিতে পাইতেছি না। বাঙ্গালায় চাউলের অভাব গোধুমের দ্বারা মিটিবে না—চাউল চাই, আজ বাঙ্গালায় সর্ব্বত্রই চাউলের অভাবে হাহাকারের রোল উঠিয়াছে। ২৭শে ফাল্গুন বাঙ্গালা সরকারের আদেশে বর্দ্ধমান, বীরভূম, ২৪ পরগণার ডায়মণ্ড-হারবার-বসিরহাট, মেদিনীপুর, খুলনা, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালি, রাজসাহী প্রভৃতি চাউল ও ধান্য সর্ব্বাধিক মজুতের ১৪টি জেলা হইতে ২০ মণের অধিক চাউল বা ৩০ মণের অধিক ধান্য খাদ্যশস্য ক্রয়ের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর বিনানুমতিতে চালান দেওয়া ভারতরক্ষা বিধি অনুসারে নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং মোটা ও মাঝারি চাউলের নিয়ন্ত্রিত মূল্য বাতিল হইয়াছে। উড়িষ্যা হইতে লক্ষ মণ চাউল আমদানী হইবে শুনিয়াছিলাম; কিন্তু তাহাই কি বাঙ্গালার ক্ষুন্নিবৃত্তির পক্ষে যথেষ্ট হইবে?

বোম্বাইয়ের মত খাদ্য-বণ্টন কার্ড দিয়া নিয়ন্ত্রিত মূল্যে পরিমিত খাদ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের পরিকল্পনা হইতেছে। কিন্তু নিয়ন্ত্রিত মূল্যে চাউল, চিনি, কেরোসিন প্রভৃতি বিক্রয়-কেন্দ্রে জনস্রোতের বিড়ম্বনা ভোগ দেখিয়া তাহা কত দূর সুফলপ্রদ হইবে, বলা দুষ্কর। ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মিষ্টার রক্সবার্গ সম্প্রতি ডিরেক্টার অফ সিভিল সাপ্লাইজ নিয়োজিত হইয়াছেন। শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার খাদ্য-সমস্যা সমাধান জন্য নবগঠিত পরামর্শদাতৃসমিতির সভাপতি মনোনীত এবং এক জন খাদ্য-সচিবও নিযুক্ত হইবেন। তাঁহাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়—নিয়ন্ত্রণাধীনে খাদ্য-সমস্যার সমাধান হইতে পারিবে, এমন আশা দুরাশায় পরিণত না হয়, ইহাই বাঞ্ছনীয়।

—

বাঙ্গালায় চাউলের ভীষণ অভাব

বাঙ্গালায় যে ধান-চাউলের বিশেষ অভাব হইয়াছে, তাহা কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সরকার পক্ষ হইতে ক্রমাগতই বলা হইতেছে যে, বাঙ্গালায় ধান-চাউলের বিশেষ অভাব ঘটে নাই। এ কথা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, তাহা আমরা বহু বার বলিয়াছি। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ শ্রীযুত উদয়চাঁদ মহাতাব বাহাদুর সরকারী হিসাব হইতে সঙ্কলন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বাঙ্গালায় প্রতি জিলাতেই এবার ধানের অভাব হইয়াছে। তিনি দেখাইয়াছেন, প্রত্যেক জিলায় যত লোকের বাস এবং তাহাদের বাৎসরিক খাইবার জন্য যত ধান্যের প্রয়োজন, কোন জিলাতেই তত ধান্য উৎপন্ন হয় নাই। আমরা তাঁহার প্রদত্ত হিসাব হইতে বাঙ্গালার প্রত্যেক জিলায় কত ধান্যের অভাব, তাহা না দিয়া প্রত্যেক বিভাগে কত মণ ধান্যের অভাব, তাহা এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

বিভাগের নাম	কত ধানের অভাব				
বর্দ্ধমান বিভাগ	৩ কোটি	১২ লক্ষ	৪১ হাজার	৬ শত	৮১ মণ
প্রেসিডেন্সী "	৬ "	৫১ "	৫৩ "		১ "
রাজসাহী "	৫ "	৩৪ "	৩৭ "	৬ "	৫১ "
ঢাকা "	৬ "	৭২ "	২৬ "	২ "	৮১ "
চট্টগ্রাম "	২ "	১৫ "	২১ "	৪ "	৩০ "
মোট	২৫ কোটি	৫১ লক্ষ	১৬ হাজার		৪৪ মণ

যদি প্রতি একরে (তিন বিঘায়) ১৮ মণ ৩২ সের করিয়া ধান জন্মে স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও বাঙ্গালায় ২৫ কোটি ৩৮ লক্ষ ৬৬ হাজার ২ শত ৭২ মণ ধানের অভাব ঘটিয়াছে। মহারাজাধিরাজ বাহাদুর স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, দেশের অধিকাংশ কৃষক যে চাউল উৎপন্ন করে, তাহা তাহাদের সম্বৎসর খাইতেই কুলায় না। অনেক কৃষক

বৈশাখ মাস হইতে ধান কিনিয়া খাইতে আরম্ভ করে। অল্পসংখ্যক কৃষকই উদ্বৃত্ত ধান বিক্রয় করিয়া থাকে। যে অল্প সংখ্যক কৃষকের জোতে ১০ বিঘার অধিক জমি আছে, তাহারাই ধান বিক্রয় করে। অবশিষ্ট কৃষকরা অল্পাধিক ধান বা চাউল কিনিয়া খায়। যাহারা ধান বেচিয়া থাকে, তাহারা হয় ত' এবার ধান কিছু হাতে রাখিয়া বেচিতেছে। এবার চাউলের মূল্য দিন দিন অত্যন্ত বৃদ্ধি হইতেছে বলিয়া তাহারা ঐরূপ করিতেছে। সে জন্য তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। মহারাজাধিরাজ বাহাদুর বাঙ্গালার প্রতি একর জমিতে গড়ে ২০ মণ ধান্য জন্মে ধরিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে গড়ে প্রতি একরে ১৬ মণ ধানও জন্মে না। ভূমির রাজস্ব-কমিশন প্রতি একরে ১৮'৮ মণ ধান জন্মে ধরিয়াছেন, কিন্তু ভারত সরকার প্রতি একরে ১৫ মণের কিছু অধিক ধান্য জন্মে স্বীকার করিয়াছেন। এ দেশের লোকেরও ধারণা প্রতি একরে গড়ে ১০ মণ চাউলের অর্থাৎ প্রায় ১৫ মণ ধানের অধিক জন্মে না। এ দেশের কৃষির যেরূপ অবস্থা, তাহাতে প্রতি বৎসরই বারিপাতের বৈলক্ষণ্য হেতু এবং পোকা-মাকড়ের উপদ্রবে ও ঝড়-ঝঞ্ঝায় প্রচুর শস্য নষ্ট হয়। কোন বৎসরই সম্পূর্ণ ধান্য জন্মে না। কাজেই আমাদের মনে হয়, খাদ্য বিষয়ে সঠিক হিসাব নিরূপণ করিতে হইলে প্রতি একরে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ১০ মণের অধিক ধরা উচিত নহে। তাহা হইলে বাঙ্গালায় চাউলের অনটন যে আরও সাংঘাতিক, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে খাদ্য-সমস্যা

২৫শে ফাল্গুন বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বঙ্গীয় সরকারের বাণিজ্য এবং শ্রমিক বিভাগের সচিব ঢাকার নবাব বাঙ্গালা প্রদেশের খাদ্য-সমস্যা এবং কি প্রকারে তাহার সমাধান সম্ভব, তৎসম্বন্ধে এক বিবৃতি দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, সরকারের খাদ্য-সমস্যা সমাধানের নূতন পরিকল্পনা অনুসারে সরকারই কেবল খাদ্য-শস্যের একমাত্র ক্রেতা হইবেন। সরকার কোন এক স্থানে ধান বা চাউল জমা রাখিয়া যেখানে যেমন পরিমাণ তণ্ডুলাভাব ঘটিবে, সেই বাজারে কতকটা অবাধ বাণিজ্য-নীতির পদ্ধতি হিসাবে অল্প দরে সেই ধান্য ছাড়িবেন। ভারত সরকার সমস্ত বৃটিশ-শাসিত ভারতে খাদ্যনিয়ন্ত্রণের এক পরিকল্পনা করিতেছেন,—সেই পরিকল্পনা যখন কার্য্যক্ষেত্রে চালান হইবে, তখন বাঙ্গালা যে পরিমাণ খাদ্য পাইবার অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হইবে, সেই পরিমাণ খাদ্য পাইবে। বিতর্ক প্রসঙ্গে প্রধান-সচিব স্বীকার করিয়াছেন যে, এ পর্য্যন্ত তাঁহারা খাদ্যনিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য যতগুলি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটিই নিষ্ফল হইয়াছে। আমাদের ধারণা, সরকার আপাততঃ যে নূতন পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহাও নিষ্ফল হইবে,—ইহাতে লোকের কষ্ট বাড়িবে এবং লোকের মনে আতঙ্কের সঞ্চার হইবে। সরকার ত' খাদ্যশস্য বণ্টনের পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা করিয়া নিষ্ফল হইতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের এই পরিকল্পনা-প্রতীক্ষায় সুদীর্ঘ সময় অপেক্ষা করিয়া থাকিয়া যে লোকের খাদ্যাভাবে কণ্ঠাগত প্রাণ হইল, তাহার কি? পরিকল্পনা ত' অনেক হইল, এখন সত্বর সমস্যার সমাধান হইলে আমাদের প্রাণ রক্ষা হয়।

বাঙ্গালার বাজেট

৪ঠা ফাল্গুন বাঙ্গালার প্রধান-সচিব মৌলবী ফজলুল হক বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাঙ্গালার বর্ত্তমান বৎসরের সালতামামি হিসাব এবং আগামী বৎসরের বাজেটের হিসাব পেশ করিয়াছেন। এবার বাঙ্গালার বড়ই দুঃসময়। দৈবী এবং মানুষী আপদে বাঙ্গালা ঘোর বিড়ম্বনাগ্রস্ত! শত্রুও বাঙ্গালায় হানা দিতেছে। অন্নাভাবে সোনার বাঙ্গালা উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। রাজনীতিক এবং অর্থনীতিক কারণে দেশে ঘোর অশান্তি দেখা দিয়াছে। এরূপ অবস্থায় বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতের আয়-ব্যয়ের পরিমাণ ঠিক মত করা কঠিন। এবার ভারত সরকারের নিকট হইতে প্রায় ৪ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়া তবে বর্ষশেষে ১ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা স্থিতি করা হইল। আগামী বর্ষে রাজস্ব খাতে ১ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে, কিন্তু ঋণ বাবদ ২৬ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত ধরিলে আগামী বর্ষশেষে ৮৭ লক্ষ টাকা সরকারী তহবিলে উদ্বৃত্ত থাকিবে। আগামী বর্ষশেষে ভারত সরকারের নিকট বাঙ্গালা সরকারের ঋণের পরিমাণ ৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা দাঁড়াইবে। বাঙ্গালা সরকারের তহবিলে যে ঘাটতি হইবে, তাহা পূরণের জন্য প্রধান সচিব এই কয় দফা কর বৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন—(১) আমোদ-প্রমোদ কর, (২) জুয়া খেলার কর, (৩) ঘোড়দৌড়ের বাজী সম্পর্কিত কর, এবং (৪) বিদ্যুৎ কর বৃদ্ধি করিয়া ৩৩ লক্ষ টাকা তুলিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। উপস্থিত দুই বৎসরের জন্য এই করগুলি বৃদ্ধি করা হইবে। ইহাই বঙ্গীয় বাজেটের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

যখন এত টাকার ঘাটতি, তখন আর সামান্য ৩৩ লক্ষ টাকার জন্য আমোদ-প্রমোদ এবং বিদ্যুতের উপর কর বৃদ্ধি করিয়া লোককে কষ্ট না দিলেই সঙ্গত হইত। বাঙ্গালার অবস্থা যেরূপ, তাহাতে বাঙ্গালীর পক্ষে আর অধিক কর দিবার শক্তি নাই। দুর্দ্দশাগ্রস্ত বাঙ্গালীর জীবনে বিরক্তি-প্রশমন—চিত্তবিনোদনের উপায় আমোদ-প্রমোদের সুবিধা সঙ্কোচ বিধান করা শোভন ও সঙ্গত নহে। বিদ্যুতের উপর করের হার বৃদ্ধি করিলে সাধারণের বিশেষতঃ বিদ্যুচ্চালিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির প্রভূত ক্ষতি হইবে। সুতরাং এই দুই বাবদ কর বৃদ্ধির প্রস্তাব সমীচীন হইবে না। যুদ্ধের সময় ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াই থাকে, ঋণও করিতে হয়। এরূপ স্থলে এই দুর্দ্দিনে ৩৩ লক্ষ টাকা তুলিবার জন্য সাধারণের অসুবিধা করা কর্ত্তব্য নহে। ভারত সরকারের কাছে যখন আগামী বর্ষশেষে ৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ঋণই হইবে, তখন ৫ কোটি বা তাহার উপর কিছু অধিক টাকা ঋণ করিতে এত সঙ্কোচ কেন? বাঙ্গালা সরকারের বাজেট এবার নানা কারণে অসন্তোষজনক। শিক্ষা, শিল্প এবং জনসাধারণের স্বাস্থ্য সম্পর্কে টাকা অধিক দেওয়া দূরে থাকুক, তাহার ব্যয় সঙ্কোচ করা হইয়াছে। শিক্ষা বাবদ ৪ লক্ষ টাকা, স্বাস্থ্য বাবদ ৮ লক্ষ টাকা এবং শিল্প বাবদ ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয় সঙ্কোচ করা হইয়াছে। কোন সভ্য দেশেই এরূপ করা হয় নাই। রুশিয়া, চীন এবং মার্কিণ এই তিন দেশই বর্ত্তমানে যুদ্ধে লিপ্ত। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোন দেশ ঐ তিনটি জনহিতকর ব্যাপারে ব্যয় সঙ্কোচ করিবে বলিয়া জানা যায় নাই। মৌলবী ফজলুল হকের জন্য আমরা বাস্তবিক দুঃখিত। বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহার ক্ষমতা

যেরূপ সঙ্কুচিত, তাহাতে তাঁহার কাছে আর কিছুই আশা করা যায় না। দেশের লোক অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছে,—৪ টাকা মণ চাউল ২০।২২ টাকা মণে কিনিতে বাধ্য হইতেছে, তাহার প্রতিকারকল্পে যে সকল লোক নিযুক্ত হইতেছেন, তাহাতে ফল সুবিধাজনক হইবে না, ইহাই সকলের বিশ্বাস। অথচ অধিক খাদ্য উৎপাদন আন্দোলন চালাইবার জন্য পৌণে ১৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া কি লাভ হইল, তাহা বুঝা যায় না। মৌলবী ফজলুল হকই বলিয়াছেন যে, ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস হইতে তিনি যান-বাহন কার্য্যের সঙ্কোচ সাধন ফলে সরবরাহ ব্যাপারে বিশেষ অশ্বস্তি অনুভব করিতেছেন। তিনি বলিয়াছেন—"আমি কাতর ভাবে কেবল ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতে পারি যে, যদি আমি এই প্রদেশের লোকের প্রতি যথাকর্ত্তব্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া থাকি, তাহা হইলে তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন।" তাঁহার এ প্রার্থনা কি নিতান্ত নিরুপায়-অসহায়ের প্রার্থনা ?

রেলওয়ে বাজেট

৩রা ফাল্গুন ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভারত সরকারের যানবাহন বিভাগের সদস্য সার এডওয়ার্ড বেন্থল এবং রাষ্ট্রীয় পরিষদে রেলওয়ে কমিশনার সার লিওনার্ড বর্ত্তমান বর্ষের রেলওয়ের সালতামামি এবং বাজেটের যে হিসাব পেশ করিয়াছেন, তাহাতে বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। গত চারি বৎসরের মধ্যে ভারত সরকারের রেলপথের আয় শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত বৎসর বাজেট করিবার সময় রেলওয়ে বিভাগে যত আয় হইবে অনুমান করা হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা আয় ১৮ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা অধিক হইয়া ১৪১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকায় উন্নীত হইবে বলিয়া আশা হইয়াছে। গত বৎসর সরকারী রেলে যত আয় হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা বর্ত্তমান বৎসরে ১৪ কোটি টাকা বেশী আয় হইবে। সার এডওয়ার্ড বেন্থল্ হিসাব করিয়া বুঝিয়াছেন যে, বর্ত্তমান বৎসরে অর্থাৎ আগামী ৩১শে মার্চ্চ যে সরকারী বৎসর শেষ হইবে, খরচ-খরচা বাদে সেই বৎসর সরকারী রেলওয়েগুলিতে ৩৬ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা এবং আগামী বৎসর সেই স্থানে ৩৬ কোটি ৪ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে। বর্ত্তমান যুদ্ধের জন্য রেলপথগুলির সামরিক প্রয়োজনে অনেক সৈন্য, রসদ, সমর-সম্ভার প্রভৃতি বহন করিতে হইয়াছে ও হইতেছে। সেই জন্যই রেলওয়ের আয় অপ্রত্যাশিত ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ সামরিক কার্য্যসাধন জন্য দেশের লোককে কার্য্যতঃ যথাসম্ভব রেলপথে ভ্রমণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, নাগরিক যাত্রীদিগের যাতায়াতের ট্রেণগুলি যত দূর পারিয়াছেন কমাইয়া দিয়াছেন,—এবং মাল-বহনের কার্য্যও প্রয়োজনানুরূপ করিতে অক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই আয় বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহাই বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়।

সাধারণের কার্য্যে রেলওয়ে বিভাগ বিশেষ অবহিত হন নাই বরং ভাড়া কমানো (Reduced rates) সুবিধাদান (Concession) প্রভৃতি রহিত এবং পার্শেলে, লগেজে, অল্প জিনিষ প্রেরণের উপর অধিক ভাড়া আদায়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও রেলওয়ের এই আয় বৃদ্ধি হইতে বুঝা যায় যে, রেলপথগুলি কিরূপ একাগ্রভাবে সরকারের সামরিক প্রয়োজন সাধনে রত হইয়াছে। দেশের লোককে সে জন্য বাধ্য হইয়া অনেক অসুবিধা সহিতে হইতেছে। ক্ষয়াদি পূরণ বাবদ ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়াতে খরচার দিকে ১১ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। ফলে খরচার পরিমাণ হইয়াছে ৮৬ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা। যুদ্ধ হেতু দুর্ম্মূল্যতার জন্য কর্ম্মচারীদিগকে ভাতা প্রদান প্রভৃতি এবং পূর্ব্বভারতে রেলপথগুলিকে সামরিক নিয়মে চালিত করা এবং বন্যা, বাত্যা ও রেলধ্বংস প্রভৃতি ক্ষতিপূরণ বাবদ যে অতিরিক্ত টাকা খরচ হইয়াছে, তাহা বাদ দিয়া রেলওয়ে রাজস্ব ৬৪ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা দাঁড়াইবে। সুদ বাবদ ২৮ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা দিয়া রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের থাকিবে ৩৬ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা। সর্ব্ববিধ ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া, দেনা ও সুদ দিয়াও সরকারী রেলপথ এবার স্বতন্ত্র করিবার সর্ত্তমতে যত টাকা ভারত সরকারকে দিবার কথা, তাহা অপেক্ষা ২ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা অধিক দিবেন। এই আয়ের প্রধান কারণ রেলওয়ের মাশুল বৃদ্ধি। অল্প পরিমাণ খাদ্যশস্য চালান বাবদ মাশুল ও অন্য কতকগুলি মালের উপর শতকরা সাড়ে ১২ টাকা হারে এবং এক টাকার ব্যতীত যাত্রী-মাশুলের উপর শতকরা সাড়ে ৬ টাকা হারে মাশুল বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ইহা প্রকারান্তরে কর-বৃদ্ধি। এই বাবদ ১০ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকায় রেলওয়ে এঞ্জিন এবং ৪২ লক্ষ টাকার পাটি ভারত হইতে বিদেশে পাঠান হইয়াছে। ভারতকে উহা আবার অধিক মূল্য দিয়া কিনিতে হইবে। ইহার জন্য যে অধিক ব্যয় হইবে, তাহা আর হিসাবের মধ্যে থাকিবে না।

আগামী ১৯৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দে রেলওয়ে খাতে ১৪০ কোটি টাকা আয়, আর ৮৮ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। সুতরাং ৬১ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা স্থিতি হইবে, ইহাই সার এডওয়ার্ড বেন্থলের অনুমান। আগামী বারে রেলওয়ে রিজার্ভ ফণ্ডে ৮ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা রাখিলেও ৩৬ কোটি ৪ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে। রেল বিভাগে যখন এইরূপ অপ্রত্যাশিত লাভের সম্ভাবনা, তখন দেশের লোকের পক্ষে ভাড়া ও মাশুল কমিবে এরূপ আশা করা স্বাভাবিক, কিন্তু তাহা সম্ভব হয় নাই। ভাড়া বৃদ্ধি করা হইল না বলিয়া রেলওয়ে সদস্যের গর্ব্ব করিবার কিছুই নাই। রেলওয়ের এই অতিরিক্ত আয় একটা মিথ্যা মায়াজাল হইতেও পারে। দেশের লোক এই আয়ের অনেকটা দিয়াছে আর সামরিক প্রয়োজনেও যথেষ্ট অর্থাগম হইয়াছে। যুদ্ধ থামিলে এই আয়ও কমিবে। তবে রেলের ভাড়া একবার বাড়িলে সহজে কমিবে, ইহা দুরাশা মাত্র।

সার এডওয়ার্ড বেন্থল বলিয়াছেন যে, সামরিক কার্য্য বৃদ্ধি হেতু অনাবশ্যক দ্রব্যাদি বহনের সঙ্কোচ করা হইয়াছে এবং ট্রেণের সংখ্যা শতকরা ৩৭খানি হিসাবে কমানো হইয়াছে সত্য, কিন্তু খাদ্যশস্য বহন বিষয়ে শৈথিল্য করা হয় নাই। খাদ্যদ্রব্য রেলওয়েগুলি সর্ব্বাগ্রে বহন করিবে। কিন্তু ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, এ দেশে সত্য সত্যই চাউলের নিদারুণ অভাব ঘটিয়াছে। মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ বাহাদুরের পুস্তিকায় তাহা সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে। সার এডওয়ার্ড বেন্থল স্বীকার করিয়াছেন যে, দেশে খাদ্যশস্যের কিছু অভাব ঘটিয়াছে, কিন্তু বণ্টনের দোষেই সমস্যা অত্যন্ত জটিল হইয়া উঠিয়াছে। ইহার প্রমাণ তিনি

কি পাইয়াছেন; তাহা সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করিলে আমরা আশ্বস্ত হইতে পারিতাম !

রেলবিভাগে আশাতিরিক্ত লাভ হওয়া সত্ত্বেও যাত্রীগাড়ীর বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে না—স্থানাভাবে যাত্রিগণের অসুবিধার সীমা নাই। পর্ব্ব-উৎসবে তীর্থদর্শনের জন্য অতিরিক্ত ট্রেণ দিবার ব্যবস্থাও রহিত হইয়াছে—যাত্রিসমাগম প্রশমন জন্য ক্রমাগত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর দেবদর্শন জন্য তীর্থগমন কি প্রমোদ-ভ্রমণের পর্য্যায়ভুক্ত ?

মেদিনীপুরের দুর্দ্দশা

৩রা ফাল্গুন বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে দুর্গতিগ্রস্ত মেদিনীপুরের অনাচার সম্বন্ধে তুমুল আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। পরিষদের সুযোগ্য সদস্য ডক্টর শ্রীযুত নলিনাক্ষ সান্যাল এক মুলতুবী-প্রস্তাবে নির্ভীক ভাবে মেদিনীপুরের রাজকর্ম্মচারীদিগের ব্যবহারের ও ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করিয়া বলেন, নিরপেক্ষ ভাবে অনুসন্ধান হইলে তাঁহার উক্তির সত্যতা সপ্রমাণ হইবে। তিনি আরও বলেন যে, এই প্রাকৃতিক দুর্গতি ঘটিবার বহু দিন পরেও লোক সরকারী কর্ম্মচারীদিগের ছাড়পত্র ব্যতীত কাঁথি হইতে অন্যত্র যাইতে পারিত না ; এমন কি, ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদিগকেও তাঁহাদের নির্ব্বাচক-মণ্ডলীর নিকট যাইতে দেওয়া হয় নাই—তাঁহারা দুর্গতি-গ্রস্ত লোককেও সাহায্য করিতে পারেন নাই। তাহার পর ডক্টর শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মেদিনীপুরের অনাচার সম্বন্ধে উদাত্ত স্বরে অনেক কথাই বলিয়াছিলেন। তিনি ঐ সময়ে বাঙ্গালার সচিবসঙ্ঘের অন্যতম সচিব ছিলেন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে নির্ভুল তথ্য জানা সম্ভব। তাঁহার ন্যায় সুবিবেচক এবং দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির অভিযোগ কোন মতেই উপেক্ষা করা সঙ্গত নহে। ইহা ভিন্ন পরিষদের অন্যান্য বহু অভিজ্ঞ সদস্য এই ব্যাপারে সরকারী কর্ম্মচারী-দিগের কার্য্যের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। এই সকল ভীষণ অভি-যোগের নিরপেক্ষ তদন্তের আর বিলম্ব করা কোন মতেই উচিত নহে। অভিযোগে প্রকাশ, (১) কংগ্রেসের আন্দোলন প্রথমে বিশেষ উগ্র ভাব ধারণ করে নাই,—কিন্তু পরে সরকারের কঠোর দমন-নীতি প্রয়োগের ফলেই উহা উগ্র ভাব ধারণ করিয়াছিল। (২) আইন অমান্য আন্দোলন উপস্থিত হইবার বহু পূর্ব্বেই সামরিক প্রয়োজনে নৌকা এবং সাইকেল ইত্যাদি যানগুলি অপসারিত করা হইয়াছিল এবং কয়েক শত নৌকার মালিকরা যথাসময়ে নৌকা কর্ত্তৃপক্ষকে দিতে পারে নাই বলিয়া সেগুলি পুড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। প্রায় ১০ হাজার সাইকেল লোকের নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। এই কার্য্যে লোকের মনে অত্যন্ত অসন্তোষ এবং ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহার ফলেই আইন অমান্য আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। (৩) ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস উপস্থিত হইলে সে সংবাদ অকারণ চাপিয়া রাখা হইয়াছিল। ১৫ দিন পরে উহার অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণমাত্র প্রকাশ করিতে দেওয়া হইয়াছিল। এই ঝড়ের ও তজ্জনিত ক্ষতির সংবাদ সামরিক কারণে প্রকাশিত করা হয় নাই। (৪) স্থানীয় রাজপুরুষরা ঝড়ের পরও সরকারকে ঝড়ের গুরুত্ব বুঝিতে দেন নাই। (৫) রাজনৈতিক কারণেই সরকারী কর্ম্মচারীরা প্রথমে আর্ত্তত্রাণ-কার্য্যে শৈথিল্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। (৬) ঐ অঞ্চলের পুলিশ শান্তি এবং শৃঙ্খলা-রক্ষার জন্য অত্যুৎকট নীতি অবলম্বন করিয়াছিল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাহারা অতিমাত্র বলপ্রয়োগ, এমন কি, লোকের গৃহ ও সম্পত্তি ধ্বংস—অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন এবং নারী ও পুরুষদিগকে নির্য্যাতন করিয়াছিল। (৭) স্থানীয় কংগ্রেসকর্ম্মীদিগকে সাময়িক ভাবে মুক্তি দিয়া সেবাকার্য্য পরিচালিত করিবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন সেবাকার্য্যে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা করা হইয়াছে, ইত্যাদি অনেক গুরু অভিযোগও করা হইয়াছে। এই সকল অভিযোগের কোন উত্তরই দেওয়া হয় নাই। প্রধান-সচিব মিঃ ফজলুল হক মেদিনীপুরবাসীদিগের কৃত অনাচারের কথাও বিবৃত করিয়াছিলেন। শ্যামাপ্রসাদ বাবু সে কথা অস্বীকার করেন নাই। শৃঙ্খলা যে বিপন্ন হইয়াছিল, তাহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। ডক্টর মুখোপাধ্যায় নারী-নির্য্যাতনের অভিযোগও করিয়াছেন। ইহার অনুসন্ধান করিতে আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে।

ইহার নয় দিন পরে য়ুরোপীয় সদস্যদিগের দলপতি বাজেট-বিতর্ক উপলক্ষে বলেন, "পরিষদ এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে সম্মত হইয়া প্রাথমিক দৃষ্টিতে এই অভিযোগগুলি সত্য বলিয়াই স্বীকার করিয়া বসিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা সত্য বলিয়া মনে হইতেছে না।" কিন্তু য়ুরোপীয় সদস্যদিগের এ কথা সঙ্গত নহে। প্রধান-সচিব যখন নিরপেক্ষ তদন্তের প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন, তখন যত শীঘ্র সম্ভব, এই তদন্ত প্রকাশ্য ভাবে শেষ করা কর্ত্তব্য। সেই তদন্ত-সমিতির সদস্যগণ যাহাতে নিরপেক্ষ এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হন, তাহার ব্যবস্থা করা বিধেয়। মেদিনীপুরে যে ঘোর অনাচার—অশান্তি—নির্য্যাতন চলিয়াছিল, হিন্দু মহাসভার সেক্রেটারী শ্রীযুত মণীন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের প্রকাশিত পুস্তিকায় সে বিবরণ পাঠ করিলে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতে হয়। অশান্তি এবং অসন্তোষের প্রতিকার দায়িত্বপূর্ণ শাসন (Responsible Government), ইহা রবার্ট হার কুটেরও কথা। এই অনুসন্ধান রদ করিবার জন্যও চেষ্টা চলিতেছে। সত্বর তদন্ত না করা হইলে তাহার ফল আরও মন্দ হইবে।

সংবাদপত্রের মূল্যবৃদ্ধি

'ছিল ঢেঁকি হল তুল, কাটতে কাটতে নির্ম্মূল।' সরকার ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে ২৭শে ফেব্রুয়ারী ইণ্ডিয়া গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় সংবাদপত্র সম্বন্ধে এইরূপ আদেশ প্রচার করিয়াছেন—(১) বর্ত্তমান মূল্যে সর্ব্বশ্রেণীর সংবাদপত্র যত পৃষ্ঠা প্রকাশ করিতেছেন, পৃষ্ঠা-সংখ্যা তাহার অর্দ্ধেক করিতে হইবে। অর্থাৎ কার্য্যতঃ সংবাদপত্রের মূল্য দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিতে হইবে। (২) পূর্ব্ব হইতে কেন্দ্রী সরকারের সম্মতি না লইয়া একই স্থানে একই দিনে কোন সংবাদপত্র একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত করিতে পারিবেন না। (৩) অবিক্রীত সংবাদপত্রের শতকরা ৫খানি পর্য্যন্ত ফেরত লইবার যে নির্দেশ ছিল, আগামী ১লা এপ্রিল হইতে তাহা প্রত্যাহার করা হইল। এই আদেশের ফলে এজেন্টদিগকে অল্পসংখ্যক সংবাদপত্র দিতে হইবে,—ফলে সংবাদপত্র প্রচারের সঙ্কোচ ঘটিবে। (৪) ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে ২০শে ফেব্রুয়ারী বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন-মূল্যের যে হার ছিল, ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে ১লা এপ্রিল হইতে সংবাদপত্রগুলি তাহার শতকরা ৫০ টাকা অধিক মূল্য লইতে পারিবেন। (৫) বিভিন্ন প্রকার

সংবাদপত্রে—সংবাদ এবং সম্পাদকীয় প্রবন্ধের অনুপাতে কি পরিমাণ বিজ্ঞাপন থাকিবে, সরকার তাহারও নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন। এই মূল্য-বৃদ্ধি এবং আকার-সঙ্কোচের ফলে সংবাদপত্রের প্রচার নিতান্তই সঙ্কুচিত হইবে। সরকার সুলভ সংবাদপত্র প্রচারের সঙ্কোচ-বিধানের নির্দ্দেশ দিয়া যে, দেশের সর্ব্বস্তরে জাতীয় ভাবধারা প্রসারের—শিক্ষা-বিস্তারের—সরকারী কার্য্যের যথাযথ সমালোচনা প্রচারের পথ রোধ করিলেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। বর্দ্ধমান প্রাদেশিক কনফারেন্সে স্বর্গীয় সার আশুতোষ চৌধুরী বলিয়াছিলেন, পরাধীন জাতির রাজনীতিক চর্চার অধিকার নাই (A subject nation has no politics)। কথা যে সত্য, তাহা এদেশের লোক মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছেন। ভারতীয় কাগজ-শিল্পের উন্নতিবিধানের অজুহাতে সরকার এত দিন যে বিলাতী আমদানী কাগজের উপর উচ্চ হারে রক্ষাশুল্ক আদায় করিয়াছেন, তাহা কি দেশবাসীর পক্ষে ভস্মে ঘৃতাহুতি তুল্য ফলপ্রদ হইয়াছে? এ দেশে সংবাদপত্র-মুদ্রণোপযোগী সুলভ মূল্যের কাগজ প্রস্তুত কি এত দিনেও সম্ভবপর হইল না? সংবাদপত্রের জন্য সরকার কি কানাডা হইতে কাগজ আনাইবার কোনো ব্যবস্থাই করিতে পারিলেন না?

সর্ব্বদল সম্মিলন

৭ই ফাল্গুন দিল্লীতে সার তেজবাহাদুর সপ্রুর সভাপতিত্বে সর্ব্বদলের নেতৃগণের সভায় সকল ধর্ম্মমতাবলম্বীদিগের প্রতিনিধিগণ সমবেত হইয়াছিলেন। সভায় এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল যে, "ভারতের সর্ব্বদলের এবং সর্ব্ব-সম্প্রদায়ের এই সংসদ এই মত ব্যক্ত করিতেছেন যে, ভারতে ভবিষ্যৎ স্বার্থরক্ষার জন্য এবং আন্তর্জাতিক সদ্ভাব প্রতিষ্ঠার জন্য মহাত্মা গান্ধীকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হউক। যদি গান্ধীজীকে সময় থাকিতে ছাড়িয়া দেওয়া না হয়, তাহা হইলে যে ভীষণ অবস্থার উদ্ভব হইবে, তাহা ভাবিয়া সভার ব্যক্তিগণ বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। অতএব অবিলম্বে গান্ধীজীকে মুক্তি দেওয়া হউক।" সভার পক্ষ হইতে ডক্টর জয়াকর এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন। ইহার সমর্থন করেন ভারতীয় খৃষ্টান-সম্প্রদায়ের মুখপাত্র সার মহারাজ সিং, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সার হাজি কাশেম, মাষ্টার তারা সিং, বোম্বাই উইলসন কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর ম্যাকেঞ্জি, সার এ এইচ গজনভী, শ্রীমতী সরলা দেবী, সিন্ধুদেশের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ আলাবক্স, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মিঃ এন এম যোশী, জমায়েৎ উল-উলেমার সম্পাদক মৌলানা আমেদ সৈয়দ, মোমিন সমিতির সভাপতি মিষ্টার জহির উদ্দীন, সীমান্ত প্রদেশের পাঠানদিগের প্রতিনিধি আবদুল কায়ুম, মিঃ হুমায়ুন কবীর, মিঃ জি এল মেটা, কমিউনিষ্ট দলভুক্ত মিঃ রণদীভ প্রভৃতি। সুতরাং প্রস্তাবটি যে সর্ব্ববাদিসম্মত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই প্রস্তাবের নকল লর্ড লিন্‌লিথগো, মিষ্টার চার্চ্চিল, মিষ্টার আমেরী প্রভৃতিকে পাঠান হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিয়াছিলেন, না—তাহা হইবে না। ইহাতে তাঁহাদের মনের ভাব বেশ বুঝা যাইতেছে। কোন সময়েই তাঁহারা দেশের লোকের মত লইয়া কাজ করিতে চাহেন না। সার তেজবাহাদুর বলিয়াছেন, বর্ত্তমান সরকারের বিশেষ বুদ্ধি এবং কল্পনাশক্তি যখন পর্য্যাপ্ত নয়, তখন মহাত্মাজীকে সরকার মুক্তি দিবেন, এমন দুরাশা তিনি করিতে পারেন না। তিনি আরও বলেন, মহাত্মা গান্ধীকে মুক্তি দিলে ভারতবাসীর সহিত কর্ত্তৃপক্ষের পুনরায় সদ্ভাব স্থাপনের প্রাথমিক সোপান রচিত হইত। ভারতীয় ব্যুরোক্রেসী মহাত্মা গান্ধীকে বিদ্রোহী বলিয়াছেন। ইহার উত্তরে সার তেজবাহাদুর বলিয়াছেন যে, ইংরেজরা সেনাপতি স্মাটসকেও বিদ্রোহী বলিতেন, কিন্তু তিনিই এখন সাম্রাজ্যের বিশেষ উপকারী বন্ধু। এক-কালে বিদ্রোহী বলিয়া অভিহিত ডি ভ্যালেরাকেও বৃটিশ সরকার এখন সাম্রাজ্যমধ্যে রাখিতে চাহেন। ইতিহাস আলোচনায় দেখা যায়, বৃটিশ সরকার বিদ্রোহীদিগের সহিত সর্ব্বদা আপোষ করিয়াছেন, রাজভক্তদিগের সহিত করেন নাই। বৃটিশ সরকার এই ব্যাপারেও তাঁহাদের জিদ ছাড়েন নাই। ইহাতে অধিক ক্ষতি কাহার হইল?

হাঙ্গামার জন্য দায়িত্ব কাহার?

গত ৬ই আশ্বিন লর্ড লিনলিথগোকে মহাত্মাজী যে পত্র লিখিয়াছিলেন, বড়লাট তাহা পূর্ব্বে প্রকাশিত করেন নাই বলিয়া সার তেজবাহাদুর সরকারকে নিন্দা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, প্রকাশ করিলে সকলে বুঝিত যে, মহাত্মা পূর্ব্বের ন্যায় অহিংসার উপর আস্থাবান্। তাহা হইলে হয় ত' এ হাঙ্গামা ঘটিত না। এই হাঙ্গামার জন্য যদি মহাত্মাজীকে দায়ী করা হয়, তাহা হইলে সরকারও সে জন্য কম দায়ী নহেন। সার তেজবাহাদুর আরও বলেন যে, "এই দায়িত্ব কাহার, তাহা অবধারণ করিতে হইলে কোন নিরপেক্ষ কমিশন বা স্বাধীন আদালতের হস্তে তাহার নির্দ্ধারণ-ভার দেওয়া উচিত।" এই হাঙ্গামায় কোন কোন কংগ্রেসওয়ালা যোগদান করিলেও কংগ্রেস যে ইহার জন্য দায়ী, ইহা তিনি বিশ্বাস করেন না। কংগ্রেস বা সরকার কাহারও মত তিনি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। ব্যাপারটা রহস্যময়, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার অনুসন্ধান আবশ্যক।

প্রাণদণ্ড কি অপরিহার্য্য?

আসতী ও চীমূরের দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও হত্যার মামলা বলিয়া পরিচিত মামলাসমূহে যে সকল অভিযুক্ত ব্যক্তি আইনের চরম দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে, ডাক্তার খারে, মিষ্টার দেশমুখ প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আসামীরা তরুণবয়স্ক—ভাবপ্রবণ—প্রচারকার্য্যে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল বলিয়া মধ্যপ্রদেশের সরকারকে ক্ষমাশীল হইয়া দণ্ড হ্রাস করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

আসতী মামলায় ১ শত ১৪ জন অভিযুক্ত হইয়াছিল। স্পেশাল জজের বিচারে ১০ জনের প্রাণদণ্ড, ৫৫ জনের যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ড, ১ জনের লঘু দণ্ড, অবশিষ্ট আসামীদের খালাস দিবার আদেশ হইয়াছিল। মিষ্টার জাষ্টিস পোলক ১০ জনের প্রাণদণ্ড ও ৫৪ জনের নির্ব্বাসন দণ্ড এবং চীমূর মামলায় ১৪ জনের প্রাণদণ্ড বহাল রাখিয়াছেন—নিম্ন আদালত কর্ত্তৃক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ৭ জনের যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ড দিয়াছেন। কেবল এই দুইটি মামলায় ২৪ জন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে এবং অনুগ্রহ ব্যবস্থা না হইলে প্রাণ হারাইবে। ইহার সহিত অন্যান্য মামলায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগের কথাও বলিতে হয়।

কর্ত্তব্যপালনে নিযুক্ত কতকগুলি সরকারী কর্ম্মচারী যে জনতার হিংসাত্মক কার্য্যে জীবন হারাইয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই দুঃখের বিষয়;

কিন্তু এই সকল ঘটনা অস্বাভাবিক অবস্থায় সংঘটিত হইয়াছিল এবং সেইরূপ অবস্থার জন্য যে সকল আইন রচিত হইয়াছিল, সেই সকল আইনেই তাহাদিগের বিচার হইয়াছে। সে অবস্থায় সরকার যদি বিশেষ অধিকারে দয়া প্রদর্শন করিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগের দণ্ড হ্রাস করিয়া তাহাদিগকে নির্ব্বাসন দণ্ড প্রদান করেন, তবে তাহাতে যেমন আইনের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হইবে না, তেমনই দুর্ঘটনার ক্ষত দূর করিয়া স্বাভাবিক অবস্থার প্রবর্ত্তনও সহজসাধ্য হইবে।

এই দুইটি মামলায় যে বিচার হইয়াছে, তাহাতে কোনরূপ দোষ আরোপ না করিয়াই বলা যায়—এই সকল এবং এইরূপ অন্যান্য মামলায় যে সকল আইন অনুসারে বিচার হইয়াছে, সে সকল আইনে সরাসরি বিচারের ব্যবস্থা আছে এবং বিচারকরা আসামীপক্ষের বহু সাক্ষ্য নির্ভরযোগ্য নহে—মনে করিয়াছিলেন।

অনেক দেশে প্রাণদণ্ড বর্ব্বর-যুগের উপযুক্ত বলিয়া বর্জ্জিত হইয়াছে; ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে রুমেনিয়ায়—১৮৭০ খৃষ্টাব্দে হল্যাণ্ডে, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ইটালীতে, ১৯০০ খৃষ্টাব্দে নরওয়েতে ও সুইটজারল্যাণ্ডে মৃত্যুদণ্ড বর্হিত করা হইয়াছে। প্রাণদণ্ডাদেশ পালিত হইলে আর তাহা ফিরান যায় না।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবার অভিযোগে আয়ারল্যাণ্ডের নয় জন যুবকের আদালতের বিচারে প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। বহু লোকের আবেদনে মহারাণী করুণাবশে তাহাদের প্রাণদণ্ডাদেশের পরিবর্ত্তে অষ্ট্রেলিয়ায় যাবজ্জীবন নির্ব্বাসনের নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। আন্দামানের মত অষ্ট্রেলিয়া তখন নির্ব্বাসনদ্বীপ ছিল। বন-জঙ্গলপূর্ণ অসভ্য জাতির আবাসভূমি অষ্ট্রেলিয়া প্রধানতঃ নির্ব্বাসিতগণের প্রচেষ্টায়—সাধনায় নবরূপ পরিগ্রহ করিয়া বৃটেনকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছিল। মহারাণী শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন যে, ২৬ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার অনুকম্পায় প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত নির্ব্বাসিত নয় জনের মধ্যে চার্লস ডাফি ভিক্টোরিয়া প্রদেশের প্রধান-সচিব—টমাস মিগার মোলতানা প্রদেশের গভর্ণর—অন্য দুই জন সেনাবাহিনীর জেনারল—রিচার্ড ওগোরম্যান নিউ ফাউনল্যাণ্ডের গভর্ণর—মরিস লাইয়েন এটর্ণী জেনারল—ম্যাকগি কানাডার প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাসিত হইয়াছেন। প্রাণদণ্ডে অব্যাহতি প্রদান কিরূপ শুভ ফলপ্রদ হইতে পারে, তাহার সমুজ্জ্বল নিদর্শন এই ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের কথা স্মরণ করিয়া আমরা মধ্যপ্রদেশের সরকারকে অনুকম্পা প্রকাশ করিতে অনুরোধ করি।

পদত্যাগ

৫ই ফাল্গুন ভারত সরকারের শাসন পরিষদের তিন জন সদস্য···শ্রীযুত মাধব শ্রীহরি এনি—সার এইচ, পি মোদি—শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার পদত্যাগ করিয়াছেন। তিন জন একযোগে বিবৃতি দিয়াছেন—কোন মুখ্য ব্যাপার সম্বন্ধে মতভেদ হওয়াতে তাঁহারা পদত্যাগ করিলেন। মহাত্মা গান্ধীর উপবাস সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য, তাহা লইয়াই মতভেদ ঘটিয়াছিল। তাঁহারা আরও বলিয়াছেন যে, যত দিন তাঁহারা বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য ছিলেন, তত দিন তাঁহাদের সহিত বড়লাট খুব সদ্ব্যবহারই করিয়াছেন। শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার স্বতন্ত্র বিবৃতিতে বলিয়াছেন, যদি দেশের কোন উপকার করিতে পারেন, এই জন্যই সদস্যপদ লইয়াছিলেন। সরকারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূমি-বাণিজ্য, খাদ্য বিভাগের ভার তাঁহার হস্তে প্রদত্ত ছিল। তাঁহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ এবং সঙ্কুচিত হইলেও তাহার মধ্যেও তিনি দেশের কাজ করিবার অবকাশ পাইবেন—যুদ্ধের সময় তাহা করা বিশেষ প্রয়োজন—বিশেষতঃ, যুদ্ধের পর শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে যখন ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটিবে, তখন শাসন পরিষদে ভারতের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিরা না থাকিলে ভারতের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবে,—ইহাই সরকার মহাশয়ের কৈফিয়ৎ। আমাদের বিশ্বাস, সচিবদিগের ক্ষমতা এত অল্প এবং সঙ্কুচিত যে, তাঁহারা চেষ্টা করিলেও এ দেশবাসীর জন্য বিশেষ কিছু করিতে পারেন না। বড়লাটই সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বে-সর্ব্বা। সচিবরা কিছুই করিতে পারেন না, কারণ, দেশের সহিত তাঁহাদের যোগ নাই,—তাঁহাদের বহাল বরতরফ দেশের লোকের মতামত অনুসারে হয় না, বড়লাটের মত লইয়াই হয়। তাঁহাদের শাসন পরিষদ রাখিবার একমাত্র প্রয়োজন যে, সরকার দেশের প্রতিনিধিস্থানীয় লোকদিগের মতামত লইয়া এই দেশ শাসন করিতেছেন,—ইহা মার্কিণ প্রভৃতি দেশের নিকট প্রচার করা। মিষ্টার আমেরী তাহা যত দূর সম্ভব করিতেছেন। মিষ্টার সরকার ব্যবস্থা পরিষদে থাকিয়া ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ বাতিল করিতে পারিয়াছেন কি? না, সিংহলে চাউল চালান বন্ধ করিতে পারিয়াছিলেন? বরং বাঙ্গালার ১৩ লক্ষ টন চাউল অধিক জন্মিয়াছে বলিয়া সিংহলে চাউল রপ্তানীর সমর্থনই কি তাঁহাকে করিতে হয় নাই? সরকারী কাজ করিতে গেলেই এরূপ করিতে হয়।

মহাত্মাজীর অনশন

ভগবান্ পুনরায় গান্ধীজীর প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। ২৭শে মাঘ হইতে ১৮ই ফাল্গুন পর্য্যন্ত ২১ দিন প্রায়োপবেশনের অগ্নি-পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হইয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী দীর্ঘজীবী হউন।

চারি মাস পূর্ব্বে গান্ধীজী তাঁহার অনশন-সঙ্কল্পের কথা বড়লাটকে জানাইয়াছিলেন। এ সম্পর্কে বড়লাটের সহিত তাঁহার যে সকল পত্র-বিনিময় হইয়াছিল, তাহার সংক্ষেপসার এইরূপ :—গত ৩১শে ডিসেম্বরের পত্রে গান্ধীজী লর্ড লিনলিথগোকে লিখিয়াছিলেন—"আপনি আমার সদভিপ্রায়ে সন্দেহ করিয়াছেন।···আমার বক্তব্য শুনিতে চাহেন নাই।···আমার মুমূর্ষু বন্ধু প্রায়োপবেশনরত অধ্যাপক ভাঁসালীর সহিত আমাকে সংযোগ স্থাপন করিতে দেন নাই।···আপনি আশা করেন যে, আমি হিংসামূলক কার্য্যের নিন্দা করিব।···কঠোর সেন্সার করা সংবাদপত্রের সংবাদ আমি বিশ্বাস করি না।···আমার সহিষ্ণুতা শেষ হইতে চলিয়াছে।···অনশন দ্বারা আত্মশুদ্ধি করিব, তবে আমায় ভুল বুঝাইয়া দিলে তাহার প্রতিকার করিব।"

১৩ই জানুয়ারী বড়লাট উত্তরে জানাইয়াছিলেন—"ভাবিয়াছিলাম, সংবাদপত্রের বিবরণীগুলি পাঠ করিয়া আপনি সুস্পষ্ট ভাবে সন্ত্রাসবাদী কার্য্যের নিন্দা করিবেন, কিন্তু তাহা করেন নাই।···আপনি যদি পশ্চাদগমন করিতে চাহেন, কংগ্রেসের গত গ্রীষ্মকালের অবলম্বিত কার্য্যক্রমের সম্পর্ক হইতে আপনাকে বিচ্যুত করিতে চাহেন, তাহা হইলে আমাকে জানাইবামাত্র এ বিষয়ে আবও বিবেচনা করিব।···আপনি আমার নিকট কি প্রস্তাব করিতে চাহেন, তাহাও জানাইবেন।"

গান্ধীজী ১৯শে জানুয়ারী বড়লাটের পত্রের উত্তরে লিখিয়াছিলেন —"আপনার পত্রের মর্ম্মে বুঝিলাম, আমাকে গ্রেপ্তার করিয়া যেন

ঠিক কাজই করিয়াছেন।···দেশব্যাপী অভাব। লক্ষ লক্ষ নরনারীর দুঃখ-দুর্দশার, তথা দেশে বর্তমানে যে সকল ব্যাপার ঘটিতেছে, আমাকে তাহার অসহায় সাক্ষিমাত্র হইয়া থাকিতে হইতেছে।···সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব করিতে বলিয়াছেন। কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির সদস্যদিগের মধ্যে থাকিলে উহা করিতে পারিতাম।···আমি ভুল করি নাই। ৯ই আগষ্ট হইতে যে সব ব্যাপার ঘটিয়াছে, তজ্জন্য অবশ্য আমি দুঃখিত। কিন্তু এ সকল ঘটনার জন্য কি সরকার দায়ী নহেন?··· যে সকল ব্যাপারের নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা আমার নাই, যে সকল ব্যাপার সম্বন্ধে আমি এক তরফা বিবরণ মাত্র পাইয়াছি, তৎসম্বন্ধে আমি কোন মতামত প্রকাশ করিতে পারি না। তবে প্রকাশ্য ভাবে আমি ঘোষণা করিতে পারি যে, অহিংসার প্রতি আমার আস্থা পূর্ব্ববৎ অবিচল।"

হিংসামূলক ও বিপ্লবাত্মক কার্য্যাবলীর জন্য, পরবর্ত্তী পত্রে বড়লাট গান্ধীজীকে সম্পূর্ণ দায়ী করিয়া বলেন—"আপনি যদি জানান যে, ৯ই আগষ্টের প্রস্তাব ও ঐ প্রস্তাবের নীতির সহিত আপনি এক-মত নহেন এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যদি আপনি যথোপযুক্ত আশ্বাস দেন, তবে আমি সে সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখিব।"

২৯শে জানুয়ারী (১৯৪৩) গান্ধীজী বড়লাটকে জানান—"কংগ্রেসের প্রধান প্রধান কর্ম্মীদিগকে গ্রেপ্তার করিবার পরে দেশব্যাপী হিংসাত্মক কার্য্য অনুষ্ঠিত; তবু বলিবেন, ইহার জন্য কংগ্রেসের আগষ্ট প্রস্তাবই দায়ী?···সরকারের অপ্রয়োজনীয় কঠোর আচরণই কি এজন্য দায়ী নহে? আগষ্ট প্রস্তাবের কোন্ অংশ আপনার নিকট আপত্তি-কর? এ প্রস্তাবে কংগ্রেস অহিংসনীতি-বিচ্যুত হয় নাই।···আইন অমান্যের কথায় আপত্তি হইতে পারে না, গান্ধী-আরউইন চুক্তিতে আইন অমান্য আন্দোলনের নীতি পরোক্ষভাবে স্বীকৃত। এ কথা আমি দৃঢ় ভাবেই বলিব, সুস্পষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ দ্বারা সরকারকেই আপন আচরণের ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করিতে হইবে, আমাকে নহে। সরকারই জনসাধারণকে উত্তেজিত করিয়া উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছেন।···ব্যাপক গ্রেপ্তারে সরকার সিংহবিক্রম দেখাইয়াছেন! এক জনের অপরাধে ১০ হাজার লোককে দোষী করা হইয়াছে।···যীশুখৃষ্টের অপ্রতিরোধ নীতির কথা উল্লেখ করিয়া লাভ নাই।···ভারতের লক্ষ লক্ষ দরিদ্র নর-নারীর অভাব-অনটনের কথা চিন্তা করুন।···এ সময় জনসাধারণের আস্থা-সমৃদ্ধ জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত থাকিলে এই দুঃখ-দুর্দ্দশার কতকটা অন্ততঃ লাঘব হইত।···আমার এই মনঃকষ্ট দূর করিবার যখন অপর কোন উপায় খুঁজিয়া পাইতেছি না, তখন ৯ই ফেব্রুয়ারী হইতে আমি ২১ দিনের জন্য অনশন করিব।···আমরণ অনশন আমার উদ্দেশ্য নহে। ভগবানের ইচ্ছায় পরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হইতে চাহি।"

মাত্র অনশনকালের জন্য সরকার গান্ধীজীকে মুক্তি দিতে চাহিলে গান্ধীজী জানান—তাঁহার সুবিধার জন্য সাময়িক সর্ত্তাধীন মুক্তি তিনি চাহেন না। সরকারের সুবিধার জন্য মুক্তির প্রস্তাব করা হইলেও তিনি সরকারের ইচ্ছামত কাজ করিতে পারিবেন না। মুক্তি দিলে তিনি অনশন করিবেন না। ইহার উত্তরে সরকার জানান যে, এ অনশনের দায়িত্ব সরকারের নহে। তবে গান্ধীজীর চিকিৎসকগণকে তাঁহার চিকিৎসা করিতে দেওয়া হইবে এবং তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ সরকারের অনুমতি লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন।

গান্ধীজীর প্রায়োপবেশন-সিদ্ধান্ত প্রচারিত হইবামাত্র ভারতের জনসাধারণ চঞ্চল হইয়া উঠিলেও লণ্ডনের 'টাইমস্' পত্র সরকারের নীতির সমর্থন করিয়া মন্তব্য করেন—"জাতীয় জাগরণের স্রষ্টারূপে গান্ধীজী স্বদেশের অশেষ কল্যাণ করিয়াছেন, এ কথা সত্য হইলেও দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারী তাঁহার নেতৃত্ব মানিয়া লয় নাই। তাঁহার বর্ত্তমান কার্য্য আপোষের বিন্দুমাত্র সহায়ক হইবে না।" 'ডেলি টেলিগ্রাফ' বলিয়াছিলেন—"এ অনশন সস্তায় আত্ম-জাহিরের চেষ্টা মাত্র। গ্রেপ্তারের পর মিঃ গান্ধীর নাম আর কেহ করিত না, সরকারের কড়া ব্যবস্থায় কংগ্রেস-দলও হৃতবীর্য্য। অনশন উভয়ের সুনাম প্রতিষ্ঠার কৌশল।" 'ডেলি মেল' লিখিয়াছিলেন—"হিটলার, মুসোলিনী ও তোজো যে জাতিকে ভীত করিতে পারিলেন না, তাহারা কখনও মিঃ গান্ধীর নিকট আত্মসমর্পণ করিবে না।"

২০শে মাঘ দিবা দ্বিপ্রহর হইতে মহাত্মা গান্ধী প্রায়োপবেশন আরম্ভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে দেশব্যাপী মহা বিক্ষোভ আরম্ভ হয়। স্থানে স্থানে ছাত্রগণ ধর্ম্মঘট ও শোভাযাত্রাদি করে। আমেদাবাদের মিলসমূহ বন্ধ হয়। ভারতীয় বণিক্ সমাজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, হিন্দু মহাসভা, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সমিতি, কলিকাতার টাউন হলের বিরাট জনসভা এবং ভারতের প্রতি প্রদেশ, নগর ও গ্রামের নরনারী ও প্রতিষ্ঠান গান্ধীজীর মুক্তির দাবী করেন। যাহাতে বিক্ষোভ প্রবল-তর হইতে না পারে, তজ্জন্য সরকার অনশন-সম্বন্ধীয় সংবাদ ও মন্তব্য সম্পর্কে সেন্সর ব্যবস্থা করেন। সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশের পূর্ব্বে সেন্সর করাইয়া লইতে 'বোম্বে ক্রনিকল' ও 'ফ্রীপ্রেস জার্ণাল' অসম্মত হন। 'মাতৃভূমি' প্রেস বাজেয়াপ্ত হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও নেতৃ-বৃন্দ মার্কিণ-মধ্যস্থতার প্রত্যাশায় ভারতে মার্কিণ সরকারের প্রতিনিধি মিঃ ফিলিপসের সহিত সাক্ষাৎ করেন। দিল্লীতে সার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুর, শেঠ ঘনশ্যাম দাস বিরলা, শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই বড়লাটের শাসন পরিষদের কয়েক জন ভারতীয় সদস্যের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সিংহল রাষ্ট্রীয় পরিষদ, বঙ্গীয় আইন-সভাগুলি গান্ধীজীর মুক্তির দাবী করেন। কেন্দ্রী ও রাষ্ট্রীয় পরিষদে দুইটি মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপিত করা হইলে সেগুলি নিষ্ফল আলোচনায় পর্য্যবসিত হয়। সরকারের মনো-ভাবের প্রতিবাদ-কল্পে রাষ্ট্রীয় পরিষদে প্রোগ্রেসিভ দলের ডেপুটী নেতা পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু ৬ জন সদস্যসহ পরিষদ-কক্ষ ত্যাগ করেন।

বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার, শ্রীযুত মাধব শ্রীহরি এনি, সার হোমি মোদি, সর্দ্দার যোগেন্দ্র সিং ও সার সুলতান আহমেদ অবিলম্বে গান্ধীজীকে মুক্তি দিবার জন্য বড়লাটকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলে তাহা ব্যর্থ হয়। সরকারের নীতির প্রতিবাদস্বরূপ ৫ই ফাল্গুন (অনশনের ৮ম দিবসে) শ্রীযুত নলিনী-রঞ্জন সরকার, শ্রীযুত এনি ও সার হোমি মোদি শাসন পরিষদের সদস্য-পদ ত্যাগ করিলে বড়লাট অবিলম্বে তাহাতে সম্মত হন। হিন্দু মহাসভার সভাপতি শ্রীযুত বিনায়ক দামোদর সাভারকরের নির্দ্দেশে শ্রীযুত শ্রীবাস্তব সদস্য-পদ ত্যাগ করেন নাই। তাঁহার মনোভাব পরিবর্ত্তন কামনায় শ্রীবাস্তব-পত্নী যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। গ্রেট বৃটেনের ৪০৫ জন প্রবাসী ভারতবাসী ও তাঁহাদিগের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন-দিগের পক্ষ হইতে লণ্ডনস্থ ভারতীয় কংগ্রেস কমিটী এই সঙ্কটে হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ করিয়া মার্কিণ রাষ্ট্রপতি মিঃ রুজভেল্ট, মার্শাল চিয়াং কাইশেক ও মসিয়ে ষ্ট্যালিনের নিকট তার প্রেরণ করিলে তাহার উত্তর পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না।

পুণায় আগা খানের প্রাসাদে অনশন-কালে মহাত্মা গান্ধীকে লইয়া চিকিৎসকগণ ব্যস্ত ছিলেন। বন্দিনী শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু, ডাঃ সুশীলা নায়ার, শ্রীমতী মীরা বেন, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, বন্দী ডাঃ গিল্ডার প্রভৃতি তাঁহার কষ্ট লাঘব করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিলেন। অনশনের দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রারম্ভে গান্ধীজীর অবস্থায় সকলেই বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। দৈহিক ক্লেশ তুচ্ছ করিয়া গান্ধীজীর বদন প্রফুল্লতা-অনুরঞ্জিত হইলেও তাঁহার কণ্ঠ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল, ওজন হ্রাস পাইতেছিল, মূত্রবিকার দেখা দিয়াছিল, হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া দুর্ব্বলতর হইতেছিল। অনশনের ত্রয়োদশ দিবসে (১০ই ফাল্গুন) অপরাহ্ণ ৪টায় চিকিৎসকগণ হতাশ হন। নাড়ী খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই; গান্ধীজী প্রায় সংজ্ঞাহীন হন, ঘন-ঘন বমনোদ্রেক হইতে থাকে। চিকিৎসকগণ অনশন ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলে মহাত্মাজী একটু হাসেন মাত্র।

আগা খানের প্রাসাদের ভিতরে চিকিৎসকগণের দারুণ উৎকণ্ঠা, বাহিরে তাঁহার সংবাদ জানিবার জন্য দেশী বিদেশী সংবাদপত্র-প্রতিনিধিগণ দিনের পর দিন ধূলিপূর্ণ পুণা-আমেদনগর রোডে দাঁড়াইয়া সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। একটি রাত্রি যেন অনন্তকাল বলিয়া মনে হইতেছিল। পরদিবস (১১ই ফাল্গুন) রাত্রির সঙ্কট অবস্থা কতকটা শান্ত ছিল।

৭ই ফাল্গুন দিল্লীর এক সর্ব্বদল-সম্মিলনে সার তেজবাহাদুর সপ্রু, ডাঃ জয়াকর, শ্রীযুত রাজাগোপালাচারী-প্রমুখ প্রায় ৪ শতাধিক নেতা সমবেত হন। মুসলেম লীগের সভাপতি মিঃ জিন্না সম্মিলনে আমন্ত্রিত হইলে বলেন, রাজনীতিক দাবী আদায়ের জন্য অনশনের হুমকী সফল হইলে মুসলমানদিগের দাবী নষ্ট হইবে; এ পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা হিন্দুরাই করুন, মুসলমানদিগের সহিত উহার কোন সম্পর্ক নাই। গান্ধীজীর মুক্তির দাবী করিয়া সম্মিলনে গৃহীত সর্ব্বসম্মত প্রস্তাব বড়লাটের নিকট প্রেরণ করা হইলে বড়লাট সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করেন। নিরুপায় হইয়া নেতৃ-সম্মিলন বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিষ্টার চার্চ্চিলের নিকট নিম্ন মর্ম্মে তার করেন—অবিলম্বে গান্ধীজীকে মুক্তি না দিলে তাঁহার মৃত্যু অনিবার্য। স্বাধীন মানুষ হিসাবে বর্ত্তমান পরিস্থিতির পর্য্যালোচনা এবং তদনুসারে জনসাধারণকে পরামর্শ দানের জন্য গান্ধীজী মুক্তি চাহেন। তিনি স্বাধীনতার প্রশ্ন তুলিতেছেন না।...তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ নিরপেক্ষ বিচারকগণের দ্বারা পরীক্ষিত হয় নাই।...বড়লাটের সহিত তাঁহাকে দেখা করিতে দেওয়া এবং গান্ধীজী যে ভাবে সমস্যার সমাধান করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল।... কঠোর দমন-নীতি অপেক্ষা উদার রাজনীতিক সুবিবেচনাতেই ইঙ্গ-ভারতীয় সমস্যার সমাধান সম্ভব। এই তারের উত্তরে মিষ্টার চার্চ্চিল জানান..."গত আগষ্টে ভারত সরকার মিঃ গান্ধী ও কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাকে আটক রাখিবার যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সে সকল কারণের অবসান হয় নাই।...অনশন দ্বারা বিনা সর্ত্তে মুক্তি পাইবার জন্য মিঃ গান্ধী যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে ভারত সরকার যে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছেন, বৃটিশ সরকার তাহার সমর্থন করেন। মিঃ গান্ধী এবং অপরাপর কংগ্রেসী নেতার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। সমস্ত দায়িত্ব মিঃ গান্ধীর।". এই সময় মিষ্টার চার্চ্চিল ও রুজভেল্ট অসুস্থ হইয়া শয়ন-কক্ষে আশ্রয় লইয়াছিলেন।

অনশনের তৃতীয় সপ্তাহে এ অগ্নি-পরীক্ষায় গান্ধীজী উত্তীর্ণ হইবেন এমন সম্ভাবনা দেখা যায়। দেশব্যাপী তাঁহার দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা চলিতে থাকে। ইহা শুনিয়া এক দিন জনৈক দর্শককে গান্ধীজী আশ্বাস দেন, আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিব, আপনাদের কোন চিন্তা নাই। এক দিন এক জন মার্কিণ সাংবাদিক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে জিজ্ঞাসা করেন, "কোন দৈবশক্তির বলে কি গান্ধীজী সঙ্কট উত্তীর্ণ হইলেন?" ডাঃ বিধানচন্দ্র বলেন—"ঐরূপ কোন শক্তি আছে কি না জানি না, তবে তাঁহার এই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার ব্যাপার অলৌকিক সন্দেহ নাই!" ইহার পর গান্ধীজী কথঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করিতে থাকেন।

এই সময় শ্রীযুত রাজাগোপালাচারী ও শ্রীযুত মাধব শ্রীহরি এনির সহিত তাঁহার প্রত্যহ সুদীর্ঘ আলোচনা চলিয়াছিল। অনশনের বিংশতি দিবসে ৪৫ মিনিট আলোচনা চলে, রাজাজী তাহা ব্যক্ত করিতে অসম্মত। ১৯শে ফাল্গুন প্রাতে ৮টায় গান্ধীজী অনশন ভঙ্গ করেন। উৎকণ্ঠিত ভারত নিশ্চিন্ত হইয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া ভগবানকে প্রণতি নিবেদন করে। বিলাতের 'টাইমস্' মন্তব্য করিয়াছেন—"সন্ন্যাসিরূপে গান্ধীজী ভারতের চিত্তে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। এই অনশনের ফলে ভারতের পরস্পর-বিরোধী রাজনীতিক ও সাম্প্রদায়িক দলগুলি ঐক্যবদ্ধ হইল।" দক্ষিণ আফ্রিকার 'ষ্টার' পত্র মন্তব্য করিয়াছেন—"গান্ধীজী রক্ষা পাইবার ফলে বড়লাটও অপবাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন।" মার্কিণ 'নেশন' পত্র বলিয়াছেন—"গান্ধীজী অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ভারতের জাতীয়তাবাদীদিগের নিরবচ্ছিন্ন বিদ্বেষ এই ব্যাপারে যেরূপ প্রকটিত, সেরূপ আর কিছুতেই হয় নাই। সরকার সুবিবেচক হইলে নূতন ভাবে আপোষ আলোচনা আরম্ভ করিতেন।"

শ্রীযুত রাজাগোপালাচারী, সার তেজবাহাদুর, শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাই প্রমুখ ৩৫ জন নেতা সরকার কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়াও হতাশ হন নাই। ২৬শে ফাল্গুন বোম্বাই বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারে তাঁহারা এক বিবৃতিতে জানাইয়াছেন যে, গান্ধীজীকে মুক্তি দিলে অচল অবস্থার সমাধানের জন্য তিনি পরামর্শ ও সাহায্য দান করিতে চেষ্টা করিবেন। গান্ধীজীর সহিত আলোচনা করিয়া তাঁহাদিগের বিশ্বাস হইয়াছে যে, আপোষ চেষ্টা ফলপ্রসূ হইতে পারে। আপোষের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিতে তাঁহারা গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বড়লাটকে অনুরোধ করিবেন। এই প্রচেষ্টা সফল হইবে কি না, তাহা ভবিতব্যই বলিতে পারে।

ব্রত-উদ্‌যাপনান্তে মহাত্মাজীকে তান্-য়ুন্ শান্ "বর্ত্তমান যুগের বুদ্ধ" এবং পার্লামেণ্টের তিনজন সদস্য ও প্রখ্যাত কথাশিল্পী এথেল ম্যানিন্ "প্রকৃত খৃষ্টান" বলিয়া সম্মানিত করিয়াছেন।

জনরব—গান্ধীজীকে নির্ব্বাসিত করা হইবে। জনরব নির্ভরযোগ্য নহে। এ সম্বন্ধে শ্রীযুত রাজাগোপালাচারী বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন:—"বড়লাট যে এইরূপ উগ্র ব্যবস্থার কথা মনে করিতে পারেন, এমন মনে হয় না। লোক অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া আছে; এ সময় গান্ধীজীকে নির্ব্বাসিত করিলে শান্তির পথ সুগম করা হইবে না। অবস্থা শোচনীয়। কিন্তু এখনও শান্তির ও মীমাংসার সম্ভাবনা আছে। প্রভাতের পূর্ব্বেই অন্ধকার সর্ব্বাপেক্ষা ঘনীভূত হয়। এখন গান্ধীজীকে দল ও সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে আস্থাভাজন চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া প্রয়োজন।"

আমরা শ্রীযুত রাজাগোপালাচারীর এই উক্তিতে বিস্মিত হইয়াছি বলিলে ভুল হইবে। ইহাতে বিরক্তির উৎপত্তি অনিবার্য্য। মিষ্টার চার্চিল ও মিষ্টার আমেরীর সহিত একমত হইয়া প্রায়োপবেশন-কালেও লর্ড লিন্‌লিথগো গান্ধীজীকে মুক্তি দেন নাই এবং তাঁহার প্রায়োপবেশন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আটকের সব পুরাতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন।

সে দিন ডাক্তার বরদারাজলু যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় —সার সি, পি, রামস্বামী আয়ার যখন বড়লাটের শাসন পরিষদের সভ্য, সেই সময় তিনি গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে তাঁহার সে প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। তাহার পর ডাক্তার শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যখন বাঙ্গালার অন্যতম সচিব, তখন যেমন তিনিও সে সুবিধায় বঞ্চিত হইয়াছিলেন—শ্রীযুত রাজাগোপালাচারীকেও তেমনই তাহাতে বঞ্চিত করা হইয়াছিল। কাজেই এখন যে লর্ড লিন্‌লিথগো গান্ধীজীকে অন্যান্য লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিবেন, এমন মনে করিবার কি কারণ থাকিতে পারে? কারাগারে কর্কের মেয়র মিষ্টার ম্যাকসুইনীর প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগের কথা আয়ার্লাণ্ডের ইতিহাস পাঠকের সুবিদিত।

ভারত সরকার যখন দেশের লোকের নিকট কৈফিয়তের দায়ীও নহেন, তখন তাঁহারা, যত দিন স্বৈর ক্ষমতা পরিচালন ও লোকমত অনায়াসে অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন, করিবেন; সুতরাং ভারত সরকার যদি গান্ধীজীকে নির্ব্বাসিত করেন, তবে তাহা যতই বেদনাদায়ক হউক,—বিস্ময়ের কারণ হইবে না!

কাগজ-সঙ্কট

শিক্ষা-বিস্তারে কাগজের প্রয়োজন অপরিহার্য্য। কেন্দ্রী পরিষদে প্রকাশ, বর্ত্তমানে প্রতি বৎসর ভারতে ৯৬ হাজার টন কাগজ প্রস্তুত হয়; যুদ্ধের পূর্ব্বে ৩ বৎসর প্রায় ১ লক্ষ ৩৮ হাজার টন হিসাবে প্রস্তুত হইত—বিদেশ হইতে সংবাদপত্রের কাগজ ও পুরাতন সংবাদপত্র প্রতি বৎসর গড়ে ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টন আমদানী হইত। অর্থাৎ ভারতের প্রতি বৎসরের প্রয়োজন প্রায় ৩ লক্ষ টন কাগজের মধ্যে অর্দ্ধেক কাগজ ভারতে উৎপন্ন হইত। যুদ্ধের পূর্ব্বে সরকার প্রায় ২০ হাজার টন কাগজ ব্যবহার করিতেন, বর্ত্তমানে প্রায় ৮৬ হাজার ৩ শত টন আপনাদের প্রয়োজনে সংগ্রহ করিতেছেন। যুদ্ধের পূর্ব্বে সরকারের প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রায় ২ লক্ষ ৮১ হাজার টন কাগজ ভারতের জনসাধারণের প্রয়োজনে লাগিত। বর্ত্তমানে বিদেশী কাগজের আমদানী বন্ধ হওয়ায় ভারতে উৎপন্ন ৯৬ হাজার টন কাগজের উপর সরকার এবং জন-সাধারণকে নির্ভর করিতে হইতেছে। বর্ত্তমানে সরকারের প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রায় ৯ হাজার ৭ শত টন কাগজ থাকে। ইহার উপর আবার ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর হইতে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ পর্য্যন্ত ৫ মাসে সাড়ে ৭ হাজার টন কাগজ মধ্য-প্রাচীতে প্রেরণের কথা। ভারতীয় কাগজ-কল সমিতি সরকারের নিকট অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের উৎপন্ন কাগজের অন্ততঃ অর্দ্ধেক সাধারণের জন্য প্রদান করিতে অনুমতি প্রদান করা হউক। কিন্তু ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহে ভারত সরকার সমিতিকে জানাইয়াছিলেন, ভারতে উৎপন্ন কাগজের শতকরা ৩০ ভাগ জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দিবেন। সরকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়া বাঙ্গালার মুদ্রাকরসঙ্ঘ প্রস্তাব করেন যে, জনসাধারণের জন্য ভারতীয় কাগজের শতকরা ৭৫ ভাগ ছাড়িয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কাগজের নিদারুণ অভাবে বহু সাময়িক পত্রিকা, গ্রন্থপ্রকাশ বন্ধ,—বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা গ্রহণ সঙ্কটাপন্ন হইয়াছে; এমন কি, ব্যবসায়ীগণের নূতন খাতার কাগজেরও অভাব। সরকার ভারতে প্রস্তুত শতকরা দশ ভাগের স্থানে ত্রিশ ভাগ কাগজ সাধারণের ব্যবহারের জন্য অনুমতি দিয়াছেন। ইহা তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম প্রতিভাত হইবে।

বিক্ষোভ, বোমাবিস্ফোরণ ও গুলীবর্ষণ

২১শে মাঘ কেন্দ্রী পরিষদে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সদস্য জানান, নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত জনতার আক্রমণে পুলিশ-দলের ৪১ জন নিহত ও ১৩৬৩ জন আহত হয়। ১৯২টি থানা ও পুলিশের ঘাটী ৪১৪টি সরকারী ভবন, ৩১৮টি রেলওয়ে ষ্টেশন ও ৩০১টি ডাকঘর ধ্বংস হয়। জনতার আক্রমণে ১৪ জন সৈনিক নিহত ও ৭০ জন আহত হয়। দেশের বর্ত্তমান বিক্ষোভ সম্পর্কিত পুলিশ ও সৈন্যদিগের জুলুমের অভিযোগের তদন্ত করিবার জন্য এক তদন্ত-কমিটীর দাবী করা হইলে স্বরাষ্ট্র সদস্য মিঃ ম্যাক্সওয়েল বলেন—সরকার সরকারী কর্ম্মচারীদিগের কার্য্য সর্ব্বথা সমর্থন করিবেন। তদন্তের ব্যবস্থা হইলে আইন ও শৃঙ্খলা লোপ পাইবে।

৬ই ফাল্গুন ভারত-সচিব পার্লামেণ্টে জানান যে, জন-আন্দোলন সম্পর্কে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ৯ই আগষ্ট হইতে ৩০শে নভেম্বর পর্য্যন্ত যুক্তপ্রদেশ ব্যতীত সমগ্র ভারতে মোট ১০২৮ জন নিহত ও ৩২১৫ জন আহত হয় ও ৯৫৮ জনকে বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এই দিন কেন্দ্রী পরিষদে সমর-সংক্রান্ত যানবাহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য সার এডওয়ার্ড বেন্থল বলেন—রাজনৈতিক হাঙ্গামার ফলে বি এণ্ড এন ডবলু রেলওয়ের ১৬ লক্ষ টাকা এবং ই-আই রেলওয়ের ১৪ লক্ষ টাকা মূল্যের জিনিষপত্রের ক্ষতি হইয়াছে। বি এণ্ড এন ডবলু রেলওয়ের ষ্টেশনগুলিতে আনুমানিক ৬ লক্ষ টাকা মূল্যের চালানী মাল লুঠ হয়।

লুণ্ঠন—৫ই ফাল্গুন খুলনা জিলার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ডুমুরিয়া হাট সম্পূর্ণ লুণ্ঠিত। ৯ই বেলগাঁওএর হুবলী গ্রামে কয়েকটি শস্য-গোলা লুণ্ঠিত। ৮ই দৌলতপুর (খুলনা) হাটে জনতা কর্ত্তৃক চাউল লুঠ। ৯ই ফকিরহাট বাজারে কতকগুলি চাউলের দোকান লুঠ। ১০ই পাঁজরভাঙ্গার (রাজসাহী) পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকখানি গ্রামের প্রায় ৩ হাজার অধিবাসী কর্ত্তৃক ১১ খানি চাউল-বোঝাই নৌকা লুঠ। জনতার উপর পুলিশের গুলীচালন। জনতা কর্ত্তৃক পুলিশ-দল আক্রান্ত। কীর্ত্তিপুর ও পার্শ্ববাড়ী হাট হইতে ধান ও চাউল লুঠ। নওগাঁ মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলায় সহস্রাধিক লোকের অভিযান। খাদ্যের দাবী। ১১ই গ্রামবাসিগণ কর্ত্তৃক হায়দ্রাবাদ মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যানের শস্যভাণ্ডার লুঠ।

কম্যুনিষ্টদলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা—শিউড়ীতে কমরেড নরহরি দত্ত গ্রেপ্তার। ঢাকানিবাসী হরিদাস ভট্টাচার্য্য ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১০৯ ধারানুযায়ী এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। ৫ই ফাল্গুন বোম্বাই প্রাদেশিক ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রণ্টের নেতা সার আর, পি, মাসানীর পুত্র কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের

ভূতপূর্ব্ব সদস্য মিঃ এম, আর, মাসানীর নেতৃত্বে এক জনতা আগা খানের (যেখানে গান্ধীজী অনশনে রত ছিলেন) প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হইলে মিঃ মাসানী ও অপর ৪৩ জন ছাত্রকে গ্রেপ্তার। ১৩ই কলিকাতায় সমাজতন্ত্রীদলের ৭ জন কর্ম্মী জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান কেন্দ্রে আহূত। ২৩শে চট্টগ্রামের সাম্যবাদী কর্ম্মী শ্রীহাসি দত্ত গ্রেপ্তার। ২৪শে দিল্লীর সাম্যবাদী দলের দুই জন কর্ম্মীর ৬ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড।

বাঙ্গালা—৭ই ফাল্গুন বাঙ্গালা সরকারের প্রধান-সচিব বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদকে জানান যে, ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট হইতে ডিসেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত জনবিক্ষোভ সম্পর্কে ভারতরক্ষা বিধির ১২৯ ধারা অনুসারে ১০৯১ জন এবং ২৬ বিধি অনুসারে ১২১০ জন আটক ও ১৫৫৯ জন দণ্ডিত হইয়াছে।

কলিকাতা—১লা ফাল্গুন ৪ স্থানে তল্লাসী, ২ জন গ্রেপ্তার, শ্রীযুত হীরালাল লোহিয়াকে এক মামলার অভিযোগ হইতে মুক্তি দিয়া পুনরায় গ্রেপ্তার। ৫ই—দক্ষিণ কলিকাতায় শোভাযাত্রা-পরিচালনার জন্য ৬ জন গ্রেপ্তার। ৭ই শোভাযাত্রা পরিচালনার জন্য আশুতোষ কলেজের ৭ জন ছাত্র গ্রেপ্তার। দুই স্থানে তল্লাসী। ৯ই উত্তর-কলিকাতায় এক স্থানে তল্লাসী, ১ জন ভারতরক্ষা বিধির ১২৯ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার। ১১ই দক্ষিণ কলিকাতায় ১ স্থানে তল্লাসী ১ জন গ্রেপ্তার; ১৪ই ৮ স্থানে তল্লাসী, বহু আপত্তিকর কাগজ প্রাপ্তি। ১৬ই হ্যারিসন রোডে গোয়েন্দা সাব ইনস্পেক্টর জগদীন্দ্রনাথ মজুমদার ছুরিকাহত। এ সম্পর্কে নির্ম্মলচন্দ্র ভঞ্জ গ্রেপ্তার, তাহার গৃহে তল্লাসীর ফলে তিনটি বোমা প্রাপ্তি। গোয়েন্দা নির্ম্মলের অনুসরণ করিতেছিল। ১লা জানুয়ারী পুলিশ কলিকাতার এক বাড়ী তল্লাসী করিয়া বোমার খোল, হাতবোমা, কার্ত্তুজ, বারুদ, নানা প্রকার এসিড, "রক্তরবিবার" শীর্ষক আপত্তিকর প্রচারপত্রাদি পাইয়াছিল। এ সম্পর্কে নীলরতন বসু, নির্ম্মলচন্দ্র বসু ও নীলকৃষ্ণ বসু নামক তিন ভ্রাতা গ্রেপ্তার হইয়া বিচারার্থ অভিযুক্ত। ২২শে মধ্য-কলিকাতার এক স্থানে তল্লাসী করিয়া আপত্তিকর কাগজপত্র প্রাপ্তি। ২৩শে ফাল্গুন রাসবিহারী এভিনিউএর 'জলযোগ' খাবার দোকানে আক্রমণ, বোমানিক্ষেপ, প্রায় ৫ শত টাকা লুণ্ঠন।

ঢাকা—২১শে মাঘ শ্রীনগর থানার দারোগাকে চাকরী ত্যাগ করিয়া কংগ্রেসে যোগ দিতে পত্র লিখিবার অভিযোগে অমূল্যপ্রসাদ চন্দ অভিযুক্ত। ৩রা ফাল্গুন গেণ্ডারিয়া ষ্টেশন লুঠ, সশস্ত্র হাঙ্গামা, প্রভৃতির অভিযোগে ২২ জন অভিযুক্ত, ১০ জন পলাতক। ১৪ই ঢাকার মুক্ত রাজবন্দী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত, 'নবভারতী'র সম্পাদক শ্রীযুত অনিলচন্দ্র ঘোষ গ্রেপ্তার।

বীরভূম—বোলপুর শান্তিনিকেতন প্রেসের ম্যানেজার শ্রীযুত সুধীন্দ্র মজুমদার গ্রেপ্তার।

বরিশাল—২১শে মাঘ—বরিশাল জেলের হাঙ্গামা (৫ই অক্টোবর, অপরাহ্ন ৫টায়) সম্পর্কে রাজনীতিক বন্দী অধ্যাপক প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী এম-এ, শ্রীযুত মাণিক ঘোষ, শ্রীযুত দিলীপ দত্ত; শ্রীযুত গোপাল নাগ, শ্রীযুত সুধীর আইচ, শ্রীযুত নীরেন্দ্র দত্তমজুমদার, শ্রীযুত সুধীর শেঠ, শ্রীযুত শরদিন্দু মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত বিনোদ কাঞ্জিলাল, শ্রীযুত সুহৃদ দত্ত ও শ্রীযুত সুশীল ঘোষ অভিযুক্ত। ২২শে ফাল্গুন ভূতপূর্ব্ব আটক বন্দী শ্রীঅমিয়লাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীকিরণচন্দ্র রায়চৌধুরী গ্রেপ্তার।

ময়মনসিংহ—২২শে ফাল্গুন টাঙ্গাইলের কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীজগদীশচন্দ্র মিত্র গ্রেপ্তার।

হুগলী—খানাকুল পুলিশ কর্ত্তৃক বৃন্দাবন সামন্ত ও প্রফুল্ল দোলুই গ্রেপ্তার। রঘুনাথপুরের যামিনী বাগ নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত অবস্থায় গ্রেপ্তার। এক ইউনিয়ন বোর্ডের কাগজপত্র পুড়াইবার অভিযোগে বোর্ডের প্রেসিডেন্ট কালীপদ ধাড়া, সেক্রেটারী ডাঃ শচীন্দ্রনাথ মণ্ডল দণ্ডিত।

নোয়াখালী—৩রা ফাল্গুন—নোয়াখালী কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুত হারাণচন্দ্র ঘোষ চৌধুরী গ্রেপ্তার। কংগ্রেস কমিটীর স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পত্তি পুলিশের হস্তগত। ১৪ই আপত্তিকর পুস্তিকা রাখিবার জন্য ফেণীর শচীন্দ্র পাল গ্রেপ্তার। আটক বন্দী অবলাকান্ত চক্রবর্ত্তীর ১ বৎসর কারাদণ্ড।

বর্দ্ধমান—রেলপথ ধ্বংসের অভিযোগে গোপাল মুখোপাধ্যায়, রত্নমণি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।

দিনাজপুর—১০ই ফাল্গুন—বালুরঘাট হাইস্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীযুত কুমুদবিহারী চট্টোপাধ্যায়, সুধীর সেন, অধীর বিশ্বাস, নির্ম্মল রায়, সরকারী হাসপাতালের কম্পাউণ্ডার বিনয়ভূষণ চন্দ্র ও অমল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু লোকের গৃহ তল্লাসী, বহু ব্যক্তি গ্রেপ্তার। বালুরঘাটে এক দল সশস্ত্র পুলিশ আমদানী। বালুরঘাটের হিন্দুমহাসভার সেক্রেটারী শ্রীযুত নরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রেপ্তার।

আসাম—২১শে মাঘ—প্রাঙ্গণে বোমাবিস্ফোরণের ফলে নলবাড়ী ডাকঘর ভবনের ক্ষতি। ১ জন ছাত্র গ্রেপ্তার। শ্রীহট্টের ফরওয়ার্ড ব্লকদলের কর্ম্মী নলিনী গুপ্ত, সুর্ম্মা উপত্যকার বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মী নিকুঞ্জবিহারী গোস্বামী, মৌলভীবাজারে রাজনগরের সুকুমার ভট্টাচার্য্য, শিলচরে কৃষক ও শ্রমিক দলের কর্ম্মী গৌহাটীর ব্যবসায়ী ভূপেন্দ্রনাথ মহান্ত গ্রেপ্তার। কামরূপ বিক্ষোভ মামলা সম্পর্কে ৪৩ জন প্রত্যেকে ১৫ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। এই মামলায় ৯২ জন অভিযুক্ত হয় ৫ জন ফেরার। অভিযোগ—২৫শে আগষ্ট ইহাদের পরিচালনে ৩ সহস্রাধিক লোক ডাকঘর, সার্কেল আফিস ও রেলওয়ে ষ্টেশন ধ্বংস করিয়া কামরূপে সমবেত হয়। ৪ঠা ফাল্গুন শ্রীহট্টের কংগ্রেস নেতা শ্রীনিকুঞ্জবিহারী গোস্বামী ৪ মাস, ফরওয়ার্ড ব্লকের কর্ম্মী শ্রীকিরীটিভূষণ চৌধুরী ৬ মাস, নওগাঁর হংসধর হাজারীকা ও উকীল শ্রীমোহনচন্দ্র মোহান্ত ৬ মাস, শ্রীবিরজাকান্ত গোস্বামী দেড় বৎসর, শ্রীরাজেন্দ্র মোহান্ত ও হরেন্দ্র সিং ৫ মাস ও অমূল্যকুমার লাহিড়ী ৬ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত। ৩রা ফাল্গুন রাত্রিতে একদল পুলিস কর্ত্তৃক রূপাহী এলাকার (নওগাঁ) এক গৃহ হইতে শ্রীমহেন্দ্রনাথ হাজারিকা, শ্রীবেণুধর ডেকা, শ্রীভদ্র হাজারিকা, শ্রীআনন্দেশ্বর ভূইঞা, শ্রীমঙ্গলেশ্বর গজেকে গ্রেপ্তার। শ্রীমহেন্দ্র হাজারিকার গ্রেপ্তারের জন্য ১ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছিল। আসামে ছাত্র ফেডারেশনের সংগঠন সম্পাদক শ্রীনারায়ণ-চন্দ্র দাস কামরূপ জিলা হইতে বহিষ্কৃত। ৬ই—উত্তর লখিমপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের গৃহ এবং পি-ডবলু-ডি আফিসের ভবনে অগ্নি-সংযোগ; সান্ধ্য আদেশ জারী। ৯ই—২ মাসের জন্য শিবসাগর জিলায় সভা, শোভাযাত্রাদি নিষিদ্ধ। ২২শে—নলবাড়ী থানায়

কয়েকখানি গ্রাম হইতে বন্দুক চুরি। বন্দুক উদ্ধারের জন্য গ্রামে গ্রামে পুলিস ফৌজ প্রেরণ। ২৬শে—বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীকুমুদরাম বোরাকে গ্রেপ্তার; পুলিস তাঁহার সন্ধান করিতেছিল।

বোম্বাই—২৭শে মাঘ—আমেদাবাদে এক স্থানে পুলিসের গুলীবর্ষণ। তিন স্থানে পুলিসের প্রতি সোডাওয়াটারের বোতল নিক্ষেপ। ধুলকা হাই স্কুলের লেবরেটারীতে বিস্ফোরণ, নাদিরা পুলিস-চৌকীতে বোমা নিক্ষিপ্ত, নিকটবর্ত্তী গৃহ হইতে ৪ জন গ্রেপ্তার। ২৫।৩০ জন সশস্ত্র লোক কর্ত্তৃক জামখান্দি রাজ্যের এক থানা আক্রান্ত। ২৯শে মাঘ—মধ্যরাত্রিতে গিরগাঁওয়ে এক দর্জ্জির দোকানে বিস্ফোরণের ফলে ৩ জন আহত। আমেদাবাদে জনতার উপর পুলিশের লাঠীচালন ও গুলীবর্ষণ। পদাপোলে পুলিশের উপর এসিড নিক্ষেপ। দুই দিন হরতাল। খোলা দোকানগুলি আক্রান্ত। ১লা ফাল্গুন—পদাপোলের নিকট পুলিশের গুলীবর্ষণ। সানকাজীশেরীতে পুলিশ বাহিনীর উপর বোমা নিক্ষেপ। বেলগাঁও—বাগলকোট রাস্তায় পাথরের সেতু ধ্বংস। ৩টি মদের দোকান ভস্মীভূত। নাসিকের পুলিশ-চৌকিতে অগ্নিদান। সুরাটের কোঠামণ্ডি ও পাসর গ্রামের চৌরাগুলি, পারশাদের তাড়ির দোকান, কোঠামণ্ডির বিদ্যালয়, চন্দ্রভাসান গ্রামের ১১ হাজার ৪ শত 'তড়পা' ঘরে অগ্নিদান। ৩রা—সুরাটের চৌবাশি তালুকে বোমা বিস্ফোরণ। ৪ঠা—বান্দোলি তালুকে ৪ দিনে ৪টি বোমা বিস্ফোরণ, পুলিশ-লাইনে দুইটি বোমা নিক্ষেপ। ৭ই—রিভলভার, কার্ত্তুজ ও ধ্বংসাত্মক অপর যন্ত্রপাতিসহ সুরাটে তিন জন ফেরার গ্রেপ্তার। সুরাটের নিকটবর্ত্তী আদাজানে, কৃষ্ণবাব তালুকের অধীন আনন্দ চৌরায় শোভাযাত্রা বাহির করিবার অভিযোগে পুণায় ১২ জন গ্রেপ্তার; বেলগাঁও-এর অধীন গাম্পেগাঁও ডাকঘর আক্রমণ ও অগ্নিদান। মাতোলী হইতে ১টি রিভলভার, ৩ খানি তরবারি; বেদবেল ও চাপগাঁও হইতে ৪টি রাইফল্‌স ও অপর দুইটি অস্ত্র অপসারিত। ৯ই সশস্ত্র জনতা কর্ত্তৃক বেলগাঁও নূতন সাউথলগীর অস্থায়ী টেলিগ্রাফ বিভাগে কর্ম্মচারীরা আক্রান্ত, শিবিরে অগ্নিসংযোগ। ১০ই—আমেদাবাদের গান্ধী রোডে ৫০ জন বালকের পুলিশ প্রহার। যারবেদা জেল হইতে পলাতক রাজনৈতিক বন্দী ছান্নু সিং ও কল্যাণ সিং গ্রেপ্তার। ১১ই—বরোচে পেটিট বালিকাবিদ্যালয়ে বোমা বিস্ফোরণ। ১৩ই, সুরাট জৈন হাইস্কুলের নিকট এক সাইকেল-আরোহী কর্ত্তৃক বোমা নিক্ষেপ, ১টি স্ত্রীলোক আহত। নাসিকে তল্লাসী করিয়া সুভাষচন্দ্র বসুর চিত্রাদি প্রাপ্তি। ১৮ই—১৫ দিনের জন্য অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বোম্বাই সহরে চলাফেরা নিষিদ্ধ। ২১শে—বোম্বাইএ আপত্তিকর কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট সন্দেহে ৮৫ জন গ্রেপ্তার। ২২শে—বেলগাঁওএর মোহন রাও দেশপাণ্ডে গ্রেপ্তার। বোম্বাই ছাত্র য়ুনিয়নের ৫ জন কর্ম্মী দণ্ডিত। হংস বেন গ্রেপ্তার। রুদ্রপুর ও চৌলিপুর (বেলগাঁও) হইতে কয়েকটি রাইফল্‌স অপহৃত। পুণায় মিঃ এম, আর মাসনী, ১৪ জন তরুণী ও অপর ছয় জন দণ্ডিত। ২৫শে ফাল্গুন—পশ্চিম খান্দেশে ৭ শত লোকের উপর পুলিশের গুলীবর্ষণ, ৩৫ জন নিহত, ৩৫ জন আহত। জনতার পুলিসের উপর তীর নিক্ষেপের অভিযোগ, ৩ জন কনষ্টেবল আহত, ৩০০ জন গ্রেপ্তার।

মাদ্রাজ—৯ই ফাল্গুন—সেক্রেটারিয়েটের সম্মুখে পিকেটিং করিবার অভিযোগে শ্রীমতী ভারতী, শ্রীযুক্তা অমুস্বামী নাথন, শ্রীযুক্তা মঞ্জুবাসিনী, ও ৪জন ছাত্র গ্রেপ্তার। সেক্রেটারিয়েটের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শনের অভিযোগে কংগ্রেস নেতা শ্রীযুত পি, পার্থসারথির কারাদণ্ড।

বিহার—পুরুলিয়ার বড়বাজার থানায় অগ্নিদান ও অস্ত্রাদি লুণ্ঠনের অভিযোগে ২৮ জনের ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। ৬ই ফাল্গুন সাঁওতাল পরগণার সারাথ থানা, ডাকঘর ও শস্যগোলা দগ্ধ করিবার ও লুণ্ঠনের অভিযোগে ১৫ জনের ৭ হইতে ৯ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড। ডুমকার অন্তর্গত বড় পলাশীর লাঠিপাহাড়ে তীর ধনুক ও অন্যান্য অস্ত্রসজ্জিত একদল লোকের সহিত পুলিস-দলের তুমুল লড়াই, ৫ জন পুলিশ অফিসার আহত। পুলিশের গুলীচালন। ডুমকার সরায়াস্থিত দ্বারভাঙ্গা রাজকাছারীতে অগ্নিদান; কয়েক জন হতাহত। ১২ই ফতোয়া ষ্টেশনে আর-এম-এসএর দুই জন অফিসারকে হত্যা করিবার অভিযোগে ৮ জনের প্রাণদণ্ড, ৫ জনের নির্ব্বাসন দণ্ড; প্রধান আসামী রাম নারায়ণ মোহান্ত নিরুদ্দেশ। পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর ভূতপূর্ব্ব ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীযুত ভোলানাথ মজুমদার, শ্রীযুত বিশ্বনাথ সাঁই, শ্রীযুত শক্তিপদ দাস, শ্রীযুত রামলাল সেবাউলী গ্রেপ্তার। রাঁচী সহরের দুই স্থানে তল্লাসী, ১ জন গ্রেপ্তার। ২২শে সরকারী শিল্প ইনষ্টিটিউট লুঠ করিবার অভিযোগে ৩ জনের ১ হইতে ৮ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। পীর পাইতি ও মীর্জাচৌকী রেল-ষ্টেশনের নিকট অপরাধজনক কার্য্য করিবার অভিযোগে কতিপয় ব্যক্তির ৬ মাস হইতে ৬ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস সমিতির অধিনায়ক শ্রীযুত নাথুনি সিং দীঘাঘাটে গ্রেপ্তার।

যুক্ত-প্রদেশ—২২শে—হরিদ্বারে সরকারী ভবন আক্রমণ, পুলিসের ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও কয় জন পুলিস কনষ্টেবলকে আঘাত ও সরকারী অর্থ লুণ্ঠনের অভিযোগে ২ জনের যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ড এবং ১৪ জনের বিভিন্ন মিয়াদে কারাদণ্ড।

মধ্য-প্রদেশ—২৮শে মাঘ মহাত্মা গান্ধীর প্রায়োপবেশনের সংবাদ পাইয়া অধ্যাপক ভাঁসালীর পুনরায় অনশন আরম্ভ, কিন্তু গান্ধীজী উদ্বিগ্ন হইয়াছিল সংবাদে ১লা ফাল্গুন রাত্রিতে অনশন ভঙ্গ।

পঞ্জাব—পঞ্জাব পরিষদে জানান হয়, পরিষদের ১১ জন কংগ্রেসী সদস্য আটক।

সিন্ধু—২৬শে মাঘ করাচীর প্রধান রাজপথ ফেরীরোডে এক টহলদারী পুলিসের উপর বোমা নিক্ষেপ। এই পুলিসদল মৈহাব দেবী স্কুলের নিকট পৌছিলে পুনরায় তাহাদিগের উপর বোমাবর্ষণ।

দিল্লী—১০ই ফাল্গুন—দিল্লী রেলওয়ে ষ্টেশনে বোমা বিস্ফোরণ, ১ জন নিহত, ১ জন আহত, একখানি প্যাসেঞ্জার ট্রেণের বিশেষ ক্ষতি। ১৪ই—জমিয়ৎ-উল-উলেমার সহকারী সভাপতি মৌলানা আমেদ সৈয়দ গ্রেপ্তার। মধ্যরাত্রিতে কে কাজির বাড়ীতে হানা দিয়া পুলিশ কর্ত্তৃক প্রভূত পরিমাণ বিস্ফোরিত পদার্থ আবিষ্কার।

সামন্তরাজ্য—২৮শে মাঘ কোলাপুরের লক্ষ্মীপুর থানা ও সিটিপোষ্ট আফিসে বোমা বিস্ফোরণ। সাঙ্গলী রাজ্যের এক স্থানে বহু লোকের কতকগুলি বাড়ী তল্লাসী করিয়া তরবারি, বর্শা, কুঠার প্রভৃতি সংগ্রহ। কোটকোলমহল আফিসে অগ্নিসংযোগ; শাপুরীতে বোমাবিস্ফোরণের ফলে ৩ জন আহত। ৩রা ফাল্গুন টাউনহলের নিকটে বোমাবিস্ফোরণ, ১ জন আহত। ৯ই কোলাপুর সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে ও এক দোকানের সম্মুখে বিস্ফোরণ, ১ জন কনষ্টেবল ও অপর এক জন আহত; কাটকোল মহলের কাছারীতে সশস্ত্র জনতার আক্রমণ ও অগ্নিদান, ১৩ই শাংলি রাজ্যের শ্রীহাট্টি গ্রামে জনতার উপর পুলিশের গুলীবর্ষণ ১ জন নিহত, ১ জন আহত।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত
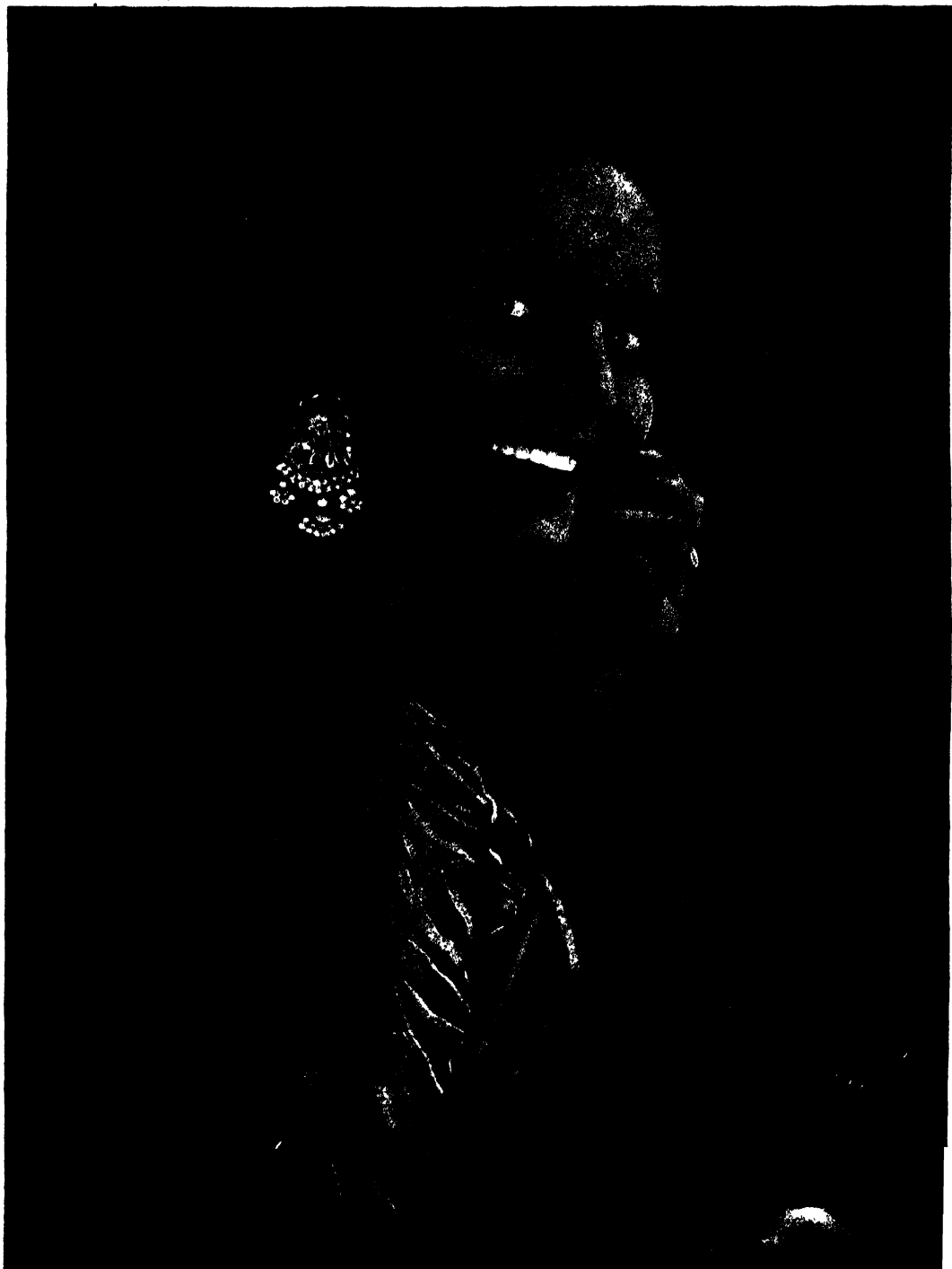
“আমার অঙ্গমাঝে
বরণের ডালা সেজেছে আলোক-মালার সাজে।”—রবীন্দ্রনাথ

[শিল্পী—মিষ্টার টমাস
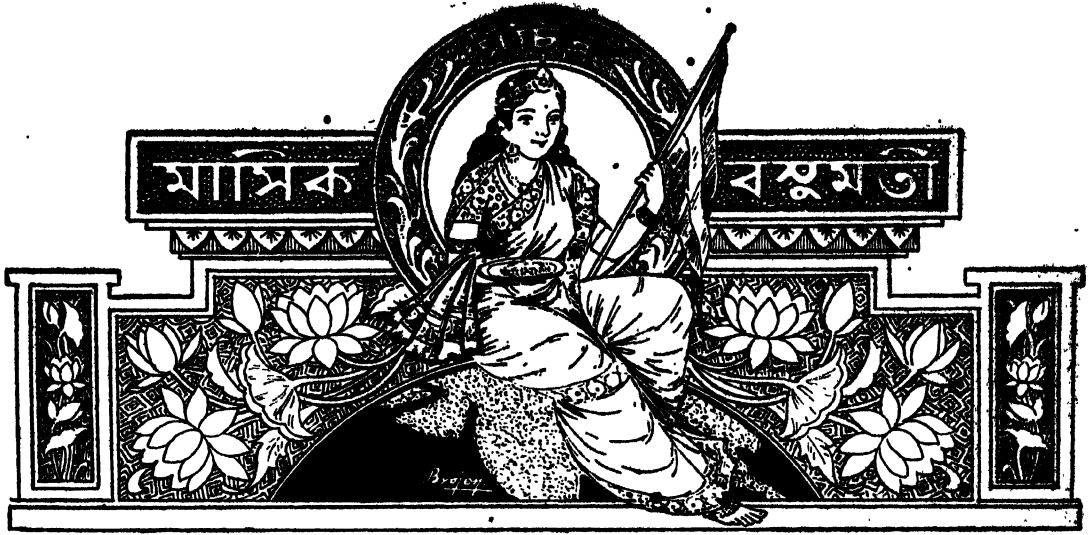
২১শ বর্ষ] চৈত্র, ১৩৪৯ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

সংস্কৃত-নাট্যে প্রহসন

আমাদের জাতীয় জীবনের আনন্দধারা ক্ষীণ-স্রোতা নদীর মত দিনে দিনে শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। দুঃখ-দুর্দ্দশার শৈবালদামে আনন্দ-স্রোতঃ রুদ্ধপ্রায়, দুশ্চিন্তার পঙ্কিলতায় পূর্ব্বাগত আনন্দপ্রবাহ বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। তাহার উপর বৈদেশিক সভ্যতা কচুরিপানার মত সমস্ত জাতির জীবন-রস শোষণ করিয়া ভাব-পরিসরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। এ দুর্দ্দিন হইতে ভারত কত দিনে যে মুক্ত হইবে, তাহা জানি না। কিন্তু চির দিন এরূপ নিরানন্দপুরীর মত ভারতভূমি বিশ্বের সম্মুখে ম্লান—নিস্তব্ধ—নিরুদ্যম ছিল না। এই ভূমির কৃতী সন্তানগণ জগৎকে বহুবিধ অবদানে উজ্জ্বল ও আনন্দে মুখর করিয়া রাখিয়াছিলেন। এক দিন এই অবদানের উপহারে সমগ্র দেশ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। বিদেশ হইতে আমদানী করা ভাবসম্পৎ যখন এ দেশে দুর্লভ ছিল, তখনও যে শিল্পকলা-কৌশলের বিবিধ বিকাশ এই ভারতের অঙ্গেই সম্ভবপর হইয়াছিল, তাহার আলোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। পরকীয় নাটক ও প্রহসন আজ ভারতের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত ও প্রদর্শিত হইতেছে, কিন্তু আমাদের নিজ সম্পদের পরিচয় দিনের পর দিন বিস্মৃত হইয়া যাইতেছি।

আজ দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে,—প্রাচীন অভিনয়-কলার সম্যক্ আদর এ দেশে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেছে না, অথচ এই সমস্ত কলা-সাহিত্যের নানাবিধ গ্রন্থ আজও বিদ্যমান। আমাদের মনোবৃত্তি পরিবর্ত্তনের জন্যই হউক, অথবা সম্প্রদায় বিলুপ্ত হইবার পর তাহার উদ্ধার-বিষয়ে উদ্যমের অভাবপ্রযুক্তই হউক, সে বিষয়ে দৃষ্টি প্রদান করিবার মত আমাদের প্রবৃত্তি জাগ্রত হইতেছে না।

সংস্কৃত-নাট্যের প্রথম প্রবর্ত্তক ভরতমুনি, তাঁহারই রচিত নাট্য-শাস্ত্র—পরবর্ত্তী সকল আলঙ্কারিকের অবলম্বন। এ জন্য দশরূপক গ্রন্থের রচয়িতা ধনঞ্জয় লিখিয়াছেন,—

দশরূপানুকারেণ যস্য মাদ্যন্তি ভাবকাঃ।
নমঃ সর্ব্ববিদে তস্মৈ বিষ্ণবে ভরতায় চ॥

বিষ্ণু ও ভরতকে প্রণাম করিতেছি, বিষ্ণু দশরূপ মৎস্য-কূর্ম্মাদি দশাকৃতি ধারণ করায়—এবং ভরতমুনি দশরূপ—নাটক-প্রকরণাদি দশবিধ দৃশ্যকাব্য প্রকাশ করায় উভয়েই ভাবুকগণের পরম আনন্দপ্রদ হইয়াছেন। বিষ্ণু সর্ব্বজ্ঞ—ভরতমুনিও সর্ব্ববিষয়ে অভিজ্ঞ, এই ভাবে—ভরতমুনিকে বিষ্ণুসদৃশ পূজ্য জ্ঞানে সম্মানিত করা হইয়াছে।

পূর্ব্বকালে জাতীয় জীবনে আনন্দবোধ আনয়ন করিবার জন্যই যে নাট্যের সৃষ্টি, তাহাও ধনঞ্জয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

আনন্দনিষ্যন্দিষু রূপকেষু
ব্যুৎপত্তিমাত্রং ফলমল্পবুদ্ধিঃ।
যোঽপীতিহাসাদিবদাহ সাধু-
স্তস্মৈ নমঃ স্বাদুপরাঙ্মুখায়॥

নাটকাদি রূপক পরম আনন্দের নিদান। কিন্তু যে ইহার দ্বারা ভাষার ব্যুৎপত্তিমাত্র প্রয়োজন বোধ করে—সে ব্যক্তি অল্পবুদ্ধি, আর যে ব্যক্তি ইতিহাসের ন্যায় মনে করেন, তিনি ত' সাধুপুরুষ—তাঁহাকে নমস্কার। কেন না, স্বাদু (আকর্ষক) রস হইতে পরাঙ্মুখ হইয়াই তিনি থাকিলেন। ইহা যে ব্যঙ্গ—তাহা বলাই বাহুল্য। প্রকৃতপক্ষে রূপকের প্রয়োজন নির্ম্মল আনন্দ-সম্ভোগ।

রূপক অর্থে নাটকাদি সমস্ত দৃশ্যকাব্যকে বুঝায়। রূপ যেমন প্রত্যক্ষ-গোচর হয়, সেইরূপ নাট্য দর্শনের যোগ্য হয় বলিয়া তাহা রূপ। যাহাতে সেই রূপের আরোপ থাকে, তাহাই রূপক। রূপণ অর্থে আরোপণ—নাট্য-ভূমিকায় নটে রামচন্দ্রের লীলা আরোপিত হইতেছে, এই জন্য সেই নটপ্রযোজ্য অভিনেয় বস্তুকে রূপক বলিয়া অভিহিত করা হয়। ভরত বলিয়াছেন,—

দেবতানামৃষীণাঞ্চ রাজ্ঞাং লোকস্য চৈব হি।
পূর্ব্ববৃত্তানুচরিতং নাটকং নাম তদ্ভবেৎ ॥

রামচন্দ্র ত' কোন্ যুগে ধরাধাম হইতে লীলাসংবরণ করিয়াছেন, কিন্তু নাটকে সেই পূর্ব্ববৃত্তের অনুকরণে আজিও রাম লীলা প্রত্যক্ষবৎ প্রতীত হয়।

সমস্ত নাট্যের মধ্যে নাটকই প্রধান। (১) নাটক, (২) প্রকরণ, (৩) ভাণ, (৪) ব্যায়োগ, (৫) সমবকার, (৬) ডিম, (৭) বীথী, (৮) অঙ্ক, (৯) ঈহামৃগ ও (১০) প্রহসন—এই দশটি রূপকের ভেদ। প্রত্যেক রূপকের এক এক বৈশিষ্ট্য আছে। সংস্কৃত সাহিত্যে বহু নাটক ও প্রকরণ প্রসিদ্ধ আছে;—পূর্ব্বকালে এই দশবিধ রূপকেরই যে প্রচলন ছিল, তাহা সাহিত্য-দর্পণে উদাহরণ প্রদর্শন দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে। ভাণের উদাহরণ 'লীলা-মধুকর'। ব্যায়োগের উদাহরণ 'সৌগন্ধিকা-হরণম্'—ভাসের 'মধ্যম ব্যায়োগ' উল্লিখিত না হইলেও বর্ত্তমান সময়ে তাহাও গ্রহণীয়। সমবকারের উদাহরণ—'সমুদ্রমন্থন'। ডিম নামক রূপকের উদাহরণ—'ত্রিপুরদাহ'। ঈহামৃগের উদাহরণ—'কুসুমশেখর-বিজয়'। অঙ্ক নামক রূপকের উদাহরণ—'শর্ম্মিষ্ঠা-যযাতি'। বীথীর উদাহরণ—'মালবিকা'। প্রহসনের উদাহরণ—তিনটি; শুদ্ধপ্রহসন—'কন্দর্পকেলি'। সঙ্কীর্ণ প্রহসন—'ধূর্ত্তচরিত' এবং মতান্তরে সঙ্কীর্ণ প্রহসন—'লটকমেলক'। উল্লিখিত উদাহরণগুলির মধ্যে বহু গ্রন্থ অপ্রচলিত অথবা বিলুপ্ত হইয়াছে।

রূপক ও নাট্যশব্দ প্রায় তুল্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তবে উভয়ের ব্যুৎপত্তিগত একটু পার্থক্য আছে। ধনঞ্জয় নাট্য ও রূপকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—

অবস্থানুকৃতির্নাট্যং রূপং দৃশ্যতয়োচ্যতে।
রূপকং তৎসমারোপাদ্ দশধৈব রসাশ্রয়ম্ ॥

অবস্থানুকরণের নাম নাট্য, তাহা দৃশ্য হইলে রূপ, সেই রূপ নটাদিতে আরোপিত হইলে, তাহা রূপক; রূপক দশবিধ, রূপক রসকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে। ধনঞ্জয় এই দশবিধ রূপক ব্যতীত আরও দৃশ্যকাব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, ঐ গ্রন্থের টীকাকার (ধনিক) সেরূপ সাতটি নাম করিয়াছেন, কিন্তু সাহিত্য-দর্পণকার ১৮টি উপরূপকের * উল্লেখ করিয়াছেন। এই যে উপরূপক, ইহা নাট্য নামে অভিহিত হইবে না—ইহার নাম হইবে নৃত্য। নৃত্য ও নৃত্ত দুইটি ভিন্ন। নৃত্য শব্দে পদার্থ বিষয়ের অভিনয়, আর নৃত্ত শব্দে তাল-লয়ের আশ্রয়ে যাহা নির্ব্বাহিত হয়, অর্থাৎ যেমন যাত্রা ও 'নাচ'। নৃত্য ভাবের আশ্রিত, নাট্য রসের আশ্রিত, আর নৃত্ত তাল ও লয়ের আশ্রিত, এইরূপ ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে।

নৃৎ ধাতুর অর্থ গাত্রবিক্ষেপ (গাত্রের চালনা-বিশেষ) সুতরাং আঙ্গিক অভিনয়ের আধিক্য যাহাতে আছে, তাহাই নৃত্য। নট ধাতুর অর্থ স্পন্দন, অল্পমাত্রায় অঙ্গচালনা অর্থাৎ বাক্যার্থ-বোধক অভিনয়ের প্রাধান্য এবং অঙ্গচালনার অপ্রাধান্য নাটকাদিতে থাকে বলিয়া তাহা নাট্য। নৃত্য ও নৃত্ত একই নৃৎ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইলেও প্রথমটিতে অনুকরণ-প্রধান গাত্রবিক্ষেপ, দ্বিতীয়টিতে তালযুক্ত গাত্রবিক্ষেপ মাত্র বুঝাইয়া থাকে।

সাহিত্যদর্পণে নাট্যের সংজ্ঞা প্রদত্ত হয় নাই, তাহাতে উক্ত হইয়াছে যে,—

ভবেদভিনয়োঽবস্থানুকারঃ স চতুর্ব্বিধঃ।

অভিনয় হইল অবস্থার অনুকরণ। ধনঞ্জয়মতে যাহা নাট্যের সংজ্ঞা, সাহিত্যদর্পণে তাহাই অভিনয় নামে কথিত হইয়াছে।

রামচন্দ্রকৃত নাট্যদর্পণে রূপক দ্বাদশবিধ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। নাটিকা ও প্রকরণী—ইহাও রূপকের মধ্যে গণিত হইয়াছে।

নন্দিকেশ্বরকৃত অভিনয়দর্পণে নটন যে ত্রিবিধ, তাহার উল্লেখ দেখা যায়, তাহাতে নাট্য, নৃত্য ও নৃত্ত—এই প্রকার ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে এবং কোন্ ক্ষেত্রে কোন্ জাতীয় নটন প্রযুক্ত হইবে, তাহাও উপদিষ্ট হইয়াছে।

পর্ব্বকালে নাট্য ও নৃত্য উভয়ের প্রয়োগ করিতে পারা যায়, কিন্তু নৃপতিদিগের অভিষেক-মহোৎসবে নৃত্ত (নাচ) অনুষ্ঠেয়। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যে পর্ব্বদিনে—দেবযাত্রায়—বিবাহে—প্রিয়জন-সম্মেলনে—নগর বা গৃহপ্রবেশ কালে—পুত্রজন্মোৎসবে নাট্যাদির প্রয়োগ কর্ত্তব্য। এই ত্রিবিধ নটনই মঙ্গলকার্য্যবিশেষ। সংক্ষেপে ইহাদের ভেদ বর্ণিত হইয়াছে,—যাহাতে ইতিহাসের সমাবেশ আছে, তাহা নাট্য বা নাটক। যাহাতে ভাবাভিনয় নাই, তাহা নৃত্ত; আর যাহা রসভাবের ব্যঞ্জনাযুক্ত অভিনয়—তাহাই নৃত্য, রাজা-মহারাজাদিগের সভায় এই নৃত্যের প্রয়োগ করিতে হয়।

সমস্ত রূপক বা নাট্যের মধ্যে নাটক নামক রূপকই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। নাটকেরই বিস্তৃত লক্ষণ আলঙ্কারিকগণ দিয়াছেন, আর কোন রূপকের এত বিশদ বিশ্লেষণ নাই; তবে যেখানে যেখানে প্রভেদ আছে—সেইটুকু মাত্র উল্লেখ করিয়া অন্যান্য অংশে নাটকের তুল্য, এই কথা বলাতেই সমস্ত রূপকের স্বরূপ বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রকরণও নাটকের মতই কাব্যাংশে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে; তবে প্রকরণ সংখ্যায় অল্প, অবয়বে নাটকাপেক্ষা বৃহত্তর এবং কবি-কল্পিত ঘটনাযুক্ত বলিয়া সর্ব্বসাধারণের চিত্ত অধিকার তেমন ভাবে করিতে পারে না বলিয়াই মনে হয়।

রামায়ণ-মহাভারতাদি প্রসিদ্ধ অথবা ঐতিহাসিক পুরুষগণের জীবন-যাত্রা চিত্রিত হইলে, তাহাতে শ্রোতৃবৃন্দের যতটা আকর্ষণ হয়, কল্পিত নায়ক-নায়িকার সমাবেশে তত গভীর রসসৃষ্টি হয় কি না, তাহা সহৃদয়বেদ্য।

লোকরঞ্জকতায় প্রকরণের পরই প্রহসনের স্থান। প্রহসনের লক্ষণ এই যে,—কবিকল্পিত ঘটনার সমাবেশে নিন্দনীয় চরিত্র অঙ্কন ইহাতে থাকিবে; এক জন ধৃষ্ট ব্যক্তি অথবা বহু ধৃষ্টের মিলনে প্রহসন চিত্রিত হইতে পারে। কিন্তু হাস্যরসই প্রধান বা অঙ্গী। বিপ্র, তপস্বী, ভগবান্ (পরিব্রাজক) প্রভৃতি ইহার নায়ক হইবে। প্রহসন ভরতমতে দ্বিবিধ, ধনঞ্জয়মতে ত্রিবিধ, রামচন্দ্রমতেও দ্বিবিধ। সাহিত্যদর্পণকার উভয় মতেরই উল্লেখ করিয়াছেন। শুদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ—এই দ্বিবিধ প্রহসন ভরতোক্ত বলিয়া অনেকেই ইহার পক্ষপাতী। ধনঞ্জয় 'বিকৃত' নামক আর এক প্রকার প্রহসনের ভেদ স্বীকার

* নাটিকা (১) ত্রোটক (২) গোষ্ঠী (৩) সট্টক (৪) নাট্যরাসক (৫) প্রস্থান (৬) উল্লাপ্য (৭) কাব্য (৮) প্রেঙ্খণ (৯) রাসক (১০) সংলাপক (১১) শ্রীগদিত (১২) শিল্পক (১৩) বিলাসিকা (১৪) দুর্ম্মল্লিকা (১৫) প্রকরণী (১৬) হল্লীশ (১৭) ভাণিকা (১৮)। ধনিকের উল্লিখিত সাতটি এই আঠারটির অতিরিক্ত নহে।

করিয়াছেন। একটি ধূর্ত্ত দ্বারা প্রহসন নির্ব্বাহিত হইলে—তাহা শুদ্ধ, বহু ধূর্ত্ত সমাবেশ হইলে—তাহা সঙ্কীর্ণ, এবং ক্লীব, কঞ্চুকী, তাপস, বিট, চারণ, সৈন্য প্রভৃতির বিকৃত বেশ ও বিকৃত বাক্য যাহাতে থাকিবে, তাহাই 'বিকৃত' নামক প্রহসন।

অনেকে অভিযোগ করিয়া থাকেন যে,—সংস্কৃত সাহিত্যে বড় বড় রাজা-মহারাজা বা ব্রাহ্মণ-সজ্জন ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিদিগকে লইয়া কোন চরিত্র অঙ্কন নাই এবং art for art's sake এ নীতিও তখনকার সাহিত্যে অজ্ঞাত ছিল। এ সকলের আলোচনা এ প্রবন্ধে নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু সংস্কৃত প্রহসনের মধ্যে এই সকল অভিযোগের যে উত্তর আছে, তাহা অকুণ্ঠিত কণ্ঠে বলা যায়।

অবশ্য সাধারণ কাব্যের নীতি অনুসারে বলা যাইতে পারে যে, প্রহসনে যদি নিন্দিত চরিত্রগুলিই অঙ্কিত থাকে, তাহা হইলে 'রামাদিবং প্রবর্ত্তিতব্যং ন রাবণাদিবং' কাব্যের সে সার্থকতা রহিল কোথায়? এ বিষয়ে আর কেহ প্রশ্ন তুলেন নাই বটে, কিন্তু রামচন্দ্র তাঁহার নাট্যদর্পণে জানাইয়া দিয়াছেন,—"বৈমুখ্যকার্য্যম্‌……প্রহসনং দ্বিধা" "বৈমুখ্যং বহুমানাভাবঃ কার্য্যং প্রয়োজনং যস্য। প্রহসনেন হি পাষণ্ডিপ্রভৃতীনাং চরিতং বিজ্ঞায় বিমুখঃ পুরুষো ন ভূয়স্তান্‌ বঞ্চকানুপসর্পতি।" বৈমুখ্য অর্থে অনাদর—ইহাই প্রহসনের প্রয়োজন। প্রহসনের দ্বারা পাষণ্ডী প্রভৃতির চরিত জ্ঞাত হইয়া লোক বিমুখ হইবে এবং আর কখনও সেইরূপ ধূর্ত্তদিগের নিকটে যাইবে না, সুতরাং দুষ্ট—নিন্দনীয় ব্যক্তিগণের কার্য্যে অনাদর প্রতিষ্ঠিত হইবে।

প্রহসনে মাত্র একটি অঙ্ক,* মতান্তরে দুইটি অঙ্ক থাকিতে পারে। অথবা দুইটি সন্ধি লইয়া একটি অঙ্কও হইতে পারে। কাহারও কাহারও মতে সঙ্কীর্ণ প্রহসনে—একাধিক অঙ্ক সন্নিবেশ ঘটিতে পারে—ইহা রামচন্দ্র উল্লেখ করিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে প্রহসনের সংখ্যা বড় কম নহে, তবে এখনও বহু প্রহসন অমুদ্রিত আছে।

গত ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে বোধায়ন কবি-বিরচিত "ভগবদজ্জুকীয়ম্‌" নামক একখানি প্রহসন মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদে ইহা অভিনীতও হইয়াছিল। এই প্রহসনখানি টীকাসহিত প্রকাশিত হওয়ায় গ্রন্থকারের নাম জানিতে পারা গিয়াছে,† নতুবা গ্রন্থে তাঁহার নাম নাই। ভাস কবির নাটকচক্রে যেমন গ্রন্থকারের নাম নাই, ঠিক্‌ সেইরূপ রীতির অনুবর্ত্তনে প্রহসনখানি রচিত। (পরবর্ত্তী কালে নাটক বা প্রহসনের আরম্ভে কবি-পরিচয় উল্লিখিত হইয়া থাকে। মহাকবি কালিদাসের বা ভবভূতির নাট্য-সাহিত্যে তাহা দেখা যায়)। এ জন্য উক্ত প্রহসনখানি খুব প্রাচীন বলিয়া অনেকে মনে করেন। যখন বৌদ্ধ-প্রভাব হ্রাস হইতে আরম্ভ হইয়াছিল—সেই সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বেও ইহার রচনা-কাল হইতে পারে। এই প্রহসনের নায়ক একটি ব্রাহ্মণ পরিব্রাজক। অনেকে বলেন,—পরিব্রাজক তাঁহার শিষ্যকে উপদেশচ্ছলে যে সকল বেদান্তসিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন—তাহা গৌড়পাদের মাণ্ডুক্যকারিকার ভাবার্থ জ্ঞাপন করে—ইহাতে মনে হয়, এই কবি গৌড়পাদের পরবর্ত্তী এবং ভগবান্‌ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং ভাষার রীতি ভাসের অনুরূপ হওয়ায় প্রাচীনতায় সন্দেহ নাই। Dr. M. Winternitz মনে করেন যে,—আচার্য্য রামানুজ তাঁহার শ্রীভাষ্য গ্রন্থে বৃত্তিকার বোধায়নের অনেক বার উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি আচার্য্য শ্রীশঙ্করেরও পূর্ব্ববর্ত্তী, সেই বৃত্তিকার বোধায়ন এবং এই প্রহসন-লেখক এক ব্যক্তিও হইতে পারেন। অবশ্য এ বিষয়ে অন্য কোন দৃঢ় প্রমাণ পাওয়া যায় না।

'ভগবদজ্জুকীয়ম্‌' এই নামটির মধ্যে ভগবান্‌ শব্দে পরিব্রাজক ও অজ্জুকা শব্দে গণিকা এই অর্থ প্রকাশ করেতেছে। নাটকের পরিভাষানুসারে অজ্জুকা শব্দটি গণিকা অর্থে ব্যবহৃত হইবে, ইহাই নিয়ম।

ভরতমুনি

[রাজা সার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পরিকল্পনা অনুসারে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে অঙ্কিত।

যাহা হউক, এই প্রহসনখানির আপাত দৃষ্টিতে আখ্যান-বস্তু এইরূপ—একটি পরিব্রাজক, তাঁহার শিষ্যসহ একটি গ্রামে আসিতেছিলেন, পথে শিষ্যটিকে দেখিতে না পাইয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন; তখন শিষ্য আসিতে আসিতে নিজ পরিচয় দিতেছে যে,—আমি ত জাতিমাত্র ব্রাহ্মণ, গলায় একগাছা পৈতা ছিল, কিন্তু বাড়ীতে অন্নাভাব, প্রাতরাশের লোভে বৌদ্ধ-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহারাও এক-বেলা খাইয়া থাকে, কাজেই সেখান হইতে পলায়ন করিয়া এই দুষ্ট আচার্য্যের হাতে পড়িয়াছি। সম্মুখে আচার্য্যকে দেখিয়া শিষ্য চুপ করিল। আচার্য্য তাহাকে অভয় দান

* বৃত্তং বহুনাং দুষ্টানাং সঙ্কীর্ণং কেচিদূচিরে।
তৎপুনর্ভবতি দ্ব্যঙ্কমথবৈকাঙ্কনির্ম্মিতম্‌। সাঃ দঃ ৬ষ্ঠ পরিঃ ২৭১
সঙ্কীর্ণমনেকাঙ্কং কেচিদনুস্মরন্তি (নাট্যদর্পণ ৮৫ শ্লোক-টীকা)

† বোধায়ন কবি-রচিতে
বিখ্যাতে "ভগবদজ্জুকাভিহিতে"

করিলেন। শিষ্য জিজ্ঞাসা করিল—ভগবান্, কি উপায়ে ভিক্ষাটা ভাল রকম জুটান যায়, তার ব্যবস্থা করুন। তিনি বলিলেন,—কামনা ত্যাগ কর, সহিষ্ণু হও, এ সংসার হ্রদের মত ভীষণ, যেমন প্রমাদশূন্য ব্যক্তি হ্রদ সন্তরণ করিয়া পার হইয়া যায়, সেরূপ সংসারও পার হওয়া যায়। শিষ্য বলিল,—আমি ধর্ম্মলোভে আসি নাই, অন্নলোভে এই দণ্ডধারণ করিয়াছি।

পরিব্রাজক বলিলেন,—সে কি কথা? তৎপরে তাহাকে নানা সদুপদেশ দিতে দিতে যাইতেছেন। অনন্তর একটি উদ্যানে উভয়ে প্রবেশ করিলেন, উদ্যান হইতে সঙ্গীতের স্বর উত্থিত হইল। শিষ্য শাণ্ডিল্য দেখিল যে. এক গণিকা তাহার দাসীসহ উপবিষ্ট এবং তাহার প্রণয়ীর জন্য অপেক্ষা করিতেছে, এবং সেই গণিকা গান গাহিতেছে। শাণ্ডিল্য আচার্য্যকে বলিল,—কি মধু বর্ষণ হইতেছে, আপনি একটু শুনুন। আচার্য্য একটু ক্রোধসহকারে তাহাকে তিরস্কার করিলেন। শিষ্য বলিল—আপনি সন্ন্যাসী, রাগের বশীভূত হইবেন না। আচার্য্য আত্মভাবে বিভোর হইয়া রহিলেন। এ দিকে যমদূত সেই গণিকার প্রাণবায়ু হরণ করিতে আসিল। তৎপরেই গণিকার সর্পাঘাতে মৃত্যু হইল। যমদূত চলিয়া গেল। এ দিকে শিষ্য গণিকার মৃত্যুতে আকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু পরিব্রাজক সেইরূপ উদাসীন হইয়া রহিলেন। শিষ্য তখন পরিব্রাজককে 'নিষ্ঠুর' প্রভৃতি শব্দে গালি দিয়া নিজেই সেই মৃত গণিকার নিকট আসিয়া রোদন করিতে লাগিল এবং গণিকার অঙ্গে হাত দিয়া তাহার জীবৎকালে হাত দিবার সুযোগ না পাওয়ায় দুঃখ করিতে লাগিল। গণিকার দাসী গণিকার মাতাকে ডাকিয়া আনিবার জন্য চলিয়া গেল। এ দিকে আচার্য্য শিষ্যকে যোগশক্তি দেখাইবার জন্য সেই মৃত গণিকা-দেহে নিজ প্রাণকে প্রবেশ করাইলেন। গণিকা উঠিয়া বসিল এবং ডাকিল—শাণ্ডিল্য! শাণ্ডিল্য! শিষ্য গণিকাকে জীবন প্রাপ্ত হইতে দেখিয়া বড়ই বিস্মিত এবং আনন্দিত হইল। কিন্তু গণিকা তখনই বলিল যে, তুমি হাত-পা না ধুইয়া আমাকে স্পর্শ করিও না। শিষ্য ভাবিল—গণিকার বড় আচার নিষ্ঠা! তখনই গণিকা বলিল—বৎস, অধ্যয়ন কর। শিষ্য মনে করিল—এ কি—আবার এখানেও সেই অধ্যয়ন? তদপেক্ষা অধ্যাপকের নিকটেই যাই না কেন? গিয়া দেখিল, অধ্যাপকের মৃত-দেহ পড়িয়া আছে। শিষ্য তাহাতেও দুঃখ করিতে লাগিল।

এ দিকে দাসী গণিকার মাতাকে লইয়া আসিল। মা আসিয়া দেখিল, গণিকা উঠিয়া বসিয়া আছে। সে মা'কে বলিল—তুমি আমায় ছুঁইও না। তাহার মা ভাবিল, বিষক্রিয়ার ফলে বিকার হইয়াছে—এ জন্য সে বৈদ্য আনিতে ছুটিল। বৈদ্য আসিয়া বিষ ঝাড়াইতে নানা মন্ত্র প্রয়োগ করিয়াও ফল পাইল না; তখন বৈদ্য প্রস্থান করিল। এ দিকে যমদূতের ভুলে বসন্তসেনা নামে আর এক গণিকার স্থলে এই গণিকার প্রাণ যমালয়ে লইয়া যাওয়ায় যম ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় সেই গণিকার প্রাণবায়ু সহ যমদূতকে পাঠাইয়া দিলেন। যমদূত আসিয়া দেখিল—গণিকা জীবিতা হইয়াছে। একটু বিচার করিয়া দেখিতেই বুঝিতে পারিল যে,—পরিব্রাজকের প্রাণ গণিকা-শরীরে প্রবেশ করিয়াছে। তখন যমদূত আর কি করিবে—সেই গণিকার প্রাণ ব্রাহ্মণের মৃতদেহে প্রবেশ করাইয়া দিল। পরিব্রাজক-দেহ উঠিয়া বসিল এবং গণিকার মত কথা কহিতে লাগিল। তখন তাহার কথা শুনিয়া শিষ্য শাণ্ডিল্য বলিল—আপনি কি সে ভগবান্‌ও নহেন, অজ্জুকাও (গণিকাও) নহেন, দেখিতেছি,—আপনি ভগবদজ্জুকা হইয়াছেন। ইহাই নাটকের নামকরণ। পরিব্রাজক তখন গণিকোচিত ব্যবহার-বার্ত্তা প্রকাশ করিতে লাগিল। এ দিকে রোজার নিকট হইতে বড়ী আনিয়া বৈদ্য আবার আসিল। গণিকার মুখে তখন সংস্কৃত কথার কি জোর! বৈদ্য ত' হতভম্ব হইল এবং গণিকাকে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। এ দিকে যমদূত দেখিল, তাহার বিলম্ব হইতেছে। যমের আদেশ—গণিকার প্রাণ গণিকা-দেহে দিতে হইবে। কাজেই যমদূত তখন উভয়ের শরীর হইতে উভয়ের প্রাণ-বিনিময় করিয়া দিল। শিষ্য চমৎকৃত হইল। এইখানেই প্রহসন সমাপ্ত হইয়াছে। এই প্রহসনে হিন্দু পরিব্রাজকের উৎকর্ষ এবং বৌদ্ধভিক্ষুদের তাৎকালিক অবনতির চিত্র পাওয়া যায়। ইহাতে অশ্লীলতা দোষ নাই, বরং গভীর হাস্যরসের সহিত একটি অপূর্ব্ব তত্ত্ববিশ্লেষণ মিশ্রিত আছে।*

মহেন্দ্রবিক্রম-বর্ম্মার রচিত 'মত্তবিলাসম্' নামক প্রহসনেও একটি ভণ্ড বৌদ্ধভিক্ষু ও কাপালিকের বিচিত্র ব্যবহারের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। 'লটকমেলক' প্রহসনখানিও খুব প্রসিদ্ধ। লটক শব্দে দুর্জ্জন, যত প্রকার দুর্জ্জন হইতে পারে, সকলের সম্মেলনে একটি অদ্ভুত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। ইহার রচয়িতা শঙ্খধর কনৌজরাজ গোবিন্দচন্দ্রের সভাপণ্ডিত ছিলেন—ইঁহার সময় খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতক। ধূর্ত্ত-সমাগম নামক প্রহসন জ্যোতিরীশ্বর কবি-প্রণীত। কবি জগদীশ্বর-প্রণীত হাস্যার্ণব নামক প্রহসন—এই কয়খানিই এক রীতিতে লিখিত। ইহাতে নানাবিধ হাস্যকর চিত্র আছে—arts for art's sake দেখিলে আধুনিক তরুণচিত্তেও বিস্ময় উৎপন্ন হইবে।

হাস্যার্ণবের নায়ক রাজা অনয়সিন্ধু, তাঁহার কুলপুরোহিত বিশ্বভণ্ড। বিশ্বভণ্ডের স্বরূপ বর্ণনায় কবি লিখিয়াছেন,—

দিনোপবাসী তু নিশামিষাশী
জটাধরঃ সন্ কুলটাভিলাষী।
অঙ্গং কষায়াম্বর-চারুদণ্ডঃ
শঠাগ্রণীঃ সর্পতি বিশ্বভণ্ডঃ।

এই রাজার সহিত কুমতিবর্ম্মা নামক মন্ত্রী এবং ব্যাধিসিন্ধু নামক বৈদ্য সর্ব্বদা সহচররূপে বর্ণিত। কৌতুকার্ণব নামক প্রহসনও এই রীতিতে লিখিত।

[ক্রমশঃ

শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ।

* Among the published Prahasanas the Bhagovadajjukiyam, 'the comedy of the saint and the courtezan', holds a some what unique position. It is certainly quite different from the Mattavilasa Prahasana···rather··a comedy in our sense of the word than a farce.

—(Dr. M. Winternitz.)

মরু-তৃষা

[উপন্যাস]

সারা রাত্রি ধরিয়া দুর্য্যোগ চলিয়াছে। আকাশের বুকে কুরুক্ষেত্র ব্যাপার! ঝড়-বৃষ্টি এবং বজ্র-বিদ্যুৎ মিলিয়া এমন কাণ্ড সুরু করিয়াছিল, মনে হইয়াছিল, মানুষের কর্ম্ম-চক্রকে অচল করিয়া দিতে তাহারা যেন ভীষণ ষড়যন্ত্র পাকাইয়াছে। এখন ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির সে মত্ততা শান্ত হইয়া আসিয়াছে। বর্ষণের বেগ মন্দা, বাতাসের গর্জ্জন কমিয়াছে এবং মেঘের ঘন-কৃষ্ণতা ফিকা হইয়া আসিয়াছে।

রমেশের শয়ন-ঘরের ঘড়িতে সশব্দে এ্যালার্ম বাজিয়া উঠিল। সে তীক্ষ্ণ আওয়াজ কাণে লাগিবামাত্র রমেশের গাঢ় নিদ্রা ভাঙ্গিয়া চৌচির হইয়া গেল। স্প্রীংএর মত লাফাইয়া তিনি শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন। কর-তলে দুই চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে খাট ছাড়িয়া মাটিতে নামিয়া অর্গল-মুক্ত কপাট খুলিয়া ঘরের বাহিরে বারান্দায় আসিলেন। রেলিংয়ের উপর দিয়া মুখ বাড়াইয়া একতলার পানে চাহিতেই দেখিলেন, নীচে গৃহিণী অমলা!

অমলা সদ্য স্নান সারিয়াছে। আর্দ্র বসন, সিক্ত-কেশ। গত রাত্রের ঝড়ে তুলসী-মঞ্চের বেড়াটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, অমলা তাহার সংস্কার করিতেছিল।

উপর হইতে হাঁকিয়া রমেশ বলিলেন—"রত্নাকে ডেকে দেছ?"

স্বামীর কণ্ঠ শুনিয়া অমলা মুখ তুলিয়া চাহিল। কহিল, "সকাল হোক!"

রমেশ আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন! বিস্মিত কণ্ঠে কহিলেন,—"সকাল হোক, মানে? সকাল হয়নি না কি? আটটায় ট্রেণ—তা মনে আছে?"—বলিয়া ক' পা অগ্রসর হইয়া একটা রুদ্ধ-দ্বারে করাঘাত করিয়া উচ্চ কণ্ঠে ডাকিলেন, "রত্না, রত্না, উঠে পড়্ মা! কাল অত করে বলে রাখলুম—"

ঘরের ভিতর হইতে নিদ্রা-জড়িত কণ্ঠে উত্তর আসিল, "উঁহুঁ চি বাবা, এই তো সবে পাঁচটা।"

রমেশ বিরক্ত হইলেন! কহিলেন, "হ্যাঁ; এই সবে পাঁচটাই বটে! সব সমান!"

সকাল হইতে এই যে-বকুনি সুরু হইল, বেলা বাড়িয়া ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাহা কিরূপ বৃদ্ধি পাইবে, অমলা জানে। তাই অঙ্কুরেই এ বকুনির উচ্ছেদ করিতে নীচে হইতে অমলা গজ্-গজ্ করিয়া উঠিল। কহিল,—"সকাল না হতেই আরম্ভ হয়েছে! পোড়া আকাশ মানুষের সঙ্গে বাদ সাধছে, তার সঙ্গে ঘরের মানুষও আবার কোমর বেঁধে পাল্লা সুরু করলে!"

রমেশ একটু থতমত খাইয়া গেলেন। বোধ করি, এরূপ ভাষণের জন্য! ইহার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। কহিলেন,—"পাল্লা সুরু কি রকম? আকাশের সঙ্গে আমি যড় করেছি! তোমরা ঘুমোতে পাওনি, আর আমিই ঘুমিয়ে কাতর হয়েছিলুম!"

অমলা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল,—"ঘুমোওনি কেন? কি রাজ্য-জয়ের মন্ত্রণা করছিলে? মানুষকে তো মেরে ফেলছিলে! এ-ফরমাস্, সে-ফরমাস্! কারুর মেয়ে তো আর পাশ করেনি—কেউ কখনো কলেজে ভর্ত্তিও হয়নি! তোমার মেয়েই যা—"

কথাটা শেষ হইল না। উপর হইতেই হাত-মুখ নাড়িয়া রমেশ প্রতিবাদ তুলিলেন,—"পাশ করেনি তো! আমার মেয়ের মত ক'টা মেয়ে পাশ করেছে? এই চব্বিশ হাজার ছেলে এগজামিন দিলে—হুঁঃ! পঁচিশ টাকা জলপানি—এ কি সাধারণ কথা! এর দাম যদি বুঝতে, তাহলে কি আর রান্নাঘরে হাঁড়ি ঠেলতে!"

ব্যঙ্গের সুরে অমলা জিজ্ঞাসা করিল,—"কি করতুম, শুনি? ইস্কুলে মাষ্টারনীগিরি!" বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়া সদ্য অগ্নি-সংযোজিত উনানের কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়ার মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

বিনা-কলহে মার খাওয়ার মত পত্নীর প্রচ্ছন্ন শ্লেষ রমেশকে হতভম্ব করিয়া দিল। বিমূঢ়ের মত অন্ধকার ঘরে অদৃশ্যপ্রায় পত্নীর দিকে তিনি চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু সে মুহূর্ত্তমাত্র! পরক্ষণেই প্রচণ্ড ক্রোধে পদ-নখ হইতে কেশাগ্র অবধি জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু প্রতিপক্ষকে পাল্টা আক্রমণে পরাভূত করিবার মত তীক্ষ্ণ কঠিন শর নিজের তূণে রমেশ হাতড়াইয়া পাইলেন না। নিষ্ফল রোষে অগ্নি-দৃষ্টি হানিয়া শুধু বলিলেন, "হুঁ!"

এমন সময়ে পৃথিবীর বুকে প্রভাতের আগমনের মত রুদ্ধ-দ্বার খুলিয়া রত্না বাহিরের বারান্দায় আসিল; এবং উঠানের ধূম্ররাশির পানে চাহিতেই পূব-আকাশের রক্ত-রাগ তাহার সুগৌর মুখখানিকে লজ্জার আভার মত রঞ্জিত করিয়া তুলিল।

মা'কে উদ্দেশ করিয়া অপ্রতিভ কণ্ঠে রত্না কহিল, "ইস্! তোমার উনুন ধরে গেছে মা! তুমি চায়ের জল চড়িয়ে দাও। আমি এখনি কাপড় ছেড়ে আসচি।"

আক্রোশের পাত্র যখন হাতছাড়া হইয়া যায়, তখন সম্মুখে যাহাকে পাওয়া যায়, তপ্ত-চিত্ত তাহারই উপরে ঝাল মিটাইয়া লইতে চায়!

অপ্রত্যাশিত ধমকের সুরে রমেশ কন্যাকে কহিলেন, "খুব হয়েছে! তোমাকে আর চা করতে যেতে হবে না! যার কাজ সে পারে, হবে—নয়তো পড়ে থাকবে। কাল তো তুমি থাকবে না। যাও, এখন স্নান করে এসো, এখন অনেক কাজ তোমার বাকী।"

রত্না অবাক্! এই বাদলায় প্রাতঃস্নান, এ যেন যূপকাষ্ঠে নীত হইবার পূর্ব্বে অবগাহনের মতই আতঙ্ককর! ভীত হরিণ-শিশুর মত বিস্ফারিত চোখের চকিত দৃষ্টি পিতার মুখে ন্যস্ত রাখিয়া মৃদু স্বরে সে কহিল, "স্নান করবো বাবা?" স্বরে তাহার একরাশ অনিচ্ছা!

কন্যার মুখখানাকে চোখে না দেখিলেও অমলা রান্নাঘরে বসিয়া সেই বিপন্ন মুখের চেহারার আভাস পাইলেন। গম্ভীর মুখে তিনি কহিলেন, "আজ যাবার দিন স্নান করে না! স্নান করে যাত্রা করতে নেই।" স্বরে আদেশের ইঙ্গিত।

বর্ষার আকাশে শরতের আলো আসিয়া পড়িল। রত্নার বিপন্ন মুখ পলকে আনন্দ-দীপ্ত হইল। নিষ্কৃতির উল্লাস মুহূর্ত্ত-পূর্ব্বে-কুণ্ঠিত স্বরকে প্রফুল্ল করিয়া তুলিল। পিতার পানে চাহিয়া সে কহিল, "তবে আজ আর নাইবো না বাবা—"

মেয়ের মুখে যে আনন্দের ছোপ লাগিয়া আছে, রমেশের

রত্না ত্রস্ত হইয়া উঠিল। বলিল, "কাকাবাবু, তোমাকে নমস্কার করবো না ?"

"আমি থাচ্ছি। তুই হাত তুলে নমস্কার কর্ মা, তাতেই হবে। আমি আশীর্ব্বাদ করছি, তুই এবার ফার্ষ্ট হবি।"

রমেশ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কহিলেন,—"এঁ্যা, এখনো হয়নি ?" বলিয়া নূতন-কেনা হাত-ঘড়িটার পানে চাহিলেন, "ইস্! ভয়ানক লেট্ হচ্ছে।"

হরিশকে প্রণাম করিয়া রত্না ভাঁড়ারের দিকে অগ্রসর হইয়া ডাকিল,—"কাকিমা!"

কপালের উপর মাথার কাপড়টা টানিয়া দিয়া কাকিমা কহিল,—"পায়ে জুতো! ছুঁয়ো্নি মা! রান্নাঘরে যাবো, অমনিই নমস্কার কর্।"

আর এক বার তাড়া দিয়া রমেশ কহিলেন, "কুইক্! কুইক্! ও কি, জুতো খুল্‌ছিস্ কেন রত্না ? না, না, অমনি সেরে নাও। দামী মোজা-জোড়া নষ্ট হয়ে যাবে! উঃ, বড্ড লেট্ হচ্ছে!"

পিতার কথায় রত্না থতমত খাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। জুতা আর খোলা হইল না।

রমেশ কন্যাকে কহিলেন, "নাও, গাড়ীতে উঠে বসো।"

কুণ্ঠিত মুখে রত্না কহিল, "মাকে নমস্কার করে আসি বাবা!"

বিরক্ত কণ্ঠে রমেশ কহিলেন, "খুব হয়েছে! আর নমস্কার করতে হবে না। ট্রেণ মিস করবো শেষে!"

মিনতি-ভরা কণ্ঠে রত্না কহিল, "এখুনি ছুটে আসবো বাবা।"

রমেশ রাগিয়া উঠিলেন, "না, না। আর এক-মিনিট দেরী নয়।"

৩

রেলগাড়ীতে বসিয়া সারা পথ রত্নার মনে এই চিন্তাটাই কাঁটার মত খচ্-খচ্ করিতে লাগিল যে, আসিবার সময় মাকে প্রণাম করিয়া আসা হইল না! শ্রাবণের মেঘ-মেদুর আকাশের মত দারুণ বিষণ্ণতা তাহার চিত্তে অনুবিদ্ধ হইয়া রহিল।

সকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া রত্না আজ মায়ের মলিন মুখ দেখিয়াছে! এখন মানস-নেত্রে দেখিতে লাগিল, সেই ম্লান মুখ কন্যা-বিরহ-বেদনায় আষাঢ়ের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মত বর্ষণোন্মুখী হইয়াছে! কামরার জানালার দিকে মুখ করিয়া রত্না চাহিয়া ছিল,—সম্মুখে পলকে-অপস্রিয়মান বর্ষার বারিস্ফীত নদী, প্রান্তর, শস্য-শ্যামল মাঠ, সবুজ তৃণাচ্ছন্ন গোচারণ-ভূমি! আর্দ্র বায়ু তাহার উপর দিয়া বেগে প্রবাহিত! দিবালোক যেন বেদনাতুর! আকাশ যেন এই মাত্র কাঁদিয়া-কাটিয়া চোখ মুছিয়াছে; কিন্তু ক্রন্দনের কালিমা-রেখা মুখ হইতে মুছিয়া যায় নাই! সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া রত্নার দুই চোখ সলিলার্দ্র হইয়া উঠিল। নির্ব্বাসিতের চক্ষে যেমন আজন্মের স্নেহদাত্রী ধরিত্রীর প্রতি-ধূলিকণা অকস্মাৎ পবিত্র হইয়া ওঠে, সুখ-দুঃখের বাস জন্মভূমির শুষ্ক গুল্ম-লতা অবধি অপূর্ব্ব মমতা-রসে সিক্ত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে অন্তরকে আপ্লুত করিয়া তোলে, তেমনি এক অত্যাশ্চর্য্য অদৃশ্য ভালোবাসার পারাবারে স্নান করিয়া গ্রাম, পথ, শস্য, ক্ষেত্র সব-কিছু আচম্বিতে তাহার সহিত নিবিড় সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করিয়া বসিল! এবং এই স্নেহের আদান-প্রদান এইখানেই শেষ হইল না! রত্নার চোখের সম্মুখে তাহারা যেন রত্নার সুবেষ্টিত মাতৃ-মুখের বিষণ্ণতা মাখিয়াই করুণ চোখে চাহিয়া রহিল! একা শূন্য গৃহকোণে ম্লান সন্ধ্যার মত স্তব্ধ মূর্ত্তিতে মা বসিয়া আছেন! সেই বিষাদ-ক্লিষ্ট মুখের কাতরতা রত্না সব-কিছুর মধ্যে যেন প্রত্যক্ষ করিতেছিল! গাড়ীর চাকার ঘর্ষণের ছন্দানুগতির কলরব যেন অস্ফুট কান্নার সুরে তাহার দুই কাণে ধ্বনিত হইতে লাগিল!

উদ্ভ্রান্ত চিত্তে মনে মনে একাধিক বার সে কহিল, বড্ড ভুল! বড় অন্যায় হয়ে গেছে মা! আসবার সময় একটিবার তোমাকে দেখা—

এমনি উতল আবেগের অশ্রুপ্রবাহ তাহার নবীন জীবনের রাঙা উষাকে মেঘাবৃত করিয়া রাখিল! আনন্দের দ্যুতিতে চরাচর সমুজ্জ্বল না হইয়া নিগূঢ় অভিমানের বেদনায় যেন মুখ ঢাকিয়াছে!

বহুক্ষণ রত্না এমনি আবিষ্টের মত বসিয়াছিল। আরও হয়তো কতক্ষণ থাকিত, আবেশ ভাঙ্গিল পিতার কণ্ঠস্বরে!

ব্যস্ত কণ্ঠে রমেশ কহিলেন,—"লিলুয়া পার হয়ে এলুম রে! গাড়ী হাওড়ায় পৌঁছুলো বলে'।"

পথে ছোট-বড়-মাঝারি ষ্টেশনগুলাতে গাড়ীর গতিতে নিমেষ-বিরতি ঘটিতেছিল। এ-সব ষ্টেশনে যাহারা উঠিতেছিল-নামিতেছিল, তাহাদের ভীড়—কোলাহল-কলরব রত্নার তন্ময়তাকে ডিঙ্গাইয়া বড় হইয়া উঠিতে পারে নাই! অত্যন্ত অবহেলায় সব-কিছু তাহার মনের বাহিরে পড়িয়াছিল, এতটুকু কৌতুক বা আগ্রহ সংগ্রহ করিতে পারে নাই!

অসংখ্য রেল-লাইনের লেখাজোখার মধ্য দিয়া লাইনের দু'পাশে রাশীকৃত গাড়ীর ভীড় পার হইয়া রত্নার ট্রেণ হাওড়ায় আসিল। গাঢ় নিদ্রার মাঝে স্বপ্নের জমজমাটি-ভাঙ্গার মত আকস্মিক আঘাতে রত্নার চিন্তাও নিমেষে নিঃশেষ হইয়া গেল।

বিরাট্ প্ল্যাটফর্মে গাড়ী প্রবেশ করিতেই রত্না যেন চমকিয়া উঠিল! কুয়াসা ভেদ করিয়া সূর্য্য ও-দিকে অজস্র আলোক-ধারায় দশ দিক্ যেন প্লাবিত করিয়া দিয়াছে!

রত্নার দেহ-মনের উপর দিয়া যেন বিদ্যুৎ চমকিয়া গেল! কর্ম্মকোলাহল-মুখরিত বিপুল বিরাট্ ষ্টেশনের প্রচণ্ডতার মাঝখানে তাহার বিস্ময়াহত অন্তর নিমেষে নিমগ্ন হইয়া পড়িল। বিমূঢ়-বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে রুদ্ধনিশ্বাসে সে শুধু চারি দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই! এখানকার মানুষ-জন যেন কাজের নেশায় ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে! এই বিচিত্র কর্ম্মপ্রবাহ, বিরাম-বিরতি-হীন উৎকণ্ঠা সময়ের প্রতি পল-অনুপলের উপর নির্ম্মম ভাবে জাঁকিয়া বসিয়াছে! তাহার অদৃশ্য উগ্র তাড়নায় প্রত্যেকেই যেন অস্থির, চঞ্চল! কেহ আসিতেছে, কেহ যাইতেছে, কেহ ছুটিতেছে। পৃথিবীর কত জাতি কি ব্যস্তসমস্ত ভাবেই না যাতায়াত করিতেছে! পাশের অপরিচিতের প্রতি কাহারো ভ্রূক্ষেপ নাই! কে আসিল, কোথা হইতে আসিল, কে কোথায় চলিয়াছে,—জানিবার এতটুকু ঔৎসুক্য নাই! দৈবাৎ যদি কোনো নেত্র-কোণ হইতে এতটুকু কৌতুক বা বিস্ময়-দৃষ্টি ক্ষণেকের জন্য কোথাও ন্যস্ত হয়, সে ঐ পলক-মাত্র! বাতাসে-ওড়া ধূলার মত চকিতে আবার তাহা উড়াইয়া সরিয়া যায়! এতটুকু মনের স্পর্শ পায় না!

আত্মবিস্মৃতির বিভোরতায় রত্না বীচি-বিক্ষুব্ধ বারিধির মত এই অখণ্ড চঞ্চলতা নিরীক্ষণ করিতেছিল। জীবনের নূতন

অধ্যায়ের প্রবেশ-পথে হঠাৎ এই কর্ম্ম-ছবির অচিন্তনীয় বিরাট্ রূপ তাহার সমস্ত অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করিয়া তাহাকে কেমন আবিষ্ট করিয়া রাখিল।

পিতার স্পর্শে রত্নার হুঁস হইল। চকিতে মনে হইল, উদ্‌ভ্রান্তের মত এমন করিয়া চাহিয়া থাকা শোভন নয়!

ত্রস্তে মুখ ফিরাইয়া পিতাকে কহিল, "চলো।"

রমেশ কহিলেন,—"তাইতো ডাকচি!" বলিয়া কন্যার হাত ধরিয়া অগ্রসর হইলেন। পশ্চাতে কুলীর মাথায় লগেজ-পত্র। রমেশ কহিলেন,—"একখানা ট্যাক্সি ধরা যাক, কি বলিস্? হাজার হোক, অত-বড় কলেজে গিয়ে উঠতে হবে। এঁ্যা!"

—"বেশ, তাই চলো।" বলিয়া রত্না পিতার সহিত প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের বাহিরে আসিল।

ট্যাক্সিতে চাপিয়া রমেশ কহিলেন, "কলকাতা হলো বড়লোকের জায়গা, বুঝলি! এখানে কঞ্জুষপনা করলে লোকে হাসবে। না হলে আমাদের এই সামান্য মালপত্র একখানা রিক্সা কি ঘোড়ার গাড়ী হলে চলে যেতো। কিন্তু তাতে প্রেস্‌টীজ থাকে না!"

মাথা নাড়িয়া রত্না পিতার কথার অনুমোদন করিল।

উৎসাহিত হইয়া রমেশ কহিলেন,—"তোমার মা'র মাথায় এ-সব ঢোকে না। বলে, আমরা যেমন! আরে বাপু, তা বললে কি চলে! যেখানে যে-রকম দস্তুর! তা ছাড়া মানুষকে সব সময়ে অদৃষ্টের সঙ্গে লড়াই করে' নিজেকে গড়ে তুলতে হয়! পাঁচ জনের কাছে প্রতিষ্ঠা পাবার কোন সুযোগই ত্যাগ করতে নেই। বরং সেই মাহেন্দ্র-ক্ষণটুকু খুঁজে বেড়াতে হয়। আমার বাবা দিন-মজুরী করতো, আমি কেন সদর-আলা হবার স্বপ্ন দেখবো? হুঁ:! এ সব কথা অচল।"

রত্না নীরব রহিল। তাই বলিয়া রমেশের কথা বন্ধ হইল না।

তিনি অনর্গল বকিয়া চলিলেন,—"আমার ইস্কুলের ছেলেগুলো কলকাতায় পড়তে এলো,—আর আমার মেয়ে স্কলারশিপ, হোল্ড করে নন-কলেজিয়েট হয়ে লেখাপড়া করবে, এ আমি সহ্য করতে পারবো না! এ আমি ভাবতে পারিনি রত্না! হুঁ:! তোমার মা, দু'দিন তাঁর কষ্ট হবে! তার পর সয়ে যাবে। সইতে হবে।"

মৃদু স্বরে রত্না কহিল,—"মা বড় একা! ফাঁকা-ফাঁকা লাগবে!"

"আরে বোকা মেয়ে, সে কথা কি বুঝি না! তুমি আমার শুধু মেয়ে নও! ছেলে নেই—তোমাকে দিয়ে ছেলের অভাব আমি পূরণ করতে চাই! কাজেই নিজেদের সুখের দিকে চেয়ে তোমার ভবিষ্যৎ দেখবো না? নিজের একটুখানি তৃপ্তির জন্য এত বড় গৌরব হারাবো, এ কোনো মতেই হতে পারে না মা!"

ট্যাক্সি আসিয়া কলেজের গেটের মধ্যে প্রবেশ করিল। অগত্যা রমেশের বাক্যস্রোত বন্ধ হইল।

কন্যাকে লইয়া রমেশ যেখানে ট্যাক্সি হইতে নামিলেন, তার বাঁ-দিকে লনের মধ্য দিয়া সরু পথ—সেই পথে খানিকটা গিয়া সোপান-শ্রেণী। রত্নার পা কাঁপিতেছিল, বুকের মধ্যেও দুরু-দুরু স্পন্দন! কন্যার মুখের দিকে তাকাইয়া রমেশ মৃদু হাস্য করিলেন। রত্না আর একটু সরিয়া পিতার গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল।

একদল মেয়ে ভর্ত্তি হইয়া বাহিরে আসিল, উৎসাহে দীপ্ত তাহাদের মুখ-চোখের পানে চাহিয়া রত্নার ভিতরের আড়ষ্টতা শিথিল হইয়া আসিল। অভিভূত মন ধাক্কা খাইয়া নিজেকে সুদৃঢ় করিয়া লইল।

মেয়েকে লইয়া রমেশ অফিস-ঘরে প্রবেশ করিলেন। জানাইলেন, কার্ড পাইয়া তিনি আসিয়াছেন।

হেড ক্লার্ক বলিলেন, "ও! হ্যাঁ; আপনার মেয়ের সীট কলেজে আছে। হোষ্টেলেও থাকবার সুবিধা হবে। আপনি তো সেখানকার স্কুলের হেডমাষ্টার?"

রমেশ মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "হ্যাঁ! আমি এ-বার দশ জন ছাত্র পাঠিয়েছিলুম, সকলেই ফার্ষ্ট ডিভিসনে পাশ করেছে।"

হেড ক্লার্ক কহিলেন, "তার চেয়ে বলুন আপনার মেয়ের কথা—উনি কুড়ি টাকা স্কলারশিপ পেয়েছেন।"

রমেশের মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সোৎসাহে তিনি কহিলেন, "আমি ওকে কোচ্ করতুম। ফার্ষ্ট ই হতো! তবে দুর্ভাগ্যের বিষয়, এগজামিনের আগের দিনে হলো ভয়ানক জ্বর—একেবারে বেহুঁস!"

রত্না ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া বাপের পানে তাকাইয়া রহিল। মনের অলিগলি খুঁজিয়াও সে মনে করিতে পারিল না, কবে তাহার জ্বর হইয়াছিল! তবে বছর দুই পূর্ব্বে দিন কয়েক সর্দ্দিজ্বরে শয্যা গ্রহণ করিয়াছিল বটে! কিন্তু সেটাকে কোন মতেই পরীক্ষার ফলাফলের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। অথচ সত্যানুরাগী বলিয়া পিতার মনে বিশেষ গর্ব্ব আছে!

হেড ক্লার্ক মাথা নাড়িলেন। "দুঃখের বিষয়! আশা করি, আগামী পরীক্ষায় আপনার কন্যা আমাদের কলেজের নাম রাখবেন।"

রমেশ কহিলেন, "সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আমার মেয়ে বলে বলছি না, আমি তো জানি ওর শক্তি!"

হেড ক্লার্ক কহিলেন, "খুবই আনন্দের কথা। হ্যাঁ, তাহলে আপনার কন্যার এখানকার অভিভাবক কে হবেন? তাঁর নাম দিতে হবে। মানে, লোকাল গার্জ্জেন! এখানে আপনার কোন আত্মীয়?"

"আত্মীয়!" রমেশ চমকিত হইলেন! এত বড় সহরে এমন কেহ নাই, যাহাকে আপনার বলিয়া স্বীকার করিবেন, এ চিন্তা যেন তীক্ষ্ণ কাঁটার মত মনে বিঁধিল! একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কুঞ্চিত ভ্রূতে কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিলেন। নাম মনে পড়িল। হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে কহিলেন, "নিশ্চয় আছেন! তিনি হলেন মিষ্টার এস, পি, গোস্বামী বার-এট্-ল! তাঁর নাম লিখে নিন, তিনিই আমার মেয়ের লোকাল গার্জ্জেন।"

হেড ক্লার্ক বলিলেন, "ও! তা মিসেস্ গোস্বামীর সঙ্গে আমাদের প্রিন্সিপালের বেশ অন্তরঙ্গতা আছে। মিষ্টার গোস্বামী আপনার কি-রকম আত্মীয় হন?"

রমেশের মুখ ঈষৎ আরক্ত হইল। একটা ঢোক গিলিয়া তিনি কহিলেন, "তিনি আমার বাল্য-বন্ধু।"

ভর্ত্তির নজর-আনা, মাহিনা, হোষ্টেলের চার্জ্জ—সব-কিছু দিয়া খাতায় সই দিয়া বিধিমত ব্যবস্থাগুলা সুসম্পন্ন করিয়া রমেশ উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

তার পর রত্নার দিকে চাহিলেন। বুকখানা ধ্বক্ করিয়া উঠিল! খোদিত প্রতিমার মত রত্না বসিয়া আছে। এত দিন স্নেহে, শাসনে, আদরে, উৎসাহে গড়িয়া-পিটিয়া যাহাকে তিনি বড় করিয়াছেন, এখন তাহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া কন্যাহীন শূন্য পুরীতে তাঁহাকে ফিরিতে হইবে! রমেশের দু' চোখ সজল হইয়া উঠিল। কন্যাকে ছাড়িয়া একটি দিনও তিনি কখনও দূরে থাকেন নাই!

আর্দ্র কণ্ঠে রমেশ ডাকিলেন,—"রত্না—"

রত্না পিতার হাত চাপিয়া ধরিল। এই পরিচয়হীন নূতন আবাসে পরের সহিত এখন হইতে তাহাকে বাস করিতে হইবে পিতামাতাকে ছাড়িয়া, ঘর-দ্বার ছাড়িয়া! এ কথা মনে হইতেই এক অজানা আতঙ্কে বুকখানা কাঁপিয়া উঠিল। মুখ বিবর্ণ হইল! মুখে একটুও স্বর ফুটিল না! শুধু অদম্য রোদন-বেগকে ভিতর দিকে ঠেলিতে দাঁত দিয়া ওষ্ঠ চাপিয়া কাঠের মত সে কঠিন হইয়া রহিল।

নিরুদ্ধ স্বরকে পরিষ্কার করিয়া রমেশ কহিলেন,—"কোন ভয় নেই, খুকী! অনেক বন্ধু পাবি। বেশ মন দিয়ে পড়াশোনা করবি। আর আমাদের নিয়মিত চিঠি দিতে ভুলিস্‌নে! সাবধানে থাকবি! বুঝলি! এখানে দেখবার বা বলবার আপন-জন তো কেউ নেই।"

নতমুখে ঘাড় হেলাইয়া রত্না জানাইল, সে সব বুঝিয়াছে।

রমেশ কহিলেন, "হ্যাঁ, এখানকার গার্জ্জেন তোমার করে গেলুম এস, পি, গোস্বামীকে। তিনি খুব ভালো লোক। মস্ত বড় ব্যারিষ্টার।"

সবিস্ময়ে প্রশ্নভরা নেত্রে রত্না পিতার মুখের পানে তাকাইল।

রমেশ সে চাহনির অর্থ বুঝিলেন। কহিলেন, "সত্যপ্রসাদ রে! তোর সুকুদিদির ছেলে। ওঃ, আমার সঙ্গে কি ভাবই না ছিল,—ছোটবেলায় মামার বাড়ী যখন আসতো, আমি ছাড়া আর কারো সঙ্গে মিশতো না। সে বকুলতলাও গেছে! সুরেন অধিকারীও মরেছে!" রমেশ একটা নিশ্বাস ফেলিলেন।

রত্না কিন্তু পিতার দীর্ঘ বক্তব্যের এতটুকু অর্থ ভেদ করিতে পারিল না! বিমূঢ়ের মত তাঁহার পানে শুধু চাহিয়া রহিল।

রমেশ একটু অস্বস্তি বোধ করিলেন। মৃদু হাস্যে কহিলেন,—"সে থাকে ওই উড্‌বার্ণ পার্কে। মস্ত-বড় বাড়ী করেছে। তিনিই তোমার দেখাশোনা করবেন।"

সত্যপ্রসাদ সম্বন্ধে এই বিশদ পরিচয়েও রত্নার বোধোদয় হইল না।

রমেশ একটু অপ্রতিভ হইলেন। মেয়ে বুঝিতে না পারুক, বুঝিবার ভাণ করিলেও সম্ভ্রম বজায় থাকিত!

রমেশ কহিলেন, "ভুলে গেছ মা! আমাদের জ্যোতিষ বাবু—বড় তরফের ভাগ্নী—তোমার সুকুমারী দিদি—তাঁর স্বামী। তিনি কলকাতায় মস্ত এটর্ণী ছিলেন না?"

এতক্ষণে রত্না পিতার বাল্যবন্ধুর হদিস পাইল।

সুকুমারী দিদি? অর্থাৎ জমিদারদের বড় সরিকের মেয়ে! ছেলেবেলায় মায়েদের সঙ্গে একবার তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়াছিল। এবং গৃহে ফিরিয়া মা ও পাড়া-পড়শীর দল যখন সমস্বরে সুকুমারী ঠাকুরঝীর সৌভাগ্য-ঐশ্বর্য্যের জয়-গানে গৃহকে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল, তখন পৃথিবীর এক-ভাগ স্থল ও তিন-ভাগ জল পড়া-মুখস্থ ভুলিয়া হাঁ করিয়া রূপকথা শোনার মত সুকুমারী দিদির অদৃষ্ট-বৈভবের কাহিনী শুনিতে শুনিতে বিস্ময়ে তার তাক্ লাগিয়া গিয়াছিল! প্রাচীনারা মন্তব্য করিয়াছিলেন, জন্মান্তরের সুকৃতি! কেবল জন্ম-মুহূর্ত্তে শুভলগ্নের সংযোগ থাকিলে মানুষ এমন সুখ-সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে পারে! রত্নার তখন শুধু মনে হইয়াছিল, এমনিতর একটা নক্ষত্র কি তাহার জন্ম-কুণ্ডলীতে নাই? সে কি সুকুমারী দিদির মত বিভবশালিনী হইতে পারে না? এখন পিতার কথায় বিদ্যুতের চকিত-আলোয় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে নিমেষে দেখিয়া লওয়ার মত অতীতের সেই সব ঘটনা চোখের সামনে নিমেষের জন্য প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

সাগ্রহে রত্না কহিল, "হ্যাঁ, মনে আছে! তাঁকে তুমি আমার অভিভাবক করে দিলে?"

খুশী-ভরা কণ্ঠে রমেশ কহিলেন, "হ্যাঁ মা। তিনিই এখানে তোমার খবরাখবর নেবেন।"

রাত্রির মেঘাবৃত আকাশ সকালের উজ্জ্বল আলোতে হাসিয়া-ওঠার মত রত্নার বিষাদ-মলিন মুখের উপরে আনন্দের দীপ্তি দেখা দিল।

রত্না কহিল, "তাঁকে বলে দিয়ো, তিনি যেন মাঝে মাঝে আমায় নিয়ে যান!"

"বলবো মা! এখন তবে আসি।"

রত্না নত হইয়া পিতার পদধূলি লইল। রমেশ সে-ঘর ত্যাগ করিলেন।

রত্না বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। পথে ঐ চলিয়াছেন পিতা! পিতার মূর্ত্তি যতক্ষণ না দৃষ্টির বাহিরে অদৃশ্য হইয়া গেল, নিষ্পলক নেত্রে খোদিত প্রতিমার মত স্থির হইয়া রত্না সে চলন্ত মূর্ত্তির পানে চাহিয়া রহিল।

খোলা জানালার দিক্ দিয়া ম্লান রৌদ্রের ঝলক আসিয়া রত্নার পাশের দেওয়ালের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে! সেই মৃদু আভা রত্নার অবয়বে পড়িয়া তাহাকে যেন নিপুণ শিল্পীর হাতের তৈয়ারী ব্রোঞ্জের পুতুলের মত অপূর্ব্ব-সুন্দর করিয়া তুলিল!

ঘরের পর্দ্দা ঠেলিয়া লেডী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আসিলেন। রত্নাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন—"তুমিই হোষ্টেলে থাকবে? তোমারই আসবার কথা ছিল?"

অস্ফুট কণ্ঠে রত্না কহিল—"হ্যাঁ।"

"তোমার নাম?"

"রত্নাবলী।"

লেডী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিস্ গুহ রত্নার দিকে চাহিয়া সপ্রশংস-নেত্রে কহিলেন,—"গ্রামের মেয়ে এমন সুন্দর হয়! আশ্চর্য্য!"

রত্নার লজ্জা করিতে লাগিল। গ্রামে নিজের গৃহে আত্মীয়-স্বজনের মুখে বহু বার সে তাহার রূপের প্রশংসা শুনিয়াছে! কিন্তু এমন করিয়া সৌন্দর্য্যের সুখ্যাতি ইতিপূর্ব্বে কোন দিন শোনে নাই। নত মুখে সে মাটির দিকে চাহিয়া রহিল।

মিস্ গুহ কহিলেন, "এসো আমার সঙ্গে। আমি তোমাদের হোষ্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। সব ব্যবস্থা আমি করে দেবো।—তুমি টেনিস খেলতে জানো?"

মৃদু কণ্ঠে রত্না কহিল, "না।"

"আচ্ছা, দু'দিনে শিখে নেবে'খন। এসো।"

কারারুদ্ধ বন্দী যেমন নিঃশব্দে প্রহরীর অনুগমন করে, তেমনি ভারাক্রান্ত চিত্তে নিরুৎসাহ মুখে রত্না মিস্ গুহর অনুসরণ করিল।

[ক্রমশঃ

শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী।

"আচার্য্য শঙ্করের জীবন ও ধর্ম্মমত"

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর *]

চতুর্দ্দশ—এই বার তিনি শ্রৌত ব্রহ্মবাদের কথা পরিত্যাগ করিয়া শঙ্করাচার্য্যের উপর নিপতিত হইলেন, কেবল তাহাই নহে, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিগণকেও নিষ্কৃতি দান করিলেন না। শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধে তাঁহার একটা যুক্তির নিদর্শন এ স্থলে পুনরুল্লেখ করিলে তাঁহার ন্যায়মার্জ্জিত বুদ্ধির বেশ পরিচয় পাওয়া যাইবে।

তিনি বলিতেছেন—"শঙ্কর কৌষীতকি উপনিষদের ভাষ্য করেন নি, সুতরাং এ পড়েছিলেন কি না তাই সন্দেহ।" আচ্ছা, দুইটি কোটির সম্ভাবনা থাকিলেই সন্দেহ হয়। এখানে কি তাহা আছে? পড়িতে গেলে কি ভাষ্য করিতে হয়? ভাষ্য না করার সঙ্গে পড়ার ত কোন অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধই নাই। পড়িয়া ভাষ্য করিতেও পারা যায়, না-ও পারা যায়। অতএব ভাষ্য করেন নাই বলিয়া তিনি পড়িয়াছিলেন কি না—এরূপ সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক নহে। তাঁহার এই সন্দেহের সুর হইতে ধ্বনিত হইতেছে যে, তিনি কৌষীতকি পড়েন নাই। আচ্ছা, তাহা হইলে তিনি কৌষীতকির কথা উদ্ধৃত করেন কিরূপে? কৌষীতকির বাক্য বিচার করিলেন কিরূপে? প্রতর্দ্দনাধিকরণে কৌষীতকির বাক্যই ত বিচার্য্য বিষয়। আর অন্যত্র যে কৌষীতকি সংক্রান্ত বিচার আছে, তাহা পড়িলে চমৎকৃতই হইতে হয়। অতএব তিনি কৌষীতকি পড়েন নাই, এরূপ কল্পনা নিতান্ত অস্বাভাবিক কল্পনাই বলিতে হইবে। অথবা এই কথাটি তাঁহার অলৌকিক ন্যায়ের কথা বলিয়া বুঝিলেও চলিতে পারে না কি? শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধে তাঁহার এইরূপ মনোভাব—ইহা স্মরণ করিয়া তাঁহার কথা আলোচনা করিলে, ভ্রমপ্রমাদের সম্ভাবনা আমাদের অল্প হইবার কথা।

তাহার পর তিনি শ্রুতিমধ্যেও পরস্পর-বিরুদ্ধ কথা পাইয়াছেন। যাহাতে পরস্পর-বিরুদ্ধ কথা থাকে, তাহা কি প্রমাণ-পদবাচ্য হয়? লৌকিক বিষয় হইলে পরীক্ষার দ্বারা নির্ণয় করিয়া পরস্পর-বিরুদ্ধ কথার এক পক্ষ গ্রহণ করা যায়। কিন্তু অলৌকিক বিষয়ে পরীক্ষা চলে না, অতএব—হয় একবাক্যতা করিয়া বিরোধের পরিহার করিয়া তাহা গ্রহণ করিতে হইবে, অথবা একবাক্যতা অসম্ভব হইলে তাহা পরিত্যাগই করিতে হইবে। এই একবাক্যতা-সাধনের কৌশল সহস্র প্রকারে মীমাংসাদর্শনে প্রদর্শিত হইয়াছে। অলৌকিক বিষয়ে কতক গ্রাহ্য, কতক ত্যাজ্য করা যায় না। ইহাই লোকবেদসাধারণ মীমাংসাশাস্ত্রের রীতি। তিনি কিন্তু উপনিষদের যে স্থলটি নিজ মতের অনুকূল, তাহাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন, আর যাহা প্রতিকূল, তাহাই ভ্রম বলিয়া ত্যাগ করিতেছেন। তিনি একই ছান্দোগ্যের ভিতর আরুণির কথায় নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদ দেখিলেন এবং রাজর্ষি প্রবাহণ ও দেবর্ষি প্রজাপতির কথায় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ দেখিলেন। তাহার পর বৃহদারণ্যকের যাজ্ঞবল্ক্যকে আবার নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদী দেখিতেছেন। সুতরাং একই ছান্দোগ্যের ভিতর পরস্পর বিরোধ এবং ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকের মধ্যেও বিরোধ। আর ইহা অলৌকিক বিষয়েই বিরোধ, অতএব এই সব উপনিষদ্ প্রমাণই হইতে পারে না, বিরুদ্ধ কথার দ্বারা অভ্রান্ত জ্ঞান জন্মিতেই পারে না। আচ্ছা, ইহা যদি হয়, তবে উপনিষদের ব্রহ্মবাদ ও পাশ্চাত্য ব্রহ্মবাদকে "সদৃশ" বলা হইল কিরূপে? অথবা উক্ত মতবাদ দুইটি মূলতঃ অভিন্ন হইল কিরূপে? আর এইরূপ উপনিষদ্ লইয়া এত আলোচনাই বা কেন? আর বেদাচার্য্যের দ্বারা সংশোধন করানই বা কেন? তাহার টীকা, অনুবাদ প্রভৃতি করিয়া বেদাচার্য্যের অনুমোদিত বলিয়া প্রচার করাই বা কেন? ইহা কি বেদবিশ্বাসী হিন্দুদিগকে কৌশলে স্বমতে আনয়নের চেষ্টা-বিশেষ নহে? ম্যাক্সমূলর প্রভৃতির বেদাদি শাস্ত্র প্রচারের উদ্দেশ্য যেমন হিন্দুদিগের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার, ইহাকে কি সেইরূপ বলিতে হইবে? তাহা সুধীগণেরই বিবেচ্য।

তাহার পর তিনি ঋষিগণের উপরও আক্রমণ করিয়াছেন। তাঁহাদেরও মতভেদ তিনি দেখাইতেছেন। বেদকে ঋষি-প্রণীতও বলিতেছেন। এখন তত্ত্ববিষয়ে ঋষিদের মতভেদ থাকিলে কাহারও কথাই আর প্রমাণ হয় না। ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার মতে ভ্রান্ত।

তিনি বলিতেছেন—"যাজ্ঞবল্ক্য-প্রদত্ত প্রমাণাভাস" শঙ্কর ব্যাখ্যা করেন নি, "আরুণি ও যাজ্ঞবল্ক্যের ভ্রম যেমন চিত্র ও ইন্দ্র কৌষীতকিতে দেখিয়েছেন, প্রবাহণ ও প্রজাপতি তেমনি ছান্দোগ্যে তাই দেখিয়েছেন" ইত্যাদি।

এই সব বাক্যে যাজ্ঞবল্ক্যের ভ্রমের কথা স্পষ্টই বলা হইয়াছে। আচ্ছা, যাজ্ঞবল্ক্যের যদি ভ্রম হয়, তাহা হইলে "ইন্দ্র, চিত্র, প্রবাহণ ও প্রজাপতি" ইঁহাদের কি ভ্রম হইতে পারে না? তত্ত্বভূষণ মহাশয় ইঁহাদের ভ্রম দেখিলেন না, তাহার কারণ কি, তাঁহাদের মত শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের মতের সহিত মিলে বলিয়া কি? এগুলি সঙ্গত কথা বলিয়া ত মনে হয় না। বেদোক্ত ঋষি প্রভৃতি কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি-বিশেষ নহেন। তাঁহারা বেদোক্ত আখ্যায়িকার অঙ্গবিশেষ। বেদ কোন পুরুষবিশেষের বুদ্ধি-প্রসূত নহে বা কাহারও অনুভূত বিষয়ের বর্ণনা নহে। ইহাতে কোনও ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখাদি নাই—এ কথা শ্রুতিতেই কথিত হইয়াছে। ইহা কোন ব্যাখ্যাকর্ত্তার কথাও নহে। যথা "নাচিকেতম্ উপাখ্যানং মৃত্যুপ্রোক্তং সনাতনম্" কঠ ১।৩।১৬ দ্রষ্টব্য। এ জন্য ইহাকে অপৌরুষেয় বলা হয়। বেদের এই প্রকৃতি না জানিয়া বা অমান্য করিয়া যাহা বলা হয়, তাহা হিন্দু বেদপ্রামাণ্যবাদীর নিকট অগ্রাহ্য। বেদ নিত্য শব্দরাশি, ইহা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরে সদা বর্ত্তমান, প্রতি সৃষ্টিকালে সম্প্রদায়ক্রমে ইহার প্রচার হয় মাত্র। ইহাতে ঐতিহাসিকতাদর্শন, অবৈদিক সম্প্রদায়ের কথা। সুতরাং বেদে মতভেদ বা বেদোক্ত ঋষিদের মতভেদ কল্পনা, বৈদিক-গণের দৃষ্টিতে বাতুলতামাত্র। এ জন্য এ সব কথা আমাদের নিকট সর্ব্বথা অগ্রাহ্য। *

ইহার পর তিনি শঙ্করাচার্য্যের উপর নিপতিত হইলেন এবং

---

* ১৩৪৯ কার্ত্তিক সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের "শঙ্করের জীবন ও ধর্ম্মমত"এর প্রতিবাদের অনুবৃত্তি।

* শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের এই সব কথার প্রতিবাদ, ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম আচার্য্য শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র রায় মহাশয় দুই তিন মাস পূর্ব্বে উদ্বোধন পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছেন।

বলিলেন,—(১) "শঙ্কর বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদ প্রমাণ করিবার জন্ত ব্যস্ত নন, শ্রুতির দোহাই দিয়াই সন্তুষ্ট। (২) তাঁহারা যুক্তি যা দেন, তা তখনকার বিশ্বাসপ্রবণ লোকদের সন্তোষকর হয়ে থাকতে পারে, এখনকার সন্দেহপ্রবণ এবং বিজ্ঞানদর্শনে প্রতিষ্ঠিত লোকদের পক্ষে তা কিছুই সন্তোষকর নয়। (৩) শঙ্কর কৌষীতকি পড়িয়াছেন কি না সন্দেহ? (৪) শঙ্কর অদ্বৈতবাদী ঋষিদের এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ঋষিদের মতের প্রভেদ বুঝিতে পারেন নাই, (৫) শঙ্কর ঋষিদের এই মতভেদ কিছুই দেখতে পান নাই (৬) আত্মবাদ সম্বন্ধেই তাঁর স্থির মত নেই, (৭) স্পষ্টই দেখা যায়—শঙ্কর আত্মবাদের যৌক্তিক প্রমাণ পান নাই, (৮) ঋষিদের সঙ্গে যে মতভেদ থাকতে পারে, তা' শাস্ত্রবাদী শঙ্কর বোধ হয় মুহূর্তের জন্ত ভাবিতে পারেন নি, সুতরাং রাজর্ষি ও দেবর্ষিদের দার্শনিক মত মনোযোগপূর্ব্বক সমালোচনার সহিত (critically) পড়ে' ব্রহ্মর্ষিদের সঙ্গে তাঁদের উক্তির প্রভেদ বুঝিতে পারেন নি"—ইত্যাদি কথার উত্তর না দিলেই ভাল। যে শঙ্করের প্রসাদে আজ বৈদিক ধর্ম্ম জীবিত, যাঁহার প্রসাদে আজ সহস্রাধিক বৎসর ব্যাপিয়া মহা মহা আচার্য্যগণ বেদার্থ বুঝিয়া আসিলেন, যিনি উপনিষদ্-ভাষ্য না করিলে উপনিষদের কোন সঙ্গত অর্থ কেহ করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ, যাঁহার ভাষ্য অপেক্ষা প্রাচীন ভাষ্য আর পাওয়া যায় না, যাঁহার প্রসাদে শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয়ও উপনিষদ্ দেখিলেন এবং উপনিষদের উপর "শঙ্করকৃপা" টীকা লিখিলেন, তাহার ইংরেজী ও বাঙ্গালা অনুবাদ করিলেন, সেই শঙ্কর উপনিষদ্ বুঝিলেন না, আর শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয় বুঝিলেন—এই কথাগুলি কিরূপ? হিন্দুদিগের পক্ষে এই কথাগুলি কিরূপ মর্ম্মভেদী, তাহা সুধী পাঠকবর্গ ই বিবেচনা করিবেন।

শঙ্করের আত্মবাদ সম্বন্ধে কোন স্থির মত নেই—এই কথা বলিয়া এই প্রসঙ্গেই তিনি বলিতেছেন—"কোন কোন স্থানে, যেমন ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ে, বৌদ্ধ-বিজ্ঞানবাদীর সঙ্গে তর্ককাণ্ড নিয়ে, তিনি জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। স্পষ্টই দেখা যায় যে, শঙ্কর আত্মবাদের যৌক্তিক প্রমাণ পান নি। ঋষিরা আত্মবাদী ব'লে স্থানে স্থানে আত্মবাদ স্বীকার করেছেন মাত্র।" ইতি।

কথাগুলি যেমন অযৌক্তিক; তেমনি দাম্ভিকতাপূর্ণ হইয়া পড়িল না কি? যে Dogmatism-এর এত নিন্দা করা হইল, এখানে তাহাই করা হইল না কি? জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের কথার উত্তরে বলা হইয়াছে। কারণ, বৌদ্ধের বিজ্ঞান ক্ষণিক, তাহা আমাদের বৃত্তিজ্ঞান। "বিজ্ঞানং ব্রহ্ম" পদোক্ত বিজ্ঞান ইহা নহে। এই বৃত্তিজ্ঞানের বাহিরে বিষয় থাকে, এবং বিষয়ানুরূপ এই বৃত্তিজ্ঞান হয়। এ জন্ত এ স্থলে শঙ্করাচার্য্য কিছুই অন্তায় কথা বলেন নাই। আমাদের মনে হইতেছে, শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের শঙ্করাচার্য্যের কথা বুঝিবার প্রবৃত্তিই নাই। আত্মা জ্ঞানস্বরূপ বস্তু, তাহার অন্তরে বা বাহিরে অন্ত কিছুই নাই, অর্থাৎ তদ্ভিন্ন কোনও বস্তুই নাই, এ কথার বিরোধ শঙ্করের উক্ত কথার দ্বারা হয় নাই।

"শঙ্কর আত্মবাদের যৌক্তিক প্রমাণ পান নি"—এটা শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের স্ববিরুদ্ধ অলৌকিক ন্যায়ের কথা বলিয়া উপেক্ষার যোগ্য অথবা উপভোগের যোগ্য। "ঋষিরা আত্মবাদী বলে স্থানে স্থানে আত্মবাদ স্বীকার করেছেন মাত্র"—তাঁহার এই কথায় মনে হয়, শঙ্করাচার্য্য বোধ হয়, শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আত্মবাদ স্বীকার করিয়াছিলেন। যাহা হউক, এরূপ কথা আমরা শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের নিকট একেবারেই আশা করিতে পারি না। তবে ইহাতে শিক্ষা হইল এই যে, নাম করে দেশপূজ্য মহামান্ত ব্যক্তিকে অমুক কিছু বুঝেন নাই বলিলে অশিষ্টাচার হয় না। পূর্ব্বে আচার্য্যেরা মতবাদেরই নিন্দা করিতেন, নাম করে মতবাদীর নিন্দা করিতেন না। বর্ত্তমানে শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের অভিমত "বিজ্ঞান-দর্শনে প্রতিষ্ঠিত" সমাজে তাহার আবশ্যকতা নাই। তিনি যদি নাম করিয়া আমাদের শাস্ত্র, ঋষি এবং পরমাচার্য্যকে নিন্দা না করিতেন, আমরাও তাঁহার নাম করিয়া এ সব কথা বলিতাম না। তাঁহার এই প্রতিবাদ আমরা নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই করিলাম, কেবল আত্মরক্ষার্থই করিলাম।

পঞ্চদশ—অতঃপর তিনি বলিতেছেন—"উপনিষদ্ ঋষিদের উক্তিতে এই প্রণালীর আভাসমাত্র পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ মন্ত্রদ্রষ্টা, সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ সেই প্রণালীতেই এই সত্যে উপনীত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রদত্ত প্রমাণ উপনিষদ্-লেখকেরা, যাঁরা স্পষ্টতঃই শোনা কথা লিখেছেন, তা যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করতে পারেন নি।"

এতদুত্তরে বলিব—শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের সম্মত সত্য-নির্ণয়ের প্রণালীর আভাসমাত্র পাইয়া "ঋষিগণ সত্যে উপনীত হইলেন, আর সেই প্রণালীতে অভিজ্ঞ হইয়াও শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয় স্ববিরুদ্ধ কথা বলিতেছেন! ইহার বহু নিদর্শন, যথাস্থানে প্রদর্শিত হইয়াছে। অগত্যা শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয় অপেক্ষা ঋষিরা নিশ্চয়ই বুদ্ধিমান্ ছিলেন না—বলিতে হইবে? যে সব উপনিষদ্ লেখকেরা "শোনা কথা লিখতে গিয়ে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করতে পারেন নি" তাঁহাদের সঙ্গে মাননীয় তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের নিশ্চয়ই দেখা-সাক্ষাৎ হইয়াছিল। নচেৎ তিনি এত ভিতরের খবর কোথা হইতে পাইলেন? এরূপ কল্পনা করিয়া হাস্যাস্পদ না হইলেই কি শোভন হইত না? শ্রুতির বক্তা একদল ঋষি; আর লেখক আর একদল ঋষি—এই কল্পনায় বাহাদুরী আছে বটে। কিন্তু যুক্তি না দিয়া বলায় ইহা কি Dogmatism হইল না? অথচ শ্রুতি—অনাদি শোনা কথা বলিয়া শ্রুতি নামে অভিহিত হয়—ইহাই—শ্রৌতগণের কথা।

ষোড়শ—এইবার তত্ত্বভূষণ মহাশয় নিজ মতবাদের পরিচয়ে প্রবৃত্ত হইলেন তিনি বলিতেছেন—"অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণে বর্ণ, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ ও আস্বাদ এবং এ সমুদয়ের আকার দেশকালকে আত্মপ্রতিষ্ঠিত আত্মস্বরূপান্তর্গত বলে বুঝা যায়। এইভাবে এ সকলকে বুঝলে জগৎ ও আত্মার বিষয় ও বিষয়ীর দ্বৈত বোধ চলে যায়। এরূপ বিশ্লেষণেই জীবাত্মা পরমাত্মার একান্ত ভেদবোধও সংশোধিত হয়, জীবাত্মা যে পরমাত্মার অচ্ছেদ্য অংশ এই সত্য প্রতিভাত হয়।"

এখানেও স্ববিরুদ্ধ কথা। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ইহারা ভূতপঞ্চকের গুণ, ইহাদের আশ্রয় পঞ্চভূত, আর ইহাদের আকার দেশ ও কালকে আত্মস্বরূপান্তর্গত বলিলে ইহারা আত্মপদবাচ্য হইয়া যায়। কারণ, যে যাহার স্বরূপের অন্তর্গত, সে তদ্ভিন্ন হয় না। অথচ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, "সবই আত্মিক, অনাত্মা জড় বলে কোনও বস্তু নেই", আচ্ছা, এই শব্দাদি কি জড় নহে? ভূতাদি দেশকাল কি জড় নহে? ইহারা যদি আত্মভিন্ন না হয়, তবে ইহাদের মধ্যে ভেদ থাকে কি করিয়া? শব্দ ত স্পর্শ নহে, আকাশ

ত বায়ু নহে; দেশ ত কাল নহে। ইহারা আত্মার স্বরূপের অন্তর্গত হইলে ইহারাও পরস্পরে অভিন্ন হয় এবং ভিন্ন হইলে আত্মাও এক অখণ্ড বস্তু হয় না। আর এক অখণ্ড বস্তু না হইলে তাহা নশ্বর হইতেই বাধ্য। সুতরাং আত্মা অখণ্ড হইলে ইহারাই "নাই" বলিতে হইবে। কিন্তু ইহাদিগেরও সত্তা স্বীকার করা হইতেছে! অতএব ইহা বিরুদ্ধ কথা।

আর "আত্মার স্বরূপের অন্তর্গত বলিয়া শব্দাদিকে বুঝিলে জগৎ ও আত্মার, বিষয় ও বিষয়ীর দ্বৈত-বোধ চলে যায়" ইহা বলায় আত্মা অখণ্ডই হয় বটে, কিন্তু আর ইহারাই থাকে না বলিতে হয়। স্বরূপান্তর্গত হইলে কোন বস্তু আর কোন রূপেই অত্যল্পও ভিন্ন হয় না। হইলে আর স্বরূপত্ব থাকে না। বস্তুতঃ, এইরূপ আপত্তি হইতে পারে বলিয়া পরবর্ত্তী বাক্যে "ভেদ-বোধ" শব্দে "একান্ত" একটি বিশেষণ দিয়া তিনি তাঁহার ত্রুটী সংশোধন করিয়া বলিতেছেন—"এরূপ বিশ্লেষণেই জীবাত্মা পরমাত্মার একান্ত ভেদবোধও সংশোধিত হয়, জীবাত্মা যে পরমাত্মার অচ্ছেদ্য অংশ, এই সত্য প্রতিভাত হয়।" ইহাতে কি বলা হইল না যে, একান্ত ভেদ না থাকিলেও অল্প ভেদ থাকে? উপরে বলা হইল, "দ্বৈত-বোধ চলিয়া যায়" আর এখানে বলা হইল, "একান্ত ভেদবোধও সংশোধিত হয়"। আচ্ছা, সংশোধিত হইলে দ্বৈত-বোধ কি চলিয়া যায় কি যায় না? দ্বৈত-বোধ অল্প মাত্রায় চলিয়া গেলে কি দ্বৈত-বোধ থাকিল না? অতএব একান্ত—দ্বৈতবোধ চলিয়া গেলে তাহা সংশোধিত হইল বলা যায় না?

তাহার পর জীবাত্মা, পরমাত্মার অচ্ছেদ্য অংশ হইলে তাহাদিগকে পৃথক্ বলা কেন? অংশ যদি অচ্ছেদ্য হয়, তবে তাহাকে অংশ বলা কি উচিত? বলিলে কি তাহা মিথ্যা কল্পনার সাহায্যে বলা হয় না? অংশ অচ্ছেদ্য হইলে তাহা স্বরূপই হয়। কল্পনা করিয়া তাহাকে অংশ বলা হয় মাত্র। কল্পনা মিথ্যাই হয়। পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ পরোক্ষ ছাড়াছাড়ি হয় না বলিয়া তাহারা এক হয় বলা হইয়াছে, আর এখানে অংশ ও অংশীর মধ্যে ভেদ কল্পনা করা হইতেছে! ইহা স্ববিরুদ্ধ কথা নহে! আর এতদ্দ্বারা পরমাত্মার কি অসীমত্ব রক্ষিত হয়? অসীমের কি অংশ থাকে? অসীমের উদরে অন্য কিছু থাকিলেও কি সেই স্থলে অসীম সসীম হইল না? ইহাকেই ত বস্তুগত পরিচ্ছেদ বলে। বস্তুগত পরিচ্ছেদ থাকিলে তাহার কি অসীমত্ব রক্ষিত হয়? অথবা তাহাদের অভেদ বলিতে পারা যায়? এইরূপে দেখা যায়, শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের অলৌকিক ন্যায়ের প্রভাবে তাঁহার নিকট বিরোধ বলিয়া কিছুই নাই, এবং লোকশিক্ষার কালেও এই বিরোধ-বুদ্ধি তাঁহার অন্তর্হিত হইয়া যায়। তিনি স্ববিরুদ্ধ কথা বলিতেই প্রবৃত্ত হইতেছেন।

সপ্তদশ—এইবার তিনি নির্বিশেষ অদ্বৈত খণ্ডনার্থ জীবাত্মা ও পরমাত্মার পৃথক্ সত্তা সিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া একটি যুক্তির কথা তুলিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—

"ব্রহ্মর্ষিরা সুষুপ্তিতে জগৎ ও জীবাত্মার অপ্রকাশ দেখে ভাবেন, নির্বিশেষ পরমাত্মাই সত্য, জীব ও জগৎ অসৎ। কিন্তু নির্বিশেষ পরমাত্মা তাঁহারা কোথায় পান? সুষুপ্তিতে কেবল জীবাত্মা নয়, বিশ্বাত্মাও অপ্রকাশিত হয়। তাতে কি তিনি অসৎ হয়ে যান? বস্তুতঃ, জীবের সুষুপ্তির অবস্থায় চিরজাগ্রত সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মার ত জীব ও জগৎ স্থায়িভাবে বর্ত্তমান না থাকলে জাগ্রদবস্থায় এ সব পুনঃ প্রকাশিত হতে পারত না। জাগ্রদবস্থায়ও জীবের জ্ঞান আংশিক ভাবে লুপ্ত হয়, কিন্তু নিত্য জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাতে সমস্ত জ্ঞান স্থায়িভাবে থাকাতে স্মৃতির পুনরুদয়ে তা প্রকাশিত হয়।"

ইহার উত্তরে বলিব—সবিশেষ থাকিলেই নির্বিশেষ পাওয়া যায়। যাহা বিশেষযুক্ত হয়, তাহাই সবিশেষ। অতএব বিশেষ ও যাহা বিশেষযুক্ত হয়, তাহারা পৃথক্ বস্তু হয়, আর বিশেষ হইতে পৃথক্ সেই বস্তু হয় বলিয়া তাহা নির্বিশেষ বলিতে হয়। যে যদ্‌যুক্ত হয়, সে তদ্‌ভিন্ন হয়—ইহাই নিয়ম। অতএব নির্বিশেষ এই শব্দ হইতে তাহা পাওয়া গেল। আচ্ছা, সুষুপ্তিতে জীবাত্মা ও বিশ্বাত্মা অপ্রকাশিত হন কে বলে? ইহা ত ঋষিরা বলেন না। জীবসাক্ষী ও ঈশ্বর ত থাকেন। তাহার পর এখানে পরমাত্মা শব্দ ত্যাগ করিয়া বিশ্বাত্মা শব্দ গ্রহণ করা হইল কেন? যাহা হউক, ইহার অভিসন্ধির বিষয় আর আলোচনা করিলাম না। সুষুপ্তিতে যে সাক্ষী প্রকাশিত থাকেন, তাহা বেদান্তের কোনও গ্রন্থে কি তত্ত্বভূষণ মহাশয় পান নাই? অপ্রকাশিত হলে অসৎ হয়, ইহা ত বেদান্তের কথা নয়। যাহা কস্মিন্ কালে প্রকাশের যোগ্য নহে, তাহাকেই অসৎ বলা হয়, যেমন, বন্ধ্যাপুত্র। ইহাও কি তিনি দেখেন নাই? আচ্ছা, সুষুপ্তিতে যদি পরমাত্মায় জীব, জগৎ স্থায়িভাবে থাকে, তবে তাহার পরিবর্ত্তন হয় কেন? স্থায়ী বস্তুর কি পরিবর্ত্তন হয়? আর যাহার পরিবর্ত্তন হয়, তাহার স্বরূপ কি, তাহা কি বলা যায়? ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন বলা যায় না, যেহেতু, ধর্ম্ম কখনও ধর্ম্মীকে ত্যাগ করে না। ধর্ম্মীর পরিবর্ত্তন বলিলে স্থায়িভাবে থাকা হইল কোথায়? জাগ্রৎ অবস্থায় যাহা পুনঃ প্রকাশিত হয়, তাহা কি ঠিক পূর্ব্বের বস্তু? এ সব প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ কথা নহে কি? নির্বিশেষবাদী ইহার যে উপপত্তি করেন, তাহা পরমাত্মার এক অনির্ব্বচনীয় মায়া-শক্তির দ্বারা। ইহা "আছেও" নয়, "নাইও" নয়, ইহা "আছে-নাই" উভয়াত্মাও নহে। ইহা অনাদি, কিন্তু ইহার অধিষ্ঠানের জ্ঞানে, ভ্রমের ন্যায়, ইহা একেবারে অন্তর্হিত হয়। এ কথা এখন থাকুক, ইহার এখন প্রসঙ্গ নহে।

তাহার পর পরমাত্মার নিত্য অচ্ছেদ্য অংশ যে জীবাত্মা ও জগৎ, তাহা সিদ্ধ কি করিয়া হয় দেখা যাউক। আমরা যাহারই সত্তা স্বীকার করি, তাহাই আমাদের জ্ঞানে জ্ঞানের আকারে ভাসমান হয় বলিয়া স্বীকার করি। জ্ঞান যাহার আকার ধারণ করে না, তাহার সম্বন্ধে আমরা "হাঁ" "না" "তাহা" প্রভৃতি কিছুই বলিতে পারি না। আমরা যাহা "জানি না" বলি, সে স্থলে জ্ঞান "জানি না"-রূপে তাহার আকার ধারণ করে বলিয়াই, আমরা তাহা জানি না বলি। জগৎ বা পরমাত্মার আকার যখন আমাদের জ্ঞান ধারণ করে, তখনই আমরা জগৎ বা পরমাত্মা "আছে" বা "নাই" এরূপ কিছু বলি। জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয়ের মধ্যে যদি এইরূপ একটা অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ হইল, তবে কোন এক অনির্ব্বচনীয় কারণে জ্ঞানই জীব, জগৎ ও পরমাত্মার আকার ধারণ করিতেছে, কেন বলিব না? দেশ, কাল সম্বন্ধেও সেই কথা। এইরূপে যাবৎ বিষয়ের কারণ, এই জ্ঞানবস্তু ও উক্ত অনির্ব্বচনীয় কারণ,—ইহারাই ত রহিয়াছে দেখা যাইতেছে। অনির্ব্বচনীয়কেই মিথ্যা বলা হয়, ইহা সৎ নহে, অসৎ নহে,

সদসৎ নহে। এ জন্য এই অনির্ব্বচনীয় কারণ দ্বারা আত্মবস্তুর ভেদ সত্য হয় না।

তাহার পর পরমাত্মার অচ্ছেদ্য অংশ জীবাত্মা, এ কথা কোথা হইতে আসে? এ কথা যিনি বলেন, তিনি কি পরমাত্মা ও জীব, উভয়কে একসঙ্গে দেখেন বা অনুভব করেন? তাহাও সম্ভব নহে। জীবের মধ্যে যে জ্ঞানবস্তুটি আছে, তাহার সত্তারই অধীন ত যাবদ্ বস্তু। পরমাত্মা জীবের জ্ঞেয় হইলে তাহাও সেই জীবের জ্ঞানস্বরূপের অধীন সত্তাসম্পন্ন হইবে। কিন্তু তাহা আর পরমাত্মাই হইলেন না। অতএব পরমাত্মার অচ্ছেদ্য অংশ জীব, এ কথার কোন প্রমাণ নাই।

তাহার পর শব্দস্পর্শাদি বিষয় ও এ সমুদায়ের আকার দেশ-কালকে "আত্মপ্রতিষ্ঠিত আত্মস্বরূপান্তর্গত" কি করিয়া বলা যায়? জ্ঞানে এই জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি সকলই আকারিত হয়, অথবা ভাসমান হয়। হয় বলিয়াই জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থা স্বীকার করা হয়। অতএব এক জ্ঞানবস্তু ও সেই অনির্ব্বচনীয় কারণ, এতদ্‌ভিন্ন আর কোন কিছুই স্বীকার করিবার সম্ভাবনা কোথায়?

তাহার পর আমাদের জ্ঞানের প্রকৃতি দেখিয়া যদি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়, তাহা হইলে কেবল জাগ্রতের জ্ঞানের বিশ্লেষণ করিয়া তাহা বুঝাইলে চলিবে কেন? স্বপ্ন ও সুষুপ্তির জ্ঞানেরও বিশ্লেষণ করিয়া তাহা করা উচিত নহে কি? জাগ্রতে জ্ঞান ও জ্ঞেয় স্থায়িরূপে বোধ হয়, স্বপ্ন সকলই অস্থায়িরূপে জাগ্রতেই প্রতিভাত হয়, সুষুপ্তিতে কিছুই অনুভূত হয় না—ইহাও জাগ্রতেই প্রতিভাত হয়। এ জন্য এ সব কথাই জাগ্রতের অবস্থার কথা। স্বপ্নকালে স্বপ্নটাই জাগ্রৎ বলিয়া অনুভূত হয়, এবং সেই স্বপ্নকালে তদন্তর্গত স্বপ্নকে জাগ্রতের তুলনায় অস্থায়ী বলিয়া বোধ হয়। এ জন্য জাগ্রতের দৃষ্টান্তে সিদ্ধান্ত করিতে গেলে বিষয়, বিষয়ী, জ্ঞান, জ্ঞেয় উভয়ই অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে স্থিত বলিতে হয়। ইহা নৈয়ায়িকগণের পথ। কিন্তু স্বপ্নের দৃষ্টান্তে সিদ্ধান্ত করিতে গেলে সকলই জ্ঞানের আকার, সুতরাং নশ্বর এবং ভ্রম বা কল্পনা-বিশেষ বলিতে হয়—ইহা বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের পথ। আবার সুষুপ্তির দৃষ্টান্তে সিদ্ধান্ত করিতে গেলে সবই অজ্ঞান হইতে সমুৎপন্ন; জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয় সবই অজ্ঞানের পরিণাম, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হয়। ইহা শূন্যবাদী বৌদ্ধ প্রভৃতির পথ। কিন্তু যদি সত্য নির্ণয় করিতে হয়, তাহা হইলে এই অবস্থাত্রয়সাধারণ অবস্থাকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া তাহাতে যে জ্ঞান থাকে, সেই জ্ঞানের প্রকৃতি বিচার করিতে হয় না কি? কিন্তু এই অবস্থাত্রয়সাধারণ কোন অবস্থা গ্রহণ করিতে হইলে আমাদিগকে সেই সুষুপ্তিকেই গ্রহণ করিতে হয়; কারণ, সুষুপ্তি অবস্থাটি স্বপ্ন ও জাগ্রতের কারণীভূত অবস্থা। যেহেতু, কারণ কার্য্যের মধ্যে অনুস্যূত হয়। এই কারণে সুষুপ্তি-দৃষ্টান্তে যাহা সিদ্ধান্ত করা যায়, তাহাই অবস্থাত্রয়-সাধারণ অবস্থা বলা যায়। আর সেই অবস্থায় কিছুই জ্ঞাত হয় না বলিয়া এবং 'কিছুই জ্ঞাত হয় না' এই জ্ঞানটি থাকে বলিয়া সেই জ্ঞানকে নির্বিশেষ বস্তুর দৃষ্টান্ত-স্থল বলা যাইতে পারে। সুষুপ্তির ভঙ্গ হয় বলিয়া তাহা নির্বিশেষ নহে বলিলে তাহা জাগ্রতের দৃষ্টান্তের কথা হইল। কেবল সুষুপ্তিকে দৃষ্টান্ত করিয়া সিদ্ধান্ত করিলে সেই সৌষুপ্ত অজ্ঞানের আশ্রয় নির্বিশেষ জ্ঞানবস্তুর স্বীকার ভিন্ন গত্যন্তর নাই। কারণ, সুষুপ্তিকে দৃষ্টান্ত করিলে এই জাগ্রৎকালে সুষুপ্তির অবস্থাটি কল্পনা করিয়া আনিতে হইবে, আর তাহা করিলে কোনও বিশেষের জ্ঞানকে পাওয়া যাইবে না। তখন যে অজ্ঞানের জ্ঞান হয়, সেই অজ্ঞানেরও সত্তা তখন অনুভূত হয় না। অতএব কেবল জ্ঞানই থাকে বলিতে হইবে। যদি বলা হয়, সুষুপ্তি যে ভাঙ্গিয়া যায়? অতএব সুষুপ্তি-ভঙ্গের হেতু সেই অজ্ঞানে থাকে, তাহাই বিশেষ? কিন্তু তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ, সুষুপ্তিভঙ্গ জাগ্রতের কথা। উহা সুষুপ্তির অবস্থার কথা নহে। সুষুপ্তিকালে অজ্ঞান আছে কি নাই, ছিল কি ছিল না—এ সব কোনও কথাই চলে না। এ জন্য শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, "অনৈকান্তিকত্বাৎ সুষুপ্ত্যেকসিদ্ধশ্চিদানন্দরূপঃ শিবঃ কেবলোঽহম্" ইত্যাদি। অতএব এ স্থলে যে আশঙ্কা করা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত বলা যায় না। সুষুপ্তি-দৃষ্টান্ত দ্বারা নির্ব্বিশেষ বস্তু সিদ্ধি হইতে কোন বাধা হয় না।

উক্ত অনির্ব্বচনীয় কারণকে মায়া বা অচিন্ত্য শক্তি বলা হয়। উহারই দ্বারা সেই জ্ঞানবস্তু সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর এবং অল্পজ্ঞ ও সসীম জীব, তাহার ঘটপটাদি বৃত্তিজ্ঞান, তাহার না-জানা-রূপ অজ্ঞান ও এই জড় জগৎ সমস্তই হইয়াছে বলিতে পারা যায়। যেমন স্বপ্নে জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয় ও ঈশ্বরাদি সবই সৃষ্ট হইতে দেখা যায়। এই জ্ঞানই পরমাত্মা, মায়ারূপ উপাধিযোগে নিয়ম্য জীব ও জগৎ এবং নিয়ন্তা ঈশ্বর হন। পরমাত্মার অচ্ছেদ্য অংশ জীব, ইহা বলিবার ত কোনও হেতু দেখা যায় না। আর জ্ঞান ভিন্ন জীব, জগৎ ও পরমাত্মা স্বীকার করিলে কত অধিক বস্তুই স্বীকার করা হইল। অলৌকিক বিষয়ে স্বীকার্য্য যত অল্প হয় ততই ভাল, অধিক স্বীকারে গৌরব-দোষ হয়। জ্ঞান আমরা সকলেই অনুভব করি, পরমাত্মার অনুভব করি না, উহা কল্পনা করি মাত্র। অতএব এই বৃত্তিজ্ঞান বৃত্তিশূন্য হইলে ইহাকেই নিত্য অখণ্ড পরমাত্মবস্তু বলা হয়। পরমাত্মা, বিশ্বাত্মা, জীবাত্মা—ইহারা নিত্য—এ সব ভাবের উচ্ছ্বাস মাত্র। বৃত্তি উক্ত মায়াশক্তিরই রূপান্তর। সেই মায়াশক্তির আশ্রয় বা অবলম্বন এই জ্ঞানবস্তু মাত্র। অতএব এই জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা এবং উক্ত সদসদ্‌ভিন্ন অনির্ব্বচনীয় জ্ঞাননাশ্য অবস্তু ভিন্ন আর কিছুই স্বীকার্য্য নহে। এই মায়ার জন্যই এই জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা সবিশেষ হন বলিয়া নির্বিশেষ বস্তু যাজ্ঞবল্ক্য স্বীকার করেন, আর তাহার দৃষ্টান্ত কতকটা সুষুপ্তিতে দেন। উহাতে কোন বিশেষ অনুভূত হয় না। এই জন্যই উহাকে নিদর্শনস্বরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। দৃশ্য বিস্মরণরূপ নির্বিশেষ অংশে উহার উল্লেখ।

"মোহেন বিস্মৃতে দৃশ্যে সুষুপ্তিরনুভূয়তে।
বোধেন বিস্মৃতে দৃশ্যে তুরীয়মনুভূয়তে।"

ইহাই প্রসিদ্ধ কথা। সম্পূর্ণ নির্বিশেষ কি দুইটা আছে যে, তাহার দৃষ্টান্ত হইবে? এ সব চিন্তা করিবার ইচ্ছা, বোধ হয়, শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের নাই।

অষ্টাদশ—এইবার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয় অবতারবাদ লইয়া পড়িয়াছেন। বলিলেন,—"জীবের জীবনরূপ প্রকাশই তাঁর অবতরণ, তিনি বিশেষ বিশেষ মহাজনরূপে অবতীর্ণ হন, সাধারণ জীব তাঁহার অবতার নয়" এই মত শাস্ত্রবিরুদ্ধ, যুক্তিবিরুদ্ধ। সত্য অবতারবাদ উপনিষদাদিতে আছে, শঙ্কর তাহা মানিতেন। আমাদের বোধ হয়, এই শাস্ত্র শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের প্রয়োজন অনুসারে অনুমোদিত

বেদাদি শাস্ত্রের অংশমাত্র। যিনি শাস্ত্রের এক অংশ মানেন, অন্য অংশ মানেন না, তাঁহার আবার শাস্ত্রের দোহাই দেওয়া কেন? তাঁহার আবার—ভ্রান্ত শঙ্করের দোহাই দেওয়া কেন? 'তিনি বিশেষ বিশেষ মহাজনরূপে অবতীর্ণ হন—ইহা অস্বীকার করিলে শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয়, হেগেল এবং যীশুখৃষ্ট কি সমান হন না? "জীবমাত্রেই ব্রহ্ম অবতীর্ণ" বলিয়া তন্মধ্যে বিশেষ না মানিলে বামনের চাঁদে হাত দেওয়া হয় না কি? শঙ্কর যে গীতাভাষ্যে শ্রীকৃষ্ণকে ভগবানের বিশেষ অবতারই বলিয়াছিলেন। অতএব বিশেষ অবতারবাদ অস্বীকার করিবার জন্য শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয় হইতে অনভিজ্ঞ শঙ্করের প্রমাণ দেওয়া কি তাঁহার পক্ষে হাস্যভাজন হইবার প্রয়াসে পর্য্যবসিত হইল না?

পরিশেষে দেখা যায়, গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতও শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের কৃপাকটাক্ষ হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। তিনি বলিলেন,—"গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা শ্রীকৃষ্ণকে বলেন ব্রহ্মের পূর্ণাবতার। এ মতও শাস্ত্রবিরুদ্ধ, যুক্তি-বিরুদ্ধ।" তত্ত্বভূষণ মহাশয় দেখিতেছি, বার বার শাস্ত্রের দোহাই দিতে ছাড়েন না। আচ্ছা, এ বিড়ম্বনা তাঁহার কেন? যিনি শাস্ত্র মানেন না, তাঁহার এ সব কথা কেন? দেখিতেছি, পূর্ব্বজন্মের শাস্ত্রমান্যের সংস্কার তাঁহার কিছুতেই যাইতেছে না। পূর্ণাবতার শব্দের অর্থ কি অন্বেষণ করিলে ভাল হইত না?

উনবিংশ—এইবার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের মতের শেষ কথা। তিনি বলিতেছেন—"আমরা সকলেই মূলে তাঁর সঙ্গে এক, অথচ আমরা অপূর্ণ। তাঁর পূর্ণ জ্ঞানশক্তি প্রেমপুণ্য দেশে কালে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিস্বরূপে, আমাদের জীবনে প্রকাশিত হচ্চে। এখানেই তাঁর সঙ্গে আমাদের ভেদ। এই ভেদাভেদ অনন্তকালই চলবে। আমরা সসীম ভোক্তা, তিনি অসীম ভোগের বস্তু। অনন্তকালই এই ভোক্তৃভোগ্যের সম্বন্ধ চলবে। আমাদের সমক্ষে এই মধুর সম্বন্ধ উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত করে ঈশ্বর আমাদের জীবন ধন্য করুন।"

এতদুত্তরে আমরা বলি—"আমরা মূলে তাঁর সঙ্গে এক। এ কথার আলোচনা আমরা করিয়াছি। আচ্ছা, তাঁর পূর্ণ জ্ঞানাদি আমাদের জীবনে প্রকাশিত হচ্চে" ইহা বলিয়াও আমরা অপূর্ণ—ইহা কি করিয়া বলা যায়? মূলে একই হয়েও অপূর্ণ—ইহা কি সঙ্গত কল্পনা? মূলে যে বস্তু একই হয়, তাহা যদি কোন কারণে ভিন্ন দেখায়, তাহা হইলে সেই ভেদ-দর্শন কি মিথ্যা নহে?

তিনি অংশী, আমরা যদি অংশ হই, তবে অংশীর ধর্ম্ম অংশে ত' প্রকাশিতই রহিয়াছে, তাহার আবার নূতন প্রকাশ কিরূপ হইবে? যাহা আছে, তাহার আবার হওয়া কিরূপ? তাহার পর কি কারণেই বা সেই ধর্ম্ম অপ্রকাশিত হইল? আর কেনই বা সেই প্রকাশের প্রতিবন্ধকের অপসরণ হইবে? এ সব কথার কোন উত্তর না দিয়া অপরের দার্শনিকতাকে নিন্দা করা কি বিড়ম্বনার নামান্তর নহে? "এই ভেদাভেদ অনন্তকালই চলবে" ইহার অর্থ আমাদের অপূর্ণতা কস্মিন্‌কালে যাইবে না, ইহাই ত বুঝায়। আচ্ছা, তাহা হইলে শান্তিও আমাদের জীবনে পূর্ণরূপে কখনই ঘটিবে না, আর তাহা যদি না ঘটে, তবে এই সাংসারিক মর্ত্ত্য-জীবন কি দোষ করিল? বলী দুর্ব্বলের সর্ব্বস্ব হরণ করিতেছে, এক জন এক জনকে প্রবঞ্চিত করিতেছে—ইহাতেই বা দোষ কোথায়? "আমরা সসীম ভোক্তা, তিনি অসীম ভোগের বস্তু, অনন্তকালই এই ভোক্তৃভোগ্যের সম্বন্ধ চলবে" এই কথায় মনে হয়—কি ভীষণ ভোগের স্পৃহা! এই ভোগ কেবল অসীম ব্রহ্মবস্তুর ভোগ নহে; কারণ, তিনি কিছু পূর্ব্বে বলিয়াছেন, "শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ দেশ-কাল প্রভৃতি সবই আত্মস্বরূপের অন্তর্ভুক্ত।" সুতরাং তাহারাও ব্রহ্মসম নিত্য, অতএব অসীম ব্রহ্মবস্তুভোগের সঙ্গে এই নিত্য পঞ্চভূতগুণেরও ভোগ চলিবে। এই সব কথা হইতে মনে হয়, এই ভেদাভেদ দর্শন আত্মবিড়ম্বনা আত্মপ্রবঞ্চনার চরম পরাকাষ্ঠা। মনে হয়, যেন এখানে ভোগ চিরস্থায়ী হয় না বলিয়া নিত্য ব্রহ্মে কল্পনার সাহায্যে সেই ভোগের ব্যবস্থা। এই ভেদাভেদ দর্শনের উৎপত্তিই মনে হয়, এই কল্পিত ভোগের জন্য। এতদপেক্ষা দার্শনিকতার অধঃপতন আর কল্পনা করিতে পারা যায় কি?

বিংশ—আচ্ছা, সসীম আমরা যদি মূলে অসীমের সঙ্গে এক হইয়াও আমাদের এই অবস্থা, তবে তাহার কারণ কি—অনাদি অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞান; জ্ঞান হইলেই যাহার নাশ হয়, অথবা ঈশ্বরের লীলারূপ স্বতন্ত্র ইচ্ছা, কিম্বা জীবাদৃষ্ট-পরতন্ত্র ঈশ্বরের ইচ্ছা বলিতে হইবে? প্রথম কল্প ব্যতীত দ্বিতীয় কল্পে ঈশ্বরেরই স্বেচ্ছাচারিতা হয়। আর তজ্জন্য নিষ্ঠুরতা, পক্ষপাতিতা প্রভৃতি বহু দোষের সম্ভাবনা। তৃতীয় কল্পে ঈশ্বরেরই ঈশ্বরত্বে হানি হয়। প্রথম কল্পে অজ্ঞানকে অনাদি বলিয়া তাহার নাশ-কল্পনাও দোষাবহ কি না—এ সব কথা তত্ত্বভূষণ মহাশয় এ স্থলে আলোচনা না করায় তাঁহার ভেদাভেদ দর্শনের অপূর্ণতাই পরিস্ফুট হইয়া উঠে নাই কি?

পরিশেষে বক্তব্য—তিনি যেমন যাজ্ঞবল্ক্য, শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতির উপর গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া—"তাঁহারা কিছু বুঝেন না—ইত্যাদি" বলিলেন, আমরাও তদ্রূপ শ্রদ্ধেয় তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের উপর গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া এই সব কথা বলিলাম। আশা করি যে, ইহা পরের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার প্রয়াসমাত্র বলিয়াই বিবেচিত হইবে। *

চিদ্‌ঘনানন্দপুরী।

---

* এই প্রবন্ধের একটি অতি সংক্ষিপ্ত-সার (যাহা ছাপিলে প্রবাসীর এক পৃষ্ঠার অধিক হইত না) প্রবাসীতে পাঠান হইয়াছিল; কিন্তু প্রবীণ সম্পাদক মহাশয় তাহা ফেরত দিয়াছেন। হিন্দু-মতবিরোধী প্রবন্ধ ছাপিয়া তাহার উত্তর ছাপিবার উদারতা পত্রিকা-সম্পাদকের থাকা উচিত বলিয়া মনে করি। আশা করি, প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় এই প্রতিবাদ-প্রবন্ধের প্রতিবাদ ছাপিয়া অতঃপর সত্যনির্ণয়ে সহায়তা করিবেন।

মহর্ষির মতে—বীর-রস উত্তম-প্রকৃতিক ও উৎসাহাত্মক। অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন—উত্তম শ্রেণীর জনগণের প্রকৃতি (অর্থাৎ স্বভাব) উৎসাহ-পূর্ণ। বীর-রসেরও স্বভাব উৎসাহ-ময়; কারণ, বীর-রসের স্থায়িভাব উৎসাহ। যদি উহার কাব্যে বা নাট্যে প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা হইলে দেখা যায় যে, উত্তম হেতু (আলম্বন-উদ্দীপন) ব্যতীত বীর-রসের উদ্ভব হয় না। বিচারমুখে অভিনব আরও বলিয়াছেন—যাঁহারা উত্তম-প্রকৃতিক, তাঁহাদিগের সর্ব্বত্রই উৎসাহ-ভাবের আস্বাদন হইয়া থাকে; এই কারণে চতুর্ব্বিধ নায়কের (ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরপ্রশান্ত ও ধীরোদ্ধত) মধ্যে ধীরত্ব গুণটি অনুযায়ি-রূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই ধীরত্ব বা ধৈর্য্যই দৃঢ় প্রযত্নের মূল—উহাই উৎসাহের নিদান। কর্ম্মে অসাফল্য-বশতঃ যাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হয় অথবা কর্ম্ম-প্রযত্নের অভাব ঘটে, তাঁহাকে উৎসাহী বলা যায় না। পক্ষান্তরে, পুনঃ পুনঃ অসাফল্য সত্ত্বেও যিনি অটল প্রযত্ন-সহকারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তিনিই ধীর—তিনিই উৎসাহী। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে,—উৎসাহ ত সকল ব্যক্তিরই অল্প-বিস্তর থাকে, তবে সকলেই বীর-রসের আলম্বন বলিয়া কথিত হয় না কেন? উত্তরে অভিনব বলিয়াছেন—যে কোন ব্যক্তি অল্প-বিস্তর উৎসাহের অধিকারী হইলেই তাঁহাকে কাব্যের বর্ণনীয় বিষয় বলা চলে না—সকলের চরিত্রই কিছু কবির উপদেশ-যোগ্য হয় না। যাঁহার চরিত্র উপদেশার্হ, যথাযোগ্য অবসরে তাঁহার উৎসাহের অভিব্যক্তি কবি-কর্ত্তৃক বর্ণিত হইলে রস-সৃষ্টির অনুকূল হইয়া থাকে। রস-নিষ্পত্তির নিমিত্ত অবসরের এই ঔচিত্য একান্ত প্রয়োজনীয়। এই ঔচিত্য-নির্দ্ধারণ কিরূপে করা যাইতে পারে?—এই প্রশ্নের উত্তরে অভিনব বলিয়াছেন, অসম্মোহাদি সম্পত্তিই এই ঔচিত্য সূচিত করিয়া থাকে। এই কারণেই—অসম্মোহ প্রভৃতিকে মহর্ষি বিভাবরূপে বর্ণনা করিয়াছেন (১)।

অসম্মোহ-অধ্যবসায়-নয়-বিনয়-বল-পরাক্রম-শক্তি-প্রতাপ-প্রভাব প্রভৃতি বিভাব-দ্বারা বীর-রসের উৎপত্তি ঘটিয়া থাকে (২)।

স্থৈর্য্য-ধৈর্য্য-শৌর্য্য-ত্যাগ-বৈশারদ্য প্রভৃতি অনুভাব-দ্বারা ইহার অভিনয় কর্ত্তব্য (৩)।

ধৃতি-মতি-গর্ব্ব-আবেগ-ঔগ্র্য-অমর্ষ-স্মৃতি-রোমাঞ্চ-প্রতিবোধ প্রভৃতি ইহার ব্যভিচারি-ভাব।

এই প্রসঙ্গে মহর্ষি দুইটি আর্য্যাশ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—

বিবিধ অর্থবিশেষের অভিসন্ধিবশে—বিষ-বিস্ময়-মোহের অভাব-বশে—উৎসাহে যে অধ্যবসায় (নিশ্চয়) তাহা হইতে বীর-রসের উৎপত্তি হইয়া থাকে (৪)।

---

(১) "উত্তমবর্ণানাং হি সর্ব্বত্রোৎসাহ আস্বাদ্যো ভবতি। অতএব চতুর্ষ্বপি নায়কেষু ধীরত্বমনুযায়িত্বেন বক্ষ্যতে ধীরোদাত্ত ইত্যাদি। তত্র সর্ব্বো জন উৎসাহবানেব কিন্তুবিষয় ইত্যনুপদেশ্যচরিততা। যদীয়ং তু চরিতমুপদেশার্হং তেষামুচিত এবাবসরে উৎসাহাভিব্যক্তিঃ, উচিতত্বং চাবসরস্য অসম্মোহাদিসম্পত্তিরিতি সৈব বিভাবত্বেনোপদিষ্টা"।—অভিনবভারতী, নাট্যশাস্ত্র, প্রথম ভাগ, বরোদা সংস্করণ, পৃঃ ৩২৫।

(২) অসম্মোহাধ্যবসায়—Dr. Mukherjee অনুবাদ করিয়াছেন—"Clearness of mind, perseverence"; কিন্তু অভিনব অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন—"অসম্মোহেন অধ্যবসায়ো হি বস্তুতত্ত্বনিশ্চয় ইতি—মন্ত্রশক্তির্দর্শিতা" (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩২৫)। অসম্মোহ-হেতু-অধ্যবসায়, অর্থাৎ—মোহের অভাব-বশতঃ বস্তুতত্ত্বের নিশ্চয় [বস্তুতঃ, অধ্যবসায়, সংস্কৃত ভাষায় নিশ্চয় অর্থেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে—perseverence অর্থে প্রযুক্ত হয় না]। ইহাতে 'মন্ত্রশক্তি' সূচিত হইতেছে। [শক্তি (রাজশক্তি) ত্রিধা বিভক্ত—প্রভুশক্তি (কোষ ও দণ্ডের তেজঃ), মন্ত্রশক্তি (মন্ত্রণার শক্তি) ও উৎসাহ-শক্তি।] মন্ত্রশক্তি উৎসাহের অন্যতম কারণ। এই প্রসঙ্গে অভিনব বিচার তুলিয়াছেন। 'অসম্মোহ' বলিতে বুঝায় সদ্বস্তুতে অভিনিবেশ। কিন্তু রাবণাদির পক্ষে ত ইহা ছিল না; কারণ, তাঁহাদিগের অসদ্-বস্তুতেই অভিনিবেশ দেখা যাইত। অতএব রাবণাদির পক্ষে অসম্মোহ—অসদ্বস্তুতে অভিনিবেশ—উহাই তাঁহাদিগের উৎসাহ-জনক। এইরূপ যাঁহারা -সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, অভিনবের মতে তাঁহারা যথার্থ তত্ত্ব উপলব্ধি করেন নাই। রাবণাদির ক্ষেত্রেও পরাক্রম-নয় প্রভৃতিই বীর-রসের বিভাব। "অসদ্বস্ত্বভিনিবেশাঽসম্মোহো রাবণাদিগত উৎসাহকারীত্যসৎ অশক্যার্থত্বাৎ। তত্রাপি পরাক্রমনয়াদিরেব বিভাবঃ" (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩২৫)। নয়—good behaviour (Dr. Mukherjee); সন্ধি-বিগ্রহ-যান-আসন (স্থান)-সংশ্রয়-দ্বৈধ (দ্বৈধীভাব)—নীতিশাস্ত্রোক্ত এই ছয়টি গুণের যথাযথ প্রয়োগ (অভিনব)। বিনয়—ইন্দ্রিয়-জয়; gentleness (Dr. Mukherjee). বল—strength (M.); হস্তি-অশ্ব-রথ-পদাতি-চতুরঙ্গসেনা (অভি)। পরাক্রম—power (M.); পরকীয় রাষ্ট্র (মণ্ডল) আক্রমণাশ্রিত ব্যাপার। শক্তি—force (M.); যুদ্ধাদির সামর্থ্য (অভি)। প্রতাপ—influence (M.); শত্রুদিগের সন্তাপ-জনক প্রসিদ্ধি (অভি); প্রভাব—masterfulness (M.); উচ্চবংশ-ধন-জন-সম্পত্তি (অভি)। প্রভৃতি বলিতে বুঝায়—যশঃ ইত্যাদি। এই সকল বিভাব সমষ্টিগত ভাবে বীর-রসের জনক হইয়া থাকে। উত্তমপ্রকৃতির নায়কের চরিত্রে ইহাদিগের মধ্যে কোনটির কখনও অন্যগুলি অপেক্ষা অধিক অভিব্যক্তি ঘটিয়া থাকে; কিন্তু তাহা বলিয়াই ইহাদিগের প্রত্যেকটির পৃথক্ পৃথক্ দৃষ্টান্ত পাওয়া কঠিন। বস্তুতঃ, সমগ্র ভাবে এই সকল বিভাবের একমাত্র আশ্রয়-রূপে রামচন্দ্রাদির ন্যায় নায়কের উল্লেখ করা যাইতে পারে। আর যথায় সিদ্ধি সচিবাধীন (যথা—বৎসরাজ উদয়নের সিদ্ধি তাঁহার প্রধান মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ, বিদূষক ও সেনাপতি রুমণ্বানের প্রযত্নাধীন), তথায় এই সকল বিভাব সচিব-গত বলিয়াও বুঝিতে হইবে। এমন কি, প্রতিনায়ক-গত হইলেও এই সকল বিভাব প্রতিনায়কের উৎসাহ-ব্যঞ্জক হইয়া থাকে।

(৩) স্থৈর্য্য—অচলতা। ধৈর্য্য—গাম্ভীর্য্যবশতঃ সংবরণ। শৌর্য্য—যুদ্ধাদি ক্রিয়া। ত্যাগ—দান। বৈশারদ্য—সাম-দান-ভেদ-দণ্ড—রাজনীতির এই চারিটি উপায়ের যথাযথ প্রয়োগ।

(৪) মূলে আছে—"অবিবাদিত্বাদবিস্ময়ামোহাৎ"। Dr. Mukherjee অনুবাদ করিয়াছেন—absence of melancholy,

স্থিতি-ধৈর্য্য-বীর্য্য-গর্ব্ব-উৎসাহ-পরাক্রম-প্রভাব ও আক্ষেপ-প্রধান বাক্য প্রভৃতি দ্বারা বীর-রসের সম্যগ্‌রূপে অভিনয় কর্ত্তব্য (৫)।

নাট্যশাস্ত্রের বীর-রস-প্রকরণ এই স্থলেই সমাপ্ত হইয়াছে।

সাহিত্যদর্পণে বিবৃত হইয়াছে—বীর-রস উত্তম-প্রকৃতিক (৬), উৎসাহ-স্থায়িভাব-সঞ্জাত, মহেন্দ্র-দৈবত ও হেমবর্ণ। যাহাদিগকে যুদ্ধে জয় করিতে হইবে, সেই বিজেতব্যগণ আলম্বন-বিভাব। বিজেতব্যগণের চেষ্টা ইহার উদ্দীপন-বিভাব (৭)। সহায়-অন্বেষণ প্রভৃতি অনুভাব। ধৃতি-মতি-গর্ব্ব-স্মৃতি-তর্ক-রোমাঞ্চ প্রভৃতি সঞ্চারি-ভাব (৮)।

বীর-রস চতুর্দ্ধা বিভক্ত—দান-বীর, ধর্ম্ম-বীর, দয়া-বীর ও যুদ্ধ-বীর। দান-বীরের দৃষ্টান্ত পরশুরাম—যিনি সপ্তসমুদ্র-মুদ্রিতা মহী অকাতরে দান করিয়াছিলেন। ত্যাগে উৎসাহই পরশুরাম-গত বীর-রসের স্থায়ি-ভাব। সম্প্রদান-ভূত ব্রাহ্মণগণ আলম্বন-বিভাব। দাতার সত্ত্বগুণোদ্রেক প্রভৃতি উদ্দীপন-বিভাব। দাতার সর্ব্বস্ব-ত্যাগ-রূপ কার্য্য অনুভাব। দাতার হর্ষ-ধৃতি প্রভৃতি সঞ্চারি-ভাব। ইহাদিগের সকলের সংযোগে পুষ্টিপ্রাপ্ত দানে উৎসাহ-রূপ স্থায়ি-ভাব দান-বীরে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ধর্ম্ম-বীরের দৃষ্টান্ত যুধিষ্ঠির। বৈদিক কর্ম্মে (ধর্ম্মে) উৎসাহ তাঁহার স্থায়ি-ভাব। যুদ্ধ-বীরের দৃষ্টান্ত শ্রীরামচন্দ্র। যুদ্ধে উৎসাহ তাঁহার স্থায়ি-ভাব। আর দয়া-বীরের প্রকৃষ্ট উদাহরণ প্রখ্যাতনামা জীমূতবাহন—যিনি সর্প শঙ্খচূড়ের জীবন-রক্ষার্থ অবলীলাক্রমে স্বদেহ গরুড়ের ভোজনার্থ প্রদান করিয়াছিলেন। সর্পের দুঃখনাশে (দয়াতে) উৎসাহ তাঁহার স্থায়ি-ভাব (৯)।

সাহিত্যদর্পণের বীর-রস-প্রকরণ এই স্থলেই সমাপ্ত হইয়াছে।

শারদাতনয় ভাবপ্রকাশনে বলিয়াছেন—উৎসাহ-স্থায়ি-ভাব বীর-রসের উপাদান-হেতু। সকল কার্য্যে ত্বরাযুক্ত যে মানসী ক্রিয়া তাহাই উৎসাহ। উদগ্রতা তন্দ্রাকে যাহা অভিভূত করে, তাহাই উৎসাহ। সহজ (স্বাভাবিক) ও আহার্য্য (আহরণীয়—কৃত্রিম) ভেদে উৎসাহ দ্বিবিধ (১০)।

আবেগ-হর্ষ-গর্ব্ব অসূয়া-উগ্রতা-তর্ক-ধৃতি-বোধ-স্মৃতি-মতি-মদ-স্বেদ-রোমাঞ্চ—এইগুলি বীররসের অনুকূল ব্যভিচারি-ভাব—কোন কোনটি কোন কোন স্থলে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বীর-রসের বিভাবগুলি 'স্থির' নামে কথিত হয়। যে সকল বিভাব শ্রুত-দৃষ্ট-স্মৃত-ধ্যাত হইলে স্থৈর্য্যের হেতু হইয়া থাকে, তাহাদিগেরই পারিভাষিক সংজ্ঞা 'স্থির'—উহারা বীররসের পরিপোষক (১১)। এই সকল স্থির বিভাব যখন স্বযোগ্য সাত্ত্বিকাদি ভাব সহ নাট্যাভিনয়ে সমাশ্রিত হইয়া নিজ স্থায়ি-ভাবে (উৎসাহে) বর্ত্তমান থাকে, তখন, প্রেক্ষকগণের মন সত্ত্ববৃত্তি রজোম্বয়ি সাভিমান অবস্থায় বিরাজ করে। ঐরূপ অবস্থা-গত মনের যে পরিণাম বা বিকার, তাহারই নাম বীর-রস (১২)।

ইহা ত গেল বাসুকি-মত। অতঃপর শারদাতনয় নারদ-মতেও রসোৎপত্তির প্রকার বিবৃত করিয়াছেন। বাহ্যবিষয়াশ্রিত অহঙ্কার-রজঃ-সত্ত্ব-যুক্ত মনের যে বিকার তাহাই বীর (১৩)। অতএব, রৌদ্র-রস হইতে বীরের পার্থক্য এই যে, বীররসে সত্ত্বের অস্তিত্ব—তমোগুণের প্রভাব নাই, আর রৌদ্রে সত্ত্বের প্রভাব নাই—তৎপরিবর্ত্তে আছে তমঃ।

---

absence of astonishment or confusion." অভিনব কোন অর্থ করেন নাই। তবে বোধ হয়, এ স্থলে 'বিষ' বলিতে কোনরূপ 'আপদ্‌' বুঝিতে হইবে। বিবিধার্থবিশেষাদ্‌ - ইহার অর্থ এইরূপ—বিবিধ (ধর্ম্ম প্রভৃতি) অর্থ (অর্থনীয়—প্রার্থনীয়)-বিশেষের অভিসন্ধিবশতঃ। আকাঙ্ক্ষিত নানাবিধ ধর্ম্মাদি বিষয়-বিশেষের অভিসন্ধিবশে—বিস্ময়—মোহ প্রভৃতির অভাব হেতু যে নিশ্চয় জন্মে, তাহাই উৎসাহের কারণ বলিয়া 'উৎসাহ'-ভাব-রূপে কথিত হইয়াছে। আপদে অভিভূত হওয়া (বিষ) স্বত্বে অসন্তোষ (বিস্ময়), মিথ্যা জ্ঞান (মোহ) প্রভৃতি দূর করিয়া যে তত্ত্ব-নিশ্চয় দেখা দেয়, তাহাই সত্ত্ব-প্রধান বলিয়া উৎসাহের হেতু। পক্ষান্তরে, রৌদ্র-রসে তমঃ-প্রাধান্য হেতু অনুচিত অশাস্ত্রীয় বধ-বন্ধনাদি দৃষ্ট হয়—এই কারণে রৌদ্রে মোহ-বিস্ময়ের প্রাধান্য থাকে। ইহাই আচার্য্য অভিনবগুপ্তের অভিমত।

(৫) স্থিতি—স্থৈর্য্য। বীর্য্য—শৌর্য্য। গর্ব্ব—ইহার অনুভাবও সূচিত হইতেছে। উৎসাহ—বিষণ্ণ বলহীনকে উত্তেজিত করা। পরাক্রম—পরাক্রম প্রদর্শন। প্রভাব—অধীনগণের উপর প্রভাব-বিস্তার। আক্ষেপ—বস্তুন্তরের সূচনা। আক্ষেপ-প্রধান বাক্য—গম্ভীর দুরবগাহ বাক্য; "words expressive of challenge" (M).

(৬) রামতর্কবাগীশ সাহিত্যদর্পণের টীকায় বলিয়াছেন—'উত্তমপ্রকৃতি' পদের অর্থ—উত্তম (অর্থাৎ—ধীরোদাত্ত) প্রকৃতি (অর্থাৎ—নায়ক) যাহাতে; অথবা, চমৎকারের আতিশয্যহেতু রসান্তর হইতে উৎকৃষ্ট প্রকৃতি (স্বভাব) যে রসের।

(৭) বিজেতব্যগণের চেষ্টা—দানবীরে—সত্ত্বোদ্রেকাদি; ধর্ম্মবীরে—শাস্ত্রাধ্যয়নাদি; দয়াবীরে—দীনের কাতরোক্তি প্রভৃতি।

(৮) সহায়—সহকারী। যুদ্ধবীরে—সৈন্য, দানবীরে—বিত্ত, ধর্ম্মবীরে—দ্রব্য-মন্ত্রাদি ও দয়াবীরে—ত্যাগাদিই সহায়। রোমাঞ্চ—ইহা সাত্ত্বিকভাব। অতএব, এ স্থলে 'রোমাঞ্চ' বলিতে বুঝিতে হইবে—রোমাঞ্চ-জনক হর্ষ।

(৯) কেবল স্থায়ি-ভাবগুলি প্রদর্শিত হইয়াছে। যথাযোগ্য বিভাবানুভাব-সঞ্চারিভাবগুলি যোগ করিয়া লইতে হইবে।

(১০) "উৎসাহঃ সর্ব্বকৃত্যেষু সত্বরা মানসী ক্রিয়া। সহজাহার্য্য-ভেদেন স দ্বিধা পরিকীর্ত্তিতঃ"।—শারদাতনয়-কৃত ভাবপ্রকাশন, দ্বিতীয়াধিকার, পৃঃ ৩৫। "উত্তন্দ্রতামভিভবত্যত উৎসাহনির্ব্বহঃ" —ভাবপ্রকাশন, দ্বিতীয়াধিকার, পৃঃ ৩৫।

(১১) "শ্রুতা দৃষ্টাঃ স্মৃতা ধ্যাতা ভবন্তি স্থৈর্য্যহেতবঃ। তে স্থিরা ইতি বিজ্ঞেয়া বীরাখ্যরসপোষকাঃ"।—ভাঃ প্রঃ, ১ম অধি, পৃঃ ৫।

(১২) "স্থিরা বিভাবাস্ত যদা স্বযোগ্যৈঃ সাত্ত্বিকাদিভিঃ। ভাবৈঃ স্থায়িনি বর্ত্তন্তে স্বীয়াভিনয়সংশ্রয়াঃ। তদা মনঃ প্রেক্ষকাণাং সত্ত্ববৃত্তি রজোম্বয়ি। সাভিমানশ্চ তত্রত্যো বিকারো যঃ প্রবর্ত্ততে। স বীররসনামা স্যাদ্রস্ততে চ স তৈরপি"।—ভাবপ্রকাঃ, ২য় অধিঃ, পৃঃ ৪৪। সত্ত্ববৃত্তি রজোম্বয়ি সাভিমানশ্চ (মনঃ)—এ স্থলে অবশ্য সাভিমানঞ্চ হইলে অন্বয়টি ভাল হইত। ইহার অর্থ এই যে—এইরূপ অবস্থায় মনে সত্ত্বগুণ মুখ্যরূপে বর্ত্তমান থাকে—রজোগুণ অপ্রধান ভাবে তৎসংসৃষ্ট (অন্বিত) থাকে—আর অভিমানেরও সংযোগ উহাতে দৃষ্ট হয়। অভিমান—'অহং' (আমি) বা 'মম' (আমার) এইরূপ মনোভাব। মনে সত্ত্বগুণের আধিক্যবশতঃ উৎসাহের দীপ্তি জন্মে; আর রজোগুণের ও অভিমানের অল্পমাত্রায় সংযোগে অহম্ভাব-যুক্ত ক্রিয়া-শক্তির প্রকাশ দেখা যায়। তখন 'আমি এই উৎসাহব্যঞ্জক বীরকর্ম্মে রত হইব বা হইতেছি'—এবংবিধ মনোভাবের স্ফুরণ হইতে থাকে। এইরূপ অবস্থাপন্ন মনের বিকার বা পরিণামের পারিভাষিক সংজ্ঞাই বীর-রস।

(১৩) "অহঙ্কাররজঃসত্ত্বযুক্তাদ্বাহ্যার্থসঙ্গতাৎ। মনসো যো বিকারস্ত স বীর ইতি কথ্যতে।" ভাব প্রঃ, ২য় অধিঃ, পৃঃ ৪৭। অতএব এ প্রসঙ্গে বাসুকি-মত নারদ-মত হইতে অভিন্ন।

বীর-শব্দের নির্ব্বচন শারদাতনয় বহু প্রকারে করিয়াছেন—(১) 'রা'-ধাতুর অর্থ 'দান'; কিন্তু উহার 'হনন' অর্থও সম্ভব (এ স্থলে মূলের কয়েকটি অক্ষর ত্রুটিত আছে—আন্দাজে অর্থটি বুঝা যায় মাত্র) বিরুদ্ধগণকে (শত্রুদিগকে) হনন করে (রাতি—হন্তি) বলিয়াই ইহার নাম 'বীর'। অথবা, (২) 'লা'-ধাতুর অর্থ 'দান,' 'জ্ঞান' ও 'খণ্ডন'। বিবিধ বিচিত্র বস্তু জানে বা ছেদন করে বলিয়াই ইহার নাম 'বীর'। এ স্থলে 'র' ও 'ল'এর অভেদ বোধ করিতে হইবে। অথবা, (৩) বিদ্বিষ্টগণের প্রেরক বলিয়া ইহার নাম 'বীর' (১৪)।

বীর-রসোৎপত্তির ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে শারদাতনয় বলিয়াছেন—ব্রহ্ম-সভায় 'ত্রিপুরদাহ' নামক রূপকের প্রয়োগকালে নটগণ-কর্ত্তৃক সম্যগ্‌রূপে ত্রিপুরমর্দ্দনের অভিনয় দর্শনে ব্রহ্মার দক্ষিণ মুখ হইতে সাত্ত্বতী বৃত্তির উদ্ভব হয়। বীর-রস এই সাত্ত্বতী-বৃত্তি-সঞ্জাত (১৫)। পুরাকালে ত্রিপুরমর্দ্দনের আয়োজন কিরূপ হইয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণও শারদাতনয় দিয়াছেন। ত্রিপুর—অসুরদিগের তিনটি পুরী—অয়: (লৌহ) রজত-কাঞ্চন-নির্ম্মিত। উহাদিগের মধ্যে প্রথম পুরীর রক্ষার ভার ছিল শত-সহস্র-কোটি অসুরের উপর। দ্বিতীয় পুরীর রক্ষক ছিল ইহার দ্বিগুণ অসুর, ও তৃতীয় পুরীর রক্ষার্থ তাহারও দ্বিগুণ অসুরসেনা নিযুক্ত ছিল। কিন্তু এতগুলি অসুরের শরবর্ষণ অবলীলাক্রমে সহ্য করিতে করিতে অসিতাপাঙ্গী অম্বিকাকে অপাঙ্গে অবলোকন-পূর্ব্বক স্মরহর হাস্য সহকারে একটি মাত্র শর-প্রয়োগে তিনটি পুরীই যুগপৎ ভসস্মাৎ করিয়া ফেলিয়াছিলেন (১৬)।

বীর-রসের বিভাবাদি-বর্ণন-প্রসঙ্গে শারদাতনয় বলিয়াছেন—বীর-রস উত্তম-প্রকৃতি ও উৎসাহাত্মক। উৎসাহ—সত্ত্ব-সম্পত্তি শৌর্য্য ত্যাগাদি গুণ হইতে সম্ভূত। অবিস্ময় অসম্মোহ অবিষাদিত্ব প্রভৃতি হইতেও ইহা জন্মিয়া থাকে (১৭)।

বিশেষ বিশেষ পুরুষার্থে কার্য্যতত্ত্বার্থনিশ্চয়, পরাক্রম, প্রতাপ, দুর্দ্ধর্ষপ্রৌঢ়সৈন্যতা, যশঃ, কীর্ত্তি, বিনয়, নয়, প্রভুশক্তি, মন্ত্রশক্তি, সম্পন্ন-ধনাভিজনমিত্রতা প্রভৃতি ইহার বিভাব (১৮)।

স্থৈর্য্য, শৌর্য্য, প্রতাপ, ধৈর্য্য, আক্ষেপপূর্ণ বচন, সামাদি নীতিশাস্ত্রোক্ত উপায়গুলির যথাকালে প্রয়োগ, ভাব-গম্ভীর উক্তি—অনুভাব (১৯)।

প্রবোধ, অমর্ষ, গর্ব্ব, উগ্রতা, মদ, হর্ষ, স্মৃতি, ধৃতি, ঔৎসুক্য, তর্ক, অসূয়া প্রভৃতি ব্যভিচারী।

মদ-হর্ষাদি সম্ভূত স্বেদ-রোমাঞ্চ প্রভৃতি সাত্ত্বিক।

আর ত্যাগাদি গুণাবলীও কোন কোন ক্ষেত্রে অনুভাব-রূপে গণ্য হইয়া থাকে।

শারদাতনয়ের মতে—বীর-রস ত্রিবিধ—(১) যুদ্ধবীর, (২) দয়া-বীর ও (৩) দান-বীর।

যুদ্ধবীরের লক্ষণ—আয়ুধবিহীন, পরিচ্ছদ-শূন্য ও একাকী হইলেও বহুর সহিত যুদ্ধে ভয়াভাব, রণে দৃঢ়নিশ্চয়, মদ, শস্ত্রাস্ত্রঘাতে হর্ষ, যুদ্ধে অপলায়ন, ভীতকে অভয়-প্রদান, শরণাগতের আর্ত্তি-দূরীকরণ ইত্যাদি। দান-বীরের লক্ষণ—অর্থিগণকে তাহাদিগের আকাঙ্ক্ষিত অর্থ অপেক্ষা অনেক অধিক বস্তু প্রদান করিবার পরও পুনরায় প্রার্থিরূপে সমাগত স্বজন ও পরজনগণকে দান ও মধুর বাক্যের দ্বারা সম্মান প্রদর্শন। দয়া-বীরের লক্ষণ—ব্যাধি-দারিদ্র্য-শস্ত্র-অস্ত্র-ক্ষুধা-পিপাসাদি-দ্বারা পীড়িত জনগণকে প্রীতিপূর্ব্বক অনুগ্রহ প্রদর্শন। সাহিত্যদর্পণে উক্ত ধর্ম্ম-বীর ভেদটি শারদাতনয় স্বীকার করেন নাই।

বীর-রসের আঙ্গিক-বাচিক-মানস-নেপথ্যজ প্রভৃতি ভেদের উল্লেখ শারদাতনয় করেন নাই।

বীর-রসের দেবতা মহেন্দ্র। বীরের অধিষ্ঠান (আশ্রয়) ধৈর্য্য। মহেন্দ্র অতি ধীর—তাই তিনি শ্রেষ্ঠ বীর। এই কারণে বীর-রসের অধিদেবতা মহেন্দ্র।

বীর-রসের বর্ণ গৌর—মহেন্দ্রের দেহকান্তির তুল্য।

শারদাতনয়ের বীর-রস-প্রকরণ এই স্থলেই সমাপ্ত হইয়াছে।

কাব্যপ্রকাশে মম্মট ভট্ট একটি শ্লোকের দৃষ্টান্ত-দ্বারা দেখাইয়াছেন, কিরূপে উৎসাহ-স্থায়িভাব হইতে বীর-রসের উৎপত্তি হইতে পারে। উৎসাহের লক্ষণ গোবিন্দ ঠক্কুর কাব্যপ্রকাশ-প্রদীপে দিয়াছেন—কার্য্যারম্ভ-কালে যে স্থায়ী ত্বরা-জনক চিত্তবৃত্তি-বিশেষ দৃষ্ট হয়, উহাই উৎসাহ। তৎপ্রকৃতিক বীর-রস (২০)। গোবিন্দ ঠক্কুরের মতে বীর-রস ত্রিবিধ—যুদ্ধ-বীর, দান-বীর, দয়াবীর। কিন্তু নাগোজী ভট্ট প্রদীপোদ্দ্যোতে বলিয়াছেন—মতান্তরে বীর-রস চতুর্দ্ধা বিভক্ত, এই মতে অতিরিক্ত ভেদটি—ধর্ম্ম-বীর। দান-বীর বলি প্রভৃতি। ধর্ম্মবীর যুধিষ্ঠির। দয়া-বীর জীমূতবাহন। আর যুদ্ধবীরের দৃষ্টান্ত স্বয়ং

---

(১৪) "রা দান ইতি যো ধাতুর্বা…দে চ বর্ত্ততে। লা দান ইত্যয়ং ধাতুর্জ্ঞানখণ্ডনয়োরপি। রলয়োরবিশেষোঽপি কথিতঃ শব্দবাদিভিঃ। বিরুদ্ধান্ রাতি হন্তীতি বীরশব্দস্য নির্ব্বহঃ। বিবিধং চ বিচিত্রং চ লাতি জানাতি কৃন্ততি। এবং বা বীরশব্দার্থঃ কথিতঃ পূর্ব্বসূরিভিঃ। প্রেরয়ত্যত্র বিদ্বিষ্টানিতি বীরো নিরুচ্যতে"—ভাবপ্রঃ, দ্বিতীয় অধিঃ পৃঃ ৪৮। (১) বি−রা+ক (বিরুদ্ধান্ রাতি হন্তি)। (২) বি−লা+ক (বিবিধং বিচিত্রং চ লাতি জানাতি কৃন্ততি রলয়োরভেদঃ)। (৩) বি−ঈর+অচ্ (বিদ্বিষ্টান্ ঈরয়তি)।

(১৫) "তস্মিংস্ত্রিপুরদাহাখ্যে কদাচিদ্‌ব্রহ্মসংসদি। প্রযুজ্যমানে ভরতৈর্ভাবাভিনয়কোবিদৈঃ। তদেতৎ প্রেক্ষমাণস্য মুখেভ্যো ব্রহ্মণঃ ক্রমাৎ। বৃত্তিভিঃ সহ চত্বারঃ শৃঙ্গারাদ্যা বিনিঃসৃতাঃ"।…"যদাভিনীতং ভরতৈঃ সম্যক্ ত্রিপুরমর্দ্দনম্। সাত্ত্বতীবৃত্তিতো জজ্ঞে বীরো দক্ষিণতো মুখাৎ"।—ভাবপ্রঃ, ২য় অধিঃ, পৃঃ ৫৭।

(১৬) "পুরাণি ত্রীণি ঘটিতান্যয়োরজতকাঞ্চনৈঃ। একৈকস্য তু রক্ষার্থমসুরাণাং তরস্বিনাম্। কোট্যঃ শতসহস্রাণি স্থাপিতানি ততস্ততঃ। দ্বিগুণোত্তরবৃদ্ধানি বলান্যতিবলানি চ। অম্বিকামসিতাপাঙ্গীমপাঙ্গেনাবলোকয়ন্। বিষহ্য শরবর্ষাণি স্ময়মানঃ স্মরান্তকঃ। শরেণৈকেন তান্যেকো ভস্মসাদকরোৎ…।"—ভাবপ্রঃ, ২য় অধিঃ, পৃঃ ৫৭।

(১৭) সত্ত্বসম্পত্তি—দুইরূপ অর্থ হতে পারে—(১) সত্ত্বগুণই ও সম্পত্তি; অথবা, (২) সত্ত্বগুণ-রূপ সম্পত্তি। অবিষাদিত্ব—বিষ প্রয়োগে (বিষদিগ্ধ শরপ্রয়োগে) ক্রূরতার অভিব্যক্তি উহাতে রৌদ্র-রসের নিষ্পত্তি। পক্ষান্তরে, বিষহীন শস্ত্র প্রয়োগে বীর-রসের অভিব্যক্তি।

(১৮) বিশেষ বিশেষ পুরুষার্থে কার্য্যতত্ত্বার্থ নিশ্চয়—ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—এই চারিটি পুরুষার্থ (বা পুরুষের প্রয়োজন)। কোন্ কোন্ পুরুষার্থ লাভ করিতে হইবে—তদ্বিষয়ে ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ। দুর্দ্ধর্ষপ্রৌঢ়সৈন্যতা—'প্রৌঢ়'-শব্দের অর্থ—অতিশয় পরিপক্ক-সুশিক্ষিত। দুর্দ্ধর্ষ-অভিজ্ঞ-সুশিক্ষিত-সৈন্যগণের আধিপত্য। সম্পন্ন-ধনাভিজন-মিত্রতা—'অভিজন' অর্থে উচ্চবংশে জন্ম। সম্পন্ন-সম্পদ্-বিশিষ্ট। প্রচুর ধন, উচ্চবংশ, অকৃত্রিম সুহৃৎ—এই ত্রিবিধ সম্পত্তির অধীশ্বরত্ব।

(১৯) আক্ষেপপূর্ণ বচন—'আক্ষেপ'—শ্লেষপূর্ণ তিরস্কারসূচক বাক্য। উপায়-চতুষ্টয়—সাম-দান-ভেদ-দণ্ড।

(২০) "কার্য্যারম্ভেষু সংরম্ভঃ স্থেয়ানুৎসাহ উচ্যতে। তৎপ্রকৃতিকো বীরঃ"।—প্রদীপ।

কাব্যপ্রকাশ-কারই দিয়াছেন—মেঘনাদ ইন্দ্রজিৎ। তাঁহার যুদ্ধে উৎসাহ স্থায়ি-ভাব—রামচন্দ্রের অন্বেষণে প্রকটিত। এ স্থলে রামচন্দ্র আলম্বন-বিভাব। রাম-কর্ত্তৃক ভ্রূভঙ্গীলীলায় সমুদ্র-বন্ধন উদ্দীপন-বিভাব। ক্ষুদ্র বানরগণের প্রতি উপেক্ষা ও রামে প্রতিস্পর্দ্ধা অনুভাব। ঐরাবত-কুম্ভ ভেদ করার স্মৃতি মেঘনাদকে বানরদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লজ্জা দিতেছে—এইরূপ বাক্য হইতে অনুমিত গর্ব্ব-ভাব ব্যভিচারী।

এই প্রসঙ্গে নাগোজী ভট্ট বলিয়াছেন—কাহারও কাহারও মতে উপপদ-বিহীন (অর্থাৎ কেবল) 'বীর'-শব্দটি প্রযুক্ত হইলে যুদ্ধ-বীরকেই বুঝাইয়া থাকে। দান-বীরাদি বস্তুতঃ বীর-রসের বিভিন্ন ভেদ নহে—পরন্তু ভাব-বিশেষ মাত্র। নাগোজী বীর ও রৌদ্রের প্রভেদ অতি স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়াছেন—বীর ও রৌদ্রের বিভাবাদির সাম্য-সত্ত্বেও স্থায়িভাবের ভেদ-হেতু রসের ভেদ হইয়া থাকে। বীর-রসে উৎসাহ স্থায়ি-ভাব—উহার মূলে আছে বিবেক বা বিবেচকত্ব। ইন্দ্রজিৎ যে ক্ষুদ্র বানরগণকে উপেক্ষা-পূর্ব্বক—এমন কি, লক্ষ্মণকেও তুচ্ছ করিয়া—কেবল এক রামকেই তাঁহার প্রতিপক্ষ স্থির করিয়াছিলেন—ইহাতে ইন্দ্রজিতের বিবেচনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। অতএব, কাব্য-প্রকাশে উদ্ধৃত ইন্দ্রজিতের উক্তিটি বীর-রসের ব্যঞ্জক। পক্ষান্তরে, তিনি যদি এইরূপ বিবেচনা পরিত্যাগ করিয়া উচ্চ-নীচ-নির্ব্বিচারে সকলকেই নিহত করিতে উদ্যত হইতেন, তাহা হইলে রৌদ্রের অভিব্যক্তি ঘটিত (২১)।

রামচন্দ্র-গুণচন্দ্রের নাট্যদর্পণে বলা হইয়াছে—পরাক্রম-বল-ন্যায়-যশঃ-তত্ত্বনিশ্চয় প্রভৃতি হেতু-দ্বারা বীরের উৎপত্তি। আর ধৈর্য্য-রোমাঞ্চ-দানাদি দ্বারা তাহার অভিনয় কর্ত্তব্য। পরাক্রম—বলিতে বুঝায় পরকীয় মণ্ডল (রাষ্ট্র) প্রভৃতি আক্রমণের সামর্থ্য। বল—হস্তি-অশ্ব-রথ-পদাতি-মন্ত্রি-ধন-ধান্যাদি সম্পত্তি, অথবা শারীরিক শক্তি। ন্যায়—সাম-দানাদি নীতিশাস্ত্রোক্ত উপায়গুলির যথাযথ প্রয়োগ। ইন্দ্রিয়জয়ও এই প্রসঙ্গে সংগ্রহণীয়। যশঃ—সর্ব্বত্র শৌর্য্যাদিগুণের খ্যাতি। এই প্রসঙ্গে শত্রুর সন্তাপকর প্রতাপও সংগ্রহযোগ্য। তত্ত্ব—যাথাত্ম্যভাব। এই সকল বিভাব হইতে উৎসাহ-স্থায়ী বীর-রসের উৎপত্তি। নাট্যদর্পণের মতে বীর-রস কেবল ত্রিধা বা চতুর্দ্ধা বিভক্ত নহে—কিন্তু যুদ্ধ-ধর্ম্ম-দান-গুণ-প্রতাপাদি উপাধি-ভেদে বহুধা ভিন্ন। ধৈর্য্য—বিপক্ষের বহু সৈন্য বা বিপদে অকাতরতা। এই প্রসঙ্গে—সৈন্যগণকে উত্তেজিত করা, পরের প্রতি আক্ষেপ (তিরস্কারাদি) করা প্রভৃতি অনুভাবও সংগ্রহযোগ্য। দান বলিতে প্রমোদ, মধ্যস্থতা, শান্তচেষ্টা প্রভৃতির সংগ্রহ কর্ত্তব্য। ধৃতি-মতি-গর্ব্ব-আবেগ-উগ্রতা-অমর্ষ-স্মৃতি-রোমাঞ্চ প্রভৃতি ব্যভিচারী। বীর-রসে যুদ্ধাদিভাব থাকা সত্ত্বেও রৌদ্র-রসের স্ফুরণ হয় না ; কারণ, বীর-রসে উৎসাহ ও ন্যায়ের প্রাধান্য। পক্ষান্তরে, রৌদ্রে মোহ-অহঙ্কার-অপন্যায় প্রভৃতির প্রাবল্য। অতএব, বীর ও রৌদ্রের সাঙ্কর্য্যের সম্ভাবনা নাই (২২)।

সাগরনন্দীর নাটকলক্ষণরত্নকোষে সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে—বীর-রস উত্তম-প্রকৃতি, উৎসাহ-স্থায়িভাব-সম্ভূত। বিনয়-প্রতাপ-বল-বিক্রম—ইহার বিভাব। গুরুসেবা, সদ্‌বৃত্তি, ধর্ম্মসম্পাদন, শক্তি, ত্যাগ বৈশারদ্য, আক্ষেপ, শুচিতা, শৌর্য্য, ধৈর্য্য প্রভৃতি অনুভাব-দ্বারা ইহা অভিনেয়। স্মৃতি, গর্ব্ব, রোমাঞ্চ, হর্ষ, অমর্ষ, ধৃতি প্রভৃতি ইহার ব্যভিচারী। সাগরনন্দী বীর-রসের অবান্তর ভেদের উল্লেখ করেন নাই।

শিঙ্গভূপাল রসার্ণব-সুধাকরে বলিয়াছেন—উৎসাহ-স্থায়িভাব স্বোচিত বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারি-সংযোগে সদস্যগণের আস্বাদ্য হইলে বীর-রসে পরিণত হয়। ইহার ত্রিধা ভেদ—দান-বীর, যুদ্ধ-বীর, দয়া-বীর। দান-বীরে—ধৃতি-হর্ষ-মতি প্রভৃতি ব্যভিচারী ; স্মিতপূর্ব্ব বাক্য-প্রয়োগ, স্মিতপূর্ব্ব-নিরীক্ষণ, প্রসন্নভাবে বহুদাতৃত্ব, (দানের) অনুমোদন, গুণাগুণ-বিচার প্রভৃতি অনুভাব। যুদ্ধ-বীরে—হর্ষ, গর্ব্ব, মোদ (মতি) প্রভৃতি ব্যভিচারী ; অপরের সাহায্য না পাইলেও যুদ্ধে ইচ্ছা, যুদ্ধস্থল হইতে অপলায়ন, ভীতগণকে অভয়-প্রদান—ইহার বিকার (অনুভাব)। দয়া-বীরে—ধৃতি-মতি প্রভৃতি ব্যভিচারী ; নিজের অর্থ ও প্রাণ ব্যয় করিয়াও বিপন্নকে ত্রাণ করিতে প্রয়াস, আশ্বাসোক্তি-প্রয়োগ, স্থৈর্য্য প্রভৃতি ইহার বিকার বা অনুভাব।

বীর-রস-প্রকরণ এই স্থলেই সমাপ্ত হইল।

ইহার পরই ভয়ানক-রস। অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন—ভীতকে অভয়-প্রদান দ্বারা বীর-রসের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। এই কারণে বীর-রসের পরই ভয়ানক-রসের স্থান। ভীত ব্যক্তিকে অভয়-প্রদানে বীর-রস জন্মে—ইহা সত্য। এখন এই ভীত ব্যক্তির ভয় কোথা হইতে জন্মিল—তাহার উত্তর দিতে হইলে ভয়ানক-রসের স্বরূপ-বিশ্লেষণের প্রয়োজন হইয়া থাকে (২৩)।

মহর্ষি বলিয়াছেন—ভয়ানক-রসের স্থায়িভাব ভয়। বিকৃত-রব, বিকৃত-প্রাণিগণের দর্শন, শিবা, উলূক, ত্রাস, উদ্বেগ, শূন্য-আগার ও অরণ্যে গমন, স্বজনের বধ-বন্ধন-দর্শন-শ্রবণ বা তৎসম্বন্ধীয় কথা-স্মরণ প্রভৃতি বিভাব হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়া থাকে (২৪)।

---

(২১) "কেচিত্তু নিরুপপদবীরপদস্য যুদ্ধবীর এব প্রয়োগঃ।··· দানাদ্যুৎসাহস্ত ভাব এবেত্যাহুঃ"—উদ্দ্যোত। "এতেন বিভাবাদিসাম্যে বীররৌদ্রয়োঃ কথং ভেদ ইত্যপাস্তম্। স্থায়িভেদাৎ। বিবেচকত্ব-তদভাবাভ্যাং ভেদাচ্চ। ক্ষুদ্রান্ বিহায় রামমাত্রান্বেষণেন বিবেকস্য স্ফুটত্বাৎ।—নাগোজী, উদ্দ্যোত।

(২২) "বীররসে যুদ্ধাদিভাবেঽপি ন রৌদ্রত্বম্, উৎসাহন্যায়প্রধানত্বাৎ। রৌদ্রে তু মোহাহঙ্কারাপন্যায়প্রাধান্যমিত্যনয়োর্ন সাঙ্কর্য্যম্"—নাট্যদর্পণ, পৃঃ ১৬৮।

(২৩) "তত্র কামস্য সকলজাতিসুলভতয়াত্যন্তপরিচিতত্বেন সর্ব্বান্ প্রতি হৃদ্যতেতি পূর্ব্বং শৃঙ্গারঃ। তদনুগামী চ হাস্যঃ। নিরপেক্ষ-স্বভাবত্বাৎ তদ্বিপরীতস্ততঃ করুণঃ। ততস্তন্নিমিত্তং রৌদ্রঃ, স চার্থপ্রধানঃ। ততঃ কামার্থয়োর্ধর্ম্মমূলত্বাদ্বীরঃ, স হি ধর্ম্মপ্রধানঃ। তস্য চ ভীতাভয়প্রদানসারত্বাৎ তদনন্তরং ভয়ানকঃ"।—অঃ ভাঃ, পৃঃ ২৬৭। "বীরস্য ভীতাভয়প্রদানত্বাদ্ভয়ানকং লক্ষয়তি"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩২৭।

(২৪) মূলে দুই প্রকার পাঠ পাওয়া যায়—(১) "বিকৃতরব-সত্ত্বদর্শনশিবোলুকত্রাসোদ্বেগশূন্যাগারারণ্য- গমনস্বজনবধবন্ধনদর্শনশ্রুতি-কথাদিভির্বিভাবৈরুৎপদ্যতে"। বিকৃত-রস—'রস' অর্থে শব্দ। বিকৃতরব—অট্টহাসাদি। সত্ত্ব—পিশাচাদি। ত্রাস—উদ্বেগ—পরগত। দর্শন—প্রত্যক্ষভাবে। শ্রুতি—শ্রবণ-নির্ভরযোগ্য আপ্তজনের মুখে শ্রবণ ("শ্রবণমাগমেন"—অঃ ভাঃ)। আর এই সকল (বধ-বন্ধনাদি ব্যাপার) দীর্ঘদিন অতীত হইলেও তাহাদিগের বিষয় অনুসন্ধান বা স্মরণ—কথা-স্মরণ। (২) "বিকৃতরবসত্ত্বদর্শনশিবোলকোকাত্রাসো-দ্বেগ-শূন্যাগারারণ্যশ্মশান-শূন্যভবনগমনমরণ-স্বজনবধবন্ধদর্শনশ্রবণকথাভি-বিভাবৈরুৎপদ্যতে।" Dr. Mukherjee বিকৃতরব ও বিকৃতসত্ত্বদর্শন এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—'strange sounds, the sight of deformed beings." Dr. Mukherjce—"শূন্যাগারারণ্য-গমন" ইহার পর "মরণ" এই কথাটির নিবেশ ধরিয়াছেন। "শ্রুতি-কথাদি" ইহার ভাবান্তর করিয়াছেন "from hearing the narrative of···" (বস্তুতঃ "কথা-শ্রবণ" এইরূপ পাঠান্তর থাকিলে তাঁহার ইংরেজীটি নির্দ্দোষ হয়, নতুবা নহে।)

প্রবেপিত-কর-চরণ, নয়ন-চাপল্য, পুলকোদ্গম, মুখ-বৈবর্ণ্য, স্বর-ভেদ প্রভৃতি অনুভাব-দ্বারা ইহার অভিনয়-প্রয়োগ কর্ত্তব্য (২৫)।

ইহার ভাব—স্তম্ভ, স্বেদ, গদ্গদ, রোমাঞ্চ, বেপথু, স্বরভেদ, বৈবর্ণ্য, শঙ্কা, মোহ, দৈন্য, আবেগ, চাপল্য, জড়তা, ত্রাস, অপস্মার, মরণ প্রভৃতি।

এই প্রসঙ্গে মহর্ষি চারিটি আর্য্যাশ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—

বিকৃত রব (শ্রবণে), বিকৃত (অঙ্গযুক্ত) প্রাণিদর্শনে (অথবা পিশাচাদি প্রাণিদর্শনে), সংগ্রামে, অরণ্যে ও শূন্যগৃহে গমনে ও গুরু-নৃপ প্রভৃতির নিকট অপরাধ-হেতু কৃত্রিম ভয়ানক-রস উৎপন্ন হইয়া থাকে (২৬)। এই প্রসঙ্গে অভিনবগুপ্ত বিচারের অবতারণা করিয়াছেন—ভয় স্ত্রী-বালক-নীচ প্রকৃতির স্বভাব-গত—উত্তম-প্রকৃতির নহে। কিন্তু উত্তম-প্রকৃতির জনগণেরও গুরু বা রাজার নিকট হইতে ভয় উৎপন্ন হয়—ইহা কবি বর্ণনায় দেখাইতে পারেন্। যাহার এই প্রকার গুরু-নৃপাদি হইতেও ভয় জন্মে না—তিনি অত্যুত্তম-প্রকৃতি। অন্যের কথা দূরে থাকুক, রাজ্যের কর্ণধার-স্বরূপ মন্ত্রিগণও রাজার নিকট হইতে ভয় পাইয়া থাকেন—যেহেতু, তাঁহাদিগের প্রভুত্ব বা স্বাতন্ত্র্য নাই। তাই রত্নাবলীতে বর্ণনা আছে —প্রধান মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ বলিতেছেন—'স্বেচ্ছায় কর্ম্ম করিতে যাইয়া প্রভুর ভয় করিতেছি' ("স্বেচ্ছাচারী ভীত এবাস্মি ভর্ত্তুঃ"—রত্নাবলী ১।৭)।

গাত্র-মুখ-দৃষ্টির ভেদ (অর্থাৎ—গাত্রাদির বর্ণ-কর্ম্ম-সংস্থানাদির উপর্য্যয়) উরুস্তম্ভ, অতিবীক্ষণ, (দিশাহারা হইয়া লক্ষ্যহীন দৃষ্টিপাত) উদ্বেগ, (গাত্রাবয়ব-সমূহের) অবসন্নভাব, মুখের (অর্থাৎ—তালুর) শোষ, হৃদয়ের (অতিবেগে) স্পন্দন, রোমোদ্গম প্রভৃতি (অনুভাব-দ্বারা) ভয়ের (অর্থাৎ— ভয়ানক-রসের) অভিনয় কর্ত্তব্য।

স্বভাবতঃ ভয়ের উৎপত্তি-প্রকার এইরূপ। অভিনয়ে প্রদর্শনীয় ভয়ানক-রস সত্ত্ব (অর্থাৎ—মনের একাগ্রতা) হইতে জন্মে; আর উহা স্বাভাবিক ভয়ের যত দূর অনুরূপ হওয়া সম্ভব, তত দূর স্বভাবানুগ করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে অভিনবগুপ্ত প্রাচীন টীকাকারের মত উদ্ধৃত করিয়া তাহার সমালোচনা করিয়াছেন। প্রাচীন টীকাকার-মতে—ভয় সত্ত্ব (অর্থাৎ—মনঃ-সমাধান) হইতে সম্ভূত—ইহা নটের শিক্ষা। অর্থাৎ—মনের একাগ্রতা-দ্বারা নটগণ অভিনয়ে প্রদর্শিত ভয়ানক-রসটিকে স্বাভাবিক ভয়ের যত দূর সম্ভব অনুগামী করিয়া প্রদর্শন করিবেন। আর এই শিক্ষা, সকল রসের অভিনয়েই প্রয়োজ্য। অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন—ইহা ঠিক নহে। "সমগ্র রস-প্রকরণটিই কবি ও নট উভয়েরই শিক্ষাদানার্থ সংগৃহীত হইয়াছে—কারণ, সাধারণতঃ লোকসমাজে বিভাব-অনুভাব-অভিনয় প্রভৃতি ব্যবহার অজ্ঞাত। অতএব মোটামুটি এই শ্লোকটির তাৎপর্য্য এই—ভয় স্বভাবতঃ রজ-স্তমঃ-প্রকৃতিক নীচজনেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। যাঁহারা সত্ত্ব-প্রধান উত্তম-প্রকৃতিক, তাঁহারা স্বাভাবিক ভয় অনুভব করেন না। তবে তাঁহারা ভয়ানক-রসের অভিনয় (বা অনুকরণ-পূর্ব্বক প্রদর্শন) করিতে পারেন। এই অভিনয় তাঁহাদিগের সত্ত্বগুণসভূত—প্রযত্ন-সাধ্য, অর্থাৎ—এক কথায়—স্বাভাবিক নহে কৃত্রিম। পূর্ব্বোল্লিখিত অনুভাবগুলির সাহায্যে তাঁহারা ভয়ানক-রসের অভিনয় দেখাইতে পারেন। কিন্তু স্বাভাবিক নহে বলিয়াই গাত্রভেদাদি চেষ্টা (অনুভাব-গুলি) মৃদুভাবে প্রযুক্ত হইয়া থাকে (২৭)। এই মৃদুতাই উহা-দিগের কৃত্রিমতার পরিচায়ক। অবশ্য এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মর্ত্তব্য যে, অভিনয়ে প্রদর্শিত রসমাত্রেই কৃত্রিম, কেবল ভয়ানক-রসটিই কৃত্রিম নহে। ধনার্থিনী বেশ্যা যখন কৃত্রিম রতিভাব প্রদর্শন করে, তথায়ও শৃঙ্গার-রসের অভিনয় প্রদর্শিত হয় মাত্র—যথার্থ শৃঙ্গার-রস উৎপন্ন হয় না। অতএব অভিনয়-দ্বারা প্রদর্শিত রসমাত্রেই কৃত্রিম (২৮)।

ভয়ানক-রস কৃত্রিমই হউক আর অকৃত্রিমই হউক, কর-চরণ-বেপথু, গাত্র-স্তম্ভ, গাত্র-সঙ্কোচ, হৃৎকম্প, শুষ্ক ওষ্ঠ-তালু-কণ্ঠাদি-দ্বারা অভিনেয়।

নাট্যশাস্ত্রের ভয়ানক-রস-প্রকরণ এই স্থলেই সমাপ্ত হইল।

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

---

(২৫) মূলে আছে "প্রবেপিতকরচরণ···"। প্রবেপিত—যাহা কাঁপিতে আরম্ভ করিয়াছে (আদি-কর্ম্মে ক্ত)। "বেপিতুং প্রবৃত্তং যৎ করচরণম্ আদিকর্ম্মেব"।—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩২৫। স্বরভেদ—স্বরের ভাববিপর্য্যয়।

(২৬) কৃত্রিম—বহুক্ষণ ভয়ের ভাব প্রদর্শিত হইতে থাকে, যাহাতে লোকের প্রতীতি হয় যে, হাঁ, সত্যই বুঝি ভীত হইয়াছে। এইরূপে বহুক্ষণ ধরিয়া ভয়ের ভাব প্রদর্শন করার ফলে ভয়ানক-রসের অবস্থান হয় বলিয়াই ইহাকে কৃত্রিম বলা হইয়াছে। যদি স্বাভাবিক ভয়ের মত অল্পক্ষণ মাত্র ভয়ের ভাব প্রদর্শিত হয়, তবে উহা রস-রূপে আস্বাদন-যোগ্য না হইয়া ব্যভিচারি-ভাবরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে—"অনু-ভাবাশ্চ তথা শ্লিষ্টাস্তত্র ক্রিয়ন্তে লোকে যেন সত্যত এব ভীতোঽয়মিতি গুর্ব্বাদীনাং প্রতীতির্ভবতি। অস্বাভাবিকত্বাচ্চ কৃতকত্বং বহুতর-কালানুবর্ত্তনেনাস্বাদ্যত্বাচ্চ রসত্বং ন চ ব্যভিচারিত্বম্। তদ্ধি তদা স্যাদ্ যদি স্বভাবত এব কিঞ্চিৎকাললবমুৎপদ্যতে" অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩২৭-২৮।

(২৭) "সত্ত্বং মনঃসমাধানং তজ্জন্মকমিতি নটস্যেয়ং শিক্ষা। সা চ সর্ব্ববিষয়েতি টীকাকারঃ। তদিদমসং কবিনটশিক্ষার্থমেব সর্ব্বমিদং প্রকরণং, লোকে বিভাবানুভাবাভিনয়াদিব্যবহারাভাবাৎ। তস্মাদয়-মত্রার্থঃ—এতত্তাবদ্ভয়ং স্বভাবজং রজস্তমঃপ্রকৃতীনাং নীচানামিত্যর্থঃ, যেহপি চ সত্ত্বপ্রধানাস্তেষাং সত্ত্বসমুত্থং প্রযত্নকৃতমেভিরেবানুভাবৈঃ কার্য্যম্। কিন্তু মৃদুচেষ্টিতৈর্যতস্তৎ কৃতকম্"। অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩২৮।

(২৮) তবে এই ক্ষেত্রে একটু পার্থক্য আছে। বেশ্যা-প্রদর্শিত কৃত্রিম শৃঙ্গারের কোনরূপ পুরুষার্থ (অর্থাৎ—পুরুষ-প্রয়োজন ধর্ম্ম বা অর্থ বা কাম বা মোক্ষ) সাধনের সামর্থ্য নাই। পক্ষান্তরে, কৃত্রিম ভীত-ভাব প্রদর্শনেরও কিছু সার্থকতা আছে। ভীত-ভাব-প্রদর্শনে গুরুজনাদি বুঝিতে পারেন—ভীত লোকটি বিনীত; তাহা ছাড়া উহার মৃদু চেষ্টা দ্বারা মনে করেন, এ লোকটি অধম-প্রকৃতির নহে। এইরূপে কৃত্রিম ভয় দ্বারাও কিছু না কিছু প্রয়োজন (পুরুষার্থ) সাধিত হইয়া থাকে। আর যথায় রাজা কৃত্রিম (ভীত) ভাব প্রদর্শন করেন না, পরন্তু অকৃত্রিম ক্রোধ-বিস্ময়াদি ভাব প্রদর্শন করেন, তথায় ঐ ভাবগুলি ব্যভিচারী বলিয়াই গণ্য হইয়া থাকে, স্থায়িরূপে পরিগণিত হয় না। "ননু চ রাজাদি কিমিতি গুর্ব্বাদিভ্যো ভয়ং কৃতকং দর্শয়তি? দর্শয়িত্বা কিমিতি মৃদূন্ গাত্রকম্পাদীন্ প্রদর্শয়তি? কিমিতি চ ভয়ানক এব কৃতকত্বমুক্তম্? সর্ব্বস্য হি কৃতকত্বমুক্তং ভবতি। যথা বেশ্যা ধনার্থিনীতি কৃতকাং রতিমাদর্শয়-তীত্যাশঙ্ক্য সাধারণমুত্তরমাহ।···ভয়ে হি প্রদর্শিতে গুরুর্বিনীতং জানাতি। মৃদু-চেষ্টিততয়া চাধমপ্রকৃতিমেনং ন গণয়তি। কৃতক-শৃঙ্গারাদ্ বেশ্যোপদিষ্টানাং ন কাচিৎ পুরুষার্থসিদ্ধিঃ। তেন হ্যনেন প্রকারেণ কার্য্যঃ পুরুষার্থবিশেষো লভ্যতে। যত্র তু রাজা ন কৃতকং পরানুগ্রহায় ক্রোধবিস্ময়াদীন্ দর্শয়তি তত্র ব্যভিচারিতৈব তেষাং ন স্থায়িতা···"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩২৮-২৯।

ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য-প্রকৃতি

ভারতের অর্থ-সচিব, গত ১৫ই ফাল্গুন, তাঁহার বাজেট-অভিভাষণের মুখবন্ধে বলিয়াছেন,—এ যুদ্ধে ভারতের অর্থ বিধানে বহু অঘটন বা প্রতিকূল ফল ফলিয়াছে সত্য; কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রথম দুই বৎসরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সুস্পষ্ট দেখা যাইবে, প্রতিকূল অপেক্ষা অনুকূল ফলের গুরুত্ব অনেক বেশী। যুদ্ধ তখন ভারত হইতে বহু দূরে চলিতেছিল, তথাপি শান্তি-শৃঙ্খলা হইতে যুদ্ধবিগ্রহে নিমজ্জিত হইলে নানা দিকে আনুষঙ্গিক যে সব অসুবিধা ঘটে, তাহা না ঘটাইয়া এ যুদ্ধের প্রভাবে ভারতে উৎপাদন, কর্ম্ম-নিয়োগ এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্প্রসারিত হইয়াছিল। সমুদ্র-পারবর্ত্তী কয়েকটি বাজার আমরা হারাইয়াছি সত্য, কিন্তু তেমনই আবার বহু নূতন বাজার আমরা লাভ করিয়াছি।

আমাদের এই লাভ-ক্ষতি বহির্ব্বাণিজ্যে কিরূপে সংঘটিত হইয়াছিল, এবং তাহা কিরূপ গতি-প্রকৃতি অনুসরণ করিয়াছিল, সংখ্যা-সাহায্যে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার আলোচনা ও বিশ্লেষণের প্রয়াস পাইব। ঘটনার পরে হইলেও, অতীতের আলোচনা নিষ্ফল নহে—ইষ্টপ্রদ। কারণ, অতীতের অনুশীলন ও বিশ্লেষণ হইতে আমরা বর্ত্তমানের গতি-প্রকৃতি এবং ভবিষ্যতের ধারা সম্বন্ধে প্রচুর ইঙ্গিত লাভ করিতে পারি। সংখ্যা-বিশ্লেষণ সৌখীন পাঠকের পক্ষে কিঞ্চিৎ নীরস হইলেও তত্ত্বজিজ্ঞাসু অভিজ্ঞের পক্ষে রুচিকর।

এই স্থলে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, যুদ্ধের তৃতীয় বৎসরের ব্যবসা-বাণিজ্যের সরকারী সংখ্যা-সঙ্কলন এখনও প্রকাশিত হয় নাই। সাধারণতঃ পরবর্ত্তী বৎসরের মধ্যভাগ ব্যতীত পূর্ব্ব বৎসরের সংখ্যা-সঙ্কলন প্রকাশিত হয় না। যুদ্ধ-পরিস্থিতি হেতু বর্ত্তমানে তাহার প্রকাশে দীর্ঘ বিলম্ব অবশ্যম্ভাবী। বিশেষতঃ যুদ্ধের তৃতীয় বর্ষ বিপর্য্যয়ের।

যুদ্ধের অভিঘাতে গত সার্দ্ধ তিন বৎসরে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যে বিপুল বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। যুদ্ধারম্ভের অব্যবহিত পরে আমাদের বহির্ব্বাণিজ্যে যে উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল, যুদ্ধের অধিকতর ব্যাপ্তি, প্রচণ্ডতা ও প্রগাঢ়তার সহিত ১৯৪০-৪১ আর্থিক বৎসরে তাহা মন্দীভূত হয়; এবং রপ্তানী ও আমদানী উভয় ক্ষেত্রেই বাণিজ্যের একুন মূল্যপরিমাণ হ্রাস পাইয়াছিল। য়ুরোপ এবং মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের পরিসরবৃদ্ধি হেতু কয়েকটি দেশের সহিত আমাদের বাণিজ্য বন্ধ হইয়াছিল, এবং তখনও নির্ব্বিরোধী, অর্থাৎ যুদ্ধে লিপ্ত নহে, এমন দেশগুলির সহিত মাল-চালানী জাহাজের অভাব এবং জাহাজ-ভাড়া ও বীমা-হারের অসম্ভব বৃদ্ধি, মুদ্রা-বিনিময়ের বর্দ্ধমান জটিলতা, তাহার উপর প্রায় প্রত্যেক দেশে ব্যবসায়-স্বাধীনতা সঙ্কোচন হেতু, এবং সর্ব্বোপরি য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক পেঁচ-পাকের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা অত্যন্ত কষ্টকর হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত, মূল্যমান বৃদ্ধিহেতু রপ্তানীর সঙ্কোচ ঘটিয়াছিল।

য়ুরোপের ন্যায় শিল্পে অত্যুন্নত মহাদেশে, বাণিজ্যের অবরোধ হেতু, কাঁচা মালের চাহিদা শিল্পজাত পণ্য অপেক্ষা অধিকতর ব্যাহত হইয়াছিল। অধিকন্তু, রপ্তানী-মূল্যের বহির্ভূত জাহাজ-ভাড়া ও বীমাকর আমদানী-মূল্যের অন্তর্ভুক্ত হইবার ফলে, আমদানী-পণ্যের মূল্য-তুলনায়, রপ্তানী-পণ্যের মূল্য নিম্নাভিমুখী হইয়াছিল। রপ্তানী-পণ্যের মূল্য-হ্রাসের আরও একটি কারণ ছিল। রপ্তানী-পণ্যের অধিকাংশই কাঁচা মাল; সুতরাং শিল্পজাত আমদানী-পণ্যের তুলনায় মূল্যের অনুপাত-অনুযায়ী, রপ্তানী-মালের পরিমাণ বেশী। এই নিমিত্ত মাল-চালানী জাহাজের অপ্রতুলতা, রপ্তানী-পণ্যের সঙ্কট বৃদ্ধি করিয়া তাহার মূল্যকে নিম্নগামী করিয়াছিল। কিন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, যুদ্ধারম্ভের পর ভারত হইতে সরকার কর্ত্তৃক প্রেরিত যুদ্ধোপকরণের অঙ্ক বাণিজ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইতেছে না। কিন্তু বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে ভারত বহু পণ্য প্রেরণ করিতেছে। এই সকল যুদ্ধ ও খাদ্যোপকরণের অঙ্ক ধরিলে, ভারতের রপ্তানী-বাণিজ্যের যথার্থ মূল্য সরকারী বাণিজ্য-হিসাবে প্রদত্ত সংখ্যা-সমষ্টি অপেক্ষা অধিক হইবে। আরও একটি বিষয় আমাদের বিবেচনা করা প্রয়োজন। আলোচ্য বর্ষে য়ুরোপের বিপণি-বন্ধ-হেতু ক্ষতি সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশ-সমূহে এবং যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরিত অধিকতর পরিমিত রপ্তানী-পণ্যের দ্বারা বহুলাংশে পূরণ হইয়াছিল।

যাহা হউক, ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশসমূহে প্রেরিত ভারতীয় পণ্যের মূল্য পূর্ব্ব-বৎসরের ১১৪·০৬ কোটি এবং তৎপূর্ব্ব বৎসরের ৮৫·৩৭ কোটি টাকার তুলনায়, ১১৬·৬৪ কোটি টাকায় উন্নীত হইয়াছিল। যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরিত ভারতীয় পণ্যের মূল্য ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দের ১৩·৮৮ কোটি এবং ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দের ২৪·৪২ কোটি হইতে, ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে ২৫·১০ কোটিতে উন্নীত হইয়াছিল। চীনে প্রেরিত ভারতীয় পণ্যের মূল্যও বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভাবে পূর্ব্ব-বৎসরের ৮·৫০ কোটি এবং তৎপূর্ব্ব বৎসরের ২·৪৭ কোটি হইতে, আলোচ্য বৎসরে ৯·১৭ কোটিতে স্থান লাভ করিয়াছিল। দেশাভ্যন্তরীণ চাহিদাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল, বিশেষতঃ কাঁচা তুলার। ফলে, এই সকল পণ্যের উৎপাদকেরা বর্দ্ধিত আভ্যন্তরিক চাহিদার দ্বারা বিদেশী বাজার-বিচ্যুতির ক্ষতি কিয়দংশে সামলাইয়া লইয়াছিল।

কাঁচা-মালের রপ্তানী বন্ধ হইবার ফলে ভারতীয় শিল্প কিছু লাভবান্ হইয়াছিল। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, রপ্তানী বন্ধ হইবার জন্য দেশাভ্যন্তরে কাঁচা মালের কাট্‌তি স্বভাবতঃই কিছু বৃদ্ধি পায়; তাহাতে শিল্পের প্রসার ঘটিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, পরিণত পণ্যের আমদানী কমিয়া যাওয়াতে ভারতীয় শিল্পের প্রচেষ্টা বহিরাক্রমণ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। রক্ষণ-শুল্ক এবং রাষ্ট্র-প্রদত্ত অর্থসাহায্য হইতে এ-সুবিধা অতিরিক্ত লাভ। তৃতীয়তঃ, যে সব কাঁচা মালের রপ্তানী বন্ধ, সেগুলির মূল্যহ্রাস শিল্প উৎপাদনের লাভের অঙ্ক কিছু বৃদ্ধি করিয়াছিল।

মোটের উপর, যদিও ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে ভারতের রপ্তানী-বাণিজ্যের একুন-মূল্য ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দের তুলনায় কম হইয়াছিল, তথাপি ১৯৩৭-৩৮ ও ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দের তুলনায় অনেক বেশী ছিল। সর্ব্বদেশে প্রেরিত ভারতীয় রপ্তানী-বাণিজ্যের তুলনায় অন্যান্য দেশ হইতে আনীত আমদানী-বাণিজ্যের মূল্যের গুরুত্ব স্বল্পতর হইয়াছিল। চারি বৎসরের অঙ্ক পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।

	রপ্তানী	আমদানী
১৯৩৭-৩৮	১৮১ কোটি টাকা	১৭৪ কোটি টাকা
১৯৩৮-৩৯	১৬৩ " "	১৫২ " "
১৯৩৯-৪০	২০৪ " "	১৬৫ " "
১৯৪০-৪১	১৮৭ " "	১৫৭ " "

উপরে উদ্ধৃত অঙ্ক-তালিকায় আমরা ব্রহ্মদেশের সংস্রব পরিত্যাগ করি নাই। এইবার ব্রহ্মদেশকে বর্জ্জন করিয়া পৃথক্ ভাবে আমরা ভারতের রপ্তানী ও আমদানী-বাণিজ্যের বিস্তৃত আলোচনা করিব। উক্ত চারি বৎসরে ভারত হইতে বিভিন্ন দেশে নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান বণিজ্‌দ্রব্য রপ্তানী হইয়াছিল :—

	১৯৩৭-৩৮ (কোটি টাকা)	১৯৩৮-৩৯ (কোটি টাকা)	১৯৩৯-৪০ (কোটি টাকা)	১৯৪০-৪১ (কোটি টাকা)
ধান্ত-গোধূমাদি, মটরকলাই ও আটা-ময়দা	৯'৪৯	৭'৭৪	৫'০৯	৫'৯২
চা	২৪'৩৯	২৩'২৯	২৬'৩১	২৭'৭৫
তৈল-বীজ (তৈলের জন্ম বাদাম সমেত)	১৪'১১	১৫'০১	১১'৯০	১০'০৫
তুলা (কাঁচা ও ত্যক্ত)	২৯'৭৭	২৪'৬৭	৩১'০৪	২৪'৪৬
পাট (কাঁচা)	১৪'৭২	১৩'৪০	১৯'৮৩	৭'৮৫
পাট-প্রস্তুত দ্রব্যাদি	২৯'০৮	২৬'২৬	৪৮'৭২	৪৫'৩৮
অন্যান্য	৫৪'২৪	৪৮'৪৯	৫৬'৯২	৬২'৩১
মোট	১৮০'৯২	১৬২'৭৯	২০৩'৯২	১৮৬'৮৬

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রপ্তানী হ্রাস ঘটিয়াছিল কাঁচা পাটে; ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দের ২০ কোটি হইতে ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে মাত্র ৮ কোটিতে। এই হ্রাস ঘটিয়াছিল, চাষী যখন অত্যধিক ফসল জন্মাইয়াছিল এবং পাট-শিল্পে উৎপাদনের প্রতিরোধ হেতু তাহার বিক্রয় কমিয়াছিল। পাটোৎপন্ন পণ্যের রপ্তানী হ্রাস অপেক্ষাকৃত কম হইয়াছিল—কাঁচা পাটের ১২ কোটি ঘাটতির তুলনায় মাত্র ৩ কোটি। ইহার কারণ, কাঁচা মালের অর্দ্ধেকের অধিক ঘাটতি মহাদেশিক য়ুরোপের বাজারে (Continental markets); কিন্তু পাটোৎপন্ন পণ্যের বিক্রয় ঐ সকল বাজারে অতি অল্প। কাঁচা ও ত্যক্ত তুলার রপ্তানীও যুদ্ধের অভিঘাতে আলোচ্য বর্ষে অবনতিপ্রাপ্ত হইয়াছিল মাত্র ২৪ কোটি টাকায়; অর্থাৎ পূর্ব্ব-বৎসরের তুলনায় শতকরা ২১ অংশ। তৈল-বীজের মধ্যে রেড়ী, রাই ও মসিনার রপ্তানী পূর্ব্ব-বৎসরাপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কিন্তু চীনাবাদামের চালান শতকরা ৩৮ অংশ কম হইবার জন্ম মোটের উপর তৈলবীজের রপ্তানী শতকরা ১৭ ভাগ কম হইয়াছিল। তৈলবীজ-রপ্তানীর এই ঘাটতি কিয়দংশে পূরণ হইয়াছিল উদ্ভিজ্জ-তৈলের (vegetable oils) অধিকতর রপ্তানীর দ্বারা, কিন্তু খইলের রপ্তানী পূর্ব্ব-বৎসরের ২'০৩ এবং তৎপূর্ব্ব বৎসরের ৩'০১ কোটি হইতে মাত্র ৮৪ লক্ষে অবনতি লাভ করিয়াছিল। যুদ্ধের অভিঘাতে আর একটি পণ্যের রপ্তানী অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছিল। কফির চালান শতকরা ৭০ অংশ হ্রাস পাইয়াছিল। ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দের ১৮৫,০০০ এবং ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দের ১৬৮,০০০ হন্দরের পরিবর্ত্তে, আলোচ্য বৎসর মাত্র ৫২,০০০ হন্দর কফি বৃটিশ-ভারত হইতে রপ্তানী হইয়াছিল।

কাঁচা চামড়ার রপ্তানীও পূর্ব্ব-বৎসরের ১২,০০০ টন ও তৎপূর্ব্ব বৎসরের ১৫,০০০ টনের তুলনায়, আলোচ্য বর্ষে মাত্র ৭,০০০ টনে দাঁড়াইয়াছিল। ছাগলের চামড়ার কাটতি কমে নাই, কারণ, ইহার ক্রেতা যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য। বিস্ময়ের বিষয় যে, যুক্তরাজ্য অধিকতর পরিমাণে চা লইলেও, বৃটিশ-ভারত হইতে প্রেরিত চা-এর পরিমাণ ১০ মিলিয়ন (নিযুত) পাউণ্ড কমিয়াছিল; তবে, মূল্য-বৃদ্ধি হেতু পূর্ব্ব-বৎসরের চেয়ে ১'১৪ কোটি টাকা অধিক আদায় হইয়াছিল। কাঁড়া চাউল পরিমাণে কম রপ্তানী হইলেও তাহার মূল্যে অধিকতর অর্থাগম হইয়াছিল। গমের রপ্তানী যেমন পরিমাণে, তেমনি মূল্যে কম হইয়াছিল। ইহার কারণ, ভারতের নিকটবর্ত্তী প্রাচ্যদেশ সমূহে গমের রপ্তানী পরিমাণে সাড়ে পাঁচ গুণ, এবং মূল্যে পাঁচ গুণ বেশী হইয়াছিল।

কাঁচা মালের রপ্তানীর তুলনায় শিল্পজাত দ্রব্যের চালান বেশ সন্তোষজনক হইয়াছিল। য়ুরোপের বাজার হইতে শিল্পজাত পণ্যের আমদানী বন্ধ হওয়াতে, প্রাচ্য দেশ-গুলিকে বাধ্য হইয়া ভারতের শরণ লইতে হইয়াছিল। ফলে, কোন কোন পরিণত পণ্যে রপ্তানী-বাণিজ্য প্রসার লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। শুক্তি বস্ত্রের রপ্তানী সাড়ে চারি কোটি টাকা অধিক হইয়া ১০'৬৪ কোটি টাকায় উন্নীত হইয়াছিল। এই অঙ্ক দশ বৎসরের অধিক কালের মধ্যেও সর্ব্বোচ্চ। এতদ্ব্যতীত জুতা, ইমারতি ও যন্ত্র-কারিগরী (Engineering) উপাদান, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, কাগজ ও পিজবোর্ড, রবার ও তামাক দ্বারা প্রস্তুত সামগ্রী অধিক পরিমাণে রপ্তানী হইয়াছিল। একমাত্র পাটোৎপন্ন দ্রব্যাদিই অধোগতি লাভ করিয়াছিল। তদ্ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানী বাড়িয়াছিল।

আমদানী-ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান বণিজ্-দ্রব্যসম্ভার উল্লেখযোগ্য :—

	১৯৩৭-৩৮ (কোটি টাকা)	১৯৩৮-৩৯ (কোটি টাকা)	১৯৩৯-৪০ (কোটি টাকা)	১৯৪০-৪১ (কোটি টাকা)
ভক্ষ্য ও প্রসাধনদ্রব্য	২'৬০	২'৪৮	২'৬৩	২'২৬
চিনি	০'১৯	০'৪৬	৩'৩২	০'৩৬
কাঁচা ও ত্যক্ত তুলা	১২'১৩	৮'৫১	৮'০৫	৯'৪৭
রাসায়নিক ও ভেষজ দ্রব্য এবং ঔষধাদি	৬'০৬	৫'৬২	৭'৫০	৮'০৭
ছুরি, কাঁচি, লোহা লক্কড় ও ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি (বৈদ্যুতিক ব্যতীত)	৬'৮৪	৫'৮১	৫'৫৭	৫'০৫
রঞ্জনদ্রব্য ও রঙ	৪'৯৯	৪'০৬	৪'৬৭	৬'৩৭
বৃহৎ যন্ত্রপাতি	১৭'১৮	১৯'৭২	১৫'৩৭	১১'৮৪
কাগজ, পিজবোর্ড ও লিপিসজ্জা	৪'১৬	৩'৯০	৪'১১	৪'৫১
কার্পাসসূতা ও সূতিবস্ত্র	১৫'৫৫	১৪'১৫	১৪'০৫	১১'৩৫
অন্যান্য সূতা ও বয়ন-শিল্পজাত দ্রব্যাদি	১১'৭৪	৭'০৮	৮'৭৫	৯'৮৫
মোট	১৭৩'৭৭	১৫২'৩৭	১৬৫'২৪	১৫৬'৭:

এই তালিকায় যে যে ক্ষেত্রে মূল্যের উন্নতি দেখা যাইতেছে, অধিকাংশ স্থলে হয় তাহা পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল, নতুবা বর্দ্ধিত

পরিমাণের সহিত অসামঞ্জস, অর্থাৎ সমঅনুপাত-বিহীন। বস্ত্র-বয়ন শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধি হেতু আফ্রিকা হইতে কার্পাস-তুলা আমদানী করিতে হইয়াছিল। রাসায়নিক বিভাগে ভারতবর্ষ প্রচুর পরিমাণে সোডিয়াম্ বাই-ক্রোমেট্, সোডিয়াম্ কার্ব্বনেট্, সোডিয়াম্ হাইড্রো-সালফেট্ এবং গন্ধক আনিয়াছিল; কিন্তু অন্যান্য দ্রব্যের আমদানী কমিয়া গিয়াছিল। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে, যুদ্ধারম্ভের প্রথম কয়েক মাসে আল্‌কাতরা হইতে প্রস্তুত রঞ্জন-দ্রব্যের সরবরাহ সম্বন্ধে ভারতবর্ষকে বিশেষ উদ্বেগগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। বয়ন-শিল্পের প্রয়োজনে ইহা একটি অত্যাবশ্যক উপাদান। যুদ্ধ-পূর্ব্বে জার্ম্মাণী ইহা প্রচুর পরিমাণে ভারতে রপ্তানী করিত। যাহা হউক, জাপান তখনও যুদ্ধ-ঘোষণা করে নাই; সুতরাং জাপান, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র আমাদের অভাব পূরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ফলে, পূর্ব্ব-বৎসরের ১২.৮ মিলিয়ন পাউণ্ড এবং তৎপূর্ব্ব বৎসরের ১২ মিলিয়ন পাউণ্ডের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে মোট আমদানী ঘটিয়াছিল ১৩.৩ মিলিয়ন পাউণ্ড। এই পরিমাণ বৃদ্ধির সমানুপাতে মূল্য-বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল অত্যধিক, কারণ, আলোচ্য বর্ষের আমদানীর একুন-মূল্য ৪.৫৫ কোটি টাকা, পূর্ব্ব-বৎসর অপেক্ষা শতকরা ৫১ অংশ, এবং তৎপূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা শতকরা ৭৩ অংশ অধিক হইয়াছিল। একমাত্র যুক্তরাজ্য ব্যতীত অধিকাংশ সরবরাহ-কারী দেশ প্রচলিত-মুদ্রা-মূল্য বিষয়ে প্রতিকূল ছিল। এই নিমিত্ত ঐ শেষোক্ত দেশ-সমূহ হইতে রঞ্জন দ্রব্যের আমদানী ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর হইতে লাইসেনস্ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল।

যুদ্ধের অভিঘাতে কাগজ ও পিজবোর্ডের অভাব আমরা বিশেষ ভাবে অনুভব করিতেছি। নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি দেশ হইতে ঐ দুইটি দ্রব্যের আমদানী বন্ধ হওয়াতে কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র প্রচুর পরিমাণে কাগজ ও পিজবোর্ড পাঠাইয়াছিল, তথাপি আলোচ্য বর্ষের মোট আমদানী পূর্ব্ব-বৎসরের ২.৭ মিলিয়ন হন্দরের তুলনায় মাত্র ২.১ মিলিয়ন হন্দর হইয়াছিল। কিন্তু এই পরিমাণের লঘুত্ব মূল্যের গুরুত্বে আত্মগোপন করিয়াছিল। মোট আমদানীর একুন-মূল্য পূর্ব্ব-বৎসর অপেক্ষা ৪৮ লক্ষ টাকা অধিক হইয়াছিল।

যে সকল প্রধান প্রধান দ্রব্যের আমদানী আলোচ্য বর্ষে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল, তন্মধ্যে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি, লৌহ ও পিত্তল-নির্ম্মিত দ্রব্যাদি, ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি, কার্পাস-সূত্র ও তন্নির্ম্মিত বস্ত্রাদি এবং চিনি উল্লেখযোগ্য। বৃহৎ যন্ত্রপাতির আমদানী ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দের ২০ কোটি এবং ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দের ১৫ কোটির তুলনায় মাত্র ১২ কোটিতে নিম্নগামী হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে, বৃহৎ যন্ত্র-পাতির মূল্য অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল; সুতরাং আমদানীর ন্যূনতা অঙ্কের পরিচয় অপেক্ষা গুরুতর হইয়াছিল। ফলে, ভারতের বহু শিল্প উপযুক্ত যন্ত্র ও কলের অভাবে প্রতিহত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে, কার্পাস-সূতা ও সূতিবস্ত্রের আমদানীর হ্রাস ভারতের বয়ন-শিল্পের পক্ষে কল্যাণকর হইয়াছিল। অন্যান্য বয়ন-শিল্পজাত পণ্যের মধ্যে পূর্ব্ব ও তৎপূর্ব্ব বৎসরে জাপান কৃত্রিম রেশমের সূতা বহুল পরিমাণে ভারতে প্রেরণ করিয়াছিল। ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দের ৬.৫ মিলিয়ন পাউণ্ড ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দে ২১.১ মিলিয়ন পাউণ্ডে ঊর্দ্ধগতি লাভ করে এবং ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে ঊর্দ্ধতর ৩২.৫ মিলিয়ন পাউণ্ডে দাঁড়ায়। এই পরিমাণাধিক্য মূল্যের উচ্চতার সহিত সংযুক্ত হইয়া কার্পাস ব্যতীত অন্যান্য বয়ন-শিল্পজাত দ্রব্যাদির আমদানী-মূল্য ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ব-বৎসর অপেক্ষা ১.১০ কোটি টাকা অধিকতর হইয়াছিল। আমদানী-পণ্যের এই সকল উচ্চাবচ পরিবর্ত্তনের ফলে ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দের তুলনায় ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে একুন-মূল্য ৮.৪১ কোটি টাকা কম হইয়াছিল!

আমরা উভয়বিধ বহির্ব্বাণিজ্যের প্রধান প্রধান পণ্যের পরিমাণ ও মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির আলোচনা যথাসম্ভব সংক্ষেপে শেষ করিয়াছি। পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে, যে চারি বৎসরের অঙ্ক-সমষ্টি আমরা বিশ্লেষণ করিয়াছি, সেই চারি বৎসর ভারতের শিল্পোন্নতি-প্রচেষ্টা-কল্পে দ্রুত পরিবর্ত্তনের কাল। বিভিন্ন শিল্পের উন্নতি ও প্রসারের ফলে স্বদেশজাত পরিণত পণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধির সহিত বিদেশী শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানী ন্যূন; এবং বিদেশজাত কাঁচা মালের অধিকতর আমদানীর সহিত স্বদেশজাত কাঁচা মালের রপ্তানী কম হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ, স্বদেশজাত শিল্পপণ্যের বৃদ্ধি, প্রত্যেক দেশকেই, বিদেশী শিল্পপণ্যের প্রয়োজন পরিহারে সমর্থ করে, এবং স্বদেশজাত কাঁচা মালের স্বদেশী শিল্পে অধিকতর ব্যবহার এবং ঐ সকল শিল্পের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও প্রসারের নিমিত্ত স্বদেশে প্রাপ্তব্য নহে—এমন বিদেশী কাঁচা মালের অধিকতর আমদানী অবশ্যম্ভাবী। আমরা নিম্নে একটি আমদানী-রপ্তানীর তুলনা-মূলক অঙ্ক-তালিকা দিতেছি, তাহাতে এই গতি-পরিবর্ত্তন সহজেই পরিলক্ষিত হইবে।

আমদানী

	১৯৩৭-৩৮ (কোটি টাকা)	১৯৩৮-৩৯ (কোটি টাকা)	১৯৩৯-৪০ (কোটি টাকা)	১৯৪০-৪১ (কোটি টাকা)
খাদ্য, পেয় ও তামাক	২১.৯	২৪.০	৩৫.৩	২৩.৮
কাঁচা মাল	৪০.৯	৩৩.২	৩৬.১	৪১.৯
শিল্পজাত পণ্য	১০৮.১	৯২.৭	৯১.৮	৮৯.৫
জীবন্ত প্রাণী	৩.৩	.৩	.২	.১
ডাকসংক্রান্ত দ্রব্যসামগ্রী	২.৬	২.১	১.৯	১.৫
মোট	১৭৩.৮	১৫২.৩	১৬৫.৩	১৫৬.৮

রপ্তানী

	১৯৩৭-৩৮ (কোটি টাকা)	১৯৩৮-৩৯ (কোটি টাকা)	১৯৩৯-৪০ (কোটি টাকা)	১৯৪০-৪১ (কোটি টাকা)
খাদ্য, পেয় ও তামাক	৪১.২	৩৯.১	৩৯.৬	৪১.৭
কাঁচা মাল	৮১.৪	৭৩.৩	৮৬.০	৬১.৯
শিল্পজাত পণ্য	৫৫.৩	৪৭.৬	৭৬.০	৮১.২
জীবন্ত প্রাণী	.১	.১	.১	.১
ডাকসংক্রান্ত দ্রব্যসামগ্রী	২.৯	২.৭	২.২	২.০
মোট	১৮০.৯	১৬২.৮	২০৩.৯	১৮৬.৯

পাঠক লক্ষ্য করিবেন, ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দের তুলনায়, ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানী ৯১.৮ কোটি হইতে ৮৯.৫ কোটি টাকায় অবনত হইয়াছিল; কিন্তু উহার রপ্তানী ৭৬.০ কোটি হইতে ৮১.২ কোটিতে উন্নত হইয়াছিল। ঐ একই কালে কাঁচা মালের আমদানী ৩৬.১ হইতে ৪১.৯ কোটিতে ঊর্দ্ধগামী হইয়াছিল; কিন্তু উহার রপ্তানী ৮৬.০ হইতে ৬১.৯ কোটিতে নিম্নগামী হইয়াছিল।

এই গতি-পরিবর্ত্তন ভারতের শিল্পোন্নয়ন ও শিল্প-প্রসারণ নীতির সাফল্যসূচক।

যুদ্ধের অভিঘাতে আলোচ্য বর্ষে, বিভিন্ন দেশ হিসাবে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের গতি ও পরিমাণ কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, এইবার আমরা তাহার আলোচনা করিব। নিম্নে প্রদত্ত অঙ্ক-তালিকা হইতে আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট হইবে।

	১৯৩৮-৩৯ টাকা (ক্রোর)		১৯৩৯-৪০ টাকা (ক্রোর)		১৯৪০-৪১ টাকা (ক্রোর)	
	রপ্তানী	আমদানী	রপ্তানী	আমদানী	রপ্তানী	আমদানী
যুক্তরাজ্য	৫৮	৪৬	৭৫	৪২	৬৫	৩৬
বর্ম্মা	১১	২৪	১৩	৩১	১৮	২৮
অন্যান্য বৃটিশ-অধিকার	২১	১৮	৩১	২০	৩৮	২৬
মোট সাম্রাজ্যিক	৯০	৮৮	১১৯	৯৩	১২১	৯০
য়ুরোপ	৩২	২৮	২৪	২০	৭	৫
মার্কিণ	১৪	১০	২৭	১৫	৩২	২৭
জাপান	১৫	১৫	১৪	১৯	১	২২
অন্যান্য পররাষ্ট্র	১৮	১১	২৯	১৮	৩০	১৩
মোট বৈদেশিক	৭৯	৬৪	৯৪	৭২	৭০	৬৭
সর্ব্ব-সমষ্টি	১৬৯	১৫২	২১৩	১৬৫	১৯১	১৫৭

আলোচ্য বর্ষে যদিও ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের অধিকাংশ যুক্তরাজ্যের আয়ত্তে ছিল, তথাপি আমদানী ও রপ্তানী—উভয়ই পরিমাণে অত্যন্ত ন্যূন হইয়াছিল। সুখের বিষয়, যুক্তরাজ্যের বাজারে কম-কাট্তি এবং তথা হইতে আমদানীর ঘাট্তি অন্যান্য সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশ-সমূহের দ্বারা পূরণ হইয়াছিল। যুদ্ধের অগ্রগতির সহিত ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য নানা কারণে গতিপথ পরিবর্ত্তিত করিতে বাধ্য হইয়াছে, এবং বিভিন্ন সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশের সহিত তাহার আদান-প্রদান বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দের শতকরা ৫২ ভাগ; ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দের শতকরা ৫৩ অংশ ও ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দের শতকরা ৫৬ ভাগের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে বৃটিশ-সাম্রাজ্য ভারতের সমস্ত রপ্তানীর শতকরা ৬১ ভাগ গ্রহণ করিয়াছিল। ফলে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের সহিত আদান-প্রদানে ভারতের বাণিজ্য-জমা-খরচের উদ্‌বৃত্ত জমা ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দের ৪ কোটি ও ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দের ২ কোটি হইতে, ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দে ২৬ কোটি এবং আলোচ্য বর্ষে ৩১ কোটিতে উর্দ্ধগামী হইয়াছিল।

পররাষ্ট্রগুলির প্রতি দৃষ্টি দান করিলে পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে, যদিও য়ুরোপের সহিত ভারতের বাণিজ্য কিঞ্চিৎ অধোগতি, লাভ করিয়াছিল, তথাপি মার্কিণের সহিত তাহার আদান-প্রদান বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বর্ত্তমানে রপ্তানী-বাণিজ্যের গুরুত্বের হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের স্থান যুক্তরাজ্যের অব্যবহিত পরে; এবং আমদানী-বাণিজ্যে তাহার স্থান যুক্তরাজ্য ও বর্ম্মার পরে। যুক্তরাষ্ট্র ধীরে ধীরে জাপানকে অতিক্রম করিয়াছে। জাপান গত কয়েক বৎসর ধীরে ধীরে ভারত হইতে তাহার আমদানী কমাইয়াছিল। ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে জাপান কর্ত্তৃক গৃহীত ভারতীয় পণ্যের মূল্য ১৯ কোটি টাকা ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে মাত্র ৯ কোটিতে নামিয়াছিল। ইহা প্রণিধানযোগ্য যে, আমদানী-শাসন সত্ত্বেও, যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান এই দুইটি দেশ হইতে আমাদের আমদানী, আমাদের প্রেরিত রপ্তানী অপেক্ষা অধিকতর হইয়াছিল। ফলে, ইহাদের সহিত আমাদের বাণিজ্য-জমা-খরচে উদ্‌বৃত্ত জমার অঙ্ক অধোগামী হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সহিত আদান-প্রদান আমাদের উদ্‌বৃত্ত জমার অঙ্ক ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে ৬ কোটি ও ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দের ৪ কোটি হইতে ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দে ১২ কোটিতে উন্নীত হইয়াছিল; কিন্তু ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে মাত্র ৫ কোটিতে নামিয়া আসিয়াছিল। জাপানের সহিত বাণিজ্যে আমাদের ঘাট্তি ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দের ৩ কোটি এবং ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দের ৫ কোটি আলোচ্য বর্ষে ১৩ কোটিতে দাঁড়াইয়াছিল, অর্থাৎ ঐ পরিমাণে আমরা জাপানের নিকট ঋণী হইয়াছিলাম। কেবল মাত্র ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দে ধনরাশি ও ঋণরাশি সমতা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে বণিজপণ্যে ভারতের সমগ্র বৈদেশিক বাণিজ্য-জমাখরচে উদ্‌বৃত্ত জমার অঙ্ক পূর্ব্ব-বৎসরের ৪৮'৮২ কোটি হইতে ৪২'১৩ কোটিতে অবনত, কিন্তু ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দের তুলনায় ২৪'৭৫ কোটি অধিক হইয়াছিল। যুদ্ধ-পরিস্থিতি হেতু সংরক্ষণ সঙ্কল্পে সরকারী আমদানী-রপ্তানীর অঙ্ক-প্রকাশ নিষিদ্ধ। এই অভাব আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী-বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতি নির্দ্ধারণের পক্ষে গুরুতর প্রতিবন্ধক। যুদ্ধ সাময়িক বিপ্লব, সুতরাং বে-সরকারী বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতিই ভারতের বাণিজ্য-বিচারের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। কিন্তু স্বর্ণ-রৌপ্যের আগম-নিগম অবশ্য বিবেচ্য।

১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে ভারত হইতে প্রেরিত স্বর্ণের মোট রপ্তানী মূল্য ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দের ১৩'০৬ কোটি এবং ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দের ৩৪'৬৮ কোটির তুলনায় ১১'৪৭ কোটিতে দাঁড়াইয়াছিল। ঐ বৎসর রৌপ্যের আমদানী ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দের ১'৭৫ কোটি এবং ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দের ৪'৭৪ কোটির তুলনায় ১'৬২ কোটিতে স্থান পাইয়াছিল। ফলে, ধন-রত্নের আদান-প্রদানের জমা-খরচে জমার উদ্‌বৃত্ত ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দের ১১'৮৯ কোটি এবং ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দের ৩০'২৮ কোটির তুলনায় ১০'১৭ কোটিতে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। এখন বণিজ্-পণ্যের উদ্‌বৃত্তের সহিত ধন-রত্নের উদ্‌বৃত্ত যোগ দিলে, বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতের উদ্‌বৃত্ত ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দের ২৯'২৭ কোটি এবং ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দের ৭৯'১০ কোটির তুলনায়, আলোচ্য বর্ষে ৫২'৩০ কোটিতে আমাদের অনুকূলে ছিল।

মোটের উপর, যুদ্ধের প্রথম দুটি বৎসর বহির্ব্বাণিজ্য-জমা-খরচে ভারতের অনুকূল ছিল। কিন্তু যাহা প্রতিকূল-গতি-পথ অবলম্বন করিয়াছে, তাহা বহু দিন প্রতিকূল থাকিবে। কারণ, ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতি একবার অভ্যস্ত-পথ পরিত্যাগ করিলে কদাচিৎ তাহাতে প্রত্যাবৃত্ত হয়। যুদ্ধের তৃতীয় বৎসরে প্রতিকূল প্রভাব প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সে আলোচনা ভবিষ্যতের।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

রসিকগঞ্জের হাট

রাজনগর, হরিরামপুর আর রসিকগঞ্জ—পাশাপাশি তিনটি গ্রাম। 'পি-ডবল্যু-ডি'র কাঁচা রাস্তা যেন একই দড়ি দিয়া তিনটিকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। তিনটি গ্রামের তিনটি স্বতন্ত্র হাট দেড় মাইল দু' মাইলের ব্যবধানে অবস্থিত। সেই কাঁচা পথ দিয়া গোরুর গাড়ী যাতায়াত করে। গ্রীষ্মকালে তাহারই চাকার চাপে উঠিয়া-পড়া মেটে-ধূলা উড়িয়া বাতাসে ঘূর্ণাবর্ত্ত রচনা করে, আর বর্ষায় আনে আবিল পঙ্কিলতা। কখনও বা বন্যার জলে সে-পথের চিহ্ন মুছিয়া যায়। তিনটি গ্রামেরই মধ্য দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে ছোট নদী কাঁকি। বৎসরের অধিকাংশ সময়েই তাহাতে জল থাকে না,—অথবা এক-হাঁটু জল। নদীর ওপারের বাসিন্দারা হাঁটিয়া এপারে হাট করিতে আসে। কিন্তু বন্যা যখন আসে, সে-সময়ে সল্‌তির দরকার হয়।

পাশাপাশি তিনটি হাট সপ্তাহের তিনটি বিভিন্ন দিনে আসর জমায়। কত বৎসরের পুরাতন কাঠামো এই তিনটি হাটের বুকে জড়ানো, সে ইতিহাস অজ্ঞাত। অতীত দিনের মানুষের পায়ের ধূলা নূতন নূতন মানুষের পদরেণুতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে,—কে জানে তাহার জন্ম-ইতিহাস!

নিয়ম-শৃঙ্খলে বাঁধা এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডেও প্রকৃতির স্বেচ্ছাচারিতা আছে—তাহাতেই যেন তাহার আনন্দ! হৃদয়ের মাঝে আছে বিদ্রোহের যে আগুন, সে আগুন সব সময়ে জ্বলে না—জ্বলে অকস্মাৎ। এমনি ওলট-পালট সত্যই এক দিন সংঘটিত হইল। তিন হাটের সাধারণ জীবন-যাত্রার গতিপথের দ্বার কে যেন সহসা সুকঠিন লৌহ-কপাটে অবরুদ্ধ করিয়া দিল!···নির্দ্দিষ্ট হাটের দিনে রসিকগঞ্জের হাটের পথে লোক-চলাচল সহসা যেন বন্ধ হইয়া গেল। কেবল কয়েকটি চেনা লোকের পদশব্দ যেন কোন্ সুদূর অতীত হইতে ফিরিয়া আসিতেছে। পথ কাঁদিয়া উঠিল।···উহারা এই হাটের পুরাতন পসারী!

পুরাতন বটগাছের ঝুরি নামিয়া অনেকখানি স্থান আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। তাহারই ছায়া-শীতল পথের ধারে নিমাই আশের মুদির দোকান। দোকানের সামনে সুপারি-গাছের গুঁড়ি চ্যালা করিয়া কয়েকখানি বেঞ্চি বাঁশের খুঁটির উপরে দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে সেখানে বসিয়া হাট উঠিয়া-যাওয়ার আলোচনা চলিতেছিল।

ভট্টাচার্য্য মশায় এ গ্রামের সব চেয়ে প্রবীণ ব্যক্তি। এ দুঃখ তাঁহারই বুকে বেশী বাজিয়াছে! কারণ, বিগত সত্তর বৎসরের মধ্যে এমন কাণ্ড আর কখনও ঘটে নাই। শেষ কালে কি-না দীনু মুকুয্যের এই কীর্ত্তি! অর্দ্ধদগ্ধ বিড়িটায় শেষ টান দিয়া তিনি বলিলেন,—আচ্ছা, আমরাও আছি।

—সে আর বল্‌তে?—সমজদারের মত এ কথা বলিলেন চক্রবর্ত্তী খুড়া। তার পর নাকের ডগায় ঝুলিয়া-পড়া দড়ি-বাঁধা চশমা-সহ গম্ভীর মুখখানা যথাসম্ভব উত্তোলন করিয়া তিনি আরম্ভ করিলেন,—"কই হে নিমাই! আমার হিসেবটা একবার ছাখো না!"

এই যে হয়ে গেল বলে'! বসুন না খুড়োমশাই—এত তাড়া কিসের?—ছোলার ডাল ওজন করিতে করিতে নিমাই বলিল, —ওরে ও ঘোটে, ছাখ্ তো খুড়োমশায়ের ও-মাসের হিসেবটা।

অতঃপর সে বাটখারায়-সাজানো মালের হিসাবে মনোনিবেশ করিয়া বলিল,—হ্যাঁ, তোর হলো গিয়ে ন' পয়সা, আর নুণ আড়াই পয়সা—তাহলে সাড়ে এগারো পয়সা। আর ডালের দাম হলো গিয়ে পাঁচ পয়সা। মোট চার আনা আধ্ পয়সা। পূরোপুরি চার আনাই দে তুই!

আব্‌দারের সুরে গোকুল দাসের ছোট ছেলে ঠং করিয়া একটা সিকি ফেলিয়া দিয়া ঠোঙায়-বোঝাই সওদা উঠাইতে উঠাইতে বলিল, —নিমাই মামা, একটা ল্যাবেঞ্চুস দাও না।

—তোর খালি ন্যাবেঞ্চুস! মৃদু ভর্ৎসনার সুরে এই কথা বলিয়া উপরের শিশি হইতে একটা ল্যাবেঞ্চুস বাহির করিয়া নিমাই তাহার হাতে দিল। দিয়া বলিল,—এই নে, যা। পালা।

আলোচনার ঝাঁজ একটু কমিয়া আসিয়াছিল।

ইতিমধ্যে জেলা-বোর্ডের প্রাইমারী স্কুলের হেড-মাষ্টার আসিয়া পড়াতে ভট্টাচার্য্য মশায় সুর খুঁজিয়া পাইলেন। বলিলেন,—দেখ্‌লেন তো মাষ্টার মশায়! এটা কি আর হরিরামপুরের ভালো হলো?

হরিরামপুরের ভালো হইয়াছে কি না, মাষ্টার মশায় তাহা চিন্তা করেন নাই। তথাপি তাঁহাকে সায় দিতে হইল,—হ্যাঁ, তা তো বটেই।

—তবেই বলুন! 'পবলিকের' কে কি বলেচে না বলেচে, আর তোরা এলি কি না গায়ে পড়ে হাঙ্গাম করতে? বলুন না ম্যাষ্টার মশায়, আপনিই বলুন না!—রাগে তিনি ট্যাঁক হইতে একটা পয়সা বাহির করিতে করিতে নিমাইয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, —দাও তো হে নিমাই, এক পয়সার বিড়ি।

ওদিকে 'ঘোটে' অর্থাৎ দোকানের মুহুরী ঘণ্টাকর্ণ খেরো-বাঁধা খাতা হইতে চোখ তুলিয়া বলিল,—চোদ্দ টাকা বারো আনা সাড়ে তিন পয়সা। চক্কোত্তি মশায়ের চোদ্দ টাকা—

—এ্যাঁ! বলো কি হে?—এতো হলো কি করে? চক্রবর্ত্তী খুড়া চক্ষু বিস্ফারিত করিলেন।

"আজ্ঞে তা হবে বৈ কি,—অধর্ম্ম করবো না! বিনয়ে অভিভূত হইয়া নিমাই মুদি দুই হাত কচলাইয়া বলিল,—ও-মাসে আপনার জামাই আসায় ঘী একটু বেশীই গেছে। কৈ রে, চক্কোত্তি-খুড়োকে একটু তামাক-টামাক দিলি? ঘণ্টাকর্ণকে আবার এই আদেশ হইল।—আজ বিশ বছর দোকান চালাচ্ছি, পাই-পয়সার ভুল-চুক হবার জো নেই!—হেঁ-হেঁ, এ কি আর হরিরামপুরের দোকান?

অদূরে সড়কের উপর দিয়া একখানা গোরুর গাড়ী আসিতেছিল। চাকার ক্যাঁ-কোঁ-শব্দের সঙ্গে গোরুর গলার ঘণ্টার ঠুং-ঠাং শব্দ ক্রমশঃ আগাইয়া আসিতেছিল। সন্ধ্যার আবছা-অন্ধকারেও যতটুকু দেখা গেল, মহিম মণ্ডলের গাড়ী। ছইয়ের ভিতরে সওয়ার ছিল কি না ঠাহর হইল না, তবে ছইয়ের বাহিরে ঝোড়ায় সাজানো লেবু, বেগুন ও কুমড়ার বোঝা।

—কার মাল ওগুলো, মণ্ডলের পো?—ভট্টাচার্য্য মশায় সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন।

সম্মুখে ঝুঁকিয়া দুই হাতে গোরুর লেজ ডলিয়া মণ্ডলের পো উত্তর দিল,—এজ্ঞে, ঐ ভুবন পাঁজার।

গাড়ীর ভিতর সওয়ারীকে বুঝিতে বিলম্ব হইল না। কথাবার্ত্তা কাণে আসিতেই সে একবার উঁকি মারিয়া প্রশ্নকর্ত্তাকে দেখিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিল না। ভট্টাচার্য্য মশায়ের পক্ষে ঐটুকুই যথেষ্ট!

—চিনি রে, চিনি! চোখে এখনো চাল্‌শে ধরেনি! লুকিয়ে যাবার কোন দরকার নেই। দেখেচেন তো ম্যাষ্টার, অ্যাঁ? বলিয়া ভট্টাচার্য্য মশায় হেডমাষ্টার মশায়কে সাক্ষী মানিলেন,—বলি ওরে ও ভুব্‌নে, দীনু মুকুয্যে কত টাকা দিয়েচে রে তোদের, অ্যাঁ? তা সত্যি কথা বল্‌লেই পারতিস্, অত ছল-চাতুরীর কি দরকার ছিল? দেখো চক্কোত্তি, দেখো, ব্যাটার বজ্জাতিটা একবার বুঝে দেখো। আমি ভাবি, সত্যিই বা! সকাল বেলা যখন গেলুম, তখন বল্লে কি না, আমার জ্বর হয়েচে। আর এ বেলা তো দেখচি বাপু দিব্যি ঘট্-গট্ করে বার হয়েছো। ও-সব ভিরকুটি কি আমি বুঝি না? তবে এও বলে রাখলুম চক্কোত্তি, ঐ দীনু মুকুয্যের দর্প যদি আমি চূর্ণ করতে না পারি তো আমার নাম খারিজ করে দিয়ো। ক্রোধে তিনি জোরে জোরে বিড়িতে টান দিতে লাগিলেন।

ভুবন পাজী সত্যই ছলনার আশ্রয় লইয়াছিল। বেলা দশটা পর্য্যন্ত যখন হাট জমিল না, তখন ভট্টাচার্য্য মশায় এ গাঁয়ের জানা-শোনা ব্যাপারীদের বাড়ীতে একবার খোঁজ-খবর লইবার চেষ্টা করেন। ভুবনের বাড়ীতে তিনি প্রবেশ করিতে না করিতেই সে বিছানায় শুইয়া কম্বল মুড়ি দিয়া হি-হি করিয়া কাঁপিতেছিল। ভট্টাচার্য্য মশায় ভাবিয়াছিলেন, সত্যই বেচারার জ্বর হইয়াছে! সে-ও যে দীনু মুকুয্যের ঘুষ খাইয়া এত বড় একটা প্রতারণার আশ্রয় লইবে, তাহা তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেন না—যদি মাল লইয়া এ বেলা তাহাকে হরিরামপুরের দিকে যাইতে না দেখিতেন!

কথায় বলে—যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধ্যা হয়! ভুবন লুকাইয়া মাল সরাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। পরশু হরিরাম-পুরের হাট। কিছু পূর্ব্বে পৌঁছাইতে না পারিলে আবার কি গণ্ডগোলে পড়িতে হইবে ভাবিয়া সন্ধ্যার ঘলিতে সে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। পথে ভট্টাচার্য্য মশায়ের সহিত এ ভাবে দেখা হইয়া যাইবে, এ আশঙ্কা তাহার মনে স্থান পায় নাই! কিন্তু ধরা যখন তাহাকে পড়িতে হইল, তখন যা হোক একটা কৈফিয়ৎ না দিলে চলে কি করিয়া?

—আজ্ঞে, লুকিয়ে আর যাবো কোথাকে? আপনাদের পায়ে ঠাঁই দিয়েচেন বলেই না! তবে মালপত্তরগুলো বৃথা নষ্ট হবে, তাই। মাইরি বলচি ঠাকুর মশায়, ও-বেলা আমার সত্যি কাঁপুনি দিয়ে জ্বর—

—থাক্ রে ভুবন, থাক্! সন্ধ্যেবেলায় বামুনের সাম্‌নে দিব্যি করে, আর মিথ্যে কথা কতকগুলো বলিস্‌নে। বাধা দিয়া ভট্টাচার্য্য মশায় আবার বলিলেন,—ও বোঝা গে যা তোর দীনু মুকুয্যেকে। শুনলে চক্কোত্তি, ব্যাটার কথাগুলো একবার!

চক্রবর্ত্তী খুড়া তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন,—তা হলে নিমাই, দামটা না হয় দু'দিন পরেই নিয়ো।

নিমাই হাসিয়া বলিল,—আজ্ঞে, তা আপনার দয়া! কিন্তু অদেষ্টে যাই থাক, অধর্ম্ম করবো না! এই দেখুন না, ঐ রকম কত আধ্‌লাই হামেসা আমাকে ছেড়ে দিতে হয়।

কিছুকাল পূর্ব্বে সে গোকুলদাসের পুত্রের নিকট চার আনা লইয়া আধ পয়সা তাহাকে রেহাই দিয়াছিল, অধিকন্তু একটা ল্যাবেঞ্চুস ফাউ দিতে কার্পণ্য করে নাই, এত বড় উদারতার কথা না জানাইয়া সে কি করিয়া স্থির থাকে?

রসিকগঞ্জের প্রাচীন হাটটি এ-সপ্তাহে সত্যই জমে নাই এবং ইহার মধ্যে যে হরিরামপুরের হাট ছিল—সে কথাটা আগাগোড়া মিথ্যা না হইতেও পারে! তবে ব্যাপার যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, অর্থাৎ ভট্টাচার্য্য মশায় যে সকল গুজব রটাইয়া বেড়াইতেছেন, তাহার সবই হয়তো সত্য নয়! প্রথমতঃ, হরিরামপুরের দীনু মুকুয্যের কথা ধরা যাক্। রসিকগঞ্জের হাট উঠিয়া যাইবার মূলে তাঁহার কোন হাত আছে কি না, তাহা ঠিক বলা যায় না, তবে তিনি যে ঘুষ দিয়া ব্যাপারীদের বশীভূত করিতেছেন—এ অভিযোগ অমূলক। দীনু মুকুয্যে আর যাহাই করুন, ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইবার অভ্যাস তাঁহার নাই! বিশেষতঃ, কঞ্জুস বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে।

তবে ইতিমধ্যে রসিকগঞ্জ এবং হরিরামপুরের মধ্যে না কি কতকগুলি সন্দেহজনক ব্যাপার পর-পর ঘটিয়া গিয়াছে। এবং তাহার প্রধান উদ্যোক্তাই না কি স্বয়ং দীনু মুকুয্যে! তাই সেই আক্রোশ ভট্টাচার্য্য মশায় আর চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। এমন কি, চার-পাঁচ মাস পূর্ব্বে একটি পুষ্করিণী-খনন ব্যাপারে দীনু মুকুয্যে যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন—অর্থাৎ কিছুতেই এমন সৎকার্য্যটি সম্পন্ন হইতে দেন নাই—আজ হাট বসিতে না দেওয়ায় যে তিনিই এমন গোপন ইঙ্গিত করিয়াছেন—ইহাই ভট্টাচার্য্য মশায়ের দৃঢ়বিশ্বাস!

সে যাহা হউক, যাহাকে লইয়া এই দুই গ্রামের মধ্যে এত বড় একটা আন্দোলন চলিয়াছে, সেই রতন হাজরা এ পর্য্যন্ত এক বারও আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল না! এত বড় বিরাট্ কাণ্ড বাধাইয়া দিয়া 'যঃ পলায়তি স জীবতি' এই মহাজন-বাক্যের অনুসরণে সেই যে সে ফেরার হইয়াছে, তাহার পর আর তাহার সন্ধান নাই!

ব্যাপারটা ঘটিয়াছিল—রতন আর হরিরামপুরের দুলালীকে লইয়া! দু'জনের মধ্যে অবৈধ প্রণয় ছিল কি না, তাহা ঈশ্বর জানেন, আর জানে তাহারা! তবে গত বারের হাটে রতন যখন তরী-তরকারী লইয়া দোকান পাতিয়াছিল, তখন দুলালী কি একটা জিনিষের দর করিবার অছিলায় তাহার সাম্‌নে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া হাসিয়া হাসিয়া কথা বলিতে থাকে। রতন না কি তাহাতে উৎসাহ দিয়াছিল অর্থাৎ দুলালীর আঁচলটা ধরিয়া একটু টানিয়া দিয়াছিল। প্রকাশ্য হাটের মাঝে এমন একটা কুৎসিত ব্যাপার ভট্টাচার্য্য মশায়ের কথিত 'পবলিক' কি করিয়া সহ্য করিবে? বিশেষ জানিয়া-শুনিয়া তো আর রসিকগঞ্জের মুখে কালি লেপিয়া দেওয়া যায় না! সুতরাং তাহাদিগকে ধরা পড়িতে হইল। আশ-পাশের গ্রামের লোকের সহিত হরিরামপুরের লোকেরাও হাট করিতে আসিয়াছিল। রতন আর দুলালী ধরা পড়িল বটে, তবে আসল দোষ কাহার—ছেলেটির, না মেয়েটির, তাহার মীমাংসা হইল না।

রসিকগঞ্জের লোকরা বলিল,—দোষ দুলালীরই! কারণ, সে-ই প্রথমে হাসিয়া কথা বলিয়াছে।

কিন্তু হরিরামপুরের লোকগুলি এ কথা মানিতে চাহিল না, বলিল—রতনের দুষ্টবুদ্ধি ছিল, নহিলে সে দুলালীর আঁচল ধরিয়া টানিবে কেন ?

মৌখিক তর্ক অবশেষে হাতাহাতিতে গড়াইল। এবং তাহা শুধু 'পবলিকের' ঘাড়ে পড়িয়াই নিবৃত্ত হইল না—ব্যাপারীদের মধ্যেও তাহার বীজ ছড়াইয়া পড়িল। স্বেচ্ছায় কেহই স্ব স্ব গ্রামের দোষ স্বীকার করিতে রাজী নয়। অবশেষে বিরোধ থামিলে দেখা গেল, আলু-পটল, কুমড়া-বেগুন প্রভৃতি আনাজ-পত্রাদি গড়াগড়ি যাইতেছে। কৈ মাছের দঙ্গল চারি দিকে চলিয়া বেড়াইতেছে! কাহারও দোকানের ঝাঁপের লাঠি নাই—দোকানপত্র বন্ধ হইয়া গিয়াছে! কাহারও মাথা ফাটিয়াছে, কেহ বেহুঁস হইয়া পড়িয়া আছে, এবং সবচেয়ে আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে, রতন বা দুলালী কেহই সেখানে উপস্থিত নাই! হাতাহাতির সুযোগে কখন যে তাহারা পলাইয়াছে, তাহা কেহ জানিতে পারে নাই! শুধু নিষ্ফল আক্রোশে কতকগুলি লোক তখনও আস্ফালন করিয়া বেড়াইতেছে। কারণ, তখন তাহাদের আর করিবার কিছু ছিল না। গ্রামের চৌকিদারের মধ্যস্থতায় ইতিমধ্যেই রসভঙ্গ হইয়াছিল, চরম-সমাপ্তি আর ঘটিতে পারিল না!

ভট্টাচার্য্য মশায় বলিলেন,—এ ঐ দীনু মুকুয্যেরই কারসাজি! অর্থাৎ তিনিই না কি এমন নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন!

রসিকগঞ্জের লোকরা দাবী করিল, আমরা ইহার বিহিত চাই।

কথাটা দীনু মুকুয্যে শুনিলেন, শুনিয়া চটিয়া উঠিলেন। ভট্টাচার্য্যকে তিনি সহ্য করিতে পারেন না। এ ব্যাপারের বিন্দু-বিসর্গও তিনি জানিতেন না; তথাপি রসিকগঞ্জের লোকগুলা তাঁহার নামে এমন দুর্নাম রটায়! তিনিও তাহাদের সমুচিত শিক্ষা দিয়া তবে জলগ্রহণ করিবেন!

তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন,—আমিই যে এমন করেচি, তার প্রমাণ ?

এ কথা শুনিয়া রসিকগঞ্জের চক্ষুস্থির! তাই তো, তিনিই যে এমন করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ কোথায় ?

কিন্তু ভট্টাচার্য্য মশায় বে-হিসাবী লোক নহেন। এরূপ কার্য্যে তিনি মাথার চুল পাকাইয়া ফেলিলেন! আর ঐ দীনু মুকুয্যে সেদিন-কার কাঁচা ছেলে!

প্রমাণ ? প্রমাণ রতনই দিবে। অর্থাৎ সে শপথ করিয়া বলিবে, দীনু মুকুয্যের পরামর্শেই দুলালী তাহাকে ঐ ভাবে অপদস্থ করিয়াছে,-নহিলে তাহার কি মাথা-ব্যথা হইয়াছিল, ইত্যাদি।

অতঃপর উভয় গ্রামই নিস্তব্ধ। বেশ, তাই হোক! প্রকাশ্য সভায় তাহারা শুনিতে চায় যে, সকল দোষ ঐ দীনু মুকুয্যের!

হুঁকা টানিতে টানিতে ভট্টাচার্য্য মশায় কথাটার আগাগোড়া মনে মনে আলোচনা করিতেছিলেন। ভাবিলেন, তাই তো, বলিয়া ভুল করিলাম না কি ? না, ভুলই বা কিসের ? দীনু মুকুয্যেকে শায়েস্তা করিতেই হইবে। কিন্তু রতন যদি জেরার মুখে সব বে ফাঁস করিয়া বসে ? যদি সে জবাব দেয়,—না, দুলালী তাহাকে কিছুই বলে নাই ? তখন ?...নাঃ! তাঁহাকে উঠিতে হইল। যে-উপায়ে হোক, রতনকে দিয়া স্বীকার করাইতেই হইবে, দুলালীই প্রথম তাহাকে প্রণয় নিবেদন করিয়াছিল! কিন্তু তাহাকে পাকড়াইবার উপায় ? ক'দিন হইতে সে বাড়ী নাই যে!

ভট্টাচার্য্য মশায়ের সৌভাগ্যক্রমে রতন সেদিন বাড়ীতেই ছিল। এ ক'দিন সে কোথায় ছিল, সে-ই জানে।

—রতন, বাড়ী আছিস্ ? বলিতে বলিতে তিনি প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন।

—আসুন, আসুন! কি সৌভাগ্য আমার, গরীবের বাড়ী আপনার পায়ের ধূলো পড়লো! রতন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে নিবেদন করিল।

—কিন্তু এদিকে আমার দুর্ভাগ্যের যে অন্ত নেই! তিনি বসিয়া আলাপের সূচনা করিলেন।—তার পর ব্যাপার কি, বল্ তো ? দুলালীই তা হলে শেষটা তোকে—

কথাটা আর শেষ করিবার প্রয়োজন হইল না। রতন তখনই বুঝিয়া ফেলিয়াছে।

—আজ্ঞে, তাই তো! সেই তো আমাকে—সত্যি দা-ঠাকুর, আমি কিছু জানতুম না। রতনের কণ্ঠে রোদনের সুর!

—থাক্ থাক্, আর কাঁদতে হবে না। আমিই সব ব্যবস্থা করবো। এখন ঠিক-ঠিক সব তুই বলতে পারবি তো ?

—আজ্ঞে, আপনাদের আশীর্ব্বাদে মিথ্যে কখনও আমি বলিনি দা-ঠাকুর। তাহার দু'চক্ষু সলজ্জ মিনতিতে ভরিয়া উঠিল।

—তা কি আমি জানিনে রে ? বেশ! বেশ! আমিও দেখে নেবো, দীনু মুকুয্যেটা কত বড় ধড়িবাজ! বলিয়াই তিনি উঠিলেন।—তা হলে ঐ কথাই রইলো। তিনি আশ্বস্ত চিত্তে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

রাত্রে রতনের চোখে ঘুম নাই। সে দো-টানায় পড়িয়াছে। এক দিকে দুলালী, অপর দিকে গ্রামের মর্য্যাদা! এবং তাহার চেয়েও বড় তাহার প্রাণ ও সম্মান। যদি সে বলে যে, সে কিছু জানে না, তবে দুলালীর প্রতি অবিচার করা হয়। কারণ, দুলালীকে সে-ই এ পথে টানিয়া আনিয়াছে। যাহাকে সে স্বর্গের স্বপ্ন দেখাইয়াছে, তাহাকে কেমন করিয়া বিনা-অপরাধে ধূলায় ফেলিয়া পলাইবে ? অপর দিকে মিথ্যা তাহার না বলিয়া উপায় নাই! কারণ, মাথার উপরে গ্রামের গুরু-দায়িত্ব! তার উপর গ্রামে মুখ দেখানো ভার!

সহসা ঘরের কপাট নড়িয়া উঠিল ঝন্-ঝন্ শব্দে। ধড়মড় করিয়া রতন উঠিয়া বসিল। তাহার বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ি পিটিতেছে!

—ও রতনদা, রতনদা! ওঠো ওঠো, দরজা খোলো।

এ যে দুলালীর গলা! এত রাত্রে দুলালী ?

রতন দরজা খুলিয়া দিতেই দুলালী ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া রুদ্ধ নিশ্বাসে বলিয়া উঠিল—এখানে আর নয়!

—কেন রে, কি হলো ?

—ওরা আমায় বাঁচ্‌তে দেবে না রতনদা'! দুলালী কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল,—দীনু মুকুয্যে আজ সারাদিন আমায় জ্বালিয়ে মেরেছে! বলে, গাঁয়ের সবার সামনে তোমার নামে মিথ্যে কথা বলতে হবে। সে আমি পারবো না, রতনদা'! মরে গেলেও না।—রতনের দুই পা দুলালী নিজের বুকের উপর সজোরে চাপিয়া ধরিল।

* * * *

অন্ধকার রাত্রি ফিকে জ্যোৎস্নায় মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। বাঁকি নদীর পাশে পাশে বাঁধের উপর দিয়া দু'জনে চলিয়াছে। রসিকগঞ্জ, হরিরামপুর, রাজনগর সব পিছনে পড়িয়া। দুলালীর মুখে আজ আনন্দের হাসি। রতন তখনও ভাবিতেছিল, কাজটা তাহার ভালো হইল কি না!

—মা-গো! ভয়ে দুলালী রতনকে জড়াইয়া ধরিল।

—কি রে, কি হলো? রতন বিস্ময়ের সুরে জিজ্ঞাসা করিল।

—দ্যাখো না, আমার গায়ের উপর কি পড়লো।

—ও কিছু না, একটা গঙ্গাফড়িং! ফড়িংটাকে টুসকি মারিয়া সরাইয়া দুলালীকে আরও কাছে টানিয়া রতন বলিল,—এ হাটে তোরই লাভ হলো রে!

ফিকে জ্যোৎস্নার মৃদু হাসি আজ দুলালীর সারা মনে!

পরদিন বিচার-সভায় আসামীর জন্য আকুল প্রতীক্ষায় উভয় গ্রাম যখন উন্মুখ হইয়া বসিয়া আছে, তখন কল্যকার রাত্রির এই দুঃসংবাদ একটা ভারি দীর্ঘশ্বাসের হাওয়ায় ভাসিয়া আসিল। রাখাল আসিয়া সংবাদ দিল,—না, দুলালী আর রতন বাড়ী নেই! কোনো তল্লাটে তাদের পাওয়া গেল না!

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া দীনু মুকুয্যে অকারণে হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ভট্টাচায্য মশায়ও হাসিলেন! কিন্তু এ যেন কেমন হাসি!

চক্রবর্ত্তী খুড়া নিমাইয়ের দোকানের পাওনা মিটাইয়া দিতেছিলেন। তাদের দু'জনের মধ্যেও মৃদু হাসির বিনিময় হইল। অথচ কেহ বুঝিল না ইহার অর্থ!

শ্রীঅনিল দাস।

লক্ষ্মণসেনের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন

তৃতীয় প্রস্তাব

মাধাইনগর ও রাজাবাড়ী (ভাওয়াল) শাসনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব

১। মাধাইনগর শাসনে প্রাপ্তব্য তথ্যাবলি

প্রথম প্রস্তাবে উল্লিখিত হইয়াছে যে, পাবনা জেলায় চলনবিলের পূর্ব্বপারে মাধাইনগর গ্রামে লক্ষ্মণসেনের একখানি তাম্রশাসন প্রায় অর্দ্ধশতাব্দপূর্ব্বে পাওয়া গিয়াছিল। এই শাসনখানির পদ্যাংশেও তেরটি শ্লোক আছে এবং আলোচ্য রাজাবাড়ী (ভাওয়াল) তাম্রশাসনেও অবিকল সেই তেরটি শ্লোকই আছে। কিন্তু মাধাইনগর শাসনখানি ভাওয়াল-রাজাবাড়ী শাসনের মত ক্ষয়িত। তাই উহার শেষের দিকের কয়েকটি শ্লোক পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কর্ত্তাগণ অধিকাংশ স্থলেই পড়িতে পারেন নাই। মাধাইনগর শাসনের গদ্যাংশেরও অনেকগুলি ঐতিহাসিক তথ্য-সম্বলিত ছত্র পড়া যায় নাই। ফলে যতটুকু পড়া গিয়াছে, তাহা হইতেও অদ্যাবধি ঐতিহাসিক তথ্যাবলি সঙ্কলনের উপযুক্তরূপ চেষ্টা হয় নাই। নিম্নে আমরা যথাসাধ্য সেই চেষ্টা করিয়া দেখাইব, মাধাইনগর শাসন হইতে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্যাবলির উদ্ধার সম্ভবপর।

তাম্রশাসনখানির প্রাপ্তির অল্পকাল পরে সিরাজগঞ্জের এক কবিরাজ মহাশয় উহার এক ভ্রমপূর্ণ পাঠ প্রকাশিত করেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ৺অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি-আই-ই মহাশয়ের সম্পাদনে ঐতিহাসিক চিত্র নামে একখানি পত্রিকা প্রচারিত হয়। এই পত্রিকার প্রথম বৎসরে পাবনার উকীল প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী মহাশয় এই শাসনখানির একটি বিশুদ্ধতর পাঠ প্রকাশিত করেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, ফিরিয়া ইহার সম্পাদন করেন, কিন্তু পাঠের বিশেষ উন্নতি-সাধন করিতে পারেন না। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সংস্করণে বরং এক গুরুতর গলদ ঢুকিয়া পড়ে। চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছিলেন, শাসনখানির প্রথম পৃষ্ঠে ২৯ ছত্র এবং ২য় পৃষ্ঠে ৩০ ছত্র লেখা আছে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভুল করিয়া লিখিলেন, উভয় পৃষ্ঠেই ২৯ ছত্র লেখা আছে। ৺ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় তদীয় Inscriptions of Bengal, Vol. III নামক গ্রন্থে যখন ফিরিয়া এই শাসনখানির সম্পাদন করেন, তখন তিনি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভুলেরই অনুসরণ করেন। এই ভুলের ফল বাঙ্গালার ইতিহাসের পক্ষে নিতান্ত শোচনীয় হইয়াছে।

ভাওয়াল শাসন সম্পাদনকালে পাঠ মিলাইবার জন্য মাধাইনগর শাসন আমার দেখিবার প্রয়োজন হয়। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের প্রত্নবিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত টি, এম্, রামচন্দ্রম্ আমার অনুরোধে মাধাইনগর শাসনের (বর্ত্তমানে বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত) দুই পিঠেরই চমৎকার ছাপ আমার ব্যবহারের জন্য পাঠাইয়া দেন। এই ছাপের সাহায্যে আমি অল্পায়াসেই দ্বিতীয় পৃষ্ঠে ত্রিংশৎ ছত্রের অস্তিত্ব নির্ণয় করিতে সমর্থ হই। তাম্রশাসনগুলির শেষ ছত্রেই তারিখ থাকে। মাধাইনগর শাসনের শেষ তিন ছত্র নিতান্ত অস্পষ্ট। কিন্তু ভাওয়াল-রাজাবাড়ী শাসনের সহিত তুলনা করিয়া ত্রিংশৎ ছত্রের শেষে যে, ভাওয়াল-রাজাবাড়ী শাসনের অনুরূপ স্থানেই, মাধাইনগর শাসনেও তারিখটি খোদিত আছে, তাহা নির্ণয় করিতে সমর্থ হই। ভাওয়াল-রাজাবাড়ী শাসনে তারিখ আছে—সং ২৭ কা দিনে ৬। মাধাইনগর শাসনের তারিখ পড়িয়াছি,—সং ২৫ ভাদ্র দি—। ইহার পরে "নে" অক্ষরটি এবং মাসের তারিখের অঙ্কটি বা অঙ্ক দুইটি ভাঙ্গিয়া লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মাধাইনগর শাসনটি যে তারিখ-হীন নহে এবং উক্ত তারিখ লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের ২৫

সম্বৎসরের ভাদ্র মাসের কোন দিন, এই আবিষ্কারের গুরুত্ব সহজই উপলব্ধ হইবে।

Indian Historical Quarterly পত্রিকার তৃতীয় খণ্ডে ১৮৬ এবং পরবর্ত্তী পৃষ্ঠা-সমূহে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় একটি ক্ষুদ্র, কিন্তু মূলবান্ প্রবন্ধে লক্ষ্মণসেনের সিংহাসন প্রাপ্তির বৎসর নির্ভুলরূপে নিরূপণ করেন। বাঙ্গালার প্রায় সমস্ত ঐতিহাসিকই এখন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নির্দ্ধারণ স্বীকার করিয়াছেন। ভারতীয় প্রত্নবিভাগের নিয়ামক রাও বাহাদুর শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দীক্ষিত মহাশয় পৃথক্ ভাবে জ্যোতিষিক গণনা দ্বারা চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নির্দ্ধারণ অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। (Epigraphia Indica, XXI, PP. 215—16, Editorial Note এবং Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1934-35, P. 69 দ্রষ্টব্য)। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নির্দ্ধারণ এই যে, লক্ষ্মণসেন ১১৭৮ খৃষ্টাব্দে অভিষিক্ত হন। এই হিসাবে তাঁহার রাজত্বে পঞ্চবিংশ সম্বৎসর ১২০৩ খৃষ্টাব্দ। এই স্থানে মনে রাখা আবশ্যক, বক্তিয়ার-পুত্র ইক্তিয়ারুদ্দিন মহম্মদের বঙ্গদেশ আক্রমণ ও নদীয়া লুণ্ঠনের তারিখ ১২০২ খৃষ্টাব্দ বলিয়া ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে আমার একটি প্রবন্ধে সপ্রমাণ হইয়াছিল। (মদীয় Determination of the epcch cf the Parganati Era নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। Indian Antiquary, 1923)। লক্ষ্মণসেনের ৬ষ্ঠ রাজ্য-সম্বৎ পর্য্যন্ত প্রদত্ত ৫খানা তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। উহাদের দ্বারা প্রদত্ত ভূমির ফিরিস্তি নীচে দিলাম।

১। নদীয়া জেলার আনুলিয়া গ্রামে প্রাপ্ত শাসন। তৃতীয় সম্বৎসর। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্গত ব্যাঘ্রতটীমণ্ডলে প্রদত্ত ভূমি অবস্থিত ছিল। ব্যাঘ্রতটীর অবস্থান এখনও ঠিকমত নির্ণীত হয় নাই। কাহারও কাহারও মতে উহা বাগড়ীর অর্থাৎ ভাগীরথী-মধুমতীর অভ্যন্তরস্থ প্রদেশের সংস্কৃত নাম।

২। ২৪ পরগণার গোবিন্দপুর গ্রামে প্রাপ্ত শাসন। এই শাসন দ্বারা বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তর্গত পশ্চিমখাটিকায় অর্থাৎ ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে বেতড় চতুরকের অন্তর্গত ভূমি প্রদত্ত। বেতড় বর্ত্তমান হাওড়া সহরের অন্তর্গত, শিবপুরের লাগ উত্তর। দ্বিতীয় সম্বৎসর।

৩। দিনাজপুর জেলায় তপন-দীঘিতে প্রাপ্ত শাসন। প্রদত্ত ভূমি পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্গত বরেন্দ্রীতে অবস্থিত ছিল। তৃতীয় সম্বৎসর।

৪। ২৪ পরগণার ডায়মণ্ডহারবার মহকুমায় বকুলতলা গ্রামে প্রাপ্ত। প্রাপ্তিস্থানেই বর্ত্তমান খাড়ী পরগণায় প্রদত্ত ভূমি অবস্থিত ছিল। এই শাসনখানিও সম্ভবতঃ দ্বিতীয় সম্বৎসরের।

৫। মুর্শিদাবাদ জেলায় শক্তিপুর গ্রামে প্রাপ্ত শাসন। শাসনখানি ৬ষ্ঠ সম্বৎসরের। বীরভূম জেলায় মোর বা ময়ুরাক্ষী নদীর পারে প্রদত্ত ভূমি অবস্থিত ছিল।

এই শাসন পাঁচখানিই শ্রীবিক্রমপুর রাজধানী হইতে প্রদত্ত। প্রদত্ত গ্রামগুলিও ভাগীরথীর দুই ধারে মধ্য ও পশ্চিমবঙ্গে এবং গঙ্গার উত্তরে উত্তর-বঙ্গে অবস্থিত।

মাধাইনগর শাসন এবং ভাওয়াল-রাজাবাড়ী শাসন লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের শেষভাগে যথাক্রমে ২৫ ও ২৭ সম্বৎসরে নূতন রাজধানী ধার্য্যগ্রাম হইতে প্রদত্ত। প্রথমখানি দ্বারা পূর্ব্ব-বরেন্দ্রীতে পাবনা জেলায় চলনবিলের পারে ভূমি প্রদত্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়খানি দ্বারা ঢাকা জেলার ভাওয়াল পরগণায় বানার নদের তীরে ভূমি প্রদত্ত হইয়াছে। ১২০২ খৃষ্টাব্দে ইক্তিয়ারুদ্দীনের আক্রমণের ফলে যে লক্ষ্মণসেন পশ্চিম-বঙ্গের উত্তরাংশ এবং উত্তর-বঙ্গের পশ্চিমাংশ হারাইয়াছিলেন, তবকত্-ই-নাদিরী পাঠে তাহা আমরা জানি। রাজত্বের প্রথম ভাগে মধ্য-পশ্চিম-উত্তরবঙ্গে ভূমি দান এবং শেষ ভাগে রাজ্যের পূর্ব্বাংশে ভূমি দানে তবকত্-ই-নাদিরীতে সমর্থিত হয়। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল সমর্থন পাওয়া গিয়াছে তাম্রশাসনের অভ্যন্তরে।

মাধাইনগর শাসনের ভূমিদানের উদ্দেশ্য এ পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই, বুঝিতে পারেনও নাই। পঞ্চবিংশ সম্বৎসরে অর্থাৎ ১২০৩ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত শাসনখানিতে লিখিত আছে যে, শ্রীগোবিন্দ দেব-শর্ম্মা লক্ষ্মণসেনের শান্ত্যাগারাধিকৃত ছিলেন, অর্থাৎ শান্তিস্বস্ত্যয়নাদি করিতেন। তিনি লক্ষ্মণসেনের জন্য কিছু দৈব-ক্রিয়া-কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহারই দক্ষিণাস্বরূপ ভূমি প্রদত্ত হইয়াছিল। ৺ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের প্রদত্ত পাঠ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

৪৯শৎ ছত্র।···সপ্তবিংশশ্রাবণদিবসে·········পূর্ব্বকমূল্যাভিষেকঃ ৫০শৎ ছত্র।···ঐন্দ্রীমহাশান্তি···ত্যাতি···নিকাদি···৫১শ ছত্র।··· সমকালং···উৎসৃজ্যাচন্দ্রার্কক্ষিতি।

শ্রীযুক্ত রামচন্দ্রম্ আমাকে মাধাইনগর শাসনের যে ছাপ পাঠাইয়াছিলেন, তাহার সাহায্যে মজুমদার মহাশয়-প্রদত্ত পাঠ নিম্নরূপে সংশোধিত করিতে সমর্থ হইলাম :—

সপ্তবিংশ শ্রাবণ দিবসে অকৃত পূবকমূলাভিষেকঃ

বুঝা যাইতেছে যে, মূলাভিষেকের কোন দোষ সংশোধনের জন্য এবং ঐন্দ্রী মহাশান্তি নামক বৃহৎ শান্তিকর্ম্মের অনুষ্ঠানের দক্ষিণাস্বরূপ এই তাম্রশাসনখানি দ্বারা ভূমি দান করা হইয়াছিল। ঐন্দ্রী মহাশান্তি কি, মাধাইনগর শাসনের পূর্ব্ববর্ত্তী সম্পাদক ও আলোচক-গণ কেহই বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই। মজুমদার মহাশয় দুই কথায় সারিয়াছেন—"ঐন্দ্রী মহাশান্তি কি ব্যাপার, বুঝা যায় না।" ঐন্দ্রী মহাশান্তি কি, তাহা বুঝিতে না পারায় পূর্ব্ববর্ত্তিগণ তাম্রশাসন প্রদানের মূল উদ্দেশ্যই বুঝিতে পারেন নাই, তাম্রশাসনখানির ঐতিহাসিক গুরুত্বও ঐ সঙ্গেই অবোধ্য রহিয়া গিয়াছে।

সাধারণ বুদ্ধিতেই বুঝা যায়, শান্তিকর্ম্মের উদ্দেশ্যই আগত বিপদ হইতে মুক্তিলাভ চেষ্টা এবং অনাগত বিপদ নিবারণ। কাজেই ভাবিলাম,—লক্ষ্মণসেনের পিতা বল্লালসেন-কৃত এবং লক্ষ্মণসেন কর্ত্তৃক সম্পূর্ণীকৃত ও প্রচারিত অদ্ভুতসাগর নামক গ্রন্থে ঐন্দ্রী মহাশান্তির বিবরণ হয় ত মিলিলেও মিলিতে পারে। অদ্ভুতসাগরে বহুবিধ অদ্ভুত দৈব-বিপত্তি এবং তাহাদের প্রতিকারের উপায় লিখিত আছে। কাশী হইতে পণ্ডিত মুরলীধর ঝা জ্যোতিষাচার্য্যের সম্পাদনে প্রভাকর কোম্পানী নামক পুস্তক-প্রকাশকগণ ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তকখানির একটি উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন। বুলান্দসহর গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র বরাট মহাশয়ের কৃপায় এই পুস্তকের এক খণ্ড উপহার প্রাপ্ত হই। বরাট মহাশয় দেবনাগর অক্ষরে লিখিত অদ্ভুতসাগরের একখানি চমৎকার পুথিও আমাকে সংগ্রহ করিয়া দেন। নানারূপেই অদ্ভুতসাগর একখানি অসাধারণ গ্রন্থ। ভূমিকায় লিখিত আছে, ১০৮১ শকে (১১৬৭ খৃঃ)

গ্রন্থখানি আরব্ধ হয় এবং গ্রন্থ অসমাপ্ত রাখিয়া বল্লালসেন স্বর্গত হন। পুত্র লক্ষ্মণসেন গ্রন্থখানি সমাপ্ত করিয়া প্রচারিত করেন। গ্রন্থের শেষাংশ তাই লক্ষ্মণসেন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হওয়াই খুব সম্ভব। এই শেষাংশে মৎস্যপুরাণ হইতে কতকগুলি অদ্ভুত ও তাহার শান্তিপ্রক্রিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। মুদ্রিত অদ্ভুতসাগরে এবং বঙ্গবাসী সংস্করণের মৎস্যপুরাণে এই অংশে কিছু কিছু ভুল-ভ্রান্তি আছে। এই স্থানটিতেই ঐন্দ্রী মহাশান্তির উল্লেখ আছে। সামান্য সংশোধনের পর শ্লোকটি নিম্নরূপ ধারণ করে—

ভবিষ্যত্যভিষেকে চ পরচক্রভয়েষু চ।
স্বরাষ্ট্রভেদেঽরিবধে ঐন্দ্রীশান্তিস্তথেষ্যতে ॥

অনুবাদ।—অভিষেক কালে, শত্রু কর্ত্তৃক রাজ্য আক্রান্ত হইবার আশঙ্কায়, নিজের রাজ্যভঙ্গ হইলে পর অথবা শত্রুবধ কামনায় ঐন্দ্রী মহাশান্তি বিহিত এবং অভীপ্সিত হইবে।

ঐন্দ্রী মহাশান্তির অনুষ্ঠান হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, অনতিপূর্ব্বে নিশ্চয়ই লক্ষ্মণসেনের রাজ্যভঙ্গ হইয়াছিল, শত্রুর আরও আক্রমণ তিনি আশঙ্কা করিতেছিলেন এবং শত্রুবধ তাঁহার কাম্য হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাই যে ইখ্‌তিয়ারুদ্দিন কর্ত্তৃক আক্রমণ,—যে আক্রমণে রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমাংশ লক্ষ্মণসেনের হস্তচ্যুত হইয়াছিল; এবং যে আক্রমণের জের তখন পর্য্যন্ত মিটে নাই, এই বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকিতেছে না।

কি ঘটিয়াছিল, ১২০৩ খৃষ্টাব্দে ঐন্দ্রী মহাশান্তির অনুষ্ঠান দেখিয়া তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। আমার "পরগণাতিসনের আরম্ভ-নির্ণয়" (Indian Antiquary, 1923) নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, এই সন লক্ষ্মণসেনের রাজ্যভঙ্গ বৎসর হইতে গণিত এবং ১২০২ খৃষ্টাব্দের কার্ত্তিক মাসে ইহা আরব্ধ। ১২০২ খৃষ্টাব্দের কার্ত্তিক মাসেই ইখ্‌তিয়ারুদ্দিনের আক্রমণ সজ্ঘটিত হয়। লক্ষ্মণসেনের বয়স তখন তবকত্-ই-নাসিরি মতে ৮০ বৎসর। এই আক্রমণে পশ্চিম-বঙ্গের উত্তরাংশ এবং উত্তর-বঙ্গের পশ্চিমাংশ হারাইয়া লক্ষ্মণসেন পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং বিক্রমপুর হইতে ধার্য্যগ্রামে রাজধানী পরিবর্ত্তিত হইল। পরবর্ত্তী ২৭শে শ্রাবণ তারিখে, ১২০৩ খৃষ্টাব্দে রাজত্বের ২৫শ সম্বৎসরে কৈবশান্তির উদ্দেশ্যে ঐন্দ্রী মহাশান্তি অনুষ্ঠিত হয়। ভাদ্র মাসে তাম্রশাসনখানি প্রদত্ত হয়। পূর্ব্ব-বরেন্দ্রীতে চলনবিলের পারে যাজক ব্রাহ্মণকে ভূমিদানের মধ্যে যেন একটু সাক্রোশ রসিকতার আভাস পাওয়া যায়। মুসলমান-অধিকারের প্রায় সীমান্তে পুরোহিতকে গ্রাম দক্ষিণা দিয়া রাজা যেন দেখিতে চাহিয়াছিলেন, পুরোহিতের শান্তি অনুষ্ঠান ও যাগযজ্ঞের জোর কত।

এই স্থানে মাধাইনগর শাসনের প্রাপ্তিস্থান মাধাইনগর গ্রামের অবস্থান প্রণিধান করা আবশ্যক। বেঙ্গল আসাম রেলওয়ের সারা-সিরাজগঞ্জ লাইনটি সুপরিচিত। এই লাইনের উপর চাটমোহর ষ্টেশনটিও সুপরিচিত। প্রকৃত চাটমোহর কিন্তু ষ্টেশনের প্রায় তিন মাইল উত্তরে। চাটমোহর হইতে প্রায় ১৬ মাইল উত্তরে তাড়াশ নামক বিখ্যাত স্থান। এই গ্রামটি চলনবিল নামক সুবিখ্যাত বিলের পূর্ব্বপারে অবস্থিত। তাম্রশাসনের প্রাপ্তিস্থান মাধাইনগর তাড়াশ হইতে ৫ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। চাটমোহর হইতে তাড়াশ পর্য্যন্ত রাস্তাটিকেই চলনবিলের পূর্ব্বপার বলা যায়। মাধাইনগর গ্রামটি সিরাজগঞ্জের ঠিক ২৪ মাইল পশ্চিমে। পশ্চিম দিক্ হইতে দেখিতে গেলে, নাটোর হইতে সোজা পূর্ব্বে ১৬ মাইল গেলে চলনবিলে উপস্থিত হওয়া যায় এবং চলনবিলের উপর দিয়া সোজা মাপিয়া তাড়াশ নাটোর হইতে ঠিক ২৪ মাইল পূর্ব্বে।

মাধাইনগর শাসনে প্রদত্ত গ্রামটির পরিচয় নিম্নরূপ প্রদত্ত হইয়াছে :—

শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্ত্যন্তঃপাতি বরেন্দ্র্যাং কান্তাপুরাবৃত্তৌ রাবণসরসি ক্ষিস্থানে (?)···দাপণিয়া পাটকঃ।

কাজেই দেখা যাইতেছে যে, প্রদত্ত গ্রামের নাম ছিল দাপণিয়া! উহা কান্তাপুর আবৃত্তির অন্তর্গত এবং বরেন্দ্রী প্রদেশে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তিতে অবস্থিত ছিল। প্রদত্ত গ্রামটি রাবণ নামক হ্রদের নিকটবর্ত্তী ছিল, ইহাও বুঝা যাইতেছে। তাম্রশাসনের প্রাপ্তি-স্থানের অদূরেই প্রদত্ত গ্রামটি প্রথম খুঁজিতে হয়। দেখা যায়, তাড়াশ থানার পশ্চিমপ্রান্তে রাজসাহী জেলার সীমার মধ্যে চলনবিলের পারে কাঁটা-বাড়ী নামে একটি গ্রাম আছে। উহার চৌদিকস্থ পরগণা কাঁটারমহল নামে খ্যাত। ইহাই যেন প্রাচীন কান্তাপুর আবৃত্তি বলিয়া মনে হইতেছে। পাবনা জেলা খুঁজিয়া তিন স্থানে তিনটি দাপণিয়া নামক গ্রাম পাইয়াছি, কিন্তু কাঁটাবাড়ীর নিকটে কোন দাপণিয়া গ্রাম পাইলাম না। যাঁহাদের সুযোগ আছে, স্থানীয় অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পারেন। বড় মৌজার নামের মধ্যে অনেক সময়ই ছোট গ্রামের পৃথক্ নাম সেটেল্‌মেণ্ট বিভাগের মানচিত্র সমূহে প্রদর্শিত হয় না। এই অঞ্চলে রাবণ নামক একটি হ্রদের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয়, উহা চলনবিলেরই প্রাচীন নাম। দাপণিয়া খুঁজিয়া পাইলে সমস্তই ঠিক মত মীমাংসা করিতে পারিতাম। কিন্তু ঐ অঞ্চলে যাইয়া নিজে অনুসন্ধান না করিলে দাপণিয়া খুঁজিয়া পাইবার সম্ভাবনা নাই।

মাধাইনগরের দুই মাইল উত্তরে নিমগাছি নামে পরিচিত একটি বিখ্যাত স্থান। এই স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরস্থ গোতীথা এবং ক্ষীরতলা নামক স্থানদ্বয় পর্য্যন্ত জুড়িয়া প্রাক্‌মুসলমান যুগে যে একটি বৃহৎ নগর ছিল, তাহার নানা প্রমাণ অদ্যাপি বর্ত্তমান। এই পরিধির মধ্যে প্রাচীন নগরের অস্তিত্ব-জ্ঞাপক অনেকগুলি বিরাট্ বিরাট্ দীঘি খনিত দেখা যায়। একটি দীঘি প্রায় অর্দ্ধ মাইল লম্বা। আর গুটি পাঁচেক দীঘিও আয়তনে প্রায় অনুরূপ বিশাল। এই সকল দীঘির পারে প্রাচীন আমলের বহু ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায় এবং অনেক পাথরের মূর্ত্তি এই স্থানে মাটির নীচ হইতে পাওয়া গিয়াছে। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের দৃষ্টি এই ধ্বংসাবশেষ সমূহের দিকে আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন। স্থানীয় প্রবাদ এই, সেনবংশের অচ্যুতসেন নামক ব্যক্তির ইহা অধিষ্ঠান ছিল। সম্ভবতঃ মুসলমান-অগ্রগতি রুদ্ধ করিতে সেনরাজ এখানে অচ্যুতসেনকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকিবেন।

২। ভাওয়াল শাসনে প্রাপ্তব্য তথ্যাবলি

(ক) লক্ষ্মণসেনের রাণীগণের নাম

ভাওয়াল-রাজবাড়ী তাম্রশাসনে লক্ষ্মণসেনের দুই জন রাণীর নাম উল্লিখিত হইয়াছে, যথা শূয়া দেবী এবং কল্যাণ দেবী। শূয়া দেবী নামটি একটু অসাধারণ, বাঙ্গালা দেশে এই নাম প্রচলিত নহে।

লক্ষ্মণের পিতা, বল্লালসেনের নামটিও অমনি বাঙ্গালা দেশের সাধারণ প্রচলিত নাম নহে। উভয় নামই দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত।

লক্ষ্মণসেনের পুত্রগণের তিনখানা শাসন অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে। লক্ষ্মণপুত্র কেশবসেনের শাসনে দেখা যায়, তাঁহার মায়ের নাম তাড়া দেবী। লক্ষ্মণপুত্র বিশ্বরূপসেনের একখানা তাম্রশাসনে দেখা যায়, তাঁহার মায়ের নামও তাড়া দেবী। কিন্তু এই রাজারই অপর একখানা তাম্রশাসনে দেখা যায়, তাঁহার মায়ের নাম অহ্লনা দেবী। একই মানুষের দুই জন মা থাকা সম্ভবপর নহে, কাজেই এই শেষ দুইখানি তাম্রশাসনের পাঠে ও ব্যাখ্যায় কিছু গলদ রহিয়া গিয়াছে নিশ্চয়। মোট কথা এই যে, এই শাসন তিনখানি হইতে লক্ষ্মণসেনের আরও দুই জন রাণীর নাম আমরা জানিতে পারিলাম, যাঁহাদের পুত্রগণ লক্ষ্মণসেনের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। কাজেই লক্ষ্মণসেনের মোট চারি জন রাণীর নাম আমরা জানিতে পারিলাম, যথা—তাড়া, অহ্লনা, শ্রয়া এবং কল্যাণ দেবী।

খ। লক্ষ্মণসেনের সান্ধিবিগ্রহিকগণ

সান্ধিবিগ্রহিক পদ প্রাচীন আমলে গুরুত্বপূর্ণ পদ ছিল। লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের বিভিন্ন ভাগে বিভিন্ন ব্যক্তিকে এই পদে অধিষ্ঠিত দেখিতে পাই। প্রথম ভাগে ছিলেন নারায়ণ দত্ত। চারিখানা শাসনে তাঁহারই নাম পাওয়া যায়। ৬ষ্ঠ সম্বৎসরের শক্তিপুর শাসনে ত্রিপুরারিনাথের নাম পাওয়া যায়। মাধাইনগর শাসনে সান্ধিবিগ্রহিকের নামাঙ্কনের স্থানটি ক্ষয়িয়া গিয়াছে, কাজেই নামটি পাঠ করা যায় না। ভাওয়াল-রাজাবাড়ী শাসনে সান্ধিবিগ্রহিকের নাম শঙ্করধর। নামটি দেখিয়া মনে হয়, উমাপতিধর নামের সহিত ইহার সাদৃশ্য স্পষ্ট। উভয় ভ্রাতা হওয়া অসম্ভব নহে।

গ। ভাওয়াল-রাজাবাড়ী শাসনের তারিখ

ভাওয়াল-শাসনের তারিখ অতি স্পষ্ট—২৭ রাজ্য-সম্বৎসর, ৬ই কার্ত্তিক। ইহা খৃষ্টাব্দের ১২০৪এর অক্টোবর-নবেম্বর। ইক্তিয়ারুদ্দিনের আক্রমণে ১২০২ খৃষ্টাব্দের কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণে লক্ষ্মণসেন রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমাংশ হারাইয়াছিলেন। এই ঘটনার পরেও তিনি যে অন্ততঃ আরও দুই বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, ভাওয়াল-রাজাবাড়ী শাসন তাহার অকাট্য প্রমাণ। শ্রীধর দাসের সদুক্তিকর্ণামৃত লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের "রসৈকবিংশে" অর্থাৎ ২৭ সম্বৎসরে সঙ্কলিত হইয়াছিল বলিয়া যে উক্ত পুস্তকের পুষ্পিকায় লিখিত আছে, এত কাল সেই উক্তি সসন্দেহে গৃহীত হইত। ভাওয়াল-রাজাবাড়ী শাসনের তারিখ দ্বারা উহা সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত হইল। লক্ষ্মণসেন আর কত দিন বাঁচিয়াছিলেন, বলিবার উপায় নাই। এই সময় লক্ষ্মণসেনের বয়স ৮২-৮৩ বৎসর হইয়া থাকিবে। সেন-রাজগণের বিজয়-বল্লাল-লক্ষ্মণ—তিন জনেই দীর্ঘজীবী ছিলেন। বিজয়ের ৬১ বৎসর রাজত্বে পুত্র-পৌত্র উভয়কেই প্রৌঢ় বয়সে সিংহাসন লাভ করিতে হয়।

তাম্রশাসনের শেষে নিবন্ধন বা রেজিষ্ট্রেশন এবং দাতা ও সাক্ষিগণের সাঙ্কেতিক নামাঙ্কন থাকে। ভাওয়াল-রাজাবাড়ী শাসনে এই সমস্ত নিবন্ধনাদির একটু আতিশয্য দেখিয়া মনে হয়, গ্রহীতা তাঁহার দলিলখানিকে বিশেষরূপে পোক্ত করিয়া লইয়াছিলেন,—কারণ, রাজা যে আর বেশী দিন বাঁচিবেন, সে ভরসা তাঁহার ছিল না। নিবন্ধনাদি নিম্নরূপে খোদিত আছে।

শ্রী নি মহাসাং নিং। শ্রীমদ্রাজ্ঞ নি। শ্রীমদনশঙ্কর নি। শ্রীমত্ সাহসমল্ল নি।

প্রথম নিবন্ধনে কাহারও নাম বা উপাধি নাই। উহা সম্ভবতঃ দেবতার উল্লেখ। সমস্ত দলিলেই তিনিই প্রধান সাক্ষী। পরে মহাসান্ধিবিগ্রহিকের নিবন্ধন। পরে রাজার ব্যক্তিগত নিবন্ধন। পরে তাহার উপাধিগত নিবন্ধন। পরে সাহসমল্লের নিবন্ধন। সম্ভবতঃ যুবরাজের উপাধি ছিল সাহসমল্ল।

ঘ। ভাওয়াল-শাসনে ঐতিহাসিক তথ্যাবলি

ভাওয়াল ও মাধাই-নগর শাসনে পদ্যাংশে কোন প্রভেদ নাই। গদ্যাংশে আছে। দুর্ভাগ্যক্রমে মাধাই-নগর শাসনের গদ্যাংশের পাঠ আজিও সম্যক্ উদ্ধৃত হয় নাই। পদ্যাংশে নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক তথ্যগুলির উল্লেখ আছে :—

১। তাঁহার "কৌমারকেলি" ছিল—"দৃপ্যদ্গৌড়েশ্বর—শ্রীহঠহরণ কলা"—অর্থাৎ কুমারকালে, প্রথম যৌবনে, ১১।১২০ বছর বয়সে, তিনি অহঙ্কার ও বলদৃপ্ত গৌড়েশ্বরের অর্থাৎ পালরাজের শ্রী বা সমৃদ্ধি বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেনের পিতামহ বিজয়সেনের দেওপাড়া বা প্রদ্যুম্নেশ্বর শাসনে আছে, তিনি "গৌড়েন্দ্রমদ্রবৎ"—গৌড়েন্দ্রকে হটাইয়া দিয়াছিলেন। অদ্ভুতসাগরে লক্ষ্মণসেনের পিতা বল্লালের বাহুকে—"গৌড়েন্দ্রকুঞ্জর"কে বাঁধিবার "আলানস্তম্ভ" বা খুঁটা বলা হইয়াছে। বিজয়সেনের রাজত্বকাল আনুমানিক ১০৯৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। বল্লালের রাজত্বকাল ১১৬০ হইতে ১১৭৮ খৃষ্টাব্দ। ১১৬১ খৃষ্টাব্দে শেষ পালরাজ গোবিন্দপাল বল্লালসেন কর্ত্তৃক পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হ'ন। বিজয়সেনও পালরাজের নিকট হইতে বরেন্দ্রীর কতক অংশ নিশ্চয়ই অধিকার করিয়া থাকিবেন, কারণ, তৎপ্রতিষ্ঠিত প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দিরের অবস্থান দেওপাড়া গ্রাম রাজসাহী সহরের ৭ মাইল উত্তর-পশ্চিমে। বিজয়সেনের সহিত ১১৪০ খৃষ্টাব্দে নিমদীঘি গ্রামে পালবংশীয় তৃতীয় গোপালের যে মহাযুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয় (বসুমতী,—শ্রাবণ, ১৩৪৯ মদীয় "বাঙ্গালার মহাশ্মশান নিমদীঘি" দ্রষ্টব্য), লক্ষ্মণসেনের কৌমারকেলিতে দৃপ্ত গৌড়েশ্বরের শ্রী বলপূর্ব্বক হরণ সেই যুদ্ধেই সঙ্ঘটিত হইয়া থাকিবে।

২। ভাওয়াল-রাজাবাড়ী, ও মাধাইনগর শাসন মতে লক্ষ্মণসেনের দ্বিতীয় কীর্ত্তি—লক্ষ্মণসেনের যৌবনে (পরাজিত ও ভীত) কলিঙ্গরাজ যুবতীগণ উপঢৌকন দিয়া সর্ব্বদা তাঁহার সন্তোষবিধান করিতেন। বিজয়সেনের দেওপাড়া লিপিতেও কলিঙ্গ নৃপতিকে দ্রুত পরাজিত করার কথা আছে। এই ঘটনা লক্ষ্মণসেনের ২৫।২৬ বছর বয়সে সঙ্ঘটিত হইয়া থাকিলে ইহাই তাঁহার "যৌবনকেলি," এবং ইহা ১১৪৫ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী ঘটনা।

৩। ভাওয়াল-রাজাবাড়ী শাসন এবং মাধাইনগর শাসন মতে তৃতীয়তঃ লক্ষ্মণসেন কাশীরাজকে রণক্ষেত্রে পরাজিত করিয়াছিলেন। ১১৬১ খৃষ্টাব্দে বল্লালসেন বরেন্দ্রী ও বিহার অধিকার করিয়া পাল-রাজবংশের রাজত্বের উচ্ছেদ-সাধন করিলে, কান্যকুব্জের গাহড়বাল রাজগণের সহিত সেন-রাজগণের

সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইয়া থাকিবে। সেন-শাসনাবলিতে গাহড়বাল রাজগণকেই কাশীরাজ বলা হইয়াছে। গাহড়বালরাজ গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র বিজয়চন্দ্র ১১৫৪ হইতে ১১৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপুত্র জয়চন্দ্র ১১৭০ হইতে ১১৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া সিহাবুদ্দিনের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। লক্ষ্মণসেন কাহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, বলা যায় না। কিন্তু লক্ষ্মণসেনের শাসনে এবং তাঁহার পুত্রগণের শাসনে কাশীরাজের সহিত যুদ্ধে জয়ের সদম্ভ দাবী সত্ত্বেও বুঝা যায়, যুদ্ধের ফলাফল সেনরাজগণের পক্ষে বিশেষ গৌরবজনক হয় নাই। ইক্তিয়ারুদ্দিনের হস্তে অতি সহজে বিহারের পতন দেখিয়া মনে হয়, সেন-গাহড়বাল দ্বন্দ্বের ফলে বিহার অরাজক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। বিহারের রক্ষাকর্ত্তা কেহ ছিল না, গ্রাসেচ্ছু ছিল বহু। কাজেই বিবদমান পশুরাজদ্বয়ের শিকারের মত বিহারকে আগন্তুক ইক্তিয়ারুদ্দিন যখন অসহায় মৃগের মত গ্রাস করিলেন, তখন সেনরাজ বা গাহড়বাল-রাজ, কেহই বিহারের রক্ষার্থে অঙ্গুলিটিও উত্তোলন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না।

৪। এই শাসনদ্বয় মতে লক্ষ্মণসেনের চতুর্থ গৌরব,—তাঁহার তরবারিভীত প্রাগ্‌জ্যোতিষেন্দ্র আসিয়া তাঁহার শরণ লইয়াছিলেন। মাধাইনগর শাসনে অধিকন্তু আছে, লক্ষ্মণসেন ছিলেন "বিক্রমবশীকৃত কামরূপ।" কামরূপ-রাজের সহিত বর্ম্মদের আমল হইতেই বিগ্রহ লাগিয়াই ছিল। পাল, বর্ম্ম ও সেনরাজ, সকলেই কামরূপ রাজকে পর্য্যায়ক্রমে জয় করিয়াছেন বলিয়া দাবী করিতেছেন। বিজয়সেন "অপাকৃত কামরূপ।" পৌত্র লক্ষ্মণসেন "বিক্রমবশীকৃত কামরূপ।" কামরূপ রাজ্য এই সময় যেন নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। লক্ষ্মণসেনের আমলেও কামরূপরাজ পরাজিত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিয়া থাকিবেন।

৫। ভাওয়াল-রাজাবাড়ী শাসনে লক্ষ্মণসেনের প্রতি প্রযুক্ত বিশেষণাবলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট বিশেষণ নিম্নলিখিত দুইটি :—

ক। নিজভুজমন্দরামন্দরপ্রমথিতাসীমসমরসাগরসমসাদিতগৌড়লক্ষ্মীঃ। অর্থাৎ নিজের বাহুরূপ মন্দর দ্বারা অমন্দর অর্থাৎ ভীমবেগে অসীম সমরসাগর মন্থন করিয়া তিনি গৌড়লক্ষ্মীকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

খ। বীরসকলকুশেশয়বিকাশবাসরংকর। অর্থাৎ তিনি বীররূপ কমল সমূহের বীরত্ব বিকাশে ভাস্করের সদৃশ ছিলেন।

এই দুইটি বিশেষণ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ইক্তিয়ারুদ্দিনের ১২০২ খৃষ্টাব্দে অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া নদীয়ালুণ্ঠন এবং সেন-রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমাংশে রাঢ়া ও বরেন্দ্রীর কতক কতক অংশ অধিকার অকাট্য ঐতিহাসিক সত্য, সন্দেহ নাই। তবকত-ই-নাসিরি পাঠে মনে হয় না যে, ইক্তিয়ারুদ্দিন বিশেষ বাধা পাইয়াছিলেন; কিন্তু মুসলমান-শাসন যে ইক্তিয়ারুদ্দিন প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র রাজ্যখণ্ডে শত বর্ষকাল আবদ্ধ হইয়াছিল এবং ঐ সীমানা ছাড়াইয়া আর অগ্রসর হইতে পারে নাই, উহাও অকাট্য ঐতিহাসিক সত্য। এ পর্য্যন্ত আমরা এই ঘটনার মুসলমান-ঐতিহাসিক লিখিত বিবরণই পাঠ করিয়া আসিতেছি। সমগ্র উত্তর-ভারত যখন মুসলমানের অধীনে চলিয়া গিয়াছে, তখন ৮০ বৎসর বয়সের বৃদ্ধ রাজার পক্ষে কতকটা কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়তা প্রকাশ করা স্বাভাবিক। প্রথম আঘাতের বিহ্বলতায় তিনি পশ্চিমবঙ্গ ছাড়িয়া পূর্ব্ববঙ্গে চলিয়া আসিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু উপরে উদ্ধৃত বিশেষণগুলি দেখিয়া বুঝা যায়, পরে "গর্গযবনান্বয়প্রলয় কালরুদ্র" পুত্রগণের সহায়তায় বিষম সমরসাগরের মন্থনদণ্ড বাহু এই বীর-ভাস্কর রুখিয়া দাঁড়াইয়া নিজের অবশিষ্ট রাজ্যাংশ রক্ষা করিয়া প্রশংসনীয় শৌর্য্যের পরিচয় দিয়াছিলেন,—উত্তর-ভারতের অন্য কোন রাজা শেষ পর্য্যন্ত এই পরিচয় দিতে পারেন নাই। নদীয়ালুণ্ঠনের দশ মাস মাত্র পরে মাধাইনগর তাম্রশাসন দ্বারা মুসলমান-রাজ্যের পূর্ব্বপ্রান্তে চলনবিলের পারে ব্রাহ্মণকে ভূমি দান দেখিয়া মনে হয়, সেনবংশীয় অচ্যুতসেন যেন নিমদীঘিতে সদম্ভে নিজ বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া বাহ্বাস্ফোট করিয়া মুসলমানগণকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছিলেন। ক্ষণবিজয়ী মুসলমান-বিজেতা ঐ সীমা পার হইতে পারে নাই। তিব্বত জয় করিতে যাইয়া ইক্তিয়ারুদ্দিন কামরূপরাজের হস্তে ১২০৬ খৃষ্টাব্দের ৭ই মার্চ্চ তারিখে গুরুতর পরাজিত হইয়া সমস্ত সৈন্য হারাইয়া দেবকোটে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করেন। লক্ষ্মণাবতীর ক্ষুদ্র মুসলমান রাজ্য, মুসলমান আক্রমণের আদিযুগের সিন্ধুরাজ্যের মত, আর বাড়িবার সুযোগ পায় নাই। কাজেই লক্ষ্মণসেনের ক্ষণিক পরাজয় সত্ত্বেও, নিরপেক্ষ বিচারক মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে,—এই non-martial raceপূর্ণ বাঙ্গালী রাজ্যে আসিয়াই সেই বন্যাকে প্রতিহত হইতে হইয়াছিল,—যাহা উত্তর-ভারতের মহা মহা বীরপূর্ণ রাজ্যসমূহকে গ্রাস করিয়া ভাসাইয়া লইয়া যাইতে অল্পায়াসেই সমর্থ হইয়াছিল।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী (এম-এ, পি-এইচ-ডি)

দ্বন্দ্বের দান

দ্বন্দ্বেরি মাঝে আপনারে মোরা চিনি,
বিরোধীরে জিনে নিজেরেই মোরা জিনি।
সুপ্ত শক্তি তাহাতেই পায় প্রাণ,
তাহা যে কতটা জানি তার পরিমাণ।
দ্বন্দ্ব-বিরোধে যে জন এড়ায়ে চলে,
লভি জড়ত্ব মরে সেই পলে-পলে।

শ্রীকালিদাস রায়।

কোষ্ঠীফল ও ভাগ্যবল*

[গল্প]

১

"পড়িতে পারে," "পড়িবার সম্ভাবনা," "পড়িবে"—নানা মতের দ্বন্দ্ব ঘুচাইয়া অবশেষে ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসের এক রাত্রিতে কলিকাতায় সত্য সত্যই জাপানী বিমান হইতে বোমাপাত হইল। বিপদের বাঁশী পূর্ব্বেও তুই দশ বার বাজিয়াছিল—কিন্তু বিপদ দেখা দেয় নাই, এ বার বিপদ দেখা দিল। এক বৎসর পূর্ব্বে—ব্রহ্ম আক্রান্ত হইলে যখন কলিকাতা হইতে লোকাপসরণের চেষ্টা হইয়াছিল, তখন যাঁহারা "ভরে রড়ে" স্থান ও অস্থান বিচার-বিবেচনাও না করিয়া কলিকাতা ত্যাগ করিয়া নির্ব্বিঘ্নতার সন্ধান করিয়াছিলেন, তাঁহারা—প্রথম রাত্রিতে বোমাপাতের পর—মনে করিলেন, এ বার আর কোথাও যাইবেন না। তাহার কারণ, যাঁহারা চলিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের অধিকাংশই ধনে বা প্রাণে অথবা ধনে-প্রাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া কেহ বা তুই মাস, কেহ বা ছয় মাস, কেহ বা নয় মাস পরে আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন এবং তাহার পর হইতে কলিকাতায় ভয়ের আর কোন কারণও ঘটে নাই। কিন্তু প্রথম দিনের বোমাপাতে যাঁহারা বিচলিত হয়েন নাই, পরদিন তাঁহাদিগের সঙ্কল্প শিথিল হইল এবং পর পর তিন রাত্রিতে যখন বোমাবর্ষণ হইল এবং তৃতীয় রাত্রিতে কলিকাতার উত্তরাংশে কয়টি বোমা পড়িল, তখন অনেকেরই সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত হইল। সর্ব্বপ্রথম তুই সম্প্রদায়ের অবাঙ্গালী স্থানত্যাগে প্রবৃত্ত হইল—তাহারা মনে করিল, কলিকাতায় আগমন ত অর্থার্জ্জনের জন্য; প্রাণ যদি থাকে, তবেই অর্থার্জ্জন সম্ভব হয়—সুতরাং প্রাণ বিপন্ন করিয়া অর্থার্জ্জনের কোন প্রয়োজন নাই। মাড়বারী ব্যবসায়ী ও পশ্চিমা—যুক্ত-প্রদেশ, বিহার প্রভৃতির অধিবাসীরা "বোম্পাট" হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রথমেই "ঝড়ের আগে শুকনা পাতার" মত ব্যবহার করিল। উড়িয়ারা তাহাদিগের অনুসরণ করিল। প্রথমে তুই শ্রেণীর লোক কলিকাতা ত্যাগ করিল—ধনী ও দরিদ্র। তখনও ট্রেণে লোকাপসারণের ব্যবস্থা হয় নাই বলিলেই হয়, সেই জন্য ধনীরা—নানা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উপায়ে—টিকিট সংগ্রহ করিতে পারিলেও দরিদ্রেরা পারিল না; তাহারা কেহ বা আপনাদিগের গোযানে—অনেকেই পদব্রজে যাত্রা করিল। হাওড়ার সেতু অতিক্রম করা দুঃসাধ্য হইল—মোটর যান, ঘোড়ার গাড়ী, মহিষের গাড়ী, রিক্সা—সর্ব্ববিধ যানের ভাড়া চতুর্গুণ বা পঞ্চগুণ হইল। রেল-ষ্টেশনে প্রবেশ করা অসাধ্য-সাধন হইয়া উঠিল।

যাঁহারা কলিকাতা ত্যাগ করিবেন স্থির করিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে নারায়ণচন্দ্র অন্যতম। তিনি যে বংশের—এক শাখার একমাত্র উত্তরাধিকারী, সে বংশের বংশপতি এ দেশে বৃটিশ শাসনের আরম্ভকালে কার্য্যব্যপদেশে মফঃস্বল হইতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পৈত্রিক গ্রামের সহিত সম্বন্ধ বর্জ্জন করেন নাই এবং তথায় রাজবাড়ী, দেবালয়, অতিথিশালা প্রভৃতি তাঁহার ও তাঁহার পরবর্ত্তীদিগের ঐশ্বর্য্যের ও অর্থের সদ্ব্যবহার-নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে। কিন্তু কর্ম্মকেন্দ্র ও বিলাসকেন্দ্র কলিকাতাও তাঁহাদিগের দ্বিতীয় বাসস্থান ছিল এবং দ্বিতীয় হইলেও তাহাই আদরে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পূর্ব্ববার যখন কলিকাতা ত্যাগের হিড়িক হইয়াছিল, তখন নারায়ণচন্দ্রের পরিবারস্থাগণ গ্রামে গিয়াছিলেন—গৃহ-দেবতার "নিয়ম সেবা" ও বার মাসে তের পর্ব্বের জন্য সকলেই ফিরেন নাই, তবে একাংশ কলিকাতায় ফিরিয়াছিলেন। নারায়ণচন্দ্র তাঁহাদিগের মধ্যে ছিলেন। তিনিই সেই পরিবারের কেন্দ্র এবং তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। পিতামহী, মাতা প্রভৃতি তাঁহার বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু মনের মত পাত্রীর সন্ধান পাইতেছিলেন না। কোন পাত্রী "বড় রোগা", কেহ বা "বেঁটে", কেহ বা "ঢ্যাঙ্গা" প্রভৃতি "ক্রটি"তে বর্জ্জিত হইতেছিল—বর্ণের জন্য যে অনেক বাছাই হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য। বিগত শত বর্ষে যাঁহারা এই পরিবারে বধূরূপে গৃহীতা হইয়াছেন, তাঁহারা কুলের ও রূপের ছাড়-সমন্বয়েই আসিয়াছেন। তাহার উপর আবার কোষ্ঠীবিচার ছিল। যদিও কোষ্ঠীবিচার এই পরিবারে বধূদিগকে বৈধব্য হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই, তবুও তাহা প্রথায় দাঁড়াইয়া অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল।

নারায়ণচন্দ্রের পক্ষে—বিশেষ তাঁহার পরিবারস্থাদিগের পক্ষে কামরা নিজস্ব না করিয়া ট্রেণে ভ্রমণ চলিত হয় নাই। সেই জন্যই সোমবার, মঙ্গলবার তুই দিন যাইবার উপায় হয় নাই! কারণ, পূর্ব্ব হইতেই যেরূপ কামরা ভাড়া হইয়াছিল, তাহাতে অপেক্ষা করা ব্যতীত উপায় ছিল না।

যাঁহারা যাইবেন, তাঁহাদিগের সংখ্যাও অল্প নহে। নারায়ণচন্দ্র পরিবারের একমাত্র পুত্র হইলেও পরিবারের সনাতন প্রথানুসারে বিধবা পিসী, পিতামহীর ভ্রাতৃবধূ প্রভৃতি তাঁহাদিগের সন্তানাদিসহ সেই সংসারভুক্তই ছিলেন এবং তাঁহাদিগের পুত্রপৌত্রাদিও শিক্ষালাভার্থ কলিকাতায় নারায়ণচন্দ্রের গৃহেই থাকিতেন। লোক তাঁহাদিগের কথায় বলিত—"ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান্ বহেন।"

বুধবারেও যখন কামরা ভাড়ার উপায় হইল না এবং রেলের কর্ম্মচারীরা কবে কামরা পাওয়া যাইবে, সে সম্বন্ধে কোন স্থির-সিদ্ধান্ত জানাইলেন না, তখন চেষ্টার মাত্রা-বৃদ্ধি করিতে হইল এবং বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে সংবাদ পাওয়া গেল, পরদিন অপরাহ্ণে যে ট্রেণ যাইবে, তাহাতেই নারায়ণচন্দ্রের জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাযুক্ত গাড়ী এবং ভৃত্যাদির জন্য তৃতীয় শ্রেণীর কামরা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সকলে স্বস্তির শ্বাস ফেলিলেন। সুখের বিষয়, বুধবার রাত্রিতে জাপানী বিমান দেখা যায় নাই—বোমাপাত ত পরের কথা, বিপদবাঁশীও বাজে নাই! শীতের রাত্রিতে নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে নাই। সকলেই ভাবিলেন—বাঁচা গেল! কোনরূপে একটা রাত্রি কাটিলেই বিপদের স্থান হইতে যাইতে পারিবেন।

২

কিন্তু মানুষ ভাবে এক আর অনেক সময় হয় অন্যরূপ। বৃহস্পতিবার দিন ভালয়-ভালয় কাটিল বটে, কিন্তু রাত্রির সম্বন্ধে তাহা বলা

গেল না। সেই কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়ার জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীর সুযোগ জাপানী বিমান অবহেলা করিল না—সদলে অভিসারে বাহির হইল। রাত্রি ১টা ১০ মিনিটের সময়, যখন অনেক গৃহেই গৃহস্থরা আহারে বসিয়াছেন বা বসিবার উদ্যোগ করিতেছেন, সেই সময় সহসা নৈশ নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করিয়া বিপদবাঁশী বাজিয়া উঠিল; আর তাহার পরেই বোমার বিস্ফোরণধ্বনি ও বিমান-বিধ্বংসী কামানের মুখ হইতে ধ্বনি ও অগ্নি বাহির হইতে লাগিল। সে দিনের আক্রমণের তুলনায় পূর্ব্বের তিন দিনের আক্রমণ ক্ষীণ প্রতীয়মান হইল এবং আক্রমণের কালও অধিক হইল। সে রাত্রিতে বিপদ-বারণ-বাঁশী মধ্যরাত্রিরও পরে বাজিল।

সে রাত্রিতে অনেক গৃহের মত নারায়ণচন্দ্রের কলিকাতার গৃহেও নিদ্রার শুভাবির্ভাবে বাধা ঘটিল এবং বিনিদ্র রাত্রির দীর্ঘ অবসরে আশঙ্কায় বিপদের সম্ভাবনা কেবল অতিরঞ্জিত হইয়া দেখা দিতে লাগিল। বালক-বালিকারা কান্দিতে লাগিল—মহিলারা প্রভাতের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন—"কালরাত পোহাইলেই হয়—কলিকাতার যমপুরীতে আর বাস নহে।"

প্রভাত হইল, কিন্তু যাইবার উপায় কি? সত্য সত্যই ত আর বোমার ভয় হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য গঙ্গায় ঝাঁপাইয়া পড়া যায় না! কিন্তু নারায়ণচন্দ্র নানারূপে বুঝাইয়াও তাঁহাদিগকে অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে সম্মত করিতে পারিল না। শেষে তাহার সুপরামর্শে উদ্দেশ্যের আরোপ হইতে লাগিল—কোন কোন মহিলা বলিতে লাগিলেন, "আজকালকার ছেলে—এদের কথা শুনলে সবংশে নিধন হ'বে।" কিন্তু উপায় কি? তাঁহারা বলিলেন, "উপায় হয় না! 'কড়িতে বাঘের দুধ মিলে' আর ট্রেণে কামরা পাওয়া যায় না?" কামরা যে পাওয়া যায় না, তাহা যত সত্যই কেন হউক না, যাঁহারা তাহা বুঝিবেন না, তাঁহাদিগকে কে তাহা বুঝাইতে পারে? সমস্ত দিনে কি ট্রেণ নাই? দেখা গেল, বেলা একটায় একখানি ট্রেণ ঐ পথে যায়। তখন কলরব উঠিল, ঐ ট্রেণে যাইতেই হইবে। বন্যার জল যখন বাঁধ ভাঙ্গিয়া বাহির হয়, তখন হাত দিয়া তাহার গতিরোধ করা যেমন অসম্ভব, নারায়ণচন্দ্রের পক্ষে তেমনই যুক্তি দিয়া সেই অসম্ভব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত করা অসম্ভব হইল। যাঁহারা পারিবারিক প্রথানুসারে পাল্কীতে প্ল্যাটফর্ম অতিক্রম করিয়া ট্রেণের কামরায় উঠেন, তাঁহারাও যখন যোদ্ধার উপযোগী সাহসের পরিচয় দিয়া বলিলেন, তাঁহারা যেমন করিয়াই হউক যাইয়া গাড়ীতে উঠিবেন—বিপদে নিয়ম নাই—তখন আর কি বলা যায়? সে ক্ষেত্রে যুক্তির অবকাশ থাকে না।

বাধ্য হইয়া নারায়ণচন্দ্রকে সম্মতি দিতে হইল। তবে সে জানিত, হাওড়া ষ্টেশনে যাইয়া ফিরিয়া আসিতে হইবে এবং তাহা জানিয়া সে কি করিবে তাহাও স্থির করিয়া লইয়াছিল।

তখন রন্ধনের আয়োজন হইল এবং ও দিকে গোযানে মালপত্র পাঠান চলিতে লাগিল। স্থির হইল, সকলে বেলা এগারটায় ট্যাক্সীতে বাহির হইয়া বালী-সেতুর পথে ঘুরিয়া হাওড়া ষ্টেশনে আসিবেন; কারণ, বুধবারে এক ভদ্রলোকের দুর্দ্দশার সংবাদ সহরে রটিয়া গিয়াছিল। হাওড়ার সেতুর মুখে কলিকাতার দিকে যান হইতে অবতরণ করিতে বাধ্য হইয়া তিনি যখন ৩২টি কুলীর মাথায় মাল চাপাইয়া সপরিবারে হাওড়ার দিকে অগ্রসর হয়েন, তখন তাঁহাকে জনতায় গৃহিণী ও পুত্রবধূদিগের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হওয়ায় একটি কুলী যে বাক্স লইয়া অদৃশ্য হয়, তাহাতে প্রায় দুই হাজার টাকার জিনিষ ছিল। সে বাক্সও পাওয়া যায় নাই—বাক্সের অধিকারীরা ষ্টেশনে প্রবেশ করিতেও পারেন নাই।

গৃহের মহিলাদিগের—বিশেষ তাহার মা, পিসীমা ও পিতামহীর ভীরুতাজনিত দৌর্ব্বল্য ও অভ্যাসজনিত জড়ত্ব নারায়ণচন্দ্রের অজ্ঞাত ছিল না। তাঁহারা তাহাকে যে ভাবে "মানুষ করিয়াছেন" তাহাতে অনেক সময় তাহার হাসি পাইয়াছে; সেকালে যখন কাবুল হইতেই আঙ্গুর আমদানী হইত, তখন যে ভাবে তুলায় দ্রাক্ষাফল ঢাকিয়া বাক্সে রাখা হইত, তাহাকে তাঁহারা যেন সেই ভাবে "মানুষ করিয়াছেন।" তাহার আত্মনির্ভরের বৃদ্ধি নিবারণের জন্য তাঁহারা কিছুতেই অস্ত্রোপচার করিতে ছেন নাই। তাঁহারা যে জনারণ্যে কখনই প্রবেশ করিতে পারিবেন না এবং অপরিচিত যাত্রীদিগের সহিত ট্রেণের কামরায় যাইতে পারিবেন না, তাহা সে জানিত। কিন্তু তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া কয় ঘণ্টাকাল কলিকাতায় রাখা অসাধ্যসাধন বুঝিয়া সে, সে বিষয়ে চেষ্টা করে নাই।

ষ্টেশনের নিকটে যখন তাঁহারা জনতা ও সেই জনতাকে সংযত করিবার জন্য পুলিসের লাঠি-চালনা লক্ষ্য করিলেন, তখন মহিলারা আপনাদিগের ভ্রম বুঝিলেন। কিন্তু উপায় কি? তখন সেই অবস্থায় তাঁহারা শেষ সম্বল বাহির করিলেন—অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

তাঁহাদিগের অবস্থা দেখিয়া নারায়ণচন্দ্র যাহা স্থির করিয়া আসিয়াছিল, তাহা ব্যক্ত করিল—ট্যাক্সীতেই সকলে বাদশাহী সড়কে ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে যাইবেন এবং তথায় অপরাহ্ণের যে ট্রেণে তাঁহাদিগের জন্য কামরা থাকিবে, তাহাতে প্রবেশ করিবেন।

প্রস্তাব শুনিয়া মহিলারা তখন অকূলে কূল পাইলেন।

ট্যাক্সী-চালকগণ সুযোগ পাইয়া যে টাকা ভাড়া চাহিল, তাহা যত অসঙ্গত অধিক হউক না কেন, তাহাতেই সম্মত হওয়া ব্যতীত গতি ছিল না।

অনেক জিনিষ দ্বারবানের দল গো-যানের বা মহিষ-যানের সঙ্গে থাকিয়া ফিরাইয়া লইয়া গেল। কয় জন ভৃত্য ও দাসী অপরাহ্ণের ট্রেণে, যে উপায়েই হউক, যাইবে স্থির রহিল।

কাহারও লক্ষ্য করিবার সুযোগ হইল না যে, আহার্য্যের পাত্রগুলি, এমন কি জলের কুঁজাও সঙ্গে লওয়া হইল না।

পথে জনতা—অতি সাবধানে, গতি সংযত করিয়া ট্যাক্সী-চালকগণ যান চালাইয়া অবশেষে ব্যাণ্ডেল রেলষ্টেশনে উপনীত হইয়া যাত্রা নামাইয়া যে ভাড়া চাহিয়াছিল, তাহা লইয়াও আবার বক্সিসের জন্য হাত পাতিল। সঙ্গে ম্যানেজার বাবু ছিলেন। তিনি তখন যেন "উৎসাহে বসিল রোগী শয্যার উপরে"—যানচালকদিগকে হুঙ্কার দিয়া বলিলেন, "অনেক ঠকাইয়াছ—আর এক পয়সাও পাইবে না!"

৩

ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে উপনীত হইয়া সকলের নানা দ্রব্যের অভাব অনুভূত হইল; বালক-বালিকারা ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িয়াছিল, আসিবার সময় ভাত আর ডাইল ব্যতীত কিছুই রন্ধন হয় নাই। কিন্তু উপায় কি? ষ্টেশনে যে আহার্য্য পাওয়া যায়, তাহা খাইতে বা কাহাকেও খাইতে দিতে নারায়ণচন্দ্রের বিশেষ আপত্তি ছিল—সে সকল রোগ

ডাকিয়া আনে। শেষে ষ্টেশনে যতগুলি কমলালেবু ছিল, সবগুলি কিনিয়া লইয়া তাহাই বালক-বালিকাদিগকে বণ্টন করিয়া দিয়া সকলে সন্ধ্যার ট্রেণের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রোদয় হইল—চন্দ্রালোক বোমার ভয়ে আপনাকে নির্ব্বাপিত করে না। আর ষ্টেশনে কলিকাতার আলোক নিয়ন্ত্রণের নিয়ম না থাকায় বহু দিনের পর যেন একটা নূতনত্ব অনুভূত হইতে লাগিল।

ম্যানেজার বাবু ষ্টেশন-মাষ্টারের সহিত ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলেন, সকলকে সুষ্ঠুভাবে কামরায় তুলিয়া দিতে যদি ট্রেণ দুই চারি মিনিট বিলম্বে ছাড়িতে হয়, তিনি তাহাতে আপত্তি করিলেন না।

দুঃখ, দুর্দ্দশা, আশঙ্কা, বিপদ—সময়কে দীর্ঘ অনুভব করায়, অপেক্ষার যেন শেষ নাই এমনই অনুভব করায়। কিন্তু সময়ের শেষ আছে—অপেক্ষার অন্ত হয়। সন্ধ্যার পর নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার প্রায় এক ঘণ্টা পরে ষ্টেশনের বৈদ্যুতিক যন্ত্রে কি বাজিয়া উঠিল। ষ্টেশন-মাষ্টার আসিয়া নারায়ণচন্দ্রের ম্যানেজার বাবুকে বলিলেন, ট্রেণ আসিতেছে—সকলে প্রস্তুত হউন।

সকলে ষ্টেশনের বিশ্রামকক্ষে স্থান পাইয়াছিলেন। ছেলেরা প্রায় সমস্ত দিন অনাহারে ও আতঙ্কে শ্রান্ত ও অবসন্ন হইয়া ঘুমাইয়া পড়িতেছিল। তাহাদিগকে ধমকাইয়া ও অনুরোধ করিয়া সজাগ করা হইল। তাহার পর সকলে প্ল্যাটফর্ম্মে আসিলেন। সকলেরই যে যথেষ্ট আবরণ-বস্ত্র ছিল, তাহাও নহে—যে বিশৃঙ্খলা হইয়াছিল, তাহা কেহ পূর্ব্বে কল্পনা করিতে পারেন নাই।

শেষে দূরে এঞ্জিনের আলোক দেখা গেল এবং শীতের রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া—বিদীর্ণ করিয়া এঞ্জিনের বাঁশী শুনা গেল। ট্রেণ অগ্রসর হইল—রেলের শ্রমিক ও বেসরকারী শ্রমিক সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল—অন্য যাত্রীরাও কলরব করিতে লাগিল।

ট্রেণ আসিল।

ষ্টেশন-মাষ্টার তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলেন—নারায়ণচন্দ্রের সহযাত্রীরা উঠিতে না পারা পর্য্যন্ত ট্রেণ ছাড়িতে দিলেন না। মহিলাদিগের মধ্যে কয় জন জীবনে কখন এই ভাবে ট্রেণে উঠেন নাই; তাঁহাদিগের উঠিতে বিলম্বও হইল। দাসদাসী যাহারা মধ্যাহ্ন হইতে অপেক্ষা করিয়া অপরাহ্ণের এই ট্রেণে আসিয়াছিল, তাহারা তাড়াতাড়ি দ্রব্যাদি প্রভুদিগের কামরায় আনিয়া তুলিয়া দিল।

ষ্টেশন-মাষ্টার আসিয়া সকলকে শীঘ্র যে যাহার কামরায় যাইতে বলিলেন—ট্রেণ ছাড়িতে আর বিলম্ব হইলে তাঁহাকে কৈফিয়ৎ দিতে হইবে। তাঁহার সেই কথা ম্যানেজার বাবুকে তাঁহার প্রতিশ্রুত ব্যবস্থার বিষয় স্মরণ করাইয়া দিল।

ম্যানেজার বাবু নারায়ণচন্দ্রের নিকট বিদায় লইলেন; তিনি কলিকাতাগামী ট্রেণে ফিরিয়া যাইবেন। তথায় ভৃত্যগণ প্রভুদিগের যে অবস্থা লক্ষ্য করিয়াছিল, তাহাতে তাহারা যে আর সহজে কলিকাতায় থাকিতে চাহিবে না, তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন—নারায়ণচন্দ্রেরও সেই আশঙ্কা ছিল। অথচ বিরাট্ গৃহে বিশাল ভৃত্যবাহিনী; তদ্ভিন্ন দুগ্ধের জন্য অনেকগুলি গবী ছিল এবং মোটরযানের পেট্রল নিয়ন্ত্রণের ফলে গাড়ীর ঘোড়ার সংখ্যাও বাড়াইতে হইয়াছিল। এই বিপদে সে সব সম্পদ্ আপদ বলিয়া মনে হইতেছিল। সে সকল সম্বন্ধে বিশেষ ভাবনা উপস্থিত হইয়াছিল।

নারায়ণচন্দ্র ম্যানেজার বাবুকে অবারিত নির্দ্দেশ দিল—ভৃত্যদিগের বেতন যেরূপ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, তিনি যেন তাহাই করিয়া তাহাদিগকে নিজ নিজ কাযে রাখেন।

নারায়ণচন্দ্রের পিতামহী বলিলেন, "ভগবান্ যা' করেন, ভালর জন্যই করেন। আগের বার যাবার সময় যে শ্রীধরকে বাড়ীতে পাঠিয়েছিলাম, সে তাঁরই ইচ্ছায়; নহিলে আজ কি বিব্রত হ'তেই হ'ত।"

ম্যানেজার বাবু বলিলেন, "আপনার কথাই ফলুক, কর্ত্তামা। কিন্তু কি জানি—বড় হিস্যার ম্যানেজার বাবু বলছিলেন, যুদ্ধের কাযে সরকার বড় বড় বাড়ী 'গোরাদের' জন্য নিচ্ছে; সে বাড়ী নিতে চেষ্টা করেছিল, কেবল তা'তে ঠাকুর থাকায় তাঁ'রা অব্যাহতি পেয়েছেন।"

পিতামহী উদ্দেশে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "তিনিই অব্যাহতি দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের ত ভাবনার কথা হ'ল?"

এই সময় ট্রেণ চলিবার শেষ ঘণ্টাধ্বনি হইল—ষ্টেশনের কর্ম্মচারীরা চীৎকার করিয়া সকলকে সতর্ক করিল—ট্রেণ ছাড়িতেছে।

বৃহদাকার সরীসৃপ কিছুক্ষণ স্থির হইয়া থাকিবার পর কোন শব্দে চমকিত হইলে যেমন ভাবে চলিতে থাকে, ট্রেণ সেই ভাবে চলিতে লাগিল।

পিতামহী ম্যানেজার বাবুর কথার জের টানিয়া পৌত্রকে বলিলেন, "শুনলে ত ম্যানেজারের কথা? এখন উপায় কি হ'বে?"

নারায়ণচন্দ্র বলিল, "কি হ'বে বলা দুষ্কর।"

"কোন উপায় করবে না?"

পূর্ব্বরাত্রি হইতে এ পর্য্যন্ত তাহাকে যে ঝঞ্চাট "পোহাইতে" হইয়াছে, তাহাতে—এইরূপ অবস্থায় অনভ্যস্ত নারায়ণচন্দ্র বিরক্ত হইয়াছিল। সে বলিল, "উপায় করা ত আমার হাত নহে। বলছ, ঠাকুরের ইচ্ছায়ই তাঁ'কে কলিকাতা থেকে সরিয়েছিলে। হয়ত তাঁ'রই ইচ্ছা, বাড়ী সরকার দখল করে।"

পিতামহী যেন শিহরিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "বল কি সর্ব্বনাশের কথা?"

"এই যুদ্ধে কত দেশে কত লোকের সর্ব্বনাশ হচ্ছে, তা' ত অনুমান করতে পার।"

"আমরা কি যুদ্ধ করছি?"

"না। কিন্তু জানই ত, 'নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়?' উপায় কি?"

"তুমি ত বেশ নিশ্চিন্ত দেখছি!"

"উপায় যে নাই, ঠাকুরমা।"

"ও হিস্যা ত অব্যাহতি পেয়েছে।"

"এক জনের যা' হয়, সকলেরই ত তা' হয় না। 'মরকত-কুঞ্জ'ও যে সরকার নিয়েছে; মহারাজা ঠেকা'তে পারেন নাই।"

"চেষ্টা ত করতে হ'বে।"

"আমি তোমাদের রেখে ফিরে গিয়ে দেখি, কি করা কর্ত্তব্য।"

নারায়ণচন্দ্রের মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা'র মানে?"

নারায়ণচন্দ্র বলিল, "যে তাড়াতাড়ি করতে হ'ল, তা'তে ত কলিকাতার বাড়ীর ও দপ্তরের কোন ব্যবস্থাই করা হয়ে উঠে নাই।"

পূর্ব্ববার সকলের কলিকাতা ত্যাগের সময় দপ্তরের অনেক দলিলপত্রাদি গ্রামের বাড়ীতে লওয়া হইয়াছিল বটে, কিন্তু কলিকাতার

সম্পত্তির দলিলপত্রাদি কলিকাতায় ছিল এবং কয় মাসে আবার কতকগুলি কাগজপত্র কলিকাতায় জমিয়াছে।

মা মনে করিলেন, তাঁহারা যে তাড়াতাড়ি করিয়াছেন, পুত্রের কথায় তাহার দিকে ইঙ্গিত ছিল। তিনি বলিলেন, "বিকেলে এলে যখন বাড়ী থেকে বেরুতে হ'ত, আমরা না হয়, তা'র চার পাঁচ ঘণ্টা আগেই বেরিয়েছি ; তা'তেই কি ব্যবস্থার যত দেরী হ'ল ?"

পিসীমা বলিলেন, "সে তুমি যা'-ই কেন বল না, তোমার এখন কলিকাতায় ফিরা হ'বে না। তোমার জীবনের দাম আর সকলের জীবনের দামের চেয়ে বেশী।"

তিনি তাঁহার মাতার দিকে চাহিলেন। তিনি তখনও কোন মত প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার মতই সে গৃহে আদেশ। সেই জন্য তিনি বিবেচনা না করিয়া মত প্রকাশও করিতেন না।

তিনি মত প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই—তাঁহাকে সে অবসর না দিবার অভিপ্রায়ে—নারায়ণচন্দ্র বলিল, "আগে যাই। তা'র পরে আসবার কথা হ'বে।"

মা বলিলেন, "তুমি যা'-ই বল, এখন তোমার কলিকাতায় ফিরা হ'বে না।"

"কায ?"

"ম্যানেজার বাবুকে লিখে দিলেই হ'বে।"

"তাঁ'র বুঝি প্রাণের ভয় থাকতে পারে না ?"

কেহ সে কথার কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। কর্ম্মচারী কায করিবে।—তাহার প্রাণের ভয় ?

মহিলাদিগের মধ্যে এক জন তত্তক্ষণে বালকবালিকা প্রভৃতির জন্য খাবার বাহির করিতেছিলেন। তিনি নারায়ণচন্দ্রকে বলিলেন, "সারা দিন ত কিছু খাও নাই—এখন খেয়ে নাও।"

সারা দিন যে তাহার খাওয়া হয় নাই, তাহা তাহার ক্ষুধা নারায়ণচন্দ্রকে জানাইয়া দিতেছিল। সে বলিল, "হাতে মুখে জল দিয়ে আসি।" ভৃত্য তাহার দুইখানি তোয়ালে বাক্স হইতে বাহির করিয়া রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা লইয়া সে স্নানের ঘরে প্রবেশ করিতে গেল। দ্বারকর্ণ ঘুরাইয়া সে বুঝিল, দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ। সে বিস্মিত হইল, বলিল, "এ কি ? এ কি ভিতর থেকে বন্ধ, না কি !"

সে সবলে দ্বারে আঘাত করিল।

মা বলিলেন, "কায নাই, হয়ত চোর লুকিয়ে আছে। পরের ষ্টেশনে দ্বারবানদের ডেকে খুলালেই হ'বে ; বিপদ ঘটতে কতক্ষণ ?"

নারায়ণচন্দ্র কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত করিল না। সে দ্বারে পদাঘাত করিল—হয়ত বলে আঘাত করিলেই দ্বার খুলিয়া যাইবে।

সে দুই বার পদাঘাত করিলেই ট্রেণের গমনশব্দের মধ্যে শুনা গেল, নারীকণ্ঠে কে বলিল, "আমি খুলে দিচ্ছি।"

সকলেই বিস্মিত হইলেন ! মা'র আশঙ্কা বিস্ময়কে অভিভূত করিল ; তিনি উঠিয়া যাইয়া পুত্রের হাত ধরিয়া টানিয়া বলিলেন, "চলে এস, নারায়ণ, আমি ভাল বুঝছি না—দ্বার বন্ধ—স্ত্রীলোকের গলা। কে জানে, কে কি ছলে ফিরছে ?"

পিসীমা বলিলেন, "লক্ষ্মী বাবা, মার কথা শুন।" তিনি আর এক জনকে বলিলেন, "পরের ষ্টেশনে গাড়ী থামলেই দ্বারবানদের ডাকবে।"

তিনি বলিলেন, "তা'রা ত আসবেই।"

সে পরিবারের প্রথা, ট্রেণ ষ্টেশনে আসিলেই দ্বারবান এক বা দুই জন আসিয়া কামরার দ্বারে দাঁড়াইত।

ঠিক সেই সময়ে স্নানাগারের দ্বার খুলিয়া গেল—কামরার উজ্জ্বল আলোকে প্রভাতালোকে ফুলের মত এক তরুণী বাহির হইয়া আসিল।

৪

মা পুত্রের হাত ধরিয়া ছিলেন—ছাড়িয়া দিতে ভুলিয়া যাইলেন। পিসীমা শেষ কথা কখন আপনি না বলিয়া ছাড়িতেন না—তাঁহারও সঙ্গিনীকে কথা বলা হইল না। সকলেই বিস্মিত ও মুগ্ধ দৃষ্টিতে তরুণীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। বিস্ময়ের কারণ—অপ্রত্যাশিত ভাবে তাহার আবির্ভাব"; মুগ্ধ হইবার কারণ—তাহার অসামান্য রূপ। সকলেই মনে মনে স্বীকার করিলেন—যে পরিবারে পুরুষানুক্রমে সুন্দরী বধূ-বরণের প্রথাহেতু পরিবার সুন্দর পরিবারে পরিণত ও সেই নামে পরিচিত হইয়াছে, সেই পরিবারেও এমন সুন্দরী এখন কেহ নাই—পূর্ব্বেও যে অনেক আসিয়াছেন এমন খ্যাতি নাই। খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দী কল্পনার যুগ নহে—সে যুগে মানুষ যে বিজ্ঞানকেও মৃত্যুর ও ধ্বংসের রথে যুক্ত করে, তাহা কলিকাতায় বোমাপাতে সকলে বুঝিয়াছেন—যে সময়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে তাহার আবির্ভাব, তখন সকলে যে যানে যাইতেছেন তাহা যাদুকরের সৃষ্টি নহে—বিজ্ঞানের আবিষ্কার-নৈপুণ্য ঘোষণা করিতে করিতে নৈশনিস্তব্ধতা নষ্ট করিয়া চলিতেছে ; যে বিস্ফোরকপাতের জন্য তাঁহারা কলিকাতা হইতে পলাইতেছেন, তাহা পুষ্পক হইতে বর্ষিত হয় নাই—কলে-চালিত জাপানী বিমান হইতে পড়িয়াছে। এ সকল না হইলে সকলে মনে করিতেন—ব্যাপারটি অতিপ্রাকৃত—কোন দেবকন্যা তাঁহাদিগকে বর ও অভয় দিতে আসিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, "সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্র। বিশেষ সুন্দর মুখের অধিকারী যদি যুবতী হয়, তবে সে মুখ অমোঘ অস্ত্র।" কথা সত্য। কিন্তু কুসুম যেমন প্রস্ফুটিত হইলে যে সৌন্দর্য্যে শোভা পায়, প্রস্ফুটোন্মুখ অবস্থায় তদপেক্ষাও সুন্দর দেখায়, তেমনই কিশোরীর কোমল সৌন্দর্য্য যুবতীর বিকশিত সৌন্দর্য্যকেও অতিক্রম করে। আর যে কিশোরী সুন্দরী সে যদি সাশ্রুনয়না হয়, তবে—প্রভাতশিশিরসিক্ত ফুলের মত তাহার সৌন্দর্য্যে আর কোন অভাবই থাকে না। এই তরুণী যে কাঁদিয়াছে, তাহা তাহার মুখ দেখিয়াই সকলে বুঝিতে পারিলেন—সে তখনও কাঁদিতেছিল—তাহার চক্ষুতে অশ্রু প্রভাতপবনান্দোলিত কুসুমে শিশিরের মত টল টল করিতেছিল—তাহার দেহ রোদনোচ্ছ্বাসে সেই কুসুমেরই মত আন্দোলিত হইতেছিল।

সর্ব্বাগ্রে বুঝি নারায়ণচন্দ্রের মনে হইল, তাহাকে উপবিষ্ট হইতে বলা সঙ্গত, শোভন—হয়ত প্রয়োজন। কিন্তু অপরিচিতা কিশোরী সুন্দরীকে সর্ব্বাগ্রে কথা বলিতে সে লজ্জা ও সঙ্কোচ অনুভব করিল। তাহার পিতামহীই সর্ব্বাগ্রে বলিলেন, "তুমি ব'স।" নারায়ণচন্দ্র স্বস্তি অনুভব করিল।

এক পার্শ্বের বেঞ্চে যে স্থানে নারায়ণচন্দ্র বসিয়াছিল, তথায় স্থান শূন্য দেখিয়া তরুণী সেই স্থানে বসিবার জন্য অগ্রসর হইলে পিতামহী বলিলেন, "এদিকে এস।" নারায়ণচন্দ্রের মাতা শাশুড়ীর

পার্শ্বে বসিয়া ছিলেন, শাশুড়ী তরুণীকে তাঁহার শূন্যস্থান দেখাইয়া দিলেন। তরুণী আসিয়া তথায় বসিল।

মা পুত্রের হস্ত ছাড়িয়া দিলেন; পুত্র যে স্থানে বসিয়াছিল, আপনি যাইয়া যথায় বসিলেন—কিশোরীর সম্মুখে বসিলে তাহাকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতে পারিবেন।

পিসীমা ভ্রাতুষ্পুত্রকে ডাকিলেন; বলিলেন, "আমার কাছে বসিবে—এস।"

নারায়ণচন্দ্রের মনে হইল, বলে—তথায় ত অধিক স্থান নাই; সে দাঁড়াইয়া থাকিবে। কিন্তু রহস্যময়ী তরুণীর সম্বন্ধে কৌতূহল তাহাকে অভিভূত করিতেছিল। পিসীমা তাহাকে যে স্থানে বসিতে বলিলেন, তথায় বসিলে—স্থানের কিছু অভাব হইলেও, সে তাহাকে লক্ষ্য করিতে পারিবে। সকলেই মনে করিলেন—যে পিতামহী এক সময়ে সমগ্র পরিবারে সুন্দরী বলিয়া পরিচিতা ছিলেন—বয়স ও শোকও যাঁহার দেহ হইতে রূপ মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই, কেবল তাহাতে গাম্ভীর্য্যের স্নিগ্ধতাসঞ্চার করিয়াছে—জরাও যাঁহার দেহ স্পর্শ করিতে যাইয়া—যেন দেবমূর্ত্তি অপহরণ করিতে যাইয়া অপহরণকারীর মত ইতস্ততঃ করিতেছে, এই তরুণীকে তাঁহার পার্শ্বেই শোভা পায়। নদীতে যখন জোয়ারের জল প্রবেশ করিয়া তাহাকে পূর্ণ করে, তখন তাহার অবস্থা যেরূপ হয়—তরুণীর সেই অবস্থা; তাহার যে বয়স, তাহাতে যৌবন তাহার দেহে পরিপূর্ণতার লাবণ্য দিতেছে—কিন্তু কৈশোর তখনও তাহার অধিকার ত্যাগ করে নাই, যৌবনও আপনার অধিকার অনুভব করিতে পারিতেছে না। উভয়েরই অবস্থা সেই—"ন যযৌ ন তস্থৌ।" তাহার পরিধানে একখানি রক্তবর্ণের রেশমী শাড়ী—তাহার বর্ণের আভা তাহার মুখে পতিত হইয়া তাহার বর্ণের সৌন্দর্য্য আরও বর্দ্ধিত করিয়াছে—সেই বর্ণের জামা তাহার অঙ্গ আবৃত করিয়া আছে; অঙ্গে অলঙ্কার অধিক নহে—কিন্তু সেগুলি দেখিলেই বুঝা যায়, নক্সা সুরুচির পরিচায়ক। অলঙ্কারগুলিতেও বেশের মত, তাহার পিতৃগৃহের স্বচ্ছল অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। কেশ কবরীমুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল—কেশের আতিশয্য ও দৈর্ঘ্য উভয়ই লক্ষ্য করিবার মত। সীমন্তে সিন্দূরের ও প্রকোষ্ঠে "লৌহের" অভাবে বুঝাইতেছিল, সে অবিবাহিতা।

নারায়ণচন্দ্রের পিতামহী তরুণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি?"

তরুণী বলিল, "সাগরিকা।"

"'সাগরের' স্নানের দিন বুঝি তুমি জন্মেছিলে?"

"না। সমুদ্রতীরে পুরীতে জন্মেছিলাম ব'লে বাবা আমার ঐ নাম দিয়েছিলেন।"

"পুরীতেই তোমাদের বাড়ী?"

"না। আমাদের বাড়ী বীরভূম জিলায়; ঠাকুরদাদা প্রতি বৎসর ক' মাস সপরিবারে পুরীতে থাকতেন।"

"তাঁ'র নাম কি?"

"তাঁ'র নাম ধনদাকিশোর ঘোষ চৌধুরী।" সাগরিকা এতক্ষণ কথায় কথায় অন্যমনস্ক ছিল। বাড়ীর কথায় তাহার কত কথা মনে পড়িল। রোদনোচ্ছাসে তাহার কথা পার্শ্বে উপবিষ্টা নারায়ণচন্দ্রের পিতামহী ব্যতীত আর কেহ শুনিতেই পাইলেন না।

পিতামহী বলিলেন, "কাঁদছ কেন? তুমি ত আমাদেরই স্বজাত; হয়ত খুঁজলে সম্বন্ধও বেরুবে। নিশ্চয় জেন, তুমি বিপদে বা জলে পড় নাই। কাল বাড়ীতে পৌঁছেই তোমার বাড়ীতে টেলিগ্রাফ ক'রে দেবার ব্যবস্থা করব; তাঁ'রা তা'র পেয়েই নিশ্চয় চলে আসবেন। তাঁ'রা নিশ্চয়ই তোমার চাইতেও বেশী ভাবছেন।"

যিনি ছেলেদিগের জন্য আহার্য্য ভাগ করিতেছিলেন, তিনি এই ব্যাপারে তাঁহার কায যেন ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এখন তাহা তাঁহার মনে পড়ায় তিনি বলিলেন, "ছেলেরা সব এস।" তিনি নারায়ণচন্দ্রকে বলিলেন, "যাও, তুমি হাত-মুখ ধুয়ে এস।"

নারায়ণচন্দ্র তোয়ালে লইয়া স্নানাগারে প্রবেশ করিতে যাইবার জন্য উঠিল। তাহার মাতা বলিলেন, "ঘরটা ভাল ক'রে দেখে ঢুক।"

পিসীমা হাসিয়া বলিলেন, "তোমার কি ভয় হচ্ছে, আরও কেহ আছে?"

নারায়ণচন্দ্র স্নানের ঘরে গেল।

তাহার পিতামহী সাগরিকাকে বলিলেন, "তোমারও ত এতক্ষণ অনাহারে গেছে। এ বার তুমি গিয়ে মুখে-চখে জল দিয়ে এস; কিছু খাও।"

নারায়ণচন্দ্র স্নানের ঘর হইতে ফিরিয়া আসিলে তাহার পিতামহী সাগরিকাকে বলিলেন, "তুমি যাও।" তিনি তাঁহার কন্যাকে বলিলেন, "একখানা গামছা কি তোয়ালে দে।"

কন্যা আপনি যেমন কাহারও গামছা ব্যবহার করিতে তেমনই আপনার গামছা কাহাকেও দিতে ভালবাসিতেন না। তিনি মা'র কথা অবজ্ঞা করিতেও পারেন না; সেই জন্য অব্যাহতি লাভের আশায় নারায়ণচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি দু'খানা তোয়ালেই ব্যবহার করেছ?"

নারায়ণচন্দ্র বলিল, "না, পিসীমা—একখানাই ব্যবহার করেছি।"

সাগরিকা সে-ই প্রথম নারায়ণচন্দ্রের দিকে চাহিল। তাহার মনে হইল, সে চক্ষুতে যেন বিদ্যুতের দীপ্তি—সে সহসা দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতে পারিল না বটে, কিন্তু তাহার পরেই দৃষ্টি নত করিল। তাহার পর সে স্নানের ঘরে গেল।

সাগরিকাকে, নারায়ণচন্দ্রের পিতামহীর কথায়, কিছু আহার করিতে হইল, নহিলে অশিষ্টতা প্রকাশ করা হয়; কিন্তু আহারে তাহার রুচি ছিল না। সে কেবল ভাবিতেছিল—এ কি হইল?

৫

সাগরিকা কিরূপে ট্রেণের কামরায় স্নানের ঘরে গেল, তাহা জানিবার জন্য সকলেরই কৌতূহলের অন্ত ছিল না—তাহার পরিচয় জানিবার জন্য কৌতূহলও অল্প ছিল না। কিন্তু নারায়ণচন্দ্রের পিতামহীর জন্য কেহ তাহাকে সে কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিতে বলিতে পারিতেছিলেন না। সে কিছু আহার করিবার পর পিতামহীই সে বিষয়ে তাহাকে প্রশ্ন করিলেন।

সাগরিকা বলিল, তাহার পিতামাতা বৎসরের অধিকাংশ কাল বীরভূম জিলায় তাঁহাদিগের পৈত্রিক গৃহেই থাকেন। তথায় তাঁহাদিগের পৈত্রিক সম্পত্তির এবং ধানের ও মানের রক্ষা-কার্য্যে পিতাকে ব্যাপৃত রাখে। তবে মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগকে কলিকাতায় আসিতেও হয়। কারণ, তাহার অগ্রজ দুই ভ্রাতার এক জন কলিকাতায় ওকালতী করিতেছে, আর এক জন এই বার ডাক্তারীতে

শেষ পরীক্ষা দিতেছে। এ বার পিতামাতা দ্বিতীয় পুত্রের বিবাহের জন্য পাত্রী স্থির করিবেন—এই উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন।

নারায়ণচন্দ্রের পিতামহী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর মেয়ের জন্য পাত্র দেখিতে নহে?"

সাগরিকা সে প্রশ্নের উত্তর দিল না বটে, কিন্তু লজ্জায় তাহার কর্ণমূল পর্য্যন্ত রক্তাভা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

তাহার পর পিতামহীর কথায় সে আবার বলিল, কয় দিন কলিকাতায় বোমাপাতের পর পিতা সকলকে লইয়া গ্রামে ফিরিয়া যাইতেছিলেন, মাতা বড়ই ভীতা হইয়াছিলেন। হাওড়া ষ্টেশনে জনতার বিষয় তাঁহারা শুনিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা কিরূপ, তাহা অনুমান করিতে পারেন নাই। তাঁহারা যে দুইখানি যানে আসিয়াছিলেন, সে দুইখানি যখন হাওড়া সেতুর কলিকাতার দিকস্থ মুখে আসিল, তখন পুলিস যান আর অগ্রসর হইতে দিল না। বাধ্য হইয়া সকলে অবতরণ করিলেন। সঙ্গে যে জিনিষ ছিল, তাহা ভারবাহীকে দিয়া সকলে জনাকীর্ণ সেতু অতিক্রম করিলেন। সে যেন জনসমুদ্র! এক ভ্রাতা পূর্ব্বে ট্রেণের টিকিট কিনিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই জন্য প্ল্যাটফর্ম্মে প্রবেশ করা সম্ভব হইল। কিন্তু সে কি কষ্টে!

সকলে ষ্টেশনে উপনীত হওয়া পর্য্যন্ত একসঙ্গে ছিলেন; কিন্তু যে প্ল্যাটফর্ম্মে ট্রেণ, তাহাতে উপনীত হইবার দ্বারপথে—একে একে যাইবার সময়—জনতায় সে আর সকলের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। অতি কষ্টে—তাঁহাদিগের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সে অগ্রসর হইল বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের ও তাহার মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। শেষে সে আর তাঁহাদিকের দিকে লক্ষ্য রাখিতে পারিল না।

সে জানিত, ঐ প্ল্যাটফর্ম্মেই ট্রেণ; সেই জন্য ট্রেণে পিতা-মাতা-ভ্রাতা-ভ্রাতৃবধূকে পাইবেই জানিয়া, যত চেষ্টা সম্ভব করিয়া, ট্রেণের নিকটে উপনীত হইল। প্রথমে যে সব কামরা, সেগুলির নিকটে দাঁড়াইয়া কয় জন রেলের উর্দ্দীপরা কর্ম্মচারী জনতায় যেন পিষ্ট হইয়া যাইতে যাইতে কেবল চীৎকার করিতেছিলেন—"এ গাড়ী নহে—আগের ট্রেণ আগে ছাড়িবে।" লোক তাঁহাদিগের কথা শুনিয়া দ্রুত অগ্রসর হইতেছিল।

সেই সময় এক দল গোরা ও বহু পাঠান সৈনিক—বলে সকলকে সরাইয়া পথ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। যাহারা প্রাণ দিতে ও প্রাণ লইতে যায়, তাহারা কি মানুষের মান ও প্রাণ সম্বন্ধে অবহিত হইতে পারে? অগ্রসর হইবার প্রয়োজনে ও আগ্রহে তাহারা অবাধে লোককে প্রহারও করিতে লাগিল। লোক ভীত হইয়া পড়িল। যেন স্বভাবতঃ চঞ্চল সমুদ্র প্রবল বাত্যায় বিক্ষুব্ধ হইল। রেলের কর্ম্মচারীরা তাহাদিগকে সংযত করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া সে চেষ্টা আর করিল না—তাহারাও আঘাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিল না। তাহাদিগের—বিশেষ পাঠানগুলির ব্যবহার এত অশিষ্ট ও তাহাদিগের কথার ইঙ্গিত এত ইতর যে, তাহারা নিকটে আসিয়া পড়িলে আত্মরক্ষার স্বাভাবিক চেষ্টায়, অনন্যোপায় হইয়া সে যে ট্রেণ পরে যাইবে তাহার যে কামরার নিকট দিয়া যাইতেছিল তাহাতেই উঠিয়া পড়িল এবং তাহাতে সৈনিকদিগের মধ্যে উচ্চ হাস্যরব শুনিয়া ভীত হইয়া স্নানের ঘরে যাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

নারায়ণচন্দ্রের পিসীমা বলিলেন, "ভগবান্ রক্ষা করেছেন—বিপদে তিনি ছাড়া গতি নাই; আমরা সেই কথাই বিপদে না পড়া পর্য্যন্ত ভুলে থাকি। কিন্তু তিনি কাযে তা' বুঝিয়ে দেন। কথা শুনে ভয়ে আমারই বুক কাঁপছিল।"

নারায়ণচন্দ্রের মাতা বলিলেন, "কি বিপদই না ঘটতে পারত!"

তিনি সে-ই প্রথম সহানুভূতিব্যঞ্জক কথা বলিলেন। সাগরিকার যে কথা ইতঃপূর্ব্বেই আর সকলের সহানুভূতি আকৃষ্ট করিয়াছিল, তাহাতে কেবল তিনিই এতক্ষণ সহানুভূতির প্রবাহ রুদ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন।

তাহার পর সাগরিকা যাহা বলিল, তাহাতে জানা গেল, সে ভীতিসঞ্জাত যে শক্তিতে আত্মরক্ষার প্রবোচনায় ট্রেণের কামরায় প্রবেশ করিয়া স্নানের ঘরে যাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিল, সে শক্তি তাহার দ্বার রুদ্ধ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর কি হইয়া ছিল, তাহা সে জানিতে পারে নাই। যখন তাহার সংজ্ঞা ফিরিল, তখন সে দেখিল, সে স্নানের ঘরের মেঝেয় বসিয়া আছে—তাহার মস্তক ঘরের কাষ্ঠপ্রাচীরে। সে কতক্ষণ সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছিল, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই; সময় দেখিবার জন্য হাত-ঘড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিল—তাহার কাচ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—ঘড়ী চলিতেছে না। কিন্তু সেই সময় ষ্টেশনের ঘড়ীতে তিনটা বাজিল। সে বুঝিল, তাহার যে ট্রেণে যাইবার কথা, তাহা তিন ঘণ্টা পূর্ব্বে ছাড়িয়া গিয়াছে। তাহার পিতামাতা?

স্নানের ঘর হইতে বাহির হইবার সাহস তাহার হইল না। সে যে ভয়ে তথায় প্রবেশ করিয়া লুকাইয়াছিল, সে ভয় তখনও "মুখ-চাপার" মত অনুভূত হইতেছিল। অতিকষ্টে উঠিয়া সসঙ্কোচে সে সেই ঘরের জানালার মধ্য দিয়া বাহিরের দিকে চাহিল—প্ল্যাটফর্ম্মে তখনও তেমনই জনস্রোতঃ—বন্যার জলে তরঙ্গের মত এ উহাকে ঠেলিয়া যাইতেছে। সেই জনারণ্যে সে কাহাকে ডাকিবে? ডাকিতে তাহার সাহস হইল না। তাহার মধ্যে সে তাহার পিতামাতাকে কি আর দেখিতে পাইবে? সে কি আর তাঁহাদিগের দেখা পাইবে?—বলিতে বলিতে যখন সাগরিকা কান্দিয়া ফেলিল, তখন নারায়ণচন্দ্রের পিতামহী তাহাকে সান্ত্বনা ও আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "তুমি ভয় ক'র না। আমি ত বলেছি, কাল বাড়ীতে গিয়েই তোমার বাবাকে তার করবার ব্যবস্থা করব; তুমি দেখবে, তিনি তা'র পরদিনই আসবেন।"

তাহার পর সাগরিকা বলিল, সে কি করিবে, তাহার কর্ত্তব্য কি—সে ভাবিয়া কিছুতেই স্থির করিতে পারিল না; সবই কেমন অস্পষ্ট মনে হইতে লাগিল। ভয়—চিন্তা যেন তাহার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটাইতে লাগিল। সে মধ্যে মধ্যে উঠিয়া জানালার ফাঁক দিয়া দেখিতে লাগিল—সে-ই জনস্রোতঃ। কলিকাতায় কি এত লোক ছিল? লোক কি কলিকাতা শূন্য করিয়া পাগলের মত ছুটিয়া চলিয়া যাইতেছে? কিন্তু এখন যদি জনস্রোতঃ শেষ হইয়া যায়, তাহা হইলেই বা সে কি করিবে? সে কোথায় যাইবে?—কাহাকে সে বিশ্বাস করিতে পারে? কাহার কাছে তাহার কথা বলিলে সে প্রতীকার পাইতে পারে? সে ভাবিতে লাগিল; কিন্তু ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না।

এই ভাবে আরও সময় অতিবাহিত হইয়া গেল। তাহার পর প্ল্যাটফর্ম্মের ঘড়ীতে ৫টা বাজিল। সে শুনিতে পাইল, সে যে

কক্ষের স্নানাগারে আশ্রয় লইয়াছিল, তাহার প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখে কাহারা বলিতেছে—সে গাড়ী "রিজার্ভ"—কেহ যেন তাহাতে না উঠে। মধ্যে মধ্যে, বোধ হয়, তাঁহাদিগের ভৃত্যগণই সেই কক্ষে প্রবেশার্থী যাত্রীদিগকে সেই কথা বলিয়া সে কক্ষে তাহাদিগের প্রবেশে বাধা দিতেছিল। সে ভাবিতে লাগিল—এই বার ত কেহ কামরায় আসিবেন। তখন সে কি করিবে?

ষ্টেশনের মধ্যে দিবালোক যেরূপ ম্লান হইতে লাগিল, তাহাতে বুঝা গেল, দিন শেষ হইয়া আসিতেছে। এই বার রাত্রি—তাহার অবস্থারই মত অন্ধকার—ভয়ানক! সে কাঁদিতে লাগিল।

তাহার পর সহসা ট্রেণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। সাগরিকা বুঝিল—এঞ্জিন ট্রেণে যুক্ত হইল; এই বার ট্রেণ চলিবে। ট্রেণ কোথায় যাইবে?

সত্যই ট্রেণ চলিল। কক্ষে আলোক জ্বলিয়া উঠিল—কিন্তু প্ল্যাটফর্মে আলোক-নিয়ন্ত্রণ-হেতু আলোক স্বল্প। তখনও প্ল্যাটফর্মে সেই জনতা—সেই কোলাহল—তাহার মধ্যে সে চীৎকার—আর্ত্তনাদ করিলেও কেহ শুনিতে পাইবে না।

ট্রেণ চলিলে সে এক বার সাহস করিয়া স্নানাগারের দ্বার অতি সন্তর্পণে একটু খুলিয়া কামরার দিকে চাহিয়া দেখিল; দেখিল, ভৃত্যগণ কতকগুলি দ্রব্য রাখিয়া গিয়াছে—কিন্তু কক্ষে কেহ নাই।

ট্রেণ চলিতে লাগিল—কক্ষে আলোক ক্রমে উজ্জ্বল হইল।

তাহার পর কাহারা কক্ষে প্রবেশ করিলেন—সে তাঁহাদিগের কথা শুনিতে পাইল। কিন্তু সে কি করিবে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না।

তাহার পর যে ষ্টেশনে ট্রেণ থামিল, তাহাতে কয় জন দাসদাসী প্রভৃতি দিগের কক্ষে উঠিল—শয্যা রচনা করিয়া দিয়া যাইবে। নারায়ণচন্দ্রের পিতামহী নির্দ্দেশ দিলেন—নারায়ণচন্দ্রের শয্যা উপরের একটি আসনে রচিত হইবে; বড় বড় ছেলেরা ঐরূপ আর একটি আসনে শয়ন করিবে; নিম্নের আসনদ্বয়ে যথাক্রমে নারায়ণচন্দ্রের মাতার ও পিসীমার শয্যা হইবে। আর সেই আসনদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে যে শয্যা রচিত হইবে, তাহাতে তিনি সাগরিকাকে আর যাঁহারা সে কক্ষে ছিলেন, তাঁহাদিগকে লইয়া শয়ন করিবেন। তাঁহার কথার উপর কেহ কথা বলিতে পারেন না।

ব্যবস্থা ছিল, কামরা তাঁহাদিগের গন্তব্য ষ্টেশনে ট্রেণ হইতে বিচ্যুত করিয়া রাখা হইবে, প্রাতে তাঁহারা গৃহাভিমুখে যাত্রা করিবেন। তাঁহাদিগের জন্য যান তথায় আসিবে।

বড় কষ্টে এবং ভীতি ও চিন্তাজনিত শ্রান্তিতে সাগরিকা ঘুমাইয়া পড়িল।

৬

গৃহে উপনীত হইয়াই নারায়ণচন্দ্রের পিতামহী তাহাকে বলিলেন, সাগরিকার পিতাকে টেলিগ্রাফ করিয়া তাহার বিষয় জানান হউক—তাঁহাকে কোন্ ষ্টেশনে ট্রেণ হইতে নামিতে হইবে, তাহা যেন জানান হয় এবং তিনি কবে আসিবেন, তাহা জানাইতে বলা হয়।

নারায়ণচন্দ্রকেই সাগরিকার নিকট হইতে তাহার পিতার নাম ও ঠিকানা জানিয়া লইতে হইল।

পরিবারের যাঁহারা গ্রামের গৃহেই ছিলেন, তাঁহারা এই অপরিচিতাকে দেখিয়া তাহার সম্বন্ধে সকল বিষয় জানিতে বিশেষ কৌতূহলাক্রান্তা হইলেন। সর্ব্বাগ্রে নারায়ণচন্দ্রের পিতামহীর "মেজদিদিই" সে বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন। এই মেজদিদি নারায়ণচন্দ্রের পিতামহদিগের কয় ভ্রাতার মধ্যে মধ্যমের বিধবা। পিতামহরা চারি ভ্রাতা ছিলেন—সকলেই পরলোকগত। জ্যেষ্ঠের একমাত্র পুত্রের পুত্ররাই বড় হিস্যা নামে পরিচিত। মধ্যম যখন যুবক, তখন অশ্ব হইতে পতনের ফলে পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত হইয়া কয় মাস পরে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহার কোন সন্তান হয় নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন—পৈত্রিক গৃহের এক চতুর্থাংশ ও মাসিক ৭ শত ৫০ টাকা আয় তাঁহার বিধবা যাবজ্জীবন সম্ভোগ করিবেন; সম্পত্তি তাঁহার তিন ভ্রাতার মধ্যে বিভক্ত হইবে। তৃতীয় ভ্রাতা যুক্তপ্রদেশে জমিদারী পরিদর্শনে যাইয়া বিসূচিকায় প্রাণ হারাইয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী তখন সন্তান-সম্ভবা ছিলেন—রক্তশূন্যতাহেতু প্রসবকালে প্রসূতি ও প্রসূত উভয়েরই প্রাণবিয়োগ ঘটে। নারায়ণচন্দ্রের পিতামহী কনিষ্ঠের বিধবা। তাঁহার দুই পুত্র হইয়াছিল; কনিষ্ঠ বিবাহের পূর্ব্বেই অবিরাম জ্বরে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল—জ্যেষ্ঠও আজ আর নাই; নারায়ণচন্দ্র তাহার একমাত্র পুত্র। জ্যেষ্ঠের ও কনিষ্ঠের পুত্রদিগের মৃত্যুর পর মেজদিদি আর প্রায় গ্রামের গৃহে থাকেন না। গৃহ ও সম্পত্তি বিভাগের সময় তিনি গৃহে তাঁহার অংশ দুই অংশের অধিকারীদিগকে সমভাগে বিভক্ত করিয়া দিয়াছেন—আপনি কখন বৃন্দাবনে, কখন জগন্নাথক্ষেত্রে থাকেন, কখন বা দ্বারকাদি তীর্থ ভ্রমণ করিয়া দেবতার কোন উৎসবানুষ্ঠানের সময় গ্রামের গৃহে আসিয়া থাকেন। তাঁহার সহিত সকলেরই বিশেষ সদ্ভাব—কারণ, তিনি সকলকে ভালবাসিয়াই সুখী। যখন জাপান ইংরেজের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করে, তখন তিনি পুরীতে ছিলেন; নাতীরাই জিদ করিয়া তাঁহাকে তথা হইতে গ্রামের গৃহে আনিয়াছে।

তাঁহার জিজ্ঞাসায় নারায়ণচন্দ্রের পিতামহী বলিলেন, "চল মেজদিদি—আগে ঠাকুরবাড়ীতে ঠাকুর-প্রণাম ক'রে আসি; তা'র পর সব বলব।"

তিনি স্নান শেষ করিলে দুই জা' ঠাকুর বাড়ীতে গমন করিলেন। তাঁহাদিগের পূজার্চ্চনা শেষ করিয়া ফিরিতে বিলম্ব হইল। ততক্ষণে গৃহের আর সকলে পিসীমা'র নিকট হইতে সাগরিকার কথা শুনিয়াছেন।

ঠাকুরবাড়ী হইতে ফিরিবার সময় নারায়ণচন্দ্রের পিতামহী মেজ দিদিকে সব কথা বলিলেন। শুনিয়া তিনি বলিলেন, "এ যে একেবারে রূপকথার কাণ্ড, ছোটবৌ!"

ঠাকুরবাড়ী হইতে প্রসাদ আসিলে উভয়ে তাহাই গ্রহণ করিলেন এবং আহারের পরে মেজদিদি নারায়ণচন্দ্রের পিসীমাকে বলিলেন, "ডাক্ ত, মা, মেয়েটিকে—ভাল ক'রে দেখতে পাই নাই।"

সাগরিকা আসিয়া তাঁহাকে ও সঙ্গে সঙ্গে নারায়ণচন্দ্রের পিতামহীকে প্রণাম করিল। মেজদিদিই তাহাকে তাঁহার কাছে বসিতে বলিলেন এবং তাহার পরিচয় লইতে লইতে বার বার তাহার দিকে চাহিয়া শেষে বলিলেন, "আমি যেন তোমাকে কোথায় দেখেছি—মুখ চেনা-চেনা মনে হচ্ছে।"

নারায়ণচন্দ্রের পিতামহী বলিলেন, "ওরা ত পূর্ব্বে প্রতি বৎসর ক' মাস ক'রে পুরীতে থাকত—সেখানে নহে ত?"

যাহা মনে পড়ে-পড়ে পড়ে না, তাহা মনে পড়িলে লোকের যেমন হয়, মেজদিদির তেমনই হইল। তিনি বলিলেন, "ঠিক বলেছিস্, ছোটবৌ, ঠিক বলেছিস্। মন্দিরে দেখেছি। কি বলব, ছোটবৌ, আমি ত পুরী গিয়ে মন্দিরে যেতাম আর ঠাকুর দেখেই চ'লে আসতাম; কিন্তু ওর ঠাকুরমা যখন নাতীনাতনী সব নিয়ে বসে আছেন দেখতাম, তখন মনে হ'ত যেন চাঁদের মেলা বসেছে—আমি না দেখে যেতে পারতাম না। ক' দিন তাঁর পরিচয় নিয়েছিলাম। তাই ত বলি, ও রূপ আর ও মুখ—ও যে আমার চিনা।"

"তুমি ত বলেই থাক, মেজদিদি, ধোপ কাপড়ের নেকড়াও ভাল।"

"সে আর বলতে? আমি পরিচয়ও নিয়েছিলাম; মনে করেছিলাম, তোকে বলব, নাংবৌ করবার মত মেয়ে পেয়েছি—নারায়ণের বিয়ে দে। কিন্তু ছাই আর কি মনে থাকে? একে ত বয়সের গাছপাতর নাই—ভুষণ্ডী ব'সে আছি—তাইতে আবার কখন্ কোথায় থাকি ঠিক নাই। নিজের সাধ, আহ্লাদ সে সব ত কবে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে—বড়দিদির আর তোর দু'টোকে নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি; তা' তা'ও অদৃষ্টে সহিল না। সেই অবধি স্রোতের শেয়ালার মতই ভেসে ভেসে বেড়াই। কবে যে শেষ হ'বে!"

বিবাহের কথায় সাগরিকার দৃষ্টি লজ্জায় নত হইল। মেজদিদির কথা শুনিয়া তাহার মনে পড়িল, শ্রীমন্দিরে তাঁহাকে দেখিয়াছিল—তিনি এমন ভাবে মুড়ী দিয়া আসিতেন যে, তাহাতেই সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইত।

কথাগুলি বলিবার সময় মেজদিদির কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিয়াছিল। নারায়ণচন্দ্রের পিতামহী জানিতেন, তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা একান্ত সত্য।

মেজদিদি নারায়ণচন্দ্রের পিসীমা'কে বলিলেন, "নিয়ে যা, মা, মেয়েটিকে—কত ভাবনায় ছিল, একটু ঘুমিয়ে সুস্থ হক।"

উভয়ে চলিয়া যাইলে মেজদিদি জা'কে বলিলেন, "ছোটবৌ, যেমনটি খুঁজছিলি, তেমনটিই ত পেয়েছিস—নারায়ণের বিয়ে দে।"

জা' বলিলেন, "খোঁজ নিতে হ'বে ত, মেজদিদি।"

"কি আর খোঁজ নিবি? খোঁজ আমি তখনই নিয়েছিলাম; ধার মেয়ের কাছেও ত পরিচয় পেয়েছিস্। বুঝতে পারলি না—ও যে সেজ-বৌয়ের মামার বাড়ীর লোক।"

"কিন্তু—"

"আর কিন্তুতে কায নাই। কম্বলের লোম বাছতে বাছতে, শেষে আর কম্বলই থাকে না। এখন ত দেখি, সব কুলে পোকা ধরেছে।"

"সে কথা সত্য, মেজদিদি। তবুও বড় হিস্তাদের এক বার, জানা'তে হ'বে ত?"

"আর জ্বালাস না, ছোটবৌ; তুই কি এখনও কণে বৌটি আছিস যে—অত ভয়? আর বড় হিস্তার কা'কে জানাবি? বড়দিদি কি বেঁচে আছে? এখন ত বৌ-ই গৃহিণী; শাশুড়ী হয়ে কি বৌকে মানতে হ'বে না কি? আমি ত সকলের বড়—আমি যা' বলব, তা'তে কে আপত্তি করতে পারবে?"

"কোষ্ঠীর বিচার?"

"না—ও সব আর করিস না। কোষ্ঠীর বিচার ক'রে বিয়ে আমারও হয়েছিল, সেজবৌ'রও হয়েছিল। কি সম্পদই হয়েছে! তোর নিজেরই বা কি? এক বড়দিদি ভাগ্যবতী যেতে পেরেছে। কথায় বলে—'যাচা মেয়ে আর কাচা কাপড় ত্যাগ করতে নাই।' এ মেয়ে যাচারও বাড়া—ভগবানের দান—ফিরাস না, ফিরাতে নাই, ছোটবৌ। কি রূপ! যেন জগদ্ধাত্রী! তোর পাশে বসবার উপযুক্ত।"

"এখনও আমার তুলনা দিবে, মেজদিদি?"

"তা' দিব—তুই যে আমার ছোট বোন।"

"ভাল, ওর বাপ আসুন—কথা বলা যা'বে।"

"কথা আবার কি? মেয়ের ভাগ্য ভাল হ'লে—এ সম্বন্ধ পা'বে।"

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কি একটু গড়া'বি?"

জা' উত্তর দিলেন, "না, মেজদিদি, ঠাকুরবাড়ীতে যা'ব।"

"তবে চল।"

৭

নারায়ণচন্দ্রের সহিত সাগরিকার বিবাহ দিবার ইচ্ছা যে নারায়ণচন্দ্রের পিতামহীর মনে উদিত হয় নাই, তাহা নহে। কিন্তু একটা বড় সংসার পরিচালনের ফলে, তাঁহার মনে কোন ইচ্ছা হইলে তিনি বিশেষ বিচার-বিবেচনা না করিয়া তাহা প্রকাশ করিতেন না—জহুরী যেমন হীরা পাইলে তাহা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখে, তেমনই তিনি চারি দিক্ হইতে তাহা বিবেচনা করিতেন। মেজদিদির কথায় তিনি ইচ্ছা ব্যক্ত করিবার কারণ পাইলেন। কিন্তু তিনি যে পরিবারের বধূ, সেই পরিবারের সম্ভ্রম সম্বন্ধে তিনি বিশেষ সতর্ক ছিলেন; কি ভাবে কথাটা উত্থাপিত করিবেন, ভাবিতে লাগিলেন। শেষে তিনি স্থির করিলেন, সাগরিকার পিতা আসিলে পুরোহিত ঠাকুরকে দিয়া কথাটা উত্থাপিত করাইবেন—মেজদিদি পুরোহিত ঠাকুরকে সে কথা বলিবেন।

দিন অতিবাহিত হইল। রাত্রিতে মেজদিদি সাগরিকাকে বলিলেন, "আমি, তুমি আর ছোটবৌ—একই বয়সী ত—তিন জন এক ঘরে থাকব; কি বল?"

সেই ব্যবস্থাই হইল এবং রাত্রিতে শুইয়া নারায়ণচন্দ্রের পিতামহীর আর যে সব কথা জানিবার ছিল, সে সব তিনি সাগরিকাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইলেন। বিবাহে আপত্তির কোন কারণ দেখা গেল না।

পরদিন সাগরিকার পিতার টেলিগ্রাম আসিল, তিনি সেই দিন রাত্রিতে যাত্রা করিয়া পরদিন প্রাতে আসিয়া উপনীত হইবেন।

আরও এক দিন সাগরিকা সেই গৃহে সকলের আদর ও যত্ন সম্ভোগ করিল।

তাহার পরদিন সাগরিকার পিতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পিতাপুত্রীতে সাক্ষাতের কি আনন্দ! পিতা আশা করিতে পারেন নাই যে, আর কন্যাকে পাইবেন। কন্যাও ভাবিতে পারে নাই যে, আবার পিতামাতার কাছে যাইতে পারিবে। তাই এ সাক্ষাৎ আশারও অতীত ছিল।

সাগরিকার পিতা জ্ঞানদাকিশোর কন্যার নিকট সকল কথা শুনিলেন এবং শুনিয়া যেমন ভগবান্‌কে ধন্যবাদ জানাইলেন, তেমনই নারায়ণচন্দ্রের পিতামহী প্রভৃতিকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম জানাইয়া বলিলেন—তাঁহাদিগের ঋণ তিনি ও তাঁহার পরিবার কখন শোধ করিতে পারিবেন না।

তাঁহার কথা শুনিয়া নারায়ণচন্দ্রের পিতামহী তাঁহাকে জানাইলেন—তিনি কেন অত কুণ্ঠিত হইতেছেন? তাঁহারা যাহা করিয়াছেন, তাহা না করিলেই মানুষের অপরাধ হয়—করায় কোন প্রশংসা নাই। তিনি আরও জানাইলেন—কয় দিনে সাগরিকা তাঁহাদিগের সকলেরই বিশেষ আদরের হইয়াছে—তাঁহাদিগকে মায়ায় জড়াইয়াছে।

পুরোহিত ঠাকুরের মধ্যস্থতায় যখন এই সব কথা হইতেছিল, তখন তিনি জ্ঞানদাকিশোরকে বলিলেন, "আমি ছোটমা'কে বলছি, মেয়েটির উপর যখন ওঁদের অত মায়া পড়েছে, তখন ওকে নাতবৌ করুন—নাতীর বিয়ের ত উদ্যোগও হচ্ছে। বিশেষ আমাদের মেজমা বলেন, তিনি পুরীতে আপনার মেয়েকে দেখেই মনে করেছিলেন, ছোটমা'কে ঐ কথা বলবেন। তবে তিনি তীর্থে তীর্থে ঘুরেন—বলতে ভুলে গিয়াছিলেন।"

জ্ঞানদাকিশোর সে কথায় সাধারণ শিষ্টাচারসঙ্গত উত্তর দিলেন, "সে ত আমার পরম ভাগ্য।"

তাহার পর তিনি বলিলেন, সাগরিকার মাতা কন্যার জন্য আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন—তিনি কন্যাকে দেখিয়া একটু সুস্থ হইলে তাঁহাকে এ কথা জানান যাইবে। তবে তিনিও যে এই সম্বন্ধ কন্যার সৌভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

জ্ঞানদাকিশোর সেই দিনই কন্যাকে লইয়া গৃহে যাইবার প্রস্তাব করিলে নারায়ণচন্দ্রের পিতামহী বলিয়া পাঠাইলেন, তাহা হইবে না—তাঁহাকে সে দিন থাকিয়া যাইতে হইবে—দিনটা "ভাল" নহে।

জ্ঞানদাকিশোরকে তাঁহার কথায় সম্মত হইতে হইল। তিনি গৃহে টেলিগ্রাফ করিয়া সংবাদ জানাইলেন এবং সে দিন—সময় পাইয়া—নারায়ণচন্দ্রের সম্বন্ধে সব সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা করিলেন। তাহার সম্পত্তি সম্বন্ধে কোন সংবাদ লইবার যে প্রয়োজন ছিল না, তাহা তিনি জানিতেন।

পরদিন জ্ঞানদাকিশোর কন্যাকে লইয়া যাত্রা করিবেন। নারায়ণচন্দ্রের পিতামহী বলিলেন—"বাপকে পেয়ে মেয়ের মুখে হাসি ফুটেছে!"

তাঁহার মেজদিদি বলিলেন, "মেয়ের মুখে ত হাসি ফুটেছে দেখলি; ছেলের মুখে যে হাসি শুকিয়ে গেল!"

"তা'-ও তুমি লক্ষ্য করেছ?"

"তা' করব না? আমি যে 'না বিয়িয়েই কানাইয়ের মা'। ওরাই ত আমার সব আশা—মুখে আগুন দিবে।"

তিনি নারায়ণচন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং সে আসিলে বলিলেন, "তোর হাত-ঘড়ীটা আমায় দে না, নারায়ণ।"

নারায়ণচন্দ্র সেটি হাত হইতে খুলিয়া দিয়া হাসিয়া বলিল, "মেজ ঠাকুরমা'র কি আবার হাত-ঘড়ী পরবার সখ হ'ল?"

তিনি বলিলেন, "পরবার নহে রে—পরাবার। সাগরিকার হাত-ঘড়ীটা ভেঙ্গে গেছে—গাঁটছড়া বাঁধার আগে আমি তোর ঘড়ীটা তা'র হাতে বেঁধে দিব। তা' হলে বাঁধন আর কাটতে পারবে না।"

নারায়ণচন্দ্র লজ্জা লুকাইবার জন্য সে স্থান হইতে চলিয়া গেল।

তাহার পিতামহী বলিলেন, "মেজদিদি, তুমি এত-ও জান?"

যাত্রার পূর্ব্বে সাগরিকা যখন সকলকে প্রণাম করিল, তখন মেজদিদি তাহার হাতে নারায়ণচন্দ্রের হাত-ঘড়ীটি পরাইয়া দিয়া বলিলেন, "দড়ী দিয়ে না বেঁধে ঘড়ী দিয়ে বাঁধলুম—মাঘ মাসেই ফিরে আসতে হ'বে।"

তিনি সাগরিকাকে সঙ্গে করিয়া ঠাকুরবাড়ীতে গমন করিলেন এবং তথায় তাহাকে ঠাকুর প্রণাম করাইয়া ঠাকুরের ফুল-তুলসী পুরোহিত ঠাকুরের নিকট হইতে লইয়া তাহার অঞ্চলে বাঁধিয়া দিলেন।

* * * *

গৃহে ফিরিয়া জ্ঞানদাকিশোর নারায়ণচন্দ্রের পরিবারের সকলকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইয়া এবং নারায়ণচন্দ্রের সহিত সাগরিকার বিবাহে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া তার করিলেন।

তখন দৈবজ্ঞ ঠাকুরের ডাক পড়িল। তিনি প্রতি বৎসর নারায়ণচন্দ্রের কোষ্ঠী বিচার করিয়া বর্ষফল গণনা করিয়া দিতেন। তিনি মনে করিলেন বর্ষফল-গণনা দিবার জন্যই তাঁহাকে ডাকা হইয়াছে। তিনি আসিয়া যখন পুরোহিত ঠাকুরকে বলিলেন, তাঁহার বর্ষফল-গণনা শেষ হইয়াছে—কেবল লিখিতে বাকি আছে, তবে যদিও এ বৎসর নারায়ণচন্দ্রের বিবাহ হইল না, তবুও আগামী বৎসরে বিবাহযোগ আর ব্যর্থ হইবার নহে।

পুরোহিত ঠাকুর হাসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "সে যোগ গণনা আর করতে হ'বে না; কোষ্ঠীফল না ফললেও ভাগ্যবল প্রবল হয়েছে। আপনি এখন লগ্নপত্রের আর বিয়ের দিন দেখুন—মাঘ মাসেই দেখতে হ'বে।"

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

সত্য পরিচয়

আর কিছু নয়—
তুমি যে ভারতবাসী—
　　এই তব সত্য পরিচয়!
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শিখ, জৈন কি খৃষ্টান
বৌদ্ধ, মুসলমান—
যাই হও; এ-ভারত যদি তব জন্মভূমি হয়,
তুমি যে ভারতবাসী, এই তব শ্রেষ্ঠ পরিচয়।
তোমারে লালন করি তুলিয়াছে যেই জন্মস্থান
তাহার সম্মান,
বাড়াবারে নাহি ক' আগ্রহ—
করো দেশদ্রোহ!
এসো—এসো—ভ্রান্ত বন্ধু মোর
আত্মঘাতী ঘোর
বিবাদের পঙ্ক-শয্যা ছাড়ি'
দাও পাড়ি
প্রীতির পঙ্কজ-লোকে
অমৃতের সিন্ধু সেই হিরণ্য-আলোকে!
আর দেরী নয়—
তুমি যে ভারতবাসী, এ তব গৌরব,
এই তব শ্রেষ্ঠ পরিচয়!

শ্রীপ্রসাদদাস মুখোপাধ্যায়।

বৌদ্ধভারতে বিবাহ-বিধি

বিবাহ-সংস্কার সমাজের একটি স্থিতিকারক সংস্কার। এই সংস্কারের উপর সামাজিক মঙ্গল অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। প্রাচীন ভারতে যে বিবাহ-পদ্ধতি ছিল,—তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায়ও হিতকর বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধবিপ্লবের পর এই বিবাহ-পদ্ধতির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। প্রাচীন ভারতে যে সকল বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল, বৌদ্ধ-বিপ্লবের পর তাহার অনেকগুলি প্রবর্ত্তিত বা প্রচলিত করা হইয়াছিল বলিয়াই অনেকে মনে করেন। বৌদ্ধ জাতক গ্রন্থাদি পাঠ করিলে তাহার কতকগুলির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন হিন্দুযুগে,—এমন কি, স্মরণাতীত বৈদিক যুগ হইতে—হিন্দু সমাজে স্বগোত্রমধ্যে এবং সনাভিদিগের মধ্যে বিবাহ-ব্যবস্থা কোন কালেই ছিল না। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব সময়ে তাহা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। এমন কি, বৌদ্ধযুগে সহোদরা-বিবাহ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল বলিয়া কোন কোন পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন। 'সুমঙ্গলবিলাসিনী' নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে কপিলবাস্তু নগরের পত্তন কাহিনী যে ভাবে বিবৃত আছে,—তাহা হইতে অনেক আধুনিক গবেষণাকার সিদ্ধান্ত করেন যে, প্রাচীন বৌদ্ধযুগে সহোদরা-বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না। এই বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বে আমি আসল কাহিনীটি এইখানে বিবৃত করিব।

রাজা ওক্কারার পাঁচ মহিষী ছিল। প্রথম এবং প্রধানা মহিষীর গর্ভে তাঁহার চারিটি পুত্র এবং পাঁচটি কন্যা জন্মে। প্রথমা মহিষীর মৃত্যু হইলে রাজা একটি সুন্দরী যুবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহ হইবার পূর্ব্বে যুবতী রাজাকে এই প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ করিয়া লইয়াছিলেন যে, রাজাকে তাঁহার গর্ভজাত পুত্রকে রাজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। রাজা সে প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন। সুতরাং বিবাহের পর তিনি প্রথমা মহিষীর গর্ভজাত পুত্র এবং কন্যাদিগকে তাঁহার রাজ্যের এলাকা ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন। তদনুসারে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজমহিষীর গর্ভজাত চারি পুত্র এবং পাঁচ কন্যা রাজ্য ত্যাগ করিয়া হিমাচলের পাদমূলে এক নিবিড় জঙ্গলে গমন করেন। তথায় তাঁহারা একটি নগর পত্তনের সঙ্কল্প করিয়া স্থান অনুসন্ধান করিতে থাকেন। সেইখানে কপিল নামক এক জন মুনির সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ ঘটে। কপিল তাঁহাদিগকে কহিলেন, যে স্থানে তাঁহার আশ্রম, সেই স্থানে নূতন নগর স্থাপন করাই উচিত। কপিল মুনির আদেশ অনুসারে তথায় তাঁহারা নূতন নগর প্রতিষ্ঠিত করেন এবং কপিলের স্মৃতির সহিত জড়িত করিয়া সেই নগরের নাম রাখিলেন কপিলবাস্তু। কালে চারি ভ্রাতা চারিটি ভগিনীকে বিবাহ করেন। জ্যেষ্ঠাকে তাঁহারা বিবাহ করেন নাই। সেই জন্য ইঁহাদিগের নাম শাক্য হইয়াছিল। হিন্দুদিগের প্রদত্ত বিবরণেও শাক্যবংশীয়দিগের শাক্য নাম দিবার কারণ এইরূপ দেখা যায় যে, ইঁহারা ইক্ষ্বাকুবংশীয়। কপিল মুনির শাকসঙ্কুল আশ্রমে ইঁহারা বাস করিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহাদের নাম হয় শাক্য। যথা—

শাকবৃক্ষপ্রতিচ্ছন্নং বাসং যস্মাৎ প্রচক্রিরে।
তস্মাৎ ইক্ষ্বাকুবংশ্যাস্তে ভুবি শাক্যা ইতি শ্রুতাঃ।

এই কপিল মুনি কে? ইনি গৌতমবংশজাত মুনিবিশেষ।

এই আখ্যান হইতে বৌদ্ধ-সমাজে যে সহোদরা-বিবাহ চলিত ছিল,—ইহা সপ্রমাণ হয় না। কারণ, নিবিড় অরণ্যমধ্যে সমাজ-বিরহিত স্থানে নিরঙ্কুশ যুবকযুবতীরা যে সমাজবিধি লঙ্ঘন করিয়া যৌনসম্বন্ধে আবদ্ধ হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? কিন্তু উহাকে সামাজিক ব্যবস্থা বলা যায় না। হিন্দুদের প্রদত্ত বিবরণে ইঁহারা গৌতমবংশীয় কপিলের শাকপূর্ণ আশ্রমে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহাদিগকে শাক্য বলা হইত—এ কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু তাঁহারা যে সহোদরা-বিবাহ করিয়াছিলেন, এরূপ কথার উল্লেখ নাই। তাহাতে লিখিত আছে যে, পিতৃশাপে রাজপুত্রেরা নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কন্যারা নির্ব্বাসিতা হন নাই। যাহা হউক, এই ভ্রাতৃচতুষ্টয় সহোদরা-বিবাহ করিয়াছিলেন, এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলেও ইহাকে সামাজিক বিবাহ বলা যাইতে পারে না। প্রকৃতির তাড়নায় অন্ধ হইয়া মানুষ অনেক ঘোর কুকর্ম্ম করিয়া বসে,—কিন্তু তাহা নিয়ম বলিয়া মনে করা অত্যন্ত অসঙ্গত।

এই প্রসঙ্গে আর একটা বড় গুরুতর আপত্তি আছে। এই বৃত্তান্ত হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, যে সময়ে কপিলবাস্তু নগরের পত্তন হইয়াছিল, সেই সময়ে এই কাণ্ড ঘটিয়াছিল। সুতরাং তাহা যখন ঘটে, তখন বৌদ্ধবিপ্লব ত দূরের কথা, গৌতম বুদ্ধদেবই জন্মগ্রহণ করেন নাই। বুদ্ধদেব যখন জন্মিয়াছিলেন, তখন ঐ কপিল মুনির অধ্যুষিত নিবিড় অরণ্য বিস্তৃত জনপদে এবং কপিলবাস্তু সমৃদ্ধ নগরে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং বৌদ্ধবিপ্লবের বহু পূর্ব্বে ইহা ঘটিয়াছিল। তখন হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দু আচার-পদ্ধতির বিরুদ্ধে এক শ্রেণীর লোকের মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল কি না, বলা কঠিন। সেই জন্য এই কথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আর যদিই এই ব্যাপার ঘটিয়া থাকে—তাহা হইলে উহা তদানীন্তন সমাজের নিয়ম নহে,—ব্যভিচার। এরূপ দৃষ্টান্ত আর প্রায় পাওয়া যায় না। মহাবংশে লিখিত আছে যে, লালহা রাজ্যের অধিপতি সিংহবাহু তাঁহার ভগিনী সিহাসীবলীকে নিজ মহিষী করিয়াছিলেন (১)। এই লালহা রাজ্য কোথায় এবং তথাকার রাজবংশ কোন্ জাতীয় লোক ছিলেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তবে প্রাচীন মিশরে সহোদর-সহোদরার বিবাহ দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হইত না (২)। কাজেই এই সিংহবাহুর বিশেষ পরিচয় না জানিলে কোন কথাই বলা চলে না। দ্বিতীয়তঃ, সিহাসীবলী সিংহবাহুর সহোদরা ছিলেন কি না, তাহাও স্পষ্ট বলা নাই।

---

(১) মহাবংশ (Geiger's Edition) ৬০ পৃষ্ঠা।

(২) **Among the ancient Egyptians, brothers and sisters were allowed to marry.—Marriage and Heredity by J. B. Nisbet, p. 5.**

কপিলবাস্তুর উল্লিখিত বৌদ্ধশাস্ত্রের বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে, শাক্যসিংহ যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা ভারতীয় ক্ষত্রিয় ইক্ষ্বাকুবংশের শাক্যশাখা,—পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তিনি শকজাতীয় (Scythion) বলিয়া যে অনুমান করেন, তাহা ভ্রান্ত। কারণ, হিন্দু এবং বৌদ্ধ উভয় প্রাচীন সাহিত্যে ঐ একই কথা পাওয়া যায়।

তবে এ কথা সত্য যে, বৌদ্ধ-যুগে হিন্দু-আচারের বিরুদ্ধে একটা প্রবল প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। হিন্দু জাতি কখনই পিতৃব্য-কন্যা, মাতুলকন্যা, পিতৃষ্বসার কন্যা, মাতৃষ্বসার কন্যা প্রভৃতি বিবাহে অনুমোদন করেন না। বৌদ্ধ-সমাজ কিন্তু ঐরূপ বিবাহ অনুমোদন করিতেন। সম্রাট্ অজাতশত্রুর মহিষী ভজিরা অজাতশত্রুর পিতৃষ্বসার কন্যা। আনন্দ তাঁহার পিসির কন্যার উলঙ্গাবস্থায় প্রণয়ে বিমুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন।

বৌদ্ধ-যুগে নর-নারীর একটু অধিক বয়সে বিবাহ হইত এবং বিবাহের কতকগুলি নিয়ম শিথিল করা হইয়াছিল বলিয়া নিতান্ত নিকট-সম্বন্ধযুক্ত পাত্র-পাত্রীর মধ্যে প্রণয় এবং বিবাহ হইত। বৌদ্ধদিগের জাতক গ্রন্থে তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। মহাবংশে লিখিত আছে যে, লঙ্কার রাজা পাণ্ডুবাসুদেবের কন্যা চিত্তা পরমাসুন্দরী ছিলেন। তাঁহার সৌন্দর্য্য দর্শনে সকলে মুগ্ধ হইয়া যাইত। সেই জন্য তাঁহাকে লোক উন্মাদচিত্তা বলিত। জনৈক জ্যোতিষী বলিয়াছিলেন যে, চিত্তার গর্ভজাত পুত্র চিত্তার সমস্ত ভাইদিগকে মারিয়া ফেলিবে, সেই জন্য রাজপুত্রগণ তাহাদের একমাত্র ভগিনীকে একটি গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই গৃহে একটিমাত্র প্রবেশ-দ্বার ছিল। রাজার গৃহের ভিতর দিয়া ঐ গৃহে যাইবার একটিমাত্র পথ। একটিমাত্র পরিচারিকা চিত্তার পরিচর্য্যা করিত। এক দিন চিত্তা তাহার মাতুল-পুত্রকে দেখিয়া তাহারই প্রতি আকৃষ্টা হয়। ঐ মাতুল-পুত্রের নাম দীঘ্‌ঘগামণি। পরিচারিকার সহায়তায় দীঘ্‌ঘগামণি চিত্তার প্রকোষ্ঠে যাতায়াত করিতেন। ক্রমে চিত্তার গর্ভ-লক্ষণ প্রকাশ পাইল। পরিচারিকা সে কথা রাণীকে জানাইল। রাণী রাজাকে কহিলেন। রাজা তখন অনন্যোপায় হইয়া পুত্রদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া চিত্তার সহিত দীঘ্‌ঘগামণির বিবাহ দিয়াছিলেন। মহাবংশ পাঠে আরও জানা যায় যে, পাণ্ডুকাভয় নামক রাজা সুবর্ণপালীকে তাহার রাণী করিয়াছিলেন। সুবর্ণপালী পাণ্ডুকাভয়ের মাতুল-কন্যা ছিলেন। মাতুল-কন্যা বিবাহ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। ভারতের কোন কোন প্রদেশে এখনও উহা চলিত আছে।

বৌদ্ধসমাজে সগোত্র বিবাহ অল্প প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। যখন পিতৃব্য-কন্যাকে বিবাহ করিবার ব্যবস্থা ছিল, তখন সগোত্রে বিবাহ যে চলিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে উহা অত্যন্ত অল্প হইত বলিয়া বোধ হয়। হিন্দুসমাজের বিবাহ আট প্রকার; যথা—ব্রাহ্ম, আর্ষ, প্রাজাপত্য, দৈব, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস এবং পৈশাচ। তন্মধ্যে প্রাজাপত্য বিবাহের ন্যায় বিবাহ বৌদ্ধসমাজে প্রবর্ত্তিত ছিল। ইহা ভিন্ন বৌদ্ধদিগের মধ্যে স্বয়ম্বরপ্রথা এবং গান্ধর্ব্ব বিবাহও ছিল। রাক্ষস এবং পৈশাচ বিবাহও অনেক হইত। প্রবৃত্তিতাড়িত মানব-সমাজ হইতে ইহা নির্ব্বাসিত করা সম্ভব নয়। বৌদ্ধসমাজে যে সাধারণ বিবাহ বিশেষ ভাবে চলিত ছিল, তাহা অনেকটা প্রাজাপত্য বিবাহের অনুরূপ হইলেও উহা প্রাজাপত্য বিবাহ নহে। প্রাজাপত্য বিবাহের উদ্দেশ্য ধর্ম্মসাধন। উহা এইরূপ—"তোমরা উভয়ে ধর্ম্মাচরণ কর" এই কথা বর-কন্যা উভয়কে বলিয়া বরকে অর্চ্চনা পূর্ব্বক কন্যাদান করার নাম প্রাজাপত্য বিবাহ। বৌদ্ধদিগকে ঠিক সে কথা বলিতে হইত না। তবে সাধারণ গৃহধর্ম্ম সাধনের জন্য যে প্রকার বিবাহ অনুষ্ঠিত হইত তাহা হিন্দুদিগের প্রাজাপত্য বিবাহের অনেকটা অনুরূপ। সমাজে উহাই অধিক চলিত ছিল। বৌদ্ধদিগের মধ্যে যে বিবাহ হইত, তাহা বর এবং কন্যা উভয়ের অভিভাবক দ্বারা স্থিরীকৃত হইত। ইহাতে বর এবং কন্যা উভয়েই সমান জাতির হইত। আর্থিক অবস্থার সমতা দেখিয়া হইত না। এরূপ বিবাহের বহু দৃষ্টান্ত জাতক গ্রন্থে পাওয়া যায়। শ্রাবস্তীর মিগারা নামধেয় কোষাধ্যক্ষ প্রথমেই শাকেতপুরের কোষাধ্যক্ষ ধনঞ্জয়ের জাতি কি, তাহা জানিয়া তবে তাহার নিজপুত্র ধর্ম্মপদের সহিত বিশাখার বিবাহে সম্মত হইয়াছিলেন। বাব্ব জাতকে শ্রাবস্তীর কানা নাম্নী কন্যাকে অন্য গ্রামের তাহার সমজাতীয় পাত্রকে দান করিবার কথা আছে। এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ইহাই ছিল সাধারণ ব্যবস্থা। তাহার কারণ, বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম হইতেই উদ্ভূত। বৌদ্ধ-সমাজ হিন্দু-সমাজের অঙ্গজ। কাজেই স্থিতিশীল জনসাধারণের মধ্যে এই সাধারণ প্রথাই অনুবর্ত্তিত হইত। এই বিবাহে বর বরযাত্রিসহ কন্যার গৃহে আসিয়া কন্যা গ্রহণ করিতেন। কন্যার পিতামাতা এবং অভিভাবকবর্গ তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সমাদর করিয়া ভোজ্যাদি প্রদান করিতেন। হিন্দু-সমাজে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ এবং প্রাজাপত্য এই চারি প্রকার বিবাহই প্রশস্ত বলিয়া গণ্য হইত। আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস এবং পৈশাচ এই চারি প্রকার বিবাহ নিন্দিত এবং ইহার ফল ভাল হয় না বলিয়া কথিত আছে। বৌদ্ধসমাজে সেরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল বলিয়া মনে হয় না।

তবে এ কথা সত্য যে, বৌদ্ধযুগে অসবর্ণ বিবাহ অধিক প্রচলিত হইয়াছিল। মহাবংশে জাতকগ্রন্থে থেরীগাথায় ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে অনেক সময় রাজা-রাজড়া এবং ধনাঢ্য ব্যক্তিরাই অসবর্ণ বিবাহ করিতেন। অশোক ক্ষত্রিয় হইলেও দেবী নামক একটি বৈশ্য-কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই দেবীর গর্ভেই তাঁহার বিখ্যাত পুত্র মহিন্দ এবং কন্যা প্রথিতকীর্ত্তি সঙ্ঘমিত্তা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (৩)। এই মহিন্দ এবং সঙ্ঘমিত্তা সিংহলে ধর্ম্মপ্রচারার্থ প্রেরিত হইয়াছিলেন। চাপা বর্ত্তকহারের এক ব্যাধের কন্যা ছিলেন। তাঁহার সহিত উপক নামক (৪) এক সন্ন্যাসীর বিবাহ হইয়াছিল। একদা এই ব্যাধ শিকার করিতে যাইয়া সাত দিন অন্যত্র অতিবাহিত করেন। উপক বর্ত্তকহারের বাড়ীর নিকটেই থাকিতেন। তিনি ঐ ব্যাধরাজের গৃহে ভিক্ষার্থ গমন করেন। চাপা আসিয়া তাঁহাকে ভিক্ষা দেন। কিন্তু সন্ন্যাসীর সৌন্দর্য্য দর্শনে তিনি মন্মথশরে অতিমাত্র পীড়িত হইয়া সাত দিন উপবাস করিয়াছিলেন। ব্যাধ গৃহে ফিরিয়া আসিয়া সকল কথাই জানিতে পারিয়াছিলেন। তখন তিনি উপকের হস্তে চাপাকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন (৫)। ইহা হইতে অনুমিত হয়, তখন এইরূপ অনুলোম ক্রমে অসবর্ণ বিবাহ বৌদ্ধ-সমাজে হইত। ব্যাধরাজ সন্ন্যাসীর

---

(৩) মহাবংশ।

(৪) ধর্ম্মপদ ২ খণ্ড।

(৫) মহাবংশ, Geiger's Edition, ch. 9.

প্রতি সম্মানবুদ্ধিতে তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। এরূপ অনুলোম ক্রমে অসবর্ণ বিবাহ বৌদ্ধ-সমাজে অনেক হইয়াছে। কিন্তু প্রতিলোম বিবাহ বৌদ্ধ-সমাজে অধিক হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বৌদ্ধদিগের দিব্যাবদান গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, চণ্ডালরাজ ত্রিশঙ্কুর পুত্র শার্দ্দূলকর্ণ বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত জনৈক ব্রাহ্মণকন্যার বিবাহ হইয়াছিল। প্রতিলোম ক্রমে অসবর্ণ বিবাহের ইহা ভিন্ন অন্য দৃষ্টান্ত আর প্রায় পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ সমজাতির মধ্যে বিবাহই অধিক হইত। ইহাতে অনুমিত হয় যে, মানুষ তাহার পূর্ব্বজগণের সংস্কারের এবং আচারের বিরুদ্ধে যতই বিদ্রোহ করুক না কেন, তাহার প্রভাব সম্পূর্ণ পরিহার করিতে পারে না। হিন্দুসমাজে বৌদ্ধ-যুগের পূর্ব্বে অনুলোম বিবাহ প্রচলিত ছিল। তবে অনুলোম বিবাহও নিন্দিত ছিল। বৌদ্ধসমাজে সেই অনুলোম বিবাহের বড় বাড়াবাড়ি এবং তাহার ফল মন্দ হইয়াছিল। সেই জন্য বৌদ্ধ-বিপ্লবের পর যখন আবার হিন্দু-সমাজ পুনর্গঠিত হইয়াছিল, তখন অসবর্ণ বিবাহ একেবারে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কলির প্রথম যুগে মনীষীরা সমাজ-হিতৈষণার জন্য বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক এই ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া দিয়াছেন। ইহা আদিপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় (৬)।

বৌদ্ধসমাজে স্বয়ম্বর-প্রথা প্রচলিত ছিল। হিন্দু-সমাজেও উহা ছিল। শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রা অর্জ্জুনকে কার্য্যতঃ স্বয়ং পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন, যদিও দৃশ্যতঃ অর্জ্জুন সুভদ্রাকে হরণ করেন। দময়ন্তী নলকে স্বয়ং বরণ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ-যুগেও স্বয়ম্বর-প্রথা ছিল। এই স্বয়ম্বর-সভায় স্বজাতীয় পাত্রদিগকে আহ্বান করা হইত এবং কন্যা তাহাদিগের মধ্যে যে কোন এক জনকে বিবাহ করিতে পারিতেন। কন্যা যাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিতেন, তাহাতে কেহ আপত্তি করিতে পারিতেন না। কিন্তু বৌদ্ধ জাতক গ্রন্থে দেখা যায় যে, সময় সময় পিতা কন্যার মনোনীত পাত্রকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেন। নব্ব জাতকে বর্ণিত আছে যে, জনৈক রাজকন্যা তাঁহার পিতার নিকট এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, তিনি স্বয়ংবরা হইবেন। পিতা তাহাতে সম্মত হইয়াছিলেন। তদনুসারে রাজা এক স্বয়ম্বর-সভা আহ্বান করেন। তথায় সকল দেশের রাজপুত্রগণ আহুত হইয়াছিলেন। রাজকন্যা সভায় যাইয়া একটি যুবকের গলে মাল্য অর্পণ করেন, কিন্তু পরেই বুঝা যায় যে, যুবকটির শ্লীলতার অভাব ছিল, সেই জন্য রাজা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। হিন্দু-স্বয়ম্বরায় কখনই এইরূপ হইত না। কন্যা যাহার গলদেশে মাল্যদান করিতেন, কন্যার পিতা তাহা আর প্রতিষিদ্ধ করিতে পারিতেন না।

জাতক গ্রন্থে কতকগুলি অদ্ভুত কথা আছে। যথা—কুণাল জাতকে রাজকন্যা কুণহার স্বয়ম্বর-কথা। উহা দ্রৌপদীর বিবাহের নকল। রাজকুমারী কুণহা স্বয়ম্বরসভায় পাণ্ডু রাজার পাঁচ পুত্রকে সমাগত দেখিয়া পাঁচ জনের প্রতিই আকৃষ্ট হইয়া পড়েন এবং একটি মালা পাঁচ জনের গলায় জড়াইয়া দেন। ঐ পাঁচ জনের নাম মহাভারতোক্ত পঞ্চ পাণ্ডবের নাম। যথা অর্জ্জুন, ভীমসেন, নকুল, যুধিষ্ঠির এবং সহদেব। এই কাহিনীটি মহাভারত হইতে গৃহীত বলিয়াই মনে হয়। বলা বাহুল্য, কুণহা, দ্রৌপদীর ন্যায় পঞ্চস্বামীরই পত্নী হইয়াছিলেন। এক দ্রৌপদী-বিবাহ ভিন্ন ভারতের ইতিহাসে এক-সঙ্গে পঞ্চস্বামী বা একাধিক স্বামী বিবাহের আর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। জাতক গ্রন্থে গান্ধর্ব্ব বিবাহের দৃষ্টান্ত অনেক উল্লিখিত আছে।

নারীদিগকে ফুসলাইয়া বা কুলের বাহির করিয়া ঘর-সংসার করিবার কথা জাতক গ্রন্থে অনেক আছে। পরে যে উহাদের অনেকের বিবাহ হইত, এমন কথা জাতক গ্রন্থে পাওয়া যায় না। শ্রাবস্তীর শ্রেষ্ঠিকন্যা পথাচারকে তাহার পিতা তাঁহার গৃহের সপ্তম তলে অতি সাবধানে রাখিয়াছিলেন। কিন্তু সে তাহার বালক ভৃত্যের প্রণয়ে পড়িয়াছিল। পরে পথাচারকে বিবাহ দিবার জন্য তাহার পিতা আর একটি তাঁহার স্বশ্রেণীর পাত্র ঠিক করিয়াছিলেন। বিবাহের দিন পথাচার তাঁহার প্রণয়ীর সহিত উধাও হইয়া দূরস্থ এক গ্রামে যাইয়া বাস করে। কালক্রমে ইহাদের একটি সন্তান জন্মে। কিন্তু বৌদ্ধমতেও ইহাদের বিবাহ হয় নাই। জাতক গ্রন্থে এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়। নারীদিগের অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতার ফলে এরূপ ঘটনা অনেক ঘটিত। যাহাতে এরূপ অনাচার না ঘটে, সেই জন্য বৌদ্ধযুগেই নারীদিগের অবরোধ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ধম্মপদ ব্যাখ্যানে কথিত হইয়াছে যে, ধনীদিগের কন্যাগণ বিবাহযোগ্য বয়স প্রাপ্ত হইলে, তাহাদিগের পিতামাতা তাহাদিগকে সপ্ততল হর্ম্ম্যের উচ্চতম প্রকোষ্ঠে বিশেষ সতর্কতা সহকারে রক্ষা করিতেন। সেই হর্ম্ম্যে পুরুষ-কিঙ্করের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। নারী-কিঙ্করীরাই তাহাদের সকল কার্য্য করিত (৭)। অভিজাত বংশের নারীরা সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাচ্ছাদিত না করিয়া কখনই বাড়ীর বাহির হইতেন না। যখন বাহির হইবার প্রয়োজন হইত, তখন তাঁহারা শকটে করিয়া বাহির হইতেন। সাধারণ লোক সাধারণ যানে করিয়া যাইতেন আর মস্তকে একটি তালবৃন্তের ছত্র ধরিতেন। তাহা না হইলে বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিতেন (৮)। সুতরাং পর্দ্দাপদ্ধতি বা নারীদিগের অবরোধ-প্রথা বৌদ্ধযুগেই আবির্ভূত হইয়াছিল। মুসলমান আমলে হয় নাই।

আমাদের দেশে যেমন বিবাহের পর বধূ প্রথম শ্বশুরবাড়ী আসিবার সময় অবগুণ্ঠন না দিয়া আসেন, বিবাহের পর বৌদ্ধযুগেও কন্যারা সেইরূপ আসিতেন। বিবাহকালে কন্যাকে যৌতুক এবং ধন-রত্ন দিবার প্রথাও বৌদ্ধযুগে ছিল। শ্রাবস্তীর শ্রেষ্ঠী মিগার তাঁহার কন্যা বিশাখার বিবাহে অনেক যৌতুক দিয়াছিলেন। এরূপ দৃষ্টান্ত আরও আছে। তবে সাধারণ লোকের মধ্যে যৌতুক দিবার বিধি যে প্রবল ছিল, তাহা মনে হয় না। অন্ততঃ বরপক্ষ বরপণের দাবী করিতেন, ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কন্যার বিবাহকালে কন্যার পিতাকে কন্যার স্নানের এবং সুগন্ধিদ্রব্য ব্যবহারের জন্য অর্থ বা বিষয় দিতে হইত। মগধের রাজা অজাতশত্রু কোশলরাজ পসেনদীর কন্যা বাজীরাকে বিবাহ করেন। পসেনদী কন্যার স্নান এবং গন্ধদ্রব্য ব্যবহারের জন্য একখানি তালুক দিয়াছিলেন। বিম্বিসারও কোশল দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কোশল দেবীও তাঁহার পিতার নিকট হইতে ঐ বাবদ কাশী অঞ্চলে একখানি গ্রাম

(৬) দ্বিজানামসবর্ণানাং কন্যাসূপযমস্তথা।—বৃহন্নারদীয়
আদিত্যপুরাণেও ঐ কথা আছে।

(৭) Dhammapada Commentary, vol III, page 24.
(৮) Do. vol I, p. 391.

পাইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন বিবাহকালে কন্যার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবর্গ সকলেই বর-কন্যাকে প্রীতি-উপহার দিতেন। মিগার শ্রেষ্ঠীর পুত্রের সহিত ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর কন্যার বিবাহে এক শত গ্রামের লোক বর-কন্যাকে অনেক উপঢৌকন দিয়াছিলেন। সাধারণ লোকের ভিতরও তাহা প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয়।

বৌদ্ধযুগে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল। তবে বিধবা-বিবাহ কতকটা নিন্দিত ছিল বলিয়াই মনে হয়। সেঠী ঋষিদাসীর তিন বার বিবাহ হইয়াছিল। তিনি ধর্ম্মিষ্ঠা এবং সেবাপরায়ণা ছিলেন। তখন পুরুষ বহু বিবাহ করিতে পারিত এবং অনেক সময় করিত। ইহার দৃষ্টান্ত অনেক আছে। উপরে লিখিত কুণাল জাতকের যে রাজকুমারী কণহার পঞ্চস্বামী একসঙ্গে বিবাহ করার কথা আছে, তাহা দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীকে একসঙ্গে বিবাহ করার কথার প্রতিধ্বনি মাত্র, অন্য কোথাও ঐরূপ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। স্বামী ইচ্ছা করিলে তাহার স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারিত। ঋষিদাসীর স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিয়াছিল। তবে পত্নী ত্যাগ করিবার জন্য কোন আইনসঙ্গত ব্যবস্থা ছিল কি না, অথবা কোন অনুষ্ঠান করিতে হইত কি না, তাহা বলা কঠিন। সম্ভবতঃ তাহা করিতে হইত না।

বৌদ্ধযুগে বিবাহ-বন্ধন কতকটা শিথিল হইয়া গিয়াছিল, তাহার ফলে সমাজে নানা অনাচার ঘটে। তথাগত যেরূপ পবিত্র ভাবে সমাজ রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কালক্রমে তাহার ঘোর অবনতি হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম সেই জন্য ভারত হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। এবং পরে হিন্দুধর্ম্ম যখন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখন পুনর্গঠিত হিন্দু-সমাজে উহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ কতকগুলি অতি কঠিন বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তখন সাগরপথে বিদেশযাত্রা, অসবর্ণ বিবাহ, বিধবা-বিবাহ, কমণ্ডলু ধারণ, দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য পালন, বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন, ব্রাহ্মণের মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত, মধুপর্কে পশুবধ, গৃহস্থ দ্বিজের শূদ্রমধ্যে দাস, গোপালকুল, মিত্র এবং অদ্ধসীরীর প্রস্তুত অন্নভোজন, দূরদেশে তীর্থযাত্রা, শূদ্রকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণের পাকাদি ক্রিয়া ইত্যাদি পণ্ডিতেরা লোকরক্ষার অর্থাৎ সমাজরক্ষার জন্য কলির আদিতে ব্যবস্থাপূর্ব্বক বর্জিত করিয়া দিয়াছিলেন। নারী জাতির চরিত্রস্খলন হেতু যৌবন-বিবাহ রহিত করিয়া বাল্যবিবাহ প্রবর্ত্তিত এই সময় হইয়াছিল। বৌদ্ধযুগে পতিতা নারীদিগকে সমাজে গ্রহণ করা হইত। অঙ্গ-কাশী প্রভৃতির ন্যায় যাহারা সমাজে গৃহীত হইয়াছিল,—পরবর্ত্তী কালে বুদ্ধদেবের ন্যায় নিয়ন্ত্রণকারীর অভাবে তাহার ফলে ঐরূপ ব্যবস্থার জন্য অনেক অনাচার ঘটে। সেই জন্য আদিত্যপুরাণ, আদিপুরাণ, বৃহন্নারদীয় পুরাণ প্রভৃতিতে হিন্দুসমাজের পুনর্গঠনকালীন ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই অনেকে মনে করেন।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]
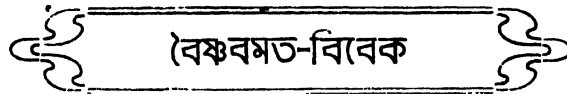
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দর্শন ও উপদেশ লাভ

শ্রীল হরিদাস ঠাকুর রঘুনাথের হৃদয়ে যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, রঘুনাথ একান্ত ভাবে তাহাতে শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ জলসেচন করিতে লাগিলেন। কালে ভক্তি-লতা অঙ্কুরিত হইয়া ধীরে ধীরে তাঁহার চিত্তকে কি প্রকারে শ্রীচৈতন্য-মহাকল্পবৃক্ষে সংযুক্ত করিল, তাহাই এখন উপলব্ধি করিবার বিষয়। শ্রীচৈতন্যদেবের মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীকে, পিতা জগন্নাথ মিশ্রকে এবং শান্তিপুরের অদ্বৈত আচার্য্যকে হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন—দুই ভ্রাতা বড়ই ভক্তি করিতেন এবং সর্ব্বপ্রকারে সকল সময়ে তাঁহাদের সাহায্য করিতেন। শ্রীল জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে যে জগন্মঙ্গল অবতার আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, এ কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল। হিরণ্য, গোবর্দ্ধন ও রঘুনাথ সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিলেন। প্রেম-পয়োধি শ্রীচৈতন্যদেবের মহাপ্রকাশের অলৌকিক বিবরণ শুনিয়া রঘুনাথ তাঁহার পদে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের গুণগ্রামের বর্ণনা তাঁহার চিত্তকে তাঁহার দর্শনলাভের জন্য ব্যাকুল করিয়া তুলিল। পিতামাতা ও পিতৃব্যের নয়নের মণি—তাঁহাদের আদরের দুলাল রঘুনাথ কি প্রকারে শ্রীচৈতন্যদেবের চরণপ্রাপ্ত হইবেন, তাহার চিন্তায় বিভোর হইলেন। ভোগবিলাসে রঘুনাথের মন নাই, বৈষয়িক কার্য্যেও তাঁহার পিতা ও পিতৃব্য তাঁহাকে নিযুক্ত করিতে চাহিলেও তিনি তাহাতে উদাসীন। পণ্ডিত যদুনন্দন আচার্য্য শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর শিষ্য। এই যদুনন্দন আচার্য্য মজুমদার-ভ্রাতৃদ্বয়ের কুলগুরুর বংশে আবির্ভূত। বালক রঘুনাথকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য সম্ভবতঃ শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর পরামর্শে পিতা ও পিতৃব্য তাঁহাকে যদুনন্দন আচার্য্যের দ্বারা দীক্ষা দিলেন। কিশোর বয়সেই, সম্ভবতঃ ১৪ বৎসর বয়সে রঘুনাথ দীক্ষালাভ করেন। দীক্ষার পর গুরুদেবের নিকট হইতে আরও সুন্দররূপে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের চরিত্র শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে পাইবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠেন। শ্রীল যদুনন্দন আচার্য্যও শিষ্যের এই ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি বোধ হয় ভাবিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শন পাইলে রঘুনাথ শান্ত হইবেন।

হঠাৎ ১৪৩১ শকের মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গদেব কাটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম গ্রহণ করিলেন। সংসারের সুখে বঞ্চিত হইয়া, বৃদ্ধা মাতা ও তরুণী পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণে সকলেই ব্যথিত হইলেন। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের বিদ্বেষ করিতেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে এই মর্ম্মস্পর্শী ঘটনায় দুঃখিত হইলেন। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর ও জগন্নাথ মিশ্রের প্রতি পরম শ্রদ্ধাশীল হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনও এই ব্যাপারে যেমন দুঃখিত হইলেন, তেমনই শঙ্কিত হইলেন। তাঁহাদের হৃদয়ের ধন রঘুনাথও যদি এই আদর্শ গ্রহণ করে, এই জন্যই

শঙ্কা। সকলেই অনতি কাল পরে শুনিতে পাইলেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পরেই শান্তিপুরে অদ্বৈত-গৃহে আসিয়া অবস্থান করিতেছেন। রঘুনাথ শ্রীচৈতন্যদেবকে দেখিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন, যদুনন্দন আচার্য্যের পরামর্শ অনুসারে সম্ভবতঃ তাঁহারই সহিত অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট বহুবিধ উপহারসহ রঘুনাথকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য প্রভু রঘুনাথের পরম গুরু এবং তিনি মজুমদার-ভ্রাতৃদ্বয়ের চিরহিতৈষী। তিনি নিজেও দুই পত্নী লইয়া গৃহস্থ-আশ্রমে অবস্থান করিতেছেন, অতএব তিনি কিছুতেই—রঘুনাথ যদি বাতুল হইয়া সংসার ত্যাগ করিতে চাহে, তবে তাহাতে উৎসাহ দিবেন না, এই বিশ্বাসেই রঘুনাথের পিতা ও পিতৃব্য তাঁহাকে আচার্য্য-প্রভুর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। আচার্য্য-প্রভুও এই সৌম্যদর্শন বিনীত ভক্ত বালককে পাইয়া অতীব আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে শ্রীচৈতন্যদেবের চরণপ্রান্তে লইয়া গেলেন। রঘুনাথ কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীচৈতন্যদেবের চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। শ্রীচৈতন্যদেব ভুবন-মঙ্গল স্মিত হাস্তে তাঁহার মাথায় হাত রাখিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করিলেন। রঘুনাথ শান্তিপুরে অবস্থান করিয়া আচার্য্যপ্রভুর কৃপায় মহাপ্রভুর পাত্রাবশেষ প্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হইলেন। যে কয় দিন মহাপ্রভু অদ্বৈত-গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন, রঘুনাথ সেই কয় দিন প্রাণ ভরিয়া তাঁহার প্রাণের দেবতাকে দর্শন করিলেন এবং তাঁহার পাত্রশেষ প্রসাদান্ন ভোজন করিয়া শরীর পবিত্র হইল এবং শ্রীচৈতন্যচরণ-প্রাপ্তির প্রতিকূল সমস্ত পাপ দূরীভূত হইল মনে করিয়া পরমানন্দিত হইলেন। নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের যাবতীয় ভক্তগণের সমাগম দেখিয়া তাঁহার নয়ন ও মন তৃপ্ত হইল। কালক্রমে এই চাঁদের হাট ভাঙ্গিয়া গেল, মহাপ্রভু নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিলেন; রঘুনাথও চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া শূন্যপ্রাণে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

দেবর্ষি নারদ পূর্ব্ব-জন্মে দাসীপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। সাধু-সেবায় ভগবানে তাঁহার ভক্তি হয়। মাতৃবিয়োগের পর তিনি ভগবল্লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া নির্জ্জন অরণ্য আশ্রয় করেন। এক বটবৃক্ষমূলে পদ্মপলাশলোচন ভগবানের ধ্যানে যখন তিনি বিভোর হইয়াছিলেন, তখন চকিতের ন্যায় ভগবান্ তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া দর্শন দান করিয়াই অন্তর্হিত হইলেন। নারদ সেই রূপ দেখিয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। পুনরায় সেই রূপের দর্শনলাভের জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার এই ঐকান্তিক আগ্রহ দেখিয়া ভগবান্ দৈববাণীর দ্বারা তাঁহাকে জানাইলেন যে, "একবার যে তোমাকে দর্শন দান করিলাম, সে আমার প্রতি তোমার আকর্ষণ বাড়াইবার জন্য, আমি কুযোগিগণের দর্শনীয় নহে। তুমি আমাতে চিত্ত সমাহিত করিয়া এই শরীর পরিত্যাগ করিবার পর আমাকে প্রাপ্ত হইবে।" রঘুনাথের এইরূপ হইল। শ্রীচৈতন্যদেবকে দর্শন করা অবধি তিনি যেন আপনাকে ভুলিয়া গেলেন—সেই ভুবন-মঙ্গল বিগ্রহের মধুর রূপ তাঁহার সমস্ত চিন্তা—সমস্ত ভাবনা অধিকার করিয়া বসিল। এখন তিনি নিরবধি শয়নে, স্বপনে ও জাগরণে সেই ভুবনমোহন রূপের চিন্তা করিতে লাগিলেন। সাধু ও গুরু-পদিষ্ট পন্থাই যে ইঁহাকে পাইবার পথ, কখনও তাহা মনে করিয়া তিনি মন্ত্রজপে ও কীর্ত্তনে নিযুক্ত হন, কখনও বা আত্মবিস্মৃত হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের ধ্যানে বিভোর হইয়া পড়েন। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দেখিলেন, রঘুনাথের সংসারাসক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা শিথিল হইয়াছে। তাঁহারা মোহের বশবর্ত্তী হইয়া ভাবিলেন, সুন্দরী সুশীলা পত্নীর সাহচর্য্য লাভ করিতে পারিলে রঘুনাথ সংসারে আসক্ত হইবে। এই মনে করিয়া রঘুনাথের সপ্তদশ বা অষ্টাদশ বৎসরে তাঁহাকে একটি পরমাসুন্দরী কিশোরীর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিলেন। সপ্তগ্রাম মুলুকের অধিকারীর একমাত্র পুত্রের বিবাহ; অতএব তাহাতে রাজকুমারের বিবাহের উপযোগী আড়ম্বরের কোনও অভাব হইবে না। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন স্বভাবতঃই দানশীল ছিলেন, এই বিবাহ ব্যাপারে তাঁহাদের ভাণ্ডারের দ্বার ব্রাহ্মণ, সজ্জন ও দরিদ্রের জন্য উন্মুক্ত হইল। কিন্তু যাঁহার জন্য এই সমারোহ—সেই রঘুনাথের মনে বিন্দুমাত্র শান্তি নাই—তিনি ভাবিলেন, এই আবার একটি বন্ধন পড়িল। কিন্তু পতিতপাবন শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপাশক্তির উপর তাঁহার তখন অগাধ বিশ্বাস আসিয়াছে—তাই তিনি নিতান্ত নির্লিপ্ত ভাবে এই ব্যাপারের প্রধান অভিনেতা সাজিলেন। কিন্তু তাঁহার বিষণ্ণমুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল না। পিতা-মাতা ভাবিলেন, নববধূ বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে রঘুনাথ সুন্দরী পত্নীর সাহচর্য্যে সুখী হইবেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে কালক্রমে সে আশাতেও নিরাশ হইতে হইল।

তখন রঘুনাথ যাহাতে গৃহ হইতে পলায়ন না করেন, তজ্জন্য তাঁহারা পাহারার বন্দোবস্ত করিলেন। কিন্তু ত্যাগের আদর্শ শিক্ষা দিতে জগতে যাঁহার জন্ম হইয়াছে, তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে এমন শক্তি কোনও পার্থিব বস্তুর নাই। পিতা-মাতা ও পিতৃব্য রঘুনাথের শরীরকে একরূপ বন্দী অবস্থায় রাখিলেন, কিন্তু তাঁহার মন সর্ব্বদা ধ্যানে শ্রীচৈতন্যদেবের চরণকমলের মকরন্দ পানে বিভোর হইয়া থাকিল, কত দিনে কিরূপে আবার তাঁহার পুনরায় দর্শন পাইবেন, এই চিন্তাতেই তিনি দিবারাত্রি মগ্ন থাকিতেন। রঘুনাথের এই বন্দিজীবন দুঃসহ বোধ হইলে—কয়েক বার তিনি পলায়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু পিতা ও পিতৃব্যের প্রেরিত পাইক তাঁহাকে পথ হইতে বাঁধিয়া আনিয়াছিল। এইরূপে বাহিরের বাঁধন যতই কঠোর হইতে লাগিল, ভিতরের আকর্ষণ ততই বাড়িতে লাগিল। ভক্তগণের এই আকর্ষণই এত শক্তিশালী যে, জগতে ইহার আর তুলনা নাই। ধ্রুব, প্রহ্লাদের এই আকর্ষণেই ভগবান্‌কে আসিতে হইয়াছিল। শ্রীরূপ-সনাতনের ও রঘুনাথের প্রবল আকর্ষণে মহাপ্রভুকে বৃন্দাবন গমনের ছল করিয়া অবশেষে রামকেলিতে ও শান্তিপুরে আগমন করিতে হইল। শ্রীরূপ-সনাতনকে আত্মসাৎ করিয়া ভক্তবৎসল শ্রীচৈতন্যদেব কানাইর নাটশালা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া পথে অগণিত ভক্তের মনোরথ পূর্ণ করিয়া অবশেষে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে আসিলেন। রঘুনাথ আবার গৌরাঙ্গরূপী গোবিন্দের দর্শনের জন্য গুরুর শরণাপন্ন হইলেন। গুরুর সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি পিতাকে বলিলেন—

"আজ্ঞা দেহ যাই দেখি প্রভুর চরণ।
অন্যথা না রহে মোর শরীরে জীবন।"

—চৈঃ চঃ, মধ্য, ১৬শ পরিচ্ছেদ।

আচার্য্য যদুনন্দন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ-পত্নীর দৃষ্টান্ত দিয়া হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনকে বুঝাইলে শ্রীরঘুনাথের প্রার্থনা—

"শুনি তাঁর পিতা বহু লোক দ্রব্য দিয়া।
পাঠাইল তাঁরে 'শীঘ্র আসিহ' কহিয়া।"
—চৈঃ চঃ, মধ্য, ১৬শ পরিচ্ছেদ।

এইবার দশ দিন মহাপ্রভু শান্তিপুরে ছিলেন, ইহার মধ্যে রঘুনাথ সাত দিন মহাপ্রভুর সঙ্গে শান্তিপুরে যাপন করিলেন এবং নিরন্তর মনে মনে মহাপ্রভুর নিকট এই কথা নিবেদন করিতে লাগিলেন যে, "কি করিয়া আমি রক্ষকগণের হস্ত হইতে ত্রাণ লাভ করিয়া তোমার পাদপদ্ম লাভ করিতে পারিব?" অন্তর্য্যামী মহাপ্রভু তাঁহার মনের কথা বুঝিতে পারিয়া এবার তাঁহাকে পাইবার উপায় নির্দ্দেশ করিয়া যে উপদেশ দিলেন, তাহা জগতের আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে অপূর্ব্ব সার্ব্বভৌম দান। গীতা ও ভাগবতের সাররূপী ঐ অমূল্য উপদেশ-বাক্য এই—

"স্থির হইয়া ঘরে যাহ, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল॥
মর্কটবৈরাগ্য * না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া॥
অন্তর্নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোকব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার।"
—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ১৬শ পরিচ্ছেদ।

জগদ্বরেণ্য শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" গ্রন্থে যামলের এই শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছেন—

"শ্রুতিস্মৃতিসদাচারপাঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
আত্যন্তিকী হরিভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে।"

অর্থাৎ—বেদপুরাণ ধর্ম্মশাস্ত্রাদিসম্মত সদাচার বা পাঞ্চরাত্র বিধান উল্লঙ্ঘন করিয়া যে আত্যন্তিকী হরিভক্তি দেখা যায়, তাহা আচরণকারীর নিজের ও জগতের উৎপাতেরই কারণরূপে কল্পিত হইয়া থাকে।

অতএব ভক্তিসাধনের পথে শাস্ত্রই একমাত্র পথপ্রদর্শক। শ্রুতি, ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ ও পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রেই ভক্তির বিধান বিধিবদ্ধ হইয়াছে—এই সমস্ত শাস্ত্রকে উপেক্ষা করিয়া নিজের অনুরাগের সাময়িক প্রভাবে যে মনঃকল্পিত ভক্তিসাধনায় পথ আবিষ্কৃত হয়, তাহাতে জীবের ও জগতের অনিষ্টই ঘটিয়া থাকে। আজ ভক্তি-সাধনের নামে আউল বাউল সহজিয়া কিশোরীভজা ও কর্ত্তাভজার মনঃকল্পিত শাস্ত্রবিরোধী পন্থায় দেশ ভরিয়া গিয়াছে। অন্য দিকে দেবমন্দিরে ও মঠে মোহান্ত ও মঠাধিকারীরাও উদাসীনের আসনে বসিয়া মর্কটবৈরাগ্যের অভিনয় করিতেছে। যেখানে মঠস্থাপনও 'মহারম্ভ' বলিয়া শ্রীবৃন্দাবনের গোস্বামিগণ বর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, সেখানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও গোস্বামীদিগের নামে মঠ-প্রতিষ্ঠার হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে। যেখানে "তৃণাদপি সুনীচ" হওয়া ভক্তের আদর্শ বলিয়া পরিগণিত হইত, সে স্থানে প্রভুপাদ ও মহাপ্রভুপাদ, গোস্বামী ও আচার্য্য, পরমহংস ও পরিব্রাজকাচার্য্য সাজিবার জন্য বিবাদ আরম্ভ হইয়াছে। অন্তরে নিষ্ঠার ঐকান্তিক অভাবে আজ বঙ্গদেশ প্রপীড়িত। অনাসক্তি এখন বক্তৃতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে এবং মর্কটবৈরাগ্য প্রকৃত সাধুর লক্ষণরূপে দেখা গিয়াছে। অধর্ম্ম, বিধর্ম্ম, পরধর্ম্ম, ছলধর্ম্ম ও ধর্ম্মাভাস এখন ধর্ম্মজগতে প্রভুত্ব করিতেছে। কত দিনে আবার মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের রঘুনাথকে প্রদত্ত এই উপদেশ বুঝিবার ও পালন করিবার সময় ফিরিয়া আসিবে, তাহা কে বলিতে পারে? শ্রীচৈতন্যদেব রঘুনাথকে বাহিরের ব্যাকুল ভাব ত্যাগ করিয়া অন্তরের ঐকান্তিক আকর্ষণকে তীব্র হইতে তীব্রতর করিবার উপদেশ দিয়া বলিলেন—

"অন্তর্নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোকব্যবহার।"

লোকব্যবহারের বিরোধী কাজ করিলেই সমাজের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। তাহাতে আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারবর্গ বিরোধী হইয়া উঠে। ইহাতে হরিভজনের পক্ষে প্রবল বাধার সৃষ্টি হয়। এই জন্য ভজনের প্রথমাবস্থায় এইরূপ বিরোধী ভাবের জনক কার্য্য সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। অন্তরে অনাসক্ত হইয়া স্বয়মাগত বৈষয়িক সুখভোগে অন্তরের কামনা-বহ্নিতে আহুতি দেওয়া হয় না; ভোগের আকাঙ্ক্ষাই মানুষকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া ফেলে—আসক্তিহীন হইয়া কর্ম্ম করিলে বা ভগবানের দানরূপে বিষয় ভোগ করিলে তাহাতে সংসারের বন্ধন দৃঢ় হয় না - পরন্তু, তাহাতে কর্ম্মের ক্ষয় হইয়া ভগবৎলাভের পথই প্রশস্ত হইয়া থাকে। তাহার পর ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা যতই সুদৃঢ় হইতে থাকে, বাহিরের বন্ধন ততই খসিয়া আসে। ফল পাকিলে বোঁটা আপনি খসিয়া পড়ে। যখন ভগবান্‌কে লাভ করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইতে প্রবলতর হয়, তখন আপনিই সংসার তাহাকে পরিত্যাগ করে। কর্ম্মক্ষয়ের উপায় বলপূর্ব্বক বা আলস্যবশে কর্ম্মত্যাগ নহে; পরন্তু, অন্তরে সুতীব্র ভগবদ্ভক্তির দ্বারাই কর্ম্মক্ষয় হইয়া থাকে। প্রারব্ধ কর্ম্ম সম্বন্ধে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, যেরূপ ধনু হইতে শর এক বার নিক্ষেপ করিলে তাহা আর ফিরাইয়া আনা যায় না—সেইরূপ যে কর্ম্মের ফলভোগ আরম্ভ হইয়াছে, সে কর্ম্ম আত্মজ্ঞান লাভ করিলেও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু শ্রীভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রের অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলিয়াছেন যে, ভগবদ্‌ভক্তির দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্মেরও বিনষ্ট ঘটিয়া থাকে। ফলতঃ, যিনি সকল কর্ম্মের মূল—সকল কর্ম্মের ও কর্ম্মফলের নিয়ন্তা, তিনি ইচ্ছা করিলে যে কর্ম্মক্ষয় করিতে পারেন না—ইহা মনে করিলে তাঁহার শক্তিকে নিতান্তই সীমাবদ্ধ করা হয়। অতএব একমাত্র সুতীব্র ভগবদ্ভক্তিই সর্ব্বকর্ম্ম ও সর্ব্বকর্ম্মের বীজ নিঃশেষে দগ্ধ করিতে সমর্থ।

শ্রীচৈতন্যদেব রঘুনাথকে যে উপদেশ দিলেন, এখন হইতে রঘুনাথ তাহা পালনের জন্য সংকল্প করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি সংসারের প্রতি বাহিরে আসক্তের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। সমস্ত আত্মীয়স্বজন ও নবপরিণীতা পত্নীর প্রতি ঔদাস্য ত্যাগ করিলেন। সমস্ত বৈষয়িক ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া পিতা ও পিতৃব্যের সাহায্য করিতে লাগিলেন—কিন্তু অন্তরে সর্ব্বদা শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীচরণলাভের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পূজা ও আহ্নিকের ব্যপদেশে যখন তিনি বিরলে অবস্থান করেন, তখন চোখের জলে তাঁহার বুক ভাসিয়া যাইতে থাকে। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের স্বর্ণোপম কান্তির ধ্যানে বিভোর হইয়া পড়েন। অথচ বাহিরের ব্যাপারে তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। পুত্রবৎসল পিতামাতা ও পিতৃব্য

* বানরের ন্যায় বৈরাগ্য। বাহিরে অনাসক্তির ভান, কিন্তু অন্তরে প্রবল আসক্তি থাকিলে তাঁহাকে "মর্কটবৈরাগ্য" কহে।

তাঁহার এই ভাব দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। সাধ্বী পত্নীও পতিসেবার সুযোগ পাইয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন।

কিন্তু শান্তিপুরে রঘুনাথকে উপদেশ দিবার সময় অন্তর্য্যামী শ্রীচৈতন্যদেব শুদ্ধ উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, কিরূপে রঘুনাথ নীলাচলে তাঁহার শ্রীচরণ প্রাপ্ত হইবেন, তৎসম্বন্ধেও তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন—

বৃন্দাবন দেখি যবে আসিব নীলাচলে।
তবে তুমি আমা-পাশ আসিও কোন ছলে॥
সেকালে সে ছল কৃষ্ণ স্ফুরাবে তোমারে।
কৃষ্ণ কৃপা যারে তারে কে রাখিতে পারে॥

রঘুনাথের ইহাই এখন ধ্যানের বিষয় হইল, শ্রীচৈতন্যদেব নীলাচল হইতে কত দিনে শ্রীবৃন্দাবনে যাইবেন, কত দিনে শ্রীবৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিবেন, রঘুনাথ তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং শ্রীচৈতন্যদেবের গতিবিধি সম্বন্ধে সংবাদ লইতে লাগিলেন। [ক্রমশঃ

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম-এ, বি-এল)।

যোগ্যং যোগ্যেন

[নক্সা]

আমাদের দেশে প্রথা আছে, ক'নে দেখিবার সময় বৃদ্ধ লোককে সঙ্গে লইয়া যাইতে হয়। বৃদ্ধদের দৃষ্টি-শক্তি বেশী, তা নয়! বয়সের সঙ্গে সে-শক্তি বরং কমিয়া আসে। আসল কথা, বৃদ্ধদের চোখে নেশা লাগে না, তাঁরা থাকেন দর্পণের মত! দর্পণে ছায়া পড়ে, ছবি আঁকে না। সুতরাং সুনীলের বিয়ের ক'নে দেখিতে এক জন বৃদ্ধ খুঁজিতে হইল। আমি সুনীলের বড় ভাই। ক'নে-পছন্দর ব্যাপারে আমারও সে দিক্ দিয়া কিঞ্চিৎ অধিকার থাকিবার কথা।

পাড়ার পাকড়াশি-মশাইকে পাকড়ানো গেল। বৃদ্ধ বলিয়া বটে, তা ছাড়া বৃদ্ধের রস-জ্ঞান এবং রুচিবোধ দুই-ই বেশ প্রখর। কিন্তু আমার সহিত বিয়ের ক'নে দেখিতে যাইবার প্রস্তাবে পাকড়াশি রাজি হইলেন না, বলিলেন,—ঐ বস্তুটি ভায়া সযত্নে পরিহার করে চল্ছি। ন্যাড়া ক'বার বেলতলায় যায়?

বেলতলার কথায় একটা বিগত কাহিনীর আভাস পাওয়া গেল। কথাটা চাপা দিয়া পাকড়াশি বলিলেন,—বিয়ের ক'নে দেখবার উদ্দেশ্যই হলো 'যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ!' অর্থাৎ কি না—

অর্থ দুরূহ নয়! বলিলাম,—আপনার কাহিনীটা শোনা যাক্!

পাকড়াশি গলা সাফ করিয়া কহিলেন,—কাহিনী কি একটা হে ভায়া, বিস্তর! সংক্ষেপে বল্ছি। কিন্তু সর্ব্বশেষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেচি যে, প্রজাপতির নির্ব্বন্ধই হচ্ছে যোগ্যং যোগ্যেন! না হয়ে উপায় নেই। ধরো, এই আমার ব্যাপার! কোন্ ত্রেতা-যুগে বিয়ে হয়েছিল, সে-বয়সের গাছ-পাথর নেই। কিন্তু প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ সে সময়েও নির্ভুল ছিল। তাই দ্যাখো না, আজ আমার অম্বল, আর ব্রাহ্মণীর চোঁয়া-ঢেকুর! আমার পা ব্যথা, তাঁর মাজা-কনকনানি,—এ হতেই হবে। সাধে বলি যোগ্যং—

বাধা দিলাম। বলিলাম,—আপনার ক'নে-দেখার কাহিনী শোনান্। পাত্রীটি কি নিজের জন্য? না, অপরের জন্য দেখতে গিয়েছিলেন?

—রামঃ, নিজের জন্য ক'নে কেউ নিজে দেখতে যায়? ও সব বাপু তোমাদের আজকালকার ফ্যাসান হয়েচে। আমাদের কালে ছিল না। অভিভাবকরা ক'নে পছন্দ করতেন আর আমরা বন্ধু-বান্ধবের মুখে টুকি-চাটুকি শুনে মনে-মনে ধ্যান করতাম নোলক-পরা একখানি লজ্জানত মুখ! তার ঘোমটায় ঢাকা মুখ—ভাবতেই কেমন কাব্য জাগতো! তার পর শুভদৃষ্টির সময় যাঁকে দেখা যেতো, তিনি হুবহু সেই স্বপ্নে-দেখা রাজকন্যা! তাঁর নাকের নোলক আর সীঁথির সিঁদুর—

আবার বাধা দিতে হইল। বলিলাম—কিন্তু আবার আপনার নিজের কথা এসে যাচ্ছে! আপনার ক'নে দেখার কাহিনী শুনতে চাই!

—বল্ছি। পাকড়াশি মহাশয় বলিতে আরম্ভ করিলেন:

আমাদের পাড়ায় এক ডাক্তার ছিল। তার নাম এখন আর বলতে চাইনে! আমি নাম দিয়েছিলাম অশ্বিনীকুমার! তার চিকিৎসানৈপুণ্যে ডক্টর অব ডিভিনিটি উপাধি! ছোকরা খাস্ কলকাতার পাশ এইচ্-এম্-বি। এইচ্টা প্যাডে, নোটিশ-বোর্ডে—সর্ব্বত্রই ছোট হরফে লেখা। মফঃস্বল হলে কি হবে, ভুলেও সে স্যুট না পরে রোগী দেখতে বেরুতো না। এক বার টাইয়ের গিঁট ফস্কে গিয়েছিল বলে রোগীর বগলে থার্ম্মোমিটার এঁটে রেখে বাড়ী চলে এসেছিল টাই টাইট্ করতে,—এমন স্মার্ট, এমন বিচক্ষণ চিকিৎসক!

সুতরাং অশ্বিনীকুমার যখন বিয়ে করবে, তখন সে মেয়ে যে শুধু-সুন্দরী হবে না, তার সঙ্গে নীরোগ, সুস্থ, সবল হবে,—এ তো জানা কথা! অশ্বিনীর আর কোন অভিভাবক ছিল না, অগত্যা আমাকেই তার ক'নে দেখতে যেতে হলো।

মেয়ে দেখতে যাবার সময় অশ্বিনী পথে আমায় তালিম দিয়ে নিলে,—বিয়ে করা মানে, কি জানো খুড়ো, একটা ফরেন্ বডি ইনজেক্ট করে ফ্যামিলি-শরীরে ঢোকানো! ফল একটা কিছু হয়ই। ভালো-মন্দ কলহ-মনান্তর নানা উপসর্গ ঘটতে থাকে। ঘটতে ঘটতে ইনার সেল্ বডিতে যখন ইয়ে হয়, মানে, দু'-চারটি কুপুষ্যি হাত-পা মেলে দেখা দেয়, তখন সব আবার ধীরে ধীরে ধাতস্থ হয়ে আসে! তদ্দিন পর্য্যন্ত সহ্য করতে হবে! সুতরাং সেই ফরেন্ বডিটি সিলেক্ট করতে একটু—

ব্রাহ্মণীর কথা তুলতে চাইছিলাম, বাধা দিয়ে অশ্বিনী বললে,—আরে রাখো, তাঁরা সব সতীলক্ষ্মী! ও-রকম মেয়ে কি আর আজকাল পাবে?

বলতে বলতে নেবুতলায় এসে পড়লাম এবং অচিরে এক ভদ্র-ভবনের বৈঠকখানায় সাদর-অভ্যর্থনা-সহ আমাদের উপবেশন।

মেয়েটির নাম শুনলাম অণিমা। চেহারা চেয়ে চেয়ে দেখবার মত। আমি তখন বিয়ে করেছি, সত্য বলতে কি, অল্প বয়সে ব্রাহ্মণীরও কিছু সৌন্দর্য্যের খ্যাতি ছিল। হলে হবে কি, আমার ভিতরের শাশ্বত পুরুষটি বার-বার আড়-চোখে মেয়েটিকে দেখে নিচ্ছিল।
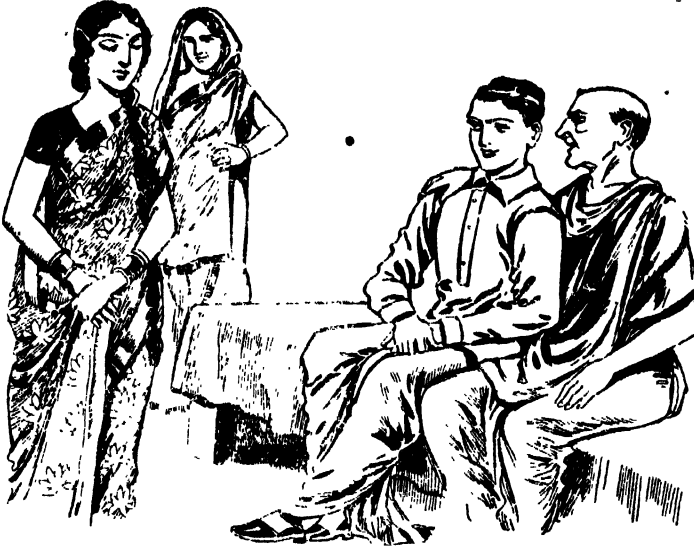
আমার ভিতরের শাশ্বত পুরুষটি বার-বার আড়-চোখে মেয়েটিকে দেখে নিচ্ছিল

পরিহিত বসনে অজস্র প্রফুল্ল কমল শোভা পাচ্ছে, চরণে অলক্ত-রাগ। সে রাঙ্গা চরণ লাভ করলে বুঝি কাঙ্গালেরও স্বর্গ-লাভ হয়! এমন ইণ্ডিয়ান আর্ট-মার্কা কিশোরীর ভালে যে ভাগ্যবান্ সিঁদুর ছোঁয়াবে, সে নিশ্চয় কোনো দুর্গম গহনে সাধনা করছে!

পাকড়াশি মহাশয়ের উচ্ছ্বাসে চমকিত হইলাম! ভদ্রলোকের নিশ্চয় কবিতা লেখার ব্যারাম ছিল বা আছে! নচেৎ পরস্ত্রীর ব্যাপারে এত উচ্ছ্বাস কেন? অথবা পরস্ত্রীর রূপ-ব্যাখ্যানই হইল রীতি! যাই হোক, শুনিতে লাগিলাম, পাকড়াশি মশাই বলিয়া চলিলেন—

অশ্বিনীর ভাগ্যে আমার হিংসা হতে লাগলো, তবু সঙ্গীর কানে কানে বললাম—মূঢ়, মতি-স্থির হলো?

অশ্বিনীর যেন সত্যই নেশা লেগেছে! কিসের নেশা—বোঝবার আগেই সে একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বললে—অ্যা-নে-মি-আ!

অভিভাবক নিকটে ছিলেন। বললেন,—না না, অণিমা! অণিমারাণী রায়।

পরিচারিকা অণিমারাণীকে অন্তরালে নিয়ে গেল।

অশ্বিনী এবার গম্ভীর ভাবে অভিভাবকের দিকে তাকিয়ে বললে,—কিন্তু কেস্ যে অ্যা-নে-মি-আ! পারনিসাস অ্যা-নে-মি-আ! কি চিকিৎসা করাচ্ছেন? কবরেজি? না এলোপ্যাথি? হেমোগ্লোবিন প্রিপারেশান খাইয়েছেন কখনো? ও কাজটি করবেন না! ভেরি ব্যাড আফটার-এফেক্‌ট্! এই তো তিনকড়ি চক্কোত্তির মেজো শ্যালির ছোট মেয়ে, বুঝেচেন কি না—

—তারও অ্যানেমিআ? তা কিসে সারলো বলুন তো? অণিমার চেহারা তো দেখলেন! চেহারায় কিছু মালুম হয় না! মাস ছয় আগে এক বার ভুগেছিল ডিসেণ্টিতে।

—ঠিক ধরেছি, পারনিসাস্ অ্যানেমিআ! গায়ে এক-বিন্দু রক্ত নেই, চোখের কোণে কালি। কত বয়স হলো? জিভ সাফ আছে কি না জিজ্ঞেস করুন তো!

অভিভাবক বাড়ীর মধ্য থেকে শুনে এসে বললেন,—জিভ সাফ আছে। গায়ের রং দেখেই তো বুঝেচেন, ওর সবই সাফ! পায়ের নখ থেকে চোখের তারা পর্য্যন্ত!

—তারা পর্য্যন্ত! আমি জিজ্ঞেস করলাম,—চোখের তারা সাদা না কি আপনার মেয়ের?

—আজ্ঞে, আমার মেয়ে নয়। আমার মাস্-শাশুড়ীর মেয়ে, মানে, ইয়ে আর কি! তা চোখের তারা সাদা হবে কেন? ঐ কথার কথা বললাম আর কি! এমন সাফ-সাফাই স্বভাব আর পাবেন না!

অশ্বিনী একখানা কাগজ চেয়ে নিয়ে কলম কামড়ে মাথা চুলকে অনেকক্ষণ ভেবে প্রেস্‌কৃপসান লিখলে। আমি ভাবছিলাম, মেয়েটির চোখের কথা! আহা, একেবারে যাকে বলে কালো হরিণ-চোখ, চোখের কোলে স্বভাব-কজ্জল রেখা! সকালবেলার সোনালী আলো নদীর তরঙ্গে যেমন কাজলের রেখা আঁকতে থাকে, ঠিক তেমনি! আর পাষণ্ড অশ্বিনী বলে কি না, অ্যানেমিয়া! রক্তশূন্য হলে বুঝি চোখ অমন হয়? অ্যানেমিয়া, না, তার মাথা!

আমার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হলো। দেখি, অণিমার ভগ্নীপতি মহাশয় অশ্বিনীর হাত থেকে প্রেস্‌কৃপসান নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। অশ্বিনীও উঠেছে। অগত্যা আমিও উঠলাম। আর-এক বার অণিমাকে দেখার সুযোগ হলো না!

ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন—শীগ্‌গিরই সেরে যাবে, আশা করেন, কেমন?

অশ্বিনী গম্ভীর হয়ে বললে—কেস্‌টা পারনিসাস্, তাই একটু সময় নেবে।

ভদ্রলোক আবার জিজ্ঞেস করলেন,—তার পর মেয়ে কেমন দেখলেন? আপনাদের মতামত কি?

উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম, অশ্বিনীই উত্তর দিলে—কেস্‌টা পারনিসাস্ কি না—একটু টাইম নেবে।

প্রথম বারে বলেছে 'সময়'! এবার বললে 'টাইম'! পার্থক্যটা অভিভাবক হৃদয়ঙ্গম করতে লাগলেন—আমরা পথে বেরুলাম।

এমন সাংঘাতিক ঘটনার পর দ্বিতীয় বার আর অশ্বিনীর সঙ্গে মেয়ে দেখবার উদ্দেশ্যে যাবো না, স্থির করলাম। কি কাজ এই সব যা

নয় তাই ঘাঁটাঘাঁটি করে! আছি বাপু নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ, আপিস, আড্ডা আর অর্দ্ধাঙ্গিনীকে নিয়ে। কিন্তু অশ্বিনী গোল বাধালো আবার। সোজা পথে হলো না দেখে ধরে বসলো ব্রাহ্মণীকে এবং তাঁর রেকমেণ্ডেসন এড়াতে না পেরে আবার যেতে হলো অশ্বিনীর সঙ্গে। তবে এবার আর ইণ্ডিয়ান আর্ট নয়, একেবারে স্মার্ট আর স্মাইলিং! অশ্বিনীর মুখে কথা শুনে মনটা ব্যাজার হয়ে গেল। স্মার্ট মেয়ের সামনে সার্ট পরে যাওয়া বিধি! আমার সনাতন দোলাই-খানা মনকে পীড়া দিতে লাগলো।

পথে অশ্বিনীর সঙ্গে কথাবার্ত্তায় মনটা ধাতস্থ হলো। সত্যি, আমি তো আর বিয়ে করতে যাচ্ছিনে, আমায় নাই বা পছন্দ করলে! আর আমরা যাচ্ছি পরীক্ষক, তবে আর অত জুজু-বুড়ীর ভয়ই বা কেন! অশ্বিনীর আর্গুমেণ্টটা ফ্যালনা নয়। মন্ত্রই পড়ো, আর নারায়ণ-অগ্নিকেই সাক্ষ্য করো,—বিয়ে যে একটা আসন্ন শারীরিক সম্বন্ধের ব্যাপার, যত গল্পই শোনাক্—সকল লোকই এ কথা স্বীকার করবেন। অথচ বিয়ের ব্যাপারে আমরা মেয়ের রূপ দেখি, হয়তো কিছু গুণও দেখি, সব চেয়ে বেশী করে দেখি পণ আর বর-সজ্জাদির বহর! আজকাল আবার বংশ-মর্য্যাদার প্রশ্ন গৌণ হয়েছে! বিধবা বা অসমশ্রেণীর হলেও দোষ নেই! কিন্তু যাকে নিয়ে সারা জীবন গোঁয়াতে হবে, তার শারীরিক সামর্থ্যের বিষয়ে—তার স্বাস্থ্যের বিষয়ে খোঁজ নেবার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন বোধ করিনে! বিয়ের জল গায়ে পড়ে শরীর সারবার ভরসায় কত রুগ্ন দুর্ব্বল অযোগ্যা কন্যার বিবাহ হচ্ছে! ফলে যত গহনাই মিলুক, ঘরের যতখানিই বর-সজ্জায় ভরে থাকুক, বিবাহিত জীবন বিষময় হয়ে ওঠে! অণিমার মায়া ফিকে হয়ে এসেছিল, বুঝলাম, অশ্বিনী ঠিক বলেছে,—যাকে বিয়ে করবে, তাকে একটু বুঝে নেবে না?

আমরা গন্তব্য গৃহে পৌঁছুলাম। মূল্যবান্ আসবাব-পত্রে গৃহস্বামীর ধনবত্তার ও আধুনিক মার্জ্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। পাত্রীর ভ্রাতাই আমাদের 'আস্তাজ্ঞা হোক' 'বোসতে আজ্ঞা হোক্' করে আহ্বান করে বসিয়ে ভিতরে গেলেন। তাঁর আপ্যায়নের ভাষায় আমি একটু ঘাবড়ে গিয়ে অশ্বিনীর কাণে কাণে প্রশ্ন করলাম—এ যে একেবারে আলালি ভাষা হে!

অশ্বিনী বললে,—অতি পুরাতন প্রথা-প্রচলনই আজকাল চরম বিলাস।

ভাই-বোন বাইরে এলেন এবং ভদ্রলোক তাঁর ভগিনী শ্রীকৌশিকী দেবী আই-কম্-এর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। কৌশিকী কুমারী। তবে কিঞ্চিৎ কমনীয়তাশূন্য! সেটা কমার্স পড়বার দরুণ কি না, বোঝা গেল না। কৌশিকীকে আমি ভুল করে জিজ্ঞেস্ করে ফেলেছিলাম—কত দূর পড়াশুনা করেছেন, বললেন? বিরক্ত গম্ভীর-স্বরে উত্তর এলো,—আই-কম্!

অশ্বিনী মৃদু স্বরে বললে,—আর কম হবে কেন? আয়ু কম।

কথাটা বোধ হয় তাঁরা শুনতে পেলেন না।

সত্যি বলতে কি, কৌশিকীর বয়স হয়েছে। পঁচিশের কম মনে হলো না! গায়ে বহু-বিখ্যাত কাননবালা ব্লাউশ! তবে ঘাড়ের কাছটা একটু লীলা দেশায়ী আর হাতার কাছটা একটু সাধনা বসুর ঢং মিশিয়ে ব্লাউশটিকে অতি-আধুনিক করা হয়েছে মনে হলো! ওরিজিনাল কাননবালা-ব্লাউশ ব্রাহ্মণীরও একটা দেখেছি কি না!

কৌশিকীর ভ্রাতা বল্লেন—কৌশিকী এবার টপ্পা আর জারি গানে অল-বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। আর ওর কানাই ধামালী গান শুনে তো য়ুনিভার্সিটিতে হুলুস্থুল বেধে গেছে। সেই জন্যই ওকে কমার্স ছাড়িয়ে আর্ট পড়াবার কথা উঠেছে—পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাসে গানের লেক্‌চারার হবার জন্য। তবে আপনারা যদি খেয়াল পছন্দ করেন, তাতেও ও হার মানবে না! খেয়ালেই লাখ্‌নৌ থেকে মেডেল পেয়েছে কি না!

একটা খেয়াল গেয়ে আমাদের শ্রবণ শীতল করবার অনুরোধ পাবা মাত্র কৌশিকী অর্দ্ধোল্লম্ফনে অর্গান অধিকার করলেন এবং তারস্বরে সংগীত স্বরু হলো—

আ—রে মেরি ননদিয়া—

আ—রে মেরি ননদিয়া—

বিবাহের পূর্ব্বে ননদিয়ার উদ্দেশ্যে তিনি কি কথা বলতে পারেন, মনে মনে তাই কল্পনা করছিলাম, এমন সময় অশ্বিনী বাধা দিয়ে বললে,—দেখুন, সংসার করতে সঙ্গীত না হলেও এক-রকম চলে যায়। কিন্তু স্বাস্থ্য না হলে—

কৌশিকী নিজেই বললে,—কেন, আমার স্বাস্থ্য খারাপ?

—না, তা বলছিনে। তবে কোনো অসুখ-বিসুখ আছে কি না—

—অসুখ! দুঃ! কৌশিকীর মুখ-বিকৃতিতে আমারও মুখ যেন বিকৃত হয়ে গেল। তার দাদা বল্লেন,—লেকে রোয়িং-এ কৌশিকী এবার উইন করেছে, জানেন না? দেখেননি ছবি কাগজে? তা ছাড়া লং জাম্প, হাই জাম্প, হকি, ক্রিকেট, বাস্কেট-বল—যাতে দেবেন, তাতেই ফার্ষ্ট। ও যদি মেয়ে না হতো, তাহলে মোহনবাগান কি আজ এরিয়ানসের কাছে হারতো? হাফ্-ব্যাকে ও চমৎকার খেলে!

অশ্বিনী বললে—কিন্তু এ সব ওভার-একসায়সাইজে হার্টের ব্যারাম হয়। আপনার ব্লাডপ্রেসার কত?

কৌশিকী কুটিল নয়নে তাকালো—এক বার আমাদের দিকে, তার পর তার দাদার দিকে। অশ্বিনী অত লক্ষ্য করেনি, বেই বলেছে,—তাছাড়া ফুটবল হকি প্রভৃতি খেলায় মেয়েদের মাতৃত্বের সম্ভাবনাও নষ্ট হতে পারে—

আর বলতে হলো না! ভাই-বোন যুগপৎ গর্জ্জন করে উঠলো—শাট্ আপ্!

কৌশিকীর হাতের কঠিন আঙুলগুলি যেন নিশ্‌পিশ্ করতে লাগলো, আর তার দাদা অর্দ্ধচন্দ্র দেখিয়ে বল্লেন—গেট আউট ইউ স্কাউনড্রেলস্!

উদুরী বা অনুরূপ-রোগগ্রস্তা। অশ্বিনী সব জিজ্ঞাসাবাদ করে রোগ স্থির করলে ওবেসিটি অর্থাৎ মেদ-বাহুল্য। সেই কথা বলেই উঠতে যাচ্ছিল, মন্দোদরী বল্‌লে, এবার আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে—সেটা অবশ্য আপনার শরীর ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে। তার পর অকুণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে—মহাশয়ের হজম-শক্তি কিরূপ? রাত্রে ভাত রোচে? না, লুচি? কম করে খেলে হজম হয়? মাসে ক'বার সর্দ্দি লাগে? অম্বলের উদ্গার ওঠে কি না? চোখের লং-সর্ট উভয় দৃষ্টিই অক্ষুণ্ণ আছে কি না? এটা সেটা নানা কথা বলতে বলতে শেষ পর্য্যন্ত মেয়েটি বললে—আপনার জিভ বের করুন তো।

অশ্বিনী জিভ বের করবে কি না ভাবছে, এর মধ্যে ভিতর থেকে মেয়েটির অভিভাবক খাবার নিয়ে প্রবেশ করলেন। মেয়েটিও উঠে চলে গেল। এমন অপমানিত অশ্বিনী জীবনে কখনও হয়নি। সে একটা রীতিমত পাশ-করা ডাক্তার, আর তাকেই কি না জিভ বের করতে বলা! এ অপমানের সমুচিত শাস্তি দিতে সে বদ্ধ-পরিকর হলো এবং সঙ্গে সঙ্গে পাকা কথা দিয়ে এলো।

পাকড়াশি মশাই হাঁফ ছাড়িয়া বলিলেন,—আপাত-দৃষ্টিতে এদের একটু বিসদৃশ দেখায়, যেন পাহাড়ের পাশে দেবদারু গাছ! কিন্তু ইনার সোলটি ঠিক আছে, অর্থাৎ যোগ্যং যোগ্যেন হয়েছে।

—গেট আউট ইউ স্কাউনড্রেলস্

আমি তখনও ননদিয়ার উদ্দেশ্যে নিবেদিত রাগিণীটুকু মনে মনে গুঞ্জন করছিলাম, এখন চমকে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। আসবার সময় চা খেয়ে আসা হয়নি! ব্রাহ্মণী বলেছিলেন, মেয়ে-বাড়ী অন্ততঃ এক-কাপ চা অবশ্য দেবে! কেবল তারই মৌতাত মনে-মনে জমিয়ে তুলছিলাম, এমন সময়—শাট্ আপ! তার পরেই গেট্ আউট এবং স্কাউনড্রেলস্! নেহাৎ গুরু-বল ছিল, তাই অর্দ্ধচন্দ্র গলদেশ স্পর্শ করবার পূর্ব্বেই পথে পা বাড়ালাম।

পথে অশ্বিনীর সঙ্গে আর স্পিক্-টি-নট্, সোজা ঘরে ফিরে এলাম।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—অশ্বিনীকুমার চিরকুমার রইলেন?

হাসিয়া পাকড়াশি মশাই বলিলেন,—বাঃ, বাংলা দেশে আবার মেয়ের অভাব! অণিমার না হয় অ্যানেমিআ হয়েছিল, কৌশিকীর স্বাস্থ্যচর্চ্চার কথাও না হয় বাদ দিলাম, তাই বলে অশ্বিনীর যোগ্য পাত্রী কি আর জুটবে না? গোড়ায় বলেচি তো যোগ্যাং যোগ্যেন—

বলিলাম—সে কাহিনী শোনবার জন্য অধীর আগ্রহ হচ্ছে।

পাকড়াশি মশাই বলিলেন—এবার কিন্তু আর কারো রেক-মেণ্ডেসনেই শর্ম্মা পা বাড়ায়নি। শেষে কি স্ত্রীলোকের হাতে নির্য্যাতিত হয়ে পৈত্রিক প্রাণটাকে খোয়াবো? অশ্বিনী একা গিয়েছিল। মেয়ের নাম মন্দোদরী। অর্থাৎ মন্দ মন্দ মানে কি না ঈষৎ

পাকড়াশি মশাই আমার সঙ্গী হইলেন না, কিন্তু তাঁর অমূল্য উপদেশ আমার যথেষ্ট সাহায্য করিল। শুনিয়া সুখী হইবেন, পছন্দ
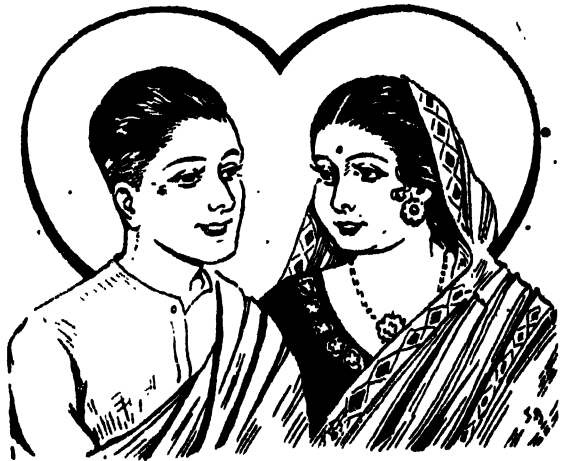
যোগ্যাং যোগ্যেন

করিয়া যাঁহাকে আনিয়াছি, সুনীলের তিনি যোগ্য হইয়াছেন! স্বাস্থ্যের বিচারেও কেহ তাঁকে নিন্দা করিতে পারিবে না!

শ্রীসন্তোষকুমার দে।

ছোটদের আসর

অর্থে অনর্থ

[রূপকথা]

বহু কষ্ট সহ্য করে গরুর গাড়ী, নৌকা ইত্যাদি চড়ে শেষ পর্য্যন্ত মামার বাড়ী গিয়ে হাজির হলুম। আজবপুর দেশটা আমাদের গ্রাম থেকে অনেক দূরে, আমার মামা গোবিন্দ বাবু আজবপুরের সব চেয়ে বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তি। মা মরবার সময় বলেছিলেন, "আজবপুরের তোর মামার কাছে যাস্, একটা হিল্লে হয়ে যাবে।"

আমাদের বিশেষ কিছুই ছিল না, তবু সামান্য যা পৈতৃক সম্পত্তি ছিল, তাই বেচে পাথেয় জোগাড় করে আজবপুরে চললুম। জীবনে পূর্ব্বে কখনও মামার বাড়ী যাইনি। আজবপুরে ঢুকে এক জনকে গোবিন্দ মামার সন্ধান জিগ্‌গ্যেস করতেই দু'চোখ কপালে তুলে তিনি বললেন, "অ্যাঁ, বলেন কি? গোবিন্দ বাবুর বাড়ী চেনেন না। দশ-বিশটা সহরের মধ্যে গোবিন্দ বাবুর নাম জানে না, এমন লোক নেই। অমন ধনী, অমন মজলিসি লোক দেখা যায় না। এই সহরের উত্তর-সীমায় প্রকাণ্ড বাগানওলা বাড়ী যেন রাজার প্রাসাদ! এই রাস্তা ধরে নাকের সিধে চলে যান।"

ভদ্রলোকের নির্দ্দেশ মত কিছুক্ষণ পরে মামার বাড়ী গিয়ে হাজির হলুম। বাড়ীটা সত্যই বিরাট্, রাজপ্রাসাদকেও বোধ হয় হার মানিয়ে দেয়! ফটকে দারোয়ানকে জিগ্‌গ্যেস্ করলুম, "গোবিন্দ বাবু কোথায়?"

সে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে বললে, "ঐ যে বাগানে বেড়াচ্ছেন।"

তার নির্দ্দেশ মত বাগানে মামার কাছে গেলুম, মামা এক বার আমার দিকে চেয়েই মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন। আমি শঙ্কিত হয়ে এক দিকে দাঁড়িয়ে রইলুম, এক জন পারিষদ ফুল তুলতে গিয়ে কাঁটায় হাত কেটে ফেললে, মামা বললেন—"আহা, বড্ড রক্ত পড়ছে যে, একটু মলম আর পটী পেলে হতো।"

বলার সঙ্গে সঙ্গে ময়লা কাপড়-পরা আধ-ময়লা আলখাল্লা গায়ে রোগা বয়স্ক একটি লোক এগিয়ে এলো, তাকে আমি এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি, সে এসেই নিজের পকেট থেকে মলম আর পটী বার করে দিলে।

একটু পরে আর এক জন পারিষদ বলে উঠল, এই নরম ঘাসে একটা কার্পেট পেতে বসে পাশা খেললে মন্দ হয় না।"

মামা বললেন—"যা বলেছ, এ সময় একটা কার্পেট আর পাশা—"

কথা শেষ হতে না হতেই সেই রোগা ভদ্রলোকটি আলখাল্লার পকেট থেকে প্রকাণ্ড কার্পেট বার করলে, আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলুম! এত বড় কার্পেট ঐটুকু পকেটে কি করে ছিল! কার্পেটটি ঘাসের ওপর পেতে ভদ্রলোক আবার জেবে হাত দিয়ে বার করলেন চমৎকার একটি পাশার ছক। আমি অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলুম, পকেটটা ওর দোকান না কি! কিন্তু মামা বা তার পারিষদদের মুখে বিস্ময়ের কোনও চিহ্নই দেখতে পেলুম না। যেন এটা অতি সাধারণ ব্যাপার!

নির্ব্বিকার চিত্তে তাঁরা পাশা খেলতে বসলেন। একটু পরে এক জন পারিষদ বলে উঠল—"পাশার সঙ্গে তামাক আর সরবৎ না হলে জমে না।"

মামা ঘাড় নেড়ে বললেন—"ঠিক বলেছ, সরবৎ আর তামাকের বিশেষ প্রয়োজন।"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই সেই রোগা ভদ্রলোকটি আলখাল্লার পকেট থেকে কয়েকটি সুদৃশ্য গেলাস এবং সরবতভরা ভৃঙ্গার, সেই সঙ্গে সুগন্ধ তামাক আর গড়গড়া বার করে তাদের সামনে সাজিয়ে রাখলে! তখন আমি শুধু বিস্মিত নয়, ভীতও হয়ে পড়েছি। এ যেন ভৌতিক ব্যাপার! ওঁরা কিন্তু সে দিকে দৃক্‌পাত না করে তামাক আর সরবত পান এবং পাশা খেলতে লাগলেন। ততক্ষণে রৌদ্র উঠেছে, খিদেয় আমার নাড়ী জ্বলছে, মাথা ঝিম ঝিম করছে, কিন্তু মামা আমার দিকে মোটে নজরই করছেন না। রৌদ্রের তাপে ক্লান্ত হয়ে মামা শেষে বললেন—"একটা তাঁবু হলে বেশ হতো হে।" বলা মাত্রই সেই রোগা ভদ্রলোক আলখাল্লার পকেটে হাত চালিয়ে বার করলে একটা বিরাট্ তাঁবু, তাঁবু খাটানো হলো, মামাদের খেলা চলতে লাগলো।

আমি রীতিমত ভয় পেয়ে গেলুম, খিদের তাড়নায় রৌদ্রের তাপে কষ্ট হচ্ছিল, একটু ইতস্ততঃ করে মামাকে বললুম,—"মামা, বেলা হয়ে যাচ্ছে—"

মামা আমার দিকে মুখ তুলে চেয়ে বললেন—"তাই তো, আচ্ছা কাল সকালে এসো।" এর পর কি বা বলব, শ্রান্ত পদে তাঁর প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পান্থশালার খোঁজে চললুম।

নতুন জায়গা, কোথায় যাব, কি করব, ভাবতে ভাবতে চলছি, এমন সময় পিছন থেকে কে যেন বলে উঠল—"অ মশাই, শুনছেন?"

চমকে পিছন ফিরে দেখি, মামার বাড়ীর সেই রোগা ভদ্রলোক। আমার কাছে এসে তিনি বললেন—"বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে, কোথায় চললেন?"

আমি উত্তর দিলুম—"থাকবার আর খাবার জায়গা খুঁজছি।"

তিনি প্রশ্ন করলেন—"গোবিন্দ বাবুর কাছে এসেছিলেন কি উদ্দেশ্যে?"

আমি বললুম—"গোবিন্দ বাবু আমার মামা হন। একটা কোন কাজ-কর্ম্মের আশায় তাঁর কাছে এসেছিলুম।"

তিনি বললেন—"তাঁর কাছে বড় সুবিধা হবে, এমন মনে হচ্ছে না। তবে দেখুন, যদি কিছু মনে না করেন, তবে একটা কথা বলি।"

আমি বললুম—"মনে করব কেন! বলুন না, কি বলবেন।"

তিনি মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন—"আপনার কাছে আমার একটা প্রার্থনা ছিল।"

আমি বিস্মিত হলুম। যার পকেটের মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, তিনি আমার মত লোকের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন! নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারলুম না। অবিশ্বাসের সুরে বললুম—"আমার কাছে প্রার্থনা! কি বলছেন আপনি! আমার কি আছে?"

তিনি অতি বিনীত ভাবে বললেন—"আপনার কাছে যা আছে, এমন জিনিষই চাইব। যদি অনুমতি দেন ত বলি।"

আমারও কৌতূহল হচ্ছিল খুব। কি এমন জিনিষ? তাই

ব্যগ্র ভাবে প্রশ্ন করলুম—"কি জিনিষ, বলুন। আমার কাছে থাকলে নিশ্চয়ই দেব।"

প্রৌঢ়টি গদগদ কণ্ঠে বললেন—"আপনার এই চমৎকার ছায়াটি আমার বড় ভাল লেগেছে। আপনি যদি দয়া করে আপনার ছায়াটি নেবার হুকুম দেন, তা হলে আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব। অবশ্য আমি তার বদলে আপনাকে এই থলেটি দিচ্ছি। এই থলির মধ্যে যখনই হাত দেবেন, তখনই দশটি করে মোহর পাবেন। আপনার বিশ্বাস না হয়, থলেটি হাতে নিয়ে পরখ করে দেখুন।"

আমি থলেটি নিয়ে ভেতরে হাত চালিয়ে দিলুম। হাত বার করতেই দেখলুম—মুঠোয় দশটা মোহর! আবার হাত দিলুম, আবার বার হ'ল দশটা মোহর, আবার—আবার! স্তম্ভিত হয়ে গেলুম! এই থলে আমার হবে! বিশ্বাস করতে পারলুম না। প্রশ্ন করলুম—"এই থলেটি কি সত্যই আমাকে দেবেন?"

তিনি হেসে বললেন—"নিশ্চয়, যদি আপনি অনুগ্রহ করে আপনার ছায়াটি আমায় দেন।"

ছায়া দেব! এ আবার কি প্রস্তাব! লোকটা পাগল না কি! বললুম—"ছায়া নেবেন কি করে? ছায়া আর কায়া তো অবিচ্ছেদ্য। কায়া ছাড়া তো ছায়া হয় না।"

তিনি মুচকে হেসে বললেন—"সে আমি নিতে পারব। আপনি দয়া করে আদেশ দিন।"

বুঝলুম, পাগলের পাল্লায় পড়েছি। ছায়া কখনও নেওয়া সম্ভব? আর এই তুচ্ছ ছায়ার জন্য এমন মহামূল্য থলে কেউ হাতছাড়া করে? যাক্, থলেটা যখন পাওয়া গেছে, তখন ছায়া দিতে আপত্তি কি। এই ভেবে উত্তর দিলুম—"বেশ তো, যদি নিতে পারেন নিন। আমার তাতে কোন আপত্তি নেই।" মূল্যহীন ছায়া—নিতে পারে নিক না।

লোকটি প্রীত কণ্ঠে বললেন—"ধন্যবাদ!"—এই বলে তিনি হাঁটু গেড়ে পথের উপর অতি সন্তর্পণে ছায়ার তলায় হাত দিলেন। ও-মা, এ কি! কাপড়ের মত আমার ছায়াটাকে গুটিয়ে পকেটে পুরে ফেললেন! তার পর আর একপ্রস্থ ধন্যবাদ দিয়ে—"আবার দেখা হবে"—বলে প্রস্থান করলেন।

আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম! এ স্বপ্ন না সত্য? ভদ্রলোক ততক্ষণে দৃষ্টির বাইরে চলে গেছেন। কতক্ষণ সেই ভাবে দাঁড়িয়ে ছিলুম জানি না, হঠাৎ চমক ভাঙ্গল কয়েক জনের বিস্ময়পূর্ণ কণ্ঠস্বরে! শুনলুম, এক জন আর এক জনকে বলছে—"ও ভাই, লোকটির ছায়া নেই।" বুঝলুম, স্বপ্ন নয়, সত্য! এই তো হাতে সেই থলে রয়েছে! ওদিকে চারিধার থেকে বিদ্রূপপূর্ণ হাসি আর শ্লেষ! তাড়াতাড়ি এক গাছের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ালুম। একটু পরে একটা গাড়ী যাচ্ছে দেখে তাতে চেপে বসলুম এবং গাড়োয়ানকে সব চেয়ে ভাল হোটেলে নিয়ে যাবার হুকুম দিলুম। পকেটে তখন প্রায় ষাটটি মোহর এবং সেই সর্ব্বধনের খনি থলে! আমায় পায় কে!

হোটেলের সামনে গাড়ী থেকে নেমে দাঁড়াতেই ক'জন লোক আমাকে ঘিরে বলে উঠল—"ওরে দেখ দেখ, লোকটির ছায়া হারিয়ে গেছে!"—সঙ্গে সঙ্গে সে কি হাসির ধুম! আমি তাড়াতাড়ি গাড়োয়ানের হাতে একটা মোহর গুঁজে দিয়ে ছুটে হোটেলের মধ্যে ঢুকে পড়লুম।

আমার তখন পয়সার অভাব নেই! হোটেলের সব চেয়ে ভাল ঘর থাকবার জন্য বেছে নিলুম। ঘরের দরজা বন্ধ করে থলের মধ্যে হাত পুরে দিলুম, বার হল দশটা মোহর। আবার ক্রমাগত থলেয় হাত পুরি, আর দশটা করে মোহর বার হয়, দেখতে দেখতে মেঝের ওপর মোহরের পাহাড় গড়ে উঠল। মোহরগুলি আমি ঘরময় ছড়াতে লাগলুম। মোহরের ঝন্-ঝন্ আওয়াজ কানে যেন অমৃত বর্ষণ করতে লাগল। টাকার নেশায় তখন আমি মত্ত—উদভ্রান্ত! মোহরগুলি পা দিয়ে মাড়িয়ে চারি ধারে ছুঁড়ে তার ওপর শুয়ে কিছুতেই যেন মনে তৃপ্তি পেলুম না! অবশেষে ক্ষুধা-তৃষ্ণার উত্তেজনায় কখন্ ঘুমিয়ে পড়েছি, জানি না। যখন ঘুম ভাঙ্গল, তখন গভীর রাত্রি! পৃথিবী নিস্তব্ধ, প্রাণি-জগৎ সুষুপ্তির কোলে নিমগ্ন! আমি একা মোহরের পাহাড়ের ওপর জেগে বসে। ঘরের কোণে একটা খালি সিন্দুক ছিল। মোহরগুলি সেই সিন্দুকের মধ্যে ভরে বিছানায় বসে নিদ্রাহীন চোখে ক্ষুধার তাড়নায় ছটফট করতে করতে ভোরের প্রতীক্ষা করতে লাগলুম।

ভোর হতেই হোটেলের এক ভৃত্যকে ডেকে যত রকম উৎকৃষ্ট খাদ্য সম্ভব, আনিয়ে গোগ্রাসে খেতে লাগলুম। পরম পরিতৃপ্তির সহিত আহারের পর এক মুঠো মোহর পকেটে ফেলে বাজারে বার হলুম—পোষাক-পরিচ্ছদ আর কয়েকটি দরকারী জিনিষ-পত্তর কিনতে। সকালের দিক্‌টা মেঘলা করেছিল, আর আমার যে ছায়া নাই, সে কথা মনেও ছিল না। দোকানের কাছাকাছি এসেছি, এমন সময় হঠাৎ প্রচণ্ড রোদ উঠে পড়ল। সেই সময় এক দল স্কুলের ছেলে যাচ্ছিল। আমাকে ঘিরে তারা চীৎকার করতে লাগল—"ও মশাই, ছায়া কোথায় ফেলে এসেছেন?" যে ছায়ার কথা এতক্ষণ ভুলেছিলুম, তাদের চীৎকারে সেই কথা মনে পড়ে গেল। আমি প্রাণপণে ছুটতে আরম্ভ করলুম। "ও মশাই, ছায়া কোথায়" বলতে বলতে তারাও আমায় তাড়া করলে—শেষে ঢিল ছুঁড়তে লাগল। আমি তাড়াতাড়ি একটা দোকানে ঢুকে তাদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করলুম। ছেলেরা কিছুক্ষণ চেঁচামেচি করার পর দোকানদারের তাড়া খেয়ে সেখান থেকে সরে পড়ল।

দোকানের সব চেয়ে ভাল এবং দামী কাপড়-জামা, জিনিষ-পত্তর কিনে জানলা দিয়ে উঁকি মেরে পথ পরিষ্কার দেখে দোকানদারকে একটা গাড়ী ডেকে দিতে বললুম। পথ দিয়ে হাঁটতে সাহস হ'ল না। কে জানে, আবার কি ফ্যাসাদ ঘটবে! গাড়ী করে হোটেলের সামনে গিয়ে উপস্থিত হলুম। তার পর গাড়ী থেকে নেমেই এক ছুটে হোটেলের মধ্যে ঢুকে পড়লুম। হোটেলের ভৃত্যকে দিয়ে জিনিষ-পত্তর আনালুম আর গাড়োয়ানের ভাড়া পাঠিয়ে দিলুম।

সেই ঘটনার পর শরীর খারাপের দোহাই দিয়ে দিন-দুই ঘর থেকে বার হইনি।

কিন্তু দিন-রাত ঘরে বন্ধ থেকে মানুষ ক'দিন বাঁচতে পারে? অথচ বেরুই কোন্ সাহসে? অনেক ভেবে-চিন্তে এক উপায় বার করলুম। সব সময় যদি এক জন সঙ্গী নিয়ে বেরুই, তাহলে এক ছায়াতে দু'জনের চলে যেতে পারে! আমার যে ছায়া নেই, সেটা চট করে ধরা পড়বে না। তখনই হোটেলের কর্মকর্তাকে ডেকে পাঠিয়ে বললুম—"দেখুন, আমার নিজের জন্য একটি চাকর চাই,

মাথায় যতটা সম্ভব আমার মত হবে, আর খুব বিশ্বাসী হওয়া প্রয়োজন। আপনার সন্ধানে যদি এমন লোক থাকে তো দিন, মাইনের জন্য আটকাবে না।"

আমার আমিরী চাল-চলনের জন্য ম্যানেজার আমায় খুবই খাতির করতেন। তিনি সেই দিনই একটি লোক জোগাড় করে দিলেন, তার নাম কানাই। চেহারা দেখে এবং কথাবার্ত্তা শুনে তাকে আমার খুবই পছন্দ হল। তখনই বেশ মোটা মাইনে দিয়ে কাজে বহাল করলুম। একটা দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পেয়ে মনটা প্রসন্ন হলো! এবার পথে বেড়ানো চলবে।

পরদিন সকালে হোটেলের সঙ্গে লাগাও যে বাগান—সেই বাগানে কানাইয়ের সঙ্গে বেড়িয়ে এক ছায়ায় কি করে দু'জনের চলতে পারে, অভ্যাস করছি—দেখি, কানাই ক্রমাগত চক্ষু ছানাবড়া করে আমার মুখের দিকে চাইছে! আমি বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করলুম—"বার বার মুখের দিকে অমন করে চাইছ কেন?"

কিছুমাত্র লজ্জিত না হয়ে বেহায়ার মত সে বললে—আজ্ঞে, আপনাকে দেখছি।"

আমি ভয়ানক চটে গেলুম। বেয়াদব বলে কি! রাগত স্বরে জিজ্ঞেস করলুম—"আমায় দেখছ, তার মানে? মানুষ দেখনি কখনো?"

সে সেই রকম নির্লজ্জের মতই উত্তর দিলে—"ছায়া নেই, এমন মানুষ জীবনে আজ এই প্রথম দেখলুম।"

বুঝলুম, ধরা পড়ে গেছি! এখন রাগারাগি করলে ফল খারাপ হবে। কৌশলে মিষ্ট কথায় কাজ উদ্ধার করতে হবে। তখনই তাকে ঘরে এনে তার হাতে দু'টো মোহর গুঁজে দিয়ে বললুম—"এক সন্ন্যাসীর শাপে আমার এই দশা হয়েছে। এ কথা কাউকে তুমি বলো না। আমি তোমায় বড় লোক করে দেবো।"

দু'টো চক্‌চকে মোহর হাতে পেয়ে একান্ত বিনীত ভাবে কানাই বললে—"আজ্ঞে, আপনি সে বিষয় নিশ্চিন্ত থাকুন। এ কথা আমি ঘুণাক্ষরে কাউকে জানতে দেব না।"

যদিও সে বললে নিশ্চিন্ত হতে, আমি কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারলুম না। কখন্ কাকে বলে দেবে, কে জানে?

কয়েক দিন এই রকম ধুক-পুকানির মধ্যে কেটে গেল। কিন্তু সে কাউকে কিছু বললে না দেখে মন অনেকটা শান্ত হ'ল।

তাকে নিয়ে সন্ধ্যার পর প্রায়ই বেড়াতে যাই। দিনে বেরুই না, বলি, চোখের অসুখ। রৌদ্রে বার হওয়া নিষেধ।

এক দিন সন্ধ্যায় কানাইকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছি, কি একটা দরকারে কানাইকে পাঠিয়েছি কাছের এক দোকানে, এমন সময় আকাশে চাঁদ উঠলো। আমি ধীরে ধীরে হাঁটছি। ছায়ার কথা ভুলে গেছি—চাঁদ উঠেছে লক্ষ্য করিনি। এক জন ভদ্রলোক একটি ছোট মেয়েকে নিয়ে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। মেয়েটি হঠাৎ চীৎকার করে উঠল—"ও বাবা, দেখ, লোকটির ছায়া নেই!" তিনি আমার দিকে চেয়ে মুখ বেঁকিয়ে মেয়েকে বললেন—"চলে আয়, ও মানুষ নয়। মানুষ মাত্রেরই ছায়া থাকে।"—এই কথা বলে মেয়ের হাত ধরে হন্-হন্ করে তিনি চলে গেলেন। আমি লজ্জায় অপমানে যেন মাটীর সঙ্গে মিশে গেলুম!

কানাইকে নিয়ে ক্ষুব্ধ মনে হোটেলে ফিরে গেলুম। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে নিজের অবস্থার কথা ভাবতে লাগলুম। আজ আমার অর্থের অভাব নেই! কিন্তু সুখ কই? তুচ্ছ ছায়ার দামও এই অফুরন্ত ধন-ভাণ্ডারের চেয়ে বেশী! নিজের অজ্ঞাতে চোখ দিয়ে হু-হু করে জল পড়তে লাগল! কাঁদতে কাঁদতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। হঠাৎ দেখি, সামনে প্রকাণ্ড এক পাহাড়—সোনা, হীরা, জহরত দিয়ে গড়া। এক জন সাধু সেই দিক্ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সামনে সেই পাহাড় দেখে থমকে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন—"পাপ, পাপ! অর্থই অনর্থের মূল!"—এই কথা বলে দ্রুতপদে তিনি সে স্থান পরিত্যাগ করলেন। কিছুক্ষণ পরে সেইখানে তিন জন চোর এসে উপস্থিত। ধনরত্নের পাহাড় দেখে তাদের সে কি আনন্দ! কিন্তু সে আনন্দ বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না। প্রত্যেকেরই মনে হতে লাগল, কি করে অপর দু'জনকে ফাঁকি দিয়ে সে একলা সমস্ত ধনরত্ন ভোগ করতে পারবে! এক জন বললে—"ভাই, ভয়ানক ক্ষিধে পেয়ে গেছে। গ্রাম থেকে কিছু খাবার নিয়ে এলে ভাল হয়!" কিন্তু কে যাবে? কারুরই যাবার ইচ্ছা নাই! শেষে লটারী করে যার নাম উঠল, তাকেই যেতে হ'ল। অপর দু'জন ঠিক করলে, তারা লুকিয়ে থাকবে। যেই খাবার নিয়ে তাদের বন্ধু ফিরবে, তখনি তারা পিছন থেকে আক্রমণ করে তাকে মেরে ফেলবে! তা হলে এই ধন-রত্নের এক জন অংশীদার কম হবে! তাদের ভাগও অনেক বেড়ে যাবে!

ওদিকে যে খাবার আনতে গেছে, সে করেছে কি, নিজে পেট ভরে খেয়ে অপর দু'জনের খাবারে বিষ মিশিয়ে নিয়ে চলেছে! ভাবছে, ওরা খাবার খেয়ে অক্কা পাবে, আর তখন সে একলাই সমস্ত ধনরত্নের মালিক হবে! সে মনের আনন্দে গান করতে করতে চলেছে। রত্নের পাহাড়ের কাছাকাছি পৌঁছুতেই অপর দু'জন তাকে অতর্কিতে আক্রমণ করে এমন প্রচণ্ড প্রহার দিলে যে, তখনই তার পঞ্চপ্রাণ গেল বাতাসে মিশিয়ে! তখন দু'জনে খুশী মনে খাবার খেতে বসল! কিন্তু খাবারে যে বিষ-মেশানো, তা ত' তারা জানত না! কাজেই খাওয়া মাত্রই দু'জনের ইহজন্মের লীলাখেলা শেষ! দেখতে দেখতে ধনরত্নের পাহাড় কোথায় মিলিয়ে গেল! পড়ে রইল শুধু তিনটি মৃতদেহ!

ভয়ে আমি চীৎকার করে উঠলুম! ঘুম ভেঙ্গে গেল। সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেছে! মনে হ'তে লাগল—হায়, হায়, কি কুক্ষণে এই মহা অনর্থকারী থলেটি নিয়েছিলুম! জীবনের সব সুখ-শান্তি জন্মের মত ডুবে গেল!

ভোর হতেই হোটেলের চাকর আমাকে একখানা চিঠি দিয়ে গেল। খুলে দেখি, তাতে দু'টি মাত্র ছত্র লেখা—

"এখনও আপনার অনুশোচনা সম্পূর্ণ হয়নি। এখন আমি বহু দূরদেশে যাত্রা করছি, এক বৎসর পরে আবার দেখা হবে। সে দিন হয়ত' আপনাকে আরও ভাল জিনিষ দিতে পারব।

বিনীত শ্রী—

তলায় নামসহি ছিল না। কিন্তু বুঝতে বাকি রইল না যে, ইনি সেই রোগা ভদ্রলোক—যিনি আমাকে থলে দিয়ে আমার ছায়া নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সুখ-শান্তি সব হরণ করেছেন!

এক বৎসর কবে পূর্ণ হবে, কবে আবার তাঁর দেখা পাব, বসে বসে শুধু দিন গুণছি!

শ্রীযামিনীমোহন কর (এম-এ, অধ্যাপক)।

ছোটর জোর

(ইভান্ ক্রাইলভের ছন্দ-কাহিনীর মর্ম্মানুবাদ)

ছোটরে করো না তুচ্ছ, করো না কো হেলা !
ছোটরে পীড়ন করা—অগ্নি নিয়ে খেলা !
যত শক্তি থাক্ তব কঠিন নিষ্ঠুর—
ছোট যদি ক্ষেপে ওঠে—সব হবে চূর !

বনে এক সিংহ ছিল। ভারী দম্ভ তার !
সকল-প্রাণীর 'পরে করে অনাচার !
সবে বলে, পশু-রাজ ! ভয়ে ভক্তি করে।
কেশর ফুলায় সিংহ অতি-দর্প-ভরে !
বনে থাকে ক্ষুদ্র মশা—তারে তুচ্ছ গণে ;
দেখিলে ফিরায় মুখ নাসিকা-কুঞ্চনে !
শ্লেষ করে, ব্যঙ্গ করে, হাসে কি কৌতুকে !
অপমান-শেল বাজে মশকের বুকে !
মশার হইল রোষ—এত তুচ্ছ করো !
ছোটরে আঁটিতে তুমি কত শক্তি ধরো !
ঝাঁজিয়া কহিল মশা,—যুদ্ধ দাও, দেখি !
হেসে সিংহ কয়,—ক্ষুদ্র মশা বলে এ কি !
মশা বলে,—বাক্য রাখো, দেখাও বিক্রম !
আমি মশা, হতে পারি কালান্তক যম !
রণে মাতে মশা পোঁ-পোঁ ভেঁপু-রব তুলে,
সিংহেরে ঘিরিয়া ফেরে রাগে ফুঁশে ফুলে !
মজা পেয়ে হাসে সিংহ। মশা আরো রোখে !
উড়ে বসে সিংহের নাকে-মুখে-চোখে।
ভেঁপু না থামায় তিল, বিরাম না মানে—
পিঠে-পেটে হুল্ ফোটে, যেন ছুঁচ টানে !
কেশর ফুলায় সিংহ, ল্যাজ নাড়ে জোরে,
থাবা মারে ! মশা উড়ে চারি দিকে ঘোরে,
পোঁ-পোঁ ভেঁপু ! ফাঁক খোঁজে বসিবে কোথায় !
হেথায় বিঁধিছে হুল, বিঁধিছে হোথায় !
নাকে বেঁধে, কাণে বেঁধে। কামড়ের ঠেলা !
সিংহের টুটিল ধৈর্য্য। মারাত্মক খেলা !
ফুলিল কেশর ঘাড়ে, করিল গর্জ্জন !
সে-ডাকে আকাশ কাঁপে ! কাঁপে সারা বন !
নখরে ছিঁড়িল মৃত্তি, দাঁতে ঘষে দাঁত।
বনে যত পশু-পক্ষী,—ভয়ে ছাড়ে ধাত্ !
বন ছেড়ে ছুট দেয়, লুকায় বিবরে—
ভাবে, বাণ ? ভূমিকম্প ? অগ্নিবৃষ্টি ঝরে ?
মশার বিরাম নাই ! সিংহ-দেহে চড়ে'
অস্থির-অধীর করে কামড়ে-কামড়ে !
গর্জ্জনে-হুঙ্কারে সিংহ করে লাফালাফি,
গড়াগড়ি খায়। ক্ষেপে কি সে দাপাদাপি !
কামড়ে-কামড়ে সিংহ ব্যথায় কাতর
নিরুপায়ে লোটে শেষে ভূমির উপর !
মিনতি ভরিয়া কণ্ঠে কহে,—মশা ভাই,
ক্ষমা কর্ ! জ্বলে মরি ! খুব শিক্ষা পাই !
নাকে-কাণে খৎ দিই, লুটাই কেশর !
তুচ্ছ তুই নোস্ ভাই, যমের দোসর !
মশার থামিল রোষ—থামায় কামড়।
সিংহ বলে,—শক্তিমান্, করি তোরে গড় !
মশা বলে,—ছোটরে করিস্ অবহেলা ?
ছোট যদি রুখে ওঠে, সাম্লাবি ঠেলা ?
সিংহ বলে,—কাণ মলি ! বুঝিয়াছি সার—
ছোট, ছোট নয় ! শক্তি খুব আছে তার !

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

আত্ম-পরীক্ষা

পরের দোষ-ত্রুটি দেখতে আমরা যেমন বিশ-জোড়া চোখ মেলে' চাই, তেমনি সে দোষ-ত্রুটির কীর্ত্তনে হই সহস্র-মুখ ! কিন্তু নিজের বেলায় একেবারে অন্ধ থাকি ! তার ফলে হয় এই যে, পরের দোষ-ত্রুটি দেখতে দেখতে এবং তার ব্যাখ্যানা করতে করতে আমাদের নিজেদের দোষ-ত্রুটি সারানো চলে না ; সেগুলো বেড়ে ওঠে ! এবং আমাদের বুদ্ধি হয় ভোঁতা এবং ছিদ্রান্বেষী।

পরের দোষ-ত্রুটি চোখে পড়লে তা না দেখে উপায় নেই, মানি ! কিন্তু সে দোষ-ত্রুটির কথা কইতে যাবার আগে নিজেদের মনের মধ্যে একবার সন্ধান নিলে ভালো হয় না ? পরের যে-দোষ দেখে গা জ্বালা করে, ও-দোষ যদি আমার থাকে ? থাকলে আমাকে দেখে পরের গা-ও তো এমনি জ্বালা করবে !

এ জন্ম উচিত, নিজের মনের সন্ধান নেওয়া। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র একটি চমৎকার গান লিখে গেছেন—

"অপরকে চিনবে যদি, আপনাকে চেনো আগে !"

এ-চেনা যে চিনেছে, জীবনে তার সাফল্য-লাভ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকতে পারে না !

নিজের মনের সন্ধান পেতে হলে নিজের মনকে একান্তে প্রশ্ন করে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। কি প্রশ্ন ?

গোটাকতক নমুনা দিচ্ছি।

ধরো, ছুটীর দিন। একলা-একলা এ-দিনটি কাটাতে পারো ? সারা দিনে কারো অভাব বোধ করবে না ? এমন কিছু ভাল কাজ বা লেখা-পড়া করবার মতো ধৈর্য্য এবং শক্তি আছে ? তা যদি থাকে, তাহলে জেনো, মানুষ হবার পক্ষে এ-স্বভাব তোমাকে বহু সাহায্য করবে ! ছুটীর দিনটা ঘুরে কাটানো, কোনো কাজ না করে তাস-পাশা খেলে, বা পরচর্চ্চা করে কাটানোর পর মনে যদি অনুশোচনা জাগে যে, তাই তো, সারাটা দিন মিথ্যা নষ্ট হয়ে গেল, তাহলে বুঝবে, আলস্যে তোমার রুচি নেই ! এবং সাবধান হয়ো, এ ভাবে সময় নষ্ট করা ঠিক নয় !

কোনো একটা সমস্যা উপস্থিত—দো-টানায় পড়েছো—এ কাজ করবে, কিম্বা করবে না ! সেখানে যাবে, কিম্বা যাবে না !—এ রকম সমস্যায় দ্বিধা-সংশয়ে বিচার-বিবেচনা করতে যদি না পারো, তাহলে বুঝবে, তোমার চরিত্রে দৃঢ়তা নেই ! চরিত্রে যার দৃঢ়তা নেই, কোনো দিন সে মানুষের মতো মানুষ হতে প

সমস্যা ঘটলে চটপট তার সমাধান করতে পারা চাই। ছোটবেলা থেকে এদিকে যদি হুঁশিয়ার থাকতে পারো, তাহলে দেখবে, জীবনে বড় বড় বিপদ এসে পাহাড়ের মতো বাধা তুলে দাঁড়ালে সে বিপদ-বাধা অনায়াসে ঠেলে ঠিক পথে নিজের লক্ষ্য ধরে চলে যেতে পারবে।

নিজের বিচার-বুদ্ধির উপর বিশ্বাস আছে তোমার? না, পরের ভালো-মন্দ-বিচারের উপর নির্ভর করো? নিজের বিচার-বুদ্ধির উপর যদি আস্থা বা বিশ্বাস করতে অথবা নির্ভর রাখতে না পারো, তাহলে জগতে কোনো দিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না, জেনো।

পরের মতামত ধার করে চলার মতন বিড়ম্বনা আর-কিছুতে নেই! সব-ব্যাপারে 'অমুক এই বলেছেন' এমন মনোভাবকে কদাচ বাড়িয়ে তুলো না। নিজে বিচার করতে শেখো। নিজের বিচার-বুদ্ধি তাহলে শাণ পেয়ে ধারালো হবে! তুমি কেন পরের মতামত ধার করে চলবে? বিচার-বুদ্ধিতে শাণ দিয়ে এমন করা চাই যে, তোমার মতামত অপরে শিরোধার্য্য করুক! সাহিত্য, আর্ট—এ-সব ক্ষেত্রে অনেক লোককে দেখি, তারা পরের কোটেশন্ ধরে দাঁড়াতে চায়! জেনো, এ-সব লোক পর-গাছার মতন কোনো দিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না—পরের মনের আওতায় মাটীতে নেতিয়ে এদের জীবন কাটবে!

যে-কাজ করতেই হবে, সে-কাজে আনন্দ পাওয়া চাই। তা যদি না পাও, তাহলে কাজ ভালো হবে না। এবং কাজ যদি ভালো না হয়, তাহলে কথ্খনো কাজের লোক হতে পারবে না!

জীবনে আমরা আশা করি অনেক—সে-সব আশা কতখানি সফল হয়? মনকে তৈরী করতে হবে এমন করে যে, ছোট-বড় নৈরাশ্যের আঘাত যেন সহ্য করতে পারো—সে-আঘাতে মুষড়ে বিচলিত হলে চলবে না! Try Try Try again—এ-কথা খুব দামী।

যারা অনাত্মীয়, যারা বন্ধু নয়, যারা অপরিচিত—তাদের সহ্য করতে পারো? যদি বলো 'না', তাহলে এ কদভ্যাস ত্যাগ করতেই হবে। কারণ, পৃথিবীতে শুধু আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে মেলা-মেশা করেই দিন কাটবে না! বহু অনাত্মীয়ের সঙ্গে মিলে-মিশে থাকতে হবে! সুতরাং সকলকেই সইয়ে নিতে হবে। কাকেও অসহনীয় মনে করে চললে বিপদ ঘটবে!

পরের গুণ দেখলে সে-গুণকে আদর করতে হবে! শ্রদ্ধা করতে হবে! পরের খুঁৎ না খুঁজে গুণ দেখবার চেষ্টা করো। গুণগ্রাহী হতে পারলে তুমিও গুণী হবে। যারা ছিদ্রান্বেষী, তারা কোনো দিন সমাজে কারো প্রীতি-ভালোবাসা বা শ্রদ্ধা-সম্মান পায় না।

পরের যে-আচরণ বা কাজ দূষণীয় মনে করো, নিজে তেমন আচরণ বা কাজ করতে লজ্জা বোধ করো। সাবধান, পরকে যে-দোষে দোষী করছো, সে-দোষ যেন তোমার না থাকে!

আত্ম-পরীক্ষায় অর্থাৎ নিজের মনকে বিশ্লেষণ করতে করতেই মনের সব জঞ্জাল সাফ হবে; মানুষ তার ক্ষুদ্রত্বকে বর্জ্জন করে মানুষ হতে পারবে। তাছাড়া মানুষ হবার আর অন্য উপায় নেই!

——

ময়-দানবের পুরী

মহাভারতে পড়িয়াছি, রাজা যুধিষ্ঠির যখন যজ্ঞ করিয়াছিলেন, দানব-শিল্পী ময় তখন ইন্দ্রপ্রস্থকে একেবারে মায়াপুরী গড়িয়া তুলিয়াছিলেন! পুরী কেমন, মহাভারতে বর্ণনা আছে, পড়িয়া দেখিয়ো।

একালে রুশ-জাতিও দানব-শিল্পী ময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়া সাইবেরিয়ার উত্তরে তুষারের বুকে এমনি পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আজ সেই পুরীর কথা বলিতেছি।

সাইবেরিয়া বা এশিয়াটিক-রাশিয়ার উত্তরে চিরতুষার-সমাচ্ছন্ন উত্তর-মেরু। এই হিম-দুর্গম প্রদেশে কি আছে জানিবার জন্য মানুষের কৌতূহল যেমন সীমাহীন, তেমনি সে-কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া মরণ-পণ করিয়া বহু সাহসী ব্যক্তি এ-পথে বহু বার যাত্রা করিয়াছেন! তাঁদের মধ্যে অনেকে আর ফিরিয়া আসেন নাই। যাঁরা ফিরিয়াছেন, তাঁরা যত দূর যাইতে পারিয়াছিলেন, ততখানি পথের রোমাঞ্চকর বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই সব বৃত্তান্ত পড়িয়া ছ'-সাত বৎসর পূর্ব্বে পাঁচ জন রাশিয়ান কর্ম্মবীর—জাহাজে নয়—বিমান-পোতে চড়িয়া উত্তর-মেরু প্রদেশে যাত্রা করেন। তাঁদের

বুলুন—ঘর-বাড়ী

উদ্দেশ্য ছিল, সেখানে কি আছে, তাহার সন্ধান লওয়া এবং বসতি-স্থাপনার ব্যবস্থা হয় কি না, তাহা নির্ণয় করা।

মস্কো হইতে উত্তর-মহাসাগরের উপর দিয়া তাঁরা পূর্ব্ব দিকে আলাস্কা পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। এ-পথে যাত্রী-হিসাবে তাঁরাই সকলের পুরোবর্ত্তী। তাঁহাদের পরে ক'জন যাত্রী বিমান-পোতে চড়িয়া কালিফোর্ণিয়া হইতে নোকি, আলাস্কা এবং আর্কেঞ্জেল প্রভৃতি স্থানে ঘুরিয়া আসিয়াছেন। দৈব-দুর্বিপাকে কোথাও কোনো অস্থানে যদি নামিতে হয়, এ জন্য তাঁরা তাঁবু, শয্যা-থলি, বরফে তাপ রক্ষা করিয়া বাঁচিবার সরঞ্জাম-পত্রাদি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। বিমান-পোতের পুচ্ছে তাঁরা জলের ট্যাঙ্ক রাখিয়াছিলেন; সে ট্যাঙ্ক হইতে পাম্প করিয়া ইচ্ছামত জল লইবার ব্যবস্থা ছিল। তাছাড়া বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিরও অভাব ছিল না।

উপর্য্যুপরি এমনি ভাবে মেরু-পরিক্রমণের ফলে রুশ-জাতি দুর্গম মেরু-প্রদেশের পথ নির্দ্ধারণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; সেখানে তুষারের বুকে বসতি এবং বাণিজ্য-কেন্দ্র সংস্থাপিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যে-সব স্থানে জন-মানবের চিহ্ন ছিল না, এখন সে সব জায়গায় ঘন বসতির সঙ্গে বাণিজ্য-সমৃদ্ধি গড়িয়া উঠিয়াছে। তাছাড়া কোথাও মিলিয়াছে সোনার খনি, কোথাও কয়লা, কোথাও খনিজ তৈল, কোথাও বা নিকেল, কাঠ, তামা; তার উপর লবণ-গিরিও পাওয়া গিয়াছে।

এ-সব প্রদেশে আসিবার জন্ত বিমানপোতই এখন একমাত্র অবলম্বন নয়। জমাট কঠিন তুষার-স্তূপ ভাঙ্গিয়া অগ্রসর হইতে পারে, এমন বহু বাষ্পীয়-পোত বিশেষ ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই দুর্গম কয়লা-খনির সুদীর্ঘ প্রসার। এ-সব খনি হইতে বছরে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টন করিয়া কয়লা উঠিতেছে।

জমির সারের জন্ত রাশিয়া পূর্ব্বে বিদেশ হইতে ফশ্‌ফেট

এত বড় মূলা!

সিনেমা-হাউস্—উত্তর-মেরু

আনাইত। এখন তার প্রয়োজন নাই। এখন নবাবিষ্কৃত মাছ-মাছ হইতে প্রচুর ফশ্‌ফেট মিলিতেছে। এত ফশ্‌ফেট যে, নিজের প্রয়োজন মিটাইয়া সারা পৃথিবীকে রাশিয়া এখন ফশ্‌ফেট জোগান দিতে পারে!

মেরুপ্রদেশকে নানা দিক্ দিয়া বাসোপযোগী এবং বাণিজ্যোপযোগী করিয়া তুলিতে সোভিয়েট-গভর্ণমেণ্টের অধ্যবসায়ের সীমা নাই! সাইবেরিয়ার উত্তর-পূর্ব্বে কোলিমা-প্রদেশে যে সোণা মিলিয়াছে, আলাস্কার সোণার চেয়ে তাহা বহু-গুণ পরিশুদ্ধ ও দামী। তাছাড়া তুষার-বক্ষ ভেদ করিয়া মোটর-বাহী বড় বড় পথ তৈয়ারী হইয়াছে, সে পথের দৈর্ঘ্য •• মাইলের অধিক।

মেরু-বক্ষে মোটর-বোট

বাতাসের জোরে মিল্ চলে!
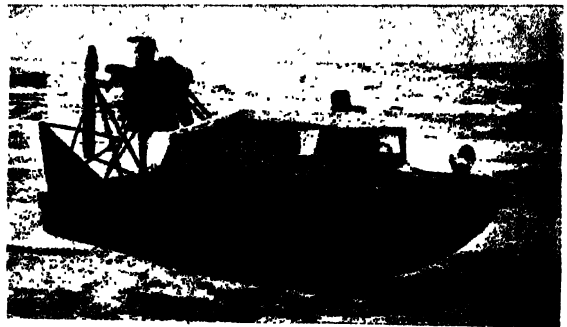
বাণিজ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এ-সব প্রদেশ জনবসতি-বহুল হইয়াছে; এবং অসংখ্য ঘর-বাড়ী, স্কুল, কলেজ হাসপাতাল, সিনেমা, থিয়েটার প্রভৃতির সমাবেশে সমৃদ্ধির আজ অন্ত নাই! এখানে ছ'মাস রাত্রি, ছ'মাস দিন। এই ছ'মাস-দিন-ছ'মাস-রাত্রির দেশের লোকজন ব্যবসা-বাণিজ্যে এখন সমৃদ্ধি লাভ করিতেছে। তুলোমা নদীর মোহনায় বৈদ্যুতিক প্ল্যাণ্ট বসানো হইয়াছে। তার সাহায্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ আনিয়া এ প্রদেশে পথ-ঘাট ঘর-বাড়ী আলোকিত করা হইতেছে; কল-কারখানা এবং রেল-গাড়ী চলিতেছে সেই বিদ্যুৎ-প্রবাহের জোরে।

ম্যাপে দ্যাখো টিক্‌শি উপসাগর। এই সাগরের কূলে টিক্‌শি প্রদেশ। সাত-আট বৎসর পূর্ব্বে এ প্রদেশ ছিল তুষার-সমাধির নীচে, লোক-লোচনের অন্তরালে! এখন এই প্রদেশটি এ-অঞ্চলের বিশাল বন্দররূপে পরিগণিত। এখানকার কাঠের চমৎকারিত্ব এবং বৈচিত্র্য

উত্তর-মেরুর গায়ে পেট্রোল এবং কেরোসিনের বিপুল খনি মিলিয়াছে। পশ্চিমে নভি পোর্টো হইতে পূর্ব্বে কোলিমা পর্য্যন্ত
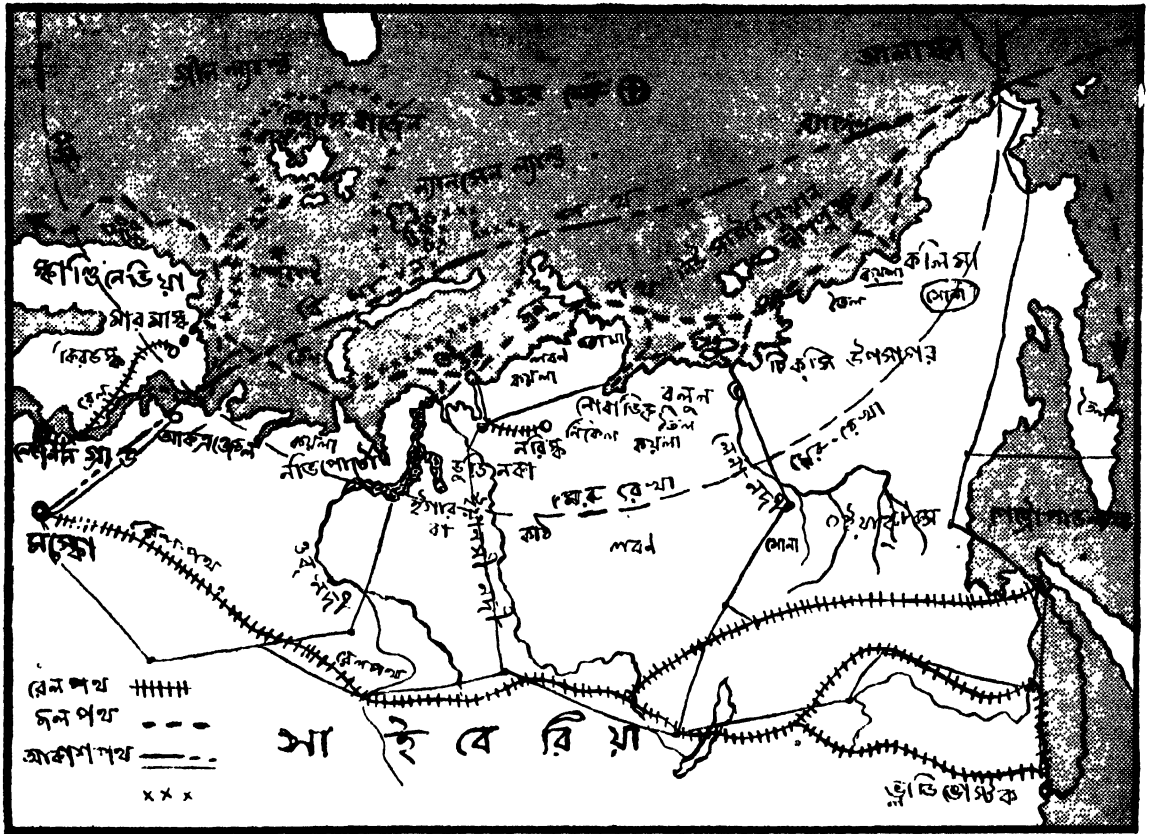
উত্তর-মেরু

বিপুলতার সীমা নাই। টিকশিতে প্রায় ২৫০ পরিবারের বাস। প্রশস্ত পথ-ঘাট, কাঠের তৈয়ারী সুদৃশ্য ঘর-বাড়ী, হাসপাতাল, বেতার-ষ্টেশন—কোন-কিছুর অসদ্ভাব নাই! হিমেল বাতাসে অসহ্য বেগ। সে হিম-বায়ুকে সোভিয়েট-গবর্ণমেণ্ট আজ আয়ত্ত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই! সে বায়ু-বেগকে আয়ত্তাধীন করিয়া তাহা দিয়া আলো জ্বালা, জল তোলা, মিল্-চালানোর কাজ করাইয়া লইতেছেন।

এখানে রোগের বালাই নাই। সকলের স্বাস্থ্য ভালো। দেহ-মনে অবসাদ বা জড়তার বৈলক্ষণ্য বড় একটা দেখা যায় না। তবে এখানকার লোকজন যদি এ হিমের দেশ ছাড়িয়া নিম্ন-মালভূমিতে তাপের দেশে যায়, তাহা হইলে ম্যালেরিয়া, নিউমোনিয়া, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগে চট্ করিয়া আক্রান্ত হয়। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, হিমেল হাওয়ায় রোগ-বীজাণু থাকে না! কাজেই এ দেশের লোকের রোগ-প্রতিষেধক শক্তি তেমন গড়িয়া ওঠে না; এবং তাহারি জন্ম তপ্ত-প্রদেশে গেলে তাদের পক্ষে রোগ-বীজাণুর আক্রমণ প্রতিরোধ করা কঠিন হয়; এবং তাহারি ফলে হয় রোগ!

তোমরা ভাবিতেছ, সব তো বেশ! বরফের বুকে সোণা, তামা, তেল ও কয়লার খনি মিলিয়াছে! কিন্তু গাছপালা? তৃণ, শস্ত, ফল, ফুল ফলে? ফলে। রুশ বৈজ্ঞানিকদের সাধনায় এ সব তুষার-প্রদেশে চাষবাসের সুব্যবস্থা হইয়াছে। আলু, গাজর, বীট, কপি, কলাই-শুঁটি, শসা, কুমড়া, শালগম, মূলা প্রভৃতি ফশল অজস্র ফলিতেছে। তাছাড়া নানা ফলমূলের বীজ আনাইয়া সে সবের ফলনেও তাঁদের সাধনার সীমা নাই। এ সব ফশল ফলানো হইতেছে হট-হাউসের মধ্যে! তার উপর বিভিন্ন ফল-ফুলের বীজ মিলাইয়া-মিশাইয়া (cross-breed) তাঁরা নব-নব বিচিত্র ফল-ফুল ফলাইতেছেন!

সোভিয়েট-গভর্ণমেণ্ট সবচেয়ে অসাধ্য সাধন করিয়াছেন মেরু-পথকে সুগম করিয়া। যে-পথের সম্ভাব্যতা সাত বৎসর পূর্ব্বেও মেরু-বিশেষজ্ঞেরা "অসম্ভব কল্পনা" বলিয়া উড়াইয়া দিতেন, সোভিয়েট-গভর্ণমেণ্ট সেই "অসম্ভব কল্পনা"কে বাস্তব সত্যে পরিণত করিয়াছেন, উত্তর-মেরু ডিঙ্গাইয়া আটলাণ্টিক হইতে প্রশান্ত-মহাসাগরে (নর্থ-সী-রুট্) সোভিয়েট-শক্তির নৈপুণ্যে আজ জাহাজ চলিতেছে নিরাপদে নিরুপদ্রবে।

জমাট তুষারে পথ রুদ্ধ হইলেও এ পথে জাহাজকে অচল হইয়া ভাগ্যের মুখ চাহিয়া থাকিতে হয় না! পথ রুদ্ধ হইবামাত্র বেতারের মারফৎ মেরু বন্দরে সে-সংবাদ পাঠানো হয়। সংবাদ পাইয়া বিমান-পথে আসিয়া উদয় হয় গাইড্-প্লেন; তাহার সঙ্গে থাকে তুষারভেদী অস্ত্র; সে অস্ত্রে জমাট তুষার ভাঙ্গিয়া পথ দেখাইয়া জাহাজকে নিরাপদ বন্দরে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়।

তুষার-মরুকে সোভিয়েট-রাশিয়া যে ভাবে পরাভূত করিয়াছে, সে কাহিনী শুনিয়া বুঝিতে পারি, মানুষের অসাধ্য কিছু নাই! এবং উদ্যোগী পুরুষকে লক্ষ্মী উপেক্ষা করেন না,—করিতে পারেন না।

হাউই-প্লেন

মার্কিণ রণতরী-বিভাগের জন্য ছোট-ছোট বিমানপোত অজস্র-সংখ্যায় তৈয়ারী হইতেছে। এগুলির নাম "স্কাই-রকেট" (হাউই)।·এ বিমানপোতে দু'খানি মোটর সংলগ্ন আছে। পোতখানি আকারে ছোট;

হাউই-প্লেন উপরে উঠিতেছে

দু'খানি মাত্র পাখ্না। এবং এক জন মাত্র লোক অর্থাৎ শুধু পাইলট্ এ পোতে বসিতে পারেন। অস্ত্রশস্ত্রে এ বিমানপোত বিপুল ভাবে সজ্জিত; এবং ইহার সম্মুখ-ভাগ হইতে অবিরাম গুলী-বর্ষণ করিবার সুব্যবস্থা আছে। এ পোতে অজস্র-পরিমাণ পেট্রোল ধরে। এঞ্জিন

সিধা গতি
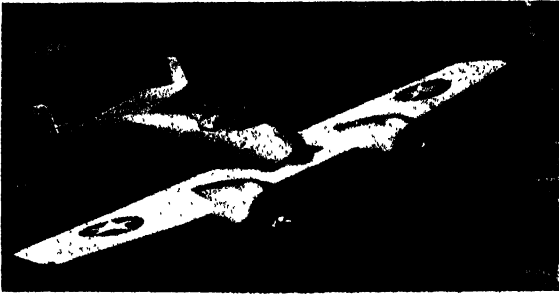
'জানিতে জানে না। বিপক্ষ-প্লেন ও বমারকে দেখিবামাত্র ঘণ্টায় ৪৫০ মাইল বেগে এ-পোত বহু-মাইল ঊর্দ্ধে শূন্যপথে উঠিয়া বিপক্ষের প্লেন ও বমারকে ধ্বংস করিবে, এই উদ্দেশ্যেই এ হাউই-প্লেনের সৃষ্টি।

শস্যকীট-সংহার

ফলকে আশ্রয় করিয়া তক্ষক-সাপ যেমন রাজা পরীক্ষিৎকে দংশন করিয়া ব্রহ্মশাপের মর্য্যাদা রাখিয়াছিল, নিউ-জার্শির প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডক্টর ওয়াক্স্ম্যান ও উড্রো বলেন, শাকসব্জী এবং ফলমূলকে অবলম্বন করিয়া বিবিধ রোগের বীজাণু-কীট তেমনি আমাদের দেহে আসিয়া প্রবেশ করে; তাদের বিষে আমাদের স্বাস্থ্যহানি এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। এ সব বীজাণু-কীট ঐ টাইফয়েড, বসন্ত, আমাশয়, কলেরা, নিউমোনিয়া, ডিপথিরিয়া রোগের বীজাণু-কীটের সগোত্র! ইহাদের বিনাশের জন্য তাঁহারা 'মৃত্যু-দণ্ড' নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এ দণ্ডের মধ্যে কীট-বিধ্বংসী রাসায়নিক দ্রাবক ভরিয়া দণ্ডটি মাটীর বুকে বিঁধিয়া দাঁড় করানো হয়; তার পর দণ্ড-সংলগ্ন টিপ-কলে (trigger) চাপ দিলে বিধ্বংসী রাসায়নিক

টিপ-কলে চাপ

দ্রাবক নিষ্কাশিত হইয়া মাটীর মধ্যে প্রবেশ করে; এবং মাটীর মধ্য দিয়া মাটীর রসে মিশিয়া বহু দূর পর্য্যন্ত তাহা প্রসারিত হয়। এই রাসায়নিক দ্রাবকের বলে মৃত্তিকাস্থিত লক্ষ-লক্ষ অলক্ষ্য রোগ-বীজাণু-কীটের ধ্বংস সংসাধিত হয়। কাজেই এ-মাটীর তৃণ-শস্য-গ্রহণে রোগের ভয় থাকিবে না।

বিলাসিনীর ছত্র

যুদ্ধের হাঙ্গামায় শুধু আমাদের এ দেশেই নয়, য়ুরোপ-আমেরিকাতেও অনেককে গাড়ীর মায়া ছাড়িয়া পায়ে হাঁটিয়া পথ-চলার কাজ সারিতে হইতেছে। এ জন্য বিলাসিনীদের অসুবিধার সীমা নাই! গাড়ীতে বসিয়া পথ-বিচরণে রৌদ্র-তাপ লাগিয়া কান্তি মলিন হইবার কিম্বা বাতাসের বেগে রূজ-প্রলেপ খশিবার তেমন আশঙ্কা ছিল না! এখন পদব্রজে পথ চলিতে রৌদ্র-বাতাসের উপদ্রব,—সে-উপদ্রব নিবারিত হয় শুধু ছত্রতলে শির রক্ষা করিলে! কিন্তু হাতে হাত-ব্যাগ—তার উপর আবার ছাতা,—সে বড় দায়! এ দায় হইতে বিলাসিনীদের রক্ষা করিতে মার্কিণ শিল্পীরা নূতন যে-সব হাত-ব্যাগ তৈয়ারী করিতেছে, সে হাত-ব্যাগের এক দিকে ছাতা

রাখিবার খোল আছে। সেই খোলে ছাতা রাখিতে পাইয়া বিলাসিনীরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছেন। হাত-ব্যাগের

হাত-ব্যাগে ছাতা

খোলে ছাত বহা—বোঝার উপরে শাকের আঁটি! কাজেই গায়ে লাগে না!

বমারের কার্য্যপদ্ধতি

দিনে-দিনে বমারের যে উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে, তাহাতে কালান্তক যমের হাতে যদি বা পরিত্রাণ মেলে, বমারের হাতে পরিত্রাণের সম্ভাবনা থাকিবে না! পাইলট ছাড়া বমার-প্লেনে যে-সব কর্ম্মী থাকে, তাদের কাজ যেমন বিভিন্ন ভাবে নির্দ্দিষ্ট, পরস্পরে সহযোগিতাও তেমনি আবার চরম রকমের। স্থইচ-সঙ্কেতে পরস্পরের মধ্যে বার্ত্তার আদান-প্রদান চলে। যেখানে বোমা ফেলিতে হইবে সে স্থানের নির্দ্দেশ দিবামাত্র বমারের মেঝেয়-শায়িত গোলন্দাজ কর্ম্মী (aimer)
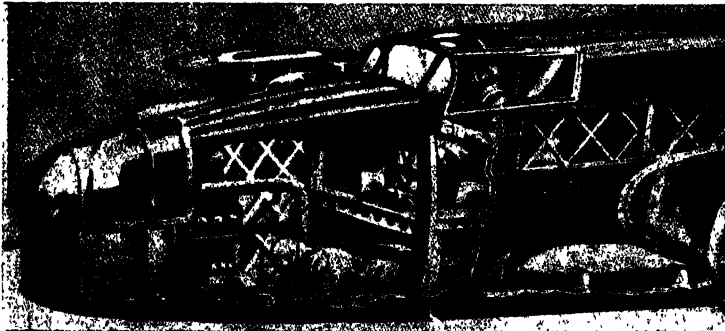
"ওয়েলিংটন" বমার; উপরে-শুইয়া 'এমার'

কন্ট্রোলে চাপ দিয়া সংরক্ষিত বোমা মুক্ত করিয়া দেয়। যে-ব্যক্তি স্থান নির্দ্দেশ করে, বমারের অবস্থান-উচ্চতা, গতি-বেগ, বাতাসের গতি—মীটারের সাহায্যে এ-সব সে সঠিক ভাবে নির্ণয় করিয়া দেয়। হিসাবে একটু ভুল-চুক হইলেই বমার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। পাশে বৃটিশ বমার ওয়েলিংটন এবং তিন-রকম বোমার ছবি দেওয়া হইল।

তিন রকম বোমা

ফিঙা-বমার

কাকের পিছনে ফিঙা লাগিলে কাক যেমন বিপন্ন হয়, বমার-প্লেনকে বিপর্য্যস্ত করিবার উদ্দেশ্যে তেমনি বাধা-স্রষ্টা (interceptor) ফিঙা-পোতের সৃষ্টি হইয়াছে! মার্কিণ অবিষ্কারকের বুদ্ধি-কৌশলে এই ফিঙা-প্লেনের উদ্ভব। বমারের আক্রমণ ঘটিবামাত্র এই ফিঙা-বমার
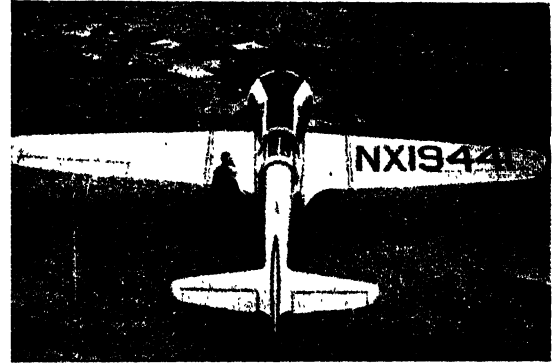
যেন কাকের পিছে ফিঙা!

শোঁ করিয়া নিমেষে শূন্য-পথে উঠিয়া বমারকে বিপর্য্যস্ত করিতে পারে। ফিঙা-বমারের গতিবেগ মিনিটে পাঁচ হাজার ফুট—ঘণ্টায় ৩০০ মাইল। বমারকে ধ্বংস করিবার উপযোগী সর্ব্ব-সরঞ্জামে সুসজ্জিত এই ফিঙা-বমারের শক্তিও অসামান্য।

বমার-বাহী জাহাজ

বহু দূরস্থিত বিপক্ষের আস্তানাকে এবং বিপক্ষ-সৈন্য ধ্বংস করিবার জন্য এ-যুগের যুদ্ধে বমার-প্লেনের শক্তি অমোঘ, তাহাতে সন্দেহ নাই! কিন্তু বমারের বলে বিপক্ষ ও বিপক্ষের দেশ ধ্বংস করিতে হইলে হাজার-হাজার বমারের প্রয়োজন। কারণ, ঘুঘু ধরিবার জন্য যেমন ফাঁদ আছে, তেমনি দু'-চারখানি বমার

বিপক্ষ-প্রদেশে হানা দিতে গেলে বিপক্ষ-পক্ষের বমার-বিধ্বংসী ফাইটারবরা বমারের স্পর্দ্ধা চূর্ণ করিবে! এ জন্য বমার-আক্রমণ সফল করিতে হইলে এক-সঙ্গে বহু বমারের সমাবেশ করিতে হয়। অসংখ্য বমার লইয়া

জাহাজ-ভরা বমার

নাগালের সীমানায় সেগুলিকে জড়ো করিয়া তবে হানা-পর্ব্ব সুরু করা চাই। তাই বহুসংখ্যক বমার বহিবার জন্য মার্কিণ রণতরী-বিভাগ সম্প্রতি চারখানি অতিকায় জাহাজ তৈয়ারী করিয়া রণ-সায়রে ছাড়িয়াছেন, সেগুলির প্রত্যেকটিতে অসংখ্য বমার-প্লেন সাজানো থাকে। নির্দ্দিষ্ট আস্তানায় এ-জাহাজ পৌঁছিবামাত্র আতস-বাজির মতো হুশ-হুশ করিয়া বহু বমার-প্লেন আকাশ-পথে ওঠে অভিযানের উদ্দেশ্যে!

কামান-স্তম্ভ

কামান-স্তম্ভ

নক্ষত্রলোকে তত্ত্ব-সন্ধানী অভিযান চালাইবার উদ্দেশ্যে জার্ম্মাণীর পশ্চিম-সীমান্তে গভীর বনমধ্যে জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিকেরা ৭২ ফুট উঁচু এক অতিকায় কামান সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন; কিন্তু নক্ষত্রলোকে জার্ম্মাণীর অভিযানের সুযোগ কোনো দিন ঘটে নাই! বিগত মহাযুদ্ধের সময় এ কামানে গোলা ভরিয়া জার্ম্মাণী সে-গোলা সুদূর প্যারিসের বুকে নিক্ষেপ করিয়াছিল। এবারকারের এ যুদ্ধেও এই কামান ফ্রান্সকে গোলা-বর্ষণে বিধ্বস্ত করিতে ছাড়ে নাই!

—

জলে জীবনরক্ষা

শুধু নদীর বুকে নয়, ঢেউ-ওঠা সাগর-জলেও আর ডুবিবার ভয় নাই! মার্কিণ বিশেষজ্ঞেরা এক-রকম ধাতব 'জীবন-রক্ষক' কলার
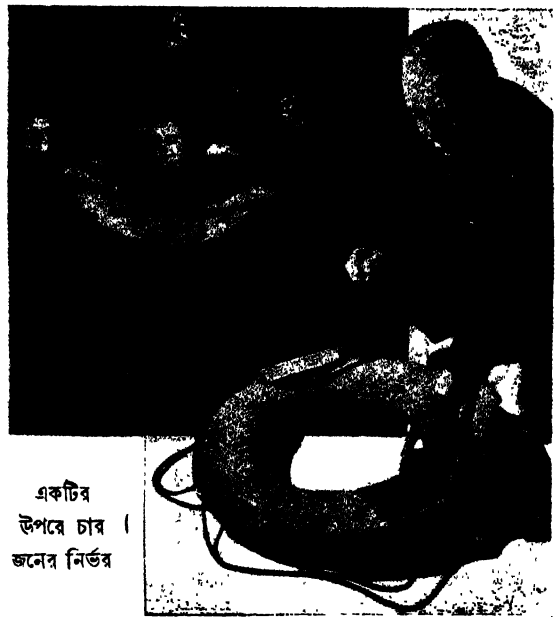
একটির উপরে চার জনের নির্ভর

খোলে খাদ্য-পানীয় ভরা

তৈয়ারী করিয়াছেন, তার একটিকে আশ্রয় করিয়া চার জন লোক ঢেউ-ওঠা সাগর-জলে অবলীলায় ভাসিয়া থাকিতে পারিবেন! এ রক্ষককে সহায় করিলে জলে ডুবিবেন না! রক্ষকের ধাতব খোলের মধ্যটা ফাঁপা—শীল-আঁটা। এই খোলের মধ্যে ছ'জন লোকের জন্য এক দিনের উপযোগী খাদ্য-পানীয় ভরিয়া রাখা চলে। তার উপর এ রক্ষক হইতে আগুন জ্বালিয়া বা ঘন ধূম্রবাষ্প আকাশে তুলিয়া বহির্জগৎকে সঙ্কেত-বার্ত্তা দিবার সুব্যবস্থা আছে।

প্রবাল

[প্রাণিতত্ত্ব]

জীব-জগতে ক্রম-বিকাশের ফলেই এই বৈচিত্র্যময়ী পৃথিবীতে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের আবির্ভাব। উদ্ভিদও যে জীব, এ বিষয়ে আজি

কাপ্-কোরাল বা পেয়ালা প্রবাল (অভ্যন্তর ভাগ)

আর কাহারও কিছুমাত্র সংশয় নাই। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র প্রজ্ঞা-প্রদীপ্ত দৃষ্টিতে উদ্ভিদেও প্রাণপ্রবাহ ও অনুভব-শক্তি আবিষ্কার করিয়া মানুষের চিন্তা-জগতে যুগান্তর আনিয়াছেন। সৃষ্টির প্রত্যূষে শুধু উদ্ভিদ্‌ই ছিল, পরে উদ্ভিদ্ হইতে ক্রম-বিকাশের ফলে কীট্, পতঙ্গ, সরীসৃপ, পশু, পক্ষী প্রভৃতির জন্ম। এমন প্রাণী আছে, যাহারা উদ্ভিদ্ বা কীটপতঙ্গ—কোন্ পর্য্যায়ভুক্ত, তাহা নির্দ্ধারণ করা সহজ নহে। সহসা দেখিলে উদ্ভিদ্ বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু মনোযোগ সহকারে কিছু কাল তাহাদের কার্য্যাবলী বা জীবিকানির্ব্বাহের প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিলে বুঝা যায়, তাহারা উদ্ভিদ্‌ধর্ম্মী নহে। বর্ত্তমান আলোচনার বিষয়ীভূত কোরাল (প্রবাল) এইরূপ প্রাণী। ইহাদিগকে দেখিবামাত্র উদ্ভিদ্-জাতীয় বলিয়া মনে হওয়া অসম্ভব নয়, এবং দীর্ঘকাল ধরিয়া সকল দেশের লোকই ইহাদিগকে বিচিত্রকায় উদ্ভিদ্ বলিয়া বিবেচনা করিত। পরে বৈজ্ঞানিকগণের সূক্ষ্ম পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণে ইহাদের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভারতবাসীরা প্রবালের কথা সুদূর অতীত হইতে অবগত ছিল এবং রত্নরূপে ও ভেষজরূপে ইহার ব্যবহারও প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। তবে অন্যান্য দেশবাসীর ন্যায় ভারতবাসীরাও ইহাকে আশ্চর্য্যজনক বা অদ্ভুত উদ্ভিদ বলিয়াই ভাবিয়াছে। জৈনসূরী হেমচন্দ্র তাঁহার "অভিধানচিন্তামণি" নামক কোষগ্রন্থে—বিদ্রুম, রক্তাঙ্ক, রক্তকন্দ ও হেমকন্দল—প্রবালের এই চারিটি প্রতিশব্দ দিয়াছেন। ইহা ছাড়া অঙ্গারকমণি, রক্তাঙ্গ, অম্ভোধিবল্লভ, ভৌমরত্ন, রত্নাকার ও লতামণি—এই নামগুলি আমরা সংস্কৃত শব্দকোষসমূহে দেখিতে পাই। কোষগ্রন্থে ইহা হীরকাদি বহুমূল্য রত্নরাজির সঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। অঙ্গারকমণি, লতামণি প্রভৃতি শব্দের দ্বারা ইহার মণিত্বই প্রতিপন্ন হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ প্রবালকে আরোগ্যকর ও শক্তি-সঞ্চারক ভেষজে পরিণত করিয়া অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

আয়ুর্ব্বেদমতে বিদ্রুম বা প্রবাল মধুর, অম্ল ও কষায়রসশালী। ইহা শীতল, সারক, বমনকারক, চক্ষুর হিতকর, কফ-পিত্তাদি দোষনাশক, কান্তিবর্দ্ধক (বিশেষতঃ নারীদিগের), বীর্য্যকারক এবং (ধারণে) বিশেষ কল্যাণজনক। অবশ্য, সকল প্রবালই ধারণোপযোগী নহে।

বিদ্রুমকে এক প্রকার বিচিত্রাকার বৃক্ষ বলিয়া মনে করা হইত—এই সত্য আমরা মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশ নামক মহাকাব্যের ত্রয়োদশ সর্গের ত্রয়োদশ শ্লোকে বুঝিতে পারি। রামচন্দ্র রাবণবধের পর পুষ্পকরথে সীতাসহ লঙ্কা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে সীতাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"তবাধরস্পর্দ্ধিষু বিদ্রুমেষু পর্য্যস্তমেতৎ সহসোর্ম্মিবেগাৎ।
ঊর্দ্ধাঙ্কুরপ্রোতমুখং কথঞ্চিৎ ক্লেশাদপক্রামতি শঙ্খ-যূথম্।"

পেয়ালা-প্রবাল (বহির্ভাগ)

কবির এই বর্ণনা হইতে বুঝা যাইতেছে, বিদ্রুম বা প্রবাল তৎকালে বৃক্ষ বলিয়া বিবেচিত হইত এবং এই বৃক্ষের শাখার অগ্রভাগগুলি কণ্টকের ন্যায় সুতীক্ষ্ণ, এইরূপও মনে করা হইত। 'অম্ভোধিবল্লভ'

প্রভৃতি নাম হইতে জানা যায়, ইহা শুধু সমুদ্রেই উৎপন্ন হয় ; তাহা প্রাচীনগণ জানিতেন।

প্লিনি এবং ডিয়োস্কোরোইডিস প্রভৃতি (প্রতীচীর) প্রাচীন লেখকগণ প্রবালকে বৃক্ষ বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। টুর্নিভিলে তাঁহার বৃক্ষবিষয়ক পুস্তকে প্রবালকে এক প্রকার অদ্ভুত সামুদ্রিক উদ্ভিদ্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহার পুষ্পসম্পর্কীয় তত্ত্ব অজ্ঞাত, এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে কাউণ্ট মার্সিগলি ঘোষণা করেন—তিনি প্রবাল-পাদপের পুষ্প আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি সমুদ্র হইতে কতিপয় প্রবাল-কীট আনিয়াছিলেন। সেই সদ্য-সংগৃহীত পুষ্পাকার পদার্থগুলিকে জলে ডুবাইবামাত্র উহারা অষ্টদলবিশিষ্ট পুষ্পবৎ প্রতীয়মান হইল বলিয়া কাউণ্ট মার্সিগলির কথায় তৎকালে সকলের প্রতীতি জন্মিল। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে এক জন অখ্যাতনামা ফরাসী ভিষক্ উত্তর আফ্রিকার (বার্ব্বারী) উপকূলের পার্শ্বে প্রসারিত 'কোরাল ফিশারী'গুলি পরিদর্শন করিবার সময় কাউণ্ট মার্সিগলির আবিষ্কৃত প্রবাল-পুষ্পগুলি পরীক্ষা করিবার সুযোগলাভ করিলেন। এই ডাক্তারের নাম পীসোনেল। ইনি সূক্ষ্মভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বুঝিলেন, এই পুষ্প বলিয়া বিবেচিত বস্তুগুলি এক প্রকার জীবন্ত 'পোলিপ-জাতীয়' কীট ছাড়া অন্য কিছু নহে। যে প্রস্তরবৎ পদার্থ কোরাল বা প্রবাল বলিয়া পরিচিত, এই সকল কীট উহাদিগের রচয়িতা।

অর্গান-পাইপ কোরাল অর্থাৎ বাদ্যযন্ত্রের নলের ন্যায় প্রবাল

ট্রি-কোরাল বা বৃক্ষ-প্রবাল

এই কীট লক্ষ লক্ষ নয়, কোটি কোটি নয়, গণনাতীত সংখ্যায় সম্মিলিত হইয়া অসীম সমুদ্র-বক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশ গড়িয়া তুলিয়াছে। আকারে ক্ষুদ্র—দেখিলে মনে হয়, রুদ্র সমুদ্র ইহাদিগকে মুহূর্ত্তে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বীয় বিরাট্ বক্ষে বিলীন করিয়া ফেলিবে ; কিন্তু অবশেষে বুঝা যায়, ইহাদের প্রতিকূল প্রবাহকে প্রতিরুদ্ধ করিবার সামর্থ্য সমুদ্রের মতই সুমহান্। দেখিতে ছোট বটে, কিন্তু শক্তিতে বিরাট্। দানবীর দধীচির ন্যায় ইহারা অবিরাম আপনাদের অস্থি পরার্থে দান করিতেছে।

পীসোনেলের বিস্ময়কর আবিষ্কার সকলের দ্বারা স্বীকৃত হইবার পর বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকগণ প্রবাল-কীটের আশ্চর্য্য কার্য্যাবলী মনোযোগসহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, ইহারা স্থাণুর ন্যায় এক স্থানে অবস্থান করে না—প্রায়ই স্থান-পরিবর্ত্তন করা ইহাদের স্বভাব। ইহাদের 'পজিশান' বা পরিস্থিতির (অবস্থান করিবার ভঙ্গীর) পরিবর্ত্তনও পণ্ডিতরা লক্ষ্য করিলেন। পর্য্যবেক্ষণের সাহায্যে ইহাও বুঝিলেন, এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবের মধ্যে রহিয়াছে রাক্ষসী বুভুক্ষা এবং সেই বুভুক্ষা নিবারণের জন্য ইহারা নানাপ্রকার কুটিল কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকে। ইহাদের শিকার ধরিবার ও গলাধঃকরণ করিবার কৌশল বৈজ্ঞানিকবর্গকে বিস্মিত করিল। ইহাদের আর একটি বিস্ময়কর শক্তি আছে। ইহারা আপনার বাহুসমূহ এবং শরীরকে ইচ্ছামত সঙ্কুচিত বা প্রসারিত করিতে পারে। এমন কি, সময়ে সময়ে এইরূপ প্রসারণের ফলে ইহাদের দেহ সাধারণ বা স্বাভাবিক আকার অপেক্ষা দশ বা দ্বাদশ গুণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ইহারা দেখিতে কিরূপ—এইরূপ প্রশ্ন পাঠকগণের মনে উদিত হওয়া স্বাভাবিক। পূর্ব্বে আকৃতি দেখিয়াই ইহাদিগকে উদ্ভিদ্ বলিয়া মনে করা হইত সন্দেহ নাই। ইহাদের দেহ-যন্ত্রে বিশেষ

কোন জটিলতা লক্ষিত হয় না। ইহাদের দেহকে দুইটি অংশে বিভক্ত (স্থিতিস্থাপক গুণবিশিষ্ট) একটি লম্বা নল বলা চলে। ঐ দুইটি অংশের মধ্যস্থলে অবস্থিত স্থানটি স্বচ্ছ। উদর-প্রদেশ বা বক্ষঃস্থল যাহাকে বলা চলে, সেরূপ কোন অঙ্গ বা যন্ত্র ইহাদের দেহে নাই। মাথাটা একটা গোলাকার পিণ্ডবৎ পদার্থ। চক্ষুর কোন চিহ্ন ঐ পিণ্ডবৎ মুণ্ডের সহিত সংযুক্ত নাই। ঐ পিণ্ডের একটা স্থান বিদীর্ণ হইয়া মুখ-গহ্বরের পরিণতি পাইয়াছে। এই বদনবিবরের চারি ধারে ৬ হইতে ৮টি পর্য্যন্ত বাহু (টেণ্টাকলস্) বিস্তৃত রহিয়া ইহাদিগকে অতি অদ্ভুত করিয়া তুলিয়াছে। এই বাহুগুলির ক্রমশঃ বা অকস্মাৎ বহু গুণ বৃদ্ধি পাইবার যে শক্তি রহিয়াছে, তাহাও অত্যন্ত অদ্ভুত বটে! প্রবাল-কীটের জন্মিবার ও বিস্তারলাভ করিবার কাল মে হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত। এই সকল কোটি কোটি প্রবাল-শিশু অসীম সমুদ্রবক্ষে বিচিত্র জীবনযাত্রা আরম্ভ করে। তখন ইহাদের চক্রবৎ আকার এত সূক্ষ্ম যে, আণুবীক্ষণিক বলিলেও চলিতে পারে। এই গোলাকার প্রবাল-শিশুদিগের গায়ে এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম লোম থাকে। সমুদ্রের ভিতর চলিতে চলিতে সেই কীট-শিশুগুলি ক্রমশঃ অন্য আকার ধারণ করে। এই আকার কতকটা 'ফ্লাস্ক' বা বোতলের ন্যায়। এই বোতলাকৃতি প্রবাল-বালকদিগের অদ্ভুত দেহের প্রশস্ততর প্রান্তটি পুরোভাগে থাকে। পশ্চাতে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ অংশটিতে মুখটি দেখা যায়। কিছু কাল এইরূপ বোতলাকার থাকিবার পর পুনরায় আকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটে। এবারের আকার কতকটা রোলারের মত। এইবার প্রবাল-বালক যৌবনে পদার্পণ করিয়া বংশবিস্তারের উপযুক্ত অবস্থায় প্রায়ই উপনীত হইয়াছে। আর ইহাদিগকে নিতান্ত ক্ষুদ্র বলা চলে না। শরীরের বেড় অপেক্ষাকৃত অনেক বাড়িয়াছে এবং পিণ্ডাকার মুণ্ডের গাত্রে ও মুখের চারি ধারে পুরুভুজের ভুজলতার ন্যায় বাহুসমূহ বিস্তৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয়, প্রবালের বংশবিস্তার করিবার বিচিত্র প্রণালী। পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে প্রবাল-কীটের দেহের বিভিন্ন অংশ হইতে—বৃক্ষকাণ্ড হইতে উদ্গত শাখা-প্রশাখা-সমূহের মত যে সকল উপাঙ্গসমূহ বাহির হয়, উহাদের প্রত্যেকেরও স্বতন্ত্র বাহুসমূহ থাকে। পরে প্রত্যেক উদ্গত অংশ খসিয়া গিয়া স্বতন্ত্র প্রবাল-কীটে পরিণত হয়! ইহা ছাড়া বয়ঃপ্রাপ্ত কোরাল-পলিপ বা প্রবাল-কীটের মুখ হইতেও সন্তান বাহির হয়। এইরূপে অতি অল্প দিনের মধ্যেই ইহারা বিস্ময়কর বিস্তার লাভ করিয়া থাকে। নিত্য নূতন নূতন উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ভারত মহাসমুদ্রে এবং প্রশান্ত মহাসাগর-বক্ষে লক্ষ লক্ষ প্রবাল-দ্বীপ এইরূপেই সৃষ্ট হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র কীটগুলি একটা বিশাল মহাদেশ গড়িয়া তুলিয়াছে বলিলেও ভুল হয় না। প্রবাল-দ্বীপ ছাড়া যে কোরাল-রীফ বা প্রবাল-শৈল ইহাদিগের দ্বারা সমুদ্রগর্ভে নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার সংখ্যানিরূপণ সম্ভব নয়।

প্রশ্ন হইতে পারে, আমরা সাধারণতঃ প্রবাল বলিতে যাহা বুঝিয়া থাকি, সেই শিলাসম সুকঠিন পদার্থের সহিত এই কোমলকায় কীটের সম্পর্ক কি? প্রবাল বলিলে আমরা সেই লালবর্ণ পলার কথাই ভাবি, যাহার মালা গাঁথিয়া কেহ কেহ গলায় ঝলায়—যাহা মুঙ্গা (মুগা) নাম ধারণ করিয়া অঙ্গুরীয়কের সঙ্গে ধনীর অঙ্গে উঠে, যাহা ভস্ম করিয়া ভিষক্‌গণ ভেষজ প্রস্তুত করেন, যাহা কোষগ্রন্থকার-দিগের দ্বারা মূল্যবান্ মণির মর্য্যাদা লাভ করিয়া সেইরূপ পর্য্যায়ে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা যাহাকে প্রবাল বা পলা বলি, সেই
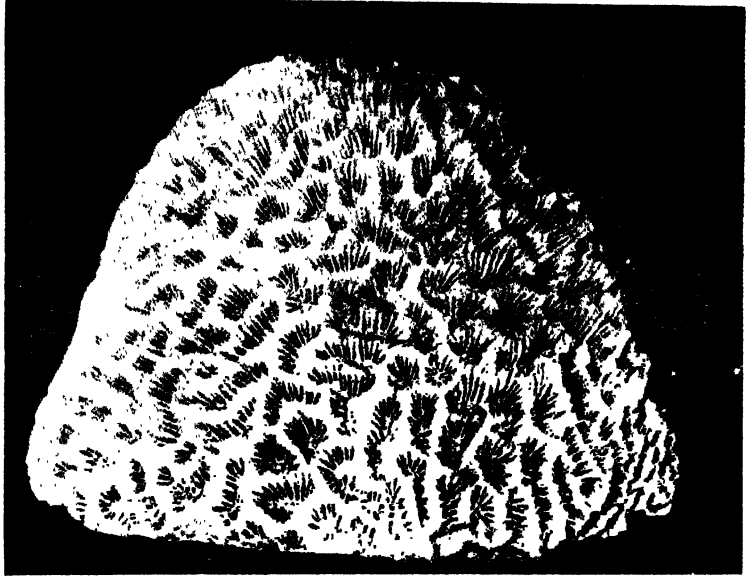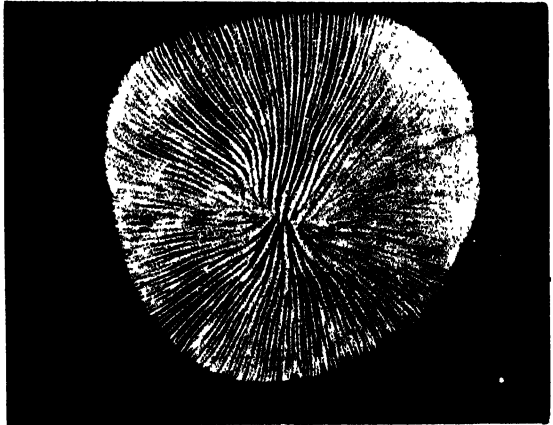
ব্রেণ-কোরাল বা মস্তিষ্ক-প্রবাল

'মাশরুম কোরাল' বা ব্যাঙের ছাতার ন্যায় প্রবাল

প্রস্তরবৎ পদার্থের একটি ক্ষুদ্র খণ্ড লইয়া পরীক্ষা করিলে উহাতে বহু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চক্রাকার চিহ্ন বা ছিদ্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। এই ছিদ্রগুলিকে প্রবালের পলিপ বা কীটগুলির বাস-গৃহের দ্বার বলিলে ভুল হয় না। সমুদ্র-সলিল হইতে চুণ-জাতীয় এক প্রকার (কার্বোনেট অফ লাইম) পদার্থ গ্রহণ করিয়া পরে সেই পদার্থটিকে নানা-প্রকার আকারবিশিষ্ট গৃহে পরিণত করিবার বিস্ময়কর শক্তি ইহাদের রহিয়াছে। কালক্রমে গৃহী সরিয়া যায়, কিন্তু সমুদ্র হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া যে গৃহ সে গড়িয়া তুলে, তাহা যুগের পর যুগ স্থায়িত্ব লাভ করে। আমরা যাহাকে প্রবাল বা পলা বলি, তাহাকে প্রবাল-কীটের দ্বারা কার্বোনেট অফ লাইমে প্রস্তুত সেই গৃহের অংশ বা খণ্ড বলা যাইতে পারে। অবশ্য এমন প্রবাল আছে—যাহারা কীটের গৃহ না হইয়া দেহাবশেষ। এই বিচিত্র কীটের দেহ এবং গেহ দুইই কার্বোনেট অফ লাইমের পরিণতি। প্রবাল তখনকার জীব—যখন উদ্ভিদ্ সঞ্চরণশীল প্রাণিত্বে প্রথম পদার্পণ করিয়াছে। অতি নিম্নশ্রেণীর এবং সৃষ্টির প্রারম্ভের প্রাণী হইলেও ইহারা স্থপতিরূপে যে অতি আশ্চর্য্যজনক শক্তির পরিচয় দেয়, তাহা সৃষ্টির অন্য কোন প্রাণী প্রদান করিতে পারে না।

প্রবাল নামক যে প্রস্তরবৎ পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়, উহা প্রবাল-কীটের দেহ এবং গৃহ উভয় হইতেই গৃহীত। আমরা সকলে কার্বনেট অফ লাইমের বিস্ময়জনক পরিণতি এই দেহ ও গেহগুলিই দেখিতে পাই, যে উদ্ভিদাকার অদ্ভুত পোলিপ বা কীট এই আশ্চর্য্য কার্য্য সাধন করে, তাহাদিগকে দেখিতে পাই না। কারণ, জল হইতে তুলিলে এই সকল কুসুম-কোমল-কান্তিবিশিষ্ট পোলিপের পক্ষে বাঁচিয়া থাকা সম্ভব হয় না। সুতরাং যাঁহারা প্রবাল-কীটকে জীবিত অবস্থায় দেখিবার আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহাদিগকে প্রবালের বাসস্থল কোন শান্তসলিল হ্রদের বক্ষ লক্ষ্য করিতে হইবে। জল হইতে তুলিলে ইহারা শুধু যে বাঁচিয়া থাকে না কেবল তাহাই নহে, ইহাদের নয়নাভিরাম সৌন্দর্য্য বা বর্ণৈশ্বর্য্যও বিলোপপ্রাপ্ত হয়। ইহাদের নীল, লোহিত, পীত প্রভৃতি বর্ণরাজির অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি—বিচিত্র সম্মিলন আমাদিগকে বিমোহিত করে। ইহাদের আকৃতির বৈচিত্র্যও কম চিত্তাকর্ষক বা বিস্ময়জনক নয়। কোনটা মৃগের শৃঙ্গের মত আঁকা-বাঁকা শাখা-প্রশাখাসমন্বিত, কোনটা কারুকার্য্য-কমনীয় কাপ বা পেয়ালার ন্যায়, কোনটা মনুষ্যের মস্তিষ্কের মত, কেহ বৃক্ষ বা ব্রততীর অনুরূপ।

বর্ত্তমানে প্রবালকীট গ্রীষ্মমণ্ডল ব্যতিরেকে দৃষ্ট হয় না, প্রধানতঃ লোহিত সাগর, ভারত মহাসাগর, এবং প্রশান্ত মহাসাগরই ইহাদের বর্ত্তমান বাসস্থল। জাপান সাগরে ওয়েষ্ট-ইণ্ডিজ দ্বীপাবলীর পার্শ্বে প্রসারিত পারাবারে প্রবালকীট পরিদৃষ্ট হয়। তবে লোহিত সাগর বা রেড-সীতে যত প্রবাল আছে, তত আর কোথাও নাই। এখানে তাঁহারা যে সকল গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে, তীরবাসীরা সেগুলিকে আপনাদিগের গৃহ-নির্ম্মাণের উপকরণরূপে ব্যবহার করে। সিংহলের পার্শ্ববর্ত্তী সমুদ্রে, ভারতবর্ষের কোরমণ্ডল উপকূলের পার্শ্বে, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের চারিদিকে লাক্ষাদ্বীপ এবং মালদ্বীপের পার্শ্বস্থ সমুদ্রে, দাক্ষিণাত্যের মালাবার উপকূলের পুরোভাগে প্রবাল-কীট ও তাহাদের প্রস্তুত পাহাড়সমূহ দেখা যায়।

প্রবাল-কীটগুলিকে কয়েকটি বিভিন্ন শ্রেণী বা পরিবারে বিভক্ত করা চলে। কোন কোন স্থানে কেবল একটি শ্রেণীই দেখা যায়। কোন কোন স্থানে বিভিন্ন শ্রেণী একত্র অবস্থান করিয়া দূর-প্রসারিত প্রবাল-শৈলসমূহ প্রস্তুত করে। কোন কোন স্থানে মধ্যবর্ত্তী বিচ্ছেদ বা অবকাশগুলি জলতলবাসী অন্যান্য জীব পূর্ণ করিয়া থাকে। পরে প্রবালকীটের দেহাবশেষ বা গৃহগুলির দ্বারা সেই শূন্য স্থান পূর্ণ হইয়া উঠে। এইরূপে প্রবাল-নির্ম্মিত সুদূর-বিস্তৃত নিরবচ্ছিন্ন পাহাড়-শ্রেণী জলতলে সংগঠিত হইতে থাকে। এই প্রবাল-রচিত পাহাড়-শ্রেণী বা 'রীফ'গুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এক শ্রেণীর প্রবাল-পাহাড় উপকূলের অতি নিকটে লক্ষিত হয়। এই প্রবালগিরিগুলি জোয়ারের সময় জলমগ্ন থাকে, কিন্তু ভাটার সময় বাহির হইয়া পড়ে। আন্দামানের পাশে এইরূপ প্রবাল-পাহাড় প্রায় দেখা যায়। ইংরেজীতে ইহাদিগকে 'ফ্রিঞ্জিং রীফস' নামে অভিহিত করা হয়। আর এক প্রকার প্রবাল-পাহাড় তীরভূমি হইতে দূরে দেখা যায়। ইহারা সমুদ্রতল হইতে সোজাসুজি মস্তক উত্তোলন করিয়া উচ্চশীর্ষ পাহাড়ের মত দাঁড়াইয়া থাকে। ইহাদের অঙ্গ ভঙ্গ হইলেও বহু গুহা উহাতে রহিয়াছে। সিন্ধুতলে বিরাজিত এই সকল অন্ধকার বন্দরে নানা প্রকার বিচিত্রাকার সামুদ্রিক প্রাণী বাস করে। এই প্রবাল-শৈলমালা উপকূল হইতে ১ শত মাইল পর্য্যন্ত দূরে দেখা যায়। ইহাদিগকে ইংরেজীতে 'বেরিয়ার রীফ' বলা হয়। ইহা ছাড়া আর এক প্রকার পাহাড় প্রবাল-কীটরা ভূভাগ হইতে বহু দূরে উন্মুক্ত সমুদ্রবক্ষে প্রস্তুত করে। ইহাদিগকে পাহাড় না বলিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ বলা চলে। অসংখ্য প্রবাল-দ্বীপ বা কোরাল-আইল্যাণ্ড প্রশান্ত মহাসাগরবক্ষে বিরাজিত দেখিতে পাওয়া যায়।

বিভিন্ন শ্রেণীর প্রবালের মধ্যে 'মাদ্রেপোরারিয়া' নামক প্রবাল-কীটরাই সর্ব্বাপেক্ষা সুপরিজ্ঞাত। ইহারা এবং ষ্টার ও ব্রেন কোরাল (অর্থাৎ তারকার ন্যায় এবং মনুষ্য-মস্তিষ্কের মত) আখ্যায় অভিহিত প্রবালবর্গই বড় বড় রীফ বা পাহাড় রচনা করিয়া থাকে। এই সকল প্রবালের কঙ্কাল বা দেহাবশেষগুলি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং উহাদিগের কাঠিন্যও অন্য জাতীয় প্রবাল অপেক্ষা অধিক। মাদ্রে-পোরারিয়া এবং তারকা ও মস্তিষ্ক-প্রবাল কেবল উষ্ণ সমুদ্রসলিলে বাস করিতে পারে। শৈত্যের সামান্য স্পর্শও ইহারা সহ্য করিতে পারে না। যেখানে টেম্পারেচার বা উত্তাপ ৬৮ ডিগ্রির নীচে কখনও নামে না, সেইরূপ স্থানেই ইহাদের পক্ষে জীবিত থাকা সম্ভব। শুধু উষ্ণতা নয়, জলের গভীরতাও ইহাদের জীবনের পক্ষে প্রয়োজন। যে সমুদ্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণিপুঞ্জ জীবিত থাকিয়া এবং মরিয়া বিরাট্ জঞ্জাল সৃষ্টি করিয়া থাকে, উহাই ইহাদের পক্ষে অধিক উপযোগী। ইহারা এই সকল জঞ্জাল ভক্ষণ করিয়া বারিধির ধাঙ্গড় বা ঝাড়ুদারের কার্য্য সাধন করে, এই ধারণা অসঙ্গত নহে। বিশ্ববিখ্যাত বিবর্ত্তবাদী ডারউইন প্রবাল-শৈলগুলির অভ্যুত্থান সম্বন্ধে তিনটি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রথম কারণ—সমুদ্রতলের কম্পন; দ্বিতীয় কারণ—ভূমি-কম্পের জন্য সমুদ্রতলের আকস্মিক স্ফীতি; তৃতীয় কারণ—প্রবাল-কীট। প্রথম ও দ্বিতীয় কারণ হইতে সমুদ্রতল কিছু উচ্চ হইয়া উঠে এবং পরে প্রবাল-কীট সেই উচ্চতার উপর অদ্ভুত ইর্ম্মারত রচনা করিয়া তাহাকে উচ্চতর করিয়া তুলে। প্রশান্ত মহাসাগরে এমন বহু মনুষ্য-অধ্যুষিত মায়াপুরী সদৃশ ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে, যাহা প্রবাল-কীটের বিস্ময়কর কীর্ত্তি।

এক প্রকার প্রবাল আছে, যাহারা অন্যান্য প্রবালের সহিত সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বাস না করিয়া নিঃসঙ্গভাবে বাস করিতে ভালবাসে। ইহাদিগকে 'সলিটারী কোরাল' আখ্যা দেওয়া হয়। প্রবালকীটরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াই পাহাড় প্রস্তুত করে; সুতরাং 'নিঃসঙ্গ প্রবাল'গুলি স্থপতিরূপে কোন বিস্ময়কর কীর্ত্তি রচনা করে না। শুধু তাহাদের দেহাবশেষগুলিই থাকে। ভারতবর্ষীয় সমুদ্র-সলিলে 'ফাঙ্গিঙ্গো' শ্রেণীর প্রবালই প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। ইহাদের সমতল শরীর সময়ে সময়ে ১২ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট হইতে দেখা যায়। মাশরুম বা 'ব্যাঙের ছাতা' জাতীয় উদ্ভিদের সহিত ইহার বিস্ময়কর সাদৃশ্য। সেই জন্য ইহাদিগকে 'মাশরুম কোরাল'ও বলা হয়। ইহারা সৃষ্টির আদিম যুগের জীব, সে বিষয়ে সংশয় নাই। প্রস্ফুটিত পুষ্পের সহিত ইহাদের সাদৃশ্যও আশ্চর্য্যজনক। কে বলিবে, ইহারা কোমল ও কমনীয়কায় কুসুম নয়—কদর্য্য কীট। ইহারা জীবিত অবস্থায় জলধির তলদেশে অবস্থান করে এবং তথায় তাহাদিগকে দেখিলে 'ক্যাকটাস দাহলিয়া' নামক বর্ণ-বিচিত্র পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে বলিয়া মনে হওয়া অসম্ভব নয়। ইহার সর্ব্বশরীরব্যাপী সঙ্কীর্ণ কিন্তু সুদীর্ঘ টেণ্টাকল বা বাহুগুলির রঙ অত্যন্ত মনোরম। শরীরের অভ্যন্তরস্থ শক্ত অংশটি এই রঙীন বাহুগুলির দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত থাকে। চক্রাকার দেহের কেন্দ্রস্থলে মুখ এবং সেই মুখকে কেন্দ্র করিয়া রেখার মত বাহুগুলি সারি সারি প্রসারিত। এই জাতীয় প্রবাল যত দিন অল্পবয়স্ক থাকে, তত দিন পুষ্পের বৃন্তের মত একটি অঙ্গ শরীরের সহিত সংযুক্ত থাকে। এই বৃন্তের সাহায্যে প্রবাল-বালক কোন আশ্রয়ের গাত্রে সংলগ্ন থাকে। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে এই বৃন্তবৎ প্রান্তটি খসিয়া পড়ে।

পত্র-প্রবাল বা 'লীফ-কোরাল' মাশরুম কোরালের আত্মীয় বা জ্ঞাতি। দেখিতে ঠিক বৃক্ষের পত্রের মতই। ইংলণ্ডের পার্শ্ববর্ত্তী সমুদ্রে 'এণ্ডাইভ' নামক যে প্রবালজাতীয় প্রাণী দেখা যায়, উহারাও এই শ্রেণীর। গাছের পাতা কর-পিষ্ট হইলে উহার আকার যে প্রকার হয়, এই প্রবাল-কীটগুলির আকার অনেকটা সেই রকম। প্রবালগিরি-গুলির অথবা জলতলস্থ সাধারণ শৈলের গুহায় বা ফাটলে এই প্রবাল দৃষ্ট হইয়া থাকে। কাপ্-কোরাল বা পেয়ালা প্রবাল এবং টার্ব্বিনারিয়া নামক প্রবাল-কীটকেও পত্র-প্রবালের পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে। বঙ্গোপসাগরে 'ক্যারিয়োফাইলি' আখ্যায় অভিহিত এক জাতীয় মনোরম প্রবাল প্রচুর দৃষ্ট হয়। লাক্ষাদ্বীপের পার্শ্ববর্ত্তী সমুদ্রে 'এস্ট্রেজিয়া'জাতীয় যে সকল প্রবাল আছে, তাহারা আরও অধিক সুদৃশ্য। ইহাদের সংখ্যা সেরূপ অধিক নহে। এক সময় ইহারা অধিকতর দুর্ল্লভ ছিল।

আমরা পূর্ব্বে যে 'তারকা প্রবাল' বা ষ্টার-কোরালের নাম উল্লেখ করিয়াছি, উহারা বিশেষ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া দূরপ্রসারিত উপনিবেশসমূহ রচনা করিয়া বাস করে। ইহাদের প্রকৃতি 'সলিটারি কোরাল' বা 'নিঃসঙ্গ প্রবাল'দের সম্পূর্ণ বিপরীত। তারকা-প্রবালশ্রেণীর পলিপ বা কীটগুলিও বিস্ময়কর সৌন্দর্য্যের বা বর্ণৈশ্বর্য্যের অধিকারী। আর এক-প্রকার প্রবাল 'আব্দিতা' আখ্যায় অভিহিত। ইহাদের মুখটি উজ্জ্বল লাল রঙে এবং বাহুগুলি প্রীতিপ্রদ পীতবর্ণে রঞ্জিত। 'এলান্স' আখ্যায় অভিহিত প্রবালকীটগুলির প্রান্তভাগ কমলাবর্ণে (অরেঞ্জ) রঞ্জিত এবং মুখটির রঙ তুষার-শুভ্র। এই জাতীয় কোন কোন প্রবালের বাহু সবুজ এবং মুখ চোকোলেট রঙের। আমরা ব্রেণ-কোরাল বা মনুষ্য-মস্তিষ্কের মত আকৃতিশালী প্রবালের নাম পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহারা গোলাকার—কতকটা গ্লোব বা ভূমণ্ডলের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। মানুষের মস্তিষ্কের গাত্রে যেরূপ বিচিত্র চিহ্নসমূহ বা রেখাবলী দৃষ্ট হয়, এই সকল প্রবালকীটের শরীরে সেইরূপ রহিয়াছে। বৃক্ষের অঙ্কুরবৎ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্কুর এক একটি কীটের শরীর হইতে উদ্গত হইয়া থাকে। ক্রমশঃ এই সকল অঙ্কুরের সঙ্গে এক একটি স্বতন্ত্র মুখ উৎপন্ন হয়। অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর হইয়া পড়িলে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখাগুলি খসিয়া স্বতন্ত্র প্রবালকীটে পরিণতি পাইয়া অসীম সমুদ্র-সলিলে অদ্ভুত অভিযান আরম্ভ করে।

লোহিত সাগরে এক জাতীয় প্রবালকীট লক্ষিত হয়—নলাকার আকৃতির জন্য যাহাদিগকে 'পাইপ-কোরাল' বা 'নল-প্রবাল' বলা হয়। ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরেও ইহাদিগকে দেখা যায়। জীবিত অবস্থায় ইহারা যেরূপ মনোহর, মৃত্যুর পর ইহাদের দেহাবশেষও সেই প্রকার পরম রমণীয়। এই সুদৃশ্য দেহাবশেষ বা কঙ্কালগুলি দেখিতে প্রস্তরবৎ বটে, কিন্তু অত্যন্ত ভঙ্গপ্রবণ। একটু চাপ দিলেই ভাঙ্গিয়া যায়। এই জাতীয় প্রবালকীটের শরীর অর্গান নামক বাদ্যযন্ত্রের অন্তর্গত টিউব বা নলের মত অংশসমূহে পূর্ণ বলিয়া ইহাদিগকে সাধারণতঃ 'অর্গান-পাইপ কোরাল' বলা হয়। এই নলাকার অঙ্গগুলি লম্বভাবে বা দণ্ডায়মানের ভঙ্গীতে সারি সারি বিরাজিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেপটা (আড়া-আড়ি বিরাজিত) এই সকল নলকে বিভক্ত করিয়া ইহাদিগের আকৃতিকে আরও অদ্ভুত করিয়া তুলিয়াছে। যে সেতুর ন্যায় অঙ্গ বা অংশ কোন বৃক্ষ-ফলের বা প্রাণিদেহের দুইটি কোষ বা রন্ধ্রকে পৃথক্ করিতেছে, বোটানি বা উদ্ভিদতত্ত্বে এবং এনাটমি বা দেহ-তত্ত্বের ভাষায় তাহাকে 'সেপ্টাম্' (বহুবচনে সেপটা) বলা হয়। এই নলগুলির রঙ প্রায় উজ্জ্বল লাল হইয়া থাকে। ইহাদের বাহুগুলি অল্প বা ফিকে লাল এবং অবশিষ্ট অঙ্গ উজ্জ্বল সবুজ।

ষ্ট্যাঘর্ণ-কোরাল' নামক প্রবালের শরীর বহু শৃঙ্গাকার অঙ্গে বিভক্ত। এই সকল অঙ্গে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র বিদ্যমান। জীবিত অবস্থায় এই জাতীয় প্রবালের পোলিপ বা কীটগুলির দেহে উজ্জ্বল রক্তরাগ দেখা যায়। 'সী-ফ্যান' বা 'সমুদ্র-পাখা' আখ্যায় অভিহিত প্রবাল-কীটগুলির কুসুম-কোমল কমনীয় কান্তি অত্যন্ত মনোরম।

যে সকল রক্তবর্ণ প্রবাল বা পলা মূল্যবান্ রত্নসমূহের অন্যতম বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, তাহাদের অধিকাংশই 'রেড-কোরাল বা 'লাল-প্রবাল' শ্রেণীর প্রবাল-কীট হইতে প্রাপ্ত। প্রধানতঃ ভূমধ্য সাগরে এই জাতীয় প্রবাল পাওয়া যায়। ভারত মহাসাগরে এবং প্রশান্ত মহাসাগরের কোন কোন অংশেও লাল প্রবাল দেখা যায়। সাগরের সুগভীর অংশে বিরাজিত গিরি-গাত্রে 'কুঞ্চন-কমনীয়' বা 'রেখা-কমনীয়' রক্তরাগ-রঞ্জিত বৃন্তগুলি সংলগ্ন করিয়া ইহারা উল্টা হইয়া অবস্থান করে। দেখিলে ঠিক লাল ফুল ঝুলিতেছে বলিয়া মনে হয়। সিসিলি, মেজরকা, মাইনরকা প্রভৃতি ভূমধ্য সাগর-মধ্যবর্ত্তী দ্বীপগুলিতে এবং আফ্রিকার উত্তরস্থ আলজিরিয়ার উপকূলে 'লাল-প্রবাল' আহরণের জন্য কিশারীসমূহ স্থাপিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের পার্শ্বে প্রসারিত সমুদ্র-সলিলে 'আইসিস্ হ্যাপিউরিস্' নামক এক জাতীয় প্রবাল দৃষ্ট হয়। ইহাদের বৈশিষ্ট্য—চারি দিকে প্রসারিত শৃঙ্গবৎ অঙ্গসমূহ।

মহাকবি কালিদাসের বর্ণনায় বিদ্রুম-বৃক্ষের গাত্রে যে উদ্ধমুখ সুতীক্ষ্ণ অঙ্কুর বা শাখার উল্লেখ আছে এবং যাহা হইতে শঙ্খসমূহ অতি কষ্টে আপনাদিগকে ছাড়াইয়া লইতেছে বলিয়া বর্ণিত, তাহাতে আমাদের বিশ্বাস, এ সকল প্রবাল লালবর্ণবিশিষ্ট বটে, কিন্তু এই 'আইসিস্ হ্যাপিউরিস্'জাতীয়। এই শাখা-প্রশাখাসমন্বিত বৃক্ষবৎ প্রবাল-কীটগুলি বিশেষ দৃঢ়-দেহ বলিয়া কোন জলচর জীব ইহাদের দেহের সহিত জড়িত হইয়া পড়িলে উহাদের পক্ষে মুক্তিলাভ করা সহজ হয় না।

'সী-পেন' বা 'সমুদ্র-কলম' আখ্যায় অভিহিত প্রবাল-কীটগুলির আকার অনেকটা কুইলের বা পাখার কলমের মত। ইহাদের বৃন্তটিও কার্ব্বোনেট অফ লাইম নামক পদার্থে প্রস্তুত বলিয়া শক্ত। ইহাদের নিম্নাংশ (কুইল বা পাখার মতই) আপেক্ষাকৃত রিক্ত এবং উদ্ধাংশ পালকবৎ পদার্থে পূর্ণ। কোন কোন 'সী-পেন' জাতীয় প্রবালকীট এক ফুট পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে। ইহাদের রং সাধারণতঃ লাল হইতে দেখা যায়। তবে কেহ গাঢ় বা উজ্জ্বল লাল, কেহ ফিকে লাল, কেহ ঈষৎ বেগুনী বর্ণবিশিষ্টও হইয়া থাকে। কোন কোন শ্রেণীর 'সী-পেন' প্রবালের দেহ হইতে এক প্রকার দীপ্তি নির্গত হয়। এক রকম প্রবালকে 'ভ্রমণকারী কোরাল' আখ্যা দেওয়া হয়। পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, ইহারা কোন স্বতন্ত্র শ্রেণীর প্রবালকীট নহে। আমরা পূর্ব্বে যে সলিটারি কোরাল বা 'নিঃসঙ্গ প্রবালে'র কথা বলিয়াছি, এক প্রকার কীট তাহাদের ভিতর বাসা বাঁধিয়া এবং তাহা-দিগকে ইচ্ছামত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চালিত করিয়া 'ভ্রমণ-কারী' নামক অভিনব শ্রেণী বলিয়া ভ্রম জন্মাইয়া থাকে। এক প্রকার কীটের ইচ্ছায় পরিচালিত অন্য প্রকার কীট! আশ্চর্য্যজনক অবস্থা বটে!

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ।

ক্ষুধা নাই—হজম হয় না!

সভ্যতার যুগে নানা-রকম বিলাস-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেও আমাদের মনে সুখ নাই, তার কারণ খাদ্যে রুচি আছে, অথচ যা খাই হজম হয় না! ইহার ফলে দেহে-মনে অবসাদ, বিমলিন কান্তি!

স্ত্রী-পুরুষ দু'জনেরই প্রায় এক দশা! তবে পুরুষ-মানুষকে অন্ন-সংস্থানের জন্য খানিকটা ছুটাছুটি করিতে হয়, তাই তাঁদের স্বাস্থ্য মেয়েদের মতো অতখানি ভঙ্গুর হয় না! সম্প্রতি মেয়েদের আবার দু'টি বিরাট্ উপসর্গ জুটিয়াছে—ডিস্পেপসিয়া এবং ব্লাডপ্রেসার।

মেয়েদের মধ্যে অনেকেরই আজ হাই-ব্লাডপ্রেসার কিম্বা লো-ব্লাডপ্রেসার। এমন শরীর লইয়া সংসার-পরিচালনা বা ছেলেমেয়েকে মানুষ করিয়া তোলা চলে না! তাছাড়া 'শরীরমাদ্যং!'

অনেকে সংসারে দেখি, জোলাপ এবং হজমী বড়ি প্রায় চাল-ডালের মত নিত্য-প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। তার উপর আছে মাথা-ধরা-উপসর্গ সারাইতে নানা রকমের পেটেন্ট বড়ি!

ভালো কথা নয়। দেহ এমন কেন, তার কারণ নির্ণয় করিয়া সেই কারণকে অপসারিত করিতে হইবে। বড়িতে দু'দিন সুফল লাভ করিলেও তিন দিনের দিন বড়ি গা সহিয়া সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়!

বিশেষজ্ঞেরা বলেন, আমাদের দেহ-যন্ত্রটি এমন ভাবে নির্ম্মিত যে, তার বিবিধ কল-কব্জাগুলি স্বভাবতঃ আপনা হইতেই চলে; এবং সে চলার দরুণ দেহ-যন্ত্রের বিগড়াইবার কথা নয়। এখন যে পদে-পদে বিগড়াইতেছে, তার কারণ জীবন যাত্রার স্বাভাবিক ধারা ছাড়িয়া নানা দিক্ দিয়া আমরা নকল সমাবেশে তাকে আক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছি! তাহারি ফলে এত উপসর্গ।

ঋতুভেদে প্রকৃতি এই যে বিভিন্ন ফল-মূল উপহার দিতেছে, সে সব ফল-মূলের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক রাখিতে হইবে—রাখিলে সুফল মিলিবে। প্রকৃতি-দত্ত স্বাভাবিক খাদ্যকে যথাযথ ভাবে গ্রহণ না করিয়া আমাদের সৌখীন রুচি-মাফিক সে-খাদ্যকে নানা ভেজাল দিয়া এমন করিয়া তুলিতেছি যে, সেগুলা আমাদের দেহমধ্যে গিয়া পুষ্টির ও দেহযন্ত্র-পরিচালনার সহায় হইতে পারিতেছে না—ভেজালের সংসর্গে উপসর্গ ঘটাইতেছে। এ ভেজালের বিষে আমাদের পাকস্থলীর সূক্ষ্ম তন্তুগুলি ক্লেদ-বিজড়িত হইতেছে, বিকল হইতেছে; তাহাদের স্বাভাবিক ক্রিয়া-শক্তি লোপ পাইতেছে। সে জন্য আহার করি, খাদ্য হজম হয় না; উদরে প্রচুর বায়ুর সঞ্চার হইতেছে! পাকস্থলী সে-বায়ুর চাপে রীতিমত জখম হইয়া নানা রোগের সূতিকাগারে পরিণত হইতেছে। ইহার জন্য কাহারো পাকস্থলী শুকাইয়া যায়। এই বায়ু উর্দ্ধ দিকে উঠিয়া হৃদযন্ত্রকে জখম করে; অধো-দিকে নামিয়া গাসট্রোপটোশিস্ বা 'গ্যাসট্রিক আলসার' রোগ ঘটাইতেছে। এ-রোগের আজ এমন প্রাদুর্ভাব ঘটিবার কারণ, খাদ্যকে স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ না করিয়া নানা ভেজালের সমাবেশে তার গুণরাশির বিনাশ করিয়া গ্রহণ!

আলস্যে শুইয়া বসিয়া যাঁরা দিন কাটান, কাজের পরিশ্রমে যাঁরা বঞ্চিত, তাঁদের সৌভাগ্য ভাবিয়া অনেকে তাঁদের হিংসা করেন। কিন্তু এ আলস্য-বিলাস সৌভাগ্য নয়—ঘোর দুর্ভাগ্য! এ আলস্যের জন্য তাঁদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা পেশীগুলি যথাযথ ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে না। বাহির হইতে দেহের বিকার দেখা না গেলেও দেহের ভিতরটা বিকৃতিতে ও বৈকল্যে ভরিয়া ফোঁপ্‌রা হইয়া যায়। এবং সেই জন্যই ঘী-দুধ প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করিলেও সে-খাদ্য পরিপাক করিবার শক্তি লোপ পায়।

বিশেষজ্ঞেরা বলেন, শরীর যদি এমন হইয়া থাকে, যে কোনো খাদ্য হজম হয় না—ক্ষুধা কাহাকে বলে ভুলিয়া গিয়াছেন,—তাহা হইলে বিশেষ ব্যায়াম-বিধি পালন করুন। এ ব্যায়াম-পালনে দেহের সমস্ত ক্লেদ বিদূরিত হইবে, দেহ-যন্ত্রের বিকৃতি সারিয়া দেহের পেশী,

সমস্ত শিরা-উপশিরা প্রভৃতি তাদের স্বাভাবিক শক্তি ফিরিয়া পাইবে ; ক্ষুধা হইবে, খাদ্য-পরিপাকেও এতটুকু গোলযোগ ঘটিবে না। এবং ঐ সঙ্গে পুষ্টি লাভ করিয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গড়ন সুছাঁদে ভরিয়া উঠিবে, দেহের কান্তিও আপনা হইতে সুশ্রী ও প্রদীপ্ত হইবে। বিশেষজ্ঞেরা বলেন,—অজীর্ণতা বা অগ্নিমান্দ্যে কদাচ পেটেন্ট ঔষধ খাইবেন না। বড়ি খাইয়া খাদ্য-হজমের চেষ্টা করিবেন না। এ-সব বড়ি পেটে গিয়া ফুলিয়া পাকস্থলীর গায়ে জোরে চাপ দেয়। সে চাপে প্রথম-প্রথম কোষ্ঠবদ্ধতা সারিতে পারে ; কিন্তু নিত্য এই বড়ির চাপ পড়িলে পাকস্থলী নানা রোগে জীর্ণ হইবে। এবং যাহাকে বলে, **intestinal tuberculosis** (নাড়ীর ক্ষয়রোগ) তাহা ঘটা বিচিত্র হইবে না! পেটে বায়ু জন্মিয়া অনেকে হার্টফেল হইয়া মারা গিয়াছেন —এ কথা মনে রাখিবেন।

এই সব উপসর্গ দেখা দিলে চিকিৎসা করাইবেন। সেই সঙ্গে বিশেষজ্ঞেরা বলেন —নিম্নলিখিত ব্যায়াম-বিধি পালন করিতে হইবে। বাড়াবাড়ি অসুখের উপর অবশ্য ব্যায়াম নয়—চিকিৎসায় উপসর্গ সারিলে ব্যায়াম করিবেন। এ ব্যায়ামের অভ্যাস থাকিলে দেহের স্বাস্থ্য ফিরিবেই। তাছাড়া ভবিষ্যতে অস্বাস্থ্যের আশঙ্কা থাকিবে না—নষ্ট রূপ-যৌবন ফিরিয়া পাইবেন, এবং যৌবনের দীপ্তি কান্তিতে কোনো দিন বঞ্চিত হইবেন না। এ-সব উপসর্গ যদি না থাকে—এ ব্যায়ামে ও-সব উপসর্গ দেহকে স্পর্শ করিতে পারিবে না—যৌবনশ্রী অটুট এবং কান্তি কমনীয় কোমল থাকিবে।

১। বুক চিতাইয়া সিধা খাড়া

এবার সেই বিশেষ ব্যায়ামের কথা বলি।

১। সিধা খাড়া হইয়া দাঁড়ান—বুক চিতাইয়া দুই হাত প্রসারিত করিয়া ঊর্দ্ধে তুলুন। ১ নং ছবির মত হাতের আঙুলগুলিকে ফাঁক-ফাঁক রাখিবেন। তার পর বেশ জোরে-জোরে হ্যাঁচকা টান দিয়া দুই হাত নামান—নামাইয়া পরক্ষণেই তেমনি জোরে আবার দুই হাত ঊর্দ্ধে তুলুন, অমনি ভঙ্গীতে। পনেরো-ষোল বার এমনি হাত তোলা-নামা করিতে হইবে।

২। ২ নম্বর ছবির ভঙ্গীতে চিৎ হইয়া শুইয়া দু'হাত ঐ ছবির মত প্রসারিত করিয়া দিন। এবার কোমর হইতে পা পর্য্যন্ত দেহের

২। বাইসিকেল চালাইবার মত

নিম্নাংশ তুলিয়া দুই পা বাইসিকেল-চালাইবার ভঙ্গীতে ক্ষিপ্রভাবে সামনে-পিছনে নাড়িতে হইবে। এ ব্যায়াম করা চাই অন্ততঃ পাঁচ-সাত মিনিট। এ ব্যায়ামে পাকস্থলীর বিকৃতি সারিবে এবং পাকস্থলীর বিকৃতি জীবনে কখনো ঘটিবে না ; কাজেই হজম-না-হওয়ার ভয়ও থাকিবে না।

৩। মাথার পিছনে মুষ্টিবদ্ধ দুই হাত

৩। ৩ নম্বর ছবির ভঙ্গীতে সিধা খাড়া হইয়া দাঁড়ান। দুই হাত মাথার পিছনে মুষ্টিবদ্ধ করুন। এই ভাবে থাকিয়া বেশ জোরে-জোরে বিশ-পঁচিশ বার শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করুন। এমন ভাবে নিশ্বাস লইবেন, পেট যেন ভিতর-দিকে ঢুকিয়া যায়। এ ব্যায়াম দিনে দু'-তিন বার করিতে পারিলে ভালো হয়। খাওয়ার দু'ঘণ্টা পরে কিম্বা খাওয়ার আগে এ ব্যায়াম করিবেন। এ ব্যায়াম করা চাই পাঁচ মিনিট করিয়া। এ ব্যায়ামে পেটে কখনো বায়ু জমিতে পারিবে না।

৪। ৪ নম্বর ছবির ভঙ্গীতে দাঁড়ান। এবার দু' হাত ৪ নং ছবির ভঙ্গীতে পিছন-দিকে কোমরের উপর মুষ্টিবদ্ধ করিয়া রাখুন—রাখিয়া জোরে-জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিবেন পাঁচ মিনিট কাল: এ ব্যায়ামে পেশীর গড়ন মজবুত এবং অবিকৃত থাকিবে, অজীর্ণতার সকল আশঙ্কা বিদূরিত হইবে।

এ কয়টি ব্যায়ামের নিত্য-নিয়মিত-পালনে ডিস্পেপসিয়ার স্পর্শ লাগিবে না কোনো কালে। স্বাস্থ্য ভালো, শ্রী অটুট এবং রূপ থাকিবে উজ্জ্বল মসৃণ!

৪। দু'হাত পিছনে কোমরের উপর

—

ঘর-কর্ণার কথা

আমাদের মধ্যে অনেক মায়ের বিশ্বাস, ছেলে-মেয়েকে ঠাণ্ডা জলে স্নান করালে কিম্বা গায়ে জামা না দিইয়ে আদুড়-গায়ে রাখলে হাওয়া লেগে ছেলে-মেয়ের অসুখ হবে! এ বিশ্বাস শুধু যে ভুল, তা নয়! এতে ছেলে-মেয়ের স্বাস্থ্য জন্মের মত নষ্ট হয়।

পৃথিবীতে আতুরের বাক্সে বন্ধ হয়ে কারো থাকবার উপায় নেই! ছোট বয়সে ঘরের দোর-জানলা বন্ধ করে, জামাজোড়ায় ঢেকে ছেলে-মেয়েদের রাখা চলে! আকাশে একটু মেঘ দেখলে ছেলে-মেয়েকে বন্ধ-ঘরের মধ্যে পোরা সম্ভব হয়! কিন্তু এর পরে ছেলে-মেয়ে যখন ডাগর হবে, ইস্কুলে-কলেজে যাবে, তখন?

বড় বড় ডাক্তাররা বলেন—এবং এ সম্বন্ধে সকলের এক-মত যে ঠাণ্ডা জল-বাতাস সইতেই হবে; আদুড় গায়ে বাতাস লাগাতে দিতেই হবে, তাতে করে ঠাণ্ডা জল-বাতাস সহ্য করার মত দেহের শক্তি-সামর্থ্য হবে—এর পরে ঠাণ্ডা জল-বাতাস লাগামাত্র সর্দ্দি-কাশি হবার ভয় থাকবে না।

অসুখ হয় নোংরা থেকে। স্নান করলে বা গা-হাত-মুখ ধুয়ে সাফ রাখলে দেহে ক্লেদ জমতে পারে না, দেহ পরিষ্কার থাকে। এবং যে মানুষ পরিষ্কার থাকতে পারে, তার অসুখ-বিসুখ বড় একটা হয় না! ঠাণ্ডা খোলা বাতাস এবং পরিষ্কার ঠাণ্ডা জলে স্নান—এ দু'টি হলো স্বাস্থ্য ভালো রাখার পক্ষে প্রধান সহায়। স্নান করে গামছা কিম্বা তোয়ালে দিয়ে গা-মোছার যে-বিধি আছে, সে-বিধি-পালনে দেহ পরিষ্কার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘর্ষণে দেহের সর্ব্বত্র রক্ত-চলাচল-ক্রিয়া স্বচ্ছন্দ হয়। শীতকালে গায়ে যারা যত বেশী জামা-কাপড়ের ভার চাপায়, তাদেরই হয় অসুখ। যারা শীত-কাতুরে নয়, তাদের স্বাস্থ্য-হানি বড় একটা দেখা যায় না! অতএব শীত-গরম-জল, এ-সব ছেলেবেলা থেকেই ধীরে ধীরে সওয়াতে শেখাবেন। তাতে ছেলে-মেয়ে ভালো থাকবে।

রান্নাঘরে, ভাঁড়ারঘরে আনাজ-তরকারী, ঘী, তেল অনেকে আলগা রাখেন, ঢাকা দিয়ে রাখেন না; তার ফলে সে-সবে মাছি বসে, আর্শুলা এসে পড়ে। মাছি-মশার, আরস্লার ছোঁয়ায় ও-সবে রোগের বীজ মেশে; এ জন্য খাবার-দাবার কদাচ আলগা রাখবেন না।

ভাত খেতে বসে এখনো গাল-গল্পে অনেক বাড়ীতে মেয়েদের খাওয়া শেষ করতে সময় লাগে এক ঘণ্টা, দু'ঘণ্টা। হয়তো তরকারীতে মাছি বসছে, হাত নেড়ে মাছি তাড়িয়েই অনেকে দায়ে খালাস হন! এতে মহা-অনিষ্ট হতে পারে। মাছি কোন্ নোংরা জায়গা থেকে নোংরা নিয়ে ভাতের পাতে বসলো, তরকারীতে বা জলের গ্লাসে বসলো, তার ফলে রোগের কত বীজাণু-কীট রেখে গেল, তার সংখ্যা নেই! এ জন্য মাছি আর্শুলা খাবারে বসলে সে খাবার-দাবার মুখে তুলবেন না—ফেলে দেবেন। এ অভ্যাসকে মজ্জাগত করে তোলা চাই। তাহলে বহু যাতনা, বহু মারাত্মক রোগ থেকে পরিত্রাণ পাবেন।

খাওয়া-দাওয়ার কথা যখন তুললুম, তখন এই সঙ্গে আরো ক'টি কথা বলতে চাই। অনেক বাড়ীতে দেখি, দাসী-চাকরে ভাতের থালা ছুঁয়ে দিলে কিম্বা বামুন-ঠাকুর ভাতের থালা বা তরকারী নিয়ে আসছে দাসী-চাকরের ছোঁয়া লেগে গেল, অমনি সে ভাত সে তরকারী ফেলা যায়! কেন না, শূদ্রের ছোঁয়া লেগেছে! অথচ খাবার-দাবারে রাজ্যের মাছি বসছে, পোকা বসছে—তার বেলা কোনো দোষ হয় না! এর ফলে রোগের আক্রমণ ঘটে! ছোঁয়ায় খাবার নষ্ট হয় কখন?—যখন কোনো দূষিত পদার্থের ছোঁয়া লাগে। বামুন-ঠাকুরকে যতই শুচি-শুদ্ধ মনে করি না কেন, তার গায়ের ময়লা জামা, পরণের ময়লা চামচিকুটি কাপড়ে তার সে শুদ্ধির সমর্থন চলে না।

শুদ্ধির আসল মানে পরিচ্ছন্নতা। ধূলায় ধোঁয়ায় ময়লায় নানা রোগের বীজাণু; তাই ধুয়ে মুছে শুদ্ধিকরণের ব্যবস্থা! নোংরা হাতে অন্ন-পরিবেষণ যেমন দোষের—নোংরা হাতে খাওয়াও তেমনি দোষের। অনেক বাড়ীতে খাবার-দাবারের সম্বন্ধে পরিচ্ছন্নতা দেখি না—অথচ সাজ-পোশাকে কি সমারোহ! বহু ধনী ও সৌখীন পরিবারে কথায়-কথায় যে টাইফয়েড-ডিপথিরিয়া রোগের আক্রমণ দেখি, খাবার-দাবার সম্বন্ধে পরিচ্ছন্নতা নেই, তারি জন্য।

অন্ন-ব্যঞ্জন তৈরী করতে পরিচ্ছন্নতা চাই। বাজারের আলগা খাবার, পথের ধারের কাটা ফল—এ-সব রোগ-বীজাণুতে ভরা—অথচ শিক্ষিত নর-নারী অম্লান বদনে তা খাচ্ছেন! খেয়ে যাঁরা বাঁচেন, রোগ ভোগ করেন না, তাঁদের নেহাৎ বরাত জোর!

বাজার থেকে তরী-তরকারী ফলমূল কিনে এনে তা বেশ করে ধুয়ে তবে ব্যবহার করা উচিত—না হলে সে-জমিতে এ-সব শাকসব্জী ফল-মূলের জন্ম, সে-মাটার বীজাণু-কীট থেকে আমাদের দেহে বহু রোগ সংক্রামিত হতে পারে।

বামুন-ঠাকুরকে রান্নার ভার দিয়ে পিয়ানো-রেডিয়ো বা নাটকের রিহার্শাল নিয়ে মত্ত থাকলে গৃহ হাসপাতাল হবে। বামুন-ঠাকুর যাতে খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে রান্না-বান্না ও পরিবেষণের কাজ করে, সে দিকে কড়া নজর রাখবেন।

মরক্কো

আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম কোণে বিরাট্ দেহ লইয়া মরক্কো পড়িয়া আছে—জিব্রালটারের কোলে মরক্কোর মাথা এবং পা সেই সাহারার বুকে !

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে মিশরে ফরাশী-জাতি ইংরেজের অধিকার স্বীকার করিয়া লইলে ইংরেজও মরক্কোয় ফরাশী-প্রতিষ্ঠা স্বীকার করে। ইহাতে জার্ম্মাণীর হয় ক্রোধ; এবং ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কাইজার সসৈন্যে ট্যাঞ্জিয়ারে আসিয়া মরক্কোর উপর জার্ম্মাণ-দাবী জানাইয়া বিরোধের প্রয়াস পান। কিন্তু জার্ম্মাণীর সে-চেষ্টা ব্যর্থ হয়। পরে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স ফেজ মাথার উপর ট্যাঞ্জিয়ার-অঞ্চল (২২৫ বর্গ-মাইল)। এ অঞ্চলের উপর আন্তর্জ্জাতিক অধিকার। তার পর মাথার বাকী অংশটুকু এবং বাঁ-কাঁধের একটুখানি-মাত্র অংশ (১৩১২৫ বর্গ-মাইল) স্পেনের; এবং বাকী অংশ (প্রায় ২০০০০০ বর্গ-মাইল) ফ্রান্সের অধিকারে।

মরক্কোর অধিবাসীরা মূর নামে পরিচিত। মূরের শিরায় আছে আরব এবং বার্বারের রক্ত। মূরেরা যেন জলের পোকা! য়ুরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকায় তাদের তুল্য জল-বিহারী জাতি কোনো কালে আর ছিল না!

মরক্কোয় এক জন সুলতান আছেন। তাঁর আইন-কানুনই মরক্কোয়
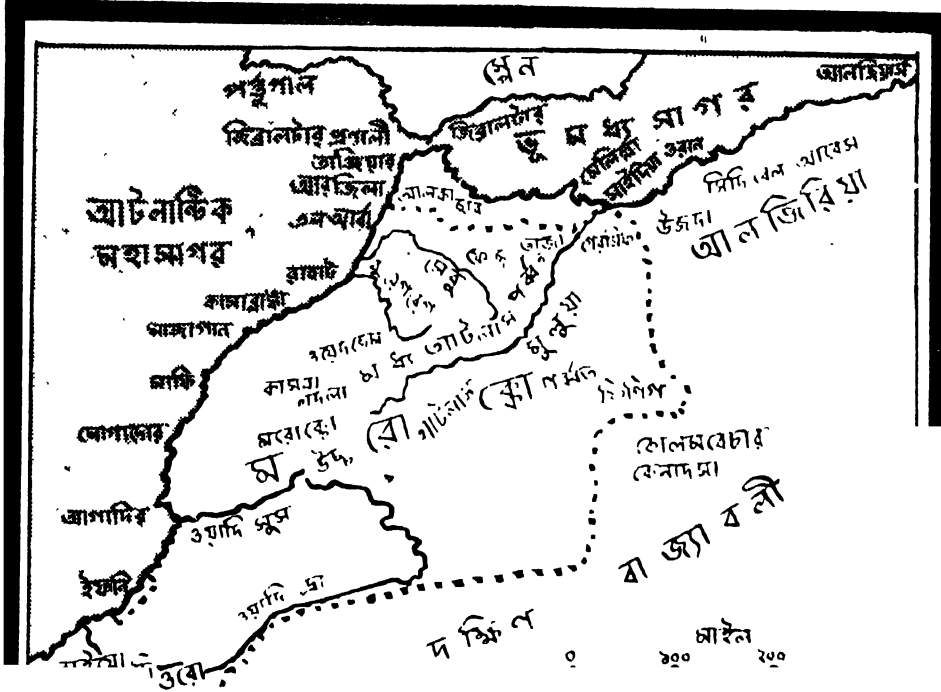
অধিকার করে। তার পর নানা বিরোধের পর মরক্কোয় ফরাশী-শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে স্পেনের সঙ্গে ফ্রান্স মরক্কো ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া লইয়াছে। স্পানিশ-মরক্কোর শাসন-ভার সুলতান-নির্ব্বাচিত খলিফার উপর ন্যস্ত আছে। স্পেন যে-ব্যক্তিকে খলিফার পদে নির্ব্বাচিত করে, সুলতানের মঞ্জুরনামা পাইলে তবেই তাঁর নিয়োগ হয় কায়েমি, নচেৎ নয়।

মরক্কোর যে অংশ ট্যাঞ্জিয়ার-জোন্ (zone) নামে অভিহিত, সে-অংশ আন্তর্জ্জাতিক নীতি-অনুযায়ী শাসিত হয়। এ কয়টি শাসক-জাতির মধ্যে আছে বৃটিশ, ফরাশী, স্পানিশ, এবং ইতালীয়ান্।

কাজেই মরক্কোর ভাগীদার সংখ্যায় তিন জন। ম্যাপে দেখুন, মরক্কোর চলিতেছে, তবু তিনি শুধু নামেই সুলতান। অর্থাৎ আসলে ফ্রান্স এবং স্পেনের নির্দ্দেশেই তাঁর আইন-কানুন বাহাল আছে।

মরক্কোয় দীর্ঘ-তুঙ্গ দু'টি পর্ব্বতশ্রেণী আছে—রিফ এবং এ্যাটলাশ। এ দুই পর্ব্বতে পাহাড়ী দস্যুর বাস। সুলতান বা রোমের সীজারও কখনো শাসনে তাদের আঁটিতে পারে নাই! এখন ফরাশী এবং স্পানিশ ফৌজের পাহারাদারীতে এবং শিক্ষায় দৌরাত্ম্য ছাড়িয়া তারা সুলতানের প্রচলিত আইন-কানুন মানিয়া চলে।

রিফ-গিরিশ্রেণী মাথা তুলিয়াছে একেবারে সেই ভূমধ্য-সাগরের তীর হইতে। জিব্রালটারের দিকে সে যেন চাহিয়া আছে—জিব্রালটারের প্রহরীর মত। রিফ-গিরিশ্রেণীর দক্ষিণে তাজ সহর—সুলতানের আমলে এ সহরের সৃষ্টি হয়। এখানকার পথ-ঘাট,

ঘর-বাড়ী দেখিলে সুলতানদের প্রাচীন বিভব এবং শত্রু-হস্তে সে বিভবের দুর্দ্দশা বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

দক্ষিণে এ্যাটলাশ গিরিশ্রেণী। রিফের মত এ গিরিশ্রেণীও পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। এ্যাটলাশ গিরির সর্ব্বোচ্চ যে শিখর, সেটির উচ্চতা প্রায় দশ হাজার ফুট।

মরক্কোর পশ্চিম-দিক্‌কার অর্দ্ধাংশে বিস্তীর্ণ জলা এবং উপত্যকা-ভূমি আছে। এ ভূমির উর্ব্বরতা অপরিসীম। এবং এ ভূমি পশ্চিমে সুদূর আটলান্টিক মহাসাগরের তীর পর্য্যন্ত প্রসারিত। আটলান্টিকের তীরে ফরাসীরা চমৎকার একটি বন্দর নির্ম্মাণ করিয়াছে—বন্দরের নাম কাশাব্লাঙ্কা। এই কাশাব্লাঙ্কাতেই চার্চ্চিলের সঙ্গে রুজভেল্টের রাজনীতি ও সমরনীতি সম্বন্ধে প্রচণ্ড আলোচনা চলিয়াছিল।

'কাশাব্লাঙ্কার ঈষৎ উত্তরে রাবাট—মরক্কোর মস্তিষ্ক; অর্থাৎ প্রাচীন সুলতানের রাজধানী। এই রাবাটেই মরক্কোর প্রকৃত দণ্ড-মুণ্ডধর ফরাসী রেসিডেন্ট-জেনারেলের আস্তানা। রাবাটকে যদি মরক্কোর মস্তিষ্ক বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে ফেজকে বলিতে হয় মরক্কোর হৃদয়। কারণ, মরক্কোর প্রাণের পরিচয় মেলে ফেজে। আটলান্টিক এবং ভূমধ্য-সাগর হইতে ফেজের দূরত্ব প্রায় সমান। অর্থাৎ দু' দিক্ হইতেই একশো মাইল দূরে ফেজ অবস্থিত। রাজনীতি এবং ধর্ম্ম-নীতির দিক্ দিয়া ফেজই হইল মরক্কোর প্রধান সহর।

ফেজের প্রাচীন মাদ্রাশা—মুর-শিল্পকলাঙ্কিত দেওয়াল

৮০০ খৃষ্টাব্দে মরক্কো-বিজয়ী আরব-জাতি এই ফেজ সহরের প্রথম পত্তন করে। তার পর দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত মুশলিম্-শক্তির প্রভাবে সাহিত্য, শিল্প, বাণিজ্য, রাজনীতি এবং ধর্ম্ম—সকল দিক্ দিয়া ফেজের গৌরব-মহিমার সীমা ছিল না। দ্বাদশ শতাব্দীতে একমাত্র এই ফেজ সহরেই মসজেদের সংখ্যা ছিল ৭৮৫; সরাইখানা ছিল ৪৮০; এবং সাধারণ বসত-বাড়ী ছিল প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার।

আজ ফেজের সে গৌরব নাই! সুলতান গিয়া বাসা বাঁধিয়াছেন রাবাটে এবং পুরানো ফেজের গায়ে নূতন ফেজ গড়িয়া উঠিয়াছে। নূতন ফেজের নাম লা ভিলা নুভে। নূতন ফেজে অসংখ্য হোটেল, দোকান, সিনেমা এবং বহু ফরাসী নব-নারীর বাস।

মরক্কোর অঙ্গ ভেদ করিয়া এখন অজস্র রেল-লাইন নির্ম্মিত হইয়াছে। সে লাইন ধরিয়া ট্রেণে চড়িয়া পশ্চিমে আটলান্টিকের তীর হইতে সুরু করিয়া মরক্কো এবং আলজিরিয়ার মধ্য দিয়া সুদূর টিউনিশিয়া পর্য্যন্ত যাতায়াত চলে।

সুলতানী-আমলে পথ-ঘাট নিরাপদ ছিল না—চোর-ডাকাতের দৌরাত্ম্য ছিল সীমাহীন। এখন দস্যুভয় ঘুচিয়াছে—মানুষের ধন-প্রাণ নিরুপদ্রব হইয়াছে। এ পথে ট্রেণে বা মোটরে চড়িয়া যেখানে খুশী মানুষ যাইতে পারে, চোর-ডাকাত বা কোনো রকম দৌরাত্ম্যের ভয় আর নাই!

বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বার্বার দস্যু-প্রজার দল মরক্কো অবরোধ করিয়া সুলতান মৌলে হাফিদকে বিপন্ন করিয়া তুলিলে সুলতান হাফিদ ফরাসীর কাছে সাহায্য চাহিয়াছিলেন। সুলতানের প্রার্থনায় ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ২রা মার্চ্চ তারিখে ফরাসী-সৈন্য আসিয়া বার্বার-দস্যুদের পরাভূত করিয়া হঠাইয়া দেয়। তার পরের বৎসর বার্বার-দস্যুরা আসিয়া ফরাসীদের আস্তানায় হানা দিয়া বহু অফিসারকে

হত্যা করিলে ফরাশীরা দস্যু দমন করিয়া মরক্কোয় নিজদের সুপ্রতিষ্ঠ করিয়া তোলে। বিগত মহাযুদ্ধের সময়েও মরক্কোর সম্বন্ধে ফরাশী এতটুকু ঔদাস্য বা শৈথিল্য প্রকাশ করে নাই।

ফেজ এখানকার মস্ত সহর। বার্বার দস্যুদের পরাভূত ও বিতাড়িত করিয়া মৌলে ইদ্‌রিশ্‌ সর্ব্বপ্রথম ফেজ-সহরের পত্তন করেন; এবং এই ফেজ-সহরকে লইয়াই ক্রমে বিরাট্‌ মরক্কো-সাম্রাজ্য গড়িয়া ওঠে।

ফেজের সমৃদ্ধি এখনো অতুলনীয়। এখানকার লোক-সংখ্যা এখন পনেরো লক্ষের উপর। এই পনেরো লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা প্রায় চল্লিশ হাজার। এখানকার মুসলমান ও ইহুদীরা যেদিদ মহল্লায় বাস' করেন। য়ুরোপীয়ানদের মধ্যে বেশীর ভাগ বাস করেন ভিল্লা নুভে নামক নব নির্ম্মিত সহরে। য়ুরোপীয়ের সংখ্যা প্রায় এগারো হাজার। ফরাশীর সংখ্যাই বেশী। সেই সঙ্গে আছে দু'-তিন হাজার স্পানিয়ার্ড এবং ইতালীয়ান।

তুষার-ঝটিকার পরক্ষণে—ত্‌লেম্‌সেন্‌

ফেজের পুরানো পথ-ঘাটে নূতনত্ব আছে। পথ প্রায় গলি-ঘুঁজি। পথের দু'ধারে শুধু দোকান আর দোকান। দোকানকে মুর-ভাষায় বলে, সৌক্‌। মরক্কো, আলজিরিয়া এবং টিউ-নিশিয়া—তিনটি প্রদেশেই দোকান সম্বন্ধে এই এক বিধি দেখা যায়। এক এক মহল্লায় এক এক রকম পণ্যের দোকান। সৌক্‌ এল আতরিণ অর্থাৎ আতর-ওয়ালার গলি। এ গলির দু'ধারে শুধু আতরের দোকান। সৌক্‌ এল খিয়াতিন অর্থাৎ দর্জীর দোকান। এ সব দোকানে দিনের বেলায় সমা-রোহে কারবার চলে; রাত্রে দোকানী-পশারীর দল দোকান বন্ধ করিয়া স্বতন্ত্র মহল্লায় তাদের বাড়ীতে চলিয়া যায়। মণিহারীর দোকানে নানা রকমের পণ্য বিক্রয় হয়। নহিলে অন্য সব দোকানে বিশেষ বিশেষ পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা। যে ফেজ-টুপির নাম আমরা শুনি, সে টুপির জন্ম এই মরক্কোয়।

পশমের হাট—ফেজ
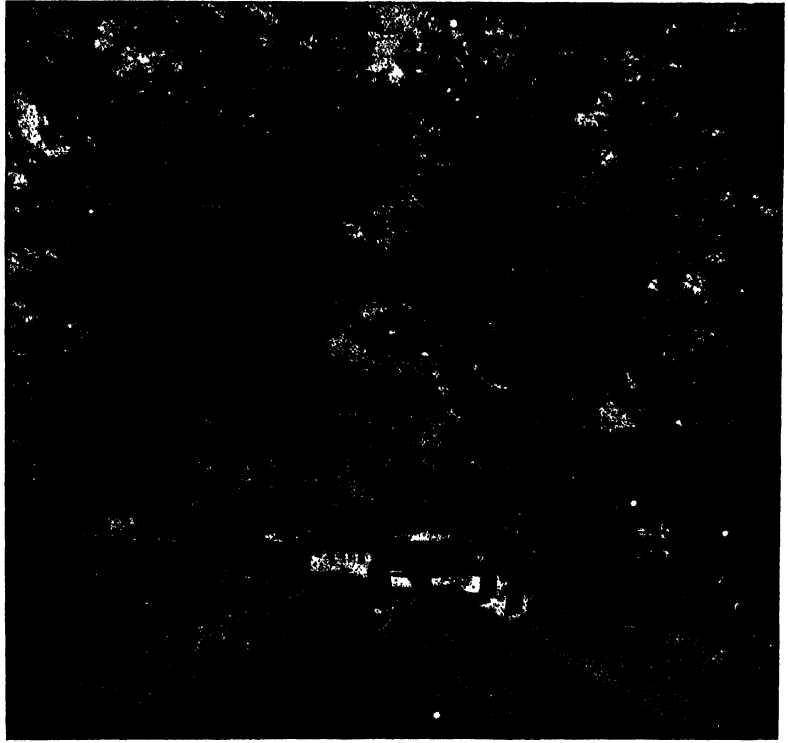
পথ সরু—কিন্তু এখানে রৌদ্রের তাপ খুব অসহ্য, বলিয়া পথের উপরে লতা-পাতা কাঠি দিয়া ছাদ তৈয়ারী করা হয়। ছাদের জন্য রৌদ্র-তাপ অনেকখানি নিবারিত হয়।

পথে রকমারি লোকের ভিড়ে বৈচিত্র্যের সীমা নাই। ছিন্ন মলিন বেশে ভিখারী-মজুর; দীর্ঘ শ্মশ্রুধারী মুসলমান পুরুষ; লম্বা কালো

গারশিখ্ হইতে দূরে ফেজ-সহরের দৃশ্য

ট্যাঞ্জিয়ার-সহরের খোলা ফটক

কুর্ত্তাধারী ছাত্রের দল ; মোটা সাদা বোর্খায় আপাদ-মস্তক ঢাকা রমণী-বৃন্দ ; মাথা-কামানো বালক, ফ্রকপরা বালিকা—ভিড়ে পথ একেবারে পরিপূর্ণ ! এত ভিড়েও কিন্তু হট্টগোল নাই ! নিঃশব্দে যে যার কাজে চলিয়াছে। এ ভিড়ের মধ্যে পদে পদে আসিয়া দেখা দিতেছে গাধার-পিঠে-চড়া সম্ভ্রান্ত ধনী পথিক। গাধার আদর এবং খাতির এখানে প্রায় ঘোড়ার মত। মোট-বাহী গাধার পিঠে সওয়ার হইলে ধনীর ধন-মর্য্যাদা বা সম্ভ্রম এখানে নষ্ট হয় না !

পথে-ঘাটে এই বিচিত্র জনতা দেখিয়া এক জন ফরাসী কবি লিখিয়া গিয়াছেন, মরক্কোর পথে বিচরণ-কালে মনে হয়, যেন আরব্য উপন্যাসের কাহিনী-বর্ণিত পথে বেড়াইতেছি ! মনে তেমনি বিভ্রম জাগে ! এ বিভ্রম ভাঙ্গিয়া যায় দোকানের দিকে চাহিয়া যখন দোকানে দেখি, সুইড দেশলাইয়ের পাহাড়-প্রমাণ প্যাকেট আর টিনে-ভরা ফল ও বিস্কুটের বিপুল সম্ভার !

১৯২০ খৃষ্টাব্দে ফেজ সহরের বাহিরে পাওয়ার-ষ্টেশন তৈয়ারী হইয়াছে। একটি ঝর্ণার জলকে সহায় করিয়া এই ষ্টেশনের সৃষ্টি। এই ঝর্ণার জলের জোরে সহরে এবং সহরের বাহিরে প্রায় বিশ মাইল পরিমিত জনপদে বিজলী আলো-পাখা এবং কল-কারখানা বেশ সুশৃঙ্খল ভাবে পরিচালিত হইতেছে।

শিল্পে মরক্কোর কুশলতা অসাধারণ। চামড়ার রকমারি কাজে কারুকারিতার অন্ত নাই ! মেয়েদের জন্য যে চামড়ার কোমর-বন্ধ তৈয়ারী হয়, তার উপর সোনালি নক্সা-কাজের চমৎকারিত্ব অতুলনীয়। ফেজে পশমের যে হাট বসে, এত-বড় হাট পৃথিবীর আর কোথাও নাই। তাছাড়া ছোট-বড় নানা আকারের যে সব ব্যাগ তৈয়ারী হয়, সে সব ব্যাগে রকমারী নক্সায় এত বাহার যে, পৃথিবীর আর কোন দেশের শিল্পীর হাতে তেমন জিনিব তৈয়ারী হয় না। জুতাও নানা ফ্যাসনের তৈয়ারী হয়। এখানকার সুবিখ্যাত মরক্কো-স্লিপার পৃথিবীর সকল সৌখীন সমাজে প্রচুর সমাদর লাভ করিয়াছে।

তার উপর এখানকার তামা-পিতলের নানা রকম তৈজস এবং সৌখীন আসবাব-পত্রাদিও পৃথিবীর সর্ব্বসমাজে আদর পাইয়াছে। তামার ও পিতলের তৈয়ারী কেটলি,

ছাডান-পথের দু'ধারে দোকান-পাট

সম্ভ্রান্ত-ঘরের বধূ—ফেজ

প্লেট, ডিশ-পেয়ালা, ঢাকনিদার গ্লাস, বাতিদান অজস্র ছাঁদে তৈয়ারী হয়; সে সব চালান দিয়া অর্থও প্রচুর আসিতেছে। রঙের কাজে মরক্কোর পটুতা খুব। শুধু কাপড়-চোপড় বা পোষাক

রঙানো নয়, তৈজস-পত্রাদিও নানা রঙে রঞ্জিত করা হয়। তৈজস ভাঙ্গিলেও তার সে-রঙ কখনো নষ্ট হয় না,—রঙের কাজে মৃৎ-শিল্পীদের এমনি দক্ষতা।

মৌলে ইদ্রিশের মসজেদে দারিদ্র-ভাণ্ডারে অর্থ-দান—ফেজ
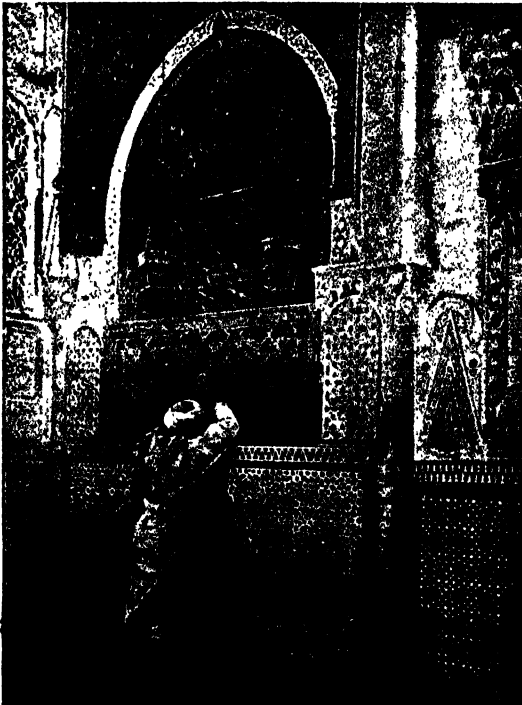
গান গেয়ে ভিক্ষা করে

ছেলের মাথায় টিকির গোছা

ফেজে বহু-ধর্ম্মী বহু নর-নারীর বাস এবং ধর্ম্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে কাহারো অনুরাগ বা নিষ্ঠা এতটুকু শিথিল নয়। অথচ শাসন-কৌশলে ধর্ম্ম লইয়া পরস্পরে বিদ্বেষের চিহ্ন এখানে দেখা যায় না। মসজেদে

সরাইখানা—ফেজ

শাল গায়ে ইহুদী মহিলা—[illegible]

বা মুস্লিম-তীর্থে পদার্পণ করিবে, খৃষ্টানের সে-অধিকার নাই। এখানে থিওলজিকাল কলেজ আছে। সে কলেজ যদি কোনো অ-মুসলমান ব্যক্তি দর্শন করিতে চান, সে জন্য তাঁহাকে অনুমতি লইতে হয়।
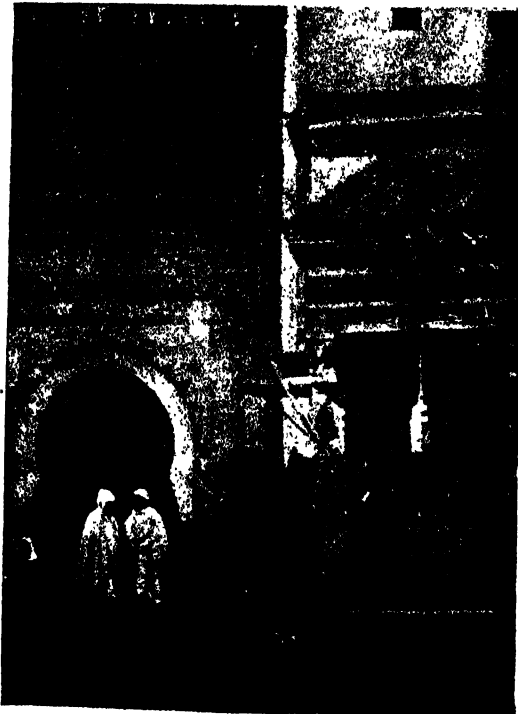
রেল-ষ্টেশনের সরবৎওয়ালা—মেকিনেজ্

জুম্মার দিনে অর্থাৎ শুক্রবার মসজেদগুলি উপাসকের ভিড়ে ভরিয়া ওঠে। মেয়ে-পুরুষের ভিড়। তবে মেয়েদের সম্বন্ধে কতকগুলি কঠিন বিধি-নিয়ম আছে। মসজেদের বিশিষ্ট স্থানটুকুতে ছাড়া অন্যত্র মেয়েদের প্রবেশাধিকার নাই।

মরক্কোয় সব চেয়ে বড় মসজেদের নাম কারুইন মসজেদ। এ মসজেদটি ফেজ সহরে অবস্থিত। নবম শতাব্দীতে সুরু হইয়া এ মসজেদের নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হয় একাদশ শতাব্দীতে। তার পর নানা সুলতান মসজেদটির বিচিত্র সংস্কার সম্পাদন করিয়াছেন। এ মসজেদের একটি ফটক ১১৩৬ খৃষ্টাব্দে আগাগোড়া ব্রোঞ্জ দিয়া আচ্ছাদিত করা হয়। উপাসনা ছাড়া এ মসজেদের একাংশে আছে মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে। এখানে ব্যাকরণ, অধ্যাত্মদর্শন হইতে কোরাণের অধ্যাপনাও হইতেছে।

মরক্কোয় বহু মাদ্রাসা বা বিদ্যাপীঠ আছে। সব চেয়ে বড় মাদ্রাসা ফেজের ইলানিয়া। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। একই গৃহে কলেজ ও মসজেদ অবস্থিত। আগাগোড়া ব্রোঞ্জ ও পোর্শিলেনের কাজ করা; দরজা-জানালাগুলিতে বহু বিচিত্র নক্সা এবং মেঝে মার্ব্বেলে মণ্ডিত।

ফেজ সহরে প্রাচীন সুলতানদিগের বহু প্রাসাদ এখনো বিদ্যমান আছে। সব চেয়ে বড় প্রাসাদ দর বেদিয়া বা শ্বেত গৃহ (White House) উনবিংশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত। নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন সুলতান মৌলে এল্ হাশান্। এখন এটি ফরাসী রেসিডেণ্ট-জেনারেলের গ্রীষ্মাবাসে পরিণত হইয়াছে। প্রাসাদের সঙ্গে বড় বাগান আছে।

দর বেদিয়ার কাছে আর একটি প্রাসাদ—দর বাথা। এখন এ বাড়ীটিতে মিলিটারী ক্লাব এবং মিউজিয়াম আছে। মিউজিয়ামে প্রাচীন মূর শিল্প-কলার বহু বিচিত্র সমাবেশ। মাটীর ও কাচের রকমারি আসবাব, জুয়েলারি এবং লেশের বিচিত্র সংগ্রহ—দেখিলে বিমুগ্ধ হইতে হয়। পুরাকালের অস্ত্র-কামানাদিও আছে। এই প্রাসাদের একটি কক্ষে বিদ্রোহী ব্যু হামারাকে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল। ব্যু হামারা নিজেকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়া সুলতানের বিরুদ্ধে বিপ্লবী হইয়াছিলেন। বন্দী করিয়া রাখার পর তাঁহাকে প্রাসাদের চিড়িয়াখানায় জীবন্ত সিংহের মুখে নিক্ষেপ করা হয়।

মরক্কোর বর্ত্তমান সুলতান বাস করেন দর এল মাখজেন নামক প্রাসাদে। পূর্ব্বে এ গৃহে ইহুদী মোল্লারা বাস করিতেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে তাঁহাদিগকে এ গৃহ হইতে বিতাড়িত করা হয়। শিক্ষার দিকে মূরদিগের অনুরাগ এবং অধ্যবসায় দিনে দিনে বাড়িতেছে। স্কুল-কলেজ ছাড়া বহু গৃহে ছোট-ছোট মখ্তব বা পাঠশালা আছে। সেখানে বিনামূল্যে গরীব-দুঃখীর ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখাইবার ব্যবস্থা চমৎকার।

আঙ্গুর-বাজার—ট্যাঞ্জিয়ার

স্পেনের রিফিয়ান ফৌজ—জাতে বার্বার

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এক জন মার্কিন মহিলা আলজিরিয়া হইতে মরক্কোয় গিয়াছিলেন। মরক্কোর স্পানিশ ও ফরাসী-অধিকৃত সর্ব্বস্থান দেখিয়া তিনি যে মনোজ্ঞ বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম সঙ্কলিত করিয়া আমরা মরক্কো-প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি।

তিনি লিখিয়াছেন,—ভূমধ্য-সাগরের তীরে আলজিরিয়ার ওরান্ হইতে আমি মরক্কো ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলাম। মরক্কোর যে-অংশ ফরাসীর অধিকারে, ফরাসীরা সে অংশের নাম দিয়াছে মারোক;

স্পানিশ-অধিকৃত অংশের নাম মারুইকোস্। ওরান্ হইতে ট্রেণে চড়িয়া আমি উজদায় আসিয়া নামিলাম। রেলে আট ঘণ্টার পথ। রেল-লাইনের দু'দিক ধানের ক্ষেত, ফলের বাগান আর দ্রাক্ষাক্ষেত্রের প্রাচুর্য্যে ঘন শ্যামল। আর কত জাতের কত রঙের বন-ফুল দেখিয়াছি! মনে হইতেছিল, মরক্কোয় প্রকৃতি দেবী যেন সুদৃশ্য গালিচা পাতিয়া সে-গালিচায় হাসি-মুখে বসিয়া আছেন! ক্ষেতে পাগড়ী-মাথায় কৃষকের দল। ক্ষেতে উট দিয়া লাঙ্গল টানা হইতেছে।
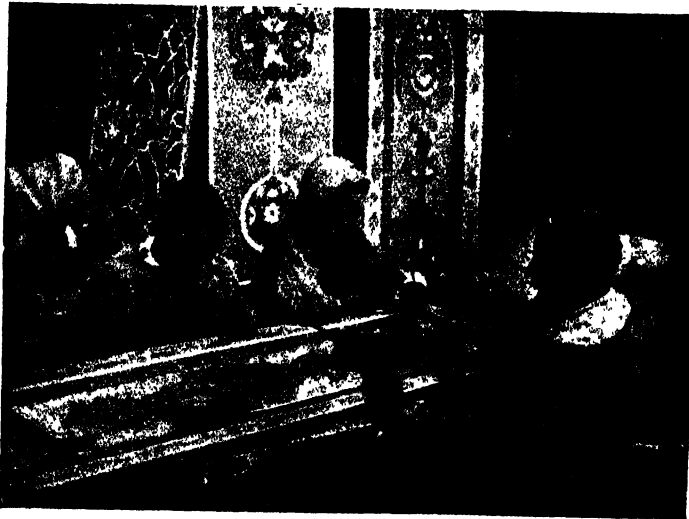
·ঃ-বাজাৎ—পথের মাথায় ছাউনি—ফেজ

চিত্রাঙ্কন-শিক্ষা—রাবাট

ওরান্ হইতে উজদার মধ্যে দু'টি বড় ষ্টেশন আছে—সিদি বেল আব্বেশ এবং ত্‌লেমসেন। সিদি বেল আব্বেশে বিদেশীয় সেনা-বাহিনীর ডিপো আছে। এখানে নানা-জাতীয় লোকের বাস। ত্‌লেমসেন প্রাচীন মুশলিম্ সহর—পাহাড়ের কোলে অবস্থিত। জলপাই ও নানা জাতীয় গাছে ঘেরা যেন কুঞ্জ-গৃহ! আশে পাশে প্রাচীন সমৃদ্ধির ভগ্নাবশেষে সহস্র স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে! পশ্চিম দিক্ হইতে বার্ব্বার দস্যুর দল এই ত্‌লেমসেন হইয়া স্পেনে গিয়া স্পেন আক্রমণ করিয়াছিল।

উজদা হইতে আমরা মোটরে চড়িয়া মরক্কোর দিকে পাড়ি সুরু করিলাম।

শেষ রাত্রে উজদা ছাড়িলাম। ভোরের দিকে পথে দেখা উষ্ট্রারোহী যাত্রীদের সঙ্গে! তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল বার্ব্বার জাতীয়। দাড়িহীন মুখ দেখি নাই। শুনিলাম, দাড়ির উপর এখানকার মুসলমানের একান্ত নিষ্ঠা! প্রাণ দিবে তবু দাড়ি ছাঁটিবে না! দাড়ি বিসর্জ্জন দেওয়ার মত অপমান আর-কিছুতে নাই! যাত্রীর দলে বার্ব্বার রমণীও ছিল। তাদের সুদীর্ঘ অবয়ব এবং মুখে বিচিত্র নক্সা আঁকা—ছেলেদের মাথায় টুপি নাই—মাথা কামানো এবং ব্রহ্মতালুতে সুদীর্ঘ টিকির গোছা! শুনিলাম, এত বড় টিকি রাখিবার কারণ, মৃত্যুর পর দেবদূত ঐ টিকির গোছা ধরিয়া স্বর্গে লইয়া যাইবে! টিকি থাকিলে দেবদূতের ধরিবার সুবিধা হইবে, তাই!

উজদার পর তাওরিত গ্রামে আসিলাম। এখানে এক ফরাশী হোটেলে কফি পান করিলাম। গ্রামখানি এ্যাটলাশ-গিরিশ্রেণীর কোলে। পাহাড়ে দেখি, অসংখ্য মেষ! লোমে ঢাকা আর কি সব পুষ্ট-নধর দেহ!

তাওরিত ছাড়িয়া রেলোয়ে-যোগে মুলুয়া নদী পার হইলাম। নদীটি নামিয়াছে এ্যাটলাশ গিরি হইতে—নামিয়া মিশিয়াছে গিয়া ভূমধ্য-সাগরের বুকে। এই নদীটি ফরাশী এবং স্পানিশ মরক্কোর সীমানা রচিয়া রাখিয়াছে।

নদী পার হইয়া পাইলাম গারশিখ গ্রাম। এখানে সেনিগালীজ ফৌজের আস্তানা। ফরাশীরা এখানে বাহিনী গড়িয়াছে—আরব, বার্ব্বার, মূর এবং সেনিগালীজদের লইয়া। বিভিন্ন দলের মধ্যে সেনিগালীজদের বীরত্ব, সাহস এবং পটুত্বের সীমা নাই।

মরক্কো অধিকার করিলেও ফরাশীরা এখানকার মুসলমান ও ইহুদী জাতির ধর্ম্মবিশ্বাস ও সামাজিক রীতি-নীতিতে আদৌ হস্তক্ষেপ করে নাই। মরক্কোর ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় সকল সমস্যা-বিরোধের মীমাংসা-ভার পাশার উপর ন্যস্ত। পঞ্চায়েতী-রীতিতে মহল্লার সর্ব্ব-বিরোধের বিচার-মীমাংসা হয় কোরাণের বিধি মানিয়া। মরক্কোর রেসিডেণ্ট

জেনারেল বলেন—মূর-জাতি কোনো বিষয়ে ফরাসীর চেয়ে হীন নয়। আমরা চাই মূর জাতি ভালো হোক, ধন-সম্পদে সম্পন্ন হোক। ফরাসীর নকল করিয়া বেচারী নকল-ফরাসী হোক, এমন কথা আমাদের মনে উদয় হয় না! এ-কথায় বুঝা যায়, মূর-জাতিকে জয় করিলেও ফরাসীরা মূরকে হীন চক্ষে দেখে না, আত্মতুল্য বিবেচনা করে।

গারশিগ হইতে পথ চড়াই। এ পথে পাহাড়ের বুকে তাজ গ্রাম—প্রহরীর মত খাড়া আছে! এই পথে প্রাচীন রোমানরা মরক্কোয় আসিয়াছিলেন। এখানে এই পাহাড়ের বুকে অধিকার-প্রমত্ততায় কত যুদ্ধ হইয়াছে, তার সংখ্যা নাই! চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এই তাজ ছিল দুর্দ্ধর্ষ বার্ব্বার দস্যুদলের প্রধান আস্তানা এবং দুর্গ। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে এই তাজার যুদ্ধে বিজয়লাভ করিয়া ফরাসী মরক্কোয় নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

তাজের পর হইতে উত্তরে রিফ্ গিরিশ্রেণী চোখে পড়ে। শীতকালে পাহাড় বরফে ঢাকা থাকে; অন্য ঋতুতে শ্যামল শস্যে সবুজের চমৎকার বাহার!

তাজ ছাড়িয়া খানিকটা আসিবার পর দেখি, দূরে ফেজের সমৃদ্ধির আভা! সাদা রঙের অসংখ্য বাড়ী-ঘর! অসংখ্য মসজেদের আকাশ-চুম্বী চূড়া! যেন ঘুমন্ত বিরাট্ এক দৈত্য অলস দেহে পড়িয়া আছে! ফেজের প্রবেশ-মুখে ক'জন আমীর লোকের দেখা মিলিল—তাঁদের মধ্যে কেহ সাদা খচ্চরের পিঠে, কেহ বা গাধার পিঠে চড়িয়া পথ চলিয়াছেন। খচ্চর বা গাধার পিঠে চড়ায় মরক্কোয় গৌরব ও আভিজাত্য প্রকাশ পায়—আজো। মরক্কোয় মূর-ঘরের মেয়েরা পথে-ঘাটে বড় একটা বাহির হন না—পর্দাপ্রথার বেশ কড়াক্কড় আছে। মেয়েদের স্থান শুধু অন্দরে—মাতৃত্বই তাঁদের জীবনের ধর্ম্ম! মাতা ও কন্যারূপেই নারীর সম্মান। পথে-ঘাটে যে সব দাসী, ক্রীতদাসী ও গরীবের ঘরের মেয়েদের দেখিলাম, তারাও বোর্খায় মুখ এবং সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া বাহির হয়। বোর্খার চোখের কাছে সাদা ব্যাণ্ড সংলগ্ন আছে; তাহারি ফাঁকে এক জোড়া করিয়া কালো চোখ! চোখের আচ্ছাদনী এমন যে, চোখের দীর্ঘ কালো পল্লব ঢাকা পড়ে না! এ সব দাসী বা গরীবের ঘরের মেয়েরা চটি জুতা পায়ে দিয়া পথে চলে।

ইহুদী-ঘরের মেয়েদের মধ্যে পর্দ্দার প্রথা নাই। বড়-মাঝারি-ছোট সকল ইহুদী-ঘরের মেয়েরা পথে বাহির হন—গায়ে দেন পারসী শাল কিম্বা রেশমী স্কার্ফ। ফেজ এবং আরো কয়েকটি প্রধান সহরে রেশমীর লেশের বহু কারখানা আছে। তাছাড়া চামড়ার বিবিধ ছাঁদের জুতা, ঘোড়ার জিন, লাগাম, বাদ্যযন্ত্রাদি তৈয়ারীর বহু কারখানা; গ্লেজ্ টালি; এবং রঙীন তৈজসপত্রাদির বিচিত্র সমারোহ দেখিয়াছি। এখানকার এই গ্লেজ-টালির প্রচলন য়ুরোপেও খুব বাড়িতেছে। সেজে নানা রকমের মাদুর-পাটী তৈয়ারী হইত এবং বহু গ্রামে চমৎকার র‍্যাগ হইত; এখন ফরাসীর যত্নে এ-সব শিল্পের পুনরুদ্ধার সাধন ও সমাদর হইতেছে।

কাশাব্লাঙ্কা সহরটি ফরাসীর হাতে নির্ম্মিত। প্রথমে য়ুরোপীয় ষ্টাইলে এখানে ঘর-বাড়ী তৈয়ারী হইয়াছিল। কিন্তু এ-ষ্টাইলের ঘর-বাড়ী মরক্কোর জল-বাতাসের উপযোগী নয়; তাছাড়া মরক্কোয় সে ঘর-বাড়ী অত্যন্ত বেমানান লাগিল বলিয়া কাশাব্লাঙ্কায় মরক্কোর প্রাচীন ছাঁদে ঘর-বাড়ী পথ-ঘাট তৈয়ারী হইতেছে।

সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলা—ফেজ

চা-খাওয়ার সময়—ফেজ

মরক্কোর বাড়ী—সব দোতলা। বাহিরে চুণকাম-করা—সাদা রঙ। দেওয়াল চুণকাম-করা, নয়, বেলে পাথরের তৈয়ারী। ঘরের দ্বার-জানালা বেশ বড়। খিলান প্রভৃতির কাজে বিচিত্র কারিগরি।

স্পেন, পোর্ত্তুগাল এবং লাটিন-আমেরিকার ইতিহাসের সঙ্গে মরক্কোর কাহিনী যেন সোনার শিকলে বাঁধা! একদা এই মরক্কোর মূর জাতি স্পেন জয় করিয়া গ্রানাডায় রীতিমত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল; এবং মূর ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, ললিত-কলা ও রীতি-নীতি পোর্ত্তুগাল, স্পেন ও ইতালীয়ান ভাষা-সাহিত্য-শিল্প প্রভৃতির সঙ্গে বিজড়িত হইয়াছিল—সে সংযোগ আজ পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্ন রহিয়াছে।

লেখিকা লিখিতেছেন—ফেজ হইতে ট্রেণে চড়িয়া আমরা আসিলাম মেকিনেজ সহরে। প্রাচীন যুগে এ সহরের সমৃদ্ধির সীমা ছিল না। এখানকার ঘোড়ার শক্তি অসাধারণ। সওয়ার লইয়া এক-টানে এক শত মাইল পাড়ি দিতে কাতর বা শ্রান্ত হইতে জানে না। এখানকার ঘোড়া লইয়া গিয়া প্রাচীন রোমান জাতি রোমের দুর্দ্ধর্ষ অশ্বারোহী ফৌজ গড়িয়া তুলিয়াছিল। এ্যাটলাশ-গিরি-সন্নিহিত বনে এ ঘোড়ার বিপুল আস্তানা। ইহারা যেন বায়ু-ভুক্! দানাপানি না খাইয়া অবিশ্রাম সওয়ার বহিতে পারে। এই ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া মূর জাতি শীকার করে।

আকাশ হইতে দেখা সুলতানের প্রাচীন প্রাসাদ—ফেজ

মেকিনেজে ফরাশী হোটেলের উঠানে একটি পীরের আস্তানা আছে। বহু শত বৎসর হইতে এ আস্তানাটি বিদ্যমান। এখনো এখানে এক জন সাধু মোল্লা বাস করেন। তাঁর কাছে বহু নর-নারী আসিয়া প্রার্থনা-মানসিক নিবেদন করে—সাধু তাদের দুশ্চিন্তা মোচন করেন।

মেকিনেজের উত্তরে জারহুন পর্ব্বতের সানুদেশে প্রাচীন রোমান নগর ভলুবিলিশ। এখানে রোমান গৌরবের বহু ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে; এবং সে সব ধূলি-জঞ্জাল ঘাঁটিয়া রোমান প্রাচ্যতত্ত্ববিদের ঐতিহাসিক তথ্যাবিষ্কারে অধ্যবসায়ের বিরাম নাই। মেকিনেজের পূর্ব্বে ওক এবং সুগন্ধি দেবদারুর ঘন জঙ্গল। এ দিকে আটলাণ্টিক হইতে এ্যাটলাশ পর্ব্বত পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান জুড়িয়া ওকের বন। মূররা এ-অঞ্চলকে বলে ব্রেড। বসন্তকালে এ বনে নানা জাতের আইরিশ-ফুল ফোটে অজস্র—নানা জাতের পাখীর কূজনে বন সারাক্ষণ মুখরিত থাকে।

ফরাসীরা এ বন-সম্পদের দাম বুঝিয়া তার প্রসার সাধন করিতেছে; গিরি-বক্ষ উর্ব্বর করিয়া সেখানে ফশল ফলাইতেছে; নদী-খাল-বিলের পঙ্কোদ্ধার করিয়াছে।

মেকিনেজ হইতে আমরা রাবাটে আসিলাম। রাবাটে কু রেগরেগ নদী। নদীর ওপারে শেল সহর। রাবাটের আকাশ বাতাস যেমন প্রাচীন যুগের পুণ্য-স্মৃতিতে ভরিয়া আছে, নদীর অপর পারে শেলের আকাশ-বাতাসে তেমনি হত্যার রক্তবিন্দু মিশিয়া আছে। এই শেল এক দিন বার্ব্বারি বোম্বেটেদের আস্তানা ছিল। কত খৃষ্টান বন্দীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া শেলে আনিয়া এখান হইতে কু রেগরেগ নদীর জলে শৃঙ্খলিত অবস্থাতেই নিক্ষেপ করা হইয়াছে, তার সংখ্যা হয় না।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে এই রাবাটেই ফরাসীর মরক্কো-বিজয় প্রথম সূচিত হয়। রাবাট অধিকারের পর জেনারেল লিয়াউতিকে রেসিডেণ্ট জেনারেলের পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। তার পর রাবাট হইতে ফরাসী-বাহিনী গিয়া ফেজ অধিকার করে। বিশ হাজার বার্ব্বার সেনাকে পরাস্ত করিয়া ফেজ অধিকার; সঙ্গে সঙ্গে মরক্কো ফরাসীর করতলগত হয়।

কাশাব্লাঙ্কার দক্ষিণে মাজাগান এবং সাফী—এখানে পোর্ত্তুগীজ শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে পোর্ত্তুগালের উচ্ছেদ ঘটে। এখানে তাহারা দুর্গ এবং বাণিজ্য-কেন্দ্র গড়িয়া তুলিয়াছিল। এখন দুর্গের চূর্ণাবশেষমাত্র পড়িয়া আছে। মাজাগানের দক্ষিণে মারাকেশ—মরক্কোর সবচেয়ে বড় সহর। সহরটি এ্যাটলাশ পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শিখরে অবস্থিত। সাহারা মরু হইতে উষ্ট্রবাহী যাত্রীরা আসিয়া এই-খানেই প্রথম লোকালয়ের দেখা পায়; এবং ত্রা, জিজ, নীর ও শুস্ প্রভৃতি গ্রামের কৃষকের দল এখানে আসে ফশল বেচিতে।

সার্বাসের অসম-সাহসিক ক্রীড়াকৌশল দেখাইতে শুস্‌বাসীদের জোড়া পৃথিবীতে আর কোথাও নাই। য়ুরোপ ও আমেরিকার বহু সার্কাশ কোম্পানী এই সব খেলোয়াড়ের খেলা দেখাইয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করে। ভিতরকার গ্রাম হইতে উটের পিঠে মারাকেশের বাজারে ভারে-ভারে আসে বার্লি, গম, নীল, উটের লোম, চামড়া, বাদাম, মধু এবং মোম। ট্রেণে এবং গাধার পিঠেও এ সব দ্রব্য আসে।

মরক্কোয় উটের সংখ্যা লক্ষাধিক।

এখান হইতে বহু মেষ চালান যায় স্পেনে, আলজিরিয়ায় এবং ফ্রান্সে। মরক্কোর মুর্গী অজস্র ডিম দেয়। এ সব ডিম মরক্কো হইতে প্রতি মেলে য়ুরোপে-আমেরিকায় চালান যাইত, এখন চালানী বন্ধ আছে। মরক্কোয় চা নাই—বিদেশ হইতে এখানে চা আসে।

আলজিরিয়া এবং টিউনিশিয়াকে স্ববশে আনিতে গিয়া ফরাসী ব্যর্থকাম হইয়াছিল—বিরোধ-বিগ্রহের সীমা ছিল না। এ ভ্রম ফরাসী জাতি মরক্কোয় প্রভুত্ব ফলায় নাই। মূরদিগের সঙ্গে মনে-প্রাণে মিশিয়া তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত সহযোগিতা করিয়া তাদের কল্যাণ সাধন করিতেছে। মূরদিগকে ফরাসী জাতি

সৈন্য-বিভাগে পূর্ণ বিশ্বাসে গ্রহণ করিয়াছে—তবে ফৌজ মূর হইলেও প্রতি দলের অধ্যক্ষ ফরাসী। মূর সমাজকে ফরাসী জাতি শিক্ষিত করিয়াছে। হাসপাতালে ধর্ম্মের ছুঁৎ-বাধা-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে নাই!

মরক্কোয় প্রায় পঞ্চান্ন লক্ষ লোকের বাস। ইহার মধ্যে প্রায় পাঁচ লক্ষ লোক বাস করে বড় বড় সহরগুলিতে।

বার্ব্বার জাতি চাষ-বাস করে। চাষের কাজে তাদের পটুতা অসামান্য রকম। মরক্কোর মাটী খুব উর্ব্বর। এখানকার মাটীতে জলপাই, আঙ্গুর, কমলা লেবু, বড় বড় ফিগ যেমন ফলে, তেমনি ফলে আখ, ধান এবং তুলার ফশল। কলাও খুব। তাছাড়া কাশাব্লাঙ্কার দিকটা ফশফেট-সম্পদে সমৃদ্ধ।

কাশাব্লাঙ্কা হইতে মোটরে এক দিনের পথে ট্যাঞ্জিয়ার। আলজিরিয়া হইতে ফেজ পর্য্যন্ত রেলোয়ে-লাইন আছে। তাছাড়া পাহাড়ের গা ফুঁড়িয়া মোটরের পথও যেমন প্রশস্ত, তেমনি স্বচ্ছন্দ-নিরুপদ্রব।

ফরাসী মরক্কোর সীমায় আর্ব্বাওয়া গ্রাম। এখানে কাষ্টম অফিস আছে। এ গ্রামের পর স্পানিশ সীমানা।

স্পানিশ-অধিকারে প্রধান সহর আলকাজার—ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সহর। এখানে ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে মুশলিম মূরের হাতে পোর্ত্তুগীজ ডন্ সেবাস্তিয়ানের পরাজয় ঘটে।

লেখিকা লিখিতেছেন, আলকাজার হইতে সমুদ্রাভিমুখে লারাশি এবং আটিলা—দু'টি প্রাচীন পোর্ত্তুগীজ সহর। লারাশিতে লোকোশ নদীর অপর পারে ট্যাঞ্জিয়ার; তার পর স্পাটেল অন্তরীপ। স্পার্টেলের পূর্ব্ব দিকে কিউটা এবং মেলিলা। দু'সহরে দু'টি দুর্গ—ভূমধ্যসাগরের গায়ে রিফ-পর্ব্বতের পক্ষপুটাশ্রয়ে অবস্থিত। তার ওপারে জিব্রালটার।

বার্ব্বার দস্যু স্পেনকে মানিয়া লইয়াছে। দস্যুতা ছাড়িয়া স্পেনের আশ্রয়ে তারা এখন চাষ-বাস লইয়া শান্তিতে বাস করিতেছে! স্পানিশরা তাহাদিগকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক-রীতির কৃষি-কাজ শিখাইয়াছে।

উট দিয়া মাঠ চষা

মরক্কোর সম্বন্ধে অনেকের মনে ধারণা আছে, মরক্কো বুনোর দেশ, অশিক্ষিতের দেশ—সে ধারণা যে ভুল, মরক্কোর বিবরণী পড়িলে তাহা বেশ বুঝা যায়।

বাঙ্গালার খাদ্য-সমস্যা

যুদ্ধ দূরস্থই হউক আর নিকটস্থই হউক, বাঙ্গালার খাদ্য-সমস্যাই আজ তাহার সর্ব্বপ্রধান সমস্যা। আমরা ইতিহাসে ও বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে বাঙ্গালায় যে দুর্ভিক্ষের বিবরণ পাঠ করি, তখন—"লোক আর খাইতে পাইল না। প্রথমে এক সন্ধ্যা উপবাস করিল, তার পর এক সন্ধ্যা আধপেটা করিয়া খাইতে লাগিল; তার পর দুই সন্ধ্যা উপবাস আরম্ভ করিল।" তাহার পর দেশে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এ দেশে রেল-পথ বিস্তারে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ের সমর্থনে বলা হইয়াছে, রেল-পথ বিস্তারের ফলে আর দুর্ভিক্ষ হইতে পারিবে না। সে কথার আলোচনা না করিয়াও বলা যায়—যদি খাদ্য-শস্য না থাকে, তবে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে কি আনা সম্ভব হইতে পারে?

এ বার বাঙ্গালায় ধান্যের যেরূপ অভাব হইয়াছে, তাহাই প্রথমে বিবেচ্য। কারণ, প্রধানতঃ দুই কারণে খাদ্য-শস্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়:—

(১) খাদ্য-শস্যের অভাব।

(২) দেশে অর্থের স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি।

দ্বিতীয় কারণ স্বাভাবিক না হইলেও কৃত্রিম হয়। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে বিলাতে যখন গমের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তখনও দেখা গিয়াছিল, কৃত্রিম উপায়ে মুদ্রা বা মুদ্রার পরিবর্ত্তে "নোট" অধিক প্রচলিত হইলে যখন আবার স্বর্ণমুদ্রার ব্যবহার বর্দ্ধিত করা হয়, তখনই গমের মূল্য কমিয়াছিল। এ দেশে যে তাহা হইয়াছে, সে কথা মাদ্রাজের গভর্ণরের পরামর্শদাতা—ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে

চাকরীয়া ইংরেজ মিষ্টার অষ্টিন—অসতর্ক অবস্থায়—স্বীকার করিয়াছেন—ব্যবসায়ীদিগের লাভ করিবার চেষ্টা অপেক্ষা পণ্যের স্বল্পতা ও প্রচলিত অর্থের বাহুল্য পণ্যের মূল্য-বৃদ্ধিতে অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

খাদ্য-শস্যের স্বল্পতা সম্বন্ধে মতভেদ নাই। বিশেষ চাউল বৃহু দেশ হইতে পূর্ব্বে আসিত না—এখন বিদেশ হইতে আমদানী বন্ধ হইয়াছে। প্রধানতঃ তিনটি দেশ হইতে চাউল রপ্তানী হইত :—

(১) ব্রহ্ম

(২) শ্যাম (নূতন নাম থাইল্যাণ্ড)

(৩) ইন্দো-চীন

ব্রহ্মে বৎসরে প্রায় ৪৭ লক্ষ ৫০ হাজার টন চাউল উৎপন্ন হইত। উহার মধ্যে লোকের আহারার্থ ১৪ লক্ষ ৮০ হাজার টন ও বীজের জন্য এক লক্ষ ৮৫ হাজার টন বাদ দিলে প্রায় ৩০ লক্ষ ৮০ হাজার টন রপ্তানী করা যাইত। ঐ প্রায় ৩০ লক্ষ টন চাউলের অর্দ্ধাংশ ভারতে আসিত। বাঙ্গালায় বিদেশ হইতে আমদানী চাউলের পরিমাণ ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দে ৬ লক্ষ ৩৭ হাজার ৪ শত ২৭ টন ছিল। উহার অধিকাংশই ব্রহ্ম হইতে আনীত চাউল।

সে যাহাই হউক, যে তিনটি দেশ হইতে চাউল আমদানী হইত ও হইতে পারিত, সেই দেশত্রয় আজ জাপান কর্ত্তৃক অধিকৃত। সুতরাং তাহা পাইবার সম্ভাবনা নাই।

সেই অবস্থায় বাঙ্গালায় চাউলের অভাব অনিবার্য্য এবং পূর্ব্ব হইতেই সে বিষয়ে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন ও সরকারের কর্ত্তব্য ছিল। তিন বৎসর হইতে সেই অভাবের জন্য চাউলের মূল্য বর্দ্ধিত হইতেছিল। প্রথমে সে বিষয়ে আন্দোলন আরম্ভ হইলে বাঙ্গালা সরকার বলেন, ত্রিবিধ কারণে মূল্য-বৃদ্ধি হইয়াছে—

(১) বন্যায় কোন কোন জিলায় শস্যহানি

(২) সামরিক প্রয়োজনে জাহাজে স্থানাভাবহেতু ব্রহ্ম হইতে চাউল আনাইবার অসুবিধা

(৩) বর্ষার সময় প্রতি বৎসরই চাউলের মূল্য কিছু বৃদ্ধি পায় এবং আশুধান্য সংগৃহীত হইলেই তাহা কমিয়া যায়।

ইহার পর ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুলাই বাঙ্গালা সরকার এক বিবৃতি প্রকাশ করেন। তাহাতে বলা হয় :—

স্বাভাবিক অবস্থায় চাউল সম্বন্ধে বাঙ্গালা স্বাবলম্বী নহে এবং প্রতি বৎসর সেই জন্য ব্রহ্ম হইতে প্রভূত পরিমাণ চাউল আমদানী করিতে হয়। বাঙ্গালার নানা স্থানে শস্যহানিহেতু এ বার বাজারে মজুদ চাউলের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। সেই জন্য—ব্রহ্ম হইতে অধিক পরিমাণে চাউল আমদানী করা একান্ত প্রয়োজন। অথচ বৎসরের প্রথম ৫ মাসে—পূর্ব্ব-বৎসরের এই কয় মাসের তুলনায় ব্রহ্ম হইতে শতকরা ৫০ ভাগ কম চাউল আমদানী হইয়াছে। যুদ্ধজনিত অবস্থায় জাহাজের অসুবিধাই ইহার প্রধান কারণ।

সেই বিবৃতিতেই বলা হয়—ব্রহ্ম হইতে চাউল আনিবার সুব্যবস্থা হইলেও চাউলের মূল্য বাঙ্গালায় হ্রাস পাইবে কি না, সন্দেহ; কারণ, জাপান, ষ্ট্রেটস ও হংকং ব্রহ্মে বহু পরিমাণ চাউল ক্রয় করায় তথায় চাউলের মূল্য বর্দ্ধিত হইয়াছে। পূর্ব্ব-বৎসরের তুলনায় ব্রহ্মে সিদ্ধ চাউলের মূল্য প্রতি মণ এক টাকা ১৩ আনা বাড়িয়াছে। তাহার সহিত—ষ্টীমার ভাড়া ৪ আনা বৃদ্ধি ও ব্রহ্ম-সরকারের মণ-করা ২ আনা এক পয়সা শুল্ক যোগ করিলে—প্রতি মণে ২ টাকা ৩ আনা এক পয়সা মূল্য-বৃদ্ধি হইবে। কাজেই ব্রহ্মের যে চাউল কলিকাতার বাজারে ৩ টাকা ২ আনা হইতে ৩ টাকা ৪ আনা মণ দরে বিক্রীত হইত, তাহা ৫ টাকা ৮ আনা হইতে ৫ টাকা ১০ আনা দরে বিক্রীত হইবে। ইহা অতিরিক্ত লাভ বলা যায় না।

ইহাতেই বুঝা যায়—বাজারে চাউল মজুদ ছিল না।

চাউল মজুদ রাখাও যে সহজসাধ্য নহে, তাহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। সরকারের হিসাবেই প্রকাশ, এ দেশে বৎসরে প্রায় ৩ কোটি টাকার চাউল নষ্ট হয়। প্রায় ৭৫ হাজার টন ধান্য ও এক লক্ষ টন চাউল—চাউলের পোকায় নষ্ট করে। অন্যান্য পোকায়ও চাউল নষ্ট হয় এবং "ধরসায়" অর্থাৎ আর্দ্রতা-জনিত বিকৃতিতেও অল্প চাউল নষ্ট হয় না।

সুতরাং সরকারী হিসাবে নির্ভর করিয়া যে প্রথমে বাঙ্গালার অর্থ-সচিব ও পরে গভর্ণর বলিয়াছিলেন, চাউলের অভাব হইবে না, তাহা আজ ক্ষুধিত বাঙ্গালীরও বড় দুঃখে হাস্যের উদ্রেক করিতেছে। তাহাতে সরকারী হিসাব কিরূপ ভ্রান্তিজনক হইতে পারে, তাহাই বিশেষ ভাবে দেখা যায়।

যখন জাপান ব্রহ্ম হইতে প্রভূত পরিমাণ চাউল ক্রয় করিতেছিল, তখনই তাহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া ভারত সরকারের পক্ষে সঙ্গত ছিল এবং যে কোন উপায়ে এ দেশে অধিক চাউল আনিয়া মজুদ রাখা প্রয়োজন ছিল। তখনও জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করে নাই এবং বঙ্গোপসাগর তখনও বিপজ্জনক হয় নাই। সুতরাং চেষ্টা করিলে তখন ঐ কার্য্য সহজেই সম্পন্ন হইতে পারিত।

একান্ত পরিতাপের বিষয়—

(১) সরকার চাউলের অভাবের গুরুত্ব যত দিন সম্ভব স্বীকার করেন নাই এবং

(২) যে সময় বাঙ্গালায় চাউলের একান্ত অভাব, সেই সময়েও বাঙ্গালা হইতে অন্যান্য দেশে চাউল রপ্তানী বন্ধ না করিয়া তাহা সঙ্কুচিতও করেন নাই। বাস্তবিক সিংহলে ভারত সরকার যে চাউল দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রদত্ত না হওয়ায় সিংহল সরকারের প্রতিনিধিরূপে সার ব্যারণ জয়তিলক এ দেশে না আসা পর্য্যন্ত এ দেশের লোক তথায় কিরূপ চাউল প্রেরিত হইতেছে, তাহা জানিতে পারে নাই।

যে সময় বাঙ্গালা হইতে বিদেশে চাউল প্রেরিত হইতেছিল, সে সময় বঙ্গোপসাগরে জাপানের যুদ্ধের জাহাজ বিচরণ করায় ও জাপানী বিমানের আক্রমণে যদি কোন কোন চাউলের জাহাজ জলতলগত হইয়া থাকে, তবে তাহাতেও বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না।

ভারত সরকার ও বাঙ্গালা সরকার যাহাই কেন বলুন না—ব্রহ্ম হইতে চাউল আনয়ন বন্ধ হওয়ায় যে ভারতে অন্নকষ্ট হইয়াছে, তাহা বিলাতে ভারত-সচিব যেমন অস্বীকার করিতে পারেন নাই, তেমনই মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্রে যাইয়া লর্ড হেলীও গত ফেব্রুয়ারী মাসে স্বীকার করিয়াছেন—ভারতে যে বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে, তাহা ব্রহ্ম হইতে আমদানী বন্ধের জন্য চাউলের অভাবসঞ্জাত। অর্থাৎ যে বিক্ষোভ ভারত সরকার সর্ব্বতোভাবে রাজনীতিক বলিয়া ভারতরক্ষা আইনের

প্রয়োগে সমধিক আগ্রহ দেখাইয়াছেন, তাহার অর্থনৈতিক কারণও উপেক্ষণীয় নহে। কারণ, ইংরেজীতেই বলা হয়—যে ক্ষুধিত, সে ক্রুদ্ধ হয়। আমাদিগের দেশের কথা—বুভুক্ষিতের পক্ষে কোন্ পাপ করা অসম্ভব ?

সরকারের আর এক কথা—লোক ভয় পাইয়া বা অধিক লাভের লোভে মাল "বাঁধাই" করিতেছে। আমরা পূর্ব্বে যে সকল কথা বলিয়াছি, সে সকল হইতেই প্রতিপন্ন হয়—"বাঁধাই" করিবার মত অধিক চাউল বাঙ্গালায় নাই। পূর্ব্বে গৃহস্থের পক্ষে সঞ্চয় ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত ছিল—বর্ত্তমানে তাহা অপরাধে পরিণত করা হইয়াছে। কিন্তু সঞ্চয়ও যে অধিক থাকে না, তাহা অনায়াসে বলা যায়। হোরেস বেল রেলপথের প্রবর্ত্তনকে সে জন্য দায়ী করিয়াছেন। তিনি ভারত সরকারের পরামর্শদাতা এঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তিনি ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বিলাতে কোন সমিতিতে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, ১৮৭৯-৮০ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষ-কমিশন বলিয়াছিলেন, আর ১০ হাজার মাইল রেলপথ রচিত হইলেই দেশে আর দুর্ভিক্ষ হইবে না—খাদ্য-দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য বা দুর্ম্মূল্য হইতে পারিবে না। সেই ১০ হাজার মাইল রেলপথ রচিত হইয়াছে, কিন্তু দেশে দুর্ভিক্ষ অসম্ভব হয় নাই। পরন্তু বলা যায়, উৎকৃষ্ট পথ রচিত ও সুয়েজ খাল খনিত হওয়ায় এখন ভারতবর্ষ হইতে খাদ্যশস্য ভিন্ন দেশসমূহে রপ্তানী হইতেছে এবং বিদেশী ক্রেতৃগণ যেরূপ ধনী, তাহাতে তাহারা অনায়াসে অনেক শস্য পাইতে পারে; আর যে সকল জমিতে পূর্ব্বে কেবল খাদ্য-শস্য উৎপন্ন হইত, সে সকলেও বিদেশের শিল্পোপকরণরূপে তৈলের শস্য, তুলা, পাট প্রভৃতির চাষ হইতেছে। দেশে খাদ্য-শস্যের সঞ্চয় থাকিতেছে না।

এই সকলের সহিত ভারত সরকারের ও বাঙ্গালা সরকারের ব্যস্ত হইয়া—বিশেষ বিবেচনা না করিয়া কৃত কার্য্যের ফলও দেখিতে হয়।

আমরা প্রথমে বাঙ্গালা সরকারের কাযের উল্লেখ করিব। বাঙ্গালা সরকার তৎকালীন সচিবদিগের সহিত পরামর্শও না করিয়া :—

(১) কতকগুলি অঞ্চল হইতে নৌকা অপসারিত করেন।

(২) সহসা এক জন বিদেশী ব্যবসায়ীকে সরকারের জন্য, বোধ হয়, কোটি টাকারও অধিক মূল্যের ধান্য ও চাউল কিনিতে নির্দ্দেশ প্রদান করেন।

বাঙ্গালার সচিবরা এই সকল কার্য্যের দায়িত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, সামরিক কর্ম্মচারীদিগের পরামর্শ লইয়া বাঙ্গালার গভর্ণর—স্থায়ী রাজকর্ম্মচারীদিগের সহযোগে—সামরিক প্রয়োজন মনে করিয়া—এই সকল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় কার্য্যে সরকারেরও আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে—এমন কথা তাঁহারা বলিয়াছেন। সরকারের আর্থিক ক্ষতির অর্থ—এই দরিদ্র দেশের দরিদ্র অধিবাসীদিগের ক্ষতি; ক্ষতির টাকা বিদেশ হইতে আসিবে না।

সহসা নৌকাপসারণে ধান্য ও চাউলের সহজ ও স্বচ্ছন্দ আনয়ন-প্রেরণের পথ প্রায় রুদ্ধ হয়। এমন কি, কোন কোন অতি-বুদ্ধি রাজকর্ম্মচারী স্থানে স্থানে নৌকা দগ্ধও করেন।

আর সহসা সরকার ধান্য ও চাউল ক্রয় করিতে আরম্ভ করায় এক দিকে যেমন ধান্যের ও চাউলের মূল্য অকারণ বৃদ্ধি পায়, তেমনই লোক ভয় পাইয়া—আর ঐ সকল পাওয়া যাইবে না, মনে করিয়া—আপনাদিগের জন্য বা লাভের লোভে যথাসম্ভব মাল "বাঁধাই" করিতে থাকে। শেষে "গুপ্ত বাজারের" উদ্ভব হয়।

জিজ্ঞাসা করা হইতে পারে—সরকার যখন লোকের প্রয়োজনের জন্যই খাদ্য-শস্য ক্রয় করেন, তখন লোক ভয় পাইবে কেন—পণ্যের মূল্য-বৃদ্ধিই বা হইবে কেন ? তাহার উত্তরে বলিতে হয়—

(১) সরকার দেশের লোকের জন্যই ঐ সকল ক্রয় করিতেছেন না, লোকের সেই সন্দেহ যে ভিত্তিশূন্য নহে, তাহাও পরে—সিংহল প্রভৃতি স্থানে চাউল প্রেরণে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

(২) যখন বাজারে চাহিদা ও সরবরাহে সামঞ্জস্য থাকে এবং সরবরাহ চাহিদার তুলনায় অধিক থাকে না, তখন ক্রয়ের সামান্য বৃদ্ধিতেও পণ্যের মূল্য ক্রয়াতিরিক্ত ভাবে বর্দ্ধিত হয়। কাযেই সরকার যখন—কত ধান্য ও চাউল ক্রয় করিবেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় নাই, তখন সরকারের ক্রেতৃরূপে বাজারে আবির্ভাবে ধান্যের ও চাউলের মূল্য অতিরিক্তরূপ বর্দ্ধিত হওয়ায় বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না।

তাহার পর ভারত সরকারের কার্য্যের উল্লেখ করিতে হয়। পদত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে সচিব শ্রীযুত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন—

(১) বাঙ্গালা হইতে যে বিদেশে প্রভূত পরিমাণ চাউল প্রেরিত হইয়াছে, সে জন্য কি বাঙ্গালার সচিব-সঙ্ঘকে দায়ী করা যায় ?

(২) প্রতিযোগিতামূলক ভাবে যে ধান্য ও চাউল ক্রয় করা হইয়াছে, তাহার জন্যও বাঙ্গালার সচিবগণ দায়ী নহেন।

তিনি এ সকলের জন্য ভারত সরকারকে দায়ী করিয়াছেন।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—সামরিক প্রয়োজনে অনেক জমি হইতে লোককে অপসারিত করা হইয়াছে—সে সকল জমিতে চাষ হয় নাই এবং বহু সৈন্যের আহার যোগাইতে হইয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ১৯৩০-৩১ খৃষ্টাব্দে বিদেশ হইতে বাঙ্গালায় ৬ লক্ষ ৩৭ হাজার ৪ শত ২৭ টন চাউল আমদানী হইয়াছিল। ঐ বৎসর ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে বাঙ্গালায় আনীত চাউলের হিসাব :—

জলপথে নীত—৯ হাজার ৯০ টন

স্থলপথে নীত—২৭ লক্ষ ৩০ হাজার ৭ শত ৯০ মণ। ইহার মধ্যে বিহারের পূর্ণিয়া প্রভৃতি জিলা হইতে আমদানী ও উড়িষ্যা হইতে আমদানী চাউল এবং পঞ্জাব ও যুক্ত-প্রদেশ হইতে আমদানী গম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চাউল ব্যতীত অন্যান্য প্রদেশ হইতে যে ধান্য আসিয়াছিল, তাহার হিসাব :—

জলপথে নীত—১৮ হাজার ৬ শত ৩১ টন

স্থলপথে নীত—১১ লক্ষ ১০ হাজার ৭ শত ২২ মণ

ইহা ভিন্ন স্থলপথে (অর্থাৎ প্রধানতঃ রেলে) অন্যান্য প্রদেশ হইতে

৩৬ লক্ষ ৩৮ হাজার ৫ শত ২২ মণ গম

৮ লক্ষ ৬৩ হাজার ১ শত ৪১ মণ ময়দা ও আটা আসিয়াছিল।

বাঙ্গালার দুর্দ্দিনে অন্যান্য প্রদেশ যে তাহাকে সাহায্য করিবার মত উদারতার পরিচয় না দিয়া বিশেষ কার্পণ্য প্রকাশ করিয়াছে, তাহা কেবল প্রাদেশিক হিসাবে—পাছে আপনার অভাব ঘটে, সেই

আশঙ্কায় নহে—ভারত সরকারই আন্তঃপ্রাদেশিক রপ্তানী বন্ধ করিয়াছিলেন।

অথচ ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ১২ মাসে ও পরবর্ত্তী জানুয়ারী মাসে বাঙ্গালা হইতে ১ লক্ষ ৫৪ হাজার টন চাউল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। আর গত ফেব্রুয়ারী মাসেই ৭ লক্ষ মণ চাউল রপ্তানী হইয়াছে।

বাঙ্গালা সরকারের হিসাবে এ বার বাঙ্গালার ৯২ লক্ষ ৭৬ হাজার ৮ শত টন চাউলের প্রয়োজন হইলেও এ বার উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ—৬৯ লক্ষ ৩৮ হাজার ৮ শত টন ধরা যাইতে পারে। তাহা হইলে আমরা প্রয়োজন অপেক্ষা ২৩ লক্ষ টন অল্প চাউল পাইব। অর্থাৎ প্রয়োজনের তুলনায় শতকরা ২৫ ভাগ কম চাউল পাওয়া যাইবে। চাহিদায় ও সরবরাহে এই প্রভেদ কিরূপে দূর করা যাইবে? অভাব পূরণ করিতে না পারিলে লোকের পক্ষে অনাহার বা অল্পাহার অনিবার্য্য। তাহাতে সরকারের সামরিক প্রচেষ্টাও ক্ষুণ্ন হইবে।

কারণ, বর্ত্তমান যুগে সকল সভ্য দেশই সর্ব্বাগ্রে দেশের লোককে সন্তুষ্ট, সুস্থ ও সবল রাখা যুদ্ধে সাফল্য লাভের জন্য প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া থাকে। সে জন্য দেশের লোকের আবশ্যক খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। দেশের লোককে সুস্থ ও সবল না রাখিতে পারিলে তাহাদিগের দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে ও সমরোপকরণের কলকারখানায় সম্পূর্ণ আশানুরূপ কাযও পাওয়া যায় না। আমরা খাদ্য পরিপাক করিয়া তাহা হইতে শরীরের জন্য শক্তি বা বীর্য্যলাভ করি এবং সেই শক্তি বা বীর্য্য অনুসারেই আমরা কার্য্য করিতে পারি। বয়সভেদে যেমন কার্য্যভেদে তেমনই এই শক্তির পরিমাণের তারতম্য হয়। ইংরেজীতে ইহাকে "ক্যালরী" বলে। কাহার কিরূপ "ক্যালরী" প্রয়োজন, পরীক্ষায় ও গবেষণায় তাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, সাধারণ পুরুষের পক্ষে প্রয়োজন :—

(১) যে কাযে বসিয়া থাকিতে হয়, তাহাতে নিযুক্ত থাকিলে —২ হাজার ৪ শত "ক্যালরী"

(২) স্বল্প দৈহিক শ্রমসাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে—৩ হাজার "ক্যালরী"

(৩) অধিক দৈহিক শ্রমসাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে—৩ হাজার ৬ শত "ক্যালরী"।

আমাদিগের দেশ উষ্ণপ্রধান। সেই জন্য আমাদিগের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অল্প শক্তিপ্রদ আহার্য্যের প্রয়োজন হয়।

জাতিসঙ্ঘ যে হিসাব করিয়াছেন, তদনুসারে বিলাতের লোকের প্রত্যেকের গড় ৩ হাজার "ক্যালরী" প্রয়োজন হইলেও বিলাতের সরকার প্রত্যেকে যাহাতে অতিরিক্ত ২ শত "ক্যালরী" লাভ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং তাহার ফলে এই যুদ্ধকালে বৃটেনের লোক যত সুস্থ, তত তাহারা যুদ্ধের পূর্ব্বে ছিল না এবং তাহারা এখন যেরূপ আহার্য্য লাভ করে, যুদ্ধের পূর্ব্বে সেরূপ পাইত না।

এ দেশে অবস্থা বিপরীত। বর্ত্তমানে এ দেশ কৃষি-প্রাণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহার কৃষক-সম্প্রদায় যে বৎসরের সকল সময়ে সপরিবারে পূর্ণাহার পায় না, তাহা আমাদিগের ইংরেজ শাসকরাও স্বীকার করিয়াছেন। ইংরেজ ডাক্তার সার ফ্রেডরিক ট্রিভস বলিয়াছেন, দারিদ্র্য সকল দেশেই দুঃখজনক; কিন্তু যখন লোক শবদাহের জন্য কাষ্ঠও সংগ্রহ করিতে পারে না, তখন তাহার দারিদ্র্য একান্তই দুঃখের কারণ। তিনি ভারতবর্ষে সেই দারিদ্র্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন। আর মার্কিণের প্রসিদ্ধ রাজনীতিক ব্রায়েন বলিয়াছেন, এ দেশের লোকের 'আকার দেখিলেই দুঃখের উদ্রেক হয়। অর্থাৎ তাহারা "অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তাজরে জীর্ণ।" 'টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া' এ দেশে য়ুরোপীয় সম্প্রদায়ের অন্যতম মুখপত্র। তাহাতে কোন লেখক লিখিয়াছেন—যুদ্ধে ৭ লক্ষ গ্রামে শতকরা ৯০ জন পরিশ্রম-ক্লান্ত কৃষকের কেবল দুঃখই বর্দ্ধিত হইয়াছে। হয়ত ব্যবসায়ীরা লাভবান হইয়াছে। কিন্তু তাহারা এ দেশের লোকের শতকরা অর্দ্ধ জন ব্যতীত আর কিছুই নহে। অবশিষ্ট—(১) শতকরা আড়াই জন নাগরিক শ্রমিক, (২) শতকরা ২ জন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোক, (৩) শতকরা ৫ জন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোক। ইহাদিগের মধ্যে যাহারা নির্দ্দিষ্ট বেতনভুক্, তাহাদিগের অবস্থাও শোচনীয়।

বিলাতে শ্রমিকদিগের আয় যুদ্ধ-পূর্ব্ব আয়ের তুলনায় শতকরা ৪৭ টাকা বর্দ্ধিত হইলেও তাহাদিগের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ব্যয় শতকরা ২০ টাকার অধিক বৃদ্ধি পায় নাই। আর এ দেশে শ্রমিকদিগের পারিশ্রমিক যে পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহাদিগের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ব্যয় তদপেক্ষা অনেক গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। তাহার কোনরূপ প্রতীকার হয় নাই। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের দুর্দ্দশার সীমা নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

বাঙ্গালায় মূল্য-নিয়ন্ত্রণ কেবল ব্যর্থই হয় নাই, পরন্তু তাহাতে লোকের কষ্টের লাঘব না হইয়া কষ্ট বর্দ্ধিতই হইয়াছে। কাহারা তাহাতে লাভবান হইয়াছে, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান আমরা প্রয়োজন মনে করি।

কি জন্য "গুপ্ত" বাজার সৃষ্ট হওয়া সম্ভব হইয়াছে, তাহাও অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে যখন বিলাতে গমের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তখন যে সকল ব্যবসায়ী অধিক লাভের লোভে বাজারে আসিবার পূর্ব্বেই পণ্য ক্রয় করে এবং যাহারা পণ্য কিনিয়া অধিক মূল্যে বিক্রয় করে, তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য ব্যবস্থা হয়। শেষোক্ত সম্প্রদায়ের এক জন ব্যবসায়ীকে যখন মামলা-সোপর্দ্দ করিয়া দণ্ড দান করা হয়, তখন প্রধান বিচারক লর্ড কেনিওন তাহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করায় জুরারদিগকে বলিয়াছেন—তাঁহারা লোকের বিশেষ উপকার করিলেন। এ দেশে—ভারতরক্ষা আইনের নিয়ম রাজনীতিক কারণে অনেক স্থলে অসঙ্গতরূপে প্রযুক্ত হইলেও তাহা "গুপ্ত" বাজার পর্য্যন্ত প্রসারিত হয় নাই কেন? সে রহস্য কি ভেদ করা যায় না? "ছাড়" প্রদানে যে সকল অনাচারের অভিযোগ সময় সময় সংবাদপত্রে উপস্থাপিত করা হইয়াছে, সে সকলের প্রতীকার হইয়াছে কি? যদি না হইয়া থাকে, তবে লোক কি মনে করিবে?

যে সময় চাউলের একান্ত অভাব, সেই সময় যদি বণ্টন-ব্যবস্থা অনাচারদুষ্ট হয়, তবে তাহা যে স্থায়ী রাজকর্ম্মচারীদিগের পক্ষে দণ্ডনীয় অপরাধ, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এই অভাব কিরূপ তীব্র, তাহা সরকারী হিসাবে নির্ভর করিয়া মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মাতাব গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে দেখাইয়াছিলেন। তিনি ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের লোক-গণনানুসারে প্রতি জিলায় লোক-সংখ্যা ধরিয়া প্রত্যেকের জন্য

১ মণ ধান্য ও প্রতি একর জমিতে এক মণ হিসাবে বীজ-ধান্য হিসাব করিয়া কত ধান্যের প্রয়োজন ও সরকারী হিসাবানুসারে কত ধান্য এ বার উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাই দেখাইয়াছিলেন। দুর্ভিক্ষ কমিশন জনপ্রতি ৯ মণের অধিক প্রয়োজন বলিলেও মহারাজাধিরাজ অন্ত সরকারী হিসাবানুসারে উহাই প্রয়োজন বলিয়া ধরিয়াছিলেন এবং মদ্যের জন্য যে চাউল ব্যয়িত হয়, (১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমানেই ঐ জন্য ১ লক্ষ ১৩ হাজার ১ শত ৭৩ মণ চাউল অর্থাৎ ১ লক্ষ ৭০ হাজার ১ শত ৫২ মণ ধান্য ব্যবহৃত হইয়াছিল) তাহা হিসাবে না ধরায়—যে সকল লোক ভাত খায় না, তাহাদিগের সংখ্যাও বাদ দেন নাই।

এই হিসাবে তিনি দেখাইয়াছিলেন, এ বার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে ধান্যের পরিমাণ প্রয়োজন-তুলনায় এইরূপ অল্প—

বিভাগ	কত মণ ধান্য কম
বর্দ্ধমান	৩ কোটি ৯২ লক্ষ ৪১ হাজার ৬ শত ৮১
প্রেসিডেন্সী	৬ কোটি ৫৯ লক্ষ ৫৩ হাজার ১
রাজসাহী	৫ কোটি ৩৪ লক্ষ ৩৭ হাজার ৬ শত ৫১
ঢাকা	৬ কোটি ৭৭ লক্ষ ২৬ হাজার ২ শত ৮১
চট্টগ্রাম	২ কোটি ১৬ লক্ষ ২৯ হাজার ৪ শত ৩০
মোট	২৫ কোটি ৫১ লক্ষ ১৬ হাজার ৪৪ [অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৪৫ ভাগ]

অক্টোবর মাসের হিসাবে উহা দেখা যাইলেও ডিসেম্বর মাসের হিসাবে ঘাটতীর পরিমাণ শতকরা প্রায় ৪৯ ভাগ হয়। এই বৃদ্ধির কারণ সরকার নিম্নলিখিতরূপ দিয়াছেন :—

"পূর্ব্ব-হিসাব প্রকাশের পর বন্যায় (বিশেষ পশ্চিম-বঙ্গে). আশু ধান্যের ফসলের ক্ষতি হইয়াছে। অতিবৃষ্টি, বাত্যা ও জলোচ্ছ্বাসে আমন ধান্যের ক্ষতি হইয়াছে।"

কোন কোন অঞ্চলে যে বাজারে ধান্য বিক্রীত হইতেছে, তাহা কি কারণে উদ্বৃত্তের পরিচায়ক নহে, তাহাও মহারাজাধিরাজ দেখান। তিনি বলেন—যাহাদিগের আহার্য্যের প্রয়োজনাতিরিক্ত ধান্য থাকে, তাহারা যেমন ধান্য বিক্রয় করে, তেমনই আবার এক শ্রেণীর লোক খাজনা ও দেনা মিটাইবার জন্য বাধ্য হইয়া প্রয়োজনের ধান্যও বিক্রয় করে এবং পরে আবার মহাজনের নিকট ঋণ করিয়া ধান্য ক্রয় করিয়া খাদ্যের অভাব মিটায়। সরকারের ধান্য ও চাউল সম্বন্ধে তদন্ত সমিতি স্বীকার করিয়াছেন—বাঙ্গালার অধিকাংশ কৃষকের আহার্য্যের জন্য প্রয়োজন বা বিক্রয়যোগ্য ধান্য থাকে না। সুতরাং উচ্চ মূল্যের লোভ দেখাইয়া লোককে ধান্য বিক্রয়ে প্ররোচিত করায় উদ্বৃত্ত ধান্যের কথা উঠিতেই পারে না।

পূর্ব্বোক্ত হিসাব দিয়া মহারাজাধিরাজ বলিয়াছেন, নিম্নলিখিত কারণসমূহের জন্য এ বার চাউলের অভাব আরও বৃদ্ধি পাইবে :—

(১) লোক-সংখ্যা-বৃদ্ধি (প্রায় শতকরা ১০ জন)

(২) বাঙ্গালা জলপথে, স্থলপথে ও বিমানে শত্রুর আক্রমণ-লক্ষ্য হওয়ায় এই প্রদেশে রক্ষিত বিরাট্ সৈন্যবাহিনী

(৩) সামরিক প্রয়োজনে শিল্পে যে সকল অতিরিক্ত শ্রমিক নিযুক্ত রহিয়াছে

(৪) জাপান কর্ত্তৃক অধিকৃত দেশসমূহ হইতে আগত ব্যক্তিগণ

(৫) আশু ধান্য ব্যতীত ঐ সময়ের অন্যান্য খাদ্য-শস্যের ফলনের অল্পতা

(৬) অন্যান্য প্রদেশ ও বিদেশ হইতে গম আমদানীর স্বল্পতা-হেতু পূর্ব্বে গম ব্যবহারকারীদিগের চাউল ব্যবহার

(৭) বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জিলায় কীটের উপদ্রবে শস্যহানি।

তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বাঙ্গালায় লোক অনেক ধান্য ও চাউল লুকাইয়া রাখিয়াছে বলিয়া যে কথা প্রচার করা হয়, তাহা অসার ও ভিত্তিহীন।

মহারাজাধিরাজের বিবৃতি প্রকাশের এক মাসের কিঞ্চিৎ অধিক কাল পরে কুমার শ্রীমান্ বিমলচন্দ্র সিংহ তাঁহার বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন।

তিনি দেখাইয়াছেন, বিদেশে পণ্য প্রেরণ যত বিপজ্জনকই কেন হউক না—১৯৪১-৪২ খৃষ্টাব্দেও ভারতবর্ষ হইতে খাদ্য-দ্রব্য বিদেশে প্রেরণে কোনরূপ শৈথিল্য হয় নাই। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে ৩০শে নভেম্বর এই ৮ মাসে এ দেশ হইতে ৩২ কোটি ৭৭ লক্ষ ৫১ হাজার ৪ শত ১৩ টাকা মূল্যের খাদ্যদ্রব্য, পানীয় ও তামাক রপ্তানী করা হইয়াছে ; আর রপ্তানী-শস্য, দ্বিদল ও ময়দার মূল্য ৫ কোটি ৯ লক্ষ ২৯ হাজার ১৬ টাকা হইয়াছে।

আমরা বিদেশে পণ্য প্রেরণের অসুবিধার কথা বলিয়াছি। অষ্ট্রেলিয়ার দৃষ্টান্ত দিয়া আমরা তাহা প্রমাণ করিতে পারি। যে সময় ভারতে গমের অভাব বিশেষরূপ অনুভূত হইতেছে এবং ময়দায় বাজরা প্রভৃতি মিশ্রিত করা হইতেছে, সেই সময় অষ্ট্রেলিয়ায় গত ফশলের সাড়ে ৯ কোটি বুশেল (এক বুশেল ৩০ সের ধরা যায়) গম মজুদ রহিয়াছে। গত জানুয়ারী মাসে এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। তখনই নূতন ফশল সংগৃহীত হইয়াছে—পুরাতন মাল মজুদ থাকায় নূতন ফশল সংগ্রহ করিয়া রাখার অসুবিধা ঘটিতেছে। বলা বাহুল্য, মাল পাঠাইবার অসুবিধা অত্যন্ত অধিক না হইলে এই গম বিক্রয় করিয়া অষ্ট্রেলিয়া যেমন লাভবান হইত, ভারতবর্ষের তেমনই খাদ্যদ্রব্যাভাবজনিত দুঃখ প্রশমিত হইতে পারিত। অথচ আমরা দেখিতেছি—বাঙ্গালা ও ভারতবর্ষ হইতে এই অবস্থায়ও খাদ্যদ্রব্যাদি বিদেশে রপ্তানী করা হইতেছে।

রপ্তানী বন্ধ করা প্রয়োজন।

বাঙ্গালায় যে সকল অঞ্চলে ধান্য ও চাউলের অভাব অধিক, সে সকল স্থানে অবশিষ্ট স্থানসমূহ হইতে ধান্য ও চাউল প্রেরণের সুব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। সে জন্য যানের প্রয়োজন। কিন্তু লোক যানের সুবিধায় বঞ্চিত হইয়াছে ও হইতেছে। নৌকা অপসারণের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। রেলের অবস্থাও সন্তোষজনক নহে। কারণ, ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে (এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৯ মাসে) খাদ্যশস্য বহনের জন্য ৫ লক্ষ ৬৪ হাজার ১ শত ২৭খানি মালগাড়ী ব্যবহৃত হইয়াছিল, আর পরবৎসর ঐ সময়ে

ব্যবহৃত মালগাড়ীর সংখ্যা ৪ লক্ষ ৯২ হাজার ৩ শত ১৬খানি—অর্থাৎ শতকরা প্রায় ২১খানি কম।

যদি বলা হয়, শস্যের অল্পতাই গাড়ীর সংখ্যা-হ্রাসের কারণ, তবে জিজ্ঞাসা করা যায়—কয়লারও কি স্বল্পতা ঘটিয়াছিল? প্রথম বৎসরের তুলনায় দ্বিতীয় বৎসর শতকরা ১৭ খানি কম মালগাড়ী কয়লা বহনে ব্যবহৃত হইয়াছিল। তাহার ফলে কলিকাতার লোক সাড়ে ৪ টাকা মণ দামে জ্বালানী কয়লা কিনিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইহা অব্যবস্থা ব্যতীত আর কি বলা যায়?

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সচিবদিগের মতে বাঙ্গালার লোকের জন্য এ বার ৯২ লক্ষ টন অর্থাৎ ২৫ কোটি ৩০ লক্ষ মণ চাউল প্রয়োজন। কুমার বিমলচন্দ্র এই মতের সমর্থন করেন না। কারণ, বৎসরে প্রত্যেক লোকের জন্য ৩৩ শত ৪৪ পাউণ্ড (পাউণ্ড প্রায় অর্দ্ধ সের) চাউল প্রয়োজন ধরিয়া ঐ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। কিন্তু মহারাজাধিরাজ দেখাইয়াছেন, সরকারী হিসাবেই প্রত্যেকের বৎসরে ৯ মণ ধান্য প্রয়োজন এবং প্রতি একরে বীজ-ধান্যের জন্য এক মণ প্রয়োজন। সচিবদিগের হিসাবে প্রয়োজন অকারণ কম ধরা হইয়াছে। এমন কি, মহারাজাধিরাজও প্রয়োজন কম ধরিয়া হিসাব করিয়াছেন। সূক্ষ্ম হিসাবে দেখা যায়, এ বার বাঙ্গালার চাউলের প্রয়োজন ৩৬ কোটি ৯৫ লক্ষ মণের কম হইতে পারে না। সুতরাং অভাবের পরিমাণ আরও অধিক এবং সেই অভাব পূরণ করিবার কোন উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থাই এখনও হয় নাই। কেবল—এত দিনে—অন্যান্য প্রদেশ হইতে কিছু চাউল আনিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

কুমার বিমলচন্দ্র বলিয়াছেন, যাহাতে শত্রুর হস্তগত হইতে না পারে, সেই অভিপ্রায়ে সরকার কতকগুলি জিলা হইতে উদ্বৃত্ত ধান্য ও চাউল সরাইয়া লইয়াছেন। ফলে প্রভূত পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য বাজার হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে—সামরিক প্রয়োজনে অনেক জমি অধিকৃত হওয়ায় লোককে সরিয়া যাইতে হইয়াছে—অথচ যানের অভাব দূর করা হয় নাই। ফলে স্থানে স্থানে খাদ্যদ্রব্যের অভাব তীব্র হইয়াছে এবং মূল্য বাড়িয়াছে। যদি কেবল বিদেশে প্রেরণ বা সম্প্রদায়-বিশেষকে প্রদান করিবার জন্যই সরকার খাদ্যশস্যাদি কিনিয়া রাখেন, তবে তাহাতে জনসাধারণের অপকার ব্যতীত উপকার হয় না। সরকার যেন কোন কোন দেশের ও কোন কোন অনুগৃহীত সম্প্রদায়ের কামদার হইয়া কায করিতেছেন! তাঁহারা যে মূল্যে মাল কিনিয়া যে মূল্যে তাহা বিক্রয় করিতেছেন, তাহাতে তাঁহারা যে লাভ করিতেছেন, ইহাও বিস্ময়ের বিষয়।

বহু কারণসমন্বয়ে এ বার বাঙ্গালায় খাদ্যদ্রব্যের সমস্যা জটিল ও লোকের পক্ষে ভয়াবহ হইয়াছে। লোকের প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া যদি সেই সমস্যার সমাধান করা না হয় এবং সে কায অবিলম্বে না করা হয়, তবে বাঙ্গালার অবস্থা কি হইবে, তাহা মনে করিতেও আতঙ্ক হয়।

প্রবন্ধের আরম্ভে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে' বাঙ্গালার তৎকালীন জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ ধ্বংসকারী "ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের" বর্ণনার উল্লেখ করিয়াছি। তখন বাঙ্গালায় মুসলমান-শাসনের চিতাধূম আকাশ মলিন করিতেছে এবং ইংরেজ দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলার মধ্যে আপনার শাসনের ভিত্তি রচিত করিতেছে। সেই সময়ে ইংরেজ যুবক জন শোর চাকরী লইয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। তিনি পরে প্রতিভাবলে উচ্চপদ লাভ করিয়া লর্ড টেনমাউথ হয়েন। তিনি ঐ সময়ে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, একটি কবিতায় তাহার বর্ণনা করিয়াছিলেন। আমরা নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি—

"এখন(ও) মানস-নেত্রে সেই দৃশ্য করি নিরীক্ষণ—
নয়ন কোটরগত, শীর্ণ দেহ, শবের বরণ।
শুনি—মাতৃ-আর্ত্তনাদ, শিশু-কণ্ঠে কাতর ক্রন্দন,
নিরাশের হাহাকার, যাতনায় অস্ফুট রোদন।
মৃত ও মরণাহত এক সাথে গড়াগড়ি যায়;
শিবার অশিব রবে শকুনির চীৎকার মিশায়;
কুক্কুর ডাকিয়া ফিরে—দিবাভাগে খর রবিকরে
স্বচ্ছন্দে ভক্ষণ করে মৃত ও মুমূর্ষু স্তরে স্তরে।
সে দৃশ্য লেখনী-মুখে বর্ণনায় ব্যক্ত নাহি হয়,
কালে তাহা স্মৃতি হ'তে কোন দিন মুছিবার নয়।"

সেই দুর্ভিক্ষ শোরের মনে এমন প্রভাব-বিস্তার করিয়াছিল যে, তিনি যত দিন জীবিত ছিলেন, দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনার কথা শুনিলে চাঞ্চল্য রোধ করিতে পারিতেন না। তাহার পর দীর্ঘকাল অতীত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে দেশবাসীকে এ দেশে বহু বার দুর্ভিক্ষের সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। সে সকল সংগ্রামে যে সময় সময় ইংরেজ শাসকদিগের ভ্রান্তি ও ত্রুটি হয় নাই (১৮৭৭ খৃঃ মাদ্রাজে লোকক্ষয়—৫২ লক্ষ ৫০ হাজার) এমন নহে। কিন্তু তাঁহারা যে উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়াছেন, তাহা বিহারের দুর্ভিক্ষে (১৮৭৪ খৃঃ) গভর্ণর-জেনারল লর্ড নর্থব্রুকের নির্দ্দেশে সপ্রকাশ—অনাহারে যেন একটি লোকও মৃত্যুমুখে পতিত না হয়।

আমাদিগের আশা ও বিশ্বাস, বাঙ্গালার বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে সরকার সেই উদ্দেশ্যেই কায করিবেন এবং বাঙ্গালার লোক যাহাতে আহার্য্যের অভাবে মৃত বা জীবন্মৃত না হয়, অচিরে তাহার ব্যবস্থা হইবে।

কলিকাতায় অল্প পরিমাণ চাউলের জন্য লোক কি ভাবে দাঁড়াইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে বাধ্য হয়েন—ভদ্র পরিবারের মহিলারাও নিরুপায় হইয়া সে দল বৃদ্ধি করেন, তাহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। তাহাতে যে আর্থিক ক্ষতি হয়, তাহা অসাধারণ। আর কলিকাতার অবস্থা হইতে মফঃস্বলের অবস্থা সহজেই অনুমান করা যায়। এইরূপ অবস্থা কোনরূপেই দীর্ঘকাল চলিতে পারে না এবং চলিলে তাহার ফল অতি শোচনীয় হয়। এ কথা যে সরকার বুঝেন না, এমন মনে করা সঙ্গত নহে। প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া, চাহিদা ও সরবরাহ হিসাব করিয়া—সাহসে ভর করিয়া তাঁহাদিগকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেই হইবে। অন্য পথ নাই।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

এই পৃথিবী

[উপন্যাস]

৬

দু' মাস পরের কথা।

সন্ধ্যার পর কারখানা হইতে ফিরিয়া দিলু ডাকিল,—মা!

সুভাষিণী ছিল রান্না-ঘরে। রান্না-ঘর হইতেই সাড়া দিল,—কেন রে?

দিলু বলিল—পিশিমার চিঠি এসেছে।

—গৌরী পিশিমা?

—হ্যাঁ।

—সব ভালো আছেন?

—আছেন। কৌমুদীর বিয়ে। তোমার চিঠি···

সুভাষিণী বাহিরে আসিল। মার হাতে দিলু চিঠি দিল, বলিল—খামখানা আমি ছিঁড়েছিলুম। কলকাতার পোষ্ট-অফিসের ছাপ···কে লিখেছে, দেখতে।

সুভাষিণী চিঠি পড়িল। গৌরী ঠাকুরাণী লিখিয়াছেন—

কল্যাণীয়াসু

ভাই সুভা, কাশীতে ছিলাম। কলিকাতায় আসিয়াছি। কৌমুদীর বিবাহের সব ঠিক। এ মাসের ২৭ তারিখে বিবাহ। দশ দিন বাকী। সুপ্রসন্ন রাঁচি গিয়াছে—দরকারী কাজে। ফিরিবার সময় বাসন্তী হইয়া আসিবে—সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিবে। তোমাদের ওখানেও যাইবে। আমার এবং কৌমুদীর একান্ত ইচ্ছা, তোমরা ক'জনে এ বিবাহে আসিবে। সুপ্রসন্নকে বলিয়া দিয়াছি, সে তোমাদের লইয়া আসিবে। কোনো মতে যেন অন্যথা না হয়।

পাত্রটি ভালো। মেডিকেল কলেজ হইতে মেডেল লইয়া পাশ করিয়াছে। মেডিকেল কলেজেই ভালো চাকরি পাইয়াছে। কলিকাতায় বাড়ী। ছেলের বাপ হাইকোর্টের উকিল ছিলেন। তাঁর পশারও বেশ ছিল।

আশা করি, তোমরা ভালো আছো।

তোমাদের আশায় পথ চাহিয়া থাকিব জানিবে। তোমরা আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ লইবে।

কৌমুদীর দিদিমার ইচ্ছা, তিনি এ বিবাহ দেখিবেন। বাতে তিনি পঙ্গু, নড়িবার ক্ষমতা নাই; কাজেই বাসন্তীতে তো তিনি যাইতে পারিবেন না। সেই কারণে কলিকাতায় তাঁর বাড়ী হইতেই বিবাহ হইবে।

শুভার্থিনী
গৌরী দেবী

চিঠি পড়া শেষ করিবার সঙ্গে সঙ্গে অতীত দিনের শত স্মৃতি মনের উপরে ভাসিয়া উঠিল! সেই গৌরী ঠাকুরাণী···সেই কৌমুদী! তাদের পাইয়া সে দিন মনে হইয়াছিল, দুর্দিন বুঝি ঘুচিল, নহিলে অজানা বিদেশে আসিবামাত্র এত স্নেহ, এত মমতার স্পর্শ এমন অযাচিত ভাবে মিলিবে কেন! কিন্তু···

যাঁকে লইয়া জীবনের নূতন অধ্যায় ভালো করিয়া গড়িয়া তুলিবে ভাবিয়াছিল, সেই স্বামী···আজ কোথায় তিনি! সামনে আঁধারের পারাবার···কোথাও কূল দেখা যায় না!

দিলু বলিল—যাবে?

নিশ্বাস ফেলিয়া সুভাষিণী বলিল—যাওয়া উচিত। যেতে মন চায়, বাবা!

দিলু বলিল—তবে?

সুভাষিণী বলিল—এ মুখ নিয়ে শুভ-কাজে গিয়ে দাঁড়াতে ভয় করে, দিলু!···তোমরা যেয়ো···দু'ভাইয়ে। সুপ্রসন্ন বাবু নিজে আসছেন···তোমার পিশিমা এমন আগ্রহ করে চিঠি লিখেছেন। না গেলে মনে ব্যথা পাবেন!

তিন দিন পরে সুপ্রসন্ন আসিলেন। বাসন্তীর এ-পল্লীতে রীতিমত কলরব বাধিয়া গেল। এ বিবাহে সুপ্রসন্ন সকলকে কলিকাতায় যাইবার নিমন্ত্রণ করিলেন। যাতায়াতের খরচ তিনি দিবেন! পরের পয়সায় সহর কলিকাতা-ভ্রমণ! বিবাহের আমোদ···তার উপর সুপ্রসন্ন বলিলেন, বাড়ীতে নাচ-গান-থিয়েটার হইবে! কৌমুদীর দিদিমার সখ! মা-মরা মেয়ে···আহা!

দিলুকে সুপ্রসন্ন বলিলেন,—জানকী বাবু তোমার ছুটী মঞ্জুর করেছেন। মাকে বলো, যেতে হবে। দিদি আমাকে অনেক করে বলে দেছেন, তোমাদের আমি নিয়ে যাবো।

দিলু বলিল—মার যাওয়ায় অসুবিধা আছে।

সুপ্রসন্ন বলিলেন—কিসের অসুবিধা! না, না···মার যাওয়া চাই।

অগত্যা তখন সুভাষিণীকে সবিনয়ে জানাইতে হইল, তার যাইবার উপায় নাই! এ দুর্ভাগ্যের পর লোকালয়ে বাহির হইতে সে যেন মরমে মরিয়া যায়! দয়া করিয়া সুপ্রসন্ন যেন তাকে ক্ষমা করেন! এখানে থাকিয়া সুভাষিণী ভগবানের কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছে, মেয়ে-জামাই দীর্ঘজীবী হোক···সকল সৌভাগ্য-সম্পদে তাদের জীবন ভূষিত হোক!

সুভাষিণীর মিনতিতে সুপ্রসন্নকে থামিতে হইল। সুপ্রসন্ন বলিলেন—ছেলেরা যাবে কিন্তু।

সুভাষিণী কহিলেন—ওরা যাবে বৈ কি! তবে এত আগে থেকে কাজ-কামাই করে যাওয়া···

সুপ্রসন্ন বলিলেন—বিয়ের আগের দিন গায়ে-হলুদ। সে দিন বাড়ীতে থিয়েটার হবে। গায়ে-হলুদের দিন সকালে গিয়ে ছেলেদের পৌঁছুনো চাই। গাড়ী-ভাড়ার টাকা-কড়ি আমি রেখে যাচ্ছি। এতে 'না' বলবেন না!···

সুভাষিণী কোন জবাব দিল না।

সুপ্রসন্ন বলিলেন—আর একটি মিনতি আছে···

সুভাষিণী বলিল—বলুন···

সুপ্রসন্ন বলিলেন—দয়া করে কোনো রকম যৌতুক দেবেন না। জানি তো আজকালকার দিনে মানুষের অবস্থা! এমন হয়েছে যে, আত্মীয়-বন্ধুর বাড়ীতে ছেলেমেয়ের বিয়ে হবে শুনলে ভয়ে যেন

কাটা হয়ে যেতে হয়! মান-ইজ্জৎ থাকবে, এমন কিছু দিতে হলে যার নাম বিশ-পঁচিশ টাকা খরচ! মানুষের চারি দিকে আজ কতখানি অভাব!···চিঠিতে সকলকে তাই মিনতি জানানো হচ্ছে, দয়া করে কেউ যেন লৌকিকতা না দেন···শুধু আশীর্ব্বাদ জানাবেন, তাহলেই আমরা কৃতার্থ হবো। আপনি দয়া করে কিছু দেবেন না যেন!

সুভাষিণীর বুকখানা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। হায় রে, কৌমুদীর বিবাহ ···কৌমুদী তাকে কতখানি ভালোবাসে, কতখানি মানে! তাদের ভুলিয়া যায় নাই! মাঝে মাঝে চিঠি লিখিয়া খোঁজ-খপর লয়! চিঠিতে কতখানি মায়া-মমতা ফুটিয়া ওঠে! সে কৌমুদীকে এমন দিনে কিছু দিবে না?

কিন্তু দিবার মতো সঙ্গতিই বা কোথায়? দারিদ্র্যের দুঃখ এই সময়েই সব-চেয়ে বড় হইয়া বাজে! মন যখন প্রিয়জনকে কিছু দিবার জন্ম অধীর আকুল হয়, অথচ যা দিতে চাই, দিবার সামর্থ্য নাই!···নহিলে দারিদ্র্যে কি-বা এমন বেদনা? সমাজে উঁচু আসন নাই, তাহাতে কি আসিয়া যায়!

সুভাষিণী কোনো জবাব দিল না।

সুপ্রসন্ন কহিলেন—এ কথা রাখতেই হবে। দিদিও বিশেষ করে বলে দেছেন···কৌমুদীও তাই বলেছে···আমারো মিনতি!

সন্ধ্যার সময় অন্নদার স্ত্রী মহামায়া আসিয়া উপস্থিত। ডাকিল,—নীলুর মা···

কণ্ঠ শুনিয়া সুভাষিণী বাহিরের উঠানে আসিল। কহিল—মহামায়া দিদি!

চারি দিকে সতর্ক দৃষ্টিতে চাহিয়া কণ্ঠ মৃদু করিয়া মহামায়া বলিল,—ছেলেরা কোথায়?

সুভাষিণী বলিল—দিলু জানকী বাবুর বাড়ী। নীলু ঘরে বসে পড়ছে।

মহামায়া বলিল—বড্ড বিপদে পড়েছি, ভাই···

বিপদ! সুভাষিণী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল মহামায়ার পানে!

মহামায়ার বিপদ···সে বিপদে মহামায়া আসিয়াছে সুভাষিণীর কাছে! আশ্চর্য্য! মহামায়া বলিল—সুপ্রসন্ন বাবুর মেয়ের বিয়ে! কাল আমরা যাচ্ছি···

সুভাষিণী বলিল—বিয়ের এত আগে যাচ্ছো?

—হ্যাঁ। মেয়ে সরোর বায়না। কৌমুদীর সঙ্গে এক দিন খুব ভাব ছিল তো···সই পাতিয়েছিল তার সঙ্গে!

মহামায়া চুপ করিল। আসল বক্তব্য বলিবে, তার জন্ম যেন নিজেকে তৈয়ারী করিয়া লইতেছে!

সুভাষিণী বলিল—ও···সুপ্রসন্ন বাবু চলে গেছেন? না, তাঁর সঙ্গেই যাচ্ছো?

মহামায়া বলিল,—সুপ্রসন্ন বাবু আজ রাত্রের গাড়ীতেই যাচ্ছেন। আমরা কাল দিনের বেলায় যাবো।

—অন্নদা বাবুও যাচ্ছেন?

—না। ওঁর কি এত আগে থেকে যাওয়া চলে! আপিস রয়েছে। উনি যাবেন বিয়ের দিন। কাল জগৎ বাবুর বাড়ীর সকলে যাচ্ছে···সেই সঙ্গে আমরাও যাবো। ওদের সঙ্গে পুরুষ-মানুষ থাকবে···আমাদের সুবিধা হবে'খন।···সরো সব খপর নিয়ে এসেছে···যাবার জন্ম সে একেবারে ক্ষেপে উঠেছে।

সুভাষিণী কহিল,—তা বন্ধুর বিয়ে···আমোদ-আহ্লাদ করবে বৈ কি!

মহামায়া বলিল,—সব বুঝি ভাই, কিন্তু আমার হয়েছে মুস্কিল; সে মুস্কিলে যদি আসান্ করো, তাই তোমার কাছে এসেছি। তুমি ছাড়া এ দায়ের কথা আর-কাকেও বলতে মাথা কাটা যায়, নীলুর মা!

সুভাষিণী কোনো জবাব দিল না···মহামায়ার পানে শুধু চাহিয়া রহিল। মনের মধ্যে চিন্তার দোলা। সে আবার মানুষ···তার কাছে আসিয়াছে সরস্বতীর মা বিপদে রক্ষা পাইবার উপায় সংগ্রহ করিতে!

মহামায়া আর এক বার চারি দিকে চাহিল···বেশ সতর্ক দৃষ্টি! এবং কণ্ঠ যথাসম্ভব মৃদু করিয়া বলিল—গহনা-গাঁটি কিছু নেই। মেয়ের ছিল একছড়া সোনার নেকলেশ আর আটগাছা চুড়ি—সেগুলি সে বারে সেই যে বাঁধা পড়েছে, উদ্ধার করতে পারলুম না তো! কি করে পারবো? সংসারের জন্ম যে-টাকা ধরে দেন, তাই থেকে ঐ ভাটিয়া শাড়ীওলাকে দিতে হয় মাসে-মাসে,—তা কম টাকা নয় ভাই, দশটা করে টাকা! উনি জানেন না। পুরুষ-মানুষের স্বভাব, বলে, টাকা এনে দিচ্ছি, খাও-দাও থাকো, ব্যস্! কিন্তু তা কখনো হয়? বিশেষ পাঁচ জনের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়···পাঁচ বাড়ীতে চায়ের নেমন্তন্ন আছে···সিনেমায় যাওয়া আছে···ভালো শাড়ী-ব্লাউশ নহিলে মান থাকবে কেন আজ-কালকার দিনে? তা তো উনি বুঝবেন না! না বুঝুন, আমাদের তো মান-সম্ভ্রম রেখে চলতে হবে ···ওঁদের মান-সম্ভ্রম! কাজেই···

সুদীর্ঘ বিস্তারে মহামায়া যে-বিবরণ দিল, সে যেন এক পর্ব্ব মহাভারত! একান্ত মনোযোগে সুভাষিণী শুনিল। সে কাহিনীর মধ্যে মিলিল মহামায়ার পিতৃগৃহে সুরুচি ও শিক্ষার পরিচয়; এবং সে আবহাওয়ায় মানুষ হওয়ার জন্ম মহামায়া 'শূকর-পেটে' দু'টি গিলিয়াই কোনো মতে প্রাণধারণ করিতে অসমর্থ—তার উপর মেয়েটা পাইয়াছে মায়ের টেষ্ট···অগত্যা ইত্যাদি।

কর্ত্তা অন্নদাচরণ যে এ-সব বোঝেন না, তা নয়,—বোঝেন! তবু পুরুষমানুষ কিনা, বলেন, সকলের সঙ্গে মিশিতে চাও, মেশো··· গান-বাজনা-পার্টি করিতে হয়, করো···কিন্তু পয়সা সম্বন্ধে হুঁশিয়ার! রাগে মহামায়ার গা জ্বলিয়া যায়। তা'ও না কি হয়? এ-সবে কঞ্জুষপণা করিলে কখনো চলে! যে কালে যেমন দস্তুর হইয়াছে··· অগত্যা এ সবের ব্যয় সঙ্কলান করিতে নিজের বালা-তাগা, মেয়ের চুড়ি ও নেকলেশ বাঁধা পড়িয়াছে! প্রতি মাসের শেষে ভাবেন, সামনের মাস হইতে একটু চাপিয়া-চুপিয়া খরচ করিয়া দু'পয়সা জমাইবেন, কিন্তু হইবার জো নাই ঐ হতভাগা ভাটিয়া শাড়ীওলার জন্ম! এমন ভালো ভালো শাড়ী আনিয়া চোখের সামনে ধরিয়া দেয়! আর কি বা সে সব শাড়ীর দাম···

কাহিনী-জালের মধ্যে বিজড়িত হইয়া সুভাষিণীর মন আবদ্ধ রহিল। এমন জটিল বন্ধন যে তার মধ্য হইতে, সে কোনো-কিছুর হদিশ পাইল না!

প্রায় পনেরো মিনিট ধরিয়া মহাভারতের কাহিনী বলিয়া মহামায়া অসঙ্কোচে উপসংহারে জানাইল, ভগবানের নিষ্ঠুর বিধানে সুভাষিণীর

গহনা গায়ে দেওয়ার সব আশা যখন নির্ম্মূল হইয়াছে, তখন ক'দিনের জন্য বিবাহ-বাড়ীতে মান রক্ষা করিতে সুভাষিণী যদি তার গহনাগুলি ব্যবহার করিতে দেয়···বাসন্তীতে ফিরিয়া সুভাষিণীর গহনা সুভাষিণীর হাতে আগে ফিরাইয়া দিয়া তবে মহামায়া গিয়া নিজের বাড়ীতে পদার্পণ করিবে···এত-বড় আশ্বাসও মহামায়া দিতে ভুলিল না।···

কথা শুনিয়া সুভাষিণী ক্ষণেকের জন্য কাঠ হইয়া রহিল। তার পর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আমার কি-বা আছে দিদি! ওঁর এত দিনের চিকিৎসায় সামান্য যা-কিছু ছিল···সব গেছে! থাকবার মধ্যে সেকেলে হু'টো মাকড়ি, মাথার কাঁটা, আর হাতের সোনা-বাঁধানো নোয়াগাছা···

মহামায়ার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল! সারা বৈকাল ধরিয়া মায়েতে-মেয়েতে জল্পনা করিয়াছে···গহনা কি করিয়া মিলিবে? এখানে কাহারো কাছে এ গহনা-ধারের কথা প্রকাশ পাইবে না··· অথচ কলিকাতার ধনী-গৃহে মর্য্যাদা রক্ষা হয়! ভাবিয়া-চিন্তিয়া সুভাষিণীর কথাই হু'জনের মনে হইয়াছে। বিধবা মানুষ··· গহনায় তার কি কাজ···বাক্সে পড়িয়া আছে বৈ ত নয়···তা ছাড়া, নীলুর মা কাহারো সাতে নাই, পাঁচে নাই···কথাটা প্রকাশ পাইবে না!

তাই মনে আশার পাহাড় লইয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকিয়া মহামায়া আসিয়াছে সুভাষিণীর কাছে···

এখন সুভাষিণীর কথা শুনিয়া নৈরাশ্যের বেদনার চেয়ে রাগ হইল অনেক বেশী! রাগ নিজের উপর! এ-কথা জানা থাকিলে নিজের অভাব-দৈন্যের কথা এমন ভাবে হুম্ করিয়া বলিবার জন্য পা বাড়াইত না তো!···

এ কথা বলিবার পর সুভাষিণীর সামনে এখন মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারিবে কি!

কিন্তু হাতের তীর ছুটিয়া গিয়াছে, সে-তীরকে আর ফেরানো চলে না!···উপায়?

অবস্থার চেয়ে উঁচু আসনে যে-লোক নিজের জীবনকে তুলিয়া ধরিতে চায়, সে-আসনকে উঁচু রাখিবার জন্য তার বুদ্ধিতে বিধাতা শাণ দিয়া সে বুদ্ধিকে একটু বেশী ধারালো করিয়া দেন!··· মহামায়ার বুদ্ধিতে সে-ধার ছিল···তাই মহামায়া তখনি বলিল,— ও মা, তাই না কি! তাহলে দেখি, ওঁকে ধরে সেভিংস ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে গহনাগুলো ছাড়িয়ে আনাবার ব্যবস্থা করি। নেমন্তন্ন যখন যেতেই হবে, রুলি-হাতে দিয়ে মেয়েটা তো সেখানে গিয়ে এক-বাড়ী লোকের সামনে দাঁড়াতে পারে না!···

এ-কথা বলিয়া এক-পা এক-পা করিয়া মহামায়া ধীরে ধীরে অপসৃত হইল।

৭

ভাটিয়া-শাড়ীর ব্যাপার ঐ রাত্রেই শেষ হইল না—সে-জের আবার দেখা দিল অন্যত্র পরের দিন সকালে।

বেলা তখন আটটা। পাশে গঙ্গাপদর বাড়ী। সে-বাড়ীতে হঠাৎ কুরুক্ষেত্র বাধিয়া গেল।

দিলু স্নান করিয়া ভাত খাইতে বসিয়াছে, ও-বাড়ীতে গঙ্গাপদর কণ্ঠে রুদ্র চীৎকার জাগিল; এবং সে চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে দুম্‌দাম্ করিয়া জিনিষপত্র-ফেলার শব্দ শুনিয়া দিলু চমকিয়া একেবারে কাঠ! সুভাষিণীও নিস্পন্দ নিশ্চল···

পাশের বাড়ী হইতে গঙ্গাপদর ভীম-ভৈরব গর্জ্জন মুহূর্ত্তে যেন বাতাসে ঘূর্ণচক্র রচনা করিয়া তুলিল!

গঙ্গাপদ বলিল—দু'-দু'মাস মুদিকে তার হিসাবের টাকা দাওনি! আজ সকালে সে বেশ দু'কথা শুনিয়ে দিয়ে গেল।··· কোথায় গেল তার টাকা, শুনি? মাইনে পেয়েই গুণে মুদির টাকা আলাদা কাগজের বাণ্ডিলে জড়িয়ে তোমার হাতে তুলে দিয়েছি···কিসে সে টাকা খরচ করলে, বলো?

এ গর্জ্জনের উত্তরে অপর-পক্ষ কি জবাব দিল, শুনা গেল না। উত্তরে গঙ্গাপদ কিন্তু খাবার কামান দাগিল! গঙ্গাপদ বলিল,— বাপের বাড়ীতে টাকা পাঠিয়েছো, কি, কার বাড়ীতে পাঠিয়েছো, সে-হিসাব আমি চাইছি না। তবে আমার সঙ্গে কথা, ও-টাকা যেখান থেকে পারো, যেমন করে পারো, জোগাড় করে মুদির পাওনা মেটাবে। দু'-দু'বার করে মুদির দেনা আমি দিতে পারবো না। এতে তোমাদের সংসার চলুক, বা বন্ধ হোক!

দিলু চাহিল সুভাষিণীর পানে···সুভাষিণী বলিল—ঐ যে ভাটিয়া-শাড়ীওলা এসে ঘর-ঘর শাড়ী দিয়ে যাচ্ছে—তাই। গঙ্গাপদ বাবুর স্ত্রী সে-দিন বলছিল শাড়ীওলার কথা। বলছিল, যে-সব শাড়ী পরবার স্বপ্নও দেখিনি ভাই, সে-সব শাড়ী এমন সুবিধা-দরে দিচ্ছে, নেবো না? মানুষ হয়ে জন্মেছি যখন, সখ-সাধ তখন তো একেবারে বিসর্জ্জন দিতে পারি না!

দিলু বুঝিল, বলিল—এরা ব্যবসার তুক জানে মা···এই ভাটিয়ারা। তবে গরীব গৃহস্থর পক্ষে কিস্তীবন্দীতে বাঁধা পড়া···ভয়ের কথা!

সুভাষিণী বলিল—উনি বলতেন, পূরো দাম দিয়ে জিনিষ কিনতে পারি, কিনবো। ধারে কিম্বা ঐ শস্তা কিস্তীর হারে কোনো-কিছু কিনতে নেই!···বলতেন, ধারে হাতী কিনতে-কিনতে আমাদের দেশের বনেদী বড়মানুষরা সে-হাতীর পায়ের চাপে পিষে মরে গেল··· আমাদের মতো গরীবের ঘরে ও-চাল সর্ব্বনেশে!

দিলু এ কথার জবাব দিল না। কারখানায় ঢুকিয়া বহির্জ্জগতের যেটুকু সে দেখিয়াছে, তাহাতে বুঝিয়াছে, বড়লোকের সখ আর সামগ্রীর নকল করিতে গিয়া গরীব-দুঃখীর দুঃখ-কষ্ট দিনে-দিনে কতখানি আরো বাড়িয়াছে উঠিতেছে!

নিঃশব্দে আহারাদি সারিয়া কাজে সে বাহির হইয়া গেল। গঙ্গাপদর গৃহে যুদ্ধের তীব্রতা তখন কমিয়া আসিয়াছে, একেবারে থামে নাই!···

কারখানায় ঢুকিতে দিলু সামনে দেখে, পিনাকী···সাহেবী-সাজে! দিলুর পানে পিনাকী ফিরিয়াও চাহিল না। ফ্যাক্টরির ফোরম্যানের সঙ্গে পিনাকী কথা কহিতেছিল। বিনয়ে জড়োসড়ো ফোরম্যানের মূর্ত্তি! আর পিনাকী···ভঙ্গী দেখিলে মনে হয়, সে যেন প্রবীণ ফোরম্যানের আদেশ-ও-অন্নদাতা মনিব!

পিনাকীর শুভাগমনের কারণ সে শুনিল বয়লার-রুমে দাশুর মুখে। কথাটা দাশু তার সঙ্গী কার্ত্তিককে বলিতেছিল···

বলিতেছিল, বড় ছেলেকে চাটুয্যে সাহেব আজ হইতে সিধিকেটে ঢুকাইয়া দিলেন। তিনি ম্যানেজার, তাঁর নীচেই পিনাকী সাহেবের

আসন। সিণ্ডিকেটের কাজ-কর্ম্ম দেখার কাজ শিখিতে হইবে তো! এক দিন উনিই হইবেন এ সিণ্ডিকেটের দণ্ড-মুণ্ডধর!

কার্ত্তিক বলিল—কেন? বাবুর ছেলে মণিময় বাবু?

দাশু বলিল—ছেলের রোগা শরীর! মাথা তেমন পরিষ্কার নয় তো! তাঁর উপরে বাবু তেমন ভরসা রাখেন না! শুনেছি, বাবুর মেয়ে···সেই মেয়ের সঙ্গে না কি ঐ পিনাকী সাহেবের বিয়ে হবে!

বাধা দিয়া কার্ত্তিক বলিল—বলিস্ কি! ঐ ষাঁড় ছেলে! ঘ্যাঃ! কি ওর বিদ্যা-বুদ্ধি, শুনি!

দাশু বলিল—ম্যানেজারীর কাজে কি এমন বিদ্যা-বুদ্ধির দরকার হবে, শুনি? বাবু সব গড়ে-পিটে মজুত মাল ধরে দিচ্ছেন! এঁর দাবীর মধ্যে উনি বড় লোকের ছেলে···তার উপরে হবেন মালিকের জামাই! বলে, কাজ যখন চলে, তখন একটা কাঠের পুতুল খাড়া রাখলেও আপ্‌সে সে চলে যায়!

কার্ত্তিক বলিল—এই জন্যই বাঙালীর কারবার দু'পুরুষ ধরে বাঁচে না! জামাই-সম্বন্ধী-ভাগনেরা মিলে কারবার নিয়ে দক্ষযজ্ঞ করে' সব ভেস্তে যায়!

দাশু বলিল,—পোষাকের বাহার দেখেছিস্! মাসে যেন দু'-তিন হাজার টাকা কামায়! মালিক যিনি, তাঁকে কখনো ধুতি ছেড়ে কোট-পেনটুলেন পরতে দেখলুম না! আর উনি বাপের পয়সায় বখামি করে বেড়ান, সেজে এসেছেন যেন বিলিতী বড়-সাহেব!

হাসিয়া কার্ত্তিক বলিল—আসল বড় সাহেবরা সাজে না রে দাশু! কলকাতার সাহেবী ফ্যাক্টরিতে আমি কাজ শিখেছি—দেখেছি, জানি! সাজে তারা, যাদের কাজের মুরোদ নেই!

এ সব কথা দিলু শুনিতে চায় না। এ সব কথা তার ভালো লাগে না! এ সব কথায় রুচি নাই! তবু উপায় ছিল না···

দিলু ভাবিতেছিল, শুনিতে খারাপ হইলেও কথাগুলো সত্য! মনে পড়িল বাড়ীর পাশে গঙ্গাপদ বাবুর ওখানে সকালেই শুনিয়া আসিয়াছে শাড়ী লইয়া স্ত্রীর সঙ্গে গঙ্গাপদ বাবুর সেই বিবাদ-কলহ!

এ সব কথাবার্ত্তায় তার মানস-চক্ষের সামনে ভাসিয়া উঠিল এক নূতন পৃথিবী! এ পৃথিবীর সঙ্গে তার পরিচয় নাই! নিজের গৃহে শান্তি ও প্রীতির আবহাওয়ায় মানুষ হওয়ার জন্য এ-পৃথিবীর কল্পনাও সে কোনো দিন করে নাই!

দাশু আর কার্ত্তিকের এ-আলোচনা বিস্তারিত হইয়া হয়তো আরো কত অপ্রিয় সত্য উদ্‌ঘাটিত করিত···কিন্তু আলোচনা বন্ধ হইল, দাশুর ডাক আসিল এঞ্জিনীয়ার ডিপার্টমেণ্টে।

কার্ত্তিক একা···কাহার কাছে বিদ্রোহী মনের ঝাঁজ ফুটাইবে? তবু দিলুর পানে চাহিয়া শেষ টিপ্পনী কাটিল,—নতুন ম্যানেজার-সাহেবকে দেখেছেন,দিলু বাবু?

কাহাকে উদ্দেশ করিয়া কথা···বুঝিলেও দিলু বলিল—ম্যানেজার-সাহেব?

হাসিয়া কার্ত্তিক বলিল—ম্যানেজার চাটুয্যে সাহেবের ছেলে! বিলেত না গেলেও বিলেত-ফেরতের ছেলে সাহেব হবে না তো কি বাঙালী হবে? হুঃ···

দিলু কথার জবাব দিল না···কাজ করিতে লাগিল।

বৈকালে কারখানার ছুটির পর রুটিন মানিয়া দিলু আসিল জানকী বাবুর গৃহে···মণিময়ের কাছে।

গাড়ী-বারান্দায় গাড়ী দাঁড়াইয়াছে।

দিলুকে দেখিয়া মণিময় বলিল—আজ পড়া নয় মাষ্টার-মশাই, বেড়াতে বেরুবো। বাবা সঙ্গে যাবেন।

দিলু বলিল—আমি তাহলে আসি!

মণিময় বলিল—না, না, আপনিও সঙ্গে যাবেন! বাবা বলে-ছেন, তোমার মাষ্টার-মশাই এলে একসঙ্গে সকলে বেরুবো।

দিলু অবাক্! কিন্তু ব্যাপার বুঝিবার পূর্ব্বেই মণিময় বলিল—আপনি বসুন, জলটল খান্, বাবাকে আমি বলে আসি, আপনি এসেছেন।

বিমূঢ়ের মতো দিলু আসিয়া ঘরে বসিল। ভোগু আসিল চায়ের পেয়ালা, লুচি-তরকারী-মিষ্টান্ন জল-খাবার লইয়া। যে দিন হইতে মণিময়ের পড়াশুনা দেখা সুরু, সে দিন হইতেই এ বাড়ীতে দিলুর জল-খাবারের ব্যবস্থা কায়েমি হইয়া আছে!

মুখ-হাত ধুইয়া দিলু জল-খাবার খাইল এবং তার খাওয়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জানকী বাবু আসিলেন। তাঁর পিছনে মণিময় এবং মণিময়ের পিছনে পিনাকী। পিনাকীর সেই সাহেবী বেশ!

দিলুর পানে চাহিয়া জানকী বাবু বলিলেন—আজ মণির ছুটী··· বুঝলে দিলীপ। আমার একটু কেনা-কাটা আছে। সুপ্রসন্ন বাবুর মেয়ের বিয়ে। তাকে মণিময় কিছু উপহার দিতে চায়। কি উপহার দেবে, ও ঠিক করতে পারছে না···বলছিল, মাষ্টার-মশাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে বলবো। আমি বলেছি, বেশ—তোমার মাষ্টার-মশাই যা বলবেন, তুমি তাই দিয়ো।···তা তোমার সঙ্গে পরামর্শ করেছে?

এত বড় সম্মান! দিলুর পায়ের নীচে মাটী যেন দুলিয়া উঠিল! গৌরবের লজ্জায় দিলুর মুখ রাঙা হইল···দিলু বলিল—আজ্ঞে, না।

মণিময় বলিল—কথা বলবার এখনো সময় পাইনি বাবা। মাষ্টার-মশাই যেমন এলেন, অমনি আমি তোমাকে খপর দিতে গেলুম।

জানকী বাবু বলিলেন,—ও···আচ্ছা। বেরুবার আগে তাহলে ঠিক হয়ে যাক, কি জিনিষ দেওয়া হবে। পিনাকী···তুমি আছে, তুমি বলো···কি দেওয়া যায়? মানে, মণিময়ের তরফ থেকে···সুপ্রসন্ন বাবুর মেয়েকে?

দিলুকে এতখানি খাতির পিনাকীর ভালো লাগে নাই···কিন্তু না লাগিলেও নিরুপায়! এখানে নিজের মান লইয়া অহঙ্কার সাজে না···অভিমানও না!

জানকী বাবুর কথায় সে বলিল—বেশ ভালো কোনো রকম মডার্ণ ষ্টাইলের শাড়ী···না হয় নতুন ফ্যাশনের রিষ্ট-ওয়াচ?

জানকী বাবু চাহিলেন মণিময়ের দিকে···বলিলেন,—তোমার পছন্দ হয় মণি?

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মণিময় বলিল—না।

জানকী বাবু চাহিলেন দিলুর পানে···কহিলেন—তুমি কি বলো দিলীপ?

যেন অগ্নি-পরীক্ষা! দিলু বলিল,—আজ্ঞে···আমি তো কিছুই জানি না···বড় মানুষের ঘরের কায়দা-কানুন···

জানকী বাবু বলিলেন—বড় লোক গরীব লোক নিয়ে কথা নয়, দিলীপ! মণিময়···এখন ওর এমন সামর্থ্য হতে পারে না যে, গহনা-গাঁটি কিনে দেবে! দিলে সেটা হবে বাপের পয়সায় অহঙ্কারের দান! তাছাড়া শাড়ী, রিষ্ট-ওয়াচ—ওর বয়সের বন্ধুরা যদি এ সব উপহার দিতে যায়, তাহলেও তাতে ভালোবাসা প্রকাশ পাবে না, প্রকাশ পাবে জাঁক! অর্থাৎ কি না ছাখো, আমি কত দামের জিনিষ দিয়েছি! তা নয়! ওর দেবার সামর্থ্য থাকবে, ওর দেওয়া চলবে···অথচ কৌমুদীর কাছে সে-উপহারের আদর হবে···এমন কিছু উপহার দেওয়া চাই।

দিলু মুহূর্ত্ত চিন্তা করিল, তার পর বলিল—ভালো দেখে ক'খানি বই যদি দেওয়া হয়? কিম্বা···

হাসিয়া জানকী বাবু বলিলেন,—'কিম্বা' শুনবো পরে। এখন এসো, আমরা দোকানে যাই, চোখে দেখে পছন্দ করা যাবে'খন! তোমার জন্যই আমরা অপেক্ষা করছিলুম। এসো···

ক'জনে আসিলেন গাড়ীর সামনে। মোটর-গাড়ী। জানকী বাবু উঠিলেন। তার পর পিনাকী। দিলুর পা কাঁপিতেছে···দিলুকে মণিময় বলিল—উঠুন মাষ্টার-মশাই···

দিলু উঠিতে যাইতেছিল সামনের দিকে ড্রাইভারের পাশের সীটে ···জানকী বাবু বলিলেন,—ভিতরে এসো দিলীপ···সামনের সীটে মণিময় বসবে!

কম্পিত বক্ষে দিলু উঠিয়া পিনাকীর পাশে বসিল। মণিময় বসিল সামনের সীটে ড্রাইভারের পাশে।

রাগে পিনাকী জ্বলিয়া লাল! কিন্তু উপায় কি!

ক'খানা দোকান ঘুরিয়া কেনা হইল টয়লেট-শেট, সেণ্ট, সাবান···এগুলা ছিল সুরুচির ফর্মাশ। এবং সেই সঙ্গে কেনা হইল বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের একসেট করিয়া বই···এগুলি কেনা হইল দিলুর কথায়।

জানকী বাবু বলিলেন,—তোমাদের বয়সের ছেলেমেয়েকে দেবার মতো উপহার যদি কিছু থাকে তো তা এই বই! এর চেয়ে দামী উপহার আর নেই! শাড়ী-গহনা—এ-সব মনকে বড় করে না, এ-সবের সঙ্গে অহঙ্কার গাঁথা থাকে! শুভ দিনে কৌমুদীকে অহঙ্কার-চর্চ্চার অনেক আসবাব আত্মীয়-স্বজনে দেবে! যারা সমবয়সী বন্ধু, তাদের দেওয়া উচিত এমন জিনিষ, মন যাতে চিরদিন আনন্দ পাবে। সে জিনিষ হলো বই, ফুল,···এই সব! **I admire your taste** (তোমার রুচির আমি সুখ্যাতি করি) দিলীপ।

জানকী বাবুর মুখে এত বড় কথা···গৌরবের লজ্জায় দিলীপ আবার মুখ নত করিল···তার মুখ-চোখ আবার তেমনি রক্ত-রাঙা হইল।

তার পর কলিকাতায় কৌমুদীর বিবাহের দিন। সন্ধ্যা বেলা। বর আসিবে···বাড়ীর প্রাঙ্গণে বিস্তীর্ণ সজ্জিত মণ্ডপ···আমের পাতায় দেবদারু-পাতায় ফুলে-লতায় মনোহর কুঞ্জ! নহবৎখানায় নহবতের বিচিত্র মধুর রাগিণী···

নিমন্ত্রিত-অভ্যাগতের বিপুল ভিড়। গাড়ীর পর গাড়ী আসিতেছে ···লোকের পর লোক···

কন্যাপক্ষের তরফ হইতে অভ্যর্থনার সমারোহ! সুপ্রসন্ন নিজে বিনয়াবনত হইয়া সকলকে অভ্যর্থনা করিতেছেন। দিলু-নীলু বাড়ীর ছেলের মতো কোমর বাঁধিয়া সকলকে চা, সরবৎ, পাণ, সিগার, সিগারেট পরিবেষণ করিতেছে। এ কাজে দু' ভাইয়ে যেন দশখানা করিয়া হাত বাহির করিয়াছে!

একখানা ট্যাক্সি আসিয়া ফটকে দাঁড়াইল। ট্যাক্সি হইতে নামিল পিনাকী-দেবকী-শুক্লাদের সঙ্গে জয়া দেবী, চ্যাটার্জ্জী সাহেব।

সুপ্রসন্ন বলিলেন—সত্যই নেমন্তন্ন খেতে এলেন চ্যাটার্জ্জী-সাহেব! বিয়ে দেখেই বোধ হয় ফিরে যাবেন?

কামাখ্যা সাহেব বলিল—কিছুতেই আগে আসার সুবিধা হলো না। নতুন প্ল্যাণ্ট এসেছে···ফিট্ না করে আসা সম্ভব হলো না!

সুপ্রসন্ন কহিলেন—মিসেস্ চ্যাটার্জ্জীও বুঝি ঐ কারণেই দু'দিন আগে আসতে পারলেন না?

সলজ্জ হাস্যে জয়া বলিল—কাল আসবার ঠিক ছিল। হঠাৎ ওঁর জন্য বিভ্রাট ঘটলো···লাষ্ট মোমেণ্টে!

সুপ্রসন্ন বলিলেন—কাল ভোরেই দু' জনে ফিরছেন, বোধ হয়?

সলজ্জ হাস্যে জয়া বলিল—না, না, বরের বাড়ীতে ফুলশয্যা-বৌভাতের নেমন্তন্ন খেয়ে তবে ফিরবো।

সুপ্রসন্ন বলিলেন,—আমার সৌভাগ্য!

দিলু দেখিল···নীলু দেখিল···এই জয়া দেবী! তাদের পিশিমা! বেশেভূষায় কি সমারোহ! তাদের কত আপন-জন···অথচ তাদের চেনেন না! তারাও চেনে না, জানে না তাদের পিশিমাকে!

সুপ্রসন্ন বলিলেন—আপনারা বসুন মিষ্টার চাটার্জ্জী। পিনাকী, তোমরা বসো বাবা···মেয়েদের আমি বাড়ীর মধ্যে পৌছে দিয়ে আসি।

জয়াকে উদ্দেশ করিয়া সুপ্রসন্ন বলিলেন,—আসুন···

সুপ্রসন্নর পিছনে জয়া চলিল অন্দরের দিকে···দিলু-নীলুর পাশ দিয়া···

সহসা কে ডাকিল—জয়াদি'!

সে-কণ্ঠ শুনিয়া জয়া চমকিয়া উঠিল! এ কণ্ঠ যেন···

কণ্ঠের উদ্দেশে জয়া চোখ তুলিয়া চাহিল। চাহিবামাত্র যে-মূর্ত্তি চোখে পড়িল···জয়া কাঠ!

এ রাজীব···জ্যাঠা সুপ্রসন্নর খাশ্-ভৃত্য···শেষ-জীবনের সঙ্গী-সহচর···সেই রাজীব!

কিন্তু এ-বাড়ীতে রাজীব আসিয়া উদয় হইল···হঠাৎ···কোন্, অদৃশ্য অতীত লোক হইতে!

[ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

শীত উত্তীর্ণ হওয়ায় স্বভাবতঃ মনে হইয়া থাকিবে—আপাততঃ পূর্ব্ব দিক্ হইতে বাঙ্গালার বিপদ উত্তীর্ণ হইল। গত বৎসর বর্ষার পূর্ব্বে ব্রহ্ম-অভিযান শেষ করিবার জন্য জাপান ব্যস্ততা প্রকাশ করিয়াছিল। প্রাকৃতিক অবস্থায় ভারতের পূর্ব্ব-সীমান্তবর্ত্তী অঞ্চলের সহিত ব্রহ্মদেশের মিল আছে। কাজেই সঙ্গত ভাবেই মনে হইতে পারে—ভারতবর্ষ সম্পর্কে জাপানের কোনরূপ দুরভিসন্ধি থাকিলে তাহার পক্ষে শীতকালেই তদনুযায়ী অগ্রসর হওয়া স্বাভাবিক। অথচ, শীত নির্ব্বিঘ্নে উত্তীর্ণ হইল; আবার ঠিক ঐ সময়ে অষ্ট্রেলিয়া আক্রমণের জন্য জাপানের ব্যাপক আয়োজন! সুতরাং আপাততঃ বাঙ্গালা দেশ তথা ভারতবর্ষ জাপানের আক্রমণ-বিভীষিকা হইতে পরিত্রাণ পাইল মনে করা অযৌক্তিক নহে।

কিন্তু বসন্ত সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের পূর্ব্ব-সীমান্তে জাপানের তৎপরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে; দক্ষিণ-পূর্ব্ব বাঙ্গালায় জাপানের বিমান-আক্রমণও অকস্মাৎ প্রাবল্য লাভ করিয়াছে। গত তিন মাস আরাকান্ অঞ্চল সম্বন্ধে জাপান একরূপ উদাসীন ছিল; কিন্তু মার্চ্চ মাসের প্রথম ভাগ হইতে সে ঐ অঞ্চলে অত্যন্ত তৎপর। সম্মিলিত পক্ষের অগ্রবর্ত্তী বাহিনী জাপ-সৈন্যের এই আকস্মিক আক্রমণে পশ্চাদ্বর্ত্তনে বাধ্য হইয়াছে। ঠিক এই সময়ে জাপান কক্সবাজার, ফেণী এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব বঙ্গের বিভিন্ন অজ্ঞাতনামা স্থানে বিমান আক্রমণ করিতেছে। আক্রমণ যেমন পুনঃ পুনঃ চালিত হইতেছে, তেমনই এই সকল আক্রমণের প্রাবল্যও অত্যন্ত অধিক। ইতঃপূর্ব্বে জাপান কখনও নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পূর্ব্ব-ভারতের কোথাও এত অধিক বার এবং এরূপ প্রচণ্ড ভাবে বোমা বর্ষণ করে নাই। আরাকান অঞ্চলে জাপানের তৎপরতা এবং সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গে প্রবল বিমান-আক্রমণে আবার হয়ত অনেকের মনে হইতেছে—শীত অতীত হইলেও বাঙ্গালা দেশ তথা ভারতবর্ষের বিপদ উত্তীর্ণ হয় নাই; না জানি, জাপানের মনে কি আছে!

আরাকানে তৎপরতা—

প্রথমতঃ আরাকান্ অঞ্চলের তৎপরতা। গত ডিসেম্বর মাসে জাপান বিনা যুদ্ধে বুথিডং ও মংড ত্যাগ করিয়া যায়; সম্মিলিত পক্ষের সৈন্য তখন ঐ দুইটি স্থান অধিকার করিয়া রথেডং পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। তাহার পর জাপানের প্রতিরোধ প্রবল হওয়ায় সম্মিলিত পক্ষের সৈন্য আর অগ্রসর হইতে পারে নাই। আরাকান্ অঞ্চলে সম্মিলিত পক্ষের এই তথাকথিত সাফল্য সম্বন্ধে অত্যন্ত অশোভন প্রকার কার্য্য চলিয়াছিল। সীমান্তের বে-ওয়ারিশ অঞ্চলে এই গুরুত্বহীন তৎপরতাকে ব্রহ্ম-অভিযান বলিয়া প্রচার করিবার চেষ্টাও হইয়াছে। এই অসঙ্গত প্রচারকার্য্যের ফলেই গত মার্চ্চ মাসে জাপানের প্রতি-আক্রমণে সম্মিলিত পক্ষের সৈন্য যখন পশ্চাদ্বর্ত্তনে বাধ্য হয়, তখন উহাও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলিয়া মনে হইয়াছে। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, প্রচারকারীরা অতীত ও ভবিষ্যতের কথা বিস্মৃত হইয়া কেবল বর্ত্তমানকে লইয়াই অভিভূত হইয়া পড়েন; ইহাতে অনেক সময় তাহাদের প্রচারকার্য্যের ফল সম্পূর্ণ বিপরীত হয়।

বস্তুতঃ, গত ডিসেম্বর মাসে আরাকানের বে-ওয়ারিশ অঞ্চলে সম্মিলিত পক্ষের সৈন্যের সামান্য অগ্রগতি যেমন গুরুত্বহীন, মার্চ্চ মাসে জাপানের সাফল্যের গুরুত্বও তেমনই অধিক নহে। ডিসেম্বর মাসে সম্মিলিত পক্ষের সৈন্যের অগ্রগতি যেমন ব্রহ্ম-অভিযান নহে, তেমনই মার্চ্চ মাসে জাপানের প্রতি-আক্রমণ ও সাফল্যও তাহার ভারত অভিযানের নিশ্চিত দ্যোতক নহে। মার্চ্চ মাসে জাপান যেখানে পৌঁছিয়াছে, গত ডিসেম্বর মাসের পূর্ব্বে সে সেই স্থানেই—বরং তাহারও পশ্চিম দিকে অবস্থান করিতেছিল। কাজেই, জাপ-সৈন্যের সাম্প্রতিক অগ্রগতিতে ভারতের যে বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, গত ডিসেম্বর মাসের পূর্ব্বে ১০ মাস ভারতের পূর্ব্বাঞ্চল সেই বিপদের সম্মুখেই ছিল। জাপান তাহার এই সাফল্যে ভারতে বিমান-আক্রমণ পরিচালনেরও অধিকতর সুবিধা লাভ করে নাই। আকিয়াব এখনও পশ্চিম-ব্রহ্মে জাপানের সর্ব্বশেষ বিমানঘাঁটী।

অবশ্য, সীমান্ত অঞ্চলের এই সঙ্ঘর্ষের ফলাফল সম্পূর্ণ উপেক্ষণীয় নহে। প্রধানতঃ শত্রুর গতিবিধিতে লক্ষ্য রাখিবার উদ্দেশ্যে এবং শত্রুসৈন্যকে সর্ব্বদা বিব্রত রাখিবার জন্যই সীমান্তে সঙ্ঘর্ষ চলিয়া থাকে। কিন্তু এই সময় সীমান্তের নিকটবর্ত্তী শত্রুর ঘাঁটীর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়; এই ঘাঁটী অধিকার করা সম্ভব হইলে ভবিষ্যৎ অভিযানের পথ সুগম হয়। এই জন্য সীমান্ত-সঙ্ঘর্ষকে নির্দ্দিষ্ট স্থানের বাহিরে প্রসারিত হইতে দেওয়া যায় না। গত ডিসেম্বর মাসে জাপান বুথিডং ও মংড নির্ব্বিরোধে ত্যাগ করিলেও রথেডংএ যাইয়া জাপ-সৈন্য দৃঢ়তার সহিত দণ্ডায়মান হয়; কারণ, রথেডং ত্যাগ করিয়া আকিয়াব বিপন্ন করা তাহাদিগের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তেমনই পশ্চিম দিকেও জাপ-সৈন্যকে আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে দেওয়া উচিত নহে; কারণ, তাহাতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব বঙ্গের বৃটিশ ঘাঁটী বিপন্ন হইবে।

পূর্ব্ববঙ্গে বিমান-আক্রমণ—

তাহার পর পূর্ব্ববঙ্গে জাপানের বর্দ্ধিত বিমান-আক্রমণ। জাপানের এই আক্রমণ দুইটি বৈকল্পিক উদ্দেশ্যে চালিত হওয়া সম্ভব। জাপান হয়ত মনে করে—পূর্ব্ববঙ্গের বিমানঘাঁটীগুলি হইতে ব্রহ্মদেশের মধ্য ও দক্ষিণ অঞ্চলে বোমা বর্ষিত হয়; দক্ষিণ-পূর্ব্ব বঙ্গের বিমানঘাঁটী, জাহাজঘাট এবং সরবরাহ-সূত্র আরাকান্ অঞ্চলে সম্মিলিত পক্ষের সেনাবাহিনীকে শক্তি যোগায়; ভবিষ্যতে এই সকল সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানই ব্রহ্ম-অভিযানের জন্য ব্যবহৃত হইবে। এই জন্য—প্রতিরোধমূলক উদ্দেশ্যেই জাপান হয়ত দক্ষিণ-পূর্ব্ব বঙ্গের সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে বিশেষ ভাবে মনোযোগ প্রদান করিয়াছে। অবশ্য, বেসামরিক অঞ্চল সম্পূর্ণ অক্ষত রাখিয়া কেবল

সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আঘাত করা সম্ভব নহে। এই জন্য আমরা পূর্ব্ববঙ্গে সামরিক অঞ্চলের ক্ষতি ও বেসামরিক অধিবাসীর হতাহতের কথা—দুই-ই শুনিতেছি। জাপান মনে করিতে পারে—বর্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বে দক্ষিণ-পূর্ব্ব বঙ্গের সামরিক লক্ষ্যবস্তুগুলি যদি চূর্ণ হয়, তাহা হইলে বর্ষাকালে উহার দ্রুত সংস্কার সম্ভব হইবে না; সে আগামী কয়েক মাস সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবে।

জাপানের উদ্দেশ্য প্রতিরোধমূলক না-ও হইতে পারে; সমগ্র বাঙ্গালায় বিমান-আক্রমণ পরিচালনের জন্য দক্ষিণ-পূর্ব্ব বঙ্গে উপযুক্ত ঘাঁটী অধিকারে প্রয়াসী হওয়াও তাহার পক্ষে অসম্ভব নহে। গত ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে কলিকাতায় বোমাবর্ষণ কালে আমরা বলিয়াছিলাম—ইহা জাপানের পর্য্যবেক্ষণমূলক আক্রমণ; অর্থাৎ কলিকাতা অঞ্চলের প্রতিরোধ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই জাপান এই আক্রমণ চালাইয়াছিল। সেই সময় জাপানী সমরনায়কদিগের এই অভিজ্ঞতা হওয়াই স্বাভাবিক যে, পশ্চিম-ব্রহ্মের ঘাঁটী হইতে কলিকাতা অঞ্চলের সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে সাফল্যের সহিত বোমাবর্ষণ চলে না। এই অভিজ্ঞতার ফলে দক্ষিণ-পূর্ব্ব বঙ্গের কতকাংশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ঐ অঞ্চলের বিমানঘাঁটী হইতে সমগ্র বাঙ্গালার সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে প্রবল আঘাত করিতে আকাঙ্ক্ষী হওয়া জাপানের পক্ষে অসম্ভব নহে। জাপানী সমরনায়কগণ যদি সত্যই এইরূপ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন, তাহা হইলে ফেণী, কক্সবাজার এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব বঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলে জাপানের বর্ত্তমান বোমা বর্ষণ স্থল ও জলপথে তাহার অভিযানের পূর্ব্ব সূচনা। কোন নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলে স্থলপথে বা জলপথে অভিযান-পরিচালনের পূর্ব্বে সেই অঞ্চলের সামরিক লক্ষ্যবস্তুগুলি বোমাবর্ষণে চূর্ণ করা আধুনিক যুদ্ধের নীতি।

সংক্ষেপে, হয় দক্ষিণ-পূর্ব্ব বঙ্গে সম্মিলিত পক্ষের সমরায়োজন চূর্ণ করিবার জন্য, নতুবা ঐ অঞ্চলের ঘাঁটী অধিকার করিয়া সমগ্র বাঙ্গালায় প্রবল বিমান আক্রমণের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ-পূর্ব্ব বঙ্গের আকাশে জাপানের এই তৎপরতা।

তবে, সমগ্র ভারতের উদ্দেশে জাপানের ব্যাপক অভিযান আপাততঃ সম্ভব ও স্বাভাবিক নহে; সে যদি সত্যই দক্ষিণ-পূর্ব্ব বঙ্গে অভিযান আরম্ভ করে, তাহা হইলে কেবল ঐ অঞ্চলের কয়েকটি ঘাঁটী অধিকারের উদ্দেশ্যেই সে অভিযান চালিত হইবে। পরে যদি অবস্থা অনুকূল হয়, তাহা হইলে তখন অধিকৃত অঞ্চলের আরও বিস্তারসাধনের জন্য জাপান উদ্যোগী হইতে পারে। তবে, এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—বর্ষার ধারা ও বন্যা জাপানের পক্ষে অলঙ্ঘ্য বিঘ্ন নহে। বর্ষাকালে সম্মিলিত পক্ষের ব্রহ্ম-অভিযান অসাধ্য হইতে পারে; কিন্তু যে জাপ-সৈন্য ইতঃপূর্ব্বে হিংস্র জন্তু ও বিষধর সর্পসঙ্কুল বন ও ভয়ঙ্কর কুম্ভীরপূর্ণ নদী অনায়াসে অতিক্রম করিয়াছে, তাহার পক্ষে বর্ষাকালে যুদ্ধ পরিচালন সাধ্যাতীত নহে। যদি অন্যান্য কারণে বর্ষাকালে ভারত-অভিযান যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয়, তাহা হইলে জাপানী সেনাপতির পক্ষে তাঁহার সেনাবাহিনীর প্রত্যেকের স্কন্ধে এক একখানি করিয়া রবারের নৌকা দিয়া পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইতে আদেশ দেওয়া অসম্ভব নহে। তবে, বর্ত্তমানে যখন দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের নৌবাহিনী বিশেষ ভাবে ব্যাপৃত, চীনের সমস্যার সমাধান অদূরবর্ত্তী নহে এবং পশ্চিম দিকে জার্ম্মাণী অত্যন্ত বিব্রত, তখন জাপানের পক্ষে একাকী ভারতবর্ষের ন্যায় বিশাল দেশে ব্যাপক অভিযানে প্রবৃত্ত হওয়া স্বাভাবিক নহে।

চীনের সমস্যা—

সমরোপকরণের অপ্রাচুর্য্যে এবং খাদ্য-সামগ্রীর অভাবে চীন এখন অত্যন্ত বিপন্ন। অবশ্য, জাপান এখন চীনে ব্যাপক যুদ্ধে ব্যাপৃত নহে; কাজেই, চীনাদিগের সামরিক বিপর্য্যয়ের কথা আপাততঃ শ্রুত হয় নাই। তবে, অবরুদ্ধ চীন বর্ত্তমানে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াছে। সম্প্রতি হোনান প্রদেশের দুর্ভিক্ষে সহস্র সহস্র চীনা অন্নাভাবে গাছের পত্র-পল্লব পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিয়াও জীবন রক্ষা করিতে পারে নাই। এই প্রদেশ ব্যতীত চীনের অন্যান্য অঞ্চলেও দারুণ অন্নাভাব। গত ফেব্রুয়ারী মাসে লণ্ডনস্থিত চীনা দূতের পত্নী মাদাম কু ফিলাডেল্‌ফিয়ায় এক বক্তৃতায় বলেন—China is on the verge of economic collapse. The danger is so serious that America cannot long delay to equip and supply China and the Chinese army. মাদাম চিয়াং-কাই-সেক্ সম্প্রতি আমেরিকায় তাঁহার বিভিন্ন বক্তৃতায় চীনের দুঃখ ও জাপানের ক্রম-বর্দ্ধমান শক্তির কথা উল্লেখ করিয়া পুনঃ পুনঃ সম্মিলিত পক্ষের উদ্দেশে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। কিন্তু তবুও সিদ্ধান্ত হইয়াছে—জাপানের সম্বন্ধে আপাততঃ দুশ্চিন্তার কারণ নাই; হিটলার পরাজিত হইবার পর জাপানকে "শিক্ষা দেওয়া" হইবে। মিঃ চার্চ্চিল তাঁহার সাম্প্রতিক বক্তৃতায় আগামী বৎসর অথবা তাহার পরের বৎসর হিটলার পরাজিত হইবে বলিয়া আশা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহারও পরে অর্থাৎ ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দেরও পরে তাঁহারা ২নং শত্রু জাপানের প্রতি অবহিত হইবেন! ইতোমধ্যে ব্রহ্ম-চীন পথ উন্মুক্ত করিয়া চীনকে সাহায্য দানের ব্যবস্থা হইবে বলিয়া যে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল, তাহাও আপাততঃ "শিকায়" উঠিল। কারণ, ব্রহ্ম-অভিযানের উপযোগী প্রাকৃতিক অবস্থা পুনরায় সৃষ্টি হইতে এখনও ১০ মাস বাকী। সম্মিলিত পক্ষ কেবল "পায়তারা" কষিয়াই গত শীতকাল অতিবাহিত করিয়াছেন।

চীনের এই দুরবস্থা এবং সম্মিলিত পক্ষের এই অদূরদর্শী নীতির ফলে জাপান অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া থাকিবে। আমরা ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি, জাপান তাঁহার তাঁবেদার নান্‌কিং সরকারের সাহায্যে চীনের সমস্যার সমাধান করিতে আগ্রহান্বিত। সম্প্রতি জেনারল টোজোর নানকিং পরিদর্শন এবং জাপান কর্ত্তৃক চীনে অতিরিক্ত অধিকার ত্যাগের প্রতিশ্রুতি আমাদের এই অনুমানের সমর্থক। জাপান এখন নানকিং সরকারকে পুষ্ট করিয়া এবং তাহাকে সম-ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি দিয়া চুংকিংএর সমর্থকদিগকে আকৃষ্ট করিতে চাহিতেছে। সে হয়ত আশা করে—এই ভাবে চুংকিংএর শক্তি হ্রাস করান সম্ভব হইবে এবং তথায় নান্‌কিংএর সহিত স্বতন্ত্র সন্ধির আগ্রহ দেখা দিবে। অবশ্য ইহা সত্য, চুংকিংএর সমর্থক-দিগের কতকাংশ কিছুতেই নান্‌কিংকে স্বীকার করিতে চাহিবে না। তবে, চুংকিংএ এরূপ লোকের অভাব না হওয়াই স্বাভাবিক; যাহারা ছয় বৎসর-ব্যাপী দুঃখ-কষ্টে এখন ক্লান্তি বোধ করিতেছে, সম্মিলিত পক্ষের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া যাহারা জাপানের নিকট হইতে সামান্য আশ্বাস পাইলেই এখন অস্ত্রত্যাগে সম্মত হইবে। আর জাপানের পক্ষেও এখন চীনের প্রতি সাময়িক ভাবে কপট উদারতা প্রদর্শনও স্বাভাবিক। সে এখন দুইটি প্রবল শত্রুর সম্মুখীন; এখন চুংকিংকে বৃটিশ ও আমেরিকার সহিত সম্বন্ধশূন্য করা তাহার চরম স্বার্থ। অবশ্য, জাপানের এই অভিসন্ধি সফল হইবে কি না, তাহা বলা যায় না; তবে, চীনের আভ্যন্তরীণ অবস্থায় এবং চীনের মিত্রদিগের ব্যবহারে সে এখন এই নীতির সাফল্য সম্পর্কে আশান্বিত হইয়া থাকিবে।

দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর—

দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের আয়োজন কমে নাই; বিসমার্ক সাগরে পরাজয়ে জাপানের উৎসাহ বিন্দুমাত্র হ্রাস

পায় নাই। জাপান যে অতি সত্বর অষ্ট্রেলিয়াকে শক্তিহীন করিতে প্রয়াসী হইবে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। অষ্ট্রেলিয়াই সম্মিলিত পক্ষের প্রধান আক্রমণ-ঘাঁটী; এই ঘাঁটীকে সম্পূর্ণরূপে শক্তিহীন করা জাপানের একান্ত প্রয়োজন। অষ্ট্রেলিয়ায় সৈন্য অবতরণ করাইয়াই হউক, আর অষ্ট্রেলিয়ার নিকটবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জে অধিকার-বিস্তার করিয়া আমেরিকার সহিত উহাকে বিচ্ছিন্ন সংযোগ করিয়াই হউক, জাপান অতি সত্বর এই দ্বৈপায়ন মহাদেশকে হীনবল করিতে প্রয়াসী হইবেই।

টিউনিসিয়ায় যুদ্ধ—

সম্মিলিত পক্ষ সম্প্রতি টিউনিসিয়ায় উল্লেখযোগ্য সামরিক সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছেন; জেনারেল মণ্টগোমারীর সেনাবাহিনী ম্যারেথ্ লাইন ভেদ করিয়া মার্শাল রোমেলের সেনাদলকে মধ্য-টিউনিসিয়া পর্য্যন্ত বিতাড়িত করিয়াছে। তবে টিউনিসিয়ায় অক্ষশক্তির সহিত সম্মিলিত পক্ষের চরম শক্তি-পরীক্ষা এখনও হয় নাই। উত্তর অঞ্চলে মার্শাল রোমেলের ও ফন্ আর্ণিমের সেনাবাহিনী স্বল্প-পরিসর রণাঙ্গনে প্রচণ্ড প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হইবে। উত্তরাঞ্চলের প্রাকৃতিক অবস্থাও প্রবল প্রতিরোধ চালনের উপযোগী। সম্মিলিত পক্ষ রোমেলের সেনাবাহিনীকে পরিবেষ্টিত করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই যুদ্ধ পরিচালন করিতেছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের সে প্রচেষ্টা সফল হয় নাই। দক্ষিণ দিক্ হইতে মণ্টগোমারীর সৈন্যের অগ্রগতির সময় মার্কিণী সেনাবাহিনী যদি গাফ্‌সা-গ্যাবেস্ পথ ধরিয়া মধ্য-টিউনিসিয়ায় পূর্ব্ব উপকূল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারিত এবং রোমেলের সেনাদলকে দুই দিক্ হইতে নিষ্পিষ্ট করা যদি সম্ভব হইত, তাহা হইলে সম্মিলিত পক্ষের পরবর্ত্তী সমর-প্রচেষ্টা আর দুঃসাধ্য হইত না। টিউনিসিয়া-যুদ্ধের প্রথম পর্ব্বে সম্মিলিত পক্ষের এই বিফলতায় এই অঞ্চলের যুদ্ধের ভবিষ্যৎ এখনও অনিশ্চিত হইয়া রহিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—অক্ষশক্তি সম্মিলিত পক্ষকে টিউনিসিয়ায় যথাসম্ভব অধিক কাল আটক রাখিতে চাহে; এই অঞ্চলে রণক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া সম্মিলিত পক্ষের সহিত ব্যাপক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া তাহার উদ্দেশ্য নহে। টিউনিসিয়ায় বৃটিশ ও মার্কিণী সৈন্যকে আটক রাখিয়া জার্ম্মাণী গ্রীষ্মকালে রুশিয়ার বিরুদ্ধে শেষ অভিযান চালাইতে চাহে। জার্ম্মাণী জানে—টিউনিসিয়ায় তাহার প্রতিরোধের সম্পূর্ণ অবসান না হইলে পশ্চিম-য়ুরোপ সম্বন্ধে তাহার উৎকণ্ঠার কারণ নাই। এখন পর্য্যন্ত টিউনিসিয়ার যুদ্ধ রুশ-রণাঙ্গনে কোন প্রকার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে নাই। গত ফেব্রুয়ারী মাসের শেষভাগে ও মার্চ্চ মাসে জার্ম্মাণী পশ্চিম-য়ুরোপ হইতে নূতন সৈন্য স্থানান্তরিত করিয়া দক্ষিণ-রুশিয়ায় প্রতি-আক্রমণের প্রাবল্য বৃদ্ধি করিয়াছিল। ঐ অঞ্চলে কেবল পরিবর্ত্তিত প্রাকৃতিক অবস্থার জন্যই রুশ-সেনা অসুবিধায় পড়ে নাই—য়ুরোপের অন্য প্রান্ত হইতে জার্ম্মাণীর নিরুদ্বেগে সৈন্য অপসারণের সামর্থ্যও রুশ সেনার বিপন্ন হইবার অন্যতম কারণ।

রুশ-রণাঙ্গন—

ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যভাগে আশা হইয়াছিল—সোভিয়েট বাহিনী এবার দক্ষিণ-রুশিয়ায় নীপারের তীর পর্য্যন্ত অব্যাহত গতিতে অগ্রসর হইবে। কিন্তু ঐ অঞ্চলে অসময়ে বরফ গলিতে আরম্ভ হওয়ায় এবং জার্ম্মাণ-সৈন্যের সংখ্যা ও শস্ত্রশক্তি দ্রুত পুষ্ট হওয়ায় অকস্মাৎ যুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তিত হয়। শীতকালে সোভিয়েট সেনাবাহিনী অতি দ্রুত পশ্চিম অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল; পুনরধিকৃত অঞ্চলে উত্তমরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় তাহারা পায় নাই। রণক্ষেত্র দূরবর্ত্তী প্রান্তে স্থানান্তরিত হওয়ায় সরবরাহ-সূত্র দীর্ঘ হইয়া পড়ে; বিদগ্ধ অঞ্চলে উত্তম সরবরাহ-পথ গড়িয়া তুলিতেও সময়ের প্রয়োজন। তাই, অনুকূল প্রাকৃতিক অবস্থায় জার্ম্মাণ-সেনা অকস্মাৎ প্রতি-আক্রমণ করিলে রুশবাহিনী তখন পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়। দক্ষিণ অঞ্চলে জার্ম্মাণীর সর্ব্বপ্রধান ঘাঁটী খারকভ এক মাসের মধ্যেই পুনরায় সোভিয়েট বাহিনীর হস্তচ্যুত হইয়া যায়, খারকভের উত্তরে গুরুত্বপূর্ণ রেলষ্টেশন বিয়েলগোরোডও জার্ম্মাণ-সেনা পুনরধিকার করিয়াছে। তবে, এখন ডোনেৎস্ নদীর তীরে তাহাদের পূর্ব্বাভিমুখী অগ্রগতি প্রতিহত।

দক্ষিণ-রণাঙ্গনে যুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তিত হওয়ায় গত ফেব্রুয়ারী মাসে রুশ সমর-নায়কগণ মধ্য-রণাঙ্গনে অবহিত হন। এই অঞ্চলে রেজভ ও ভিয়াস্‌মা অধিকার করিয়া রুশ সেনা স্মলেন্স্ক অভিমুখে আক্রমণ প্রসারিত করে; স্মলেন্স্কের ৩০ মাইল দূরে তাহাদিগের উপস্থিতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে রুশ-সৈন্য কর্ত্তৃক ভেলিকাই-লুকি অধিকৃত হওয়ায় উত্তর-পশ্চিম দিক্ হইতেও স্মলেন্স্ক নিরাপদ ছিল না। শীতকালে দক্ষিণ-রুশিয়ায় সোভিয়েট বাহিনীর অগ্রগতির তুলনায় মধ্য-রণাঙ্গনে তাহাদের সহযোদ্ধৃগণের গতি মন্থর। কাজেই, জার্ম্মাণী এখানে প্রতিরোধ-ব্যবস্থা সুসংগঠিত করিবার প্রচুর সময় পাইয়াছে। বর্ত্তমানে এই অঞ্চলেও বরফ গলিতে আরম্ভ করিয়াছে; ফলে, এখানে উভয় পক্ষের সেনাবাহিনীই এখন একরূপ নিষ্ক্রিয়।

কুবানে রুশ সেনা কৃষ্ণসাগরের অন্যতম প্রধান পোতাশ্রয় নভরোসিস্কের পূর্ব্বাংশে প্রবেশ করিয়াছে।

আসন্ন গ্রীষ্মে দক্ষিণ-রুশিয়ায় জার্ম্মাণীর শেষ অভিযানের আয়োজন এখন দ্রুত চলিতেছে। জার্ম্মাণী এই বৎসরও সমগ্র দেড় হাজার মাইল রণাঙ্গণে তৎপর না হইয়া কেবল দক্ষিণ-রুশিয়াতেই প্রচণ্ড আঘাত করিতে প্রয়াসী হইবে বলিয়া মনে হয়। গত ফেব্রুয়ারী মাসের শেষভাগে ও মার্চ্চ মাসে জার্ম্মাণ সমর-নায়কগণ দক্ষিণ-রুশিয়ায় যে সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহাতে ঐ অঞ্চলে ব্যাপক অভিযানে প্রবৃত্ত হইবার সুবিধা তাঁহাদিগের হইয়াছে। ডোনেৎস্ নদীর পশ্চিম দিকে যে অঞ্চল জার্ম্মাণীর হস্তচ্যুত হইয়াছিল, তাহা পুনরুদ্ধারে বিলম্ব না হওয়ায় জার্ম্মাণী তথায় সহজেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছে; তাহার সরবরাহ-সূত্রও দৃঢ় হওয়া সম্ভব। অভিযান-পরিচালনের উপযোগী বিশাল ঘাঁটী খারকভ এখন জার্ম্মাণীর অধিকারভুক্ত। হিট্‌লার তাঁহার গত ২১শে মার্চ্চের বক্তৃতায় আশা প্রকাশ করিয়াছেন—"**We have stabilised the front and taken steps to ensure that in the months to come we shall achieve success.**"

বর্ত্তমানে রুশিয়ার সমর-নেতৃবর্গ এক দিকে যেমন ডোনেৎস্ অঞ্চলে জার্ম্মাণীর আরও পূর্ব্বাভিমুখী অগ্রগতি প্রতিরোধে ব্যস্ত, তেমনই অন্য দিকে তাঁহারা পূর্ব্বাঞ্চলে আপনাদিগকে উত্তমরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। ষ্টালিনগ্রাডের পশ্চিমে এবং ককেসাস্ অঞ্চলে যে সকল স্থান শীতকালে রুশ-সেনার অধিকারভুক্ত হইয়াছে, তথায় এখন শত্রুর পরবর্ত্তী আক্রমণ-প্রতিরোধের আয়োজন দ্রুত চলিতেছে। শ্রম-শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কার করিয়া, সরবরাহ-ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করিয়া এবং প্রতিরোধ-ব্যূহগুলি দৃঢ় করিয়া সোভিয়েট সমর-নায়কগণ এখন আসন্ন গ্রীষ্মকালীন অভিযান-প্রতিরোধের ব্যবস্থায় বিশেষ ভাবে অবহিত।

৫।৪।৪৩ শ্রীঅতুল দত্ত।

সাময়িক প্রসঙ্গ

ব্যর্থ চেষ্টা

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে ১৩ই চৈত্র মুস্লিম লীগের সহায়তায় য়ুরোপীয় দল তদানীন্তন সচিবমণ্ডলীকে অপসারিত করিবার যে দারুণ অপচেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা সফল হয় নাই। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গ-প্রদেশে যে ভীষণ খাদ্য-সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকে অবলম্বন করিয়াই য়ুরোপীয় দলের সদস্য মিষ্টার কে, এ, হামিল্টন বর্ত্তমান খাদ্য-সঙ্কটে সচিবমণ্ডলী বিশেষ কিছুই করিতে পারেন নাই বলিয়া এই ছাঁটাই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন। এই সচিবমণ্ডলীকে অপসারিত করিবার জন্য ইহার পূর্ব্বে আরও দুই বার য়ুরোপীয় ও মুস্লিম লীগের সম্মিলিত আক্রমণ ব্যর্থ হইয়াছিল। অথচ ইহার পূর্ব্বতন সচিবমণ্ডলীর অপসারণ জন্য পূর্ব্বে য়ুরোপীয় দলের বিশেষ চেষ্টা দেখা যায় নাই। হক-বন্দ্যোপাধ্যায়-বসুসমন্বয়ে গঠিত সচিবমণ্ডলীর আমলে বাঙ্গালায় এই খাদ্য-সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া সাধারণে উত্তেজিত এবং উত্যক্ত—সাধারণের সেই ভাব লক্ষ্য করিয়া তাহাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ-কল্পেই য়ুরোপীয় ও মুস্লিম লীগদল এ প্রস্তাব করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। অবশ্য সভাস্থলে বাক্যের ছটা, হাত-নাড়ার ঘটা এবং এই সম্পর্কে সকল দোষ সচিবমণ্ডলীর উপর চাপাইবার চেষ্টা চলিয়াছিল। মুস্লিম লীগের পক্ষ হইতে মিষ্টার সুরাবর্দ্দী বাগ্‌বিন্যাস-বহুল বক্তৃতা করিয়াছিলেন, এবং শ্রীযুত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অকাট্য যুক্তি উপস্থিত করিয়া সকল নিরপেক্ষ লোকের সন্তোষ সম্পাদন করিয়াছিলেন। উক্ত সচিবমণ্ডলীর উপর এই অভিযোগ উপস্থিত করা হয় যে, তাঁহারা এই সমস্যা সমাধানে অযোগ্যতা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা চোরা বাজার বন্ধ করিতে পারেন নাই; ফাট্‌কাবাজী রহিত করিতে এবং খাদ্য-শস্যের গোপন-সঞ্চয় নিবারণ করিতে অক্ষম হইয়াছেন। অতএব তাঁহারা অযোগ্য! আস্থাহীনতার এই গর্হিত প্রস্তাব গ্রাহ্য হইলেই উক্ত সচিবমণ্ডলীকে পদত্যাগ করিতে হইত। মিষ্টার সুরাবর্দ্দীর বক্তৃতার উত্তরে শ্রীযুত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন, এই ব্যাপারে এমন কতকগুলি রহস্য নিহিত আছে,—যাহার উপর সচিবমণ্ডলীর কোন হাতই নাই। খাদ্য-সমস্যার সমাধান অত্যন্ত কঠিন। কারণ, অনেকগুলি ব্যাপার সম্মিলিত হইয়া এই পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করেন,—(১) ব্রহ্মদেশ পরহস্তগত হওয়াতে তথা হইতে চাউল আমদানী বন্ধ হইয়াছে, সে দোষ কি সচিবদের? (২) ব্রহ্মদেশ পরহস্তগত হওয়াতে বহু লোক এই প্রদেশে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে, সে জন্য কি সচিবরা দায়ী? (৩) সামরিক সঙ্কট উপস্থিত হওয়াতে অনেক লোক সরাইতে হইয়াছিল, সে দোষও কি সচিবদের? (৪) এই প্রদেশের কতকগুলি বিশেষ অসুবিধা ঘটিয়াছিল, সে জন্য কি সচিবরা দায়ী? (৫) ভারত সরকার নৌকা এবং যান-বাহন বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, সেই জন্য মাল-চলাচলের অসুবিধা ঘটিতেছে, তাহাও কি সচিবদিগের দোষ? (৬) এ দেশ হইতে অন্য দেশে চাউল রপ্তানী করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল, সে দায়িত্বও কি সচিবদিগের? (৭) যুদ্ধের জন্য বহুসংখ্যক সৈন্যকে খাওয়াইতে হইতেছে, সে জন্যও কি সচিবরা অপরাধী? (৮) ঝড়, জল, বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপদ্রবে এ দেশের শস্যহানি ঘটিয়াছে, সে দোষ কি সচিবদিগের স্কন্ধে চা[...] (৯) এবার যে শীতের ফসল হইল না, তাহাও কি সচি[...] (১০) এতগুলি অসুবিধা যে জটলা পাকাইয়া বা[...] দুর্দ্দৈব ঘটাইয়াছে, সে দোষও কি সচিবদিগের? প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া যে পণ্য খরিদ করা হইয়াছিল সচিবদিগের কোন হাত ছিল না,—সে জন্যও কি স[...] করিতে হইবে? বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এই উক্তি[...] জবাব দিতে পারেন নাই! তাহার পর ভারত[...] নাগরিকদিগের খাদ্য-সরবরাহের জন্য এক জন নিরঙ্কু[শ] কর্ত্তাও নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার কার্য্য সম্বন্ধে[...] বলিবার অধিকার ছিল না। এরূপ অবস্থায় সচিবমণ্ড[লী] সঙ্কট সম্বন্ধে কোন মতে দায়ী করা সঙ্গত হইতে পারে[...] বিষয়, এই দিন মুস্লিম লীগের কয়েক জন সদস্য অ[...] পরিষদে উপস্থিত, কিন্তু জাতীয় দলের কয়েক জন[...] ছিলেন। ইঁহাদের অনুপস্থিতির অন্তরালে কোন র[...] না ত? যাহা হউক, ভোটে সচিবমণ্ডলীই জয়লাভ[...] উক্ত সচিবমণ্ডলী ত্রুটি-শূন্য না হইতে পারেন—সে ত্র[...] শাসন আইনই অনেকটা দায়ী। বাঙ্গালায় উক্ত [...] ত্রুটি থাকুক, লীগপন্থীদিগের দ্বারা গঠিত সচিব[...] ভাবে ত্রুটি প্রকাশ করিবেন, দেশের লোকের মনে সে[...] আশঙ্কা আছে। সেই জন্য য়ুরোপীয় দল-সনাথ লী[গ] বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। এই সচিবমণ্ডলী সাধারণের আস্থাভাজন ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ না[ই।] কি তাঁহারা য়ুরোপীয়দিগের চক্ষুঃশূল হইয়াছিলেন?

সম্মিলিত ভারতীয় বণিক্-সভ[া]

১৪ই চৈত্র শনিবারে নূতন দিল্লী সহরে ভারতের স[...] সভায় যে অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাহার সভাপতি বিহারীলাল মেটার অভিভাষণে এ দেশের রাজনীতিব[...] বিষয়ের কথা বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে[...] প্রয়োজনীয়তায় আলোচ্য বিষয়গুলি মূল্যবান্। রা[...] গুলি সম্বন্ধে ইনি বলিয়াছেন, (১) ভারত সরকার অবি[...] হস্তে কার্য্যকরী ক্ষমতা ছাড়িয়া দিবেন, ঘোষণা করুন। বন্দীদিগকে অবিলম্বে মুক্তি দিয়া তাঁহাদিগকে অন্যা[...] সম্মিলিত হইয়া জাতীয় সরকার গঠন করিতে দেওয়া[...] দুই দফা রাজনীতিক দাবী যে সর্ব্ববাদিসম্মত, তাহাতে[...] আর্থিক ব্যাপার সম্পর্কে ইনি বলিয়াছেন, জনসা[...] উপরই আর্থিক উন্নতি অপরিহার্য্যরূপে নির্ভর করে। লোক যে আর্থিক ব্যাধিতে পীড়িত হইতেছে, তাহাকে[...] বলিয়া 'ধামা-চাপা' না দিয়া—উহা হইতে দেশকে মু[...] একান্ত কর্ত্তব্য। আমরা তাঁহার কথা সম্পূর্ণ সমর্থ[ন ...] আরও বলিয়াছেন—ভারতবাসীরা আর বিদেশী শ্রমশি[...] মাত্র হইয়া থাকিতে চাহেন না। তাঁহারা কেবল উপকরণগুলির উৎপাদক ও যোগানদার হইয়াও থাকি[...]

তিনি মার্কিণের সহিত সরাসরি চুক্তি করিবার পক্ষপাতী; ইজারা এবং ঋণদান সম্পর্কে সকল স্বীকৃত তথ্যের যথার্থ রহস্য তিনি জানিতে চান, কিন্তু দুঃখের বিষয়, দেশের ব্যবসায়ী-সমাজের বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও সে সকল কথা প্রকাশ করা হইতেছে না। তিনি আরও বলিয়াছেন, ব্রহ্মদেশ, মালয় এবং মধ্যপ্রাচী অঞ্চলে সামরিক অভিযান চালাইবার জন্য ইজারা এবং ঋণদান ব্যবস্থা অনুসারে যে সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহা পরিশোধের গুরু দায়িত্ব ভারতের স্কন্ধে চাপাইয়া ভারতের মেরুদণ্ড ভগ্ন করা সঙ্গত হইবে না। বর্তমানে ভারতের যেরূপ আর্থিক অবস্থা, তাহাতে ভারতের আর্থিক শ্রমশিল্প-সম্পর্কিত, এবং ভারতীয় শাসনযন্ত্রের গঠনগত যেরূপ দশা,—তাহাতে সরকারের ভারতের উপর আর অতিরিক্ত ব্যয়ভার চাপান সঙ্গত নয়। তাঁহার এই কথার সহিত কোন বিচক্ষণ ভারতবাসীই ভিন্ন মত প্রকাশ করিতে পারেন না। ষ্টার্লিং ব্যালান্স সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—ভারতের নামে যে ষ্টার্লিং ব্যালান্স জমা হইতেছে, উহা কি ভাবে ব্যয় বা নিয়োগ করা হইবে, সে বিষয়ে ভারতবাসীর কোন হাত নাই। ভারত সরকার বলিতেছেন,—ও-সব কথা যুদ্ধের পরে হইবে। সভাপতি মহাশয় বলেন, অবিলম্বে ভারতবাসীর সংগঠনমূলক এবং সম্পদ্ রক্ষাকল্পে উহা ব্যয় করা উচিত। বণিক্-পরিষদ যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা উহার দ্বারা বৈদেশিক ঋণ শোধ করিবার কথা বলিয়াছেন। আমরাও সেই কথা বলিয়া আসিতেছি। ঐ প্রস্তাব সার চুণিলাল মেটা উপস্থাপিত করেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে বণিক্-সভায় উহা গৃহীত হয়।

—

সরকারী শ্বেতপত্র

মহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রেস-কর্ম্মী অন্যান্য জননায়কদিগকে গ্রেপ্তার করাতে নিখিল ভারতের স্থানে স্থানে যে অশান্তি-উপদ্রবের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার সকল দায়িত্ব মহাত্মাজী এবং কংগ্রেসের স্কন্ধে চাপাইবার ব্যর্থ প্রয়াসে কিছু দিন পূর্ব্বে ভারত সরকার একখানি পুস্তিকা ভারতে প্রচার করিয়াছিলেন। আমরা সে পুস্তিকা সম্বন্ধে তখন কোন কথাই বলি নাই। কারণ, আমরা জানি, "কতক্ষণ জলের তিলক থাকে ভালে! কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে!" যাঁহারা ভারতের ইদানীন্তন রাজনীতিক গতি নিরপেক্ষ ভাবে লক্ষ্য করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই বুঝিতেছেন—মহাত্মাজী প্রভৃতির বিরুদ্ধে যে হিংসাত্মক কার্য্যের উত্তেজনা প্রদানের অভিযোগ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা একেবারেই মিথ্যা। এই মিথ্যা বা ভ্রান্ত তথ্যপূর্ণ পুস্তিকার ভূমিকায় সার রিচার্ড টটেন্‌হাম এক মন্তব্য দিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি অসঙ্কোচে বলিয়াছিলেন যে, সরকারের সংগৃহীত তথ্যগুলির সমস্ত এই পুস্তিকায় প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু উহাতে যে তথ্য দেওয়া হইয়াছিল, তাহার প্রায় সবগুলিই ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ অথবা ইচ্ছাকৃত বিকৃত, অনেকেই তাহা প্রমাণিত করিয়াছিলেন। 'হরিজন' প্রভৃতি হইতে যে সব উক্তি উদ্ধৃত করা হইয়াছে, পূর্ব্বাপর সঙ্গতিশূন্য করিয়া তাহাকে সুকৌশলে বিকৃত করা হইয়াছে। এ দেশে ঐ পুস্তিকা অগ্রাহ্য হইলেও কর্ত্তারা এবার ছয় হাজার মাইল দূরবর্ত্তী ভারতের ঘটনাবলী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বিলাতী জনসাধারণের নিকট উহা প্রকাশ করিয়াছেন। পুস্তিকাখানিতে ৫০ হাজার শব্দ আছে। পুস্তিকাখানির আসল কথা, কংগ্রেস ভারতে বিশৃঙ্খলার এবং কোন কোন অঞ্চলে প্রকাশ্য বিদ্রোহের সৃষ্টি করিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, লর্ড লিন্‌লিথগোর আমলে এই পুস্তিকা প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদের প্রতিশোধাত্মক ক্রিয়া এইরূপেই সম্পাদিত হইয়া থাকে। প্রতিপক্ষকে বৃথা কলঙ্কিত করিয়া তাহাকে শাস্তি দেওয়া সাম্রাজ্যবাদীদিগের চিরন্তনী নীতি। এই পুস্তিকায় মহাত্মা গান্ধীকে এবং কংগ্রেসকে হিংসাসূচক কার্য্যের প্রেরণাদাতা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার যে চেষ্টা হইয়াছে, তাহা এরূপ ভিত্তিশূন্য এবং অপ্রামাণ্য যে, কোন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি প্রমাণ বলিয়া তাহা দাখিল করিতে পারেন, ইহা কল্পনা করা কঠিন। ভারত সরকারের প্রচারিত পুস্তিকায় এবং বিলাতে প্রকাশিত শ্বেতপত্রের একই উদ্দেশ্য—কংগ্রেসকে এই অশান্তি এবং হিংসাত্মক আন্দোলনের জন্য দায়ী প্রতিপন্ন করা। প্রকৃত তথ্য যাঁহারা জানেন, তাঁহারাই স্বীকার করিবেন, সরকারের সে চেষ্টা নিষ্ফল! কংগ্রেস কখনই হিংসাত্মক কার্য্যের সমর্থন করেন নাই। কিন্তু সরকারী পুস্তিকায় এবং শ্বেতপত্রে এই অশান্তির পসরা কংগ্রেসের স্কন্ধে বিনা প্রমাণে চাপাইয়া সরকার সরাসরি সিদ্ধান্ত করিতে চান যে, কংগ্রেস এই অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার পর তাঁহারা বলিতেছেন, "এই অশান্তি বিদ্রোহের লক্ষণ প্রকটিত করিতেছে। অতএব তাঁহাদের ন্যায়তঃ সিদ্ধান্ত এই বিদ্রোহের স্রষ্টা কংগ্রেসকে দমন করিতে হইবে।" বলা বাহুল্য, এই সিদ্ধান্তের আগাগোড়াই ভুল। কংগ্রেস যে স্বাধীনতার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, "ভারতের স্বাধীনতাই তাঁহাদের লক্ষ্য এবং কংগ্রেস গম্ভীর ভাবে প্রতিজ্ঞা করিতেছেন যে, পূর্ণ স্বরাজলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা অহিংস ভাবেই সেই আন্দোলন পরিচালনা করিবেন।" সে সিদ্ধান্ত হইতে কংগ্রেস এ পর্য্যন্ত বিচলিত হন নাই। কংগ্রেস যে শত্রুপক্ষের সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন, এ কথা বলা উৎকট মিথ্যাচার। কারণ, গত ১৪ই জুলাই ওয়ার্দ্ধায় কংগ্রেস যে মন্তব্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতেও তাঁহারা অতি স্পষ্ট ভাষাতেই বলিয়াছিলেন যে, "ভারতবর্ষের লোকের সম্মিলিত শক্তি এবং ইচ্ছা দিয়াই ভারতকে শত্রুপক্ষের আক্রমণে বাধা দানে সমর্থ করাই কংগ্রেসের একান্ত বাসনা।" ইহার উপর কংগ্রেসকে বিদ্রোহের অধিনায়ক প্রতিপন্ন করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা নহে কি? মহাত্মাজীকে গ্রেপ্তার করিবার পর তাঁহার নামে প্রচারিত কয়েকটা হিংসার উত্তেজক ইস্তাহার না কি সরকার পাইয়াছেন! উহা যে মহাত্মাজীর লেখা, এ পর্য্যন্ত তাহা প্রমাণিত হয় নাই। জয়প্রকাশ লালের ইস্তাহার যে জয়প্রকাশের লিখিত বা জানিত, তাহারও একান্ত প্রমাণাভাব। উহা যে উঁহাদিগের শত্রুপক্ষের লিখিত এবং প্রচারিত নয়, তাহার অকাট্য প্রমাণ সরকার পাইয়াছেন কি? 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' যথার্থই বলিয়াছেন, "সরকারের শ্বেতপত্রখানি ফরিয়াদী পক্ষের উকিলের বক্তৃতা।" আমাদের মনে হয়, উহা নিতান্ত ছেঁড়া উকিলের বক্তৃতা! পর্য্যাপ্ত চাউল কিনিয়া সে-চাউল গোপনে বিদেশে চালান দিয়া যে দেশে তারস্বরে "চোরা বাজার" "চোরা বাজার" বলিয়া ঘোষণার চীৎকারে আকাশ-মেদিনী প্রকম্পিত হয়, সে দেশে সবই সম্ভব। এই সম্পর্কে একটা বিষয় শুধু বিশেষ লক্ষ্য করিবার আছে। যে সময় উপবাসজনিত কষ্টে মহাত্মাজীর

প্রাণ লইয়া টানাটানি, সেই সময়ে ভারত সরকারের পুস্তিকা এ দেশে প্রকাশিত হইয়াছিল। আবার যে সময়ে বড়লাট সর্ব্বদলের প্রতিনিধিদিগের সহিত সাক্ষাতের প্রস্তাব গ্রহণ করেন, সেই সময় বিলাতে এই শ্বেতপত্র প্রচারিত হইয়াছে! ইহাতে বুঝ লোক যে জান সন্ধান!

—

পদত্যাগ

বাঙ্গালার প্রধান-সচিব মিষ্টার ফজলুল হক পদত্যাগ করিয়াছেন বা পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার জন্য ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই ব্যবস্থাপক সভায় তিন বার তাঁহার উপর অনাস্থাসূচক প্রস্তাব আনীত হইয়াছিল, তিন বারই তিনি ভোটাধিক্যে জয়লাভ করিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যায়, তাঁহার উপর ব্যবস্থাপক সভা এবং দেশের জনসাধারণের আস্থা কতখানি! যখন বুঝা গেল, ভোটে তাঁহাকে পরাজিত করা সম্ভব হইবে না, তখন বাঙ্গালার সর্ব্বশক্তিমান্ শাসনকর্ত্তা সার জন হার্ব্বার্ট তাঁহাকে পদত্যাগ করিবার নির্দ্দেশ প্রদান করেন। এমন কি, মিষ্টার হকের পদত্যাগ-পত্রও তাঁহার স্বাক্ষর-প্রতীক্ষায় লাটভবনে টাইপ করিয়া প্রস্তুত রাখা হইয়াছিল! পত্র-স্বাক্ষরের পূর্ব্বে সহযোগীদিগের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য মিষ্টার হক সময় চাহিয়াছিলেন, সে সুযোগও তাঁহাকে দেওয়া হয় নাই—ইহা তাঁহার উক্তি হইতেও প্রকাশ পাইয়াছে। ১৪ই চৈত্র রবিবার সন্ধ্যার সার জন হার্ব্বার্ট মিষ্টার হককে লাটপ্রাসাদে আহ্বান করেন। রাত্রি সাড়ে ৭টার সময় তিনি লাটভবনে গিয়াছিলেন এবং রাত্রি ৯টার পর পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত বঙ্গীয় লাটের অনেক কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। লাট বাহাদুর তাঁহার নিকট যে সকল প্রস্তাব করিয়াছিলেন,—আত্মমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহার মধ্যে অনেকগুলি প্রস্তাবে তিনি সম্মত হইতে পারেন নাই। পরদিন এই কথা প্রকাশ পাইবার পর ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্যগণ অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন। এমন কি, প্রতিপক্ষ দলের নেতা সার নাজিমুদ্দীনও সে-সভায় একটি কথা বলিতে পারেন নাই! লাট বাহাদুর জাতীয় সরকার গঠনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু যে ভাবে তিনি সে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, মিষ্টার হক তাহাতে সম্মত হইতে পারেন নাই। এই ব্যাপারে বাঙ্গালা দেশে তুমুল বিক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে। কলিকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কের সাধারণ জনসভায় সে বিক্ষোভ তরঙ্গায়িত হইয়াছিল। মিষ্টার ফজলুল হক স্বাধীন ভাবে কায করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। স্থায়ী রাজ-পুরুষগণ সচিবদিগের তোয়াক্কা না রাখিয়াই সকল কাজ চালাইতেন —তিনি এই কথা বলিয়াছেন বলিয়া অনেক য়ুরোপীয় সদস্যের বিরাগভাজন হন। শ্রদ্ধানন্দ পার্কের সভায় ডাক্তার শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন—য়ুরোপীয় দল মিষ্টার হকের নিকট প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, তিনি যদি শ্যামাপ্রসাদ বাবুর উক্তি অস্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহারা সকলে মিষ্টার হকের কার্য্যের সমর্থন করিবেন। কিন্তু যাহা সত্য, মিষ্টার হক তাহা অস্বীকার করিতে অসম্মত হন। সেই জন্য তাঁহার পদচ্যুতি ঘটিয়াছে। শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যদি এ কথা বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে অনেকেই তাহা বিশ্বাস করিবে। অকস্মাৎ সাধারণের আস্থাভাজন সচিবকে এই ভাবে পদত্যাগে বাধ্য করা অত্যন্ত অসঙ্গত ও অশোভন হইয়াছে। এরূপ ব্যাপার ভারতেই সম্ভব!

ইহা হইতে ভারতের প্রাদেশিক শাসন-যন্ত্রের স্থায়িত্ব কিরূপ অনিশ্চিত এবং উহার বনিয়াদ কত ভঙ্গুর, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। বুরোক্রেসী আপন সুবিধামত অনায়াসে উহা ভাঙ্গিয়া দিতে পারে। উহা তথাকথিত স্বায়ত্ত-শাসনের একটা রঙ্গীণ কাগজের দর্শনধারী এবং শূন্যগর্ভ মূর্ত্তিমাত্র! ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে সরকারের সহিত কংগ্রেসের মতভেদ ঘটিলে কংগ্রেস-দলভুক্ত সদস্যগণ যখন সাতটি প্রদেশের সচিবত্ব বর্জ্জন করিয়াছিলেন, তখন সরকার পুনর্নির্ব্বাচনে সাহসী না হইয়া ঐ সাতটি প্রদেশের গভর্ণরের হস্তেই স্বৈরিতার সহিত শাসন-কার্য্য পরিচালনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তখনই ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের পরিকল্পিত শাসন যন্ত্র ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। অবশিষ্ট ছিল চারিটি প্রদেশ। তাহার পর যখন ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে মৌলভী সার মহম্মদ সাদুল্লার সচিবত্ব ভাঙ্গিয়া আসামের গভর্ণর ভারত-শাসন আইনের ৯৩ ধারা অনুসারে কিছু দিনের জন্য শাসন-যন্ত্র চালাইতে থাকেন, এবং শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার চৌধুরীকে সচিব-পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে অস্বীকার করেন, তখনই আসামের শাসনযন্ত্র ভাঙ্গিয়া যায়। তাহার পর সার মহম্মদ সাদুল্লাকে প্রধান-সচিব করিয়া আবার আসামে সচিবসঙ্ঘ সংগঠিত করা হইয়াছে। ইহার পর বড়লাটের নির্দ্দেশে সিন্ধুপ্রদেশে প্রধান-সচিব আল্লাবক্সকে পদচ্যুত করা হইলে সিন্ধুদেশের শাসনযন্ত্র ভাঙ্গিয়া যায়। এখন সেখানে জোড়াতালি দিয়া মুসলিম লীগের সার গোলাম হুসেন হিদায়েৎউল্লাকে সচিব করিয়া কোনরূপে কাজ চালান হইতেছে। এবার বাঙ্গালার পালা। সার জন হার্ব্বার্ট ব্যবস্থা পরিষদের এবং সর্ব্বসাধারণের আস্থা-ভাজন মৌলবী ফজলুল হককে কার্য্যে ইস্তফাদানে বাধ্য করিয়া বাঙ্গালার শাসনভার স্বনেতৃত্বে গ্রহণ করিয়াছেন। পরে হয়ত সার হার্ব্বার্ট মুস্লিম লীগের দলভুক্ত এবং য়ুরোপীয় সদস্যদিগের প্রীতিভাজন সার নাজিমুদ্দীনকে প্রধান-সচিব-পদ দিতে পারেন,—কিন্তু দেশপ্রাণ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর নির্দ্দেশে গঠিত বাঙ্গালার সচিবসঙ্ঘ যেরূপ ছিল, তাহার অধিক উৎকর্ষ সাধন সহজ-সাধ্য নয়। এই নাজিমুদ্দীনী দলের প্রাদুর্ভাব-কালে ঢাকায় ভীষণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও বাঙ্গালায় স্থানে স্থানে ঘোর অশান্তি হইয়াছিল, বাঙ্গালী নিশ্চয় এত শীঘ্র তাহা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই! এখন লাটপ্রাসাদে সার নাজিমুদ্দীনের ও সুরাওয়ার্দ্দী সাহেবের ঘন ঘন ডাক পড়িতেছে—এত ডাক নিষ্ফল হইবে বলিয়া মনে হয় না! বঙ্গীয় লাট ভারত-শাসন সংস্কার আইনের ৯৩ ধারা অনুসারে স্বৈরক্ষমতা-বলে বাঙ্গালার বাজেট পাশ করিয়াছেন। ইহাই আমাদের প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের স্বরূপ!

—

বাঙ্গালা প্রদেশ "লাল এলাকা" বলিয়া বিঘোষিত

১৬ই চৈত্র সরকার সমগ্র বাঙ্গালা প্রদেশকে লালমার্কা বা বিপদ-জনক দেশ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। অর্থাৎ এই প্রদেশে পূর্ব্ব দিক্ হইতে যে কোন স্থান শত্রুপক্ষ কর্ত্তৃক বিমান-পথে আক্রান্ত হইতে পারে। সরকার আচম্বিতে এই ঘোষণা কেন করিলেন, বুঝা কঠিন। ইহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই। জাপান যে দিন আরাকান্-বিজয় শেষ করিয়াছে, সেই দিন হইতেই আসাম এবং বাঙ্গালার

এই বিপদের আশঙ্কা সূচিত হইয়া আছে। জাপানী বিমান চট্টগ্রাম ও আসাম অঞ্চলের যে সকল স্থান আক্রমণ করিয়াছে, তাহাতে কোথাও বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে নাই বলিয়া সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ। তাহা যদি সত্য হয়, তবে এইরূপ ঘোষণা করিয়া লোককে আতঙ্কিত করা সঙ্গত হয় নাই। কেহ কেহ বলিতেছেন যে, কলিকাতা কর্পোরেশন সিভিল ডিফেন্স সম্পর্কিত ব্যয় সঙ্কোচ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন বলিয়া সরকার তাহাতে আপত্তি করেন; সেই জন্য ভারত সরকার সহসা এই ঘোষণা করিয়াছেন। যাহা হউক, সরকার পরে তাঁহাদের বিবৃতি সংশোধন করিয়া ১১শে চৈত্র যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে বলিয়াছেন—"বিপজ্জনক অঞ্চল শব্দের কোন বিশেষ অর্থ নাই। বাঙ্গালা সম্পর্কে এই কথার প্রয়োগে এরূপ বুঝায় না যে, গত ১২ মাসের তুলনায় বাঙ্গালা প্রদেশের বা তাহার কোন অঞ্চলের পক্ষে আকস্মিক আক্রমণের শঙ্কা বাড়িয়াছে।—কক্সবাজার এবং ফেনীতে কয়েক জন লোক মরিয়াছে ও কিছু সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে।" যুদ্ধে—বিশেষ বর্ত্তমান কালের যুদ্ধে—এরূপ ঘটিবেই। সে জন্য আতঙ্কিত হইলে চলিবে কেন?

গান্ধীজীকে কি অভিযুক্ত করা হইবে?

মহাত্মা গান্ধীজীকে আদালতে অভিযুক্ত করা হইবে বলিয়া একটা প্রবল গুজব উঠিয়াছিল। বড়লাট গান্ধীজীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও ঐরূপ একটা ইঙ্গিত ছিল। ১০ই চৈত্র নয়া-দিল্লীর রাষ্ট্রীয় সভায় রাজা যুবরাজ দত্ত সিংহ প্রশ্ন করেন যে, মহাত্মা গান্ধী এবং তাঁহার সহকর্ম্মীদিগকে আইন অনুসারে প্রতিষ্ঠিত কোন আদালতে অভিযুক্ত করা হইবে কি? সরকার পক্ষ হইতে স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী মিষ্টার কনরান্ স্মিথ উত্তরে বলেন যে, "বর্ত্তমান সময়ে সরকার প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন না।" মিষ্টার এইচ, ইমাম জিজ্ঞাসা করেন, "এই উত্তরে কি বুঝিতে হইবে যে, সরকার এ বিষয়ে মামলা উপস্থিত করিবেন না?" উত্তরে মিষ্টার স্মিথ বলেন, "আমি যে উত্তর দিয়াছি, তাহা ভিন্ন আমার আর কিছুই বলিবার নাই।"

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উচ্ছেদ

বাঙ্গালার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিলোপ-সাধন এবং শাসকবর্গের সহিত প্রকৃত কৃষীবলের সরাসরি সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইবে, এই কথা বঙ্গীয় রাজস্ব বিভাগের বিদায়প্রাপ্ত সচিবের মুখে ১লা চৈত্র প্রকাশ পাইয়াছিল। ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট সম্বন্ধে সরকার যে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহারই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিলোপ সাধন করা হইবে। ইহার জন্য জমিদারগণকে ষ্টেটের অবস্থানুসারে নিট্ মুনাফার দশ গুণ হইতে পনর গুণ পর্য্যন্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে। নবগঠিত বিশেষ আদালত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ধার্য্য করিবেন এবং সেই সিদ্ধান্তই চরম বলিয়া গণ্য হইবে। ফরিদপুর জিলায় প্রথম জমিদারী কিনিয়া সরকার পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। এই সম্বন্ধে ব্যবস্থাপক পরিষদে যে বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিপক্ষে কেহ অধিক কথা বলেন নাই; তবে অধিকাংশ সদস্যই এই কথা বলিয়াছিলেন যে, বিষয়টির গুরুত্ব-বিবেচনায় যুদ্ধান্তে ইহা আলোচনা করা কর্ত্তব্য। আমাদের মনে হয়, বর্ত্তমান যুদ্ধের সময় সরকার যদি সমস্ত জমিদারী সর্ত্ত খরিদ করেন, তাহা হইলে বিশেষ ভুল করিবেন। বাঙ্গালার সমস্ত জমিদারীর মোট আয় ১৩ কোটি টাকা হইবে। তাহা হইতে খরচ-খরচা বাদ দিলে নিট্ মুনাফা দাঁড়ায় ৭ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা। উহা যদি সরকার ১০ গুণ পণে অর্থাৎ জলের দরেই কিনিয়া লন, তাহা হইলে উহার পণ বাবদ ৭৭ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ঋণ করিতে হইবে। তাহার উপর বকেয়া খাজনার জন্য ১৩ কোটি ধরিতে হইবে। রেকর্ড সংশোধন বাবদ ব্যয় হইবে ৫ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা; এবং ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা তহশিল আফিস এবং আমলাদিগের বসত-বাটী নির্ম্মাণ বাবদ খরচ পড়িবে। সর্ব্বসমেত ৯৭ কোটি ২০ লক্ষ টাকা বা প্রায় ৯৮ কোটি টাকা খরচ পড়িবে। সরকার যদি ঐ টাকাটা ঋণ করিয়া লন, তাহা হইলে সে বাবদ শতকরা ৪ টাকা হিসাবে সুদ দিতে হইলে বার্ষিক ৩ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা ব্যয় চাপিয়া বসিবে। ইহা খুব কম করিয়া ধরা হইল। এই যুদ্ধের সময় সরকারের এত টাকা ঋণ ঘাড়ে লওয়া কি কর্ত্তব্য? তাহার পর দশ গুণ পণে জমিদারী কিনিলে জমিদারদিগের উপর ঘোর জুলুম করা হইবে। উহা ১৫ গুণ পণেই কেনা উচিত। কমিশনের হিসাব মতে ১৫ গুণ পণে জমিদারী কিনিলে সরকারের বিশেষ লাভ হইবে না। তাহাতে বার্ষিক ৩৩ লক্ষ টাকা আয় হইবার সম্ভাবনা। ইহার জন্য এত টাকা সরকারের দেনা করা উচিত হইবে না। বিশেষ এই যুদ্ধজনিত দুর্ম্মূল্যতার সময়ে লোকে যখন খাইতে না পাইয়া হাহাকার করিয়া মরিতেছে, তখন এ প্রস্তাব কোন মতেই লাভজনক মনে করা যাইতে পারে না। মৌলভী ফজলুল হক যুদ্ধের সময়ে এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া বিশেষ বুদ্ধিমানের কাজ করেন নাই। কর্জ্জ করিয়া ঐ টাকা লইতে হইলে কত দিন ধরিয়া সুদ টানিতে হইবে, তাহার স্থিরতা নাই। সে দেনা কত দিনে পরিশোধ হইবে, তাহাও বলা কঠিন। ইহাতে কৃষীবল বা জনসাধারণ কোন পক্ষেরই মঙ্গল হইবে না।

মরীচিকা

কেবল আশায় যদি ক্ষুধা মিটিত এবং নগ্নতা দূর হইত, তবে আমাদিগের আর অভাব কি? সরকার বলিয়াছেন, প্রতিদিন কলিকাতায় গাড়ী-গাড়ী চাউল—জাহাজ-বোঝাই গম আসিতেছে। কথা হয়ত সত্য, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত সেই সকল মাল-গাড়ী খালি করিয়া কোথায় পর্ব্বতের সৃষ্টি হইতেছে, সে খবর জনসাধারণ পায় নাই। মূল্য এবং অভাব সমতালেই মারাত্মক ভাবে বিরাজ করিতেছে।

বর্ষকাল ধরিয়া ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ পাইবার আশায় মজিয়া তালি দিয়া গেরো বাঁধিয়া লোকে ছেঁড়া কাপড় পরিয়া কোন মতে লজ্জা-নিবারণ করিতেছে। পূজার পূর্ব্বে আসিবার কথা ছিল, কিন্তু দোল-দুর্গোৎসব পার হইয়া চৈত্র-সংক্রান্তিও অতীত হইল, কিন্তু সেই লজ্জা-নিবারণ বস্ত্র আর আসিল না। এখন সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, বাঙ্গালা দেশের দুঃখ অবসানের আর বিলম্ব নাই। ২৮ লক্ষ ৯৩ হাজার ৯ শত ১৭ গজ কাপড় মিলে প্রস্তুত হইতেছে—এমন কি, কলিকাতার এক জন ভাগ্যবান্ ব্যবসায়ীর নিকট না কি বহু-আকাঙ্ক্ষিত ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় আসিয়াছে। সে

কাপড়ে ধুতি ও শাড়ীর পাড়ের তারতম্য নাই—সবই ফিতে পাড়—ইহা হয়ত সাম্যবাদ-প্রসারের প্রচেষ্টা! কিন্তু এ-কাপড়ে আশা-পূরণের সম্ভাবনা কোথায়? বাঙ্গালার লোক-সংখ্যা সামন্ত রাজ্য বাদে ৬ কোটি ৩ লক্ষ ৬ হাজার ৫ শত ২৫ জন। হিসাব করিলে দেখা যায়, প্রত্যেকের ভাগ্যে দেড় ইঞ্চিরও কম বস্ত্র জুটিয়াছে বা মিলিতে পারে! ইহাতে কৌপীনও সম্ভব নয়—ঘুন্সী হইতেও পারে! তবে কি সরকার এ দেশে নগ্নতা সম্বন্ধে পুলিসের নিয়ম শীঘ্রই অর্ডিনান্স জারি করিয়া পরিবর্ত্তিত করিবেন?

বাজেটে বৈষম্য

কেবল বাঙ্গালা দেশেই আগামী বর্ষের বাজেটে টাকার ঘাটতি ঘটিয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ প্রদেশেই অর্থের বেশ স্বচ্ছলতা দেখা গিয়াছে। পঞ্চনদ প্রদেশে আগামী বর্ষের বাজেটে ৬ লক্ষ টাকা, যুক্তপ্রদেশে বর্ত্তমান বৎসরান্তে ৮ লক্ষ টাকা, বিহারে এই বর্ষশেষে ৬১ লক্ষ টাকা এবং মধ্যপ্রদেশের বাজেটেও ৭ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে। বোম্বাই প্রদেশেও উদ্বৃত্ত অর্থের পরিমাণ অল্প নহে। এই সকল প্রদেশের প্রয়োজনীয় খরচের বরাদ্দ কমাইয়া এই টাকা উদ্বৃত্ত দেখান হয় নাই। কংগ্রেস সচিবমণ্ডলী যে সকল বিষয়ে যে ব্যয় বরাদ্দ করিয়া গিয়াছেন, তাহাও বিশেষ কমান হয় নাই। পক্ষান্তরে মধ্যপ্রদেশের সরকার যুদ্ধের পরবর্ত্তী সংগঠনের জন্য ১০ লক্ষ টাকা জমা দিয়াছেন। আমাদের এই বাঙ্গালা দেশেই কেবল "নাই-নাই" রব এবং অভাবের ক্রন্দন! শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি জনহিতকর কার্য্যের জন্য ব্যয়ের বরাদ্দ কমান হইয়াছে।

সাম্রাজ্যবাদ ত্যাগ করিতেই হইবে

সম্প্রতি মিষ্টার ওয়েণ্ডেল উইল্‌কি "ওয়ান ওয়ার্ল্ড" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"যদি কথায় কাজে ঠিক রাখিতে হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে সাম্রাজ্যবাদ ত্যাগ করিতে হইবে এবং যে সকল জাতি আত্মশাসনে সমর্থ, তাহাদিগকে স্বাধীনতা দিতে হইবে।" তিনি এই পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, চীনের সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই বলিয়াছেন, "যদি ভারতবাসীকে স্বাধীন করিয়া দিতে বিলম্ব করা হয়, তাহা হইলে সে জন্য বৃটেন নিন্দিত হইবে না,—মার্কিণই নিন্দাভাজন হইবে।" মিষ্টার ষ্টিল ভারত হইতে মার্কিণে ফিরিয়া গিয়া 'সিকাগো ডেলী নিউজ' পত্রে এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "বৃটেন যে সকল তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন, সে সকল তথ্য হইতে কংগ্রেসের নেতাদিগের সহিত জাপানীদিগের সম্বন্ধ কিছুমাত্র প্রমাণিত হয় না।" প্রকৃত কথা বুঝিতে কাহারও বাকী থাকে না। প্রতারণাই সাম্রাজ্যবাদীদিগের নীতির মূলমন্ত্র। সাম্রাজ্যবাদীরা কোন কার্য্যের উদ্দেশ্য প্রকাশ করেন না। সুতরাং তাঁহাদিগকে কথায় ও কাজে মিল দেখাইতে বলা বৃথা।

পরলোকে সত্যমূর্ত্তি

স্বদেশ-সেবায় আত্মনিবেদিতপ্রাণ এস, সত্যমূর্ত্তি ৫৬ বৎসর বয়সে কার্ব্বাঙ্কল অস্ত্রোপচারের পর মাদ্রাজ জেনারেল হাসপাতালে ১৩ই চৈত্র রাত্রি ১টার সময় পরলোক গমন করিয়াছেন। সত্যমূর্ত্তি ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে পাদুকোটা ষ্টেটের সিরুমায় এক মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পাদুকোটা রাজ-কলেজ, মাদ্রাজ ক্রিশ্চিয়ান কলেজ, ও মাদ্রাজ ল কলেজে শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি মাদ্রাজে ওকালতী আরম্ভ করেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে এবং ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে স্বরাজ পক্ষের সদস্যরূপে তিনি বিলাতে যান। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে তিনি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হন, পরে কংগ্রেস দলের ডেপুটী লিডার হন। পরিষদে বক্তৃতায়

এস্, সত্যমূর্ত্তি

অখণ্ডনীয় যুক্তি-তর্কের প্রভাবনৈপুণ্যে তিনি দেশবাসীর সমাদর ও শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন। ১৯৩১ এবং ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে তিনি আইন অমান্য ও সত্যাগ্রহ আন্দোলনের জন্য কারাবরণ করেন। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন হইতে ফিরিবার পথে তিনি আরকোনাম রেল-ষ্টেশনে গ্রেপ্তার হন। প্রথমে ভেলোরে পরে অমরাবতী জেলে তাঁহাকে স্থানান্তরিত করা হয়। সেইখানে অসুস্থ হইলে ২৫শে পৌষ চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে মাদ্রাজ জেনারেল হাসপাতালে পাঠান হয়। ১৯শে মাঘ মুক্তিদানের আদেশ প্রদত্ত হইলেও তিনি হাসপাতালে থাকিয়াই চিকিৎসিত হন এবং সেইখানেই তাঁহার কর্ম্মবহুল জীবনের অবসান ঘটে। তাঁহার মৃত্যুতে ভারতবাসী এক জন শক্তিশালী কর্ম্মী, আদর্শ যোদ্ধা, নির্ভীক দেশভক্তকে হারাইল।

বিক্ষোভ, বোমাবিস্ফোরণ ও গুলীবর্ষণ

১১ই চৈত্র কেন্দ্রী পরিষদে স্বরাষ্ট্র সদস্য জানাইয়াছেন, কংগ্রেসে আন্দোলন আরম্ভের পর হইতে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ভারতে মাত্র ১৮ হাজার ১২০ জনকে জেলে আটক রাখা হয়। এই দিন শ্রীযুত টি, টি, কৃষ্ণমাচারী বন্দীদিগের সম্বন্ধে এক প্রস্তাব প্রসঙ্গে তাঁহাদিগের প্রতি দুর্ব্যবহারের অভিযোগ করেন। ১৫ই—মহাত্মা গান্ধীর সহিত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সাক্ষাতের অনুমতি দিতে বোম্বাই সরকারের আপত্তি। ২৬শে ফাল্গুন সংবাদপত্রে প্রকাশ, মহাত্মা গান্ধীর নির্ব্বাসনের সম্ভাবনা; শ্রীযুত রাজাগোপালাচারির

উৎকণ্ঠা। গান্ধীজী ও তাঁহার সমর্থকগণ লিখিত ভাবে কংগ্রেসের আগষ্ট প্রস্তাব প্রত্যাহার করিলেই তাঁহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইবে বলিয়া বিলাতী সংবাদপত্র মহলের অভিমত প্রকাশ। কিন্তু লণ্ডনের বিশিষ্ট ভারতীয় ও বৃটিশ রাজনৈতিক মহলের আলাপ হইতে জানা যায়, যুদ্ধ যত দিন চলিবে, ততদিন গান্ধীজীকে বন্দী হইয়াই থাকিতে হইবে।

বাঙ্গালা—২৮শে ফাল্গুন, মেদিনীপুরের বন্যা ও বাত্যা সম্পর্কে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের এক সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র বিভাগ-লিখিত এই উত্তর মুদ্রিত হয়—"মেদিনীপুরের এই বিপর্য্যয়ের পূর্ব্বে সমগ্র তমলুক মহকুমার টেলিগ্রাফের তার সমূহ, ডাক ব্যবস্থা, রাস্তা, নদীপথ বা অন্যান্য উপায়ে সংবাদ আদান-প্রদানের পন্থাগুলি কংগ্রেসী আন্দোলনকারীরা ধ্বংস করে। প্রধান সচিব পরিষদে বলেন, "স্বরাষ্ট্র বিভাগ কর্ত্তৃক যে ভাবে উত্তরটি লেখা হইয়াছে, আমি ঠিক সেই ভাবে উহা পাঠ করিতে পারি না। যান বাহন চলাচল ব্যবস্থা ও সংবাদাদি আদান-প্রদান পন্থাগুলি নষ্ট করা হইয়াছিল ইহা ঠিক, কিন্তু কাহারা উহা করে, তৎসম্বন্ধে সঠিক কোন প্রমাণ নাই।" ১১শে চৈত্র, তমলুক মহকুমায় এক চাউলের কল হইতে প্রায় ২ হাজার লোক কর্ত্তৃক ১ হাজার মণ ও ছয় বস্তা চাউল লুণ্ঠন। কয় জন গ্রেপ্তার।

কলিকাতা—১২ই চৈত্র উত্তর ও দক্ষিণ কলিকাতার কয়েক স্থানে তল্লাসী, কয়েকজন গ্রেপ্তার চিত্তরঞ্জন এভিনিউর এক গৃহ হইতে রিভলভার, কার্ত্তুজ ও আপত্তিকর কাগজপত্রপ্রাপ্তি; এ সম্পর্কে জগবন্ধু বসু, অবনীশ্বর মিশ্র, বিমলাংশু, সুধাংশু মিত্র, রাজেন্দ্র সিংহ, বীরেন্দ্র ঘোষ, বৈজনাথ পাণ্ডে ও হারাধন মজুমদার গ্রেপ্তার। ১৪ই, উত্তর কলিকাতার দুই স্থানে তল্লাসী, ৭ জন গ্রেপ্তার। ১৭ই, চারি স্থানে তল্লাসী, কিছু বিস্ফোরক পদার্থ ও প্রচারপত্র হস্তগত। ১৮ই, উত্তর কলিকাতায় তল্লাসী করিয়া কিছু বিস্ফোরক পদার্থ ও আপত্তিকর প্রচারপত্র হস্তগত। ... আইন অনুসারে মোহনলাল মুরালা, গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও রমেশচন্দ্র সেন গ্রেপ্তার। ২০শে চৈত্র, বিস্ফোরক পদার্থ রাখিবার অভিযোগে একজনের ৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। ২৩শে ও ২৪, কয়েক স্থানে তল্লাসীর ফলে কতকগুলি আপত্তিকর কাগজপত্র প্রাপ্তি, ৬ জন গ্রেপ্তার।

ঢাকা—৩০শে ফাল্গুন, টিপসহি দিবার জন্য বন্দী ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্তা আশালতা সেন, শিবানন্দ দত্ত, বীরেন গুহ, গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়, ও কিরণ চক্রবর্ত্তী দণ্ডিত। ১৪ই চৈত্র, লুতাবদী বয়রাগাদি ঋণ-সালিশী বোর্ড অফিসের নথিপত্র পুড়াইবার অভিযোগে মুন্সীগঞ্জের মোক্তার অমূল্যকুমার দাস, সুরেন্দ্রনাথ দত্ত, জিতেন্দ্রচন্দ্র দাস ও বন্ধু চক্রবর্ত্তী দণ্ডিত। ১৬ই, আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত অমূল্যচন্দ্র সেন ভারতরক্ষা বিধির ১২৯ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার, তাঁতিবাজারের লোকনাথ বসাক গ্রেপ্তার, শ্রমিক কর্ম্মী দীনেশ সেনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত। ১৭ই, ঢাকার আদালত প্রাঙ্গণে এক স্কুলের ছাত্র গ্রেপ্তার। ২১শে—দিল্লী হইতে প্রেরিত ৩ ও ৯ বড় ছোরাপূর্ণ এক রেলওয়ে পার্শ্বেল প্রাপ্তি, ১ জন গ্রেপ্তার। ২৫শে, শ্রীনগর থানার শোলাগড়ে গোয়েন্দা কর্ম্মচারী ও কনষ্টেবলকে মারপিট করিয়া একজন ধৃত ব্যক্তিকে উদ্ধার, ৫০ জন যুবক গ্রেপ্তার, কংগ্রেসকর্ম্মী মণীন্দ্র মুখোপাধ্যায় গ্রেপ্তার।

ময়মনসিংহ—২৪শে ফাল্গুন, টাঙ্গাইল মহকুমার এক গ্রামে গ্রামবাসীদিগের সহিত দুই যুবকের সঙ্ঘর্ষ, বন্দুক ও রিভলভার ব্যবহার, ৪ জন আহত। আহত অবস্থায় রিভলভার সমেত যুবকদ্বয় (এক জন পলাতক বন্দী) গ্রেপ্তার।

ত্রিপুরা—১১ই চৈত্র, ত্রিপুরা জিলা ফরওয়ার্ড ব্লকের সম্পাদক আশুতোষ মাইতি দশ মাস দণ্ডভোগের পর মুক্তিলাভ করিলে পুনরায় গ্রেপ্তার।

বর্দ্ধমান—১৩ই চৈত্র, ৬ মাস কারাদণ্ডের পর কংগ্রেস নেতা যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজার মুক্তিলাভ। জিতেন্দ্রনাথ চৌধুরীর আত্মসমর্পণ।

দিনাজপুর—৫ হাজার লোক কর্ত্তৃক বালুরঘাট সহরের ডাকঘর, আদালত ও ব্যাঙ্ক প্রভৃতি আক্রমণ ও অগ্নিদানের সম্পর্কে ৩৭ জন ২ হইতে ৭ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত।

আসাম—৪ঠা চৈত্র আসাম পরিষদে জানান হয় যে, ঐ তারিখ পর্য্যন্ত আসামের বিভিন্ন জেলে প্রায় ২২৭ জন আটক। সর্ত্তাধীনে কিছু দিনের জন্য এ সকল বন্দীকে মুক্তি দিতে সরকার প্রস্তুত নহেন। ২৮শে ফাল্গুন—ধুবড়ীর এক গৃহে বোমা বিস্ফোরণ, ১ জন যুবক নিহত, ৯ জন আহত। গৌহাটী কটন কলেজে বোমা বিস্ফোরণ। ধুবড়ীর একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের আফিস-গৃহ ধ্বংস করিবার চেষ্টায় ১ জন ছাত্র অভিযুক্ত। সরুপাথার ষ্টেশন হইতে ৩।৪ মাইল দূরে ট্রেন-দুর্ঘটনা ঘটাইবার অভিযোগে ৪ জনের প্রাণদণ্ড, ২ জনের ১০ বৎসর করিয়া কারাদণ্ড; ২৩ জনকে মুক্তিদানের পর গ্রেপ্তার। ২৯শে—ঢেকিয়াজুলি (তেজপুর) একটি বন্দুক চুরি। বিশ্বনাথ গ্রামের বাংলায় অগ্নি-সংযোগ। শ্রীহট্টে আটক বন্দী ফরওয়ার্ড ব্লকের কর্ম্মী নলিনী গুপ্ত দশ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত। ১লা চৈত্র, পুলিস কংগ্রেসকর্ম্মী বৈকুণ্ঠ সিং ও গোলাঘাটের অপর ৩ জন কর্ম্মীর সন্ধানে ছিল, কুমারবন্দে তাঁহারা ধৃত। নওগাঁয় ভোগেশ্বর নিয়োগ ও নলিনীকুমার সাইকিয়া অভিযুক্ত হইয়া অব্যাহতি পাইবার পর পুনরায় গ্রেপ্তার। কালিয়াবাদের উকিল লীলাকান্ত বেরা গ্রেপ্তার। ১৩ই—বাটাবাড়ী (বড়পেটা) বন-বিভাগের ভবনে অগ্নিদানের অভিযোগে দুই যুবক দণ্ডিত। তেজপুরে ধ্রুবানন্দ চালিহা ও অজয়ানন্দ চালিহা ভাঃ রঃ বিধির ১২৯ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার, আসাম কংগ্রেসের সম্পাদক নারায়ণচন্দ্র ভূইঞাকে মুক্তিদানের পর আটক। ১৮ই—দরং জিলার ৩৮ খানি গ্রামের অধিবাসীদিগের উপর ১ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য্য। ২২শে—কংগ্রেসকর্ম্মী মাণিকচন্দ্র দত্তকে ২৪ ঘণ্টা মধ্যে ধুবড়ী ত্যাগ করিতে আদেশ।

সিন্ধু—৭ই চৈত্র ও ৮ই চৈত্র, করাচীতে অস্ত্রশস্ত্রসহ পথে চলা নিষিদ্ধ। ২৩শে চৈত্র, সিন্ধু ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য রইস রসুল বক্স তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। মামলায় একজিবিট রূপে একটি ট্রাঙ্ক দায়রা আদালতে লইয়া যাইবার সময় ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ, দুই জন পেয়াদা বিষম আহত।

বোম্বাই—২৮শে ফাল্গুন—বেলগাঁওয়ের সহরতলী খালা-কাওয়াড়ীর পুলিশচৌকীতে অগ্নিদান। সিদিনী ষ্টেটের শিরহট্টী তালুকের এক গ্রাম্য চৌরা ভস্মীভূত। বরমতী ডাকঘর ও রেলওয়ে ষ্টেশনে অগ্নিদানের অভিযোগে ১ জন দণ্ডিত। ৫ই চৈত্র—নিমবাগ ষ্টেশনে অগ্নিদানের অভিযোগে ৬ জনের প্রত্যেকের ৫ বৎসর কারাদণ্ড। ৭ই, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুকে অসুস্থতার জন্য মুক্তিদান। ১০ই, আমেদাবাদে সান্ধ্য আদেশের মেয়াদ বৃদ্ধি, ভারত রক্ষা বিধি বলে দুই জন গ্রেপ্তার। ১৩ই, আমেদাবাদে এক ছাত্র সম্মেলন সম্পর্কে ২৫ জন গ্রেপ্তার। ১৪ই আমেদাবাদে বনভোজনের জন্য নদীর ধারে সমবেত ১৬ জন ছাত্রকে গ্রেপ্তার। ১৫ই, আমেদাবাদ রেলওয়ে ষ্টেশনে একবাক্সে ৪টি বোমা ও ১০ পাউণ্ড বারুদ প্রাপ্তি। বেলভেদা গ্রামের (সুরাট) চৌরা ভস্মীভূত। ১৬ই, রূপবাদ থানার (শাংলি) সম্মুখে দুই বার এবং এক ধর্ম্মশালায় ১ বার বিস্ফোরণ,

২ জন নিহত, ৬ জন আহত। আলানওনারে (বেলগাঁও) এক ব্যাঙ্ক লুঠ সম্পর্কে ২৬ জন গ্রেপ্তার। দুই ব্যক্তির পুলিশের হেফাজত হইতে পলায়ন। কোলাপুরে সংগৃহীত রাজস্বের কিয়দংশ লুণ্ঠিত। রেলপথে লাইন অপসারণের ফলে ডাকগাড়ী লাইনচ্যুত করিবার অভিযোগে জলগাঁওয়ে ৫জন দণ্ডিত। ১১শে নদিয়াদের এক বিদ্যালয়ে অগ্নিদানের অভিযোগে এক জনের যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ড, ১ জনের ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড। ২০শে, আমেদাবাদে পুলিশদল আক্রান্ত, একজন পুলিশ আহত; দুইটি মিউনিসিপ্যাল বিদ্যালয়ে অগ্নিদান। কোলাপুর রেলওয়ে ষ্টেশনে বিস্ফোরণ, ৩ জন আহত। কানাওয়াড়ে গ্রামের চাবাদি হইতে আদায়ীকৃত খাজনা লুণ্ঠনের নিষ্ফল চেষ্টা। ব্রোচ জিলার সরভন গ্রামের এক পুলিশ-চৌকীতে অগ্নিদান। বেলগাঁওয়ের সাহাপুর সরাফগুলিতে বিস্ফোরণ। হুদলি গ্রাম হইতে ৫ জন গ্রেপ্তার। কুমারী গ্রামে সকল গৃহে তল্লাসী। ২৩শে বেলগাঁও মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার ডাঃ টি, জি, যোশী ও অপর ৪ জন গ্রেপ্তার।

যুক্ত-প্রদেশ—২৭শে ফাল্গুন, আন্দোলন ও বিক্ষোভের ফলে প্রাদেশিক বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২ জন ছাত্রকে বারাণসী ডিভিসন হইতে বহিষ্করণ। জনৈক ছাত্র গ্রেপ্তার। ৫ই চৈত্র—বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯ জন ছাত্রের প্রতি স্থান-ত্যাগের আদেশ। সরকারের ২৫ লক্ষ হইতে ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়। ২৮ লক্ষ টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য্য। আন্দোলন সম্পর্কিত বন্দীদিগের জন্য প্রতি মাসে ১ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয়। আগষ্টে বালিয়ার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে ট্রেজারীতে রক্ষিত ৪ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকার কারেন্সী নোট পোড়ানো হয় বলিয়া প্রকাশ, পরে জানা যায় যে পোড়ানোর সার্টিফিকেট দেওয়া হইলেও কিছু নোট বাজারে চলতি; রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক নোটগুলির মূল্য পরিশোধের অনুরোধ। ২০শে বিনা লাইসেন্সে পিস্তল রাখার অভিযোগে বারাণসীতে বাবুলাল নামে এক জন দণ্ডিত। পিস্তল-নির্ম্মাণ কালে (বারাণসীতে) শিবপ্রসাদ নামে এক জন অস্ত্র আইন অনুসারে ধৃত—দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। ২১শে—পুলিস-দখলে বারাণসীর গান্ধী-আশ্রম।

সীমান্ত-প্রদেশ—কেন্দ্রী পরিষদে স্বরাষ্ট্র সদস্য বলেন—২৫শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত সীমান্ত-প্রদেশে ৪৯৩ জন আটক। ১১ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ১৪৩২ জন দণ্ডিত। ১লা চৈত্র—সীমান্ত প্রাদেশিক পরিষদে কংগ্রেস-দলের সদস্য খান বাহাদুর জারিন খান গ্রেপ্তার।

মাদ্রাজ—২৬শে ফাল্গুন, রাজমহেন্দ্রীর সরকারী উকীল মিঃ ডি ভি, সুব্বারাওন পদত্যাগ করায় ৬ মাস কারাদণ্ড ও ৩০০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত। ৩০শে, মাদুরার কংগ্রেস নেতা মিঃ পারিয়া আম্বালাম, মিঃ টি, জি কৃষ্ণমূর্ত্তি গ্রেপ্তার। ১০ই চৈত্র—শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু মারকারা হইতে উতকামণ্ডে স্থানান্তরিত। ১৩ই—শ্রীযুত এস, সত্যমূর্ত্তির মৃত্যু। ২১শে—এক লবণগোলা লুণ্ঠন ও আবগারী ইনস্পেক্টরকে হত্যা করিবার অভিযোগে ২ জনের প্রাণদণ্ড, ২১ জনের ৩ হইতে ১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

পঞ্জাব ও কাশ্মীর—২৮শে ফাল্গুন, পঞ্জাব ব্যবস্থা পরিষদে প্রধান সচিব জানান, এক গোপন ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত এবং বহু অস্ত্র ও ক্ষতিকর কার্য্যের যন্ত্রাদি হস্তগত, এক মহিলার নিকট ৩টি রিভলভার প্রাপ্তি। ১লা চৈত্র—শ্রীনগরে এক দর্জ্জির দোকানে বিস্ফোরণ, ১ জন নিহত, ২ জন আহত। ১৭ই চৈত্র অখণ্ড হিন্দুস্থান সম্মেলনের মনোনীত সভাপতি ও আকালীদলের সভাপতি বাবা খড়্গ সিং, সর্দ্দার ভগবান সিং এবং সর্দ্দার তেজসিং গ্রেপ্তার।

দিল্লী—২৮শে ফাল্গুন অবৈধ শোভাযাত্রার জন্য ৩ জন তরুণী গ্রেপ্তার।

উড়িষ্যা—২০শে চৈত্র পর্য্যন্ত উড়িষ্যায় ৩ শত ৫৪ জন আটক, বিক্ষোভ সম্পর্কে ১২ শত ৬৬ জন দণ্ডিত। উড়িষ্যা পারিষদে প্রকাশ, ১৫ই নভেম্বর একদল সশস্ত্র রিজার্ভ পুলিসকে বহরমপুর জেলে লইয়া যাওয়া হয়, তাহারা জেলের রাজনৈতিক বন্দীদিগের উপর লাঠী চার্জ্জ করে কয়েক জন বন্দী আহত হয়। ১১ই চৈত্র—কোরপুট জিলায় দেবগাঁও থানা আক্রমণ, অবৈধ ইস্তাহার বিলি, পাহাড়িয়াদিগের সহিত সংযোগ রক্ষার ব্যবস্থা নষ্ট করা, সংরক্ষিত বনের ক্ষতি করা, সরকারী ভবনগুলিতে অগ্নিসংযোগ, খাজনা ও ট্যাক্স বন্ধের আন্দোলন করা, সেতু ভাঙ্গিয়া গাছ ফেলিয়া জয়পুরের রাস্তা অবরোধ প্রভৃতির অভিযোগে ১৭ জনের মধ্যে ৮৯ জন ৩ মাস হইতে ৩ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত।

মধ্য-প্রদেশ—১২ই চৈত্র মধ্যপ্রাদেশিক সরকারের অর্থ বিভাগের সেক্রেটারী সাংবাদিকগণকে জানান যে, কংগ্রেসের আন্দোলনের ফলে সাড়ে এগার লক্ষ টাকার সরকারী সম্পত্তির ক্ষতি হয়। রামটেক সাব ট্রেজারী হইতে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা লুণ্ঠিত। প্রায় ১ লক্ষ টাকার কারেন্সী নোট পরে উদ্ধার হয়। পাইকারী জরিমানা করিয়া ৩ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা আদায় হয়। আন্দোলনের জন্য প্রায় ৭ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হয়। পুলিশবাহিনীর সম্প্রসারণের জন্য ১৪ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা ব্যয় হয়। বন্দীর সংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়ায় জেলের জন্য ৩ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা অধিক ব্যয় হয়।

বিহার—১লা চৈত্র, মজঃফরপুরে এক গৃহ হইতে কতকগুলি রিভলভারের তাজা কার্ত্তুজ প্রাপ্ত, বাড়ীর মালিক গ্রেপ্তার। ১৫ই চৈত্র ভারত-রক্ষা বিধির ১২৯ ধারা অনুসারে অতুলচন্দ্র মিশ্র রাঁচিতে গ্রেপ্তার। ১৭ই—মুঙ্গের জিলার ৮ খানি গ্রামের উপর ৮৭৬০ টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য্য। ২৩শে—বানগাঁও থানার ১৩ খানি গ্রামের উপর আড়াই হাজার টাকা ও বাঁকা থানার ৪ খানি গ্রামের উপর ১৩ শত টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য্য। ২৬শে, হাজারিবাগ জেল হইতে পলাতক (৯ই নবেম্বর) জয়প্রকাশ নারায়ণকে গ্রেপ্তারের জন্য ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা।

সংবাদপত্র ও মুদ্রণ-প্রতিষ্ঠান—২৭শে ফাল্গুন পুণার লোকসানগড় ছাপাখানার নিকট ৯৫০০ টাকা জমানৎ তলব। ২৯শে, লাহোরের উর্দ্দু সাপ্তাহিক পত্র 'ন্যাশনাল কংগ্রেসের' নিকট ১ হাজার টাকা জমানৎ তলব, পত্রের নাম পরিবর্ত্তন করিতে অনুরোধ। ১লা চৈত্র, বিহার সরকার কর্ত্তৃক 'সার্চ্চ লাইট' পত্র প্রকাশের নিষেধ আদেশ প্রত্যাহার। ৪ঠা, অনন্তপুরমে (মাদ্রাজ) সাধনা প্রিণ্টিং প্রেসে তল্লাসী, কয়েকখানি পুস্তক পুলিশ কর্ত্তৃক সংগৃহীত। ১০ই বাঙ্গালা-সরকার কর্ত্তৃক সাম ফ্যাক্টস এবাউট মিডনাপুর ট্র্যাজিডি (মেদিনীপুরের শোচনীয় ব্যাপার সম্বন্ধে কয়েকটি সত্য কথা) নামে হিন্দু মহাসভার প্রকাশিত পুস্তিকা বাজেয়াপ্ত। ১২ই মারাঠী সাপ্তাহিক পত্র 'বেলগাঁও সমাচারের' সম্পাদক শ্রীযুত শঙ্কররাও পারুলেকার গ্রেপ্তার।

শ্রীযতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত